সংস্কৃতি ও সভ্যতা

মানুষের ইতিহাসের ধারাকে সজাগ দৃষ্টি নিয়ে অনুসরণ করে যারা তারা জানে, অনুকরণ করবার প্রবৃত্তি আত্মঘাতের পথকেই প্রশস্ত করে। অপরের অনুকরণ করতে যাওয়ার সার্থকতা কোনখানে? একের বেলায় যা সত্য, অপরের বেলায় তা সত্য নাও হ'তে পারে। এক সময়ে যার প্রয়োজন আছে পরবর্ত্তীকালে তার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে না—একথা জোরের সঙ্গে বলবার সাহস আছে কার? চিরন্তন সত্য ব'লে কিছু আছে কিনা—বলা বড় কঠিন। আমাদের অভিজ্ঞতা আমাদিগকে বলে, যে কথা একটা জাতির পক্ষে সত্য—সে কথা আর একটা জাতির পক্ষেও সত্য হবে—এমন কোনো বিধান নাই। কোনো একটা বিশেষ যুগের সত্যকে শাশ্বত ব'লে যখন আমরা পূজা দিতে আরম্ভ করি, তখনই আরম্ভ হয় গোঁড়ামির যুগ। প্রাণের পরিবর্ত্তে কঙ্কালের কাছে অর্ঘ্য দেওয়ার পালা সুরু হয়। কর্ত্তাভজার দল জ্ঞানকে বধ করে শাস্ত্রের কারাগারে। গুরুকে সম্মান করতে গিয়ে মানুষ নেমে যায় গরুর স্তরে। মগজের চেয়ে টিকির খাতির যায় বেড়ে।

শাশ্বত আর মরণশীল—এরকম দুটো ভাগে সত্যকে আমরা ভাগ করতে পারিনে। কোনো সত্যই শাশ্বত নয়। একটা বিশেষকালের প্রয়োজনকে আশ্রয় ক'রে জন্ম নেয় এক একটা মতবাদ। কালের চাকা ঘুরে যায়—মতবাদও হারিয়ে ফেলে তার সজীবতা। নতুন কাল আসে কণ্ঠে নতুন যুগের মন্ত্র নিয়ে। সেই মন্ত্রকে স্বীকার ক'রে নেবার সাহস থাকে না যাদের তারা ঘুন-ধরা, মরা-সত্যের শবদেহকে আঁকড়ে ধ'রে চণ্ডীমণ্ডপের মাটি কামড়ে প'ড়ে থাকে। যেখানে ভাঙা-[illegible]ক আর গোলা পায়রা, চামচিকে আর টিকটিকি বাঁশ-ঝাড় আর আশশ্যাওড়ার জঙ্গল—সেখানে শ্যাওলা-ঢাকা প্রাচীনের যূপকাষ্ঠে সত্যকে বলি দিয়ে বুড়ো-খোকারা আওড়াতে থাকে মনুসংহিতার শ্লোক! কেবল পুরানোকে আঁকড়ে থাকে যারা তারাই কি শুধু সত্যকে অস্বীকার করে? যারা নতুনের মোহে বড় বড় বুলির বন্যায় ভেসে গিয়ে বাস্তব থেকে দূরে স'রে যায় তারাও তো সত্যকে কম অস্বীকার করে না। শাস্ত্র মানুষকে যতখানি গোঁড়া করে—বিজ্ঞান তার চেয়ে কম করে না। পরাশর আর বেদব্যাসকে অনুসরণ ক'রে মানুষ যেমন সত্যের সঙ্গে আপনার যোগকে হারিয়ে ফেলতে পারে—নীটশে আর ইবসেনকে অনুসরণ করতে গিয়েও সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া খুবই সম্ভব।

তা'হলে সত্যকে যাচাই করবার কষ্টিপাথর কি? কোন্ মতবাদকে আমরা প্রাধান্য দেবো? বুলি শুনে শুনে আমাদের কান ঝালাপালা হ'য়ে গেল। পারঘাটায় এসে দাঁড়িয়েছি। সামনে সংশয়-সাগর ফুলে ফুলে উঠছে। মাঝিদের ভীড়। প্রত্যেকে বলে, আমার নৌকায় এসো—আমি তোমায় পার করে দেবো। কোন্ নৌকায় পা দেবো? কোন্ মাঝিকে বিশ্বাস করবো? কোন্ মতবাদে আস্থা রাখবো? মার্ক্সবাদে না গান্ধীবাদে? কুটীর-শিল্পে না বড় বড় কলকারখানায়? ডিমোক্র্যাসিতে না ডিক্টেটরশিপে? [illegible] না সত্যাগ্রহে?

এই সব প্রশ্নের উত্তরে কেবল এই কথাই আমরা বলবো—ধার-করা কোনো বুলি দিয়ে কখনই আমরা সত্য-মিথ্যার যাচাই করতে যাবো না। ভারতবর্ষের মঙ্গল কোন্ পথে—তার বিচার করবো আমরা বাস্তবের কষ্টিপাথরে। যেহেতু অমুক পণ্ডিত এই কথা লিখে গেছেন অমুক পুঁথির পাতায় সেই হেতু তাঁর বাণী সত্য হ'তে বাধ্য—এ হলো গোঁড়ামির কথা। আইডিয়া যতই বড় হোক, তা নিষ্ফল হ'তে বাধ্য, যদি বাস্তবের সঙ্গে তার যোগ না থাকে। জীবন হচ্ছে সকলের চেয়ে বড় কথা। জীবনের প্রয়োজনে যে মতবাদের উদ্ভব—প্রাধান্যের উপরে দাবী আছে শুধু তার।

কোন মানুষ সত্যিকারের চিন্তাবীর কিনা—তার বিচার করবো আমরা কোন্ মাপকাঠি দিয়ে? সমসাময়িক বড়ো বড়ো ঘটনাগুলি কোন দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করছে—তা দেখবার দৃষ্টি আছে যার সেই হলো সত্যিকারের চিন্তাবীর। অনেক বড় বড় নামজাদা মানুষকে বলতে শুনেছি মস্ত মস্ত আদর্শের কথা। দেশ-বিদেশের ইতিহাস আর দর্শন তাঁদের ঠোঁটস্থ। কিন্তু যুগের উপরে আঁচড় কাটতে এত অক্ষম কেন তাঁরা? কারণ পাণ্ডিত্যই আছে, দৃষ্টি নেই। আইডিয়া যতই বড় হোক তার কোন মূল্য থাকে না যখন দৃষ্টিহীন মূর্খ হয় তার বাহন।

A philosopher who cannot grasp and command actuality as well will never be of the first rank.

যুগের বুকের উপরে কান রেখে শোনা চাই তার অন্তরের ধ্বনিকে। সময়ের তালের সঙ্গে তাল রেখে চলা চাই।

A doctrine that does not attack and affect the life of the period in its inmost depths is no doctrine and had better not be taught.

যুগের অন্তরের গভীরতম প্রদেশকে নাড়া দেবার ক্ষমতা নেই যে বাণীর—সে বাণী প্রচারের সার্থকতা কি?

যুগের এই মর্ম্মবাণীকে অন্তর দিয়ে বুঝবার দিন এসেছে আজ। ইউরোপ চলেছে কোন্ দিকে? আমরা যাবো কোন্ দিকে? তার পথ আর ভারতবর্ষের পথ কি এক? আজ ইউরোপীয় ভাবধারার সঙ্গে ভারতবর্ষের ভাবধারার বেধেছে দারুণ সংঘর্ষ। ভাবের সঙ্গে ভাবের এই প্রচণ্ড সংঘাতের দিনে আজ আমাদের জেনে নিতেই হবে—পাশ্চাত্য সভ্যতার গতি কোন্ পথে।

তার গতি মৃত্যুর দিকে। ইউরোপের culture মরে গেছে—বেঁচে আছে তার civilisation. Culture বলতে যা বোঝায় civilisation বলতে তা বোঝায় না।

The energy of culture-man is directed inwards, that of civilisation-man outwards.

[illegible]

বহির্মুখী। সঙ্গীতের মধ্যে, চিত্রকলার মধ্যে, সাহিত্যের মধ্যে, স্থাপত্যশিল্পের মধ্যে মানুষের সংস্কৃতির প্রকাশ। সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে সভ্যতার উলঙ্গ রূপ। সংস্কৃতির অনিবার্য্য পরিণতি সভ্যতায়। সভ্যতা যখন এলো তখন অন্তরের দিক দিয়ে মানুষ দেউলে হ'য়ে গেছে। সভ্যতার যুগ হলো কলির সন্ধ্যা। প্রাণের ফসল ফলানোর সোনালি শরৎ শেষ হ'য়ে গেছে—এসেছে মগজের আধিপত্যের তুষার-কঠিন দিন। জীবনের মধ্যাহ্ন শেষ হ'য়ে গেছে—এসেছে মৃত্যুর রাত্রি। সভ্যতার যুগে মাটির সঙ্গে মানুষের নাড়ীর যোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। সভ্য মানুষ নিজেকে বন্দী ক'রে ফেলেছে নগরের নীরস পাষাণ-অট্টালিকার মধ্যে। সংস্কৃতির জন্ম মাটি-মায়ের বুক থেকে। প্রাণের চঞ্চলতায় সে জীবন্ত। সভ্যতার সৃষ্টি মগজ থেকে। তার মধ্যে যন্ত্রের আড়ষ্টতা। মানুষের পরমায়ুর যেমন শেষ আছে, সংস্কৃতির যুগেরও তেমনি একটা সমাপ্তি আছে। সংস্কৃতির সমাপ্তি যেখানে সভ্যতার আরম্ভ সেখান থেকে।

ইউরোপ আজ চলেছে তার সভ্যতার যুগের মধ্য দিয়ে। এই সভ্যতার যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নগরের প্রাধান্য। নগরকে কেন্দ্র ক'রে যা কিছু লীলাখেলা। গ্রামগুলির প্রাণচাঞ্চল্য একদিকে যেমন মন্দীভূত হ'য়ে আসছে, আর একদিকে তেমনি উচ্ছল হ'য়ে উঠছে শহরের কৃত্রিম জীবন-প্রবাহ। গ্রাম থেকে দলে দলে মানুষ এসে শহরের অট্টালিকাগুলির কক্ষে নিচ্ছে আশ্রয়। পল্লী থেকে গাড়ী বোঝাই হ'য়ে আসছে খাদ্যসামগ্রী—আর সেই অন্নে পালিত হচ্ছে শহরের পরভোজীর দল। এই শহুরে নরনারিগণের রুচিও যেমন অদ্ভুত, জীবন যাত্রাপ্রণালীও তেমনি অদ্ভুত। জাতির সাধনার ধারার সঙ্গে জীবনের যোগ লোপ পেয়েছে। পাউন্ড-শিলিং-পেন্সের বাইরে যা কিছু সবই মূল্যহীন! নিজের কোলে ঝোল টানবার বেলায় ভারি উৎসাহ। কি ক'রে স্বার্থ ষোলোআনা বজায় রাখা যায়, সে দিকে সদা জাগ্রত দৃষ্টি! অবসর সময়ে কথাবার্ত্তার বিষয় হচ্ছে মোটরকার, সিনেমা-ষ্টার, নয়তো ময়দানের ম্যাচ। শহরের বাইরে যারা গ্রামের লোক, তারা সব 'গেঁয়ো'—ভদ্রলোকদের সঙ্গে মেলামেশা করবার অনুপযুক্ত! পাঠ্যতালিকা সংবাদ-পত্রের আর ডিটেক্টিভ উপন্যাসের দ্বারা সীমাবদ্ধ। আত্মা-টাত্মা সবই ভুয়ো! যৌন ব্যাপারে যে সব বিধি-নিষেধ আছে, তাদেরও কোনো মানে হয় না! ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ের বাহিরে যা তার কোনো অস্তিত্ব নেই! এরই নাম শহুরে আবহাওয়া! নিপুণ তুলিকায় পাশ্চাত্যের শহুরে জীবনের এই ছবি এঁকে নোবেল প্রাইজ পেলেন সিনক্লেয়ার লুইস। সভ্যতার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কাঞ্চন-কৌলীন্য। টাকাকে বাদ দিয়ে সভ্যতার কোনো ধারণা করতে পারিনে আমরা। এই বৈশ্য-যুগকে শাসন করছে কার্ণেগী আর রকফেলারের দল। সভ্যতার চরম পরিণতি সাম্রাজ্যবাদে। Spengler-এর ভাষায় Imperialism is Civilisation unadulterated. সাম্রাজ্যবাদের ঘানিতে পাশ্চাত্য-সভ্যতা বাঁধা প'ড়ে গেছে। এ বন্ধন থেকে তার মুক্তি অসম্ভব। সংস্কৃতির যুগের মানুষ আর যুগের মানুষের জীবনধারার গতি একপথে নয়। ধর্ম্ম হচ্ছে বিস্তার। গভীরতার একান্ত অভাব তা সভ্য-মানুষ বাহিরের জগৎটাকে হাতের মুঠোয় মধে জন্য এতই ব্যস্ত যে, ভিতরটার দিকে তাকা আদৌ সময় নেই। সিসিল রোড্‌স্ হচ্ছে এ যুগে ক্যাল মানুষ। বোঝে না সৌন্দর্য্য, বোঝে না মঙ্গল শুধু টাকা আর টাকাকে পাবার জন্য বিয়ন্ত গরুর বিশ্বটাকে শিং দিয়ে গুঁতিয়ে বেড়াচ্ছে।

পাশ্চাত্যের ইতিহাসে বিঠোফেনের মহাসঙ্গীত দিন শেষ হ'য়ে গেছে—শেষ হয়ে গেছে র‍্যাফেলের মাইকল এঞ্জেলোর সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির অধ্যায়। চরণমূলে পূজো দেবার পালা শেষ ক'রে ইউরোপ আ করেছে কামান-পূজোর পালা। এ হোলো কবির ইঞ্জিনীয়ারের যুগ। বাঁশি যে বাজাবে সে ম'রেছে। পাখায় ভর দিয়ে মেঘলোকে বিচরণ করতে চাবে অবস্থা হবে কাহিল। এ যে যন্ত্রের যুগ। চণ্ বসে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ আর কালিদাসের মেঘদূত কাল অতীত হয়ে গেছে। এসে গেছে রাজনীতি কলকব্জার যুগ। সমুদ্রে নাবিক হয়ে যাবার সা যার, তার জীবন-সংগ্রামে টিঁকে থাকবার আশা আছে ধরবে যে—তার জীবনের দিগন্ত ঘনঘটাচ্ছন্ন। ইউনি গ্রন্থাগারে ফিলসফির কচকচি ক'রে বেশী কিছু আছে? সেই ক্যাণ্ট, সেই হেগেল, সেই আত্ম বিচার, সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ নিয়ে আলোচনা। ঝুড়ি থিসিস লেখা হ'য়ে গেলো এদের উপরে। ঝুড়ি থিসিস লেখার পরিণতি কোন্‌খানে? থোড়-—খাড়া-বড়ি-থোড়। সময় নষ্ট, অর্থ নষ্ট, উ তার চেয়ে অনুর্ব্বর ক্ষেত্রে ফসল ফলানে ঢের বেশী প্রশংসনীয়। দার্শনিক মতবাদের ধোঁয় পুরাতনের জ্যবরকাটার দিন শেষ ক'রে দেওয়াই এসেছে বাস্তবের কঠিন দিন। এই বাস্তবকে স্বী নেওয়ার মধ্যেই আমাদের মঙ্গল।

পাশ্চাত্যকে বর্জ্জন করতে গিয়ে তার সবই বন্ধ —এ কোনো কাজের কথা নয়। পাশ্চাত্যের অনুক গিয়ে তার সবকিছুই নির্ব্বিচারে গ্রহণ করবো—এ কাজের কথা নয়। একটা জিনিষ ভালো ক'রে মনে ইউরোপের সভ্যতা মৃত্যুর পথে। সংস্কৃতির দি তার যা দান করবার ছিলো মানুষের ইতিহাসকে ঐ করবার জন্য—সে দান ফুরিয়ে গেছে। নতুন ক' বিঠোফেনের, র‍্যাফেলের, মাইকেল এঞ্জেলোর অভ্যুদ অল্পই। এর জন্য হা-হুতাশ ক'রে কোনো লা জন্মালেই মৃত্যু আছে। যৌবনের পরিণতি কালচার সম্পর্কেও এই কথা খাটে। Every passes through the age-phases of the ir

(শেষাংশ ৭৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জলধর সেন

অধ্যাপক শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়

(১)

কোন বিশিষ্ট বড়লোক মারা গেলে আমাদের বলা অভ্যাস, "ও, একজন দিকপাল চলে গেলেন; একটা স্থির তারকা আকাশ অন্ধকার করে আজ খসে পড়ল! যিনি গেলেন তাঁর শূন্যস্থান পূর্ণ হওয়া অসম্ভব।" ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সুবিধার কথা এই যে, জলধরদা'র মৃত্যুতে আমাদের এ রকম অত্যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে' অলীক ভাষণের কোন প্রয়োজন নেই। জলধরদা কোনদিন সাহিত্যের কোন বিভাগেই নিজেকে একজন ক্ষণজন্মা, নেতা, অগ্রণী বা দিকপাল বলে' প্রচার করবার চেষ্টা করেন নি। অথবা, বাগ্দেবীর তিনি মাত্র একজন নীরব সাধক—এই পরিচয়ে বিনয়ের গরিমায় গলে গিয়ে তিনি লোক-সন্তোষ আকর্ষণের চেষ্টাও করেন নি। গরীবের ঘরের ছেলে হয়ে জন্মেছিলেন; তাঁর দীর্ঘজীবনে, কোন সময়েই—ঠিক যাকে সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্য বলে—তা তাঁর ভাগ্যে জোটে নি। স্কুল-মাষ্টারী, প্রাইভেট টিউটরী, সংবাদপত্রের দপ্তরে সম্পাদকীয় বিভাগে সহকারীর কাজ—এই রকম করে তাঁর জীবনের প্রথম অধ্যায় ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে অতিবাহিত হয়। পরে তিনি "ভারতবর্ষে'র" সম্পাদক হয়ে' কয়েক বৎসর একটু আরামে কাটিয়েছিলেন সত্য। কিন্তু বিত্ত বা বিভবের দিক থেকে নিরঙ্কুশ সমৃদ্ধি তিনি কোন দিনই ভোগ করতে পান নি। এর উপর—রোগ-শোকের ধাক্কায় তাঁকে অনেকবার বিব্রত হ'তে হয়েছে। ফলত, জীবনধারার অবাধ গতিতে অনেকবারই তাঁকে ছন্দ-পতনের দুর্ভোগ ভুগ্‌তে হয়েছিল। আমাদের শতকরা ৯৯ জনের ভাগ্যে যা সচরাচর ঘটে, সাংসারিক জীবনে তাঁর পক্ষেও তাই ঘটেছিল। তাই আমাদের সাহিত্যে আজ পর্য্যন্ত যে সমস্ত শক্তিমান লেখককে গরীবের ও চিরদুঃখীর দরদী বন্ধুরূপে আমরা পেয়েছি, নিঃসংশয়ে বলতে পারি যে, জলধরদা আপন দারিদ্র্য ও দুঃখের মর্য্যাদায় তাঁদের অগ্রণীদের অন্যতম। দুঃখের সুর তাঁর বাঁশীতে পরের 'ফু'-এ বাজে না। তাই তিনি করুণ রসের রাজা। আর তাই জীবনের প্রথম থেকেই তাঁর একটা ঝোঁক এই ছিল যে, যা কিছু তিনি পেয়েছেন বা হারিয়েছেন তার একটা পরিচয় তিনি রেখে যাবেন। এই পাওয়া বা হারানোর ভিতরে হয়ত অসাধারণ বা অলৌকিক কিছুই নেই। তবু এটা তাঁর নিজস্ব। এবং নিজের এই "স্ব" বা সম্পদ তাঁর কাছে ছিল অমূল্য। কারণ, কাঙাল হরিনাথের কৃপায় তাঁর সকল "হারানোকেই" তিনি হাসিমুখে ভগবানে সমর্পণ করার যোগ্যতা লাভ করেছিলেন এবং সকল "পাওয়াকেই" কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করতে দ্বিধা করেন নি—কোন দিনও। এই জন্যই তিনি সাহিত্যের দিকপাল, বা নীরব সাধক না হয়েও আমাদের নিজের আহরণ করা বাণী-ভাণ্ডারে যে সঞ্চয় রেখে গিয়েছেন তার দাম নিতান্ত কম নয়। কম নয় এই হিসেবে যে, সে সঞ্চয়ের মূলে বা সমষ্টিতে ধার করা অথবা মেকী প্রায় কিছুই নেই। অবশ্য আমাদের এ কথাটা তাঁর উপন্যাস বা গল্পগুলির সম্বন্ধেই প্রযোজ্য; "হিমালয়ের" সম্বন্ধে নয়। কারণ দীনেন্দ্রবাবুর এ বিষয়ে যে অভিযোগ আছে তার এখনও সুমীমাংসা হয়নি। কিন্তু করুণ সমবেদনার তারে অশ্রুর মুক্তা দিয়ে গাঁথা তাঁর গল্পগুলি—সত্যই তাঁর নিজস্ব।

তথাপি "সুখের কথা বোলোনা ভাই, বুঝেছি সুখ কেবল ফাঁকি"—এ কথা জলধরদা, কি তাঁর লেখায়, কি তাঁর জীবনে—কখনই স্বীকার করেন নি। তবে—দুঃখকেও তিনি কোন দিন জয় না করলেও—ভয় করেন নি,—এমন কি ভালোবেসেছিলেন। ভালোবেসেছিলেন এই হিসাবে যে, দুঃখই ছিল তাঁর চির-সাথী। চোখের দেখা দিতে সুখের উদয় হলেই তিনি যেন একটু বিব্রত হয়ে উঠতেন। তিনি যেন বল্‌তেন, "সুখ, আমি তোমাকে চিনি; কিন্তু বিদ্যুৎ-দীপ্তির মত ক্ষণিকের লীলা দেখিয়ে আমার জীবনের কোলে গাঢ় অন্ধকারকে তুমি আরও গাঢ় ক'রে তুলো না। তোমার ও মূর্ত্তিকে আমি চিনিনি—কখন স্বীকার করিনি। দুঃখের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে তুমি চিরলিপ্ত,—আর দুঃখই আমার চিরসম্বল। তাই—এই দুঃখের ভিতর দিয়েই দুঃখের ওপারে তোমার চির-অম্লান এক করুণা-মাখা অমর দ্যুতিটি আমি দেখতে পাই। তোমার ঐ চকিত-চিক্কণে আমার চোখে আর ধাঁধা লাগিও না!"

সুখ-দুঃখের এই সম্পর্ক তিনি মেনে নিয়েছিলেন বলেই তিনি আমাদের ঐহিক জীবনকেও সম্পূর্ণরূপে ভালোবাসতে পেরেছিলেন। এ ভালোবাসায় ফাঁক কোথাও ছিল না। রূপদক্ষের মত কলা-বিদ্যা হিসাবে তিনি জীবনের মেঘ ও রৌদ্রের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তাই তাঁর লেখায় ধনীর প্রলাপ, নির্ধনের বিলাপ, পাপীর প্রাণের জ্বালা, পুণ্যাত্মার নিরাবিল সন্তোষ, অনুতাপের তপ্ত-অশ্রু, ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস—সরল ও ঋজুভাবে আত্মপ্রকাশ ক'রে—সমান আদর, সমান অভ্যর্থনা লাভ করেছে! পক্ষান্তরে, তিনি ছিলেন আবার সম্পাদক। সম্পাদক হয়েও ক্ষ্যাপার মত পরশ-পাথর খুঁজতে খুঁজতে, অনেক অমূল্য রত্ন অনেক সময়ে অপ্রত্যাশিত উপায়ে আহরণ ক'রে তিনি আমাদের মায়ের মন্দির সমৃদ্ধ ক'রে দিয়ে গিয়েছেন। তাই আজকের কত খ্যাতনামা লেখক হয়ত আজও অখ্যাত থাকতেন—যদি তাঁরা জলধরদা'র আশ্রয় খুঁজে না পেতেন।

আজ তিনি স্বর্গে। আত্মা যদি সত্যই অবিনশ্বর হয়—তাহ'লে যুগে যুগে আমাদের সৃষ্টি সাহিত্যে যে আবর্ত্তন চল্‌তে থাকবে তার অনেকগুলি স্তরেই তাঁর আত্মার স্পর্শ ও আশীর্ব্বাদ নিদাঘ-শেষে বর্ষার স্নিগ্ধ ধারার মত ঝরে প'ড়ে আমাদের চিন্তা ও চেষ্টাকে সরস, সফল করে তুলবে। তিনি জীবন ও মানুষকে ভালোবাসতেন বলে বাঙালীকেও ভালো-বাসতেন; আর তিনি—বাঙালী হয়ে জন্মেছিলেন বলে বাঙলার মা ও মেয়ের প্রাণ, বাঙালীর সতীত্বের মান, বাঙলার প্রকৃতির ঐশ্বর্য্য, বাঙলার ধর্ম্মের ধ্যান

ছিল তাঁর সকলের চেয়ে আদরের বস্তু। তাই—ব্যথার ব্যথী তিনি—বাঙলার অশ্রুকে বাঙলার বুকভাঙ্গা দীর্ঘ-নিশ্বাসে ঘিরে এমন সুন্দর, সরল, স্বচ্ছন্দভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন।

তিনি কান্নার সঙ্গে হাসি মিশিয়ে আমাদের আনন্দ পরিবেষণ করেন নি—হয়ত এই অপরাধে আমরা একদিন তাঁকে ভুলে যাব। হয়ত—তাঁর অতুল সমবেদনা-ভরা সরস প্রাণটিকে 'বাজে-মার্কা' সস্তার জিনিষ বলে উড়িয়ে দেব; সমালোচনার খোপা-ভাটিতে তাঁর লেখা হয় ত না টিঁকতেও পারে। কিন্তু তিনি আমাদের কখনই ভুলবেন না;—যেমন বঙ্কিম, গিরিশ বা অমৃতলাল, জলধরও তেমনি আমাদের ভুলতে পারেন না। "বাঙালী আমার ভাই, সে যেখানেই থাক,—যে অবস্থায়েই হোক—সে আমার ভাই"—জলধরের এই বাণী চিরসত্য এবং চিরজয়ী! তাই বিস্মৃতির দুঃখ দিয়ে আমরা সেই করুণরসের রসিক দুঃখের দুলালকে কোন দিনই ক্ষুব্ধ করতে পারব না। দুঃখকেই চির-সখার মত বরণ করে নিয়েছিলেন তিনি;—আমাদের অবহেলায় তাঁর অপমান হবে না। অকৃতজ্ঞতার অপমান, পঙ্ক তিলকের মত আমাদেরই হবে চির-লাঞ্ছন! *

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মিরাট শাখায় বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

সংস্কৃতি ও সভ্যতা

(৭২ পৃষ্ঠার পর)

man. ব্যক্তির জীবনে যেমন শৈশব আছে, যৌবন আছে, বার্দ্ধক্য আছে—সংস্কৃতির জীবনেও তাই। প্রাণের বসন্ত ঋতু দেখা দেয় পত্রপুষ্পের ঐশ্বর্য্য নিয়ে—ইতিহাসের উপর দিয়ে চলে সংস্কৃতির জয়যাত্রা। তারপর আসে সেই দুর্দ্দিন যখন প্রাণের অগ্নিশিখা নিভে যায় সভ্যতার ধূসর প্রভাতে। অন্তরের দিক দিয়ে মানুষ হ'য়ে যায় দেউলে-মগজ করে জীবনকে শাসন। বাঁশি ফেলে মানুষ দাঁড়ি পাল্লা নেয় হাতে। তুলি রেখে নেয় অসি—লাঙলের ফালকে পরিণত করে সঙীকর ফলায়—দিকে দিকে সুরু হয় সাম্রাজ্যবাদের অভিযান। পাশ্চাত্য জগৎ আজ এই সাম্রাজ্যবাদের লৌহজালের মধ্যে জড়িয়ে গেছে। ওর মৃত্যুকাল উপস্থিত। সামনে যে জগদ্ব্যাপী লড়ায়ের রাত্রি ঘনিয়ে আসছে সেই রাত্রির অন্ধকারে পশ্চিমের মুমূর্ষু সভ্যতার ঘুণধরা ইমারত, খুব সম্ভব, হুড়মুড় ক'রে ভেঙে পড়বে। এই পরিণতি যতই শোচনীয় হোক—একে রুখবার সাধ্য নেই কারও। জীবনের উচ্ছ্বল-ধারা যেমন মৃত্যুর সমুদ্রগর্ভে বিলুপ্ত হবার জন্য ছুটে চলেছে—তেমনি পাশ্চাত্য সভ্যতার পতঙ্গকে দুর্ব্বার আকর্ষণে টানছে ভাবী কুরুক্ষেত্রের প্রচণ্ড দাবানল। এই উন্মার্গগামী প্রাণহীন নিমজ্জমান সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ করতে গিয়ে আমরা শুধু আমাদের আত্মঘাতের পথকেই প্রশস্ত করবো। পাশ্চাত্য থেকে নিতে হবে তার বিজ্ঞানের দানকে কিন্তু সেই দানকে শুদ্ধ ক'রে নেওয়া চাই প্রেমের হোমানল-শিখার স্পর্শ দিয়ে। রাত্রি আসে আকাশে আকাশে অন্ধকার ছড়িয়ে। এ রাত্রির অবসানে যখন নতুন প্রভাত আসবে—ভারতবর্ষ তখন কি করবে? সেই প্রভাতে প্রেমের গায়ত্রীমন্ত্র কি উচ্চারিত হবে তার কণ্ঠ থেকে? ইউরোপের শ্মশানে নবজীবনের অমৃতবারি সিঞ্চন করবে কি আমাদেরই তপোবনের মৃত্যুহীন বাণী?

'জলধর'-তর্পণ

শ্রীপ্রাণগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্য-সেবীর বঙ্গে সবার সে চিরন্তনী 'দাদা'
স্থূল বিশ্বে লুপ্ত দেহ,—প্রেম-সূত্রে আত্মা হেথা বাঁধা।
মন কাদা, প্রাণ সাদা, ছিল তাঁর লেখনীটি সাধা,
আধেক প্রব্রজ্যা-শেষে পুনরায় নাগরিক আধা!
নাহি সেই 'জলধর' বাঙলার সাহিত্য-গগনে,
দেহ-হীন স্মৃতি আছে মৃত্যু-হীন প্রেমের আসনে।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের ষষ্ঠ অধিবেশন

ওয়েলেসলী স্ট্রীটস্থ মুস্লিম ইনষ্টিটিউট হলে গত ৬ই মে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের ষষ্ঠ অধিবেশন আরম্ভ হয়। সাহিত্য বিশারদ আবদুল করীম মূল-সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মৌল্বী এ কে ফজলুল হক উহার উদ্বোধন করেন।

বাঙলার বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় একশত মুসলমান সাহিত্যিক প্রতিনিধি ইহাতে যোগদান করেন। শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু, ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই দিন সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহারা সভায় বক্তৃতা করেন। অনেক মুসলমান মহিলা সাহিত্যিকও সম্মেলনে যোগদান করেন।

সম্মেলনের উদ্বোধন করিতে উঠিয়া ফজলুল হক সাহেব বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, তাঁহারাই সত্যিকারের সাহিত্যিক যাঁহারা সাহিত্যের উন্নতির জন্য কোন কিছু ত্যাগ করাকেই বড় করিয়া দেখেন না এবং যাঁহারা সাম্প্রদায়িকতা, সংকীর্ণতা ও অন্যান্য পার্থিব দোষগুলি হইতে মুক্ত থাকিয়া সাহিত্যের সেবা করিয়া থাকেন। এইরূপ সম্মেলনে সেই সব সাহিত্যিক একত্র হইয়া দেশের জনগণের মধ্যে ঐক্য সাধনে ব্রতী হওয়ার সুযোগ পান। রাজনীতি ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বহু চেষ্টা সত্ত্বেও দেশের যে সাম্প্রদায়িক মীমাংসা করিতে সক্ষম হন নাই, তিনি আশা করেন যে, বাঙলার সাহিত্যিকগণ সাহিত্যের মধ্য দিয়া সেই সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানে ব্রতী হইবেন।

খাঁ বাহাদুর আজিজুল হকের অভিভাষণ

অতঃপর সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি খাঁ বাহাদুর আজিজুল হক (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার) উপস্থিত প্রতিনিধিগণকে সাদর-সম্ভাষণ জানাইয়া বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, মুসলমান সাহিত্যিকদের সাহিত্য সৃষ্টি ও সাহিত্য সাধনায় যে নানাপ্রকার বাধা বিপত্তি আসিয়া পড়ে সেই সমস্ত বাধা বিপত্তি দূরীকরণকল্পে মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের প্রয়োজন আছে। তারপর ভারতীয় ভাষাসমূহের মধ্যে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু এই সাহিত্যে বাঙালী মুসলমানদের দান তাহাদের সংখ্যানুপাতে যথেষ্ট নহে।

খাঁ বাহাদুর আজিজুল হক আরও বলেনঃ—"বাঙলা ভাষা বাঙালীর মাতৃভাষা—হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান—জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলের মাতৃভাষা। সুতরাং ভাষা ও সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গতা সাধন করিতে হইলে ইসলামিক কৃষ্টি সাধনার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। আমার এই কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, প্রধানত দুইটি বিরাট সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে বাঙালী জাতির সৃষ্টি এবং এই দুই সম্প্রদায়েরই কৃষ্টি ও সাধনার সমন্বয়েই বাঙালীর প্রকৃত জাতীয় সাহিত্যের সৃষ্টির সম্ভাবনা।

"রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে, ধর্ম্ম ও ভাবের ক্ষেত্রে সাহিত্য যেরূপ প্রভাব বিস্তার করে, অন্য কিছু সেরূপ করিতে পারে না। বিগত এক শতাব্দীর মধ্যে বাঙালী জাতি যে প্রেরণা লাভ করিয়াছে, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে যে শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে, তাহার মূলে বাঙলা সাহিত্যের যথেষ্ট প্রভাব আছে। তাহার মূলে মুসলমানদের প্রভাব নাই। ইহার জন্য দায়িত্ব যদি কাহারও থাকে, তবে সে মুসলমানেরই। বাঙলা সাহিত্য বাঙালীকে অনুপ্রাণিত, সঞ্জীবিত ও সম্বুদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু তাহাতে মুসলমানের খুব বেশী স্থান নাই। তাই আজ মুসলমানও চায় নিজেকে সম্বুদ্ধ করিতে, দেশ ও সাহিত্যের মধ্যে তাহার প্রকৃত স্থান গ্রহণ করিতে। সে বাঙলা সাহিত্যে তুরস্কের বিপ্লব, মিশরের যুগ-সঞ্চিত শব আনিতে চাহে না। সে ভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনই করিতে চায়। সে তাহার নিজস্ব রত্নসম্ভার, তাহার ঐশ্বর্য্যকান্তি, তাহার আদর্শ ও অনুভূতি ভাষা ও সাহিত্যে অন্তর্নিবিষ্ট করিতে চায়।

"হিন্দু সত্যিকার হিন্দু থাকিয়া মুসলমান খাঁটী মুসলমান হইয়াও বিরাট বাঙালী জাতি হইয়া বাঙলার ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিতে পারে। জাতি, ধর্ম্ম ও আদর্শের বৈষম্য আমরা বিভিন্ন হইলেও জাতীয়তায় আমরা বিরাট বাঙালী জাতি এবং তাহাই বাঙলার ভবিষ্যৎ। সেই বিরাট জাতির সৃষ্টি জাতীয় সাহিত্যের মধ্য দিয়াই সম্ভব এবং সেই জাতীয় সাহিত্যই আমাদিগকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। সে সাহিত্যে বুদ্ধ, চৈতন্য, শঙ্কর, নানক, সীতা, সাবিত্রী, কণিষ্ক, অশোক, পুরু, প্রতাপ সিংহের জীবনের আদর্শের সঙ্গে সঙ্গে আবুবাকর, ওমর, আলী খালেদ, খাদেজা, রাবেরা-আলাউদ্দীন, মুস্তাফা কামালের মহান আদর্শ সম্মিলিত হইয়া আমাদের জাতীয় জীবনকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবে—আজ সেই সাহিত্যই আমাদিগকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। সেই সাহিত্যই হইবে জাতির জীবন পথের শাশ্বত পথ রেখা—ভবিষ্যৎ আঁধার পথে চিরন্তন আলোর দিশারী।

"মুসলমান সাহিত্যিকগণের নিকট আমার ঐকান্তিক নিবেদন—আপনারা সাহিত্যের ভিতর দিয়া মুসলমানের দান, ভারত ইতিহাসে ইসলামের বৈশিষ্ট্য, তাহাদের সাধনা ও ত্যাগ, শৌর্য্য, পরাক্রম, শিক্ষা, সভ্যতা ও মানবতার কথা ঘরে ঘরে প্রচার করুন। অথচ বাঙলার প্রাণ যেন তাহার মধ্যে থাকে। জাতির ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি করিতে হইবে।"

শ্রীযুক্ত সরোজিনী নাইডুর বক্তৃতা

শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু ইংরেজীতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি আশা করেন মুসলমান সাহিত্যিকগণ দেশের প্রগতিশীল লেখকদের সহিত একস্তরে দাঁড়াইয়া বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য তাঁহাদের যথোপযুক্ত প্রতিভাশক্তি নিয়োজিত করিবেন। একটি জাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার জন্য ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব যথেষ্ট। এই সম্মেলন যদি বাঙলার হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে এই ধারণার সৃষ্টি করিতে সাহায্য করিতে পারে যে, তাহাদের সকলে এক ভাষাভাষী এবং তাঁহারা সকলে এক ভাষার দ্বারা সম্মিলিত—তাহা হইলে

এই সম্মেলন বিশেষ একটা কার্য্য করিবেন। বাঙলার হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নরনারীর পল্লীগাথার ভাষা একই, তাহাদের সাধারণ কথাবার্ত্তা, তাহাদের ঘুমপাড়ানি গান —প্রাচীন কাহিনীর ভাষা একই। তাই এই দুই সম্প্রদায়কে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় কিরূপে? উপসংহারে শ্রীযুক্তা নাইডু বলেন যে, বাঙলার হিন্দু, মুসলমান উভয় সাহিত্যিকগণকে সাহিত্যের ভিতর দিয়া শুধু বাঙলার নরনারীকে একত্রিত করার বাণী প্রচার করিলে চলিবে না, তাঁহাদের ঐক্য সাধনের বাণী বৃহত্তর ভারতেও প্রচারিত করিতে হইবে।

মুসলমান সাহিত্যিকবৃন্দের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য

ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি হিসাবেই তিনি এই সম্মেলনে উপস্থিত হইয়াছেন। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্যের সহিত তাঁহার পূর্ণ সহানুভূতি আছে। পৃথিবীর মধ্যে পারসী সাহিত্য অন্যতম উন্নত সাহিত্য। তাই বাঙলা দেশের মুসলমান সাহিত্যিকগণ তাঁহাদের বাঙালী মনের উপর ইসলামিক ছাপ আনিয়া যে সাহিত্য সৃষ্টি করিবেন তাহা পৃথিবীর সাহিত্য উদ্যানে আর একটি সুশোভিত পুষ্পোদ্যানে পরিণত হইবে। বাঙলা ভাষায় বাহিরের জগতের ভাবধারা আনা প্রয়োজন—তাহা শুধু ইউরোপীয় ভাবধারাই নহে, আরবী ও পারসী জগতের ভাবধারাও। এই কার্য্যে বাঙালী মুসলমানদের দায়িত্ব অধিক। তাঁহারা একার্য্যে যোগদান করিলে মাতৃভাষার প্রতি তাঁহাদের ঋণের অনেকাংশ তাঁহারা শোধ করিতে পারিবেন। প্রাচীন আরব সাহিত্যের সুদুর্ল্লভ মনোভাব ও ভাবধারা বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যে আনা প্রয়োজন এবং ইহাতে মুসলমানদেরই উদ্যোগী হওয়া উচিত। সেই সাহিত্যে ভাষা যাহাই হউক না কেন তাহাতে যদি সত্যিকার রস সৃষ্টি হয় তবে তাহা দেশ গ্রহণ করিবে।

উপসংহারে ডাঃ চাটার্জ্জী এই আশা ব্যক্ত করেন যে, বাঙলার মুসলমান সাহিত্যিকগণ কর্ত্তৃক রচিত বাঙলা সাহিত্য অখণ্ড বাঙলা সাহিত্যের একটি অংশ হইবে এবং উহা দুই মহাসমুদ্রের মিলন ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবে।

মূল-সভাপতি সাহিত্য-বিশারদ আবদুল করীম কর্ত্তৃক তাঁহার অভিভাষণ পঠিত হওয়ার পর সম্মেলনে আচার্য্য স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, স্যার জগদীশচন্দ্র বসু, কামাল আতাতুর্ক, ডাঃ মহম্মদ ইকবাল, মৌলানা আবুবকর সিদ্দিকী, ডবলিউ টি ইয়েটস্, মৌলানা সৌকত আলী, ডাঃ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্যার আব্দুল্লাহ সুরাবর্দ্দী, অধ্যাপক জিয়াউদ্দীন (শান্তিনিকেতন), আবুল হোসেন, ওয়াহেদ হোসেন, আবুল কাশেম, চারু ব্যানার্জ্জী, জলধর সেন, মোজাম্মেল হক (শান্তিপুর), মুন্সী রেয়াজুদ্দীন আমেদ, জালালুদ্দীন খোদাবক্স, ডাঃ লুৎফার রহমান, সেখ ফজলুল করিম, আলী আমেদ আলী ইসলামবাদী, সিরাজুদ্দীন আবদুল করিম, সুরশিল্পী এনায়েৎ খাঁ, শিল্পী আব্দুল মিয়ান, ওবায়েদুল্লার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়। (সভাপতির অভিভাষণ ৭৭ পৃষ্ঠা)

মানবীয় ঐক্যের আদর্শ

(৭০ পৃষ্ঠার পর)

যে, এই ঐশ্বর্য্য বিহুন হইয়া ভবিষ্যতে নিজ দাবীকে ন্যায়সঙ্গত বলিয়া প্রমাণিত করিবে, মানবজাতি ইহাকে স্বীকার করিয়া লইবে, কেবল ইহাতে এতখানি রূঢ়তা, দাম্ভিকতা বা অহমিকা থাকিবে না। অন্য কথায়, মানবজাতির রাজনৈতিক বুদ্ধিতে এমন একটা প্রবলতর প্রবৃত্তির বিকাশ হইতে পারে, যাহা বর্ত্তমান মিশ্র সাম্রাজ্য ও স্বাধীন অধিজাতিগুলিকে বজায় রাখিবার নীতি অনুসরণ না করিয়া কতকগুলি বৃহৎ সাম্রাজিক সম্মেলনের ব্যবস্থায় রাষ্ট্রসকলকে পুনর্বিন্যস্ত করিতে ইচ্ছা করিবে, সম্ভবত কালক্রমে এইটির উপরেই জোর দিবে।* কিন্তু যদিও এইরূপ কোন বিকাশ না ঘটে, অথবা যথাকালে ইহা কার্য্যে পরিণত হইতে না পারে, বর্ত্তমানে যে সকল স্বাধীন ও অ-সাম্রাজিক রাষ্ট্র বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহারা অবশ্য যে কোন আন্তর্জ্জাতিক পরিষদ বা অন্য ব্যবস্থাই হউক না কেন তাহার অন্তর্ভুক্ত হইবে কিন্তু মধ্যযুগে প্রধান প্রধান সামন্ত নরপতিদের সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তদের যেমন সমকক্ষের সম্বন্ধ ছিল না, অনেকটা রাজা-প্রজার সম্বন্ধই ছিল, তাহাদের অবস্থাও অনেকাংশেই সেইরূপ হইবে। বর্ত্তমান যুদ্ধ দেখাইয়াছে যে, আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে কেবল বৃহৎ বৃহৎ রাষ্ট্রগুলিই প্রকৃত পক্ষে গণ্য হয়; অন্যগুলি থাকে কেবল তাহাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া, অথবা তাহাদের রক্ষিত বা মিত্র শক্তিরূপে। যতদিন জগৎ স্বতন্ত্র জাতীয়তার নীতি অনুসারে বিন্যস্ত ছিল ততদিন এই বাস্তব পরিস্থিতি অপ্রকটরূপেই থাকিতে পারিত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির জীবনের উপর কার্য্যত ইহার কোন গুরুতর পরিণাম নাও হইতে পারিত; কিন্তু যখন মিলিতভাবে কার্য্য করিবার প্রয়োজন এবং অবিরাম জাগ্রত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া জগৎ ব্যাপারে স্বীকৃত অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে, তখন আর এইরূপ নির্ব্বিঘ্নতা সম্ভব নহে। বৃহত্তর শক্তিসমূহের অথবা বৃহত্তর শক্তি সকল লইয়া গঠিত একটা দলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের অবস্থা অপেক্ষা অথবা বিরাট ট্রাষ্ট (Trusts) সমূহের দ্বারা পরিবৃত একটি ক্ষুদ্র প্রাইভেট কোম্পানী অপেক্ষাও খারাপ হইবে। তাহার চতুর্দ্দিকে বিরাটাকার সমবায়গুলির কোন একটির নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া লইতে সে বাধ্য হইবে এবং জাতি সকলের পরিষদে তাহা স্বাধীন মত বা ক্রিয়া বলিতে কিছুই থাকিবে না।* (ক্রমশ)

---

* যদি ইটালী, জার্ম্মানী এবং জাপানের এবং সাধারণভাবে ফ্যাসিজমের উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলি জয়ী হইতে পারে, তাহা হইলে এইরূপ একটা আন্তর্জ্জাতিক ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে। জাতিসঙ্ঘ (League of Nations) জাতীয় স্বাধীনতার আদর্শটিকে কিছুকালের জন্য পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিল, কিন্তু পুনরুত্থিত সাম্রাজ্যবাদের শক্তির সম্মুখে জাতিসংঘ দাঁড়াইতে পারে নাই।

* The Ideal of Human Unity (Arya 1916) হইতে শ্রীঅনিলবরণ রায় কর্ত্তৃক অনূদিত।

'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনে মূল' সভাপতির অভিভাষণ

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতি সাহিত্য বিশারদ আব্দুল করীম তাঁহার অভিভাষণে বলেন:—

বাঙালী মুসলমানের সাহিত্যিক জাগরণ বাস্তবিকই বিস্ময়ের সামগ্রী। এই বিস্ময় শুধু আমার একার নহে, ইহা আমাদের প্রতিবেশী হিন্দুভ্রাতৃগণকেও বিস্মিত করিয়া দিয়াছে। মুসলমানেরা এইবার রাজনীতির ক্ষেত্র হইতে সাহিত্যেও সাম্প্রদায়িকতা টানিয়া আনিল বলিয়া নানাদিক হইতে নানাভাবে হুংকার কানে আসিতেছে। আমি রাজনৈতিক নহি। রাজনীতির ক্ষেত্রে বাঙলার মুসলমান কতখানি সাম্প্রদায়িক সে-কথার বিচার বাঙালী মুসলমান রাজনৈতিকরা করিবেন। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুসলমানের জাগরণে সত্যই সাম্প্রদায়িকতা প্রবেশ করিয়াছে কি-না, সেকথা বলিবার অধিকার—যতই সামান্য হউক—আমার আছে বলিয়া বিশ্বাস করি।

সাহিত্যে জাতি-ধর্ম্মের গণ্ডী আমি কখনও স্বীকার করি নাই, এখনও করি না; কিন্তু ইহার বৈচিত্র্য স্বীকার করি। সাহিত্য হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃষ্টান যে-জাতিরই হউক, ইহা সাহিত্য পদবাচ্য হইলেই সর্ব্বজনীন হইয়া থাকে। এই সর্ব্বজনীনতা নানা বৈচিত্র্যের মধ্য হইতেই উদ্ভূত হয়। আমার ধারণায় সৌন্দর্য্য সর্ব্বজনীন গুণ; ইহা মসজিদ ও মন্দিরে সমভাবে প্রতিফলিত হইতে পারে। মসজিদ ও মন্দির সৌন্দর্য্য-প্রকাশের স্বচ্ছ আধার মাত্র। এজন্যই উভয়ের মধ্য দিয়া সর্ব্বজনীন সৌন্দর্য্য শুধু বিচিত্র ভঙ্গীতে প্রকাশিত হয়। আধারের গঠন-ভঙ্গীর তারতম্যে আধেয় পরিবর্ত্তিত হয়, এই কথা স্বীকার করিতে হবে। সাহিত্যিক সৌন্দর্য্যের পরিসর বহু-বিস্তৃতির সম্ভাবনায় পূর্ণ। শুধু জাতি-ধর্ম্মের ক্ষুদ্র গণ্ডীতে ইহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে ইহার পরিসর সীমাবদ্ধ হয়, সৌন্দর্য্যের সকল দিক স্বতঃস্ফূর্ত হইতে পারে না। মুসলমানের সাহিত্য সর্ব্বজনীন সাহিত্যিক সৌন্দর্য্যের বিচিত্র ভঙ্গীর একদিক মাত্র। হিন্দুর সাহিত্যও তদ্রূপ আর একদিক।

বঙ্গীয় মুসলমানদের বর্ত্তমান সাহিত্যিক জাগরণ এই সম্প্রদায়ের প্রগতির পরিচায়ক ত বটেই, সঙ্গে সঙ্গে অখণ্ড বাঙলা সাহিত্যেরও বৈচিত্র্য এবং সম্পদবৃদ্ধির একটি প্রধান চিহ্ন। বাঙলা সাহিত্য শুধু বাঙালী হিন্দুর কিম্বা বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য নয়, ইহা উভয়েরই সম্মিলিত সাহিত্য। উভয় জাতি এই সাহিত্যকে আপন ধর্ম্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতা দিয়া সৌষ্ঠবশালী করিয়া না তুলিলে এই সাহিত্য যে নিতান্তই একদেশদর্শী হইয়া পড়িবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙলার বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও মুসলমানগণ তাহাদের সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য দিয়া এই সাহিত্যকে পরিপুষ্ট না করিলে আজ মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যকে শুধু শাক্ত হিন্দুদের সাহিত্যিক প্রচেষ্টায় এত উন্নত অবস্থায় পাওয়া কখনই সম্ভব হইত না। একথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, মুসলমানেরা আপন জাতীয়, ধর্ম্মীয়, সংস্কৃতি ও সভ্যতাগত বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য লইয়া বাঙলা ভাষার সেবা করিলে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য অপ্রতুল ও অনুপমেয় মূর্ত্তি ধারণ করিবে।

বাঙালী মুসলমানেরা আজ আপন সাহিত্য হিসাবে বাঙলা সাহিত্যের সেবা করিতেছেন। ইঁহারা আপন সাহিত্য হিসাবে বাঙলা সাহিত্যের সেবা করিতেছেন বলিয়াই আজ হয়ত কতকটা তাঁহাদের স্বীয় আপনত্ব বা নিজস্বতা বা বৈশিষ্ট্য এই সাহিত্যে দেখা দিয়াছে। ইহাকে সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা বলিয়া চীৎকার করিলে চলিবে কেন? মুসলমান আপন বৈশিষ্ট্য বাদ দিয়া বাঁচিতে পারে না। দুনিয়ার কোন জাতিই জাতি হিসাবে আপন বৈশিষ্ট্য ছাড়াইয়া বাঁচিতে পারে না—বাঁচেও নাই

মুসলমানদের আধুনিক সাহিত্যিক জাগরণের যে দিকটি সর্ব্বাগ্রে প্রতিবেশীদের চোখে পড়িয়াছে, তাহা প্রধানত ভাষা-সংশ্লিষ্ট। তাঁহারা বলিতেছেন, বাঙালী মুসলমানেরা বাঙলা ভাষাকে দ্বিখণ্ডিত করিবার উপক্রম করিয়াছেন। এই অভিযোগ একেবারে অসার নহে। কতিপয় প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমান লেখক (আমি ইচ্ছা করিয়াই সাহিত্যিক বলিলাম না) আজ যেন কোমর বাঁধিয়া কাজে অকাজে বাঙলা ভাষায় অপ্রচলিত বা অপ-প্রচলিত ফারসী বা আরবী শব্দ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দু লেখকদের অদ্ভুত সংস্কৃত শব্দের আমদানির অত্যাচারে বা সংস্কৃত ব্যাকরণের জুলুমে মধ্যে মধ্যে বাঙলা ভাষা যে-অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এই প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমানদের লেখায়ও বাঙলা ভাষার সেই দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়। তবে আতঙ্কিত জনগণ নিজেদের দোষের প্রতি যেমন উদার, মুসলমানদের দোষের প্রতি তেমন অসহিষ্ণু। এইজন্যই তাঁহারা মনে করেন, বাঙালা ভাষা দ্বিখণ্ডিত হইতে উপক্রান্ত হইয়াছে। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, প্রাকৃত ভাষাই বাঙলা ভাষার জননী—সংস্কৃত নহে। আরবী বা ফারসীর সহিত বাঙলা ভাষার সৌষ্ঠব বৃদ্ধির যে-সম্বন্ধ, সংস্কৃতের সহিতও ইহার সেই একই সম্বন্ধ।

কারণে অকারণে বাঙলা ভাষায় সংস্কৃতের আমদানীতে যদি ভাষার প্রতি জুলুম করা না হয়, তবে আরবী বা ফারসীর আমদানীতে কেন তাহা ঘটে, তাহা সরল বুদ্ধিতে বুঝিতে পারা কঠিন। আমার মতে এই উভয় প্রকারেই বাঙলা ভাষার প্রতি জুলুম করা হয়। এই দুই দলের হাত হইতেই বাঙলা ভাষাকে বাঁচাইতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে মুসলিম সাহিত্য-সৃষ্টির কথা আসিয়া পড়ে। এখানেই প্রশ্ন উঠে সাহিত্য ত সাহিত্যই, তাহার আবার জাতের বালাই কেন? আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সাহিত্যে জাতি-ধর্ম্মের গণ্ডী আমি স্বীকার করি না, কিন্তু ইহার বৈচিত্র্য মানি। অখণ্ড বাঙলা সাহিত্যকে যদি একটি পুষ্পরূপে কল্পনা করা যায়, তবে বলিতে পারি, বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য তাহার একটি দল বা পাপড়ী মাত্র। আমার মতে বঙ্গীয় মুসলমান তাহার ধর্ম্ম, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও আচার ব্যবহার লইয়া সে-সাহিত্যের সৃষ্টি করে অর্থাৎ বাঙলা সাহিত্যের যে-অংশে মুসলমান

ধর্ম্ম, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও আচার-ব্যবহারের সুন্দর দিক ফুটিয়া উঠে, তাহাই "মুসলিম সাহিত্য।" এই সাহিত্য অখণ্ড বাঙলা সাহিত্য হইতে পৃথক নহে, কিন্তু প্রকাশভঙ্গীতে, রূপে, রসে মুসলমান ব্যতীত অপরের সংস্কৃতিগত সাহিত্য হইতে অনেকখানি স্বতন্ত্র। মুসলমানের ধর্ম্ম, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও আচার-ব্যবহারের বিশিষ্ট ভাবদ্যোতক শব্দ ও ভাবের স্পষ্ট ছাপ বহন করিলেও, ভাষায় এই সাহিত্য পুরাদস্তুর বাঙালী, প্রাণের স্ফুরণে এই সাহিত্য হইতে বাঙলার ভিজা মাটির সম্মোহন গন্ধ ছড়াইয়া পড়ে।

আমার বিশ্বাস, বাঙালী মুসলমানের এইরূপ সাহিত্যই অখণ্ড বাঙলা সাহিত্যকে বৈচিত্র্যময় করিয়া তুলিয়া ইহাকে পূর্ণাঙ্গ করিতে পারে।

এই প্রসঙ্গে হিন্দুদের প্রতি বঙ্গীয় মুসলমানদের একটি অভিযোগের কথাও মনে পড়ে। সম্প্রতি বাঙলার মুসলমান সন্দেহ করিতেছেন, এদেশের হিন্দুগণ মুসলিম সংস্কৃতির সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য ষড়যন্ত্র করিয়া বাঙলা সাহিত্যকে হিন্দু আদর্শ ও ভাবে পূর্ণ করিয়া তুলিতেছেন এবং স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা শিক্ষার ভিতর দিয়া সেই আদর্শ ও ভাবকে মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করিয়া মুসলমানদের সংস্কৃতিগত ভিত্তির সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন। আমি এ সন্দেহকে সম্পূর্ণ হউক বা না হউক, আংশিক অমূলক বলিয়া মনে করি। হিন্দু "হরিনাম" না করিয়া "কালিমা" উচ্চারণ করিবেন, এমন চিন্তা করা শুধু অশোভন নহে, বরং একান্তই অস্বাভাবিক। আমরা যখন এরূপ অভিযোগ উত্থাপন করি, তখন ভুলিয়া যাই যে, আধুনিক বাঙলা সাহিত্য যে সকল প্রতিভাবান হিন্দুর দ্বারা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাঁহাদের ধর্ম্ম সংস্কৃতিগত ছাপ তাঁহাদের রচিত সাহিত্যে থাকিবেই। কেন না তাঁহারা স্বীয় ধর্ম্মীয় ও সংস্কৃতির গণ্ডী ছাড়াইয়া সাহিত্য রচনা করেন নাই—পৃথিবীর কোন সাহিত্যিক আজ পর্য্যন্ত তাহা করিতে পারেন নাই। আমার বিশ্বাস, হিন্দুরা জোর করিয়া তাঁহাদের আদর্শ ও ভাবকে আমাদের স্কন্ধে যতটা চাপাইতেছেন না, আমরা তাঁহাদের প্রতিভাবান সাহিত্যিকদের সৃষ্টির দ্বারা অজ্ঞাতসারে ততোধিক আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাদের আদর্শ ও ভাবকে বরণ করিয়া লইতেছি। আমি ইসলামী আদর্শ ও ভাবপূর্ণ সাহিত্যসৃষ্টিতে যেমন আতঙ্কিত নহি, হিন্দু আদর্শ ও ভাববহুল সাহিত্যসৃষ্টিতেও তেমন শঙ্কিত নহি। আমরা চিন্তা, ভাব ও আদর্শে মুসলমান হইতে পারিলে হিন্দু-সাহিত্য দেখিয়া আতঙ্কগ্রস্ত হইবার কোন কারণ আমাদের নাই। হিন্দুগণ আমাদের ফরমায়েশ মত সাহিত্যসৃষ্টি করিয়া আমাদিগকে নিয়মিতভাবে পরিবেষণ করিয়া যাইবেন, এইরূপ আশা করা প্রকৃতির বিপরীত ও বাতুলতা মাত্র।

বাঙলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি একজন এইরূপ আশাবাদী। সেই কারণেই বাঙলার সকল সম্প্রদায়ের জাগরণে সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমার মনে নিরাশার চেয়ে আশার আলোকই অধিক প্রতিফলিত হয়।

ইসলামী সাহিত্যের কথা মনে হইতেই অখণ্ড বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বঙ্গীয় মুসলমানদের একটি কর্ত্তব্যের কথাও মনে পড়ে। আমার মনে হয়, এই সম্মেলনের পক্ষ হইতে এতৎ সম্বন্ধে কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। ইসলামী সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া যাঁহারা বাঙলা ভাষাকে সমৃদ্ধ ও পরিপুষ্ট করেন, তাঁহাদের পক্ষে আরবী ও ফারসী ভাষার ইসলামী ভাবদ্যোতক বহু শব্দের ও নামের প্রয়োগ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। বাঙলা ভাষায় বাঙলা অক্ষরে এইরূপ ইসলামী শব্দ ও নাম লিখিতে গেলে কি পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত, তৎসম্বন্ধে একটি সর্ব্বজনীনভাবে পালনীয় নির্দ্দেশ থাকা আবশ্যক।

শ্রীসমর ঘোষ

নীল কালো দীঘি জলে সন্ধ্যার ঘনমায়া কাঁপে তিমিরে,
পাড়ে দোলে বেণু বন, শান্ত সবুজ বন ধীর সমীরে;
এখানেতে এসে বসি, ভুলে যাই পৃথিবীরে কেন তা জানো:
নীল কালো ঢেউগুলি শিখিয়াছে পূরবীর সুর বাজানো।

সূর্য্য বিদায় নিয়ে গিয়েছে অনেক আগে, গোধূলি আলো
আমারে কপালে দিলো রক্তিম ছোঁয়া তার বাসিয়া ভালো;
তার সেই ভালোবাসা 'পরে দাবী আজিকার সন্ধ্যাভরে
কালকে ফুরাবে ছুটি, ফিরে যাবে ফের সেই দূর শহরে।

তারপর সুরু হবে সেই একঘেয়ে দিন সকাল থেকে,
সীসকের অক্ষর এক একটি সাজাবো কালিমা মেখে;
ভুল হবে কতবার কতো কমা দাঁড়ী হবে বদল কতো,—
সব ভুল ঠিক হোলে, আমি হোয়ে যাবো হায় মৃতের মতো।

দেখা যাবে ভুলে গেছি আকাশ থাকার কথা পৃথিবী পরে,
যেনমতে জেবলে শুধু নেবো কেরোসিন বাতি মেসের ঘরে;
তারপর চিৎ হোয়ে মেঝেতেই শুয়ে শুয়ে টানবো বিড়ি,
পার্কে বসবো গিয়ে......ক্ষমতা যে নেই হায় ভাঙতে সিঁড়ি।

রাতে ঘুম ভাঙে নাকো আমি যে প্রেতের মতো ঘুমিয়ে থাকি
ঘণ্টা সাতেক ধরে সময়ের পাহারায় লাগাই ফাঁকি;
তবে যদি কোন রাতে পাথরের ঘুম সেই সহসা ভাঙে:
মনের গলিতে এসে গোধূলির রাঙা আলো একটু লাগে!

নীল কালো দীঘিজল, পাড়ে তার বেণু বন—পূরবী সুরে
নীল ঢেউগুলি ডাকে শহরের সীমা ভেঙে অনেক দূরে;
ছোট বালকের মতো চোখ ভরে আসে জল অন্ধকারে
মনে পড়ে ছুটি নাই, চলবে না ছুটে যাওয়া শহর পারে।

মৃত্যু

(গল্প)

শ্রীসুধীরকৃষ্ণ বসু বি.কম

সুদর্শন বাড়ী আসিয়াছে।

বাড়ীতে অবশ্য সবাই আসে ও যায়,—কিন্তু তাহার বাড়ী আসিবার মধ্যে একটু অভিনবত্ব ছিল, যাহা তাহার আগমনকে বরণীয় করিয়া তুলিয়াছিল। সুদীর্ঘ বারটি বৎসর তাহার কাটিয়াছে সুদূরে আন্দামানে,—কত দূরে তাহা ধারণা করিবার মত লোক সে গ্রামে খুব কমই আছে; তায়, যখন সকলে শুনিল 'কংগ্রেসী' সুদর্শন এই দীর্ঘকাল পরে আজ স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিতেছে, তখন সকলেই উন্মুখ আগ্রহে সেই অপ্রত্যাশিত ক্ষণটির আশায় চাহিয়া রহিল।

সেদিন গ্রামের হাটবার। গোপাল ঘোষ একঝুড়ি তরকারী মাথায় করিয়া চলিয়াছে হাটে বিক্রয় করিবার জন্য। পশ্চাতে তাহার বাদল কর্ম্মকার ডান হাতে কয়েকটি বোতল ঝুলাইয়া লইয়া এক মনে চলিয়াছে। খানিক মৌনভাবে অগ্রসর হইয়া বাদল বলিল,—গোপালদা' না কি? গোপাল ঘোষ তেমনিভাবে চলিতে চলিতেই উত্তর করিল,—হ্যাঁ ভাই। বড্ড দেরী হয়ে গেছে আজ, হাট বসে গেছে কখন। তরী-তরকারী বিক্রী একটু আগে না গেলে সুবিধে হয় না। বাদল হাসিয়া বলিল,—তা একদিন বৈত নয়। ছোটবাবু বাড়ী এলেন আজ, তুমি ইষ্টিশনে গিয়েছিলে বুঝি, গোপালদা? হ্যাঁ,—বলিয়া গোপাল হাসিল। তারপর বলিল,—তা আর না যেয়ে কি পারি। বারটা বছর বাবু দেশছাড়া! তোর মনে পড়ে বাদুলা সেই যে পুলিশে ছোটবাবুকে ধরে নিয়ে গেল। সেদিন ছোটবাবুর মা'র কি কান্না!—সেই শোকেই ত তিনি মারা গেলেন। আহা—কি মা-ই ছিলেন তিনি!—গরীব দুঃখী তাঁর ছেলে ছিল যেন।—বলিতে বলিতে ভাবাবেগে গোপালের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল।

সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকার পল্লীর বুকের উপর ঘনাইয়া আসিয়াছে। মৃদু বাতাসে খেজুর গাছের আন্দোলিত পত্রে পত্রে একটা ঝিরঝির শব্দ চলিয়াছে। অদূরে 'পদ্মবিলের' মাঝে খুঁটার উপরে তখনও দুই একটা মাছরাঙা শিকার প্রত্যাশায় একদৃষ্টে জলের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। গোপাল সেই দিকে চাহিয়া বলিল,—আজ কি তিথিরে বাদলা? আঁধার যে বড্ড বেশী হবে বলে মনে লাগছে। বাদলা এ কথায় কোন কান না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—তুমি বুঝি ইষ্টিশানে গিয়েছিলে গোপালদা'?—কেমন দেখলে ছোটবাবুকে, খুব রোগা হ'য়ে গেছেন নাকি তরণীমামা বলছিল। গোপাল উত্তর করিল—তা একটু হবেন না, কতদিন মা-বাপ ছেড়ে সাতসমুদ্দুরে তের নদীর পারে থাকা। ভাল খাওয়া দাওয়া কি আর পাওয়া যায় সেখানে।

কথাবার্ত্তায় দুইজনে হাটে চলিয়া আসিল। সেই রাত্রে হাটেই গ্রামের জমিদার রামকান্তবাবু প্রচার করিয়া দিলেন—কাল তাহার বাড়ীতে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র সুদর্শনের বহু প্রত্যাশিত প্রত্যাগমন উপলক্ষে সকলের নিমন্ত্রণ রহিল। সকলেই যেন দলে দলে তাঁহার বাড়ীতে শুভাগমন করিয়া ছোটবাবুকে আশীর্ব্বাদ [illegible]

পুত্রের কল্যাণ কামনায় রামকান্তবাবুর আপ্রাণ চেষ্টা ও যত্নের বার্ত্তা আজ রজনীর অন্ধকারাবৃত পল্লীর এক ক্ষুদ্র হাটের মাঝে অবারিতভাবে প্রচারিত হইল। মানবহৃদয়ের আকুলতা অযথা রূপ পরিগ্রহ করিয়া কতভাবেই না আত্মপ্রকাশ করে। স্বদেশের সেবাব্রত উৎসর্গিত মন সুদর্শন—তাহার আদরের সুদর্শন ভগ্ন স্বাস্থ্য হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহার মঙ্গল কামনায় দশজন ভগবানকে প্রার্থনা জানাইবে, তাহার সর্ব্বাঙ্গীন কুশলের জন্য ইহা অপেক্ষা সহজ উপায় আর কি থাকিতে পারে?

* * * *

উৎসব শেষ হইয়াছে। যাহারা আসিয়াছিল তাহারা একে একে সকলেই বিদায় লইয়াছে, পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছে তাহাদের অন্তরের আশীর্ব্বাদ,—ছোটবাবুর মঙ্গল কামনায় অন্তরের দেবতার উদ্দেশে উচ্চারিত অসংখ্য স্বস্তি বচন।

সুদর্শনকে প্রাণ ভরিয়া সকলে দেখিয়াছে। বাড়ীর সম্মুখে উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে উৎসবের আয়োজন করা হইয়াছিল। সেইখানেই একটা উচ্চ আসনে বসিয়াছিল সুদর্শন, আর বিপুলে জনতা তাহার জয়ধ্বনি করিতে করিতে আনন্দোৎফুল্লচিত্তে চাহিয়াছিল তাহার দিকে। অনেকে তাহাকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিয়াছে, সে-ও সমাদরে সকলের প্রাণের উপহার গ্রহণ করিয়াছে। এই ত জীবন!—সুদর্শন ভাবে,—এই ত জীবন! তুচ্ছ ইহার কাছে সংসারের সুখশান্তি, স্ত্রী-পুত্রের একটানা সাহচর্য্য, যে ইহার মর্ম্ম বুঝিয়াছে, সে জানে জীবনের চরমলক্ষ্যে পৌঁছিতে না পারা পর্যন্ত সংসার সুখভোগের কামনা তাহাকে এতটুকুও উদ্বেলিত করিতে পারে না। কত সৌভাগ্য তাহার যাহাকে দেখিবার জন্য দেশের লোক আজ আকুল আগ্রহে চাহিয়া আছে।

(২)

নিস্তব্ধ রাত্রি।—

আকাশের বুকে জুড়িয়া তারার নাচানাচি ছাড়া আর বিশেষ কিছু চোখে পড়ে না। দোতলার একটি ঘরে শুইয়া সুদর্শন সেইদিকে চাহিয়াছিল। উন্মুক্ত বাতায়ন পথে নিশীথের নীরবতা মেদিনীর পুঞ্জীভূত বেদনা লইয়া মৃদু বাতাসে গুঞ্জন বহিয়া আনিতেছিল তাহার কাণে। মাঝে মাঝে দু'একটি পাখীর কর্কশ আলাপে সে নীরবতা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। এত রাত্রি,—অথচ সুদর্শনের চোখে ঘুম নাই। আঁখি তাহার তন্দ্রাবিজড়িত কিন্তু মন বিমুখ। তাই জোর করিয়া সে চাহিয়াছিল দূরের আকাশের দিকে,—যেখানে সে দেখিতে পাইতেছিল নিপীড়িত আত্মার অযথা অপেক্ষা,—তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেছিল সাগর পারের কারাগৃহ, আর তারই মাঝে শত শত বন্দীর হতাশ হৃদয়ের আকুল উৎকণ্ঠা। সে ভাবিতেছিল তাহাদের কথা—যাহাদের মধ্যে সে-ও এই দীর্ঘ বার বৎসর নিঃশব্দে কাটাইয়া আসিয়াছে, সকরুণ বেদনা তাহার সাগর তরঙ্গাঘাতে উদ্বেলিত হইয়াছে মাত্র।.....

আপনি অধিকার লাভে বঞ্চিত যে নিঃস্ব দল তাহাদের কি এতটুকুও ক্ষমতা থাকিবে না আপনাপন উদারান্নের সংস্থান

করিবার? অথচ দিনের পর দিন এই যে অপরিসীম পরিশ্রম, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া এই যে কঠোর প্রচেষ্টা—ইহা ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে! উৎপাদক চাষী,—সেই থাকে অনাহারে, আর তাহারই হাতের ফসল অবাধে লুটিয়া খায় আর এক সম্প্রদায়। দিনের পর দিন ইহারা কাটাইতেছে আলস্যে দেহ ঢালিয়া,—কোন চিন্তা নাই, অযথা অর্থ ব্যয়ে ইহারা এতটুকু কুণ্ঠিত পর্য্যন্ত হয় না। আর ইহাদের পাশেই কাঁদিয়া মরে আর এক সম্প্রদায়ের হতভাগ্য দল! কেন এ বিভেদ? দেশ যখন সকলের—দেশের অধিবাসী যখন সকলে আমরা, তখন একই দেশে বসবাস করিয়া কেন এ প্রবঞ্চনা? সে ভাবে,—যতদিন না ইহার সমাধান সম্ভব ততদিন দেশের মুক্তি নাই। অহেতুক গর্জ্জনে অসারতাই শুধু লভ্য।

পার্শ্বেই তাহার নিদ্রাতুরা জায়া। সুদর্শন তাহার দিকে চোখ ফিরায়। দেখে স্রস্তকুন্তলা—অমলা অচেতন নিদ্রায় মগ্ন। চারিদিকে তাহার নিস্তব্ধতার তরঙ্গ উঠিয়াছে, মুদিত আঁখি পল্লবে জাগরণের চিহ্নমাত্র নাই। সুদর্শন তাহার দিকে চাহিয়া থাকে।

দীর্ঘ বার বৎসর পরে আজ দুই দিন হইল মাত্র অমলার সহিত তাহার দেখা হইয়াছে। কত পরিবর্ত্তন ইহার মধ্যে ঘটিয়া গিয়াছে। কিশোরী অমলা আজ যৌবনের সীমানা পার হইতে চলিয়াছে,—যৌবনের মাধবীমঞ্জরী দিবারাত্র জাগিয়া জাগিয়া অবশেষে ঝরিতে আরম্ভ করিয়াছে। অমলার যৌবন নদীতে তরঙ্গ উঠিয়া উঠিয়া এখন স্থির হইয়া গিয়াছে। সে দেহে কামনা আছে, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতা নাই। দুইদিন হইল অমলার সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছে, অথচ ইহার মধ্যে সে তাহার নিকট হইতে বিশেষ কোন আহ্বান পায় নাই। সুদর্শন চিন্তা করে,—অবশেষে ভাবিতে ভাবিতে কোন এক অজানা মুহূর্ত্তে সে-ও ঘুমাইয়া পড়ে।

(৩)

স্ব গ্রামে অন্তরীণ সুদর্শন। স্বাধীনতা নাই—নিজের অভিমত পরিপোষণের ক্ষমতা নাই, দুই বেলা তাহাকে থানায় হাজিরা দেওয়ার তালেই থাকিতে হয়। তবু ইহারই মধ্যে সে কত কি করিয়াছে। অক্লান্তকর্ম্মী সে,—তাই এই নিপীড়নের মধ্যেও গ্রামের কতকগুলি অকর্ম্মা ছেলেকে কাজে লাগাইতে পারিয়াছে। গান্ধীজীর পন্থা অবলম্বন করিয়া সে-ও গ্রামোন্নয়নে মন দিয়াছে। সরকার তাহার ভাতা বন্ধ করিয়াছে। তা করুক,—তাহাতে তাহার বিশেষ কোন অভাব হইবে না। নিজের সম্পত্তি রাখিয়া খাইতে পারিলে এখনও তাহার দুপুরুষ কাটিয়া যাইবে। এজন্যে সুদর্শন ভাবে না। পিতা নিষেধ করেন, বলেন—তোর শরীর এতটা ভেঙ্গে পড়েছে,—ও রকম পরিশ্রম করিসনে সুদর্শন। অমলা হয়ত কোনদিন তাহাকে কাছে পাইয়া নিতান্ত নির্জ্জীবের মতই বলে,—তুমি বড্ড রোগা হ'য়ে যাচ্ছ। সুদর্শন হাসিয়া উত্তর দেয়,—বড় কষ্ট হয় তোমার—না?—তারপর সে চলিয়া যায়। অমলা ভাবে,—অদ্ভুত এই লোকটি! সংসারের মায়া মমতা কোনও দিনই ইহাকে বাঁধিতে পারিল না। এতদিন তাহাদের বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু অন্তরের সহিত আদর করিয়া আজও পর্য্যন্ত একটি কথাও সুদর্শন তাহাকে বলে নাই;—অথচ কি অগ্নিদাহই না অহর্নিশি চলিতেছে অমলার বুকের ভিতর। দীর্ঘ বারটি বৎসর যে কেমন করিয়া সে কাটাইয়াছে, তাহা ভাবিতে গেলেও চোখ ফাটিয়া জল আসে। কত কি সে ভাবিয়াছে! একে একে কত রাত্রি চোখের জলের ভিতর দিয়া নিঃশব্দে কাটিয়া গিয়াছে—খোলা জানালার ধারে বসিয়া অমলা সুদর্শনের কথা ভাবিয়াছে। প্রদীপের মৃদু আলোকে—টেবিলের উপর হইতে সুদর্শনের বাঁধান ফটো লইয়া হয়ত বুকে চাপিয়া ধরিয়া তাহা অশ্রুজলে সিক্ত করিয়াছে,—তবুও সে আসে নাই। অমলা বুঝিয়াছে—তার এখন আসিবার উপায় নাই। কিন্তু এখন? এখন সে কি বলিয়া মনকে প্রবোধ দিবে। উন্মুখ অন্তর তাহার অধীর আগ্রহে এতদিন যাহার অপেক্ষায় বসিয়াছিল,—সেই প্রিয়তম আজ অতি নিকটে। অথচ তাহাকে একেবারে নিজস্ব করিয়া সে পাইতেছে না,—ইহা হইতে বড় দুঃখ তাহার আর কি থাকিতে পারে?—তায় অনেক সহ্য করিয়া অমলা এখন বুঝিয়াছে,—সুদর্শনের সবটুকু সে কখনও পাইবে না; যেটুকু পাইবে তাহা তাহার অন্তরের দান নহে—বাহিরের সামাজিকতা,—অমলার নারী মনকে ভুলাইবার জন্য সুদর্শনের ছলনাময় চাতুরী। অমলা ইহা ভাবিয়া কর্ম্মী সুদর্শনকে অযথা আর বিরক্ত করে না, মাত্র যখন কাছে পায়, তখনই কিছু বলিতে চেষ্টা করে।

কিন্তু বলা হয় কোথায়? অন্তরের পুঞ্জীভূত ভাষা আপনা হইতেই যেন রুদ্ধ হইয়া আসে,—শুধু অপলক নয়নে অমলা সুদর্শনের দিকে চাহিয়া থাকে। সুদর্শন চলিয়া যায়—বাড়ীর সম্মুখের রাস্তা দিয়া—হাঁ ঐ সরু মেঠো পথ দিয়া আম-কাঁঠালের বাগান ছাড়াইয়া সুদর্শন—কর্ম্মব্যস্ত সুদর্শন দূরে চলিয়া যায়। বেদনাহত অমলা অপরিজ্ঞাত গৃহকোণে একাকিনী অশ্রু মোচন করে—সুদর্শন ফিরিয়াও চাহে না। অমলা ভাবে—হয়ত একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া সুদর্শন তাহাকে দেখিবে—হয়ত একটিবার তাহাকে স্মরণ করিয়া দিনের মাঝে একবারের জন্যও সে ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু কই? উন্মুখ বাসনা তাহার নিষ্ফলতায় পর্য্যবসিত হইতেছে। দিনের পর দিন—আঘাতের পর আঘাত তাহাকে ক্ষত বিক্ষত করিতেছে,—অথচ কে তাহাকে সান্ত্বনা দিবে? শাশুড়ী তাহার অনেক দিন আগেই চলিয়া গিয়াছেন, শ্বশুর জমিদারী লইয়া ব্যস্ত, সুদর্শন দেশের উদ্ধার চিন্তায় মগ্ন,—তবে? অমলা ভাবে,—কি হইবে নিষ্ফল সান্ত্বনায়,—মৌখিক স্তোকবাক্যে?—তা ত ক্ষ্যাপার-মা আসিয়াও কত শুনাইয়া যায়। সুতরাং অমলা নিজের ভাগ্য চিন্তা করিয়া নীরবে অনেকক্ষণ বসিয়া কাঁদে।

সুদর্শন হয়ত সমস্ত দিন বাড়ী ফেরে না, কিম্বা হয়ত আহারের সময় কিছুক্ষণের জন্য আসে,—কিন্তু অমলার সঙ্গে দেখা হয় না। অমলার বড় ইচ্ছা করে তাহাকে নিজে রাঁধিয়া খাওয়ায়—তাহাকে নিজের মত করিয়া উপভোগ করে। কিন্তু সুদর্শন তাহা বুঝে না,—অথবা বুঝিয়াও তুচ্ছ [illegible] করে। অমলার নিজের মনকে সান্ত্বনা দিতে পারে না। ন[illegible] জীবনের

সার্থকতা তাহার কোথায়? কে তাহাকে বুঝাইবে সে ব্যর্থ জীবনের মূল্য কতটুকু?

(৪)

কৃষকদের দুর্দ্দশার সীমা নাই। সুদর্শন তাঁহাদের লইয়াই ব্যস্ত। যাহাতে তাহাদের অপরিসীম ঋণ সীমাবদ্ধ হয় যাহাতে তাহারা দু' মুঠো পেট ভরিয়া খাইতে পায়,—তাহার চেষ্টায় সুদর্শন সারাক্ষণ কৃষক পল্লীতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সব উপায় বুঝাইয়া দিতেছে। জমিদারকে বাকী খাজনার অর্দ্ধেক ছাড়িয়া দিতে হইবে, ফসল চাষের জন্য ও ভাল বীজ কিনিবার জন্য জমিদারকে ঋণ দিতে হইবে,—ইত্যাদি বাণী শুনাইয়া শুনাইয়া কৃষকদিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতেছে, আমাদের দেশে জমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত বলিয়া চাষ করিতে অসুবিধা হয়, —অন্যান্য দেশে কেমন করিয়া অত বেশী বিঘা জমি চাষ করে ও সহজ উপায়ে তাহাতে দ্বিগুণ ফসল উৎপন্ন করে তাহা বুঝাইয়া দিয়া কৃষকদিগকে এই সব দাবী জানাইবার জন্য শিক্ষা দিতেছে, সুদর্শনের স্নানাহারের দিকে লক্ষ্য নাই,—সে চায় দেশের উন্নতি,—এই সব চাষী মজুরদের মঙ্গল। সে নিজে শিক্ষিত এবং জানে বাঙলার শতকরা ৮০জন লোক গ্রামবাসী ও জমিই হইতেছে তাহাদের অন্ন সংস্থানের সম্বল, সুতরাং সাত্যকারের শক্তিকে জাগাইতে হইলে এই সকল জাগিয়া-ঘুমানো-প্রাণীগুলিকে সচেতন করিয়া তুলিতে হইবে। নিষ্পেষিত ও নিপীড়িত আত্মার ক্রন্দন ধ্বনি যতদিন পর্য্যন্ত না ভারতের আকাশ-বাতাস কাঁপাইয়া ত্রাসের সঞ্চার করিবে, ততদিন অভিজাত সম্প্রদায় ইহাদের কথায় কর্ণপাত করিবে না। কিন্তু অশিক্ষিত এই ভীরু বর্ব্বর দল কি করিয়া নিজেদের দাবী জানাইবে? সুদর্শনের চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে ফরাসী বিপ্লবের ছায়া চিত্র, জারের অত্যাচারের কবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ক্ষুধিত রুশিয়াবাসীর মরণ-পণ-দৃঢ়তা। আর এরা? হালের বলদের মতই প্রভুর আজ্ঞায় চালিত;—প্রতিবাদের কণ্ঠ নাই ভাষা নাই মূক মৌন জরদ্গব সাজিয়া দিনের পর দিন অনাহারে অত্যাচারে মরণের পথে অগ্রসর হইতেছে। হোক সুদর্শন জমিদার তবুও সে জমিদারের অত্যাচার সহ্য করিবে না। যাহাদের গৃহদ্বারে শত সহস্র অপরাধীর দল সর্ব্বস্বহারা হইয়া আশ্রয় লাভের আশায় দিবারাত্র মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছে,—তাহাদের উপর ইহাদের একটুকুও করুণা হয় না। কি স্বার্থপর এই অভিজাত শ্রেণী! হোক তার ক্ষতি না হয় সে-ও তাহাদের সহিত না খাইয়া মরিবে। সুদর্শনের চিন্তারও শেষ নাই কাজেরও শেষ নাই, —দিনরাত তাহার নিকট যেন এক হইয়া গিয়াছে।

জেলে থাকিতে সুদর্শন অনেক বই পড়িয়াছিল, গান্ধীজীর গীতাভাষ্য, অরবিন্দের গীতা তাহার কণ্ঠস্থ। 'কর্ম্মযোগ' হইতে আরম্ভ করিয়া 'ব্রহ্মচর্য্য পালন' প্রভৃতি সাত্ত্বিক গ্রন্থ সে বহু পড়িয়াছে। সে বুঝিয়াছে দেশ সেবা করিতে গেলে পশ্চাতের বন্ধন ছিন্ন করা প্রয়োজন। আপনাকে উৎসর্গ করিতে হয়,—এবং উৎসর্গ মানে যে কেবল অবসর সময়ের যোগ্য ব্যবহার করা তাহা নয়;—আত্মসর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া দেশবাসীর জন্য সমস্ত বিলাইয়া দেওয়ার নামই হইতেছে প্রকৃত দেশ সেবা। সুদর্শন তাহাই চায়। ইহাতে কাহারও বাধা সে মানিবে না—অমলারও না, তবুও যেন সুদর্শনের কেমন লাগে, কোথায় যেন গলদ থাকিয়া যাইতেছে, কোথায় যেন মন তাহার বিদ্রোহী হইতে চাহে। সে ভাবে,—গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখে —ইহা তরুণ মনের খেয়ালীপনা ছাড়া আর কিছুই নয়। সত্যই কি অমলাকে সে অনাদর করে? কিছুতেই নয়। কোনদিন একটা রূঢ় কথা পর্য্যন্ত আজও সে অমলাকে বলে নাই। তবে? কোথায় অমলার অভাব? অর্থ, প্রতিপত্তি পরিজনাদির অভাব ত তার আদৌ নাই। সুদর্শনের মন যেন ভ্রূকুটি করিয়া উত্তর দেয়,—গীতাভাষ্যে তাহার উত্তর মিলে না সুদর্শন। ক্ষণিকের জন্য সুদর্শনের অন্তরে অমলার মিনতিভরা আঁখি দুটির ছায়া ফুটিয়া উঠে। কিন্তু পরক্ষণেই তাহা মিলাইয়া যায়।—সুদর্শন তখন দুই হাত জোড় করিয়া ঈশ্বরের নিকট কাতরভাবে প্রার্থনা জানায়,—আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর প্রভু! আমাকে সাহস দাও, আমাকে বল দাও, আমাকে এ দুর্ব্বলতা থেকে মুক্ত কর। আমি স্ত্রী চাই না, ধনরত্ন চাই না,—আমি চাই দেশের সেবা করতে, দেশবাসিগণকে আমার করে পেতে চাই। আমাকে তাই দাও দয়াময়, আমাকে তাই দাও। সুদর্শনের এ করুণ প্রার্থনা-বাণী অমলার কানে পৌঁছায়,—নীরবে অমলা অশ্রু বিসর্জ্জন করে। তারপর নিজেকে সংযত করিয়া অপরাধীর মত সুদর্শনের নিকটে আসে। সুদর্শন জিজ্ঞাসা করে,—আমায় কিছু বলবে, অমলা। হাঁ, বলব।—অমলার কণ্ঠরোধ হইয়া আসে। অতি কষ্টে অশ্রু সংযত করিয়া অমলা বলে,—আজ আর বেরিয়ো না কোথাও,—এই অনুরোধটি আমার রাখ। আমি ত কোনও দিন তোমার কাছে কিছু চাইনি, আজ চাইছি, আজ আর আমাকে ফিরিয়ে দিও না। নিশ্চল সুদর্শন শান্তস্বরে উত্তর করে,—কিন্তু আমাকে যে বেরুতেই হবে অমলা। দুটো সভাতে আজ আমাকে বক্তৃতা দিতে হবে, না গেলে কি করে চলবে বলত। তুমি ত অবুঝ নও।—অমলা যেন ফাটিয়া পড়ে। ছলছল নেত্রে সুদর্শনের পা দুইখানি জড়াইয়া ধরিয়া মিনতিভরা কণ্ঠে বলে,—আমি কি তোমার কেউ নই? আমি আর বুঝতে চাই না,—ওগো, আর তুমি আমায় বুঝিও না। তুমি বল,—তুমি বল—আমার আজকের কথাটা রাখবে! তাড়াতাড়ি দুই হাত ধরিয়া অমলাকে উঠাইয়া তেমনিভাবেই সুদর্শন বলে,—দেশসেবাব্রতে যারা আত্মনিয়োজিত করে তাদের দায়িত্ব যে কত বড়,—তা তুমি বুঝতে পারবে না অমলা। তা যদি বুঝতে তাহ'লে আজ আমায় এ অনুরোধ তুমি করতে পারতে না। তোমার দিক থেকে আমি কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হ'লেও..........আচ্ছা থাক্, তোমার এ অনুরোধ রাখতে পারলুম না বলে আমি ব্যথিত। হাঁ, সময় হয়ে এসেছে প্রায়, আমাকে যেতেই হবে, অমলা।........বলিতে বলিতে চাদরখানা কাঁধে ফেলিয়া দ্রুতপদে সুদর্শন বাহির হইয়া পড়িল।

সেদিন স্থিরচিত্তে সুদর্শন বক্তৃতা করিতে পারিল না। কেবলই তাহার মনে হইতে লাগিল অমলার কাতর নিষেধ বাণী,—অমলার করুণ অনুরোধ। তবুও সে বক্তৃতা করিল। কিন্তু সে স্থির করিতে পারিল না—কেন তাহার মন এত

দ্রুত ভিন্নমুখী হইতে চলিয়াছে। অমলা যে তাহাকে একটু একটু করিয়া পশ্চাতে টানিয়া আনিতেছে, তাহা যেন সে বেশ বুঝিতে পারিতেছে। তাই ত সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে অমলাকে যথাসম্ভব এড়াইয়া চলিবার।

কিন্তু নারীর মন,—মানিতে চাহে না। সুদর্শনের এত অবহেলার মাঝেই যেন অমলা তাহাকে বেশী করিয়া পাইতে চায়। সুদর্শন ভাবে,—বিচিত্র এই নারীজাতি! নীতিগ্রন্থ সে পড়িয়াছে বহু, কিন্তু সেই সঙ্গে নারীতত্ত্ব সম্বন্ধে দুই চারিখানি বইও তাহার পড়া উচিত ছিল, বিবাহ সম্বন্ধে প্রতীচ্যের মনীষিগণের মতামত সুদর্শন বিশ্বাস না করিলেও ইহা সে বিশ্বাস করিত যে, সৌন্দর্য্যপিপাসু নারী মন পর্য্যাপ্ত আত্মতৃপ্তির উপকরণ পাইলেই সন্তুষ্ট। তাই সে অমলার সে দিক হইতে কোন অভাব নাই জানিয়া কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারে না,—কোথায় অমলার দুঃখ, কিসের জন্য সে এত কাতর, এত উন্মুখ! রাজনীতির ঘর সন্ধান জানিলেও যে নারী মনের সন্ধান জানা যায় না, ইহা সুদর্শন কোনও দিন ভাবিয়াও দেখে নাই,—তাই কারণে অকারণে অমলার অনুরোধ, অনুযোগ অযথা মনে করিয়া অবাধে সে উপেক্ষা করিতে সাহসী হইয়াছে।—সে ভাবিতেও পারে নাই—ইহাতে অমলার কি ক্ষতি হইতে পারে!

(৫)

দেড় বৎসর পরের কথা।—

সুদর্শনের নিয়ত বক্তৃতার ফলে দেশের অশিক্ষিতেরা বুঝিয়াছে যে, জমিদারই হইতেছে তাহাদের প্রকৃত শত্রু। জমিদারকে খাজনা দিতে না হইলে তাহাদের জীবনযাত্রা স্বচ্ছন্দে চলিয়া যায়। আর সত্যই ত, ধনপুষ্ট জমিদার কেন তাহাদের উপর কর্তৃত্ব করিবে? তাহারা পুত্রপরিজনসহ বৎসরের অধিকাংশ সময় না খাইয়া কাটাইবে, আর তাহাদেরই সেই অক্ষমতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ধনপুষ্টের দল দিনে দিনে শক্তি সঞ্চয় করিবে? ইহা হইতেই পারে না। তাহাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইল যে, তাহারা যদি অনাহারে থাকে, জমিদার তাহা হইলে তাহাদিগকে সাহায্য করিতে বাধ্য। না করিলে উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

আর হইলও তাহাই। সেবার অজন্মার ফল দেশব্যাপী এমন ভীষণভাবে দেখা দিল যে, খাদ্যের অন্বেষণে লোকে অতিশয় হীন কার্য্যসমূহও অবাধে করিতে আরম্ভ করিল। কৃষকদিগের মরাই-এ ধান নাই, খরচের মত একটি পয়সা পর্য্যন্ত তাহাদের হাতে নাই, অথচ স্ত্রীপুত্র অনাহারে মরিতে বসিয়াছে। সুদর্শন অনেক চেষ্টা করিয়া একটি সাহায্য ভাণ্ডার খুলিয়াছে। কিন্তু তাহাতে কি হইবে? একজনের ক্ষুধা মিটাইতে গেলে আর একজন আসিয়া হাত পাতে। সুতরাং এক-কে দিতে গেলে অন্যে পায় না, আবার তাহাকে না দিলেও সে জোর করিয়া খাইতে চাহে. যে সমস্ত বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সাহায্য লইয়া আসিয়াছিল, তাহাও ফুরাইয়া গিয়াছে। সকলেই ক্ষুধায় কাতর, কোথায় খাদ্য পাইবে তাহার চেষ্টায় বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। চারিদিকে পাপের ছায়া স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে—অথচ ইহাকে রোধ করিবার তেমন কোন উপায় নাই। ঠিক এমনি এক আবর্ত্তনের মাঝেই একদিন এমন একটি ঘটনা ঘটিল যাহা সুদর্শনের জীবনে বিরাট পরিবর্ত্তন আনিয়া দিল।

সেদিন কৃষ্ণপক্ষেরই কি একটা তিথি ছিল হয়ত। সমস্ত আকাশ জুড়িয়া জমাট অন্ধকার গুমু হইয়াছিল। মাঝে মাঝে বৈশাখী ঝড়ের মত দমকা হাওয়া বহিয়া যাইতেছিল।

গভীর রাত্রি। দোতলার ঘরে সুদর্শন ও অমলা খানিক আগে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বাহিরে জীবনের কোন সাড় পাওয়া যায় না। তমিস্রারজনীর এই নিস্তব্ধতা জীবন্ত প্রাণীর অন্তরে ভীতির সঞ্চার করে।

হঠাৎ চীৎকারে সুদর্শনের ঘুম ভাঙিয়া গেল। প্রথমটা সে বিশেষ কিছু বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু পরে যখন দেখিল বাহিরে আলো লইয়া বাড়ীর চাকর দারোয়ানেরা ব্যস্ত-ভাবে ছুটাছুটি করিতেছে, আর তাহারই পাশে হতচেতন অবস্থায় অমলা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিতেছে, তখন তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিয়া যাহা সে দেখিল তাহাতে সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেল। দেখিল,—একখানি বর্শাফলক অমলার দক্ষিণ পঞ্জর ভেদ করিয়া খাড়া হইয়া আছে, আর সেই ক্ষতস্থান হইতে অপরিমিত রক্তপাত হইতেছে।

* * * *

দিনতিনেক পরে—

স্থানীয় পুলিশের রিপোর্টে প্রকাশিত হইল পাঁচ মাইল দূরে বড়নপুর গ্রামের জমিদারের প্ররোচনায় সুদর্শনের হত্যা প্রচেষ্টা চলিতেছিল। কিন্তু ভাগ্যবান সুদর্শন, তাই সেদিন-কার বর্শাফলক হইতে রেহাই পাইয়াছে। জমিদারের এই আক্রোশ নিছক অহেতুক নহে। তাহাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের প্রচারের ফলে যে গণ-আন্দোলনের সাড়া পড়িয়াছিল, তাহারই ফল আজ দেখা দিয়াছে এইরূপ আত্মঘাতী হইয়া। তাই নিজ কর্ত্তব্যসাধনরত সুদর্শন উপেক্ষিতা অমলার মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে বসিয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারে নাই। মুমূর্ষু অমলা তাহার প্রিয়তমের এই দুঃখ কাতরভাব দেখিয়া মাত্র তাহার দিকে কয়েকবার স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া কি যেন বলিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু পারে নাই। নিদারুণ আঘাত। সে আঘাত অমলার কোমল দেহ সহ্য করিতে পারে নাই। সুদর্শনের শত মিনতি সে উপেক্ষা করিয়াছে, আত্মীয় পরিজনের হাহাকার-পূর্ণ অশ্রুজলের দিকে চাহিয়া তাহার এতটুকুও দয়া হয় নাই।

যে সুদর্শন অমলার দিকে একটিবারের জন্যও ফিরিয়া চাহে নাই, একটি অনুরোধও রাখে নাই, অমলার এই অকাল ও আকস্মিক মৃত্যুতে আজ সেই-ই যেন আঘাত পাইয়াছে বেশী। বিচ্ছেদই বেদনার উদ্ভব। তাই অমলার জীবিতকালে সুদর্শন তাহার অভাব অনুভব করে নাই। আজ অমলা নাই।—সে যেন ভাবিতেই পারিতেছে না—অমলা নাই। চারিদিকে তাহার শত্রু। নিজের হাতে এই দল পুষ্ট করিয়া সে আজ যথা-সর্ব্বস্ব হারাইতে বসিয়াছে। কিন্তু তাহাতেও দুঃখ ছিল না। যাহাদিগকে প্রাণের অপেক্ষা প্রিয় মনে করিয়া এই দীর্ঘ-

(শেষাংশ ৯০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

যুক্ত-নির্ব্বাচন

রেজাউল করীম এম-এ বি-এল

পৃথক নির্ব্বাচনের আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছি যে, উহা তিনটি কারণে সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। পৃথক নির্ব্বাচন জাতীয়তা গঠন করিতে বাধা দেয়, সাম্প্রদায়িক মিলন প্রতিষ্ঠার পরিপন্থী এবং দেশের স্বার্থের দিক হইতে যাহারা অবাঞ্ছিত ও অনভিপ্রেত তাহাদিগকেই আইন সভায় প্রাধান্য দিতে সহায়তাকারী। পৃথক নির্ব্বাচনের পরিবর্ত্তে যুক্ত নির্ব্বাচন পদ্ধতি গ্রহণ করিলে উপরোক্ত অসুবিধাগুলি অনেকটা বদূরিত হইবার সম্ভাবনা আছে। যুক্ত নির্ব্বাচন স্বীকার করার অর্থই হইতেছে সরকারের ভেদনীতির চালকে ব্যর্থ করা। আজ দীর্ঘ যুগ হইতে ভেদনীতির দ্বারা ভারত শাসিত হইতেছে। শাসনকার্য্যের নানা স্তরে ভেদনীতি প্রবেশ করিয়া আমাদের জাতীয় জীবনকে দুর্ব্বিষহ করিয়া তুলিয়াছে। পৃথক নির্ব্বাচন যেরূপ সাফল্যের সহিত ভেদনীতিকে জীবিত রাখিয়াছে, সরকারের অন্য কোন কার্য্য তাহা পারে নাই। চাকরী-বাকরীতে যে ভেদনীতি দেখা যায় তাহা লক্ষ লক্ষ অধিবাসীকে প্রভাবিত করে না। অনেকে সে সংবাদও রাখে না, অথবা রাখিলেও বেশী দিন তাহা লইয়া আন্দোলন করে না। কিন্তু পৃথক নির্ব্বাচনের বিষময় প্রভাব দেশের প্রত্যেক অঞ্চলকে বিদ্বিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। আমরা যুক্ত নির্ব্বাচন গ্রহণ করিয়া সরকারী ভেদনীতির মর্ম্মস্থল ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারিব। যুক্ত নির্ব্বাচন প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মন হইতে তাহাদের বিশেষ স্বার্থের মিথ্যা ধারণা দূর হইয়া যাইবে। এক দেশ, এক আদর্শ, এক স্বার্থ, এই ভাব তাহাদের অন্তরে বদ্ধমূল হইতে থাকিবে। এইভাবে ক্রমে ক্রমে দেশবাসী সাম্প্রদায়িক বেষারেষি ভুলিয়া যাইবে এবং সমবেত ভাবে কাজ করিতে শিখিবে।

যুক্ত নির্ব্বাচনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে, ইহা পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সহযোগিতার ভাব জাগাইয়া দেয়। দেশের কাজে একজন বা এক সম্প্রদায় যথেষ্ট নহে, সে জন্য সকলের সহযোগিতা ও সাহচর্য্য দরকার। দেশের কাজে হিন্দুকে আসিতে হইবে মুসলমানের নিকট, মুসলমানকে যাইতে হইবে হিন্দুর নিকট। একজন সামান্য ব্যক্তিরও মূল্য ও গুরুত্ব কাহারও অপেক্ষা কম নহে। সে তখন আত্মসত্তা উপলব্ধি করিবে। আত্মশক্তি বোধ করিলে সে বড় বড় লোককে প্রভাবিত করিতে পারিবে। এই ভাব পৃথক নির্ব্বাচন জাগাইতে পারিবে না। বর্ত্তমান অবস্থায় হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সহযোগিতা ও নির্ভরশীলতা প্রতিষ্ঠিত হইবার আশা খুবই কম। হিন্দুকে মুসলমানের দ্বারে ধন্না দিবার জন্য আসিতে হইবে না, মুসলমানকেও হিন্দুর নিকট যাইতে হইবে না। অন্য সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ হইয়াই প্রত্যেকেই আইন সভায় প্রবেশ করিতে পারিবে। নির্ব্বাচনের সময় লক্ষ লক্ষ লোকের সহিত আলাপ-আলোচনা করিতে হয়, তাহাদের নিকট অনুরোধ নিবেদন করিতে হয়, তাহাদের অভাব-অভিযোগ শ্রবণ করিতে হয়, প্রতিকারের প্রতিশ্রুতি দিতে হয়। এই সব লোক আবার গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যখন ছড়াইয়া পড়ে তখন তাহারাও নানারূপ আলোচনা করে, পরামর্শ করে প্রার্থীদের যোগ্যতা সম্বন্ধে, যাচাই করে, তারপর একটা সিদ্ধান্ত করে। এই সময় দুইটি সম্প্রদায় যদি সম্পূর্ণভাবে পৃথক হইয়া থাকে তবে তাহাদের মধ্যে মিলন ও সহযোগিতার ভাব জাগিতে পারিবে না। যুক্ত নির্ব্বাচন এই ভাব জাগাইতে পারিবে। কারণ উহা দেশবাসীকে সাম্প্রদায়িক টিকিটে বিভক্ত করিবে না, তাহাদিগকে একই পর্য্যায়ভুক্ত করিবে, একই স্থানে দাঁড় করাইবে, একই ভাব ও আদর্শের কথা বুঝাইবে। তাহাদের মনে সমস্বার্থ বোধ জাগ্রত করিবে। জাতীয়তার আদর্শে জনমত গঠন করিবার পক্ষে যুক্ত নির্ব্বাচন একটি প্রধানতম উপায়। বর্ত্তমানে সমাজের উচ্চতর স্তরে সাম্প্রদায়িক নেতাদের মধ্যে যে সব জাতীয়তা বিরোধী ভাব পরিদৃষ্ট হয় তাহা পরিপুষ্ট হইতেছে পৃথক নির্ব্বাচনের অকল্যাণে। নেতারা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য জনসাধারণের ধর্ম্মানুভূতিতে আঘাত দিয়া মিথ্যা প্রচার করিয়া বেড়ান। জনসাধারণের নির্ব্বাচন ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকে বলিয়া তাহারা ইচ্ছা থাকিলেও অবাঞ্ছিত লোককে বাদ দিতে পারে না। ধর্ম্মান্ধ নেতাদেরকে ব্যাপকভাবে সর্ব্বত্র আবেদন করিতে হয় না, তাহাদের প্রচার কার্য্য নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। তাই তাঁহারা অনায়াসে ধর্ম্মানুভূতিতে আঘাত দিতে পারেন। কিন্তু নির্ব্বাচনী প্রচারকার্য্য অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে চালাইবার অধিকার থাকিলে স্বতঃসিদ্ধভাবে ধর্ম্মের আবেদন পরিত্যক্ত হইবে। নির্ব্বাচনী বৈতরণী পার হইবার জন্য হিন্দুর নিকট কোন মুসলমান ইসলাম বিপন্নের ধুয়া তুলিবে না। আবার সেইরূপ মুসলমানের নিকট কোন হিন্দু প্রার্থী মহাসভার বাণী আওড়াইবে না। তখন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আদর্শই প্রত্যেক প্রার্থীর মুখ্য বিষয় হইবে। যুক্ত নির্ব্বাচনের মধ্যবর্ত্তিতায় নেতাদের ধর্ম্মান্ধতা কমিবে। আবার জনসাধারণও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আদর্শে দীক্ষিত হইতে থাকিবে। নির্ব্বাচন হইতে ধর্ম্মের আবেদন থামিয়া গেলে, হিন্দু প্রার্থীকে বলিতে হইবে আমি মুসলমানের বন্ধু, এবং মুসলমান প্রার্থীকেও বলিতে হইবে আমি হিন্দুর বন্ধু। প্রথম প্রথম এই প্রতিশ্রুতি পালিত না হইতে পারে। কিন্তু একথাও মনে রাখিতে হইবে যে, নির্ব্বাচিত সদস্যগণ জীবন-সদস্য নহেন। তাঁহাদের কাল ফুরাইয়া আসিলে আবার তাঁহাদিগকে জনসাধারণের নিকট আবেদন করিতে হইবে। পুনরায় সাহায্যপ্রার্থী হইতে হইবে বলিয়া কেহ সহজে প্রতিশ্রুতি ভাঙিতে পারিবে না। হিন্দু ও মুসলমান একত্র মিলিত হইয়া যে প্রার্থীকে প্রেরণ করিবে, তাহার নিরপেক্ষ হওয়া যত সহজ, পৃথকভাবে নির্ব্বাচিত সদস্যদের সেরূপ হওয়া মোটেই সম্ভব নহে।

আমাদের মুসলিম নেতারা একটা কথা জোর গলায় বলিয়া থাকেন যে, হিন্দুরা বড়ই মুসলিম-বিদ্বেষী। তাঁহাদের এই অভিযোগ যদি সত্য হয়, তবে তাহাদের মুসলিম-বিদ্বেষ যাহাতে কমিয়া যায় সেইরূপ কাজ করা কি উচিত হইবে না?

মুসলমানের প্রতি হিন্দুদের বিদ্বেষ বৃদ্ধি হওয়া বা হইতে দেওয়া মুসলিম স্বার্থের দিক হইতে নিশ্চয় শুভকর নহে। ভাবিয়া চিন্তিয়া গবেষণা করিয়া এমন সব পন্থা আবিষ্কার করিতে হইবে, এমনভাবে হিন্দুকে মুসলমানের নিকট বাধ্যবাধকতায় ফেলিতে হইবে যাহাতে তাহাদের সে বিদ্বেষ ভাব কমিয়া যায় এবং বিদ্বেষের স্থলে ভালবাসা ও প্রীতি জাগিতে পারে। পৃথক নির্ব্বাচন কি সেই বিদ্বেষ দূর করিতে একটুও সাহায্য করিবে? বরং পৃথক নির্ব্বাচনের কারণে হিন্দুরা মুসলমানের সাহায্যপ্রার্থী হইবার সামান্য মাত্র প্রয়োজনীয়তা বোধ করে না। কিন্তু যুক্ত নির্ব্বাচন প্রবর্ত্তিত হইলে হিন্দুকে বাধ্য হইয়া মুসলমানের নিকট আসিতে হইবে। বিদ্বেষ ভাব অন্তরে পোষণ করিয়া সে কি কখনও সাহায্য পাইতে পারে? মুসলমানের সহযোগিতার জন্য তাহাকে হৃদয় পরিবর্ত্তন করিতে হইবে এবং তাহার নিদর্শন স্বরূপ এমন কাজ করিতে হইবে যাহাতে মুসলমান তাহার উপর সন্তুষ্ট হয়। যুক্ত নির্ব্বাচন ব্যতীত হিন্দুর হৃদয় পরিবর্ত্তনের সহজতম উপায় নাই। ঠিক এইভাবে যে-সব মুসলমান হিন্দু-বিদ্বেষী তাহদেরও হৃদয় অদ্ভুতভাবে পরিবর্ত্তিত হইবে।

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আদর্শে নির্ব্বাচন যুদ্ধ না চালাইলে সত্যিকারভাবে পার্টি প্রথা গঠিত হয় না। পৃথক নির্ব্বাচন এই পার্টি-প্রথার ঘোর পরিপন্থী। কারণ বর্ত্তমানে প্রার্থীরা জনসাধারণের নিকট যে আবেদন করেন তাহা হইতেছে ধর্ম্মের আবেদন। হিন্দু কৃষক মুসলমান কৃষকের সহিত মিলিতে পারে না। হিন্দু শ্রমিকে ও মুসলমান শ্রমিকে মিলন হয় না ডালভাতের যাহাদের সমস্যা তাহারা একত্র মিলিত হইয়া নিজেদের বাঞ্ছিত প্রার্থীদের পাঠাইতে পারে না। প্রজাহিতৈষী মুসলমান যে হিন্দুর জন্য সর্ব্বস্ব দিতে পারে এবং হিন্দুরাও যাহার জন্য সকলকে পরিত্যাগ করিতে পারে, নির্ব্বাচন পদ্ধতির ত্রুটির কারণে তেমন মুসলমান হিন্দুর সাহায্য পায় না। অথবা সেইরূপ হিন্দু মুসলমানের সহযোগিতা লাভ করিতে পারে না। এই জন্য দেশবাসী সত্যিকারের আদর্শ পায় না। এবং নির্ব্বাচিত সদস্যগণ সুদৃঢ় ভিত্তিতে কোন পরিকল্পনা করিতে পারেন না। নির্ব্বাচিত সদস্যগণ নানা শ্রেণীর লোক লইয়া যে দল গঠন করেন তাহার গঠন ক্ষমতা খুবেই কম। ব্যক্তিগত স্বার্থ ব্যতীত দেশের স্বার্থ সে দলের দ্বারা রক্ষিত হয় না। বর্ত্তমানে বাঙলা ক্যাবিনেটের যে অবস্থা তাহা প্রত্যেক দেশহিতৈষীকে বাঙলার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ করিয়া দিবে। পৃথক নির্ব্বাচন না থাকিলে বাঙলার এ দুর্দ্দশা হইত না। এখানে আদর্শ নাই, নীতি নাই, কাজ নাই, আছে শুধু ধর্ম্মের আবেদন, সাম্প্রদায়িকতায় ইন্ধন প্রদান। বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী ভাল করিয়া জানেন যে দেশে আছে পৃথক নির্ব্বাচন, তাঁহারা কাজ করুন আর নাই করুন, দেশবাসীর ধর্ম্মানুভূতিতে আঘাত দিবার সুযোগ যতদিন থাকিবে ততদিন তাঁহাদের গতিরোধ করে কে? এই সব ধুরন্ধর মন্ত্রিগণ যদি যুক্ত নির্ব্বাচনের মধ্যবর্ত্তিতায় নির্ব্বাচিত হইতেন তাহা হইলে তাঁহাদের এই-প্রকার বেপরওয়াভাব থাকিত না। তাঁহাদেরকে কাজ [illegible] হইত, দেশের জনমতের নিকট মাথা নত করিতে [illegible] ইসলামের দোহাই দিয়া সস্তায় কাজ হাসিল করা চ[illegible] আর্জ হিন্দু-মুসলমান পরস্পর বিভিন্ন, রেষারেষি, হাঙ্গমা দিন-রাত চলিতেছে। যুক্ত নির্ব্বাচন থাকিলে [illegible] হইত না। তাহা হইলে সদ্ভাব, প্রীতি ও ভালবাসা[illegible] সকলে আবদ্ধ হইয়া যাইত।

ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, প্রতিক্রিয়াপন্থী ও [illegible] সর্ব্বস্ব ব্যক্তিগণই পৃথক নির্ব্বাচন সমর্থন করিয়া [illegible] কারণ তাহা না হইলে 'ওথেলোর' (Othello) কারবার [illegible] বিনষ্ট হইয়া যাইবে। সম্প্রতি হক সাহেবের সুখী [illegible] কলিকাতা কর্পোরেশন হইতে যুক্তনির্ব্বাচন পদ্ধতি [illegible] করিয়া তৎস্থলে পৃথক নির্ব্বাচন প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা [illegible] ছেন। হাতে ক্ষমতা আছে, তাঁহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই [illegible] পারেন। কিন্তু ক্ষমতার এমন অপপ্রয়োগ খুব কম [illegible] হইয়া থাকে। কলিকাতার নাগরিক জীবনকে বিষাক্ত না তুলিলে হক সাহেব কি কোনওরূপ স্বস্তি পাইবে[illegible] কোথায় তাঁহারা আইনসভার পৃথক নির্ব্বাচন তুলিয়া [illegible] জন্য চেষ্টা করিবেন, তাহা না করিয়া যেখানে যুক্তনি[illegible] প্রচলিত আছে সেইখানে পৃথক নির্ব্বাচনের বিষ প্রয়োগ [illegible] যাইতেছেন। পৃথক নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে যেসব যুক্তি [illegible] কর্পোরেশনে তাহার প্রত্যেকটি ঘটিতে পারে। [illegible] নির্ব্বাচনের অকল্যাণে কর্পোরেশন ইউরোপীয় ব[illegible] অবাঙালীদের হাতে পড়িয়া যাইবে। মুসলমানের উপ[illegible] নামে যাহা করা হইতেছে তাহাতে মুসলমান উপকৃত হই[illegible] উপকৃত হইবে অন্য লোক। যুক্তনির্ব্বাচন থা[illegible] কর্পোরেশনে নিতান্ত অযোগ্য মুসলমান নিযুক্ত হ[illegible] মোমিন সাহেব ইসপাহানি সাহেব, স্বয়ং হক সাহে[illegible] শ্রেণীর লোকই ত অধিক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তবে কো[illegible] দিয়া হক সাহেব যুক্তনির্ব্বাচন তুলিয়া দিতে চাহিতে[illegible] আমরা মনে করি ইহাতে মুসলমানের দুইদিকে ক্ষতি [illegible] প্রথমত কর্পোরেশন হইতে প্রগতিপন্থী দলের অস্তিত্ব [illegible] পাইবে। আর এ দলের অস্তিত্ব লোপের সোজা অর্থ হ[illegible] জনকল্যাণকর কাজসমূহ বাধাপ্রাপ্ত হইবে। দ্বিতীয় [illegible] এই হইবে যে মুসলমানকে ইউরোপীয়ান ও অবা[illegible] হাতের পুতুল হইয়া থাকিতে হইবে। বিদেশ হইতে [illegible] বাঙলার বুকে বসিয়া যাহারা বাঙলার রক্তশোষণ ক[illegible] তাহাদেরই হাতে বাঙলার রাজধানীর সমস্ত ভার ছাড়ি[illegible] হক সাহেব বাঙলার যে ক্ষতি করিতেছেন তাহার জন[illegible] চিরকালই নিন্দিত হইবেন। এই অঘটন বন্ধ করিবার [illegible] সময় আছে। কর্পোরেশনের যদি কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি [illegible] তবে তাহা দূর করিবার অন্য উপায় আছে। পৃথক নি[illegible] দ্বারা তাহা দূর হইবে না। ইহা কেবল অবাঙালীর [illegible] কলিকাতার পৌর শাসনভার ছাড়িয়া দিবে মাত্র। নির্ব্বাচনের সুবিধার প্রতি হক সাহেবের মনঃসংযোগ [illegible] আমরা আবার তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছি এ সর্ব্ব[illegible] খেয়াল যেন তিনি ছাড়িয়া দেন।

ঘূর্ণাবর্ত

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীমতী অমিয়া সেন

(৯)

বাসায় ফিরিয়া অরুণার মনে ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবলই মঞ্জরীর কথাই জাগিয়া উঠিতে লাগিল। মঞ্জরীর কথা—মঞ্জরীর অশ্রু—সর্ব্বোপরি মঞ্জরীর কাহিনী—তার অকাল বৈধব্য, ব্যর্থ-জীবন—স্বজন-বন্ধুদের নিষ্ঠুর উৎপীড়ন।

বিছানায় শুইয়া শুইয়া অরুণা ভাবিল,—আহা, মঞ্জরীর বড় দুঃখ। কি আছে ওর ভবিষ্য-জীবন! নাই—নাই, কিছুই নাই। আশা নাই—আনন্দ নাই—শান্তি নাই, তৃপ্তি নাই—নাই নাই, কিছু নাই।

উঃ, এ কী ভয়ানক জীবন! শিক্ষিতা সুন্দরী বুদ্ধিমতী মেয়ে, তার সমস্ত জীবনব্যাপী আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ, কামনা, উজ্জ্বল জীবন, আজ দুঃখ আর যন্ত্রণার যজ্ঞে আহুতি দিয়া বাঁচিয়া আছে।

ওর শিক্ষা আজ উদরান্নের জন্য, বুদ্ধির গৌরব নাই, রূপ অভিশাপ। ......কী ভয়ানক অবস্থা!

আচ্ছা—

চকিতে অরুণার মনে একটা কথা বিদ্যুতের মত চমকাইয়া গেল।

মঞ্জরীর মত অবস্থা ত অকস্মাৎ প্রত্যেক মেয়েরই হইতে পারে। আজ যদি ভগবান অরুণাকে এই রকম শাস্তি—অরুণার চিন্তাশক্তি একটা দুর্নিবার ভয়ে অকস্মাৎ একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গেল।

মঞ্জরীর তবু লক্ষ্মণের মত দেবর আছে। হ্যাঁ, জ্যোতির মত দেবর আজকাল ক'জন মেয়ে পায়?

কিন্তু অরুণার কে আছে! সব থাকিয়াও ত তাহার কেহ নাই। আর তা' ছাড়া—

মিহির স্বামী। জীবনের সর্ব্বোত্তম প্রিয়, মরণে মুক্তি যন্ত্রণায় শান্তি, কল্পনায় আনন্দ......তাহাকে ফেলিয়া, তাহাকে হারাইয়া অরুণা বাঁচিবে কেমন করিয়া?

অন্ধকার শয়ন ঘরেই ভবিষ্যতের কোন বীভৎস-ভয়ঙ্কর ছায়ামূর্ত্তি দেখিবার আশংকায় অরুণা সজোরে দুই হাতে নিজের মুখ আবৃত করিল। অস্ফুট চীৎকারে কণ্ঠ চিরিয়া বাহির হইল, একটা কাতর প্রার্থনা, নারায়ণ, রক্ষা কর—রক্ষা কর—

জ্যোতি প্রায়ই আসিত।

মঞ্জরীর প্রতি একটা দুর্ব্বোধ্য আকর্ষণ যেন অরুণার মনটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াইয়া ধরিয়াছিল। সুযোগ পাইলেই তার সমস্ত অন্তর আকুল আগ্রহে ছুটিয়া যাইতে চাহিত, সেই স্বল্পভাষী, অশ্রুমুখী, রূপসী মেয়েটির কাছে।

অরুণার সখী কেহ নাই।

বাইশ বৎসরের দীর্ঘ জীবন প্রবাহে সে গা ভাসাইয়া চলিয়াছে একা, সম্পূর্ণই একা।

কত বর্ষার, অশ্রান্ত বর্ষার প্রায়ান্ধকার দিনে, কত ফাল্গুনের মন-মাতাল-করা সন্ধ্যায় তার নিঃসঙ্গ মন এমন একজন সঙ্গী চাহিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, যার জীবনের সুখ-দুঃখ হইবে তার সুখ-দুঃখের সহিত কাঁটায় কাঁটায় সমান। যার সহিত জীবনের বা অন্তরের একান্ত গোপন কাহিনীটি, দুঃখ ও বেদনার সমস্ত সুগোপন ইতিহাস আলোচনা করা যাইবে, একান্ত নিঃসঙ্কোচে।

কিন্তু অরুণার দুঃখময় জীবনের এ আর একটা দিক, অন্তরের এই সামান্য বাসনাও তার মেটে নাই।

চারিদিক দিয়া সে একা নিঃসঙ্গ।

তাই আজ মঞ্জরী তাহাকে এমন নিবিড়ভাবে আকর্ষণ করিতেছিল।

প্রথমে মাঝে মাঝে, পরে প্রায়ই সে মঞ্জরীর বোর্ডিং-এ যাতায়াত সুরু করিয়া দিল।

অরুণার দিদি বরুণা ভিতরের অতশত ব্যাপার তলাইয়া জানিলেনও না, তেমন কিছু বুঝিলেনও না। তিনি শুধু লক্ষ্য করিলেন, অরুণা জ্যোতির সহিত প্রায়ই বাহিরে যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। বাঙলার মেয়েদের দৃষ্টিতে ও চিন্তাতে একটা রক্ষণশীলভাব ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া আছে, যিনি যত বড় আধুনিকাই না হোক, এ গোপন রক্ষণশীলতা প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের মত একদিন না একদিন সহসা আত্মপ্রকাশ করিয়া বসিবেই।

যদিও অরুণার মুখে মঞ্জরীর সব কথাই তিনি শুনিয়াছিলেন এবং অরুণা যে তার কাছেই যায়, তাও জানিতেন। কিন্তু তবুও তাঁর ব্যাপারটা খুব ভাল লাগিল না। এই জ্যোতির সহিত যাওয়াটা বিশেষ করিয়াই ভাল লাগিল না। জ্যোতি তাঁহাদের কেহ নয়। স্ব-বর্ণ পর্য্যন্ত নয়। যখন তখন সময়ে অসময়ে তার সহিত অরুণার এইভাবে যাওয়াটা কি ভাল দেখায়?

শনিবার দিন অরুণা সামান্য প্রসাধন করিয়া নীচে নামিয়া বরুণার খোঁজে ঘরে গেল। বরুণা ছেলেমেয়েদের খাবার দিতেছিলেন। পায়ের শব্দে মুখ তুলিয়া কি যেন বলিতে গিয়া অরুণার বেশ-বাসের দিকে তাকাইয়া সহসা চুপ করিয়া গেলেন!

অরুণা ডাকিল, দিদি,

বরুণা গম্ভীর মুখে বলিলেন, বল।

—আমি একটু মঞ্জরীর ওখানে যাচ্ছি।

খাবারের ডিশখানা ও চায়ের কাপটা তার দিকে আগাইয়া দিয়া নিদারুণ গম্ভীর মুখে বরুণা কহিলেন, কেন?

অরুণা চায়ের বাটিতে চুমুক দিতে যাইয়া থামিয়া গেল। অবাক হইয়া কহিল, এ কথার মানে?

বরুণা ঝাঁজিয়া উঠিয়া কহিলেন, মানে আবার কি, খালি, মানে আর মানে। রোজ রোজ কি দরকার সেখানে যাওয়ার?

অরুণা তবুও বুঝিল না, চা খাইতে খাইতে করুণ দৃষ্টিতে বরুণার মুখ পানে চাহিয়া কহিল, আহা, তার বড় কষ্ট দিদি, একটা জনপ্রাণীর মুখ দেখতে পায় না। অল্প-বয়সে...... নিশিদিন থাকে ঐ এক বোর্ডিংয়ের অন্ধকূপে বন্দী হ'য়ে। দিদি, তুমি যদি তাকে দেখতে

বরুণা তেমনি স্বরেই কহিলেন, আমার দরকার নেই দেখে। ও-সব ফ্যাসান তোমাদের আজকালকার মেয়েদেরই মানায়।

অসহ্য বিস্ময়ে অরুণা তার মুখ পানে চাহিয়া কহিল, ফ্যাসান? ফ্যাসান কি বলছ তুমি? —ফ্যাসান কি বলছ তুমি?

ফ্যাসান নয় ত কি? ঐ এক মঞ্জরীর দুঃখেই তুমি এমন গলে গেলে কেন? খোঁজ কর, ওরকম মঞ্জরী বাঙলার ঘরে ঘরে আছে। কিন্তু সেজন্য এমন মমতা দেখিয়ে দিন দিন ওর কাছে ছুটে যাওয়ায় কি লাভ? কোন প্রতিকার করতে পারবে তুমি?

অরুণা শূন্য দৃষ্টিতে শুধু তাঁর মুখপানে চাহিয়া রহিল, একটা কথাও কহিল না। সম্মুখে অর্দ্ধ পীত চায়ের পেয়ালা জুড়াইয়া ঠাণ্ডা হইতে লাগিল।

বরুণা বলিতে লাগিলেন, তোমার শরীর সারবার জন্য তোমার শাশুড়ী তোমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। এদিকে-সেদিকে একটু বেড়িয়ে বেড়াবে, মনটা প্রফুল্ল থাকবে, শরীরও ভাল হবে। কত দিন উনি অফিস থেকে এসে জিজ্ঞেস করেছেন অরু কই। তাকে তৈরী হ'তে বল, বেড়াতে নিয়ে যাব। কিন্তু কোথায় তুমি? একটু সুযোগ পেলেই তুমি ছুটবে ঐ বোর্ডিংয়ে। কলকাতা থেকে তোমার মাসতুত দেওর দু'দিন এসেছিলেন দেখা করতে, তুমি ঐখানে। কি বলব, মিছে কথা বলে ফিরিয়ে দিয়েছি। কিন্তু এমনটা ত ভাল নয়। জ্যোতি আমাদের কে? কেউ না। কলকাতায়, এখানে তোমার আমার শ্বশুরবাড়ীর মেলা আত্মীয়-স্বজন অলিতে গলিতে গিস্‌গিস্ করছে, তারা যদি তোমাকে জ্যোতির সঙ্গে কোন দিন দেখে আমার কাছে কৈফিয়ৎ তলব করে, কি বলব আমি তখন?

অরুণার মুখের স্বাভাবিক বর্ণ ক্রমশ ঘুচিতে ঘুচিতে তৎক্ষণে একেবারে বিবর্ণ হইয়া মুখখানা কোলের মধ্যে ঝুঁকিয়া পড়িল।

বরুণার দেখিয়া মমতা হইল। কহিলেন, যদিও জ্যোতিকে আমি ঘরের ছেলের চেয়ে কম দেখিনে, প্রায় সাত-আট বছর মেলামেশার ফলে এখন আর ওকে আমার পর বলে মনে হয় না। মনে হয় আমার ঘরের পাঁচজন লোকের মধ্যে ও-ও এক-জন। কিন্তু বাইরের লোকে ত তা জানবে না বা বুঝবে না। তারা শুধু দোষের দিকটাই দেখবে।

অরুণা আস্তে আস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। তার মাথা ঘুরিতেছিল। এখনই গিয়া না শুইলে হয় ত এইখানেই ফিট হইয়া পড়িবে।

বরুণা কোমল স্বরে বলিলেন, রাগ করিস নে, বোনদের মধ্যে তোকেই সবচেয়ে ভালবাসি, তুই সবার ছোট, কত আদরের আমাদের। কড়া কথা শুনে মনে করিসনে, তোকে শুধু দুঃখ দেবার জন্যই এমন করে বলছি। তুই বড় ছোট, ছোট তোর বয়সের চেয়েও। সংসারকে তোর বয়সী মেয়েরা যতটুকু চেনে, তুই তার সিকিও এখন পর্য্যন্ত চিনলিনে। এই জন্যই আমার এত কথা বলতে হ'ল।

অরুণা কোন কথাই কহিল না। নিরুত্তরে দ্বিতলের সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। তার সমস্ত দেহ থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। মনের মধ্যে মূক অভিমান গর্জ্জন করিয়া ফিরিতেছিল, যে সংসার এমন, সে সংসারকে আমি চিনতেও চাই না। ইহার চেয়ে আমি বরং হব, শতবার মন্দ শতবার মূর্খ।

(১০)

সেদিন জ্যোতি নীচ হইতে ডাকিয়া ডাকিয়া ফিরিয়া গেল। অরুণা আর তার সম্মুখেও আসিল না, যাইবে কি যাইবে না তাও জানাইয়া গেল না। একটা দুর্নিবার লজ্জা অকারণেই তার মনটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াইয়া ধরিয়াছিল। জ্যোতির সম্মুখে যাইতে তাই তার আর সঙ্কোচেরও সীমা ছিল না।

পরদিন বিকালে সে টিউশনী সারিয়া বাড়ী যাইবার পথে আবার এ বাসায় আসিল।

বরুণা দেখিতে পাইয়া কহিলেন, বস ঠাকুরপো। এসেছ যখন চা-টা খেয়েই যাও।

জ্যোতি চারিদিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকাইতেছিল কহিল, অরুণাদি কোথায় বৌদি?

বরুণা মুখ ফিরাইলেন। মিনিট খানেক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, সে ওপরে শুয়ে আছে, অসুখ।

একটা ব্যস্ত উদ্বেগ জ্যোতির চোখে-মুখে তার নিজের অলক্ষিতেই আত্মপ্রকাশ করিয়া বসিল। কহিল, কি অসুখ? কবে থেকে?

বরুণার মুখ অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল, কহিলেন, বিশেষ কিছু নয়। এমনিই শরীরটা ভাল নেই। মাথা-ধরা আছে।

চায়ের কাপটা শেষ করিয়া খাবারের ডিশটা অর্দ্ধেক করিয়া জ্যোতি তৎক্ষণে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে কহিল, একবার দেখে যাই। নইলে বৌদির কাছে গেলে প্রশ্নবাণের জ্বালায় আমাকে অস্থির হ'তে হবে।

অরুণা শুইয়াই ছিল, বিছানার উপর উবু হইয়া দুই-হাতের তলে উপাধানটা জড়াইয়া মাথার নীচে দিয়া উদাস দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকাইয়াছিল।

জানালার নীচেই বরুণাদের বিস্তীর্ণ বাগান। ঝাউ-গাছগুলি বাতাসে দুলিতেছিল। আর বাতাসের স্পর্শনে পাতায় পাতা, ডালে ডাল ঠেকিয়া বাতাসের সঙ্গে সুর মিলাইয়া একটা মিষ্টি গম্ভীর শব্দের সৃষ্টি করিতেছিল।

টবের ভিতর ছোট ছোট পামগুলি, ফুল গাছগুলি বাতাসে ঈষৎ দুলিতেছিল।

—ভিতরে আসব?

কণ্ঠস্বর প্রত্যাশিত না হইলেও অভাবনীয়।

অরুণা চমকিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিল, দিবা-স্বপ্ন টুটিয়া গেল।

সংযত হইয়া ডাকিল, আসুন।

অতিথি যতই অনাকাঙ্ক্ষিত হউক, দুয়ার হইতে তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া চলে না।

অন্তরের সহজ অনুভূতিই শুধু সে পথে প্রতিবন্ধক নয়, শিষ্টাচারও প্রতিবন্ধক।

জ্যোতি ভিতরে আসিল।

অরুণা কহিল, বসুন।

জ্যোতি বসিল না, কহিল, আপনার নাকি অসুখ করেছে, অরুণাদি?

অরুণা চমকিয়া জ্যোতির মুখপানে চাহিল, কে বললে?

জ্যোতি একটু অপ্রতিভ হইয়া গেল যেন, কহিল, কেন, বরুণা বৌদি।

অরুণা লজ্জিত হইয়া কহিল, হ্যাঁ, শরীরটা কাল থেকে একটু খারাপই হয়েছে। তবে হ্যাঁ বিশেষ কিছু নয়।

—বৌদি জিজ্ঞেস করছিল আপনার কথা। কাল খুব আশা করেছিল, আপনি যাবেন। গেলেন না যখন, সে কি দুঃখ বৌদির। কাল আবার অনেক করে বলে দিয়েছে আপনাকে যাবার জন্যে।

অরুণা দাঁতে দাঁত চাপিয়া অন্যদিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। একবার ইচ্ছা হইল, চীৎকার করিয়া বলে, মঞ্জুদিকে বলবেন জ্যোতিবাবু, অরুণা সংসার চিনেছে, সে আর আসবে না।

কিন্তু মুখে কিছুই বলিল না, চুপ করিয়াই রহিল।

জ্যোতি এতক্ষণ পরে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল। অরুণার মুখের পানে আশান্বিত দৃষ্টি মেলিয়া ধরিয়া কহিল, বৌদি কাল বলছিল কি জানেন অরুণাদি?

অরুণাদির তরফ থেকে তবুও কোন সাড়া পাওয়া গেল না। সে মাটির পুতুলের মত তেমনিভাবেই মুখ নত করিয়া নিশ্চলভাবে বসিয়া রহিল।

জ্যোতি তবুও বলিতে লাগিল, বৌদি বলছিল, জীবনে তিনি এত ভালবাসা, এত দরদ এত অকৃত্রিম বন্ধুত্ব কারও কাছ থেকে পান নি, যেমন পেয়েছেন আপনার কাছ থেকে। যে গেছে সে আর ফিরে আসবে না, কিন্তু তাকে হারিয়ে যে জীবন বৌদির বয়ে বেড়াতে হবে, সে জীবনের অর্দ্ধেক দুঃখ কমে যায়, যদি বৌদি আপনার মত একজন দরদীর দরদ নিজের জীবনে পায়। আর আমারও কি মনে হয় জানেন অরুণাদি, বয়সে ছোট হলেও আপনার যে সহানুভূতি আমি পেয়েছি, এতখানি সহানুভূতি মার পেটের বোনের কাছ থেকেও বোধ হয় লোকে পায় না। তাই ছোট হলেও আপনাকে আমার দিদি বলে ডাকতেই ইচ্ছা করে। বলিয়াই জ্যোতি শান্তমুখে অকৃত্রিম আনন্দ আর সারল্যে শিশুর মত হাসিতে লাগিল, যে হাসির আভায় অরুণার মনের ব্যথার কালিমাও ধীরে ধীরে ঘুচিয়া গেল।

বিস্ময় বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে সে এতক্ষণ পরে সহজ দৃষ্টিতে জ্যোতির মুখপানে চাহিল।

জ্যোতি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আজ তা হলে আসি। কাল পারি ত যাওয়ার পথে একবার এদিক ঘুরে যাব। কিন্তু আগে থাকতেই জানিয়ে রাখছি, ভাল হলেই কিন্তু একবার বৌদির কাছে যেতে হবে। নইলে আমি যা মুস্কিলে পড়ব, আমার ভগবানই জানেন।

অরুণা হাসিল।

জ্যোতিও হাসিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল। বরুণা আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন, কহিলেন, জ্যোতি কি বলে গেল রে?

অরুণার এতক্ষণের চেষ্টাকৃত মনের সহজ স্বাচ্ছন্দ্যটুকু বরুণার এই এক কথায় একেবারে নষ্ট হইয়া গেল। তার সমস্ত অন্তর অসহ্য ঘৃণায় রী রী করিয়া উঠিল। ছিঃ—ছিঃ দিদি একি স্পাইগিরি আরম্ভ করিয়াছে। এত সংকীর্ণতা—এত হীনতা, ছিঃ—ছিঃ, এও কি সম্ভব?

বরুণা কহিলেন, কথা কইছিস্ না যে?

অরুণার মনের প্রচ্ছন্ন বিরক্তি এবার মুখে চোখে প্রকট হইয়া ফুটিয়া উঠিল। বলিল, বলব‌ কি?

বরুণা স্থির দৃষ্টিতে তার মুখপানে চাহিলেন, বিস্মিত হইয়া কহিলেন, ওকি, অত রাগছিস কেন তুই?

অরুণা রোষ-রুদ্ধস্বরে প্রায় চীৎকার করিয়া কহিল, রাগ কার না হয়? কি ভাবছ তোমরা আমাকে, ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ—

বরুণা অসহিষ্ণু হইয়া কহিলেন, থাম অরুণ, থাম। অত বাড়াবাড়ি ভাল না। তোকে কিছুই ভাবছিনে, ভাবছি লোকে কি বলবে। এতেই তুই এত অধৈর্য্য হয়ে উঠলি কেন?

অরুণা এবার পরিপূর্ণ বিদ্রোহের স্বরে জলভরা চোখে উচ্চকণ্ঠে কহিল, আমি যাব, আমি যাব, মঞ্জুদির কাছে আমি যাব। কেউ ঠেকাতে পারবে না আমাকে। ভারী ত, চিরকাল শুনে এলাম ঐ এক কথা, লোকে কি বলবে আর লোকে কি বলবে। বলুক লোকে যা খুশী, আমি গ্রাহ্য করিনে। বলিয়াই দুম্ দাম শব্দে পা ফেলিয়া দিদির সম্মুখ হইতে ছুটিয়া পালাইল।

পিছনের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়া সে যখন ঘন ঘন আঁচলে চোখ মুছিতেছিল, পাশের ঘর হইতে দেখিতে পাইয়া হেমনাথ বিস্মিতস্বরে ডাকিলেন, ওখানে দাঁড়িয়ে কে? ছোট গিন্নী না? আরে, ওখানে একা একা দাঁড়িয়ে কেন, এখানেও যে আমি একা, এস, এস এদিকে, এস। অরুণার পাশ কাটাইয়া বরুণা আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন, মৃদুস্বরে কহিলেন, আস্ত পাগল, ছেলেবেলা থেকে ঐ এক ধরণ, বুদ্ধিশুদ্ধি যে কবে আর হবে, তাও বুঝিনে, বললাম কাল জ্যোতির কথা, কোথায় লোকের একটু লজ্জা হয়, তা না, উল্টে ঐ নিয়ে আবার চীৎকার।

—না—না ব্যাপারটা মোটেই ভাল মনে কর না। যদিও আমরা জানি, ওর মন শিশুর মত সরল আর নির্ম্মল, তবুও সংসারের লোক এ নির্ম্মলতার মূল্য দেবে? আর তা ছাড়া একটি কথা কি জান—বলিয়া হেমনাথ বরুণার মুখের কাছে একটু সরিয়া আসিলেন, অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে মুচকি হাসিয়া কহিলেন, কথাটা কি জান, তোমরা মেয়েজাত বড় সেন্টিমেন্টাল, তোমাদের বিশ্বাস করা দায়। বিয়ের পর হতে অরুণাতে আর মিহিরে দেখাশোনা মেলামেশা খুবই কম হয়েছে। স্বামীর প্রতি বিপুল আকর্ষণের প্রাচীরে ওর মনটা এখনো ঠিক সুরক্ষিত হয়ে ওঠেনি। অন্য কোন তরুণ ছেলের সাহচর্য ওর খুব মঙ্গলজনক হবে না।

কথাগুলো আস্তে উচ্চারিত হইলেও ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া অরুণা প্রায় সবটাই শুনিতে পাইল, লজ্জায় ক্ষোভে তার মনটা মাটির সহিত মিশিয়া যাইতে চাহিল। মনে মনে কহিল, ধরণী, দ্বিধা হও—

(ক্রমশ)

নৃত্য-চারিণীর হলাহল

শ্রীমতী অঞ্জলি দেবী

ক্লিওপেট্রা নাগনাগিনী আখ্যায় প্রসিদ্ধা—আরও কত কত নারী হতাশ প্রেমিকের বর্ব্বর প্রতিঘাতে দলিতা ফণিনী রূপে ধারণা! কিন্তু কেন যে নিখিল সৌন্দর্য্যের আধার —কোমলতার মূর্ত্ত প্রতীক প্রফুল্ল মল্লিকা নারী নাগিনীর বিশ্ব ধ্বংসী বিষ উদ্‌গিরণ করে—কে তাহার অন্তরের সংবাদ রাখে। স্বভাব-মধুরা নারী যে সর্পিণীর মতই দংশনোদ্যত হয় কত নিপীড়ন ও নির্যাতনে, তাহার প্রতি সুবিচার করিতে সমাজ কখনও প্রস্তুত নয়—তা সে সমাজ আলোক-প্রাপ্ত পাশ্চাত্যই হউক আর চিরান্ধকার প্রাচ্যই হউক।

সে ছিল 'সেন্ট্ ভ্যালেন্টাইনস্ ডে!' চটুলা নর্ত্তকীর সমাগমে এমনিই লণ্ডনের বিলাসী মহলে লাগে মোহের দোলা—আজ আবার এক নূতন নর্ত্তকী-মূর্ত্তির আবির্ভাব! রূপে সে অপ্সরী—কণ্ঠের মাধুরিমায় কিন্নরী—প্রতি অঙ্গ-ভঙ্গীর অপরূপ লাস্যে দর্শকচিত্তে আকুল হিল্লোল খেলিয়া যায়। লণ্ডনের হে মার্কেটের 'হার ম্যাজেষ্টিস্ থিয়েটারে' সে দিন দর্শকের ভিড়ে কক্ষবায়ু পর্য্যন্ত সজীব।

সেভিল্ হইতে সমাগত নবীনা স্পেনীয় নর্ত্তকী "ডোনা লোলা মোন্টেজ"-য়ের নাম কণ্ঠে কণ্ঠে তরঙ্গায়িত। মঞ্চের পারিপার্শ্বিকে নর্ত্তকীর কমনীয় কান্তি—কালো সাটিন বডিজে ঢাকা আর পুরু সিল্কের ঘাগরায় ঘেরা—যেন স্বপ্ন-লোকের মায়া বিস্তার করিয়াছে। হাঁ নর্ত্তকী সুন্দরী বটে। বিজ্ঞাপনের ভাষা এতটুকু রঞ্জিত নয়। স্পেনীয় ভ্রমর-কৃষ্ণ আঁখিতারার বিজলীচমক অপরূপ লীলায়ই মণ্ডিত করিল নর্ত্তকীর নিজস্ব সৃষ্টি—তাহার অভিনব মৌলিক রচনা—স্পেনীয় 'এল ওলকেনো' (El Oleano) নৃত্যকে। সে কি নৃত্য, এমন লাবণ্য, এমন ভঙ্গিমা লণ্ডনেও বুঝি আর কেহ দেখে নাই।

কিন্তু নর্ত্তকীর নয়াত অভিশাপ—তাহার মৌলিকতাই হইল তাহার যত লাঞ্ছনার মূলে। এই মৌলিকতা এতই সুপরিস্ফুট যে, ইহাতে ভুল বুঝিবার অবকাশ নাই। বিধাতার সৃষ্টিতে যেমন দুই ব্যক্তি হুবহু একই অপরূপ সৌন্দর্য্যের মালিক হয় না, তেমনই নৃত্য-জগতেও একই সাবলীল বিশিষ্টতা দুইয়ের থাকে না। তদুপরি মৌলিকতার এমনই একটা বিচিত্র ছাপ থাকে, যাহাকে ভুল করিতে পারা যায় না কিছুতে।

নৃত্য চলিয়াছে—প্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া—চোখ-ধাঁধান অভিব্যক্তির উজ্জ্বল ব্যঞ্জনায়। সহসা বক্সের সারি হইতে নিদারুণ বিদ্রূপ ও বিরূপ সমালোচনার হিস্ হিস্ ধ্বনি উত্থিত হইল। প্রথমত একক কণ্ঠেই উহার সূত্রপাত—কিন্তু মুহূর্ত্তে তাহা দলে পুষ্ট হইয়া সমগ্র প্রেক্ষাগৃহ মুখরিত করিয়া তুলিল।

এই সময় দেখা গেল সৌখীন লর্ড রেনিলে—আভিজাত্যের বিলাসী নায়ক বলিয়া প্রসিদ্ধ তরুণ—দণ্ডায়মান! মুহূর্ত্তে দর্শকগণের বিস্ময় চরমে পরিণত করিয়া তিনি উচ্চকণ্ঠে, ঘোষণা করিলেন "লেডিজ্ য়্যাণ্ড জেন্টলমেন আপনাদের প্রতারিত করা হইতেছে; আপনাদের সম্মুখে যে নর্ত্তকী—সে স্পেনীয় রূপসা নহে,—সে হল বেট্াস জেম্‌স সাধারণ একটা আইরিশ মেয়ে!"

নর্ত্তকীর মস্তকে বজ্রাঘাত। নিমেষে প্রেক্ষাগৃহের সকল কোণ হইতে—গ্যালারি হইতে টিটকারি ভাসিয়া আসিতে লাগিল। বিড়ালের ডাক, বিকট শব্দ, হিস্ হিস্—কানে তালা ধরাইয়া দিল। প্রতারণা কেহ নীরবে সহ্য করে না, ধাপ্পা দিবার প্রয়াসকে কেহ ক্ষমা করিতে পারে না। মঞ্চ-অধ্যক্ষ যবনিকা পাত করিতে বাধ্য হন।

লোলা কাঁদিয়া ফেলিল। রুদ্ধ আক্রোশে ধারা বহিল দুনয়নে—এই লর্ড রেনিলে, যাহার প্রেম-নিবেদন সে ঘৃণার সঙ্গে উপেক্ষা করিয়াছে—সে কিনা অবশেষে এই হীন প্রতিশোধ গ্রহণ করিল।

হাঁ, সে বেট্সি জেম্‌সই বটে। তাহার মাতা ছিল আইরিশ, স্পেনীয় মূর ছিল পিতা। সতর বৎসর বয়সে সে প্রণয়ীর পরামর্শে গৃহত্যাগ করিয়া গোপনে বিবাহ করে কিন্তু তাহার মনোনীত ছদ্মনাম "লোলা মোন্টেজ", তাহার নিকট নিতান্তই রহস্যময়। স্বামী পরিত্যক্ত তরুণী লোলা যে আজ নৃত্য-পূজারিণী—তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত নির্ভর করিতেছে এই নৃত্য-ব্রতের সাফল্যের উপর। সে কি করিয়া তবে এমন লোভনীয়, এমন মনের মত নামটি বর্জ্জন করিতে পারে? না, সে নামটি ত্যাগ করিবে না—যেমন সে বর্জ্জন করিতে পারে না তাহার নৃত্য-ব্রত।

কাজেই সে লণ্ডন ত্যাগ করিয়া প্যারিসে গমন করিল, কিন্তু ভাগ্যদেবী মুখ তুলিয়া চাহিলেন না। কারণ প্যারিস-বাসীর আকর্ষণ আকাশপরীর মাদকতাপূর্ণ রূপ-মাধুরীর উপর—তাহাদের নজর নিরুজ্জ্বল এই নর্ত্তকীর স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যে বন্দী হইল না—তাহারা উহার কোন বিশেষত্বই লক্ষ্য করিল না।

লোলার সহ্য হইল না। প্যারিসবাসীর উদাসীন উপেক্ষা লোলার অন্তরে শেলাঘাত করিল—তাহার ভ্রমর-কৃষ্ণ আঁখি তারা হিংস্রতায় জ্বলিয়া উঠিল—ওষ্ঠদ্বয়ে দুরভিসন্ধির ছায়া ফুটিয়া উঠিল—উদ্ধতরোষে সে তাহার লম্বা গার্টার্স জোড়া খুলিয়া লইল ত্বরিৎবেগে এবং দলিতা ফণিনী যেমন ক্রোধকম্পিত দংশনে গরল ঢালিয়া দেয়, তেমনই ক্ষুব্ধ নৃশংসতায় লোলা ছুঁড়িয়া মারিল গার্টার্স দর্শকদের মস্তকে। প্যারিসবাসী স্তম্ভিত!

পত্রে পত্রে সমালোচনা বাহির হইল—ক্রুদ্ধা-সুন্দরীর "অগ্নিবর্ষী চক্ষুর লীলাখেলা! উহাতে একদিকে লোলার কৃতিত্বের প্রচার হইল—যদিও নৃত্যের নিপুণতার নয়। লোলার স্নিগ্ধ মাধুরিমার আবরণে যে সিংহিনী-তেজ, ইহাই পরিগণিত হইল শ্রেষ্ঠ আকর্ষণে। রাজা-রাজড়া, অভিজাতগণ, উচ্চপদস্থ অফিসার সকলে আসিয়া জুটিল লোলার উপেক্ষা-বক্র ওষ্ঠের একটি ক্ষীণ হাসিরেখা উপহার পাইবার আশায়। কত কত প্রেমিক দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রাণ হারাইল—শুধু প্রতিযোগীকে পরাভব

করিয়া লোলাকে আপন করিবার আশায় : কত কত হতাশ প্রেমিক আত্মহত্যা করিল।

তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী ছিল—পিয়ানো-বাদক লিস্‌জি, প্যারিসের শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক দুজ্যারিয়ে; তাহার প্রণয়মুগ্ধ ছিল পোল্যাণ্ডের ভাইসরয় আইয়েন পাস্‌কিয়েভিচ্ এবং এবারসবুর্ফ-য়ের প্রিন্স হেন্‌রি। লোলা এবার আর কাহাকেও প্রকাশ্যে প্রত্যাখ্যান করিল না, কিন্তু ধরাও দিল না—আত্মসমর্পণও করিল না কাহারও কাছে। সকলকেই প্রলুব্ধ করিয়া মনে মনে তৃপ্তিলাভ করিতে লাগিল। এমনই এক একটি ধনিক, ওমরাহ তাহার প্রেম-মুগ্ধের সংখ্যা বৃদ্ধি করে, আর লোলা অন্তরে অন্তরে কতকটা প্রতিহিংসার তৃপ্তিলাভ করে এবং আরও উচ্চপদের একজনকে মোহিত করিবার প্রতীক্ষায় থাকে।

ইহার পর সে গেল মিউনিচে। কিন্তু লোলার প্যারিস-কীর্ত্তি সেখানে পৌঁছিয়াছে—রঙ্গমঞ্চে তাহার নৃত্য প্রদর্শনের অনুমতি দেওয়া হইল না। ইহাতে দমিয়া যাইবার মত মন-মেজাজ সিংহিনী লোলার নয়। সে গায়ের জোরেই রাজ-প্রাসাদের ফটক ঠেলিয়া স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট লুড্‌উইগ (প্রথম)-য়ের সমক্ষে হাজির হইল। (মিউনিচ বেভেরিয়ার রাজধানী। প্রথম লুড্‌উইগ উহার রাজা ছিলেন ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি)।

ষাট বছর বয়সের রাজা, সম্মুখে এই অযাচিত এবং পরিচারকগণের অপ্রচারিত মহিলা-মূর্ত্তি দেখিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। কিন্তু লোলার অপরূপ হাস্যের বিজলীচমক রাজার অঙ্গ হইতে চল্লিশটি বৎসর বয়স মোচন করিয়া দিল।

এই সাক্ষাতের পাঁচদিন পরে রাজা লোলাকে রাজসভায় উপস্থিত করিয়া কাউণ্টেস অফ ল্যাণ্ডসফিল্ড উপাধি ভূষিত করিয়া অতুল সম্মানে সম্মানিত করিলেন। লোলা তখন হইতেই রাজাকে একেবারে খেলনার পুতুলে পরিণত করিয়া লইল। রাজার সাধ্য ছিল না যে, লোলার আদেশ ব্যতীত এক পাও নড়ে।

লোলার জন্য পৃথক প্রাসাদ নির্ম্মিত হইল। ২০,০০০ ফ্লোরিন বার্ষিক ভাতা রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হইতে লাগিল। ইহাতেও লোলা তেমন তৃপ্ত নয়—রাণীর উপর লোলার ঈর্ষা; এই বার্ত্তা জানিতে পারিয়া বৃদ্ধ রাজা প্রণয়িনীকে পরিতৃপ্ত করিতে আদেশ দিলেন; কাউণ্টেস অফ্ ল্যাণ্ডস্‌ফিল্ডকে বেভেরিয়ার সর্ব্বোচ্চ পদবী—"হোলি বেভেরিয়ান অর্ডার অফ্ সেণ্ট থেরেসি" অর্পণ করা হইল এবং স্বয়ং রাণী সেই প্রতীক কাউণ্টেসের দেহে পরাইয়া দিবে।

এতদিনে লোলার প্রতিহিংসা তৃপ্ত; কিন্তু ক্ষমতার প্রভাব তরুণীকে দিশেহারা করিয়া দিল। ক্ষমতার মোহেই লোলার পতন আরম্ভ হইল—আর তাহার সূচনা হইল নৈতিক পতনে। বেভেরিয়া রাজ্যে লোলা সর্ব্বেসর্ব্বা—এই অহঙ্কার তাহাকে নানা দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত করিল।

প্রথমত তাহার ভীষণ-দর্শন একটা বুলডগ ছিল। যেসুইট দেখিলেই লোলা কুকুর লেলাইয়া দিত—কুকুরটা বেচারীদের উপর নির্ম্মম অত্যাচার করিত।

দ্বিতীয়ত মিউনিচের মধ্যস্থলে সে এক নৃত্য-মন্দির স্থাপিত করিল। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণদের আহ্বান করিয়া মজলিশ জমান হইত। বৃদ্ধ রাজা লোলার প্রেমে অন্ধ, নিবারণ করিবার শক্তি বা ইচ্ছা কিছুই তাহার ছিল না।

বেভেরিয়া রাজ্যে লোলার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ—তাহার কুকার্য্যের প্রতিকার জন্য আবেদন রাজসভায় পেশ হইতে লাগিল। কিন্তু রাজা নির্ব্বিকার। তাহা হইলে কি হইবে, দেশবাসী নীরবে সহ্য করিল না। তাহারা আন্দোলন আরম্ভ করিল। রাজ্যে লোলার বিরুদ্ধে বিপ্লবের সূচনা দেখিয়া প্রধান মন্ত্রী কার্ল ফন য়্যাবেল (Carl Von Abel) রাজার সাক্ষাতে এবং লোলার উপস্থিতিতে লোলার বিরুদ্ধে জনমতের যথাযথ বর্ণনা করিলেন। তিনি ছিলেন, দেশ-হিতৈষী, রাজভক্ত সরল প্রকৃতির মানুষ। উত্তেজনা সংযত রাখিতে না পারিয়া লোলার মুখের উপরই তাহাকে "কৌশলী দুশ্চারিণী" বলিয়া প্রধান মন্ত্রী ধিক্কার দিলেন। আর যায় কোথা! তড়িৎবেগে কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া লোলা তাহার ঘোড়া হাঁকাইবার চাবুক পাড়িয়া আনিল, আর সপাসপ প্রধান মন্ত্রীর বুকে-পিঠে প্রহার করিতে লাগিল। মন্ত্রীর জাঁকাল পোষাক ছিন্নভিন্ন হইল—উন্মুক্ত পৃষ্ঠ হইতে রক্ত-স্রোত প্রবাহিত হইল। তথাপি নিস্তার নাই, ক্রুদ্ধা সিংহিনীর প্রতিহিংসা-অনল অদম্য বেগে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। নিরুপায় হইয়া প্রধান মন্ত্রী প্রাণভয়ে আকুতি জানাইল—"ক্ষমা, ক্ষমা, রাজ-প্রণয়িনী! ক্ষমা।"

লোলা নিরস্ত, তখনকার মত নিরস্ত হইল বটে, কিন্তু প্রধান মন্ত্রীর পদ হইতে কার্ল ফন্ য়্যাবেল্ অপসারিত হইল। জনগণের মনে যে বিক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহাতে ইন্ধন জোগাইল—প্রধান মন্ত্রীর বিতাড়ন। সমগ্র জাতি লোলার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে নানা আন্দোলন করিতে লাগিল। দুঃসাহসিকা হইলেও কাউণ্টেসের পক্ষে কশাঘাতে সারা জাতির প্রতিটি নরনারীকে সায়েস্তা করা সম্ভব নয়। মিউনিচের রাজপথে বিপ্লব উপস্থিত হইল।

নৃত্য-মন্দির হইতে প্রাসাদে ফিরিবার পথে উত্তেজিত জনতা লোলাকে ধরিয়া ফেলিল—গালাগালি বর্ষণ হইল চারিদিক হইতে, কেহ তাহার মুখে থুতু ফেলিয়া দিল, কেহ মারিল চপেটাঘাত—আজ বুঝি লোলার প্রাণ দিয়া তাহার সকল অত্যাচারের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। লোলা কাহাকে আহ্বান করিবে? কে আছে তাহার বন্ধু, এই সংকটে তাহাকে ত্রাণ করিবে?

আঘাতে কাতর, অপমানিত, লাঞ্ছিত লোলা মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়া যথাসাধ্য আত্মরক্ষা করিতে লাগিল—কিন্তু ক্রুদ্ধ প্রতিহিংসাপর জনতার ভিতর একা নারী কি করিতে পারে? সবল মুষ্ট্যাঘাত উত্তোলিত হইল শত হস্তে—লোলা চক্ষু মুদিয়া রহিল চরম মুহূর্ত্তের অপেক্ষায়—কিন্তু নিমেষে কাহার কোমল স্পর্শ তাহার হুঁস ফিরাইয়া আনিল। জ্বরকাতর বৃদ্ধ-রাজা জনতার আক্রোশ উপেক্ষা করিয়া

আপন প্রাণের মায়া তুচ্ছ করিয়া লোলাকে স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছে। রাজার আগমনে বিক্ষুব্ধ জন-সাগর নির্ব্বাত নিষ্কম্প হইয়া পড়িল। কিন্তু নীরবেও তাহারা রাজা ও লোলার পশ্চাদ্‌গমন করিতে লাগিল। প্রাসাদে প্রবেশ করিলে যখন জনতাকে রোধ করিবার জন্য দ্বার রুদ্ধ করা হইতেছিল, তখন লোলা পিস্তল বাহির করিয়া জনতার উপর গুলী বর্ষণ করিল।

দেশব্যাপী বিপ্লবে রাজার মনও শঙ্কিত হইল। তদুপরি মন্ত্রিগণের পুনঃপুনঃ অনুরোধ—রাণী, হিতৈষী বন্ধুগণের জেদ্—রাজা মনস্থির করিলেন—প্রণয়িনীকে ত্যাগ না করিলে চলিবে না।

করুণকণ্ঠে লুডউইগ বলিলেন—"লোলা, প্রিয়তম, তুমি আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাও, নতুবা আমরা দুইজনেই মরিব।"

যে সেন্ট 'ভ্যালেণ্টিন্‌স্ ডে' লোলার জীবনে ধূমকেতু-স্বরূপ—সেদিনেই তাহার লণ্ডনে প্রথম পরাভব; আর মিউনিচেও সেই 'ভ্যালেণ্টিন্‌স্ ডে'-তেই তাহার ভাগ্য বিপর্য্যয়। অশ্রুপ্লাবিত রাজা প্রেয়সী লোলার কথাই ভাবিতে থাকে—সেদিন একবার মাত্র দেখা পাইয়াছিল, যখন তরুণের ছদ্মবেশে লোলা রাজার নিকট বিদায় গ্রহণ করে।

চারি সপ্তাহ পরে বেভেরিয়াবাসী স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িতে পায়, কারণ রাজাদেশ প্রচারিত হয়—

কাউণ্টেস অফ্ ল্যাণ্ডসফিল্ডকে বেভেরিয়াবাসীর সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইল—এ রাজ্যে সে আর পদার্পণ করিতে পারিবে না।

বেভেরিয়া হইতে নির্ব্বাসিত, অর্থ-শূন্য, যশপ্রতিষ্ঠা বিলুপ্ত লোলা আবার নৃত্যই গ্রহণ করিল পেশাস্বরূপে। ইউরোপ হইতে সুদূর অষ্ট্রেলিয়ায় সে উপনীত হইল নৃত্য প্রদর্শনে অর্থ-বৃদ্ধির জন্য। কিন্তু এত পরিবর্ত্তনেও তাহার স্বভাব—তাহার তেজস্বিতা হ্রাসপ্রাপ্ত হইল না সামান্যও। অষ্ট্রেলিয়া বনাঞ্চলে নূতন নূতন শহরে পৌঁছিবার পর্য্যটনকালে নৃত্য ম্যানেজারের সহিত তাহার বেজায় কলহ হইল। লোলার চিরাচরিত সেই চাবুকাঘাত এখানেও ফলপ্রদ হইবে মনে করিয়া চাবুক হাতে লোলা রুখিয়া গেল। কিন্তু লোলার দুনিয়ায় একমাত্র সিংহিনী নয়—ম্যানেজার-পত্নীও এ অস্ত্রে ব্যবহারে রীতিমত নিপুণ—সে ছুটিয়া আসিয়া লোলার হাত হইতে চাবুক ছিনাইয়া লইয়া স্বামীকে ত রক্ষা করিলই, তাহার পর চাবুকের আস্বাদও লোলাকে ভালরকমই সমঝাইয়া দিল।

যশ, মান, অর্থ, প্রতিপত্তি—সকল আকাঙ্ক্ষার দ্রব্যের তিরোধানে ভগ্নহৃদয় লোলা আমেরিকা যাত্রা করে। সেখানে রিক্ত জীবনযাত্রা করিয়া পরিশেষে ৪৩ বৎসর বয়সে সকল জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। কিন্তু বেভেরিয়ার ইতিহাসে লোলার নাম বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিয়া আছে। মিউনিচের প্রাসাদে লুডউইগের "Hall of Beauties" (সুন্দরীবৃন্দের কক্ষ) অংশে রাজকীয় প্রণয়িনীগণের যে প্রতিকৃতিসমূহ ছিল, লোলার চিত্র তাহাদের মধ্যমণিরূপে শোভা পাইয়াছিল। বৃদ্ধ রাজার পক্ষপাতিত্ব, লোলার স্বৈরাচার-উত্তেজিত দেশব্যাপী বিপ্লব প্রভৃতির কাহিনী বেভেরিয়ার ইতিহাস হইতে মুছিয়া যাইবার নহে।

মৃত্যু

(৮২ পৃষ্ঠার পর)

কাল ধরিয়া তাহাদেরই সর্ব্ব সুখ সুবিধার জন্য সে প্রাণপাত করিয়াছে, তাহারাই আসে তাহাকে হত্যা করিতে! সুদর্শন ভাবে,—হায়রে মূর্খের দল! এই তোমাদের শিক্ষা! এতদিন সে এইভাবেই একটি ডাকাতের দল গড়িয়া তুলিয়াছে! ঘৃণায় সুদর্শনের অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠে। ইহা অপেক্ষা ভাল ছিল তাহার আন্দামান। সে ভাবে—আবার সে আন্দামানেই যাইবে। এই সমস্ত মনুষ্যত্বহীন নীতিজ্ঞান বর্জ্জিত কতকগুলি হীন পশুকে শিক্ষা দিয়া কি লাভ? অমলা!—হাঁ,—অমলাকে ইহারাই হত্যা করিয়াছে।—অমলাকে ইহারাই হত্যা করিয়াছে,—সুদর্শন উত্তেজিত হইয়া উঠে। ঘর হইতে ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া চীৎকার করিয়া ডাকে—দারোয়ান, তিপল সিং, ভজু। সকলে ছুটিয়া আসে। সুদর্শন আরও জোরে চীৎকার করিয়া উঠে,—সাজা দিতে হবে,—হাঁ সাজা দিতে হবে,—ওরা অমলাকে মেরেছে! ওরা বুঝিতে পারে সুদর্শনের মন ঠিক নাই—তাই এইরূপ চীৎকার করিতেছে, সুতরাং সকলে তাহাকে ধরিয়া বাড়ীর ভিতর লইয়া যায়। ভিতরে যাইয়া সে হয়ত চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, অথবা চীৎকার করিয়া অমলাকে ডাকে। সে করুণ আর্ত্তনাদ অমলার কানে পৌঁছায় না। পাশের ঘরে বামাকান্তবাবু ভাবেন, সে বহু কেঁদে গেছে, তোমার জন্য, তখন এতটুকু মমতা হয়নি। এখন তার জন্য ত তোমাকে কাঁদতেই হবে। ভাবিতে ভাবিতে তাহারও দুই চোখ দিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়ে।

*   *   *   *

তারপর বহুদিন কাটিয়া গিয়াছে। সুদর্শন আজও বক্তৃতা করে, ছোট বড় সব সভাতেই সুদর্শনের দেখা মিলে। কিন্তু আগেকার মত সে বক্তৃতা প্রাণবন্ত হয় না, সে বক্তৃতায় থাকে না কোন প্রাণের জাগরণ, কোন উদ্দীপনার উৎস ধারা। বক্তৃতা করা তাহার স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে যেন। সব স্থানেই কিছু না কিছু বলিয়া সে যেন কর্ত্তব্য পালন করিতে চাহে মাত্র। লোকে বলে,—পাগল না কি, কথার কোন মানে নেই—যা না তাই বকে যাচ্ছে। পণ্ডিতগণ বলেন,—সুদর্শনের নিষ্ঠা নষ্ট হয়ে গেছে—সুদর্শন ভাবে,—মৃত্যু তাহার হয় নাই—তাহাই যথেষ্ট।

নীল-বাতি

(গল্প)

শ্রীদিলীপকুমার ধর চৌধুরী

নেহাৎ ভাগ্য দোষ,—তা' না হ'লে রূপ গুণ দুই-ই থাকতে অমন স্বামীর হাতে পড়্‌ল কেন। রূপে গুণে সত্যি-ই সে সাবিত্রী! কিন্তু কপালে সুখ বিধাতাপুরুষ লেখেন নি।

পাঁচ বছর বয়সে মা বাপ হারিয়ে সাবিত্রী মামার সংসারে আবর্জ্জনার মত-ই ঠাঁই পেল। অবজ্ঞা আর অবহেলার ভেতরেও রূপের জ্যোতি তা'র আপনা থেকেই প্রস্ফুটিত হ'ল। কিছু বয়স হতেই সাবিত্রীকে এক বিত্তশালী প্রবীণের হাতে তুলে দিয়ে মামা দায়মুক্ত হলেন। আর মামী ছাড়লেন তৃপ্তির নিশ্বাস। নিজের মেয়ে তো আর নয়! * * *

মামার সংসার থেকে সাবিত্রী যখন মুক্তি পেল তখন তা'র বড় আশা ছিল, এবার শান্তির মুখ দেখতে পাবে। শ্বশুর বাড়ী—সে ভেবেছিল, এনে দেবে তার বুভুক্ষিত প্রাণে শ্বশুর শাশুড়ী, দেওর-ভাশুর, ননদ-জা নিয়ে হাসি ভরা এক শান্তিময় তৃপ্তির সংসার। আর স্বামীর সম্বন্ধে ছিল তা'র রঙিন এক স্বপ্নময় কল্পনা।

কিন্তু আশা তার ভাঙল প্রথম দিনেই। নববধূ যখন উঠল স্বামীর ভিটায়, বরণ করার ভার নিল সন্ধ্যার গভীর অন্ধকার আর অসহ্য একটা নির্জ্জনতা।

পকেট থেকে দেশলাই বার করে বর নিজেই হারিকেন একটা খুঁজে জ্বালাবার চেষ্টা করল। লোকের সন্ধান পেয়ে ঘর থেকে একটা কালো পেঁচা চেঁচাতে চেঁচাতে উড়ে গিয়ে বাঁশঝাড়ের মাথায় আশ্রয় নিল।

এমনি করেই স্বামীর ভিটের সঙ্গে সাবিত্রীর প্রথম পরিচয় হয়।

স্বামী দুলালের সাতকুলে কেউ নেই। কয়েকদিনের ভেতরেই সাবিত্রী তা'র স্বামীর পরিচয় ভাল করেই পেল। গাঁয়ের ওধারে যে ছোট শহরটা রয়েছে, তারি কোন বিশেষ পল্লীতে দুলালের বেশির ভাগ সময় কাটে। মাঝে মাঝে যখন মর্জ্জি হয়, মদ খেয়ে টঙ্ হয়ে বাড়ী ফেরে, আর যাওয়ার সময় সাবিত্রীর কপালে, পিঠে, সারা গায় দুলাল তা'র স্বামিত্বের অধিকার নিদর্শন রেখে যায়। জিজ্ঞাসা করলে জবাব দেয়,—বিয়ে সে করেছে শুধু বাপ পিতেম'র আত্মার শান্তির জন্য। সহ্য করার শক্তি সাবিত্রীর জন্ম-লব্ধ,—দিন তা'র কেটে যায়।

দিদি বলতে সুবল অজ্ঞান। রোগশয্যার উত্তপ্ত জ্বালার মধ্যে এক স্নেহময় স্পর্শে সে এই দিদির প্রথম পরিচয় লাভ করে। নিঃসঙ্গ সুবল যখন কোম্পানীর দেওয়া ইঁটের ঘরের ভেতর পড়ে জ্বরের ঘোরে ছট্‌ফট্ করছিল, গাঁয়ের লোকের মুখে সে কথা শুনে অন্ততঃ সাবিত্রী চুপ করে থাকতে পারে নি; আর পারে নি বলেই এক অপরিচিত ছেলের সাম্‌নে যেতেও সাবিত্রীর সঙ্কোচ হয় নি।

সাবিত্রীর সেবায় দু'দিনেই সুবল সেরে উঠল। সেই থেকে সাবিত্রী হ'ল দিদি আর সুবল তা'র ভাই। সাবিত্রীর অন্তরের এতদিনের রুদ্ধ স্নেহ, মায়া-মমতা, ভালবাসা সুবলকে কেন্দ্র করে প্রকাশ পেল। আর নিঃসঙ্গ সুবলও স্নেহ দাবী করার একটা স্থান পেল।

সুবলের আয় মন্দ নয়। পাড়া গাঁয় পঁচিশ টাকা কম কি! কাজটাও বেশ। গাঁয়ের ধারে রেল লাইন, কিছু দূরেই ছোট ষ্টেশনটা। এই রেল লাইনের সিগ্‌ন্যাল ঘরের ভার সুবলের ওপর। ছোট লাইন, সারা দিনে পাঁচটা ট্রেন 'পাশ' করে। ট্রেন যাওয়ার আগে 'ফোন' আসে ক্রিং ক্রিংক্রিং। কথা শুনে সুবলকে সিগ্‌ন্যাল ঠিক করতে হয়। আর রাত্তিরে লাল বা নীল বাতি লাগাতে হয় সিগ্‌ন্যালের মাথায়। দিনের বেলায়-ই বাতিগুলি পরিষ্কার করে, তেল-টেল দিয়ে ঠিক করে রাখে। এই ত' গেল তা'র কাজ, বলতে গেলে সারাদিনই ছুটি। আগে দিনগুলি সুবলের কাটত না, এখন দিদিকে পেয়ে গল্প করে কি করে যে দিনগুলি কেটে যায়, তা'-ই ভেবে পায় না।

গাঁয়ের লোকে কিন্তু সুবল আর সাবিত্রীর এতটা মাখা-মাখি ভাল চোখে দেখে না,—তা' বলা-ই বাহুল্য। গাঁয়ের লোকে সন্দেহ করলেও প্রকাশ্যে কিছু বলতে পারে না। তার কারণ সুবলের কাছে সময়ে অসময়ে গ্রামের ভদ্র অভদ্র সাহায্য চেয়ে বিফল হয় না।

প্রকাশ্যে না হলেও গোপনে এই নিয়ে ইতর আলোচনা কম চলে না; আর আলোচনার উৎসাহটা ভদ্র অভদ্র সকলেরই সমান, বরং ভদ্রলোক বা মুরুব্বী শ্রেণীর উৎসাহটাই যেন বেশি।

কথাটা দুলালের কানে উঠতেও বিশেষ দেরী হয় না। দুলালের বংশ মর্যাদা আর পুরুষত্বের যেন টনক নড়ে; তার ওপরে ভ্রষ্ট পুরুষের স্ত্রীর উপর সন্দেহটা অনেকটা আপনা থেকেই জাগে। ফলে সাবিত্রীর উপর অত্যাচারের মাত্রাটা অনেক বেড়ে যায়। সুবল কিন্তু জানতে পারে না, সুবলকে মুখ ফুটে এ কথা বলার শক্তি সাবিত্রীর নেই; বরং আঘাতের চিহ্নগুলি যেদিন প্রকট হয়ে ওঠে সেদিন 'ঘাট থেকে পড়ে-যাওয়া' বা অন্য অছিলায় সুবলের কাছে সত্য ঢাকা দেয়।

সেদিন ভাই-ফোঁটা। সাধ্যমত রান্নার আয়োজন করে সাবিত্রী সুবলকে নিমন্ত্রণ করেছে। সুবলও স্নান-টান সেরে তাড়াতাড়ি দিদির বাড়ী সানন্দে হাজির হ'ল। ফোঁটা দেওয়া সেরে নিয়ে সাবিত্রী সুবলকে পাশে বসিয়ে প্রাণভরে খাওয়াচ্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে হাস্য পরিহাস চল্‌ছে।

সুবল বলে—আচ্ছা দিদি যমের দুয়ারে কাঁটা দিয়ে কি লাভটা হ'ল বল দিকিন? যমের দুয়ারে ত' যেতেই হ'বে, তা' আট্‌কান স্বয়ং ব্রহ্মারও সাধ্য নেই, তবে কাঁটা দিয়ে লাভটা কি, বরং যম যখন টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাবে, তখন ওগুলো পায়ে ফুটে কষ্ট দেবে বৈ ত নয়।

সাবিত্রী রেগে যায়, বলে,—নাও নাও আর ব্যাখ্যা করে কাজ নেই, যত সব অলক্ষুণে কথার ছিরি দেখ।

সাবিত্রীর রাগ করাটা সুবলের বড় ভাল লাগে। সে হাসতে থাকে।

তাদের কথাবার্ত্তার মাঝে হঠাৎ উঠানে কা'র পায়ের

আওয়াজ শোনা গেল। আওয়াজ শুনেই সাবিত্রী বুঝতে পারে দুলাল এসেছে। তিনদিন বাদে বাড়ী ফিরল। সাবিত্রী ভাবতে পারে নি যে দুলাল আজ এমন অসময়ে এসে হাজির হবে। ভয়ে সে শিউরে উঠল। সুবলকে ইসারা করে চলে যেতে বলামাত্র ঘরে এসে দুলাল হাজির হ'ল।

—বাঃ বাঃ চমৎকার হচ্ছিল। এতটা দুঃসাহস যে স্বামীর বর্ত্তমানে, তারি-ই ভিটেয় বসে দিনদুপুরে পর পুরুষের সংগে......ছি ছি এমন কুলটা! দাঁড়াও আমিও জানি—

দুলালের এবারের ওষুধটা কি সাবিত্রী তা' ভাল করেই জানে। কিন্তু তার সেদিকে লক্ষ্য ছিল না, সাবিত্রীর একমাত্র ভয়,—যদি সুবল দুলালের কথা শুনে থাকে! সুবল কি যেতে যেতে কিছু কি না শুনেছে! উঃ কি লজ্জা! * * *

সাবিত্রীর আর ভাববার অবকাশ রইল না—মাথায় একটা বিষম আঘাত পেয়ে, জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল।

দিদির মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে সুবল বললে—না দিদি আর ভয় নেই, ফুলোটা অনেক কমে গেছে। উঃ আমি যদি সেদিন ব্যাপারটা বুঝতে পারতাম, তুমি রাগ কর না দিদি, হতচ্ছাড়াটার জান্ নিয়ে ফাঁসীতে ঝুলতাম সেও ভী আচ্ছা।

শান্ত কণ্ঠে সাবিত্রী জবাব দিল—ছিঃ ভাই রাগ করতে নেই। এই যে আমি সারা জীবন সয়ে এয়েছি, সত্যি বলছি, তা'র ওপর আমার এক বিন্দু রাগ নেই। আমি স্ত্রী, আমাকে ত' সইতেই হবে।......

না দিদি আমি তা' মানি না। পুরুষের সব দোষের মার্জ্জনা আছে, আর মেয়েছেলে বলে দোষ না করেও দোষী। এর কোন যুক্তি নেই। গাঁয়ের লোকের কানাকানি অনেক দিন থেকেই লক্ষ্য করেছি, কিন্তু সঠিক কিছু বুঝি নি। এখন সব সহজ হয়ে গেছে।

খানিকক্ষণ নীরব থেকে সুবল আবার বলতে আরম্ভ করল—আচ্ছা দিদি একটা কথা বলব, কিছু মনে করবে না বল?

সাবিত্রী বলল—কি কথা ভাই:

চল আমরা ভাইবোন এখান থেকে চলে যাই। দিদি কলকাতা যাবে? সেখানে বেশ আরামে থাকা যাবে। বিরাট শহর কেই বা কা'কে চেনে! দুখানা ঘর ভাড়া নিয়ে দুজনে থাকব। রোজ রোজ বেশ যাদুঘর চিড়িয়াখানা, কালিঘাট দেখে বেড়াব। দিদি তুমি রাজী হও।

শুষ্ক হেসে সাবিত্রী জবাব দিল—আচ্ছা আমি না হয় ধর রাজী হলাম। কিন্তু বেশ কিছু টাকা চাই। না অমনি অমনি!...

সুবল বললে—দিদি তুমি যদি রাজী হও, টাকায় আটকাবে না। শ' কয়েক জমিয়েছি হাতে। আর কলকাতা বিরাট শহর, একটা কিছু জুটিয়ে নিতে কতক্ষণ?

সুবলের আগ্রহাতিশয্যে শেষ পর্যন্ত কোন কিছু না ভেবেই সাবিত্রীকে রাজী হতে হয়। সাবিত্রী রাজী হয়েছে দেখে সুবলের কি আনন্দ!

সুবল বলে—দিদি কাল দুপুরের ট্রেনেই রওয়ানা হতে হবে। সাবিত্রী বলে—পাগল না কি! হুট করে হঠাৎ কাল; তাও কি সম্ভব?

—না দিদি, কেন সম্ভব নয়? তোমাকে একদিনও এখানে থাকতে আমি দেব না। কালকেই যেতে হবে। তুমি কিছু ভেব না দিদি। সকালের ভেতর আমি সব গুছিয়ে নিতে পারব।

সুবলের তর্কের কাছে সাবিত্রীর আপত্তি টেঁকে না। তারপর সুবল সাবিত্রীর সংগে পরামর্শ করতে থাকে—ঘর দুখানা কি করে সাজাবে, হাওয়া গাড়ী ভাড়া করে কোথায় কোথায় বেড়াতে যাবে, এইসব। সুবলের শিশুর মত এই সরলতা সাবিত্রী সকৌতুকে উপভোগ করে। যাওয়ার আগে সুবল সাবিত্রীকে মনে করিয়ে দিয়ে গেল বারবার—দিদি আলসের মত বসে থেক না যেন। সব গুছিয়ে টুছিয়ে নাও। কাল দুপুরেই, মনে থাকে যেন।

দীপ জ্বালা হয় নি ইচ্ছে করেই। সন্ধ্যার অন্ধকারে সাবিত্রী ভাবতে থাকে। সুবলের সংগে যাওয়া উচিত হবে কি না। না গেলে সুবল কঠিন আঘাত পাবে সত্য, কিন্তু গেলে, গ্রামের লোকে একেই ত রটিয়েছে যা তা, তখন তা হলে আর লোক-সমাজে মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না। আচ্ছা, কোন মধ্যপথ নেই? কলকাতা যাওয়া কিসের জন্য—মুক্তির আশায় শান্তির আশায়,—কেমন তো? এ জীবনে শান্তি কি আর হবে? মুক্তির কি অন্য পথ নেই? সাবিত্রী অনুভব করল, দমকা বাতাস যেন বলে গেল—আছে আছে, আছে। সাবিত্রীর অন্তরে একটা উন্মাদনা একটা কিসের অস্থিরতা ক্রমেই বাড়তে লাগল। আত্মা যেন বলছে,—প্রেমের পর জন্মান্তর। স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন যেমন জনম-জনমের ভাই-বোনের দরদও তেমনি মৃত্যুঞ্জয়ী। সাবিত্রীর অন্তরকে যেন বলে—সাবিত্রী তুই কি সত্যি দুঃখিনী? হঠাৎ সাবিত্রীর মনে হয়, তাই ত দুঃখটা তার কোথায়! সে ত বেশ আছে, তার ঘরকন্না, তার স্বামী, তার ভাই, তবে তার অভাব কিসের? অভাব যে তার কোথায় সাবিত্রী তা আবিষ্কার করতে পারে না।

গভীর রাত। গ্রামের পথে পথে জ্যোৎস্নার আলো ছড়িয়ে পড়েছে। ভিটের মাটিকে প্রণাম করে সাবিত্রী বাইরে এল। বাতাবী ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। সাবিত্রী এগুতে আরম্ভ করল। রায়েদের পুকুর ভর্ত্তি শাল, ফুল হওয়ায় দুলছে আর চাঁদের আলোয় হাসছে। ওদিকের গাছটা থেকে শিউলী ফুল অবিশ্রান্ত ঘাসের ওপর ঝরে পড়ছে, বেশ অনুভব করা যায়। পৃথিবীর এত রূপ সাবিত্রীর চোখে কখনও ধরা পড়ে নি। আরো এগিয়ে চলে। কাদের বাড়ীর একটা শিশু জেগে কেঁদে উঠল। নতুন মা শিশুকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করে কখনও বকে, কখনও আদর করে। সাবিত্রী চুপ করে তা' শুনল। ভেতর থেকে তা'র একটা অতৃপ্ত নিশ্বাস বেরিয়ে আসে। আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে সাবিত্রী দেখতে পেল রেল লাইন দুটো যেন

বিপুল বেগে ছুটে চলেছে যেখানে দিগন্তের সঙ্গে অসীমের প্রেমগুঞ্জন।

হাঁ, ঐ ত সে প্রেমগুঞ্জনের রেশ ভেসে আসে। ঐ ত গন্ধে-আলোকে-গানে স্বর্গ রচনা করে কে যেন সাবিত্রীকে ডাকছে। হাঁ, যাবে সাবিত্রীও যাবে।

এস এস আর দেরী করা চলে না। এস।

যাই ভাই—যাই। সাবিত্রী পশ্চাতে তাকায় না, সম্মুখে তাকায় না—হৃদয়ের রুদ্ধদ্বার কে যেন খুলে দিয়েছে। সেখানে আলোয় আলোয় চাঁদের মেলা। তবে তার ভিতর একটা নীল বাতি যেন সাবিত্রীর প্রাণ কেড়ে নিতে চায়।

—অভিমান করিস্ নি লক্ষ্মী ভাইটি, যাই আমি। আমার অনেক কথা বল্‌বার ছিল—অনেক কাজ করবার ছিল—না, না, আর দেরী কর্‌ব না.

চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যায় সুবল ঘুমে ঢুলছে। এই ২-১৫ মিনিটের ট্রেনখানা গেলেই তার ছুটি। হঠাৎ ফোন বেজে উঠল—ক্রিং ক্রিং ক্রিং। ধড়ফড়িয়ে উঠে সুবল রিসিভার ধরে। ২-১৫ মিনিটের ট্রেন আসছে, লাইন ক্লিয়ার। ঘুমের ঘোরেই সুবল সিগন্যালে নীল বাতি লাগায়। আবার শুয়ে পড়ে। হয় ত' স্বপ্ন দেখছে, দিদিকে নিয়ে কলকাতায় বাসা বাঁধবার মধুর স্বপ্ন। ঐ যে ২-১৫র ট্রেন্ আসছে—ঝক্ ঝক্। সিগন্যালে নীল বাতি, স্পীড ভাই কমে না, বরং বেড়ে যায়।

গাড়ী ত এল। সাবিত্রী আজ কিছুতেই পেছনে পড়ে থাক্‌বে না। তবু শিশুর মত সরলতায় কে যেন ডাকে—দিদি! দিদি!

এই যাই ভাই। হাঁ রে অবুঝ, তোর দিদিকে নীল বাতি দিয়ে পথ দেখিয়ে নিতে এসেছিস্। কত কষ্ট হ'ল তোর... নীল বাতিটা একটু সরা না ভাই—আমি যে কিছু দেখতে পাচ্ছি না চোখে।...

আমার হাতখানা ধর লক্ষ্মীটি—চারদিকে কেবলি যে নীল—নীল—পরক্ষণেই তড়িৎবেগে ঘোর গর্জ্জনে যন্ত্র-দানবের অগ্রগতি......

একটি মাত্র করুণ আর্ত্তনাদ—ভাই সুবল, কোথা।...

তারপর সব নিস্তব্ধ। সাবিত্রী আজ আর পিছিয়ে পড়ে নি। তারও সিগন্যাল আজ মাথা নত করেছে—তার জীবন পথেও আজ লাইন ক্লিয়ার—ঐ নীল বাতি।

অগ্নিস্তুতি

[ঋগ্বেদ—১ম মণ্ডল,—১ম সূক্ত]

শ্রীঅমিয় ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি টি

অগ্নির পূজা করি,
ঋত্বিক তিনি, হোতা তিনি, তিনি দেবতা, তাঁহারে বরি।
যজ্ঞের পুরোহিত,
পরম-রত্ন অধিকারী যিনি সর্ব্বকলুষ-জিৎ।
যশঃ বাড়ে তাঁর দৃষ্টি লভিয়া, লভি তাঁর কৃপাকণা
শূরশ্রেষ্ঠ তনয় জনমে ধরায় সুমহামনা।

যাঁর স্তব গাহি, অন্ধ নয়ন মেলিলেন ঋষিগণ,
যাঁর স্তব-গীতি ঋষি তপোবনে চলিছে চিরন্তন
কলুষ-পাবক অগ্নি দেবতা, তাঁহারে জানাই নতি,
তাঁর করুণায় দিব্য চক্ষু গেছে খুলি সম্প্রতি।

জয়, অগ্নির জয়,
রক্ত-শিখায় উঠুক জ্বলিয়া নিখিলের গ্লানি-ভয়।
দশদিশি ভরি হে বৈশ্বানর, লভিছ আহুতি তুমি
সকল যজ্ঞ কৃপায় তোমার পরশে স্বর্গ-ভূমি।
তুমি হোতা, তুমি প্রজ্ঞা-আধার চিত্রশ্রবস্তম,
সত্য তোমার মুকুটে ঝলকে এস নবরাজ সম।

দীপ্তির সাথে দানের মহিমা উঠে তব শিখা বাহি,
দেবগণ সহ আজি এ যজ্ঞে তোমারেই মোরা চাহি।
কল্যাণ-কর বিছাইয়া দিলে তোমার পূজারী-পানে,
অঙ্গির! তুমি কল্যাণ-উৎস। তোমা পানে মন টানে।
প্রতিদিন দিবা-বিভাবরী ধরি' অর্চ্চি হে হুতাশন,
অন্তর ঢালি তোমার পূজায় নিষ্কাম করি মন।

যজ্ঞের রাজা, সত্য-পালক, দীপ্ত, স্বপ্রকাশ,
হে জ্ঞান স্বরূপ! তোমারে ভাবিয়া তোমাতে করিব বাস।
নিজ-গৃহে ক্রমবর্দ্ধমান হে!—এই প্রার্থনা করি,
ভাস্বর তব মূর্ত্তিরে যেন চিরদিন বুকে ধরি।
আপন পিতারে পুত্র যেমন কাছে পায় অনায়াসে
হে অগ্নি! তুমি তেমনি রহিও আমাদের আশে পাশে।
প্রতি নিঃশ্বাসে তোমার মন্ত্র বরণ করিতে চাহি,
রহ রহ দেব! মঙ্গলাশিস উঠুক শিখাটি বাহি।

জয়, অগ্নির জয়!
রক্ত-শিখায় উঠুক জ্বলিয়া নিখিলের গ্লানি-ভয়।

দক্ষিণ আফ্রিকা

(ভ্রমণ-কাহিনী)

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

বুলবায় পার হয়ে একটা গ্রামে এসেছি। নেটিভদের বাস তাতে। একটা বৃক্ষের নীচে বসে একটু আরাম করছি, এমন সময় আমার পরিচিত দুজন নেটিভ গ্রামে প্রবেশ করল। গত তিনদিন ধরে এদের প্রায়ই পথে পেয়ে সইকেল থামিয়ে কথা বলতে চেয়েছি কিন্তু এরা কথা বলে নাই। আমার এদের প্রতি সন্দেহ হয়েছিল নানা কারণে। সাধারণত নেটিভরা যখন পথে চলে তখন তাদেরে হয় চিন্তিত, পরিশ্রান্ত দেখা যায় নতুবা তাদের মন প্রফুল্ল এবং শিস দিতে দেখা যায়। নেটিভদের মাঝে গান গাওয়া রীতি হালে চালু হয়েছে, এদের মাঝে গানের প্রথা ছিল না। যেখানে প্রকৃত নেটিভ সভ্যতা বিদ্যমান সেখানে এখনও নাই। এরা পূর্ব দেবতাকে উপাসনা করে থাকে। এ দুজন লোকের চালচলন তিন দিন ধরে দেখে আসছি। এদের মুখে খুনীর ভাব আপনা হতেই যেন প্রকাশ পাচ্ছে। এদের সঙ্গেই একটা গ্রামের কাছে এলাম।

দক্ষিণ আফ্রিকার দেশীয় নারী ভুট্টা পিষিয়া আটা তৈরী করিতেছে; পিছনে বাসগৃহ দেখা যায়, উহারা ইহা অপেক্ষাও ছোট ঘরে বাস করে

নেটিভদের গ্রাম বড় হয় না। ছোট ছোট কুণ্ডলীকৃত ঘর, তাতেই তারা বাস করে, জীবন কাটায়, সুখে থাকে। মনে মনে ভাবলাম, ওদের সুস্থির হতে দাও তারপর আবার যাব ওদের কাছে। পনর মিনিট পর গ্রামে গেলাম এবং এদের একটা ঘরের পেছনে বসে একটা বাদ্যযন্ত্র বাজাতে দেখলাম। মানে এদের মন তখন প্রফুল্ল। আমি ওদের কাছে যেতেই ওরা তাদের বাদ্যযন্ত্র বন্ধ করে আমার দিকে তাকাল। আমি তাদের বুঝিয়ে বললাম, আমি পুলিশ নই। আমি একজন ইণ্ডিয়ান পথিক মাত্র। দেশ দেখতে এসেছি। আমি দরিদ্র বলে সাইকেলে বেড়াই; যদি পয়সা থাকত তবে তোমাদের Bush landএ নিশ্চয়ই মোটরে বেড়াতাম। তাদের মনের ভাব পরিবর্ত্তন হল দেখে তাদেরই পাশে ঘরের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে মাটিতে বসে পড়লাম। এতে তাদের মাঝে আরও আনন্দ হল।

আমি বললাম, লিম্বি, পোট জনষ্টন, ইমতালী এসব দেখে এসেছি। তাদের গ্রাম সেদিকে কি-না? একজন ন্যাসাল্যেণ্ডের ইংরেজী ভাষায় বলল, নিশ্চয়ই তারা সেদিকের লোক, তবে ইমিগ্রেসন অফিসরদেরে ফাঁকি দিয়ে জহোনবার্গে যাবে বলেই এইরূপভাবে লুকিয়ে চলছে। তাদের হাঁটার বহর দেখে আমার আনন্দ হল। যে চল্লিশ মাইল পথ আমি সাইকেলে চলি সেই চল্লিশ মাইল পথ তারা আনন্দে পায়ে চলে। তারাও আমারই মত ভুট্টার আটার পরিজ খায়। তারাও সপ্তাহের মাঝেও একদিন স্নান করে না। তাদের পায়ে পাদুকা নাই, মাথায় টুপি নাই। পরণে ময়লা পাতলুন

দক্ষিণ আফ্রিকার কাফের নামীয় দেশীয় সম্প্রদায়; কাফের নামটি কাফ্রি শব্দের অপভ্রংশ মাত্র; সাধারণত ইহারা নিজগৃহে কিছুই পরিধান করে না

গায়ে একটা মাত্র সার্ট। তাদের সহ্যশক্তি অপরূপ। তারা ইংরেজী ভাল করে জানে। তারা বাইবেল হাজারবার পাঠ করেছে, তারা ভূগোল অবগত আছে। তবে এদের এই অবস্থা কেন? এই অবস্থার একই মাত্র কারণ, তুমি কালো, তোমাকে দাবিয়ে রাখবই, শাসনভার আমাদের হাতে, শাসন করব, তারপর যে অবস্থায় রাখি সে অবস্থায় থাকতে হবে। এ জন্যই এই দেশের শিক্ষিত লোকেরও এরূপ দুর্দ্দশা। এই দুর্দ্দশা দূরীকরণার্থ অনেক যুবক বলিদান করেছে তাদের জীবন, কিন্তু কেউ জানে না সে কথা। জানবার পথ নাই,

সংবাদপত্র শাসকের হাতে, কালো লোকের কথা সংবাদপত্রে বের হয় না। আসামের কুলি সমাচারও পূর্ব্বে বের হত না, কুলির মরণ, বাগানের সাহেব ত' দূরের কথা বাগানের বাবুদেরও মন আকর্ষণ করত না। ঠিক সেরূপভাবে এ দেশের নেটিভদের মরণ কারো মন আকর্ষণ করে না।

দুজনে মিলে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, এখন আমি যাব কোথায়? আমি বল্‌লাম, প্রিটোরিয়া। তারা আমাকে বললে, প্রিটোরিয়া পর্য্যন্ত একই সঙ্গে যাবে এবং পথে প্রায়ই দেখা হবে। গ্রামে তাদেরে রেখে দিয়ে আমি এগিয়ে চল্‌লাম। মন আমার নিশ্চিন্ত, কারণ যেভাবে এরা আমার সঙ্গে কথা বল্‌ল, তাতে

প্রবন্ধলেখক এবং ভেলুরেম গ্রামের "কলোনিয়াল বর্ণ য়্যাণ্ড সেটেলার্স" এসোসিয়েশন-এর সেক্রেটারী

অবিশ্বাস করার কিছুই রইল না। সেদিন বিকালে আবার তাদের সঙ্গে দেখা হল। কথা মোটেই হল না, কারণ আমি আমার থাকার স্থান নিয়েই ব্যস্ত। গ্রামের কাছে একটা নদী; কিন্তু ঠাণ্ডা বাতাসের জন্য শুধু মাথা ধুয়েই স্নান সমাপন করলাম। এখানে আমার অবস্থা এবং নেটিভদের অবস্থা একই, সেজন্যই বুঝতে পারছি নেটিভদের অবস্থা, নতুবা মোটেই বুঝতে পারতাম না। কাছেই রেল ষ্টেশন। একটা সংবাদপত্র কেনার জন্য তথায় গেলাম। সকলেই যেন আমাকে এড়াতে চায়। আমি যেন নেটিভ হতেও অছুৎ, সে ভাব কেন? সে ভাবের কারণ, আমি Boss শব্দের ব্যবহার করি না। এদেশে ইউরোপীয়ানরা নেটিভদের কাছ হতে Boss শব্দের দাবী করেন, যেমন আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ শূদ্র হতে প্রণামের দাবী করে থাকেন, এদেশেও অনেকটা তাই। কিন্তু আমি মানুষ, আমি তাতে রাজি হব কেন? ঠাণ্ডায় শুকিয়ে মরব, না খেয়ে মরব তবুও নিজকে পদদলিত করতে দিব না। সংবাদপত্র কেনা হল না, ফিরে চললাম গ্রামে।

প্রবল বাতাস বইছে, মাঝে মাঝে বৃষ্টিও পড়ছে, আকাশ একেবারে মেঘমালায় ভর্ত্তি। গ্রাম বড়। কোথাও চতুষ্কোণ ছোট ছোট গৃহ, কোথাও গোল গোল ঝাঁপি। বাইরের লোক সকলেই ঘরে ফিরে আসছে। এক নেটিভকে ছয় পেনী দিয়ে তার বিছানা কেরায়া করলাম এবং আর ছয় পেনী দিয়ে খাবারের বন্দোবস্ত করলাম। চা এরা যা খায় তা আমার অখাদ্য, তাই সেকথা বলে আর লাভ নাই। গরম জলে চিনি মিশিয়ে চায়ের তৃষ্ণা দূর করলাম। আমার সঙ্গে এমন কোন বই নাই যে পাঠ করি। একটু বিশ্রাম করেই ঘর হতে বের হয়ে পড়লাম গ্রামে

নাটালের ভেলুরেম টাউন হলে বক্তৃতাদানের পর প্রবন্ধলেখক এবং উপরোক্ত এসোসিয়েশনের কতিপয় সদস্য

বেড়াতে। যাদের চোখ আছে তাদের দেখার মত অনেক কিছু আছে। যাদের চোখ নাই তাদের দেখার মত কিছুই নাই।

একটা ঘরের মাঝে চারজন যুবক মিলে তাস খেল্‌ছিল। এসব তাস খেলা আরব ধরণের। আরবদের কাছ হতেই এরা তাস খেলা শিখেছিল প্রথম। এখন অন্যান্য খেলাও খেলে। খেলাতেও মগজের ব্যবহার করতে হয়। মস্তিষ্কের ব্যবহারোপযোগী কোন খেলা ওদের মাঝে ছিল কি-না তাই দেখবার জন্য আমি অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুই পাই নাই। তাদের কাছে বসে একটা ছোকরা মালয় ধরণে একটা বেহালা বাজাচ্ছিল। সে তাতেই মত্ত, এদিকে যে খেলা হচ্ছে, সে খবর তার নাই। সে তন্ময় হয়ে পড়েছে তাতে।

আফ্রিকাতে এসে আমাকে অনেক সময় বসে থাকতে অনেকে দেখেছে। অনেকে বলেছেন আমি সাধনা করি। আমি কিসের সাধনা করব? আমি কাউকে ভজি না, ভগবানকে প্রার্থনা করি না। অতএব ভজনের আমার কিছুই নাই। তন্ময় হয়ে বসে থেকে আমি ভাবি নানা কথা। রূপ-বিকাশ তার মধ্যে সর্ব্বপ্রথম। মালয়, শ্যাম, আরব, বেলুচি,

কোচিন, কোরিণ—এদের দেখেও অনেক ভেবেছি। এখন আফ্রিকায় এসেছি, এখন ভাবছি আদিম নেটিভদেরে দেখে। সকলের মাঝেই মৌলিকত্ব খোঁজা আমার অভ্যাস। ঐ যে লোকটা এত তন্ময় হয়েছে, তার মন কিসে লয় হয়েছে তাই আমার জ্ঞাতব্য বিষয়। লোকটাকে ঠেলে দিয়ে বললাম, দাও ত তোমার ভায়লিন একটু বাজিয়ে দেখি। সে যেন সংসারে নূতন এল এবং আমার হাতে তার ভায়লিন দিল, আমার ভায়লিন বাজাবার কোনই ইচ্ছা নাই, আমার ইচ্ছা শুধু জানা—যখন সে ভায়লিন বাজায় তখন তার মন থাকে কোথায়? খুব চেষ্টা করলাম জানতে, কিন্তু কোন সদুত্তর পেলাম না। মন আমার রইল তাতে। জানতে হবেই। সেদিন যে গৃহে ছিলাম, সেই গৃহের মালিক এবং তার স্ত্রী ঘরে ছিল এবং খাবারের জন্য সুজি এবং টিনের মাছ তৈরী করেছিল। রাত্রে সেই গৃহের এক কোণায় আমাকে শুতে দিয়েছিল।

নেটিভদের ঘরের একই দরজা থাকে। সেই দরজায় ফাঁক ফাঁক। দরজা বন্ধ করে দিলেও বিশুদ্ধ বায়ু গৃহে প্রবেশ করতে পারে। ঘরে আগুন জ্বলছিল এবং মাঝে মাঝে সেই আগুন নিভে গিয়ে ধোঁয়ার সৃষ্টি করছিল। কিন্তু আমি বুঝেছিলাম স্বামী-স্ত্রী কিসের অস্বস্তি অনুভব করছে। তার কারণ আমি জানতাম তাই শরীরের সব কাপড় খুলে একদিকে রেখে কম্বল মুড়ি দিলাম। নেটিভরা শুইবার বেলা শরীরে কোন কাপড় রেখে শুতে পারে না তাই আমার অপেক্ষায় ছিল কতক্ষণ পরে আমি কাপড় পরিত্যাগ করে শুই। আমি নেটিভদের মাঝে থেকে থেকে তাদের অনেক আচার ব্যবহার আয়ত্ত করেছি। বিবাহিত স্ত্রী কখনও অপর পুরুষের সঙ্গে থাকে না এবং বিবাহিত পুরুষও কখন অন্য স্ত্রীলোকের মুখ দেখে না। বিধবা বিবাহ এদের মাঝে প্রচলন আছে। যুবতী যদি বিধবা হয় তবে তাকে বাধ্য হয়ে পুনরায় বিবাহ করতে হয়। এর মানে যুবতী বিধবা হলে অনেক সময় ব্যাভিচারী হয়ে পড়ে। এই বিপদ হতে রক্ষা পেতে বিবাহ করাই সমাজের নিয়ম। অনেক ভারতবাসী নেটিভ স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা দেখে অনেক সময় নানা কথা বলে থাকে, কিন্তু এদের মাঝে পাপের লেশ মাত্র নাই। স্বাধীনতা এমনি জিনিষ যে, পাপ থাকতেও ভয় করে।

পরদিন চললাম আমি লাইস্-ব্রি-চাটএর দিকে। সামনে ভয়ানক জঙ্গল। জঙ্গলের বর্ণনা আনন্দ মঠে অনেকে পেয়েছি, কিন্তু এদেশের জঙ্গল সেরূপ নয়। আমাদের দেশে অনেকে গাছে উঠে বন্যজীব হতে প্রাণ রক্ষা করে, কিন্তু এদেশে তা করবার উপায় নাই। প্রত্যেকটি বৃক্ষ কণ্টকে পূর্ণ। কণ্টক শক্ত এবং ধারাল। তাতে হাত দিলেই রক্ত হাত হতে বের হতে থাকে। অনেক কণ্টকিত বৃক্ষ বিষাক্ত। তাতে যদি ভুলেও হাত লাগে তবে মৃত্যু অনিবার্য্য। সেরূপ বৃক্ষ আমি দেখেছি এবং তার কণ্টক অনেকদিন সঙ্গে রেখে পরে নিরাপদ স্থানে এসে ফেলে দিয়েছি। সেই কণ্টক রাখার মানে যদি এমন কোন বিপদে পড়ি যাতে জীবন কষ্টের হয় তবে এই কণ্টক শরীরে বিদ্ধ করে শরীর নষ্ট করব।

ভাবছিলাম পথে ঐ দুটা লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। কিন্তু এ সদর পথ, এতে চোর চলতে পারে না। তাদেরে আমি কয়েক দিনের জন্য হারালাম। এতে মনে কষ্ট হল। দুই শত মাইল চলতে হবে তাতে আসবে শুধু নেটিভের বাড়ী অন্য কিছু নয়। নেটিভ, ইউরোপীয়ান হতে সহস্র গুণে ভাল। তারা আমাকে ঘৃণা করে না। তাদের মাঝে ভারতীয় অনেক সদগুণ আছে, এমন কি অনেক সময় দেখতে পেয়েছি, এদের মাঝে চূড়ান্ত মানব ভাবের বিকাশ হয়েছে একদিকে। আমাদের দেশে বলে চুরি করা পাপ, নেটিভরা বর্ত্তমানে চুরি করা পাপ বলতে শিখেছে মিশনারীদের কৃপায়। এখনও অশিক্ষিত নেটিভ চুরি করা পাপ বলে না। চুরি করে নরকে যাবার ভয় রাখে না। ভগবানকে পরওয়া করে না। চুরি কেন করে? চুরি কাকে বলে? যদি জানতে হয় তবে যাদের উপর এখনও অবতারদের প্রভাব আসে নাই তাদের কাছ হতে শিখতে হয়।

একজন বলবানের এমন একটা জিনিষ আছে, যা সকলের সকল সময় দরকার। জিনিষটা চাইলে-পরেও দেয় না। জোর করেও তার কাছ হতে আনা যায় না, এক্ষেত্রে দরকারের সমাপন করার জন্য, বলবানের অজানিত ভাবেই সেই দরকারী জিনিষ আনা উচিত এবং কর্ম্ম সমাপনান্তে ফেরৎ দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু বলবান যখন দেখে একটা লোক যাকে সে তার জিনিষ দেয় নাই, অথচ কার্য্য সমাপনান্তে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে, তখন রাগের বশীভূত হয়ে সে দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করে। এই ছিল চুরি করার প্রথম কারণ। অনেক নেটিভ আদিম অবস্থায় আছে বলেই, তাদের প্রথম রোগের কারণ জেনেছি, নতুবা জানতে পারতাম না। যারা একটু উপর স্তরে চলে গেছে তারা বলে চুরি করলে উভয়ের ক্ষতি। একটা লোক পরিশ্রম করে একটা জিনিষ আয়ত্ত করেছে, সেই জিনিষটা যদি চুরি করা হয় তবে মালিকের মনে কষ্ট হবে এবং সেরূপ একটা গড়তে কিম্বা পেতে তার সময়ের অপব্যবহার হবে। যে চুরি করে তার কর্ম্মতৎপরতা কমে যায় এবং সমাজের ক্ষতি-কারক হয়ে দাঁড়ায়। এবং সমাজের ক্ষতিকেই পাপ বলা হয়। সমাজ রক্ষা পায় পুণ্য কর্ম্মে। পাপ খারাপ, পুণ্য ভাল। এই ভাল মন্দের জন্য পরলোকে কোনরূপ কষ্ট পেতে হয়, একথা এখনও কাফ্রিরা অনুভব করতে পারে না। দক্ষিণ আফ্রিকায় কাফ্রিদেরে কাফের বলা হয়, তাদের ভাষাকে কাফের ভাষা বলা হয়, তাদের শিরস্ত্রাণ, পুরাতন তুর্কি টুপিকে কাফের টুপি বলা হয়। সরকারী ভাষায় সেরূপ শব্দের ব্যবহার করতে পারা যায় না, সত্য কথা, কিন্তু এই কাফের শব্দের যেরূপ ব্যবহার চলছে হয়ত আফ্রিকার নিগ্রোদেরে একদিন কাফেরই হতে হবে শেষে আবিসিনিয়াও ফরাসীরা ইটালীর কাছে বিক্রয় করেছে।

আরও দুদিন কাটল। এই দুদিন আমার পক্ষে ভীষণ কষ্টেরই ছিল প্রথম কষ্ট ছিল জলের। পথে জল পাওয়া যেত, কিন্তু সে জল মুখে দিতে ভয় হত। এরূপ জল বঙ্গদেশের অনেক গ্রামের লোক ব্যবহার করে। কিন্তু আফ্রিকাতে এসে এরূপ জল ব্যবহার করতে ভয় করে। কেন ভয় করে তাই বলছি। আফ্রিকার নিগ্রোও নদীর জল ব্যবহার করে না। তারা খাবারের জল আনে ঝরণা হতে। নদীর জলে স্নান

করতে আপত্তি নাই, কিন্তু কেউ তা পান করে না। নদীর জলে গরুতে স্নান করে এই হল একমাত্র কারণ। অন্যান্য কারণও থাকতে পারে। এদের সঙ্গে থাকতে থাকতে আমারও এখন নদীর জল পান করতে অনেক সময় ভয় করে। এদেশের নদী আবার অন্য ধরণের। বৃষ্টি হল নদীতে জল বইছে। বৃষ্টি বন্ধ হল নদীতে জল নাই। মাঝে মাঝে নদীতে যে জল তাহার গতি নাই। আবদ্ধ জল অনেক সময় বিষাক্ত হয়।

পথে যে সকল গ্রাম পড়েছিল তারা আমাদের ভাষায় অসভ্য। এ অসভ্যদের মধ্যে থাকা অনেক সময় সভ্যদের কষ্টকর আমিও অসভ্য তাই আমার কষ্ট হয় না। কিন্তু আমি ভারতবাসী। অনেক ভারতবাসী এসব গ্রামে এসে কাম দেবের উপাসনা করে থাকেন বলে আমাকে রোডেসিয়াতে এরূপ গ্রামে থাকতে অনেক ইণ্ডিয়ান নিষেধ করেছিলেন। আমার ভয় হয়েছিল যদি কোন ইণ্ডিয়ান আমাকে এরূপ গ্রামে থাকতে দেখে তবে আমার বদনাম ইণ্ডিয়ানদের মাঝে বেশ হবে। আমি ইণ্ডিয়ানদের উপর নির্ভর করি। এখনও আমার আমেরিকার visa পাওয়া হয় নাই। একশত পাউণ্ড জমা দিতে হবে। এই একশত পাউণ্ড বের করতে হবে ইণ্ডিয়ানদের পকেট হতে। কিন্তু আমি উপায়বিহীন। আমাকে এরূপ গ্রামেই থাকতে হল। পা আর চলে না।

প্রিটোরিয়া অনেক দূরে এমন কি লুইস-ত্রি-চাট আরও দুইশত মাইল। এখন আমি যে স্থানে দাঁড়িয়ে আছি তার চারিদিকে ভীষণ জঙ্গল। নেটিভ গ্রাম কাছে একটাও নাই। পাহাড় নাই যার উপরে উঠে গ্রামের ঠিকানা করব। জল আছে রুটি নাই এমন কি সঙ্গে যে লবণ রাখি তাও ফুরিয়েছে। সিগারেটও নাই। পথে লোক চলাচল বন্ধ হয়েছে, কারণ আকাশ মেঘমালায় ভর্তি। বৃষ্টি সত্বরই আরম্ভ হবে। বিপরীত দিক হতে ধীরে বাতাস বইছে। সাইকেল পুরাদমে চালিয়ে আগে চল্লাম। একটি উলঙ্গ রাখাল তার গরুকে তাড়িয়ে পথ চলে যাচ্ছিল। তার পেছন নিলাম। এরূপ ভাবে বোঝাই সাইকেল নিয়ে গোপদ-চিহ্ন-পথে চলা কঠিন। সাইকেল হতে নেমে পথে চলতে লাগলাম। জঙ্গলের মাঝ দিয়ে পথ চলেছে। কত দূরে গ্রাম তা ঠিক করা যায় না। হতাশ হতে নাই। এদিকে বজ্র যদিও প্রায়ই লেক ক্ষয় করে, তবুও আমার ভরসা আছে কাছে কণ্টকিত অসংখ্য বৃক্ষ। যদি বজ্রপাত হয় তবে তাদের উপরই যাবে। তিন চেইন পথ চলে সামনে পড়ল গ্রাম। গ্রাম ছোট। দশটা ছোট ছোট গোল গৃহ। তাতেই আজ থাকতে হবে। কোন্ ঘরে যাই? আমার ধৈর্য্য বেশ আছে। একটু চিন্তা করে কোন্ গৃহে যাব ঠিক করলাম। তারপর যেন আপন গৃহে চলেছি এই ভাবটি মনে রেখে ঘরের দরজায় গিয়ে সাইকেল রেখে ঘরের মাঝে প্রবেশ করলাম।

গৃহের মাঝে দুটি উলঙ্গ যুবতী, একটি উলঙ্গ যুবক, একজন উলঙ্গ বৃদ্ধা। প্রত্যেককে আপন প্রথা মত নমস্কার করলাম। নমস্কার আমার একমাত্র অস্ত্র। তাতে তেজ আছে, বীর্য্য আছে, আর আছে বশ্যতার অর্থাৎ গোলামীর একের নম্বর প্রতিবিম্ব। এই প্রতিবিম্ব সকলের মাঝেই প্রতিফলিত হয়। যুবতীগণ প্রথম একটু শঙ্কা অনুভব করল, তারপর আমার জোড়হাত দেখে তাদের সেই শঙ্কা দূর হল। তারা বাইরে এল, দেখল আমার সাইকেল। যুবক সাইকেলটা ঘরের মাঝে নিয়ে গেল এবং দরজা বন্ধ করে দিল। আমি তাদের আপন হয়ে গেলাম।

কম্বল বের করে তা মাটিতে পেতে ফেললাম। তারপর আপন অঙ্গ-বসন খুললাম, তারপর হাপসার্ট পরে আরাম করে তাদের কাছে বসলাম। এদিকে পরেজ তৈরী হচ্ছিল। পরেজ তৈরী হয় মাটির পাত্রে। পরেজ তৈরী হবার পর তারা খেতে বসল। আমিও সঙ্গে ছিলাম। থালা নাই, জলের গ্লাস নাই, হাত ধুইবার জল নাই। বাইরে প্রবল বৃষ্টি পড়ছে। তাতে আমাকে হাত ধুতে দেখে তারাও হাত ধুয়ে এল বাইরে। তারপর হাত দিয়ে সকলেই হাঁড়ি হতে একটু একটু করে পরেজ নিয়ে খেতে লাগল। পরেজ খাওয়া সমাপ্ত হল। আমি ফের বাইরে গিয়ে হাত ধুইনি। দেখব এরা হাত পরিষ্কার করে কিনা? এরা আমি পূর্ব্বে যেমন করে হাত ধুয়েছিলাম তেমনি হাত ধুইল, তারপর হাঁড়িটাকে একদিকে সরিয়ে দিয়ে আগুনের কাছে এসে বসল। আমি হাত পরিষ্কার করে কম্বলে এসে বসলাম। এদের ঘরেও কম্বল ছিল কিন্তু এরা কম্বল মাটিতে পাতে না, কম্বল জড়িয়ে শুয়ে পড়ে। আমাকে মাটিতে কম্বল পাততে দেখে ওদের কষ্ট হয়েছিল বলেই মনে হয়। তারা কেউ এসে আমার কম্বলের উপর বসল না

আগুনের কাছে বসে তারা প্রথম প্রথম হাতের উপর তালি পিটছিল। তারপর যুবক দুটি লাকড়িতে সংগীত লহরীর সৃষ্টি করতে আরম্ভ করল। দুটো লাকড়িতে কি করে সংগীত শব্দ-লহর তৈরী হয় তা প্রণিধান যোগ্য। একটা লাকড়ি মাটির উপর তির্য্যক ভাবে রেখে অন্য লাকড়ি দিয়ে তার উপর শরীরের সঙ্গে মনের সংযোগ করে আঘাত করলে তাতে সংগীত শব্দ-লহরীর আপনা হতেই সৃষ্টি হয়। এতে মনের পবিত্রতা চাই, নতুবা হতে পারে না। শব্দ সংগীত লহরী যখন ঝুমুরে জমিল তখন যুবতীগণ মাটিতে পা নাচাতে লাগল। পা নাচান কতক্ষণ হবার পর দাঁড়িয়ে নৃত্য করতে লাগল। আমাদের দেশের তাণ্ডব নৃত্য নয়, চালি নৃত্য নয়, শুধু পায়ের নৃত্য মাত্র। এরূপ নৃত্য অনেক সময় চলার পর এদের মাঝে অবসাদ এল। বসল, কথও কইল, তারপর এক এক খানা কম্বল মুড়ি দিয়ে আগুনের চারিদিকে শুয়ে পড়ল। আমার নিদ্রা এল না, কারণ ঘরের মেজেটা বড়ই উঁচুনীচু। শরীর বিছান তাতে হতে পারে না। তাই কখন বসে, কখন শরীরটাকে কুঞ্চিত করে শুতে লাগলাম।

পূর্ব্বে বলেছি, একটি মাত্র যুবক। যুবকের যুবকত্ব পূর্ণত্বে এসেছে। যুবতীদের মাতৃ ভাবের দেখা দিয়েছে। এই যুবক কে, এবং কেন এসেছে, এই যুবক কি এদের ভাই? এরূপ ভাব আমার মনে আসতে লাগল। তাদের নাক হতে অনবরত ভেক শব্দ হচ্ছে, এরা এখন মত্ত। যখনই ঘুম ভাঙ্গতে লাগল তখনই তাই দেখতে লাগলাম। কামের নাম গন্ধও এদের মাঝে নাই। অথচ ইণ্ডিয়ান আমাকে হুসিয়ার

করে দিয়েছে এমন গ্রামে যেন না থাকি। অপবিত্র মনের অপবিত্র প্রতিবিম্ব মাত্র প্রকাশ হয়েছে, এর বেশী আমার বলার নাই। নেটিভদের মাঝে বিধবা, বিবাহ আছে। অনেক স্ত্রী রাখার প্রথা আছে, কিন্তু একটি প্রথা নাই যাতে সমাজের ক্ষতি করে। গোপনে কোন স্ত্রীর সতীত্ব হরণ করা এদের লিখা নাই।

এখানে বলতে হবে সতীত্ব কাকে বলে। নেটিভরা সাধারণত একই বিয়ে করে থাকে। তাদের বিয়ে ঠিক হয় যুবক যুবতীর মাঝে। পিতা মাতার তাতে কোন হাত নাই। বিবাহ ঠিক হয়ে গেলে যুবক যুবতীর পিতাকে এবং মাতাকে গোদান করে। কেউ দুটি, কেউ আটটি পর্যন্ত যুবতীর মাতা পিতাকে গোদান করে। এই গোদান কার্য্য যে পর্য্যন্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত কোন মেয়েই যুবকের কথার মোহে বা যুবকের সৌন্দর্য্যে মোহিত হয় না। কেন হয় না, কি করে আপন ইচ্ছাকে দমন করে, তার পেছনে রয়েছে এক অপূর্ব্ব সত্য কথা। তারা চোখ খুলে দেখে যে, মাতাপিতা এতদিন পালন করেছে তাদেরে সন্তুষ্ট করা হয় নাই, তাদের আশীর্ব্বাদ নেওয়া হয় নাই, কি করে নূতন সংসার পত্তন করতে যাওয়া যেতে পারে? এর চেয়ে সুন্দর পবিত্র ভাব আর কি হতে পারে?

নেটিভরা এখনও স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করতে শেখেনি।

বৈশাখের গান

শ্রী নমিতা দেবী

ওগো সন্ন্যাসী বৈশাখ,
বাজাও তোমার রুদ্র-বিজয় শাখ।
জীবন-খাতার সকল লিখন উড়াও ওগো উড়াও ভুল
ছড়াও তোমার ধূসর ধূলি
বাজাও শিঙা বাজাও হে বৈশাখ।
তোমার বজ্র পিনাক ঝনঝনি,
আগল ভাঙা শিকল নাড়ার পাগল রণরণি,
বাঁধন ভাঙার লগন এলো
হাঁকাও তোমার রুদ্র মাতাল গান;
আকাশ ঢাকা বনের শাসন করছে খানখান।

যাত্রা পথের তোরণ খুলি মুক্তপথে দাও গো প্রণয় ডাক,
বৈশাখ ওগো হে খ্যাপা বৈশাখ।
ওগো, এই পৃথিবীর সবুজ বুকে তোলো তোমার
কালো মেঘের নাচন,
বিদ্যুতেরি ছটায় তুমি দীপ্ত কর
আমার সকল বাঁচন।

ছিন্ন করো স্বপ্নকুসুমে
টোটাও ধরার চৈতালী ঘুমে
দাও পিনাকে দাও গো হে টঙ্কার,
দোলে দেহ গো আমায় বারেবার।

হে অপরূপ হে অপরূপ
আর তো আমি রইবো না চুপ
তোমার নাচের সঙ্গী করে
দাও গো আমার সকল জয়ের বল,
ঝড়ের সাথে ছিটাও শান্তি জল।
দুর্জ্জয় ওগো হে দুর্জ্জয়,
তোমার নিজের বিজয় সাথে গাও গো আমার জয়
ওগো, রুদ্র-প্রেমের আপনভোলা পাগল,
আমার সাথে বাজাও তুমি মাদল,
খসে খসে পড়ুক বাঘের ছাল
বাজাও তুমি গাল।
ওগো খামখেয়ালী, কালো আমার কালো,
তোমার বিদ্যুতে ওই জ্বলছে আমার আলো।
তুমি বাঘের ডাকে কাটাও আমার সকল শঙ্কাভয়,
তোমার সাথে মিশুক আমার জয়।
তোমার খামখেয়ালী রাগ ও হাসির সাথে,
ঢালো আশিস্ ঢালো আমার মাথে,
ভীষণ আমার সুন্দর হে মধুর,
নৃত্যে তোমার শুনছি আমি আমার সকল সুর।
তোমার বৃষ্টিধারার ঝড়ের পানে
দাও গো আমায় ডাক,
বন্দি হে বৈশাখ।

প্রলয়ের পরে

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীসত্যকুমার মজুমদার

(১০)

জগতে এমন কতকগুলি লোক থাকে যারা নিজেরা সচ্চরিত্র না হইলেও, কারণে বা অকারণে অন্যের চরিত্র খারাপ বলিয়া ভাবিবার মত প্রবৃত্তি রাখে না। এইটাই তাহাদের মস্ত গুণ বা দোষ যে তারা নিজেকেই শুধু চরিত্রহীন বলিয়া ভাবে। তজ্জন্য নিজেরা লজ্জিত থাকে কিন্তু অপরকে হীন চরিত্র ভাবিতে পারে না। তাহারা ভাবে বিশ্বেশ্বরের অপূর্ব্ব বিশ্ব সৃষ্টির মধ্যে ভাগ্যদোষে তারাই শুধু সৃষ্টি ছাড়া, আর সব ভাল। কাহারও উপর সন্দেহের কারণ উপস্থিত হইলে, তার কার্য্য-প্রণালীর একটা সঙ্গত হেতু খুঁজিতে থাকে। খুব বড় জিনিষকেও অতি হাল্কা করিয়া ভাবে।

লীলার স্বামী নরেন্দ্রনাথ ছিল এই শ্রেণীর একটি মানুষ। নিজের জীবনের শত ত্রুটি-বিচ্যুতি নরেন্দ্র বুঝিতে পারিত। কিন্তু সংসারটাকে নিজের মত কলঙ্কিত করিয়া ভাবিতে পারিত না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা তাহাকে সংশোধন করিতে না পারিলেও তাহার অন্তরের উদারতা অনেকখানি বাড়াইয়া দিয়াছিল। সেই কবে কোন অশুভ মুহূর্ত্তে তার পদস্খলন হইয়াছিল। চেষ্টা করিয়াও নরেন্দ্র সম্পূর্ণরূপে উঠিতে পারে নাই। কেউ বুঝি তাহাকে বিপথ হইতে ফিরাইয়া আনিবার জন্য তেমন আপ্রাণ চেষ্টাও করে নাই।

লীলাও তার চরিত্র সম্বন্ধে বিদ্রূপ করিলেও তেমন কোন চেষ্টা ছিল না তার স্বামীর সংশোধনে। পত্নীর এ উদাসীনতা নরেন্দ্রের চক্ষে পড়িত। কিন্তু নরেন্দ্র তাহাতে অসুখী ছিল না। তাহার স্বেচ্ছাচারের পথের কণ্টক না হইয়া নেহাৎ অশিক্ষিতার মত লীলা নীরবে সমস্তই সহিত, অথবা স্বামীর দোষে অন্ধ সাজিয়া নিজের কর্ত্তব্য প্রফুল্ল মনে করিয়া যাইত, ইহা দেখিয়া শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞতায় নরেন্দ্রের অন্তর লীলার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়া পড়িত।

লীলার প্রতি নরেন্দ্রের অবিচলিত বিশ্বাস ছিল। পত্নীর নির্ম্মল সুকান্তিময় মুখচ্ছবি নরেন্দ্রকে বিমুগ্ধ করিত। নিজের অযোগ্য স্বামীত্ব লইয়া লীলার সম্মুখে দাঁড়াইতে তাহার লজ্জা হইত। কখনও বা নিজকে লীলা অপেক্ষা নিতান্ত অকৃতী ভাবিয়া দুঃখিত হইত; কখনও বা নিজেকে অপরাধী ভাবিয়া দূরে সরিয়া যাইত। সাহস করিয়া প্রাণ ভরিয়া লীলার দিকে চাহিতে পারিত না। মন খুলিয়া লীলার সহিত কথা কহিতে পারিত না।

লীলারও বুঝি অনেক কিছু স্বামীর গোচর থেকে গোপন করিবার ছিল। বলি বলি করিয়া আজও তাহার অনেক কথাই বলা হয় নাই। সর্ব্বস্ব দিয়া স্বামীর মনের সঙ্গে এক হইয়া মিশাইয়া যাইতে পারে নাই। এইখানেই হয়ত লীলার পরাজয়; কিন্তু এ পরাজয়টুকু নরেন্দ্রের চখে পড়িত না। পড়িবার অবসরও হইত না।

লীলার উপর অচল বিশ্বাস থাকায় নরেন্দ্রনাথ বন্ধু-বান্ধবের সামনে লীলাকে বাহির করিতে ইতস্তত করিত না। অমরের সম্বন্ধে অনেক কথাই লীলা স্বামীর কাছে বলিয়াছে। বাল্যজীবনের লজ্জাকর ইতিহাস কোন দিন খুলিয়া না বলিলেও নরেন্দ্র এইটুকু আভাসে বুঝিতে পারিয়াছিল যে, ছেলেবেলায় কোন সময় হয়ত অমরকে লীলা ভালবাসিয়াছিল, মায়ের পেটের ভাইয়ের চেয়ে বেশী—বন্ধুর চেয়ে বুঝিবা তার নিজের স্বামীর চেয়েও। তবুও সন্দেহ বা অবিশ্বাস করিবার মত লীলার চরিত্রে নরেন্দ্রের চোখে কিছুই পড়িত না।

আজ কিন্তু লীলার এই অস্বাভাবিক মূর্চ্ছা নরেন্দ্রকে একটু বিস্মিত ও বিচলিত করিয়া তুলিল। কিন্তু এ বিস্ময়ও তাহার বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না। নরেন্দ্র ভাবিল একজনের সত্যকারের সম্বন্ধ অস্বীকার করিবার যে অপরিসীম অন্তর্দ্বন্দ্ব ইহাই লীলাকে মূর্চ্ছিত করিয়া ফেলিয়াছে।

সামান্য শুশ্রূষাতেই লীলা সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিল। একবার সলজ্জদৃষ্টিতে নরেন্দ্রের দিকে তাকাইয়া পরে পার্শ্বোপবিষ্ট অমরনাথের পানে করুণ চোখে চাহিয়া বলিল, "তুমি আমার ফিট্ হওয়া দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছ, না অমরদা? এ আমার নূতন নয়, আরও অনেকবার হয়েছে।"

অমরনাথ সে কথায় কান না দিয়া বলিল, "তুমি আজ অসুস্থ হয়ে প'ড়েছ লীলা, বাড়ীর ভেতর গিয়ে বিশ্রাম নাও গে! আমি এখন উঠ্‌ব।"

ক্লান্ত চোখে চাহিয়া লীলা বলিল, "উঠবে কেন ব'সনা একটু। কি আর এমন অসুখ ও ত আমার হ'য়েই থাকে।"

অমর শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, "দিনে দিনে তুমি বড় অবাধ্য হয়ে প'ড়ছ লীলা।"

লীলা জবাবে কি বলিতে যাইতেছিল, অমরের মুখের দিকে চাহিয়া বলিতে সাহস করিল না।—ধীরে ধীরে উঠিয়া বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল।

ক্লান্তিতেই হউক আর অমরের আদেশেই হউক লীলা চুপ্‌চাপ্ খানিক শুইয়া রহিল। প্রথমে ঘুমাইতে চেষ্টা করিল পারিল না। যত রাজ্যের চিন্তা আসিয়া মনের ভিতর জড় হইতে লাগিল। কত কথাই না তাহার মনে হইল! অতীত দিনের সুখ-দুঃখ-আশা নিরাশা—ছেলেবেলাকার কত অবস্থা ছবিই না একে একে তাহার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল।

এই না তাহার সেই অমরদা,—কত আপনার—কত স্নেহের, তাকেই সে অস্বীকার করিয়া জয়ী হইতে চাহিয়াছিল। একটুও কি তার মনে হইল না যে, এই জয়যাত্রায় পরাজয়ের গ্লানি অঙ্গে মাখিয়াই তাহাকে ফিরিতে হইবে। কিন্তু এমনটি যে হইবে, অমরদার সম্বন্ধ অস্বীকারে এত আঘাত যে তাহার লাগিবে, ইদানীং এ ধারণা মোটেই তাহার ছিল না। তাই না অতবড় সাহস করিয়া অমন দুষ্কার্য্য করিতে গিয়াছিল।

যাকে আঘাত দিয়া সে আনন্দ লাভ করিতে চাহিয়াছিল আঘাত পাইয়া সে নিশ্চল পাষাণ হয়ত আটুটই রহিয়া গেল। আঘাত করিবার জন্য আত্যন্তিক উদ্যমের প্রয়োগে সেই শুধু মুসড়াইয়া পড়িল; এতই দুর্ব্বল সে। আজও কি শৈশবের খেলা-ধূলার অঙ্গরাগ দেহ হইতে নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই। যদি নাই পারিয়া থাকে, তবে কোন্ জোরে সে আধুনিক সতীত্বের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে। [illegible] হইতে যে ছবি দাগ আজও নিশ্চয়ে মুছিয়া যায় নাই; [illegible]

[illegible]

ধরিয়া কোন্ প্রাণে সংসারের সঙ্গে—বুঝিবা নিজের সঙ্গেও খাপ খাওয়াইবার লুকোচুরি খেলিতে যায়; তার কি লজ্জা করে না!

কি চাহে সে, অমরকে কি সে আজও চায়! ছিঃ, এতটুকুও না। সতী মায়ের সতী কন্যা সে, আজ অমরনাথ তাহার কে? শুধু ভাই বই ত নয়; কিন্তু সত্যই কি শুধু ভাই?—বুঝি ভাই-এর চেয়েও বড় কিছু। তবে এত বড় মিথ্যাটা কি করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। কি আত্মপ্রবঞ্চনাই সে করিতে গিয়াছিল। কিন্তু একটা কথা, তার অন্তরে আজও তবে তেমন করিয়া সাড়া জাগে না কেন স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্যে। রূপ যৌবনসম্পন্ন—বুঝিবা অমরদার চেয়েও সুরূপ স্বামী সে পাইয়াছে, তবুও তার খালি বুকে ভরিয়া উঠিল না কেন! শ্বশুর শাশুড়ীর অপরিসীম স্নেহ-মমতা,—আদর-যত্ন—বন্ধুবান্ধবের অকৃত্রিম প্রীতি,—অগাধ ঐশ্বর্য্যের স্বেচ্ছা উপভোগ, কিছুতেই সে তৃপ্তি পাইল না কেন। এত সব যে সে সহিল—এত ত্যাগ যে সে করিল, তাহার এই ত্যাগ—তাহার এই সহিষ্ণুতা জীবনযুদ্ধে কোনটাই তাহাকে জয়মাল্যে ভূষিত করিতে পারিল না।

স্বামী চরিত্রহীন—এই কি তাহার দুঃখ—কই সে দুঃখ ত তেমন করিয়া কোন দিনই তাহার বুকে বাজে নাই! কেন বাজে নাই—বাজাই যে সব চেয়ে বেশী স্বাভাবিক ছিল।

লীলার চিন্তার ধারা ক্রমে এলোমেলো হইয়া উঠিতে লাগিল। বিশ্বের অফুরন্ত আলোক যেন তাহার চক্ষের সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইতেছিল, অবচেতন মদিরতায় লীলা বহুক্ষণ বিছানায় পড়িয়া রহিল।

আবার কখন যেন বাস্তবে ফিরিয়া আসিল,—চিন্তার ছিন্ন সূত্রে আবার জোড়া লাগিল। লীলা ভাবিল, তবে কি সে স্বামীকে ভালবাসে নাই! বই ভালবাসিয়াছে? যেটুকু সে দান করিয়াছে সেটুকু ত তার কর্ত্তব্যের ভিতরেই উবিয়া বাষ্প হইয়া গিয়াছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কর্ত্তব্যের বাহিরের হিসাব খতিয়ানে জমার চেয়ে খরচ ত সে বেশী কিছু করে নাই। এত দিনকার দাম্পত্য জীবনে সমগ্র তৃপ্তির সঙ্গে আঁকড়াইয়া ধরিবার মত প্রেমের আলোক কি সে জ্বালিতে পারিয়াছে—? তাই না এ আঁধার—এত দুঃখ—এত অতৃপ্তি। এ তার কি আত্মপ্রবঞ্চনা। নিজেকে নিঃশেষে স্বামী দেবতার চরণে নিবেদন করিয়া দিবার যে অসাধ্য সাধন করিতে চাহিয়াছিল স্বেচ্ছায়—তাহা যেন সে পূর্ণ করিতে পারে নাই। তাহার মন—বিদ্রোহী মনকে যেন সে সঁপিয়া দিতে পারিল না।

মন কি তার দেবতাকে উৎসর্গ করিয়া দিবার মত পবিত্র ছিল না: কিন্তু তাহার জীবন ইতিহাসে মানসিক পাপও ত এমন কিছু সে করে নাই—যাহার স্পর্শে তাহা দেবতার পূজার অযোগ্য—অপবিত্র হইবার আশঙ্কা আসিতে পারে।

একজনকে সে এই মন দিতে গিয়াছিল—কতক বা দিয়াও ছিল: কিন্তু এই দেওয়াই কি প্রকৃত দেওয়া—না নিজেকে উজাড় করিয়া সবটুকু দেওয়ায় যে পুষ্পিত স্বর্গ তারই অভাবে তাহার জীবন এমন শূন্য হইয়া রহিল। নিজেকেও ত সে একজনের উদ্দেশ্যে ডালি সাজাইয়া কত না শিক্ষায় সমৃদ্ধ করিয়াছিল। একজনের উদ্দেশ্যে সাজান ডালি যদি সে অন্যজনকে দিতে পারিল, তবে মন দিতে পারিল না কেন? দিবার চেষ্টা কি সে কোন দিন করিয়াছে?

মনের সমস্ত আকৃতি গোপন করিয়া সে শুধু স্বামীকেই প্রবঞ্চনা করে নাই—নিজেকেও বঞ্চনা করিয়াছে। সে কেন এতদিন তার স্বামীর কাছে সব কথা খুলিয়া বলে নাই—বলিলে ত এ পাপের বোঝা তাহাকে এতদিন বহিয়া বেড়াইতে হইত না।

অমরদা বলিয়াছে, বলিয়া লাভ নাই! পুরুষের বোধ শক্তির বিচার দিয়াই ত অমরদা বলিয়াছিল। চিররহস্যময়ী নারীর মনের খবর অমরদা কি জানে—! বলিলে স্বামী দুঃখিত হইবেন,—রাগ করিবেন,—হয়ত বা ত্যাগ করিবেন। এই আত্মপ্রকাশের ভিতর দিয়া যত বিপদই ঘনাইয়া আসুক তাও যে এ আত্মপ্রবঞ্চনার চেয়ে অনেক সুখের। এই সহজ কথাটা সে আগে কেন ভাবিয়া দেখে নাই। মুক্তি এতটা হাতের কাছে, কি আশ্চর্য্য, আর সে শুধু চিতা জ্বালিয়া রাখিয়াছে বুকের মাঝে।

সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত যে জীবন সে জীবনে যত দুঃখই আসুক তা সে মাথা পাতিয়া বরণ করিয়া লইবে। সত্যকে সম্বল করিয়া সে নূতন জীবন গড়িয়া তুলিবে। লীলা ভাবিল, এই আত্মগোপন প্রচেষ্টাই তাহার স্বামীর ভালবাসার পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কি দোষ তাহার স্বামীর যাহার জন্য তাহাকে ভালবাসা যায় না—। প্রেমপূর্ণ তাঁর দৃষ্টি,—অনুগত তাঁর ব্যবহার,—মনোহর তাঁর রূপ। আর তাহার অমরদা—কি অপরাধ সে করিয়াছে যে সে তাহাকে হীন প্রতিপন্ন করিতে চায় পদে পদে, ছিঃ ছিঃ, এত সঙ্কীর্ণ তার মন। এত অনুদার কুটিল মন লইয়া স্বামীর সম্মুখে সে দাঁড়াইবে কোন লজ্জায়।

লীলার রক্ত আবার চঞ্চল হইয়া উঠিল। যন্ত্রণাদায়ক একটা অস্ফুট চীৎকার করিয়া লীলা আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

মূর্চ্ছাভঙ্গের পর লীলা দেখিল, নরেন্দ্রের ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া সে শুইয়া আছে। দুর্ব্বল শ্রান্ত চোখ দুটি তুলিয়া সে স্বামীর মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, "অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম, না! কতক্ষণ এসেছ তুমি?"

নরেন্দ্র কহিল, "তোমার আবার ফিট্ হ'য়েছিল।"

লীলা ক্লান্তভাবে বলিল, "কেন এত ফিট্ হ'চ্ছে আজকে বলত, অনেকদিন ত হ'য়নি।"

"তা আমি কি ক'রে ব'লব?"

"তুমিই ত ব'লবে। তুমি যে আমার স্বামী,—আমার দেবতা—আমার অন্তর্যামী নারায়ণ।"

নরেন্দ্রনাথ চমকিত হইল। এমন আত্মনিবেদনের করুণ আকুতি ত লীলার মুখ দিয়া কোন দিন বাহির হয় নাই,—এ শুধু অভিনব নয়—অতি সুন্দর।

"ওগো চুপ ক'রে থাক কেন। আমায় তুমি ভালবাস না, না!" অতি কুণ্ঠিত কাতর সুরে কহিল লীলা।

নরেন্দ্র একটু হাসিল, বলিল, "এতদিন পরে বুঝি তোমার এই ধারণা হ'ল তোমায় ভালবাসি না?"

"তবে তুমি আমায় ছেড়ে মাঝে মাঝে কোথায় যাও। আমায় লুকিয়ে কি সব কর। আমি বুঝি কিছুই জানিনে!"

শুনিয়া নরেন্দ্র অনেকক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিল, পরে বলিল, "জান যদি বারণ ক'রনি কেন!"

"কেন করিনি,—বল দেখি কেন করিনি!"

লীলা একটি গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল, পরে বলিল, "বারণ ক'রলেই কি তুমি মানতে। আর কোথাও যেয়ে যদি শান্তি পাও—সে সুখের পথে আমি কাঁটা হ'য়ে দাঁড়াব কেন।"

নরেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইল। নারী প্রকৃতির একেবারেই কোন তত্ত্ব সে না জানিত এমন নয়—অন্য নারীর প্রতি স্বামীর সপ্রশংস দৃষ্টিটুকু পর্যন্ত যে নারীর অসহ্য কেমন করিয়া এত জানিয়াও লীলা বুকে পাতিয়া সবই সহিয়াছে। মানুষে তা কি পারে! নরেন্দ্রের মনে একটা তীব্র সংশয়ের ছায়া ফুটিয়া উঠিল। হয়ত লীলা তাহার প্রকৃত দুর্নীতির কিছুই জানে না। অজানাকে জানিবার আবেগে এ একটা ভাণ বা কৌশল মাত্র

নরেন্দ্র কহিল, "কি জান তুমি আমার সম্বন্ধে—কতটুকু জান?"

মৃদু হাসিয়া লীলা কহিল, "সবটুকুই জানি বোধ হয়। যাক্‌গে এসব আমি আর জানতে চাইনে।"

নরেন্দ্র বলিল, "আমি বিশ্বাস ক'রতে পারছিনে; কি ক'রে জানলে—কার কাছে জানলে—বলবে না আমায়?"

"কেউ আমায় বলেনি—আমার মন আমায় ব'লেছে,—আর তুমি আমায় জানিয়েছ।"

"আমি!" সবিস্ময়ে নরেন্দ্র লীলার মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিল।

"হাঁ, তুমি, মুখে বলোনি, কিন্তু তোমার হাসি, তোমার ভংগী, তোমার মেজাজ আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে। তুমি স্বামী তোমাকে না জানলে যে আমার নারী জন্মটাই বৃথা।"

"তুমি আমায় সন্দেহ কর লীলা?"

মনোহর হাসি হাসিয়া লীলা কহিল, "না জানা বিষয়ের ওপরেই থাকে লোকের সন্দেহ, জানলে আর কি সন্দেহ থাকতে পারে, তুমিই বল না।"

"তাহ'লে প্রকারান্তরে তুমি আমায় অযোগ্য স্বামী ব'লছ।"

হাসিয়া লীলা কহিল, "না তা বলছিনে।"

"এই ত বললে। আবার কি করে বলে। দুটা ত একসংগে হ'তে পারে না—হয় ভাল—না হয় মন্দ।"

লীলা এবার উঠিয়া বসিল। স্বামীর মুখের উপর টানা টানা চোখ দু'টি তুলিয়া ধরিল। বলিল, "ভালমন্দ কিছুই না ব'লে যদি বলি তুমি প্রকৃতিস্থ নও—তাহ'লে ত, লজিকের নিয়মে আটকাবে না।"

স্ত্রীর কথায় নরেন্দ্র হাসিয়া ফেলিল। লীলা কহিল "থাক্‌গে ওসব বাজে কথা। অমরদা চ'লে গেছে?"

এই অপ্রিয় প্রসংগ চাপা পড়ায় নরেন্দ্র যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। আর একটু হইলেই ধরা পড়িয়া গিয়াছিল আর কি! কি বুদ্ধিমতী তাহার স্ত্রী!

নরেন্দ্র কহিল, "তুমি চ'লে আসবার পরই অমরবাবু চ'লে গিয়েছেন। অমরবাবু তোমায় খুব ভালবাসেন, না?"

স্বীকারের ভংগীতে মাথা ঈষৎ হেলাইয়া লীলা কহিল, "মায়ের পেটের ভাইও অত স্নেহ করে না। তবুও তাই অস্বীকার ক'রতে যেয়ে তার মনেও ব্যথা দিলাম, নিজের মাথাও ঘুরে গেল। তুমি ত অবাক হ'য়ে চেয়ে রইলে। কেন গিয়েছিলাম অস্বীকার করতে জান?"

আর কিছু বলিতে না পারিয়া কতক্ষণ কাতর একাগ্র দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পরে ধীরে বলিল, "সে কথা আর নাই শুনলে। ছেলেবেলার সে রূপকথা —না-শুনে কাজ নেই তোমার।

আবার লীলা থামিয়া গেল। স্বামীর মুখে কোন ভাবান্তর হয় কিনা লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিল।

তাহার পর আবার ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, "সে কথা শুনে তোমার ঘৃণাই হ'বে আমার ওপর। তবু যেন আজ কেন তোমার কাছে আমার সবই খুলে ব'লতে ইচ্ছে যাচ্ছে। না ব'লে যেন আর সোয়াস্তি পাচ্ছিনে। সে লীলা ত আর আজ বেঁচে নেই। না-থাক্‌, আর ব'লব না, তুমি কত ব্যথা পাবে!"

মৃদু হাসিয়া নরেন্দ্র কহিল, "ব্যথা দেওয়াই যে নারীর স্বভাব।"

অবনত মস্তক সবলে উত্তোলন করিয়া লীলা বলিল, "ব্যথা দেওয়া নারীর স্বভাব! নূতন একটা গবেষণা ক'রে ফেললে। এই নিয়ে মস্ত দর্শনের বই হ'বে—নূতন একটা মতবাদ থেকে যাবে। ওগো ব্যথাহারী দয়াময়, ব্যথা পেয়ে এত করুণা তোমরা নারীর ওপর কর যে তোমাদের করুণার দানের বোঝা সইতে না পেরে কেউ গলায় দড়ি দেয়—কেউ বিষ খায়—কেউ কেরোসিনে পুড়ে মরে।"

তারপর একটু থামিয়া হাসিয়া বলিল, "তাই ব'লে তোমায় বলছিনে কিন্তু,—তুমি যেমন নারী জাতের কথা ব'ললে—আমিও তেমনি পুরুষ জাতের কথাই ব'ললাম।"

হাসিয়া নরেন্দ্র কহিল, "তাহ'লে তুমি আমায় পুরুষ জাতের সংজ্ঞা থেকে বাদ দিচ্ছ!"

"বাদ দেব কেন। তুমি না হয় একটা বিরলপ্রদত্ত ব্যতিক্রম যাকে ইংরেজিতে বলে এক্‌সেপ্‌শন।"

"যেহেতু এটা তোমার নিজের জিনিষ—কেমন না!"

"নিশ্চয়ই, আমার স্বামীর—আমার দেবতার আবার কি দোষ থাকতে পারে।

"এ তোমার রহস্য—না অন্তরের কথা।"

অবিচলিত কণ্ঠে লীলা কহিল, "রহস্য নয়—অন্তরের কথা—। তুমি নির্মল—তুমি নিষ্পাপ। তুমি দেবতা তোমারি গা ছুঁয়ে আমি দিব্যি ক'রে বলতে পারি।"

অচঞ্চল দৃষ্টি দিয়া নরেন্দ্রনাথ কতক্ষণ লীলার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। দেবতার আসনে বসিতে বুঝি তাহার বুকে বাঁধিতেছিল। অকারণে একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল, "দিব্য তোমায় করতে হ'বে না, অমনি আমি

(শেষাংশ ১০৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কৃত্রিম গন্ধদ্রব্য

শ্রীসমীরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

গন্ধদ্রব্যের কৃত্রিমতা সম্বন্ধে বিগত প্রবন্ধে আলোচনা করি ও কি ব্যবহারে তাহা প্রধানত নিয়োগ করা হয়, তাহা বিষয় বর্ণনা করিয়াছি। এইবার দেখা যাক্ কৃত্রিম গন্ধদ্রব্য উৎপাদনে বিশেষজ্ঞগণ কি পদ্ধতি অনুসরণ করেন।

যখন কোনও ফুলের গন্ধের অনুকরণ করিবার প্রয়াস চলে, তখন ব্যাপার কতকটা সরল হইয়া যায়। মৌলিক তেল (essential oils) বা নির্য্যাস মূলে পুষ্পটি হইতে নিষ্কাশিত করা হয়; প্রাচীনকাল হইতেই এই প্রথা চলিয়া আসিয়াছে বলিয়া আমরা ইতিহাস সাহায্যে জানিতে পারি। এই সকল নির্য্যাস ব্যবসায়ীর রুচি ও বাজারের চাহিদার অনুযায়ী মিশ্রণে অতি সহজেই সুফল প্রদান করে—ইহাতে জটিলতা কিছুই নাই।

গবেষণাগারে প্রস্তুত মিশ্র কৃত্রিম গন্ধের পরীক্ষা। বিভিন্ন টেষ্ট টিউবে রক্ষিত একই গন্ধের তীব্রতার বিভিন্ন ক্রমের নির্ণায়ক আরকে কাগজের ফালি ডুবাইয়া গন্ধ-শক্তি পরীক্ষা।

রাসায়নিকগণ জানেন যে, লক্ষ্য করিবার যোগ্য গন্ধ পাওয়া যায় সেই সকল দ্রব্য হইতে, যে সকলের বহিরাবরণ দৃঢ়তা অতি ক্ষীণ অর্থাৎ উৎকৃষ্ট গন্ধ-দ্রব্যের ভিতর হইতে বাষ্প উত্থিত হইয়া অনায়াসে নাসিকা পর্যন্ত পৌঁছায়; কেননা সুগন্ধ দ্রব্যের ত্বক থাকে অদৃঢ় এবং বাষ্প অবাধে মুক্তি পাইতে পারে সেই ত্বক ভেদ করিয়া। রকমওয়ারি গন্ধ প্রস্তুত করিতে হইলে কোনও একটি সুগন্ধ দ্রব্যকে বিভিন্ন প্রকার গন্ধবাহ উপাদানের দশ-বারোটির সহিত স্বতন্ত্রভাবে মিশ্রিত করিতে হয় বিশুদ্ধ গন্ধবিহীন সুরাসারে। ইহার পর উহার সহিত একটি যোগবাহ (fixative) পদার্থ যোগ করিতে হয়, যাহাতে মিশ্র পদার্থটির ত্বক ক্ষীণ ও কোমল হয় এবং গন্ধটির অনায়াসে মুক্তি পাইবার কার্যে সহায়তা করিতে পারে। আধুনিক রসায়নের আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য আবিষ্কারের পূর্ব্বে সেকালে সাধারণত জান্তব সুগন্ধই ব্যবহৃত হইত fixativeরূপে—কস্তুরী; সিভেট* বিড়াল হইতে প্রাপ্ত গন্ধ উপাদান; পীড়িত তিমি হইতে উৎপন্ন গ্যাম্বারগ্রিস্; বীবর হইতে নিষ্কাশিত ক্যাষ্টোরিড্যম্ প্রভৃতি।

রাসায়নিকগণের গবেষণার ফলে ল্যাবরেটরিতে একটির পর একটি কৃত্রিম গন্ধ আবিষ্কৃত হইতে লাগিল, আর পূর্ব্বোক্ত গন্ধ-উপাদানের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। শুধু জান্তব গন্ধদ্রব্যই নয়, অন্যান্য বহু স্বাভাবিক গন্ধদ্রব্যের অনুকরণে কৃত্রিম গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছে।

পূর্ব্বে মাত্র এক আউন্স ভায়োলেট অয়েল উৎপাদন করিতে ২৫ টন ওজনের ভায়োলেট ফুল প্রয়োজন হইত। আধুনিক গন্ধ বিশেষজ্ঞ রাসায়নিকগণ অতি সামান্য মাত্র ব্যয়ে লেমন্ ঘাস হইতে তেল প্রস্তুত করিয়া উহাকে ভায়োলেট সদৃশ গন্ধযুক্ত করিতে পারেন হুবহু। এই প্রকারে যে জিনিষ 'কার্নেশন' ফুলের গন্ধ বলিয়া পরিচিত, তাহা অধুনা প্রস্তুত হয় লবঙ্গের তেল হইতে।

হে (hay) গন্ধ বিশেষ করিয়া সদ্যকর্ত্তিত (new-mown) হে'র গন্ধ ইংরেজদিগের অতি প্রিয়। 'হে' অর্থে বিচালী নয়।—ইংলণ্ডে ফসলের ক্ষেতের ধারে ধারে শক্ত ডাঁটাওয়ালা এক জাতীয় ফুলগাছের বীজ বোনা হয়, গাই-বাছুর প্রভৃতির উপদ্রব হইতে ফসল রক্ষা করিতে, কারণ ঐ সকল ফুলের গাছের গায়ে ছোট ছোট কাঁটাও থাকে। উহার ফুলের গন্ধ অতি মিষ্ট। ফসল যখন কাটা হয়, তখন ঐ ফুলগাছগুলিও কাটা হয় জ্বালানি ও অন্য কাজে লাগাইবার জন্য। পূর্ব্বে এই ফুল সংগ্রহ করিয়া সুগন্ধ দ্রব্য প্রস্তুত করা হইত, বর্ত্তমানে এই ফুলগাছ আগের মত প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় না। অনেকস্থলেই ক্ষেতের চারিদিকে কাঁটা তারের বেড়া পড়িয়াছে বলিয়া। তাই এখন কয়লা চোয়াইয়া তাহা হইতে 'হে' গন্ধ সৃষ্টি করা হয়।

শুনিতে পাওয়া যায় আমাদের দেশের পুদিনা হইতে এসেন্স অফ্ লেমন্ এবং কদম্ব ফুল হইতে বকুল গন্ধ প্রস্তুত করা হয় অনায়াসে সংগ্রহযোগ্য এবং প্রচুর উৎপন্ন হয় বলিয়া। ইহা ছাড়া স্কাটোল (Skatole)য়ের ন্যায় দুর্গন্ধ পদার্থ, যাহা পচা গলা জৈব পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাও ভাল ভাল সুগন্ধ দ্রব্য প্রস্তুতের মৌলিক উপাদানরূপে ব্যবহৃত হয়।

আমাদের দেশে সাধারণ পানীয়ে যে গ্রিন্ ম্যাঙ্গো (কাঁচ আম) গন্ধ দেওয়া হয়, তাহা আম-আদার সাহায্যে। যে আম-সন্দেশ ময়রারা প্রস্তুত করিয়া প্রশংসা-প্রার্থী হয়, তাহাতেও ঐ আম-আদার গন্ধই দেওয়া হয়।

লোস এঞ্জেলস্-য়ে এক ব্যক্তি নেহাৎ সখের বশে নানাপ্রকার গন্ধদ্রব্যের মিলন মিশ্রণে শত শত প্রকার নূতন ধরণের গন্ধের সৃষ্টি করে। কিন্তু তাহার এই নূতন সৃষ্টির নামডাক

---

* সিভেট বিড়াল আমাদের দেশে ভাম্ বা ভাগ্গড় কিম্বা গন্ধ-গোকুলের সদৃশ জাতীয়। ফরাসী দেশে ইহার যেমন আদর, তেমনিই প্রচুর সংখ্যায় পাওয়া যায়

এমনই ছড়াইয়া পড়ে যে, বাধ্য হইয়া তাহাকে ঐ ব্যবসায় লিপ্ত হইতে হইয়াছে এবং সে এখন হলিউডের তারকাদের জন্য তাহাদের হুকুম মত জনে জনের প্রিয় নিত্য নূতন গন্ধদ্রব্য তৈরী করিয়া দিতেছে। তাহার মিশ্রগন্ধদ্রব্যের ভিতর একটি রহিয়াছে যাহার নাম 'ফ্লাওয়ার লেই'—ইহার গন্ধ হাওয়াই দ্বীপের বহুতর বন্যফুলের মিশ্রিত গন্ধের অনুরূপ।

এই জাতীয় মিশ্র গন্ধ চিরপরিচিত কয়েকটি বিখ্যাত গন্ধ-দ্রব্যের মিশ্রণ মাত্র। গন্ধ বিশেষজ্ঞের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারা যায় যে—odors mix, but never combine, অর্থাৎ বিভিন্ন গন্ধ মিশান যায়, কিন্তু উহাদের মিলনে নূতন একটি গন্ধ সৃষ্টি সম্ভব নয়, কারণ এই প্রকার মিশ্রণে কোন গন্ধেরই বিলোপ সম্ভব হয় না।

রাসায়নিক কৃত্রিম উপায়ে কোনও গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া গবেষণাগারের টেষ্টটিউব হইতেই নিশ্চিতরূপে বলিতে পারেন না ঠিক কি প্রকার গন্ধ তাহা হইবে। নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর গন্ধ-বাহ হইলেও ঐ শ্রেণীর ভিতর সামান্য হেরফেরে হয়ত দশ-বারোটি পৃথক শাখা-গন্ধের সৃষ্টি হইতে পারে। সুতরাং পরে ঐ দ্রব্যটি শাখা-গন্ধের কোন্ পর্য্যায়ে পড়িতে পারে, তাহা সদ্য সদ্য বলা কঠিন। ইহার অর্থ এই যে, বহু পরীক্ষা ও অসাফল্যের তিক্ত অভিজ্ঞতার পর হয়ত একাধিক বৎসরের গবেষণার ফলে নির্ণীত হইবে—নূতন কৃত্রিম গন্ধবাহ পদার্থটি ঠিক কোন্ শ্রেণীর কোন্ পর্য্যায়ে পড়িতে পারে।

এই প্রকার নূতন গন্ধ পদার্থের চাহিদার উদ্ভব প্রথম হইয়াছিল, যখন কোনও স্বাভাবিক গ্যাস সরবরাহক কোম্পানীর রাসায়নিককে বলা হইল উক্ত কোম্পানীর সকল গ্যাসে এমন একটি বিচিত্র গন্ধ সংযোগ করিতে, যাহা সম্পূর্ণ নূতন অর্থাৎ এমন এক গন্ধ দিতে হইবে যাহাই ফলতঃ হইবে কোম্পানীর জিনিষের ট্রেড মার্ক।

সাধারণের বিশ্বাস অন্যরূপ হইলেও বিশেষজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন যে, বিশুদ্ধ স্বাভাবিক গ্যাস সম্পূর্ণরূপেই গন্ধবিহীন, যদিও কারখানায় কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত গ্যাস প্রায়ই উহার বিপরীত। আবার ইহাও সত্য যে খাঁটি স্বাভাবিক গ্যাস মাত্রই বিষবর্জ্জিত। কোনও এক ব্যক্তি বদ্ধ-কক্ষের বায়ু হইতে সমস্ত অক্সিজেন নিঃশেষে গ্রহণ করিবার পর হয়ত সে বিশুদ্ধ বায়ুর অভাবে দমবন্ধ হইয়া মারা যাইতে পারে, কিন্তু কক্ষের যে অক্সিজেনহীন বায়ু (যাহাকে সচরাচর বিষাক্ত বলিয়া অভিহিত করা হয়) তাহা দ্বারা ঐ ব্যক্তির কোনও অনিষ্ট সম্ভব নয়। যখন পাইপ হইতে কোনও গ্যাস অজানা রন্ধ্রপথে মুক্তি পায়, সেস্থলে বিস্ফোরণের আশঙ্কা বা আগুন লাগার সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। কোম্পানী চাহিয়াছিল, যখন ঐ প্রকার গ্যাস পাইপ হইতে লিক্ (leak) করিবে, তখন যেন তাহা নিশ্চিতরূপে ধরিয়া ফেলা যায় গন্ধ-দ্বারা; আবার যখন গ্যাস পোড়াইয়া আগুনের সৃষ্টি করা হয় (যেমন ষ্টোভ, উনান প্রভৃতিতে), তখন যেন কোনও খারাপ ফলের না সৃষ্টি হয়। সুগন্ধ দেওয়া চলিবে না, কারণ তাহা হইলে গ্রাহকগণ উহাকে উপেক্ষা করিয়া সারাইবার চেষ্টা শীঘ্র করিবে না। গন্ধ যখন বিরক্তিকর নয়—উহা বন্ধ করিবার জন্য গ্রাহকগণের কোনও প্রকার উদ্বেগ থাকিবে না। আবার ঐ গন্ধ যে গ্যাস হইতেই আসিতেছে, উহা টের পাইতেও যেন গ্রাহকদের বেগ পাইতে না হয়, নতুবা ত্রুটি কোথায় নির্দ্ধারণে অনেক সময় কাটিয়া যাইবে এবং কোম্পানীর অযথা বহু ক্ষতি হইতে পারে।

নানাপ্রকার রাসায়নিক মিশ্র গন্ধ পদার্থ লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ হইল। পরিশেষে রাসায়নিকগণ বাঞ্ছিত দ্রব্য পাইলেন। গ্যাসোলিন বিশুদ্ধ করিবার প্রণালী হইতে বর্জ্জনীয় পদার্থের ভিতর এমন এক আবিলতাপূর্ণ তরল বস্তু বাহির হইল, যাহার ঝাঁঝাল অরুচিকর গন্ধ লক্ষ্য করা অতি সহজ। উহার সহিত বেশী পরিমাণ জল মিশ্রিত করিলে মিশ্র তরল পদার্থ হইতে এমন একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গন্ধ উত্থিত হয়, যাহা নাসিকা স্পর্শ করিবামাত্র মনে হইবে

ওস্মোস্কোপ (Osmoscope) দ্বারা বোতলে রক্ষিত গন্ধদ্রব্যের নমুনা হইতে উহার তীব্রতা নির্ণয়

ভাটিখানায় বিশোধনাগারে বা তেলের খনিতে উপস্থিত হইয়াছি। রাসায়নিকগণ তখন উহার মিশ্রণ এইভাবে নিয়ন্ত্রণ করিলেন যাহাতে উহার গন্ধ মালুম করা যায়, যখন কক্ষের লিক্ করা গ্যাস সমগ্র কক্ষ বায়ুর এক্শত ভাগের এক ভাগও হয়। এখন স্বাভাবিক গ্যাস যতক্ষণ পর্য্যন্ত বায়ুতে শতকরা পাঁচ ভাগ পরিমাণ না মিশ্রিত হয়, ততক্ষণ কোনও বিস্ফোরণের আশঙ্কা থাকে না। তাহার অর্থ হইল—গ্যাস লিক্ করিয়া বিস্ফোরণের আশঙ্কা উপস্থিত করিবার বহু পূর্ব্বেই গন্ধ-দ্বারা টের পাওয়া যাইবে যে গ্যাস লিক্ হইতেছে।

যে বিশোধনাগারে এই গন্ধের আবিষ্কার হইল, তাহারা একটা বর্জ্জনীয় পদার্থের চাহিদা পাইয়া বিক্রয় দ্বারা লাভবান হইতে লাগিল—যদিও মূল্য উহার নগণ্যই ধার্য্য হইল। গ্যাস কোম্পানী ঐ গন্ধদ্রব্যটি ট্যাঙ্কে ট্যাঙ্কে গ্রহণ করিতে লাগিল

-কারণ উহার ২০০ গ্যালন তাহারা মিশাইতে লাগিল ১০ কোটি ঘনফুট গ্যাসের সহিত।

গন্ধ-বিশেষজ্ঞগণকে অনেক সময় দুর্গন্ধ বিদূরিত করিবার ফিকির উদ্ভাবন করিতে ডাকা হয়। 'চিকাগোর শহরতলীর একাংশে কয়েক মাইল অঞ্চল জুড়িয়া ভয়ানক এক বোট্‌কা গন্ধে লোক অতিষ্ঠ হইয়া পড়ে। রাসায়নিক আসিয়া পর্যবেক্ষণ করিয়া স্থির করেন যে নর্দমার জলস্রোতের সহিত ঐ গন্ধ সঞ্চালিত হইতেছে, কিন্তু নর্দমার মোড়ের মাথায় যেখান হইতে আরও শাখা নর্দমা বাহির হইয়াছে ঐখানেই গন্ধের ঘনত্ব সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। তখন প্রচুর পরিমাণে ক্লোরিন্‌ ব্যবহারে অল্প সময় মধ্যে দুর্গন্ধ দূর হইল। এক ব্যক্তি মাছ প্রভৃতি হইতে প্রস্তুত জমীর সার বিক্রয় করিত। তাহার গুদামঘর হইতে যে দুর্গন্ধ সর্ব্বদা উত্থিত হইত, তাহার জন্য প্রতিবেশীরা সকলেই তাহাকে ঘৃণা করিত। নানাপ্রকারে সেই বিক্রেতাকে উত্ত্যক্ত করিতেও থাকে, অবশেষে সে গন্ধ-বিশেষজ্ঞ ডাকাইল। সেই রাসায়নিক এমন একটি পাত্র প্রস্তুত করাইয়া দিলেন যাহার ভিতর ঐ দুর্গন্ধ দ্রব্য রাখিয়া ক্লোরিন্‌ সাহায্যে দুর্গন্ধ দূর করা সম্ভব।

অয়েলক্লথ, লিনোলিয়াম প্রভৃতি প্রস্তুতের কারখানায় যাহারা কাজ করে তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদে বারো হইতে পনেরো ঘণ্টা পর্যন্ত কারখানার দুর্গন্ধ লাগিয়া থাকিত। ইহা ছিল অত্যন্ত বিরক্তিকর ও ক্ষেত্র বিশেষে বমনোদ্রেককারী। কিন্তু গন্ধ বিশেষজ্ঞগণ বর্ত্তমানে ঐ সকল কারখানা হইতে দুর্গন্ধ দূরীভূত করিয়াছেন।

অবাঞ্ছিত পূতিগন্ধের প্রকৃতি অনুসন্ধান করিবার সময় বিশেষজ্ঞগণ সাধারণত অগ্রে নির্ণয় করিতে চেষ্টা করেন ঐ পূতিগন্ধের শক্তি অর্থাৎ ঘনত্ব কি পরিমাণ। গন্ধের শক্তি নির্ণয়ে কিন্তু মানব-নাসিকার স্থান কোন কৃত্রিম যন্ত্রদ্বারা পূরণ করা সম্ভব হয় নাই। যে সকল যান্ত্রিক নাসিকা (mechanical nose) দুর্গন্ধ পরিমাপ করিবার জন্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহারও ফলাফল নির্দ্ধারিত হয় মানবের নাসিকা দ্বারাই। কারণ মানবের নাক ভিন্ন উহাদের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না—বিশেষ করিয়া কোন্‌ জাতীয় গন্ধ, তাহা সনাক্ত করিতে। কিন্তু একটি যন্ত্র আছে যাহা গন্ধ-বিশেষজ্ঞকে বিশেষ সাহায্য করে; উহা হইল ওস্‌মোস্কোপ (Osmoscope)। দুইনল বিশিষ্ট একটি টিউবের মাথায় নাসিকায় সংলগ্ন করিবার ব্যবস্থাসম্বলিত কল থাকে; উহার একটি নল-দ্বারা বোতল হইতে পরীক্ষণীয় গন্ধদ্রব্যের নমুনা টানিয়া আনা হয় নাক পর্যন্ত; অপরটির দ্বারা ঐ গন্ধ-নমুনাকে বিশুদ্ধ বায়ুর সহিত মিশ্রিত করিয়া হাল্কা করিবার উপায় থাকে। ইহার পর বিশেষজ্ঞ ঐ নল দুইটিকে লম্বিত ও খর্ব্ব করিয়া ট্রম্বোন বাঁশি বাজাইবার মত হাত নামা উঠা করিয়া ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর শক্তিতে পরিণত করিতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে শুঁকিতে থাকে সর্ব্বক্ষণ; অবশেষে বিশেষজ্ঞ গন্ধটির ন্যূনতম শক্তির পরিচয় পায় যাহা নলের ভিতর বায়ু মিশ্রিত অবস্থায় রহিয়াছে। এই প্রকারে গন্ধবাষ্পের 'প্রবেশ' (Threshold) শক্তির পরিমাণ পাওয়া যায়। এই শক্তির নিম্নতম পরিমাপ সাধারণত হইল এক কোয়ার্ট বোতল বায়ুতে এক গ্রামের দশ কোটি ভাগের এক ভাগ গন্ধের অবস্থান। কোন কোন গন্ধ ঠিক এই হারে বায়ুতে অবস্থান করিলেও শুঁকিয়া উহার অস্তিত্ব পাওয়া যায় না, আরও বেশী হারে না থাকিলে মিশ্র বায়ুতে উহার গন্ধ অনুভূত হয় না শ্বাস গ্রহণ দ্বারা। আবার ক্ষীণতম গন্ধ হইলে ঐ সামান্য পরিমাণ অস্তিত্বেও গন্ধটি শুঁকিয়া টের পাইতে কষ্ট হয় না আদৌ।

কোনও সিগার-সিগারেট নির্ম্মাতা নিজ তৈরী সিগার প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য প্রচার করিবার জন্য কোনও গন্ধ-বিশেষজ্ঞকে নিয়োজিত করে। বিভিন্ন সিগার ও ঐ নির্দ্দিষ্ট সিগার হইতে ধূমপানের পর পানকারীর শ্বাসে যে গন্ধ অবশিষ্ট থাকে তাহার পরিমাণ বিশেষজ্ঞদ্বারা নির্ণীত করিয়া দেখান হইল যে ঐ নির্দ্দিষ্ট ব্র্যাণ্ডের সিগার হইতে ধূমপানের পর শ্বাসে যে গন্ধ অবশিষ্ট থাকে তাহা সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষীণ। সুতরাং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নির্দ্ধারিত হইল যে ঐ নির্দ্দিষ্ট ব্র্যাণ্ডের সিগারই সর্ব্বাপেক্ষা কম অনিষ্টকর।

বর্ত্তমানে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য যে কার্য্য গন্ধ-বিশেষজ্ঞদের করিতে হয় দুর্গন্ধ লোপ করিবার জন্য, তাহা হইল "এয়ার কণ্ডিশনড্‌" কক্ষের বায়ু হইতে সঞ্চিত আবিলতা দূর করা। প্রায় সকল এয়ার কণ্ডিশন ব্যবস্থায়ই কক্ষ-বায়ুকে পুনঃপুনঃ সঞ্চালন করা হয় (recirculate) এবং সঞ্চিত গন্ধাবিলতা ক্রমশ শক্তিতে বর্দ্ধিত হইতে থাকে, পরিশেষে উহাই সহ্যাতীত দূষণীয় হইয়া পড়ে।

এই প্রকার দূষিত কক্ষবায়ুতে যে গন্ধ পাওয়া যায় তাহাকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। এবং হারভার্ডের স্কুল অফ্‌ পাবলিক হেলথের অধ্যাপক ডাঃ ফিলিপ ড্রিঙ্কার ঐ তিনটিকে নিম্নলিখিত তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—(১) খাদ্যদ্রব্য গন্ধ (হাইড্রোজেন সাল্‌ফাইডয়ের সহিত তুলনীয়, 'পচা ডিম' গ্যাস্‌); (২) মানবীয় গন্ধ (বহুদিন অস্নাত ব্যক্তির দেহ-গন্ধ, বিউটাইরিক (butyric acid) অ্যাসিডের সদৃশ, যাহা পচা মাখনে পাওয়া যায়); (৩) তামাক গন্ধ। ইহার সব কয়টিই অতিশয় নিবিড়ভাবে বায়ুকে আঁকড়াইয়া থাকে—সহজে বিশ্লিষ্ট বা বিদূরিত হইবার নয়। এইগুলির স্ফুরণ-শক্তি এত অধিক যে ১০০ কোটি ভাগ বায়ুতে সামান্য এক বা দুইভাগ থাকিলেও উহার উপস্থিতি জানা যায় গন্ধে।

এই সকল গন্ধকে বিদূরিত করা সম্ভব হয় শীতল তরল পদার্থে শোষণ ক্রিয়া দ্বারা—যেমন ঠাণ্ডা জল, কিম্বা লবণাক্ত জল; যে সমস্ত গ্যাস গলন-প্রবণ সেইগুলি ঐ জলে বিগলিত হইয়া থাকিয়া যাইবে। অন্য উপায় হইল বিশুদ্ধ বায়ু দ্বারা ঐ গন্ধকে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর করা, যতক্ষণ না উহার গন্ধ ঘ্রাণশক্তির অতীত হয় বা এত ক্ষীণ হয় যে ঘ্রাণে টের পাইবার নহে। বিশোধনের আর একটি কৌশল হইল কাঠকয়লা বা কার্ব্বনের ভিতর দিয়া ফিল্‌টার করা। ইহা ছাড়াও আর একটি প্রণালী রহিয়াছে, তাহা হইল—অক্‌সিডেশন্‌ অর্থাৎ বিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে গেলে বায়ুর সকল আবিলতা 'ওজোন' (ozone) দ্বারা পোড়াইয়া ফেলা।

প্রতিনিধি

(গল্প)

শ্রীবীরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

দিনের পর দিন চলে যায় কিন্তু লিলুয়া তার মনের গোপন বাসনাটুকু প্রকাশ করতে পারে না। শুধু চেয়ে থাকে মেথারগড়ের রক্তরাঙা মাটির দিকে। এ রকমভাবে আলস্যে জীবন কাটাতে মোটেই ভাল লাগে না। সে বাবার কাছে আব্দারের সুরে বলে, "বাবা আমি যুদ্ধ ক'রব।"

ধরমদাস তার অন্তরের বেদনা বুঝতে পেরে বলেঃ এ বাসনা তোর সফল হ'ক লিলু, এতে আমি তোকে বাধা দেব না। তোকে আটকে রাখবার মত ক্ষমতা আমার নাই, যার ছিল সে আজ বহু দূরে মর্ত্তের ডাক সেখানে পৌঁছায় না। আজ তোর বাবার কথা মনে পড়ে। লিলুয়া ধরমদাসের এই হেঁয়ালীর কথা কিছুই বুঝতে না পেরে তার দিকে ফ্যাল ফ্যাল নেত্রে চেয়ে থাকে। কিছুক্ষণ পরে বলেঃ তবে তুমি আমার বাবা নও?

এবার লিলুয়ার কথায় ধরমদাসের অন্তরের কোন এক গুপ্ত কোণে আঘাত লাগে, সে সেটাকে যথাসম্ভব চাপা দিয়ে বলে ঃ না লিলু, আমি তোর বাবা নই। তোর বাবা আজ আর এ দেশে নাই—সে কোন এক অজানা দেশে হারিয়ে গেছে। তোর বাবা ছিল আমার বন্ধু, একজন বিশিষ্ট যোদ্ধা। ১৭ বৎসর পূর্ব্বে মেথারগড়ে এক ভীষণ যুদ্ধ হয়, সেই সময় তোর বাবা স্বদেশ উদ্ধার ক'রতে কৃতসঙ্কল্প হ'য়ে যুদ্ধে যোগ দেয়। স্বদেশ সে একরকম উদ্ধার করেছিল কিন্তু............। ধরমদাস বাকীটুকু আর ব'লতে পারে না। কিছুক্ষণ পরে ধরমদাস আবার বলে ঃ যুদ্ধে আমি ছিলাম তোর বাবার সহচর। মৃত্যুকালে তোকে উদ্দেশ্য ক'রে সে আমায় বলে ঃ "ধরমদাস, একে একে সবাই আমায় ছেড়ে চলে গেছে শুধু যায়নি এই এক বৎসরের লিলুয়া, এও চলে গেলে ভাল হ'ত কিন্তু যখন যায়নি তখন এর ভার নিতে হবে তোমায়—আপত্তি ক'রলে চ'লবে না বন্ধু............।" আমার একটিমাত্র মেয়ে ছাড়া আর কেউই ছিল না, তোকে পেয়ে মহিধীর সিংয়ের সব স্মৃতি ভুলে গেলাম।

লিলুয়া বিস্ময়ের সুরে বলে ঃ তোমার মেয়ে? সে কোথায়?

ধরমদাস ধীরে ধীরে উত্তর দেয়, সে কথা তোকে আর একদিন ব'লব।

লিলুয়া জিজ্ঞাসা করে ঃ আমার বাবার নাম মহিধীর সিং?

ধরমদাস—হ্যাঁ।

লিলুয়া—তা হ'লে দেওয়ালে যে তরবারিখানা ঝুলান আছে সেখানা আমার বাবারই?

ধরমদাস—হ্যাঁ।

লিলুয়া কল্পনায় আঁকতে থাকে তার বাবার একটা মৃত্যুকালীন নিখুঁত ছবি, আর তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে তারই প্রতিচ্ছবি। সে যেন তার হারানো বাবাকে ফিরে পেয়ে হাত দুখানা বাড়িয়ে দেয় তার বাবার গলাটা জড়িয়ে ধরবার জন্য কিন্তু হাতে ঠেকে খালি শূন্য—ধূ ধূ ক'রছে কেবল শূন্য।

লিলুয়া সহসা আনন্দে মেতে ওঠে। একবার বাবার তরবারীখানার দিকে সে তাকায় আর একবার তাকায় তার রক্তরাঙ্গা মেথারগড়ের মাটীর দিকে। নিমেষে সে তার সব দুঃখ ভুলে যায়। তার বাবার মত ধরার বুকে হারিয়ে যেতে চায়। লিলুয়া জিজ্ঞাসা করে, "১৭ বৎসর পূর্ব্বেও কি এই আকতার আলিই মেথারগড় আক্রমণ ক'রেছিল?"

ধরমদাস উত্তর দেয়—হ্যাঁ।

লিলুয়া এক লাফে দেওয়াল থেকে তরবারীখানিকে ছিনিয়ে নিয়ে ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে যায় বোধ হয় প্রতিশোধ নেবার জন্য।

লিলুয়া যুদ্ধ করে এক নবীন উৎসাহ নিয়ে। দুদিন অনাহারে সে তার শত্রুপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে থাকে। পিতার তরবারীখানির সাহায্যে সে অসংখ্য শত্রু ধ্বংস করে। আক্তার আলিকে শাস্তি দিতে যায় কিন্তু পারে না। দুর্গে প্রবেশের সময় সে শত্রুপক্ষের দৃষ্টি এড়াতে পারে না। বন্দুকের একটা গুলি এসে তার পায়ে লাগে। অনেক কষ্টে সে একটা জানালার কাছে এসেই অচেতন হ'য়ে পড়ে যায়। যখন জ্ঞান হয়, তখন বলে,—কে আছ গো একটু জল............।

এই জানালার ভিতর হাত বাহির করে একটি তরুণী লিলুয়াকে জল দেয় এবং ভিতর থেকেই অতিকষ্টে তার সেবা করে।

লিলুয়ার কাছে সমস্ত ব্যাপারটা যেন আশ্চর্য্য রকমের লাগে।

লিলুয়া জিজ্ঞাসা করে, তুমি কে? তরুণী বলে, আমি কে সে খবর পরে নিও, একটু সুস্থ হ'য়ে নাও।

লিলুয়া তরুণীর রূপ দেখে মুগ্ধ হ'য়ে যায়; বলে, তোমার নাম কি?

তরুণী উত্তর দেয়—'শান্তা'।

লিলুয়া বলে, তা হ'লে পরিচয়টা আর দেবে না?

শান্তা বলে, আমার পরিচয় দিবার আর কিছুই নাই, শুধু বলতে পারি, আমি এখানকার বন্দিনী। ছোটবেলা থেকে এইরূপ বন্দিনীই আছি। শান্তা ধীরে ধীরে জানালার কাছে ব'সে বলে, তুমি এখানে এ রকম ভাবে থাকলে হয়ত' দুর্গের লোক তোমাকে এক্ষুণি আটক ক'রবে। আমার তোমাকে ভিতরে আনবার উপায় নাই, আমি যে এখানকার 'বন্দিনী'।

লিলুয়া বলে, তুমি আমায় বাঁচিয়েছ, আমি তোমার কাছে ঋণী। প্রতিদান দেবার মত আমার আর কিছুই নাই শুধু এইটুকু ব'লতে পারি যে, আজ আমি তোমাকে এই বন্দিশালা থেকে উদ্ধার ক'রব

শান্তা বলে, পারবে? (মুখে তার অপূর্ব্ব পুলক)।

দুর্গের বাহিরে শহর। নিশুতি রাত। তরুণ-তরুণী রজনীর শান্তিময় ক্রোড়ে ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ে আছে। কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল তাদের স্মরণ হয় না। হঠাৎ জেগে ওঠে কোন এক অতর্কিত হাওয়ার স্পর্শে আর ঘরের জানালার দিকে তাকাতেই তাদের চোখে পড়ে এক নিদারুণ দৃশ্য, পাশের বাড়ীতে আগুন। লিলুয়ার দৃষ্টি—লিলুয়াই ত, তরুণটি যে লিলুয়া—যেন আগুনের সঙ্গে মিশে যায়। তাড়াতাড়ি সে তার ছোরাখানা টেনে নেয়।। লিলুয়া ছুটে যায় অগ্নির কবল থেকে অসহায় নর-নারীকে বাঁচাতে। পারে না আর কাউকে বাঁচাতে শুধু এক পাঁচ বছরের শিশু ছাড়া। খোকা, তোমার নাম কি ? লিলুয়া শিশুটিকে জিজ্ঞাসা করে।

শিশু ভয়ে ভয়ে বলে, 'কিষণ'।

লিলুয়া কিষণকে বলে, চল কিষণ তোমায় বাড়ী রেখে আসি, সেখানে তুমি একটি নূতন 'মা' পাবে।

লিলুয়া কিষণকে শান্তার কাছে রেখে ফিরে আসে। নিমেষের তরেও ভুলতে পারে না প্রতিশোধ নেবার কথা। আসবার সময় পথে একজন শত্রুপক্ষীয় সিপাই তার গতিরোধ করে, কিন্তু সে তবুও পশ্চাৎপদ হয় না। লিলুয়া সিপাইয়ের হাতখানা একহাতে ধরে আর অপর হাতে তার ছোরাখানি বাহির ক'রে সিপাইকে ভয় দেখিয়ে বলে—প্রাণ যদি চাও, আমি যা জিজ্ঞাসা করি তার উত্তর দাও, নইলে দেখছ ছোরা। এই সামনের বাড়ীখানাতে আগুন লাগায় কে ? আর কেন ?

সিপাই ভয়ে ভয়ে উত্তর দেয়, মেহেরবাণি করে যদি প্রাণ ভিক্ষা দাও, বলছি সব। শোন তবে, আমার হুকুম। এ বাড়ীর কেউ আকতার আলিকে হত্যা করবার অভিসন্ধি নিয়ে দুর্গে প্রবেশ করে, তাই আমি আমায় এই নিষ্ঠুর আদেশ দিয়েছে হুজুর।

লিলুয়া আপন মনে ভাবে আকতার আলিকে হত্যা করবার অভিসন্ধি নিয়ে আমিই দুর্গে প্রবেশ করি, কিন্তু পারি নি। তারপরে সিপাইকে জিজ্ঞাসা করে। "আকতার আলি কি এখনও দুর্গেই আছে ?" সিপাই বলে, "হ্যাঁ, সে এই খবর পাবার জন্য দুর্গের বাইরে অপেক্ষা করছে।"

লিলুয়া বলে ভাল রহমান (সিপাই) আকতার আলির সঙ্গে একটু দেখা ক'রে আসি। এমন পথ দিয়ে তুমি আমায় নিয়ে যাবে, যাতে সে প্রথমে আমাদের দেখতে না পায়। একটু এদিক হ'লে সর্ব্বনাশ হবে জানবে।

সিপাই বলে—হুজুর কোন ভয় নাই, আমি নিমকহারাম হব না। আলির জুলুমে কেউ তার উপর খুশী নয়। আমি ঠিক পথে নিয়ে যাব, আমার সঙ্গে এস।

এইভাবে রহমানের সঙ্গে লিলুয়ার ভাব হ'য়ে যায়। লিলুয়া বলে : "আমার পা যে এখন হ'য়ে গেছে হাঁটব কেমন করে ?" রহমান বলে—"এইখানেই সব সিপাইদের ঘোড়া আছে অনুমতি দেন ত আনতে পারি।"

লিলুয়া বলে "সেই ভাল হবে।"

তারপর নিস্তব্ধ রজনীর অন্ধকার চিরে তারই মধ্য দিয়ে রহমান ও লিলুয়া ঘোড়া ছুটিয়ে চলে। নির্দ্দিষ্ট স্থানে এলে রহমান আকতার আলিকে দেখিয়ে দেয়।

লিলুয়া ক্ষণ বিলম্ব না করে তার ছোরাখানা হাতে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে আকতার আলির উপর। নিমেষে আলির সকল জোর-জুলুমের লীলা অবসান হয়ে যায়। কিন্তু লিলুয়া যেন দিশেহারা। তার পা আর চলে না।

রহমান লিলুয়াকে বলে—শীগ্‌গির পালাও বাবু। লিলুয়া তীরের ন্যায় তার ঘোড়া ছুটিয়ে পালিয়ে যায়। কত প্রান্তর, কত বনানী পার হয়ে অবশেষে ঝেলাম নদী অতিক্রম করে তার সোনার দেশ মেথারগড়ে ফিরে আসে। বাড়ীতে ঢুকতেই লিলুয়ার এক বন্ধু সংবাদ দেয় যে, তার বাবার ভীষণ অসুখ, বাঁচবেন কিনা সন্দেহ। এই দুঃসংবাদে লিলুয়া আর স্থির থাকতে পারে না। তার প্রাণ আকুল হ'য়ে ওঠে। সে তখন ধরমদাসের বাড়ীর উদ্দেশ্যে ছুটে বেরিয়ে যায়।

শান্তা লিলুয়ার মতিগতি বেশ বুঝেছিল। সে যে অসমসাহসিক কাজে গিয়েছে, সেখান হ'তে ফিরবে কবে—আদৌ ফিরবে কি না—তার কোন স্থিরতা নেই। শান্তা তখন আর কোথা মাথা গুঁজতে পারে নিজের বাপের কাছে ছাড়া। বাবা কতকাল তাকে দেখে না। রহমানকে সঙ্গী করে চলল বাপের কাছে।

শয্যাশায়ী ধরমদাস শান্তাকে দেখেই বলে "তুমি কে মা ?"

লিলুয়া বাড়ী পৌঁছে সারারাত সেবা শুশ্রূষা করছিল ; বাধা দিয়ে বলে, "এখন একটু চুপ কর বাবা, অসুখ যে বাড়বে। ওর কথা পরে বলছি।"

ধরমদাস লিলুয়ার কথা শোনে না বলে, "এ যে আমার সেই হারান মাণিকের মত।"

লিলুয়া বলে, বাবা অত উত্তেজিত হ'য়ো না।

ধরমদাস বলে, "আমার একটা মেয়ে ছিল তোকে বলেছি। আজ একে (শান্তা) দেখে তারই কথা আমার মনে পড়ছে। জীবনে অনেক ভুলই ক'রেছি লিলুয়া, কিন্তু আজ বোধ হয় আমার ভুল হয়নি। এই আমার সেই মেয়ে.........।'

ধরমদাস কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকে, আবার বলে, "দেখি না, তোর হাতখানা একবার, সেই ফোড়ার দাগটা.........।"

হাতখানি ভাল ক'রে দেখে ধরমদাস বলে, 'না, না, আজ

আমার ভুল হয়নি, আমি আজ আমার হারান মাণিককে ফিরে পেয়েছি। আজ প্রায় তের বৎসর হ'ল আমি একে হারিয়ে ছিলাম।"

ধরমদাস শান্তাকে উদ্দেশ্য করে বলে, "তোকে আর তোর কাকাকে যে দিন আমার চোখের সামনে থেকে আকতার আলি সবলে ছিনিয়ে নিয়ে গেল সে দিন ভেবেছিলাম তোরা বোধ হয় আর নেই; কিন্তু আজ আমি তোকে ফিরে পেয়েছি। লিলুয়া, আজ এর ভার তোমাকেই নিতে হবে, আজ আমি আমার মেয়েকে তোমার হাতে সঁপে দিয়ে গেলাম।"

"সে ভার ত আমি আগেই নিয়েছি, কারাগার থেকে মুক্ত করে এনে।"

হঠাৎ লিলুয়া আর শান্তা রোগীর কি একটা কাতরানি শব্দে চেয়ে দেখে ধরমদাসের দেহ নিসাড়, আর তার বুকের উপর কিষণ।

প্রলয়ের পরে

(১০১ পৃষ্ঠার পর)

তোমার কথায় বিশ্বাস করি। তোমার অমরদার কথা কি বল্‌ছিলে তাই বল।"

লীলা ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া ব্যাকুলভাবে বলিল, "শুনবে তুমি সে কাহিনী—রাগ হ'বে না তোমার—মুখ ঘুরিয়ে নেবে না আমার ওপর থেকে।"

নরেন্দ্রনাথ চমকিয়া উঠিল। কি একটা অজানা আশঙ্কায় তাহার দৃঢ় বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল। সবলে নিজেকে স্থির রাখিয়া বলিল, "তোমার ওপর রাগ ক'র্‌ব কেন?"

লীলা বলিল, "যদি আমি বলি আমি বিশ্বাসিনী নই,—আমি—।"

বাধা দিয়া দৃঢ়স্বরে নরেন্দ্র কহিল, "আমি বিশ্বাস করি না—স্বচক্ষে দেখ্‌লেও না।"

লীলা স্থির কৃতজ্ঞ করুণ মুগ্ধ নয়ন তুলিয়া স্বামীর পানে চাহিয়া রহিল, কথা কহিল না।

নরেন্দ্রনাথ বলিল, "নিজের চক্ষুকে অবিশ্বাস ক'র্‌তে পারি—তোমাকে না। আমি তোমার স্বামী—সবদিক দিয়ে তোমার যোগ্য নাও হ'তে পারি। নিজের স্ত্রীর সামান্য দোষ-ত্রুটি ক্ষমা না ক'র্‌তে পারার মত হীন বংশে আমার জন্ম নয়।"

লীলা নীরবে চাহিয়া রহিল। নরেন্দ্র বলিতে লাগিল, "তুমি যদি তোমার অকলঙ্ক চরিত্র নিয়ে চরিত্রহীন স্বামীকে দেবতা জ্ঞানে ভক্তি ক'র্‌তে পার—আমি আমার সাধ্বী পত্নীর ছেলেবেলার একটা দুঃস্বপ্নকে অবহেলা ক'র্‌তে পারি না এত ছোট তুমি আমায় ভেবনা। আজ তুমি আমায় যে কথা বল্‌তে চাচ্ছ, এতকালও কি আমি তা না জেনে র'য়েছি। এটুকুও যদি তুমি না বুঝে থাক—তবে আমাকে বোঝ্‌বার তোমার অনেকখানি বাকী র'য়ে গেছে।"

পরাজিত লীলা মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না। নরেন্দ্র তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, "আমি জানি আমার লীলা সীতা সাবিত্রীর চেয়ে ছোট নয়।" অপরিসীম স্নেহে নরেন্দ্র তাহার গভীর প্রেমের নিদর্শন অঙ্কিত করিয়া দিল। (ক্রমশ)

সন্ধ্যা

শ্রীকটিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সুমুখের ইউকেলিপ্টাসের আড়ালে
এখুনি সন্ধ্যাতারা উঠ্‌বে।

তোমার হাতখানি আমার হাতে রাখ।
দুপরের হাওয়া ঝিমিয়ে পড়েছে—
রাঙা পথের দূরান্তে বাজে সাঁওতালের বাঁশী
নদীর চরে চলেছে একটি গরুর গাড়ী
শোনা যায় চাকার ক্লান্ত আর্তনাদ
আমাদের চোখে চোখে চাওয়ার নীরব স্বপ্নে
পৃথিবী রঙিন হয়ে উঠেছে,
তোমার হাতখানি আমার হাতে রাখ।

হয়ত তুমি হারিয়ে যাবে আজ রাতের অন্ধকারে,
শুনতে কি পাও দূরতম নক্ষত্রের আহ্বান?
সন্ধ্যার ঝরে পড়া ফুলদল হয়ত তোমায়
করবে তাদের পথ চলার সাথী।
নবীন প্রভাতের মালিকাখানি নিয়ে আস্‌ব যখন
হয়ত তোমার আসার মাঝে তখন পড়ে যাবে
জন্মান্তরের অন্তরাল।
জীবনের প্রতি মুহূর্তই আমাদের কাছে অপরিচিত,
তার মাঝে এই মুহূর্তের সত্য তুমি আর আমি
আর ইউকেলিপ্টাসের আড়ালে ওই সন্ধ্যাতারা।
তোমার হাতখানি আমার হাতে রাখ।

আর্থিক রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ

শ্রীক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ

রাষ্ট্রজগৎ আজ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে রাষ্ট্র-গঠনের আদর্শ বিচার করিতে যাইয়া। অথচ বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহা লইয়া চিন্তার ক্ষেত্রে কিংবা বাস্তব রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে অনৈক্য ছিল অল্পই। ফরাসী বিপ্লবের পর হইতে গণবাদ বা ডিমোক্রেসিই ছিল এ যুগের রাষ্ট্রীয় সাধনার আদর্শ। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই গণবাদকে ইউরোপে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল জাতীয়তার দৃঢ় ভিত্তির উপর। জাতীয়তার উপাদান কি, একটি জাতি কেমন করিয়া সৃষ্টি হয় ইহা লইয়া বিচার বিতর্ক বহু হইয়াছে। তবে সাধারণত ইহা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, যখন কোন ভৌগোলিক পরিধির ভিতর কোন একটি মানবসমাজ যে যে কারণেই হোক একটি নিজস্ব রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্যের অনুভূতি লাভ করিয়াছে, তখনই সে মানবসমাজ ভাবমার্গে একটি জাতিতে পরিণত হইয়াছে; এবং সেই ভাবাত্মক জাতীয়তাকে সাম্যবাদী গণ-প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়া রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য দান করাই আমরা এতদিন মনে করিয়া আসিয়াছি মানব সভ্যতার একটি মুখ্য উদ্দেশ্য এবং মানব-ইতিহাসের একটি সুমহান গূঢ় অভিপ্রায়।

দুর্ভাগ্যের ব্যাপার মানবসভ্যতার এই একশত বৎসরের রাষ্ট্রীয় আয়োজন আজ ধূলিসাৎ হইতে চলিয়াছে। এমন কথা বলিতে চাই না যে প্রত্যেক জাতির স্বাতন্ত্র্য গণবাদী শাসন প্রচেষ্টাই আজ সত্য সত্য ভাঙিয়া পড়িয়াছে, কিংবা অদূর ভবিষ্যতেই ভাঙিয়া পড়িবে। প্রকৃতপক্ষে আজ বহু জাতি-রাষ্ট্র টিকিয়া থাকিতে পারে নাই এবং বাহ্য ঘটনার দিক দিয়া বিচার করিলে বহু গণ-রাষ্ট্রের হয়ত অদূরে অবসান হইবে, কিংবা তাহাদের অবসান নাও হইতে পারে। এ কথা আজ বৃহৎ করিয়া ভাবিবার আবশ্যক নাই যে, গণবাদী ইংলণ্ড আর বেশী দিন টিকিয়া থাকিবে কি না, অথবা ফরাসীজাতি তাহাদের বিপ্লবার্জ্জিত সাম্যরাষ্ট্র আর বহুদিন অব্যাহত রাখিতে পারিবে কি না। কেন না আজ আদর্শের ক্ষেত্রে গণ-রাষ্ট্র চৌচির হইয়া ফাটিয়া পড়িয়াছে। এই ভঙ্গুর আদর্শকে ইংলণ্ড কিংবা ফরাসী যতদিন আঁকড়াইয়া থাকিবে ততদিন গণ-রাষ্ট্রের মহিমা বৃদ্ধি পাইবে না। ভঙ্গুর রাষ্ট্রের শোচনীয় পরিণামই ততদিন ধরিয়া ইংলণ্ড কিংবা ফরাসীদেশকে পোহাইতে হইবে।

প্রশ্ন উঠিবে যে কালের স্রোতে গণ-রাষ্ট্রকে কেন আজ তার "অমল ধবল" পাল গুটাইতে হইবে। এই একশত বৎসর কেমন সুন্দর আর্থিক সম্পদের সুমধুর হাওয়ার সঙ্গে তাহাকে জাতির তরণীকে বাহিয়া লইয়া যাইতে দেখিয়াছি। তবে আজ গণ-রাষ্ট্রের কি হইল? যদি কিছু নাই হইয়া থাকিবে, তবে বিশ্বময় রাষ্ট্রজগতে এত অপার্থিব কোলাহল কিসের? অন্তর রাষ্ট্রিক সম্বন্ধের কথা এখানে উত্থাপন নাই করিলাম, কারণ ধরিয়া লওয়া যাক্ বিশ্ববিধানে দিবা-রাত্রির মত, হাসি কান্নার মত ভাল-মন্দের দ্বৈত-রহস্য লাগিয়াই রহিয়াছে। কাজেই রাষ্ট্র পরিবারের কোন কোন রাষ্ট্র পর-শ্রেষী, স্বার্থপর এবং হিংসাপরায়ণ, তাই রাষ্ট্রপ্রণালী গণ-প্রতিষ্ঠ হইলেও, রাষ্ট্রজগতে দ্বন্দ্ব লাগিয়াই রহিয়াছে। কিন্তু বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক সমস্যার কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখিতে পাই কোন রাষ্ট্রেই আজ শান্তি নাই। জাতীয়তার পতাকা বহিয়া গণবাদের বিপ্লব স্বপ্নে বিমূঢ় হইয়া কত মানুষ যে হেলায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছে ইতিহাস তাহার সংখ্যা বলিতে পারে না। কিন্তু ম্যাজিনি কিংবা উইলিয়াম টেলের স্বপ্ন সার্থক হইয়াছে কি? জাতীয়তা দিয়া, গণবাদের প্রতিষ্ঠা দিয়া রাষ্ট্রজগতে মানুষ সুখ-সার্থকতা লাভ করিয়াছে কি? দারিদ্র্য, উপার্জ্জনহীনতা, জীবন সংগ্রামের কঠোরতা আর্থিক অনিশ্চয়তা ও হাহাকার যে প্রতি গণবাদী জাতি-রাষ্ট্রেই লাগিয়া আছে, তাহাতে মনে হয় কি জাতীয়তা ও গণবাদ রাষ্ট্রীয় আদর্শকে সার্থকতার পথে লইয়া গিয়াছে?

মানুষের রাষ্ট্রীয় সাধনার এই পরিণতি বিস্ময়কর সন্দেহ নাই। কারণ রুশো হইতে আরম্ভ করিয়া হার্ব্বার্ট স্পেন্সার পর্য্যন্ত যে সব গণ-চিন্তার নায়ক গণবাদের জয়যাত্রা ঘোষণা করিয়াছিলেন তাঁহারা একদিকে যেমন অসাধারণ ধীসম্পন্ন ছিলেন, অন্যদিকে মুক্তিমন্ত্রের যথার্থ হোতাও ছিলেন। তবে যে আজ অকৃতকার্য্য হইল তাহার কারণ গণবাদী পণ্ডিতদের রাষ্ট্রদর্শনের মধ্যে একটি অতি মারাত্মক প্রমাদ ছিল। গণ-বাদী পণ্ডিতরা মনে করিয়াছিলেন যে মানুষের মুক্তি তার ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে। শেলির 'প্রোমেথিউস আনবাউণ্ডই' ছিল গণবাদীর মতে মুক্তিমন্ত্রের সাধনা। মানুষ যে সমাজ দ্বারা, ধর্ম্ম দ্বারা ও সঙ্ঘ দ্বারা আষ্টেপৃষ্ঠে শৃঙ্খলিত ছিল সেই শৃঙ্খলকে মোচন করিয়া মানবাত্মার মহান স্বাতন্ত্র্যকে ঘোষণা করাই গণবাদী রাষ্ট্রপ্রচেষ্টার আদর্শ। কাজেই গণবাদী রাষ্ট্রের অন্য কথায় মানে দাঁড়াইল ব্যক্তি-কেন্দ্রগ সমাজ ব্যবস্থা।

এইখানেই গণবাদের পরিণতির শেষ হইল না। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য একটি ভাবাদর্শ মাত্র। তাহার ত একটা ব্যবহারিক ও সাঙ্কেতিক রূপ দেওয়া চাই এবং গণবাদ এই সাঙ্কেতিকরূপের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করিল হেগেল-প্রণোদিত আদর্শ যুক্তিবাদের উপর। হেগেলের মতে বিশ্ববিধান একটি অখণ্ড যুক্তির লীলামাত্র সকল মানুষের মধ্যে এই যুক্তি ক্রিয়া করিতেছে এবং যে যুক্তি দশজনের মধ্যে সাধারণ সেই হইল সত্য যুক্তি। কাজেই রাষ্ট্রীয় নির্ব্বাচনে মাথা গুনতি ভোটের ব্যবস্থা হইল; ইহাতে একদিকে যেমন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের মর্য্যাদা রক্ষা হইল, অন্যদিকে যথার্থ যুক্তি (Right Reason) রাষ্ট্রবিধানে সুপ্রতিষ্ঠিত ও কার্য্যকরী করিবার জন্য একটি উপায় উদ্ভাবিত হইল। আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে সাহিত্যের ক্ষেত্রে গণবাদী রোমাণ্টিক কাব্য জার্ম্মান দর্শন হইতে অতীন্দ্রিয়বাদ গ্রহণ করিয়াছিল কিন্তু রাষ্ট্রদর্শনের ক্ষেত্রে গণ-ব্যবস্থা জার্ম্মান দর্শন হইতে গ্রহণ করিল তাহার যুক্তিবাদ। সে যাহাই হউক এই যুক্তিবাদের সঙ্গে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের সংমিশ্রণ হইল গণ-রাষ্ট্রের কাল।

গণরাষ্ট্র যদি যুক্তিবাদী না হইত তাহা হইলে তাহার ব্যবহারিক স্বরূপটি অতি শীঘ্র চোখে ধরা পড়িত। যেহেতু

প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত নরনারীকে নির্ব্বাচনে ভোটাধিকার দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতেই গণরাষ্ট্র মনে করিয়াছে যে, রাষ্ট্রবিধানে সমাজের যথার্থ হিতায়োজন করা হইয়াছে এবং ইহার বেশী রাষ্ট্রের আর কিছু করিবার নাই। তেমনি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ব্যবস্থা করিয়া গণরাষ্ট্র মনে করিয়া আসিয়াছে যে, সমাজে যে যথার্থ সাম্য থাকা চাই তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের আদর্শে প্রণোদিত ছিল বলিয়াই গণরাষ্ট্র সাধনা রাষ্ট্রিক সাম্যের যথার্থ মূল্য গ্রহণ করিতে পারে নাই। আধুনিক রাষ্ট্রের যথার্থ স্বরূপ তাহার আর্থিক পরিকল্পনায়। আদর্শবাদী গণবাদ যে ধূলিসাৎ হইতে চলিয়াছে তাহার কারণ এই নয় যে, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বা যুক্তিবাদের কোন ভাবগত মূল্য নাই। মূল্য আছে উহাদের প্রচুর, তবে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের সাঙ্কেতিক বিধানে সে মূল্য মুখ্য নহে, সে মূল্য সম্পূর্ণই গৌণ। রাষ্ট্রবিধানের প্রধান তাৎপর্য্য তাহার আর্থিক পরিকল্পনায়। যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, তা কেন হইবে অশোক, হর্ষ, ঔরংজীবের সাম্রাজ্য প্রচেষ্টায় কিংবা আগাষ্টাস্, শার্লমেন ক্রমওয়েলের শাসন ব্যবস্থায়ও কি তাহাদের মুখ্য তাৎপর্য্য ছিল এই সমাজের আর্থিক পরিকল্পনায়? অনেকে উত্তর করিবেন, "হাঁ, তাই বটে।" আমরা তা বলিব না। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, প্রাচীন ভারত কিংবা মধ্যযুগের ইউরোপ কিংবা তিনশ বৎসরের পূর্ব্বেকার ইংলণ্ড কি আর্থিক সভ্যতার দিক হইতে বিচার করিলে আজিকার রাষ্ট্রজগত হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল না? রাষ্ট্রের স্বরূপ আজ একান্তভাবে আর্থিক, কেননা মানুষের আর্থিক সভ্যতার পরিণতি আজ অনন্য-সাধারণ। গণ-চিন্তার শ্রেষ্ঠ নায়ক রুসো কিংবা তাঁহার শিষ্যগণ রাষ্ট্র-বিদের এই অতি গোড়ার কথাকে এই দৃষ্টিতে দেখেন নাই এবং দেখেন নাই বলিয়া যে রাষ্ট্রাদর্শ উনবিংশ শতাব্দীর সামনে দাঁড় করাইয়াছিলেন, অভিনব আর্থিক জগতের প্রচণ্ড শক্তির প্রভাবে তাই আজ উহা ধূলায় গড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে।

•

অবশ্য এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, অধিকাংশ গণবাদী দার্শনিকও উহাকে সেই দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন নাই, যে দৃষ্টিতে গণবাদী রাজনীতিক কিছু কিছু দেখিতে শিখিয়াছিলেন। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, উনবিংশ শতাব্দীর সূর্য্য পশ্চিমাকাশে ক্রমশঃ যত অগ্রসর হইয়াছে, গণবাদ ততই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে আঘাত করিয়াছে এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে গণমতের প্রভাবের পরিধি ততই সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। রুসো যদি একবার ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে অবতীর্ণ হইতেন তাহা হইলে হয়ত আধুনিক গণ-রাষ্ট্রের চেহারা দেখিয়া বিস্মিত হইতেন। এমন কি হয়ত চিনিয়া লওয়া তাঁহার পক্ষে শক্ত হইত। আধুনিক রাষ্ট্রের নরনারীর হাত-পা আজ অষ্টে-পৃষ্ঠে আইন-কানুনে বাঁধা, বিশেষত সর্ব্বপ্রকার আর্থিক চেষ্টা ও উদ্যোগে। কৃষি, শিল্প, ব্যবসা, বহির্ব্বাণিজ্য সর্ব্বক্ষেত্রেই আধুনিক গণরাষ্ট্রের প্রজাকে অজস্র আইনের বেড়ার মধ্যে কাজ করিতে হয়। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য আজ সুদূরপরাহত। আর গণমত? সে ত' আজ পার্টি অনুশাসনের নিগড়ে কোণঠাসা এবং আমলাতন্ত্রের দুশ্ছেদ্য জালে শুধু গণমত নয়, গণ-নায়ক পর্য্যন্ত আজ বন্দী হইয়া আছেন। এ সব পরিবর্ত্তন যতই হউক না কেন, তাহা হইলেও গণ-বাদ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে আস্থাহীন হয় নাই। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে খর্ব্ব করিলেও, গণবাদ বাধ্য হইয়াই এই আদর্শ বিচ্যুতিতে সায় দিয়াছে, স্বেচ্ছায় কিংবা আদর্শ প্রণোদিত হইয়া দেয় নাই।

•

কিন্তু রাষ্ট্রীয় চিন্তার জগতে আজ আগুন লাগিয়াছে—গণবাদের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া গণ-বৈরীবাদ (Fascism) ও সঙ্ঘবাদ (Communism) মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই দুইটি চিন্তাধারা পরস্পরবিরোধী বলিয়াই আমরা জানি এবং অনেকাংশে তাই বটে। তাহা হইলেও গণবৈরী ও সঙ্ঘবাদী রাষ্ট্র উভয়েই গণবাদকে বিশেষত তাহার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের আদর্শকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করে। এই উভয় চিন্তাদর্শের মতেই ব্যক্তিকে স্বাতন্ত্র্য দেওয়া মূর্খতা। কেননা সঙ্ঘবাদের মতে ব্যক্তি ত' সমষ্টির অঙ্গমাত্র এবং গণদ্বেষী মতে ব্যক্তিবাদের উপর কোন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা যায় না, আদর্শ দিয়া ব্যক্তিকে যথেচ্ছ নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। তাই আমরা দেখিতে পাই, এই দুইপ্রকার সমষ্টিবাদী (totalitarian) রাষ্ট্রেই সর্ব্বপ্রকার আর্থিক উদ্যোগের মধ্যে ব্যক্তি-স্বাধীনতার অবসান। তাহা এত সুস্পষ্ট ও এতখানি ব্যাপক যে গণবাদী রাষ্ট্রের আর্থিক নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে তাহার প্রায় তুলনা হয় না, বলিলেই চলে। সঙ্ঘবাদী ও গণবৈরী রাষ্ট্রের আর্থিক পরিকল্পনায় প্রভেদ এই যে, প্রথমোক্ত রাষ্ট্রে কোন প্রকার ধনোৎপাদন-উদ্যোগে কোন মালিকী স্বত্ব স্বীকার করা হয় না। কারখানা চালান হইতেছে, শ্রমিক তাহার নির্দ্ধারিত মজুরী পাইতেছে, সরকারী কর্ম্মচারী তাহার তত্ত্বাবধান করিতেছে এবং নির্দ্ধারিত মূল্যে সেই সব উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয় হইতেছে। অন্য পক্ষে গণদ্বেষী রাষ্ট্রে মালিকানী উদ্যোগের কোন প্রকার ব্যাঘাত নাই, তবে মজুরী মূল্য, আমদানী, রপ্তানী সবই রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত।

আধুনিক সভ্যতার যুগে আর্থিক সংগঠনের পরিকল্পনা বাদ দিয়া কোন প্রকার রাষ্ট্রাদর্শ হইতে পারে না এবং মানব সভ্যতার এই সন্ধিক্ষণে এই আদর্শের তিন তিনটি বিভিন্ন রূপের পরীক্ষা আজ পৃথিবীর বক্ষে চলিতেছে। এই কঠোর ও ইতিহাস-নিয়ন্ত্রক পরীক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা শক্ত হইলেও একটি কথা অতি সহজেই প্রতীয়মান হইতেছে। আর্থিক সভ্যতার পরিমাণ-গত শ্রীবৃদ্ধি যদি বন্ধও হইয়া যায়, তাহা হইলেও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উপর যে রাষ্ট্রাদর্শের প্রতিষ্ঠা তাহাকে অচিরেই কালের তরণীতে সোনার ধান্য বোঝাই করিয়া নিরুদ্দেশ যাত্রা করিতে হইবে। আর যদি তাহা নাও করা হয়, তবে যে গণবাদের ঊষর ভূমিতে আর সোনার ফসল ফলিবে না তাহা নিশ্চিত। গণবাদ এ যুগের আর্থিক শক্তির প্রভাবে বাধ্য হইয়া যে আদর্শ বিচ্যুতি গ্রহণ করিয়াছে তাহাকে স্বেচ্ছায় ও আদর্শানুগত হইয়া বরণ করিয়া লইতে হইবে। ইহাতে ক্ষোভ পরিতাপের কোনই যথার্থ কারণ নাই। অনেকে বলিবেন যে, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য যদি না থাকে তবে ত' রাষ্ট্র দাসত্বের কারাগারে

পরিণত হইল। মুস্কিল এই যে ব্যক্তিবাদী ভুলিয়া যান যে, মুক্তি মানে যথেচ্ছাচারের ক্ষমতা নয়। মুক্তি মানে সকল বন্ধন হইতে মুক্তি নহে। বন্ধনই যেখানকার সত্যকার নিয়ম, সেখানে বন্ধনজ্ঞানই যথার্থ মুক্তি। রাষ্ট্র প্রচেষ্টা মানুষের আর্থিক প্রয়োজনের শৃঙ্খলিত ব্যবস্থা। ব্যক্তির এক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য থাকিতে পারে না, সে সেখানে আর্থিক প্রয়োজনের নিয়মের বশবর্ত্তী। গণবাদী রাষ্ট্র বিধানের এই অতি প্রাথমিক সত্যকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছে বলিয়াই ডিমোক্রেসি আজ ভয়ঙ্কর অশান্ত এবং নিজের অকৃতার্থতা বোধে নিজেই পঙ্গু হইয়া রহিয়াছে। রাষ্ট্র যদি আজ শুধু দারোগা, জেলার ও হাকিমের কার্য্য মাত্র করে তাহা হইলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আদর্শকে অব্যাহত রাখা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলে এই ভাবগত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পরিবর্ত্তে সমাজের অগণিত নরনারীর আর্থিক দুর্দ্দশার অবধি থাকিবে না। শুধু তাহাই নহে, অন্তঃসারশূন্য ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সে সমাজ একদিন আপনার ভারেই ধ্বসিয়া পড়িবে।

গণবাদী বলিবেন যে, উপকার কথা সত্য হইলেও ডিমোক্রিসির যান্ত্রিক কাঠামোকে ত' অব্যাহত রাখিতে হইবে, যথা—ভোটাধিকার, পার্লামেন্টের নায়কদিগের শাসনভার গ্রহণ ইত্যাদি, কেননা এর পরিবর্ত্তে অন্য কোন কার্য্যকরী শাসন-প্রণালী মানুষ আবিষ্কার করিতে পারে নাই। কথাটা এক হিসাবে সত্য এবং অন্য হিসাবে আবার তেমনি ঘোরতর ভ্রমপূর্ণ। সত্য এই হিসাবে যে, ডেমোক্রিসির শাসন-যন্ত্র অপেক্ষা সর্ব্বাবস্থায় উপযোগী ও কার্য্যকরী সত্যই কোন যান্ত্রিক ব্যবস্থা মানুষে আজও সৃষ্টি করিতে পারে নাই। কিন্তু ভ্রম এই যে রাষ্ট্র পরিচালনার বাস্তবরূপ কোনও যান্ত্রিক বিধানের উপর নির্ভর করে না। গণরাষ্ট্রকে যদি আজ সাফাই গাহিতে হয়, তবে তাহার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতে হইবে তাহার শাসনকার্য্যের ফলাফল দিয়া, তাহার শাসন-যন্ত্রের কাঠামোর বহাদারী দিয়া নয়। রাষ্ট্র আজ আর শুধু আইনের বিধান নয়, ইহা সমাজের আপামর সাধারণের মঙ্গল ব্যবস্থা।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের স্বপক্ষে আর একটি যুক্তি বা অজুহাত দেওয়া হয় এই বলিয়া যে, অবাধ প্রতিযোগিতা হইল প্রাণি-জগতের নিয়ম। এই নিয়মের ফলে কোন কোন জীবের ধ্বংস হইবে ইহা নিছক প্রাকৃতিক নিয়ম। অপটু জীবের বিনাশ হইল বলিয়া মানুষের মত শ্রেষ্ঠ জীবের অভিব্যক্তি ত' পৃথিবীতে তবুও ঘটিয়াছে। বলা বাহুল্য যে, প্রাণি-জগতের এই নিয়ম সমাজ-জীবনে খাটাইতে যাওয়া সম্পূর্ণ দুষ্টতা। অভিব্যক্তিবাদ জগৎ-ব্যাপারের একটি অজ্ঞাত ইতিহাসের পাঠোদ্ধার করিলেও এ কথা প্রাণি-বিজ্ঞান কখনও বলে নাই যে, মানুষ ও মনুষ্যেতর জীবের মধ্যে একটি বিশিষ্ট প্রভেদ নাই। প্রভেদ আছে বলিয়াই পশু, বন্য এবং মানুষ সামাজিক জীব। আজ রাষ্ট্র ছাড়া কোন সমাজ-ব্যবস্থা নাই এবং আজিকার সমাজ সম্পূর্ণভাবে ক্রিয়াশীল আর্থিক সমাজ, তাই রাষ্ট্রাদর্শে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে খর্ব্ব করা প্রয়োজন। আমরা এমন কথা বলিতে চাই না যে, আর্থিক ক্ষেত্রে নাই বলিয়া মানুষের কোন ক্ষেত্রেই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য থাকিবে না। সঙ্ঘবাদীর মতে তাই বটে, গণদ্বেষীর মতে তাহা নয়। সঙ্ঘবাদী মানুষকে ষোলআনা একটি সামাজিক জীব বলিয়া মনে করেন, মানুষের প্রতিক্রিয়াই তাহার সামাজিক ক্রিয়া এবং তাঁহার মতে এই সামাজিক ক্রিয়া নিরপেক্ষ মানুষের কোন চেতনাই নাকি নাই। গণদ্বেষী মত এই জড়াদ্বৈতবাদ বিশ্বাস করে না এবং কেহ আর্থিক সমষ্টিবাদে আস্থাবান হইলেও তাহাকে সঙ্গে সঙ্গে এই জড়াদ্বৈতবাদে আস্থাবান হইতে হইবে এমন কোন কারণ নাই। সে যাহাই হউক, আজিকার জগতে গণবাদ, গণবৈরীবাদ ও সঙ্ঘবাদ এই তিনটি বিভিন্ন রাষ্ট্রাদর্শের মধ্যে যে প্রচণ্ড সংঘাত চলিতেছে, আমরা সেই সংঘাতের কথা স্মরণ করিয়া রাষ্ট্রীয় সাধনার অনিশ্চিত ভবিষ্যতের প্রতি শঙ্কাকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম।

ধরণীর তৃষা

শ্রীতারাপদ ভৌমিক এম-এ

প্রচণ্ড যৌবনমত্ত নর্ত্তনের বেগে
হে ভাস্কর একদিন তোমার গতির দোলা লেগে
মহাশূন্যে বিচ্ছুরিয়া উদ্ভাসিয়া সে গতির রথে
আসিল তোমার পৃথ্বী দিক্‌হীন অনন্তের পথে
লক্ষকোটি যোজনের অন্তরালে ব্যগ্র বাহুডোরে
আবার চাহিলে তুমি বক্ষমাঝে বাঁধিতে তাহারে,
মাঝপথে স্তিমিতগতি অসহায় ধরণীর বুকে
জাগিল মিলন-তৃষা—সকরুণ বাণীহীন মুখে

তাই সে তোমারে টানে; ফিরে যেতে নাহিক উপায়
ঊর্দ্ধমুখী হয়ে শুধু অনিরুদ্ধ কামনা জানায়;
তোমারি মিলন চাহি বিবাগিনী ফুটায় কমল
তোমারে সে অর্ঘ্য দেয় কামনার রক্তশতদল;

তোমারে ঘেরিয়া তাই পলে পলে চলে সংক্রমণ
স্থির হয়ে শোন তুমি শুধু তার করুণ ক্রন্দন।

অপ্রত্যাশিত

(গল্প)

শ্রীকিশোরীমোহন ভট্টাচার্য্য

বেকার অবস্থায় মানুষে সাধারণত যাহা করে থাকে, বীরেনও তাহাই করল। সে এ বৎসর বি-এ পরীক্ষা দিয়েছে কিন্তু পাশ সম্বন্ধে তার সন্দেহ আছে। কারণ ফিলোসফির একটা পেপার না কি ভারী শক্ত হ'য়েছে। সংসারের অবস্থা তেমন স্বচ্ছল নয়। তার মা অনেক কষ্ট করে লেখাপড়ার খরচ চালাচ্ছিলেন। পরীক্ষা ভাল দিতে না পারায় মন তার বড়ই খারাপ। চুপ করে বসে থাকাটা সে মোটেই পছন্দ করে না। তাই সকালে একটা ছেলে পড়িয়ে পাড়ার লাইব্রেরী হ'তে 'ষ্টেট্‌সম্যান'টায় চাকুরীর বিজ্ঞাপন দেখে। তারপর স্নানাহার সেরে দুপুর বেলায় খাতা নিয়ে বসে কয়েকটা আজব গল্প লিখতে। মধ্যে মধ্যে যে দু'একটা প্রেমের কবিতা বা শোকোচ্ছ্বাস না লিখে এমনও নয়। আত্মীয় স্বজন যাও দু'-চারজন আছে, তাদের সঙ্গে মেলামেশাটা তার আদপেই পছন্দ নয়। কলেজের বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে অশোকের সঙ্গেই সে একটু প্রাণ খুলে মিশতে পারে।

জুলাই মাসে পরীক্ষার ফল বের হ'ল। সত্য সত্যই সে এবার ফেল হ'য়েছে। কলেজের ভাল ছাত্র ব'লে বিশ্ববিদ্যালয় তাহার প্রতি কোনরূপ দয়া প্রদর্শন করল না। সে বুঝত তার চাকুরীর জন্য অনেক লোকের নিকট অনুরোধ করতে হবে। অনেকের দোরে খাটতে হবে। কথাও শুনতে হবে। বীরেনের মাতা প্রসূতি দেবী একদিন তাকে বললেন, "বীরু, রণেনের কাছে গিয়ে একটু ভাল করে বল না, সে একটা কাজের ব্যবস্থা নিশ্চয়ই ক'রতে পারবে। ঠাকুরঝি ...ছিলেন তার ওমাস থেকে ১৫৫, টাকা মাইনে হ'বে।" ...রেন তার রণেনদাকে ভালরূপেই জানিত। তাকে কখনও সে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতে পারেনি, তাই সে মাতৃভক্ত সন্তান ...ওয়া সত্ত্বেও মায়ের এই কথাটিতে কান দিতে পারল না। ...দি অনাহারেও মৃত্যুকে বরণ করতে হয় তাও রাজি, তথাপি সে রণেনদার নিকট চাকুরীর অনুরোধ ক'রতে পারবে না।

বীরেনের বয়স ২১।২২ বৎসর হবে। সংসারে ...র বিধবা মাতা ও একটি ১৩ বৎসর বয়স্কা ভগিনী ভিন্ন ...র কেহ নাই। বাড়ীর ভাড়া ও একটি ছেলে পড়িয়ে যাহা ...য় তাতেই অতি কষ্টে তাদের দিন চলে। প্রসূতির শরীর ...বরই রুগ্ন। তারপর পুত্রের অকৃতকার্য্যতা ও সংসারের ...ভাবের তাড়নায় শরীর তাঁর আরও ভেঙ্গে পড়ল। ...রেনের বোন সুমতিই এখন সংসারের সমস্ত কাজ করে। ... বীণাপাণি স্কুলে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছে। জ্ঞাতি ... পিসিমায়ের বাকা যন্ত্রণায় এ বৎসর তাকে স্কুল ছাড়িয়ে ...ওয়া হয়। সংসারে তেমন বেশী কাজকর্ম্ম না থাকায় ...নও সে প্রতিদিন মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যার পর বই কাগজ সম্মুখে ...র পড়তে বসে।

অশোক প্রায় প্রতিদিন বীরেনদের বাটীতে আসে। ... বড়লোকের ছেলে কিন্তু তার হালচাল এমনই সুন্দর যে, ...পাদিনের মধ্যেই বীরেনদের বাড়ীর অন্দরেও তার অবাধ ...কার এসে গেল। বীরেনের মাতা প্রসূতি দেবী তাকে আপন সন্তানের মত যত্ন করেন। সেও তাঁকে মায়ের মত ভক্তি করে। সুমতি অশোকের কাছে তাই লজ্জা সংকোচ করে না।

সেদিন সন্ধ্যায় সুমতি দাদার ছোট্ট ঘরটিতে বসে একটা ইংরেজী কবিতা পড়ছিল, এমন সময় অশোক ডাকল, "বীরেন আছ?"

সুমতি উত্তর দিল, "আসুন অশোকদা, দাদা পড়াতে গিয়েছেন। একটু বসুন এক্ষুণি আসবে।

অশোক বসল। সুমতি আবার পড়তে সুরু করল,—

"I bring fresh showers, for the thirsty flowers"

অশোক বলিল, এটা শেলির লেখা না?

সুমতি ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে মনে মনে পড়তে লাগল। একটু পরেই অশোক বলল, "সুমতি তোমার ইংরেজী ও অন্যান্য সমস্ত বিষয় ত' বেশ তৈরী আছে। এ বছরে প্রাইভেটে পরীক্ষাটা দিয়ে দাওনা!"

সুমতি বলল, "অঙ্কটা যা শক্ত। তা ছাড়া কে দেখিয়ে দেবে?"

—কেন বীরেন ত' বসে আছে। সে ত' একটু দেখিয়ে দিতে পারে।

—দাদার সময় হয় না। এবার একটি ফার্ষ্ট ক্লাশের ছেলে নিয়েছে। তাকে পড়িয়ে দাদার আর সময় থাকে না। নয় ত' আমার ইচ্ছা হয় মাঝে মাঝে।

—পড়ানর জন্য আটকাবে না। তোমার মাকে বলে আমিই না হয় ২।১ ঘণ্টা পড়াব'খন কি বল। তোমার সমস্ত বই আছে ত'?

—হাঁ। কেবল হিষ্টরীটা নাই।

অশোক সগর্ব্বে বলল, ও, হিষ্টরী একটা সাবজেক্ট, তার জন্য আবার বই চাই। আমার বি-এতে এমনি মোটা মোটা ক'খানা হিষ্টরী পড়তে হ'য়েছিল তা জান?

—কেমন করে জানব। দাদার ত' হিষ্টরী ছিল না।

—সুমতি, তোমাকে হিষ্টরীর জন্য ভাবতে হবে না। আমি ভালকরে বুঝিয়ে দেব আর প্রয়োজন মত নোট দেব। তা হ'লেই তোমার ঠিক হ'য়ে যাবে। আজ তোমার দাদা এলে বলবে অশোকদা এ বছর ম্যাট্রিকটা দিয়ে দেবার কথা বলছিল। তার মতটা একবার নিতে হবে বই কি!

ইতিমধ্যে বীরেন এসে ছোট ঘরটিতে প্রবেশ করল এবং হাসিমুখে বলল, "I thoroughly agree to your proposal" (তোমার প্রস্তাবে আমি সম্পূর্ণ সম্মত)। তারপর একটা চেয়ারে বসে পড়ল।

সুমতি বলল, দাদা তোমরা বস। আমি অশোকদার জন্য চা তৈরী করে আনিগে।

অশোক ও বীরেন তখন প্রাণখুলে আলোচনা সুরু করলে। দুবন্ধুর সাক্ষাৎ হ'লে এমন বিষয় দুনিয়ায় নেই যা নিয়ে তারা বিজ্ঞের মত মতামত প্রচার না করে। এরই

তাঁকে সুমতি কখন এসে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে তা কেউই তা লক্ষ্য করে নি।

অনেকক্ষণ নীরবে থেকে সুমতি বলল, "নিন্ চা যে একেবারে জল হ'য়ে গেল।" বন্ধুদের চমক ভা'ঙ্গল।

সুমতির আজ ভারী আনন্দ। অশোকদার মত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিখ্যাত ছাত্র তার পড়াশুনার সাহায্য করবে। গর্ব্বে তার বুকখানা ফুলে উঠতে লাগ্‌ল। বীরেন ও বীরেনের মা প্রসূতি এক বছরের জন্যে সুমতির বিবাহের চেষ্টায় ঢিল দিল। সুমতি ম্যাট্রিক পাশ করলে আধুনিক যুগে তার একজন উপযুক্ত পাত্র জুটতে পারে এই আশাই তাদের নিশ্চেষ্টতার কারণ। অল্পদিনের মধ্যেই বীরেনের চাকুরীও জুটল। ৪৫্ টাকা মাহিনা। এই টাকাতেই তাদের বেশ স্বচ্ছন্দে চলে যাবে। ভবিষ্যতের উন্নতি ও সুখের কথা কল্পনা করে বীরেন উৎসাহের সহিত কাজে যোগ দিল। এখন সংসারে একটু অধিক খরচ ক'রতেও বীরেন বা প্রসূতি কেউ কুণ্ঠিত হন না। প্রসূতির শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল। তাদের সংসারের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীতে কয়েকজন আগন্তুক দেখা দিল। বলা বাহুল্য বীরেনের পিসি তার মধ্যে সর্ব্বপ্রথম। এসেই তিনি নূতন করে মৃত ভ্রাতার শোকে বিহ্বল হ'য়ে পড়লেন। আরও কয়েকজন আত্মীয় হাজির হ'ল যারা পূর্ব্বে কখনও তাদের বাড়ীর ছায়াও মাড়াত না।

পিসিমা এখন প্রায় প্রত্যহই আসেন ছোট বৌমার সঙ্গে সুখ দুঃখের গল্প করতে, অর্থাৎ তাঁর জীবিত ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূ অপেক্ষা ছোট বৌমা ও মৃত কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনেকাংশেই শ্রেয় ইহাই বুঝাতে। বীরেনের ও সুমতির বিবাহ সম্বন্ধে যে আলোচনা না হ'ত তাহা নহে। রণেনের চাকুরীর হঠাৎ জবাব হয়ে যাওয়াই তার এই দুর্দ্দান্ত পিসির এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তনের কারণ।

সেদিন রবিবার। অশোক অন্যান্য দিনের মত সেদিন সন্ধ্যায় না এসে এসেছে দুপুরে। সুমতির পরীক্ষা সন্নিকট। আঁকে তার বুদ্ধি খেলতে চায় না। এক সপ্তাহ ধরে চেষ্টা করেও 'প্রফিট্ এ্যান্ড লস্'-এর অঙ্ক সে শিখতে পারল না। একটু বেশী সময় খেটেখুটে তাকে শিখিয়ে দেবে ব'লে আজ এই অসময়ে অশোক এসেছে। প্রসূতি ইহাতে বিশেষ আশ্চর্য্য হ'লেন। অশোক সুমতিকে খাতা আনতে ব'লে ঘরে ঢুকল। একটু পরে সুমতিও বই খাতা নিয়ে সেই ঘরে প্রবেশ করল।

সুমতি ও অশোকের এই অবাধ মেলামেশাটা পিসির মনে আগুন ধরিয়ে দিল। তিনি মনের ভাব গোপন করে বললেন—বৌমা ঐ ছেলেটি কে বল ত'?

প্রসূতি বললেন—বীরেনের বন্ধু, অশোক। খুব ভাল ছেলে এম-এ পড়ছে। ভারী বিনয়ী। বড়লোকের ছেলে ব'লে একটুও দেমাক নেই। সুমতিকে পড়ায়। পরীক্ষা এসে পড়েছে বলে বোধ হয় আজ এসময়ে এসেছে।

—সুমতির পরীক্ষা আবার কিসের? ও-ত স্কুলে যায় না। লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে না বলছিলে।

এতদিন প্রসূতি কন্যার লেখাপড়ার কথা চেপে রেখেছিলেন, আজ ব'লে ফেললেন,—সুমতি এ বৎসর ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবে বাড়ীতে পড়ে। সুমতি ও বীরেনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি আর কিছু বলি নি। অশোকও চেষ্টা করছে যাতে প্রথম বিভাগেই পাশ করতে পারে। মেয়েটার চেষ্টা আছে, কষ্ট ক'রে খাটছে আশীর্ব্বাদ করুন যেন ভাল পাশ হয়।

পিসির অন্তর হু হু ক'রে জ্বলে উঠ'ল। রণেনের জন্য একমুঠো টাকা খরচ করেও তিনবারে ম্যাট্রিক পাশ ক'রতে পারে নি; আর সামান্য একটা গরীবের মেয়ে বিনা পয়সায় পড়ে পাশ হবে। ইহা তাঁর আরও অসহ্য হ'ল। তবু বললেন, বৌ পাশটা এত সোজা নয় যে ইচ্ছা করলেই হবে তবে যদি বরাতে থাকে ত' ক'রবে বৈকি।

ইহার পর আর কোনও কথা হ'ল না। পিসি নিজেদের বাড়ী চলে গেলেন। তারপর আর আসেন নি।

অশোক সুমতিকে পড়াত, সুমতি শুনত কি না কে জানে! উভয়ের নিকট এই সময়টাই অধিক আনন্দের ছিল পড়াতে পড়াতে অশোক যখন নিজেকেই আইভান্‌হো ঠাউরে নিয়ে তন্ময় হয়ে যেত, সুমতিও হয়ত বা রোয়েনার কথা ভাবতে ভাবতে একই অবস্থায় স্পন্দিত হ'য়ে পড়ত। কয়দিন হ'তে সুমতির পড়াশুনায় আর মন নেই। সে বড়ই চঞ্চল তার এই চঞ্চলতা প্রসূতি লক্ষ্য করলেন, হয়ত পরীক্ষা জন্যই তার এই চঞ্চলতা ইহাই তাঁর ধারণা হ'ল। সুমতিকে তিনি এখন সাংসারিক কোনও কাজ করতে দেন না। তার পরীক্ষার আর মাত্র ১০ দিন বাকি। অশোক একদিন কলেজ কামাই ক'রবে স্থির ক'রেছে। বীরেন সুমতির পড়াশুনা দেখবার সময় পায় না। তার ছাত্রও এ বছর পরীক্ষা দিবে। অফিস ও টিউশনি ক'রে তার আর অন্য কথা ভাববার সময় হয় না।

বীরেনের মামা তার জন্য একটি সুশ্রী পাত্রী দেখে রেখেছেন, সুমতির বিবাহের পর সে বিবাহ হবে। বীরেন তা জানে বটে, কিন্তু সময়ের এতই অভাব যে, ভাবী বধূটির কথা চিন্তা করবারও সময় নেই। সুমতিকে অশোক পড়ায় কি না তাও জিজ্ঞাসা করবার সময় হয় না। সুমতির বিবাহের কথা মাতা ও পুত্রের ভাবতে হয় না। তার বিবাহের একপ্রকার সমস্তই ঠিক। ছাত্রের পিতা অবিনাশবাবু সুমতিকে দেখে তার কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত বিবাহ দিতে ইচ্ছুক। সুমতির পরীক্ষা শেষ হ'লেই জ্যৈষ্ঠ মাসে তাদের বিবাহের দিন স্থির হবে।...

সুমতির পরীক্ষা আরম্ভ হ'য়ে গিয়েছে। আজ তাহার শেষ দিনের পরীক্ষা। সংস্কৃত ও ইতিহাস। অন্যান্য দিন প্রসূতি ও অশোক টিফিনের সময় সুমতিকে দেখেশুনে খাইয়ে উৎসাহ দিতেন। আজ বাড়ীতে একজন আত্মীয় আসায় প্রসূতি যেতে পারলেন না। সুতরাং অশোক একাই গেল। টিফিনের সময় অশোক একপাশে সুমতির জন্য অপেক্ষা ক'রতে লাগল।

সুমিতি তাকে দেখেই হাসতে হাসতে বলল, আজ
এ পেপারটা ভালই হ'য়েছে। এখন হিষ্টরীটা হ'লেই হয়।

অশোক তাহাকে লেবু ও দুধ খেতে দিলে।

—আমি এত খেতে পারব না। আপনি খান না
অশোকদা।

অশোক হাসতে হাসতে বলল,—আমি কি পরীক্ষা দিব
য়, এসব রোগীর পথ্য খাব। উভয়েই হেসে উঠল।

তারপর পরীক্ষা সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিয়ে অশোক
বিদায় নিতে প্রস্তুত হ'লে সুমিতি বলল—অশোকদা,
আপনি কাছে থাকলে কেমন ভাল লাগে। আপনাকে ছেড়ে
পরীক্ষা দিতে যেতেও মোটেই ভাল লাগছে না আজ।

অশোক তার হাত দুটী নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে
স্নেহে বলল—আমারও তোমাকে ছেড়ে বাড়ী যেতে ভাল লাগছে
না সুমিতি। ইচ্ছা হয় দুজনে দিগন্তের নিরালা রাজ্যে,
যেখানে জনমানবের সংস্রব নেই, সেখানে গিয়ে হাতে হাত
রেখে বসে থাকি।

তাদের এই রঙিন কবিতার রেশ ঢাকিয়া হঠাৎ বিশ্ব-
বিদ্যালয়ের ঘণ্টাধ্বনি বেজে উঠল। সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে
গেল। দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে সুমিতি আবার হলে প্রবেশ করল।

অল্পদিনের মধ্যে সুমিতি সম্বন্ধে একটা দুর্নাম রটে
গেল তার জ্ঞাতি মহলে। সুমিতি ও অশোক সম্বন্ধে এমন
কয়েকটি কথা (কানাকানি হ'তে হ'তে ক্রমে প্রকাশ্যে) প্রচার
হয়ে গেল যে সমাজে তাদের স্থান অসহনীয় হ'য়ে উঠল।
বীরেন ইহাতে মোটেই চঞ্চল হ'ল না। কারণ কলিকাতার
মত বড় শহরে সমাজ তাদের কিছুই ক'রতে পারবে না।
তাছাড়াও সুমিতির বিবাহ যে আর ১৫ দিন পরে হ'য়ে যাবে,
তাতে কোনও সন্দেহ নেই। বিশেষত বীরেনের ছাত্র খুব ভাল
পরীক্ষা দিয়েছে সেজন্যও অবিনাশবাবুর আগ্রহ একটু বেশী।
তার ইচ্ছা যত শীঘ্র হয়।

বিবাহের দিন এল। সন্ধ্যা লগ্নেই বিবাহ হবে। সন্ধ্যার
আগেই বর আসবার কথা। বাড়ীতে খুব হৈ চৈ প'ড়ে
গেছে। আত্মীয় স্বজন যদিও অল্পই এসেছে তথাপি
তাদের ক্ষুদ্র বাড়ীটী যেন গম্‌গম্ করছে। সকলেই আজ
আনন্দে যোগদান করেছে। অশোকের মা সকাল থেকেই
নানা কাজকর্ম্ম নিয়ে ব্যস্ত। সুমিতির মা ও বীরেন আজ
নিশ্বাস ফেলতেও সময় পাচ্ছে না।

কিন্তু অশোক বা সুমিতি—কারুর মনেরই এমন অবস্থা
যে মনের ভার চেপে রেখে এ উৎসবে যোগ দিতে পারে
সহজভাবে। অশোক বীরেনের সাহায্যের জন্য যদিও সম্মত
হয়েই তার সঙ্গে আছে, কিন্তু মুখখানি বড়ই মলিন।

সুমিতি ভাবছে— অশোকদাকে ভাল করে সব কথা বলে নি
কেন—সে ত একটা মুক্তির উপায় বলে দিতে পারত।
আর পাঁচজন সমবয়স্ক মেয়েদের সঙ্গে গোলমালের মধ্যে যোগ
দিতে চেষ্টা করছে বটে, কিন্তু সমস্ত উৎসবই তার নিকট
প্রাণহীন। ঠিক সন্ধ্যার সময় অবিনাশবাবুর বাড়ীর লোক
এসে সংবাদ দিলে যে আজ এ বিবাহ কোন কারণে হ'তে পারে
না এবং এর পর তাদের ছেলের সহিত হবে কিনা সন্দেহ।

সংবাদ পেয়ে প্রসূতি পাগলের মত হয়ে গেলেন। তাঁকে
হঠাৎ যেন কোন দুরারোগ্য ব্যাধি আক্রমণ করল। বীরেন এ
কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে অবিনাশবাবুর বাড়ী ছুটল।
সেখানে যা শুনল, তা আর না বললেও চলবে। বীরেন
ইহাতে বিশেষ আশ্চর্য্য হ'ল না বটে, কিন্তু কর্ত্তব্য স্থির করতে
পারল না।

এদিকে বাড়ীতে বয়স্থাদের মধ্যে যেসব আলোচনা হ'তে
লাগল তা আমরা চিরকাল পল্লীসমাজ কর্ত্তাদের মুখে শুনে
আসছি। সুমিতির যদি আজ বিবাহ না হয় তা হলে এ জীবনে
কেহ তাকে বিবাহ করবে না। কোনও আত্মীয়স্বজন তাদের
বাটীতে পদার্পণ করবে না। সমাজের বাহির হয়ে ব্রাহ্ম কিংবা
খৃষ্টান হতে হবে ইত্যাদি। প্রসূতি এই সমস্ত কথা শুনে
আরও বেশী মর্ম্মাহত হতে লাগলেন। হায় অভাগিনীর আজ
সান্ত্বনা দিবার কেহ নেই। বীরেন বাড়ী ফিরে সমস্ত ঘটনা
মাতাকে বললে তিনি বুঝতে পারলেন বসুভাষিণী ননদিনীই
তাঁদের এই সর্ব্বনাশের মূলে।

ক্রমে অশোকও সমস্ত কথা শুনল। শুনে অন্তরে বড়ই
আঘাত পেল। তার নিজের জন্য নয় সুমিতির জন্য। লগ্নের
আর মাত্র কুড়ি মিনিট আছে। বীরেন সিঁড়ির এক কোণে
মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। অশোক তার কাছে গিয়ে বলল
—ভাই, তোমার মায়ের কাছে একবার নিয়ে চলে, বিশেষ দরকারী
কথা আছে।

বীরেন অশোকের কাঁধ ধরে প্রসূতির কাছে নিয়ে গেল।
অশোক প্রসূতির পায়ের কাছে বসে বলল—"মা, আজ যা বিপদ
ঘটে গেল, এর কি কোনও প্রতিকার নেই? যদি কিছু মনে না
করেন, তা'হলে একটা কথা বলি। আর মাত্র ১৫ মিনিট সময়
আছে। নিকটে অন্য কোনও পাত্র থাকে ত' বলুন, যত টাকাই
লাগুক তার সঙ্গে সুমিতির বিবাহ দিব।" অশোকের মাতা
নিকটেই ছিলেন। তিনিই এই বিপদে প্রসূতিকে সান্ত্বনা দিবার
একমাত্র মহিলা। তিনি অশোকের দিকে তাকিয়ে হাসতে
হাসতে বললেন—"বাবা, তোমার মত সুযোগ্য পাত্র থাকতে
অন্যত্র কোথায় পাত্র খুঁজতে যাবেন।"

সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খ ও হুলুধ্বনিতে বীরেনদের ক্ষুদ্র
বাটীখানি মুখরিত হয়ে উঠল।

কয়েকটি অনাবিষ্কৃত রহস্য

'জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া' হইতে প্রকাশিত এক রিপোর্টে জানা যায় যে, বিহারের অন্তর্গত পূর্ণিয়া অঞ্চলে দূরাগত কামান গর্জ্জনের মত যে শব্দ পূর্ব্বে শ্রুতিগোচর হইত, ১৯৩৪ সালের বিহার ও নেপালের ভীষণ ভূমিকম্পের পর হইতে তাহা আর তেমন শোনা যায় না। এই বিচিত্র ধ্বনি 'পূর্ণিয়া গানস্' (Purnea guns) নামে পরিচিত। কেনই বা এই ধ্বনি উত্থিত হইত, কি কারণেই বা ইহা এখন ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইতেছে, তাহার কারণ আজ পর্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। 'পূর্ণিয়া গানসে'র অনুরূপ এক প্রকার কামান গর্জ্জন গঙ্গার নিম্নভাগস্থ ব-দ্বীপাংশে বরিশাল অঞ্চলেও শোনা যায়। বাঙলার ভূতপূর্ব্ব সার্ভেয়ার জেনারেল মিঃ জি বি স্কট ১৮৭১ সালে 'বরিশাল গানসে'র বিষয় প্রকাশ করেন। তাঁহার পর হইতে এ পর্যন্ত বহু ব্যক্তি এইরূপ আওয়াজের কারণ সম্পর্কে বহু মত প্রকাশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু কেহই যথাযথভাবে ইহার রহস্য ভেদ করিতে পারেন নাই।

এইরূপ বিচিত্র কামান গর্জ্জন সদৃশ ভৌতিক আওয়াজ শুধু যে এদেশেই স্থানবিশেষে শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে, তাহা নহে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পৃথিবীর বহু স্থান হইতেও এইরূপ ভৌতিক কামান গর্জ্জনের সংবাদ পাওয়া যায়। কোথাও বা জল হইতে, কোথাও বা স্থল হইতে, কোথাও বা আবার শূন্য হইতে যেন এইরূপ আওয়াজ ভাসিয়া আসে। ইউরোপের অন্তর্গত বেলজিয়মের উপকূল ভাগে এইরূপ এক প্রকার শব্দ শ্রুতিগোচর হয়। উহা সাধারণতঃ 'mistpoeffers' নামে পরিচিত। পৃথিবীর বহু স্থানের হ্রদাঞ্চলেও দূরাগত কামান গর্জ্জনের মত শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। উহা 'Lake guns' বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। আয়র্ল্যাণ্ডের 'লফ্ নে' হ্রদের উপকূলে এরূপ এক ধরণের শব্দ বহু পর্যটকের কানে আসিয়াছে। ঐ অঞ্চলে উহা 'water guns' বলিয়া উল্লিখিত হয়। অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের কোন কোন অংশেও কামান গর্জ্জনের ন্যায় গুরুগম্ভীর আওয়াজ উত্থিত হয়। ঐস্থানে সাধারণতঃ উহা 'Desert Sound' বা 'মরু-নিনাদ' বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে শ্রুত এইরূপ আওয়াজের সহিত বজ্রনির্ঘোষের সামঞ্জস্য লক্ষ্য করিয়া ১৯০৪ সালে ইহাদের 'Brontides' (অর্থাৎ thunder-like) এই আন্তর্জ্জাতিক সংজ্ঞা প্রদত্ত হয়।

'ব্রোনটাইডসের' উদ্ভব কেন হয়, তাহার কারণ নির্ণয় করিবার জন্য আবহতত্ত্ববিদ্, ভূকম্পবিদ্ এবং পদার্থবিদ্‌গণ মিলিয়া এ পর্যন্ত কম চেষ্টা করেন নাই। কেহ কেহ এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, হয়ত পাহাড় ধ্বসিয়া পড়ার শব্দ হইতে ইহার উদ্ভব হইয়া থাকিবে। কেহ বা বলেন, বাঁশের ঝাড়ে বাঁশ ফাটিয়া বা চিরিয়া গিয়া এইরূপ শব্দের সৃষ্টি করে। দাবানলের ফলে, কিম্বা সমুদ্র বা সুবৃহৎ জলরাশির নিম্নভাগে বিশেষ কোন বিপর্যয় হইতেও ইহার উদ্ভব হইতে পারে বলিয়া কেহ কেহ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ বা আবার বলেন, পর্ব্বত-গুহায় বায়ু-প্রবাহ বাধা পাওয়ার ফলে হয়ত এইরূপ শব্দের উদ্ভব ঘটিতেছে। কোনও স্থান হইতে দাহ্য কোন গ্যাস নির্গমনের ফলে কিম্বা বৈদ্যুতিক কোন বিস্ফোরণের ফলেও ইহার উদ্ভব হইতে পারে বলিয়াও কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন। আবার অনেকে ইহাকে সাধারণ বজ্রের নির্ঘোষ ব্যতীত অন্য কিছু বলিয়া মনে করেন না। বহু ব্যক্তি এইভাবে বহু প্রকারে প্রকৃতির এই বিচিত্র রহস্যকে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু কোনটিই শেষ পর্যন্ত বিচারসহ হয় নাই। ফলে, প্রকৃতির এই রহস্য আজও আমাদের নিকট একান্ত দুর্জ্ঞেয় রহিয়া গিয়াছে।

আধুনিক বিজ্ঞান প্রকৃতির অনেক রহস্যই উদ্ঘাটন করিতে পারিয়াছে বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারে বটে, কিন্তু জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে আজও মাঝে মাঝে বহু চমকপ্রদ দৃশ্য বা ঘটনার অবতারণা হইতে দেখা যায়, যাহার সঠিক ব্যাখ্যা বৈজ্ঞানিক আজও করিতে সমর্থ হন নাই। অনুসন্ধান করিলে প্রকৃতির এরূপ বিচিত্র রহস্যের সংখ্যাও নেহাৎ কম হইবে না।

উপরোক্ত ব্রোনটাইডস্ বা দূরাগত কামান গর্জ্জন সদৃশ আওয়াজের কথা ছাড়িয়া দিলেও, এরূপ বহুবিধ প্রাকৃতিক রহস্য রহিয়াছে, যাহা আমাদিগকে বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া ফেলে অথচ কেন যে ইহা ঘটিতেছে তাহার কোন হদিসই আমরা পাইয়া উঠি না। প্রকৃতি কখনও বা দুর্যোগময়ী ভীমা-মূর্ত্তিতে আমাদের নিকট প্রতিভাত হন, কখনও বা তিনি হাস্যময়ী—স্নেহ করুণায় সুমিষ্ট সঙ্গীতে আমাদিগকে মোহিত করেন। কোথাও দূরাগত কামান গর্জ্জনের ন্যায় আওয়াজে কিম্বা ভূকম্পের পূর্ব্বে ঘর্ঘর রবে যেমন উহা আমাদিগকে সচকিত করিয়া তোলে, তেমনি কোথাও আবার ইহার অন্তরীক্ষ হইতে যেন সঙ্গীত ভাসিয়া আসিয়া আমাদের কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওমিং (Wyoming) প্রদেশের অন্তর্গত ইয়েলোষ্টোন পার্কে যাঁহারা ভ্রমণ করিতে যান, তাঁহাদের অনেকে এরূপ বিচিত্র সঙ্গীত ধ্বনি শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু এই সঙ্গীতধারা কোথা হইতে ভাসিয়া আসে, আজ পর্যন্ত তাহার রহস্য ভেদ করা সম্ভবপর হয় নাই। সুমেরু ও কুমেরু অভিযানে বহির্গত হইয়া বহু অভিযাত্রী নির্জ্জন প্রকৃতির মধ্যে বিচিত্র ধ্বনি শুনিয়া চমকিত হইয়াছেন। কিন্তু এ পর্যন্ত তাহার রহস্য উদ্ঘাটিত হয় নাই। স্কোটিয়া অভিযানের নায়ক ডাঃ ব্রুস কুমেরু অঞ্চলে এক প্রকার শব্দ শুনিতে পান, যাহার বর্ণনায় তিনি বলিয়াছেন, "a weird and ghostly cannonade." স্কট ও স্যাকলটনও মরু অভিযানে গিয়া এরূপ শব্দ শুনিয়াছেন। ১৯৩০-৩১ সালের শীত ঋতুতে গ্রীনল্যাণ্ডে অভিযানের সময় নির্জ্জনে পরিভ্রমণ করিতে করিতে ইংরেজ পর্যটক কোর্টঅল্ড দিগন্তবিস্তৃত তুষার ক্ষেত্র মধ্যে এক প্রকার শব্দ শুনিয়া চমকিত হইয়া উঠেন। একবার নয়, বহুবার তিনি এরূপ শব্দ শুনিতে পাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'হঠাৎ সর সর করিয়া এমন এক উচ্চ শব্দ হইল, মনে হইল যেন বিরাট তুষার ধ্বসিয়া গিয়া কাহারও ঘর-বাড়ী সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করিয়া দিল। কিন্তু নিকটে বা দূরে কোথাও

কিছুই দেখিলাম না।' এইরূপ বহুবিধ বিচিত্র
তক শব্দ পৃথিবীর বহু স্থানে শ্রুতিগোচর হয়। কিন্তু
দের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আজও সম্ভবপর হয় নাই।

বিচিত্র শব্দের কথা ছাড়িয়া দিয়া প্রকৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রে
করিলেও কম বিস্ময়কর দৃশ্যাবলীর সন্ধান পাওয়া যায়
অথচ ইহাদের রহস্য বিজ্ঞান আজও উদ্ঘাটিত করিতে পারে
। যে সমস্ত দেশে তুষারপাত হয়, তথায় তুষার লইয়া
তি কত রকমের খেলাই না খেলিয়া থাকে। পদার্থবিদ্ ও
হতত্ত্ববিদগণ এইরূপ বরফের খেলা হইতে তুষার স্তূপ
ভাবে যে কোথায় গড়িয়া উঠিতেছে, তাহার কোন কোনটির
বেশ নিখুঁতভাবেই নির্ণয় করিয়াছেন বটে, কিন্তু
াময়ী প্রকৃতির সব রহস্যের কারণ তাঁহারা আজও ধরিতে
ন নাই। গবাক্ষে বা বৃক্ষ শাখায় বরফ পড়িলে কখনও
ও দেখা যায়, বরফের ক্ষুদ্র স্তূপটির মধ্যাংশ কখন যেন
দিকে নামিয়া সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া মালার মত
তেছে। আবহতত্ত্ববিদ্ উহা 'Snow garlands' বা
ফের মালা' বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। কিন্তু কি ভাবে
ন করিয়া উহা যে গড়িয়া উঠে আজও তাহার ব্যাখ্যা ইঁহারা
য়া উঠিতে পারিতেছেন না। দুইটি ক্ষুদ্র তুষার খণ্ডকে
া অবস্থায় চাপ দিয়া একত্রে একটা বড় ঢেলায় বেশ পরি-
ত করা যায়। কিন্তু অনেক স্থানে দেখা যায়, প্রকৃতি
না হইতেই মুহূর্ত্ত সময় মধ্যে অনেকগুলি ক্ষুদ্র তুষার
কে একত্রিত করিয়া রোলারের মত বিরাট আকারের একটি
টি প্রকাণ্ড ঢেলায় পরিণত করিয়া ফেলে। এইরূপ তুষার
ow rollers) কি ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে! ক্ষুদ্র
ক তুষার খণ্ড এক সময়েই বা কোথা হইতে আসিয়া
যে সন্নিবিষ্ট হয়,—তাহার অনুকূল পারিপার্শ্বিক
স্থার সৃষ্টি এক প্রহেলিকা বলিয়াই মনে হয়।

বিজ্ঞানীদের নিকট এরূপ আর একটি ধাঁধাঁর সংবাদ
ছেন, কেয়ার্ডের অভিযাত্রীদলের ভূতত্ত্ববিদ্ গাউল্ড।
হেইবার্গ তুষার স্তূপে (Axel Heiberg Glacier)
এমন কতকগুলি অদ্ভুত গোলাকৃতি ফাঁপা তুষারের
ক দেখিতে পান, যাহা হাতের স্পর্শ পর্যন্ত সহ্য
তে পারে নাই। হাত দেওয়া মাত্র তুষারের সেই 'puff-
গুলি যেন বিলীন হইয়া গেল। প্রকৃতির এই রহস্য
ও অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। প্রকৃতির তুষার লইয়া ভাঙা-
এইরূপ কাজে মাঝে মাঝে যে বিচিত্র দৃশ্যের উদ্ভব
পর্ব্বত আরোহণকারী বিভিন্ন অভিযাত্রীদল তাহার
বধ বর্ণনা দিয়াছেন। এ বর্ণনা হইতে প্রকৃতির যে বিচিত্র
র আভাষ আমরা পড়িয়া থাকি, তাহা হইতে বহু বিষয়ে
নের পরাজয়ের দিকটাও আমাদের চোখে ধরা পড়িয়া
সামান্য জল জমিয়া তাহা হইতে বিভিন্ন ভংগীতে
ব স্ফটিক-গঠন তুষারের উৎপত্তি ঘটে, তাহার রহস্য
আমাদের নিকট অজ্ঞাত। আজও আমরা বুঝিয়া
পারিতেছি না, একই তরল পদার্থ জল হইতে সৃষ্ট
বিভিন্ন আকৃতির স্ফটিক (Crystal) রূপে আত্মপ্রকাশ
করে কিরূপে! কোথাও উহা নিরেট শক্ত, কোথাও বা উহা
অতি সূক্ষ্ম সুকোমল কণারূপে ও বিভিন্ন স্ফটিক আকারে
শোভা পাইতে থাকে! বিজ্ঞান তো আজও এ রহস্যের সন্ধান
দিতে পারে না!
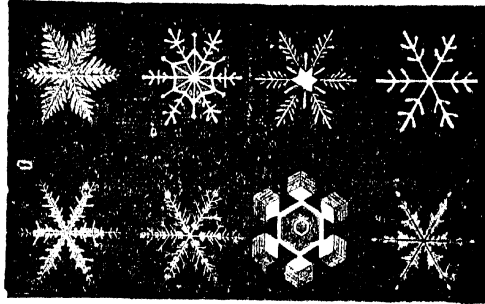
একই তরল পদার্থ জল হইতে সৃষ্ট তুষারের কয়েকটি স্ফটিকরূপ। বিভিন্ন ভংগীতে যেভাবে স্ফটিক-গঠন তুষারের উৎপত্তি ঘটে, তাহার রহস্য আজও আমাদের নিকট অজ্ঞাত

শুধু তাই নয়, সুউচ্চ পর্ব্বতে তুষারের পর তুষার জমিয়া কত মনোহর দৃশ্যেরই যে সৃষ্টি হয়, তাহা বর্ণনাতীত। সূর্য্য কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া যেভাবে ইহারা পৃথিবীর সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করে বৈজ্ঞানিক তাহার বহুবিধ রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন বটে, কিন্তু কোন কোন উচ্চ পর্ব্বতে তুষারের পর তুষার যেভাবে সুনির্দ্দিষ্ট আকারে সজ্জিত হইতে থাকে, তাহার সঠিক কারণ বৈজ্ঞানিকগণ আজও বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। আণ্ডিজ পর্ব্বতের উপরে বিস্তৃত তুষার ক্ষেত্রে তুষার জমিয়া শিখরদেশ মাঝে মাঝে এমনি সম্মোহন মূর্ত্তি ধারণ করে, দূর হইতে দেখিলে মনে হয়, যেন শুভ্র সজ্জায় সজ্জিত হইয়া একদল পূজারী অনুতপ্ত হৃদয়ে পরমপিতার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানাইতেছে। স্থানীয় অধিবাসীরা সামঞ্জস্য সাদৃশ্যে উহাকে Snow of the Penitents বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। বৈজ্ঞানিকগণ ইহার রহস্য উদ্‌ঘাটনে চেষ্টিত আছেন বটে, কিন্তু 'nieve penitente-এর উপরোক্ত সমস্যার সমাধান আজও সম্ভবপর হয় নাই।

প্রকৃতির এরূপ বহু রহস্যের কারণ আজও আমাদের অজানা রহিয়াছে। মেঘ, বৃষ্টি, তুষারপাত, মেঘ গর্জ্জন, বিজলীর চমক এসব সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান পরিণতি লাভ করিলেও মাঝে মাঝে এরূপ বিস্ময়কর ঘটনা পরিলক্ষিত হয় যাহার কোন কারণই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ডাঃ ওয়ালটার ক্লথে (Knoche) নামে একজন জার্ম্মান আবহতত্ত্ববিদ্ একটি বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। ১৯২৭ সালে তিনি একদিন দক্ষিণ আমেরিকার রায়ো পারাগুয়ে নদী দিয়া ষ্টীম-বোটে যাইতেছিলেন। সেদিন কোথাও মেঘ বা ঝড়ের বিন্দুমাত্র লক্ষণ ছিল না। ডাঃ ক্লথে লিখিয়াছেন, তাহা হইলে কি হয়। সহসা অপরাহ্ণ ৭ ঘটিকার সময় একান্ত আকস্মিকভাবে চারিদিকে ঘন ঘন বিজলী চমকিত হইতে লাগিল মুহূর্ত্তমাত্র অবকাশ না দিয়া এইরূপ মুহুর্মুহু বিজলী

খেলিতে লাগিল যে, উহা গণনা করা সম্ভব ছিল না। কয়েকটি বিদ্যুৎ সাধারণ যেভাবে বিদ্যুৎ খেলিয়া থাকে আকারে তদ্রূপ হইলেও, উহাদের রঙ ছিল লাল। বাকিগুলি সাদা আলো ছড়াইয়া সমস্ত আকাশে এরূপভাবে পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল মনে হইল যেন আকাশে মুক্তা ফুটিতেছে। শুধু তাহাই নহে, ডাঃ রুথে লিখিয়াছেন, এরূপ বিজলী চমকের সঙ্গে সঙ্গে একটা জ্যোতির্ম্ময় গ্যাস যেন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। আর ঘূর্ণিবাত্যার মত একটা উজ্জ্বল আলো পাক খাইয়া বেড়াইতে লাগিল। একসঙ্গে শত শত উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আর্ক জ্বলিয়া উঠিলে যেরূপ হয় এযেন তাহারই অনুরূপ। এইরূপ উজ্জ্বল আলোকছটায় নয়ন ধাঁধিয়া আসিল। কোনরূপ ঝড়বাদল ব্যতিরেকে অনবরত বহুক্ষণ পর্যন্ত এরূপ মুহুর্মুহু বিজলী চমক চলিল বটে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় বিজলীর সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে অব্যবহিত পরেই মেঘের যে গর্জন সচরাচর শ্রুত হইয়া থাকে, এক্ষেত্রে তাহার কোন কিছুই হইল না। তারপর বহুক্ষণ বাদে যখন বজ্রধ্বনি সুরু হইল, পূর্ব্বেকার বিজলী চমকের ন্যায় ইহাও আবার বহুক্ষণ পর্যন্ত মুহুর্মুহু ধ্বনিত হইতে লাগিল। আবহতত্ত্ববিদ ডাঃ রুথে প্রকৃতির এরূপ বহুবিধ ঘটনার বর্ণনা করিয়াছেন যাহার সঠিক কারণ কেহ নির্ণয় করিতে পারিতেছেন না। চিলি সরকারের আবহ-বিভাগের অধ্যক্ষ রূপে ডাঃ রুথে বহুকাল দক্ষিণ আমেরিকায় কাটাইয়াছেন। গ্রীষ্মকালে আণ্ডিজ পর্ব্বতের শিখরদেশে তিনি একরূপ উজ্জ্বল আলোকের সমাবেশ লক্ষ্য করিয়াছেন, এ সম্পর্কে বহু বর্ণনাও তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে মনে হয়, সমগ্র পর্ব্বতটি যেন বিরাট এক তড়িত-দণ্ডের কাজ করিতেছে। ফলে ইহার ও মেঘমালার মধ্যে অনবরত বিদ্যুৎ খেলিয়া নানারূপে চিত্তাকর্ষক ও বিস্ময়কর দৃশ্যের অবতারণা করিয়া থাকে। এ সম্পর্কে আজও বৈজ্ঞানিকগণ কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারেন নাই

আর একটি প্রাকৃতিক ঘটনার* বিষয়ও বহু বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাদিতে স্থান লাভ করিতে দেখা যায়। ইহা যে দৃষ্টি-বিভ্রম নহে, বহু ব্যক্তির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় ইহা স্থির হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আজও কিছু সম্ভবপর হয় নাই। ইহা একটা আগুনের জ্বলন্ত ফুলকির মত,—কখনও বা গোলাকার, কখনও বা অন্য আকারের। ঝড়-বাদল বা দুর্য্যোগপূর্ণ আবহাওয়া ব্যতীত এমনিও ইহাদিগকে কখনও কখনও আত্মপ্রকাশ করিতে দেখা যায়। ইহারা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। কখনও খোলা জানালা দিয়া সবেগে ঘরে প্রবেশ করিয়া আবার তৎক্ষণাৎ হয়তো সেই ভাবেই বাহির হইয়া যায়। কিন্তু বিচিত্র চলার ভঙ্গীতে এই জ্বলন্ত গোলক-সদৃশ বিজলীর চমক অনেকে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। ইহাকে বৈজ্ঞানিকগণ "Ball lightning" বলিয়া অভিহিত করেন বটে, কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ কৃত্রিম উপায়ে সাধারণ বিদ্যুতের সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইলেও আজ পর্য্যন্ত এরূপ ধরণের গোলাকৃতি 'আগুনের ঢেলার' (fire-bell) রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারেন নাই।

বহু সামুদ্রিক জীবের দেহ-নিঃসৃত আলোকণায় যে সমুদ্রের পৃষ্ঠদেশ অনেক সময় বহুদূরে পর্য্যন্ত আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে তাহার কারণ বৈজ্ঞানিকগণ বহুদিন হয় আবিষ্কার করিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তবু মাঝে মাঝে বিভিন্ন নাবিকদের নিকট হইতে এবং তাহাদের প্রকাশিত পত্রিকাতে সমুদ্র-পৃষ্ঠে সংঘটিত যে সমস্ত ঘটনার কাহিনী অবগত হওয়া যায়, তাহা কম বিস্ময়কর ও রহস্যাবৃত নহে। ১৯২৯ সালের ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে তালমা (Talma) নামে একখানি ব্রিটিশ জাহাজ বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ উপকূল দিয়া আসিতেছিল। সমুদ্র একান্ত শান্ত, কোথাও কোনরূপ দুর্য্যোগের লক্ষণ ছিল না। সন্ধ্যার দিকে জাহাজের কর্ম্মচারিগণ সমুদ্রে যে বিস্ময়কর দৃশ্য অবলোকন করেন, উক্ত জাহাজের ক্যাপ্টেন তাহারই এক বর্ণনা দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, 'সচরাচর যেমন সমুদ্রে দেখা যায়, তেমনি প্রথমত জলমধ্য হইতে একটা জ্যোতি (phosphorescence) নির্গত হইল, কিন্তু দেখিতে দেখিতে উহা যেন জল মধ্যেই একটা উজ্জ্বল বিজলী-চমকের ন্যায় পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই উহার মধ্য হইতে চারিদিকে রশ্মি ছড়াইতে লাগিল এবং সমস্তটা চক্রাকারে পরিণতি লাভ করিয়া আমাদের জাহাজের অনতিদূরে একটা স্থানকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমে সরিয়া পড়িল। এই বিস্ময়কর ঘটনা পনের মিনিটকালের মধ্যে ঘটিয়া গেল।' এরূপ বহু বিস্ময়কর প্রাকৃতিক ঘটনার সংবাদ নৌ-যাত্রীদের নিকট পাওয়া যায়। কেহ কেহ এ সমস্ত বাজে গল্প বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন নাবিকগণের নিকট হইতে সমুদ্র বিশেষের নির্দ্দিষ্ট স্থানে সংঘটিত এরূপ ঘটনার এক ধরণের কাহিনীকে একেবারে অবিশ্বাস করা যায় না। ব্রিটিশ আবহাওয়া অফিস হইতে প্রকাশিত 'Marine Observer' কাগজেও এরূপ বহু বিস্ময়কর প্রাকৃতিক ঘটনার বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। এ সমস্ত প্রাকৃতিক রহস্যের সন্ধানে এ পর্য্যন্ত কোন অভিযান হয় নাই, সুতরাং প্রকৃতির এই সব বিচিত্র রহস্য আজিও অজানা রহিয়াছে।

প্রত্যেক ঘটনায় কার্য্য-কারণ সম্পর্ক বিদ্যমান রহিয়াছে আজও প্রকৃতির সব কিছু ঘটনার কারণ নির্ণয় করা সম্ভবপর না হইলেও বিজ্ঞান তার সাধনা বলে একদিন যে প্রকৃতির এ বিচিত্র রকমের কাজগুলিরও ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হইবে তাহা অবশ্যই আমরা আশা করিতে পারি। তবে, এ কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে, রহস্যময়ী প্রকৃতির যত কাছে আমরা উপনীত হই না, যতই তাহাকে বুঝিতে পারি, তবু দেখিতে পাই আর এক নূতন সমস্যা লইয়া পুনরায় সে আমাদের নিকট উপস্থিত হয়। তাই তাহাকে পুরাপুরি বুঝিয়া উঠা মানুষের পক্ষে সম্ভবপর হইতেছে না। জ্ঞানের পরিধি ক্রমে বিস্তার লাভ করিতেছে বটে, কিন্তু প্রকৃতির নিগূঢ় রহস্য শেষ পর্য্যন্ত হয়তো রহস্যই থাকিয়া যাইবে।

কাচের বাসন

আজিকার দিনে কাচের কতপ্রকার বাসন যে আমাদের অবশ্য প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। তথাপি নিত্য নূতন বাসন আমরা বাজারে দেখিতে পাইতেছি। এতকাল কাচের রন্ধন পাত্র (অর্থাৎ নগ্ন অগ্নি-শিখায় বসাইয়া অনায়াসে নিরাপদে রান্না করা যায়) কেবল ল্যাবরেটরীর ব্যবহারেই লাগান হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে কড়া (frying pan), ডেক্‌চি (pan, sauce pan প্রভৃতি) আরও

ইস্পাত রংয়ের কাচের টেবিল—প্রথম দৃষ্টিতে পাথর বলিয়া ভ্রম হয়

কয়েকপ্রকার কাচ নির্ম্মিত বাসন নির্ম্মিত হইয়াছে, যাহা ধাতু-পাত্রের মতই উনানে ব্যবহার করা চলে। আবার অভিনব আসবাব তৈরীর এক জাতীয় কাচ প্রস্তুত করা হইয়াছে, যাহার রং ইস্পাতের ন্যায়। ইস্পাতের রঙের কাচ দ্বারা এখন তৈরী হইতেছে টেবিল। তীব্র আলোকিত কক্ষে এই টেবিলটিকে কাচের বলিয়া ঠাওরান শক্ত ব্যাপার। দিনের বেলাও সহসা দেখিয়া ঐটিকে পাথরের বলিয়াই মনে হইবে। যদিও কাট্‌-গ্লাসের আসবাব্‌-পত্র বহুদিন হইতেই প্রচলিত, তথাপি ইস্পাত রঙের কাচের আসবাব অতি অল্পদিন হইল আবিষ্কৃত।

জাহাজ-কাপ্তেনের পদে নারী

জার্ম্মান নৌ ও বাণিজ্য বিভাগে বিপুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে—যেহেতু ফ্রাউলিন্ স্পারব্লার জার্ম্মানীর বাণিজ্যিক বিভাগে কাপ্তেনের পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য মাষ্টারের সার্টিফিকেটের অধিকারী হইতে প্রাণপণ শক্তিতে কার্য্য করিতেছে। সে পূর্ব্বে স্কুলের শিক্ষয়িত্রী ছিল।

বর্ত্তমানে ফ্রাউলিন্ স্পারব্লার কোনও বাণিজ্যিক ট্রলারে সাধারণ নাবিকের কাজ করিতেছে। জার্ম্মানীর প্রধান প্রধান সংবাদপত্র তাহার এই প্রয়াসের নিন্দা করিয়া বহু প্রবন্ধ লিখিতেছে ও বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতেছে। তাহারা বলে—এই কার্য্যে লিপ্ত হইলে তাহার নারীর কর্ত্তব্য করা হইবে না, স্বাস্থ্যপূর্ণ সন্তানের জননী হইবার পথে অন্তরায় সৃষ্ট হইবে। কিছুদিন কাজ করিবার পর যখন সে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইবে, তখন দেখিতে পাইবে তাহার নারী-জনোচিত কমনীয়তা ও আকর্ষণ অনেকটা লোপ পাইয়া গিয়াছে। তথাপি যদি তাহার সমুদ্রের প্রতি আকর্ষণ অতিশয় প্রবল হয়, সে কাপ্তেন হইতে চেষ্টা না করিয়া ষ্টিউয়ার্ডেস্ হইতে পারে।

দিদিমা না খুড়ীমা—কে বেশী দরদী?

বোম্বাইয়ের ম্যাজাগন শহরে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়, সে তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়াছে। আদালতে হাজির হইয়া আসামী বলে—মেয়েটির মা পীড়িত অবস্থায় হাসপাতালে রহিয়াছে। মেয়েটিকে তাহার দিদিমার নিকট থাকিতে হয়। সেখানে মেয়েটির যথাযোগ্য যত্ন লওয়া হয় না, বিশেষত দিদিমাতা অতি বৃদ্ধা, তাহার সেবা-যত্ন করিবারও ক্ষমতা নাই। এই জন্য মেয়েটির দুঃখ-দুর্দ্দশা মোচন জন্য এবং তাহাকে রীতিমত শিক্ষাদান করিবার উদ্দেশ্যে খুড়ীমার নিকট আনা হইয়াছে।

অপর পক্ষ বলে মেয়েটিকে কিছুতেই তাহার খুড়ীমার নিকট রাখা যাইতে পারে না। আসামী পক্ষের উকীল তখন বলে যে, মেয়েটিকে বৃদ্ধা অপটু দিদিমা অপেক্ষা খুড়ীমা বেশী ভালবাসে ও বেশী যত্ন করিতে পারিবে। সুতরাং মেয়েটি আসামীর নিকট থাক।

ম্যাজিস্ট্রেট বলেন,—মেয়েটিকে দিদিমা বেশী ভালবাসে কি খুড়ীমা বেশী ভালবাসে তাহার কোনও নিশ্চয়তা নাই, পারিবারিক জীবনে এখানে কোনটি সম্ভব তা আমি জানি না। কাজেই মেয়েটিকে মায়ের নিকট হাসপাতালে পাঠান হোক। অসুস্থ মেয়েটি সারিয়া উঠিলে, মায়ের যেখানে ইচ্ছা সেখানে রাখিতে পারিবে।

তুষারস্তূপে সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত ট্রেন্

ভিয়েনা হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, অতিরিক্ত তুষার-পাতে পথ-ঘাট ত একেবারে আচ্ছাদিত হইয়াছে। গৃহের ছাদগুলিও একেবারে শাদা দেখাইতেছে। একখানি লোক্যাল ট্রেন যখন সাল্‌জবার্গয়ের নিকট আসিয়া পৌঁছে, তখন তুষারপাত এমন প্রবল হয় যে, সমগ্র ট্রেনখানি অল্প সময়ের ভিতর সম্পূর্ণরূপে তুষার-স্তূপে ঢাকা পড়িয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে এমনই তুষার-ঝঞ্ঝা ও দুর্য্যোগ উপস্থিত হয় যে ট্রেন-খানিকে বরফ-স্তূপ হইতে উদ্ধার করিবার কাজ আরম্ভ করিতে ছয়ঘণ্টা দেরী হয়। কিন্তু এত বিপুল পরিমাণে তুষার পুঞ্জীভূত হয় ট্রেনের উপর যে, উহা বিদূরিত করিয়া ট্রেন-খানিকে মুক্ত করিতে শ্রমিকদলের দুইদিন সময় লাগিয়াছিল। ইহার পর আবার ট্রেনখানিকে গতিশীল করিতেও আরও কয়েকঘণ্টাকাল কাটিয়া যায়। এই দুর্ঘটনা ঘটে সাল্‌জ-কামেরগাট লাইনে।

তরল-বায়ুর কারসাজি

ডাঃ ফ্রন্সিস্ স্মিথ্ (ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল ব্যুরো অফ্ ষ্ট্যাণ্ডার্ড'স) তাঁহার সিগারেটটি তরল বায়ুতে ডুবাইয়া লইয়া পরে ধরাইয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন। ফলে দেখা গেল সিগারেটের জ্বলন্ত সীমা হইতে পাঁচ ইঞ্চি লম্বা একটি শিখা বাহির হইয়াছে—শিখাটি এমন আভা ছড়াইতেছে যে ডাঃ স্মিথের সিগারেট

ম্যাজিক নয়—প্রকৃতই সিগারেট হইতে ধূমপান করা হইতেছে; তবে সিগারেটটি তরল বায়ুতে ডুবাইয়া আগুন ধরানতে লম্বা লম্বা শিখা বাহির হইয়াছে

অদৃশ্য হইয়া রহিয়াছে, মনে হইতেছে, তিনি ম্যাজিক দেখাইতেছেন—অদৃশ্য সিগারেট হইতে ধূমপান করিয়া চারিদিকে ধূমে ও অগ্নিশিখা বিস্তার করিয়া। সহসা ঐ অবস্থায় কাহাকেও ধূমপান করিতে দেখিলে মনে হইবে—সিগারেট হইতে বিস্ফোরণ আরম্ভ হইয়াছে। হয়ত কেহ সিগারেটটিতে বারুদ পুরিয়া রাখিয়াছিল কৌতুক করিবার উদ্দেশ্যে।

বে-আইনী ভয় প্রদর্শন

বোম্বাই শহরে এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে ৩০০০৲ টাকা গহনাদি জহরৎ চুরির সংস্রবে রহিয়াছে সন্দেহে গৃহের এক পরিচারিকাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এই মর্ম্মে এক সংবাদ বোম্বে ক্রনিককুল্ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। পুলিশ হেফাজতে ১৪ দিন রাখিবার আদেশ দান করা হয় আদালত হইতে। এই সময়ে নাকি গৃহস্বামীকে পুনঃ পুনঃ টেলিফোনযোগে সংবাদ দেয় বলিয়া প্রকাশ যে, যদি ঐ পরিচারিকাকে অবিলম্বে ছাড়িয়া দেওয়া না হয়, তবে গৃহস্বামীর পুত্রকে হত্যা করার প্রয়াস করা হইবে।

৫ই এপ্রিল যখন ঐ বালকটি স্কুল হইতে বাড়ী ফিরে তখন একটি কুলি-শ্রেণীর লোক একখানি চিরকুট দেখাইয়া কি ঠিকানা লেখা আছে জানিতে চাহে। ঠিকানা পড়িয়া দিলে বালকটিকে অনুরোধ করা হয় বাড়ীটি দেখাইয়া দিতে। বালক কুলিটির সঙ্গে কিছুদূর অগ্রসর হইলে পশ্চাৎ হইতে কে বা কাহারা তাহাকে আক্রমণ করে এবং একখানা রুমাল নাকি তাহার নাকের উপর ধরা হয়। পরে তাহাকে জোর-জুলুমে এক মোটর গাড়ীতে উঠাইয়া দেওয়া হয়। তখন সে সংজ্ঞা হারায়। ইহার পরে যখন তাহার চেতনা ফিরিয়া আসিল, তখন সে দেখিতে পাইল যে হ্যাঙ্গিং গার্ডেন্স-এর এক বেঞ্চিতে পড়িয়া আছে। তাহার উভয় বাহুতে ছোরার আঘাত। জ্ঞান সঞ্চার হইলে সে উঠিয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করে এবং হিউয়েস্ রোডের এক দোকানে যাইয়া আশ্রয় লয়। তথা হইতে তাহাকে বাড়ী নেওয়া হয়।

আবার টেলিফোন সংবাদ আসিল গৃহস্বামীর নিকট যে এখনও যদি পরিচারিকাকে ছাড়িয়া দেওয়া না হয়, তবে পুনরায় বালকটির উপর চড়াও করা হইবে।

এই সম্পর্কে পুলিশ দুইজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

নকল চিড়িয়াখানা

পিতল প্রভৃতি ধাতুতে ঢালাই-করা খেলনা, বিশেষ করিয়া নানা জাতীয় মানুষ মূর্ত্তি পূর্ব্বে নিরেট করা হইত—নির্ম্মাতা ছিল জার্ম্মানগণ। ১৮৯৩ সালে মিঃ উইলিয়ম ব্রিটেন ফাঁপা মূর্ত্তি ঢালাই করিবার কৌশল আবিষ্কার করেন—সেই হইতে ইংলণ্ডের তৈরী সৈনিক মূর্ত্তি নানা দেশে ক্রীত হয়। ভারতের পিতলের মূর্ত্তিও এক সময়ে প্রচুর রপ্তানি হইত জার্ম্মানীতে ও আমেরিকায়। বর্ত্তমানে ভারতের পিতল মূর্ত্তির বিদেশে চাহিদা খুবই কমিয়া গিয়াছে—নূতনত্বের আরোপের অভাবে। মহাসমরের পরে ঢালাই করা খেলনায় রূপান্তর আসে—তখন ইংলণ্ডে কারখানার সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য মানব মূর্ত্তি ছাড়িয়া জীবজন্তু, পাখী, মাছ প্রভৃতির মূর্ত্তি ঢালাই আরম্ভ হয় এবং উহা অগণিত সংখ্যায় বিক্রয় হইতে থাকে শিশু-বিদ্যালয়গুলিতে; কারণ ঐ সকল নকল মূর্ত্তি দ্বারা শিক্ষা দানের সহায়তা হয় অশেষ। বর্ত্তমানে আবার সারা ইউরোপে লড়াইয়ের তোড়জোড়ের ফলে খেলনা-শিল্পের গতিতে আবার নূতন মোড় দেখা দিয়াছে। এখন বিশেষ করিয়া ঢালাই হইতেছে বিমান-ধ্বংসী কামান, সন্ধানী আলোক, বিমান ত্যাগ করিবার যন্ত্র, ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া মোটর, উড়োজাহাজ, প্যারাশূট প্রভৃতি। শিশু-বিদ্যালয়সমূহে ছোটদের শিক্ষার জন্য নব-উদ্ভাবিত নকল 'জু' এই দিকে অভিনব প্রয়াস। বৃহৎ চিড়িয়াখানার মত ছোট ছোট আলাদা আলাদা গৃহে হরেক জানোয়ারের স্থান দান করা হইয়াছে। জানোয়ারগুলি ঢালাই করা হইয়াছে অতিশয় সস্তা ধাতুতে, কিন্তু তাহাতে রং করা হইয়াছে স্বাভাবিকের মত। বাঘ, সিংহ, ভালুক, হাতী হইতে সুরু করিয়া খুদে খরগোস পর্য্যন্ত কোন জন্তু-জানোয়ার বাদ পড়ে নাই। তারপর জল-জন্তু, পাখীও রহিয়াছে বহু জাতীয়। সর্ব্বোপরি চিড়িয়াখানার রেলিং ঘেরা রাস্তা ও দর্শকদের রকমওয়ারি মূর্ত্তিও বাদ পড়ে নাই।

সেয়ানা বানানকারিণী

বানান প্রতিযোগিতায় মিসিস বারবারা নোয়েস্ ৯০০ শব্দের মধ্যে ৮৯৬টি শুদ্ধ বানান করে। রাটল্যাণ্ডের কমার্শিয়াল কলেজে এই প্রতিযোগিতা হয়। নয় সপ্তাহ ধরিয়া এই প্রতিযোগিতা চলিয়াছিল। মিসিসের গড় সাব্যস্ত হইয়াছে শতকরা ৯৯·৬ পারসেণ্ট। বিগত কয়েক বৎসর যে প্রতিযোগিতা চলিয়াছে, তাহাতে এত উচ্চ রেকর্ড আর পাওয়া যায় নাই।

কলিকাতা ফুটবল লীগ

কলিকাতা ফুটবল লীগের খেলা আরম্ভ হইয়াছে। মাত্র দুই সপ্তাহ হইল খেলা আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু ইহার মধ্যেই জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহ বিপুলভাবে সাড়া দিয়াছে। গড়ের মাঠে এক এক দিন সহস্র সহস্র লোক খেলা দেখিবার জন্য সমবেত হইতেছে। প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী বিভিন্ন দলের দুই তিনটির বেশী খেলা হয় নাই; তথাপি এখন হইতেই "কে লীগ চ্যাম্পিয়ান হইবে" "কোন দলের সম্ভাবনা" আছে প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা ক্রীড়ামোদি-গণের মধ্যে আরম্ভ হইয়াছে। প্রতি বৎসর ফুটবল খেলার সময় যেরূপ হইয়া থাকে এই বৎসরও তাহারই পুনরাভিনয়ের সূচনা আরম্ভ হইয়াছে।

এই বৎসরের বিশেষত্ব

তবে এই বৎসরে বাঙলার বাহিরের খেলোয়াড়দের প্রতি অসহানুভূতিসূচক বিরুদ্ধ মনোভাব জনসাধারণের মধ্যে ধীরে ধীরে তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে। গত দুই সপ্তাহের মধ্যে এমন একদিন যায় নাই যেদিন জনসাধারণের মধ্যে অভিযোগ করিতে শোনা যায় নাই "অমুক দল বাহিরের খেলোয়াড়কে খেলাইয়াছে," বাঙলার ফুটবল ইতিহাসে জনসাধারণের এইরূপ মনোভাবের পরিচয় ইতি-পূর্ব্বে কখনই পাওয়া যায় নাই। এমন কি গত বৎসরেও এইরূপ মনোভাবাপন্ন লোকের অভাব ছিল। সুতরাং এই বৎসরের ফুটবল খেলার ইহা যে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। বহু পূর্ব্বের কথা ছাড়িয়া দিলেও গত ১০।১২ বৎসর হইতে কলিকাতার বিশিষ্ট বিভিন্ন দল বাঙলার বাহিরের খেলোয়াড় আনাইয়া দল পুষ্ট করিতেছেন। জনসাধারণও ঐ সমস্ত খেলোয়াড়গণের ক্রীড়ানৈপুণ্যের প্রশংসাও করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং এই বৎসরের হঠাৎ এইরূপ পরিবর্ত্তন কিরূপে হইল এই চিন্তা অনেকের মনেই জাগিবে ও তাঁহারা আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। কিন্তু আমরা ইহাতে কোনরূপ আশ্চর্য্য হই নাই। আমরা জানিতাম ও আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, জনসাধারণ একদিন বাঙলার বাহিরের খেলোয়াড় আনাইয়া দল পুষ্টি করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনি করিবে। সেই জন্যই আমরা গত কয়েক বৎসর হইতে "বাঙলার বাহিরের খেলোয়াড় আনাইয়া দল পুষ্টি করায় স্থানীয় উৎসাহী খেলোয়াড়দের উন্নতির পথে বিরাট বাধা সৃষ্টি করা হয় ও তাহাদের প্রতি ভীষণ অবিচার করা হয়" প্রভৃতি উল্লেখ করিয়া পরিচালকগণকে সাবধান করিয়া দিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু পরিচালকগণ বাহিরের খেলোয়াড় আমদানীর হুজুগে এতই মত্ত ছিলেন যে, আমাদের কথা শুনিবার বা বুঝিবার মত সময় ছিল না। এখনও পর্য্যন্ত তাঁহাদের পূর্ণ জ্ঞান সঞ্চার হয় নাই। কিরূপে বাহিরের খেলোয়াড় আনাইয়া স্থানীয় খেলোয়াড় বলিয়া চালাইয়া দেওয়া যায়, তাহার ফন্দি ফিকির বাহির করিবার জন্য ভীষণ গবেষণায় লিপ্ত হইয়াছেন। স্থানীয় খেলোয়াড়দের উপর আস্থা এখনও পর্য্যন্ত তাঁহাদের আসে নাই। শীঘ্র আসিবে না ইহাও ঠিক। তবে জনসাধারণের বর্ত্তমান মনোভাব দেখিয়া ইহা একরূপে নিশ্চিত করিয়া বলা চলে যে, আগামী দুই এক বৎসরের মধ্যেই পরিচালকগণ মত পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইবে। নিখিল ভারত ফুটবল সঙ্ঘ যত প্রকারের বাহিরের খেলোয়াড় আমদানী করা বন্ধ করিবার জন্য আইন করুন না কেন পরিচালকগণ সর্ব্বদাই নিজেদের কাজ হাসিল করিবার মত ফাঁক বাহির করিতে পারিবেন, কিন্তু জনসাধারণকে ফাঁকি দিতে পারিবেন না। সুতরাং আইন-গত ফাঁকির মধ্য দিয়া চাল বজায় রাখার চেষ্টা করিলেই জনসাধারণের নিকট [illegible]ভাবে অপদস্থ হইবার সম্ভাবনা থাকিবেই। বাহিরের খেলোয়াড়গণ আসিয়া দেশের ভবিষ্যৎ খেলোয়াড়দের [illegible]নাশ করে, ইহা জনসাধারণ উপলব্ধি করিয়াছে। সুতরাং [illegible] খেলোয়াড়দের সর্ব্বনাশ করিয়া বাহিরের খেলোয়াড়দের [illegible] যে দল সুনাম অর্জ্জনের চেষ্টা করিবে, তাহাকেই [illegible]ন চক্ষে দেখিবে। ইহার পরেই জনসাধারণ দেশের খেলোয়াড়দের নিয়মিত শিক্ষাধীনে রাখিয়া খেলার উন্নতি করাইবার জন্য দাবী করিতেছে বলিয়া দেখা যাইবে।

লীগ খেলায় বর্ত্তমানে কাহার কিরূপ স্থান

	খে	জ	ড্র	প	পক্ষে	বি	পয়েণ্ট
মোহনবাগান	৩	৩	০	০	৪	০	৬
রেঞ্জার্স	৩	২	০	১	৫	২	৪
কালীঘাট	২	১	১	০	৩	১	৩
ভবানীপুর	২	১	১	০	৩	১	৩
ক্যামেরোনিয়ান্স	২	১	১	০	২	১	৩
মহমেডান	২	১	১	০	৪	২	৩
কাষ্টমস	৩	১	১	১	৪	৪	৩
এরিয়ান্স	২	১	০	১	৩	২	২
ক্যালকাটা	৩	০	২	১	৩	৪	২
ইষ্টবেঙ্গল	৩	০	২	১	১	২	২
ই বি আর	৩	০	১	২	১	৬	১
পুলিশ	২	০	০	২	১	৪	০
বর্ডার রেজিঃ	২	০	০	২	০	৩	০

সাপ্তাহিক সংবাদ

২রা মে—

রাজনৈতিক বন্দিনী কল্পনা দত্তকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। ১৯৩৩ সালের ১৪ই আগষ্ট স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুনালের বিচারে শ্রীমতী কল্পনা দত্ত চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন অতিরিক্ত মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন।

সিরাজগঞ্জে কৃষ্ণরঞ্জন বসু নামক একব্যক্তি নিহত হইয়াছে এবং উহার অব্যবহিত পরেই ধীরেন্দ্রনাথ বসু নামক একব্যক্তি আফিম খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। এই হত্যা-কাণ্ডের কারণ এখনও রহস্যাবৃত রহিয়াছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধন বিলের দফা-ওয়ারী আলোচনা হয়। গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে খাজা সাহাবুদ্দিন এই মর্ম্মে এক সংশোধন প্রস্তাব করেন যে, নির্ব্বাচিত কাউন্সিলারদের সংখ্যা ৮৪ স্থলে ৮৫ করা হউক। তাঁহার সংশোধন প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

রংপুরের গঙ্গাচড়া থানার একটি গ্রামে আগুন লাগিয়া একটি মুসলমান পরিবারের সমস্ত ব্যক্তি—স্বামী, স্ত্রী ও দুইটি সন্তান পুড়িয়া মারা গিয়াছে।

শ্রীহট্টের ধলাই হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ যে, সেখানে একজন পশ্চিমা শ্রমিক ক্ষিপ্ত হইয়া তাহার পত্নী, দুই পুত্র ও দুই কন্যাকে একখানি দা দ্বারা আঘাত করিয়া হত্যা করিয়াছে। পরে নিজের দেহে আঘাত করিয়া গুরুতর জখম হইয়াছে।

বর্দ্ধমানের ফ্রেজার হাসপাতালের দুইজন হাউস সার্জ্জনকে বরখাস্ত করায় এবং অবশিষ্ট হাউস সার্জ্জনগণ পদত্যাগ করায় হাসপাতালের অবস্থা ক্রমেই সঙ্গীন হইয়া উঠিতেছে।

লাহোরে ৩৮ জন কিষাণ সত্যাগ্রহী গ্রেপ্তার হইয়াছে; তন্মধ্যে ২৯জন স্ত্রীলোক.

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু মহম্মদ আলী পার্কে এক জনসভায় বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে না থাকার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া তিনি বলেন যে, ওয়ার্কিং কমিটিতে থাকা অপেক্ষা বাহিরে থাকিয়াই তিনি দেশের অধিকতর সেবা করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করেন।

কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ আচার্য্য কৃপালনীকে পুনরায় জেনারেল সেক্রেটারী এবং শেঠ যমুনালাল বাজাজকে কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর শ্রীযুক্ত রোহিণী চক্রবর্ত্তী মিঃ এ ডি খাঁ আই-সি-এস-এর বিরুদ্ধে ক্ষতি পূরণের দাবী করিয়া যে মামলা দায়ের করিয়াছিলেন কুমিল্লার সাব-জজ শ্রীযুক্ত শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায় অদ্য তাহার রায়ে শ্রীযুক্ত রোহিণী চক্রবর্ত্তীকে ক্ষতি পূরণের দাবী স্বরূপ মিঃ খাঁর বিরুদ্ধে এক হাজার দুইশত টাকার ডিক্রী দিয়াছেন।

লর্ড সভায় ভারত ও ব্রহ্ম শাসন আইনের সংশোধন বিলটির দ্বিতীয় দফা আলোচনা কালে দ্বিতীয় ধারাটিতে একটি সংশোধন প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সংশোধন প্রস্তাবে ট্রাম গাড়ীর উপর প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহকে কর ধার্য্য করার ক্ষমতা দিবার বিধান করা হইয়াছে।

৩রা মে—

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু রাষ্ট্রপতির পদ পরিত্যাগ করায় তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করার জন্য কলিকাতা শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক বিরাট জনসভা হয়। শ্রীযুত বসু এই সভায় কংগ্রেসের মধ্যে "প্রগতিশীল দল" নামে একটি দল গঠনের কথা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন যে, এই দল কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র, আদর্শ, মূলনীতি ও কর্ম্মনীতি অনুসরণ করিবে। তাই বলিয়া কংগ্রেসের বর্ত্তমান কর্ণধারদিগকে অন্ধভাবে অনুসরণ করিবে না। মহাত্মা গান্ধীর প্রতিও এই দল শ্রদ্ধা পোষণ করিবে এবং তাঁহার প্রবর্ত্তিত অহিংস অসহযোগে আস্থা রাখিবে। যাঁহারা মনে করেন যে, এই দল গঠনের ফলে কংগ্রেসের মধ্যে সঙ্কট দেখা দিবে, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীযুত বসু বলেন যে, কংগ্রেসের বর্ত্তমান কর্ত্তৃপক্ষের মনোভাব যেরূপ এবং তাঁহারা যুগ-ধর্ম্মকে যেভাবে উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছেন, তাহাতে সঙ্কট অনিবার্য্য। তিনি আরও বলেন যে, অনেক ক্ষেত্রে বিচ্ছেদ মঙ্গলকর হইয়া থাকে। উপসংহারে শ্রীযুত বসু নূতন দল সংগঠনে দেশবাসীর সাহায্য প্রার্থনা করেন।

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে আস্থা জ্ঞাপন করিয়া কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক বাণী দিয়াছেন।

ভারত গবর্ণমেণ্ট এই মর্ম্মে এক ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী জুন মাস হইতে ভারতীয় সৈন্যদলের ৫টি গোরা সৈন্যবাহিনীকে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীভুক্ত করা হইবে। ইহার ফলে ভারতীয় রাজস্বের অনুমান এক কোটি টাকা বাঁচিবে

মঃ লিটভিনফ সোভিয়েট পররাষ্ট্র-সচিবের পদত্যাগ করায় মঃ মলোটোভ পররাষ্ট্র-সচিবের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

হায়দরাবাদ জেলে আর একজন অনশনকারী সত্যাগ্রহী বন্দীর মৃত্যু হইয়াছে। তাহার নাম বিষ্ণু জুন্ডেকার।

যুদ্ধ বাধিলে তাহার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা সম্পর্কে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনের সংশোধন করা সম্বন্ধে সম্প্রতি যে প্রস্তাব উত্থাপিত করা হইয়াছে, তদ্বিষয়ে বাঙলা গবর্ণমেণ্ট কোন মতামত দিয়াছেন কিনা এবং দিয়া থাকিলে কি মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা মন্ত্রিমণ্ডলীর নিকট হইতে বাহির করার জন্য অদ্য বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বিরোধী-দলের পক্ষ হইতে বহু প্রশ্ন করা হয়। স্বরাষ্ট্র-সচিব খাজা স্যার নাজিমুদ্দিন এই ব্যাপারে তাঁহাদের গোপন কথা প্রকাশ করিতে অস্বীকার করেন।

৪ঠা মে—

মেদিনীপুরের ভূতপূর্ব্ব জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বার্জ্জের হত্যা মামলায় দণ্ডিত রাজনৈতিক বন্দী শ্রীযুত সনাতন রায়কে প্রেসিডেন্সী জেল হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধন বিলের ৩নং ও ৪নং ধারা গৃহীত হয়। ৩নং ধারাতে বলা হইয়াছে যে, কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্ব্বাচিত কাউন্সিলারদের সংখ্যা হইবে মোট ৮৫। হিন্দু ৪৭ (তন্মধ্যে ৪টি তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের জন্য যুক্ত-নির্ব্বাচন পদ্ধতি রিজার্ভ থাকিবে), মুসলমান ২২, শ্রমিক ২,

এংলো-ইণ্ডিয়ান ২, ইউরোপীয় ১২ এতদ্ব্যতীত গবর্ণমেণ্ট ৮ জন কাউন্সিলার মনোনীত করিবেন। মনোনীত ৮ জনের মধ্যে তিনজন তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের হইতে হইবে। ৪নং ধারাতে বর্ত্তমান মিউনিসিপ্যাল আইনে মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য যুক্তনির্ব্বাচন পদ্ধতিতে আসন সংরক্ষণের যে ব্যবস্থা আছে, তাহা উঠাইয়া পৃথক নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের জন্য যুক্তনির্ব্বাচন পদ্ধতিতে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

৫ই মে—

ভারতের রাজনৈতিক অগ্রগতি সাধনের জন্য ও ভারতবাসীর মুক্তির জন্য ব্যয় করিতে অন্তত এক লক্ষ টাকা তুলিয়া শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর হস্তে দেওয়ার উদ্দেশ্যে অর্থ-সংগ্রহের জন্য "সুভাষ ধন-ভাণ্ডার" কমিটি গঠিত হইয়াছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধন বিলের ৫নং ধারা আলোচনাকালে স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী এই মর্ম্মে এক সংশোধন প্রস্তাব করেন যে, যোগ্যতাসম্পন্ন কোন ব্যক্তির সাধারণ নির্ব্বাচন কেন্দ্র, মুসলমান নির্ব্বাচন কেন্দ্র ও এংলো-ইণ্ডিয়ান নির্ব্বাচন কেন্দ্রের এই তিন শ্রেণীর কেন্দ্রের একটি বাছিয়া লইবার ক্ষমতা থাকিবে না; যে সব মুসলমান নাগরিকের ভোট দিবার যোগ্যতা আছে, তাঁহাদিগকে শুধু মুসলমান নির্ব্বাচন কেন্দ্রেরই ভোটদাতা হইতে হইবে, যে সব অ-মুসলমান নাগরিকের ভোট দিবার যোগ্যতা আছে, তাঁহাদিগকে শুধু সাধারণ অ-মুসলমান নির্ব্বাচন কেন্দ্রেরই ভোটার হইতে হইবে। সেইরূপ এংলো-ইণ্ডিয়ান নাগরিকদের শুধু এংলো-ইণ্ডিয়ান কেন্দ্রেরই ভোটার হইতে হইবে। নবাব বাহাদুরের এই সংশোধন প্রস্তাব সহ বিলের ৫নং ধারাটি পরিষদে গৃহীত হয়। শ্রীযুত সন্তোষকুমার বসু নবাব বাহাদুরের এই সংশোধন প্রস্তাব সম্পর্কে এক বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপন করেন তাহা অগ্রাহ্য হয়।

সিরাজগঞ্জ মহকুমার স্থলনওহাটা হাটখোলার বারওয়ারী কালীমূর্ত্তি দুর্ব্বৃত্তগণ কর্ত্তৃক ভগ্ন হইয়াছে। এ পর্যন্ত উক্ত মহকুমার ১৩টি কালীমূর্ত্তি ভগ্ন হইল।

কংগ্রেস মনোনীত শ্রীযুক্ত আর কে সিদ্ধ করাচী মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

প্রিভি কাউন্সিলের নবনিযুক্ত বিচারপতি মিঃ এম আর জয়াকর অদ্য লণ্ডনে প্রিভি কাউন্সিলের এক অধিবেশনে বিচারপতি পদে নিযুক্ত হওয়ার শপথ গ্রহণ করিয়াছেন।

হায়দরাবাদ আর্য্য সত্যাগ্রহের ৫ম ডিক্টেটর বেদব্রতজী বাণপন্থী সত্যাগ্রহ করিবার কালে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

হের হিটলার জার্ম্মান-পোলিশ চুক্তি বাতিল করিয়া পোল্যাণ্ডের নিকট যে নোট প্রেরণ করিয়াছিলেন, অদ্য পোল্যাণ্ডের পররাষ্ট্র সচিব কর্ণেল বেক তাহার উত্তর দেন। পোল্যাণ্ডের প্রতিনিধি পরিষদে বক্তৃতায় কর্ণেল বেক বলেন যে, ডানজিগে বৈদেশিক বাণিজ্যের অধিকার ও নৌনীতি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পোল্যাণ্ড দৃঢ়সংকল্প। পোলিশ করিডর সম্পর্কে তিনি বলেন যে, পোল্যাণ্ডের নিজের রাজ্যের রাজক্ষমতা প্রয়োগ করিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। জার্ম্মানী যদি শান্তিপূর্ণভাবে অভিপ্রায় প্রদর্শন করে এবং শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি অবলম্বন করে, তাহা হইলে তাহার সহিত আলোচনা করিতে পোল্যাণ্ড রাজী আছে।

ইংলণ্ডের রাজ-দম্পতি 'এম্প্রেস অব অষ্ট্রেলিয়া' জাহাজযোগে পোর্টসমাউথ হইতে কানাডা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

৬ই মে—

বাঙলার সর্ব্বশেষ রাজবন্দিনী শ্রীমতী অমিয়া ওরফে উজ্জ্বলা মজুমদারকে (বয়স ২২ বৎসর) গত বুধবার ঢাকা সেনট্রাল জেল হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। গত ১৯৩৪ সালে লেবং গুলী মারা মামলা সম্পর্কে শ্রীমতী অমিয়া ১৪ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

কলিকাতা ওয়েলেসলী ষ্ট্রীটস্থ মুসলীম ইনষ্টিটিউট হলে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের ষষ্ঠ অধিবেশন আরম্ভ হয়। সাহিত্য বিশারদ আবদুল করীম মুল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করিয়া শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু যেরূপ দৃঢ়তা ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন, তজ্জন্য দক্ষিণ-কলিকাতাবাসিগণ হাজরা পার্কে এক বিরাট জনসভা করিয়া শ্রীযুক্ত বসুকে অভিনন্দিত করেন। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু সভায় বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি জানান যে, কংগ্রেসের মধ্যে থাকিয়া এই "ফরোয়ার্ড ব্লক" সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইবে। অর্থ-ভাণ্ডারের উল্লেখ করিয়া শ্রীযুত বসু বলেন যে, বাঙলা দেশবাসী এই বিষয়ে যে-ভাবে সাড়া দিতেছেন, তাহাতে তিনি আশা করেন যে, একমাত্র বাঙলা হইতেই দুই লক্ষ টাকা উঠিবে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, একজন ফিরিওয়ালা তাঁহার নিকট এক টাকা পাঠাইয়াছেন। সভায় কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। তন্মধ্যে একটি প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে "দেশ-গৌরব" উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

গান্ধী সেবা-সঙ্ঘের অধিবেশনে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, সেবা-সঙ্ঘের সদস্যগণ রাজনীতিতেও যোগদান করিতে পারিবে।

বারাণসীর বিখ্যাত কংগ্রেসী নেতা শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ গুপ্ত এক বিবৃতি প্রচার করিয়া যুক্তপ্রদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের অবলম্বিত ব্যবস্থায় গভীর উষ্মা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার বিবৃতিতে কাশীতে কেবলমাত্র হিন্দুদের বিরুদ্ধে তিন দিনের জন্য ২৪ ঘণ্টা সাঁঝ বাতি আইন জারীর তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন।

লাহোর ডি এ ভি কলেজের ছাত্রাবাসে গুলীর আঘাতে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর জনৈক ছাত্রের শোচনীয় মৃত্যু হইয়াছে।

৭ই মে—

গয়ায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সুরু হইয়াছে। দাঙ্গার ফলে ১০জন নিহত ও শতাধিক লোক আহত হইয়াছে। অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ অতিরিক্ত পুলিশ ও সৈন্য মোতায়েন করিয়াছেন। বহু দোকানপাট বন্ধ হইয়াছে এবং লোকের মনে ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছে।

হায়দরাবাদে ৫১৫ জন সত্যাগ্রহী ধৃত হইয়াছেন। য়দরাবাদ সেনট্রাল জেলে শ্রীবিষ্ণুজী তানদরেকার নামক আর কজন সত্যাগ্রহী মারা গিয়াছেন।

রেঙ্গুণে এক উন্মত্ত কুলীর ছোরার আঘাতে ৪ ব্যক্তি রুতর আহত হইয়াছে। তন্মধ্যে একজনের হাসপাতালে মৃত্যু য়াছে।

বোম্বাই প্রাদেশিক মুশ্লিম লীগ সম্মেলনের উদ্বোধন ঙ্গে মিঃ জিন্না বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে সতর্ক করিয়া দিয়া লন যে, মুশ্লিম লীগকে বাদ দিয়া কেবল কংগ্রেসের সহিত থাবার্ত্তা চালাইয়া যুক্তরাষ্ট্র সমস্যার সমাধান হইবে না। ঐ বস্থায় মুশ্লিম লীগ যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবে বং উহা চালু করা অসম্ভব করিয়া তুলিবে।

বাঙলার নানাস্থানে প্রবল ঝড়-বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ষ্টিয়ায় প্রবল ঘূর্ণিবাত্যার ফলে তিনজন নিহত ও বহু লোক াহত এবং বহু গৃহ ভূমিসাৎ হইয়াছে।

মিলানে জার্ম্মান পররাষ্ট্র-সচিব হের ভন রিবেনট্রপ ও তালীর পররাষ্ট্র-সচিব কাউণ্ট সিয়ানোর মধ্যে ইউরোপের র্ত্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা হয়। আলোচনার ফলে াঁহারা ইউরোপে শান্তিরক্ষার জন্য উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে একটি াজনৈতিক ও সামরিক চুক্তি সম্পাদনে সম্মত হইয়াছেন।

যুক্তপ্রদেশের রাজস্ব-মন্ত্রী মিঃ রফি আমেদ কিদোয়াইয়ের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত অজিতপ্রসাদ জৈন ও প্রাইভেট সক্রেটারী শ্রীযুক্ত গোবিন্দ সহায়কে রুশিয়ার পাসপোর্ট দেওয়া য় নাই।

ই মে—

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেস সভাপতি পদ ত্যাগ করিয়া যে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছেন, তজ্জন্য হাওড়াবাসিগণ বেলিলিয়াস পার্কে এক বিরাট সভা করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন। এই সভায় "দেশগৌরব" সুভাষচন্দ্র "ফরোয়ার্ড ব্লকের" নীতি ও কর্ম্মপদ্ধতি ঘোষণা করেন।

নওগাঁ হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ যে, শিলং-এ আসাম এসেম্বলী কংগ্রেস পার্টির কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অধিবেশনে আসামের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত গোপীনাথ বরদলৈ পদত্যাগপত্র দাখিল করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পদত্যাগপত্র বিবেচনা স্থগিত রাখা হইয়াছে। প্রকাশ যে, ডিগবয় শ্রমিক ধর্ম্মঘট সম্পর্কে আসাম কংগ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত শ্রীযুত গোপীনাথ বরদলৈর সহিত মতদ্বৈধ উপস্থিত হওয়ার ফলেই নাকি তিনি পদত্যাগপত্র দাখিল করিয়াছেন।

গত ৬ই মে গয়া শহরে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হইয়াছে তৎসম্পর্কে এ পর্য্যন্ত পুলিশ মোট ২৫৬ জন লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। শহরের অবস্থা অপেক্ষাকৃত শান্ত আছে। দাঙ্গার কারণ সম্পর্কে এক সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, একটি মুসলমান দম্পতি নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করিয়া রাগের বশে একটি উত্তপ্ত মাংসের পাত্র উপর হইতে ফেলিয়া দেয়। একটি অল্প বয়স্কা হিন্দু বালিকা নীচে খেলা করিতেছিল, উত্তপ্ত মাংসের পাত্রটি তাহার উপর নিক্ষিপ্ত হয়। ইহাতে বালিকা সামান্য দগ্ধ হওয়ার ফলেই দাঙ্গা-হাঙ্গামার উদ্ভব হয়।

জব্বলপুর সেনট্রাল জেলে কৌশল্যা নাম্নী এক মধ্য বয়সী ব্রাহ্মণ রমণীর ফাঁসী হইয়া গিয়াছে। স্ত্রীলোকটি তাহার ১৮ বৎসর বয়স্থা পুত্রবধূকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিবার অভিযোগে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। স্ত্রীলোকটি হোসেঙ্গাবাদের জনৈক শিক্ষকের পত্নী।

রঙ্গজগৎ

(১২২ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীযুত নীতীন বসু নিউ থিয়েটার্সের হইয়া নূতন বাঙলা ছবির কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার হিন্দী ছবি "দুষমনের" কাহিনী অবলম্বনে এই ছবি তোলা হইবে। লীলা দেশাই এই ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করিবেন। আমরা জানিতে পারিলাম যে, সায়গল এই ছবিতে নায়কের ভূমিকা গ্রহণ করিবেন। বাঙলা ছবির নায়কের ভূমিকা সায়গলকে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত হইবে কি না তাহা আমরা নিউ থিয়েটার্স কর্তৃপক্ষকে একটু ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

শ্রীযুত প্রমথেশ বড়ুয়া তাঁহার "রজত-জয়ন্তী" ছবি তোলার কাজে বিশেষ ব্যস্ত আছেন।

* * * *

আরোরা ফিল্ম কোম্পানী নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের কলিকাতা অধিবেশনের ছবি তুলিয়াছেন। ছবিখানি আমরা একটি বিশেষ প্রদর্শনীতে দেখিয়া আসিয়াছি।

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসুর কলিকাতায় আগমন হইতে কংগ্রেসের শেষ দিনের অধিবেশন পর্য্যন্ত সমগ্র ছবি তাঁহারা তুলিয়াছেন। একথা আমরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে, আজ পর্য্যন্ত কংগ্রেসের যত টপিক্যাল ছবি আমরা দেখিয়াছি আলোচ্য ছবিখানি তাহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই ছবির মধ্যে রাষ্ট্রপতি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু ও পণ্ডিত জওহরলালের বক্তৃতা বিশেষভাবে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। কলিকাতায় রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশন উপলক্ষে যে বিপুল উত্তেজনা পরিলক্ষিত হইয়াছিল তাহার হুবহু রূপ এই ছবিখানিতে দেখান হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত রাষ্ট্র-নায়কদের ছবি ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। আরোরা ফিল্মের এই প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হইয়াছে এবং আমরা এইজন্য তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিতেছি।

* * * *

নূতন পরিচালনায় 'রঙমহল' থিয়েটার নট-নাট্যকার যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর নূতন নাটক "মাকড়সার জাল" অভিনয়ের আয়োজন করিতেছেন।

৬ষ্ঠ বর্ষ] শনিবার—২২শে বৈশাখ, ১৩৪৬ Saturday, 6th April 1939 [২৫শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ড়যন্ত্রের শেষ পরিণতি—

উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। দেশের নব জাগ্রত শক্তিকে কুৎসিত াগ্রহে পিষ্ট করিবার অহিংস আক্রোশের যে পাকচক্র সুরু ইয়াছিল, কলিকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে তাহার পূর্ণ-পে প্রকট হইল। রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রকে স্বপদে খিবার জন্য কাঁদুনি-ফোঁপানির নির্লজ্জ এবং ন্যক্কার-নক অভিনয়ের ভিতর দিয়া আমরা দেখিলাম, ইহার ন্ত্রতা এবং উপলব্ধি করিলাম ইহার মধ্যে মিথ্যাচার যে খানি রহিয়াছে, তাহার গভীরতা। অহিংসার ঊর্দ্ধ র হইতে যে নির্লিপ্ত বাতাস নর্ম্মদার বুকে বিক্ষোভ নয়াছিল, ভাগীরথীর কূলে তাহার রুদ্ররূপ দেখা গেল। মরা দেখিলাম, নির্লিপ্ততার ভণ্ডরূপকে, আমরা উপলব্ধি রলাম ইহার গৃধ্নু রূপকে। মুখে বড় বড় কথা বলিব, নব রাষ্ট্রপতির হাতেই সব অধিকার; কিন্তু তাঁহাকে জেদের হাতের পুতুল করিয়াই রাখিব, নিজেদের জিদ ক চুলও ছাড়িব না, দেখিলাম এই চক্র এবং বুঝিলাম যে, ণ্ডিত জওহরলাল নেহরু পর্য্যন্ত এই চক্রের প্রভাবের দ্বারা ভাবান্বিত। যে জওহরলালের দীপ্ত রূপ দেখিয়া এক-ন আমরা বিস্মিত হইয়াছিলাম, দেখিয়াছিলাম তাঁহার ধ্য স্বাধীনতার বহ্নি-শিখা, জনগণের অধিকার রক্ষায় পরিসীম দৃঢ়তা, দেখিলাম সেই জওহরলালই যেন নিষ্প্রভ বং দীনভাবাপন্ন, জনগণের অধিকার রক্ষায় দৃঢ় ব্রতের ভাব দেখিলাম তাঁহার মধ্যে। তাঁহার ভিতর লক্ষ্য করিলাম, বীর্য্যকে। অহিংসার উচ্চস্তরে এইভাবে যে পরমতত্ত্ব প্রকটভাবে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা উপলব্ধি রলাম আমরা হৃদয়ভরা অপরিসীম বিক্ষোভ এবং বেদনা য়া। রাজকোটে আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্যে সমাহিত রিয়া যে অহিংস সাধনার সপ্তরশ্মি ত্রিপুরীতে পরোক্ষ-বে বিকীরিত হইয়াছিল, সেই অহিংস আধ্যাত্মিকতা ত্যক্ষভাবে লীলা প্রকট করিল, কলিকাতার গোলতলার দানে। ১৯২০ সালে লালা লাজপৎ রায়ের রাষ্ট্র-নায়কত্বে যেখানে দেশময় আত্মত্যাগের যজ্ঞায় অনল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সেইখানেই প্রত্যক্ষ হইল আমাদের সম্মুখে স্বার্থাগ্নিলুব্ধ স্বেচ্ছাচারের বীভৎস মূর্ত্তি। ত্যাগের দুশ্যবেশে লোভ, অহিংসার আবরণে অতি ক্রুর হিংসা জাতিকে আজ কি ভাবে জর্জ্জর করিয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহার মর্ম্মান্তিকতাকে উপলব্ধি করিয়া আমরা ভীত হইলাম, স্তব্ধ হইলাম।

এ ব্রতের যে এই ফল, তাহা আমরা জানি। বাঙলা দেশের যাঁহারা জাতীয়তাবাদী, এ সত্য তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহারা জানিতেন এ কথা যে, সাত্ত্বিকতার আভাস সাময়িকভাবে মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে; কিন্তু সে জিনিষ সত্য নয়, প্রকৃতি নিজের পথ ছাড়ে না। ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিজের জায়গায় আসিয়াই দাঁড়ায়। সে সত্বাভাস জাতির অবীর্য্যকে দগ্ধ করিবে বলিয়া আমরা মনে করিয়াছিলাম, শ্রদ্ধায় অবনত হইয়াছিলাম তাঁহারই কাছে, দেখিয়াছিলাম যাঁহার যজ্ঞরূপ, ত্যাগ-রূপ, আজ তাহারই ধূঁয়া জাতির আবহাওয়াকে, মিথ্যাচারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছে। তাহারই ভোগ-প্রসক্তি জাতিকে প্রমাদ, আলস্য, নিদ্রা এবং পশু-প্রকৃতি-সুলভ পরবশ্যতার দিকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। সে পথে বাধা পাইলে, সে প্রমত্ত হইয়া উঠিতেছে, হিংস্র হইয়া রুখিয়া দাঁড়াইতেছে। ত্যাগের ফলে লাভ হয়, দৃষ্টির যে স্বচ্ছতা এবং উদারতা ও সমদর্শন—ক্রোধে সে তাহা হারাইয়াছে। আজ সে প্রমত্ত হইয়া নিজের ধ্বংসের পথ নিজেই সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইয়াছে বৈষম্যের দ্বারা, বিরোধের দ্বারা। তাহার আধ্যাত্মিকতার পরিণতি আজ মদান্ধ সংকীর্ণতার মধ্যে।

তেলে জলে মিশ খায় না। স্বাধীনতার সাধনায় ত্যাগের যে পরম আনন্দ রহিয়াছে, তাহার স্পর্শ পাইয়াছিল বাঙালী। আজও বাঙলার অন্তরের অন্তস্থলে সেই আনন্দের আস্বাদন রহিয়াছে এবং সেই অনুভূতিই মিথ্যাচারের এই অভিনয়ে বাঙালীকে বিপর্য্যস্ত করিতে পারে নাই। বাঙালীর

অন্তর সাড়া দেয় নাই ইহাতে—দিতে পারে না। বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়াছে বাঙালীর অন্তরে এই ভণ্ড আধ্যাত্মিকতার বিরুদ্ধে; নৈষ্কর্ম্মোর নামে প্রবল কর্ম্মোদাম হইতে বিরতির এই ভীরুতার বিরুদ্ধে'

· এই বিদ্রোহের বিগ্রহমূর্ত্তি দেখিয়াছি আমরা সুভাষচন্দ্রের মধ্যে। কূটচক্রী দলের চক্রান্তে সুভাষচন্দ্রকে রাষ্ট্রপতি পদ ত্যাগ করিতে হইয়াছে, কিন্তু আমরা সেজন্য দুঃখিত বিন্দুমাত্র হই নাই; বরং সুভাষচন্দ্র এই বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলন করিয়াছেন, এজন্য আমরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি। বাঙলার এই বীর সন্তানের যে ত্যাগোজ্জ্বল মূর্ত্তি আমরা এই অহিংস আক্রোশের ধূমময় আকাশতলে দেখিয়াছি, তাহা আমাদের চিত্তকে উল্লসিত করিয়াছে। বাঙলার স্বদেশ প্রেমিকতার স্বরূপ ত ইহাই যে, সকল রকমের ইতর রাগকে দগ্ধ করিয়া সে ঊর্দ্ধমুখে শিখা বিস্তার করে, ধুঁয়া সে ছড়ায় না, সে জ্বালায় আগুন। জাতির রাষ্ট্রীয় সংগ্রামের ইতিহাসে যখনই হীন আসক্তি ও কার্পণ্য ধুঁয়া ছড়াইতে চেষ্টা করিয়াছে, সেই ধুঁয়ার আবরণকে ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন এই বাঙলার স্বাধীনতারই সাধকগণ। তাঁহারাই সাগ্নিকের কাজ করিয়াছেন, অগ্নিহোত্রী হইয়াছেন। সুরাটের দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস হইয়াছিল বাঙালীর স্বাদেশিকতারই প্রেরণা-প্রভাবে এবং অহিংস আক্রোশের যে আবহাওয়া দেশকে আচ্ছন্ন করিতে উদ্যত হইয়াছে, ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বাঙালী সন্তানের প্রজ্বলিত যজ্ঞানলেই তাহার পাপ-প্রভাব হইতে জাতি নিস্তার পাইবে। জানি, এ পথ কুসুমে আস্তৃত নয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের উপর যে আত্যন্তিক বিশ্বাস্তি, প্রেম এবং মৈত্রীর ছদ্ম নামে ভীরুতা, দুর্ব্বলতা এবং কার্পণ্য—বুদ্ধিকে লুকাইয়া চলিতে চাহিতেছে, জানি এ পথ সে পথ নয়, কিন্তু এই পথই একমাত্র পথ। বাঙলার পূর্ব্বগামী ত্যাগী এবং দুঃখব্রতী আত্মোৎসর্গকারী, জীবন-মরণে ভ্রূক্ষেপবিহীন দেশসেবকগণের ধারা বজায় রাখিয়া ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনা করিবার স্পর্দ্ধা রাখে বাঙালী। বাঙলার স্বদেশপ্রেমিকদের ইহাই স্ব-ধর্ম্মের পথ। কর্ত্তার রায়ে সায় যোগাইয়া বাঙালী অন্য পথ ধরিতে পারে না। বাঙলা দেশের সন্তান হইয়া যাঁহারা তেমন কর্ত্তাভজা মনোবৃত্তি লইয়া চলে, তাহারা ভণ্ড এবং মিথ্যাচারী। সুভাষচন্দ্র আজ বাঙালীর স্ব-ধর্ম্মকে উদ্দীপ্ত করিয়া ধরিলেন এবং আমরা জানি, এই স্ব-ধর্ম্মের পথেই পরম শ্রেয়ঃ লাভ হয়, প্রকৃত কল্যাণের প্রতিষ্ঠা হয়। বাঙালী আনিবে আজ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে নূতন অধ্যায়। ভণ্ড সাত্ত্বিকতার যে আভাষ দেশে আসিয়াছিল, আজ তাহার ধুঁয়া জমিয়া উঠিতেছে, আজ তাহা আনিতেছে তামস অবসাদকে। এই সংকট হইতে জাতিকে রক্ষা করিবে বাঙালী। হীন সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা এবং অন্ধ গুরুবাদ সকলের ঊর্দ্ধে থাকিয়াই বাঙালী কংগ্রেসের প্রণষ্টপ্রায় গৌরব ও মর্য্যাদা রক্ষা ও প্রতিষ্ঠা করিবে। সুভাষচন্দ্র সেই আত্মপ্রত্যয় জাগাইয়াছেন। **তাঁহার নেতৃত্বে এবং কর্ম্মশক্তির মধ্যে জাতি পূর্ণ** স্বাধীনতার সাধনায় মৃত্যুঞ্জয়ী আনন্দের আস্বাদ করিবে, দুর্ব্বার হইবে, ইহাই আমাদের বড় আশা ও আ[...] কথা। আমরা পুনরায় বাঙালীর এই দুঃখব্রতী স্বদে[...] প্রেমিক সন্তানকে আমাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতে[...]

নূতন প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন—

মতলব পাকানই ছিল, জোট বাঁধাই ছিল; সুতর[...] অভিনয়টা শেষ করিতে আটকাইল না। শেষ পর্য্যায়ে[...] উত্তেজনামুখে আগ্রহের সঙ্গে অবিচারিতভাবে কংগ্রেসে[...] নূতন সভাপতি নির্ব্বাচন প্রক্রিয়া নিষ্পন্ন হইল, কংগ্রেসে[...] ইতিহাসে, শুধু কংগ্রেস কেন, বিধি-বিধানবদ্ধ কো[...] প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে তাহা অপূর্ব্ব। সভানেত্রী শ্রীযু[...] সরোজিনী নাইডুর অন্তরে উত্তেজনা এবং উদ্বেগের মুহূর্তে[...] কাব্যালোকের প্রতিভা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল; তাঁহার হৃদয়ে[...] কোমলতন্ত্রী ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, সোদপুরের আশ্রমে খাঁটি এ[...] বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিকতার যে সুর বাজিতেছিল, সেই সুরে[...] সঙ্গে। ভাবাবেগে তিনি অনহঙ্কৃত এবং অতীন্দ্রিয় রা[...] এক মুহূর্ত্তে উত্তীর্ণ হইলেন এবং সুভাষচন্দ্রের পদত্যা[...] সম্পর্কিত আলোচনা চালাইবার যে প্রতিশ্রুতি তিনি পূর্ব্ব[...] দিন দিয়াছিলেন, তাহা বিস্মৃত হইলেন; এবং বিস্মৃ[...] হইলেন এ কথাও যে, সুভাষচন্দ্র পদত্যাগপত্র দাখি[...] করিয়াছেন বটে, কিন্তু নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমি[...] কর্ত্তৃক সে পদত্যাগপত্র তখনও গৃহীত হয় নাই; শুধু ইহা[...] নহে, সুভাষচন্দ্র তাঁহার পদত্যাগের সম্বন্ধে শেষ যে বিবৃ[...] দিয়াছেন, তাহাতেও তিনি নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতি[...] সিদ্ধান্তের অপেক্ষা করিতেছেন এ কথাও জানাইয়াছেন[...] কিন্তু মহাত্মাদের এবং মহাত্মাদের অনুগৃহীত ব্যক্তিদে[...] কার্য্যের রহস্য দেবতারাই বুঝিতে পারেন না, মানুষে [...] বুঝিবে? সভানেত্রী আবেগদৃপ্ত কণ্ঠে বলিলেন,—আ[...] আইন-কানুন মানি না বুঝি না। সভানেত্রী হিসাবে অবৈধভা[...] কাজ করিবার অধিকার আমার আছে—বুঝটা ঠিক থাকিতে[...] হইল। সুতরাং ত্রিপুরী কংগ্রেসে পন্থ-প্রতিক্রিয়ার ভিতর দি[...] আধ্যাত্মিক ঊর্দ্ধস্তরের অনহঙ্কৃত যে ভাব উদ্ভাসিত হই[...] উঠিয়াছিল কংগ্রেসী বিধি-বিধানের গণ্ডীকে ভাসাইয়া দি[...] এক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল। নূতন সভাপতি আগে চাই, [...] এই মুহূর্ত্তে। নূতন সভাপতি নির্ব্বাচন করিবার ক্ষম[...] নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির আছে কি নাই বিত[...] উঠিল। নরীম্যান বিতর্ক তুলিলেন। শ্রীযুক্তা না[...] নির্দ্দেশ দিলেন, অস্থায়ী জেনারেল সেক্রেটারী, স্থা[...] জেনারেল সেক্রেটারীর কাজ চালাইতে অধিকারী নহে[...] সভাপতি নির্ব্বাচন সম্পর্কে কংগ্রেস বিধিতে যে বিধান আ[...] তাহা এই যে, সভাপতি পদত্যাগ করিলে জেনা[...] সেক্রেটারীর কর্ত্তব্য হইবে নূতন সভাপতি নির্ব্বাচ[...] তারিখ ঘোষণা করা, এবং সভাপতি নির্ব্বাচনের অধিক[...] তেমন ক্ষেত্রে মূল প্রতিনিধিদেরই আছে। এতদ্ব্যতী[...] জরুরী অবস্থা যদি দেখা দেয় তবেই সেক্ষেত্রে নূতন সভাপ[...] **নির্ব্বাচনের অধিকার নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমি[...]**

সদস্যদের আছে। সভানেত্রী ঘোষণা করিলেন, কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী নাই, সুতরাং এক্ষেত্রে জরুরী ব্যবস্থাই প্রযোজ্য। কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁহার যুক্তির ভিতর যে গলদ রহিল কোথায় সভানেত্রী তাহা তলাইয়া বুঝিলেন না। অস্থায়ী জেনারেল সেক্রেটারীর কাজ যদি বিধিবিহিত না হয়, তাহা হইলে ত্রিপুরী কংগ্রেসের অধিবেশন হইতে আরম্ভ করিয়া যে সভার তিনি সভানেত্রীত্ব করিতেছিলেন, তাহাও যে অবৈধ হইয়া পড়ে। অবৈধভাবে আহূত সভায় উপস্থিত সদস্যদের বিধিবিহিত জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বনের অধিকারই বা থাকে কোথায়? কিন্তু অবান্তর এ সব কথা। বিধি-বিধান মানি না—চাই কাজ, এবং সে কাজ হইল একমাত্র পরম দেবতার সেবা—তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং—দেশের মুক্তি—আধ্যাত্মিক মুক্তি—আধিদৈবিক মুক্তি। এমন যে মহদুদ্দেশ্য ইহার কাছে আর সবই যে তুচ্ছ। সুতরাং বিধি-বিধানের কথা তুলিও না, শুনিতে চাই না কোন কথা। আন নূতন সভাপতি। চক্ষু পালটিতে না পালটিতে রাজেন্দ্রপ্রসাদকে তক্তাউসে আনিয়া বসান হইল। অহিংস আধ্যাত্মিকতার আনন্দ-জ্যোতি প্রতিভাত হইল দক্ষিণপন্থী দলের চোখে মুখে, পরম পুরুষার্থ সিদ্ধির আনন্দ রসে তাঁহারা আত্মাকে অভিষিক্ত করিয়া বিনয় বচন আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। দেবগণ জয়ধ্বনি করিলেন অনাচারী অভক্তদের উচ্ছেদে। মুহূর্তে সভাতল ওয়ার্দ্ধার পুণ্য তপোবনের আভোগ ক্ষেত্রে পরিণত হইলে নব-নির্ব্বাচিত সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ উঠিয়া বিনীত বচনে নব পরিস্থিতির গুরুত্বের কথা বলিলেন। তিনি বলিলেন, পুরাতন ওয়ার্কিং কমিটি সুভাষচন্দ্রের পথে অন্তরায় ঘটাইবেন না, এ আশ্বাস তিনি সুভাষচন্দ্রকে দিয়াছিলেন; কিন্তু মহাত্মাজী নিজে তেমন আশ্বাস দিবার পরও মানসিক সেই মৈত্রী কর্ম্মস্তরে কি রূপ ধরিয়াছে ত্রিপুরীর পরবর্ত্তী ইতিহাসের অভিজ্ঞতা সে সম্বন্ধে দেশের লোকের পর্য্যাপ্ত রকমেই হইয়াছে। লোকের অন্তর সভাপতির যুক্তি-স্পর্শ করিতে পারিল না। সুতরাং সুভাষচন্দ্র জোট বাঁধা দলের সেই কুটচক্র কাটাইয়া যে বাহির হইয়াছেন, ইহাতে সমবেত জনতা তাঁহাকে উল্লাসভরে সম্বর্দ্ধিত করিল। এইভাবে চতুর্দ্দিক হইতে উত্থিত ধিক্কার ধ্বনির মধ্যে দক্ষিণপন্থী বাক্য-মন এবং কার্য্যে বিশুদ্ধ সত্যাশ্রয়ী সৈনিকদলের বিজয় ব্যাপার উদ্যাপিত হইল।

নূতন ওয়ার্কিং কমিটি—

যাহা সত্য, তাহা সনাতন এবং অবিনাশী, দেশ কালে তাহার ব্যত্যয় নাই। বল্লভাচারী ওয়ার্কিং কমিটি যখন সত্যনিষ্ঠার আধ্যাত্মিক আলোকে উদ্ভাসিত এবং অভিষিক্ত, তখন তাহাও সনাতন। বহু ঋষি পৃথক পৃথক ছন্দে এ যাবৎ এই কথাই বলিয়া আসিয়াছেন। নূতন সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদেরও সেই একই কথা। পুরাতন ওয়ার্কিং কমিটি বজায় রাখা হইয়াছে, কারণ 'পরাজিত গান্ধীর বিজয়ের ভিত্তি-ভূমিই ও ওইখানে। পণ্ডিত জওহরলালকে দলে আটকাইয়া রাখিবার জন্য টানাটানি যথেষ্টই করা হইয়াছিল; কিন্তু তিনি তাহাতে রাজী হইতে পারেন নাই। পণ্ডিতজীর কাজে স্ব-বিরোধিতা আসিয়াছে, ইহা সুস্পষ্ট—উর্দ্ধস্তরের টান তিনি একেবারে কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই; কিন্তু তত্ত্ব বস্তুটি তাঁহার বোধ হয় উপলব্ধি হইয়াছে, তাই অন্তরঙ্গ-সঙ্গে রস-আস্বাদনে তাঁহার রুচি জন্মে নাই। বাঙলা দেশের সম্বন্ধে এ সমস্যা কাটাইতে বেশী বেগ পাইতে হয় নাই। ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এবং ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় অন্তরঙ্গ দলের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ বল্লভাচারী দলের একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মী। ঐ দলের মহাত্মাদের পদাঙ্ক অনুসরণ কার্য্যে তিনি প্রথিতযশা হইয়াছেন; আর ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মহাশয়, তিনি তো এক পায়ের উপরই খাড়া ছিলেন। তাঁহার শিলংয়ের বক্তৃতায় সম্প্রতি তিনি পবিত্র আধ্যাত্মিকতার রসোপলব্ধির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে ওয়ার্দ্ধার আশ্রমের অন্তরঙ্গ দলে উন্নীত হইবার অধিকারী তিনি হইয়াছেন, ইহা আমরা অনুমানই করিয়াছিলাম। বাদ রহিলেন কিরণশঙ্কর, কিন্তু পরোক্ষভাবে কাজ চালাইতেই তিনি পাকা ওস্তাদ। বাঙলায় নব-জাগ্রত জনশক্তির যে প্রবল তরঙ্গ আজ ভণ্ডামির সকল বাঁধকে চূর্ণ করিয়া গর্জ্জিয়া উঠিতে চাহিতেছে, সেই নবীন স্রোতকে রুদ্ধ করিয়া বল্লভমার্গের বিশুদ্ধ আব-হাওয়া বজায় রাখিবার পক্ষে এই তিন শক্তি কাজ করিবে। বাঙলা দেশের অনাচারে আতঙ্কগ্রস্ত দক্ষিণী দলের অন্তরে ইঁহারা আশ্বাস সঞ্চার করিয়াছেন এবং সেই অনাচারের গতিকে রুদ্ধ করিবার জন্য উদ্যোগ-আয়োজনও সুরু হইয়াছে। সোদপুরের আশ্রমকক্ষে আত্মস্থ থাকিয়া মহাত্মাজী এই উদ্যমকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। যে বাঙলা দেশের জনমতের প্রবল তোড়ের মুখে সুরেন্দ্রনাথ, বিপিন-চন্দ্রকে মডারেটী মনোবৃত্তির জন্য ভাসিয়া যাইতে হইয়াছিল, সেই বাঙলার জাতীয়তার প্লাবন প্রতিরুদ্ধ হইবে নলিনী-বিধান, কিরণশঙ্কর-বিরলার নিয়মতন্ত্রানুকূল কূট-নীতিতে ইহা যাঁহারা মনে করিতেছে, তাঁহাদের ভুলভাঙ্গিতে যে দেরী হইবে না, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

নিখিল ভারতীয় প্রশ্ন—

মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে হক মন্ত্রিমণ্ডলের আলোচনার ফলে বাঙলার রাজনৈতিক বন্দিরা যে সময়ের মধ্যে মুক্তি লাভ করিবে বলিয়া মহাত্মাজী আশা করিয়াছিলেন এবং আশ্বাস দিয়াছিলেন, সে তারিখ পার হইয়া গিয়াছে। এখন কর্ত্তব্য কি? নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতিতে এই সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, এই প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, বাঙলার রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির প্রশ্নটি নিখিল ভারতীয় প্রশ্ন স্বরূপেই বিবেচনা করা হইবে এবং ইঁহাদের মুক্তির জন্য যাহাতে নিখিল ভারতীয় আন্দোলন চালান যায়, তৎসম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটি কার্য্যক্রম নির্দ্দেশ করিবেন। বাঙলার দিকে কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষের অন্তত এ বিষয়ে যে এতদিন পরেও দৃষ্টি পড়িয়াছে, ইহা সুখের

বিষয় বলিতে হইবে। কথা হইতেছে কি ভাবে এই প্রস্তাবটিকে নিখিল ভারতীয় প্রশ্নে সহজভাবে এবং কার্য্যকরভাবে প্রয়োগ করা যায়। আমাদের মনে হয়, নিখিল ভারতীয় বাঙালী-পাঞ্জাবী রাজনীতিক বন্দীদিবস বা দিন-বিশেষে সাময়িক তেমন একটা কোন অনুষ্ঠানে এখন ফল ফলিবার কোন সম্ভাবনা নাই। একমাত্র কার্যকর উপায় হইল, এই প্রশ্ন লইয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রিমন্ডলের ভারত গবর্ণমেণ্টের উপর চাপ দেওয়া। মহাত্মা গান্ধী রাজকোটে উপবাস-ব্রত অবলম্বন করিলে, বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রীরা পদত্যাগের হুমকীতে যে চাপ দিয়াছিলেন, ভারত সরকারের উপর, আন্তরিকভাবে যদি সে পন্থা তাঁহারা এই ব্যাপারে অবলম্বন করিতে পারেন, তাহা হইলে সমস্যার সমাধান হইতে পারে। আমরা এ কথা অনেক আগেই বলিয়াছি; কিন্তু এতদপেক্ষা সামান্য ব্যাপারে কংগ্রেসী মন্ত্রিমন্ডল যে আগ্রহ দেখাইয়াছেন, বাঙলার এই ব্যাপারে তেমন আগ্রহ তাঁহাদের দেখা যায় নাই। কংগ্রেসের এই ব্যাপারে দায়িত্ব রহিয়াছে, কংগ্রেসের নির্দ্দেশ রহিয়াছে এ সম্বন্ধে; কিন্তু সে নির্দ্দেশ কার্য্যে পরিণত করিবার গরজ —ব্যক্তিগতভাবে এক মহাত্মাজীর ছাড়া, নীতিগতভাবে কংগ্রেসী দক্ষিণী দলের দেখা যায় নাই। তাঁহারা প্রাদেশিক নীতি লইয়াই ব্যস্ত আছেন এবং ধীরে ধীরে নিয়মতান্ত্রিকতার পথেই গড়াইয়া যাইতেছেন। দক্ষিণী দল প্রভাবিত নূতন ওয়ার্কিং কমিটি এ সম্বন্ধে কি করেন, দ্রষ্টব্য রহিল। দেখিবার বিষয় রহিল নীতির মর্য্যাদা, প্রতিশ্রুতির মর্যাদা বজায় রাখিবার জন্য তাঁহারা কি পরিমাণ দৃঢ়তা দেখান এ বিষয়ে?

নব বাঙলার রূপ—

বাঙলার কবি ভৈরব মন্ত্রে বৈশাখের বন্দনা গান করিয়াছেন—'হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ, কারে দাও ডাক।' বাঙলার দগ্ধ তাম্রদিগন্ত হইতে বৈশাখের সেই ডাক শুনিতে পাইতেছি। এই কয়েকদিনে নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে আমরা বাঙলার সে রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছি, বাঙলার রাজনীতিক ইতিহাসে গত ৪০ বৎসরের মধ্যে তেমনটি দেখা যায় নাই। বাঙলার অন্তরে আজ উদার ছন্দে মানবতার এক মহান্ উচ্ছ্বাস তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিতে চাহিতেছে। বাঙালী চাহিতেছে সকল হীনতা, দীনতা, স্বার্থসম্বন্ধগত হিসাবনিকাশের ঊর্দ্ধে উঠিতে। আত্ম-নিবেদনে আনন্দের একটা উন্মাদনা তাহার মধ্যে জাগিয়া উঠিতেছে। বাঙালী দেখিতেছে তাহার রাজনীতিক সাধনার মূলীভূত আদর্শ, সে আদর্শের উদ্দীপনা কংগ্রেসী সনাতনী দলের মধ্যে সে পাইতেছে না। এই দক্ষিণী দল ছুটিয়া চলিতেছে নিয়মতান্ত্রিকতার দিকে, কারণ নিয়মতান্ত্রিকতার যে বাস্তব দিকটা তাহারা পাইয়াছে, তাহাতেই তাহারা মধু পাইয়াছে। তাহারা ছুটিয়া আসে তাহারই মধ্যে। তাহাদের অন্তরাত্মার আকর্ষণ সেইখানে; কিন্তু বাঙালীর **অন্তরাত্মার আকর্ষণ কোনদিনই সেদিকে নাই; বিশেষভাবে** বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের নিয়মতান্ত্রিক সুখ-সুবিধার যে বাস্ত[ব] প্রলোভনের দিকটা বাঙালীর পক্ষে তাহা নাই, বোধ হয় যে ভগবান ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শে আগাই[য়া] লইয়া যাইবেন, বাঙালীকে ইহা হইতে বঞ্চিত রাখা তাঁহার ইহা অভিপ্রেত। তাই আজ কংগ্রেসী দক্ষিণী দলে[র] বিরুদ্ধে বাঙলার সর্ব্বত্র একটা বিদ্রোহের ভাব সুস্পষ্ট এবং সুতীব্র হইয়া উঠিয়াছে। নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনের ইহাই বিশেষ অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতা দক্ষিণী দল উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু উপলব্ধি করিলে কি হইবে? হিসাব নিকাশের যুক্তি তাঁহাদিগকে জড়াইয়া পাকাইয়া নিয়মতান্ত্রিকতার খাতেই লইয়া চলিয়াছে এ পথ পূর্ণ স্বাধীনতার পথ নয়, মুক্তির পথ নয়। কংগ্রেসের সনাতনী দলকেও একদিন সে সত্য স্বীকার করিতে হইবেই দুইদিন আগে আর পরে। আজ বাঙালীর মর্ম্মগ্রন্থিকে নিপীড়ন করিয়া যে বেদনা উঠিতেছে, আমরা জানি, বাঙলা ছাড়া ভারতের অন্য কোন প্রদেশ ষোল আনা রকমে তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবে না। কিন্তু এ অবস্থা বেশী দিন থাকিবে না। ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে বাঙলার অন্তর মন্থন করিয়া এই বেদনা ছড়াইয়া পড়িবে যাহারা দেশের প্রতি জাতির প্রতি প্রকৃতপক্ষে সমবেদনাসম্পন্ন তাহাদের মধ্যে। স্বার্থ সংকীর্ণ মনের হিসাব-নিকাশে নিরাপত্তার নিরিখ বাঁধা পথে গতির মূলে যে মোহ রহিয়াছে, রহিয়াছে যে দুর্ব্বলতা ভীরুতা, কৃপণতা এবং ভণ্ডামি, তাহা এই নব জাগরণের প্রেরণাকে কিছুতেই প্রতিরুদ্ধ করিতে পারিবে না। মিলিত মন্ত্রিমন্ডলের ধোঁকা দেখাইয়া যাঁহারা এই প্রবৃত্তিকে ঘুরাইয়া দিতে চাহিতেছেন তাঁহারা সত্বরই বুঝিতে পারিবেন হাড়ে হাড়ে যে, বাঙলা দেশে তাঁহাদের স্থান কোথায়?

মিউনিসিপ্যাল বিলের সংশোধন—

মিউনিসিপ্যাল সংশোধন বিল লইয়া বাঙলার হিন্দু মন্ত্রীদের পদত্যাগের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, এই গুজব কিছু দিন হইতে শুনা যাইতেছিল। গত ১লা মে তারিখে একটি সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ঐ সকল অনুমান একেবারেই ভুয়া—পদত্যাগও হয় নাই এবং সংকটও ঘটে নাই। তবে প্রস্তাবিত মিউনিসিপ্যাল বিলের সামান্য একটু সংশোধন করা হইয়াছে। বাঙলা গবর্ণমেণ্টের অন্তরঙ্গ দলের মান-অভিমানের রহস্য সম্বন্ধে আমরা একেবারেই আগ্রহান্বিত নহি; সুতরাং, হিন্দু মন্ত্রীদের পদত্যাগের কোন গুজবকেই আমরা গুরুত্ব দেই নাই। তবে ইহা দেখা যাইতেছে যে, যে কারণেই হউক, প্রস্তাবিত মিউনিসিপ্যাল বিলের কিছুটা সংশোধনের প্রস্তাব করিতে হইয়াছে কর্ত্তাদের। গত ১লা মে বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হকের মুখেই এই তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী বলেন, **"প্রস্তাব এই হইয়াছে যে, কর্পোরেশনের মোট ৯৩ জন সদস্যের মধ্যে ৪৭ জনই সাধারণ নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচিত হইবেন। অন্য কথায় কর্পোরেশনের মোট সদস্য সংখ্যার অনুপাতে গবর্ণমেণ্ট**

াধারণ নির্ব্বাচন-কেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচিত সদস্যগণকে সংখ্যা-রিষ্ঠ হইবার সুবিধা দিয়াছেন। সংশোধন প্রস্তাব নুযায়ী ২২ জন নির্ব্বাচিত মুসলমান সদস্য থাকিবেন, ; জন শ্রমিক প্রতিনিধি, ২ জন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান প্রতিনিধি, বভিন্ন কেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচিত ১২ জন শ্বেতাঙ্গ থাকিবেন বং ৮ জন মনোনীত সদস্য থাকিবেন। এই ৮ জনের ধ্যে ৩ জন হইবেন তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের লোক। বর্ণমেণ্ট নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি সংখ্যা ৮৪ হইতে বাড়াইয়া ৫ করিবেন।"

আবার এক নূতন ফন্দীবাজী। নীতিগত যে অনিষ্ট-ারিতা ইহাতে তাহা একটুও কমে নাই এবং গণতান্ত্রিকতার র্য্যাদাও রক্ষিত হয় নাই: সুরেন্দ্রনাথ যে আদর্শ র্পোরেশনের ভিতর দিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন, স আদর্শকে নূতন রকমের কারসাজী খাটাইয়া এক্ষেত্রেও ংস করাই হইয়াছে। আমাদের কথা আমরা পূর্ব্বেই লিয়াছি এখনও আবার বলিতেছি, তাহা এই যে কর্পো-রশনের মোট সদস্য সংখ্যার অনুপাতে এই সংখ্যা গরিষ্ঠতার স্তুরুকী আমরা মানিব না। শহরের জনসংখ্যার অনুপাতেই াধারণ কেন্দ্রে সমাজের জন্যও আসন-সংখ্যা নির্দ্ধারিত করিতে ইবে এবং তাহার চেয়ে বড় প্রয়োজনীয় কথা হইল এই যে, ন্দু সমাজের নির্ব্বাচন ও প্রতিনিধিত্বের মধ্যে জোর করিয়া কটা কৃত্রিম ভেদ সৃষ্টি করিতে কিছুতেই আমরা দিব না। ভেদ পরিকল্পনা একেবারে বর্জ্জন করিতে হইবে। নোনয়ন প্রথা তুলিয়া দিতে হইবে: কারণ যাহাদের জন্য নোনয়নের প্রয়োজন ছিল, তাহাদের সকলের জন্যই পৃথক বং বিশেষ ব্যবস্থা যখন হইল, তখন আর মনোনয়নের য়োজন থাকে কোথায়? মন্ত্রীদের মধ্যে এই বৈঠক ইয়া কোন মতদ্বৈধ ঘটিয়াছিল কি না, এবং তাহা ইয়া সুখী হক পরিবারের সুখের বিঘ্ন ঘটিয়াছিল ক না, কিংবা নূতন সংশোধন প্রস্তাবের সঙ্গে তাহার কান সম্পর্ক আছে কি না, সে বিষয় লইয়া আমাদের াথা ঘামানো আমরা অনাবশ্যক মনে করি। আমরা শুধু এই থাটা জানাইয়া দিতেছি যে, মিউনিসিপ্যাল বিলের 'সামান্য ংশোধন' নয়, এই অনিষ্টকর উদ্যমের একেবারে ব্যর্থতা না টাইয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইব না। হক মন্ত্রিমণ্ডলের ুর্ব্বুদ্ধি যদি দূর না হয়, বাঙলার হিন্দু, বাঙলার মুসলমান ক হইয়া সে দুর্ব্বুদ্ধিকে দূর করিয়া তবে ছাড়িবে। দশের চোখ খুলিয়াছে, নূতন বাঙলা জাগিয়া উঠিয়াছে এবং সই নব জাগ্রত বাঙলার সমস্ত শক্তি সর্ব্বপ্রথমে প্রযুক্ত ইবে এই অনিষ্টকর উদ্যমকে ব্যর্থ করিবার প্রক্রিয়ার ভিতর দয়া। মন্ত্রীদের সাহস থাকে—আগাইয়া আসুন। গোঁজা মলে গোড়াকার গলদ ঢাকা দেওয়া এখন আর খাটিবে না।

নসাধারণের বিক্ষোভ—

নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনের কালে নসাধারণের মধ্যে উত্তেজনা এবং বিক্ষোভের ভাব দেখা দয়াছে। আমরা ইহাকে খারাপ চোখে দেখি না। বরং ইহাতে আমরা জাতির মধ্যে যে রাষ্ট্রনীতিক চেতনা সুতীব্র আকার ধারণ করিতেছে, ইহারই পরিচয় পাইয়া আশান্বিত হই। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুও সেই কথাই বলিয়াছেন, তিনি বলেন, দেশের জনসাধারণের মধ্যে বিস্ময়করভাবে রাষ্ট্রীয় চৈতন্য দেখা দিয়াছে। 'জাগ্রত জাতির মধ্যে রাজ-নীতিক মতামত লইয়া এই যে আগ্রহ-উত্তেজনা, ইহা থাকিবেই; এ জিনিষ যে জাতির মধ্যে নাই, সে জাতি মরিয়া গিয়াছে বলিতে হইবে। কিন্তু এই বিক্ষোভ এবং এই নীতিবিশেষ বা কার্য্যবিশেষের প্রতি এই যে অসন্তোষ প্রদর্শন, ইহারও একটা ধারা আছে, সে জিনিষকে অতিক্রম করিলে ইহা সফল হয় না; বরং নিন্দনীয় হইয়া উঠে। রাজ-নৈতিক মতবাদ সম্পর্কিত অভিযোগে বিক্ষোভ প্রকাশ অনিবার্য্য এবং স্বাভাবিক, কিন্তু সেই উত্তেজনার মুহূর্ত্তেও মর্য্যাদা বুদ্ধি হারান উচিত নয়, মতকে এবং কার্য্যবিশেষকে নিন্দার ভিতর দিয়া নিজেদের মতকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, অসংযমের মর্য্যাদা বুদ্ধি হারাইলে, তেমন সব কার্য্যের প্রতিক্রিয়ায় নিজেদের মত এবং আদর্শ খাটো হইয়া যায়। অসংযম শক্তির পরিচয় নহে, দুর্ব্বলতারই পরি-চায়ক এবং দুর্ব্বলতার ভিতর দিয়া অসংযমের আশ্রয়ে কোন বড় আদর্শ বা মতের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইতে পারে না। দক্ষিণী কংগ্রেস পন্থীদের স্বৈরাচারমূলক কার্য্যে বাঙালীর বিক্ষুব্ধ হইবার কারণ আছে, প্রকৃত কারণ আছে এ কথা আমরা বলিবই; কিন্তু সুসংযত কর্ম্মসাধনার ভিতর দিয়াই বাঙালীকে ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে তাঁহাদের উদার আদর্শকে উজ্জ্বল করিয়া ধরিতে হইবে। দেখাইতে হইবে, এ জাতির শক্তি আছে, এবং সে শক্তি প্রবল ও প্রচণ্ড, অপরের আঘাত যতই ক্রূর এবং অন্যায়মূলক হউক না, তাহা সহ্য করিয়া সমুচিত শিক্ষা দিবার শক্তি বাঙালী রাখে, সাময়িক বিক্ষোভই তার সব নয়।

যুদ্ধ সম্বন্ধে কংগ্রেস—

গত মঙ্গলবার কলিকাতা ত্যাগ করিবার প্রাক্কালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কলিকাতার মহম্মদ আলী পার্কে এক জনসভায় বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় তিনি বলেন, নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে যতগুলি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে আসন্ন যুদ্ধ সম্পর্কে কংগ্রেসের নীতি সম্বন্ধীয় প্রস্তাবটি সব চেয়ে প্রয়োজনীয়। প্রস্তাবটির গুরুত্ব আমরাও স্বীকার করি, কিন্তু বাস্তবিক-পক্ষে প্রস্তাবটিকে কংগ্রেসের দক্ষিণী দল কতটা গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করিতেছেন সে বিষয়ে আমাদের যথেষ্টই সন্দেহ রহিয়াছে এবং তাঁহারা এ সম্বন্ধে এমন কোন কার্য্য-ক্রম দেশের লোকের নিকট উপস্থিত করিতে পারেন নাই, যাহাতে দেশের লোকের মনে সুস্পষ্ট একটা ধারণা হইতে পারে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এই প্রস্তাব সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু কথা তো অনেক শুনিয়াছি। কাজ হইতেছে কি, কিম্বা কি করা হইবে, তাহাই বা কি ঠিক হইয়াছে? পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এ সম্বন্ধে কোন্

নূতন আলোক আমাদিগকে দিতে পারেন নাই। পণ্ডিতজী বড় জোরের সঙ্গে এই কথাটাই বলিয়াছেন যে, সাম্রাজ্যবাদীদের চেষ্টাকে সর্ব্বপ্রযত্নে বাধা দিবার জন্য মন্ত্রীদিগকে নির্দ্দেশ দিতে হইবে; কিন্তু এ সবই ফাঁকা কথা মাত্র, ওদিকে অপরপক্ষে কাজ রীতিমত আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, এমন কি, কতকগুলি সেনা ভারত হইতে ইতিমধ্যে বিদেশে চালান দেওয়াও হইয়া গিয়াছে। অথচ এমন একটা গুরুতর প্রশ্নে পণ্ডিত জওহরলালের মত একজন নেতা যাহা বলিয়াছেন, তাহার ভিতর যেটি আসল কাজের কথা সেইটিই উহ্য রহিয়া গিয়াছে। জওহরলালজী সব বলিলেন, কিন্তু মন্ত্রীরা কি করিবেন বা কখন করিবেন, সে সম্বন্ধে কিছুই বলিলেন না। পণ্ডিতজী বলিয়াছেন, মন্ত্রীদিগকে যে পদত্যাগ করিতেই হইবে, এমন কিছু নয়, তাঁহারা স্বপদে থাকিয়াই সংগ্রাম চালাইবেন। ভাল কথা, কিন্তু পদত্যাগের ঝুঁকি তাঁহারা লইতে পারিবেন কি? দরকার হইলে মন্ত্রিগিরি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া জনসাধারণের মধ্যে কাজে নামিতে পারিবেন কি? ইহাই হইতেছে প্রশ্ন? বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস মন্ত্রীদের নিয়মতান্ত্রিক আনুরক্তি, উগ্রতা যেভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাতে এ সম্বন্ধে লোকের মনে যথেষ্টই সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে এবং সুভাষচন্দ্রের যে জয়লাভ, তাহার মূলে ছিল দক্ষিণী দলের নিয়মতান্ত্রিকতার প্রতি দেশের লোকের সেই অনাস্থারই ভাব। গঠনমূলক কার্য্যের মহিমা আমরা বহুদিন হইতেই শুনিয়া আসিতেছি; কিন্তু আমরা স্পষ্টই দেখিতেছি, গঠনমূলক কার্য্যের মোহের ভিতর দিয়া মডারেটী মনোবৃত্তিই দক্ষিণী দলের মধ্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। নেশন বিল্ডিংয়ের ধোঁকায় আমরা ভুলি না; মণ্টেগু জেমসফোর্ড শাসনতন্ত্রের সাবেকী আমল হইতেই ইহার স্বরূপ আমরা যথেষ্টই দেখিয়া আসিতেছি। আমরা বুঝি এই সোজা সত্যকে যে প্রকৃত যে গড়া, তাহা ভাঙ্গারই অন্য একটা রূপ। ভাঙ্গা ছাড়া নূতন কোন গঠন হয় না। 'যিনি ক্রীড়াচ্ছলে গড়েন নূতন সৃষ্টি প্রলয় অনলে' আমরা বাঙলার জাতীয়তাবাদীরা তাঁহারই বিভূতির বিকাশ দেখিতে পাই। একদিন বাঙলা দেশ যে মাতিয়া ছিল মহাত্মাজীর আহ্বানে, তাহার কারণ এই যে, মহাত্মাজীর মধ্যে সেই ত্যাগময় পুরুষের মৃত্যুঞ্জয়ী বিভূতির বিকাশ দেখিতে পাইয়াছিল। চেলার দলের ভ্রষ্টাচার এবং সংকীর্ণচিত্ততার ফলে, সেই আদর্শ বিমলিন হইতে বসিয়াছে বলিয়াই জাতির মধ্যে এমন বিক্ষোভ।

আনন্দের সমসূত্র—

দক্ষিণপন্থী দলের অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়াতে বিলাতের কাগজগুলোর আনন্দ আর ধরে না। আমাদের 'ষ্টেটস্‌ম্যানে'র বক্ষেও আনন্দের লহরী বিলাতের সংরক্ষণশীল সাম্রাজ্যবাদী দলের মুখপত্র 'ডেলী টেলিগ্রাফ' আজ মহাত্মাজীর গুণকীর্ত্তন করিয়া লিখিয়াছে—"১৫ বৎসর পূর্ব্বে মিঃ সি আর দাশ যখন তাঁহার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, সেই সময় অপেক্ষা এখন তাঁহার রাজনৈতিক দক্ষতা ও ধার্ম্মিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি জনশ্রদ্ধা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। মিঃ সি আর দাশ ১৫ বৎসর পূর্ব্বে বিদ্রোহ করিয়া সফলকাম হইয়াছিলেন, কিন্তু মিঃ বসু ব্যর্থকাম হইলেন।" 'ডেলী টেলিগ্রাফ' আরও লিখিয়াছে, মহাত্মা গান্ধী এবং বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ একথাও জানেন যে, বৃটেন যদি যুদ্ধে পরাজিত হয়, তাহা হইলে 'স্বাধীন' অসহযোগী ভারতবর্ষ অনেক পীড়ন-পন্থী ইউরোপীয় রাষ্ট্রের পদানত হইবে। 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' পত্রও আপোষপন্থী মনোভাবসম্পন্ন দলের জয় দেখিয়া আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছেন এবং আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। এদিকে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল তো আনন্দে অধীর। তিনি গত ২রা মে বলিয়াছেন যে, তাঁহার অনুপস্থিতি সত্ত্বেও কলিকাতার নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনের কোন ক্ষতি হয় নাই। ক্ষতি হয় নাই—অর্থাৎ নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। দক্ষিণপন্থী দল এবং তাঁহাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন সাম্রাজ্যবাদীরা আজ যে আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন, তাহার কারণ আমরা বুঝি; কিন্তু আমরা তাঁহাদিগকে এ কথাও বলিয়া দিতেছি যে, দক্ষিণপন্থীরা যাহাকে আজ জয় মনে করিতেছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের পরাজয়ের পথই প্রশস্ত করিয়া দিল, কলিকাতার অধিবেশনে তাঁহাদের মুখোস যেমনভাবে খসিয়া গিয়াছে, এমন ধারা কোন দিন হয় নাই। বাঙলাদেশে তাঁহাদের রাজনীতিক ধাপ্পাবাজীর আজ সূচাগ্র পরিমিত স্থানও নাই। স্বাধীনতার অনুভূতি উগ্র আকারে দানা বাঁধিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সকল স্থানেই তাঁহাদের এই অবস্থা দাঁড়াইবে। তাঁহারা দলগত স্বার্থ এবং ব্যক্তিগত অহমিকার অন্ধ আক্রোশে জাতির জাগ্রত জনমতকে নিষ্ঠুরভাবে পদদলিত করিয়া আজ নিজেদের দূরদৃষ্টির একান্ত অভাব বশত বিজয় গর্ব্ব ফলাইতেছেন, কিন্তু এই অন্ধ অহমিকাই দেশের অন্তর হইতে তাঁহাদের স্থান লুপ্ত করিবে এবং করিয়াছে এ কথাও বলা যায়।

কলিকাতায় নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতির অধিবেশন

প্রথম দিন

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসুর পদত্যাগ

ওয়েলিংটন স্কোয়ারে নির্ম্মিত বিরাট ডপে ২৯ এপ্রিল অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় ব্র উত্তেজনা ও গভীর উৎকণ্ঠার মধ্যে খিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিশন আরম্ভ হয়। ওয়ার্কিং কমিটি ন সমস্যা মীমাংসার আলোচনা ব্যর্থ ওয়ায় রাষ্ট্রপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র সু কোন্ পন্থা অবলম্বন করিবেন, ষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহা অতিশয় গোপনে রাখা হইয়াছিল। কাজেই ধিবেশন কাল যতই নিকট হইতে কে, সকলের কৌতূহল ও উত্তেজনা তই বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

অধিবেশন মণ্ডপটি সুচারুরূপে জ্জিত করা হইয়াছে। প্রধান তোরণটির ম রাখা হইয়াছে দেশবন্ধু তোরণ। এই তোরণটির গঠন-ভঙ্গী সম্পূর্ণ ভারতীয় আদর্শে পরিকল্পিত এবং ভারতীয় পদ্ধতিতে ইহা রঞ্জিত। মণ্ডপের অভ্যন্তরে এক জমকালো শ্য দেখা গিয়াছিল। বিগত অর্দ্ধ তাব্দীর প্রচেষ্টায় কংগ্রেস দেশে যে মুক্তি কামনা জাগাইয়াছে, ঊর্দ্ধে উড্ডীয়ান জাতীয় পতাকা ও স্বেচ্ছাসেবকগণের সামরিক বাদ্য তাহাতে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহ সঞ্চার করিতেছিল। মণ্ডপ স্তম্ভগুলির নানা বর্ণ এবং স্বেচ্ছাসেবিকাগণের শাড়ীর জাফরাণ রং-এর সমাবেশ এক অপূর্ব্ব বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছিল।

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির ৪২০ জন সদস্যের মধ্যে প্রায় সাড়ে তিন শত জন সদস্য অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। মঞ্চের উপর পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু, শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, আচার্য্য কৃপালনী, খাঁ আবদুল গফুর খাঁ, শ্রীযুত রাজাগোপালাচারী, পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ, শ্রীযুত শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, পণ্ডিত রবিশঙ্কর শুক্ল, শ্রীযুত বিশ্বনাথ দাস, শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাই, শ্রীযুত টি প্রকাশম, পণ্ডিত দ্বারকাপ্রসাদ মিশ্র, ডাঃ কিচলু, মিঃ রফি আমেদ কিদোয়াই, শ্রীযুত বাল গঙ্গাধর খের, শ্রীযুত সত্যমূর্ত্তি, শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বরদলৈ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে দেখা গিয়াছিল। বিশিষ্ট দর্শকগণের মধ্যে বাঙলার ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী সৈয়দ নওশের আলী ও কলিকাতার নব-নির্ব্বাচিত মেয়র শ্রীযুত নিশীথচন্দ্র সেনকে দেখা গিয়াছিল।

প্রায় আট হাজার দর্শক উপস্থিত ছিল, তন্মধ্যে বহু মহিলাও ছিলেন।

রাষ্ট্রপতি ঠিক পাঁচটার সময় মণ্ডপে প্রবেশ করেন। তখন সমবেত জনতা তুমুল হর্ষধ্বনি করিয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করে। মণ্ডপে প্রবেশ করিয়াই রাষ্ট্রপতি বক্তৃতা-মঞ্চে আরোহণ করিয়া সমবেত জনতাকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "অতি বিলম্বে আসার দরুণ আমি আপনাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। কিন্তু আমি আশা করি, আপনারা বিলম্বের কারণ বুঝিতে পারিতেছেন এবং বিনা দ্বিধায় আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

ইহা বলিয়া রাষ্ট্রপতি সভা আরম্ভ হইল বলিয়া ঘোষণা করেন।
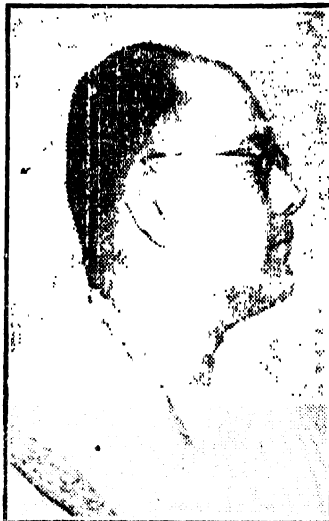
রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু

অতঃপর কয়েকটি তরুণী 'বন্দে মাতরম্' গান করে। জাতীয় সঙ্গীত গানের সময় উপস্থিত সকলে দণ্ডায়মান হইয়া উহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন।

অতঃপর রাষ্ট্রপতি পুনরায় বক্তৃতা-মঞ্চে আরোহণ করিয়া দর্শকগণকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "যে সকল ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা দর্শক হিসাবে এখানে আসিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমার একটি নিবেদন আছে। আপনাদিগকে একথা স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করিতেছি যে জনসাধারণ যাহাতে কৌতূহল নিবৃত্তি করিতে পারেন, তজ্জন্য সৌজন্যবশতঃ নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে দর্শকদিগকে উপস্থিত থাকিতে দেওয়া হয়। আমরা—অর্থাৎ নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্যগণ আশা করি যে, অধিবেশনের কাজ যাহাতে নির্ব্বিবাদে সম্পন্ন হয়, তজ্জন্য আপনারা আমাদের সহিত সহযোগিতা করিবেন। যে সঙ্কটজনক অবস্থায় আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি, তাহা আপনারা সবিশেষ অবগত আছেন। আজ এখানে যে জটিল সমস্যার মীমাংসা করিতে হইবে, তাহাও আপনারা অবগত আছেন। সুতরাং দর্শক হিসাবে সমাগত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাগণের নিকট আমার অনুরোধ এই যে, সম্মেলনের কাজ যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতে পারে, তজ্জন্য আপনারা আমাদের সহিত সহযোগিতা করিবেন।"

অতঃপর নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্যগণকে সম্বোধন করিয়া রাষ্ট্রপতি বলেন, "আজ আমাদের যে সকল সমস্যার মীমাংসা করিতে হইবে, তন্মধ্যে প্রথমটি হইতেছে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন সমস্যা। আপনারা জানেন, নূতন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণের নাম এখনও ঘোষণা করা হয় নাই। কংগ্রেসের ত্রিপুরী অধিবেশনে ওয়ার্কিং কমিটি গঠনে পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থের যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহাও আপনারা অবগত আছেন। যাহাতে সেই প্রস্তাব কাজে পরিণত করা যায়, তজ্জন্য সকলেরই সচেষ্ট হওয়া উচিত। ঐ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। যাহা হউক, এই সম্পর্কে আমার বক্তব্য প্রকাশ করার পূর্ব্বে আমি মহাত্মা গান্ধীর নিকট হইতে প্রাপ্ত পত্রখানা নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে দাখিল করিতেছি। পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থের প্রস্তাব আপনারা জানেন, সুতরাং ঐ প্রস্তাব দ্বারা মহাত্মাজীর উপর যে দায়িত্ব ন্যস্ত করা হইয়াছে, তাহাও আপনারা জানেন।"

অতঃপর শ্রীযুত বসু মহাত্মাজীর পত্রখানা পাঠ করেন। স্বয়ং রাষ্ট্রপতি উহার বাঙ্গানুবাদ করেন এবং ডাঃ আশরফ তাহা হিন্দী ভাষায় অনুবাদ করেন। (রাষ্ট্রপতির নিকট লিখিত মহাত্মা গান্ধীর পত্র অন্যত্র দ্রষ্টব্য)।

'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতান্তে রাষ্ট্রপতি যখন বক্তৃতা-মঞ্চে আরোহণ করেন তাহার পূর্ব্বে তাঁহাকে প্রায় পাঁচ মিনিট কাল

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সহিত গভীর আলোচনায় নিমগ্ন থাকিতে দেখা যায়।

রাষ্ট্রপতি বসু মহাত্মা গান্ধীর লিখিত চিঠি পাঠের পর নিজের পদত্যাগ ঘোষণা করিয়া এক বিবৃতি দেন।

(রাষ্ট্রপতির বিবৃতি অন্যত্র দ্রষ্টব্য)

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর বক্তৃতা

অতঃপর পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে, আজ আমাদের সম্মুখে একটা বিষম সমস্যা দেখা দিয়াছে; এ সময় যদি সঠিক কোন প্রস্তাব তাঁহাদের নিকট উপস্থিত করা না হয়, তাহা হইলে তাঁহারা আবোল-তাবোল যা-তা মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারেন এবং তাহার ফলে কোনই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর হইবে না। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার পত্রে কি লিখিয়াছেন তাহাও তাঁহারা শুনিয়াছেন এবং রাষ্ট্রপতির প্রদত্ত বিবৃতিও তাঁহারা শ্রবণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের অনিশ্চিত অবস্থার কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। সুতরাং একটা সঠিক কোনও কিছুর বিষয় যে বিবেচনা করা দরকার তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন।

এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণভাবে কার্য্য করিতে হইলে তাঁহাদিগকে হয় ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নির্ব্বাচন করিতে হয়, কিম্বা কাহাকেও ঐ সব সদস্য মনোনীত করিতে বলিতে হয়। কিন্তু তিনি মনে করেন যে, এই পন্থা অবলম্বনের ফলে তাঁহাদিগকে কেবলমাত্র বিরত হইতে হইবে না, পরন্তু উহা বিপদসঙ্কুলও বটে। বিশেষ করিয়া গত ২।৩ মাস ধরিয়া বিতণ্ডা ও তিক্ত আলোচনার ফলে ইহার যে পটভূমি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে ঐরূপ ধারণা করিবার বিশেষ কারণ আছে বলিয়া তিনি মনে করেন। সেজন্য "আপনাদের নিকট আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই যে, সভার কার্য্য পরিচালনের সময় এই ২।৩ মাসের মধ্যে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হওয়া সম্ভবপর না হইলেও সকলেই উহা স্মৃতি হইতে মুছিয়া ফেলিবেন। কারণ ঐ সব বিতণ্ডার উল্লেখ করায় কোনই উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না। বাক-বিতণ্ডা অনেক হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে আমাদিগকে বিপদসঙ্কুল ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া কাজ করিতে হইবে, আমাদিগকে নানা বিঘ্নসঙ্কুল এই ভবিষ্যতের সম্মুখীন হইতে হইবে। আমরা যদি দৃঢ়সংকল্প হইয়া সমবেতভাবে এই ভবিষ্যতের [illegible] না হই, তাহা হইলে আমাদের বা[illegible] [illegible]ার বিশেষ সম্ভাবনা।

"আপনারা সকলেই প্রত্যহই বিদেশী এবং অন্যান্য সংবাদ বেশ মনোযোগের সহিতই পাঠ করিয়া থাকেন এবং যুদ্ধ কতদূর আসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করেন। এই মাসেই কি যুদ্ধ বাধিবে? আগামী শরৎকালেই কি যুদ্ধ আরম্ভ হইবে? আপনাদের অনেকেরই হয়ত ধারণা, অধিকাংশ লোকেরই হয়ত অনুমান এই যে, আন্তর্জ্জাতিক মহাসমর আর ঠেকাইয়া রাখা চলিবে না। তাহাই যদি হয়, তবে আপনাদের, আমার এবং কংগ্রেসের, আমাদের সকলেরই সম্মুখে এক ভীষণ বিঘ্নসমাকুল পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে। আমরা এই সব বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি এবং তদনুসারে আমরা আমাদের নীতিরও নির্দ্ধারণ করিয়াছি। কিন্তু যখন এই অনিবার্য্য ঘটনা ঘটিবে, তখন আমাদিগকে উহার সম্মুখীন হইতে হইবে এবং ঐ সম্পর্কে আমাদের নীতি নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। এই পটভূমির মধ্যে আজ আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি। এই যখন পটভূমি, তখন যাহাতে আমরা কেবলমাত্র বক্তৃতা এবং বাকবিতণ্ডাতেই রত না হই, তৎপ্রতি অবহিত হওয়া বিশেষভাবে প্রয়োজন। উহার ফল যাহাই হউক না কেন, উহার ফলে সুনিশ্চিতভাবে তিক্ততার উদ্ভব হইবে এবং তার ফলে আমরা আরও দুর্ব্বল হইয়াই পড়িব।

"আজ ভারতের সম্মুখে বিরাট সমস্যা দেখা দিয়াছে। সারা বিশ্বেই আজ একটা সমস্যা দেখা দিয়াছে। সেজন্য আপনাদের নিকট আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই যে, এই বিষয়টির বিষয় বিবেচনা করিবার সময় যাহাতে আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া অগ্রসর হইতে সমর্থ হই, সেজন্য আপনারা এই জাতীয় ও আন্তর্জ্জাতিক পটভূমির বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিবেন:

"সেজন্য আমার প্রথম বক্তব্য এই যে, এই সময় কংগ্রেস সভাপতির পদত্যাগ অতীব দুর্ভাগ্যের বিষয়। উপস্থিত আমি ব্যক্তিগত বিষয়ের আলোচনা হইতে বিরত থাকিব। কারণ বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখিতে গেলেও এখন নূতন সভাপতি নির্ব্বাচন করিতে হইলে অনেক অসুবিধার উদ্ভব হইবে। উহাতে তিক্ততারও উদ্ভব হইবে। আমাদের কাহারও পক্ষে উহা সুখকর কার্য্য হইবে না। সেজন্য সভাপতিকে আমি এই অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি যে, তিনি যেন তাঁহার পদত্যাগের জন্য পীড়াপীড়ি না করেন। আর আমার বিশ্বাস এই সভায় সকলেই এ বিষয়ে আমার সহিত একমত।

"তারপর ওয়ার্কিং কমিটি গঠন সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, এই সমিতি কর্ত্তৃক ওয়ার্কিং কমিটি নির্ব্বাচন অতি দুষ্কর ব্যাপার হইয়া পড়িবে। যাঁহারা নির্ব্বাচিত হইবেন, তাঁহারা যে ভাল লোকই হইবেন তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু উহাতে ইহা কোনক্রমেই বলা যায় না যে, তাঁহাদের সকলের মধ্যেই মতের মিল হইবে কিম্বা সকলেই প্রত্যেকের সহিত সহযোগিতা করিতে সমর্থ হইবেন। সবদিক দিয়াই এই নির্ব্বাচন ব্যাপারটি অতি জটিল পন্থা হইয়া পড়িবে এবং উহার ফলে আমাদের মধ্যে বিদ্বেষের সৃষ্টি হইতে পারে। বিশ্ববাসী এই দৃশ্যকে মহান বলিয়া মনে করিবে না। গত তিনদিন মহাত্মা গান্ধীর সহিত আমাদের সভাপতির ও অন্যান্য নেতার যে আলোচনা চলে, তাহাতে মাঝে মাঝে আমিও যোগ দিই। তাহাতে যে সব সমস্যার বিষয় আলোচিত হয়, সে সব বিষয়ে মতের ঐক্য দেখিয়া আমি বিস্মিত ও আনন্দিত হই। উপস্থিত সকলের মধ্যেই পরমত গ্রহণের আগ্রহ মোটামুটিভাবে পরিলক্ষিত হয় তাঁহাদের মধ্যে পরমত সহিষ্ণুতার আকাঙ্ক্ষাও দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে আমার একরূপ নিশ্চিত ধারণাই হয় যে, এই সভায় সভাপতির ও অন্যান্য ব্যক্তির সমর্থিত যাহা হউক একটা সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করা হইবে। দুর্ভাগ্যক্রমে শেষ মুহূর্ত্তে মতের মিল না হওয়ায় তাহা সম্ভবপর হয় নাই। কিন্তু আমাদের মধ্যে ব্যবধান যে বেশী নয় তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অপ্রত্যাশিতভাবে কতকগুলি বিঘ্নের উদ্ভব হয়, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু একত্রিত হইয়া সমবেত কার্য্য করিবার এত প্রবল আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় যে এখনও আমরা একত্রিত হইয়া সমবেতভাবেই কার্য্য করিব বলিয়া আমার দৃঢ় ধারণা।

বক্তা পণ্ডিত জওহরলাল ত্রিপুরী প্রস্তাবের সর্ত্তানুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে প্রস্তাবের সত্তানুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদিগের নাম প্রস্তাব করিতে অনুরোধ করা হইয়াছিল। মহাত্মাজী যে কারণে দায়িত্ব গ্রহণ করিতে অসমর্থ তাহা তিনি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন। এতৎসত্ত্বেও, আমাদের সম্মুখে কোনও সমস্যার উদয় হইলে বর্ত্তমানে এবং ভবিষ্যতে আমাদিগকে তদ্বিষয়ে পরামর্শ দিতে প্রস্তুত ছিলেন। এই সকল বিষয়ের আলোচনা হইয়া

গিয়াছে। অতঃপর আমাদের কর্ত্তব্য কি, বর্ত্তমানে ইহাই হইল আসল সমস্যা।

আমাদিগকে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করিতেই হইবে। তবে বসিয়া বসিয়া আলোচনা করা এবং সমস্ত নাম বাছাই করা শক্ত। তাহার ফলে হয়ত কর্ম্মক্ষম কমিটি গঠিত হইতে পারে; কিন্তু সে একটা অদ্ভুত কমিটি হওয়ারই সম্ভাবনা। তাহা ছাড়া বর্ত্তমান অবস্থায় নির্ব্বাচন-মূলে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করিতে গেলেও অবস্থার কোনও উন্নতি হইবে না। সুতরাং সমবেত সদস্যগণের নিকট আমি সসম্মানে এই অনুরোধ জানাইতেছি, যে, গত বৎসরের পুরাতন কমিটি পূর্ব্বের ন্যায় কার্য্য করিতে থাকুন এবং তাঁহারা সকলে এই বিষয়ে সম্মতি প্রদান করুন। আমার, রাষ্ট্রপতির এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকলের অভিমত এই যে, কমিটিতে নূতন সদস্য লওয়া প্রতি ক্ষেত্রেই বাঞ্ছনীয়। অন্য পক্ষে আবার ইহাও বাঞ্ছনীয় এবং অত্যাবশ্যক যে, অনুসৃত নীতির ধারা বজায় রাখিতে হইলে এবং আমাদের আরব্ধ কার্য্যের সমতা ও সংহতি রক্ষা করিতে হইলে, যে সকল অভিজ্ঞ ও বহুদর্শী ব্যক্তি দায়িত্ব বহন করিয়া আসিয়াছেন; কমিটিতে তাঁহাদেরও থাকা প্রয়োজন। যেহেতু কংগ্রেস এ সম্বন্ধে যখন নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি নির্দ্দেশ দিয়াছেন, তখন কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি এমনভাবে গঠিত হওয়া আবশ্যক যে, ঐ কমিটি কংগ্রেসের অনুসৃত পুরাতন নীতি বজায় রাখিতে সমর্থ হন। কিন্তু আমি কমিটিতে নূতন সদস্য লওয়ারও পক্ষপাতী। তবে উহাতে নির্ব্বাচনের প্রয়োজন হয়। অদূর ভবিষ্যতে কমিটির রদবদল করা আমাদের পক্ষে কঠিন হইবে না। কারণ, কমিটির দুইজন সম্মানভাজন বিশিষ্ট সদস্য বর্ত্তমানে কার্য্য করিতে অপারগ। ঐ দুইজনের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন সদস্য শেঠ যমুনালাল বাজাব এক্ষণে বন্দী অবস্থায় কালযাপন করিতেছেন। তাহা প্রকাশ করেন। সম্ভবত তিনি আর অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তিনি কমিটির সদস্য-পদ ত্যাগ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সম্ভবতঃ তিনি আর কমিটির সদস্যের কাজ করিতে সমর্থ হইবেন না। প্রাচীন ও সম্মানভাজন দ্বিতীয় সদস্য শ্রীজয়রাম দাস দৌলতরাম কয়েক মাস যাবত পীড়িত আছেন। এখনও তিনি রোগভোগ করিতেছেন। সুতরাং কমিটির কার্য্যে যোগ দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। সুতরাং স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, এই দুইজন পুরাতন সদস্য কমিটিতে কার্য্য করিতে পারিবেন না এবং রাষ্ট্রপতিকে সহ-কর্ম্মিদিগের সহিত পরামর্শক্রমে তাঁহাদের স্থলে নূতন সদস্য মনোনয়ন করতে হইবে। তবে সে অবস্থা পরে আসিবে। সুতরাং বর্ত্তমান ক্ষেত্রে নির্ব্বাচন পরিহার করা এবং আমার প্রস্তাব গ্রহণ করা সমীচীন ও সংগত হইবে। এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া আমরা এই অপ্রীতিকর অধ্যায়ের দ্রুত পরিসমাপ্তি করিতে পারি। এই ব্যবস্থা ক্রমে আমাদের এবং দেশের শক্তি বৃদ্ধি হইবে। আমরা গত দুই তিন মাস ধরিয়া যে অপ্রীতিকর অবস্থার মধ্য দিয়া চলিয়াছি, সেই অবস্থার অবসানকল্পে ইহাই সমীচীন ও সংগত উপায় বলিয়া মনে করি।
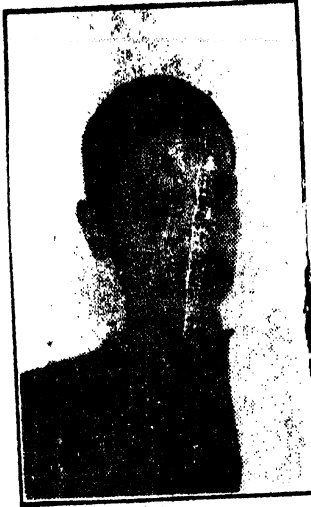
বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ

আসুন আমরা নূতন করিয়া কার্য্যারম্ভ করি এবং আমাদের সম্মুখে যে বৃহত্তর ব্যাপার রহিয়াছে, আসুন আমরা তাহার জন্য প্রস্তুত হই।

পণ্ডিত জওহরলালের প্রস্তাব

অতঃপর পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন যে, নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুকে তাঁহার পদত্যাগ প্রত্যাহার করিতে এবং ১৯৩৮ সালের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদিগকে লইয়া নূতন নূতন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করিতে অনুরোধ করিতেছে।"

এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করার পর রাষ্ট্রপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু জলযোগের জন্য অর্দ্ধঘণ্টাকাল সভার অধিবেশন স্থগিত রাখেন এবং বলেন যে, সভায় তাঁহার ব্যক্তিগত ব্যাপার সম্পর্কে আলোচনা হইবে, সুতরাং তিনি সভাপতিত্ব করিবেন না এবং অতঃপর সভায় উপস্থিত কংগ্রেস প্রেসিডেন্টদের মধ্যে প্রবীণতম প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিবেন।

জলযোগের পর

জলযোগের পর সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় সভার অধিবেশন আরম্ভ হয়। এই সময় শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্তা নাইডু বলেন যে, সভায় উপস্থিত কংগ্রেস প্রেসিডেন্টদের মধ্যে প্রবীণতম প্রেসিডেন্ট হিসাবে তিনি সভার কার্য্য পরিচালনা করিবেন এবং পণ্ডিত জওহরলালের প্রস্তাব শেষ পর্য্যন্ত যাহাতে সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই বক্তৃতা করিবেন। তবে তিনি শনিবার কোন ভোট গ্রহণ করিবেন না বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কারণ রাষ্ট্রপতি ও নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্যগণকে সমগ্র পরিস্থিতি সম্পর্কে সমস্ত রাত্রি ধরিয়া বিবেচনার পর একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার সুযোগ দিবার জন্য তিনি এইরূপ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

মিঃ রফি আমেদ কিদোয়াই পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর প্রস্তাব সমর্থন করেন। মিঃ কিদোয়াই বলেন যে, কোন কোন বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হওয়ার ফলেই বর্ত্তমান পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, কিন্তু কংগ্রেসের চরম লক্ষ্য তথা স্বাধীনতা সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটির প্রাক্তন সদস্য এবং অন্যান্যদের মধ্যে কোন মতভেদ নাই।

শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণ

শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রস্তাবটি সমর্থন করিতে গিয়া বলেন যে, ত্রিপুরীর পর তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের ঘোষণা অনুযায়ী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এ পর্য্যন্ত ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হয় নাই। এই সম্পর্কে যে সব বিবৃতি প্রচার করা হইয়াছে ও বক্তৃতা করা হইয়াছে, তাহা আদৌ সমর্থনযোগ্য নহে। গলদ যে কোথায় তাহা হৃদয়ঙ্গম করা দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। নেতৃবৃন্দ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্যদের উপর সিদ্ধান্তের ভার অর্পণ করিয়াছেন। ইহা ঠিক হয় নাই। মহাত্মাজীর অভিপ্রায় অনুযায়ী ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করিলেই সব চেয়ে ভাল হইত, কিন্তু ইহাতে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র

বসুর কিসে অসুবিধা ছিল, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন না। একটা আপোষ-রফা দ্বারাও এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভবপর ছিল, কিন্তু এমন কি তাহাও সম্ভব হয় নাই।

অতঃপর শ্রীযুত জয়প্রকাশ নারায়ণ বলেন যে, রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ গ্রহণ করার ফল কিরূপ হইবে, তাহাও তাঁহাদিগকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। সমাজতন্ত্রিগণ সব সময়েই কংগ্রেসের সংহতি রক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়া আসিয়াছে। তিনি জানেন যে, কোন কোন নেতা সমাজতন্ত্রীদিগকে আমলে আনিতে চাহেন না এবং তাঁহাদের ধারণা এই যে, তাঁহারা সমাজতন্ত্রীদের সাহায্য ব্যতিরেকে কংগ্রেস চালাইতে পারিবেন। ঐক্যই কংগ্রেসকে শক্তিশালী করার মূলসূত্র বলিয়া যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তিনি তাঁহাদের দলভুক্ত এবং তিনি এই ঐক্য রক্ষা করিতে চাহেন। শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু পদত্যাগ করিলে তাহার পরিণাম ফল গুরুতর হইবে। ঘোরতর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রগতি প্রতিহত হইবে।

ওয়ার্কিং কমিটি গঠন সম্পর্কে শ্রীযুত জয়প্রকাশ নারায়ণ বলেন যে, এই বিষয়ে তিনি পণ্ডিত জওহরলালের প্রস্তাব মানিয়া লইতে রাজী নহেন, কিন্তু উহাই বর্ত্তমান সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় বলিয়া উহা মানিয়া লইতে হইতেছে। তবে ওয়ার্কিং কমিটিতে নূতন সদস্য গ্রহণ করার সার্থকতা যে অনুভূত হইয়াছে, ইহা সুখের বিষয়। তদুপরি ওয়ার্কিং কমিটির দুইজন পুরাতন সদস্য নূতন সদস্যের জন্য সদস্যপদ ত্যাগ করিবেন শুনিয়া তিনি আশ্বস্ত হইয়াছেন। তিনি ইহাও শুনিয়াছেন যে, পণ্ডিত জওহরলালকে কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারীর পদ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে। উহা কার্য্যে পরিণত হইলে তিনি সুখী হইবেন, তবে দুঃখের বিষয় এই যে, নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন দলের লোক লইয়া ওয়ার্কিং কমিটি গঠনে রাজী হন নাই। যাহা হউক সমস্যা সমাধানের আর কোন উপায় না থাকায় তিনি প্রস্তাবটির মূল উদ্দেশ্য সমর্থন করিতেছেন এবং সেই সঙ্গে এই মতও প্রকাশ করিতেছেন যে, অধিকতর প্রকৃষ্ট উপায়ে এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভবপর ছিল।

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালের বক্তৃতা

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল বলেন,—

নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে ও পরে রাষ্ট্রপতি যে সকল বিবৃতি দিয়াছেন, তাহার সকলগুলি তিনি অনুমোদন করেন নাই। ইহা নিতান্ত সুস্পষ্ট যে, ত্রিপুরী প্রস্তাবের উদ্দেশ্যই ছিল—রাষ্ট্রপতিকে একটি হস্তপদাবদ্ধ ক্রীড়নকে পরিণত করা এবং সঙ্গীতের ভয় দেখাইয়া তাঁহাকে এমন এক অবস্থায় লইয়া যাওয়া,—যে অবস্থার পরিবর্ত্তন আজি পর্য্যন্ত সম্ভব হয় নাই। পণ্ডিত জওহরলালের উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনি (পণ্ডিতজী) যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার ফলে কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট কমিটির চেয়ারম্যান হইবেন মাত্র। কিন্তু রাষ্ট্রপতি যেরূপ ক্ষমতা ও অধিকার পাইতে চাহেন, এই প্রস্তাবে তাঁহার সে মর্য্যাদাপ্রাপ্তি ঘটিবে না। কোনও ব্যক্তি বিশেষের ব্যক্তিগত অভিপ্রায়ের সহিত তাঁহার কোনও সংস্রব নাই। যে প্রকারেই হউক, বর্ত্তমান সময়ের সংকুল বৈপ্লবিক পরিস্থিতিতে, নেতৃবৃন্দের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহ পরিহার করা এবং তাঁহারা কোন্ পথ অনুসরণ করিবেন, তাহার সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দেওয়া প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। সুতরাং তিনি (বক্তা) এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিতেছেন। কারণ, তাঁহাদের যাহা অভিপ্রায়, প্রস্তাবমূলে তাহা পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করা হইতেছে।

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল আরও বলেন, তাঁহারা দেশ হইতে সাম্প্রদায়িকতার মূলোচ্ছেদ করিতে চাহেন। তাঁহারা চান—দেশীয় রাজ্যের এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পূর্ণোদ্যমে চলিতে থাকুক। এইরূপ অবস্থায় বে-সরকারী প্রস্তাবাদি পর্য্যালোচনায় সুস্পষ্ট নীতির নির্দ্দেশ দিতে সমর্থ একটি পরিবর্ত্তনকামী কমিটি গঠন করা সকলেরই কাম্য। ঐরূপ একটি কমিটি গঠনের সংকল্প গ্রহণের পর কাহাকে লইয়া কমিটি গঠিত হইবে, সে প্রশ্ন বিবেচনা করা যাইতে পারে।

বর্ত্তমান পরিস্থিতি আপনা হইতেই উদ্ভূত হয় নাই। পুরাতন ওয়ার্কিং কমিটিই এই অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন। (দর্শকগণের মধ্য হইতে 'শুনুন' 'শুনুন' ধ্বনি হইতে থাকে)।

প্রেসিডেণ্ট—দর্শকগণের বিক্ষোভ প্রদর্শনে বা কোনও অংশ গ্রহণ করা উচিত নহে। পুনরায় এরূপ হইলে আমি সভা ভাঙ্গিয়া দিব।

শ্রীযুক্ত সান্যাল—বর্ত্তমানে আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ সাধন করা। আমি স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাই যে, রাজকোটের ব্যাপার যেভাবে পরিচালিত হইয়াছে, তাহা মোটেই আশাপ্রদ নহে। বিদেশী কাপড়ের বা বিদেশী মদের দোকান পিকেটিং করার পুরাতন পদ্ধতিতে আমার বিশ্বাস নাই, আমি তাহা স্পষ্ট করিয়াই বলিতেছি।

প্রেসিডেণ্ট—প্রস্তাব সম্পর্কে আপনার যাহা বলিবার তাহাই বলুন।

শ্রীযুক্ত সান্যাল—যে কারণে আমি এই সকল বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি, তাহা এই—বর্ত্তমানে নূতন কার্য্যপদ্ধতি আবশ্যক। পুরাতন কমিটি এখন আমাদিগকে চালাইতে অসমর্থ। আমি নিতান্ত খোলাখুলিভাবেই তাহা বলিতেছি। পুরাতন ওয়ার্কিং কমিটি সে কার্য্যের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

শ্রীযুক্ত সান্যাল আরও বলেন,—প্রাচীন নীতি পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহা কার্য্যকরী নহে। যদি গণতন্ত্রে বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে বলিতে হয়,—মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র, তাঁহারা যতই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হউন না কেন,—ভারতের ন্যায় বিশাল রাজ্যের ভাগ্য পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না। অবস্থা এখন এইরূপ দাঁড়াইয়াছে—একমতাবলম্বী কর্ম্ম-পরিষদ একদলের কাম্য আর মিশ্র কর্ম্ম-পরিষদ অন্য দলের কাম্য। ওয়ার্কিং কমিটি যদি একমতাবলম্বী লোক লইয়া গঠিত হয়, আর প্রেসিডেণ্ট যদি ভিন্ন মতাবলম্বী হন, তাহা হইলে ওয়ার্কিং কমিটি একমতাবলম্বী হইতে পারে না। নির্ব্বাচিত প্রেসিডেণ্টের মত অপেক্ষা ওয়ার্কিং কমিটির সমস্ত সদস্য স্বতন্ত্র মত পোষণ করিবেন,—ইহা বড়ই অসামঞ্জস্যমূলক। এরূপ অবস্থায় নানা অবান্তর বিরোধের সৃষ্টি হইয়া কংগ্রেসের মর্য্যাদার যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা।

সুতরাং প্রস্তাবটি প্রত্যাখান করাই আমাদের সুস্পষ্ট কর্ত্তব্য। তৎপরিবর্ত্তে বে-সরকারী প্রস্তাবাদির সূত্র ধরিয়া, স্বতন্ত্র একটি প্রস্তাব উত্থাপন দ্বারা ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণ করা উচিত। প্রেসিডেণ্ট কাহাকে নির্দ্ধারণ করা হইবে সে প্রশ্ন বিবেচনার সময় ইহার পর আসিবে।

শ্রীযুত যদুমণি মঙ্গরাজ

শ্রীযুত ভূপেন সান্যাল বক্তৃতার পর শ্রীযুত যদুমণি মঙ্গরাজ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন এবং বলেন যে, যেহেতু ত্রিপুরী কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুযায়ী মহাত্মাজীর উপর ওয়ার্কিং কমিটি গঠনে রাষ্ট্রপতিকে উপদেশ দানের ক্ষমতা

অর্পিত হইয়াছে এবং যেহেতু মহাত্মাজী শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুকে ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন, সুতরাং রাষ্ট্রপতিই তাঁহার মনোনীত ব্যক্তিদিগকে লইয়া ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের ন্যায়সঙ্গত অধিকারী। পুরাতন ওয়ার্কিং কমিটি এমন সব সদস্য লইয়া গঠিত যাঁহারা রাষ্ট্রপতি পদে সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্বাচন দেশের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু দেশবাসী সুভাষচন্দ্রকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন করিয়া আপনাদের মনোভাবের পরিচয় দেয়। যাঁহাদের সহিত তাঁহার মূলগত পার্থক্য তাঁহাদের কর্ণধার পদে অধিষ্ঠিত থাকা রাষ্ট্রপতির পক্ষে একটা অদ্ভুত ব্যাপার হইবে।

স্বামী গোবিন্দানন্দ রাষ্ট্রপতি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু এবং মহাত্মা গান্ধীকে সম্মিলিতভাবে বিভিন্ন দলের লোক লইয়া ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করিতে এবং কংগ্রেস ও জাতীয় আন্দোলনকে শক্তিশালী করিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান।

এই সময় শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু ঘোষণা করেন যে, বক্তাদের তালিকায় আরও চারজন বক্তার নাম আছে এবং একটি সংশোধন প্রস্তাবও রহিয়াছে এবং তিনি রবিবার দ্বিপ্রহর পর্যন্ত অধিবেশন স্থগিত রাখিতে চাহেন ও ৩০শে এপ্রিল রবিবারে সংশোধন প্রস্তাবসমূহ আলোচিত হইবে। বক্তাগণ রবিবারে বক্তৃতা করিতে সম্মত হওয়ায় রাত্রি ৮॥ ঘটিকায় অধিবেশন স্থগিত থাকে।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন

৩০ এপ্রিল বেলা সওয়া দুইটার সময় বিপুল উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠার মধ্যে পুনরায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হয়। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর প্রস্তাবের পরিণতি কি হইবে তাহা জানিবার আগ্রহে এইদিন প্যাণ্ডেলের মধ্যে ভিড় পূর্ব্বদিন অপেক্ষা অধিক হইয়াছিল। দর্শকদের গ্যালারীতে তিলধারণের স্থান ছিল না। 'রাষ্ট্রপতি বসু তাঁহার পদত্যাগ পত্র কি প্রত্যাহার করিবেন?' 'পণ্ডিত নেহরুর চেষ্টা কি ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে?' সকলের মুখে এই প্রশ্নই শুনা যায়। একদিকে লবীতে গুজব রটিয়াছিল, পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব সংশোধন করিয়া এ আই সি সি কংগ্রেস সভাপতিকে ওয়ার্কিং কমিটি গঠনে যথেষ্ট ক্ষমতা না দিলে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করিবেন না; অপরপক্ষে ইহাও শুনা যায়, দক্ষিণপন্থী নেতারা পন্থ-প্রস্তাব কিছুমাত্র সংশোধনে সম্মত হইবেন না।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর প্রস্তাব সম্পর্কে বহু সংখ্যক সংশোধন প্রস্তাবের নোটিশ ছিল। আপোষে কংগ্রেসের সংকট মীমাংসার চেষ্টায় বিভিন্ন দলের নেতাদের মধ্যে ঘরোয়াভাবে আলোচনা চলিতেছিল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে সভা আরম্ভ হইতে পারে নাই।

শ্রীযুক্ত বসু, পণ্ডিত নেহরু ও অন্যান্য নেতা প্যাণ্ডেলে পৌঁছিলে জনতা জয়ধ্বনি করিয়া তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধিত করেন। শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। একদল বালিকা ও যুবক কর্ত্তৃক "জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে" সঙ্গীতের পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়।

সভানেত্রীর সম্মতি লইয়া শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু দর্শকবৃন্দের নিকট একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন। তিনি দর্শকবৃন্দকে উত্তেজিত না হইতে এবং সভার কার্য্য পরিচালনায় নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্যগণের সহিত সহযোগিতা করিবার জন্য আবেগপূর্ণ ভাষায় অনুরোধ জানান।

দর্শকগণের প্রতি রাষ্ট্রপতির আবেদন

শ্রীযুত বসু বলেন, "আজ আমি আপনাদের মধ্যে উত্তেজনার লক্ষণ পরিস্ফুট দেখিতে পাইতেছি। এইজন্য আমি আপনাদিগকে যথাসম্ভব সংযত থাকিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। গতকল্য প্রারম্ভিক বক্তৃতায় আমি আপনাদিগকে বলিয়াছি যে ইহা নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন এবং ইহাতে দর্শকদিগকে যে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয় তাহা নেহাৎ সৌজন্যের খাতিরেই। নির্ব্বিবাদে ও সুচারুরূপে যাহাতে সমস্ত কাজ সম্পন্ন হয় তজ্জন্য আমি আপনাদিগকে আমাদের সাহায্য করিতে ঐকান্তিক অনুরোধ করিতেছি। আপনারা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন যে, নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্যগণ নিজেদের অভিপ্রায় অনুযায়ী প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারেন। আমরা অর্থাৎ নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্যগণ যদি বিনা উত্তেজনায় সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারি, তবে দর্শকদের পক্ষে উত্তেজিত হওয়ার তো কোনই কারণ থাকিতে পারে না। সুতরাং আপনাদের নিকট আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই যে, আপনারা সাধ্যানুসারে নিজদিগকে সংযত রাখিবেন। গতকল্যকার অধিবেশনকালে অনেক হর্ষধ্বনি উঠিয়াছে। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। অবশ্য মানুষের মনোভাবের কিছুটা অভিব্যক্তি প্রয়োজন; কিন্তু সেই অভিব্যক্তির একটা সীমা থাকা দরকার।"

অতঃপর শ্রীযুক্ত বসু বলেন যে, শনিবার রাত্রে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন স্থগিত রাখিবার পর যখন সদস্যগণ ও দর্শকগণ বাহির হইয়া যাইতেছিলেন, তখন গণ্ডগোল হইয়াছে। এই গণ্ডগোলের মধ্যে কাহারা ছিলেন, তাহা তিনি অবগত নহেন। কাহারা গণ্ডগোল করিয়াছে তাহা তিনি বাহির করিতে পারেন নাই। শ্রীযুত বসু প্যাণ্ডেলের ভিতরে ও বাহিরে শান্তিরক্ষা করিবার জন্য বিশেষভাবে আবেদন করেন। শ্রীযুক্ত বসুর বক্তৃতার পর পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বক্তৃতা করেন।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর বিবৃতি

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁহার বিবৃতিতে বলেন যে, যদি তাঁহার প্রস্তাবটি রাষ্ট্রপতি অনুমোদন না করেন তাহা হইলে তিনি উক্ত প্রস্তাবটি প্রত্যাহারের জন্য এই সভার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন।

তিনি বলেন, "গতকল্য আমি সভায় একটি প্রস্তাব উত্থাপন করি এবং উক্ত প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তৃতাও করি। বর্ত্তমানে আমরা যে অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছি এবং এই অবস্থায় ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করার বাধাবিঘ্ন সম্পর্কেও গতকাল আলোচনা করিয়াছি। আপনারা জানেন যে, রাষ্ট্রপতি তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী সদস্য লইয়া ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করিতে পারেন। এ বিষয়ে আমরা বা অন্য কাহারও নিকট হইতে কোনরূপ সম্মতি লওয়ার দরকার হয় না। তথাপি রাষ্ট্রপতি নিজের ইচ্ছানুযায়ী ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা সঙ্গত মনে করেন নাই। তাঁহার এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা বিশেষ কঠিন হইত না, কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা ছিল, ত্রিপুরী প্রস্তাব অনুযায়ী একটি শক্তিশালী ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা—যাহাতে যুদ্ধের সমস্যা উদ্ভব হইলে কংগ্রেস একযোগে তাহার সম্মুখীন হইতে পারে।

"এই সমস্ত সর্ত্ত পূরণ না করিয়াও তিনি তাঁহার ক্ষমতার বলে হয়তো ওয়ার্কিং কমিটি নিযুক্ত করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা হইলে তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইত না। কাজেই মহাত্মা গান্ধী ও কতিপয় সহকর্মীর সহিত আলাপ আলোচনা না করা পর্যন্ত তিনি এবিষয়ে কোনরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে বিরত থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, মহাত্মা গান্ধী, রাষ্ট্রপতি ও অন্যান্য নেতার মধ্যে আলাপ আলোচনা করিয়াও কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর হয়

নাই। আমি আশা করিয়াছিলাম যে, শীঘ্রই এবিষয়ে একটা আপোষ হইয়া যাইবে।

"গতকল্য রাষ্ট্রপতি যখন পদত্যাগপত্র দাখিল করেন, নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতি কর্ত্তৃক ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু উক্ত পন্থা অবলম্বন করা আমার নিকট অত্যন্ত দুঃখজনক বোধ হয়। যদিও নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতি ইচ্ছা করিলে ওয়ার্কিং কমিটি নির্ব্বাচন করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা হইলে অত্যন্ত গোলযোগের সৃষ্টি হইত। কাজেই সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, রাষ্ট্রপতিকে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিতে এবং পুরাতন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণকে লইয়া নূতন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করিতে অনুরোধ করা আমাদের বর্ত্তমান কর্ত্তব্য।

"এই সঙ্গে, আমি ইহাও বলিয়াছিলাম, ওয়ার্কিং কমিটিতে নূতন সদস্য গৃহীত হওয়া বাঞ্ছনীয়; কারণ ওয়ার্কিং কমিটি তাহা হইলে জাতীয় সংগ্রামে নূতন আদর্শ ও নূতন প্রেরণায় নূতন শক্তির সন্ধান পাইবেন। আমি আপনাদিগকে বলিয়াছি, পুরাতন ওয়ার্কিং কমিটির দুইজন সদস্যের নানাকারণে কমিটিতে যোগ না দিবার সম্ভাবনা আছে এবং কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টকে তাঁহাদের শূন্যপদ পূরণ করিতে হইবে। আমার বক্তৃতায় এই সকল বিষয় আমি উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু সব কিছু আমার প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয় নাই। এই সকল বিষয় সুস্পষ্টভাবে আমার প্রস্তাবে উল্লেখ করা না হইলেও প্রস্তাব প্রসঙ্গে বক্তৃতায় ইহা আমি আপনাদিগকে খুলিয়া বলিয়াছি।

"এখন দেখিতেছি, রাষ্ট্রীয় সমিতির কোন কোন সদস্য মনে করেন, আমার প্রস্তাব দ্বারা আমি রাষ্ট্রপতির উপর নূতন কিছু চাপাইয়া দিবার চেষ্টা পাইয়াছি। আমার প্রস্তাবের সেরূপ কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। অবস্থা যেরূপ তাহাতে ঐরূপ কিছু আরোপ করিবার উদ্দেশ্যে প্রস্তাব উত্থাপন ও প্রেসিডেণ্টের চরম সিদ্ধান্ত অবগত হইবার পর রাষ্ট্রীয় সমিতি কর্ত্তৃক ঐরূপ অভিসন্ধিপূর্ণ কোন প্রস্তাব গ্রহণ সম্পূর্ণ অর্থহীন। এ অবস্থায় এই প্রস্তাবের আলোচনা, সময়ের অপচয় মাত্র। আমার প্রস্তাব প্রেসিডেণ্ট অনুমোদন করিবেন, একমাত্র সেই উদ্দেশ্যেই এই প্রস্তাব উত্থাপন করা হইয়াছিল। প্রেসিডেণ্ট যদি আমার প্রস্তাবে সম্মত হন,—ভাল কথা। তিনি যদি ইহাতে সম্মত না হন, আমি আমার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিব আশা করি, প্রেসিডেণ্ট আমার প্রস্তাবে সম্মত হইবেন। আমার এই আশার যুক্তি কি, তাহা আপনাদের নিকট নির্ভয়ে খুলিয়া বলিব। আমার প্রস্তাব অনুযায়ী কার্য্য হইলে প্রেসিডেণ্টের উপর যে জটিল সমস্যা আরোপিত ছিল, তাহা কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব হইত এবং তিনি দেশের স্বার্থে খানিকটা স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত কার্য্যপথে অগ্রসর হইতে সুবিধা পাইতেন। আমার প্রস্তাবের একমাত্র ইহাই উদ্দেশ্য ছিল। আমার প্রস্তাব তাঁহার মনের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহা আমি অবগত নহি। বর্ত্তমানে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া আমি তাঁহাকে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ জানাইতেছি। কিন্তু সর্ব্বদিক বিবেচনা করিয়া প্রেসিডেণ্ট যদি আমার প্রস্তাব অনুমোদন না করেন, তাহা হইলে আমার ও আপনাদের নিকট এই প্রস্তাব সমভাবে মূল্যহীন। তাহা হইলে আমি আমার প্রস্তাব প্রত্যাহারের অনুমতি প্রার্থনা করি। যে কোন অবস্থায়ই এই প্রস্তাবের সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপনের কোনও হেতু নাই। যখন যাবতীয় বিষয় প্রেসিডেণ্টের উপর নির্ভর করিতেছে তখন আমরা এই প্রস্তাব সম্পর্কে সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন বা আলোচনার জন্য জিদ করিতে পারি না। প্রেসিডেণ্ট যদি প্রস্তাব অনুমোদন করেন তাহা হইলে সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপনের প্রয়োজন হয় না। বিনা আলোচনায় প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত,—কারণ গতকল্য আমরা যে ধরণের আলোচনা শুনিয়াছি তাহাতে সমস্যা মীমাংসা হইবে না। নীতি লইয়া যদি কিছু মত বিরোধ থাকে, তাহা হইলে আমরা সে সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে পারি। কিন্তু এক্ষেত্রে ঐ ধরণের আলোচনায় পুরাতন বিতর্কের পুনরাবির্ভাব হইবে এবং তাহাতে সমস্যা সমাধানের কোনই সাহায্য হইবে না। ফলে অন্যান্য প্রস্তাব আলোচনায় তিক্ততার সৃষ্টি হইতে পারে।

"প্রেসিডেণ্ট যদি আমার প্রস্তাবে সম্মত হন, তাহা হইলে আপনারা বিনা আলোচনায় ইহা গ্রহণ করুন এবং তিনি যদি ইহা গ্রহণযোগ্য মনে না করেন,সভা আমাকে প্রস্তাব প্রত্যাহারের অনুমতি দিবেন, ইহাই আমার অনুরোধ।

রাষ্ট্রপতির বিবৃতি

অতঃপর রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু নিম্নলিখিত বিবৃতি দেনঃ—

"এক্ষণে যে প্রস্তাব সভার আলোচ্য উহার সহিত আমি বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। ইহার সম্বন্ধে আমার প্রতিক্রিয়া কিরূপ হইবে তাহা ব্যক্ত করিতে পারিলে আলোচনার সাহায্য হইবে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আমাকে পদত্যাগ-পত্র প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করিয়া প্রস্তাব উত্থাপন করায় আমি আপনাকে বিশেষ সম্মানিত মনে করি। কিন্তু যে হেতু আমি লঘুভাবে পদত্যাগ-পত্র দাখিল করি নাই সেই হেতু কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বে আমাকে গভীরভাবে চিন্তা করিতে হইবে। সেইজন্য গতকল্য সন্ধ্যায় আলোচনা মুলতুবী রাখায় আমি আনন্দ প্রকাশ করিতেছি।

মহাত্মা গান্ধী ও পূর্ব্বেমত ওয়ার্কিং কমিটির কতিপয় সদস্যের সহিত আমার ঘরোয়াভাবে আলোচনার সময়ে যে প্রস্তাব করা হইয়াছিল বর্ত্তমান প্রস্তাব কার্য্যতঃ উহার অনুরূপ। সাধারণতঃ আমার নিকট মহাত্মাজীর কথাই আইন; কিন্তু যে স্থলে নীতি জড়িত সেইস্থলে আমি আপনাকে কোন কোন সময়ে তাঁহার প্রস্তাব বা উপদেশ গ্রহণে অশক্ত মনে করি।

দুর্ভাগ্য বশতঃ মহাত্মাজী যখন ওয়ার্কিং কমিটি মনোনয়ন দ্বারা আমাদিগকে সাহায্য করা সম্ভবপর নয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তখন নির্দ্দেশ গ্রহণ না করিয়া আমাদের পক্ষে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা সংগত হইবে ? বন্ধুগণ, এই প্রশ্নের উত্তর দিবার ভার আপনাদের উপর রহিল

এক্ষণে সমস্যার ব্যবহারিক দিক সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এই দিক হইতে বিচার করিলে প্রধান প্রশ্ন এই যে, বর্ত্তমান সময়ের এবং আগামী কয়েক মাসের জন্য কিরূপ মন্ত্রণাসভা দরকার ?

গত বৎসর হরিপুরে আমি পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রণা সভার (ওয়ার্কিং কমিটি) তিনজন সদস্য পরিবর্ত্তন করিয়াছিলাম। আমার নিজের সুস্পষ্ট অভিমত এই যে, প্রতি বৎসর নূতন রক্ত সঞ্চার করা উচিত। নীতি অব্যাহত রাখিবার জন্য পূর্ব্বের সদস্যগণের এখাধিক্য রাখা যাইতে পারে। কিন্তু ভারতের ন্যায় বিরাট দেশে কংগ্রেসের সর্ব্বোচ্চ কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি দল বিশেষের একচেটিয়া থাকা উচিত নহে। সুতরাং প্রতি বৎসর স্বাভাবিক অবস্থায় পরিবর্ত্তন হওয়া উচিত।

কিন্তু বর্ত্তমানের ন্যায় জরুরী অবস্থায় কি করা যাইতে পারে ? আপনারা জানেন যে, গ্রেট বৃটেনের ন্যায় দেশে—যেখানে নির্দ্দিষ্ট মতাবলম্বী রাজনৈতিক দল বিদ্যমান—সেখানে সমরাশংকা কিংবা জাতীয় সংকট সমস্ত রাজনৈতিক বাধাবিঘ্ন সমতল করিয়া দিয়া বিভিন্ন মতসম্পন্ন ব্যক্তিদের সম্মিলিত করিয়া দেয়। বিভিন্ন মতসম্পন্ন ব্যক্তিদের সংমিশ্রণে এরূপ কমিটি গঠিত হয়, যাহারা স্বাভাবিক অবস্থায় পরস্পর পরস্পরকে ঘোর শত্রু বলিয়া মনে করে। ফ্রান্স প্রভৃতি অনেক পাশ্চাত্য দেশে

জাতীয় সংহতিমূলক মন্ত্রিসভা গঠন একটা সাধারণ জিনিষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের স্বদেশ হিতৈষণা কি বৃটিশ কিংবা ফরাসীদের চেয়ে কম যে, তাহারা যাহা করে, আমরা তাহা করিতে পারিব না? তাহাদের চেয়ে আমরা কোন অংশে নিকৃষ্ট একথা আমি ভাবিতেও পারি না।

অপ্রত্যাশিতভাবে সম্মুখে অগ্রসর হইবার মনোভাব সম্পন্ন একটি দৃঢ় ওয়ার্কিং কমিটি যদি আমরা চাই তাহা হইলে কমিটিতে কংগ্রেসের বিভিন্ন মতাবলম্বী দলের প্রতিনিধিগণকে নিযুক্ত করিতে হইবে এবং যাহারা কংগ্রেসের নীতিকে চালু রাখিবে তাহাদের সংখ্যাধিক্য কমিটিতে রাখিতে হইবে। যদি আমরা উৎসাহী নবীনগণকে প্রবেশ করিতে না দেই তাহা হইলে ওয়ার্কিং কমিটি শক্তি ও ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হইবে। বৃটেন ও অন্যান্য দেশে যুদ্ধের সঙ্কটের সময় এক দলীয় মন্ত্রিসভার স্থলে "জাতীয়" মন্ত্রিসভা নিযুক্ত করার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে এখানেও কি আমরা সেই একই প্রয়োজন অনুভব করিতেছি না?

বলা যাইতে পারে যে এইরূপ বিভিন্ন মতাবলম্বী সদস্য লইয়া ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করিলে রীতিমত কাজ করার পক্ষে অসুবিধা হইবে। কিন্তু এইরূপ আশঙ্কার কোন ভিত্তি নাই। কংগ্রেস কিংবা নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে বিভিন্ন মতাবলম্বী লোক আছেন। কিন্তু তাহাতে কি আমাদের মধ্যে অধিকাংশ বিষয়ে মতৈক্য দেখা যায় না? আমরা যাহারা কংগ্রেসের বর্তমান গঠনতন্ত্র, উদ্দেশ্য এবং নীতি গ্রহণ করিয়াছি, তাহারা সকলেই কি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নহি? এইদিক দিয়া বিচার করিলে অর্থাৎ বহির্জগত সম্পর্কে সকল কংগ্রেস কর্মীই কি এক মতাবলম্বী নয়? আমরা মাঝে মাঝে 'একমত' শব্দটির অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ অর্থ করি। ১৯৩৪ সাল হইতে কংগ্রেসের প্রকৃতির কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে একথা যেন আমরা স্বীকার করি। এই পরিবর্তিত অবস্থা ওয়ার্কিং কমিটিতেও প্রতিফলিত হওয়া উচিত, যাহাতে ওয়ার্কিং কমিটি সমগ্র কংগ্রেসের প্রকৃত প্রতিনিধি হইতে পারে।

অধিকন্তু প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচনে যে ভাবে ভোটাভুটি হইয়াছে, তাহার ফল আমাদের ভুলিলে চলিবে না। আমরা কি যুগধর্ম্মের সহিত সমান তালে অগ্রসর হইবে না এবং ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনের প্রতি লক্ষ্য রাখিব না?

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বর্ত্তমান মনোভাব আমি অবগত নহি। কিন্তু যদি আপনারা চাহেন যে, আমি রাষ্ট্রপতি পদে থাকিব, তবে আমি পূর্ব্বে যাহা বলিলাম তাহার কতকটা আপনাদের জানিয়া লওয়া চাই। কিন্তু যদি আপনারা অন্যরূপ বিবেচনা করেন তবে আপনারা আমাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক রাষ্ট্রপতি পদের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দিবেন।

আমাদের সম্মুখে ঘোর বিপদ উপস্থিত। যে বিপদ আমাদের সম্মুখে ঘনাইয়া আসিতেছে, আমরা যদি তাহা কাটাইয়া উঠিতে চাই তবে আমাদের সমস্ত শক্তি একযোগে প্রয়োগ করিয়া সমবেত প্রচেষ্টা করিতে হইবে। আমি এতকাল আমার ক্ষুদ্র শক্তি দ্বারা যতদূর সম্ভব সাহায্য করিব। আমি যদি রাষ্ট্রপতি না থাকি তবে তাহাতে কি আসে যায়? আমি সর্ব্বদা কংগ্রেস ও জাতির সেবা করিতে প্রস্তুত থাকিব। আমি বলি দেশের এই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি—সংগ্রামে সামান্য সৈনিকের ন্যায় সংগ্রাম করিতে পারি, আমার এতটুকু দেশভক্তি ও শৃঙ্খলা নিষ্ঠা আমার আছে বলিয়া আমি মনে করি।

শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর প্রশ্ন

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর বিবৃতির পর শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু বলেন, অনেকের মনে এই ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হইয়াছে যে, পণ্ডিত নেহরুর প্রস্তাবে রাষ্ট্রপতির উপর চালাকির দ্বারা বাধ্য-বাধকতা চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পণ্ডিত নেহরু উদার মনোভাব লইয়াই এই প্রস্তাব আনিয়াছেন। কোন কোন সংবাদপত্র ও নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অনেক সদস্য পণ্ডিত নেহরুর সদিচ্ছায় সন্দিহান হইয়াছেন দেখিয়া তিনি ব্যথিত হইতেছেন। পণ্ডিত নেহরুর প্রস্তাবে খোলাখুলিভাবে সহযোগিতার জন্য আবেদন করা হইয়াছে। তাঁহার বক্তৃতায় সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা নিশ্চয়ই দূর হইয়াছে। ওয়ার্কিং কমিটিতে নবীন লোক গ্রহণ করা উচিত বলিয়া শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু যে বিবৃতি দিয়াছেন, তিনি তাহার পূর্ণ সমর্থন করেন। কিন্তু উহা বিবেচনার সহিত করিতে হইবে। তিনি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, ওয়ার্কিং কমিটিতে ঐজন্য দুইটি আসন পাওয়া যাইবে এবং অন্যান্য পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হইবারও সম্ভাবনা আছে। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু তাঁহার পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিতেছেন কি-না এবং দেশের জাতীয় অধিনায়করূপে থাকিতে প্রস্তুত আছেন কি-না, তাহার সোজাসুজি উত্তর দিবার জন্য তিনি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্রকে অনুরোধ করেন। জাতির আহ্বান অনুসারে কাজ করিতে কংগ্রেস-সভাপতি বাধ্য। প্রস্তাব সম্বন্ধে আর বক্তৃতা করা বা প্রস্তাবের উপর কোন সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করা বাঞ্ছনীয় নয় বলিয়া শ্রীযুক্তা নাইডু অভিমত প্রকাশ করেন।

পণ্ডিত নেহরুর প্রস্তাব প্রত্যাহার

শ্রীযুত বসু বলেন, এইমাত্র আমি আমার বিবৃতিতে আমার বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছি, বিবৃতিতে যাহা বলিয়াছি, তাহার বেশী আমার আর কিছু বক্তব্য নাই।

আমার পদত্যাগ সম্পর্কে প্রথমেই আমি বলিয়াছি, আমি সহযোগিতার মনোভাব লইয়াই পদত্যাগপত্র পেশ করিয়াছি। যদি আপনারা যখন তখন আমাকে চূড়ান্ত জবাব দেওয়ার জন্য বলেন, যেমন সভানেত্রী বলিয়াছেন, তবে আমি বলিতে পারি যে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির গৃহীত প্রস্তাবের উপরই আমি আমার চূড়ান্ত জবাব দিতে পারি। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি কি ধরণের প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন, এই অবস্থায় আমি তাহা বলিতে পারি না এবং যে পর্য্যন্ত আমি তাহা না জানি, সে পর্য্যন্ত আমার পক্ষে চূড়ান্ত জবাব দেওয়া সম্ভব নহে। (ধ্বনি)। আমি ইহাও বলিতে চাই যে, আমি আমার মনোভাব পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছি। আমার মনোভাব বেয়াড়া নহে। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রত্যেক সদস্য তাহা মনে করিবেন আমি ঐক্য চাই। যে ঐক্যের দ্বারা কাজ হইবে, তাহাই চাই। যাহার দ্বারা কাজ হইবে না, তাহা চাই না। (ধ্বনি)।

অতঃপর পণ্ডিত জওহরলালকে তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাহারের অনুমতি দেওয়া হয়।

শ্রীযুক্ত নরীম্যান কর্ত্তৃক বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপন

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিলে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু বলেন যে, কংগ্রেস সভাপতি পদত্যাগ করিয়াছেন, কাজেই একজন নূতন সভাপতি নির্ব্বাচন করা প্রয়োজন। এই সময়ে কয়েকজন সদস্য বলেন যে, পদত্যাগপত্র গৃহীত হয় নাই। কিন্তু অন্য কয়েকজন সদস্য বলেন যে, এই সভার পক্ষে পদত্যাগপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করিবার কোনও প্রয়োজন নাই।

শ্রীযুক্ত নরীম্যান এই মর্ম্মে একটি বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রে এইরূপ বিধান আছে যে, প্রতিনিধিগণ কর্ত্তৃক সভাপতি নির্ব্বাচনের জন্য কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদককে একটি দিন স্থির

করিতে হইবে। যদি এই কার্য্যক্রম অনুসরণ করা সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলেই শুধু নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি সভাপতি নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন। শ্রীযুক্ত নরীম্যান মন্তব্য করেন যে, প্রতিনিধিগণ কর্ত্তৃক সভাপতি নির্ব্বাচন অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে—বর্ত্তমানে এইরূপ কোনও অবস্থার উদ্ভব হয় নাই।

এই সময় সভায় কিঞ্চিৎ গোলযোগের সৃষ্টি হয় এবং কয়েকজন সদস্যকে "না-না" বলিয়া চীৎকার করিতে শোনা যায়।

শ্রীযুক্ত নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের প্রস্তাব

ইতিমধ্যে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ঘোষণা করেন যে, তিনি শ্রীযুক্ত নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারকে নিম্নলিখিতমর্ম্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিতে অনুমতি দিয়াছেনঃ—

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু যে বিবৃত দিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু তাঁহার পদত্যাগপত্রে যেরূপ মানসিক অবস্থার উল্লেখ করিয়াছেন তাহা বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে (শ্রীযুক্ত বসুকে) পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করা হউক।

শ্রীযুক্ত এ এস আয়েঙ্গার একটি বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া বলেন যে, এই সভা শ্রীযুক্ত জওহরলাল নেহরুর প্রস্তাব সম্পর্কে পূর্ব্বেই ইহার অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন; কাজেই এই ব্যাপারের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। এই সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন যে, শ্রীযুক্ত দত্ত মজুমদারকে তাঁহার প্রস্তাব উত্থাপন করিতে দেওয়া যায় না। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু বলেন যে, যেরূপ অস্বাভাবিক অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে তিনি (শ্রীমতী নাইডু) নিয়মতন্ত্র বিরোধী কোনও কাজ করিলেও কিছু আসে যায় না। তাঁহারা (সদস্যগণ) পরে বলিতে পারিবেন যে, একজন নির্ব্বোধ সভাপতি নির্ব্বোধের মত রুলিং দিয়াছেন। কাজেই তিনি শ্রীযুক্ত দত্ত মজুমদারকে তাঁহার প্রস্তাব উত্থাপনে অনুমতি দিতেছেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার পূর্ব্বোল্লিখিত প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বলেন যে, কংগ্রেস সভাপতি পদত্যাগ করুন—তাঁহারা ইহা চাহেন না। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি সম্মিলিত ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের পক্ষপাতী—এইরূপ অভিমত নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিই [illegible] করিতে পারেন; কারণ শুধু এই সর্ত্তেই সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন। [illegible] ভূতপূর্ব্ব ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণকে

এই অনুরোধ করেন যে, তাঁহারা কংগ্রেস সভাপতিকে যেন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করিতে সাহায্য করেন।

শ্রীযুক্ত সরদেশাই এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। শ্রীযুক্ত দত্ত মজুমদার ও শ্রীযুক্ত সরদেশাই যখন বক্তৃতা করিতেছিলেন তখন তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিয়া ব্যতিব্যস্ত করা হয়।

অতঃপর অকস্মাৎ সভার কার্য্য স্থগিত হয় এবং নেতৃবৃন্দকে বেদীর উপরে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র ও শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর সহিত পরামর্শ করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে, ওয়ার্কিং কমিটি গঠন সম্পর্কে তাঁহার কয়েকটি পরিকল্পনা আছে। ঐ সমস্ত সর্ত্ত পূরণ করা হইলেই তিনি সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত দত্ত মজুমদারের প্রস্তাবে এই ব্যাপারটির উল্লেখ করা নাই; কাজেই ঐ প্রস্তাব সন্তোষজনক নহে। সুতরাং তিনি শ্রীযুক্ত দত্ত মজুমদারকে তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতে বলেন। তদনুসারে শ্রীযুক্ত দত্ত মজুমদার তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন।

অতঃপর শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু বলেন যে, পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করা হয় নাই; কাজেই এই সভাকে এখন নূতন সভাপতি নির্ব্বাচন করিতে হইবে। বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া শ্রীযুক্ত নরীম্যান যে বক্তৃতা সুরু করিয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহাকে তাহা শেষ করিতে অনুমতি দেওয়া হয়। শ্রীযুক্ত নরীম্যান মন্তব্য করেন যে, এই সভার নূতন সভাপতি নির্ব্বাচনের অধিকার নাই।

শ্রীযুত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্রের সমর্থন

শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র বৈধতার প্রশ্নটি সমর্থন করিয়া বলেন যে, সভাপতি নির্ব্বাচন করা ডেলিগেটদের মৌলিক অধিকার। কংগ্রেস গঠনতন্ত্রের অন্য কোন ব্যাখ্যা করা চলে না। উপরন্তু নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সভ্যদিগকে সভাপতি নির্ব্বাচন হইবে বলিয়া ইতিপূর্ব্বে নোটিশ দেওয়া হয় নাই। সমিতির ৪৮০জন সভ্যের মধ্যে মাত্র ২৮৫ জন উপস্থিত আছেন; এক-তৃতীয়াংশের অধিক সদস্য এই অধিবেশনে যোগ দেন নাই। সুতরাং এই অবস্থায় রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচন বৈধ হইবে না।

শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাই কর্ত্তৃক বৈধতার প্রশ্নের বিরোধিতা

শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই বৈধতার প্রশ্নটির বিরোধিতা করেন। তিনি কংগ্রেস গঠনতন্ত্রের ১০নং বিধানের উল্লেখ করিয়া বলেন,—এই সংক্রান্ত যে কয়টি বিধান রহিয়াছে, তাহার সব কয়টিতেই কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির বিষয় বলা হইয়াছে। কিন্তু আজ এক বিশেষ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, কংগ্রেস আছে, কিন্তু তাহার ওয়ার্কিং কমিটি, সভাপতি বা সম্পাদক নাই। ফলে এমন এক জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, যাহা ইতিপূর্ব্বে আর হয় নাই। এখনই একজন রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনের দায়িত্ব গ্রহণ না করিলে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি তাহার কর্ত্তব্যে অবহেলা করিবেন। গঠনতন্ত্র অনুসারে অভূতপূর্ব্ব ব্যাপারে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের দায়িত্ব গ্রহণ করার অধিকার নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির আছে; বর্ত্তমানেও আমরা একটা অভূতপূর্ব্ব ব্যাপারে সম্মুখীন হইয়াছি।

এই অবস্থায় নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনের পক্ষে উপযুক্ত বলিয়া শ্রীযুত দেশাই মত প্রকাশ করেন।

শ্রীযুত দেশাইর বক্তব্য শেষ হইলে তাঁহার একটি উক্তির সংশোধন করিয়া শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু বলেন, বর্ত্তমানে কংগ্রেসের কোন সেক্রেটারী নাই, এমন কথা বলা ভুল। কংগ্রেসের অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদক আছেন; আর রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচন করা যদি স্থির হয়, তবে তাহার ব্যবস্থা নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্যালয় হইতেই করা চলিবে।

শ্রীযুক্তা নাইডুর নির্দ্দেশে সভামণ্ডপে বিক্ষোভ

অতঃপর শ্রীযুক্তা নাইডু এই নির্দ্দেশ দেন যে, নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিই রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন। তদনুসারে তিনি সভাকে কাজ আরম্ভ করিতে বলেন।

নূতন রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচন

তখন ডাঃ চৈতরাম গিদোয়ানী রাষ্ট্রপতি পদের জন্য বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের নাম প্রস্তাব করেন এবং শ্রীযুত মোহনলাল শকসেনা তাহা অনুমোদন করেন।

শ্রীযুত দেবেন দে আচার্য্য কৃপালনীর নাম প্রস্তাব করেন। শ্রীযুত মাখনলাল সেন কর্ত্তৃক তাহা সমর্থিত হয়। এই সময় আচার্য্য কৃপালনী রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণে তাঁহার অসম্মতি জ্ঞাপন করেন।

সভানেত্রী তখন ডাঃ চৈতরাম গিদোয়ানীর প্রস্তাবটি ভোটে দেন; প্রস্তাবটি ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়। এই সময় বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের সমর্থকগণ "গান্ধীজীকী জয়" ধ্বনি তুলিলেও অধিকাংশ লোকই ধিক্কার দিতে থাকেন।

অতঃপর [illegible] রাজেন্দ্রপ্রসাদ বক্তৃতা দেওয়ার জন্য মঞ্চের উপর যান। তখনও কোন কোন দিক হইতে 'ধিক্কার' ধ্বনি উঠিতে থাকে। তাহাতে নূতন রাষ্ট্রপতির বক্তৃতা দেওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু বিক্ষুব্ধ দর্শকদিগকে

শান্ত ভাব ধারণ করিতে বলেন এবং সভার কার্য্য যাহাতে যথাযথভাবে চলিতে পারে, তজ্জন্য তাঁহাদের সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। শ্রীযুত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্রও দর্শকদিগকে শান্ত থাকিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু গোলমাল তবুও চলিতে থাকে। এই অবস্থায় শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু বলেন, দর্শকবৃন্দ গোলমালের সৃষ্টি করিয়া সভার কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটাইলে বাধ্য হইয়া রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন মুলতুবী রাখিতে হইবে এবং পরবর্ত্তী অধিবেশনে দর্শকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিতে হইবে। এই সময় কিছুক্ষণের জন্য গোলমাল কতকটা হ্রাস পাইলেও শেষ পর্য্যন্ত 'শেম শেম', 'ফিরিয়া যাও' প্রভৃতি বিদ্রূপাত্মক ধ্বনি চলিতে থাকে। ঐ অবস্থায়ই বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ বক্তৃতা দেন।

বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদের বক্তৃতা

বিষম হট্টগোলের মধ্যে বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ বক্তৃতা প্রসঙ্গে সমবেত সদস্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলেন,—

বন্ধুগণ! নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি আমাকে প্রেসিডেন্টের গুরু দায়িত্ব সম্পন্ন করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। আমাদের সম্মুখে যে বিপুল সমস্যা উপস্থিত গত কয়েকদিন ধরিয়া আমরা তদ্বিষয়ে আলোচনা করিতেছি এবং সন্তোষজনক মীমাংসায় উপস্থিত হইবার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু এ কয়দিন যেসকল ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহাতে আমি সুখী হইতে পারি নাই। দেশ যে পরিস্থিতির সম্মুখীন—কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং অন্যান্য যে সকল ব্যাপার আমাদের সম্মুখে সমুপস্থিত, তাহাতে প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হওয়া একেবারেই সুখের বিষয় নহে এবং প্রেসিডেন্টের কর্ম্মক্ষেত্রও কুসুমাস্তীর্ণ নহে। আমি নানা অসুবিধার বিষয় এবং বর্ত্তমান পরিস্থিতির ফলে যে পরীক্ষার মধ্য দিয়া যাইতে হইবে এবং যে সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইবে, তদ্বিষয় অন্যের অপেক্ষা বেশী অনুভব করিতেছি। কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হিসাবে আমার সে অনুভূতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সুতরাং আপনাদের আদেশ পালন করা আমার পক্ষে মোটেই সুখের বিষয় নহে।

প্রেসিডেন্টের গুরু দায়িত্ব বহন করার জন্য আমরা শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়াছিলাম। তাঁহার নিজের পছন্দ মত অর্থাৎ যাঁহারা পুরোপুরি তাঁহার মতের পরিপোষক, এমন লোক লইয়া ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম এবং যতদূর সম্ভব অর্থাৎ মতানৈক্য না ঘটা পর্যন্ত আমরা তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলাম। আমি তাঁহাকে আরও প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম যে, তিনি পছন্দ মত ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করিলেও আমি নিজে তো তাঁহার বিরোধী হইবই না, পরন্ত অন্য কেহই তাঁহার বিরোধিতা করিবেন না। সে ক্ষেত্রে কোনরূপ বাধা সৃষ্টির মোটেই সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তিনি আমাদের সহিত একমত হইতে পারিলেন না। এইরূপ অবস্থায় তিনি পদত্যাগ করাই সমীচীন মনে করিলেন। আমি সেজন্য অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি।

আজ আমরা যে অবস্থায় নিপতিত, সেই অবস্থার বিষয় বিবেচনা করিয়া আমি আপনাদের সকলের নিকট এই নির্ব্বন্ধাতিশয্য জানাইতেছি যে, নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্যগণ সকলেই আমাকে সমর্থন করিবেন, আমার প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হইবেন এবং সদিচ্ছা পোষণ করিবেন। সকলের ঐকান্তিক সাহায্য ও সহযোগিতা ভিন্ন কোনও প্রেসিডেন্টের পক্ষেই সাফল্য লাভের সম্ভাবনা নাই।

বর্ত্তমান অবস্থাধীনে প্রেসিডেন্টের অসুবিধা দ্বিগুণ হইয়াছে। সুতরাং আপনাদের সহযোগিতা, সদিচ্ছা ও সাহায্য ভিন্ন কোনও কিছু করা সম্ভব নহে। আপনারা আমার নির্ব্বাচন ঘোষণায় আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। আপনাদের সেই আনন্দ ধ্বনিতে আমার দায়িত্ব ও সুবিধা অসুবিধার বিষয় স্মরণ করাইয়া দিতেছি। সদস্যগণ যে মতাবলম্বীই হউন এবং তাঁহাদের মধ্যে যত বিরোধ বিতণ্ডাই থাকুক, আমি আশা করি, তাঁহারা অকপটে আমাকে সাহায্য করিবেন। এই বিশ্বাস ও এই আশায়ই আমি আপনাদের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। যাহা ঘটিয়াছে অনেকে তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহাদের অসন্তোষের কারণ আছে, সন্দেহ নাই। সেজন্য আমি তাঁহাদিগকে দোষ দিতেছি না। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্যগণ আমার স্কন্ধে এই গুরু ভার চাপাইয়া দিতেছেন। যদি কখনও আমি ঘুণাক্ষরে জানিতে পারি যে, আপনারা আমাকে চান না, অথবা আমি প্রেসিডেন্ট পদে বহাল থাকি, ইহা আপনাদের অভিপ্রায় নহে বলিয়া যদি আমি বুঝিতে পারি, বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় তখনও আমি আপনাদের আদেশ পালন করিব। কংগ্রেসে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, আপ্রাণ চেষ্টায় তদনুযায়ী কার্য্য করা আমার একমাত্র কর্ত্তব্য হইবে।

সম্প্রতি আমরা কোনও নূতন নীতি ঘোষণা করিতে চাই না। কংগ্রেস যে নীতি পূর্ব্বেই প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। এখন আমাদিগকে ঐ নীতি অনুসারে কাজ করার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। আমি আশা করি, সেই পন্থা নির্দ্দেশের সময় আমরা সকলে একমত হইব এবং সকলেরই সহযোগিতা লাভ করিব। এখন যে হট্টগোল চলিয়াছে তাহার মধ্যে আমার বক্তব্য শুনিবার জন্য আপনাদিগকে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হইতেছে। আমি আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, সভার কার্য্য চালান অথবা স্থগিত রাখা আপনাদের কি অভিপ্রায়? আমি আশা করি, আপনারা আপনাদের মতামত প্রকাশ করিবেন। আমি আপনাদের আদেশ মানিয়া চলিব। বর্ত্তমান অবস্থায় বক্তার পক্ষেও বক্তৃতা দেওয়া যেমন কষ্টকর, শ্রোতার পক্ষে সে বক্তৃতা শুনাও তেমনি কষ্টকর। তবে এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণরূপে আপনাদের মতামতের উপর নির্ভর করিতেছি। আমি জানিতে চাই,—সভার কার্য্য স্থগিত রাখাই আপনাদের অভিপ্রায় কি-না।

অধিকাংশ সদস্য সভা স্থগিত রাখার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন।

তখন বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেন,—বর্ত্তমানে আমাদের কোনও ওয়ার্কিং কমিটি নাই। সুতরাং ওয়ার্কিং কমিটির কোনও কার্য্যসূচীও এই অধিবেশনের আলোচ্য নহে। আমাদের আলোচ্য কতকগুলি প্রস্তাব আছে; সদস্যগণ ঐ সকল প্রস্তাবের যথারীতি নোটিশ দিয়াছেন। ঐ সকল প্রস্তাব সম্পর্কে ব্যালট গ্রহণ করা হইয়াছে। তবে প্রস্তাবগুলি আলোচনা করিবার সময় আমাদের নাই। আমার মতে, প্রথমে আমরা ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের বিষয় আলোচনা করি এবং ঐ ওয়ার্কিং কমিটি আপনাদের নিকট যে কার্য্যসূচী উপস্থিত করিবেন তদ্বিষয় চিন্তা করি। সেই উদ্দেশ্যে এবং সভার কার্য্য সহজ ও সুগম করার উদ্দেশ্যে অদ্যকার মত সভা স্থগিত রাখা হউক। আগামীকল্য যখন আমরা সমবেত হইব, তখন সম্ভবতঃ অবস্থার কতকটা উন্নতি হইবে এবং আমরা ব্যবসায়ীর নীতিতে সভার কার্য্য পরিচালনায় সমর্থ হইব।

শেষ দিনের অধিবেশন

১লা মে, বেলা ১-২০ মিনিটে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ সভাস্থলে পৌঁছেন। স্বেচ্ছাসেবকগণ ব্যাণ্ড বাজাইয়া নবনির্ব্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে মঞ্চোপরি লইয়া আসেন; রাষ্ট্রপতির সম্মানার্থ নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সভ্যগণ দণ্ডায়মান হন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদিগের একদল তুমুল "সেম্ সেম্" ধ্বনি করিয়া উঠেন। রাজেন্দ্রবাবু করজোড়ে সকলকে অভিবাদন করেন। তিনি বক্তৃতা-মঞ্চে আসিয়া দাঁড়াইলে তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করা হয়; রাষ্ট্রীয় সমিতির বহু সদস্য এই সময় তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন; দর্শকগণ কিন্তু পুনরায় তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বিপুলভাবে "সেম্ সেম্" করিয়া উঠেন; দুই একজন নূতন রাষ্ট্রপতিকে

লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠেন, "বাহির হইয়া যান।"

তারপর পরলোকগত কবি ইকবালের "হিন্দুস্থান হামারা" সংগীতটি গীত হয়।

সংগীতের পর রাজেন্দ্রবাবু নূতন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন।

১। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ
২। শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু
৩। সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল
৪। খাঁ আব্দুল গফুর খাঁ
৫। শেঠ যমুনালাল বাজাজ
৬। ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া
৭। শ্রীযুত জয়রামদাস দৌলতরাম
৮। আচার্য্য জে বি কৃপালনী
৯। শ্রীযুত শঙ্কররাও দেও
১০। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মহাতাপ
১১। শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই
১২। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়
১৩। ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ

তিনি তখন বলেন যে, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু নূতন ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য হইতে রাজী হন নাই, তখন চতুর্দ্দিকের দর্শকমণ্ডলী তুমুল উল্লাসভরে "হিয়ার, হিয়ার" বলিয়া উঠেন।

তারপরে রাজেন্দ্রবাবু যখন বলেন যে, নূতন ওয়ার্কিং কমিটিতে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু ও শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর স্থলে বাঙলাদেশ হইতে ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে লওয়া হইল, তখন দর্শকগণ তুমুল "সেম সেম" করিয়া উঠেন।

দর্শকের গ্যালারী হইতে জনৈক লোককে বলিতে শুনা যায়, "ডাঃ বি সি রায় ত' লিডারই নয়, ও আবার ওয়ার্কিং কমিটির মেম্বার হবে কি রে?"

সম্প্রতি ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের মাজদিয়া ষ্টেশনে ট্রেণ দুর্ঘটনায় মনোরঞ্জন ব্যানার্জ্জি ও বীরেন্দ্রনাথ মজুমদারের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিবার জন্য রাষ্ট্রপতি একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন। রাজেন্দ্রবাবু মাজদিয়া দুর্ঘটনা ও মনোরঞ্জন ব্যানার্জ্জি ও বীরেন মজুমদারের নাম উচ্চারণ করা মাত্রই দর্শকদিগের মধ্য হইতে কয়েকজনকে বিদ্রূপভরে বলিতে শুনা যায়, "আহা আহা কি দরদরে। ন্যাকামি আর ক'রো না।" শোকজ্ঞাপক প্রস্তাবেই সভ্যগণ দণ্ডায়মান হইয়া গ্রহণ করেন।

বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু রাষ্ট্রপতি থাকাকালে কিরূপ যোগ্যতার সহিত কাজ করিয়াছেন তাহা উল্লেখ করিয়া শ্রীযুত বসুর প্রশংসা করেন। এই সময় পণ্ডিত নেকিরাম শর্ম্মা বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করেন যে, ত্রিপুরী কংগ্রেসে গৃহীত পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থের প্রস্তাব নবনির্ব্বাচিত রাষ্ট্রপতির উপর প্রযোজ্য কিনা—প্রযোজ্য হইলে মহাত্মাজীর ইচ্ছা অনুযায়ী নূতন ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হইয়াছে কিনা। উত্তরে নূতন রাষ্ট্রপতি বলেন যে, পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব তাঁহার উপর প্রযোজ্য নহে, তবে মহাত্মাজীর সহিত পরামর্শ করিয়াই তিনি নূতন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করিয়াছেন।

জনৈক সদস্য—তাহা হইলে কি সুভাষবাবুর হাত-পা বাঁধিবার জন্যই পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব করা হইয়াছিল?

শ্রীযুত কে এফ নরীম্যান এই সময় বক্তৃতা-মঞ্চে যাইয়া রাষ্ট্রপতির পার্শ্বে দাঁড়ান; তাঁহাকে দেখিবামাত্র দর্শকগণ উল্লাসভরে চীৎকার করিয়া উঠেন। রাজেন্দ্রবাবু যখন জানান যে, শ্রীযুত নরীম্যান নূতন রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচন অবৈধভাবে করা হইয়াছে বলিয়া প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতে চাহেন, তখন দর্শকদিগের উল্লাসের মাত্রা আরও বাড়িয়া যায়। তৎপর শ্রীযুত নরীম্যান নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির ৩২ জনের পক্ষ হইতে এক বিবৃতি পাঠ করেন। ঐ বিবৃতিতে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদকে যে নিয়মে রাষ্ট্রপতি পদে নির্ব্বাচন করা হইয়াছে তাহার তীব্র প্রতিবাদ করা হইয়াছে। শ্রীযুত নরীম্যান যখন বিবৃতিটি পড়িতেছিলেন তখন বারম্বার দর্শকগণ উল্লাসভরে "হিয়ার হিয়ার" করিতে থাকেন। উল্লসিত চীৎকারের মাত্রা এত বেশী হয় যে, সময় সময় শ্রীযুত নরীম্যানের বক্তব্য বিষয় শুনা কঠিন হইয়া পড়ে। শ্রীযুত নরীম্যানের বিবৃতির শেষ পংক্তিটি ছিল, "আমরা নূতন রাষ্ট্রপতির বৈধতা চ্যালেঞ্জ করিতেছি।" শেষ পংক্তিটি পড়া মাত্র চতুর্দ্দিক হইতে "সেম সেম", "হিয়ার হিয়ার" ধ্বনি উত্থিত হয়। বিবৃতিটি পড়ার পর যে ৩২ জন সভ্য নূতন রাষ্ট্রপতির নির্ব্বাচন পদ্ধতির প্রতিবাদ করিতেছেন, তিনি তাঁহাদের নামগুলি পড়েন; তিনি বলেন যে, সময়াভাবে আরও স্বাক্ষর সংগ্রহ করা যায় নাই। যাঁহারা বিবৃতি দিয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই বাঙলা, বোম্বাই, পাঞ্জাব ও দিল্লীর।

বস্তুতঃ শ্রীযুত নরীম্যান যখন দাঁড়াইয়া বিবৃতিটি পড়িতেছিলেন, তখন অনেকেই মনে করিয়াছিলেন যে, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের পক্ষে বোধ হয় দর্শকগণকে সংযত রাখা সম্ভব হইবে না।

শ্রীযুত নরীম্যানের বক্তৃতার পর কি কি প্রস্তাব উপস্থিত করা হইবে তাহা জানাইবার জন্য যখন বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ দাঁড়ান, তখন পুনর্ব্বার চতুর্দ্দিক হইতে "সেম সেম", "বসে পড়ুন" ইত্যাদি রব উঠে।

বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ জানান যে, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু "যুদ্ধ ও ভারত গবর্ণমেণ্ট আইন সংশোধন "সম্পর্কিত একটি প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন। প্রস্তাবটি উপস্থিত করিবার জন্য পণ্ডিত জওহরলাল যখন বক্তৃতা-মঞ্চের দিকে আসিতে থাকেন, তখন তাঁহাকে তুমুলভাবে অভিনন্দিত করা হয়। পণ্ডিতজী প্রায় ১৫ মিনিটকাল বক্তৃতা করেন। ঐ সময় দর্শকগণ শান্তভাবে তাঁহার বক্তৃতা শুনেন।

মিঃ ভারদ্বাজ পণ্ডিত নেহরুর প্রস্তাব সম্পর্কে একটি সংশোধন প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন। কিন্তু পণ্ডিতজীর আশ্বাসে তিনি উহা প্রত্যাহার করেন। পণ্ডিত নেহরুর প্রস্তাব গৃহীত হয়।

অতঃপর শ্রীযুত শঙ্কর রাও দেও কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দুর্নীতি দূরীকরণের উদ্দেশ্য একটি সাব-কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন। রাষ্ট্রপতি, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, ডাঃ পট্টভি সীতারামায়া, নরেন্দ্র দেও ও আচার্য্য কৃপালনীকে লইয়া উক্ত সাব-কমিটি গঠন করা হইয়াছে।

শ্রীযুত দেবেন দে শ্রীযুত দেও'র প্রস্তাব সম্পর্কে এই মর্ম্মে একটি সংশোধন প্রস্তাব করেন যে, পূর্ব্বোক্ত সাব-কমিটির সভ্যদের নামের তালিকা হইতে পণ্ডিত নেহরুর নাম বাদ দেওয়া হউক এবং তালিকায় সমস্ত কংগ্রেসী প্রধান মন্ত্রীদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হউক। তাঁহার এই সংশোধন প্রস্তাবে সভায় হাসির রোল পড়িয়া যায়; কিন্তু কংগ্রেসী মন্ত্রী ও মোমরা-চোমরাদের মধ্যে উহাতে বেশ একটু চাঞ্চল্য দেখা দেয়; মনে হয় যেন, তাঁহারা মনপোড়ায় অভিভূত হইয়াছিলেন। শ্রীযুত দে এইরূপ মন্তব্য করেন যে, ত্রিপুরীতে কংগ্রেসী মন্ত্রীরা যেরূপ কীর্ত্তি দেখাইয়া আসিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করিলে কংগ্রেসে আভ্যন্তরীণ শুদ্ধি ব্যাপারে মন্ত্রীরাই যোগ্যতম ব্যক্তি। তাঁহার এই বিদ্রূপাত্মক উক্তিতে সভায় হাসির রোল পড়িয়া যায়। দর্শকগণ চীৎকার করিয়া বারম্বার শ্রীযুত দে'কে উৎসাহিত করেন।

শ্রীযুত শঙ্কর রাও দেও শ্রীযুত দে'র সংশোধন প্রস্তাব সম্পর্কে যে জবাব দেন, তাহাতে মনে হয়, তিনি বিদ্রূপ বুঝিতে পারেন নাই, কংগ্রেসী মন্ত্রীদের

(শেষাংশ ৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ফসল

(গল্প)

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

লক্ষ্মীবিলের জমিতে সোনার ফসল ফলিত। বিলটি ছোট—লম্বায় মাইল খানেক হইবে। ইহারই তিন পাশ ঘুরিয়া চণ্ডীপুর গ্রাম। গ্রামে ৩০।৪০ ঘর কৃষকের বাস—তাহারাই এই বিলের জমি-জমা চাষ-আবাদ করিয়া খায়। বিলের দক্ষিণ দিকে কাপাশডাঙ্গি গ্রাম—এই কাপাশডাঙ্গির ভেতর দিয়া একটি খাল গিয়া পড়িয়াছে ঠাকুর বিলে; ঠাকুর বিল হইতে আর একটি খাল গিয়া পড়িয়াছে একেবারে গড়াই নদীতে। এই দুই খাল দিয়া বিল দুইটির জল নিকাশের কাজ হয়। লক্ষ্মী বিলের খাল দিয়া জল গিয়া জমে ঠাকুর বিলে, পরে ঠাকুর বিলের খাল দিয়া সব জল গড়াই নদীতে বাহির হইয়া যায়। ঠাকুর বিল আকারে লক্ষ্মী বিলের চার পাঁচ গুণ বড় হইবে। ইহার চারি পাশ ঘিরিয়া ৭।৮ খানা গ্রাম—গ্রামের সকলেই কৃষক, সকলেই ঠাকুর বিলের জমি চাষ-আবাদ করে। কিন্তু লক্ষ্মী বিলে আজ ৬।৭ বৎসর ধরিয়া আর একটি ফসলও জন্মে না। কাপাশডাঙ্গির খালটি এই কয় বৎসর হইল একেবারে মজিয়া গিয়াছে—কাজেই বর্ষার যে জল একবার বিলে গিয়া ঢোকে তাহা আর খাল দিয়া বাহির হইয়া যায় না। পূর্ব্বে যেখানে কৃষকেরা লাঙল লাগাইয়া চাষ-আবাদ করিত এখন চৈত্র মাসেও সেখানে এক বুক জল জমিয়া থাকে। একেবারে ডাঙ্গার দিকে কোথাও ২।১ বিঘা চাষ-আবাদ হয় বটে কিন্তু সে নাম মাত্র। সারা বিলে এই কয় বৎসরে কুচরীপানা গজাইয়া একেবারে ছাইয়া ফেলিয়াছে। এই যে ৩০।৪০ ঘর কৃষক—এই ছয়-সাত বৎসর তাহাদের লাঙল নাই—গরু নাই—কোন কাজ নাই। কেহ কেহ পদ্ম-চাকা তুলিয়া, পানিফল তুলিয়া দূরবর্ত্তী হাটে গিয়া দৈনিক দুই তিন আনা বিক্রয় করিয়া আসে। কেহ কেহ গোপনে জেলেদের সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছে—তাহারা মাছ ধরিয়া দিবে—জেলেরা মাথায় করিয়া হাটে গিয়া বিক্রয় করিয়া আসিবে। কাজটি গোপনীয়—কারণ অন্য গ্রামের লোকে শুনিলে কি বলিবে? যাহারা দশজনের মুখের অন্ন যোগাইত তাহারাই আজ নিজের দুটি অন্নের জন্য মাছ ধরিয়া দিন কাটাইতেছে—ইহা কি কম দুঃখের কথা!

এই লক্ষ্মী বিলের একেবারে ধারেই মাধব মণ্ডলের বাড়ী। মাধবের বয়স এই ষাটের কাছাকাছি। ঘরে একটি মাত্র বছর পঁচিশের ছেলে কানাই আর একটি মাত্র মেয়ে নাম পদ্ম। পদ্মর বয়স এই বছর ১৩।১৪ হইল—সে-ই ঘরের কাজ-কর্ম্ম করে। কানাই রাত দিন কোথায় ঘুরিয়া বেড়ায়—কি করে কিছুরই তেমন ঠিকানা নাই। মাঝে মাঝে অন্য গ্রামে গিয়া জন খাটিয়া কিছু কিছু আনিয়া পিতাকে সাহায্য করে। মাধবের তবু আজ বলিবার কিছুই নাই—চাষার ছেলে এই বয়সে সারা দিন মাঠে পড়িয়া খাটিবে—কিন্তু হায় আজ না আছে তার চাষের উপযুক্ত এক ছটাক জমি না আছে হালবলদ। মাধব উঠানের পাশে বসিয়া বসিয়া ঝিমায়। এই লক্ষ্মীবিলে ঠিক তাহার বাড়ীর সংলগ্ন বিশ বিঘা জমি। সুদিনে সেই জমিতে কি ফসলটাই না জন্মিত! সমস্ত বৎসরের খাবার ধান ঘরে উঠাইয়া, যাহা বাঁচিত তাহা বিক্রয় করিয়া জমিদারের খাজনা দিত—অন্যান্য খরচপত্রের জন্য রাখিয়া দিত—অতি স্বচ্ছলভাবে দিনগুলি যাইত কাটিয়া।—বাড়ীর আঙিনায় মরাই ভরা ধান—তাহাতে সম্বৎসরের খোরাক—গোয়ালে এক মানুষ উঁচু পরিপুষ্ট এক জোড়া বলদ—বাড়ীর ঘরগুলি পরিপাটি করিয়া খড় দিয়া ছাওয়া—সমস্ত বাড়ীখানিতে যেন লক্ষ্মীশ্রী ফুটিয়া উঠিত। কিন্তু আজ ধানের মরাই একেবারে শূন্য, ৫।৬ বৎসর হইতে সেখানে সঞ্চয়ের জন্য একটা ধানও লওয়া হয় নাই—গোয়ালঘর-খানা খসিয়া খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে—শূন্য ভিটা খাঁ খাঁ করিতেছে—কবে অভাবের তাড়নায় বলদ দুইটি বিক্রয় করিয়া কিছুদিনের মত খাইয়া পড়িয়া বাঁচিয়াছে। ঘরের চালের খড়-গুলি আজ ৩।৪ বৎসর আর বদলান হয় নাই—বৃষ্টির জল অঝোরে তাহারই ফাঁকে ফাঁকে ঝরিয়া পড়িতে থাকে।

মাধব উদাস দৃষ্টি মেলিয়া বিলের দিকে তাকাইয়া থাকে—জ্যৈষ্ঠে, আষাঢ়ে একদিন যেখানে ধানের চারাগুলি সতেজে বাড়িয়া উঠিত—এখন সেখানে সাঁতার জলে কচুরীপানা উর্দ্ধে ফণা তুলিয়া বাড়িয়া উঠিতেছে।

কিন্তু এতদিন পরে এইবার বুঝি সকল দুঃখের অবসান হইল—দূরবর্ত্তী একটি গ্রামের কয়েকজন্য 'স্বদেশী ভদ্রলোক' এইবার গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া চাঁদা সংগ্রহ করিয়া এবং সরকারের নিকট হইতে কিছু টাকা আদায় করিয়া লক্ষ্মীবিলের খালটির সংস্কার করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছেন। কার্ত্তিক মাসে খাল কাটা আরম্ভ হইয়া পৌষ মাসের মাঝামাঝি কাজ শেষ হইয়া গেল। ফাল্গুন মাসে সমস্ত বিলের জল বাহির হইয়া এবার একেবারে সারা মাঠ জাগিয়া উঠিল। কৃষকদের মনে আবার উৎসাহ আসিল ফিরিয়া। ধার কর্জ্জ করিয়া যে যেরকমে পারিল আবার লাঙল গরু কিনিয়া চাষ করিতে লাগিয়া গেল। ধানের শত্রু কচুরীপানা শুকনা মাঠে পড়িয়া শুকাইতে লাগিল—কৃষকগণ লাঙল দিয়া চষিয়া স্তূপাকার করিয়া আগুন ধরাইয়া দিল।

মাধব তাহার থালা-বাসন শেষ-সম্বল যাহা ছিল, সমস্ত বিক্রয় করিয়া, ধার করিয়া একজোড়া বলদ কিনিয়া আনিল। তাহার একদাগে বিশ বিঘা জমি একেবারে জাগিয়া উঠিয়াছে। কানাই আর এখন বাড়ী ছাড়িয়া ছুটা ছুটি করিয়া বেড়ায় না—দিন রাত মাঠে পড়িয়া খাটিতেছে। সাত বৎসর জলের নীচে মাটি পচিয়া পচিয়া ইহার উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে অসম্ভব রকম। মাটির চেহারা দেখিলেই তাহা বুঝা যায়।

মাধব আর কানাই একেবারে মাতিয়া উঠিয়াছে—মাধব কোদালী চালায়, কানাই জমিতে লাঙল দেয়। শুকনা পানি-ফলের কাঁটায় পা ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায়—পচা শামুকে লাগিয়া পা দিয়া অঝোরে রক্ত ঝরিতে থাকে—তবু কাহারও বিরাম নাই। ক্ষেতের কাজের এমনই নেশা—তাও আবার এমনই ক্ষেত, যেখানে নিঃসন্দেহে বীজ ফেলিলেই তিন বৎসরের ফসল

এক বৎসরে পাওয়া যাইবে। চৈত্রের শেষে বৃষ্টি হইল বেশ। কৃষকেরা সারা মাঠ ভরিয়া বীজ ছড়াইল—কয়দিনেই ধানের চারা গজাইয়া উঠিয়া সতেজে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল—কৃষকেরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

বৈশাখ গেল—জ্যৈষ্ঠের প্রথমে সারাবিল একেবারে সবুজে সবুজে ভরিয়া গেল—কোথায়ও একটু ফাঁক নাই একেবারে সারা বিল ভরিয়া ধানের ঝাড়গুলি মানুষ সমান উঁচু হইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে। কোন কোন ক্ষেতে দুই একটি করিয়া ধানের শিষ বাহির হইতেছে—কোথায়ও কোথায়ও হয়ত ২।৪ দিন দেরী আছে। এবার আষাঢ়ের প্রথমেই আউশ ধান পাকিয়া উঠিবে—এই ত মাত্র আর একটা মাস বাকী! কৃষকদের আনন্দ আর ধরে না।

যেদিন জ্যৈষ্ঠের প্রথম সপ্তাহের শনিবার বিকাল বেলা আকাশ কালো করিয়া মুষল ধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ধানের শিষ বাহির হইবার সময় বৃষ্টি হওয়া ভাল। কৃষকেরাও ভাবিল ভালই হইল। কিন্তু সারা রাত্রের মধ্যে আর বৃষ্টির বিরাম হইল না। বৃষ্টির বেগে মাধবের ঘরের চাল ফুটা হইয়া সমস্ত ঘরময় কাদা হইয়া গেল। আজ কয়েকদিন কানাই মাইল দুই দূরে এক কুটুম্ব বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছে। আজ বিকালে সেখান হইতে ফিরিয়া আসিবার কথা ছিল, কিন্তু যে বৃষ্টি, ইহার ভিতর কি পথে মানুষে বাহির হইতে পারে? রাত্রি প্রভাত হইল, কিন্তু বৃষ্টির বিরাম হইল না—সারা রবিবার একইভাবে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল—দুপুর বেলা বেগ একটু কমিয়াছিল বটে, কিন্তু সেও অতি অল্প সময়ের জন্য—বিকালের দিকে আবার ঘটা করিয়া মেঘ চাপিয়া আসিল। মাধব চিন্তিত মুখে বারে বারে বিলের দিকে তাকাইতে লাগিল। জ্যৈষ্ঠের প্রথমে এত বৃষ্টি, তাহার বয়সেও ত কোন দিন দেখিয়াছে বলিয়া মনে হয় না—শেষে ফসলের কোন ক্ষতি হইবে না ত? কিন্তু যে খাল এবার কাটা হইয়াছে—বৃষ্টির সাধ্য কি যে ধান ডুবাইয়া দেয় যত জলই জমা হউক, সবটাই সবেগে সবেগে খাল দিয়া বাহির হইয়া যাইবে। রবিবার রাত্রে বৃষ্টির বেগ আরও বেশী হইল এবং সারা সোমবার একটুও বিরাম নাই। এ কি অসাধারণ বৃষ্টি! মাধব এমন বৃষ্টি তাহার জীবনে কখনও দেখে নাই—জ্যৈষ্ঠ মাসে ত নয়ই—আষাঢ়েও না, শ্রাবণেও না। সোমবার দুপুর বেলা কানাই ভিজিয়া ভিজিয়া বাড়ী আসিয়া হাজির হইল। মাধব এই বৃষ্টির মধ্যে আর ঘর হইতে বাহির হয় নাই। কানাই আসিবামাত্র মাধব প্রশ্ন করিল—"বিলের পথ দিয়ে এলি কানাই? বিলে কত জল হয়েছে রে?" কানাই হতাশভাবে দাওয়ার এক কোণে বসিয়া পড়িয়া বলিল—"সব গেল—এবার সব গেল। বিলের পথে কি আর হেঁটে আসবার উপায় আছে—সেখানে একবুক জল জমে গেছে। রাইপুর থেকে তাদের ডিঙ্গি নৌকাখানা চেয়ে নিয়ে এলাম। নৌকা একেবারে আমাদের ঘাটে এসে লেগেছে। আর এক হাত জল বাড়লেই মাঠের সমস্ত ফসল ডুবে যাবে। এক হাত জল হতে আর বেশীক্ষণও লাগবে না—কাপাশডাঙ্গার খালের মুখে তিন চার গ্রামের লোক জুটে বাঁধ দিচ্ছে—দেখে এলাম।"

—"বাঁধ দিচ্ছে কেন?

—ঠাকুর বিলের জল নাকি তাদের খাল দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরুতে পারছে না—তার ওপর এই বিলের জল ঠাকুর বিলে পড়লে, তাদের ফসলের ক্ষতি হতে পারে।"

—"তা হ'লে আমাদের উপায়?"

—"আর উপায়! এবার না খেয়ে মরতে হবে। জমি আবাদ না করলেও ছিল ভাল—বীজ ধানগুলো ঘরে থাকত।" মাধব আর একটা কথাও কহিল না—পদ্মর নিকট হইতে একখানা গামছা চাহিয়া লইয়া এই বৃষ্টি মাথায় করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। বিলের ধারে আসিয়া, সে একেবারে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল—"তাইত, এ কি হইয়াছে?" শ্রাবণে বর্ষার জল না ঢুকিলে বিলের এমন অবস্থা ত সে কখনও দেখে নাই। বারকয়েক আকাশের দিকে ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখিল—পূর্ব্বে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে চারিপাশ ঘিরিয়া একেবারে কালোয় কালোময়—কোথায়ও একটু ফাঁক নাই। এ বৃষ্টির কবে বিরাম হইবে কে জানে? মাধব সেখান হইতে ফিরিয়া গ্রামের ভিতরে গিয়া ঢুকিল। আধঘণ্টার মধ্যে সমস্ত গ্রামের লোক জুটিয়া লাঠি সড়্‌কি লইয়া চলিল খালের মুখের দিকে—তাহারা প্রাণ থাকিতে খালের মুখে বাঁধ দিতে দিবে না। কিন্তু তাহারা মাত্র ৩০।৪০ জন লোক; খালের ধারে গিয়া দেখে সেখানে ২।৩ শত লোক জমা হইয়া আছে—বাঁধও প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। তাহাদের দেখিয়া বিপক্ষ দল তাড়া করিয়া আসিল—কিছুক্ষণ দুইপক্ষ লাঠালাঠি করিয়া চণ্ডীপুরের দল পিছু হটিয়া আসিল—কাহারও মাথা ফাটিল কাহারও হাত ভাঙ্গিল—ভাগ্যে কেহ প্রাণে মরিল না। ২।৩ শত লোকের সহিত ৩০।৪০ জন লোক কেমন করিয়াই বা পারিয়া উঠিবে, সুতরাং ম্লানমুখে যে যাহার বাড়ী আসিয়া ঢুকিল।

একেবারে শেষ বেলায় মাধব তাহার ঘাটের ডিঙ্গিখানায় চড়িয়া লাগি দিয়া নৌকাখানা তাহার ক্ষেতের দিকে ঠেলিয়া লইয়া চলিল।

এইত তাহার বিশ বিঘা জমি। এ কি! ইহারই মধ্যে বিলের নীচের দিকের ২।৩ বিঘা জমির ধানের পাতা মাত্র জলের উপরে ভাসিতেছে—আর ২।৪ আঙুল জল বাড়িলেই সেগুলি একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া ডুবিয়া যাইবে। উপরের জমিগুলির ধান এখনও জলের উপরে খানিকটা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু, জল যে হু হু করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছে! বৃষ্টির বেগ এখন অবশ্য পূর্ব্বের চেয়ে অনেক কমিয়া গিয়াছে কিন্তু একেবারে ত ছাড়িয়া যায় নাই—সারা আকাশে এখনও মেঘ জমাট বাঁধিয়া আছে। তাহা ছাড়া অন্যান্য সমস্ত উঁচু জায়গার জল বিলের ভিতরে গড়াইয়া আসিতেছে—এদিকে জল নিকাশের খাল একেবারে বন্ধ, সুতরাং আর কতক্ষণই বা এই ধান জলের উপরে ভাসিয়া থাকিতে পারিবে? মাধবের দুই চোখ ফাটিয়া অশ্রু গড়াইতে লাগিল—কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিল,—"মা লক্ষ্মী, এমনি করে দেখা দিয়ে ডুব দিলে মা! সারা বছরের মুখের গ্রাস কেড়ে নিলে?" সে ধীরে ধীরে তাহার ডিঙ্গিখানা একেবারে ধানের ক্ষেতের মধ্যে ঢুকাইয়া দিল। কোন্ ঝাড়টি কেমন পুষ্ট হইয়াছে, কোন্‌টি

হইতে কতগুলি ধানের চারা বাহির হইয়াছে—কোথায় সবে দুই একটি ধানের শিষ বাহির হইতেছে—কোন্ ষটি হইতে শিষ বাহির হইতে আরও ২।৪ দিন বাকী আছে—সে সতৃষ্ণ নয়নে তাহাই দেখিতে লাগিল। কতক্ষণ এমনি ভাবে কাটিল তাহার খেয়াল নাই—যখন কানাই তীর হইতে তাহাকে ডাকাডাকি সুরু করিয়া দিল তখন একেবারে সন্ধ্যা ঘোর হইয়া আসিয়াছে। মাধব ধীরে ধীরে ডিঙ্গিখানা তীরের দিকে বাহিয়া লইয়া আসিল।

রাত্রে পদ্ম সাধাসাধি করিয়া পিতাকে আহারে বসাইল, কিন্তু মাধবের মুখে অন্ন রুচিল না।

রাত্রি বোধ হয় তখন দ্বিতীয় প্রহর হইবে—ঘরের একপাশে কানাই ও পদ্ম অকাতরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বৃষ্টি না থামিলেও এতক্ষণ খুব অল্প অল্পই হইতেছিল, কিন্তু আবার প্রবল বেগে বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে। মাধব এতক্ষণ একটুও ঘুমাইতে পারে নাই—একবার শুইতেছে, আবার উঠিয়া বসিতেছে।

এতক্ষণে বিলের নীচের দিকের জমি কয় বিঘা একেবারে জলের তলে ডুবিয়া গিয়াছে নিশ্চয়। মাধব দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল—বৃষ্টির জলের ছাঁটে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু এবারের বৃষ্টির বেগ বড় বেশী ক্ষণ স্থায়ী হইল না। মাধব এতক্ষণ এমনিভাবে বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল, তারপর আবার ঘরের ভিতরে আসিল—আবার কি ভাবিয়া বাহিরে আসিয়া একেবারে উঠানে নামিয়া গেল। বৃষ্টি তখন একেবারে থামিয়া গিয়াছে—আকাশে জমাট চন্দ্রালোক ফুটিয়া বাহির হইতেছে। মাধব দাওয়ার কোণে চন্দ্রালোক ঝুটিয়া বাহির হইতেছে। মাধব দাওয়ার কোণে রক্ষিত কোদালীখানা কি ভাবিয়া কাঁধে তুলিয়া লইয়া বিলের দিকে যাইতে লাগিল। ডিঙ্গি নৌকাখানা ঠিক সেইখানেই বাঁধা ছিল—মাধব লগি দিয়া ঠেলিয়া সেই আধা অন্ধকার আধা আলোকে নিজের জমির দিকে লইয়া চলিল। কিন্তু এযে কোথাও একটা ধান-ঝাড়ের চিহ্নমাত্র নাই! সারা বিশ বিঘা জমির উপরেই যে একেবারে কাল জল ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে। মাধব নিজের চোখকে বিশ্বাস করিতে পারিল না—আবছা আলোয় চোখের ভুল হইল নাকি? নৌকা হইতে জলের উপরে হাত প্রসারিত করিয়া দিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল —'কই' কোথাও ত একটা ধানের পাতাও হাতে লাগিতেছে না! তবে ত সবই শেষ হইয়া গিয়াছে! মুহূর্ত্ত মধ্যে মাধবের চোখ হিংস্র পশুর মত জ্বলিয়া উঠিল। সেই চোখ তুলিয়া একদৃষ্টে কাপাশডাঙ্গির খালের দিকে রহিল তাকাইয়া। আজ খাল যদি বাঁধা না থাকিত—তাহাদের এ সর্ব্বনাশ কিছুতেই হইতে পারিত না।

ঐ কাপাশডাঙ্গির খালের মুখে একটা আলো দেখা যায় না! হাঁ, তাহাই হইবে। সেই আলো দেখিয়া মাধব দিক নির্ণয় করিয়া খালের দিকে নৌকা ঠেলিয়া লইতে লাগিল। ঘণ্টাখানেক পরে কাপাশডাঙ্গির খালের মুখে আসিয়া তাহার নৌকা ভিড়িল। কোথায়ও জন-মানবের সাড়া নাই—মাধব নৌকা হইতে নামিয়া একেবারে বাঁধের উপরে গিয়া উঠিল। একবার চারিপাশে ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া কোদালীখানা শক্ত করিয়া ধরিয়া ঝপাঝপ কোপ চালাইতে লাগিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাঁধের একপাশ হইতে অন্য পাশে সশব্দে জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। একটু দূরে থাকিয়া কয়েক জন বাঁধ পাহারা দিতেছিল—তাহারা এতক্ষণ লক্ষ্য করে নাই। হঠাৎ ৩।৪ জন চীৎকার করিয়া ছুটিয়া আসিল। একজন পিছন হইতে মাধবের পিঠে একঘা লাঠি বসাইয়া দিল। মাধব কোদালী লইয়া রুখিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু দেখিতে দেখিতে অন্য ২।৩ খানা লাঠি একেবারে তাহার মাথায় আসিয়া পড়িল। বৃদ্ধ হইলেও মাধবের গায়ে শক্তি ছিল। সে নৌকায় উঠিয়া তাড়াতাড়ি করিয়া খোঁচাইয়া দূরে সরিয়া গেল।

এতক্ষণে জলের বেগে বাঁধের প্রায় আধাআধি ভাঙিয়া গিয়াছে—প্রবল জলস্রোত উপর হইতে নীচে, গর্জ্জন করিয়া ছুটিয়া যাইতেছে। ২৫।৩০ হাত বাঁধটি ইহারই মধ্যে একেবারে ভাঙ্গিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল।

পরের দিন চণ্ডীপুরের কৃষকেরা কোলাহল করিয়া বিলের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। এ কি! এক রাত্রের মধ্যে বিলের জল যে এক হাত কমিয়া গিয়াছে! কাপাশডাঙ্গির খালের বাঁধ ভাঙিয়া গিয়াছে নিশ্চয়! সারা মাঠের ধান আবার জলের উপরে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে—যাক তাহা হইলে আর একটা ধানও নষ্ট হইবে না, ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। আকাশে আজ আর মেঘের চিহ্নমাত্র নাই—সূর্য্য সহস্র কিরণ মেলিয়া হাসিয়া উঠিয়াছে।

সকাল বেলা পদ্ম ঘরের কাজ-কর্ম্ম সারিয়া রান্না চাপাইয়া দিয়াছিল—এই কিছুক্ষণ হইল তাহার রান্না শেষ হইয়া গিয়াছে। কানাই আসিয়া খাইয়া গেল। পদ্ম ভাবিল, বিলের ধারে কোথায়ও হয়ত পিতা বসিয়া জটলা করিতেছে। একখানা থালায় করিয়া খাবার ঢাকা দিয়া রাখিয়া পদ্ম পিতাকে খুঁজিতে বাহির হইল। পরাণ মণ্ডলের বাড়ীর সম্মুখে কয়েক জন বসিয়া জটলা করিতেছিল—পদ্ম সেখানে দেখিয়া আসিল—বিলের ধারে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল, কিন্তু কোথাও পিতার দেখা পাইল না।

ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, পিতার খাবারের থালা হইতে ভাতে কাকে কুকুরে খাইতেছে।

জীবজগতে বোধশক্তি

শ্রীপুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য

জন্তু-জানোয়ারের বোধ ও চিন্তাশক্তি নামক প্রবন্ধে আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, উহাদের ধারণা ও চিন্তা করিবার শক্তির অভাব উহাদের আচরণে ফুটিয়া উঠিলেও, ঐ শক্তি নিতান্তই ক্ষীণ ও অস্পষ্ট এবং উন্মেষের দিক হইতে বোধহীন মানবশিশুর সহিতও তুলনীয় নহে একেবারেই। ঐ প্রবন্ধ 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশের পর শ্রীমতী শান্তনা দেবী এই সাপ্তাহিকেই এক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধে জীব-জন্তুর নিদ্রা ও স্বপ্ন এবং আহার্য্য দ্রব্যের বহু বিচারে যে বিশেষত্ব তাহা সুন্দররূপে বুঝাইয়া উহাদের চিন্তাশক্তির অস্তিত্ব সমর্থন করিয়াছেন। অবশ্য উহাদের সেই চিন্তা-শক্তিও যে নিতান্তই অপূর্ণ ও আবছা রকমের ইহাতে আর সন্দেহ কিছুমাত্র নাই।

শুধু কি নিদ্রা ও স্বপ্নে কিম্বা আহারের বাছকোচেই উহাদের অনুভূতি অতি নগণ্য? তাহা নহে একেবারেই, কারণ উহাদের মানসিক স্ফুরণ যে নিকৃষ্ট স্তরের, উহাদের সকল প্রকার বোধ বা অনুভূতিও তেমনি নিম্ন স্তরের। তাই উহাদের শিশুকালের কৌতুকপ্রিয়তাও তেমনি নিম্ন স্তরের, যেমন অপূর্ণ ও আবছা উহাদের অন্য সকল প্রকার ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ব্যাপার,—উহাদের স্বাদ গ্রহণ, উহাদের গন্ধ অনুভূতি, উহাদের শ্রবণ, উহাদের নিজ নিজ অভাব বা অক্ষমতা সম্বন্ধে ধারণা—সকল ক্রিয়াই মানবের সহিত তুলনায় অপূর্ণ ও এলোমেলো।

কুকুর প্রভৃতি জানোয়ারের তীব্র ঘ্রাণশক্তি রহিয়াছে, যাহার জন্য উহাদের নিয়োগ করা হয় গোয়েন্দা পুলিশ বিভাগ কর্তৃক অপরাধীর সন্ধান করিতে। বিড়ালের বেমালুম তীক্ষ্ণ ঘ্রাণ-শক্তি রহিয়াছে দুধের কড়া খুঁজিয়া বাহির করিতে। পিপীলিকার অদ্ভুত শক্তি কোন কোন খাদ্য যেমন লুক্কায়িত স্থান হইতেও আবিষ্কার করিয়া লইতে। মানুষের তেমন সূক্ষ্ম অনুভূতি নাই—তেমন দূরবর্ত্তী পদার্থের কোনও ঘ্রাণ মানুষের নাকে ধরা পড়ে না। কিন্তু সুগন্ধ যে অনুভূতির সৃষ্টি করিয়া মানুষকে তৃপ্ত করে কিম্বা দুর্গন্ধ যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দ্বারা মানুষকে বিরক্ত করে, অনুভূতির সেই প্রকার বিশ্লেষণের কোনও ক্ষমতা জন্তু-জানোয়ারদের নাই। গন্ধ উহাদের নিকট আহ্বান মাত্র—তাই নিতান্ত ময়লা নোংরা জিনিষের বোটকা গন্ধও উহাদের নিকট বিরক্তিকর নয়, উৎকৃষ্ট খাদ্যের গন্ধও রুচিকর বলিয়াই উহাতে উহারা আকৃষ্ট হয় না—আকৃষ্ট হয় ঐ গন্ধ (সু-ই হোক আর কু-ই হোক) উহাদের নাসিকার কোষবিশেষে যে উন্মাদকর প্রেরণা দান করে, তাহারই জন্য। সেই উন্মাদনা যে সর্ব্বাংশেই সুখকর, এমন কথা বলা যায় না; কিন্তু উহার প্রভাবে জীব-জন্তুগুলি বিকৃত-মস্তিষ্কের মতই উত্তেজনা প্রকাশ করে। কাজেই বৈজ্ঞানিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—গন্ধ যে কি প্রতিক্রিয়া উৎপাদন করে, তাহার কোনই ধারণা উহাদের নাই, উহারা শুধু একটা আকর্ষণই অনুভব করে, কিন্তু গন্ধকে প্রকৃত প্রস্তাবে উপভোগ করিবার কোন ক্ষমতা উহাদের নাই। হউক ঘ্রাণশক্তি উহাদের প্রখরতায় মানবের অপেক্ষা অধিক, তথাপি উহা অন্ধ-সংস্কার, উহার মর্ম্ম বুঝিবার ক্ষমতা জীব-জন্তুর নাই।

নিম্নস্তরের জীব-জন্তুতে যেমন উহা প্রকট এমন আর কোথাও নয়। আর একথাও অবিসম্বাদিত সত্য যে, শুধু ঘ্রাণশক্তিতে নহে, সকল ইন্দ্রিয় শক্তিতেই উহাদের অনুভূতির জ্ঞান যেমন আবছা তেমনই এলোমেলো।

বৈজ্ঞানিকেরা যখন বলেন মেরুদণ্ড বিশিষ্ট জীব ভিন্ন অপর কোনটি শুনিতে পায় না, (অবশ্য কোন কোন কীট ব্যতীত) তখন এই শোনা ও না-শোনার ভিতর প্রভেদ যে কি তাহা সতর্কতার সহিত লক্ষ্য করিবার বিষয়। শব্দ সম্বন্ধে যে অনুভূতি মানুষের তেমন অনুভূতি অবশ্য জীব জগতে আশা করা যায় না। মননশীলতার বেলা যেমন উচ্চ-নীচ ভেদে জানোয়ারের ভিতর তারতম্য, শব্দ শ্রবণেও তাহাই। শব্দ-তরঙ্গের প্রত্যক্ষ অনুভূতি এবং ঐ শব্দ তরঙ্গজনিত কোষবিশেষের স্পন্দনের মাত্র অনুভূতি—এই দুইকেই 'শোনা' বলা যায়, কিন্তু শব্দের প্রকৃতির কোন মর্ম্ম না গ্রহণ করিয়া দেহের স্থানবিশেষের একটা বিকার দ্বারা আকৃষ্ট হওয়া—ইহাকে ঠিক 'শোনা' বলা চলে না।

কেঁচোর এমন সূক্ষ্ম অনুভূতিপ্রবণ কোষ আছে, যাহাতে সামান্য স্পন্দন উপস্থিত হইলেও উহা টের পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দেয় ক্ষিপ্র গতি দ্বারা। এই স্পন্দন সচল বালি-কণাটি দ্বারা প্রেরিত দোলায়ও উত্থিত হইলে; কিন্তু শব্দ-তরঙ্গের প্রভাবে কোন প্রকার স্পন্দন উপস্থিত হইবে না কোষে। ছোট একটি মৃত্তিকাপূর্ণ টবে কেঁচো রাখিয়া টবটি যদি পিয়ানো বা হারমোনিয়ামের উপর স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে পিয়ানো বা হারমোনিয়ামে একটি রিড্ টিপিয়া শব্দ করা মাত্র কেঁচো মৃত্তিকার গর্ত্তে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু কেঁচোর এই সাড়া দেওয়ার হেতু শ্রবণশক্তি নয়, উহার চারিদিকের মাটীতে যে স্পন্দন উপস্থিত হইয়াছে শব্দ-তরঙ্গে তাহারই দোলায় উহার কোষবিশেষে স্পন্দনের সৃষ্টি হইয়াছে, প্রত্যক্ষ শব্দ-তরঙ্গে নহে। বহু সরীসৃপ ও অন্য নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীব এই প্রকার প্রতিক্রিয়ারই অধিকারী, শ্রবণশক্তির সহিত উহাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় নাই।

কিন্তু ঘ্রাণশক্তিতে যে সরীসৃপ পাখী অপেক্ষাও শক্তিধর বেশী, এ-কথা স্বীকার করিতে হয়। সাপ অনায়াসে ঘ্রাণের আকর্ষণে গর্ত্তের গলিঘুঁজিতে ধরিয়া ইঁদুরটিকে পাকড়াও করিবে। উহার সঙ্গী বা সঙ্গিনী সাপকে খুঁজিয়া বাহির করিতে সাপের প্রধান সহায়ক হয় সেই সঙ্গী বা সঙ্গিনীর দেহ গন্ধ। জলে চার ফেলিলে মাছ পাগল হইয়া ছুটিয়া আসে।

এই সকল ক্ষেত্রে পণ্ডিতগণ পরীক্ষা দ্বারা নির্ণয় করিয়াছেন যে, এই উত্তেজনা বা আকর্ষণ উত্থিত হয় উহাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের কোষবিশেষে প্রতিক্রিয়ার ফলে। গন্ধ উপভোগের কোন কথাই উঠিতে পারে না, কোষবিশেষের বিকার ভিন্ন অন্য

তাৎপর্য্যই উহাদের অনুভূত হয় না গন্ধ দ্বারা, সে গন্ধ তীব্র অথবা মৃদু হউক না কেন।

তথাপি স্বাদ গ্রহণের অনুভূতিতে মাছ কিন্তু উৎকর্ষের পরিচয় দেয়, যখন স্বাদ গ্রহণ করিবার পদার্থটি উহার গ্রহণ কোষের সহিত সংস্পর্শে আসে। কিন্তু অনুভূতির বেলা উহাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় কোষ তেমন সূক্ষ্ম পরিচয় দেয় না। এই জন্য দেখা যায়, মাছ মূলত তাহার দ্বারাই খাদ্য অন্বেষণ করে এবং যাহা কিছু দেখে তাহাই করে, কিন্তু যে মুহূর্তে স্বাদকোষ উহার সংস্পর্শে আসে ই খাদ্যযোগ্য না হইলে স্বাদ-কোষ যে প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন তাহারই ফলে মাছটা সে পদার্থকে ওগড়াইয়া দিতে হয়। তবে যে চারের গন্ধে মাছ আকর্ষিত হয়, উহা ল করা আহ্বানে মাত্র কারণ ঘ্রাণ-কোষে যে বিকার স্থিত হয়, তাহা উহাদিগকে অস্থির করিয়া তোলে। উহারা ঠিক খাদ্য সংগ্রহের আশায় উপস্থিত হয় না টা, যতটা হয় অপর এক কৌতূহলের বশে।

এই কারণে বঁড়শীতে কৃত্রিম কোন পোকা বা পোকার গাঁথিয়া দিলেও মাছ আকৃষ্ট হয়, কিন্তু বেশীক্ষণ সেই সাজি কার্য্যকারী হয় না। উহারা কৃত্রিমতা ধরিয়া ফেলে উহার কাছে আসে না। কিন্তু সেই অভিজ্ঞতার স্মৃতি এক সময় উহাদের মনে থাকে না। অন্যদিন আবার সেই রূপ কৃত্রিম পোকা দেখিয়া উহারা ছুটিয়া আসিবে ার কিছুকাল পরে বর্জন করিবে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি কুকুরের ঘ্রাণশক্তি প্রখর। কিন্তু ন্যায় মৌমাছিকে বলিতে হয় যে সে গন্ধ জগতে বাস করে। অপেক্ষা লম্বা যে একজোড়া শুঁয়া (feelers) উহাদের ক, তাহার অগ্রভাগে থাকে ঘ্রাণ-কোষ। উহার দ্বারা মাছি যে কেবল গন্ধহীন ফুল হইতে সুগন্ধ ফুল চিনিয়া তে পারে এমন নয়, বিভিন্ন ফুলের বিভিন্ন সুবাসও বাছিয়া তে পারে; আবার সঙ্গী মাছিদের দেহ-গন্ধ ও তাহারা ন্ জাতীয় ফুলের মধু সংগ্রহ করিয়াছে, তাহাও বুঝিতে রে।

আবার মৌমাছির দেহে গন্ধ-সৃষ্টির গ্রন্থি (gland) হয়াছে। যখনই উহা মধু অন্বেষণে কোনও ফুলে মধুর ধান পায়, তখনই ফুলের পাপড়িতে নিজ দেহ সৃষ্ট গন্ধ গইয়া দেয়, যাহাতে পুনরায় মধু আহরণে আসিয়া ঐ দর্শন দ্বারা মধু-ভাণ্ড আবিষ্কার করা সহজ হয় নিজের থবা সহকর্ম্মীদের। রাণী-মৌমাছির দেহে বিচিত্র এক গন্ধ হয়াছে, যাহার ফলে অন্য মৌমাছিরা উহার উপস্থিতি, ার আনাগোনা টের পায়। আবার রাণীর এই দেহ-গন্ধই লে প্রেম নিবেদন অথবা অনুরাগের আহ্বান, যখন উহা াভিসারে বাহির হয় মৌচাক হইতে।

বড়ই আশ্চর্যের বিষয় ইহা যে, মৌমাছির নিজ দেহে গন্ধ ষ্টি এবং উহা পরিবেশনের বৈশিষ্ট্য বাদ দিলে উহার ঘ্রাণ-ক্তি সম্বন্ধীয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রায় মানুষেরই সমান। বিভিন্ন গন্ধের শ্রেণী-বিভাগ ক্ষমতা উহার অতি উচ্চস্তরের, যাহা র মানবে ভিন্ন অন্য কোনও জীবে দেখা যাইবে না। তথাপি এই গন্ধ সম্বন্ধে অনুভূতির জ্ঞান উহাদেরও অন্য সকল প্রকারে নিকৃষ্ট, কেবল গন্ধানুযায়ী সঞ্চিত মধুর পৃথক শ্রেণী বিন্যাস-শক্তিটি ব্যতীত। তবে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, জীবজগতে মৌমাছির ন্যায় সূক্ষ্ম ঘ্রাণ-অনুভূতি অন্য কোনও জাতির নাই।

মানুষ চিনির গন্ধ পায়, কিন্তু পিঁপড়া ও-গন্ধটি পায় মানুষ অপেক্ষাও বেশী। খুব কাছে না আনিলে চিনির গন্ধ মানুষের নাকে ধরা পড়ে না, কিন্তু পিপীলিকা উহার আকর্ষণ অনুভব করে বহু দূর হইতে। এই আকর্ষণ কি প্রকার তাহার আভাস পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই খাদ্য সংগ্রহ ব্যাপারে পিপীলিকারও সেয়ানা কৌশল রহিয়াছে। আবাস-স্থান হইতে খাদ্য সংগ্রহের ভাণ্ডার পর্য্যন্ত সে যেন মাইল-পাথর পুঁতিয়া পথের নিশানা রাখিয়া যায় নিজের ও সহ-কর্ম্মীদের পথ চিনিয়া লইবার সুবিধার জন্য। এই মাইল-পাথর আর কিছুই নয়, খাদ্যের অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণা, যাহা একেবারে মানব চক্ষেও দৃষ্টিগোচর হয় না, তাহাই পথের উপর নম্বররূপে কিছুদূর অন্তর অন্তর রাখিয়া যায়। এই জন্য দেখা যায় যখন পিপীলিকার সারি চলে, তখন ঘোরা পথ হইলেও সেই নিশানাযুক্ত রাস্তায়ই সকলগুলি আনাগোনা করিবে, ভুলেও অন্য পথে যাইবে না। সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার গন্ধও নির্ণয় করিবার উহাদের আশ্চর্য্য ক্ষমতা রহিয়াছে, যাহাদ্বারা অন্য কোন জীব কোন প্রকার আকর্ষণই অনুভব করিবে না। আবার খাদ্য ভাণ্ডার হইতে সমুদয় অংশ সংগ্রহ করা হইলে, পিপীলিকা তখন মাইল-পাথররূপী কণাগুলিকেও বহন করিয়া আনিবে।

এই সকল বিচিত্র আচরণ হইতে কেবল যে জীব-জন্তুর সহজাত প্রবৃত্তির আভাষ পাওয়া যায়, এমন কথা অবশ্য নয়; ইহার ভিতর যে উহার বোধ-শক্তিরও স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়, এই সত্য আর অস্বীকার করা চলে না।

এইবারে অপরের শেষ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া আলোচনা সমাপ্ত করিব। উহাদের অভাব সম্বন্ধে কোনও প্রকার চেতনার আভাষ উদিত হয় কিনা উহাদের মনে।

বিড়াল যেমন যত্নের সহিত উহার পশম চাটিয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে—ইহা আর কাহারও জানিতে বাকী নাই। পাতিহাঁসগুলি ঠিক ঐ প্রকার শ্রম ও ধৈর্য্য স্বীকার করিয়া উহার অঙ্গের প্রতিটি পালক চকচকে ঝকঝকে করিয়া ফেলে। বনের দুরন্ত জানোয়ারগুলির ভিতর অনেকেরই, বিশেষ করিয়া প্রাণিতত্ত্ববিদের মতে যেগুলি 'বিড়াল' জাতীয় (যেমন সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি)—উহাদের পরিচ্ছন্নতা অতিমাত্রায়। নিজ অঙ্গ ত পরিষ্কার রাখিবেই, যেস্থানে থাকিবে সে স্থানটি রাখিবে পরিপাটিরূপে মার্জ্জিত। 'কুকুর' জাতীয় জানোয়ারগুলি কিন্তু যেমন আহারে, তেমন বিশ্রামে পরিচ্ছন্নতার ধার ধারে না একটা।

একটা কথা সর্ব্বাগ্রে মনে হয়, যখন উহাদের আর কাজ থাকে না, সেই সময় এইভাবে সময় কাটানতে কর্ম্মহীন অলস জীবনের একঘেয়েমি হইতে রক্ষা পায়। তাহা ছাড়া এই পরিচ্ছন্নতা বা সভ্যভব্য হইবার প্রবৃত্তির উদ্ভব এমন একটা

প্রেরণা হইতে যাহা উহার মনে ত্রুটি বা অভাব-বোধের আভাষ জাগায়। হয়ত এই প্রকার ফিটফাট থাকার কারণ গভীরতর—কেন না, উহার সহিত জানোয়ারটির স্বাস্থ্যের যোগাযোগ রহিয়াছে প্রত্যক্ষ; হয়ত এমনও হইতে পারে যে, নিজ দেহ-গন্ধ তীব্রতর হইলে শিকারের দেহগন্ধ দূর হইতে নির্দ্ধারণ বা অনুভব উহার পক্ষে অসম্ভব দাঁড়ায়; আবার নিজ পশম সকল প্রকার ময়লা বা দুর্গন্ধ হইতে মুক্ত রাখা আপন নিরাপত্তার জন্যই প্রয়োজন; কারণ উহার দেহগন্ধই উহাকে বিপক্ষের গোচরে আনিয়া দিবে। তথাপি অপরিচ্ছন্ন থাকিলে যে উহা অস্বস্তি বোধ করে এবং পরিষ্কার হইবার একটা আগ্রহের তাড়না প্রাপ্ত হয়, একথা অনুমান করা কষ্টকর নয়।

মলয় ভালুক নিজ পশম, ছানাগুলির পশম পরিষ্কার করিয়াই তৃপ্ত হয় না। গাছের কোটরের আস্তানাটি পর্য্যন্ত নিপুণ গৃহিণীর মত লেজ দ্বারা ঝাড়ু দিয়া, আর্দ্র পশমের জলে ধোয়াইয়া নিকাইয়া-চুকাইয়া লয়। এইখানেই পরিচ্ছন্নতার শেষ নয়, আহারের মাছটি, কিম্বা ডোবাখানা হইতে সংগৃহীত গুগ্‌লিগুলি পর্য্যন্ত ভাজিয়া—পরে জলে শতবার ধৌত করিয়া তবে কোটরে লইয়া যাইবে। অধ্যাপক ইয়েরকেস্ ইহাদের আখ্যা দিয়াছেন—ফিট্‌বাবুর দল।

সদ্য শিকার-করা টাট্‌কা খাদ্য ছাড়া যে সিংহ প্রভৃতি কয়েকটি জানোয়ার খায় না—একথা ত প্রবাদের মত দেশে দেশে প্রচারিত। এমন কি গরুগুলিকে পর্য্যন্ত দেখা যায়, পূর্ব্বদিনের ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্যের বিচালী-টুকরাগুলি পুনরায় উহার সম্মুখে ধরিলে মুখ ফিরাইয়া লয়। ঐ অংশ আর খাইবে না কিছুতে।

আমরা গুরুভার বোঝা সঙ্গে থাকিলে যেমন ভারবাহী মজুরের আশায় অপেক্ষা করি, হুবহু সেই প্রকার মজুরের প্রতীক্ষা করে একপ্রকার কুমীর নদীতীরে উঠিয়া আসিয়া, যখন উহার দাঁতের ফাঁকে মাছের কাঁটা, মাংসের তাল আটকাইয়া উহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তোলে। কুমীরটি হাঁ করিয়া থাকে, আর কোথা হইতে দলে দলে ছোট ছোট পাখী আসিয়া অকুতোভয়ে উহার দাঁতের গোড়ায় ঠোকরাইয়া কাঁটা ও মাংসের তাল বাহির করিয়া লয়—প্রাপ্য মজুরী হিসাবে। এই যে কুমীরের অস্বস্তিবোধ ও উহা হইতে রক্ষা পাইবার ফিকির উদ্ভাবন—ইহার পশ্চাতে এমন একটা প্রেরণা রহিয়াছে, যাহা সহজাত প্রবৃত্তিমাত্র নয়।

ভারতের কোন কোন অঞ্চলের তীর্থক্ষেত্রে যে মর্কট ও হনুমানের দল কিছু আহার্য্য পাইবার আশায় কাপড়-চাদর প্রভৃতি বেমালুম সরাইয়া বস্ত্র-মালিকের চোখের সাম ছিঁড়িবার ভান্ করে অথচ সহসা ছিঁড়িয়া ফেলে না—ই পশ্চাতে রহিয়াছে একটা মতলব আঁটিবার জন্য সুনি স্পষ্ট চিন্তা-শক্তি।

প্রাণিতত্ত্ববিদ্ স্যাভিগ্নি বলেন—মিশরবাসী কূপের জল পান করিতে কখনই স্বীকৃত নয় যে কূপের আইবিস (সারস জাতীয়) পাখী পান করিতে উদ্যত হই ঠোঁট ফিরাইয়া লয়। মিশরবাসীদের বিশ্বাস এই পাখী এমন ক্ষমতা রহিয়াছে যাহা দ্বারা জলে কোনরূপ অনি পদার্থ থাকিলে ঘ্রাণেই উহা টের পায়। অথচ পূর্ব্বেই আ দেখিয়াছি—পাখীর ঘ্রাণশক্তি ক্ষীণ—সরীসৃপ অপেক্ষা ক্ষ তর।

প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ প্রাণিতত্ত্ব কুভিয়ার আবিষ্কার করিয়াছেন যে—লেমুর ন মাদাগাস্কারের মর্কটের নিম্ন পঙক্তির সম্মুখ দাঁত চিরু আকারে সংলগ্ন। উহার সাহায্যে লেমুর নিজ আঁচড়াইয়া পাট করে। উড্ জোন্স্ নামক প্রাণিতত্ত্ব পণ্ডিত বলেন যে, ঐ দাঁত ছাড়াও লেমুরের জিহ্বার ি পৃষ্ঠে মাংসল দাঁত রহিয়াছে কয়েকটি এক সারিতে, য দ্বারা উহা দাঁতের বুরুশের কাজ সারে। দাঁত দ্বারা পরিষ্কারকালে যে পশম ও অপরিষ্কার জিনিষ উহার আটকাইয়া যায়, জিহ্বার উক্ত বুরুশবৎ মাংসল দাঁত তাহা ঝাড়িয়া বাহির করে জিহ্বাটি আগাইয়া পিছাইয়া।

আমাদের কনিষ্ঠাঙ্গুলের নাম পূর্ব্বকালে ইংরেজ ছিল "অরিকুলারিস" (Auricularis); অর্থাৎ 'অরিক বা কান হইতে আঠাবৎ ময়লা পরিষ্কার করিবার জন্য ব্য হইত বলিয়া। বেজি আর আমেরিকার পিঁপড়া (Ant-eater)-য়ের পায়ের দ্বিতীয় আঙ্গুলে একটি ব লম্বা বক্র নখর আছে। বেজি ঐটিকে ব্যবহার করে মাথ পরিষ্কার করিতে আর পিঁপড়েখেকো ব্যবহার করে পশমের ভিতর ঢুকাইয়া গা চুলকাইতে। কোন কোন ভাল এই প্রকারের নখ আছে, যাহা গা চুলকান ভিন্ন অন্য কাজে উহা লাগায় না।

এই যে পরিচ্ছন্নতা বিধানের জন্য নখ বিশেষকে নির্দি করিয়া রাখা, ইহার পশ্চাতেও একটা অভাববোধের রহিয়াছে এবং উহা কতকটা মানুষের সভ্যভব্য বা স্পৃহারই মতই বলিতে গেলে। জানোয়ারের বোধ-নাই, চিন্তাশক্তি নাই একেবারে, এমন কথা বলা চলে না।

সন্ধ্যাতারা

(গল্প—পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ গুহঠাকুরতা

ঈশ্বরের কোলে উঠিয়া মেয়েটি কান্না থামাইয়াছিল। [ঈশ্ব]র জিজ্ঞাসা করিলঃ তোমার নামডা কি মণি—

তারাঃ মেয়েটি বলিল।

বাবার নাম জান?—ঈশ্বর আবার জিজ্ঞাসা করিল।

বিপিন বসুঃ মেয়েটি উত্তর দিল।

কোথায় থাক কইতে পার—ঈশ্বর বলিল।

—এখানে—আর কিছুই বলিতে পারিল না। তারপরেই [আ]মার হার, আমার হার—বলিয়া গঙ্গায় হাত দিয়া কাঁদিতে [শু]রু করিল। ঈশ্বর প্রথমে ভাল করিয়া ওর কথা বুঝিতে [পা]রিল না, তারপর বার বার শুনিতে শুনিতে বুঝিল, [মে]য়েটির গলায় একটি হার ছিল, সেই লোক দুটা লইয়া সরিয়া [প]ড়িয়াছে। বলিলঃ আমি তোমারে হার দেব তুমি চুপ [কর]। মেয়েটি কি বুঝিল কে জানে, কিন্তু চুপ করিল। তার-[প]র ঈশ্বর তাকে লইয়া অনেক জায়গায় গেল, যদি মেয়েটি তার [চে]না লোক দেখাইয়া দিতে পারে এই আশায়। কিন্তু কিছুতেই [কি]ছু হইল না। অনেক লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া অনেক [খোঁ]জ করিয়াও ঈশ্বর তার চেনা লোক বাহির করিতে পারিল [না]। অগত্যা সে নিজের কাছে রাখিল এবং সেই হইতে 'তারা' [ঈ]শ্বরের কাছে থাকিয়াই এত বড় হইয়া এখন পাঠশালায় যাইতে [আ]রম্ভ করিয়াছে।

পাঠশালায় একটি ছেলের সঙ্গে তারার খুবই ভাব হইল। [ছে]লেটির নাম মণ্টু। দেখিতে অবিকল তারার মত। বয়সেও [দু]জনে প্রায় সমান। তারা বলেঃ তুমি আমার মত। মণ্টু [ব]লেঃ তুমি আমার মত। তারপর ওদের মধ্যে তর্ক হয়, কে [ব]ড় কে ছোট। তারা বলেঃ আমি বড়। মণ্টু বলেঃ আমি [ব]ড়। শেষে দুজনে দাঁড়াইয়া দেখে কে বড় কে ছোট।

এমনি করিয়া ওদের দুজনের মধ্যে খুব ভাব হইয়া যায়। [তা]তে অন্য ছেলেমেয়েরা হিংসা করে। কিন্তু কিছু বলে না। ওদের দুজনকে দেখিতে ঠিক একরকম—যেন দুটি ভাই বোন। একদিন ওরা তারাকে জিজ্ঞাসা করিলঃ এই তারা, তোর বাবার [না]ম কিরে?—

হঠাৎ তারার মুখ কালো হইয়া উঠে, কিছু বলে না, সেই-দিনই বাড়ী গিয়া ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলঃ কাকা, বাবার নাম কি?-

—কাকা বলিয়া ডাকিতে ঈশ্বর শিখাইয়া দিয়াছিল। [ব]াবার কথা বলিলে বলিত; সে কাজে গিয়াছে, কাজ শেষ হইলেই আসিবে।

ঈশ্বর বলিলঃ বিপিন বসু।

একদিন মণ্টু ওদের বাড়ী লইয়া গেল তারাকে। ঘরে [ঢু]কিয়া বলিলঃ দেখ দাদা কাকে এনেছি।

কাকে রে—বলিয়া বিজন বাহিরে আসিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ তার মুখ হইতে আর কথা বাহির হইল না। কে জানিত, বন্ধুর বাড়ী আসিয়া আবার সে তার হারান বোনকে ফিরিয়া পাইবে? বিজন ভাবিল—এখন যদি তার মা বাঁচিয়া থাকিত; তবে দিনগুলি কত সুখের হইত। হায়, মা আর দেখিয়া গেল না।—বাবাও না। কিন্তু উপর হইতে কি দেখিতেছেন না? কোথায় ছিল এই বোনটি, কি ভাবে ছিল —কে তাকে দয়া করিয়া, ভালবাসিয়া এত আদর, এত যত্নে এত বড় করিয়াছে?—

দাদাকে হঠাৎ গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া মণ্টু বলিলঃ কি হ'ল তোমার দাদা? ওর নাম তারা, ও আমাদের সঙ্গে পড়ে। ওর বাবার নাম বিপিন বসু। দাদা, আমাদের বাবার নামও বিপিন বসু, না? কেমন মিল হয়েছে। দাদা, ওকে আর আমাকে দেখ্‌তে ঠিক একরকম, না?—

এতগুলি কথা বলিয়া মণ্টু হাঁপাইয়া পড়িল। তারা এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল। ভাবিয়াছিল, যে তার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সে হয়ত তাকে মারিবে কি বকিবে। কিন্তু অনেকক্ষণ পর যখন দেখিল, কিছুই করে না, তখন বলিলঃ আচ্ছা, ও বড় না আমি বড়?—আমি, না?—

এইবার বিজন বলিলঃ সে তখন মেপে দেখা যাবে, এখন ভেতরে এস, তোমাকে একটা জিনিষ দেখাই।

তারাকে লইয়া মণ্টু ঘরে ঢুকিলে, বিজন তার বাক্স হইতে একখানা ফটো বাহির করিয়া ওর সামনে ধরিয়া বলিলঃ বল ত এ কে—

ফটোখানি হাতে নিয়া অনেকক্ষণ দেখিয়া দেখিয়া তারা বলিলঃ আমার মা আমার মা। কোথায় আমার মা? অনেক-দিন তাকে দেখিনি ত? কোথায় বল না?—

বিজন বলিলঃ দেখবে পরে। তুমি আমাদের বোন, বুঝলে? চল খেয়ে দেয়ে তোমাদের বাড়ী যাই।—

আমাদের বোন হয়, তারা আমার বোন—বলিয়া মণ্টু তারাকে জড়াইয়া ধরিল। তারাও মণ্টুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলঃ তাই তুমি আর আমি দেখতে ঠিক একরকম, না মণ্টু?—

ঠিক বলেছিস তারা, তোর বেশ বুদ্ধি আছে ত—মণ্টু বলিল।

তারা বলিলঃ দ্যাখ মণ্টু, মা ভাই ভারী দুষ্টু। আমাদের রেখে কোথায় চলে গেছে, এখনও এ'ল না, আমরা কেমন আছি কি করছি, কত বড় হয়েছি, কিছু জানে না। এবার এলে কিন্তু আর যেতে দেব না, কেমন?—

হ্যাঁ ঠিক। দেখ্‌বি আমি এমন করে ধরে রাখ্‌ব যে, আর ছাড়িয়ে যেতে পারবে না। জানে না ত আমার গায়ে কেমন জোর—বলিয়া তারার হাত ধরিয়া কয়েকবার ঘুরপাক খাইল।

খাওয়া দাওয়া হইয়া গেলে বিজন তাদের লইয়া ঈশ্বরের বাড়ী আসিল। আসিবার সময় নিরঞ্জন তারাকে দেখিতে পাইয়া বলিলঃ আরে ঈশ্বরের মেয়েটা এল কোত্থেকে— কোথায় যায়, কি ছুঁয়ে দেয় তার কি ঠিক আছে?—

বিজন উত্তর দিলঃ বাগ্দী কি মানুষ নয় নিরু?—

বাড়ীর সামনে আসিয়া তারা ডাকিলঃ কাকা দাদা এসেছে, দ্যাখ এসে।—

ঈশ্বর তখন উনুন ধরাইয়া রান্নার যোগাড় করিতেছিল। ডাক শুনিয়া বাহিরে আসিল, বলিলঃ কই তোর দাদা—

এই যে—বলিয়া তারা বিজনের দিকে দেখাইয়া দিল। ঈশ্বর ত অবাক্। তার জমিদারের বন্ধু ওর দাদা।

ধীরে ধীরে সব কথাই উঠিল। বিজন যাহা জানে বলিল। ঈশ্বর বাকি কথা পূরণ করিয়া দিল।

বিজন বলিলঃ সত্যিই তুমি কাকা, আজ থেকে তোমাকে আমরা কাকা ডাক্‌ব।

ঈশ্বর বলিলঃ আমি ত একটা বাগ্‌দী। আপনার বোন্ আপনি নিয়ে যান্। এবার আমি কোথাও যাই।

বিজন বলিলঃ কাকা তুমি আবার কোথা যাবে? আমাদের আগ্‌লে রাখ্‌বে কে?

সেইদিন হইতে ঈশ্বর বা তারা নিরঞ্জন চৌধুরীর বাড়ীর কোন জিনিষ ধরিলে আর তা' গঙ্গাজল দিয়া শুদ্ধ করিতে হয় না। এমন কি, কিছুদিন বাদে ঈশ্বর আর তারা সেইখানেই উঠিয়া আসিল।

কিছুদিন পর নিরঞ্জনের ছোট ভাই শ্রীরঞ্জনের নজর পড়িল তারার উপর। তারা এখন বড় হইয়াছে—স্কুলে যায় না। যখন তখন যার তার সঙ্গে কথা কহিতেও পারে না। কিন্তু শ্রীরঞ্জন আসিয়া বিরক্ত করিতে আরম্ভ করে। কথা না বলিলে রাগ হইয়া চলিয়া যায়, তা'ও চায় না তারা। কারও প্রাণে ব্যথা দিতে পারে না ও।

নিরঞ্জনের স্ত্রী ঊষা শ্রীরঞ্জনের বিবাহের জন্য খুব চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু দেবরটির মত না পাওয়ায় এ পর্যন্ত ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে পারে নাই। কেন না, শ্রীরঞ্জন বলিয়াছিল যে বাবা নাই, মাও নাই যখন, (তিনি অনেক আগেই মারা গিয়াছিলেন) তখন বিবাহ করিবে কার জন্য, আজ সেই শ্রীরঞ্জনের মুখে বিবাহের কথা শুনিয়া ঊষা যেমন খুশী হইল, তেমনি বিস্মিতও হইল।

তারার উপর শ্রীরঞ্জনের প্রথম দেখা হইতেই কেমন একটা টান পড়িয়াছিল। এখন তাকে বিবাহ করিবার জন্য সে তার বৌদিকে ঘটকালির কার্য্যে লাগাইয়া দিল।

নিরঞ্জন প্রথম হাঁ, না কিছুই বলিল না। শেষে এক সময় মত দিয়া দিল। বিজনও আর দ্বিরুক্তি না করিয়া ছোট বোনের বিবাহ দিয়া দিল।

কিন্তু ভাগ্য দেবতা বোধ হয় বিরূপ ছিলেন।

কয়দিন ধরিয়া অতিরিক্ত ভোজনের ফলে বেচারা মন্টু কলেরা বাধাইয়া বসিল। তারপর এক সন্ধ্যায় ঘরে কান্নার রোল উঠাইয়া, সুখের আসরে বিষাদ আনিয়া সকলের কাছ হইতে বিদায় লইল।

কিন্তু ইহাতেই শেষ হইল না, কলেরা নিরঞ্জনকেও ধরিল তবে সে অপেক্ষা করিল কিছুদিন। ভুগিতে ভুগিতে তার চেহারা কাঠ হইয়া গেল। তারপর এক সময় সকলকে মুক্তি দিয়া নিজে মুক্ত হইল। আবার কান্নার রোল উঠিল।

বিজনের এর পর আর বেশী দিন মন টিকিল না। ছোট্ট ভাইটি চলিয়া গেল। তার বহুদিনের পুরান বন্ধু চলিয়া গেল। আর এখন সে থাকিবে কি লইয়া—কার কাছে? তাই একদিন তারাকে আর শ্রীরঞ্জনকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, ঊষার উপর সমস্ত ভার চাপাইয়া, ঈশ্বরের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া গ্রামের আঁকাবাঁকা মেঠো রাস্তা ধরিয়া অজানা পথে সে রওনা হইল।

মাস দুই পরে।

ঊষা আর শ্রীরঞ্জন বসিয়া গল্প করিতেছে, আর তারা কুটনা কুটিতেছে। শ্রীরঞ্জন বলিল, কি ছিল বাড়ীখানা বৌদি, আর কি হ'য়েছে এখন। ওঃ, সব ছারেখারে গেল। যখন ভাবি বাবার আমলের কথা, মনে হয় নিশ্চয়ই কেউ অভিশাপ দিয়েছিল। তুমি কি বল বৌদি!

সত্যই তাই। আগে কেমন বাড়ীটা লোকজনে গম্‌গম্ ক'রত, আর এখন—ঊষার গলা ধরিয়া আসিল।

এমন সময়ে ঈশ্বর একখানা চিঠি দিয়া গেল। পত্রখানি পড়িয়া ঊষা বলিল, আমার ত যেতে হবে। মায়ের খুব অসুখ লিখেছে।

—তা যেতে যখন একান্তই হবে, যাবে। কিন্তু তুমি যাতে তাড়াতাড়ি আস্‌তে পার তার চেষ্টা ক'র। নইলে বাড়ীটা আরও ফাঁকা মনে হবে।—শ্রীরঞ্জন বলিল।

দিন কতক পরে।

শ্রীরঞ্জন খাইতে বসিয়াছে। তরকারি দিতে দিতে তারা বলিল, দাদা গিয়েছে আজ কতদিন, কিন্তু একখানাও চিঠি দিলে না। কোথায় আছে না আছে কিছুই জানি না।

—তাইত, একখানা চিঠিও দিলেন না। কোথায় গেলেন বলেও গেলেন না।—শ্রীরঞ্জন উত্তর করিল।

একটু পরে হঠাৎ তারা বলিল, আচ্ছা তোমায় ডাক্তার কি বলেছে বলত? দিন দিন খাওয়া কমে যাচ্ছে। তারপর একটু রক্ত পড়ছে কাশির সঙ্গে। রোগটা সারবে না কি?

অল্প হাসিয়া শ্রীরঞ্জন বলিল, দেখ তারা, তুমি ত জান না এ কেমন রোগ। এ হ'লে আর সারতে চায় না।

তোমার কেবল ওকথা—বাধা দিয়া তারা বলিল। ওরকম ক'রে আরও শরীরটাকে খারাপ ক'রে ফেল্‌ছ।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া শ্রীরঞ্জন বলিল, তারা, তুমি এজীবনে আর সুখ পেলে না। ছোট বয়সে মা হারিয়েছ বাবা হারিয়েছ। তারপর স্বামী চিররোগী...... আবার একটু থামিয়া বলিল, তোমাকে পেয়ে আমার জীবন যে কি সুখের হ'য়েছিল তারা, কিন্তু বিধাতা বাদ সাধলেন। উঃ, পিকদানী দাও ত—বলিতে বলিতে এক ঝলক রক্ত তার মুখ হইতে বাহির হইল। তারপর আবার কাশিতে আরম্ভ করিল।

হতভাগিনী তারা তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়া মুখ মুছাইয়া দিয়া মাথায় পাখার বাতাস করিতে লাগিল। শ্রীরঞ্জনের দিকে চাহিয়া চোখ হইতে টস্ টস্ করিয়া জল পড়িল তার বুকের উপর।

শ্রীরঞ্জন চাহিয়া বলিল, একি তারা, তুমি কাঁদছ? কেঁদ না, ছি। জানি তুমি কত কষ্ট পাচ্ছ। কিন্তু তুমি যদি আমার জন্যই কাঁদ তা হ'লে আমি বড় কষ্ট পাই।

তারা বলিল, ওখানে একটা চিঠি লিখে দেব? একা

ার বড় ভয় করে। অসুখ হ'লে কি ক'রতে হয় ানে ত।

শ্রীরঞ্জন বলিল, কি হবে আবার বৌদিকে জড়িয়ে। অবশ্য লে তিনি আসবেনই! কিন্তু তাতে লাভ--

জগতে কতকগুলি জিনিষ এমনি অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটে, মানুষ স্বপ্নেও কোনদিন ভাবিতে পারে না।

বৌদির কাছে আর শ্রীরঞ্জনের চিঠি লিখিতে হইল না। দিন সকালবেলা বুদ্ধু আসিয়া ডাক দিল - চিঠি আছে।

চিঠিখানা পড়া হইলে তারা এবং শ্রীরঞ্জন দুজনেই কিছুক্ষণ করিয়া রহিল। ঘরে একটা নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে গল। কেবল ঘড়িটা তার স্বভাবসিদ্ধ টিক্ টিক্ শব্দ াইল না।

খবর---বৌদি হঠাৎ মাথায় রক্ত উঠিয়া মারা গিয়াছেন।

শ্রীরঞ্জন বলিল, তারা একে একে সব গেল। প্রথমে বাবা া—মা ত অনেক আগেই। তারপর সুখের দিন ভোগ ক'রতে ক'রতে মণ্টু গেল। দাদাও গেল। তোমার দাদারও আর ভাল ল না এখানে। কি ক'রে লাগবে বল— হারিয়ে, বন্ধু হারিয়ে কি নিয়ে থাকবেন— তিনিও একদিন আমাদের রেখে চলে লন। তারপর যা হোক একরকম চল্‌ছিল, কিন্তু দাদাকে ড় বৌদিও আর থাকতে পারলেন না- চলে গেলেন তিনিও। ন শুধু আমি তুমি আর তোমার ঈশ্বর কাকা। এবার ারও সময় এসেছে—শ্রীরঞ্জনের চক্ষু ভিজিয়া উঠিল। া চোখের জল ফেলিয়া বলিল, তবে আমি কার কাছে বে?

--এতদিন যার কাছে ছিলে।

আর বেশীদিন রোগের বোঝা সামলাইতে হইল না ঞ্জনকে। একদিন রাত্রে কাশিটা খুব বেশী হইল, খানিকটা ও পড়িল। মধ্যরাত্রে কথা কহিবার সামর্থটুকুও রহিল না। রবেলা তারাকে ঈশ্বরের কাছে রাখিয়া সে দাদার পথের যাত্রী ল।

মাস তিনেক পর।

ঘরের ভিতর হইতে সূর্য্যকিরণে উদ্ভাসিত গঙ্গা দেখা তেছে। বারান্দায় রৌদ্রে বসিয়া ঈশ্বর তামাক টানিতেছে। তরে তারা ঘর ঝাঁট দিতেছে।

তারা বলিল, কাকা, চল কাশী যাই। এখানে আর থাক্‌তে া করে না।

—কাশী! ঈশ্বরের মনের মধ্যে কি একটা পুরান কথা ক মারিল। বলিল, কাশী কেন—তারপরেই বলিল, আচ্ছা, তে চাও যাব, আমার আপত্তি কি।

—বেশ, তবে আমি আজই সব ঠিক ক'রে রাখি। কালই রানা হব, তারা বলিল।

ঈশ্বর উত্তর দিল, আচ্ছা।

তারা সব গুছাইতে আরম্ভ করিয়া দিল। কয়েকখানা পড়, কিছু টাকা আর দু-একটা খুব দরকারী জিনিষ ছাড়া র কিছুই লইল না।

পরদিন খাওয়া-দাওয়া সারিয়া প্রথম ট্রেনে উঠিয়া পড়িল। সন্ধ্যা তখন প্রায় হইয়া আসিয়াছে। রাখালেরা গরুগুলি লইয়া গৃহের দিকে ফিরিতেছে। খেয়াঘাটে দু-চারজন লোক লইয়া শেষ নৌকাখানি ছাড়িয়া দিল।

কাশী আসিয়া দিন কতক মন্দ গেল না। চারিদিক ঘুরিয়া দেখিয়া তারা মনটা একটু হাল্কা করিবার চেষ্টা করিল। রোজ দুবেলা গঙ্গাস্নানও করিতে লাগিল। শরীরটাও আগের চেয়ে একটু ভাল হইল।

কিন্তু বেশীদিন এভাবে চলিল না। মাস দুই যাইতে না যাইতেই শ্রীরঞ্জনের উৎকট ব্যাধি তারার ঘাড়ে চাপিয়া বসিল। প্রথম প্রথম তারা কিছু গ্রাহ্য করিল না। বিকালে মাঝে মাঝে একটু জ্বর হইত আবার রাত্রে ছাড়িয়া যাইত। কিন্তু তারপর হইতে রোজই জ্বর হইতে লাগিল---সঙ্গে কাশিটাও। তারাকে বাধ্য হইয়াই নজর দিতে হইল। কিন্তু নজর দিয়াই বা করিবে কি?--কয়েকদিন পর কাশির সঙ্গে একটু একটু রক্ত পড়িতে আরম্ভ করিল।

এইবার তারা বুঝিল, তারও দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে সে আর বেশী দিন বাঁচিবে না। কিন্তু দুঃখ হইল ঈশ্বর কাকার জন্য। বুড়া মানুষ—কোথায় থাকিবে, কি খাইবে—তারার কান্না আসিল।

অসুখের পর হইতে তারা ঈশ্বরকে ধারে আসিতে দিত না। বলিত, এতে তোমার আবার এই অসুখ হ'বে কাকা।

কিন্তু ঈশ্বর ছাড়িবার পাত্র নয়। জবাব দিত, আমার জন্য ভয় কি পাগলী, আমি যে পোড়া কাঠ।

তারা অতিরিক্ত বারণ করিলে বলিত, বেশ, তবে এই উপোস দিলাম। বাধ্য হইয়া তারা শেষে কাছে আসিতে সম্মতি দিল।

প্রাণ মন উজার করিয়া ঈশ্বর তারার সেবায় লাগিয়া গেল। কিন্তু উৎকট ব্যাধি কিছুতেই তাকে নিষ্কৃতি দিল না। একদিন লাঠি দিয়া ঈশ্বর তারাকে বাঁচাইয়াছিল গুণ্ডার হাত হইতে। কিন্তু বৃদ্ধ ঈশ্বর আজ আর পারিল না। জোর করিয়া মৃত্যু তার হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া গেল।

এখন একেবারেই ঈশ্বরের মন ভাঙিয়া পড়িল। সন্ধ্যাকে হারাইয়া তারাকে লইয়াই সে এতদিন নিজেকে ভুলিয়াছিল। কিন্তু এখন—

ঈশ্বর ঠিক করিল, আবার সে তার গ্রামে ফিরিয়া যাইবে। একদিন যাত্রাও করিয়া ফেলিল। কিন্তু গঙ্গার ধারে আসিয়া আর তার পা চলিল না। একদিকে কুড়ান তারার হারান ক্ষেত্র, আর একদিকে তার সুখদুঃখের চিরসঙ্গিনী সন্ধ্যা। কে বেশী—কোন্‌দিক ফেলিয়া যায় সে

ঈশ্বর জলের দিকে চাহিয়া মনে করিল তার জীবনের প্রত্যেকটি খুটিনাটি ঘটনা। যখন সন্ধ্যা ছিল—শুধু সন্ধ্যা আর সে। তারপর—কোথা হইতে আসিল একটি ছোট ফুট্‌ফুটে মেয়ে। কি সুখের দিন গিয়াছে দুইজনকে নিয়া। কত আবদার করিয়াছে তারা—কত ছোট্ট হাতের কীল, চড় সহিয়াছে সন্ধ্যা। আঃ, কি সে সুখের নীড় ছিল।

(শেষাংশ ২৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সনাতন ধর্ম্ম

ডাক্তার মহানাম ব্রত ব্রহ্মচারী

সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে আমেরিকার একটি সভার গল্প বলিয়া জিনিষটিকে আস্বাদনযোগ্য করিয়া লইব।

একবার একটি সভায় সমবেত বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রতিনিধিকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে,

"Whether Religion can give adequate Philosophy of human life?"

অন্যান্য ধর্ম্মের প্রতিনিধিগণ বলেন, তাহাদের ধর্ম্ম বর্ত্তমান যুগোপযোগী মসলা দিতে অক্ষম, প্রচলিত ধর্ম্মমতকে পরিবর্ত্তিত করিয়া বিজ্ঞানের মতানুযায়ী নূতন করিয়া গড়া দরকার। কারণ প্রচলিত ধর্ম্মমতের সঙ্গে বিজ্ঞানের অনেক অংশে বিরোধ দৃষ্ট হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, Bible মতে জগৎ সৃষ্ট হয় ছয় দিনে। কিন্তু evolution theory বা ক্রম অভিব্যক্তিবাদ অনুসারে দেখা যায়, এই জগতের ক্রমবিকাশ হইতে হাজার হাজার বৎসর লাগিয়াছে।

কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মে সৃষ্টি অনাদি কাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে, ইহাতে অভিব্যক্তিবাদ (evolution theoryর) মিল আছে। এস্থলে দেখা যায় অন্যান্য ধর্ম্ম বিশ্বাস বা faith-রে উপর প্রতিষ্ঠিত এবং আর্য্যধর্ম্ম যুক্তির উপর—Reason এর উপর প্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞান গবেষণা যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু উহার Practical application এর সঙ্গে অমিল।

যখন মানুষের ইতিহাস বিজ্ঞান ছিল না। তখন মেঘ বা বিদ্যুতের কারণকে দেবতা বলা হইত বা মানুষকে ঐভাবে ভয় দেখান হইত। কাজেই আমাদের পূর্ব্ব গৌরব কিছুই নাই, যদি কিছু থাকে তবে গীতা, উপনিষদ ও ভাগবতের মধ্যেই আছে। আর যদি ওতে কিছু না থাকে তবে আমাদের কিছুই নাই। তাহলে বিজ্ঞানের কাছে মাথা হেঁট করিতেই হইবে।

সত্য দুই প্রকার—(১) নিত্য সত্য—সনাতন সত্য—চির সত্য, (২) তাৎকালিক সত্য—ক্ষণস্থায়ী সত্য।

প্রত্যেক ধর্ম্মে দুই প্রকার লোক আছে এক দল গোঁড়া অন্য দল অবিশ্বাসী। প্রাচীন দল গোঁড়া, নবীন দল অবিশ্বাসী, পূজা-পার্ব্বণ আদৌ গ্রাহ্য করে না বা মানে না। আমরা কোথায় আছি তাহা জানা দরকার। মানুষ কোন দেশে বা শহরে গেলে সেই শহরের কোন স্থানে আছে, তাহা ম্যাপ দেখিয়া ঠিক করিয়া লয়, কাজেই আমরা কোথায় আছি আমাদের কর্ত্তব্যতার কতটা হইতেছে বা না হইতেছে, তাহার একটা হিসাব-নিকাশ হওয়া দরকার। Geographical position না হোক একটা moral position আছে।

এইটি একটু ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে—জাহাজ যাত্রার বিষয় চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, জাহাজের কলকব্জা প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় জিনিষ থাকিলেও দিকদর্শন যন্ত্র থাকা দরকার—উহা দ্বারা ধ্রুবতারা (Pole star) বা গ্রীণ উইচ সঙ্গে বা equador-এর সঙ্গে দূরত্বের একটা নির্দ্দিষ্ট মাপ ঠিক না থাকিলে ১০·১/১০০ অংশ ভুল হইলে জাহাজ প্রকৃত স্থান হইতে ৫০ মাইল দূরে পাওয়া যাইবে, এই জন্য একটি স্থির বা নির্দ্দিষ্ট বস্তুর সহিত দূরত্বের সম্বন্ধ থাকা দরকার; সেইরূপ আমাদের জীবনযাত্রাও ঠিকমত চালাইতে হইলে একটি নিত্য সত্য বস্তুর সঙ্গে জীবনের গতিবিধি বা মাপ ঠিক করা দরকার।

ভারত এই নিত্য বস্তু বা সনাতন বস্তু সম্বন্ধে একটা বুঝাপড়া করিয়াছে বলিয়া ভারতের হিন্দু ধর্ম্মকে সনাতন ধর্ম্ম বলা হয়।

পৃথিবীতে দেখা যায় প্রত্যেক ধর্ম্মমতেরই একজন স্রষ্টা আছে। কোন একটি নির্দ্দিষ্ট তারিখ হইতে উক্ত ধর্ম্মমত আরম্ভ হইয়াছে। হিন্দু ধর্ম্মের কোন নির্দ্দিষ্ট স্রষ্টাও নাই এবং কোন্ সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে তার দিন তারিখ পাশ্চাত্যের মত নাই দেখিয়া পাশ্চাত্য বাসিগণ মনে করে যে Tropical দেশে বাস করার জন্য গরমের প্রভাবে আলস্য বশত সময় জ্ঞানের জন্য চেষ্টা করে নাই। কাজেই তাদের মতে সনাতন বা অনাদি শব্দের কোন মূল্য নাই উহা vogous মাত্র। আর একটি কথা হইতেছে হিন্দুদের ধর্ম্ম ও অন্য দেশের Religion এক বস্তু নয়। পাশ্চাত্য দেশে Religion বলিতে কতকগুলি বিশ্বাস বা faith বুঝায় কিন্তু ভারতের ধর্ম্মের অর্থ অন্যরূপ।

খৃষ্টানকে Religion-এর কথা বলিলে সে কতকগুলি বিশ্বাসের নাম করিবে। কিন্তু হিন্দুকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, সে কি বিশ্বাস করে? কেউ ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে, কেউ করে না। কেউ কৃষ্ণ, কেউ শিব, কেউ কালী, কেউ দুর্গা, কেউ বৃষ, কেউ সর্পকে উপাস্য মনে করে; তবুও সকলেই হিন্দু। হিন্দুধর্ম্ম কতকগুলি সদাচার, শিষ্টাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত।

যে বস্তুর যে অবস্থা, তাহার নিত্য স্বরূপ তাহাকে তাহার ধর্ম্ম বলে। এবং যাহা না থাকিলে তাহাকে সেই বস্তু বলা যায় না, তাহাকে তাহার ধর্ম্ম বলে। যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে বলিয়া অগ্নি অগ্নি। এস্থলে অগ্নির ধর্ম্ম দহন। সূর্য্যের ধর্ম্ম তাপ দেওয়া, জলের ধর্ম্ম শৈত্য, মেঘের ধর্ম্ম বর্ষণ, চক্ষুর ধর্ম্ম দর্শন, কর্ণের ধর্ম্ম শ্রবণ। সেইরূপ যে সকল গুণ থাকিলে মানুষকে মানুষ বলা যায়, তাহাকে মানব ধর্ম্ম বলে; এই মানব ধর্ম্মই আর্য্য ধর্ম্ম। মানবের নিজস্ব ধর্ম্মই তাহার নিত্য বা সনাতন ধর্ম্ম। উহাই আর্য্য ধর্ম্ম। আর্য্য শব্দের অর্থ ভদ্র।

একমাত্র হিন্দু ধর্ম্মে পরিণামবাদের evolution theoryর স্থান আছে। এই ধর্ম্মে জীবের protoplasmic cell হইতে মানবত্ব লাভে ৮৪ লক্ষ যোনির কথা আছে। হিন্দুদের ১০ টা অবতারও অভিব্যক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। সৃষ্টির প্রথমে জগৎ জলময় ছিল তখন হয় মৎস্য অবতার, তৎপর স্থলভাগ সৃষ্টি হইলে হয় কূর্ম্ম অবতার, জল ও স্থলচারী; তৎপর জঙ্গল হইলে হয়—জল ও জঙ্গলচারী বরাহ অবতার; তৎপর নৃসিংহ—অর্দ্ধেক মানুষ অর্দ্ধেক পশু; তৎপর মানবক—ছোট মানুষ বা বামন অবতার; তৎপর পরশুরাম—যোদ্ধা; তৎপর

ত রামচন্দ্র—আদর্শ মানুষ। তৎপর বলরাম—
ধ—শ্রেষ্ঠ সাধক বা জ্ঞানী ; তৎপর কল্কি কল্ক
রেণকারী। ক্রমগতিশীল বিবর্দ্ধনবাদকে সমর্থন-
ে মতে সৃষ্টি অনাদি সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই
য় সহস্র সহস্র সমষ্টি মাত্র। উহার পরিমাণ পঞ্জিকায়
বুঝা যাইবে—আর্য্য মতে সৃষ্টি অনাদি ও অসীম।
ষের সামাজিক ধর্ম্ম, পারিবারিক ধর্ম্ম, ছাত্র ধর্ম্ম,
র্ম, বাণিজ্য ধর্ম্ম, রাজনৈতিক ধর্ম্ম প্রভৃতি বিভিন্ন
হ, বক্তার ধর্ম্ম ও শ্রোতারও ধর্ম্ম আছে। কিন্তু
একটা এমন বিশিষ্ট ধর্ম্ম আছে, যাহা যে যেখানেই
কেন সর্ব্বদেশের মানুষেই উহা বিদ্যমান।

মানবধর্ম্মের দুইটি দিক

া পশুর সহিত সামঞ্জস্যযুক্ত (animality) অপরটি
y বা মানবত্ব—সর্ব্বদেশের মানবের মধ্যেই নিম্ন-
টি মানবধর্ম্ম বিদ্যমান আছেঃ—

বের প্রথম ধর্ম্ম হচ্ছে দয়া—অন্যের প্রতি আপন
স্বার্থ-পরবশ না হওয়া বা হিংসা না করা—এক কথায়

বের দ্বিতীয় ধর্ম্ম, অস্তেয়—চুরি না করা।
বের তৃতীয় ধর্ম্ম, শৌচ—দৈহিক ও মানসিক
।
বের ৪র্থ ধর্ম্ম, সংযম—পঞ্চ কর্ম্ম ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের
ংযত করা।
বের ৫ম ধর্ম্ম, সত্য—বাহির ও ভিতরের সরলতা মিথ্যা
বিন খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া যায়, জীবনটা disintegrated
য়।

় কোন কথা মিথ্যা বলিলে, উহা অন্যের কাছে সত্য
প্রতীয়মান হউক বলিয়া আশা করে। অথচ সত্যের
াহার দ্বন্দ্ব। একমাত্র সত্যই স্থায়ী হয়, মিথ্যা
া।

রোক্ত ৫টি ধর্ম্ম সর্ব্বসম্প্রদায়ে সর্ব্বকালে নিত্য
ন ; কাজেই উহা মানবের নিত্য ধর্ম্ম, উহা অপরিব-
উহা দেশ বা কালকে অপেক্ষা করে না। মনুষ্যত্ব লাভ
"মানুষ দেবত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা করে"
ুষের নিজের একটি potential বা dormant শক্তি
াহা জাগ্রত করা দরকার। প্রত্যেকের মধ্যেই ঈশ্বর
ত্মিক শক্তি বা একটা spiritual power আছে, অভ্যাস
় অন্তর্নিহিত দেবভাবকে জাগ্রত করিতে হইবে।

র্য্যগণ কোন জনসংঘকে কোন একটি অন্ধ বিশ্বাসের
' হইবার উপদেশ দেন নাই। কাছে কাছে বসবাস
আচার-ব্যবহার সংস্কার করিয়া চরিত্র পরিবর্ত্তন করিয়া
ব্যবস্থা করিত। ঈশ্বর সম্বন্ধে তার যাহা ইচ্ছা ধারণা
না কেন তাহাতে কিছু আসে যায় না। কালী, কৃষ্ণ,
র্প যাহাই তাহার ভগবান হউক না কেন তাতে হিন্দুত্বের
হইবে না। আচরণ দ্বারা অন্তর্নিহিত দেবত্বের
ন করা দরকার। সাধন, ভজন, আসন, প্রাণায়াম দ্বারা
উহার উদ্বোধন করিতে হইবে। আর্য্যদের convertion
এর পদ্ধতি সম্পূর্ণ নূতনরূপ।

সমাজধর্ম্ম—দুই ভাগে বিভক্তঃ—(১) সমষ্টিগত ধর্ম্ম।
(২) ব্যষ্টিগত—বা ব্যক্তিগত ধর্ম্ম।

অনেকেই দেশে দেশে বলিয়া চীৎকার করেন,—সামাজিক
রাজনৈতিক, নৈতিক বিপর্যয় দেখিয়া প্রত্যহ কত হট্টগোল
হয়, কিন্তু প্রকৃত প্রতিকার কি? সভা-সমিতি দ্বারা উহার
খণ্ডন বা উচ্ছেদ হয় না। ব্যক্তির ধর্ম্ম ঠিক হইলে সমষ্টির
ধর্ম্ম আপনা আপনিই ঠিক হইয়া যাইবে। প্রত্যেক ব্যক্তি
যদি ঠিক হয় একদিনে পৃথিবীর বিপ্লব অপনোদন হইতে
পারে।

সমষ্টিগত ধর্ম্মের ৪টি অঙ্গ। উহাকে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম
বলে—যথা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র।

(১) সমাজের বিদ্যা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি
যাহারা চর্চ্চা করিবে তাহারা ব্রাহ্মণ। (২) যাহারা রাজ্য
শাসন সংরক্ষণ করিবে তাহারা ক্ষত্রিয়। (৩) যাহারা কৃষি-
বাণিজ্য করিবে তাহারা বৈশ্য। (৪) যাহারা এদের দাসত্ব
করিবে তাহারা শূদ্র।

আর ব্যষ্টিগত ধর্ম্মের অপর নাম চতুরাশ্রম ধর্ম্ম, যথা—
ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ভৈক্ষ্য বা সন্ন্যাস—ব্যক্তিগত
ধর্ম্মের প্রথম সিঁড়ি হচ্ছে ব্রহ্মচর্য্য।

ব্রহ্মচর্য্যং বীর্য্য ধারণং—চিন্তা ভাবনা, গবেষণার মূল
হচ্ছে বীর্য্য বা ব্রহ্মশক্তি, ব্রহ্ম বা মহান বিষয়ে চিন্তার আশ্রয়
থাকে। কাজেই এই ব্রহ্ম বস্তু রক্ষা করিতে হইলে বিধি-
নিষেধের মধ্য দিয়া জীবন গঠন করা দরকার।

দ্বিতীয় স্তর—গার্হস্থ্য জীবন বিবাহিত জীবন এই
জীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনার পূর্ব্বে নারী-জীবন
সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা দরকার—

নারীজীবন তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ১ম—
কুমারী জীবন। ২য়—পত্নী জীবন। ৩য়—মাতৃকা জীবন।

মাতৃত্বই রমণী জীবনের পরাকাষ্ঠা বা সার্থকতা। আত্ম-
দান ও সেবাই মাতৃ জীবনের প্রধান অবদান। মাতৃত্ব অর্থে
দুর্গা বা জগদ্ধাত্রী বা জগন্মাতার ভাবের স্ফুরণ। এজন্য
বালিকা জীবনে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা—বিবাহিত জীবনে সংযম
শিক্ষার জন্য বিবিধ ব্রত অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে। ব্রতের
মধ্যে অনেক কিছু নূতন শিক্ষা আছে এবং উহা পরিপুষ্ট হয়
ব্রতের সঙ্গে ব্রত-কথা শ্রবণ দ্বারা। কেবল লেখাপড়া করিলেই
যে শিক্ষা হয় তাহা নহে। পূর্ব্বে আমাদের দেশে দিদিমা,
ঠাকুরমাতাগণ মেয়ে বা নাতনীদিগকে মুখে মুখে অনেক
কিছু শাস্ত্র-রহস্য শিক্ষা দিত।

পূর্ব্বে পাশ্চাত্য দেশে নারী জাতির সম্মান ছিল না,
সর্ব্বপ্রকারে দাবাইয়া রাখা হইত, এখন তাহার প্রতিক্রিয়া
হইতেছে। কিন্তু নারী ও পুরুষ সম্বন্ধে ভারতের ধারণা
স্বতন্ত্র প্রকারের।

আমাদের দেহে চক্ষু ও কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের প্রত্যেকের
স্ব স্ব কার্য্য আছে এখানে বড় ছোট ভেদ নাই—দৃষ্টির জন্য

চক্ষু বড়, শ্রবণের জন্য কর্ণ বড়। প্রত্যেকের স্থানানুযায়ী প্রয়োজনীয়তা আছে—মাতার স্থানে মাতা বড়, পিতার স্থানে পিতা বড় দুইজনের দুই প্রকার দান। দানের ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। কাজেই ছোট বড় বলা চলে না স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্ব স্ব প্রধান। কাজেই পুরুষ স্ত্রীর কাজ এবং স্ত্রী যদি স্তন দান ত্যাগ করিয়া অফিসে কাজ করিতে যান তবে সেটা সমীচীন হইবে না।

পাশ্চাত্যগণ গার্হস্থ্য জীবনকে স্ফূর্ত্তির জীবন বলে। ঋষিগণ বলেন গার্হস্থ্য জীবন কঠোর কর্ত্তব্যের সমষ্টি। ঋষিগণ বলেন—মানুষ পিতামাতার কাছে, সমাজের কাছে, প্রত্যেকের কাছে ঋণী, তাহাকে এই সকল ঋণ শোধ দিতে হইবে। কাজেই তার গর্ব্ব করিবার কিছুই নাই।

দেবঋণ—দেব পূজা দ্বারা দেবঋণ শোধ হয়।

ভূতঋণ—সমস্ত পক্ষী রক্ষণাবেক্ষণ পালন দ্বারা।

নৃ যজ্ঞ—অতিথিসেবা বা অসময়ে আগন্তুক ব্যক্তিকে খেতে দেওয়া।

এই অতিথিসৎকার পৃথিবীর অন্য কোন সভ্য দেশে নাই ও দেশের অতিথি হচ্ছে নিমন্ত্রিত guest। অনিমন্ত্রিত কেউ খাদ্য ত দূরের কথা কোন প্রকার অভ্যর্থনাই পায় না।

ভোগবিতৃষ্ণ হইয়া সমস্ত জাতির জন্য চিন্তা করা, দেশ-ভ্রমণ, তীর্থ-পর্য্যটন দ্বারা বিভিন্ন দেশের জ্ঞান বিজ্ঞান পরি-দর্শন ও পর্য্যালোচনা করিয়া স্বদেশে ঐ সকল সংস্কৃতি প্রবর্ত্তন করিতেন কাজেই তাঁহাদের কার্য্য ছিল জ্ঞান আহরণ জ্ঞান দান।

বৌদ্ধ যুগের শূন্যবাদ, শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ দ্বারা জগৎ অসার বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। একমাত্র ব্রহ্ম সার আর সব অসার বা মায়ার খেলা। এই জন্য চতুরাশ্রম দুই ভাগে বিভক্ত হইল। এক হইল সংসারী আর সন্ন্যাসী।

সন্ন্যাসিগণ মায়াময় সংসার ছাড়িয়া পর্ব্বতে বনে জঙ্গলে, পর্ব্বত-গুহায় চলিয়া গেলেন, মিলনের উপায় নাই। সংসার তখন সশ্রম কারাবাস বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

সংসার বা গার্হস্থ্য আশ্রম বিক্ষিপ্ত ও বিপর্য্যস্ত হইল এবং দুর্ব্বিষহ হইয়া পড়িল। চতুরাশ্রমের গতিশীলতা ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িল। ষ্টেশনকে গৃহ মনে করিলে যাত্রীর যেমন দুরবস্থা হয় তদ্রূপ সংসার বিষময় হইয়া উঠিল।

বৌদ্ধযুগে অকাল সন্ন্যাস, বৌদ্ধের শূন্যবাদ হইতে আরম্ভ হয়। শঙ্করাচার্য অন্য দিকের কিছু পরিবর্ত্তন করিলেও শূন্যবাদ স্থানে ব্রহ্ম ও মায়াবাদ স্থাপন করিলেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ধ্বংস হইল। সংসার ও সন্ন্যাসের বিষময় অবস্থা হইতে সমাজকে রক্ষা করিতে হইলে একমাত্র ভক্তি ধর্ম্মই সমর্থ।

"যৎ করোষি যৎ অশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।

যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুস্ব মদর্পণম্॥ গীতা

কি সন্ন্যাসী কি সংসারী যদি এই মহাবাণী অনুযায়ী কার্য্য করে, তবে তার আর কোন বিঘ্ন থাকে না। ভক্তি ধর্ম্ম দ্বারা সংসারী প্রকৃত সন্ন্যাসী এবং সন্ন্যাসী প্রকৃত সংসারী হয়।

কারণ মন-প্রাণে কর জীব করুণা, কল্যাণ, ক্ষমা, দয়া ধর্ম্মদান, উদ্ধার, বিকাশ। কারণ মনপ্রাণে কর জীবে করুণ কল্যাণ ক্ষমা দয়া অপরাধ উদ্ধার বিকাশ।

ভক্তি ধর্ম্মে সংসার অনিত্য নয়, জ্ঞানেই সংসারে জীবের প্রতি সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য আছে। সংসারীর মত তাহার বিগ্রহ-সেবা, সাধু-সেবা ভক্ত-সেবা অতিথি-সেবা আছে। কাজেই ভক্তিধর্ম্ম এই অসঙ্গতিতে সংসার ও সন্ন্যাস আশ্রমের মধ্যে একটা মধুর আনন্দময় অবস্থা আনয়ন করিতে সক্ষম।

সন্ধ্যা-তারা

(২৫ পৃষ্ঠার পর)

তারপর অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। এক অপ্রত্যাশিত দিনে চলিয়া গেল সন্ধ্যা। ঈশ্বর তখন পাগল। কিন্তু তারার সেই আধ আধ কথাই আবার তাকে সংসারের ক্ষুদ্র নীড়ে ফিরাইয়া আনিল।

তারপর আবার কিছুদিন গেল, তারার বিবাহ হইল। এই বিবাহে সবচেয়ে সুখী হইয়াছিল সে। কিন্তু সেই সুখ বেশীদিন সহিল না। কোথা হইতে কে আসিয়া ছোট্ট ভাইটিকে ছিনাইয়া লইল। সেই মণ্টুই কি তার হৃদয় কম দখল করিয়া-ছিল—

আবার...আবার গেল তারার স্বামী। ঈশ্বরকে তার বিধবা বেশ দেখিতে হইল। এই শোক তার প্রাণে কতখানি লাগিয়া-ছিল, কেউ জানে নাই। সেই দুঃখে কত রাত্রি যে সে কাঁদিয়া কাটাইয়াছে, সে খবর তারাও জানিতে পারে নাই।

জলের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ সন্ধ্যার মুখখানি ঈশ্বরের সামনে ভাসিয়া উঠিল। ঐ ত সন্ধ্যা—ঐ তাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। কই, কই—আবার সেখানে তারার মুখ কেন দেখা গেল।—

না, না—আবার ঐ সন্ধ্যার মুখ। তারপর আবার মিলাইল—আসিল তারা। এখন আবার তারা। এই আসিয়াছে সন্ধ্যা।

কিছুই বুঝিল না ঈশ্বর। দুইখানি মুখ ঘুরিয়া ফিরিয়া তার চোখের সামনে ভাসিতে লাগিল। দোটানায় পড়িল সে। এখানে থাকিবে কি গ্রামেই ফিরিবে—জলের দিকে অনিমেষনেত্রে চাহিয়া ঈশ্বর শুধু এই কথাই ভাবিতে লাগিল।

সন্ধ্যা তখন ঘনাইয়া আসিয়াছে। দূরে আকাশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি উজ্জ্বল তারা কিছুক্ষণ মিটমিট করিয়া স্থির হইয়া জ্বলিতে লাগিল।

—শেষ—

প্রণয়ের পরে

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীসত্যকুমার মজুমদার

(৯)

ইহার পর প্রায় দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। অমর আর লীলাকে একদিনের জন্যও দেখিতে যায় নাই—লীলাও আর অমরকে দেখিবার জন্য তেমন আগ্রহ প্রকাশ করে নাই। ইহার মধ্যে দুই একবার লীলা পিত্রালয়ে আসিয়াছে। অমরের সঙ্গে দেখা হয় নাই। সেবার মায়ের অসুখের সংবাদ পাইয়া লীলা পিত্রালয়ে গিয়াছিল। একদিন সন্ধ্যার জল লইয়া বাড়ী ফিরিতে অমরের সঙ্গে মুখামুখি দেখা হইয়া গেল।

অমর কহিল, "লীলা! তুই কবে এলি এখানে?"

লীলা অমরের পায়ে মাথা নোয়াইয়া বলিল, "তা আট-দশ দিন হবে। তুমি কবে বাড়ী এসেছ অমরদা, বৌদি এসেছেন?"

অমর কহিল, "আমি বরাবর বম্বে থেকে আসছি। তোর বৌদির সঙ্গে দেখা হয়নি! এ ক'মাস আমি বম্বে ছিলাম। হ্যারে লীলা, নরেনবাবুরা ভাল আছেন?"

লীলা কহিল, "ওঁরা কাল আসবেন এখানে। চল না অমরদা, ভেতরে গিয়ে বসবে চল। কতদিন তোমায় দেখিনি, পেটে কত কথা জমা হয়ে রয়েছে।"

"রাত হয়ে গেছে—কাল এসে শুনবখন।"

"তবে তোমার এসে কাজ নেই, আমি নিজেই যাব দুপুর বেলায়!"

অমর চলিয়া গেল। লীলাও জল লইয়া বাড়ী ফিরিল।

পরদিন নির্জন ঘাট-পথে লীলা আসিয়া অমরের সম্মুখে বসিল। নিদাঘের প্রখর মধ্যাহ্ন। রৌদ্রতপ্ত প্রকৃতির উষ্ণ নিশ্বাস বহুদিনের বিস্মৃত স্মৃতি বহিয়া আনিতেছিল। কালের ব্যবধানে—নিষ্মম নিয়তির কঠোর বিধানে—কত নিকট—কত পর হইয়া গিয়াছে। আজ কোথায় সে অমর—কোথায় সেই লীলা! সে লীলাও বুঝি আর বাঁচিয়া নাই, অমরেরও বুঝি সব শেষ হইয়া গিয়াছে। তবুও তাহারা সেই—দুজনাই, সেই অমর আর সেই লীলা!

লীলাই প্রথমে কথা কহিল। বলিল, "আজ অনেকদিন পরে আমার এই কথাই মনে হচ্ছে যে, তুমি বুঝি কখনও মিথ্যে কথা বল না অমরদা!"

বুঝিতে না পারিয়া অমর কহিল, "আজই বা কোন্ মিথ্যে বলেছি লীলা?"

"তা নয় অমরদা, তুমি যা বল প্রথমে তা বিশ্বেস করতে ইচ্ছে না গেলেও শেষে দেখি সত্যি হয় তোমার কথাই।"

অমর লীলার দিকে চাহিয়া রহিল। লীলা বলিতে লাগিল, "মনে নেই অমরদা, সেই বছর দুই পূর্ব্বে—পরেশনাথের বাগানে আমায় বলেছিলে—একটি লোককে ভয় করে চলতে,—ঐ যে আমার স্বামীর বন্ধু সতীশবাবু!"

"হ্যাঁ তাই কি হয়েছে?" অমরের স্বরে সোৎকণ্ঠ কৌতূহল।

লীলা একটু হাসিবার চেষ্টা করিল, পারিল না। যেন কি বলিতে যাইয়া লজ্জায় তার সারা মুখখানি আরক্ত হইয়া উঠিল।

"কি করেছে সতীশবাবু?"

অমরের কথার সুরে হাসিয়া ফেলিয়া লীলা কহিল, "করবে আবার কি, তুমিও যেমন। তবে কিনা তোমার কথাই সত্যি, হ'ল যে লোকটি একটু ভয়ের হয়েই উঠেছে আমার কাছে।"

"আর সেই সঙ্গে তুমি অনেকখানি নীচে নেবে এসেছ।" শ্লেষ-মিশ্রিত বিরক্তিতে অমরনাথ কহিল।

অমরের মুখে এরূপ রূঢ় উত্তর লীলা প্রত্যাশা করে নাই। তার আত্মমর্য্যাদায় এমনধারা আঘাত করিবার কে এই অমরদা। গুম্ হইয়া লীলা কতক্ষণ বসিয়া থাকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "তুমি আমাকে অত ছোট ভাববে জানলে আমি আসতেম না। তুমি জান কত বড় অগ্নি-পরীক্ষা আমি পার হয়ে এসেছি! তার পরও তুমি আমায়......"

কথা অসমাপ্ত রাখিয়াই অভিমানিনী চোখে অঞ্চল দিয়া বাহিরে আসিল—আর ফিরিয়া চাহিল না।

বিকালের দিকে সতীশকে সঙ্গে লইয়া নরেন্দ্রনাথ আসিয়া পৌঁছিল। দুইদিন স্বামী আর স্বামীর বন্ধুকে লইয়া লীলা বেশ আমোদেই কাটাইয়া দিল—। কিন্তু অমরের কথার আঘাত কিছুতেই ভুলিতে পারিল না।

সেদিন বৈঠকখানার ঘরে বসিয়া নরেন্দ্র আর সতীশ তর্ক করিতেছিল কাব্য আর সৌন্দর্য্য লইয়া। কথাটা উঠিয়াছিল লীলার বোন মণিকে দেখিয়া। অবসর পাইয়া লীলা একটু অমরের কথা ভাবিতে লাগিল। কি তাহার এই অমরদা!......কি আর তেমন কথা! জীবনের কোন কথাই সে তার অমরদার কাছে না বলিয়া সোয়াস্তি পায় না। এ তার নিছক নিজের কথা, এ তার জয় না পরাজয়! এ খেলায় তাহার গৌরবের মাত্রাই বাড়িল না নারীত্বের আদর্শ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে সরিয়া পড়িল। এই বিচারের ভারই না সে অমরের কাছে ফেলিয়া দিয়া একটু নিশ্চিন্ত হইতে চাহিয়াছিল। কি ঈর্ষাপরায়ণ এই পুরুষের জাত! অমরদাও ঈর্ষার হাত হইতে অব্যাহতি পায় নাই। নিজের দাবীর মধ্যে আইনত কোন স্বত্ব না থাকিলেও অপরের অনুরূপ দাবী এত তিক্ত লাগে! যা নিজের আয়ত্তের বাহিরে তাতে অন্যের লুব্ধ দৃষ্টিটুকু কি এতই অসহনীয়! হায়রে মানুষের কি চিত্তবৃত্তি!

লীলার আবার মনে হইল, সে নারী। নারী চিরকাল পুরুষের পদানত, পুরুষের দাসী, পুরুষের পরিচালনে ন্যস্ত পদার্থ—দাবী যেন তাহার কিছু নাই। কোন স্বাধীন ইচ্ছা যেন তাহাদের থাকিতে নাই। যত শাস্ত্র নির্দ্দেশ, যত বিধি নিষেধ, সে সকলের কঠোরতা যেন একা নারীর জন্য। তাদের অন্তরের সুখ-দুঃখ অনুভূতি এর কোন মূল্যই যেন পুরুষের কাছে নাই। তারা যেন খেলার পুতুল। নারী হৃদয় লইয়া ছিনি-মিনি খেলিবার অধিকার যেন পুরুষের একচেটিয়া!

তাদের সেই একচেটিয়া অধিকারে হস্তক্ষেপ করিয়া কোন নারী যদি তুল্যরূপ অধিকার দাবী করে তবেই তাহার পক্ষে হয় তাহা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।

নিজের মনের সঙ্গে অনেক তর্ক করিয়াও লীলা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না যে অমর তাহাকে নীচে নামিয়া যাওয়ার কথা বলিল কি ভাবিয়া। অমর কি তাহাকে জানে না। কি কুকার্য্য সে করিতে পারে বলিয়া তার অমরদা ধারণা করিয়াছে, যে এই নীচে নামিয়া যাওয়ার কথা আসিল। সে ত তার অমরদার কাছে শুধু এই কথাই বলিতে গিয়াছিল যে, যে সতীশকে সে মোটেই পছন্দ করিত না; যাহার নির্লজ্জ দৃষ্টির অন্তরালে থাকিতে পারিলে সে নিজেকে সুখী মনে করিত, আজ কিনা তারই বন্ধুত্বের দাবী সে অস্বীকার করিতে পারে না। কেবল এটুকুই না তার কথা—না আর কোন কিছু ছিল! এই অস্বীকার করিতে না পারার মধ্যে নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি—পুরুষের হৃদয় জয়ের আকাঙ্ক্ষা—মুগ্ধহৃদয়ের সপ্রশংস-দৃষ্টি কি অলক্ষ্যে উঁকি মারিতেছিল!

সে যে অনেক কথা—অনেকদিনের ইতিহাস। কত চেষ্টা—কত সাধ্য-সাধনা—স্বামীত্বের অধিকারের কত দোহাই দিয়াই না তার স্বামী সতীশের সম্মুখে তাহাকে বাহির করিতে পারিয়াছিল, সতীশের সঙ্গে কথা বলাইতে বাধ্য করিয়াছিল, তার সঙ্গে আলাপ করিতে প্ররোচিত করিয়াছিল। তবেই না সে সতীশের সম্মুখে বাহির হইয়াছে—তার সঙ্গে কথা কহিয়াছে, আলাপ করিয়াছে, আবার তার মুগ্ধ-বিহ্বল দৃষ্টির সম্মুখে পড়িয়া ভয়ানক সঙ্কুচিত ও কুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে। তারপর দীর্ঘ দিনের অভ্যাসেই না সে—সে-সঙ্কোচ কুণ্ঠাকে দূরে ঠেলিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছে। কত দীর্ঘ দিনের মেলামেশাতেই না নারী-হৃদয়ের অফুরন্ত স্নেহ ভাণ্ডারের এতটুকু কণার স্পর্শে তাহাকে অভিনন্দিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহাই না তাহার কথা! এই সামান্য কথা কয়টি শুনিবার ধৈর্য্যও কি তার অমরদার নাই!

কি সে তাহার অমরদা —যার সমস্ত কথা—সমস্ত নিন্দা সে মাথা পাতিয়া লইবে! কি অধিকার তার অমরদার তাকে অমন করিয়া অপমান করিবার। শুধু না সে একটু ভাল-বাসিত। তার চতুর্গুণ করিয়াই লীলা তাহাকে ফিরাইয়া দিয়াছে। এত জোর তার কিসের! এত অধিকার তার কোন্ দানে—কোন্ সৎকর্ম্মের প্রচেষ্টায়! .. দীর্ঘদিন পরে কোন্ অধিকারে সে তাহাকে শাসন করিতে আইসে! আজ কোন্ বাধ্যতায় সে তার শাসন মানিয়া লইবে!

আজ সর্ব্বপ্রথম লীলার চিত্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। অমরের কথা মনে হইয়া চোখের কোণে অশ্রু দেখা দিল না, বুকের উপর আবেগের ঢেউ খেলিয়া গেল না। কোমল অধরপ্রান্তে ক্রূর হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। যে আঘাত এত-দিন সে বুক পাতিয়া সহিয়াছে—সেই আঘাতের ব্যথা আজ অমরের বুকে ফুটাইয়া তুলিতে দৃঢ়সংকল্প হইল। হৃদয়ে ঈর্ষার বহ্নি জ্বালাইয়া দেখিতে চাহিল কেমন সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়। নিজের ঘরে বসিয়া লীলা উপায় খুঁজিতে লাগিল। ভাবিয়া ভাবিয়া উপায় স্থির করিয়া ফেলিল।—

সংকল্প সিদ্ধির আনন্দে সারা মুখ উজ্জ্বল করিয়া লীলা ডাকিল "রাণু, এদিকে আয় ত ভাই।"

রাণু নিকটে আসিলে লীলা রাণুর হাতে একটুকরা কাগজ লিখিয়া দিয়া বলিল, "অমরদার কাছে এক দৌড়ে যাবি লক্ষ্মী বোনটি। এইটে তাকে দিয়ে আস্‌বি—কি বলেন, শুনে আস্‌বি!"

রাণু চলিয়া গেল। খানিক বসিয়া লীলা কি ভাবিল। এক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু নয়নের কোণে দেখা দিয়াই মিলাইয়া গেল। লীলা উঠিয়া আসিয়া বৈঠকখানার ভিতরকার দরজার পাশে দাঁড়াইয়া দেখিল, সতীশ আর নরেন্দ্র যেন কি একটা কথা বলাবলি করিয়া পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া আছে।

লীলা মুখ বাড়াইয়া বলিল, কি বলা হচ্ছে তোমাদের দুজেনায় চুপি চুপি! কবি আজ যে বড় গম্ভীর!—

নরেন্দ্র হাসিয়া কহিল, "তুমি এসেছ, ভালই হয়েছে। কবির এই দার্শনিক ভাবটা দূর করে দিয়ে যাও!"

লীলা ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া কহিল, "দার্শনিকভাব,—সে আবার কেমন?"

সতীশ বলিল, "আপনিই বলুন না বৌদি, এতে দার্শনি-কতা কি আছে! আমার পেছনে মিছি মিছি লেগেছে কেন?"

লীলা কহিল, "দাঁড়ান, বন্ধু, সদরটা আগে বন্ধ করে দিয়ে আসি। কেউ যদি পাছে এসে পড়ে!"

লীলা সদর বন্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিল। বলিল, "এবার বলুন, কি নিয়ে কথা হচ্ছিল!"

নরেন্দ্র হাসিয়া কহিল, "বলে ফেল্‌না তোর বৌদির কাছে—ওঁর চেয়ে তোর কথা ত কেউ বেশী বুঝবে না!"

সতীশ সলজ্জভাবে বলিল, "সব কথা বৌদির কাছে বলা যায় কিনা! এ তোমার বড্ড অন্যায় নরেন।"

লীলা নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমিই বল না গা, কি নিয়ে তোমাদের তর্ক!"

নরেন্দ্র কহিল, "তর্ক হচ্ছিল, নারী কোন বয়সে সুন্দরী! কৈশোরে না যৌবনে?"

লীলা সতীশের পানে চাহিয়া বলিল, "নারী প্রসঙ্গ ছাড়া কি আপনাদের আর কোন কথা নেই ঠাকুরপো? কি-ই যে বিশেষত্ব এই নারী জাতের—! শ্রদ্ধাই বা কতখানি পায় তারা আপনাদের কাছে—। তবু তাদের চর্চ্চা নিয়েই আপনাদের দিন কাটে।"

পরে স্বামীর দিকে চাহিয়া কৃত্রিম রোষ-মিশ্রিত ভ্রূভঙ্গী করিয়া কহিল, "খেয়ে দেয়ে ত কাজ নেই—কেবল বসে বসে মেয়েদের কথা নিয়ে নাড়াচাড়া!"

গম্ভীরভাবে নরেন্দ্র বলিল, "নারীরা যে মহাশক্তির অংশ, সুতরাং তাদের জান্‌তে চাওয়া—ব্রহ্মাণ্ডটাকে জান্‌বার ইচ্ছার একটা নামান্তর মাত্র।"

লীলা বলিল, "অত বড় একটা ফাঁকির বেড়া জাল দিয়েই ত তোমরা নারীকে ঘিরে রেখেছ! নারী শক্তি,—নারী জননী, নারী দেবী! মুখে মুখে কত বড় বড় কথাই না আওড়াও। কিন্তু অন্তরে অন্তরে নারীকে একমাত্র দাসী ছাড়া আর কিছু বলেই ভাবতে পার না। এই না কথা হচ্ছিল তোমাদের

নারীর রূপ-যৌবন নিয়ে। এই সমালোচনার অন্তরালে রয়েছে তোমাদের ভোগবাসনার একটা লুকান নগ্ন ছবি। নারীর দেহ, নারীর রূপ যে পরিমাণে তোমাদের ভোগের অনুকূল—সেই পরিমাণের মাপকাঠিতেই না তোমরা নারী সৌন্দর্য্যের বিচার কর। কি ঠাকুরপো, চুপ ক'রে থাকলে চলবে কেন! সারাজীবন কাব্যের সামগ্রী হয়ে থাকলে ত নারীর জীবনযাত্রা চলে না!"

এইবার সতীশের মুখে কথা ফুটিল। সপ্রশংস দৃষ্টিতে লীলার দিকে চাহিয়া বলিল, "সারাজীবন যদি কাব্যের সামগ্রী হ'য়ে থাকতে পারত নারী—তবে যে তার জীবন হ'ত অমৃতময়! তা সে পারে না! কাব্য যে সত্য সুন্দরেরই স্তুতি-গান। জরা-মরণশীল—দুঃখ-ব্যথা ভরা এই সংসারে কাব্যই যে মানুষের প্রাণে অমৃতের বার্ত্তা এনে দেয়,—তার জীবন-মরুভূমিতে সলিল সিঞ্চন করে! কবি তাই অমর—তার সৃষ্টি তাই স্বর্গীয়।"

লীলা বলিল, "বক্তৃতার মত কথা শুনতে বেশ শোনায়, ঠাকুরপো! আপনার কথা সত্য হলেও নারীর এ তুচ্ছ রূপ-যৌবন কিন্তু কাব্যের সামগ্রী হ'তে পারে না। নারীর রূপে না আছে সত্য না আছে অমৃত। এই যে ললিত দেহ,—সুঠাম সুগোল বাহু এর চামড়াটুকু তুলে ফেললে কি ফুটে উঠবে! কদাকার বিশ্রী মাংসপেশী, নয় ঠাকুরপো? তারপর এই রূপেই বা ক'দিনের জন্য যা আপনাদের চোখে স্বর্গ সৃষ্টি করে। অল্প সেই কয়দিন, যে কয়দিন না নারীদেহের কমনীয়তা অদৃশ্য হয়। ওসব কাব্য কবিতা কিন্তু নিছক মিথ্যে—নেহাৎ তোষামোদ। নারীর অপরূপ রূপ দেখে যখন আপনারা বাহবা দেন—অপলক দৃষ্টিতে অবাক্ হ'য়ে চেয়ে থাকেন—মনে আপনাদের কবিতার ছন্দ ফোটে, সত্যি করে বলুন ত ঠাকুরপো, সেটা সত্যি কবিতা—না লালসার প্রকাশ কাব্যের আবরণ দিয়ে ঢাকা।"

সতীশ যেন চিন্তিত মনে কি ভাবিতে লাগিল, লীলার কথার কোন জবাব খুঁজিয়া পাইল না। লীলা বলিল, "যাক্ মৌন থেকে যে আমার এই কথাগুলি স্বীকার করে নিলেন এও আমার ভাগ্য।"

পরে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল, "কি গো তুমি যে বড় চুপ ক'রে ভাল মানুষটি হ'য়ে বসে আছ। এতক্ষণ ত দুই বন্ধুতে ব'সে খুব রূপের চর্চ্চা করছিলে। কবই না দুটো কথা আমার সঙ্গে।"

নরেন্দ্র কি বলিতে যাইতেছিল, সতীশ বলিয়া উঠিল, "চুপ ক'রে আছি ব'লেই আপনার কোন কথাই স্বীকার ক'রে নিইনি বৌদি! নারীর রূপেই ত কেবল কাব্যের সামগ্রী নয়,—তার অন্তর,—তার স্নেহ মমতা,—প্রেম-প্রীতি, এই হ'ল কাব্যের সম্পদ। তর্কের খাতিরে যদি স্বীকার ক'রেও নিই যে নারীর অপরূপ রূপচ্ছটা—সুললিত দেহ লক্ষ্য ক'রেও কবিরা অনেক কবিতা লিখেন, কিন্তু সে কবিতাও ত কবির মনেরই প্রকাশ। দেহ ছেড়ে নারীর মনও কবি উঁকি মেরে দেখে। মন বাদ দিয়ে শুধু দেহ নিয়ে কাব্য সৃষ্টি হয় না বৌদি।"

লীলা কহিল, "যদি নাই হয় তাতেও ঐ ঐ কথাই আসে! নারীর অন্তরও যে পুরুষের ভোগের বস্তু। ওকি একেবারে চমকে উঠলেন যে। শুধু দেহ পেয়েই পুরুষ খুশী হয় না। যদি না মন পায়—প্রীতি পায়—ভালবাসা পায়! জিজ্ঞেস্ করুন না আপনার বন্ধুকে। এ সব বিষয় ত উনি ভাল জানেন।"

নরেন্দ্র বিস্ফারিত চোখে লীলার দিকে চাহিল। শেষ কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই লীলাও স্বামীর পানে ফিরিয়া চাহিল। চোখে চোখ্ পড়িতেই একটু মৃদু হাসিয়াই সতীশকে লক্ষ্য করিয়া আবার বলিল, "তারপর নারীর অন্তরের সৌন্দর্য্য—তা কয়জন পুরুষের চোখেই বা পড়ে। কালেভদ্রে কারুর চোখে পড়লেও সহসা কেউ কুরূপার অন্তরকে খুঁজে দেখে না। নারীর মন নিয়ে এই যে সব কবিতা তা ক'জন কুরূপার মনের খবর ব'য়ে আনে। আফ্রিকার আমদানী ঠোঁট আর রং, চীন দেশের আমদানী নাক দেখলে, তার মনের কথার খোঁজ নেবার ক'জনের সাধ যায় ঠাকুরপো! দেহটাই না আগে—তারপর অন্তর।"

ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া লীলা আবার বলিল, "ঐ ত আপনাদের আলোচনা চলছিল। নারী সুন্দরী কৈশোরে, না যৌবনে। এর কোন্‌খানটায় আছে নারীর মনের কথা,—তার অন্তরের সৌন্দর্য্য। নারীর রূপটাও দৈহিক—যৌবনটাও দৈহিক। তারপর বয়সের ছাপ ত দেহের ওপরেই আগে পড়ে। সুতরাং বিচার হচ্ছিল ত নারীর দেহ নিয়েই।"

সদর দ্বারে আসিয়া রাণু ডাকিল, সদরটা আবার বন্ধ ক'রলে কে গা, কালা নাকি শুনতে পাচ্ছ না। ও দিদি সদরটা খোল না শীগ্‌গির করে। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আমি অমরদাকে নিয়ে—আমরা শুনতে পাচ্ছি ওর কথা।

লীলা যেন হঠাৎ চমকিয়া উঠিল। কিন্তু মুহূর্ত্তে আত্ম-সংবরণ করিয়া কহিল, "যাচ্ছি ভাই রাণু।"

তারপর উঠিতে উঠিতে কণ্ঠস্বর আরও একটু উচ্চ করিয়া বলিল, "কেমন, ঠিক বলিনি ঠাকুরপো। এই ত অমরদা আসছেন, ওঁকে মধ্যস্থ ক'রে তর্ক করা যাবে।"

লীলা সদর খুলিয়া দিলে অমর তীব্র দৃষ্টিতে লীলার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল, পরে বিনাবাক্য ব্যয়ে বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া হাসিমুখে বলিল, "কি নিয়ে আপনাদের তর্ক হচ্ছিল নরেনবাবু?"

লীলাও সদর বন্ধ করিয়া অমরের পিছনে পিছনে ঘরে ঢুকিল; হাস্যোজ্জ্বল মুখে বলিল, "জান অমরদা এই বন্ধু দুটির মধ্যে একজন হচ্ছেন কবি, অপরটি তার সমজদার। নারীই এঁদের কাব্যের লক্ষ্য—। আর নারীর রূপ যৌবন তার দার্শনিকতা।"

বিস্মিত দৃষ্টিতে অমর লীলার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। লীলা বলিতে লাগিল, "তুমিই বল না অমরদা, আমি বলছি নারীর দেহটিই আগে পুরুষের চোখে পড়ে,—তারপর সে চায় তার মন। শুধু মন নিয়ে তার তৃপ্তি নেই।"

লীলার ব্যবহারে অমর ভয়ানক বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল।

সেভাব লুকাইয়া শ্লেষব্যঞ্জক স্বরে কহিল, "ও সব শাস্ত্র আমি পড়িনি লীলা। তোমার কবি বন্ধুটি হয়ত এসব তত্ত্ব ভাল জানেন। ওঁকেই জিজ্ঞেস্ কর।"

লীলা অমরের কথার খোঁচা বেমালুম হজম করিয়া বলিল, "কবি বন্ধুর সঙ্গেই ত এতক্ষণ ঐ নিয়ে তর্ক হচ্ছিল।"

পরে স্বামীকে দেখাইয়া বলিল, "উনি বলেন, কবির চক্ষে নাকি আমি অসামান্যা রূপসী। আমি ত ভেবে পাইনে কি এমন আমার রূপ—যা দেখে অকবি বন্ধু আমার হঠাৎ কবি হয়ে উঠ্‌লেন। তুমিই বলনা অমরদা সত্যিই খুব রূপসী আমি?"

স্তব্ধ বিস্ময়ে অমরনাথ লীলার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার আবাল্য স্নেহে সংযত শিক্ষায় শিক্ষিতা লীলার একি পরিণাম। তাহারই এই অধঃপতন দেখাইবার জন্যই কি লীলা তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছে—অথবা তাহাকে অপমানিত করিবার জন্যই কি লীলার এই অসাময়িক নিমন্ত্রণ। সে কি আর লীলার কেউ নয়—কিংবা এ তাহার প্রতিহিংসা। লীলার এই অধঃপতনের জন্য দায়ী কে—সে, না তার স্বামী। বিস্ময় কাটাইয়া অমরের দৃষ্টি করুণ হইয়া আসিল। নীরব কাতরতায় লীলার মুখের পানে অনিমেষে চাহিয়া রহিল, কথা কহিল না।

লীলা সমস্তই দেখিল; হয়ত বা কতক বুঝিল, তবু দমিল না। আজ সে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কথা কহিল তার স্বামী। বলিল, "বোন্ রূপসী কিনা একথা বোন্ হয়ে ভায়ের কাছে জিজ্ঞেস করলে ভাই ত অবাক হয়ে যাবেই—এই ভেবে যে, বোনের মাথাটি বুঝি বা বেশী রকম বিগড়ে গেছে।"

বিস্ফারিত চোখে স্বামীর দিকে চাহিয়া লীলা প্রশ্ন করিল, "তার মানে।"

"মানে খুব সোজা এবং সরল। কোন বোন্ বোধহয় কোন ভাইকে আজ পর্য্যন্ত জিজ্ঞেস্ করেনি সে রূপসী কি-না!"

পরাজিতা লীলা নিজের লজ্জাকে ঢাকিয়া ফেলিবার দুরাশায় বেশী কিছু না ভাবিয়া চিন্তিয়াই কি বলিতে যাইতেছিল থামিতে পারিল না। আবার ঢোক গিলিয়া অস্ফুটকণ্ঠে বলিয়া ফেলিল, "অমরদা ত আমার তেমন সত্যিকারের ভাই নয়।"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই লীলা যেন কেমন অভিভূত হইয়া পড়িল। লীলার কথাটা অস্ফুট হইলেও কাহারও শ্রুতিগোচর না হইবার মত অস্ফুট ছিল না। অপার বিস্ময়ে অমর ও নরেন্দ্র লীলার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

খানিক পরে বিস্ময় দমন করিয়া নরেন্দ্র বলিল, "তবে না আমাকে বলেছিলে সত্যিকারের ভাই এর চেয়েও বড়!"

লীলা কথা কহিতে পারিল না। অপলক অস্বাভাবিক দৃষ্টি দিয়া কতক্ষণ স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নরেন্দ্র দেখিল লীলার পা কাঁপিতেছে—দেহ টলিতেছে। ব্যস্ত হইয়া নরেন্দ্র উঠিয়া আসিয়া লীলার হাত ধরিল, বলিল, "ওকি কাঁপছ কেন? কি হয়েছে তোমার?"

লীলা কথা কহিতে পারিল না, কাঁপিতে কাঁপিতে মূর্চ্ছিত হইয়া নরেন্দ্রের গায়ে ঢলিয়া পড়িল। (ক্রমশ)

স্টেশনের পাখা

শ্রীকার্ত্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়

পাখা পড়েছে—
রেল আসবার সময় হ'ল।
দাঁড়িয়ে আছি সাঁকোর উপরে—
সুমুখে চলে গেছে লাইন মাঠ পার হয়ে—
আকাশের কোলে মিলিয়ে থাকা পাহাড়ের দিকে।
ওইখান থেকে ট্রেন্ আস্‌বে।—

রোজই ট্রেন আসে।
রোজই দেখি।
কারো আসার প্রতীক্ষা আমার নেই—
তবুও মাঠ পার হয়ে যখন কালো ইঞ্জিন
দেখা যায় বুকটা তখন আনন্দে ভরে ওঠে।

ছুটে আসি ষ্টেশনে।
যাত্রীরা নামে পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে—
ক্লান্ত মুখে ম্লান হাসি—
কেউ এসে ওর হাত ধরে—
কেউ পায়ের ধুলো লয়।

পাখা উঠে যায়—
আবার পাখা পড়ে—
আমার ত কেউ আসার নেই।

ব্রহ্মের জলোৎসব

আমাদের দেশে হিন্দুদিগের ভিতর যেমন হোলি উৎসব দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি ব্রহ্মদেশে রহিয়াছে বেরং হোলি উৎসব, যাহাকে ব্রহ্মবাসী বলে—জল উৎসব (Water Festival)। দারুণ গ্রীষ্মে যখন সকল দেশ উত্তপ্ত—মাঠ-ঘাট খাঁ খাঁ করিতে থাকে আর অধিবাসিবৃন্দ করিতে থাকে বর্ষণাভাবে টা-টা, তখনই যেন জলের পিপাসা মিটাইতে উপস্থিত হয় জল উৎসব। সামান্য পিচকারী বা শিশি-বোতল হইতে ধারা বর্ষণে ব্রহ্মবাসী তৃপ্ত হয় না, তাহারা বালতী বালতী জল একে অন্যের গায়ে ঢালিয়া দিয়া কৌতুক উপভোগ করে। জল ঢালিবার সঙ্গে সঙ্গে নারীগণ ছড়া কাটে চমৎকার—সে

সকল ছড়ার সারমর্ম্ম হইল—'দীর্ঘায়ু হও'। পথে পথে বালতী হাতে ঘুরিয়া পরিচিত অপরিচিত সকলকেই জলসিক্ত করা হয়। অবশ্য কেহ এমন কৌতুকে বিরক্ত হয় না, বিশেষ করিয়া বিষম গরমে যখন প্রাণ আনচান করে, তেমন সময়ে এই প্রকার ধারা বর্ষণ অপ্রিয় নয়। তথাপি আইনের কড়াকড়িতে ধারাবর্ষণ এখন গণ্ডীবদ্ধ হইয়াছে। ছবিতে দেখা যাইতেছে লরীতে চাপিয়া একদল বালক-বালিকা বয়স্কদের সহিত চলিয়াছে জলের ভাণ্ডার লইয়া। ধারা বর্ষণে পথচারী পথচারিণীদের মুখে হাসি ফুটাইতে ইহাদের আর বেগ পাইতে হইবে না। যেমন অন্য সকল দেশে তেমনি এদেশেও এই জাতীয় চঞ্চলতাপূর্ণ কৌতুকে বালক-বালিকা ও তরুণ-তরুণীই যোগদান করে বেশীর ভাগ। ইহাদের বিশ্বাস এই প্রকার যে, যে জল দেয় এবং যাহাকে দেওয়া হয় উভয়েই দীর্ঘজীবন লাভ করে। অনেক সময় বিদেশীয় বিশেষ করিয়া পাশ্চাত্যদেরও বালতীর জলের ধারা অতর্কিতে বরদাস্ত করিতে হয়। অভিনব এই অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের সুযোগ পাইয়া তাহারা খুশীই হয়। উষ্ণ দেশের পক্ষে এইরূপ জলধারা বর্ষণ উৎসব বিচিত্র হইলেও আরামপ্রদ। শীতের দেশে ইহা অবশ্য কল্পনার অতীত।

ফরাসী-কন্যার বিবাহের সুযোগ

ফরাসীদের বিশ্বাস তাহাদের দেশের মেয়েরাই সৌন্দর্য্যের জন্য বিশ্ব-বিখ্যাত এবং আমেরিকান মেয়েদের অপেক্ষা তাহাদের বিবাহের সুযোগ বেশী।

গবর্ণমেণ্টের বিবৃতি হইতে সংখ্যা তুলনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ফরাসী-কন্যা ষোল বৎসরে পদার্পণ করিলেই তাহাদের বিবাহের আশা উপস্থিত হয় এবং শতকরা ৮৮ জন ১৭ বৎসর বয়সে বিবাহ করিতে সমর্থ হয়।

আবার ইহাও দেখা যায় যে, ৭৬ বৎসর বয়সেও ফরাসী মহিলা বিবাহের আশীর্ব্বাদ হইতে বঞ্চিত হয় না, যেহেতু তাহাদের সৌন্দর্য্য একেবারে তিরোহিত হয় না। অবশ্য বর্ত্তমানে উহা স্বল্পতর হইয়াছে হাজারে একটিতে পর্য্যবসিত হইয়া।

৪৫ বৎসর বয়সের ফরাসী মহিলা দেশের সমগ্র বিবাহ-সংখ্যার শতকরা ১০টি স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হয়। দেশের নারী-সংখ্যা ও তাহাদের বিবাহ সম্বন্ধে অনুসন্ধান দ্বারা জানা গিয়াছে যে, প্রতি ১০০ নারীতে ৭৮জন বিবাহে সমর্থ হয়। কিন্তু ১৭ বৎসরের তরুণীর বিবাহ-সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, কারণ হিসাব করিয়া দেখা যায় এই বয়সের তরুণীর বিবাহের সংখ্যা শতকরা ৮৮·৫।

তুলনায় আমেরিকার নারীদের বিবাহের সংখ্যার গড় ইহা অপেক্ষা অনেক কম। কিন্তু ফরাসী মেয়েদের বয়সের তারতম্যে বিবাহের গড়-সংখ্যা উঠা-নামা করে। তাহার ভিতর আবার ২৯ ও ৩০ বৎসরে পার্থক্য বিপুল। ২৯ বৎসর বয়সে মেয়েদের বিবাহের গড় শতকরা ৫৫টি। কিন্তু ৩০ বৎসরে পৌঁছিলে ঐ সংখ্যা নামিয়া ৪৬টিতে দাঁড়ায়। আবার ৭৬ বৎসর বয়সে ফরাসী নারীর তবু যে বিবাহের আশা থাকে, তাহা এক বৎসর পরে আর থাকে না। অর্থাৎ ৭৭ বৎসর বয়সের নারীর আর বিবাহ হয় না।

শতকরা ২২টি ফরাসী-নারী যে বিবাহ বঞ্চিত থাকে, তাহাদের ভিতর পড়ে ভগ্নস্বাস্থ্য ও বিকলাঙ্গ এবং বিশেষ জাতীয় গায়িকা নর্ত্তকী শ্রেণী। পুরুষের সহিত তুলনায় ফরাসী দেশে ২১ বৎসর বয়স্কা তরুণী আর ৩২ বয়স্ক পুরুষ বিবাহের সমান সুযোগ পায় এবং ৪৫ বৎসর বয়সের নারী আর ৫১ বৎসর বয়সের পুরুষেরও বিবাহের সংখ্যা সমতুল্য।

ফরাসীদেশে পুরুষের বিবাহ-সংখ্যা

ফরাসী দেশের সমগ্র পুরুষ সংখ্যার শতকরা ৭৪টি বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ইহার মধ্যে কতকগুলি পুরুষের স্ত্রীবিয়োগ বা অন্য কারণে জীবনের অধিকাংশ কাল বিপত্নীক থাকিতে হয়। সুতরাং ফরাসী নারী যে শতকরা ৭৮ হারে বিবাহে সমর্থা হয়, তাহার সহিত তুলনায় পুরুষের বিবাহ হার কম। অর্থাৎ একই নারী বিবাহ-বিচ্ছেদ দ্বারা একাধিক স্বামী গ্রহণ করে।

ফরাসী-নারীর যেমন ১৭ বৎসর বয়সে বিবাহের সুযোগ থাকে সর্ব্বোচ্চ অর্থাৎ শতকরা ৮৮·৫, তেমনি পুরুষের হয় ২১ বৎসর বয়সে, কারণ সরকারী রিপোর্ট হইতে জানা যায় শতকরা ৮৭টি ঐ বয়সের তরুণ বিবাহে আবদ্ধ হয়। তবে সাধারণত ২[illegible] বৎসর বয়সের পূর্ব্বে অনেক তরুণই বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হয় না।

ফরাসী দেশে প্রতি এক লক্ষ পুরুষের ৮৬,৬৫৭ জন ১৮ বৎসর বয়স প্রাপ্ত হয়। এই সংখ্যার ১,৯৩৭ জন ২০ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে বিবাহ করে আর ৬০,৩৭২ জন বিবাহ করে ২০ হইতে ২৯ বৎসর বয়সের ভিতর। ইহার পর আবার সংখ্যা কমিতে থাকে। শেষে দেখা যায় ৬০ হইতে ৬৯ বৎসর বয়সের মধ্যে মাত্র ১০৩টি অবিবাহিত স্ত্রী গ্রহণ করে।

সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী বিবাহ ফরাসী দেশে ৩২ বৎসর পর্য্যন্ত। কিন্তু যে সকল বিবাহ বিচ্ছেদ দ্বারা রহিত করা হয় তাহার দীর্ঘতম কাল ১৭ বৎসর। ফরাসী দেশে বিবাহ-বিচ্ছেদের হার অতি উচ্চ। কারণ হিসাব করিয়া দেখা যায় যে প্রত্যেক আটটি বিবাহের ভিতর একটি বিচ্ছেদ দ্বারা বাতিল করা হয় আদালতের সাহায্যে।

তথাপি একটি আশ্চর্য্য ব্যতিক্রম এই যে, পুরুষের ৩০ হইতে ৪৫ বৎসর বয়সে বিবাহের গড় ঐ বয়সের নারী অপেক্ষা অনেক বেশী। ৩০ বৎসর বয়সের নারী অপেক্ষা ৩২ বৎসর বয়সের পুরুষেরও বিবাহ-সংখ্যা [illegible] বেশী। এই জন্যই ৪০ বৎসরের বিপত্নীক অপেক্ষা ৪০ বৎসরের [illegible] সংখ্যা অধিক।

পুরুষের ভিতর শতকরা ২৬টি যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় না, তাহার ভিতর মাত্র শতকরা ২জন স্বাস্থ্যবান ও সমর্থ চিরজীবন অবিবাহিত থাকে।

মাছ জমাট করা

মার্কিনের ওরিগন প্রদেশে একটি "ফিশ কমিশন" বিভাগ রহিয়াছে। এই কমিশনের নিয়ন্ত্রণে প্রচুর পরিমাণ মাছ ধরা হয়। স্থানীয় চাহিদা মিটাইয়াও বহু মাছ উদ্বৃত্ত থাকে। এইজন্য বহুদিন যাবৎ চেষ্টা চলিতেছে যাহাতে ফল প্রভৃতির ন্যায় ঐ উদ্বৃত্ত মাছ জমাট করিয়া যাহাতে বিদেশে চালান দেওয়া যায়। শুধু বরফের সাহায্যে পাঠাইলে উহা বেশী দিন ব্যবহারযোগ্য থাকে না। জমাট করিবার এমন একটি প্রথা আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহার ফলে এই মাছ অতি দূরদেশে অবাধে চালান দেওয়া যাইবে, অথচ উহার স্বাদ-গন্ধ কিছুই বিনষ্ট হইবে না। শাকসব্‌জী ও ফল যে রকম অটুট তাজা অবস্থায় দূরদেশে চালান দেওয়া যায়, ঠিক তেমনিভাবে মাছও চালান দেওয়া যাইবে। ইহাতে আর জমাট করার পর বরফ ব্যবহার করিতে হইবে না, কেবল বিশেষভাবে তৈরী বাক্স ব্যবহার করিলেই চলিবে।

পুলিশের সময়ের মূল্য

নিউ ইয়র্কে এটর্নি ওয়ালটার ওয়াইস্ অভিযুক্ত হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির হয়। তাহার বিরুদ্ধে চার্জ্জ—সে বহু স্থানে রাস্তায় চলাচল বিধি ভঙ্গ করিয়াছে, তাহার নিজ মোটর চালনে। ওয়াইস্ তখন অনুরোধ করে যে প্রত্যেক স্থলের পুলিশ কর্ম্মচারীকে আদালতে হাজির করা হউক। ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন—আপনার এই অনুরোধ করিবার অধিকার রহিয়াছে। কিন্তু পুলিশেরও সময়ের মূল্য রহিয়াছে। সুতরাং পরিশেষে যদি আপনি দোষী সাব্যস্ত হন, তবে রীতিমত জরিমানা ব্যতীতও প্রত্যেক পুলিশ অফিসারের জন্য আপনাকে পাঁচ ডলার করিয়া ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

ইহাতে এটর্নি হিসাব করিয়া দেখিল, দোষী সাব্যস্ত হইলে তাহাকে একুন ১৫০ ডলার দিতে হইবে। কাজেই সে আর পুলিশকে হাজির করাইতে চাহিল না এবং মাত্র ৪৫ ডলার জরিমানা দিয়া অব্যাহতি পাইল। অবশ্য তাহাকে দোষ স্বীকার করিতে হইয়াছে।

আমেরিকার সর্ব্বাদি এরোপ্লেন

আমেরিকার সর্ব্বপ্রথম এরোপ্লেন ওরভিল্ এবং উইলবার রাইট কর্ত্তৃক ১৯১১ সালে নির্ম্মিত। উহা বর্ত্তমানে ফিলাডেল্‌ফিয়ার ফ্রাঙ্কলিন্ ইনষ্টিটিউটে প্রদর্শন জন্য রক্ষিত আছে। এক জন প্রাচীন পাইলট বলেন উহা এখনও উড্ডয়ন-ক্ষম রহিয়াছে। এই পাইলট বর্ত্তমানে লাইসেন্স বঞ্চিত এবং কর্ত্তৃপক্ষের দয়ায় ইনষ্টিটিউটের গাইড্ পদে অধিষ্ঠিত। ইহার নাম মিঃ উইলিয়াম শিহ্যান্; তিনি বলেন ইহাই আমেরিকার প্রাচীনতম এরোপ্লেন এবং পলাতক কোরপতি গ্রোভার বার্গডোলের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। চার বৎসর পূর্ব্বেও এই এরোপ্লেন দ্বারা দুইবার স্বল্প দূরত্ব অতিক্রম করা হইয়াছিল। রাইট্ এরোপ্লেনটি তৈরী করিয়া ৩১ বৎসর পূর্ব্বে কিটিহক শহরে প্রথমে উড়িবার মহড়া দেন। ঐ অনুষ্ঠানের স্মৃতি-বার্ষিকী রীতিমত অনুষ্ঠিত হইতেছে। এমন প্রাচীন অথচ সচল এরোপ্লেন আর এদেশে নাই।

বেকার

(গল্প)

শ্রীশোভারাণী হুই

শ্যামবাজারের ঘন সন্নিবিষ্ট বস্তির একটি অতি ক্ষুদ্র জীর্ণশীর্ণ ঘরে একটি ভাঙ্গা তক্তপোষের উপর শুইয়া এক অতি শীর্ণ বৃদ্ধ মুহুর্মুহু কাসিতেছে। অদূরে শিয়রের কাছে মিটি মিটি করিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছে। একটি ৩।৪ বৎসরের বালক মাটীতে ছিন্ন কাঁথা গায়ে দিয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে। কাসির ঝোঁক একটু কমিলে বৃদ্ধটি বলিলেন, "বৌমা, চরণ এখনও এল না? রাত্রি ত অনেক হয়েছে।" বৌমা প্রদীপটি একটু উস্‌কাইয়া দিয়া শ্বশুরের কাছে বসিয়া ঘাড় নাড়াইয়া জানাইল—এখনও আসে নাই। "এই বয়সে বাছার আমার কি কষ্ট"—বলিয়া বৃদ্ধ জোরে একটি নিশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন। বধূ ম্লান নয়নে মাথা হেঁট করিয়া শ্বশুরের পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পর চরণ অতি সন্তর্পণে পিতার ঘুম ভাঙ্গিবার ভয়ে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিল। কিন্তু যাহার পদ-শব্দের জন্য উন্মুখ হৃদয় আকুলি বিকুলি করিতেছে—সে যত নিঃশব্দেই আসুক না কেন, তাহা কি বুঝিতে কাহারও বাকি থাকে? বৃদ্ধ মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "কে বাবা চরণ এলি? আয়, বাবা আয়, কাছে বস্।" চরণ পিতার বুকের কাছটিতে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, কেমন আছেন?" "আমার আর থাকা থাকি কি বাবা। দিন ফুরিয়েছে, গেলেই হয়। তোর একটা কিছু দেখে যেতে পারলেম না এই আমার দুঃখু" —বলিয়া বৃদ্ধ তাহার শীর্ণ হস্তে তাহার মাথাটি বুকের কাছে টানিয়া নীরবে একাগ্রচিত্তে হৃদয়ের সমস্ত আশীর্ব্বাদ ঢালিয়া দিতে লাগিলেন।

পরদিন বেলা দশটার সময় চরণ টিউশনি হইতে ফিরিয়া তাড়াতাড়ি স্নান আহার সারিয়া ছেঁড়া জামাটি গায়ে দিতেই বৃদ্ধ বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁরে, এক্ষুণি আবার কোথায় যাবি?" চরণ বলিল,—"এক জায়গায় কজের খবর আছে, দেখি কি হয়? বৃদ্ধ বলিলেন—এখন বড্ড রোদ উঠেছে, বিকেলে গেলে হয়?" বৃদ্ধ বলিলেন—এখন বড্ড রোদ উঠেছে, বিকেলে গেলে লইয়া বাহির হইয়া গেল। আর বৃদ্ধ ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাহার গমনপথের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

এই ক্ষুদ্র ঘরটি লইয়াই তাহাদের সংসার। চরণের পিতা প্রায় ৬ মাস জ্বর কাসিতে ভুগিতেছেন। দুর্ব্বলতায় উঠিয়া বসিতেও পারেন না, আর বোধ হয় কোনদিন পারিবেনও না। শুইয়া শুইয়া আর তাঁহার সময় কাটিতে চাহে না, বেচারী বধূরও তাই, তাহারও সময় কাটিতে চাহে না। এক বেলা চারটি ভাত ফুটান, ঘরটি ঝাঁট দেওয়া এক কলসী জল আনা—কোন সময় হইয়া যায়, আর বাকি সময় রুগ্ন শ্বশুরের নিকট বসিয়া তাহার পূর্ব্বজীবনের কাহিনী শুনিতে হয়। বৃদ্ধ বধূর মাথায়, পিঠে হাত বুলাইয়া কত সুখ-দুঃখের কথাই শুনাইতে থাকেন। সজল চক্ষে গাঢ়কণ্ঠে বলিতে থাকেন—"মা, এই হাত দুটিতে যদি বল থাক্‌ত, তাহ'লে এমনি ক'রে চরণকে আমার চাকুরীর জন্য পথে পথে ঘুরতে হ'ত না। বাপ-ঠাকুর্দ্দার ব্যবসা শিখলে আজ এইটুকু ঘরে এমনভাবে নিরুপায় হ'য়ে তার কষ্ট দেখতে হ'ত না। কি মতিচ্ছন্ন বুদ্ধিই আমার ধরেছিল—সর্ব্বস্ব দিয়ে কেন চরণকে পড়িয়ে-ছিলাম"—বলিয়াই বৃদ্ধ দুইহাতে চক্ষু ঢাকিয়া শিশুর ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। বধূ তাড়াতাড়ি শ্বশুরের চক্ষু মুছাইয়া দিয়া অলক্ষ্যে নিজেও চক্ষু দুটি মুছিয়া মিনতি করিয়া বলিতে থাকে, "বাবা, চুপ করুন, যা হবার তা হবেই। আপনি মিছামিছি এ-সব ভেবে কষ্ট পাবেন না।" "না মা, না, আমি চুপ ক'রে থাক্‌তে পারব না, আমায় বল্‌তে দাও। তোমায় ছাড়া আর কাকে আমি বল্‌ব মা? বুক যে আমার ঠেলে উঠ্‌ছে। এখনও মনে পড়ে—ছ'-বছরেরটি রেখে চরণের মা যেদিন মারা গেলেন, সে দিন থেকেই ওকে আমি বুকে ধরে সব ভুলেছি ও আমার এত ন্যাওটা ছিল যে, একদণ্ডও আমাকে কোথাও যেতে দিত না। তখনই ভেবেছিলাম, একে আমি লেখা-পড়া শিখিয়ে মানুষ করব। ভদ্রলোকের সঙ্গে যাতে এক আসনে বস্‌তে পারে, সবাই মিস্ত্রি না ব'লে চরণবাবু বলে, তার ব্যবস্থা করব। এখন ভাবি—ভগবান, এ দুর্ব্বুদ্ধি কেন আমার হ'য়েছিল। আজ সর্ব্বস্ব দিয়ে বাবু না ক'রে চরণকে যদি ভাল মিস্ত্রি করতাম তাহ'লে এক মুঠো ভাতের জন্য বাছাকে আমার এমনি ক'রে ঘুরতে হ'ত না। বাবু সাজার এত দুঃখ তা জান্‌তাম না বৌমা! ভাবতাম্ চরণ আমার দশটা পাঁচটায় অফিস করবে, বাবুদের মত কলম ধরে লিখ্‌বে, পড়াতে যা গেল, তার দ্বিগুণ নিয়ে আস্‌বে—কিন্তু আজ ভাব্‌ছি—ঠিক তার উল্টো।" বলিয়া বৃদ্ধ সজোরে একটি নিশ্বাস ফেলিলেন। হায়রে, মানুষের মন! যাহাকে এক দিন জীবনের পরম কামনা, চরম সার্থকতা বলিয়া সযত্নে বুকের ভিতর পুষিয়া রাখিতে ইচ্ছা হয়, অনেক সময় তাহাই আবার পরজীবনে পরম ব্যর্থতা জ্ঞানে দূরে ঠেলিতে ইচ্ছা করে। চরণের পিতারও হইয়াছিল তাই। তিনি ভাবিয়া-ছিলেন, চরণকে লেখাপড়া শিখাইয়া বাবু বানাইতে পারিলেই বুঝি বা তাঁহার জীবন সার্থক হইবে। কিন্তু এখন ভাবিতে-ছেন—লেখাপড়া না শিখাইয়া জাত ব্যবসা করাইতে পারিলেই বোধ হয় ঢের বেশী ভাল হইত। কিন্তু যাহাই হউক বৃদ্ধের আর চরণকে অফিসের বাবু দেখা হইল না। একদিন ভোর ছয়টার সময় পুনঃপুনঃ পুত্র, পুত্রবধূ ও নাতীকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে তিনি মহাকালের আহ্বানে চলিয়া গেলেন।

চরণ অকূলে ভাসিল। ২৩।২৪ বৎসরের সংসারানভিজ্ঞ যুবক সে—এতদিন কি করিয়া যে সংসার চালিতেছিল, তাহার কোন খবরই রাখে নাই। পূর্ব্বে পিতাই মিস্ত্রীর কাজ করিয়া চালাইতেছিলেন। মাস ছয়েক যদিও তিনি শয্যাগত ছিলেন তবুও সংসারের সব কিছু দায়িত্ব তাহারই উপর ছিল। মাস গেলে টিউশনির দশটাকা দিয়া সে খালাস পাইয়াছে, কিন্তু আজ হইতে সব দায়িত্ব তাহার উপর, বোঝা বহিবার আর কেহই নাই।

একমাস পর চরণ অশৌচান্তে গঙ্গার তীরে বাপের শ্রাদ্ধ করিয়া আসিয়া নিতান্ত অসহায়ভাবে তাহার ভাঙ্গা তক্তপোষের উপর বসিয়া পড়িল। একটা কথাও তাহার বলিবার ক্ষমতা ছিল না। বধূ নলিনী এক গ্লাস মিছরীর সরবৎ আনিয়া মুখের কাছে ধরিয়া বলিল, "এইটুকু সরবৎ খেয়ে নাও, যে রোদে এসেছ।" চরণ সরবৎটুকু এক চুমুকে

খাইয়া শুইয়া পড়িল। একটা কথাও তাহার বলিবার ক্ষমতা ছিল না। বধূ বুঝিতে পারিল বাপকে হারাইয়া সে কতখানি ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে। সে আস্তে আস্তে তাহাকে বাতাস করিতে লাগিল। কখনও বা গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দিয়া নীরবে তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল।

পরদিন ভোরে উঠিয়া মুখ ধুইয়া চরণ তক্তপোষের উপর বসিয়া ভাবিতে লাগিল। মাস গেলে ১০টি টাকা পিতার হাতে দিয়া সে এতদিন পোষাদের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়াছে। সারাদিন এ অফিস ও অফিস চাকুরীর আশায় ধন্না দিয়া রাত্রিতে শ্রান্ত মনে অবসন্ন দেহে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। চাকুরীর চিন্তা ছাড়া অপর কোন চিন্তাই করে নাই, কিন্তু আজ ত জীবনের গতি ফিরাইতেই হইবে। যে করেই হোক্ স্ত্রী-পুত্রের মুখের অন্নের ব্যবস্থা করিতেই হইবে। টিউশনীর ১০, টাকা ছাড়া ত আর অন্য কোন আয় নাই। মাত্র এই কয়টি টাকায় সে কি করিয়া সংসারের সব দাবী মিটাইবে। ভাবিতে ভাবিতে সে যেন ব্যাকুল হইয়া আরও অসহায়ভাবে ঘরের চারিদিকে তাকাইতে থাকে। হায়রে, কি করিয়া সে পোষাদের ব্যবস্থা করিবে—তাহার কি যেন মনে পড়িয়া যায়। সে হঠাৎ উবু হইয়া বসিয়া খাটের নীচ হইতে তাহার বাবার মিস্ত্রীজীবনের সরঞ্জাম টানিতে থাকে। যন্ত্রপাতি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে থাকে, কিন্তু সে কিছুই বুঝিতে পারে না যে, কি করিয়া তাহার বাপঠাকুর্দ্দা ইহাদের সাহায্যে অবলীলাক্রমে টেবিল চেয়ার ইত্যাদি গড়িত। হতাশ হইয়া আবার সেগুলি যথাস্থানে রাখিয়া দেয়। ঘরের আধ অন্ধকার, ভাঙ্গা জানালা, ছেঁড়া কাপড়, মলিন বিছানা সবগুলিই যেন তাহাকে ভীষণ দারিদ্র্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সে এক সময় হঠাৎ পায়চারী করিতে করিতে নিরুপায়ভাবে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চারিদিকে তাকাইতে থাকে। না, না, এভাবে সে কিছুতেই থাকিতে পারিবে না। বেশী দিন এমনি করিয়া থাকিলে সে পাগল হইয়া যাইবে। ছেঁড়া জামাটি গায়ে দিয়া বধূকে যাইয়া বলিল—"আমি বাইরে যাচ্ছি, খোকাকে সাবধানে রেখ।" স্বামীর ব্যাকুল মুখের দিকে চাহিয়া বধূ আর কথা বলিতে পারে না। চক্ষু টন্ টন্ করিতে থাকে—কথার স্বর বন্ধ হইয়া যায়। তবুও জোর করিয়া মিনতিপূর্ণস্বরে বলিল—"একটু দাঁড়াও, শুধু চলে যেও না, চারটি মুড়ী খাও।" চরণ দাঁড়াইয়া থাকে। বধূ ক্ষিপ্রহস্তে একটি বাটীতে চারটি মুড়ী, একটু গুড় ও এক গ্লাস জল আনিয়া দেয়। চরণ তাড়াতাড়ি খাইয়া, ছেঁড়া ছাতাটি লইয়া সোজা কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের দিকে চলিতে থাকে। সার্টটার পিঠে একটা মস্ত তালি, গলার কলার ইস্ত্রির অভাবে দুমড়াইয়া আছে—ছাতা দুইটার স্থানে স্থানে ফাটিয়া সুতা বাহির হইয়া গিয়াছে কাপড়ের প্রায় একই অবস্থা,—পায়ের জুতাতে যে কতবার তালি পড়িয়াছে তার ঠিক নাই তার উপর আবার ডান পায়ের কড়ে আংগুলটা ছেঁড়ার ফাঁকে বাহির হইয়া আছে। মাথার উপরে মধ্যাহ্ন সূর্য্য সমান তেজে জ্বলিতেছে। নীচে পায়ের তলে আংগুলেটার রাস্তার তাতে ফোস্কা পড়িবার মত হইয়াছে, এক-একবার গরম বাতাস ঝাপটা মারিয়া তাহার শরীরের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে। কিন্তু সে আজ সব অগ্রাহ্য করিয়া কিসের একটা দুর্নিবার আকর্ষণে হন্ হন্ করিয়া চলিতেছে। আজ সে কাহারও বারণ শুনিবে না—একটুমাত্র ইতস্ততঃ করিবে না। সোজা প্রত্যেক অফিসে অফিসে ঢুকিয়া তাহার ভাগ্য পরীক্ষা করিবে। এইরূপে কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে সে ক্লাইভ ষ্ট্রীটে আসিয়া পড়িল, প্রকান্ড প্রকান্ড অফিস, দ্বারে দ্বারে তকমাধারী দরওয়ান, জানালায় জানালায় খস্‌খসের পর্দ্দা ঝুলিতেছে,—দরজার সামনে কয়েকটি দামী মোটর দাঁড়াইয়া আছে। চরণ দরজায় ঢুকিতে যাইয়া থমকিয়া দাঁড়ায়। নিজের কদর্য্য বেশের দিকে চাহিয়া তাহার পূর্ব্ব সঙ্কল্প কোথায় ভাসিয়া যায়—ভয়ে ভয়ে দরওয়ানকে জিজ্ঞাসা করে,—"বড় সাব উপরমে হ্যায়?" দরওয়ান উত্তর দেয়—"জি হাঁ। আপ মোলাকাত করেগা—?" —"নেই, কোই নক্‌রী খালি হ্যায়, তোম জান্‌তা?" "নেই বাবু, নক্‌রী ত কুছ খালি নেই হ্যায়" —বলিয়া মুচ্‌কি হাসিয়া দরওয়ান মুখ ফিরাইয়া নেয়, চরণ হতাশ হইয়া আবার চলিতে থাকে। চলিতে চলিতে হঠাৎ পান-দোকানের একটা আয়নার দিকে তাহার নজর পড়িল, তাহার ভিতর নিজের চেহারা দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। ছি, ছি, রোদে ঘুরিতে ঘুরিতে এ তাহার কি চেহারা হইয়াছে। মাথার রুক্ষ চুলগুলি বাতাসে উড়িতেছে, সমস্ত মুখে চিন্তার রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে; ঘামে মুখের রং তামাটে হইয়া গিয়াছে, ঠোঁট দুটা অসম্ভব শুকাইয়া গিয়াছে। সমস্ত মুখে একটা করুণ পান্ডুরতা ঘনাইয়া আসিয়াছে। কেবলমাত্র কোটরগত স্তিমিত চক্ষু দুটি জ্বল জ্বল জ্বলিতেছে। সে সেখানেই দাঁড়াইল। দোকানের ঘড়িতে দেখিল আড়াইটা বাজিয়া গিয়াছে। উঃ, এত বেলা হইয়া গিয়াছে, একবার ভাবিল বাড়ী ফিরিয়া যাই, কিন্তু সেই আধ-আঁধার নির্জ্জন ঘরের মলিনতা, ছেলের শীর্ণ চেহারা, স্ত্রীর সজল চক্ষু মনে করিয়া তাহার ঘর যাইবার প্রবৃত্তি চলিয়া গেল। না, না, যতক্ষণ পারে সে রাস্তাতেই কাটাইবে। যতক্ষণ পারে সে সেই মলিনতা হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিবার চেষ্টা করিবে। সে আবার চলিতে লাগিল। চলার যেন আজ তাহার শেষ নাই। ঘুরিতে ঘুরিতে কলেজ স্কোয়ারে আসিয়া পৌঁছিল। আর হাঁটিতে পারে না, পা দুটা অবশ হইয়া আসিতেছে, ক্ষুধায় পেটের ভিতর হু হু করিয়া জ্বলিতেছে—পিপাসায় দগ্ধ শুষ্ক ওষ্ঠ হইতে এক প্রকার তীব্র জ্বালা ছড়াইয়া পড়িতেছে —সে আর কোন দিকে না চাহিয়া গাছের নীচে একটা বেঞ্চের উপর ধপাস করিয়া বসিয়া পড়িল। ৭।৮ মিনিট চরণ চক্ষু বন্ধ করিয়া বৃক্ষের ঠান্ডা ঝিরঝিরে বাতাসটুকু উপভোগ করিল। কাঠফাটা রৌদ্র চারিদিকে খাঁ খাঁ করিতেছে কাক পক্ষীগুলি পর্য্যন্ত গাছের উপর ঝিমাইতেছে। চরণ পিপাসায় আর স্থির থাকিতে পারিল না, মাথাটি তুলিয়া এদিক ওদিক চাহিতে দেখিতে পাইল—অদূরে একটি চানাচুরওয়ালা তাহার চানাচুরের ঝুড়িটি একটা ময়লা গামছায় ঢাকা দিয়া চোখ বন্ধ করিয়া ঝিমাইতেছে। চরণ ভাবিল—এত রৌদ্রে ঘুরিয়া শুধু জল খাইবে না। এক পয়সার চানাচুর

কিনিয়া খাইলে বেশ হয়। সে পকেটের ভিতর হাত দিয়া দেখিল—ঠিক একটি পয়সাই তাহার আছে। তাড়াতাড়ি সে চানাচুরওয়ালার কাছে যাইয়া এক পয়সার চানাচুর চাহিল। ২।৩ বার চাহিতেই চানাচুরওয়ালার তন্দ্রা কাটিয়া গেল। চারটি ভাজা ডাল, ছোলা ও মটর এক সঙ্গে মিশাইয়া তাহাতে দুটি লঙ্কার গুড়ো দিয়া সে চরণের হাতে দিল। চরণ তাহাকে একটি পয়সা ফেলিয়া দিয়া পূর্ব্বের বেঞ্চিতে যাইয়া বসিল। দুই-তিনটি ছোলা মুখে ফেলিয়া খুব আরামের সহিত সে চিবাইতে চিবাইতে ভাবিতে লাগিল—হায়রে মানুষের জীবনে প্রয়োজনের দাবী এমনই বেশী! প্রয়োজন না থাকিলে মানুষ মূল্যবান বস্তুও ফিরিয়া দেখে না, আবার প্রয়োজন পড়িলে অতি তুচ্ছ বস্তুও সাদরে গ্রহণ করিতে ইতস্তত করে না। আজ এমনি করিয়া সারাদিন রৌদ্রে পুড়িয়া ক্ষুধায় শ্রান্ত হইয়া না পড়িলে এই সামান্য অতি সামান্য এক পয়সার চানাচুরের ভিতর যে এত সুধা থাকিতে পারে তা সে কিছুতেই বুঝিতে পারিত না। চানাচুর খাইতে খাইতে অনেক কথাই তাহার মনে পড়িতে লাগিল। B. A. পড়িবার সময় সে প্রায় প্রতিদিনই এখানে বেড়াইতে আসিত। এমনি একটা বেঞ্চে ৩।৪ জন বন্ধু মিলিয়া তাহারা বসিত। কত কল্পনার রঙীন জাল বুনিত, কত বড় বড় কথা ভাবিত, কত উচ্চাঙ্গের আলোচনা হইত। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কিছুই বাদ যাইত না। আর আজ—হায়রে, নিষ্ঠুর বাস্তব তাহার সেই কল্পনার জগৎ অতি নিষ্ঠুর নির্দ্দয় হস্তে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। যাহারা তাহাকে পূর্ব্বে দেখিয়াছে, তাহারা ভাবিতেও পারে না—এই সেই চরণ, যে এককালে কলেজের সর্ব্বকার্য্যে উৎসাহী, সকলের প্রিয় ছিল। তাহার আজ এই পরিণতি! চরণ নিজের মনেই হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। চানাচুর খাওয়া তাহার শেষ হইয়া গিয়াছিল। সে হাতটি ঝাড়িয়া আস্তে আস্তে গেটের বাহিরে আসিল। সেখানে ফুটপাথের উপরে একটা কল হইতে অঞ্জলি ভরিয়া জলপান করিল। খানিকটা জল চোখে মুখে খুব করিয়া ঝাপটা দিয়া মুখটি কোঁচার খুটে মুছিয়া ফেলিল। এবার সে অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইল। মুখ তুলিয়া চাহিতেই সামনে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাণ্ড প্রাসাদ তাহার চোখে পড়িল, সে অভিমান ভরে চোখ ফিরাইয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। হায়রে, এই সেই বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে সে দরিদ্র বাপের সর্ব্বস্ব দিয়া নিজের সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য দিয়া বিদ্যার্জ্জন করিয়াছে। যাহার সুসজ্জিত কামরার বৈদ্যুতিক পাখার নীচে বসিয়া সে ভবিষ্যতের কত রঙীন ছবিই আঁকিয়াছে। তাহার মনে হইল —এই বিরাট অট্টালিকা কি মোহজালই না বিস্তার করিয়াছে যে, শেষ পরিণাম জানা সত্ত্বেও কত দরিদ্র সর্ব্বস্ব দিয়া আজ তাহারই মত নিঃস্ব হইয়া পথে পথে ঘুরিতেছে। চরণ চলিতে চলিতে দেখিতে পাইল একটি তরুণী কৌতূকপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। মুখের দিকে চাহিয়া সে বুঝিতে পারিল এ সেই তাহার সহপাঠিনী—মালতী বিশ্বাস। চরণ তাড়াতাড়ি লজ্জায় ছেঁড়া ছাতাটায় মাথা ঢাকিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল। ছি ছি—মালতী কি ভাবিতেছে! তাহার দুর্গতি দেখিয়া মনে মনে কতই হাসিতেছে! চরণ হন্ হন্ করিয়া চলিতে লাগিল। কোন দিকে তাকাইতে আর তাহার সাহস হইল না। এখন ৪টা বাজিয়া গিয়াছে, এই পথেই কলেজ প্রত্যাগত ছেলের দল যাইবে, হয়ত তাহার মধ্যে আবার কোন পরিচিত বন্ধুর সহিত দেখা হইয়া যাইতে পারে। চরণ মুখ নামাইয়া যতদূর সম্ভব নিজেকে ছাতার আড়াল করিয়া ক্ষিপ্র পদে চলিতে লাগিল।

প্রায় সাড়ে পাঁচটায় সে বস্তিতে পৌঁছিল। নলিনী ভয়ে ভাবনায় অস্থির হইয়া গিয়াছিল। সেই যে চারটি মুড়ী খাইয়া চলিয়া গিয়াছে আর এতক্ষণে ফিরিল। নলিনী স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া ব্যাকুলভাবে বলিল, "দুপুরে খেতেও এলে না, এতক্ষণ কোথায় ছিলে?" চরণ ম্লানভাবে বলিল—"কোথায় আর থাকব—রাস্তায়।" নলিনী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল— "রাস্তায়, এই রোদে তুমি রাস্তায় ঘুরছিলে?" চরণ বলিল— "হ্যাঁ, নলিনী, আমাদের আর স্থান কোথায়?" নলিনী নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"মুখ হাত ধোও, আমি ভাত বাড়ছি।" চরণ মুখ হাত ধুইয়া ভাত খাইতে বসিল। কাছে বসিয়া এটা খাও, ওটা বলিয়া খাওয়াইবার তেমন উপকরণ কিছুই ছিল না। তবুও সে কাছে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিল। চরণের বিবর্ণ মুখ আর কদন্ন খাইবার ধরণ দেখিয়া তাহার চোখে জল আসিল। তাহার কত ক্ষুধাই পাইয়াছে— সে ঐ লাল মোটা চালের ভাত সামান্য একটু তরকারী দিয়া কি ভাবে খাইতেছে। নলিনী ভাবিল—ভগবান, তাহারা গরীব হইলেও কখন মাছ ছাড়া ভাত খায় নাই। তাহার বিবাহের সময় তাহাদের সমাজে শ্বশুরের অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না। গ্রামে পুকুরের মাছ, গরুর দুধ তাহারা স্বচ্ছন্দেই পাইয়াছে। ওরকম কদন্ন খাওয়া ত তাহাদের কোন দিনই অভ্যাস নাই। সে ভাবিয়াছিল, স্বামী তিন তিনটা পাশ করিল, দেশের ভিটা, কয়বিঘা জমি বিক্রয় হইয়া গেল। তা যাক, যাহা গেল তাহার বিশগুণ তাহারা ফিরিয়া পাইবে। কিন্তু আজ—? সে আর ভাবিতে পারিল না। ব্যথায় বুক টন টন করিয়া উঠিল। চরণ খাইয়া উঠিয়াই সেই ছেঁড়া জুতাটিতে পা ঢুকাইতেই নলিনী ভয়ে ভয়ে বলিয়া উঠিল—"আবার কোথায় যাবে?" নামে এসেছে।" "কে আবার চিঠি দিল, দেখি—" বলিয়া চরণ বলিল,—"হ্যাঁ, শুধু শুধু ত আর কামাই করতে পারি না। ঐ কয়টি টাকাই আমার সম্বল।"

পিতার মৃত্যুর পর হইতে চরণ দিনের বেলায় না যাইয় সন্ধ্যার সময় পড়াইতে যাইত। নলিনী তক্তপোষ হইতে একটি খাম লইয়া স্বামীর হাতে দিয়া বলিল—"এই চিঠিটা তোমার নামে এসেছে।" "কে আবার চিঠি দিল, দেখি—"বলিয়া চরণ চিঠিটি তাহার হাত হইতে লইয়া প্রদীপের নিকট যাইয়া তাড়াতাড়ি খুলিয়া মনে মনে পাঠ করিতেই তাহার মুখ ছাইয়ের মত শুষ্ক হইয়া গেল। সে নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে প্রদীপের দিকে চাহিয়া রহিল। নলিনী তাহার মুখ-চোখের ভাব দেখিয়া ভয় পাইয়া গেল। স্বামীর কাঁধে হাত দিয়া বলিল, "কি লেখা আছে, অমন করে চেয়ে রয়েছ কেন?" চরণ কিছু না বলিয়া চিঠিটি তাহার হাতে দিল। নলিনী চিঠিটা মনে মনে পা[illegible] করিয়া নিজের উদ্গত অশ্রু গোপন করিয়া মুখে হাসির ভা[illegible]

আনিয়া বলিল—"এর জন্য অত ভাবছ কেন? ব্যবস্থা একটা হবেই। তুমি যে ভেবে ভেবে আধখানা হ'য়ে গেলে।" চরণ কোন উত্তর না দিয়া চিঠিটি লইবার জন্য তাহার দিকে হাত বাড়াইল। চিঠিখানা লইয়া খামে ভরিবার সময় ঠিকানায় তাহার নামের পাশের ডিগ্রীর উপর নজর পড়িল, B. A. অক্ষর দুইটি প্রদীপের আলোতে জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে। সে ভীষণ জ্বালাময় দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে হইল অক্ষর দুইটি যেন তীরের ন্যায় তাহার বুকে বিঁধিতেছে। হায়রে, এককালে উহাই নামের পাশে লিখিবার জন্য তাহার কতই না আগ্রহ ছিল, কিন্তু আজ উহা যে কত অর্থহীন সে তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছে। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া নলিনী বলিল, "যাবে ত যাও। চিঠি নিয়ে যে দাঁড়িয়েই রইলে।" "না নলিনী, যাচ্ছি"—বলিয়া চরণ অগ্রসর হইল। চরণের B. A. পরীক্ষার সময় তাহার পিতা দেশে এক মহাজনের কাছে কিছু টাকা ধার করিয়াছিলেন, সেই টাকা শোধ করিবার জন্য মহাজন তাগাদা দিয়া চিঠি লিখিয়া পাঠাইয়াছে।

যাইতে যাইতে, বস্তীর পশ্চিম কোণে একঘর ছুতার বাস করিত, তাহাদের দিকে চরণের নজর পড়িল। সারাদিনের পরিশ্রমের পর তাহারা মাটিতে বসিয়া খুশী মনে তামাক খাইতেছে। কোণের দিকে কয়েকটি ছেলে মেয়ে খেলা করিতেছে। তাহাদের আনন্দোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া চরণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। সেও ত ছুতারেরই ছেলে—ভদ্রলোক সাজিয়া না তাহার এত দুঃখ। হায়রে, সে যদি তুচ্ছ ডিগ্রীর মোহে না ভুলিয়া উহাদেরই মত মান-অপমান সব বিসর্জ্জন দিতে পারিত, তাহা হইলে তাহাকে পেটের জন্য এমনি করিয়া রাস্তায় রাস্তায় কুকুরের মত ঘুরিতে হইত না। সে তাড়াতাড়ি ইহাদের দিকে পিছন ফিরিয়া গা আড়াল দিয়া চলিয়া গেল।

পিতার মৃত্যুর পর চারি মাস এমনি করিয়াই চলিয়া গেল। ভোর হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত অফিসের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিতে ঘুরিতে সে হয়রান হইয়া পড়িল। তবুও কোথাও কোন আশার বার্ত্তাটুকুও পাইল না। শুধু কি তাই—ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়াইয়া আছে, পাশ কাটাইয়া কত লোক চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু কেহ একবার মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসাও করে না যে, সে কেন দাঁড়াইয়া আছে, তাহার কি দরকার। তাহার আত্মসম্মানে ঘা লাগে—চোখ জলে ভরিয়া আসে। হায়রে ২৫।৩০ টাকার চাকুরীর জন্য এত অপমান! তার চেয়ে তাহাদের জাত-ব্যবসা ঢের ভাল ছিল। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল আর সে এমন করিয়া কুকুরের মত ঘুরিবে না। তাহার চেয়ে সে মোট বহিবে, রাস্তায় ঝাড়ু দেবে—সেও ভাল, ঢের বেশী সম্মানের। আজ হইতে সে ভুলিয়া যাইবে যে, সে তিনটা পাশ করিয়াছে। তাহার নামের পাশে B. A. লেখা হয়। ঐ সর্ব্বনেশে ডিগ্রীর মোহেই তাহার এত দুর্দ্দশা। চরণ সেইদিনই রাত্রিতে তাহার ছাত্রের পিতা গৌরহরিবাবুকে ধরিল—যে কোন চাকুরীতে হউক তাহাকে লাগাইয়া দিতেই হইবে।

গৌরহরিবাবু একটা মার্চেণ্ট অফিসের বড়বাবু। তিনিও চরণের চাকুরীর জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু কিছুই সুবিধা করিতে পারেন নাই। তিনি চিন্তিত মুখে বলিলেন, "অফিসের কোন কাজ ত খালি নাই, তবে আমার জানা-শুনা একটা Card-board Works-এ একটি কারিগরের কাজ খালি আছে, কিন্তু তুমি কি সেই কাজ করবে?" চরণ বলিল, "নিশ্চয়ই করব, কিন্তু আমার ত ঐ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই।" গৌরহরিবাবু বলিলেন, শিখতে মাত্র মাস দুই লাগবে। আচ্ছা, তাদের সঙ্গে কথা বলে দেখি কি হয়?

দিন চারেক পর, চরণ রাত্রিতে পড়াইয়া যখন বাড়ী ফিরিতেছিল, গৌরহরিবাবু তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওহে তারা রাজী হয়েছে। তবে তুমি কাজ কিছুই জান না। সেজন্য তাদের কাছে কাজ শিখবে এবং বিকালের দিকে চিঠিচাপাটি লিখতে হবে, আর হিসাবের খাতাপত্রও একটু একটু দেখতে হবে। আপাতত ওরা ৩০৲ টাকা করে দেবে, তারপর কাজ শিখলে মাইনে বাড়িয়ে দেবে। তোমার কোন আপত্তি আছে?" চরণ আনন্দিত মুখে বলিল,—"না বাবু, আমার কোন আপত্তিই নাই। আমাকে যা তারা করতে বলবে, আমি তাই করব।" "তবে নয়টার সময় কাল আমার এখানে এস। তোমাকে নিয়ে যাব"—বলিয়া তিনি চরণের হাতে একটি দশটাকার নোট দিলেন। নোটটি হাতে লইয়া চরণ বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিতে তিনি বলিলেন—"মাইনেটা একটু আগেই দিলাম, কাল আবার ওখানে যেতে হবে—কাপড়-চোপড়গুলো একটু বুঝলে না।"—চরণ বুঝিল সবই, কৃতজ্ঞচিত্তে তাহাকে নমস্কার করিয়া বাহির হইল।

পথে চলিতে চলিতে চরণ ভাবিল—আজই সে কাপড়-চোপড় কিনিয়া লইয়া যাইবে। কাল কিনিবার সময় পাইবে না। সে দোকান হইতে কাপড়, জামা ও চীনা-দোকান হইতে এক জোড়া সস্তা জুতা কিনিল। ফিরিবার পথে বাজারে একটা মাছও কিনিল। আহা, তাহার ছেলে আজ কতদিন মাছ খাইতে পায় নাই, মাছের স্বাদ একরকম ভুলিয়াই গিয়াছে। চরণ জিনিষগুলি লইয়া অতিশয় আনন্দিত মনে ক্ষিপ্রপদে চলিতে লাগিল। সে বাড়ীতে ঢুকিয়া দেখিল তাহার নলিনী ঘরের এক কোণে লক্ষ্মীর পটের কাছে চক্ষু বন্ধ করিয়া ধ্যানে বসিয়া আছে। তাহার দুই চোখ বহিয়া জল ঝরিতেছে। ছেলেটি খাটের উপর বসিয়া কাঁদ কাঁদ মুখে মায়ের দিকে চাহিয়া আছে। চরণ জিনিষগুলি রাখিয়া ছেলেটিকে সস্নেহে কোলে তুলিয়া বুকে চাপিয়া ধরিল। আজ কতদিন উহাকে আদর করে নাই, শীর্ণ চেহারা দেখিবার ভয়ে ভাল করিয়া চাহিয়াও দেখে নাই। পায়ের শব্দে নলিনীর ধ্যান ভাঙিয়া গিয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি চক্ষু মুছিয়া পিছন ফিরিয়া অনেকদিন পর স্বামীর আনন্দোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া অবাক হইয়া গেল। চরণ হাসিতে হাসিতে বলিল—"হাঁ করে আমার মুখের দিকে কি দেখছ—উঠে পড়। মাছটা কুটে বেশ ভাল করে রান্না করে আজ সতুকে খেতে দাও।" নলিনী হাসিয়া বলিল, "মাছ কে দিল।" চরণ বলিল, "কিনে আনলাম। গৌরহরিবাবু আমার একটি চাকুরী ঠিক করেছেন। কাল থেকেই কাজে যেতে হবে আজকে আমার মাইনের টাকাটা আগেই দিলেন। তাই এইগুলি কিনে আনলাম। নলিনী আনন্দিত চিত্তে আর একবার মাথা লুটাইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—ঠাকুর তোমারই দয়া।

রবীন্দ্রনাথের মহুয়ায় প্রেমের অভিব্যক্তি

শ্রীনরেন্ সেন-গুপ্ত

মহুয়া লিরিকধর্মী রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব প্রণয়-কাব্য। বইখানি প্রজাপতির মন্দিরে উৎসর্গ করিবার দাবীতে লেখা হইলেও সকল মহান্ সৃষ্টির ন্যায় ইহাও তাহার আদিম উদ্দেশ্যকে ছাড়াইয়া বহু দূরে চলিয়া গিয়াছে। এই বইয়ের নামকরণ সম্বন্ধে কবি নিজে যাহা বলিয়াছেন তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, "নামের দ্বারা আগে-ভাগে কবিতার পরিচয়কে বেঁধে দেওয়ার প্রথাকে আমি অত্যাচার বলে মনে করি। কবিতার অতি-নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞা প্রায়ই দেওয়া চলে না। আমি ইচ্ছে করেই 'মহুয়া' নাম দিয়েছি। অথচ কবিতাগুলির সঙ্গে মহুয়া নামের একটু সংগতি আছে—'মহুয়া' বসন্তেরই অনুচর, আর ও রসের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে উন্মাদনা। যাই হোক অর্থের অতি বেশি সুসংগতি নেই বলেই কাব্যগ্রন্থের পক্ষে এ নামটি উপযুক্ত বলে বিবেচনা করি।"

বইখানির প্রারম্ভে 'উজ্জীবন' বলিয়া একটি কবিতা আছে। কবিতাটি কবির 'মদনভস্মের পর' কবিতার পরবর্তী দৃশ্য। পঞ্চশর মদন তাহারই চঞ্চলতার জন্য ধূর্জটির শাপানলে দগ্ধ। সারা নিখিল রতি-বিলাপ সংগীতে ভরিয়া গিয়াছে। আকাশে বাতাসে তাহারই করুণ আর্তনাদ রণিয়া রণিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। চঞ্চল ও অচঞ্চলের এই দ্বন্দ্বে বারে বারে অচঞ্চল বিজয়ী (Bergson) আবার অন্য মুহূর্তে চঞ্চলের কাছেই নিজেকে বিলাইয়া দিতেছে। পরিশেষে চঞ্চল ও অচঞ্চলের অপূর্ব মিলন। তাই স্বর্গোপম প্রেম ও তাহার বাহন-দেবতা পুষ্পধনুর এই বেদনাহত পরিণামে ব্যথিতচিত্ত কবি পঞ্চশরকে সতনু সঞ্জীবিত করিয়া রূপায়িত করিলেন। তাই রতি-প্রিয়ের আজ নূতন সজ্জা, আজ তাহার বীরের রূপ।

> যাহা মরণীয় যাক্ মরে
> জাগো অবিস্মরণীয় ধ্যানমূর্তি ধরে
> যাহা রূঢ় যাহা মূর্ত
> যাহা স্থূল দগ্ধ হোক্, হও নিত্য নব
> মৃত্যু হতে ওঠো পুষ্পধনু,
> হে অতনু বীরের তনুতে লহো তনু।

পরবীতেও আমরা এই কথারই ধ্বনি শুনিতে পাই,

> 'হে শুষ্ক বল্কলধারী বৈরাগী, ছলনা জানি সব,
> সুন্দরের হাতে চাও আনন্দে একান্ত পরাভব
> ছদ্ম-রণ বেশে।
> বারে বারে পঞ্চশরে অগ্নিতেজে দগ্ধ ক'রে
> দ্বিগুণ উজ্জ্বল করি বাঁচাইবে শেষে।" (তপোভঙ্গ)

গ্রন্থখানির প্রথমে কয়েকটি কবিতা আছে—যথা বোধন, বসন্ত, বরযাত্রা ও মাধবী—ইহারা প্রেমের কবিতা নহে। সেগুলি বসন্তের, ঋতু-উৎসব পর্যায়ের। কবি বলিয়াছেন, "নব-বসন্তের আবির্ভাবই মহুয়া কবিতার উপযুক্ত ভূমিকা বলে নকীবের কাজে ওদের এই গ্রন্থে আহ্বান করা হয়েছে।" ইহার মধ্যে 'বরযাত্রা' বলিয়া যে কবিতাটি তাহার শব্দ-ঝঙ্কার সত্যই অতুলনীয়। কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারলাম না,

> অশোক রোমাঞ্চিত মঞ্জরিয়া
> দিল তার সঞ্চয় অঞ্জলিয়া।
> মধুকর-গুঞ্জিত
> কিশলয় পুঞ্জিত
> উঠিল বনাঞ্চল চঞ্চলিয়া।

'মহুয়া' বলিয়া একটি কবিতা এই কাব্যখানিতে স্থানলাভ করিয়াছে। বইখানির নামের সহিত ইহার নামের সম্বন্ধ নেহাৎ মুখ্য না হইলেও নামের ঐক্যের আবেদনে ইহার সম্বন্ধে কিছু বলার দাবী অগ্রাহ্য করা যায় না। মহুয়া-বৃক্ষ এতো গাম্ভীর্যময়, এতো বিশাল মহনীয় হইয়াও কবি কর্তৃক উপেক্ষিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের কবি খেদ করিতেছেন। অশোক-বকুল-কিংশুক-মালতীকে লইয়া এতোখানি সমারোহ কবি যেন কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেছেন না। অকুণ্ঠিত মর্যাদায় শালতালসপ্তপর্ণ তরুরাজির সহিত একত্র দণ্ডায়মান স্পর্দ্ধাভরে উন্নত শির হইয়াও মহুয়ার খ্যাতি নাই, সম্মান নাই— এ ভাবনা কবির কাছে সত্যই পীড়াদায়ক। কবি মহুয়ার আপন সম্মান দান করিতে ব্যগ্র। তাই অধীর বিপুল ভালোবাসায় প্রেমিক-চিত্তের সর্ব্বোচ্চ সম্মান কবি তাহাকে উৎসর্গ করিলেন,

> কানে কানে কহি তোরে
> বধূরে যেদিন পাবো, ডাকিব মহুয়া নাম ধরে।

প্রেম ও বিরহের গীতিকাব্য হিসাবে 'মহুয়ার' তুলনা কোথায়ও মেলে না। 'বলাকার' অসীমের অসোয়াস্তি, ভূমার টান, সুদূরের বেদনার অস্পষ্টতা ইহাতে নাই। মহুয়ার আপন-ভোলা কবি চিত্ত-দেউলে-করা গানে আপন অন্তর ভরিয়া তুলিয়াছেন। ছন্দ, গান, ভাব ও আনন্দের সহজ মাধুর্যে কবি নিজেকে ভুলাইয়াছেন। কবি নিজে মহুয়ার কবিতাকে দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "আমি মহুয়ার কবিতার মধ্যে দুটো দল দেখতে পাই। একটি হচ্ছে নিছক গীতি-কাব্য, ছন্দ ও ভাষার ভঙ্গীতেই তার লীলা, তাতে প্রণয়ের প্রসাধন-কলা মুখ্য। আরেকটিতে ভাবের আবেগ প্রধান স্থান নিয়েছে, তাতে প্রণয়ের সাধন-বেগই প্রবল।' 'মায়া' নামক কবিতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "মায়ার প্রণয়ের দুই-ধারার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। প্রেমের মধ্যে সৃষ্টি শক্তির ক্রিয়া প্রবল। প্রেম সাধারণ মানুষকে অসাধারণ করে রচনা করে—নিজের ভিতরকার গন্ধে, রসে, বর্ণে ও রূপে। তার সাথে যোগ দেয় বাইরের প্রকৃতি থেকে নানা গান, নানা গন্ধ, নানা আভাস। এমনি করে অন্তরে বাইরে মিলনে চিত্তের নিভৃতলোকে প্রেমের অপরূপ প্রসাধন নির্মিত হতে থাকে—সেখানে ভাবে, ভঙ্গীতে, সাজে, সজ্জায় নূতন নূতন প্রকাশের জন্য ব্যাকুলতা, সেখানে অনির্বচনীয়ের নানা ছন্দে, নানা ব্যঞ্জনা। একদিকে এই প্রসাধনের বৈচিত্র্য, আর ... উপলব্ধির নিবিড়তা ও বিশেষত্ব। মহুয়ার কা... সেই মায়ালোকের কাব্য: তার কোনও অংশে

ভঙ্গীতে এই প্রসাধনের আয়োজন, কোনও অংশে উপলব্ধির প্রকাশ।

ইহা ছাড়া একটু স্বতন্ত্রভাবে মহুয়ার কবিতাগুলিকে এরূপভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে, যথা—(১) উদার-প্রেম, (২) নীরব-প্রেম (৩) পরিচয় ও প্রথম প্রেম (৪) প্রণয়ের প্রসাধন, (৫) খানিক সুন্দর (moment-musical), (৬) নারীর আদর্শ (৭) নারীর রূপ ও (৮) বিরহ-প্রেম। আমরা একটি একটি করিয়া বিভাগে কবির মনোভাব ও তাহার প্রকাশ আলোচনা করিব।

(১) উদার-প্রেম:—কবি অপরাজিত, অচেনা, নির্ভয়, পরিচয়, দায়-মোচন, প্রকাশ, মুক্তরূপ, আহ্বান, ছায়ালোক প্রভৃতি গুটিকয়েক কবিতায় স্বাধীন ও উদার-প্রেমের আদর্শ দেখাইয়াছেন। এই প্রেম ভীরু নহে, না-পাওয়ার বেদনাতে ম্রিয়মান নহে। দেওয়াকেই ইহা চরম বলিয়া জানে। মিথ্যা সৌন্দর্য ও কলাচাতুরীর দ্বারা এই প্রণয়ীকুল নিজেদের ভালোবাসার [illegible] ভুলাইতে চাহে না। সহজ ও মুক্তপ্রেমে ইহাদের হৃদয় [illegible] বীর্য ও শৌর্যে সুষমামণ্ডিত। অসম্পূর্ণ মিথ্যা-পরিচয়ের মরীচিকাকে ভাঙিয়া ইহারা বলে,

> [illegible]মারে উদ্ধার করি আনো,
> আমারে সম্পূর্ণ করি জানো!
> যেথা আমি একা
> সেথায় নামুক তব দেখা।

অথবা,

> আত্মা যেথা লুপ্ত থাকে সেথা উপচ্ছায়া
> মুগ্ধ-চেতনার পরে রচে তার মায়া।
> তাই নিয়ে ভুলাবে কী আমার জীবন?
> গাঁথিব কি বুদ্বুদের হার?

দুর্লভ প্রেমের দাবীতে প্রণয়িনী কামনা করে,

> তুমি মোরে কর আবিষ্কার
> পূর্ণ ফল দেহ মোর আমার আজন্ম প্রতীক্ষার।

এই প্রেম মানুষকে জনতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া সম্পূর্ণ করিয়া নিবিড় করিয়া নিভৃত পরিচয় করাইয়া লয়। আত্মবিস্মৃতির সংগোপনতা হইতে এই প্রেম প্রণয়িনীকে উদ্ধার করিয়া আনে ও সত্যের আলোকে, দৃপ্তবলে, শংকা-লজ্জাভয় দ্বিধাদ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত করে। সত্য আত্মীয়তার বেদীতে প্রেমিক আপনাকে উৎসর্গ করে।

> মহা আকস্মিক
> বাধাবন্ধ ছিন্ন করি দিক্,
> তোমারে চেনার অগ্নি দীপ্তশিখা উঠুক উজ্জ্বলি
> দিব তাহে জীবন অঞ্জলি।

এ প্রেম উদার, এ প্রেম নির্ভীক, প্রেমিকার অবহেলার [illegible] ও কুণ্ঠা ইহার নাই। দৃপ্ত-চিত্তে ইহা ভালোবাসার শেষ পরিণতিতে বিশ্বাস করে ও প্রেমিকার সাময়িক দুর্বলতাজনিত অবহেলাকে দাক্ষিণ্যভরে ক্ষমা করে।

> উদার-হাসি সাঁঝের সহে অবুঝ অবহেলা—
> একদা শেষে পলাতকার খেলা।

> বক্ষে তার মিলায় কবে মিলনে হয় সারা
> পূর্ণ হয় নিবেদনের ধারা।

জীবনে যদি ব্যর্থতা আসে, তবুও ইহাদের শংকা নাই। যতদিন বাঁচিয়া থাকে, ততদিন যেন সবলবেগে, দুর্দম বেগে বাঁচিতে পারে, ইহাই কামনা। রুক্ষদিনের কঠোরতা ইহাদের দমন করিতে পারে না, শান্তি ও সান্ত্বনাকে ইহারা উপহাস করে। পারস্পরিক পাওয়াকেই ইহারা চরম বলিয়া জানে।

> পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি
> ছিন্ন-পালের কাছি,
> মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব
> তুমি আছো আমি আছি

এ দান কঠোর, এ দান 'মালা নহে, 'থালা নহে,' 'গন্ধজলের ঝারি'ও নহে,—এ দান 'ভীষণ তরবারি।' এ-নিবেদন ফুলের সঙ্গীত নহে, কাঁটার সঙ্গীত। এ সঙ্গীতে শিরায় শিরায় রক্ত প্রবাহিত হইয়া ওঠে। অপ্রস্তুত মন তীব্র হরষে চমকিয়া ওঠে—

> সহজ-সাধন-লব্ধ নহে সে মুগ্ধের নিবেদন
> অন্তরে ঐশ্বর্যরাশি, আচ্ছাদনে কঠোর বেদন—
> নিষেধে নিরুদ্ধ সে-সম্মান
> তাই তব দান।

এই প্রেম সত্য, আপনার আলোকের দীপ্তিতে আপনি দীপ্যমান। Browning এর "Ways of love" কবিতাতে এই প্রেমেরই পরিচয় আমরা পাই,

> "I love the freely, as men
> strive for right
> I love thee purely, as they
> turn from praise."

এই প্রণয় দুর্বলতা দিয়া বরমাল্যের অবমাননা করে না। ইহাতে প্রার্থনা নাই, দীন কান্না নাই, অভিমান নাই, পিছু ফিরে দেখা নাই। মিথ্যা প্রেমকে ইহা ঘৃণা করে। দুঃখ সহিয়া ইহারা দুঃখের মূল্য দিতে জানে। সবলকণ্ঠে এই প্রেম জানায়,

> প্রেমেরে বাড়াতে গিয়ে মিশাবোনা ফাঁকি,
> সীমারে মানিয়া তার মর্যাদা রাখি।
> যা-পেয়েছি সেই মোর অক্ষয়-ধন,
> যা-পাইনি বড়ো সেই নয়।
> চিত্ত ভরিয়া রবে খনিক-মিলন
> চির-বিচ্ছেদ করি জয়!

এই স্বাধীন প্রেম প্রেমিককে সৃষ্টি করিয়া লয়। তাহাকে সে আপনি সৃজন করিয়া আপন করিয়া লয়। ইহা মায়াবাদীর মায়া নহে, ইহা সৃষ্টিকারের মায়া। বস্তু হইতে সেই মায়াই সত্যতর। গীতাঞ্জলিতেও তিনি ইহা বলিয়াছেন,

> "আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে
> আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান।

'কমলা-বক্তৃতা' প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, "বিষয়কে বড়ো ক'রে পায় বলে আনন্দ নয়, আপনাকেই বড়ো ক'রে, সত্য ক'রে

পায় বলে আনন্দ।   মানব-জীবনের যে বিভাগ অহৈতুক অনুরাগের অর্থাৎ আপনার বাহিরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগের, তার পুরস্কার আপনারই মধ্যে। কারণ সেই যোগের প্রসারেই আত্মার সত্য।"

"ন বা অরে পুত্রস্য কামায় পুত্রঃ প্রিয়োভবতি, আত্মনস্তু কামায় পুত্রঃ প্রিয়োভবতি।" জীবলোকে চৈতন্যের নীহারিকা অস্পষ্ট আলোকে পরিব্যাপ্ত। সেই নীহারিকা মানুষের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হ'য়ে উজ্জ্বল দীপ্তিতে বললে, "অয়মহং ভোঃ", এই যে আমি, সেইদিন থেকে মানুষের ইতিহাসে নানাভাবে, নানারূপে, নানাভাষায় এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া চলল, "আমি কী।"

(২) **নীরব প্রেম**ঃ—উদ্ঘাত, অসমাপ্ত, দীনা, গুপ্তধন প্রভৃতি কবিতাগুলিতে কবি প্রণয়িনীর গুপ্ত বুকে সঞ্চিত ভীরু-প্রেমের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। এই প্রেম নীরব-নিবেদনে আপনাকে উদ্বেল করিয়া দেয়। দম্‌কা হাওয়ার মত একটুখানি কাঁপিয়া কাঁপিয়া ওঠে। সে কম্পনে মধুর হিয়ার রন্ধ্রে, রন্ধ্রে শিহরণ লাগিয়া যায়। সে যেন গোপন করিতেই ভালবাসে; হৃদয়ের সঞ্চিত যত অর্ঘ সে প্রেমিকের অগোচরেই তাহাকে উপহার দেয়। ধরা পড়িতে সে ভয় করে। ভাবে, পৃথিবীর তিমির-গর্ভে যে মণি, লোকচক্ষুর অগোচরে জ্যোতি বিকীর্ণ করে, আলোর নির্মম নিষ্ঠুরাঘাতে সে জ্যোতি ম্লান হইয়া যাইবে। রাত্রির উজ্জ্বল-দীপ দিবসের আলোতে নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে। সে সর্ব্বদাই সঙ্কুচিত, তাহার প্রিয়তম, তাহার নিভৃত-হৃদয়ের নীরব-পূজা গ্রহণ করিল কী না! তাই সরমের অর্দ্ধস্ফুট ভাষায় ও মাঝে মাঝে ভাবে,—

প্রদোশনে মোর নিভৃতে
    দেখে নিলে মোর কী ভাবে,
যে দীপ জেবলেছি নিশীথে,
    সে দীপ কী তুমি নিভাবে?
ছিলো ভরি মোর থালিকা
ছিঁড়িব কী সেই মালিকা
সরম দিবে কী তাহারে
    অকথিত নিবেদনে,
যা আছে আমার মনে?

কত রাত্রে চৈত্র মাসে, যখন উদাসী হাওয়ায় আকুলিয়া দেয়, প্রিয়তম তাহার আসিয়াছিল ভীরু সে, কম্পিত-প্রাণ লইয়া তাহাকে সে অভ্যর্থনা করিতে পারে নাই। প্রিয়তমের সুমধুর নিশ্বাসে তাহার সেতারের তার কাঁদিয়া কাঁদিয়া স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অভাগ্য সে, তাহার প্রাণের অর্গলম্বার খুলিয়া দিয়া বলিতে পারে নাই "আমি আজ ধন্য, ধন্য প্রিয়তম।" তাই তাহার আজ এত খেদ তাহার সেদিনের ভুল আজ সে শোধরাইতে ব্যস্ত। সে বলে,

বোলো তারে আজ,
অন্তরে পেয়েছি বড়ো লাজ,
কিছু হয় নাই বলা
বেধে গিয়েছিলো গলা
ছিলোনা দিনের যোগ্য সাজ।

প্রিয়তম যেন তাহাকে ভুল না বোঝে। সেদিনের ভীরুতাকে সে-যেন কৃপণতা বলিয়া ভুল করিয়া চলিয়া যায়।

আমার বক্ষের কাছে
পূর্ণিমা লুকানো আছে
সেদিন দেখেছো শুধু অমা।
দিনে দিনে অর্ঘ মম
পূর্ণ হবে প্রিয়তম
আজি মোর দৈন্য করো ক্ষমা।

দুর্বল সে। তাহার প্রেমের অধিকার জানাইতে ভয় পায়। তাই প্রিয়তমকে সে মনে মনে জিজ্ঞাসা করে,

"I can't give thee what man call love,
    But will thou accept not.
The worship that heart lifts above
    And the heavens reject not?
(Shelley).

প্রিয়তমকে প্রেমের দানের বোঝায় ক্লান্ত করিতে সে ব্যথা পায়। সে জানে,

"কী মোর শকতি আছে তোমারে যে দিব উপহার—
    হোক্ ফুল, হোক্ না গলার হার।
        তার ভার
        কেনই বা সবে
        একদিন যবে
নিশ্চিত শুকাবে তারা ম্লান ছিন্ন হবে?" (বলাকা)

পরিপূর্ণ মিলনের মাঝে সে বিরহিণী। প্রিয়তমকে সে সম্পূর্ণ করিয়া বুঝিতে পারিল না। ভীতা সে, প্রিয়তমের উপর দাবী সে করিতে পারে না। যাহা সে আপন-ইচ্ছায় দেয়, তাই তাহার যথেষ্ট বলিয়া মনে করে। প্রিয়তম যাহা বলে নাই, তাহার ভাষা তো সে জানেনা! কী করিয়া বুঝিবে! তাই অচেনার বিচ্ছেদ তাহার মনে চিরদিন রহিয়া গেল। তাহার চিরদিনই ভয়, যে-সম্পদ তাহার প্রিয় চাহিয়াছিল, সে তো তাহা তাহার কাছে পাইল না। কিন্তু তবু তাহার সান্ত্বনা আছে, সে তাহাকে ফাঁকি দেয় নাই, কিছুই তাহার কাছে গোপন রাখে নাই। সে জানে, তাহার প্রিয়ের অনেক ঐশ্চর্য আছে, তবু যে সে তাহাকে ধন্য করিয়াছে, তাহা নিজের (প্রিয়ের) দেবার আনন্দ পরিপূর্ণ করিয়া লইবার জন্য। আবার একবার তাহার সাধ হয়, দেবতার কাছে জানিয়া লয় যে, তাহার হৃদয়ের নিবেদন কতোখানি সার্থক হইয়াছে,—তাহার কতোটুক নৈবেদ্য সে গ্রহণ করিয়াছে?

প্রথম প্রভাতে সব কাজ তব ফেলে
যে-গভীর বাণী শুনিবারে কাছে এলে,
কোনোখানে কিছু ইসারা কি তার পেলে
হে পথিক, বলো বলো—

সে বাণী আপন গোপন প্রদীপ জেবলে
রক্ত-আগনে প্রাণ মোর জবলোজবলো।

(৩) পরিণয় ও প্রথম প্রেম ঃ—আশীর্বাদ, নববধূ, পরিণয়, মিলন কবিতাগুলিতে কবি পরিণয় ও প্রথম প্রেমের মহান্ সৌন্দর্য দেখাইয়াছেন। কবি নববধূকে বলেন, তাহার জীবনে সৃষ্টির এই আনন্দ উৎসবে তাহার শ্রেষ্ঠ ধন অর্ঘ দান করিতে হইবে। তবে সে নিজে নিজেই আপনার মাঝে লুকানো যে ঐশ্বর্য-ভাণ্ডার আছে, তাহার বিরাট-রূপ দেখিতে পাইবে। কবি উচ্ছ্বসিত-স্নেহে নববধূরে জীবনের শুভলগ্নে আশীর্বাদ করিতেছেন।

যদি পারিতাম আজি অলকার দ্বারীরে ভুলায়ে
হরিয়া অমূল্যমণি অলকেতে দিতাম্ দুলায়ে।
তবু মোর মন মোরে কহে
সে-দান তোমার যোগ্য নহে
তোমার কমল বনে দিব আমি রবির প্রসাদ
তোমার মিলনখনে সঁপিব কবির আশীর্বাদ!

আজ বধূর শুভ-পরিণয়। জীবনের শৈশব হইতে আরম্ভ করিয়া হৃদয়ের গোপন-ভাণ্ডারে যে-সুধা এতোদিন সঞ্চয় করিয়া আসিয়াছিল, তাহা উজাড় করিয়া দিবার পরম লগ্ন আজ আসিয়াছে। এই আপনাকে বিলাইয়া দেওয়া, ইহাই ত চরম-দেওয়া। এই প্রেমের বিরাট দানে স্বর্গের দীপ মাটীর ঘরে জ্বলিয়া ওঠে ও মর্তে অমৃত-ধারা বহে। সহস্র দিনের মাঝখানে মিলনের এই দিনখানি স্বতন্ত্র ও চিরন্তন। আজ তুচ্ছতার বেড়া ভাঙিয়া প্রত্যহের বন্ধন ছিন্ন করিয়া এই দিন আপন গৌরবের ঐশ্বর্যে আপনাতে মহনীয় হইয়া ওঠে। সে-দিন যেন,—

প্রাণ-দেবতার হাতে জয়টীকা পরেছে সে ভালে
সূর্য-তারকার সাথে স্থান সে পেয়েছে সমকালে,
সৃষ্টির প্রথম-বাণী যে-প্রত্যাশা আকাশে জাগালো
তাই এলো করিয়া বহন।

সংসারের নামহীন ইতিহাসে যুগ যুগ ধরিয়া নববধূরা যে কতো কাহিনী রচনা করিয়া গেল, তাহা বিস্মরণের পারে চলিয়া গিয়াছে। সে প্রাণোৎসর্গের আজ কোনও চিহ্নই নাই। তাহাদের নীরব সহনশীল ব্যথাহত হৃদয়ের অন্তঃধ্বনি তার কোনও ক্ষতই রাখিয়া গেল না, তুচ্ছতার ধূলায় তাহা মুছিয়া বিলীন হইয়া গেল। আজ নববধূ চলিয়াছে এক চেনা ঘর ছাড়িয়া আর এক অচেনা ঘরকে আপন করিয়া লইতে। অজানার আশঙ্কায় তাহার মন খনে খনে চমকিয়া উঠিতেছে। তাহার সেই শঙ্কাভীত প্রশ্নের কোনও জবাব বিধাতা-পুরুষ দেন নাই। শুধু গোপনে তাহার দুঃখভারানত চিত্তে অদৃশ্য বল যোগাইয়াছেন। সমস্ত দুঃখ, সকল বিচ্ছেদের মধ্যেও বধূ সান্ত্বনা পায়, সে ভালোবাসিয়া হৃদয়ের আলো জ্বালাইতে পারিয়াছে।

(৪) প্রণয়ের প্রসাধন ঃ— কবি বর্ণিত "প্রণয়ের প্রসাধন করুণ রূপ" পরিস্ফুট হইয়াছে অর্ঘ, দৈবত, সন্ধান, নির্ঝরিণী, শুকতারা, পথের বাঁধন, দূত প্রভৃতি কবিতাগুলিতে। -গুলি নিছক গীতি-কবিতা। গভীরতার দিক দিয়া ইহাদের বিশেষ মূল্য নাই। ইহাদের মূল্য ইহাদের নিজস্ব বর্ণ-বৈচিত্র্যে, ছন্দে ও ভাষার ভঙ্গীতে। এগুলি যেন ঝরণা আপন দেহের পশরা লইয়া কল-নর্তে ছুটিয়া চলিয়াছে। কোনও খানে কিছু সঞ্চয় নাই, গতির স্রোতে ইহারা অনন্ত প্রবহমান। Romanticism-এর সুপ্ত-বিষণ্নতা ও formlessness বা mysticism-এর অস্পষ্টতা ইহাদের মধ্যে নাই। সর্বত্রই আনন্দ, আনন্দের পরিপূর্ণতায় আত্মহারা উদ্বেল হৃদয় বিলাইয়া দেওয়াই ইহাদের স্বভাব। গভীরতার ভার ইহাদের লঘু ছন্দকে মন্থর করিয়া দেয় নাই। ইহারাও আপন মুক্ত-স্বভাবে পাঠান্তে আমাদের মনে কোনও স্মৃতির বোঝাও রাখিয়া যায় না। কবিতাগুলি প্রত্যেকটিই ছোট ছোট—মহুয়ার কবিতাগুলির বিশেষত্বই এই—তাই প্রথম হইতে যে-সুরে ইহাদের আরম্ভ করা যায়, সেই সুরেই ইহারা শেষ হইয়া যায়। সুর-বৈচিত্র্যের ভারে ইহারা নত হইয়া পড়ে না। দৈবত নামে কবিতাটিতে কবি প্রেমিককে ধ্যানরত গোধূলি-লগ্নের সহিত ও তাহার প্রিয়াকে নিরালা পিয়াল তরুর সহিত উপমিত করিয়াছেন। কবি বলিতেছেন, পিয়ালের শাখায় শাখায়, পল্লবে পল্লবে, নবকিশলয়ের, মুকুলের ও ফুলের যে মেলা, যে চঞ্চলতা, সমস্তই যেন সন্ধ্যার একটি সুন্দর রঙীন খনের জন্য আপনাকে বিকশিত করিয়া দেয়। সন্ধান কবিতায় কবি বলিতেছেন, প্রিয় ও প্রিয়া পরস্পরের জন্য আপনাকে প্রস্ফুটিত করিতেছে।

আমার হৃদয়ে যে-কথা লুকানো, তার আভাষণ
ফেলে কভু ছায়া তোমার হৃদয়তলে?
দুয়ারে এঁকেছি রক্ত-রেখায় পদ্ম-আসন
সে তোমারে কিছু বলে?
একের জন্য অপরের প্রেম সার্থক।
আমার ছায়াতে তোমার হাসিতে
মিলিত ছবি
তাই নিয়ে আজি পরাণে আমার
মেতেছে কবি।

শাশ্বত কাল হইতে মানব-হৃদয় আর একখানি মধুর-হৃদয়ের অন্বেষণ করিতেছে। এই সমব্যথিত হৃদয় না হইলে, তাহার একেলা চলে না। একাকীত্ব তাহাকে পাগল করে, সে স্থির থাকিতে পারে না। যুগে যুগে তাই বিরহিণী আত্মা অভিসারে বাহির হয় তিমির-রাত্রির দুর্যোগে তাহার প্রিয়তমকে বরণ করিয়া লইবার জন্য। মানব-হৃদয়ের যতো কিছু অব্যক্তবাণী, তাহা যেন একটি হৃদয়ের গহনতলে সমস্ত উজাড় করিয়া দিতে পারিলে বাঁচিয়া যায়। তাই একাকীত্বের বোঝায় ক্লান্ত চাঁদ ঊষার শুকতারাকে ডাকিয়া ডাকিয়া বলে,—

সুন্দরী, ওগো শুকতারা
সুদূর শৈলশিখরান্তে!
শর্বরী যবে হবে সারা
দর্শন দিয়ো দিক্‌প্রান্তে।

পথের বাঁধন কবিতায় আমরা উচ্ছল প্রেমের একখানি উজ্জ্বল চিত্র দেখিতে পাই। বাঁধনহারা মুক্তি-প্রিয় এই প্রেম

আমাদের এই মর্ত্যে স্বর্গের সুষমা বহাইয়া দেয়। সত্যই হঠাৎ আলোর ঝলকানি লাগিয়া আমাদের চিত্ত ঝলমল করিয়া ওঠে। এই অবারিত প্রাণের স্পন্দনেই আত্মহারা হইয়া রডোডেনড্রনগুচ্ছ প্রভাতের অরুণ মেঘকে অবহেলা করিয়া উদ্ধত মস্তক আকাশের দিকে বাড়াইয়া দেয়।

(৫) **ক্ষণিক সুন্দর** (moment musical)ঃ—শুভযোগ লগ্ন, বাণী, প্রচ্ছন্না, পথবর্তী, উপহার কবিতাগুলিকে কবি সেই মুহূর্তের কথা বলিয়াছেন, যে-মুহূর্তে জীবনের 'সকল ভাবনা সোনা' হইয়া যায় ও 'আঁধার আলো' হইয়া ওঠে। হঠাৎ কোন্ শুভ প্রত্যুষে তাহার মনের বীণার সোনার তারে ঝঙ্কার লাগিয়া যায়, সে সুর-মূর্চ্ছনা তাহাকে তন্ময় করিয়া দেয়। এক মুহূর্তের উন্মাদনায় সারা জীবনের যা কিছু সঞ্চয়, যা কিছু পাথেয় সবই উজাড় করিয়া দিয়া রিক্তবিত্ত হইয়া সে মুক্তিলাভ করে। জীবন-দেবতার প্রেমের দেউলে মুগ্ধ পূজারী সে-পরমধন নিবেদন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া ওঠে। তখন ঘর-বাহির আর ভিন্ন থাকে না। সমস্ত ভাঙিয়া চুরিয়া একাকার হইয়া যায়। পরিণামের চিন্তা মানুষের মনে হয় না। লাভালাভের কোনও প্রশ্নই চিন্তায় আসে না। কখন 'রাজকুমার' আসিবে, 'বাতায়ন-পাশ' দিয়া তাহার রথ চলিয়া যাইবে, তাহার জন্য সকাল হইতে সে সাজিয়া গুজিয়া বসিয়া রহে। সে-জানে, রাজকুমার হয় ত তাহাকে দেখিবেও না। তবুও সমস্ত জীবন-ভর যাহার জন্য সে সুর চড়াইয়া গান গাহিয়া বেড়াইয়াছে, তাহার জীবনের সেই সকল সুরের রূপমূর্তি রাজকুমার তাহার ঘরের সম্মুখ-পথ দিয়া চলিয়া যাইবে। সে তাহাকে 'মণিহার' উপহার না দিয়া কী করিয়া থাকিবে? সংসারের তুচ্ছ ঘরকরণা লইয়া সে কেমন করিয়া ব্যস্ত থাকিবে? আজ যে তার সকল তুচ্ছতার বন্ধন হইতে মুক্তি। জীবন-দেবতাকে এই পরমধনটি সে উপহার দিবার জন্য উন্মুখ হইয়া ওঠে। সে বলে—

> এই পণ মোর
> সমস্ত জীবন ভোর
> দিনে দিনে দিব তার হাতে তুলি
> স্বর্গের দাক্ষিণ্য হ'তে আসিবে যে শ্রেষ্ঠ-ধনগুলি।

সেই একনিমেষে তাহার একযুগের কথা বলা হইয়া যায়

> উচ্ছ্বসিত সে এক নিমেষে
> যা-কিছু বলার ছিলো বলেছি নিঃশেষে।

আবার জীবনের এক দৃশ্যের সঙ্গে যাহাকে বে-মানান দেখায়, অন্য দৃশ্যে তাহাই অপরূপ হইয়া ওঠে। নিবিড় আষাঢ়ে যে-মিলন উজ্জ্বল হইয়া ওঠে না, ফাল্গুনের ফুল-গন্ধের ঐশ্বর্যে যাহাকে প্রসন্ন দেখায় না, আশ্বিনের শুভ-ক্ষণে—যখন আকাশের সমারোহে ধরণী পূর্ণ হইয়া ওঠে, তখন সেই মিলন অপূর্ব বলিয়া মনে হয়,—

> সেই স্নিগ্ধক্ষণে সেই স্বচ্ছ সূর্যকরে
> পূর্ণতায় গম্ভীর স্বরে
> মুক্তির শান্তির মাঝখানে
> তাহারে দেখিব যারে চিত্ত চাহে, চক্ষু নাহি মানে।

একদিন প্রিয় দাক্ষিণ্যভরে যে মুহূর্তের দান গ্রহণ করিয়াছিল, প্রিয়তমের পথযাত্রায় যে সৌধনেকের ছায়া দিয়া ক্লান্তি অপনোদন করিয়াছিল, তাহার কঠোর কঠিন জীবনের সাথে সে যে কিছু মধুরতা মিলাইতে পারিয়াছিল, তাহারই স্মৃতি তাহার জীবনে অক্ষয় হইয়া রহিল। একটি ক্ষণের দানের মহিমায় তাহার জীবনের সকল সাধনা ফললাভ করিল। তাই প্রিয়তম যখন চলিয়া গিয়াছে, পথ যখন শূন্য তখনও সে একাকী পথপ্রান্তে দাঁড়াইয়া রহিল,

> এই পথখানি রবে মোর প্রিয়
> এই হবে মোর চির-বরণীয়
> তোমারি স্মরণে রবো স্মরণীয়
> না মানিব পরাভব।
> তব উদ্দেশে অর্পিব হেসে
> যা-কিছু আমার সব।

রোমাণ্টিক-কবি ব্রাউনিংও তাহার "Last Ride Together"এ বলিয়াছেন,

> What if we still ride on, we two
> With life for ever old yet new
> Changed not in kind but in degree,
> The instant made eternity—
> And heaven just prove that I and she
> Ride, ride together, for ever ride?

একদিন বিজনে যুগল-তরু-মূলে সখী যে-তৃষ্ণার জল-দান করিয়াছিল বহুদিন পরে সেই স্মৃতি স্মরণ করিয়া পথিক আবার সেই তরুতলে আসিয়া দেখে সেই কূপ আছে, সেই যুগল-তরু আছে, সবই আছে। কেবল তাহার সখী নাই। পথিক শুধু ফিরিয়া গেল। সেই জলদানের স্মৃতি তাহার মনে চিরন্তন হইয়া রহিল। সখী তাহা জানিলও না।

> এ কূপের তলে মোর যক্ষের ধন
> একটি দিনের দুর্লভ সেই ক্ষণ—
> চিরকাল ভরি রহিল লুকানো,
> ওগো অগোচরা জানো নাহি জানো।

বিদেশের রাজপথে যাইতে যাইতে পথিক দেখিল অলিন্দের উপরে একটি অনিন্দ্যসুন্দর মুখ। সেইখানে সেই দেখার মাঝখানে সমস্ত নীরব-বিজন ছিলো। পথিকের চিত্ত বিদেশিনীর কম্পিত-ব্যথায় ব্যথিত হইয়া উঠিল। পথিক চলিয়া গেল। কিন্তু লইয়া গেল বিদেশিনীর ছবি। সে মুখ তাহার চিত্তপটে নিত্য হইয়া রহিল।

(৬) **নারীর আদর্শ ঃ—**

রবীন্দ্রনাথ সবলা, প্রতীক্ষা, বরণ, সৃষ্টিরহস্য, স্পর্ধা ও দর্প কবিতাগুচ্ছে যে নারীচিত্র আঁকিয়াছেন, সে নারী 'বীর্যবত নারী,' সে নারী কোষমুক্তা 'কৃপাণলতা।' সে মহিমময়ী রমণী শুধু 'নর্মসহচরী' নহেন, 'পুরুষের কর্মসহচরী, সে বধূবেশে বাসরকক্ষে কিঙ্কিণী বাজাইয়া যায় না। সে আপনার ভাগ্য আপনি জয় করিয়া লয়। বিনম্র দীনতা দিয়ে সে বরমাল্যে অভ্যর্থনা করে না। বলদৃপ্তকণ্ঠে সে প্রার্থনা জানায়,—

> হে বিধাতা, আমারে রেখোনা বাক্যহীনা
> রক্তে মোর জাগে রুদ্রবীণা।

ভরিয়া জীবনের সর্বোত্তম মুহূর্তের পরে
জীবনের সর্বোত্তম বাণী যেন ঝরে
কণ্ঠহতে
নির্ধারিত স্রোতে।

এই নারীর হৃদয়-জেনা পুরুষ তাহাকে ভালোরূপেই জানে। সে তাহার কাছে মধুর শুশ্রূষা প্রার্থনা করে না। শুধু তাহার আপন আত্মা হইতে সর্ব গ্লানি, সকল কুশ্রীতা, সকল অবসাদ ধুইয়া মুছিয়া লইবার আকাঙ্ক্ষা জানায়। তাহাদের দুজনার বিরাট আত্মদানে চিরসত্য জাগ্রত হইয়া দেখা দেয়।

এই নারী তাহার আপন জীবন-সাথীকে চিনিয়া লইতে পারে। মিথ্যার মরীচিকা তাহার চোখ ভোলায় না। যে-মানুষ জনতার ছায়ায় আপনার ছায়া মিশাইয়া ফেলে, সে তাহাকে আকাঙ্ক্ষা করে না। সমস্ত পৃথিবীর অবজ্ঞাকে সে হাস্যভারে উপেক্ষা করে। দুর্বলের প্রেমকে সে ঘৃণা করে। সে তাহার বিরাট-নারীত্বের ঠিকানা জানে।

নারী সে-যে মহেন্দ্রের দান,
এসেছে ধরিত্রীতলে পুরুষেরে সঁপিতে সম্মান।

(৭) নারীর রূপঃ—

নিম্নের এই কবিতাগুলিতে কবি নারীচরিত্রের নানারূপের ব্যঞ্জনা করিয়াছেন, কবিতাগুলিতে কয়েকটি মাত্র কথার সমাবেশে কবি আমাদের সামনে এক একখানি পূর্ণ-চরিত্র প্রকাশ করিয়াছেন। এ-যেন চৈনিক চিত্রকর। তুলির মাত্র দুই চারিটি বলিষ্ঠ রেখাপাতে পর্দার উপরে এক একখানি পূর্ণ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। রেখা ও রঙের বাহুল্যহীনতায় ছবিগুলি আরও উজ্জ্বল, আরও দীপ্ত। নারীচরিত্রের বিভিন্ন অভিব্যক্তি এই চরিত্রগুলিতে সমাবেশ করা হইয়াছে। প্রত্যেকটি চরিত্র আপন মহিমায় আপনি মহীয়সী। দু'একটি কথায় কবি নিখুঁতভাবে তাহাদের প্রাণধর্মের বর্ণনা করিয়াছেন:

সহজ সরল গ্রামালক্ষ্মীর চিত্র শ্যামলী,—
সে যেন গ্রামের নদী
বহে নিরবধি
মৃদু মন্দ কলকলে।

শান্ত দাক্ষিণ্যের মূর্তিমতী কমলা এই কাজরী,—
প্রচ্ছন্ন দাক্ষিণ্যভারে চিত্ত তার নত
স্তম্ভিত মেঘের মতো
তৃষ্ণাহরা
আষাঢ়ের আত্মদান প্রত্যাশায় ভরা।

হেঁয়ালী নাম্নী নারী একখানি অপরূপ বৈপরীত্যের প্রতিমূর্তি,—

আপনার নির্দয়-লীলায়
আপনি সে ব্যথা পায়,
দূরে যে গিয়েছে তারে ফিরায়ে ডাকিতে কাঁদে প্রাণ;
আপনার অভিমানে করে খান্‌খান্।

হেঁয়ালী অহেতুক উৎসুকতার ছবি,—
সুদূরের বেদনায়
অতীতের অশ্রুবাষ্প হৃদয়ে ঘনায়।

কাকলী চলমান নৃত্যপরা প্রাণবতীর চিত্র,—
কলছন্দে পূর্ণতায় প্রাণ—
নিত্য বহমান
ভাষার কল্লোলে
জাগাইয়া তোলে চারি ধারে
প্রত্যহের জড়তারে।

ইহা যেন Wordsworthএর

"And yet a spirit still, and bright
With something of an angle light."
(Lucy Poems)

পিয়ালী একখানি সুস্নিগ্ধ মমতার ছবি,—
নিঃশব্দে খুলিয়া দ্বার
অঞ্চলে আড়াল করি সে যেন কাহার
আনিয়াছে সৌভাগ্যের থালি।

দিয়ালীর দৃষ্টি মেলে একাকীত্বের নিবিড়তায়,—
জনতার মাঝে
দেখিতে পাইনে তারে থাকে তুচ্ছ কাজে।

ব্যঙ্গসুনিপুণা, বুদ্ধিদীপ্তা প্রসাধনসাধনা নারী এই নগরী
জ্যোৎস্নার মতন
গোপনেও নহে সে গোপন।

তারপর সত্য ও দৃঢ়তার জ্বলন্ত নারীমূর্তি জয়তী, স্বর্গ-ভ্রষ্টা, পথভোলা, কুণ্ঠিতা এই ঝামরী, ইন্দ্রধনুকল্পনা অগভীর-চিত্তা রমণী মল্লিকা ও অন্তহীন প্রসন্নতাময়ী এই মালিনী—
—Wordsworth যাহাকে বলিয়াছেন,

"The vital feeling of delight
Shall rear her to stately height,
Her virgin bosom swell."
(Education of Nature).

কবি তাহার চরিত্রদের নামকরণের মধ্যে তাহাদের সবকথাই কহিয়া দিয়াছেন।

(৮) **বিরহ প্রেমঃ**—গ্রন্থখানির শেষভাগে একাকী, পুরাতন, ছায়া, বাসরঘর, বিদায় ইত্যাদি কবিতাগুচ্ছে কবি বিরহের গীতি গাহিয়াছেন। এই বিরহে বিচ্ছেদ নাই, দুঃখ নাই, হৃদয়-থাক্-করা দীর্ঘশ্বাসে অন্তর খালি হইয়া যায় না। প্রেমালোকিত অন্তরে যতোটুকু অন্ধকার থাকে, তাহাও বিরহের জ্যোতিতে উজ্জ্বল হইয়া ওঠে। এই বিরহের একাকীত্বে প্রেমিক-চিত্ত সর্বহারা হইয়া যায় না। সেই বিরাট একাকীত্বের মাঝে দুইটি পরিপূর্ণ হিয়া এক হইয়া যায়। বাহিরের ম্লানতা সে প্রেমকে স্পর্শ করিতে পারে না, এই বিরহে সুদূরের পথ দিয়া নিকটকে লাভ সত্য হইয়া ওঠে। বিরহের শুভ্রতায় প্রেম নূতন রূপ লাভ করে। তাই বিরহিণী বলে,

গভীর বিচ্ছেদ আজি ভরিয়াছে অসীম ক্ষমায়,
আজি আমি নবতর বধূ।

এ বিরহে মিলন বাহিরে মিথ্যা হইয়া অন্তরে সত্য হইয়া ওঠে। বিরহ-মিলনের এই ক্ষীণ-আভাস আমরা 'বলাকা'র কবিতায় দেখিতে পাই। কবি সেখানে সম্পূর্ণ হইয়া উঠিতে পারেন নাই। সেখানে তিনি যেন অন্ধকারের মধ্যে পথ খুঁজিয়া

(শেষাংশ ৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ঘূর্ণাবর্ত্ত

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীমতী অমিয়া সেন

(৭)

সেইদিন রাত্রেই কমল বাড়ী আসিল, ইষ্টারের ছুটি।

আসিয়াই কোথাও অরুণাকে না দেখিয়া মহালক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিল, দিদি কোথায়?

মহালক্ষ্মীর মন সেই হইতেই ভাল ছিল না। কমলকে দেখিয়া বহুক্ষণ আগের শোনা সেই নিদারুণ নির্লজ্জ মিথ্যাটা তার মনটাকে আবার নিপীড়িত করিয়া তুলিল।

গম্ভীর মুখে কহিলেন, অসুখ করেছে, শোবার ঘরে শুয়ে আছে।

—অসুখ করেছে? দিদির অসুখ?

খাবারের থালাটা একপাশে ঠেলিয়া রাখিয়া চায়ের কাপটা হাতে লইয়া কমল অরুণার ঘরের দিকে ছুটিল।

—দিদি।

অরুণা শিহরিয়া উঠিল। এই ছেলে, বালকের মত সরল শিশুর মত নিষ্পাপ, এর নামে—তার নামে,—ছিঃ ছিঃ কি বিশ্রী—কি ভয়ংকর!

কমল আসিয়া বিছানার পাশে বসিল, কহিল, তোমার কি হয়েছে দিদি?

—কিছু না।

—কিছু না, মানে? শুয়ে রয়েছ কেন তবে?

—এমনি।

—কখনও এমনি নয়। মাথা ধরেছে? টিপে দেব?

—না কমল, আমাকে বিরক্ত কর না। এখান থেকে যাও।

—তুমি ত চা খেলে না দিদি, আনব?

অরুণা ভয়ানক বিরক্ত হইয়া উঠিল—কিছুরই দরকার নেই আমার এখন, তুমি শুধু যাও এখান থেকে!

—অসুখ হলে বুঝি তুমি সবাইকে অমনি করে তাড়াও। আগে তুমি কিছু খাও, তারপর আমি যাব।

—বলেছিই ত—অরুণা একেবারে ঝাঁজিয়া উঠিল, বলেছিই ত কিছু খাব না, তবু তোমার কানে যায় না? যাও এখান থেকে—

অরুণা আজ সর্ব্বান্তঃকরণে কমলকে এড়াইয়া চলিতে চায়। উঃ তার জীবনব্যাপী শুভ্রতা, নামের নির্ম্মলতা আজ এই এক ফোঁটা ছেলের জন্য ডুবিতে বসিয়াছে! হ'ক তা মিথ্যা, কিন্তু এ কালির দাগ অরুণা মুছিয়া ফেলিবে কি দিয়া?

একের মনের মিথ্যা যে আজ সমস্ত [illegible] স্পর্শ করিয়াছে। যে বলিয়াছে, সে-ই শুধু জানে এ-কথা মিথ্যা। কিন্তু আর কেহ ত তা জানিবে না, বুঝিবে না। সত্যের বুকে চাপিয়া গড়িয়া উঠিবে মিথ্যার সৌধ। অরুণার ভীরু মন প্রতিবাদের ক্ষমতা রাখে না, আতঙ্কেই বিহ্বল। এমন ধমক সে কমলকে কোন দিন দেয় নাই। নিজের কানেই তার কথাটা অত্যন্ত রূঢ় শোনাইল। কমলের পরিশ্রান্ত মুখ মলিন হইতে মলিনতর হইয়া আসিল। আস্তে আস্তে সে অরুণার শয্যা-পার্শ্ব হইতে উঠিয়া নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেল। কাপ শুদ্ধ অ-পীত চা সেইখানেই জুড়াইয়া জল হইয়া গেল।

সেইদিকে চাহিয়া অরুণার মনটা সহসা বেদনার্ত্ত হইয়া উঠিল, আহা বেচারী, কতদূর হইতে এইমাত্র আসিয়াছে। চা-টাও খাওয়া হইল না। অরুণার একবার ইচ্ছা হইল, ডাক দেয়, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই ভাবিল, না থাক, দরকার নাই। পিতৃ-মাতৃহারা ছেলে, ভাই পাঠাইয়াছে তাহার নিকট। তাই সে কমলের দিকে একটু দৃষ্টি দিত। কমলের সুবিধা অসুবিধাটা বিশেষ করিয়া দেখিত। তের বছর বয়সে অরুণার নিকট আসিয়াছিল, আজ কমল বড় হইয়াছে, কথা বলিতে শিখিয়াছে। কিন্তু সেদিন কমল ছিল শিশুর মত ভীরু আর মূক। যখন তখন দাদার জন্য চোখ ছল ছল করিয়া উঠিত। সেদিনকার সেই অসহায় করুণ মুখ আজ পাঁচ বছর পরে অরুণার মনে নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিল!

করুণা বলিয়াছিল, অরু, ওকে একটু দেখিস, বড় অভিমানী—বড় লাজুক।

সেই দেখার অর্থ কি হয় আজকাল এই অপবাদ? অরুণার সমস্ত অন্তর অসহ্য ব্যথায় টন্ টন্ করিতে লাগিল। একান্ত অসহায় নির্ভরশীল দুটি চোখ মিহিরের নিষ্প্রাণ প্রতিরূপের পায়ে ধাক্কা খাইয়া থামিয়া চাহিল। চারিপাশের নির্জ্জন পরিবেশ শূন্য ঘর, ততোধিক শূন্য নিজের অন্তরের দিকে চাহিয়া আজ আর অরুণা কিছুতেই নিজেকে সামলাইয়া রাখিতে পারিতেছিল না।—জীবনে অনেক সহিয়াছি, অনেক দুঃখ হেলায় জয় করিয়াছি। কিন্তু এ পাথার আর আমার পার হইবার ক্ষমতা নাই স্বামি! এ আমি কি করিয়া ভুলি? সব ত আজ তোমার জন্য—এত দুঃখ কেন তুমি আমাকে দিতেছ? এ কি জন্মান্তরের শত্রুতা শোধ! উঃ—এত লাঞ্ছনা—এত যন্ত্রণা সকল কিছুর মূলেই মাত্র তুমি। এ দুঃখ এত লজ্জা দেওয়ার জন্য কি তুমি আমাকে এই ঘরে আনিয়াছিলে! জানি, ওগো, জানি আমি, কত ভাল তুমি আমাকে বাস, কিন্তু তোমার সে ভালবাসা আজ আমার নামের শুভ্রতাকে রক্ষা করিতে পারিল কই? জীবনে আর কিছুই চাহি নাই, চাহিয়াছিলাম মাত্র তোমাকে। তার বিনিময়েই কি ভগবান দিলেন এই পুরস্কার!

অরুণা প্রাণপণ চেষ্টায় দুরন্ত কান্নার গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বুকের ভিতর হইতে একটা অসহ্য যন্ত্রণা শব্দরূপ ধরিয়া বাহিরে আসিবার জন্য গলার কাছে চাপিয়া দাঁড়াইল। অরুণা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

পাশের ঘরে কমল সে ব্যথা-কাতর কণ্ঠ শুনিতে পাইল। অভিমান টিকিল না, ছুটিয়া আসিয়া কহিল, দিদি—দিদি, খুব কি কষ্ট হচ্ছে?

অরুণা কাঁদিয়া কহিল, না কমল, না, তুমি যাও।

কমল ক্ষেপিয়া উঠিল, কোথায় যাব! কেন যাব? কেন তুমি খালি যাও যাও করছ?

হায় রে অবোধ, এ এখনও জানে না, কেহ কানের কাছে না বলিলে কিছু জানিবেও না। এর স্নেহের দাবী এ পূর্ণ মাত্রায়ই আদায় করিতে চাহিবে। কিন্তু জানিবে না, দিদির

স্নেহের নদীতে ভাঁটার টান লাগিয়াছে। পুরুষের মন যেখানে মমতার স্পর্শ পাইবে, যত্নের আস্বাদ পাইবে, সেখান হইতে শত প্রতিবন্ধকেও সহজে ফিরিতে চায় না। কিন্তু নারী মন ভীরু, নারী মন দুর্ব্বল, সংসার তথা সমাজের সামান্য সংস্কার-বৈষম্য ঘটিলেই সে আতঙ্কে বিহ্বল হইয়া পড়িবে। এতদিন যে যত্নে, যে স্নেহে, সে কমলকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল, এখন সে তাহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিবে কি বলিয়া? এ পাগল কিশোরের উন্মুখ চিত্তকে সে কি বলিয়া দূরে ঠেলিয়া দিবে? কেমন করিয়া বলিবে, কমল আর তুমি আমার কাছে কিছু আশা করিও না।

অনেকক্ষণ পরে ক্লিষ্টস্বরে কহিল, কমল, আমার মাথা ধরা কমেছে। ঐ টেবিলের উপর থেকে আমার পেনটা আর রাইটিং প্যাডটি আমাকে দিয়ে যাও। একখানা চিঠি লিখব।

এখন তোমার চিঠি লিখে দরকার নেই। মাথা ধরা বাড়বে। চিঠি কাল লিখ।

অরুণা বিরক্ত হইয়া উঠিল। সবটাতেই বাড়াবাড়ি কর না কমল, যা বলছি তাই শোন।

না শুনব না। এখন তুমি ঘুমাও।

অরুণা অবসন্ন হইয়া উঠিল। এ ছেলের সঙ্গে সে পারিয়া উঠিবে কি করিয়া, এ কি অদ্ভুত দাবীর সুর-এর প্রত্যেকটি কথার অন্তরালে; একে পর বলিয়া দূরে ঠেলিয়া দিবার শক্তি কই অরুণার?

ধীরে ধীরে অরুণা চোখ বুজিল, চোখের কোণ বাহিয়া দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। কমল মাথায় বাতাস দিতে লাগিল।

(৮)

অরুণার চিঠিতে গত ঘটনা সব জানিয়া মিহির লিখিল, মিথ্যা দুর্ণামকে ভয় করার কিছু নেই। ওকে সাহসের সঙ্গে উপেক্ষা করাই ভাল। তোমার আমি আছি। আমাকে মনে করেও কি বুক বাঁধতে পারছ না? তোমার মনটা খুবই ধাক্কা খেয়েছে বুঝতে পারছি। কিছুদিন এখন ওখান থেকে অন্যত্র যাওয়াই তোমার ভাল। তোমার দিদি ত তোমাকে অনেক দিন থেকেই দেখতে চান, তুমি না হয় কিছুদিন সেখানেই গিয়ে থাক।

অরুণা ভাবিয়া দেখিল, যুক্তিটা মন্দ নয়। মনটা তার সত্যই বড় মুসড়াইয়া পড়িয়াছে। ঐ বিশ্রী কথাটার পর হইতে কমলও যেন বড় বেশী করিয়া তার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। অরুণার করুণ মুখ তার তরুণ হৃদয়ে একটি নূতন বেদনা সৃষ্টি করিয়াছিল, এ বেদনা একান্ত প্রিয়জনের অন্তরের গোপন দুঃখ না জানার বেদনা। সেই অজানা দুঃখ দূর করিতে না পারার নিরুপায় ক্ষুব্ধ বেদনা।

এই বেদনাই আজকাল কমলকে অরুণার কাছে টানিয়া আনিত বেশী করিয়া।

মিহিরের চিঠি পাইয়াই অরুণা তার বড়দি বরুণার কাছে কৃষ্ণনগর যাওয়া ঠিক করিয়া ফেলিল।

কমলকে পূর্ব্বে কিছু জানাইল না, মনে আশঙ্কা ছিল পুরামাত্রায়, সে জানিতে পারিলে নিশ্চয়ই বাধা দিবে—রাগে অভিমানে অনর্থ বাধাইবে। এ সংসারে তার যে দিদি ছাড়া পরিচিত কেহ নাই। দিদি চলিয়া গেলে সে এখানে কেমন করিয়া থাকিবে।

অরুণার চিঠি পাইয়া বরুণার স্বামী হেমনাথ অরুণাকে নিতে আসিলেন।

মহালক্ষ্মী আপত্তি করিলেন না, অকারণেই অরুণার শরীরটা বড় ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। কিছুদিন অন্যত্র থাকিয়া যদি সুস্থ হইয়া আসিতে পারে আসুক।

কমল ছিল টাউনে, সে জানিতেও পারিল না। একদিন ধূসর গোধূলিতে অরুণা গোপনে চোখের জল মুছিয়া নদী-মেখলা বনানী ঘেরা গ্রাম ছাড়িয়া ষ্টীমারে উঠিয়া বসিল। অরুণার শ্বশুরালয় ছিল খুলনা জেলার অন্তঃপাতী এক গ্রামে।

* * * * *

কৃষ্ণনগরে আসিয়া অরুণা কয়েকদিন অত্যন্ত অস্বস্তির মধ্যে কাটাইল। ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবলই মনে জাগিতে লাগিল, কমলের কথা। বাড়ী আসিয়া সে যখন দেখিবে, দিদি নাই,—ইস্! অরুণার বুকের মধ্যে একটি অপরাধ-কুণ্ঠিত ব্যথা পাক্ খাইয়া উঠে।

কি ভাবিবে সে অরুণাকে! ভাবিবে না কি দিদি এমনভাবে না জানাইয়া চলিয়া গেল, ইস্ দিদি কি নিষ্ঠুর। সামনে তার ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা। এখন যদি সে এই নিয়া মাথা অস্থির করে, পাশ করিবে কি করিয়া? ব্যথার উপর অরুণার মনে নূতন চিন্তা আসিয়া জুটিল।

কয়েকদিন পরে কমলের এক চিঠি আসিল, দীর্ঘ চিঠি—অনেক রাগ অভিমানের ঝড় বহাইয়া সর্ব্বশেষে লিখিয়াছে, সে পরীক্ষা দিবে না।

অরুণা শঙ্কিত হইয়া মিষ্টি করুণ ভাষায় তাহাকে এ সঙ্কল্প ত্যাগ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র দিল।

এখানে আসিয়া একটি যুবকের সঙ্গে অরুণার আলাপ হইয়াছিল, যুবকের নাম জ্যোতি চৌধুরী। বছর বাইশ বয়েস। অরুণারই সম বয়সী। এম-এ পড়িতেছিল, হঠাৎ একমাত্র অভিভাবক ও অবলম্বন বড় ভাইর মৃত্যু হওয়ায় পড়া ছাড়িয়া চাকুরীর চেষ্টায় গলদঘর্ম্ম হইয়া ঘুরিতেছে।

অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। তার উপর এই আকস্মিক বিপদ তাহাকে একেবারে বিপর্যস্ত-বুদ্ধি করিয়া তুলিয়াছে।

বিধবা বৌদি মঞ্জরীর জীবনের একটা পন্থা করিয়া দিবার জন্য তাহাকে বোর্ডিং-এ রাখিয়া পড়াইতে হইতেছে। ৪।৫টা টিউশনি মাত্র অবলম্বন। ইহার উপর সে মাঝে মাঝে সাময়িক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়াও কিছু কিছু পায়। উদয়াস্ত পরিশ্রম। শ্যামবর্ণ তরুণ। সংসারের পেষণ-যন্ত্রের চাপে দেহমন অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

বরুণা অনেকদিন হইতেই জ্যোতিকে চিনিতেন। জ্যোতির বর্ত্তমান দুরবস্থায় তার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন একমাত্র তিনিই। সেই সূত্রে অরুণার সহিতও জ্যোতির পরিচয়। সামান্য আলাপেই সে নিজের জীবনের

দুঃখ-ম্লান ইতিহাস খুলিয়া বসিল তার কাছে। শুনিয়া অরুণা ভাবিল, আহা!

একদিন বিকালে জ্যোতি আসিলে বলিল, জ্যোতিবাবু চলুন, আপনার বৌদিকে একদিন দেখে আসি।

জ্যোতি সানন্দে রাজী হইল।

পরদিন ছিল রবিবার।

হেমনাথের মোটর নিয়া সকালেই দুজনে বাহির হইয়া পড়িল, কলিকাতার দিকে।

মঞ্জরী স্নান করিয়া চুপ চাপ ঘরের মধ্যে বসিয়াছিল, কোলের উপর শিথিল হাতে মেলিয়া রাখা গীতা, কিন্তু তাহাতে যে তার এক বিন্দু মন ছিল না, তা তার মুখের দিকে চাহিলেই টের পাওয়া যাইত।

জ্যোতিকে দেখিয়া হঠাৎ যেন অকূলে কূল পাইল, আগ্রহে কহিল, এস ভাই।

জ্যোতির পিছনে অরুণাও আসিয়া ঘরে ঢুকিল, মঞ্জরী ঈষৎ সঙ্কুচিত হইয়া স-প্রশ্ন [illegible] জ্যোতির মুখপানে চাহিল, জ্যোতি কহিল, যাঁর কথা [illegible] এসে তোমার কাছে বলে গিয়েছিলাম, ইনি সেই অরুণা চৌধুরী।

মঞ্জরী দুইখানা চেয়ার দুইজনার দিকে আগাইয়া দিয়া কহিল, বসুন আপনারা।

বসিয়া পড়িয়া জ্যোতি কহিল, তোমার কি কোন অসুখ করেছে বৌদি?

মঞ্জরীর চোখ ছল ছল হইয়া আসিল, যেন মাটির দিকে চাহিয়া আস্তে আস্তে কহিল, না।

—তবে কি হয়েছে?

—অনেক কথা, কাল একবার এস।

অরুণা একটু লজ্জা পাইল যেন, সে আসিলে যে এমন একটা কুণ্ঠিত আবহাওয়ার সৃষ্টি হইবে, তা সে বুঝিতে পারে নাই। মৃদু হাসিয়া কহিল, আমি এসে তা হলে একটা বেঘোর সৃষ্টি করলাম?

মঞ্জরী ত্রস্ত হইয়া কহিল, না-না, সেকি কথা ভাই, এসেছ তুমি বয়সে আমার চেয়ে ছোটই হবে, তোমাকে তুমিই বললাম, রাগ করনা এসেছ, বড় সুখী হয়েছি। এখানে ত পড়ে আছি নির্ব্বাসিতার মত। আত্মীয়-বন্ধু কারও মুখই দেখার উপায় নেই।

জ্যোতি কহিল, তোমরা গল্প কর, আমি একটু ঘুরে আসি, বলিয়াই বাহির হইয়া গেল।

মঞ্জরী আসিয়া অরুণার কাছে বসিল, কহিল, কতদিন [illegible] তোমার বিয়ে হয়েছে ভাই?

—পাঁচ বছর।

—পাঁচ বছর? ছেলেপুলে কিছু?

লজ্জিত হাসিয়া অরুণা কহিল, না।

—বেশ আছ, বর কি করেন?

—চাকরী।

মঞ্জরীর শুভ্রবেশ অরুণাকে বড় পীড়া দিতেছিল, এত রূপ চাওয়া যায় না যেন, এমন সুন্দর ফুলটিকে ভগবান কিসের জন্য এমনভাবে ভাগ্যচক্রের চাপে দলিত পিষ্ট করিয়া সংসারের আবর্জ্জনার স্তূপে ফেলিয়া দিলেন? সংসারে আজ আর এ নারীর কোন মূল্য নাই—গৌরব নাই।

মঞ্জরী হাসিয়া কহিল, ওকি, চুপ-চাপ হঠাৎ কি ভাবতে সুরু করলে?

অরুণা ব্যথিত হাসিয়া কহিল, কিছু না, আচ্ছা দিদি, তোমার বিয়ে হয়েছে ক'বছর?

মঞ্জরীর মুখের হাসি ব্যথার দৈন্যে রূপায়িত হইয়া উঠিল। একটু কাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, বেশী দিন নয়। গরীবের ঘরে বিধবা মার ঘাড়ের বোঝা হয়ে ছিলাম, রূপো না দিলে শুধু রূপ দেখে কে একুশ-বাইশ বছরের ধাড়ী মেয়েকে বিয়ে করবে? তার ওপর শিখিনি লেখাপড়া। এমন সময়ে কোথা থেকে উনি এলেন দেবদূতের মত, তাঁর দয়ার বন্যায় আমার সব দোষ গুণ হয়ে ধরা দিল। দেড় বছর হয় আমাদের বিয়ে হয়েছিল।

—মাত্র দেড় বছর?

—হ্যাঁ, মাত্র দেড় বছর। কিন্তু আমাদের মধ্যে জানা ও চেনার কিছু বাকী ছিল না, সেদিক দিয়ে আমার কোন ক্ষোভ নেই। আমি শুধু দুহাত ভরে নেই-ইনি, দিয়েছিও নিজেকে নিঃশেষ করে। কিন্তু—

মঞ্জরীর দুই চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া কয়েক ফোঁটা জল অরুণার হাতের উপর ঝরিয়া পড়িল, রুদ্ধস্বরে কহিল, কিন্তু উনি ত কোনদিন, একদিনের তরেও আমাকে না দেখে থাকতে পারতেন না, তাই এখন ভাবি, কি করে আমাকে একলা ফেলে উনি এমনভাবে ভুলে আছেন?

—ইস্ এ কি অসহ্য ব্যথা, দুর্নিবার দুঃখ! অরুণার চোখেও জল আসিয়াছিল সে নতমুখে চুপ করিয়া রহিল।

মঞ্জরী চোখ মুছিয়া বলিয়া চলিল, চারিদিক দিয়ে বড় অসহায় বড় একলা ফেলে হঠাৎ পালিয়ে গেলেন। একটা মুখের কথা জিজ্ঞেস করবার সুযোগ পেলাম না। সংসার যে কি ভয়ানক ঠাঁই, ওঁর বুকের আওতায় থেকে এতদিন তা বুঝতে পারিনি। যখন বুঝলাম, তখন তিনি পাশে নেই, কার কাছে আমি পথ শুধাই?

অরুণা করুণস্বরে ডাকিল, দিদি!

শ্রান্তস্বরে মঞ্জরী কহিল, জান অরুণা, আমার হিতৈষী আত্মীয়েরা চায়, আবার আমাকে বিয়ে দিতে। বিধবা হলেও যে প্রিয়কে আমি হারাইনি, ওরা ভুলিয়ে দিতে চায় আমার সেই প্রিয়তম স্বামীর স্মৃতিটুকু। অরুণা—অরুণা তুমি বুঝবে না, তুমি জান না কি ভয়ানক এই পৃথিবীর লোক-গুলো, এরা বড় নিষ্ঠুর বড় ভয়ানক। উঃ এরা বলে, ওঁকে ভুলে যেতে। বলে, দুদিনের সাথী, তার স্মৃতি কেন চিরদিন বোঝার মত বয়ে বেড়াবে, কি লাভ! উঃ—

মঞ্জরী ঝর্ ঝর্ ধারে কাঁদিয়া ফেলিল।

অরুণার চোখের সিক্ততা বিস্ময়ের চাপে দূর হইয়া গেল, বিস্ফারিত চোখে চাহিয়া কহিল, এই রকম বলে তোমার বন্ধুরা?
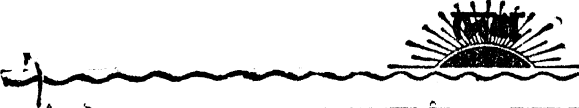
—হ্যাঁ ভাই বলে, আরও কত বলে, সে সব আর কি শুনবে। আমার দুর্গত জীবনের এ লাঞ্ছিত ইতিহাস, এ শুধু আমার মনেই থাক। এ নিয়ে অন্যের মনে ব্যথা জাগিয়ে কোন লাভ নেই।

অরুণা উত্তেজিত হইয়া উঠিল, না দিদি, তোমাকে বলতে হবে, আমি শুনব। আমি শুনব, মানুষ কতখানি নিষ্ঠুর, কতখানি ক্রূর, কতখানি মিথ্যাবাদী হতে পারে।

অরুণার চোখে জল টলমল করিতেছিল।

হৃদয় সাগরের স্বচ্ছ জলে একখানা অতি পরিচিত অতি স্নেহের মুখ ঝক্ ঝক্ করিয়া প্রতিবিম্বিত হইতেছিল। কমল—কমল—সোনার কমল, তার উপরেও ত মানুষের এমনি অবিচারই অরুণাকে নিষ্ঠুর হইতে বাধ্য করিয়াছে। সেকথা অরুণা ভুলিবে কি করিয়া?

মঞ্জরী কহিল, ঠাকুরপোর অনেক বন্ধুরা এসে আমাকে শাসিয়ে গেছে, আমি নাকি ঠাকুরপোর জীবনের দুর্বহ বোঝা, তার জীবনটাকে ঘন নিরাশার আবর্তে ফেলে নষ্ট করে দিচ্ছি। কিন্তু আমি ত কোন কাউকে আটকে রাখতে চাইনি। ওঁর অতি স্নেহের ভাই এই জ্যোতি আমিও ত কম ভালবাসিনে! যারা এসে আমাকে শাসিয়ে গেছে, তাদের চেয়ে কি ওর ওপরে আমার দাবীই কম? কিন্তু দাবী আমি করতে যাইনি, ঠাকুর-পো নিজের অন্তরের সহজ প্রেরণায়ই আমার সব ভার গ্রহণ করেছে। আমার জন্য খাটছে। একি আমার দোষ।

অরুণার মুখে চোখে বিদ্রোহ ঘনাইয়া আসিল, অসহিষ্ণু হইয়া কহিল, তুমি গ্রাহ্য কর না, মঞ্জুদি, ওদের কথা তুমি গ্রাহ্য কর না, ওরা মানুষ নয়, পশু—জানোয়ার।

মঞ্জরী চোখ মুছিয়া বড় দুঃখেও একটু হাসিল। কহিল, সংসার ত এখনও চেননি, তাই এ কথা বলছ। এই সব আত্মীয় বন্ধু নিয়েই ত আমাদের সমাজ। এদের অগ্রাহ্য করে কি এক পাও আমাদের চলবার উপায় আছে?

জ্যোতি আসিয়া পড়িল, হাসিয়া কহিল, কি গল্প হচ্ছে দুজনের? গয়নার ডিজাইন নয় নিশ্চয়ই—কারণ মঞ্জরীর দিকে হঠাৎ চোখ পড়ায় জ্যোতি অপ্রতিভ হইয়া থামিয়া গেল, অরুণা কহিল, ছিঃ জ্যোতিবাবু।

মঞ্জরী কহিল, গল্প যা হচ্ছিল, তাই শুনবার জন্য তোমাকে এখানে আসতে বলেছি ভাই।

জ্যোতি সপ্রশ্ন উৎসুক দৃষ্টিতে তার মুখপানে চাহিল।

কিন্তু বলার সময়ে মঞ্জরী কিছুই বলিল না, অরুণাই সব বলিল।

জ্যোতির অবসন্ন চোখ মুখ প্রখর ধৈর্যে দীপ্ত হইয়া উঠিল। শান্ত দৃঢ়স্বরে কহিল, দাদার নাম নিয়ে শপথ করে বলছি, জীবন থাকতে তোমার অসম্মান ঘটতে আমি দেব না।

মঞ্জরী ছল ছল চোখে চাহিয়া কহিল, তোমার বড় কষ্ট হয় ঠাকুর-পো, সবই বুঝি। কিন্তু তুমি ত কোন দিন বললে না, আমি পারছিনে বৌদি, তা যদি বলতে—

জ্যোতি গভীর দৃষ্টিতে মঞ্জরীর মুখপানে চাহিল। কহিল, দাদার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছি, যতদিন আমার এক-বিন্দু জীবনী শক্তি থাকবে, তোমাকে দেবীর মত মাথায় করে রাখব। তারপর? তারপর ভগবান। জ্যোতি বারেকের তরে উর্দ্ধপানে চাহিল ক্লান্ত জীবন হাঁকাইয়া চলিবার জন্য আজ যেন তার জীবনে পার্থ সারথির এটুকু করুণা সত্যই বড় দরকার।

(ক্রমশ)

রবীন্দ্রনাথের মহুয়ায় প্রেমের অভিব্যক্তি

(৪৪ পৃষ্ঠার পর)

খুঁজিয়া ফিরিতেছেন। তাই দ্বন্দ্বের অস্পষ্টতায় কবি বলেন,

"যে প্রেম সম্মুখপানে
চলিতে চালাতে নাহি জানে,
যে-প্রেম পথের মাঝে
পেতেছিলো নিজ সিংহাসন,
তার বিলাসের আভরণ
দিয়েছো তা ধূলিরে ফিরায়ে।" (বলাকা)

কিন্তু পরিণততর বয়সে বুদ্ধির পূর্ণতর আলোকে কবি সত্যের সন্ধান পাইলেন। তাহার পরিচয় আমরা পাই 'শেষের কবিতায়।'* তাই অমিত ও লাবণ্যের যখন বাহিরের মিলনের বাঁধা ছিন্ন হইয়া গেল, তখন প্রিয়বিরহিণী লাবণ্য অকম্প-কণ্ঠে জানাইল

সব-চেয়ে সত্য মোর, সেই মৃত্যুঞ্জয়
সে আমার প্রেম,
তারে আমি রাখিয়া এলেম,
অপরিবর্তন-অর্ঘ্য তোমার উদ্দেশে,
পরিবর্তনের স্রোতে আমি যাই ভেসে
কালের যাত্রায়,
হে বন্ধু! বিদায়?

বিরহের মাঝেই সে প্রেম সার্থক। মনের কল্পনায় প্রেমিক তাহার প্রেমিকার চিরসুন্দর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে। প্রকাশের দৈন্য তাহাকে পীড়িত করিতে পারে না। প্রত্যহের ম্লান-স্পর্শে সে-নৈবেদ্যের পুষ্প ভ্রষ্ট হইয়া যায় না। মনের গহনের যে-বাণী প্রিয়াকে বলা হইল না, সেই-হৃদয়ের সমস্ত অকথিত বাণী দিয়া সে প্রিয়ার গান রচনা করে। এই দুঃখের পরশেই প্রেম সুন্দর হইয়া ওঠে। বিচ্ছেদের হোমবহ্নিতে প্রেমে দুঃখের আলোতে উজ্জ্বল হইয়া দেখা দেয়। দুঃখই প্রেমের মুক্তি। বাহিরের বাঁধন ছিন্ন করিয়া এই বিরহ অন্তরে চিরমিলন আনিয়া দেয়!

শুধু সে মুক্তির ডালিখানি
ভরিয়া দিলাম আজি আমার মহৎ মৃত্যু আনি।*

* 'শেষের কবিতা'র কবিতাগুলি মহুয়ার অংশীভূত।

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় "বাঙলা সাহিত্য সমিতি"র সাধারণ সভায় পঠিত।

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের বিবৃতি

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিবৃতি দেনঃ--

বন্ধুগণ, কংগ্রেসের ত্রিপুরী অধিবেশনে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন সম্পর্কে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহা আপনারা অবগত আছেন। সে প্রস্তাবটি এইঃ—

"কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচন সম্পর্কে ও তাহার পরে নানারূপ বিতণ্ডার ফলে, দেশের ও কংগ্রেসের মধ্যে নানা-প্রকার ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হওয়ায় এবং কংগ্রেসের অবস্থা পরিষ্কার করিয়া বলিতে ও কংগ্রেসের নীতি ঘোষণা করিতে মহাত্মা গান্ধীর নির্দ্দেশ মত গত কয়েক বৎসর কংগ্রেসের কার্য্যতালিকা যে মূলগত নীতি ও কার্য্যক্রম অনুসারে অনুসারিত হইয়া আসিয়াছে, এই কমিটি তাহাতে গভীর আস্থা জ্ঞাপন করিতেছে। এবং দৃঢ়তার সহিত এই অভিমত ব্যক্ত করিতেছে যে, ঐ নীতি পরিহার না করিয়া ভবিষ্যতে কংগ্রেসের কার্য্যক্রম নির্দ্ধারণে উক্ত নীতিই অনুসরণ করা উচিত। গত বৎসরের কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির কার্য্যে এই কমিটি আস্থা জ্ঞাপন করিতেছে এবং উহার সদস্যের উপর দোষারোপ করায় দুঃখ প্রকাশ করিতেছে।

"আগামী বর্ষে সংকটজনক পরিস্থিতি উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় এবং ঐরূপ সংকটে মহাত্মা গান্ধীই কংগ্রেস ও দেশবাসীকে পরিচালিত করিতে সমর্থ বলিয়া তাঁহার অবিচলিত আস্থা কংগ্রেসের কার্য্য পরিচালকগণের লাভ করা একান্ত প্রয়োজন বলিয়া এই কমিটি মনে করে। সেজন্য এই কমিটি সভাপতিকে মহাত্মা গান্ধীর ইচ্ছানুযায়ী আগামী বৎসরের কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণকে মনোনীত করিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছে।"

ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত আমি নূতন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করিতে পারি নাই বলিয়া বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। ইহার জন্য আমার আয়ত্তের অতীত ঘটনাসমূহ দায়ী। আমি পীড়িত হইয়া পড়ায় মহাত্মা গান্ধীর নিকট যাইতে পারি নাই; সেইজন্য আমি তাঁহার নিকট চিঠি লিখিতে আরম্ভ করি। ইহা দ্বারা আমরা উভয়ে পরস্পরের মতামত সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারি; কিন্তু ইহা আমাদিগকে মীমাংসায় লইয়া যাইতে পারে নাই। যখন আমি উপলব্ধি করিলাম যে, পত্র আদান-প্রদান ব্যর্থ হইয়াছে, তখন আমি মহাত্মা গান্ধীর সহিত দিল্লীতে সাক্ষাৎ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করি; কিন্তু ঐ চেষ্টাও ব্যর্থ হয়।

মহাত্মাজীর কলিকাতায় আগমনের পর আমাদের মধ্যে দীর্ঘ কথোপকথন হইয়াছে; কিন্তু ইহা দ্বারা কোন মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায় নাই। মহাত্মাজী আমাকে এই উপদেশ দিয়াছেন যে, আমার নিজেরই পূর্ব্ববর্ত্তী ওয়ার্কিং কমিটির পদত্যাগকারী সদস্যদিগকে বাদ দিয়া নূতন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা উচিত। কয়েকটি কারণে আমি এই উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিতে পারি না। আমি উহাদের মধ্যে দুইটি প্রধান কারণ উল্লেখ করিতেছি। আমি নিজে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করিলে, পন্থজীর প্রস্তাবের নির্দ্দেশ অমান্য করা হইবে। পন্থজীর প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, গান্ধীজীর অভিপ্রায় অনুযায়ী ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হইবে এবং উহার উপর তাঁহার পূর্ণ আস্থা থাকিবে। আমি যদি পূর্ব্বোক্ত উপদেশ অনুযায়ী ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করি, তাহা হইলে আপনাদের নিকট বলিতে পারিব না যে, কমিটির উপর গান্ধীজীর পূর্ণ আস্থা আছে।

অধিকন্তু ভারতবর্ষে ও বিদেশে সংকট ঘনাইয়া আসিতেছে, কাজেই আমার দৃঢ় অভিমত এই যে, ওয়ার্কিং কমিটিতে যাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক কংগ্রেস সদস্য-গণের আস্থা থাকিতে পারে এবং যাহাতে ওয়ার্কিং কমিটিতে মোটামুটি সমস্ত দলভুক্ত কংগ্রেস সদস্যগণের মতামত প্রতি-ফলিত হইতে পারে, তজ্জন্য মিশ্র ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা আবশ্যক।

আমি মহাত্মা গান্ধীর উপদেশ গ্রহণ করিতে পারি নাই; কাজেই তাঁহাকে পুনরায় অনুরোধ করিতে বাধ্য হই যে, ত্রিপুরী কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাব দ্বারা তাঁহার উপর যে দায়িত্ব ন্যস্ত করা হইয়াছে, অনুগ্রহপূর্ব্বক ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনয়ন করিয়া তিনি সেই দায়িত্ব পালন করুন। আমি তাঁহাকে আরও বলি যে, তিনি যাঁহাদিগকেই ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনয়ন করুন না কেন, আমি তাঁহার সিদ্ধান্ত মানিয়া চলিব, কারণ আমি পন্থজীর প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় মহাত্মাজী ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনয়ন করিতে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করেন।

শেষ পন্থা হিসাবে আমি পূর্ব্বোক্ত সমস্যা মীমাংসা-কল্পে একটি আপোষ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করি। মহাত্মাজী আমাকে বলেন, আপোষ মীমাংসা সম্ভব কি না, তাহা দেখিবার জন্য আমার ও পূর্ব্ববর্ত্তী ওয়ার্কিং কমিটির বিশিষ্ট সদস্যগণের একযোগে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আমি তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হই এবং তদনুরূপ চেষ্টা করি। যদি আমা-দের পক্ষে কোথাও মীমাংসায় উপনীত হওয়া সম্ভব হইত, তবে আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত অনুমোদনের জন্য নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে দাখিল করিতাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কয়েক ঘণ্টা আলোচনা চালাইয়াও আমরা কোনও মীমাংসা করিতে পারি নাই। সুতরাং আমি গভীর দুঃখের সহিত আপনাদিগকে জানাইতেছি যে, আমি নূতন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণের নাম ঘোষণা করিতে অক্ষম।

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্মুখে যে সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, সেই সমস্যার সমাধানকল্পে আমি কি করিতে পারি, তাহাই আমি গভীরভাবে চিন্তা করিতেছিলাম। আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, এই সংকটকালে আমি সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকিলে, নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্যে হয়ত কোনওরূপ বাধার সৃষ্টি হইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি হয়ত এমন একটি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করিলেন, যেখানে

আমি নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারিব না। আমি আরও বুঝিতে পারিয়াছি যে, নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির একজন নূতন সভাপতি হইলে সম্ভবত, উহার পক্ষে এই ব্যাপারের মীমাংসা করা আরও সহজ হইবে। সুতরাং ধীরভাবে চিন্তা করিবার পর সম্পূর্ণরূপে সহযোগিতার মনোভাব লইয়া আমি আপনাদের হস্তে আমার পদত্যাগ-পত্র অর্পণ করিতেছি।

আমার সময় অত্যন্ত অল্প ছিল বলিয়া আমি এই সংক্ষিপ্ত বিবৃতি রচনা করিয়াছি। যাহা হউক, আমি আশা করি যে, বর্ত্তমানে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে এই সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দ্বারাই তাহা পরিষ্কারভাবে বোঝা যাইবে।"

চা-পানের পর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর সভানেত্রীত্বে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির পুনরায় অধিবেশন আরম্ভ হয়।

পণ্ডিত নেহরু রাষ্ট্রপতিকে পদত্যাগ-পত্র প্রত্যাহার করিতে ও ১৯৩৮ সালে যে ওয়ার্কিং কমিটি ছিল, তাহাকে নূতন করিয়া মনোনীত করিতে অনুরোধ করিয়া এক প্রস্তাব পেশ করেন।

মিঃ রফি আমেদ কিদোয়াই প্রস্তাবটি সমর্থন করেন।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্রের নিকট গান্ধীজীর পত্র

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর নিকট মহাত্মা গান্ধীর লিখিত পত্রের মর্ম্ম এই,—

"প্রিয় সুভাষ, পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব অনুযায়ী ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণের নাম দিবার জন্য তুমি আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলে। আমার পত্র ও টেলিগ্রামসমূহে আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম যে আমি নাম দিতে সম্পূর্ণ অক্ষম।

"ত্রিপুরীর পর অনেক কিছু ঘটিয়াছে। তোমার অভিমত জানিয়া এবং তোমার ও অধিকাংশ সদস্যের মধ্যে নীতিগত পার্থক্য কতদূর, তাহা জানিয়া আমার মনে হয় যে, আমি যদি তোমাকে নাম দিতাম, তাহা হইলে উহা তোমার উপর চাপাইয়া দেওয়া হইত। আমাদের মধ্যে তিন দিন ঘনিষ্ঠভাবে আলোচনার ফলেও এমন কিছু ঘটে নাই, যাহাতে আমার অভিমত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় তুমি তোমার ওয়ার্কিং কমিটি নিজ ইচ্ছামত মনোনীত করিতে পার। আমি তোমাকে ইহাও বলিয়াছি যে, পারস্পরিক সহযোগিতার সম্ভাবনা সম্বন্ধে তুমি ভূতপূর্ব্ব সদস্যগণের সহিত আলোচনা করিতে পার এবং তোমরা একটা মীমাংসা করিতে সক্ষম হইয়াছ জানিতে পারিলে আমি তাহাতে যতটা আনন্দিত হইব, এমন আর কিছুতে নহে। তাহার পর কি হইয়াছে, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সমক্ষে তুমি ও ভূতপূর্ব্ব যে সকল সদস্য উপস্থিত আছেন, তাঁহারা সমস্ত বিষয় স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিবেন। আমার সর্ব্বাপেক্ষা ইহাই দুঃখ যে, আপোষ মীমাংসা সম্ভবপর হইল না। তবে আমি আশা করি যে, যাহাই করা হউক, তাহা পারস্পরিক সদিচ্ছার সহিতই করা হইবে।"

কলিকাতায় নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতির অধিবেশন

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

সম্পর্কিত উক্তিতে উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি বলেন যে, ত্রিপুরী কংগ্রেসে মন্ত্রীরা মন্ত্রী হিসাবে কাজ করেন নাই, নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সভ্য হিসাবে কাজ করিয়াছেন।

শ্রীযুত দে'র সংশোধন প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হয় ও শ্রীযুত শঙ্কররাও দেওর প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। শ্রীযুত দে'র সংশোধন প্রস্তাবটি যখন ভোটে দেওয়া হয়, তখন দর্শকগণ উল্লসিত হইয়া উঠেন।

অতঃপর বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ দক্ষিণ আফ্রিকার কেনিয়া-প্রবাসী ভারতবাসীদের সম্পর্কে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন; উহা অল্প সময়ের মধ্যেই গৃহীত হইয়া যায়।

বাঙ্গলার ও পাঞ্জাবের রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির জন্য আন্দোলন চালাইবার আবশ্যকতা সম্পর্কে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ আর একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে গৃহীত হয়। সদস্যগণ ঐ প্রস্তাবে কোন উৎসাহ দেখান নাই; বন্দীদের মুক্তির জন্য একটা প্রস্তাব গ্রহণ করিতে হইবে, কেবল এই মনোভাব প্রকাশ পায়।

বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ বন্দীদের সম্পর্কিত প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়ার পূর্ব্বে শ্রীযুত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র সহসা মাইক্রোফোনের সম্মুখে যাইয়া বলেন,—হিন্দীভাষাবিরোধী আন্দোলন করিয়া মাদ্রাজে যাঁহারা জেলে গিয়াছেন, সেই বন্দীদের মুক্তির কথাও প্রস্তাবটিতে উল্লেখ করিতে পারি কি? উহাতে সভায় হাসির রোল পড়িয়া যায়।

বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের বন্দী মুক্তি সম্পর্কিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

বন্দী-মুক্তি সম্পর্কিত প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ার পর বে-সরকারী প্রস্তাবের আলোচনা হইবার কথা ছিল; কিন্তু পূর্ব্বে হইতে বুঝা গিয়াছিল যে, বে-সরকারী প্রস্তাবের আলোচনা এই অধিবেশনে হইবে না। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রস্তাব করেন যে, বে-সরকারী প্রস্তাবগুলির আলোচনা নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির আগামী অধিবেশন পর্য্যন্ত স্থগিত রাখা হউক। তাঁহার প্রস্তাব গৃহীত হয়; প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সদস্যগণ তাড়াহুড়া করিয়া উঠিয়া পড়েন, দর্শকগণও গ্যালারী হইতে নামিয়া পড়েন। এই তাড়াহুড়ার মধ্যে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অডিটার নিয়োগ করা হয়। সভার শেষে "বন্দেমাতরম্" যখন গীত হয়, তখন অনেকে [illegible] হইয়া পড়িয়াছেন, কেহ কেহ দলবদ্ধভাবে কথাবার্ত্তা বলিতে থাকেন। বস্তুতঃ এত তাড়াহুড়ার মধ্যে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন শেষ হইতে খুব কমই দেখা গিয়াছে।

বাসন্তী-উৎসব

(কাথিকা)

শ্রীগোবিন্দচরণ মুখোপাধ্যায় কাব্যপুরাণতীর্থ

ফাল্গুনী, সে ছিল আমার সহপাঠী বন্ধু। আমাদের ক্লাসে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ জন ছেলে থাকলেও কেন যে ওর সাথে আমার বন্ধুত্ব হয় তার একটু কারণ আছে। আমি প্রতি বৎসর প্রথম হয়ে ক্লাশে উঠ্‌তাম, কাজেই ভাল ছেলেদের আন্তরিক ঈর্ষার পাত্র হলেও অন্য ছেলেদের ভালবাসা কম পাইনি। তবুও মনে হয় ফাল্গুনীর ভালবাসা আমাকে আকৃষ্ট করেছিল খুব বেশী করেই।

ফাল্গুনী ছেলেটি ছিপ্‌ছিপে, দোহারা চেহারা—শ্যামবর্ণ, মাথায় আমার সমানই। ওর সুঠাম আর কমনীয় মুখখানিতে এমন একটি ভাব থাক্‌ত, দেখে মনে হত যেন, ওর মনে দুঃখের লেশ মাত্র নাই। এই সদাপ্রফুল্ল ছেলেটি পড়ার সময় প্রায়ই মনোযোগী থাক্‌ত না। অনেক সময় তাকিয়ে থাক্‌ত বাইরে; যেন দূরের পাহাড়ের গায়ে মেঘখণ্ডগুলোর সাথে ভেসে বেড়াচ্ছে পল্‌কা ডানা মেলে—খুশীর আনন্দে চঞ্চল। টিচার ক্লাশ থেকে বেরিয়ে গেলেই ও এমন একটা প্রশ্নের অবতারণা কর্‌ত—যাতে মনে হ'ত, ও তাই নিয়েই ছিল ব্যস্ত এতক্ষণ—পড়া-শুনা কিছুই শোনে নাই। কিন্তু এতেও ক্লাসের রোলে দুই থেকে চারের মধ্যেই ওর নাম পাওয়া যেত, ছেলেটি আমারি মত বিদেশী থাক্‌ত বোর্ডিং-এ।

কিছুদিনের মধ্যেই ক্লাসের ছেলেরা আবিষ্কার করে ফেল্‌লে ফাল্গুনীও কবিতা লেখে আমারই মত। কাজেই আমাদের পরস্পরের ইচ্ছাতেই দুজনের সম্বন্ধ ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে। ফাল্গুনীকে ভাল করে দেখ্‌বার বা বুঝবার অবকাশ পাইনি, তবুও ওকে যতটুকু জেনেছিলাম তাতে বুঝেছিলাম ওর ফাল্গুনী নামের সার্থকতা আছে ওর জীবন-যাত্রার পথেই।

পাহাড় থেকে মাইল দুই দূরে আমাদের ইস্কুল। আমরা বোর্ডিং-এ থাকি প্রায় দুশ ছাত্র; নিকটের ছাত্ররা বাড়ী থেকে যাতায়াত করে। আমরা রোজ সকালে উঠে হাতমুখ ধোয়া আর বেড়ান একেবারেই সেরে আসি। ইস্কুল থেকে পাহাড়ের বিপরীত দিকে প্রায় মাইলখানেক দূরে—ঘন শালবনের ধারে একটি বড় দীঘি। দীঘির আশেপাশে পলাশের বন। বড় বড় পাথর আর কাঁকরের উপর দিয়ে—শালবনের ভিতর দিয়ে আমাদের রাস্তা। অমরা পাথরের উপর দিয়ে পাহাড়ে উঠ্‌তে অভ্যস্ত ছিলাম—এতে বেশ আনন্দও পেতাম। ফাল্গুনে শালের বনে গাছে গাছে ফুলে ফুলে ভরে যায়। আস্‌বার পথে কতদিন শালের ফুল ভেঙে এনেছি। রক্ত-রাঙা পলাশের ফুলের ডাল ভেঙে তার সাথে তোড়া বেঁধেছি। আনন্দে প্রাণ নেচে উঠেছে। ছোট ছোট পাহাড়ী ছেলেমেয়েদের অবাধ বিচরণ, স্বভাবসুলভ বন্যভাব, সভ্যতার বিষাক্ত আবহাওয়া থেকে চিরমুক্ত নগ্নতা আমাদের মনে আদিম মানবের জীবনযাত্রার ছায়াপাত কর্‌ত। ওদের সাথে রোজই দেখা হয়। আমরা বোর্ডিংএর কয়েকজন ছাত্র অনেক চেষ্টা করে বেশ একটু আলাপ জমিয়ে নিয়েছিলাম।

দুপুরে ইস্কুল থেকে প্রায় সমান দূরে বনের অপর দিক দিয়ে—যেদিকে বড় রাস্তা চলে গিয়েছে—ঐ রাঙা মাটির পথ ধরে খানিকটা গিয়ে তারপর বড় একটা আম বাগানের ভিতর দিয়ে আমরা আর একটি দীঘিতে যেতাম স্নান করতে। দীঘির নির্ম্মল জলে স্নানের যে আনন্দ পেতাম—এই পাহাড়ে বন পথ দিয়ে হেঁটে যেতে তার চেয়ে কম আনন্দ পেতাম না। ফাল্গুনী কতদিন কালিদাসের মেঘদূতের—মেঘের পথ নির্দ্দেশ করেছে এইখানে; বনের পথে মেঘের মায়া ফাল্গুনীর মনে দিয়েছে দোলা, করেছে ওর মনকে লঘু—আকাশচারী।

বিকেলে এই স্নানের দীঘির পথ বেয়ে যেতাম বেড়াতে;—আম, জাম, জামরুল, কাঁঠাল, লিচু আর পেয়ারা গাছের বড় বাগানটা পড়্‌ত পথে দীঘির ঠিক উপরেই।

ওপরে শালের বন। বর্ষায় যখন জলে জলে ভরে উঠ্‌ত মাঠ, ঘাট আর দীঘির বুকে চল্‌ত নূতন জলের ঢেউ—তখন এই পাহাড়ে পথে হাঁট্‌তে একটুও কষ্ট হ'ত না। আমরা সবাই দল বেঁধে, হল্লা ক'রে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আওড়িয়ে সারা বন মুখরিত করে তুল্‌তাম। কোন কোন দিন গাছের তলায় ভাঙা মন্দিরের ধাপে বসে বা দীঘির পাড়ে বসে আমাদের মধ্যে কেউ বা বাঁশী বাজাত, আবার কেউবা গান গাইত অজস্র। তবে, যাদের তা ভাল লাগ্‌ত না তারা ভিন্ন ভিন্ন দিকে বেড়াতে চলে যেত। আমরা প্রায় পাঁচ ছয়জন একসঙ্গে থাক্‌তাম। ফাল্গুনী বাঁশী বাজাত চমৎকার, অন্তত আমার ত লাগ্‌ত খুব ভালই। গাইতে ওস্তাদ অজয় আর রমণী, সুবোধও কোন কোন দিন যোগ দিত। এক একদিন গানের আসর এমন জমে উঠ্‌ত যে, আকাশে চাঁদ উঠে যেত। ভয়ে ভয়ে চুপি চুপি বোর্ডিংএর পিছনদিক দিয়ে ফিরে এসে শান্ত ছেলের মত নিজেদের পড়ার জায়গায় বস্‌তাম। কারণ, বোর্ডিংএর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন ভয়ানক কড়া মেজাজের লোক। ঠিক সন্ধ্যার সময় বোর্ডিংএর ছেলেদের যে রোল কল হত সেই সময় একটু প্রার্থনা হত—গীতার একাদশ অধ্যায় অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন। প্রার্থনার সময় যে উপস্থিত না থাক্‌বে তাকে বিশ্বরূপ দর্শন কর্‌তে হবে—হয়, না খেয়ে উপবাস করে, না হয়, মিণ্টি মিণ্টি বুলি খেয়ে। কাজেই আমরা ঠিক সময়ে উপস্থিত হ'তে চেষ্টা কর্‌তাম পারত পক্ষে, অবশ্য সরস্বতী পূজা উপলক্ষে আমাদের ছাত্রদের যে প্রাইভেট থিয়েটার হ'ত তার মহল্লা চল্‌ত আগে থেকে শালবনের মধ্যে কোন একটু নিজ্জর্ন ফাঁকা জায়গায়—সেই সময়টা অন্ততঃ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মশায় কড়া নজর দিতেন না আমাদের উপর। নইলে, দীঘির নূতন জলে সাঁতার কাটতে গিয়ে আর বিকেল বেলা বেড়াতে গিয়ে দেরী ক'রে বকুনি খুব কম ছেলেই না খেয়েছে এক আধটু।

তারপর বলি এমনি করে সকাল বিকেল বেড়াবার ফাঁকে আমাদের কিশোর মনের উপর প্রকৃতির প্রভাব ক্রমে ক্রমে এত বেড়ে উঠেছিল যে, পাহাড় আর শালবন, দীঘি আর পাহাড়ের গা-বেয়ে নামা ঝরণা যেন কি এক অচ্ছেদ্য মায়ায় আমাদের অন্তরে স্বপ্নের ইন্দ্রজাল রচনা কর্‌ত।

ফাল্গুনী আর আমি এতটা অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম যে, আমরা অনেক দিন দল ছেড়ে গিয়ে একটি গাছের তলায় চুপ ক'রে বসে দেখ্‌তাম নীল পাহাড়ের উপর অস্তগামী সূর্য্য-রশ্মির বর্ণবৈচিত্র্য। ঝরণার কলকণ্ঠে আর পাখীর কাকলীতে অন্তরের তারে অনুভব কর্‌তোম সে কি এক অব্যক্ত ঝংকার আর পুলক। আস্‌বার পথে ভেঙে আনতাম আমের মঞ্জরী আর ফুলেভরা মাধবীর শাখা। ফাল্গুনী একটু বাঁশী বাজাত—বেশ মিষ্টি ওর বাঁশীর সুর; তারপর চুপচাপ। কি যেন আনন্দের স্রোত মনের মাঝে ঢেউ খেলে যেত। বহিঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য বিলাস—বর্ণে, গন্ধে আর গানে—উন্মাদ, উতলা করে তুল্‌ত আমাদের সবুজ হৃদয়কে।

আমাদেরই মত আর একজন—যে অলক্ষ্যে থেকে প্রকৃতির রূপসজ্জার সঙ্গে সঙ্গে বনের ফুল, ফল আর পাতায় নিজের রূপসজ্জা করে আমাদের এত আকৃষ্ট করে তুলেছিল তার কথাটুকু বল্‌লেই আমার কথারও শেষ হ'য়ে যায়। সে এক পাহাড়ী কিশোরী, সূর্য্য যখন অস্তাচলের পথে তখন সে নেমে আসে পাহাড়ের বুক বেয়ে—চকিত হরিণীর মত লঘু চটুল পদ-সঞ্চারে, কাঁকে কলসী নিয়ে—ঝরণার পথে। দূর থেকে দেখা যায়—ও থমকে দাঁড়ায় পলাশ বনে; কলসী নামিয়ে রেখে—লাল পলাশের ফুলের গোছা এলো খোঁপায় গুঁজে নেয়। মাধবীর একটি শীষ একটি কানে গুঁজে নেয়; আর একটি কানে পরে মুচকুন্দার ফুল—কোন দিন বা দুলের মত করে পরে শিরীষ ফুলের অবতংস। তারপর এঁকে-বেঁকে নাম্‌তে থাকে পাহাড়ের গা বেয়ে। ওর হলুদ রঙের কাপড়ে খেলা করতে থাকে সূর্য্যের আরক্তিম শেষরশ্মি। ওর সবল পরিপুষ্ট শ্যাম দেহের অযত্নসম্ভূত বিলাসলীলায় আর টানাটানা কালো চোখের তারার দীপ্তির মায়ায় বিদ্যুৎ খেলে যায়। বনের হরিণী মনের ভুলে ক্ষণিক বনের পথে অদৃশ্য হয়ে যায়; আশ্চর্য্য!

এমনি করে দিন চলে যায়। এই অসভ্য পাহাড়ী কিশোরীর অন্তরের কিসের স্বপ্ন ওকে স্বপ্নাতুর করে রেখেছে—যার চকিত আভাসে আমরা আমাদের চিরাভ্যস্ত কর্ত্তব্য হারিয়ে যাই; তাই জান্‌বার কৌতূহল হয়। একদিন ফাল্গুনী ঝরণার ধার ঘেঁসে বসে উপলে বাধিত ঝরণার সাথে প্রাণ খুলে বাঁশী বাজিয়ে চলেছে, আমি একটু দূরে একটা পাথরের উপর বসে আছি। মেয়েটি পাহাড়ের পথে নাম্‌তে নাম্‌তে থমকে দাঁড়াল পিয়াল গাছের ছায়ার আড়ালে;—আপন মনে তুললে পিয়াল ফুলের মঞ্জরী;—তারপর চুপি চুপি বসে গাছের আড়ালে কখন এসে দাঁড়িয়েছে জানি না। আমি কিছুক্ষণ পরে ফাল্গুনীর পাশে এসে বসেছি। মেয়েটি স্বভাবসুলভ বন্য ভাবের প্রেরণায় অথবা বাঁশীর সুরে আকুলা হয়ে আপনভুলে স্থান, কাল পাত্রাপাত্রের বিবেচনা না করেই ছুঁড়ে ফেলেছে ঐ ফুলের গোছা আমাদের ঠিক গায়ের উপর। আমরা যেমনি পিছন ফিরে তাকিয়েছি অমনি ও হাততালি দিয়ে খিল্‌-খিল্‌ করে হেসে উঠে দে ছুট। কোথায় কোন গাছের আড়ালে লুকিয়ে গেল। আমরা অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। সেই দিন থেকে ফাল্গুনী কেন জানি না ওর নাম দিলে 'বনশ্রী'।

এরপর কত দিন গিয়েছে। ও এখন আর আমাদের কাছে অপরিচিতা নয়। ও আসে বনের দুলালী মেয়ে, আমাদের সঙ্গে ভাঙা ভাঙা পাহাড়িয়া বাঙলায় কথা বলে অজস্র। কখনও বা চুপ করে থাকে, কি যেন ভাবে। তবে ফাল্গুনীর বাঁশী ও শুন্‌তে ভারী ভালবাসে, আমার গানও ও শোনে মুগ্ধ শ্রোতার মত। একদিন ও ফাল্গুনীর বাঁশীটি হাতে নিয়ে পরীক্ষা করলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে—অনেকক্ষণ বেশ ভাল করে, তারপর ফিরিয়ে দিলে; যাবার সময় ওর খোঁপা থেকে তুলে দিয়ে গেল একগোছা টাট্‌কা তাজা বনের ফুল ফাল্গুনীর হাতে। জানি না এই সরলা বন্য বালিকার অন্তরে কি ভাব জেগেছিল, ও যেতে যেতে ফিরে এসে ফাল্গুনীকে হাতছানি দিয়ে একটু দূরে ডেকে নিয়ে গেল। ফিরে আস্‌তে ফাল্গুনীর হাতে দেখ্‌লাম তার বেণীতে জড়াবার মালাটি। ওর চোখ দুটি আনন্দে উজ্জ্বল।

পরের দিন সকালে ফাল্গুনী আর বেড়াতে আসে নাই। ফিরে গিয়ে খোঁজ নিলাম, বল্‌লে "নীরু! ভাই! কিছু মনে করিসনি—মাথাটা একটু ধরেছে, তাই আর বেড়াতে বেরুতে ইচ্ছে হ'ল না।" আমি দেখ্‌লাম ওর কপালে হাত দিয়ে—সত্যিই যেন একটু গরম হয়েছে। চোখ দুটো লাল টক্‌টকে, একটু ফুলেও উঠেছে যেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম "ডাক্তার ডাক্‌বো নাকি?" ফাল্গুনী জবাব দিল "ও কিছু না, কাল রাত্তিরে ভাল ঘুম হয়নি তাই।" আমার কিন্তু মনে হ'ল 'ভাল' কেন, বোধ হয় সারারাত্রিই ও কাল ঘুমায়নি।

যাই হোক্‌ আমি ভাল করে দেখেশুনে ওকে সকাল সকাল স্নান করে খেয়ে নিতে বল্‌লাম।

দুপুরে ফাল্গুনী আর ক্লাসে যায় নাই, তাই টিফিনের সময় খবর নিতে এলাম—এসে দেখি ও জাগরণের ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে। যাক্‌ ভালই হয়েছে, ঘুমোলে ক্লান্তিটা কেটে যাবে মনে করে চলে আস্‌ছি—চোখে পড়্‌লো ডেস্কের উপর একটি বাঁধানো খাতা—দেখ্‌লাম দু'ছত্র কবিতাও লেখা—

> গিরিসানু হ'তে নামিয়া আসিছে
> তটিনী অলকনন্দা!
> দখিনা পবন উতলি ফিরিছে
> বনভূমি মধু-ছন্দা।

দেখ্‌লাম পাহাড়ের পথে-নামা বনশ্রীর ছবিও স্কেচ্‌ করেছে—ফাল্গুনী ছবি আঁকতেও জানে।

বিকেলে ফাল্গুনী বেড়াতে গিয়েছিল আমার সঙ্গেই, তবে তার বাঁশীর সুর সেদিন তেমন করে ফুট্‌ল না। বাঁশী কেবলই বেসুরো বাজে;—শেষে বিরক্ত হয়ে ও বল্‌লে "ভাই, আজ রাত হ'য়েছে, চল উঠি এবার।" আমরা উঠে পড়্‌লাম। পথেও সদাপ্রফুল্ল ফাল্গুনীর বিশেষ আলাপ আলোচনা কর্‌বার উৎসাহ দেখা গেল না, কেবল কথার মাঝে মাঝে 'হুঁ', 'না' গোছের সায় দিয়ে যাচ্ছিল।

মাঘের শেষ দিন। দিনটি আমার খুব বেশী করে মনে পড়ে। ফুলের সঙ্গে মাতাল হয়ে উঠেছে আম্রকুঞ্জ আর বনবীথি

স্মার্ণা-নন্দিনী—মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী প্রণীত। বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ৬৩, ক্রিমেটোরিয়াম ষ্ট্রীট কলিকাতা। দাম পাঁচসিকা।

বিশ্বশ্রুতিখ্যাতিসম্পন্না তুর্কী মহিলা খালিদা এদিব খানুমের 'ফায়ারী ষ্মার্ট' নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকের অনুবাদ। আমরা এই পুস্তকখানা পড়িয়া খুশী হইয়াছি। মূল গ্রন্থের সরসতা, সজীবতা এবং বর্ণনাভঙ্গীর ভিতর দিয়া বাস্তবকে চোখের সম্মুখে আনিয়া ধরিয়া দেখাইবার যে, বিস্ময়কর কৃতিত্ব রহিয়াছে, অনুবাদে সে রস-ধর্ম্ম ক্ষুণ্ণ হয় নাই। স্বদেশ প্রেমিক পাঠকের চিত্ত এ পুস্তক পাঠে নবীন তুর্কীদের মুক্তি-সাধনায় উদ্বেল কর্ম্মোদ্যমের তীব্রতায় আনন্দ রসে নিমগ্ন হইবে।

সাহিত্য-সংবাদ

নিখিল বঙ্গ রচনা প্রতিযোগিতা (১৯৩৯)

(তারিখ পরিবর্ত্তন)

১নং কালী কুণ্ডু লেনস্থিত (হাওড়া) ওয়েষ্ট য়েণ্ড ক্লাবের সাহিত্য শাখার উদ্যোগে যে প্রতিযোগিতার কথা ঘোষণা করা হইয়াছে উপযুক্ত রচনাদি না পাওয়ায় জমা দিবার তারিখ পিছাইয়া আগামী ২০শে মে, ১৯৩৯ ধার্য্য করা হইল।

বিষয়—"বাঙলা সাহিত্যে আধুনিকতা।"

শ্রীশ্রীগোবিন্দ ভট্টাচার্য্য, সম্পাদক, সাহিত্য শাখা, ওয়েষ্ট য়েণ্ড ক্লাব।

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ফলাফল

"কর্ম্মকার যুব সম্মিলনী" হইতে 'জাতীয় উন্নতি' শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে ঢাকা, মুন্সীগঞ্জের শ্রীনরেন্দ্রকুমার রায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। প্রতিশ্রুত পদক যথাসম্ভব শীঘ্র প্রেরিত হইবে।

শ্রীআশুতোষ মল্লিক, যুগ্ম-সম্পাদক।

"দীপিকা" পত্রিকার গল্প প্রতিযোগিতার ফলাফল

গত ৪ঠা মার্চ্চের "দেশ" পত্রিকায় প্রকাশিত চট্টগ্রামের ছাত্র-পরিচালিত "দীপিকা" পত্রিকার উদ্যোগে যে গল্প প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল, তার ফল নিম্নে দেওয়া হ'ল।

১ম পুরস্কার—শ্রীসিপ্রা দেবী (ঢাকা)—গল্পের নাম—"কাঁদছে কেন ?" আমাদের প্রতিশ্রুতি রৌপ্যপদক পাবেন।

২য় পুরস্কার—শ্রীইনা চৌধুরী (চট্টগ্রাম)—গল্পের নাম—"বন্দীর বেদনা"; শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "ছেলেবেলার গল্প" বইখানি দেওয়া হবে।

আমাদের প্রতিশ্রুত পুরস্কার বৈশাখ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে পাঠান হচ্ছে।

পরিচালকবৃন্দ—"দীপিকা", চট্টগ্রাম।

গল্প ও রচনা প্রতিযোগিতা

(বৈশ্য সাহা ছাত্র সমিতি)

প্রথম পুরস্কার—সুবর্ণপদক।

স্কুলের ছাত্রদের জন্য, যে কোন একটিঃ—(১) ব্যবসায়ে বাঙালী; (২) ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে বাঙালীর দান; (৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও পরবর্ত্তী জীবন।

কলেজের ছাত্রদেরঃ—একটি ছোট গল্প।

১৯৩৯ সালের ৩০শে জুন তারিখের পূর্ব্বেই নিম্নলিখিত ঠিকানায় গল্প ও রচনা পাঠাইতে হইবেঃ—

শ্রীঅতীন্দ্রলাল সাহা, সম্পাদক, বৈশ্য সাহা ছাত্র সমিতি ৮৫নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

'তরুণ-যাত্রী' রচনা প্রতিযোগিতার ফলাফল

(১) ছোটগল্পঃ—১ম; 'ঝড়ের যাত্রী'—কুমারী মায়াকণা রায় (পাটনা); ২য়; 'জীবন সমরে'—ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

(২) হালবাংলার ছাত্রছাত্রীদের মনোভাবঃ—১ম; অকরুণ বাগচী (কলিকাতা)। ২য়; প্রগতিশীলা হালদার (ঢাকা)। বিশেষ; হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় (বর্দ্ধমান রাজ কলেজিয়েট স্কুল)।

(৩) হস্তলিখিত পত্রিকাঃ—১ম; শুভেন্দুসুন্দর রায় (কলিকাতা)। ২য়; মানসকল্পনা দাশগুপ্তা (কলিকাতা)।

পুরস্কার বৈশাখের শেষাশেষি আমাদের বাৎসরিক অধিবেশনের পর পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। পুরস্কারপ্রাপ্তগণ ঠিকানা বদল করিলে, আমাদের জানাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীপঞ্চানন দে, প্রতিযোগিতা সম্পাদক।

বনফুল সাহিত্য সমিতি

গত ২৩শে এপ্রিল শ্রীরামপুর টাউন হলে শ্রীযুক্ত অবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে বনফুল সাহিত্য সমিতির উদ্যোগে সপ্তম বার্ষিক আবৃত্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। ছাত্রীদের আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় কুমারী লীলা চট্টোপাধ্যায় প্রথম, কুমারী মিনতি ভট্টাচার্য্য দ্বিতীয় এবং কুমারী বেলা গোস্বামী তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। সকলের আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় চন্দননগর নিবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য প্রথম, শ্রীরামপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ভাদুড়ী দ্বিতীয় এবং রিষড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। লীলারাণী মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ কাপ এবং গণেশচন্দ্র মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ কাপ যথাক্রমে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য এবং কুমারী লীলা চট্টোপাধ্যায়কে প্রদান করা হয়। সভায় কুমারী গৌরী সেন ও শ্রীযুক্ত বিমল করের সংগীত এবং শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের হাস্যকৌতুকে শ্রোতৃবৃন্দ পরম পরিতৃপ্ত হন। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক জলধর সেন ও জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের মৃত্যুতে দুইটি শোক-প্রস্তাব গ্রহণের পর শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় অতিথিবৃন্দকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। সভায় অন্যূন পাঁচশত বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

রঙ্গজগৎ

আর কে ও রেডিও পিকচার্স "গঙ্গাদীন" নামে যে ছবিখানি তুলিয়াছেন, তাহা বাঙলা ও বোম্বাইএর সেন্সর বোর্ড বাঙলা দেশ ও বোম্বাইতে প্রদর্শনী নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। রেডিও পিকচার্স কর্ত্তৃপক্ষ সেই সম্পর্কে একটি বিবৃতি প্রসঙ্গে জানাইয়াছেন যে, অনেকে ছবিখানি না দেখিয়া বলিতেছেন যে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিদ্বেষ ও কুৎসা প্রচার করা হইয়াছে বলিয়া ছবিখানি বর্জ্জন করা হইয়াছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাই ছবিখানি বর্জ্জনের কারণ দেখান হয় নাই। বোম্বাই বোর্ড ছবিখানি বর্জ্জনের কোন কারণ দেখান নাই। বাঙলা বোর্ড যাহা দেখাইয়াছেন, তাহা এই যে ছবিখানির মধ্যে বৃটিশ সৈন্যদের নীচু করিয়া দেখান হইয়াছে এবং তাহাতে সৈন্যদল ও জনসাধারণের সম্পর্ক খারাপ ধারণা হইতে পারে ও জাতিগত বিদ্বেষ আনিতে পারে।

রেডিও পিকচার্স কর্ত্তৃপক্ষ আরও জানাইয়াছেন যে, বোম্বাই বোর্ডকে ছবিখানি বর্জ্জনের কারণ জানাইতে অনুরোধ করিয়া তাঁহারা পত্র লিখিয়াছেন এবং ছবিখানির মধ্যে যদি কোন আপত্তিকর অংশ থাকে তাহা বাদ দিয়া তাঁহারা পুনরায় বাঙলা ও বোম্বাই বোর্ডকে ছবিখানি দেখাইবেন।

রেডিও পিকচার্স কর্ত্তৃপক্ষ সম্প্রতি এই ছবিখানি বেঙ্গল ফিল্ম জার্ণালিষ্ট এসোসিয়েশনের সভ্যদের দেখাইয়াছেন। তাঁহারা ছবি দেখিয়া যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহা এই যে, অনেকে হয়ত ছবিখানি না দেখিয়া, এই ছবি সম্বন্ধে যে সমস্ত মন্তব্য করিয়াছেন তাহা তাঁহারা ছবির মধ্যে কিছুই দেখিলেন না। যাহা হউক ছবির মধ্যে যেখানে যেখানে জাতীয় মর্য্যাদা অথবা ধর্ম্ম বিষয়ে জনসাধারণের মনে আঘাত লাগিতে পারে বলিয়া তাঁহারা মনে করিয়াছেন তাহা বাদ দিবার প্রস্তাব তাঁহারা করিয়াছেন এবং রেডিও পিকচার্স তাহা করিতে প্রস্তুত আছেন বলিয়া জানাইয়াছেন। তাঁহারা রেডিও পিকচার্সকে আরও জানাইয়াছেন যে, ছবিখানি সম্বন্ধে যাহাতে কোন অপ্রীতিকর ধারণা জনসাধারণের মনে না আসে তজ্জন্য ছবির প্রথমে বিশদভাবে একটি প্রস্তাবনা দিতে হইবে। ছবির কর্ত্তৃপক্ষ তাহাও করিতে প্রস্তুত আছেন বলিয়া জানাইয়াছেন। যদি সেইভাবে সংশোধন করা হয় তাহা হইলে ছবির বিরুদ্ধে আপত্তির কিছু কারণ থাকিতে পারে বলিয়া এসোসিয়েশন মনে করেন না।

* * *

ষ্টার থিয়েটারে "দুর্গা শ্রীহরি" নাটিকাখানি বহুদিন ধরিয়া প্রশংসিতভাবে চলিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহ এই নাটকাভিনয়ের শেষ সপ্তাহ হইবে।

নাট্যকার শ্রীযুত মহেন্দ্র গুপ্ত বিরচিত নূতন ঐতিহাসিক নাটক "সোনার বাঙলা" শীঘ্রই ষ্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইবে।

'পরশমণি' চিত্রে শ্রীমতী জ্যোৎস্না। শ্রীযুত প্রফুল্ল রায় পরিচালনা করিয়াছেন।

শ্রীযুত কালীপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় প্রযোজনা করিতেছেন।

বাঙলার ইতিহাস প্রসিদ্ধ বার ভূঁইয়ার অন্যতম ভূঁইয়া মহারাজ লক্ষ্মণ মাণিক্যের জীবনী অবলম্বন করিয়া এই নাটকখানি রচিত হইয়াছে। প্রতিযুদ্ধে অজেয় এই মহাপ্রাণ বাঙালী বীরের জীবন কথা চাঁদ, প্রতাপ, ঈশাখাঁর কাহিনীর মতই প্রতি বাঙালীর প্রাণে অনুপ্রেরণা জাগায়। বর্ত্তমান সময়ে এই কাহিনীকে যে নূতন করিয়া শুনাইবার প্রয়োজন আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীমতী সরযূবালা সম্প্রতি ষ্টারে যোগ দিয়াছেন এবং এই নাটকে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করিবেন। চরিত্রলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

চন্দন—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; রাজা রামানুজ রায়—বঙ্কিম দত্ত; রঘুডাকাত—প্রফুল্ল দাস; দেওয়ান কীর্ত্তিধর—সুশীল ঘোষ; আরাকানরাজ মৌসং—জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়; রহিম শেখ—রণজিৎ রায়; ধলু সর্দ্দার—গোপাল ভট্টাচার্য্য; বরকতুল্লা—গগন চট্টোপাধ্যায়; কুঙ্কুম—সরযূবালা; অনুরাধা—লাইট; সাকিনা—রাজলক্ষ্মী ও ভানুমতী—রাধারাণী।

খেলোয়াড়গণ জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ

খেলোয়াড়গণ জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ। খেলোয়াড়গণের উন্নতি জাতীয় উন্নতির সহায়ক। খেলোয়াড়গণের বিশ্ব-বিজয়ী নাম জাতিকে বিশ্বের নিকট পরিচিত করে। জাতিকে সর্ব্ব বিষয় শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য উদ্বুদ্ধ করে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিসমূহের পরিচালকগণ ইহা উপলব্ধি করিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহারা দেশের খেলোয়াড়গণকে সম্মান দান করিতে বা বিপদকালে সাহায্য করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। এইজনাই দেখা যায় ১৯৩৭ সালে চিলিয়ান বালিকা অনিতা লিজানা লণ্ডনে খেলিয়া পোল্যাণ্ডের বিশ্ববিখ্যাত মহিলা টেনিস খেলোয়াড় জেড জেওয়াস্কাকে পরাজিত করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার কালে পাথেয়ের অভাবে বিপদাপন্ন হইয়া কি করিবেন চিন্তা করিতেছেন, এই সময় চিলির প্রধান মন্ত্রীর নিকট হইতে তার আসিয়া পৌঁছিল, "চিন্তা করিও না, অর্থ পাঠান হইতেছে।" কুমারী লিজানাকে অর্থের জন্য মাত্র একদিন লণ্ডনে অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। এই একদিনের মধ্যে প্রধান মন্ত্রী জাতীয় দলের এক বিশেষ সভা আহ্বান করিয়া কুমারী লিজানার জন্য অর্থ মঞ্জুর করিয়া লন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "কুমারী লিজানা চিলিবাসীদের ধন্য করিয়াছে। বিশ্বের মাঝে চিলিবাসীকে পরিচিত করিয়াছে।"

জার্ম্মানীর নাজি সরকারও এইরূপ অবস্থার মধ্যেই জার্ম্মান সাঁতারু এরিক রাডেমেকারকে সাহায্য করেন। ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসে রাডেমেকার চিকাগোতে সন্তরণের কয়েকটি বিষয় অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। এমন কি ২০০ গজ বুক সন্তরণে পৃথিবীর রেকর্ড করেন। রাডেমেকারের অবস্থা ভাল ছিল না। তিনি চিকাগো হইতে কিরূপে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন এই চিন্তা করিতে-ছেন এমন সময় ওয়াশিংটন হইতে জার্ম্মান প্রতিনিধির তার তাঁহার নিকট পৌঁছিল। প্রতিনিধি রাডেমেকারকে জার্ম্মানীর সংস্কৃতির বাহক বলিয়া অভিনন্দিত করিয়া সকল বিষয় সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দেন। সেই প্রতিশ্রুতি যে তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য।

পোল্যাণ্ডের ইতিহাসেও এইরূপ ঘটনা বিরল নহে। পাওভা নুর্ম্মিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এ্যাথলীট নুর্ম্মি জীবিতাবস্থায় যে সম্মান পাইয়াছেন পৃথিবীর কোন দেশের কোন ভাগ্যবান খেলোয়াড়ের পক্ষে তাহা লাভ করা সম্ভব-পর হয় নাই।

ফিন্ল্যাণ্ডের রাষ্ট্র পরিচালকগণ দেশের বর্ত্তমান শ্রেষ্ঠ জিমনাষ্ট মার্টি ইউসিকিলেনকে "গোল্ডেন প্লাকেট" দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। উক্ত গোল্ডেন প্লাকেট পূর্ব্বে কেবল দেশের নেতা বা রাজাকে সম্মান নিদর্শনস্বরূপ দেওয়া হইত। কিন্তু জিমনাষ্ট ইউসিকেলেনের ভাগ্যে তাহা জুটিয়া গেল।

ফ্রান্সও তাহার দেশের এ্যাথলীট বা খেলোয়াড়দের সম্মানিত করে। টেনিস খেলোয়াড় ব্রুগনন, এ্যাথলীট রকার্ড প্রভৃতিকে নাইট উপাধি দান করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই। নরওয়ে গবর্ণমেণ্ট দেশের শ্রেষ্ঠ টেনিস খেলোয়াড় ও এ্যাথলীট জোহান হানিজকে "এজবার্গ প্রাইজ" পুরস্কার দান করিয়াছেন। নরওয়ে সরকার এই পুরস্কার পূর্ব্বে দেশের রাজাকে ব্যতীত অপর কাহাকেও দিতেন না। বর্ত্তমানে খেলোয়াড়গণকেও দিতেছেন। এমন কি ইংল্যাণ্ড পর্য্যন্ত হার্ডল প্রতিযোগিতায় বর্গে অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ানকে "লর্ড" উপাধি দান করেন।

আমেরিকার বিশ্ববিজয়ী এ্যাথলীট বা খেলোয়াড়কে সুলিভান ট্রফি পুরস্কার দেওয়া হয়। জাপান সরকার দেশের শ্রেষ্ঠ এ্যাথলীট ও সাঁতারুকে "নিপুন পুরস্কার" দান করেন। এইরূপে অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে—পৃথিবীর সকল শ্রেষ্ঠ জাতি দেশের এ্যাথলীট, খেলোয়াড় ও সাঁতারুকে সম্মানিত করিয়া থাকে। এইরূপ সম্মান পায় বলিয়াই দেশের উৎসাহী খেলোয়াড় ও এ্যাথলীটগণ দেশের ও জাতির সম্মান বৃদ্ধির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের যে, আমাদের দেশের বিশ্ববিখ্যাত হকি খেলোয়াড় ধ্যানচাঁদ, ক্রিকেট খেলোয়াড় পতৌদির নবাব, দলীপ-সিংহজী, মেজর নাইডু প্রভৃতিকে সেইরূপ সম্মান দান করিতে পারি নাই। কিন্তু তাহা হইলেও এই কথা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না যে, তাঁহাদের কথা স্মরণ করিলে আমাদের প্রাণে উৎসাহ ও উদ্দীপনা জাগে না।

সাপ্তাহিক সংবাদ

২৫শে এপ্রিল –

গাইবান্ধা হইতে এক ব্যক্তির অনাহারের ফলে শোচনীয় মৃ[illegible] সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, সুন্দরগঞ্জ থানার ভা[illegible] [illegible]লামীয়া গ্রাম নিবাসী হাসিমউদ্দিন সেখ ৩ দিন সম্পূর্ণ অনাহারে থাকার পর গত ২৩শে এপ্রিল কোনও প্রকারে কয়েক মুষ্টি চাউল সংগ্রহ করিয়া দ্বিপ্রহরে আহারের বন্দোবস্ত করে। আহারে বসিয়া একগ্রাস ভাত মুখে দেওয়ার পরই জল খাইতে থাকে ও তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘামিতে থাকে। ঐ দিবস বেলা ৩টার সময় তাহার মৃত্যু হয়। প্রকাশ যে, ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে দারুণ অন্নকষ্ট দেখা যাইতেছে।

ত্রিপুরার রাজ সরকারের আদেশে ভূতপূর্ব্ব রাজবন্দী শ্রীযুক্ত শচীন সিংহকে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রজাগণকে রাজা ও রাজ সরকারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার অভিযোগে এক বৎসরের জন্য ত্রিপুরা রাজ্য হইতে বহিষ্কারের আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

লর্ড লোথিয়ান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বৃটিশ রাজদূত নিযুক্ত হইয়াছেন।

ইঙ্গ-রুশ আলোচনার ফলে সোভিয়েট যে সকল প্রস্তাব পেশ করেন, বৃটিশ গবর্ণমেন্ট এখনও তাহার উত্তর দেন নাই। লন্ডন ও মস্কোতে এখনও কথাবার্ত্তা চলিতেছে।

জার্ম্মান সরকার তিনজন বৃটিশ ব্যবসায়ীকে বহিষ্কারের আদেশ দিয়াছেন। তাঁহাদিগকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, ১০ই মে'র মধ্যে তাঁহাদিগকে জার্ম্মানী ত্যাগ করিতে হইবে।

লর্ডস সভায় ভারত ও ব্রহ্ম শাসন আইনের সংশোধন বিলটির দ্বিতীয় দফা আলোচনা শেষ হইয়াছে।

ক্যাপ্টেন টি ও পি ওষ্টার হস নামক জনৈক হল্যান্ডবাসী শান্তির সন্ধানে মোটর যোগে গত ১৭ বৎসর ধরিয়া ৭০টি দেশে ২ লক্ষ ৭০ হাজার মাইল পরিভ্রমণ করিয়াছেন। কিন্তু কোথাও শান্তি দেখিতে পান নাই। ক্যাপ্টেন ওষ্টার হসের সঙ্গে তাঁহার ব্যাভেরিয়ান পত্নীও আছেন। উক্ত পরিব্রাজক দম্পতি সিঙ্গাপুরে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

২৬শে এপ্রিল—

কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ও ডেপুটি মেয়র নির্ব্বাচন হয়। কংগ্রেস মনোনীতপ্রার্থী শ্রীযুক্ত নিশীথচন্দ্র সেন মেয়র ও সাহাজাদা প্রিন্স ইউসুফ মির্জ্জা ডেপুটি মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। নির্ব্বাচনে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় নাই।

বর্দ্ধমানের জেলা বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীযুত রাধাগোবিন্দ হাতীর প্রচেষ্টায় বর্দ্ধমান জেলা বোর্ডের টেকনিকেল স্কুলের ধর্ম্মঘটকারী ছাত্ররা অনশন ভঙ্গ করিয়াছে।

লক্ষ্ণৌয়ে ইমামবারার সম্মুখে তাব্বারা আন্দোলন করায় লাহোরের "রেজাকর" সংবাদপত্রের সম্পাদক সমেত মোট ২০৯ জন সিয়াকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এ পর্যন্ত সর্ব্বসমেত ৫৬০০ জন সিয়া গ্রেপ্তার হইল।

বোম্বের সুপ্রসিদ্ধ জননায়ক ও বাগ্মী মিঃ কে এফ নরীম্যানের সভাপতিত্বে দক্ষিণ কলিকাতা জেলা রাজনৈতিক সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। দক্ষিণ কলিকাতার তিনশত প্রতিনিধি ও অভ্যর্থনা সমিতির ছয়শত সদস্য এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি মিঃ নরীম্যান তাঁহার অভিভাষণে বাঙলার প্রাণের কথা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন যে, মহাত্মা গান্ধীর অনুগামিগণের একনায়কত্বের ফলে ভারতের গণতন্ত্র বিপন্ন হইতে বসিয়াছে। সভাপতি মহাশয় আরও বলেন যে, ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটাতেই পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ইউরোপ ভ্রমণে বাহির হন। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের পাশে আসিয়া দাঁড়াইবার জন্য সভাপতি মহাশয় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন এবং যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে বৃটিশ গবর্ণমেন্টকে ৬ মাসের সময় দেওয়ার প্রস্তাব সমর্থন করেন।

কমন্স সভায় প্রধান মন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেন বিশ হইতে বাইশ বৎসর বয়স্ক বৃটেনের মধ্যে বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তি প্রবর্ত্তনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। মিঃ চেম্বারলেন বলেন যে, বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা গ্রহণের মেয়াদ ছয় মাস হইবে। শীঘ্রই এই সম্পর্কে একটি বিল উপস্থিত করা হইবে।

২৭শে এপ্রিল-

নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতির অধিবেশন উপলক্ষে কলিকাতায় নেতৃবৃন্দের সমাগম হয়। মহাত্মা গান্ধী অদ্য সকালে বি এন আর বোম্বাই মেলে কলিকাতায় পৌঁছেন। শহরের উপকণ্ঠস্থ সোদপুরে খাদি প্রতিষ্ঠানের আশ্রমে গান্ধীজী অবস্থান করেন। সেখানে মহাত্মা গান্ধী ও রাষ্ট্রপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর মধ্যে কংগ্রেসের অচল অবস্থা সম্পর্কে দীর্ঘকাল আলোচনা হয়। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুও আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন। রুদ্ধদ্বার-কক্ষে আলোচনার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

ত্রিপুরার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ষ্টিভেন্সের হত্যা সম্পর্কে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত শ্রীমতী শান্তি ঘোষ ও শ্রীমতী সুনীতি চৌধুরীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

উড়িষ্যার ছাত্রদের ধর্ম্মঘট অবসান হইয়াছে। উৎকল প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি পণ্ডিত নীলকণ্ঠ দাসের মধ্যস্থতায় উড়িষ্যার সরকার ছাত্রদের কয়েকটি দাবী মানিয়া লইয়াছেন। ছাত্র-সত্যাগ্রহ প্রত্যাহৃত হওয়ার ফলে ১৪ জন বিচারাধীন ছাত্রকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

দিল্লী গুলী মারা মামলায় দণ্ডিত শ্রীযুত ধন্বন্তরি ৭ বৎসর কারাদণ্ড ভোগের পর লাহোর সেনট্রাল জেল হইতে মুক্তি পাইয়াছেন।

২৮শে এপ্রিল—

রাজনৈতিক বন্দি-মুক্তি দিবস প্রতিপালন উপলক্ষে কলিকাতা ও সহরতলীর বিভিন্ন স্থানে জনসভা ও শোভা-যাত্রাদির অনুষ্ঠান হয়। বিভিন্ন সভায় রাজনৈতিক বন্দিদের অবিলম্বে মুক্তির দাবী করিয়া এবং এই উদ্দেশ্যে দেশব্যাপী তীব্র আন্দোলনের সৃষ্টি করিতে জনগণকে আহ্বান জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই উপলক্ষে শ্রদ্ধানন্দ পার্কের জনসভায় শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু এক বাণী প্রেরণ করেন। উহাতে তিনি বলেন, "বাঙলা, পাঞ্জাব ও অন্যান্য প্রদেশে যে-সমস্ত রাজনৈতিক বন্দি এখনও কারাগৃহের অন্তরালে কষ্টভোগ করিতেছেন তাঁহাদের মুক্তির জন্য কারাদ্বার যতদিন না মুক্ত করা যায়, ততদিন পর্য্যন্ত আমরা যেন সুস্থির না হই।

কলিকাতায় রাজনৈতিক বন্দি মুক্তি সম্মেলনের প্রচার-কার্য্যের জন্য জমিরুদ্দীন হাউস্ হইতে একটি লরী লাউড স্পীকারসহ রাজপথে বাহির হয়। লরী জাতীয় পতাকা, রক্ত পতাকা এবং বহু পোষ্টারসহ শহর প্রদক্ষিণ করেন। পুলিশ লরী এবং লাউড স্পীকারসহ ১২ জন কংগ্রেস কর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করে।

বিহারের একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেলের অফিসের সহকারী অফিসার শ্রীযুক্ত কে পি নাহা মার্জাদিয়া ট্রেন দুর্ঘটনায় আহত হইয়াছিলেন। রাঁচীতে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া তিনি মারা গিয়াছেন।

চীনাদের এক সংবাদে প্রকাশ, চীনা সৈন্য-বাহিনী জাপ সৈন্য-বাহিনীকে কাওয়াল হইতে বিতাড়িত করিয়াছে এবং তাঁহারা শহরটি সম্পূর্ণভাবে দখল করিয়াছে।

উড়িষ্যার গাঙ্গপুর রাজ্যে পুলিশ ও সৈন্য দলের গুলী বর্ষণের ফলে অনুমান ৬৫ জন নিহত এবং বহুলোক গুরুতর আহত হইয়াছে। পুলিশ কতিপয় লোককে গ্রেপ্তার করিয়া-ছিল। এই সম্পর্কে যে গোলযোগ ঘটে, তাহার ফলেই গুলী বর্ষিত হয়।

অদ্য সকাল ৭-২৫ মিনিট হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি ৯-৪০ মিনিট পর্যন্ত প্রায় সমস্তক্ষণ মহাত্মা গান্ধী, রাষ্ট্রপতি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও পুরাতন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিকাংশ সভ্য যাঁহারা কলিকাতায় আসিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কংগ্রেসের অচল অবস্থার কোন সন্তোষজনক মীমাংসা হয় নাই।

হের হিটলার রাইখষ্টাগে ঘোষণা করেন যে তিনি ইঙ্গ-জার্ম্মান নৌ-চুক্তি বাতিল করিয়া দিতেছেন। জার্ম্মান-পোলিশ চুক্তিও বাতিল করা হইল বলিয়া হের হিটলার ঘোষণা করেন।

২৯শে এপ্রিল—

কলিকাতা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে নির্ম্মিত বিরাট মণ্ডপে অদ্য অপরাহ্ণ ৫ টার সময় তীব্র উত্তেজনা ও গভীর উৎকণ্ঠার মধ্যে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন আরম্ভ হইলে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু তাঁহার কংগ্রেসের সভাপতি পদত্যাগ ঘোষণা করেন। এই সম্পর্কে এক বিবৃতি দান প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বসু নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতির সদস্যগণকে বলেন, "বিশেষ ভাবে বিবেচনার পর সম্পূর্ণভাবে পারস্পরিক সাহায্যের মনোভাব লইয়া আমি আপনাদের নিকট আমার পদত্যাগ পত্র পেশ করিতেছি।" উপস্থিত হাজার হাজার দর্শক গম্ভীর ও নিস্পন্দভাবে রাষ্ট্রপতির বিবৃতি শুনেন। বিবৃতি দানের পূর্ব্বে রাষ্ট্রপতি সভায় মহাত্মা গান্ধীর একটি পত্র পাঠ করেন। ঐ পত্রে মহাত্মা গান্ধী রাষ্ট্রপতিকে জানাইয়াছেন যে, তিনি তাঁহাকে ওয়ার্কিং কমিটি গঠনে সাহায্য করিতে অক্ষম; সুতরাং রাষ্ট্রপতি নিজেই তাঁহার মনোমত লোক লইয়া তাঁহার ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করিতে পারেন।

রাষ্ট্রপতি বসুর বিবৃতি দানের পর পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এক দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। **"এই কমিটি কংগ্রেস সভাপতিকে তাঁহার পদত্যাগ** প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করিতেছে। এই কমিটি তাঁহাকে আরও অনুরোধ করিতেছে যে, ১৯৩৮ সালে যে ওয়ার্কিং কমিটি কার্য্য করিয়াছে, সেই ওয়ার্কিং কমিটিই তিনি যেন নূতন করিয়া মনোনয়ন করেন।" যুক্তপ্রদেশের মন্ত্রী মিঃ রফি আমেদ কিদোয়াই প্রস্তাবটি সমর্থন করেন।

সমাজতান্ত্রিক নেতা শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রস্তাবটি সম্পর্কে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, এই বিষয়ে তিনি পণ্ডিতজীর সহিত একমত; এই প্রস্তাব অনুযায়ী কার্য্যের দ্বারাই বর্ত্তমান সংকটের সঠিক মীমাংসা হওয়া সম্ভব বলিয়া তিনি মনে করেন।

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল (যুক্তপ্রদেশ) পণ্ডিতজীর প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন। ঘন ঘন করতালি ও হর্ষ-ধ্বনির মধ্যে তিনি বক্তৃতায় বলেন যে, পুরাতন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণের নেতৃত্বের যোগ্যতার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে এবং তাহতে তাঁহারা অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত সান্যাল আরও বলেন যে, ভারতের স্বাধীনতার জন্য নূতন নীতি ও কর্ম্মপন্থার প্রয়োজন এবং তাহা কার্য্যকরী করার জন্য নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতির সরাসরি একটি "নূতন বিপ্লবী ওয়ার্কিং কমিটি" নির্ব্বাচন করা উচিত।

শ্রীযুক্ত যদুমণি মঙ্গরাজও (উড়িষ্যা) প্রস্তাবটির বিরো-ধিতা করিয়া বলেন যে, এই প্রস্তাবের দ্বারা রাষ্ট্রপতি বসুকে আরও অপমান করার ব্যবস্থা হইয়াছে। স্বামী গোবিন্দানন্দও প্রস্তাবটির বিরোধিতা করেন।

স্বামী গোবিন্দনন্দের বক্তৃতার পর রাত্রি ৮॥ ঘটিকার নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতির এই দিনকার অধিবেশন পরদিন রবিবার বেলা ১ ঘটিকা পর্য্যন্ত স্থগিত রাখা হয়। এই দিনে জলযোগের পর শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু সভানেত্রীত্ব করেন।

৩০শে এপ্রিল—

নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতির অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেস সভাপতি পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার না করায় বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁহার স্থলে বৎসরের অবশিষ্ট কালের জন্য কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করিয়া যে প্রস্তাব আনয়ন করেন, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র তাহা প্রত্যাহার করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করায় পণ্ডিত নেহরু তাঁহার প্রস্তাব উঠাইয়া লন। অতঃপর সভার সভানেত্রী শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু ঘোষণা করেন যে, নূতন প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন করা হইবে। বহু সদস্য শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর নিকট জানিতে চাহেন যে, রাষ্ট্রপতি শ্রীযুক্ত বসুর পদত্যাগ পত্র গৃহীত হইয়াছে কিনা। উত্তরে শ্রীযুক্তা নাইডু বলেন যে, পদত্যাগপত্র গ্রহণের কোন প্রশ্ন উঠে না। শ্রীযুক্তা নাইডুর এই উক্তিতে সভ্যদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দেয়। শ্রীযুক্তা নাইডু তখন কংগ্রেস নিয়মতন্ত্রের ১০নং ধারায় প্রতি সভ্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শ্রীযুক্ত কে এফ নরীম্যান একটি বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া বলেন যে, ১০নং ধারা বর্ত্তমান ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতি কর্ত্তৃক নূতন রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচন অবৈধ হইবে। শ্রীযুক্ত এম এস আণে

এই বৈধতার প্রশ্নটি সম্পর্কে কিছু বলিতে চাহিলে, সভানেত্রী শ্রীযুক্তা নাইডু তাঁহার অনুরোধে কর্ণপাত করেন নাই প্রতিবাদে শ্রীযুক্ত আশে সভাস্থল ত্যাগ করেন।

অতঃপর করাচীর ডাঃ চৈতরাম গিদোয়ানী প্রস্তাব করেন যে, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হউন। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হইলেন এই ঘোষণা হওয়া মাত্র দর্শকদের মধ্যে অত্যন্ত চাঞ্চল্য দেখা দেয়। নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতির সদস্য শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্রনাথ রায় ও বহু বামপন্থী সভ্য যে রীতিতে রাজেন্দ্র বাবুর নির্ব্বাচন হইয়াছে, তাহার প্রতিবাদ জানাইয়া সভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ বক্তৃতা মঞ্চে আসিয়া দাঁড়াইলে চতুর্দ্দিকে "সেম সেম", "পদত্যাগ করুন", "গান্ধীবাদ ধ্বংস হউক" প্রভৃতি ধ্বনি করিতে থাকে। বিপুল চীৎকার ও হট্টগোলের মধ্যে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ আধ ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন এবং অপরাহ্ন ৫ টায় সভার কার্য্য স্থগিত রাখেন।

সভা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের চতুর্দ্দিকে অপেক্ষমান বিপুল জনতার মধ্যে প্রবল উত্তেজনার সঞ্চার হয়। উত্তেজিত জনতা পুনঃ পুনঃ "সেম সেম", "গান্ধীবাদ ধ্বংস হউক" প্রভৃতি ধ্বনি করিয়া তুমুল বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। অবস্থা বেগতিক দেখিয়া শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় নেতৃবর্গকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দেন। প্রকাশ যে, উত্তেজিত জনতা মিঃ কিরণশঙ্কর রায়, ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ প্রমুখ কয়েকজন কংগ্রেস নেতাকে আক্রমণ করিয়াছিল। উচ্ছৃঙ্খল আচরণের অভিযোগে নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতির সম্মুখে পুলিশ চার ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে।

১লা মে—

পাঁচদিন কলিকাতায় অবস্থানের পর মহাত্মা গান্ধী সদলবলে বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া থানার অধীন বাঁধাবাড়ী গ্রামে নরহত্যাসহ এক ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল সংশোধন বিল সম্পর্কে এক এক ধারা করিয়া আলোচনা আরম্ভ হয়। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল সম্বন্ধে বঙ্গীয় মন্ত্রিমণ্ডলীর মধ্যে মতদ্বৈধ হওয়ার ফলে যে সঙ্কট ও সমস্যার উদ্ভব হয়, তাহার সমাধানকল্পে একটি আপোষমূলক প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছে। এই প্রস্তাবটি অদ্য পরিষদে ঘোষণা করা হয়।

করাচীর এক সংবাদে প্রকাশ যে, এন ডবলিউ রেলওয়ের টিকিট পরীক্ষক মিঃ ইদানমল বিনা টিকিটে ট্রেনে ভ্রমণকারী জনৈক মুসলমান আততায়ী কর্ত্তৃক ছুরিকাঘাতে নিহত হইয়াছেন।

সিন্ধুদেশে বিবাহে যৌতুক নিয়ন্ত্রণের জন্য সিন্ধু ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে একটি বিল আনা হইবে। এই বিলে ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, কোনও বিবাহে বা বাকদানে কেহ ৫০০্ টাকার অধিক যৌতুক লইতে বা দিতে পারিবেন না।

ওয়েলিংটন স্ট্রীটে শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাইয়ের প্রতি জুতা নিক্ষেপ করিয়া ও চীৎকার করিয়া উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দেওয়ার অভিযোগে ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র নামক এক ব্যক্তি পাঁচ টাকা অর্থদণ্ডে অনাদায়ে সাতদিন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। অপর একটি মামলায় তিন ব্যক্তি ওয়েলিংটন স্কোয়ারে মারপিট করার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছে।

অদ্য নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন আরম্ভ হইলে কংগ্রেস সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করিয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করেনঃ—(১) মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, (২) শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু, (৩) সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল, (৪) খাঁ আব্দুল গফুর খাঁ, (৫) শেঠ যমুনালাল বাজাজ, (৬) ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া, (৭) শ্রীযুক্ত জয়রাম দাস দৌলতরাম, (৮) আচার্য্য জে বি কৃপালনী, (৯) শ্রীযুক্ত সঙ্করারাও দেও, (১০) শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মহাতাপ, (১১) শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই, (১২) ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, (১৩) ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ যখন বলেন যে, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু নূতন ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য হইতে রাজী হন নাই, তখন দর্শকবৃন্দ উল্লাসে 'হিয়ার হিয়ার' করিয়া উঠেন। তিনি যখন জানান যে, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর স্থলে বাঙ্গলা দেশ হইতে ওয়ার্কিং কমিটিতে ডাঃ বি সি রায় ও ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষকে লওয়া হইবে, তখন দর্শকবৃন্দ তুমুলে "সেম সেম" ধ্বনি করিয়া উঠেন।

শ্রীযুক্ত কে এফ নরীম্যান প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশের ৩০ জনের অধিক সদস্য এক বিবৃতিতে নূতন কংগ্রেস সভাপতি নির্ব্বাচন অবৈধ হইয়াছে বলিয়া প্রতিবাদ জানান। শ্রীযুক্ত নরীম্যান যখন বিবৃতিকারীদের পক্ষ হইতে সভায় বিবৃতিটি পাঠ করেন, তখন তাঁহাকে দর্শকবৃন্দ বিপুলভাবে অভিনন্দিত করে।

অদ্যকার অধিবেশনে চারিটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রথম প্রস্তাবে কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দুর্নীতি দূরীকরণ সম্পর্কে একটি সাব-কমিটি গঠন করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় প্রস্তাবে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভারত শাসন আইন সংশোধন দ্বারা যুদ্ধের সময় ভারত সরকারের হস্তে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করিয়া প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির ক্ষমতা হরণের প্রতিবাদ জানান হয় এবং যুদ্ধ বাধিলে ভারতের ধন ও জনবল ক্ষয়ের বিরোধিতা করিবার সঙ্কল্প করা হয়। তৃতীয় প্রস্তাবটি দক্ষিণ আফ্রিকার কেনিয়া প্রবাসী ভারতবাসীদের সম্পর্কে এবং চতুর্থটি বাঙ্গলার ও পাঞ্জাবের রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি সম্পর্কিত। কোন প্রস্তাবেই সদস্যগণ বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেন নাই। প্রস্তাবগুলির বিরোধিতাও করা হয় নাই।

অদ্য নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতির অধিবেশন শেষ হয়। অধিবেশনের পর ওয়েলিংটন স্কোয়ারের সন্নিহিত রাস্তাগুলিতে জনগণের মধ্যে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক নেতাকেই স্বেচ্ছাসেবকগণের দ্বারা পরিবেষ্টন করিয়া মোটরে তুলিয়া দিতে হয়; ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পার্শ্বস্থ রাস্তাগুলিতে প্রচুর পুলিশ পাহারাও ছিল। স্বেচ্ছাসেবক ও জনতার মধ্যে সঙ্ঘর্ষের ফলে কয়েকজন আহত হয়।

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

(৬ষ্ঠ বর্ষ ১৩শ সংখ্যা 'দেশ' হইতে ২৪শ সংখ্যা পর্যন্ত)

—র—

—শ—

—স—

—হ—

[১৪শ সংখ্যা

৬ষ্ঠ বর্ষ] শনিবার—১৫ই বৈশাখ, ১৩৪৬, Saturday 29th April 1939.

সাময়িক প্রসঙ্গ

স্বাগত—

নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন আরম্ভ হইল। এই অধিবেশনে যোগদানের জন্য মহাত্মা গান্ধী এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের যে সব জননায়ক কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে আমাদের স্বাগত অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহারা আজ সমগ্র ভারতের সমস্যা সম্পর্কে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে ব্যাপৃত। আমরা জানি, শুধু বাঙলা দেশের প্রশ্ন তাঁহাদের বিবেচ্য নয়; কিন্তু তবু আমরা বাঙলা দেশের সম্বন্ধে তাঁহাদের নিকট কয়েকটি কথা [illegible] না করিয়া পারিতেছি না। সত্য কথা বলিতে কি, বর্ত্তমানের যে অবস্থা, তাহা বাঙালী সমাজকে একেবারে অবসন্ন এবং [illegible] করিয়া তুলিয়াছে। ম্যাকডোনাল্ডী সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা, মেস্টনী ব্যবস্থা সর্ব্বোপরি, সাম্রাজ্য-বাদীর এই সব কূট নীতির মত বিষ সেগুলি জড়াইয়া বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলের কর্ম্মপন্থা আজ বাঙলা দেশকে জর্জ্জর করিয়া তুলিয়াছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে রাজ-নীতিক বন্দীরা মুক্তিলাভ করিয়াছেন; কিন্তু বাঙলা দেশে বহু রাজনীতিক বন্দী এখনও কারাপ্রাকারের অন্তরালে অবরুদ্ধ রহিয়াছেন। সংবাদপত্রের যে স্বাধীনতা জাতীয় আন্দোলনের মূল শক্তিস্বরূপ, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সে স্বাধীনতা কংগ্রেসী মন্ত্রীদের আমলে কিছু সম্প্রসারিত হইলেও, সে স্বাধীনতা বাঙলা দেশে দিন দিন সঙ্কুচিত হইতেছে। মন্ত্রীদের কার্য্যের সমালোচনা পর্য্যন্ত এখন দণ্ডনীয় অপরাধের গণ্ডীর মধ্যে ফেলিবার চেষ্টা হইতেছে এই বাঙলা দেশে। গণ-তান্ত্রিকতার মর্য্যাদা বা মূল্য আজ বাঙলা দেশে কতটা, ইহাতেই তাহার প্রমাণ; আর একটি— জ্বলন্ত প্রমাণ হইল, প্রস্তাবিত কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল। কিন্তু এইখানেই [illegible] নয়। বাঙলা দেশের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের যে স্বাধীনতার জন্য বাঙলার মনীষী সন্তান-গণ এতদিন সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছেন, তাহাকে লুপ্ত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে সাম্প্রদায়িক প্রভাব পরিচালিত মন্ত্রিমণ্ডলের মুঠার মধ্যে লইবার আয়োজন চলিতেছে। বাণীর মন্দিরে আসিয়া বসিবে মধ্য যুগীয় বর্ব্বরতা। ভারত-শাসন আইনের যে নূতন সংশোধন প্রস্তাব পার্লা-মেণ্টে হইয়াছে, তাহাতে এই দলের আস্ফালন বাড়িয়া গিয়াছে। বাঙলা দেশে যাঁহারা জাতীয়তাবাদী, অবস্থা তাঁহা-দের পক্ষে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে, না হইয়া পারে না। একমাত্র আশা, নেতারা যদি ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে অবতীর্ণ হন, তাহা হইলে সমগ্র ভারতীয় সেই রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতির ঊর্দ্ধ ভূমি হইতে যে আন্দোলন চলিবে, তাহাতে আঘাত পড়িবে বাঙলার এই সব অনাচারের উপর— উৎখাত হইবে বাঙলা দেশেরও এই সব আতঙ্ক। নতুবা সমগ্র ভারতের কংগ্রেসী রাজনীতি হইতে বাঙলা দেশ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে এবং যে দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছে, সেই দুর্দ্দশা আরও বাড়িবে। ধ্বংস হইবে বাঙালীর সব। পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নীতিই সমগ্র ভারতের রাজনীতি হইতে বাঙলা দেশের বিচ্ছেদকে দূর করিতে পারে। কবে আসিবে সেদিন? বাঙলার স্বাধীনতাকামী সন্তান, যাহারা বাঙলা দেশের কল্যাণ চাহেন, তাঁহারা একান্ত আগ্রহে সেই দিনেরই অপেক্ষা করিতেছেন। কংগ্রেসী মন্ত্রি-গিরির পরীক্ষা চালাইবার সখ এখনও কি মিটে নাই, আসে নাই কি এখনও স্বাধীনতা-সংগ্রামে বলিষ্ঠতর এবং কার্য্যকর ও অধিকতর ব্যাপক নীতি প্রয়োগের? বাঙালী সমাজের বর্ত্তমানে প্রধান প্রশ্নই এই, একমাত্র নেতাদের কাছে। তাঁহারা স্বাধীনতার সংগ্রামে ব্যাপকতর নীতি প্রয়োগ করিয়া আজ বাঙলার প্রাণরসের সঙ্গে যুক্ত হউন। স্বাধীনতা-সাধনায় বাঙালীর অন্তর সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে, জাগিবে বাঙালী জাতি আবার আপনার পরিপূর্ণ মহিমায়, সে যদি পায় আপনার প্রাণের জিনিষের আস্বাদ। কংগ্রেসের কর্ম্মপন্থা যদি পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে অধিকতর সঙ্ঘর্ষ-মূলক হয় এবং আপোষ-নিষ্পত্তির দিকে ফাঁকা দুর্ব্বলতা তাহার মধ্যে না থাকে, তবেই বাঙালী সে আস্বাদ পাইবে এবং বাঙালী জানে যে, সেই পথ যেমন বাঙলার রাষ্ট্রনীতিক,

সমস্যা সমাধানের পথ, তেমনই সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রনীতিক সমস্যার সমাধানের পথও সেই একই—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে।

নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন—

দুই একদিনের মধ্যেই কলিকাতা শহরে নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন আরম্ভ হইবে। বলা বাহুল্য এই অধিবেশনের গুরুত্ব খুবই বেশী। এবং এই অধিবেশনের গুরুত্ব নানা কারণে ত্রিপুরী কংগ্রেসের চেয়েও বেশী হইয়া উঠিয়াছে। কংগ্রেসের সমস্ত সমস্যা কেন্দ্রীভূত হইয়াছে এই অধিবেশনের উপর, এবং আমরা এই আশা করিতেছি জাতির বৃহত্তর কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই অধিবেশনে সে সব সমস্যার সমাধান হইবে। সংগ্রামের পরম মুহূর্ত্ত ঘনাইয়া আসিয়াছে। কথা কাটাকাটির সময় আর নাই, এখন চাই কাজ। আমরা আশা করি সেই কাজের পথে দেশের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করা হইবে। মহাত্মা গান্ধী এই অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুও আসিয়াছেন এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে জননায়কগণ আগমন করিয়াছেন। রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র সেদিন বলিয়াছেন যে, জাতির সংগ্রামশীল শক্তিগুলিকে তিনি কেন্দ্রীভূত দেখিতে চাহেন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি ঘরোয়া বিবাদ মিটাইয়া ফেলিবার পক্ষপাতী। এ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত কাহারও মতভেদ নাই। কংগ্রেসের মধ্যে যদি আজ মতভেদ দেখা দিয়া থাকে, সেজন্য দায়িত্ব, আমরা বলিব নেতাদেরই এবং সে মতভেদ দূর করিবার দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্যও নেতাদের। রাষ্ট্রপতি এই আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, মহাত্মাজীর সহিত দেখা সাক্ষাতের ফলে এই সব ব্যাপারের মীমাংসা হইয়া যাইবে। আমরা দেশবাসীরাও তেমন আশাই করিতেছি। এবং আমরা একথাও স্পষ্টভাবে বলিতেছি যে, নেতারা যদি এখনও ব্যক্তিগত রেষারেষিকে বড় করিয়া দেখেন, তবে দেশের লোকেরা তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিবে না। আজ দেশ যে সঙ্কট মুহূর্ত্তের সম্মুখীন হইয়াছে, তাহাতে অনর্থক কথা কাটাকাটির সময় নাই। আজ আসিয়াছে সংগ্রামের আহ্বান; জগতের কেন্দ্রে কেন্দ্রে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় জনগণের রণভেরী বাজিয়া উঠিতেছে, ভারতও আজ বসিয়া থাকিবে না—আগাইয়া সে যাইবেই, এবং তেমন নেতাকেই ভারত চায় যিনি অপ্রতিহত প্রভাবে ভারতকে আগাইবার পথে পরিচালিত করিবেন; তুচ্ছ লাভ-লোকসানের হিসাবের বিড়ম্বনায় জাতিকে বিপর্য্যস্ত হইতে দিবেন না।

কংগ্রেসের সমস্যা—

গত শনিবার রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের কলিকাতায় আগমন উপলক্ষে তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য একটি সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় সুভাষচন্দ্র "দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতি" সম্পর্কে একটি বক্তৃতা করেন। সুভাষচন্দ্র এই বক্তৃতায় দেশের সমস্যা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন; কিন্তু যে সম্বন্ধে লোকে বিশেষভাবে আগ্রহযুক্ত ছিল তাঁহার কথা শুনিবার জন্য, সেই ত্রিপুরী কংগ্রেসের পরবর্ত্তী সমস্যার সম্বন্ধে তিনি কোন কথাই বলেন নাই। আমরা বাঙালীরা একটা বড় রকমের আশ্বস্তি তাঁহার বক্তৃতা হইতে পাইয়াছি কেবল একটি বিষয়ে—সে বিষয়টি হইল কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল সম্পর্কিত ব্যাপার। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় বলেন,—"মিউনিসিপ্যাল বিল লইয়া কলিকাতার ও বাঙলার জনসাধারণ উত্তেজিত হইয়াছে, এই সম্পর্কে কিছু নিবেদন করিতে চাই। এই সমস্যা শুধু হিন্দুর সমস্যা নহে, ইহা সমগ্র বাঙলার সমস্যা। ইহারই জন্য আমাদিগকে সংগ্রাম করিতেই হইবে। বাঙলার মুসলমানেরা কি উত্তেজিত হন নাই? তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবেন, তাঁহারাও এই বিল চাহেন না। তাঁহারা জানেন যেভাবে এই বিলে সংশোধনের চেষ্টা হইয়াছে, তাহার দ্বারা তাঁহাদের স্বার্থসিদ্ধি হইতে পারে না। আপনাদের কাছে নিবেদন ইহাকে সাম্প্রদায়িক সমস্যায় পরিণত করিবেন না। ইহার বিরুদ্ধে বাঙলার হিন্দু-মুসলমানকে লড়িতে হইবে। এক বৎসর পূর্ব্বে বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলীকে আমি বলিয়াছিলাম, ইহার জন্য আমি প্রাণপণ সংগ্রাম করিব। যখন আইন পেশ হয়, তখন আমি পীড়িত। আমি যে প্রতিশ্রুতি দেই তাহা কখনও ভুলি না। যে কথা আমি এক বৎসর পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম, আজ তাহার পুনরাবৃত্তি করিতেছি। আজ তাঁহারা গায়ের জোরে বাঙলার এসেম্বলীতে এই বিল পাশ করিতে পারেন, তাহা হইলেও আপনারা নিরাশ হইবেন না। বাঙলা এসেম্বলী যদি বদলাইতে পারে, তবে এই আইনও বদলাইতে পারিবে। ফজলুল হক সাহেবকে জানাইয়া দিতে চাই, এই আইন লইয়া আমরা লড়িব, ভাল করিয়াই লড়িব। এক বৎসরে যদি সফলকাম না হই, পাঁচ বৎসরে হইব। সত্য ও স্বাধীনতা আমাদের দিকে। তপশীলভুক্ত সম্প্রদায় পৃথক নির্ব্বাচন চাহেন না, তাঁহারাও যুক্ত-নির্ব্বাচন চান। আপনারা লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হউন। কিভাবে লড়াই করিতে হইবে, তাহার তিন চার রকম পথ আছে। যাহাতে শীঘ্র সাফল্যলাভ করা যায়, সেই পথ অবলম্বন করিতে হইবে। এজন্য যদি সত্যাগ্রহ করিতে হয় এবং পদত্যাগ করিতে হয় তজ্জন্য আপনারা প্রস্তুত থাকিবেন। আসন্ন সংগ্রামের জন্য আপনারা প্রস্তুত হউন। এই সংগ্রামই যেন ভারতবর্ষের ইতিহাসে শেষ সংগ্রাম হয়। এই সংগ্রামেই যেন আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিতে পারি।"

সুভাষচন্দ্র বলিয়াছেন—"ভারতব্যাপী যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, তাহার এক ধাক্কায় হয়ত হক মন্ত্রিমণ্ডলী ধ্বংস হইতে পারে। ১৯৩৫ সালের আইন যদি ধ্বংস হইতে পারে তবে এই বিলও সেই সঙ্গে ধ্বংস হইবে।" এ সব কথাই বুঝা যায় কিন্তু আমরা সব চেয়ে বড় বুঝি বাঙলায় প্রত্যক্ষভাবে জন-জাগরণ। বৃহত্তর ত্যাগের ভিতর দিয়া ছাড়া কোন জাতিই জাগিতে পারে না। মিউনিসিপ্যাল বিলের ভিতর দিয়া যে অনিষ্টের উদ্যম আরম্ভ হইয়াছে, তাহার অনিষ্টকারিতার সম্বন্ধে উগ্র অনুভূতির প্রকট-রূপে দেখিতে চাই আমরা বাঙলার জনসাধারণের মধ্যে।

মন্ত্রীদের পদত্যাগের কথা—

বাঙলাকে আজ এই দৃঢ় সংকল্প করিতে হইবে যে, এই বিলকে আমরা কিছুতেই কার্য্যে পরিণত হইতে দিব না। বাধা দিব সকল রকমে। এই যে সংকল্পশক্তি—সমষ্টিগতভাবে জাতির স্বার্থের এই যে অনুভূতি ইহাই বড় কথা। সেই অনুভূতির উগ্রতর অভিব্যক্তির অবশ্যম্ভাবিতাই অনিষ্টকারীদিগকে সংযত করিবে কিংবা যাহারা স্বার্থের টানে পড়িয়া দোদুল্‌বান্দার মত অবস্থায় আছেন, তাহাদিগকে ঠিক পথে আনিবে; নতুবা মন্ত্রীদের মধ্যে যাঁহারা এই ব্যাপার লইয়া পদত্যাগ করিবার কথা বলিতেছেন শুনিতেছি, তাঁহাদের গতিগতির উপর বিশ্বাসটুকুও আমরা বড় করিয়া দেখি না। কারণ স্বার্থের প্যাঁচ মানুষের অন্তরের ভিতর এমন সূক্ষ্মভাবে পাকে পাকে কাজ করে যে, অযুক্তি এমন কি কুযুক্তিকেও যুক্তি বলিয়া বুঝিয়া লইতে বেশী দেরী হয় না। হিন্দু মন্ত্রীরা সত্যই যদি পদত্যাগ করেন এই প্রশ্ন লইয়া ভালই। আমরা বুঝিব সঙ্গের প্রতিকূল প্রভাবের মধ্যেও মনুষ্যত্ব তাঁহারা হারান নাই; কিন্তু ক্ষমতা যাহারা হাতে পাইয়াছে কিংবা ক্ষমতাকে হাতে রাখাই যাহারা বড় বলিয়া বুঝে, পদ মান প্রতিষ্ঠাকেই যাহারা বড় দেখে, জনগণের জাগ্রত স্বার্থবুদ্ধিই শুধু তাহাদিগকে শোধরাইতে পারে। সেই উদারতর বুদ্ধি জাগ্রত না হওয়া পর্য্যন্ত এক মীরজাফর বা উমিচাঁদ শোধরাইলেও অন্যের আসিয়া মীরজাফর উমিচাঁদের জায়গা লইতে বিলম্ব ঘটিবে না। মন্ত্রিমণ্ডলের হিন্দু মন্ত্রীরা দুই বৎসরকাল বিপন্ন ইসলামের নামে তুর্কী নাচন এবং সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির প্রচার—সব করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের এই দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া আজ ম্যাকডোনাল্ডী বাটোয়ারার ছুরিতে হিন্দু সমাজের অখণ্ড দেহে চালাইবার নির্লজ্জ অভিযান সুরু হইয়াছে। হিন্দু সমাজের মধ্যে ভেদনীতি ঢুকাইয়া হিন্দু সমাজের সর্ব্বনাশের চেষ্টা চলিয়াছে। হিন্দু মন্ত্রীরা গণ্ডারের চামড়া গায়ে জড়াইয়া তৎসম্বন্ধে অনুভূতিবিহীন হইয়া রহিয়াছেন। আজ যদি সত্যই বিবেকের বেদনা তাঁহাদের দেখা দিয়া থাকে সুখের বিষয়; কিন্তু সে দিকে আমরা বড় ভরসা করি না—কারণ দুর্ব্বলতা স্বার্থকে কেন্দ্র করিয়া একবার ঢুকিলে তাহা কাটাইয়া উঠা কঠিন; বাঙলার জনসাধারণের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবল শক্তির আবহাওয়াই মন্ত্রিগোষ্ঠীর অক্ষুণ্ণ এই দুর্ব্বলতাকে সত্যভাবে এবং শক্তভাবে দূর করিতে পারে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি—

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গেল। এই অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং সমিতির সদস্যগণ বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিদিগকে লইয়া কার্য্যকরী সমিতি গঠন করিবার ভার সুভাষচন্দ্রের উপর দিয়াছেন। রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র যে সভাপতি নির্ব্বাচিত হইবেন, এ সম্বন্ধে অবশ্য কোন সংশয় ছিল না; কিন্ত এই ব্যাপারে লক্ষ্য করিবার বিষয় হইল সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে কংগ্রেস কর্ম্মীদের ঐক্যবদ্ধ কার্য্য করিবার যে মনোবৃত্তি—সেই জিনিষটি। বাঙলার কংগ্রেস কর্ম্মীদের এই যে ঐক্যবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিবার ইচ্ছা ইহা বড়ই আশার কথা। তাঁহারা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করিবার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াই আজ সুভাষচন্দ্রের হাতে সর্ব্ববিধ ক্ষমতা ছাড়িয়া দিয়াছেন। বাঙলার সম্মুখে আজ সংগ্রাম ঘনাইয়া আসিয়াছে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল সংশোধন বিলের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছেন। দুই এক দিনের মধ্যে কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইবে এবং কার্য্যকরী সমিতির অন্যতম প্রথম কর্ত্তব্য হইবে এই অনিষ্টকর এবং প্রতিক্রিয়ামূলক বিলের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হওয়া এবং তদুপযোগী কর্ম্মপদ্ধতির নির্দ্দেশ করা। গত বৎসরের কংগ্রেসের কাজ সম্পর্কে সম্পাদক মৌলবী আশরফ উদ্দিন চৌধুরী যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, আলোচ্য বর্ষে কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা দ্বিগুণ হইয়াছে। মুসলমান এবং তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের লোক সংখ্যা এই সদস্য তালিকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহা আশার বিষয় সন্দেহ নাই; কিন্তু কেবল সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার দিকেই লক্ষ্য রাখিলে চলিবে না, সদস্য করিতে হইবে এমন সব লোককে, যাহারা প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসের আদর্শে অনুপ্রাণিত। মান, যশ এবং সেইরূপ ভাবে কোন ফিকিরে নিজেদের কাজ বাগাইবার জন্য যাহারা কংগ্রেসী সাজে অথচ আসল কাজের বেলায় সকলের আগে ডুব দেয়, তেমন সদস্য থাকার চেয়ে আমরা না থাকাই ভাল মনে করি। কংগ্রেসের শক্তি বৃদ্ধি হইবে প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসের আদর্শের প্রতি সদস্যদের আন্তরিকতার ওজনে, সদস্যদের সংখ্যা এবং বিত্তোপপত্তির বিচারে নয়, এদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।

বাঙলার দুর্দ্দশা—

কবিকঙ্কণ ফুল্লরার মুখ দিয়া দুঃখের কাহিনী শুনাইয়াছেন 'অনল সমান পোড়ে বৈশাখের খরা'। অবস্থার ব্যতিক্রম কিছুই ঘটে নাই। বাঙলার বড় কষ্ট হইল গ্রীষ্মের জলকষ্ট। নিদারুণ জলকষ্টের ফলে কাদা ছানিয়া খাইয়া প্রতি বৎসর কলেরায় বাঙলা দেশে যেমন প্রাণহানি ঘটে, এ বৎসরও নানাস্থানে সেইরূপ প্রাণহানি আরম্ভ হইয়াছে। মফঃস্বলের নানাস্থান হইতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের খবর প্রত্যহ পাওয়া যাইতেছে। বৃষ্টি না হওয়ার ফলে আবাদের আশাও কিছু দেখা যাইতেছে না। নানারকমে আজ দেশের লোক বিপন্ন। দেশের এই গরীবদের প্রতি বাঙলার মন্ত্রীদের দরদ কতখানি, ইহা হইতেই সে বিষয়ে সামান্য কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে যে, বাঙলার মন্ত্রীদের বেতন, ভাতা, রাহা-খরচ প্রভৃতি বাবদ বৎসরে প্রায় সাত লক্ষ টাকা খরচ হইতেছে। ইহা ছাড়া বিভিন্ন সিলেক্ট কমিটি, তদন্ত কমিটি প্রভৃতির উমেদারদের তোয়াজ ত আছেই, তারপর, এই সব গরীব-প্রাণ মহোদয়েরা যাহাতে ঠাণ্ডা মাথায় এবং বহাল তবিয়তে গরীবের

সেবা করিতে পারেন, সেজন্য দাজ্জিলিংয়ের শৈল-শিখর-বিহারের ব্যবস্থার জন্যও ব্যয় আছে। বাঙলার মন্ত্রিমহোদয়েরা কচুরিপানা ধ্বংসের আন্দোলনের সম্পর্কে সরকারী কেতায় দেশের নানাস্থানে সফর করিয়া আসিলেন দেশের দুঃখ-দুর্দ্দশার এই দিকটা তাঁহাদের চোখে পড়িল কি? পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না। শুধু ফাঁকা কথায় দেশের লোকের পেট যে ভরে না, এবং দেশের লোকে যে তাঁহাদের মুখের ফাঁকা কথা শুনিয়া নিশ্চিন্ত নয়, অন্তত তাঁহারা এ অভিজ্ঞতাটা যে লাভ করিয়াছেন, বিভিন্ন স্থানে তাঁহাদের অভ্যর্থনা সম্পর্কে জনসাধারণের মতিগতি হইতেই সে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এমন কি প্রধান মন্ত্রী-মহোদয় এত আয়োজন করিয়া যে টাঙ্গাইল মহকুমায় দিগ্বিজয় করিতে গিয়াছিলেন অমাত্যবর্গ পরিবৃত হইয়া, সেখানেও এই তিক্ত অভিজ্ঞতাই তাঁহাকেও অর্জ্জন করিয়া আসিতে হইয়াছে।

ভারত কি করিবে—

গত সোমবার যুদ্ধ-বিরোধী দিবস উপলক্ষে আহূত জনসভায় বক্তৃতাকালে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বলেন—"আসন্ন যুদ্ধে ভারতকে প্রস্তুত করিবার জন্য সম্প্রতি ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে এক সংশোধক আইন পেশ করা হইয়াছে। তাহার প্রধান কথা এই যে, যুদ্ধ যদি বাধে তাহা হইলে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের হাতে যে সকল ক্ষমতা আছে, তাহাতে ভারত সরকার হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন অর্থাৎ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে যে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করা হইবে।"

সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধের সঙ্গে ভারতবাসীরা কোন সম্পর্ক রাখিবে না, কংগ্রেসে এই সংকল্প গৃহীত হইয়াছে; কিন্তু এই সংকল্প অনুযায়ী কাজ করা মুখে কথাটা বলা যত সোজা, তত সোজা নয় এবং পরে আরও থাকিবে না। রাষ্ট্রপতিও সে কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন—"হঠাৎ যদি যুদ্ধ বাধে তখন প্রচারকার্য্য চালাইবার সময় এবং সুযোগ থাকিবে না। সময় ও সুযোগ থাকিতে এই কাজ সম্পাদন করিতে হইবে। এই বাণী যদি ভাল করিয়া প্রচার হইতে পারে, তাহা হইলে যুদ্ধ বাধিলে ভারতের নর-নারী সেই যুদ্ধে যোগদান করিবে না।" রাষ্ট্রপতি যে নির্ব্বিঘ্নতার সুযোগ গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন, তাহার যৌক্তিকতা আমরা না বুঝি এমন নহে; কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, নির্ব্বিঘ্নতার পথে এই সংকল্পকে প্রকৃতপক্ষে কার্য্যকরী করা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। কার্য্যকরী উপায় সর্ব্বাপেক্ষা যেটি প্রয়োজনীয় উপায় তাহা নির্ভর করিতেছে প্রধানত ভারতের যে কয়েকটি প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এ সম্বন্ধে তাঁহাদের অবলম্বিত কর্ম্মপদ্ধতির উপর। মন্ত্রীগিরির মোহ কাটাইয়া কংগ্রেসী মন্ত্রীদিগকে কংগ্রেসের নির্দ্দেশিত নীতির মর্য্যাদা রক্ষায় কাজে নামিতে হইবে। ইতিমধ্যেই ভারত হইতে কয়েক দল ভারতীয় সেনা ইউরোপের সমরাতঙ্কে ইংরেজ অধিকৃত অঞ্চলে রওনা হইয়াছে। বড়লাট এরূপ ক্ষেত্রে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের বিভিন্ন দলের সহিত পরামর্শ করিবেন, সরকার পক্ষ হইতে এইরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। গত বৎসরের পূর্ব্ব বৎসর ভারত হইতে যখন চীনে সৈন্য প্রেরণ করা হয়, তখন ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সিমলা অধিবেশন চলিতেছিল, সেই সম্পর্কে কয়েকজন কংগ্রেসী সদস্যের কার্য্য কংগ্রেস পক্ষ হইতে সমালোচনার বিষয়ীভূত হইয়াছিল; কিন্তু এবার সে ভেজাল চুকাইয়া ফেলা হইয়াছিল। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন স্থগিত হইবার দুই দিন পরে বড়লাট দলের নেতাদিগকে ডাকেন, তখন দলের অনেকেই অনুপস্থিত ছিলেন; সুতরাং নেতারা নিজেদের দলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কোন কাজ করিতে পারেন নাই। এ রকম চাল অবশ্যই হইবে, সুতরাং এরূপক্ষেত্রে কংগ্রেসী দলের নেতাদের উপর কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষের সুস্পষ্ট এবং অলঙ্ঘনীয় বিশেষ নির্দ্দেশ থাকা আবশ্যক। সে বেলায়ও যদি কংগ্রেসী পার্লামেণ্টারী কাজকে বড় করিয়া দেখা হয়, তাহা হইলে এ সম্বন্ধে যত বড় বড় কথা সব অকেজো থাকিয়াই যাইবে। অন্যান্য সব অধীন দেশ, এইরূপ পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করিয়াছে এবং এখনও করিতে পারিলে ছাড়ে না; কিন্তু মূলে আবশ্যক উগ্র রকমের ত্যাগের স্পৃহা, দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইবার দুর্জ্জয় সংকল্প—কংগ্রেস সেই সংকল্পশীলতাকে সর্ব্বপ্রকার নিয়মতান্ত্রিক অধিকার-সংশ্লিষ্ট প্রলোভনের ঊর্দ্ধে যদি জাগ্রত রাখিতে পারে, তবেই এদিকে কিছু কাজ হইবে। দেশের লোকে চায় সেই জিনিষটি—ত্রিপুরীর কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনের মূলে যদি কিছু থাকে, আছে এই জিনিষটি।

সুবিচারের নিরিখ—

নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত বিনায়ক দামোদর সাভারকর মার্কিন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের নিকট নিম্নলিখিত তার প্রেরণ করিয়াছেন—"পশু বলের সাহায্যে পর রাজ্য আক্রমণ হইতে গণতান্ত্রিকতাকে এবং মানবের স্বাধীনতাকে নিরাপদ রাখিবার নিঃস্বার্থ আগ্রহ প্রণোদিত হইয়াই আপনি হিটলারের নিকট পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। অনুগ্রহ করিয়া গ্রেট ব্রিটেনকে ভারতবর্ষ হইতে সমস্ত প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার নীতি প্রত্যাহার করিয়া লইতে বলুন এবং ভারতবর্ষকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিতে বলুন। একটা ক্ষুদ্র রাজ্য যে, আন্তর্জ্জাতিক সুবিচার পাইতে পারে, অন্তত ভারতের ন্যায় একটি মহান দেশ সে সুবিচারের আশা করিতে পারে।"

ভারতবর্ষ আজ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার চায়। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিউনিক চুক্তি স্বাক্ষরের বেলায় আত্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে ওকালতি করিয়া বলিয়াছিলেন—"চেকোশ্লোভাকিয়ার জার্ম্মানরা আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী করিয়া যখন জার্ম্মানীর সঙ্গে যুক্ত হইতে চাহে তখন তাহাতে আপত্তি করা ইংলণ্ডের উচিত নহে।" ভারতের বেলায় কিন্তু এ যুক্তির কোন মূল্যই নাই—তাহার কারণ এই যে, চেকোশ্লোভাকিয়ার এবং মেমেলের জার্ম্মানদের দাবীর পিছনে হিটলারের গুঁতার ভয় রহিয়াছে; কিন্তু ভারতবাসীরা দুর্ব্বল এবং অসহায়। এ জগতে দুর্ব্বল

যে, সে সব চেয়ে বড় পাপী, তাহার সেই এক মহাপাপের জন্য তাহার পক্ষে যত যুক্তিই থাকুক কোনটি কিছুমাত্র কাজে আসে না। আইরিশ বিদ্রোহের বার্ষিকী স্মৃতিতিথি প্রতিপালন দিবসে বক্তৃতা করিতে গিয়া সেদিন আয়ারের প্রধান মন্ত্রী ডি ভেলেরা বলিয়াছেন—"যতদিন পর্য্যন্ত উত্তর আয়র্লণ্ড এবং দক্ষিণ আয়র্লণ্ড এই ব্যবচ্ছেদ নীতি বজায় থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত ইংরেজের সঙ্গে আমাদের কিছুতেই বন্ধুতা জন্মিতে পারে না। আইরিশরা যখনই রাজনীতিকদের মুখে পররাজ্য আক্রমণের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ শুনে, তখনই তাহাদের মনে জাগে এই সত্যটি যে, উত্তর আয়র্লণ্ডে বহু শতাব্দীকাল ধরিয়া নিরবচ্ছিন্নভাবে এই পররাজ্য গ্রাসের নীতি বলবৎ রহিয়াছে।" ডি ভেলেরার কথা ফাঁকা কথা নয়—পিছনে জোর আছে; তাই ইংরেজের কাছে আজ তাঁহার যুক্তির কদর হইতেছে। কিন্তু ভারতের সম্বন্ধে ব্যাপার বিপরীত। কারণ কি? ভারতকে আজ যদি আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করিতে হয়, তাহাকে নিজেদের সংকল্পশক্তির পরিচয় প্রদান করিতে হইবে, নতুবা কোন কর্ত্তার কোন রকমের উদারতাই ভারতের ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারিবে না।

আত্মদাতাদের স্মৃতি পূজা—

গত ১৯৩০ সালের ২৩শে এপ্রিল পেশোয়ারের কিসাখানী বাজারে সেনাদের গুলী চালনার ফলে বহু সংখ্যক সত্যাগ্রহী মৃত্যু বরণ করেন। গত ২৪শে এপ্রিল খান আব্দুল গফুর খান এই সব সহীদের নবম বার্ষিক স্মৃতি উদ্‌যাপন করেন। ঐস্থানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে। ৪ শত লাল কোর্ত্তা সেনা স্মৃতিস্তম্ভের নিকট গিয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে। খান আব্দুল গফুর খান সমবেত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলেন—"আজ আমরা যে পবিত্র ভূমির উপর দণ্ডায়মান রহিয়াছি, সেখানে দেশমাতৃকার বীর সন্তানগণ নির্ভীকভাবে দেশের জন্য জীবন দান করিয়াছেন। হিন্দু, মুসলমান, শিখ ইহাদের রক্ত একসঙ্গে অজস্র ধারায় বহিয়া গিয়া এই ভূমিকে সমভাবে সিক্ত করিয়াছে। এই ক্ষুদ্র স্মৃতিস্তম্ভ তাহাদের অতুলনীয় সাহস এবং আত্মদানের মহিমা চিরকাল প্রচার করিবে এবং স্বাধীনতার সাধনায় আমাদের স্বদেশবাসীদের অন্তরে অনুপ্রেরণার সঞ্চার করিবে, ঐক্য বুদ্ধিকে সুদৃঢ় করিবে। বীরের মৃত্যু নাই। মৃত্যুর দ্বারা তাঁহারা অমরত্বেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।"

আত্মদাতাদের শোণিত নিষেক কখনই ব্যর্থ হয় না, জগতের ইতিহাস জ্বলন্ত অক্ষরে ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিবে। পেশোয়ার এবং জালিয়ানওয়ালাবাগে যে পশুশক্তি স্পর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছিল, কাল যতই অতীত হইবে ততই সে স্পর্দ্ধার উপর মানব সমাজের ধিক্কারের পরিমাণ পরিবর্দ্ধিত এবং পুঞ্জীভূত হইবে উপরন্তু উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে তাহাদেরই মহিমা যাহারা পশু শক্তির কাছে আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করে নাই। জাগ্রত জীবনলক্ষ্মী তাহাদের কণ্ঠে বিজয় মাল্য পরাইয়া দিয়াছেন। মহাকাল দেবতার অন্তরের কাছে মহেন্দ্র-মন্দিরে হইয়াছে তাহাদের প্রতিষ্ঠা। কালের কি সাধ্য আছে—তাহাদের স্মৃতিকে বিমলিন করিতে পারে?

বন্ধু ও শত্রু—

কেরেনেস্কির নাম সকলেই জানেন। ইনি বলশেভিক বিপ্লবের প্রাক্কালে রুশ সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। বর্ত্তমানে কেরেনেস্কি প্যারিসে আছেন। তিনি সেদিন সাংবাদিকদের নিকট একটি বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, নাৎসী আন্দোলন শুধু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শত্রু নয়, সমগ্রভাবে এশিয়ার এবং বিশেষভাবে ভারতবর্ষেরও শত্রু। কেরেনেস্কি বলেন, ভারতবাসীদের মনে যদি এই ধারণা জন্মে যে, ফ্যাসিষ্টরা তাহাদের স্বাধীনতার আন্দোলনের সাহায্য করিবে, তবে তাহারা মারাত্মক ভুল করিবে। কেরেনেস্কি যে কথা বলিয়াছেন, ভারতবাসীরা তাহা না বুঝে এমন নয়। যে ফ্যাসিষ্টরা স্পেন গণ-তন্ত্রের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, যে ফ্যাসিষ্টরা আবিসিনিয়ার স্বাধীনতা হরণ করিয়াছে, যাহারা চেক দেশকে কুক্ষিগত করিয়াছে, তাহারা করিবে পতিত এবং পরাধীন ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতা লাভের পক্ষে সাহায্য? এ কথা অতি বড় মূর্খও বিশ্বাস করিবে না। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য পররাজ্য শোষণকারী, দস্যুস্বভাব সাম্রাজ্যবাদীরা চিরকাল যেরূপ প্রচারকার্য্য চালায়, শুনিতেছি, নাৎসীরাও ভারতবাসীদের মন ভিজাইবার জন্য সেইরূপ প্রচারকার্য্য আরম্ভ করিয়াছে; কিন্তু তাহাদের মূল উদ্দেশ্য কি, ভারতবাসীদের চোখের উপর এত কাণ্ড ঘটার পরও কি সে সম্বন্ধে ভুল করিবে, তাহারা ইহাই মনে করে। ভারতবাসীরা বুঝিয়াছে অন্তত দীর্ঘদিন ইংরেজের শিক্ষানবিশীতে থাকিয়া এই সত্য কথাটি যে, ইউরোপের রাজনীতিকদের মুখে মিঠা-কথা যেখানে যত বেশী, সেইখানে তাহাদের অন্তরে গরল ততখানি। আমরা সাম্রাজ্যবাদীদের স্পষ্টবাদিতাকে বরং প্রশংসা করি, কিন্তু ঘৃণা করি, এই ধরণের ভণ্ডামিকে। ভারতবাসীরা অসহায় হইতে পারে, হইতে পারে তাহারা নিরস্ত্র, তবু মনুষ্যত্বকে পশুবল বা আসুরিকতার কাছে কিছুতেই তাহারা বলি দিতে প্রস্তুত নয়। অতীত ভারত এককালে মানবের অন্তর-মহিমার যে মহনীয়-তত্ত্ব প্রচার করিয়াছিল, নবীন ভারতও যেদিন জাগিবে মৃত্যুর মধ্য দিয়া অমৃতের সেই বাণীই উদাত্তকণ্ঠে প্রচার করিবে।

মহাত্মাজীর পরাজয়ের কারণ—

মহাত্মা গান্ধী ভগ্নহৃদয়ে রাজকোট পরিত্যাগ করিয়াছেন। রাজকোট পরিত্যাগের পূর্ব্বে তিনি রাজকোটের দেওয়ান মিঃ বীরবলকে জানান—আমার পরাজয় হইয়াছে এবং জয়ী হইয়াছেন আপনিই। মহাত্মা গান্ধী সূক্ষ্ম রাজনীতিক, রাজনীতিতে যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রয়োজন হয়, সে বুদ্ধি তাঁহার বিশেষরকমে আছে। কিন্তু মিঃ বীরবলের চালের কাছে তাঁহাকেও হার মানিতে হইল। এই যে পরাজয়, এ পরাজয়ের কারণ কি? আমাদের মনে হয় এ সম্বন্ধে শুধু একটা কথা,

তাহা এই যে, বিধি মার্গের প্রতি একটা আত্যন্তিক নিষ্ঠাই হয়ত কতকটা অবোধপূর্ব্বকভাবে মহাত্মাজীর অন্তরে কাজ করিয়া তাঁহার এই পরাজয় ঘটাইয়াছে। মহাত্মাজী রাজকোট সমস্যার সমাধানের নিমিত্ত প্রত্যক্ষভাবে একেবারে উচ্চস্তরের আধ্যাত্মিক মার্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন, এই আধ্যাত্মিক মার্গকে অন্য কথায় বলা যায় রাগমার্গ, অর্থাৎ বিধি বিধানের হিসাব-নিকাশ হইতে মানুষের মনোবৃত্তিকে উপরে—ভালবাসা বা প্রেমের রাজ্যে তুলিয়া সমস্যার সমাধান করা; কিন্তু শেষটা এই নীতির গতি, বিধি মার্গ অর্থাৎ আইন-কানুনের পারিভাষিক ধারার মধ্যেই গিয়া পড়ে। বড়লাট এবং স্যার মরিস গায়ারের সালিশীর ভিতর দিয়াই এই বিধিমার্গানুবর্ত্তির স্বরূপ প্রকাশ পায়। অবশেষে এই বিধি বিধানের প্যাঁচের মধ্যে পড়িয়াই মহাত্মাজীর আধ্যাত্মিক সাধনার উদ্দেশ্য বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে। ঐশ্বর্য্য জ্ঞানই সূক্ষ্মভাবে মহাত্মাজীর পরাজয়ের মূলে রহিয়াছে। এই ঐশ্বর্য্য জ্ঞান থাকিতে কোন আধ্যাত্মিক স্তর হইতে কোন ক্ষেত্রে সাধনায় সাফল্যলাভ হয় না। বড়লাট এবং স্যার মরিস গায়ারের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের ভিতর না পড়িয়া যদি জনশক্তির দিকে মুখ্যভাবে এই সাধনা কেন্দ্রীভূত হইত, তাহা হইলে দেওয়ান বীরবলের কোন যুক্তি-বুদ্ধিই সেখানে জয়ী হইতে পারিত না—ইহাই আমাদের বিশ্বাস। অহিংসার শক্তি সেখানে কাজ করে প্রত্যক্ষভাবে, পরোক্ষভাবে করে না, অর্থাৎ অন্য একজনের মারফতে করে না। মহাত্মাজীর অধ্যাত্মসাধনার অহিংস প্রভাব যখন ঠাকুর সাহেব এবং দেওয়ান বীরবলের উপর প্রত্যক্ষভাবে কাজ করে নাই—এবং সেই দিককার ব্যর্থতাকে এড়াইবার জন্য উহা অন্যের আশ্রয় খুঁজিয়াছিল, খুঁজিয়াছিল আইনের ভাষার ব্যাখ্যার খুঁটি-নাটির দিকে, তখনই এই পরাজয়ের বীজ যে কোথায় তাহা বুঝিতে পারা গিয়াছিল। গরু খাইতে খাইতে বাঘের গরুর উপর অরুচি কখনই হয় না, গরুর উপর বাঘের অরুচি জন্মাইতে হইলে বাঘের স্বভাব বদলাইতে হয়, মহাত্মাজী আধ্যাত্ম প্রভাব-প্রয়োগে ঠাকুর সাহেব এবং মিঃ বীরওয়ালার স্বভাব বদলাইতে পারেন নাই। ইহা হইতেছে সমস্যা।

বড়লাটের ডিক্টেটরী—

পার্লামেণ্টারী সভায় ভারত-সচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড সেদিন ভারতীয় শাসন আইনের সংশোধন বিল উপস্থিত করিয়া যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে কিছু নূতন তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে। ভারত-সচিব এই সংশোধন বিলের সম্বন্ধে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মন্ত্রীদের মত জানিতে চাহিয়াছিলেন। পাঠকবর্গ অবগত আছেন, এই বিলের ৪র্থ ধারায় বড়লাটের হাতে এমন কতকগুলি জরুরী ক্ষমতা দেওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে, যেগুলির সাহায্যে তিনি প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের মূলগত অধিকারকে উড়াইয়া দিয়া প্রাদেশিক মন্ত্রীদের সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে লইতে পারিবেন। বড়লাটের এই যে স্বেচ্ছাচারশক্তি ইহা কোন্ পক্ষে, কোন্ প্রদেশের মন্ত্রীরা কি মত দিয়াছেন, জানিবার জন্য লোকের কৌতুহল হওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু ভারত-সচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড গুমর ফাঁক করেন নাই। তিনি বলেন, তিনটি প্রদেশের মন্ত্রীরা কোনরূপ মত প্রকাশ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। আর অধিকাংশ প্রদেশের মন্ত্রীরা বড়লাটের হাতে ক্ষমতা প্রদানের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। বাঙলা এবং পাঞ্জাবের মন্ত্রীরা যে আমাদের বর্ত্তমান ভারত-সচিব মহোদয়ের বিশেষ পেয়ারের পাত্র, এ পরিচয় আমরা পূর্ব্বেই পাইয়াছি। বর্ত্তমান বিবৃতিতেও ভারত-সচিব নিতান্ত নিরপেক্ষ মনোবৃত্তির স্তরে উঠিয়া বাঙলা ও পাঞ্জাবের মন্ত্রীদের প্রতি তাঁহার এই যে বিশেষ প্রেম, ইহাকে সংযত রাখিতে পারেন নাই। তিনি এবারও বাঙলা এবং পাঞ্জাবের মন্ত্রীদিগকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন। বাঙলা এবং পাঞ্জাব—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঘাটী এই দুইটি স্থানে মজবুত রাখিতেই হইবে, এই মতলব আঁটিয়াই ভারত শাসন আইন প্রণয়ন করা হইয়াছিল। বাঙলা দেশ হইল ভারতের মস্তিষ্কস্বরূপ এবং পাঞ্জাব হইল বাহু। ভারতের রাষ্ট্রীয় দেহে এই দুই কেন্দ্রে সাম্রাজ্যবাদ অটুট রাখিতে হইবে, ইহাই কর্ত্তাদের ছিল আগাগোড়া উদ্দেশ্য। তৎকালীন ভারত-সচিব স্যার স্যামুয়েল হোর ভারত শাসন আইন সম্পর্কিত আলোচনার মুখে একথাটা স্পষ্টভাষাতেই প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি ব্রিটিশ জাতিকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছিলেন যে, ভারত শাসন আইনে ব্যবস্থা পরিষদের আসন বণ্টন এমন কূট-কৌশলের ভিতর দিয়া করা হইয়াছে যে, পাঞ্জাবে এবং বাঙলা দেশে কংগ্রেস কিছুতেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারিবে না। এই দুই প্রদেশে ভেদনীতির সাহায্যে জাতীয় শক্তি দুর্ব্বল রাখাতেই সাম্রাজ্যবাদীদের নিশ্চিন্ততা। বাঙলা এবং পাঞ্জাবের বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডল সর্ব্বতোভাবে প্রভুদের এই দিক হইতে মনস্তুষ্টি সাধন করিতেছেন। সুতরাং গুরুদেবদের আশীর্ব্বাদ তাঁহারা তো লাভ করিবেনই বিশেষভাবে বাঙলা দেশের মন্ত্রীরা; এবং সেই জন্যই বোধহয়, ভারত-সচিবের মুখ হইতে এই দুই প্রদেশের মন্ত্রীদের প্রসংশাসূচক বচনই বাহির হয়, তখন আগে বলিতে শোনা যায় বাঙলার নাম। যে বাঙলা দেশ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য দুর্দ্দম পিপাসা জাগাইয়াছিল, মডারেট মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে যে বাঙলার নির্ম্মম বিক্ষোভ হইতে একদিন সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্রের ন্যায় রাজনীতিকেরা নিস্তার পান নাই; সেই বাঙলা দেশে চলিতেছে আজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের দরদের দরদী—মন্ত্রীদের রাজত্ব। এই যে গ্লানি, এই গ্লানি হইতে বাঙলা দেশ কতদিনে মুক্তিলাভ করিবে, কে জানে? জগতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামশীল সমাজে বাঙালীর এই যে দুর্ণাম, এই দুর্ণাম হইতে বাঙালীকে রক্ষা করিবার জন্য বাঙলার জনসমাজের মধ্যে জাতির বৃহত্তর স্বার্থের অনুভূতি কি জাগিয়া উঠিবে না?

মানবীয় ঐক্যের আদর্শ

শ্রীঅরবিন্দ

ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের উৎপত্তি

জাতীয় অহমিকা বর্ত্তমান থাকিলে, সংঘর্ষের পথগুলি খোলা থাকিলে, ইহার কারণগুলি, সুযোগগুলি বর্ত্তমান থাকিলে অজুহাতের অভাব কোন দিনই হইবে না। বর্ত্তমান যুদ্ধটি আসিয়াছে কারণ প্রধান প্রধান জাতিগুলি বহুকাল ধরিয়াই এমনভাবে কার্য্য করিতেছিল যেন উহা অবশ্যম্ভাবী হয়; ইহা আসিয়াছে কারণ বলকানে (Balkan) গোলমাল ছিল, নিকট প্রাচ্যে আশা আকাঙ্ক্ষা ছিল, উত্তর আফ্রিকায় বাণিজ্য ও উপনিবেশ লইয়া প্রতিযোগিতা ছিল—প্রধান প্রধান জাতিগুলি এই সম্পর্কে বন্দুক ও বোমা ধরিবার বহু পূর্ব্ব হইতে শান্তির সময়েই দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত ছিল। মরক্কো হইতে ত্রিপোলি, ত্রিপোলি হইতে থ্রেস ও মাসেডোনিয়া, মাসেডোনিয়া হইতে হেরজেগোভিনা—সবের ভিতর দিয়া বৈদ্যুতিক শিকল কার্য্য ও কারণের, কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের সেই অপ্রতিরোধ্য গতি লইয়া চলিয়াছিল যাহাকে আমরা "কর্ম্ম" বলি, পথে উহা ছোট ছোট আস্ফুটন ঘটাইয়াছিল, শেষে ঠিক দাহ্য স্থানটিতে উপস্থিত হইয়া যে বিরাট বিস্ফোরণের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা ইউরোপকে রক্তসিক্ত ও ধ্বংসাবশেষে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। বলকান সমস্যাটি চূড়ান্তভাবে মীমাংসিত হইলেও হইতে পারে, যদিও সে বিষয়ে নিশ্চয়তা আদৌ নাই; জার্ম্মানীকে আফ্রিকা হইতে সম্পূর্ণভাবে বিতাড়িত করিলে বর্ত্তমানে যাহারা মিত্র এমন তিনটি কিম্বা চারটি জাতির অধিকারে ঐ দেশটি থাকায় সেখানে অবস্থা শান্ত হইতে পারে। কিন্তু যদিও জার্ম্মানীকে মানচিত্র হইতে একেবারে মুছিয়া দেওয়া হয় এবং ইউরোপে একটা শক্তি হিসাবে জার্ম্মানীর বিরাগ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাসমূহ লুপ্ত হইয়া যায়, তথাপি সংঘর্ষের মূল কারণগুলি থাকিয়াই যাইবে। তখনও এশিয়ায় নিকট প্রাচ্য ও সুদূর প্রাচ্যের সমস্যা থাকিবে, তাহা নূতন অবস্থা, নূতন রূপ গ্রহণ করিতে পারে এবং তাহার অংশগুলির নূতন বিভাগ ও বণ্টন হইতে পারে, কিন্তু উহা এমন বিপৎসঙ্কুল হইয়া থাকিবে যে, যদি নির্ব্বোধভাবে সমস্যাটির মীমাংসা করা হয় অথবা উহা আপনা আপনিই মীমাংসিত হইয়া না যায়, তাহা হইলে ইহা বেশই ভবিষ্যদ্বাণী করা যাইতে পারে যে, এর পরের মহাযুদ্ধে এশিয়াই প্রথম ক্ষেত্র বা উৎপত্তি স্থান হইবে। আর যদি ঐ সমস্যাটিরও সমাধান হয়, যতদিন জাতীয় অহমিকা ও লোভ নিজ তৃপ্তির সন্ধান করিবে ততদিন সংঘর্ষের নূতন নূতন কারণ আবির্ভূত না হইয়াই পারে না; আর যতদিন উহা জীবিত থাকিবে ততদিন সে নিজ তৃপ্তি খুঁজিবেই এবং উদরপূর্ত্তির দ্বারা কখনই উহাকে স্থায়ীভাবে সন্তুষ্ট করা যাইবে না। যেমন বৃক্ষ, তাহার ফল তেমনি হইবেই, আর প্রকৃতি হইতেছে সকল সময়েই অতি যত্নশীল উদ্যানপালক।

যুদ্ধ ও যুদ্ধোপকরণ সীমাবদ্ধ করা
(The limitation of war and armaments)

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সৈন্যবল ও যুদ্ধোপকরণ সীমাবদ্ধ করা হইতেছে ভুয়া প্রতিকার। যদিই এই সবকে নিয়ন্ত্রিত করিবার একটা কার্য্যকরী আন্তর্জাতিক উপায় আবিষ্কৃত হয়, যুদ্ধের ঝঞ্ঝনা বাজিয়া উঠিলেই তাহার কার্য্যকারিতার অবসান হইবে। বর্ত্তমান যুদ্ধ প্রমাণিত করিয়াছে যে, যুদ্ধ চলিতে চলিতেই একটা দেশকে অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ারী করিবার এক বিরাট কারখানায় পরিণত করা যায় এবং একটা জাতি তাহার সমগ্র শান্তিপ্রিয় পুরুষশক্তিকে সৈন্যদলে পরিণত করিতে পারে। ইংলণ্ড ক্ষুদ্র এমন কি নগণ্য সৈন্যদল লইয়াই আরম্ভ করিয়াছিল কিন্তু সে এক বৎসরের মধ্যেই লক্ষ লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করিতে এবং দুই বৎসরের মধ্যে তাহাদিগকে শিক্ষিত ও সুসজ্জিত করিয়া যুদ্ধে নামাইতে সমর্থ হইয়াছিল। এই দৃষ্টান্তই যথেষ্টভাবে শিক্ষা দিতেছে যে, সৈন্যদল ও যুদ্ধোপকরণ সীমাবদ্ধ করিলে কেবল শান্তির সময়েই জাতির বোঝা কম হইতে পারে এবং ঠিক সেই কারণেই সে যুদ্ধের জন্য বেশী প্রস্তুত হইয়া থাকিবে, কিন্তু উহা যুদ্ধের বিভ্রাটের উগ্রতা ও বিস্তার নিবারণ করিতে, এমন কি কম করিতেও সমর্থ হইবে না। আর যদি কঠোরতর আন্তর্জাতিক আইন রচনা করা হয় এবং তাহার প্রয়োগের জন্য অধিকতর কার্য্যকরী শক্তির ব্যবস্থা করা হয় তাহাও পূর্ণ বা সংশয়শূন্য প্রতিকার হইবে না। অনেক সময় বলা হয় যে, এইটিই হইতেছে প্রয়োজনীয় জিনিষ, বলা হয় যে, জাতির মধ্যেই যেমন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, পরিবারে পরিবারে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিবাদ বলের দ্বারা নিষ্পত্তি করিবার প্রথা রদ করিয়া আইনের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে, তেমনি আন্তর্জাতিক জীবনেও ঐরূপ বিকাশ সম্ভব হওয়া উচিত। সম্ভবত, শেষ পর্য্যন্ত তাহাই হইবে; কিন্তু এখনই উহা সফলতার সহিত কার্য্য করিবে এরূপ আশা করার অর্থ হইতেছে আইনের কার্য্যকরী কর্ত্তৃত্ব শক্তির প্রকৃত ভিত্তিটি সম্বন্ধে অনবহিত হওয়া এবং একটি সুগঠিত জাতির অঙ্গ সকল ও যে অসম্পন্ন আন্তর্জাতিক ঐক্য আরম্ভ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে তাহার অঙ্গ সকল—এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্যটি উপেক্ষা করা।

একটা জাতি বা সমাজের মধ্যে আইনের যে কর্ত্তৃত্ব তাহা বস্তুত পক্ষে মনুষ্য-রচিত বিধি বা বিধানের কোনরূপ "মহিমা" বা রহস্যময় শক্তির উপর নির্ভর করে না। ইহার শক্তির বাস্তব মূল হইতেছে দুইটি, প্রথমত, এইটিকে রক্ষা করিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের অথবা প্রাধান্যশালী সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের অথবা সমগ্র সমাজেরই প্রবল স্বার্থ এবং দ্বিতীয়ত, সজ্জিত সামরিক শক্তি পুলিশ ও সৈন্যের উপর একাধিপত্য—ইহার দ্বারা ঐ স্বার্থটি কার্য্যকরী হয়। ন্যায়ের দণ্ড কেবল উপমামাত্র, উহা কাজ করে কেবল এইজন্য যে, উহার পিছনে সত্যিকারের একটি দণ্ড থাকে, তাহা উহার হুকুমগুলিকে জোর করিয়া চালায় এবং বিদ্রোহী ও অপরাধিগণকে শাস্তি দেয়। আর এই সামরিক শক্তির বিশিষ্ট লক্ষণ হইতেছে এই যে, ইহা কাহারও সম্পত্তি নহে, যে রাষ্ট্র বা রাজা বা শাসক শ্রেণীতে সার্ব্বভৌম কর্ত্তৃত্ব কেন্দ্রীভূত, ঐ সামরিক শক্তি তাহারই, উহা সমাজের কোন ব্যক্তি বিশেষ বা কোন বিশেষ সঙ্ঘ বা সম্প্রদায়ের নহে। আর

ব্যক্তি বিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষের অধীনে যদি অন্য সজ্জিত শক্তি থাকে এবং তাহা যদি রাষ্ট্রের সজ্জিত শক্তির সমান হইয়া উঠে অথবা উহার একাধিপত্যকে ক্ষুণ্ণ করে, আর ঐ সব শক্তির উপর যদি কেন্দ্রীয় শাসনের কোন আধিপত্য না থাকে এবং কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে উহাদিগকে প্রয়োগ করিবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে আর কোনরূপ নির্ব্বিঘ্নতা সম্ভব হয় না। এমন কি, একমাত্র ও কেন্দ্রীভূত সামরিক সজ্জিত শক্তির দ্বারা সমর্থিত কর্ত্তৃত্ব থাকা সত্ত্বেও, আইন ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির, সম্প্রদায়ের সহিত সম্প্রদায়ের সংঘর্ষ নিবারণ করিতে সমর্থ হয় নাই, কারণ উহা সংঘর্ষের মনস্তত্ত্বমূলক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য কারণগুলি দূর করিতে পারে নাই। দুষ্কর্ম্ম ও তাহার শাস্তি হইতেছে একপ্রকার পারস্পরিক দৌরাত্ম্য, একপ্রকার বিদ্রোহ ও গৃহযুদ্ধ; এমন কি যে সব সমাজে পুলিশের ব্যবস্থা সর্ব্বোত্তম এবং যেখানকার লোক বিশেষভাবে আইনের অনুগত সেখানেও দুষ্কর্ম্ম অদম্যভাবে চলিতেছে, এমন কি দুষ্কর্ম্মের জন্য অর্গ্যানিজেশন এখনও সম্ভব, যদিও তাহা স্থায়ী বা শক্তিশালী হয় না কারণ সমস্ত সমাজের প্রচণ্ড জনমত ও কার্য্যকরী অর্গ্যানিজেশন তাহার বিরুদ্ধে থাকে। কিন্তু এই বিষয়ে আরও প্রাসঙ্গিক হইতেছে এই যে, আইন সংঘবদ্ধ জাতির মধ্যে পৌরবর্গের বিবাদ এবং অস্ত্রশস্ত্র লইয়া প্রচণ্ড সংঘর্ষ যথাসম্ভব হ্রাস করিলেও একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে সক্ষম হয় নাই। যখনই কোন শ্রেণী বা মতবাদ নিজেকে নিপীড়িত বা অসহ্যভাবে অত্যাচারিত বলিয়া বোধ করিয়াছে, আইন এবং সজ্জিত শক্তিকে এমন সম্পূর্ণভাবে বিরুদ্ধ স্বার্থের সহিত মিলিত হইতে দেখিয়াছে, যে আইনের মূলনীতিকেই অমান্য করা এবং অত্যাচারের দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের দৌরাত্ম্যকেই একমাত্র প্রতিকার বলিয়া অনুভব করিয়াছে, তখনই সে কৃতকার্য্যতার সম্ভাবনা দেখিলে বলের দ্বারা প্রতিকারের প্রাচীন পন্থাটিই অবলম্বন করিয়াছে। এমন কি আমাদের নিজেদের যুগেই আমরা দেখিয়াছি যে, সর্ব্বাপেক্ষা আইন-পালনকারী জাতিগুলিও নিয়মতান্ত্রিক গৃহযুদ্ধের অতি সন্নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে এবং দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন রাষ্ট্রবিদেরাও তাঁহাদের মতবিরুদ্ধ আইন প্রচলিত হইলে ঐ পন্থাই অবলম্বন করিতে নিজেদিগকে প্রস্তুত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন—যদিও ঐ আইন রাজার অনুমোদন সহ দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবস্থাপক সভায় মঞ্জুর হইয়াছিল।

কিন্তু বর্ত্তমানে যাহা সম্ভব এমন যে-কোন শিথিল আন্তর্জ্জাতিক সংগঠনে সজ্জিত সামরিক শক্তি তাহার অন্তর্ভুক্ত মণ্ডলীসমূহের মধ্যেই বিভক্ত হইয়া থাকিবে, তাহা কোন সার্ব্বভৌম কর্ত্তৃত্ব, অতি-রাষ্ট্র (super-state) বা ফেডারেল (federal) কৌন্সিলের অধীনে থাকিবে না। অবস্থাটি সামন্ত যুগের (feudal ages) বিশৃঙ্খল অর্গ্যানিজেশনেরই অনুরূপ হইবে, তখন প্রত্যেক সামন্ত বা ব্যারনের স্বতন্ত্র কর্ত্তৃত্ব ও সামরিক সংগতি ছিল। এবং সে যথেষ্ট শক্তিমান হইলে অথবা তাহার সমকক্ষদের মধ্য হইতে যথেষ্ট সংখ্যক মিত্র পাইলে রাজার কর্ত্তৃত্বকেও অগ্রাহ্য করিতে পারিত। আর এই (আন্তর্জ্জাতিক) ক্ষেত্রে সামন্তাধিরাজের মতও একজন কেহ থাকিবে না, এমন কোন রাজা থাকিবে না যে সে-যুগে আর কিছু না হইলেও, প্রকৃত অধিরাজ না হইলেও, অন্তত তাহার সমকক্ষদের মধ্যে প্রধান ছিল, তাহার রাজ সম্মান ছিল এবং সেটিকে শক্তিপূর্ণ ও স্থায়ী বাস্তবতায় পরিণত করিবার মত কিছু সুযোগও তাহার ছিল।

আর জাতি সকল এবং তাহাদের স্বতন্ত্র সামরিক শক্তিকে সংযত রাখিবার জন্য তাহাদের উপর যদি কোনরূপ মিশ্রিত সামরিক শক্তির প্রতিষ্ঠা করা যায় তাহাতেও অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি হইবে না, কারণ প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধ আরম্ভ হইলেই ঐ মিশ্রণটি ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং খণ্ডগুলি পরস্পরের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত আপন আপন মূল জাতিতে ফিরিয়া যাইবে। বিকশিত অধিজাতির মধ্যে ব্যক্তিই হইতেছে ইউনিট (Unit) এবং সে বহু ব্যক্তির সমূহের মধ্যে ডুবিয়া থাকে, সংঘর্ষ বাধিলে তাহার পক্ষে কত শক্তি সে সংগ্রহ করিতে পারিবে সে-বিষয়ে সে নিশ্চয় করিয়া কোন হিসাব করিতে সক্ষম হয় না, যে-সকল ব্যক্তি তাহার সহিত যুক্ত নহে তাহাদের সকলকেই সে ভয় করে। কারণ সে তাহাদিগকে রুষ্ট কর্ত্তৃপক্ষেরই স্বাভাবিক সমর্থক বলিয়া মনে করে, বিদ্রোহ তাহার পক্ষে অতিশয় বিপজ্জনক ও অনিশ্চিত ব্যাপার, এমন কি ষড়যন্ত্রের সূত্রপাতেই প্রতি মুহূর্ত্তে থাকে সহস্র ভীতি ও বিপদ, সাফল্যের সম্ভাবনা খুবই কম থাকে। আর সৈনিকও একজন একক ব্যক্তি, অন্যান্য সকলকেই সে ভয় করে, সামান্য মাত্র অবাধ্যতার জন্য তাহার মাথার উপর ভীষণ শাস্তি ঝুলিতে থাকে, তাহার সঙ্গীরা তাহাকে সমর্থন করিবেই এ-বিষয়ে সে কখনও নিশ্চিত হইতে পারে না, আর যদিই বা কতকটা নিশ্চিত হয়, অসামরিক জনসাধারণ হইতে সে কোন কার্য্যকরী সাহায্য পাইবে, এরূপ ভরসা সে করিতে পারে না, অতএব তাহার সেই নৈতিক বল থাকে না যাহার দ্বারা সে আইন ও গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতাকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করিতে পারে। আর তাহার সাধারণ অনুভূতিতে সে আর ব্যক্তির বা পরিবারের বা শ্রেণীর নহে, পরন্তু রাষ্ট্রের এবং দেশের অন্তত পক্ষে সেই সঙ্ঘের—যাহার সে একটা অংশ। কিন্তু এই (আন্তর্জ্জাতিক) ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত অংশগুলি হইবে অল্প সংখ্যক অধিজাতি, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ হইতেছে শক্তিশালী সাম্রাজ্য, তাহার নিজেদের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে নিজেদের শক্তির পরিমাপ করিতে, নিজেদের বিরোধী শক্তিসমূহের হিসাব করিতে বেশই সমর্থ, সাফল্য বা অসাফল্য কোনটির সম্ভাবনা বেশী কেবল সেইটিই তাহাদিগকে বিবেচনা করিতে হইবে।* আর মিশ্রিত সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত সৈনিকগণ মনেপ্রাণে নিজেদের দেশের প্রতিই অনুরক্ত থাকিবে, যে নিরবয়ব বস্তুটি তাহাদিগকে চালিত করিতেছে তাহার প্রতি নহে।

---

*ইটালী আবিসিনিয়া আক্রমণের সময়ে ঠিক এইভাবেই জাতিসংঘের কর্ত্তৃত্বকে অমান্য করিয়াছিল। তাহার পূর্ব্বে জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিয়া পথ দেখাইয়াছিল।

(শেষাংশ ৭২৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রেশম (Silk)

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

(২)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে রেশমের উৎপত্তি ও ইতিহাস সম্বন্ধে সকল কথা বলা হইয়াছে, যদিও ভারত বহুদিন রেশম উৎপাদন ও তৎসংক্রান্ত সকল শিল্প বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী ছিল, আজ আর তাহার সে সুদিন নাই।

চীনও ভারত অপেক্ষা এ বিষয়ে বিশেষ অগ্রণী ছিল, আজও রেশম তাহার এক সম্পদ কিন্তু গতানুগতিকের ধারা পালন করিতে গিয়া আজ সে চতুর জাপানের বহু পশ্চাতে পড়িয়াছে।

জাপান এই বিদ্যা অনেক পরে শিখিয়াছে; কিন্তু অন্য অনেক বিষয়ে সে যেমন তাহার শিক্ষাদাতাকে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হইয়া গিয়াছে; এখানেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। আজ জাপান রেশম উৎপাদনে সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। জাপানীদের বুদ্ধি এবং অধ্যবসায় ব্যতিরেকেও তাহাদের সৌভাগ্য আজ তাহাকে এই স্থান দিয়াছে। যখন রেশমকীটের রোগজীবাণু অন্যান্য দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, তখন জাপানে এই আপদের আবির্ভাব হয় নাই। এমন কি জাপান হইতে সুস্থ রেশম কীটের ডিম্ব লইয়া অন্যান্য দেশ রেশম "চাষ" করিতেছে।

এশিয়া মহাদেশই রেশমের কীটের পক্ষে উপযুক্ত বাসস্থান, তাহার মধ্যে আবার জাপানই প্রধান। জাপানে যত রেশম উৎপন্ন হয়, পৃথিবীর আর সকল দেশ মিলিয়া হয়ত তাহার সমান হইতে পারে। এশিয়ার মধ্যে জাপানের পরই চীনের স্থান। রপ্তানী হিসাবে কোরিয়ার স্থান ভারত ও ইরাণের উপরে। জাপানে প্রতিবৎসর আন্দাজ ১ কোটী ২৬ লক্ষ ৪০ হাজার পাউণ্ড রেশম উৎপন্ন হইয়া থাকে। চীনের পরিমাণের কোন হিসাব নাই, তবে প্রতিবৎসর ১ কোটী ২৩ লক্ষ পাউণ্ড মাল রপ্তানী হইয়া থাকে। কোরিয়ার অংশ আন্দাজ ২৮ লক্ষ পাউণ্ড। ইটালীতে প্রতিবৎসর ৭২ লক্ষ পাউণ্ডের উপর রেশম উৎপন্ন হয়; তাহার পরেও রুশসাম্রাজ্যের স্থান; তথাকার পরিমাণ ২৬ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯২৮ সালেও সেখানে ৯ লক্ষ পাউণ্ড রেশম হইত না, দশ বৎসরে প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি করিয়াছে। গ্রীস, বুলগেরিয়া ও তুরস্কের স্থান নিতান্ত মন্দ নহে; একা গ্রীসে প্রায় ৬ লক্ষ পাউণ্ড রেশম হয়। ফরাসী, স্পেন, যুগোস্লাভিয়া প্রভৃতি স্থানেও বেশ বেশী রেশম চাষ হয়।

সকল রকম মিলিয়া ভারতবর্ষে আন্দাজ ২৬ লক্ষ পাউণ্ড রেশম হয় তাহার উপর আন্দাজ ১২ লক্ষ পাউণ্ড রদ্দি বা অব্যবহার্য্য রেশম পাওয়া যায়। তুঁতপাতাভোজী গুটীর রেশম (অব্যবহার্য্য রেশম বাদে) প্রায় ২১ লক্ষ পাউণ্ড হয়, তন্মধ্যে বাঙ্গলা দেশেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী জন্মে, আন্দাজ ১০ লক্ষ পাউণ্ড আর রদ্দি রেশম মোট ১১ লক্ষ পাউণ্ডের মধ্যে ৫ লক্ষ পাউণ্ড। পরে পরে মহীশূর (৭,৫০,০০০) কাশ্মীর, জম্মু, মদ্র, আসাম ও পঞ্চনদের স্থান। তসর রেশম হয় বিহার উড়িষ্যায় খুব বেশী, অর্থাৎ আন্দাজ মোট ৪ লক্ষ পাউণ্ডের মধ্যে প্রায় আড়াই লক্ষ পাউণ্ড। মধ্যপ্রদেশ ও যুক্তপ্রদেশের অংশ নিতান্ত মন্দ নয়। মুগা ও এণ্ডি প্রায় দেড় লক্ষ পাউণ্ড হয়, তাহার সবটাই আসাম হইতে প্রাপ্ত।

যতদূর সম্ভব কাঁচা রেশমের উৎপত্তিস্থানগুলির নাম দেওয়া হইয়াছে। এখন সেখানে যাহাই হউক, এক সময় বাঙ্গলা দেশ রেশমের জন্য সকল বণিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অতি পুরাতন বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে কাম্বে ও মসুলিপট্টমের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু বাঙ্গলা সম্বন্ধে বার্ণিয়ারের কথা কয়টি উল্লেখ করার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

"There is in Bengal such a quantity of cotton and silks, that the kingdom may be called the common store-house for those two kings of merchandise, not of Hindoustan or the Empire of the Great Mogul only, but of all the neighbouring Kingdoms and even of Europe."

(ভাবার্থঃ—তুলা এবং রেশম বাঙ্গলা দেশে এত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় যে, এই দেশকে উক্ত দুই পণ্যের জন্য কেবল হিন্দুস্থান বা মোগল সাম্রাজ্যের নয়, নিকটবর্ত্তী সকল রাজ্যের এমন কি ইউরোপের ভাণ্ডার বলা যাইতে পারে)।

পাটনা অপেক্ষা মুর্শিদাবাদে কুঠী স্থাপনের পক্ষে Foster বলিতেছেন—

"Factory at the cittye of Mucksoudabad (Murshidabad) * * * * may be provided in infinite quantetyes at least twentyper cent cheaper than in anye other place of India, and of the choysest stuffe, wounde off into what condition you shall require it, as it comes from the worme; where are also innumerable of silk wynders, experte workmen and labour cheaper by a third than elsewhere."

(ভাবার্থঃ—মুর্শিদাবাদের কুঠীতে রেশম পাওয়া যাইবে প্রচুর পরিমাণে এবং দামও ভারতের অন্যান্য অংশ হইতে শতকরা কুড়ি টাকা সস্তা। সর্ব্বাপেক্ষা ভাল তন্তু, সদ্য গুটী হইতে প্রাপ্ত এবং প্রয়োজনানুরূপ গুণশালী এখানেই পাওয়া যায়; আর পাওয়া যায় রেশম শিল্প সংক্রান্ত সমস্ত লোকজন। বিশেষত এখানে মজুরের খরচ অপর স্থান হইতে এক-তৃতীয়াংশ মাত্র)।

উদ্ধৃত দুই অংশই Watt-এর পুস্তকে পাওয়া যায়, ইহাতে সুদিনের স্মৃতি আসিয়া মন একবার ব্যাকুল করে।

কাঁচা রেশমের সঙ্গে রেশম শিল্পের কেন্দ্রগুলির পরিচয় আবশ্যক। সাধারণত আন্দাজ হইতে লোকে মনে করে ভারতের তন্তু আমদানী করা মালের সহিত মিলাইয়া আট কোটি টাকার বস্ত্রাদি প্রতি সনে প্রস্তুত হয়। অনেক স্থানের শিল্প ও শিল্পী নষ্ট হইয়া গিয়াছে; বর্ত্তমানে যে কয়েকটি আছে, তাহার মধ্যে প্রধান কয়েকটির নাম দেওয়া গেল।

বাঙ্গলার মধ্যে মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর

আসামের বহু স্থানে, বিহারে ভাগলপুরে; যুক্তপ্রদেশে কাশী ও সাহজাহানপুরে; পঞ্চনদে অমৃতসর, জলন্ধর ও মুলতান; মধ্যপ্রদেশে নাগপুরে; বোম্বাইয়ে সুরাট, আহম্মদাবাদ, পুণা, বেলগাঁ, ধারওয়ার, ইওলা, হুবলী, সোলাপুর, বাগালকোট, ইত্যাদি; মদ্রে বহরমপুরে, ধরমভরম, কুম্ভকোণম্‌ কঞ্জীভরম, ত্রিচিনপল্লী, তাঞ্জোর, সালেম; মহীশূর রাজ্যে বাঙ্গালোর ও মহীশূরে এবং কাশ্মীরে শ্রীনগরে।

এখন যে পরিমাণ রেশমী বস্ত্র দেশে উৎপন্ন হইতেছে তাহা আমদানী করা বস্ত্রাদি অপেক্ষা বেশী; কিন্তু নকল রেশমী তন্তু এবং বস্ত্রাদি ধরিলে প্রায় সমান হইয়া পড়ে।

রেশমকীট ও উন্নত ধরণের গুটী পালন সম্বন্ধে জগতে বহু প্রকার উন্নত শিক্ষা ও প্রণালী প্রবর্তিত হইয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষ এ বিষয়ে এখন বহু পিছনে পড়িয়া আছে। তাহা-ছাড়া এই যে বিদেশী রেশম আনিয়া দেশের শিল্প নষ্ট করিয়া দিতেছে, তাহা হইতে রক্ষা করিবার ভার সরকারের উপর। যদি এখনও রক্ষণ শুল্ক স্থাপিত হয় তাহা হইলে আবার কিছু উন্নতির আশা করা যাইতে পারে।

ভারতের রেশম দেশ বিদেশে যাইত এবং তাহার একটা বিপুল বাণিজ্য ছিল, ক্রমে তাহা লোপ পাইয়াছে। এই অবনতির কারণ বহু, তন্মধ্যে আমাদের উন্নত শিক্ষার অভাব বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত মিলাইয়া চলিতে না পারা এক প্রধান কারণ। রেশমকীটের রোগের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তাহার পর বিদেশী বাণিজ্যে, প্রতি দেশে রক্ষণ-শুল্ক দ্বারা ভারতীয় শিল্প নষ্ট করা হইল; তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া কোন ফল পাওয়া গেল না। ইংরেজ আমাদের রাজশক্তি; কোনও স্বাধীন রাজ্যের সহিত বিতণ্ডা করিতে হইলে, তাহারই করা উচিত। তাহা সে ত করে নাই, উপরন্তু ফরাসী প্রভৃতি দেশে শুল্ক কম ছিল বলিয়া সেখানে যে বিক্রয় হইত তাহাও রোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। তাহা-ছাড়া ফরাসী ও ইটালী প্রভৃতি দেশে গুটী পালন করা সম্ভব হওয়ায় ভারতীয় তন্তুর চাহিদা কমিয়া যায় এবং রপ্তানী হ্রাস পাইতে থাকে। ১৮৫৭ সালে সাধারণভাবে অব্যবহার্য্য রেশমের ব্যবহার প্রচলিত হওয়ায় মূল্যবান রেশমের পরিবর্ত্তে তাহাই ব্যবহৃত হইতে থাকে।

এই সকলগুলি কারণের সহিত ভারতীয় রেশম বাণিজ্য ঘনিষ্ঠভাবেই জড়িত। ১৭৭২ সালে ইংলণ্ডে প্রথম ভারতীয় রেশম রপ্তানী হইয়াছিল; ইহার পরিমাণ ঠিক জানা নাই। পরে পাঁচ বৎসর গড়ে ১ লক্ষ ৮০ হাজার পাউণ্ড করিয়া রেশম যায়। ১৭৯৩ সালে ইংলণ্ডে সাড়ে ১২ লক্ষ পাউণ্ড রেশম আমদানী হইলে এক বাঙলা প্রায় সাড়ে ৭ লক্ষ পাউণ্ড সরবরাহ করে। ১৮৬৭-৬৮ সালে লাটাই-জড়ানো বা ছাড়া রেশম ২২ লক্ষ ২৬ হাজার পাউণ্ড ১ কোটি ৫৫ লক্ষ ৩২ হাজার টাকার রপ্তানী হইয়াছিল। ইহাই ইংরেজ আমলে ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রপ্তানী। দশ বৎসর যাইতে না যাইতে (১৮৭৭-৭৮) উহা কমিয়া ১৫ লক্ষ ১৩ হাজার পাউণ্ড হয় এবং দামও অর্দ্ধেকেরও নীচে নামিয়া যায়, অর্থাৎ ৭০ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা। আরও দুই বৎসর যাইতে না যাইতে (১৮৮০-৮১) রেশম ৫ লক্ষ ৫১ হাজার পাউণ্ড এবং চশম বা রদ্দি রেশম ৭ লক্ষ ৮৮ হাজার পাউণ্ড মোট ৫৫ হাজার টাকার যায়। বিংশ শতাব্দী আরম্ভ (১৯০০-১) হওয়ার সময়ও ৫১ লক্ষ টাকা ছিল, এখন তিন লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে (১৯৩৭-৩৮)!

শিল্পজাত বস্ত্রাদি এক সময় খুব বেশী যাইত এবং বিদেশে গিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিত। ১৮৩৮ সালে কেবল ভারতীয় রুমাল এবং রুমাল জাতীয় বস্ত্রাদি একমাত্র ফরাসী দেশে ৩০ লক্ষ টাকার উপর যায়। ভারতীয় বস্ত্রাদির কিরূপ আদর ছিল, তাহার অঙ্ক পাঠকদের দিবার ইচ্ছা রহিল। যদি কেবল রুমাল প্রভৃতি ৩০ লক্ষ টাকার গিয়া থাকে, তাহার সহিত অন্য বস্ত্রাদি কিরূপ গিয়াছে, তাহার হিসাব করা প্রয়োজন। কেবল ফরাসীদিগের এই ভারতীয় বস্ত্রপ্রিয়তা ইংরেজের চক্ষুশূল হইয়া পড়িয়াছিল। ১৯০০-১ সালেও আন্দাজ সাড়ে ১২ লক্ষ টাকার শিল্পজাত বস্ত্রাদি যায়, বর্ত্তমানে উহা সাড়ে তিন লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু আমদানীর অঙ্ক ঠিক এইরূপ নাই, বলা বাহুল্য ইহার নানা ভাঙ্গাবদল হইয়াছে, কিন্তু মোটের উপর নকল সিল্ক মিলিয়া ভারতের পক্ষে আমদানী বৃদ্ধিই পাইয়াছে। শতাব্দীর মুখে (১৯০০-১) সালে কাঁচা রেশম (২৫,৩৫,৪০০ পাউণ্ড) এক কোটি টাকার আসিয়াছিল, সেই বৎসর রেশমী মাল আসে পৌনে দুই কোটি টাকা মূল্যের। রেশম ১৯০৬-৭ সালে কমিয়া (১৪,২২,৫০০ পাউণ্ড) ৫৬ লক্ষ ৮০ হাজার টাকায় দাঁড়ায়। তাহার পর বরাবরই কম বেশ এক কোটি টাকা মূল্যের কাঁচা রেশম আসিয়াছে কেবল ১৯৩১-৩২ সালে (১০,৬৫,০০০ পাউণ্ড) ৬২ লক্ষ টাকা হইয়া পরে বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯৩৭-৩৮ সালে ইহা আবার প্রায় এক কোটি টাকায় (৯৫ লক্ষ টাকা) দাঁড়াইয়াছে

রেশমী কাপড়ের ও তন্তুর বেলায় দেখিতে পাই ১৮৭৬—৭৭ সালে ইহা সাড়ে ৫৮ লক্ষ টাকার ছিল। ১৮৮১—৮২ সালে এক কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা হইয়া যায়; তাহার পর হইতে বরাবরই প্রায় দুই কোটি টাকার কাছাকাছি রহিয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে ইহা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। তন্মধ্যে ১৯১৫—১৬ সাল হইতে ১৯২৯—৩০ সাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯১৫-১৬ সালে ২ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায় এবং পরবর্ত্তী কয় বৎসর তিন কোটি টাকার উপর চলিয়াছে। ১৯১৯—২০ এবং ১৯২০—২১ সালে যথাক্রমে ৫ কোটি ৯২ লক্ষ এবং ৫ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকার রেশমী দ্রব্যাদি ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। ১৯৩৭—৩৮ সালেও ১ কোটি ৯১ লক্ষ টাকার মাল (২ লক্ষ ৯৯ হাজার গজ কাপড় প্রভৃতি ও ২৩ লক্ষ ৩৭ হাজার পাউণ্ড সূতা প্রভৃতি) আসিয়াছে

সর্ব্বপ্রকার মিলিয়া ১৯৩৭—৩৮ সালে মাল আসিয়াছে ২ কোটি ৮৫ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকার। তন্মধ্যে কাঁচা রেশম ও গুটীর পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী (৯৪ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকার) অর্থাৎ ৩৩·২%। তাহার পর বস্ত্রাদি (৮৯ লক্ষ ৯১ হাজার টাকার) ৩১·৫%; সূতা প্রভৃতি (৬১ লক্ষ ১৮

হাজার টাকা) ২১·৫%, রেশম ও অন্যান্য তন্তু মিশ্রিত দ্রব্যাদি (৩৭ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা) ১৩·২%।

জাপানই বর্ত্তমানে আমাদের প্রধান বিক্রেতা। সে মাল দিয়াছে ২ কোটি ৭ লক্ষ টাকার অর্থাৎ মোট টাকার ৭১·৮% বা চার ভাগের তিন ভাগ। ইটালী, চীন, ইংরেজ বাকী অংশ ভাগ করিয়া লয়।

রেশম এবং রেশমী বস্ত্র শতকরা ৭৫ ভাগ একা বোম্বাই লইয়া থাকে।

নকল সিল্কের কথা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। তবে এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, বর্ত্তমানে ৩ কোটি ১৬ লক্ষ পাউণ্ড তন্তু ২ কোটি ৫ লক্ষ টাকাতে আসিতেছে এবং নিছক নকল সিল্কের প্রস্তুত বস্ত্রাদি প্রায় নয় কোটি গজ এবং তাহার মূল্য সওয়া দুই কোটি টাকা। তাহা ছাড়া নকল সিল্কের সহিত মিশ্রিত অন্যান্য যৌগিক তন্তুজাত বস্ত্রাদি আসিতেছে এবং সম্মিলিত মূল্য কিঞ্চিদধিক পাঁচ কোটি টাকার উপর।

নকল সিল্কের আন্দাজ ৯০ ভাগ জাপান দেয়। ১৯১৮—১৯ সালে সরকারী হিসাবে নকল সিল্ক স্বতন্ত্র আসন পায়, জাপান তখনও ভারতের ক্ষেত্রে আসিয়া পদার্পণ করে নাই। ১৯২৬ সালে জাপানের স্বতন্ত্র হিসাব রাখা সুরু হয়, তখন ইটালীর স্থান ছিল প্রথম, এখন জাপানের বহু পিছনে পড়িয়াছে। ভারতবর্ষের এখনও নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই; এদিকে কত বড় বিরাট ব্যবসায় পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার কোন চেষ্টা নাই।

রেশমের ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই; মোটামুটি ইহা সকলের জানা আছে। রেশমী বস্ত্র শুচি বলিয়া ইহা পূজাদির কার্য্যে পরিহিত হইয়া থাকে। টেঁকসই, মোলায়েম প্রভৃতি গুণের জন্য ইহার আদর খুবই বেশী। ধনীর ঘরে ইহার প্রচলন বেশী, কারণ ইহা অন্য তন্তু অপেক্ষা মূল্যবান। বিদ্যুৎরোধক বলিয়া ইহা বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি ও তার (cable) প্রভৃতিতে লাগে। অস্ত্রোপচারের পর ক্ষত বাঁধিয়া দিবার জন্য রেশমী সূতার প্রয়োজন আছে। একেবারে রদ্দি রেশম নানা প্রক্রিয়ায় একপ্রকার আকার ধারণক্ষম কর্দ্দম-কোমল পদার্থে (plastic material) পরিণত হইতেছে; ইহা বিদ্যুৎরোধক বলিয়া বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। তাহা ছাড়া স্বল্প ওজনের এবং অপেক্ষাকৃত কম দাহ্য করিয়া প্রস্তুত করিয়া লইতে পারায়, ইহা নানারূপে কাজে লাগান সম্ভব হইয়াছে।

মানবীয় ঐক্যের আদর্শ

(৭২৬ পৃষ্ঠার পর)

অতএব যতক্ষণ না এমন এক আন্তর্জ্জাতিক রাষ্ট্র প্রকৃত পক্ষে গড়িয়া উঠিতেছে যাহা জাতি সকলের অথবা প্রকৃতপক্ষে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট সকলের প্রতিনিধিসমূহের একটা শিথিল সম্মেলন অপেক্ষা বেশী কিছু হইবে ততক্ষণ আদর্শবাদীরা যে শান্তি ও ঐক্যের রাজ্যের স্বপ্ন দেখিতেছেন তাহা এই সকল রাজনৈতিক ও শাসনমূলক উপায়ের দ্বারা কখনই সম্ভব হইবে না। আর সম্ভব হইলেও তাহা কখনই স্থায়ী হইতে পারে না।এমন কি যদি যুদ্ধ উঠাইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলেও যেমন জাতির মধ্যে ব্যক্তি ব্যক্তির উপর অত্যাচার করিতেছে অথবা যেমন শ্রেণী সংগ্রামে বিভ্রাটজনক সাধারণ ধর্ম্মঘটের ন্যায় অন্য পন্থা অবলম্বিত হইতেছে, তেমনিই এই (আন্তর্জ্জাতিক) ক্ষেত্রেও সংঘর্ষের অন্যান্য পন্থা আবিষ্কৃত হইবে এবং সম্ভবত সেগুলি যুদ্ধ অপেক্ষাও অধিকতর অনর্থপূর্ণ হইবে। এমন কি প্রকৃতির যথাযথ ব্যবস্থায় সে-সব প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য্যই হইবে, মানুষের চেতনার মধ্যে অহংভাবমূলক দ্বন্দ্ব, আবেগ, উচ্চাকাঙ্ক্ষার যে দাবী রহিয়াছে শুধু তাহা মিটাইবার জন্য নহে, পরন্তু অন্যায়ের প্রতিকার, দলিত স্বার্থসমূহের উদ্ধার, ব্যাহত সম্ভাবনা সকলের রক্ষা— এ-সবের জন্যও সেইরূপ পন্থা অবলম্বন প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য্য হইবে। সর্ব্বত্র সাধারণ নিয়মটি একই, অহংভাব যতক্ষণ কর্ম্মের মূলে থাকিবে ততক্ষণ তাহা নিজ ফল ও প্রতিক্রিয়া প্রসব করিবেই আর বাহ্যিক ব্যবস্থার দ্বারা সে সবকে যতই খর্ব্ব বা দমিত করা হউক না কেন, কালক্রমে তাহারা প্রকট হইবেই, তাহাদিগকে বিলম্বিত করা যাইতে পারে; কিন্তু চিরকালের জন্য ঠেকাইয়া রাখা যাইবে না।

একাধিপত্যশালী কেন্দ্রীয় কর্ত্তৃত্ব স্থাপনের আদর্শ

অন্তত ইহা সুস্পষ্ট যে, কেন্দ্র স্থলে একটা প্রবল নিয়ন্ত্রণ শক্তি না থাকিলে কোনরূপে শিথিল সংগঠনই সন্তোষজনক, কার্য্যকরী বা স্থায়ী হইতে পারে না; নিকট ভবিষ্যতে যাহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় তাহা অপেক্ষা অনেক কম শিথিল, অনেক বেশী সংহত সংগঠন সম্বন্ধেও এই কথা বলা যাইতে পারে। সম্ভবতই ইহার পরে একটা দ্বিতীয় স্তর প্রয়োজন হইবে, অধিকতর কড়াকড়ি, জাতীয় স্বাধীনতা সকলের সঙ্কোচন এবং একাধিপত্যশালী বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কর্ত্তৃত্ব স্থাপনের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। (ক্রমশ)

পাল্টা জবাব ?

অন্তর্জ্জগতে যে একটা ভীষণ চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে সে সম্বন্ধে কোনই দ্বিমত নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি, হিটলার ও মুসোলিনীকে ঠেকাইবার জন্য ব্রিটেন ও ফ্রান্স ইদানীং খুবই তৎপর হইয়াছে। ইহাদের কার্য্য এখন একটি বিশিষ্ট ধারায় চলিয়াছে। ইউরোপের ছোট বড় বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে ইহারা পারস্পরিক আত্মরক্ষামূলক চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছে। যখনই কাহারও স্বাধীনতা বিপন্ন হইবার উপক্রম হইবে তখনই একযোগে ইহাদের আক্রমণকারীকে বাধা দিতে হইবে। ব্রিটেন পোল্যাণ্ডের সঙ্গে এইরূপ সন্ধি করিয়াছে। মুসোলিনীর আলবেনিয়া গ্রাসের পর, গ্রীস, রুমানিয়া ও তুরস্ক ব্রিটেনের নেতৃত্ব মানিয়া লইয়াছে। যে রুশিয়াকে আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হওয়া উচিত নয়। হিটলার-মুসোলিনী আবার কোন্ দেশ গ্রাস করেন কে জানে ?

গত ২০শে এপ্রিল হিটলারের পঞ্চাশত্তম জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। সে সময় তাঁহাকে 'ডানজিগের 'সিটিজেনশিপ' দিয়া সম্মানিত করা হইয়াছে! এই ডানজিগের উপরই হয়ত তাঁহার পরবর্ত্তী আক্রমণ সুরু হইবে। পোল্যাণ্ডের সঙ্গে জার্ম্মানীর খিটিমিটি তো লাগিয়াই আছে। পোল্যাণ্ডের ভিতরে জার্ম্মান-পোলদের সামান্য ঝগড়াকেও তিলকে তাল করিয়া বর্ণনা করা হইতেছে। এ সবের উদ্দেশ্য বুঝিতে কাহারও বাকি নাই। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের পক্ষে যদি পোল্যাণ্ডকে সার্থকভাবে সাহায্য করিতে হয় তাহা হইলেও সোভিয়েট রুশিয়াকে

পূর্ব্ব-দক্ষিণ ইউরোপের মানচিত্র

কাউণ্ট সিয়ানো
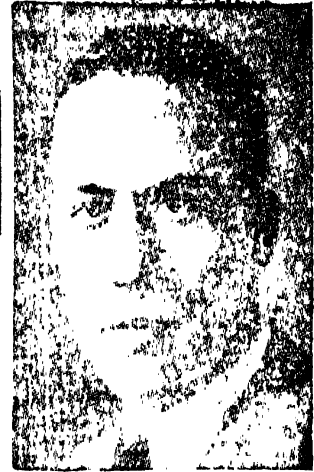
একঘরে করিবার জন্য ব্রিটিশের এত চেষ্টা তাহার সঙ্গেও ঐ একই উদ্দেশ্যে জোর আলাপ-আলোচনা চলিয়াছে। ব্রিটেন ও রুশিয়ার রাষ্ট্রনেতাদের মধ্যে আলোচনা একটু বেশী দিন ধরিয়াই চলিতেছে। ব্রিটেনস্থিত রুশিয়ার রাষ্ট্রদূত মঃ মাইস্কি সাক্ষাৎভাবে সব কথা জানাইবার জন্য মস্কো গিয়াছিলেন। তিনি পুনরায় লণ্ডনে ফিরিয়া গিয়াছেন। এজন্য বলা হইয়াছে যে, ব্রিটেন-রুশিয়া আলোচনার শীঘ্রই পরিসমাপ্তি হইবে। ওদিকে বিলাতের লোকেরা এই উভয় দেশের মধ্যে চুক্তি বা সন্ধি হইতে বিলম্ব দেখিয়া বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। মিঃ লয়েড জর্জ্জও ইহা হইতে বাদ যান নাই। সকলেরই ঐক রা—সোভিয়েটের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হইতে দলে টানিতে হইবে। নহিলে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের বন্ধুত্ব বা প্রতিশ্রুতি তাহার বিশেষ কাজে আসিবে না। তাই রুশিয়া সম্পর্কে ব্রিটিশ ধুরন্ধরদের দোমনা ভাব দেখিয়া অনেকের মনেই চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে।

বলাবাহুল্য, হিটলার-মুসোলিনী ব্রিটেনের এই কার্য্য মোটেই ভাল চক্ষে দেখিতেছেন না। তাঁহাদের অবাধ প্রভুত্ব বিস্তার ইহার ফলে ব্যাহত হইবার ষোল আনা সম্ভাবনা! তাঁহারা ইহার নাম দিয়াছেন 'Encirclement' বা ঘেরাও করার নীতি। জার্ম্মানী ও ইটালীকে যদি চারি দিক হইতে আটকাইয়া ফেলা যায় তাহা হইলে তাহাদের আর বেশী দূর অগ্রসর হইতে হইবে না, সাম্রাজ্য বিস্তারও বন্ধ হইয়া যাইবে।

গত যুদ্ধের সময়ও বিপক্ষকে জব্দ করিবার জন্য এইরূপ করার চেষ্টা করা হইয়াছিল। বার্লিন ও রোমে ব্রিটেনের এই নীতির তীব্র প্রতিবাদ হইয়াছে। ব্রিটেনের কিন্তু এখনও সাধু সাজিতে চাহিতেছে। পার্লামেণ্টে পররাষ্ট্র-সচিব ঐকথা অস্বীকার করিয়াছেন। সংবাদপত্রেও বলা হইয়াছে, ইটালী ও জার্ম্মানীকে কেহই ঘেরাও করিয়া ফেলিতে চাহিতেছে না; নিজ নিজ আত্মরক্ষার জন্যই একে অন্যের সঙ্গে চুক্তি করিতে বাধ্য হইতেছে। কিন্তু ভবী ভুলিবার নয়। হিটলার মুসোলিনী অন্য রাস্তা খুঁজিতে সুরু করিলেন। ইহার মধ্যে আসিয়া পড়িল হিটলার মুসোলিনীর নিকট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট মিঃ রুজভেল্টের বিখ্যাত রাইখষ্টাগ বা পার্লামেণ্ট আহূত হইয়াছে। প্রকাশ, উক্ত উদ্দেশ্যেই ইহা আহবান করা হইয়াছে। হিটলার রাইখষ্টাগের সম্মুখে তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করিবেন।

কিন্তু তাঁহার অভিমত কিরূপ হইবে তাহা বুঝিতে বেশী বেগ পাইতে হয় না। এখনও কিন্তু তিনি বসিয়া নাই। আপনারা মিঃ রুজভেল্টের আবেদন-পত্রে ছোট বড় বহু রাষ্ট্রের উল্লেখ পাইয়াছেন। হিটলার এই সব রাষ্ট্র আক্রমণ করিবেন না—এই মর্ম্মে রুজভেল্ট মহাশয় তাঁহার নিকট হইতে দশ বৎসরের গ্যারাণ্টি বা প্রতিশ্রুতি চাহিয়াছেন হিটলার ঐরূপ প্রতিশ্রুতি দিলে জার্ম্মানীর আর্থিক সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন রাষ্ট্র মিলিয়া সাহায্য করিবে। বর্ত্তমানে

গ্রীস সীমান্তে ইটালীর সৈন্য সমাবেশ। ইটালী লরী ও বিমানযোগে গ্রীস সীমান্তে সৈন্য আমদানী করিতে আরম্ভ করায় ইউরোপে উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছে।

আবেদন-পত্র। এই আবেদন-পত্রখানি পুরাপুরিই সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছে। গত সপ্তাহে এ সম্বন্ধে আলোচনাও করিয়াছি। হিটলার ও মুসোলিনীর জবাব সরকারীভাবে কিন্তু আজিও, এই পঁচিশে এপ্রিল পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তবে জার্ম্মান ও ইটালীয়ান সরকার যে ভালভাবে ইহাকে গ্রহণ করে নাই তাহা তাহাদের সংবাদপত্রের বিরুদ্ধ মন্তব্য হইতেই বুঝা গিয়াছে। মুসোলিনী দুই এক জায়গায় আবেদন-পত্র সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তাহা সরকারীভাবে বলা হয় নাই। হিটলার তাঁহার সঙ্গ পাঙ্গদের সঙ্গে আলোচনায় রত হইয়াছেন। আবেদন-পত্রখানি প্রধানত তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়াই রচিত। কাজেই এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে তাঁহার কিছু বেশী সময় লাগিবে ইহাই হয়ত স্বাভাবিক। ২৮শে এপ্রিল জার্ম্মান হিটলার যে অগ্রসর নীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে উল্লিখিত রাষ্ট্রগুলি নিজেদের বিপন্ন মনে করিতেছে—রুজভেল্ট মহোদয়ের এই প্রধান দোষারোপ যে ভিত্তিহীন বা ইহার মূলে যে সত্য কিছুই নাই তাহাই প্রমাণ করিবার জন্য হিটলার বিশেষ সচেষ্ট হইয়াছেন। তিনি সরকারীভাবে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিকে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন তাহারা তাঁহার কার্য্যে নিজেদের বিপন্ন বোধ করে কিনা। ডেনমার্ক, নেদারল্যাণ্ডস্, সুইজারল্যাণ্ড, লিথুয়ানিয়া, ফিনল্যাণ্ড ও রুমানিয়া ইতিমধ্যে এই প্রশ্নের জবাব দিয়াছে। ইউরোপের আন্তর্জ্জাতিক অবস্থা খুবই সঙ্কট-সঙ্কুল ইহারা সকলেই স্বীকার করিয়াছে, কিন্তু হিটলার কর্তৃক তাহাদের অস্তিত্ব বিপন্ন এরূপ কথা সোজা ভাষায় বলিতে ভরসা পায় নাই। অন্যান্য

দেশও হয়ত শীঘ্র জবাব প্রেরণ করিবে। এই সব বিষয়ের নিরিখে আপনারা নিশ্চয়ই আঁচ করিতে পারিবেন—হিটলারের জবাব কিরূপ হইবে। রুজভেল্ট যেমন হিটলারকে পররাজ্য হরণ বিষয়ে ও জগতের অশান্তি সৃষ্টি ব্যাপারে সাক্ষাৎভাবে দায়ী করিয়াছেন, হিটলারও হয়ত ইহার পাল্টা জবাব দিবেন। তাই জবাবের পাণ্ডুলিপি রচনায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন!

ওদিকে মুসোলিনী কি করিতেছেন? হিটলার কর্ত্তৃক চেকোশ্লাভাকিয়া গ্রাসের পর হইতে ব্রিটিশসিংহ তাহার কুম্ভকর্ণের নিদ্রা হইতে যেন কতকটা গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়াছে। ইউরোপে পোল্যাণ্ড, রুশিয়া প্রভৃতি নানা দেশের সঙ্গে সন্ধিবন্ধ হইতে চেষ্টা করিতেছে। এ কথা আমরা সকলেই জানি। ব্রিটিশের আর একটি উদ্দেশ্য বলকান রাষ্ট্রগুলির উপর আবার নিজ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করা। একথা সাধারণে

মঃ মার্কোভিচ

যেমন প্রকাশ হইতে না হইতেই মুসোলিনী আলবেনিয়া অধিকার করিয়া ফেলিলেন। মুসোলিনীর মতলব আগে হইতেই ব্রিটিশ ধুরন্ধরদের জানা ছিল। তথাপি তাঁহারা ইহার প্রতিরোধে অগ্রসর হন নাই। মুসোলিনীর আলবেনিয়া অধিকারকে বাস্তব জিনিষ বলিয়া ধরিয়া লইয়া বলকান উপদ্বীপে তাঁহাদের উদ্দেশ্য হাসিল করিতে লাগিয়া গেলেন। রুমানিয়া, গ্রীস, ও তুরস্কের সঙ্গে তাঁহারা যে চুক্তি করিয়া ফেলিয়াছেন তাহা আগে আপনাদিগকে বলিয়াছি। রুমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, গ্রীস ও তুরস্ক বলকান আঁতাতভুক্ত রাষ্ট্র। বুলগেরিয়া যদিও এই উপদ্বীপের মধ্যে অবস্থিত তথাপি সে ইহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে যুক্ত হয় নাই। ব্রিটেনের আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া সুযোগ মত কয়েকটি সর্ত্তে ইহাদের সঙ্গে যোগ দিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে যদি বলকান রাষ্ট্রগুলি সম্মিলিত হইতে পারে তাহা হইলে পূর্ব্ব ইউরোপে জার্ম্মানীর ও দক্ষিণ ইউরোপে ইটালীর ক্ষমতা ব্যাহত করা খুবই সম্ভব। কিন্তু একি কথা শুনি আজ?

মুসোলিনী একটা বড় রকমের চাল চালিয়াছেন। বলকান আঁতাত হইতে যুগোশ্লাভিয়াকে ভাঙ্গিয়া আনিতে প্রায় সক্ষম হইয়াছেন। ভিনিস নগরীতে ইটালীর তরফে কাউণ্ট সিয়ানো ও যুগোশ্লাভিয়ার তরফে মঃ মার্কোভিচ্ শলা-পরামর্শ করিয়া কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এই সিদ্ধান্তগুলির মর্ম্ম এই যে, জার্ম্মানী ও ইটালীর সঙ্গে যুগোশ্লাভিয়া সন্ধিতে আবদ্ধ হইবে, কমিণ্টার্ণ বা সোভিয়েট বিরোধী সঙ্ঘে সে মিলিত হইবে এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের সভাপদে ইস্তফা দিবে! যুগোশ্লাভিয়া হঠাৎ পূর্ব্ব বন্ধুদের ত্যাগ করিয়া ডিক্টেটরদের সঙ্গে আঁতাত করিতে আগুয়ান হইল কেন? ইহার রহস্য আপনারা ভেদ করিতে পারিবেন যদি একবার যুগোশ্লাভিয়ার মানচিত্র পরখ করিয়া দেখেন। ইহাতে দেখিবেন যে, জার্ম্মানী ইটালী দুই-ই তাহার সীমানায় আবির্ভূত হইয়াছে। উত্তর দিককার অষ্ট্রিয়া জার্ম্মানীর অধিকারে, দক্ষিণে আলবেনিয়া ইটালী আত্মস্থ করিয়াছে। সমগ্র আড্রিয়াটিক সাগরের কর্ত্তা হইল ইটালী। হিটলার মুসোলিনী বিরূপ হইলে তাহার অস্তিত্ব একেবারেই বিপন্ন হইবে। ইঁহাদের সঙ্গে যোগ দিয়াও তাহার কতটা সুরাহা হইবে, সন্দেহস্থল। যুগোশ্লাভিয়ার ক্রোট জাতি স্বায়ত্ত-শাসনের জন্য আন্দোলন সুরু করিয়া দিয়াছে। শ্লোভাক ও রুথেনের স্বায়ত্ত-শাসনের আন্দোলনের মত এখানেও নাকি নাৎসীদের নির্দ্দেশে ইহা পরিচালিত হইতেছে! যুগোশ্লাভিয়া হয়ত ভাবিতেছে, এখন যদি সে মানে মানে হিটলার মুসোলিনীর সঙ্গে যোগ দেয় তাহা হইলে তাহার স্বাধীনতা হয়ত বিপন্ন হইবে না, অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবার হয়ত আশঙ্কা থাকিবে না। বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক অবস্থা যেরূপে দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে বোধ হয় যুগোশ্লাভিয়ার স্বাধীনতা বিপন্ন হইবে না। হিটলার ও মুসোলিনীর, বিশেষত হিটলারের বাসনা পূর্ব্ব ও পূর্ব্বদক্ষিণ ইউরোপে তাঁহার প্রাধান্য এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করা, যাহাতে এই অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি তাহার বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি না করিতে পারে। ব্রিটেনের নীতিতে তাহা ক্ষুণ্ণ হইতে বসিয়াছে। এমন সময় যুগোশ্লাভিয়াকে হাত করায় হিটলার-মুসোলিনী তাহার উপর আর এক চাল জিতিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। ২৫শে এপ্রিল, ১৯৩৯

গোবিন্দর মা

(গল্প)

শ্রীকুঞ্জ নাথ

আইন পরীক্ষার আর তিনটি দিন মাত্র বাকী ঃ বিপুলে উদ্যমে পড়া তৈরী করিতেছি। রাত্রি বারোটা বাজিয়া পঁয়ত্রিশ মিনিটের সময় হিন্দু-ল'এর বইখানা আপনা হইতেই বুকের উপর ঝুপ্ করিয়া পড়িয়া গেল; বুঝিলাম বৃথা চেষ্টা ঃ কিন্তু উঠিয়া বইখানা যে টেবিলের উপর রাখিয়া আসিব সে শক্তিও নাই। প্রখর শীতের রাত্রে গরম লেপখানা সর্ব্বাঙ্গে যেন আদর ঢালিয়া দিয়াছে।

অকস্মাৎ ঢোল-কাঁসির এবং সানাইয়ের শব্দে চমকিয়া উঠিলাম। আমাদের পাশের বাড়ীর মেয়ে মণিকা আমার ঘরের জানালাটার ধারে দাঁড়াইয়া বাহিরে কি যেন দেখিতেছে। ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কিসের বাজনা? উত্তরে মণিকা যাহা বলিল তাহার মর্ম্ম এই যে, গোবিন্দর মা অপুত্রক থাকা হেতু সম্প্রতি গোকুল ঘোষের কনিষ্ঠ পুত্রটিকে দত্তক লইতেছে; তাহারই যৎসামান্য উৎসব উপলক্ষে এই বাদ্যভাণ্ডের আয়োজন।

অবাক হইয়া বলিলাম, সে কি! গোবিন্দর মা'র কি মাথা খারাপ হ'য়েছে? এ যে invalid adoption! আইনে টিকিবে না ত!

মণিকা হাত-মুখ নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, দুত্তোর আইন। আইনেই তোমাকে খেয়েছে। ও ছাড়া কি আর কথা নেই?

বলিলাম, কি মুস্কিল! ব্যাপারটা মোটেই বুঝতে চেষ্টা ক'রছ না, কেবলি তর্ক ক'রছ। এই ধর না,—গোবিন্দর মাকে ধর 'এক্স', আর বিপিন অর্থাৎ গোবিন্দর মা'র হাসব্যাণ্ড—

মণিকা বিরক্ত হইয়া বলিল, আঃ! চুপ কর না কুঞ্জু-দা; পারিনে তোমার আইনের মাথা-মুণ্ডু শুনতে।

মণিকার ধমক খাইয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম। হায় রে এগজামিন! দুই মিনিটের জন্য চোখ বুজিয়াও কি শান্তি নাই! হতভাগা হিন্দু-ল' ব্রহ্মদৈত্যের মত কাঁধে চাপিয়া বসিয়াছে। তবু মনে মনে হাসিয়া লইলাম; ভূদেব-বাবুর কথাট মনে আসিল,—"ইংরাজিতে স্বপ্ন দেখিতে হইবে।" কিন্তু আর নয়, অনেক রাত্রি হইয়াছে। আলো নিভাইয়া লেপটা ভাল করিয়া গায়ের উপর টানিয়া লইলাম।

পরীক্ষা একরকম করিয়া শেষ হইল। শেষ পরীক্ষা দিয়া আসিয়া রাত্রি নয়টার গাড়ীতেই চাপিয়া বসিলাম; সহজ-ভাবে নিশ্বাস লইতে পারিয়া যেন বাঁচিয়া গেলাম। পরদিন বেলা আটটায় বাড়ী পৌঁছিয়াই চিরদিনের বেয়াড়া মন ছটফট করিয়া উঠিল; সারা সকালটা কোথাও বসিয়া আড্ডা দিতে না পারিলে রাত্রে ঘুমই হইবে না। শূন্য-গর্ভ চায়ের পেয়ালাটা মেজ-বৌদির হাতে ফিরাইয়া দিয়া বাহির হইয়া পড়িব ভাবি-তেছি, এমন সময় মণিকা আসিয়া উপস্থিত। স্বপ্ন-কথা মনে পড়িয়া গেল। গুছাইয়া বলিতে যাইতেই মণিকা বলিল, এসেই পড়েছ যখন, দেখে এস একবার। আর বেশিক্ষণ হয়ত টিকবে না। বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপার কি? কে টিকবে না?

মণিকা মেজ-বৌদির সহিত একবার দৃষ্টি-বিনিময় করিয়া লইয়া কহিল, শোননি বুঝি এখনও? গোবিন্দর মা যে যায়-যায়; অবস্থা এখন-তখন।

আশ্চর্য্য! সেই গোবিন্দর মা, দিনকতক আগে যাহার দত্তক লওয়া ব্যাপারে স্বপ্নে মণিকার সহিত বাগ্‌বিতণ্ডা করিয়াছি। স্বপ্ন এবং বাস্তব দুয়ে মিলিয়া চিন্তার রাজ্যে এক মুহূর্ত্তেই যেন একটা গোলমাল বাধাইয়া বসিল।

মণিকা বলিল, যাবে কুঞ্জু-দা? আমিও যাই তা হ'লে তোমার সঙ্গে।

বলিলাম, চল। এক সময় বড্ডই জ্বালিয়েছি; এখন না-দেখাই অন্যায়।

মনে পড়িল নবদ্বীপে কণ্ঠীবদল করিয়া গোবিন্দর মা চক্রবর্ত্তীর ঘরে তাহার অধিকার ধীরে ধীরে বেশ ভাল করিয়াই গড়িয়া তুলিল এবং বিপক্ষের সতর্ক প্রহরা সত্ত্বেও একটু একটু করিয়া পাড়ার লোকের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে লাগিল। তাহার হেতুও ছিল। অসম্ভব রকমের খাটুনি খাটিতে পারিত এই মেয়েটা। কাহারও বাড়ীতে ব্যাপার-বিষয় আরম্ভ হইলে দেখিয়াছি, কোমরে কাপড় জড়াইয়া গোবিন্দর মা বাট্‌না বাটিতেছে, কুটনা কুটিতেছে, পান সাজিতেছে এবং ইহার মধ্যেও আবার একটুখানি সময় করিয়া লইয়া হয়ত বা বাড়ীর রোগা ছেলেটির জন্য বার্লি করিয়া তাহাকে খাওয়াইয়া আসিতেছে। ব্যাপারের শেষে প্রায় বাড়ীতেই মেয়েদের বলিতে শুনিয়াছি,—'যে যাই বলুক বাপু, সদুর মত অমন খাটিতে দেখিনি কাকেও; দিব্যি মেয়ে!'

কিন্তু সে যাহাই হউক, গোবিন্দর মার সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা ছিল নিতান্তই গরজের। আমরা তাহাকে সৌদা-মিনী বলিয়া জানিতাম না, তাহার সাংসারিক জীবনের কর্ম্মপটুতা লইয়াও মাথা ঘামাইতাম না। আমরা যখন হইতে তাহাকে জানি, তখন হইতেই সে গোবিন্দর মা এবং চক্রবর্ত্তীর বিলাতী আমড়া গাছটির একমাত্র মালিক; সুতরাং চক্রবর্ত্তীর ঘরে আসিয়া এ পাড়ায় সর্ব্বপ্রথম পরিচয় ঘটিয়াছে তাহার আমাদের সহিত। পরিচয়টা নিতান্তই আকস্মিক। সেদিন রবিবার। দলের সব কয়টি একত্রিত হইলেই উর্ব্বর মস্তিষ্কে একটা-না-একটা দুষ্টবুদ্ধি গজাইতই এবং অচিরাৎ তাহা কাজে লাগাইতে না পারিলে কিছুতেই আর শান্তি পাওয়া যাইত না। সেদিনের প্ল্যান পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল। চক্রবর্ত্তী বাড়ীতে নাই; তাহার সযত্ন-রক্ষিত আমড়া গাছটি একেবারে হাতের পাঁচ হইয়া পড়িয়া আছে। এমন সুযোগ এ জীবনে আর আসিবে কি না সন্দেহ; সুতরাং চক্রবর্ত্তীর চালার পাশে আমাদের আহ্লাদে-আটখানা প্রাণ ডাগর আমড়ার রসে একে বারে 'মরি মরি' হইয়া উঠিল। হাবুলটা চির-কালের খুঁৎখুঁতে। সে হতভাগা জিভ দিয়া এক প্রশলা লাল

বর্ষণ করিয়া কহিল,—যাই বলিস, কুঞ্জ; এর সঙ্গে খানিকটা নুন আর একটুখানি লঙ্কা বাটা হ'লে'—বলিয়াই জিহ্বা ও তালুর সহযোগে টক্ করিয়া একটা শব্দ করিয়াই সে তাহার বক্তব্য সম্পূর্ণ করিল। অতএব চাই-ই তাহা। বলিলাম সবুর; চক্কোত্তীর ভাঁড়ার লুটতে হ'বে। যে কথা সেই কাজ দলবল রহিল বাহিরে বাহাদুরী দেখাইবার উৎসাহে ঝাঁপ খুলিয়া আমি ঢুকিয়া পড়িলাম চক্রবর্ত্তীর উঠানে। চক্রবর্ত্তীর ভাঁড়ার চিনিতাম এবং তাহার চাবি লুকাইয়া রাখিবার গুপ্ত স্থানটিও আমার অবিদিত ছিল না; সুতরাং লবণের ভাঁড় আবিষ্কার করিতে দেরী হইল না। কিন্তু কেবল লবণ ত নয়, হাবুলার ফরমাস মত আয়োজন করিতে হইলে লঙ্কা বাটাও চাই। লঙ্কা খুঁজিতে ভুল করিয়া গুঁড় হলুদের ভাঁড়ে হাত ঢুকাইয়া দিলাম এবং তাড়াতাড়ি গামছা খুঁজিয়া না পাইয়া চক্রবর্ত্তীর ধোয়া মটকাখানাতেই হাত মুছিব কি না ভাবিতেছি, এমন সময় উঠানে পায়ের শব্দ হইল। 'কে রে; হাবুলা নাকি?'—বলিয়া সাড়া দিতেই দুপ্-দাপ্ শব্দে দলবল কে কোথায় সরিয়া পড়িল। বুঝিলাম ধরা পড়িয়া গিয়াছি। কিন্তু উপায় নাই। একমুঠা লবণ এবং অর্দ্ধভুক্ত আমড়াটি হাতে লইয়া বিদ্যুদ্বেগে ভাঁড়ার হইতে বাহির হইয়া আসিলাম বটে, কিন্তু এই পর্য্যন্ত। উঠানের একেবারে মাঝখানে দাঁড়াইয়া যে মানুষটি অবাক হইয়া আমার অবৈধ কার্য্যপদ্ধতি বেশ মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করিতেছে, পরে জানিতে পারিয়াছিলাম, সেই গোবিন্দর মা। কিন্তু সে যেই হোক, আপাতত তাহাকে দেখিয়াই ভয়ে প্রাণ উড়িয়া গেল প্রাণপণে একটা ছুট দিতে পারিলে, উহার হাতের নাগালের বাহিরে যাইয়া পড়িতে পারিব কি না, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম! গোবিন্দর মা কিন্তু আমার মতলবটা বুঝিয়া ফেলিল। ঝাঁপের দরজাটা শক্ত করিয়া বাঁধিয়া আসিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া টিপিয়া সে হাসিতে লাগিল। তাহার সেই হাসিতে যাই থাক, ভয়ের কিছু খুঁজিয়া পাইলাম না। একটু সাহস হইল; বলিলাম, ঝাঁপ খুলে দাও, আমি বাড়ী যাব। ভাষাটা আদেশজ্ঞাপক হইলেও কণ্ঠস্বরে অপরাধীর কারুণ্যটা কিছু অতিরিক্তভাবেই প্রকাশ হইয়া পড়িল; সুতরাং গোবিন্দর মা দরজা তো খুলিলই না বরং আমাকে ধরিবার জন্য হাসিমুখে অগ্রসর হইল। ভাবিলাম, দেখাই যাক, কি উহার মতলব। চুপ করিয়া মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

গোবিন্দর মা আসিয়া আমার হাত ধরিল। আধখানা আমড়া তখনও আমার হাতের মধ্যে। ডান হাতখানা ধরিতেই লবণটুকু ঝরঝর করিয়া পড়িয়া গেল। গোবিন্দর মা তাই দেখিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। রাগে, দুঃখে, অপমানে দুই চোখ আমার জলে ভরিয়া উঠিল। গোবিন্দর মা হাসিতে হাসিতেই কহিল, হলুদ দিয়ে আমড়া খাওয়া হচ্ছিল বুঝি? তোমার নামটা কি বলত, দুষ্টু? শুনিয়া অবাক হইলাম। এমন করিয়া যে কথা কহিতে পারে সে যে মারিতেও পারে, কোন মতেই ইহা বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিলাম না। ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিয়া ফেলিলাম, আমার নাম কুঞ্জ।

গোবিন্দর মা আমার হলুদমাখা হাতখানা সযত্নে তাহার আঁচলের কোণ দিয়া মুছিয়া লইয়া কহিল, চুরি করে কে খেত জান? তুমিও দেখছি ঠিক তেমনি। কেমন, নয়? তাহার এই অসংগত প্রলাপের উত্তর দেওয়ার চেয়ে তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভটাই তখন বাঞ্ছনীয় মনে করিতেছিলাম, সুতরাং তাহার আদর অভ্যর্থনার এই আতিশয্যটা বিশেষ মনঃপূত হইল না; বলিলাম বাড়ী যাব; আমায় ছেড়ে দাও।

গোবিন্দর মা পরম স্নেহে আমার ধূলিমলিন অবিন্যস্ত চুলগুলির ভিতরে আঙ্গুল চালাইতে চালাইতে কহিল, যাবে বৈ কি! কিন্তু কাল আবার এমনি চুরি করে খেতে আসবে ত গোপাল? লক্ষ্মীটি, এস; কেমন? আমায় ভয় ক'রনা যেন। আমি যে মাসী হই।

সন্দেহ এবং বিস্ময় লইয়া চক্রবর্ত্তীর উঠানের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দলের আর সকলে কে কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে, রঞ্জন কেবল চুপি চুপি আমড়া গাছ হইতে নামিয়া আসিয়া অলক্ষ্যে দাঁড়াইয়া আগাগোড়া ব্যাপারটা লক্ষ্য করিতেছিল। আমি বাহিরে আসিতেই সে ছুটিয়া আসিয়া গভীর কৌতূহলভরে জিজ্ঞাসা করিল, কি বললে রে?

আগাগোড়া সব কথাই তাহাকে বলিলাম। শুনিয়া রঞ্জন এক গাল হাসিয়া বলিল, ভালই হ'ল।

কিন্তু ভালই হোক আর মন্দই হোক সেই হইতেই গোবিন্দর মা আমাকে আদর করিয়া 'গোপাল' বলিয়া ডাকিতে সুরু করিল এবং আমিও তাহার সহিত 'মাসী' পাতাইয়া নির্ব্বিঘ্নে নিশ্চিন্তমনে আমড়া উপভোগ করিতে লাগিলাম। কিন্তু একটা কথা ভাবিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়া যাইতাম যাহার মা, সেই গোবিন্দ লোকটাকে আমি কোন দিনই দেখি নাই। এ সম্বন্ধে তাহাকে একদিন প্রশ্নও করিয়াছিলাম। উত্তরে সে কোন কথাই কহে নাই, কেবল মুখ ফিরাইয়া আমাকে লুকাইয়া একবার চোখ মুছিয়াছিল।

কিন্তু সে যাই হোক, গোপালের বাল্য-লীলার কাল কিছু দিনের মধ্যেই অতিক্রম হইয়া এবং তাহার স্নেহের ক্ষুধা অতৃপ্ত রাখিয়াই আমি ভাল মানুষের মত ইস্কুল এবং ইস্কুল হইতে কলেজের ক্লাশগুলো ডিঙ্গাইতে সুরু করিলাম। অবশেষে এমনি করিয়াই তাহার সহিত আমার ছাড়াছাড়ি হইল যে তাহার স্মৃতিটুকুও আমার মন হইতে লোপ পাইল। গোবিন্দর মা কিন্তু আমাকে ভোলে নাই; ছুটিতে বাড়ী আসিলেই সে তাহার গোপালের জন্য আমড়া পাঠাইয়া দিত। আমার সুমধুর কৈশোর তাহার নিষ্ফল যৌবনের অন্ধকার কক্ষে একদিন যে একটু আলোক সম্পাত করিয়াছিল, প্রৌঢ়ত্বের পথপ্রান্তে আসিয়া আজ পর্য্যন্ত সেই ক্ষণপ্রভায় কি-যেন সে খুঁজিয়া ফিরিতেছে।

এ-হেন গোবিন্দর মার অবস্থা 'এখন তখন' শুনিয়া অতীতের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ঘটনা অকস্মাৎ যেন চোখের সম্মুখে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া কানে কানে কথা কহিতে সুরু করিয়া দিল। আজ অনেক বড় হইয়াছি; 'গোপাল' বলিয়া

তাহার কাছে যাইয়া দাঁড়াইতেও লজ্জা করে; কিন্তু তবু যাইতে হইবে। মণিকাকে সঙ্গে লইয়া গোবিন্দর মার বাড়ীর দিকে চলিলাম।

গোবিন্দর মা'র বরাবর ধারণা যে, আমি হয় জজ, না-হয় মাষ্টার,—এ দুয়ের একটা কিছু হইবই। আজ মরিতে বসিয়াও কথাটা সে ভুলিতে পারে নাই। আমি যাইয়া তাহার পাশে বসিতেই সে আনন্দে অধীর হইয়া আমাকে একেবারে বুকে জড়াইয়া ধরিল এবং তাহার পর এ-কথা ও-কথার পরই জিজ্ঞাসা করিল, তুই জজ হয়েছিস, গোপাল? বড় দুঃখেও হাসি পাইল; বলিলাম, না মাসী; ওরা আমায় জজ করতে চাইছে না কিছুতেই।

অবাক হইয়া গোবিন্দর মা কহিল, কেন রে?

বলিলাম, ওরা বলে, আমি নাকি চুরি করে তোমার গাছের আমড়া খেয়েছি। চোর কখনো জজ হয়!

শুনিয়া গোবিন্দর মা আবার আমাকে দুই হাতে আঁকড়াইয়া ধরিল; তাহার পর আমার মাথার উপর তাহার শিথিল রোগ-পাণ্ডুর আঙ্গুল কয়টি বুলাইতে বুলাইতে বলিল, মাসীর গাছের আমড়া কি চুরি করা যায়রে পাগল।

বলিলাম, ওদের একটুও বুদ্ধি নেই, মাসী; থাকলে এই সোজা কথাটা বুঝত।

গোবিন্দর মা'র কিন্তু সংশয় দূর হইল না, আমার মুখের দিকে চাহিয়া আমার বিগত-কৈশোরের দৌরাত্ম্য-পিপাসাটাকে খুঁজিতে খুঁজিতে শঙ্কিত হইয়া কহিল, হাঁরে গোপাল; এখনও তুই চুরি ক'রে খাস?

মন-গড়া একটা জবাব মুখের কাছে আসিয়াছিল, কিন্তু মণিকা আমাকে থামাইয়া দিয়া বলিল, অভ্যেস কি কা'রও যায় মাসী! আজ সকালে এসেই কুঞ্জ-দা আমার নতুন রুমালখানা সরিয়েছে। ওই দেখনা, পকেটেই রয়েছে।

গোবিন্দর মা ধড়মড় করিয়া পাশ ফিরিয়া কহিল, কে রেণু? আয় মা, বোস। দাঁড়িয়ে কেন?

মণিকা আসিয়া আমার পাশেই বসিয়া পড়িল। কিন্তু আমি যাহা লক্ষ্য করিলাম তাহা মণিকা নয়, মণিকার দেওয়া রুমালখানাও নয়। মণিকার কণ্ঠস্বর শুনিয়া গোবিন্দর মা যেভাবে চমকিয়া উঠিয়া আমাকে তাহার বুকের উপর হইতে অনেকটা জোর করিয়াই ঠেলিয়া সরাইয়া দিল তাহাতে আশ্চর্য না হইয়া পারিলাম না এবং তাহার এই অর্থহীন সতর্কতায় বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, কি এ! ব্যাপারটা মণিকাও লক্ষ্য করিয়াছিল, কিন্তু এই অত্যন্ত চাপা মেয়েটি আমাকে ভাবিবার এতটুকুও সুযোগ না দিয়া কহিল, কি কষ্ট হচ্ছে মাসি?

গোবিন্দের মা মুহূর্ত্তে মধ্যে আপনাকে সংযত করিয়া লইয়া কহিল, কিছু নয় মা; ভাবছি আর কতক্ষণ তোদের দেখতে পাব।

গোবিন্দর মা'র গোপন করিবার ইচ্ছাটা কিন্তু আমার ভাল লাগিল না। তাহার অসুখ যাই হোক, সে যে তাহাতে 'এখন-তখন' হইয়া পড়িয়া আছে, তাহার শরীরের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া তাহা মনে হয় না। প্রৌঢ়ত্ব যে তাহার একদা-প্রদীপ্ত যৌবনের উপর এখনও পরিপূর্ণভাবে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই তাহা তাহাকে দেখিলেই বুঝা যায় এবং আজিকার এই আকস্মিকতাটাকে চাপা দিতে যাইয়া তাহার সেই ম্রিয়মাণ তারুণ্য এমনি বিসদৃশভাবে হঠাৎ লজ্জায় জিভ কাটিয়া মুখ ফিরাইয়াছে যে, বলিবার যেন কোথাও কিছু আর বাকি রাখে নাই। রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা মাথার উপর হইতে পরচুলাটা হঠাৎ খসিয়া পড়িলে যেমন করিয়া আড়ালে সরিয়া পড়ে, গোবিন্দর মা ঠিক তেমনি করিয়াই আজ আমার তীক্ষ্ম দৃষ্টির অন্তরালে সরিয়া দাঁড়াইবার এই যে ব্যর্থ চেষ্টা করিল, ইহাতেই আমার মনটা অকস্মাৎ ভারি হইয়া উঠিল। বোধ করি সে নিজেও আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছিল, তাই ব্যাপারটাকে সহজ করিয়া লইবার জন্যই কহিল, বুকের মধ্যে ধড়ফড় করে মা; তাইতেই বড় কষ্ট হয়। অনুকূল ডাক্তার বলছে, হঠাৎ নাকি কোনদিন সব শেষও হ'য়ে যেতে পারে। হ'লেই বাঁচি।

হৃদ্‌রোগের কথা সত্য হইতেও পারে, কিন্তু সেই যে মনের কোণে একবার একটা সন্দেহ উঁকি দিয়াছে, সে যেন আর কোন কিছুতেই চাপা পড়িবার নয়। কিন্তু সত্যই হোক আর মিথ্যাই হোক, গোবিন্দর মা'র চোখের দৃষ্টিতে আজ একটা নূতন কিছু খুঁজিয়া পাইলাম। কি-যেন একটা কথা তাহার ওষ্ঠাগ্রে আসিয়াও ফুটিতে না পারিয়া তাহার দুই চোখের ভিতর দিয়া ঠেলিয়া বাহির হইতে চাহিতেছে। কিন্তু সে যাহাই হোক; রোগিণীকে দেখিতে আসিয়াছি মাত্র, মনে মনে তাহার আচার-ব্যবহারের সমালোচনা করিতে আসি নাই। বলিলাম, ও কিছু নয়, মাসি। অনুকূল ডাক্তার হয়ত ঠিক ধরতে পারছে না। কিছু ভয় নেই।

গোবিন্দর মা আমার একখানি হাত তাহার দুই হাতের মুঠার মধ্যে লইয়া নাড়িতে লাগিল। মণিকা তাহার পথ্যাপথ্য সম্বন্ধে কিছুক্ষণ আলোচনা করিয়া তাহাকে বারবার করিয়া অভয় দিয়া কহিল, এইবার তবে উঠি, মাসি; বিকেলের দিকে পারি ত আসব আবার।

আমিও উঠিলাম। গোবিন্দর মা বাধা দিল না; কহিল, সময় পেলে মাঝে মাঝে তুইও আসিস, গোপাল।

কহিলাম, নিশ্চয় আসব। বিকেলেই আসব।

* * *

দ্বিপ্রহর বেলায় দিবানিদ্রার ইচ্ছায় চোখ বুঁজিয়া শুইয়া পড়িলাম বটে কিন্তু ঘুম আসিল না। গোবিন্দর মা যেন কাঁটার মত হঠাৎ বুকের মধ্যে কোথায় বিঁধিয়া গিয়াছে, নিশ্বাসের সঙ্গে খচ্ করিয়া বাধে। সকাল বেলা তাহার ব্যবহারে যে একটুখানি সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছিল, রাজ্যের গ্লানি সেই সন্দেহের অতি ক্ষুদ্র ছিদ্রপথ দিয়া প্রবেশ করিয়া সমস্ত অন্তরে যেন ক্রমাগতই কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠিতে লাগিল এবং এতদিন যাহা ভাবি নাই,—ভাবিবার প্রয়োজনও বোধ করি নাই, গোবিন্দর মা'র সেই নবদ্বীপ বাসের অখ্যাত ইতিবৃত্তটা আজ একটি মুহূর্ত্তের একটি সামান্য ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া সম্ভব অসম্ভব অনেক কিছু রূপ লইয়াই চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন,

কিন্তু বিপিন চক্রবর্ত্তীকেও ত পাড়ার লোকে খুব ভাল লোক বলিয়া জানিত না! বৈকালের দিকে আসিব, এ আশ্বাস তাহাকে দিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু নানা কথা ভাবিয়া মন আমার সত্যই তাহার দিক হইতে যেন ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া বসিল।

এমনি কত কিছুই ভাবিতেছিলাম; হঠাৎ চুড়ির শব্দে মুখ তুলিয়া দেখি শিয়রে দাঁড়াইয়া মণিকা মৃদু মৃদু হাসিতেছে। বলিলাম, এমন নিঃশব্দে যে মতলবখানা কি?

মণিকা কণ্ঠস্বরকে যথাসম্ভব কর্কশ করিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, ভয় নেই; চুরি করব না কিছু।

সম্মুখের জানালাটা দিয়া বড় আলো আসিতেছিল; ডান হাতখানা চোখের উপর রাখিয়া আলোটাকে এবং মণিকাকেও আড়াল করিয়া কহিলাম, তবু সাবধানের মার নেই, তাই গোড়াতেই সন্দেহটা জানিয়ে রাখলাম।

কিন্তু সে কথা কানে না তুলিয়া হঠাৎ নাক মুখ সিঁটকাইয়া কহিল, মাগো! কি বিদঘুটে লোক তুমি, কুঞ্জ-দা! এত ময়লা টেবিল ক্লথখানা কি করে সইছ? চোখে বাধে না?

বলিলাম, দু-বেলা যারা এসে এসে দেখে যায় তাদেরই যদি সয়, নতুন এসে আমারই বা সইবে না কেন?

মণিকার জবাব পাইলাম না। মুখ তুলিয়া দেখি, ইতিমধ্যে কখন যে টেবিলের ময়লা ঢাকাখানা তুলিয়া লইয়া সেখানে বিচিত্র ফুল-লতা-পাতা আঁকা নূতন আর একখানি বিছাইয়া দিয়াছে। সূচি-শিল্পে যে তাহার সমকক্ষ বাস্তবিকই কেহ নাই, তাহার হাতের কাজ দেখিয়া মনে মনে তাহা স্বীকার করিতে হইল। বোধ করি শ্রীমতী নিজেও ইহা জানিতেন প্রশংসাটাকে আমার মুখ হইতে টানিয়া বাহির করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন হয়েছে, কুঞ্জ-দা?

বলিলাম, বিশ্রী। ময়লা হ'লেও ওটার দাম আছে।

মুহূর্ত্তের মধ্যে মণিকার মুখের হাসি এবং কণ্ঠের স্বর যেন কোন যাদু মন্ত্রের প্রভাবে শুকাইয়া কাঠ হইয়া উঠিল; পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের উপর চাহিয়া কঠিন তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিল, সত্যি?

বলিলাম, রাগ করলে ভালই বলতে হবে!

নাই-বা বললে দয়া করে! আমি নিয়ে যাচ্ছি। আমার এটাও ফেলো নয়; দাম এরও আছে।—বলিয়াই মণিকা রাগে ফুলিতে ফুলিতে ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

মনে মনে কহিলাম, আছে বৈকি! এই সামান্য কথাটা বুঝিব না, আমি কি এতই বোকা?

প্রায় ঘণ্টাখানেক চুপ করিয়া পড়িয়া রহিলাম, ঘুম আসিল না। হঠাৎ দ্রুত পদশব্দ শুনিয়া মাথা তুলিয়া দেখি, ব্যস্ত হইয়া মণিকা আমারই ঘরে ঢুকিতেছে। বলিলাম, চমৎকার হয়েছে। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। ফুলগুলো তুমি তুলেছ বুঝি? সুন্দর! এক কথায় বলতে গেলে—

তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়া মণিকা কহিল, থাক, দরকার নেই। সে জন্যে আসি নি।

বিস্মিত হইয়া কহিলাম, তবে?

বিরক্ত হইয়া মণিকা কহিল, মদন তোমায় ডাকতে এসেছিল। গোবিন্দর মা'র সময় ফুরিয়ে এসেছে।

এ্যাঁ! বল কি?—বলিয়া ধড়মড় করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিতেই মণিকা ধপ্ করিয়া আমার পাশে বসিয়া পড়িয়া কহিল, তোমার যাওয়া হবে না।

আশ্চর্য্য হইয়া কহিলাম, সে কি! তবে যে বললে, ফুরিয়ে এসেছে?

মাথা নীচু করিয়া মণিকা কহিল, মিথ্যে ত বলিনি; কিন্তু তুমি যেতে পাবে না।

আশ্চর্য্য! কেন যে তাহার আপত্তি, শত চেষ্টাতেও তাহার মুখ দিয়া তাহা বাহির করাইতে পারিলাম না এবং কেন যে তাহার রোষ-রুক্ষ কণ্ঠে অকস্মাৎ এমন করিয়া কাতর আবেদন প্রকাশ পাইল তাহাও বুঝিলাম না। যাইতে আমিও যে খুব ইচ্ছুক ছিলাম তাহা নয়। অসুস্থ চিত্ত যে কত সহজে তাহার সযত্ন-রক্ষিত গোপনতা এক মুহূর্ত্তের অসতর্কতায় হঠাৎ প্রকাশ করিয়া ফেলিতে পারে তাহা জানিতাম, তাই এই নির্জ্জন নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহর বেলায় একা একা আজ গোবিন্দর মা'র সান্নিধ্যে আসিতে অন্তর হইতে কে যেন ক্রমাগতই বাধা দিতে লাগিল। বলিলাম, কিন্তু এ সময় না যাওয়াই কি ঠিক হবে মণি?

মণিকা এক মুহূর্ত্ত কি চিন্তা করিল, তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, বেশ; তবে আমিও যাব।

এতক্ষণে তাহার আপত্তির কারণ অনুমান করিতে পারিয়া লজ্জায় শিহরিয়া উঠিলাম। বেশ বুঝিলাম, সকালের সেই ব্যাপার এই অত্যন্ত চাপা মেয়েটির দৃষ্টি এড়ায় নাই। ইচ্ছা করিয়াই হ'ক আর ভুল বুঝিয়াই হ'ক সে যে আমাকে সন্দেহ করিয়া বসিয়াছে তাহা নিশ্চিত। এমন করিয়া যে, সে অভিমান করিতে শিখিয়াছে তাহা জানিতাম না। আজ হঠাৎ তাহার পানে চাহিয়া বিস্মিত হইয়া দেখিলাম, আগামী দিনের এক সরস মাধুর্য্য তাহার সর্ব্বাঙ্গের উপর দিয়া নামিয়া আসিয়া তাহাকে এক অপূর্ব্ব সুষমায় মণ্ডিত করিয়া তুলিতেছে।

বলিলাম, যেতে পার; কিন্তু এ গোয়েন্দাগিরি না করলেও চলত।

অদম্য লজ্জায় মণিকার সমস্ত মুখখানা লাল হইয়া উঠিল; 'বোৎ, আমি তাই বলেছি বুঝি! যাওগে না; আমি ত বেঁধে রাখিনি।'—বলিয়াই আমার সম্মুখ হইতে সে যেন কোন রকমে পলাইয়া বাঁচিল।

আশ্চর্য্য! একটু আগেও তাহাকে নিতান্ত ছেলে-মানুষ বলিয়াই জানিতাম।

* * * * *

এইবার বুঝিলাম, গোবিন্দর মা'র অবস্থা সত্য সত্যই সঙ্কটজনক। সামান্য কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বেও তাহার চোখে মুখে যে নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ্তি দেখিয়া গিয়াছি, সে যেন কেমন করিয়া নিঃশেষে অন্তর্হিত হইয়াছে। সমস্ত দেহের সুস্পষ্ট পাণ্ডুরতা এবং শৈথিল্যের ভিতর হইতে আসন্ন পরিসমাপ্তির একটা বিজ্ঞাপন ফুটিয়া উঠিয়া তাহার অন্তরের প্রচ্ছন্ন দৈন্যটাকে যেন উলঙ্গ করিয়া ধরিয়াছে। সে হাসি নাই, সে রূপ নাই, স্নেহাতুর অন্তরের সুমধুর অভিব্যক্তি তাহার মুখের উপর হইতে কে যেন মুছিয়া লইয়াছে।

ধীরে ধীরে তাহার মাথার কাছে সঙ্কুচিত হইয়া বসিয়া পড়িলাম; অসঙ্কোচে পাশে বসিবার মত মনের অবস্থা ছিল না। গোবিন্দর মা একবার উদাস দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল; তাহার পর একটা দীর্ঘশ্বাসের ভিতর দিয়া অন্তরের আগুন বাহির করিয়া দিতে যাইয়া তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। এই প্রথম তাহাকে কাঁদিতে দেখিলাম।

বলিলাম, কেন ডাকছিলে, মাসি? খুব বেশী কষ্ট হচ্ছে কি?

গোবিন্দর মা সে কথার জবাব না দিয়া কহিল, কেন তুই রাগ করলি, গোপাল?

অন্তরের অসহ্য বিরক্তি কোন মতে গোপন করিয়া কহিলাম, সে কি! রাগ করব কেন, মাসি?

গোবিন্দর মা আমার একান্ত অনিচ্ছা-সঙ্কুচিত একখানি হাত তাহার বুকের উপর টানিয়া লইয়া কহিল, আমার পেটের ছেলে থাকলে সে কি রাগ করত রে?

চক্ষের পলকে আমার সন্দিগ্ধ মন যেন কাহার সুতীব্র কশাঘাতে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়া মাথা চাপড়াইয়া 'ছি-ছি' করিতে লাগিল। লজ্জায় তাহার মুখের দিকে চাহিতে পারিলাম না; নিতান্ত শিশুর মত তাহার বুকে মুখ লুকাইলাম। গোবিন্দর মা আমার এই শোচনীয় পরাজয় লক্ষ্য করিল কিনা জানি না, কিন্তু তাহার দুই চোখে যেন হঠাৎ আগুন জ্বলিয়া উঠিল, পাণ্ডুর মুখখানার উপর কে যেন একমুঠা আবীর ছড়াইয়া দিল এবং প্রাণপণে আমাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া অজস্র চুম্বন বর্ষণ করিতে করিতে সে যেন পাগল হইয়া উঠিল। এবার আর তাহাকে বাধা দিতে পারিলাম না। সমস্ত সন্দেহের কুয়াসা একটিমাত্র মুখের কথায় অপসারিত করিয়া এ রমণী তাহার অন্তরের পরমতম লজ্জা, পরমতম দৈন্য বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে; ইহাকে বাধা দিব, উপেক্ষা করিব কোন সাহসে! যে ব্যর্থ যৌবন একটিমাত্র সন্তানের আশায় মাথা কুটিয়া কুটিয়া হতাশ হইয়া তাহার অন্তরের রুদ্ধকক্ষে এতকাল ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, আজ আমাকে বুকের কাছে পাইয়া সে যেন অকস্মাৎ ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া অব্যক্ত আনন্দে রুদ্ধদ্বার খুলিয়া চীৎকার করিয়া মরিতে চায়। বহুদিন পর তাহার অন্তরের মরুক্ষেত্রে নব জাগরণের বন্যা আসিয়াছে; ভয় হইল, বুঝি-বা এই খরস্রোত তাহার দুর্ব্বল মন ধরিয়া রাখিতে পারিবে না।

বলিলাম, আচ্ছা মাসি, তোমার ত গোবিন্দ রয়েছে! ওকে একটা খবর দিলে হ'ত না?

শুনিয়া গোবিন্দর মা একেবারে ভাঙিয়া পড়িল। হাউমাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া সে কহিল, ওরে; গোবিন্দ যে নেই! সে থাকলে কি আজ আমার ভাবনা ছিল! সে যেখানে গেছে— বলিতে বলিতে তাহার বুকের মধ্যে ধপ্ ধপ্ করিয়া উঠিল; সে কম্পন আমিও অনুভব করিলাম।

বলিলাম, তুমি স্থির হও মাসি, আমি ডাক্তারকে একটা খবর দিয়ে আসি

গোবিন্দর মা প্রবল চেষ্টায় অনেকটা সংযত হইয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে কহিল, না; ডাক্তার আর নয়। তুই যাসনে, গোপাল; থাক আমার কাছে। আমার কপালের দোষে আমি কোলে ছেলে পাইনি, কিন্তু তোকে পেয়ে সে দুঃখু অনেক ভুলেছিলাম। আর বেশী দেরী নেই; যাবার আগে সব কথাই তোকে বলে যাব। তুই লজ্জা করিসনে, গোপাল। সে কথা গোবিন্দকেই একদিন বলে যেতে হ'ত—

বাধা দিয়া কহিলাম, থাক না, মাসি; আমি নাই-বা জানলাম।

গোবিন্দর মা প্রবল আপত্তি জানাইয়া কহিল, না না; সে হয় না। তা' হ'লে আমার পাপ হবে রে।

বলিলাম, কিন্তু শুনলে আমারও যে পাপ হবে মাসি?

গোবিন্দর মা আমার মাথায় হাত রাখিয়া কহিল, হবে না রে, হবে না; আমি বলছি, হবে না। শোন তুই। চক্রবর্ত্তীর জন্যেই হলাম পথের ভিখারী, গোবিন্দকে পেয়েও হারালাম। এখানে কি আনত, না বিয়ে করত—সমিতির লোক যে ভয় দেখালে জেলে দেবে।

শঙ্কিত হইয়া কহিলাম, এইবার একটু চুপ কর, মাসি

গোবিন্দর মা তবু চুপ করিল না; প্রাণপণ চেষ্টায় কহিতে লাগিল, দু-দিনের জ্বরে গোবিন্দ আমায় ফাঁকি দিয়ে চলে গেল!

বলিলাম, আর নয়, মাসি; আমি সব বুঝেছি। এইবার স্থির হও।

নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখা যেমন করিয়া শেষবারের জন্য প্রদীপ্ত হইয়া উঠে ঠিক তেমনি করিয়া গোবিন্দর মা জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল,—চক্কোত্তীও আমায় ফাঁকি দিলে। গোবিন্দকে হারালাম তার জন্যেই। ফাঁকি রে ফাঁকি। সব ফাঁকি। গোবিন্দ যে দিন ফাঁকি দিয়েছে, সেই দিনই—উঃ, গোপাল!

গোবিন্দর মা কণ্ঠের সমস্ত শক্তি দিয়া একটা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়া এক মুহূর্ত্তে স্থির হইয়া গেল। সে আর্ত্তনাদে শঙ্কিত হইয়া পাশের বাড়ীর শৈল চীৎকার করিয়া লোকজন জড়ো করিয়া ফেলিল; কিন্তু আমার বুকের মধ্যে গোবিন্দর মা তখন পরম নিশ্চিন্তে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

ইলিশের ইতিহাস

শ্রী: কুঞ্জবিহারী দত্ত

মৎস্য পালন ও মৎস্য ক্ষেত্রাদি সংরক্ষণের প্রতি অবহেলা-বশত বঙ্গদেশে মৎস্যের প্রাচুর্য্য অধুনা অনেক পরিমাণে কমিয়া গেলেও, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাঙলার মৎস্য-সম্পদ এখনও প্রচুর। খাল, বিল, নদী, জলাশয়পূর্ণ সমুদ্রতটবর্ত্তী বঙ্গভূমি বহুসংখ্যক মৎস্য-জাতিকে আশ্রয় দান করিয়া থাকে। এই সকল মাছের মধ্যে কয়েকটি জাতি জনসাধারণের বিশেষ প্রিয়। সর্ব্বাদৃত মৎস্য-শ্রেণীতে রোহিত ও সমগণীয় মৎস্যই উচ্চ স্থান অধিকার করে, তথাপি, বিশেষ প্রকার স্বাদের জন্য ইলিশ অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ত্বরিত বহনা-বহনের সুবিধার অভাবে ইলিশের ব্যবহার কয়েকটি মাত্র জিলাতে পূর্ব্বে ছিল, কিন্তু ক্রমশ ইহার প্রসার বহু গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। মৎস্য-শিল্পের উন্নতির সহিত ইলিশের আরও অধিক কাটতি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু খাদ্যরূপে ইলিশ সুপরিচিত হইলেও, ইহা পোনা মাছের ন্যায় সর্ব্বত্র ও সর্ব্বসময়ে পাওয়া যায় না; এবং সেইজন্য অনেকেই ইহার জীবন কাহিনী অবগত নহেন। আমরা এ স্থলে ইলিশের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিতেছি।

ইলিশের জন্ম ও বিচরণ স্থান

সুবিশাল ভারত মহাসমুদ্রই ইলিশের বাসস্থান। ভারত হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমে পারস্য উপসাগর ও পূর্ব্বে ব্রহ্ম, শ্যাম ও মালয় দ্বীপপুঞ্জের কতিপয় দ্বীপ পর্য্যন্ত ইলিশের আবাসভূমি বিস্তৃত। কিন্তু মহাম্বুধির অসীম জলরাশির মধ্যে ইহা জীবনের অধিকাংশ সময় যাপন করিলেও জলধিকে ইহার জন্মস্থান বলা যায় না। কারণ ইহার প্রকৃতি এই যে, সন্তানোৎপাদনের সময় ইহা বড় বড় নদীর মোহনা ধরিয়া উজান বাহিয়া যায় এবং তথায় ডিম্ব প্রসব করিয়া পুনরায় সাগরে প্রত্যাগমন করে। বস্তুত ইহার এই অভ্যাসের জন্যই লোকে ইলিশ মৎস্য ভোজনের সুযোগ পাইয়া থাকে।

গঙ্গার ন্যায় ভারতের অন্যান্য সমুদ্রগামী নদীতেও ইলিশ পাওয়া যায়। কেবল যে সমস্ত নদীতে উঠিতে ইহারা কোনরূপ স্বাভাবিক কিম্বা কৃত্রিম বাধা প্রাপ্ত হয়, সেই সকল নদীই ইহারা পরিহার করে। এইরূপে দেখা যায় যে, কোন কোন নদীতে পূর্ব্বে ইলিশ সুলভ থাকিলেও Weir, anicut ইত্যাদি নির্ম্মাণের পর আর সেরূপ নাই। খোলা পথ পাইলে ইলিশ উজান জলে দেশান্তরে বহুদূর পর্য্যন্ত চলিয়া যায়। দিল্লীর সন্নিকটস্থ যমুনায় প্রাপ্ত ইলিশ তাহার দৃষ্টান্তস্থল। বঙ্গ, উড়িষ্যা ও মাদ্রাজ উপকূলের প্রায় সমস্ত সমুদ্রগামী নদীতে অল্পবিস্তর পরিমাণে ইলিশ মাছ প্রবেশ করে। পশ্চিম উপকূলের অনেক স্থলে এইরূপ স্রোতস্বিনীর অভাবে ইহার পথ রুদ্ধ। কিন্তু উত্তর-পশ্চিমে আবার সিন্ধুদেশ প্রভৃতিতে ইলিশ সুলভ। বস্তুত যেখানেই সমুদ্র হইতে উঠিবার মুখে নদী মোহনা প্রশস্ত, স্রোতো পথ বাধাহীন এবং উপরের দিকে প্রজননোপযোগী ক্ষেত্র সহজ-লভ্য, ইলিশ স্বভাবতই সেই সকল নদীতে বর্ষারম্ভে ঝাঁকে ঝাঁকে প্রবেশ করে। অবশ্য সকল বৎসর আগন্তুক মৎস্য-সমূহের সংখ্যা সমান হয় না।

গঙ্গায় ইলিশ অনেক দূর পর্য্যন্ত উঠিয়া যায়; মুঙ্গের পর্য্যন্তও ইহার প্রজনন ক্ষেত্র রহিয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন, যদিও ইতিপূর্ব্বে এস্থলে একটি মৎস্যশালা (Hatchery) প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা সফল হয় নাই। শীতকালে ইলিশ শিশু (খোকা ইলিশ) গঙ্গায় প্রায়ই ধরা পড়ে। কিন্তু ডিম্ব ত্যাগের পর বড় ইলিশ সাগরাভিমুখে ফিরিয়া যাইতে কম দেখা যায়। সম্ভবত এরূপ মাছ ধীবরের হস্ত হইতে রক্ষা পায় না। নিম্ন বঙ্গের নদী-মোহনা (Estuary) সমূহে ইলিশ কোন্ কোন্ স্থানে স্বভাবত সন্তানোৎপাদন করে তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান চলিতেছে, যদিও এ সম্বন্ধে সবিশেষ তথ্য এখনও সংগৃহীত হয় নাই। যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে, নিম্নলিখিত কয়েকটি স্থান ডিম্ব প্রসবের অন্যতম ক্ষেত্র (Spawning ground) যথা:-- ভাগীরথী নদীতে বহরমপুর কোর্টের সন্নিহিত স্থান; পদ্মার লালগোলাঘাট হইতে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত অংশ; যমুনা বা ব্রহ্মপুত্রে সিরাজগঞ্জ এবং মেঘনায় ভৈরব বাজার অঞ্চল। কিন্তু এতদ্ভিন্ন আরও অনেক স্থানে যে ইলিশ ডিম্ব প্রসব করে তাহা সুনিশ্চিত। কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে কলিকাতার ১১ মাইল উর্দ্ধে নবাবগঞ্জের সম্মুখস্থ গঙ্গায় বহু পরিমাণে দেখো দুই ইঞ্চি অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর ইলিশ পোনা ধরা পড়ে। তাহাতে অনুমান করা যায় যে, উহাদের উৎপত্তি বড় বেশী দূরে হয় নাই। সে যাহা হউক, ডিম্ব প্রসব ও নিষেক কার্য্য আশ্বিন মাসের মধ্যেই শেষ হইয়া যায়। পোনা ইলিশ পরে জন্মস্থান হইতে ক্রমশ নদীর মোহনার দিকে চলিয়া যায়। সেই জন্যই শীতকালে সুন্দর বনে ৪।৫ ইঞ্চি পরিমিত ক্ষুদ্র ইলিশের প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য যে, সুন্দরবনই বঙ্গদেশের মোহনা এবং মৎস্য ক্ষেত্রের (Estuarine fishery) মধ্যে অন্যতম।

স্বভাব চরিত্র

ইলিশের বৈজ্ঞানিক নাম Clupea Ilisha বা Hilsa Ilisa ইহা Clupieade বর্গভুক্ত। আমেরিকার Shad মাছ (Alosa Sapindissima ইহার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং সেই জন্য ইলিশকে Indian Shad বলা হয়। বঙ্গদেশে ইলিশের সমগণীয় আরও চারিটি মাছ আছে যথা,—নার ইলিশ, চাপলা, কানগুর্ত্তা ও জ্যাটকা; এগুলির মধ্যে চাপলা স্বাদুজলবাসী; অন্যগুলি নদী মোহনাতেই বিচরণ করে। চিল্কা হ্রদের সুপ্রসিদ্ধ সব্বা মৎস্যও ইলিশের সমবর্গভুক্ত, কিন্তু ইহা অপেক্ষা অনেক বড় ও অপূর্ব্ব স্বাদযুক্ত। ইহার অতুলনীয় গুণে মুগ্ধ হইয়া মহীশূরাধিপতি হায়দর আলি এক সময় এই মৎস্য লইয়া গিয়া সেরিঙ্গাপত্তনে রাজকীয় তড়াগে পালন করেন; তাহাদিগের বংশধরগণ আজিও বিদ্যমান। মাদ্রাজের পশ্চিম উপকূলে ইলিশের সমগণীয় যে মাছ আষাঢ় শ্রাবণ মাসে ঝাঁকে

ঝাঁকে দেখা দেয় তাহার নাম Clupea longiceaps বা Oil Sardine. এইরূপ নামকরণের হেতু এই যে, এই জাতীয় মাছে বিস্তর তৈল থাকে, শতকরা ১০ হইতে ১৫ ভাগ। সিদ্ধ করিয়া ইহার তৈল নিষ্কাষণ ও অবশিষ্টাংশ হইতে সার প্রস্তুত করণ উক্ত উপকূল অঞ্চলের অন্যতম শিল্প।

সমুদ্র জলে ইলিশ বেশ দৃঢ়কায় থাকে। কিন্তু নদী মোহনায় কিম্বা নদী মধ্যে প্রবেশ করিবার সময় ইহারা অনেকটা শক্তিহীন হইয়া পড়ে। তাহার প্রধান কারণ বোধ হয় এই যে, সন্তান উৎপাদনের জন্য যখন ইহারা আসে তখন প্রায়ই কোন খাদ্য গ্রহণ করে না। সাগর বারি হইতে সদ্য আগত অনেক ইলিশের দেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, পাকস্থলীতে ভুক্ত দ্রব্যের চিহ্ন নাই। জল হইতে তুলিলে এবং এমন কি জালে সজোরে ধাক্কা লাগিলেও ইলিশ তৎক্ষণাৎ মরিয়া যায়। অতি সাবধানে তুলিলেও পাঁচ মিনিটের বেশী বাঁচান যায় না। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, ধৃত হওয়ার পর জাল হইতে না তুলিয়া জলের মধ্যেই যদি মৎস্য পাত্রান্তরে রাখা যায়, তাহা হইলে অবস্থা বিশেষে এক ঘণ্টা পর্যন্তও বাঁচিতে পারে। স্বর্গীয় মৎস্যতত্ত্ববিৎ বনওয়ারীলাল চৌধুরী সর্বাপেক্ষা অধিককাল ইলিশ মাছ জীবিত রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। চিল্‌কা হ্রদে অনুসন্ধানের সময় তিনি মাটির গামলায় একটি মাছ ছয় ঘণ্টা পর্যন্ত বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন।

ইলিশ মাছ দ্রুত সন্তরণশীল; ইহারা নদীর তলভাগ দিয়াই সন্তরণ করে; কেবলমাত্র কোনরূপ বাধাপ্রাপ্ত হইলেই জলের উচ্চতর স্তরে আসে। রোহিত অথবা অন্যান্য মৎস্যের ন্যায় জলের উপর লম্ফপ্রদান করিবার প্রবৃত্তি বঙ্গদেশীয় ইলিশের দেখা যায় না। কিন্তু মাদ্রাজ প্রদেশে ইলিশ মাছ নদীবক্ষ হইতে রাত্রিকালে লাফাইয়া উঠে। ধীবরেরা তাহা হইতে বুঝিতে পারে যে, মাছ আসিয়াছে এবং এই অভ্যাসের সুবিধা গ্রহণ করিয়া জাল নিক্ষেপ করে।

ইলিশ জাতির পুরুষ স্ত্রী অপেক্ষা আকারে ছোট। স্ত্রী-মৎস্যের প্রধান লক্ষণ অবশ্য ডিম্ব-স্ফীত উদর, কিন্তু তদ্ভিন্ন অন্যান্য লক্ষণ দ্বারাও স্ত্রী পুরুষের প্রভেদ বুঝিতে পারা যায়। এক একটি ঝাঁকে কিম্বা বর্ষাকালে আগত মোট মৎস্য সংখ্যার মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষের অনুপাত কি রূপ তাহা সঠিক বলা যায় না, কিন্তু অনেক স্থলে স্ত্রী মৎস্যেরই সংখ্যাধিক্য দৃষ্ট হয়।

সলিলবিচরণকারী আণুবিক্ষণিক জীবোদ্ভিদই ইলিশের প্রধান খাদ্য। এইগুলি জল হইতে ছাঁকিয়া বাহির করিয়া লইবার বিশেষ যন্ত্র মাছের কানকোর মধ্যেই অবস্থিত। বর্ষার জলের সঙ্গে পোনা মাছের চারা খাল, বিল, পুষ্করিণী প্রভৃতিতে চলিয়া যায়; কিন্তু ইলিশ সহজ সংস্কার বশত কখন উক্তরূপ আবদ্ধ জলে যায় না। ইহারা স্রোতের জল এবং কমবিস্তৃত নদীগর্ভই পছন্দ করে। নদী মোহনাসমূহই শিশু ইলিশের চারণ-ক্ষেত্র (Feeding ground) বলিয়া বোধ হয়।

প্রজনন নীতি

অধিকাংশ মৎস্যের ডিম্বই শরীরের বাহিরে নিষিক্ত হইয়া থাকে। ইলিশ যে সময় নদীতে উঠিয়া আসে সে সময় তাহাদের সন্তানোৎপাদন পক্ষে পূর্ণ পরিণত অবস্থা থাকে। কৃত্রিমভাবে ডিম্ব নিষেক দ্বারা ইলিশ প্রজননের প্রধান অন্তরায় এই যে পূর্ণ পরিণত স্ত্রী ও পুং মৎস্য একই সময় প্রায় পাওয়া যায় না এবং জল হইতে তুলিলেই মাছ অবিলম্বে মরিয়া যায়। জীবন্ত মৎস্যের উভয়ের সংযোগ করা সেই জন্য সচরাচর ঘটিয়া উঠে না। পূর্ব্বতন বঙ্গীয় মৎস্য বিভাগ এ বিষয়ে অনেক চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কিন্তু মাদ্রাজ সরকারের মৎস্য বিভাগ অনেক দিন হইল কৃত্রিম উপায়ে তৎপ্রদেশীয় ইলিশের সন্তানোৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বাঙলার ইলিশের চালচলন বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিলে এতৎ প্রদেশেও কৃত্রিম উপায়ে ডিম্ব নিষেক দ্বারা সন্তানোৎপাদন এবং মৎস্যশালায় পালন পূর্ব্বক ইলিশের বংশ বৃদ্ধি করা অসম্ভব হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

কিন্তু ভারতীয় প্রাণিতত্ত্ব বিভাগের (Zoological Survey of India) অধুনা অনুষ্ঠিত অনুসন্ধানের ফল হইতে প্রতীয়মান হয় যে কৃত্রিমভাবে ইলিশের বংশবৃদ্ধির চেষ্টা ব্যতীত আপাতত যে সকল স্বাভাবিক সন্তানোৎপাদন ক্ষেত্র রহিয়াছে সেগুলি সংরক্ষণের রীতিমত ব্যবস্থা করিলেও ইলিশমাছের প্রাচুর্য্য সংঘটনের যথেষ্ট সহায়তা হইতে পারে। কলিকাতার কলের জলের বিশুদ্ধতা বিষয়ক অনুসন্ধান উপলক্ষে উক্ত বিভাগের অভিজ্ঞ কর্ম্মচারিগণ কলিকাতা কর্পোরেশনের ফলতায় অবস্থিত জল শোধনাগার পরিদর্শন করেন। উক্ত স্থানে জল পরিষ্কার করিবার যে বড় বড় বালুকাস্তর (Filter bed) রহিয়াছে তাহাতে ইলিশের নবজাত পোনা তাঁহারা দেখিতে পান। এতদ্দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, গঙ্গার যে স্থান হইতে জল পাম্প করিয়া তোলা হয় তাহার অনতিদূরেই ইলিশের প্রজনন ক্ষেত্র রহিয়াছে। পাম্প দ্বারা জলের সহিত উত্তোলিত পোনা থিতাইবার চৌবাচ্চার (Settling Tank) মধ্য দিয়া বালুকাস্তরে উপস্থিত হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবার সুযোগ পায়। এস্থলে পরিণত যৌন অবস্থায় উপনীত মাছও পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং ইহা খুবই সম্ভবপর যে, দেশাভ্যন্তরস্থ জলাশয় (Inland waters) মধ্যেও ইলিশের বৃদ্ধি, পরিপুষ্টি ও সন্তানোৎপাদন চলিতে পারে; পোনা ইলিশের সব সময় সমুদ্রে গিয়া বড় হইয়া আসিবার আবশ্যক হয় না।

অবশ্য প্রজননকাল ব্যতীত অন্য সময় নদী ও নদী মোহনায় যে পূর্ণবয়স্ক ইলিশ বড় একটা পাওয়া যায় না তাহা ইলিশের সমুদ্রবাসের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করে, কিন্তু ইহাও আশ্চর্য্য নহে যে, বৎসরের পর বৎসর নদীজলে কয়েক মাসের জন্য বাস করিয়া ইলিশ ক্রমশ দেশাভ্যন্তরস্থ জলসহ হইবে ও নদীজলে জাত সন্তান কালক্রমে উক্ত জলেই পরিণতি লাভ করিতে পারিবে। জীব ও উদ্ভিদের নূতন আবেষ্টন সহনীয়তার (Aclimatization) প্রচুর উদাহরণ রহিয়াছে। এখন যদিও একটি স্থলে মাত্র ছোট বড় সর্ব্বস্তরের ইলিশ দেখা গিয়াছে, তথাপি ইহা অসম্ভব নহে যে, ধারাবাহিক অনুসন্ধান দ্বারা এরূপ ক্ষেত্র আরও আবিষ্কৃত হইবে।

ফলত এই উপায় ফলপ্রদ হইলে ইহা যে মৎস্যশালা প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা কম ব্যয়সাধ্য ও অধিক কার্য্যকর হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। শুনিতে পাওয়া যায় যে, সম্পূর্ণরূপে নদী-জলে পালিত ইলিশ সমুদ্র জলে বর্দ্ধিত ইলিশের ন্যায় সুস্বাদু হয় না। কিন্তু এ সম্বন্ধে বিশেষ প্রমাণ নাই। কারণ সেরূপ মৎস্যই (অন্তত বঙ্গদেশে) এখন বিরল। বঙ্গ সরকারের অধুনানিযুক্ত মৎস্যতত্ত্ববিৎ কিন্তু মৎস্যশালা স্থাপন পূর্ব্বক ইলিশের বংশ বৃদ্ধির দিকেই বিশেষ লক্ষ্য প্রদান করিতেছেন।

ব্যবহারিক প্রাধান্য

বঙ্গদেশীয় উৎকৃষ্ট মৎস্যসমূহের মধ্যে ইলিশ যে অন্যতম তাহা সকলেই স্বীকার করেন। ইহার মরসুমের সময় শত শত লোক মৎস্য ধরা, সংগ্রহ করা, চালান দেওয়া ও বিক্রয় কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। বস্তুত ইলিশ ব্যবসায় দ্বারা বহুসংখ্যক ব্যক্তি জীবিকা উপার্জ্জন করে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইলিশ-শিল্প এতৎ প্রদেশে এখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ইলিশের শরীর ও যকৃতজাত তৈল, অব্যবহার্য্য মৎস্যজাত সার, সংরক্ষিত মৎস্য ও ডিম্ব—এ সমস্তই ব্যবসায়যোগ্য দ্রব্য। অবহেলায় ও সংগঠনের অভাবে এ সকল দ্রব্য এখনও উপযুক্তরূপে ও মাত্রায় প্রস্তুত হইতেছে না। মাদ্রাজ এ বিষয়ে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। তৎপ্রদেশের দৃষ্টান্ত আমাদিগের পক্ষে অনুকরণীয়।

পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে বাঙালী দিন দিন যেরূপ হীনবল ও রোগাক্রমণপ্রবণ হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে আমাদিগের আহার্য্যের উন্নতিসাধন অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। এ বিষয়েও ইলিশ সহায়তা করিতে সক্ষম। আধুনিক পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে ইলিশমাছে শরীর-পোষক উপাদানসমূহ যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে। তদ্ভিন্ন ইহাতে খাদ্য-প্রাণের অনুপাতও কম নহে যথা— প্রতি ১০০ গ্রামে খাদ্য-প্রাণ ক ৪, খ ১—১০, ও খ ২—৮ Unit বিদ্যমান। অতএব অপুষ্টিজনিত ব্যাধি নিবারণ করিতে ইহা যথেষ্ট ফলপ্রদ।

সরবরাহ বৃদ্ধি

ইলিশের স্বাভাবিক শত্রুসংখ্যা নিতান্ত কম নহে। সমুদ্র হইতে উঠিয়া আসিবার সময় ঝাঁকের অনুসরণ করিয়া এক জাতীয় হাঙ্গর বিস্তর মৎস্য গলাধঃকরণ করে। তৎপরে নদীতে প্রবেশ করিলে কুম্ভীরের হস্ত হইতেও ইহারা নিস্তার পায় না। শুশুকেও ইলিশমাছ প্রিয়; এবং সর্ব্বশেষে ভোঁদড়ও কম ইলিশমাছ বিনষ্ট করে না, কিন্তু মানুষই একরকমে ইহার প্রধান শত্রু। একদিকে সন্তানোৎপাদনোন্মুখ পরিণত মৎস্য এবং অন্যদিকে ক্ষুদ্র পোনা অত্যধিক পরিমাণে ধরিয়া বহুস্থলে নদীতীরবাসী ব্যক্তিবর্গ ইলিশের স্বাভাবিক বংশ বৃদ্ধির যেরূপ প্রতিকূলতা আচরণ করিয়া থাকে সেরূপ আর কেহই করে না। দেশমধ্যে যাহাতে মৎস্য সরবরাহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তজ্জন্য সকল সুসভ্য দেশেই মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও পরিপুষ্টির জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে অন্যতম উপায় হইতেছে মৎস্যসমূহকে পূর্ণমাত্রায় সন্তানোৎপাদনের সহায়তা করা এবং অপুষ্ট মৎস্য রক্ষা করা। সেই উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে অন্যান্য দেশের ন্যায় এতদ্দেশেও আইন দ্বারা মৎস্য ধরা নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক হইবে। বৎসরে নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য সন্তানোৎপাদনমুখ মৎস্য ধরা যেমন নিষিদ্ধ হওয়া দরকার; তেমনই ক্ষুদ্র পোনা মারাও বন্ধ করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। আশা করা যায় যে, বহুকাল স্থগিত থাকার পর বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে যখন আবার মৎস্য-চাষ ও মৎস্য-শিল্প বিষয়ক উন্নতি সাধনের কল্পনা হইতেছে, তখন এ সম্বন্ধে আইন বিধিবদ্ধ হইতেও বিলম্ব হইবে না। কিন্তু সর্ব্বোপরি একান্ত আবশ্যক ধারাবাহিক অনুসন্ধান। আমরা আমাদিগের প্রধান মৎস্যগুলির জীবন বৃত্তান্ত সম্বন্ধে খুব কমই জানি। অথচ এ বিষয়ে সম্যক জ্ঞান না থাকিলে কোন প্রকার উন্নতি সাধন সম্ভবপর হয় না। বাঙলার ন্যায় দেশে, যেখানে মৎস্য শিল্পের সম্ভাব্যতা অসামান্য, সেখানে আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম সমন্বিত মৎস্য গবেষণাগার না থাকা বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয়। এ অভাব যে কতদিনে পরিপূরণ হইবে তাহা বলা যায় না।

আমার গানের ঢেউগুলি যায়

শ্রীমতী নলিমা গঙ্গোপাধ্যায়

আমার গানের ঢেউগুলি যায়
নিত্যই তোমার কানে
ভালো-কি তা লাগে প্রিয়—
বাজে তোমার প্রাণে।

আমার বুকের বিজন বনে
কুসুম ফোটে নিরজনে,
সেই কুসুমের মালা গাঁথি
আমার গানে গানে।

এ মোর মনের পরশ যখন
বাজায় তোমার বাঁশি
তুমি তখন আমার পানে
পাঠাও চাঁদের হাঁসি।

কান্না যখন চোখে লাগে
বুকে তোমার রূপ যে জাগে
ভরে তখন রিক্ত হৃদয়
তোমার অসীম দানে।

প্রণয়ের পরে

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীসত্যকুমার মজুমদার

লীলার বিবাহের পর প্রায় দুই মাস কাটিয়া গিয়াছে। বিবাহের দুই দিন পূর্ব্বে যে হঠাৎ অমরনাথ বাড়ী ছাড়িয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিয়াছে—আর লীলার সঙ্গে দেখা হয় নাই। লীলা ভাবিত কেন অমরদা এমন না বলিয়া কহিয়া চলিয়া গেল। এতটুকু সহ্য করিবার ক্ষমতা কি তার অমরদার নাই। তবে সে নিজে সহিল কেমন করিয়া! এই কলিকাতায় সে-ও রহিয়াছে, অমরদাও আছেন, অথচ এক দিনের জন্যও দেখিয়া গেলেন না, সে কেমন আছে! তবে বিদায়-বেলায় অত জোরে সে কি করিয়া কহিল যে, তার অমরদা চিরকাল অমরদাই থাকিবে। ভাই হইয়া কি ভগ্নীকে দেখিতে আসিতে নাই! এবার দেখা হইলে সে এই কথাই জিজ্ঞাসা করিবে যে তার কাছে আসিতে অমরদার এত ভয় কিসের। কি চতুর তার অমরদা, আমার বিবাহের উপহারের মধ্যে আর একখানা নীল শাড়ী পাঠাইয়াছে। এবার যদি আসেন নীল শাড়ী পরিয়াই তার সম্মুখে বাহির হইবে। বেশ কিন্তু কাপড়-খানা এবারকার।

লীলা নিজের বাক্স খুলিয়া অমরের দেওয়া উপহারগুলি বাহির করিয়া দেখিতে লাগিল।

মুক্ত দ্বার পথে স্বামী নরেন্দ্রনাথ গৃহে প্রবেশ করিল। লীলা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত জিনিষগুলি টেবিলের উপর ফেলিয়া রাখিয়াই অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

নরেন্দ্রনাথ একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "আমি যেন রাস্তার লোক—অজানা, অচেনা কেউ এসে দাঁড়িয়েছি, তুমি লজ্জায়ই মরে যাচ্ছ!"

লীলা সলজ্জ মৃদু হাসিয়া মুখের অবগুণ্ঠন সামান্য সরাইয়া ফেলিল। নরেন্দ্রনাথ মুগ্ধ চক্ষে লীলার পানে চাহিয়া বলিল, "সরে এস না এদিকে!"

লীলা সংকুচিতভাবে একটু অগ্রসর হইয়া কহিল, "দিনের-বেলা, কেউ এদিকে এসে পড়ে যদি!"

"এটা তোমাদের পাড়াগাঁ নয় গো, আচ্ছা আমি দোরটা ভেজিয়ে দিচ্ছি।"

নরেন্দ্রনাথ উঠিতে যাইতেছিল লীলা তাহার হাত ধরিয়া ফিরাইল। বলিল, দো'র ভেজাতে হবে না, দিনের বেলায় আমার লজ্জা করে!

লীলা নিকটে দাঁড়াইল। নরেন্দ্র টেবিলের উপর ছড়ান জিনিষগুলির দিকে চাহিয়া বলিল, "বা-রে চমৎকার শাড়ী ত! বে'র সময় কেউ দিয়েছে বুঝি!"

লীলা ঘাড় হেলাইয়া স্বীকার করিল। নরেন্দ্র কাপড়-খানা হাতে লইয়া কহিল, "শাড়ীখানা যিনি দিয়েছেন, তাঁর রুচিটি বেশ ডিসেণ্ট আর ডিগনিফাইড! কে পাঠিয়েছেন—কি হয় তোমার?"

লীলা অনুচ্চস্বরে কহিল, "ভাই—দাদা।"

"বেশ দাদাটি তোমার! আমার তারিফ করতে ইচ্ছে করছে। তাঁর পছন্দের দাম আছে কিন্তু! শাড়ীখানা পরলে কিন্তু আমি না ব'লে পারতুম না—

"কিবা চলে নীল শাড়ী, নিঙাড়ি নিঙাড়ি,
পরাণ সহিত মোর!"

লীলা স্বামীর উপর দুষ্ট কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া যাইতেছিল। নরেন্দ্র হাত ধরিয়া ফিরাইয়া কহিল, "বৈষ্ণব কবিদের সৌন্দর্য্য জ্ঞান ছিল বাহিরি!"

লীলা উন্নত গ্রীবা-ভঙ্গি করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। নরেন্দ্রনাথের চোখ থাকিলে সে দেখিতে পাইত, তার অসামান্যা রূপসী স্ত্রী শুধুই রূপসীই নহে, বিরাট রহস্যময়ী। লীলার তীব্র দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়া নরেন্দ্র ক্ষণকালের জন্য হত-বুদ্ধি হইয়া পড়িল। স্বামীর এই বিমূঢ় ভাব লক্ষ্য করিয়া লীলা হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "বৈষ্ণব কবিতা সব পড়া হয়ে গেছে! জয়দেবের গীতগোবিন্দও বোধ হয় বাদ যায়নি!"

নরেন্দ্র সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া বলিল, "আমি সায়েন্সের ছাত্র, কাব্যের ধার বড় ধারি না—। গানটি চণ্ডীদাসের না বিদ্যাপতির তাও আমার জানা নেই। সেদিন তিনকড়ি ভট্চায গঙ্গায় নাইতে যেয়ে একটি মেয়েকে দেখে গুন্ গুন্ ক'রে গাইছিল, তাই আমার মুখস্থ হয়ে গেছে।"

"ভদ্রলোকের ঝি-বৌ দেখে ঐসব গান গেয়ে কটাক্ষ করা বুঝি তোমার বন্ধুদের স্বভাব!"

লীলা তাহাকে কোন্ দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে, সেদিকে লক্ষ্য না করিয়াই নরেন্দ্র বলিল,—"ভদ্রলোকের মেয়ে না একেবারে সতী-সাবিত্রী—খড়দয়ের মা ঠাকরুণ।"

লীলা যেন কি বুঝিতে চেষ্টা করিল—কতক বুঝিলও। এই দুই মাসের মধ্যে বিচিত্র শহর কলিকাতার বিচিত্রতা কতক কতক বুঝিতেও পারিয়াছে। আরও বুঝিল তার নব পরিচিত স্বামী দেবতাটির চরিত্র কোন গুণধরদের সংসর্গে মিশিয়া গঠিত হইয়াছে। তবুও বুকে খুব বাজিল না। বিম্বাধরে জোর করিয়া হাসি ফুটাইয়া লীলা বলিল, "এই জন্য বুঝি আমার পাড়াগেঁয়ে লজ্জা তোমার ভাল লাগে না। যাদের সঙ্গে তোমাদের পরিচয়—তাদের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারা কোন ভদ্র-ঘরের মেয়ের সাধ্য নয়, উচিতও নয়।"

নরেন্দ্রনাথ এবার তলাইয়া দেখিল, কৌশলে তাহার বুদ্ধিমতী স্ত্রী তাহাকে কোন্‌দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে।

নিজের চরিত্রের নির্ম্মলতা প্রমাণ করিতে যাইয়া নরেন্দ্র কি বলিতে যাইতেছিল, নীচের বৈঠকখানা হইতে সতীশের কণ্ঠস্বর শুনিয়া আর বলা হইল না। পত্নীর পানে চাহিয়া নরেন্দ্র বলিল, "তর্ক রইল তোমার সঙ্গে এই নিয়ে। সতীশ ডাকছে শুনে আসি আগে।"

নরেন্দ্র নীচে নামিয়া আসিল। সতীশ নরেন্দ্রের সহ-পাঠী। বয়সে নরেন্দ্রের চেয়ে এক আধ বৎসরের ছোট। দিব্য সুগৌর চেহারা—ব্যায়ামপুষ্ট দেহ—অনিন্দ্যসুন্দর মুখশ্রী! এক কলেজ হইতেই দুই বন্ধু বি-এ পাশ করিয়াছে। নরেন্দ্রের ছিল বিজ্ঞান—সতীশ পড়িত কলা বিভাগে। গ্রেজুয়েট হইয়া নরেন্দ্র ঢুকিল মেডিকেল কলেজে সতীশ ভর্ত্তি হইল ইউনিভার্সিটিতে এম-এ আর আইন লইয়া। সতীশের বৃদ্ধ প্রপিতামহ কেশব গাঙ্গুলী নবাবী আমলে

জমিদারী কিনিয়া গাঙ্গুলীর পরিবর্ত্তে চৌধুরী খেতাব গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেশব গাঙ্গুলী ছিলেন পূর্ব্ববঙ্গের লোক। সতীশচন্দ্রের পিতামহ ভুবন চৌধুরী গঙ্গাতীরে বাস করিবার ইচ্ছায় শেষ বয়সে কলিকাতায় আসিয়া শ্যামবাজার অঞ্চলে এক বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়া তথায় সপরিবারে বাস করিতে থাকেন। পিতামহের জীবনেই সতীশের পিতার পরলোক হইয়াছিল। মৃত্যুকালে ভুবন চৌধুরী তাঁর একমাত্র পৌত্র সতীশের জন্য রাখিয়া গেলেন হাজার চল্লিশ টাকা আয়ের পূর্ব্ববঙ্গের এক জমিদারী, কলিকাতার উপর আট দশখানা বাড়ী, আর ব্যাঙ্কের হিসাবে জমা মোটা টাকা। পিতামহের নিকট সতীশ যথেষ্ট সুশিক্ষা পাইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর পর প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনের "বয়ে যাবে" এই ভবিষ্যৎ বাণী ব্যর্থ করিয়া সতীশ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিঁড়ি-গুলি একে একে পার হইয়া গেল।

সতীশ ছিল একটু লাজুক ধরণের ছেলে। নরেন্দ্রের সাহচর্য্যে তার লজ্জা-সঙ্কোচ অনেকখানি কমিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে সহজভাবে মিশিবার শক্তি নরেন্দ্রের মত সতীশের ছিল না। সতীশ বেশ কবিতা লিখিতে পারিত। রীতিমত ওস্তাদ রাখিয়া কুস্তী শেখা পালোয়ানী শরীরের ভিতর কবিত্ব যে তার কোথা হইতে আসিত এই ভাবিয়াই নরেন্দ্রনাথ সময় সময় আশ্চর্য্য হইয়া যাইত।

নরেন্দ্র ছিল ভাববিলাসী হাল্কা প্রাণের মানুষ। একটু উচ্ছৃঙ্খল ধরণের। কিন্তু এই দুটি তরুণের কোথায় যেন একটু মিল ছিল। যেদিন অনেক চেষ্টা করিয়াও নরেন্দ্র তার এই লাজুক বন্ধুটিকে নিজের দলে টানিয়া আনিতে পারিল না এবং নিজের পদস্খলনের অতি গোপন কাহিনী প্রকাশ করিয়াও তাহার শ্রদ্ধা হারাইল না, সেইদিন হইতেই নরেন্দ্রের হৃদয় গভীর শ্রদ্ধায় অটুট বিশ্বাস ও অকৃত্রিম বন্ধুত্বে ভরিয়া উঠিল!

নীচের বৈঠকখানায় সতীশকে বসাইয়া নরেন্দ্র কহিল, "তারপর হঠাৎ কি মনে করে কবি?"

সতীশ বলিল, "বৌদিকে দেখতে এসেছি।"

হাসিয়া নরেন্দ্র কহিল, "এই ত সেদিন চুপি চুপি দেখে গেলি, তাতে হ'ল না?"

"আমার বড্ড লজ্জা করতে লাগল। ভাল করে চাইতে পারলাম না যে! চল্ আজ একবার দেখাবি!"

বলিয়াই সতীশ মুখে মুখে এক কবিতা রচনা করিয়া কহিল, -

সে যখন সই এল কাছে
চাইনি মুখের পানে
সলাজ অভিমানে!...

শুনিয়া সপ্রশংস দৃষ্টিতে সতীশের দিকে চাহিয়া নরেন্দ্র কহিল, "সত্যি, বেশ লিখিস তুই সতীশ। সেদিন তোর কবিতা পড়ে কান মলে দিতে চেয়েছে। বলেছে, বন্ধুর বৌ দেখে যার কবিতা বেরোয় তার শুধু কান মলা নয়, কান কেটে দেওয়া উচিত!

সতীশ হাসিতে লাগিল।

"উপাধি দিয়েছে তোকে 'কবি' কালিদাস। ভবিষ্যৎ বাণীও করেছে চমৎকার। হাড়ীর কোদালে মৃত্যু!"

সতীশ কহিল, "তোর ভাগ্য ভাল নরেন, অজ পাড়াগাঁয়ে বে' করেও এমন বিদুষী ভার্য্যা পেয়েছিস। তোর বরাত দেখে সত্যিই হিংসে হয়।"

নরেন্দ্র বলিল, "পেট ভর্ত্তি ওর বিদ্যে। বে'র সময় ও বাড়ীতে দেখে এসেছি চারটি আলমারীতে সব ওর বই! অমরবাবু বলে কে নাকি ওর এক ভাই সব ওকে শিখিয়েছে। ভাবছি আসছে বছর ওকে দিয়ে প্রাইভেট ম্যাট্রিক দেওয়াব।"

"তা হ'লে বেশ হবে। বৌদির সঙ্গে আমার আলাপ করবার লোভ হচ্ছে নরেন!"

নরেন্দ্র কহিল, "ধীরে বন্ধু একটু ধীরে! বড্ড সেকেলে ধরণের। কিছুতে বন্ধুদের সামনে বেরুতে চায় না। আচ্ছা দেখ, আজ বিকেলে পরেশনাথের বাগানে বেড়াতে যাবি, পারি যদি তোর বৌদিকে নিয়ে যাব।"

"থ্যাঙ্কস থ্যাঙ্কস টু মাই ওয়াণ্ডারফুল ফ্রেণ্ড" বলিয়া সতীশ তখনকার মত বিদায় লইল।

বিকালে নরেন্দ্র লীলাকে ডাকিয়া বলিল, "চল আজ একটু পরেশনাথের মন্দিরটা দেখিয়ে আনি।"

লীলা স্বামীর উপর সহাস্য কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "আজ যে বড় নূতন সখ দেখতে পাচ্ছি। বেড়াতে নিয়ে যাবার তোমার ত বান্ধবীর অভাব নেই জানি!"

নরেন্দ্র কহিল, "আর বক্ বক্ না করে চট্ করে তৈরী হয়ে নাও!"

"মার কাছে বলেছ ত?" লীলা জিজ্ঞাসা করিল।

"যাবার বেলায় বলে গেলেই ত চলবে।"

"না চলবে না, আগে তাঁর অনুমতি নিতে হবে।"

"কি আপদ। তোমাকে নিয়ে আর পোষাচ্ছে না। বেয়াড়া পাড়াগাঁয়ে তুমি।"

"না পোষালেও তোমার পোষাবার লোকের অভাব হবে না জানি। সত্যি আমরা পাড়াগেঁয়ে এবং তা জেনেই ঘরে এনেছ! এখন না পোষালে ফেলবে কোথায়! কিন্তু তোমাদের যে শহুরে সভ্যতায় কোন কাজে গুরুজনের অনুমতির অপেক্ষা করে না, তা নিয়ে তোমরাই থাক। আমি তা চাইনে। তার চেয়ে আমার অসভ্যতা নিয়ে যেন আমি জন্মে জন্মে পাড়াগেঁয়ে হয়েই জন্মাই।"

নরেন্দ্রনাথ টেবিল চাপড়াইয়া বলিল, "চমৎকার লেকচার দিতে শিখেছ কিন্তু! নাও আর ছেলেমো করো না, কি বলবে মাকে বলে এস।"

লীলা শাশুড়ীর ঘরের দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া অতি মৃদুস্বরে ডাকিল "মা!"

শাশুড়ী বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "ওখানে দাঁড়িয়ে কেন বৌমা, ভিতরে এস।"

লীলা অতি সঙ্কোচের সহিত নতমুখে কহিল, "একটু বেড়াতে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন, যাব মা?"

শাশুড়ী খুশী হইয়া বলিলেন, "তা বেশ তো, যাও।" পরে নরেন্দ্রকে ডাকিয়া কহিলেন, "ড্রাইভারকে আস্তে গাড়ী চালাতে বলিস!"

লীলা শাশুড়ীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "আপনিও চলুন না মা!"

হাসিয়া মাতা কহিলেন, "আজ তুমি একাই যাও, অন্যদিন আমি সঙ্গে নিয়ে যাব।"

লীলাকে লইয়া নরেন্দ্রনাথ পরেশনাথের বাগানে আসিয়া পৌঁছিল। বন্ধু সতীশ ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বেই আসিয়া বসিয়াছিল। সস্ত্রীক নরেন্দ্রকে দেখিয়া আনন্দোজ্জ্বল মুখে সতীশ কি বলিতে যাইতেছিল নরেন্দ্রের ইঙ্গিতে থামিয়া যাইয়া অন্যদিকে চলিয়া গেল।

বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ লীলা থামিয়া মৃদুকণ্ঠে নরেন্দ্রকে কহিল, "ঐ যে ঐখানটায় অমরদা বসে রয়েছেন। ডেকে নিয়ে এস না।"

লীলার নির্দ্দেশ মত বেঞ্চটির দিকে চাহিয়া নরেন্দ্র বলিল, "ওখানে ত তিন চারিটি ভদ্রলোক বসে রয়েছেন কোনটি তোমার অমরদা? চল না ঐদিক দিয়ে ঘুরে যাই তোমায় দেখলেই ত তোমার অমরদা উঠে আসতে পারেন।"

লীলা কৃত্রিম রোষে মুখ ভার করিয়া কহিল, "হাঁ, ঐখানে যাব! কারা সব বসে রয়েছে দেখতে পাচ্ছ না?"

তারপর খানিক থামিয়া বলিল, "আমার অমরদা তেমন লোকই নন, তাঁর সম্মুখ দিয়ে চলে গেলেও তিনি ফিরে চেয়ে দেখবেন না। তোমার বন্ধুদের মতন মেয়েদের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকবার স্বভাব তাঁর নয়, আর মেয়েদের আশে পাশে ঘুরে বেড়াবার জন্য নিশ্চয়ই তিনি বাগানে আসেন নি।"

কথাটা যে কাহাকে লক্ষ্য করিয়া প্রয়োগ করা হইল, নরেন্দ্রনাথ তাহা বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া কহিল, "তোমার অমরদা কবি তা হলে নিশ্চয় নন। তা তুমি এই খানটায় বস আমি ডেকে নিয়ে আসছি।"

লীলাকে বসাইয়া রাখিয়া নরেন্দ্রনাথ অমরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল, নমস্কার করিয়া কহিল, "আপনি অমরবাবু?"

অমর প্রতি-নমস্কার করিয়া নরেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিলে, হাসিয়া নরেন্দ্র কহিল, "আমার সঙ্গে পরিচয় নেই এই তো! তা সব চেনা-শোনাই যে আগে অচেনা থাকে অমরবাবু!"

নরেন্দ্রের কথায় উপস্থিত সকলেই হাসিয়া ফেলিল, ও-পাশ হইতে একজন বলিয়া উঠিল, "বিশেষত নিজের অর্দ্ধাঙ্গিনীটি।"

সকলের হাসিতে যোগ দিয়া অমর কহিল, "বসুন না তবে, আজ থেকে একটু চেনা জানাই হয়ে যাক।"

নরেন্দ্রনাথ পূর্ব্ববৎ বলিল, "সেইটিই হবে'খন, আপনাকে একটু ওধারে যেতে হচ্ছে—বিশেষ দরকার।"

নরেন্দ্রের কথা অমরের নিকট হেঁয়ালীর মত ঠেকিল, বলিল, "আপনার নামটি জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

নরেন্দ্র কহিল, "ওই তো মশাই শহরে এসেও পাড়াগেঁয়ে আদব-কায়দা ছাড়তে পারেন নি। এটা কলকাতা শহর, আলাপ করবেন, ভদ্রলোকের নাম জিজ্ঞেস করবেন কেন। উঠে আসুন না, অনেকক্ষণ যে সে তার অমরদার জন্যে বসে রয়েছে।"

অমরের মুখ সহসা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, "কে লীলা, আপনি নরেনবাবু?" নরেন্দ্রনাথ উত্তর না করিয়া অগ্রসর হইল, অমরও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উঠিয়া আসিল।

কাছে আসিলে লীলা অমরের পায়ের ধুলো লইয়া বলিল, "ভাল আছ অমরদা, বৌদি ভাল আছেন? শরীরটি এমন রোগা দেখাচ্ছে কেন।"

এমন সময় নরেন্দ্রনাথ উঠিয়া বলিল, "আপনারা ততক্ষণ একটু গল্প করুন অমরবাবু, আমি একটু ঘুরে আসি।"

নরেন্দ্রনাথ চলিয়া গেল। অমর কহিল, "নরেনবাবুকে ত দেখলাম বেশ লোক, দেখে খুশী হয়েছি।"

লীলা সেদিকে কান না দিয়া বলিল, "বৌদির মেজাজটা আজকাল একটু ভাল হয়েছে অমরদা?"

অমরনাথ হাসিয়া বলিল, "মন্দ আবার কবে ছিল যে ভাল হবে।"

লীলাও একটু মৃদু হাসিল। অমর কহিল, "নরেনবাবু চলে গেলেন, আমি এবার উঠি লীলা!"

লীলা হাসিয়া বলিল, "লোকটির কেবল ঐ একটি দোষই নেই অমরদা! দেখ না কোন হতচ্ছাড়া বন্ধুর অনুরোধে আমাকে দেখাবার জন্য বাগানে বেড়াতে নিয়ে এসেছে। ঐ যে তোমার সামনেই এখান দিয়ে দু'বার চলে গেল। এমন লোকও না কি কোথাও আছে অমরদা যে নিজের ঘরের বৌকে কুণ্ঠাহীন আদর্শরহিত বন্ধু-বান্ধবের সামনে বের করে!"

অমর চোখ তুলিয়া দূরে উপবিষ্ট সতীশের পানে চাহিয়া দেখিল, পরে কহিল, "মুখ চোখ দেখে ত তেমন খারাপ লোক বলে মনে হয় না লীলা! তা হোক লোকটিকে দেখে একটু হুঁসিয়ার হয়েই চলিস।"

লীলা প্রথমে একটু কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। পরে হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "কি যে তুমি বল অমরদা, পথের লোককেও আমার ভয় করে চলতে হবে। বিশেষত একটা বেয়াদব অভদ্র—।"

অমরনাথ বাধা দিয়া বলিল, "ঐ বাধাহীন অভদ্র লোকগুলোকেই যে বেশী ভয় করে চলতে হয় লীলা। ওরা যে বিদ্রোহী। সমাজের বিধি-নিষেধ-শৃঙ্খলা কিছু মানতে চায় না।"

তারপর একটু থামিয়া বলিল, "ঠিক পথের লোককেই যে ভয় করে চলতে হবে তার কোন মানে নেই, কিন্তু তা যখন সত্যই নয়, তাকে অত অবহেলা করলে চলবে কেন?"

লীলা খানিক চুপ করিয়া কি ভাবিল, পরে কহিল, "তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছিনে অমরদা।"

অমরনাথ কহিল, "কথাটা বুঝে ওঠা ভারি শক্ত। বোঝানও তার চেয়ে কম কঠিন নয়। ওসব মনোবিজ্ঞানের কথা, কিন্তু অত কথা বলবার সময় ত আমার নেই লীলা! আমি এবার উঠব।"

লীলা অমরের পায়ের ধুলো লইয়া বলিল, "তবে আর একদিন আমায় বুঝিয়ে দিও অমরদা! হাঁ অমরদা! কবে আমাদের বাড়ী যাবে?"

"যাব একদিন" বলিয়া অমর উঠিয়া দাঁড়াইল।

অমরনাথ দুই এক পদ অগ্রসর হইতেই নরেন্দ্র অতর্কিতে

আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল, বলিল, "এরই মধ্যে চলে যাচ্ছেন যে বড়। বোনটি কোন জানোয়ারের হাতে পড়েছে তার একটু পরিচয় নিয়ে যাবেন না!"

পরে লীলার দিকে চাহিয়া বলিল, "উঠে এস না গো ওঁকে আজ বাড়ী না নিয়ে ছাড়ছিনে।"

অমরকে কোন প্রতিবাদ করিবার অবসর না দিয়াই নরেন্দ্র একরূপ জোর করিয়া অমরকে গাড়ীতে তুলিয়া লইল, পেছনে ফিরিয়া সতীশকে ইঙ্গিতে কি বলিয়া নরেন্দ্র গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

বিবাহের পর হইতেই লীলার চরিত্রে অনেক পরিবর্ত্তন আসিয়াছে সত্য কিন্তু অমরকে সেবা করিবার আকাঙ্ক্ষা লীলার যায় নাই। একই নারীর হৃদয়ে স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা এক সঙ্গেই নীড় রচনা করে—লীলাও তেমনি একযোগে মাতৃত্ব, ভগ্নীর মহিমা হইতে বঞ্চিত হইবে কেন। অমরকে বাগান হইতে জোর করিয়া ধরিয়া আনায় স্বামীর উপর তাহার শ্রদ্ধা গভীর কৃতজ্ঞতায় পরিণত হইল। কিন্তু জলখাবারের থালা সাজাইবার সময় নরেন্দ্র যখন বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া কহিল, তার বন্ধু সতীশের জন্যও যেন একখানা ঠাঁই করা হয়, তখন লীলা স্বামীর উপর শুধু বিরক্ত নয় অসন্তুষ্টও হইল। তবু সেভাব দমন করিয়া হাসিমুখে কহিল, "বাগানে দেখে আশ মেটেনি বুঝি!"

আহারান্তে অমর চলিয়া গেল। লীলা যে সুখী হইতে পারিয়াছে—তার শিক্ষা-দীক্ষা যে ব্যর্থ হয় নাই—অতীত দিনের দুঃস্বপ্নকে সে যে ভুলিতে পারিয়াছে—ইহা অমরের পক্ষে কম সান্ত্বনার বিষয় ছিল না। তবুও যেন কোথায় কি বিঁধিতেছিল। এমনই এক প্রথম দেখার দিনে প্রভাকে দেখিয়া লীলা বিজয় দৃপ্ত মুখে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল—আজ কিন্তু এই প্রথম পরিচয়ে সর্ব্বাঙ্গে পরাজয়ের গ্লানি মাখিয়াই অমরকে ফিরিতে হইল।

রাত্রে শয়ন কক্ষে লীলার স্কন্ধে হাত রাখিয়া নরেন্দ্র কহিল, "ইনিই তোমার সেই অমরদা, না?"

লীলা বুঝিতে না পারিয়া নরেন্দ্রের পানে চাহিয়া রহিল। নরেন্দ্র বলিতে লাগিল, "যার কাছে তুমি পড়তে, সেই যে নীল শাড়ীখানা উপহার দিয়েছিলেন?"

লীলার অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। অতি কষ্টে কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখিয়া বলিল, "হাঁ ইনিই ত।"

নরেন্দ্রনাথ পত্নীর মুখের উপর স্থির দৃষ্টি রাখিয়া বলিল, "তোমার এই অমরদাটি কে আমায় বলবে লীলা?"

শয়ন কক্ষের আলো নিষ্প্রভ না হইলে নরেন্দ্র দেখিতে পাইত এই সামান্য প্রশ্নে লীলার সুগৌর উজ্জ্বল মুখমণ্ডল ছাইয়ের মত শাদা হইয়া গিয়াছে।

ম্লান হাসি হাসিয়া লীলা উত্তর করিল, "দেখ ত কথা! অমরদা আবার কে, আমার ভাই—আমার দাদা!"

(ক্রমশ)

তুমি কি আসিবে প্রিয়

শ্রীহেমেন সেনগুপ্ত

তুমি কি আসিবে প্রিয়, নরম জ্যোছনা রাতে,
মোর এই বাতায়নতলে—
নরম সোনার চাঁদ, কনক প্রদীপ সম,
তারার জোনাকিগুলি জ্বলে।
যে-কথা বলিনি আজো, মরমে লুকায়ে আছে,
না-বলা কথাটি মোর বলি—
কুঁড়ির মাঝারে কাঁদে, চাঁদের স্বপন দেখি,
কনক চাঁপার যত কলি।
চেয়ে দেখ আকাশেতে, তুমি যে আসিবে তাই,
নয়ন ভরিয়া নিয়া জলে
অভিমান ছলছলো, চকোর কাঁদিয়া মরে,
নবনী মেঘের ছায়াতলে।
হিজল গাছের শাখা, মহুয়ার বনতল,
ফুলে ফুলে দেখিছে স্বপন—
পড়েছে চাঁদের টিপ, আকাশ সোনার মেয়ে,
জোছনার হাসে অনুখন।
সেই কবে এসেছিলে, হেসেছিলে ভালবেসে,
কোজাগরী পূর্ণিমা রাতে—
কাছে এসে বসেছিলে, সে কথা ভুলেছি আজ,
বীণাখানি ছিল তব হাতে।

আজি রাতে এস প্রিয়, দখিণা এ সমীরণে,
বিরহের বাসরের রাতে,
অভিমানে মুছিওনা চোখের কাজল লেখা,
হাতখানি রেখ মোর হাতে।
সে দিন হয়নি বলা, বলিতে চেয়েছি যাহা,
চুপি চুপি তব কানে কানে—
সে-কথা কহিব আজি, রাকা-চাঁদ উঠিয়াছে,
আকাশ ভরিয়া গেছে গানে।
মেঘমারা ছলছল, চামেলী ফুটেছে বনে,
নেশাতুর হয়েছে ফাগুনে—
আজি রাতে এস প্রিয়, এই মধু যামিনীতে,
তনু-মনে লেগেছে আগুন।
চেয়ে দেখ ওই দূরে, তুমি যে আসিবে তাই,
বিরহিণী তটিনীর ধারা—
নীরবে চাহিয়া আছে, বিরহ-প্রদীপ জ্বালি,
আকাশে জাগিছে শুকতারা।
তুমি কি আসিবে প্রিয়, উতলা জ্যোছনা রাতে,
নিরজন বাতায়নতলে—
আকাশে সোনার চাঁদ, নরম সোনার চাঁদ,
না-বলা কথাটি যাব বলে।

পৃথক নির্ব্বাচন

রেজাউল করীম এম-এ বি-এল

আজ প্রায় পনর বৎসর হইতে যুক্ত নির্ব্বাচনের স্বপক্ষে বিপক্ষে নানারূপে আলোচনা হইয়া আসিতেছে। উহার প্রত্যেক খুঁটিনাটি বিষয়, উহার উপকারিতা, অনিষ্টকারিতা, উহার দোষগুণ প্রভৃতি বিষয় দেশের স্বার্থের দিক হইতে ও সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের স্বার্থের দিক হইতে তন্নতন্নভাবে আলোচিত হইয়াছে। এত সব আলোচনার পরও এই নির্ব্বাচন সমস্যা, দেশের রাজনৈতিক পণ্ডিতগণকে মোটামুটিভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে ঃ—একদল যুক্ত নির্ব্বাচনে সমর্থক ও অন্য দল উহার বিরোধী। কংগ্রেস, সমুদয় জাতীয়তাবাদী দল, ভারতীয় মুসলমান, শিয়া সম্প্রদায়ের বহু মুসলমান, ভারতীয় খৃষ্টান, শিখ, পার্শি—এইগুলি যুক্ত নির্ব্বাচনের পূর্ণ সমর্থক। লীগপন্থী মুসলমান, ইউরোপীয়ান ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট পৃথক নির্ব্বাচনের পক্ষপাতী। এ বিষয়ে ভোট গ্রহণ করিলে যুক্ত নির্ব্বাচনেরই জয়লাভ হইবে। কারণ পৃথক নির্ব্বাচনের সমর্থকদের সংখ্যা অতি অল্প। জনমত যুক্ত নির্ব্বাচনেরই পক্ষপাতী। এরূপ স্থলে এই ব্যাপারটি দেশের জনমতের ভোটের উপর ছাড়িয়া দিলে যুক্ত নির্ব্বাচনই সমর্থন লাভ করিবে। সমগ্র জাতির ইণ্টারেস্টের সহিত জড়িত ব্যাপারটির শেষ মীমাংসা জনমতের ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দেওয়া উচিত ছিল—জনমতই স্থির করিত কোন্‌-প্রকার নির্ব্বাচন পদ্ধতি দেশে প্রচলিত হইবার যোগ্য। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার নিজেরাই চাহেন পৃথক নির্ব্বাচন। তাঁহারা জনমতের মর্জির উপর ছাড়িয়া ইহাকে হত্যা করিতে পারিলেন না। নানাবিধ কৌশল উদ্ভাবন করিয়া পৃথক নির্ব্বাচনকেই বলবৎ করিলেন। যুক্ত নির্ব্বাচনের সমর্থকদের সমস্ত দাবী, সমস্ত আবেদন নিবেদন ব্যর্থ হইল। কথা উঠিতে পারে, যুক্ত নির্ব্বাচনকে চাপা দিয়া পৃথক নির্ব্বাচনকে বলবৎ রাখিতে সরকার পক্ষের কেন এত আগ্রহ? ইহাতে তাঁহাদের কি লাভ? একটু পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যাইবে ইহাতে সরকার পক্ষের যথেষ্ট লাভ আছে। সাম্রাজ্যের স্বার্থের জন্য ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পন্থা আর হইতে পারে না। বিশাল সাম্রাজ্য রক্ষার মূলে সূত্রটি ব্রিটিশ সরকার এমন সহজ ও সুন্দরভাবে আয়ত্ত করিয়াছেন যে তজ্জন্য তাঁহারা যুগ যুগ ব্যাপী পৃথিবীতে একাধিপত্য লাভ করিতে থাকিবেন। —সেই সূত্র হইতেছে ভেদনীতি। এমনভাবে শাসিত দেশের বিভিন্ন অধিবাসীকে পৃথক করিয়া দিতে হইবে যে, তাহারা যেন সহজে একত্র ও সংঘবদ্ধ হইতে না পারে। সেইজন্য পৃথক নির্ব্বাচন সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী। এরূপ কার্য্যকরী পন্থাটিকে তাঁহারা সহজে পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। তদুপরি যখন এ দেশেরই একদল লোক পৃথক নির্ব্বাচনের জন্য জিদ ধরিল তখন ত তাঁহারা উহাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার একটা যুক্তি খুঁজিয়া পাইলেন। যাহারা পৃথক নির্ব্বাচন চাহে, তাহাদের সংখ্যা কম হউক, নগণ্য হউক, তাহাদের দাবী অযৌক্তিক হউক, তাহাদের যুক্তি সঙ্কোচিত হউক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। যাহা ব্রিটিশ সরকার চাহেন, তাহাই যখন এক শ্রেণীর লোক চাহিতেছে তখন তাঁহারা সে দাবী অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। সুতরাং পৃথক নির্ব্বাচন-কেই বলবৎ রাখিলেন। যে গোপন উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া তাঁহারা পৃথক নির্ব্বাচন বলবৎ রাখিয়াছেন, কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গেল তাঁহাদের সেই উদ্দেশ্য সফল হইতে চলিয়াছে। প্রথমতঃ এদেশে অবস্থিত ইউরোপীয়ান বণিকদের সহিত এদেশের কাহারও বাধ্যবাধকতা জন্মিতে দেয় নাই। মুসলমানদের মত তাহারাও পৃথক নির্ব্বাচন পাইয়াছে। তাহারা এদেশে বাস করিলেও এদেশের সকলবিধ সমস্যা হইতে পৃথক ও স্বতন্ত্র হইয়া থাকিবে। অথচ আইন প্রণয়নের বেলায় তাহাদের পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিবার অধিকারী হইয়া রহিবে। যাহাদের সহিত মিলিব না, মিশিব না, যাহাদের সুখ-দুঃখের অংশ লইব না, ব্যথা বেদনার সহিত পরিচিত হইব না, তাহাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের সময় নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিব, ইচ্ছামত গড়িব, ভাঙ্গিব ও পরিচালিত করিব—পৃথক নির্ব্বাচন ইউরোপীয়ানদিগকে এই প্রকার মোড়লী-করিবার অধিকার দিয়াছে। ভারতের অছিগিরি করিবার জন্য বিলাতে রহিয়াছে পার্লামেণ্ট, সেক্রেটারী অব ষ্টেট, ব্রিটিশ জনমত—আর এদেশে রহিয়াছে বড়লাট ছোটলাট, শত শত আই-সি-এস কর্ম্মচারী। কিন্তু ইহাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যদি কিছু অঘটন ঘটিয়া যায় তবে কে ভারত সাম্রাজ্য রক্ষা করিবে? তজ্জন্য রহিয়াছেন ইউরোপীয়ান বণিক—ইঁহারা এক হাতে ব্যবসায় চালাইবেন, আর অন্য হাতে সাম্রাজ্য রক্ষা করিবেন। পৃথক নির্ব্বাচন পদ্ধতি ইউরোপীয়ানদিগকে এই সুবিধা দিয়াছে। পৃথক নির্ব্বাচন এইভাবে সাম্রাজ্য রক্ষা করিতেছে।

পৃথক নির্ব্বাচন আর একটা উপায়ে সাম্রাজ্য রক্ষা করিতেছে। ইহা ভারতের হিন্দু-মুসলমান, খৃষ্টান, শিখ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপভাবে ভেদনীতি সৃষ্টি করিয়াছে যে উহারা একবার ভ্রমেও ভাবিতেছে না যে, তাহাদের স্বার্থ এক ও অভিন্ন। হিন্দু হিন্দুর কথা, মুসলমান মুসলমানের কথা, এইভাবে যদি প্রত্যেক সম্প্রদায় পৃথকভাবে জাতীয় সমস্যাকে দেখিয়া থাকে তবে কোনদিনই সংঘবদ্ধভাবে দেশের কাজ করা সম্ভব হইবে না। আর তাহা যদি না হয় তবে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম সহজেও সফল হইবে না। পৃথক নির্ব্বাচন এই ভাবে জাতীয়তা গড়িতে বাধা দিয়াছে। দেশকে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন করিতে সহায়তা করিয়াছে। আমাদের জাতীয় জীবনের পক্ষে উহা একটা প্রচণ্ড অভিশাপ। তৈমুরলঙ্গ ও নাদীর শাহ ভারতের যে ক্ষতি করিতে পারেন নাই, এই নিরস্ত্র পৃথক নির্ব্বাচন আমাদের সেই ক্ষতি করিয়াছে। এই পৃথক নির্ব্বাচন পরিবর্ত্তন করিয়া তৎস্থলে যুক্ত নির্ব্বাচন প্রবর্ত্তনের জন্য চেষ্টা করা প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্ত্তব্য। সাম্রাজ্যবাদের সর্ব্বাপেক্ষা লাভ হইবে, যদি এদেশের বিভিন্ন অধিবাসীর মধ্যে একতা প্রতিষ্ঠিত না হয়. সংহায়

শক্তি না জাগে। পৃথক নির্ব্বাচন এই পার্থক্য-বোধ জাগাইয়া দিয়া প্রকাশ্যভাবে সাম্রাজ্যবাদকে সাহায্য করিতেছে।

পৃথক নির্ব্বাচনের সমর্থকদের যুক্তি হইতেছে যে, দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায় বাস করিতেছে এবং চিরকালই বাস করিবে, এক সম্প্রদায়ের অভাব অভিযোগগুলি অন্য সম্প্রদায়ের লোক ভাল করিয়া না জানিতে পারে। আইন সভায় প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি থাকা দরকার। আর এই সব প্রতিনিধি সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায় ভিন্ন অন্য কেহ নির্ব্বাচন করিলে এবং তাঁহাকে প্রভাব বিস্তার করিতে দিলে হয়ত প্রকৃত প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইতে পারিবে না। এই যুক্তি কুযুক্তি ও হাস্যকর। কারণ প্রথমত আইন সভায় রাজনীতি অর্থনীতি ও শাসননীতি সংক্রান্ত বিষয় আলোচিত হইবে ও সেই আলোচনা অনুসারে দেশের শাসন কার্য্য চলিবে। কিন্তু দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও শাসনগত স্বার্থ পৃথক ও স্বতন্ত্র নহে। তজ্জন্য প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোক লইবার কোনই প্রয়োজন নাই। দেশের মধ্যে যোগ্যতম যাঁহারা তাঁহাদের হাতে ছাড়িয়া দিলেই শাসন কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে। প্রত্যেক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লোক লইবার নীতি স্বীকার করিলে দেশের অখণ্ড স্বার্থের আদর্শ অস্বীকার করা হয়। স্বার্থ যখন অখণ্ড তখন যে কোন যোগ্য লোক সমগ্রদেশের কথা নিঃস্বার্থভাবে ভাবিতে পারেন। যদি কেহ না ভাবেন, তবে তাঁহার মনে এই বোধ জন্মাইবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু পৃথক নির্ব্বাচন অব্যাহত থাকিলে তাহা কোন দিনই সম্ভব হইবে না। প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে আবার এতগুলি উপসম্প্রদায় আছে যে পৃথক নির্ব্বাচনকে স্বীকার করিলে তাহাদের কাহাকেও সন্তুষ্ট করা যাইবে না। এই সব উপসম্প্রদায়গুলি আবার স্বতন্ত্র আসনের দাবী করিলে দেশের অখণ্ড স্বার্থের আদর্শ টুকরা টুকরা হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িবে। ইতিমধ্যে মুসলমানদের মধ্যে কতকগুলি সিয়া ও মোমিন উপসম্প্রদায়, হিন্দুদের মধ্যে অবনত শ্রেণী প্রভৃতি পৃথক সুবিধা দাবী করিতেছে। ধর্ম্মের ভিত্তিতে আসন বণ্টনের দাবী করিলে উপসম্প্রদায়ের দাবী অগ্রাহ্য করিবার কোন কারণ নাই। কারণ তাহারাও ত এই বলিয়া দাবী করিতেছে যে তাহাদের সম্প্রদায়ের মেজরিটিদের চাপে তাহাদের স্বার্থ খণ্ডিত হইতেছে। সুতরাং সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে আসন দাবী করিলে দেশে সংহতি কোন দিন জাগিবে না; তাহার কুফল এই হইবে যে দেশ স্বাধীন হইতে বহু বিলম্ব হইবে।

নির্ব্বাচনের সময় আপন সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কেহ প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না বলিয়া যে দাবী করা হইয়াছে তাহা সকল দিক দিয়া দেশের স্বার্থের পক্ষে সর্ব্বনাশকর। আইন সভায় যে সব বিষয় আলোচিত হয় তাহা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে হয় না। হিন্দুর স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয় কেবল হিন্দু প্রতিনিধিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, মুসলমানের বিষয় মুসলমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। নির্ব্বাচন পদ্ধতি যাহাই হউক, আইন সভায় সমগ্রভাবে বিষয়টি আলোচিত হয়। হিন্দুর ব্যাপারে মুসলমানকে ভোট দিতে হয় এবং মুসলমানের ব্যাপারে হিন্দুকেও ভোট দিতে হয়। নির্ব্বাচনের সময় হিন্দু যদি মুসলমানের সহানুভূতি না পায়, অথবা মুসলমান যদি হিন্দুর সহানুভূতি না পায় তবে আইন সভায় মুসলমানের ব্যাপারে হিন্দুর ও হিন্দুর ব্যাপারে মুসলমানের হস্তক্ষেপ করিবার কি আছে? আইনে যদি এরূপ বিধান থাকিত যে সাম্প্রদায়িক স্বার্থগুলি সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে এবং তাহারা ভোটের দ্বারা যাহা সিদ্ধান্ত করে তাহাই বলবৎ হইবে, তবে না হয় পৃথক নির্ব্বাচনের দাবীটা কতক সমর্থন করা যাইত। কিন্তু আইনে যখন এরূপ বিধান নাই তখন পৃথক নির্ব্বাচনের দাবী কোন মতেই সমর্থন করা যায় না। যে হিন্দুর উপর মুসলমানের বিশ্বাস নাই, সেই হিন্দু আইন সভায় মুসলমানের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে, প্রভাব বিস্তার করিবে। আবার সেই প্রকার মুসলমান হিন্দুর ব্যাপারেও প্রভাব বিস্তার করিবে। ইহাতে মুসলমান স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবারই অধিক সম্ভাবনা রহিয়াছে। আইন সভায় যখন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দয়ার উপর নির্ভর করিতেই হইবে, তখন এমন লোক প্রেরণ করা উচিত যাহাদের উপর সকলের বিশ্বাস আছে। যাহারা নিরপেক্ষ হইয়া সকল দিক দেখিতে পারিবে এবং সহানুভূতির সহিত সকলের অভাব অভিযোগ মিটাইতে পারিবে। পৃথক নির্ব্বাচন অব্যাহত থাকিলে কোন দিনই এরূপ লোক প্রেরিত হইবে না। হিন্দু নির্ব্বাচকগণ যে মুসলমানকে প্রভাবিত করিবে এবং মুসলিম নির্ব্বাচকগণ যে হিন্দুকে প্রভাবিত করিবে সেই প্রকার লোকই হিন্দু-মুসলমানের স্বার্থকে সমভাবে দেখিবে। ইহার জন্য চাই যুক্ত নির্ব্বাচন,—পৃথক নির্ব্বাচন এই শ্রেণীর মহৎ ও উদার লোককে অগ্রাহ্য করিবে। এইজন্য আমরা পৃথক নির্ব্বাচনের বিরোধী। আগামী বারে যুক্ত নির্ব্বাচনের উপকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

পাহাড় বনে

(গল্প)

শ্রীপ্রশান্ত চৌধুরী

অবহেলায় এই ছন্নছাড়া জীবনটার কেটেছে ২৫টা বছর, এখনও কাটছে, হয়ত কাটবে। পথভ্রষ্ট উল্কার মত শূন্য-পথে আমার আবির্ভাব আবার শূন্যপথেই আমার যবনিকা হ'বে টানা।

কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের সকাল। মূর্চ্ছাহত আলোময় পথের পানে চেয়ে আছি—সামনে একটা ইংরেজী উপন্যাস খোলা; কখনও বা তারই একটি পংক্তিতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছি, আবার চাইছি পথের দিকে আর ভাবছি—অতীতের কথা।

দেশ দেশ ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পোঁছিলাম সে এক পাহাড়ের অঞ্চলে—যে দেশের লোকেদের হৃদয়গুলো পাথর দিয়ে গড়া—যেখানে স্নেহ মমতা হৃদয়ের সর্ব্বনিম্নতলে ঢাকা পড়ে থাকে, সেখানে এই ছন্নছাড়া জীবন পেয়েছিল প্রেমের প্রতিমা। পাহাড় বনে প্রবেশ করবার পূর্ব্বে স্থানীয় লোকেরা আমায় জানিয়ে দিয়েছিল পাহাড়ীয়ারা বড় হৃদয়হীন, তাহারা অর্থের বিনিময়ে মানব হৃদয়ে শাণিত ছুরিকা বসাইতে কুণ্ঠিত হয় না। অবহেলা করা আমার স্বভাব তাই তখন সে কথা আমি গ্রাহ্য করি নাই।

সন্ধ্যা যখন পৃথিবীর বুকে কুহেলীমায়া বুলাল তখন আমরা পাহাড়বনের মাঝে। আমাদের বোঁচ্‌কাগুলো চামড়ার বেল্ট দিয়ে পিঠের সঙ্গে বেশ শক্ত করে বাঁধা ছিল। হাতে ছিল টর্চ্চ আর একটি করে লাঠি। আমরা একটি বড় পাথরের পাশে তাঁবু খাটাব স্থির করে একটু বিশ্রাম করছি এমন সময় পাহাড়ীদের চীৎকার শোনা গেল। আমার এবং আমার সাথীদের সাহস যথেষ্টই ছিল এবং আমরা জানতাম পাহাড়ীয়ারা বন্দুককে বড় ভয় করে। তাই অতুল একটা ফাঁকা আওয়াজ করল—।

যাই হউক তাহাদের আমরা তখন দেখতেও পেলাম না। ধীরে সুস্থে আমরা ক্যাম্প খাটিয়ে চা খাবার-দাবার খেয়ে শুয়ে পড়লাম। দিনের বেলায় পাহাড় বনে বেড়াতে বেড়াতে আমরা একটি মজার জিনিষ লক্ষ্য করি, যেটা আপনাদেরও আশ্চর্য্যান্বিত করবে। পাহাড়ে একরকম গাছ দেখা গেল যার পাতাগুলো আমাদের দেশের ডুমুর পাতার মত দেখতে, কিন্তু কর্কশ নয়। সেই পাতার উপর কোন প্রকারের পতঙ্গ বসিলেই সঙ্গে সঙ্গেই আবদ্ধ হইয়া যায়। পতঙ্গটি পাতার মধ্যে আটকা থাকে আর পাতা হতে একরকম লালা বাহির হয়ে পতঙ্গটিকে গলিয়ে লালার সহিত মিশ্রিত করে আপন দেহের মধ্যে টেনে নেয়। আমরা এই অদ্ভুত ও বিস্ময়কর গাছটিকে অবলম্বন করে নানা প্রকারের আজগুবি গল্প করছিলাম। কখন আমরা ঘুমিয়ে পড়ি কিছুই জানি না—বোধ করি আমার সাথীদের সেই ঘুম আর ভাঙ্গে নাই। তীব্র বেদনা অনুভব করে যখন আমি চোখ মেলে ধরলাম—দেখলাম একটি গুহার মধ্যে আমি শুয়ে আছি—পাশে একটি মেয়ে; পালকে করে আমার বুকের উপর কি লাগিয়ে দিচ্ছে—সেটা তীব্র ঠাণ্ডা। প্রথমে আমি রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠলাম—উঠে বসবার চেষ্টা করলাম কিন্তু সহসা চারিদিক অন্ধকার হ'য়ে গেল, আমি কিছুই দেখতে পেলাম না—বোধ করি আমার সংজ্ঞা লুপ্ত হয়েছিল, কারণ আবার যখন আমি চোখ চাইলাম একটা গর্ত্ত দিয়ে খানিকটা রোদ এসে পড়েছে আমার গায়ে। চারিপাশে চেয়ে দেখলাম কেউ নেই, বুঝতে পারলাম এটা দিনের বেলা। সহসা আমার মাথা ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগল—মনে হ'ল আমি বুঝি স্বপ্ন দেখছি। কোথায় আমার সঙ্গীরা—কোথায় আমাদের ক্যাম্প এবং কেই বা সে মেয়েটি? এমন সময় খস্ খস্ শব্দ শুনলাম শুষ্ক পাতার উপর দিয়ে লোক যাওয়ার। ভাবলাম অতুলকে ডাকি, কিন্তু বুকটা টন্ টন্ করে উঠল, পারলাম না। ক্রমে শব্দটি নিকটে প্রতীয়মান হ'ল, গর্ত্তের ভিতর দিয়ে চেয়ে দেখলাম একটি মেয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আমি তাহারই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে চুপ করে রইলাম। মেয়েটি রোদ আসা গর্ত্তের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করল—হাতে তার একটা মাটীর হাঁড়ী—দেখলাম গত রাত্রের সেই মেয়েটিই, যে আমার বুকে পালক দিয়ে ঠাণ্ডা জিনিষ লাগিয়ে দিচ্ছিল। হাঁড়ীটা এক ধারে সরিয়ে রেখে সে আমার বুকের উপর একটা হাত রেখে পাশে বসল। আমার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু নয়নে রইল চেয়ে। বড় তেষ্টা পেয়েছিল।

বল্লাম, জল আছে? সে হাসল মধুর হাসি। হয়ত সে আমার কথা বুঝল না—তাই বল্লাম পানী হ্যায়? সে হাসল্ চপল হাসি—।

উপায় না দেখে আমিও তার দিকে চেয়ে রইলাম—একটু পরে সে আমার চোখ দুটাকে আস্তে চেপে ধরল। আর কোমলকণ্ঠে বলল,—হ্যায়, পিও গে?

চোখ দুটা আমার ছেড়ে দিয়েছিল—দেখলাম সে হাসছে।

বল্লাম—হাঁ।

সে। নেহি।

আ কাহে?

সে। খুসী।

বাধ্য হয়ে চুপ করলাম। তখনও সে হাসছে চপল মধুর হাসি। আমায় চুপ করে থাকতে দেখে সে জিজ্ঞেস করল: নাম? হৃদয়ে তখন আমার শত প্রশ্নের বান ডেকেছে। ঝাঁজাল স্বরে বললাম—কুছ নেহি হ্যায়।

সে রাগল না, হেসে বলল:—হো নেহি সাক্তা—নাম কহিয়ে পানী মিলেগা।

তর্ক করবার শক্তি আমার ছিল না, বললাম—প্রশান্ত্।

আমারি বলার সুরে সুর মিলিয়ে সে বলল:—প্রশান্ত্। খানিকটা জল এনে সে আমায় দিল আর অপেক্ষা, না করেই সে সেই গর্ত্তের ভিতর দিয়ে চলে যেতে যেতে বলল:—যানেকো মৎলব্ মাৎ করিয়ে ম্যা আতা হু।

ঝড়ের মত সে চলে গেল, আর তাকে দেখ্‌তে পেলাম না। ভাব্‌লাম ডাকি—কিন্তু নাম—?

সে চলে গেলে ভাব্‌লাম এ সবই যেন সৃষ্টিছাড়া অর্থহীন স্বপ্ন। বুকে হাত দিয়ে বুঝলাম অস্ত্রের আঘাত, আরও বুঝলাম সবই পাহাড়ীদের কাণ্ড। যাই হউক আমি মরিনি। কিন্তু কে ঐ মেয়েটি—? কেমন করেই বা এখানে এলাম? একটা প্রধান প্রশ্ন আমার মনে উদয় হ'ল মেয়েটি পাহাড়ী নিশ্চয়ই। কিন্তু কেমন করে সে এত সুন্দর হিন্দী বলছে! এই হ'ল আমার সব চেয়ে বিস্ময়। মনে ভাবলাম এখন উপায়? উঠ্‌বার শক্তি হয় ত আমার ছিল, কিন্তু ক্লান্তি আর অবসাদ আমার দৈহিক শক্তিকে পরাজয় করে রেখেছে। আবার মনে হ'ল যখন বেঁচে আছি আমার সবই চাই—তৃষ্ণার জল, আহারের সামগ্রী, আত্মরক্ষার অস্ত্র; কিন্তু দেখলাম আত্মরক্ষার অস্ত্রটাই হ'চ্ছে সব চেয়ে বড় প্রয়োজনীয় বস্তু যা না হ'লে মরণ অনিবার্য্য। কারণ এস্থলে জীবনটাকে প্রতি মুহূর্ত্তেই মরণের সম্মুখীন করাতে হ'বে। আবার সেই পাতার মর্ম্মর ধ্বনি। আমি আবার রইলাম গর্ত্ত দিয়ে চেয়ে। সে এসে ঢুক্‌ল—তার চোখে ভয়াবহ দৃষ্টি।

আমি তাকে কিছু বল্‌বার আগেই সে ইসারা করে আমায় চুপ করতে বল্‌লঃ তারপর দু'জনেই শুন্‌তে পেলাম অদূরে পাহাড়ীদের চীৎকার আর পাতার মর্ম্মর শব্দ। ধীরে ধীরে সে শব্দ ও চীৎকার মিলিয়ে গেল।

সে আমায় জিজ্ঞাসা করল,—ভুক্ লাগা?

আমি—হল্লা করতা কোন্?

সে—পাহাড়ী ডাকু।

—তোম্ কোন হ্যায়?

সে—সর্দ্দার কা লেড়কী।

আমি—তব্ তোম্ ভি পাহাড়ীয়া হ্যায়?

সে—জরুর—

সে আমার দিকে যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে হাস্‌ল সে দৃষ্টি বলে বুঝান যায় না।

আমি—পাহাড়ীয়া হো তব্ কায়সে এইসা আচ্ছা হিন্দী বল্‌তে হো।

সে—শিখ্ লিয়া।

চুপ করে গেলাম—সে হাসছে।

আবার সেই প্রশ্ন—ভুক্ লাগা?

আমি—খানা মিলেগা কাঁহাসে?

সে—যাঁহাসে হামকো মিলতা।

সে আমার চুলগুলো নেড়ে দিয়ে তার কোচরটা আমার কাছে খুলে ধর্‌ল—তাতে নানা রকমের ফল রয়েছে। আমি অবাক্ হয়ে তার দিকে চাইলাম—এ কি ব্যাপার। হয় ত আমি বিহ্বল দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়েছিলাম। তাই সে বল্‌লঃ দেখনে কা বক্‌ত বহুৎ মিলেগা আভি খা লিজিয়ে। মুখভরা দুষ্টু হাসি।

পরাজয় স্বীকার করে বল্‌লাম—আওর তোম্—?

সে—হ্যাঁ এক্ সং খায়েগা।

মনে পড়ল কই নামটা ত জানা হয় নাই। জিজ্ঞাসা করলাম—কেয়া নাম?

সে—মেরা নাম লে কর কেঁয়া কাম? গম্ভীর হ'য়ে—দুষ্টু দৃষ্টে আমার দিকে চাইল। তার একখানি হাত বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললাম—নেহি কহ।

আমার কাতর আকুতি তাকে স্পর্শ করল, সে বল্‌ল—মনোগী অর্থাৎ মনোজ্ঞা।

আবার সেই বুকের ব্যথা টন্ টন্ করে উঠ্‌ল। হাত দিয়ে চেপে ধরলাম। মনোগী সেই হাঁড়ীটা কাছে সরিয়ে এনে আবার পালকে করে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ওষুধ লাগিয়ে দিলে। কিছুক্ষণ বাদে ব্যথাটা যেন উপশম হ'ল। আবার তার সঙ্গে কথা বলা আরম্ভ করলাম। নানা কথার ভিতর দিয়ে বুঝতে পারলাম—মনোগীর পিতাই এই পাহাড়ী লোকগুলোর সর্দ্দার। গতরাত্রে তাহার পিতার প্রেরিত দল আসিয়া আমাদের লুট্‌পাট্ করিয়া ঘাল্ করিয়া দিয়া যায়। কিন্তু মনোগী আমার সঙ্গীদের কাহাকেও জানে না এবং দেখে নাই। সে চাঁদনী রাতে আনমনা হয়ে বেড়াতে বেড়াতে অজান্‌তে এই দিকে এসে পড়েছিল। আমায় তাঁবুর ধারে আহত এবং সংজ্ঞালুপ্ত অবস্থায় পেয়ে এই গোপন গুহার ভিতরে নিয়ে এসেছে। এ ব্যাপার যদি এখন পাহাড়ী 'ডাকু'রা জানতে পারে, জানতে পারে যে, আমি শুধু জীবিত আছি এমন নয়, উল্টে মনোগী আমায় ঔষধ ও আহার দিয়ে প্রাণ রক্ষা করেছে, তাহ'লে পাহাড়ীরা কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ না করে উভয়েরই প্রাণদণ্ড দিবে। চপল হাসি হেসে মনোগী সন্ধ্যার সময় আমার কাছ হ'তে বিদায় নিল আর বলে গেল—গভীর রাত্রে সে আবার আমার কাছে আসবে কিন্তু আমি যেন কিছুতে গুহার বাহিরে না যাই—। ধীরে সাঁঝের অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে এল। এ ত গুহা নয় এ যেন অন্ধ কারা। মনে হ'ল আমি দৃষ্টি হারালাম—মনে হ'ল সহসা পৃথিবী হ'তে আলো, বাতাস, শব্দ সব কিছু লোপ হয়ে গেছে—আছে শুধু গাঢ় অন্ধকার! এ কি শাস্তি আমার! আজ যদি আমার মৃত্যু হয় এই পাহাড়ের গুহায়—কেই বা জানবে আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের পরিণতির বিষাদময় কাহিনী। মৃত্যু! না এত কষ্টের ভিতরও মরণ বরণের আকাঙ্ক্ষা জাগে না।

কিছুক্ষণ বাদে এক ফালি চাঁদের আলো গুহায় প্রবেশ করল। কিন্তু তন্দ্রায় তখন আমার চোখ দু'টো জড়িয়ে গেছে। হয় ত বা ঘুমিয়েই পড়েছিলাম। কোমল শীতল হাতের পরশে শিহরিত হয়ে চোখ চাইলাম—ডাক্‌লাম—মনোগী! মনো!

উত্তর এল—প্রশান্ত্।

এমনি করে তিন দিন তিন রাত কেটেছে। আমি বেশ ভাল হয়ে উঠেছি। চতুর্থ দিন সকালে মনোগী আমার মাথার চুলগুলোর ভিতরে সস্নেহে আঙুল সঞ্চালন করতে করতে জিজ্ঞাসা কর্‌লঃ—প্রশান্ত্ অব আচ্ছা মালুম হোতা?

আমি। হাঁ—আচ্ছা।

ম। আপ্‌নো মোকাম জানে সাকেগা?

(শেষাংশ ৭৫৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

খনি গহ্বরে গন্ধসঙ্কেত

শ্রীসমীরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমেরিকার পশ্চিমপ্রান্তের এক খনির অভ্যন্তর। বিকট গর্জ্জনে চলিয়াছে বিরাট বিদ্যুৎ-শক্তির হাতুড়ি যন্ত্র। ধাতু-প্রবাহের উপর ড্রিল-যন্ত্রের প্রতিঘাত-ক্রিয়া বন্ধ করিয়া কারিগর বারবার চারিদিকের বায়ুর গন্ধ গ্রহণে নাক কুঁচকাইয়া ফোঁস ফোঁস করিয়া শ্বাস লইতে লাগিল।

কয়েকবার ঐ প্রকারে গন্ধ মালুম করিবার প্রয়াসের পর সে বিস্ময়চকিত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"স্কাঙ্কের গন্ধ পাইতেছি।" ঐ অঞ্চলে স্কাংক নামে ভোঁদড় শ্রেণীর এক প্রকার জানোয়ার আছে, যেগুলি কোনও বিপক্ষকে আক্রমণ করিবার সময় এক প্রকার রস পিচকারীর ধারার আকারে নিক্ষেপ করে। ঐ রসের গন্ধ যেমন তীব্র তেমনই কিছুটা বিষাক্ত। সুতরাং আক্রান্ত জীবটি উহার গন্ধে অভিভূত হইয়া পড়ে, আর পলায়ন করিবার সামর্থ্য তাহার থাকে না। স্কাঙ্ক অনায়াসে সেই বিপক্ষকে কাবু করিয়া ফেলিয়া ভোজ
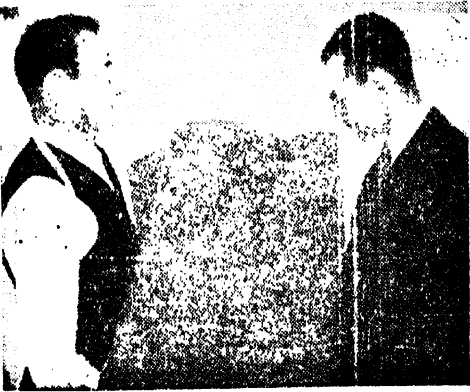
স্কটল্যাণ্ড ও আয়র্ল্যাণ্ডের কলগুলিতে যে টুইড কাপড় বোনা হয়, তাহাতে 'পিট ধোঁয়া'র গন্ধ দেওয়া হয়; এবং ঐ সকল স্থানের ভাটিখানায় প্রস্তুত হুইস্কি মদ্যেও ঐ পিট গন্ধ দেওয়া হয়

লাগাইতে পারে অথবা উহাকে বহন করিয়া নিজ আড্ডায় লইয়া যাইতে পারে। উহার সেই আক্রমণাস্ত্র রসের গন্ধ একেবারে বিচিত্র, কারণ অন্য কোনও প্রকার গন্ধের সহিত উহার সাদৃশ্য নাই সামান্য মাত্রও। ঐ গন্ধের জন্যই কোনও স্থানে স্কাঙ্কের আবির্ভাব নিশ্চিতরূপে জানিতে পারা যায়।

কারিগর চীৎকার করিল—আমি স্কাঙ্কের গন্ধ পাইতেছি। কিন্তু তাহার সেই চীৎকার হাতুড়ি-যন্ত্রের ভীষণ গর্জ্জনে কোথায় তলাইয়া গেল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই বিপদ জ্ঞাপক রক্তবর্ণ আলো জ্বলিয়া উঠিল খনির অভ্যন্তরের সকল স্থানে—সকল গলিতে—সকল কারখানা কর্ম্মস্থানে আলোগুলি জ্বলিয়া উঠিয়াই নিবিয়া গেল। আবার জ্বলিল আবার নিবিল। এইপ্রকার তিনবার জ্বলা ও তিনবার নিবিবার ক্রিয়া সামান্য সময় অন্তর অন্তর চলিতেই থাকিল। তিনবার জ্বলা ও তিনবার নিবিয়া যাওয়া হইল আগুন লাগিবার বিপদের সংকেত-প্রতীক।

কারিগরের চারিপাশে যাহারা কাজ করিতেছিল তাহারাও কাজ বন্ধ করিয়া গন্ধ লইবার জন্য জোরে জোরে শ্বাস টানিতে লাগিল।

সহসা চারিদিকে সমবেত কণ্ঠে চীৎকার উঠিল—আগুন! আগুন!

অমনি যে যাহার হাতের যন্ত্র ফেলিয়া দিয়া ছুটিল—সকল শ্রমিক, সকল মিস্ত্রী আসিয়া জুটিল স্কিপের কাছে। স্কিপ অবিরাম উঠানামা করিতেছে—একদলকে খনির উপরে উঠাইয়া দেয়, আবার ফিরিয়া আসে খনিমুখ দিয়া নীচে দ্বিতীয় দলকে উপরে বাহিরের মুক্ত বায়ুতে নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইতে।

আমেরিকায় যতদিন পর্য্যন্ত নকল চামড়ার তৈরী জিনিষে চামড়ার গন্ধের অনুকরণে বিশেষ গন্ধ না দেওয়া হয়, ততদিন নকল চামড়ার জিনিষ জনপ্রিয় হয় নাই

মুহূর্ত্তে নীরব খনিগর্ভ ঘণ্টা ধ্বনির অবিরাম রেশে মুখরিত হইয়া উঠে—বিদ্যুৎ-শক্তি চালিত কারখানার সকল যন্ত্র যেন যাদুমন্ত্রবলে নিশ্চল হইয়া যায়। ঘণ্টা ধ্বনি ব্যতীত অন্য কোনও শব্দ ভাসিয়া আসে না ভিতরে বাহিরে।

অতি অল্প সময়ের ভিতর খনির অভ্যন্তরে আর জনপ্রাণীও অবশিষ্ট থাকে না—সকলেই য়্যালার্ম ঘণ্টা বা স্কাঙ্ক গন্ধে আতঙ্কিত হইয়া উপরে উঠিবার স্কিপ সাহায্যে খনির ভিতর হইতে উত্তোলিত হইয়াছে। অতি সত্বর এই কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে পারিয়াছে শুধু স্কাঙ্ক গন্ধ সঙ্কেতের বলে। কারণ খনির ভিতর এমন নিরালা কোণও রহিয়াছে যেখানে য়্যালার্ম ঘণ্টার ধ্বনি পৌঁছাইতে পারে না, অথবা যে স্থানের বিরাট সচল যন্ত্রের নিদারুণ গর্জ্জনে অন্য সকল শব্দই ব্যর্থ হইয়া যায়—কোন প্রকার শব্দ-সঙ্কেত সেই সকল স্থানে কাহারও কর্ণগোচর হইতে পারে না।

এই জন্যই আমেরিকার পশ্চিম অঞ্চলের খনিসমূহে আগুন লাগার বিপদবার্ত্তা প্রচার করা হয় গন্ধ সঙ্কেত দ্বারা। পাছে অন্য সুগন্ধ দ্বারা বিপদসূচনা জানাইতে চেষ্টা করিলে কর্ম্মিগণ ভুল বুঝিয়া ফেলে, এই জন্য বিকট বিচিত্র স্কাঙ্ক গন্ধ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে আগুন লাগিবার সঙ্কেতবাণী প্রচারে। এই গন্ধ উৎপন্ন করিয়া চারিদিকে ছড়াইবার জন্য ব্যবহার করা হয় 'বিউটিল' মার্কাপ্‌টান,—ইহা ল্যাবরেটরীতে বিশেষভাবে প্রস্তুত একপ্রকার উদ্বায়ী তরল পদার্থ। খনির অভ্যন্তরে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালনের যে ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহাতে উক্ত পদার্থের কয়েক ফোঁটা ইন্‌জেক্‌ট করিয়া দেওয়া হয়; উহার ফলে যে বাষ্প উৎপন্ন হয়, তাহা ভেণ্টিলেশন লাইনস্‌-এর ভিতর দিয়া সেকেণ্ডে হাজার হাজার ফুট বিস্তারযোগ্য গতিতে চালিত করা হয়। এই প্রকারে নীরবে গন্ধ-সঙ্কেত বিদ্যুৎগতিতে প্রবেশলাভ করে অতি দূরবর্ত্তী কোণেও যেখানে ঘণ্টা ধ্বনি কোন প্রকারেই শোনা সম্ভব হইত না।

কৃত্রিম উপায়েই এই গন্ধ সৃষ্টি করা হয়; শিল্পকার্য্যে ব্যবহারের জন্য নানা প্রকার কৃত্রিম গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করা যে সকল রাসায়নিক বিশেষজ্ঞের কাজ, তাহারাই এই গন্ধ এবং অনুরূপ আরও বহু প্রকার বিচিত্র গন্ধদ্রব্য আবিষ্কার করিয়াছে নিজ নিজ গবেষণার ফলে। এই সকল গন্ধের বিশেষত্ব এই যে, উহাকে ভুল বুঝিবার বা কারখানার কোনও দ্রব্য হইতে আপনা আপনি উৎপন্ন বলিয়া সন্দেহ করিবার কোনও আশঙ্কা থাকে না।

তবে এই কৃত্রিম গন্ধ যে আদৌ সকল স্থলে স্বাভাবিক সুগন্ধ দ্রব্যের অনুকরণে প্রস্তুত হয় এমন নহে। তবে এমন পরিপার্শ্বিকে ও বিশেষ অবস্থায় উহা প্রয়োগ করা হয় যে, সেই সকল ক্ষেত্রে স্বাভাবিক গন্ধের উদ্ভব নিতান্তই সম্ভাবনার অতীত। কোনও কোনও স্থলে গন্ধটিকে মনোমুগ্ধকর করা হয়, বিশেষ করিয়া যে সকল খনিতে দুর্গন্ধই উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা বেশী। কোনও স্থলে গন্ধের তীব্রতাই হুঁসিয়ারী ব্যবস্থার কাজ করে। এইজন্য যে সকল স্থানে কার্য্য করার দরুন শ্রমিকদের নাকে মৃদু গন্ধ বাছিয়া লইবার শক্তি থাকে না—ঘ্রাণশক্তি যাহাদের হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া যায়, এমন ক্ষেত্রে গন্ধের তীব্রতার আতিশয্যই কার্য্যকরী হয়। যদি কোনও রকমে সে তীব্র গন্ধও তাহাদের নাকে প্রবেশ না করে, তথাপি গন্ধের ঝাঁজ তাহাদের চক্ষুতে—তাহাদের ত্বকে আক্ষেপের সৃষ্টি করিবে। যে সকল স্থলে শ্রমিকেরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কাজ করে, সে সকল ক্ষেত্রেও এই জাতীয় তীব্র গন্ধ অশেষ ফলপ্রদ।

সুগন্ধযুক্ত রং; সুগন্ধ কালি; সুগন্ধ তেল; রবার, চামড়া, অয়েলক্লথ, ওয়াটারপ্রুফ, কাপড় প্রভৃতির দুর্গন্ধ বিনাশ; পশম ও পশমে প্রস্তুত ব্রুশ প্রভৃতির স্বাভাবিক গন্ধ দূরীকরণ—এই জাতীয় বহু আবিষ্কার সম্ভব হইয়াছে গন্ধ দ্বারা সঙ্কেত প্রচার উদ্ভাবনের গবেষণায়। একপ্রকার কৃত্রিম গন্ধবিশিষ্ট আরক আবিষ্কার করা হইয়াছে যাহার মাত্র কয়েক আউন্স যোগ করিলে ১০০ পাউণ্ড রবারের দুর্গন্ধ নষ্ট করা যাইবে অথবা কোনও ফুলের গন্ধে উক্ত রবারকে সুগন্ধি করিয়া তোলা যাইবে। অবশ্য রবারের বিগলিত অবস্থায় ঐ গন্ধ-দ্রব্যের প্রয়োগ করিতে হইবে।

দেওয়াল মুড়িবার কাগজে (wall paper) আজকাল মৃদু সুগন্ধ দেওয়া সম্ভব হইয়াছে, যাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে। অতিশয় সস্তা নিকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুতের সময় উহাতে সুগন্ধ মিলাইয়া দিবার প্রথা আবিষ্কৃত হইয়াছে, ফলে খেলো কাগজে ছাপা, ক্যাটালগ, বিজ্ঞাপন প্রভৃতি হইতে আর দুর্গন্ধ উত্থিত হইয়া বমনোদ্রেকের আতঙ্ক উপস্থিত করিবে না।

আমেরিকায় কোনও রৌপ্য বাসন নির্ম্মাতার কাজকর্ম্ম নিতান্তই মন্দা হইয়া পড়ে; বেগতিক দেখিয়া সে যে কাগজের বাক্সে বাসন প্যাক করিত ও আঠা দিয়া জুড়িত, সেই আঠায় সুন্দর এক গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করিতে থাকে। তাহাতে ক্রমশ তাহার নামডাক ছড়াইয়া পড়ে। ইউরোপ ও আমেরিকায় ইহা প্রবাদের মত প্রচলিত যে স্কটল্যাণ্ড ও আয়র্ল্যাণ্ডের কলগুলিতে যে টুইড্ (tweed) কাপড় বোনা হয়, তাহাতে থাকে 'পিট' (peat) ধোঁয়ার গন্ধ। বিল অঞ্চলে যে জলজ ঘাস—তাহার চাপড়া বা পচা বোদ শুকাইয়া পোড়াইলে সেই ধোঁয়ার যে গন্ধ হয় তাহাকেই 'পিট' ধোঁয়া গন্ধ বলে। কিন্তু আমেরিকান গন্ধ-বিশেষজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন যে, ঐ পিট গন্ধ নিশ্চয়ই কৃত্রিম, কারণ ঐ দুইটি দেশে এখন আর জলজ ঘাসের অস্তিত্ব নাই। বিশেষজ্ঞগণ আরও বলেন যে, অন্য দেশ হইতে শুষ্ক ঘাসের চাপড়া আমদানী করিয়া উহা বক যন্ত্রে চোয়াইয়া এবং গন্ধবর্জ্জিত গ্যাসোলিনে গুলিয়া এমন এক তরল পদার্থ প্রস্তুত করা যায়, যাহা টুইড-সূত্রে প্রক্ষিপ্ত করিলে পিট ধোঁয়ার গন্ধ পাওয়া যায়। শুধু টুইড কাপড়ে নয়, স্কটল্যাণ্ডে যে হুইস্কি মদ্য প্রস্তুত হয়, তাহাতেও উক্ত পিট গন্ধ দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশের বালাপোষবিক্রেতাদের আতর দ্বারা বালাপোষ সুগন্ধিত করিবার প্রয়াস উল্লেখযোগ্য। ইহা অতি প্রাচীন কাল হইতেই রীতিতে পর্য্যবসিত হইয়া আছে। এই সূত্রে আধুনিক একটি প্রচেষ্টার কথাও বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। দোল উপলক্ষে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' হইতে যে বার্ষিক সংখ্যা এইবার (১৩৪৫ সাল) প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার প্রচ্ছদ সুবাসিত কালিতে মুদ্রিত হইয়াছিল। গন্ধ মৃদু হইলেও স্থায়ী হইয়াছিল মন্দ নয়

চিকাগো শহরে গ্রীষ্মকালে এক হোটেলের নৃত্যকক্ষে (ball-room) পাইন কাঠের গন্ধ ছড়াইয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিল। এয়ার-কণ্ডিশনের ব্যবস্থা ছিল সেই কক্ষে; কারবুরেটরের সাহায্যে পাইন তেল ফোঁটায় ফোঁটায় এয়ার-কণ্ডিশন ব্যবস্থায় পাত করিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। এক কোয়ার্ট বোতল তেলে ৮ ঘণ্টাকাল ঐ কক্ষে উত্তরাঞ্চলের বন্য পাইন গন্ধের সৃষ্টি করা সম্ভব হইয়াছিল।

কৃত্রিম পদার্থ নির্ম্মাণের বেলা গন্ধ যে কতদূর প্রভাব বিস্তারে সহায়ক, তাহা সহসা বুঝিতে পারা যায় না, কিন্তু

এই ক্ষেত্রে মনস্তত্ত্ব প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। এইজন্য দেখা যায়, কৃত্রিম চামড়ার জিনিষ প্রথমত আমেরিকায় জনপ্রিয় হইতে পারে নাই; কিন্তু যে সময় হইতে উহাতে চামড়ার স্বাভাবিক গন্ধ আরোপ সম্ভব হইল, তখন হইতেই ঐ কৃত্রিম চামড়ার চাহিদা হু হু করিয়া বাড়িয়া চলিল। এই কারণে বর্ত্তমানে একজন গন্ধ-বিশেষজ্ঞ মহিলাদের জুতায় স্নিগ্ধ সুগন্ধ প্রদান করিতে গবেষণা চালাইতেছেন।

আমেরিকায় এখন "এশিয়ার শালের" অনুকরণে শাল প্রস্তুত হইতেছে মহিলাদের ব্যবহারের জন্য। উহাও প্রথমত ক্রেতাদের আকর্ষণ করিতে পারে নাই। কিন্তু কোন এক রাসায়নিক "এশিয়ার শালের" যে বিশিষ্ট গন্ধ তাহারই অনুকরণে কৃত্রিম গন্ধ দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া ফেলিল। ফলে এখন ঐ কৃত্রিম শালই আদরে গৃহীত হইতেছে সমগ্র আমেরিকায়। চিকাগো মিউজিয়াম অফ্ সায়েন্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিতে একবার কয়লা-খনির এক নকল গঠন প্রস্তুত করিয়া প্রদর্শিত হইল, উহাতে মাটির সোঁদা গন্ধ সংযুক্ত করা হইল। এই মাটির গন্ধ আবিষ্কার করিতে ২।৩ জন বিশেষজ্ঞকে মাসাবধি কাল কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল গবেষণাগারে।

কৃত্রিম গন্ধ দ্রব্য আবিষ্কার করা মাত্র আবিষ্কারক উহার পেটেণ্ট রেজিষ্ট্রি করে, কারণ কোনও নূতন গন্ধ উৎপন্নকারীর ঐ পেটেণ্ট বিপুল মূল্যে বিক্রয় হয়। স্বাভাবিক যে সকল গন্ধদ্রব্য রহিয়াছে তাহা হইতেও কৃত্রিম গন্ধ সৃষ্টি করিবার পদ্ধতি আবিষ্কার করা হইয়াছে। তিব্বতের কস্তুরী হরিণের গ্রন্থি হইতে কস্তুরী (musk) বিলিষ্ট করা হইত। পূর্ব্বে উহার মূল্য ছিল এক আউন্স—২৫০০ ডলার। কিন্তু রাসায়নিকগণ কৃত্রিম উপাদানে ঐ গন্ধ সৃষ্টি করিবার কৌশল আয়ত্ত করিবার পর কস্তুরীর মূল্য নগণ্য হইয়া গিয়াছে, বর্ত্তমানে উহার এক আউন্সের মূল্য এক ডলারেরও ভগ্নাংশ। এই লাভের প্রলোভনেই সকল প্রকার স্বাভাবিক গন্ধদ্রব্যেরই কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করিবার প্রয়াস চলিতেছে।

পাহাড় বনে

(৭৫০ পৃষ্ঠার পর)

আ। কাঁহে নহি যাকেগা।

ম—তব্—?

আ—ক্যাঁও রোনে লাগা মনো?

সে কাঁদছে। আমি তার হাতখানি চেপে ধরলাম। সে জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল, বেরিয়ে গেল গুহা থেকে ছুটে। আমিও তাকে ধরব বলে ছুটলাম তার পিছনে পিছনে। বনের ধার দিয়ে, পাহাড়ের গা বেয়ে, নদীর তীর ঘেঁসে—অনেকক্ষণ ছোটবার পর সে আমায় স্বেচ্ছায় ধরা দিল একটা সঙ্কীর্ণ লাল কাঁকরের পথে এসে,—দেখি তখনও সে কাঁদছে।

তার কান্না দেখে আমি উচ্ছ্বসিত হ'য়ে তার হাত ধরে জিজ্ঞাসা করলাম—কহ মনো ক্যাঁও রোতি হ্যায়?

সে শুধু বলল—যাও এহি সরকসে চলা যাও।

আমি—মনোগী

সে—প্রশান্ত।

আমি—মেয় নহি যাউংগা।

সে—জানে হোগা আলবৎ।

আমি—আউর তোম্?

সে হাসল মলিন হাসি।

সহসা সে দিল ছুট্ পাহাড়-বনের দিকে। করুণ কণ্ঠে বলে গেল—'যাও চলা যাও।'

ভাবলাম যাই ছুটে তার দিকে কিন্তু শক্তিতে আর কুলাল না। যত দূর দেখা যায় তার দিকে রইলাম চেয়ে। শেষে সে অদৃশ্য হ'য়ে গেল পাহাড়ের আড়ালে। বাতাসে ভেসে এল করুণ কণ্ঠ—প্রশান্ত চলা যাও।

চোখ দিয়ে আমার জল গড়িয়ে পড়ল ইংরেজি উপন্যাসখানির পাতার উপর। টেবিলে ভুলুয়া চাকরটা চা রেখে চলে গেল। বাবু চা—

আমি বই বন্ধ করলাম।

ঘূর্ণাবর্ত্ত

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীমতী অমিয়া সেন

(৫)

মিহির হঠাৎ একদিন বাড়ী আসিল।

অত সুদূরের পথ হইতে খবর না দিয়া এমনভাবে আসায় সকলেই অত্যন্ত আশ্চর্য্য ও আনন্দিত হইয়া উঠিল।

দুই বৎসর—প্রায় দুই বৎসর পরে মিহির এই বাড়ী আসিল। দুই বৎসরের সমস্ত ছুটী জমা করিয়া সে অরুণাকে চম্‌কাইয়া দিবার বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়াই এমনভাবে আসিয়াছে।

কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর রাত্রেও অরুণার হঠাৎ মনে হইল, ষোল কলায় পূর্ণ হইয়া আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠিয়াছে।

রাত্রে সকলের খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিলে অরুণা নিঃশব্দ পায়ে শোবার ঘরে ঢুকিল।

মিহির গভীর ঘুমে মগ্ন।

সন্তর্পণে দ্বার বন্ধ করিয়া অরুণা বিপুল তৃষায় ঝুঁকিয়া পড়িল তার ঘুমন্ত মুখখানির উপরে—শুধু দেখিবার জন্য।

পাঁচ বছর তার বিবাহ হইয়াছে, পঞ্চদশী কিশোরী আজ তরুণী। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত অরুণা মিহিরকে ভাল করিয়া দেখিতে পায় নাই। দেখার সুযোগ ঘটে নাই। পাঁচ বছরের মধ্যে দু'জনের সাক্ষাৎকাল যোগ করিলে পঁয়ষট্টি দিনও হইবে না। প্রদীপটা ম্লান শিখায় জ্বলিতেছিল। আর একটা সলিতা দিয়া অরুণা আলোটা উজ্জ্বল করিয়া বাড়াইয়া দিল।

—ইস্ কী চমৎকারই না মিহিরকে দেখাইতেছে! এই দুই বৎসরে মিহির যেন আরও সুন্দর হইয়াছে। তার সমস্ত দেহে সুন্দর স্বাস্থ্যের একটা উজ্জ্বল দীপ্তি! উঃ—এত সুন্দর—এত মধুর! দেখিয়া দেখিয়া অরুণার আশ আর মেটে না। মিহির ঘুমাইতেছে, কিন্তু সত্যই কি ঘুমাইতেছে? অরুণা আর একটু নত হইল।

অসাবধানতায় তার কানের একটা দুল হঠাৎ মিহিরের কপোল ঈষৎ স্পর্শ করিল।

মিহির চোখ মেলিয়া চাহিল। অরুণার মুখ লজ্জায় রক্তিম হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেই মিহির ধরিয়া ফেলিল। হাসিয়া কহিল, এতক্ষণ ঝুঁকে পড়ে কি দেখছিলে?

লুটাইয়া পড়িয়া মুখ গুঁজিয়া অস্ফুট স্বরে অরুণা কহিল, তোমাকে।

—আমাকে?

—হ্যাঁ, এত সুন্দর তুমি—

—থাক্ আর শুনতে চাই না।

—না গো, সত্যি।

—সত্যি, তাতে তোমার কি! তুমি ত কালো, ইস্ কী দুর্ভাগ্য!

অরুণার মুখ এতটুকু হইয়া গেল। ম্লান মুখে সে মিহিরের মুখপানে চাহিল। সে যে সত্যিই কালো।

মিহির হাসিয়া অস্থির হইল, কালো বলেছি তাতে দুঃখ হয়েছে? কেন? আমি কি তোমাকে ভালবাসিনে?

—ছাই বাস, অরুণা সত্যই কাঁদিয়া ফেলিল।

কালো মেয়ের ডাগর চোখের অশ্রুজল মিহিরের ভারী মিষ্টি লাগিল, মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া হাসিয়া কহিল, এমন বোকাও ত দেখি নি, পাগলী মেয়ে। কালো হ'লেও যে তুমি আমার চেয়ে কত সুন্দর! অরুণার চোখ তবুও ছল্ ছল্ করিতে লাগিল।

মিহির এবার সত্যই অস্থির হইয়া উঠিল, কিচ্ছুটি ব'লবার জো নেই, অমনি চোখে জল। বিশ্বাস হচ্ছে না, দাঁড়াও, আয়নাটা আনি। দেখ, কার মুখ বেশী সুন্দর—মিহির সত্যই উঠিয়া আয়না লইয়া আসিল। অরুণা লজ্জা পাইয়া বালিসের মধ্যে মুখ গুঁজিল। কিন্তু মিহিরের চোখে মুখে ততক্ষণে দুষ্টুমী বুদ্ধি মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। জোর করিয়া টানিয়া তুলিতে তুলিতে কহিল, মুখ লুকোলেই ছাড়ব নাকি ভেবেছ, আয়, ওঠ্ শীগগির—

অরুণাকে টানিয়া তুলিয়া নিজের মুখের পাশে তার মুখ চাপিয়া মিহির আয়নাখানা সম্মুখে ধরিল। অরুণা হাসিয়া উঠিল।

—কিগো, কার মুখ বেশী সুন্দর?

—আমার।

হাসিয়া হাসিয়া অরুণা কহিল, আমার।

মিহির গম্ভীর হইয়া কহিল, না, আমার।

—ইস্ তোমার যে চোখ ছোট—

এই ছোট চোখই তোমার বড় চোখের চেয়ে অনেক বেশী ক্ষমতা রাখে, তা জান!

—তা আবার জানিনে।

—আর কাঁদবে?

—কাঁদবই ত—

—দুষ্টু মেয়ে,—

কয়েক দিন পরে দুপুর বেলা অরুণা তার বইর আলমারী গুছাইতেছিল। মিহির আসা হইতে সব একেবারে বিশৃঙ্খল হইয়া রহিয়াছে, এদিকে মন বা নজর দিবার মোটে অবসরই পায় নাই। সদ্য ঘুম ভাঙিয়া এমন সময়ে মিহির কহিল, এক গ্লাস জল—

জল দিয়া অরুণা কহিল, একটা জিনিষ দেখবে?

—কি?

—দীপক রায়ের চিঠি।

—না বাবা, ওসব আমি দেখতে চাইনে।

—কেন চাও না?

—দরকার কি, ও সমস্ত দেখলেই আবার হয় ত মন-টন খারাপ হয়ে যাবে।

—কেন?

অরুণার মুখ গম্ভীর হইয়া আসিয়াছিল।

মিহির দুই হাতে চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে কহিল, ও তোমাদের ব্যাপার, তোমরা বোঝ। আমি বারণ করলেও ত তুমি শুনবে না। আমার ওর মধ্যে না যাওয়াই ভাল।

—তার মানে?

—মানে আবার কি? মিহির প্রায় বিরক্ত হইয়া কহিল।

অরুণার হাতের কাজ আপনা আপনি থামিয়া গেল, গভীর উত্তেজনায় মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিল। রুদ্ধশ্বাসে কহিল, তুমি, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না?

তার মুখপানে চাহিয়া মিহির ত্রস্ত হইয়া উঠিল—না—না, তা নয়, আ ভাকি লক্ষ্মীটি বিশ্বাস কর, আমি কোন দিন তোমায় অবিশ্বাস করি নি, আজও করি না।

অরুণা কাঁদিয়া কহিল, না—না—না—

ব্যাকুল হইয়া মিহির কহিল, মিথ্যে তুমি আমাকে এই কষ্ট দিচ্ছ অরু, মনে মনে তুমিও জান, তোমার উপর আমার কত বিশ্বাস—কত নির্ভর

রুদ্ধস্বরে অরুণা কহিল, এই পঙ্কিল আবহাওয়ার মধ্যে ফেলে রেখেছ তুমি আমাকে। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে আমার এখানে থাকতে, তার উপর তুমিও—অরুণা আর বলিতে পারিল না।

মিহির তার চোখের জল মুছাইয়া দিয়া কোমল স্বরে কহিল, ঈশ্বর জানেন, তোমাকে ভালবাসি কিনা, বিশ্বাস করি কিনা, কিন্তু অরু, আমার কথা তুমি বিশ্বাস করলে না!

অরুণা চুপ করিয়া রহিল। সংসারশুদ্ধ লোকের অনাদর সহ্য করা যায়, কিন্তু মিহিরের কালো কথা, একি সওয়া যায়। অনেকক্ষণ পরে ম্লান মুখে কহিল, বিশ্বাস করেছি। কিন্তু তুমি জান না—

—আমি জানি লক্ষ্মী, কিন্তু কি করব আমি, আমার কি ইচ্ছে করে না তোমাকে কাছে পেতে! বোঝ ত সবই, জান ত সবই। কত নিরুপায় আমি, মাথার ওপর এত বড় সংসার, নিজের দিকে, তোমার দিকে চাইবার সময়ই ত এরা দিচ্ছে না।

—কিন্তু আমি ত আর পারি না, এতদিন ছোট ছিলাম, তেমন বুঝি নি তোমাকে। এই সংসারের চাকার তলে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উৎসর্গ করে অবাধে থাকতে পেরেছি। কিন্তু আর ত পারিনে, ওগো, আমার বড় কষ্ট হয়। ঝর্ ঝর্ ধারে অরুণা আবার কাঁদিয়া ফেলিল।

মিহির পুরুষ, আপনাকে সম্বরণ করার শক্তি সে রাখে। দাঁত দিয়া নীচের ঠোঁটখানা চাপিয়া ধরিয়া সে আস্তে আস্তে অরুণার হাত দুখানা বুকে চাপিয়া উদাস দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিল।

রুদ্ধ কান্নার আবেগে ফুলিয়া ফুলিয়া অরুণা কহিল, সংসারে এত দুঃখ, আমি দিশেহারা হয়ে যাই। এত সংকীর্ণতা, এত নীচতা আর আমার সহ্য হয় না।

অস্ফুট মৃদুস্বরে মিহির কহিল, আর একটু সহ্য করে চল। এতদিনই যখন করেছ, আর দু'দিন পারবে না থাকতে?

—না—না, আমার বড় কষ্ট হয়, আর পারিনে আমি, কত [illegible] কত চিন্তা আমার তোমাকে নিয়ে—

—পাগল মেয়ে, ভয় কি!

—সে তুমি বুঝবে না। কত আর পারব সয়ে থাকতে! আমি পাগল হয়ে গেলাম, তুমি কাছে থাকলে আমি সব সইতে পারি, কিন্তু এভাবে আর পারিনে।

মিহির ম্লান মুখে চুপ করিয়া রহিল, তার বক্ষতল অরুণার চোখের জলে ভিজিয়া উঠিল।

(৬)

মিহির চলিয়া গিয়াছে।

অরুণার চোখের জল তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। সে পুরুষ, ঘরের কোণ তাহার জন্য নয়। বাহিরের বিরাট কর্ম্ম-চঞ্চল জগৎ তাহাকে অহর্নিশি ডাকে হাতছানি দিয়া। সে বাহির হইয়া পড়ে তারই আহ্বানে। জীবনে পুরুষকারের প্রতিষ্ঠা চাই।

অরুণার দিন তেমনিভাবেই গড়াইয়া চলিয়াছে। আনন্দ হীন—বৈচিত্র্যহীন দিন.....

কমল আছে। মাঝে মাঝে আসে, আশার বাণী শোনায়, রচনা শক্তির মূলে উৎসাহ জোগায়।

কিন্তু মন তবুও উদাস হইয়া উঠে। এখানে তার কোন আকর্ষণ নাই—কোন বন্ধন নাই—তবুও তাকে থাকিতে হইবে। সে কাহারও নিকট হইতে কিছু পাক্ না পাক্, তাহার নিকট হইতে সকলেই অনেক কিছু পাইতে চায়। কিন্তু অপদার্থ মেয়ে সে, কাহারও পূর্ণ প্রয়োজনই সে মিটাইতে পারিল না। ভগবান তাহাকে যেন সংসারের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলেন নাই।

মহালক্ষ্মী বিরক্ত হইয়া বলেন, দিন দিন তুমি হচ্ছ কি বৌমা?

অরুণা চমকিয়া ভীত দৃষ্টিতে তাকায়, কি জানি কি ত্রুটি—কি অপরাধ সে করিয়া ফেলিয়াছে।

মহালক্ষ্মী বলিলেন, আনতে বলি একটা জিনিষ, আন আর একটা জিনিষ। এখন থেকে আমার কোন কাজে আর তুমি হাত দিতে এস না, যা পারি আমি নিজে করব, না পারি, আমার মেয়েরা আছে। মহালক্ষ্মী বিরক্ত মুখে দ্রুত পায়ে ভাঁড়ার ঘরে গিয়া ঢুকিলেন।

অরুণা স্তব্ধমুখে সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল, সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি, এও কি ক্ষমা করা যায় না! ঐ যে, ও বাড়ীর বৌ মীনা, তার ত কি সাংঘাতিক ভুল, মিনিটে মিনিটে সব কথা ভুলিয়া যায়, কই সে জন্য তার পরিজনরা ত কখনও তাকে মন্দ বলে না! সবই কি তার অদৃষ্ট!

মহালক্ষ্মীকে আসিতে দেখিয়া অরুণা তাড়াতাড়ি গিয়া রান্নাঘরের পাশে খাবার ঘরে ঢুকিল। অরুণার মনে আজকাল বদ্ধ ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল যে, সে সকলের অপ্রিয়, সুতরাং তার দৈহিক রূপটাও সকলের বিরক্তি উৎপাদনের সহায়ক, নিজেকে সে তাই সর্ব্বদা লুকাইয়া রাখিতে চায় লোকচক্ষুর অন্তরালে।

—মা, শুনছ?

শ্যামলার ছোট বোন শচীর বিষম বিস্ময় ও উদ্বেগপূর্ণ কণ্ঠস্বরে অরুণা চমকিয়া উঠিল।

শচী বলিতেছে, মা, ওরা সব কি বলাবলি করছে বৌদির নামে।

—কি বলাবলি করছে? মহালক্ষ্মী উদ্বেগপূর্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন। পাশের ঘরে অরুণা নিশ্বাস বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ঘরে তাদের পরিজন অনেক। প্রাচীন প্রথার আদর্শানুযায়ী একান্নবর্ত্তী পরিবার। অথচ, ভিতরে ভিতরে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের উপর খড়্গহস্ত। কেহ কাহারও নামে কিছু রটাইতে পারিলে বাঁচিয়া যায়। অশিক্ষিত—তথা কুশিক্ষিত সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তি। অরুণার কাছে তাই এখানকার আকাশ বাতাস এত বিষাক্ত। মিথ্যার উপর মিথ্যা চাপাইয়া নির্দ্দোষীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া এরা মহা আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

অরুণা পাঁচ বছরের শিক্ষায়ও এ মনোবৃত্তি আজও লাভ করিতে পারে নাই। তাই পদে পদে সকলে তাহাকে করে এত লাঞ্ছনা—এত গঞ্জনা।

শচী কণ্ঠস্বর নমিত করিয়া আনিল। মায়ের কাছে ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, ওরা বলছে, বৌদি আর কমল—পাশের ঘরে অরুণা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল; শব্দ শুনিয়া মা ও মেয়ে সেইদিকে ছুটিলেন।

* * * * *

মূর্চ্ছা ভাঙিলে মহালক্ষ্মী কহিলেন, কিছু খাও বৌমা।

—না মা, অরুণা পাশ ফিরিয়া উপাধানের আড়ালে মুখ লুকাইল।

আরও অনেকক্ষণ সাধাসাধি করিয়া অগত্যা মহালক্ষ্মী চলিয়া গেলেন।

হঠাৎ কেন অরুণা ফিট হইয়া পড়িল, তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন না। শচী যা বলিয়াছিল, তা তিনি একবর্ণও বিশ্বাস করেন নাই। এমনি অরুণার সাংসারিক বুদ্ধির ত্রুটিতে তিনি যতই অসন্তুষ্ট হন না, বধূর চরিত্রের নির্ম্মলতায় তাঁর সন্দেহ ছিল না। মিহির শুধু বিবাহই করিয়া গিয়াছে, আর অরুণার সহিত তার যা কিছু সম্পর্ক, পত্রের মধ্য দিয়া। পাঁচ বছর হইল তিনি অরুণাকে বধূরূপে ঘরে আনিয়াছেন। সেই হইতে মেয়ের মত অরুণা অহর্নিশি তাঁর কাছে ছায়ার মত ফিরিতেছে। আর সকল বিষয়ে সে যতই মন্দ হ'ক, এ বিষয়ে তাকে সন্দেহ করা মহালক্ষ্মীর পক্ষে সাধ্যাতীত।

আর কমল! কমল যে এখনও দুধের ছেলে, কলেজে পড়িলেই ত আর বড় হইয়া যায় না, বয়েস যে তার এখনও আঠারোর কোঠা ছাড়ায় নাই।

অরুণা, অরুণা তার চেয়ে কত বড়! ছি—ছি—এরা মানুষ নয়।

মহালক্ষ্মীর মন নিমিষে সমস্ত আত্মজনের দিক হইতে বিমুখ হইয়া উঠিল। তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলে এতক্ষণের রুদ্ধ বেদনা অরুণার অশ্রুজলের মধ্য দিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কেবলই তার মনে হইতে লাগিল, বিবাহের পর হইতে সে এমনভাবে মিহিরের কাছছাড়া হইয়া না থাকিলে আজ তার নামে এমন অযথা অপবাদ কিছুতেই উঠিতে পারিত না।

মিথ্যা—মিথ্যা, সব মিথ্যা। তার জীবনের আগাগোড়া প্রত্যেকটা অধ্যায়ই মিথ্যার মসীতে মসীময়। মিথ্যা তার বিবাহ, না পালন করিতে পারিল সে স্ত্রীধর্ম্ম, না হইল সন্তানের মাতা। সংসারে তার গৌরব কোথায়! মিথ্যা তার রচনা স্পৃহা, মিথ্যা মান—মিথ্যা খ্যাতি। তার আত্মজনেরা কেহ দিল না তার এতটুকু মর্য্যাদা, একবিন্দু প্রশংসা। উপরন্তু দিল নিন্দা, তিরস্কার—সর্ব্বোপরি কুযশ—কুখ্যাতি। কমলের কাছে সে পায় যা কিছু উৎসাহ, যা কিছু আশা, —যা কিছু সাহায্য। চারিদিকের মলিন পঙ্ক পরিবেশের মধ্যে কমল যেন শ্বেত পদ্ম। কমল শুধু সৌন্দর্য্যের আধার নয়, পবিত্রতার প্রতীক।

কমল তাই—কমল সন্তান—হ'ক না অরুণার বয়েস অল্প না হ'ক সে সন্তানের মাতা। তার মনে তবুও মাতৃত্বের অভাব নাই। কমলের প্রতি মমতায় তার সেই মাতৃহৃদয় সহস্র ধারে উথলিয়া উঠে।

কিন্তু একী ঘটিল! এমন যে হইতে পারে, মানুষের রসনা যে এতবড় নির্জ্জলা মিথ্যা—এতবড় অপবিত্র বাণী উচ্চারণ করিতে পারে, তা ত সে স্বপ্নেও ভাবে নাই!

পাঁচ বছরের শুভ্র সুনাম একটা কিশোর ছেলের জন্য আজ নিমেষে নরকের অন্ধকারে ডুবিয়া গেল! এ-জীবনে আর কি অরুণা তা উদ্ধার করিতে পারিবে! উঃ! ভগবান—

অরুণা আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

(ক্রমশঃ

বাস্তবের খণ্ড-নাট্য

শ্রীগুণময় আচার্য্য

১। ফিরিওয়ালা মহাজন

ফিরিওয়ালা খুদে মানুষটি রোজ রোজ ওয়ান্ডারশটের অলিগলিতে আনাগোনা করে—পিঠে তাহার পশরার বোঁচকা। কালো জ্বলন্ত চোখ দুটি শ্রমে-ক্লান্তিতে জ্বল্ জ্বল্ করে। সূচ, আলপিন, জুতা, জামা, গেঞ্জি—কি না পাইবে তাহার কাছে! সৈনিক-পত্নীগণ এই সওদা করিয়াই কত খুশী! সপ্তাহে আশি ঘণ্টার কঠোর পরিশ্রমে সে গড়ে ত্রিশ শিলিং মুনাফা করিতে পারে। আয় তাহার নগণ্য হইলেও তাহার নিরানন্দ জীবনের তৃপ্তি সে উপভোগ করে একেবারে বিশেষজ্ঞের নিজস্ব বিচিত্রতায়।

সেদিন সে একজোড়া বুটজুতা বিক্রয় করিতে চেষ্টা করিতেছিল ল্যান্সকরপোরেলের পত্নীর নিকট। জুতো জোড়ার তারিফে যখন ফিরিওয়ালার মুখ হইতে অবিরাম খই ফুটিতেছিল, এমনই সময় করপোরেল-গৃহিণী তাহার নিকট দশ শিলিং ধার চাহিয়া ফিরিওয়ালাকে একেবারে সচকিত করিয়া দিল।

"এক সপ্তাহ পরে তোমার দশের জায়গায় বারো শিলিং দিয়ে দেব"—গৃহিণী নিশ্চিত প্রতিজ্ঞার সুরে বলিয়া চলিল—"টম্ কাল ভাড়ার টাকাটা আমার হাতে দিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু গ্রীন্ ড্রাগন হোটেলের মালিকের কাছে আমার সামান্য কিছু ধার ছিল; আর বুঝছ ত সে কথা আমি টমকে জানাতে দিতে চাই না। ঘণ্টাখানেকের ভেতরই বাড়ীওলা আসবে ভাড়ার টাকার জন্যে।"

খুদে ফিরিওয়ালা করপোরেল-গৃহিণীকে আজ দুই বৎসর যাবত জানে। মহিলাটিকে বিশ্বাস করা যায় কিনা, সে কথাই সে মনে মনে তোলাপাড়া করিতে থাকে।

সহসা উত্তেজনার সহিতই সে বলিয়া উঠে—"বেশ, দিচ্ছি। কিন্তু এই দশ শিলিংই আমার মোটমাট সম্বল।"

করপোরেল-গৃহিণী এক সপ্তাহ বাদে তাহার কথা রক্ষা করিল, দুই শিলিং সুদ বিনা ওজরেই দিয়া দিল এবং কথায় কথায় ফিরিওয়ালাকে জানাইয়া দিল, যদি কেউ সামান্য একটু ঝুঁকি লইতে পারে, তবে এই অঞ্চলে সৈনিক-পত্নীদের সপ্তাহে সপ্তাহে দুই-চারি শিলিং ধার দিয়া যথেষ্ট লাভবান হইতে পারে।

সেদিন ঘরে ফিরিয়া ফিরিওয়ালা ভাবিতে বসিল—"এক সপ্তাহের জন্য দশ শিলিং ধার দিয়া যদি দুই শিলিং সুদ পাওয়া যায়, তবে ত বৎসরে সুদের হার পড়ে হাজার পারসেন্টেরও বেশী। দুত্তের, তাহা হইলে আর পিঠে বোঝা বহিয়া সারাদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া হয়রান্ হই কেন? শ্রমও নাই, অথচ লাভও বেশী—শুধু একটু ঝুঁকি; যাহা থাকে বরাতে এবার হইতে ঝুঁকিই লইব।

প্রথম বৎসর এই ধার দিবার ব্যাপার হইতে খুদে ফিরিওয়ালাটির যাহা লাভ হইল তাহা দ্বারা লণ্ডন শহরের বুকে ছোট্ট একটি লোন অফিস সে খুলিয়া বসিল। পাঁচ বৎসর পার না হইতে অভিজাত নরনারী পর্যন্ত তাহার অফিস হইতে মোটা অঙ্কের ধার পাইতে লাগিল।

তাহার বিশিষ্ট সমৃদ্ধিপূর্ণ জীবনের অবসানে দেখিতে পাওয়া গেল ২০ লক্ষ পাউণ্ড সে জমাইয়া রাখিয়া গিয়াছে।

এই খুদে ফিরিওয়ালাটি আর কেহই নহেন—স্বয়ং স্যাম্ লিউইস্—যাহাকে কুসীদজীবীরাজ বলিয়া লণ্ডনবাসী আজও স্মরণ করিয়া থাকে।

২। দারোয়ান, পীয়ার (Peer)

চেলসি টাউন হলে রাজনীতিক দলের এক সভা চলিতেছে। ব্যস্তভাবে হলের দারোয়ান ছোকরা আসিয়া সভার উদ্যোক্তাদের একজনকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিল—"তোমাদের সঙ্গে কথা ছিল রাত্রি দশটার ভিতর সভা শেষ করবে; আর এখন ১১টা বেজে দশ মিনিট। কখন 'অল'টা ধোয়া-পোঁছা করব, কখন ঘুমাব? আবার সকাল সাতটায় হাজির হতে হবে।" (ভার্নন 'হল' উচ্চারণ করিতে পারে না, বলে 'অল্')।

সভার অন্যতম চাঁই মহাশয় বলিলেন—"তা বললে কি হয়, আরও ঘণ্টাখানেক লাগবে আমাদের সব সারা করতে, তার কমে ত নয়ই।"

দারোয়ান যুবক বেশ বলিষ্ঠ—লম্বাও একটু অসাধারণ, কিন্তু সাদাসিধা ভাল মানুষ; নাম তাহার পার্শি ভার্নন। খাটুনিতে সে ভয় পায় না, দুইজনের উপযুক্ত কাজ একা করিয়া সে সপ্তাহে ২৫ শিলিং বেতন পায়। কিন্তু সভার উদ্যোক্তারা মিছামিছি দেরী করিয়া তাহার রাত্রির ঘুমটা মাটি করিবে—শেষটায় হল ঘর ঝাঁটপাট দিতে দিতেই রাত কাবার হইয়া যাইবে—ইহা যে তাহার পক্ষে অসহ্য। এমন সময় এক ব্যক্তি বক্তৃতা করিতে করিতে পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তার Flood of oratory (অর্থাৎ বক্তৃতা প্রবাহ) র বিষয় উল্লেখ করল। দারোয়ান যুবকের মাথায় অমনি এক মতলব খেলিয়া গেল।

বক্তাদের আলোচনা তখন জমিয়া উঠিয়াছে চরমে—হলঘরের দূর কোণ হইতে ভাঙ্গা গলার এক অদ্ভুত সুরের রেশ ভাসিয়া আসিল—

"তোমাদের গলাবাজি যদি না থামাও, তবে দি আমি এটা ছেড়ে।"

সকলে দেখিল কোটহীন দারোয়ান সার্টের হাতা গুটাইয়া ঘর ধোয়াইবার জলের হোসপাইপ (hosepipe) দুই হাতে ধরিয়া আছে সমবেত জনতাকে তাগ করিয়া।

সমবেত জনতার মুখে সরবে হাস্য উত্থিত হইল—কিন্তু সহসা সে হাস্য স্তব্ধ হইল পাইপ হইতে ধারাবর্ষণে—নিমেষে রাজনীতিক সভাস্থের দল হলঘর শূন্য করিয়া প্রস্থান করিল।

কিন্তু পরদিন দারোয়ানের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করা হইল। ফলে অতিরিক্ত উৎসাহী যুবক-দারোয়ানের চাকুরীটি গেল।

ত্রিশ বৎসর পরে তৃতীয় লর্ড লিভেডেন চেলসি টাউন হল দেখিতে আসিলেন। ভদ্র বেশধারী দারোয়ান, লর্ডকে সঙ্গে করিয়া সর্ব্বত্র দেখাইতে লাগিল।

লর্ডের মুখে কিন্তু মাত্র একটি কথা—"I want to see the 'all" (আমি হলঘরটি দেখিতে চাই)। লর্ড হইলে

কি হইবে, তিনি hall (হল) উচ্চারণ করিতে পারিলেন না বলিলেন—'all (অল)।

তারপর যখন সত্য সত্যই 'অল'-এ পদার্পণ করিলেন তখন বলিলেন—

"পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ে গেল; একদিন দারোয়ান ছিলাম আমি এখানে।"

Here (অর্থাৎ এখানে) বলিতে যাইয়া লর্ডের মুখে বাহির হইল 'ere (ইয়ার); তথাপি পার্সি ভার্নন খুশী—সেই পুরাতন হোসপাইপ ব্যবস্থা তেমনই রহিয়াছে—যাহার ব্যবহারের ফলে তাহার চাকুরী গিয়াছিল।

পার্সি ভার্ননই খুড়ো মহাশয়ের মৃত্যুতে তৃতীয় লর্ড লিভেডেন হইয়াছে: কিন্তু আজন্মের "হ" উচ্চারণের অক্ষমতা এত টাকা পয়সায়ও ঢাকা পড়ে নাই।

৩। সেয়ানার সঙ্কট

জার্ম্মানীর হোমবার্গ শহরের মস্ত বড় এক জাঁকাল হোটেলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন—"কর্ণেল ডি ভিয়ার হ্যামলটন্ গ্রিনেডিয়ার গার্ডস্।" লম্বা-চওড়া চেহারার যেমন বৈশিষ্ট্য তেমনই পোষাকের অতিরিক্ত পারিপাট্য। শ্রদ্ধা ও সম্মানের সহিত সকলে তাঁহার দিকে তাকায়; বহু অভিজাত তরুণ তাঁহার কক্ষে আমন্ত্রিত হয় তাস খেলিবার জন্য—অবশ্য শুধু তাস খেলা নয়, তাসের সংগে বাজি ধরা হয় মোটা মোটা অংক টাকার।

কিন্তু বহু সম্মানিত এই সামরিক অফিসার ইহাতেও যেন তৃপ্ত নন; তাঁহার লক্ষ্য থাকে উত্তর ইংলণ্ডের কোনও ক্রোরপতির বিশ বৎসর বয়স্ক পুত্র—যে নাকি ঠিক ঐ সময়েই হোমবার্গে আসিয়াছে শফরে। সামরিক ধুরন্ধরের আশা আছে একবার ঐ ক্রোরপতি পুত্রের সহিত মেলামেশা করিবার সুযোগ পাইলে তাস খেলার বাজিতে মোটা রকমের একটা টাকা আত্মসাৎ করিতে সমর্থ হইবেন। কারণ তাসের কারসাজিতে প্রকৃতই কর্ণেলের হাত একেবারে পাকা।

সেদিন সবে ডিনার সমাপন করিয়া কর্ণেল বহুমূল্য একটি সিগার উপভোগ করিতেছেন, এমন সময় হোটেল-ম্যানেজার আসিয়া কানে কানে বলিলেন—দুটি ভদ্রলোক দেখা করতে এয়েছেন। ভয়ে আতঙ্কে কাঁপিতে কাঁপিতে কর্ণেল গেলেন ভদ্রলোক দুইটির সংগে দেখা করিতে। ভদ্রলোকেরা বলিলেন—"এখানে যত ইংলিশ মিলিটারী অফিসার আছে, সবাইকে গ্রেপ্তার করবার হুকুম এয়েছে উপর হতে। কারণ যে কোন মুহূর্ত্তে লড়াই বেধে যেতে পারে। এ ব্যাপারে কোন ওজর আপত্তি গ্রাহ্য হবে না।"

কর্ণেলের কাছে এটা বিস্ময়ের ব্যাপার হইলেও, কথাটা মিথ্যা নয় আদপেই, কেন না তারিখটা হইল ৩রা আগষ্ট ১৯১৪ সালের।

হতভম্ব কর্ণেল তৎক্ষণাৎ সত্য কথা বলিয়া ফেলিলেন—আমি ত আর মিলিটারী অফিসার নই

যেমন এই কথা শোনা অমনই ভদ্রলোকদ্বয়ের একজন বলিলেন—তা হলে আপনি নিশ্চয়ই গোয়েন্দা (spy); স্পাই ছাড়া কে ছদ্মবেশে সৈনিক সেজে বেড়ায়। আমি একজন ডিটেকটিভ, আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করলাম।

ছদ্মবেশী কর্ণেল মহাবিপদে পড়িলেন। স্পাইরূপে ধরা পড়িলে গুলী করিয়া মারিয়া ফেলা হইবে। তখন কর্ণেল বাধ্য হইয়া আপন-স্বরূপ প্রকাশ করিলেন। লণ্ডনের ওয়েষ্ট এণ্ডে তাঁহাকে অন্য নামেই লোকে জানে; তাসের হাতসাফাই, ধোঁকাবাজী আর কৌশলে তিনি ওস্তাদ। বিশেষ করিয়া ধনাঢ্য তরুণদের ফুসলাইয়া আনিয়া তাসের খেলায় পরাস্ত করিয়া টাকা আদায় করা হইল তাঁহার আসল পেশা। কিন্তু জার্ম্মান অফিসারেরা সহসা সে কথা বিশ্বাস করিতে পারিল না। শেষ নিরুপায় হইয়া কর্ণেলকে ব্যক্ত করিতে হইল যে, এই তাসের হাত সাফাইয়ের দরুন একবার তিন মাস জেল খাটিতে হইয়াছে। লণ্ডনের কারাবিভাগের সহিত টেলিফোনে আলাপ করিলে সে কথা জানা যাইবে; আর লণ্ডন পুলিশের নিকট তাঁহার ফটো রহিয়াছে, সুতরাং তাঁহার প্রকৃত নাম "কার্ড-শার্পার ডেনিস" কিনা, তাহা সনাক্ত করা যাইবে লণ্ডন পুলিশের নিকট হইতে।

এবারে জার্ম্মান অফিসারগণ ব্যক্তিটির প্রকৃত পরিচয় বুঝিতে পারিয়া উঁহাকে ছাড়িয়া দিল। সে যাত্রা "কার্ড-শার্পার ডেনিস" প্রাণে বাঁচিয়া গেল।

৪। মৃত পত্নী

২১ বৎসর বয়সে সে বিবাহ করিয়াছিল। ২৩ বৎসর বয়সে সে পত্নীকে হারাইল, কারণ দারিদ্র্য-স্রোত এমনই ভাবে প্লাবন আনিল যে পত্নীর প্রতি প্রেম সে প্লাবনে ভাসিয়া গেল। স্বামীর অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া পত্নী জানালা পথে পলায়ন করিল।

কিন্তু তরুণ ইঞ্জিনিয়ার আঘাত পাইলেও ভাঙ্গিয়া পড়িল না বিষয় কর্ম্মে প্রাণ ঢালিয়া দিল। ২০ বৎসর পরে আবার তাহার প্রথম ফুরসৎ হইল প্রেমের মর্য্যাদা দানে, যখন সে এক অপরূপ সুন্দরীর সাক্ষাৎ পাইল। সুন্দরীর বয়স ৩০ বৎসর, সর্ব্বপ্রকারেই ইঞ্জিনীয়ারের মনের মত; বিশেষ করিয়া ইঞ্জিনীয়ার এখন অর্থে ও যশে বিখ্যাত। বিবাহের কোনই বাধা নাই—কিন্তু...।

কিন্তু ইঞ্জিনীয়ার বিবাহের প্রস্তাব করিতে পারে না যতক্ষণ সে নিশ্চিত হইতে না পারে তাহার পূর্ব্ব স্ত্রী জীবিত নয়। প্রাইভেট ডিটেকটিভ কোম্পানীর উপর অনুসন্ধানের ভার দেওয়া হইল। তাহারা অল্পকাল মধ্যেই সংবাদ আনিল যে তাহার পত্নী ব্রাইটনে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মারা গিয়াছে।

ইঞ্জিনীয়ার তখন বিবাহের প্রস্তাব করিল, সুন্দরী প্রস্তাব গ্রহণ করিল। খুব ঘটা করিয়া বিবাহের ব্যবস্থা হইতে লাগিল। বার্কলি স্কোয়ারের কাছে মস্ত বড় একটা বাড়ী ভাড়া লওয়া হইল। লণ্ডনের সবচেয়ে রান্নার সুনাম যে কোম্পানীর তাহাদের হাতে ভোজের ভার দেওয়া হইল। এমন আড়ম্বরের ভোজ ব্যবস্থা করিতে অর্ডার দেওয়া হইল

(শেষাংশ ৭৬৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সন্ধ্যাতারা

(গল্প)

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ গুহঠাকুরতা

ঈশ্বর কাঠ কাটে।

সারাদিন কাঠফাটা রৌদ্রে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়া যখন বাড়ী ফিরে, বেলা তখন দুপুর গড়াইয়া বিকেলে আসিয়া পড়ে। সন্ধ্যা পাখা লইয়া বাতাস করিতে বসে। পরে এ-কথা সে-কথা কহিয়া ভাত দিবার জন্য উঠিয়া যায়। ঈশ্বরও সন্ধ্যার তোলা জলে হাত-পা ধুইয়া আস্তে আস্তে ছোট্ট কুঠুরীটায় ঢুকিয়া পড়ে। তারপর খাওয়া হইলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া গরুর গাড়ীখানি লইয়া কাঠ বেচিতে চলিয়া যায়। সন্ধ্যা দোর-গোড়ায় দাঁড়াইয়া থাকে। যখন চোখের বাহিরে চলিয়া যায়, দরজা বন্ধ করিয়া ঘরের সব কাজ সারিতে থাকে।

প্রত্যহ এই রকম করিয়া দিন চলে।

সেদিনও গাড়ী লইয়া ঈশ্বর কাঠ বেচিতে গেল। তারপর ডা-ডা করিতে করিতে যখন চৌধুরী বাড়ীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, অক্ষয়বাবু তখন বাহিরে বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন। বলিলেনঃ কত করে ঈশ্বর?— সাত আনা গাড়ী কর্ত্তাঃ ঈশ্বর বলিল। —আরে বল কি, পাঁচ আনায় সেদিন হামিদ দিয়ে গেল। আর তুমি বল কিনা সাত আনা।

অক্ষয়বাবু এ গ্রামের জমীদার। ঈশ্বরকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া ভাবিলেন, হয়ত ভয়ে ঈশ্বর আর কিছুই বলিবে না। হয়ত কেন, বলিবেই না। আহা, বেচারা কত কষ্ট করিয়া কাঠ কাটিয়া আনে, কাঠের দাম হয়ত এখন বাড়িয়াছে। বলিলেনঃ আচ্ছা, দিয়ে যাও এক গাড়ী। তারপর পকেট হইতে একটা সিকি আর তিনটা আনি বাহির করিয়া ঈশ্বরের হাতে দিয়া বলিলেন ঃ আজ এখানে খাবে নাকি ঈশ্বর? সহাস্যবদনে ঈশ্বর বলিলঃ আপনি দিবেন তার আর কি। কিন্তু—ঈশ্বর থামিল।

মনের কথা বুঝিয়া অক্ষয়বাবু বলিলেন ঃ ঠিক বলেছ ঈশ্বর তুমি। আচ্ছা, নিয়ে যাও তোমার বাসায়। তারপর ডাকিলেন—কেষ্টা, কেষ্টা—

ভিতর হইতে একটি লোক আসিল। তাকে কি বলিলেন, সে দুইথালা ভাত, তরকারি, মাছের ঝোল প্রভৃতি লইয়া আসিয়া ঈশ্বরের গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া গেল।

কুটীরের প্রাঙ্গণে আসিয়া ঈশ্বর ডাকিল ঃ ও সন্ধ্যা, সন্ধ্যা—

সন্ধ্যা আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। ঘরে ঢুকিয়া ঈশ্বর বলিল ঃ আজ আর রান্না করিস না, বুঝলি—

কেন?—সন্ধ্যা বলিল।

ঈশ্বর থালা দুইখানি দেখাইল। আহ্লাদে আটখানা হইয়া সন্ধ্যা বলিল ঃ জমীদার আমারগো খুব ভালবাসে—না? তারপর বলিল ঃ মাইয়াডা যদি ঘুমাইয়া না পড়ত, ত খাইতে পারত।

ঈশ্বরের একটি মেয়ে ছিল—ঈশ্বরের কিনা সন্দেহ হয়। এ যেন গোবরে পদ্মফুল। এমন সুন্দর ফুটফুটে রং, আর এমন নাক চোখ যেন কোন শিল্পী তুলি দিয়া আঁকিয়া রাখিয়াছে। কাজেই বিশ্বাস হয় না যে এ ঈশ্বর বাগদীর মেয়ে। এ বিষয়ে তাকে কেউ জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর এড়াইয়া যাইত।

কিছুদিন পর জমীদার অক্ষয় চৌধুরী মারা গেলেন। বহু লোক তাঁকে দেখিতে আসিল—তাঁর জন্য শোক করিল। ঈশ্বরও আসিল। তারপর যেন আপনার জন গেছেন, এইভাবে খুব কাঁদিল। বাস্তবিক তিনি প্রজাদের আপন সন্তানের মত দেখিতেন।

খুব ধুমধাম করিয়া তাঁর শ্রাদ্ধ হইল। তাঁর উদ্দেশ্যে ঈশ্বর ভগবানের নিকট কি প্রার্থনা করিল।

দিন কারও সমান যায় না। সহৃদয় জমীদার অক্ষয় চৌধুরীর পর তাঁর পুত্র নিরঞ্জন চৌধুরী জমীদার হইলেন। তিনি যেমন বিলাসিতাপ্রিয়, তেমনি সেটা পূরণের জন্য দায় হইল প্রজাদের।

বর্ষা আসিয়াছে।.........

আজ চারদিন জ্বরের পর ঈশ্বর দুখানা রুটি খাইয়াছে। তারপর অতি কষ্টে কাঠ কাটিতে গিয়াছে। শেষে এক গাড়ী কাঠ বোঝাই করিয়া বেচিতে চলিল। উপায় কি? ঘরে চাল নাই, আর একদিন শুইয়া থাকিলে খাইবে কি—খাজনাও ত আবার কিছু বাকী পড়িয়াছে।

গরু দুটাকে তাড়াইয়া ঈশ্বর চলিয়াছে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে। মাঝে মাঝে হাঁক দিতেছে—কাঠ চাই—জমীদার বাড়ীর সামনে আসিয়া পড়িলে দেখা হইল মণির সঙ্গে। মণি এ বাড়ীর বর্ত্তমান ভৃত্য। এখন আর সে কেষ্টা নাই। কেষ্টা চোর, কেষ্টা বদমাস। অবশ্য এককালে কেষ্টা নিরঞ্জন বাবুর বসন্তের সময় রাত জাগিয়া সেবা করিয়াছিল—তা' চাকর হইলে খাটিতেই হয়।

মণি বাজারে চলিয়াছিল। বলিলঃ দেখা হইল ভালই হইল ঈশ্বর। কাঠগুলা দিয়ে যাও। বাবু তোমার খোঁজ করছিল একটু আগে। আজ একটা ভোজ আছে কিনা। আমারও আজ—হঠাৎ থামিয়া গেল। নিরঞ্জনবাবু আসিয়া পড়িলেন। বলিলেনঃ ভাল ঈশ্বর, তোমারই খোঁজ করছিলাম। কাঠগুলা দিয়ে যাও, দাম যা' পড়ে খাজনার থেকে কাটা যাবে। আর সেটাও তাড়াতাড়ি করে দিয়ে ফেল—বলিয়া চলিয়া গেলেন।

কথা শুনিয়া ঈশ্বরের সমস্ত শরীর অবশ হইয়া আসিল, বাবু যদি ওকথা না বলিয়া গলায় খাঁড়া বসাইয়া দিত তা'ও বোধ হয় ভাল ছিল। অত কষ্ট করিয়া অসুস্থ শরীরে সে এই কাঠ কাটিয়া আনিয়াছে, আর তাই কিনা সে এইখানে রাখিয়া যাইবে? কেন—এ দাবী শুধু তার খাজনার জন্য? ঘরে সে কি খাইবে তার ঠিক নাই, তবু—

কাঠ রাখিয়া ঈশ্বর বিষণ্ণ মনে গৃহের দিকে ফিরিল। গরুর গাড়ীর চাকাগুলি ক্যাঁচ্-কোঁচ করিয়া তাকে যেন ব্যঙ্গ করিতে লাগিল।

ঘরে আসিয়া দেখিল আর এক বিপদ। মেয়েটার খুব জ্বর হইয়াছে। মুখ, চোখ লাল হইয়া উঠিয়াছে। ধারে বসিয়া সন্ধ্যা কপালে একটা জলের পটি লাগাইয়া বাতাস করিতেছে।

ঈশ্বর নিজের সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া গেল। মনের ক্লান্তি অবসাদ ঝাড়িয়া উঠিল। মেয়েটাকে ত বাঁচাইতে হইবে।

কি হইবে ? সকলেই ঈশ্বরকে ভালবাসিত। তার কারণ, লোকের বিপদে আপদে ঈশ্বরের ডাক পড়িত—ঈশ্বর না হইলে চলিত না। দুলে বাগ্দীর বাড়ী যেদিন ডাকাত পড়ে, ঈশ্বরের লাঠিই সেদিন সকলের মান, ইজ্জৎ রক্ষা করিয়াছিল। সামুর ছেলেটার অসুখের সময়ও রাতদিন তার শিয়রে জাগিয়াছিল ঈশ্বর।

দুলের বাড়ী গিয়া ঈশ্বর দুইটা টাকা লইয়া আসিল। পরদিন তাই দিয়া ডাক্তার ডাকিয়া আনিল। ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিলেন এবং গম্ভীরভাবে মন্তব্য করিয়া গেলেন--রোগ সাংঘাতিক।

দুই, তিন দিন গেল। ঈশ্বর তার কুঠারখানি বেচিয়া পথ্যাদি দিতে লাগিল। কারণ, বারবার কারও নিকট হাত পাতিতে সে দ্বিধা বোধ করিত। যা'হউক, ভগবানের কৃপায় মেয়েটা ভাল হইয়া উঠিল।

(দুই)

বিপিন বাবু কলিকাতা শহরে একজন বড় এটর্ণী। টাকা পয়সাও আছে বিস্তর। বিপিন বাবুরা লোক বেশী নন। মাত্র গিন্নী, দুই ছেলে, এক মেয়ে আর তিনি নিজে, ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিজনই বড়।

বিজন সেবার আই-এ পাশ করিয়া বি-এতে ভর্ত্তি হয়, সেই সময় নিরঞ্জন চৌধুরীর সহিত তার আলাপ হয়। ক্রমে আলাপ বন্ধুত্বে পরিণত হয়। একদিন ওরা দুইজন সিনেমায় গেল। বিজনের ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু নিরঞ্জন জোর করিয়া লইয়া গেল। তারপর শো দেখিয়া রাস্তায় আসিয়া নিরঞ্জন বলিলঃ রামী কি রকম করেছে !—মারভালাস—

হুঁ—বিজন উত্তর দিল। আসল কথা ও মোটে ওদিকে মনই দেয় নাই।

এমনি করিয়া কলেজের দিনগুলি বেশ কাটিতেছিল। হঠাৎ পিতা অক্ষয় চৌধুরীর মৃত্যুতে নিরঞ্জনকে দেশে যাইতে হয় এবং কলেজের পড়ায় সে ইস্তফা দেয়। কলেজে থাকিতে নিরঞ্জনের মনটা ছিল রঙ্গীন। কিন্তু জমীদারী আবহাওয়ায় শেষে অন্য রকম হইয়া যায়। এদিকে বিজন পাশ করিয়া এম-এ পড়িতে আরম্ভ করে। মাঝে মাঝে নিরঞ্জন তাকে যাইবার জন্য চিঠি লিখিত। বিজন উত্তর দিত, এখন তার সময় নাই। সময় হইলেই যাইবে।

বি-এ পাস করিবার পর হইতেই বিজনের মাতা মানদাদেবী পুত্রের বিবাহের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। বিজন কিন্তু ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল না। মানদাদেবী আশ্চর্য্য হইলেন তখন, যখন শুনিলেন পাস করিয়া ছেলে বিলাত যাইবে। তিনি তাড়াতাড়ি বিবাহের যোগাড় করিতে লাগিলেন। কিন্তু কারও কথা না শুনিয়া বিজন বিলাত রওয়ানা হইল, মাতার স্নেহ বাধা দিতে পারিল না।

মাস দুই পরে একদিন মানদাদেবী বলিলেনঃ চল কোথাও ঘুরে আসি—

কোথায় ?—বিপিনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন।

এই কাশী—মানদাদেবী বলিলেন।

হঠাৎ এ মত কেন ?—বিপিনবাবু বলিলেন।

মানদাদেবী উত্তর করিলেনঃ এতদিন এক জায়গায় থেকে হাঁপিয়ে উঠেছি, আর একটা তীর্থস্থানও দেখা যাবে।

—বেশ চল—বিপিনবাবু বলিলেন।

তারপর একদিন সত্যসত্যই তাঁরা কাশী যাত্রা করিলেন।

কাশীতে আসিয়া মানদাদেবী খুব খুশী হইলেন। চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিলেন। বিশ্বনাথের মন্দিরে আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন।

বিকালে পাঠ শোনা তাঁর নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ হইয়া উঠিল। সেখানে একটি সঙ্গী জুটিল। তিনিও প্রায় সমবয়সী। কাজেই আলাপ ভাল জমিল এবং দুই বাড়ীতে যাতায়াত হইতে লাগিল। মানদাদেবী তাঁর সঙ্গে দুপুর বেলা গল্প জুড়িয়া দিতেন ; বিয়ের বয়েস ছেলের। কত করে বললাম, তা' কিছুতেই শুনলে না, চলে গেল।

—কোথায় গেল দিদি—তিনি বলিতেন।

—সে একেবারে সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে—সেই বিলেত। সঙ্গে সঙ্গে গর্ব্ব অনুভব করিতেন।

তিনি বলিতেনঃ আমারও এক মেয়ে ছাড়া আর কেউ নেই। এবার সে ম্যাট্রিক পাস করেছে, ওকে কোথাও দিয়ে দিতে পারলেই আমার আর কোন জ্বালা নেই। তারপর কিছুক্ষণ থামিয়া বলিতেনঃ উঠি এখন দিদি, যাবেন একদিন।

একদিন মানদাদেবী গিয়া ডাকিলেনঃ ও দিদি—

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর আসিল—আসুন, আসুন ! ও রাণু, কে এসেছে দ্যাখ, প্রণাম কর এসে

একটি চৌদ্দ পনর বৎসরের মেয়ে আসিয়া প্রণাম করিল।

থাক্, থাক্—বলিয়া মানদাদেবী মেয়েটির মুখের দিকে ভাল করিয়া তাকাইলেন। দেখিলেন, সত্যই মেয়েটি সুন্দরী। তারপর দু-একটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া মনে হইল খুব নয় ! মানদাদেবীর পছন্দ হইল। কথায় কথায় জানিলেন, এক দূর সম্পর্কীয় মামা আছে কোথায়, সে-ই খরচপত্র চালায়। মানদাদেবী ঠিক করিলেন, এই মেয়েটিকেই পুত্রবধূরূপে তিনি ঘরে আনিবেন।

বিপিন বাবুকে প্রথমে এ বিষয়ে কিছুই জানাইলেন না, রাগ হইল বিজনের উপর। কতদিন হইল গিয়াছে, মাত্র একখানা পৌঁছ সংবাদ দিয়াই খালাস।

মানুষ যেটা ঠিক করে, বিধাতা সেটা ভাঙেন। একদিন দশাশ্বমেধ ঘাট হইতে ফিরিয়া আসিয়া মানদাদেবী বলিলেনঃ শরীরটা কেমন লাগছে, স্নান না করলেই বোধ হয় ভাল হ'ত।

না করলেই পারতে—বিপিনবাবু উত্তর দিলেন।

সেইদিন দুপুরে তাঁর জ্বর আসিল। বিকালের দিকে বাড়িয়া চলিল। বিপিন বাবু ডাক্তার দেখান সমীচীন মনে করিলেন। ডাক্তার আসিয়া ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেনঃ ভয় নেই, তবে কিছু ভুগতে হবে।

কিন্তু তিন দিন গিয়া চার দিনের সন্ধ্যায় অবস্থা খুবই খারাপ হইয়া পড়িল। বড় বড় ডাক্তার আনাগোনা করিতে লাগিল। রাত্রিতে আরও খারাপ হইল। সে কি মুহূর্ত্ত—

যমে মানুষে টানাটানি হইতে লাগিল। শেষে পরদিন ভোর বেলায় তিনি চলিয়া গেলেন।

বিপদ কি কখনও একা আসে?

মানদাদেবীর অসুখের সময় যখন হুলুস্থুল লাগিয়া গিয়াছিল, বাড়ীর আর কারও দিকে নজর দিবার কেউ তখন ছিল না। সেই সময় তাঁর ছোট মেয়েটি একা কোথায় বাহির হয়, তারপর কে লইয়া যায়। এখন তাকে দেখিতে না পাইয়া বিপিন বাবু খোঁজাখুজি করিতে লাগিলেন। তিন বছরের মেয়ে, ভাল করিয়া নাম ঠিকানাও হয়ত বলিতে পারিবে না। কাশীতে তখন গুণ্ডার উপদ্রব বেশ ভালই ছিল। বিপিনবাবু থানার দারোগার আশ্রয় লইলেন। তাঁরা অনেক আশ্বাস দিয়া মেয়ে বাহির করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। যাহা হারাইল, আর তাহা ফিরিয়া পাওয়া গেল না। কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া অতি দুঃখেই বিপিনবাবু কাশী ত্যাগ করিলেন।

(তিন)

ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা দিয়া বিজন বেশ স্ফূর্তিতেই দিনগুলি কাটাইতেছিল। দুপুর বেলায় ক্রিকেট আর সন্ধ্যা বেলায় লাইব্রেরী তার বাঁধা নিয়ম হইয়া দাঁড়াইল, সুবিধা হইল জনকে পাইয়া। জন ওর পাশের ঘরেই থাকে। তাই আলাপটা জমিল ভাল। জনও বিজনকে পছন্দ করে বেশী। কেন না, আর সবের বড় চাল, বড় বড় কথা; কিন্তু সেদিক দিয়া বিজন খুবই ভাল। উপরন্তু কোন জিনিসটা জানিলেও গোপন করিতে চায়। তাই বিজনকে ভাললাগে জনের। তা ছাড়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জানিবার আগ্রহও ওর খুব বেশী—যেমন বিজনের ওদের দেশ সম্বন্ধে। বিজন গল্প করে তার পল্লীর। সবুজ মাঠ, শস্যভরা ক্ষেতের পাশে রঙ-বেরঙের ফুলের গন্ধ—শুনিতে শুনিতে মুগ্ধ হইয়া যায় জন। বিজন যখন বর্ণনা করে, গোধূলি-লগনে রাখালেরা বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে মনের আনন্দে গরুগুলি লইয়া বাড়ীর দিকে যাত্রা করে, পল্লীবধূ কলসী কাঁখে গ্রামের মেঠো রাস্তা দিয়া জল লইয়া ফিরে, অদূরে মন্দিরে শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিতে আরম্ভ করে, মাঠের দুইধারে শিয়ালগুলি ডাকিতে থাকে।—একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে জন ওর দিকে। যেন সব দেখিতেছে ও। তারপর আসে জনের পালা, সে কিন্তু বেশী কিছু বলিতে পারে না। শুধু বলেঃ শীতকালে বাইরে যখন সবটা বরফে ঢাকিয়া যায়, সমস্ত জায়গাটা যেমন এক-রকম হইয়া যায়—সে এক অপূর্ব দৃশ্য। তারপর যেদিন ওরা দল বাঁধিয়া শিকারে যায়, বনে কতকগুলি জন্তুর ভীড় লাগিয়া যায়—বেশ লাগে তখন। মনে হয় আকাশটা যেন সায় দিতেছে। কিন্তু গাছগুলি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থা[illegible] তার পাতাগুলি যেন ভয়ে শুকাইয়া যাইতে থাকে।......তা[illegible] বলে নিজের কথা। পাঁচ বছর বয়সের সময় ওর পিতার [illegible] হয়। কি একটা যুদ্ধ বাধিয়াছিল। সেই যুদ্ধে তার পিতা গেল মনের আনন্দে; কিন্তু আর ফিরিয়া আসে নাই। [illegible]র সে কি কান্না। ও তখন কতটুকুই বা কি আর বোঝে। [illegible]র চোখে জল দেখিয়া ও-ও কাঁদিতে থাকে। একটা জিনিস কিন্তু ওর স্পষ্টই মনে পড়ে, যখনই ও জিজ্ঞাসা করিত ওর বাবার কথা, অমনি 'বয়' আসিয়া লইয়া যাইত রাস্তায়, তারপর এটা সেটা দেখাইয়া বিস্কুট কি লজেন্স কিনিয়া দিত। ও তাতেই ভুলিয়া যাইত। তারপর ওদের অবস্থা খারাপ হইয়া পড়ে। পিতা লর্ড বা ডিউক কিছুই ছিলেন না। ছিলেন একজন সামান্য স্কুল-শিক্ষক। কাজেই অর্থের অনটন আরম্ভ হইল। তাই জন্ প্রথমে মায়ের কাছেই লেখাপড়া শিখিতে থাকে, পরে স্কুলে ভর্ত্তি হয়। সেখান হইতে পাস করিয়া কলেজে ঢুকিয়া পড়ে। সেই সঙ্গে একটি ছেলেকে পড়াইতে থাকে। ইহাতে অবস্থার একটু পরিবর্ত্তন হয়। এইরকম করিয়া তবে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা দেয়। কিন্তু এখন এ হোস্টেলেও বেশী দিন থাকিতে পারিবে না, টাকা ফুরাইয়া আসিয়াছে। তবুও ইহার মধ্যেই সে একটু স্ফূর্ত্তি না করিয়া পারে না।

সেদিন খেলার পর ঘরে ঢুকিয়াই বিজন টেবিলের উপর একখানি চিঠি দেখিতে পাইল। তাড়াতাড়ি খামখানি খুলিয়া ফেলিল।

চিঠি আসিয়াছে কলিকাতা হইতে। সংবাদ খারাপ—মা মারা গিয়াছেন। শুধু তাই নয়, ছোট বোনটিও কোথায় হারাইয়া গিয়াছে, তার কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই।

মুহূর্ত্তে পৃথিবীটা বিজনের কাছে ফাঁকা মনে হইল। সে রাত্রে বিজন কিছু খাইল না। মা—কত আদর করিত, কত স্নেহ করিত। এখানে আসিবার সময় বারণ করিয়াছিল, কিন্তু বিজন শোনে নাই। ছেলেবেলা বিজনকে স্নান করাইতে, ভাত খাওয়াইতে মাকে কি কম দৌড়াদৌড়ি করিতে হইত—সেই মা এখন নাই। হইতে পারে না। বিজন বিশ্বাস করিল না। মা কি তাকে ফেলিয়া যাইতে পারে? তবে কে আদর করিয়া খাওয়াইবে? কার কাছে আবদার করিবে? না, না—মা আছে। আর বোনটি—ফুলের মত কোমল, নিষ্পাপ বোনটি—তার কথা বিজন ভাবিতেই পারে না। বালিশে মাথা দিয়া সে পড়িয়া রহিল। বিজন ভাবে কে এই চিঠি লেখা আবিষ্কার করিল—কেন করিল? তার জন্যই ত আজ সে দূর দেশে নিজেকে সম্পূর্ণ অসহায় মনে করিতেছে। কিন্তু একদিন ত জানিতে হইতই। সে একদিন সকলেরই। সে তখনকার কথা তখন।

এখন আর বিজন খেলিতে যায় না। বন্ধুরা ডাকিলে বলেঃ ভাল লাগে না। সারাদিনে শুধু একবার লাইব্রেরীতে যায়।

দুইদিন হইল আবার একখানা চিঠি আসিয়াছে—পিতার শরীর খারাপ। বিজন ভাবে, এখন বুঝি তার কপাল ভাঙ্গে। বাপ-মা কারও চিরদিন থাকে না, সেকথা সে ভালই জানে। কিন্তু এখনও তার বাপ-মায়ের সে সময় হয় নাই। তবে কেন—

সকালবেলা। সূর্য্যের আলোয় ঘর ভরিয়া গিয়াছে। বিছানায় বসিয়া খবরের কাগজের হেডিংগুলায় চোখ বুলাইতেছিল বিজন। এমন সময় একজন আসিয়া একখানা টেলিগ্রাম রাখিয়া গেল তার কাগজটার উপর। টেলিগ্রাম

দেখিয়া বিজনের অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। বিশেষত কয়েক-দিন আগে তার পিতার অসুখের সংবাদ আসিয়াছিল। ভয়ে ভয়ে পড়িল—কাম সার্প। তার পিতার এক বন্ধু লিখিয়াছে। যাক্, এখন পর্যন্ত তবে তার বাবা বাঁচিয়া আছে। কিন্তু যাইতে তাকে হইবেই। অবস্থা নিশ্চয়ই খারাপ। নইলে বাঙালী সচরাচর চট্ করিয়া আর টেলিগ্রাম করে না—বিজন সে কথা ভাল করিয়াই জানে।

সেই দিনই দুর্গার নাম লইয়া রওনা হইল বিজন।

(চার)

কলিকাতায় আসিবার কিছুদিন পরে বিপিনবাবুর যে অসুখ হয়, আজ পর্যন্ত তাহা সারে না। রোগটি টাইফয়েড। বিজনকে একখানা চিঠি দিয়া জানাইয়াছিলেন অসুখ সম্বন্ধে। তারপর হইতে কেবল জিজ্ঞাসা করেন—বিজন আসিয়াছে কি না।

আজ একুশ দিন বিপিনবাবু প্রলাপ বকিতেছেন। মাঝে মাঝে বিজনের নাম করিতেছেন। ......ও বিজু, বিজু—বিজু এলি না এখনও—বেশ। এই যে বিজু এসেছিস—এত দেরী হ'ল কেন? তোর মাকে একবার ডেকে দেত।......

অনবরত বকিয়া যাইতেছেন। হুঁস নাই, কয়দিন আগে অবস্থা দেখিয়া বন্ধু পরেশবাবু বিজনের কাছে একটা টেলিগ্রাম করিয়া দিয়াছেন। আসিলেও কিছুদিন সময় যাইবে ত।—

রাত্রি এগারটা।

বিপিনবাবুর ঘর লোকে লোকারণ্য। কিন্তু একটু টুঁ শব্দ নাই। সকলেই গম্ভীর হইয়া কাজ করিয়া যাইতেছে। কেহ শরীরের উত্তাপ পরীক্ষা করিতেছে, আর একজন খাতায় লিখিয়া লইতেছে। কেহ বা বাতাস করিতে করিতে আইস-ব্যাগের জলটা ফেলিয়া আবার মাথায় চাপিয়া ধরিতেছে। শুশ্রূষার ত্রুটি নাই। সকলেই ব্যস্ত।

কিন্তু মধ্য রাত্রিতে অবস্থা আরও খারাপ হইয়া পড়িল। একবার পায়খানা করিলেন, একবার মুখ দিয়া একটু কি বাহির হইল। ভোর রাত্রে তিনি মারা গেলেন।

সকালে বিজন আসিয়া উপস্থিত হইল। এতক্ষণ গাড়ীতে বসিয়া কোন কথাই মনে হয় নাই। কত সুন্দর সুন্দর দৃশ্য ফিল্মের ছবির মত তার সামনে আসিয়া আবার সরিয়া যাইতেছিল। টেলিগ্রামের তারগুলি উঠানামা করিতেছিল। রেল লাইনগুলি পরে পরে মিশিয়া যাইতেছিল। তারপর মাঝে মাঝে পান-সিগারেট, এ-কুলি শব্দে বিজনের কোন ভাবনাই ছিল না। এখন হঠাৎ বাড়ীর সামনে আসিয়া কেন তার বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল? যত রাজ্যের চিন্তা এখন কেন তার মাথায় ঢুকিয়া কিলবিল করিতে লাগিল?

বিজন বাড়ীর গেটের সামনে আসিল। পা যেন আর চলে না। লোহার কবাট খোলাই ছিল, ঢুকিয়া পড়িল।—উঃ, বাড়ীটা কি নিস্তব্ধ—

একটু পরেই দেখা হইল তাদের পুরান চাকর পরাণ-দার সঙ্গে। পরাণ বিপদে-আপদে, অসুখে-বিসুখে খুবই খাটিত। কখনও মনিব বলিয়া ভাবিত না, মনে করিত যেন আপনার জন। বিপিনবাবুরাও তাকে কখনও চাকর জ্ঞান করিতেন না।

বিজনকে দেখিয়াই পরাণ হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—বাবা নেই, দাদু বাবা নেই—তোমারে কত ডাকছে, একটু আগে আইলে হয়ত পরাণডা যাইত না, দাদু—

কোন্ শ্মশানে গিয়াছে জানিয়াই বিজন ছুটিল সেই দিকে। কোন ভ্রুক্ষেপ নাই, পাগলের মত সে চলিয়াছে, তাকে দেখিলে কে বলিবে এই লোক একটু আগে বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে।—

রিক্সার ঠুনঠুন, মটরের ভোঁ ভোঁ, কোন দিকে তার খেয়াল নাই। এবার বুঝি গরুরগাড়ী চাপাই পড়ে—নাঃ, বড় জোর বাঁচিয়া গেল। লোকটা কি গালাগালি দিল, বিজনের কানে ঢুকিল না। বিজন শ্মশানে আসিয়া উঠিল।

চিতা জ্বলিতেছে ধু-ধু-ধু-ধু। আর তার ধোঁয়াগুলি কুণ্ডলী পাকাইয়া শূন্যে উঠিতেছে। চারিদিক হইতে একটা কথা ভাসিয়া আসিতেছে—নাই। একটু আগে যে ছিল সে এখন নাই। একটু আগে যে বিজনকে দেখিবার জন্য পাগলের মত হইয়া বিজন, বিজন করিয়া ডাকিয়াছে; এখন সে বিজনের শত ডাকেও আর সাড়া দিবে না। কেন? কোথায় চলিয়া গিয়াছে সে এটুকু সময়ের মধ্যে?—কতদূরে সে স্থান?—

নদীর জলে ছোট ছোট ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে, তার উপর সূর্যের রশ্মি পড়িয়া রক্তরাঙা দেখাইতেছে, উপরে অনন্ত ঘননীল আকাশ যেন হাঁ করিয়া তাই দেখিতেছে।

প্রায় সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিল বিজন।

এখন আর কিছুই ভাল লাগে না। সমস্ত বাড়ীটা যেন খাঁ খাঁ করিতেছে। মা নাই, বাবা নাই, ছোট বোনটি পর্যন্ত হারাইয়া গিয়াছে কবে আজ পর্যন্ত তার কোন খোঁজ নাই। এক আছে ছোট্ট ভাইটি, আর আছে পরাণ-দা।

দিনকতক ঘরে বসিয়াই কাটাইয়া দিল বিজন। রাত্রে—গভীর রাত্রে ছাদে উঠিয়া উদাসভাবে চাহিয়া থাকিত অসংখ্য তারকা সুশোভিত আকাশের দিকে। একটি তারা খুবই উজ্জ্বল। বিজন মনে করিত তার মা, আর গাল বাহিয়া টসটস করিয়া চোখের জল গড়াইয়া পড়িত, কতক্ষণ এভাবে কাটিত হুঁস থাকিত না। তারপর ভোরবেলা পরাণ-দা উঠিয়া ডাকিয়া দিলে চেতনা ফিরিত। ধীরে ধীরে নামিয়া আসিয়া নিজের ঘরে ঢুকিত।

এমনি করিয়া যখন কিছুদিন কাটিল, বিজনের স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া পড়িল, শেষে একদিন বন্ধুর ওখানে যাইবার জন্য তাকে চিঠি লিখিয়া দিল এবং ছোট্ট ভাইটিকে লইয়া একদিন ট্রেনে উঠিয়া পড়িল।

(পাঁচ)

ঈশ্বরের মেয়েটা একটু বড় হইয়াছে। ঈশ্বর তাকে পাঠশালায় ভর্তি করিয়া দিয়াছে।

সন্ধ্যা মারা যাইবার পর ঈশ্বর যে শোক পাইয়াছে, সে শোক এ জীবনেও ভুলিতে পারিবে না—ভুলিতে পারে না। সন্ধ্যার প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি কাজ ঈশ্বরের মনে পড়ে অহরহ। মনে পড়ে, রোজই ঈশ্বর যখন কাঠ কাটিয়া ঘরে

ফিরিত, শত কাজ থাকিলেও সন্ধ্যা সে সময় পাখা লইয়া তার কাছটিতে আসিয়া বসিত। ঈশ্বরের ক্লান্তি এক মুহূর্তে কোথায় চলিয়া যাইত। মনে মনে ভাবিত, এর চেয়ে আর কি সুখ আশা করিতে পারে মানুষ। ভগবান তাদের অগাধ ধন-দৌলত দেন নাই সত্য, কিন্তু এক সন্ধ্যাকে দিয়াই সব দিয়াছেন। ঈশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে মনে মনে প্রণাম করিত। তারপর খাওয়া সারিয়া বিশ্রাম করিয়া গাড়ীখানি লইয়া যখন বাহির হইত, সন্ধ্যা দাঁড়াইয়া থাকিত দোর-গোড়ায়, যতক্ষণ দেখা যায় অনিমেষনেত্রে চাহিয়া থাকিত। ঈশ্বর এজন্য কত বলিত, কিন্তু সন্ধ্যা শুনিত না—দাঁড়াইয়া সে থাকিবেই। কিছুই নূতন নাই, সন্ধ্যার পরেই ঈশ্বর বাসায় ফিরিবে জানে, তবুও প্রতিদিন তার দাঁড়ান চাই-ই।

একদিনের কথা ঈশ্বরের বেশ মনে পড়ে। ঈশ্বর সেদিন ইচ্ছা করিয়াই একটু রাত করিয়া ফিরিল। দরজার সামনে আসিয়া দেখে, দরজা খোলা, রোজই বন্ধ থাকে কিন্তু আজ কেন খোলা? ঈশ্বরের মনে কৌতূহল জাগিল। অতি সন্তর্পণে ভিতরে ঢুকিল। তারপর যা দেখিল, ঈশ্বরের তাতে আনন্দ হইল।—সন্ধ্যা কাঁদিতেছে। ধীরে ধীরে ঈশ্বর তার কাছে আসিল। তারপর আস্তে আস্তে দুই হাত দিয়া চোখ চাপিয়া ধরিল। সন্ধ্যা ত প্রথমে ভয়ে একেবারে লাফ দিয়া উঠিল। তারপর অতি কষ্টে চোখ ছাড়াইয়া চাহিয়া দেখে—ঈশ্বর হাসিতেছে।...........সেদিন রাত্রে কত কথাই না হইল।...........আজ সে সমস্তই অতীত। সেদিনও সন্ধ্যা ছিল, সেদিনও ত ঈশ্বর সন্ধ্যার হাতের বাতাস খাইয়াছে, আর আজ সে কোথায়—কোন্ মুল্লুকে।—

ঈশ্বর চলিয়া যাইত কোথাও। পারে নাই শুধু মেয়েটার জন্য। কেন যে ভগবান জুটাইয়া দিলেন—সে কি আজের কথা—সেই কি এক উৎসবে ঈশ্বর গিয়াছিল কাশী। সঙ্গে ছিল সন্ধ্যা, কত লোকের ভীড় সেখানে। একদিন কাশী বিশ্বনাথের মন্দির ছাড়াইয়া ঈশ্বর বাড়ী ফিরিতেছে—একটা বস্তীর একটু এ ধারে আসিয়া সরু গলার কান্না শুনিল। ঈশ্বর সেদিকে আগাইয়া গেল। আর একটু আসিতেই একটি ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ে তার কাছে আসিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। হয়ত মনে করিয়াছিল, এই লোকটিই তার চেনা লোকের কাছে লইয়া যাইতে পারিবে। ঈশ্বর তাকে কোলে তুলিতেই দুজন লোক তার সামনে আসিয়া পড়িল। দুজনের হাতেই দুখানা ছোরা। ঈশ্বরের হাতে ছিল তার চির সাথী বাঁশের লাঠি। যার জন্য সে অনেকবার অনেক স্থানে প্রশংসা পাইয়াছে। অবস্থা দেখিয়া সে লাঠিখানা বাগাইয়া ধরিল। মেয়েটিকে রাখিয়া লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে ঈশ্বর দুজনের দিকে আগাইয়া গেল। তারপর একটু পরেই সব সরিয়া পড়িল। (ক্রমশ)

বাস্তবের খণ্ড-নাট্য

(৭৫৮ পৃষ্ঠার পর)

যে কোম্পানীর মহিলা ম্যানেজার আসিলেন সাক্ষাৎ করিয়া সকল বিষয় ঠিক ঠিক বুঝিয়া লইতে।

মহিলা ম্যানেজারকে ইঞ্জিনীয়ারের অফিস ঘরে আনা হইল। ইঞ্জিনীয়ার নিজ চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না—পুনঃ পুনঃ চক্ষু রগড়াইয়া তাকাইয়া রহিল। কারণ ১৯ বৎসর পরে আবার তাহার পত্নী তাহার সম্মুখে হাজির—তরুণ বয়সে যে পত্নীকে সে প্রাণ অপেক্ষাও ভালবাসিত।

পরের দিন সংবাদপত্রে প্রচার করা হইল ইঞ্জিনীয়ারের বিবাহ আর হইবে না।

৫। আপন জালে বন্দী

লণ্ডনের বিবাহ ব্যবস্থার অফিস। প্রতিষ্ঠানের মালিক মিঃ ডানকান খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন তাঁহার অকপট সত্য ব্যবহারে ও প্রসিদ্ধ কয়টি বিবাহ অনুষ্ঠিত করিবার ক্ষমতায়।

গ্লাডিস তাঁহার অফিসে যাইয়া ৫ গিনি জমা দিল। তাহার চাই মনোমত ভদ্র স্বামী—তাহাকে সুখে শান্তিতে ভরণ পোষণ করিতে পারে, এমন ধনিক স্বামী। মিঃ ডানকান ভাবেন—গ্লাডিসের মত সুন্দরী তরুণীর আবার বিবাহের ভাবনা। যে কেহ-ই ত আদর করিয়া তাহাকে বিবাহ করিবে। সে কেন এই প্রতিষ্ঠানের দালালীর টাকা দিতে আসে!

মিঃ ডানকান বলিলেন—"আপনার জন্য ধনী স্বামী স্থির করিয়া দিব, এ আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি।"

গ্লাডিস আনন্দিত হইয়া বাড়ী যায়। পনর দিন পরে আবার সংবাদ লইতে আসে। মিঃ ডানকান বলেন—"আপনি এখন হইতে প্রত্যহ একবার এ অফিসে আসিবেন।" গ্লাডিস রোজ আসে নিত্য নূতন পরিচ্ছদে—নূতন পারিপাট্যে।

সাতদিন ক্রমাগত সাক্ষাতের পর মিঃ ডানকান বলিলেন—আচ্ছা গ্লাডিস, আমায় কি তোমার পছন্দ হয় না?

বিবাহের ঘটকই পাত্রীর প্রেমে মুগ্ধ! ইহার পর কত প্রেমপত্রই না আদান প্রদান হইল। গ্লাডিস সুখী—মিঃ ডানকানও সুখী। কিন্তু কিছুদিন কাটিয়া যায়, গ্লাডিসের এত সাধের বিবাহ বাস্তবে পরিণত হয় না। বিবাহের দিন ত ধার্য্য হওয়া চাই। গ্লাডিস ডানকানকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরে। তখন ডানকান বলেন তিনি বিবাহ করিবেন না।

ক্ষুব্ধ অপমানে গ্লাডিস আদালতের শরণাপন্ন হয়—জুরি তাহাকে ১০,০০০ পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ দানের আদেশ দেয়।

কিন্তু মিঃ ডানকান পলাতক। ইংলণ্ড ছাড়িয়া তিনি মধ্য ইউরোপে চলিয়া গিয়াছেন। ১০,০০০ পাউণ্ডও আদায় হইল না। একদিন খবর আসিল ডানকান মৃত্যুবরণ করিয়াছেন।

গ্লাডিস টাকা না পাওয়ায় দুঃখিত নয়। কয় সপ্তাহের রমণীয় স্মৃতি এখনও তাহার চিত্তে পুলকের সঞ্চার করে। আর সে যাহা চাহিয়াছিল—প্রচার নামযশ—তাহা সে প্রচুরই পাইয়াছে আদালতে মামলা জুড়িয়া—তাহার ন্যায় একটি মঞ্চ-গায়িকা (Chorus girl) আর কি গৌরবের আকাঙ্ক্ষা করিতে পারে।

চীনের কমল সরোবর

মারগারেট ম্যাক্ প্রাং ম্যাকে

তিন বৎসর পূর্ব্বে একবার মাত্র পদ্মফুলের মরশুমে পিকিং শহরে ছিলাম। প্রায় ভুলিতেই বসিয়াছিলাম সে স্বর্গীয় শোভা-সম্পদের বিচিত্রতা। সেই অবিশ্বাস্য মঞ্জুশ্রী যেন স্মৃতির পরতে পরতে সংস্ত-কুণ্ঠিত হইয়া পড়িতেছিল। কিন্তু আবার দেবতার আশিসের মত শুভ মুহূর্ত্তের উদয় হইল পুনরায় উহার সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার সুযোগ আমাকে প্রদান করিতে। শুভ মুহূর্ত্ত এই জন্য যে, সকল ঋতুতে সে দুর্লভ দৃশ্যের দেখা পাওয়া সম্ভব নয়। অতিরিক্ত বারিপাত এবং উত্তাপের প্রাচুর্য্য না হইলে, জল-পদ্ম কখনই আকারে, বর্ণসুষমায় দর্শককে মন্ত্রমুগ্ধ করিতে পারে না। এবারে জলপদ্মের নিখিল আভিজাত্য-গর্ব্বিত হইবার মতই অনুকূল আবহাওয়া আসিয়া পড়িয়াছে হুবহু। ইহার অপরূপ লাবণ্যের তুলনা আর মিলিবে না-ইহার সৌন্দর্য্যের মূর্ত্ত-প্রতীক একমাত্র ইহাই। পৌরাণিক দৃশ্যাবলীর চিত্রে যেমন দেখিতে পাওয়া যায় সূচীশিল্পের আদর্শ কিম্বা বিচিত্র অলঙ্করণ, যাহার তুলনা মিলিবে না সারা বিশ্বে কোনও বাস্তব শিল্প-কারুতায়, তেমনই প্রাচ্যের এই জলপদ্ম—আপন পুষ্পিত স্বর্গে আপনি বিরাজ করে একেবারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী পারিপার্শ্বিকে—অপরাজেয় মাধুরিমায়।

সৌভাগ্যবশত চীনের অন্যান্য ফুলের মরশুমের অপেক্ষা জলপদ্মের স্থায়িত্ব বহুকাল দীর্ঘ। এক মাসেরও বেশী সময় জলপদ্ম হ্রদ, তড়াগ শোভিত করিয়া বিরাজ করে। জুলাই মাসের মধ্যভাগ আসিবার পূর্ব্বেই ইহার প্রথম কলিগুলি ফুটিতে আরম্ভ করে আর আগষ্টের মধ্যভাগেও দুইচারিটি শেষফুল ফুটিয়া থাকিতে দেখা যায়। কাজেই কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে যদি জুলাইতে উহার দেখা না পাওয়া যায় তবে আগষ্টে নিশ্চয়ই মিলিবে অথবা জুলাইতেই ঐ অঞ্চলের কোন-না-কোন স্থানে প্রস্ফুটিত পদ্ম দর্শকের নয়ন-মনোরঞ্জন করিবে। আবার এমন দৃশ্যও উদ্ঘাটিত হওয়া বিচিত্র নয় যে একস্থানে দেখা গেল সবুজ কলি মাত্র অন্য স্থানে দেখিতে পাওয়া গেল স্ফুটনোন্মুখ কলিশিরের রক্তিম লুকাচুরি, আবার তৃতীয় স্থানটিতে হয়ত চোখ জুড়াইয়া গেল সম্পূর্ণ বিকশিত পদ্মের অপূর্ব্ব মায়া-দীপ্তিতে। আবার হয়ত দুইপদ অগ্রসর হইলেই অবনত ফুলগুলির আধা-ঝরা করুণতা প্রাণে এক উদাস সুরের রেশ স্পন্দিত করিবে। এই প্রকার পূর্ণ আশা-আকাঙ্ক্ষার আহ্বানে কয়েকদিনের রঙিন স্বপ্ন সার্থক করিয়া তুলিতে পিকিং-য়ে উপস্থিত হইলাম—উদ্দেশ্য বিশ্ববিখ্যাত এই ফুলগুলির বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকের বিভিন্ন আলো-ছায়ার যাদুতে যে ভাববিলাস, তাহাই উপভোগ করিব অবিরাম, লোলুপতার আকুল আবেশে।

নিষিদ্ধপুরী পিকিং-য়ের চারিদিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে প্রকাণ্ড ঝিলটি (Great Moat); ইহার নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য পিকিং-য়ের কনক-শিরোশোভা আর লুক্কায়িত মহলগুলিকে যেন অবিচ্ছা ঝিলমিলিতে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে বিশেষ করিয়া পদ্মফুলের ঋতুতে। এই ঋতুতে না হইলে আর কখন চতুর্দ্দিকের বেষ্টনী-পথে যান-বাহন হাঁকাইয়া দৃশ্য-রম্যতায় আপন সত্তাকে বিলাইয়া দিতে পারা যাইবে?—প্রশস্ত বেষ্টন-পথের এক পাশে ধূসর রঙের প্রাচীর—তার পরেই ঝিল আর ঝিলকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে গোলাপী প্রাচীর। পূর্ব্বে দেখা ছিল বলিয়াই ঠাওরাইয়া লইলাম ঝিলের অবস্থান—নহিলে জল কোথায়। কোণে-কোণে যে সু-উচ্চ প্রহরা-মন্দির লাল আর সোনালী রঙের বাহারে উজ্জ্বল উহার আর প্রতিচ্ছায়া পড়ে না ঝিলের বুকে। পড়িবে কি করিয়া? ঝিলের জল যেন মুছিয়া ফেলিয়া সেখানে সবুজের রাজত্ব—পদ্মের পাতায় ডাঁটায় পথিপার্শ্বের কর্দ্দমময় ঢালু গাত্র হইতে গোলাপী প্রাচীর-গাত্র পর্য্যন্ত সবুজের গদি-আঁটা যেন একখানি বিশাল বিরাট গালিচা—আর গালিচার সারা বক্ষ অধিকার করিয়া কমল-কলির গুচ্ছ উহাদের ফিকা গোলাপী মুখ তুলিয়া ধরিয়াছে দয়িতের চরণে প্রাণের আকুতি জানাইতে। যে-দিকে চোখ যায়—উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম—কমল-কলির ঢল ঢল লাবণ্য যেন গলিয়া পড়িতেছে সবুজ পটভূমির গায়ে ফোটায় ফোটায়! এ দৃশ্য একবার দেখিলে আর ভুলিবার নয় জীবনে!

পিকিংবাসীর নিকট এই পদ্ম-সরোবরটি দেখিবার প্রিয় স্থান হইল—পেই-হেই হইতে। প্রাসাদ-সংশ্লিষ্ট উদ্যানের উন্মুক্ত স্থান হইতে দ্রষ্টব্য উত্তর হ্রদটির নামই হইল পেই হেই। একদিন সাঁঝের বেলা আমরা ঐ স্থানটিতেই গেলাম উন্মুক্ত আকাশতলে ডিনার সমাধা করিবার এবং সঙ্গে সঙ্গে পদ্মের শ্রেষ্ঠ দর্শনীয় অংশটি উপভোগ করিবার জন্য। উদ্যানে পদার্পণ করিবামাত্র আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে প্রসারিত দেখিতে পাইলাম সীমাহীন পদ্মের সে রাজ্যটি—দক্ষিণে বামে—শ্বেত-মর্ম্মরের সেতুটি পর্য্যন্ত আলম্বিত সেই মনোমুগ্ধকর মধুর দৃশ্য। সেতুটির উপর দিয়া আমরা পাইনের গুচ্ছে ছায়া-ঢাকা দ্বীপটিতে উপস্থিত হইলাম—সন্ধ্যার বায়ুহীন সিক্ত উষ্ণতায় আমরা ধীর পদক্ষেপে চলিতে লাগিলাম। দ্বীপের ঢালু গায়ে প্রস্তর-সোপান বাহিয়া উপরে উঠিলাম—যুগজীর্ণ সে প্রস্তর ধাপের সর্পিল পথাঙ্কে উচ্চ হইতে উচ্চতর চত্বরে আরোহণ করিলাম বৃক্ষচ্ছায়ার ক্ষীণান্ধকার আশ্রয়ে। আবার নামিলাম, আবার উঠিলাম, শেষে শ্রান্ত হইয়া বিশ্রাম করিবার উদ্দেশ্যে যাইয়া পৌঁছিলাম রক্তস্তম্ভ বেষ্টিত অপ্রশস্ত ও দীর্ঘাকার দরদালানে। উহারই ঠিক উপরে রহিয়াছে শুচি-শুভ্র দাগোবা—দ্বীপটির সর্ব্বোচ্চ শিরোশোভা আর আমাদের দরদালানের এ-পাশে ও-পাশে রহিয়াছে গুটিকয়েক গৃহ। এই দরদালানটিতে স্থান পাইয়াছে একটি চীনা রেস্তোরাঁ। এখানেই আলিসার পাশে আমরা বসিয়া পড়িলাম। চক্ষু প্রসারিত করিয়া দিলাম দ্বীপটির খাড়া পাড়ের উপর হইতে হ্রদবক্ষে—দক্ষিণে বামে চক্ষু সরাইলে নগরীর বাসভবনগুলির

ধূসর ছাদের ভিড় অপূর্ব রূপায়নে চমৎকৃত করে। মাঝে মাঝে ঝাঁকড়া গাছগুলির নিবিড় সবুজ ছোপ—আর পরিশেষে দৃষ্টি প্রতিহত হয় দূরে দিগন্তের পশ্চিম পর্ব্বতমালার রক্তিম অঙ্গসৌষ্ঠবে—কুয়াসার ঝিলমিলি যাহাকে প্রতি নিমেষে অস্পষ্টতর করিয়া তুলিতেছে।

এক ঘণ্টারও বেশী অতীত হইয়া গেল আমরা যুঁই-গন্ধ চা চামচের পর চামচে জিহ্বায় ঢালিয়া তৃষ্ণা নিবারণের চেষ্টা করিতে লাগিলাম। অবশেষে লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া চপষ্টিকের সাহায্যে তরমুজের সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলাম—জিহ্বা আর দাঁতের সহকারিতায় তরমুজ-বীজগুলি বর্জ্জন করিয়া করিয়া। সর্ব্বক্ষণই কিন্তু আমাদের নয়নযুগল ব্যস্ত রহিল হ্রদবক্ষের পদ্ম-কাননের সৌন্দর্য্য পান করিতে। আমাদের ঐ উচ্চাসন হইতে বৃহদাকার পদ্মগুলিও মনে হইতেছিল যেন একটি সবুজ মখমলের প্যাডে গাঁথা শাদা আর গোলাপী মণিমুক্তা। উদ্যানের সেই উত্তর হ্রদে সখের দাঁড়টানার নৌকা রহিয়াছে কতকগুলি আর রহিয়াছে কেন্দ্র আর প্রাচীন রাজকীয় তরণী। এক সময়ে এই রাজকীয় তরণীগুলি ছিল রাজারাজড়াদেরই একচেটিয়া নৌকাবিলাসের জন্য রক্ষিত, কিন্তু এখন যে-কেহ ভাড়া দিলেই উক্ত তরণীতে চাড়িয়া সমগ্র হ্রদে বেড়াইতে পারে। আমাদের দ্বীপ-শীর্ষের এই উচ্চ দরদালান হইতে নৌকাগুলি দেখাইতেছে যেন ছেলে-মেয়েদের খেলনা, কেবল কোন কোন সচল তরণীর দাঁড়ের টানে জলের উচ্ছল ঝলক উহাদের বাস্তবতার প্রমাণ তুলিয়া ধরিতেছে আমাদের বিস্মিত চোখের সম্মুখে! উদ্যানটি একেবারে চীনা ও জাপানী বায়ুসেবনার্থীতে পূর্ণ,—কেহ পায়চারি করিতেছে, কেহ বসিয়া আছে ঘাসের উপর, আর কেহ কেহ নৌকা-চালনা করিতেছে—কিন্তু আশ্চর্য্য নির্লিপ্ততা উভয় জাতীয়ের ভিতর; কোন জাপানী ভুলেও চীনার প্রতি তাকাইবে না বা অভিবাদন করিবে না সৌজন্য প্রকাশে আবার চীনারাও গ্রাহ্য করিবে না বিদেশী জাপানীকে সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোন কিছু জিজ্ঞাসা করিতে আগাইয়া আসিলেও: কোথায় একজন যেন চীনা বেহালা বাজাইতেছে—ঘনায়মান সান্ধ্য-ছায়ায় সে সুর উঠিতেছে নামিতেছে—মাঝে মাঝে বেহালাবাদকের বন্ধুগণ উচ্চরবে তারিফ করিতেছে—সমগ্র আবহাওয়ার গাম্ভীর্য্য যেন তাহাতে তরল হইয়া পড়িতেছে।

পদ্মগুলির বর্ণসুষমার ছোঁয়াচে আকাশে দেখা দিল এক সারি গোলাপী মেঘ অস্তগামী সূর্য্যকে অভ্যর্থনা করিতে; আমাদের পদনিম্নে রক্তায়মান বৃক্ষশিরগুলি মৃদু বায়ু-হিল্লোলে শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। হ্রদ পার হইয়াই পাঁচটি গুম্বজাকৃতি সোনালী ছাদ পাশাপাশি যেন ক্রমে উবিয়া যাইতে উদ্যত; কেবল উহাদের পীত প্রতিবিম্ব হ্রদবক্ষকে সোনালী হারে সাজাইয়া নৃত্য করিতেছে হাওয়ার তালে তালে। সহসা আমাদের চোখ ধাঁধাইয়া বিজলী বাতি জ্বলিয়া উঠিল—একটি ছোট্ট চীনা মেয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল—"দীপের মরই সুন্দর!" পদ্মপদ্মের সকল আভিজাত্য সবুজের অরণ্যে একাকার হইয়া গেল—আমরাও দ্বীপের পর্ব্বত চূড়া হইতে অবতরণ করিবার পথের সন্ধানে চলিতে লাগিলাম।

পরদিন ভোর ৭টার সময় আবার আমরা পেই-হেই অভিমুখে যাত্রা করিলাম। এইবারে আমাদের উদ্দেশ্য হইল প্রাতরাশের চড়ুইভাতি উপভোগ করা ঐ পবিত্র ও পৌরাণিক পুষ্পের পারিপার্শ্বিকে। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ যে রাজকীয় তরণী—সেই ১নং নৌকাখানি ভাড়া করিবার ব্যবস্থা আগেই হইয়াছিল। নৌকাখানিতে আসন গ্রহণ করিয়া মনে হইল—হয়ত চীনের বিখ্যাত সুন্দরী কোনও প্রধানা রাজ-মহিষী তাঁহার অতি ক্ষুদ্র পা-দুখানি টুক টুক করিয়া বাড়াইয়া এই নৌকাখানিরই মেঝেতেই পায়চারি করিয়া থাকিবেন। হয়ত আমি যেখানে বসিয়াছি এখানে বসিয়া জানালাপথে তাকাইয়া থাকিতেন পদ্মবনের দিকে—নৌকা-ছাদের সূক্ষ্ম কারুকার্য্য, গবাক্ষ-আবরণের জেল্লা আর রমণীয় কারিগরি রাজমহিষীর চোখেমুখে হয়ত স্নিগ্ধ আভার সৃষ্টি করিত পদ্মের গোলাপী বর্ণ-শিখাকে ম্লান করিয়া। কুয়াসার মত ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়িতেছিল চারিদিকে—চীনদেশের দারুণ গ্রীষ্মের প্রকোপ হইতে আমাদিগকে রেহাই দিয়া। মাঝিরা দাঁড় টানিয়া নৌকাখানিকে চালাইতে লাগিল দ্বীপটির চারি-দিকে এবং হ্রদের বাঁকে বাঁকে—এই অবকাশে আমরা আমাদের চড়ুইভাতির প্রাতরাশে মনোযোগ দিলাম। বৃষ্টির শব্দে চক্ষু স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হইল হ্রদ বক্ষে—এইবারে বড় বড় ফোঁটায় বর্ষণ সুরু হইয়াছে—জলের উপরেও যেন তাহার ছাপ রাখিয়া যাইতেছে—পদ্মপাতাগুলির উপর পটা পট্ শব্দ পড়িয়া মুক্তাদানার মত গড়াইয়া যাইতেছে—কোন কোনটি পদ্মপাতার বাটিপানা মধ্যস্থলে স্থায়ী হইয়া ঈষৎ দুলিতেছে, চকমক করিতেছে।

এতক্ষণে আমরা আসিয়া পোঁছিয়াছি বিরাট বিরাট ফুল-গুলির দরবারের মাঝখানে। মাঝখানে সরু আঁকা-বাঁকা উন্মুক্ত জলপথটুকু চিকচিক করিতেছে আর দুই পাশে রহিয়াছে শাদা গোলাপী পদ্মফুলগুলির মেলা। বাঁকা বোঁটায় সবুজে-লালে জড়ান শাঁখের আকারে কুঁড়িগুলি একেবারে হাত বাড়াইলে ছোঁয়া যায়। বড় বড় ফুলগুলির অন্তরতম মণিকোঠায় অবধি আমাদের দৃষ্টি পোঁছাইয়া যায়—পাপড়ি-গুলির মিলন-মন্দিরের সোনালী কেশরগুলির কোমল কান্তি রেশমী মসৃণতায় চক্ষু জুড়াইয়া দেয়—আর স্নিগ্ধ মনোরম সুবাসে যেন কিন্নর কন্যার সুরভিত কানাকানি। সম্মুখে ঐ প্রস্তর-খিলান কত অতীত যুগের গোপন বার্ত্তা উহার ফাটলে ফাটলে লুকাইয়া আছে কে তাহা উদ্ধার করিবে? ঐ খিলানের পদপ্রান্তে আমাদের নৌকা থামিল—ঐ পথে নৌকার উচ্চ দেহ প্রবেশ করিতে পারিবে না। তখন খিলানের ফাঁকে তাকাইয়া দূরে প্রসারিত কমল-কানন আমরা দেখিয়া লইলাম—যতদূর চক্ষু যায় শাদা আর লালের লুকাচুরি সেই সবুজের বনে। জল-উদ্যানের সেই রহস্যময় শোভা আমাদের চেতনাকে যেন ক্ষণকালের জন্য সুষুপ্তিমগ্ন করিল।

একসঙ্গে এইরূপ বিস্তৃত প্রসারে সর্ব্ববৃহৎ ও সংখ্যা-

ভীত পদ্মের মেলা দেখিয়া পরে যে সঙ্কীর্ণ স্থানের অনিবিড় সন্নিবিষ্ট ফুলগুলির প্রত্যেকটিকে পৃথকভাবে পর্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ পাওয়া, ইহা যেন সঙ্গতই হইল। প্রত্যেকটি ফুলের স্বতন্ত্র আভিজাত্যের নব রূপায়নে পুলকশিহরণ অনুভব করিবার জন্যই আর একদিন প্রাতে আমরা গেলাম তাই মিয়াও মন্দিরের পার্কে। তাই মিয়াও মন্দির চীনের প্রসিদ্ধ চেঙ রাজবংশের প্রতিষ্ঠিত এবং এই মন্দির সংশ্লিষ্ট যে পার্ক তাহাতে রহিয়াছে আমাদের আজিকার দর্শনের অপ্রশস্ত তীর্থ। পার্কের ঘনসন্নিবিষ্ট দেবদারু কুঞ্জে বসিয়া আমরা আমাদের প্রাতরাশ সমাপন করিলাম। আমাদের পাশেই রহিয়াছে ঘেরাও জালের বেড়ার ভিতরে শত শত সারস পাখী। আহারের সঙ্গে সঙ্গে আমরা পাখীগুলির ডানা ঝটাপটি ও বাচ্চাদের খাওয়াবার বিচিত্র ফিকির লক্ষ্য করিলাম। শতাব্দীর পর শতাব্দী এইস্থানে সারস পাখী-গুলি রক্ষিত, কারণ এইগুলি মন্দিরের উদ্দেশ্যেই উৎসর্গী-কৃত। পাখীর কলরোলের ঐক্যতানের সঙ্গে সঙ্গে পরি-তৃপ্তির সঙ্গেই আমাদের আহার শেষ হইল।

আহার-শেষে মন্দির-প্রাঙ্গণে আমরা ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলাম—গোলাপী রঙের প্রাচীর, খিলানওয়ালা ফটক, মর্মরের চত্বর এবং সোনালী ছাদ বিশিষ্ট ঘুরান বারান্দা। এখানকার শান-বাঁধান রাস্তাগুলির দুই পাশে—যেখানে চীনের সম্রাটগণ প্রাতে-সন্ধ্যায় ভ্রমণ করিতেন—রহিয়াছে বড় বড় গোল টব বা চৌকা পাত্রে রক্ষিত জলপদ্ম গাছ; কোথাও বাঁধান খালের আকারে তৈরী চৌবাচ্চাগুলিতে পাঁক ও জল দিয়া পদ্মলতা জন্মান হইয়াছে। কোথাও আবার মাটির বড় বড় গামলা—চীনামাটির বিরাট কড়া—কালের কবলে সমুজ্জ্বতা প্রাপ্ত রঙের মটকি—কোনটিই উচ্চতায় পাঁচ ফুটের কম হইবে না, ব্যাসে হইবে ৮।১০ ফুট। সবগুলিতেই পদ্মফুল ফুটিয়া চারিদিক আলোকিত করিয়াছে। চোখের এত কাছে—একই স্তরে ফুল পর্যবেক্ষণ করিবার এমন সুযোগ খুব কম স্থানেই মিলে। ফুলের প্রতিটি পাপড়ির শিরা উপশিরা, প্রতিটি কণা পরাগরেণু, পাতার গায়ে পোকায় কাটা অতি সরু একটি ছিদ্র পর্যন্ত দৃষ্টি এড়াইতে পারে না। আবার বিচিত্রতা বর্দ্ধিত হইয়াছে প্রতিটি ফুলের নিম্নস্থ স্থির জলে প্রতিবিম্ব দ্বারা।

ইহার পরের দিন দ্বিপ্রহরে আমরা গেলাম ন্যান-হেই হ্রদে—এই হইল রাজপ্রাসাদ উদ্যানের দক্ষিণ হ্রদ। হ্রদের চারি তীরের উইলো লতাচ্ছাদন পার্শ্বের রাস্তায় রাস্তায় আমরা মোটর হাঁকাইয়া বেড়াইলাম। এখানে নাই সেই সখের নৌকার বিলাস, নাই হ্রদ বক্ষে নৌকা চলাচলের লতাহীন মুক্তপথ—শুধু পদ্মলতার বুনট্, পদ্মের কলি আর বিকশিত ফুলের শুভ্র হাস্য ছড়াইয়া রহিয়াছে সমগ্র হ্রদ জুড়িয়া। ন্যান-হাই হ্রদের ঠিক মধ্যস্থলে রহিয়াছে একটি দ্বীপ—উহার উপর পাশাপাশি নির্ম্মিত রহিয়াছে থামওয়ালা দরদালান, বিভিন্ন উচ্চতার ছাদে শোভিত। পাইন গাছের সারি বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে সমস্ত অট্টালিকাটিকে। গাছের শিরের উপর দিয়া দালানের ছাদগুলি উঁচু-নীচু উঁকি মারিতেছে—আর উহাদের অঙ্গের নীল, আশমানী, সোনালী, ফিরোজা আর বাদামী রং অতুল প্রভায় জ্বল জ্বল করিতেছে। অন্য সময়ে ছাদের এই রকমওয়ারি রংবাহার এতই উজ্জ্বল দেখায় যে সকলের আগে দর্শকের চক্ষু বন্দী হয় উহাদের জৌলুসের আকর্ষণে। কিন্তু আজ দালানের ছাদের রং হইয়া পড়িয়াছে অপ্রত্যক্ষ, ম্লান—প্রকৃতির রহস্যময় জাদুর খেলা—জলপদ্মের সৌন্দর্য্যের কাছে মানবের সৃজন-কৌশল নিতান্তই নিকৃষ্ট বনিয়া গিয়াছে—শান্ত সমাহিত হ্রদের জলে পদ্মের পাতা আর ফুলে চলিয়াছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কে কত উচ্চে মাথা তুলিতে পারে লতার বুনটের গদির উপর। বর্ণের লালিত্যে, উচ্চতার আভিজাত্যে, আকর্ষণের মোহ-মদিরায় জলপদ্ম সেখানে স্বপ্নলোকের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে ভাবপ্রবণ দর্শকের চিত্ত জয় করিবার জন্য। প্রকৃতির এই অভিনব বিন্যাস-মায়ার পটভূমিকায় মানবের নিপুণ সৃষ্টিরও কৃত্রিমতা ধরা পড়িয়া যায় নিতান্তই রূঢ়ভাবে।

মনীষা

(গল্প)

শ্রীআশীষ গুপ্ত

ভাই অনাদি,

বাড়ীতে ফিরে তোমার ওখানে আজ সন্ধ্যা বেলা চায়ের নিমন্ত্রণের চিঠি পেলাম। কিন্তু নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে হ'ল, যেহেতু আজ আমার মন একেবারেই ভাল নেই।

মনীষা মারা গিয়েছে। মনীষা যে স্ত্রীলোক তা ত' নাম শুনেই বুঝতে পারছ, সেই স্ত্রীলোকটির ঘটেছে মৃত্যু!

ভাবছি, এমন করে' রুচিহীনভাবে মারা গেল মনীষা! এই শোকাবহ ঘটনাটি সংঘটিত হ'য়েছে আজ অপরাহ্নেই, দুঃখ এখনও টাটকা, তাজা, কাজেই তোমার ওখানে কেক, স্যাণ্ডউইচ খেতে যেতে আজ বাধছে।

মাত্র ঘণ্টাখানেক আগে দেখেছি মনীষাকে চৌরঙ্গীর মোড়ে তার স্বামীর সঙ্গে রাস্তা পার হ'তে! তাকে দেখলাম মাতৃমূর্ত্তিতে, হৃষ্টপুষ্টা মনীষা বছরখানেকের এক কুৎসিত ছেলেকে কোলে নিয়ে সগর্ব্ব পদক্ষেপে ধর্ম্মতলার মোড় পার হচ্ছে। তার স্বামী প্রমথকে দেখলাম পিতৃমূর্ত্তিতে, তারও কোলে এক শিশু, বছর দুয়েক বয়স হবে—প্রমথর মুখের ভাবও বেশ গর্ব্বিত ধরণের। মধ্যস্থলে মনীষা, বাঁয়ে স্বামী, ডাইনে স্বামীর বন্ধু হরিহর।

কাগজ কিনছিলাম—বিকেল বেলা কাগজের বিশেষ সংখ্যা বেরিয়েছে কংগ্রেসের অধিবেশনের সংবাদ নিয়ে, তাই কিনছিলাম এসপ্ল্যানেডে দাঁড়িয়ে। গাড়ীটা বিগড়েছে বলে' আজ দুপুরবেলা থেকে ট্রামে বাসে ঘুরেছি, ঘেমে গিয়েছিলাম অর্থাৎ সংসার সংগ্রামে যে রকম গলদঘর্ম্ম হ'লাম, তেমনই গলদঘর্ম্ম হ'য়েছি আজ দুপুরে ট্রামে-বাসে ঘুরে এবং রৌদ্রে রৌদ্রে প্রচুর পরিমাণে হেঁটে।

এসপ্ল্যানেডের মোড়ে দাঁড়িয়ে কাগজ কিনছি এমনি সময় দেখি যে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের মত মনীষা প্রমথ, হরিহর আসছে। অতি পরিচয়ের হাসি হেসে মনীষা-প্রমথ-হরিহরের দিকে তাকিয়ে আমার হাসি কাষ্ঠহাসিতে রূপান্তরিত হ'য়ে অপ্রস্তুতভাবে ঠোঁটের আড়ালেই মিলিয়ে গেল। গোধূলি বেলার আলো আর অন্ধকারের মধ্যে যে সম্বন্ধ, অর্থাৎ কখন্ আলোর শেষ এবং অন্ধকারের সুরু তা নির্দ্দেশ করা যেমন শক্ত তেমনই হ'ল আমার হাসির উদয়-বিলয়, মাঝখানের ব্যবধানটুকুকে ধরা গেল না।

এমন করে' সে হাসির অকালমৃত্যু ঘট্‌ল যে, মনটা তিক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। মনীষা এর পূর্ব্বে আমায় কোন দিন দেখেছে বলেও মনে হ'ল না, প্রমথ-হরিহরের পাশাপাশি মার্চ্চ করে' সে লাটসাহেবের বাড়ীর দিকে চলে গেল।

প্রচুর পরিমাণে হাস্‌ছিল মনীষা, তার চেয়ে বেশী হাস্‌ছিল প্রমথ এবং সবচেয়ে বেশী হাস্‌ছিল হরিহর।

ভারী নির্ব্বোধ বনে' গেলাম। পকেট থেকে রুমাল বার করে' কপালের ঘাম আর একবার মুছতে হ'ল।

মনটা ব্যথায় ভরে' গেল, মনীষা মরে' গিয়েছে, হায়-রে! সেই রূপসী মনীষা, সেই তন্বী শ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী মনীষা,—একদিন যাকে দেখে মনে হ'য়েছিল হাতে যখন কাজ থাক্‌বে না, যখন সময় নষ্ট করার মত কোন বাজে কাজও থাক্‌বে না হাতে, তখন এসে আমি মনীষার সাথে আলাপ কর্‌ব। যাকে দেখ্‌লে একদিন চোখ জুড়াত, যার কথা শুনলে একদিন মন হ'ত খুশী, দেহে ছিল যার রুচির পরিচয়, চলনে-বলনে যার সংস্কৃতির দীপ্তি ছিল অসামান্য স্নিগ্ধতায় স্বয়ংপ্রভ সে আজ হিন্দুস্থানী দারোয়ানের মত বড় বড় পা ফেলে হাঁটছে, চেহারা হ'য়েছে তার মাংসের পাহাড়ের মত, থল্‌থলে সমস্ত তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, কাঁকালে তার শিশু, যুগযুগান্তের শিল্পী ও কবিকল্পনার আদর্শ মাতৃমূর্ত্তি! ভাই অনাদি, তোমার চায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা হ'ল না আজ, কিন্তু আমার পরিচিতা মনীষার অপ্রত্যাশিত মৃত্যুর জন্য শোক সভায় তোমার আমন্ত্রণ রইল।

মনীষা আমাকে চিনতে পারে নি! যে মনীষা একদিন আমার আহ্বানমাত্রে দশাগ্রস্ত হ'ত সে আজ আমায় চিনতে পারল না।—তার স্বামী প্রমথও পারল না চিনতে, আর চিনতে পারল না মনীষার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে হাসছিল যে-হরিহর সে। হরিহরের সঙ্গদোষ হয়েছে প্রমথর হয়েছে কৃতজ্ঞতার আতিশয্য আর মনীষার বেড়েছে পতিভক্তি!

আমি কাউকে দোষ দিচ্ছিনে অনাদি,—প্রমথর কিছু উপকার ক'রেছিলাম এক সময়। সেদিন প্রমথর কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না,—মনীষার চোখ ছল্‌ছলিয়ে উঠেছিল সেদিনকার কথা বলতে গিয়ে। আমাদের জীবনে এইসব ছোটখাট মুহূর্ত্তগুলি যে কি অদ্ভুতভাবে বেঁচে থাকে অনাদি!—মনীষা মরে গিয়েছে, বেদনা পাচ্ছি তার জন্য।—আজকের অপরাহ্নের মনীষা নামধারিণী চৌরঙ্গী বিচরমানা স্ত্রীলোকটির কথা মনে করে আমার মনে আর ক্ষোভের পরিসীমা নেই,—কিন্তু ভুলব না সেদিনকার কথা কোনদিন, যেদিন মনীষার স্বামীকে আমি বাঁচিয়েছিলাম আমার অর্থের দ্বারা আমার প্রভাবের দ্বারা। মনীষার হরিণনয়ন কানায় কানায় ভরে' উঠ্‌ল জলে, কথা কইল না মনীষা, শুধু বল্‌ল, "অজয়দা—"

মনীষার সেদিন রুচিবোধ ছিল, ওর সৌন্দর্য্যানুভূতির অপরূপত্বে আমার আর পরিতৃপ্তির সীমা ছিল না। দীর্ঘ বক্তৃতা দিল না মনীষা সেদিন, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আড়ম্বরে মনের গভীরতাকে ক্ষুণ্ণ করল না সে, শুধু কেবল দু'চোখ ভরে গেল তার জলে, নীরব কণ্ঠের অপূর্ব্ব কলভাষণে আমার চিত্ত কিন্তু পূর্ণ হ'য়ে গেল।

তারপর আমি জীবনে কৃতকার্য্য হ'য়েছি, প্রমথ সুবিধা করতে পারেনি।—কৃতজ্ঞতার Complex (বিকার) জন্মেছে প্রমথর মনে, ও পাচ্ছে না স্বস্তি, যার কাছে ওর ঋণ তাকে খাটো না করতে পারলে, তার প্রতি অসম্মান না দেখাতে পারলে ও বাঁচবে কি করে?—আমি স্পষ্ট বুঝতে পারি অনাদি, রাত্রিতে ওর ঘুম হয় না একথা মনে ক'রে।

সংসারে যারা অকৃতকার্য্য হ'য়েছে, জীবনে যারা কিছু করতে পারল না, তারা শান্তি পায় এই ভেবে যে তাদের চেয়েও অকৃতকার্য্য লোক সংসারে আছে। অপর লোকে আমার চেয়ে বেশী দুঃখ ভোগ করছে একথা না মনে করতে পারলে আমাদের নিজেদের দুঃখ সইব কি করে!

অতএব প্রমথ দস্তুরমত offence (অপরাধ) নিয়েছে আমার সফলতায়।—আর একটা কথা, প্রমথর কিছু অপকর্ম্মের কাহিনী কয়েকদিন পূর্ব্বে আমার কর্ণগোচর হ'য়েছিল, তাতে প্রমথকে মৃদু তিরস্কার করে একটু চিঠিতে লিখেছিলাম,—প্রমথ, এ ভাল নয়! তাতে সে খুশী হয়নি,—কিন্তু আজকের ব্যাপার দেখে বোঝা গেল শুধু ধোঁয়া নয়, উত্তাপও জমেছে প্রচুর।—কিন্তু প্রমথকে তবু বুঝি,—মনীষার পতিভক্তিকে বুঝতে পারা শক্ত। —আমার সম্বন্ধে প্রমথর উত্তাপ মনীষাতে সংক্রামিত হ'ল কেমন করে! "স্ত্রী স্বামীর ছায়াসম," এমনতর আদর্শ নারী হ'য়ে উঠল মনীষা শেষ অবধি আমার বিষয়ে!

আর এটা এমনই বা কি অস্বাভাবিক! এই যে অপূর্ব্ব adaptibility (নমনীয়তা), এরই জোরে না বাঙালীর মেয়ের এত গর্ব্ব!

প্রমথ বলল, "অজয় বোসের successful (সফল) হওয়াটা উচিত হয় নি"—

মনীষা বলল, "নিশ্চয়ই হয়নি"—

প্রমথ বলল, "রাস্তায় চলতে অজয় বোসের সঙ্গে দেখা হ'লে আমরা তাকে চিনতে পারব না"—

মনীষা বলল, "নিশ্চয়ই পারব না,—বরং উল্টে নিজেরাই নিজেদের মনে হাসব,—তুমি হাসবে, আমি হাসব, আর যদি হরিহর সঙ্গে থাকে তাহ'লে সে ত নিশ্চয়ই সবচেয়ে বেশী হাসবে"—

সেই মনীষা, যে বলত, আমার তুলনা দেখেনি, আমার মত মহাত্মা নেই,— তার পতিভক্তি বেড়েছে এবং মহাত্মাও দুরাত্মায় পরিণত হ'য়েছে মনীষার কাছে!

সাধ্বী মনীষা,—পতিভক্তির যার বাস্তবিকই তুলনা নেই, —যার মাতৃমূর্ত্তি দেখলে চোখ জুড়োয়!

কিন্তু, অনাদি, ভয় পেয়ে গিয়েছি,—সংসারে এমনিতরই হয় না কি!—মাত্র তিন বছর মনীষাকে দেখিনি, তার মধ্যেই এতখানি পরিবর্ত্তিত হ'য়েছে সে! যে সূক্ষ্ম তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হ'ত সে বার্ত্তাবহ রূপান্তরিত হ'ল লোহার ভাঁটায়!

অনাদি, মনীষা বেঁচে আছে! বিশাল স্থূলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মনীষা তার সংসার-পাহাড় নিয়ে থলথলে দেহ নিয়ে শাঁসেজলে আরও পুষ্টিলাভ করছে দিনের পর দিন, কতকগুলো কুদর্শন ছেলেমেয়েতে বছরে, বছরে তার সংসার উঠছে পূর্ণ হ'য়ে শূয়রের খোঁয়াড়ের মত!—কিন্তু তবুও তার জন্য আমার শোক, তার জন্যই আমার চোখে দেখা দিল আজ অশ্রু!

সে আমায় পথের মাঝখানে চিনতে পারেনি বলে' আমার দুঃখ নয়,—আমার দুঃখ কেন মনীষার এমনতর দেহান্তর ঘটল কেন ঘটল এমনতর মনান্তর। নইলে, অমন রুচিবিকারগ্রস্ত দলের সঙ্গে পথের মাঝখানে দেখা হ'য়ে যাওয়াটাই একটা লজ্জার বিষয় বলে মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে সাময়িক ভ্রান্তি-বশত পরিচয়ের যে হাসিটুকু হেসে ফেলেছি তা আর ফিরবে না বটে, কিন্তু না চিনতে পারাটা উচিত ছিল আমারই।

মনীষার একখানা চিঠির কথা মনে পড়ছে, সে লিখেছিল গিরিডি থেকে, "অজয়দা, আজ সন্ধ্যায় আমার ঘরে যে প্রদীপ জ্বাললাম তার দীপশিখাতে তোমাকে স্মরণ করি, আজ আমার গৃহে যে শঙ্খধ্বনি এর মাঝে তোমাকে বরণ করি,—এইগৃহের মঙ্গলের মাঝে তুমি প্রতিষ্ঠিত, আমার স্বামীর কল্যাণকে আশ্রয় করে' তোমার নিত্যকালের আসন যদি নিত্যকালাতীত করা সম্ভব হয়, আজ তাই হ'ল!—অজয়দা, আশীর্ব্বাদ কর এমন গৃহ যেন আমি গড়ে' তুলতে পারি আজকের এই দীপশিখাকে, শঙ্খধ্বনিকে, তোমার শুভ কামনাকে, সদাপ্রসারিত কল্যাণ হস্তকে সম্বল করে' যে গৃহে মলিনতা থাকবে না, আমার গৃহপ্রাঙ্গণের তুলসীমঞ্চের ন্যায় যে গৃহ হ'বে পবিত্র শান্ত।

—কল্পনা কর অনাদি, সেই মনীষা আজ হিন্দুস্থানী দারোয়ানের মত সগৌরবে ধর্ম্মতলা দিয়ে যাচ্ছিল মুখে তার দোক্তাবহুল পান, কাঁকালে ছেলে, সঙ্গে প্রমথ হরিহর।— অজয় বোসকে চিনতে পারাটা সে আর আজ উচিত ও প্রয়োজন বলে মনে করেনি, অনাদি।

বিদ্যাপতিকে যদি ছেঁড়া গেঞ্জী গায়ে গলির মধ্যে ডাণ্ডাগুলি খেলতে দেখ তাহ'লে কি রকম মনে হ'বে তোমার বলতে পার!—

জীবনের স্বপ্নগুলো নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে এমনি করে',— মনীষা আজ আমায় ভারী গোলযোগে ফেলে দিল,—আমার বাগানে যেখানে গোলাপ ফুলের গাছ জন্মেছিল, সেখানে ফুলগাছ গেল মরে', মাটি থেকে বেরুল প্রকাণ্ড পাথর—ফুলের বদলে পেলাম প্রত্নতাত্ত্বিকের শিলালিপি।

আজ আর এ ধাক্কা সামলে উঠতে পারব না,— তোমার চায়ের নিমন্ত্রণের লোভ আজকের মত ছাড়তে হ'ল অনাদি।—ইতি

—অজয়—

বৈমানিক লিণ্ডবার্গ

ওয়াশিংটনের এক সংবাদে প্রকাশ যে, সুপ্রসিদ্ধ বৈমানিক লিণ্ডবার্গকে মার্কিন সরকার তাঁহাদের বিমান বিভাগে বিশেষ কাজে যোগদান করিবার নিমিত্ত আহবান করিয়াছেন। ইংলণ্ডের মহিলা বৈমানিক মিস এমি জনসনও দেশরক্ষা বাহিনীতে নিজের নাম তালিকাভুক্ত করিয়াছেন। আসন্ন সমরের ইহা যে পূর্ব্বাভাষ মাত্র, তাহা বুঝিতে কাহারও অসুবিধা হয় না। বিভিন্ন দেশে সমরায়োজনের যে তোড়-জোড় চলিয়াছে, তাহার হিসাব-নিকাশ দেওয়া অবশ্য বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তবে আগামী মহাযুদ্ধে আন্ত-র্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বহু বিশেষজ্ঞকেও যে যোগদান করিতে হইবে, তাহার সুস্পষ্ট আভাষ এখনই আমরা পাইতেছি।

কর্ণেল লিণ্ডবার্গের নাম আজ সর্ব্বত্র পরিচিত। বিমান জগতে তাঁহার সমকক্ষ নাই বলিলেই চলে। ১৯২৭ সালের মে মাসে বিমানযোগে তিনি সর্ব্বপ্রথম আটলাণ্টিক মহাসাগর অতিক্রম করিয়া যেভাবে নিউইয়র্ক হইতে প্যারিসে আসিয়া উপস্থিত হন, তাহাতে তাঁহার নাম সহসা চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। কূটনীতিক বুদ্ধি কৌশলে ও অনন্যসাধারণ কর্ম্ম-ক্ষমতা ও সাহসিকতার গুণে আজ তিনি পৃথিবীর যশস্বি-গণের অন্যতম। মার্কিন সরকার এই দুর্দ্দিনে তাঁহার সহায়তা চাহিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি! কিন্তু লিণ্ডবার্গ শুধু একজন বৈমানিকই নহেন। বৈজ্ঞানিক হিসাবে তাঁহার তত প্রসিদ্ধি না থাকিলেও বিজ্ঞানেও তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় আমরা বহুবার পাইয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক লিণ্ডবার্গের সেই পরিচয় দিবারই চেষ্টা করিব।

এই লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৈমানিকের বিজ্ঞান সাধনার প্রথম পরিচয় আমরা পাই ১৯৩৫ সালের জুন মাসে। এই সময়ে তিনি যে আবিষ্কার ঘোষণা করেন, তাহা বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। তাঁহার পূর্ব্বে বহু বৈজ্ঞানিক এ ধরণের আবিষ্কারে মনোনিবেশ করিয়া বার বার ব্যর্থ মনোরথ হইয়াছেন। কিন্তু যাহা ছিল বিজ্ঞানীদের নিকট স্বপ্ন, তাহাই সফল করিয়া তুলিলেন বৈমানিক লিণ্ডবার্গ। এই সময়ে তিনি এমন একটি কৃত্রিম যন্ত্র আবিষ্কার করেন, যাহার মধ্যে কোন ব্যক্তি বা প্রাণীর মৃত্যুর পরেও তাহার হৃদপিণ্ডটি সযত্নে রক্ষিত হইতে পারে এবং বহুকাল পর্যন্ত উহা জীয়াইয়া রাখিবার ব্যবস্থা হইতে পারে। শুধু তাহাই নহে, লিণ্ডবার্গ বলেন, এই যন্ত্রের মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রসহ হৃদপিণ্ড রক্ষিত হইলে তাহা হইতে প্রয়োজনমত অপরকে জীবন-রসায়নও (elixir of life) সরবরাহ করা যাইবে। বস্তুত, উহা এরূপ একটি রাসায়নিক কারখানার কাজ দিবে, যাহা হইতে আমরা বার বার জীবন-রসায়ন লাভ করিতে পারিব, অথচ ভাণ্ডার কখনও নিঃশেষ হইবে না। দুঃসহ-জীবনভার বহিয়া বহিয়া যাহারা একান্ত হাঁপাইয়া উঠিবেন মোটর গাড়ীর পেট্রোল লওয়ার মত উপরোক্ত যন্ত্র হইতে সঞ্জীবনী শক্তি সংগ্রহ করিয়া সেরূপ বেচারীদের চাঙ্গা করাও সম্ভবপর হইবে। বলা বাহুল্য, লিণ্ডবার্গের এই গবেষণার কথা প্রকাশ পাইলে বিজ্ঞান জগতে এক অভূতপূর্ব্ব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। বৈমানিক লিণ্ডবার্গ তাঁহার আবিষ্কারের দ্বারা যে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন, তাহার মধ্যে আমরা সর্ব্বপ্রথম তাঁহার বৈজ্ঞানিক মনের পরিচয় লাভ করি।

কিন্তু তাই বলিয়া উহাই লিণ্ডবার্গের প্রথম ও শেষ আবিষ্কার নহে। বিমান পরিচালনার মধ্যে তাঁহার অনু-সন্ধিৎসু মন চিরকাল কাজ করিয়া আসিয়াছে এবং তাই আমরা দেখিতে পাই, বিমান-পরিভ্রমণের ফাঁকে ফাঁকেও তিনি

কর্নেল লিণ্ডবার্গ

এমন অনেক কিছু আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহা আমাদের জ্ঞান-ভাণ্ডারকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে।

মেক্সিকোর অন্তর্গত য়ুকেটান উপদ্বীপের অনাবিষ্কৃত অঞ্চলে যে প্রাচীন সভ্যতা একদা বিরাজ করিত, ঐতি-হাসিকগণ তাহার খোঁজ পাইলেও উহার কোন নিদর্শন বহুকাল আবিষ্কৃত হয় নাই। বৈমানিক লিণ্ডবার্গই সর্ব্ব-প্রথম ঐ অঞ্চলে প্রাচীন যুগের কয়েকটি প্রধান নগরের সন্ধান লাভ করেন। উচ্চ পর্ব্বতসঙ্কুল স্থানে গিরিপার্শ্বে প্রাচীন পিউব্লো (Peublo) অর্থাৎ আদিম বস্তি লিণ্ডবার্গই সর্ব্বপ্রথম লক্ষ্য করেন। তাঁহার পূর্ব্বেও বহু বৈমানিক বিমানপোতে করিয়া ঐ অঞ্চলে পরিভ্রমণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু উহা কেহ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন নাই। প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কারে লিণ্ডবার্গের মধ্যে যে অনু-সন্ধিৎসার লক্ষণ দেখিতে পাই, তাহা বৈমানিকের নহে, পরন্তু খাঁটি বৈজ্ঞানিকের। সে হিসাবে লিণ্ডবার্গের আসন অপর সকল বৈমানিকের অনেক উদ্ধে!

১৯৩২ সালের এপ্রিল মাসে 'সায়েন্স' নামক কাগজের এক সংখ্যায় একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রবন্ধে রক্তের যে তরল অংশে লোহিত বর্ণ কণিকা ভাসিয়া বেড়ায় (blood plasma) তাহা হইতে লোহিত কণাগুলিকে (red blood cells) পৃথক করিবার নিমিত্ত উদ্ভাবিত নূতন একটি যন্ত্রের উল্লেখ ছিল। প্রবন্ধের শেষভাগে লিখিত

ছিল যে যন্ত্রটি রকফেলার ইনষ্টিটিউট ফর মেডিক্যাল রিসার্চে "সি এ লিণ্ডবার্গ" কর্তৃক পরিচালিত। বৈমানিক 'চার্লস অগাষ্টাস লিণ্ডবার্গ' যে রকফেলার ইনষ্টিটিউটে এরূপ গবেষণা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, বাহিরের অনেকেই তখন তাহা জানিতেন না। সুতরাং প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইলে স্বতঃই সকলের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হয়। বিমান পরিচালনায় কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়া যিনি যশস্বী হইয়াছেন বিশ্ববাসী এতদিন শুধু সেই বৈমানিক লিণ্ডবার্গকেই চিনিত। আজ তাঁহার অন্যরূপ দেখিয়া লোক বিস্মিত হইল। এইভাবে লিণ্ডবার্গের বিজ্ঞান-প্রতিভার পরিচয় বিশ্ববাসীর নিকট পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

বিভিন্ন প্রকার তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব ভিন্নরূপ। কেন্দ্রাতিগ শক্তি (centrifugal force) প্রয়োগ করিয়া কিভাবে দুই বা ততোধিক মিশ্রিত তরল পদার্থকে পৃথক করা যাইতে পারে, তাহা হয়ত লিণ্ডবার্গ তাঁহার তরুণ বয়সে পিতার নিকট হইতেই শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার দুগ্ধের ব্যবসায় ছিল এবং এরূপ অনুমিত হয়, পিতার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া বিবিধ গব্য পদার্থকে পৃথক করিতে গিয়া লিণ্ডবার্গ এই শক্তি প্রয়োগের নীতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সন্ধান লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। কিন্তু জীববিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে লিণ্ডবার্গের মধ্যে যে কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার উদ্ভব যে কিভাবে সম্ভব হইল, বৈমানিকের জীবনে তাহা এক বিচিত্র রহস্য। অনেকে এই রহস্যের উদ্ঘাটন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং ইহার দুইটি কারণও অনুমিত হইয়াছে। প্রথমতঃ, ১৯২৮ সালে তাঁহার বন্ধু ও সহকর্ম্মী ফ্রয়েড্ বেনেট কোয়েবেক সহরে বিশেষভাবে অসুস্থ হইয়া পড়িলে বন্ধুর প্রাণ বাঁচাইবার চেষ্টায় লিণ্ডবার্গ বিমানযোগে নিউইয়র্ক হইতে কোয়েবেক শহরে নিউমোনিয়ার সিরাম লইয়া আসেন। বলা বাহুল্য রকফেলার ইনষ্টিটিউট হইতেই এই সিরাম আনীত হয়। ১৯৩০ সালে তাঁহার প্রথম পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে পর তিনি আর একবার রকফেলার হাসপাতালের চিকিৎসকগণের শরণাপন্ন হন। এরূপ অনুমিত হয় যে, দুই দুইবার রকফেলার ইনষ্টিটিউটের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি ইহার কার্য্যে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। ফলে ১৯৩০ সালেই তিনি উক্ত ইনষ্টিটিউটের গবেষক-কর্ম্মী দলের তালিকাভুক্ত হইয়া বিজ্ঞান সাধনায় মনোনিবেশ করেন। ফলে, আজ বৈমানিক লিণ্ডবার্গের বৈজ্ঞানিকরূপ আমাদের নিকট পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

লিণ্ডবার্গের বিজ্ঞান-সাধনার ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে আরও বহু তথ্য আমরা জানিতে পারি। ১৯১২ সালে 'রকফেলার ইনষ্টিটিউটের' ডাঃ এলেক্সিস্ ক্যারেল মানুষ বা প্রাণিদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিভিন্ন 'টিসু'-গুলিকে কাচের পাত্রে জীয়াইয়া রাখিবার এক প্রণালী প্রবর্ত্তন করেন। কিন্তু বাহিরের বিষাক্ত আবহাওয়া হইতে কোন প্রাণী বা মানুষের ফুস্ফুস্ সহ সমগ্র হৃদপিণ্ডটিকে যতদিন ইচ্ছা জীয়াইয়া রাখিবার কোন প্রকৃষ্ট প্রণালী তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। লিণ্ডবার্গ তখন উক্ত ডাক্তারের সহকারী হিসাবে গবেষণায় নিরত ছিলেন এবং এই সমস্যা কিভাবে সমাধান করা যায়, তাহারই পথ খুঁজিতেছিলেন। ফলে ১৯৩১ সালের মে মাসে তাঁহার জীবাণু নিরোধক 'পাম্প' (germ-proof pump) আবিষ্কৃত হয়। ইহা দ্বারা ধমনীর অংশবিশেষের মধ্য দিয়া কৃত্রিম উপায়েই রক্ত সঞ্চালন করান যাইতে পারে। লিণ্ডবার্গের আবিষ্কৃত এই যন্ত্রটিই পরে আরও সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়। ডাঃ ক্যারেল ইহারই সাহিত হৃদপিণ্ড ফুসফুস প্রভৃতির সংযোগ সাধন করিয়া নানাবিধ পরীক্ষা দ্বারা ইহার ব্যবহারিক গুণাবলী লক্ষ্য করেন। ফলে, দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াও যে দেহস্থ যন্ত্র বিশেষ (organ) জীবন্ত থাকিতে পারে, লিণ্ডবার্গের পরিকল্পিত আবিষ্কার হইতে তাহারই একটি মডেল প্রস্তুত করা সম্ভবপর হইয়া উঠে।

লিণ্ডবার্গের কর্ম্ম প্রতিভা শুধু গবেষণাগারের সীমানার মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে নাই। গবেষণাকালে অবকাশের ফাঁকে ফাঁকে চারি বৎসর হিমমণ্ডল হইতে আরম্ভ করিয়া উষ্ণ-মণ্ডল পর্য্যন্ত প্রায় বিশ হাজার মাইল দীর্ঘ পথ তিনি বিমানে পরিভ্রমণ করিয়াছেন। শুধু পরিভ্রমণ করার উদ্দেশ্যেই তিনি ঘুরিয়া বেড়ান নাই। সি-প্লেনে পরিভ্রমণ করিতে করিতে তিনি উত্তর আতলান্তিক সাগর হইতে বহুরকমের উদ্ভিদের নমুনা মার্কিন কৃষিবিভাগের জন্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। উহার অনেকগুলির সঠিক পরিচয় আজ পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই বটে, তবে সংগৃহীত বিভিন্ন উদ্ভিদ ও শৈবাল হইতে হিমমণ্ডলে কিভাবে উদ্ভিদজীবন পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তৎসম্পর্কে বহু তথ্য উদঘাটিত হইয়াছে। এরূপ জানা যায় যে, উপরোক্ত সংগ্রহ কাজের সুবিধার্থে তিনি তাঁহার বিমানে এক অদ্ভুত ধরণের একটি লৌহ নির্ম্মিত ছিপ পরাইয়া লইয়াছিলেন। বিমান পরিভ্রমণের অব্যবহিত পূর্ব্বে সাংবাদিকগণ যখন উহা কি জানিতে চাহেন, তখন লিণ্ডবার্গ পরিহাসচ্ছলে বলেন, "উহা একটা 'sky-hook' মাত্র।" কিন্তু পরে দেখা গিয়াছে, আকাশকে গাঁথিবার জন্য নহে, পরন্তু সমুদ্র বক্ষ হইতে উদ্ভিদ ও শৈবালের নমুনা সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত তিনি পূর্ব্ব হইতেই এরূপ একটি যন্ত্র (Spore-catcher) তাঁহার বিমানে লাগাইয়া নিয়াছিলেন। জ্ঞানের পরিধিকে বিস্তৃত করিবার এই আকাঙ্ক্ষা লিণ্ডবার্গের বৈজ্ঞানিক মনের পরিচায়ক।

লিণ্ডবার্গের আর এক বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা—লিণ্ডবার্গ চেম্বার। আমাদের দৈহিক কার্য্যাবলী কি ভাবে পরিচালিত হইতেছে, তাহারই চিত্র আমাদের চোখের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিবার এই অসাধারণ প্রচেষ্টার মধ্যে তাঁহার বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার বিকাশই আমরা দেখিতে পাই। সাধারণ লোকের পক্ষে ইহা সম্যক ধারণা করা সম্ভবপর নহে, তবে বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক লিণ্ডবার্গ যেন প্রকৃতির সবটুকু নিগূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া দেখিবার নিমিত্ত একান্তই চঞ্চল হইয়া

ফিল্ম অন্যত্র পাঠাইবার জন্য উহাদের পায়ে চোঙে-পোরা ফিল্ম আঁটিয়া দিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইবে। বিভিন্ন বিপক্ষ ঘাঁটির ছবি পাইবার জন্য ক্যামেরাটিকে নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর কার্য্য করিবার ব্যবস্থায় পূর্ব্ব হইতেই নিয়ন্ত্রণ করিয়া দেওয়া হয়। জাপানে, জার্ম্মানীতে ও আমেরিকায় এইরূপ শিক্ষিত পারাবত দ্বারা বহু প্রকার মহলা দেওয়া হইয়াছে। এই জাতীয় শিক্ষিত পারাবত বর্ত্তমানে জাপানেই রহিয়াছে সংখ্যায় বেশী।

কুকুরের অন্ত্যেষ্টি

টেক্সাসের ডালাস শহরের মিসিস মোর জে হুইলার যখন মারা যাইবেন, সে সময় তিনি এবং তাঁহার প্রিয় কুকুর উইগলস্ একত্র চিতায় ভস্মীভূত হইবেন। তিনি যে উইল করিয়া রাখিয়াছেন তাহাতে এই বিচিত্র অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই কুকুরটির মৃতদেহ সংরক্ষণ করা হইতেছে এবং স্বয়ং মিসিসের মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত সংরক্ষণ করা হইবে। কুকুরের মৃতদেহ সংরক্ষণে তিন পাল্টা হুঁসিয়ারি ব্যবস্থা করা হইয়াছে—ইস্পাতের একটি কক্ষ তৈয়ার করিয়া উহাতে প্লাশ (plush) ক্যাসকেটে উষ্মাদিযুক্ত অবস্থায় রাখা হইয়াছে। শুধু কক্ষ ও ক্যাসকেটে ৫০০ ডলার ব্যয় হইয়াছে। উইগলস্ যখন জীবিত ছিল, তখন মিসিস হুইলার উহাকে সাইড-কারে লইয়া বেড়াইবার জন্য বিশেষ লাইসেন্স গ্রহণ করিতেন। উহার বিছানা ছিল সিল্কের তৈরী। তিনি মনে করেন উইগলস্ তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছে, তাঁহার রান্নাঘরে আগুন লাগিবার উপক্রম হইলে, কেবল অনবরত ঘেউ ঘেউ করিয়া সে চেঁচাইয়া যখন রান্নাঘরের কাঠের আসবাবে আগুন ধরে ধরে হইয়াছিল, সে মিসিসের ঘুম ভাঙ্গায়।

মিসিস হুইলারের ইচ্ছা ছিল যে, তাঁহার মৃতদেহের সহিত একত্রই কুকুরটির মৃতদেহও সমাহিত হয়, কিন্তু দেশের আইন হইল ইহার অন্তরায়, কারণ মানুষের সমাধিতে কোনও পশুর বিশেষ করিয়া কুকুরের শব সমাহিত করা হইতে পারে না। কাজেই তিনি উইলে ব্যবস্থা করিয়াছেন উভয়ের শব একত্র অগ্নিসংস্কারে স্থাপন করিতে।

সমাধিতে প্রদত্ত আহার্য্য

প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই মানব মৃতের উদ্দেশ্যে আহার্য্যাদি প্রদান করিয়া আসিতেছে। বিবিধ উপচারে সমাধি সাজান আজ সুসভ্যদেরও কেহ কেহ শ্রদ্ধার সহিত মানিয়া থাকেন। সিরিয়ার কোনও সমাধি হইতে ফরাসী প্রত্নতাত্ত্বিকগণ ১,০৮৫খানি ডিশ্ প্রাপ্ত হইয়াছে। কবরে স্বামী ও পত্নী দুইয়ের শব বা অস্থি রক্ষা করা হইয়াছিল। এতগুলি ডিশে যে আহার্য্য প্রদত্ত হইয়াছিল তাহার সমর্থনে পণ্ডিতগণ বলেন যে, সমাধিতে ছাগাস্থিও পাওয়া গিয়াছে প্রচুর, কাজেই এই দম্পতি যে দেশের লোকের অতিশয় শ্রদ্ধাভাজন ছিল, ইহাতে সন্দেহ নাই। কবরটি নাকি খৃষ্টপূর্ব্ব ২৫০০ সালের। পণ্ডিতগণের অনুমান যে সময়ে এব্রাহাম বেবিলোনিয়ায় অভ্যুত্থিত হয়, এই সমাধি তাহারও পূর্ব্বেকার।

অতি বৃদ্ধ কাকাতুয়া

কাকাতুয়াটির বর্ত্তমান নাম—সারা। রহিয়াছে লণ্ডন চিড়িয়াখানায়। গত সেপ্টেম্বর মাসে উহাকে এইস্থানে রাখা হইয়াছে। উহার পূর্ব্বে পাখীটির মালিক ছিল মিঃ সি আর আরউইন। মিঃ আরউইন বলেন, পাখীটি তাঁহাদের বাড়ীতে ১৩৪ বৎসর যাবৎ রহিয়াছে তাঁহার পিতামহের বাল্যকাল হইতে। কিন্তু ঠিক কত বয়সে কাকাতুয়াটি আনীত হইয়াছিল, তাহা আর জানিবার উপায় নাই; সুতরাং পাখীটির প্রকৃত বয়স ১৩৫ বৎসর কিম্বা তদূর্দ্ধ হইবে। উহার বার্দ্ধক্যের জন্য উহার হাঁটু দুইটি কতকটা শক্তিহীন হইয়াছে, কিন্তু ঠোঁটের শক্তি হ্রাস পায় নাই কিছুমাত্র। চিড়িয়াখানায় বিশেষ যত্নে রক্ষিত হইবে বলিয়াই পাখীটির মালিক উহাকে ঐ স্থানে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

বে-আইনী বিবাহের অজুহাত

ইংলণ্ডে স্ত্রী বর্ত্তমানে পুনর্বিবাহ দণ্ডনীয়—সাত বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড দ্বারা। কিন্তু অধিকাংশস্থলেই অপরাধী খালাস পায় অথবা নামমাত্র দণ্ডে দণ্ডিত হয়।

যোসেফ ট্রেনর ১৯৩০ সালে অক্সফোর্ডে মে এণ্ডারসনকে বিবাহ করে। এই তাহার ২নং বিবাহ। প্রথম স্ত্রীর কোন সংবাদ পায় নাই ১৯১৮ সালের পর, যখন স্ত্রীকে ছাড়িয়া চলিয়া আসে। ইহার পর আবার সাত বৎসর পরে চিচেষ্টারে সে বিবাহ করে কেথালিন ফ্লোরেন্সকে।

আদালতে হাজির হইয়া সে বলে,—

(১) তাহার দ্বিতীয় বিবাহ যখন বে-আইনী, তখন উহা বিবাহই নয়। কারণ হয় ত প্রথম স্ত্রী জীবিত আছে।

(২) বার বৎসর সে প্রথম স্ত্রীর সংবাদ পায় নাই—কাজেই সে ৩নং বিবাহ করিয়াছে। ২নং বিবাহ যখন বিবাহই নয় তখন উহা ত গণনায় আসে না।

আইনের এই প্যাঁচে জজেরা উপায়হীন হইয়া শুধু ৩নং বিবাহের জন্য নামে মাত্র সাজা দেয়। এই ভয়ে যে, আপীলে অপরাধী হয়ত খালাস পাইয়া যাইবে। একমাত্র চার্জ্জ তাহার বিরুদ্ধে এই যে—সে বিবাহ রেজিষ্টারে মিথ্যা এণ্ট্রি (entry) করাইয়াছে। বে-আইনী বিবাহের চার্জ্জ টিকে নাই।

পরীক্ষার কাগজে নম্বরের পরিবর্ত্তে গন্ধ

নিউ ইয়র্ক সেণ্ট টমাস কলেজের অধ্যাপক জন ম্যাডিগ্যান পদার্থ-বিজ্ঞান শ্রেণীর পরীক্ষায় ছাত্রদের পরীক্ষাপত্রে কোন নম্বর না দিয়া উহাতে মাখাইয়া দেন নম্বরের প্রতীক গন্ধ। তিনটি শ্রেণী-বিভাগ করা হয়—সুগন্ধ, দুর্গন্ধ ও উগ্রতর দুর্গন্ধ দ্বারা। সুগন্ধ-সিঞ্চিত কাগজে পাওয়া গিয়াছে গোলাপের আতরের গন্ধ। সাধারণ দুর্গন্ধে হাইড্রোজেন-সালফাইডের গন্ধ উত্থিত হইয়াছে; আর উগ্রতর দুর্গন্ধ যে সকল কাগজে ছিল, তাহা যে বিউটারিক (butyric acid) এসিডের তাহা বুঝিতে গোল হয় নাই কিছু মাত্র। বিউটারিক এসিড গন্ধবিশিষ্ট কাগজগুলির পরীক্ষার্থী যে পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়াছে, তাহা ছাত্রেরা কাগজ ফিরিয়া পাইবামাত্রই গন্ধ হইতে বুঝিতে পারিয়াছে। অধ্যাপক বলেন,—ছাত্রদের আর পরীক্ষার ফলাফল বলিয়া দিতে হয় নাই—গন্ধ হইতেই তাহা তাহারা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছে।

পুস্তক পরিচয়

আলপনা—(বালক-বালিকাদের জন্য) গ্রন্থকার—শ্রীসুনির্ম্মল বসু। প্রকাশক বৃন্দাবন ধর এন্ড সন্স, ৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ছয় আনা।

শিশু সাহিত্যে সুনির্ম্মলবাবু লব্ধপ্রতিষ্ঠ। তাঁহার এই নবপ্রয়াসে তাঁহার পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। কয়েকটি হাস্যরসাত্মক কবিতা এবং কচি মনের উপযোগী কয়েকটি রূপকথা এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট। রূপকথাগুলি বিশেষ করিয়া ছোটদের কৌতূহল তৃপ্ত করিবে এই জন্য যে উহাতে টুনটুনি, কট্‌কটে ব্যাঙ, চড়াই, ফিঙে, ভুতুম পেঁচা প্রভৃতি জীবগুলির অভিনব সুখ-দুঃখের কথায় ভরপুর। ইহা ছাড়া আজব কুমিতগীর, বত্রাসুর প্রভৃতির কাহিনীতেও শিশুরা মজা পাইবে কম নয়। ছবি, ছাপা আর লেখকের বর্ণনাভঙ্গী আলপনাকে সার্থক করিয়াছে।

কালো-ভ্রমর—(ছোটদের উপন্যাস) লেখক—শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত। প্রকাশক বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স, ৫নং কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা। মূল্য বার আনা।

শ্রীমান নীহাররঞ্জন দেশ পত্রিকার পাঠক-পাঠিকার নিকট সুপরিচিত। কথা-সাহিত্যে নিরত উদীয়মান সৃষ্টিপ্রয়াসিগণের তিনি অন্যতম। তিনি বাঙলার বালক-বালিকাগণকে যে বিচিত্র ঘটনা-সম্বলিত দীর্ঘ গল্পটি পরিবেশন করিয়াছেন, তাহাতে তাহারা যে যথেষ্ট আমোদ উপভোগ করিবে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। শুধুই আধুনিক য়্যাডভেঞ্চার নয়, ইহাতে সখের গোয়েন্দাগিরিরও আভাষ মিলিবে। ভাষা বেশ প্রাঞ্জল, তবে স্থানে স্থানে মুদ্রাকর প্রমাদ দৃষ্ট হইল। আশা করা যায় ভবিষ্যতে লেখক এ বিষয়ে আরও সতর্ক হইবেন। গল্পটি ধারাবাহিকরূপে "শিশুসাথী" পত্রিকায় পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। উহাই আংশিক পরিবর্ত্তিত আকারে এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে—ভূমিকায় লেখক একথা জানাইয়াছেন।

ছাপা, ছবি, সুদৃশ্য প্রচ্ছদ ছোটদের নিকট লোভনীয়ই মনে হইবে।

বেদান্ত সোপান ও অদ্বৈতবাদ—শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সিংহ রায় প্রণীত। মূল্য ।৹ আনা মাত্র। পি ২০৫, ল্যান্সডাউন রোড এক্সটেনশন হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত।

সিংহ রায় মহাশয় তর্ক শাস্ত্রে একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁহার লিখিত 'তর্ক বিজ্ঞান' 'ধর্ম্ম যোগ' 'গীতা সোপান' প্রভৃতি গ্রন্থ জিজ্ঞাসু-সমাজে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। আমরা তাঁহার লিখিত 'বেদান্ত সোপান ও অদ্বৈতবাদ' পাঠ করিয়া প্রীতি লাভ করিলাম। তিনি অতি সরল এবং সহজবোধ্য ভাষায় অথচ অতি সুচিন্তিতভাবে বেদান্ত শাস্ত্রের বিভিন্ন মতবাদের বিচার বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং প্রকৃত কথাটি সুপরিস্ফুট করিয়াছেন। শিক্ষার্থীর পক্ষে দুরূহ বেদান্ত শাস্ত্রে প্রবেশের পথ ইহাতে ত সুগম হইবেই, যাঁহারা দর্শন শাস্ত্রে অভিজ্ঞ তাঁহারাও ভারতীয় জ্ঞান সাধনার বিশিষ্টতাকে উপলব্ধি করিয়া আনন্দ পাইবেন।

দর্শন সোপান—শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সিংহ রায় ন্যায়বাগীশ প্রণীত। মূল্য পাঁচসিকা। পি ২০৫ ল্যান্সডাউন রোড এক্সটেনশন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

সিংহ রায় মহাশয় এই গ্রন্থে দেশ বিদেশের দার্শনিক চিন্তাক্ষেত্রে যাঁহারা অগ্রণী তাঁহাদের মতবাদের সঙ্গে পাঠক-দের পরিচয় ঘটাইয়া দিয়াছেন। 'দর্শন সোপান' পাঠ করিলে নব্য ইউরোপের চিন্তার সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় ঘটিবে এবং ঐ চিন্তাধারার সঙ্গে ভারতীয় চিন্তার তুলনামূলক জ্ঞান তাঁহারা মোটামুটি লাভ করিতে পারিবেন। গ্রন্থখানি বাঙলা ভাষার একটি বড় অভাব পূরণ করিয়াছে।

গল্প লহরী—(মাসিক পত্র, পঞ্চদশ বর্ষ) সম্পাদক শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বৈশাখ, ১৩৪৬। বার্ষিক মূল্য ৩৷৹ টাকা, মাসিক ।৵৹ আনা। ৮নং রাধামাধব গোস্বামী লেন হইতে প্রকাশিত।

ছোট গল্পই বৈশিষ্ট্য। ডাক্তার বিমল সেনের 'কি সে যে কি!' লেখাটি ভাল লাগিল। 'প্রেমের গল্প' 'পয়লা বৈশাখ' সুখপাঠ্য লেখা।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেট—স্বাস্থ্য সংখ্যা; সচিত্র। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের বিশেষগুলির বৈশিষ্ট্য সকলেই জানেন, আলোচ্য স্বাস্থ্য সংখ্যাতেও সকল দিক হইতে সেই বৈশিষ্ট্যজনিত পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। কি চিত্র-সজ্জা, কি প্রবন্ধ নির্ব্বাচন, বিষয়-বস্তুর বৈচিত্র্য, পারিপাট্য এবং সুসংস্থিতি বর্ত্তমান স্বাস্থ্য সংখ্যায় সর্ব্বতোভাবে গেজেটের সুযোগ্য সম্পাদকের কৃতিত্বের পরিচয় পত্রে পত্রে পরিস্ফুট হইয়াছে। সকল সাধনার গোড়ার সাধনা হইল স্বাস্থ্য সাধনা। মহর্ষি চরক বহু যুগ পূর্ব্বে যে কথা বলিয়া গিয়াছেন, গেজেটের বর্ত্তমান সংখ্যার ভূমিকায় ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ও সেই উক্তিরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। এই ধরণের বিশেষ সংখ্যা-সমূহ প্রকাশের দ্বারা গেজেটের সম্পাদক সমাজে, বিশেষভাবে কলিকাতার পৌরজনগণের মধ্যে সেই স্বাস্থ্য সাধনার অনু-প্রেরণা জাগ্রত করিয়া দেশের কল্যাণ সাধন করিতেছেন। বর্ত্তমান সংখ্যা কর্ণেল চোপরা, কর্ণেল এ সি চ্যাটার্জ্জি, কর্ণেল বার্কলে হিল, ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস, ডাক্তার অমূল্যচরণ উকীল প্রভৃতি বিশেষবিদ্‌গণের সুচিন্তিত সন্দর্ভরাজিতে সমৃদ্ধ হইয়াছে। এমন সংখ্যার যত প্রচার হয়, ততই ভাল।

সাহিত্য-সংবাদ

অনুবাদ-গল্প প্রতিযোগিতা

অনুবাদ সাহিত্যের উন্নতিকল্পে যাত্রীদলের সাহিত্য বিভাগ হইতে বাঙলা ভাষায় একটি ছোট অনুবাদ-গল্প প্রতিযোগিতা আহ্বান করা যাইতেছে। গল্প যে কোন সাহিত্য হইতে অনূদিত হইলেই চলিবে, কিন্তু উহা সমর-গল্প হওয়া আবশ্যক। দুইটি পুরস্কার দেওয়া হইবে। বঙ্গের ও বঙ্গের বাহিরের প্রত্যেক নবীন লেখক-লেখিকাদের এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। অনুবাদকদের অনূদিত গল্পের মূল লেখক ও মূল গল্পের নাম উল্লেখ করিতে হইবে। গল্পসমূহ আগামী ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় পৌঁছান প্রয়োজন।

সম্পাদক, সাহিত্য বিভাগ, "যাত্রীদল", ২৭ গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড (সাউথ), হাওড়া।

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

ঢাকা করোনেশন রিডিং রুমের তত্ত্বাবধানে দুইটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রথম প্রবন্ধটি হইতেছে,—"গণতন্ত্রের সুফল।" ইহাতে বাঙলার যে কোন ছাত্র-ছাত্রী যোগদান করিতে পারিবেন। অপর প্রবন্ধটি হইতেছে,—"ছাত্র-ছাত্রীদের বর্ত্তমান কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব।" ইহাতে বাঙলার স্কুলের যে কোন ছাত্র-ছাত্রী যোগ দিতে পারিবেন। সর্ব্বোৎকৃষ্ট দুইটি প্রবন্ধ লেখক বা লেখিকাদিগকে দুইটি কাপ পুরস্কার দেওয়া হইবে। প্রবন্ধ বাঙলায় লিখিতে হইবে অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হইবে না। আগামী ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে। পাঠাইবার ঠিকানা—সম্পাদক, করোনেশন রিডিং রুম, ৫নং আরমেনিয়ান ষ্ট্রীট, ঢাকা।

রচনা ও গল্প প্রতিযোগিতা

(ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী কর্ত্তৃক পরিচালিত)

সর্ব্বসাধারণের জন্য

বসুমতী মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ শীল্ড। বিষয়—১। "বাঙলার কৃষির উন্নতির উপায়।" প্রথম পুরস্কার চ্যালেঞ্জ শীল্ড ও একটি রৌপ্য পদক। দ্বিতীয় পুরস্কার একটি রৌপ্য পদক।

স্কুলের ছাত্রদের জন্য

বসন্ত কুমারী মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ শীল্ড। ২। "স্বদেশে ছাত্রের কর্ত্তব্য।" প্রথম পুরস্কার চ্যালেঞ্জ শীল্ড ও একটি রৌপ্য পদক। দ্বিতীয় পুরস্কার একটি রৌপ্য পদক।

স্কুল-কলেজের ছাত্রী ও মহিলাগণের জন্য

কৃষ্ণদাস মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ কাপ। ৩। "ভারতের স্ত্রীশিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত।" প্রথম পুরস্কার চ্যালেঞ্জ কাপ ও একটি মিনিয়েচার কাপ। দ্বিতীয় পুরস্কার একটি রৌপ্য পদক। রচনা ফুলস্কেপ্ কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া আগামী ৬ই মে, শনিবারের মধ্যে সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হইবে।

গল্প—সাধারণের জন্য

রায় অতুলচন্দ্র মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ কাপ। বিষয়—একটি 'রোমাঞ্চমূলক' গল্প। প্রথম পুরস্কার চ্যালেঞ্জ কাপ ও একটি রৌপ্য পদক। দ্বিতীয় পুরস্কার একটি রৌপ্য পদক। গল্প এক্সাইজ বুকের এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া ৬ই মে শনিবারের মধ্যে সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হইবে। গল্প কুড়ি পৃষ্ঠার অধিক হইবে না।

শ্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক, ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী, ৩৫৪, গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, শালকিয়া (হাওড়া)।

রচনা প্রতিযোগিতা

আগামী ১৪ই মে, রবিবার, বেলা ১১-৩০ সময় কালীঘাট হাই স্কুলে, (৫০, মহিম হালদার ষ্ট্রীট কালীঘাট) "সবুজ শিল্পী সঙ্ঘের" উদ্যোগে একটি বাঙলা রচনা প্রতিযোগিতা হইবে। বিষয়ঃ—"বর্ত্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থায় গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন সম্ভব কি না।" প্রতিযোগীদিগকে উক্ত স্থানে আসিয়া রচনা লিখিতে হইবে। কেবলমাত্র স্কুলের ছাত্র ও ছাত্রীগণই এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে পারিবে। আগামী ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে ১৬-এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কালীঘাট, এই ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইতে হইবে। কালীঘাট, এই ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইতে হইবে। আবেদন পত্রে বিদ্যালয়ের নাম, বাড়ীর ঠিকানা এবং প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের স্বাক্ষর থাকা চাই।—উৎকৃষ্ট রচনার জন্য প্রথম দুই-জনকে দুইটি রৌপ্য নির্ম্মিত কাপ প্রদান করা হইবে। রচনা লিখিবার জন্য কাগজ 'সঙ্ঘ' হইতে পাওয়া যাইবে।—সবুজ শিল্পী সঙ্ঘ।

রচনা প্রতিযোগিতা

(হাওড়া ফ্রেণ্ডস্ এসোসিয়েশন)

উক্ত এসোসিয়েশনের উদ্যোগে একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হইবে। প্রতিযোগিতা বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে। নিম্নে লিখিত বিষয়ের মধ্যে যে কোন এক বিষয়ে লিখিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ লেখক বা লেখিকাকে রৌপ্য পদক পারিতোষিক দেওয়া হইবে। প্রবন্ধের বিষয়ঃ—(১) "বাঙলা শিশু সাহিত্য," (২) "বাঙলার ভবিষ্যত," লেখক-লেখিকার নাম, বয়স, শ্রেণীর নাম, বিদ্যালয়ের নাম সম্বলিত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বা প্রধান শিক্ষয়িত্রীর স্বাক্ষরিত ফুলস্কেপ্ কাগজে এক পৃষ্ঠায় বাঙলা ভাষায় লিখিয়া আগামী ১৫ই জ্যৈষ্ঠ মধ্যে পাঠাইতে হইবে। অন্যান্য বিষয়ের জন্য পত্র লিখুন। সম্পাদক—শ্রীঅলোকনাথ মিত্র, ৫১, প্রসন্নকুমার দত্ত লেন নিতাইচন্দ্র পালিত, ১-২ প্রসন্নকুমার দত্ত লেন, পোঃ শিবপুর, হাওড়া।

প্রবন্ধ ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

পানিয়া সারদাবাড় হিতসাধন সমিতির উদ্যোগে বিভিন্ন প্রবন্ধ, আবৃত্তি ও খেলাধূলার প্রতিযোগিতা হইবে। নিম্ন-লিখিত দুইটি প্রবন্ধের জন্য প্রতিযোগিতা আহ্বান করা যাইতেছে। এই প্রতিযোগিতায় মেদিনীপুর জেলার উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ যোগদান করিতে পারিবেন। যাঁহারা প্রথম স্থান অধিকার করিবেন তাঁহাদিগকে একটি করিয়া রৌপ্যপদক পুরস্কার দেওয়া হইবে।

বিষয়—(১) পল্লী সংগঠনে ছাত্র, (২) জাতীয় জীবনে প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা।

প্রবন্ধ স্ব স্ব বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের পরিচয়পত্র সহ আগামী ১৫ই মে ১৯৩৯ তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র মাল, সভাপতি, পানিয়া সারদাবাড় হিতসাধন সমিতি, পোঃ আড়গোয়াল, জেলা মেদিনীপুর।

হাওড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ স্মৃতি সঙ্ঘ পরিচালিত রচনা প্রতিযোগিতা

বিষয়ঃ—ছাত্রছাত্রী ও সর্ব্বসাধারণের জন্য—বিশ্ব কল্যাণে মহাপুরুষের দান। কেবলমাত্র স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য—ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনে ছাত্রছাত্রীদের কর্ত্তব্য। উভয় বিভাগের প্রথম এবং দ্বিতীয় পুরস্কার যথাক্রমে একটি করিয়া রৌপ্য কাপ এবং রৌপ্য পদক। প্রত্যেক প্রতিযোগী নিজ নাম ও ঠিকানা (স্কুলের ছাত্রছাত্রীগণ তাঁহাদের স্কুলের নাম ও ঠিকানা) লিখিয়া পাঠাইবেন; এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক প্রতিযোগী খামের উপর "রচনা প্রতিযোগিতা" লিখিয়া পাঠাইবেন। রচনা প্রেরণের শেষ তারিখ—৩১শে মে, ১৯৩৯। রচনা প্রেরণের ঠিকানা—মৌলবী রেজাউল করিম এম-এ, বি-এল, সভাপতি (রচনা বিভাগ) ২২এ নং হরকুমার ঠাকুর স্কোয়ার, কলিকাতা। শ্রীযুক্ত হিমাংশুশেখর ভট্টাচার্য্য, ১১৬নং কাসুন্দিয়া রোড, হাওড়া। শ্রীযুক্ত সুবিমল দে সরকার, সম্পাদক (রচনা বিভাগ), ১০নং আশুতোষ বসু লেন, শিবপুর, হাওড়া।

গল্প প্রতিযোগিতা

কেবলমাত্র ছাত্র ছাত্রীদের জন্য—প্রবেশের শেষ তারিখ ২০শে মে, ১৯৩৯। প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার যথাক্রমে ১টি সুদৃশ্য কাপ ও ১টি মেডেল। গল্প ফুলস্কেপ কাগজের ৪ পৃষ্ঠার বেশী হইবে না। শ্রীকানাই দে, ৪৬ হেম চক্রবর্ত্তী লেন, হাওড়া।

লেখা ও রেখা প্রতিযোগিতার ফলাফল

কবিতাঃ—১ম, 'মরুর গান'—সত্যনারায়ণ দাশ (আদড়াহাটি, বর্দ্ধমান)। ২য়, 'প্রেম'—সন্তোষ সেনগুপ্ত (ঝাগড়াখান্দ কলিয়ারী)। উল্লেখযোগ্য—'বসন্ত এসেছে ফিরে', 'আঁধারে যাত্রী', 'স্বৈরিণী', 'জাগরণ'।

ছবিঃ—১ম, রমেশগুপ্ত (কলিকাতা)। ২য়, মনোতোষ রায় (দিল্লী)। উল্লেখযোগ্য—ভূতনাথ কর্ম্মকার (নামখাজার)।

ফটোঃ—অমিয় বাগ্চী (কলিকাতা), সুবিনয় ঘোষ (ঢাকা)।

পুরস্কার মে মাসের প্রথমেই পাঠাইয়া দেওয়া হইবে।
আর্টিষ্ট, বি ভট্টাচার্য্য।

সভা-সমিতি

রাঁচিতে প্রবাসী বাঙালীর নববর্ষোৎসব
(মধুচক্রের অনুষ্ঠান)

গত ১লা বৈশাখ, শনিবার (১৫ই এপ্রিল) অপরাহ্নে রাঁচির রবীন্দ্র-সাহিত্য-সেবা-প্রতিষ্ঠান 'মধুচক্র' কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত নববর্ষোৎসব উক্ত সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত অবনীশ্বর দাশগুপ্ত মহাশয়ের ভবনে সুসম্পন্ন হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয় প্রথমে উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া নববর্ষের অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। পরে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সময়োচিত প্রার্থনা করেন। অতঃপর মধুচক্রের সভাপতি শ্রীযুক্ত নলিনীকুমার চৌধুরী নবর্ষ উপলক্ষে লিখিত "চলার পথে" শীর্ষক একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ পাঠ করেন। তারপর শ্রীযুক্ত সুধাকান্তি রায়, শ্রীযুক্ত অবনীশ্বর দাশগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত নলিনীকুমার চৌধুরী প্রভৃতি মহাশয়গণ রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী হইতে নির্ব্বাচিত কবিতা, আবৃত্তি ও প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত নীরদকুমার রায় সময়োচিত বক্তৃতা করেন। উৎসবানুষ্ঠানটি উপস্থিত সকলেই বিশেষ উপভোগ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্তা শান্তি পালের আল্পনা নৈপুণ্যে উৎসব মণ্ডপ অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত হইয়াছিল।

সালিখা বিষ্ণুপদ স্মৃতি পাঠাগার

গত ১৬ই এপ্রিল, রবিবার সালিখা হিন্দু স্কুল প্রাঙ্গণে বিষ্ণুপদ স্মৃতি পাঠাগারের আবৃত্তি প্রতিযোগিতা শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রতিযোগিতায় কলিকাতার এবং হাওড়ার বহু স্কুল কলেজের ছাত্র যোগদান করিয়াছিলেন। প্রতিযোগিতায় সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রথম ও শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন এবং স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য প্রথম ও শ্রীযুক্ত বাসু গাঙ্গুলী দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। শ্রীশিবনাথ বসু মল্লিক ও শ্রীপান্নালাল আঢ্য, যুগ্ম-সম্পাদক।

হিন্দু ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন ক্লাবে নববর্ষোৎসব

গত ১৫ই এপ্রিল (১লা বৈশাখ ১৩৪৬) রাঁচিতে হিন্দু ফ্রেণ্ড্স্ ইউনিয়ন ক্লাব কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত নববর্ষোৎসব উপযুক্ত আড়ম্বর সহকারে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উদ্বোধন-সঙ্গীতের পর শ্রীযুক্ত কালীমোহন চৌধুরী মহাশয় বেদমন্ত্র পাঠ করেন। তারপর ক্লাবের সভাপতি শ্রীযুক্ত নলিনীকুমার চৌধুরী মহাশয় নববর্ষোপলক্ষে রচিত একটি মনোজ্ঞ চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধে তিনি প্রসঙ্গক্রমে বলেন যে, "সংসার পথে শ্রেয়ের স্থান প্রেয় অধিকার করিতে চায়, তাহা দ্বারা আমাদের মনে যে মোহের সঞ্চার হয় তাহাতে হয় চলার পথে বিঘ্ন। * * * এই মোহের পথ প্রতি মুহূর্ত্তেই প্ররোচিত ও প্রভাবান্বিত করিতেছে। * * * এই সব বিঘ্ন দূর করিতে হইবে সাধনা দ্বারা এবং এই সাধনার জন্য যে মানসিক শক্তিলাভের প্রেরণা আবশ্যক, সেই প্রেরণা লাভের জন্যই আমাদের বিভিন্ন উৎসবানুষ্ঠান।"

অতঃপর উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে শ্রীযুত মালীশরণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় বক্তৃতা করেন। সভায় কয়েকটি উদ্বোধনের কবিতা আবৃত্তি ও সুললিত সংগীত সকলেরই আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিল।

ভারতীয় চলচ্চিত্র কংগ্রেস

মে মাসের প্রথম সপ্তাহে বোম্বাইতে ভারতীয় চলচ্চিত্র কংগ্রেসের অধিবেশন হইতেছে। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় চলচ্চিত্রের যুগ আরম্ভ হয়। আজ ২৫ বৎসর পরে এই যে রজত জয়ন্তী উৎসব ও চলচ্চিত্র কংগ্রেসের আয়োজন হইতেছে, প্রত্যেক ভারতবাসী তাহা অন্তরের সহিত সমর্থন করিবেন।

বোম্বাই এই উৎসবের আয়োজন করিয়াছেন বলিয়া সমগ্র ভারতবাসী বোম্বাইকে অভিনন্দিত করিবে এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা ইহাতে যোগ দিয়া এই উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিবে ইহা স্বাভাবিক। ইহাতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানের সুবিধা হইবে এবং তাহার ফলে যে ভারতের চলচ্চিত্রশিল্পের কল্যাণ হইবে তাহা নিঃসন্দেহ।

প্রজাপতি নৃত্য — দেবদাসী নৃত্য

[illegible] সম্প্রতি একটি নৃত্য-গীতের জলসা হইয়া গিয়াছে। কুমারী মায়া ব্যানার্জী নাম্নী একটি নবম বর্ষীয়া বালিকা "প্রজাপতি" নৃত্যে ও 'দেবদাসী' নৃত্যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে।

কিন্তু এই সদিচ্ছার পিছনে যে আরও একটি গোপন ইচ্ছার রূপ আমাদের চোখে ক্রমে ক্রমে প্রকট হইয়া উঠিতেছে তাহার পরিচয় পাইয়া আমরা ইদানীং বোম্বাইবাসীদের বাহিরের এই নিছক সদিচ্ছার উপর আর আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছি না। ইহা আমরা স্বীকার করি যে, আমাদের দেশে নিখিল ভারত চলচ্চিত্র সংঘ বা ঐ জাতীয় কোন একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠা আবশ্যক এবং বোম্বাই যদি এই জাতীয় কোন একটি সঙ্ঘ গড়িয়া তোলার ভার গ্রহণ করে, তাহা হইলে আমাদের আপত্তি করার ত কিছুই থাকিতে পারে না, বরং আমরা আনন্দের সহিত তাহাতে যোগদান করিব। কিন্তু যদি অন্য কোন প্রদেশের সহিত কোনরূপ আলোচনা না করিয়া অন্যান্য প্রদেশের মত লওয়া দূরে থাকুক, তাহাদের একেবারে না জানাইয়া যদি বোম্বাই নিজ প্রদেশের সুবিধানুযায়ী এবং নিজেদের স্বার্থের দিকে সম্পূর্ণ লক্ষ্য করিয়াই এইরূপ একটি সর্ব্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে নামে 'সর্ব্বভারতীয়' হইলেও প্রকৃতপক্ষে বোম্বাই ছাড়া আর কোন প্রদেশই এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিতে পারে না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও প্রথম প্রচেষ্টা বলিয়া এবং বাহিরের সদিচ্ছার রূপ দেখিয়া বাঙলা ইহাকেও মানিয়া লইতে প্রস্তুত হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে 'বেঙ্গল মোসান পিকচার্স এসোসিয়েশন' বোম্বাই কংগ্রেসের সহিত সম্পূর্ণ সহযোগিতা করিতেও প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি যে সমস্ত ব্যাপার দেখা যাইতেছে, তাহাতে 'বেঙ্গল মোসান পিকচার্স এসোসিয়েশনের" বোম্বাই কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতা করা আর সমীচীন হইবে কিনা তাহা ভাবিয়া দেখার সময় আসিয়াছে। নিজেদের খুশীমত, নিজেদের খেয়াল মত ও নিজেদের সুবিধামত বোম্বাই যাহা কিছু করিবে, অন্যান্য প্রদেশকে নির্ব্বিচারে তাহাই মানিয়া লইতে হইবে, ইহাই যদি সর্ত্ত হয়, তবে বাঙলা বোম্বাই কংগ্রেসে যোগদান করা দূরে থাক ইহাকে সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন করিবে। শুধু বাঙলা নহে, অন্যান্য প্রদেশও বোম্বাই-এর এই তথাকথিত 'সদিচ্ছাকে' সন্দেহের চোখে দেখিতেছে এবং এখনও পর্য্যন্ত বোম্বাই যদি এই বিষয়ে দৃষ্টি না দেন এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন না করেন, তবে শুধু যে তাঁহাদের নিজেদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবে তাহা নহে, উৎসব পর্য্যন্ত ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে।

অন্যান্য প্রদেশ সম্বন্ধে আমরা এখানে আলোচনা করিব না। আমরা শুধু মাত্র বাঙলা সম্বন্ধেই এখানে বলিব। একথা সত্য যে, বাঙলা দেশে এমন কয়েকটি অ-বাঙালী চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান আছে, যাহারা নির্ব্বিচারে বোম্বাইয়ের নির্দ্দেশ হয়ত মাথা পাতিয়া লইবেন, কারণ সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠান বোম্বাইয়ের ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট। অনেক বিষয়ে কেন, প্রায় সমস্ত বিষয়েই বোম্বাইয়ের স্বার্থের সহিত তাহাদের স্বার্থ এক। কিন্তু কয়েকটি অ-বাঙালী প্রতিষ্ঠান 'বাঙলা' নহে। বাঙলার শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানের সহিত যদি ইঁহাদের যোগ না থাকে, তবে তাহারা নিজেদের 'বাঙলার' বলিয়া দাবী করিতে পারেন

না। সুতরাং বাঙলা বোম্বাই কংগ্রেসকে বর্জ্জন করিলে, যদি তাঁহারা যান, তবে বাঙলা সেখানে যাইবে না, যাইবে বাঙলা দেশের ও বোম্বাইয়ের এজেণ্টের দল।

বোম্বাই, নিজেদের খুশী মত চলচ্চিত্র কংগ্রেসের নিয়মাবলীর যে খসড়া করিয়াছেন, তাহা আগামী কংগ্রেসে আলোচিত হইবে। এই খসড়া প্রণয়নের সময় অন্যান্য কোন প্রদেশের কোন মতামত লওয়া হয় নাই। অন্যান্য প্রদেশের কংগ্রেসের নিয়মাবলীর সম্পূর্ণ নূতন খসড়া প্রণয়ন করিয়া কংগ্রেসে উপস্থাপিত করার অধিকার আছে, অথবা ইচ্ছা করিলে তাহারা বোম্বাই খসড়াকে যে কোন ভাবে সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিতে পারে। কিন্তু তাঁহাদের প্রস্তাবিত খসড়াকে চূড়ান্ত মনে করিয়া বোম্বাই কংগ্রেসের উদ্যোক্তাগণ সেই খসড়া অনুযায়ী কার্য্য চালাইতে যেভাবে জেদ করিতেছেন, তাহা নিছক পাগলামি ভিন্ন আর কিছুই নহে। কি করিয়া তাঁহারা মনে করেন যে, তাঁহাদের খসড়াই চূড়ান্ত এবং কংগ্রেসে তাহা গৃহীত হইবে? কি করিয়াই বা তাঁহারা মনে করেন যে, তাঁহাদের প্রস্তাবিত খসড়া অন্যান্য প্রদেশ নির্ব্বিচারে মাথা পাতিয়া মানিয়া লইবে? ইহা কি সহযোগিতা কামনা করা না স্বেচ্ছাচার? বোম্বাই কংগ্রেস একটি ডেপুটেশন কয়েকদিন পূর্ব্বে বাঙলায় পাঠাইয়াছিলেন। আমাদিগকে বলা হইয়াছিল যে, কংগ্রেস সম্বন্ধে সমস্ত বিষয়ের আলোচনার জন্য তাঁহারা বাঙলায় আসিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা আসার পর আমরা দেখিলাম যে, তাঁহারা কেবলমাত্র বোম্বাই কংগ্রেসের জন্য টাকা সংগ্রহ করিতে আসিয়াছেন এবং অন্যান্য ব্যাপার সম্বন্ধে তাঁহারা কিছু বোঝেন না, জানেনও না। ইহা কি ছেলেখেলা? বিভিন্ন প্রদেশ হইতে যে সমস্ত লোক সময় নষ্ট করিয়া, অর্থ ব্যয় করিয়া, বোম্বাই যাইবে, তাহারা কি পুতুল-নাচ দেখিতে যাইবে?

বোম্বাই প্রদেশ কংগ্রেসের নিয়মাবলীর যে খসড়া প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। পরে আমরা এই প্রস্তাবিত নিয়মাবলীর অসারতা সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

মুক্তি

সমীর ঘোষ

জানালার খোলা কপাটের পারে দেখি
আকাশের বুকে নেমেছে সোনালী আলো,
শরৎ এসেছে—আনিয়াছে আজো সে কি
মুক্তির পাখা সকলেরে বাসি ভালো?

ভালোবাসা ছাড়া কি আর বলিতে পারি,
জানি কলকাতা আমারে রেখেছে বেঁধে·
বলাকা নয় সে উড়িছে কাকের সারি—
—ছাদের ওপারে দিগন্ত মরে কেঁদে।

তবু ভালো আজ বিছানায় শুয়ে লাগে
নগরীর এই কোলাহল-ভরা দিন,—
টুকরো টুকরো অনেক কথাই জাগে·
ঝিল্লী-ঝলকে বেজে ওঠে মনোবীণ

মনে পড়ে যায় রাস্তার মোড়ে সেই
শিউলী গাছেতে কতই ধরেছে কুঁড়ি;
পার্কের বুকে আকাশের সীমা নেই
—সেখানে ধোঁয়ায় আকাশ হয়নি বুড়ি।

আমার কাজটা 'রাধাপতি' এসে করে—
কালীঘাট হোতে ধর্ম্মতলার ট্রাম
চালিয়ে গিয়েছি তেরটা বছর ধরে,
ছুটি মিলেনিকো হয়নি তো যাওয়া গ্রাম।

'কাজল' নদীর কথাটা গিয়েছি ভুলে,
কচুরী পানায় ঢেকে গেছে নাকি জল;
দুটো পার তার হাসে না কাশের ফুলে
—তেরটা বছর চালিয়েছি শুধু কল!

গোধূলি বেলায় মেঘে মেঘে রঙ খেলা
প্রাণভরে দেখা দেখিবার অবসর
পাইনি এখানে—টাকা কড়ি করি' হেলা
উপায় ছিল না ফিরিয়া যাবার ঘর।

আজ তিন মাস বেরি বেরি আর কাশি
রোগে পড়ে আছি—কোম্পানী দিলো ছুটি,
বাদলে বাদলে আকাশের সারা হাসি
নিভে গিয়েছিল আবার উঠিলো ফুটি'।

একটু আকাশ দেখি জানালার ফাঁকে
আর সে আকাশ ময়ূরকণ্ঠী নীল,—
মনে হয় খালি গ্রাম সে আমায় ডাকে—
চরের বুকেতে উড়ে যায় গাঙচিল।

জানি না সেখানে ফিরবো কি কোনদিন—
ভয় হয় আজ পথে যদি হই বার,
তা হোলে ট্রামের ঘণ্টিটা টিন্ টিন্
শুনতে যে হবে—নেইকো সে সাধ আর।

তবে যদি পারো তোমরা তা হোলে কেউ
মোড় হোতে এনো শিউলি কুড়িয়ে দুটো
'কাজল' নদীতে খেলে নাকো আজি ঢেউ
—ট্রাম চালিয়ে যে জীবনটা হ'ল ফুটো।

নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধা আর্ম্মষ্ট্রং *

অতীতের গৌরবময় প্রতিষ্ঠার চেতনা জাতিকে অনুপ্রাণিত করিয়া অগ্রগতির পথে চালিত করে। যে ভিত্তি একবার সুদৃঢ় সূচনার উপর স্থাপিত হয়, তাহা শত বাধা বা শত বহিঃ-বিপ্লবেও সমূলে উৎপাটিত হয় না। ঝড়-ঝঞ্ঝা উপরিস্থ সৌধকে বিধ্বস্ত করিলেও নিম্নস্থ চিরস্থির ভিত্তি অটুট রহিয়া যায়। সেই ভিত্তির উপরই নব উদ্যম লইয়া ধীরে ধীরে সৌধ রচনা কার্য্য আরম্ভ হয়। নিগ্রো জাতির মুষ্টিযুদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে এইরূপই এক সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ভিত্তির উপর ভাঙা-গড়ার ইতিহাস জানিতে পারা যায়। তরুণ নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধা জো লুই বা আর্ম্মষ্ট্রং যে বিশ্ববিজয়ী নাম অর্জ্জন করিয়া নিগ্রো জাতির মুষ্টিযুদ্ধে কৃতিত্বকে বর্ত্তমানে আকাশ-চুম্বী কীর্ত্তিস্তম্ভে পরিণত করিয়াছে, সে স্তম্ভের ভিত্তি প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে বেতনভোগী সামান্য ভৃত্য আমেরিকান নিগ্রো বিল রিচমণ্ড কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। হস্তাবরণ শূন্য হস্তদ্বয়ের উপর নির্ভর করিয়াই বিলকে ক্রীড়াক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হয়। বিলের প্রভু নী আমেরিকান নিজের নাম জাহির করিবার নিমিত্ত বিলকে মুষ্টিযুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ করিতে বাধ্য করেন। তিনি জানিতেন না যে বিলের কৃতিত্ব ভবিষ্যৎ নিগ্রো জাতিকে মুষ্টিযুদ্ধ ক্ষেত্রে সুনাম প্রতিষ্ঠার জন্য অনুপ্রাণিত করিবে। বিল মুষ্টিযুদ্ধের কৌশল জানিতেন না, কেবল দেহের ও মনের শক্তির উপর নির্ভর করিয়াই তিনি ক্রীড়াক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া সাফল্যলাভ করেন। দীর্ঘ ৩০ বৎসর ধরিয়া তিনি ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া সাফল্য লাভ করেন। ৫৫ বৎসর বয়সে যখন বিল অবসর গ্রহণ করেন তখনও পর্য্যন্ত ইউরোপ ও আমেরিকার শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধাগণ বিলের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে ভীত হইতেন। বিলের পর ১৮১০ সালে মোলিনিউ নামে আর এক নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধা প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইহার পর জ্যাক জনসন, পিটার জ্যাকসন এণ্ড বোয়ান প্রভৃতি নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধাগণ পৃথিবীর সর্ব্বত্র নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধাগণের নাম প্রচারের কারণ হন। তাঁহাদের পরই জর্জ্জ ডিকেন্স, টাইগার ফ্লাওয়ার, জো ওয়ালকাট প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের পরই টেরী ম্যাকগভর্ণ, জো গ্যান প্রভৃতি নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধাগণ ক্রীড়াক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া মুষ্টি-যুদ্ধ ইতিহাসে নিগ্রোজাতির নাম বিলোপ পাইবার সুযোগ দেন না। তাঁহাদের পর জো লুই ও আর্ম্মষ্ট্রং ক্রীড়াক্ষেত্রে উজ্জ্বল তারকার ন্যায় দেখা দিয়াছেন। জো লুই বর্ত্তমানে বিশ্ববিজয়ী হেভী ওয়েট চ্যাম্পিয়ান। এই পর্য্যন্ত ৬।৭ জন মুষ্টিযোদ্ধা জো লুইয়ের সম্মান কাড়িয়া লইবার জন্য অগ্রসর হইয়া শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়াছেন। আর্ম্মষ্ট্রংয়ের কৃতিত্ব **কোন অংশে কম নহে। তিনি এক বৎসরের মধ্যে মুষ্টি-**যুদ্ধের তিনটি বিভাগে পৃথিবীর চ্যাম্পিয়ান হইয়াছেন। এই পর্য্যন্ত উক্ত তিন বিভাগের অর্থাৎ ওয়েলটার ওয়েট, ফেদার ওয়েট ও লাইট ওয়েট চ্যাম্পিয়ানশিপের জন্য যতগুলি মুষ্টি-যুদ্ধ হইয়াছে আর্ম্মষ্ট্রং কোনটিতেই পরাজিত হন নাই। তাঁহার অসীম মানসিক ও দৈহিক শক্তি তাঁহাকে বিশ্ববিজয়ী করিয়াছে। আমেরিকার সকল মুষ্টিযোদ্ধাই আর্ম্মষ্ট্রংকে "অপরাজেয়" আখ্যা দিয়া থাকেন। কেহ কেহ তাঁহার মুষ্টি-চালনার তৎপরতা দেখিয়া "পার্পেচুয়াল মোসন" বা অফুরন্ত শক্তি আখ্যা দিয়াছেন।

আর্ম্মষ্ট্রংয়ের বর্ত্তমান বয়স ২৬ বৎসর। ২৫ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে আর্ম্মষ্ট্রং বিশ্ববিজয়ী নাম পাইবার সুযোগ পান না। ইহার পূর্ব্বে আর্ম্মষ্ট্রং রেল লাইনে কুলির কার্য্য করিতেন। গুরুভার হাতুড়ী ঠোকার কার্য্য তাহাকে করিতে হইত। অল জনসন নামক নিগ্রো চলচ্চিত্র পরিচালক তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করেন। দুই তিন বৎসর অখ্যাত নাম মুষ্টিযোদ্ধাদের সহিত লড়িবার পর আর্ম্মষ্ট্রংকে বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা পেটী স্যারনের সহিত লড়িতে হয়। পেটী স্যারন ফেদার ওয়েট বিভাগে তখন সুনাম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আর্ম্মষ্ট্রং স্যারনকে ষষ্ঠ রাউণ্ডে ভূতলশায়ী করেন। ইহার পর লু এম্বার্স, বার্ণী রস, বব ফিট্, সিমনস প্রভৃতি মুষ্টিযোদ্ধাকে পরাজিত করেন। এই সমস্ত বিশিষ্ট মুষ্টিযোদ্ধাগণের পরাজয়ের কথা প্রচারিত হইতেই আর্ম্মষ্ট্রংয়ের নাম প্রসারলাভ করে। আর্ম্মষ্ট্রং ফেদার ওয়েট, লাইট ওয়েট, ওয়েলটার ওয়েট প্রভৃতি বিভিন্ন মুষ্টিযুদ্ধ বিভাগের চ্যাম্পিয়ানশিপের জন্য অগ্রসর হন ও সাফল্য লাভ করেন। প্রত্যেকটি বিভাগেই প্রতিদ্বন্দ্বী মুষ্টি-যোদ্ধাগণকে আর্ম্মষ্ট্রংয়ের ক্ষিপ্র প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাতের নির্য্যাতন সহ্য করিতে না পারিয়া ভূতলশায়ী হইতে হইয়াছে। বর্ত্তমানে আর্ম্মষ্ট্রং ইংলণ্ডে অবস্থান করিতেছেন। ইউরোপের উক্ত তিন বিভাগের শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধাগণের সহিত লড়িবার তাঁহার ইচ্ছা আছে। সকলে তাঁহার বিপক্ষে লড়িবার জন্য অগ্রসর হইবেন কিনা সেই বিষয় যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আর্ম্মষ্ট্রংয়ের বিশ্বজোড়া নাম ইউরোপের মুষ্টিযোদ্ধা-গণের প্রাণে ভীতির সঞ্চার করিয়াছে। আর্ম্মষ্ট্রংয়ের ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে নানারূপে গুজব শোনা যায়। কেহ বলে চল-চ্চিত্রে যোগদান করিবেন, কেহ বলে ধর্ম্মপ্রচারক হইবেন। ধর্ম্মপ্রচারক হওয়ারই বিশেষ সম্ভাবনা কারণ তাঁহার স্ত্রী এক-জন ধর্ম্মপ্রচারকের কন্যা। মুষ্টিযোদ্ধাগণ সাধারণত রুক্ষ ও কর্কশ স্বভাবাপন্ন হইয়া থাকেন। কিন্তু আর্ম্মষ্ট্রংয়ের স্বভাব ঠিক তাহার বিপরীত। তিনি স্বল্পভাষী, অমায়িক ও নম্র।

অজস্র অর্থোপার্জ্জন করা সত্ত্বেও তাঁহার [illegible] ভিকতা স্থান পায় নাই।

সাপ্তাহিক সংবাদ

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু আগামী ২৩শে এপ্রিল ভারতের সর্ব্বত্র যুদ্ধ-বিরোধী দিবস প্রতিপালনের জন্য অনুরোধ করিয়া এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ দিবস সভা করিয়া এবং অন্যভাবে আন্দোলন চালাইয়া পার্লামেণ্টের লর্ডস সভায় ভারত শাসন আইনের যে সংশোধন বিল উত্থাপিত হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতে এবং সাম্রাজ্যবাদীদের কোন যুদ্ধে যোগদান না করার কংগ্রেস-নীতি পুনরায় অনুমোদন করিতে তিনি বলিয়াছেন।

মেঘনাদ বধ কাব্যের টীকাকার, "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" প্রভৃতি পুস্তকের প্রণেতা, বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয় গতকল্য রাত্রি ২-৩০ ঘটিকায় নিজ বাসভবন আগড়পাড়ায় পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৬ বৎসর হইয়াছিল।

রাজসাহী কলেজের হিন্দু হোষ্টেলের ভূতপূর্ব্ব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অধ্যাপক বাণীকান্ত ব্যানার্জ্জিকে সাময়িকভাবে উক্ত কলেজের মুসলিম হোষ্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত করা হইয়াছে। প্রকাশ, মুসলিম হোষ্টেলের ছাত্রগণ উক্ত হোষ্টেলের মুসলমান সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বিরুদ্ধে প্রিন্সিপালের নিকট কতকগুলি অভিযোগ করেন। কিন্তু তাঁহাদের অভিযোগের অবিলম্বে প্রতিকার না হওয়ায় হোষ্টেলের ছাত্রগণ অনশন ধর্ম্মঘট করে। অবশেষে প্রিন্সিপাল হস্তক্ষেপ করেন এবং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁহার পদ ইস্তফা দেন।

ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর কলিকাতাস্থ ম্যানেজিং এজেণ্টস বার্ণ এণ্ড কোম্পানী এবং জামসেদপুরে লেবার ফেডারেশনের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য বাঙলা গবর্ণমেণ্ট শ্রমিক-বিরোধ আইনের ৬ ধারা অনুসারে যে সালিশ বোর্ড গঠন করিয়াছিলেন অদ্য কলিকাতা গেজেটে তাহার রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে।

ডিগবয় অয়েল কোম্পানীর শ্রমিকদের ধর্ম্মঘটের অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে; পুলিশ ধর্ম্মঘটীদের উপর গুলী চালাইয়াছে, ফলে তিনজন শ্রমিক নিহত হইয়াছে এবং বহু শ্রমিক আহত হইয়াছে। নিহতদের নাম পরাণেশ্বর চৌধুরী, সত্যেন চক্রবর্ত্তী ও চণ্ডী আহীর। ইহারা সকলেই লেবার ইউনিয়নের সভ্য। এই ধর্ম্মঘটীদের প্রতি সহানুভূতি দেখাইবার জন্য ডিব্রুগড়-সদিয়া রেলওয়ের শ্রমিকগণও ধর্ম্মঘট করিয়াছে। তিনসুকিয়া ও ডিগবয়ে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারা জারী করা হইয়াছে। পুলিশের গুলী বর্ষণের প্রতিবাদে যে সভা হইয়াছে তাহাতে ২০ হাজার শ্রমিক যোগদান করে। ডিগবয়ে গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ায় রাজস্ব-মন্ত্রী ঘটনাস্থলে যাত্রা করিয়াছেন।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু জামাডোবায় গিয়া রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসুর সহিত সাক্ষাৎ করেন। উভয়ের মধ্যে প্রায় ৫ ঘণ্টা কালব্যাপী আলোচনা হয়।

২০শে এপ্রিল—

আলিপুরের ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জি ঘোষাল তারকেশ্বরে ... গিরি এবং অপর সাত ব্যক্তিকে জালিয়াতির ষড়যন্ত্র করিবার অভিযোগে দায়রায় সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

ডিগবয়ে পুলিশের গুলী বর্ষণের ফলে আহত ১৪ জনের মধ্যে এক জনের মৃত্যু হইয়াছে।

"আনন্দবাজার পত্রিকা" জানিতে পারিয়াছেন যে, কলিকাতা কর্পোরেশনে মুসলমানদের স্থায়ী আধিপত্য স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের জন্য যে সাতটি আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা লইয়া নির্ব্বাচন হইবে না; সরকারই উক্ত সাত জনকে মনোনীত করিবেন। এই সিদ্ধান্ত লইয়া মন্ত্রীদের মধ্যে গভীর মতভেদ ঘটিয়াছে।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন কমন্স সভায় ঘোষণা করিয়াছেন যে, সমর-সম্ভার সরবরাহের জন্য একটি নূতন দপ্তর খোলা হইবে। ডাঃ ই এল বার্গিনের উপর উহার ভার অর্পণ করা হইবে। সম্প্রতি সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত করায় উহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের সমস্যা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু সমস্যার ব্যবস্থাও এই নবগঠিত দপ্তরখানাই করিবেন। দেশরক্ষার পরিকল্পনা সম্পর্কে যে-সব প্রধান প্রধান ধাতব বস্তু ও অন্যান্য কাঁচা মাল সংগ্রহ করা ও মজুত রাখা দরকার তাহার ভারও এই নূতন মন্ত্রীর উপর ন্যস্ত থাকিবে।

"বন্দে মাতরম্" সঙ্গীতের অঙ্গচ্ছেদের প্রতিবাদকল্পে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা তাঁহার ১৬নং সতীশ দাস রোডস্থ (বালিগঞ্জ) বাসভবনে অনশন আরম্ভ করিয়াছেন।

কটক মেডিক্যাল স্কুল ছাত্র ধর্ম্মঘট গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। অদ্য সেক্রেটারিয়েটের সম্মুখে সত্যাগ্রহকারী ১২ জন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

পাটনা হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ যে, বিহারের কংগ্রেসী গবর্ণমেণ্টের আদেশক্রমে সাঁওতালী হাইস্কুল হইতে জাতীয় পতাকা অপসারণের ফলে উক্ত স্কুলের ছাত্রবৃন্দ যে ধর্ম্মঘট করিয়াছিল তাহার সমর্থনে সাঁওতালী মহকুমার অন্তর্গত হাইস্কুলের ছাত্রগণও ধর্ম্মঘট সুরু করিয়াছে। জাতীয় পতাকা সম্পর্কিত সমস্যার সমাধানকল্পে বিহারের কংগ্রেসী গবর্ণমেণ্ট যে দুর্ব্বলতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার ফলে বিহারের ছাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে ৪টি বে-সরকারী প্রস্তাবের আলোচনা হয়। কোয়ালিশনী দলের সদস্যগণ কর্ত্তৃক উত্থাপিত আই-সি-এস এবং আই-পি-এস এর নবনিয়োগের ক্ষেত্রে বেতনের হার হ্রাস সম্পর্কিত একটি প্রস্তাব এবং কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কার্য্যপদ্ধতি ও আর্থিক ব্যাপারের তদন্তের উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করা সম্পর্কে একটি প্রস্তাব পরিষদে গৃহীত হয়।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের পরিবর্ত্তে বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্ব্বাচিত গণ-পরিষদ কর্ত্তৃক গঠিত একটি শাসনতন্ত্রের প্রবর্ত্তন করা সম্পর্কে কৃষক-প্রজাদলের একজন সদস্য কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি ৭৬-৬৮ ভোটে অগ্রাহ্য হয়।

২১শে এপ্রিল—

রাষ্ট্রপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু জামাডোবা হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধন বিলে মন্ত্রীদের মধ্যে ঘোরতর মতভেদ দেখা দিয়াছে। ইহার ফলে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে মিউনিসিপ্যাল বিলের আলোচনা গবর্ণমেণ্ট ১লা মে পর্য্যন্ত স্থগিত রাখিয়াছেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে ই বি রেলওয়ের মাজদিয়ায় শোচনীয় দুর্ঘটনার বিষয়টি উত্থাপিত হয় এবং এই সম্পর্কে ই বি রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের আচরণের তীব্র সমালোচনা করা হয়। দুর্ঘটনা সম্পর্কে রেলওয়ে কর্ম্মচারীদের আচরণের তদন্ত করিবার জন্য একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করিতে অবিলম্বে ভারত গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হইবে বলিয়া স্থির হয়।

কটক মেডিক্যাল স্কুল ছাত্র ধর্ম্মঘট সম্পর্কে আরও ২৮ জন সত্যাগ্রহী ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহারা সরকারী দপ্তরখানার সম্মুখে অবস্থান ধর্ম্মঘট করিতেছিল।

বৃটেন, ফ্রান্স ও সোভিয়েট সরকারের মধ্যে বর্ত্তমানে যে আলোচনা চলিয়াছে, তাহাতে সোভিয়েটের পক্ষ হইতে কতকগুলি প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছে। পররাজ্য আক্রমণের প্রতিরোধাত্মক উপায় আবিষ্কারের জন্য এই সব প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছে।

২২শে এপ্রিল—

বালীতে (হাওড়া) তড়িতাহত হইয়া এক পরিবারের চারজনের সকলেই শোচনীয়ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

দীর্ঘকাল যাবৎ অনাবৃষ্টির ফলে মফঃস্বলের বহু পল্লীগ্রামাঞ্চল হইতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু কলিকাতা শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক বিরাট জনসভায় দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে এক গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা করেন। রাষ্ট্রপতি বসু বলেন যে, জার্ম্মানী ও ইটালীর আক্রমণাত্মক নীতির বিরুদ্ধে ইংলণ্ড ইউরোপের দেশসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী করিয়াছে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রযোজ্য। সুতরাং এই সময় কংগ্রেসের ভিতরকার ভেদ বিরোধ দূর করিয়া উহাকে শক্তিশালী করতঃ একযোগে ভারতের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী উপস্থিত করিতে হইবে। মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধন বিল সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতি বলেন যে, গায়ের জোরে ব্যবস্থা পরিষদে এই বিল পাশ করিলেও উহা ব্যর্থ করিতে হইবে। সেজন্য প্রয়োজন হইলে সত্যাগ্রহ, পদত্যাগ বা অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

ফরাসী মন্ত্রিসভা দেশরক্ষা ব্যবস্থার জন্য করবৃদ্ধি ও ব্যয়হ্রাসের ক্ষমতা দিয়া অদ্য কতকগুলি নূতন বিধান অনুমোদন করিয়াছেন। বে-সরকারীভাবে বলা হইয়াছে যে এই ব্যবস্থার জন্য ফ্রান্সের ১৭ শত কোটি ফ্রাঙ্ক ব্যয় হইবে।

হাঙ্গেরীর ওয়াকিবহাল মহলের বিশ্বাস, হাঙ্গেরী করেকটি সর্ত্তে যুগোশ্লাভিয়ার সহিত একটি অনাক্রমণ চুক্তি করিতে রাজী হইবে।

পাঞ্জাব ব্যবস্থা পরিষদে প্রধানমন্ত্রী সহ ৬ জন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ৬টি অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে।

মহাত্মা গান্ধী অদ্যকার হরিজন পত্রে "তালচেরের শোচনীয় অবস্থা" শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উহাতে তিনি গত ২১শে ম্যার্চ্চ উত্তর উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্যসমূহের সহকারী পলিটিক্যাল এজেণ্ট মেজর হেনেসী এবং দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মহতাপের মধ্যে যে চুক্তি হইয়াছে, উহার সর্ত্তসমূহ প্রকাশ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, এই সকল সর্ত্ত পালনে বিলম্ব করা শুধু বিপজ্জনক নহে, উহা অপরাধমূলকও। তালচেরের ২০।২৫ হাজার আশ্রয়প্রার্থী বৃটিশ উড়িষ্যার আঙ্গুলের জঙ্গলে কি দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছে, মহাত্মা গান্ধী উক্ত প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ করেন।

প্যারিসের ওয়াকিবহাল মহলের নিকট হইতে "রয়টার" জানিতে পারিয়াছেন যে, পূর্ব্ব ভূমধ্যসাগরের নিরাপত্তা সম্পর্কে বৃটেন, ফ্রান্স ও তুরস্কের মধ্যে যে আলোচনা চলিতেছে, শীঘ্রই তাহার সন্তোষজনক পরিসমাপ্তি ঘটিবে।

জার্ম্মান সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান পোল্যাণ্ডে জার্ম্মানদের উপর উৎপীড়নের অভিযোগ করিয়া আর একটি নূতন তালিকা প্রচার করিয়াছে।

২৩শে এপ্রিল—

মহারাষ্ট্রের হিন্দু নেতা শ্রীযুক্ত এল, বি, ভোপৎকার নিজাম রাজ্যে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদান করিয়াছেন। আর্য্যসমাজ কর্ত্তৃক ব্যাপক সত্যাগ্রহ ঘোষণার পর দুই দিনে ৭৩২ জন সত্যাগ্রহী গ্রেপ্তার হইয়াছে।

চম্পারণ জেলায় রক্সৌলে অগ্নিকাণ্ডের ফলে কতিপয় ব্যক্তি অগ্নিদগ্ধ হইয়া মারা গিয়াছে এবং প্রায় এক হাজার লোক গৃহহীন হইয়াছে।

স্যার উজীর হাসানের পুত্র এবং যুক্ত প্রদেশ ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মিঃ সৈয়দ আলি জহরী লক্ষ্ণৌ-এ তাব্বারা আন্দোলন সম্পর্কে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। ইহা ছাড়া অযোধ্যার ভূতপূর্ব্ব রাজপরিবারের প্রিন্স মেহেদী হাসান এবং প্রিন্স মহম্মদ আগা হাসান প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই সম্পর্কে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু পুনরায় আগামী বৎসরের জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদ গঠন করার ক্ষমতাও দেওয়া হয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির মোট ৫৪৪ জন সদস্যের মধ্যে ৪২০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। অধিবেশনে সমিতির গঠনতন্ত্রের কিছু অদল-বদল করা হয়।

রাজকোট সমস্যায় অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। দরবার বীরবলের সহিত গান্ধীজীর যে [illegible] ছিল, তাহা পুনরায় ব্যর্থ হইয়াছে [illegible]

সকল প্রস্তাব করিয়াছিলেন এবং রাজকোট দরবার যে সকল পাল্টা প্রস্তাব করিয়াছিলেন, গান্ধীজী তাহা তাঁহাদের নিকট সবিস্তারে বর্ণনা করেন এবং কি কারণে আলোচনা ব্যর্থ হইল তাহা বুঝাইয়া দেন। পরিষদ কর্ম্মীদের ভবিষ্যৎ কার্য্য-পদ্ধতি এবং কর্তৃপক্ষের সহিত তাঁহাদের কিরূপ সম্পর্ক হইবে, তৎসম্পর্কেও তিনি তাঁহাদের সহিত আলোচনা করেন এবং কর্ম্মীদিগকে গঠনমূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবার উপদেশ দেন।

ভিনিসে ইতালীর পররাষ্ট্র সচিব কাউন্ট সিয়ানো এবং যুগোশ্লাভিয়ার পররাষ্ট্র সচিব মঃ মার্কোভিচের মধ্যে আলোচনা হয়। ফলে উভয় রাষ্ট্র দানুবীয় রাষ্ট্রসমূহের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে রাজনীতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যুগোশ্লাভিয়া ও জার্ম্মানীর মধ্যে পারস্পরিক সহ-যোগিতা প্রতিষ্ঠা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে।

জনৈক চীনা সামরিক মুখপাত্র দাবী করিয়াছেন যে, চীনাবাহিনী বিগত ২০ দিনে ৭০টির অধিক শহর অধিকার করিয়াছে; তন্মধ্যে অনেকগুলি শহরের সামরিক গুরুত্ব খুব বেশী। চীনাদের সামরিক ইস্তাহারে প্রকাশ যে, চীনারা নানকিং-চিং-কিয়াং অঞ্চলে জাপানীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক আক্রমণ চালাইতেছে।

২৪শে এপ্রিল—

ই আই রেলপথে আবার দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। গ্রান্ড কর্ড লাইনের ডিহরী-অন-শোন ষ্টেশনে একটি মাল গাড়ীর সহিত একসঙ্গে বাঁধা দুইটি লাইট ইঞ্জিনের সংঘর্ষ হয়। ফলে মাল গাড়ীর গার্ড নিহত হইয়াছে।

পাটনা হইতে ছয় মাইল দূরবর্ত্তী ফুলওয়ারা শরিফ নামক স্থানটি কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনের স্থান নির্ব্বাচিত হইয়াছে।

ডিগবয় গুলীবর্ষণ সম্পর্কে ম্যাজিষ্ট্রেট তদন্ত আরম্ভ করিয়াছেন এবং জনসাধারণকে সাক্ষ্য দিতে আহ্বান করিয়াছেন। কয়েকজন লোক সাক্ষ্যে বলিয়াছে যে, তাহারা ঘটনা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। তাহারা বলে যে, কোম্পানীর কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারী গুলী বর্ষণ করিয়াছে এবং তাহাতে প্রাণহানি হইয়াছে।

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির বিশেষ সাধারণ সভার অধিবেশনে প্রাথমিক, মহকুমা, জেলা ও প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির মধ্যে সভ্যের চাঁদা বাবদ আদায়ী চারি আনা বণ্টন করা সম্পর্কিত একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সরকারী অনুষ্ঠানে কংগ্রেস কর্ম্মীদের যোগদান নিষিদ্ধ করিয়া ও কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন বিলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া সভায় আরও দুইটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

যুদ্ধবিরোধী দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে কলিকাতা ইউ-নিভার্সিটি হলে এক জনসভায় রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু বক্তৃতা [illegible] তিনি আসন্ন যুদ্ধে অর্থবল ও লোকবল দ্বারা [illegible] যা না করিতে সকলকে উপদেশ দেন।

[illegible]এসোসিয়েশনের এক সভায় কলিকাতা কর্পোরেশনের আগামী মেয়র ও ডেপুটি মেয়র নির্ব্বাচন সম্পর্কে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে মেয়র ও ডেপুটি মেয়রের পদের জন্য প্রার্থী মনোনয়ন করার ভার উক্ত এসো-সিয়েশনের নেতা শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর উপর অর্পিত হয়। কর্পোরেশনের বিভিন্ন ষ্ট্যান্ডিং কমিটিগুলির সভ্য নির্ব্বাচন এবং প্রতি কমিটির চেয়ারম্যান ও ডেপুটি চেয়ারম্যান স্থির করার ভারও শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর উপর অর্পিত হয়।

রাজকোট শাসন সংস্কার কমিটি গঠন সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী ও মিঃ বীরবলের মধ্যে যে আপোষ-আলোচনা চলিতে-ছিল, তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী মিঃ বীরবলের নিকট এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, উহাতে তিনি মিঃ বীরবলের প্রস্তাবমত শাসন সংস্কার কমিটি নির্ব্বাচনে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী পত্রে উল্লেখ করিয়াছেন যে, সাতটি সদস্যপদের মধ্যে চারটি সদস্যপদই যদি কয়েকটি সম্প্রদায়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা হয়, তবে বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ জন-গণ সংখ্যালঘিষ্ঠে পরিণত হইবে।

মহাত্মাজী রাজকোট ত্যাগ করিয়াছেন, রাজকোটের ব্যাপার সম্পর্কে গান্ধীজী এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন, "কেবলমাত্র সাহসীরাই অহিংসার বর লাভে সক্ষম হইয়া থাকে। তাই আজ আমাকে শূন্য হস্তে, বিধ্বস্ত দেহে সমস্ত আশায় জলাঞ্জলি দিয়া ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে।" তিনি বলেন, "রাজকোটের গবেষণাগারে আমি যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছি, তাহা অমূল্য। কাথিয়াবাড়ের কুটীল রাজনীতি দ্বারা আমার ধৈর্য্যের অগ্নিপরীক্ষা হইয়া গিয়াছে।"

আলিপুর চিড়িয়াখানায় একটি হিপোপটেমাস (জল-হস্তী) ফুলেশ্বরী নাম্নী এক মুসলমান যুবতীকে অতি নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, যুবতীটি যখন একটি প্রকান্ড হিপোকে বেড়ার বাহির হইতে হাত বাড়াইয়া খাবার দিতেছিল, সেই সময় অকস্মাৎ হিপোটি লাফাইয়া উঠিয়া তাহার হাত কামড়াইয়া দেয় এবং লোহার রেলিং-এর মধ্য দিয়া তাহাকে টানিয়া একেবারে বেড়ার ভিতরে লইয়া যায়। হিপোটি অতঃপর চোয়াল দিয়া যুবতীটিকে কামড়াইয়া দেওয়ালের সঙ্গে চাপিয়া ধরে এবং তাহাকে খন্ড খন্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে যুবতীটির মৃত্যু হয়।

শ্রীহট্ট জেলার সুনামগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত ভাটিপাড়ার জমিদারদিগের কর্ম্মচারিগণের অভিযোগক্রমে ফৌজদারী কার্য্য-বিধি আইনের ১৪৫ ধারা অনুসারে রাজাপুর গ্রামের ধানী-জমি ক্রোক হয়। নিলাম খরিদসূত্রে জমিদারের লোকজন ধান লইয়া যাইতে না পারে, এইজন্য সত্যাগ্রহ আরম্ভ করা হয়। জমিতে প্রবেশ করিয়া সত্যাগ্রহ করার অভিযোগে ৪৪৭ ধারা অনুসারে আসাম ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত করুণাসিন্ধু রায় প্রমুখ এগারজন কংগ্রেসকর্ম্মী গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

বজবজে মিউনিসিপ্যাল এলাকায় সভা ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করিয়া ১৪৪ ধারা জারী করা হইয়াছে।

কমন্স সভায় মেজর এটলীর এক প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেন ঘোষণা করেন যে, বৃটেন জার্ম্মানীর চেকোশ্লোভাকিয়া অধিকার স্বীকার করেন নাই

বিচিত্র বার্ত্তা

সংখ্যাগরিষ্ঠের মর্য্যাদা

বার্নার্ড শ'য়ের কোন নাটক যখন রঙ্গালয়ে অভিনীত হইতে সুরু হয়, সকল দর্শকই নাটকখানির তারিফ করিতে থাকে। কিন্তু এক ব্যক্তি হিস্ হিস্ করিয়া তাহার বিরক্তি প্রকাশ করিতে থাকে। সকল বাহবার সমগ্রতা ভেদ করিয়া ঐ বিরক্ত ব্যক্তির অপ্রিয় টিপ্পনি এমনই ছাপাইয়া উঠে যে, যবনিকা ফেলিয়া বার্নার্ড শ'কে আসিয়া হাজির হইতে হইল দর্শকদের সম্মুখে। শ' কালবিলম্ব না করিয়া প্রশ্ন করেন—আপনি আমার নাটকখানিকে খারাপ মনে করেন? সে ব্যক্তি বিনা কুণ্ঠায় বলে—খারাপ শুধু, একেবারে রদ্দি। তৎক্ষণাৎ শ' বলিয়া ফেলেন—ঠিক বলিয়াছেন, আমিও আপনার সঙ্গে একমত। কিন্তু এতগুলি দর্শকের বিরুদ্ধে আমরা দুইজন কি করিতে পারি? সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠের মান রাখিতে হয়।

প্রণয়ের টানে রাজকুমারীও আলুর খোসা ছাড়ায়

প্রিন্সেস নেটালি রাশিয়ার অভিজাতবংশে বিবাহের জন্যই লালিত-পালিত হইয়াছিল। তাহাকে ফরাসী ও ইংরেজী ভাষা শিখান হইয়াছিল; পিয়ানো বাজাইতে, নৃত্য করিতে, বক্তৃতাদানে তাহাকে পারদর্শিনী করা হইয়াছিল। সেলাই বা রান্না শেখান হয় নাই—কারণ ঐ সকল তাঁহার রাজপরিবার উপযোগী সমাজে হীনকার্য্য বলিয়াই বিবেচিত। কিন্তু বিপ্লবের বন্যা আসিল। নেটালিকে কোনপ্রকারে জনতার আক্রোশ এড়াইয়া লণ্ডনে পাঠান হইল ম্যাগেমেমনন্ নামক জাহাজে। জাহাজের তরুণ এক মিড্‌শিপম্যান মাইকেল ম্যাক্‌জোলিয়রের সহিত জাহাজেই নেটালির পরিচয় হয় এবং উভয়েই আকৃষ্ট হয়। ফলে ইংলণ্ডে পৌঁছিয়া তাহাদের বিবাহ হয়।

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বেও নেটালি রান্নার কিছুই জানিত না। স্টোভে ডিম সিদ্ধ করা ও চা তৈরী ব্যতীত রান্নার আর কিছুই তাহার জানা ছিল না। কিন্তু এখন মাইকেলের অবস্থা এমন নয় যে, সে পরিচারিকা রাখিতে পারে। সুতরাং নেটালিকে সকল কাজই শিখিতে হইয়াছে। দামী পরিচ্ছদ সে পায় না, প্রসাধনের উপকরণেরও নিতান্ত অভাব। ফলে, নেটালির হাতের নখ পালিশ করা হয় না বা বার্ণিশ লাগান হয় না; চুলেও ঢেউ খেলান কায়দা আনিবার সুযোগ নাই পয়সার অভাবে। ছেঁড়া, ময়লা পোষাকে তাঁহাকে অনেক সময়ই নিজেদের ঘরকন্নার বাজার করিতে হয়।

কিন্তু নেটালি তাহা বলিয়া খেদ প্রকাশ করে না, স্বামীর নিকট অভিযোগ জানায় না। সে বলে,—

আমি এবং আমার স্বামী পরস্পর অতিশয় অনুরক্ত। সকল কাজই আমি করি, তবে ইস্ত্রি করা, উনান ধরান ... করা—এ সব আমার ভাল লাগে না, কিন্তু রান্না করা ... বাসন-মাজা আমার বেশ লাগে।

আমার মনে হয়, পুরাতন অভিজাত জীবনে ফিরিয়া যাওয়া সম্ভব হইলেও আমি আর ফিরিতাম না, কারণ আমি আমার স্বামীকে ভালবাসি, আমার স্বামীও আমাকে অতিশয় ভালবাসে। অভিজাত জীবনে ফিরিয়া গিয়া কিছুতেই শান্তি পাইব না।

...যাওয়ার সম্ভবনা রহিয়াছে, তাহার মানসিক সুস্থতার

"দেশ"এর নিয়মাবলী

(১) সাপ্তাহিক "দেশ" প্রতি শনিবার প্রাতে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। মফঃস্বলের কাগজ ঐ দিনই ডাকে দেওয়া হয়।

(২) চাঁদার হার। (ক) ভারতে:—ডাকমাশুল সহ ৫১ পাঁচ টাকা; ষাণ্মাসিক ২৸০ টাকা। (খ) ব্রহ্মদেশ ও ভারতের বাহিরে অন্যান্য দেশে:—ডাকমাশুল সহ বার্ষিক ১০১ টাকা; ষাণ্মাসিক ৫১ টাকা। ছয় মাসের কম সময়ের জন্য গ্রাহক করা হয় না।

(৩) ভিঃ পিঃ-তে লইলে যতদিন পর্য্যন্ত ভিঃ পিঃ-র টাকা আসিয়া না পৌঁছায় ততদিন পর্য্যন্ত কাগজ পাঠান হয় না। অধিকন্তু ভিঃ পিঃ খরচ গ্রাহককেই দিতে হয়। সুতরাং মূল্য মণিঅর্ডারযোগে পাঠানই বাঞ্ছনীয়।

(৪) যে সপ্তাহে মূল্য পাওয়া যাইবে সেই সপ্তাহ হইতে এক বৎসর বা ছয় মাসের জন্য কাগজ পাঠান হইবে।

(৫) কলিকাতায় হকারদের নিকট এবং মফঃস্বলে এজেন্টদের নিকট হইতে প্রতিখণ্ড "দেশ" নগদ ৴১০ (ছয় পয়সা) মূল্যে পাওয়া যাইবে।

(৬) টাকা পয়সা ম্যানেজারের নামে পাঠাইতে হইবে। টাকা পাঠাইবার সময় মণিঅর্ডারের কুপনে বা চিঠিতে "দেশ" কথাটি স্পষ্ট উল্লেখ করিতে হইবে।

বিজ্ঞাপনের নিয়ম

"দেশ" পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার সাধারণত নিম্নলিখিতরূপ :—

একবারের জন্য—পূর্ণ পৃষ্ঠা ৪৫১, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ২৪১, সিকি পৃষ্ঠা ১৪১ এবং এক পৃষ্ঠার আট ভাগের এক ভাগ ৮১ টাকা। এক বৎসর, ছয় মাস, তিন মাস বা এক মাসের জন্য এককালীন চুক্তি করিলে দরের তারতম্য হয়। বিশেষ কোনও নির্দ্দিষ্টস্থানে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে টাকাপিছু চারি আনা হইতে আট আনা বেশী লাগে।

বিজ্ঞাপনের "কপি" মঙ্গলবার অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার মধ্যে "আনন্দবাজার কার্য্যালয়ে" পৌঁছান চাই।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ ম্যানেজারের নিকট পত্র লিখিলে বা [illegible] সাক্ষাৎ করিলে জানা যাইবে।

বিজ্ঞাপনের টাকা পয়সা এবং কপি ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন এবং মণিঅর্ডারের কুপনে বা চিঠিতে "দেশ" কথাটি উল্লেখ করিবেন।

প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে নিয়ম

পাঠক গ্রাহক ও অন্যগ্রাহকবর্গের নিকট হইতে প্রাপ্ত উপযুক্ত প্রবন্ধ গল্প কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালিতে লিখিবেন। কোন প্রবন্ধের [illegible] ফেরত পাইতে হইলে [illegible] পাঠাইবেন [illegible]।

[illegible]

[illegible]

সম্পাদক 'দেশ' ১নং বর্ম্মণ ষ্ট্রীট কলিকাতা

বক্স ও ফোল্ডিং ক্যামেরা

এই ক্যামেরার সাহায্যে অনায়াসে এক সেকেণ্ডে যে কোন স্ত্রী, পুরুষ, বালক বালিকা, বাগান-বাগিচা ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের ফটো তুলিতে পারিবেন। বেকার লোক এই ক্যামেরা দ্বারা প্রত্যহ ৫১ আয় করিতে পারিবেন। এই ক্যামেরার সঙ্গে ফিল্ম কার্ড কেমিকেল ও শিক্ষাপ্রণালী পুস্তক বিনামূল্যে দেওয়া হয়। মূল্য ফোল্ডিং ক্যামেরা ৪১; বক্স ক্যামেরা ২নং ২৸০; ১নং ৩৸০। প্যাকিং ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

ন্যাশনাল ট্রেডিং কোং (দ)

১২৫ [illegible] ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৫০০১ পুরস্কার

মহাত্মা প্রদত্ত শ্বেতকুষ্ঠের অদ্ভুত বনৌষধি। একদিনে অর্দ্ধেক ও অল্প দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। যাঁহারা ডাক্তার, বৈদ্য ও হেকিমের ঔষধ ব্যবহার করিয়া নিরাশ হইয়াছেন তাঁহাদিগকেও এই দৈব ঔষধ ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি। গুণহীন প্রমাণিত হইলে উপরোক্ত ৫০০১ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। মূল্য ২১ টাকা।

বৈদ্যরাজ— শ্রীঅখিলকিশোর রাম

নং ১০, কাটারীসরাই (গয়া)

বিনামূল্যে

"সর্ব্বশান্তি কবচ" (উদয়পুরে 'কালী-মাতার বাড়ীতে সন্ন্যাসী প্রদত্ত)। ইহা সর্ব্বপ্রকার রোগ আরোগ্য ও কামনা পূরণে অব্যর্থ। রোগ ও কামনা জানাইয়া পত্র লিখিলে সন্ন্যাসীর আদেশে বিনামূল্যে পাঠাইয়া থাকি। শ্রীবসুদারঞ্জন চক্রবর্ত্তী, "শান্তি আশ্রম" মেরকুটা, পোঃ বিদ্যাকুট, (ত্রিপুরা)।

—সংহতি—

সম্পাদক— শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী

বাংলা ভাষায় সুলভতম মাসিক পত্র

বার্ষিক মূল্য—২১; প্রতি সংখ্যা তিন আনা।

বাঙলার খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও মনীষিগণের গল্প, কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও সচিত্র ভ্রমণ-কাহিনীতে সমৃদ্ধ হইয়া [illegible] শেষে প্রকাশিত হয়।

বৎসরের যে-কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়।

কলিকাতার [illegible] ও রেলওয়ে বুকষ্টলে পাওয়া যায়।

ঠিকানা :—

পরিচালক, 'সংহতি',

৭নং মুরলীধর সেন লেন, কলিকাতা।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত

ছেলেদের বিবেকানন্দ

(আট আনা)

প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

৬ষ্ঠ বর্ষ] শনিবার- ৮ই বৈশাখ ১৩৪৬, Saturday 22nd April 1939 [২৩শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

মাজদিয়া দুর্ঘটনা—

রেল দুর্ঘটনা তো একটা নিত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিলেই চলে, গত কয়েক মাসের মধ্যে ই, আই, রেলপথে পর পর কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। কিন্তু রবিবার রাত্রি ৩টা ২৩ মিনিটের সময় মাজদিয়া ষ্টেশনে যে শোচনীয় কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে, যাহার ফলে বাঙলা দেশের সর্ব্বত্র আজ একটা গভীর বিষাদের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে, আমরা ভাবিতেছি তাহাকে সত্যই দুর্ঘটনা বলিব, না বলিব অন্য কিছু? এমন ঘটনা অবশ্য অনেক সময় ঘটে, যেগুলির উপর মানুষের হাত থাকে না; মানুষের সকল ব্যবস্থাকে বিগড়াইয়া দিয়া অদৃশ্য কোন শক্তি মানুষের উপর ভীতিময় প্রভাব বিস্তার করে। আমরা অস্বীকার করিতেছি না সে শক্তিকে; কিন্তু আমাদের মনে বিষাদের সুতীব্র বিক্ষোভে আজ এই প্রশ্নই শুধু উঠিতেছে যে মাজদিয়ার ব্যাপার সত্যই কি এমন একটা ব্যাপার যাহাকে দুর্ঘটনা বলা যাইতে পারে? সত্যই কি যথোচিত সতর্ক ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া সত্ত্বেও সব বিগড়াইয়া দিয়া এই কাণ্ড ঘটিয়াছে? বহু জীবন হানি ঘটিয়াছে এই ব্যাপারে, অনেক অমূল্য জীবন আমরা হারাইয়াছি। হারাইয়াছি যাঁহারা আমাদের একান্ত বন্ধু এবং আত্মীয় তেমন লোককেও। জীবনের মূল্য কাহারও কম নয়। ই যে শোচনীয় ব্যাপার ঘটিল, নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস াজদিয়া ষ্টেশনের ভিতরে থাকিতেই ঢাকা মেল পিছন দিক ইতে সবেগে তাহার উপর আসিয়া পড়িল—এই যে ব্যাপার, তর্কতার ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া সত্ত্বেও কি ইহা ঘটিয়াছে, া—ঘটা সম্ভব হইতে পারে? অনেক লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছে, খমও হইয়াছে অনেক। আমরা জিজ্ঞাসা করি, যদি সতর্কতার ব্যবস্থা যথোচিতভাবে অবলম্বিত না হইয়া থাকে, তবে কেন য় নাই এবং তাহার জন্য দায়ী কে বা কাহারা? ডিভি-ন্যাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সকল দোষ ঢাকা মেলের ড্রাইভারের পর চাপাইয়াছেন। ঘটনার পরে তিনি যে বিবৃতি দয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, ঢাকা মেলের ড্রাইভার সগনাল অগ্রাহ্য করিয়া ষ্টেশনের মধ্যে গাড়ী ঢুকাইয়া দেয়। জানি না, তাঁহার এই বিবৃতি কতটা সত্য; ঘটনার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ তদন্ত না হওয়া পর্য্যন্ত, তাঁহার এই বিবৃতির সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিবার উপায় নাই। তিনি যে কথা বলিতেছেন, সে কথাও শোনা কথা। বিচার ইহার হইবে এবং দোষী যে, তাহার সাজাও হইবে; কিন্তু আমাদের কথা এই যে, একটা কারণকে মুখ্য বলিয়া ধরিয়া তাহার উপর জোর দিলেই চলিবে না; দেখিতে হইবে সেই সব আনুষঙ্গিক কারণকেও যেগুলির ফল মুখ্য, অর্থাৎ স্থূলত দৃষ্টিতে বা হাতের মাথায় যে-টি মুখ্য কারণ হইয়া দেখা দিয়াছে। মোটা হিসাবে যে মুখ্য কারণ ঘটাইয়াছে দোষী, সে ত আছেই, কিন্তু একা সেই দোষী নয়। অন্যান্য আনুষঙ্গিক কারণের সহযোগে যাহারা মুখ্য কারণটি ঘটিতে সাহায্য করিয়াছে দোষী তাহারাও। উপর হইতে নীচে—ছোট বড় যে যেমনই হউক, সেইভাবে এই ব্যাপারের সঙ্গে যে জড়িত আছে, যাহার দোষ ত্রুটি রহিয়াছে যেভাবেই হউক না কেন, সে এই শোচনীয় দুর্ঘটনার জন্য দায়ী। আমরা সাজা চাই তাহাদের সকলের। প্রথমতঃ ড্রাইভারের কথা। ড্রাইভার জীবিত আছে, যাহা বক্তব্য তাহা অবশ্যই বলিবে; কিন্তু আমাদের প্রশ্ন এই যে, নানারূপ ভাবে সিগন্যাল দেওয়া সত্ত্বেও ড্রাইভার সব অগ্রাহ্য করিয়া ষ্টেশনে গাড়ী ঢুকাইয়াছিল নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে, সাধারণের পক্ষে ইহা বিশ্বাস করিয়া উঠা সত্যই কঠিন। একটি সিগন্যাল নয়, কয়েক দফা সিগন্যাল অগ্রাহ্য ড্রাইভার করিয়াছে। বিবৃতিতে এমন প্রকাশ, দুর্ঘটনা ঘটিবার কত সময় পূর্ব্বে হইতে এই সিগন্যাল অগ্রাহ্য করিবার ঝোঁক ড্রাইভারের দেখা যায় এবং সেই সময়ের মধ্যে প্রতীকারের অন্য ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল কিনা, থাকিলে কেন করা হয় নাই এবং কাহারা করে নাই। তাহার পর প্রশ্ন হইতেছে এই যে, ড্রাইভার যদি তেমন কাজ করিয়াই থাকে নিশ্চয়ই সুস্থ অবস্থায় করে নাই। একজন লোকের অসুস্থ মানসিক অবস্থা, যদি কোন রকমে ঘটে, যে কারণেই ঘটুক, যাহার ফলে এত লোকের প্রাণহানি ঘটিবার সম্ভবনা রহিয়াছে, তাহার মানসিক সুস্থতার

সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করা হয় কি? ড্রাইভারকে ট্রেণ চালাইতে দিবার আগে তাহার মাথা ঠিক আছে কিনা, তবিয়ত ঠান্ডা আছে কিনা, সে সম্বন্ধে কোনরূপ দেখিবার শুনিবার ব্যবস্থা আছে কি? ঢাকা মেলের ড্রাইভারের সম্বন্ধে তেমন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল কি? ড্রাইভার ঘুমের ঝোঁকে পড়িলে কিম্বা মদের নেশায় অপ্রকৃতিস্থ হইলে যে বিপদ ঘটিতে পারে, সে বিপদ এড়াইবার জন্য কি ব্যবস্থা আছে? ফায়ার-ম্যান এবং গার্ড ইহারা কি করিয়াছিল এবং ড্রাইভারকে সংযত করিবার ক্ষমতা বা সুবিধা তাহাদের কতখানি আছে? এ ক্ষেত্রেই বা সে ক্ষমতা কিরূপভাবে পরিচালিত হইয়াছিল? তাহার পরের কথা এই যে, মাজদিয়া ষ্টেশনে যখন ঢাকা মেল ঢুকে, তখন ষ্টেশন গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল বলিয়া জানা যাইতেছে। একখানা ট্রেন ষ্টেশনে থাকা অবস্থাতেও ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মে আলো রাখা হয় না ইহাই কি ব্যবস্থা? যদি ব্যবস্থা ইহা না হয়, তবে এজন্য দায়ী কে? ইহা ছাড়া দুর্ঘটনা ঘটিবার পরে আহতদিগের উদ্ধার এবং শুশ্রূষার ব্যবস্থা যথাসময়ে করা হইয়াছিল কি? আমরা দেখিতেছি শেষ রাত্রি ৩॥ ঘটিকার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে, অথচ বিপন্ন-দিগকে সাহায্য করিবার জন্য রিলিফ ট্রেণ পৌঁছে বেলা ৭ ঘটিকার সময়। কলিকাতা হইতে মাজদিয়া মাত্র ৬৫ মাইল দূরে অবস্থিত, রাণাঘাট এবং কাঁচড়াপাড়াও বেশী দূরে নয়, ঘণ্টা দেড় ঘণ্টার মধ্যে রিলিফ ট্রেণ সেখানে পৌঁছে নাই কেন? এই ধরণের দুর্ঘটনা ঘটিলে বিপন্নদের উদ্ধারের ব্যবস্থা যাহাতে তাড়াতাড়ি করা যায় এমন কি ব্যবস্থা আছে কর্ত্তাদের? যদি না থাকে, কেন থাকে না—দায়ী কে বা কাহারা দায়ী সেজন্য? সংবাদপত্রে দেখিতেছি, উদ্ধার কার্য্য অত্যন্ত মন্থরগতিতে চলে কারণ, ঘোর অন্ধকার ছিল। গ্রামের লোকেরা যে কয়েকটি লণ্ঠন লইয়া আসিয়াছিল এবং ষ্টেশনের কর্ম্মচারীরা যে কয়েকটি বাতি যোগাইয়াছিলেন তাহা ছাড়া আলোর ভালো ব্যবস্থা ছিল না। 'ষ্টেটস্‌ম্যান' পত্রের রিপোর্টেই ইহা প্রকাশ। আমরা জিজ্ঞাসা করি, আলোর ব্যবস্থা অন্তত এইসব জরুরী কার্য্যের জন্যও ষ্টেশনে কেন রাখা হয় না। আলোর অভাবে উদ্ধার কার্য্যে যে অব্যবস্থা ঘটিয়াছে এবং তাহার ফলে যাহাদের মৃত্যু ঘটিয়াছে ইহার জন্য দায়ী কে?

মাজদিয়াতে যে ব্যাপার ঘটিয়াছে, আমরা তাহাকে দুর্ঘটনার কোঠার মধ্যে ফেলিয়া কিছুতেই মনকে প্রবোধ দিতে পারিতেছি না। আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতেছি, ইহার মূলে রহিয়াছে, মানুষেরই দোষ-ত্রুটি, অব্যবস্থা ও অবহেলারই ফল। গলদ জড়াইয়া পাকাইয়া উঠি-তেছে অনেক দিক হইতে এবং ইহার প্রতিকার করিতে হইলে রেল বিভাগের উপর হইতে নীচ পর্যন্ত আমূল পরি-বর্ত্তনের আবশ্যক আছে। উপরের ঔদাসীন্য এবং কুব্যবস্থার মধ্যে পাপের মূল রহিয়াছে, সেই পাপই ফুটিয়া উঠিয়াছে প্রত্যক্ষ একটি কারণরূপে। মামুলী তদন্তের দ্বারা প্রত্যক্ষ কারণের সহিত সংশ্লিষ্ট কয়েকজনকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া দণ্ড দিলেই পাপ দূর হইবে না। পাপের মূল কারণ যাহারা সৃষ্টি করিতেছে ঔদাসীন্য অবহেলায় এবং উচ্চ পদের অপেক্ষাকৃত নিরাপত্তার প্রশ্রয়ে সেই সব ধাড়ীদিগকেও ধরিয়া কড়া সাজা দিতে হইবে এবং রেল বিভাগ হইতে সেই শ্রেণীর জীবদিগকে তাড়াইতে হইবে। তাহাদের গায়ের চামড়ার গৌরবে ভুলিলে চলিবে না।

নিদারুণ শোক—

ই বি আর ট্রেন দুর্ঘটনায় আমরা যাঁহাদিগকে হারাইয়াছি তাঁহাদের মধ্যে ঢাকার প্রসিদ্ধ কংগ্রেস-নেতা ঢাকা মিউনিসি-প্যালিটির চেয়ারম্যান, বীরেন্দ্রনাথ মজুমদার এবং মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন। ইঁহারা দুইজনে গুড-ফ্রাইডের ছুটির পরে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে আসিতে ছিলেন। ইঁহারা দুইজনেই আমাদের বন্ধু ছিলেন। বীরেন্দ্র-নাথ কলিকাতা হইতে ঢাকায় যাওয়ার পূর্ব্বদিনও আমাদের কার্য্যালয়ে আসিয়াছিলেন। এমন শোচনীয়ভাবে তাঁহার জীবনান্ত ঘটিবে, আমরা ইহা কল্পনাও করিতে পারি নাই। ইঁহাদের সঙ্গে যাঁহার একবার আলাপ হইয়াছে, তিনিই জানেন তাঁহাদের অন্তরে স্বদেশপ্রেম কিরূপ গভীর ছিল। ইঁহারা দুইজনেই ত্যাগী কর্ম্মী ছিলেন। দেশের কাজের জন্য যখনই ত্যাগের প্রয়োজন আসিয়াছে তখনই আগাইয়া গিয়াছেন। বীরেন্দ্রবাবু ১০২৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন, কিন্তু পরে লাহোর কংগ্রেসের নির্দ্দেশ অনুযায়ী পদত্যাগ করেন। লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হইলে তিনি লাভজনক আইন-ব্যবসা পরিত্যাগ করেন। তিনি ১৯৩২ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়া ১৯৩৬ সালে নয় মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। স্বদেশ সেবার ক্ষেত্রে বীরেন্দ্রনাথের অবদানের কথা মনে উঠিলে আমাদের মনে পড়ে ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার কথা। এই মামলায় তিনি আসামী পক্ষ সমর্থনের জন্য নিযুক্ত হন; সেই সময় হইতেই তিনি দেশবন্ধু দাশের সহকর্ম্মীরূপে রাজনীতি ক্ষেত্রে কার্য্যে নিযুক্ত হন। ১৯৩৭ সালে বীরেন্দ্রনাথ পূর্ব্ববঙ্গ শহর সাধারণ নির্ব্বাচন-কেন্দ্র হইতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হন এবং ১৯৩৮ সালে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হন। তিনি ঢাকার প্রথম কংগ্রেসী চেয়ারম্যান। বিক্রমপুরে বাঙ্গলা দেশের অনেক বিশিষ্ট স্বদেশপ্রেমিক জন্মগ্রহণ করিয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, বীরেন্দ্রনাথও বিক্রমপুরের অন্তর্গত পাইকপাড়ার অধিবাসী ছিলেন।

বীরেন্দ্রনাথ দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। মনোরঞ্জনবাবুও গুরুতররূপে আহত হইয়াছিলেন। শেষ মুহূর্ত্ত পর্যন্ত আমরা আশা করিতেছিলাম যে তিনি রক্ষা পাইবেন; কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। আহত অবস্থায় তাঁহাকে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে আনা হইয়া-ছিল; গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মনোরঞ্জনবাবু আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবর্গকে শোকসাগরে ভাসাইয়া পরলোক

মনোরঞ্জনবাবু প্রথম জীবনেই দেশসেবায়

করেন। ঢাকা ষড়যন্ত্রমামলায় তিনি দেশবন্ধু

কারীরূপে আসামীপক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। তিনি ১৯২১ সালে কংগ্রেসের আহ্বানে আইন ব্যবসা পরিত্যাগ করেন এবং রাজনীতিক কারণে তাঁহার ৬ মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়। তিনি বহু বৎসর ঢাকা জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিলেন। ১৯৩০ সালে আইন-অমান্য আন্দোলনের সময় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ঢাকা হইতে বহিষ্কার করেন। ১৯৩৭ সালে মনোরঞ্জন ঢাকা পল্লীনির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হন।

ইঁহাদের এই শোচনীয় মৃত্যুতে বাঙ্গলা দেশ দুইজন একনিষ্ঠ স্বদেশপ্রেমিককে হারাইয়াছে। তাঁহাদের শোক আমাদিগকে মুহ্যমান করিয়াছে এবং সে শোক প্রকাশের ভাষা আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না। ভগবান তাঁহাদের শোকক্লিষ্ট পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা প্রদান করুন, শোকসন্তপ্ত দেশবাসী শুধু এই প্রার্থনাই করিতে পারে।

বিপন্নের সাহায্য—

মাজদিয়া দুর্ঘটনার ফলে বহু লোক হতাহত হইলেও ধ্বংস আরও ভয়াবহ হইতে পারিত। ইষ্টারের ছুটির পর অনেকে কলিকাতায় আসিতেছিলেন, ব্যবস্থা পরিষদের যোগদানের জন্য এবং অন্যান্য কাজের সম্পর্কে। বাঙলার বহু খ্যাতনামা সুসন্তান এবং আরও বহু লোক সৌভাগ্যক্রমে রক্ষা পাইয়াছেন, সুগভীর শোকের মধ্যে ইহা কতকটা সান্ত্বনার বিষয়। বিপন্ন এবং আহতদের সেবার জন্য মাজদিয়ার কংগ্রেস কর্ম্মিগণ এবং গ্রামবাসীরা ঘটনাক্ষেত্রে ক্ষিপ্রতা সহকারে ছুটিয়া আসিয়া যে কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন তাহা সত্যই প্রশংসনীয়। যাঁহারা ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই—অনেক বিদেশী ও মাজদিয়ার গ্রামবাসী এবং কংগ্রেস কর্ম্মীদের শতমুখে প্রশংসা করিতেছেন। প্রকৃতপক্ষে অতি অল্প সময়ের মধ্যে দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যদি তাঁহারা উদ্ধার কার্য্যে তৎপর না হইতেন এবং রিলিফ ট্রেণ পৌঁছা পর্যন্ত উদ্ধার কার্য্য আরম্ভ না হইত, তাহা হইলে আরও গুরুতর আকার ধারণ করিত। সংঘর্ষের ধ্বংস সংবাদ শুনিবামাত্র মাজদিয়া কংগ্রেস কমিটির ডাক্তার ননীগোপাল লাহিড়ী এবং শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার লাহিড়ী মহাশয় তাঁহাদের সহকর্ম্মিগণ সহ উদ্ধার কার্য্যে ব্রতী হন। ইহাদের মধ্যে ১৫ জন ডাক্তার ছিলেন, তাঁহারা যাত্রীদের সঙ্গে যোগ দিয়া উদ্ধার কার্য্য চালাইতে থাকেন এবং ধ্বংস স্তূপ হইতে আহতদিগকে এবং মৃতদেহসমূহ বাহির করিবার কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনায় বিহ্বল না হইয়া দৃঢ়তার সঙ্গে সেবায় অগ্রসর হইয়া ইহারা জাতির মুখ উজ্জ্বল করিলেন। মানুষের প্রকৃত মনুষ্যত্ব তো ইহার মধ্যেই। ইহারা সমস্ত জাতির আশীর্ব্বাদ লাভ করিবেন।

কংগ্রেসের ভবিষ্য-নীতি—

আগামী ২৮শে এপ্রিল কলিকাতা শহরে নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন আরম্ভ হইবে। নিখিল ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে উপযুক্তভাবে সংবর্দ্ধনা করিবেন এবং তাঁহাদের গুরু কর্ত্তব্য প্রতিপালনে সহায়তা করিবেন, এই বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অনেকদিন কাটিয়া গিয়াছে, ত্রিপুরীর ব্যাপারের পর যে একটা এলোমেলোভাব দেখা দিয়াছে, ইহাকে গোছাইয়া লইতে এখন আর দেরী করিলে চলিবে না। রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র এতদিন কলিকাতা হইতে অনুপস্থিত ছিলেন, তিনি কলিকাতায় আসিয়া নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন পরিচালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহার পক্ষে দায়িত্ব কঠোর, শরীর তাঁহার অসুস্থ কিন্তু কর্ত্তব্য গুরুতর রকমের। দক্ষিণপন্থী দল তাঁহাদের গোঁ ছাড়েন নাই। তাঁহারা কংগ্রেসে একক কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন। কংগ্রেসের আদর্শ হইল ভারতের বিভিন্ন স্বার্থ এবং বিভিন্ন মতের সমন্বয় বা সমাহার করিয়া চলা কিন্তু দক্ষিণপন্থীরা সমন্বয়ের নীতি মানিবেন না। তাঁহারা চাহেন তাঁহাদের নিজেদের জোটবাঁধা দলের নীতির সর্ব্বতোময় প্রভুত্ব। দক্ষিণপন্থীদের এই যে নীতি—যে নীতি ধরিয়া তাঁহারা চলিতে চাহিতেছেন, তাহা সুস্পষ্টভাবে গণতান্ত্রিকতার বিরোধী এবং গণতান্ত্রিকতার নীতিতে প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেসেরও যে ইহা বিরোধী এ বিষয়ে আমাদের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সমগ্র দেশ বিপুল সংখ্যাধিক্যের ভোটে যাহাকে রাষ্ট্রপতি বলিয়া নির্ব্বাচিত করিয়াছে, গণতান্ত্রিকতাকে মানিতে হইলে প্রত্যেক কংগ্রেসকর্ম্মীর প্রাথমিক কর্ত্তব্য হইল অবিসংবাদিতভাবে তাঁহার নেতৃত্বকে স্বীকার করিয়া লওয়া; কিন্তু দক্ষিণপন্থীরা তাহাতে রাজী নহেন। তাঁহারা গণতান্ত্রিকতার মূলনীতিকে পদদলিত করিয়া ব্যক্তিগত ব্যাপারকে বড় করিয়া দেখিতেছেন। ব্যক্তি যতই বড় হউন, আমরা বড় বুঝি নীতিকে এবং জনগণের মতকে যেখানে ব্যক্তি বা ব্যক্তিগত প্রভাববিশিষ্ট গোষ্ঠীর কাছে খাটো করা হয়, তখন আদর্শের পতন ঘটে এবং আদর্শের যদি পতন ঘটিল তবে প্রতিষ্ঠানের প্রাণশক্তিই নষ্ট হইয়া যায়। দক্ষিণপন্থী দল ব্যক্তিগত রেষা-রেষির ঝোঁকে পড়িয়া আজ যে পথ অবলম্বন করিতে যাইতেছেন তাহা দেশের পক্ষে ঘোরতর অনিষ্টকর হইবে বলিয়াই আমরা মনে করি। বৃহত্তর আদর্শের ভিত্তিতে কংগ্রেস বিভিন্ন দল এবং রাজনীতিক মতবিশিষ্ট সম্প্রদায়ের সংহতিতে সুদৃঢ় হওয়ার উপরে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে কংগ্রেসের সাফল্য নির্ভর করিতেছে। দক্ষিণপন্থী দল এখনও যদি তাঁহাদের মতি গতি পরিবর্ত্তন না করেন এবং নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে এই সংহতি এবং ঐক্যের উপর জোর না দেওয়া হয়, তাহা হইলে কংগ্রেসের মধ্যে ভেদ-বিভেদ দেখা দিবে, তাহার ফলে কংগ্রেসের ক্ষতি হইবে, ক্ষতি হইবে সমগ্র দেশের। মহাত্মা গান্ধী নিজে কলিকাতায় আসিতেছেন। ত্রিপুরী কংগ্রেসের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই অন্ততপক্ষে প্রত্যক্ষভাবে কংগ্রেসের কাজকর্ম্মের সহিত তাঁহার যোগ দেখিতে পাই নাই। ব্যাপার তাঁহার পক্ষে এখন আর পরোক্ষ থাকিবে না। আমরা এখনও এই আশা করিতেছি যে, মহাত্মাজীর সুদক্ষ নেতৃত্বে জাতি

এখনও এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইবে। রবীন্দ্রনাথ এই সঙ্কট হইতে জাতিকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত মহাত্মাজীর নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন, আমরা আশা করিব সে প্রার্থনা ব্যর্থ হইবে না।

নববর্ষের উৎসব—

নববর্ষের উৎসব এবার একটু নূতন রকমে কলিকাতা শহরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে; হাওড়া এবং মফঃস্বলের কোন কোন স্থানে নববর্ষ উৎসবের এই নূতন রূপটি আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। বিভিন্ন স্থানে বালক বালিকারা সামরিক কায়দায় কুচকাওয়াজ করিয়াছে এবং জাতীয় পতাকা অভিবাদন করিয়াছে। বর্ষাভিনন্দনের এই নূতন রূপটি দেখিয়া আমরা আনন্দ লাভ করিয়াছি এবং আমাদের অন্তরে আশা এবং উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছে। নববর্ষ বরাবরই আসে এবং এবারও আসিয়াছে কিন্তু বাঙালীর দৃষ্টিতে এবারকার নববর্ষের একটি বিশিষ্টরূপ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। নববর্ষ আনিয়াছে নানা পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর দিয়া স্ফুটতর রূপে বাঙালীর প্রতি নূতন কর্ম্মের নির্দ্দেশ। আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি, ভারতের রাজনীতিক আবহাওয়া যেভাবে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহাতে ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক সংগ্রামের ভারকেন্দ্র আসিয়া পড়িবে বাঙলা দেশেরই উপর। বাঙলা দেশ এতকাল সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রনীতির কেন্দ্রস্থল স্বরূপে কাজ করিয়াছে। ভারতের রাষ্ট্রনীতিকে নূতনরূপ দীপকরূপ দীপ্ততর রূপ দিয়াছে এই বাঙলা দেশ। আজ আবার উহার প্রতি কঠোরভাবে কর্ত্তব্য পালনের সেই আহ্বান আসিয়াছে আবশ্যক এবং আত্যন্তিকভাবে। আমাদের এই আশা আছে যে বাঙালী সে আহ্বানে সাড়া দিতে পরাঙমুখ হইবে না। বাঙালী পিছাইয়া যাইবে না ত্যাগ প্রয়োজনের এই পরম মুহূর্ত্তে প্রতিকূলতার আঘাত বাঙলার উপর আসিয়া পড়িতেছে সকল দিক হইতে। বাঙলা দেশের ভিতরে এই প্রতিকূলতা প্রগতি বিরোধী সাম্প্রদায়িকতা বাদীদের প্রভাবে পরিচালিত মন্ত্রিমণ্ডলের দ্বারা গড়িয়া উঠিয়া আজ রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, বাহির হইতেও আসিতেছে প্রতিকূলতার আঘাত প্রাদেশিকতার আকারে এক স্বাধীনতা সংগ্রামে যে পরম ত্যাগের আদর্শের জন বাঙালীদের প্রাণ ব্যাকুল, তাহার প্রতি উপেক্ষামূলক সাম্রাজ্য বাদীদের সঙ্গে আপোষ-নিষ্পত্তির অনুকূল মনোবৃত্তি প্রচার-পরতন্ত্রতার আকারে। এই অন্তঃসংগ্রাম এবং বহিঃ সংগ্রামের মধ্যে বাঙালীকে আজ জাতীয়তার আদর্শ অব্যাহত করিয়া আগাইয়া যাইতে হইবে। বড় কাজের ভার আসিয়া যাহার উপর পড়ে, বড় কাজের শক্তিও তাহার মধ্যে আসে আছে, সে শক্তি বাঙ্গালীর আছে, আমরা এ বিশ্বাস রাখি নববর্ষের উদ্বোধনে আমাদের জাতির অন্তরে উজ্জীবিত হইয়া উঠুক আত্মপ্রত্যয়, আজ উজ্জ্বল হইয়া উঠুক স্বদেশ প্রেমের সেই আগুন, যে আগুনে সব দৈন্য সব কার্পণ্য, সব দীনতা এবং সকল ভণ্ডামি এবং ভীরুতাকে ভস্ম করিয়া দেয়। পথ কোথায়? আজ এ প্রশ্ন যদি কাহারও অন্তরে উঠিয়া থাকে, তাহার একমাত্র উত্তর এই যে, তুমি যদি বাঙলার সন্তান হও এবং যে বলিষ্ঠ স্বদেশপ্রেম বাঙালীর রাষ্ট্রীয় সাধনার বিশিষ্টতা সেই বিশিষ্টতা যদি তুমি বজায় রাখিতে পার, তাহা হইলে সেই স্বদেশ প্রেমই তোমাকে পথ দেখাইয়া দিবে। সেই স্বদেশ প্রেমে প্রতিষ্ঠিত হইলে যিনি অন্তর্য্যামিরূপে যুগে যুগে জাতির উন্নিদ্র হৃদকর্ণিকারে অধিষ্ঠিত থাকিয়া মৃত্যুর ভিতর দিয়া পরম মাধুর্য্যের আকর্ষণে অমরত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেন তিনিই পথ দেখাইয়া দিবেন। বাহিরের কোন নিয়োগই বড় নহে।

নববর্ষ ও বিশ্ব—

রবীন্দ্রনাথ নববর্ষকে আবাহন করিয়া বলিয়াছেন—"নববর্ষ এলো আজি দুর্য্যোগের ঘন অন্ধকারে।" কাল বৈশাখীর মেঘ উঠিয়াছে। রুদ্র তাণ্ডব সুরু হইতে বুঝি বা দেরী নাই। বৈশাখী খরার রৌদ্র-জ্বালা কাটিতে না কাটিতে মেঘে মেঘে মহাকালের প্রলয় নর্ত্তন আরম্ভ হইবে। ন্যায় নীতিকে পিষ্ট করিয়া পশু শক্তি গর্জ্জন করিয়া উঠিতেছে, যে দুর্ব্বল জগতে বুঝি আর তাহার স্থান নাই। ধর মার কাট সকল দিকে এই বুলি। বিশ্বের বুকে আসুরিক পিপাসার উত্তপ্ততায় আজ এই যে বিক্ষোভ এবং বিপর্য্যয় দেখা দিয়াছে, আমরা কি ইহা হইতে মুক্ত আছি? ইহার প্রভাব কি আমাদের জীবনকে স্পর্শ করিতেছে না? যদি কেহ মনে করেন যে, আমরা ইহা হইতে নিরাপদ আছি, আমরা এই বিশ্ববিপর্য্যয়-লীলার গণ্ডীর বাহিরে, তাহা হইলে তাঁহার তেমন ধারণা ভ্রান্ত হইবে। আমরা ইহার বাহিরে নহি, সে আসুরিক আত্মম্ভরিতা নিজের উদরকে পূর্ণ করিবার জন্য মাতিয়া উঠিয়াছে, সূক্ষ্মতরভাবে কূটতর কৌশলের ভিতর দিয়া তাহা বাঙালী জাতিকেও আসিয়া আঘাত করিতেছে। মূর্ত্তি তাহার প্রকট নহে, আছে সে ছদ্মবেশের আড়ালে, আজ সেই ছদ্মবেশের ভিতর দিয়া তাহার তীক্ষ্ণ নখর-দশনকে দেখিতে হইবে। বাঙালীকে বুঝিতে হইবে, কে তাহার আপন, কে তাহার পর—কে তাহার শত্রু, কে তাহার মিত্র। আজ বাঙালীকে বুঝিতে হইবে এই সত্যকে যে, দেশের দাসত্ব শৃঙ্খল কি করিয়া ছিন্ন করা যায় তাহাই হইতেছে সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রশ্ন এবং বাঙালীদের মধ্যে যাহাদের নীতি আজ কোন রকমে ভেদাভেদকে বাড়াইতেছে তাহারা সেই দাসত্বের শৃঙ্খলকে দৃঢ় করিতেছে। তাহারা মুখে দেশের কাজের কথা বলিলেও প্রকৃতপক্ষে দেশের শত্রুতাই সাধন করিতেছে। বাঙালীর মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া পরের উদর পূর্ণ করিবার ফিকিরেই আছে তাহারা। নিজেদের হীন স্বার্থসিদ্ধি করিবার জন্য তাহারা দেশকে বিদেশীর পায়েই বিকাইয়া দিতেছে। কাল-বৈশাখীর দুর্য্যোগ ঝঞ্ঝায় দীপ্তাশনির আলোকে যদি ইহাদের সত্য রূপ দেখিয়া সাবধান হইতে পারি, তাহা হইলে ভয়ের কোন কারণ নাই। আমরা নববর্ষে রুদ্র দেবতার প্রসাদই আশীর্ব্বাদস্বরূপে লাভ করিব।

মিউনিসিপ্যাল বিলের প্রতিবাদ—

গত ২রা বৈশাখ, রবিবার প্রস্তাবিত মিউনিসিপ্যাল বিলের প্রতিবাদকল্পে কলিকাতা শহরে সর্ব্বত্র হরতাল প্রতিপালিত হয়। ঐ দিন সন্ধ্যাকালে ব্যারিষ্টার শ্রীযুত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে যেরূপ বিরাট জনসভা হয়, এত বড় সভা সচরাচর দেখা যায় না। এই বিলের উদ্দেশ্য কি এবং বিধেয়ই বা কি, একথা কাহাকেও বলিয়া বুঝাইবার আবশ্যক আছে আমরা মনে করি না। এই বিলের নিন্দা আমরা এই জন্য করিতেছি না যে, ইহাতে কলিকাতা কর্পোরেশনে মুসলমান সদস্যের সংখ্যা কয়েকজন বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, আমরা এই বিলের মূলে যে হীন সংকীর্ণ মনোবৃত্তি রহিয়াছে, যে মনোবৃত্তি, শুধু গণতান্ত্রিকতার বিরোধী নহে, দশজনে মিলিয়া মিশিয়া, দশজনের সুখদুঃখকে এক করিয়া দেখিবার স্বাভাবিক সমাজ জীবনের যে আদর্শ—এবং যে আদর্শ পশু হইতে মানুষের সমাজজীবনের বিশিষ্টতা, সেই মনুষ্যত্বের মৌলিক আদর্শকেই অতি কৃত্রিম উপায়ে ধ্বংস করা হইয়াছে। আজ যদি কলিকাতার পৌরপ্রতিষ্ঠানে এই অনিষ্টকর মনোবৃত্তির প্রতিষ্ঠা ঘটে, তাহা হইলে গোটা বাঙলা দেশের রাষ্ট্র এবং সমাজ-জীবন সাম্প্রদায়িকতার বিষে জর্জ্জরিত এবং কলুষিত হইয়া উঠিবে। ভেদের মধ্যে ভেদ—তাহার মধ্যে সহস্র ভেদ দেখা দিবে। এই বিলের সাহায্যে যে অনিষ্ট সাধনের উদ্যম আজ হইয়াছে, এত বড় অনিষ্ট বাঙলা দেশে কোন দিনই ঘটে নাই—বুঝিতে হইবে, বুঝে সুঝে মানুষ হিসাবে যাহাদের কিছু আছে আজ এই সত্যটি তাহাদিগকে। রবিবারের সভায় এই প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, "ব্যবস্থা পরিষদের হিন্দু সদস্যেরা যেন এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করেন এবং হিন্দুদের সমবেত প্রতিবাদ সত্ত্বেও যদি এই বিল পাশ করা হয়, তাহা হইলে হিন্দু সদস্যগণ যেন একযোগে ব্যবস্থা পরিষদ হইতে বাহির হইয়া আসেন।"

রবিবারের সভা বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সভার উদ্যোগে বিশেষভাবে হিন্দুদের জন্যই আহূত হইয়াছিল; কিন্তু আমরা জানি, শুধু হিন্দুরাই এই বিলের প্রতিবাদী এমন নয়, বাঙলার মুসলমান সমাজ, প্রকৃতপক্ষে বাঙলা দেশের স্বার্থ যাহাদের অন্তরে আছে তাহারা সকলেই এই বিলের ঘোর প্রতিবাদী; কারণ এই বিলে প্রকৃতপক্ষে কলিকাতা কর্পোরেশনে বাঙালী মুসলমানদের কর্ত্তৃত্ব বজায় রাখা হয় নাই, যদি কর্ত্তৃত্ব বাড়ান হইয়া থাকে হইয়াছে কিছুটা বিদেশী মুসলমানদের এবং তাহাদিগকে যন্ত্ররূপে পরিণত করিয়া আসল প্রভুত্ব দেওয়া হইয়াছে শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ীদিগকে। আমরা এমন আশা করি না যে, কলিকাতার পৌরজনগণের এই প্রতিবাদ হইতেই বাঙলার বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলের চৈতন্য হইবে। তাহাদের চৈতন্য সম্পাদন একদিনের আন্দোলনেই সম্ভব হইবে না—দীর্ঘদিন আন্দোলন চালাইতে হইবে এবং শুধু সভা-সমিতিতে আন্দোলন নয়, দেশের স্বার্থ, জাতির স্বার্থের অনুভূতি যাহাদের আছে, তাহাদিগকে এজন্য অধিকতর ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে

দুই রকম দস্যু বৃত্তি—

রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছিলেন—"নব বৎসরে করিলাম পণ নব স্বদেশের দীক্ষা।" আজও কবির বীণায় ভারতের সেই শাশ্বত বাণীই ধ্বনিত হইতেছে, যে বাণী মানুষের ভিতর যে অমরত্ব আছে তাহাকে উপলব্ধি করিয়া, যে মৃত্যুঞ্জয় প্রাণ কোন না কোন সুরে সূর্য্যলোকের ঊর্দ্ধলোকে আলোক প্রকাশ করে, তাহারই সন্ধান দেয়। নববর্ষের উৎসব উপলক্ষ্যে গত সোমবার অপরাহ্নে পাইকপাড়ার রাজবাড়ীতে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"আমরা জানতাম না, যে পৃথিবীতে আমরা এসেছি, তার ভিতর আছে নাগিনী—বিষাক্তকারিণী—যা সমস্ত জগৎকে ও মানুষকে সন্তপ্ত ক'রে মহাকালের প্রলয়-লীলালয় ডমরুর সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করছে। যে অবস্থায় পৃথিবী এসেছে, এর পরিণতি কোন পথে হবে ভাবতে পারি না। দুদিক আছে। রাষ্ট্রিক ভাগ্যদেবতা এক পক্ষকে যে সমস্ত পর্য্যাপ্ত শক্তি ও সম্পদ পরিবেশন করেছেন, অন্য পক্ষের ভাগ্যে তেমনটি জোটেনি। তখন আরম্ভ হয় লাঠালাঠি। কত রকম অধ্যবসায় তার পেছনে ছিল। তাতে সাহিত্য বিজ্ঞান বড় হয়ে উঠেছে। রাষ্ট্রীয় দস্যুবৃত্তিতে তারা অনেক দূর এগিয়ে গেল, তারা পৃথিবীর বার আনা ভাগ করে নিল। অন্যেরা যদি তাতে একটা কিছু দাবী করে সেটা সহ্য হয় না। জগৎজোড়া লোভ। বণিকেরা বাণিজ্যতরী আরোহণ করে এসেছিলেন এবং সমুদ্রের তীরে তীরে দেশ-বিদেশে ঘুরেছিলেন। অল্প অল্প আগুন লেগেছিল। সে দাবদাহ তখন ব্যাপ্ত হতে পারেনি। কিন্তু মানুষের যে প্রবৃত্তি ভাঙ্গে সে প্রবৃত্তি কাজ করতে আরম্ভ করেছিল। একটা না একটা কিছু আছে যাকে আমাদের কথায় বলে ছিদ্র—যে ছিদ্র না হলে শনি বা কলি প্রবেশ করতে পারে না—সমস্ত ছিদ্র দেখা দিয়েছিল। তার মধ্য দিয়ে দুগ্রহের দূত ছদ্মবেশে প্রবেশ করতে পেরেছে। সে মানুষকে মারে। এ হচ্ছে মানুষের মরবার পথ। আজকার দিনে বাছবিচার নেই। আমরা যে এর থেকে মুক্ত আছি তা নয়। আমাদের ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে যে শক্তি আছে তা শাসন-শোষণ ও পোষণ করবার পক্ষে কম মজবুত নয়। আমাদের ভিতর তার যথেষ্ট উপদ্রব রয়েছে। সমস্ত পৃথিবীতে মানুষ আপনাকে মারবার যে বিষ ক্রমশ বড় করে তুলেছে তার থেকে তাকে রক্ষা করা যাবে না। সব ইতিহাসে, এমন কি জীব-জন্তুর ইতিহাসেও দেখা যায়, একটা কিছু অযোগ্যতা, একটা কিছু অসামঞ্জস্য যখন ঢুকেছে তখনই, হুকুম হয়েছে তাহাদের সরিয়ে দাও। সে অসামঞ্জস্য প্রচণ্ড অসামঞ্জস্য, অত বড় লাভ, ধনের অত বড় সঞ্চয়,—যাহা অনেককে বঞ্চিত করে পৃথিবীতে কখনও ছিল না, এ ভেঙ্গে গড়তেই হবে। এ নিয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না। মানুষের ভিতর এই যে মৃত্যুর বীজ প্রবেশ করেছে, এ তিন সবুর

করেছে না। মানুষকে যখন বিধাতা ডিসমিস করেন নিজ হাতে করেন না—মানুষ আপনাকে আপনি সরিয়ে দেয়। মহাভারতে মুষল পর্ব্বে আছে মরবার দিন মুষল প্রসব করেছিল। আপনি আপনাকে মারবে তার উদ্যোগ হচ্ছে। ভবিষ্যতের কথা বলা যায় না। হঠাৎ একটা প্রতিক্রিয়া হতে পারে; হঠাৎ গতি ফিরতে পারে। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স ভয় পেয়েছে। তারা বুঝেছে, মাথার কাছে, শিয়রে বিপদ এসেছে, তাই ভাবছে এর থেকে পরিত্রাণ পাবে কোন কৌশলে। যেটা তাদেরকে মারবে সেটা তাদের নিজেদের ভিতরকার রিপু। লীগ অব নেশন করলে কত সুবিধা হবে, তাই করছে। তিন চারিটি দস্যু মিললে অন্য দস্যুদের ঠেকাতে পারবে, এ একেবারে মিথ্যা।"

কবি সত্যই বলিয়াছেন—মরণের পথে এই যে গতি আরম্ভ হইয়াছে, আমরা যে এর থেকে মুক্ত আছি তা নয়। আসুরিক দম্ভে, রাজসিক আত্মম্ভরিতায় পাশ্চাত্য জাতিগুলো মরণের পথে আগাইয়া চলিয়াছে, আর আমরা আগাইয়া যাইতেছি সেই মরণের পথে আমাদের ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে। তাহাদের মধ্যে জাতিতে জাতিতে দ্বেষ-বিদ্বেষ, আর আমাদের মধ্যে দ্বেষ-বিদ্বেষ ভাইতে ভাইতে। প্রচণ্ড কর্ম্মোদ্যমের সঙ্গে তাহাদের আসুরিকতা, আর প্রমাদ, আলস্য, নিদ্রা এবং জড়তায় নিন্দনীয় নৈষ্কর্ম্মের অধস্তন স্তরে নিমজ্জিত আমরা তামসিকতায়। অথচ সেই তামস স্তরে থাকিয়াই সাত্ত্বিকতার স্বপ্ন দেখিতেছি, অহিংসার ভণ্ডামী দেখাইতেছি। আজ যদি আমাদিগকে বাঁচিতেই হয় 'মার খেয়েও যে মরে না, এমন যে মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণশক্তি তাহাকে উদ্বোধন করিতে হইবে। সে পথ মার এড়াইয়া যাইবার ভীরুতার পথ নয়। সে পথে মৃত্যুর মুখে আগাইয়া গিয়া আত্মশক্তিকে উপলব্ধি করিবার পথ। পাশ্চাত্য জগতের লোকেরা বাঁচিবার মোহে মরণের পথে যাইতেছে, আর আমাদিগকে মরণের মধ্য দিয়া বাঁচিতে হইবে। নতুবা পাশ্চাত্যের দস্যুতা, যেমন দস্যুতা,—রাষ্ট্রীয় দস্যুতা, আমাদের নীচ ভোগলালসা এবং ইতর স্বার্থ পিপাসায় যে দস্যুতা সে দস্যুতাও ততোধিক দস্যুতা; এ দস্যুতা ভাইয়ের বুকে ছুরি বসাইতে ব্যস্ত। ইহা ঘৃণিত এবং বীভৎস।

রাজকোটের সমস্যা—

যেখানে ডালে ডালে কাজ চলে সেখানে পাতায় পাতায় কাজ চালাইবার মত কূট চক্রীরও অভাব হয় না। রাজকোটের ব্যাপারে ইহার একদফা পরিচয় পাওয়া গেল। রাজকোটের ব্যাপারে ফেডারেল কোর্টের বিচারপতি মরিস সাহেব যে রায় দেন, তদনুসারে শাসন-সংস্কার কমিটির মোট দশজন সদস্যের মধ্যে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মনোনীত ৭জন সদস্যকে গ্রহণ করিতে ঠাকুর সাহেব বাধ্য হইয়াছিলেন। এইদিক হইতে প্রজাপক্ষের কাছে রাজপক্ষ অর্থাৎ ঠাকুর সাহেবের দলের সংখ্যালঘিষ্ঠতা বর্ত্তিয়া ছিল। ঠাকুর সাহেব এই অবস্থাকে উল্টাইবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার সেই চেষ্টার প্রতিবাদেই মহাত্মাজীকে অনশন অবলম্বন করিতে হয়। মহাত্মাজীর জয় হইবার পর, নূতন রকমের চাল অপর পক্ষ হইতে আরম্ভ হয়। রাজকোটের মুসলমান এবং ভায়াৎ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা সব ক্ষেত্রে প্রজাপক্ষের নীতি মানিয়া ভোট দিতে অস্বীকৃত হন। অথচ তাঁহারা প্রতিনিধিত্বও চাহেন; এরূপ ক্ষেত্রে, তাঁহাদের প্রতিনিধিরা যদি ঠাকুর সাহেবের মনোনীত প্রতিনিধিদের সঙ্গে জোট বাঁধেন তাহা হইলে ঠাকুর সাহেবের ভোটের জোরই বেশী দাঁড়ায় এবং প্রজাপক্ষের নীতি ব্যর্থ হইয়া যায়। মহাত্মাজীর ইচ্ছা ছিল যে, কমিটিতে দুইজন মুসলমান এবং একজন ভায়াৎ প্রতিনিধি থাকেন কিন্তু মোট দশজন প্রতিনিধির মধ্যে ঠাকুর সাহেবের তিনজন প্রতিনিধির সঙ্গে এই তিনজন যোগ দিলে সুস্পষ্টভাবে ৬জনে ঠাকুর সাহেবের স্বেচ্ছাচারিতাই পাকা থাকে। আন্দোলনের সব উদ্দেশ্য একেবারেই নষ্ট হয়। সুখের বিষয় মহাত্মাজী এই ফাঁদে পা দেন নাই। তিনি অন্তত এক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা-বাদীদের সঙ্গে আপোষ-রফার ভেজাল ঢুকাইয়া দিয়া তাঁহাদের প্রস্তাবে অস্বীকৃত হইয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইহার ফলে সংগ্রাম নূতন আকারে দেখা দিবে, মীমাংসা হইল না। কিন্তু তাহা না হইলেও পরিস্থিতি স্পষ্টতর হইল। আমরা আশা করিয়াছিলাম যে, মরিস সাহেবের রায়ের পরে অন্তত ঠাকুর সাহেবের মতিগতিটা ফিরিবে, কিন্তু দেখা যাইতেছে, মতিগতির পরিবর্ত্তন কিছু ঘটে নাই। কলকাটি অন্যভাবে ঘুরিতেছে এবং সমস্যার সুনিশ্চিত সমাধান শেষটাতে সেই প্রজাপক্ষের স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠায় সংকল্পশীলতার উপর গিয়াই দাঁড়াইল; বড়লাট সাহেবের কৃপাদৃষ্টিতেও কুলাইল না। আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, দেশীয় রাজ্যসমূহের ব্যাপারের সন্তোষজনক সমাধান একমাত্র এইদিক হইতেই হওয়া সম্ভব, কোন কর্ত্তার অনুগ্রহের জোরেই সম্ভব নহে। রাজকোটের ক্ষেত্রেও অবশেষে তাহাই সত্যে পরিণত হইল।

জিব্রাল্টার বিপন্ন—

ইংরেজ প্রভুরা চোখে আঁধার দেখিতেছেন। স্পেন একবার জেনারেল ফ্রাঙ্কোর করতলগত হইলেই—ইটালীয়ানেরা খাতাপত্র তাহাকে বুঝাইয়া দিয়া সুবোধ ছেলের মত দেশে ফিরিবে—কর্ত্তারা এই স্বপ্নে মজগুল থাকিয়া স্পেনের সাধারণ-তন্ত্রীদের উৎখাত দেখিতে পরম উৎসাহ সহকারে উৎসুক ছিলেন, এখন উল্টা বুঝিলি রাম! ইটালীয়ানেরা স্পেন ছাড়িবে তো দূরস্থান, এখন দেখা যাইতেছে যে তাহারা স্পেনে নিজেদের কব্জির জোরেই লড়িতেছে, এমন কি ইংরেজের বড় সাধের জিব্রাল্টার দখল করিবার জন্যও নাকি চক্রান্ত আঁটিতেছে। দূরবর্ষী কামান বসাইয়া তাহারা ইংরেজের জিব্রাল্টারের সব কিম্মৎ নষ্ট করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। জার্ম্মান কখন ডানজিগে ঢুকে এবং ইংরেজের নিকট উপনিবেশ দাবী করে, কিছুই ঠিক নাই। দুই একদিনের মধ্যেই ইউরোপের রঙ্গমঞ্চে হিটলারের উদ্যোগে নূতন পালার অভিনয় আরম্ভ হইতে পারে। সুতরাং বিপদ চারিদিক দিয়া ঘনাইয়া আসিতেছে; কিন্তু এই যে বিপদ ইহাতে আকস্মিকত্ব কিছুই নাই।

মহাসমর কি আসন্ন?

সম্প্রতি একটি বিষয়ের দিকে আপনাদের সকলেরই দৃষ্টি পড়িয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট ফ্রাঙ্কলিন ডেলানো রুজভেল্ট হিটলার ও মুসোলিনীর নিকট একখানি আবেদন প্রেরণ করিয়াছেন। এই আবেদনখানির মর্ম্ম এই যে, তাঁহারা বিশ্ব-শান্তির কথা বিবেচনা করিয়া আর কাহারও স্বাধীনতার উপর যেন হস্তক্ষেপ না করেন। তাঁহারা যদি প্রতিশ্রুতি দেন যে, অন্তত আগামী দশ বৎসরের জন্য কাহারও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিবেন না তাহা হইলে তাঁহাদের কাঁচা মাল সরবরাহ ও অন্যান্য আর্থিক সমস্যা সম্বন্ধে একটা সুরাহা করিতে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। কোন্ কোন্ দেশের স্বাধীনতার উপরে তাঁহাদের হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় নহে যুক্তরাষ্ট্র হইতে বলা হইয়াছে যে, রুজভেল্ট বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়াছেন, আগামী পাঁচ ছয় দিনের মধ্যেই যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়া সম্ভব। এইজন্য তিনি এমন কতকগুলি দেশের উপর হস্তক্ষেপ করিতে হিটলার-মুসোলিনীকে নিষেধ করিতেছেন যাহা লইয়া বিবাদ বা লড়াই যে কোন মুহূর্ত্তে বাধিয়া যাইতে পারে। বিশ্ববাসী এই কথা জানিয়া আতঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে। যুদ্ধের মহড়া আবিসিনিয়ায়, স্পেনে ও চীনে যেমন লক্ষ্য করা গিয়াছে তাহাতে ত আতঙ্ক বাড়িয়া যাইবারই কথা।

রুজভেল্ট মহাশয়ের আবেদনে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইতেছে দেখা যাউক। ব্রিটেন ও ফ্রান্স না কি খুবই খুশী হইয়াছে।

সোভিয়েট পররাষ্ট্র-সচিব মঃ লিটভিনফ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট ফ্রাঙ্কলিন ডেলানো রুজভেল্ট

ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-সচিব লর্ড হ্যালিফাক্স

রুজভেল্ট মহাশয় তাহারও একটা ফিরিস্তি দিয়াছেন। তিনি এই প্রসঙ্গে ফিনল্যাণ্ড, এস্থোনিয়া, লাটভিয়া, লিথুয়েনিয়া, সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, সুইজারল্যাণ্ড, লাইকটেনষ্টাইন, লাকসেমবার্গ, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, যুগোশ্লোভিয়া রুশিয়া, বুলগেরিয়া, গ্রীস, তুরস্ক, ইরাক, আরবদেশসমূহ, সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন, মিশর, ইরাণ, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, গ্রেট ব্রিটেন, আয়ার (আয়ার্লণ্ড), ফ্রান্স, পর্ত্তুগাল ও স্পেনের উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। এই দেশগুলির সকলেই যে স্বাধীন তাহা নহে। কয়েকটি অর্দ্ধ স্বাধীন, আবার কোন কোনটি ব্রিটিশ ও ফরাসীর তাঁবেদারি ভুক্ত রাষ্ট্র।

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের এই আবেদন লইয়া নানারূপ জটলা সুরু হইয়াছে। নানাজনে ইহার নানারূপ ব্যাখ্যা, অপব্যাখ্যা ইত্যাদি করিতেছেন। একটি বিষয় যাহা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা কিন্তু বড়ই ভয়াবহ। গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ অন্তর্জগতে একটা ভীষণ অস্থির ভাব বিরাজ করিতেছে। তাহাদের খুশী হইবারই কথা। গত তিন চার বৎসর, বিশেষত গত এক বৎসরের মধ্যে জার্ম্মানী তাহার শক্তি যেরূপ বাড়াইয়া লইয়াছে তাহাতে সকলেই ভীত সন্ত্রস্ত। তাহাতে আবার মুসোলিনীর সঙ্গে তিনি ঘনিষ্টভাবে যুক্ত। ব্রিটেন ও ফ্রান্স তাঁহাদের মত অস্ত্রশস্ত্র এখনও বাড়াইতে পারে নাই, যদিও সময়ে অসময়ে ঢাকঢোল পিটাইয়া ঘোষণা করিয়া থাকে যে, যে কোন শক্তিকে ইহারা হটাইতে সক্ষম হইবে। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের খুশী হইবার কারণ সুতরাং কতকটা বুঝা যায়।

হিটলার ও মুসোলিনী কিরূপ জবাব দেন তাহাই লক্ষ্য করিবার বিষয়। এ সম্বন্ধে নানা লোকের মনে নানাবিধ প্রশ্ন জাগিয়াছে। হিটলার ও মুসোলিনী আবেদনখানি ভাল করিয়া পরখ করিয়া দেখিতেছেন। তাঁহাদের অভিমত কয়েক দিনের মধ্যে প্রকাশিত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। ঐ ঐ দেশের পত্রিকাগুলি কিন্তু ইতিমধ্যে ইহার তীব্র সমালোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভাওতা দিয়া তাহাদিগকে আর ঠেকান যাইবে না বলিতেছে। হিটলার অনুচরবর্গসহ

পরামর্শ করিতেছেন। হিটলার-মুসোলিনীর মধ্যে অনবরত ফোনে কথাবার্ত্তা হইতেছে। অদ্যকার সংবাদে প্রকাশ, হিটলার না কি আবেদনের জবাবে উপনিবেশ প্রত্যর্পণের দাবী পেশ করিবেন। হিটলার-মুসোলিনীর জবাব সম্বন্ধে অন্তর্জগতে গবেষণা চলিতেছে খুবই। তাঁহারা যদি রুজভেল্টের প্রস্তাবে রাজি না হন তাহা হইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহার ইতিকর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইবে।

রুজভেল্টের তালিকাটি কিঞ্চিৎ দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু হিটলার ও মুসোলিনীর যেরূপ বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা তাহার সম্মুখে এ তালিকাভুক্ত দেশগুলি হয়ত খুবই সামান্য! অথবা, উল্লিখিত দেশগুলির যে-কোনটিরই উপর তাঁহারা অতর্কিতে চড়াও হইতে পারেন। সত্য কথা বলিতে কি, তাঁহারা অল্প সময়ের মধ্যে খুবই শক্তিশালী হইয়া পড়িয়াছেন। জার্ম্মানী চেকোশ্লোভাকিয়া ও ইটালী আলবেনিয়া অধিকার করিয়া মধ্য ও দক্ষিণ ইউরোপে খুবই প্রবল হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদিগকে এখন কে ঠেকাইবে?

কি কুক্ষণেই না মিউনিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল! ইহার পর মাত্র ছয়মাস অতীত হইয়াছে। কিন্তু ইহার মধ্যেই ইউরোপের আকাশে বাতাসে একটা অনর্থের সূচনা দেখা যাইতেছে। ব্রিটেন প্রথমে তোয়াজ করিয়া হিটলার মুসোলিনীকে ঠাণ্ডা করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু সে চেষ্টা বিফল হইয়াছে। হিটলার ও মুসোলিনী এখন একযোগে তাঁহাদের এই দরদী বন্ধুটির উপরই শ্যেন দৃষ্টি হানিয়াছেন! এসব বিষয় পূর্ব্বে পূর্ব্বে বারে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি। এখন রুজভেল্টের শেষ আবেদনে বুঝা যাইতেছে আর বুঝি আসন্ন মহাসমরের বেশী বিলম্ব নাই।

হিটলার মুসোলিনী এক একটি দেশ গ্রাস করিয়া লইতেছেন, অমনি ব্রিটিশ সিংহ যেন গা-ঝাড়া দিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহার তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবটা এখনও যেন কাটিয়া যায় নাই। তাহার সজাগ দৃষ্টির পরিচয় এখন আর তেমন পাওয়া যাইতেছে না। হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাস করিয়াছেন, অমনি ব্রিটেন কতকটা চেতনা লাভ করিয়া ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে আপোষ-আলোচনা সুরু করিয়া দিল। হিটলার মেমেল দখল করিয়া ডানজিগের উপর দৃষ্টি হানিলেন, অমনি পোল্যাণ্ডের সঙ্গে মিতালী করিতে অগ্রসর হইল। মুসোলিনী আলবেনিয়া অধিকার করিয়া লইলেন, ব্রিটেন অমনি গ্রীস ও রুমানিয়াকে আশ্বাস দিয়া ফেলিল! এইরূপ নানা দৃষ্টান্তে দেখা যাইতেছে ব্রিটেন হিটলার মুসোলিনীর পশ্চাৎ অনুসরণ করিতেছে। তাঁহাদের দুর্জয় লোভ প্রতিহত করিতে হইলে আগে হইতেই যে রকম চেষ্টা করা আবশ্যক সে সেরূপ কিছুই করিতেছে না। ব্রিটেনের মনের কোথায়ও এমন ঘুণ ধরিয়াছে যাহাতে অগ্রণী হইয়া কোন কাজ করা আজ তাহার পক্ষে এতই কঠিন হইয়া পড়িয়াছে?

এ প্রশ্নের জবাব দিতে হইলে তাহার বর্ত্তমান মতিগতিরই আলোচনা করিতে হইবে। উপরে বলিয়াছি, রুজভেল্টের প্রস্তাবে ব্রিটেন ও ফ্রান্স খুশী হইয়াছে। ব্রিটেন গত ছয় মাসে অস্ত্রশস্ত্র ঢের বাড়াইয়া লইয়াছে, এ কথা ঠিক। তথাপি হিটলার ও মুসোলিনীর বিরুদ্ধে তাহা এখনও যথেষ্ট বিবেচিত হইতেছে না। কিন্তু তাহার পক্ষে কোন সুনির্দ্দিষ্ট পন্থা অবলম্বনের পক্ষে ইহাই একমাত্র বাধা নহে। ব্রিটেন জার্ম্মানীর আক্রমণের বিরুদ্ধে পোল্যাণ্ডকে এবং ইটালী জার্ম্মানী উভয়েরই আক্রমণের বিরুদ্ধে গ্রীস ও রুমানিয়াকে রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতির কোনই মূল্য থাকে না যদি-না সোভিয়েট রুশিয়াকে তাহার পক্ষে না রাখা যায়। কি পোল্যাণ্ড কি রুমানিয়া কি গ্রীস—জার্ম্মানী ও ইটালীর হঠাৎ আক্রমণের বিরুদ্ধে ইহাদিগকে বাঁচাইতে পারে একমাত্র সোভিয়েট রুশিয়া। বিশেষজ্ঞগণ বলিয়াছেন, ব্রিটেন এই সব ছোট রাষ্ট্রের সঙ্গে আত্মরক্ষামূলক চুক্তিতে যেমন ক্ষিপ্রতার সহিত আবদ্ধ হইয়াছে সোভিয়েট রুশিয়ার সঙ্গে সেরূপভাবে আবদ্ধ হইবার কোনই চেষ্টা হইতেছে না। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে, সংবাদপত্রে ও নানা সভা-সমিতিতে সোভিয়েট রুশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ সাধনের জন্য সরকারকে অনুরোধ জানান হইতেছে। মন্ত্রিসভার মধ্যে নাকি এমন লোক বিস্তর রহিয়াছেন যাঁহারা সোভিয়েট রুশিয়ার নামে এখনও আঁৎকাইয়া উঠেন। একদল নাকি এখনও মুসোলিনীর 'সদিচ্ছা'র উপর আস্থাশীল! ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেন সেদিন বলিয়াছেন যে, আলবেনিয়া অধিকার করিবার পরও ইঙ্গ-ইটালীয়ান চুক্তি অক্ষুণ্ন রহিয়াছে!

কিন্তু সম্প্রতি বাধ্য হইয়াই যেন ব্রিটিশ শাসকবর্গ তাঁহাদের মনোভাবের কতকটা পরিবর্ত্তন সাধন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। আজকাল ঘন ঘন সংবাদ আসিতেছে, সোভিয়েট রুশিয়া এখন আর ব্রিটেনের উপর ততটা বিরূপ নয়, ব্রিটেনের সঙ্গে একযোগে কাজ করিতে সে রাজী হইতেছে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। ইহা দ্বারা লোকের মনে এইরূপ ধারণাই জন্মাইয়া দেওয়া হইতেছে যে, সোভিয়েট রুশিয়া যেন এখন নিজ গরজেই ব্রিটেনের সঙ্গে যুক্ত হইতে চাহিতেছে। রুমানিয়া ও পোল্যাণ্ড আক্রান্ত হইলে সোভিয়েট বিমান-বাহিনী তাহাদের রক্ষায় অগ্রসর হইবে।

এখন কিন্তু যতই সময় যাইতেছে ততই বুঝা যাইতেছে গরজ কাহার। ব্রিটিশ কূটনীতিবিদ্‌রা এতকাল জার্ম্মানী ও সোভিয়েট রুশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বাধাইতে চাহিয়াছিল। আজ সে আশা পণ্ড হইয়া গিয়াছে। সোভিয়েট এ কথা জানিতে পারিয়া ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষের উপর বিরূপ হইয়াছিল। তাই এতদিন ব্রিটিশরা তাহার সঙ্গে মিলিত হইবার মুখ পায় নাই। জাতির সর্ব্বদলের অভিপ্রায় এতাদৃশ মিলনের অনুকূলে প্রকাশিত হইলেও শাসকবর্গ এদিকে তেমন অবহিত হন নাই। কিন্তু গরজ বড় বালাই। এখন যদিও প্রচার করা হইতেছে যে, সোভিয়েট নিজেই ব্রিটেনের সঙ্গে একযোগে কার্য্য করিতে অগ্রসর হইয়াছে, তথাপি আসল কথা এই যে, ব্রিটেনই নিজ গরজে তাহার দুয়ারে ধর্ণা দিতেছে। লণ্ডনে ঘন ঘন সোভিয়েট দূতের সঙ্গে, ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিবের পরামর্শ এবং মস্কোতে সোভিয়েট পররাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে ব্রিটিশ দূতের আলাপ-আলোচনা কি সূচিত করে? এত সব আলাপ-আলোচনার মর্ম্ম আমরা

বুঝিতে পারিতেছি না। তবে একটি বিষয় আমরা ধরিয়া লইতে পারি। ব্রিটেন ও সোভিয়েট রুশিয়া পরস্পরকে সাহায্য করিবে হয়ত একটি সর্ত্তে। তাহা এই যে, পরস্পরের আভ্যন্তরিক শাসন ব্যাপারে কেহই হস্তক্ষেপ করিবে না। ব্রিটেনের প্রধান ভয় এই যে, রুশিয়ার সঙ্গে একযোগে কার্য্য করিতে গেলে সে তাহার সাম্রাজ্যের মূলে ঘা না দিয়া বসে। রুশিয়ার উপর পোল্যাণ্ড খুশী নয়, আপনাদের আগে বলিয়াছি। ইহার বর্ত্তমান পররাষ্ট্র-সচিব কর্ণেল জোসেফ বেকের জীবনী পাঠে আপনারা জানিতে পারিয়াছেন যে, সোভিয়েট-বিরোধী কার্য্য তিনি জীবনে ঢের করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমানে শুধু ব্রিটেনের প্রতিশ্রুতিই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট নয়। ব্রিটিশ বাহিনী আসিবার পূর্ব্বেই যে জার্ম্মান বিমানপোত তাহাকে ছারখার করিয়া দিতে পারিবে। কাজেই

মুসোলিনী

সোভিয়েট রুশিয়ার বিমান-বাহিনীর সাহায্যে তাহার বিশেষ প্রয়োজন। প্রথমদিকে সোভিয়েট রুশিয়ার সাহায্য লইতে অরাজী হইলেও এখন ইহার বিমান-বাহিনীর সাহায্য লইতে সে সম্মত হইয়াছে। সম্মত না হইয়া তাহার উপায়ও নাই। রুমানিয়াও এখন সোভিয়েটের সাহায্য প্রত্যাশী। শুধু বিমান-বাহিনীর সাহায্য নহে, প্রয়োজন হইলে রুমানিয়ার রুশ সৈন্য চলাচল সে করিতে দিবে। তুরস্ক ও ব্রিটেনের মধ্যে কিভাবে পরস্পরকে সাহায্য করা যায় তাহার আলোচনা সুরু হইয়াছে। তুরস্ক ও ব্রিটেনের মধ্যে কিভাবে পরস্পরকে সাহায্য করা যায় তাহার আলোচনা সুরু হইয়াছে। বসফোরাস ও দার্দ্দেনেলিস প্রণালী উন্মুক্ত করিবার জন্য ব্রিটেন তুরস্ককে অনুরোধ জানাইয়াছে। তুরস্ক নাকি ব্রিটেনকে স্পষ্টই বলিয়াছে যে রুশিয়ার সাহায্য না পাইলে তাহার আত্মরক্ষা করা বড়ই কঠিন হইয়া পড়িবে। [illegible]

একথা নাকি খুবই প্রযুজ্য। কাজেই দেখা যাইতেছে, ব্রিটেন নিজের গরজে, এবং যাহাদিগকে সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছে তাহাদেরও নির্ব্বন্ধাতিশয়ে সোভিয়েট রুশিয়াকে কোলে টানিতে বাধ্য হইতেছে।

এখন অন্তর্জ্জগতে অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে? ব্রিটেন যখন কূটনীতির পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছিল তাহার মধ্যেই রুজভেল্টের আবেদন সাধারণের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যান্য বারেও যেমন হইয়াছিল এবারেও কি সেইরূপ হিটলার মুসোলিনী পররাজ্য অধিকার করিবেন, আর ব্রিটিশ ধুরন্ধরগণ নানারূপ লম্বাচওড়া বোলচাল আওড়াইতে থাকিবেন? হয়ত এইরূপ সম্ভাবনাই ঘটিয়াছিল। নহিলে রুজভেল্ট কেমন করিয়া বুঝিলেন যে, আগামী পাঁচ ছয় দিনের মধ্যেই একটা ভীষণ অনর্থ ঘটিয়া যাওয়া সম্ভবপর? একটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিলে কতকগুলি ব্যাপার আমাদের

হিটলার

নিকট পরিষ্কার হইয়া যাইবে। ব্রিটেনের কূটনীতির বিষয় আপনারা ভালই জানেন। কিন্তু অন্য কি কি উপায় সে অবলম্বন করিতেছে? কেবল কূটনীতির আশ্রয় লওয়াই ত যথেষ্ট নহে। একান্তভাবে কূটনীতির আশ্রয় লওয়ায় এতগুলি দেশ ত নিজেদের স্বাধীনতা হারাইয়া বসিল!

ব্রিটেনের নৌবহর একরকম প্রস্তুত হইয়াই আছে। জিব্রাল্টার সুরক্ষিত করা হইতেছে। ফরাসী নৌবহর সেখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ভূমধ্যসাগরে মাল্টা নৌঘাঁটি নৌবহরের আনাগোনায় সরগরম হইয়া উঠিয়াছে। মাল্টায় নৌবহর তাহার পূর্ণ শক্তি লইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। স্থলবাহিনী দ্বিগুণ করিবার চেষ্টা হইতেছে। সৈন্য সংগ্রহ অবিরাম চলিয়াছে। বিমানবাহিনী বাড়ান হইতেছে। আবার বিমান আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার নানা

মুখোস বিলি করা হইয়াছে। বিমান আক্রমণ ব্যাহত করিবার জন্য প্রতিটি গৃহে মাটি খুঁড়িয়া কুঠুরী করিয়া রাখা হইতেছে। গত ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতায় কুঁড়ি কোটি 'স্যান্ড ব্যাগ' বা বালির থলে তৈয়ীর অর্ডার দেওয়া হইয়াছিল, সম্প্রতি ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা ইহার সচিত্র বর্ণনা পত্রস্থ করিয়াছেন! ব্রিটেনের তরফে যেরূপ, ফ্রান্সের তরফেও সেইরূপ অবিশ্রান্ত চেষ্টা চলিতেছে।

কিন্তু এত করিয়াও ইহারা জার্ম্মাণী ও ইটালীর সমকক্ষ হইতে পারিতেছে না। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, একদিকে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও অন্যদিকে ইটালী, জার্ম্মানী থাকিলে উভয় পক্ষের সৈন্যবাহিনীর অনুপাত দাঁড়ায় ২ঃ৩। অর্থাৎ ব্রিটেন ও ফ্রান্সের দুইটি বাহিনী থাকিলে ইটালী ও জার্ম্মানীর থাকিবে তিনটি। কাজেই ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সোভিয়েট রুশিয়ার সাহায্য একান্ত দরকার, এরূপ বলা হইতেছে। এখন যেরূপ সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে তাহাতে সোভিয়েট রুশিয়া হয়ত ব্রিটেনের পক্ষে যোগ দিবে। হিটলার, মুসোলিনী হয়ত ওৎ পাতিয়া আছেন, সুবিধা পাইলেই নূতন কাহারও ঘাড় মট্‌কাইবেন। কিন্তু এরূপ করিতে যাইয়া যদি কোন প্রবল শক্তির সম্মুখীন হইতে হয়, তাহার বিষয়ও তাঁহারা ভাবিতেছেন এবং নানা উপায়ও অবলম্বন করিতেছেন।

একটু আগেই বলিয়াছি, ব্রিটেন জিব্রাল্টার সুরক্ষিত করিতে লাগিয়া গিয়াছে। প্রায় তিন বৎসর পর্য্যন্ত স্পেন বিপ্লব চলিল, জার্ম্মানী ইটালী তাহার শক্তির কসরৎ দেখাইল এই দীর্ঘদিন ধরিয়া। ব্রিটেন, ফ্রান্স তো ফ্রাঙ্কোর হাতেই স্পেনকে দিয়া দিয়াছে। এখন আবার সেখানে কাহার ভয়? কিন্তু ভয়ের কারণ নাকি বাস্তবিকই ঘটিয়াছে। জার্ম্মান নৌবহর সিউটা ও বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জে জড় হইয়াছে। মুসোলিনী স্পেন হইতে একটি সৈন্যও সরাইয়া লন নাই, বরং দিনের পর দিন নূতন নূতন বাহিনী সেখানে প্রেরিত হইতেছে। মুখে অবশ্য বলা হইতেছে, ফ্রাঙ্কোর মাদ্রিদ প্রবেশের পরই আবার ইহাদের সরাইয়া লওয়া হইবে। কিন্তু লক্ষণ দেখিয়া মনে হয় কোন ভাবী অনর্থের সুযোগ লইবার জন্যই ইটালী এইরূপ সৈন্য জড় করিতেছে। ফ্রাঙ্কোর মাদ্রিদ প্রবেশের তারিখ ক্রমশ পিছাইয়া যাইতেছে, আর ইটালীয় সৈন্য-সংখ্যাও ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। কাজেই কোন রকম গূঢ় অভিসন্ধি যে রহিয়াছে সে বিষয়ে সকলেই যেন নিঃসন্দেহ।

এই সন্দেহ আর একটি কারণে দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। ফ্রান্স ও স্পেন সীমান্তে পিরানিজ অঞ্চল। এই অঞ্চল ইটালীয়দের সাহায্যে সুরক্ষিত করা হইতেছে। ফ্রান্স যেসব সর্ত্তে ফ্রাঙ্কোকে মানিয়া লইয়াছে, তাহা সে এখন পূরণ করিতে চাহিতেছে না। বহু সহস্র স্পেন-বাসী ফ্রান্সে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। ফ্রাঙ্কো এখন এই সকল ফিরাইয়া লইতে অস্বীকার করিতেছে। স্পেনে হিটলার মুসোলিনীর নিকট ব্রিটিশ ও ফরাসী কূটনীতি যেন হার মানিয়াছে। ফ্রাঙ্কো ঐ দুই ডিক্টেটরদের দিকেই ইদানীং বেশী ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। ইহাদের সঙ্গে এণ্টি-কমিণ্টার্ন চুক্তিতে ইতিমধ্যেই সে আবদ্ধ হইয়াছে। ভূমধ্যসাগরীর সমস্যায় স্পেনের মতামত গ্রাহ্য হইবে কিছুকাল পূর্ব্বে মুসোলিনী এইরূপ বলিয়াছিলেন। আজ যে অনর্থের শীঘ্র উদ্ভব সম্ভাবনা তাহাতে ফ্রাঙ্কোর সুবিধার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া নিজের দিকে টানিয়া রাখিতে হয়ত সক্ষম হইয়াছেন।

মুসোলিনী তাঁহার সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত রাখিয়াছেন। তাঁহার নৌবহর ও বিমানপোত ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে খুবই শক্তিশালী বিশেষজ্ঞগণ এইরূপ মত আগেই ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি লিবিয়ায় অত্যধিক সৈন্য জড় করিতে লাগিয়া গিয়াছেন। তুরস্কের নিকটবর্ত্তী ডোডেকানিজ দ্বীপগুলি ইটালীর অধিকারে। এই দ্বীপগুলি অনেকদিন হইতেই সুরক্ষিত আছে। এখন আবার এখানে সৈন্য ও রণাস্ত্র বেশী করিয়া জড় করিতেছেন। আলবেনিয়া অধিকারের পরে আড্রিয়াটিক সাগরে ও পূর্ব্ব ভূমধ্যসাগরে তাহার প্রাধান্য হইয়াছে। বলকান রাষ্ট্রগুলি বেয়াড়া হইলে আলবেনিয়াকে ভিত্তি করিয়া আক্রমণ চালানোও সম্ভব হইবে। বলা হইয়াছে যে, জার্ম্মানী ও ইটালীকে যেমন ঘেরাও করিয়া ফেলিবার চেষ্টা হইতেছে, তাহারাও তাহা ব্যর্থ করিবার প্রয়াস পাইবে। তাহার সূচনা হইল ইটালীর আলবেনিয়া অধিকার দ্বারা।

ইটালী ও জার্ম্মানীর প্রভাব ভূমধ্যসাগর তীরস্থ উত্তর-আফ্রিকা ও পূর্ব্ব এশিয়ার দেশগুলিতে কিরূপ আস্তে আস্তে বাড়িয়া চলিয়াছে তাহার বিবরণ আমরা অনেক পাঠ করিয়াছি। আলবেনিয়া একটি মুসলমান রাষ্ট্র। মুসোলিনী এই রাষ্ট্রটিকে অতর্কিতে আক্রমণ করায় মুসলমানরাও যে তাঁহার হস্তে নিরাপদ নয়, এ কথা জোর গলায় ব্যক্ত করা হইতেছে। সব শেয়ালের এক রা। সাম্রাজ্যবাদী সকলেই সমান। ইটালী, জার্ম্মানী, ব্রিটেন, ফ্রান্স কাহারও মধ্যে কোন তফাৎ করা যায় না। নিজ নিজ কার্য্য হাসিল করিবার জন্য তাহাদের প্রীতির তারতম্য বা হের-ফের হয় এই যা তফাৎ। ভাবী সমরে মুসলমান রাষ্ট্রগুলি কোন দিকে যায় তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। রুজভেল্টের ফিরিস্তিতে কিন্তু মুসলমান রাষ্ট্রগুলিও পড়িয়াছে। হিটলার মুসোলিনীর এসব করায়ত্ত করিবার অভিপ্রায়ও কি তবে আছে?

রুজভেল্টের তালিকায় কিন্তু ভারতবর্ষের উল্লেখ নাই। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলি ইহা হইতে বাদ পড়িয়াছে। আফ্রিকারও অধিকাংশের ইহাতে স্থান দেওয়া হয় নাই। ইহার কারণ কি? ভাবী সমরে স্বাধীন-পরাধীন কেহই নির্লিপ্ত থাকিতে পারিবে বলিয়া বোধ হয় না। হিটলার মুসোলিনীর কি ইহাদের উপর লোভ নাই? রুজভেল্টের আবেদনের দ্বিতীয় দফায় প্রকাশ, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে কাঁচামাল সমানভাবে বণ্টনের চেষ্টা করা হইবে। এই সব অঞ্চলকেই কি তবে আবার দশজনে মিলিয়া লুটিয়া খাইবার ব্যবস্থা হইবে? রুজভেল্টের মতলব বোধ হয় তাহাই। কিন্তু যখন এক ঢিলে একাধিক পাখী মারা সম্ভব, তখন আলাপ আলোচনার মধ্যে গিয়া ডিক্টেটরদ্বয় যে নিজ স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইতে দিবেন এমন তো মনে হয় না। যিনি যাহাই বলুন, আজ যুদ্ধের দিকেই সকলে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

১৮ই এপ্রিল, ১৯৩৯

ঝটিকার ঊর্দ্ধে

War is not a convulsion of nature, like an earthquake; it is a result of human volition and human volition can prevent it.* লড়াই ভূমিকম্পের মতো দৈবদুর্ব্বিপাক নয়। মানুষের ইচ্ছা থেকেই লড়ায়ের উৎপত্তি আবার মানুষের ইচ্ছাই লড়ায়ের অবসান ঘটাতে সক্ষম। পৃথিবী থেকে লড়াইকে চিরতরে উঠিয়ে দিতে হ'লে আমাদের যা যা করা দরকার—রাসেল তাঁর Which Way To Peace নামক গ্রন্থে সে-সবের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলছেন, যুদ্ধকে উঠিয়ে দেবার পথে অন্তরায় তিন প্রকারের। প্রথম অন্তরায় এবং দ্বিতীয় অন্তরায় যথাক্রমে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক; তৃতীয় অন্তরায় আসছে মানুষের মনস্তত্ত্বের দিক থেকে।

শান্তির শুভ্র-পতাকাকে চির-উড্ডীন রাখতে হোলে রাজনীতির ক্ষেত্রে আমাদের কি করা প্রয়োজনীয়—তার কথা রাসেল লিখেছেন। তিনি বলছেন, বিভিন্ন রাষ্ট্র উদ্ধত স্বাতন্ত্র্যের উপরে দাঁড়িয়ে যতদিন আপনাদের কর্ত্তৃত্বকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করবার সুযোগ পাবে—ততদিন যুদ্ধের সম্ভাবনা বিলুপ্ত হবার নয়। কিন্তু রাষ্ট্রগুলি আপনাদের কর্ত্তৃত্ব সঙ্কুচিত করতে রাজী হবে কেন? জাপান রাষ্ট্রসংঘের নাকের ডগায় তুড়ি মেরে মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করলো। কে তাকে আটকাতে পারলে? ইটালিও তো সেদিন রাষ্ট্রসংঘের সমস্ত অনুশাসনকে সাগর-জলে ভাসিয়ে দিয়ে আবিসিনিয়ার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো। কেউ তো তাকে বিরত করতে সক্ষম হোলো না। জার্ম্মানীও সেদিন যখন ইউরোপকে স্তম্ভিত ক'রে চেকোশ্লোভাকিয়াকে আত্মসাৎ করলে তখনও দেখা গেল একটা জাতির উদ্ধত স্বাতন্ত্র্যের ভয়াল রূপ। এইসব কাণ্ডকারখানা দেখে একটা সত্য হৃদয়ঙ্গম করা যায়। রাষ্ট্রগুলির অবাধ কর্ত্তৃত্বকে সঙ্কুচিত করতে হ'লে আইনের নজির যথেষ্ট নয়। যারা সহজে বিশ্বরাষ্ট্রের অনুজ্ঞা মেনে নেবে না—তাদের জোর ক'রে সে অনুজ্ঞা মানাতে হবে। শান্তিকে চিরস্থায়ী করতে হ'লে রাজনীতির ক্ষেত্রে দুটো কাজ আমাদের করতেই হবে। প্রথম বিশ্বরাষ্ট্রের (World Government) প্রতিষ্ঠা। এই বিশ্বরাষ্ট্রের শাসন-দণ্ডের কাছে প্রত্যেক রাষ্ট্রকে মাথা নোয়াতে হবে। তার অনুশাসনের বিরুদ্ধে কাজ করবার অধিকার থাকবে না কারও। এই উদ্ধত স্বাতন্ত্র্যের প্রাদুর্ভাবের দিনে যখন সবাই স্ব স্ব প্রধান তখন কেবল আইনের নজির দেখিয়ে বিশ্বরাষ্ট্রের প্রাধান্যকে স্বীকার করানো যে সহজ হবে না—এ কথা খুবই সত্য। তাই এমন উপায় অবলম্বন করতে হবে যার ফলে প্রত্যেকটী রাষ্ট্র বিশ্বরাষ্ট্রের অনুশাসনকে মেনে নিতে বাধ্য হবে। বিশ্বরাষ্ট্রের ক্ষমতা হওয়া চাই দুর্জ্জয়; তার প্রভাব হওয়া চাই এমন অপ্রতিহত যে কোনো রাষ্ট্রশক্তি তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস পাবে না। এই রকমের একটা অপরাজেয় বিশ্বরাষ্ট্রকে সৃষ্টি করতে হ'লে আমাদের কি করার প্রয়োজন? প্রয়োজন—তার ক্ষমতাকে এমন সব দুর্জ্জয় অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা সুরক্ষিত করা যে বিদ্রোহী রাষ্ট্রগুলি দল পাকিয়েও বিশ্বরাষ্ট্রের কর্ত্তৃত্বের অণুমাত্র ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না। বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলছেন, সামরিক এবং বে-সামরিক উড়োজাহাজগুলির উপরে অধিকার থাকবে কেবল বিশ্বরাষ্ট্রের। রসায়ন-শিল্পের উপরেও অধিকার থাকবে শুধু আন্তর্জাতিক গবর্ণমেণ্টের। জাতীয় গবর্ণমেণ্টগুলি যদি রসায়ন-শিল্পের উপরে কর্ত্তৃত্ব পায় তবে তো সর্ব্বনাশ! বিষবাষ্প তৈরী ক'রে আন্তর্জাতিক গবর্ণমেণ্টের শাসনকে তারা অচল ক'রে দেবে—উড়োজাহাজ রাখবার অধিকার পেলেও একই ফল হবে। জাতিগুলিরও অস্ত্রশস্ত্র তৈরীর নিশ্চয়ই অধিকার থাকবে কিন্তু তাদের অস্ত্রশালায় থাকবে কেবল পুরানো ধরণের আয়ুধগুলি। আকাশ থেকে যুদ্ধ করবার যে অধিকার—সে অধিকার থাকবে একমাত্র বিশ্বরাষ্ট্রের (World Government)—আর কারও নয়।

শান্তিকে প্রতিষ্ঠিত করবার পথে রাজনৈতিক যে অন্তরায় রয়েছে তার কথা আলোচনা করা গেল। অর্থনীতির ক্ষেত্রে আমাদের কি করা প্রয়োজন—তার কথা লিখতে গিয়ে রাসেল লিখেছেন, সর্ব্বাগ্রে দরকার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায়ের শাসনকে প্রতিষ্ঠিত করা। অর্থনীতির ক্ষেত্রে ন্যায়ের শাসনকে প্রতিষ্ঠিত করতে হ'লে কি আমাদের করতে হবে? রাসেল লিখছেন,

But if there is to be economic justice, all ultimate ownership and control of land and raw materials must be in the hands of the international authority.

অর্থনীতির ক্ষেত্রে ন্যায়কে বিজয়ী করতে হ'লে জমির এবং কাঁচামালের উপরে চরম অধিকার থাকা চাই বিশ্বরাষ্ট্রের হাতে। কেন রাসেল বলছেন এই কথা? কারণ কাঁচামাল অথবা জমি যতদিন ব্যক্তির অধিকারে থাকবে ততদিন ফল শোচনীয় হ'তে বাধ্য। ধরুন কোনো কৃষকের জমিতে তৈলের খনি আবিষ্কৃত হয়েছে। যদি দেশটা সভ্য হয় তবে কৃষককে অনেকগুলি টাকা দিয়ে তৈলের খনিটী কিনে নেওয়া হয়। তৈলের খনিটীকে কাজে লাগিয়ে লাভ করবার জন্য একটী কোম্পানীও গঠিত হয়। অনেক রকমের নোংরামির আর চক্রান্তের সাহায্যে ঐ কোম্পানী অন্যান্য কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে শেষে একটী জাতীয় কারবারে পরিণত হয়। রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান লোকগুলিকে মোটা মোটা লভ্যাংশ দিয়ে ঐ কোম্পানী শেষে জাতীয় রাষ্ট্রকে মুঠোর মধ্যে নিয়ে আসে। অন্যান্য দেশেও ধনীরা কোম্পানী গঠন ক'রে রাষ্ট্রশক্তিকে আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে আসে। তখন এক রাষ্ট্র আর এক রাষ্ট্রকে ম্লান ক'রে নিজে লাভবান হবার চেষ্টা করে। এমনি প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে লাগে রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের সংঘর্ষ।

যদি তৈলের খনিটী কোনো সভ্যদেশে আবিষ্কৃত না হ'য়ে অসভ্য দেশে আবিষ্কৃত হয় তবে তো প্রথম থেকেই রঙ্গমঞ্চে রাষ্ট্রের আবির্ভাব প্রয়োজন হ'য়ে পড়ে। তৈলের খনি যে স্থানে অবস্থিত সে স্থানটীর উপরে রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হ'লে লাভবান হবার কোনো উপায় নাই। খনির মালিক হবে কে—এই নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী জাতিগুলির মধ্যে বাধে

* Which Way To Peace—Bertraud Russel, p 13–14

সংগ্রাম। মোটের উপরে একথা খুবই সত্য যে কাঁচামালের উপরে ব্যক্তির অধিকার যতদিন অক্ষুণ্ণ থাকবে ততদিন অর্থনীতির ক্ষেত্রে অন্যায়কে আশ্রয় ক'রে লড়াই বাধবার সম্ভাবনা পদে পদে। সোস্যালিজম্ কেবল যদি জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাহ'লেও লড়াই বাধবার সম্ভাবনা সমান বলবতী থাকবে। রাশিয়া তার বাকুর তেলের খনি কিছুতেই ছাড়বে না, ইংলণ্ডও ছাড়বে না তার পার্শিয়ার তেলের খনি। জার্ম্মানী যুদ্ধের সময় পাবে না তেল—সুতরাং রাজ্য বিস্তার ছাড়া তার কাছে তেল পাবার আর কোনো পথ খোলা নেই। অর্থ-নীতির ক্ষেত্রে সাম্যের প্রতিষ্ঠা করতে হ'লে কাঁচামাল থেকে যে লাভ হয় তার অংশকে সব জাতির মধ্যে সমানভাবে বণ্টন ক'রে দেওয়ার প্রয়োজন আর তা করতে হ'লে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রের পূর্ণ অধিকার থাকা চাই কাঁচামালের উপরে। তা যত-দিন না হ'চ্ছে ততদিন লড়াইকে আমরা পৃথিবী থেকে তুলে দিতে পারবো না। কোনো জাতি তার কাঁচামালের সম্পদকে বিশ্বরাষ্ট্রের হাতে ছেড়ে দিতে যদি অস্বীকার করে তবে জোর ক'রে সে সম্পদ তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে। সামরিক ব্যাপারে আন্তর্জাতিকতার নীতি যতদিন প্রতিষ্ঠিত না হচ্ছে, ততদিন অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিশ্বরাষ্ট্রের প্রভাবকে আমরা অনুভব করতে পারবো না।

রাসেল আন্তর্জাতিকতার নীতিকে কেবল যে অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে বলেছেন তা নয়। জিব্রাল্টার প্রণালী, সুয়েজ-খাল, পানামা ক্যানেল প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ স্থান-গুলি কোন জাতিবিশেষের অধিকারে থাকা উচিত নয়—এমন মতও তিনি প্রকাশ করেছেন।

যুদ্ধ বাধবার রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণগুলি নিয়ে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করেছি। কিন্তু লড়াই কি কেবল রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণেই ঘটে থাকে? লড়ায়ের মনস্তত্ত্বঘটিত কারণকে কি উপেক্ষা করা যায়? যুদ্ধের পিছনে রয়েছে আমাদের সেই প্রবৃত্তি যার উল্লাস হচ্ছে খুনোখুনির আর নিষ্ঠুরতার মধ্যে। এই প্রবৃত্তির খেলা যতদিন উদ্দাম থাকবে আমাদের চরিত্রে, ততদিন অর্থ-নৈতিক অথবা রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কোনো পরিবর্ত্তনই পৃথিবীর বুকে শান্তির শ্বেত-পতাকাকে উড্ডীন করাতে সক্ষম হবে না। কোনো সভা-সমিতিতে যুদ্ধের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করবার পর প্রবীণের মুখ থেকে শোনা যাবে—'আরে মশাই, যুদ্ধ কি কখনো থামতে পারে? মানুষের স্বভাবই যে হচ্ছে লড়াই করা।' এই রকমের লোকের সংখ্যা একেবারেই বিরল নয়। এ'দের প্রশ্ন থেকে বোঝা যায়, লড়ায়ে এ'দের আনন্দ। যেখানে লড়াই নেই সে জগত এ'দের কাছে অত্যন্ত পানসে। এই ধরণের লোকেরা লড়ায়ের অনুকূলে অনেক রকমের যুক্তি প্রদর্শন করে থাকেন—যথা যুদ্ধের মধ্যেই মানষের পৌরুষ জাগ্রত হবার সুযোগ পায়। শান্তি মানুষকে নিব্বীর্য্য করে ফেলে। আসলে এই সব যুক্তি তো আবরণ মাত্র। আবরণের নীচে জ্বলে ঘৃণার, হিংসার, ক্রোধের, পরশ্রীকাতরতার রক্তশিখা। মানুষের এই প্রবৃত্তি-গুলিকে রূপান্তরিত করতে পারে শিক্ষার সোনার কাঠি।

আমাদের চরিত্র গঠিত হ'য়ে যায় খুব ছেলে বয়সে। তাই শয়তানী প্রবৃত্তিগুলি মনের মধ্যে ভালো করে বাসা বাঁধবার আগেই ছেলে-মেয়েদের চরিত্রকে শিক্ষা দিয়ে গড়ে তুলতে হবে।

এই শিক্ষার দিকটা নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে রাসেল প্রথমেই মায়েদের করেছেন অপরাধী। Mothers and nurses are the first instructors in militarism এই হচ্ছে রাসেলের মন্তব্য। ছোটো ছেলে অসাব-ধানে কিছু ভেঙে ফেলেছে নয়তো হারিয়ে ফেলেছে—অথবা পড়া ঠিকমতো বলতে পারছে না। রাগ ক'রে কচি গালে মারলে এক চড়। ছোটো ছেলের মনে সঙ্গে সঙ্গে কোন্ ভাবের উদয় হবে? তার মনে জাগবে একটা প্রচণ্ড ক্রোধ। "আচ্ছা, বড়ো যখন হবো—তখন এই মারের নেবো প্রতিশোধ।" কিন্তু যে মানুষটী মারলে সে যদি বালকের ভালোবাসার পাত্র হয়, তবে ক্রোধের সঙ্গে আরও অনেক ভাবের তরঙ্গ খেলে যাবে তার মনে। মার খেয়ে বালক প্রথমে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে যাবে। যার কাছ থেকে আদর আর সোহাগ ছাড়া আর কিছুই সে প্রত্যাশা করেনি, সংসারে যাকে সে জেনে এসেছে রক্ষাকর্ত্তী ব'লে, আঘাত এলো তারই কাছ থেকে! বালক প্রথমটা বিশ্বাসই করতে পারে না। তারপর অভিভূত বালক চিত্ত মারের ধাক্কা থেকে সামলিয়ে উঠে যখন ব্যাপারটা ভালো ক'রে বোঝে—তখন তার হৃদয় থেকে মা অনেক দূরে স'রে গেছে! মাও তা হ'লে বাহিরের শত্রুদের মধ্যেই একজন। মা-ই যদি শত্রু হ'য়ে দাঁড়ালো তবে সংসারে আশ্রয় নেবার স্থান রইলো কোথায়? বালক ভীতনেত্রে চারিদিকে চায় আর নিজেকে মনে করে নিঃসঙ্গ ও নিরাশ্রয়। সে ভাবে "সংসারে মায়া, দয়া, স্নেহ, মমতা সবই মিথ্যা; সত্য কেবল গায়ের জোর। বন্ধুত্ব একটা কথার কথা মাত্র—ভালোবাসার কোন মানে হয় না।" এমনি ক'রেই আমাদের মায়েরা মারের সঙ্গে সঙ্গে ছেলের মনের মধ্যে যুদ্ধের প্রতি অনুরাগের ভিত্তিকে করে প্রতিষ্ঠিত। ছেলের মনে যুদ্ধ করবার কামনা, মেয়ের মনে পুরুষকে রণ-ক্ষেত্রে পাঠাবার ইচ্ছা সবকিছুর মূলে রয়েছে ছেলেবেলায় মায়ের হাতের নির্দয় আঘাত। আমরা মনে করি—না মারলে ছেলেরা মানুষ হয় না—আদর পেয়ে পেয়ে গোল্লায় যায়। আমরা ভাবি, ছেলেদের মনের উপরে কোনো ঘটনা গভীর রেখাপাত করে না—তাকে যে আঘাত করে—সে বুঝি তার ভালবাসা হারায় না। ছেলেদের মনের গঠন সম্পর্কে আমাদের এই অজ্ঞতাই আমাদিগকে এমন নিষ্ঠুর হ'তে প্রশ্রয় দেয়। মানুষের শরীরের আয়তন দিয়ে যারা তার মনের বিচার করে তাদের মতো মূর্খ আছে কয়জন?

কেবল যে মারের জন্যই ছেলে-মেয়েদের মন প্রতিহিংসা-পরায়ণ হয়—তা নয়। ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েদের স্বাধীনতায় ক্রমাগত হস্তক্ষেপ ক'রেও আমরা তাদের নিষ্ঠুর ক'রে তুলি। 'এটা কোরোনা', 'ওটা কোরোনা', 'কথা বোলোনা'—এমনি ধরণের কথা রুদ্ধস্বরে আমরা ক্রমাগত শোনাই শিশুদের কানে। তাদের যেন রামাবলী গায়ে দিয়ে

ঘরের কোণে জপ করবার বয়স। তাদের হচ্ছে দুরন্তপনা করবার বয়স—। সেই চপল দুরন্তপনাকে আমরা যখন শাসন ক'রে থামিয়ে দিই শিশু আমাদের কথা শোনে—কিন্তু তার মনের মধ্যে বাসা নেয় প্রতিহিংসা। প্রথম বয়সে অভিভাবকদের কড়াশাসনকে অনেক কষ্টে যে মেনে নেয়—পরিণত বয়সে সেই আবার অন্যকে শাসনশৃংখলে বেঁধে আনন্দ পায়। বধূ অবস্থায় শাশুড়ীর দেওয়া বাক্য-যন্ত্রণা শুনতে হয় যাকে—শাশুড়ী হ'য়ে সেই আবার বউকে দাঁতে কেটে তৃপ্তি লাভ করে।

আমাদের ইস্কুলে ছেলে-মেয়েদের ইতিহাস শেখাতে গিয়ে অনেক সময় আমরা তাদের মনে স্বাজাত্যাভিমানকে অত্যন্ত উগ্র ক'রে তুলি। নিজের জাতিকে শ্রদ্ধা করা অবশ্যই উচিত—কিন্তু এমন ইতিহাস ছেলে-মেয়েদের পড়ানো কখনই উচিত নয় যা পাঠ ক'রে তাদের মনে জাগে অপর সম্প্রদায়ের প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি নিয়ে। নিরপেক্ষ-ভাবে ছেলেরা যাতে ইতিহাসের ঘটনাগুলির বিচার করতে পারে এমন শিক্ষাই তাদের দেওয়া উচিত। তারপর যে সব রক্ত-পাগল দিগ্বিজয়ী বর্ব্বর ইতিহাসে মহাবীর ব'লে পূজা পেয়ে আসছে—তারা যে দস্যুর চেয়ে বড়ো কিছু নয়—এ কথাও ছেলে-মেয়েদের বুঝিয়ে দেবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। মানুষের রক্ত নিয়ে পৃথিবীতে হোলি খেলেছে যারা—তাদের জীবনকে ছেলেদের চোখে উঁচু ক'রে ধরতে গিয়ে আমরা নরহত্যা, লুণ্ঠন প্রভৃতির চারিদিকে রচনা করেছি শৌর্য্যের মহিমা। আমাদের এই নির্ব্বুদ্ধিতা যুদ্ধের প্রতি মানুষের মনে অনুরাগ জাগানোর জন্য কম দায়ী নয়।

বিশ্বব্যাপিনী শান্তির আশা কি এতই সুদূরপরাহত? কে জানে—যে কুরুক্ষেত্র সম্মুখে আসন্ন তার রক্ত-সাগরের মধ্যে ইউরোপীয় সভ্যতা হয়তো অচিরে বিলীন হ'য়ে যাবে। মূর্চ্ছিত রক্তাক্ত ইউরোপ হয়তো আমাদেরই তপোবনের বাণী শুনে জেগে উঠ্‌বে নবজীবনের প্রভাতের মধ্যে—পাশ্চাত্যকে হয়তো নূতন ক'রে দীক্ষা নিতে হবে এই অবজ্ঞাত ভারতবর্ষের কাছে। আমরা হয়তো ভাবছি মানুষের ইতিহাসে যুগান্তর আসবার এখনো অনেক দেরী। তা নাও তো হ'তে পারে। আমরা তো সর্ব্বজ্ঞ নই। কে জানে ভারতবর্ষ এখনও বেঁচে আছে কেন? কেন তার স্বাধীনতা-যুদ্ধের সেনাপতির কণ্ঠে প্রেমের আর মৈত্রীর বাণী? আজ যে সমস্যার সমাধানের কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছে না দিশেহারা পাশ্চাত্য—হয়তো সে সমস্যার সমাধান ক'রে দেবে শৃংখলমুক্ত ভারতবর্ষের তপোবনের মৃত্যুহীন বাণী। সেই বাণী শুনে ইউরোপ কামানগুলো ছেড়ে দিয়ে হয়তো মানবতার পূজায় ব্রতী হবে। ভবিষ্যতের কথা আমরা কিছুই জানিনে। তাকে আশায় রঙীন ক'রে দেখা যেমন বোকামি, তাকে নৈরাশ্যে মলিন ক'রে দেখাও তেমনি বোকামি।

মাজদিয়া রেল দুর্ঘটনা
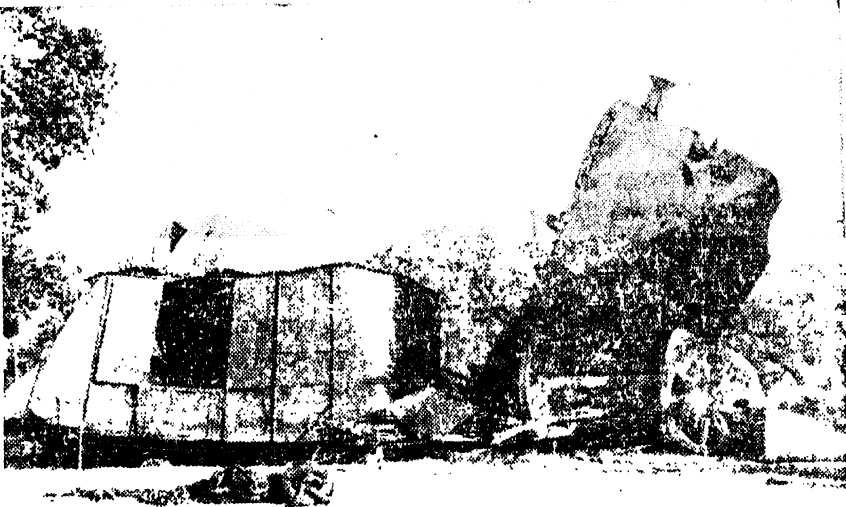
মাজদিয়া ষ্টেশনে ১৬ই এপ্রিলের ট্রেন সংঘর্ষে নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসের গার্ডের গাড়ীর আঘাতে রাজার গাড়ীখানি সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়। প্ল্যাটফরমের উপর অপসারিত উহার চূর্ণ-বিচূর্ণ অংশগুলি

ঘূর্ণাবর্ত্ত

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীমতি অমিয়া সেন

(৩)

অরুণার রচনা খ্যাতি যত না বৃদ্ধি পাইতেছিল ততটা বৃদ্ধি পাইতেছিল, তার রীতিনীতির প্রতি রাধাবিনোদ প্রভৃতির দারুণ বিতৃষ্ণা।

সাধারণের মধ্যে অরুণা অনন্যসাধারণ। তার মন শুধু সংসারের সঙ্কীর্ণ পরিবেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিত না। সে অনেক কিছু ভাবিবার ও বুঝিবার চেষ্টা করিত। এই চেষ্টার ফলে চিত্তে আসিল যে অন্যমনস্কতা, সেই অন্যমনস্কতাও আবার তাহাকে কম বিপদে ফেলিল না।

গৃহে ঘনাইয়া আসিল অশান্তির ছায়া, প্রিয় পরিজনরা অসন্তুষ্ট। অরুণা দিশাহারা হইয়া গেল।

কমল প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিয়া সামনের মফঃস্বল টাউনের কলেজে আই-এ-তে ভর্ত্তি হইয়াছিল। শনিবার শনিবার অরুণাদের বাড়ী আসিত। ছোটবেলা পিতৃ-মাতৃহারা ছেলে, বড় ভাই—অর্থাৎ অরুণার বোন করুণার স্বামী থাকে চাকরী ও স্ত্রী নিয়া সুদূরে বাংলার বাহিরে। সেখানে বাঙালী ছেলের পড়াশুনার অসুবিধা বিস্তর, তাই কমলকে করুণা অরুণার নিকট পাঠাইয়াছিল।

আজ চার বৎসর কমল অরুণার কাছে আছে। সেদিন কমল বাড়ী আসিল শনিবার রাত্রে। অরুণা তার জন্য আলাদা বিছানা করিতেছিল। খানিক আগেই মহালক্ষ্মীর অকারণ তিরস্কারে তার আয়ত নয়নাকাশ হইতে খানিক বর্ষণ হইয়া গিয়াছিল।

ঘরের কোণে একটা মাটির প্রদীপ কাঁপিয়া কাঁপিয়া জ্বলিতেছিল, সেই মৃদু আলোকেই কমল দেখিল, অরুণার শ্যাম মুখ যেন কালো দেখাইতেছে।

ডাকিল, দিদি!

অরুণা মুখ না তুলিয়াই কহিল, বল।

কমল কাছে আসিয়া মুখের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িল। কহিল, দিদি তোমার কি হয়েছে?

অরুণা সরিয়া গিয়া কহিল, কই কিছুই ত হয় নি!

এক বৎসরে কমল আরও অনেক বড় হইয়া গিয়াছে। তার চঞ্চল দুটি চোখের তারায় বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা যেন ফুটিয়া বাহির হইতে চায়। তাই অরুণা আজকাল কমলকে ভয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু সে কিছু না বলিলেও কমল ছাড়িল না। কহিল, দিদি, তুমি খালি আমার কাছে সব কথা গোপন করিতে চাও, কেন বল ত! আমি ত কিছু তোমার কাছে গোপন করি না!

অরুণা ঈষৎ বিরক্ত মুখে কহিল, কি এমন ঘটেছে যা আমি গোপন করছি। তোমার ত বুদ্ধি দিন দিন বাড়ছে কিনা। কলেজে পড়ে বুঝি বুদ্ধিতে শান দেওয়া হচ্ছে, না?

কমল চটিয়া গিয়া কহিল, যাও তোমার সংগে আর আমি কথাই বলব না। সব কথায় খালি ইয়ে—

অরুণার বিছানা পাতা হইয়া গিয়াছিল, শিয়রের দিকের জানালাটা বন্ধ করিতে করিতে আড় চোখে একবার কমলের দিকে চাহিয়া দেখিল, কমল নিদারুণ গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। কচি কিশোর মুখে ক্ষুব্ধ অভিমান যেন মূর্ত্ত হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

অরুণার মায়া হইল, কাছে আসিয়া কোমল স্বরে কহিল সব কথা কি সবার কাছে বলা যায় ভাই! তুমি যে এখনো ছেলে মানুষ, বড় হও, তখন সব বলব।

কমলের রক্তিম ঠোঁট বাণীর আবেগে কাঁপিয়া উঠিল, কিছু জিজ্ঞেস করলেই অমনি তুমি ঐ কথা বল। খালি ছেলে মানুষ—ছেলে মানুষ...কেন, এই ত আমি বড় হয়েছি, আর কত বড় হব?

অরুণার মনের ঘন মেঘ কমলের কথার হাওয়ায় উড়িয়া গেল। হাসিয়া কহিল, যে বড় হয়, সে কখনো বলে না, আমি বড় হয়েছি। এতেই ত বোঝা যায় তুমি কেমন বড় হয়েছ!

কমল এবার রাগে একেবারে ফাটিয়া পড়িল, যাও তুমি, তুমি ছেলেমানুষ বললেই যেন আমি ছেলেমানুষ থাকব। খালি বড় হও—বড় হও, ইয়ার্কী, না!

অরুণা মলিন মুখে একটু হাসিয়া স্নেহ করুণ দৃষ্টিতে তার মুখ পানে চাহিয়া রহিল, এই বাড়ীতে তার প্রতি যথার্থ দরদ শুধু এই ছেলেটিরই আছে। এর মত ভাল আর কেহ বুঝি তাহাকে বাসে না। বয়সে হোক এ কিশোর স্বভাবে হোক এ শিশু অরুণার দুঃখে অরুণার বেদনা একে যতখানি স্পর্শ করে, এ বাড়ীতে আর কাহাকেও ত এমন করে না। কিন্তু বুঝিলেও এর কাছে কোন কথাই বলা যায় না। পাগল ছেলে অর্দ্ধেক হয় ত বুঝিবে, অর্দ্ধেক বুঝিবে না। আর সেই বোঝা না-বোঝার বিদ্যা লইয়াই হয়ত ঝাঁপাইয়া পড়িবে তার উদার চিত্ত পরিজনদের উপরে, —রণং দেহি। চোখের জল ছাড়া অরুণার বুকের বোঝা হাল্কা করিবার আর কোন পন্থাই নাই। অন্য দিকে চাহিয়া অরুণার চোখে আবার জল আসিয়া পড়িল।

কমল দেখিতে পাইয়া অভিমানের বোঝা দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া ব্যাকুল হইয়া কহিল, দিদি—দিদি কেন কাঁদ তুমি, না—না, অত কেঁদ না দিদি—

অরুণা মুখ তুলিয়া চাহিল, গভীর বেদনার্ত্ত স্বরে কহিল, তুমি বুঝবে না কমল, মেয়েদের জীবনে অনেক জ্বালা, অনেক দুঃখ। ভগবান কেন আমাকে আর পাঁচ-জনের একজন করে সৃষ্টি করলেন না; আমি যদি শুধু ঘর নিকানো বাসন মাজার মধ্যেই মসগুল হয়ে ডুবে যেতে পারতাম, সারাদিন কাজের পরে রাত্রি একটার সময়েও খাতা বই নিয়ে না বসতাম, তা হ'লে ত আর কোন হাংগামাই ছিল না।

এ তোমার মিথ্যা অভিমান দিদি, যারা যে জিনিষটা আংশিকভাবেও বোঝবার ক্ষমতা রাখে না, তাদের কাছ থেকে সে জিনিষটার পূর্ণ মর্য্যাদা আশা করাই ভুল। তুমি দুঃখ

ক'র না, চিরদিন মানুষের সমান যায় না, তোমার উপযুক্ত সম্মান, আজ হ'ক, কাল হ'ক এরা দিতে বাধ্য হবেই।

অরুণা চুপ করিয়া রহিল, কোন্ সুদূর ভবিষ্যতে তার অদৃষ্টে ঘটিবে সেই সম্মান-যোগ তা কি কেউ জানে! ততদিন সে এই অসম্মানময় লাঞ্ছিত জীবন কি করিয়া বহিয়া চলিবে! অরুণার বিরহী মন সৃজন স্পৃহার বিচিত্র জগত হইতে বাহির হইয়া ছুটিয়া চলিল, সুদূরের বন্ধুর কাছে, সংসারের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া যখনি সে দিশাহারা হইয়া পড়ে, ব্যাকুল চিত্ত ছুটিয়া চলে তার কাছে,—ওগো, আর ত পারিনে আমি! এখানে কেউ আমার আপন নয়, কেউ আমায় দেয় না শ্রদ্ধা দেয় না প্রীতি। এখানে কি করে থাকি আমি? আমার শক্তি, আমার মুক্তি সবই ত তোমার মধ্যে, এমন অসহায়ভাবে আমাকে ফেলে গেলে কেমন করে পারি আমি!

কমল আবার কহিল, দিদি কেঁদনা।

কাঁদিয়া লাভ নাই, তা অরুণাও বোঝে, কাঁদিলেত মুক্তি মিলিবে না।

হতাশ হইয়া সে কমলের মুখপানে চাহিল।

কমল কহিল দিদি........

অরুণা কহিল, কমল, আর ত পারিনে ভাই।

—দিদি, ধৈর্য্য ধর, তুমি ত এমন ছিলে না।

—না কমল, ছিলাম না, মন আমার এত দুর্ব্বল সত্যিই ছিল না। কিন্তু এরা আমার সব ধৈর্য্য-স্থৈর্য্য যেন শুষে নিচ্ছে, আমি পাগল হয়ে গেলাম।

—এরা কি মানুষ! এদের কথায় তুমি এত অস্থির কেন হও?

—কমল, আমাকে যে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্ত কাটাতে হবে এদের সঙ্গে, এদের কথার দাম যে আমার জীবনে অনেকখানি।

নিরুপায় ক্ষুব্ধ মুখে কমল চুপ করিয়া রহিল, তার ত কিছুই ক্ষমতা নাই। নহিলে অরুণাকে সে যেমন ভালবাসে, এ বাড়ীতে আর কেহ তেমন বাসে না। অরুণার যত কিছু রূপ, গুণ, সব কিছুকে এমন অবিমিশ্র শ্রদ্ধার চোখে পৃথিবীতে আর কেহ দেখে কিনা সন্দেহ। এ বাড়ীতে অরুণার গুণের আদর নাই, আর সেই অনাদরটা কমলের বুকে বাজে বোধ হয় অরুণার চেয়েও বেশী। ক্ষুব্ধ মুখে মলিনতার স্পর্শ লাগিল। ব্যথাহত বিস্ময়ে সে ভাবিল, এরা এমন!

(৪)

দীপক রায় একজন সাহিত্যিক, (আজকাল বাঙলা সাহিত্যে যেন-তেন প্রকারে কালির আঁচড় কাটিতে পারিলেই সাহিত্যিক হওয়া সোজা, তা সে আঁচড় কলমের উল্টা দিক দিয়াই হোক, আর সোজা দিক দিয়াই হোক)।

অরুণা ও দীপক একই পত্রিকার লেখক লেখিকা। একদা পত্রিকা অফিসে গিয়া দীপক শুনিল অরুণা দেবী তার রচনার প্রশংসা করিয়া লিপিকা পাঠাইয়াছে।

দীপকের মনে অকাল-বসন্তের হাওয়া বহিল, সে খুশী মনে অরুণার ঠিকানাটি নোট বুকে টুকিয়া লইয়া বাসায় ফিরিল। অস্বাভাবিক কিছু নয়।

নবীন লেখকদের কেহ প্রশংসা করিলে তাদের মনটা ধূলি মলিন মাটির পৃথিবী হইতে একেবারে উদ্ধলোকে যাত্রা করে।

চিত্রলেখা অবাক হইয়া কহিল, হয়েছে কি?

দীপক হাসিয়া কহিল, কেন?

—খুশী যে তোমার চোখে মুখে উপচে পড়ছে।

—তোমাকে দেখে।

—যাও, খালি ইয়ার্কি—

—দীপক তার খোঁপাটা ধরিয়া নাড়িয়া দিয়া কহিল, অরুণা দেবী আমার লেখার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে।

সে কে?

—একজন লেখিকা।

ওঃ—বলিয়া চিত্রলেখা ঠোঁট বাঁকাইল।

দীপক কহিল, ওকি, রাগ করলে?

—না।

—তবে?

—কী তবে?

—অমন করলে কেন?

—খুশী।

—বেশ। বলিয়া দীপক আর দাঁড়াইল না, ঘরে ঢুকিয়া চেয়ারটাকে টেবিলের কাছে টানিয়া নিয়া কলম খুলিয়া নিয়া বসিল।

অরুণার কাছে একখানি চিঠি লিখলে কেমন হয়? দীপক উদাস দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিল। কলমের মুখে এই যে চরিত্র সৃষ্টি—নিজের মনের সুখ-দুঃখে—ভাবে-অভাবে প্রতিনিয়ত তাহাকে রাঙাইয়া তোলা এতে তৃপ্তি কই? কেন সে সুখী হইতে পারিতেছে না? কেন তার মনে এ অকারণ অসন্তোষ!

তার মত অতৃপ্তি কি অরুণার মনেও আছে? আর থাকিলেও কি তা অরুণা তার কাছে প্রকাশ করিবে?

কিন্তু করিলেই বা দোষ কি! তাদের মধ্যে যোগসূত্র ত সাহিত্য নিয়া, সে সাহিত্য বিষয়ে হর্ষ বেদনা অরুণা কেন অন্যের নিকট প্রকাশ করিবে না?

দীপক অরুণার কাছে চিঠি লিখিল। যথা সময়ে সে চিঠির উত্তরও আসিল। চিত্রলেখা দেখিতে পাইয়া কহিল, তুমি বুঝি চিঠি লিখেছিলে?

—হ্যাঁ।

—কেন লিখলে আমাকে না জিজ্ঞেস করে।

—আমার ইচ্ছা।

চিত্রলেখা মুখ ভার করিয়া চলিয়া গেল। দীপক ফিরিয়া চাহিল না। সে তখন মনে মনে অরুণার চিঠির উপরের চাহিল না। সে তখন মনে মনে অরুণার চিঠির উত্তরের লেখা রাগ করিয়া গিয়াছে।

দীপক উঠিল, চিত্রলেখা পাশের ঘরে জানালার শিক ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, মেঘলাদিনের বর্ষণোন্মুখ আকাশের মত মুখে চোখে আসন্ন বর্ষণ-চিহ্ন ঘনাইয়া আসিয়া-

ছিল, দীপক দুই হাতে তার লুটানো অঞ্চল ধরিয়া টানিল, চিত্রা!

চিত্রা শক্ত করিয়া শিক চাপিয়া ধরিল।

দীপক কহিল, চিত্রা কথা শোন.

ঠোঁট কামড়াইয়া চিত্রলেখা কহিল, না।

দীপক হাসিল। এক বৎসরের বিবাহিতা প্রিয়া। প্রথম ভালবাসার ভাললাগার ঘোর আঁখির তট হইতে এখনও মিলাইয়া যায় নাই। অভিমান হইবারই কথা। কহিল, রাগ করলে কেন? অরুণা চিঠি লিখেছে, তাই?

চিত্রলেখা কথা কহিল না।

দীপক কহিল, এতে কি দোষ আছে? লেখক লেখিকাদের মধ্যে এমন আলাপ হয়ে থাকে। চিত্রলেখা নির্বাক।

দীপক আবার কহিল, তুমি যদি বারণ কর, আর লিখব না।

—আমার বারণে তোমার কি আসে যায়!

—এত অভিমান! দীপক নিজে হাসিয়া চিত্রাকে হাসাইয়া ছাড়িল।

দীপক অরুণার চিঠির জবাব দিল। সে চিঠি পাইয়া অরুণা স্তব্ধ হইয়া রহিল। কমল কহিল, অত কি ভাবছ? কী আছে ও চিঠিতে? অরুণা কহিল, নেই কিছু, তবে এ পোয়েটীক ছন্দের লেখা চিঠি, অন্য কারুর চোখে পড়লে তারা এ চিঠির যথার্থ সারল্য বুঝবে না। সোজা কথাগুলোকে বিকৃত করে দেখবে।

—বেশ ত তুমি সে কথা দীপকবাবুকে লিখে দাওনা।

—লিখব?

—হ্যাঁ লেখ।

একটু ভাবিয়া কমল কহিল, কিন্তু দীপকবাবু কিছু ভাববে না ত!

অরুণা হাসিয়া কহিল, আমি কি তাঁকে অসম্মান করব? এতে ভাবার কি আছে?

কমল কহিল, সবার সম্মান জ্ঞান ত সমান নয়।

—নারে দীপকবাবু তেমন লোক নয়।

—সে তুমিই ভাল বুঝবে।

অরুণা সরল ভাষায় তার বাধা-বিপত্তির সহজ কথাগুলি দীপককে লিখিয়া দিল। সে চিঠি পড়িয়া চিত্রলেখা উঠিল আগুন হইয়া। সে আগুনের স্পর্শ দীপকের মনেও লাগিল। শিক্ষিত সাহিত্যিক মন তার সঙ্কুচিত হইয়া ভদ্রসীমার বাহিরে চলিয়া গেল। অভদ্র, বিশ্রী, সন্দেহপূর্ণ কথার মালায় সে চিঠির উত্তর সমাপ্ত হইল।

চিত্রলেখা ঠোঁট ফুলাইয়া কহিল। মেয়েটা কি বেহায়া!

—অতি আধুনিকা, দীপক বিদ্রূপ করিয়া কহিল।

—এদের উপর কি গার্জ্জিয়ানদের দৃষ্টি নেই?

—তারা কি করে জানবে, যে মেয়ে অন্তত এতটুকু লেখাপড়াও জানে, সে সাধারণ ভদ্রভাবে একখানা চিঠি লিখতে জানে না।

—এই চিঠিই তুমি ডাকে দাও, বেশ শিক্ষা হবে।

দীপক তার গালে একটা টোকা মারিয়া কহিল, মিস অরুণা ত জানে না যে, আমার তুমি আছ!

দীপক সেই চিঠিই ডাকে দিল।

* * *

অরুণা সবেমাত্র স্নান সারিয়া তোয়ালে দিয়া চুল মুছিতে ছিল, কমল চিঠি আনিয়া কহিল, দিদি, রায় চিঠি লিখেছে।

—পড় ত কি লিখেছে।

—তোমার চিঠি তুমি আগে পড়বে না?

—পড়ই না তুমি।

কমল চিঠি খুলিল।

অরুণা মুখ মুছিতে মুছিতে দেখিল, চিঠি পড়িতে পড়িতে কমলের মুখ ক্রমশ গম্ভীর হইয়া আসিতেছে। মাঝামাঝি পড়িয়াই সে একেবারে ফাটিয়া পড়িল, অসভ্য-ব্রুট—

অরুণা চমকিয়া উঠিল, কি হয়েছে?

—দেখ, অভদ্র ইডিয়টটা কি লখেছে।

অরুণা পড়িল, পড়িয়া আকস্মিক বেদনায় একেবারে বিবর্ণ হইয়া উঠিল।

কমল কহিল এর জবাবের উপযুক্ত ভাষা কি তোমার কলমে জুটবে না দিদি? তোমাকেও ঠিক এমনি একখানা চিঠি লিখতে হবে।

ঘোরটা কাটাইয়া উঠিয়া অরুণা কহিল, না, কমল, আমি আর লিখব না।

—কেন? এমন অসম্মান করল তোমাকে, আর তুমি তার জবাব দেবে না?

—কি জবাব দেব কমল? চিঠি ত তুমি পড়লে, এমন চিঠি কোন শিক্ষিত ভদ্রলোক কোন ভদ্রমেয়েকে লেখে?

—তোমাকে মনে করেছে কুমারী মেয়ে, মনে করেছে তুমি শুধু তার রচনায়ই আকৃষ্ট নও, আকৃষ্ট—

কমলের কিশোর মুখ অনুচ্চারিত বাণীর উত্তাপে রক্তিম হইয়া উঠিল। শেষের কথাটা বিপুল লজ্জায় চাপা পড়িয়া গেল।

অরুণা বুঝিল, কহিল, হলেই বা কুমারী মেয়ে। কুমারী মেয়ের কি সম্মান কম? আর—অরুণা সহসা বিষম উত্তেজিত হইয়া উঠিল, আর দীপক রায় কি মনে করেছে! করলামই বা তার রচনার একটু প্রশংসা—তাইতেই কি—মিহির চৌধুরীর কাছে সে যে তুচ্ছ হতেও তুচ্ছ। রাগের ঝোঁকে মিহিরের উপমা দিয়াই অরুণার হঠাৎ খেয়াল হইল, কমল অবাক হইয়া তার মুখপানে চাহিয়া আছে।

খেয়াল হইতেই সুনিবিড় লজ্জায় অরুণা তাড়াতাড়ি ঘর ছাড়িয়া পিছনের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। পাশের ঘরে রাধাবিনোদ আর শ্যামলা আছেন। অরুণা এতজোরে মিহিরের নাম উচ্চারণ করিয়াছে, হয়ত তাহারাও শুনিতে পাইয়াছে। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অরুণা ঘামিয়া উঠিল।

(ক্রমশ)

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতি ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অভিভাষণ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বংগীয় সাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতি শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অভিভাষণ গতসপ্তাহে কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছে; অদ্য অবশিষ্টাংশ প্রদত্ত হইল,—

ভারতীয় ভাষার সংস্কৃত শব্দাবলীতে কখনও কোন প্রাচীন মুসলমান লেখকের আপত্তি হয় নাই। আরবী ফারসী শব্দ যাহা আসিয়াছে, তাহা ধীরে ধীরে আসিয়াছে, সাহিত্যের উপরে জবরদস্তী করিয়া আনা হয় নাই। উর্দু ভাষার ইতিহাস আলোচনা করিলেই এ বিষয়টি স্পষ্ট দেখা যায়। উর্দু কবিতার আরম্ভ হয় দাক্ষিণাত্যে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে; দক্ষিণের প্রাচীন উর্দু কবিতার ভাষা আর তখনকার দিনের হিন্দী কবিতার ভাষা, দেশী হিন্দী আর সংস্কৃত শব্দ প্রায় সমান ভাবেই ব্যবহার করিয়াছে। বাংগালা দেশে কতকগুলি মুসলমান লেখক এখন বাংগালা ভাষা ও সাহিত্যকে 'ইসলামীয়' করিতে চাহিতেছেন। উর্দু ভাষায় যে আরবী ফারসী শব্দের বাহুল্য বর্ত্তমানে দেখা যায়, তাহা ইঁহাদের কাহারও কাহারও কাছে বাংগালা ভাষাতেও কাম্য এবং অনুকরণীয় বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ইঁহারা দুইটি কথা ভুলিয়া যান। প্রথমতঃ ভাষার শব্দ হইতেছে বস্তু, ক্রিয়া বা ভাবের প্রতীক; শিক্ষা ও সংস্কৃতি দ্বারা আমাদের ভাব উন্নত বা বিশুদ্ধ অথবা কোন ঈপ্সিত মতবাদের অনুসারী হইয়া দাঁড়াইলে, শব্দ পুরাতন হইলেও নূতন ভাবকে গ্রহণ করে। ইংরেজী God শব্দ মূলতঃ সংস্কৃত 'হূত' শব্দেরই প্রতিরূপ,—God এবং 'হূত', উভয় শব্দ আদিম আর্য্য (ইন্দো-ইউরোপীয়)* ghuto শব্দ হইতে জাত, ইহার অর্থ, 'যাঁহার জন্য আহুতি দেওয়া হয়'; এক্ষণে ইংরেজীতে God শব্দের এই মৌলিক অর্থ কোথায় তলাইয়া গিয়াছে—যিনি আহুতির অপেক্ষা রাখেন না এমন খৃষ্টান ঈশ্বরের ভাব এই God শব্দ এখন প্রকাশ করে। ফারসীর 'খোদা' শব্দ মূলতঃ সংস্কৃতের 'স্ব-ধা' শব্দের ইরানীয় প্রতিরূপ হইতে জাত—ইহার অর্থ, 'যিনি নিজে কার্য্য করেন বা শক্তি প্রকাশ করেন'; ইহা আরবী 'অল্লাহ' শব্দের ফারসী প্রতিশব্দ হইয়া গিয়াছে; আবার কলিকাতায় চীনাদের মুখে যে 'বাজারু' হিন্দুস্থানী প্রচলিত, তাহাতে 'খোদা' শব্দ, 'যে কোনও দেবতা, ঠাকুর বা মূর্ত্তি' অর্থে ভাবান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে—হিন্দুর কালীমূর্ত্তি কলিকাতার চীনার কাছে 'খোদা', আবার তাহার নিজের ধর্ম্মের দেবতা বা মূর্ত্তি ও 'খোদা'। ইংরেজের God, মুসলমানের খোদাকেও ঐ নামে সে অভিহিত করে।

নানা ভাষা হইতে বহু দৃষ্টান্ত দিয়া দেখানো যায়, প্রচলিত একটা ভাষায় তাহার পুরাতন শব্দের রূপ না বদলাইয়া, ভাব বদলাইতে পারা যায়; এবং তাহা সহজ ভাবেই ঘটিয়া থাকে। অন্যথা ফরমাইশ-মতন তাড়াতাড়ি কিছু করিতে গেলে, নানা রকমের বিভ্রাট সৃষ্টি হয়; শব্দ নূতন হইলেও, লোকের মনের সংস্কৃতি বা চিন্তা-প্রণালী পূর্ব্ববং থাকিলে, নূতন শব্দেরই অর্থ বিকৃত হয়। 'গুরু' বা 'শিক্ষক' স্থানে 'ওস্তাদ', 'মারা গেলেন' বা 'দেহত্যাগ করিলেন' স্থলে 'এন্তেকাল ফরমাইলেন', 'বিচার' স্থলে 'এন্সাফ', 'সেবক' স্থলে 'খাদেম', 'মানুষ' স্থলে 'এন্ছান' অর্থাৎ 'ইন্সান', 'মাতা পিতা' স্থলে 'ওয়ালিদায়েন', 'গুরুজন' স্থলে 'বুজুর্গান্', 'ঈশ্বর-দত্ত' বা 'ভগবানের দেওয়া' স্থলে 'খোদাদাদ', 'কবিত্ব' স্থলে 'শাইরী'—এইরূপ বিদেশী শব্দ প্রয়োগে, ভাষা অর্দ্ধেকের উপর বাংগালীর কাছে দুর্বোধ্য হইয়া দাঁড়ায়। দ্বিতীয় কথা এই যে, ভাষাকে আরবী ফারসী শব্দে ভরপুর করিয়া না দিলে, সেই ভাষা যাহারা বলে তাহাদের ইসলামী পাকাপোক্ত হয় না, এইরূপ এক অনৈতিহাসিক এবং হানিকর ধারণার বশবর্ত্তী ইঁহারা হইয়াছেন। বাংগালী মুসলমান বাংগালা সাহিত্যে ব্যবহৃত সাধারণ সংস্কৃত শব্দ বুঝে, অনেক স্থলে আরবী ফারসী শব্দের অর্থ তাহাকে বাংগালী হিন্দুর মতই জানিয়া লইয়া তবে বুঝিতে হয়। এই জন্যই সহজে উচ্চ-শিক্ষিত বাংগালী মুসলমানগণ তাঁহাদের মধ্যে মাতৃভাষার চর্চার উদ্দেশ্যে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি' করিয়াছেন, তাঁহারা এই সমিতির ফারসী নাম-করণ করেন নাই—'আঞ্জুমান-এ-ইসলামিয়া বরায় তরক্কী-এ আদব-এ-বংগলা'। প্রথম তুর্কী-বিজয়ের যুগে গজনার সুলতান মহমুদ প্রমুখ তুর্কী রাজারা ভারতবর্ষে অনেকবার বিজয়-অভিযান করিয়াছিলেন, পাঞ্জাবকে তাঁহারা গজনার সাম্রাজ্যের অংশীভূত করিয়া লইয়াছিলেন—তাঁহারা 'বুৎ-শিকন' বা 'মূর্ত্তি-ধ্বংসী' ছিলেন, কিন্তু 'জবান-শিকন্' বা ভাষা-ধ্বংসী হন নাই। গজনার সুলতানেরা ভারতীয় প্রজাদের জন্য প্রথম যে সকল মুদ্রা জাহির করেন, সেগুলির মধ্যে তাঁহারা মুসলমান ধর্ম-বীজ কলমা-মন্ত্র 'লা ইলাহা-ইল্লাল্লাহ্, মুহম্মদ, রসূলুল্লাহ্' (অর্থাৎ-অল্লাহ ব্যতীত ইলাহ্ বা উপাস্য নাই, মুহম্মদ অল্লাহের রসূল, অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রেরিত'), ইহার দেশীয় অনুবাদ করাইয়া ভারতীয় মুদ্রায় দিয়াছিলেন—'অব্যক্তম্ একম্, মুহম্মদ অবতার; তারিখ দিয়াছেন হিজিরার অব্দে, কিন্তু 'হিজিরা' অর্থাৎ মক্কা হইতে নবী মুহম্মদের পলায়নের বৎসর হইতে যে সংবতের উৎপত্তি তাহার ভারতীয় অনুবাদ করেন 'জিনায়ন'—অর্থাৎ মুহম্মদ, যেন বুদ্ধ ও মহাবীরের দরের 'জিন' বা জেতা—তাঁহার 'অয়ন' বা গমনের তারিখ। এখন 'হিজিরা'কে কোনও ভারতীয় মুসলমান 'জিনায়ন' বলিতে চাহিবেন কি? 'অব্যক্ত এক, মুহম্মদ অবতার'—ইহা অবশ্য কলমার ঠিক অনুবাদ নহে, কিন্তু এই অনুবাদের চেষ্টা হইতে তখনকার মনোভাব বুঝা যায়। ঔরংগজেব বাদশাহের পুত্র রাজকুমার আজম পিতার নিকটে কতকগুলি অতি উৎকৃষ্ট আম পাঠাইয়া দেন, পিতাকে অনুরোধ করেন ঐ জাতীয় আমের যেন একটি করিয়া নাম তিনি ঠিক করিয়া দেন; ভারতে মুসলমানগণের মধ্যে রাজর্ষি রূপে সম্মানিত ঔরঙ্গজেব আলমগীর বাদশাহ এই আমের নাম রাখেন, ভারতের সকলের বোধ্য সংস্কৃত শব্দ দিয়া—'সুধারস' এবং 'রসনা-বিলাস' ('রোক্কা-আৎ-এ-আলমগীরী', নয়ের সংখ্যার চিঠি)। গান্ধীজীর প্রস্তাবিত লোকশিক্ষার বিধি প্রবর্তিত করিবার জন্য যে-সব স্কুল স্থাপিত করা হইতেছে সেগুলির নাম দেওয়া হইয়াছে 'বিদ্যামন্দির'—'বিদ্যা' এবং 'মন্দির' এই দুইটি শব্দ উর্দুওয়ালারাও বুঝিবেন, কিন্তু এই নাম সংস্কৃত ভাষার শব্দে গঠিত বলিয়া কতকগুলি মুসলমান আপত্তি করিলেন—তাঁহারা আরবী নাম 'বৈতু-ল্-ইলম্' না হইলে প্রস্তাবিত বিধির বিরোধিতা করিবেন। ওদিকে ভারতের বাহিরে তুর্কীস্থানে ও পারস্যদেশে মুসলমান সাহিত্যিক মহলে চেষ্টা চলিতেছে, তুর্কী ও ফারসী ভাষাদ্বয়কে খাঁটী তুর্কী ও ফারসী ভাষা করিয়া তুলা,—তুর্কী হইতে আরবী ফারসীর, এবং ফারসী হইতে আরবীর শব্দ বহিষ্কারের চেষ্টা চলিতেছে। পারস্যের রাজধানী তেহ্রান-এর বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন নাম ছিল আরবী ভাষায়—'দারু-ল-উলুম', এখন এই নাম বদলাইয়া ফারসী আর্য-ভাষার শব্দ দিয়া নূতন নাম হইয়াছে, 'দানিশ-গাহ্'। তুর্কীস্থান ও ইরান এতদিন ধরিয়া বিদেশী শব্দের সাধনা করিতেছিল, এখন তাহার মোহ হইতে নিজকে মুক্ত করিতেছে। ভারতে মুসলমান শাসনের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবময় প্রথম যুগে, এবং মোগল-যুগে, এই মোহ ভারতীয় মুসলমানদের ততটা আবিষ্ট করে নাই; অবস্থাগতিকে ফারসী খুব বেশী করিয়া উত্তর-ভারতে রাজ-ভাষা, রাষ্ট্র-ভাষা, দপ্তরের ভাষা এবং সংস্কৃতির ভাষা থাকায়, ফারসীর প্রভাব 'মুসলমানী হিন্দী' বা উর্দুতে

গভীরভাবে পড়িয়াছে। কিন্তু এখন উর্দু ভাষাতেই নবীন কতকগুলি মুসলমান লেখক দেখা দিয়াছেন, যাঁহারা উর্দুর বিদেশী আরবী-ফারসী শব্দাবলী কমাইয়া দিবার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছেন। যুগোপযোগী প্রচেষ্টা বাঙ্গালার বাহিরে আরম্ভ হইয়াছে; পশ্চিমের মুসলমান লেখকগণের মধ্যে ভাষা-বিষয়ে নির্বিচারে আরবী-ফারসী শব্দ গ্রহণের রীতিকে বর্জন করিবার কথাও উঠিয়াছে; কেবল বাঙ্গালা ভাষাতেই কি সেই রীতি নূতন করিয়া গৃহীত হইয়া, বাঙ্গালী জনসাধারণকে ধাঁধায় ফেলা হইবে, এবং পাঁচ কোটির উপর লোকের দুর্লভ ভাষা-গত ঐক্যকে স্বেচ্ছায় বিনষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে?

* * *

বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করিতে গেলে, এই ভাষার উপরে ভীষণ এক জুলুম হইবে—এবং এই পরিবর্তন দুই এক পুরুষে সম্ভব হইবে না। পুরাতনকে মুছিয়া ফেলিয়া আবার নূতন এক ধারা গড়িয়া তুলিতে হইবে। সেরূপ নূতন কিছু গড়িয়া তুলিবার মত কল্পনা ও শক্তি, এবং মানসিক প্রবণতা, 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যকে ইসলামীয় করিয়া ফেলিতে হইবে' এই মত যাঁহারা পোষণ করেন, তাঁহাদের আছে কি না জানি না; কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে, যেখানে laissez faire অর্থাৎ 'যা-খুশী-তাই-করো' নীতি অবাধে চলিতেছে, সেখানে এই প্রকার মানসিক শক্তি এবং কল্পনার পরিচয় বাঙ্গালা ভাষায় কেহ এখনও দেখান নাই। আরবী-ফারসী-বহুল বাঙ্গালায় যেখানেই শক্তিশালী মুসলমান লেখকের আবির্ভাব হইয়াছে, সেখানেই তাঁহার সমাদর হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে সকল বাঙ্গালীর নিকটেই হইয়াছে, বাঙ্গালী হিন্দুর কাছেও তাঁহার জনপ্রিয় হইতে বাধা ঘটে নাই। শ্রীযুক্ত কাজী ইমদাদুল-হক সাহেবের 'আব্দুল্লাহ্'-এর মত উপাদেয় সামাজিক উপন্যাসে স্থানে স্থানে যে আরবী-ফারসী-মিশ্র বাঙ্গালা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে কোনও হানি হয় নাই, বরঞ্চ তাহার দ্বারা বাস্তবের যথার্থ অনুকরণ হইয়া রস-সৃষ্টিতে সহায়তা হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলেও আরবী-ফারসী-মিশ্র বাঙ্গালা, কবি প্রসঙ্গক্রমে ব্যবহার করিয়াছেন, এবং সে সম্পর্কে তিনি যে অভিমত দিয়াছেন তাহা সকল সাহিত্যিক মানিয়া লইবেন—'যে হৌক সে হৌক ভাষা—কাব্য রস লয়ে।'

বিগত শতকের মধ্যে কলিকাতায় মুদ্রিত মুসলমানী কেচ্ছা-সাহিত্যে যে একটা খিচুড়ী বাঙ্গালা দাঁড়াইয়া গিয়াছে, যাহা প্রাচীন মুসলমান লেখকগণের ধারাকে অনুসরণ করে না, বাঙ্গালা দেশের কোনও অঞ্চলের মুসলমানদের বা হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত মৌখিক ভাষার সঙ্গে যাহার কোনও সংযোগ নাই। [illegible]

প্রযোজন করা হয় (যথা—'তেরা পাও' অর্থাৎ 'তোমার পা', 'দেলের বিচেতে'= 'মনের মাঝে', 'পয়দা করে জাহান'='জগৎ সৃজন করে', 'ওয়াস্তে খোদার'='ঈশ্বরের জন্য', 'এছা, জেছা, তেছা'='এমন, যেমন, তেমন', ইত্যাদি)—সেই কেচ্ছা-সাহিত্যের ভাষাকে কেহ কেহ মুসলমান বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ সাহিত্যের ভাষা-রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন। যদি এই ভাষায় শক্তিশালী লেখক দেখা দেন, তাহা হইলে বিশ্বজগৎ ইহাকে মানিয়া লইতে বাধ্য হইবে। কিন্তু যাঁহারা ইহার প্রকৃতি আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা স্বীকার করিবেন যে এই ভাষা, সাহিত্য-বোধ এবং ভাষা-জ্ঞান, উভয় বিষয়েই অক্ষমতার পরিচায়ক। বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতির সঙ্গে, হিন্দু এবং মুসলমানের লেখা পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যের সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় নাই, যাঁহাদের প্রধান সম্বল অল্পস্বল্প আরবী ফারসী ও উর্দু, এহেন শক্তিহীন পেশাদার লেখকের হাতে এই আরবী-ফারসী-মিশ্র কেচ্ছা-সাহিত্যের বাঙ্গালা জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে। ইহা খাঁটী বাঙ্গালাও নহে, শুদ্ধ উর্দুও নহে,—'ন ঘর-কা, ন ঘাট-কা'। কেচ্ছা-সাহিত্যের বাহিরে, মুসলমান-ধর্ম-সংক্রান্ত কিছু কিছু পুস্তক এই ভাষায় লিখিত হইয়াছে—তাহাতে আরবী ফারসী শব্দের অবাধ প্রবেশের ওজুহাত অনেকে দেখিয়াছেন।

কিরূপে সমাধান সম্ভব

এক্ষেত্রে অনুযোগ অভিযোগ উপরোধে কিছু কাজ হইবে বলিয়া মনে হয় না—বিষয়টি হিন্দু ও মুসলমান লেখকগণের সহজ বুদ্ধির উপরে ছাড়িয়া দিতে হইবে। তবে এই রকম একটা বোঝাপড়ায় বোধ হয় সুবিধার দিক্ হইতে সকলেই স্বীকৃত হইবেন—বাঙ্গালা ভাষায় যে সাহিত্য হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষিত লোকের পাঠের উদ্দেশ্যে লিখিত হইবে, বিদ্যালয়ে হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে সমস্ত ছাত্রগণের পাঠ্য হইবে, তাহাতে বাঙ্গালা সাধু-ভাষায় যে রীতি অধুনা প্রচলিত আছে সেই রীতিই আপাততঃ বহাল থাকুক। মুসলমান ধর্ম ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি সম্বন্ধীয় বিশেষ শব্দ আবশ্যক হইলে আরবী ফারসী হইতে বাঙ্গালায় লইতে হইবে—এ বিষয়ে কাহারও আপত্তি হইবে না। কিন্তু যদি বাঙ্গালা শব্দ (ইহার মধ্যে প্রচলিত সংস্কৃত শব্দও ধরিতে হইবে) অনুরূপ অর্থে ইতিপূর্বেই বিদ্যমান থাকে, তাহা গ্রহণ করা যাইতে পারে কি না তাহা বিবেচনা করিলে ভাল হয়। আমার মনে হয়, মৌলানা আকরাম খাঁ, অধ্যাপক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রমুখ মুসলমান সাহিত্যিক, যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষা ভাল জানেন এবং যাঁহারা আরবী-ফারসীতেও প্রবীণ আরবী-ফারসী-জানা কয়েকজন হিন্দু সাহিত্যিকের সঙ্গে মিলিত হইয়া, সমগ্র বঙ্গভাষী হিন্দু-মুসলমানগণের জনসাধারণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, এবং

প্রধান হইয়া, এ বিষয়ে বাঙ্গালী-জাতিকে যথাকর্তব্য নির্দেশ করিয়া দিলে ভাল হয়।

* * *

বাঙ্গালা-ভাষী হিন্দু-মুসলমানের ভাষা-গত ঐক্যের হানি যাহাতে না হয়, তাহার জন্য দেশের যথার্থ হিতকামী বঙ্গ-সন্তান চেষ্টিত হইবেন; অন্যথায় হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই মহান্ অনর্থ হইবে। আমার মনে হয়, উপস্থিত ক্ষেত্রে ভারতের রাজনৈতিক গগন যেরূপ মেঘাড়ম্বরময়, তাহার কৃষ্ণ ছায়া আমাদের সাংস্কৃতিক জগতেও প্রতিফলিত না হইয়া পারে না। রাজনৈতিক গগন পরিষ্কার হইলে, আশা করি এ বিষয়েও আমাদের দৃষ্টি খুলিবে, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যও নবীন গরিমার দ্বারা উদ্ভাসিত হইবে।

প্রসঙ্গতঃ এই সম্পর্কে আর একটী কথা বলিতে চাই। বাঙ্গালী খ্রীষ্টান সম্প্রদায়, কি রোমান-কাথলিক কি প্রটেস্টাণ্ট, সম্প্রতি যে ভাবে তাঁহাদের ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধীয় শব্দাবলীর বাঙ্গালা করিতেছেন, তাহা হইতে দেখা যায় যে তাঁহারা ইউরোপীয় (গ্রীক) শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় চালাইবার পক্ষে তো নহেন, বরঞ্চ সহজ ভাবে বাঙ্গালা ভাষার খাঁটী বাঙ্গালা অথবা বাঙ্গালা ভাষায় আগত সংস্কৃত শব্দ এবং ধাতু ও প্রত্যয় সাহায্যে, বাঙ্গালার প্রকৃতির অনুযায়ী শব্দ গ্রহণ করিতেছেন বা গঠন করিতেছেন। Baptism অর্থে 'দীক্ষা-স্নান', Eucharist অর্থে 'খ্রীষ্ট-প্রসাদ', Confession = 'পাপ-স্বীকার', Extreme Unction='অন্তিম লেপন' Sacred Heart of Jesus অর্থে 'যীশুর শ্রীহৃদয়', Mass='খ্রীষ্ট-যাগ', Sacrament='সংস্কার', প্রভৃতি অনুবাদ, 'হিজিরা' অর্থে 'নির্গমন'-এর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার দ্বারা খ্রীষ্টান মতবাদ বিপন্ন হইয়া পড়িবার আশঙ্কা ইঁহারা করেন না। ইহার সুফল এই হইবে যে, আমাদের সাধারণ মাতৃভাষার মধ্য দিয়া অখ্রীষ্টান বাঙ্গালী, হিন্দু ও মুসলমান বাঙ্গালী, খ্রীষ্টান ধর্মের সহিত পূর্ণ পরিচয় লাভ করিতে পারিবেন, এবং খ্রীষ্টান আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও উপলব্ধির রস আস্বাদন করিতে পারিবেন।

নূতন যুগ-সন্ধি

বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাসে এখন নূতন যুগ-সন্ধি আসিয়া উপস্থিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বাঙ্গালা ভাষা প্রবর্তিত হওয়ায়, মাতৃভাষা বাঙ্গালার প্রতিষ্ঠা শিক্ষার মধ্য দিয়া আমাদের জাতীয় জীবনে আরও সুদৃঢ় হইবে। শিক্ষার বাহন ইংরেজী থাকায় ইংরেজী-শিক্ষিত এবং ইংরেজীতে অনভিজ্ঞ এই দুই শ্রেণীতে বাঙ্গালী জনগণ বিভক্ত হইয়া পড়িতেছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণে বাঙ্গালা ভাষা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাহন হইয়া দাঁড়াইলে, আধুনিক যুগের উপযোগী প্রৌঢ় ও শিক্ষিত মনো-

পুস্তকের সাহায্যে চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে এই যে নূতন বিধি প্রবর্তিত হইল, তাহার ফলে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের পঠন-পাঠনে, বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনায়, প্রাদেশিক, সাম্প্রদায়িক ও গ্রাম্য মনোভাবের পরিবর্তে সার্বজনীন বিশ্বসাহিত্যের আলোচনার উপযোগী উচ্চ আদর্শ ও বৈজ্ঞানিক মনোভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হউক, এই বিধি বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালা সাহিত্যের পক্ষে একটী শুভ যোগ হউক,—ইহা আমরা সকলেই কায়মনোবাক্যে কামনা করি।

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা-বিষয়ে নানা দিকে সার্থক উদ্যোগ দেখা যাইতেছে। এমন সময় ছিল যখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বাঙ্গালা ভাষার সাহিত্যের —বিশেষতঃ আমাদের পুরাতন সাহিত্যের আলোচনার, তাহার উদ্ধারের এবং প্রকাশের, মুখ্য কেন্দ্র ছিল। এবিষয়ে সাহিত্য পরিষদের যে প্রয়াস, তাহা সমবেত ও সচেতন ভাবে বাঙ্গালী জাতির প্রয়াস। ইহা ভিন্ন, ব্যক্তিগত ভাবে অনেকে বহু অত্যাবশ্যক কার্য করিয়াছেন, এখনও করিতেছেন। বহরমপুরের রাধারমণ যন্ত্রের স্বত্বাধিকারিগণ, বৃন্দাবনের নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী, 'অমৃত-বাজার-পত্রিকা'র পরিচালকগণ প্রমুখ বৈষ্ণব সাহিত্যানুরাগীদের চেষ্টায় বাঙ্গালার বৈষ্ণব সাহিত্যের বহু দুর্লভ রত্ন আমাদের পক্ষে সুলভ হইয়াছে। 'বঙ্গবাসী'র সত্বাধিকারিগণ সংস্কৃতের ইতিহাস পুরাণ প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থনিচয় বাঙ্গালা অক্ষরে এবং বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত সুলভমূল্যে প্রচার করিয়া বাঙ্গালীকে তাহার জাতির প্রাচীন আধ্যাত্মিক ও মানসিক সম্পদের সহিত পরিচিত হইতে আহ্বান করিয়াছেন; বাঙ্গালী, বিশেষ করিয়া হিন্দু বাঙ্গালী, এই জন্য 'বঙ্গবাসী'র স্বত্বাধিকারিগণের নিকট চিরকাল ঋণী থাকিবে। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের কতকগুলি প্রধান পুস্তকও ইঁহারা প্রকাশিত করিয়াছেন। তদ্রূপ 'বসুমতী'র প্রতিষ্ঠাতা ও অধুনাতন স্বত্বাধিকারী বাঙ্গালার প্রাচীন ও আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ-সাহিত্য সৃষ্টি সুলভ গ্রন্থাবলী আকারে প্রকাশিত করিয়া, দেশের মধ্যে সেগুলিকে ছড়াইয়া দিয়াছেন—অন্যথা বাঙ্গালীর পক্ষে তাহার নিজের সাহিত্যের সহিত এত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ ঘটিত কিনা সন্দেহ। বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের কল্যাণে বাঙ্গালী পাঠক নূতন করিয়া কালিদাসের গ্রন্থাবলীর মূলের সৌন্দর্য মাতৃভাষার মাধ্যমে উপভোগ করিতে সমর্থ হইতেছে, ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গেও পরিচয় লাভ করিতে পারিতেছে; এই প্রতিষ্ঠানটী সমস্ত শেক্স্‌পিয়রের গ্রন্থাবলীর যে সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা ভাষার পক্ষে একটী সুসংবাদ, বঙ্গভাষী জাতিকে তজ্জন্য অভিনন্দিত করা হইতে পারে। 'হিতবাদী' যন্ত্র হইতে পূর্বে যে সমস্ত বাঙ্গালা সাহিত্য-গ্রন্থ ও অনুবাদ-গ্রন্থ বাহির হইয়াছে, সেগুলির দ্বারাও বঙ্গবাণীর মহিমা দিগ্‌দিগন্তে বিস্তৃত হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রসার-বৃদ্ধি বিষয়ে চট্টগ্রামের বাঙ্গালী বৌদ্ধগণ রেঙ্গুনে ও কলিকাতা হইতে বঙ্গাক্ষরে মূল পালি ত্রিপিটক ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিতেছেন, তৎসম্বন্ধে বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

সুখের বিষয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পাশে আজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, বাঙ্গালা ভাষার ও সাহিত্যের চর্চায় এবং প্রকাশে তৎপরতা দেখাইতেছেন। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাঙ্গালা-সাহিত্য-বিষয়ক আলোচনাকে অবলম্বন করিয়া, পঁচিশ বৎসরের অধিক কাল হইল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গালা সাহিত্যের ও ভাষার চর্চাকে উৎসাহ দিতেছেন, এবং এ সম্পর্কে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে লক্ষণীয় ও কতকগুলি বিষয়ে বিশেষ সার্থক অনুসন্ধান হইয়াছে। কলিকাতা তথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা পুঁথির সংগ্রহ, পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথিশালার মত অপরিহার্য হইয়াছে। চণ্ডীদাস-সমস্যার সমাধান বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও চেষ্টা চলিতেছে—এ সম্বন্ধে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসুর আলোচনা, তৎকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের পদের নূতন পুঁথির ও দীন চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদময় পুঁথির খণ্ডিত অংশের আবিষ্কার, এবং বড়ু চণ্ডীদাস হইতে পৃথক্ দীন চণ্ডীদাসের পদের নির্ণয়ের প্রয়াস ও সেগুলির সংস্করণ, এই লক্ষণীয় কার্যগুলির বিশেষ উল্লেখ করিতে পারা যায়। ঢাকায় ও কলিকাতায় চর্যাপদ-গুলি লইয়াও আলোচনা চলিতেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ভবানন্দের 'হরিবংশ' প্রভৃতি প্রাচীন বাঙ্গালা পুস্তকের প্রকাশ হইয়াছে, এবং ঢাকার শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের কৃত্তিবাসের রামায়ণের সংস্করণও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব আলাওলের 'পদ্মাবত'-এর একটি প্রামাণিক সংস্করণ বাহির করিবেন, আমরা এইরূপ আশ্বাস পাইয়াছিলাম; প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের এই শ্রেষ্ঠ বইখানি যত শীঘ্র যথোচিত পাণ্ডিত্যের সহিত প্রকাশিত হয়, ততই মঙ্গল। পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্য প্রচার কল্পে 'শনিবারের চিঠি'র স্বনামধন্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়-দ্বয়ের সম্পাদনায় যে 'দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা' খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইতেছে, তাহা এই যুগে বাঙ্গালীর মাতৃভাষা-চর্চার ইতিহাসে এক লক্ষণীয় ঘটনা। পুঁথি হইতে উদ্ধার করিয়া আমরা অনেক লুপ্ত ও লুপ্তপ্রায় গ্রন্থ বাঁচাইয়া রাখিতেছি, কিন্তু মুদ্রণের সহায়তা লাভ করিবার পরও অনেক বাঙ্গালা গ্রন্থ আমাদেরই সংগ্রহশীলতার অভাবে লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে। সেগুলির পুনর্মুদ্রণ দ্বারা, আধুনিক কালে ইউরোপীয় সভ্যতার সহিত আমাদের সংঘাতের সন্ধিক্ষণে নূতন ভাব-ধারা কি ভাবে আমাদের মনে কার্য করিতেছিল, তাহার পরিচয় আবার সহজ-লভ্য হইতেছে, এই জন্য 'দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা'র সম্পাদকগণ ধন্যবাদার্হ।

মেদিনীপুরে ঝাড়গ্রামের কুমার শ্রীযুক্ত নরসিংহ মল্লদেব মহাশয়ের বদান্যতায় এবং মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত বিনয়রঞ্জন সেন মহাশয়ের আগ্রহে, পুণ্য-শ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গ্রন্থাবলীর একটী প্রামাণিক সংস্করণ বাহির হইতেছে; এতদ্ভিন্ন, বঙ্কিমচন্দ্র-শতবার্ষিকীর অনুষ্ঠানকে চিরস্মরণীয় করিবার চেষ্টায়, ঝাড়-গ্রামের কুমার বাহাদুরের প্রদত্ত অর্থে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র গ্রন্থাবলীর একটী শোভন ও প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। বাঙ্গালীর পক্ষে এই দুইটী সংবাদে বিশেষ আত্মপ্রসাদ হইবার কথা।

ভাষার আলোচনার জন্য, এবং ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞান আহৃত করিয়া দিবার জন্য প্রামাণিক অভিধান ও বিশ্বকোষের আবশ্যকতা বাঙ্গালায় কাজ-চালানো ভাবে পূরণ করা হইয়াছে। ছোট কার্যকর অভিধানের মধ্যে শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয়ের সুপরিচিত 'চলন্তিকা'র তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে; শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র-মোহন দাস মহাশয়ের বৃহৎ 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ কিছুদিন হইল প্রকাশিত হইয়াছে; এই বইয়ে এক লক্ষ পনের হাজারের অধিক শব্দ স্থানলাভ করিয়াছে। শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রাণপাত করিয়া তাঁহার সুবৃহৎ 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' মুদ্রিত করিতেছেন, তাঁহার এই কার্য অদ্ভুত পরিশ্রম ও পাণ্ডিত্যের ফল—তাঁহার অধ্যবসায় এবং উৎসাহ, সাহস এবং কার্যশক্তি অদম্য; এই বই সম্পূর্ণ হইলে, বাঙ্গালা ভাষার অভিধানজগতে এক কীর্তিস্তম্ভ, 'শব্দকল্পদ্রুম' বা 'বাচস্পত্য', অথবা বোট্‌লিঙ্ক ও রোটের সংস্কৃত অভিধানের দরের এক বৃহৎ অভিধান বাঙ্গালা ভাষা লাভ করিবে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শান্তিনিকেতনের শিক্ষকতা-কার্য হইতে অবসর লইয়াছেন, এই বিরাট্ কার্য সম্পন্ন করা তাঁহার একার সাধ্য নহে; এ বিষয়ে দেশের মাতৃভাষাপ্রেমী লক্ষ্মীমন্ত-গণের সহায়তা নিতান্ত আবশ্যক। কুমিল্লার বিদ্বান্ ও কর্মী সন্তান, মাতৃভাষার একনিষ্ঠ সেবক, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার মহাশয় অনুরূপ একটি বড় কাজে হাত দিয়াছেন। তিনি ইতিমধ্যে কয়েক খণ্ডে একখানি পৌরাণিক অভিধান বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত করিয়াছেন—রেঙ্গুনে থাকিয়া তিনি এই কার্য আরম্ভ করেন; সংস্কৃত ইতিহাস ও পুরাণ বর্ণিত

তাবৎ পাত্র পাত্রীর পরিচয় ইহাতে আছে। এক্ষণে ইনি বহু খণ্ডে একটী প্রামাণিক ঐতিহাসিক 'জীবনী-কোষ' প্রকাশ করিতে ব্যাপৃত আছেন, তাহারও তিন খণ্ড ইতি-মধ্যে বাহির করিয়াছেন—বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ বহির অভাব আছে; কিন্তু এ কাজ তাঁহার একার নহে—তিনি জীবনীকোষ সঙ্কলন করিয়া দিলেন, ছাপাই-বার ভার মুখ্যতঃ দেশের—সরকারের, অথবা বিদ্যোৎসাহী ভাগ্যবানদিগের। এই দুই নিঃস্বার্থ নিঃস্ব বিদ্যা-সর্বস্ব পণ্ডিতের কার্যের প্রতি দেশবাসীর সহানুভূতি-পূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করা কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেছি।

বাঙ্গালা ভাষায় এবং পরে হিন্দীতে 'বিশ্বকোষ' সঙ্কলন করিয়া যিনি বাঙ্গালী জাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, সেই কর্ম-বীর পণ্ডিত, নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয়ের মৃত্যুতে, বাঙ্গালা ভাষার অনপনেয় হানি হইল। সহ-কর্মী একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর পরেও বসুজ মহাশয় অদম্য উৎসাহে তাঁহার বিশ্বকোষের দ্বিতীয় সংস্করণের সংশোধন এবং প্রকাশ কার্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু এই মহাগ্রন্থের অল্পমাত্র অংশ তিনি মুদ্রিত করিয়া যাইতে সমর্থ হন; তাঁহার অভাবে বোধ হয় এই আরব্ধ কার্য আর বুঝি সম্পূর্ণ হইল না। বসুজ মহাশয় তাঁহার বিশ্ব-কোষকে আধুনিক এবং যুগোপযোগী তথ্য দ্বারা নূতন কলেবরদান করিতে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু ইহা বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য যে তাঁহার এই বিরাট কার্য অসমাপ্তই রহিয়া গেল। এখন আমাদের ভরসা-স্থল শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের 'মহাকোষ'।

* * *

শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রসঙ্গে মনে হয়, এই বৎসর বাঙ্গালার সাহিত্য ও সংস্কৃতির দিক হইতে বিশেষ এক দুর্বৎসর গেল। বাঙ্গালা সাহিত্যের, বাঙ্গালীর বিদ্যার জ্ঞানবিজ্ঞানের ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে কতকগুলি ইন্দ্রপাত হইয়াছে—কতকগুলি মনীষীর মৃত্যুতে বাঙ্গালা দেশের যে ক্ষতি হইল, তাহার আর পূরণ হইবার নহে। আমি কেবল শ্রদ্ধার সহিত এই সকল মনীষীর নাম করিব; তাঁহাদের গুণকীর্তন করিয়া, প্রদীপের সাহায্যে সূর্যকে দেখাই-বার চেষ্টা করিব না। শিল্পী গগনেন্দ্র-নাথ ঠাকুর; মনীষী ব্রজেন্দ্রনাথ শীল; শিক্ষাব্রতী, বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক গিরিশ-চন্দ্র বসু; সুসাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায়; নৃতত্ত্ববিৎ শরৎচন্দ্র মিত্র; স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর প্রচারক, রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী শুদ্ধানন্দ; ভারত-গৌরব প্রত্নতত্ত্ববিৎ ননীগোপাল মজুমদার; ব্যবহারবিৎ কলারসিক সতীশচন্দ্র বাগচী; সংস্কৃতজ্ঞ ও প্রত্নতত্ত্ববিৎ পদ্মনাথ ভট্টাচার্য; প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবক শিবরতন মিত্র; সুসাহিত্যিক হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, বনওয়ারিলাল গোস্বামী, দেবেন্দ্রনাথ বসু; গণিতবিৎ অপূর্বচন্দ্র দত্ত; রাজা জগৎ-কিশোর আচার্য; রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুর।

সাহিত্যের প্রকৃতি, গতি ও আদর্শ

সাহিত্য-সম্মেলনে সাহিত্যের প্রকৃতি, গতি বা আদর্শ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হওয়া উচিত, ইহা অনেকেই মনে করেন। আমিও মনে করি; তবে আমি সাহিত্যিক অর্থাৎ রস-সাহিত্যের স্রষ্টা নহি, সুতরাং নিজ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা আমি বলিতে পারিব না—কোন্ প্রেরণার ফলে এবং কোন লক্ষ্যের অভিমুখী হইয়া সাহিত্য-চেষ্টা সার্থক সৃষ্টিতে আত্মপ্রকাশ করে। আমি ব্যবসায়ী সাহিত্য-বিচারক অর্থাৎ সাহিত্য-সমালোচকও নহি যে, অধ্যয়ন এবং অব-লোকনের দ্বারা, বস্তুনিষ্ঠ ভাবেই হউক অথবা আত্মনিষ্ঠ ভাবেই হউক, সাহিত্যের মধ্যে স্থিত রস-বস্তুর আবিষ্কার করিব এবং তাহার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিব, তাহার স্বরূপ ও উৎপত্তি নির্ণয় করিব। সাধারণ ভাবে সাহিত্য সম্বন্ধে যে ধারণা আমরা পোষণ করিয়া থাকি, তাহা কতকটা আমাদের শিক্ষা এবং বহুল পরিমাণে আমাদের রুচি ও মানসিক প্রবণতার ফল। এই ধারণা প্রধানতঃ দুই প্রকারের দেখা যায়; পদার্থ-বিজ্ঞানের ভাষায়, ইহা হয় কেন্দ্রাভি-মুখী, না হয় কেন্দ্রাপসারী। এই দুই প্রকার সাহিত্য-দৃষ্টি এবং সাহিত্য-সাধনা পরস্পরের প্রতিকূলও বটে, পরস্পরের পরি-পূরকও বটে। অন্য বিষয়ে যেমন, তেমন সাহিত্যের কেন্দ্রাভিমুখী মনোভাবের নিকট সংহতি, সমবায়, সমষ্টি-ধর্ম বা সঙ্ঘ-ধর্ম, discipline বা বিনয়, নিয়ম বা বিধি-নিষেধের অনুবর্তিতা, প্রাচীন রীতির অনু-সরণ, নীতি-পরায়ণতা প্রভৃতি ধর্ম বা গুণ অভীপ্সিত; এবং কেন্দ্রাপসারী মনোভাব, স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য, ব্যষ্টি-ধর্ম বা ব্যক্তি-ধর্ম স্বাধীনতা, স্বেচ্ছানুবৃত্ততা, নবীনের প্রতি আকর্ষণ, অনৈতিকতা প্রভৃতি ধর্মের বা গুণের অনুকূল। সাধারণতঃ প্রত্যেক মানবের মনে এই দুই মনোভাবের মিশ্রণ থাকে—কোথাও বা কেন্দ্রাভিমুখী ভাব অধিক, কোথাও কেন্দ্রাপসারী ভাব প্রবল। এই দুই বিভিন্ন মনোভাব যতক্ষণ পর্যন্ত কেবল ভাব-জগতে নিবদ্ধ থাকে, ততক্ষণ ইহাদের মধ্যে বিরোধ প্রকাশ পায় না; কিন্তু যখন সাহিত্যে রূপ গ্রহণ করে, তখন, এবং যখন চরিত্রে রীতি ও নীতিতে প্রকট হয়, তখনই ভাব-সংঘাতের এবং চরিত্র-সংঘাতের অবকাশ ঘটে। ক্ল্যাসিক্যাল ও রোমান্টিক, নীতি-মূলক ও সৌন্দর্যবোধ-মূলক, সমাজ-সংরক্ষক ও ব্যক্তিত্ব প্রসারক, বিচার-মূলক ও অনুভূতি-মূলক, যুক্তিধর্মী ও কল্পনা-ধর্মী, আদর্শ-বাদী ও বাস্তব-বাদী—এই প্রকার বিপরীত অথবা পরস্পরের পূরক ভাব ও চিন্তা-ধারা অবলম্বন করিয়া সাহিত্যচেষ্টা আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। এই দুই শ্রেণীর ভাবকে পরস্পর-বিরোধী বা প্রতিস্পর্ধী না বলিয়া, পরস্পরের সহিত সংযুক্ত, একই বস্তুর দুই মুখ বলিয়া বর্ণনা করিলে, ইহাদের যথার্থ সম্বন্ধ প্রকাশ করা হয়। কেন্দ্রাভিমুখী এবং কেন্দ্রাপসারী এই উভয় ভাবের সুসামঞ্জস্য হইলে, মানসিক ও সামাজিক জীবনে সুসার আসে, সাহিত্যে চিরস্থায়ী শাশ্বতগুণ-যুক্ত রস-সৃষ্টি ঘটিয়া থাকে। শ্রেষ্ঠ রস-সৃষ্টি কখনও একদেশদর্শী হইতে পারে না, তাহার মধ্যে ব্যষ্টি ও সমষ্টি, সুষমা ও শক্তি, স্বাধীনতা ও নিয়মানু-বর্তিতা, নীতির বন্ধন ও বাধাবন্ধহীন স্বচ্ছন্দ গতি, উভয়েরই সামঞ্জস্য দেখা যায়। বন্ধনের মধ্যেও মুক্তি এই মহাসত্য কেন্দ্রাভি-মুখী মনোভাব প্রকাশ করিতে চাহে; কেন্দ্রাপসারী মনোভাব মুক্তির মধ্যে আপনাকে বাঁধিতে চাহে। যেখানে এই দুই ভাবকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা হয় সেখানেই একদেশদর্শিতা আসিয়া পড়ে, সেখানেই এক দিকে ভার পড়ে সৎ-এর বহু মুখের মধ্যে একটীকে মাত্র স্বীকার করিয়া লইলে যাহা হয়, তাহা ঘটে—একের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অন্যকে বর্জন করিবার অন্যকে খর্বীকৃত করিবার আকাঙ্ক্ষা হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা হয়। আমাদের দেশে সাহিত্য-বিষয়েও উপস্থিত সেই পরস্পর-বিরোধী মনোভাবের প্রকাশ দেখা যাইতেছে। এইরূপে একদেশদর্শী হওয়ায়, আমাদের সাহিত্যিকগণের মধ্যে দুইটী দল দেখা দিয়াছে; প্রাচীন-পন্থী ও আধুনিক-পন্থী, আদর্শ-বাদী, ও বাস্তব-বাদী, নীতি-নিষ্ঠ ও দুর্নীতি-নিষ্ঠ, স্থিতি-শীল ও প্রগতি-শীল, এইরূপ পরিচয় বা নাম, হয় ইঁহারা স্বয়ং লইতেছেন, না হয় অপরে ইঁহাদের দিতেছে; প্রতিদ্বন্দ্বী বিরোধী পক্ষ মনে করিয়া, অন্য দলের প্রতি বিরূপ-ভাব প্রকাশক শ্লেষ বা কটুক্তিময় অন্যান্য নানা নামও আছে। 'প্রগতি সাহিত্য'—এই নামটী, কয়েক মাস যাবৎ হঠাৎ কতকগুলি 'তরুণ' সাহিত্যিকের প্রিয় হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ নামের সার্থকতা বুঝি না। আমরা এই নাম এবং ইহার মধ্যে নিহিত মনোভাবের গতি অনু-সরণ করিবার জন্য উৎসুক রহিলাম। আদর্শবাদ ও বাস্তবানুসারিতা; উদ্দেশ্য-শালিতা ও উদ্দেশ্য-হীনতা; শিবের অর্থাৎ কল্যাণের প্রতিষ্ঠার জন্য সাহিত্য, অথবা অনৈতিক হউক বা প্রতিনৈতিক হউক, কেবল সুন্দরের প্রতিষ্ঠার জন্যই সাহিত্য; সমাজ ও ধর্ম সংরক্ষণ করিব, কি ব্যক্তিত্বের বাধা-হীন প্রকাশের আবাহন করিব—এই দুই ধরনের মত-বাদকে আশ্রয় করিয়া, এই দুই বিভিন্ন শ্রেণী সম্মুখীন হইয়াছেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গে আবার সংরক্ষণ ও বিধ্বংসনের প্রশ্নও উঠিয়াছে। Art for Art's sake—এই মত লইয়া পুরাতন কলহও উঠিয়াছে। সাহিত্যে পরকীয়া-বাদের প্রাবল্য, দুর্নীতির প্রসার প্রভৃতি অনাচার অনেককে বিচলিত করিতেছে।

এ সম্বন্ধে আমার ব্যক্তি-গত অভিমতের বিশেষ মূল্য বা কার্যকারিতা আছে বলিয়া মনে হয় না। বিশ্ব-সাহিত্যের কতকগুলি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের সহিত অল্পাধিক পরিচয়ের ফলে আমার বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছে যে, যাহা

সত্যকার রস-রচনা, তাহা প্রাণধর্মী—প্রাণের স্ফূর্তি যেমন স্বতঃ হইয়া থাকে, এই রূপ রস-রচনার স্ফূর্তিও স্বতঃ হইয়া থাকে; দেশ, কাল, পাত্র—এগুলির প্রভাব বা আবেষ্টনীকে এই রূপ প্রাণধর্মী রচনা বর্জন করিতে পারে না,—এই জন্য ইহা বাস্তবানুসারী হইতে বাধ্য; আবার সেই সঙ্গে, লোকাতিগ দৃষ্টি বা অনুভূতির পরিচয়ও ইহাতে পাই,—অন্যথা বিশ্ব-মানবের আস্বাদনের উপযোগী রসের সৃষ্টি ইহাতে হইতে পারিবে না। সাহিত্য-রচনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য মহাকালের মান-দণ্ডের আবশ্যকতা আছে; যাহা সত্য, যাহা মহৎ, যাহা সার্থক, তাহাই নিরবধি কালের স্রোতের মধ্যে টিকিয়া যায়; যাহা অসত্য, যাহা ক্ষুদ্র, যাহা নিরর্থক, তাহা ক্ষণিকের খ্যাতি পাইয়া বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া যায়।

উপস্থিত কালে প্রাচীন ও অতি আধুনিক স্থিতি-শীল ও প্রগতি-শীল ভেদে বিভিন্ন প্রকারের সাহিত্য-রচনার বিরুদ্ধে, প্রতিপক্ষদলের অভিযোগ উঠিতেছে। প্রাচীন-পন্থী সাহিত্যিকেরা—বঙ্কিমচন্দ্র ইঁহাদের প্রতীক—এখন অচল, কারণ ইঁহারা আদর্শ-বাদী, ইঁহারা 'সমাজ, সমাজ' করিয়াই পাগল, ইঁহারা নীতিবাগীশ, ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ইঁহারা হইতে দিবেন না, ইঁহারা বাস্তবকে উপেক্ষা করিয়া আদর্শকে লইয়াই মাতিয়া থাকেন; নবীনপন্থী সাহিত্যিকেরা বাস্তবানুসারিতার দোহাই দিয়া সাহিত্যে পঙ্কিলতা আনয়ন করিতেছেন, ইঁহাদের মনোভাব প্রতিনৈতিক, ইঁহারা ব্যক্তিত্বের নামে সাহিত্যে ও সমাজে স্বৈরাচার আনয়ন করিতে চেষ্টা করিতেছেন, সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাহিত্যের মাপ-কাঠি ছাড়া আর কোনও মান ইঁহারা অস্বীকার করেন, সাহিত্যে কোনও নৈতিক সামাজিক বা অপর কোনও আদর্শ, মত-বাদ উদ্দেশ্য, বা প্রয়োজন থাকিলে তাহা সাহিত্য-গৌরব হইতে ভ্রষ্ট হয় ইহাই ইঁহাদের অভিমত। আর্টের খাতিরেই আর্ট—সাহিত্যের জন্যই সাহিত্য, সাহিত্যের অন্য কোনও দায় বা কর্তব্য নাই—এ কথার বিচার তখনই হইতে পারে, যখন এই আর্ট এবং ইহার চরম স্বরূপ বা প্রকৃতি কি, সে সম্বন্ধে এবং ইহার সহিত জীবনের সম্বন্ধ কি, সে বিষয়ে আমরা স্থির ধারণা করিতে পারিব; আর্টের অনুশীলনের বা আস্বাদনে—সে আর্ট রূপ-কলারই হউক, বা সাহিত্য-রচনারই হউক, সঙ্গীতেরই হউক বা নৃত্য ও নাটকেরই হউক—আমরা যে অপার্থিব রসানুভূতির অধিকারী হই, তাহাই আর্টের লক্ষ্য; এবং সাংসারিক জীবনের বিষবৃক্ষে ইহাই অন্যতর মধুর ফল। আর্টের উদ্দেশ্য আর্ট, অর্থাৎ এই রসানুভূতি;—সুতরাং যেখানে এই রসানুভূতি নাই, সেখানে আর্ট নিষ্ফল—সাহিত্য সেখানে নিরর্থক। ইহা হইল আধিমানসিক ও আধ্যাত্মিক জগতের কথা। সামাজিক ও ব্যক্তিগত নৈতিক জীবনে আর্ট অর্থাৎ কলা ও সাহিত্য উদ্দেশ্য-বিহীন থাকিতে পারে কি না, তাহা বিচার্য। মানসিক ও আত্মিক জীবনের প্রভাব, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে অপরিহার্য ভাবে আসিয়া পড়ে, সুতরাং জীবন সাহিত্যের প্রভাব হইতে মুক্ত নহে। এইরূপ প্রভাব কাম্য কি না, ইহা হইতে আমরা মানসিক, আত্মিক, নৈতিক ও ব্যবহারিক জীবনে নিজেদের মুক্ত রাখিতে পারি কি না, এ কথার সমাধানের সঙ্গে, সাহিত্য উদ্দেশ্য-মুক্ত হইবে অথবা নিরুদ্দেশ্য হইবে, এই প্রশ্ন ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বন্ধ। এক প্রকার সাহিত্য আছে, যাহার প্রেরণা এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকে না যে, সেই প্রকার সাহিত্যের উৎস রিরংসা এবং তাহার কাম্য ঐ মনোবৃত্তির উত্তেজন; সেই প্রকার সাহিত্য হয় তো আধুনিকতার, বাস্তবের ও শিল্পের দাবী করিয়া, 'সাহিত্য নীতিনিষ্ঠ হইবে না' এই মত-বাদের ধ্বজা উড়াইয়া লোকের কাছে সাফাই গাহিবার চেষ্টা করে। সে রূপ সাহিত্য জগতে নূতন নহে, তাহা কখনও টিকে নাই, টিকিবেও না; এবং এ যুগে সেইরূপ সাহিত্যের জন্য ধর্মাধিকরণের ব্যবস্থা সব দেশেই অল্প-বিস্তর আছে। যথার্থ বাস্তব-বাদী সাহিত্য যদি সত্য দৃষ্টির সঙ্গে দর্শনের লক্ষ্য বা আদর্শ লইয়া আত্মপ্রকাশ করে, তাহা হইলে তাহা আমাদের আদরের সহিত গ্রহণীয়। প্রাচীন আরব কবির উপদেশ এই প্রসঙ্গে সার্থক উপদেশ বলিয়া মনে হয়—'তুমি যে সব কবিতা ও শ্লোক রচনা করিয়াছ, সেগুলির মধ্যে প্রশংসার যোগ্য ও সকলের চেয়ে সুন্দর কবিতা সেইটি, যেটি শুনিয়া লোকে বলে—হাঁ, ইহা সত্য বটে।'

মানুষের মনের ধর্ম বহু জটিলতায় পূর্ণ; সাহিত্য এই সমস্ত জটিলতারই প্রকাশ করিয়া থাকে; এখানে আমরা একটী বা দুইটী ধর্মের ধ্বজা খাড়া করিয়া, অন্য সবগুলিকে উড়াইয়া দিতে পারি না। নিছক সাহিত্য-দৃষ্টিতেই দেখিব, ব্যক্তিগত ও জাতিগত রুচি এবং সংস্কৃতি আমার কাছে কিছুই নহে যেহেতু আমি বাস্তব-বাদী সাহিত্যিক, এই সাহসের উক্তি তাঁহারই সাজে, যাঁহার শক্তি আছে, যাঁহার পক্ষপাতহীন সমদৃষ্টি আছে, মানবধর্মিতার সাধনার ফলে যাঁহার চিত্তে সহানুভূতি আছে, ধৈর্য আছে, ক্ষমা আছে, এবং যাঁহার রস-সৃষ্টি অনুভূতির বা বৈজ্ঞানিক চিন্তার আলোকে উদ্ভাসিত। সাহিত্যে উদ্দেশ্যহীনতা—ইহা 'নিষ্কাম' কর্মের মত; eppur si muove—'নিষ্কাম' ভাবের মধ্যেও in tune with the Infinite হইবার আকাঙ্ক্ষা বা কামনা রহিয়াছে। বাহ্য প্রকৃতির মধ্যেই বা উদ্দেশ্যহীনতা কোথায়? সাহিত্যের মধ্যে যদি অবশ্যম্ভাবিতা থাকে, তাহা হইলে তাহার প্রভাবশালিতার সঙ্গে অপরোক্ষ ভাবেও উদ্দেশ্য আরোপ করা যাইতে পারে।

সাহিত্যের এই প্রভাবশালিতা, ব্যক্তি-মন ও সমাজ-মনের উপর তাহার কার্য, আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না। অবস্থা বা পারিপার্শ্বিক অনুসারে একই বস্তুর বা ভাবের স্বরূপ এবং প্রভাব বিভিন্ন হয়। Totalitarian State অর্থাৎ 'সর্ব-গ্রাসী' রাজতন্ত্র যেখানে প্রচলিত, সেখানে মনের জগতে সাহিত্যের জগতে, কেন্দ্রাপসারিত্বের, ব্যক্তিত্বমূলক সংস্কৃতির আবশ্যকতা আছে। আমাদের মত অবস্থায়, যেখানে সবই খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, যেখানে জাতীয় সংঘবদ্ধতা সকলের চেয়ে অধিক অপেক্ষিত, যেখানে ব্যষ্টি অপেক্ষা সমষ্টি দুর্বল, সেখানে কেন্দ্রাভিমুখিতা হইলে, সামাজিক এবং জাতীয় বিনয় ও সংহতি সুদৃঢ় হইতে পারে। মুদ্রিত সাহিত্য হাতের ঢিল, বা ক্ষেত্রে নিক্ষিপ্ত বীজ, কোথায় গিয়া কাহার মনে কিরূপ কার্য করে, তাহা কাহারও জানা নাই। প্রারম্ভে ভাবশুদ্ধি, অমায়িকতা, সত্যাদিদৃক্ষা থাকিলে, তবেই যথার্থ রসসৃষ্টি সম্ভব হয়; তখন সার্থক ও কল্যাণকর সাহিত্য-রচনা দেশকে ও সমগ্র মানব জাতিকে ধন্য করে।

সুনীতি ও দুর্নীতির প্রশ্ন

সাহিত্যে নীতিনিষ্ঠতা থাকিবে না কি না, তাহা বিচার করিতে হইলে, 'নীতি' বলিলে আমরা কি বুঝিব তাহা জানা দরকার। 'নীতি' শব্দে সাধারণতঃ আমরা বুঝি morality; এই শব্দ যে অর্থে স্বামী বিবেকানন্দ একবার ব্যবহার করিয়াছেন, সেই অর্থ বিশেষভাবে আমার মনে লাগে—Morality is that which strengthens, immorality is that which weakens; যে নীতি মানুষকে জীবনের সব দিকে শক্তি দিতে পারে না, তাহার আবশ্যকতা নাই; এই দৃষ্টিতে বিষয়টী দেখিলে, বোধ হয় সাহিত্যে সুনীতি বা দুর্নীতির প্রশ্নের সমাধান অনেকটা সহজ হইয়া উঠে।

আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যে এখন 'আধুনিক' বা 'প্রগতিবাদী' লাঞ্ছন বা নিশানা অথবা নাম দিয়া কোনও লেখক বা পুস্তককে চিহ্নিত করিয়া দিবার কোনও কারণ দেখি না। এখন আমাদের দেশে যুগ-সন্ধির কাল; আদর্শ-বিপর্যয় এবং তৎসঙ্গে সাহিত্যের ক্ষেত্রে নানা অভূত-পূর্ব মনোভাব দেখা দিবেই। প্রগতি সাহিত্যের বা আধুনিকতার নাম দিয়া, আনুষ্ঠানিক হিন্দুয়ানীর মধ্যে নিহিত মৃত বা মৃতকল্প প্রাচীনপন্থিতাকে আক্রমণ করা বা ইহার প্রতি শ্লেষ বা কটূক্তি করা, 'মরা ঘোড়ার উপর চাবুক মারা' বা 'মরা সিংহকে বধ করা'র মত; ইহাতে সাহসের বা বীরত্বের কিছুই নাই। আধুনিক বাস্তব-বাদী সাহিত্যিকের কর্তব্য, দরদ দিয়া নির্ভীক ভাবে সত্য দৃষ্টির সহিত আমাদের সমাজের পরিস্থিতি দেখানো—আমাদের জীবন-মরণ সমস্যাগুলি দরিস্ফুট করিয়া তোলা। এই আধুনিক কালে অর্থনৈতিক কারণে নানা ক্লান্তিকর মনোভাব দেখা দিতেছে, ও আমাদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনের ভিত্তিকে নাড়া দিতেছে। আমাদের সাহিত্যে যদি এই সব বিষয়ের প্রতিচ্ছায়া না পড়ে, তাহা হইলে সে সাহিত্যকে দেশকালের পক্ষে নিরর্থক বলিতে হয়। সমস্যা আমাদের অনেক; কিন্তু প্রধান প্রধান সমস্যাগুলির মধ্যে, কাহারও কাহারও নিকট মাত্র স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধটাই সর্বপ্রধান বলিয়া দেখা দিয়াছে, তাঁহারা ইহারই বর্ণনায় ইহারই চিত্রণে বিশেষ ভাবে অবহিত হইয়াছেন। এ বিষয়ে আবার

বাহিরের জগতের—ইউরোপের নানা দেশের ও আমেরিকার—সমাজের উপযোগী দৃষ্টি-কোণ হইতে অনেকে পরিদর্শন করিতেছেন। আমার বক্তব্য এই—আমাদের দেশে ব্যাপক-ভাবে বুভুক্ষা, নিষ্ঠুর সাম্প্রদায়িক, সমাজ-গত ও ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা, বিভীষিকা এবং নৈরাশ্য যেখানে প্রেতলোকের সৃষ্টি করিতেছে, সেখানে সাহিত্যে ভাব-বিলাস এক হৃদয়-বিদারক ট্রাজেডি বলিয়া মনে হয়। শক্তিশালী সাহিত্যিক নির্ব্যক্তিক বস্তুবাদিকতার সহিত আমাদের জীবনের যথার্থ স্বরূপটী দেখান, জীবনের সব দিকে আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা, ব্যর্থতা-সার্থকতা, শোক-আনন্দ, জয়-পরাজয়, শক্তি-দৌর্বল্য, সত্য-মিথ্যা প্রকট করিয়া দিন,—তাঁহাকে পাইয়া, তাঁহার সত্য দর্শন ও প্রদর্শনের শক্তির অনুপাতে আমাদের বঙ্গ-ভারতী গৌরবশালিনী হইবেন।

সাধুভাষা ও চলিত ভাষা

প্রসঙ্গান্তরে যাওয়া যাক। বাঙ্গালা সাহিত্যে উপস্থিত যে দুই প্রকার রচনা-রীতি চলিতেছে—সাধু ভাষা ও চলিত-ভাষা তাহা বাঙ্গালা ভাষার ঐক্যের পক্ষে কোনও কোনও বিষয়ে হানিকর হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বাঙ্গালা সাধু-ভাষা, পুরাতন বাঙ্গালার ব্যাকরণ, শব্দ ও ধাতু-রূপ প্রভৃতিকে আঁকড়াইয়া রহিয়াছে; এবং বাঙ্গালা চলিত-ভাষা, আধুনিক কালের ভাগীরথী-তীরের ভদ্র-সমাজের মৌখিক ভাষার সাহিত্যিক রূপ মাত্র। সাধু-ভাষা নিখিল বঙ্গদেশের প্রাদেশিক কথ্য-ভাষার পূর্বরূপ প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাঙ্গালার আধারে গঠিত, এবং সাধু-ভাষা এখনও এই সমস্ত কথ্য ভাষার মধ্যে সহজ যোগ-সূত্র রূপে বিদ্যমান। বিগত পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্য বিষয়ে ভাগীরথী-তীরস্থিত নবদ্বীপ ও পরে কলিকাতা বাঙ্গালী জাতির কেন্দ্র—হৃদয় ও মস্তিষ্ক উভয়ই হইয়া রহিয়াছে, সেই জন্য এই অঞ্চলের কথ্য ভাষার যে একটা বিশেষ সম্মানের স্থান হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। এই কারণে বিগত শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সমগ্র বঙ্গদেশে প্রচলিত সাধু-ভাষার পার্শ্বে কলিকাতা অঞ্চলের ভাষা, একটী লঘু শৈলীর সাহিত্যের ভাষারূপে নিজ স্থান করিয়া লইয়াছে। বিংশ শতকের তৃতীয় পাদ হইতে এই চলিত-ভাষা বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আগত তরুণ সাহিত্যিকদের নিকট বিশেষ 'ফ্যাশনেবল' বা নবীন ঢঙ্গের বলিয়া অনুকরণ-যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সাহিত্যিকগণ চলিত-ভাষায় বহুল পরিমাণে লিখিয়াছেন, শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় চলিত-ভাষার পক্ষে তাঁহার শক্তিশালী লেখনী ধারণা করিয়াছেন নিজেও তিনি এই ভাষায় লোকপ্রিয় সাহিত্য রচনা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন অনেকের কাছে চলিত-ভাষা আধুনিকতার প্রতীক বলিয়া মনে হইয়াছে। এই সব কারণে, আজকাল চলিত-ভাষার প্রতি বহু সাহিত্যিকের একটা আকর্ষণ দেখা যাইতেছে; এমন কি অনেকে সাধু-ভাষাকে পুরাপুরি অপ্রচল করিয়া দিয়া, একমাত্র চলিত-ভাষা, সারা বাঙ্গালা জুড়িয়া সমগ্র বঙ্গভাষীর মধ্যে সাহিত্যের ভাষা হইয়া যায়, ইহা কামনা করেন, অবশেষে এইরূপই হইবে বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। আমিও এক সময়ে এইরূপ কামনা করিতাম—মনে করিতাম, বুঝি প্রাচীনপন্থী ভাষা বলিয়া সাধু-ভাষার আয়ুষ্কাল শেষ হইয়া আসিল। কিন্তু আধুনিকতার লেবেল গায়ে লাগাইয়া কতকগুলি তরুণ সাহিত্যিক যে ভাবে এক উৎকট চলিত-ভাষার প্রয়োগ করিতেছেন, তাহা দেখিয়া এবং কয়েক বৎসর ধরিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার বাঙ্গালা ভাষার প্রধান পরীক্ষকের কার্য করিবার সময়ে, উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম বাঙ্গালার বিভিন্ন জেলার ছাত্রদের বাঙ্গালা রচনা দেখিয়া, আমার মনে দৃঢ় ধারণা দাঁড়াইয়াছে যে, সাধু-ভাষার উপযোগিতা এখনও যায় নাই,—আরও কিছুকাল ধরিয়া সাধু ভাষা বাঙ্গালী জাতির সাহিত্য ও মানসিক সংস্কৃতির বাহন থাকিতে পারে; এবং থাকা আবশ্যক বলিয়া আমার মনে হয়। এ কথা, যাঁহারা ঘরে চলতি-ভাষায় কাছাকাছি ভাগীরথী-অঞ্চলের কথ্য ভাষার মত কথ্য ভাষা বলেন না, চলিত-ভাষা যাঁহাদিগকে শিখিয়া লইয়া তবে ব্যবহার করিতে হয়, তাঁহাদের সম্বন্ধে যেমন খাটে; তেমনি যাঁহারা ঘরে চলিত-ভাষা বলিয়া থাকেন এমন ভাগীরথী-তীর-নিবাসী সাহিত্য-বুদ্ধি-হীন বা সাহিত্য-সাধনা হীন সাধারণ ব্যক্তির সম্বন্ধেও খাটে। আমি ইতিপূর্বে এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহার পুনরুল্লেখ করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি,—উপস্থিত ক্ষেত্রে আমার মনে হয়, সাধুভাষায় শিক্ষা-নবিশী করা, ইহার চর্চা করা এবং বিশুদ্ধ ভাবে অর্থাৎ চলিত ভাষার সহিত মিশ্রণ না ঘটাইয়া সাধুভাষায় লেখা, বাঙ্গালা ভাষায় যাঁহারা অধিকার লাভ করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগের পক্ষে একটী বিশেষ প্রয়োজনীয়, এমন কি অপরিহার্য ব্রত বা সাধনা। চলিত-ভাষারও স্বকীয় ব্যাকরণ আছে, নিজস্ব শব্দ আছে, ধ্বনিগত ও উচ্চারণে বর্ণ বিন্যাস-গত স্বাতন্ত্র্য আছে, নিজস্ব বাক্য-রীতি ও নানা রূঢ়ি প্রয়োগ আছে। যাঁহারা জন্ম ও শিক্ষাগত অধিকারে এইগুলি প্রাপ্ত হন নাই, এইগুলি আয়ত্ত করিয়া লইয়া তবে তাঁহাদিগের চলিত-ভাষায় লিখিবার প্রয়াস করা উচিত। এই বিষয়ে সহায়তা করিবার জন্য, সাধু-ভাষার সঙ্গে চলিত-ভাষারও ব্যাকরণ আবশ্যক; এখানেও নানা স্থলে ও সূক্ষ্ম নিয়মের যে যথেষ্ট বাঁধাবাঁধি আছে, অনেক সময়ে আমরা সে কথা ভুলিয়া যাই।' ভাগীরথী-তীরের আশে-পাশে একাধিক-পুরুষ ধরিয়া যাঁহাদের বাস, তাঁহারা বলিতে পারেন—যে দিকে সূর্য উদিত হয় সেই দিক্ই পূর্ব দিক্—ঘরে আমরা যাহা বলি, তাহাই চলিত ভাষা। যাঁহারা এই কথা বলিতে পারেন না, বিশেষ করিয়া তরুণ লেখকদের অনেকে, তাঁহাদের এবং ভাগীরথী-তীরবাসী ছাত্র ও অন্যের উপর অধিকার লাভে ইচ্ছুক অন্য সাধারণ লোকেরও কর্তব্য—প্রথমে সাধু-ভাষার সাধনা করা। সাধু-ভাষা মনোভাব-প্রকাশের পক্ষে প্রশস্ত রাজ-বর্ত্ম-স্বরূপ বিদ্যমান; চলিত-ভাষা এখনও বহু লোকের পক্ষে সংকীর্ণ পল্লীবীথি মাত্র; সে পথের সঙ্গে অপরিচিত লেখকের পক্ষে, পদে পদে পথভ্রান্তি বা পদস্খলনের সম্ভাবনা। চলিত-ভাষায় লিখিবার প্রয়াস করেন এমন বহু 'তরুণ' লেখকের লেখা দেখিয়া মনে হয়, ইঁহাদের বক্তব্য সাধু-ভাষায় আরও গুছাইয়া বলিতে পারিতেন, নিজ বিশিষ্ট ব্যাকরণ ও বাক্য-রীতি এবং প্রয়োগ সমেত চলিত-ভাষাকে দুর্বোধ্য করিয়া হত্যা না করিলেই পারিতেন। মাতৃভাষার প্রকৃতি এবং তাহার বাক্যভঙ্গী না বুঝিয়া, কেবল অল্প-স্বল্প ইংরেজী সাহিত্যের সহিত পরিচয়ের জোরে বাঙ্গালা ভাষা লিখিতে চেষ্টা করিয়া আবার বহু স্থলে ব্যর্থতার পরিচয় অনেকে দিতেছেন, এই দৃশ্য বাস্তবিকই হৃদয় বিদারক। আমার মনে হয়, ইস্কুলগুলিতে বাঙ্গালা ভাষার পঠন-পাঠনের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবিলম্বে হওয়া উচিত সাধু-ভাষার আলোচনা প্রথম আবশ্যক। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের পূর্ণ পরিচয়ের জন্য চলিত-ভাষারও দরকার—কিন্তু তাহাতে লিখিবার প্রয়াসের পূর্বে, তাহার ব্যাকরণাদির জ্ঞান যাহাতে বঙ্গভাষা অধ্যাপনের সময়ে দিতে পারা যায়, সে বিষয়ে চেষ্টা করা উচিত। চলিত-ভাষায় যাঁহাদের অধিকার জন্মগত, অথবা শিক্ষার দ্বারা যাঁহারা এই অধিকার লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা রুচি বা অবস্থা-মত চলিত রূপ অবলম্বন করিয়াই মাতৃভাষার সেবা করিবেন। চলিত ভাষার সহিত পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ট হইলে, ভবিষ্যতে হয় তো ইহা সাধু-ভাষার স্থান দখল করিবে। কিন্তু আপাততঃ তাহা দূরের কথা বলিয়া মনে হয়।

বাঙ্গালা বানানে বিশৃঙ্খলা

এই প্রসঙ্গে বাঙ্গালা বানান সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত বলিয়া মনে করি। বাঙ্গালা বানানে, বিশেষতঃ চলিত-ভাষায়, নিয়মানুবর্তিতা নাই। এক 'ক'রছে' বা 'ক'রবো' শব্দের দশ রকম বানান হয়। বিদেশী নামের বানানেরও কোনও নিয়ম নাই। এই সমস্ত বিশৃঙ্খলা দূর করিবার জন্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বাঙ্গালা বানানের সংশোধন উদ্দেশ্যে একটী সভা নিযুক্ত করেন, সেই সভা হইতে বাঙ্গালা বানানের কতকগুলি নিয়ম নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হয়। শুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের বানানে কোনও পরিবর্তন প্রস্তাবিত হয় না—কেবল রেফের পর ব্যঞ্জন-বর্ণের দ্বিত্ব না করিয়া একক অবস্থান অনুমোদিত হইয়াছে। 'সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে রেফের পর দ্বিত্ব বিকল্পে সিদ্ধ; না করিলে দোষ হয় না, বরং লেখা ও ছাপা সহজ।' অসংস্কৃত শব্দে কতকগুলি বিধান প্রস্তাবিত হইয়াছে, এগুলি বাঙ্গালা ভাষা-

শেষাংশ ৬৭৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

কাচের-রেকাবি

(গল্প)

শ্রীঅমলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়

শীতে সন্ধ্যা। নিতান্ত আলসে ভাব; পড়াশুনায় মন বসছিল না। নারিকেল পাতার শঙ্কিত শিহরণে মৃদু বাতাস একটু একটু করে জানালা দিয়ে গলিয়ে এসে দেওয়ালের গায়ে ঝুলান ক্যাপারটাকে মৃদু দোল দিচ্ছিল। আর অদূরের বাঁশের ঝাড়ের শব্দ সন্ধ্যার নিস্তব্ধতাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল। গলস্‌ওয়ার্দির একখানা বই পড়বার চেষ্টা করছিলাম; লেপটা গায় দিয়ে, পাশবালিশটায় ভর দিয়ে পড়ে রইলাম। ক্ষিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করছিল। কিন্তু তখনও মার রান্না হয়নি। মাসিমারা নাকি বৈকালের দিকে বেড়াতে এসেছিলেন, তাই এত দেরি। একটা কাচের প্লেটে ক'রে ছোট বোন মণিকা মাসিমার আনা কিছু মিষ্টি দিয়ে গেল—"রান্না না হওয়া পর্যান্ত এই খাও, দাদা", বলে।

কাচের প্লেটখানি দেখেই আঁৎকে উঠ্‌লাম। কি যে করব ভেবে উঠতে পারলাম না। জোর গলায় বলে উঠ্‌লাম্—"কিরে তুই এই প্লেট কোথায় পেলি ?" মণিকা বললে,—"বা-রে, জাননা বুঝি, নন্তু যে আজ দুটো প্লেটই ভেঙে ফেললে; অন্য প্লেট ত নেই। তাই মা আজ এটাই খাটের নীচ থেকে বের ক'রে সাবান দিয়ে ভাল ক'রে মেজে নিয়েছেন।"

বহুদিনের পুরোন স্মৃতি-বিজড়িত এই প্লেটখানি। এক দৃষ্টি দিয়ে চেয়ে রইলাম। হায়রে মানুষের জীবন। বহু স্মৃতির অন্তরাল থেকে একটি করুণ কাহিনী চোখের সামনে ভেসে উঠ্‌ল ঠিক বাস্তবতার রূপ নিয়ে। আর খেতে পারলাম না। প্রায় কান্না এসে পড়্‌ল।

সে প্রায় বছর দশেক আগের কথা। আমরা তখন সবে মাত্র পাঠশালার গণ্ডি পেরিয়ে গ্রামের হাই স্কুলে ভর্ত্তি হয়েছি। বড় স্কুলে পড়ি বলে আর নতুন নতুন চকচকে বই দেখে স্কুলে যাওয়া কোন দিনই কামাই হ'ত না। আমাদের বাড়ী থেকে স্কুল একটু দূরেই ছিল। বেশ বড় একখানা মাঠ পেরিয়ে যেতে হ'ত। সেই বিগত দিনগুলোর কথা এখনও মনে পড়ে—যখন শীতের দ্বিপ্রহরে সোনালী রোদে ছাওয়া মাঠ-ভরা কচি কচি মটরশুঁটির চারাগুলো মাড়িয়ে স্কুলে যেতাম আর পকেট-ভরা মটরশুঁটির দানা নিয়ে স্কুলের প্রাঙ্গণে হল্লা করতাম।

মাঠের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল সেই অনাদিকাল থেকে একটি বট গাছ। মনে হয়, সেই সৃষ্টির আদি যুগ থেকে গাছটি দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য স্মৃতি নিয়ে। ঠাকুরদার গল্পে শুনেতাম তাঁরাও নাকি ছোটবেলা থেকে গাছটিকে একইভাবে দেখে এসেছেন। আরও যে কতকাল থাকবে কে জানে? সেই গাছেরই অল্পপরিসর ছায়াটুকু দখল ক'রে বসে থাক্‌ত এক বুড়ী। বার্দ্ধক্যের কোন বিশেষণ থেকেই সে বাদ পড়েনি। বুড়ীটি বসে থাক্‌ত এক ঘড়া জল আর বহু আগে কোনও মেলায়-কেনা একটি এলুমিনিয়ামের গেলাস নিয়ে। যে কোনও অচেনা পথিক ঐ মাঠ অতিক্রম করে যাচ্ছে দেখলে বুড়ী তাকে সাদর আহ্বান করে বস্‌তে বলে' এক গ্লাস জল দিত আর একটি পয়সা ভিক্ষা করত। যদি বুড়ীকে কেহ কোন দিন পয়সার বিষয়ে কোনও প্রশ্ন করলে তবে সে অস্বাভাবিক মুখভঙ্গি করে' চীৎকার করে' কেঁদে উঠত আর ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে প্রশ্নকর্ত্তার দিকে চেয়ে থাকত, যেন তার ভাষা নেই কিছু বলতে, শক্তি নেই, সামর্থ্য নেই। কোন কোন দিন বা বলত—"বাবারে, আমার একটা মাত্তর নাতি আছেরে বাবা; তোমাগো থাইকা দু'গা-এউগা পয়সা লইয়া বাছারে মানুষ করতে আছি। ওর গায় দুঃখ লাগতে দেই না, ও-ইত আমার সব। ও যে আমার সোয়ামীর বংশ রক্ষা করবে। ও আমার শ্বশুরের ভিটাতে পিদ্দীম্ দিবে।" কেহ কেহ দয়া হ'লে দু'একটি পয়সা দিত, না দিলে বুড়ী প্রতিবাদ করত না। মনে হ'ত বুড়ী জলের ঘড়া আর গ্লাস নিয়ে বটগাছটারই মত যুগ যুগ ধরে রয়েছে আর বটগাছেরই ছায়ার মত নিজের পঙ্গু দুঃখক্লিষ্ট দেহ বিলিয়ে দিয়ে তৃষ্ণার্ত্তকে জল দিচ্ছে শুধু এইটুকু প্রত্যুপকারের আশায় যেন দু'একটি পয়সা পেয়ে নাতিকে বাঁচাতে পারে—যাতে তার স্বামীর বংশ থাকবে, শ্বশুরের ভিটে বর্ত্তে যাবে।

তারপর তিন-চার বছর কেটে গেছে। বাবার সঙ্গে একবার পুরী বেড়াতে গেলাম। পুরীতে পিসিমারা থাকতেন। পুরীর সমুদ্রের কলকল্লোল আর সমুদ্রের বুকে মোহময় সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত আমাকে পেয়ে বসল। আমি আর কিছুতেই আসতে চাইলাম না। তারপর পিসিমার যথেষ্ট আগ্রহে আমাকে থেকেই যেতে হ'ল। পাঁজি দেখে ভাল দিনে স্কুলে ভর্ত্তি হ'লাম। তখন গ্রামের খবর আর রাখতাম না, সেই বুড়ীর খবরত দূরের কথা। গ্রীষ্মের বন্ধে বাড়ী এলাম। ছুটির দিন আমের নেশায় মেতে বেশ ভালভাবে কাটছিল। সেদিন ছিল জামাই-ষষ্ঠীপূজা; বেলা আটটা বেজেছে, তখনও ঘুম থেকে উঠিনি। হঠাৎ আমাদের অলিন্দের সামনে একটা কোলাহল শুনতে পেলাম। লাফ দিয়ে উঠে পড়লাম, ক্ষীণ একটা কান্নার রোল। কিছুই ঠাহর করতে পারলাম না। ঘটনাস্থলে এসে যা দেখলাম, তাতে এতদূর বিস্মিত হলাম, জীবনে আর হ'ব কিনা সন্দেহ। আমাদের সেই বটতলার বুড়ী আকুলভাবে কেঁদে কেঁদে ধূলায় লুটোচ্ছিল আর ভাঙ্গাগলায় অস্পষ্টভাবে কি যেন বলছিল—অনেক কষ্টে শুধু এইটুকু উদ্ধার করতে পারলাম—"আমার শ্বশুরের ভিটাতে পিদ্দীম দিবে কে গো ?" কি আশ্চর্য্য ? তবে কি সেই ছেলেটা মারা গেল? আঁৎকে উঠ্‌লাম। নাঃ, এ অসম্ভব। বুড়ী একটু শান্ত হ'লে তার কাছ থেকে দু'একটি কথা জানতে পারলাম। তারপর বাড়ীর অন্যান্যের কাছ থেকে যা শুনলাম, তার মোট কথা এই—দিনকয়েক আগে নাকি পাশের গ্রামে মেলা বসে, সেখানে শহর থেকে একটি দোকান এসেছিল নানারকম কাচের বাসন-কোসনের। বুড়ীর নাতিটি নাকি রোজই বুড়ীর কাছে আব্দার করত মেলা থেকে একটি কাচের রেকাবি কিন্‌বে বলে। বুড়ী তাকে বলত—তুই বাবা, গরীবের ছ্যাইলা, তুই এত পয়সা কোথা পাইবি ? ছেলে শুনত না, আরও বেশী আব্দার করত। বুড়ীও নীরবে কাঁদত। তারপর পরশুর আগের দিন নাকি ছেলেটি বুড়ীর ঝুলি থেকে কয়েকটি পয়সা চুরি করে [illegible]

বুড়ী নাতিকে গাল-মন্দ দেয়—এমনকি প্রহারও করে। নাতি করে অভিমান। এই প্রথম বুড়ী তাকে একটু অনাদর করলে। ছেলের রাগ ভয়ানক বেড়ে যায়। গভীর রাতে বুড়ী হাতড়ে দেখে পাশে তার নাতি নেই। উঠে বসে, দেখে নাতি নেই—ঘরের কোথাও নেই, বাহির হয়ে পড়ে—কোথাও খুঁজে পায় না। সে চীৎকার করে ওঠে, কেঁদে ফেলে। তার সাহায্যে কেউ এল না। বনবাদাড়, মাঠ-ঘাট পেরিয়ে বুড়ী নাতিকে খুঁজতে থাকে; তার কান্নার শেষ নেই, হায়রে, তার অদৃষ্টে এতও ছিল! কোথাও পায় না। পরশু সারাটি দিন খুঁজে খুঁজে সে কাল ভোর সময়ে ভিন-গাঁয়ের মরা নদীর বালু চরে আসে। তারপর কি হ'ল, বুড়ীর মুখ থেকে কেউ শুনতে পায়নি। শুধু দেখেছে মাটিতে গড়িয়ে কাঁদতে। আমার কাছে সে শুধু বললে,—"তারপর, বাবা, দেখলাম যে বাছার পোড়াকাঠের লাখান্ কালা শরীলটারে লইয়া কতগুলাইন্ শিয়াল আর কাউয়া টানাটানি করতে আছে। আর সমুখের গাছের ঠাইলে একটা রক্তমাখা দড়ি ঝুলতে আছেরে বাবা। আমি বাছার শরীলটারে জড়াইয়া ধইরা কানতে লাগলাম্। অনেক পরে ঐ পাড়ার বিশা আমারে ধইরা বাড়ী লইয়া আইল।"

আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম আর বুড়ীর সঙ্গে সঙ্গে কেঁদে ফেললাম। তারপর বুড়ী তার ঝুড়ি থেকে সযত্ন-রক্ষিত কাচের রেকাবিখানা বের করে মার হাতে দিলে। মা তাকে একখানি দশটাকার নোট দিয়ে দিলেন।

আমি বুড়ীকে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি তাকে মেরেছিলে কেন?"

বুড়ী গদগদ স্বরে বললে, "কিন্তু বাবা, ও যে চুরি করছিল! তোমরা না বইয়ে পড় চুরিকরণ পাপ।"

আমি বুড়ীর দিকে চেয়ে রইলাম, আর সে "আমার শ্বশুরের ভিটাতে পিদ্দীম দিবে কেগো", বলে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল।

তারপর আমার আর বুড়ীর সঙ্গে কোনদিন দেখা হয়নি বা এসব কথা মনে পড়েনি। কিন্তু আজ এই মিষ্টির প্লেট যে সেই কাচের রেকাবি—এ'কথা মনে হওয়ামাত্র বাল্যের সেই দিনগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠল।

ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের অভিভাষণ

(৬৭৮ পৃষ্ঠার পর)

তত্ত্বের দিক্ হইতে বিচার করিয়া গৃহীত হইয়াছে; কোনও কোনও ক্ষেত্রে বহুলো প্রচলিত চলিত বানানের দিকে লক্ষ রাখিয়া, বৈকল্পিক ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। ছাত্রগণের পক্ষে নূতন বানানে অভ্যস্ত হইতে সময় লাগিবে, এ জন্য প্রথম প্রথম কয়েক বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পুরাতন বানানে লিখিলেও চলিবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত ও অনুমোদিত বাঙ্গালা বই একটী নির্দিষ্ট বানানে মুদ্রিত হইলে, ক্রমে এই অত্যাবশ্যক বিষয়ে আমরা একটী নিয়মানুবর্তিতার অবকাশ পাইব। রেফের পরে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব-ভাব বর্জনের দ্বারা (বিশ্ববিদ্যালয় দ্বিত্ব-বর্জন অনুমোদন করিয়াছেন মাত্র, প্রচলিত রীতি অনুসারে দ্বিত্ব করিয়া লিখিলে ভুল হইবে এ কথা বলেন নাই) এবং অ-সংস্কৃত শব্দে 'ণ' বর্জন করায়, 'শ'-'স'র-ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করিয়া দেওয়ায়, কেহ কেহ অনাবশ্যক ভাবে আতঙ্কিত হইয়া এই বানানের বিপক্ষে আন্দোলন করিয়াছেন। আমার মনে হয়, তাঁহাদের এই আশঙ্কা অমূলক। যাহা হউক, বহু স্থলে বিকল্পের ব্যবস্থা থাকায়, বাঙ্গালার শিক্ষক, ছাত্র এবং লেখকগণ প্রস্তাবিত সংস্কারের উপযোগিতা বা অনুপযোগিতা বুঝিতে পারিবেন, এবং আমাদের বিশ্বাস, লিখিবার সুবিধা এবং বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্য দেখিয়া, সকলেই এই সংস্কার ধীরে ধীরে মানিয়া লইবেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের গুরুত্ব আমরা মাতৃভাষানুরাগী শিক্ষিত বাঙ্গালী সকলেই উপলব্ধি করি। জাতি মানেই ভাষা, এই সংজ্ঞায় স্বজাতীয়দের সঙ্গে বৎসর

সংস্কৃতি, জাতীয়তা—এইগুলির আলোচনা করি, এইগুলির সংরক্ষণ, পরিপোষণ এবং পরিবর্ধনের কথা চিন্তা করি। এইরূপ সম্মেলন ধর্ম বর্ণ বৃত্তি নির্বিশেষে সকল বাঙ্গালীর মিলনের এবং কর্ম-চেষ্টার ক্ষেত্র হওয়া উচিত। কিন্তু সকল শ্রেণীর বঙ্গভাষী ইহাতে এখনও তাদৃশ আকৃষ্ট হয় নাই। শিক্ষিত ও অভিজাত শ্রেণীর বঙ্গভাষী ইহা গড়িয়া তুলিয়াছেন—এখন ইহাতে যাহাতে বঙ্গভাষী জন-সাধারণও সম্মিলিত হন, বাঙ্গালা দেশের যে প্রান্তে এই সম্মিলন হইবে সেই প্রান্তের সকলকেই যাহাতে ইহার প্রতি আকৃষ্ট করা যায়, সেদিকে এইবার আমাদের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। শিক্ষার প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যসম্মেলনেরও জনপ্রিয়তা বাড়িবে, তাহা আশা করিতে পারা যায় বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারও আবশ্যক। আলোক-চিত্র যোগে বক্তৃতা রেডিও প্রভৃতির সহায়তা এই কার্যে গ্রহণ করিতে হইবে।

কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত এই দ্বাবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি শ্রীমান মহারাজ বীরবিক্রম মাণিক্য বাহাদুর ইহার উদ্বোধন করিয়, ইহাকে সম্মানিত করিয়াছেন। ত্রিপুরার রাজবংশের সহিত বাঙ্গালা সাহিত্যের অচ্ছেদ্য প্রীতির সংযোগ, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস চিরপ্রসিদ্ধ; বহু বহু বৎসর ধরিয়া বঙ্গবাণী ত্রিপুরা রাজসভায় সম্মানিতা হইয়া আসিতেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সহিত ত্রিপুরাধীশের এই সহযোগিতার ফলে, বঙ্গসাহিত্যের সহিত এই রাজবংশের যোগসূত্র দৃঢ়তর হউক, মহারাজ শ্রীমান বীরবিক্রম মাণিক্য বাহাদুর বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতিকল্পে তাঁহার পূর্বগামীদের ন্যায়

ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেনের অভিভাষণ

(৬৭৯ পৃষ্ঠার পর)

দেশের মহাফেজখানায় ও বড় বড় লোকের দপ্তরে ঐতিহাসিক মালমসলার খোঁজ পড়িয়াছে। ভারতবর্ষে এই শাস্ত্রের এখনও শৈশব অবস্থা। এখনও সরকারী দপ্তরখানার সমস্ত কাগজপত্র পরীক্ষা করা হয় নাই, বিদেশে ভারতবর্ষের ইতিহাসের যে উপকরণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে তাহার সঙ্কলনের ব্যবস্থা হয় নাই। সুতরাং আজও ভন্‌র‍্যাঙ্ক, ভন্‌সিবেল, মম্‌সেন বা অ্যাক্টনের সমকক্ষ কোন ঐতিহাসিকের আবির্ভাব এদেশে হয় নাই। বিহঙ্গম-দৃষ্টিতে সমগ্র ভারতের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করিতে পারেন, ভারতীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিবৃত্ত রচনা করিতে পারেন, বাহ্যদ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া ভারতীয় কৃষ্টির ঐক্যের প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারেন, জগতের সভ্যতায় ভারতের দানের পরিমাণ নির্ণয় করিতে পারেন, একাধারে সাহিত্যরথী ও বৈজ্ঞানিক রসস্রষ্টা ও সত্যদ্রষ্টা, এরূপ ঐতিহাসিকের সাক্ষাৎ আজ পর্যন্ত পাইলাম না। কিন্তু একদিনে বিশাল সৌধ নির্ম্মিত হয় না। সুদক্ষ শিল্পীর আগমনের পূর্ব্বেই প্রয়োজনীয় মালমসলা মজুত করিতে হইবে। ইতিহাসের উপকরণ সংগৃহীত হইলে একদিন এদেশেও যথার্থ ঐতিহাসিকের আবির্ভাব হইবে। সেই অনাগত মহামনীষীর ভবিষ্যৎ সাধনাপীঠের একখানি ইষ্টক রচনা করিতে পারিলেও আমাদিগের শ্রম সফল হইবে।

ভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতার দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের পরিবর্ধনের সহায়তা করিয়া, সমগ্র বঙ্গভাষী জনগণকে তিনি কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করুন।

সাহিত্য সম্মেলনে ইতিহাস শাখার সভাপতি ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেনের অভিভাষণ

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের দ্বাবিংশ অধিবেশনে (কুমিল্লা) ইতিহাস শাখার সভাপতি অধ্যাপক ডক্টর সুরেন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে বলেনঃ—

ইতিহাস শাখার সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়া আমাকে আপনারা সম্মানিত করিয়াছেন, তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি; মামুলী বা মৌখিক নহে, আন্তরিক। সভাপতি হইলেই ভাল হউক মন্দ হউক একটি অভিভাষণ পাঠ করিবার রীতি আছে। এই হিসাবে অধ্যাপককে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে বলিলে একটি অসুবিধার আশঙ্কা থাকে। প্রত্যহ বক্তৃতা করা যাহার পেশা, নূতন শ্রোতা পাইলেও সে তাহার অভ্যস্ত পুরাতন বুলির পুনরাবৃত্তি করিবার প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারিবে কি না সন্দেহ। কিন্তু সে ত্রুটির জন্য সভাপতি অপেক্ষা যাঁহারা তাহাকে জানিয়া শুনিয়া ডাকিয়া আনিয়াছেন, তাঁহাদেরই দায়িত্ব বেশী। সম্প্রতি সভার প্রারম্ভেই সভাপতিকে সায়েস্তা করিবার একটা নজীর সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু সাহিত্য সম্মেলনে এখনও রাজনীতি প্রবেশ করে নাই এবং সাহিত্য সেবা যাঁহারা জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা এখনও অহমিকার বেদীতে দুরাগ্রহের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। সেই ভরসায়ই নিজের অক্ষমতার কথা না ভাবিয়া বিনা দ্বিধায় আপনাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে সাহসী হইয়াছি।

ইতিহাস সম্বন্ধে এখনও সাধারণের মধ্যে কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। কান্ত কবি ঐতিহাসিকদিগকে বিদ্রূপ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ [illegible] ভৎসনা করিয়াছেন। কিন্তু [illegible] কি ইতিবৃত্ত-কথা মিথ্যাময়ী? সত্য সত্যই কি বিদ্যা জাহির করিবার অশোভন আগ্রহে মূঢ় ঐতিহাসিক চন্দ্রগুপ্তের হাতী ও রাজা অশোকের নাতির সংখ্যা নির্ণয় করিতে উদ্যত হয়? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে ইতিহাসের লক্ষ্য ও স্বরূপ নির্ণয় করা আবশ্যক।

ইতিহাসের লক্ষ্য ও স্বরূপ

ইতিহাস শব্দটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। আজকাল ইংরাজী Historyর প্রতিশব্দ হিসাবে বাঙ্গলায় ইতিহাস শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। সেকালে সংস্কৃত ভাষায় রামায়ণ ও মহাভারতকে ইতিহাস বলা হইত। রামায়ণ মহাভারতের মধ্যে ঐতিহাসিক উপাদান থাকিতে পারে, কিন্তু একালে ঐ দুইখানি মহাগ্রন্থকে কেহই History বলিয়া স্বীকার করিবেন না। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গলা "তোতার ইতিহাস"ও History পর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে না। কিন্তু এমন একদিন গিয়াছে যখন পশ্চিম দেশের ইতিহাসেও অলৌকিক ঘটনার অপ্রাচুর্য্য ছিল না, যখন দুই-মাথাওয়ালা ছাগ-শিশু ও ছয়-পাওয়ালা শূকর-শাবকের জন্ম-কথা লিপিবদ্ধ করিতেও পশ্চিমের ঐতিহাসিক ইতস্ততঃ করেন নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ইতিহাস ও উপাখ্যান (History ও Chronicle)এর পার্থক্য ভাল করিয়া ধরা পড়ে নাই। আজ যদি History অর্থে ইতিহাস শব্দ ব্যবহার করি তাহা হইলে সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কালক্রমে মূল সংস্কৃত শব্দের অর্থ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই জন্য বাঙ্গলা ভাষায় নূতন করিয়া বিদেশী শব্দের আমদানী করিবার প্রয়োজন নাই।

আখ্যায়িকার প্রভাব হইতে মুক্ত হইবার পর ইতিহাসের ব্যাপকতাও বাড়িয়া গিয়াছে। প্রাচীনকালে আমাদের দেশে ইতিহাসের

তেমন চর্চ্চা ছিল না। পুরাণের ঐতিহাসিক অংশ বাদ দিলে তিন চারিখানি পুস্তক আমাদের সম্বল থাকে। তাহার মধ্যেও একমাত্র কহ্লনের রাজতরঙ্গিণীতেই একটা রাজ্যের ধারাবাহিক ইতিহাস সঙ্কলনের চেষ্টা দেখা যায়। রামচরিত, হর্ষচরিত, বিক্রমাঙ্কচরিত প্রভৃতি গ্রন্থ ব্যক্তি-বিশেষের শৌর্য্য, বীর্য্য ও ঔদার্য্যের পরিচয় দিবার উদ্দেশ্যে লিখিত। কহ্লন পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকজন ঐতিহাসিকের কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের গ্রন্থ আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই। কহ্লনের গ্রন্থে সমসাময়িক ঘটনার নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায়, কিন্তু রাজতরঙ্গিণীর প্রারম্ভেই আছে জলাশয়বাসী অপদেবতার কথা। একালে অলৌকিক ঘটনায়, দেবদেবীর প্রভাবে ঐতিহাসিকেরা বিশ্বাস করেন না সেকালে করিতেন। ইতিহাসের জনক বলিয়া অভিহিত হেলিকারনাসাস নিবাসী হেরোডোটাসের গ্রন্থেও অলৌকিক ও অসম্ভব ঘটনার অসদ্ভাব নাই। যে কারণেই হউক, প্রাচীন গ্রীসের ন্যায় প্রাচীন ভারতবর্ষে ঐতিহাসিক সাহিত্যের প্রাচুর্য্য ছিল না।

মুসলমান আমলের গোড়া হইতেই পণ্ডিতদিগের মধ্যে ইতিহাস সঙ্কলনের আগ্রহ দৃষ্ট হয়। তখন রাজদরবারের আনুকূল্যে ইতিহাস লেখা হইত। মুসলমান সুলতানেরা দরবারী পণ্ডিতদিগের সাহায্যে আপনাদের কীর্ত্তি চিরস্থায়ী করিবার চেষ্টা কর[illegible] এই সকল গ্রন্থে কেবল রাজা বাদশাদিগের কীর্ত্তি বা অপকীর্ত্তির কথা, বড় বড় সেনাপতি ও মন্ত্রীদিগের বীরত্ব ও বিজ্ঞতার কাহিনীই স্থান পাইয়াছে। কখনও কখনও রাজানুগ্রহভাজন সাধু ও সুধীদিগের কথাও যে দরবারী ইতিহাসে না পাওয়া যায় তাহা নহে। কিন্তু নগর মানুষের সুবিধা, অসুবিধা, সুখ-দুঃখ তখনকার ঐতিহাসিকের দৃষ্টি সচরাচর আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তাহাদের চিত্রে সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবান ও গিয়াসুদ্দিন তুগলক শাহের মত সর্ব্বজনমান্য শাসনকর্ত্তাদিগের আলেখ্য ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে, আলাউদ্দীনের শৌর্য্য ও মালিক কাফুরের বীর্য্য অমর হইয়া রহিয়াছে, ফিরুজ বিন রজবের স্বধর্ম্মনিষ্ঠা জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। পটভূমির পশ্চাতে বহুদূরে অন্ধকারের মধ্যে কখনও কখনও দরিদ্র কৃষক ও দীন পল্লীবাসীর অস্পষ্ট ছবি বহুকষ্টে আবিষ্কার করা যায়। শক্তিমানের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন তখন ইতিহাসের লক্ষ্য, ঘটনা তাহার প্রাণ, তারিখ তাহার আশ্রয়। সাধারণ মানুষের সাধারণ কথার স্থান সেখানে ছিল না। কার্য্য-কারণের সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টাও তখনকার ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে একান্ত বিরল। কহ্লনের সংস্কৃত গ্রন্থ ও মুসলমান আমলের পারসী তারিখ একালে ইতিহাসের গৌণ উপাদান বলিয়া স্বীকৃত হইবে, কিন্তু ইতিহাস বলিয়া গৃহীত হইবে না।

ইতিহাসের বিচার্য্য বিষয়

ঘটনা ও তারিখের তালিকা ইতিহাস নহে, মহতের প্রশস্তি ইতিহাস নহে, শক্তিমানের কীর্ত্তিকথাও ইতিহাস নহে। তবে ইতিহাসের বিচার্য্য বিষয় কি? ঘটনার সুশৃঙ্খল বিবরণ ব্যতীত ইতিহাস হয় না। ঘটনা-বিন্যাসের জন্য তাহার কাল নির্ণয় করা প্রয়োজন। মহতের প্রভাবও ইতিহাস অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু এখন ইতিহাস আলোচনা করে সমগ্র মনুষ্যজাতির কথা। সাধুর তিরোধান হয়, বীরেরও মৃত্যু অনিবার্য্য; রাজা ও রাজ্য কাল-সাগরের বক্ষে বুদ্বুদের মত উঠিয়া বুদ্বুদের মত ডুবিয়া যায়, কিন্তু মনুষ্যজাতির মৃত্যু নাই। আদিম যুগ হইতে আধুনিককাল পর্য্যন্ত সমগ্র মনুষ্যজাতির জীবন-প্রবাহ নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম

করিয়া বিবিধ প্রতিকূলতার ভিতর দিয়া ক্রমশঃ সার্থকতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। মানুষের এই জয়-যাত্রার বিবরণই ইতিহাসের উপজীব্য। জাতি-নির্বিশেষে, শ্রেণী-নির্ব্বিশেষে মানুষের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনই আমাদের শাস্ত্রের লক্ষ্য। চির নির্ভীক, চির অশ্রান্ত, চির কৌতূহলী মানুষের আমরা জয়গান করি. প্রকৃতির সহিত মানুষের যে অবিরাম সংগ্রাম, ইতিহাস তাহারই চারণ। অতীতের সাহায্যে ইতিহাস বর্ত্তমানকে বুঝিতে চেষ্টা করে, ভবিষ্যতের স্বরূপ নির্ণয়ের প্রয়াস পায়। তাই শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য, সঙ্গীত—মানুষের মনের পরিচয় যাহাতে পাওয়া যায়, মানুষের প্রাণের স্পর্শ যেখানে আছে, মানুষের আশা, আকাঙ্ক্ষা, জল্পনা, কল্পনা যেখানে মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহার কিছুই ইতিহাসের গণ্ডির বাহিরে পড়ে না। ইতিহাসের আরম্ভ হইয়াছিল রাজা, বাদশাহ, যুদ্ধ-বিগ্রহের কাহিনী লইয়া, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সংঘাতের কথা লইয়া। এখন আর ইতিহাসের দৃষ্টি রাজনৈতিক ঘটনার সঙ্কীর্ণ সীমানার মধ্যে আবদ্ধ নহে। এখন বিজ্ঞানের ইতিহাস, সাহিত্যের ইতিহাস, শিল্পকলার ইতিহাস, সামাজিক ইতিহাস, ধর্ম্মসঙ্ঘের ইতিহাস, শ্রমজীবীসমবায়ের ইতিহাস রচিত হইতেছে ; আর তাহারই মধ্য দিয়া মানুষের সমাজ, রাষ্ট্র ও চিন্তাধারা বিবর্ত্তনের প্রভাবে কিরূপে বর্ত্তমান অবস্থায় পৌঁছিয়াছে তাহারই ছবি ফুটিয়া উঠিতেছে।

সমষ্টির সমস্যা ও ব্যষ্টির প্রভাব

তবে কি ইতিহাস কেবল সমষ্টিকে লইয়াই ব্যস্ত? তাহার হিসাবে কি ব্যষ্টির কোনই মূল্য নাই? ইতিহাস ব্যষ্টিকে উপেক্ষা করে না, করিতে পারে না। মহামানবের প্রভাবে সমগ্র মানবসমাজের চিন্তার ধারা ফিরিয়া যায়, গতির লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট হয়। ভারতের ইতিহাসে বুদ্ধ, চৈতন্য, শঙ্কর, রামানুজ, অশোক, আকবর, শিবাজী, হায়দর আলি, রণজিৎ সিংহের প্রভাব কে অস্বীকার করিবে? লুথারের আন্দোলনে যে ইউরোপের খৃষ্টসমাজে মহাবিপ্লবের সূচনা হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ভলটেয়ার ও রুশোর শিক্ষায়ই ত ফরাসী বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু ব্যষ্টির প্রতিভা সকল সময় সমষ্টির জড়তাকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। অসময়ে ধর্ম্মান্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন বলিয়া স্যাভোনারোলার জীবনের ব্রত ব্যর্থ হইয়াছিল। অনুকূল সময়ে পোপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া লুথার জয়লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং মহামানবের প্রতিভার প্রভাব স্বীকার করিয়াও যুগ-প্রভাব উপেক্ষা করা চলে না। প্রতিভাবান্ ব্যক্তিরা নবযুগের সূচনা করিতে পারেন, কিন্তু জনসাধারণের যদি তাহাদের শিক্ষা গ্রহণের যোগ্যতা না থাকে, তবে তাহাদের উদ্যম সফল হইতে বিলম্ব হইবেই। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রতিভাবান্ পুরুষকে কেন্দ্র করিয়া ইতিহাস রচিত হইত। একালের ঐতিহাসিকেরাও অসাধারণ ব্যক্তিদের প্রভাব বিশ্লেষণ করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রতিবেশ-প্রভাবের কথা বিস্মৃত হইতে পারেন না। তাই হিটলারের অভ্যুদয়ের কারণও অনুসন্ধান করিতে হয় ও আধুনিক জর্ম্মণ জাতির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, প্রাচীন ঐতিহ্য প্রভৃতির পর্য্যালোচনা না করিলে হিটলারের নেতৃত্বের মূল কারণ কখনও নির্দ্দেশ করা যাইবে না। এই একনায়কত্বের যুগেও কেহ মুসোলিনী ও ষ্টালিনের জীবনচরিতকে ইটালী ও রাশিয়ার ইতিহাস বলিয়া চালাইতে পারিবেন কি না সন্দেহ। ইটালী ও রাশিয়ার জাতীয় প্রতিভা, সাধারণের সমষ্টিগত শক্তি অনুকূল না হইলে মুসোলিনী ও ষ্টালিনের নেতৃত্ব ব্যর্থ হইত। তেমনই মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর প্রতিপত্তির পশ্চাতে রহিয়াছে কোটি কোটি ভারতবাসীর মৌন আনুগত্য। এই বিশাল মৌন জনতার মনোবৃত্তি পর্য্যালোচনা না করিয়া গান্ধীযুগের ইতিহাস রচনা করিবার চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র।

ইতিহাসের ভিত্তি—যুক্তি ও প্রমাণ

এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, জ্ঞানের অগোচর, বুদ্ধির অগম্য, অপ্রমেয় বিষয় ইতিহাসের আলোচ্য নহে। ঐতিহাসিক নাস্তিক হইতে পারেন, আস্তিকও হইতে পারেন। কিন্তু কার্য্যকারণের সম্বন্ধ বিচারের কালে তিনি সাধারণ বুদ্ধির অতীত বিষয়ের অবতারণা করিতে পারেন না। ইতিহাস ইহলোকের খবরই দিতে পারে, পরলোকের খবর ঐতিহাসিকের জানা নাই। সুতরাং ফেরিস্তার মত আলাউদ্দিন ও তাঁহার সহচরদিগের দুঃখদুর্দ্দশার মধ্যে তাঁহাদের দুষ্কর্ম্মের শাস্তি ও বিধাতার নির্দ্দেশের সন্ধান পাইয়া আনন্দ প্রকাশ করা তাহার পক্ষে শোভা পায় না। ধর্ম্মের জয় বা অধর্ম্মের পরাজয়ের দৃষ্টান্ত সঙ্কলন ইতিহাসের কর্ত্তব্যের অন্তর্গত নহে। ইতিহাসের ভিত্তি যুক্তি ও প্রমাণ,—অন্ধ বিশ্বাস নহে। বিধাতার নিগূঢ় ইচ্ছা কি তাহা নির্ণয় করা মানুষের সাধ্যাতীত ; সুতরাং ঐতিহাসিক আলোচনায় ভগবানের দোহাই খাটে না। বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদকে আমরা মানুষ হিসাবেই বিচার করিব। সভ্যজগতে প্রচলিত ন্যায় অন্যায়ের মানদণ্ডে ঐতিহাসিক ব্যক্তিদিগেরও দোষগুণের বিচার হইবে। বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম্মের প্রভাবে প্রাচীন ভারতের জাতীয় জীবন কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা ইতিহাসের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়। খৃষ্ট পশ্চিম দেশের উন্নত জাতিসমূহের ধর্ম্মগুরু। মহম্মদের আবির্ভাব না হইলে হয়ত পৃথিবীর ইতিহাস অন্যরূপ হইত। মানুষের জীবনে ধর্ম্মের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। সুতরাং সর্ব্ব দেশের সর্ব্ব যুগের ধর্ম্মমত ও সামাজিক অনুষ্ঠানগুলির বিশেষত্ব ঐতিহাসিকদিগকে প্রণিধান করিতে হয়। কিন্তু সমস্ত ধর্ম্মের উপাস্য ভগবানের কথা ইতিহাসে পাওয়া যাইবে না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে সর্ব্বদা ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয় হয় নাই, বরঞ্চ সততাই অনেক সময় শাঠ্যের নিকট পরাভূত হইয়াছে, মিথ্যার নিকট সত্য নতি স্বীকার করিয়াছে।

বহুর মধ্যে ঐক্যের সন্ধান

ইতিহাস ধর্ম্মশাস্ত্র নহে, নিরীশ্বরবাদীও নহে,—ঈশ্বর বিরহিত। তথাপি ঐতিহাসিকেরা বহুর ভিতরে সর্ব্বদাই ঐক্যের সন্ধান করিতেছেন। বৈজ্ঞানিক যেমন পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার সাহায্যে প্রাকৃতিক জগতের অন্তর্নিহিত সত্য আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করেন, সেইরূপ ঐতিহাসিকও প্রমাণ ও যুক্তির সাহায্যে মানব জাতির ও মানব সভ্যতার বিভিন্ন রূপের ভিতরে বাহ্যদ্বন্দ্বের মধ্যেও ঐক্যবন্ধন অন্বেষণ করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে এই প্রকার গবেষণার পর্য্যাপ্ত উপকরণ ছিল না। এখন দেখা যাইতেছে যে, কোন শক্তির উত্থান পতন, কোন সভ্যতার অভ্যুদয় বিলয় এবং কোন ধর্ম্মমতের বিস্তার বা বিলোপ একেবারে আকস্মিক নহে। তাহার সহিত অন্য শক্তির, অন্য সভ্যতার, অপর ধর্ম্মমতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। বর্ত্তমান যুগের সভ্যতা কোন এক জাতিবিশেষের সৃষ্টি নহে। তাহার পশ্চাতে রহিয়াছে বহু জাতির বহু যুগের সাধনা। আজ ভারতবর্ষ পশ্চিমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু অতীতকালে আরবদিগের মারফতে পশ্চিমের লোকেরা ভারতের সাধনালব্ধ সত্য গ্রহণ করিয়াছিল। খৃষ্টান সন্ন্যাসিসঙ্ঘের গঠনে বৌদ্ধ সন্ন্যাসিসঙ্ঘের নিয়ম অনুসৃত হইয়াছিল। মুসলমান ধর্ম্মের উপর খৃষ্টান ও যরথুস্ত্রীয় ধর্ম্মের প্রভাব দেখা দেয়। প্রাচীন গ্রীস প্রাচীন মিশরের নিকট ঋণী। প্রাচীন চীন ও তিব্বতের সঙ্গে প্রাচীন ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। মালয় দ্বীপপুঞ্জে, শ্যামে, কম্বোজে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির বহু চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান। কোন সভ্যতাই স্বয়ম্ভূ নহে, স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। মানব-সভ্যতার উদ্ভব ও বিকাশ হইয়াছে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন কৃষ্টির সংক্রমণ ও সংমিশ্রণের ফলে। ভাষাতত্ত্বের আলোচনা দ্বারা, বিভিন্ন জাতির সামাজিক রীতিনীতি, শিল্পকলার তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা কৃষ্টির সংক্রমণের ইতিহাস রচিত হইতেছে। সুতরাং আধুনিক ইতিহাসকে দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা অসঙ্গত হইবে না। এক শ্রেণীর ঐতিহাসিকেরা দেশবিশেষ, জাতিবিশেষ এবং যুগবিশেষের ইতিহাস লইয়া গবেষণা করিতেছেন। ঐতিহাসিক উপাদানের পরিমাণ যতই বৃদ্ধি পাইতেছে ততই ইঁহাদের গবেষণার ক্ষেত্র সংকুচিত হইতেছে। আবার, আর একদল ঐতিহাসিক ইঁহাদের গবেষণা-

লব্ধ সত্যের সমন্বয় সাধনে নিরত। মানুষের জ্ঞান বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইঁহাদের গবেষণার পরিসরও বিস্তৃত হইতেছে। ইঁহাদের মধ্যে কে বড়, কে ছোট, তাহা লইয়া তর্ক উত্থাপন করিয়া লাভ নাই। বিদ্যুৎ আবিষ্কৃত না হইলে বৈদ্যুতিক যন্ত্র নির্ম্মাণ সম্ভব হইত না। বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন যুগের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস সঙ্কলিত না হইলে মানব-সমাজ ও মানব-সভ্যতার বিবর্ত্তনের ইতিবৃত্তও রচনা করা যাইত না।

ইতিহাস বিজ্ঞান, না সাহিত্য

এই প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন স্বতঃই মনে হয় ইতিহাস কি বিজ্ঞান, না সাহিত্যের অন্তর্গত? ইতিহাসের আখ্যানভাগে লিপি-কুশলতার প্রয়োজন। নৈয়ায়িকের মত ঐতিহাসিক বলিতে পারেন না যে অর্থের সঙ্গেই আমার সম্পর্ক, শব্দ লইয়া আমি মাথা ঘামাই না। বাক্যের সাহায্যে চিত্র অঙ্কনে অসমর্থ হইলে ইতিহাস রচনা করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। সুতরাং ইতিহাসকে সাহিত্য বলা অসঙ্গত হইবে না। কিন্তু ইতিহাস কেবল রসলিপ্সুর চিত্ত বিনোদন করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, অনুসন্ধিৎসুর বুদ্ধির রসদ সরবরাহ করিতে না পারিলে ইতিহাসের কার্য্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে, ইতিহাস আখ্যায়িকার পর্য্যায়ে নামিয়া যাইবে। সুতরাং ইতিহাসকে আপনার সিদ্ধান্ত, যুক্তি ও প্রমাণের সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। যে সিদ্ধান্ত যুক্তিসিদ্ধ নহে, প্রমাণসিদ্ধ নহে, ইতিহাস তাহা প্রত্যাখ্যান করিবে। বিজ্ঞানও সত্য-নির্ণয়ে পর্য্যবেক্ষণ ও যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সত্য পরীক্ষাসাধ্য। বৈজ্ঞানিক আপনার গবেষণাগারে যে পরীক্ষার দ্বারা সত্যের সন্ধান লাভ করেন, আর দশজনের সাক্ষাতেও পুনরায় সেই পরীক্ষা করিয়া আবিষ্কৃত সত্যের অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারেন। ইতিহাস অতীত ঘটনার সাহায্যে বর্ত্তমানের ব্যাখ্যা করে। অতীতের পুনরাভিনয় সম্ভব নহে। বৈজ্ঞানিক অনায়াসে হাইড্রোজেনের দুইটি অণুর সহিত অক্সিজেনের একটি অণুর সংযোগে জল প্রস্তুত করিয়া দেখাইতে পারেন। ঐতিহাসিক পলাশীর যুদ্ধের নায়কদিগকে চক্ষুর সম্মুখে হাজির করিতে পারেন না। তাহাদের দোষ ত্রুটির চাক্ষুষ প্রমাণ দেওয়াও তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। ফলিত গণিতের হিসাবে পৃথিবীর বা সূর্য্যের গতির কিঞ্চিন্মাত্র পার্থক্য ধরা পড়িলেই স্বীকার করিতে হইবে যে বিশাল শূন্যমণ্ডলে কোথাও না কোথাও মানুষের অজ্ঞাত কোন গ্রহ বা উপগ্রহ রহিয়াছে। নতুবা সূর্য্য বা পৃথিবীর গতির ব্যতিক্রম হইত না। ইতিহাস ব্যক্তিত্বের প্রভাব স্বীকার করে, আকস্মিক ঘটনার প্রভাব স্বীকার করে। ব্যক্তিত্বের প্রভাব অনিশ্চিত, আকস্মিক ঘটনার কথা পূর্ব্বাহ্নে জানা যায় না; সুতরাং গণিতের ন্যায় ইতিহাস সকল বিষয়ে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত করিতে পারে না। মুসলমানদিগের অভ্যুদয়ের পশ্চাতে আছে মহম্মদের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা। অবশ্য আরবজাতির নিজস্ব গুণাবলীর সদ্ব্যবহার করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার ধর্ম্মমতের এত দ্রুত প্রচার হইয়াছিল। কিন্তু মহম্মদ যদি প্রথম যৌবনে আততায়ি-হস্তে নিহত হইতেন, তাহা হইলও কি অপর কোন নেতার পরিচালনায় আরব-জাতির এতদ্রুত উন্নতি হইত? এরূপ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে। কিন্তু বিজ্ঞানও ত সকল প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারে না। বিজ্ঞানও ত সকল প্রাকৃতিক রহস্যের মীমাংসা করিতে পারে নাই। যুক্তি ও প্রমাণই যদি বিজ্ঞানের ভিত্তি হয়, তাহা হইলে ইতিহাসও বিজ্ঞান বলিয়া দাবী করিতে পারে। অন্ততঃ ঐতিহাসিক গবেষণা যে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী অনুসৃত হয় তাহাতে সন্দেহ না।

ইতিহাসে কি কল্পনার অবকাশ আছে?

এই প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে। ইতিহাসে কি কল্পনার অবকাশ আছে? বৈজ্ঞানিকেরাও কখন কখন কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন, প্রয়োজনের অনুরোধে ঐতিহাসিকেরও মধ্যে মধ্যে অনুমান বা কল্পনার সাহায্য লইতে হয়। কিন্তু কবি বা নাট্যকারের ন্যায় ঐতিহাসিকের কল্পনা নিরঙ্কুশ নহে, সাক্ষ্য প্রমাণের নিগড়ে তাহার চরণ শৃঙ্খলিত, সম্ভব অসম্ভবের বিবেচনায় তাহার গতি সঙ্কুচিত। এইখানেই রাজা অশোকের নাতির সংখ্যা ও চন্দ্রগুপ্তের হাতীর সংখ্যার প্রয়োজনীয়তা। শাহজাহানের সময় যানবাহনের ব্যবস্থা কিরূপ ছিল তাহা জানা না থাকিলে কেবল কল্পনার সাহায্যে তাহার যুদ্ধাভিযানের চিত্র আঁকা যাইবে না। চন্দ্রগুপ্তের কতগুলি রণহস্তী ছিল তাহা জানা না থাকিলে গ্রীক-বিগ্রহে তাঁহার আপেক্ষিক সামরিক শক্তি অনুমান করা যাইবে না। অশোকের নাতির সংখ্যা জানা থাকিলে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের পতনের কারণ আলোচনার সুবিধা হইত। অসম্ভব কল্পনার নিবৃত্তির জন্যই ঐতিহাসিকেরা তুচ্ছতম তথ্য সম্বন্ধেও ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতে পারেন না।

ঘটনার সান্নিধ্যও আবার নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনায় বাধা জন্মাইতে পারে। সমসাময়িক ঘটনা অথবা মতবাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব অথবা লঘুত্ব বিচার করা সহজ নহে। টেসিটাসের দৃষ্টিতে খৃষ্টান ধর্ম্মের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ধরা পড়ে নাই। ঐতিহাসিকও মানুষ, তাহার মনোভাবও রাগ-দ্বেষ-বিবর্জ্জিত নহে। অথচ পক্ষপাতিত্ব বর্জ্জন না করিতে পারিলে ঐতিহাসিক সাক্ষ্য প্রমাণের মূল্য নির্দ্ধারণ করা যায় না। দুইশত বৎসরের পূর্ব্বের ঘটনার যেরূপ নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করা যায়, সমসাময়িক ব্যক্তিবিশেষ বা দলবিশেষের প্রতি সেরূপ নিরপেক্ষদৃষ্টি সকল সময় সম্ভব হয় না। সমসাময়িক আবেষ্টনের প্রভাবও অনেক সময় নির্ভুলভাবে বিচার করা যায় না। অথচ সকল পক্ষের সকল প্রকার প্রমাণ বিচারকের মত অনুরাগ-বিরাগ বিবর্জ্জিত দৃষ্টিতে আলোচনা করাই ঐতিহাসিকের কর্ত্তব্য। এই জন্যই কোন সম্প্রদায় বিশেষের বা জাতি বিশেষের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া অতীত ঘটনার মূল্য বিচার করিতে গেলেও অনেক দোষ ত্রুটি হইতে পারে।

ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন

প্রাচীন ঐতিহাসিকেরা প্রচলিত প্রবাদ ও অবদান বিনা প্রমাণে গ্রহণ করিতেন, এখন ইতিহাসের উপাদান সঙ্কলনে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। সমসাময়িক বিবরণও সর্ব্বদা ইতিহাসের মুখ্য উপাদান বলিয়া গৃহীত হয় না। প্রাচীনতম লোকেরা কোন লিখিত বিবরণ রাখিয়া যান নাই। আবার সকল যুগের লেখার পাঠোদ্ধারও হয় নাই। কিন্তু আদিম যুগের মানুষের পরিচয় তাহাদের হাতের কাযের ভিতর দিয়া পাওয়া যায়। মহেঞ্জোদারোর প্রাচীন স্নানাগার ও পয়ঃপ্রণালীর মধ্যে রহিয়াছে, সেখানকার অধিবাসীদিগের দৈনন্দিন জীবনের রহস্য, তথাকার পুতুল ও মূর্ত্তির মধ্যে পাই তাহাদের রসবোধের পরিচয়। সুদূর প্রাচ্যে ভারতীয় মন্দির ও মূর্ত্তি অপেক্ষা বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের অধিকতর বিশ্বাস-যোগ্য সাক্ষ্য কোথায় পাওয়া যাইবে? সেদিন পম্পিয়াইর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ভারতীয় শিল্পিরচিত দুইটি নারী মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। ইহাদিগকে বেসনগরের যক্ষিণীর সহোদরা বলিলেও অন্যায় হয় না। ইহার পরেও কি প্রাচীন রোমের সহিত ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে? একালের ঐতিহাসিকেরা প্রাচীন সাহিত্য ও অবদানের সাক্ষ্য একেবারে অগ্রাহ্য করেন নাই। কিন্তু পুরাণগুলির কাল নির্ণয় না করিয়া তাঁহারা পৌরাণিক বিবরণের ঐতিহাসিক মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে সম্মত নহেন। রামের জন্মের পূর্ব্বেই রামায়ন রচনা হইয়াছিল বলিয়া তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। রামায়ণ মহাভারতের পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয়ে তাঁহারা কেবল অন্ধ বিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত হন না। প্রাচীন গ্রন্থের প্রক্ষিপ্ত অংশ তাঁহারা প্রত্যাহার করিয়া চলেন। পরবর্ত্তিকালের সাহিত্যে প্রাপ্ত কিম্বদন্তী অন্য প্রমাণ না থাকিলে গ্রহণ করেন না। ইতিহাসের উপাদানের শ্রেণীবিভাগ ও তাহার কারণ আলোচনা করিয়া আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে চাহি না। এইকথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে সরকারী মহাফেজ খানার কাগজ-পত্রের উপরই একালের পণ্ডিতেরা নির্ভর করেন বেশী। উপাদান সংগ্রহের পূর্ব্বে ইতিহাস রচনা করার চেষ্টা বৃথা। ঊনবিংশ শতাব্দীতে জর্ম্মণ পণ্ডিতেরা এই কার্য্যে প্রথম ব্রতী হন; তারপর ইউরোপের বিভিন্ন

শেষাংশ ৬৭৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

প্রলয়ের পরে

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীসত্যকুমার মজুমদার

(৭)

"অমরদা!"

লীলার বিবাহের আর সপ্তাহ খানেক বাকী। নিদাঘ দিনের অলস মধ্যাহ্নে লীলা অমরের লাইব্রেরী ঘরে যাইয়া ডাকিল।

"হঠাৎ দুপুর বেলায় কি মনে ক'রে-রে লীলা?" পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া অমরনাথ লীলার পানে চাহিয়া বলিল।

সম্মুখের একটি চেয়ারে বসিয়া লীলা বলিল, "অনেকদিন পরে, শেষ বারের জন্য তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে এলাম অমরদা! এই ত আর ক'দিন তারপর"—

লীলার স্বর যে ক্রমশ বাধিয়া আসিতেছিল লীলা নিজেও তাহা জানিতে পারিল। ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "হ্যাঁ অমরদা, আমায় নিয়ে বৌদির সঙ্গে তোমার কিসের এত কথা হয়! জান আমি মেয়ে মানুষ! আমায় জড়িয়ে কোন কথা পাড়লে আমার পক্ষে কত ক্ষতিকর! আমাকে অপমান কর্‌বার সে কে! তোমার সামনেই আজ তার শেষ মীমাংসা করতে এসেছিলাম। তা মহারাণী সটান উপরে পড়ে ঘুমুচ্ছেন।"

অমরনাথ বিস্মিতও হইল, দুঃখিতও হইল। তাদের দাম্পত্য জীবনের গোপন নিরালা কথা আবার কাহার কর্ণগোচর হইল? সে ব্যক্তিটি কে, যে নাকি লীলার কাছে তাহা প্রকাশ করিবার জন্য জিহ্বার কণ্ডুয়ন নিবৃত্তি করিতে পারিল না? হাজার ভাবিয়াও অমর সে মানুষটিকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল না। বলিল, "কার কাছে কি শুনেছিসরে লীলা?"

"যার কাছেই শুনি না, কথা সত্যি কিনা তোমায় বল্‌তে হবে।"

"আমি যদি না বলি?"

"সে তোমার ইচ্ছে! তোমাকে দিয়ে জোর করে বলিয়ে নেবার কি অধিকার আমার আছে অমরদা!"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া লীলা আবার বলিল, "আর তারই কি অধিকার আছে অমরদা, যে ভদ্রলোকের মেয়ের সম্বন্ধে যা তা ইঙ্গিত করে!"

অমরনাথ হাসিয়া বলিল, "তাকে ত খুব দোষ দেওয়া হচ্ছে, আর নিজেই বা কোন অধিকারে পরের নিছক ঘরের কথা নিয়ে দরবার কর্‌তে এসেছ?"

লীলা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল, "কি আর আমার অধিকার! তোমরা বড় লোক অধিকারও তোমাদের বেশী। সাহসও তোমাদেরই আছে। মুখে কথা বল্‌তেও তোমাদের বাধে না। আমরা গরীব তাই তোমাদের ঘা সইতেই জন্মেছি!"

অমর পূর্ব্ববৎ সহাস্যে কহিল, "সত্যি সত্যি ঝগড়া কর্‌তে এসেছিস্ লীলা?"

"কেন আস্‌ব না! বড় লোকের মেয়ে ব'লে আর মাটিতে পা পড়ে না! কোন্ জন্মে কত তপস্যা করেছিস তাই—। নইলে—! না অমরদা আমি শুনব না। আমার কথা নিয়ে জীবন ভর যে তোমায় গঞ্জনা দেবে—কেন, কোন্ অপরাধে—?" অভিমানে লীলার পাত্‌লা ঠোঁট দুটি ফুলিয়া উঠিল।

স্নেহার্দ্র কণ্ঠে অমর কহিল, "আমার মুখ চেয়ে তাকে ক্ষমা কর্ লীলা, সে যে আমার স্ত্রী। তাকে সুখী কর্‌তে আমি ন্যায়ত বাধ্য। সমস্ত কিছু ছেড়ে দিয়ে ভুলে যেয়ে নিষ্ঠার সঙ্গেই তাকে ভালবাসা আমার কর্ত্তব্যের মধ্যে। নিজের চিত্তের দুর্ব্বলতায় যদি তা আমি না পারি সে দোষ তার নয়, আমার!"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া অমর বলিল, "হাঁরে পাগলী, আঘাত পেয়ে ফিরে আঘাত কর্‌লেই কি আঘাতের জ্বালা যায়। অপরাধীকে ক্ষমা করাই যে সব চেয়ে বড় শাস্তি দেওয়া! যে তোকে ঘৃণা করে তাকেই যদি ভালবাস্‌তে পারিস্ কতক্ষণ সে ঘৃণা কর্‌বে! ভুল যেদিন তার ভাঙ্গবে,—ওরে লীলা, পায়ে এসে সে লুটিয়ে পড়্‌বে না!"

লীলা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তাই হবে অমরদা, তাকে আর কিছু বল্‌ব না। কিন্তু শুধু এইটুকু তাকে বুঝিয়ে দিতে চাই, ভুল বুঝে সে যেন আর তোমার ওপর অবিচার না করে।"

অমরনাথ কহিল, "ফলে অবিচার তার বেড়েই যাবে। সে ত তোর কথা বিশ্বাস কর্‌বে না লীলা। ভাব্‌বে এ মিথ্যা সাফাই! কথায় কি বিশ্বাস ফিরে আসে রে!"

"চাইনে তার বিশ্বাস জন্মাতে—। শুধু তাকে জিজ্ঞেস্ কর্‌ব কেন মিছামিছি সে তোমার নামের সঙ্গে আমায় জড়াচ্ছে!"

"ফলে কথাটা বেশী করে আরও জনকতকের কানে পৌঁছে অপরূপ এক গুজবের সৃষ্টি কর্‌বে। ওরে বোকা মিথ্যাকে কি ঘাটাতে আছে!"

লীলা গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল। অমর হাসিয়া কহিল, "যাবি তোর বৌদির সঙ্গে ঝগড়া কর্‌তে?"

লীলা কোন উত্তর করিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। পরে চোখের জল মুছিয়া বলিল, "মানুষকে আঘাত কর্‌লে সে কতখানি ব্যথা পায় সেটা বুঝ্‌তে পারা যায় কখন জান অমরদা, সে যখন নিজে আঘাত পায়!"

অমরনাথ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "সেত ঠিক কথা!"

লীলা অমরের মুখপানে চাহিয়া বলিল, "বুঝ্‌তে পেরেছ অমরদা! তাই বুঝি আমার বিয়ের কথা শুনে সেদিন এক চুমুকে এক গ্লাস জল নিঃশেষ ক'রে ফেল্‌লে! শুন্‌তে শুন্‌তে মুখখানি শাদা ফ্যাকাসে হয়ে উঠ্‌ল! কেন সে কথা কি আগে ভেবে দেখনি অমরদা? সে সব জেনে শুনেই ত বিয়ে করেছিলে, তবে আবার এমন করে আপন জন পর হয়ে যাবার আঘাতটা প্রাণে আর সইতে চায় না, না?"

অমরের গম্ভীর মুখ আরও গম্ভীর হইয়া উঠিল, বলিল, "বড়ই ফাজিল হ'য়ে পড়েছিস্ লীলা!"

"কোন্ কালেই বা ছিলাম না! তা আজকের বাচালতা আমায় মাপ কর্‌তে হবে অমরদা। আর কোন দিন লীলা তোমার সঙ্গে বাচালতা কর্‌তে আস্‌বে না। লীলা মর্‌বে সেই সঙ্গে সঙ্গে আর বাচলতা চঞ্চলতা সবই যাবে।"

অমর শঙ্কিত হইয়া লীলার পানে চাহিয়া বলিল, "কি বল্‌ছিস লীলা!"

"যা হবে তাই বলছি।—যে লীলা এতকাল ছিল আনন্দের প্রতিমা—যে একজনকে ছাড়া জান্‌তে না সে লীলা আর থাক্‌বে না অমরদা!"

"আত্মহত্যা কর্‌বি তুই, এ বল্‌ছিস কি?"

অমরের চোখমুখে ভয়ের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। লীলা বলিল, "ভয় পেওনা অমরদা, আত্মাকে এক রকম হত্যা করাই ত বটে। তাই ব'লে নিজের হাতে দেহ পাত কর্‌ব না।"

তারপর একটু থামিয়া লীলা বলিল, "সে দিন তোমার যে বড় তেষ্টা পাচ্ছিল, বলত কেন! তুমি অমরদা বড় নিষ্ঠুর—! মুখ বুজে বুক পেতে বজ্রাঘাতও নেবে—তবু উঃ আঃ করবে না একটি বার। ভুলেও বুঝি ভেবে দেখ না যে, সকলের তেমন নীরব যাতনা সহ্য করা সম্ভব কি না! বলবে না একটি কথাও—আজ বিদায়ের কালেও। বলে ফেল; এখনো সময় যায়নি কিন্তু! এর পর আমায় দোষ দিতে পারবে না! শেষে যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠলেও কিন্তু আমি ফিরে চাইব না। তোমার ম্লানমুখ আজ আমার দেখ্‌বার শক্তি না থাক্‌লেও একদিন সে শক্তি আমি আয়ত্ত করব, অমরদা!"

অমরনাথ চুপ করিয়া, ভাবিতে লাগিল। লীলা বলিল, "ভাল করে ভেবে দেখে বল, আমার কি করা উচিত এখন—বুক ফেটে যায় যাক, তবু অমরদার বাণী হবে আমার ধ্রুবতারা।"

"লীলা," অমর দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া স্নেহার্দ্র কণ্ঠে ডাকিল। লীলা নিকটে সরিয়া আসিয়া বলিল, "কি অমরদা?"

"তোর যেতে আর কদিন বাকী আছেরে?"

"আর সাত দিন।"

"তাই বুঝি আমার কাছে বিদায় নিতে এসেছিস?"

"তাই এসেছিলাম অমরদা, ইচ্ছে ছিল তোমার সঙ্গে ঝগড়া করে যাব। তা তুমি করতে দিলে না। তোমার ওপর ঘৃণা অশ্রদ্ধা নিয়ে যেতে পারলে আমার এ-যাত্রা যেন সুখের হ'ত! হ'ত না অমরদা?"

"তা হয় নারে লীলা! জোর ক'রে অশ্রদ্ধা টেনে আনার পরিণাম যে গভীর শ্রদ্ধা! আর অশ্রদ্ধাই বা তুই কেন করবি আমায়! আমি তোর অমরদা, চিরকাল অমরদাই থাকব। তুই আমার চির স্নেহের ছোট বোনটি হয়েই আমার বুকে জেগে থাক্‌বি। পারবিনে লীলা?"

"কেন পারব না অমরদা; তুমি আশীর্ব্বাদ কর—আমি পারব।"

লীলার স্বরে দৃঢ়তা ফুটিয়া উঠিল। অমর কহিল, "আমি আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি তুই পার্‌বি। আমার শিক্ষা তোর ব্যর্থ হবে না।"

"তবুও দুর্ব্বলচিত্ত মেয়েমানুষ আমি! এইটি তুমি ফিরিয়ে নাও।" বলিয়া লীলা বস্ত্রাভ্যন্তরে লুক্কায়িত দুই বৎসর পূর্ব্বেকার দেওয়া নীল শাড়ীখানি বাহির করিয়া অমরের সম্মুখে ধরিল। অমর আশ্চর্য্য হইয়া লীলার পানে চাহিলে লীলা বলিল, "সেই যে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স পেয়ে আমায় দিয়েছিলে—! আমি আজও পরিনি। দেখ, যেমনটি দিয়েছিলে ঠিক তেমনটি আছে।"

অমর কহিল "একদিনও পরিস্‌নি? কিন্তু ওটি ফিরিয়ে না দিলেই কি চল্‌বে না?"

"না অমরদা, একদিনও পরিনি। ফিরিয়ে না দিলে আমার চলবে না। তোমার ভালবাসার কোন দানই আমি কাছে রাখ্‌ব না।"

"বড় ভায়ের স্নেহের দান বলেও কি ওটি নিতে পার্‌বিনে লীলা?"

"না অমরদা; পার্‌ব না। ভ্রাতৃস্নেহে ওটি তুমি আমায় দাওনি। ঐ নীল শাড়ীতে আমার বাল্য জীবনের ইতিহাস লেখা থাকবে। ঐ শাড়ী যখনই আমি পরতে যাব তোমার কথাই আমার মনে হবে। তখন তোমায় যে ভাবতে পারব না—। আমার যে পাপ হবে! তোমার যে লীলা সেত মরবে; ঐ নীল শাড়ী মৃত লীলাকে কেবলই বাঁচিয়ে তুলতে চেষ্টা করবে।—না অমরদা, কায়মনোবাক্যে স্বামীর কাছে আমি অবিশ্বাসিনী হ'তে পার্‌ব না!"

লীলার হাত হইতে কম্পিত হস্তে শাড়ীখানি লইয়া অমর দেরাজের ভিতর রাখিয়া দিল। গবাক্ষপথে দূর প্রান্তরের দিকে উদাস দৃষ্টিতে কতক্ষণ চাহিয়া রহিল।

অমরের টেবিলের পার্শ্বে ঘেঁষিয়া আসিয়া লীলা অশ্রু-সজল কণ্ঠে বলিল, "তবে বিদায় দাও অমরদা!"

অমর দূর প্রান্তরের দিকে চাহিয়াই রহিল—কথা কহিল না।

লীলা অমরের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "আমার আর ব্যথা বাড়িও না অমরদা, এ জন্মের—এ জীবনের শেষ বিদায়—একবার হাসিমুখে আমার দিকে চাও—বল তোমার কোন দুঃখ নেই বল সইতে পারবে—বল অমরদা, তোমার লীলাকে তুমি ইচ্ছে করেই বিদায় দিচ্ছ!"

চোখের জলে পা ভিজাইয়া লীলা অমরের চরণ ধূলি মাথায় মাখিল। মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে অমর লীলার সারা মস্তক স্পর্শ রাখিল না।

লীলা চলিয়া গেল। যতক্ষণ দেখা যায় অমর নির্নিমেষ চক্ষে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যে দৌর্ব্বল্য পায়ে ঠেলিয়া অমরনাথ সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল আবার পর মুহূর্ত্তেই সেই দৌর্ব্বল্য তার দেহ মনকে আচ্ছন্ন করিয়া বুঝাইয়া দিল যে, উপদেশে, অভ্যাসে বা সংযমে আত্মজয় করা যায় সত্য কিন্তু সেই জয়লক্ষ্মী অঙ্ক ত্যাগ করিয়া ছুটিয়া পলাইতেও অনভ্যস্ত নয়। মায়িক জগতের এই যে মোহ তা যদি অত সহজেই পরিত্যাগ করা যাইত তবে আর ভাবনা ছিল কি! অভাব—দুঃখ—ব্যথা—এদের খুব সহজ ভাবা যায়—অবহেলা করা চলে ততক্ষণই যতক্ষণ না তারা প্রচণ্ডভাবে নিজের উপর আসিয়া পড়ে। তাই মানুষ পুত্রশোকবিধুরা জননীকে সান্ত্বনা দেয়, পতিবিয়োগকাতরা অভাগিনীকে বিধাতার বিধান মানিয়া লইতে উপদেশ দেয়; তারা সংসারটাকে দুঃখের সঙ্গে বীরদর্পে লড়িবার জন্য শক্তি সঞ্চয় করিতে

বলে। কিন্তু দুঃখ যখন তার পরিপূর্ণ রূপ লইয়া বিভীষিকার মত নিজের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন কয়জন তাকে নিজের উপদেশানুযায়ী অগ্রাহ্য করিতে পারে। ব্যর্থ প্রণয়ের ব্যথা নাকি নিতান্ত অসহ্য! চাপিয়া রাখিলে চাপা মানে না, মারিতে চাহিলে মরিতে চায় না—। শত কর্ত্তব্যজ্ঞানের বিরাট বাধা, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা কিছুই নাকি উহার অদম্য বেগের সম্মুখে তিষ্ঠিয়া দাঁড়াইতে পারে না। পারে না যেখানে মোহ; যেখানে ভালবাসা—যেখানে আত্মার আত্মায় মিলন আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বের তাবৎ বস্তু,—অসীমের পদরেণু,—এই মিলন আকাঙ্ক্ষা লইয়া সেখানে জন্মিতেছে, মরিতেছে, আবার জন্মিতেছে—তাকে পাওয়ার আশায় জন্ম-মৃত্যুর ভিতর দিয়া তারই নিকটে ছুটিয়া চলিয়াছে।

লীলা ক্রমে অদৃশ্য হইয়া গেলে অমর ফিরিয়া আবার জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়াছিল দাঁড়াইয়াই রহিল—কখন কেমন করিয়া যে বৈশাখের দীর্ঘ দিন শেষ হইয়া গেল অমর তাহা জানিতেও পারিল না।

লাইব্রেরী ঘরের দ্বারে আসিয়া তারাসুন্দরী ডাকিলেন, "অমর!"

অমর পেছন ফিরিয়া মায়ের পানে চাহিল। মা বলিলেন, "সন্ধ্যে অবধি ব'সে ব'সে পড়ছিস্ নাকি! মুখ-চোখ অমন পিংশে হয়ে গেছে কেনরে,—খাবার খেতেও ওপরে যাস্‌নি?"

"চল যাচ্ছি" বলিয়া অমর টেবিলের উপর বিক্ষিপ্ত কাগজ-পত্র গুছাইয়া ড্রয়ারের ভিতর রাখিতেই লীলার ফিরাইয়া দেওয়া শাড়ীখানির কিয়দংশ বাহির হইয়া পড়িল।

অমর তাড়াতাড়ি ড্রয়ার বন্ধ করিতে চেষ্টা করিলেও মায়ের দৃষ্টি এড়াইল না। মা সাগ্রহে বলিলেন, "ওটা কিরে অমর?"

"একখানা কাপড়!"

"বেশত শাড়ীটি দেখতে। বৌমার জন্য এনেছিস্ বুঝি!"

অমর চুপ করিয়া রহিল, কথা কহিল না।

মা বলিলেন, "বড়লোকের বেটীর বুঝি পছন্দ হয়নি, তাই ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছিস্!"

অমর এবার চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। বলিল, "ও তার নয় মা!"

"তবে কার," বলিয়া মাতা বেদনাকাতর মুখপানে চাহিলেন। নতবদনে অমর কহিল,—"দু'বছর আগে লীলাকে আমি দিয়েছিলাম মা, সে তাই আজ ফিরিয়ে দিয়ে গেল।"

করুণ দৃষ্টিতে মাতৃস্নেহ বিলাইয়া মা কতক্ষণ পুত্রের পানে চাহিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, "কেন ফিরিয়ে দিচ্ছে—বললে না?"

"বললে, চাইনে।"

মা আর কোন প্রশ্ন না করিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন। অমর তাঁহার অনুবর্ত্তী হইল।

ছেলের সম্মুখে জলখাবার রাখিয়া মাতা সম্মুখে বসিলেন। লীলার সম্বন্ধে অনেক কথাই হইল। পরিশেষে মাতা এমন একটি প্রস্তাব করিলেন যে অমর বলিতে বাধ্য হইল, "তুমি কি পাগল হয়েছ মা, বিয়ে না হয় কুলীনের ছেলেরা একটির বেশী করতে পারে! তাই বলে আমি যে করতে যাব কোন্ দুঃখে! লীলা যে আমার ছোট বোন মা!"

অতঃপর মাতা লীলার প্রসঙ্গ আর কোন দিন উত্থাপন করিতে সাহস করেন নাই।

জলযোগ সমাধা করিয়া অমর প্রভার কক্ষের দিকে অগ্রসর হইল। প্রভা যেন ঘরে ছিল না—কোথা হইতে দৌড়িয়া আসিয়া প্রায় অমরের সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকিল। বেশ-বিন্যাস অসমাপ্ত রাখিয়াই যেন প্রভা কোথায় চলিয়া গিয়াছিল। হাতের চিরুণী দিয়া একগোছা চুল ধরিয়া আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে প্রভা বলিল, "কি কথা হচ্ছিল মার সঙ্গে খেতে বসে?"

অমর অপ্রসন্ন মুখে বলিল, "আড়ালে দাঁড়িয়ে ত শুনেই এসেছ! আবার জিজ্ঞেস করছ কেন?"

শ্লেষপূর্ণ স্বরে প্রভা কহিল, "মায়ের ইচ্ছেটা আর অপূর্ণ রাখছ কেন? অমন পরীর মত সুন্দরী বোন্‌টি পর হয়ে যাবে—! তারপর সেই ছেলেবেলাকার ভালবাসা!"

"আমি উঠে যাচ্ছি প্রভা" বলিয়া অমর দুই এক পদ অগ্রসর হইতেই প্রভা হাত ধরিয়া ফিরাইল। বলিল, "যেতে চাইলেই যেতে দিচ্ছি আর কি! সারা দুপুর বেলাটায় এত প্রেমের কথা—এত হা হুতাশ—দীর্ঘশ্বাস!"—

অন্তরের মধ্যে গভীর অস্বস্তি লইয়া অমর বসিয়া পড়িল। বলিল, "কি বলছিলে বল।"

প্রভা অমরের অতি নিকটে দাঁড়াইয়া বলিল, "লীলা এসেছিল না দুপুর বেলায়!"

প্রভার চক্ষু জ্বলিতেছিল। অমর ধীরভাবে বলিল, "কে বললে তোমায়?"

"যেই বলুক না, বলবার লোক আমার ঢের আছে! এ বাড়ীতে কিছু ক'রে তুমি আমার চোখ এড়াতে পারবে না।"

অমর কহিল, "তোমার চোখ এড়াতে আমি চাইনে! তোমাকে লুকিয়ে করবার মত কোন অপকার্য্য আমি করিনি!"

প্রভার পর পর প্রশ্নের উত্তরে অমর লীলার ফিরাইয়া দেওয়া নীল শাড়ীর কথাও বলিয়া ফেলিতে বাধ্য হইল। প্রভা শাড়ীখানি দেখিতে চাহিলে অমর কহিল, "তা কাল দেখ, পরবে তুমি?"

"কাল নয়, এক্ষুণি দেখতে চাই—যাও নিয়ে এস।"

বাধ্য হইয়া অমরকে উঠিতে হইল, ড্রয়ার খুলিয়া শাড়ীখানি আনিয়া প্রভার হাতে দিল। পরে বলিল, "পরবে; পরনা! সে একদিনের জন্য পরেনি, যেমনটি দিয়েছিলাম ঠিক তেমনটি আছে!"

"তার ফেলে দেওয়া সব পুরান জিনিষ আমায় নিতে হবে—না? এই যেমন"—

বলিয়া প্রভা শাড়ীখানির ভাঁজ খুলিয়া মেজের উপর ফেলিয়া দিল। তারপর দুই পায়ে মাড়াইয়া পা দিয়া দূরে ছুঁড়িয়া দিল।

অমর বিস্ময়ে—ক্রোধে স্তম্ভিত হইয়া প্রভার এই হৃদয়হীন অমানুষিক কার্য্য দেখিতেছিল। দেখিতে দেখিতে তাহার

(শেষাংশ ৬৮৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

অনামিকা রাজকুমারী

"হ্যালো! হ্যালো! সিইন্ ইন্‌ফেরিরিকিউর ডিপার্টমেণ্ট?"—সরকারী সাংকেতিক ভাষায় লণ্ডন হইতে ফরাসী দেশের উক্ত ডিপার্টমেণ্টের প্রিফেক্টের নিকট টেলিফোন আহ্বান আসিল। ব্যস্ত-সমস্ত প্রিফেক্ট সচকিত হইয়া টেলিফোন-সংবাদ অনুসরণ করিল। ইংলণ্ডের রাজকুমারী একটি প্যারিসে যাইতেছেন নিউহ্যাভেন হইতে জাহাজযোগে দিয়েপ্পে বন্দর হইয়া। তাঁহার প্রকৃত নাম প্রকাশ করা হইবে না, কিন্তু তাঁহার রাজকীয় পরিবারোচিত অভ্যর্থনা ও সৌজন্যের যেন ত্রুটি না হয়। এমন একজন সম্মানিত অতিথির আগমন 'অফিসিয়াল কোডে' লণ্ডন হইতে জানান হইল আর কি প্রিফেক্ট নিশ্চল থাকিতে পারে।

দিয়েপ্পে'র সামরিক দপ্তরে সংবাদ প্রেরণ করা হইল—সেখান হইতে বাছা বাছা বীর 'গার্ড অফ্ অনার' দল গঠন করিয়া হাজির হইল। প্রিফেক্ট স্বয়ং তাহার ডেপুটিদের সহিত আর মেয়রকে লইয়া দিয়েপ্পেতে উপস্থিত রাজকীয় অতিথির যোগ্য সম্মান-দানের জন্য।

দিয়েপ্পেতে জাহাজ পৌঁছিবামাত্র ক্যাপ্তেন রাজকুমারীকে সসম্মানে আনিয়া উপস্থিত করিল সমবেত অভ্যর্থনাকারী অফিসিয়ালদের সাক্ষাতে। সুদীর্ঘ কালের অভিজ্ঞতা-প্রসূত নিখুঁত স্বাভাবিকতার সহিত রাজকুমারী গার্ড অফ্ অনার দল পরিদর্শন করিলেন। যেমন প্যারিস-গামী ট্রেন দিয়েপ্পে ষ্টেশন হইতে রওনা হইল—ট্রেনের গার্ড নিজ অস্ত্র হুজুরে হাজির করিয়া প্রচলিত প্রথামত রাজকুমারীর প্রতি যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিল।

প্রিফেক্ট পূর্ব্বে সম্মানিত অতিথির বার্ত্তা প্যারিসে প্রেরণ করিয়াছিল সুতরাং সেণ্ট লেজেয়ার ষ্টেশনে উচ্চপদস্থ অফিসিয়েলগণ রাজকুমারীর আপ্যায়নের জন্য হাজির ছিল।

পুলিশ 'কার'-এ সশস্ত্র গোয়েন্দাগণ রাজকুমারীর রক্ষীর কাজ করিল। তাঁহার বসবাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট রাজকীয় অতিথির অভ্যর্থনার হোটেলে রাজ-অতিথিকক্ষে রাজকুমারীকে যোগ্য মর্যাদার সহিত নিরাপদে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইল। লণ্ডনের অফিসিয়াল কোডের টেলিফোন্—অতিথির উপযুক্ত সমাদর করিতে হইবে বৈ কি!

রাজকুমারীর নির্দ্দেশে নানা দোকান হইতে দামী দামী জিনিষপত্র ডেলিভারি দেওয়া হইতে লাগিল ঐ রাজ-অতিথির হোটেলে। দামের জন্য ভাবনা কি—হোটেল ম্যানেজার জানাইয়া দিল—লণ্ডনের সরকারী দপ্তরের সুপারিশ, তার উপর রাজকীয় পাসপোর্ট।

দুই দিন পরে রাজকুমারী আদেশ দিলেন, তাঁহার সকল মালপত্র ব্রুসেল্‌স্ শহরে পাঠান হউক রেলযোগে—সর্ব্বদা আবশ্যক সামান্য টুক্‌টাক্ জিনিষ বাদে। হুকুম তামিল হইল অগোণে।

আরও দুইদিন কাটিয়া গেল। তৃতীয় দিন রাজকুমারীর প্রাতরাশ সজ্জিত, কিন্তু রাজকুমারীর কোনই সন্ধান নাই। টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, পুলিশ-গোয়েন্দার ছুটাছুটি—কিন্তু সব বৃথা। রাজকুমারীর পাত্তা নাই—বেমালুম উধাও!

তখন লণ্ডনের সঙ্গে টেলিফোনে কথাবার্ত্তা—সর্ব্বনাশ! রাজকুমারী বেশধারিণী নেহাৎই ছলনাময়ী তরুণী। অনুসন্ধানে আরও প্রকাশ পাইল—ফরাসীদেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে এই তরুণীরই প্রতারণার অপরাধে সাজা হইয়াছে কয়েকবার। ব্রুসেল্‌স্-এ অনুসন্ধানের ফলে জানা গেল, মালপত্র পৌঁছামাত্র ডেলিভারি লইয়া তরুণী সরিয়া পড়িয়াছে—ঠিকানা কিছুই রাখিয়া যায় নাই।

শেষ গোয়েন্দাগণ সংবাদ বাহির করিল, এই তরুণী কয়েক বৎসর রাজকীয় পরিবারে পরিচারিকার কার্য্য করিয়াছে, তাই রাজকুমারীর মত হাবভাব প্রকাশে ভ্রমপ্রমাদ করে নাই।

হোটেল ম্যানেজারের বিল রহিয়াছে বাকি সম্পূর্ণই—দোকানদারগণের বিলও। প্রিফেক্ট আর সামরিক অফিসিয়ালগণ এমন আহাম্মোক বনিবার অনুশোচনায় একেবারে অস্থির। কিন্তু তাহারা এখনও ঠাহর করিতে পারে না কি প্রকারে এই তরুণী পরিচারিকা লণ্ডনের 'অফিসিয়াল কোড' আয়ত্ত করিল এবং রাজকীয় পাসপোর্ট সংগ্রহ করিল।

বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসা

আমাদের গরীবের দেশ—চিকিৎসকের নিকট রোগীর ব্যবস্থা গ্রহণে দর্শনী দিতে অনেকেই অপারগ। সেরূপ ক্ষেত্রে কোনও চিকিৎসক বিনা দর্শনীতে রোগ ব্যবস্থা দিলে জনসাধারণ ত কৃতজ্ঞ হয়ই, অধিকন্তু উহার পশ্চাতে কোনও অভিসন্ধির আরোপ এদেশে সম্ভব নয়।

কিন্তু পাশ্চাত্য ধনীর দেশ—সেখানে সহজে কেহ কাহারও নিকট হইতে সামান্য উপকার পাইবার ঋণও মাথা পাতিয়া লয় না। বরং সেরূপ পরোপকারের কার্য্য সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হয়।

তাই প্যারিসের রু করবোর সাততলা বাড়ীর উপরিস্থ কক্ষে যখন এক বিজ্ঞ চিকিৎসক বাস আরম্ভ করিয়া বিনা-দর্শনীতে রোগী দেখিতে আরম্ভ করিল, তখন প্যারিসের পুলিশের টনক নড়িয়া উঠিল।

কিছুদিন ধরিয়া অনুসন্ধান চলিতে থাকে গোপনে গোপনে। কিন্তু ডাঃ লুই বেনেতোর বিরুদ্ধে কোন কিছু আপত্তিকর ঘটনা পাওয়া যায় না। বরং রোগী-রোগিণীদের মুখে ডাক্তারের অপার পারদর্শিতার কথাই প্রচারিত হয়। স্থানীয় কেমিষ্টের ছোট ছেলেটির জীবন বাঁচাইয়াছে ডাক্তার; অন্য এক চিকিৎসকের একপ্রকার পুনর্জ্জীবন দান করিয়াছে সে।

কিন্তু পুলিশের সন্দেহ দূর হয় না। একদিন দেখা গেল শাদা পোষাকে ইন্‌স্‌পেক্‌টর দুত্রে ডাক্তারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে থানায় লইয়া গেল। সেখানে নানা প্রকার জেরার পর জানিতে পারা গেল—এই চিকিৎসকপদপ্রার্থী,

কোন দিন চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করে নাই, কোনও ডিগ্রি বা লাইসেন্সও তাহার নাই। পরিশেষে এই আশ্চর্যজনক তথ্য উদ্ঘাটিত হয় যে, এই ব্যক্তি উন্মাদ; কয়েক মাস পূর্ব্বে প্যারিস এসাইলাম হইতে সে পলাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে জটিল রোগের সময় প্যারিসের প্রধান প্রধান বিশেষজ্ঞদের ডাকিয়া আনিয়াছে 'কন্সাল্ট' করিতে এবং প্রাথমিক চিকিৎসায় সে ভুলচুক করে নাই আদপেই।

গ্রেপ্তারের কয়েকদিন মাত্র পূর্ব্বে সে ক্যান্সার সম্বন্ধে এক জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দেয় এবং উহা প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। তাহাতে বিশেষজ্ঞগণের প্রশংসাও লাভ করে। তথাপি আজ সে উন্মাদ বলিয়া প্রচারিত।

বিশ্বাসে মিলায়

সকল দেশেই অন্ধ বিশ্বাসের স্থান রহিয়াছে—তবে কোথায় সেটি ক্ষীণ, আবার কোথায় তাহা অতি উগ্র আকারে

প্রতিষ্ঠিত। সমগ্র প্রাচ্য ত এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বলিয়াই প্রতীচ্যের বিশ্বাস। কিন্তু প্রতীচ্যের খোঁজখবর যাঁহারা রাখেন, তাঁহারা জানেন প্রতীচ্যও এই ব্যাধি হইতে মুক্ত নয় বরং যে সকল বিশ্বাস তাহাদের ভিতর স্থান লাভ করিয়াছে, তাহাকে প্রাচ্যবাসী উদ্ভট ছাড়া আর কিছুই বলিবে না। 'ভালুককে পিঠে বসাইলে বাত সারিয়া যায়'—এই চিকিৎসা মধ্য ও দক্ষিণ ইউরোপেই চলে হাটে বাজারে এবং তাহার ফলে একদল লোক জীবিকা অর্জ্জন করিতেও পারে ভালুক পুষিয়া। সে যাহা হউক, চীনে নানকিং-য়ের নিকট মিংসমাধি সমূহের পথে যে বিরাট প্রস্তরহস্তীমূর্ত্তি আছে উহার পিঠের উপর পিঠ ডিঙাইয়া ঢিল ছুড়িয়া দিতে পারিলে দীর্ঘজীবন লাভ হইবে এবং বংশ লোপের কোনই সম্ভাবনা থাকিবে না—ইহাই সাধারণের বিশ্বাস। পিঠের উপর যে ঢিলটি ফেলিতে হইবে উহা যেন গড়াইয়া না পড়ে, পিঠেই থাকে, এইরূপ কৌশল অবলম্বন করিতে হয়। অন্ততঃ কোনক্রমেই যেন যে পার্শ্ব হইতে ঢিল ফেলা হয় সে পার্শ্বে আর ফিরিয়া না আসে।

বিবাহ-বিচ্ছেদের বিচিত্র অজুহাত

পাশ্চাত্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়া সমাজে এক জটিল সমস্যার উদ্ভব করিয়াছে। বর্ত্তমানে বিবাহ-বিচ্ছেদের নামে পাশ্চাত্যে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু যে সকল অজুহাতে বিবাহ নাকচ করিবার প্রার্থনা করা হয় তাহাতে নাটকীয় বৈচিত্র্যের বিকাশ হামেশাই দেখিতে পাওয়া যায়। ফলে বিবাহ-বিচ্ছেদ যেন পাশ্চাত্যে ছোটদের পুতুলের বিবাহে পরিণত হইয়াছে।

বাঙালীর ঘরের একটি পুতুল বিবাহের পরিণতির কথা তুল্যমূল্যেই দাঁড় করান যায় পাশ্চাত্যের খেয়ালী বিচ্ছেদ প্রার্থীদের সারিতে।

পুতুলের বিবাহ—টুটুর পুতুল বর। প্রতিবেশী কন্যার পুতুল কনে। বিবাহের দিন মোটরে আরোহণ না করাইয়া শুধু টুটু তাহার পুতুল-বরকে হাতে করিয়া উপস্থিত। আর যাবে কোথা! অমন ছোট লোকের সংসারে কি মেয়ে দেওয়া যায়—হউক না চীনে মাটির বোবা পুতুল। প্রথম বচসা, পরে ধাক্কাধাক্কি—শেষে শানের মেঝেয় আছাড় খাইয়া বরের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি! বিবাহ আর হয় কি করিয়া।

পাশ্চাত্যের বিবাহ-বিচ্ছেদেও যেন তেমনই ছেলেমানুষী 'আখুটে' স্থান পায় বেশীর ভাগ সময়।

নিম্নে যে সকল বিচিত্র 'অজুহাত' উদ্ধৃত করা হইল, তাহা হইতেই সুসভ্যদের মতিগতি মালুম হইবে:—

(১) প্যারিস—স্নানের টবে কুমারী-ছানা রাখা হয় স্বামী কর্ত্তৃক।

(২) ন্যান্সী—পত্নী তাহার মৃত প্রথম স্বামীর আত্মার সহিত আলাপে বাড়াবাড়ি করিতে আগ্রহান্বিত।

(৩) বুদাপেস্ত—পত্নীর ব্রিজ খেলা; ৫১টি বিচ্ছেদ-মামলা এখানে হইয়াছে শুধু এই অজুহাতে।

(৪) লস্ এঞ্জেলস্—বাইবেল পড়ার সময় স্বামী পত্নীকে আপন উরুতে বসাইয়া রাখে।

(৫) মার্কিন—দীর্ঘকাল গৃহ-ছাড়া হইয়া গোবি মরুতে অবস্থান।

(৬) জার্ম্মানী—স্বামীর প্রতি অবমাননাকর উক্তি প্রয়োগ।

(৭) ক্যালিফোর্নিয়া—অধিক রাত্রিতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন-কারী স্বামীর আগমন ধরিয়া ফেলিবার জন্য সিঁড়িতে টিনের ফালি রাখিয়া ফাঁদ পাতা।

(৮) আইওয়া, মেজন সিটি—স্ত্রী মোটা হইয়া পড়িতেছে বলিয়া শাসন।

(৯) চিকাগো—বিবাহ-দিনের বার্ষিক তিথিতে পত্নীকে প্রহার।

(১০) সাদেম্পটন—কুয়াসাকালীন জাহাজের হুঁসিয়ারী ধ্বনির ন্যায় স্বামীর নাকের ডাক।

(১১) চিকাগো—ব্রিজ খেলায় পত্নী একটি 'ট্রিক'ও পাইতে অসমর্থ হওয়ায়—তেরখানা রুহিতন পাওয়া সত্ত্বেও।

(১২) প্যারিস—স্বামীর এবং নিজ শয়ন-কক্ষে ৪০টি বুদ্ধ মূর্ত্তি রাখিতে স্ত্রী জেদ করায়।

(১৩) চিকাগো—সিঁড়ির রেলিং বাহিয়া পত্নীর নামিয়া যাওয়ায় স্বামীর আপত্তি।

(১৪) মার্কিন—"জিম্ রাত্রিবেলা বাড়ীতে থাকিবেই।"

(১৫) বোষ্টন—প্রত্যহ অফিসে যাইবার বেলা পত্নীকে চুম্বন করিতে স্মরণ করাইয়া দিবার অপমানে পত্নী বিবাহ-বিচ্ছেদ চাহিতেছে।

(১৬) ম্যাঞ্চেষ্টার—পত্নীকে তাহার প্রিয় বিড়াল পুষিতে দেওয়া হয় না, অথচ দুই চোখের বিষ কুকুর একটা পুষিবে স্বামী।

(১৭) নিউ ইয়র্ক—কোন্ ফিল্মখানি শনিবারে যুগলে দেখা হইবে, তাহাতে মতভেদ হওয়ায়। বিচ্ছেদপ্রার্থী স্বামী।

বিচিত্র দন্ত-রুচি

পরিচ্ছদ ও অংগশোভা বিষয়ে অসভ্যদের তেমন

অনুরাগ দেখা না গেলেও একটি ব্যাপারে তাহাদের যে সৌন্দর্য্য-বোধ প্রকৃতই আজব একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই গুরুত্ব সম্পন্ন ব্যাপারটি আর কিছুই নয়—তাহাদের ধারণা মত দন্ত-পঙক্তির শোভা বৃদ্ধি ছাড়া। প্রায় সকল জাতীয় অসভ্যগণই বিধাতাপ্রদত্ত দন্ত-রুচিতে তৃপ্ত নয়—তাহারা তাই দন্তের সৌন্দর্য্যে উৎকর্ষ সাধনে এমন যাতনা নাই যাহা বরদাস্ত করে না। কোন কোন সম্প্রদায় দন্ত বিরল করিবার জন্য উভয় পঙক্তি হইতে কয়েকটি করিয়া দন্ত উৎপাটিত করে। কোন কোন জাতি আবার দাঁতগুলিকে দুরন্ত জানোয়ারের মত ছুঁচাল করিবার জন্য উকা দিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া রক্তপাতেও কুণ্ঠিত হয় না। কোন কোন দল উপর পঙক্তির দাঁতগুলিকে কাটিয়া ছাঁটিয়া ছোট করিয়া রাখে। ইহাতে যে বিষম যন্ত্রণা—তাহা তাহারা অক্লেশে ভোগ করিয়া থাকে। দাঁতের এই প্রকার নবরূপায়ন প্রত্যেক নরনারীর অবশ্য কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান। এইজন্য যে সময়ে বালকবালিকাদের দাঁত পড়িয়া যাইয়া দ্বিতীয়বার জন্মায় তখনই নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রথামত সেই সকল দাঁতের অনুমোদিত আকার দান করা হয়। এই রীতি প্রায় ধর্ম্মানুষ্ঠানের মর্য্যাদাই লাভ করিয়াছে তাহাদের ভিতর সুতরাং কেহ যে স্বেচ্ছায় উহাকে অবহেলা করে না, এই সত্য বুঝিয়া লইতে বেগ পাইতে হয় না। অদ্য বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদেও এমন অসভ্য সম্প্রদায় বহু পাওয়া যাইবে যাহারা দাঁত ভাঙ্গিয়া, কাটিয়া বা ছুঁচাল রূপ দিয়া সুন্দর-তর করিতে প্রয়াস পায়। ছবিতে দেখা যাইবে কি নিষ্ঠুরতার সহিত সৌন্দর্য্য বিধানের প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা হইতেছে।

বার্ষিক দেড় আউন্স খনিজ

দেড় আউন্স মাত্র খনিজ উৎপন্ন হয়, অথচ অতিশয় লাভজনক খনি—এমন একটি রহিয়াছে কানাডার আরক্‌টিক্ অঞ্চলের গ্রেটবেয়ার লেকের নিকট এলডোরাডো নামক স্থানে। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই, কেননা এই খনিজটির নাম রেডিয়াম এবং বার্ষিক যে দেড় আউন্স পাওয়া যায় উহার আনুমানিক মূল্য তিন লক্ষ পাউন্ড। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ববৃহৎ যে দুইটি রেডিয়াম খনি আছে, এইটি তাহারই অন্যতম। এই খনিটির আবিষ্কারের ফলে রেডিয়ামের মূল্য প্রতি গ্রেন্—১০,০০০ পাউন্ড হইতে ৫০০০ পাউন্ডে নামিয়া আসিয়াছে অর্থাৎ বর্ত্তমানে এক পাউন্ড (আধ সেরের কিঞ্চিৎ কম) পরিমাণ রেডিয়ামের মূল্য দাঁড়াইয়াছে—২৪,০০,০০০ পাউন্ড।

প্রলয়ের পরে

(৬৮২ পৃষ্ঠার পর)

আপাদ-মস্তক কাঁপিয়া উঠিল। নীচের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কতক্ষণ যেন কি ভাবিল, তারপর অতি যত্নে নিক্ষিপ্ত শাড়ীখানি তুলিয়া লইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, "তুমি জাননা প্রভা, আজ কত বড় অত্যাচার আমার ওপর কর্‌লে! তোমার মধ্যে মনুষ্যত্ব নেই। তাই তোমায় ক্ষমা কর্‌লাম। তুমি আজ যা কর্‌লে,—শুধু আমার স্ত্রী বলেই বেঁচে গেলে। নতুবা জগতে এত বড় অত্যাচার আমার ওপর কেউ কর্‌তে সাহসী হত না। কেউ অব্যাহতি পেত না—কারুকে ক্ষমা করতাম না!"

শাড়ীখানি বুকের কাছে লুকাইয়া অমর কষ্টে চক্ষের জল দমন করিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। (ক্রমশঃ)

যশোহরের পল্লী নিকেতন

(চিত্র)

শ্রীতারাপদ রাহা

আকাশে নিবিড় কালো মেঘের নীচে দিয়া তখন দুই জোবিটি বক উড়িয়া যাইতেছে—আমাদের চোখের সম্মুখে রাস্তায় ছুটিল বাস, ডাইনে বাঁয়ে সবুজ ধানের ক্ষেত। মাটীর বুকে কে যেন সবুজ গালিচা বিছাইয়া দিয়াছে। আর উপরে সমস্ত আকাশ জুড়িয়া মহাকালীর রণরঙ্গিনী মূর্ত্তি। ভারতের ঋষিরা এইরূপ একটা মূর্ত্তি দেখিয়াই বুঝি তাহাদের দেবতার কল্পনা করিয়াছিলেন। এইরূপ সঙ্কটে না পড়িলে ঐ রূপ প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইতাম, এই কথাই ভাবিতে ভাবিতে চলিতেছিলাম হঠাৎ দেখি আমাদের চোখের সম্মুখে প্রায় দুই শত হাত দূরে—বাসের চতুর্দ্দিকে একটা ভীষণ গোলযোগ সুরু হইয়া গিয়াছে। পরক্ষণেই বুঝিলাম ইহা শুধু গোলযোগ নয়, ইহা মারামারির উপক্রম ঃ কয়েকজন লোক হাতে নিড়ানি ও সরু কোদালি লইয়া বাস কোম্পানীর লোকের মাথায় আঘাত করিবার উদ্যোগ করিতেছে। বাস কোম্পানীর লোকগুলিও পাল্টা জবাব দিয়া বীরের মত আস্ফালন করিতেছে। অসীম ভীত হইয়া বলিল, ঐ দেখুন বাবা, দাঙ্গা বেধে গেল, আমি তখনই মানা করেছিলাম আপনাকে, এ পথে আসবেন না। বাসে কয়েকজন স্ত্রীলোক ছিলেন তাঁদের আর বাস হইতে নামাইয়া দেওয়া হয় নাই, মনে পড়িতেই ছুটিয়া গেলাম। অসীম পিছন হইতে কাঁদিয়া বলিল, যাবেন না, বাবা, ও মারামারির মাঝে। তাহাকে অভয় দিয়া, ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিতে উপদেশ দিয়া দৌড়াইয়া 'বাস'-এর কাছে গেলাম। কোদালি, নিড়ানি ও লাঠিধারী চারখানা হাত তখন বাস কোম্পানীর লোকের মাথায় আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকেই জোয়ান কৃষক, সুস্থ-সবল মাংসপেশী গলার শিরা ফুলিয়া উঠিতেছে, ক্রোধে চক্ষু রক্ত বর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, তাহার উপর পাড়াগাঁয়ের প্রচলিত অবাচ্য ভাষায় গালি বর্ষণ করিতেছে। তাহাদেরই একটি ছোট ছেলে—বয়স বার তের—দুই হাতে চোখ রগড়াইয়া কাঁদিতেছে। মারামারি বাধিলে ড্রাইভারও ঐ কোদালি ও লাঠি হইতে রেহাই পাইবে না, বাস আর মাঠ পার হইতে পারিবে না; উহাতে যে কয়টি অবলা জীব আছেন তাঁহাদের—আর শুধু তাঁহাদেরই বা কেন—এ তেপান্তরের মাঠে দুর্যোগ সম্মুখ করিয়া আমাদের দশাও যে কি হইবে মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহা একবার কল্পনা করিয়া লইলাম। বিপদের চিন্তাই আমার মনে দুঃসাহস আনিয়া দিল; আক্রমণকারীদের মধ্যে একজন প্রবীণের হাত জড়াইয়া ধরিয়া মিষ্ট স্বরে বলিলাম, কি হয়েছে ভাই!

লোকটা আমার দিকে তাকাইয়া বাসওয়ালাদের দেখাইয়া—অকথ্য গালি দিয়া বলিল,—এই কোদালির আছাড় দিয়ে মাথা ফাটিয়ে দেবো না!......এই বুধো, ছাড়িস্‌নে শালাদের 'বাস'।

প্রমাদ গণিলাম। মেঘে চারিদিক আরও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে। লোকটার গায়ে মৃদু হাত বুলাইয়া বলিলাম,—আজ ওদের ছেড়ে দাও, আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখ—আর একটু দেরী করলে বাসের সব যাত্রীগুলি মাঠের মাঝে মারা যাবে। বাসে মেয়েছেলে রয়েছে—তোমাদেরও ত মা বোন আছে—তাদের কথা ভাব।

দেখিলাম মিষ্ট কথায় লোকটার মন নরম হইয়াছে, কোদালি মাথার উপর হইতে মাটীতে নামাইয়া সে বলিল, শালাদের আক্কেল দেখেছেন বাবু? আমারই ধানের ক্ষেতের উপর দিয়ে 'বাস' চালাবে, আর তা বলতে গেলে মারতে আসে, দেখুন বাবু, ছেলেটারে কেমন করে মেরেছে!......আয় ত রে নবে!

ছেলেটা চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে আগাইয়া আসিল। ওদিকে বাস দুই একবার ফোঁস ফোঁস শব্দ করিয়া জনশূন্য মাঠের উপর দিয়া তীরের মত ছুটিয়া চলিল। ছেলেটির দিকে চাহিয়া তার বাপের চোখ ছল ছল করিয়া আসিল। দেখিলাম ছেলেটির বাঁ গালে ও বাহুতে আঘাতের চিহ্ন:

এতটুকু ছেলেকে এমনি করে মেরেছে?

লোকটা বলিল, হাঁ বাবু, দোষের মাঝে ও যেয়ে পয়সা চেয়েছিল।

পয়সা পাওনা ছিল বুঝি?

পাওনা হবে না! সরকারী রাস্তা ছেড়ে আমাদের ধানের ক্ষেতের মাঝ দিয়ে ধান নষ্ট করে মোটরগাড়ী চালাবে—আর আমরা মাগ্‌না ছেড়ে দেব?

চাহিয়া দেখিলাম সামনে সরকারী রাস্তা মেরামত হইতেছে,—তাহারই নিম্নে ধানের ক্ষেতের ভিতর দিয়া অনেকটা জায়গা ভাঙ্গিয়া বাস যাইবার রাস্তা করা হইয়াছে। সমস্ত ব্যাপার এবার স্পষ্ট হইয়া উঠিল। চাষাদের পয়সার লোভ দেখাইয়া তাহাদের ক্ষেতের মাঝ দিয়া বাস চালানোর রাস্তা করা হইয়াছে, নইলে বাস চালানো বন্ধ রাখিতে হয়।

লোকটা বলিতে লাগিল, নিড়ুচ্ছিলাম বাবু, তাই ছেলেটারে পয়সা আনতে পেঠিয়ে দিলাম। তা শালারা বলে কি, বাবু,—পয়সা ত একবার ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডেরে দিয়েছি, তোমাদের আবার দেবো ক্যান্?—ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের টাকা দিয়েছিস্ ত তার রাস্তা দিয়ে গাড়ী চালাবি—না পারিস গাড়ী বন্ধ রাখবি,—তাই বলে আমাদের ধানের ক্ষেত ভাঙ্গবি ক্যান্।......চাষার ছেলে বাবু,—ওরা রাগ হ'লে দু'একটা ভাল মন্দ বলে থাকে, তাই বলে দুধের ছেলেকে ধরে মারবি?

রাগে লোকটার গলার শিরা আবার ফুলিয়া উঠিল, কিন্তু তখন আর রাগ করিয়া লাভ নাই—বাস তখন অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে—আর তাহারই পা-দানিতে দাঁড়াইয়া বাসের টিকেট বিক্রেতা লোকটি বিদ্রূপ করিয়া কি যেন বলিতেছে আর হাসিতেছে, রাস্তায় দাঁড়াইয়াও তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম।

কৃষকটি তাহা দেখিয়া আর একবার অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিয়া উঠিল। অসীম আসিয়া গিয়াছে। লোকটার গায়ে হাত দিয়া আর দুই একটি মিষ্ট কথায় প্রবোধ দিয়া অন্যদিন ইহার প্রতিকার করিতে উপদেশ দিয়া আমরা—মাঠের বন্ধুর পথে অতি দ্রুত আবার যাত্রা সুরু করিলাম। কৃষকটি তাহার সঙ্গীদের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া উচ্চস্বরে বাস-কোম্পানীর উদ্দেশ্যে আবার গালি সুরু করিল।

কিন্তু কৃষকের কণ্ঠস্বর আর বেশিক্ষণ শোনা গেল না, জনহীন মাঠের একপ্রান্ত হইতে এক অদ্ভুত ভয়ঙ্কর শব্দ অতি

দ্রুত আমাদের দিকে আগাইয়া আসিল। অসীমকে কাছে আনিয়া ছাতা খুলিলাম। এরূপ বৃষ্টিতে ছাতা খোলার কোন অর্থ হয় না। বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটার ঝাপটা বাঁকা হইয়া গায়ে বিঁধিতে লাগিল; সঙ্গে সঙ্গে ঝড় আরম্ভ হইল। এক মাথা ছাড়া আমাদের সর্ব্বাঙ্গ মুহূর্ত্তে ভিজিয়া উঠিল. জামা কাপড় হইতে জল গড়াইতে আরম্ভ করিল, বাতাসে ছাতা মাথায় ধরিয়া রাখা দায় হইয়া উঠিল। মাড়োয়ারী ভদ্রলোক তাহার ছোট সুটকেশটি হাতে করিয়া আমাদের ঠিক সম্মুখেই ছিলেন। তিনি তাঁহার বহুমূল্য ছোট সুটকেসটি সঙ্গে লইতে না ভুলিলেও বাস হইতে ছাতাটি বাহির করিয়া আনিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন; সুতরাং তিনি বিনা বাধায় ভিজিয়া অদ্ভুতদর্শন হইয়া উঠিলেন। অসীম তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ দেখিয়া বলিল, বাবা, ওঁর সুটকেসের মাঝে অনেক টাকা আছে, নইলে এ বৃষ্টিতে ছাতা ফেলে সুটকেস্ হাতে করে বেরিয়েছেন! বৃষ্টির দৌরাত্ম্যে কেহই আগাইতে পারিতেছিলেন না সুতরাং আমরা অনেকেই এক সঙ্গে মিলিত হইলাম কিন্তু ঝড় বৃষ্টির শব্দ ভেদ করিয়া কেহ কাহারও সহিত কথা কহিতে পারিতেছিলাম না।

মাঠ পার হইয়া বাস আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, প্রায় বিশ মিনিট ঝড় বৃষ্টির সহিত যুদ্ধ করিয়া আমরা তাহার নিকটে আসিয়া পৌঁছিলাম। অসীম শীতে কাঁপিতেছিল, ড্রাইভারের পিছনে মেয়েদের যে কেবিন ছিল সেখান হইতে একজন মহিলা দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে একটি চাদর গায়ে দিতে দিলেন। বাসের ভিতরে প্রবেশ করিয়া আমাদের দুরবস্থা একেবারে চরমে পৌঁছিল। যাহার যেটুকু শুকনা কাপড় জামা ছিল পাশের লোকের ভিজা কাপড় জামার সহিত লাগিয়া তাহাও ভিজিয়া গেল। বাহিরে তখন ঝড় বৃষ্টি পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে, বাসের পাশ দিয়া বৃষ্টির ছাট আসিয়া যাত্রীদের আবার নূতন করিয়া ভিজাইয়া দিতেছে। তবু বাস ছাড়িল—না ছাড়িয়া উপায় নাই। ইহার পর ক্রমে রাস্তা এতই খারাপ হইয়া পড়িবে যে বাস চলিতেই পারিবে না,—সুতরাং যতটা আগাইয়া লওয়া যায় তত ভাল। ভাল নিশ্চয়ই কিন্তু কি করিয়া যে আগাইবে তাহাই সমস্যা। পথে এত কাদা হইয়া পড়িয়াছে যে স্পীড্ দেওয়া সত্ত্বেও গাড়ীর চাকা অনেক জায়গাতেই না চলিয়া ঘুরিতে থাকিল,—আরাকান জায়গা এত পিছল হইয়া পড়িয়াছে যে, ষ্টিয়ারিং ঠিক রাখা দুষ্কর। রাস্তার দুপাশে—অনেকটা নীচে রাস্তারই মাটী কাটিবার খাদ। রাস্তা হইতে তাকাইয়া দেখিতে খাদের মত দেখায়। তাহার মাঝে মাঝে খর্জ্জুর ও বাবলা গাছ,—কোথাও বা রাস্তার মাটী আটকাইয়া রাখিবার জন্য বাঁশের গোঁজ পোঁতা। গাড়ী পিছলাইয়া একবার নীচে পড়িলে যাত্রীদের একটিও আস্ত পাওয়া যাইবে না। অসীম কাঁদিতে লাগিল। নেমে চলুন, বাবা,—নেমে চলুন, বাবা,—বলিয়া সে অনবরত চীৎকার করিতে লাগিল। ভয় যে আমারও না করিতেছিল—তাহা নয়, তবে অসীম সঙ্গে না থাকিলে হয়ত এতটা দুশ্চিন্তা থাকিত না।

ইহার উপর আরেকজন যাত্রী সময়োপযোগী একটি গল্প বলিয়া একেবারে মণিকাঞ্চন যোগ করিয়া দিলেন। কথাটা এমন কিছু নয়—দুই বৎসর আগে বৃষ্টির দিনে একজন ভদ্রলোক সাইকেল চড়িয়া এই পথে যাইতে হঠাৎ পিছলাইয়া সাইকেল সমেত নীচে পড়িয়া যান,—নীচে ছিল মাটীর বাঁধ দিতে চোখালো বাঁশের-গোঁজ; —বেগে পড়িতে ভদ্রলোক তাহারই একটিতে গাঁথিয়া যান। যাত্রীটি উপমা দিয়া বুঝাইয়া দিলেন তাহাকে দেখিতে হইয়াছিল—বশীবিদ্ধ পুঁটিমাছের মত।

শুনিয়া অসীম চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, নেমে চলুন শীগগির, আর এক মিনিট বাসে থাকব না।

তাহাকে জোরে আঁকড়াইয়া ধরিলাম। নামিয়া কোথায় যাইব? চারিদিকে শুধু মাঠ, জনপ্রাণহীন শ্যামলিমার তরঙ্গ। দুর্যোগহীন শান্ত দিনে তাহার শোভা দেখিয়া চোখ জুড়ায়—কিন্তু দুর্যোগের দিনে সেখানে আশ্রয় মিলে না। অসীমকে কাছে টানিয়া বলিলাম, ভগবান আছেন, ভয় কি?

অসীম তাহাতে আশ্বাস পাইল কি না জানি না, তবে বৃষ্টির বেগ ইহার পর কিছু মন্দীভূত হইয়া আসিল। একজন কে বলিলেন—আর একটু যাইতে পারিলে আমরা ঘটকী নদীর ধারে গিয়া উপস্থিত হইব। সেখানে গেলে একটা ব্যবস্থা হইতে পারে—সেখানে ডাকবাংলো আছে,—কিছু খরচ করিলে থাকিবার ব্যবস্থা হইতে পারে।

অনেকটা আশার কথা বটে, কিন্তু পথের একটুও উন্নতি দেখা গেল না,—কাদার মধ্যে এক একবার বাস বাধিয়া গেলে আধঘণ্টার আগে আর উঠিতে পারে না,—ইহা ছাড়া নীচে পড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা ত রহিয়াছেই। অসীম বলিল—চলুন, বাবা, ঘটকী অবধি আমরা হেঁটে যাই।

এবার আর তাহার কথার উত্তর দিলাম না ঃ কষ্ট বিপদ ও ঝঞ্ঝাটে নিজের উপরই বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম। এক একটা ছোড়া জায়গা উত্তীর্ণ হইবার সময় অসীম আঁৎকাইয়া আমায় জড়াইয়া ধরে, বলে, বাবা আর পারছি না, নেমে চলুন।

তাহার ভয় দূর করিবার কোন উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া আমি নিজেকেই অসহায় মনে করিতে লাগিলাম।

আরও বিশ মিনিট এইরূপে কাটাইবার পর ঘটকীর ধারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বৃষ্টি একটু কমিয়াছিল—আমরা বাস হইতে নামিয়া বাঙলোতে আশ্রয় লইলাম। বৃষ্টির জন্য অনেক লোকই সেখানে আশ্রয় লইয়াছিল। বৃষ্টিতে ভিজিয়া আমরা শীতে কাঁপিতেছিলাম, সকলেই যেন আমাদের অনুকম্পার দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। আমরা প্রথমে বাহিরে বারান্দায় দাঁড়াইয়াছিলাম, ভদ্রলোক বিপন্ন দেখিয়াই হউক অথবা বালকের প্রতি অনুকম্পা বশতঃই হউক ভিতর হইতে আহ্বান আসিল। ভিতরে গেলে দুখানা চেয়ার আমাদের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইল। অসীমের চাদরের একপাশ টানিয়া লইয়া নিজের গায়ে জড়াইলাম। ইহাতে তখন আর কিছু লজ্জাবোধ করিলাম না।

সেদিন ওখানকার হাটবার ছিল। কেহ দুধের কেঁড়ে, কেহ আমের ধামা, কেহ তরকারীর ঝাঁকা লইয়া বাঙলোয় আশ্রয় লইয়াছিল। অসীম দুই এক মিনিটের মধ্যে তাহাদের প্রায় প্রত্যেকের সহিত ভাব করিয়া লইল।

তোমার কেঁড়েতে দুধ,—আঁ—কত দাম?

এই চার পয়সা, পাঁচ পয়সা, ছয় পয়সা,—যখন যেমন।

কতটা আছে?

এক কেঁড়ে।

এক কেঁড়ে ত বুঝলাম,—মাপে কত?

তা,—দুই সের সাত পো হবে।

আঁ—অসীমের দুই চোখ কপালে উঠিল; এরা বলে কি—দুই সের দুধ চার পয়সা? দুই পয়সা করে দুধের সের? হাঁ বাবা সত্যি? অসীমের বিস্ময়ের ভাব দেখিয়া পাশের লোকগুলি সব তাকাইয়া রহিল। দুই পয়সা করিয়া দুধের সের তাহাদের কাছে বিস্ময়ের কারণ নয়; ইহা শুনিয়া যে কেহ বিস্মিত হইতে পারে—ইহাই তাহাদের বিস্ময়।

আমি তাহাকে সস্তার কারণ বুঝাইবার পূর্ব্বেই সে তরকারীওয়ালা, আমওয়ালার নিকট হইতে বিভিন্ন জিনিষের দাম জানিয়া লইল। পটল এক পয়সায় দুই সের, —লঙ্কা এখন এক সের—বর্ষাকালে হইবে এক পয়সায় তিন সের, ভাল আম এক পয়সায় দুই তিনটা,—টক্ আম ছ'সাতটা পর্য্যন্ত। শীতকালে বড় লাউ এক পয়সায় দুই তিনটা এক জোয়ানের বোঝা। হাঁস বা মুরগীর ডিম এক পয়সায় দুই তিনটা!

বৃষ্টি না থামিলে 'বাস' পার হইতে পারিবে না,—অসীম বিপদের কথা ভুলিয়া কৌতূহলের সহিত বিক্রেতা কৃষকদের নিকট হইতে কেবলি জিনিসের দাম জানিতে লাগিল। লোকগুলি অসীমের কথা শুনিয়া কৌতুক অনুভব করিতে লাগিল। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, বাবা,—লোকে এখানে না থেকে কলকাতা থাকে কেন,—এখানে জিনিষ এত সস্তা!

আমি তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম, এক খাবার জিনিষ সস্তা ছাড়া আর কোন সুবিধাই এখানে নাই,—অর্থোপার্জ্জনের উপায়—বিলাস, শিক্ষার ব্যবস্থা,—কোন কিছুই না।

অসীম আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া কৃষকদের জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা এ সব কলকাতা নিয়ে বিক্রী করলেই ত পার—কত লাভ হয়!

একজন বলিল, খোকাবাবু, কলকাতা নেওয়া কি সোজা, দেখছেন ত কলকাতা থেকে আসা কেমন মজা, যাওয়াও অমনি।

অসীম বলিল, কিন্তু বৃষ্টি ত সব সময় হয় না, তখন ত কত জিনিষ চালান দিতে পার!

একজন বুড়া মাথা নাড়িয়া বিজ্ঞের মত বলিল, সে কথা ঠিক!

আর একজন বলিল, চালান ত যায়—ঐ ত হোথা নৌকা-ভরতি আম চালান যাচ্ছে—বলিয়া ঘটকির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল।—আম যায়, কাঁঠাল যায়।

ও—আমি জানি! আমাদেরও ৫।৬ বিঘে কাঁঠালের বাগিচে আছে—আমাদের কাছ থেকে ব্যাপারীরা কাঁঠাল কিনে নিয়ে যায়,—না—বাবা!—আচ্ছা ওগুলি কোথায় নিয়ে যায়—কলকাতায়?

ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছরের—মাথায় ঝাঁকড়া চুল—একজন লোক পাশেই বসিয়াছিল। অসীমের কথা শুনিয়া বলিল, কলকাতাও যায়, তা ছাড়া যখন যেদেশে হয় না,—অর্থাৎ মানে কথা—যে দেশে কম হয়—সে দেশে চালান দিয়ে যায়।

অসীম লোকটির কথা শুনিয়া অতি কষ্টে হাসি চাপিল। বৃষ্টি থামিয়া আসিয়াছিল এইবার বাস ঘটকী পার হইয়া আবার যাত্রা সুরু করিল। অসীমের কৃষক বন্ধুর কেহ কেহ আমাদিগকে রাত্রের মত বাঙলোয় আশ্রয় লইতে উপদেশ দিল; অসীমের ভয়ের সংবাদও তাহারা ইহার মাঝে গল্পে গল্পে বুঝিয়া লইয়াছে। অসীম কিন্তু ইহাদের উপদেশ গ্রহণ করিতে রাজী হইল না। সে ইহাদের সহিত প্রাণ খুলিয়া গল্প করিলেও ইহাদের কাহাকেও প্রাণ ভরিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। নড়াইলের হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার কথা সে কাগজে পড়িয়া আসিয়াছে, পথে এক দাঙ্গার সূচনা সে স্বচক্ষে দেখিয়াছে, সুতরাং অজানা জায়গায় রাত্রি বাস তার পক্ষে সহজ নয়। তাই আবার যাত্রা সুরু হইল। নৌকা-সেতুতে বাস পার হইল, আরোহী পার হইল। ঘটকীর উত্তরে গিয়া বাস আবার মাগুরার দিকে আগাইয়া চলিল। গতি অতি মন্থর। মাগুরা আর ৮।৯ মাইলের বেশী নয় তবে যে গতিতে বাস চলিয়াছে তাহাতে সেদিন রাত্রি বারোটার আগে যে বাস গিয়া মাগুরায় পৌঁছিবে সে ভরসা নাই।

মানুষের পায়ে চলার গতি অপেক্ষা কম বেগে বাস চলিতে লাগিল। কোথাও ছেঁড়া জায়গায় বাস আটকাইয়া আধ-ঘণ্টার আগে উঠিবার নাম নাই—আবার অসীমের ভয়ের ভাব তখনও কাটে নাই (সত্য বলিতে কি— আমারও কাটে নাই)—তাই আমরা বাসের সাথে সাথে হাঁটিয়া যাইব সাব্যস্ত করিলাম। কাদায় কাদায় পা অসম্ভব ভারী হইয়া উঠিল জুতার চারিদিকে কাদা জমিয়া বুটের আকার ধারণ করিল। বুঝিলাম খালি পায়ে হাঁটিলে হয়ত ভাল হইত। যাহা হউক প্রায় দুই ঘণ্টা এইভাবে হাঁটিবার পর আমরা জাগলায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। হাটবার। বন্ধু সত্য তার ভাইয়ের সহিত হাট করিয়া ফিরিতেছিল, আমাদের দেখিয়া উল্লাসে প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিল, আরে—তোরা!

বলিলাম, বাঁচলুম ভাই!

বেশী কিছু বলিবার প্রয়োজন ছিল না। সে দিনকার দুর্য্যোগের কথা স্মরণ করিয়া আমাদের অবস্থা দেখিয়া নিতান্ত অনাত্মীয়েরও দয়া হইত। সত্য ত আমার পরম-আত্মীয়,—ও বাল্য বন্ধু। বাস হইতে জিনিষপত্র নামাইয়া তাহার সঙ্গে হাঁটা দিলাম। পথে একবার উচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিয়াছিলাম, তুই আজ আমাদের ত্রাণ-কর্ত্তা, রে সত্য, মরুভূমিতে ওয়েসিস্,—

সত্য শুনিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল ছেলেবেলা-কার সেই প্রাণখোলা হাসি। অসীম আমাদের অন্তরঙ্গতা দেখিয়া বিস্মিত হইতেছিল। কতকাল পরে সত্যর সঙ্গে দেখা—আবার যেন আমরা বাল্যকাল ফিরিয়া পাইলাম।

সত্য জয়পুরের এক কলেজে ইংরেজী অধ্যাপক, গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ী আসিয়াছিল। আত্মীয়স্বজনে বাড়ী

ভরতি। সত্য ও আমি বারান্দায় শুইলাম, মাঝে অসীম। রাত্রে একটুও ঘুম হইল না,—সারারাত, কেবল গল্প—গল্প ঠিক নয়—কথা,—অধিকাংশই দুঃখের কথা। গ্রামে আর বাস করা চলে না। অসুখ বিসুখে গ্রাম উজাড় হইয়া গেল। লোকে পুরাতন ভিটা ছাড়িতে চায় না, অথচ অসুখ লাগিয়াই আছেঃ ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, কলেরা। নিকটে ডাক্তার নাই, ছয় মাইল দূরে মাগুরা হইতে ডাক্তার ডাকিয়া আনিবার সামর্থ্য অনেকেরই নাই। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে সত্য তার মা, বাপ, কাকা, ঠাকুরমা সবাইকে হারাইয়াছে; অথচ ইঁহাদের প্রত্যেককেই সত্য তার কর্ম্মস্থলীতে গিয়া থাকিতে সাধিয়াছে, কেহই রাজী হন নাই। বাস্তুভিটা ছাড়িয়া তাঁহারা কোথাও যাইতে চান না। জমী-জমা সকলই আছে, তবু ভাই, তাহার স্ত্রী ও কাকীমার জন্য সত্যকে ৫০, টাকা করিয়া খরচ পাঠাইতে হয়। ভদ্রগৃহস্থ যে কয় ঘর এখানে ছিল—সবই প্রায় উজাড় হইয়া গিয়াছে। জমী-জমা রাখাও মুস্কিল। উৎপন্ন দ্রব্যের আয় হইতে খাজনা দেওয়াই দুস্কর। চাষী পাওয়া যায় না, জমী অনাবাদী রহিয়া যায়। অথচ কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের জরিপ হওয়ার পর জমীর খাজনা অসম্ভব বাড়িয়া গিয়াছে। কেবল খাবার জিনিস সস্তা,—কিন্তু পয়সা কোথায়—কেনে কে?

অসীম হঠাৎ বলিয়া উঠিল, দুধ কত করে?

আরে—তুই ঘুমুস নি? সত্য তার গায়ে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিল।

না,—দুধ দুই পয়সা করে?

দুই পয়সা,—আবার দুই পয়সার কমেও পাওয়া যায়,—দেড় পয়সা। তবে সের হিসাবে ত বিক্রী হয় না, কেঁড়ে হিসাবে; তবে সের দেড় পয়সা, দুই পয়সা পড়ে বটে।

সত্যকে বলিলাম, ওর ঐ এক রকম নেশা হয়েছে—কেবলি জিনিষের দাম জিজ্ঞেস করছে।

ভাল,—বড় হয়ে ব্যবসা ট্যাবসা করবে হয়ত।

তা ভাল,—যে দিনকাল পড়ছে চাকরী ত আর মিলবে না।

অসীম কিছুকাল পরেই ঘুমাইয়া পড়িল। আরম্ভ হইল নিজেদের সুখ-দুঃখের কথা; সুখ-দুঃখের বলিলে ভুল হয় নিছক দুঃখের কথা। দরদী শ্রোতা পাইলে ইহা বলিবার একটা নেশা —আছে। রাত্রি প্রায় ভোর হইয়া গেল।

সকালে একটা মোষের গাড়ী ভাড়া করিয়া মাগুরার উদ্দেশ্যে যাত্রা সুরু করা গেল। যা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে তাহাতে ৪।৫ দিনের ভিতরে আর বাস আসিবার সম্ভাবনা নাই। কিছুক্ষণ আসিবার পরই আমরা এমন একটা জায়গায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম যেখানে গাড়োয়ান ঠিকমত গাড়ী চালাইয়া লইতে পারিলে, গাড়ী কোনরূপে উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে পারে,—একটু বে-হুঁসিয়ার হইলে গাড়ী মোষ সহিত আরোহী অন্তত দশ বারো হাত নীচে। সাবধানের মার নাই—এই নীতিবাক্য স্মরণ করিয়া আমরা আগেই গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলাম; আর তাহার মিনিট খানেক পরে—গাড়ীসমেত মোষ সেই জায়গায় আসিয়া দশ বারো হাত নীচে পড়িয়া গেল। গাড়োয়ান ছিট্‌কাইয়া অথবা লাফ দিয়া রাস্তার এক পাশে পড়িল। আমাদের সুটকেস দুটি গাড়োয়ান ঝাড়িয়া পুঁছিয়া তুলিয়া আনিল। গাড়ী জুতিয়া উপরে আনিতে আরও মিনিট পনের কাটিয়া গেল। অসীম আর গাড়ীতে চাপিতে সাহস করিল না। রাস্তা ইহার পরে ভাল —গাড়োয়ান কত বুঝাইল তবুও সে স্বীকৃত হইল না। অবশেষে সুটকেস দুইটা গাড়ীতে উঠাইয়া আমরা হাঁটিতে সুরু করিলাম। প্রয়োজন বোধ করিলে আবার উঠিতে পারিব।

পথে কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়োয়ানের সঙ্গে অসীমের আলাপ জমিয়া উঠিল। তাহার গাড়ীর দাম কত, মোষ দুইটির দাম কত, দিনে সে কত রোজগার করে—অসীম অবিরত এইরূপ প্রশ্ন করিয়া চলিল। উত্তরে জানা গেল গাড়ী মোষ কিছুই তার নিজের নয়। সে দাম জানে না, সে শুধু মোষ রাখে আর ভাগী খাটে। এক টাকা ভাড়া হইলে আট আনা তার মালিককে দিতে হয়—আট আনা নিজে রাখে।

মাসে তোমার কত আয় হয়—পনের বিশ টাকা?

না বাবু,—তা' হ'লে ত বেঁচে যেতাম,—পাড়াগাঁয়ে কি রোজ ভাড়া মেলে,—অমনি দশে পাঁচে এক দিন।

অসীম তাহাকে বলিল, তা হ'লে তুমি কলকাতা গেলেই ত পার,—সেখানে রোজ ভাড়া মেলে!

গাড়োয়ান অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে বলিল, দেখি তাই যেতে হবে, এখানে আর খেতে পাই না, বাবু!

গাড়োয়ান মাঝে মাঝে আমাদের গাড়ীতে উঠিতে সাধিল,—কিন্তু অসীমের মত হইল না। গাড়ীর ঝাকুনী খাওয়ার চেয়ে নরম মাটীর উপর পা ফেলিয়া ধীরে ধীরে যাওয়া অনেক বেশী আরামের।

মাগুড়া আসিয়া ২, টাকা ভাড়া আর ৵০ আনা ঘাট-খাজনা দিয়া নৌকা ভাড়া করা হইল। মাঝি তিন জন। এখানেও অসীমের ঐ একই কথাঃ নৌকাখানার দাম কত? মাঝিরা মাসে কত রোজগার করে? নৌকার বয়স হইয়াছে কত? একখানা নৌকার আয়ু কত?—ইত্যাদি।

বালকের কথায় মাঝিরা হাসিয়া উত্তর দিয়াছে। নৌকার দাম প্রায় দেড়শত টাকা। নৌকা তাহাদের নিজের নয়,—মহাজনের। ভাড়া হিসাবে ১০, মহাজনের দিতে হয়; বাকী টাকা ভাগ করিয়া তাহারা লয়। সে ভাগও আবার সমান নয়। যে মাঝি হাল ধরে—সে পায় ছ'আনা বাকী দুই জন পাঁচ পাঁচ আনা করিয়া পায়। ভাড়া ও রোজ মিলে না। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, মহাজনের টাকা শোধ দিবার পর ৬।৭ টাকা এক একজনের ভাগে থাকে—যে হা'ল ধরে তার একটু বেশী।

অসীম অমনি বলিয়া উঠিল, বাবা, এ ব্যবসা ত তবে ভাল! এক বৎসরেই নৌকার দাম উঠিয়া যায়। ১২×১০ =১২০,। দেড় শত টাকার নৌকায় বৎসরে ১২০, মহাজনের ঘরে আনিয়া দেয়।

ভাববারই কথা। অসীম শেষে আমার ব্যবসায়ী

করিয়া তুলিল দেখিতেছি। আমি স্বীকার করিলাম ইহা অত্যন্ত সুবিধার কথা বটে, সেই সঙ্গে কলিকাতার রিক্সওয়ালাদের কথাও তাহাকে বলিলাম। ব্যবসায় সম্বন্ধে অসীমের এত কৌতূহল দেখিয়া নিজে দেশে যে সকল জিনিসে ব্যবসার সম্ভাবনা দেখিয়াছি তাহার দুই একটি তাহাকে বলিলাম।

দেশে ঝড়ে আম পড়ে দেখেছিস?

হ্যাঁ, অনেক, অনেক।

তা' দিয়ে আমাদের বাড়ীতে কি করা হয়?

তার কিছু দিয়ে কর্ত্তামা আমচুর করে, আর বাকী ফেলে দেওয়া হয়।

ঐ ফেলে দেওয়া জিনিষ নিয়েই ব্যবসায় করা যায়।

কি রকম?

আমের আচার হয় চাটনী হয় জানিস?

হ্যাঁ, খেতে খুব সুন্দর লাগে।

তা ত লাগবেই। আমাদের দেশে যেমন আচার চাটনী হয়,—বিদেশে হয় তেমন জ্যাম জেলী। অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে এ সকল করবার জন্য বড় বড় কারখানা আছে। এখান থেকে বাগান ধরে কাঁচা আম ফালি দিয়ে, নুন মাখিয়ে, বাক্সে প্যাকিং করে ঐ সব দেশে চালান দেওয়া হয়। এতে বেশ মোটা টাকা লাভ হয়।

অসীম সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, এ ত বেশ ভাল—ঝড়ে পড়া আম নিলে আর বেশী দাম দিয়ে কিনতে হয় না,—অথচ কত লাভ হয়। যশোরের লোকে চাকরী চাকরী করে ঘুরে না বেড়িয়ে এই সব করে না কেন?

সেই ত দুঃখ, যশোরের লোকে ত করেই না, এমন কি কোন বাংগালীও করে না,—এ ব্যবসা করে দু একজন মাড়োয়ারী।

অসীম বলিয়া উঠিল,—আমি বড় হয়ে এ ব্যবসা করব।

ব্যবসার কথা বলিতে গিয়া আরও কয়েকটা ছোট ছোট ব্যবসায়ের কথা মনে পড়িয়া গেল। অসীমকে বলিলাম, শিমুলের গাছ দেখেছিস?

হ্যাঁ, লাল লাল ফুল হয়, তুলো হয়।

যশোরের মাঠ ঘাট এ গাছে ভরতি। কেউ এর আদর করে না, দাবী করে না। গাছে ফুল আপনি ফোটে আপনি ঝরে যায়,—তুলো হয়, চৈত্র-বৈশাখে ফেটে আপনি উড়ে যায়, কেউ ওদের কুড়িয়ে নেয় না। একটা লোক রেখে গাছ থেকে শিমুল ফল পেড়ে তুলোর চালান দিতে পারলে বেশ দু' পয়সা হয়। কেউ এসে পয়সা দাবী করলে অল্প দু'চার আনা দিলেই তার দাবী মিটে যায়।

অসীম অবাক্ হইয়া শুনিতে লাগিল।

বলিলাম, আরও এমনি কত আছে। সাহেবরা যে টুপী পরে তা কি দিয়ে তৈরী হয় জানিস?

শোলা।

যশোরের মাঠ এই শোলায় ভরতি, চাষারা কেটে, উপড়ে কূল পায় না। কেউ লোক রেখে এই শোলা সংগ্রহ করে কলকাতা টুপীর নির্ম্মাতা, মালিকের অথবা ব্যবসায়ীদের কাছে চালান দিতে পারলে বেশ মোটা টাকা লাভ হয়। পৃথিবীর মাঝে এক বাঙলা দেশ ছাড়া আর কোথাও প্রায় শোলা হয় না, অথচ টুপী পরে জগতের প্রায় সব দেশের লোক।

অসীমের বিস্ময় আর কৌতূহল ক্রমেই বাড়িতেছে দেখিয়া যশোরের আরও দুই একটি ব্যবসায়ের কথা সেদিন তাহাকে বলিয়াছিলাম। যশোরে অবশ্য শাল-সেগুনের বন নাই, কিন্তু আম কাঁঠালের প্রাচুর্য্য আছে। বর্ষায় অনেক গাছ মরিয়া যায়, বুড়ো গাছ অনেকে বিক্রয় করিয়া ফেলে। মূল্য নামমাত্র। সেগুলি কিনিয়া ফাড়াই করিয়া চালান দিলে অর্থাগম নিতান্ত কম হয় না। পাটের ব্যবসায়ের জন্য ব্যবস্থা অবশ্য বহু পূর্ব্ব হইতেই আছে, ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে ছিল নীলের। গম, ছোলা, মটর, মুগ, মসুর প্রভৃতির ব্যবসা এখনও খুব ভাল চলিতে পারে। মরশুমের সময়ে যশোরের অভ্যন্তর স্থানসমূহে এখনও টাকায় তিন চার কাঠা মটর ও দুই তিন কাঠা মুগ পাওয়া যায়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে ঐ সকল জিনিষের ব্যবসা করিলে এখনও প্রচুর লাভবান্ হইতে পারা যায়।

অসীমকে এই সকল কথা বলিলে সে উৎসাহিত হইয়া বলিল, বাবা, তবে লোকে এ সকল ব্যবসা করে না কেন?

তারা আরাম চায়, কষ্ট করে দুশো টাকা আয় করবার চেয়ে বিশ টাকার বাঁধা মাইনের চাকরী ভাল মনে করে। অথচ যশোরের এই অজ পাড়াগাঁয়ে থেকেই কত শত উপায়ে পয়সা রোজগার হ'তে পারে। একদিন উৎপন্ন দ্রব্য আর শিল্পে যশোর অন্যান্য জেলাকে হার মানিয়ে দিয়েছিল। যশোর নাম হয়েছে কেন জানিস ত?

কেন?

অন্যান্য জেলার যশ এ হরণ করেছিল, তাই এর নাম যশোহর।

সত্যি?—আনন্দে অসীম যেন লাফাইয়া উঠিতে চায়। নিজের জেলার গৌরবে সে গর্ব্ব বোধ করে দেখিয়া আনন্দ বোধ করিলাম।

অন্যান্য বার বাড়ী আসিয়া কর্ত্তামায়ের সংগে গল্প করিয়া খেলা করিয়া সে দিন কাটাইয়া দেয়,—এবারকার খেলা ও গল্প তার একটু নূতন ধরণের।

আমাদের বাড়ীর ধারেই গ্রামের হাট। সেখানে গিয়া সে প্রতি জিনিষের দাম সংগ্রহ করে। সন্ধ্যায় কর্ত্তামার কোলের কাছে বসিয়া গ্রামে যখন যে জিনিষ সস্তা হয় সেই জিনিষের তখনকার একটা দাম সংগ্রহ করিয়াছে। তাহার তালিকা হইতে

(শেষাংশ ৬৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জীবজন্তুর স্বপ্ন দেখা

শ্রীমতী শোভনা দেবী

দেশ-পত্রিকায় সেদিন জীব জন্তুর চিন্তাশক্তি সম্বন্ধে অনেক তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের পরখের ফল থেকে আশ্চর্য্য সব ফলাফল তা পড়ে জানতে পারা গেছে। বাঙলা ভাষায় এ বিষয়টির আলোচনা তেমন নেই। তাই অনেক ব্যাপার এ সম্বন্ধে আমরা জানতে পারিনে। জানোয়ারের চিন্তাশক্তির সুন্দর একটা দিকে আলোকপাত হয় অধ্যাপক জে আর্থার টমসন মশায়ের লেখা থাকে। অবশ্য দেশ-পত্রিকার উক্ত প্রবন্ধ লেখক শ্রীযুত পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য মশায় এই স্বনামধন্য অধ্যাপক মশায়ের কোন কোন গবেষণার ফল উদ্ধৃত করেছেন। অধ্যাপক শেইফার এবং অধ্যাপক ইয়েরকেসয়ের লেখা থেকেও অনেক নূতন জিনিষ তিনি আমাদের শুনিয়েছেন। কিন্তু জন্তু-জানোয়ারের অবচেতন চিন্তাশক্তির প্রভাব কতকটা যে মানব-জাতির সুষুপ্তিকালের মতই প্রায় একই নিয়মে রূপ ধরে ওঠে, সে কথাটা তিনি উল্লেখ করেন নি। হয়ত প্রবন্ধান্তরে তা পরে আমরা দেখতে পাব।

যাক, অধ্যাপক টমসনের লেখা থেকে যে কথা নিয়ে আজ আলোচনা করবার ইচ্ছে, সে কথাটা হঠাৎ শুনলে অবিশ্বাস্য মনে হবে। অথচ প্রোফেসর টমসন তা বলেছেন বেশ জোরাল ভাষায় এবং তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ রাখেন নি। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়—জীব জন্তুগুলোর নিদ্রায় স্বপ্নের আবির্ভাবে উহাদের চিন্তাশক্তির প্রমাণ পাওয়া যায় কি না !

ঘোড়া-গরুর স্বপ্ন ! কথাটা হাস্যকর বে মনে হবে অধিকাংশ লোকের কাছে তাতে অবশ্য ক্ষুণ্ণ হবার বা তাদের অজ্ঞতাকে পরিহাস করবার কিছু নেই। আগেই বলেছি, আমাদের দেশে আমাদের বাঙলা ভাষায় জীব জন্তুর মন-মেজাজ নিয়ে গবেষণা ও আলোচনা চলেনি বড় বেশী। এ বিষয়ে আমরা যা কিছু পাই, বেশীর ভাগই পাশ্চাত্য পন্ডিতদের অবদানে। প্রাচীনকালে এদেশে হয়ত হয়ে থাকবে —অন্য অন্য বিষয়ে যে রকম আলোচনা দেখা যায় মাঝে মাঝে (ধরুন একশত কি পঞ্চাশ বছর আগে), তাতে মনে হয় এ বিষয়েও কিছু আলোচনা হয়ত হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সে সকল অমূল্য অবদান কোন অধুনাবিলুপ্ত সাময়িকের বক্ষেই হয়ত নিহিত হয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়েছে। পুস্তকাকারে প্রকাশ পায়নি নিশ্চয়ই। তাই আমাদের আর সুযোগ নেই ওগুলোর দ্বারা উপকৃত হবার।

অধ্যাপক টমসন বলেন, জীব জন্তুর যে ক্রোধের উদয় হয় একথা অস্বীকার করা একেবারে অসম্ভব। কখন কখন উহা এমনই আকার ধারণ করে যে, জানোয়ারটিকে সহজ রাগীই বলতে হয়, অন্য কথায় উহাকে বাদমেজাজী খিটখিটে আখ্যা দেওয়া যায়, কারণ এবং সমর্থনযোগ্য যুক্তি তার যতই থাক না কেন। এই যে সহজে উত্তেজনাপ্রবণ জানোয়ার, তার এলাকার ভিতর যদি কেউ অনধিকার প্রবেশ করে, তার আস্তানার কাছাকাছি যেয়ে হাজির হয়, তার সঙ্গী বা সঙ্গিনীটির উপর যদি জুলুম করে, অথবা তার বাচ্চা-বাচ্চার উপরই যদি হস্তক্ষেপ হয়, সে সময় তার ধৈর্য্য ধরে থাকবার কথা নয় নিঃসাড়ে। তখন এতটা উত্তেজনার উদয় হতেও দেখা যায় যে, স্বভাবভীরু জানোয়ারটি তার সকল ত্রাস কাটিয়ে ক্ষেপে ওঠে বলতে গেলে, ঠান্ডামেজাজের জীবটি পর্য্যন্ত তখন সঙ্গত অসঙ্গত কাজের বাঁধাবাঁধিকে মুছে ফেলে দেয় মনের কোণ থেকে।

অন্য সময়ে যে জন্তুটির আচরণে কিছুমাত্র অযৌক্তিকতা পাওয়া যাবে না, সে বিজ্ঞ পশুটি যে এমন অদ্ভুত কাজ করে ফেলে, তা শুধু নিমেষের উত্তেজনায় নয় ; কেননা, ওরকম ব্যাপার যখনই ঘটবে, তখনই সে উত্তেজনা প্রকাশ করবে, বার-বার একই আচরণ করে যাবে জীবন-ভর। নিমেষের প্রেরণা হলে, কোন না কোন সময় অভিজ্ঞতার স্মৃতির অঙ্কুশে অন্য-রূপ অভিব্যক্তিও প্রকাশ করত। কিন্তু তা সে করে না। কাজেই এই উত্তেজনা প্রকাশের পূর্ব্বে তার মনে নিশ্চয় কোন রকম ধারণার ক্রিয়া চলতে থাকে, যাকে "জান্তব চিন্তা" আখ্যা দিয়াছেন পুরুষোত্তমবাবু।

তবে এই রাগের ব্যাপারেও একটা কথা নিশ্চিত বুঝতে আমরা পারিনে। সে কথাটা হ'ল— অপরের ঔদ্ধত্য ও অসঙ্গত ব্যবহার যাকে ওরা মনে করে রুখে ওঠে উত্তেজনার বশে বা, বিপক্ষ চড়াও হলে যে লড়ায়ে পাল্লা দিতে যায়, তাতে ওদের প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি আছে কি না। অবশ্য অনেক স্থলে আমরা দেখতে পাই আঘাতের পাল্টা প্রতিঘাত ওরা করে। এ ব্যাপারে—কাক, রাজহাঁস, ময়ূর, শূকর, হাতী—এরা আঘাত ভুলে যায় না, সুযোগ পেলেই তার প্রতিঘাত প্রদান করে। কিন্তু 'প্রতিঘাত' আর 'প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি' এক কথা নয়। জীব-জন্তুদের প্রতিঘাতের উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার প্রবৃত্তির আরোপ করা যায় না।

প্রতিহিংসা গ্রহণ করবার প্রবৃত্তির অর্থ হ'ল প্রতিঘাত করবার একটা সুনির্দ্দিষ্ট মতলবের দৃঢ় রূপায়ন—এবং যাকে বাস্তবে পরিণত করা সচেতন মনন-শীলতার প্রত্যক্ষ গন্ডীর ভিতর পড়ে। এতে শুধু এমনই বুঝায় না যে, রাগটিকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য মনে মনে তাকে উস্কিয়ে রাখতে হবে নানা ইন্ধনে, তার উপরও কেমন করে বিপক্ষের উপর ঝাল ঝাড়া যায় তারই স্পষ্ট একটা ফিকির-ফন্দী আঁটা। এতটা মান-সিক উচ্চতার স্তরে জীব-জন্তু ওঠে নি।

কাজেই ক্রোধের প্রকাশে যেটুকু চিন্তাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় হরেক জাতীয় জানোয়ারদের কাছ থেকে তাকে নিকৃষ্ট বা অবিকশিত শক্তিই বলতে হবে—বোধশক্তির উপরে অভিজ্ঞতার স্মৃতিরও উচ্চে, কিন্তু মনের নিজ কর্ম্ম ও অনু-ভূতির প্রত্যক্ষ জ্ঞান নয়। ক্রোধ সম্বন্ধে পুরুষোত্তমবাবু কিছু উল্লেখ করেন নি। তাঁর ত্রুটি দেখাবার উদ্দেশ্যে এ প্রসঙ্গের উল্লেখ নয়। আর একথা আমার নিজের আবিষ্কার ত নয়ই—পাশ্চাত্য পন্ডিতের অভিমতই যেটুকু বুঝতে পেরেছি, তাই লিখে জানালাম, আলোচনার সাহায্য করবার জন্যে। শ্রীযুত পুরুষোত্তমবাবুর প্রামাণ্য সমর্থন করবার জন্যেই

এ জিনিষটার উত্থাপন করা হ'ল। এখন সমর্থনের দ্বিতীয় যুক্তি স্বপ্নের কথা ধরা যাক।

স্বপ্ন হ'ল মনেরই একটা সক্রিয় অভিব্যক্তি যখন দেহের অধিকাংশ ভাগই সুষুপ্তিতে মগ্ন। (নিদ্রা ও সুষুপ্তি এখানে সমার্থক)। কাজেই "জীব জন্তু কি স্বপ্ন দেখে?" এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার আগে আমাদের মনে আর একটি যে প্রশ্ন জাগে, তা হ'লে—"জীব জন্তু কি সত্যি ঘুমায়?"

যদি নিদ্রা বললে শরীরের নবদ্বার নিরুদ্ধ থাকার অবস্থাকেই মাত্র বুঝায়, অথবা যদি কোন প্রকার আহ্বানে সাড়া দিবার অক্ষমতাকেই মাত্র বুঝায়, কিম্বা এদিকে ওদিকে ঘুরে (অবশ্য আগে জাগরিত না হয়ে) বেড়াবার শক্তি লোপকেই মাত্র বুঝায়, তাহলে ঢের ঢের জন্তু-জানোয়ারই ঘুমায় বলে ধরে নেওয়া যায়।

ঘোড়াগুলো ঘুমাতে পারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, আবার গাছের ডাল আঁকড়ে ধরে বাদুড়গুলোও ঘুমাতে পারে, তিমি-গুলো ঘুমাতে পারে সাগরের বুকে। যে কুকুরটা ঘুমাতে পারে না, সে অমন করে চার কি পাঁচ দিনের বেশী বেঁচে থাকতে পারে না। না খেয়ে কুকুর হয়ত বাঁচতে পারে দীর্ঘকাল, অন্তত নিদ্রাহীন অবস্থার চেয়ে যে বেশী তাতে ভুল নেই এক বিন্দু।

আবার এমন কথাও অধ্যাপক টমসন বলেছেন যে, কোন কোন জানোয়ারের এমনতর ঘুমেরও কোন দরকার হয় না বলে দেখা যায়। তিনি বলেছেন, প্রাণিতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা বলে থাকেন, গিনিপিগ জীবটির কোন রকম ঘুমেরই দরকার হয় না। ওগুলো খাবারের বহরের ঠিক অর্দ্ধেকও কমিয়ে দিয়ে বেঁচে থাকতে পারে, তবু কিন্তু এদের ঘুমাতে দেখা যায় না। এটা জীব-জগতের জীবন ধারার একটা বড় উল্লেখযোগ্য নজির। এমনিধারা নানারকমের পরখ আর সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ থেকে পণ্ডিতেরা ঠাউরে নিয়েছেন,—জানোয়ারটি বোধ শক্তিতে যতটা নীচু স্তরের, তার ঘুমের চাহিদাও ততটাই কম। আর এ কথা ত শরীর-গঠনের সাধারণ তত্ত্ব যে, মস্তকের সম্মুখ ভাগের অংশস্থ যে মগজ, তা-ই হ'ল বুদ্ধিবৃত্তির কেন্দ্রস্থান। এই মগজাংশ যে প্রাণীর যত বেশী, সে তত বেশী মানস-শক্তির উচ্চস্তরের অধিকারী। আর জীব জন্তু পর্য্যবেক্ষণ থেকে যা জানতে পারা যায়, তা হ'ল এই—এ রকম মগজের অধিকারীকে এই অতিরিক্ত অংশের জন্য যে নিয়মিত ট্যাক্স দিতে হয়—তা ঘুম ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকৃতির এ যে একটা ধারা বাঁধা নিয়ম, তার সমর্থনে আরও অনেক কথাই বলা যায়।

তা যেমনই হোক, এ কথা অতি বড় সত্য যে, পাখীর নিম্নস্তরে এমন জীব আর নেই একটি যার ঘুমের ব্যাপার সম্বন্ধে সমর্থনযোগ্য প্রমাণ উপস্থিত করা যেতে পারে অন্তত বাইরের কোন নিদর্শন থেকেও। উচ্চস্তরের জানোয়ারদেরও ঠিক নিদ্রা হয় কি পরিমাণে, যে নিদ্রার ভাব দেখা যায় তাতে সুষুপ্তি কতটা থাকে, এ নিয়ে পণ্ডিতদেরও মতভেদ আছে।

সরীসৃপ ও মাছ—এরা নিঃসাড়ে পড়ে থাকে; কিন্তু সত্যি এরা ঘুমায় কি? সাপটা হয়ত কুণ্ডলী পাকিয়ে জড়ের মত নির্জ্জীব থাকে, দেখে মনে হয় ঘুমে একেবারে অচেতন; গিরগিটি দশ-পনেরটা একসঙ্গে জড়াজড়ি ক'রে ঢিবি-পানা আকারে পরিণত হয় ফুল-ফলের গাদার মত; পুকুরের জলে মাছটাকে দেখা যায় নিতান্ত নিশ্চল হয়ে দীর্ঘকাল এক অবস্থায় থাকতে; কিন্তু যখন ওদের ছোঁয়া যায়, তখন সদ্য নিদ্রাভঙ্গের কোন চিহ্ন দেখা যায় না ঘুমের ঘোর কাটাতে। ঘুম ভাঙলে ঘুমের রেশ কিছু না কিছু থাকে যত কমই হোক না কেন জীববিশেষ বলে, কিন্তু সরীসৃপ বা মাছের তেমন কোন ঘুমের ঝোঁক কাটাবার ইঙ্গিত পাওয়া যায় না সদ্য জাগরণের মুখেও। বরং এর বিপরীত অবস্থাই দেখতে পাওয়া যায়। কাজেই এদের স্তব্ধতা 'জান্তব' ঘুমও নয়। ও নিছক জিরিয়ে নেবার ফিকির মাত্র।

মানসিক সক্রিয়তার কম বা বেশী বিশৃঙ্খলাকেই স্বপ্ন বলা যেতে পারে, যদি সে সময় প্রায় সম্পূর্ণ অবয়ব নিদ্রা-ভিভূত থাকে। আর যখন উচ্চ শ্রেণীর জানোয়ার ভিন্ন নিদ্রাই পাবার যোগ্য নয়, তখন সক্রিয় মন সেখানেই খুঁজতে হবে এবং সে সঙ্গে স্বপ্নের আভাষ যদি পাওয়া যায় তাদের ভিতরই সেটা সম্ভব, অন্য কোনটিতে নয়।

এখানে অধ্যাপক টমসন বলেছেন—বিড়াল ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে গর্‌র্‌ গর্‌র্‌ করে। এখন বিড়াল আহ্লাদ জানাতে সব চেয়ে প্রিয় যে তার গা ঘেঁসে ও-রকম শব্দ করে। মানুষের হাসির সঙ্গে এর তুলনা করা চলে। বিশেষ আরামেও বিড়াল অমন শব্দ বার করে থাকে। কিছুক্ষণের নিদ্রালস বিড়ালের মনে যদি একটা কোন রকম সক্রিয়তা না এসে পড়ে, তবে সে ও-রকম শব্দ করে আরামের নিদর্শন প্রকাশ করবে কেন। হয়ত মনের সে ক্রিয়া নিতান্তই এলোমেলো, তবু জাগ্রত অবস্থায় যখন নয়, তখন সেটা স্বপ্ন ছাড়া আর কি!

কুকুর ঘুমের ভিতরই লেজ নাড়বে আর যদি করুণ গোঁ-গোঁ শব্দ করবে, যেমন সে করে থাকে মালিককে দেখে। প্রোফেসর টমসন বলেন,—"Cats and dogs certainly have their dreams." (অর্থাৎ বিড়াল ও কুকুর নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখে)। * সর্ব্বপ্রকারে স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্যে প্রতিষ্ঠিত কুকুর, যে নাকি স্বাধীনভাবে শিকার বাগিয়ে উদর পূরণ করে, তাকে দীর্ঘকাল লক্ষ্য করে দেখলে একথাও জানতে পারা যাবে যে,—ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখছে, সে শিকার তার পিছু ছুটতে যাবে, অমনি ঘুম ভেঙে গেল, চমকে উঁচিয়ে তুলল দেহখানার অর্দ্ধেক। তার পরেই বাস্তব পারিপার্শ্বিক নজরে পড়ল, স্বপ্নের দেখা যা কিছু সব উবে গেল মন থেকে। স্বপ্নের সামান্য একটা আবছা ছাপও রইল না মনে। মনের সে ক্রিয়া নিতান্তই এলোমেলো।

এমন ঘোড়ার বিবরণ পাওয়া গেছে, যেটা নিদ্রিত অবস্থায় চিঁ-হিঁ করে ডেকে ওঠে, সময়ে আবার চাঁটও ছোড়ে। ঘুমের ঝোঁকে এরূপ করবার আর কোন হেতু থাকতে পারে না, যদি না একে স্বপ্নেরই একটা রকমফের বলা যায়। কাজেই

---

* Bulletin on Natural History published by the University of Aberdeen: এ বিশ্ববিদ্যালয়ে জে এ টমসন অধ্যাপক।

অধ্যাপক টমসন নিশ্চিতভাবেই বল্‌তে চেয়েছেন যে, ঘোড়াগুলোও ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখে।

কোন কোন সময় মানুষ যে স্বপ্ন দেখে, তার সঙ্গে বাস্তব শয্যাদ্রব্যের বা অন্য ব্যক্তির রঙ্গ-কৌতুকের দ্রব্যের সংস্পর্শেও নিদ্রাভঙ্গ হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যায়, লেখিকার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হ'তে জানা এক ব্যক্তির স্বপ্ন-বৃত্তান্ত। নিদ্রায় বেহুঁস অবস্থায় সে উবুড় হ'য়ে শুয়ে বুকের নীচে একটি বালিশ দিয়ে সন্তরণের কায়দায় হাত-পা চালনা করছে। সে অবস্থায় তার মুখে একটু চিনি পুরে দেওয়া হ'ল সে বেশ চুক্ চুক্ করে খেল, কিন্তু তার ঘুম ভেঙে গেল না। শেষ ঘুম ভাঙলে স্বপ্নের বৃত্তান্ত বেশ বলে গেল যে, তার মনে হ'য়েছিল গঙ্গায় সাঁতার কাটছে, আর ঢেউয়ে তাকে নাচাচ্ছে। কিন্তু চিনি খাওয়ার কোন স্মৃতিই তার নেই। অথচ তখনও তার মুখে চিনি লেগে রয়েছে।

কিন্তু ঘুমন্ত কুকুরের স্বপ্নে দেখে গজরানীর সময় যদি কড়া গন্ধওয়ালা কিছু এনে তার নাকে ধরা যায়, অমনি তার স্বপ্নের সঙ্গে ঘুমও ভেঙে যায়। সে হয়ত দেখছিল পাশের বাড়ীর রোগা কুকুরটাকে তেড়ে গেছে, কিন্তু ঘুম ভাঙার পর আর কোন প্রয়াসই পেল না বিপক্ষটির পশ্চাদ্ধাবন করতে, কেননা, ততক্ষণে তার স্বপ্নের সকল ঘোর একেবারেই কেটে গেছে মন থেকে নিঃশেষ, ঠিক যেমন স্বপ্ন-দেখা মানুষটির চিনি খাবার ব্যাপার স্মৃতি থেকে লোপ পেয়ে গেছল পুরোপুরি।

এমনিধারা শত শত দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে বোঝাতে—জানোয়ারের ঘুম এবং স্বপ্ন নেহাৎ যেন একটা কৃত্রিমতাপূর্ণ ব্যাপার। তা বলে কোনটাই নিছক মিথ্যা নয়, হেঁয়ালি-ঢাকা হতে পারে বটে।

এলোমেলোই হোক আর অবচেতন মনের অপ্রত্যক্ষ ক্রিয়ার আভাষই হোক, জানোয়ারদেরও যে এক রকমের স্বপ্ন-দেখা ব্যাপার রয়েছে, একথা অস্বীকার করা যায় না। কাজেই চিন্তা-শক্তির দিক দিয়ে তাদের যে কিছুটা দাবী রয়েছে, সে শক্তি যতই ক্ষীণ ও অপূর্ণ থাক না কেন, একথাও স্বীকার না করে উপায় নাই। তবে একথা সব দিক থেকেই উল্লেখযোগ্য যে, মানবের চিন্তা-শক্তি বললে মনের যে প্রকার সক্রিয়তার রূপ পাওয়া যায়, জীব জন্তুর বেলা সে প্রকার শৃঙ্খলিত ও গণ্ডীবদ্ধ ধারা নয়। হয়ত সেটা আকস্মিক, হয়ত সেটা কোন কোষবিশেষের যান্ত্রিক সাড়া মাত্র।

যশোহরের পল্লীনিকেতন

(৬৯০ পৃষ্ঠার পর)

দুই একটি উদ্ধৃত করিলাম। ইহা জিনিষ যখন সুলভ হয় তখনকার মূল্য—

দ্রব্য	সময়	মূল্য
দুধ	জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়	টাকায় ৩২ সের
আম	"	" ১৬০টা
কাঁঠাল	"	" ১৬টা
পটল	শ্রাবণ-ভাদ্র	পয়সায় ২ সের
লংকা	"	" ৪ সের
বেগুন	শীতকাল	" ৩ সের
লাউ	"	" ২।৩টা
মুরগীর ডিম	"	" ২।৩টা
পাটালী গুড়	"	তিন পয়সা সের
গাওয়া ঘি	"	এক টাকা সের
মাছ	ভিন্ন ভিন্ন সময়ে	২।৩ পয়সা সের

ফিরিবার সময় আমরা হাঁটিয়া ঝিনাইদহ আসিয়াছি। আমাদের গ্রাম হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় ৮ ক্রোশ। অসীমকে লইয়া এত পথ এক সঙ্গে হাঁটা সম্ভব হয় নাই, তাই মধ্য পথে হরিশঙ্করপুরে (সুপ্রসিদ্ধ বীজগণিত প্রণেতা কে পি বসুর জন্মভূমি) এক রাত্রি বিশ্রাম করিয়াছি। অনেক মাঠ আমাদের পাড়ি দিতে হইয়াছে। পথের দুর্গমতা অসীম ভাল করিয়াই উপলব্ধি করিয়াছে, তবু সে বলে সে ব্যবসা করিবেই। বর্ষায় মাঠ জলে একাকার হইয়া যায়। অসীম বলে, সে দশবারো খানা নৌকা করিবে, শীত কালে যখন জল থাকে না, তখনকার জন্য মোষের গাড়ী করিবে। ব্যবসায় সে করিবেই। নৌকা পথে কুষ্টিয়া দিয়া সে মাল চালান দিবে।

ঝিনাইদহ আসিবার পথে মাঠের শ্যামশোভা সে প্রাণ ভরিয়া দেখিয়াছে। সে এইখানেই তার কর্ম্মজীবন সুরু করিবে। শহরে আসিয়া সে শুধু মাল দিয়া টাকা লইয়া যাইবে। শহরের সহিত সম্পর্ক শুধু তার এইটুকু মাত্র।

আমি হাসিয়া বলিলাম, সিনেমা দেখা, রেডিয়ো শুনার কি ব্যবস্থাটা হবে শুনি?

সে গম্ভীরভাবে বলিল, একটা ছোট সিনেমা ঘর আমি আমাদের গ্রামেই খুলব। লোকের শিক্ষা হয় এমন ভাল ভাল বই সেখানে দেখান হবে। আর আমাদের এক লম্বা কাঁঠাল গাছের মাথায় দামী রেডিও বসান হবে, বাড়ীর কাছের হাটের লোক সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান শুনে যাবে—আর আমায় আশীর্ব্বাদ করবে।

—শেষ—

পাহাড়ী ফুল

(গল্প)

শ্রীপুষ্প বসু

গত রাত থেকে মৃণালের মনটা ভারী অবসন্ন হয়ে আছে। বাড়ীতে আজ যেন চারিদিকে কি একটা ম্লানছায়া। একমাত্র মেয়ে টুনি মাত্র দেড়বছরের, সে কেবলই কাঁদছে আর বলছে 'মা কুমু যাব;' মা কিছুতে তাকে ভুলিয়ে রাখতে পাচ্ছে না। টুনি কেঁদে কেঁদে শেষে ঘুমিয়ে পড়ল, মৃণাল তাকে সযত্নে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। জানলার নীচেই বাগান—কিন্তু গ্রীষ্মের চোখ ঝলসান রোদে বাহিরে চাওয়া যায় না। কিছুক্ষণ আগে গৃহস্বামী টেলিফোনে জানিয়েছেন—"কুসুমের অবস্থা মোটেই ভাল নয়, এক ঘণ্টার মধ্যে তোমায় জানাব, তুমি ব্যস্ত হয়ো না, কারণ ডাক্তাররা খুকুকে এখানে আনতে বারণ করেছেন—কুসুমের খারাপ টাইপের 'ম্যানেন-জাইটিস' হয়েছে।"

কিন্তু এই এক ঘণ্টার মধ্যেও খবর এলনা, মৃণাল মনে মনে ভারী চঞ্চল হয়ে উঠল, আহা কুসুমের যে এত শীঘ্র শেষ হয়ে যাবে, তা কেই-বা জানত, আজ সাত দিন তার অসুখ করেছে, প্রথমে মনে হয়েছিল সাধারণ ইনফ্লুয়েঞ্জা। গত দুদিন সে মাথার অসহ্য যন্ত্রণায় চাইতে পারে নি। ডাক্তার এসেই বললেন, "এখনই হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিন। প্রথমেই চিকিৎসা হ'লে হয়ত কোন উপায় করা যেত, এখন কিন্তু টু-লেট্।"

কুসুম কিছুতেই হাসপাতালে যেতে চায় নি, তার সে কি কান্না! যাবার আগে মৃণালের হাত ধরে বলেছিল, "মা আমি চললাম, আমার জন্য তুমি কোন দুঃখ কর না, আমায় তুমি মায়ের আদরে রেখেছিলে। তুমি ত জান না মা, জগতে আমার কোন আকর্ষণই নেই। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন। সাহেব আর তোমার দয়ায় আমার শেষের দুবছর বড় শান্তিতে বড় আরামে কেটেছে মা, আমার গলার হারটি আমি খুকুকে দিয়ে গেলাম।"

কুসুমকে হাসপাতালে পাঠিয়ে অবধি মৃণালের উৎকণ্ঠা উদ্বেগের অবধি নাই, তার মনে হচ্ছে যেন কত আপনার জনকে পথের ধুলোর মাঝে কুড়িয়ে পেয়ে আজ সে হারাচ্ছে। চোখের জলে মৃণালের বুক ভেসে যাচ্ছে—কুসুমের শুধু কি রূপ ছিল! গুণের কথা মনে হ'লে মনে হয় পাহাড়ী রমণীদের উপর যাদের অমূলক হীন ধারণা আছে, তাদের একবার মৃণাল জানিয়ে দেবে যে ভালমন্দ সব জাতেরই প্রায় থাকে। কিন্তু এই পাহাড়ী বালিকা কুসুম সত্যই একটি অপূর্ব্ব মহিমময়ী নারী চরিত্রের উজ্জ্বল স্বর্ণ প্রতিমা। তার কুসুম নাম সার্থক হয়েছিল। সে ফুলের মতই সুন্দর ও পবিত্র ছিল।

ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারটা বেজে গেল, ঘরের বাহিরে দরজার কাছে দরোয়ান বলে উঠল—"মাইজী সাহেব কা চিঠি হ্যায়।" ত্বরিৎপদে মৃণাল ঘর থেকে বেরিয়ে এসে চিঠিখানি নিলে। স্বামী লিখেছেন

মৃণাল, আমি আফিসে এসেই খবর পেলাম। তুমি এসে আর কি করবে! ডাক্তারদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ [illegible] চলে গেল, বেশ শান্তিতেই সে গেছে। বাড়ী ফিরে সব বলছি—তুমি খুকুর কাছে থেক। আমি সব ব্যবস্থা করে ফিরব।—অরুণ।

মৃণাল, কিন্তু স্বামীর অনুরোধ রাখতে পারে নি। খুকুকে চাকরের কাছে রেখে সে তখনি কুসুমকে শেষবার দেখবার জন্য রওনা হ'ল।

কুসুমকে যথারীতি শেষ বিদায় দিয়ে স্বামী স্ত্রী যখন ঘরে ফিরল, সূর্য্যদেব তখন পশ্চিমদিগন্তে ঢলে পড়েছে। সেদিন গভীর রাত অবধি স্বামী স্ত্রীতে কুসুমের কথাই আলোচনা করছিল। অরুণ ঘুমিয়ে পড়ল, কিন্তু মৃণালের সারারাত চোখে ঘুম এল না, সারা রাত যেন কুসুমের স্মৃতি চোখের সামনে নূতন করে ভেসে উঠল—মনে পড়ে গেল—

খুকুর জন্ম সম্ভাবনায় মৃণালের শরীর যখন খুব খারাপ, অরুণ মৃণালকে নিয়ে সিমলা পাহাড়ে হাওয়া বদল করতে গেল।

বড় একটি উঁচু পাহাড়ের নীচে শ্যামল তৃণে ঢাকা গালচের মত অল্প পরিসর খানিকটা জমির উপর একখানি সুন্দর ছোট বাড়ী, চারিদিকে ফুলের বাগান। পাহাড়ে এসে মৃণালের ভারী ভাল লাগে, সে বাগানের রেলিং ধরে কত সময় তন্ময় হয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখত। অরুণ বেশীর ভাগ ঘোড়ায় চড়ে বহুদূরে ঘুরে আসত। মৃণালের শরীর ভাল থাকলে, অরুণ তাকে রিক্স করে বেড়িয়ে আনত। মৃণালের কিন্তু বেশীর ভাগ এই বাগানের একটি ধারে বসে থাকতেই ভাল লাগত। তাদের বাড়ীর অনতিদূরেই দুচারটি পাহাড়ী রমণী ঘাস কাটতে আসত। তারা ঘাস কাটতে কাটতে কত গল্প করত গান করত, হাসত। মৃণাল পাইন বনের ভিতর দিয়ে ভেসে আসা তাদের গানের ভাষা বুঝতে না পারলেও, আবিষ্টের মত—এই রহস্যময় সুরলহরীর মাধুর্য্য উপভোগ করত। এমন কতদিন যায়—মৃণাল কিন্তু লক্ষ্য করে, ঘাস কেটে সব পাহাড়ী স্ত্রীলোকগুলি সন্ধ্যার পূর্ব্বেই যে যার ঘরে ফিরে যায়। কিন্তু একটি তরুণী ভারী সুন্দরী সে—বাড়ী ফিরত না যতক্ষণ না গাঢ় অন্ধকারে দিগন্ত ছেয়ে যেত।

মৃণাল অভিভূতের মত ঐ পাহাড়ী তরুণীটির দিকে চেয়ে থাকত এ দেখে অরুণ কতদিন মৃণালকে বলেছে "আচ্ছা মৃণাল, তুমি ঐ পাহাড়ী মেয়েটির দিকে অমন করে চেয়ে থাক কেন বলত?"

মৃণাল অপ্রতিভ হয়ে বলে, "সত্যি তুমি ঠিক ধরেছ, আচ্ছা সবাই বাড়ী ফিরে যায়—কিন্তু ঐ মেয়েটির যেন বাড়ী ফিরবার কোন গা দেখি না। আমার ভারী কৌতূহল হয় ওর সঙ্গে আলাপ করে এর কারণ জানবার জন্য।"—অরুণ হো হো করে হেসে উঠে বলে "এতে আর আশ্চর্য্য হবার কি আছে, ও বেচারীর হয়ত এখনও কোন বান্দা জোটে নি!" মৃণাল বাধা দিয়ে বলে, "তোমার সব তাতেই ঠাট্টা, নিশ্চয় ঐ মেয়েটির মনে কোন বিশেষ দুঃখ আছে।" উভয়ের ভেতর এইরূপ কত কথা হয়।

স্বামীর স্নেহে মৃণাল নিজের অস্তিত্ব ভুলে গেছে, সে ভাবতে পারে না, স্বামীপ্রেমশূন্যা নারী বাঁচে কেমন করে।

এই পাহাড়ী মেয়েটির বোধহয় স্বামী নেই, হয়ত স্বামী বিদেশে গেছে, বিধবা নয় ত? নইলে এত বয়স পর্য্যন্ত কি আর অবিবাহিতা আছে। কিন্তু পাহাড়ীদের শুনেছি বিধবা বিবাহ প্রথা আছে, তবে কেন মেয়েটি এমন করে থাকে? নিজের অজ্ঞাতে মৃণাল কত সময় এ মেয়েটির কথা ভাবতে বসে—সেই সঙ্গে তার প্রতি সহানুভূতি ও করুণার অন্ত থাকে না।

দিন সাতেক পরে—

সেদিন বৈকালে অরুণ ও মৃণাল চলেছে বেড়াতে। মৃণাল রিক্সয় অরুণ ঘোড়াতে। ম্যালরোড ঘুরে তাঁরা 'ইলিসিয়াম'-এর পথে চলল, অরুণ মৃণালের পাশেপাশেই চলেছে। চারিদিকেই যেন আনন্দের রাগিণী, দুই পাশের বড় বড় পাথরের ঢিবিগুলো যেন তাদেরই দিকে উজ্জ্বলনেত্রে চেয়ে আছে। উত্তরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে দেখা যায় তরঙ্গায়িত মেঘপুঞ্জ সাদৃশ পর্ব্বত শ্রেণী, আরও দূরে দূরে পর্ব্বতগুলি তুষারাবৃত। তারি উপর অপরাহ্নের অস্তরাগের রক্তচ্ছটায় অজস্র স্বর্ণদ্যুতি বিকীর্ণ হয়ে রামধনু রঙের এক অপূর্ব্ব দৃশ্যে পরিণত হয়েছে।

মৃণাল স্বামীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, "আচ্ছা এ সব জায়গায় মানুষ বেশী দিন থাকলে—কলকাতাটা যেন নির্ম্মম কারাগার বলে মনে হয় না? আচ্ছা শোন ঐ যে নীচের দিকে রাস্তাটি চলে গেছে—ঐ দিকে একটু চল না, রাস্তাটি ভারী সুন্দর আর নির্জ্জন।"

অরুণ ব্যস্ত হয়ে বললে, "না মৃণাল, এখন তোমার ওদিকের রাস্তায় যাওয়া ঠিক নয়, ওটা শ্মশানে যাবার রাস্তা।" মৃণাল বললে, "না, না, যত সব কুসংস্কার তোমাদের। রাস্তায় বেড়াতে গেলে আবার দোষ কি?"

তারা কিছুদূরে যেতেই দেখলে আশপাশের পাহাড়ের গায়ে দু'একটি করে প্রদীপ জ্বলে উঠছে। সন্ধ্যাদেবীর অবগুণ্ঠনের সঙ্গে সঙ্গেই বেশ শীতের শিহরণ জানিয়ে দিলে। অরুণ ঘোড়া থামিয়ে বললে—"মৃণাল তোমার শালটা এবার গায়ে জড়াও, ঠাণ্ডা লেগে যাবে, ওকি ওদিকে আবার কি দেখছ?" মৃণাল উৎকণ্ঠাজড়িতস্বরে বললে, "থাম, থাম আর এগিও না, দেখতে পাচ্ছ না, পাহাড়ের ও ধারে সেই পাহাড়ী মেয়েটি বসে—ও-মা, ও-অমন করে কাঁদছে আর চুল ছিঁড়ছে কেন? নিশ্চয় ওর সাংঘাতিক কিছু হয়েছে, তুমি এইখানে অপেক্ষা কর—আমি একটু দেখে আসি ওর কি হ'ল।" বলতে বলতেই মৃণাল রিক্স থেকে নেমে চলল। মেয়েটির কাছে এসে দেখে—তার অনুমান মিথ্যা নয়—সত্যই ত সেই মেয়েটিই যে রোজ তাদের বাড়ীর কাছে ঘাস কাটতে আসে। মৃণাল মেয়েটির খুব কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "কি হয়েছে তোমার, এই সন্ধ্যাবেলা একলাটি বসে এখানে এমন করে কাঁদছ কেন?"

মেয়েটি হঠাৎ আগন্তুকের মুখের পানে চেয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে বারেকের জন্য চোখ মুছে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "মেমসাহেব, এইমাত্র আমার দিদিমাকে পুড়িয়ে এলাম, আমার আর কোন আশ্রয় আর রইল না।" বলেই মেয়েটি আবার উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে তার মুখখানি ওড়নায় মুছতে লাগল। মৃণাল আশ্চর্য্য হয়ে বললে, "আর তোমার কেউ নেই? তুমি একলাই তোমার দিদিমার শেষ কাজ করে এলে নাকি?" মেয়েটি আবার কান্নারোধ করে বললে, "না, আমাদের সঙ্গে অনেক লোক আছে—ঐ যে তারা আসছে। আমার শাশুড়ী স্বামী আছেন, একটি ছেলেও আছে মেমসাব। কিন্তু আমায় তারা চায় না।" মৃণাল আবার বললে, "ও-মা কি রকম লোক তারা? এই বিপদেও কেউ এল না? তোমার ঘর কোথায়? রোজ তুমি ঘাস কাটতে যাও আমাদের বাড়ীর কাছে ঐ পাহাড়টায়, না?" মেয়েটি সসম্ভ্রমে বললে, "হ্যাঁ মেমসাহেব, আমার বাড়ী আপনার বাড়ীর খুব কাছে নীচের দিকে। আমি একদিন আপনার কাছে যাব কি?" মৃণাল খুশী হয়ে বললে, "নিশ্চয়ই, তুমি এস"—ওদিকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে অরুণ ব্যস্ত হয়ে বললে, "আ কি কর মৃণাল, পথের মাঝে দাঁড়িয়ে তোমার যত ছেলেমানুষী, তুমি ওদের কি বোঝ সব বলত? চলে এস।" মৃণাল অরুণের কথায় ফিরল, কিন্তু বারে বারে পিছন ফিরে মেয়েটিকে দেখতে দেখতে বললে, "তুমি বাড়ী যাবে না?" মেয়েটি ম্লান মুখে বললে, "আমাদের এখনই শুদ্ধ হয়ে তবে ফিরতে হয় মা, ঐ যে ওরা এসে পড়ল।" সত্যই একদল পাহাড়ী স্ত্রী পুরুষ মেয়েটির কাছে এগিয়ে এল। অরুণ ও মৃণাল গৃহ অভিমুখে চলে গেল।

উক্ত ঘটনার দিনদশেক পরে—

সেদিন সকালে মৃণাল কুটনো কুটছে, হঠাৎ সুমুখের বারান্দায় কার ছায়া পড়ল, মৃণাল বঁটিখানি কাত করে রেখে উঠে এল, দেখে সেই পাহাড়ী মেয়েটি এক বোঝা তরী-তরকারী এনে দাঁড়িয়েছে। মৃণালকে দেখে সে নমস্কার করে বললে, "সবজি লেগা মেমসাব?" মৃণাল আনন্দদীপ্ত মুখে বললে—"ওমা তুমি সবজি বিক্রি কর নাকি? কই আর ঘাস কাটতেও আস না!" মেয়েটি ম্লান হেসে বললে—"আর কি বলব, দিদিমা মারা যাবার পর থেকেই পেটের চিন্তা করতে হচ্ছে, দুটো গরু আছে, বেচে দেব মনে করছি—এখন সবজি বেচেই খেতে হবে আমায়। তুমি কিছু সবজি নেবে মায়ী?" মৃণাল আগ্রহ দেখিয়ে বলে, "নিশ্চয়ই নেব," বলেই মৃণাল সবজি দেখতে বসে। একবার মেয়েটির মুখপানে চেয়ে বলে—"তোমার নাম কি? আর সেদিন যে বলছিলে তোমার স্বামী আছেন, ছেলেটি তোমার কত বড়? তোমায় দেখে ত মনে হয় তোমার ছেলের বয়েস খুব কমই হবে।" মেয়েটির চোখে জল আসে, সে বলে "মেমসাহেব,"— মৃণাল বাধা দিয়ে বলে, "দেখ আমায় মেমসাহেব বল না, বরং মাইজি কিম্বা মা বল কেমন?" মেয়েটি ঘাড় নেড়ে জানাল তাই হবে। মৃণাল চাকরদের ডেকে সবজিগুলি তুলতে বলে ঘরে ঢুকে দুটি টাকা এনে মেয়েটির হাতে দেয়—বলে "কই এইবার বল তোমার নামটি কি?" মেয়েটি হতবুদ্ধি হয়ে দুটি টাকা নিয়ে মৃণালের পানে চেয়ে থাকে—তারপর আস্তে আস্তে দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বলে, "আমার নাম কুসুম, কিন্তু আপনি দু'টাকা কেন দিলেন মা, এই সামান্য সবজির দাম ত সামান্য কয় আনা পয়সা মাত্র।" কুসুমের দ্বিধা দেখে মৃণাল স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বললে—"হ'লই বা কুসুম, আমায় মা বলেছ এই সামান্য পয়সায় লজ্জা করতে নেই।" কুসুম সসম্ভ্রমে সেলাম জানিয়ে বললে "আচ্ছা মাইজি, আমার প্রতি তোমার অশেষ করুণা, ভগবান তোমার মঙ্গল

করবেন।" মৃণাল কুসুমকে বলে—"আর একটু বস না, তা এখন তুমি কোথায় থাকবে, স্বামীর কাছে যাও না?" কুসুম বলে, "না মা, আমি আমার বাপমার বড় আদরের একটি মাত্র মেয়ে ছিলাম, তাঁরা মারা যাবার পর বুড়ো দিদিমাই আমার একমাত্র সম্বল ছিল। আর স্বামীর কথা"—বলেই কুসুম মস্ত এক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে চুপ করে থাকে। মৃণাল বলে "থাক তোমার যদি কষ্ট হয় বলতে, নাই বা বললে।" কুসুম বলে—"না এই যে বলছি মা, স্বামী আমার পাগল, আমার বিয়ের পর এই কথাটি আমরা জানতে পারি। তারপর একটি ছেলে হয়েছিল আমার, তার বয়স এখন ন' দশ বছর হবে, এই ছেলে জন্মাবার পর আমার স্বামী সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে ওঠে, আমার শাশুড়ীর ধারণা হ'ল যে, আমি তাঁর ছেলেকে কিছু খাইয়ে মারবার ষড়যন্ত্র করেছি—এই ভুলের বশবর্ত্তী হয়ে তিনি আমার ছেলেকে আমার ত্রিসীমানায় আসতে একদিনের জন্য দেন নি—উল্টে আমার উপর নানা অত্যাচার সুরু করলেন, শেষে বাধ্য হয়ে আমাকে ফিরে আসতে হ'ল—আমার দিদিমার কুঁড়ে ঘরে। বাপ মা তখন মারা গেছেন। এতদিন আমি দিদিমার কাছেই ছিলাম, দিদিমা আমায় কোন দুঃখ জানতে দেয় নি—আজ আমি পথের কাঙ্গালিনী।" কুসুম দিদিমার কথা বলতে বলতেই কেঁদে ভাসিয়ে দেয়—মৃণাল তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে—"চুপ কর, কেঁদে আর কি করবি, যে চলে যায়, সে কি আর ফিরে আসেরে।" কুসুম চোখ মুছতে মুছতে এবার উঠে বলে, "মা, আমি আবার তোমার কাছে"—তার অসমাপ্ত কথা শেষ হ'ল না, অরুণকে আসতে দেখে শশব্যস্তে সেলাম জানিয়ে কুসুম চলে গেল। অরুণ হেসে স্ত্রীকে বললে, "কি মুস্কিল, তুমি ঐ পাহাড়ী মেয়েটার সঙ্গে ভাব করে তবে ছাড়লে! কি এত অন্তরঙ্গ কথা ও মেয়েটার সঙ্গে কইছিলে মৃণাল?" কুণ্ঠিতভাবে উত্তর দেয়—"আহা বেচারী ভারী দুঃখী, দুপুর বেলা বলব তোমাকে ওর কাহিনী।" অরুণ বাধা দিয়ে বলে, "আমার এ বিষয়ে তোমার মত কিছুমাত্র কৌতূহল নেই, এ সব পাহাড়ী মেয়ের রূপই আছে গুণ কিছু নেই।" মৃণাল তবুও পাহাড়ীদের পক্ষ নিয়ে বলে, "তা তুমি যাই বল, অন্যদের কথা জানি না বাপু, একে দেখে কিন্তু সে রকম ধারণা আমার মোটেই হয় না। যাকগে, এখন তুমি স্নান করে খাবে চল, খাবার তৈরী।"

কুসুম এখন প্রায়ই আসে মৃণালের কাছে। দুজনের কোথাও মিল নাই, শুধু অনাত্মীয়, অপরিচয়ের সুদূর ব্যবধানই নয়, শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কার, রীতি, নীতি, সামাজিক ব্যবস্থা উভয়ের কত বড়ই না প্রভেদ, তবুও এই মৃণাল ও কুসুম পরস্পরকে অতি নিবিড়ভাবেই ভালবেসে ফেলেছে। অরুণ প্রথম প্রথম মৃদু আপত্তি করে বলত—কোথাকার কে তার সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা ভারী বিসদৃশ দেখায় মিনা।" ক্রমে অরুণও এ অনাত্মীয়া তরুণীটির গুণে মুগ্ধ হয়ে কুসুমকে সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখতে আরম্ভ করেছিল। কুসুম সর্ব্বদা আসে, কোনদিন মৃণালকে তেল মাখিয়ে দেয়, কোনদিন মাথার চুল ঘষে দেয়, মাঝে মাঝে বলে—"মা, তোমার ছেলেমেয়ে হ'লে তাদের কিন্তু আমিই দেখব।" মৃণাল খুশী হয়ে বলে "সেত খুব ভালই হবে, কিন্তু কলকাতার গরমে কি তোমাদের সহ্য হবে?" কুসুম চুপ করে থাকে, ভাবে—তা সত্যি।...........

এবার মৃণালদের কলকাতা ফিরে যাবার সময় হয়ে এল, এমন সময় কুসুম তিন চার দিন এল না। নিশ্চয় তার অসুখ করেছে, এই ভেবে মৃণাল সেইদিন বিকেল বেলা চলল কুসুমকে দেখতে। দিনান্তের ক্লান্ত রোদ তখন পাহাড়ের গায়ে বিশ্রাম নিচ্ছে! মৃণালদের বাড়ী থেকে নীচের দিকে যেতে হ'লে, পাহাড়ের সরু আঁকাবাঁকা পথ পড়ে, সেই পথ ধরে মৃণাল চলে। পথের কাছেই একটা ঝরণা ঝর ঝর শব্দে আপন মনে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে। সন্ সন্ শব্দে বাতাস এসে গাছপালাগুলোকে দুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে অজস্র কাঠগোলাপের ঝাড় পথটিকে বর্ণসুষমায় আমোদিত করে রেখেছে। পাহাড়ের গা ঘেঁসে একখানি ছোট কুঁড়ে ঘরের সামনে এসে মৃণাল এদিক ওদিক চেয়ে ডাকলে—'কুসুম।' একটি পাহাড়ী রমণী কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে এসে থমকে দাঁড়িয়ে মৃণালকে সেলাম করে জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। মৃণাল তাকে জিজ্ঞাসা করলে "এইটাই ত—কুসুমের ঘর?"

রমণীটি বললে, "হুজুর"

—"তার বোধ হয় অসুখ করেছে?"

—"হাঁ, আজ তিন চার দিন সে বিছানা থেকে উঠতে পারে নি।"

—"আমি তাকেই দেখতে এসেছি, ঘরেতে আর কে আছে?"

—"আর কে থাকবে আমিই ওকে দেখছি, আচ্ছা আপনি একটু দাঁড়ান, আমি কুসুমকে বলছি।" রমণীটি অল্পক্ষণের মধ্যে ফিরে এসে বললে, "কুসুম বহুত বহুত সেলাম দিয়ে বললে, 'মা এখানে কোথায় আসবেন, আমি একটু ভাল হলেই তাঁর কাছে যাব, মার শরীর খারাপ, কেন এমন একা এসেছেন', আমাকে বললে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসবার জন্য।"

মৃণাল বললে—"না, না, এই ত এইটুকু পথ, তাছাড়া আমি দেখতে এসেছি, না দেখে ফিরে যাব কি! চল কুসুমকে দেখে আসি।"

বলতে বলতেই মৃণাল কুটীরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। কিন্তু কুটীরের মধ্যে সে যে দৃশ্য দেখলে তাতে তার সারা মন ব্যথিত হয়ে উঠল। মাত্র কদিনে যেন কুসুম বিছানার সঙ্গে মিশে গেছে, ঘরের চারদিকে দারুণ দারিদ্র্যের চিহ্ন পরিস্ফুট, কিন্তু আশ্চর্য্য, কুসুমের যে এতকষ্ট, কুসুমের অজস্র কথার মধ্যে আভাসেও ত মৃণাল কিছু জানতে পারে নি। অরুণ কতবার বলেছে, "মৃণাল অত ভক্তি যত্ন—কিছু আদায় করবে বলে বুঝলে?" মৃণালের কিন্তু প্রথম কুসুমের প্রতি ধারণা অন্য রূপ ছিল, আজ প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়ে মৃণাল স্তব্ধ হয়ে শুধু ভাবছিল, কি আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান এই গরীব পাহাড়ী বালিকার। মৃণাল কুসুমের বিছানার অতি সন্নিকটে এসে বললে, "একি কুসুম তোমার এত অসুখ করেছে, আর আমাকে খবর দাও নি, আর আমি তোমার মা হব না?"

কুসুমের ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠল, অতিকষ্টে তার ক্ষীণ দুর্ব্বল বাহু দুখানি তুলে ভক্তিভরে মৃণালকে নমস্কার করে বললে, "না মা, অসুখ বিশেষ কিছু করে নি, তবে বড্ড পড়ে গিয়েছিলাম মা, তাই কোমরের ব্যথায় উঠতে পাচ্ছি না, জ্বরও আর নেই, আমি উঠতে পারলেই আপনার কাছে যাব। আপনি কেন এমন করে এলেন মা, সাহেব রাগ করবেন।"

মৃণালও ঘরখানি থেকে বেরোবার জন্য ব্যস্ত হয়েছিল। একে স্বল্পপরিসর জায়গা, তায় একটা উৎকট গন্ধে যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। কুসুমের কথায় দ্বিরুক্তি না করে মৃণাল বললে, "আচ্ছা, এখন আমি চললাম।" ইঙ্গিতে পাহাড়ী রমণীটিকে সঙ্গে আসতে বললে। পথে আসতে আসতে মৃণাল পাহাড়ী রমণীটিকে জিজ্ঞাসা করলে, "কুসুম তোমার কে হয় ?" রমণীটি বলতে বলতে চলল, "আমি কুসুমের সম্পর্কে মাসী হই, আমিও ত খেটে খাই, তেমন করে আর কই ওকে দেখতে পারি। আর কুসুম ত নিজের দোষে কষ্ট পাচ্ছে।" মৃণাল বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে যায়, বলে 'কেন ?' রমণীটি বললে—"তা আর নয়, স্বামী ত পাগল, শাশুড়ী ভয়ানক ঝগড়াটে, মেরে মেরে কুসুমের দফা সেরে দিয়েছে। যা হক দিদিমা ছিল তাই আগলে রেখেছিল।'

মৃণাল আবার চলতে সুরু করে বললে—"তাতে আর ওর দোষ কি বল, সে সব কুসুম আমায় বলেছে।" রমণীটি আবার বললে—"শোনইনা মেমসাহেব, ওর দোষ আছে বই কি, আমাদের দেশে স্বামীত্যাগ করে পুনরায় বিবাহ করার প্রথা আছে। কুসুমকে আমাদের জানা শোনার মধ্যে কত পাহাড়ীরা বিয়ে করতে চাইলে। কিন্তু কুসুমকে কিছুতেই রাজী করান গেল না। কুসুমের দিদিমাও বলত, 'না ওকে জোর কর না', ওর ভগবান আছেন। যে সত্যপথে থাকে তার অদৃষ্টে বাড়েও অন্ন জোটে। আমরাও আর কিছু বলতাম না, ওমা শেষে এক বিদেশীর প্রেমে পড়ে গেল কুসুম, তার জন্য কুসুম পাগল, ওমা হঠাৎ একদিন শুনি কুসুম তাকে নাকি তাড়িয়ে দিয়েছে।" মৃণাল মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠল—ভাবলে এই রকম মেয়েকেই সে কত উঁচু আসন দিয়ে বসে আছে, তবুও যথাসম্ভব সংযত হয়ে বললে, "থাক থাক ওসব আমার শোনবার দরকার নেই, এই টাকা তুমি কুসুমকে দিও এবং তার চিকিৎসার জন্য যা খরচ লাগে জানিও। বিনা চিকিৎসায় যেন মারা না পড়ে।" বাড়ী পৌঁছে টাকা নিয়ে রমণীটি চলে গেল, মৃণালের মন কুসুমের প্রতি বিরূপ হলেও—অন্তস্থল থেকে তাকে মুছে ফেলতে পারলে না, কি জানি কুসুমের কথা মনে হলেই বড় মায়া হয় যেন।

সেদিনটা ভারী মেঘলা করেছে, অরুণ ও মৃণালের কলকাতা যাবার জন্য তল্পি-তাল্পা বাঁধা হচ্ছে। হঠাৎ কুসুম হাঁফাতে হাঁফাতে এসে ঘরের চৌকাঠে বসে পড়ল। তার চেহারাটি গভীর শোকাচ্ছন্ন পাষাণ মূর্ত্তির মতই দেখাচ্ছিল। মৃণাল দুঃখিত হয়ে বললে, "কিরে তোর আবার অসুখ করেছিল নাকি ?" কুসুম তৎক্ষণাৎ জবাব দিলে—"না মাইজি, আমি আর এখানে থাকতে পারছি না, আমাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে যাবেন ?" বলেই সে কেঁদে ফেললে। মৃণাল একটু ব্যস্ত হয়ে বললে, "ওঘরে সাহেব আছেন, চল আমরা ঐদিকের বারান্দায় বসিগে।" দুজনেই বারান্দার দিকে গেল—মৃণাল একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে কুসুমকে নীচে বসতে বললে। তারপর বললে "আচ্ছা সত্যি করে বলত কুসুম তোর কি হয়েছে ?" কুসুম তেমনি স্তব্ধ হয়ে বসে আকাশের জমাট কালো মেঘের পানে তাকিয়ে রইল। ইদানীং মৃণালেরও কুসুমের উপর তেমন শ্রদ্ধার ভাব ছিল না। বাঙালী হিন্দু ঘরের মেয়ের আজন্মের সংস্কার মৃণাল তাড়াতে পারছিল না। হলই বা স্বামী পাগল, স্বামী যেমনি হন না কেন, আবার আর একজনকে ভালবাসতে যাওয়া কেন। কিন্তু তবুও আজ কুসুমের মুখ পানে মৃণাল চেয়ে চেয়ে দেখছিল, কিন্তু কই কুসুমের মুখে যেন কোথাও কলঙ্ক কালিমার চিহ্ন নেই। মৃণাল আবার বললে—"ওকি অমন করে বসে রইলে যে ?" কুসুম আচম্বিতে মুখখানা মৃণালের দিকে ফিরিয়ে বললে—"আমায় যদি আপনার সঙ্গে নিয়ে যান মা, তবে আমার কিছু বলবার আছে।" মৃণালের মনের ভাব কুসুম কিছু জানতে পেরেছিল কিনা কে জানে! মৃণাল বললে "বল না কি ?" কুসুম তখন মৃদু ভাষায় তার বিগত নারীজীবনের বেদনার রাশি উজাড় করে মৃণালকে বলতে লাগল—

"আমাকে নিয়ে যাবার আগে, আমার কথা আপনার ভাল করে জানা দরকার, আমরা সমবয়সী হলেও, আমি সত্যিই আপনাকে মায়ের মতই শ্রদ্ধাভক্তি করি ও ভালবাসি। আপনার কাছে কিছুই আমি লুকোব না, সব শুনে যদি আপনার ইচ্ছা হয় তবে আপনার সঙ্গে আমায় নিয়ে যাবেন।

"আমার বাপমা মারা যাবার পর আমি দিদিমার কাছেই থাকতাম, তা ত আপনাকে আগেই সব বলেছি, তবে আমার দিদিমার শিক্ষা দীক্ষা ঠিক আমাদের পাহাড়ী সমাজের মত ছিল না, তিনি বেশ শিক্ষিতা ও ধার্ম্মিক ছিলেন। দিদিমার বাবা ছিলেন একজন প্রাতঃস্মরণীয় সাধু। যা হোক দিদিমার কাছে থেকে আমারও মনের ভাবগুলি ঠিক এদেশীয় বন্য পাহাড়ীদের মত হয় নি। দিদিমার উপদেশ অনুযায়ী স্বামীকে ভালবাসবার বহু চেষ্টা আমি করেছি। বয়সের সঙ্গে একটু উপলব্ধি করতাম যে, জগতে সকলেই হয়ত একটি স্নেহের বন্ধন খোঁজে। যদি ছেলেটিকে কাছে পেতাম, হয়ত সকল অভাব ভুলে থাকতাম। কিন্তু ছেলেকে কাছে পাওয়া ত দূরের কথা, কখনও চোখের দেখাও দেখতে পেতাম না। দিদিমার কাছে থাকতাম, ইচ্ছামত ঘরকন্নার কাজ করতাম। ঝরণার কাছে বসে থাকতে আমার ভারী ভাল লাগত, তাই জল আনবার অছিলায় আমি প্রায়ই ঝরণার ধারে যেতাম। এমন রোজই যাই, একদিন হঠাৎ চোখে পড়ল, একটি বিদেশী লোক নিবিষ্ট মনে আমার গতিবিধি লক্ষ্য করছে। একদিন দেখলাম সে ঝরণার কাছেই নীচে নেমে এসে বসে আছে, আমি ঘড়ায় জল আনতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম, ভদ্রলোকটি মৃদুস্বরে আমায় নানা প্রশ্ন করতে লাগল। তার কথার ভঙ্গিতে কি ছিল জানি না, আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম, আমি কখনও কোন যুবকের সঙ্গে মিশিনি, এক আমার পাগল স্বামী ছাড়া। আমার যেন মনে

হ'ল, এই বিদেশী লোকটি মানুষ নয় দেবতা। ক্রমে আমার জল আনতে আসা এবং সেই সঙ্গে দুজনের ঘনিষ্ঠতাও বেড়ে চলল। ক্রমে কথাটা কনাকানি হ'ল। দিদিমা একদিন তিরস্কার করে বললেন "কুসুমি ঐ বিদেশীর সঙ্গে তোমার আর মেশা চলবে না, ও যদি তোমায় বিয়ে করতে চায়, তবেই তুমি ওর সঙ্গে মিশতে পাবে। এত বড় মেয়ে, তোমার এটুকু জ্ঞান এখনও হয় নি?"

এই অবধি বলেই কুসুম গাঢ় নিশ্বাস ফেললে, মৃণালের তখন রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে মুখের চেহারা বদলে গেছে, সে বললে "থাক থাক আর বলতে হবে না, আমার ধারণা ছিল তুমি খুব সচ্চরিত্রা মেয়ে, তাই" মৃণাল আর বলতে পারে না, চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে। মৃণালের এই ভাব পরিবর্ত্তনে কিন্তু কুসুম কিছুমাত্র লজ্জিত না হয়ে বললে, "মা আমি কোন অন্যায় কোন পাপ করিনি, তুমি বল, যাকে ভালবাসি, সে পুরুষ হোক আর মেয়েই হোক কিম্বা জন্তু জানোয়ার হোক, শুধু মিশলে, কথা কইলে বুঝি পাপ হয়? তবে এটুকু আমার শিক্ষা হয়েছে যে দেবতাভ্রমে আমি কালসর্পের মুখে পড়েছিলাম। ক্রমে আমার সম্মুখে এক প্রকান্ড দৈত্যের কালো রূপ নিয়ে সে দেখা দিল। আমি দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে করলাম তাকে সজোরে পদাঘাত। সে চলে গেল এবং সেই সঙ্গে জেনে গেল পাহাড়ী রমণীদের শুধু রূপই নেই, যথেষ্ট বলও আছে।"

কুসুম উত্তেজনায় হাঁফাতে লাগল। মৃণালের অভিভূত মুগ্ধ চোখ তখন মাধুর্য্য ও শ্রদ্ধায় অপরূপ হয়ে উঠেছে মৃণাল দ্বিরুক্তি না করিয়া তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে রাজী হ'ল। স্নিগ্ধকণ্ঠে সস্নেহে সে কুসুমকে বললে—"আচ্ছা তুই গুছিয়ে নিগে যা—আমি সাহেবকে বলে তোকে সঙ্গে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছি।"

অরুণ সব শুনে বলে, "কিছু হাঙ্গামায় না পড়তে হয়, কুসুমকে দেখে আমারও মনে হয় যে সে মেয়ে খুব ভাল। আর তোমার কাছে এখন এই ধরণের লোক একটি থাকা খুবই দরকার। এক পরিচারিকা তায় আবার বন্ধু—কি বল?"

তারপর কুসুম কেমন করে মৃণালের সমস্ত সংসারের ভারটি মাথায় তুলে নিয়েছিল। খুকু হওয়া অবধি সে তাকে বুকে পিঠে করে মানুষ করছিল। অরুণ ও মৃণালকে সে কি ভক্তিই না করত—যেন কৃতজ্ঞতায় তার সারা হৃদয় অহোরাত্রি ভরপুর হয়ে থাকত। মাঝে মাঝে বলত, "মা তোমাদের কৃপায় আমি বড় শান্তিতে আছি। তোমাদের কোলেই যেন আমি মরি। আমার খুকুর খুব ভাল ছেলে দেখে তবে বিয়ে দিও মা। তার চোখের জল যেন পৃথিবীতে না পড়ে।"

মৃণাল সারারাত কুসুমের কথা ভাবতে ভাবতেই অশ্রু-জলে তার উপাধান সিক্ত করে ফেলেছিল। একদিন কুসুমকে মৃণাল সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল, "চলে যে যায়, সে কি আর ফিরে আসে?" আজ সত্যই সেই নিভৃতে ফুটে উঠা বনের কুসুম নিভৃতে ঝরে গেছে। সে সত্যই ছিল একটি অম্লান পবিত্র পাহাড়ী ফুল।

চাঁদের বেদনা

শ্রীহেমেন সেনগুপ্ত

পৃথিবী ওগো ঘুমেতে নরম হয়ে'—
রাতের আকাশ শিহরায় স্বপনে।
পলাশ ফুলের আরতি সাজায়ে
বসন্ত এলো ফাল্গুন ফুলবনে।
অশোক শাখায় লেগেছে আগুন—
রহিয়া রহিয়া 'চোখ গেল' ডাকে দূরে—
আরো কতদূর গেলে ওগো বল ফিরে পাবো
মোর হারানো বন্ধুটিরে!
রাতজাগা চাঁদ ছলছলো চোখে শুকতারা লাগি
কাঁদিয়া হল যে সারা,
কেঁদে ডেকে কয়, 'তোমারি লাগিয়া জাগি সারানিশি,
শোন ওগো শুকতারা!'

কহে শুকতারা সজল নয়নে,
'তোমারি লাগিয়া শোন আকাশের চাঁদ,
তোমারি লাগিয়া রেখেছি পাতিয়া
আকাশ ভরিয়া নয়ন জলের ফাঁদ।'—
হিমানি সজল রাতের শিশির পড়িছে
ঝরিয়া ভোরের কুসুম লাগি,—
সারানিশি ভোর শুকতারা লাগি
ঘুমহারা চাঁদ একাকী রহিল জাগি।—
এ পারেতে চাঁদ ছলছলো চোখ—
ওপারে জাগিছে শুকতারা থর থর
সীমালেখাহীন মাঝখানে জাগে
দুঃখের নদী—বিরহের বালুচর।

দক্ষিণ বঙ্গের ধলই গান

শ্রীতারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

আমাদের দেশে "রাখালিয়া গানের" অন্ত নাই। গোচারণের সময় পাচন হস্তে রাখালেরা গ্রামের পথ ধরিয়া গান করিয়া যায়। কৃষকেরাও প্রাণের আনন্দে গান গাহিয়া থাকে। বাঙলা দেশে ধান-ই একমাত্র সোনার ফসল। "নূতন ধান্যে নবান্ন" করিবার আনন্দ কোন কৃষক গৃহস্থ দমন করিতে পারে না। তারপর পৌষ মাস পড়িলে পিঠা বানাইবার ধুম পড়িয়া যায়। এসময় কাহারও ঘরে খাদ্যের অভাব হয় না—অতিথি বিমুখ হইয়া যায় না। এমন কি, মেয়েদের তুসোলা ব্রতেও এ পিঠার কথা উল্লিখিত আছে।

তুসোলা লো রাই,
তোমার দৌলতে আমরা ছাবড়ী পিঠে খাই।
ছাবড়ী পিঠে বড় মিঠে,
গাঙ সিনানে যাই।
গাঙের বালিগুলিন্ তুলে তুলে খাই। ইত্যাদি।

পৌষ মাসের প্রথম দিন হইতে রাখালেরা ঢোল, কাঁসির, ঘণ্টা লইয়া সন্ধ্যার পর বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়ায়। কয়েকজন মিলিয়া দল গঠন করিয়া গ্রামে গ্রামে ফিরে। প্রতি গৃহস্থের বাড়ী যাইয়া কাঁসর ঘণ্টা বাজাইয়া ছড়া বলিতে থাকে,—বাড়ীর সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া তাহাদের ছড়া শোনে। তাহারা যেন পৌষ মাসের আনন্দ সংবাদ সকলের নিকট দিবার জন্য ব্যস্ত। "গোলা ভরা ধান" যাহাতে প্রত্যেকের হয়, সেজন্য তাহারা কামনা করে। বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে ইহা বিভিন্ন নামে পরিচিত। উত্তর-বঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে ইহা শাঁখ বোল নামে অভিহিত। মধ্য-বঙ্গে ইহাকে "হোল-বোল" বলে। দক্ষিণ-বঙ্গ ও পূর্ব্ব-বঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে ইহাকে "হাচে গান", "ধলই গান" ইত্যাদি বলে। মূলতঃ ভাবে ইহা যে "বাস্তু পূজা" ও পৌষ পার্ব্বণকে উপলক্ষ্য করিয়া গীত হয়, তাহা ধারণা করা চলে।

দক্ষিণ-বঙ্গের পল্লী অঞ্চল হইতে আমি কয়েকটি "ধলই গান" সংগ্রহ করিয়াছি। এস্থলে তাহার কিছু আভাস দিতেছি। ইহার সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের গানের অপূর্ব্ব মিল আছে।

(১)

ও গিরি ও গিরি বার করে দেও সোনার পিঁড়ি,
সোনার পিঁড়িতে বসবে কে?
ধলই ঠাকুর এসেছে।
ধলই ঠাকুর দেবেন বর।
ধনে ধানে ভরবে ঘর॥ ইত্যাদি।

(২)

এ বাড়ী কার?
চাঁদ মুখ যার।
চাঁদ মুখ কতোরের খোপ।
আয় পায়রা পড়সে।
লম্বা বাগুনে ধরসে।।
লম্বা বাগুনে নারিকল পাত।
ভিক্ষা দেও লক্ষ্মীনাথ।
ধন দেবা না দেবা কড়ি,
পাছ দুয়ারে সোনার নড়ি॥
ভাইরে ভাই—
একটি টাকা পাই,
ধানে বাড়ী যাই।
ধানে বাড়ী ঘুঘুর বাসা,
টাকা মাগ্‌গে লয়না পয়সা।।
"বোল বোলা" বল ছাড়ে ঘোড়া-
ঘোড়ার আগে ঘুড়ী যায়।
ঘুরে সতারে বাঘে খায়।।
খায় আর কড়মড়ায়॥
যে দেবে ছালায় ছালা,
তার হবে সাত গোলা।।
লক্ষ্মী দেবী দেলেন বর—
ধানে চালে গোলা ভর,
এ ঘর ভরে ও ঘর ভর,
কলা বলে গোলা কর।।
কলা বলে আইলো জল,
ধান করে টলমল।।
কলা বলে আইলো পানি।
ধান লয়ে টানাটানি।। ইত্যাদি।

(৩)

এ বাড়ীর বুড়ীরা ভাই বড় কলবল জানে,
চাল ভাজা গুঁড়ো দিয়ে ইঁদুর বন্ধন করে।
ইঁদুর বন্ধন করে বুড়ী, মনে মনে কয়,
এই মুখেতে খাইছ তুমি নাত জামাই-এর ধান।।
ধান খান নাই, পান খান নাই,
খাইছে ঘরের কোণা।
এক রাতে আনে দেব নব লক্ষ সোনা।।

(৪)

শুকে ও শুক সাজে
টাকা কড়ি ঝুমুর বাজে।
বাজুক ঝুমুর বাজুক মাল—
এই ঘরখানি জগৎ কাল।।
জগৎ কালের ঘররে
ভাল ছাওনি চাইছ।
বেতের অণ্ডল পাইছ
হরবোলা দেবীর বাজারে—

ছল খেলাতে লাগলে ঝুল।
ডেগাই গেলেন মেঘাইপুরে।।
পাইয়া এলেন চাঁপা ফুল।।
চাপায় চাপায় মর্ত্তমান।
হেসে খেলে কর দান।। ইত্যাদি।

শেষোক্ত ছড়ার সঙ্গে সোনারায় ঠাকুরের "শাঁখ বোল" ছড়ার কোন অংশের মিল আছে। "শাঁখ বোল" ছড়া শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশ মহাশয় সংগ্রহ করিয়াছেন এবং 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। "সোনা রায় ঠাকুরের ছড়া" উত্তর-বঙ্গের সর্ব্বত্রই প্রচলিত বলিতে হইবে। রঙ্গপুর ও পাবনা হইতে আমি কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়াছি, সময় সুযোগ পাইলে প্রকাশ করিতে পারিব।

যাহা হউক, দক্ষিণ-বঙ্গের "ধলই গানের" মধ্যে পৌষ মাসের সৌভাগ্য ভিন্ন আরও অনেক উপভোগ্য তথ্য আছে। "অত্যাচারী মহিমবাবুর গান", বাল গোপালের ছড়া ও সীতার জন্ম, বিবাহ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল প্রভৃতি উল্লিখিত হইয়া থাকে। এক-ই রকম ছড়া না বলিয়া বিভিন্ন প্রকারে লোকরঞ্জন করিবার জন্য ছড়ার আবৃত্তি করা হয়। এস্থলে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি।

(১)

মহিমবাবু চান করে
সোনা বান্ধা ঘাটে।
হেন কালে চাপড়াশী আসে
রশি দিল হাতে,
হাতে দিল হাত রশি,
পায়ে দিল বেড়ী।
মহিমবাবুরে লইয়া গেল
পাথরঘাটার বাড়ী॥
মহিমবাবুর মায় কাঁদে
মুখে ছাড়ে হাই,
তোমরা সবে এলে বাড়ী,
আমার মহিম কই।।
মহিমবাবুর বোন কাঁদে
পথের দিকে চেয়ে।
আর বুঝি এল না দাদা
কোচাটি দুলোয়ে।।
মহিমবাবু কেঁদে বলে,
বড়দাদা রে ভাই।
গাড়ী পুরে আন টাকা,
খালাস হয়ে যাই।। ইত্যাদি।

(২)

বালগোপালের ছড়া

ননি খালো কেরে গোপাল ননি খালো কে?
—আমি ত খাই নাই ননি,—খাইছে বলাই দাদা।
—বলাই যদি খাইত ননি, থাকত আধা আধা।।
তুমি ত খাইছ ননি ভাণ্ড কইরা ছেঁদা।।
হাতে ছড়ি নন্দরাণী যায় গোপালের পিছে,
লম্ফ দিয়ে উঠলরে গোপাল কদম্বিকের গাছে।
—আলারে আলারে গোপাল,
পাড়ে দেব ফুল,
ডাল ভাঙ্গিয়ে পড়বিরে গোপাল,
মজাইবি দুই কুল।।

বাঙলার কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে এরকম বহু ছড়া প্রচলিত আছে। এই সব ছড়ার মধ্য হইতে ঐতিহাসিক মাল-মসল্লাও সংগ্রহ করা যাইতে পারে। শিক্ষিত সমাজের অনাদরের জন্য তাহা লোপ পাইতে বসিয়াছে। দক্ষিণ-বঙ্গের পল্লীঅঞ্চল হইতে সংগৃহীত "ধলই গানের" সামান্য কিছু উল্লেখ করিয়াছি। পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে ভিক্ষার সামগ্রী লইয়া কৃষকেরা মাঠের মধ্যে বন ভোজনের মত একটা কিছু করে। পূজার রীতিও আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু বাঙলার অন্যান্য স্থানের সহিত তাহার কোন ভেদ নাই।

ধরণী

শ্রীরণময় দাস

সে কথা পড়ে না মনে—প্রথম কখন
এ উদার দিবালোকে মেলিনু নয়ন,—
এই প্রাণ-পরিপূর্ণ ধরণীর বুকে।
শুধু জানি প্রতিদিন বহু দুঃখে-সুখে
চলেছি সম্মুখ পানে। আঘাত সংঘাত
এসেছে জীবনে কত। তবু দিন-রাত
যখনি ধরার পানে চাহিয়াছি ফিরে
অপার আনন্দে প্রাণ ভরিয়াছে ধীরে।

শুধু জানি, এ ধরণী রহস্য-নিলয়,
যত এরে দেখি তবু জাগিছে বিস্ময়
নিত্য নব নব। যত বেশী নাহি জানি
তত আরো ভালবাসি আপনার মানি।

—মনে হয়, এই মত অনন্ত জীবন
মোর পৃথিবীর বুকে করি উদ্‌যাপন।

পৃথিবীর কয়েকটী শোচনীয় রেল দুর্ঘটনা

• অল্প সময়ের ব্যবধানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়েতে পর পর যে কয়েকটি শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার বেদনাবিজড়িত স্মৃতি লোকের মন হইতে অপসারিত হইতে না হইতেই ইষ্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের মাজদিয়া ষ্টেশনে ঢাকা মেল ও নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসের মধ্যে নিদারুণ সংঘর্ষের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই দুর্ঘটনার ফলে যত লোক নিহত ও আহত হইয়াছে, তাহার সঠিক সংখ্যা এখন পর্যন্ত পাওয়া না গেলেও ইতিমধ্যেই যে সংবাদ আসিয়াছে, তাহাতে অনুমান হয় হতাহতের সংখ্যায় ১৯৩৭ সালের ১৭ই জুলাই তারিখের বিহিটা ট্রেণ দুর্ঘটনার সমান না হইলেও ইহার পরেই ভারতীয় রেলওয়ে দুর্ঘটনার ইতিহাসে ইহা স্থান লাভ করিবে। বিহিটা দুর্ঘটনায় বিশেষ ধরণের ইঞ্জিন ব্যবহারে ও রেলপথের গোলযোগের জন্যই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু মাজদিয়া দুর্ঘটনার যে সংবাদ উক্ত রেল-কর্ত্তৃপক্ষের প্রাথমিক বিবৃতিতে প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে জানা যায়, ঢাকা মেলের ড্রাইভার ট্রেণখানি বাণপুর ষ্টেশন পরিত্যাগ করিবার পর হইতে সিগন্যালসমূহ অগ্রাহ্য করিয়া গাড়ী চালাইবার ফলেই উহা প্রচণ্ডগতিতে আসিয়া মাজদিয়া ষ্টেশনে দণ্ডায়মান উহার পূর্ব্বগামী নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসের পশ্চাদ্দিকে সজোরে ভীষণবেগে পতিত হয়। ফলে যে শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার মর্ম্মন্তুদ বিবরণ পাঠ করিয়া আধুনিক যন্ত্র-সভ্যতার প্রতি সকলেরই মন অশ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠে।

যন্ত্রদানব ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহাকে চালাইবার ভার যাহারা গ্রহণ করে, তাহাদের সামান্য ভুল-ত্রুটির ফলে দেশে দেশে যে শোচনীয় দুর্ঘটনার সূত্রপাত ঘটে, আধুনিক ইতিহাসের পাতায় পাতায় তাহার প্রচুর সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যাইবে। ক্ষণিকের ভুলে শত শত যাত্রীর জীবন এই সব যন্ত্র-পরিচালকের হাতে বিপন্ন হয়। যন্ত্র হইতে তাই যন্ত্র-পরিচালকের দেহ মন রক্ষার দিকে মনোনিবেশ করিবার জন্য দুনিয়া ভরিয়া এক আবেদন উঠিয়াছে। অন্যথায় এই যন্ত্রদানবের চাপে পড়িয়া একদিন আমাদের নিজ হাতে গড়া সভ্যতা একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই।

আধুনিক যন্ত্র-সভ্যতার লীলাভুমি পাশ্চাত্য দেশ। তাহারা প্রকৃতিকে নানাভাবে জয় করিয়াছে বটে, কিন্তু যন্ত্রদানবের উৎপীড়ন এখনও সম্পূর্ণরূপে দমন করিতে পারে নাই। এ সমস্ত দেশ হইতে মাঝে মাঝে বহু শোচনীয় দুর্ঘটনার সংবাদ আসিয়া থাকে। নিম্নে রেল দুর্ঘটনার ইতিহাসে যে কয়টি শোচনীয় ঘটনা প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাহার কাহিনী বর্ণিত হইল। নিহত ও আহতদের সংখ্যাধিক্যে আজও এই তিনটি রেল দুর্ঘটনা জগতে রেকর্ড স্থাপন করিয়াছে বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে।

(১) স্কটল্যাণ্ডের অন্তর্গত গ্রেটনা গ্রীণ দুর্ঘটনা—ইহা ১৯১৫ সালের ২২শে মে তারিখে সংঘটিত হয়। এই ঘটনার যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে জানা যায়, ঐদিন অতি প্রত্যূষে রাত্রির সিগন্যালের ভারপ্রাপ্ত 'টাওয়ারম্যান' গ্রেটনা গ্রীণ জংসনে দুইখানি মালগাড়ী সাংইডিংএ দিয়া 'বিটক কারলাইল' লোকাল (Beattock Carlisle Local) ট্রেণখানিকে 'ইন' করিতে দিয়াছে। কিন্তু তাহার অব্যবহিত পরেই দুই ইঞ্জিন-যুক্ত লণ্ডন-গ্লাসগো এক্সপ্রেসখানি আসিবার কথা। 'টাওয়ারম্যান' তাই লোকাল ট্রেণখানিকে ডাউন মেন লাইনে না দিয়া আপ-মেন লাইনে রাখিয়া এক্সপ্রেসখানিকে লাইন ক্লিয়ার দিয়াছে। রাত্রির টাওয়ার-ম্যানের তখনই ডিউটি বদল হইবে। দনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী আসিয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি তাহাকে কাজ বুঝাইয়া বাড়ী ফিরিবার নেশায় সে তখন মশগুল। এদিকে অন্যদিক হইতে সৈন্যভর্ত্তি একখানি গাড়ী আসিয়া পড়িয়াছে। টাওয়ার-ম্যান লোকাল ট্রেণখানির কথা ভুলিয়া গিয়া সৈন্যের গাড়ীখানাকে সেই আপ লাইনই ছাড়িয়া দিল। গাড়ীখানি সজোরে লোকাল ট্রেণখানার উপরে আসিয়া পড়িল। বহু লোক হত ও নিহত হইল। যাহারা অক্ষত দেহে বাহির হইতে পারিয়াছিল, তাহারা আহতদের সেবায় মনোনিবেশ করিল। কিন্তু টাওয়ার-ম্যান যেন কিরূপে বিভ্রান্ত হইয়া গিয়াছিল। নিজের ভুল বুঝিবার পূর্ব্বেই এদিকে লণ্ডন-গ্লাসগো এক্সপ্রেস ট্রেণখানিকে 'রিসিভ' করার জন্য ঘণ্টা বাজিয়া উঠিতেই সে অসতর্কভাবে সিগন্যাল 'ডাউন' করিয়া দিয়াছে। লণ্ডন এক্সপ্রেসখানি তখনই হুড়মুড় করিয়া আসিয়া পড়িল। টাউয়ার-ম্যানের চক্ষু ঝাপসা হইয়া আসিল,—কিন্তু আর সময় ছিল না। প্রচণ্ড শব্দ করিয়া বাঁক ঘুরিয়াই লণ্ডন-এক্সপ্রেসখানি পূর্ব্বোক্ত সংঘর্ষের হত-আহতদের ও উদ্ধারকারী দলকে দলিয়া ঐ গাড়ী দুইখানির উপর আসিয়া পড়িল। শুধু তাহাই নহে। সংঘর্ষের ধাক্কায় পার্শ্বস্থিত সাইডিং-এ অবস্থিত মালগাড়ী কয়খানিকেও সে চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে ছাড়িল না। এক্সপ্রেস গাড়ীখানির প্রধান ইঞ্জিনটি ধাক্কার চোটে শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হইল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় উহার ফায়ারম্যান বা ইঞ্জিনিয়ার অভাবনীয়রূপে রক্ষা পাইল। দ্বিতীয় ইঞ্জিনখানি কিন্তু লোকজন সহ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইল। দেখিতে দেখিতে ধ্বংসস্তূপে আগুন ধরিয়া গেল। অনেক যাত্রী আগুনে প্রাণ হারাইল। পাঁচখানা গাড়ীর এইরূপ একত্রে সংঘর্ষের ফলে কমপক্ষে ২২৭ জন নিহত ও ২৫০ জন আহত হইল।

ঘটনার পরে তদন্তক্রমে রাত্রির সেই টাওয়ারম্যান দোষী সাব্যস্ত হইল। অনুতাপানলে সে পূর্ব্বেই দগ্ধ হইতেছিল। বিচারে তাহার কারাদন্ড হইল।

(২) গ্রেটনা-গ্রীণের এই দুর্ঘটনার চেয়েও আর একটি মারাত্মক রেলদুর্ঘটনা ঘটে—১৯১৭ সালের ২রা ডিসেম্বর তারিখে ফ্রান্স ও ইতালীর সীমান্তে ক্ষুদ্র মোদান্ ষ্টেশনে। ১২০০ শত সৈন্য একটি ট্রেণে বোঝাই করা হইয়াছে। পিয়াভের যুদ্ধক্ষেত্রে দারুণ যুদ্ধ করিয়া যুদ্ধাবসানে সব বড়দিনের উৎসব করিতে চলিয়াছে। এই স্থানের রেলপথ সংকীর্ণ গিরিপথের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। গাড়ী অতিরিক্ত বোঝাই। শকটচালক এরূপ বোঝাই গাড়ী নিয়া রওনা হইতে সাহস করিতেছে না। সৈন্যগণ জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া উৎসবে মাতিয়া হল্লা করিতেছে—'চালাও' 'চালাও'। একান্ত অনিচ্ছায় কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে ড্রাইভার ট্রেণখানি চালাইয়া দিল—আলপাইন গিরিসংকুল পথে। ফরাসী লেখক আঁরি বারবুসের লেখায় এ দুর্ঘটনার যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে জানা যায়, ট্রেণচালক যাহা আশংকা করিয়াছিল,

তাহাই সত্যে পরিণত হইল। শীঘ্রই গাড়ীর ব্রেক অগ্নিপ্রায় হইয়া উঠিল; বোঝাই গাড়ী বহিয়া লৌহবর্ত্ম আগুনের মত তাতিয়া উঠিল। স্থানে স্থানে ধূম উদ্‌গীরণ হইতে লাগিল। ঘর্ষণে ঘর্ষণে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। চালক কোনপ্রকারে ট্রেণখানিকে পরবর্ত্তী ষ্টেশন সেন্ট মিচেলের দিকে নিয়া যাইতে চেষ্টা করিল। রাত্রির অন্ধকার জমাট বাঁধিয় রহিয়াছে। বিপদ বুঝিয়া কোন কোন সৈনিক সেই অন্ধকারের মধ্যেই জানালা দিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িয়া প্রাণ বাঁচাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু অনেকের চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। ট্রেণখানি টলিতে টলিতে রাস্তায় রাস্তায় মৃতদেহ ছড়াইতে ছড়াইতে অগ্রসর হইতে লাগিল। একটা বাঁক ঘুরিতেই গাড়ী টাল সামলাইতে না পারিয়া বিকট আওয়াজ করিয়া অচেতনপ্রায় অজগরের মত গিরিপার্শ্বে গড়াইয়া পড়িয়া গেল। চারিদিকে আগুনে জ্বলিয়া উঠিল। চারিশত সৈনিকের দেহ দেখিতে দেখিতে ভস্মস্তূপে পরিণত হইল। এই দুর্ঘটনায় ৫৪৩ জন নিহত এবং ২৪৩ জন আহত হয় বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ প্রকাশ করেন বটে, কিন্তু অনেকের অভিমত এক সহস্রেরও অধিক লোক এই দুর্ঘটনায় নিহত হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে আজ পর্য্যন্ত শোচনীয় ট্রেণ-দুর্ঘটনার ইহাই বড় রকমের রেকর্ড বলা যাইতে পারে।

মাজদিয়া ট্রেণ দুর্ঘটনা— শিয়ালদহ ষ্টেশনে সোমবার শেষ রাত্রে ২৬টি মৃতদেহ আনার পর সনাক্ত করিবার চেষ্টা।

ফটো—আনন্দবাজার

(৩) ফ্রান্সের লাঞি (Lagny) ষ্টেশনে ১৯৩৩ সালে যিশুর জন্মদিবসের পূর্ব্বদিন যে রেল দুর্ঘটনা ঘটে, তাহার বিবরণ দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। এই দুর্ঘটনায় প্যারিস-ষ্ট্রাসবুর্গ এক্সপ্রেস ই বি আরের ঢাকা মেল নর্থ-বেঙ্গল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার অনুরূপ তাহার পূর্ব্বগামী অপর একখানি যাত্রীবাহী গাড়ীর পশ্চাদ্দিকে এমনিভাবেই আসিয়া পতিত হয়। ফলে ২০০ শত লোক নিহত ও ৩০০ শত লোক আহত হয়। সেদিন কুয়াসায় সর্বদিক আচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু এক্সপ্রেসের চালক প্রতি ৫৫ সেকেন্ডে এক মাইল করিয়া তাহার যন্ত্রদানবকে চালাইয়া লইয়া চলিয়াছে। প্যারিস হইতে ১৫ মাইল পূর্ব্বে লাঞি ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী হইলেও তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। সহসা প্যারিস-ন্যান্সি এক্সপ্রেস গাড়ীর পশ্চাদ্দিকের লাল আলো দেখা গেল বটে, কিন্তু চালকের হুঁস হইবার পূর্ব্বেই এক সেকেন্ডের মধ্যে ইহা পেছোক্ত গাড়ীটির উপর আসিয়া পতিত হইল। প্যারিস-ন্যান্সি এক্সপ্রেসের বগীগুলি সব কাঠনির্মিত ছিল। সুতরাং সংঘর্ষের ফলে উহার পিছনের তিনখানি বগী সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইল। স্কুলের ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে নিয়া শহরের বহু যাত্রী প্যারিস-ন্যান্সি এক্সপ্রেসে বড়দিনের উৎসব করিতে চলিয়াছে। ড্রাইভারের ভুলে তাহাদের উৎসব হাহাকারে পরিণত হইল। একমাত্র এ ট্রেনের যাত্রীদের মধ্য হইতেই দেড়শত মৃতদেহ বাহির হইল। ষ্ট্রাসবুর্গ-এক্সপ্রেসের গাড়ীগুলি ষ্টীলনির্ম্মিত থাকায় ইহার অতি অল্প সংখ্যক যাত্রীই আহত হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় ইহার ইঞ্জিন-ড্রাইভার ও ইঞ্জিনের অন্যান্য কর্ম্মীরাও আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়। যথাসময়ে তদন্তে প্রমাণিত হইল, ড্রাইভারের অসতর্কতার জন্যই এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। চারিদিকে কুয়াসার জন্য সে সিগন্যাল দেখিতে পায় নাই বলিয়া অজুহাত দেখাইল। কিন্তু তাহার অসতর্কতার মূল্য দিতে হইল যাত্রীদিগকে। বড়দিনের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উপহারের দ্রব্যসম্ভারে লাঞি ষ্টেশন পরিপূর্ণ হইয়া গেল। শুধু পিছনে পড়িয়া রহিল করুণ স্মৃতি আর বেদনার হাহাকার।

ই-বি-রেলের মাজদিয়ার রেলদুর্ঘটনাও আমাদের প্রাণে দারুণ বেদনা বহন করিয়া আনিয়াছে। বহু প্রিয়জনকে হারাইয়া বহু গৃহস্থ-পরিবারে যে নিদারুণ শোকের ছায়া পড়িবে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। এরূপ শোচনীয় দুর্ঘটনার কবে পরিসমাপ্তি ঘটিবে, অসহায়ের মত শুধু সেই প্রতীক্ষাই করিতেছি। পাশ্চাত্য দেশে পূর্ব্বে হামেশাই বহু দুর্ঘটনা সম্ঘটিত হইত। রেল দুর্ঘটনা, নৌ-দুর্ঘটনা, বিমান-দুর্ঘটনা এসব দুর্ঘটনার কাহিনীতে পাশ্চাত্যের ইতিহাস পরিপূর্ণ সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের দেশের সহিত ঐ দেশের পার্থক্য এই যে, প্রতি দুর্ঘটনা হইতে তাহারা যে শিক্ষালাভ করে তাহার পূর্ণ সুযোগ তাহারা গ্রহণ করিতে কসুর করে না। কিন্তু আমাদের দেশের রেলকর্তৃপক্ষগণ দুর্ঘটনার সময় কর্ম্মব্যস্ততা দেখাইলেও তাহা হইতে শিক্ষালাভ করিয়া দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করিতে তেমন যত্নবান হন বলিয়া মনে হয় না। তাহা না হইলে মাত্র দুই বৎসরকাল মধ্যে এতগুলি রেল দুর্ঘটনা কেনই বা ঘটিবে!

১৯৩৭ সালের জুলাই মাস হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্যন্ত দুই বৎসরেরও কম সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষে যে কয়েকটি শোচনীয় রেল দুর্ঘটনা ঘটে তাহার একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

(১) ১৯৩৭ সালের ১৭ই জুলাই পাটনা হইতে ১৭ মাইল দূরে ই আই রেলওয়ের বিহিটা ষ্টেশনের নিকট পাঞ্জাব হাওড়া এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত হয়। এই দুর্ঘটনায় ১২৬ জন নিহত ও অনুমান দুইশত লোক আহত হয়।

(২) ১৯৩৮ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী এলাহাবাদ হইতে ৮ মাইল দূরে বামরোলী রেল ষ্টেশনে ভীষণ রেল দুর্ঘটনা হয়। ফলে ৭ জন নিহত ও ১৫ জন আহত হয়।

(৩) ১৯৩৮ সালের ১১শে মার্চ জব্বলপুর হইতে ৮০ মাইল দূরে জুকেহি ও [illegible] ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী স্থানে এক ট্রেন দুর্ঘটনা হয়। ফলে ২ জন নিহত ও ১৯ জন আহত হয়।

(৪) ১৯৩৮ সালের ৭ই জুন [illegible] মধুপুরের নিকট ট্রেন দুর্ঘটনার ফলে ২ জন নিহত ও ৩৯ জন আহত হয়।

(৫) ১৯৩৮ সালের ২০শে আগষ্ট সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের ট্রেন দুর্ঘটনায় ৩৫ জন মৃত্যু হয়।

(৬) ১৯৩৮ সালের ১৬ই অক্টোবর ই আই রেলের ফলে তিন জন নিহত ও ৪০ জন আহত হয়।
মোগলসরাই ষ্টেশনের নিকট পাঞ্জাব এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত হয়।

(৭) ১৯৩৯ সালের ১১ই জানুয়ারী রাত্রি ৩-১০ মিনিটে ই আই রেলে হাজারীবাগ রোড ষ্টেশনের নিকট দেরাদুন এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত হয়। ফলে ২২ জন নিহত ও ৫২ জন আহত হয়।

(৮) ১৯৩৯ সালের ২৬শে জানুয়ারী ই আই রেলে আবার দুর্ঘটনা হয়। মহম্মদগঞ্জ ও গড়োয়া রোড ষ্টেশনের মধ্যে দুইখানি ইঞ্জিন সংঘর্ষের ফলে ৭ জন নিহত ও তিনজন আহত হয়।

(৯) ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের মাজদিয়া ষ্টেশনের এই শোচনীয় দুর্ঘটনা।

উপরোক্ত দুর্ঘটনার তালিকা হইতে বুঝা যাইবে যে, ভারতে রেল কর্ত্তৃপক্ষের কাজে বহু গলদ প্রবেশ করিয়াছে এবং All is not well in the State of Denmark.

পরলোকে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ মজুমদার

সংক্ষিপ্ত জীবনী

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ মজুমদার বিক্রমপুর পাইকপাড়ার অধিবাসী ছিলেন। বি-এ পাশ করিবার পর তিনি কিছুকাল কোন স্কুলে এসিষ্ট্যান্ট হেডমাষ্টার ছিলেন। ঐ সময়ে তিনি বি-এল পাশ করেন এবং ঢাকা বারে যোগ দেন। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি আইন ব্যবসায়ে কমিটির স্থলবর্ত্তী ছিল। পরলোকগত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ উহার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি বহু বৎসর ঢাকা বার এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী ছিলেন এবং ঢাকার প্রায় সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

১৯২৯ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন; সালে ৯ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

১৯৩৭ সালে তিনি পূর্ব্ববঙ্গ সহর সাধারণ নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হন এবং ১৯৩৮ সালে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান

বীরেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের মৃতদেহ; সঙ্গে অপর ২৬জন নিহত যাত্রীর শবও দেখা যাইতেছে। ফটো—'আনন্দবাজার'

প্রতিষ্ঠা লাভ করেন; ফলে তিনি ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় আসামী পক্ষ সমর্থনের ভার প্রাপ্ত হন। উহাতে তিনি সাফল্য লাভ করেন। অতঃপর তিনি বহু রাজনৈতিক মামলায় আসামী পক্ষ সমর্থন করেন।

তিনি দীর্ঘকাল ঢাকা সেবাশ্রমের সেক্রেটারী ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ১৯১১ হইতে ১৯১২ সাল পর্য্যন্ত ঢাকা ডিষ্ট্রিক্ট এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী ছিলেন। উহা বর্ত্তমান জিলা কংগ্রেস কিন্তু পরে লাহোর কংগ্রেসের নির্দ্দেশ অনুযায়ী পদত্যাগ করেন। লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণস্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হইলে পর তিনি লাভজনক আইন ব্যবসায় ত্যাগ করেন। অতঃপর ঢাকা জিলা কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হন। অল্পদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি ঐ পদে ছিলেন। তিনি আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়া ১৯৩২ নির্ব্বাচিত হন। তিনিই প্রথম কংগ্রেসী চেয়ারম্যান।

তাঁহার বয়স প্রায় ৬৪ বৎসর হইয়াছিল। তিনি তিন পুত্র, এক কন্যা এবং বহু বন্ধু ও আত্মীয় স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ মজুমদার ৮ বৎসর কাল রাজবন্দী ছিলেন।

পরলোকে মনোরঞ্জন ব্যানার্জ্জি

মাঝেরদিয়া ট্রেণ দুর্ঘটনায় আহত শ্রীযুত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এল-এ, মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টা ১৬ মিনিটের সময় কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

রবিবার শেষরাত্রে মাঝেরদিয়া ষ্টেশনে ট্রেণ দুর্ঘটনায় তিনি বুকে ও হাতে আঘাত পান। তাঁহাকে সোমবার কলিকাতায় আনিয়া মেডিক্যাল কলেজে রাখা হয়। সোমবার সমস্ত দিনরাত্রি তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক ছিল। মঙ্গলবার সমস্ত দিনও সেই একইভাবে কাটে ও সন্ধ্যার সময় তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

হইতে বাহির হওয়ার পর তিনি ঢাকা জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক হন এবং বহু বৎসর উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত ঢাকার বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনি ৯ বৎসর ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ঢাকা হইতে বহিষ্কার করেন।

১৯৩৭ সালে মনোরঞ্জনবাবু কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীরূপে শ্রীযুক্ত বি সি

হাসপাতালে যান এবং তাঁহার মৃতদেহ সুসজ্জিত করিয়া রাত্রি ৯টার সময় বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির অফিসে লইয়া আসেন। তাঁহার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য বাঙ্গলায় কয়েকজন মন্ত্রী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে গিয়াছিলেন।

মঙ্গলবার রাত্রি ১০-৩০ ঘটিকার সময় শ্রীযুত প্রতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়

চিরনিদ্রাভিভূত শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ঢাকা জজ কোর্টে ওকালতি করিতেন। তিনি বহু রাজনৈতিক মামলায় আসামীপক্ষ সমর্থন করিয়া সুনাম অর্জ্জন করেন। বিখ্যাত ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সহকারীরূপে আসামী পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন।

তিনি আজীবন কংগ্রেসের সেবা করিয়া গিয়াছেন। ১৯২১ সালে তিনি আইন ব্যবসায় ছাড়িয়া দেন এবং রাজনৈতিক কারণে ছয় মাসকাল কারাবরণ করেন। কারাগার

চ্যাটার্জ্জিকে নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে পরাভূত করিয়া পূর্ব্ব ঢাকা পল্লী নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হন।

মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় ৫৫ বৎসর হইয়াছিল। তিনি স্ত্রী, পুত্র ও বহু আত্মীয় স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি বিখ্যাত জননায়ক শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলীর ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

তাঁহার মৃত্যু সংবাদ পাইবামাত্র দলে দলে কংগ্রেস নেতা ও কর্মী [illegible]

চট্টগ্রাম মেল যোগে শ্রীযুত ব্যানার্জ্জির স্ত্রী ও পুত্রকে লইয়া কলিকাতায় আসেন।

মঙ্গলবার রাত্রি প্রায় ১২টার সময় শ্রীযুত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুসজ্জিত মৃতদেহ সহ একটি শোকযাত্রা বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির অফিস হইতে বাহির হয় এবং শেষরাত্রিতে কেওড়াতলা শ্মশান ঘাটে তাঁহার

পোষ্টমাষ্টার

(আলেকজাণ্ডার পুস্কিনের গল্পের অনুবাদ)

বীরভদ্র

এমন লোক খুব কমই আছে যারা পোষ্টমাষ্টারগণের * উপর অভিশাপলাঞ্ছিত অভিযোগ বর্ষণ করে নি, বরং এমন বহুলোককেই দেখা গেছে যে তারা রোষকষায়িত চিত্তে 'ভিজিটার্স-বুক' টেনে নিয়ে তাতে পোষ্টমাষ্টারের বিরুদ্ধে সময়ক্ষেপণ ও অসৌজন্যের জন্য সবিস্তারে অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেছে। কিন্তু বেচারী পোষ্টমাষ্টারগণের প্রতি আমরা যদি এতটুকু পক্ষপাতশূন্য বিচার প্রদর্শন করি তাহ'লে তাদের প্রতি আমাদের সহানুভূতির উদ্রেক হওয়াই স্বাভাবিক। হতভাগ্য জীবগুলি প্রকৃতপক্ষে হচ্ছে পরিশ্রমের চূড়ান্ত প্রতিমূর্ত্তি—দিনেরাতে একবিন্দু অবসরও তাদের জোটে না। তার ওপর অযাচিত উপরিওয়ালার অত্যাচার আছে; দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া, খারাপ রাস্তাঘাট বা দীর্ঘ পরিভ্রমণজনিত অবসাদ সম্ভূত বিরক্তি ও খিটখিটেমির সমস্ত ঝালটাই গিয়ে পড়ে ঐ পোষ্টমাষ্টারের ওপর। তার ঐ ক্ষুদ্র কুটিরে আগন্তুক যাত্রীর দল যুদ্ধং দেহি চিত্তেই প্রবেশ করে এবং তাদের সেই অনাবশ্যক তর্জ্জন-গর্জ্জনের হাত থেকে কি করে যে নিষ্কৃতি পাবে তা সে ভেবে শেষ করতে পারে না। এর ওপর কোন সৈন্যাধ্যক্ষ যদি উপস্থিত হয় তাহলে ত বেচারী একেবারে থরহরি কম্প। ঘোড়া না থাকলেও নিজেদের শেষ সম্বল ডাকবাহী ঘোড়া দুটিকে ছেড়ে দিতে সে বাধ্য হয়—এই বিরাট দানের জন্য প্রতিদানে সে সামান্য ধন্যবাদটুকুও প্রাপ্ত হয় না। ঠিক পাঁচ মিনিট পরেই সরকারী কর্ম্মচারী এসে আবার ঘোড়ার জন্য দাবী জানায়। হা ভগবান! তখনকার অবস্থাটা রীতিমত উপভোগ্যই বটে। পূর্ব্বেই বলেছি যে এই সমস্ত ব্যাপার থেকে তাদের প্রতি বিরক্তির চেয়ে করুণার উদ্রেক হওয়াই স্বাভাবিক। গত বিশ বছরের মধ্যে আমি রুশিয়ার সকল স্থানেই পরিভ্রমণ করেছি—এমন কোন পোষ্ট-অফিস নেই যা আমি না দেখেছি এবং খুব অল্পই পোষ্টমাষ্টার আছে যারা আমার চেনা নয়। সাধারণভাবে এটুকু আমি বলতে পারি যে, তাদের সম্পর্কে এক ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। জীব হিসাবে এই হতভাগ্য পোষ্টমাষ্টারগণ ভদ্র, সৌজন্যপরায়ণ ও সামাজিক বিনয়ের অবতার। তাদের মধ্যে অনেকেই আমার বন্ধুস্থানীয়, তন্মধ্যে একজনের স্মৃতি আমার কাছে অক্ষয় আছে। ঘটনাচক্রে এক যায়গায় এসে আমরা মিশেছিলাম, সেই কাহিনীই পাঠকদের নিকট এবার আমি ব্যক্ত করব।

১৮১৬ সালের মে মাসে কার্য্যোপলক্ষ্যে আমি এক সরকারী প্রদেশের মধ্য দিয়া পরিভ্রমণ করছি। যে রাস্তা দিয়ে গিয়েছিলাম বর্ত্তমানে সেটা অব্যবহার্য্য হয়ে রয়েছে। আমার বেশভূষা ও পদমর্য্যাদা ছিল সামান্য, প্রতি ষ্টেশনে আমি মাত্র দুটি ঘোড়ার ভাড়া বরাদ্দ করেছিলাম, সেইজন্যই পোষ্টমাষ্টারগণ কেহই আমায় গ্রাহ্যের মধ্যে আনেনি এবং আমার যেটি স্বাভাবিক ন্যায্য পাওনা সেটি জোর করেই আদায় করে নিতে হচ্ছিল। এতে যুবা বয়সের রক্তের মধ্যে বিরক্তি ও উত্তেজনা সঞ্চারিত হওয়াই স্বাভাবিক এবং যখন আমার বরাদ্দ ঘোড়া অপর কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে প্রদান করা হচ্ছিল তখন আমিও আমার রোষবহ্নি প্রদীপ্ত করছিলাম।

গরম দিন। ষ্টেশন ছাড়তেই কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি নামল এবং কিছুক্ষণ পরে তা এত ঝেঁপে এল যে আমি একেবারে ভিজে গেলাম। তাই অপর ষ্টেশনে পৌঁছে আমার প্রথম কাজ হ'ল পোষাক পরিবর্ত্তন করা ও দ্বিতীয় কর্ম্ম হ'ল এক কাপ চায়ের অর্ডার দেওয়া। তাই দিলাম।

আমার কথায় পোষ্টমাষ্টার ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলে উঠল—ডুনিয়া, চায়ের জল চড়াও শীগ্গির; আর কিছু খাবার নিয়ে এস।

কথা শুনে একটি মেয়ে পার্টিসনের ওপাশ থেকে বেরিয়ে আমার সামনে দিয়ে ওধারে চলে গেল। মেয়েটি চতুর্দ্দশী, সত্যি কথা বলতে কি আমি তার সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হয়েছিলাম।

—ও কি তোমার মেয়ে? আমি পোষ্টমাষ্টারকে শুধোলাম।

সে একটু গর্ব্বের সঙ্গেই জবাব দিলে—হ্যাঁ। ও খুব বুদ্ধিমতী ও চট্‌পটে, ঠিক মার মতই হয়েছে।

বলেই সে আমার আদেশপত্র কপি করতে লাগল, আমিও ইত্যবসরে তার ছোট্ট পরিষ্কার ঘরখানির উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। দেওয়ালগুলিতে বাইবেলোক্ত 'Prodigal son'-এর ছবি অঙ্কিত ছিলঃ প্রথমেই এক শ্রদ্ধেয় বর্ষীয়ান নৈশবেশভূষায় সজ্জিত হয়ে অশান্ত যুবাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছেন, যুবকটি তাঁর হাত থেকে টাকার থলি গ্রহণ করছে; তৎপরেরটিতে সূক্ষ্ম তুলির টানে বিভ্রান্ত যুবকের চরিত্র মূর্ত্তিমান হয়ে উঠেছে—টেবিলের ধারে সে কুসঙ্গী ইয়ারবন্ধু ও ভ্রষ্টা স্ত্রীলোক পরিবেষ্টিত হয়ে বসে। তারপরে আঁকা রয়েছে বিপথগামী যুবকের শেষ পরিণতি, তার দৈন্যদশা; দীনবেশ পরিহিত হয়ে সে শূকরদের খাবার দিচ্ছে এবং নিজে তারই অংশ গ্রহণ করছে—তার মুখে চোখে সর্ব্বাঙ্গে গভীর বেদনা ও অনুতাপের চিহ্ন পরিস্ফুট। অবশেষে চিত্রিত হয়েছে তার গৃহ প্রত্যাগমনের দৃশ্যঃ সেই সৌম্যমূর্ত্তি ঐ একই নৈশপরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে ছেলেকে ফিরে নেবার জন্য ছুটে যাচ্ছে; বিপথগামী অসৎ সন্তান এবার তার পদপ্রান্তে। প্রত্যেক চিত্রের তলায় যথাযোগ্য জার্ম্মান কবিতা লেখা ছিল—সে সমস্তই এবং অপর সমুদয় বস্তু এখনো আমার মানসপটে জ্বল্ জ্বল্ করছে।

আমার আগেকার গাড়োয়ানের সঙ্গে দেনাপাওনা চুকাবা মাত্রই ডুনিয়া চা নিয়ে এল। ঐ চপল চতুর্দ্দশী দ্বিতীয় দৃষ্টিতেই বুঝতে পেরেছিল যে, আমার ওপর সে কতখানি মৌন-প্রভাব বিস্তার করেছে। তার দীর্ঘায়ত নীলচক্ষুর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই আমি কথাবার্ত্তা সুরু করলাম। বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করেই সে তার পরিষ্কার জবাব দিতে লাগল, বোধ হ'ল যেন সে এই বয়সেই পৃথিবীর সকল কিছুর সঙ্গেই পরিচিত হয়েছে। কেৎলী থেকে চা ঢেলে আমি এক কাপ তার পিতার দিকে এগিয়ে দিলাম, নিঃসঙ্কোচে তাকেও এক

* রেলগাড়ী আবিষ্কৃত হবার পূর্ব্বে যারা যাত্রী বা ডাক যাতায়াতের বন্দোবস্ত করত, তাদেরও পোষ্টমাষ্টার বলা হ'ত।

কাপ প্রদান করলাম এবং এ ভাবে গল্প চালাতে লাগলাম যেন আমরা কতকাল ধরে পরস্পরের নিকট পরিচিত।

বাইরে অনেকক্ষণ ধরেই ঘোড়া তৈরী হয়েছিল, কিন্তু ঐ পোষ্টমাষ্টার ও তার কন্যার নিকট এত শীঘ্র বিদায় নিতে আমার মন সরছিল না। অবশেষে আমি বিদায় নিলাম, পোষ্ট-মাষ্টার আমার নির্বিঘ্ন যাত্রা কামনা করলে, মেয়েটি গাড়ী পর্য্যন্ত আমায় এগিয়ে দিয়ে গেল। বিদায়কালে মুহূর্ত্তের জন্য আমি থামলাম, একটু ইতস্তত করে তাকে চুম্বন করবার অনুমতি চাইলাম - দুনিয়া রাজী হ'ল।

* * *

তারপর কয়েকটি বছর কেটে গেল। ঘটনাচক্রে আবার আমি সেই একই রাস্তা দিয়ে একই স্থানে গিয়ে উপনীত হলাম। পোষ্ট মাষ্টারের সেই চতুর্দ্দশী কন্যার কথা আমার স্মরণ ছিল, তাকে দেখবার আশায় আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলাম। কিন্তু বারেকের জন্য প্রতিকূল চিন্তা এসে আমায় নাড়া দিলেঃ সেই পোষ্ট মাষ্টার এখন হয়ত অপর কোন জায়গায় বদলী হয়ে গেছে, কিম্বা এমনও হতে পারে যে ডুনিয়া এতদিনে হয়েছে বিবাহিত। তাদের যে কোন এক জনের মরণের চিন্তাটাও যে মনে উদয় না হল তা নয়—একবার শিউরে উঠলাম। একটা বিষাদক্রান্ত উদ্বেগ নিয়ে সেই কুটিরের দিকে এগোচ্ছি; ঘরের মধ্যে ঢুকে সেই পুরাতন চিত্রগুলো চোখে পড়ল। খাট এবং টেবিলটি সেই পুরাতন স্থানেই অবস্থান করছে কিন্তু তাদের সে শ্রী আর নেই। দেখে মনে হ'ল কোন পরিপাটি লীলাময়ী হস্ত আর এখানে গার্হস্থ্য সৌন্দর্য্য রচনা করে না। পোষ্ট-মাষ্টার বেচারী ঘুমোচ্ছিল, আমার আগমনে সে নিজেই উঠে বসল। সেই পোষ্ট মাষ্টারই বটে! কিন্তু এই ক' বছরে কিরকম বুড়িয়েই না সে গিয়েছে। আমার আদেশপত্র কপি করতে যখন সে নিবিষ্ট ছিল তখন আমি তার দিকে একবার পরিপূর্ণভাবে চেয়ে নিলাম। মাথার চুলগুলো সব পেকে গিয়েছে, ক্ষৌরহীন মুখের উপর পড়েছে। বার্দ্ধক্যের দীর্ঘতর বলিরেখা, দেহের ঋজু ভঙ্গিমা আজ ভেঙ্গে নুয়ে পড়েছে। আমি ভেবেই পেলাম না যে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে সে কি করেই বা এরকম বার্দ্ধক্যে উপনীত হ'ল।

আমি শুধোলাম—তুমি আমায় চিনতে পারছ না? আমরা—আমরা যে পুরাতন বন্ধু।

—হবেও বা। এই ত সদর রাস্তা; যাবার পথে কত লোকই ত এখানে হয়ে যায়। সে অগ্রাহ্যভরে জবাব করলে।

—তোমার ডুনিয়া ভাল আছে?

—ভগবান জানেন।

—তাহলে তার বিয়ে হয়ে গিয়েছে, না? আমি আবার শুধোলাম। ও যেন আমার কথা শুনতেই পায় নি এই ভাব দেখালে এবং বিড় বিড় করে আমার আদেশপত্র আবৃত্তি করতে লাগল। আর কিছু না বলে আমি তখন চা আনতে অর্ডার করলাম। আশ্চর্য্য আমি কম হইনি কিন্তু ভাবলাম যে, পানীয়ের গুণে পুরাতন বন্ধুর রুদ্ধ মুখ আলগা হতে পারে।

আমি ঠিকই ভেবেছিলাম, পানীয়-এ কাজ হ'ল। প্রথম গেলাসে তার বিষণ্ণভাব বেশ কেটে গেল, দ্বিতীয় গেলাসেই সে বাকোচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলে। সাধারণভাবেই হোক বা ভাণ দেখিয়েই হোক্ বললে আমায় তার মনে পড়েছে এবং তার কাছ থেকে যে কাহিনী শুনলাম তা আমায় ভয়ঙ্কর বিচলিত করে তুলেছিল।

সে বলে চলল—আপনি ত আমার ডুনিয়াকে জানতেন? আর কেই বা না জানে। কি লক্ষ্মী মেয়েই না ছিল! যেই-তাকে দেখেছে সেই তার প্রশংসা করেছে, তার বিরুদ্ধে এতটুকু অভি-যোগ কখনও আমার কানে আসে নি। মহিলারা তাকে কতদিন কত উপহার দিয়ে গেছে। প্রত্যেক যাত্রীই শুধুমাত্র তাকে দেখবার জন্য এখানে একবার করে হয়ে যেত। উত্তেজিত ভদ্রলোকের ক্রমবর্দ্ধমান রোষবহ্নি তাকে দেখে জল হয়ে গেছে—এইরকমভাবে কতদিন সে আমায় বাঁচিয়েছে। আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, কিন্তু সে ছিল আমার ঘরের মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী-শ্রী। কেবল আমিই তার যথাযোগ্য সমাদর করতে পারি নি। আমি কি তাকে ভালবাসতাম না? তা নয়, অদৃষ্টের লিখন কে খণ্ডাবে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে আবার তার কাহিনী সুরু করলে যার সারমর্ম্ম হচ্ছে যে, তিন বছর পূর্ব্বে এক শীতের সন্ধ্যায় যখন পোষ্ট মাষ্টার একটা নতুন খাতায় রুল টানছে এবং ডুনিয়া ওধারে একটা পোষাকের কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছে, এমন সময় একখানা গাড়ী এসে তাদের দরজায় থামল এবং ভেতর থেকে এক ভদ্রলোক নেবে এসে ঘোড়ার অর্ডার দিলে। ভদ্রলোকের পরণে সৈনিকের পরিচ্ছদ, মাথায় 'সারকাসিয়ান' টুপি এবং সর্ব্বাঙ্গ শাল দ্বারা আবৃত। তাঁকে যখন বলা হ'ল যে সবকয়টি ঘোড়াই বেরিয়ে গিয়েছে তখন সবেমাত্র উত্তেজিত হয়ে তাঁর ছড়ি উঁচিয়েছেন, এমন সময় ডুনিয়া ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে মিষ্টভাবে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে যে, চা পেলে তিনি খুশী হবেন কিনা? এসব ব্যাপারে ডুনিয়া অভ্যস্ত। পিতাকে বাঁচাবার জন্য উত্তেজিত ভদ্রলোককে কি করে জল করতে হয় তা সে জানে—তার আবির্ভাবেই কাজ হাঁসিল হ'ল। আগন্তুক অপেক্ষা করতে রাজী হলেন ও চায়ের অর্ডার দিলেন। তারপর সে তার মিলিটারী পোষাক পরিচ্ছদ খুলে ফেলে বেশ সহজভাবেই পোষ্ট মাষ্টার ও তার মেয়ের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় প্রবৃত্ত হ'ল। খাবার ও চা ডুনিয়া নিয়ে এল। ইতিমধ্যে—ঘোড়াগুলো ফিরেছে, তাই পোষ্ট-মাষ্টার তাদের সাজ না খুলে তৈরী রাখবার জনাই বাইরে বেরিয়ে গেল এবং সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করে ফিরে এসে দেখলে ঐ আগন্তুক যুবা মূর্চ্ছিত অবস্থায় বেঞ্চে শুয়ে আছে—হঠাৎ তার মাথায় ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা দেখা দিয়েছিল। এরকম অবস্থায় তার পক্ষে যাত্রা করা সম্ভব নয়, তাই পোষ্ট-মাষ্টার তাকে নিয়ে গিয়ে নিজের বিছানায় শুইয়ে দিলে এবং ঠিক হ'ল যে পরের দিন সে সুস্থ বোধ করলে যাত্রা করবে।

পরের দিনও রোগীর যন্ত্রণার উপশম হ'ল না দেখে পোষ্ট মাষ্টার শহরের ডাক্তারের কাছে খবর পাঠালে এবং ডুনিয়া আপ্রাণ তার সেবা করতে লাগল। পোষ্ট মাষ্টারের সামনে রোগী মোটেই কথাবার্ত্তা কইত না, বরং যন্ত্রণায় কাতর হ'য়ে

পড়ত, কিন্তু আড়ালে সে বেশ রীতিমত দু'কাপ কফি গলাধঃকরণ করলে এবং সর্ব্বদাই যেন তৃষ্ণায় ছট্‌ফট্ করছে এমনি ভাব দেখাতে লাগল। ডুনিয়া তার এই অবস্থা দেখে নিজে হাতে লেমনেড্ তৈরী করে তার মুখের কাছে বারে বারে ধরছিল এবং প্রতিবারই রোগী নিঃশেষে সেটা পান করে এবং ডুনিয়ার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছিল।

দুপুরের দিকে ডাক্তার এল। সর্ব্বাঙ্গ পরীক্ষা করে জার্ম্মান ভাষায় কিসব জিজ্ঞেস পত্র করে রুশ ভাষায় জানালে যে, কিছুই হয় নি, দু'একদিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিলেই সে সুস্থ হয়ে উঠবে। রোগী একথা শুনে তাঁকে পঁচিশ রুবল্ দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক কৃতজ্ঞতা-গদ্‌গদ্ ভাষায় তাঁকে আহারের নিমন্ত্রণ জানালে। ডাক্তার রাজী হ'ল এবং ফূর্ত্তি সহকারে ভোজন ও মদ্য পান সমাপন করার পর সহাস্য-বদনে বিদায় নিলে।

আর একদিন কাটতেই রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল সেদিন সে যেন অতিরিক্ত প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে, বারে বারে শিস্ দিচ্ছে ডুনিয়া ও পোষ্ট মাষ্টারের সঙ্গে মুহুর্ম্মুহু হাসি-ঠাট্টা চালাচ্ছে এবং অতিরিক্ত কর্ম্মতৎপর হয়ে পোষ্ট মাষ্টারের কয়েকটা কাজ করে দিচ্ছে। এইভাবে সে এত বেশী ঘনিষ্ঠতা পাতিয়ে নিলে যে পরের দিন সকালে সে জানালে যে তাদের ছেড়ে তার আর যেতে ইচ্ছা করছে না। দিনটা ছিল রবিবার। ডুনিয়া গীর্জ্জায় প্রার্থনায় যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। যাই হোক্ আর বেশী দিন থাকা চলে না দেখে আগন্তুক বিদায় নিয়ে গাড়ীতে গিয়ে উঠল। যাবার সময় পোষ্ট মাষ্টারকে প্রচুরভাবে পুরস্কৃত করলে এবং তাদের আতিথেয়তার জন্য বারে বারে ধন্যবাদ জানালে; ডুনিয়ার কাছ থেকেও সে মৃদু-হাস্যে বিদায় নিলে এবং তাকে গাড়ী করে গীর্জ্জা পর্য্যন্ত পেঁৗছে দিতে চাইল। ডুনিয়া কিন্তু এ প্রস্তাবে কেমন ইতস্ততঃ করতে লাগল, কিন্তু তার বাবা বলে উঠল—ভয় কি মা, যাও উনি ত আর বাঘ-ভালুক নন যে খেয়ে নেবেন। অগত্যা ডুনিয়া গাড়ীতে গিয়ে উঠল এবং কোচ্‌ম্যান গাড়ী ছেড়ে দিলে।

কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার হচ্ছে যে, ডুনিয়া চলে গেলে পর বেচারী পোষ্ট মাষ্টার কিছুতেই ভেবে পেলে না যে, কি করে সে ডুনিয়াকে কোন অপরিচিত যুবকের সঙ্গে পাঠাতে পারে। কোন্ শয়তান তখন তার উপর ভর করেছিল যাতে সে অমন অন্ধ হয়ে গেল? আধ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই তার মনটি এতই অস্থির হয়ে উঠল যে সে নিজেই গীর্জ্জার দিকে ছুটল। গিয়ে দেখলে যে প্রার্থনা শেষ করে লোকজন তখন একে একে ফিরছে, কর্ম্মচারীরা সব বাতি নিভিয়ে দিচ্ছে—কিন্তু ডুনিয়াকে সেখানে পাওয়া গেল না। পাদ্রীকে জিজ্ঞেস করে জানলে যে ডুনিয়া আজ এখানে আসে নি। উত্তর শুনে তার সর্ব্বশরীর বিষিয়ে উঠল, কোন মতে টলতে টলতে সে বাড়ী ফিরে এল। একবার ভাবলে হয়ত বোকা মেয়ে তার পরের ষ্টেশনে তার এক আত্মীয় থাকেন সেখানেই গিয়েছে। অস্থির-লাগল। সারাদিনের মধ্যে কেউ ফিরল না, অবশেষে সন্ধ্যার সময় সেই কোচম্যান এসে জানালে যে ডুনিয়া ঐ যুবকটির সঙ্গে চলে গেছে।

মারাত্মক সংবাদ! পিতার পক্ষে তা হৃদয়ভেদীই বটে। মর্ম্মান্তিক আঘাতের পীড়ায় সে বিছানা নিলে। এখন তার মনে হ'ল যে যুবকটির অসুখের ব্যাপারটা সব মিথ্যা—একটা ছল নিষ্ঠুর প্রতারণামাত্র। পূর্ব্বে যে ডাক্তারটিকে ডাকা হয়েছিল, এবারও তাকে ডাকা হ'ল। সে এসে সব শুনে জানালে যে, এইরকম আশংকা তাকে দেখবামাত্রই সে করেছিল কিন্তু ভয়ে সে কিছু বলতে পারে নি। তার এই ভাষণ কিন্তু বেচারী পোষ্ট মাষ্টারকে কোন সান্ত্বনাই প্রদান করলে না। অসুখ থেকে সেরে উঠেই সে দু'মাসের ছুটি নিলে এবং একাই তার কন্যার খোঁজে বেরুল। ঘোড়ার অর্ডারের আদেশপত্র থেকে সে জানতে পেরেছিল যে যুবকটির নাম হচ্ছে মিনিস্কি—সে হ'ল অশ্বারোহী সৈন্য দলের ক্যাপ্টেন, সমোলেস্ক থেকে সেণ্ট্ পিটার্সবার্গ-এ যাচ্ছে। কোচম্যান এটুকু জানিয়েছিল যে, ডুনিয়া তার সঙ্গে চলে গেছে বটে কিন্তু সারাটা পথ সে বিষণ্ণ ছিল। তার থেকে বেচারী এই ভাবলে যে সে নিজে গিয়ে বুঝিয়ে শুঝিয়ে মেয়েকে ফিরিয়ে আনতে পারবে। তদনুসারেই সে সেণ্ট পিটার্সবার্গ-এ গিয়ে এক বন্ধুর বাসায় আস্তানা নিলে এবং ঠিক করলে যে মিনিস্কির বাসায় সে নিজে গিয়ে দেখা করবে।

পরের দিন প্রত্যুষেই সে মিনিস্কির বাড়ী গিয়ে দারোয়ানকে জানালে যে, সে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা করতে চায়। দারোয়ান অগ্রাহ্যভরে জবাব দিল যে, ক্যাপ্টেন এগারোটার সময় ঘুম থেকে ওঠে তার আগে দেখা হয় না। ব্যথিতচিত্তে পোষ্ট মাষ্টার তখন চলে গেল, কিন্তু ঠিক এগারোটার সময় আবার উপস্থিত হ'ল। মিনিস্কি এবার নিজেই বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলে—কি চাও তুমি?

মিনিস্কিকে দেখেই তার চোখে জল ভরে এসেছে ও বক্ষে দ্রুততর স্পন্দন সুরু হয়েছে; কোনরকমে জানালে—ইওর এক্‌সেলেন্সি, ভগবানের দোহাই আমায় বাঁচাও।

কথা শুনে মিনিস্কি একবার চমকে উঠে তার দিকে ভালভাবে তাকালে, তারপর ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে তার হাত ধরে তুলে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলে। বৃদ্ধ পোষ্ট-মাষ্টার তখন অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে জানালে—ইওর একসেলেন্সি! যা'হবার তা হয়েছে, কিন্তু এবার আমার ডুনিয়াকে ফিরিয়ে দাও। তাকে নিয়ে যথেষ্ট ছেলেখেলা করেছ, আর তার ভবিষ্যৎ নষ্ট কর না।

একটু চুপ করে থেকে ক্যাপ্টেন জবাব দিলে 'রাগ ক'র না, আমি তাকে ভালবাসি। আমি তোমার কাছে অপরাধী, তার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করছি। কিন্তু ডুনিয়াকে আমি ছাড়তে পারব না। আমি কথা দিচ্ছি, সে আমার কাছে সুখে থাকবে, সে আমায় ভালবাসে। এই বলেই সে ওর হাতে কি একটা গুঁজে দিয়ে চকিতে তাকে রাস্তায় বার করে এনে দরজা বন্ধ করে দিলে।

ভেবে পেলে না যে কি করে কি ঘটে গেল। তারপর জামার আস্তিনের দিকে লক্ষ্য করে দেখলে যে একতাড়া কাগজ সেখানে গোঁজা রয়েছে—সেটা বার করে খুলে বুঝলে যে তা ১০ রুবলের নোটের বাণ্ডিল। এবার তার চোখে জল ভরে এল—জ্বালাময়ী বেদনার অশ্রু। সে নোটগুলোকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে তা'পা দিয়ে পিষে মাড়ালে এবং তারপর সে স্থান ত্যাগ করলে। কিছু দূরে গিয়ে কি ভেবে সে আবার পূর্ব্বস্থানে ফিরে এল, কিন্তু তখন নোটগুলো একেবারে অদৃশ্য হয়েছে। তার ইচ্ছা হচ্ছিল যে, সে ঐ ঘৃণিত স্থান ত্যাগ করে কিন্তু ডুনিয়ার সঙ্গে শেষ দেখা করবার লোভ সে সম্বরণ করতে পারলে না। তাই কৌশলে ডুনিয়া কোন বাড়ীতে থাকে সে জেনে নিলে এবং তার দ্বারে গিয়ে হাজির হ'ল।

দরজা বন্ধ, সে ঘণ্টাধ্বনি করলে। কয়েক সেকেণ্ড একটা আশংকাজনক নিস্তব্ধতা ঝুলে রইল, তারপর দরজা খোলার শব্দ হ'ল। পরিচারিকা বেরিয়ে আসতেই সে শুধোলে—এ্যাওদোতিয়া ক্যাম্‌সুনোভ্‌না কি এইখানে থাকে?

হ্যাঁ। কি চান আপনি? পরিচারিকা জানালে।

সে কিছু না বলে ভেতরে ঢুকে যেতে লাগল। পরিচারিকা তাকে বার বার বাধা দিয়ে উচ্চৈঃস্বরে বললে—আপনি সেখানে যেতে পাবেন না, তাঁর ঘরে লোক আছে। ও তার কোন মানা শুনলে না, সরাসরি ঢুকে গেল। প্রথম দু'খানা ঘর অন্ধকার, তৃতীয়টিতে আলো জ্বলছে। সেই ঘরের খোলা দরজার সামনে গিয়ে সে থমকে দাঁড়াল। দেখলে যে একটি কারুকার্য্যখচিত মূল্যবান কোচে মিনিস্কি বসে আছে, তারই সামনে ডুনিয়া—যেন ঠিক সৌন্দর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি মিনিস্কির দিকে কোমলভাবে তাকিয়ে সে তার চম্পকাঙ্গুলীর সাহায্যে আপন অলকগুচ্ছ নিয়ে খেলা করছিল, অভিজাত বেশভূষায় তখন তাকে কি সুন্দরই না দেখাচ্ছিল। পোষ্ট মাষ্টার স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ইতিমধ্যে কার যেন পদশব্দ পেয়ে ডুনিয়া চাকত হয়ে উঠেছিল, তবুও মুখ না তুলেই সে জিজ্ঞেস করলে—কে ওখানে?

পোষ্টমাষ্টার কোন জবাব করলে না।

জবাব না পেয়ে সে ঘাড় তুলে দরজার দিকে তাকালে। কিন্তু পোষ্টমাষ্টারকে দেখেই সে একটা আর্ত্তনাদ করে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল। মিনিস্কি কিছু না বুঝতে পেরে তাকে তুলে ধরতে গেল কিন্তু দরজার দিকে দৃষ্টি পড়াতে সে ওকে ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে এল। কুপিত স্বরে দাঁত খিঁচিয়ে বললে—কি চাও তুমি? আমায় কি তিষ্ঠিতে দেবে না? একদিন বলে দিয়েছি না যে আমার এখানে আর এস না। তারপর মিনিস্কি চুপ করে থেকে ওর ঘাড় ধরে ধাক্কা মারতে মারতে ওকে রাস্তায় বার করে দিয়ে বললে—বেরোও এখান থেকে।

একটা মর্ম্মান্তিক মনঃকষ্ট নিয়ে বেচারী ফিরে এল। তার বন্ধু তাকে মিনিস্কির বিরুদ্ধে নালিশ ঠুকে দিতে বললে কিন্তু সে কিছুই করলে না, শুধু আবার তার পুরাতন চাকুরীতে হাজিরা দিলে।

* *

এই কাহিনীই আমার কাছে সে ব্যক্ত করেছিল—অশ্রুময় বেদনার ইতিহাস।

কয়েক বছর পরে আবার একবার আমি সেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন শরৎকাল, ধূসর মেঘমালা সারা আকাশ ছেয়ে রয়েছে, একটা ঠাণ্ডা বাতাস দু'পাশের ক্ষেতের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল। সেই পুরাতন পোষ্টমাষ্টারের বাড়ীর কাছে গিয়ে যখন আমি হাজির হলাম তখন সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে। আমার পদশব্দ শুনে একজন মোটাসোটা স্ত্রীলোক বেরিয়ে এসে উঠানটাতে দাঁড়াল—উঃ, মনে পড়ে এইখানটায় দাঁড়িয়ে সুন্দরী ডুনিয়া আমায় একদিন চুমু দিয়েছিল। আমার প্রশ্নের জবাবে স্ত্রীলোকটি যা জানালে তার সারমর্ম্ম হচ্ছে যে, প্রায় বছরখানেক পূর্ব্বে ঐ পোষ্টমাষ্টার মারা গিয়েছে, এখন ঐ বাড়ীতে একজন শুঁড়ী বাস করছে এবং সে নিজে হচ্ছে তারই স্ত্রী।

সংবাদ শুনে আমি দুঃখিত হলাম, আরও কষ্ট পেলাম এই জন্য যে, আমার সাত রুবল খরচা করে আসা একেবারে বৃথাই গেল। তবুও এমনি জিজ্ঞেস করলাম—কিসে সে মারা গেল?

—অত্যধিক মদ খেয়ে। জবাব এল।

—কোথায় তার সমাধি রচিত হয়েছে?

—ঠিক তার স্ত্রীর সমাধির পাশেই।

—আমায় কি সেখানটা কেউ দেখিয়ে দিতে পারে?

—কেন পারবে না হুজুর। ওরে অ-অ জ্যাঙ্কা, জ্যাঙ্কারে এদিকে আয় ত বাপ্। এই ভদ্রলোককে গোরস্থানে নিয়ে গিয়ে পোষ্টমাষ্টারের কবরটি দেখিয়ে দে ত।

কথা শুনেই একটা এক চোখ কাণা ছোঁড়া আমার নিকট হাজির হল এবং আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

—হ্যারে, তুই পোষ্টমাষ্টারকে চিনতিস ত?

—কেন চিনব না হুজুর। তিনি যে কতদিন আমাদের বাদাম কিনে খাইয়েছেন।

—কোন বিদেশী লোক কি এপথে যেতে যেতে তার কথা জিজ্ঞেস করে?

বিদেশী লোক ত এখন এপথে কম যায় হুজুর। একজন এ্যাসেসর যায় বটে, তা তিনি ত কোনদিন জিজ্ঞেস করেনি। তবে গ্রীষ্মকালে একজন মেয়েলোক এসে কবর দেখতে গিয়েছিল বটে।

—কি রকম দেখতে রে তাকে? আমি আগ্রহভরে শুধোলাম।

—খুব সুন্দর দেখতে গো। ছ'ঘোড়ার গাড়ী করে সে এসেছিল, সঙ্গে তার তিনটি ছেলে ও একটা কালো কুকুর। পোষ্টমাষ্টার মরে গেছে শুনে সে খুব কাঁদতে লেগেছিল, তারপর ছেলেগুলিকে বসিয়ে রেখে সে কবর দেখতে গেল। আমি তেনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে চাইলাম; তা তিনি

(শেষাংশ ৭১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

'নববার্ষিকী'র কথার শেষ জবাব

শ্রীবর্নবিহারী গুপ্ত

সজনীবাবুর "শেষ কথা" পড়িলাম। ১২৮৩ বঙ্গাব্দের নববার্ষিকী দেখাইবার যে চ্যালেঞ্জ আমি দিয়াছিলাম সজনীবাবু তাহাকে মুদ্রাকর প্রমাদ বলিয়া ধরিয়া লইয়া উহা ১২৮৪ বঙ্গাব্দের হইবে স্থির করিয়াছেন। কিন্তু উহা যে মুদ্রাকর প্রমাদ নহে, তাহা আমার স্বহস্ত-লিখিত পাণ্ডুলিপি (যাহা আপনাদের কাছে আছে) তাহা হইতেই প্রমাণিত হইবে। আমার ১২৮৪ বঙ্গাব্দকে চ্যালেঞ্জ করিবার নাই, কারণ আমি সজনীবাবুর প্রত্যুত্তরেই স্বীকার পাইয়াছি যে, "নববার্ষিকী" ১৮৭৭ খৃঃ ৭ই জুলাই অর্থাৎ ১২৮৪ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল। সে সম্বন্ধে সজনীবাবুর নজীর ছাড়াও আমার নিজের নজীর দিয়াছি। তদনুসারে প্রথম-বর্ষের নববার্ষিকীতে ১২৮৪ বঙ্গাব্দের পাঁজিকা থাকাই উচিত ও সম্ভব এবং তাহা হইলে "আত্মনিবেদনে" উল্লিখিত কালবিলম্বজনিত পঞ্জিকার মূল্য কমিয়া যাওয়ার সম্বন্ধে যে বিবৃতি আছে, তাহার অর্থ হয়; ১২৮৭ পাঁজিকায় তাহা হয় না। তবে আমি যে বলিয়াছিলাম আমার খানি প্রথম বর্ষের, তাহা ভাবিবার সংগত কারণও আছে। আত্মনিবেদনের প্রমাণের উপর নির্ভর করিলে উহাই ঠিক মনে হয়, কেবল গোল বাধে পঞ্জিকার মূল্যহীনতা সম্বন্ধে উক্তিতে। সেজন্য প্রথমবার প্রত্যুত্তরে আমি বলিয়াছিলাম যে, "টাইটেল পেজ না থাকাতে আমি নিঃসন্দিগ্ধ নহি।" আমার সন্দেহের কারণই ওই উক্তি।

পরে যখন আমি "ইণ্ডিয়ান মিরার" পত্রে নববার্ষিকীর সমালোচনাতে সূচী দেখিলাম এবং ব্লুমহার্ডে দেওয়া পত্রাংক ৪, ২৭০, ৫ দেখিলাম এবং তাহার সহিত আমার সূচী ও পত্রাঙ্ক মিলিয়া গেল, তখনই নিঃসন্দেহে বুঝিলাম যে, "নববার্ষিকী" মাত্র একবারই মুদ্রিত হইয়াছিল; পরে পাঁজিকা যাহাতে নিরর্থক না হয়, সেজন্য কেবলমাত্র পাঁজিকার অংশ পুনর্মুদ্রিত হইয়া ওই অংশ পরিবর্ত্তিত করিয়া গ্রাহক-দিগকে দেওয়া হইতে থাকে। সে হিসাবে আমার বিবেচনায় যাহা সংগত বোধ হইয়াছিল, তাহা ঠিক। উহা একই সংস্করণ কেবল পাঁজিকাংশ পুনর্মুদ্রিত।

কিন্তু মিরারের সমালোচনা হইতে আমি নিঃসংশয়ে জানিতে পারিয়াছি যে, ব্রজেন্দ্রবাবু কথিত ১২৮৩ বঙ্গাব্দের কোনও "নববার্ষিকী" ছিল না, থাকিতে পারে না। কারণ ১৮৭৭ জুলাই-এ প্রকাশিত, ১২৮৪ বঙ্গাব্দের 'নববার্ষিকীর' সমালোচনা প্রসংগে 'মিরার' বলিতেছেন—

"This is the result of the first attempt ever made to supply the people of Bengal with a book of general information written in Bengali."

কাজেকাজেই ১২৮৪ বঙ্গাব্দের খানিই "the first attempt ever made" সে বিষয়ে আমার সন্দেহের অবকাশ-মাত্র ছিল না।

অথচ ব্রজেন্দ্রবাবু বলিলেন, "নববার্ষিকীটি ১৮৭৬-৭৭ খৃষ্টাব্দের ও সজনীবাবু বলিলেন যে, "ব্রজেন্দ্রবাবু বলেন, ১৮৭৬-৭৭ খৃষ্টাব্দের (১২৮৩ বঙ্গাব্দের) নববার্ষিকী তিনি দেখিয়াছেন।"

এই ১২৮৩ বঙ্গাব্দের "নববার্ষিকী" দেখাই আমি অস্বীকার করি এবং তাহাই দেখাইতে চ্যালেঞ্জ করিয়াছি।

আমার প্রথম হইতেই তর্ক ১২৮৩ বঙ্গাব্দের "বার্ষিকী" লইয়া, ১২৮৪ বঙ্গাব্দে যে উহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা তো আমি স্বীকারই করিয়াছি।

প্রথম তর্ক তুলিলেন ব্রজেন্দ্রবাবু। তিনি লিখিলেন যে, "এই নববার্ষিকীটি ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের নয়, ১৮৭৬-৭৭ খৃষ্টাব্দের" এবং তাহার জন্য প্রমাণস্বরূপ ১২৮৩ বা ১২৮৪ বঙ্গাব্দের পাঁজিকার কথা উল্লেখ না করিয়া ৩ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত এই ১২৮৩ বৎসরের উপর ঝোঁক দিলেন। এই ১২৮৩ বৎসর যাহা চলিতেছে, এইরূপ অর্থ না হইয়া এই ১২৮৩ বৎসর যাহা গত হইয়া গেল ইহা ধরার কোনও অন্তরায় নাই। কাজেকাজেই এই ১২৮৩ বৎসর ৩ পৃষ্ঠায় উক্ত এই বাক্যটি হইতে ১৮৭৬-৭৭ খৃষ্টাব্দ প্রমাণিত হয় না। সুতরাং আমি উত্তরে লিখিলাম "ব্রজেন্দ্রবাবু প্রকৃত ঐতিহাসিকের ন্যায় অন্যান্য পৃষ্ঠাগুলি পাঠ করিলে" তাঁহাকে ভ্রমে পতিত হইতে হইত না, এবং দৃষ্টান্তস্বরূপ পুস্তকের ২৬৫ পৃষ্ঠা, ১৯৬ পৃষ্ঠা ও ২৬৯ পৃষ্ঠায় যে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের যে মাসের ঘটনার সংবাদ আছে, তাহা উল্লেখ করিয়া দেখাই যে, ব্রজেন্দ্রবাবুর দেওয়া প্রকাশকাল ঠিক হইতে পারে না। সজনীবাবু বা ব্রজেন্দ্রবাবু ওই পাতাগুলির সংবাদ সম্বন্ধে নিরুত্তর, তাহা হইতে ধরিয়া লইতে পারি যে, সে সংবাদ অন্ততঃ সজনীবাবুর পুস্তকে আছে। সজনীবাবু "আনন্দবাজার পত্রিকা" অফিসেও স্বীকার করিয়াছেন যে, তাহা আছে। কিন্তু বাদানুবাদে কুত্রাপি সে কথার উল্লেখ না করিয়া এবং ব্রজেন্দ্রবাবুর ভুল হইয়াছে, তাহা স্বীকার না করিয়া সজনীবাবু জোরের সহিত বলিলেন যে, ব্রজেন্দ্রবাবু ১২৮৩ বঙ্গাব্দের বার্ষিকী দেখিয়াছেন। তাঁহার খানিই যে ব্রজেন্দ্রবাবু দেখিয়াছেন এবং দুজনের দেখা বই এক, ইহা বলেন নাই। বরং যেভাবে বলিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যে, দুখানা স্বতন্ত্র পুস্তক। কারণ সজনীবাবু প্রথম বলিলেন যে, "ব্রজেন্দ্রবাবু বলেন যে তিনি ১৮৭৬-৭৭ খৃষ্টাব্দের (১২৮৩ বঙ্গাব্দের) নববার্ষিকী দেখিয়াছেন।" তাহার অল্প পরেই বলিতেছেন যে, "আমার সম্মুখে একটি "নববার্ষিকী" রহিয়াছে।" ইহাতে কি বোঝায় না যে, দুইটি বার্ষিকী স্বতন্ত্র? ব্রজেন্দ্রবাবুর সেই স্বতন্ত্র বার্ষিকীর অস্তিত্বে আমি সন্দিহান। তর্ক উঠিবে যে, ১২৮৪ বঙ্গাব্দের পাঁজিকা ও ১৮৭৬-৭৭ ঘটনা সম্বলিত বার্ষিকীই ১২৮৩ বঙ্গাব্দের বার্ষিকী। কিন্তু বার্ষিকীর যে রীতি প্রচলিত ছিল ও আছে, তাহাতে যে বর্ষের বার্ষিকী সেই বর্ষের পাঁজিকা ও পূর্ব্ব বৎসরের ঘটনা থাকাই স্বাভাবিক। সে হিসাবে ১২৮৩ বঙ্গাব্দের বার্ষিকীতে ১২৮৩ পাঁজিকা ও ১৮৭৫-৭৬-এর ঘটনা থাকিবে। কিন্তু সজনীবাবুর

দেখানো বার্ষিকীতে ১২৮৪ বঙ্গাব্দের পাঞ্জিকা ও ১৮৭৬-৭৭ ঘটনা তো আছেই, উপরন্তু ৭৭-৭৮-এর ঘটনার যে মাস পর্যন্ত আছে। উহা কোনও মতেই ১২৮৩ বঙ্গাব্দের বার্ষিকী নহে। উহা ১৮৭৬-৭৭ প্রকাশিতও হয় নাই। এই হিসাবে ব্রজেন্দ্রবাবুর ভ্রম হইয়াছে। আমার ভ্রম আমি প্রথম হইতেই স্বীকার পাইয়াছি। ব্রজেন্দ্রবাবু ও সজনীবাবু ব্রজেন্দ্রবাবুর ভ্রম স্বীকার করিতেছেন না। আমি ১২৮৪ যে বার্ষিকীর প্রকাশকাল তাহা পূর্বেই স্বীকার করিয়াছি; কিন্তু দুইটি প্রত্যুত্তরেই জোরের সহিত বলিয়াছি যে, ব্রজেন্দ্রবাবুর তারিখ ভুল। এখনও তাহাই বলিতেছি। শেষে হয়তো তর্ক উঠিবে, আমি সজনীবাবুর প্রসঙ্গে 'তিনি নাকি একখানি বার্ষিকী পাইয়াছেন, এই কথা কেন বলিলাম? এই কথা হইতে সন্দেহ প্রকাশ করা হয় মাত্র। চ্যালেঞ্জের ভাষা "না কি" দিয়া হয় না। তাহা হইলে আমি লিখিতাম "সজনীবাবু বলিতেছেন তাঁহার খানিতে ১২৮৪ বঙ্গাব্দের পাঞ্জিকা আছে, তাহা থাকা সম্ভব নহে। তিনি উহা দেখাইবেন কি?"

কিন্তু "না কি" এই কথা দ্বারাই অস্তিত্ব সম্ভাবনা, কিন্তু সজনীবাবুর নিকট তাহা থাকা সম্বন্ধে সন্দেহ দ্যোতনা করিতেছে। কিন্তু তাহা করিলেও সে সম্বন্ধে আমার চ্যালেঞ্জ নহে। আমার চ্যালেঞ্জ ১২৮৩ বঙ্গাব্দের ব্রজেন্দ্রবাবু কথিত "বার্ষিকী" সম্বন্ধে। উহা মুদ্রাকর প্রমাদ নহে এবং তাহার অন্তরালে ব্রজেন্দ্রবাবুর ভ্রম ঢাকা পড়িবে না। সজনীবাবু তাঁহার দ্বিতীয় বক্তব্যে বলিয়াছেন আমি কেন এই সহজ কথাটি বুঝিতে পারিতেছি না যে আমার পুস্তকখানি পরের কালের? আমিও বুঝিতে পারিতেছি না যে, যে সজনীবাবু তাঁহার ও আমার পুস্তকের তিনের পাতা, ১১৬ পাতা, ২৬৫ পাতা ও ২৬৯ পাতার অদ্ভুত মিল দেখিয়াও ও পঞ্চানন কাহিনী, মরেল কাহিনী, রামমোহনস্ ওয়াইফ প্রভৃতি অংশ যাহা আমা কর্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার মিল দেখিয়াও বুঝিতে পারিতেছেন না যে এই দুই পুস্তক একই সংস্করণ, কেবল পঞ্জিকাংশ আমার পুস্তকে পুনর্মুদ্রিত মাত্র; ইহা ভিন্ন পাতার পর পাতার এরূপ অদ্ভুত মিল সম্ভবপর হইতে পারে না।

তাঁহার তৃতীয় কথা বিপিনবাবুর সম্পর্কে। সজনীবাবু কি করিয়া তাঁহার খণ্ডিত পুস্তক হইতে নিঃসংশয়ে ধরিলেন যে তাঁহার পুস্তকে—"আত্মনিবেদন" ছিল না? ব্লুমহার্ড বর্ণিত পুস্তকারম্ভের পূর্বে চার ও পরে পাঁচটি ক্রোড়পত্রাঙ্ক তাঁহার খণ্ডিত পুস্তকে আছে কি? আমার পুস্তকখানি কোন্ প্রেসে মুদ্রিত তাহাও সজনীবাবু জানেন কি প্রকারে? ভিক্টোরিয়া প্রেসের মালিক বিপিনবাবুকে পুস্তক রচনায় সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ দিলে কি প্রমাণ হয় যে পুস্তকটি ভিক্টোরিয়া প্রেসে মুদ্রিত?

সজনীবাবুর ন্যায়শাস্ত্র অনুসরণে আমি অসমর্থ।

তবে প্রথম সংস্করণ অর্থাৎ যাহা নিঃসংশয়ে ৯ই জুলাই ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে বাহির হইয়াছে, তাহাও যে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত, তৎসম্বন্ধে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তি ব্যতীত আরও প্রমাণ দিতেছি।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে 'ইণ্ডিয়ান্ মিরার' বলিতেছেন যে '

"We are the more glad to welcome this publication as it is written by a Brahmo, and one whose hands are tolerably full with other kinds of patriotic works",

ও কুমারী কলেট তাঁহার Year book এর ৩৫ পাতায় বলিতেছেন যে,—

"A work which is evidently both useful and original, by a gentleman whose name is wellknown in Calcutta Brahmo circles."

বিপিনবাবু যদিও ব্রাহ্ম ছিলেন, তথাপি "wellknown in Brahmo circles" ও "whose hands are tolerably full with other kinds of patriotic works." এই কথাগুলি তাঁহার সম্বন্ধে ঠিক খাটে না, কিন্তু ভারত সভা (Indian Association) ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম স্থাপয়িতা ও নেতা দ্বারকানাথ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত বোধ হয়।

প্রথম বর্ষের পুস্তকের যে মুখপত্র ছিল তাহার প্রমাণ দিতেছি। 'Indian Mirror' বলিতেছেন,

"The writer in a modest preface truly admits this, (deficiencies) and disarms all hostile criticisms."

সজনীবাবু কর্তৃক প্রদর্শিত পুস্তকে এই মুখবন্ধটি আছে কি? আমার পুস্তকের কিন্তু "আত্মনিবেদন" এইরূপ একটি মুখবন্ধ আছে। সজনীবাবু ক্যালকাটা গেজেটে বিপিনবিহারী রায়কে পুস্তক প্রকাশকরূপে পাইয়াছেন, কিন্তু গ্রন্থপ্রণেতা তাঁহাকেই স্থির করিলেন কেন, তাহার উত্তর এবারও না দিয়া এখনও তর্ক করিতেছেন। আমার যেটুকু প্রথমে ভুল ছিল প্রথম প্রত্যুত্তর হইতেই তাহা স্বীকার পাইয়াছি, কিন্তু ব্রজেন্দ্রবাবু যে প্রকাশকাল সম্বন্ধে ভুল করিয়াছিলেন ও সজনীবাবু যে প্রকাশককে গ্রন্থপ্রণেতা বলিয়া ভুল করিয়াছেন, ইহা স্বীকার পাইতে এত লজ্জিত হইতেছেন কেন?

আর ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের "নববার্ষিকী"র প্রকাশক দ্বারকানাথ নহেন, তাহাও বিপিনবাবুর রায় প্রেস ডিপসিটারী হইতে প্রকাশিত হয়। তখন বিপিনবাবুর পুস্তকালয় কলেজ ষ্ট্রীটে ছিল।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দের July 15thর Bramho Public Opinion 348 ppতে যে বিজ্ঞাপন আছে তাহা এই, "Naba Barsiki" for 1287 B.S. Price Rupees 1-4-0. To be had at the Roy Press Depository, 14, College Square, Calcutta.

সাহিত্য-সংবাদ

নিখিল ভারত রচনা প্রতিযোগিতা (শিবপুর ভ্রাতৃ-সঙ্ঘ পরিচালিত)

বিষয়ঃ—শরৎ-সাহিত্যে শিশু।

প্রথম পুরস্কার—একটি রৌপ্য কাপ, ২য় পুরস্কার একটি রৌপ্য-পদক।

যে কেহ এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারিবেন। রচনা স্পষ্টাক্ষরে, কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিতে হইবে। বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণ রচনা পরীক্ষা করিবেন। রচনা পাঠাইবার শেষ তারিখ পরিবর্ত্তন করিয়া ৩০শে এপ্রিল করা হইল। কোন বিদ্যালয়ের ছাত্র বা ছাত্রী ১ম পুরস্কারের অধিকারী হইলে তাহাকে একটি অতিরিক্ত পুরস্কার দেওয়া হইবে। রচনা পাঠাইবার ঠিকানাঃ—সম্পাদক, শিবপুর ভ্রাতৃসঙ্ঘ ২০৪, শিবপুর রোড, হাওড়া।

গল্প ও রচনা প্রতিযোগিতা—প্রথম পুরস্কার—সুবর্ণ-পদক। বৈশ্য সাহা ছাত্র সমিতি।

নিম্নলিখিত রচনাগুলির মধ্যে যে কোন একটি স্কুলের ছাত্রদের জন্য নির্দ্ধারিত হইলঃ—

(১) ব্যবসায়ে বাঙালী। (২) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও পরবর্ত্তী জীবন। (৩) ভারতের জাতীয় আন্দোলনে বাঙালীর দান।

কলেজের ছাত্রদের জন্য একটি ছোট গল্প।

নিয়মাবলী

যে কোন বৈশ্য সাহা ছাত্র বা ছাত্রী উক্ত প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারে। স্কুলের ছাত্রদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনার জন্য একটি স্বর্ণ-পদক এবং কলেজের ছাত্রদের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ছোট গল্পের জন্য একটি স্বর্ণ-পদক প্রদত্ত হইবে। ৩০শে জুন, ১৯৩৯ তারিখে অথবা ইহার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত ঠিকানায় লিখিত রচনা ও গল্প পাঠাইতে হইবে। কার্য্যকরী সমিতির সিদ্ধান্তই গ্রাহ্য হইবে। (স্বাঃ) শ্রীঅতীন্দ্রলাল সাহা সম্পাদক, বৈশ্য-সাহা ছাত্র সমিতি। ৮৫, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নিখিল বঙ্গ প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

কেন্দ্রীয় অধ্যয়নাগারের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে নিম্নলিখিত প্রবন্ধ দুইটি নিখিল বঙ্গ প্রতিযোগিতার জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছে। বাঙলা ভাষাভাষী যে কোন ব্যক্তি এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারেন।

১। সাহিত্যে সমালোচকের স্থান—সর্ব্বসাধারণের জন্য।

২। চরিত্র গঠনে সদ্‌গ্রন্থের প্রভাব—স্কুলের ছাত্রদের জন্য।

প্রবন্ধ পরিষ্কারভাবে কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া হইবে। ছাত্রগণ তাহাদের স্ব স্ব বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নিদর্শনপত্র সঙ্গে পাঠাইবেন। প্রবন্ধ ফেরৎ চাহিলে উপযুক্ত ডাক টিকিট সঙ্গে পাঠান বাঞ্ছনীয়।

শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র দাস, সম্পাদক, উৎসব কমিটি। কেন্দ্রীয় অধ্যয়নাগার। পোঃ বিক্রমপুর, পাইকপাড়া, ঢাকা।

'ছোট গল্প ও চিত্র প্রতিযোগিতা'

বিদ্যুত সঙ্ঘ হইতে প্রকাশিত হস্তলিখিত 'জাগরণী' পত্রিকার উদ্যোগে একটি ছোট গল্প ও চিত্র প্রতিযোগিতা হইবে। চিত্রটি যে কোন বিষয়ের, তবে চিত্রটির সাইজ ৫" × ৩½" ইঞ্চি হওয়া চাই। গল্পটি মানুষের দারিদ্র্যের চিত্র হওয়া চাই। গল্পটি মৌলিক হওয়া চাই। অনুবাদ চলিবে না। গল্পটি কালিতে এক পৃষ্ঠায় লিখিতে হইবে। গল্পটি ফুলস্কেপ কাগজের আট পৃষ্ঠার মধ্যে হওয়া চাই পাঠাইবার শেষ তারিখ ২৯শে এপ্রিল। শ্রেষ্ঠ গল্পের লেখক ও শ্রেষ্ঠ চিত্রের চিত্রকরকে একখানি করিয়া কাপ দেওয়া হইবে। লেখা ফেরৎ দেওয়া হইবে না। ভাল গল্পগুলি ক্রমে ক্রমে 'জাগরণীতে' প্রকাশিত হইবে। স্ত্রী-পুরুষ বিভেদ নাই। গল্প ও চিত্র পাঠাইবার ঠিকানাঃ—

শ্রীরামানন্দ বসু সম্পাদক জাগরনী, বা শ্রীপ্রদ্যোত গুহ ২৪।১ পটুয়াটোলা লেন।

রচনা প্রতিযোগিতা

আগামী ১৪ই মে, রবিবার, বেলা ১১-৩০টার সময় কালীঘাট হাই স্কুলে, (৫০, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট) "সবুজ শিল্পী-সঙ্ঘের" উদ্যোগে একটি বাঙলা রচনা প্রতিযোগিতা হইবে, বিষয়ঃ—"বর্ত্তমান সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থায় গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন সম্ভব কি না" প্রতিযোগীদিগকে উক্ত স্থানে আসিয়া রচনা লিখিতে হইবে। কেবলমাত্র স্কুলের ছাত্র ও ছাত্রীগণ এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারিবে। কোন প্রবেশ-মূল্য নাই। আগামী ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে ১৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কালীঘাট—এই ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাইতে হইবে। আবেদনপত্রে স্কুলের নাম, বাড়ীর ঠিকানা এবং প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের স্বাক্ষর থাকা চাই। উৎকৃষ্ট রচনার জন্য দুইজনকে দুইটি রৌপ্য নির্ম্মিত কাপ প্রদান করা হইবে। রচনা লিখিবার জন্য কাগজ "সঙ্ঘ" হইতে পাওয়া যাইবে।

শশিভূষণ নন্দী স্মৃতি-সঙ্ঘ
(শ্রী পত্রিকা পরিচালিত)

বিজ্ঞপ্তি

নিখিল বঙ্গ রচনা প্রতিযোগিতা (শ্রী পত্রিকা পরিচালিত) শশী স্মৃতি-সঙ্ঘের সাহিত্য শাখার উদ্যোগে বৈশাখ মাসের শেষ সপ্তাহে একটি রচনা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পুরুষ ও মহিলা নির্ব্বিশেষে নিখিল বঙ্গের যে কেহ যোগদান করিতে পারিবেন এবং প্রত্যেকেরই একাধিক রচনা পাঠাইবার অধিকার থাকিবে। কোনও রচনা ফেরত দেওয়া হইবে না এবং রচনার স্বত্ব সঙ্ঘের থাকিবে। বিশিষ্ট সাহিত্যিকবৃন্দের উপর ইহার বিচারকার্য্যের ভার অর্পণ করা হইয়াছে। (১) যে কোনও বিষয়ে একটি কবিতা, (২) যে কোনও বিষয়ে একটি মৌলিক ছোট গল্প, (৩) যে কোনও বিষয়ে একটি প্রবন্ধ। প্রত্যেক বিষয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীকে পদক ও পুস্তকাদি প্রদত্ত হইবে। রচনার দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে

কোনও বিশেষ নিয়ম নাই। আগামী ২০শে বৈশাখের পূর্ব্বে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট রচনাদি পেঁছান আবশ্যক। বিস্তৃত বিবরণ জানিতে হইলে এক আনার ডাকটিকিট সহ সম্পাদকের সহিত পত্র ব্যবহার করুন, সঙ্ঘের বিচারই চূড়ান্ত, এ বিষয়ে কোনও বাদ-প্রতিবাদ চলিবে না।

(স্বাঃ) শ্রীউপেন্দ্রকুমার নন্দী, সম্পাদক, সাহিত্য শাখা শশিভূষণ নন্দী স্মৃতি-সঙ্ঘ ১১, গঙ্গাপ্রসাদ মুখার্জ্জি রোড. পোঃ ভবানীপুর, কলিকাতা।

প্রতিযোগিতার ফলাফল

(শিবপুর সাহিত্য-চক্র)

শিবপুরে সাহিত্য-চক্রের (৪৮৬/১, সারকুলার রোড শিবপুর, হাওড়া) তরফ হইতে যে রচনা প্রতিযোগিতা বাহির করা হইয়াছিল, তাহার ফলাফলঃ—১। প্রথম হইয়াছেন শ্রীসুধাংশুকুমার বিশ্বাস (পাটনা), ২। দ্বিতীয় হইয়াছেন শ্রীশিবশঙ্কর মুখোপাধ্যায় (বনগাঁও), ৩। তৃতীয় হইয়াছেন শ্রীসচ্চিদানন্দ ঘোষ (বালি)।

শ্রীসুধীরকুমার মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক।

প্রতিযোগিতার ফলাফল

গত ১৯শে চৈত্র বরাহনগর সচিত্র ত্রৈমাসিক দীপ্তি পুঁথি পত্রিকার বার্ষিক মিলনোৎসবে রচনা প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা করা হইয়াছে।

গল্প ও প্রবন্ধে—অধ্যাপক শ্রীযুত জিতেশচন্দ্র গুহ এম-এ, বি-এল (বিদ্যাসাগর কলেজ), কবিতায়—শ্রীযুত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ সাহা, চিত্র ও ফটোয়—শ্রীযুত কালী দত্ত (আর্টিষ্ট এণ্ড ফটোগ্রাফার), আবৃত্তিতে—কবিরাজ শ্রীযুত বসন্তকুমার রায়, বিদ্যারত্ন, শ্রীযুত নরেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ দে।

প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পাইয়াছেন,—প্রবন্ধে—শ্রীরঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়, কাশীপুর। গল্পে—শ্রীদুলালচন্দ্র সরকার, আলমবাজার। কবিতায়—কুমারী রেণুকা সরকার, বরাহনগর। চিত্রে—শ্রীগোপীনাথ চন্দ্র, বরাহনগর। ফটোয়—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা। আবৃত্তিতে—(প্রথম) শ্রীগণপতি দত্ত, বরাহনগর, (দ্বিতীয়) শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ পাল, বরাহনগর, (বিশেষ) শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বরাহনগর।

পুস্তক পরিচয়

ভাই বোনঃ—২য় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা। সম্পাদক—শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু। বার্ষিক—দুই টাকা, প্রতি সংখ্যা তিন আনা। কার্য্যালয়—৭নং নন্দন বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা "ভাই বোন", প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা সব দিকেই সুন্দর হইয়াছে। চিত্রসম্ভারে উৎকর্ষ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইল। ছেলেমেয়েরা "ভাই বোন" পাইয়া খুসী হইবে।

ভারতবর্ষ বৈশাখ, ১৩৪৬—শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুত সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায় যুগ্ম সম্পাদনায় বৈশাখের "ভারতবর্ষ" প্রকাশিত হইয়াছে। ফণীন্দ্রবাবু একজন প্রবীণ সংবাদপত্রসেবী, সুলেখক হিসাবে তাঁহার খ্যাতি আছে। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও এবিষয়ে কৃতবিদ্য ব্যক্তি, বৈশাখের "ভারতবর্ষ" ইঁহাদের সম্পাদনায় নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। "আধুনিক বিজ্ঞান ও হিন্দু ধর্ম্ম", "বিজ্ঞানের পরিস্থিতি ও দর্শন" সারগর্ভ রচনা—দিলীপকুমারের "ভূস্বর্গ দর্শন" সুখ পাঠ্য। স্নেহ-স্মৃতি—কবিশেখর কালীদাস রায়ের রচনাটি সুন্দর।

দক্ষিণেশ্বর মহাতীর্থে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের লীলাতত্ত্ব, প্রথম ভাগ। শ্রীশশিভূষণ সামন্ত প্রণীত। মূল্য ১৲ টাকা। ৮নং যোগেন্দ্র বসাক রোড, বরাহনগর হইতে প্রকাশিত। লেখকের পিতা ৺পীতাম্বরচন্দ্র সামন্ত দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দিরের বহু দিন ভাণ্ডারী ছিলেন। লেখক তাঁহার পিতৃদেবের সহিত দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটীতে বাল্যকালে অবস্থান করিতেন। তিনি এই সময় ঠাকুরের লীলা যেভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, এই পুস্তকে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। লেখা সরল এবং ভাষা প্রাঞ্জল। অনেক নূতন কথা আছে। আমরা ইহার অন্যান্য ভাগগুলি দেখিবার জন্য আগ্রহান্বিত থাকিলাম।

পোষ্টমাষ্টার

(৭০৯ পৃষ্ঠার পর)

বললে কি যে তিনি সব চেনে গো। আর আমায় অমনি পাঁচ কোপেক্ দিলে।

আমরা এতক্ষণে গোরস্থানে এসে পড়েছিলাম। একটা খোলা যায়গা। কোন পাঁচিল নেই, সীমানা নেই। ছায়া করবার জন্য একটা গাছ পর্য্যন্ত নেই। এধারে ওধারে ভাঙাচোরা ক্রুশগুলো পড়ে রয়েছে। এরকম অযত্ন লাঞ্ছিত শ্রীহীন গোরস্থান জীবনে আমি কখনও দেখিনি।

একটা ঢিপির ওপর উঠে কাণা ছোঁড়াটা বললে—এইটাই হল ওর কবর।

—মেয়েটি এইখানেই এসেছিল, নারে? আমি শুধোলাম।

হ্যাঁ হুজুর। আমি তেনাকে দূর থেকে দেখলাম যে, এখানটায় অনেকক্ষণ পড়ে রইল। তারপর গাঁয়ের মধ্যে গিয়ে পুরুত ডেকে তার হাতে কিছু টাকা দিয়ে আবার গাড়ী চড়ে চলে গেল। যাবার সময় আবার আমায় পাঁচ কোপেক্ দিলে। কী চমৎকার মেয়ে গো!

কথা শুনে আমিও ছেলেটাকে পাঁচ কোপেক প্রদান করলাম। এর পর আর আমি কখনও সাত রুবল খরচার জন্যে দুঃখ-প্রকাশ করিনি।

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "বড়দিদি" উপন্যাস অবলম্বনে তোলা "বড়দিদি" ছবিখানি নিউসিনেমায় দেখান হইতেছে। নিউ থিয়েটার্স এই ছবিখানি তুলিয়াছেন এবং শ্রীযুত অমর মল্লিক ছবিখানি পরিচালনা করিয়াছেন। বিভিন্ন ভূমিকায় পাহাড়ী সান্ন্যাল, মলিনা, চন্দ্রাবতী, যোগেশ চৌধুরী, শৈলেন চৌধুরী, মেনকা, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্ম্মল বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, অহি সান্ন্যাল প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন।

প্রথম পরিচালক হিসাবে শ্রীযুত অমর মল্লিক মহাশয় আশাতীত সাফল্য লাভ করিয়াছেন। অভিনেতা হিসাবে তিনি ইতিপূর্ব্বে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন; পরিচালক হিসাবেও আজ তিনি যে খ্যাতি লাভ করিলেন তাহা উত্তরোত্তর বিস্তৃত হইবে বলিয়া আমরা আশা করি। নিষ্ঠার সহিত দরদ দিয়া তিনি ছবিখানি তুলিয়াছেন; কোথাও বাহাদুরী দেখাইবার চেষ্টা করেন নাই। সেই জন্য ছবিখানি আমাদের এত ভাল লাগিয়াছে।

ছবিখানি ভাল হওয়ার আর একটি কারণ এই যে, যে সমস্ত চরিত্রে শরৎচন্দ্র 'বড়দিদি' উপন্যাস গড়িয়া তুলিয়াছেন অভিনেতা অভিনেত্রীগণ সেই সমস্ত চরিত্রের যথাযথ ও চমৎকার রূপ দিয়াছেন। পাহাড়ী সান্ন্যালের সুরেন্দ্রের যে প্রতিচ্ছবি আমরা পর্দ্দার উপর দেখিলাম তাহা আমাদিগকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করিয়াছে। শ্রীযুত পাহাড়ী সান্ন্যাল যে এমন অপূর্ব্ব অভিনয় করিতে পারেন তাহা আমাদের ধারণারও অতীত ছিল। শ্রীমতী মলিনা বড়দিদি চরিত্রের নিখুঁত রূপ দিয়াছেন। শান্তির ভূমিকায় শ্রীমতী চন্দ্রাবতীর অভিনয়ও আমাদের বিশেষ ভাল লাগিয়াছে। ব্রজবাবুর ভূমিকায় যোগেশ চৌধুরী, মনোরমার ভূমিকায় মেনকা, মনোরমার স্বামীর ভূমিকায় ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, নিমুর ভূমিকায় নির্ম্মল বন্দ্যোপাধ্যায় ও মথুরবাবুর ভূমিকায় ইন্দু মুখোপাধ্যায় সমগ্র ছবিখানিকে ফুটাইয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছেন। ছবিখানির মধ্যে যে কোন দোষ নাই তাহা নহে, তবে সেগুলি এমন কিছু নহে যাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। ছবির সম্পাদনা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। ফটোগ্রাফী উল্লেখযোগ্য। রেকর্ড ও সংগীত পরিচালনা নিউথিয়েটার্সের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারে নাই। অজয় ভট্টাচার্য্য, জীবনময় রায় ও পশুপতি চট্টোপাধ্যায় রচিত গানগুলি সুরচিত হইলেও সুগীত হয় নাই।

নিউ থিয়েটার্সের 'রজতজয়ন্তী' চিত্রের একটি দৃশ্যে শ্রীযুত প্রমথেশ বড়ুয়া। শ্রীযুত বড়ুয়া ছবিখানি পরিচালনা করিতেছেন।

উত্তরায় যখের ধন

ইষ্ট ইন্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীর "যখের ধন" ছবি উত্তরা চিত্রগৃহে দেখান হইতেছে। শ্রীযুত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের "যখের ধন" আখ্যানভাগ অবলম্বনে ছবিখানি তোলা হইয়াছে। শ্রীযুত হরি ভঞ্জ পরিচালনা করিয়াছেন। বিভিন্ন ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী, শীলা হালদার, রবি রায়, জানকী ভট্টাচার্য্য, জহর গাঙ্গুলী, সুশীল রায়, কুমার মিত্র, মনোজ ঘোষ, রাধারাণী, শিশুবালা, ছায়া, নিভাননী, সুহাসিনী প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন।

ছবিখানি আমাদের ভাল লাগে নাই এবং কোনদিক দিয়া ছবিখানিকে প্রশংসা করিবার মত কিছুই নাই। পরিচালক এই ছবির মধ্যে নূতন কিছু দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাহা পারেন নাই। তাহার কারণ তাঁহার ক্ষমতা সংকীর্ণ এবং নূতন কিছু করিতে গেলে যে দূরদর্শিতার প্রয়োজন তাহা তাঁহার নাই।

ভাল অভিনয় কাহারও হয় নাই; তবে ইহার মধ্যে জহর গাঙ্গুলীর নাম একটু করা যাইতে পারে। সুশীল রায়ের অভিনয় করার কোন ক্ষমতাই নাই। অন্যান্য অনেক নামজাদা অভিনেতা অভিনেত্রী থাকিলেও তাঁহাদের অভিনয়-নৈপুণ্য দেখাইবার কোন সুযোগই দেওয়া হয় নাই। ফটোগ্রাফী, রেকর্ডিং অথবা সংগীত পরিচালনা কোনটিই প্রশংসনীয় নহে।

বিশ বৎসরের অধিককাল হইতে ওয়াটারপোলো খেলা বাঙলাদেশে প্রচলিত হইয়াছে। এই দীর্ঘ বিশ বৎসরের মধ্যে ধীরে ধীরে এই খেলাটি বাঙলায় জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। বড় বড় শহর হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রামাঞ্চলেও এই খেলার উৎসাহ দেখা যাইতেছে। দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার ফলে বাঙালী খেলোয়াড়গণ এই খেলায় উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ভারতের মধ্যে বাঙ্গলাদেশের ওয়াটারপোলো খেলোয়াড়গণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বোম্বাই, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশে এই খেলার বিপুল উৎসাহ পরিলক্ষিত হইলেও বাঙলায় ওয়াটারপোলো খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড এত উচ্চ স্তরে উঠিয়াছে যে ঐ সকল প্রদেশের খেলোয়াড়গণকে সেই স্তরে উঠিতে হইলেও আরও কয়েক বৎসর সাধনা করিতে হইবে। গত দশ বৎসরের ওয়াটারপোলো খেলার ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে এই দীর্ঘ দশ বৎসরের মধ্যে কোন খেলাতেই কোন প্রাদেশিক ওয়াটারপোলো দল, বাঙলার দলকে পরাজিত করিতে পারে নাই। বাঙালী ওয়াটারপোলো খেলোয়াড়গণের এই কৃতিত্ব খুবই আনন্দদায়ক ও উৎসাহবর্দ্ধক। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাঙালী খেলোয়াড়গণের এই গৌরব চিরস্থায়ী করিবার জন্য এই প্রদেশে কোন ব্যবস্থাই হয় নাই। অব্যবস্থার মধ্যেও এতদিন যে বাঙলার গৌরব রক্ষা পাইয়াছে তাহা কেবল কয়েকজন একনিষ্ঠ ওয়াটারপোলো খেলোয়াড়গণের জন্যই সম্ভব হইয়াছে। এই সমস্ত একনিষ্ঠ বাঙালী খেলোয়াড়গণ একে একে অবসর গ্রহণ করিতেছেন। এই জন্যই গত দুই তিন বৎসর হইতে বাঙলার ওয়াটারপোলো খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড নিম্নগামী হইতেছে বলিয়া দেখা যাইতেছে। সুতরাং যে ভাবে বাঙলার ওয়াটারপোলো খেলাটি পরিচালিত হইতেছে সেই ভাবে যদি চলিতে থাকে, তবে আমাদের আশঙ্কা হয়, দুই তিন বৎসরের মধ্যেই বাঙালী খেলোয়াড়গণের এই গৌরবজনক স্থান পাঞ্জাব বা বোম্বাইর খেলোয়াড়গণ দ্বারা অধিকৃত হইবে। গত দুই তিন বৎসর হইতেই আমরা এই বিষয়ে ওয়াটারপোলো খেলা পরিচালকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু কোন ফল হয় নাই। বোধ হয় এখনও পর্য্যন্ত অন্য প্রদেশের খেলোয়াড়গণকে এই খেলায় পরাজিত করিতে পারিতেছেন বলিয়াই তাঁহারা এইরূপ নিশ্চিন্ত আছেন। কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে, পরিচালকগণকে শীঘ্রই এই নিশ্চিত ভাব ত্যাগ করিতে হইবে। বোম্বাই প্রদেশের খেলোয়াড়গণই তাঁহাদের জ্ঞান সঞ্চারের কারণ হইবে। উক্ত প্রদেশের খেলোয়াড়গণ উক্ত খেলায় যেরূপ দ্রুত উন্নতি করিতেছেন তাহাতে দুই তিন বৎসরের মধ্যেই বাঙলার খেলোয়াড়গণকে ইহাদের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইবে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহা যাহাতে না হয় এই জন্যই আমাদিগকে পুনরায় বাঙলার ওয়াটারপোলো খেলা পরিচালকগণকে, খেলার ক্রম অবনতির কথা স্মরণ করাইয়া দিবার প্রয়োজন হইল।

সম্প্রতি ওয়াটারপোলো খেলার মরসুম আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং এই বৎসরেও ওয়াটারপোলো খেলার উন্নতির ব্যবস্থা করিবার সময় অতিবাহিত হয় নাই। এখন হইতেই যদি তাঁহারা কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হন তবে আমরা জোর করিয়াই বলিতে পারি যে মরসুমের শেষে তাঁহারা অন্ততপক্ষে গত বৎসর অপেক্ষা বাঙালী খেলোয়াড়গণ খেলায় উন্নতি করিয়াছেন বলিয়া দেখিতে পাইবেন। অর্থাভাব এই ব্যবস্থার অন্তরায় হইবে বলিয়া তাঁহারা যদি মনে করেন তবে আমরা বলিব ভুল করিবেন। বাঙলার ওয়াটারপোলো খেলা বর্ত্তমানে যে স্তরে আছে তাহার উন্নতির জন্য অর্থের প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন কেবল অভিজ্ঞ প্রবীণ খেলোয়াড়গণের সম্মিলিত আলোচনাপ্রসূত নির্দ্দেশ। তাঁহারা খেলার মাঠ হইতে অবসর গ্রহণ করিতে পারেন কিন্তু খেলার কৌশল তাঁহারা ভুলিয়া যান নাই। তাঁহাদের একত্র করিলেই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই খেলার অভাবনীয় উন্নতি পরিলক্ষিত হইবে ইহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। জাপান, আমেরিকার সন্তরণ উন্নতির ইতিহাস আমাদিগকে এই আদর্শ দান করিয়াছে। আমরা মূর্খ, তাই সেই আদর্শ ভুলিয়া বহু ব্যয়সাধ্য বৈদেশিক শিক্ষকের কথা মাঝে মাঝে স্মরণ করিয়া থাকি। বৈদেশিক শিক্ষক আনাইলে যে ফল ভাল হইবে না তাহা নহে, তবে আমাদের দেশের আর্থিক অবস্থার কথা স্মরণ করিয়াই আমাদের ঐ চিন্তা ত্যাগ করা উচিত। আমরা দরিদ্র, সুতরাং দারিদ্র্যের মধ্য হইতে যেভাবে উন্নতি করিতে পারা যায় সেই চিন্তাই আমাদের করা উচিত। পরিচালকগণের কথা ছাড়িয়া দিলেও খেলোয়াড়গণ কি করিয়া যে নিশ্চিন্ত আছেন ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। কারণ আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, তাঁহারা খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড যে পড়িয়া যাইতেছে তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। সুতরাং জানিয়া শুনিয়াও নিশ্চেষ্ট থাকার কোন সার্থকতা আছে বলিয়া আমরা জানি না। দীর্ঘ সময় সর্ব্বদেশের খেলাধূলার ইতিহাস আলোচনা করিয়া আমরা দেখিয়াছি সম্মান হইতে বঞ্চিত হইবার পূর্ব্বে আপ্রাণ চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু বাঙলার খেলোয়াড়গণ সে নিয়মের বাহিরে। পরাজয়-কালিমা মুখে লেপন করিতে হইবে ভাবিয়াও তাঁহারা লজ্জা অনুভব করিতেছেন না।

সাপ্তাহিক সংবাদ

১১ই এপ্রিল—

আরামবাগ মহকুমার কোন কোন গ্রামে খাজনা বন্ধ আন্দোলন সুরু হওয়ায় হুগলীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সভা, শোভাযাত্রা প্রভৃতি নিষিদ্ধ করিয়া সমগ্র আরামবাগ মহকুমায় ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারা অনুসারে এক আদেশ জারী করিয়াছেন। ইহা দুই মাসকাল বলবৎ থাকিবে। উক্ত খাজনা বন্ধ আন্দোলনে যোগদান করার অভিযোগে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও হুগলী জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও হুগলী জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত অতুলাচরণ ঘোষ ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১০৭ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছেন।

এলাহাবাদ মিউনিসিপ্যাল মিউজিয়ামে চারি হাজার টাকা মূল্যের একটি সোনার কাস্কেট চুরি হইয়া গিয়াছে। গত ১৯৩৭ সালে সিঙ্গাপুরের ভারতীয়গণ পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে এই কাস্কেটটি উপঢৌকন দিয়াছিলেন।

পাটনার মধুবনী মহকুমার অন্তর্গত বশিষ্ঠ গ্রামে ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের ফলে প্রায় ৬ শত বাড়ী ভস্মীভূত হইয়াছে, ৪ জন আগুনে পুড়িয়া মারা গিয়াছে এবং আর ৭ জন গুরুতররূপে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে।

হিন্দু মহাসভার সেনাপতি বাপাত হায়দরাবাদ সত্যাগ্রহ সম্পর্কে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

যুক্তপ্রদেশ গবর্ণমেণ্টের নিষেধাদেশ অমান্য করিয়া 'তাব্বারা' আবৃত্তি সম্পর্কে সিয়াদিগের আন্দোলন ক্রমশ শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে। এই উপলক্ষে প্রায় দুই শত সিয়া গ্রেপ্তার বরণ করিয়াছে। প্রকাশ, সিয়া সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগুরু মৌলবী নসী হোসেন মুসলিম লীগের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য সিয়া সম্প্রদায়ের উপর এক 'ফতোয়া' জারী করিয়া সিয়াগণকে মুসলিম লীগ দল বর্জ্জন করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। এই ফতোয়া জারী হওয়ায় মুসলিম লীগের সিয়া সদস্যগণ বিষম ফাঁপরে পড়িয়াছেন। সিয়াগণ পূর্ব্বাপরই পৃথক নির্ব্বাচনের বিরোধী। তাহারা কোনও লাভের বা রক্ষাকবচের দাবী না করিয়াই কংগ্রেসে যোগ দিয়াছে এবং যুক্ত নির্ব্বাচনের পক্ষে আন্দোলন করিতেছে।

ওমমণ্ডলীর বিরুদ্ধে আন্দোলন যতই তীব্র হউক, উহা সিন্ধু প্রদেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে। নুবাক নামক স্থানে দাদা লেখরাজের ন্যায় অপর এক ব্যক্তি একটী মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এ পর্য্যন্ত ৩০ জন বিবাহিতা রমণী গৃহত্যাগ করিয়া মণ্ডলীতে যোগদান করিয়াছে। সেখানেও আন্দোলন সুরু হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সম্রাট সাহ-জাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা কর্ত্তৃক লিখিত সিয়েরুল আস্রার নামক এক ফার্সী পুস্তকের একটি সুন্দর পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়াছেন। উহা হিন্দুদের উপনিষদের ফার্সী অনুবাদ, উহা ভারতে দুষ্প্রাপ্য। কথিত হয় যে, উপনিষদের চর্চ্চা করিবার উদ্দেশ্যে দারা কাশীর যে অংশ বর্ত্তমানে দারানগর নামে পরিচিত সেই অংশে বাস করিতেন। প্রায় দেড়শত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাঁহাকে উপনিষদ অনুবাদে সাহায্য করিয়াছিলেন।

১২ই এপ্রিল—

কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ রায় ও মিঃ মহাতাপউদ্দীন খাঁ যথাক্রমে রংপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ার-ম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

স্যার আবদুল হালিম গজনবী কেন্দ্রীয় পরিষদের মুসলিম-লীগ দলের সদস্য পদ ত্যাগ করিয়াছেন।

বোম্বাইয়ে হায়দরী কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হয় এবং যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের নূতন সর্ত্ত-নামার খসড়া ও যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক বিলি-ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা হয়।

কাণপুরে একটি হিন্দু যুবককে হত্যার অভিযোগে একটি মুসলমান কনেষ্টবলকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

লক্ষ্ণৌয়ের সাঝোয়া গ্রামে আগুন লাগায় দশজন লোক অগ্নি-দগ্ধ হইয়া মারা গিয়াছে।

নদীয়া জেলার দামুরহুদা থানার অন্তর্গত চিথিলা ও গোবিন্দ-হুদা গ্রামে আগুন লাগিয়া ৫০টি গৃহস্থের ১৫০ খানি ঘর ও ধানের গোলা ইত্যাদি সমস্ত আসবাবপত্রাদি ভস্মীভূত হইয়াছে। অনুমান ১০ হাজার টাকার উপর ক্ষতি হইয়াছে।

তিরানায় গণ-পরিষদের প্রথম অধিবেশনে স্থির হইয়াছে যে, ইটালীর রাজাকে আলবানিয়ার সিংহাসনে অভিষিক্ত করা হইবে।

রোমে সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, গ্রীসের সীমান্ত রক্ষায় ইতালী প্রতিশ্রুতি দিয়াছে।

১৩ই এপ্রিল—

লাহোরে তিন সপ্তাহ কাল যাবৎ কিষাণ সত্যাগ্রহ চলিতেছে। এ পর্য্যন্ত মোট ৫৩৮ জন কিষাণকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

পটুয়াখালী সার্কেলের পুলিশ ইন্সপেক্টার এরফানুদ্দিন আমেদকে কিছুদিন পূর্ব্বে চাকুরী হইতে সসপেণ্ড করা হইয়াছিল। গত রবিবার দঃ বিঃর ৩৭৬ ধারা অনুসারে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

হিন্দু নারীর বিবাহ-বিচ্ছেদের বৈধ অধিকার সাব্যস্ত করিবার জন্য ডাঃ দেশমুখের বিল লইয়া কেন্দ্রীয় পরিষদে একদফা আলোচনা হইয়া গিয়াছে। আগামী সিমলা অধিবেশনে পুনরায় উহার আলোচনা হইবে।

কমন্স সভায় প্রধান মন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেন ইউরোপের বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেন যে, গ্রীস ও রুমানিয়াকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করার জন্য ব্রিটেন প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। ফ্রান্সও অনুরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছে।

১৪ই এপ্রিল—

বাঙলার নানা স্থানে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। বহরমপুরের সেন্ডা গ্রামে শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী ও একটি আট বৎসর বয়স্ক পুত্র অগ্নিদগ্ধ হইয়া মারা গিয়াছে। মেহেরপুরের নিকটবর্ত্তী সোনাখালি গ্রামে একটি তরুণীর জীবনান্ত হইয়াছে।

ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য চুক্তির সর্ত্তাবলীর উপর ভিত্তি করিয়া রচিত একটি বিলের আলোচনার জন্য বাণিজ্য-সচিব মহম্মদ জাফরুল্লা অদ্য কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক প্রস্তাব উত্থাপন করিলে তাহা ৩৯—৫৪ ভোটে অগ্রাহ্য হইয়া যায়। কংগ্রেসী দল এবং কংগ্রেস জাতীয় দল প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেন, পক্ষান্তরে মুসলিম লীগ দল নিরপেক্ষ ছিলেন। স্যার আব্দুল হালিম গজনবী (ইনি মুসলিম লীগ পার্টি হইতে সম্প্রতি পদত্যাগ করিয়াছেন) গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ভোট দেন।

পলিটিক্যাল এজেণ্ট মেজর ব্যাজালগেটের হত্যার মামলা সম্পর্কে আরও ৭ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

লক্ষ্ণৌয়ে সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া প্রকাশ্যভাবে 'তাব্বারা' পাঠ করায় অদ্য মোট ৫০৬ জন সিয়াকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত ২২ শত সিয়াকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ, গবর্ণমেণ্টের নীতির প্রতিবাদে এলাহাবাদ জেলের সিয়াগণ অনশন ধর্ম্মঘট করিবে বলিয়া ভয় দেখাইতেছে।

স্যার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের দক্ষিণ আফ্রিকা সফর শেষ হইয়াছে। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ইংলণ্ডে রওনা হইয়া গিয়াছেন।

বার্লিনে সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, শীঘ্রই স্পেনের পশ্চিমে আটলাণ্টিক মহাসাগরে জার্ম্মান নৌ-বহরের এক মহড়া হইবে। এই সম্পর্কে 'রয়টার' অবগত হইয়াছেন যে, ঐ সময় দুই একখানি রণতরীর ভূমধ্য সাগরে প্রবেশেরও সম্ভাবনা আছে।

১৫ই এপ্রিল—

ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য চুক্তির উপর রচিত টেরিফ বিল বড়লাটের সুপারিশ অনুযায়ী আকারে আজ আবার কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে আসে। গতকল্যকার ন্যায় আজও বিলটি ৩৭—৫০ ভোটে অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে।

রাজকোটের সংবাদে প্রকাশ যে, শাসন সংস্কার কমিটিতে মুসলমান প্রতিনিধি সুপারিশ করা সম্পর্কে দীর্ঘ ছয় দিনব্যাপী মহাত্মা গান্ধীর সহিত মুসলমান প্রতিনিধিদের যে আলোচনা চলিতেছিল তাহা ব্যর্থ হইয়াছে।

কটক হইতে খবর আসিয়াছে যে, গত ১০ই এপ্রিল হইতে ঢেনকানল জেলের রাজনৈতিক বন্দিগণ পুনরায় অনশন ধর্ম্মঘট সুরু করিয়াছে।

হায়দরাবাদ হইতে খবর পাওয়া গিয়াছে যে, নিজাম সরকার সত্বরই হায়দরাবাদ রাজ্যে শাসন সংস্কার সম্পর্কে একটি ঘোষণা প্রকাশ করিবেন। প্রকাশ, মহাত্মা গান্ধী রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতেছেন।

'রেঙ্গুন গেজেটের' সম্পাদক মিঃ এইচ স্মাইলস মোটর দুর্ঘটনায় নিহত হইয়াছেন।

বাঙ্গলার নববর্ষ উপলক্ষে কলিকাতার নানাস্থানে উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। এইবার নববর্ষ উপলক্ষে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় কলিকাতা ও হাওড়ার নানাস্থানে বালক-বালিকাদের সম্মিলনী ও কুচকাওয়াজের অনুষ্ঠান হইয়াছিল।

আসামে অহিফেন বর্জ্জন আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে।

১৬ই এপ্রিল—

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু আগামী ২১শে এপ্রিল কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

"আনন্দবাজার পত্রিকা" বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়াছেন যে, যদি রাজকোটের ব্যাপারের নিষ্পত্তি হয়, তবে মহাত্মা গান্ধী আগামী ২৬শে এপ্রিল কলিকাতায় আসিবেন এবং ডাঃ বিধান রায়ের অতিথি-রূপে রিজেণ্ট পার্কে অবস্থান করিবেন।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিলের প্রতিবাদে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সভার নির্দ্দেশে সমগ্র কলিকাতা শহরে হরতাল প্রতিপালিত হয়।

মহাত্মা গান্ধী রাজকোটের শাসন সংস্কার কমিটির জন্য প্রজা পরিষদে ৭জন সদস্যের নাম ঠাকুর সাহেবের নিকট পেশ করিয়াছেন। এই বে-সরকারী কমিটিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের—যথা মুসলমান, ভায়াত ও গিরসীয় সম্প্রদায়ের কাহাকেও গ্রহণ করা হয় নাই বলিয়া তাহারা আন্দোলন সুরু করিয়াছে। মুসলমানরা হরতাল করিয়াছে এবং ভায়াত ও গিরসীয়রা সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিবার ভয় দেখাইতেছে। অদ্য সান্ধ্য উপাসনার পর গান্ধীজী যখন রাষ্ট্রীয় শালা হইতে বাহিরে আসিতেছিলেন, তখন প্রায় পাঁচশত গিরসীয় এবং মুসলমান বিক্ষোভকারী তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলে।

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট হের হিটলার ও সিনর মুসোলিনীর নিকট শান্তি প্রতিষ্ঠার একটি প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছেন। উহাতে তিনি তাঁহাদের নিকট জানিতে চাহিয়াছেন যে, সশস্ত্র জার্ম্মান ও ইতালীয় বাহিনী কতকগুলি স্বাধীন রাষ্ট্রকে আক্রমণ করিবে না বলিয়া তাঁহারা কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন কিনা। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট জানাইয়াছেন যে, শুধু বর্ত্তমান সময়ের জন্যই যে এইরূপ প্রতিশ্রুতির দরকার তাহা নহে, স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা কল্পে যাহাতে সর্ব্বপ্রকার শান্তিপূর্ণ উপায়ের সুযোগ গ্রহণ করা যায়, তজ্জন্য ন্যূনপক্ষে দশ বৎসর কাল এই প্রতিশ্রুতি বলবৎ থাকা প্রয়োজন। তিনি বলিয়াছেন যে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে শান্তির এই প্রতিশ্রুতি আদানপ্রদান ব্যাপারে তিনি মধ্যস্থতা করিবেন।

১৭ই এপ্রিল—

গতকল্য রবিবার শেষ রাত্রি ৩-২৩ মিনিটের সময় কলিকাতা হইতে ৬৬ মাইল দূরে ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের মাজদিয়া ষ্টেশনে নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস এবং ঢাকা মেলের মধ্যে এক ভীষণ সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। দুইখানি ট্রেনই কলিকাতার দিকে আসিতেছিল। নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস মাজদিয়া ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া ৩৬নং ডাউন (পার্শ্বেল এক্সপ্রেস) ট্রেনের আগমন বার্ত্তা পাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। এমন সময় ঢাকা মেলের ড্রাইভার সমস্ত সিগন্যাল অগ্রাহ্য করিয়া ট্রেন চালাইতে চালাইতে তাহার উপর আসিয়া পড়ে। ফলে নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসের দুইখানি লগেজ ভ্যান, তৃতীয় শ্রেণীর একখানি বগী এবং ব্রেক ভ্যান চুরমার হইয়া যায়। ঢাকা মেলের ইঞ্জিন ও দুইখানি মালগাড়ী লাইনচ্যুত হইয়া একটি অপরটির মধ্যে ঢুকিয়া যায়।

এই দুর্ঘটনার ফলে হতাহতের সংখ্যা রেল কর্ত্তৃপক্ষের ইস্তাহারে ২৭ জন নিহত ও ৩১ জন আহত বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীদের অনুমান এই যে, অন্তত ৫০ জন লোক নিহত হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন যে, মৃত্যু সংখ্যা একশত হইতে পারে। ২৭টি মৃতদেহ অদ্য রাত্রে কলিকাতায় আনীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কলিকাতার পথে রাস্তায় একজন ও কলিকাতা ক্যাম্বেল হাসপাতালে অপর একজন আহত ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে।

নেতাদের মধ্যে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য, ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান এবং কংগ্রেসী নেতা শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ মজুমদারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসের গার্ড মিঃ রেনিউও এই দুর্ঘটনায় নিহত হইয়াছেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ব্যানার্জ্জিও ঐ গাড়ীতে ছিলেন। তিনি গুরুতর আহত হইয়াছেন। তাঁহার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

গান্ধীজীর ইচ্ছানুসারে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু কলিকাতায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের তারিখ সামান্য পরিবর্ত্তন ঘোষণা করিয়াছেন। ওয়ার্কিং

কমিটির বৈঠক ২৭শে এপ্রেলের পরিবর্ত্তে ২৮শে এপ্রেল এবং নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির বৈঠক ২৮শে এপ্রিলের পরিবর্ত্তে ২৯শে এপ্রিল তারিখে হইবে।

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধন বিল সম্পর্কে এক বিবৃতি দিয়াছেন। উহাতে এমন ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, বাঙলা গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের যে সংশোধন করিতে চাহিতেছেন, তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য কর্পোরেশনের কংগ্রেসী সদস্যগণ পদত্যাগ করিতে পারেন।

১৪৪ ধারার আদেশ অমান্যের অপরাধে ব্যারাকপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ও শ্রমিক নেতা শ্রীযুক্ত নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার এবং টিটাগড় লেবার ইউনিয়নের সেক্রেটারী ননীগোপাল মুখার্জ্জিকে ৩ মাস করিয়া বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

নববর্ষের উৎসব উপলক্ষে পাইকপাড়া রাজবাটীতে সাহিত্যিকদের এক বিরাট সমাবেশ হয়। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উৎসবের সভাপতিত্ব করেন।

১৮ই এপ্রিল—

মাজদিয়া ষ্টেশনের ধ্বংশস্তূপ হইতে আরও চারিটি মৃতদেহ উদ্ধার করা হইয়াছে, এইগুলিসহ এই পর্য্যন্ত মোট ৩৪টি মৃতদেহ পাওয়া গেল। ধ্বংশস্তূপ অপসারণ করার ব্যবস্থা হইয়াছে। উহার মধ্যে অনেক মৃতদেহ আছে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিতেছেন।

মাজদিয়া ট্রেণ দুর্ঘটনার মৃতদেহগুলি প্রায় ২৪ ঘণ্টা পরে সোমবার শেষ রাত্রে শিয়ালদহ ষ্টেশনে লইয়া আসা হয়। এই মৃত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এ পর্য্যন্ত ষোল জনকে সনাক্ত করা হইয়াছে। নিহত কংগ্রেসনেতা বীরেন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের মৃতদেহ সোমবার রাত্রি তিনটায় শিয়ালদহ হইতে শোভাযাত্রা সহকারে কেওড়াতলা শ্মশান ঘাটে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় বহু কংগ্রেসনেতা ও কর্ম্মিবৃন্দের উপস্থিতিতে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে।

ঢাকা মেলের ড্রাইভার ডব্লিউ জে পিয়ার্সন এবং তাহার দুইজন ফায়ারম্যান সঙ্গীকে রেলওয়ে আইনের ১০১ ধারা (জনগণের নিরাপত্তা বিপন্ন করা) ও ফৌজদারী আইনের ৫৪ ধারা অনুযায়ী গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহাদিগকে ৫০০৲ টাকা করিয়া জামীনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। প্রকাশ এই তিনজন লোক সংঘর্ষের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে ইঞ্জিন হইতে লাফাইয়া পড়িয়াছিল এবং তাহারা কোন প্রকার জখম হয় নাই।

২৪ পরগুণার অন্তর্গত বাজপুর নিবাসী ভূতপূর্ব্ব রাজবন্দী শ্রীযুক্ত পান্নালাল চক্রবর্ত্তী গত সোমবার রাত্রিতে বালীগঞ্জ ষ্টেশনে ট্রেণের তলায় পড়িয়া নিহত হইয়াছেন।

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাত্মা গান্ধীর নিকট এক তার করিয়াছেন। এই তারে তিনি মহাত্মাজীকে ঐকান্তিকভাবে অনুরোধ জানাইয়াছেন যে, তিনি যেন রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত বিভেদ দূর করিয়া দেশকে একটা শোচনীয় অনর্থ হইতে রক্ষা করেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ও ঢাকার কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ব্যানার্জ্জি মাজদিয়া ট্রেণ দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হইয়াছিলেন। অদ্য কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

হের হিটলার ২৮শে এপ্রিল রাইখষ্ট্যাগের অধিবেশন আহ্বান করিয়াছেন। এই সময় তিনি প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের পত্রের কি উত্তর দিবেন, তাহা বিবৃত করিবেন।

প্যারিসের ওয়াকিবহাল মহলের সংবাদে প্রকাশ, রুমানিয়ার প্রয়োজন উপস্থিত হইলে সোভিয়েটের সাহায্য লইতে সম্মত হইয়াছে।

মাল্টা ও জিব্রাল্টারে বৃটিশ ও ফরাসী নৌ-বহরের সমাবেশ হইয়াছে।

বৃটেনের সরকারী নীতি কতকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাশিয়ার দিকে ঝুঁকিতেছে। কারণ দুইটি, প্রথমত তুরস্ক জানাইয়াছেন যে, রাশিয়ার সহায়তা না পাইলে তাহার পক্ষে শান্তি চুক্তিতে যোগ দিবার বিবেচনা করা সম্ভবপর নহে। দ্বিতীয়ত নৌ-বিভাগের বড় কর্ত্তা এবং ইম্পিরিয়াল জেনারেল ষ্টাফের অনেক সদস্য পদত্যাগ করিবেন বলিয়া হুমকি দিয়াছেন।

ডাষ্টবিন

শ্রীশৈলেন গঙ্গোপাধ্যায়

হয়ত বা তুমি বোঝনি কেমন ক্ষুধার জ্বালা,
তাইত জাননা পচা গলা ভাতও লাগিবে কাজে;
রাস্তার ধারে 'ডাষ্টবিনে' যেথা রাবিশ ঢালা
সেথায় দেখিবে ক্ষুধিতেরা যত অন্ন খোঁজে।

কালো কাক চাটে ছেঁড়া পাতা কালো কাদাতে মাখা,
কৃমি-কীট কত কিলবিল করে কেহ না জানে;
হয়ত বা তুমি ঘ্রাণ চেপে রেখে দাঁড়াবে সেথা
কেননা তাহার বিকট গন্ধ বমন আনে।

তবুও দেখিবে তার চারিধারে লেগেছে ভীড়,
মানুষে কুকুরে কাড়াকাড়ি করে মানেনা জাত,
হয়ত দেখিবে তাহাদের কোন বিজয়ী বীর,
সকলের আগে নর্দ্দমা থেকে চাটিছে পাত।

হয়ত সে হীন অন্নে তাদের মিটিবে ক্ষুধা,
অন্নহীনের নয়ন জলের লবণ সহ;
হয়ত বা সেই এঁটো ছেঁড়া পাতে মিলিবে সুধা,
মৃত্যুর সুধা অগণিত রোগ বীজাণুসহ।

কিন্তু কখন ভেবেছ কী তুমি এমন কেন,
পৃথিবীর মাঝে মানুষের ব্যথা এমন কেন;
জগতের মাঝে ক্ষুধার বেদনা এমন যদি,
বসুন্ধরার বুকেতে প্রচুর ফসল কেন।

৬ষ্ঠ বর্ষ]   শনিবার—১লা বৈশাখ ১৩৪৬, Satruday 15th April 1939   [২৪শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন—

কুমিল্লা শহরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের দ্বাবিংশ অধিবেশন হইয়া গেল। মূল সভাপতি স্বরূপে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা নানা দিক হইতে উল্লেখযোগ্য হইয়াছে। সুনীতিকুমারের পাণ্ডিত্য প্রগাঢ়। তাঁহার আলোচনা আগাগোড়া মনস্বিতায় পূর্ণ; বাঙলা ভাষার সম্মুখে বর্ত্তমানে যে সমস্যা দেখা দিয়াছে, তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি প্রকৃতপক্ষে সমগ্রভাবে বাঙলীর জাতীয় সমস্যার উপর আলোক সম্পাত করিয়াছেন। বাঙলা ভাষাকে দ্বিখণ্ডিত করিবার যে অনিষ্টকর প্রয়াস সম্প্রতি দেখা দিয়াছে, তৎসম্বন্ধে সুনীতিকুমার যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, তাঁহার অভিভাষণের সেই অংশই আমরা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য মনে করি।

সুনীতিকুমার বলিয়াছেন—"হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই এতাবৎ মিলিতভাবে একই মাতৃ-ভাষার সেবা করিয়া আসিয়াছে। এই ভাষা সাম্য—ইহা হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে বাঙালী জাতির প্রতি ভগবানের এক বিশেষ করুণা বলিয়া মনে করি।"

অতঃপর তিনি বলেন—"বাঙলা ভাষার প্রকৃতিকে পরিবর্ত্তিত করিতে গেলে, এই ভাষার উপর ভীষণ এক জুলুম হইবে এবং এই পরিবর্ত্তন দুই-এক পুরুষে সম্ভব হইবে না। পুরাতনকে মুছিয়া ফেলিয়া আবার নূতন এক ধারা গড়িয়া তুলিতে হইবে। সেরূপ নূতন কিছু গড়িয়া তুলিবার মত কল্পনা ও শক্তি এবং মানসিক প্রবণতা 'বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যকে ইসলামীয় করিয়া ফেলিতে হইবে' এই মত যাঁহারা পোষণ করেন, তাঁহাদের আছে কিনা জানি না, কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেখানে 'যা খুশী তাই কর' নীতি অবাধে চলিতেছে, সেখানে এই প্রকার মানসিক শক্তি এবং কল্পনার পরিচয় বাঙলা ভাষায় কেহ এখনও দেখান নাই। আরবী ফারসী বহুল বাঙলায় যেখানেই শক্তিশালী মুসলমান লেখক আবির্ভাব হইয়াছে, সেইখানেই তাহার সমাদর হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে সকল বাঙালীর নিকটই হইতেছে। বাঙালী হিন্দুর কাছেও তাহার জনপ্রিয় হইতে বাধা ঘটে নাই।"

সাহিত্যের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতাকে ঢুকাইবার এই যে কৃত্রিম চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে, ইহার সঙ্গে বাঙলার প্রাণ-রস-ধারার কোন যোগ নাই এবং সেই যে রসধারা যাহা সর্ব্বজনীন, তাহার সঙ্গে যে পর্য্যন্ত যোগ না হয়, সে পর্য্যন্ত ভাষার কোন কারসাজীই প্রকৃত সাহিত্য পদবাচ্য হইবার যোগ্য হইতে পারে না। সে চেষ্টা স্থায়ী হয় নাই, স্রোতের শেওলার মত ভাসিয়া চলিয়া যায়। কারণ আমাদের বিশ্বাস এই যে, সাহিত্য একটা জীবন্ত জিনিষ। তাহার একটা প্রকৃতি আছে ও গতি আছে এবং সেই গতি এবং প্রকৃতির অনুকূল উপাদান গ্রহণ করিয়াই তাহা স্ফূর্ত্তি লাভ করে। সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের অনিষ্টকর উদ্যমে বাঙলার সংস্কৃতির এই সর্ব্বজনীন সম্পদ, যাহাতে বিনষ্ট না হয়, সুনীতিকুমার সেজন্য সাহিত্যিক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি বলেন,—"বাঙলাভাষী হিন্দু-মুসলমানের ভাষাগত ঐক্যের হানি যাহাতে না হয়, তাহার জন্য দেশের যথার্থ হিতকামী বঙ্গ সন্তান চেষ্টিত হইবেন; অন্যথায় হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই মহান্ অনর্থ হইবে। আমার মনে হয়, উপস্থিত ক্ষেত্রে ভারতের রাজনৈতিক গগন যেরূপ মেঘাড়ম্বরময়, তাহার কৃষ্ণছায়া আমাদের সংস্কৃতিক জগতেও প্রতিফলিত না হইয়া পারে না। রাজনৈতিক গগন পরিষ্কার হইলে আশা করি, এ বিষয়েও আমাদের দৃষ্টি খুলিবে, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যও নবীন গরিমার দ্বারা উদ্ভাসিত হইবে।"

রাজনীতিক গগনে কৃষ্ণছায়া পড়িয়াছে, পড়িবার কারণও রহিয়াছে প্রচুর। বিরোধী-শক্তি অনবরত কাজ করিতেছে ভারতের রাজনীতিক স্বাতন্ত্র্য বুদ্ধিকে সমাচ্ছন্ন করিবার জন্য। কিন্তু এই যে অন্ধকার ... এই ...

আলো, সেটি আছে সাহিত্যিকদেরই হাতে। আজ বাঙলার সাহিত্যসেবীদিগকে সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক হীন প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিতে হইবে। শিবরাত্রির সলিতার মত বঙ্গ-সন্তান—হিন্দু এবং মুসলমান, বাঙালী বলিতে যাহাদের সকলকে বুঝায়, তাহাদের সংস্কৃতির আদর্শকে সাহিত্য-সাধনার ভিতর দিয়া আগলাইয়া রাখিতে হইবে। সুনীতি-কুমারের অভিভাষণ এই কর্ত্তব্যের দিকে জাতির দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছে।

রাষ্ট্রভাষা ও বাঙলা-

ডাক্তার সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, সাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতি স্বরূপে বাঙলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হইবার যোগ্য কি না, এ সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন,—"ভাষা প্রসার লাভ করে কেবল তাহার সাহিত্যের জন্য নহে, যাহারা কোনও ভাষা ব্যবহার করে, তাহাদের প্রসার-শক্তি, কর্ম্ম-শক্তি এবং অধিকার-শক্তির উপরে সেই ভাষার প্রসার নির্ভর করে, সঙ্গে সঙ্গে যদি সেই ভাষা সরল ও সবল হয়, বিদেশীর দ্বারা সহজে যদি আয়ত্ত করা যায় এবং মানসিক অথবা ভাব-জগৎ সম্পৃক্ত সংস্কৃতির ফলে যদি হয়, তাহা হইলে ত কথাই নাই।"

এই দিক হইতে সুনীতিকুমার বাঙলা ভাষায় রাষ্ট্রভাষা-রূপে সমগ্র ভারত কর্ত্তৃক গ্রহণের যে সব অন্তরায় আছে, তৎপ্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন এবং কতকটা হিন্দুস্থানীর পক্ষই সমর্থন করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমরা সুনীতিকুমারের মত ষোল আনা সমর্থন করিতে পারি না। মানসিক অথবা ভাব-জগৎ সম্পৃক্ত সংস্কৃতি গ্রাহ্য হওয়ার যে গুণটা সুনীতিকুমার রাষ্ট্রভাষায় কতকটা গৌণ গুণরূপে ধরিয়াছেন, আমরা তাহাকেই মুখ্য গুণ বলিয়া মনে করি। শিক্ষা-দীক্ষার সঙ্গে যাহার সম্পর্ক বিশেষ নাই, সেই যে বাজারিয়া হিন্দুস্থানী তাহা আজ পর্য্যন্ত একটা ভাষাস্বরূপেই গড়িয়া উঠে নাই। সেই যে হিন্দুস্থানী তাহার কোন সাহিত্য এখন পর্য্যন্ত নাই; হাটে-বাজারের আন্তঃপ্রাদেশিক ক্ষেত্রে তাহার কিছু মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রভাষা বলিতে যে জিনিষ বুঝায়, সে জিনিষ স্বতন্ত্র পদার্থ—তাহার পিছনে জাতির সংস্কৃতিগত সাধনা এবং ভাব-সম্পদের জোর বিশেষভাবে থাকা আবশ্যক, নহিলে রাষ্ট্রগত যে সব ব্যাপার, সেগুলির সম্পর্কে তেমন ভাষার সাহায্যে ভাবের আদান-প্রদান চলে না। সে সব কাজের জন্য অন্য ভাষাকে অনেক ক্ষেত্রেই বিদেশী ভাষাকে ধার করিয়া আনিয়া একটা জগা-খিচুড়ি সৃষ্টি করিতে হয়। বাঙলা ভাষার পিছনে এই ভাব-সম্পদ এবং সাংস্কৃতিক সাধনা যত বেশী আছে, আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতে পারি, ভারতের অন্য কোন ভাষারই তাহা নাই। বাঙলার নীচেই হইল এই হিসাবে মারাঠী ভাষার স্থান। ভারতবর্ষ যদি সত্যই স্বাধীনতা লাভ করে এবং প্রকৃত ভারতীয়-রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়, তবে রাষ্ট্রভাষা হইবার মর্য্যাদা লাভ করিবার দাবী যে একমাত্র বাঙলা ভাষারই থাকিবে, এ কথা আমরা জোরের সঙ্গেই বলিব। যে হিন্দুস্থানীর কোন সাহিত্য নাই, ভাব-সম্পদ কিছুই নাই, রাষ্ট্র-ভাষার মর্য্যাদা লাভ করিবার শক্তি তাহার থাকিতেই পারে না।

বাঙলার অতীত ও বর্ত্তমান—

বর্দ্ধমান জেলা শিক্ষক সম্মেলনের সভাপতিস্বরূপে অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয় বলিয়াছেনঃ—

"বঙ্গের পল্লীতেও বিদ্যাচর্চ্চার এমন শক্তিশালী কেন্দ্র ছিল যে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে বিদ্যার্থী আসিয়া এখানে বিদ্যাভ্যাস করিত। এমন কি, ভারতের যে অংশকে আমরা পৃথক বলিয়া মনে করি, সেই দক্ষিণ ভারত হইতেও ছাত্র আসিয়া আমাদের চতুষ্পাঠী পুষ্ট করিত। আমাদের পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্য ম্লান হইল কেন, বিষয়ৈষণা আমাদের সকলকে গ্রাস করিল কেন, আমাদের মধ্যে দিগবিজয়ী পণ্ডিতের আর প্রাদুর্ভাব হয় না কেন, তাহা আলোচনা করিয়া বা তাহার জন্য আক্ষেপ করিয়া হয়ত কোনও লাভ নাই। কিন্তু আজকাল যাঁহারা বাঙালীর মস্তিষ্কের অবনতি ঘটিয়াছে বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহার কারণানুসন্ধান করিতে ব্যগ্র হওয়া অসম্ভব বা অসঙ্গত নহে। বিদেশী ভাষার সাহায্যে শিক্ষা করিতে হইলে মানসিক যে বিড়ম্বনা ঘটে, সত্যের সহিত সাক্ষাৎ স্পর্শ থাকে না, তাহাই হয়ত ইহার কারণ। শিক্ষার বাহন লইয়া এই যে অসুবিধা, ইহা যে ভাষা শিক্ষার স্বাভাবিক পটুতা থাকা সত্ত্বেও বাঙালী ছাত্রের পক্ষে শিক্ষালাভের পথে একমাত্র অন্তরায়, সে স্বীকার না করিবার আমি কোন কারণ দেখিতে পাই না।"

মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করিবার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করিয়া সভাপতি বলিয়াছেন—"সুদিন আগত। মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষণীয় বস্তু শিখিতে পারিব, পূর্ব্বে যাহা চোখে ঝাপসা ঠেকিত, এখন তাহা স্পষ্ট দেখিতে পারিব, তাহার ধারণা সহজ হইবে। প্রস্তাবিত—এখন আর শুধু প্রস্তাবিত বলি কেন, গৃহীত ও স্বীকৃত মন্তব্যে কাহারও অসম্মতির কারণ নাই। অবশ্য আমি জানি, কেহ কেহ আশঙ্কা করিতেছেন এরূপ হইলে ভবিষ্যতে কূপমণ্ডুকতা দোষে আমরা দুষ্ট হইব, বহির্জগতের কোন সংবাদই বুঝি আমরা রাখিতে পারিব না। এখনও যে এইরূপ সম্পূর্ণ অযৌক্তিক আপত্তি উঠে, ইহাই অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়।"

বলাবাহুল্য দীর্ঘ পরাধীনতার ফলে জাতির মধ্যে আত্মপ্রত্যয়ের অভাব এবং যে দাসমনোবৃত্তি দেখা দেয়, তাহাই যে ইহার কারণ, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুখের বিষয়, বাঙালী এই দিক দিয়া দাসমনোবৃত্তি কাটাইয়া উঠিতেছে।

সংস্কৃতি ও জনসাধারণ—

অধ্যাপক সেন মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে আরও একটা কথা তুলিয়াছেন। তিনি বলেন,—"বাঙলা ভাষাকে শিক্ষার বাহন করিবার অর্থ এই যে, আমরা সাধারণ জীবনে মাতৃ-

ভাষাকে তাহার প্রাপ্য স্থান দিতে প্রস্তুত আছি। আমাদের পারিপার্শ্বিক ও চিন্তা-জগতের মধ্যে শিক্ষার বাহন হইয়া বিদেশী ভাষা যে কৃত্রিম ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে, যাহার ফলে আমাদের শিক্ষা কৃত্রিম, আমাদের চিন্তা নিস্তেজ, আমাদের সজীবতার কোন লক্ষণ নাই, সেই ব্যবধান আমরা ভাঙিগয়া দিতে প্রস্তুত। সহস্র সহস্র ছাত্র-ছাত্রীর এই যে মানসিক ক্ষতি তাহা আমরা আর হইতে দিব না। কিন্তু বক্তৃতার মঞ্চে ইহাকে স্বীকার করিলেই আমাদের কাজ ফুরাইল না। আমরা যাহাতে কথাবার্ত্তায়, চালচলনে, গত এক শতাব্দী ধরিয়া যে কৃত্রিমতা ক্রমে ক্রমে জাতীয় সংস্কৃতিকে চাপিয়া বসিয়াছিল, তাহা দূর করিতে পারি, তাহা ছাড়াইয়া উঠিতে পারি, সেজন্য আমাদের ব্যক্তিগতভাবে ও সঙ্ঘবন্ধভাবে চেষ্টা করিতে হইবে।'

বর্ত্তমান বাঙলার জাতীয় সংস্কৃতির উপর পরকীয় প্রভুত্বের কৃত্রিমতা কেমন করিয়া আসিয়া পড়িতেছে এবং সেই কৃত্রিমতা কিভাবে ভদ্রসমাজকে জন-জীবন হইতে পৃথক করিতেছে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দত্ত মহাশয় তাঁহার অভিভাষণটিতেও সে কথাটা বলিয়াছেন। তিনি বলেন—

"আমাদের সাহিত্য বিশেষ করিয়া যেন আমাদের শিক্ষিতদেরই সাহিত্য হইয়া উঠিতেছে; উহাতে আমাদের জনসাধারণ কোন তৃপ্তি পায় না। এই উৎসব-ক্ষেত্রে তাহারা যেন অনধিকারী, আমাদের সাহিত্য যেন শিক্ষিতের সাহিত্য, যেন সাহিত্যিক সাহিত্য। * * কারণ, হয়ত এই যে পশ্চিমের পরিবর্ত্তমান জীবন, পরিবর্ত্তমান সাহিত্যের প্রভাবে আমাদের সাহিত্যিকদের দৃষ্টি এতটা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে যে আমাদের সমাজ, আমাদের জীবনযাত্রার বাস্তব রূপ তাহারা আর দেখিতে পান না। এই কারণে তাঁহাদের সৃষ্টির প্রয়াসে দুই রকমের ফাঁকি আসিয়া জুটে—তাঁহারা দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রাকে সাহিত্য বস্তু হিসাবে এড়াইয়া যান, অথবা সমাজের কোন একটি পরগাছাতুল্য অংশকে উপাদানস্বরূপে গ্রহণ করেন। ইহাতে সুবিধা এই যে পরগাছার উপর পরধর্ম্ম আরোপ করিলে ততটা বিভ্রাট ঘটে না, তাই সে পরগাছার জীবনকেও আবার তাঁহারা নিজের মনগড়া কোন একটি কাঠামোতে আঁটিয়া লন। প্রাণরসের যে অভাব ইহাতে অনিবার্য্য তাহার ত্রুটি দূর করিতে চেষ্টা করেন সূক্ষ্মতম বিশ্লেষণ বা নূতনতম বাগ্‌ভঙ্গিমায়। এই সাহিত্য যে মানুষের হৃদয় স্পর্শ করিবে না তাহাতে আর সন্দেহ কি ?"

পাটনা কলেজ বঙ্গ সাহিত্য সমিতির দশম অধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ও তাঁহার অভিভাষণে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিয়াছেনঃ—

সেই সাহিত্যই সাহিত্য পদবাচ্য যাহা সকলকে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করে। এই বন্ধন সাম্যের বন্ধন নহে, ইহা সামঞ্জস্যের বন্ধন। আমরা বাঙলা সাহিত্য ভাল করিয়া পাঠ করি নাই এবং তাহার স্বরূপ খুঁজিয়া দেখিবার প্রয়াস করি নাই। সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সংস্কৃত কিম্বা ইংরাজীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। সংস্কৃত এবং ইংরেজী সাহিত্যের বিষয় আমরা কিছু কিছু জানি। আজকাল আমরা যে সাহিত্য রচনা করি তাহার মধ্যে অনেক সময়ই বাঙলার নিজ স্বভাব ব্যক্ত না হইয়া সংস্কৃত কিম্বা ইংরাজী ভাবই ব্যক্ত হইয়া থাকে। যখন আমরা বাঙলা সাহিত্যের বিচার করিতে বসি তখন আমরা ইংরাজী অথবা সংস্কৃতের মানদণ্ডেই তাহার বিচার করিয়া থাকি। আমি বলিতে চাই যে, ইংরেজী অথবা সংস্কৃত সাহিত্যের ভাব গ্রহণ করিব, কিন্তু তাহা হজম করিয়া তাহাই উদ্গীরণ করিব না—আমরা বাঙলার একান্ত নিজস্ব যে ভাব আছে তাহারই সহিত তাহাকে মিশাইয়া তাহাকে রূপ দিব।'

এই জন্য সাহিত্য-সাধনাকে সার্থক করিতে হইলেও আমাদের মতে আগে দরকার, জাতীয় মর্য্যাদাবোধ এবং তাহাদের মূলে যে জিনিষ—সেই দেশবাসীর প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি, প্রেম বা ঐকান্তিক রকমের প্রাণের টান।

'বন্দে মাতরম্' বিভীষিকা—

'বন্দে মাতরম্' বাঙালীর জাতীয় সঙ্গীত; কিন্তু একদল সাম্প্রদায়িকতাবাদী ইহা লইয়া এখনও অনর্থ সৃষ্টি করিতেছে। নিখিল বঙ্গ ও আসাম মোক্তার সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণের শেষাংশে 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত নয়,—শুধু 'বন্দে মাতরম্' এই শব্দটি থাকাতেই অনেকগুলো লোক অনর্থ সৃষ্টি করিয়াছিল। আমরা জানি, ইহারা অনর্থ সৃষ্টি করিবার মতলবেই আছে; কিন্তু ইহাদের আবদার মত কাজ করিতে গেলে, ইহারা প্রশ্রয়ই পাইবে এবং ক্রমেই ইহাদের কু-মতলব বাড়িয়া যাইবে। কুমিল্লায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে কিছু গোল যে না ঘটিয়াছিল, ইহা নহে। আমাদের মনে হয়, এ সম্পর্কে অভ্যর্থনা সমিতি উপযুক্ত দৃঢ়তা এবং সৎসাহসের পরিচয় প্রদান করিতে পারেন নাই। ছিন্নাংগ 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতের বিধান বাঙালী জাতি মানিয়া লইবে না। সে বিধান যে দিক হইতেই আসুক। বিশেষভাবে যে বাঙলা ভাষার প্রাণশক্তি যোগাইয়াছেন বঙ্কিমচন্দ্র, সেই বঙ্কিমচন্দ্রের সাধন-মন্ত্র 'বন্দে মাতরম্'এর মর্য্যাদা রক্ষায় শিথিলতা যদি কোনভাবে হয়, সাহিত্য সম্পর্কিত সভায়, তবে তাহা যে অত্যন্ত লজ্জাকর ব্যাপার হইয়া পড়ে, এ সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ থাকিতে পারে কি? সুখের বিষয় অভ্যর্থনা সমিতি নিজেদের সৎসাহসের এই অভাবের অবস্থাটা পরে কাটাইয়া উঠিয়াছিলেন এবং অধিবেশনের শেষে 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতটি পুরাপুরিই গীত হইয়াছিল। আমাদের কথা এই যে, এই সাহসটা আগে দেখান উচিত ছিল। যদি তাঁহারা তাহা দেখাইতেন, তবে প্রথম দিককার বিভ্রাট ঘটিত না। তাঁহাদের সেই দুর্ব্বলতার জন্যই মতলববাজ কতকগুলি লোক প্রশ্রয় পায়। এই শ্রেণীর লোকদের প্ররোচনায় সাহিত্য শাখার সভাপতি অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ প্রথম দিনের অধিবেশনে যোগ দিতেই পারেন নাই। সাহিত্য সম্মেলনের ইতিহাসে এ এক অদ্ভুত-

পূর্ব্ব ব্যাপার এবং বাঙলার তথাকথিত জনপ্রিয় মন্ত্রীদের আমলেই দেখিতেছি এমন ব্যাপারও সম্ভব হইল। পরে এই সব মতলববাজদের চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং বহু মুসলমান অধিবেশনে যোগদান করেন। এইরূপ নির্ব্বিঘ্নে কাজ পূর্ব্ব হইতেই চলিত, যদি অভ্যর্থনা সমিতি 'বন্দে মাতরম্' সম্পর্কে দৃঢ়তা অবলম্বন করিতেন।

অনিষ্টকর উদ্যম—

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সম্প্রতি একটি বিবৃতিতে বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, তাঁহারা যেন দেশের স্বার্থ রক্ষার জন্য সর্ব্বদা সজাগ থাকেন এবং আবশ্যক হইলে, সর্ব্বপ্রকার সমস্যার সম্মুখীন হইবার নিমিত্ত প্রস্তুত থাকেন। পণ্ডিত নেহরুর এই সতর্কবাণীতে যে আতঙ্কের আভাষ ছিল, এই আতঙ্ক সত্যই আজ উপস্থিত হইয়াছে। হইবার কারণও রহিয়াছে। ব্রিটিশ জাতির সাম্রাজ্য-স্বার্থ বিপন্ন হইতে বসিয়াছে সকল দিক হইতে। এমন সময় ব্রিটিশ জাতির স্বার্থ শোষণের একমাত্র ক্ষেত্র হইল ভারতবর্ষ; সুতরাং সেই ভারতবর্ষে যে তাহারা নিজেদের ঘাঁটী সকলদিক হইতে পাকা করিতে চেষ্টা করিবে, ইহা সম্পূর্ণরূপেই স্বাভাবিক। যাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, জগতের বর্ত্তমান রাষ্ট্রনীতিক পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ভারতবাসীদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার উদ্দেশ্যে ভারতের শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে উদারতর নীতি অবলম্বন করিবে, আমরা তাঁহাদের যুক্তি কোন দিনই সমর্থন করি নাই; কারণ, ইংরেজ জাতি সে ধাতুতেই গঠিত নয়। তাহারা নিজেরা দায়ে না পড়িলে কাহাকেও নিজেদের হাতে পাওয়া অধিকার ছাড়িয়া দেয় না। ইংরেজের সম্বন্ধে এই ঐতিহাসিক সত্যই আজও সার্থক হইয়া উঠিয়াছে। ভারত সচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড সম্প্রতি পার্লামেণ্টের লর্ড সভায় ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন-সংস্কার আইনের একটি সংশোধন বিল উপস্থিত করিয়াছেন। এই বিলে ভারতবাসীদিগকে নূতন অধিকার কিছু দেওয়া ত হয়ই নাই, বরং যেটুকু দেওয়া হইয়াছিল, তাহার সঙ্কোচ সাধনের উদ্যম করা হইয়াছে। কর্ত্তারা কি করিতে চাহিতেছেন দেখুন—প্রথমত, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ বর্ত্তমানে স্বায়ত্ত-শাসনের নামমাত্র যে অধিকার ভোগ করিতেছেন, প্রস্তাবিত সংশোধন বিল আইনে পরিণত হইলে, যুদ্ধ আরম্ভ হইবা-মাত্র বড়লাট সে সমস্ত অধিকার জরুরী বিধানের জোরে নিজের হাতে লইতে পারিবেন। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট-সমূহের তখন আর শাসন কার্য্যে কোন অধিকার থাকিবে না। দ্বিতীয় প্রস্তাব এই যে, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় এবং আলীগড়ের মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত বিভিন্ন প্রদেশে যে সব বিশ্ববিদ্যালয় আছে, সেগুলি সেই প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের হাতে যাইবে। বর্ত্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙলার মধ্যে হইলেও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্ব বাঙলা সরকারের হাতে নাই। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে, হক মন্ত্রি-মণ্ডলের মনের অভিলাষ পূর্ণ হইবে। তাঁহারা উচ্চ শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ বিলকে এই অন্তরায়ের জন্য কার্য্যে পরিণত করিতে না পারিয়া মরমে মরিয়া আছেন। প্রস্তাবিত বিল পাশ হইলে, সে আইন করিবার এক্তিয়ার তাঁহাদের হাতে আসিবে এবং তাঁহারা মনের সাধ মিটাইয়া কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে নিজেদের সাম্প্রদায়িক নীতি চালাইতে পারিবেন। তাঁহাদের দয়ায় কলিকাতা কর্পোরেশনের স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতা যেমন নষ্ট হইতে বসিয়াছে, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অবস্থাও তেমনই হইবে। তৃতীয় প্রস্তাবটি দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে। এই প্রস্তাব অনুসারে দেশীয় রাজ্য বলিতে ব্রিটিশ-ভারত ছাড়া, শুধু দেশীয় সামন্ত রাজাদের রাজ্য নয়, জমিদারী, জায়গীর প্রভৃতি যত কিছু সব বুঝাইবে; সুতরাং, এই বিধানের বলে, যত ক্ষুদে রাজা-রাজড়া আছেন, তাঁহারা সকলেই আইনত দেশীয় রাজা হইয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের ছত্রছায়াতলে থাকিয়া নিজেদের স্বেচ্ছাচার চালাইতে পারিবেন। দেশের জনমতের বিরোধী আগা-গোড়া এ সব প্রস্তাবই। কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল এই সব প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করিবার জন্য কোন্ শক্তি প্রয়োগ করেন এবং তাঁহারা কিভাবে সে দিকে প্রস্তুত হন বর্ত্তমানে ইহা অন্যতম প্রধান বিবেচ্য বিষয়। এ সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না।

যত দোষ নন্দঘোষ—

গত ৮ই এপ্রিল বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলীম লীগের এক সভায় বক্তৃতা করেন। হক সাহেবের বক্তৃতা বিশেষত মুসলীম লীগের মনের কথা সুতরাং সে বক্তৃতার ধরণ-ধারণ বুঝাইবার বলা আর দরকার হয় না। হক সাহেব মনের সাধে কংগ্রেসকে গালি দিয়াছেন, আর গালি দিয়াছেন বাঙলা দেশের সংবাদপত্র সমূহকে। সংবাদপত্রগুলির প্রধান অপরাধ হইল এই যে, সেগুলির অধিকাংশেরই সম্পাদক হিন্দু এবং এই কাগজ-গুলির সম্পাদক হিন্দু বলিয়াই সেগুলির ভিতর দিয়া অনবরত হক মন্ত্রিমণ্ডলের নিন্দা, শুধু নিন্দা নয়, ভিত্তিহীন নিন্দা প্রচারিত হইয়া থাকে। এখন প্রশ্ন দাঁড়ায় এই যে, হক সাহেব সে কথা বলিয়া থাকেন, যদি সংবাদপত্রগুলি তাঁহার এবং তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডলের বিরুদ্ধে যে-সব কথা বলিয়া থাকে, সেগুলি মিথ্যাই হয়, অর্থাৎ তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার কোন কারণই না থাকে, অন্য কথায়, যদি তাঁহারা জনকল্যাণকর কর্ম্মপ্রণালীই অবলম্বন করিয়া চলিয়া থাকেন, এবং সেইরূপ নীতি অবলম্বন করিবার ফলে জনপ্রিয়ই হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, তাঁহাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা জন-সাধারণের মধ্যে এমনভাবে বিকায় কেন? যদি না-ই বিকাইবে, তবে সম্পাদকেরা যতই দুরভিসন্ধিপরায়ণ হউক না কেন, তাঁহাদের সাধ্য কি আছে যে, তাঁহারা জনসাধারণের মতের বিরুদ্ধতা করিয়া চলিতে পারেন? তেমনভাবে চলিলে কাগজ বিকাইবে না, সম্পাদকদের চাকুরী ত যাইবেই, সঙ্গে সঙ্গে স্বত্বাধিকারীদিগকেও কারবার গুটাইতে হইবে। সংবাদপত্র-সমূহ, বিশেষভাবে, জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলির দোষের ত

মর্য্যাদা লাভ করিবার দাবী যে একমাত্র বাঙলা [illegible]

অন্ত নাই-ই ; যত ইতি পাপং নরোত্তমে চাপং—ইহা ত বুঝি কিন্তু বুদ্ধি-শুদ্ধির দিক দিয়া বিষয়টি ধরিলে নিজেদের দিকটাও দেখিতে হয় ; কিন্তু হক মন্ত্রিমণ্ডলের কাছে, সে সব যুক্তির কথা বলা বৃথা। ইঁহাদের উদ্দেশ্য হইল যাহাতে মন্ত্রি-গিরি বজায় থাকে সেই কৌশলকে প্রয়োগ করা। এংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের নেতা মিঃ সি ই গিবন সেদিন হক সাহেবকে উদ্দেশ করিয়া সংবাদপত্রে লিখিয়াছেন—"আপনি জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র, জাতীয় প্রতিষ্ঠান ও তাহার সদস্য-দিগকে সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন বলিয়াছেন ; কিন্তু আপনার সাহায্যপ্রাপ্ত সংবাদপত্র, আপনার মুসলীম লীগ এবং পরিশেষে আপনি স্বয়ং কি ? আপনি সব সময়ই বরের পিসী, কনের মাসী নীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন। আজ যাহারা আপনাকে জোর গলায় বাহবা দিতেছে, কাল তাহারাই আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিন্দা করিবে। ইসলাম এবং ইসলাম বিপন্নের ধুয়া ধরিয়া আপনি কত দিন চলিতে পারিবেন ?"

কংগ্রেসের কর্ম্ম-ব্যবস্থা—

আগামী ২৮শে এপ্রিল কলিকাতায় নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন হইবে ; তৎপূর্ব্ব দিবস নূতন কার্য্যকরী সমিতির বৈঠক বসিবে। রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র জানাইয়াছেন যে, এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহেই সদস্যদের নামের তালিকা ঘোষিত হইবে। রাষ্ট্রপতি জানাইয়াছিলেন যে, মহাত্মাজীর মত অনুসারে তিনি নূতন কার্য্যকরী সমিতি গঠন করিতেছেন। এই সংবাদে সমস্যা কাটিয়া গিয়াছে, এমন কিছু আশা দেখা গিয়াছিল ; কারণ মহাত্মাজীর মতানুসারে যদি কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইত, তাহা হইলে নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির সমর্থনও সে সমিতি লাভ করিত। কিন্তু দেখা যাইতেছে, মহাত্মাজী পূর্ব্ব হইতে কোন মত দিতে নারাজ। মহাত্মাজী নূতন কার্য্যকরী সমিতির গঠন সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতিকে কোনপ্রকার পরামর্শ প্রদান করিতে অনিচ্ছুক। ইহার সোজা অর্থই হইল এই যে, রাষ্ট্রপতি নিজে নিজের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্যকরী সমিতি গঠন করুন, তিনি ইহাই চাহেন এবং তাহার অর্থই হইল এই যে, তাঁহার মতামতের প্রভাব-নিরপেক্ষভাবে রাষ্ট্রপতির কার্য্যকে মহাত্মাজী নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির বিচার্য্য বিষয় করিতে চাহেন। এরূপ অবস্থায় মিটমাটের আশা সুদূর-পরাহত হইল বলিয়াই মনে হয়। রাষ্ট্রপতি যখন পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থের প্রস্তাবকে মানিয়াই লইয়াছেন এবং ব্যক্তিগতভাবে উহা অবৈধ মনে করিলেও নীতিগতভাবে সেই প্রস্তাব অনুসারে কাজ করা তাঁহার কর্ত্তব্য এ কথা স্পষ্ট বলিতেছেন, তখন সেই প্রস্তাব অনুসারে কার্য্যকরী সমিতি গঠনে নিজের মত-প্রকাশ করা, মহাত্মাজীর কর্ত্তব্য ছিল বলিয়াই আমাদের মনে হয়। কিন্তু সমস্যার সমাধান সে পথে হইল না। যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে—তাহাতে রাষ্ট্রপতিকে প্রকারান্তরে নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির দ্বারা নিজের সমর্থন পাশ করাইয়া লইতে হইবে। দক্ষিণপন্থীরা তোড়জোড়ে নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতিতে হাজির থাকিবেন, তাহা ছাড়া সোসিয়া-লিষ্টরাও সম্ভবত নিরপেক্ষ থাকিবেন, সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে পরিণাম ফল কি দাঁড়াইবে, অনুমান করা কঠিন নয়। মোটের উপর, স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ত্রিপুরীতে যে অভিনয় আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার যবনিকা এখনও পড়ে নাই। অপেক্ষা আছে নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনের।

সুখের রাজত্ব—

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে কিছুদিন আগে বাঙলার রাজস্ব-সচিব স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় 'বুভুক্ষুদের অভিযানের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে কতকগুলি দুরভি-সন্ধিপরায়ণ কংগ্রেসীদেরই ঐ কাজ। লোকেরা দুঃখ-কষ্টে পড়িয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই যে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে দল বাঁধিয়া আসে ইহা ঠিক নয়, দুরভিসন্ধিপরায়ণ যে সব রাজ-বন্দী ছাড় পাইয়াছে, তাহারাই উহাদিগকে জোট পাকাইয়া লইয়া আসে এবং অনর্থক এই হুজুগের সৃষ্টি করে। সম্প্রতি বাখরগঞ্জ জেলা কৃষক-প্রজা সমিতির সভাপতি সৈয়দ হবিবর রহমান মন্ত্রিবরের এই উক্তির প্রতিবাদ করিয়াছেন। দেশের লোকের দুঃখ-দুর্দ্দশা যে কত বেশী, এ অনুভূতি যাঁহার কিছুমাত্র আছে, তাঁহারা সকলেই বুঝেন যে রাজস্ব-সচিবের উক্তির মূলে যুক্তি কিছুই নাই, আছে দেশের লোকের দুঃখ-কষ্টের প্রতি ঔদাসীন্য এবং উপেক্ষার একটা ভাব। সৈয়দ হবিবর রহমান বলেন—গ্রামের লোকেরা অন্নকষ্টে তাড়িত হইয়া কিছু সাহায্য পাইবে, এই আশায় ২৫ হইতে ৩৫ মাইল পর্য্যন্ত পথ হাঁটিয়া নিজেরাই ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট গিয়াছে। তাহাদিগকে কেহ জোটাইয়া পাকাইয়া লইয়া আসে নাই। যখন কৃষকদের এই সব অভিযান হয় তখন শ্রীযুত সতীন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ বরিশালের কংগ্রেসকর্ম্মীরা কেহ বরিশালে ছিলেন না। ত্রিপুরী কংগ্রেস হইতে ফিরিয়া তাঁহারা কলিকাতায় ছিলেন।

পরের দুঃখ-কষ্ট দেখিয়া—মানুষ যে, তাহারই প্রাণ কাঁদে এবং সে সেই দুঃখ-কষ্টের লাঘব করিতে চেষ্টা করে। বরিশাল জেলার লোকদের অন্নকষ্টের কারণ যে ঘটিয়াছে, রাজস্ব-সচিব নিজে একথা স্বীকার করিতে পারেন নাই,—এমন অবস্থায় তাঁহাদের দুঃখকষ্টে যদি কেহ বিচলিত হইয়া প্রতিকারের জন্য চেষ্টা করেন মন্ত্রীদের মতে তাঁহারা হইলেন নিতান্ত পাষণ্ড, নরাধম, দুরভিসন্ধিপরায়ণ এবং তাঁহারা জেলে পুরিবার যোগ্য। তাঁহাদের অপরাধ এই যে পরের জন্য তাঁহাদের প্রাণ কাঁদে, এবং সেই প্রাণ কাঁদার ফলে তাঁহারা বে-আইনী কিছু করিয়াছেন এমন নয়, ম্যাজি-ষ্ট্রেটের কাছে দুঃখ-কষ্ট জানাইয়াছেন বা জানাইবার জন্য লোককে লইয়া আসিয়াছেন! যদি জোটাইয়া আনিবার সে অভিযোগ সত্যই হয়, তাহা হইলেও সেটা অপরাধ যে কিসে হইল বুঝা দুষ্কর। আসল কথা হইল এই যে, নিজেদের মোটা মাহিয়ানায় এবং মন্ত্রিগিরির আরাম-আয়াসে যাহারা মশগুল, অন্নকষ্টের অনুভূতি [illegible]

অনুভূতি তাহাদের হইবে কোথা হইতে? বাঙলা দেশের বড় দুর্ভাগ্য হইল এই যে, দেশের লোকের দুঃখকষ্টের সম্বন্ধে নিতান্ত উদাসীন যাঁহারা—যাঁহারা শুধু বুঝেন নিজের নিজের স্বার্থ তাঁহারাই এখানকার মন্ত্রিমণ্ডল জুড়িয়া বসিয়া যথেচ্ছাচার চালাইতেছেন—অন্য জায়গায় হইলে, এই শ্রেণীর লোকদিগকে বহুপূর্ব্বে অর্দ্ধচন্দ্র-লাঞ্ছিত হইয়া দেশের রাজনীতিক জীবন হইতে বিতাড়িত হইতে হইত; মুখ দেখাইবারও উপায় থাকিত না।

জীবন না মৃত্যু?—

বসিয়া থাকিবার সময় আর নাই। বাঙালী জাতির সভ্যতা, সংস্কৃতি, বাঙালী জাতির জাতীয়তা—এককথায় বাঙালীর বাঙালীত্ব বলিয়া যাহা কিছু গর্ব্ব করিবার বস্তু, আজ তাহা ধ্বংস হইতে বসিয়াছে,—নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সম্মেলনের সভায় সভাপতিত্ব করিতে গিয়া অধ্যাপক প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন, সভ্যতা এবং সংস্কৃতির উপর শিক্ষার ভিত্তি না করিয়া প্রগতি-বিরোধী রাজনীতিক মতবাদের সঙ্গে মধ্যযুগীয় ধর্ম্মান্ধতাকে যুক্ত করিয়া তাহার দ্বারা শিক্ষানীতি নিয়ন্ত্রণ করিবার ঘৃণিত চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। অধ্যাপক প্রমথনাথ আবেগভরে প্রশ্ন করিয়াছেন,—আমরা বাঁচিব না মরিব? এই যে বাঙলা দেশ, এই যে আমাদের মাতৃভূমি, সুদীর্ঘকাল সুদুষ্কর ত্যাগ এবং তপস্যার ফলে আমরা আমাদের মাতৃভূমিকে যে মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, তাহার সেই মর্য্যাদা কি আমরা বিকাইয়া দিব, তাহার মর্য্যাদা কি ধূলায় বিলুণ্ঠিত হইবে? স্বার্থপরতা সঙ্কীর্ণতা এবং হীন-প্রবৃত্তির পিপাসার অন্ধকারের মধ্যে যত আশা ভরসা আছে সবই কি বিলুপ্ত হইবে? অধ্যাপক প্রমথনাথ যে প্রশ্ন করিয়াছেন, জাতিকে সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে। জাতির সম্মুখে এই যে সমস্যা আজ দেখা দিয়াছে, জাতির ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা-স্বরূপ যুবকদের শিক্ষা দীক্ষার গুরুভার যাঁহাদের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে, তাঁহাদিগকে সে সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে হইবে। শিক্ষায় জাতির উন্নতি এবং ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। শিক্ষার বিস্তারের জন্য এদেশের শাসকদের ঔদাসীন্য আজ নূতন নহে, সে ত্রুটি বরাবরকার। মহামতি গোখলেও এজন্য আক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু বাঙলা দেশে যে বিপদ দেখা দিয়াছে, সে বিপদ তাহার চেয়েও বড় বিপদ। শিক্ষা না হয়, বরং ভাল; কিন্তু শিক্ষার নামে কুশিক্ষা ভয়ানক জিনিষ। বাঙলা দেশে শিক্ষার নামে—যাহা সব চেয়ে যুবকদের পক্ষে কুশিক্ষা সেই কুশিক্ষার দ্বারা জাতির চিত্তবুদ্ধিকে কলুষিত করিবার চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। শিক্ষার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় হইতেছে না, এ অভিযোগ আজ নূতন নয়, কিন্তু বাঙলায় এর চেয়ে বেশী বড় আতঙ্ক দেখা দিয়াছে শিক্ষার নামে সাম্প্রদায়িকতার বিস্তারের ভিতর দিয়া। ইহা হইতে জাতিকে রক্ষা করিতে না পারিলে জাতির ধ্বংস অনিবার্য্য। বাঙালীকে এই সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে আজ সকলের আগে, এবং সকল রকমের ত্যাগ-স্বীকারের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। উৎখাত করিতে হইবে হীন সাম্প্রদায়িকতার বিষকে, যদি জাতি সত্যই বাঁচিতে চায়।

যুদ্ধ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য—

মিঃ কে হেলস, ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের একজন ভূতপূর্ব্ব সদস্য। কলিকাতাতেও ইঁহার কারবার আছে এবং এখানে তিনি অপরিচিত নহেন। ইনি এখন এই দেশে আছেন। সংবাদপত্রের প্রতিনিধির নিকট তিনি সম্প্রতি একটি বিবৃতিতে বলিয়াছেন—"মিউনিক চুক্তি যে কলমে স্বাক্ষরিত হয়, সেই কলমের কালি শুকাইতে না শুকাইতেই হিটলার ইউরোপের মানচিত্র হইতে চেকোশ্লোভাকিয়াকে মুছিয়া ফেলিয়াছেন। এখন তাঁহার গতি হয় কোন দিকে ইহাই দ্রষ্টব্য। তিনি রুমেনিয়া এবং পোল্যাণ্ডকে নাড়াচাড়া দিয়া দেখিতেছেন। এইভাবে ইতিহাসের পুনরাবর্ত্তন ঘটিতেছে। বার্লিন হইতে বাগদাদ পর্য্যন্ত প্রভুত্ব বিস্তার করা হইল জার্ম্মানদের আকাঙ্ক্ষা, তাহা প্রায় পূর্ণ হইতে বসিয়াছে।"

মিঃ হেলস বলেন—"ডিক্টেটরগণ অর্থাৎ হিটলার এবং মুসোলিনী যাহা আঁচ করিয়া বসিয়া আছেন, যদি আমরা তাহা দিতে অস্বীকার করি, তবে যুদ্ধ অনিবার্য্য। যদি তাহাই হয় এবং সেক্ষেত্রে আমরা যেভাবেই হউক, যুদ্ধ এড়াইবার চেষ্টাতেই থাকি, তাহা হইলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংস সুনিশ্চিত। হিটলারকে যতই সুবিধা দেওয়া হইতেছে, ততই সে দিন নিকটবর্ত্তী হইতেছে। চেকোশ্লোভাকিয়ার সোকদার কারখানার গুলী, বারুদ এবং অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্য পাইয়া, রুমেনিয়ার কাঁচা মালের জোর পাইয়া হিটলার ক্রমেই নিরপেক্ষ হইয়া উঠিতেছেন, তিনি ক্রমশই শক্তিশালী এবং অপরাজেয় হইতেছেন। একটি মাত্র গুলী না ছুড়িয়া তিনি রাইন অঞ্চল, অষ্ট্রিয়া এবং চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করিয়াছেন। এই সব সাফল্য হিটলারকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে। পশ্চিমের গণতন্ত্রসমূহ যতদিন তাঁহাকে বাধা না দিবে, ততদিন তিনি শুধু এইভাবে হুমকী এবং ধাপ্পাবাজিতেই কাজ বাগাইতে থাকিবেন। হিটলার যখন আমাদের নিকট হইতে উপনিবেশসমূহ দাবী করিবেন, তখন আসিবে প্রকৃত পরীক্ষার সময়, তখন যদি আমরা যুদ্ধ না করি, আমাদিগকে তৃতীয় শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত হইতে হইবে।"

কিন্তু যুদ্ধ বাধিলে কি হইবে? সেই ভয়টাইত বোধ হয় বেশী।

মর্য্যাদা লাভ করিবার দাবী যে একমাত্র [illegible]

মানবীয় ঐক্যের আদর্শ

শ্রীঅরবিন্দ

অন্তর্জাতিক ঐক্যের পথে প্রথম প্রয়াসের সম্ভাবনা—ইহার বিরাট বাধাসমূহ—

(১৪)

আধিজাতিক ঐক্য বিকাশের ধারা হইতে শিক্ষাঃ আন্তর্জাতিক ঐক্যের প্রথম অবস্থা

আধিজাতিক ঐক্য বস্তুতঃ গড়িয়া উঠিয়াছে ক্রমবর্দ্ধমান আভ্যন্তরীণ প্রয়োজন ও আদর্শের চাপে, কিন্তু ইহা সংসাধিত হইয়াছে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক শক্তি, প্রতিষ্ঠান ও প্রকরণ সকলের সাহায্যে। এই বিকাশের ধারা অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, প্রথমে থাকে একটা তরল সংগঠনের অবস্থা। সেখানে বিবিধ উপাদান সকল ঐক্যবদ্ধতার জন্য সংগৃহীত হইয়াছে; তাহার পর আইসে একটা দৃঢ় কেন্দ্রীকরণ ও বলপ্রয়োগের যুগ, তখন সচেতন জাতীয় অহংজ্ঞান পরিপুষ্ট হয়, সুদৃঢ় হয় এবং তাহার সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের জন্য একটা কেন্দ্র এবং প্রকরণসমূহ লাভ করে; শেষে আইসে সুরক্ষিত স্বতন্ত্র জীবন ও আভ্যন্তরীণ ঐক্যের যুগ, তাহা বাহিরের চাপ হইতে আত্মরক্ষায় সমর্থ, সেই যুগে স্বাধীনতা এবং জাতীয় জীবনের সুখ সুবিধাসমূহে সকলকেই সক্রিয় অংশ দেওয়া, এবং ক্রমশঃ বেশী বেশী সমান অংশ দেওয়া সম্ভব হয়। আর মানবজাতির ঐক্যও যদি এই উপায়ে ও এই সকল প্রকরণের সাহায্যে এবং অধিজাতি গঠনের মতই গড়িয়া তুলিতে হয়, তাহা হইলে উহাও ঐ একই ধারা অনুসরণ করিবে বলিয়া আমরা আশা করিতে পারি। অন্ততঃ এইটিই হইতেছে সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট সম্ভাবনা, আর ইহা সকল সৃষ্টির সাধারণ ধারার অনুযায়ী বলিয়া মনে হয়; সৃষ্টি আরম্ভ হয় প্রথমে তরল স্তূপ লইয়া, তাহা হয় শক্তি ও উপাদানসমূহের অল্পাধিক অনির্দ্দিষ্ট ও আকারহীন সমবায়, তাহার পর তাহা সংকোচন, পেষণ, জমাটকরণের ভিতর দিয়া এক সুদৃঢ় আকারে গড়িয়া উঠে, তাহার মধ্যে অবশেষে জীবনের বিচিত্র রূপের সমৃদ্ধ বিবর্ত্তন সম্ভব হয়।

জগতের বাস্তব অবস্থা এবং নিকট ভবিষ্যতে ইহার সম্ভাবনাসমূহ

আমরা যদি জগতের বাস্তব অবস্থা এবং নিকট ভবিষ্যতে ইহার সম্ভাবনাসমূহ বিবেচনা করিয়া দেখি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, শিথিল সংগঠন এবং অসম্পূর্ণ শৃঙ্খলার একটা প্রাথমিক যুগ অপরিহার্য্য। মানবজাতির বুদ্ধির সামর্থ্য অথবা তাহার হৃদয়বৃত্তিসমূহের স্ফুরণ অথবা যে সকল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তি ও বিধান তাহাকে পরিচালিত করিতেছে, ব্যাপৃত রাখিয়াছে—কোনটিই এখনও আভ্যন্তরীণ প্রেরণা বা বাহিক চাপের এমন অবস্থায় পৌঁছায় নাই, যাহা হইতে আমরা আশা করিতে পারিতাম যে, আমাদের জীবনের ভিত্তির সমগ্র পরিবর্ত্তন হইবে অথবা পূর্ণ বা বাস্তব ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। একটা বাস্তব বাহ্য ঐক্যও এখন সম্ভব নহে, চৈতন্যমূলক একত্ব ত দূরের কথা। ইহা সত্য যে এই রকম একটা কিছু সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণা ও প্রয়োজনবোধ দ্রুত গড়িয়া উঠিতেছিল এবং মহাযুদ্ধের শিক্ষা ভবিষ্যতের এই সুমহান আদর্শটিকে সম্মুখে আনিয়া দিয়াছে, ইতিপূর্ব্বে উহা কয়েকজন শান্তিবাদী ও আন্তর্জাতিকতাবাদীর একটা উদার অলীক স্বপ্ন ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। এখন স্বীকৃত হইতেছে যে, ইহার মধ্যে বাস্তব সম্ভাবনার একটা শক্তি নিহিত রহিয়াছে; এবং যাহারা এখনও ইহাকে ছিটগ্রস্ত লোকদের একটা সখের কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চায় তাহাদের কথায় এখন আর তেমন জোর বা আত্ম-প্রত্যয় নাই। কারণ এ-কথা এখন আর সাধারণ লোকের সহজ বোধের দ্বারা সেরূপ জোরের সহিত সমর্থিত হইতেছে না। (স্থূল মনের এই যে দূরদৃষ্টিহীন সহজ বোধ, নিকট বাস্তব সম্ভাবনা সম্বন্ধে ইহার একটা সুদৃঢ় অনুভূতি আছে, ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সম্বন্ধে ইহা একেবারেই অন্ধ)। কিন্তু মানুষ এখনও ইহার জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠে নাই। যুগের মনীষিগণ একটা আদর্শের প্রচার করেন, তাহা উত্তরোত্তর শক্তিশালী হইয়া সাধারণ জনমণ্ডলীর ধ্যান ধারণাকে নূতনভাবে গড়িয়া দেয়, এইভাবে দীর্ঘকাল ধরিয়া মানুষের মন ও বুদ্ধি তৈয়ারী হইয়া উঠে; আবার প্রচলিত অবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ভাব ঘনাইয়া উঠে; এই দুয়ের সংযোগে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাহাতে বিরাট জনমণ্ডলী আদর্শের জন্য পাগল হইয়া উঠে এবং মানবজাতির জন্য এক নূতন সুখের আশায় উদ্দীপ্ত হইয়া প্রচলিত অবস্থার ভিত্তিকে ধ্বংস করিয়া দিতে এবং সমষ্টি জীবনের এক নূতন পরিকল্পনার সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু এই দুইটির কোনটিই এখনও হয় নাই। অন্য এক দিকে, সমাজের ব্যষ্টিগত ভিত্তিকে বর্জ্জন করিয়া তাহার স্থলে ক্রমবর্দ্ধমান সমষ্টিতন্ত্রের (collectivism) প্রতিষ্ঠা করার দিকে, মানুষের মন এইরূপ তৈয়ারী এবং বিদ্রোহের শক্তিবৃদ্ধি অনেক পরিমাণেই হইয়াছিল। এইজন্যই মহাযুদ্ধ এই ক্ষেত্রে ত্বরান্বিত করিয়া দিবার শক্তিরূপে কার্য্য করিয়াছে এবং আমাদিগকে রাষ্ট্রগত সমাজতন্ত্র (State Socialism) প্রতিষ্ঠার সন্নিকটবর্ত্তী করিয়া দিয়াছে,* তবে তাহা যে গণতান্ত্রিক হইবেই এমন কোন কথা নাই। কিন্তু আন্তর্জাতিক ঐক্য স্থাপনের জন্য কোন শক্তিশালী আন্দোলনের অনুকূল এরূপ পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা এখনও হয় নাই। আদর্শবাদের এমন কোন সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিময় অভ্যুত্থান আশা করা যায় না, যাহাতে উহা সিদ্ধ হইয়া উঠিতে পারে উদ্যোগ হয়ত, আরম্ভ হইয়াছে, অধুনাতন ঘটনা সকলের দ্বারা উহার অনেক সহায়তা হইয়াছে, তথাপি উহা এখনও রহিয়াছে কেবল প্রারম্ভের অবস্থায়।

রাজনৈতিক বুদ্ধির অক্ষমতা এবং তাহার সম্ভাব্য পরিণামসমূহ

এইরূপ পরিস্থিতিতে জগতের যে সকল চিন্তাশীল ব্যক্তি আন্তর্জাতিক জীবনের সমগ্র সংস্থানটিকে সাধারণ নীতির আলোকে মূল হইতে একেবারে নূতন করিয়া গঠন করিতে চান তাঁহাদের পরিকল্পনা ও ধারাগুলি যে নিকট

---

* শ্রীঅরবিন্দ ১৯১৬ সালে এই প্রবন্ধ লেখেন, ১৯১৭ সালে রুশিয়ায় বোলশেভিক বিদ্রোহের দ্বারা প্রথম রাষ্ট্রগত সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়।

ভবিষ্যতে কোনরূপে সফলতালাভ করিবে তাহা মনে হয় না। মানবীয় আশার যে ব্যাপক আদর্শমূলক অভ্যুত্থান হইলে এইরূপ পরিবর্ত্তন সম্ভব হইতে পারিত তাহার অবর্ত্তমানে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের পরিকল্পনা দ্বারা ভবিষ্যৎ গঠিত হইবে না। পরন্তু তাহা গঠিত হইবে রাজনীতিকের ব্যবহারিক বুদ্ধির দ্বারা; এই বুদ্ধি সাধারণ বুদ্ধি ও প্রকৃতিরই প্রতিভূ, সে বুদ্ধি সাধারণতঃ যত বেশী সম্ভব তাহা না করিয়া যত কম সম্ভব কেবল ততটুকুই কার্য্যে পরিণত করে। বিরাট জনমণ্ডলীর যে সাধারণ গড় মনবুদ্ধি তাহা কেবল সেই সব পরিকল্পনার প্রতিই কর্ণপাত করিতে যায় যেগুলি গ্রহণ করিবার জন্য তাহাকে তৈয়ারী করা হইয়াছে; আর দলাদলির ভাব লইয়া এই মতটা কিম্বা ঐ মতটাকে আগ্রহের সহিত ধরিতেও সে অভ্যস্ত; তথাপি কর্ম্মক্ষেত্রে তাহা তাহার স্বার্থ, তাহার প্রাণের আবেগ, তাহার সংস্কার সকলের দ্বারা যতটা পরিচালিত হয়, ততটা তাহার চিন্তার দ্বারা হয় না। রাজনীতিক ও রাষ্ট্রবিদ * জনসাধারণের এই গড় সাধারণ বুদ্ধি অনুসরণ করিয়াই কর্ম্ম করেন; রাজনীতিক উহার দ্বারাই পরিচালিত হন, রাষ্ট্রবিদ্‌কে সর্ব্বদা ঐটিকেই প্রাধান্য দিতে হয় এবং উহাকে তিনি নিজের ইচ্ছামত কোন দিকে পরিচালিত করিতে পারেন না, যদি না তিনি সেই সব মহান প্রতিভাশালী ও শক্তিময় ব্যক্তিত্বশালী পুরুষগণের মধ্যে একজন হন, যাঁহাদের মধ্যে একাধারে থাকে প্রশস্ত মন ও পরিকল্পনার ওজস্বিনী শক্তি এবং সেই সঙ্গে মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করিবার অপরিমেয় ক্ষমতা।

আবার জনমণ্ডলীর সাধারণ গড় মনোবৃত্তির যে-সব ত্রুটি আছে, সে-সব ছাড়াও রাজনীতিকের নিজের মনেরও ত্রুটি আছে; প্রচলিত অবস্থার (status quo) প্রতি ইহা আরও অধিক শ্রদ্ধাসম্পন্ন, অতীতের নিরাপদ দাঁড়াইবার স্থান পরিত্যাগ করিয়া দুঃসাহসিক পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে আরও অনিচ্ছুক, অনিশ্চিত ও নূতনের মধ্যে অগ্রসর হইতে আরও অধিক অসমর্থ। এইরূপ কিছু সে করিতে পারে, কেবল যখন জনসাধারণের অভিমত অথবা কোন শক্তিশালী স্বার্থ তাহাকে উহা করিতে বাধ্য করে অথবা সে নিজেই সাময়িক চিন্তার ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত কোন নূতন ও মহান উদ্দীপনার মোহে পতিত হয়।

রাজনৈতিক বুদ্ধিকেই যদি অবাধে কাজ করিতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে এই যে আন্তর্জাতিক মহাবিক্ষোভের তুলনা ইতিহাসে নাই ইহার বাস্তব ফল হইবে কেবল দেশসমূহের সীমান্ত নির্দ্ধারণে কিছু পরিবর্ত্তন, শক্তি ও অধিকৃত দেশের কিছু হস্তান্তর, এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসাগত ও অন্যান্য সম্বন্ধের কিছু বাঞ্ছনীয় বা অবাঞ্ছনীয় নববিধান, এইগুলির অধিক আর বেশী কিছুই আমরা আশা করিতে পারি না। ঐরূপ একটা বিভ্রাটজনক পরিণতির সম্ভাবনা এখনও রহিয়াছে এবং যতক্ষণ না সমস্যাটির সমাধান হইতেছে ততক্ষণ ইহার পরিণাম আরও অধিক বিভ্রাটজনক হইতে পারে এবং তাহার দ্বারা জগতের ভবিষ্যৎ বিপর্য্যস্ত হইবে না, এমন কথা কোন মতেই বলা চলে না। তথাপি যেহেতু মানবজাতির মন বিশেষভাবে বিচলিত হইয়াছে এবং তাহার হৃদয়বৃত্তিগুলি প্রবলভাবেই জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, যেহেতু প্রাচীন পরিস্থিতি যে আর বরদাস্ত করা চলে না এইরূপ উপলব্ধি বেশই বিস্তারলাভ করিতেছে, জাতি সকলের অহমিকা পরস্পরের প্রতি ভয় ও সংশয়ের দ্বারা, অকার্য্যকর সালিশী সন্ধি ও হেগ (Hague) আদালতের দ্বারা এবং ভ্রান্তি ও দ্বন্দ্বে পূর্ণ একটা ইউরোপীয় সমবায়ের দ্বারা দমিত থাকায় যে আন্তর্জাতিক ভারসাম্য রক্ষিত হয় তাহার অবাঞ্ছনীয়তা এখন রাজনৈতিক মনীষার নিকট বেশই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। অতএব আমরা আশা করিতে পারি যে, প্রাচীন বিধানের নৈতিক ভিত্তিটি নষ্ট হইয়া যাওয়ার ফলে একটা নূতন বিধান আরম্ভ করিবার দিকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু চেষ্টা হইবে। যুদ্ধের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ যে বিক্ষোভ, বিদ্বেষ ও স্বার্থপর জাতীয় আশাসকল জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা নিশ্চয়ই বড়রকমের প্রতিবন্ধক স্বরূপ হইবে, হয়ত বা এইরূপ কোন প্রয়াসের আরম্ভকে ব্যর্থ অথবা ক্ষণস্থায়ী করিয়া দিবে।* কিন্তু আমরা আশা করিতে পারি যে, যদি আর কিছুই না হয়, যুদ্ধের তীব্র প্রচেষ্টার পর যে অবসাদ ও আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়া আসিবে শুধু তাহার দ্বারাই এমন সব নূতন চিন্তা, অনুভূতি, শক্তি, ঘটনা আবির্ভূত হইবার সময় পাওয়া যাইবে যাহারা এই অনিষ্টকর প্রভাবকে প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইবে। †

তথাপি খুব বেশী যাহা আমরা আশা করিতে পারি, তাহাও হইবে অতি সামান্য। জাতিসকলের আভ্যন্তরীণ জীবনে যুদ্ধের ফল শক্তিপূর্ণ ও গভীর না হইয়া পারে না, কারণ সেখানে সব জিনিষই প্রস্তুত, যে চাপ সহ্য করিতে হইয়াছে, তাহা অতি গুরুতর, আর চাপটি যখন সরিয়া যাইবে তাহার পরবর্ত্তী প্রসারণের পরিণামও তদনুযায়ী গুরুতর হইবে; কিন্তু আন্তর্জাতিক জীবনে আমরা কেবল স্বল্প পরিমাণই আমূল পরিবর্ত্তন আশা করিতে পারি, তাহা যতই ক্ষুদ্র হউক, তাহা আর ফিরিবার নহে, সেই ক্ষুদ্র বীজের মধ্যেই যে জীবনীশক্তি নিহিত থাকিবে তাহাতে ভবিষ্যৎ বিকাশ অবশ্যম্ভাবী হইবে। অবশ্য যদি যুদ্ধটি শেষ হইবার পূর্ব্বেই এমন সব ঘটনাবলীর বিকাশ হইত যাহারা ইউরোপের সাধারণ মনকে অধিকতর গভীরভাবে আকৃষ্ট করিত এবং একটা নূতন আমূল পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনবোধ ব্যাপকভাবে জাগাইয়া তুলিত এবং ইউরোপের শাসকবর্গের মনকেও তদনুযায়ী চলিতে বাধ্য করিত, তাহা হইলে বেশী কিছু আশা করা যাইত; কিন্তু বিরাট সঙ্ঘর্ষটি তাহার পরিসমাপ্তির সন্নিকটবর্ত্তী হইতে চলিলেও

* জগতে এখন রাজনীতিকে (Politician) পূর্ণ, কিন্তু প্রকৃত রাষ্ট্রবিদের (Statesman) অভাব খুবই আছে।

* বস্তুত এইরূপই ঘটিয়াছে—যুদ্ধের পর জার্ম্মানীর সহিত যে ভার্সাই সন্ধি হয় তাহাতে দুইটি পরস্পর বিরোধী মনোবৃত্তি কাজ করিয়াছিল—একটির ফল হইয়াছিল League of Nations-এর সূত্রপাত, আর অপরটির দ্বারা জার্ম্মানীকে চিরপদানত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ফলে League of Nations সার্থক হইয়া উঠিতে পারে নাই।

† এই শুভতর সম্ভাবনাটি কার্য্যে পরিণত হয় নাই, কিন্তু বিপৎসঙ্কুলতা, বিক্ষোভ ও বিশৃঙ্খলা যেমন বাড়িয়া উঠিতেছে তাহাতে কোনরূপ একটা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা সৃষ্টি করা উত্তরোত্তর অপরিহার্য্য হইয়া পড়িতেছে, নতুবা রক্তপাত ও মহা বিশৃঙ্খলার মধ্যে আধুনিক সভ্যতার অবসান হইবে।

সেরূপ কোন সম্ভাবনাই দেখা যাইতেছে না; মনে হয়, আমরা সেই শক্তিপূর্ণ মুহূর্ত্তটি পার হইয়া আসিয়াছি, যখন এইরূপ একটি গুরুতর সন্ধিক্ষণে মানুষের সাফল্যপ্রদ আদর্শ ও প্রবৃত্তি সকল গড়িয়া উঠে। সাধারণের মন বস্তুতঃ যে দুইটি বিষয়ে প্রবলভাবে প্রভাবিত হইয়াছে সে দুইটি হইতেছে—বর্ত্তমান বিভ্রাটের পুনরাবৃত্তি হইবে এইরূপ সম্ভাবনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, আর এই উপপ্লবের ফলে মানবজাতির অর্থনৈতিক জীবনে যে অভূতপূর্ব্ব বিশৃঙ্খলা আসিয়াছে তাহা নিবারণ করিবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তীব্র অনুভূতি। অতএব এই দুইটি দিকেই কোনরূপে প্রকৃত নবব্যবস্থা আশা করা যাইতে পারে। কারণ যদি সাধারণের আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে তৃপ্ত করিতে হয়, তাহা হইলে এতখানি করিতেই হইবে, আর এই-গুলিকে তাচ্ছিল্য করিলে ইউরোপের রাজনৈতিক বুদ্ধিকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হইবে। তাহার গবর্ণমেণ্ট ও শাসক সম্প্রদায়ের নৈতিক ও মানসিক ক্লৈব্য প্রমাণিত হইবে এবং প্রচলিত ব্যবস্থা ও বর্ত্তমান অন্ধ ও দিক্‌ভ্রান্ত নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় জনসমূহের সাধারণ বিদ্রোহ ডাকিয়া আনা হইবে।

অতএব আমরা আশা করিতে পারি যে, যুদ্ধকে নিয়ন্ত্রিত করিবার এবং যথাসম্ভব কমাইয়া দিবার, যুদ্ধোপকরণের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবার এবং বিপজ্জনক বিবাদসকল সন্তোষজনকভাবে মিটাইয়া ফেলিবার একটা স্থায়ী ও কার্য্যকরী ব্যবস্থার দিকে চেষ্টা করা হইবে, বিশেষতঃ, বাণিজ্যগত লক্ষ্য ও স্বার্থসমূহের বিরোধ মিটাইয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করা হইবে। এইটিই হইতেছে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন এবং যে-সকল অবস্থা পরম্পরায় যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠে তাহাদের মধ্যে এইটিই এখন একমাত্র না হইলেও প্রকৃতপক্ষে কার্য্যকরী কারণ। যদি এই নূতন ব্যবস্থার মধ্যে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের বীজ নিহিত থাকে, যদি ইহা একটি শিথিল আন্তর্জাতিক সংগঠনের দিকে প্রথম পাদক্ষেপ হইয়া দাঁড়ায় অথবা ইহার মধ্যে হয়ত তাহার উপাদান বা প্রথম ধারাগুলি থাকে অথবা এমন একটা প্রথম পরিকল্পনা দেয় মানবজাতি যাহা হইতে একটা ছাঁচ বা আদর্শ লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে ঐটি নিজে যতই স্থূল বা অসন্তোষজনক হউক না কেন, ভবিষ্যৎ সাফল্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যাইতে পারে। একবার আরম্ভ করিলে মানবজাতির পক্ষে আর পশ্চাৎপদ হওয়া অসম্ভব হইবে এবং ইহার বিকাশধারায় যতই বাধাবিঘ্ন, আশাভঙ্গ, দ্বন্দ্ব, প্রতিক্রিয়া আসিয়া দেখা দিক না কেন, তাহারা চূড়ান্ত ও অবশ্যম্ভাবী পরিণতিটিকে বাধা দেওয়ার পরিবর্ত্তে শেষ পর্য্যন্ত সাহায্য করিতেই বাধ্য হইবে।

তথাপি ইহা আশা করা ভুল যে, আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের নীতি প্রথমেই প্রকৃতপক্ষে কার্য্যকরী হইয়া উঠিবে অথবা প্রথমে সম্ভবতঃ যে শিথিল অর্দ্ধগঠিত সংগঠন দাঁড়াইবে তাহা নূতন সঙ্ঘর্ষ, উপদ্রব ও বিভ্রাট নিবারণে সমর্থ হইবে। বাধাগুলি অতি গুরুতর। মানবজাতি এখনও আবশ্যকীয় অভিজ্ঞতা লাভ করে নাই। ইহাকে সফল করিবার জন্য কর্মশাসক সম্প্রদায় এখনও তাহা অর্জ্জন করে নাই। জনগণের প্রকৃতিতে অপরিহার্য্য সহজ প্রেরণা ও হৃদয়বৃত্তিগুলির বিকাশ এ পর্য্যন্ত হয় নাই। যে কোন বন্দোবস্তই হউক না কেন, তাহা জাতীয় অহমিকা, ক্ষুধা, লোভ, আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতির পুরাতন ভিত্তির উপরেই অগ্রসর হইবে এবং কেবল সেইগুলিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করিবে যেন কোন রকমে বিভ্রাটজনক সঙ্ঘর্ষ এড়াইতে পারা যায়। প্রথমে যে উপায় আবিষ্কৃত হইবে, তাহা স্বভাবতঃই অপর্য্যাপ্ত হইবে, কারণ যে-সকল অহমিকাকে দমন করিতে চাওয়া হইতেছে ঠিক সেইগুলিকেই অত্যধিক সম্মান দেওয়া হইবে। বিবাদের কারণগুলি থাকিয়াই যাইবে; যে স্বভাব হইতে তাহাদের উৎপত্তি তাহা জীবিত থাকিবে; হয়ত তাহা তাহার কোন কোন ক্রিয়ায় সাময়িকভাবে আসন্ন ও দমিত হইবে, কিন্তু ভূতটিকে একেবারে তাড়ান হইবে না; বিবাদের উপকরণগুলির উপর একটা নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাদিগকে বর্ত্তমান থাকিতে দেওয়া হইবে। অস্ত্রসম্ভার (armament) সঙ্কোচ করা যাইতে পারে, কিন্তু লোপ করা হইবে না। জাতীয় সৈন্যদলের সংখ্যা বাঁধিয়া দেওয়া যাইতে পারে (তাহা কেবল দৃশ্যতঃই সীমাবদ্ধ হইবে), কিন্তু তাহাদিগকে বজায় রাখা হইবে, বিজ্ঞান সমষ্টিগতভাবে লোক ধ্বংস করিবার কৌশল আবিষ্কার করিতে ব্যাপৃত থাকিবে। জাতীয় সৈন্যদলের পরিবর্ত্তে অন্য কোন ব্যবস্থা করিয়া যদি জাতীয় সৈন্যদলগুলি উঠাইয়া দেওয়া যায়, কেবল তাহা হইলেই যুদ্ধ উঠাইয়া দিতে পারা যাইবে এবং তখনও উহা করিতে বেগ পাইতে হইবে; কিন্তু কেমন করিয়া সেইরূপ অন্য ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে মানবজাতি এখনও তাহা জানে না, এবং যদিও তাহা গঠিত হয়—মানুব এখনও কিছুকাল তাহাকে পূর্ণভাবে প্রয়োগ করিতে সমর্থ বা ইচ্ছুক হইবে না। আর জাতীয় সৈন্যদলগুলি যে উঠাইয়া দেওয়া হইবে তাহারও সম্ভাবনা নাই; কারণ প্রত্যেক জাতিই অন্য সকল জাতিকে অতি মাত্রায় সন্দেহ করে, প্রত্যেকেরই আছে অতি বেশী দুরাকাঙ্ক্ষা ও ক্ষুধা এবং আর কিছুর জন্য না হউক আপন আপন অধিকৃত দেশ, উপনিবেশ ও অধীনস্থ জাতিগুলিকে শাসনে রাখিবার জন্য প্রত্যেকেরই পক্ষে রণসাজে সজ্জিত থাকা আবশ্যক। ইউরোপ বহুদিনের পোষিত দুরাকাঙ্ক্ষা, ঈর্ষা এবং বিদ্বেষের উন্মাদ সঙ্ঘর্ষে তাহার পুরুষশক্তিকে ধ্বংস করিল এবং তিন বৎসরের মধ্যে বহুদিনের সঞ্চিত সম্ভারসকল যুদ্ধের অগ্নিতে ঢালিয়া দিল বলিয়াই যে বাণিজ্য বিষয়ক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও প্রতিযোগিতা, রাজনৈতিক অহঙ্কার, স্বপ্ন, লোভ, ঈর্ষা প্রভৃতি যেন যাদুমন্ত্রের দ্বারা লুপ্ত হইয়া যাইবে তাহা নহে। জাগরণ আরও গভীরতর হইতে হইবে, কর্ম্মের আরও শুদ্ধতর মূলকে ধরিতে হইবে, তবেই জাতি সকলের মনোবৃত্তি এমন একটা "আশ্চর্য্যময়, সমৃদ্ধ ও অপূর্ব্ব" কিছুতে রূপান্তরিত হইতে পারিবে যাহার দ্বারা যুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক সঙ্ঘর্ষ মানবজাতির জীবন হইতে দূর হইয়া যাইবে।*

(ক্রমশঃ)

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে দর্শনশাখার সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীর অভিভাষণ

কুমিল্লায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের দ্বাবিংশ অধিবেশনে দর্শন শাখার সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী যে অভিভাষণ পাঠ করেন, নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল ঃ—

বন্ধুগণ, আপনাদের আদেশ এখানে দর্শনের আলোচনাটা আমাকে চালাইয়া দিতে হইবে। এ আদেশ না করিলে আপনাদের কোন ক্ষতি তো হইতই না, বরং লাভ হইত অনেক। কিন্তু এ ভালমন্দ বিচারের অধিকার আমাকে দেওয়া হয় নাই। আপনাদের আদেশেরই জয় হইবে, হউক। আমি কেবল তাহা পালন করিবার চেষ্টা করিব।

দেখাও দর্শন, যাহা দেখা যায় তাহাও দর্শন, আর যাহা দিয়া দেখা যায় তাহাও দর্শন। ভিতর ও বাহির দুইই আছে ঠিক কাগজের দুইটি পৃষ্ঠার মত, একটি থাকিলে অন্যটিকে থাকিতেই হইবে। ভিতর বাহির উভয়েরই সহিত আমাদের জীবনের সম্বন্ধ। তাই দার্শনিক দেখেন এই উভয়কেই। তিনি বাহিরের যাহা দেখেন তাহাতে সন্তুষ্ট হন না, ভিতরটা কি তাহা না দেখিলে তাঁহার চলে না। চোখ দিয়া মানুষ বাহিরের নানা কিছু দেখিলেও নিজের মুখ দেখিতে পায় না, ভিতরের কিছু দেখিতে পায় না। সার্চলাইটের সমুখেরই ভাগটা প্রকাশ পায়, পিছনের দিকটায় অন্ধকারই থাকে, উহা ঠিক তেমনি। তাই দার্শনিক চোখটাকে ফিরাইয়া লন, 'আবৃত্তচক্ষু' হন যদি তিনি অজানার বাঁধন ছিঁড়িতে চাহেন। তাঁহার একটা বিপদ আছে। অনেক সময়ে তাঁহার মনে কোন আগ্রহ থাকে, আর তাহাই যদি হয়, তবে তিনি নিজের সমস্ত যুক্তিকে যে কোন রকমে হউক উহারই দিকে লইয়া চলেন। ইহা সত্যকে দেখায় বাধা সৃষ্টি করে। অপর পক্ষে বলিতে পারা যায়, মন যদি নির্মল থাকে, তাহাতে যদি কোন পক্ষপাত না থাকে, তবে যুক্তি যে দিকে যায় দার্শনিকের মনও সেইদিকে যায়। তা যাহাই হউক, দার্শনিকেরা তত্ত্ব দেখিতে বলেন। কিন্তু চলিতে চলিতে তাঁহারা এমন এক জায়গায় গিয়া পড়েন যেখানে তাঁহার কথার তো কথাই নাই, মনও আগাইতে পারে না, ফিরিয়া আসে। অনেক সময়ে তিনি যত-যতই কিছু বিচার করেন, তত-ততই তাহা গড়িয়া না উঠিয়া একেবারে ভাঙিয়া চুরমার হইয়া যায়। তখন বলিয়া উঠেন, মর্যাদা লাভ করিবার দাবী তত্ত্বটা হইতেছে একেবারে মৌন। প্রহেলিকার মত বলেন, যে বলে উহা জানি, সে তা জানে না আর যে বলে জানি না সে তা জানে। আরো বলেন, উহা জানা অজানা এই দুয়েরই অতীত। তত্ত্বের তত্ত্বটা যখন এই রকম তখন পাগলের মত সেই দিক্‌টাই না মাড়াইয়া বাহিরে বাহিরে থাকিয়া

দুই একটা কথায় আপনাদের হুকুমটা কোনরূপে তামিল করিব।

নানা দর্শনের নানা কথা

আমাদের সামনে নানা দর্শনের নানা কথা আছে, আবার একই বিষয়ে নানা দর্শন আছে। এ সবই কি সত্য দর্শন? অর্থাৎ এইগুলি আমাদিগকে যাহা কিছু শোনায় তাহা কি সবই সত্য? আচ্ছা, উপনিষদেরই কথা ধরা যাউক। অনেক আচার্য অনেক রকমে ইহা ব্যাখ্যা করিয়া দ্বৈত, অদ্বৈত, ইত্যাদি ইত্যাদি কত মতের কত কথা আমাদিগকে শোনাইয়াছেন। এগুলি কি সবই সত্য?

আচার্যেরা ধরিয়া লইয়াছিলেন, অথবা লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, সমস্ত উপনিষদে সাক্ষাৎ বা পরম্পরাভাবে যাহা হয় একটি কোন তত্ত্ব বলা হইয়াছে। বলিয়াছি ধরিয়া লইতে তাঁহারা বাধ্য হইয়াছিলেন, ইহা না করিয়া তাঁহাদের উপায় ছিল না। কারণ, তাঁহাদের নিকট উপনিষৎটা কেবল কতকগুলি চিন্তা নহে। কতকগুলি চিন্তার সহিত পরিচিত যে [illegible] হইলেই, অথবা তাহার অনুকূলে বা প্রতিকূলে আরো কতক চিন্তা করিলেই উপনিষদের উদ্দেশ্য তাঁহাদের কাছে পূর্ণ হইত না। উপনিষদে যে চিন্তা পাওয়া যায়, বা যে তত্ত্ব জানা যায় তাহা জীবনে পালন বা উপলব্ধি করাই হইল তাঁহাদের কাছে তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

উপনিষদে যে একই তত্ত্ব বলা হইয়াছে তাহা কখনো নহে। তাহাতে একই বিষয়ে নানাস্থানে নানাকথা পাওয়া যায় এবং ইহাই স্বাভাবিক। আধুনিক ব্যক্তিগণের ন্যায় তখনো ঋষিদের কোন কোন বিষয়ে ভিন্ন-ভিন্ন, এমনকি বিপরীত দৃষ্টি ছিল। যেমন, কেহ বলিতেন আগে অসৎই ছিল, তাহা হইতে সৎ হয়। ইহাই উল্লেখ করিয়া আবার কেহ বলিতেছেন, অসৎ হইতে কিরূপে সৎ হইতে পারে, তাই আগে সৎই ছিল।

পরবর্তী আচার্যের কাছে এই দুইটি কথাই দেখা দিল। তিনি কোনটিকে রাখিবেন আর কোনটিকে ছাড়িবেন? কতটাই বা রাখিবেন আর কতটাই বা ছাড়িবেন? কীরূপেই বা ইহা করিবেন? একটিকে রাখিলে বা ছাড়িলে অপরটিকে রাখিতে বা ছাড়িতে হয়। কেননা ইহাদের উভয়েরই মূল্য বা প্রামাণ্য সমান। তাই ইহাদের একটা মীমাংসা না করিলে তাঁহার চলে না। তাই না হইলে কোন একটা তত্ত্ব নির্ণীত হয় না, আর ইহা না হইলে তাঁহার সাধন-ভজন কিছুই হয় না। আর ইহাই যদি না হয় তবে তাঁহার কাছে দর্শনের কোন মূল্য থাকে না। তাই যে কথাগুলির বিরোধ দেখা গেল তাহাদের একটা মীমাংসা, সমন্বয়, বা সামঞ্জস্য, রফা বা আপোষ, অপর কথায়, যেমন করিয়াই হউক ব্যাখ্যার কৌশলে খানিকটা লওয়া আর খানিকটা ছাড়া ভিন্ন উপায় থাকিল না।

ব্যাসের ব্রহ্মসূত্র

নানা তত্ত্বের উল্লেখ থাকায় ও কোন কোন বাক্যের অর্থ অস্পষ্ট হওয়ায় এক সময়ে উপনিষদের কতকগুলি কথায় সন্দেহ বা অসামঞ্জস্য খুবই তীব্রভাবে অনুভূত হয়। ইহার সমাধানের জন্য ব্যাস লিখিলেন ব্রহ্মসূত্র। তিনি ব্রহ্মতত্ত্ব-স্থাপনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাই উপনিষদের মধ্যে যাহা কিছু তাহার প্রতিকূল ছিল, অথবা পাঠকের মনে হইত, কিংবা হইতে পারিত, ব্যাখ্যার কৌশলে তিনি তাহা অপনয়ন করিলেন।

শ্রুতিতে সাংখ্যের অনুকূলে কিঞ্চিন্মাত্রও কিছু থাকিতে পারে তিনি তাহার সম্ভাবনা রাখিলেন না। তাঁহার অনুগামী এক আচার্য তো সাংখ্যকে নিজেদের প্রধান শত্রু মনে করিয়া যতদূর পারিয়াছেন খণ্ডন করিয়াছেন। প্রধান শত্রু মরিলে ক্ষুদ্র শত্রু আর কী করিবে? তা যাহাই হউক, যাঁহারা তখন ব্রহ্মসূত্র শুনিলেন তাঁহাদের নিকটে তাহাতে একটা মীমাংসা হইয়াছিল। কিন্তু এই মীমাংসা স্থায়ী হয় নাই, তাই ব্যাসের কথার নূতন নূতন ব্যাখ্যার সৃষ্টি হইল, এখনো হইতেছে এবং হইবে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, ব্রহ্মসূত্রের এই যে দ্বৈত, অদ্বৈত, ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যাখ্যা বা দর্শন এই সবগুলিই কি ব্যাসের অভিমত? ইহা কখনই মনে করা যাইতে পারে না। তাহা হইলে বলিতে হয়, ব্যাসদেব ছিলেন অব্যবস্থিতচিত্ত। বলিতে হইবে, এই সব দর্শনের কোন একটিই তাঁহার অভিমত। অথবা এমনো হইতে পারে যে, ইহাদের কোনটিই তাঁহার অভিমত নহে। তাঁহার অভিমত দর্শন এখনো আমরা জানিতে পারি নাই, ইহাই বলিতে পারা যায়। আবার ইহাও বলিতে পারা যায় যে, যদিও ব্যাসের নামে বলা হইতেছে তথাপি ঐ দর্শনগুলি সেই ব্যাখ্যাতা আচার্যগণের। যেখানে পরস্পর বিরুদ্ধ কথাগুলির বিরোধভঞ্জন করিয়া তুমি সামঞ্জস্য বিধান কর, আর বল যে, তাঁহার ঐ কথাটির তাৎপর্য এই, আর ইঁহার এই কথাটির তাৎপর্য ঐ, সেখানে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, ইহা হইতেও পারে, নাও পারে। তবে এই কথাটি যে তোমার কাছ হইতে পাওয়া যাইতেছে ইহাতে কোন সংশয় নাই।

আর এই সমস্ত আচার্য আসলে কী বলিয়াছেন তাহাও কি সব সময়ে ঠিক বলা যায়? ইহা লইয়া অনেক অনৈক্য রহিয়াছে। বরাবরই এইরূপ হইয়া আসিয়াছে, আর বরাবরই এইরূপ হইতে থাকিবে। ক্রমশই বিষয়টি জটিল হইতে জটিলতম হইয়া উঠিবে। ইহার নিবারণের উপায় নাই। একটা প্রাচীন দৃষ্টান্ত দিই। বেদের একটা মন্ত্রে এক মহাদেবতার কথা বলা হইয়াছে যে, তাঁহার শিং চারিটি, পা তিনখানি, মাথা দুইটি, আর হাত সাতখানি। তিনি প্রবল, তিনি তিন জায়গায় বাঁধা। তিনি শব্দ করেন, আর মর্ত্যগণের মধ্যে আগমন করেন। এই অদ্ভুত মহাদেবতাটি কে? এ এক প্রহেলিকা। নানা মুনির নানামত। কেহ বলেন যজ্ঞ। তাঁহার চারিটি শিং বলিতে চারিখানি বেদ। তিনখানি পা বলিতে প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে করা তিনটি সোমের অভিষব। দুইটি মাথা বলিতে যজ্ঞের আরম্ভে ও শেষে দুইটি ইষ্টি। সাতখানি হাত বলিতে বেদের সাতটি ছন্দ। তিন জায়গায় বাঁধা, এখানে তিন জায়গা বলিতে মন্ত্র, ব্রাহ্মণ ও কল্পসূত্র।

কেহ বলেন, না তাহা নহে। এখানে মহাদেবতা বলিতে সূর্য। চারিটি শিং বলিতে চারিটি দিক্। তিনখানি পা বলিতে তিনখানি বেদ (সূর্যের গতির সঙ্গে তিনখানি বেদের সম্বন্ধ কল্পনা করা হয়)। দুইটি মাথা বলিতে দিন ও রাত। সাতখানা হাত বলিতে সাতটি কিরণ। তিন জায়গায় বাঁধা, এখানে তিন জায়গা বলিতে ভূলোক, অন্তরীক্ষলোক ও দ্যুলোক; অথবা গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত এই তিন ঋতু।

আর একজন বলেন, না; ইহাও নহে। এখানে বৈয়াকরণদের শব্দের কথা বলা হইয়াছে। এই মহাদেবতাটি শব্দ। চারিটি শিং বলিতে চার রকমের শব্দ, যথা নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত। তিনখানি পা বলিতে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই তিন কাল। দুইটি মাথা বলিতে নিত্য ও অনিত্য এই দুই রকমের শব্দ। সাতখানি হাত বলিতে সাতটি কারকবিভক্তি। তিন জায়গায় বাঁধা বলিতে উচ্চারণের সময় বুকে, গলা ও মাথা এই তিন জায়গায় শব্দের যোগের কথা বুঝায়।

এ ছাড়া সায়ণাচার্যকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিবেন ইহার অন্যান্য অর্থও হইতে পারে।

একটি মন্ত্রের অন্যূন সাত রকমের ব্যাখ্যা কোন প্রাচীন আচার্যই করিয়াছেন। তাছাড়া একই বৈদিক মন্ত্রের আধ্যাত্ম, অধিভূত, অধিদৈব প্রভৃতি ভাবের ব্যাখ্যা ব্রাহ্মণ প্রভৃতিরও মধ্যে দেখা যায়। মন্ত্র ঋষিরাই এতগুলি অর্থ অভিপ্রেত ছিল, ইহা হইতেও পারে, না-ও পারে। যে দেশে অমরুশতকের বেদান্ত পক্ষে ব্যাখ্যার কথা শুনা যায়, সে দেশে অসম্ভব কি?

যাহাতে যুক্তি আছে তাহাই কি সত্য?

বেদান্তের ব্যাখ্যার কথা উঠিয়াছিল আর প্রশ্ন করা হইয়াছিল এতগুলি দর্শন বা মতের মধ্যে কোনটি সত্য। বলিতে পারা যায়, যাহাতে যুক্তি আছে। কিন্তু যুক্তি নাই কোথায়? যদি বলা যায়, যাহাতে প্রবল যুক্তি আছে তাহাই সত্য। কিন্তু ইহাই বা ঠিক হইবে কীরূপে? তা ছাড়া, আজ যেখানে প্রবল যুক্তি দেখা যাইতেছে, না, কাল সেখানে তাহা দেখা যাইতে পারে। আজ তাহা দেখা না গেলেই যে তত্ত্ব অন্যরূপ হইয়া যাইবে তাহা হয় না। আজ যদি কেহ জলের লক্ষণটী ঠিক করিয়া বলিতে না পারে তাহা হইলে তাহাতেই জল অজল হইয়া যায় না। যুক্তিই বা আমাদের কতদূর লইয়া যাইতে পারে? যুক্তির সীমাও নাই। যত ভাল যুক্তিই দেওয়া হউক, অভিজ্ঞতর ব্যক্তি তাহা খণ্ড-খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলেন। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের সমস্ত যুক্তিকে এক জায়গায় করিয়া প্রয়োগ করাও চলে না। আবার একের পক্ষে যাহা যুক্তি অন্যের নিকটে তাহা মোটেই যুক্তি নহে। বৈদান্তিক শ্রুতির বিরোধ দেখাইয়া কোন যুক্তি দেখাইলে বৌদ্ধের কাছে তাহা কিছুই নহে, ইনি ইহা মানেন না। বেদের কথায় মীমাংসকের যজ্ঞে পশুবধ সমর্থনের যুক্তি সাংখ্যের কাছে কিছুই নহে, ইনি এ বিষয়ে বেদের কথা মানেন না।

অস্পষ্ট আলোকে সম্মুখে এক টুকরা দড়ি দেখিয়া মানুষ অনেক সময়ে তাহা সাপ বলিয়া মনে করে। এখানে তাহার ভ্রম হয়। কিন্তু কিরূপে এই ভ্রম হয় দার্শনিকেরা তাহার চুলচেরা বিচার করেন। সে বিচার কি এক রকমের? নানা রকমের, পাঁচ-সাত রকমের কম নহে। একজন তো এই বিচার করিতে করিতে এতদূর গিয়াছেন যে, বলেন ভ্রমজ্ঞান বলিয়া কিছু নাই। ইঁহার যুক্তি ফেলিবার নহে, আর ইহা মনে আনন্দও কম দেয় না। ইহার পরে অন্য কোন দার্শনিক অন্য রকম ব্যাখ্যা করিবেন না তাহাই বা কে বলিল? আসল ব্যাখ্যা কোনটি? বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, এই সমস্ত ব্যাখ্যাতাদের চিন্তারাজ্যের সমৃদ্ধি দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়, কিন্তু আমরা ইহাতে তত্ত্বে উপস্থিত হইতে পারিয়াছি ইহা বলা শক্ত।

জগৎটা তো চোখের সামনে জ্বল-জ্বল করিতেছে। কোথা হইতে আসিল? কত পূর্বেই না এই প্রশ্ন হইয়াছে! ইহার উত্তরও দিতে কত চেষ্টাই না করা হইয়াছে! কাল, স্বভাব, নিয়তি, যদৃচ্ছা, আত্মা, প্রধান, পরমাণু, ঈশ্বর (তা ছাড়া বৈজ্ঞানিকদেরও কথা আছে), ইহাদের কোনটি হইতে জগতের সৃষ্টি হইল? আবার, বস্তুত সৃষ্টি বলিয়া কিছু আছে কি? দার্শনিকেরা এ বিষয়ে নানা দর্শন শুনাইয়াছেন, আরো হয় তো শুনাইবেন। কিন্তু কোনটি সত্য? এই সমস্ত দার্শনিকেরা নিজ-নিজ দর্শনের প্রক্রিয়া রচনা করিতে গিয়া যাহা বলিয়াছেন বা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন তাহাতে নিজেকে বা নিজের ন্যায় অন্যকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহা দ্বারা।

বস্তুতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে কি? কে এবং কিরূপে ইহার নিশ্চিত উত্তর দিবেন?

এইরূপ যিনি বলেন প্রমাণ এক, বা যিনি বলেন উহা দুই, কিংবা যিনি বলেন উহা তিন, অথবা যিনি বলেন তিনের বেশী, তাঁহাদের সকলেরই হয় তো তাহাতে খুব পাণ্ডিত্য, চিন্তাশীলতা ও বিচারপটুতার পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে, দর্শনশাস্ত্রেরও গৌরব তাহাতে যথেষ্ট বাড়ে; কিন্তু উহাতে বস্তুতত্ত্বের কি? প্রত্যক্ষের কথা বলিতে গিয়া প্রয়োজন-অনুসারে দুই একটি আরো শব্দ যোগ করিয়া কেহ বলিবেন উহা হইতেছে ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের যোগে উৎপন্ন জ্ঞান। কেহ বলিবেন সেই জ্ঞানই প্রত্যক্ষ যাহাতে কোনরূপ কল্পনা নাই। কেহ বা ইহার সহিত অভ্রান্ত শব্দটি জুড়িয়া দিবেন। কেহ বা আর কিছু বলিবেন, আর কত জানি না কত কথা বলিয়াছেন! কিন্তু কেহ একটি বিশেষ লক্ষণ মানুন, আর নাই মানুন, তাহাতে আসলে কি আসিয়া যায়? সকলেরই যেমন প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় ইঁহারও ঠিক তেমনি হয়। বস্তুধর্ম্ম একই থাকে—
"উৎপাদাদ্বা তথাগতানামনুৎপাদাদ্বা স্থিতৈবৈষা ধর্ম্মাণাং ধর্ম্মতা।"

যাঁহারা দর্শনপদ্ধতি রচনা করিয়াছেন তাঁহাদের চিত্তে প্রথমে কোন একটি চিন্তার উদ্রেক হয়, আর সেই মূল চিন্তার অনুষঙ্গে অন্যান্য চিন্তা দেখা দেয়। দার্শনিক চিন্তামাত্রেই সন্তুষ্ট হন না, তিনি তাহার যুক্তির অনুসন্ধান করেন। যতক্ষণ তাঁহার সন্তোষ না হয় ততক্ষণ তিনি একটির পর একটি, তাহার পর আর একটি, এইরূপে যুক্তির মালা গাঁথিয়া চলেন। কিন্তু এই যুক্তিগুলি যে, সব সময়ে বস্তুতত্ত্ব প্রকাশ করে তাহা বলা যায় না।

যুক্তির সন্ধানে মানুষ

মানুষ যাই কিছু করুক আর নাই করুক, সে যে নিজে আছে এবং বরাবর থাকিবে এই ধারণাটি তাহার চাই-ই-চাই। ইহা না হইলে তাহার চলে না, তা তাহার এই শরীর থাকুক আর না-ই থাকুক। শরীরটা থাকিবে না, অথচ সে থাকিবে, এ তো বড় অদ্ভুত কথা। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? সে নাই, থাকিবে না, এ চিন্তাকে সে যে স্থানই দিতে পারে না। যে কোন রূপেই হউক ইহার একটা যুক্তি তাহাকে বাহির করিতেই হইবে। সে দেখিল, চাঁদ ওঠে, অস্ত যায়, আবার আসে। সে দেখিল [illegible] বা এই সব দেখিয়াই সে ভাবিল, সেই বা আবার ফিরিতে পারে না কেন? আবার তাহার চিন্তা হইল, ভাল, মরিলেও তাহার স্বরূপ থাকে, কিন্তু এই স্বরূপটি কিরূপ? স্বভাবতই তাহাকে ভাবিতে হইল, ইহা সেই রকমের কিছু যাহা কিছুতেই নষ্ট হয় না। অতএব আমাদের চোখের সামনে যে সব জিনিসকে আমরা নষ্ট হইতে দেখি, নিশ্চয়ই তাহাকে সেই সব হইতে ভিন্ন রকমের হইতে হইবে। যেমন, যে সব জিনিসের মূর্ত্তি আছে, যেমন ঘটী-বাটী প্রভৃতি, তাহারা নষ্ট হয়ই হয়। তাই মানুষ ভাবিল তাহার আসল স্বরূপটি ঐরূপ নহে।

মর্য্যাদা লাভ করিবার দাবী যে

সে আবার দেখিল, তাহার দুঃখের বাঁধন আছে। এই বাঁধন হইতে তাহাকে ছাড়া পাইতে হইবে, না পাইলেই নয়। কীরূপে ইহা হইবে? সে ভাবিল, এ বাঁধন যদি তাহার স্বাভাবিক হয়, তবে ইহা হইতে কখনো তাহার ছাড়া পাইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ স্বভাব স্বভাব। ইহা কখনো অন্যরূপ হইতে পারে না। আগুন আগুনই, ইহা গরম, সব সময়ই ইহা গরমই থাকিবে। তাই সে স্থির করিল, তাহার বাঁধনটি হইতেছে আগন্তুক, কোন বাহিরের কারণে ইহা ঘটিয়াছে। আয়না স্বভাবত পরিষ্কার, বাহিরের ধূলায় ময়লা হয়, ঘষিলে মাজিলে আবার পূর্ব্বের মত পরিষ্কার হইয়া উঠে, উহাও ঠিক এইরূপ।

এই রকম একটার পর একটা, তারপর আর একটা, এইরূপে ধাপে ধাপে দর্শন-পদ্ধতি গড়িয়া চলিল। কালক্রমে বিভিন্ন দর্শনপদ্ধতি দেখা দিল বিভিন্ন চিন্তার ধারা অনুসরণ করিয়া। কিন্তু কী করিয়া বলা যাইতে পারে যে, সমস্ত দর্শনপদ্ধতিই সত্য-সত্যই তত্ত্ব দর্শন করাইতে পারিয়াছে?

চিন্তাসমূহের যুক্তি পরম্পরাই কি দর্শন শাস্ত্রের পর্য্যবসান

বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই যে, এই জাতীয় দার্শনিক চিন্তাসমূহের যুক্তি-পরম্পরা অতি উপাদেয় এবং যে দেশে এই সমস্ত প্রকাশ পাইয়াছে জগতে তাহার স্থানও অতি উচ্চে। কিন্তু ইহাতেই যদি দর্শনশাস্ত্রের পর্যবসান হয় তবে আমাদের দেশের মতে তাহাতে বিশেষ কিছু লাভ হইল না। যদি কেবল চিন্তারাজ্যে চিত্তবৃত্তির ঔৎসুক্য নিবৃত্তি ছাড়া দর্শন আমাদের আর কিছু করিতে না পারে, তবে নিতান্ত অল্পসংখ্যক কয়েকটি বিদ্বানের ইহা কোন কাজে [illegible] অর্থাগমের বিশেষ কিছু সুবিধাও পাইতে পারেন। কিন্তু আপামর সাধারণ লোকের ইহাতে কি হইল? দর্শন কি ইহাদেরও জন্য নহে? দর্শনের কাছে কি সর্ব্বসাধারণের কিছু পাইবার নাই? যদি তাহাই হয়, তবে থাকুক তাহা দূরে, তাহা লইয়া আমরা কি করিব, বিশেষত এই সময়ে? ইহা কি দর্শন আলোচনার সময়? চারিদিকে যে সব দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে! পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ সব দিকেই দানবের, পিশাচের সংহার-তাণ্ডব চলিয়াছে। মানুষ ইহার চাপে পড়িয়া পিষিয়া মরিয়া যাইতে বসিয়াছে। সে এখন কুকুর-শিয়ালেরও অধম। তাহার জীবনের মূল্য কি? যে হত্যাকাণ্ড চলিয়াছে তাহার মধ্যে স্ত্রীলোকেরও রক্ষা নাই, শিশুরও রক্ষা নাই। নিষ্ঠুরতার সীমা-পরিসীমা নাই। কত শত পরিবারের ধন-জন-প্রাণ ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। কাতর ক্রন্দনে দিগন্ত পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। সকলেই সর্বদা শঙ্কিত, কখন কি হয়। কাহারো প্রতি কাহারো বিশ্বাস নাই। ধর্ম-অধর্ম, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা বলিয়া কিছু নাই। পূর্বে পুরুষেরাই যুদ্ধ করিত। এখন তাহাতে কুলায় না, মেয়েদিগকেও তাহাতে লাগান হইতেছে। যুদ্ধবিদ্যা তাহাদের আবশ্যক করা হইতেছে। কিন্তু ইহাতেও প্রয়োজন নির্বাহ হয় না। শিশুগণকেও ইহা শেখান হইতেছে। তথাপি যুদ্ধ না কমিয়া উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিতেছে। চারিদিকে ঘোর অস্বস্তি, ঘোর অশান্তি। ইহার মধ্যে দর্শন লইয়া কী হইবে বা হইতে পারে? বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন এমন কাজে হাত দিলেন কেন?

বর্ত্তমানের মানুষ বুদ্ধির প্রভাবে কী না করিয়াছে? সে আকাশেও উড়িতে পারে, জলেও ঢুকিতে পারে। অগম্য বলিয়া তাহার কাছে কোন স্থান নাই। যাহা কেহ কোন দিন কল্পনাও করে নাই সে আজ তাহা করিয়া চোখের সামনে ধরিয়া দিতেছে। একটা ছোটখাট বোতাম টিপিয়া সে যে কোন দূরবর্ত্তী স্থানের খবর এক নিমেষে আনিয়া দিতে পারে। সে শিক্ষার জন্য কত-কত এবং কত রকমের বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রন্থালয়, বিজ্ঞানালয় স্থাপন করিয়াছে। কিন্তু তবুও নিতান্ত শিশুও যাহা করে না, কিরূপে সে তাহা আজ অবলীলায় করিতেছে? তাহার কাছে অকার্য বলিয়া কিছুই নাই। যাহা ইচ্ছা তাহাই সে করে। সে ধ্বংসের পতাকা-হাতে দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞান হারাইয়া পাগলের মত

ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছাড়িতেছে। ইহার মধ্যে দর্শনের আলোচনা! ইহা কি খাপ খায়? তবুও বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন এ অনুষ্ঠানে হাত দিলেন কেন?

দর্শন শাস্ত্রের সার্থকতা

আমাকে যদি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় তবে অসঙ্কোচে বলিব, সম্মেলন ঠিকই করিয়াছেন। দর্শন আলোচনার যদি কোন প্রশস্ত সময় থাকে তো তাহা ইহাই। অন্য কোন বিষয়কে এখন খুবই বাদ দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু দর্শনকে নহে। কারণ, মানুষ আজ যে আগুনে জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরিতে বসিয়াছে, আমাদের দর্শনই তাহা নিবাইতে পারে, তাহার পথ দেখাইয়া দিতে পারে। ইহা হয় কি না তর্ক করিয়া লাভ নাই, পরীক্ষা করিলেই বুঝা যায়।

যাঁহারা মনে করেন, আমাদের দর্শন হইতেছে কেবল পরলোক লইয়া, অর্থাৎ পরলোকে স্বর্গ হইবে বা মোক্ষ হইবে, অথবা এইরূপ আর কিছু হইবে এই জাতীয় কথা লইয়া, এ জীবনের সঙ্গে তাঁহাদের সম্বন্ধ নাই, তাঁহারা দর্শনের সম্বন্ধটাকে খুবই ছোট করেন, বলিতে কী, তাঁহারা দর্শনকে অপমান করেন।

পরলোক আছে ইহার অনুকূলে অনেক অনেক যুক্তি আছে। কিন্তু এ যুক্তি কেহ বুঝিতেও পারে নাও পারে। কেহ ইহা মানিতেও পারে, নাও পারে। ও, সে, তুমি, আমি—আমরা কেহই পরলোক দেখি নাই। কিন্তু যাহা আমরা দেখিতে পাই না তাহাই যে নাই, ইহাও বলা যায় না। তাই পরলোক থাকিতে পারে, নাও পারে। যদি থাকে, থাকুক; না থাকে, নাই থাকিল। কিন্তু ইহলোকটা যে চোখের সামনে আছে ইহা অস্বীকার করা যায় না। পরলোক না থাকিলেও ইহলোক আছে। ইহলোক না থাকিলে পরলোকও থাকে না। আমাদের পৌনে ষোল আনা লোকের কাছে পরলোক একটা কথার কথা, ইহলোকটা লইয়াই সব। দর্শন যদি ইহলোকে আমাদের প্রতিদিনের জীবনে তাহার কাজ দেখাইতে না পারে, তবে তাহা থাকিলেই বা কী, আর না থাকিলেই বা কী?

এক দিয়া দেখিলে বলা যাইতে পারে মানুষের দুইটি জিনিস আছে। শরীর ও মন। শরীরেরও দুঃখ আছে। মনেরও দুঃখ আছে। ক্ষুধা-পিপাসা, শীত-আতপ, ব্যাধি প্রভৃতিতে শরীরের দুঃখ হয়। আর যখন কেহ আমাদিগকে খুব অপমান করে, বা খুব নিন্দা করে, বা আমাদের গুরুতর পরাভব হয়, বা খুব ক্ষতি হয়, বা কাহারো কিছু ভাল দেখিলে মন পুড়িতে থাকে, বা অত্যন্ত ক্রোধ হয়, বা অত্যন্ত লোভ হয়, কিংবা একমাত্র অতিপ্রিয় পুত্রের মৃত্যু হয়, অথবা এইরূপ আর কিছু ঘটে, তখন আমাদের মনের দুঃখ হয়। সন্দেহ নাই, শরীরের দুঃখ অনেক, কিন্তু হয়তো কেহ কোন দিন ইহার গণনা করিয়া ফেলিতে পারেন; কিন্তু মনের দুঃখের ইয়ত্তা নাই আবার শরীরের দুঃখ খুব তীব্র হয় সত্য, কিন্তু মনের দুঃখের তীব্রতা তাহা হইতে এত বেশী যে বলিবার নহে। শরীরের দুঃখের প্রতিকার আমরা দেখিতে পাই। ক্ষুধা হইলে আমরা খাই, পিপাসায় জল পান করি, শীতে গায়ে কাপড় দিই, রৌদ্রে ছায়ায় গিয়া বসি, জ্বর হইলে ঔষধ খাই। কিন্তু মনের দুঃখ দূর করিবার উপায় কি?

ইহার মধ্যে আর একটা কথা আছে। আগে মনের যে রকমের দুঃখের কথা বলা হইল, তাহাতে যে কেহ কেবল নিজেই পীড়িত হয় তাহা নহে, সে অন্যেরও পীড়ার কারণ হয়। অত্যন্ত লোভে বা অত্যন্ত ক্রোধে মানুষ যে, বাপ-মাকেও হত্যা করে, এ আমরা সকলেই জানি। মানুষ বস্তুত এ অনর্থ চায় না; কারণ, ইহা যে ভাল নয় সে তাহা জানে। জানিয়া-শুনিয়াও সে ইহা করে, কে যেন জোর করিয়া তাহাকে ইহা করায়। স্বভাবতই সে এই সব অনর্থ হইতে মুক্তি চায়, যত দিন সে বাঁচে ততদিন এই দুঃখ যেন তাহাকে স্পর্শ না করে। দার্শনিকের ভাষায় বলিতে পারা যায় সে জীবন্মুক্তি চায়। বিদেহমুক্তি পরের কথা, ইহা অপেক্ষা করিতে পারে। আগে মাথার আগুনটা নিবুক, তার পর অন্য কথা। কিন্তু উপায়? পথ কী? কেই বা ইহা দেখাইবে? আমাদের দর্শন, একমাত্র দর্শন, যদিও ইহা 'ফিলসফী' না হইতে পারে।

মানুষের জীবনে ভাবের স্থান

প্রকৃতি অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে জানা যাইবে, মানুষ কেমন ভাবের দ্বারা চালিত হয়। দুইটি ছেলে বেশ মিলিয়া-মিশিয়া খেলা করিতেছে। হঠাৎ দেখা গেল তাহারা মারামারি করিতে লাগিয়াছে। আবার একটু পরেই দেখা গেল তাহারা উভয়ে ঠিক আগেরই মত বেশ আনন্দে খেলিতেছে। কেন এরূপ হয়? কারণ, তাহাদের মনের ভাবটা বদলাইয়া যায়। যখন তাহারা পরস্পরকে অনুকূল বলিয়া ভাবে তখন মিলিয়া থাকে, আর যেই প্রতিকূল বলিয়া ভাবে অমনি বিরোধ উপস্থিত হয়। ইহা ছাড়া অন্য কোন কারণ সেখানে থাকে না। এক বাকলপরা সন্ন্যাসী এক রাজচক্রবর্তীকে বলিয়াছিলেন 'মহারাজ, আপনি রেশমী কাপড় পরিয়া যে আনন্দ পাইতেছেন, আমি বাকল পরিয়া সেই আনন্দই পাইতেছি, আমাদের আনন্দের মধ্যে কোন ভেদ নাই।' কিন্তু রাজা তো এ কথা বলিতে পারেন না যে, 'সন্ন্যাসী ঠাকুর, তোমার বাকল পরার আনন্দ, আর আমার রেশমী কাপড় পরার আনন্দ এক'। রাজা ভাবেন রেশমী কাপড় পরার যে আনন্দ বাকল পরার আনন্দ তাহার কাছেও ঘেঁষিতে পারে না। কেন এমন হয়? কারণ, রাজার মনের ভাব এক, সন্ন্যাসীর মনের ভাব আর এক। রাজা সোনার থালায় ভাত খান, সোনার গেলাসে জল পান করেন। আর যাঁহার সংসারে আসক্তি কমিয়া গিয়াছে তিনি কলার পাতায় ভাত খান, আর মাটির ঘটে জল পান করেন। রাজা হইতে ইঁহার আহার যে কম হয়, অথবা পিপাসা কম মেটে তাহা নহে। ইঁহার তৃপ্তি যে কম হয়, তাহাও নহে। আবার রাজা যদি কলার পাতা আর মাটির ঘট ব্যবহার করেন তবে যে তাঁহার ক্ষুধা ও পিপাসা মেটে না, বা কম মেটে, তাহা নহে। কিন্তু তিনি তৃপ্তি অনুভব করিতে পারেন না। অপর পক্ষে ঐ অনাসক্ত ব্যক্তি যদি সোনার থালা ও সোনার গেলাস ব্যবহার করেন তবে যে তাঁহার তৃপ্তি বেশী হয়, তাহা নহে। এই ভেদের একমাত্র কারণ এই যে, ঐ উভয় ব্যক্তির মনের ভাব ভিন্ন-ভিন্ন।

ছেলে বিদেশে পড়ে। মায়ের সঙ্গে অনেক দিন দেখা নাই, তবে নিয়মমত তাহার কুশল সংবাদ তিনি পান। মনে তাঁহার কোন উদ্বেগ ছিল না। হঠাৎ ছেলের মৃত্যুর সংবাদ আসিল। তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। পূর্বে তিনি ছেলেকে দেখিতে পাইতেছিলেন না, পরেও পাইতেছিলেন না, অথচ পূর্বে বেশ স্থির ছিলেন, পরে অস্থির হইলেন। কারণ, পূর্বে মায়ের মনে এই ভাবটা ছিল যে, ছেলেটি বাঁচিয়া আছে, কিন্তু পরে ভাব হইল সে বাঁচিয়া নাই।

ধরা যাউক, বিদেশে ছেলেটির বস্তুত মৃত্যু হয় নাই, কিন্তু মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া মা খবর পাইলেন। এখানে মৃত্যুর খবরটি সত্য হইলে মা যেমন অস্থির হইতেন, উহা অসত্য হইলেও তিনি তেমনি অস্থির হইয়া থাকেন। ইহার ইহাই কারণ যে, মৃত্যুটি সত্যই হউক আর অসত্যই হউক, উহার সংবাদে মায়ের মনের ভাবটা একই হয়।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ভাবটা হইলেই যে ভাবের বিষয়টি সত্য হইবেই তাহা নহে। বিষয়টি সত্য না হইলেও ভাব হয়। এই ভাবটা যদি ভাল হয় আমাদের সুখ হয়, আর মন্দ হইলে দুঃখ হয়।

রামায়ণের রামের নামে আমাদের মনে একটা ভাবের উদ্রেক হয়। কিন্তু তিনি কি বস্তুত ছিলেন? তাঁহার ঐতিহাসিকতা কে প্রমাণ করিবে? যিশুখৃষ্টের ঐতিহাসিকতা প্রমাণ করা শক্ত ঐতিহাসিক রাম বা ঐতিহাসিক যিশুখৃষ্ট নাই থাকিলেন, উহাতে কিছু আসিয়া যায় না, ভাবের আকারে রাম ও যিশুখৃষ্ট ছিলেন, আছেন ও থাকবেন এবং ইহার যাহা ক্রিয়া তাহা হইবেই।

রাজনীতিক্ষেত্রে একবার তাকান যাউক না। দেশে-বিদেশে, ঘরে-বাহিরে যে সব কথা প্রচার করা হয় তাহাদের সবই কি সত্য? অনেক অসত্য আছে। কিন্তু তাহা হইলে কী হয়? এগুলি লোকের চিত্তে এক-একটা ভাব উৎপাদন করে, সে তাহাতে মত্ত হইয়া উঠে, আর তদনুসারে কাজ করে।

অধিকাংশ ভাবই মুক্তির সহায়ক

আমাদের দর্শনও আমাদিগকে কেবল কতকগুলি বিষয়ে ভাব দিয়াছে, কিন্তু এই বিষয়গুলির সবই যে সত্য তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু তাহা হইলেও অধিকাংশ ভাব আমাদিগকে মুক্তির দিকে আনয়ন করে। দুই একটা দৃষ্টান্ত দিই।

আমাদের সাধারণ জীবন ধরা যাউক। গৃহস্থের যখন গোলাভরা ধান থাকে, গোয়াল-ভরা গাই থাকে, ক্ষেত ভরা তরি-তরকারী থাকে, এইরূপে আর আর আবশ্যক জিনিষপত্র ঘর ভরা থাকে, তখন সে কেমন আনন্দে কাল কাটায়। কেন তখন তাহার এরূপ আনন্দ হয়? কারণ, তাহার অভাবজ্ঞান থাকে না। কিন্তু যখনই সে কোন জিনিসের অভাব মনে করে তখনই তাহার সে আনন্দ আর থাকে না। আমাদের দার্শনিক এখানে বলিবেন 'বাপু, তুমি যদি মনে করিয়া থাক যে, বাহিরের জিনিস-পত্র সংগ্রহ করিয়া অভাব পূরণ করিবে, তবে তা কখন করিতে পারিবে না। বাহিরের জিনিস কি দুই-চারিটা? তাহার তো সীমা-সংখ্যা নাই। আর কটাই বা সংগ্রহ করিবে? একটার পর একটা, তার পর আর একটা, এইরূপে তুমি চাহিয়াই চলিবে। সুমেরু পর্ব্বতও যদি সোনার হয় তবুও তাহা একজনের অভাব দূরে করিতে পারে না। তোমার অভাব পূর্ণ হইবে কিসে? তুমি যা সংগ্রহ কর তাই যে তোমার কাছে সব সময় থাকিবে ইহাও বলা যায় না। কে কখন হঠাৎ আসিয়া কাড়িয়া লইয়া যাইতে পারে। তাই তুমি ওরকম করিয়া অর্থাৎ বাহিরের জিনিসের উপর নির্ভর করিয়া পারিবে না। অভাব বাড়াইও না। বাড়াইলেই মরিবে। যাহা তোমার নয়, যাহাতে তোমার অধিকার নাই তাহা তুমি চাহিতেও পার না, চাহিলেও পাবে না। তোমার কী এবং কাহাতে তোমার অধিকার? যতটুকুতে তোমার পেট ভরে। যে ইহার বেশী চায় সে চোর। সে দণ্ডার্হ। আরো দেখ, যা তোমার নিজের তাই তোমার কাছে থাকতে পারে। সেটি কী? সেটি তুমি নিজে, তোমার আত্মা। যতদিন তুমি আছ ততদিন উহা আছে, এ তোমাকে ছাড়িবে না। ইহাতেই তোমার আনন্দ হইবে। তুমি স্বতন্ত্র ও আত্মারাম হইয়া থাকিতে পারিবে।'

বাড়ীতে ছেলের গুরুতর ব্যারাম হইয়াছে। পিতার উদ্বেগ স্বাভাবিক। তিনি ছট-ফট করিয়া ছুটাছুটি করিতেছেন। দার্শনিক তাহাকে বলিবেন 'ওহে, শোন। অত ব্যস্ত হইতেছ কেন? তোমার শক্তি অনুসারে যাহা হয় চিকিৎসার ব্যবস্থা কর। তোমার যদি ১০, দশ টাকা আয় থাকে তবে তদনুসারেই যে চিকিৎসককে ডাকিতে পারা যায়, তাঁহাকে ডাক। ২০, টাকা দক্ষিণার চিকিৎসক একবার বা দুবার তোমার কাকুতি-মিনতিতে আসিলে আসিতেও পারেন, কিন্তু তৃতীয়বার আসিবেন না। যতটা সম্ভব হয় শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করে। তারপর? তারপর নিশ্চিন্ত হইয়া মন হইতে চিকিৎসার ভাল-মন্দ ফলের কথাটা ধুইয়া মুছিয়া ফেলিয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাক। হাঁসের উপর একবাটি জল ঢালিয়া দিলে সে দুই-চারিবার পাখা দুইটি ফট-ফট করিয়া নাড়ে, আর সব জল ঝরিয়া পড়িয়া যায়। ঠিক তেমনি শুভ ও অশুভ দুইই ঝাড়িয়া ফেল। ছেলের রোগ যদি না সারে তো তুমি কী করিতে পার? তোমার শক্তি কী? তুমি কাঁদিলে-কাটিলে, হা-হুতাশ করিলে বা ছটফট করিলে যদি সে ভাল হইয়া উঠে তো ইহা খুব করিতে পার, কিন্তু তাহা তো হয় না, হইবে না। তাই চুপ করিয়া থাক। ছেলে ভাল হয় ভাল, না হয় ভাল।' দার্শনিক এই একটি ভাব দিলেন। গৃহস্থ যদি ইহা হৃদয়ে ধারণ করিতে পারেন, বারবার বারবার ইহা ভাবনা করেন, ইহা অনুসরণ করিয়া চলিতে পারেন, পুত্রের মৃত্যুতেও তিনি বিচলিত হইবেন না।

অন্য কোন দার্শনিক বলিবেন, 'ছেলে মারা গিয়াছে? শোক করিতেছ? শোক করিয়া কী করিবে? যে জন্মায় মৃত্যুত তাহার হবেই। এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। ইহা এড়াইতে কেহ পারে না। তুমি ইচ্ছা কর, আর নাই কর, ইহা হইবেই। এ অবস্থায় তোমার শোক করা ঠিক হয় না। ইহাতে লাভ একটুও নাই, বরং ক্ষতিই আছে। এ শোক সহ্য কর, ইহা সহ্য করা যায়।'

অন্য কোন দার্শনিক বলেন, 'যাহার যেমন কর্ম তাহার তেমন ফল। ইহা কেহ খণ্ডন করিতে পারে না। কর্মের ফল ভোগ করিতেই হইবে। তোমার কর্মে পুত্রশোক নিয়ত ছিল। ইহার আর উপায় কী? সহিতে হইবে।'

আর কেহ বলিবেন, 'কপালে এই ছিল। কপালের লিখন মেটান যায় না।'

অন্য কেহ বলিবেন, 'এ সবই ঈশ্বরের লীলা, তিনি যখন যা ইচ্ছা করেন তাহাই হয়। তিনি তোমার কাছে ছেলেকে পাঠাইয়াছিলেন, তিনিই লইয়া গেলেন। তোমার ইচ্ছায় তো তিনি চলিবেন না, তাঁহারই ইচ্ছায় তোমাকে চলিতে হইবে। তোমার কাছে ছেলে যে ভাবে ছিল, তাঁহার কাছে তাহা অপেক্ষা অনেক ভাল আছে। সে তাঁহার লীলার সহচর হইয়াছে। ইহাতে দুঃখ করিবার কী আছে?'

অপর কেহ বলিবেন, 'নিজেকে কর্তা বলিয়া অভিমান কর কেন? তোমার কী শক্তি? সবই ঈশ্বরের। তাঁহার কাছে তোমার জপ-তপ, ধন-জন, পুত্র-কন্যা, দেহ-প্রাণ যা কিছু থাকে সব সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হও। তিনি যাহা বিধান করেন মাথায় পাতিয়া লও। যদি আনন্দের সহিত ইহা না লইতে পার, অন্ততঃ ধৈর্য্যের সহিত লও। তুমি তাঁহার ভৃত্য তাঁহার আদেশ পালন করাই তোমার ধর্ম্ম।'

আবার কেহ বলিবেন, 'ওরে মরণ আর কী? পুরাণ কাপড় ছাড়িয়া নূতন কাপড় আমরা পরি না? ঠিক তেমনি পুরাণ শরীরটা আমরা ছাড়িয়া একটা নূতন শরীর ধারণ করি। অথবা এই একই আমরা শিশু থাকিয়া যুবা হই, যুবা হইয়া বৃদ্ধ হই। অর্থাৎ আমরা একই থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া আসি। মরণও ঠিক তেমনি একটা অবস্থা অতিক্রম করিয়া অন্য অবস্থায় যাওয়া। মরিলে কি কাহারও উচ্ছেদ হয়? কখনো নহে। সে যে আগুনেও পোড়ে না, জলেও ভেজে না, বাতাসেও শুকায় না, অস্ত্রেও কাটা যায় না। সে নিত্য

আবার অন্য কোন দার্শনিক বলিবেন, 'ওহে ছেলে কী? কোথায় ছেলে? কে ছেলে? কোথায় তার জন্ম? কোথায় তার মরণ? ও সব কিছুই না। ও সব ভুল, ভৌতিক, মায়া, মিথ্যা। না আছে ছেলে, না আছে তার জন্ম, না আছে তার মৃত্যু। মাথা নাই, মাথার ব্যথা। যখন আসল অবস্থাটা এই, তখন শোক করিবার কী আছে?'

এই নানা দার্শনিকের নানা কথার মধ্যে যেটি মানুষের মনের মধ্যে লাগে, সে সেইটি বারবার ভাবে। ভাবিতে ভাবিতে তাহার এমন একটা ভাব মনের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া যায় যে, মরণে সে বিচলিত হয় না।

সেদিন একটি বৃদ্ধার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। স্বামীও নাই, পুত্র-কন্যাও নাই। চোখের অসুখ হইয়াছিল। কলিকাতায় কোন নামজাদা ডাক্তারের চিকিৎসায় তাহা ভাল হইয়া যাইবে এই আশায় তিনি সহরে আসিয়াছিলেন। রাম বুঝিলেন উল্টা। চিকিৎসার গুণে তাঁহার দুইটি চোখই গেল। অন্ধ হইয়া পড়িলেন। তিনি বলিলেন 'বাবা, প্রভুই তো চোখ দিয়াছিলেন, তিনিই লইলেন। তাঁহার ইচ্ছা। ডাক্তারের দোষ কী দিব? বাবা, তাঁহার অপরাধ কী? তিনি তো কত লোকের চোখ ভাল করিয়া দিয়াছেন? আমার নিজেরই অদৃষ্টে এই ছিল। প্রভুর ইচ্ছা।' বৃদ্ধাটি কেমন: কী ধীর স্থির শান্ত ভাব! চোখ যাওয়ার দুঃখে তিনি একটুও বিচলিত নহেন। কিসে তিনি এইরূপ হইতে পারিলেন? একটি ভাবে যাহা তাঁহার চিত্তকে ভরিয়া রাখিয়াছিল।

দার্শনিকেরা জীবনে প্রাত্যহিকের দুঃখ নিবারণের উদ্দেশ্যে এইরূপ নানাভাব দিয়াছেন, যেখানে যেটা খাটে। এক ওষুধে সব ব্যারাম সারে না, এক ওষুধ সকলের জন্য নহে, আর সব ওষুধও একের জন্য নহে।

আজ যে কারণে সমস্ত পৃথিবী দানবের বা পিশাচের লীলাক্ষেত্র হইয়া অশান্তিতে ভরাইয়া যাইতেছে, আমাদের দার্শনিকেরা তাহা বহুপূর্বেই দেখিয়াছেন, আর তার প্রতীকারও চিন্তা করিয়াছেন। আমরা ইহা শুনিয়া শুনিয়া এতই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি যে, ইহার কোন গুরুত্বই মনে হয় না।

অত্যাধিক কামনা মৃত্যুবৎ দুঃখের কারণ

এটা দিবালোকেরই ন্যায় সুস্পষ্ট যে, আমাদের মনে কোন বিষয়ে প্রবল আকাঙ্ক্ষা হইলে যেরূপেই হউক যতক্ষণ সেই বিষয়টি না পাওয়া যায় ততক্ষণ ঘোর অস্বস্তি অনুভব করিতে হয়। আর তাহার পাওয়ায় যদি অল্পমাত্রও কোন বাধা আসে, তবে তাহাতে ক্রোধ হয়। ক্রোধ হইলে অকার্য বলিয়া কিছু থাকে না। আর তখন নিজের ও নিজের চারিদিকে সকলের দুঃখেরও অবধি থাকে না।

এই যে বিষয়ের প্রতি প্রবল আকাঙ্ক্ষা ইহাকে কাম, আসক্তি, তৃষ্ণা, বাসনা, কামনা ইত্যাদি নানা নাম দেওয়া হয়। কিন্তু ইহার দূরপ্রসারী ফলের দিকে লক্ষ করিয়া বুদ্ধদেব যে নাম দিয়াছেন তাহা হইতে উৎকৃষ্টতর আর কোন নাম হইতে পারে না। তাঁহার দেওয়া নামটি হইতেছে মার। মার ও মৃত্যু দুইই এক ধাতু হইতে এবং উভয়েরই অর্থ হইতেছে মরণ। অত্যধিক কামনা মৃত্যু বা মৃত্যুর মত দুঃখ ঘটায় বলিয়াই তাহার নাম মার।

ইহাকে জয় করিবার জন্য বুদ্ধদেবকে কী না চেষ্টাই করিতে হইয়াছিল। ইহাকে সংগ্রাম বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং ইহা খুবই যুক্তিযুক্ত। যতদিন তিনি ইহাকে জয় করিতে পারেন নাই ততদিন তিনি বুদ্ধ হন নাই।

বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের সমস্ত দর্শনের শেষ গতি এই মারবিজয় বা কামবিজয়ের দিকে। কেমন করিয়া ইহা ঘটিতে পারে, ইহার উপায় কী, তাহাই নির্দেশ বা অনুসন্ধান করিতে গিয়া ভিন্ন-ভিন্ন দার্শনিক ভিন্ন-ভিন্ন প্রক্রিয়া রচনা করিয়াছেন। আর ঐ উপায় অন্য কিছুই নহে কেবল কতকগুলি ভাব

একজন বলিয়াছেন, বিষয়সমূহ উপভোগ করিলে যে সুখ হয় আর স্বর্গের যে মহাসুখ, এই দুইই তৃষ্ণাক্ষয়-সুখের ষোল ভাগের এক ভাগেরও সমান নহে। কেমন করিয়া তিনি ইহা বলিলেন?

একবার এক যাত্রা হইতেছিল। কুমার-ব্রহ্মচারী শ্রীশুকদেব গোস্বামী রাজর্ষি জনকের নাম শুনিয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে মিথিলায় আসিয়াছেন। উভয়ের মধ্যে কথাবার্তা চলিতেছে। এমন সময় হঠাৎ তাঁহাদের সম্মুখেই আগুন লাগিয়া মিথিলা নগরী দাউ দাউ করিয়া পুড়িতে লাগিল। রাজর্ষি জনক ইহা দেখিয়াও নির্বিকার, অথচ শ্রীশুকদেব গোস্বামী অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। এই গল্প এককালে আমাদের দেশে খুবই প্রচলিত ছিল। জনক ছিলেন অকিঞ্চন, অর্থাৎ তাঁহার কিছুতেই আসক্তি ছিল না। তিনি বলিয়াছিলেন 'আহা আমি কী সুখেই জীবন ধারণ করি, আমার কিছুই নাই। মিথিলা পুড়িয়া যাইতেছে, কিন্তু আমার কিছুই পুড়িতেছে না'। এই গল্পে আমাদের চিত্তে একটা ভাবের উদ্রেক হয়। স্পষ্টই ইহা রচিত হইয়াছিল লোকের বিষয়ে আসক্তি কমাইবার জন্য।

দার্শনিকেরা বা ঋষিরা বারবার ও নানা কথায় শুনাইয়া আসিতেছেন, মানুষ হইতেছে মর্ত্য,—তাহার মরণ হয়। কিন্তু যদি হৃদয়ের সমস্ত কামনা যায় তবে সে সঙ্গে সঙ্গেই অমৃত হইয়া যায়। সে স্বর্গে গিয়া দেবতা হইয়া জন্মায়, ইহা একথার অর্থ নহে। ইহার এই অর্থ যে, কামকে ত্যাগ করিতে পারিলে সমগ্র দুঃখের অবসানে পরমা শান্তি পাওয়া যায়—সদ্য-সদ্য, এই জীবনেই।

কামনা ত্যাগের অর্থ

এখানে একটা কথা বলিয়া যাওয়া ভাল। কামনাত্যাগ করা মানে কেহ যদি মনে করেন যে, ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া দিয়া বনে গিয়া থাকা, তবে তাহা ভুল। অর্জুন বনেই যাইতে চাহিয়াছিলেন, ভিক্ষা করিয়া খাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যদিও তাঁহাকে কাম ত্যাগের উপদেশ দিয়াছিলেন তথাপি বলিয়াছিলেন, 'ওঠ অর্জুন, যশোলাভ কর, শত্রু জয় করিয়া সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর।' কিন্তু কামনা ত্যাগ কর বলিলেই তো তাহা করা যায় না। অন্যথা জগৎ তো সকলেরই কাছে আনন্দের উৎস হইত। ইহা বড় সোজা নহে। দার্শনিকেরা এক দিকে দেখিলেন উহা না করিলে মানবের দুঃখের অবসান নাই, অপর দিকে দেখিলেন যুক্তি দিয়া তাহাকে বুঝাইয়া না দিলে সে এজন্য কোনরূপ চেষ্টাই করিবে না। কোন কথায় যদি যুক্তি থাকে তবে তাহা মানবের অন্তরে গিয়া পৌঁছায়। তাঁহারা নানা যুক্তির অবতারণা করিলেন।

মানুষে সেই জিনিসটি চায় যাহাতে সে নিজের অনুকূল কিছু পায়, আর তাহা হইতে কোন অনিষ্ট না হয়। চন্দনে সুগন্ধ ও শীতলতা পাই, আর তাহা হইতে কোন অনিষ্ট হয় না বলিয়াই আমরা তাহা চাই। কিন্তু এরূপ হইলেও যাহা এই আছে এই নাই, তাহা আমরা চাই না। বাজারে গিয়া যে কাপড়খানিকে আমরা টেকসই দেখি, পারিলে সেইখানিই কিনি। মানুষে সকলের মূলে নিজের সত্তা চায়, আর তার সঙ্গে স্থায়ী আনন্দ চায়। ঘর-বাড়ী, হাতী-ঘোড়া, ধন-দৌলত হইতে আনন্দ হয়। কিন্তু দার্শনিক বলিলেন, 'এগুলি কয় দিন থাকে, এই আছে এই নাই, এ কি চাইবার যোগ্য?

এমন জিনিস চাও যা স্থায়ী হয়, যা নিত্য। অনিত্য লইলে তা একটু আনন্দ দেয় সত্য, কিন্তু তা যেই নিজের স্বভাবেই কোনরূপে নষ্ট হয় তখন বড় দুঃখ দেয়। তোমার চারিদিকে তাকাইয়া দেখ না, কোন জিনিসটা নিত্য? তোমার দেহটাই কি নিত্য? তাই ইহাও চাহিবার যোগ্য নহে।' দার্শনিক দেহের প্রতি আসক্তি কমাইবার উদ্দেশ্যে আরও শুনাইবেন, 'এই দেহ-দেহ করিতেছ, ইহা কি উপভোগ্য? ইহার মধ্যে আছে কী? ইহা তো একটা মল-মূত্র, রক্ত-লালা প্রভৃতি কতকগুলি অশুচি দ্রব্যের কুণ্ড। ইহা কে চাইবে? দার্শনিকের ভাষায়, তিনি মানুষকে অনিত্যভাবনা করিতে বলিবেন, অশুচিভাবনা করিতে বলিবেন, অনাত্ম-ভাবনা করিতে বলিবেন—অর্থাৎ বলিবেন 'ভাবিয়া দেখ না, এই যে তোমার দেহ, এটা নিত্য না অনিত্য? নিশ্চয়ই অনিত্য। যদি অনিত্য হয় তবে আবার ভাব, যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ না সুখ? নিশ্চয়ই দুঃখ। যাহা দুঃখ তাহা কি আত্মা হইতে পারে? আবার তুমি যে ইহাকে আমার আমার করিয়া মনে করিতেছ ইহা কি ঠিক? যাহা তোমার তাহাকে তুমি যেমন ইচ্ছা কর তেমনি করিয়া রাখিতে পার। কাপড়খানি তোমার, তুমি যেমন চাও তেমনি ইহার ব্যবহার করিতে পার। কিন্তু তোমার দেহটাকে সেইরূপে ব্যবহার করিতে পার কি? তুমি তো চাও দেহটা তোমার নির্বিকার থাকিবে, কিন্তু তাহা হয় কি?'

যাহা চোখে দেখা যায়, তাহাই কি সত্য সত্য থাকে?

দার্শনিক এইরূপে আরো কত কি বলেন। তিনি বলেন, 'এই যে তুমি তোমার লোক-জন ধন-দৌলতের কথা বলিতেছ, যাহা পাইবার জন্য তুমি মরিয়া হইয়া উঠিয়াছ, ইহা কি সত্যি-সত্যি আছে? তুমি তোমার চোখে ইহা দেখিতে পাইতেছ সত্য, কিন্তু যা তুমি চোখে দেখ তাই যে সত্য সত্য থাকে তাহা তো নয়। চোখে যদি তিমির রোগ হয় তবে একটা চাঁদের জায়গায় দুইটি চাঁদ দেখা যায়। চাঁদ তো একটাই। স্বপ্নে তুমি কত কী দেখ, সে সব কি সত্যি? একটা মশাল জ্বালাইয়া যদি তুমি তাহা ঘুরাইতে থাক তো কেবল তুমি কেন, আমরা সকলেই দেখিতে পাইব যে সেখানে একটা আগুনের চাকা আছে, কিন্তু বস্তুত যে, তাহা নাই ইহা যেমন আমরা জানি, তেমনি তুমিও জান। চোখের সামনে যে সব জিনিস দেখা যায় সেগুলি যে এমনি নয় সে কে বলিল? আমি তো বলিতেছি ঠিক তেমনি, ইহার অন্যথা হইতেই পারে না। যুক্তি যে ইহাই বলে।' দার্শনিক এই কথা বলিয়া ইহার অনুকূলে প্রকাণ্ড একটা যুক্তির প্রাসাদ গাঁথিয়া ফেলিবেন। তাহার মধ্যে সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

দার্শনিক আবার বলিবেন। 'তুমি তো বাপু, এটা সেটা কত জিনিসই চাও, তার সীমা-সংখ্যা নাই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই যে-তুমি চাও সেই তুমিই কে? তার স্বরূপটা কি? একবার ভাবিয়াছ কি? হাত, না পা, না চোখ, না কান, না মাথা, ইত্যাদি ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে কোনটা তুমি? ঐ সবগুলির সমষ্টিই কি তুমি, না এইগুলি ছাড়া আর কিছু তুমি? তাই যদি হয় তো সেটা কি? একবার তাকে দেখাও না। কিন্তু দেখাইতে পারিতেছ না। আমি তো বাপু, খুঁজিয়া খুঁজিয়া আসল তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না, তুমিও পাইতেছ না। এই যে 'তুমি' এ একটা নাম, সংজ্ঞা, সঙ্কেত, ব্যবহার মাত্র, এখানে বস্তু কিছুই নাই—যেমন জোয়াল, চাকা প্রভৃতি ভিন্ন-ভিন্ন অঙ্গ থাকিলে মানুষ সেগুলির নাম দেয় গাড়ী। তাই তোমারই যখন অস্তিত্বের ঠোর-ঠিকানা নাই, তখন তোমার কিছু চাওয়া একটা কি কিম্ভূতকিমাকার ব্যাপার নয়?'

দার্শনিক আবার বলিলেন, 'দেখ হে বাপু, ধরিলাম তুমি আছ। ঠিক তুমি আছ। কিন্তু তুমিই একমাত্র আছ, তোমা ছাড়া আর কিছু নাই। যেখানে দুইটা কিছু থাকে সেখানে চাওয়া বা পাওয়ার কথা উঠিতে পারে, কেও কাওকে দেখিতে পাইতে পারে, কেও কিছু ধরিতে পাইতে পারে, শুনিতে পাইতে পারে ইত্যাদি। কিন্তু যেখানে একমাত্র তুমি সেখানে তুমি কী দেখিবে, কী ধরিবে, কী শুনিবে?'

ইহা বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না যে, 'আমি' ও 'আমার' বুদ্ধি আমাদের বহু অনর্থের মূল। যেমন করিয়াই হউক আমাদের দেশের দার্শনিকেরা ইহাকে উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। একজনের কথা একটু উল্লেখ করি। তিনি বলিতেছেন, 'দেখ, 'আমি' এই জ্ঞান যদি থাকে, তবে 'পর' এ জ্ঞানও থাকিবেই। আর ইহাই যদি হয় তবে নিজের প্রতি একটা টান, ভালবাসা, আসক্তি, রাগ, আর পরের প্রতি একটা দ্বেষ হয়। এইরূপে যদি রাগ আর দ্বেষ হয় তবে যত রকমের দোষ, অনর্থ হইতে পারে সবই আসিয়া উপস্থিত হয়। তাই 'আমি' এবং তাহার আনুষঙ্গিক 'আমার' এই বুদ্ধিটি থাকিলে আমাদের দুঃখের অবসান নাই।'

দার্শনিকেরা এইরূপে কত কথা বলিয়া মানুষকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সে বুঝে কৈ? বুঝিলেই বা তাহা করে কৈ?

যাহার পরিণামে আজ সমগ্র জগৎ অস্বস্তি ও অশান্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে তাহা এই কাম বা তৃষ্ণা। এই কামই বন্ধন, দার্শনিক বলিতেছেন, অন্য বন্ধন নাই। আর ইহার ক্ষয়ই হইল মোক্ষ। ব্যারাম গিয়া ঢুকিয়াছে হাড়ে, একেবারে মজ্জার ভিতরে, বাহিরে একটু প্রলেপ লাগাইলে কী হইবে? শত-সহস্র লীগ অফ নেশন অস্ত্রশস্ত্র কমাইবার কথা বলিলে বা নিয়ম করিলে কিছু হইবে না। অন্তত হইল যে না, তাহা দেখাই গেল। কিন্তু আমাদের দার্শনিকেরা ব্যারামের যে ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাতে উহা সারে কি না, তর্ক করিয়া কী হইবে, একটু পরীক্ষা করিয়াই দেখ না। জল পান করিলে পিপাসা যায় কি না তাহা একটু জল পান করিয়া দেখিলেই হয়।

বন্ধুগণ কোন রকমে আপনাদের হুকুম তামিল করিলাম। এইবার নমস্কার। কী আর বলিব? ধ্রুবের কথাটি মনে করি—

"স্বস্ত্যস্তু বিশ্বস্য"

বিশ্বের কল্যাণ হউক।

সাড়া

(গল্প)

শ্রীজগন্নাথ সরকার

(১)

বর্ষার পদ্মা। এক পার হইতে আর এক পার দেখা যায় না। তাহার উন্মাদ জলকল্লোলে কান পাতিয়া রাখা দায়। ঢেউএর উপর ঢেউএর উচ্ছ্বাস আজ পদ্মাকে একেবারে ভীষণ করিয়া তুলিয়াছে। এই পদ্মার কূলে নাদিরগঞ্জের ঘাটে রহিম মাঝি তাহার নৌকাখানি লাগাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। মুখে চিন্তার রেখা। এ তুফানে আজ কোন যাত্রীই পাওয়া যাইবে না। রহিম অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল। অবশেষে আর কোন আশা নাই দেখিয়া পাশের নৌকার মাঝিকে ডাকিয়া বলিল,—নাছির ভাই, একছিলিম তামুক সাজ ত। গোটা দুই টান দিয়ে রওনা হ'য়ে পড়ি।

—সে কি? এই তুফানের মধ্যে?

—তা আর কি করি বল। বাড়ীতে বউয়ের অবস্থা ভাল নয়। কখন কি ক'রে বসে ঠিক নাই। তারওপর গরু দুটা হয়ত না খেয়েই মারা পড়বে।

নাছির হাত দিয়া কলিকার আগুন চাপা দিয়া বলিল, —তা যাই বল রহিম ভাই,—তোমার বউয়ের যেন সব তাতেই একটু বাড়াবাড়ি। সকলের ছেলেপেলেই ত আর সমান দিন বাঁচে না। তাই বলে সারা বছর ধরে গুম হ'য়ে বসে থাকলে সংসার চলে কি ক'রে?

রহিম কোন উত্তর করিল না। আস্তে আস্তে নাছিরের হাত হইতে হুঁকোটি লইয়া কয়েকটি টান দিল। তারপর নৌকা ছাড়িয়া দিল। পিছন হইতে নাছিরের গলা শোনা গেল, —একটু সামাল হ'য়ে চল, রহিম ভাই। গাঙ্গে আজ যা তুফান উঠেছে।

রহিমের কানে কথাটা গেল কি না বোঝা গেল না। সে কোনদিকে খেয়াল না করিয়া নৌকা চালাইতে লাগিল। তাহার আশে পাশে চারিদিকে উত্তাল তরঙ্গগুলি ক্রুদ্ধ গর্জ্জনে ফুলিয়া উঠিতেছিল। ঢেউএর দোলায় দুলিতে দুলিতে তাহার মনে পড়িয়া গেল বহুদিন পূর্ব্বেকার টুকরা টুকরা স্মৃতি। লতিফার সঙ্গে তাহার বিবাহের কথা। তখন তাহারা দুজনেই বালক-বালিকা। এই উত্তাল পদ্মার বুকে তাহারা বিবাহের পরও সাঁতার কাটিয়াছে—হুটোপাটি করিয়াছে। ছোটবেলা হইতেই তাহারা এই পদ্মাকেই সমস্ত হৃদয়-মন দিয়া উপভোগ করিয়াছে—ভালবাসিয়াছে। বড় হইয়াও রহিম এই পদ্মাকে ছাড়ে নাই। পাঁচ বৎসর আগে সে একটি ছোট নৌকামাত্র সম্বল করিয়া মাঝির কাজ আরম্ভ করিয়াছিল। আজ তাহার মত পাকা মাঝি আশে পাশের পাঁচ সাতটা গ্রামের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

কিন্তু সে তাহার জীবনের প্রথম আঘাত পাইল এই পদ্মার কাছ হইতেই। সে আজ প্রায় বৎসরখানেক আগেকার কথা। রহিম নৌকার উপর বসিয়া বসিয়া সেই সর্ব্বনাশের কথাই চিন্তা করিতে লাগিল।

বহু সাধ্য-সাধনার পর এবং বহু পীরের দরগায় সিন্নী-মানতের পর যখন লতিফার কোল জুড়িয়া একটি নবীন অতিথির শুভাগমন হইয়াছিল,—তখন সকলেই তাহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিল। কি সুন্দর ফুটফুটে রঙ, আর কি সুন্দর তার চোখ! ছেলেটাকে যে দেখিত সেই রহিমকে ডাকিয়া বলিত,—রহিম তোর আঁধার ঘরে চাঁদ উঠেছে রে!

রহিম মৃদু হাসিয়া বলিত,—তা ভাই, খোদার রহমে এখন বরাতে টিকলে হয়

সে হয়ত ধমকের সুরে বলিত,—ছি, অমন কথা মুখেও আনতে নাই।

রহিম তার নাম রাখিয়াছিল চাঁদ মিঞা—হয়ত আকাশের চাঁদের সঙ্গে সামঞ্জস্য ছিল বলিয়াই। সারাদিন ধরিয়া ঢেউ আর স্রোতের সহিত যুদ্ধ করিয়া যখন সে ঘরে ফিরিত—তখন এই চাঁদের একটুখানি হাসিই তাহার সমস্ত পরিশ্রম এক নিমিষেই হরণ করিয়া লইত। সে চাঁদকে বুকে তুলিয়া ভাবিত তাহার মত সুখী বোধ হয় এ পৃথিবীতে কেহ নাই।

চাঁদের মত শান্ত ছেলে সচরাচর পাওয়া যায় না। সারাদিন চুপ করিয়া থাকিত—একটুও কাঁদিত না। ক্রমে ক্রমে সে হামাগুড়ি দিতে শিখিল। সারাবাড়ী হামাগুড়ি দিয়া ফিরিত।

লতিফা তাহাকে উঠানে বসাইয়া বলিত,—দেখিস যেন গাঙের ওধারে যাস্‌নে।

চাঁদ তাহার নূতন ওঠা দাঁত দুইটা বাহির করিয়া উত্তর দিত,—ইজ্‌জা।

কথাটার মানে হয়ত কিছুই নাই, কিন্তু লতিফা তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া নিজের কাজে চলিয়া যাইত। কারণ চাঁদের স্বভাব সে জানিত। উঠানের বাহিরে সে কখনই যাইবে না।

কিন্তু এই স্থিরবিশ্বাস একদিন কাল হইয়া দেখা দিল। সেদিন রহিম গিয়াছিল নিশ্চিন্তপুরের মেলায় কয়েকজন দোকানদারের ভাড়া খাটিতে। লতিফা প্রত্যেক দিনের মত সেদিনও চাঁদকে উঠানের মাঝখানে বসাইয়া নিজের কাজ করিতে গেল। চাঁদ খানিকক্ষণ এদিক ওদিক হামাগুড়ি দিয়া বেড়াইল। তারপর হঠাৎ কি খেয়াল হইল, উঠান পার হইয়া পদ্মার দিকে যাইতে লাগিল। রহিমের ঠিক বাড়ীর নীচেই পদ্মা। লতিফা কাজ সারিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখে চাঁদ সেখানে নাই। দৌড়াইয়া পদ্মার পাড়ের দিকে যাইতে যাইতে সে যাহা দেখিল তাহাতে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। চাঁদ পাড়ের একেবারে কিনারায় যাইয়া কি যেন ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। পরমুহূর্ত্তে ডিগবাজি খাইয়া পদ্মার প্রখর স্রোতে পড়িয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। লতিফা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া গাঁয়ের লোক সেখানে সমবেত হইল। তারপর সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া জাল লইয়া অনেক খোঁজাখুঁজি করিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না।

সেদিন রহিম একটু রাত করিয়াই নিশ্চিন্তপুরের মেলা হইতে ফিরিল। সঙ্গে একটা লাল পুতুল আর একটা বাঁশী।

এই দুইটি জিনিষ পাইয়া চাঁদ যে কত খুশী হইবে রহিম তাহা ভাবিতে ভাবিতে আনন্দে অধীর হইয়া উঠিতেছিল। নৌকা ঘাঁটে লাগাইবার অনেক পূর্ব্বে হইতেই সে বাঁশীটা বাজাইতে লাগিল—যেন সে দিগ্বিজয় করিয়া চাঁদের জন্য অনেক কিছু লইয়া আসিয়াছে। কিন্তু বাড়ীর ভিতর যাইয়া লতিফার চেহারা দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল। চুল উস্কো-খুস্কো—পাগলিনীর মত চেহারা। সারা কাপড়ে ধূলায় গড়াগড়ি দেওয়ার চিহ্ন। রহিমকে দেখিয়াই সে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া বলিল,—চাঁদ নাই—চাঁদ চলে গেছে।

—সে কি! কোথায়?

—গাঙে!

ব্যাপারটা সমস্ত শুনিয়া রহিম আকুল প্রাণে কাঁদিয়া উঠিল। তাহার চীৎকারে গাঁয়ের কেহই অশ্রু সংবরণ করিতে পারে নাই। সেই হইতেই লতিফার যেন কি হইল। সারাদিন চুপচাপ গম্ভীর হইয়া বসিয়া থাকে। একটিও কথা বলে না। পাড়ার লোক শত চেষ্টা করিয়াও কথা বলাইতে পারে না। কিন্তু রাত্রে রহিম বাড়ী ফিরিয়া আসিলে তাহার কথার বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়,—সে-সমস্তই চাঁদ সম্বন্ধে অবান্তর কথা। রহিম চুপ করিয়া এ পাগলামী সহ্য করে—কারণ তাহা ছাড়া উপায় নাই।

উত্তাল তরঙ্গের মধ্য দিয়া নাদিরগঞ্জের ঘাট হইতে ফিরিবার পথে রহিম তাহার এই সুদীর্ঘ দুঃখের কাহিনীই চিন্তা করিতেছিল।

(২)

ঘাটে নৌকা ভাল করিয়া বাঁধিয়া রহিম বাড়ীর ভিতর যাইয়া দেখে কেহ কোথাও নাই। তখন অন্ধকার ঘোর হইয়া গিয়াছিল—কিন্তু সারা বাড়ীতে একটিও আলো জ্বালা হয় নাই—চারিদিকে থমথমে অন্ধকার।

রহিম ডাকিল,—লতি!

কোনই উত্তর আসিল না। রহিম আবার ডাকিল,—লতি?

সম্মুখের বারান্দার একটি অন্ধকার কোণ হইতে উত্তর আসিল—কি?

—সারাদিন যদি এমনি চুপচাপ করে বসে থাকিস্ তা-হ'লে আমিই বা পারি কি ক'রে বলত?

লতিফা সে কথা গায়ে তুলিল না। রহিমকে জিজ্ঞাসা করিল, চাঁদ আসেনি? চাঁদ কই? ও বুঝি দুষ্টামী করে নায়ে বসে আছে? দাঁড়াও আমি ওকে নিয়ে আসি।

লতিফা যাইতে উদ্যত হইতেই রহিম তাহার হাতটা শক্ত করিয়া ধরিয়া বলিল,—ছি লতি, এত রাতে আর পাগলামী করিস্‌নে।

লতিফা যেন সে কথা শুনিতেই পাইল না,—আপন মনেই বলিয়া চলিল,—আচ্ছা, ও অত শয়তান কেন মাঝি? এক-বারও আমার কাছে আসে না। আমি এত ডাকি—ও আমার কথা একটুও গায়ে তোলে না।

রহিম ধমকের সুরে বলিল,—দেখ্ লতি, ফের যদি তুই আবোল তাবোল বকিস, তাহলে আমি ঠিক গলায় দাড়ি দিয়ে মরে থাকব।

লতিফা ইহাতে একটুও ভয় পাইল না। রহিমের কাছ ঘেঁসিয়া বসিয়া বলিল, আবোল-তাবোল আবার কি বকি? দেখ, আমার চাঁদ কিন্তু বড় হ'য়ে তোমার চেয়েও ভাল মাঝি হবে। ও গাঙকে একটুও ডরাবে না।

রহিম বিরক্ত হইয়া বসিয়া পড়িয়া তামাক সাজিতে লাগিল। লতিফা কিন্তু সমানভাবেই বকিয়া চলিতে লাগিল। সমস্তই অবান্তর প্রলাপ। রহিম অনেকক্ষণ ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তারপর আর থাকিতে না পারিয়া বলিল,—তুই সারারাত ধরে ঘ্যানর ঘ্যানর করবি না ভাতটাত রাঁধবি। ক্ষিদেয় যে পেটের নাড়ী জ্বলে যাচ্ছে।

লতিফা যেন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িয়া বলিল,—তাই ত সারাদিন চাঁদ আমার না খেয়ে আছে। আচ্ছা আমি যাচ্ছি। সে একটি কেরোসিনের ডিবে ধরাইয়া রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল। রহিম তাহার গমন পথের দিকে তাকাইয়া একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল,—আল্লা!

রহিম বারান্দার যেখানে বসিয়াছিল সেখান হইতে পদ্মার কিছুটা অংশ দেখা যায়। কিন্তু ঘোর অন্ধকারে রহিম সে দিকে চাহিয়া কিছুই দেখিতে পাইল না। অকারণেই তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। বাহিরে পদ্মার উন্মাদ জলকল্লোলের শব্দ। বহুদূরে গ্রামের মধ্যে কয়েকটি শৃগাল সমস্বরে ডাকিয়া উঠিল। বাড়ীর পাশের ঝোপের মধ্যে কয়েকটি ঝিঁ ঝিঁ পোকা তাহাদের ভৈরব রাগিণী জুড়িয়া দিয়াছে। রহিম বারান্দার থামটাতে হেলান দিয়া দূরের আঁধার-ঘেরা পদ্মার দিকে চাহিয়া একটি চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

হঠাৎ হাসির শব্দে সে সচকিত হইয়া উঠিল। চাহিয়া দেখে লতিফা রান্না করিতে করিতে ভীষণভাবে হাসিতেছে।

একটু পরেই লতিফা বলিয়া উঠিল,—উ, ছাড়্ ছাড়্, ভীষণ লাগে। চুল ধরে অত জোরে টানিস্ নে—এই চাঁদ! যা ঐখানে চুপ ক'রে বসে থাক ত। যা বাপজান! এখন রাঁধবার সময়,—এখন কি বিরক্ত করতে আছে? সারাদিন না খেয়ে আছিস্। চুপ করে না থাকিস্ ত মাঝিকে ডাক্‌ব কিন্তু......

রহিমের বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। সে জানে এসব লতিফার প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। তবুও আজ যেন সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাহার অবাধ্য চরণ তাহাকে রান্নাঘরের দিকে লইয়া চলিল। যদি যাইয়া দেখে চাঁদ সত্যি সত্যি লতিফার চুল ধরিয়া টানিতেছে, তাহা হইলে......।

রহিম রান্নাঘরের দরজার পাল্লাটা আর একটু ফাঁক করিয়া বাহির হইতে বলিল,—কে রে লতি?

—কে আবার? চাঁদ মিঞা। তোমাকে দেখে ভয় পেয়ে চলে গেল।

রহিম জানিত সে যে আশা করিয়া রান্নাঘরের দিকে আসিয়াছিল সে আশা কোন দিন সফল হয় না—হইতে পারেও না। তবু সে লতিফার কথা শুনিয়া একেবারে দমিয়া গেল। আস্তে আস্তে ঘরের ভিতর ঢুকিয়া একটি পিঁড়ি লইয়া

সামনের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সামনের কপির জানালা দিয়া এতক্ষণে কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমীর চাঁদ উঁকি মারিতেছিল। বাহিরে গাছপালার ভিতরে আবছা অন্ধকার। হাজার হাজার জোনাকী পোকা সেই অন্ধকারের মধ্যে যাইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরিতেছে। দূরে ঝাউ বনের শব্দ দীর্ঘশ্বাসের মতই শোনা যায়। একটি নিশাচর পাখী ডানা ঝটপট করিতে করিতে উড়িয়া গেল। বাহিরের সমস্ত কিছু আজ রহিমকে একেবারে বিচলিত করিয়া তুলিল।

লতিফা রান্না শেষ করিয়া রহিবের গা ঘেঁসিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়া খানিকক্ষণ জানালার বাহিরে চাহিয়া রহিল। তারপর হঠাৎ বলিয়া উঠিল,—আচ্ছা মাঝি, একটা কথা সত্যি ক'রে বল্‌বি ?

—কি ?

—বল্‌ মিথ্যে বল্‌বিনে—মক্কা-মদনের কিড়ে।

—অত সব কিড়ে ফিড়ে আমি বুঝি নে। ইচ্ছে হয় বল্‌ না হয় চুপ করে থাক্‌। বকর বকর করিস নে।

আচ্ছা আমার চাঁদ মিঞাই ভাল, না, আশমানের চাঁদই ভাল ?

রহিম কোন উত্তর করিল না।

লতিফা আপন মনেই বলিয়া চলিল,—আমার চাঁদই ভাল। কেমন সুন্দর হাসে—কোলে আসে - চুল ধরে টানে! আশমানের চাঁদ ত আর তা পারে না। তাই না মাঝি ?

রহিম এবার আর নিজেকে সামলাইতে পারিল না। দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুজিয়া হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

বাহিরে পদ্মার দিক হইতে একটি একটানা শোঁ শোঁ শব্দ ভাসিয়া আসিতেছিল।

(৩)

এর পর কয়েকদিন কাটিয়া গেল। একদিন খুব ভোরে রহিম ঘুম হইতে উঠিয়াই লতিফাকে ডাকিয়া তুলিল,—লতি, ওঠ্‌ ত। আজ সারেঙ্গডাঙ্গা দত্তবাবুদের একটা ভাড়া আছে। তুই সকাল সকাল যা হয় কিছু রেঁধে-টেধে রাখিস। আমি এই পথ দিয়ে যাবার সময় খেয়ে যাব। সন্ধ্যার আগেই তাদের পলাশপুর পোঁছে দিতে হবে। আজকাল বিকেলে আবার যা বাতাস ওঠে।

লতিফা একটি কথাও বলিল না। চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে উঠিয়া গেল। রহিম কয়েক টান তামাক খাইয়া সারেঙ্গডাঙ্গার উদ্দেশ্যে নৌকা ছাড়িয়া দিল। দত্তবাবুরা তাহার খুব পরিচিত। পদ্মা দিয়া কোনখানে যাইতে হইলেই তাঁহারা রহিমকে স্মরণ করিতেন। কারণ বয়সে অল্প হইলেও রহিমের মত পাকা মাঝি এদিকে আর ছিল না।

সারেঙ্গডাঙ্গার যাত্রী হইল মোট পাঁচ জন। দত্তবাবু নিজে, তাঁর স্ত্রী, পিসিমা, দুই বছরের ছেলে খোকা ও গোমস্তা গোপাল সরকার। রহিম যাইয়া হাল ধরিয়া বসিল। কিন্তু সে আজ বড়ই উন্মনা হইয়া পড়িতে লাগিল। খোকাবাবুর দিকে যতবারই তাহার চোখ পড়িতে লাগিল ততবারই তাহার প্রাণের ভিতর হুহু করিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার চাঁদের চেহারাও ঠিক এমনি ধরণের ছিল,—এমনি ফুটফুটে রঙ—এমনি টানাটানা চোখ। খোকাবাবু হামাগুড়ি দিয়া সারা নৌকাখানি তোলপাড় করিয়া তুলিল। একবার মায়ের চুল ধরিয়া টানে—একবার দত্তবাবুর কাঁধের উপর ঝুলিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া ওঠে। কাচের ভারী পুতুলটা দিয়া পিসিমার মাথায় এমন জোরে ঠুকিয়া দিল যে, তিনি বেদনায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন

—কি, উঃ, কি দুষ্টু ছেলেরে বাপু। চুপ ক'রে বস্‌ ত দেখি এখানে। একটুও নড়বিনে।

খোকাবাবু সে পাত্রই নয়। ছইয়ের ফাঁক দিয়া বাহিরের ঢেউগুলি দেখা যাইতেছিল। মায়ের আঁচল ধরিয়া টানিয়া সেদিকে হাত দিয়া দেখাইয়া অস্পষ্টস্বরে বলিল,—মা, বো—মা, বো।

মা হাসিয়া উঠিলেন,—হে' বউ। যা দেখিস্‌ সবই ত তোর বউ।

সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। রহিমও না হাসিয়া পারিল না। সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইল যদি খোকাবাবুকে কোলে করিয়া আদর করিতে পারিত!

হঠাৎ খোকার নজর রহিমের উপর পড়িয়া গেল। হামাগুড়ি দিয়া সেই দিকে আসিতে যাইবে অমনি তাহার মা তাহাকে দুইহাতে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন,—ওদিকে যাস্‌নে। পড়ে যাবি।

খোকা মায়ের হাত ছাড়াইবার অনেক চেষ্টা করিল। মা বলিলেন,

—দেখ্‌, দুষ্টুমী করিস তো তোকে আর আমরা নেব না। রহিমকে দিয়ে দেব। রহিমকে ডাকিয়া বলিলেন,

—রহিম, আমাদের এই ছেলেটা নিবি ?

রহিমের মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল,

—তা দিয়ে দ্যান মাঠান।

কথাটা সে রহস্যচ্ছলে বলিলেও তাহার বুকের ভিতরটা ছ্যাৎ করিয়া উঠিল। নৌকা এতক্ষণে রহিমের বাড়ীর প্রায় কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছিল। সে দত্তবাবুকে ডাকিয়া বলিল,

—বাবু, একটু যদি দাঁড়ান ত মুখে কিছু দানাপানি দিয়ে আসি

—তা বেশ যা। তবে একটু শীগ্‌গির শীগ্‌গির সেরে আয় বাপু। পদ্মায় আবার আজকাল যা অবস্থা—কখন কি হয় বলা যায় না।

রহিম ঘাটে নৌকা ভিড়াইয়া নামিতে যাইবে—খোকাবাবু হামাগুড়ি দিয়া তাহার কাছে আসিয়া হাজির। রহিমের সহিত যাইবার জন্য সে হাত বাড়াইল। মা তাহাকে ধরিয়া রাখার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন। অবশেষে রহিম বলিল,

—তা ছেড়ে দ্যান মাঠান। খোকাবাবু বোধ হয় আমার বাড়ী দেখবে।

খোকা ততক্ষণে রহিমের হাত ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। রহিম তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল। ভাবিল, মন্দ নয়—লতিফা হয়ত খোকাবাবুকে দেখিয়া তাহার শোক অনেকটা ভুলিয়া যাইবে। সে বাড়ীর ভিতর যাইয়া দেখে লতিফা রান্না-

ঘরের দরজার কাছে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। হাসিতে মুখ উজ্জ্বল করিয়া সে ডাকিল,

—লতি, দ্যাখ ত কে এসেছে!

লতিফা চোখ তুলিয়া চাহিয়াই ভীষণভাবে চমকাইয়া উঠিল। তারপর ছুটিয়া আসিয়া খোকাকে রহিমের কোল হইতে একটানে কাড়িয়া লইয়া নিজের বুকে খুব করিয়া চাপিয়া ধরিল। খানিকক্ষণ তাহার মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিয়া হুহু করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। খোকা প্রথমে অবাক হইয়া তাহার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। তারপর কি মনে করিয়া তাহার নূতন ওঠা দাঁত দিয়া লতিফার নাক কামড়াইয়া ধরিল। লতিফা এবার একেবারে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। তারপর খোকাকে কোলে লইয়া এক দৌড়ে শোয়ার ঘরের মধ্যে যাইয়া ঢুকিল। বাহির হইতে রহিম ডাকিল,

—শীগ্‌গির ভাত দিয়ে যা ত। বাবুদের নিয়ে আবার এখুনি রওনা হতে হবে।

ভিতর হইতে লতিফার স্বর শোনা গেল,

—রাঁধা আছে, বেড়ে ন্যাওগে যাও। আমার এখন সময় নাই।

রহিম উপায়ান্তর নাই দেখিয়া নিজেই রান্নাঘরের মধ্যে যাইয়া ঢুকিল। খাওয়া দাওয়া সারিয়া সে এঘরে আসিয়া দেখে যে, লতিফা একটি পুরান বেতের চুপড়ি খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে সেই নিশ্চিন্তপুরের মেলা হইতে কেনা লাল পুতুল ও বাঁশীটা বাহির করিয়া খোকার হাতে দিতেছে। রহিম বলিল,

—ওকে দে দেখি এখন। এবার রওনা হ'য়ে পড়ি।

লতিফা খোকাকে বুকের কাছে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,

—সে কি আমার চাঁদ আবার কোথায় যাবে?

রহিম অবাক হইয়া গেল।

—চাঁদ কোথায় রে? ও ত দত্তবাবুর ছেলে খোকাবাবু।

—ইস্, বললেই হ'ল? না না চাঁদকে আমি কিছুতেই ছাড়ব না।

রহিম মহা মুস্কিলে পড়িল। ঘাট হইতে দত্তবাবুর গলা শোনা গেল,

—রহিম, তোর হ'ল রে?

রহিম চাপা গলায় বলিল,

—শুনলি ত? এখন শীগ্‌গির ওকে দে।

—না, আমি দেব না।

—ছিঃ, এ আবার কি আরম্ভ করলি। একশোবার বলছি এ চাঁদ না,—দত্তবাবুর ছেলে—তাও শুনবি নে!

—ইঃ, ফাঁকি দেওয়ার আর জায়গা পাওনি। তুমি যাই বল চাঁদকে আমি কিছুতেই ছাড়ব না।

সে খোকাকে আরও জোর করিয়া চাপিয়া ধরিল।

রহিম দেখিল, জোর করিয়া না কাড়িয়া লইলে লতিফা কিছুতেই খোকাকে ছাড়িবে না। সে যতই জোর করিতে লাগিল, লতিফা ততই খোকাকে বুকে চাপিয়া ধরে। শেষকালে লতিফা আর না পারিয়া খোকাকে ধাক্কা দিয়া রহিমের দিকে সরাইয়া দিয়া বলিল,

—নে যা,—দূর হ'য়ে যা। গোল্লায় যা।

মাটির উপর লুটাইয়া পড়িয়া সে হুহু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। রহিমের চোখও শুষ্ক ছিল না। তাড়াতাড়ি করিয়া চোখ মুছিয়া সে খোকাকে লইয়া ঘাটে আসিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। ঈশান কোণে তখন একটু কালো মেঘের রেখা দেখা যাইতেছিল।

(৪)

রহিম পলাশপুর হইতে যখন ফিরিয়া আসিল, তখন সন্ধ্যা ঘোর হইয়া গিয়াছে। একে অমাবস্যার রাত, তার ওপর আবার মেঘে মেঘে সমস্ত আকাশ একেবারে কালো করিয়া তুলিয়াছে। পদ্মার জল স্থির নিথর। নদীর এত শান্ত মূর্ত্তি ত রহিম কোনদিন দেখে নাই। চারিদিকে একটা গুমোট ভাব। অনুমানে বুঝিল নিশ্চয়ই একটা ঝড় উঠিবে। চারিদিক একেবারে নিস্তব্ধ। ক্বচিৎ কখনও দুই একটা পাখী নদীর উপর দিয়া উড়িয়া বাসায় ফিরিতেছে তাহারই যা শব্দ। রহিম আস্তে আস্তে ঘাটের জিগার গাছটার সহিত রশি দিয়া নৌকাখানা বাঁধিল তারপর বাড়ীর ভিতর যাইয়া সে কাহাকেও দেখিতে পাইল না। ঘরের ভিতর যাইয়া কোমরের খুঁট হইতে দেশলাই বাহির করিয়া জ্বালাইল। দেখে খোকাবাবুকে কাড়িয়া লইবার সময় লতিফা যেখানে লুটাইয়া পড়িয়াছিল ঠিক সেখানেই সে তেমনিভাবে পড়িয়া আছে। রহিম প্রথমে বাতি ধরাইল তারপর লতিফার কাছে গিয়া তার গায়ে হাত দিয়া ডাকিল।

—লতি, তোর কি কোন অসুখ-উসুখ করেছে রে?

এবার লতিফা পাশ ফিরিয়া রহিমের দিকে তাকাইল। রহিম অবাক হইয়া গেল। একেবারে শান্ত সুন্দর মুখশ্রী! চোখে সে উন্মাদ দৃষ্টি আর নাই। এ যেন পাঁচ বৎসর পূর্ব্বেকার সেই লতিফা,—শান্ত হাস্যময়ী। রহিমের বুকটা আনন্দে দুলিয়া উঠিল। তাহার ঔষধ তাহা হইলে কাজে লাগিয়াছে। নিশ্চয়ই খোকাবাবুকে দেখিয়াই সে এরূপভাবে তাহার শোক ভুলিতে পারিয়াছে। সে আল্লাকে উদ্দেশ্য করিয়া সহস্র সহস্র সেলাম জানাইল। তারপর লতিফাকে বলিল,—শরীল এখন কেমন লাগছে? ভাল ত?

লতিফা কোন উত্তর করিল না। তেমনি শান্তভাবে উঠিয়া কোন কথা না বলিয়া রান্নাঘরের দিকে চলিল। রহিম ভাবিল বেশী ঘাটাইয়া লাভ নাই—ফল খারাপ হইতে পারে।

সে হাত মুখ ধুইয়া রান্নাঘরে যাইয়া দেখে, লতিফা ঠিক তেমনি শান্তভাবে বসিয়া রান্না করিতেছে। রহিম ঘরে ঢুকিতেই সে একবার উদাস দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইল। তারপর আবার নিজের কাজে মন দিল। অন্য দিন হইলে এতক্ষণ তাহার কথার বাঁধ ভাঙিয়া যাইত। কত কি অর্থহীন প্রলাপ বকিত—মিছামিছিই হয় ত হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিত। কিন্তু আজ আর সে ভাব নাই।

রহিম বহুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর ভাবিল কথাবার্ত্তা বলিলে লতিফার মনটা হয় ত আরও ভাল হইতে

পারে। এই মনে করিয়া সে তাহার সহিত কথা বলার চেষ্টা করিল। কিন্তু লতিফা তেমনি শান্ত—নির্বাক। রহিম একটু অবাক হইয়া গেল।

রান্না শেষ হইলে লতিফা আস্তে আস্তে ভাত বাড়িয়া রহিমের সামনে থালাখানা সরাইয়া দিল। একটিও কথা বলিল না। রহিম দেখিল কথা বলার চেষ্টা বৃথা। সেও নিঃশব্দে খাওয়া সারিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল—কি ভীষণ অন্ধকার! সারা আকাশ জুড়িয়া কে যেন কালি লেপিয়া দিয়াছে। বাড়ীর নীচেই পদ্মা। অথচ তাহার জল একটুও দেখা যাইতেছে না। সব একেবারে একাকার হইয়া গিয়াছে। বহুদূরে অল্প অল্প বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। রহিম ডাকিয়া বলিল,—একটু তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে আয় লতি। এক্ষুণি বুঝি ঝড় উঠবে।

সে বারান্দায় আসিয়া হুকা-কলিকা লইয়া বসিল। লতিফা খাওয়া-দাওয়া সারিয়া এ ঘরে আসিতেই অল্প অল্প বাতাস বহিতে আরম্ভ করিল। নদীর দিক হইতে একটা অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনি ভাসিয়া আসিতে লাগিল। প্রথমে কলকল —তারপর ছলছল—তারপর একেবারে ছপাৎ ছপাৎ। রহিম বুঝিল বাতাস ক্রমেই চড়িতেছে। একটু পরেই শোঁ শোঁ করিয়া ভীষণ বাতাস বহিতে আরম্ভ করিল। নদীর বুকে তখন তুফানের খেলা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। বাতাস আর ঢেউয়ের শব্দে কান পাতিয়া রাখা দায়। হঠাৎ রহিমের দৃষ্টি লতিফার উপর পড়িতেই সে একেবারে অবাক হইয়া গেল। সে শান্ত মুখচ্ছবি আর নাই। দরজার কাছে বসিয়া সে নদীর দিকে চাহিয়া উৎকর্ণ হইয়া কি যেন শুনিবার চেষ্টা করিতেছে।—নদীর উদ্দাম কৃষ্ণতরঙ্গের মধ্যে তাহার চঞ্চল দৃষ্টি কি যেন খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই সময় মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়া পড়িল। চারিদিকে কেবল ঝড়, বৃষ্টি, ঢেউ আর পাড় ভাঙ্গার শব্দ। লতিফা হঠাৎ রহিমের কাছে আসিয়া তাহার মুখের দিকে উন্মাদ দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিল,—আমার চাঁদ কই মাঝি?

রহিম কি যে করিবে ভাবিয়া পাইল না। বাহিরে উন্মাদিনী পদ্মা আর ভিতরে ততোধিক উন্মাদিনী একটি নারী। সে প্রমাদ গণিল। তাহাকে কিছু বলিবার অবসর না দিয়া লতিফা পুনরায় বলিল,—কই এখনও ত এল না। তুই তখন নিয়ে গেলি। বাপজানের আমার সারাদিনের মধ্যে দেখা নাই। সে কখন আসবে রে মাঝি?

রহিম কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। একটু পরে তাহাকে শান্ত করিবার ছলে বলিল,—এই আর একটু পরেই আসবে তুই এখন চুপ করে বস ত।

আচ্ছা এই আঁধারের মধ্যে বাড়ী চিনতে পারবে ত?

—কেন পারবে না? খুব পারবে

—না থাক্, আমিই যাই।

—কোথায়?

—গাঙের ধারে।

রহিম তাহার হাতখানা দৃঢ়ভাবে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, —সে কি? এই তুফানের মধ্যে?

—না হাত ছাড় তুই। আমি যাবই। বাপজান আমার আমাকে না দেখলে ওখান থেকেই ফিরে যাবে।

বাহিরের প্রলয়ের মাতামাতি ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। একটা দমকা ঝাপ্টা আসিয়া তাহাদিগকে একেবারে ভিজাইয়া দিল। ঘরের আলোটা দপ করিয়া নিবিয়া গেল। রহিম লতিফাকে ঘরের ভিতর জোর করিয়া টানিয়া আনিয়া দরজায় খিল দিয়া দিল। তারপর আন্দাজ করিয়া তাহাকে বিছানার কাছে লইয়া গিয়া শোয়াইয়া দিয়া বলিল,—এখন একটু চুপ করে ঘুমা ত। সে যদি আসে তোকে ডাক দিয়েই তুলবে।

—ঠিক ত? আল্লার নাম করে বল্ ত?

রহিম চুপ করিয়া গেল। লতিফা আর কোন কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। বহুক্ষণ চুপ করিয়া থাকার পর হঠাৎ ধড়মড় করিয়া বিছানার উপর বসিয়া বলিল,—ওই ত বাপজানের গলা শোনা যাচ্ছে। আমাকে ডাকছে। আমি যাই।

বহুদূরে কোথায় যেন হুড়মুড় করিয়া পাড় ভাঙ্গিয়া পড়িল। রহিম তাহাকে আরও দৃঢ়ভাবে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, —কি যে পাগলাম করছিস লতি?

লতিফা আর কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া শুইয়া পড়িল। রহিমও তাহাকে শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া পাশে শুইয়া পড়িল। সারাদিনের খাটুনী,—রহিম একটু পরেই ঘুমাইয়া পড়িল। কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিল, জানে না, হঠাৎ কিসের একটা শব্দে ধড়মড় করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। এই সময় বিদ্যুৎ চমকাইল। দেখে খোলা দরজা দিয়া ঝড়ো হাওয়া আর বৃষ্টির ছাট আসিয়া ঘরের জিনিষপত্র সব ওলট-পালট করিয়া দিয়াছে। দরজা খোলা! উর্দ্ধশ্বাসে ঝড়বৃষ্টি মাথায় করিয়াই পদ্মার দিকে ছুটিল। উর্দ্ধশ্বাসে ঝড়বৃষ্টি মাথায় করিয়াই পদ্মার দিকে ছুটিল। মিশমিশে অন্ধকারের মধ্যে পদ্মার ঠিক পারের উপর একটা যেন শাদা রেখা দেখা গেল। রহিম সেই দিকে ছুটিল। পরক্ষণেই বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দের মধ্য হইতে লতিফার অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শোনা গেল,

—এই যে যাচ্ছি বাপজান!

সঙ্গে সঙ্গে ঝপাৎ করিয়া একটি শব্দ—আর তার সঙ্গে শাদা রেখাটিও অদৃশ্য হইল। রহিম দুই হাতে বুকটা চাপিয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল

—আল্লা!

প্রকৃতির উন্মাদ মাতামাতি তখনও সমানভাবেই চলিয়াছে।

যশোহরের পল্লীনিকেতন

(চিত্র)

শ্রীতারাপদ রাহা

বন্ধুরা যখন জিজ্ঞাসা করেন—দেশে যাও না কেন—অন্য সকলের মত নিজেকে নিরপরাধ মনে করিলেও একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়ি; কিন্তু তখনই যদি কোন বন্ধু জিজ্ঞাসা করিয়া বসেন,—হাঁ হে—কোন পথে তোমরা দেশে যাও—তখন উল্লসিত হইয়া উঠি, কারণ এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরের ভিতরই—প্রথম প্রশ্নের সদুত্তর প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। বলি,—হাঁ,—এ একটা কথার মত কথা বটে। E. B. Ry-য়ের যে কোন ষ্টেশন থেকে আমাদের গ্রামে যাওয়া যায়।

বন্ধুরা বলেন, তোমার ফাজলামী রাখো, কোন্ ষ্টেশনে নামতে হয় তাই বলো।

হাসিয়া বলি, —তা, যশোর নামলেও হয়, দৌলতপুর নামলেও হয়, আবার খুলনা নামলেও হয়; আর এদিকে রাজবাড়ী নামলেও হয়, চুয়াডাঙ্গা নামলেও হয়, কুষ্টিয়া নামলেও হয়, খোক্‌সা নামলেও হয়, পাংশা নামলেও হয়। আবার কামারখালি নামলেও হয়।

বন্ধুরা একসঙ্গে অনেকেই হো হো করিয়া হাসিয়া ওঠেন।

বন্ধুরা অনেকে আমাদের দেশের বাড়ীর আম কাঁঠালের রূপ, গুণ ও প্রাচুর্য্য ও গাইয়ের দুধের স্বাদের বর্ণনা শুনিয়াছেন, তাই গ্রীষ্মের ছুটিতে সত্যই হয়ত কেহ কেহ আমার সঙ্গে গিয়া তাহা পরখ করিয়া আসার বাসনা পোষণ করেন। তাহাদের মধ্যে কেহ হয়ত বলিয়া বসেন,—তোমার হেঁয়ালি রাখো—কোন্ ষ্টেশনে নামতে হয় ঠিক করে বলো,—আর ভাড়াই বা কত?

জগতের অনেক কঠিন সত্যই হেঁয়ালির মত শুনায়,—তাই বলিয়া তাহাকে উড়াইয়া দেওয়া চলে না, আমারও কথা সেইরূপ ফিরাইয়া লইতে পারি না, বরং ভাড়ার উত্তরে তাহার কাছে আরেকটা নূতন হেঁয়ালির সৃষ্টি করি, অথচ সেটাও আমাদের দেশের নির্জ্জলা দুধের মত খাঁটি সত্য।

আমাকে বলিতে হয়, ভাড়া,—তারও কি—একটা ঠিক আছে?—২,১০ থেকে আরম্ভ করে ১১,।১২, টাকা পর্য্যন্ত হতে পারে।

বন্ধু বলেন, মানে?

মানে হচ্ছে—তুমি যে পথে যাবে তারপর সেটা নির্ভর করছে।

বন্ধু হত চটিয়া উঠেন, বলেন,—এমন মূর্খ কে আছে যে ২,১০ হ'লে যেখানে চলে সেখানে ১১,।১২, টাকা খরচ করতে যাবে?

উত্তরে বলি, বেশী টাকা কেউ ইচ্ছে করে খরচ করে না, বন্ধু—বাধ্য হয়ে করে।

যথা?

২,১০ পয়সার পথের মানে হচ্ছে খানিকটা পায়ে হাঁটার পথ। শীতকালে যখন মাঠঘাট শুকিয়ে যায়, তখন যশোরে নেমে—বাসে ঝিনাইদহ গিয়ে ১৬ মাইল হেঁটে—উত্তরে গেলে বাড়ী যাওয়া যায়। বর্ষা হলেই মাঠে মাঠে জল জমে যায়। হাঁটা পথে অল্প খরচে আর যাওয়া চলে না, বেশী পয়সা খরচ করে অন্য পথে যেতে হয়।

বন্ধুরা হয়ত তখন আমার কথা বিশ্বাস করতে রাজী হন, বলেন,—তা'লে সত্যি এতগুলি পথে তোমাদের ওখানে যাওয়া যায়?

বলি, নিশ্চয়,—এ বিষয়ে অন্তত আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান। ই বি আর-এর যে কোন ষ্টেশনে নিয়ে নামিয়ে দাও সেখান থেকে ঠিক বাড়ী চলে যাবো। আমাদের গ্রামের লোক সময় ও সামর্থ্য বুঝে কেউ বা পাংশা নেমে ১৬ মাইল দক্ষিণে হেঁটে, কেউ বা কামারখালি নেমে—১৬ মাইল পশ্চিমে হেঁটে, কেউ বা খোক্‌সা নেমে খানিকটা বাসে, খানিকটা নৌকায়, বাকীটা পায়ে হেঁটে বাড়ী পেঁাছে; কেউ বা কুষ্টিয়া নেমে তিন দিন নৌকায় প'চে বাড়ী পেঁাছে। শুকনার সময় চুয়াডাঙ্গা থেকে বাসে ঝিনাইদহ এসে হাঁটা পথে বা মোষের গাড়ী করে বাড়ী আসে। আবার অনেকে দৌলতপুর বা খুলনা নেমে ষ্টীমারে—২০ ঘণ্টা শুকিয়ে যেখানে নামেন সেখান থেকেও গ্রাম হ'ল নৌকা যোগে অন্তত ১০।১২ ঘণ্টার পথ।

বন্ধুরা আর আমার কথা শুনিয়া হাসেন না। বস্তুত এই বিংশ শতাব্দীতে—এই ট্রেন, ষ্টীমার, বাসের যুগে—এমন অনেকগুলি দুর্গম স্থানও যে থাকিতে পারে— তাহা বিশ্বাস করা একটু কঠিন।

ছুটিতে নিয়মিত দেশে না যাওয়ার জন্য বন্ধুদের মধ্যে যাহারা আমাকে দোষারোপ করিবার উদ্যোগ করেন, আমার এই পথের বর্ণনা শুনিয়া তাহাদের উৎসাহ কমিয়া যায়।

বস্তুত 'ঘরমুখো বাঙালী' বলিয়া যে একটা প্রবাদ চিরকাল প্রচলিত আছে—আমার জীবনে তাহার সত্যতা নষ্ট করিতে বসিয়াছে এই পথের দুর্গমতা।

—কিন্তু দুর্গম পথই না কি ভালবাসার আহ্বানকে যুগে যুগে রহস্যময় করিয়া তোলে,—তাই দেশ হইতে পর-পর তিনখানি পত্রে মা যখন বারবার গ্রীষ্মের বন্ধে আমার গ্রামে যাইবার একান্ত প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যুক্তি দেখাইয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন তখন 'না' করা আর সম্ভব হইল না।

মা তাঁর দীর্ঘপত্রের স্থান বিশেষে বলিয়া রাখিয়াছেন—আমাদের বাল্যকালে আমাদের দেখিবার জন্য তাঁর যে বিপুল আগ্রহ জন্মিত—তাহাই রূপান্তরিত হইয়াছে—এখন নাতি-দের উপর, সুতরাং আমার একমাত্র পুত্র অসীমকে যেন সঙ্গে লইতে অন্যথা না করি।

আমার প্রাপ্য ভালবাসা আর একজন বালককে মা অনায়াসে দান করিয়া ফেলিয়াছেন জানিয়া যে ক্ষোভ আসিতেছিল—বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বলে মন হইতে তাহা সমূলে বিনাশ করিলাম। মনকে বলিলাম, মন—জগতের স্নেহে বিশ্বাস

করিও না—তুমি যখন শিশু ছিলে অক্ষম ছিলে—নিজেকে পালন করিবার, রক্ষা করিবার ক্ষমতা যখন তোমার জন্মে নাই তখন তোমার বাঁচিয়া থাকিবার জন্য মাতৃ-স্নেহের প্রয়োজন ছিল; আজ তোমার সে প্রয়োজন শেষ হইয়াছে, আজ বাঁচিয়া থাকিবার—বাড়িয়া উঠিবার জন্য স্নেহের প্রয়োজন তোমার পুত্রের। সুতরাং স্নেহ এখন তাহারই প্রাপ্য। সৃষ্টি-কর্তার বুদ্ধিকে মনে মনে তারিফ করিয়া তাহাকে একটি ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাইলাম। অসীমকে ডাকিয়া বলিলাম, হ্যাঁ রে—গ্রীষ্মের ছুটিতে দেশে যাবি?—তোর কর্তামা—যেতে লিখেছেন!

অসীম নিবিষ্টচিত্তে ঘুড়ীর মাঞ্জা তৈরী করিতেছিল, দেশে যাইবার কথা শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়া পরমোৎসাহে বলিয়া উঠিল, কর্তামা চিঠি লিখেছে—কই, বাবা, কই—! আমি সত্যি দেশে যাব—এবার আর আপনাকে একা যেতে দেব না,—কতকাল দেশে যাই না আমি,—দেশের কথা প্রায় ভুলেই গেছি। সত্যিই, বাবা,—চিরকাল আর কলকাতা ভাল লাগে না,—একটুখানি যায়গা!—দেশে কত যায়গা আমাদের সেখানে খোলা হাওয়ায় ছুটোছুটি করতে ভাল লাগে—সত্যি।

তারপর সানুনয় দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকাইয়া সে বলিল, আমায় নিয়ে যাবেন—বলুন?

আমি হাসিয়া তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলাম,—আচ্ছা, আচ্ছা—তুমি এ কয়দিন একটু লক্ষ্মীর মত কথা শুনে চলো—তা হ'লে—

অসীমের আশ্চর্য্য পরিবর্তন হইল, কয়েকদিন ধরিয়া সে তার মায়ের কথা শুনিতে লাগিল, নিয়মিত পড়িতে বসিতে লাগিল এবং রাত্রে নিয়মিত আমাকে দেশের গল্প করিতে বিরক্ত করিতে লাগিল।

পাড়াগাঁয়ের অতি তুচ্ছতম ঘটনা—যাহা কবে মনের কোণ্ হইতে নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে—যাহার উপর আজ আর কিঞ্চিন্মাত্র মোহও খুঁজিয়া পাই না—তাহাই হেলা-ফেলা করিয়া বলিতে গেলে অসীম রোমাঞ্চকর উপকথার মত শোনে।

দেশে যাইবার আগ্রহ তাহার ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। পথের দুর্গমতার কথা বলিয়া তাহাকে দুই একবার নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছি—কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফল হইল না, সে বলে, 'বাস্' যদি নাই চলে—তবে আমি হেঁটেই যেতে পারব।

কথাটা শুনিয়া মনে মনে একটু হাসিলাম মাত্র।

যাবার দুই তিন দিন আগে হইতেই সে কি কি জিনিস সঙ্গে লইবে তাহার একটা ফিরিস্তি করিতে লাগিল—ক'খানা বই—ক'টা জামা,—কি কি খেলনা।

আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিলাম কিছু না—শুধু তোমার দু'টি জামা—আর দু'টি হাফপ্যাণ্ট

সে একটু নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল তারপর একটু ভয়ে ভয়ে অনুনয়ের স্বরে বলিল, আমার কলমটা নেব?

অতি কষ্টে হাসি দমন করিয়া গম্ভীরভাবে বলিলাম, আচ্ছা নিও।

জলখাবারের পয়সা হইতে পয়সা বাঁচাইয়া—আরও কত কি নিত্য নূতন ফন্দীতে পয়সা আদায় করিয়া—সে কয়েকটি টাকা জমাইয়াছিল—তাহারই ভগ্নাংশ দিয়া সে একটি প্যাকেট কলম কিনিয়াছে। এটি তাহার স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি বলিয়া—নিতান্ত গর্ব্বের বস্তু। গ্রামের ছেলেদের কাছে এটা দেখাইবার বাসনা সে কিছুতেই জয় করিতে পারিতেছিল না। আমি তাহাকে সেটি লইবার অনুমতি দিলাম।

ক্রমে যাইবার দিন ঘনাইয়া আসিল।

যেদিন সকালের ট্রেনে দেশে রওয়ানা হইব, তার পূর্ব্ব-দিন শেষ রাত্রে অসীম আমার পিঠে হাত দিয়া ডাকিল,—বাবা, জেগেছেন?

কেন রে?

না, কিছু না, এমনি।

বুঝিলাম কি যেন একটা কথা মনে আসিয়াছে, বলিতে সাহস করিতেছে না। কিছুক্ষণ চুপচাপ গেল। আবার একটু তন্দ্রা আসিতেছিল—অসীম আমার পিঠের কাছে মুখ আনিয়া বলিল, আচ্ছা—বাবা!

কি রে!

আচ্ছা, আমরা ত মাগুরা দিয়ে যাব?

হাঁ।

ওরা ত জিনিস-পত্তর কিছু কেড়ে নেয় না?

ওরা কারা?

ঐ যে দাঙ্গা হচ্ছে!

দাঙ্গা হচ্ছে কোথায়?

খবরের কাগজে লিখেছে যে, মাগুরা-নড়াইলে দাঙ্গা হচ্ছে—সেদিন সাহায্যের জন্য হ্যাণ্ডবিল বিলি করে গেল।

আমি তাহাকে বুঝাইলাম,—আমরা যাব—যশোর থেকে মাগুরা পর্য্যন্ত যে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা আছে—তাই ধরে বাসে, দাঙ্গা হচ্ছে তা থেকে অনেক দূরে, সুতরাং ভয় নেই।

কিন্তু যাইবার সময় দেখিলাম—অসীম আমার কথায় প্রত্যয় করিতে পারে নাই, সে তাহার পরম আদরের কলমটা—কলিকাতায় ভাল করিয়া বাক্স-বন্দী করিয়াছে।

বলিলাম,—কি রে খোকা,—তোর কলম যে নিলি না?

অসীম একটু সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিল, না বাবা ওটা এখানেই থাক;—ক'দিনই বা থাকব আমরা সেখানে!

আমিও হাসিলাম,—সত্যিই ত! ট্রেনে চাপিয়াই অসীম বাহিরের দিকে চাহিয়াছিল। শুধু বালক কেন—অনেক বৃদ্ধের পক্ষেও এ কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক; সুতরাং প্রথমে আমি তেমন খেয়াল করি নাই। কয়েকটা ষ্টেশন পরে আমি তাহার দৃষ্টি যশোর রোডের সুবিন্যস্ত বৃক্ষশ্রেণীর দিকে আকর্ষণ করিয়াছি। কিন্তু যশোরের কাছাকাছি আসিয়া দেখিলাম—অসীম যেদিকে তাকাইয়া আছে সেদিকে যশোর রোড নয়,—বৈচিত্র্যহীন মাঠ শুধু মাঠ।

এদিক তাকিয়ে কি দেখছিস্,—তার চেয়ে বরং—ওদিকে দেখ—যশোর রোড ছাড়া আর অনেক দেখবার জিনিস আছে

অসীম তাহাতে কোন উৎসাহ না দেখাইয়া বলিল,—দেখেছেন বাবা,—এদিকে কেমন বৃষ্টি হয়েছে,—মাঠে জল বেধে গিয়েছে। কলকাতার ওদিকের মাঠ দেখে এলাম সব খট্‌খটে, যত এদিকে এগুচ্ছি—তত ভিজে—আর জল।....... আমাদের একেবারে দৌলতপুরের টিকেট করলে হ'ত, বাবা, যশোরে নেমে হয়ত মুস্কিলে পড়তে হ'বে।

মাগুরা হইতে যশোরের পথে বৃষ্টি হইলে যে মোটার চলে না—এ সংবাদ দেখি অসীমের বেশ জানা আছে,—তাই কলিকাতা হইতে যাত্রা সুরু করিয়াই সে মাঠের দিকে চাকাইয়া আছে ঃ কোন্ দিকে কত বৃষ্টি হইয়াছে।

ঝিকরগাছা ঘাট হইতে একজন মাড়োয়ারী ভদ্রলোক একটা ছোট সুটকেস হাতে করিয়া উঠিয়াছেন, এবং উঠিয়া তিনি কোন দিকে তাকাইয়া বসিয়াছিলেন,—বুঝিতে পারিতেছিলাম না—এমনি অদ্ভুত দুটি তার চোখ।

অসীমের কথা শুনিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় যেতে হবে,—খোকা?

যশোর হয়ে মাগুরা যাব,—আপ কাহা যায়েংগে?

অসীমের হিন্দী শুনিয়া ভদ্রলোক একটু হাসিয়া বলিলেন,—আমিও মাগুরা যাবে।—তোমার ডর করছে?

অসীম বলিল,—না,—ডর নয়,—মাগুরা 'বাস্' যাবে ত?

কেনো যাবে না,—আমি পরশু রোজ এসেছে।

পরশু বৃষ্টি হয়েছিল?

না,—বৃষ্টি কেনো হোবে?

অসীম ভদ্রলোকের কথা শুনিয়া—মৃদু হাসিল, বোধ হয় বলিতে চায়,—তা' হ'লে 'বাস' না যাওয়ার আর কি কারণ থাকতে পারে—কিন্তু তারপরে যে বৃষ্টি হয়ে গেছে—দেখতে পাচ্ছেন না!—কিন্তু কথাটা মুখ ফুটিয়া সে আর বলিল না।

যশোর আসিতে যে সামান্য সময় বাকী ছিল—তাহার মাঝে মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের সংগে অসীমের বন্ধুত্বটা বেশ জমিয়া উঠিল। প্রশ্নে প্রশ্নে অসীম তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল,—তিনি কোথায় গিয়েছিলেন, তার সুটকেশের ভিতরে কি—মাগুরায় তিনি কোথায় থাকেন—কি করেন—ইত্যাদি।

উত্তরে জানা গেল—তিনি একজন পাট ব্যবসায়ী,—মাগুরা থাকিয়া তিনি পাটের ব্যবসা করেন,—গিয়াছিলেন তিনি ঝিকরগাছায় ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে। সুটকেশের ভিতর তার সামান্য জিনিসপত্র আছে।

অসীম জিজ্ঞাসা করিল—পাট ত এখন সবে বুনেছে—এখন আবার ব্যবসার কি কাজ?

বালকের প্রশ্ন হইলেও দেখিলাম ভদ্রলোকের উত্তর দিতে আপত্তি নাই। কথা বলিতে পারিলেই বুঝি লোক বাঁচে। প্রবীণ বন্ধুর কথার জবাবের মত ভদ্রলোক বলিতে লাগিলেন,—প্রকৃত ব্যবসায় সুরু হয় ঠিক এখন হইতে। প্রত্যেক মোকামে ব্যবসায়ীর যে খরিদ্দার আছে—তাহাদের হাত দিয়া এখন হইতে টাকা দাদন দিতে হয়,—নইলে—বাজার এক-চেটিয়া করা যায় না ভাল মাল পাওয়া যায় না। যারা টাকা দাদন নেয়,—বাজার হইতে কিছু সুবিধা দরে তাহাদের নিকট হইতে মাল পাওয়া যায়, কারণ তাহারা ব্যবসায়ীর দত্ত টাকা আগে ভোগ করিয়া লইল।

অসীম নিবিষ্ট হইয়া শুনিতে লাগিল,— কি বুঝিল জানি না, কিন্তু বাঙলা কৃষকের দুর্দ্দশার কথা মনে করিয়া আমি স্তব্ধ হইয়া গেলাম। দরিদ্র মূর্খ কৃষকেরা—সাময়িক দুর্দ্দশার হাত হইতে আংশিক রক্ষা পাইবার আশায় টাকা আগাম লয়, পাট বিক্রয় করিবার সময় তাহা ছাড় দিয়া হয়ত সামান্যই অবশিষ্ট থাকে, তাহা ছাড়া পাটের জন্য টাকা আগাম লইয়া ধানের চাষ করিবার অধিকার তাহাদের থাকে না।

অসীম ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিল,—এতে কত লাভ হয় আপনার?

দশ বিশ পঁচিইস—

মোটে দশ বিশ পঁচিশ?

ভদ্রলোক মৃদু হাসিয়া বলিলেন—হাজার।

দশ বিশ পঁচিশ হাজার!—খুব ভাল ত!—বলিয়া অসীম আমার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইল।

মাড়োয়ারী ভদ্রলোক বলিলেন, আবার লোকসান বি হয়।

যশোর আসিয়া গেলাম।

ভদ্রলোক সুটকেশটি লইয়া গুটি-গুটি আমাদের সংগে নামিয়া পড়িলেন, তিনি আমাদের সংগেই যাইবেন ঃ অসীমের ভালই জুটিয়াছে। তিনি বলিলেন—মাগুরা গিয়া—হোটেলে খাইয়া তাহার আড়তে আমরা শুইয়া থাকিতে পারি—নৌকা সকালে ছাড়িলেই চলিবে।

জানাইলাম—মাগুরায় আমাদের অনেক আত্মীয় আছেন,—তাহার আর প্রয়োজন হইবে না।

টিকেট দিয়া বাহিরে আসিতেই—দেখিলাম কয়েকখানা বাস দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের লোকেরা হাঁকিতেছে—মাগুরা, ঝিনাইদা, নড়াল..............।

তাড়াতাড়ি মাগুরার বাসে উঠিতে যাইতেছিলাম ঃ আকাশে মেঘ করিয়াছে। একখানা ট্যাক্সি পাশেই অপেক্ষা করিতেছিল—তাহার লোক অমনি হাঁকিল,—বাবু, মাগুরায় যাবেন? আসুন ট্যাক্সিতে আসুন।

ট্যাক্সিতে শেয়ারে ভাড়া 'বাসের' সমান—অথচ যাইয়া আরাম আছে—তাই তিনজন তাড়াতাড়ি ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসিলাম। কিন্তু তখনই উঁহাদের আর একটি লোক আসিয়া—বলিল,—না, বাবু—ট্যাক্সি মাগুরায় যাবে না—'বাস' যাচ্ছে।

'বাস' ত যাচ্ছেই, কিন্তু—'বাস' যে এর মাঝে ভরতি হয়ে গেছে!

তাড়াতাড়ি নামিয়া কোন রকমে বাস-এ দুইটি সীট করিয়া লইলাম। ভাল সীটগুলি আগেই লোকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে। আমরা যখন উঠিলাম তখন 'বাস'এ আর জায়গা নাই—তবু লোক উঠিতে লাগিল এবং 'বাস' ওয়ালারা সিংহ বিক্রমে শিংগা বাজাইয়া—হাঁকিতে লাগিল—খাজুরো, মাগুরা—চাউলিয়া,—মাগুরা, মাগুরা, মাগুরা—আ—

সামনের ক্যাবিনে স্ত্রীলোক ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছে আর

স্থান নাই.—পিছনে পুরুষের সীটে একটি সীটও খালি নাই.—বরং দুই একজন বাড়তি হইয়া বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে—তবু যে এরা যাত্রীর জন্য কেন হাঁকিতেছে বুঝিলাম না।

ষ্টেশন হইতে আরও একটি লোক উঠিল ইহার পর শহরের মধ্যে গিয়া রাস্তায় রাস্তায় হাঁকিতে লাগিল: মাগুরো—মাগুরা—আ—

হঠাৎ শুনিলে মনে হয়—মাগুরো যেন একটা জিনিস—এবং কে যেন তার ফেরী করিতেছে।

শহরের শেষ প্রান্তে—একটা বটগাছের নীচে আসিয়া গাড়ী থামিল। সেখানে কাহার যেন মাল উঠিতে লাগিল। বড় বড় টিনের কেনেস্তারা ভর্ত্তি মাল—ঝালাই করা মুখ বন্ধ করা। তাহার আট দশটি উঠিল—সঙ্গে সঙ্গে চার-পাঁচটা গুড় ভরা কলসী। বেঞ্চে বসিয়া লোকগুলি যেখানে পা রাখিয়াছিল, তাহা একেবারে বন্ধ হইয়া গেল।

অসীম বলিল, বাবা নেমে চলুন।

কিন্তু নামিয়া কোথায় যাইব!—তাহা ছাড়া মাল উঠাই-বার সঙ্গে সঙ্গে ভাড়া লইতে আরম্ভ করিয়াছে.— আদায়-কারী আমাকে কাছে পাইয়া আমাদের ভাড়াটা আগেই আদায় করিয়া লইয়াছে। একবার মনে হইল—নামিয়া কলিকাতা ফিরিয়া যাই. তারপর মাকে বুঝাইয়া একখানা পত্র লিখিলেই চলিবে।

গুটি গুটি বৃষ্টি সুরু হইয়াছে। লোকের জিনিসপত্র বিছানা সব বাসের উপরে দড়ি দিয়া বাঁধা হইয়াছে। অনেকেই চীৎকার আরম্ভ করিল. আমার বিছানা বোঁচকা সব নামিয়ে দাও, সব ভিজে গেল। কিন্তু নামাইয়া কোথায় দিবে—এদিকে ভিতরে যে তিলধারণের স্থান নাই। ভাড়া আগেই আদায় করিয়া লইয়াছে। বাসওয়ালারা কোন জবাব দেওয়া প্রয়োজন বোধ করিল না। অসীমের মুখ কষ্টে বিরক্তিতে কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে—একজন গেরুয়া বসনধারী সন্ন্যাসী-মত লোক তাহাকে ইতিমধ্যেই চাপিতে সুরু করিয়াছে।

ভাড়া আদায় প্রায় শেষ হইয়া আসিল। বুঝিলাম ভাড়া আদায় শেষ হইলেই গাড়ী ছুটিবে। কিন্তু না—আরও দুইজন যাত্রী আসিতেছে। আর নিও না—আর নিও না—বলিয়া যাত্রীরা সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। কিন্তু সে কথা শুনিবে কে? যাত্রী দুইজন উঠিল—একজনের হাতে আবার মস্ত বড় একটা টিনের সাইন-বোর্ড। এবং ভাগ্যক্রমে সেখানা আমারই পাশে কাৎ করিয়া রাখিল। বাস চলিলেই সেটা পায়ের উপর সজোরে পড়িবে।—সবই বুঝিলাম কিন্তু উপায় নাই।

সাইনবোর্ড-ওয়ালা লোকটা চাহিতেই ভাড়া বাহির করিল। অপর যাত্রীটি একটি মুসলমানের ছেলে—দিব্যি নাদুসনুদুস হাসি হাসি প্রিয়দর্শন চেহারা—বয়স তের চৌদ্দর বেশী নয়। ভাড়া চাহিতেই মৃদু হাসিয়া বলিল,—আমার লোক দুজন নেবুতলায় এগিয়ে গেছে—ঘোড়গাড়ীতে—সেখান থেকে উঠবে, তারা এসে ভাড়া দেবে।

—বলিয়া আবার কেমন একটু হাসিল।

আমি অসীমের দিকে তাকাইয়া বলিলাম,—দেখ, এই ছেলেটা বড় চালাক।

কেন?

দেখবি ও ফাঁকি দিয়ে নেবুতলায় নেমে যাবে—পয়সা দেবে না।

অসীমের সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকজন যাত্রী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ছেলেটিও হাসিল, —বলিল, —না না—আমি মিছে কথা বলছি নে,—দেখবেন আপনারা এই কত পথই বা!

টিকেট বিক্রেতা কেমন একটু সন্দেহের চোখে ছেলেটির দিকে তাকাইয়া নিজের কাজে মন দিল।

আকাশের মেঘ ক্রমেই ঘন হইয়া উঠিতেছে,—যাত্রীরা হাঁকিল, এইবার জোর চালাও—নইলে মাগুরা যাওয়া আর হবে না, মাঠের মাঝে প্যাকিং বাক্সে আটকা পড়তে হবে!

বাস ছুটিল।

প্রতি মুহূর্ত্তে গায়ে গায়ে ধাক্কা লাগিল—ভর্ত্তি টিনের পাত্র পা পিষিয়া ধরিল, সাইনবোর্ড জানুর উপর সজোরে আঘাত করিতে লাগিল—উপরে টিনের প্যাটরা সশব্দে নৃত্য সুরু করিয়া দিল—বাস চলিল।

যশোর হইতে খাজুরা পর্য্যন্ত পাকা পথ। দুধারে ধান ও পাটের ক্ষেত, মাঝে মাঝে তাল খর্জ্জুর অচেনা গাছের জটলা।

দেখিতে দেখিতে নেবুতলা আসিয়া গেল। সেই মুসলমান ছেলেটি নামিয়া—ছুটিয়া গেল,—বলিয়া গেল,—একটু দাঁড়ান এক মিনিট—এক্ষুণি ডেকে আনছি আমার লোক।

অসীম হো হো করিয়া হাসিল: তুমি আবার আসছ!—ওর কোন লোক থাকলে—তারা এখানে দাঁড়িয়ে থাকত—না বাবা?

বাসের সকল লোকই হাসিল। কোম্পানীর লোক তবু এক মিনিট দু মিনিট করিয়া পাঁচ মিনিট বাস দাঁড় করাইয়া রাখিল—কেহ আসিল না।

কিন্তু মেঘ আসিতেছে, সুতরাং বাস ছুটিল

পাকা রাস্তা ফুরাইয়া কাঁচা রাস্তা আরম্ভ হইল। বন্ধুর পথ, বৃষ্টির পরে বাস চলিয়া পুনরায় শুকাইয়া আরও বন্ধুর হইয়া উঠিয়াছে—সে পথে বাস চলিলে—ঝাঁকুনীতে দেহের সমস্ত গ্রন্থি শিথিল হইয়া যায়,—মাথার শিরা টন্-টন্ করিতে থাকে—এ উহার গায়ে পড়িয়া অনাবশ্যক ঘনিষ্ঠ-তার সৃষ্টি করিতে থাকে।

সংবাদ পাওয়া গেল—এখনও না কি খারাপ পথ আরম্ভ হয় নাই—ইহার পরে তিন চার জায়গায় না কি পথ এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যেখানে বাস হইতে নামিয়া খানিকটা হাঁটিয়া যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। কথাটা শুনিয়া দেখিলাম অসীম ভীত হইয়া উঠিল, বলিল; আমাদের নেমে গেলে হ'ত, বাবা!

অনেক দূর আসিয়া গিয়াছি; নামিবার উপায় নাই।

(শেষাংশ ৬১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বৈদেশিক রাষ্ট্রনীতির ভিত্তি

শ্রীযোগানন্দ দাস

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সভাপতি হওয়ার পূর্ব্বে উপরি উপরি দু'বছরের প্রথম যে বছরে পণ্ডিত জওহরলাল কংগ্রেসের সভাপতি হন, তখন থেকে এদেশের রাষ্ট্রিক আলোচনার গতিতে একটা পরিবর্ত্তন ঘটেছে। জওহরলালের জন্যে তখন থেকে আমাদের মধ্যে সমাজতন্ত্রের আলোচনা ক্রমশ বিস্তৃতি লাভ করতে সুরু হয়েছে। সমাজতন্ত্রের কথা তা'র আগেও যে দেশে আলোচিত হয়নি তা' নয়, কিন্তু ইতস্তত বিক্ষিপ্ত প্রয়াস মাত্র। কিন্তু এদেশের রাষ্ট্র-চিন্তার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রমনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা-বোধ, নিয়মিতভাবে ছোট ছোট আলোচনা-সঙ্ঘ গঠিত ক'রে সমস্ত ভারতময় এই চিন্তাধারাকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেবার জন্য দেশবাসী ছাত্র, যুবক ও জনসাধারণকে নানাভাবে উদ্দীপিত করবার শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রয়াস, এ সকলের আরম্ভ এই সময় থেকেই। জওহরলালের এই উদ্দীপনার ফলেই আজ কংগ্রেসের মধ্যেই সমাজতন্ত্রীদলের অস্তিত্ব ও এ বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীর স্বীকৃতি।

এই সমাজতন্ত্র এ-যুগে ভারতের নিজস্ব জিনিষ নয়, সম্পূর্ণভাবে বৈদেশিক নীতির অন্তর্গত। সুতরাং সমাজতন্ত্র আলোচনা করতে গিয়ে ভারতীয় রাষ্ট্রিক মনকে আজ পরিপূর্ণভাবে বৈদেশিক রাষ্ট্রনীতির আলোচনায় নামতে হয়েছে। একথা ঠিকই যে, বৈদেশিক রাষ্ট্রনীতির আলোচনা অনেক আগেই বাঙলাদেশে সুরু হয়েছে, বহু পূর্ব্বে অর্থনীতির দিক থেকে শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অমল হোম "প্রবাসী" পত্রিকায় এ আলোচনা চালিয়েছিলেন এবং পরে তারকনাথ দাস, সুধীন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি এর ক্ষেত্র আরো বিস্তৃত করেছিলেন এবং সুভাষচন্দ্রও ইউরোপে এই নিয়ে অনেক কথা বলেছেন, কিন্তু কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট হিসাবে জওহরলাল এই আলোচনা ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির আবশ্যিক অঙ্গ হিসাবে ব্যবহার করে এ দেশের বৈদেশিক মনকে জাগ্রত করবার পথ সুগম করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে এই মনোভাবই বাঙলাদেশে অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে এই কয় বছরের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে বাঙলার দৈনিক ও সাপ্তাহিকগুলি, তাদের মধ্যে সকলের চেয়ে বড়ো অবদান 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র ও 'দেশ' পত্রিকার। এই অবদানের মূল্য শুধু প্রচার বিস্তৃতি বা 'সারকুলেশান' দিয়ে নয়, এই বৈদেশিক অংশটি এ সকল পত্রিকার একটি বিশেষ লক্ষণ বা 'ফীচার' হওয়ার দরুন।

এই সবের জন্য পাঁচ বছর আগেকার বাঙলাদেশ ও আজকের বাঙলাদেশের মধ্যে খুব বড় একটি প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়, জনসাধারণের মধ্যে বৈদেশিক রাষ্ট্রীয় আলোচনার বাহুল্যে। আগে যেমন পাঁচজনের সঙ্গে দেখা হলে রেস, সিনেমা, ফুটবল, মহাত্মা গান্ধী বা ঘরোয়া সুখ-দুঃখের কথাই চলত, বর্ত্তমানকালে এ সকলের সঙ্গে যোগ হয়েছে হিটলার-মুসোলিনীর বাণী।

কিন্তু এই সকল লিখিত ও মৌখিক আলোচনার মধ্যে একটি সাধারণ ত্রুটি লক্ষিত হয়, সেটি হল হিটলার, মুসোলিনী, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানী, ইটালী প্রভৃতি সম্বন্ধে খণ্ড-দৃষ্টি, বিচ্ছিন্ন আলোচনা। এখনো আমরা Hero worship-এর যুগমনকে কাটিয়ে উঠতে পারিনি, সেইজন্যে রামমোহন, বিদ্যাসাগর থেকে সুরু করে হিটলার, মুসোলিনী, ফ্রাঙ্কো, চেম্বারলেন পর্য্যন্ত সমস্ত "মহাপুরুষ"কেই এককমহিমার বিচ্ছিন্ন গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করি। এ'দের পিছন থেকে যে জনসাধারণের সমষ্টি-জীবনের বিপুলতর এবং প্রবলতর শক্তি অলক্ষ্যে অথবা স্পষ্টতরভাবে কাজ করেছে বা করছে তাকে ভুলে যাই বলে এ'দের কীর্ত্তিগুলির এক একটি একদেশী দৃশ্য পাই। ষ্ট্যালিনকে বিচার করতে গেলে যেমন তাঁর পিছনে সমাজতান্ত্রিক রুশিয়ার সমষ্টিগত মন বা 'কলেক্‌টিভ্ মাইণ্ড'-এর কথা ভুলে যাই, হিটলার-মুসোলিনীর আলোচনাতেও তেমনি বার বার ভুল হয়, এ'দের পিছনকার 'ক্যাপিট্যালিষ্ট কম্বিনেশন' বা বিশালতর ধনতান্ত্রিক সংহতির ফলে বহুতর শক্তিশালী সঙ্ঘের কথা, যে সংহতির কাছে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী, জার্ম্মানীর ভেদ নেই। এই ভুল হয় বলেই আমরা মুসোলিনীর গর্ব্বিত বাণী, হিটলারের নির্বাধ রাজ্যবিস্তার প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয়কে তাদের নিজস্ব আলাদা আলাদা মূল্যে দিয়ে বিচার করি। তাই মনে হয়, হিটলার একজন স্বয়ম্ভু বিরাট পুরুষ, তাঁর ভয়ে ইংলণ্ড কাঁপছে, মুসোলিনী নিজস্ব ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত একজন একক 'হিরো', তাঁর দাবড়িতেই সুবোধ বালকের মতো ফ্রান্স ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলছে।

একটিমাত্র উদাহরণ এখানে দেব। একথা আজ আমাদের মধ্যে একটা সাধারণ আলোচনার বিষয় যে হিটলারের ভয়ে ইংলণ্ড তটস্থ। এক একবার হিটলার গুরুগম্ভীর স্বরে ইংলণ্ডকে খবরের কাগজের সম্পাদকীয় প্রবন্ধের চেয়েও গরম সুরে শাসায়, তারপরেই একটা করে সর্ত্তভঙ্গ বা রাজ্যবিস্তার চালায়, ইংলণ্ড খানিকটা আমতা আমতা করে শেষ বরাবর ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে। সুতরাং প্রমাণ হল হিটলার আজ ইংলণ্ডের চেয়ে শক্তিশালী।

এবার এই সিদ্ধান্তটিকে একটু পরীক্ষা করে দেখা যাক্। বর্ত্তমানকালে আমরা 'বার্টার' বা বিনিময়ের যুগে বাস করি না। অবশ্য জাপান তার বৈদেশিক বাণিজ্যে বিনিময় প্রথার আশ্রয় নিয়েছে বটে, কিন্তু সেটা বিশেষক্ষেত্রে ও বিশেষ কারণে এবং এটি পৃথক প্রবন্ধের বিষয়। এখন, ব্যক্তির মতো জাতির জীবনেও সকলের চেয়ে বড় শক্তি হ'ল, অর্থ। অর্থই জীবনের বিচিত্র কর্ম্মশক্তির মূল উৎস। খাওয়া পরা থেকে সুরু করে যুদ্ধ ও 'প্রোপ্যাগাণ্ডা' পর্য্যন্ত সমস্তই অর্থসাপেক্ষ। যুদ্ধ সম্বন্ধে সর্ব্ববাদীসম্মত কথাই আছে, "Money is the sinew of War" বিশেষত বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞানসম্মত যুদ্ধে কি বিপুল অর্থের প্রতিদিন প্রয়োজন হয় বিগত মহাযুদ্ধে তার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। যার টাকা নেই তার কিছুই নেই, বর্ত্তমান সভ্যতার এইটিই হল প্রকৃত দরকষা বা 'ভ্যালুয়েশন্'।

এইবার যদি আমরা ইউরোপের শক্তিপুঞ্জ, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইটালী, জার্ম্মানীর প্রতি তাকাই, তবে কি দেখতে

মর্য্যাদা লাভ করবার দাবা [illegible]

পাব? প্রথম দুইটি ইউরোপের সর্ব্বাপেক্ষা বিত্তশালী সুতরাং শক্তিশালী জাতি এবং শেষের দুইটি সর্ব্বাপেক্ষা বিত্তহীন বা প্রায় দেউলিয়া জাতি। শেষের দুইটি আজ বিশ্বরাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে দাঁড়াতে পারত না যদি তাঁরা ইংলণ্ডের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ সাহায্য না পেত। যদি বলা যায় যে, হুমকি দিয়ে জার্ম্মানী ইংলণ্ডের কাছ থেকে টাকা আদায় করেছে বা এই সব রাজ্য বিস্তার ক'রে নিচ্ছে তবে বলতে হয় যে একজন সহায় সম্পদহীন ভিখারী একজন প্রভূত বিত্তশালী ধনীর পাইক-বরকন্দাজ ভরা বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে শাসিয়ে টাকা আদায় করতে পারে। ইটালী ও জাপান অবশ্যই সঙ্গে আছে, কিন্তু তাদেরই বা আর্থিক সঙ্গতি কতদূর? জাপানের বা ছিল, চীনের রাজ্য বিস্তারে সে আর্থিক শক্তির বহু ক্ষতি হয়েছে। সুতরাং তিনটি আর্থিক 'এ্যানিমিয়া' বা রক্তাল্পতা-গ্রস্ত জাতি আজ পৃথিবীর অন্যতম প্রধান ধনশালী জাতি-গুলিকে ভয়ে কাবু করেছে এ ধারণা শুধু তখনি সম্ভব হয়, যখন আমরা ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানী, ইটালী, জাপানকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখি। অবশ্য ধনতান্ত্রিক নীতির নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক ধনিক জাতি অন্য প্রত্যেক ধনিক জাতিরই 'পোটেনশেয়াল' শত্রু, কিন্তু প্রবলতর বাহ্য কারণে যেমন পরস্পর-বিরুদ্ধ ডাকাত-দলেও সাময়িক মিলন হয়, তেমনি আজ পাশ্চাত্য জাতিসমূহের মধ্যে পরস্পর স্বাভাবিক রেষা-রেষি সত্ত্বেও সকলের মধ্যে গোপন আঁতাতের কোনও প্রেরণা বলবত্তর কি না, সে কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার জার্ম্মানী, ইংলণ্ড প্রভৃতির বিচ্ছিন্ন আলোচনার সময়।

দ্বিতীয় কথা যা স্মরণ রাখা দরকার সেটি হ'ল পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলির 'ডিপ্লোম্যাসী' বা গুপ্ত কূটনীতি। হিটলারের দম্ভ ইংলণ্ডের ভড়কে যাওয়া প্রভৃতি 'ড্রামাটিক্' ব্যাপার-গুলির আলোচনার সময়ে সর্ব্বদা সচেতন থাকতে হবে যে, হিটলার বা মুসোলিনী, চেম্বারলেন এ'রা কেউই মহাত্মা গান্ধী ন'ন। "Laying the cards on the table" পাশ্চাত্য রাষ্ট্রনীতির নিয়ম নয়। সুতরাং পাশ্চাত্য ডিক্‌টেটর বা হুকুমদারদের চমকপ্রদ ভীতিদায়ক রোমাঞ্চকর উক্তিগুলির সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, তাঁদেরই রাষ্ট্রগুলির অঙ্গরূপে এক একটি গুপ্ত কূটনীতি বিভাগ আছে।

তৃতীয় কথা মনে রাখা দরকার, আন্তর্জ্জাতিক শস্ত্র-শিল্পের সংহতি। এই সংহতির কাছে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানী প্রভৃতি বিভিন্ন জাতিভেদ বা জাতীয়তার বৈশিষ্ট্য-চেতনা নেই। এই বিষয়ে কিছু আলোচনা আগে করেছি, আরও বিস্তৃতভাবে করা দরকার।

বৈদেশিক রাষ্ট্রনীতির বিভিন্নভাবে আলোচনা করবার আগে আমরা যদি জগদ্ব্যাপী রাষ্ট্রিক গঠনের মূল ভিত্তি-গুলির সঙ্গে পরিচিত হই, এবং এই সমগ্র দৃষ্টি নিয়ে পৃথক পৃথক রাষ্ট্রিক কার্য্যগুলির পর্য্যালোচনা করতে পারি তবে ঐগুলির প্রকৃত ও যথার্থতর অর্থ আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

আমাদের দেশে এইভাবের আলোচনার প্রয়োজন দ্রুত এগিয়ে আসছে, কারণ বর্ত্তমান যুগে কোন দেশের, ভারতবর্ষেরও, বিশ্বরাষ্ট্রনীতির বেড়াজাল থেকে মুক্ত থাক-বার ইচ্ছা থাকলেও সম্ভাবনা নেই। আজ ইউরোপে বা চীনে যে সঙ্ঘবদ্ধ রাষ্ট্রিক প্রণালী অবলম্বিত হচ্ছে, আগামীকল্য ভারতবর্ষও তা' থেকে মুক্ত থাকবে না। কারণ, কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম।

সুতরাং আধুনিক জগতের বিশ্বরাষ্ট্রনীতির সমগ্র মূলনীতিগুলির ধারণা সর্ব্বাগ্রে পরিস্কার ক'রে নিতে হবে।

যশোহরের পল্লীনিকেতন

(৬১১ পৃষ্ঠার পর).

চারিদিক আঁধার হইয়া আসিল। কিছুক্ষণ আগে যে ছেঁড়াছেঁড়া মেঘ এ উহার কাছে গিয়া কিসের ষড়যন্ত্র করিতে-ছিল, তাহারা দলবদ্ধ হইয়াছে—এইবার তূর্য্য নিনাদে তাহারা আক্রমণ সুরু করিবে।

হঠাৎ বাস থামাইয়া ড্রাইভার বলিল, নেমে পড়ুন, নেমে পড়ুন, আর দেরী নয়।

কথাটার তাৎপর্য্য ঠিক বুঝিলাম না, অথচ নামিবার জন্য দেখিলাম সকলেই ত্বরান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। অসীম ভীত-চকিত চক্ষে বলিল, এই ঝড়ের মাঝে বাস থেকে নেমে আমরা কোথায় যাব, কাছে ত কোথাও দাঁড়ানোর জায়গা দেখছি না। আমরা ত পয়সা দিয়েছি,—আমাদের নিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে থাকুক না কেন!—তার পরেই, বাবা, ভয় করে!—বলিয়া সে আমায় জড়াইয়া ধরিল।

যে লোকটা বাসে টিকিট দিয়াছিল, সে হাসিয়া বলিল, খোকা, এই মাঠটা পার হ'লেই আবার বাসে উঠবে,—সামনে রাস্তা মেরামত হচ্ছে বাস চলবে না,—তুমি আমার কোলে এস, তাড়াতাড়ি যেতে হ'বে। বৃষ্টির আগে মাঠ পার না হ'তে পারলে আর উপায় নেই।

ব্যাপার বুঝিয়া নামিয়া পড়িলাম, অসীম সন্দিগ্ধ-দৃষ্টিতে বাসের লোকটির দিকে তাকাইতে লাগিল। মাড়োয়ারী ভদ্রলোক তাহার ছোট সুটকেশটি হাতে করিয়া নামিলেন। অসীমের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, কি খোকা, ডর করছে? অসীমের মেজাজ তখন ভাল ছিল না, সে বন্ধুর কথায় জবাব না দিয়া আমার হাত ধরিয়া হাঁটা সুরু করিল।

(ক্রমশ)

প্রণয়ের পরে

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীসত্যকুমার মজুমদার

(৬)

কলিকাতা ভবানীপুরে অমরের বিবাহ হইয়াছিল। শ্বশুর বড়লোক। রাজপ্রাসাদ তুল্য বাড়ী। যোগীন্দ্রবাবু ইচ্ছা করিয়াছিলেন বিবাহের পর ছেলে শ্বশুরবাড়ী থাকিয়া হোষ্টেলের খরচটা হইতে তাঁহাকে বাঁচাইয়া দিবে। অমর হোষ্টেলে থাকিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িত। অমর কিন্তু পিতার একান্ত বাধ্য পুত্র হইলেও হোষ্টেল ছাড়িয়া শ্বশুরালয়ে যাইতে স্বীকৃত হইল না। বরং জননীকে চিঠি দিয়া জানাইল যে, পরীক্ষার আর কয় মাসই বা বাকী, এই সামান্য দিনের জন্য সে আত্মসম্মান তথা তার পিতার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিতে ইচ্ছুক নহে। শ্বশুরালয় হইতে তাহাকে লইবার জন্য প্রায় প্রত্যহই মোটর আসিত। অমর নানা ওজর দেখাইয়া ফিরাইয়া দিত। কেবল যেদিন প্রভা মাথার দিব্য দিয়া চিঠি লিখিয়া লোক পাঠাইত কর্ত্তব্যানুরোধে অমর প্রভার সঙ্গে এক আধ দিন দেখা করিয়া চলিয়া আসিত। বিবাহের পর সেই একবার আসিয়া প্রভা আর শ্বশুর গৃহে যায় নাই। পাড়াগাঁয়ের জল-হাওয়া বধূর যদি হঠাৎ সহ্য না হয়, এই ভাবিয়া কর্ত্তা-গৃহিণীও বউ আনিবার আগ্রহ এতদিন প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু বড়দিনের ছুটীতে পুত্র একা আসিল—বধূকে সঙ্গে আনিল না, গৃহিণী ব্যথিত হইয়া কর্ত্তাকে কহিলেন, "কি গো, করবে আরও বড়াই!"

কর্ত্তা বলিলেন,—"আরে যেতে দাও না, আর ক'দিন, সব ঠিক হয়ে যাবে এর পর। কিন্তু কি জেদী ছেলে—মুখ ফুটে একদিন আপত্তিও করলে না!"

গৃহিণী বলিলেন, "আপত্তি করলে রাখতে তুমি! ছেলে তার বাপকে চেনে। পিতা হয়ে পুত্রের মনে জেনেশুনে যে আঘাত তুমি দিয়েছ, অমন ছেলে বলে তাই, নইলে কোন্‌দিন তোমার বাড়ী ছেড়ে চ'লে যেত!"

"যেত ত ব'য়ে যেত" বলিয়া মুখোর্জ্জি মহাশয় বহির্ব্বাটীর দিকে চলিয়া গিয়াছিলেন।

তারপরই ফাল্গুনের শেষাশেষি এক শুভদিন দেখিয়া যোগীন্দ্র বাবু পুত্রবধূকে গৃহে লইয়া আসিলেন। পল্লীর আমোদ-প্রমোদ বিহীন নিৰ্জ্জন নিঃসঙ্গ জীবন প্রভার বড় ভাল লাগিল না। তার উপর স্বামীও কাছে নাই। নিবিড়ভাবে স্বামীকে কাছে পাইবার সুযোগ প্রভার জীবনে একদিনের জন্যও আসে নাই। একই কলিকাতা শহরে দুইজনে বাস করিয়া আসিয়াছে। তারা স্বামী-স্ত্রী। একের সঙ্গে অপরের দেখাশুনা খুব কম দিনের জনাই হইয়াছে! অমরের কলেজের লেকচার শেষ হইয়া গিয়াছিল, উপস্থিতিরও আর প্রয়োজন ছিল না। প্রভা অমরকে বাড়ী আসিবার জন্য চিঠি দিয়াছিল। অমর আজ-কাল করিয়া চৈত্র মাস কাটাইয়া দিল, বাড়ী আসিল না। রাগিয়া প্রভা শেষে লিখিয়া জানাইল, বাড়ী আসিতে যদি তার অধিক বিলম্ব থাকে ত সে কলিকাতা চলিয়া যাইবে। পাড়াগাঁয়ের জীবন তাহার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে! উত্তরে অমর লিখিয়াছিল, তার পিতাকে লিখিয়া সে কলিকাতা চলিয়া আসিতে পারে। তার কোন আপত্তি নাই। কবে সে বাড়ী পৌঁছিবে, তাহার স্থিরতা নাই। পত্র পড়িয়া প্রভা খানিক কাঁদিয়াছিল, তার পর লিখিয়াছিল, "আমি জানি, আমি এখানে থাকতে তুমি বাড়ী আসবে না। যেহেতু আমি থাকলে তোমার অসুবিধা। ভাই-সোহাগী বোন লীলার সঙ্গে যখন তখন দেখা মিলবে না। আমি যাব না—কোথাও যাব না।"

প্রভার পত্র পাইয়া অমর শুধু লিখিল, "কি ভেবে তুমি কি লিখেছ তা তুমিই জান। ঈর্ষায় আর কিছু করতে না পারলেও নিজের মনের শান্তি যে নষ্ট ক'রে দেয় তাতে আর ভুল নেই। আজ প্রথম তোমায় একটা উপদেশ দিচ্ছি! স্বামীর ওপর অবিশ্বাস আর অশ্রদ্ধা দাম্পত্য জীবনের মূলোচ্ছেদ করে দেয়। ইহা ভুল না।"

ইহার কয়দিন পরেই কোন সংবাদ না দিয়াই অমর একদিন বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল।

অমর বাড়ী আসিলে সংবাদ পাইয়া লীলা সাধারণত অমরের সঙ্গে দেখা করিতে আসে। অমর আসিয়াছে শুনিয়াও লীলা এবার দেখা করিতে আসিল না। অমর দুই তিনদিন লীলার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া যখন দেখিল, লীলা আসিল না, তখন ভিতরে ভিতরে মনোমালিন্য একটা কিছু হইয়াছে মনে করিয়া অমর নিজেই লীলাদের বাড়ী যাইয়া উপস্থিত হইল।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া অমর ডাকিল, "কাকীমা!"

লীলা মণির চুল বাঁধিয়া দিতেছিল। অমরকে দেখিয়া উঠিয়া প্রণাম করিল। পরে কহিল, "মা বাড়ী নেই অমর দা, কবে এসেছ?"

অমরনাথ অদূরে এক চৌকীর উপর বসিয়া বলিল, "পরশু সকালে। ভাল আছিস লীলা?"

লীলা স্মিত হাস্যে মাথা নাড়িয়া জানাইল ভাল আছে। অমর বলিল, "দুদিন বাড়ী এসেছি—শুনেছিস কারু কাছে নিশ্চয়। ওদিকে যাস্‌নি যে! এত শীগ্‌গিরই তোর অমর দা এত পর হয়ে গেল!"

"তুমিই কোন্ এসেছ অমর দা? আমি ত মেয়েমানুষ পরাধীন! তুমিও ত দু'দিনের ভেতর এসে দেখে গেলে না লীলা কেমন আছে।'

অমর সহসা উত্তর খুঁজিয়া পাইল না। লীলা মণির চুল বাঁধা শেষ করিয়া বলিল, "যা ত মণি, মাকে ডেকে আন্‌গে। বলিস, অমর দা এসে বসে আছেন।"

মণি চলিয়া গেলে লীলা কহিল, "আজ যে কি মনে ক'রে হঠাৎ লীলাকে দেখতে এসেছ তা তুমিই জান।"

অমর বলিল, "তুই যাবি ব'লে আসিনি। হ্যাঁরে লীলা, তুই আমার ওপর রাগ করেছিস?"

লীলা স্বাভাবিক স্বরে বলিল, "তোমার ওপর রাগ করব কেন অমর দা! ভায়ের ওপর বোনের যেটুকু অভিমান থাকা সম্ভব, আজ তাও আমার নেই। তবে এই ভেবে একটু দুঃখ পাই যে, তোমার মত লোকের ভাগ্যেও ভগবান সুখ লেখেন নি।"

মর্য্যাদা লাভ করিবার দাব।

অমরনাথ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "সুখ দুঃখ ত একই মনের দুটি অবস্থা। ওতে আমাকে বিচলিত করতে পারে নারে লীলা! গোনা কটা দিনের এই জীবন,—দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যাবে।"

অমরের এই শেষ কথাটির মধ্যে যে কত বড় ব্যথা—কতখানি বৈরাগ্য প্রচ্ছন্নতার আবরণ উন্মোচন করিয়া পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল, লীলা তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিল, "বড়ই কি ব্যথা পাচ্ছ অমর দা!"

লীলার স্বর সহানুভূতিব্যঞ্জক। অমর কহিল, "কিচ্ছু না। ব্যথাকে আমি কাছে ঘেঁসতেই দিই নে। মানুষকে হার মানিয়ে দেবার শক্তিতে ও যখন কাছে আসে, দুর্ব্বল যারা, তারাই ভয়ে পিছিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে। কিন্তু ওকে ভয় না করে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালে ওই ভয়ে পেছিয়ে যায়। মানুষের চেয়ে ওর শক্তি ত বেশী নয়! কিন্তু ওর কর্কশতায় মাধুর্য্যও ত আছে। ও যদি না থাকত রে লীলা—সারা জগতের সাহিত্য, কাব্য, সঙ্গীত এত মধুর হয়ে উঠত না। ওর আঘাতের যাতনায় শুধু কান্নাই পায় না, আনন্দও দেয়। অবশ্য সেটুকু উপভোগ করবার শক্তি থাকা চাই। কান্নায় কান্নায় সারা হৃদয় ভরে উঠলে কি যে আনন্দ, না কাঁদলে তা বোঝা যায় না রে!"

বলিয়া অমর একটু ম্লান হাসি হাসিল। লীলার চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিল। বিশ্রান্ত করুণ নয়ন অমরের মুখের উপর তুলিয়া ধরিয়া কহিল, "কাঁদিবার অধিকারও যে আমাদের নেই অমর দা!"

অমর ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, "কারই বা আছে রে লীলা! সমাজ যে নরনারী উভয়কে আষ্টে পিষ্টে বেঁধে রেখেছে! পুরুষের বাঁধনটা একটু আলগা। তাই যা তার একটু গায়ের জোর। নারী পুরুষ দুজনে মিলে যদি সমাজ বিধি গড়ত—অধিকার কোন পক্ষেরই বেশী থাকত না।"

অদূরে মণির কণ্ঠস্বর শুনিয়া লীলা একটু দূরে সরিয়া গেল। নন্দরাণী ভিতরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "অনেকক্ষণ আমার জন্য ব'সে আছ, না অমর?"

অমরনাথ উঠিয়া নন্দরাণীকে প্রণাম করিল। নন্দরাণী বলিলেন, "ক'দিন বাড়ী এসেছ শুনেছি—আজ বুঝি কাকী-মাকে মনে পড়ল? তা এখন ত তোমাদের কলেজ ছুটী, লীলার বে পর্য্যন্ত বাড়ী থাকবে ত! এই মাসের ২৯শে!"

অদূরে বজ্রপাতের শব্দ শুনিয়া মানুষ বুঝি অত চমকাইয়া উঠে না, লীলার বিবাহের কথা শুনিয়া অমর যতখানি চমকাইয়া উঠিল। সহসা মুখে কথা ফুটিল না—যেন আচমকা একটা আঘাতে তার সারা দেহমন অসাড় হইয়া গিয়াছে। মুহূর্ত্তে আত্মসংবরণ করিয়া শুষ্কমুখে অমর কহিল, "কোথায় বে স্থির হ'ল কাকীমা?"

অমর বুঝিয়া উঠিতে পারিল না, এ শুভ সংবাদে এত আঘাত তাহার লাগিল কেন। কি অধিকার আছে তার ব্যথিত হইবার। সেই ত নিজ হস্তে সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, আশার বীজ সমূলে উৎপাটিত করিয়া দূরে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু লীলার বিবাহ, এত সাধের লীলা—এত আপনার লীলা, এক মুহূর্ত্তে পর হইয়া যাইবে।

নন্দরাণী বলিলেন, "ও তুমি শোননি অমর! কলকাতায় তোমার কাকাবাবুর এক বন্ধু সম্বন্ধ এনেছিলেন। তোমার কাকাবাবু ছেলে দেখে একেবারে দিন তারিখ স্থির করে এসেছেন। ছেলেটি কলেজে ডাক্তারী পড়ে।"

অমরের নিজের অনিচ্ছায়ই দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। নন্দরাণী তাহা লক্ষ্য করিলেন। বলিলেন, "তোমার কাকা বললেন, ছেলের বাপ নাকি মস্ত বড় লোক, প্রকাণ্ড তেতলা বাড়ী। কাজ কারবার দেশে জমিদারী কোন কিছুরই অভাব নেই। বাপের ঐ একমাত্র ছেলে!"

"তা বেশ সম্বন্ধ হয়েছে" বলিয়া অমর শুষ্কমুখে দ্বারের পাশে দণ্ডায়মানা লীলার মুখপানে চাহিল। দেখিল উদ্বেগহীন প্রশান্ত মুখে লীলা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। লীলার এই নিরুদ্বেগ প্রশান্তি অমরের ব্যথিত হৃদয়কে যেন ব্যঙ্গ করিতেছিল। অমর সেদিকে বেশীক্ষণ চাহিয়া থাকিতে পারিল না, অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

নন্দরাণী আবার বলিলেন, "লীলাকে নিয়ে বড়ই বিপদে পড়েছিলাম অমর। ভগবান যে মুখ তুলে চাইবেন সে ভরসা ছিল না। জান ত বাছা, পয়সা খরচ করে বে' দেবার সঙ্গতি তোমার কাকার নেই। ভগবান যেন দয়া করে নিজেই জুটিয়ে দিয়েছেন, এখন ওর ভাগ্য!"

অমরনাথ আরও একটি দীর্ঘশ্বাস দমন করিয়া কহিল, "ভাগ্য ওর মন্দ হতে পারে না কাকীমা! ভাগ্যবানের হাতেই ও পড়বে। হতভাগা যে সে ওকে পাওয়ার মত সৌভাগ্য নিয়ে জন্মায় নি!"

বলিতে বলিতে সারা বিশ্বের পুঞ্জীভূত বেদনা অমরের বুকের ভিতর দোলা দিয়া উঠিল। আঁখিপল্লব ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। অমর ডাকিল, "লীলা, এক গ্লাস জল দে ত রে, বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।"

লীলা অমরকে লক্ষ্য করিতেছিল। তার বিবাহের সংবাদ যে অমরের বুকে এমন কঠোর হইয়া বাজিবে এ ধারণা লীলার ছিল না। অতীতে যত অন্যায়ই তার অমর দা করিয়া থাকুক, আজ এই প্রলয় সৃষ্টির সন্ধিক্ষণে তার অতি বড় আপন অমরদাকে আহত করিয়া তুলিবার ইচ্ছা লীলার আদৌ হইল না। আহত হইয়া আঘাত দেওয়া ত ভালবাসার পরিচয় নয়। লীলার দৃষ্টি ব্যথিত হইয়া উঠিল।

অমর যে আঘাত পাইতেছে এবং কেন পাইতেছে নন্দরাণী তাহা হয়ত বুঝিতে পারিতেছিলেন। আহত করিবার লোভ কম না থাকিলেও মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া নন্দরাণী থামিয়া গেলেন।

লীলা জল আনিতে যাইতেছিল, মাতা বলিলেন, "জল আমিই দিচ্ছি, তুই দুখানা সন্দেশ বের কর।"

নন্দরাণী জল আনিতে গেলেন। লীলা দুখানা সন্দেশ একখানি রেকাবীতে রাখিয়া অমরের সম্মুখে ধরিল। অমর বলিল, "সন্দেশ নয়, শুধু জল।"

লীলা বলিল, "একটু মুখে দাও অমর দা, আর বেশী দিন ত তোমার সামনে কিছু দিতে পারব না।"

টস করিয়া এক ফোঁটা চোখের জল সন্দেশের উপর পড়িল। লীলা ত্বরিতে চোখের জল মুছিয়া বলিল, "তুমি যে আমার চেয়েও দুর্ব্বল—তার পরিচয় আজ ভাল করেই দিলে।"

নন্দরাণী জল লইয়া আসিলেন। অমর এক টুকরা সন্দেশ মুখে দিয়া এক চুমুকে সবটুকু জল নিঃশেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

নন্দরাণীর নিকট হইতে চলিয়া আসিয়া অমর আর বাড়ীর দিকে গেল না। গ্রামপ্রান্তে বিস্তৃত মাঠের ধারে অশ্বত্থ গাছের তলায় কতকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া আবার উঠিয়া মাঠের প্রান্তবাহিনী নদীর ধারে চলিয়া গেল। ক্ষুদ্র নদী, জল বেশী ছিল না; পার হইয়া অপর তীরে আসিয়া পেঁাছিল। যাত্রা লক্ষ্যহীন। করুণ বেদনার সুরে হৃদয় তার ভরিয়া গিয়াছিল, চারিদিকে শুধু বিসর্জ্জনের হাহাকারই সে শুনিতে পাইতেছিল। কতদিনকার যত্নে গড়া প্রতিমা, বিসর্জ্জন যে দিতে হইবে, সে তাহা জানিত। কিন্তু বিসর্জ্জনের মুহূর্ত্ত যে এত বেদনাময় হইয়া উঠিবে, তাহা সে কোনদিনও ভাবিয়া দেখে নাই। সূর্য্য ডুবিয়া যাইতেছিল। অস্তায়মান ম্লান সূর্য্যের দিকে কতক্ষণ চাহিয়া রহিল,—সূর্য্য ডুবিতেছে, কাল আবার উঠিবে। কিন্তু সে ত আর ফিরিবে না। জন্মান্তরে—দূর মৃত্যুর পরপারে—রহস্যময় অজ্ঞাত অন্ধকার।

সাঁঝের আঁধার নিবিড় হইয়া আসিতেছিল,—অমর গৃহের পানে ফিরিয়া চলিল। বাহিরের অন্ধকার ভিতরের অন্ধকারের সহিত মিশিয়া এক হইয়া গেল। ভাবিয়া ভাবিয়া সহসা তাহার মনে হইল, বড় স্বার্থপর সে। নিজে যা ফেলিয়া দিয়াছে, অন্যে তাই আদর করিয়া তুলিয়া লইবে—তাতেও ব্যথা! অথচ সে তাকে ভালবাসে!

অমরের বাড়ী ফিরিতে একটু রাত্রি হইয়া গেল। প্রভা একখানা বাঙলা মাসিক লইয়া বসিয়াছিল। অমরকে আসিতে দেখিয়াও প্রভা উঠিল না বা কোন কথাও কহিল না। অমরও জামা-কাপড় ছাড়িয়া একখানা বই লইয়া বসিতে যাইতেছিল, প্রভা হাতের মাসিকখানা টেবিলে রাখিয়া বলিল, "এসেই যে ভাল ছেলেটির মত বড় বই নিয়ে বস্‌লে,—এত রাত ছিলে কোথায়?"

প্রভার স্বরে কোমলতার লেশমাত্র ছিল না। তবুও অমর স্বাভাবিকভাবে বলিল, "বিকেলে চাটুজ্জে বাড়ী কাকীমার ওখানে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে বেরিয়ে মাঠের ওধার দিয়ে একটু ঘুরে এলাম।"

শ্লেষব্যঞ্জক দৃষ্টি দিয়া অমরের মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "কাকীমা বোধহয় বাড়ী ছিলেন না। তাই লীলার সংগে গল্প ক'রে ক'রে রাত হয়ে গেল।"

প্রভার শ্লেষপূর্ণ কথায় অমরের রাগ নিতান্ত কম হইতেছিল না। পত্নীর ঔদ্ধত্য যে সীমা ছাড়াইয়া বক্রগতিতে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে ইহা ভাবিয়া অমরের চক্ষু একটু লাল হইয়া উঠিল। কিন্তু মুহূর্ত্তে সে ভাব দমন করিয়া কহিল, ঘরে এমন জ্যোতির্ব্বিদ্ থাকতে নিজের ভবিষ্যৎটা এতদিন কেন জেনে নিইনি তাই ভেবেই আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি।"

প্রভা বলিল, "এটুকু জানতে আর কারুর জ্যোতিষ শিখ্‌তে হয় না। ও মাঠে বেড়ানর গল্পটা নিছক মিথ্যে!"

অমরের মুখ গম্ভীর হইল। বলিল, "সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ প্রভা! মানুষের সহ্যেরও একটা সীমা আছে—ভুলে যেও না; কোন কিছুতেই আমার লাগে না। জীবনে ঐ একটি কাজ আজও করি নি—সে মিথ্যা কথা বলা!"

"ওগো সত্যের অবতার, রেগে যে একেবারে আগুন হয়ে গেছ! ভদ্রতায় আটকাচ্ছে ব'লে গায়ে হাত তুল্‌ছনা—নইলে—"

অসমাপ্ত কথার মাঝে অমর বলিয়া উঠিল, "নইলে মেরে আধমরা ক'রে ফেল্‌তাম।—ব'লে ফেল না থাম্‌লে কেন!"

প্রভা কিঞ্চিৎ দমিয়া গেল। স্বামীর এ মূর্ত্তি তার চোখে আর কোন দিন পড়ে নাই। সুর একটু নরম করিয়া প্রভা কহিল, "কি এমন তোমায় বলেছি যে তুমি অত রেগে গেছ! তোমাকে কোন কিছু জিজ্ঞেস করবার অধিকার কি আমার নেই!"

অমর অপেক্ষাকৃত শান্তস্বরে বলিল, "অধিকার তোমার নিশ্চয়ই আছে—এবং তার একটা সীমাও আছে!"

"কি এমন সীমা ছাড়িয়ে গেলাম বলত। সেই কোন্ সকালে তুমি চলে গেছ, আর এলে এই রাত আটটায়! কোথায় যাবে বলে যাওনি—আর আমি সারা বিকেলটা তোমার পথ-পানে চেয়ে আছি।"

বলিয়া প্রভা আঁচলে মুখ ঢাকিল। অমরনাথ এবার হাসিয়া ফেলিল। বলিল, "তোমার মত জ্যোতিষ জানলে না হয় জান্‌তে পারতাম যে, পথপানে চেয়ে চেয়ে একজনের চোখ কাণা হবার দাখিল।"

প্রভা এবার ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া বলিতে লাগিল, "আমি তোমার পথপানে চেয়ে ব'সে থাক্‌ব কেন—লীলা ব'সে থাকে। সে তোমায় ভালবাসে—আমি তোমায় ত ভালবাসি না!"

অমরের ফুটন্ত হাসি অধরেই মিলাইয়া গেল। ধীরস্বরে কহিল, "লীলাকে তুমি ঈর্ষা কর কেন প্রভা, সে যে আমার বোন।"

প্রভা আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিল, "বোন্!—তা আমিও জানি! অন্য উপায় ছিল না বলেই ত বোন্ হয়েছে, তা আমি জেনেছি! তাকে যদি ভুল্‌তেই পারবে না তবে আমায় আন্‌লে কেন? আমি ওসব সইতে পারব্ না।"

অমর দৃপ্তকণ্ঠে কহিল, "জেনেছ—! কি তুমি জেনেছ প্রভা—? কি অন্যায় আমি কর্‌ছি যে তুমি সইতে পার্‌বে না!"

প্রভা উঠিয়া দাঁড়াইল—পরিপূর্ণ যৌবনভারানত দেহ ঈষৎ বাঁকাইয়া, অপূর্ব্ব গ্রীবাভঙ্গি করিয়া অমরের আরও নিকটে সরিয়া গেল, বলিল, "কোন অন্যায়ই তুমি করনি, কর্‌ছ না। তবে কোন্ ন্যায়ের উপর দাঁড়িয়ে তাকে ভালবেসে

(শেষাংশ ৬৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

অনির্ব্বাণ-দীপে পাখীর প্রাণনাশ

মার্কিনের মাসাচুসেটস্ ষ্টেটের সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত শিখর মাউণ্ট গ্রেলকে ১১০ ফুট উচ্চ একটি টাওয়ার নির্ম্মিত হইয়াছে ১৯৩২ সালে—উহার উপরে ১২০০০ ওয়াট শক্তির আলোক জ্বালাইয়া রাখা হয় অবিরাম, কারণ সমরে নিহত বীরদের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যেই উহা উৎসর্গীকৃত। উহার প্রখর আলোকে আকৃষ্ট হইয়া পাখীর দল প্রবলবেগে উড়িয়া আসিয়া আলোকস্তম্ভের গায়ে আঘাতে প্রাণ হারায়; কোন কোন পাখীর দল আবার ঐ আলোকের চারিদিকে চক্রাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে চরম অবসন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ঢলিয়া পড়ে। বিশেষ করিয়া "মুশাফির" পাখীর দল অর্থাৎ যেগুলি কড়া শীত এড়াইতে অপেক্ষাকৃত গরম দেশে চলিয়া যায় এবং শীতান্তে পুন ফিরিয়া আসে—সেই সকল পাখীই এইভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই বৎসর শীতারম্ভে উক্ত আলোক-স্তম্ভের গোড়ায় এত বেশী সংখ্যায় মৃত পাখী প্রতিদিন জড়ো হইতে থাকে যে, আলোক তত্ত্বাবধায়কের অনুরোধে কর্ত্তৃপক্ষ পাখীর শফরের মরসুমে এই আলোক নির্ব্বাপিত রাখার আদেশ দিয়াছেন। সমরে নিহতদিগের প্রীত্যর্থে উৎসর্গিত আলোকস্তম্ভে এত পাখীর নিধন বন্ধ না করিলে পরলোকগত আত্মাগুলি নিশ্চয়ই স্বস্তি পাইবে না।

নিমকহারাম মোটর গাড়ী

আমেরিকার মোণ্টানা ষ্টেটের বাট্টে নামক শহরে এক 'কাউবয়' (গরু প্রভৃতি পশুচারক) গ্রেপ্তার হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে নীত হয়। সে বিনীতভাবেই হুজুরকে বুঝাইয়া বলে যে—

যখন কোন ভদ্রলোক অধিক মাত্রায় তরল আগুন (মদ্য) পান করে এবং বে-এক্তিয়ার হইয়া পড়ে, তখন প্রভুভক্ত ঘোড়াটি মালিকের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া অতি সতর্কতার সহিত মালিক সহ বাড়ী ফিরে—মালিকের কোনপ্রকার অনিষ্ট বা অসুবিধা হইতে দেয় না। কিন্তু সভ্যতার প্রতীক 'অটোমোবিল' মালিককে জেলখানার দোরে পৌঁছাইয়া দেয়।

ম্যাজিষ্ট্রেট অবশ্য কাউবয়ের এই সিদ্ধান্ত মানিয়াই লইয়াছেন; কারণ অভিযোগ ছিল মদ্যপানে বেহাল অবস্থায় মোটর হাঁকান—এবং দণ্ড দেওয়া হয় ২০ দিন কারাবাস।

তখন কাউবয় বলে—সে অশ্বপৃষ্ঠেই নিজ গ্রাম হইতে বাট্টে শহরে আগমন করে; কিন্তু দুইবার পানীয় গ্রহণের পর ঘোড়াটি বিনিময় করে মোটরগাড়ীর সহিত। —"দেখুন মোটরটা আমায় জেলখানায় টানিয়া আনিল।"

একদা যাহা ছিল বিস্ময়

সে ছিল বুধবার ১৯২৯ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী, যে দিন সর্ব্বপ্রথম লণ্ডন হইতে ৩০০০ মাইল দূরবর্ত্তী নিউ ইয়র্কে কুইনস্ হল কনসার্ট ব্রডকাষ্ট করা হয়। ইঞ্জিনীয়ারগণ বলেন সে সময় বর্ত্তমানের আধা-আধি সাফল্যে পৌঁছান গিয়াছিল কিনা সন্দেহ—সুস্পষ্ট ব্রডকাষ্টিংয়ে। তথাপি তাহাতেই সকল সংবাদপত্রে বিস্ময় ও প্রশংসা উপছাইয়া পড়িয়াছিল।

পাছে যন্ত্রাদির কোন খুঁতের দরুন ব্রডকাষ্ট ঠিক ঠিক মত করা না যায় এই আশঙ্কায় কনসার্ট শুনাইবার ব্যাপার গোপন রাখা হইয়াছিল। কনসার্ট পুরাপুরি নিরাপদে প্রেরণ করা হইলে পরে ঘোষণা করা হয়—উহা লণ্ডন হইতে ব্রডকাষ্ট করা হইয়াছে।

যদিও ১৯২৪ সাল হইতেই "বিগবেন" ঘণ্টার শব্দ, লণ্ডনের কোনও একতান বাদ্যের একাংশ, এমনি টুক্রা-টাক্রা সুর ব্রডকাষ্ট করা চলিতেছিল, তথাপি ১৯২৯ সালের উক্ত ২রা ফেব্রুয়ারী কুইনস্ হল কনসার্টই হইল রীতিমত প্রোগ্রাম—যাহা সর্ব্বপ্রথম ব্রডকাষ্ট করা সম্ভব হয় পুরাপুরি এবং তখনকার দিনের মত সুস্পষ্টভাবে।

বাস্-য়ে প্রাপ্ত হরেক জিনিষ

চিকাগো ট্যাক্সী ক্যাব কোং'র বাসসমূহে এক বৎসরে ৬০০০ বিভিন্ন সামগ্রী আরোহীরা ফেলিয়া গিয়াছে বলিয়া ঐ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী হ্যারি মিলার বিবৃতি দিয়াছে। সে আরও বলে—বিগত নয় বৎসরে সে অন্যূন ৫০,০০০টি জিনিষ উহাদের প্রকৃত মালিকদের প্রত্যর্পণ করিয়াছে।

প্রমাণাদি সহ দাবী করিবার অপেক্ষায় উক্ত কোম্পানীর গুদামে এখনও হরেক প্রকার জিনিষ তাকে তাকে সাজান রহিয়াছে। ইহার ভিতর রহিয়াছে—টুপী, মদ্যবোতল, বেহালা, ব্যাঞ্জো, ২৩টি ছাতা, কাচের গ্লাস, ব্রিফ কেস্, ক্ষুদে ক্যামেরা, নোট-বুক, সুটকেস, ২৫টি ওভারকোট, পুরুষদের সুট আর্টগ্রন্থ, বেস্ বল খেলার ব্যাট, ফার-কোট, রং স্প্রে করিবার পিচকারী, দাঁতের ব্রুশ, বড় একটা দেওয়াল ঘড়ি এবং পুস্তক। পুস্তক রহিয়াছে শত শত—লাটিন ভাষার কবিতা পুস্তক হইতে অধ্যাত্মবিজ্ঞানের উচ্চতম আলোচনা পুঁথি পর্য্যন্ত এবং সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যায় রহিয়াছে দস্তানা—মেয়ে-পুরুষ উভয় সম্প্রদায়ের ব্যবহারের।

প্রাণরক্ষার প্রতিদান

মিশিগান অঞ্চলের ডিয়ারহর্ন শহর। শহরের গা ঘেঁসিয়া প্রবাহিত পার্ব্বত্য নদী রুজ। শীতকাল আসিয়া পড়িয়াছে—যেমন তুষারপাত, তেমনই জমাট বরফ সারা রাজ্য জুড়িয়া রহিয়াছে। নদীর জল অদৃশ্য হইয়াছে—উপরে ভাসিতেছে নিরবচ্ছিন্ন জমাট বরফস্তর—মাঠ ঘাট কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না—কেবলই বরফ, কেবলই তুষার—যেদিকে তাকান যায় শুধু শাদায় শাদা ধব ধব করিতেছে।

মিসিস ষ্টেলা মড্ ক্রোনবার্গ বেড়াইতে বাহির হইয়া দেখিলেন কুকুর একটি নিরুপায় অবস্থায় নদীর বুকের বরফের ফাঁকে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে, বরফস্তরের উপরে উঠিবার সকল প্রয়াসই উহার নির্ম্মমভাবে বিফল হইতেছে। মিসিস্ এ দৃশ্য দেখিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিলেন না। একখানি ছোট নৌকা অশেষ ক্লেশে বরফ ঠ্যাঙাইয়া ঠ্যাঙাইয়া

কুকুরটির কাছে লইয়া গেলেন। তারপর উহাকে সযত্নে কোলে তুলিয়া লইয়া অতিকষ্টে পুনরায় তীরের দিকে অগ্রসর হইলেন।

তীরে পৌঁছিবামাত্র কুকুরটা হুটোপুটি আরম্ভ করিল এবং অতর্কিতে প্রাণরক্ষাকারিণীর গালে বিষম এক কামড় বসাইয়া দিয়া বেমালুম চম্পট দিল।

মিসিস ক্রোনবার্গ সেই দংশন-বিষ হইতে ত্রাণ পাইলেন না; র‍্যাবিস্ (rabies) বিষে প্রাণ হারাইলেন।

জান্তব প্রেরিত পুরুষের জন্ম-বার্ষিকী

টমি ক্লার্কের ২৪শ জন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষে নিউ ইয়র্কের অন্তর্গত সেনেগা ফলস্ গ্রামে অভূতপূর্ব্ব সমারোহ লক্ষ্য করা গিয়াছে। ইহার ২১ বর্ষে পদার্পণ হইতেই এই বার্ষিক ঘনঘটাপূর্ণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ফেব্রুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহের রবিবারে। গ্রামাঞ্চলে এরূপ জাঁকজমকের ভোজাদি সহ উৎসব খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। বিগত ১১ই ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে ২৪শ জন্মতিথির উৎসব-সজ্জা অন্য সকল পূর্ব্ব অনুষ্ঠানকে ম্লান করিয়া ফেলিয়াছে।

এত ঘটাপটায় যাহার জন্মতিথি অভিনন্দিত সে "প্রেরিত পুরুষ" হইলেও মানব নয়—জরদ আর শাদার ছোপে শোভিত একটি গোত্র-ঐতিহ্যহীন বিড়াল মাত্র। গ্রামের পশু চিকিৎসাবিদ ডাঃ উইলিয়াম ক্লার্ক ২৪ বৎসর পূর্ব্বে ইহাকে কুড়াইয়া পায় কোন গোলাবাড়ীতে পশু রোগী দেখিয়া ফিরিবার পথে গ্রাম্য রজনীর কুহেলীময় পারিপার্শ্বিকে।

ইহার ২১ বর্ষে পৌঁছিবার কালে ভোজের ব্যবস্থা ডাঃ ক্লার্ক করে, সে সময়ই ইহার জন্ম-বার্ষিকী অনুষ্ঠানের সমিতি গঠিত হয় এবং ইহা এক হিসাবে আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতি লাভ করে। সেই হইতে সেনেগা ফলস্ লজ অফ এলক্স্ দল ইহাকে "অনারারী মেম্বর" করিয়া লইয়াছে। বৎসরের পর বৎসর এই উৎসবের আড়ম্বর বাড়িয়াই চলিয়াছে। এই বৎসর ১৫০০ নিমন্ত্রণ চিঠি সুদৃশ্য খামে মুড়িয়া প্রেরণ করা হইয়াছে সারা মুল্লুকে।

দেশের গণ্যমান্য নামজাদা লোকের কেহই বাদ যান নাই নিমন্ত্রণ হইতে। প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজেভেল্ট এবং নিউ ইয়র্কের গবর্ণর হার্বার্ট এইচ লেম্যান—নিমন্ত্রণ তালিকার শীর্ষ অলংকৃত করিয়াছেন। ইহা ছাড়া মার্কিনের বিভিন্ন ষ্টেটের উচ্চপদস্থ অফিসার এবং বহু নগরীর মেয়রগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছেন।

এমন ব্যাপক জন্ম-বার্ষিকী উৎসব কোনও সেনেগা ফলস্‌বাসী বা বাসিনীর জন্য এ পর্য্যন্ত হয় নাই। ২৪টি বাতিতে সজ্জিত জন্মতিথি কেক্ ও ভোজের অগণিত উপচার অভ্যাগতদের চমৎকৃত করিয়াছিল। উৎসব উপলক্ষে বিশেষ পারিপাট্যের সহিত নির্ম্মিত সার্কাস খাঁচায় টমিকে ভোজ সভায় আনা হয়—ভোজের পর বক্তৃতা চলে। এই সময়ে ডাঃ ক্লার্ক দূরদেশ হইতে প্রাপ্ত উপহারপুঞ্জ সমাগতদের প্রদর্শন করেন। সহানুভূতিসূচক বাণী—যাহা হিতৈষী বন্ধুদের দল তারযোগে বা ডাকযোগে প্রেরণ করিয়াছে তাহাও পাঠ করা হয়। চিঠির সহিত যে অর্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহা ব্যাঙ্কে রাখা হইয়াছে টমির নামে। সমুদয়ে ৬ ডলার ১৫ সেণ্ট জমায়েত হইয়াছে। উহাই টমির বৃদ্ধ বয়সের সিকিউরিটি ফাণ্ড বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

গোঁফের দিগ্বিজয়

লম্বা গোঁফওয়ালা মানুষ আমরা আমাদের দেশে মাঝে মাঝে দেখিয়া থাকি। রাখিবার অন্য ব্যবস্থা করিতে না পারিয়া শেষে বেচারীকে কানের উপর দিয়াই গোঁফ ঝুলাইয়া রাখিতে হয়। কেহ গোঁফের অতিরিক্ত দৈর্ঘ্য বেসামাল হইয়া পড়ে বলিয়া গোঁফটিকে পাকাইয়া পাকাইয়া লম্বায় খাটো করিয়া রাখে। ঐ প্রকার গুটান অবস্থায় অধিক স্থান না জুড়িলেও, পাক খুলিয়া লইলে উহা আয়ত্তের

কাথিয়াবার ষ্টেটের পুলিশম্যান দেসার অর্জ্জুন দাংগারের গোঁফ জোড়া ১০৩ ইঞ্চি লম্বা; বাঁদিকে ৫১ ইঞ্চি এবং ডানদিকে ৫২ ইঞ্চি

বাহিরে চলিয়া যায়। অথচ লম্বা গোঁফ পুষিবার সখটিকে বর্জ্জন করা সম্ভব হয় না—তখন গোঁফজোড়াকে পাকাইয়া আকারে খর্ব্ব করিয়া আনিয়া বাঁধিয়া রাখা হয় সুতা দ্বারা। এমনি একজোড়া গোঁফ ছবিতে দেখা যাইবে—সিপাই দেসার অর্জ্জুন দাংগারজীর। ইনি কাথিয়াবার রাজ্যের একজন সিপাই অর্থাৎ পুলিশম্যান। ইহার বাঁ দিকের গোঁফ লম্বায় ৫১ ইঞ্চি এবং ডান দিকের গোঁফ লম্বায় ৫২ ইঞ্চি। এই জোড়া যে সারা দুনিয়ার সর্ব্ববৃহৎ গোঁফ—আশা করি, একথা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

পণ্ডিতের নির্ভুল সিদ্ধান্ত

ফরাসী সংবাদপত্রে একটি মজার খবর প্রকাশিত হইয়াছে :—

জনৈক ইতালীয় ভাস্কর ভিনাসের একটি মূর্ত্তি খুদিয়া এক মাঠে পুঁতিয়া রাখেন। এক চাষী চাষ করিতে করিতে উহা মাটীর তলা হইতে উদ্ধার করে। অতঃপর সে উহা জাতীয় শিল্প-কলা ভাণ্ডারে লইয়া যায়। তথায় পুরাকলা-তত্ত্ববিদগণ বহু পরীক্ষার পর সিদ্ধান্ত করেন যে, মূর্ত্তিটি অতি প্রাচীন এবং এরূপ মূর্ত্তি দুর্ঘট। চাষী এখন ঐ দেখাইয়া বেশ দু-পয়সা করিয়া লইতেছে। ভাস্কর চেঁচাইতেছেন, ওটা মোটেই প্রাচীন মূর্ত্তি নহে, মাত্র কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি উহা খুদিয়াছেন, মূর্ত্তিটি তাঁহার, তাঁহাকে ফেরৎ দেওয়া হউক। পণ্ডিত-সভা বলিতেছেন, পণ্ডিতের

কথা ভুল, একথা কি করিয়া স্বীকার করা যায়। সুতরাং, এই নূতন মূর্ত্তি 'পুরাতন' বলিয়াই গণ্য হইবে।

মানবের বাঁ-হাত ব্যবহার

মানবের ভিতর যাহারা বাঁ-হাতকে প্রধানত সকল কাজে ব্যবহার করে, তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য। অধিকাংশই ডান হাত ব্যবহার করিয়া থাকে প্রায় সর্ব্ব কাজে। জীব-জগতে মর্কট জাতীয়েরাই মানবের অনেকাংশে সাদৃশ্যযুক্ত

গরিলা, শিম্পাঞ্জী প্রভৃতি মর্কট জাতীয় প্রায় সকল জানোয়ারই বাঁ হাত ব্যবহার করে বেশীর ভাগ; কিন্তু এপ্ মানুষের মত ডান হাত ব্যবহার করে

বলিয়া কথিত হয়; তাহা হইলেও উহাদের ভিতরও এই ডান বা বাঁ-হাত ব্যবহার ব্যাপারে একটা আশ্চর্য্য প্রভেদ দেখা যায়। এপ্ (বা লাঙ্গুলহীন মর্কট, যাহাকে একদা বন-মানুষ বলা হইত) কিন্তু ডান-হাতই ব্যবহার করে বেশী। বিশেষ অবস্থার উদ্ভব না হইলে উহারা ডান-হাতই আগাইয়া দিবে যে কোন কাজ করিবার জন্য। কিন্তু শিম্পাঞ্জী অথবা গরিলাদের অভ্যাস সেই প্রকার নয়। উহারা নানাপ্রকারে মানুষের মত হাল-চালবিশিষ্ট হইলেও বাঁ-হাতই ব্যবহার করিয়া থাকে বেশীর ভাগ সময়ে। অভ্যস্ত বলিয়াই হউক, কিম্বা সহজাত বৃত্তি বলিয়াই হউক গরিলা, শিম্পাঞ্জী ও আরও কয়েক প্রকার মর্কট জাতীয়েরা সচরাচর ডান-হাত ব্যবহার করে না। ছবির এপ্‌টিকে দেখা যাইতেছে, মুখে ডান-হাতের আঙ্গুলই গুঁজিয়া বসিয়া আছে।

বাড়ী পোড়াইবার অধিকারী

ক্যালিফোর্ণিয়া প্রদেশের স্যানজোন্স নগরের উপকণ্ঠে এডওয়ার্ড ফ্রান্সেস মার্ফি নামক এক ব্যক্তি একদিন সকালে উঠিয়া তাহার ঘরের কাছে সব গাছ কাটিয়া ফেলিতে আরম্ভ করিল। তারপরই সকলে দেখিল যে, সে বাড়ী হইতে সমস্ত জিনিষ-পত্র বাহির করিয়া ঘরে তালা মারিয়া চলিয়া গেল। কিছু পরেই বাড়ী হইতে ধুঁয়া উঠিতে লাগিল। লোকে ফায়ার ব্রিগেডে খবর দিল। দমকল আসিয়া যখন আগুন নিবাইল, তখন সব পুড়িয়া ছাই। বাড়ীখানা বড় ছিল না। একটি মাত্র ঘর, তাহাতে দুটি কোঠা।

গৃহে অগ্নিসংযোগের অভিযোগে পুলিশ লোকটাকে গ্রেপ্তার করিল। পুলিশের উপর বিষম খাপ্পা হইয়া সে বলিল—বাপু হে, আমার ঘরে আমি আগুন লাগাইয়াছি তাতে আইনের বাবার কি? আমার বাড়ীর একশত ফুটের মধ্যে অপর কাহারও বাড়ী নাই যে, আমার বাড়ীর আগুনে তার বাড়ী পুড়িবে। আমার বাড়ী বীমা করাও নাই যে, কোনও বীমা-কোম্পানী ঠকিবে। আচ্ছা ধর আমি যদি বাড়ীটা না পোড়াইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতাম, অপরাধ হইত কি? আমার বাড়ী, ভাঙ্গিয়া ফেলার অধিকার যদি আমার থাকে, পোড়াইবার অধিকারই থাকিবে না কেন?

পুলিশ নাচার হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন সে বাড়ী পোড়াইল। উত্তরে সে বলিল যে, পাড়ার লোকগুলোকে সে পছন্দ করে না, তাই সে তাহাদিগকে মজা দেখাইল।

মাথা ফাটানর নিমন্ত্রণ

বিগত মহাসমরের কালে রুশিয়ান তুর্কীস্তানে গুস্তাব ক্রিস্ত কশাকদের হাতে বন্দী হয়। কিন্তু পথচারী সার্কাস-ওয়ালার বেশে সে ঐ স্থান হইতে পলায়ন করিয়া আফগানি-স্তানে হাজির হয়। সেখানে ফিল্‌ম ও সিনেমা-প্রজেক্‌টর যন্ত্র ক্রয় করিয়া সে গ্রামাঞ্চলে ভ্রমণ করিয়া করিয়া সিনেমা প্রদর্শন করিতে থাকে।

একটি ছোট শহরে সিনেমা প্রদর্শনের পূর্ব্বে সে কয়েক খানি চিঠি ও বিজ্ঞাপন একটি দেশীয় লোক দ্বারা লেখায়। চিঠিগুলিতে থাকে স্থানীয় দল-সর্দ্দার ও উচ্চপদস্থ কর্ম্ম-চারীদের নিমন্ত্রণ—প্রদর্শনী-সভা অলংকৃত করিবার জন্য। আর বিজ্ঞাপনগুলি লেখা থাকে সাধারণের উদ্দেশ্যে যে, তাহারা যদি প্রাচীর বৃক্ষাদিতে চড়িয়া বিনা পয়সায় সিনেমা দেখিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে মাথা ফাটাইয়া দেওয়া হইবে।

কিন্তু সিনেমা আরম্ভ হইবার দুইঘণ্টা পূর্ব্বে গুস্তাবকে গ্রেপ্তার করা হইল। সর্দ্দার জানিতে চাহিলেন কেন তাঁহাদের মাথা ফাটাইবার ভয় দেখান হইয়াছে।

গুস্তাব বুঝিল পত্রবাহক কুলী এই অদলবদল করিয়াছে। তখন ভ্রান্তির কথা খুলিয়া বলা হয়—গুস্তাব রেহাই পাইয়া যথাসময়ে সিনেমা প্রদর্শন আরম্ভ করিল।

হালখাতা

(গল্প)

শ্রীরামনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বি-এ

গ্রামের মধ্যে একখানি মাত্র দোকান। নিতান্ত ছোট নহে। বলিতে গেলে গ্রামখানিও বড়ই ; কিন্তু তাহার সর্ব্ববিধ অভাবের পূরণ হয়—ঐ একখানি দোকানের মালে। লোকের চাহিদার হিসাবে বিনোদপুরে হয়ত আরও তিনখানি দোকানও দিব্য চলিতে পারে কিন্তু তাহা চলিবার যো নাই ; কেন না—ঐ দোকানের মালিকই গ্রামের একচ্ছত্র জমিদার, গ্রামের এক-চেটিয়া অধিকার তাঁহার। প্রজার বড় কষ্টের দুটি পয়সা যেমন বহু অছিলায় এবং তাহাদের বিবিধ নির্য্যাতনের মধ্য দিয়া জমিদারের সিন্দুকে আসিয়া উঠিত, তেমনি এই দোকানটিও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাদের অর্থ-শোষণের অন্যতম ফন্দি-হিসাবে। দোকানের বিক্রেতা বা বেচনদারের উপর মালিকের পরিষ্কার নির্দ্দেশই ছিল, চৌদ্দ আনার জিনিষ দিয়া—যদি ষোল আনার দাম ঠুকিয়া না লওয়া গেল, তবে আর সে দোকান করিয়া অনর্থক একটা পণ্ডশ্রমের প্রয়োজন কিসের। দোকানের মালিকের উপদেশ না মানিয়া উপায় ছিল না, কেন না বক্কু ত হুকুমের চাকর,—দূর বলিলেই যখন শতেক হাত। তাহার উপর বক্কুর নিজেরও কিছু করিয়া লওয়া চাই, নহিলে সামান্য পাঁচটি টাকা মাহিনায়—সকাল হইতে সেই রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত খাটিলে তাহার মজুরী পোষাইবে কেন। ফলে দাঁড়াইয়াছিল এই যে, খরিদ্দার একটি টাকা দিয়া বারো আনার জিনিষ পাইত। প্রতিবাদ করিলে বিপরীত ফল হইত, সে কোন দিন আর জিনিষ পাইত না, তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী রূপসা হইতে প্রয়োজনীয় খাদ্যাদি বহিয়া আনিতে হইত। সে যে কি দুর্ভোগ যে তাহা একদিন ভোগ করিয়াছে, সে-ই জানে। অপর কাহারও দোকান গ্রামে খুলিবার উপায় নাই—সে যে জমিদারের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে লড়িতে যাওয়া। বিহারী মণ্ডলের একবার এই দুর্ব্বুদ্ধি হইয়াছিল ; দোকানে চুরি হইল, শেষে একদিন অতি রহস্যজনকভাবে সমস্ত মাল সমেত দোকানের অগ্নি-সংকার হইয়া গেল। অবশেষে বেচারা গুণ্ডার অতর্কিত আক্রমণে প্রাণে মারা যায় আর কি! লোকে সবই বুঝিল এবং বুঝিয়া নীরব হইয়া গেল।

এ হেন দোকানে হালখাতার দিন আগত। পয়লা বৈশাখ দেখিতে দেখিতে আসিয়া পড়িল ; সে দিন দোকানে হালখাতা না করিলে সর্ব্বনাশ। নূতন খাতা মহরৎ করিয়া—পুরান বাকির মধ্যে সেইদিন কিছু জমা না দিলে সারা বছরের মত দোকানের জিনিস-পত্র ত দিবেই না, উপরন্তু জমিদার বাকির চতুর্গুণ আদায় করিয়া ছাড়িবে। এই কথা ভাবিয়া নীলু পরামাণিকের কদিন হইতে আহার নিদ্রা বন্ধ হইবার মত হইয়াছে। হাতে একটি কপর্দ্দক নাই, অথবা উক্ত বস্তু পয়লা বৈশাখের মধ্যে হাতে আসিবার কোনরূপ সম্ভাবনাও নাই। চৈত্র মাসের শেষ দিন কটির প্রতিটি ঘণ্টা কাটিবার সঙ্গে সঙ্গে নীলু স্পষ্ট অনুভব করিতে লাগিল, যেন বিষম এক বিপৎপাত তাহার সম্মুখীন হইবার জন্য পায়ে পায়ে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে!

নীলু খাটিত দিন মজুরী। ভাল কাজ করে বলিয়া গ্রামে তাহার নাম ছিল। লোকের বাড়ী-ঘরের বাঁশ-বাখারীর বেড়া দেওয়া, বাগান কোপান, জমি নিড়ান, ধান-কাটা, হলুদ-তোলা, চাষ-বাসের নানারকম কাজ,—ইত্যাদি পল্লী-গ্রামের গৃহস্থ ঘরের সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপারই তাহার ভাল জানা ছিল এবং এ সকল কাজ সে গ্রামের অন্য জন-মজুরের চেয়ে বেশী তৎপরতার সহিত সম্পন্ন করিত। কিন্তু সময়টা এমনি পড়িয়াছিল যে, তখন কোন কাজের জন্যই নীলুর তল্লাস করিবার প্রয়োজন হইবার কথা নহে, কেন না—কাজই তখন আর বড় ছিল না। চৈতালি ফসল তোলা এবং ঝাড়া হইয়া গিয়াছে—ধান নিড়ানর সময় আসিতে বিলম্ব আছে, যেহেতু বৃষ্টির অভাবে ধান আজও কাহারও বোনাই হয় নাই—এবং গৃহস্থালীর কাজও তেমন জুটিতেছে না, কেন না অধিকাংশ লোকই যে যেমন—সবাই আর্থিক অস্বচ্ছলতার মধ্যেই কাল কাটায়,—জোড়া তালি দিয়া কোন মতে দিন-যাপন করিতে পাইলেই যেন বাঁচিয়া যায়,—বিনা প্রয়োজনে দূরের কথা, প্রয়োজনের মুখেও লোকে একটি পয়সা গেরো দিয়া বাঁধিতে পারিলে আর সে পয়সাটি বাহির করিয়া দিতে বড় সহজে ঘেঁসে না।

গ্রামের আর্থিক পরিস্থিতি যখন এই প্রকার,—তখন নীলুর হঠাৎ মনে পড়িল, গত মাঘ মাসের মধ্যে নফর পারুই বলিয়াছিল, তাহার হলুদ বিক্রয় হইলে একখানি রান্নার দো-চালা তুলিবে। আজ কয়েক দিন হইল তাহার হলুদ বিক্রয় হইয়াছে, সুতরাং নফরের দো-চালা উঠিবার সময় আসন্ন প্রায়। কাজটি তাগাদা দিয়া হাতে লইতে পারিলেই কিছু পারিশ্রমিক আসিবে, তাহা হইলেই এই হালখাতার বিপদ হইতে আপাতত মুক্তি মিলিতে পারে। কথাটা মনে পড়িয়া যাইতেই নীলু যেন অন্ধকারে আলো দেখিতে পাইল। সে তখনই নফর পারুই-এর সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত হইবার জন্য কলিকায় তামাক সাজিয়া ধূমপানে মনোনিবেশ করিল।

(২)

নফর পারুই তখন বাড়ীতেই ছিল, এমন সময়ে নীলু গিয়া ডাকিল,—'নফর-দা, বাড়ী আছ ?'

'কে, নীলু,—আয় ভাই। তা—এদিকে কি মনে ক'রে ?'—

'কেন, আসতে নেই ?'

'সে কি কথা, নিশ্চয় আছে। বস ভাই'—বলিয়া নফর দাওয়ায় একখানি মাদুর বিছাইয়া নীলুকে বসিতে দিয়া তামাকের ডিবা লইয়া কলিকায় তামাক সাজিতে লাগিল।

'নীলু, এক কথা শুনেছিস, ভাই ? এক নূতন ট্যাক্স বসবে না কি,—শুনেছিস কিছু ?—'

'না দাদা, কিছুই ত শুনিনি। কিসের ট্যাক্স ?'

'শুনেচি—লেখাপড়া শেখার ট্যাক্স। লেখাপড়া শিখবে—লোকের ছেলেমেয়ে আর পাড়ার পাঁচজনে তার খরচ যোগাবে আবদারের কথা শোন।'

'পয়লা নম্বর—জমিদারের খাজনা, তার উপর—চৌকীদারী ট্যাক্স, এই দিতেই প্রাণ বেরিয়ে যায়। তার উপর—আবারও ট্যাক্স!'

'শুধু তাই নয় নীলু। এ ছাড়া জমিদার আবার না কি

ঘাস-কর আদায় করবে। মিঠে পুকুরের ধারে যে দু'বিঘে জমি গো-চর ব'লে পতিত আছে, জমিদার বলছে—গাঁয়ে যার যার গরু আছে, তাকেই ঐ জমির বাবদ ঘাস-কর দিতে হবে, নইলে ঐ জমি খাজনা বন্দোবস্ত করে দেবে।'

'এত বড় গ্রামখানির এতগুলো গরুর লেগে ঐ এক ফোঁটা জমি গো-চর আছে। তার জন্য আবার খাজনা নেবে! বেটা এমন কসাই, দাদা।'

'তা—গ্রামের গোয়ালারা ব'লেছে যে, যদি ঘাস-কর দিতে হয়, তবে তারা দল বেঁধে এ গাঁ থেকে উঠে যাবে। তাই ঘাস-করের কথাটা আর বড় তুলছে না। গোয়ালারা যে ভয়ানক একরোখা।'

'সংসারে বাস করা যে কত যন্ত্রণা, ভাই। এই চৌকিদারী ট্যাক্সটা কি বলত। মাসের মধ্যে চৌকিদার পাহারা দেয় ক'দিন? কিন্তু তার ট্যাক্সর বহর দেখেছ? এ বছর শুনছি—আবার ট্যাক্স বাড়াবে।'

'এই ট্যাক্সর জন্যই গাঁ ছেড়ে পালাতে হবে দেখছি।'

'তুমি যা হোক এক রকম ক'রে তাল সামলাতে পারবে, দাদা। দু'চার মণ খন্দকুটো ঘরে তুলেছ, কিন্তু আমি যে একেবারে ছেলেপুলে নিয়ে মারা গেলাম, ভাই।'

'পারব আর কোথা থেকে, বল। খন্দকুটো যা কিছু হয়েছিল, খামার থেকেই জমিদারের লোক দেনার দায়ে মুঠো থাবা দিয়ে তা উঠিয়ে নিয়ে গেল। হলুদটা বিক্রি ক'রে একখানা দো-চালা তোলার ইচ্ছা ছিল; তা সে টাকাটাও ঐ মহাজনের পেট ভরাতেই ফুঁকে গেল। মহাজনও ত ঐ বেচু রায়।'

'আরে—আমিও যে ঐ জন্যই তোমার কাছে এসেছিলাম, নফর দা। তোমার ঘরের কাজটা হাতে নিলে তোমারও কাজটা হয়, আমিও একটু সামলাতে পারি। কাজ কর্ম্ম কিছুই পাচ্ছিনা, বড় কষ্টে পড়েছি, ভাই।'

'সে কথা ব'ল না দাদা, আমার সে গুড়ে বালি পড়েছে। এখন পরশু বেচু রায়ের দোকানের হালখাতা করি কি দিয়ে তাই ভাবছি।'

'ও-হরি! আমারও যে অবিকল ঐ দশা। আমি তোমার কাছে এলামই ঐ জন্যে। তুমি দো-চালা তোলার কথা বলেছিলে, ভাবলাম কাজটা আরম্ভ ক'রে দিয়ে তোমার কাছে কিছু নিয়ে হালখাতার হিড়িকটা কাটিয়ে নেব। হালখাতার দিন কিছু না দিলে ত রক্ষে নেই—সে তেমন বেচু রায়ই নয়।'

'কথায় বলে—তুমি জল খাও ভাঁড়ে, আমি খাই ঘাটে। তা আমাদের দু'জনেরও ঠিক তাই হ'ল দেখছি।'

'তা ত হ'ল, এখন উপায় কি করি বল দেখি।'

'তুমি এক কাজ কর, নীলু। তুমি মাঝেরপাড়ার দুগ্গে ঠাকরুণের কাছে একবার জেনে যাও। ঠাকরুণ নতুন কলমের গাছের বেড়া দেবার জন্যে বাঁশ কাটিয়েছে আমি জানি। এ কাজটা হবার খুব আশা আছে। তুমি এখনই একবার যাও।'

'খোঁজটা দিয়ে বড় উপকার করলে ভাই। তবে উঠলাম এখন।'

'আচ্ছা, এস।'

নীলু নৈরাশ্যের মধ্যেও কিছু ভরসা পাইল নফরের কথায়। সে তখনই উঠিয়া সোজা মাঝেরপাড়ার দুর্গা-ঠাকুরাণীর বাড়ীতে গিয়া উঠিল এবং দেখিল, নফর মিথ্যা বলে নাই, সত্যই বাড়ীর প্রাঙ্গণে কতকগুলি বাঁশ জমা করা আছে। দেখিয়া তাহার অন্তর আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। সে প্রথমে বাঁশগুলিই পরীক্ষা করিয়া দেখিল, বেড়ার কাজ তাহা দ্বারা ভালই হইবে। তারপর সে অগ্রসর হইয়া গিয়া বাহির দরজায় তালা বন্ধ দেখিয়া ভাবিল, ঠাকুরাণী হয়ত পাশের কোন বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়া থাকিবেন। নীলু প্রাঙ্গণস্থ একটা আমগাছের নীচে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

এক ঘণ্টার উপর হইতে চলিল, দুর্গা-ঠাকুরাণীর কোন খোঁজ-খবর নাই। নীলু অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। তখন সে উঠিয়া গিয়া পাশের বাড়ীতে সন্ধান লইল, দুর্গা-ঠাকুরাণী আজ সকালে তাঁহার কন্যার বাড়ীতে গিয়াছেন, কবে ফিরিবেন তাহার স্থিরতা নাই।

আবার যে তিমিরে সেই তিমিরে। নফরের কাছে এই কাজটুকুর সন্ধান পাইয়া নীলু যতখানি উৎসাহ ও আনন্দ লইয়া দুর্গা-ঠাকুরাণীর বাড়ী আসিয়াছিল, ঠিক ততখানি নৈরাশ্য ও নিরানন্দ তাহার মনকে যুগপৎ অধিকার করিল। দুর্গা-ঠাকুরাণী স্থানান্তরে গিয়াছেন সংবাদে কয়েক মুহূর্ত্ত হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া নীলু ধীরে ধীরে রাস্তার দিকে অগ্রসর হইল। ভাগ্য বিমুখ হইলে মানুষ যে ডাল ধরে, তাহাই বুঝি ভাঙ্গে!

(৩)

বাড়ী আসিয়া নীলু দেখিল, সেখানেও নূতন বিপদ উপস্থিত। ইউনিয়ন বোর্ডের আদায়কারী পঞ্চায়েৎ প্রাণহরি হালদার দুইজন চৌকিদার সঙ্গে লইয়া আসিয়া তাহার বাড়ীতে জাঁকিয়া বসিয়া তাহারই আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। মার্চ্চ মাস শেষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু মার্চ্চ কিস্তীর ট্যাক্স এখনও নীলুর কাছে সম্পূর্ণ অনাদায় পড়িয়া আছে। ও পাড়ায় একমাত্র সে-ই বাকি-দার, আর সকলেরই কাছে ট্যাক্স আদায় হইয়া গিয়াছে। বৈশাখ মাস পড়িতে চলিয়াছে, গত বৎসরের সমুদয় ট্যাক্স আদায় না হইলে নূতন বৎসরের ট্যাক্স ধার্য্যের মিটিং করা যাইতেছে না; বোর্ডের প্রেসিডেন্ট কড়া নোটিশ জারি করিয়াছেন, চৈত্র মাসের অবশিষ্ট এই দুই দিনের মধ্যেই সমস্ত বাকি আদায় দিতে হইবে। ইতিপূর্ব্বে প্রাণহরি হালদারকে অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া নীলু আরও দুই দিন ফিরাইয়া দিয়াছে। আজ বিকালে তাহার ট্যাক্স পরিশোধ করিবার কড়ার আছে, তাই যথা-নির্দ্দিষ্ট সময়েই স-পারিষদ প্রাণহরির আবির্ভাব হইয়াছে; অন্য সময়ে প্রাণহরি একাই আসে। আজ পার্শ্বচরদ্বয়কে আমদানী করিতে হইয়াছে এই জন্য যে, হয়ত বা তাহাদের সাহায্যেরও কোন এক সময়ে প্রয়োজন উপস্থিত হইতে পারে। বুদ্ধিমান লোকের সময় থাকিতে সাবধান হইয়া চলাই নিয়ম।

নীলু প্রমাদ গণিল। সে হঠাৎ বাড়ী ঢুকিয়া পড়িয়াছে, নতুবা পূর্ব্বে তাহাদের আগমন সংবাদ পাইলে সে আদৌ বাড়ীতে ঢুকিত না, বা গা ঢাকা দিত। কিন্তু আর উপায়ান্তর নাই, সে একেবারে তাহাদের সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে।

'দণ্ডবৎ, হালদার মশাই'—নীলু সোজা আসিয়া প্রাণহরিকে যুক্ত-করে প্রণাম করিল।

'আমি বাড়ী ছিলাম না, হালদার মশাই, আপনাকে পান-তামাক দেওয়া হয়নি। বসুন, আমি হুঁকোয় জল ফিরিয়ে তামাক সেজে আনি। হারাণ ভাই, ব'স তোমরা, আমি এই এলাম।'

কিন্তু প্রাণহরিকে এত সহজে ভুলান গেল না।

'তামাক আনছ, ভাল কথা। ঐ সংগে এক টাকা ন' আনা সংগে এন। মনে থাকে যেন নীলু, এদিকে বছরও শেষ, তোমার কড়ারও আজ শেষ। ট্যাক্স আজ তোমাকে শোধ করতেই হবে। তোমার জন্য প্রেসিডেণ্ট বাবুর কাছে আমি তাড়া খাচ্ছি।'

ঘুস দিয়া ভুলাইবার ফন্দি গোড়াতেই ফাঁসিয়া যায় দেখিয়া আর একবার শেষ চেষ্টা করিবার উদ্দেশ্যে নীলু বলিল, 'আচ্ছা সে হবে; আগে তামাক-টামাক খেয়ে সুস্থ হন। এই রোদ্দুরে—ভদ্দরলোক আপনারা—কত কষ্ট হচ্ছে। আমার গাছের ডাব খুব সুন্দর, গোটা কয়েক ডাব পাড়ব, হালদার মশাই ?'

নীলুর মতলব বুঝিতে পারিয়া প্রাণহরি উত্তেজিত হইয়া বলিল, 'ও সব ধাপ্পাবাজি রাখ, নীলু। আজ তোমার ট্যাক্স আদায় ক'রে আমি এখান থেকে উঠব।'

'তবে খুলেই বলি, হালদার মশাই, আপনার ট্যাক্স ত দূরের কথা, আমার একটি পয়সা দিবার ক্ষমতা নাই। থাকবার মধ্যে ঘরের ঐ চৌকাঠ-জোড়াই আছে, খুশী হয় খুলে নিয়ে যান।'

নীলুর নির্দ্দেশ মত ঘরের চৌকাঠের দিকে চাহিতে গিয়া প্রাণহরির দৃষ্টি পড়িল ঘরের দাওয়ায় খানকয়েক মাটির সানকির সংগে রহিয়াছে একখানি কাঁসার থালা। আর দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রাণহরি অগ্রসর হইয়া গিয়া সেখানি তুলিয়া লইয়া হারাণ চৌকিদারের হাতে দিয়া বলিল, 'তোমার ঘরের চৌকাঠ আগামী কিস্তির ট্যাক্সের জন্য মজুত রইল, নীলু। হারাণ, চল্ বাবা।'

সংসারে দারিদ্র্য শুধু পাপ নয়, অপরাধ। নীলু দরিদ্র, সুতরাং সে-ও এই অপরাধে অপরাধী। কিন্তু অপরাধ ক্ষালনের জন্য তাহার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। এককালে তাহার বাপ-পিতামহের অবস্থা বেশ সংগতিপন্নই ছিল; দীনু পরামাণিকের দরুন জমা, পুলিনের বন্দ প্রভৃতি নামে বিনোদপুরের মাঠে অনেক জমি-জমা তাহার অবস্থাপন্ন পিতা-পিতামহের কথা আজও স্মরণ করাইয়া দেয়। নীলুও তাহার বাল্যকালে দেখিয়াছে—তাহার এই বাড়ীতেই বৃহৎ বৃহৎ আট-চালা ঘর ছিল, এই বাড়ীরই সুপ্রশস্ত আঙিনায় খামার হইত, সেই খামারে পর্ব্বত-প্রমাণ ধানের আঁটি গাদা করা হইত, তাহা ঝাড়া হইত, ধান প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মরাইতে উঠিত, কত লোক জন খাটিত। কিন্তু দেশে অজন্মা অনাবৃষ্টি বন্যা প্রভৃতির ফলে ক্রমে ক্রমে তাসের ঘরের মত সে সমুদয় লোপ পাইতে লাগিল। সেই সময় তাহার পিতারও মৃত্যু হইল, এবং তাহার সংগেই সব গিয়া আরম্ভ হইল নীলু ও তাহার মাতার দারিদ্র্যের জীবন। সেই জীবনের জের চলিতে চলিতে সংসারে যেমন হইয়া থাকে, কালক্রমে তাহার বিবাহ হইল, একটি ছেলে হইল এবং আজ যাহা হইয়া গেল, তাহারই চেহারা দেখিয়া নীলুর চক্ষু অশ্রু-সজল হইয়া উঠিল।

ট্যাক্স-আদায়কারীর দল চলিয়া গেলে নীলুর স্ত্রী গঙ্গামণি বাহিরে আসিয়া বলিল, 'হ্যাগা, খোকার থালাখানা নিয়ে গেল, তুমি কিছু বললে না ? আহা, ছেলেমানুষ কিছু বোঝে না, কেঁদে মরবে'খন।'

নীলু জীর্ণ বস্ত্রাঞ্চলে চোখ মুছিয়া বলিল, 'কিছু বললেও কিছুই হ'ত না, লাভের মধ্যে ওদের হাতে অপমান হ'তে হ'ত। ট্যাক্সর জন্যে দু'দিন ফিরিয়েছি, মাস শেষ হয়; আর ফেরাবই বা কি ব'লে, ওরাই বা শুনবে কেন ? তুমি ঘরে যাও, ঐ দেখ—এক বিপদ কাটতে না কাটতে আর এক বিপদ উপস্থিত; জমিদারের পেয়াদা আসছে।'

দেখিতে দেখিতে জমিদারের পাইক এরফান আসিয়া উপস্থিত হইল।

'তোমার সংগে দেখা হওয়াই যে দায় হয়েছে, পরামাণিকের পো।'

'দেখা না হওয়াই বোধ হয় ভাল। এস বসবে এস।'

'ব'সতে আসিনি তোমার কাছে। এসেছি খাজনা শোধ করবে কি-না, এই দুয়ের এক জেনে যাবার জন্যে।'

খাজনা শোধ করবো না, এমন কথা ত কোন দিন বলিনি। তবে—এবার বড়ই টানাটানির মধ্যে পড়েছি, তাই দিতে দেরী হ'চ্ছে।'

'ও সব বেশী কথা তোমার বলার দরকার নেই, আমারও শোনার গরজ নেই। তুমি খাজনা কবে দেবে তাই বল। আর —না দাও, সে কথাও পরিষ্কার ক'রে বল, আমি গিয়ে বলিগে, যার খাজনা সে যেমন ক'রে পারে আদায় ক'রবে।'

যাহার খাজনা, তাহার আদায় করিবার পদ্ধতি নীলুর ভালই জানা ছিল। এরফানের কথায় তাহার মনে পড়িয়া গেল, মাত্র সে দিন দক্ষিণপাড়ার সুরেন বোস বেচু রায়ের বাকি খাজনার দায়ে সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া সাতপুরুষের ভিটা ছাড়িয়া স্ত্রীপুত্রের সহিত গ্রাম হইতে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইল। জমিদারের এক কণিকা করুণা সে পাইল না, তাহার প্রতি সামান্য সহানুভূতি পর্য্যন্ত দেখাইবার দুঃসাহস কাহারও হইল না।

নীলুকে নীরব থাকিতে দেখিয়া এরফান চটিয়া উঠিল।

'তোমার বাক্যি উবে গেল যে, যা হয় একটা কিছু বলবে, না আমি এখানে ব'সে থাকব ? আমাকে আবার এই এতগুলো হালখাতার চিঠি বিলি করতে হবে। তোমার খানা নাও ত দেখি।'

নীলু হাত বাড়াইয়া হালখাতার চিঠি লইল। লাল রঙের পোষ্টকার্ডের মধ্যে নীলু দেখিতে পাইল, তাহার বিরুদ্ধে আর এক দফা যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া যেন শত্রুপক্ষের রক্তপতাকা উত্তোলিত হইল ; দৈন্যদুর্দ্দশা-অপমান পীড়িত তাহারই বক্ষ-রক্তে যেন সে পতাকা রঞ্জিত করা হইয়াছে।

পরাজিত এবং ক্ষত-বিক্ষত মুমূর্ষু সৈনিকের মত

ক্ষীণস্বরে নীলু বলিল, 'আমার দোকানের বাকি কত ফেলেছে, একবার দেখ ত এরফান্ ভাই।'

এরফান হালখাতার কার্ডখানি একবার চোখের খুব নিকটে, একবার অনেক দূরে লইয়া গিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, 'পাঁচ টাকা পোনে সাত আনা।'

'বল কি, এরফান, পাঁচ টাকা পোনে সাত আনা? আমার বড় জোর টাকা দেড়েক বাকি থাকার কথা। আমি বরাবর নগদই জিনিষ নিয়ে থাকি। এই কয়েক মাস থেকে বড় নাতান প'ড়ে গেছি।'

'যাক ভাই, সে তুমি বুঝবে, আর যাঁর বাকি ধারো, তিনি বুঝবেন। এখন খাজনার কথা কি বলছ একবার শেষ-কথা বলে ফেল।'

বোশেখ মাসের পয়লা হপ্তার মধ্যেই তোমাদের খাজনা দেব—যেমন ক'রে পারি।'

'ভাল কথা। তা হ'লে কথা রইল, আমি আজ থেকে সাত দিন পরে একেবারে তোমার দাখিলা নিয়ে আসব। আর ঐ সঙ্গে আমার পার্ব্বণি জোগাড় ক'রে রেখ। তোমাদের স্বপক্ষে মনিবের কাছে আমাদের যে কত টেনে বলতে হয় তা ত জান না, নইলে এতদিন ভিটে ছাড়া হ'তে। সে টের পেয়ে গেছে সুরেন বোস'—বলিয়া এরফান চলিয়া গেল।

(৫)

চৈত্রের দিনাবসানের আর বিলম্ব ছিল না। অস্তগামী সূর্য্যের রক্তিম কিরণচ্ছটা নীলুর আঙিনার নারিকেল গাছের মাথায় ঝিকিমিকি করিতেছিল। গ্রীষ্মের আবির্ভাবের রীতিমত সূচনা হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত এক ফোঁটা বৃষ্টি নাই, তাই পড়ন্ত বেলায় অপচীয়মান উষ্ণতার ফাঁকে ফাঁকে দক্ষিণা পবন এক এক ঝলক গায়ে আসিয়া পড়ায় যথেষ্ট সুখানুভূতি জাগিতেছিল। মাঝের পাড়ার চড়কতলায় গাজনের ঢাক বাজিতেছিল, এবং সেই সঙ্গে সন্ন্যাসীদের 'শিব শিব মহাদেব' শব্দ ভাসিয়া আসিতেছিল। নীলুর কিন্তু এ সকলের দিকে লক্ষ্য ছিল না। সে ভাবিতে লাগিল, কি করিয়া এই হালখাতার দায় হইতে উদ্ধার পাইবে। হালখাতার বাকি শোধ না করিলে সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী; অভাব-অনটনের সংসার, সময়ে অসময়ে বাকি-বকেয়া না লইলে চলে না; কিন্তু হালখাতা না করিলে সে পথ একেবারেই মারা যাইবে। অথচ হাতে একটি পয়সা নাই। পরশ্ব পয়লা বৈশাখ—হালখাতা, মাঝে একটি দিন মাত্র সময়। ইহার উপর আবার খাজনার চাপ! নীলুর মাথা ঘুরিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে ধীরে ধীরে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। গঙ্গামণি আগাইয়া আসিয়া বলিল, 'আমি সবই শুনেছি কথাবার্ত্তা যা হ'ল। তোমার মুখের পানে চাওয়া যাচ্ছে না। তুমি হাতে মুখে জল দাও, আমি তামাক, সেজে আনছি। অত ভেবনা, যা হবার হবে।

'হবার মধ্যে হবে এই যে, এক দফা—চাল ডাল নুন তেল আর কিছুই মিলবে না, আর দুই দফা এই যে—তোমার হাত ধ'রে বাপ-দাদার এই ভিটেটুকু এইবার ছেড়ে চ'লে যেতে হবে।'

'আচ্ছা, তার ব্যবস্থা করা যাবে। চাল ডালও মিলবে ভিটেও ছাড়তে হবে না।'

স্ত্রীর কথা নীলু ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। সে সন্দিগ্ধভাবে গঙ্গামণির দিকে চাহিয়া বলিল, 'তুমি কি বলছ, মণি? এই দুঃসময়ে তোমার আবার মাথা খারাপ হ'ল না ত?'

'না, আমার মাথা ঠিকই আছে। মেয়েমানুষের মাথা অত তাড়াতাড়ি খারাপ হ'লে চলে না।'

'না—না, মণি, বল—তুমি কি ক'রে কিসের ব্যবস্থা করবে। সত্যি, আর ধোঁকায় রেখ না।

'তবে একটু দাঁড়াও, আমি আসছি' বলিয়া গঙ্গামণি ঘরের মধ্যে গেল, এবং অনতিবিলম্বে ফিরিয়া আসিয়া নীলুর হাতে ক্ষুদ্রাকৃতি একজোড়া বালা দিয়া বলিল, 'টুনুর বালাজোড়া বিক্রি ক'রে এই হালখাতার দায় সামলাও, আর জমিদারের খাজনা মিটাও।'

এক মুহূর্ত্ত অবাক হইয়া স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া নীলু বলিল, 'তুমি বল কি, মণি? টুনুর হাতের ঐ গয়নাটুকু বিক্রি ক'রে আমাকে এই সব করতে বল?'

'হাঁ বলি। নইলে আর কোন উপায় থাকলে আমি মা হ'য়ে ছেলের গায়ের এক কোঁটা গয়না ঘোচাতে দিতাম না। গেল বছর এই কালেই আমার মা টুনুর ভাতে এসে ঐ সোনাটুকু দিয়ে ছেলের মুখ দেখেছিলেন। ওতে কতটুকু সোনাই বা আছে! তবুও আমার কাছে ও যে কত দামী! কিন্তু কি করব নিরুপায়। তুমি আজই এ নিয়ে গিয়ে স্যাকরা দোকানে বিক্রি ক'রে যা পাও নিয়ে এস, নৈলে কাল সংক্রান্তি, ছেলের গায়ের সোনা কালকে বের ক'রে দেওয়া ভাল হবে না।'

নীলু এতক্ষণ বিস্মিত দৃষ্টিতে স্ত্রীর কথা শুনিতেছিল। এইবার সে তাহার মনের অবস্থা কতকটা বুঝিয়া লইল বটে, তবুও প্রতিবাদ করিয়া বলিল, 'না তুমি আমাকে টুনুর বালা বিক্রি করার কথা আর ব'ল না। আমার যা হবার হবে, কিন্তু ও আমি পারব না।'

'তোমাকে পারতেই হবে, নইলে এ ছাড়া অন্য উপায় নেই যে। আমি টুনুর মা, এর জন্য আমার যে কি ব্যথা বাজছে, তা তুমি কি বুঝবে। কিন্তু তবু, তারই জন্য এ আমাদের করতে হবে, নইলে ঘরে ক্ষুদকুঁড়া পর্য্যন্ত নেই, ওই দোকান ভরসা। জিনিষপত্র দেওয়া বন্ধ ক'রে দিলে নিজেরা উপোস পেড়ে থেকে ক'দিন তাকে বাঁচাবে বল? তারপর যে জমিদার, খাজনার জন্য যদি ঘাড় ধ'রে উঠিয়ে দেয়, তুমি গরীব, কি করবে তার। টুনুকে নিয়ে গাছতলায় দাঁড়িয়ে ক'দিন কাটাতে পারবে?'

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নীলু বলিল, 'তবে আর কি বলব। ভগবানের যত শাস্তি সবই কি গরীবের জন্য! বালা দাও, একেবারে কাজ শেষ ক'রে এসেই হাত মুখ ধোব।'

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতি ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অভিভাষণ

কুমিল্লায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের দ্বাবিংশ অধিবেশনে মূল সভাপতি ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অভিভাষণ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

এইবারকার বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনে সভাপতিনির্বাচন বিষয়ে আপনারা নূতন ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। বাঙ্গালী জাতির সাহিত্য-সম্পর্কীয় এই সর্বপ্রধান আলোচনা-সভায় এতাবৎ প্রতি বৎসর বাঙ্গলা দেশের প্রথিতযশাঃ সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, অথবা সাহিত্যের উদার ও রসজ্ঞ পৃষ্ঠপোষক, সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়া আসিয়াছেন। আপনারা এবার আমার মত ব্যক্তি, রস-সাহিত্যের দরবারে যাহার কোনও স্থান নাই, আধুনিক ভারতের পক্ষে অত্যাবশ্যক পদার্থ-বিদ্যা বা রসায়ন বা অন্য কোনও ফলিত বিজ্ঞানে যাহার প্রবেশ হয় নাই এবং এই বিজ্ঞানের আলোচনা যাহার ক্ষমতার বাহিরে, যে শিক্ষাজীবী মাত্র, তাহাকে যখন বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতি-পদের গৌরব দান করিয়াছেন, তখন কোন্ সাহসে আমি আপনাদের প্রদত্ত এই সম্মান-মাল্য শিরোধার্য করিয়া লইলাম, তদ্বিষয়ে কৈফিয়ৎ-রূপে অল্প-কিছু নিবেদন করিব। তৎপূর্বে মাতৃভাষার সাহিত্য-জগতের প্রতিভূ-স্বরূপ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের পরিচালকবর্গকে আমার বিনীত কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। দেশবাসী স্বজাতীয়গণের প্রদত্ত এই সম্মান, দুর্লভ এবং সকলেরই কাম্য বস্তু; কিন্তু এই সম্মান আমার প্রাপ্য বলিয়া আমি মনে করি না, এই সম্মান আপনাদের মাতৃভাষার প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও প্রীতিরই প্রতীক বলিয়া, মাতৃভাষার একজন ভক্ত ও শ্রদ্ধাশীল সেবক রূপে এবং বঙ্গভাষা-আলোচকদের অন্যতম রূপে, ইহাকে আমি গৌরব তথা দীনতাবোধের সহিত শিরোভূষণ করিয়া গ্রহণ করিতেছি।

উনবিংশ শতকের চতুর্থপাদে ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজ

ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী তাহার মাতৃভাষার সাহিত্য সম্বন্ধে সচেতন হইতে আরম্ভ করে, উনবিংশ শতকের চতুর্থ পাদ হইতে। ইহার পূর্বে, ছাপাখানার প্রসাদে, কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামের মহাভারত (উনবিংশ শতকের প্রথম দশক), ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল (দ্বিতীয় দশক), বৈষ্ণব-মহাজন-পদাবলী (তৃতীয় ও চতুর্থ দশক) প্রভৃতি বাঙ্গলা সাহিত্যের কতকগুলি শ্রেষ্ঠ বই, বাঙ্গালী জনসাধারণের পাঠের জন্য বহুল প্রচারিত হইতে থাকে; কলিকাতার বটতলার ছাপাখানাগুলি হইতে লোকপ্রিয় সাহিত্য হিসাবে রামায়ণ, মহাভারত, কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের মনসার ভাসান, রামেশ্বরের শিবায়ন, মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য প্রভৃতি গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়া, প্রাচীনপন্থী
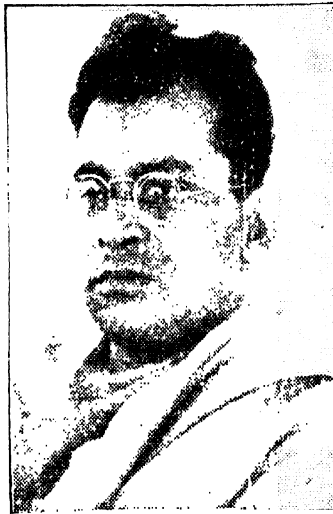
বাঙ্গালীদের সাহিত্য-ক্ষুধা মিটাইতে থাকে। ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী কিন্তু তখন ইংরেজী সাহিত্যের তীব্র মদিরা আকণ্ঠ পান করিয়াও তৃপ্ত হইতেছে না; তাহার মাতৃভাষার সাহিত্য তাহর গ্রামীণ জীবনের সহিত জড়িত বলিয়া, বহির্জগৎ সম্বন্ধে কৌতূহলী তাহার মনকে কিছু কাল ধরিয়া তৎপ্রতি বিরূপই করিয়া রাখিয়াছিল। ভাষায়, মনে, প্রাণে সে ইংরেজ বনিবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেছিল। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধে ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী বুঝিতে পারিল, ভাষায় তাহাকে বাঙ্গালীই থাকিতে হইবে, এবং তাহার মাতৃভাষাতেই তাহাকে ইংরেজী সাহিত্যের দরে আধুনিক উচ্চকোটির সাহিত্য গড়িয়া তুলিতে হইবে। রঙ্গলাল, মধুসূদন, বঙ্কিম প্রমুখ লেখকগণ এই আদর্শকে কার্যকর করিয়া তুলিলেন। ইতিমধ্যে দুইটি জিনিস ইউরোপ হইতে আসিয়া, ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালীকে তাহার মাতৃভাষায় নিবদ্ধ সাহিত্যের দিকে আকৃষ্ট করিল; একটী হইতেছে—ইউরোপীয় সাহিত্যের এবং ইউরোপীয় মানসিক সংস্কৃতির Humanism অর্থাৎ মানবিকতা বা মানবধর্মিতা, যে জিনিস দেশ-কাল-জাতি-নির্বিশেষে সমগ্র মানব-সমাজের সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার সহিত সহানুভূতি-সম্পন্ন, তাহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসার ভাব পোষণ করে, তাহা অনুশীলন করিয়া তাহা হইতে রস-গ্রহণে সচেষ্ট হয়; অপরটী হইতেছে—স্যার উইলিয়ম জোন্সের সময় হইতে ইউরোপের প্রাচ্য-বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতদের আলোচনার ফলে, ভারতের সংস্কৃতির প্রতি ইউরোপের মনে শ্রদ্ধার উন্মেষ, ও ভারতবর্ষে ইংরেজী-শিক্ষিত ভারতীয়দের মনে এই শ্রদ্ধা-ভাবের প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ, স্বদেশীয় সভ্যতা সম্বন্ধে গৌরব-বোধ, স্বদেশীয় সভ্যতার অঙ্গ সাহিত্য ইতিহাস প্রভৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধানের স্পৃহা। ১৮৭০ সাল পর্যন্ত, ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী, সাহিত্য-জগতে নূতন সৃষ্টির খেলায় মাতিয়াছে; পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে তাহার মনে তেমন কোনও দরদ, কোনও মোহ আসে নাই। সিভিলিয়ান জন্ বীম্‌স্ 'ইণ্ডিয়ান আণ্টিক্বোয়ারি' পত্রিকায় ১৮৭২ সালে বাঙ্গালা দেশের প্রাচীন কবি রূপে পরিচিত বিদ্যাপতির ভাষায় আলোচনা করিলেন, ১৮৭৮ সালে তাঁহার নবীন ভারতীয় আর্য ভাষাগুলির তুলনা-মূলক ব্যাকরণের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করিলেন; সিভিলিয়ান জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন্ ১৮৭৯ সালে উত্তর-বাঙ্গালায় সংগৃহীত 'মাণিকচন্দ্র রাজার গান' প্রকাশিত করিলেন। উনিশের শতকের সাতের দশকে দেশভাষার প্রতি ইউরোপীয় পণ্ডিতদের অনুসন্ধানাত্মক কৌতূহলের সঙ্গে সঙ্গে, দেশের শিক্ষিত লোকেদের মনেও একটা সাড়া পড়িয়া গেল—নিজেদের ভাষা ও সাহিত্যকে, বিশেষ করিয়া সাহিত্যকে, ভাল করিয়া জানিবার জন্য বুঝিবার জন্য তাগিদ আসিল। ১৮৭৩ সালে পণ্ডিত রামগতি

ন্যায়রত্ন 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য-বিষয়ক' প্রস্তাব প্রকাশিত করিলেন;' ১৮৭৭ সালে সিভিলিয়ান রমেশচন্দ্র দত্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস লিখিলেন, ইংরেজী ভাষায়। পরের দশকে, ওদিকে গ্রিয়ার্সন্ সাহেব মৈথিলীর আলোচনায় ব্যাপৃত হইলেন, রুডল্ফ্ হ্যোর্ন্‌লে সাহেব উত্তর ভারতের আর্য ভাষাগুলির নূতন একখানি ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ব্যাকরণ লিখিলেন, এবং মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর সংস্কৃত হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের আর্য ভাষার ইতিহাস প্রকাশিত করিলেন—আর এদিকে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সারদাচরণ মিত্র, অক্ষয়কুমার সরকার ও জগদ্বন্ধু ভদ্র এবং নয়ের দশকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রমণীমোহন মল্লিক, শিশিরকুমার ঘোষ, দীনেশচন্দ্র সেন, কীটদষ্ট পুঁথি ঘাঁটিয়া, বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাচীন বইয়ের নষ্টকোষ্ঠি উদ্ধার করিয়া, বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজের পাঠের জন্য প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তৎসম্বন্ধে আলোচনা এবং গবেষণাও আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই ভাবে আধুনিক কালে নূতন করিয়া ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী তাহার জাতীয় সাহিত্যের সহিত পরিচয়-সাধনে উন্মুখ হইল।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম যুগ

ঊনবিংশ শতকের শেষ পাদ এবং মোটামুটি বিংশ শতকের প্রথম পাদ—এই শতকার্ধ বা পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া যে দুই পুরুষ অতিবাহিত হইল, সে দুইটীকে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা-বিষয়ে, মুখ্যতঃ সেই সাহিত্যের সহিত একটা সাধারণ পরিচয়-সাধনের কাল বলা যাইতে পারে। তখন বাঙ্গালা সাহিত্য—বিশেষ করিয়া ইংরেজ রাজত্বের পূর্ব যুগের সাহিত্য—সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ছিল অল্প; বঙ্গের ভাণ্ডারে কি কি বিবিধ রত্ন আছে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য আমরা তখন চেষ্টিত হইলাম; তখন আমাদের যাহা কিছু আছে, তাহা কোনও রকমে বাহির করিয়া, সাজাইয়া ফেলিতে আমরা আগ্রহান্বিত হইলাম—যাহা পাইলাম, তাহা যাচাই করিয়া দেখিবার—তাহাতে কতটা মাটি আর কতটা মণি, কতটা সাঁচ্চা আর কতটা ঝুটা, তাহার খুঁটিনাটির খোঁজ লইবার মত আমাদের সময়ও ছিল না, জ্ঞানও ছিল না। সেটা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম যুগ; বাঙ্গালা সাহিত্যের পুঁথি খুঁজিয়া রক্ষা করা, শীঘ্র শীঘ্র ছাপাইয়া ফেলা—যাহাতে পিতৃপুরুষদের সাহিত্য-চেষ্টা লোপ হইতে বাঁচিয়া যায়, যাহাতে আমাদের পিতৃপুরুষ হইতে লব্ধ সাহিত্যিক রিক্থকে আমরা সমাজে দশের সমক্ষে প্রদর্শন-যোগ্য রূপে ধরিয়া দিতে পারি। এই ভাবে আমরা অনেকটা নির্বিচারে যাহা পাইয়াছি, তাহা প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছি; প্রাচীন পুঁথি দুই পাঁচ খানি মুদ্রিত করিয়া প্রকাশের দ্বারা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছি।

কিন্তু এই পঞ্চাশ বৎসরের সাহিত্য-সংগ্রহের এবং প্রকাশের ফলে, এবং আনুষঙ্গিক-ভাবে তাহার কথঞ্চিৎ আলোচনার ফলে, আমাদের হাতে যে-সকল মাল-মসলা জমিয়া গিয়াছে, যে-সকল সমস্যা আমাদের সমক্ষে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, সেই মাল-মসলার মূল্য-নির্ধারণের এবং সেই সকল সমস্যার সমাধানের সময় এখন আসিয়া গিয়াছে। আমাদের যাহা আছে, বা যাহা পাওয়া গিয়াছে, মোটামুটি তাহার তালিকা হইয়াছে; এখন এই তালিকা-নির্দিষ্ট, আমাদের সমক্ষে প্রসারিত সাহিত্য-নিদর্শনগুলিকে লইয়া, বাঙ্গালা ভাষার সাহিত্যিক ইতিহাসের, বাঙ্গালী জাতির সাহিত্যিক সংস্কৃতির যথার্থ পরিচয় লাভের আবশ্যকতা আমরা উপলব্ধি করিতেছি। ১৮৫০ সালের পরের আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য তাহার নানা বৈচিত্র্য লইয়া আমাদের সমক্ষে প্রবহমান; মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে, নানা উপায়ে সংরক্ষিত উপাদানের বাহুল্যে, আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস প্রণয়ন করা তত কঠিন ব্যাপার হইবে না। কিন্তু এখন শিক্ষিত বাঙ্গালী তাহার পুরাতন সাহিত্যের স্বরূপ বুঝিতে চায়, তাহার প্রাগ্-ইউরোপীয় যুগের ভাব-ধারার এবং ভাবনিবন্ধক বা ভাবপ্রকাশক লেখকদের পূর্ণ পরিচয় চায়।

এই আলোচনা যে বস্তুনিষ্ঠ নির্বাচিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির অপেক্ষা রাখে, তাহা আমরা সকলেই অল্পবিস্তর স্বীকার করিতেছি। ইতিমধ্যে বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাসের আলোচনা, বৈজ্ঞানিক (অর্থাৎ কার্যকারণাত্মক পারম্পর্যানুসারী যুক্তিতর্কের) ক্ষেত্রে উন্নীত হইয়াছে। বাঙ্গালার পুরাতন সাহিত্যের ঐতিহাসিক আলোচনায়, বিজ্ঞানানুমোদিত ভাষাতত্ত্বের দাবীকে কেবল রসাস্বাদনের অজুহাতে আর ঠেকাইয়া রাখিতে পারা যায় না। সার্থক সাহিত্যের আত্ম-স্বরূপ ইহার অন্তর্নিহিত রস-বস্তু দেশকালাতিগ; যুগে যুগে নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তাহা মানুষের চিত্তকে সরস করিবে, আনন্দযুক্ত করিবে। কিন্তু সাহিত্যের বহিরঙ্গ, দেশ-কাল-পাত্রাদি ধর্মের সহিত জড়িত; সেখানে ভাবুকের রাগরঞ্জিত স্নেহসিক্ত দৃষ্টি অপেক্ষা, বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিকের শুষ্ক শুভ্র আলোকপাতের উপযোগিতা অনেক বেশী।

বাক্‌কে আশ্রয় করিয়া বাঙ্ময় বা সাহিত্য; বাক্-এর জ্ঞান না হইলে বাঙ্ময়ের উপলব্ধি হওয়া সম্ভবপর নহে। ধীরে ধীরে এই বোধ আমাদের মাতৃভাষায় বাঙ্ময়ের সেবকদিগের মনে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। সেই জন্যই বোধ হয়, বাগ্‌দেবীর ধ্বনিময় ও লিপিময় রূপের ক্রম-বিকাশের ইতিহাসের দিগ্‌দর্শনে নিযুক্ত আমার মত অসাহিত্যিককে, এই নিখিল বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনে আপনারা আহ্বান করিয়াছেন। যে-সকল স্থপতি বঙ্গবাণীর দেউল গড়িয়া তুলিয়াছেন, যে-সকল শিল্পী ভাস্কর্যে চিত্রে অলঙ্করণে এই দেউলকে মহিমময় করিয়া তুলিয়াছেন, আমার মত ভাষাতাত্ত্বিকের স্থান তাঁহাদের বহু নিম্নে—ভাষাতাত্ত্বিক ভাষার মাটিকাটা মজুর মাত্র। তথাপি, আমাদের আলোচিত শাস্ত্র আমাদের সাহিত্যের সত্য স্বরূপটি বুঝাইবার পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক—কেবল আবশ্যক নহে, পরিহার্য; অনশীলন-ও ভূয়োদর্শন-জাত এই বিশ্বাসে, নীরস ভাষাতাত্ত্বিক হইয়াও, আমি আপনাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে সাহসী হইয়াছি।

বাঙ্গালা ভাষায় সাহিত্যের পত্তন

বিষয়টী একটু আলোচনা-সাপেক্ষ। যুগে যুগে ভাষা যখন মৌখিক ও সাহিত্যিক রূপের মধ্য দিয়া এক পুরুষ হইতে অন্য পুরুষে বাহিত হয়, তখন তাহাতে পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। এই পরিবর্তনের ধারাটী খুঁজিয়া বাহির করিলে, ভাষার ইতিহাস বা ইতিবৃত্ত পাওয়া গেল। বাঙ্গালা দেশ বিদেশী তুর্কীদের দ্বারায় বিজিত হইবার কিছু পূর্বে, খ্রীষ্টীয় ১২০০ সনের পূর্বে, বাঙ্গালা ভাষা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, বাঙ্গালা ভাষায় সাহিত্যের পত্তন হইয়াছে। এই সাহিত্যের অতি অল্প নিদর্শন—৪৭টী বৌদ্ধ চর্যাপদ—নেপাল হইতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় উদ্ধার করিয়া আনিয়া দিয়া বাঙ্গালী জাতিকে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই চর্যাপদ কয়টী অত্যন্ত বিকৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে; এগুলির সংস্কৃত টীকা আছে, কিন্তু সেই টীকা যখন রচিত হয়, তখন মূলের পাঠ ঠিক ছিল না। চর্যাপদ কয়টীর মূল পাঠের

নির্ণয় ও নির্ধারণ এবং ক্বচিৎ পুনর্গঠন করা, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম যুগের ইতিহাসের সম্পর্কে এক অতি আবশ্যক কার্য। সুখের বিষয়, এই কাজে চর্যাপদের প্রাচীন তিব্বতী অনুবাদ খুঁজিয়া বাহির করিয়া শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ছাপাইয়া দিয়াছেন। চর্যাপদের ভাষার প্রকৃত স্বরূপ কি, তৎসম্বন্ধে বাঙ্গালা দেশে ও বাঙ্গালার বাহিরে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়াছে। কেহ বলিয়াছেন, চর্যাপদের ভাষা বাঙ্গালা নহে, একটা মিশ্র বা খিচুড়ী ভাষা, তাহাতে বিভিন্ন ভাষার শব্দ ও বিভক্তি প্রত্যয়াদি সন্নিবেশিত হইয়াছে; কাহারও মতে, উহা প্রাচীন বাঙ্গালা নহে, প্রাচীন বিহারী, বা প্রাচীন উড়িয়া। এই মতভেদের নিরসনের জন্য ভাষাতত্ত্ব আমাদের একমাত্র সাধন। চর্যাপদের ভাষা যে প্রাচীন বাঙ্গালা, ইহা মিশ্রভাষা বা প্রাচীন বিহারী বা অন্য কিছু নহে, সেকথা বৈজ্ঞানিক অর্থাৎ যুক্তিতর্কানুমোদিত ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে জোর করিয়া বলা যায়। চর্যাপদের প্রাচীন বাঙ্গালার প্রকৃতি-নির্ণয়-ও কঠিন ব্যাপার নহে—এই ভাষার উপরে তখনকার যুগের হিন্দী যাহাকে বলা যায় সেই পশ্চিমা-অপভ্রংশের প্রভাব কেমন ভাবে পড়িয়াছিল, তাহা ধরিতে দেরী হয় না।

মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্য

তারপরে, মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে, প্রায় সবই সমস্যাময়। তুর্কী বিজয়, ও তুর্কী সুলতানদের যুগ; পাঠান সুলতানদের যুগ; মোগল যুগ; নবাবী আমল:—১২০০ হইতে ১৮০০ পর্যন্ত ছয় শত বৎসর ধরিয়া, বাঙ্গালী কবিরা কাব্য রচনা করিয়াছেন, গান বাঁধিয়াছেন, দেবতার লীলা বর্ণনা করিয়া বড় বড় কাব্যে দেবতাদের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন, দেবতার লীলাকে প্রতীক করিয়া গীতি-কবিতায় ও গানে মানুষের মনের আশা আকাঙ্ক্ষা প্রেম-ভালবাসা শ্রদ্ধা-ভক্তির উৎস খুলিয়া দিয়াছেন; এবং চৈতন্যদেবের ব্যক্তিত্ব দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া, পুণ্য-চরিত মানবেরচরিত্রচিত্রণ রূপ নূতন ধারা উত্তর-ভারতের সাহিত্যে প্রবর্তিত করিয়াছেন। এই সকল কবি আমাদের নমস্য। ইঁহাদেরই প্রসাদে বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব বাঙ্ময় মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু আমরা কখনও কবিদের সম্বন্ধে কোনও ঔৎসুক্য দেখাই নাই। আমাদের মন ঐতিহাসিক তথ্য অপেক্ষা রস-বস্তুর প্রতি বেশী আকৃষ্ট থাকায়, বৈষ্ণব-রচিত-সাহিত্যের বাহিরে, তথ্য-সংরক্ষণের প্রায় কোনও ব্যবস্থা আমরা করি নাই। বরঞ্চ, কবিদের আহৃত রস-বস্তুর আস্বাদনে তৃপ্ত হইয়া, সেই রস-বস্তুরই পূর্ণতর পরিস্ফুটনে আমাদের সাহিত্য-চেষ্টা নিয়োজিত করিয়াছি। ইহার ফলে এই ঘটিয়াছে যে, প্রায়ই কবিদের পরিচয় তাঁহাদের সাহিত্যিক জীবনের কথা, যেটুকু দয়া করিয়া তাঁহারা আমাদের জানাইয়া গিয়াছেন, সেইটুকুর বাহিরে আমাদের অজ্ঞাত; এবং তাঁহারা যাহা রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহাও সর্বত্র আমাদের যুগ পর্যন্ত যথাযথ রূপে পঁহুছায় নাই। তখনকার দিনে, নিজ নামের অপেক্ষা, নিজ রচনার প্রতি লোকের মমতা বেশি হইত; সেই হেতু অনেক কবি নূতন রচনা পূর্বের বড় কবির নামে জুড়িয়া দিয়া, তাঁহার পুঁথিতে বসাইয়া দিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন। লিপিকর-প্রমাদ লেখকের অনবধানতা, ভাষা প্রাচীন হইয়া গেলে বহু শব্দ দুর্বোধ্য হইয়া পড়ায় সেগুলির স্থানে নূতন শব্দ ব্যবহার, প্রভৃতি নানা কারণে, মূল রচনা একেবারে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। অল্প কতকগুলি কবির রচনা ছাড়া, পুরাতন যুগের বাঙ্গলা সাহিত্যের কোনও কবি সম্বন্ধে আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি না যে আমাদের কাছে তাঁহার রস-সৃষ্টি ঠিক তাঁহারই কথায় পঁহুছিয়াছে। আমরা আবার তথ্যের অভাবে গাল-গল্পকে ইতিহাসের মূল্য দিয়া, বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে এই কবিদের মধ্যে কাহারও কাহারও সম্বন্ধে কতকগুলি কল্পনোজ্জ্বল কাহিনীকে খাড়া করিয়া, তদ্দ্বারা ইতিহাসের অভাব পূরণ করিয়াছি। একই নামের একাধিক কবির রচনা মিলিয়া গিয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে একাধিক কবি একই ব্যক্তিতে সম্মিলিত হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা আমরা ভুলিয়াই গিয়াছি। বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত পদ এবং মুখ্যতঃ সহজিয়াদের রচিত কতকগুলি পদের আধারে, আমরা এক চণ্ডীদাস কবিকে গড়িয়া তুলিয়াছি, তাঁহাতে ব্যক্তিত্ব আরোপ করিয়াছি, এবং এই চণ্ডীদাসকে বাঙ্গলা সাহিত্য-মন্দিরে এক দেবতা রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছি। ভাবের ঠাকুর চণ্ডীদাসকে লইয়া তাঁহার নামের সহিত জড়িত পদ আস্বাদন করিয়া যাঁহারা রসানুভূতি লাভ করেন, তাঁহারা করুন,—কাহারও তাহাতে আপত্তি হইতে পারে না, এবং হয় তো বহুজনের পক্ষে তাহা কাম্য হইতে পারে। কিন্তু আমরা বাঙ্গলা সাহিত্যের নাড়ী-নক্ষত্রের কথা জানিতে চাহিতেছি; চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত পদ-সমূহের মধ্যে এবং অন্য গ্রন্থ মধ্যে তথ্য কি আছে, তাহা আমাদের জ্ঞাতব্য বিষয় হইয়াছে। ভাব-সাধনার কালে চণ্ডীদাস এক কি বহু, সে তথ্যে কিছু আসে যায় না। কিন্তু সাহিত্যালোচনার কালে, চণ্ডীদাস কাব্যের বাহ্য রূপ, তাহার অন্তর্নিহিত বিষয়-বস্তু, তাহার ভাবাবলীর বিকাশ, ইত্যাদি আলোচনার কালে, এক অথবা একাধিক চণ্ডীদাস, একাধিক চণ্ডীদাস হইলে বিভিন্ন চণ্ডীদাসের জীবৎকাল, সম্ভব হইলে তাঁহাদের সময়ের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ও তাঁহাদের সাহিত্য-জীবনের প্রেরণা, এই সকল বিষয়ে তথ্য-নির্ধারণ সাহিত্যালোচকের প্রধান কর্তব্য হইয়া উঠে। তখন ব্যাপকভাবে ভাষাতত্ত্ব-বিদ্যা সাহিত্যালোচকের অন্যতম প্রধান এবং অপরিহার্য্য সাধনরূপে প্রতিভাত হয়।

বাঙ্গালী আজকাল তাহার পূর্ব-কথা জানিতে উৎসুক হইয়াছে—সাধারণ শিক্ষিত বাঙ্গালীর মন এ বিষয়ে যে অনেকটা সংস্কারমুক্ত, ইহা তাহার মানসিক সংস্কৃতির পক্ষে গৌরবের কথা। তাহার জাতির উৎপত্তি, ভাষার উৎপত্তি, সাহিত্যের উৎপত্তি, ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ—এসব বিষয়ে অনাবিল সত্য যাহা, তাহা উদ্ঘাটন করিবার মত সাহস ও সাধুতা তাহার হইয়াছে। আমার মনে হয়, এই শুভ অবসরে, আমাদের আত্মজ্ঞান সত্যের আধারের উপরে, যুক্তি-তর্কের ভিত্তির উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, বৈজ্ঞানিকের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বাঙ্গালীর প্রাচীন সংস্কৃতি ও সাহিত্যের আলোচনা, নূতন করিয়া আরম্ভ করা উচিত। এই কার্যে বিজ্ঞান-সম্মত ভাষাতত্ত্ব যতটুকু পারিয়াছে করিয়াছে, এবং আরও সহায়তা করিবার জন্য সদা প্রস্তুত রহিয়াছে।

ভারতীয় আর্য ভাষাসমূহের মধ্যে বাঙ্গালীর স্থান

একথা সকলেই স্বীকার করিবেন উপস্থিতকালে শিক্ষিত বাঙ্গালী সব চেয়ে বেশী গৌরব অনুভব করে তাহার ভাষা ও সাহিত্য লইয়া। চল্লিশ বৎসর পূর্বে এ বিষয়ে আমরা ততটা সচেতন ছিলাম না—যদিও বাঙ্গালী সাহিত্যিক-মণ্ডলীর মধ্যে বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে একটা সহজ প্রীতির অভাব ছিল না। ঊনবিংশ শতকে যে-সকল বাঙ্গালা লেখক বাঙ্গালা ভাষার শক্তি সম্বন্ধে উচ্চ ভাব পোষণ করিতেন, আমার মনে হয় বাঙ্গালা ভাষার অন্তর্গত সংস্কৃত শব্দ-সম্ভারই তাঁহাদের মনে এই ভাব দৃঢ় করিতে সাহায্য করিয়াছিল। আধুনিক ভার-

ভীয় আর্য ভাষাগুলির মধ্যে বাঙ্গালার স্থান অতি উচ্চে,—কারণ বাঙ্গালা সংস্কৃত-বহুল ভাষা, সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য, প্রাকৃত বাঙ্গালা ভাষার সংস্কৃত ভাষার সৌন্দর্য ও শক্তি আনয়ন করিয়া দিয়াছিল। নিজ সাহিত্য লইয়া ঘরে বাহিরে গর্ব করিবার সময় তখনও আসে নাই--নিজ পৃথক অস্তিত্বের আশ্রয়-স্বরূপ প্রাণপণ যত্নে মাতৃভাষাকে আঁকড়াইয়া ধরিবার কারণ তখনও ঘটে নাই। কিন্তু পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে, বঙ্গ-ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে বুঝি তাহার ভাষাকেও দ্বিখণ্ডিত করিবার চেষ্টা যখন তাহার সামনে দেখা দিল, তখন সমগ্র ও অখণ্ড বঙ্গদেশের মধ্যে অচ্ছেদ্য যোগসূত্ররূপে তাহার মাতৃভাষা বাঙ্গালীর নিকট আত্মপ্রকাশ করিল। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে, রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলাল সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিগণ কতক-গুলি অতি-জনপ্রিয় গীতি-কবিতায় বাঙ্গালা ভাষার প্রশস্তি গাহিয়া গিয়াছেন। "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিম, মধুসূদন, হেম, নবীন প্রভৃতির সাহিত্য-সাধনার মূল্য বাঙ্গালী বুঝিতে পারিল--এক কথায়, বঙ্গ-ভঙ্গ-আন্দোলনে বাঙ্গালী নিজেকে আবিষ্কার করিল, তাহার রাষ্ট্রনৈতিক আকাঙ্ক্ষাকে প্রত্যক্ষ করিল, তাহার ভাষা ও সাহিত্যকে ঘরে ও বাহিরে উভয়ত্র সংহতির এক প্রচণ্ড শক্তির আকর বলিয়া সে দেখিতে পাইল। ১৯১৩ সালে, বঙ্গ-ভঙ্গের আট বৎসর পরে, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের দরবারে তাঁহার বাঙ্গালা কবিতার জন্যই যশের মুকুট পরিয়া আসিলেন, তাঁহার নোবেল্-পারিতোষিক-প্রাপ্তি দ্বারা এক দিকে যেমন বঙ্গ-ভারতীর ও সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় বাঙ্ময়ের মুখ উজ্জ্বল হইল, অন্য দিকে তেমনি বাঙ্গালীর ভাষা ও সাহিত্য লইয়া গর্বের ভিত্তি যেন আরও সুদৃঢ়ীকৃত হইল। ঊনবিংশ শতকে ইংরেজের অনুগামী বাঙ্গালী, ইংরেজী শিক্ষায় ভারতের গুরু-স্থানীয় ছিল; বিংশ শতকের প্রারম্ভে, স্বদেশী আন্দোলনের যুগে এবং তাহার পরে, বাঙ্গালী রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ে এবং স্বাধীনতার সংগ্রামে নিখিল ভারতের অবিসংবাদিত নেতা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বিংশ শতকের সেই স্বল্পকাল-স্থায়ী গৌরব এখন প্রায় অস্তমিত। অবস্থা-গতিকে, এবং তাহার নিজের বিষয়-বুদ্ধির ও সংহতি-শক্তির অভাবে, বাঙ্গালীকে সব বিষয়ে হটিয়া আসিতে হইতেছে। ইংরেজী শিক্ষায় তাহার একাধিপত্য আর নাই; রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারেও সে পশ্চাতে পড়িয়া যাইতেছে; ভারতের প্রদেশান্তরের জনগণের চাপে, নিজ বাস-ভূমেও পরবাসী হইতে সে বাধ্য হইতেছে; তাহার নিজ প্রদেশে হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা বীভৎসতার চরমে উঠিয়া, সভ্য-জনোচিত জীবনযাত্রাকেও তাহার পক্ষে অসম্ভব করিয়া তুলিতেছে। ঘরে অন্ন নাই, সম্প্রীতি নাই; বাহিরে পূর্ব প্রতিষ্ঠা নাই; ঘরে বাহিরে অভাব, অপমান; এই পরাভবের ও নৈরাশ্যের আবেষ্টনীর মধ্যে একটি প্রধান আশ্রয় সে পাইয়াছে--তাহার ভাষা ও সাহিত্য।

মানব-সমাজের প্রধান বন্ধন ভাষা

মাতৃভাষা এবং তাহার সাহিত্য, যে কোনও জাতির পক্ষে একটা মস্ত বড় অবলম্বন। প্রাচীন যুগ হইতে ভাষা মানব-সমাজের প্রধান বন্ধন হইয়া আছে। প্রাচীন কালে nationalism বা জাতীয়তা, সামাজিক জীবনে বড় স্থান পায় নাই; কিন্তু ভাষাকে অবলম্বন করিয়া, সম-ভাষী জনগণ ঐক্যের একটা সূত্র পাইত। যাহার ভাষা বুঝি, সে আমার সমান জাতির, আমার মত 'মানুষ' তাহাকে বলিতে পারি, আমার মত 'শ্রেষ্ঠ' জাতির লোক সে; যাহার ভাষা বুঝি না, সে 'বোবা', সে 'বর্বর', সে 'ম্লেচ্ছ' বা সংকর জাতির লোক, সে 'অনার্য', অন্য জাতীয়। প্রাচীন কাল হইতে বহু জাতির মধ্যে সম-ভাষী এবং অন্য-ভাষী জনসমূহকে এইভাবে পরস্পর পৃথক্ ও বিচ্ছিন্ন করিয়া আসা হইয়াছে। কখনও কখনও কোনও বিরাট্ রাষ্ট্রীয় বা ধার্মিক আদর্শ ভাষার পার্থক্যকে অতিক্রম করিয়া, বিভিন্ন-ভাষা-ভাষী মানব-সমাজকে একত্র গ্রথিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল; যেমন রোম-সাম্রাজ্যে ঘটিয়াছিল; যেমন প্রাচীন ভারতে হিন্দু বা ব্রাহ্মণ্য আদর্শ, আর্য ও দ্রাবিড়ভাষী হিন্দুদের এক সংস্কৃতির সূত্রে ও ক্বচিৎ এক রাজ্যের সূত্রে সম্মিলিত করিয়াছিল; যেমন ইসলামের আদর্শ এক ইসলামীয় ভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল, 'আরব' ও 'আজম' অর্থাৎ আরব ও অন-আরবকে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া এক ধর্ম-রাজ্য-পাশে বাঁধিয়া দিয়াছিল, যেমন রোমান কাথলিক খৃষ্টান ধর্মের আদর্শ এককালে ফরাসী জরমান ও ইটালীয়দের এক রাষ্ট্রান্তর্ভুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু ভাষা-গত জাতীয়তা বরাবরই কেন্দ্রাপসারিতার দিকে কার্য করিয়াছে। ধর্ম বা রাষ্ট্রনীতির নামে যেখানে যেখানে কেন্দ্রীকরণ বা কেন্দ্রাভিমুখী-করণের আদর্শ আসিয়া বিভিন্ন-ভাষা-ভাষী নানা জনগণকে মিলাইয়া এক করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে, ভাষা-গত জাতীয়তা সেইখানেই আসিয়া শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক, এই আদর্শকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে।

রাষ্ট্রীয় জীবনে ভাষাগত জাতীয়তা বোধ

আধুনিক জগতে Linguistic Nationalism অর্থাৎ ভাষা-গত জাতীয়তা-বোধ, রাষ্ট্রীয় জীবনে একটা প্রবল মনোভাব। অবস্থাগতিকে এই মনোভাব প্রচণ্ড শক্তির সঙ্গে কার্য করিয়া, সম-ভাষীদের মধ্যে ঐক্য এবং বিষম-ভাষীদের বিপক্ষে বা বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা ও প্রতিস্পর্ধিতা আনয়ন করিয়া থাকে। আমাদের ভারতবর্ষে প্রাচীন কালে ভাষা-গত জাতীয়তা-বোধের বিশেষ অবকাশ ছিল না। আর্য এবং অনার্য, এই দুই মুখ্য ভাষা স্বীকৃত হইত; আর্য ভাষা-গুলির মধ্যে, কথ্য ভাষা প্রাকৃত কখনও কখনও রাজভাষারূপে দ্রাবিড় ও অন্য অনার্য দেশে প্রচলিত হইলেও (যেমন মহারাজ অশোকের আমলে, দাক্ষিণাত্যে ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজাদের আমলে, এবং প্রাচীন অন্ধ্র রাজাদের আমলে হইয়াছিল), আর্যভাষা সংস্কৃত, বেদ উপনিষদ্ ব্রাহ্মণ সূত্রগ্রন্থ রামায়ণ, মহাভারত পুরাণের কল্যাণে, সর্বজন-সম্মানিত দেবভাষার স্থান পাইয়াছিল, অনার্য দ্রাবিড় ও কোল-ভাষীরা ব্রাহ্মণ্যের আদর্শ গ্রহণ করিয়া দেবভাষা সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষারূপে মানিয়া লইয়াছিল; জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে প্রাকৃতকেও মানিতে তাহাদের বাধা ছিল না। দক্ষিণ-ভারতে সুসভ্য দ্রাবিড়জাতীয় জনগণের মধ্যে 'আর্য' ও 'তমিল' এই দুই পরস্পর-বিরোধী জনসংঘের বা জাতির ধারণা, খৃষ্টীয় প্রথম সহস্রকের মধ্যভাগেই দাঁড়াইয়া গিয়াছিল; প্রাচীন তামিল সাহিত্যে ইহার কিছু পরিচয় আছে। উত্তর-ভারতে বহুকাল ধরিয়া কথিত প্রাকৃত-গুলির মধ্যে তাদৃশ পার্থক্য না থাকায় এবং সর্বত্রই সংস্কৃত ভাষার অবিসংবাদিত প্রভাব স্বীকৃত হওয়ায়, ভাষাশ্রয়ী জাতীয়তা-বোধ হিন্দু যুগে দেখা দেয় নাই— যদিও কাশ্মীর, মদ্রদেশ বা উত্তর-পাঞ্জাব, সিন্ধুসৌবীর, লাট বা গুজরাট, বিদর্ভ, মালব, শূরসেন বা মথুরা, কান্যকুব্জ, চেদিরাজ্য, কাশী, কোশল, মিথিলা, মগধ, রাঢ়া, বরেন্দ্রী, বঙ্গ, কামরূপ, ওড্রদেশ প্রভৃতি প্রদেশের বৈশিষ্ট্য, অল্পাধিক পরিমাণে ফুটিয়া উঠিতেছিল, এবং তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি লোকেদের কাছে এই সব বৈশিষ্ট্য ধরা দিতেছিল। খৃষ্টীয় ১০০০-এর দিকে বিভিন্ন প্রদেশের প্রাকৃত ও অপভ্রংশ হইতে আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষা-গুলি নিজ নিজ বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করিয়া বসিল; খৃষ্টীয় প্রথম সহস্রকের শেষ দুই

তিন শতকে, মগধ ও গৌড়ে পাল বংশের অভ্যুদয়ের পরে, গৌড়-বঙ্গের ভাষা, মাগধী অপভ্রংশ বা গৌড়ী অপভ্রংশ অবস্থা হইতে আর এক ধাপ আগাইয়া যে নবীন রূপ ধারণ করিল, তাহাকেই 'প্রাচীন বাঙ্গালা' বলিতে হয়। এই প্রাচীন বাঙ্গালার যে সাহিত্যের ভগ্নাবশেষ আমাদের হস্তগত হইয়াছে, বৌদ্ধ চর্যাপদের ৪৭টি গান, সেগুলি আনুমানিক ৯০০-১২০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। অন্য নিদর্শনের অভাবে, এই চর্যাপদগুলিকে বাঙ্গালা দেশের লোকের নিজ মাতৃভাষায় রচনা করিবার প্রথম প্রয়াসের ফল বলিতে হয়। চর্যাপদের পূর্বে বাঙ্গালার অধিবাসীরা দেশ-ভাষায়—বাঙ্গালা ভাষার পূর্ব-রূপ অপভ্রংশে ও প্রাকৃতে—কোনও সাহিত্য রচনা করিয়াছিল কিনা, আমাদের জানা নাই। বাঙ্গালার পণ্ডিতেরা অবশ্য সংস্কৃতে রচনা করিতেন; বাঙ্গালী পণ্ডিতের হাতে সংস্কৃতে একটি শক্তিশালী রচনা-নীতি গড়িয়া উঠিয়াছিল, যাহার নাম দেওয়া হইয়াছিল 'গৌড়ী রীতি'; হয় তো প্রাকৃতেও অল্প-শিক্ষিত বা অশিক্ষিত জন, গান ও গাথা রচনা করিতেন—কিন্তু তাহা রক্ষিত হয় নাই। আধুনিক আর্য-ভাষা প্রাচীন বাঙ্গালা, প্রাচীন গুজরাটি, প্রাচীন মারাঠী, প্রাচীন ব্রজভাখা, প্রাচীন অউধী, প্রাচীন মৈথিল প্রভৃতির বিকাশের বা রূপ-গ্রহণের পূর্বে লোকভাষাকে অবলম্বন করিয়া ব্যাপকভাবে সাহিত্য রচনা হয় গুজরাটে, মালবে, রাজপুতানায় এবং মধ্যদেশে অর্থাৎ এখানকার পশ্চিম-সংযুক্ত প্রদেশে; এই পশ্চিমের দেশগুলিতে, রাজপুত রাজাদের সভায়, ঐ অঞ্চলের লোকভাষার আধারে একটী সমৃদ্ধ সাহিত্যের ভাষা দাঁড়াইয়া গেল। সেটীর নাম দেওয়া হইয়াছে 'পশ্চিমা-অপভ্রংশ'—পশ্চিমের বৈয়াকরণগণ ভাষাটীকে কেবল 'অপভ্রংশ' নামেই অভিহিত করিয়াছেন। এই পশ্চিমা-অপভ্রংশ খৃষ্টীয় প্রথম সহস্রকের শেষ কয় শতক এবং দ্বিতীয় সহস্রকের প্রথম দুই তিন শতক ধরিয়া, কথ্য ভাষার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত একটী প্রবল-প্রতাপ সাহিত্যের ভাষারূপে, পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্র হইতে বাঙ্গালা পর্যন্ত সমগ্র উত্তর-ভারতে প্রসৃত হয়। বাঙ্গালা দেশেও ইহার প্রচলন ঘটে, বাঙ্গালী বৌদ্ধ সাধকদের রচিত বহু পদ এই ভাষায় পাওয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষা, লিখিত সাহিত্যে প্রথম ব্যবহৃত হইবার পূর্বে, বাঙ্গালা দেশে সম্ভবতঃ এই পশ্চিমা-অপভ্রংশই লৌকিক সাহিত্যের ভাষা-রূপে ব্যবহৃত হইত। পাল-বংশীয় রাজাদের আমলে গুর্জর-প্রতিহার প্রমুখ পশ্চিমাদের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহ, ভাষা-বিষয়ে তখনকার যুগের রাঢ়-বরেন্দ্রী-বঙ্গ-বাসীদিগকে স্বদেশের গৌড়বঙ্গের ভাষার প্রতি আকৃষ্ট করিয়া থাকিবে; অবশ্য এটা একটা অনুমান মাত্র। যাহা হউক, বাঙ্গালা ভাষার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী তাহাতে সাহিত্য-রচনায় মনোনিবেশ করিয়াছিল; ভারতের অন্যান্য বহু প্রদেশ সম্বন্ধে, এ কথা বলা চলে না। অবশ্য এ কথা বলিব না যে, তখনই গৌড়-বঙ্গের অধিবাসী পাল-যুগে নিজ ভাষা সম্বন্ধে সাভিমান হইয়া উঠে, ভাষাগত জাতীয়তা-বোধের দ্বারায় অনুপ্রাণিত হয়। ভাষাগত জাতীয়তা-বোধের উন্মেষ দেখা যায়, ইউরোপের ছোঁয়াচে, ঊনিশের শতকে; এবং বিংশ শতকেই এই বস্তুটী ভারতবর্ষময় বিভিন্ন প্রান্তিক ভাষাকে অবলম্বন করিয়া প্রাদেশিক জাতীয়তারূপে দেখা দিয়েছে—ইংরেজীকে বা হিন্দীকে লইয়া যে নিখিল-ভারতীয়-মহাজাতি-গঠনের প্রয়াস চলিয়াছে, এই প্রাদেশিক জাতীয়তা ভাব-জগতে ও কর্ম-জগতে তাহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতেছে।

কিন্তু বাঙ্গালীর মধ্যে ভাষা-গত এবং প্রদেশ-গত জাতীয়তা-বোধ অন্য প্রদেশের চেয়ে আগে আসিয়া গিয়াছে, তাহা স্বীকার করিতে হয়। পূর্ব-পাঞ্জাব, রাজপুতানা, মালব, মধ্যভারত, সংযুক্ত-প্রদেশ, বিহার—এই বিরাট ভূখণ্ডে ভাষা-গত জাতীয়তা-বোধ যেভাবে বাঙ্গালা দেশে জাগিয়া উঠিয়াছে সে ভাবে কখনও দেখা দেয় নাই; রাজপুতানার অধিবাসীর, পাঞ্জাবীর, পূর্বী-হিন্দী-ভাষীর, ভোজপুরিয়ার, মগহিয়ার, মৈথিলের মনে নিজ মাতৃভাষার সম্বন্ধে বোধ বা দরদ নাই, সকলেই দিল্লী অঞ্চলের ভাষা হিন্দুস্থানীকে (হিন্দী বা উর্দুকে) মানিয়া লইয়াছে। বাঙ্গালায় কিন্তু ইহার বিপরীত—অন্ততঃ শিক্ষিত লোকদের সম্বন্ধে। আমরা হিন্দু যুগে উত্তর-ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবনে অংশ গ্রহণ করিয়াছি; কিন্তু তাহার পরে তুর্কী-বিজয় হইতে আকবর কর্তৃক বাঙ্গালা দেশ জয় পর্যন্ত ১২০০ হইতে ১৫৭৫ পর্যন্ত পৌণে চারি শত বৎসর ধরিয়া, পৃথক্‌ রাষ্ট্র হিসাবেই আছি; মোগল বাদশাহদের আমলে মোগল সাম্রাজ্যের কেন্দ্র দিল্লী আগরার সহিত সংযুক্ত হইলেও, আমাদের দেশ এক টেরে পড়িয়াছিল—উত্তর-ভারতের নাগরিক সভ্যতার সহিত আমাদের তেমন যোগ ছিল না; পৃথক্‌ভাবে আমরা মধ্যযুগে আমাদের পল্লীসমাজ এবং গ্রামীন সভ্যতা গড়িয়া তুলিতেছিলাম। ইংরেজ আমলে আমরা ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবনে ইংরেজের অনুচর হিসাবে একটু পাণ্ডাগিরি করিবার সুযোগ পাইলাম—সমগ্র বঙ্গভাষী জাতি একই শাসনের অন্তর্ভুক্ত থাকায়, আমাদের ভাষাগত ঐক্য-বোধ আমাদের জাতীয় চেতনায় একটী স্থান করিয়া লইল। বঙ্গ-ভঙ্গের বিপদে সেই বোধ আরও সুদৃঢ় হইল। রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্বে তাহা আমাদের প্রধান গৌরবের বস্তু হইয়া দাঁড়াইল।

ভারতের রাষ্ট্রভাষা হওয়ার পক্ষে বাঙ্গালাভাষার দাবী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দারভাঙ্গা সৌধে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আবক্ষ মূর্তির পাদপীঠে যে উক্তি উৎকীর্ণ আছে—

His noblest achievement, the surest of all, The place for his mother-tongue in step-mother's hall

—তাহা হইতে মাতৃভাষা সম্বন্ধে বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনোভাব বুঝিতে পারা যাইবে। বাঙ্গালীই প্রথমে বিমাতা ইংরেজীর ঘরে তাহার মাতৃভাষার স্থান করিয়া দিয়াছে—প্রথমেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষাকে বি-এ পরীক্ষা পর্যন্ত অবশ্য-পাঠ্য বিষয় করা হয়, এম-এ পরীক্ষার জন্য আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির স্থান করা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষা পি-এচ-ডি-র জন্য মৌলিক গবেষণা প্রণয়ন কার্যে বাঙ্গালা-ভাষার দাবীকে কার্যতঃ স্বীকার করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার বাহনরূপে বাঙ্গালা প্রভৃতি চারিটী ভাষাকে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও বাঙ্গালীর মাতৃভাষা-প্রীতির অনুকরণ দেখা যাইতেছে।

বাহির হইতে দেখিলে, বাঙ্গালা ভাষার বেশ বাড়-বাড়ন্ত অবস্থা। এই ভাষায় যুগোপযোগী সাহিত্য রচিত হইতেছে, ইহার অন্তর্নিহিত সমস্ত শক্তির আবাহন হইতেছে; বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহার গৌরবময় স্থান হইল। বাঙ্গালা ভাষা পাঁচ কোটির অধিক লোকের মাতৃভাষা—পৃথিবীর সংখ্যা-ভূয়িষ্ঠ জনগণের ভাষার মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার স্থান সপ্তম ভাবের স্ফুরণে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে বাঙ্গালা ভাষা। বাঙ্গালা ভাষার গৌরব সম্বন্ধে আমর এতটা স্থিরনিশ্চয় হইয়াছি যে, সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবার জন্য বাঙ্গালীর দাবী যে আর সব ভাষার আগে, এ কথাও মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছি।

কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার সমক্ষে একটি ঘোর বিপদের ছায়া আসিয়া পড়িতেছে—তদ্দ্বারা হয়ত আমাদের এক এবং অখণ্ড বাঙ্গালা ভাষা দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পড়িবে।

আমার মনে হয়, নিখিল ভারতের রাষ্ট্র-ভাষাপদবীর জন্য বাঙ্গালার দাবী উত্থাপন অপ্রাসঙ্গিক; এবং হিন্দী অথবা হিন্দুস্থানী কবে স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র-ভাষা হইয়া বাঙ্গালা-ভাষার হানি করিবে, তজ্জন্য আমাদের কাহারও কাহারও মনে যে দুশ্চিন্তা দেখা দিতেছে, তাহাও নিতান্ত অসাময়িক এবং অমূলক-ভীতি-প্রসূত। ভারতের রাষ্ট্রভাষার প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা এক্ষেত্রে আমাদের বিষয়-বহির্ভূত হইবে, সুতরাং পূর্ণভাবে সে আলোচনা হইতে নিবৃত্ত রহিলাম। প্রথমতঃ, প্রসঙ্গক্রমে এই কথা বলিতে চাহি যে, ইংরেজীকে বাদ দিয়া অন্য কোনও ভাষাকে তাহার স্থানে বসাইতে গেলে আমাদের মানসিক ক্ষতি ঘটিবে। 'রাষ্ট্রভাষা' বলিতে কি বুঝিব, তাহা লইয়াও বিচার চলে। যদি রাষ্ট্রভাষা অর্থে ভারতের ইংরেজী-অনভিজ্ঞ জন-সাধারণের মধ্যে সাধারণ প্রয়োজনের তাগিদে মেলামেশার ভাষা, 'বাজারু' ভাষা বুঝি, তাহা হইলে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, এক প্রকার সহজ ব্যাকরণদুষ্ট চলতি হিন্দুস্থানী বহুদিন হইতেই ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যদি উহার অতিরিক্ত আরও কিছু বুঝি, নিখিল ভারতের জনগণের মধ্যে মাতৃভাষার অতিরিক্ত একটি Culture Language অর্থাৎ সংস্কৃতিবাহী সৎসাহিত্যের ভাষা বুঝি, তাহা হইলে দেবনাগরীতে লেখা সংস্কৃত-শব্দবহুল শুদ্ধ হিন্দীকে মানিব, কিংবা ফারসী হরফে লেখা আরবী-ফারসী শব্দবহুল শুদ্ধ উর্দুকে মানিব; কিংবা ব্যাকরণ-শুদ্ধ সাহিত্যিক হিন্দী এবং কেতাবী উর্দু, অথবা অশুদ্ধ-ব্যাকরণ বাজার-চলতি হিন্দুস্থানীর আধারে নূতন করিয়া গড়া ভবিষ্যতের গর্ভে কোনও অভিনব অপ্রাপ্তরূপে সাহিত্যের ভাষাকে মানিব; তাহা স্থির করিয়া লইতে হইবে। হিন্দী-উর্দু-হিন্দুস্থানীর প্রশ্ন আমাদের কাছে কতকটা দূরের বস্তু; আবার হিন্দী-উর্দুর ঝগড়া, ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রভাষা হিন্দুস্থানীতে আরবী-ফারসী শব্দ বেশী থাকিবে কি সংস্কৃত শব্দ বেশী থাকিবে, ইহা আমাদের ভাষায় নূতন করিয়া দেখা দিতেছে এমন কতকগুলি সমস্যার সহিত সম্পৃক্ত। হিন্দুস্থানীকে (হিন্দী-উর্দুকে) পাঞ্জাব, রাজপুতনা, মধ্যপ্রদেশ, মধ্যভারত, সংযুক্ত-প্রদেশ, বিহার, আংশিকভাবে গুজরাট, ভারতের এই কয়টি প্রদেশের লোকেরা, সাহিত্যের ভাষা বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। এই সমস্ত প্রদেশের অনেকের ইচ্ছা, হিন্দুস্থানী ভাষা (উর্দুরূপে হউক বা হিন্দীরূপে হউক) ভারতের অন্য প্রদেশের লোকদিগকে শিখানো হইবে—তাহারা যদি স্বেচ্ছায় শিখিতে না চাহে, তাহা হইলে জোর করিয়া শিখানো হইবে। মাদ্রাজে এই জবরদস্তী নীতি ইতিমধ্যে অনুসৃত হইতেছে—তাহার ফলে মাদ্রাজে তামিলভাষীদের মধ্যে বিক্ষোভ এবং হিন্দী বিরোধী সত্যাগ্রহের কথা প্রতিদিন সংবাদপত্রে আমরা পড়িতেছি। এইরূপে জোর করিয়া অনিচ্ছুক প্রজার ঘাড়ে আর একটি ভাষা চাপানো ঘোর অত্যাচার—এই Linguistic Imperialism বা ভাষাগত সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, প্রত্যেকেরই বিদ্রোহ করা উচিত। হিন্দুস্থানী (হিন্দী বা উর্দু) যাহাদের মধ্যে পূর্ব্ব হইতেই শিক্ষা ও সাহিত্যের ভাষা বলিয়া গৃহীত হয় নাই এমন ভারতীয় জনগণের মধ্যে যদি অবশ্যপাঠ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়, তাহাদের যদি হিন্দুস্থানী পড়িতে বাধ্য করিবার কথা মনে হয়, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে যাহারা হিন্দুস্থানী মাতৃভাষা বা সাহিত্যের ভাষারূপে ব্যবহার করিতেছে তাহাদের মধ্যে অন্য একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা (তাহাদের রুচি ও সুবিধা মত বাঙ্গালা, মারাঠী, গুজরাটি, উড়িয়া, তেলুগু, তামিল, কানাড়ী, মালয়ালম্ যাহাই হউক না কেন) বাধ্যতামূলক করিয়া দেওয়া উচিত; অন্যথা, শিক্ষা-জীবনে এবং জীবনের প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে হিন্দুস্থানীওয়ালাদের অনুচিত এবং পক্ষপাতপূর্ণ সুবিধা দেওয়া হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত হিন্দুস্থানী ভাষা বা হিন্দুস্থানী ব্যবহারকারী ছাত্রদের মধ্যে, বিহার, সংযুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে আর একটি ভারতীয় ভাষা বাধ্যতামূলক করা না হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত অন্য প্রদেশের ছাত্রদের উপরে হিন্দুস্থানী চাপানোর বিরুদ্ধে আমাদের যথাশক্তি লড়িতে হইবে।

বাঙ্গলা ভাষাকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করিবার আকাঙ্ক্ষা কেহ কেহ প্রকট করিয়াছেন। আমার মাতৃভাষা ভারতের আন্তঃপ্রাদেশিক হউক; ভারতের প্রধান ভাষা হউক, ইহা কোন্ বাঙ্গালীর অনভীপ্সিত? কোন্ বাঙ্গালী ইহাতে খুসী হইবে না? কিন্তু এই ইচ্ছা কতদূর কার্য্যে পরিণত হইতে পারে, তাহা বিচারসাপেক্ষ; কেবল মাতৃভাষার প্রতি প্রীতির বশে, মাতৃভাষার ও তাহার সাহিত্যের গৌরব লইয়া উচ্ছ্বাস করিলে চলিবে না। নাথ-পন্থ, সহজিয়া-পন্থ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদ অবলম্বন করিয়া প্রাচীন ও মধ্যযুগে, খৃষ্টীয় প্রথম সহস্রকের শেষে ও ষোড়শ শতকের পরে, বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালা ভাষা কিছু প্রসার লাভ করিয়াছিল, কিন্তু তাহা অতি সীমাবদ্ধরূপে। কিন্তু পশ্চিমের লোকেরা আবহমানকাল ধরিয়া বাঙ্গালায় আগমন করিতেছে, তাহাদের ভাষার প্রভাব বাঙ্গলা ভাষার উপর আসিয়াছে। ভাষা প্রসার লাভ করে, কেবল তাহার সাহিত্যের জন্য নহে; যাহারা কোনও ভাষা ব্যবহার করে, তাহাদের প্রসারশক্তি, কর্ম্মশক্তি এবং অধিকারশক্তির উপরে সেই ভাষার প্রসার নির্ভর করে; সঙ্গে সঙ্গে যদি সেই ভাষা সরল ও সবল হয়, বিদেশীর দ্বারা সহজে যদি আয়ত্ত করা যায় এবং মানসিক অথবা ভাবজগৎ সম্পৃক্ত সংস্কৃতির বাহন যদি হয়, তাহা হইলে তো কথাই নাই। কর্ম্ম এবং সংহতি শক্তিযুক্ত উৎসাহী পাঞ্জাবী মার-বাড়ী হিন্দুস্থানী বিহারীরাই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া সহজেই হিন্দী বা হিন্দুস্থানী ভাষার প্রসার ঘটাইতেছে; বাঙ্গালী সেভাবে ছড়াইতে পারে নাই—দুই-দশ জন চাকুরীজীবী কেরাণী বাঙ্গালীর ততটা শক্তি নাই যে, বাঙ্গলার বাহিরে নিজ মাতৃভাষার কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে; বাঙ্গালী কখনও সেদিকে কোন চেষ্টাও করে নাই। বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া, এক-আধজন গুজরাটি, হিন্দুস্থানী, মারাঠা, তেলুগু, কানাড়ী বা মালয়ালী বাঙ্গালা শিখিতে পারেন, কিন্তু সেরূপ শেখার দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার প্রসার ঘটিয়াছে বলা যায় না। এতদ্ভিন্ন, সরল হিন্দুস্থানীর তুলনায় বাঙ্গালা অপেক্ষাকৃত কঠিন ভাষা; বাঙ্গালার ব্যাকরণ সরল বটে, কিন্তু ইহার বাক্যভঙ্গী, ইহার সাধু ও চলিত দুই রূপ এবং ইহার উচ্চারণ-রীতি বাঙ্গালা ভাষাকে অ-বাঙ্গালীর পক্ষে নিতান্ত দুরধিগম্য করিয়া রাখিয়াছে। বাঙ্গালার বাহিরে প্রায় সমগ্র ভারতে সংস্কৃত শব্দের যে সাধু উচ্চারণ প্রচলিত আছে, তাহা বর্জ্জন করিয়া বাঙ্গালীর মত সংস্কৃত উচ্চারণ অ-বাঙ্গালী কেহ করিবে কিনা সন্দেহ; অ-বাঙ্গালীর সুবিধার জন্য বাঙ্গালী যে তাহার ভাষার উচ্চারণ বদলাইবে, তাহাও অসম্ভব। তা ছাড়া সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়িয়া হিন্দী বা হিন্দুস্থানী ভাষার ঝঙ্কার সকলেরই কানে পৌঁছিতেছে, বাঙ্গালার সম্বন্ধে সে কথা বলা চলে না। মারাঠী গুজরাটির মত বাঙ্গালা যদি দেবনাগরী অথবা দেবনাগরীর বিকার-জাত কোনও লিপিতে লিখিত হইত, তাহা হইলে হিন্দীর সঙ্গে বাঙ্গালা কতকটা পাল্লা দিতে পারিত। বাঙ্গালা ভাষার রাষ্ট্রভাষারূপে সমগ্র ভারত কর্তৃক গ্রহণের যে কতকগুলি দূরপনেয় বা অনপনেয় অন্তরায় আছে, তাহা আমাদের জানিয়া রাখা উচিত।

বাংগালা ভাষাকে দ্বিখণ্ডিত করার প্রয়াস

রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন অপেক্ষা আরও গুরুতর ব্যাপার হইতেছে, বাংগালা ভাষাকে নূতনভাবে দ্বিখণ্ডিত করিবার আকাঙ্ক্ষা। হাজার বছর ধরিয়া বাংগালা ভাষা বিদ্যমান—বাংগালা ভাষার প্রারম্ভ হইতে এখন পর্যন্ত শত শত বঙ্গদেশীয় কবি, মনীষী ও সুলেখক এই ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়া বিরাট করিয়া তুলিয়াছেন, ইহাকে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছেন।

অন্য পাঁচটি প্রাকৃতজাত ভাষার মত, বাংগালা ভাষাও তাহার প্রাকৃতজাত শব্দাবলী অবলম্বন করিয়া রূপগ্রহণ করিয়াছিল; সেই শ্রেণীর প্রাকৃত-জ শব্দ এখনও বাংগালায় বিদ্যমান থাকায় বাংগালা ভাষার বাংগালাত্ব। বাংগালা ভাষার পিছনে আছে তাহার মাতামহী সংস্কৃত ভাষা; যেন সংস্কৃতের কোলেই বাংগালার জন্ম ও পরিপুষ্টি এবং তদনন্তর সব বিষয়ে অনুপ্রাণনা লাভ। প্রাকৃত যুগ হইতেই যখনই নূতন শব্দের আবশ্যক হইয়াছে, যেখানে খাঁটি প্রাকৃত ধাতু প্রত্যয় দ্বারা শব্দ-গঠন সুষ্ঠু হয় নাই, বিনা দ্বিধায় সংস্কৃত হইতে শব্দ গৃহীত হইয়াছে। বাংগালা ভাষার আদি যুগ হইতে সংস্কৃত শব্দ বাংগালা ভাষায় আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। সংস্কৃতের অক্ষয় শব্দ-ভাণ্ডার চিরকালই বাংগালার নিকট উন্মুক্ত; সংস্কৃত যে একটা পৃথক ভাষা, সংস্কৃতের শব্দসম্ভার যে বাংগালার শব্দসম্ভার হইতে ভিন্ন, এ ধারণা সে দিন পর্যন্ত বঙ্গভাষীর মনে উদিত হয় নাই—এখনও অনেক বাংগালীর মনে এ ধারণা স্থান পায় নাই। চর্যাপদের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বাংগালার সমস্ত লেখক, এতাবৎকাল পর্যন্ত প্রায় সহস্র বৎসর ধরিয়া, সহজভাবে, মাতৃভাষা বাংগালার সহিত সংস্কৃতের নাড়ীর টান মানিয়া লইয়া,—সংস্কৃতের বিকারে বাংগালা, অতএব বাংগালার শুদ্ধতর পূর্ণতর রূপই হইতেছে সংস্কৃত এই বিচারে এবং সংস্কৃতের শব্দসম্পৎ উত্তরাধিকারসূত্রে নিঃসংশয়ে বাংগালারই, এই বোধে,—বাংগালা ভাষায় সংস্কৃত শব্দ আমদানী করিয়া আসিয়াছেন। ইহাতে হয়ত বাংগালা ভাষার একটু হানি হইয়াছে—ঐশ্চর্যশালী সংস্কৃতের উপর শব্দ-দানের ভার অর্পণ করিয়া, বাংগালা ভাষা ততটা নিজের পায়ে দাঁড়াইবার কথা মনে রাখে নাই, বাংগালা অনেকটা পরমুখাপেক্ষী, সংস্কৃতের প্রসাদ পুষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান উভয় কবিদের দ্বারা এই রীতি অনুসৃত হইয়াছে। চর্যাপদের সিদ্ধা কবিরা; বড়ু চণ্ডীদাস ও কৃত্তিবাস, মালাধর, বিপ্রদাসাদি চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী বা সামসময়িক কবিগণ; বৈষ্ণবচরিত রচয়িতৃগণ, মহাজন পদকারগণ; কবিকঙ্কণ; কাশীরাম, আলাওল; মাণিক গাঙ্গুলী, ঘনরাম, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র; রামমোহন রায়, ভবানীপ্রসাদ; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর; রঙ্গলাল, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব; গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল; রবীন্দ্রনাথ; শরৎচন্দ্র; আধুনিক মুসলমান লেখকগণের মধ্যে মীর মশাররফ হোসেন, মৌলানা আকরাম খাঁ এবং অন্যান্য গদ্য লেখক ও কবি—বাংগালা সাহিত্যের এই সমস্ত ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ লেখক, ইঁহাদের কেহ বাংগালা ভাষার শব্দস্রোতের স্বাভাবিক উৎসকে বিস্মৃত হন নাই; হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই এতাবৎ মিলিতভাবে একই মাতৃভাষার সেবা করিয়া আসিয়াছে। 'প্রবাসী' ও 'মাসিক মোহাম্মদী' বাংগালা ভাষার নিদর্শন হিসাবে এখনও মোটের উপর তুল্যমূল্য। এই ভাষা সাম্য, ইহা হিন্দু-মুসলমাননির্ব্বিশেষে বাংগালী জাতির প্রতি ভগবানের এক বিশেষ করুণা বলিয়া মনে করি। উত্তর-ভারতে একই হিন্দুস্থানী ভাষা, কেবল বর্ণমালা এবং ভাষান্তর হইতে আনীত শব্দাবলীর পার্থক্য হেতু, এক ব্যাকরণ এবং এক সাধারণ প্রকৃতি ও সাধারণ শব্দসম্ভার সত্ত্বেও, হিন্দী ও উর্দু এই দুই প্রতিস্পর্ধীরূপে দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে। মুখ্যতঃ বাংগালী হিন্দু বাংগালা ভাষার সাহিত্য গড়িয়া তুলিয়াছে, সেইজন্য এই সাহিত্যে বাংগালার হিন্দু সংস্কৃতির অর্থাৎ বাংগালা দেশের মুসলমান পূর্ব্ব যুগের সংস্কৃতির ছাপ বেশী করিয়া পড়িয়াছে। মুসলমান লেখক যাঁহারা বাংগালায় লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা না করিলে বিদেশী শব্দের আমদানী করিতেন না। বাংগালা ভাষার কাঠামো বদলাইতে কেহ কখনও চেষ্টা করে নাই, তাহার উপরের সাজস্বরূপে শব্দাবলীরও ব্যাপকভাবে পরিবর্ত্তনের চেষ্টা এতাবৎ হয় নাই। বাংগালা দেশের মুসলমানগণের মধ্যে, নিতান্ত অল্পসংখ্যক পশ্চিম হইতে আগত মুসলমানদিগের বংশধরদিগকে বাদ দিলে (এবং এই মুসলমানদের পশ্চিম হইতে প্রথম আগত পিতৃকুল বাংগালার বাহিরের হইলেও, পুরুষের পর পুরুষ ধরিয়া মাতৃকুল প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই এ-দেশীয়), শতকরা নব্বইয়ের উপর মুসলমান বাংগালী,—হিন্দুদের সঙ্গে সমান ভাষায়, রক্তে, বংশগত মানসিক গুণে ও অবগুণে। তুর্কীদের দ্বারা বাংগালা দেশ বিজিত হইল, তুর্কী বীরের দল এদেশেই রহিয়া গেলেন; যুদ্ধবিজয়ী ফৌজের দলে স্বদেশীয় স্ত্রীলোক বেশী থাকে না, যে দেশ তাহারা জয় করিয়া বাস করিতে থাকে সেই দেশেরই লোকদের ঘর হইতে তাহাদিগকে মেয়ে লইতে হয়। এইভাবে তুর্কী ও তাহার পরে পাঠান এবং পাঞ্জাবী ও হিন্দুস্থানী মুসলমান (ইহারা রক্তে পুরোপুরি ভারতীয়), তিন চারি পুরুষের মধ্যে বাংগালী বনিয়া গেল,—ভাষায়, রক্তে, চিন্তারীতিতে। মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত জাত-বাংগালীদের তো কথাই নাই। (ক্রমশঃ)

ঘূর্ণাবর্ত্ত

(৬৩২ পৃষ্ঠার পর)

মিহির থাকে সুদূর মধ্যপ্রদেশে, চাকরীর জন্য। সে-ই শুধু জানে, তার অরুণা কেমন মেয়ে।

মিহিরের ডায়েরী বুকের কয়েকটা লাইন অরুণার মনে পড়িল, অরুণা চুরি করিয়া পড়িয়াছিল।

"—বলুক না লোকে যা খুশী, ওতে ভয় পাও কেন? আমি ত জানি, আমার অরুণা কেমন মেয়ে!............আমার বাগানে এই যে বিচিত্র বর্ণের পুষ্পসমারোহ, হৃদয় তোমার বর্ণ-মাধুর্যে এদেরই মত রঙীন—সুন্দর। তুমি পবিত্র—তুমি মধুর—তুমি প্রিয়—তুমি লক্ষ্মী।"

আকাশে মেঘের পরে মেঘ জমিয়াছিল, এতক্ষণে তাহা বিন্দু বিন্দু হইয়া মাটীর বুকে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সে ধারাবর্ষণকে উপেক্ষা করিয়া চোখের জলে ভাসিয়া অরুণা মনে মনে কহিল, তোমার চিত্ত মহাসমুদ্রের মত, সংকীর্ণতা তোমার মনে স্থান পায় না জানি, কিন্তু আমি যে কিছুতেই মানিয়ে চলতে পারছি না এখানে। তুমি কি পার না এখান থেকে মুক্তি দিতে আমাকে? কিন্তু অরুণা জানে, সে শক্তি সত্যই মিহিরের নাই। প্রেমময় স্বামী লাভ করে সীতার মতই তার জীবন হয়ত চোখের জলের মধ্য দিয়াই পৌঁছিবে পরিসমাপ্তিতে। (ক্রমশ)

ঘূর্ণাবর্ত্ত

(উপন্যাস)

শ্রীমতী অমিয়া সেন

(১)

বর্ষার সন্ধ্যা।

সেদিন সারাদিন এক ফোঁটা বৃষ্টি হয় নাই।

সূর্য্য আলোকের পরিপূর্ণ গৌরবে আকাশের তটপ্রান্তে আবীর ঢালিয়া দিয়া বিদায় লইয়া গিয়াছে।

পশ্চিম আকাশ তখনও রঙে রঙীন। তীব্র লাল রঙের আভায় আকাশে যেন রঙের মহোৎসব লাগিয়াছে। ছাদের কার্নিসের উপর হেলিয়া পড়িয়া অরুণা একদৃষ্টে সেইদিকে চাহিয়াছিল।

আজিকার এই আকাশ—যমুনের পরিপূর্ণা নদী—চারিদিকে গ্রাম্য প্রাকৃতিক দৃশ্য তাহাকে যেন সহসা একেবারে অভিভূত করিয়া তুলিয়াছিল। বর্ষার পল্লী.....চারিদিকে শোভার যেন অন্ত নাই। অরুণার চক্ষু ঘুরিয়া ঘুরিয়া সব কিছুকেই দেখিতে লাগিল।

সন্ধ্যা ঘন হইয়া আসিয়াছে।

প্রতিবেশীদের ঘরে ঘরে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল, বাতাসে ধূপ-সৌরভ ভাসিয়া আসিতে লাগিল।

অরুণা তবুও স্থিরভাবে সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল, ঘরে তাহারও সন্ধ্যা বহিয়া যাইতেছে, কিন্তু যাই যাই করিয়াও তার পা উঠিতেছিল না। হয় ত এজন্য নীচে গিয়া শাশুড়ী মহালক্ষ্মীর তিরস্কার সহ্য করিতে হইবে।

তা হোক—

অরুণার দৃষ্টি উদাস হইয়া আসিল, তার আর ভাল লাগে না, এই গতানুগতিক জীবন, আনন্দ নাই—বৈচিত্র্য নাই, অলস একঘেয়ে জীবন! মুক্তি চায়—সে মুক্তি চায় এই অসহ্য পরিবেশ হইতে।

নিশীথচারী এক ঝাঁক পাখী নিঃশব্দে শূন্য পথে যাত্রা করিয়াছে। আকাশের বুকে তাহাদের ক্ষীণ দেহ রেখার মতন মিশিয়া গিয়াছে।

সেইদিকে চাহিয়া অরুণার ইচ্ছা হইল, দু হাত বাড়াইয়া পক্ষ বিস্তার করিয়া সেও যাত্রা করে ঐ নীল অসীমের পথে।

কিন্তু ঐ নিশীথচারীদের যাত্রার শেষ আছে, পথ চলার সিদ্ধি আছে। সিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ওরা আবার ফিরিয়া যাইবে এই পথে, ওদের পুরান কুলায়ে। আর অরুণার যাত্রার শেষ ঘটিবে কোথায়? কিসে ঘটিবে সিদ্ধি?

আছে, অরুণার যাত্রারও শেষ আছে—

প্রাকৃতিক দৃশ্য কখন অন্ধকারে ঢাকিয়া গিয়াছে। অরুণার মন সেদিক ছাড়িয়া ছুটিয়া চলিল অন্য পথে—

অবলম্বনহীন বেদনার্ত্ত মন নিমেষে সহস্র যোজন পার হইয়া গেল।

ওগো বঁধু, ওগো প্রিয়, তুমি কোথায়—অরুণা ত আর পারে না, ফিরে এস ফিরে এস তুমি—

অরুণার চোখ ছলছলিয়া উঠিল।

ষোড়শ বসন্তের এক আলোয় ভরা পূর্ণিমা যামিনীতে যে রাজদুলাল, রাজাধিরাজ অরুণার চোখের সম্মুখে আসিয়া মধুর হাসিয়া তার অবগুণ্ঠন উঠাইল, লজ্জার বাঁধন খসাইল, সে আর আসিল না কেন? কবে আসিবে তাও ত বলিয়া গেল না! এ কি নিষ্ঠুরতা।

অরুণার মনের বনে ঘন পুষ্পারণ্যের আড়ালে পূর্ণিমার চাঁদ পূর্ণত্বের গৌরবে হাসিয়া উঠিল, বনের অন্ধ্রে-রন্ধ্রে যে আলো হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল, সে কী রূপ! অরুণা যেন অন্ধ হইয়া গিয়াছিল। মিহিরের সর্ব্বাঙ্গ ঘিরিয়া যেন জ্যোৎস্নার জোয়ার বহিতেছিল।

অরুণা তাই বুঝি মিহিরকে অত ভালবাসে? স্বামীকে ত সবাই ভালবাসে, কিন্তু অরুণার প্রেম যেন অতুলনীয়,—পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার মত, মিহিরের রূপের মত—ফুলের মত পবিত্র মধুর—বর্ষার বন্যার মত অদম্য বেগবান।

—বৌমা, তুমি কোথায়?

—এই যে যাই মা,—

চোখ মুছিয়া অরুণা নীচে নামিয়া আসিল।

অরুণা বাণী-উপাসিকা। ছোট ছোট মাসিক সাপ্তাহিকে মাঝে মাঝে কিছু কিছু লেখে। একখানা পাক্ষিকে নিয়মিত লেখে। একদিন তার রচনা-মুগ্ধা জনৈকা পাঠিকা ঈষৎ সংকোচে তার নিকট তার জীবনের হিষ্ট্রীর একটুখানি আভাস জানিতে চাহিল। অরুণার রচনার করুণতা পাঠিকার কোমল মনকে বিশেষভাবে স্পর্শ করিয়াছিল।

চিঠি পড়িয়া অরুণা হাসিল, লিখিল—

"কুমারী জীবনের ইতিহাসে জ্ঞাতব্য কিছু নেই। পনের বছর বয়সে বিয়ে করেছি। তাঁর প্রেম আমাকে শেখালে ভালবাসা। সেই থেকে আমি ভালবাসি এই মাটীকে, ঐ আকাশকে, ভালবাসি মানুষকে, এই সুন্দরী পৃথিবীকে। কিন্তু জীবন আমার ব্যর্থতায়, বেদনায় ভরপুর। যাঁকে ভালবাসি, তাঁকে না পাওয়ার ব্যর্থতা আমার জীবনের প্রত্যেকটি অধ্যায় করে তুললো বেদনার্ত্ত করুণ। সেই ব্যথা—সেই ব্যর্থতা আমার মনে আনলো সৃজন স্পৃহা। এই আমার সাহিত্যিক জীবনেতিহাস।" সত্যই অরুণার জীবনের ইতিহাস এইটুকুমাত্র। এর উপরে অতিরিক্ত যা আছে, তা অনুল্লেখযোগ্য।

সংসারের অপ্রীতিকর পরিবেশ—গ্রাম্যমনের সঙ্কীর্ণ অনুভূতি। কুসংস্কারাবদ্ধ রীতিনীতি। এ সমস্ত অরুণার সত্যই ভাল লাগে না—পদে পদে তার সহজ সরল চিত্ত আঘাত খাইয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। মনের মধ্যে মূক প্রশ্ন আবর্ত্তিত হইয়া ফেরে, এরা কেন এমন! এই ত গেল পূর্ব্বাভাষ। কালের স্রোতে গড়াইয়া চলে দিন—তার সাথে বহিয়া চলে ঘটনার স্রোত—অরুণার ক্ষুদ্র ললাটে এত লেখা কে লিখিল!

(২)

বর্ষার এক প্রভাতে সাহিত্যিক দীপক রায়ের সঙ্গে অরুণার আলাপ হইয়াছিল। মৌখিক আলাপ নয়, পত্রালাপ। অরুণার মেজ-বোনের এক দেবর অরুণাদের বাড়ীতে থাকিয়া পড়িত। ষোল বছরের কিশোর ছেলে, অত্যন্ত চঞ্চল—অত্যন্ত সুন্দর, কমল। দীপক রায়ের চিঠিখানি সে টানু

মারিয়া কাড়িয়া লইল অরুণার হাত হইতে। কহিল, আমি পড়ি দিদি?

অরুণা রাগিয়া কহিল, না—না, তুমি পড়বে কি, বড় দুষ্টু ছেলে ত তুমি!

—না দিদি, পড়ি আমি।

কমল উচ্চৈঃস্বরে সুরু করিল, 'নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন,'

অরুণার শ্বশুর রাধাবিনোদ আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। কহিলেন, কি হয়েছে কমল?

—দীপক রায় দিদির কাছে চিঠি লিখেছে,—বলিয়াই কমল চক্ষের নিমেষে সেখান হইতে উধাও হইয়া গেল।

রাধাবিনোদের কুঞ্চিত ভ্রূর দিকে চাহিয়া নতমুখে অরুণাও ঘরের বাহির হইয়া গেল।

চিঠিখানি মেজেতে পড়িয়া রহিল।

রাধাবিনোদ সেখানা কুড়াইয়া লইলেন। বড়মেয়ে শ্যামলা আসিয়া ঘরে ঢুকিল। কহিল, কার চিঠি বাবা?

—কি জানি, কে লিখেছে তোর বৌদির কাছে।

চিঠিখানি পড়িয়া তিনি মেয়ের হাতে দিলেন।

মেয়ে পড়িয়া কহিল, এ কে বাবা?

বিরক্তমুখে রাধাবিনোদ কহিলেন, কি জানি, যত সব বাজে লোকের কাছে চিঠি লেখা, তোর বৌদির কি যে কাণ্ড।

শ্যামলা ততোধিক বিরক্ত হইয়া কহিল, এমনি কাগজে লেখে টেখে তা লেখুক। তা বলে রাজ্যিশুদ্ধ লোকের কাছে চিঠি লেখার কি দরকার? লোকে শুনলেই বা কি বলবে? আপনি কিছু বলেন না কেন?

—আমি আর কি বলব? বারণ করলেই কি তা শুনবে নাকি?

—কেন শুনবে না? ওবার দাদাও আমার কাছে বলে গিয়েছিল, অত চিঠি লিখতে বারণ করিস, অত বাজে চিঠি কেন লেখে?

দুষ্টু কমল আড়ালে দাঁড়াইয়া সব শুনিল। শুনিয়া এক ছুটে অরুণা যেখানে ছাদে কাপড় মেলিতেছিল, সেই-খানে হাজির হইল। কহিল, দিদি বুড়ো, তোমার উপর পড়ুগে।

আশঙ্কা অরুণার মনেও ছিল, কহিল কেন রে?

—ঐ চিঠি দেখে।

—তা আমিও জানি।

অরুণার মুখ কঠিন হইয়া আসিল। কতকটা আত্মগত-ভাবেই কহিল, আর সব বিষয়েই বশ্যতা মেনে নিয়ে চলতে রাজী আছি। কিন্তু এ সমস্ত বাদ দিয়ে চলা আমার পক্ষে অসম্ভব। তা কেউ সন্তুষ্টই হোক, আর অসন্তুষ্টই হোক্।

—তোমার ভয় করে না দিদি?

—না।

—ওরা যদি তোমায় বকে?

অরুণার হঠাৎ খেয়াল হইল, সে যার সঙ্গে এই গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিতেছে, সে নেহাৎই একজন ছেলে-মানুষ, (বয়সে যদিও অরুণা তার চেয়ে মাত্র তিন-চার বৎসরের বড়) খেয়াল হইতেই আসিল লজ্জা, লজ্জা ঢাকিবার জন্য আসিল রাগ, বিরক্ত মুখে কহিল, তোমার এ সব কথায় কি দরকার কমল? তোমার না সামনে এগ্‌জামিন? যাও পড়ুগে।

—কিন্তু দিদি সত্যি যদি তোমায় বকে?

—আবার! যাও বলছি—

—না দিদি, আমার বড্ড রাগ ধরেছে। ওরা কেন তোমায় বকবে?

অরুণা হাসিয়া ফেলিল,—দূর পাগল, বকেনি ত এখনো।

—যদি বকে?

—তুমিও তা হ'লে ওদের আচ্ছা করে বকে দিও।

—সত্যি দিদি, এই নিয়ে তোমায় যদি কেউ বকে, আমার সাথে কিন্তু তা হ'লে খুব লেগে যাবে, জানিয়ে দিচ্ছি।

তর তর করিয়া কমল চঞ্চল পায়ে নীচে নামিয়া গেল। তার গমন পথের দিকে চাহিয়া অরুণা একটু হাসিল।

কমল যেন সত্যই তার ছোট ভাই। এত ভাল তাহাকে কেন যে বাসে, অরুণা বুঝিয়াই উঠিতে পারে না। কমল যেন অরুণার বুকের অর্দ্ধেক জুড়িয়া সিংহাসন পাতিয়া বসিয়াছে। এত চঞ্চল—এত সুন্দর কমল কেন হইল? অরুণার স্নেহমুগ্ধ চক্ষু তার দিক হইতে আর যেন ফিরিতে চায় না। মিহির খুবই সুন্দর, কিন্তু আজ হঠাৎ অরুণার মাতৃত্ব-ক্ষুধিত অন্তরে মনে হইল, এ শুভ্র কিশোর সৌন্দর্য্যের কাছে উচ্ছল স্নেহ-স্রোতের কাছে বুঝি সারা বিশ্ব আবছা হইয়া গিয়াছে। কল্পনায় ভাসিয়া আসে তার কানে পরমাকাঙ্ক্ষিত শিশুর অভিমানকম্পিত বাণী। কিন্তু বাৎসল্য বিশ্লেষণের চেয়েও বড় চিন্তা অরুণার মনকে পাইয়া বসিয়াছিল।

মেঘ ছায়া-ম্লান আকাশতলে দাঁড়াইয়া কার্ণিশের উপর দেহভার রক্ষা করিয়া সে নিজের অদৃষ্ট চিন্তায় ডুবিয়া গেল। জীবনের এ কী পরিবেশ, এ কী সংকীর্ণ মনোবৃত্তি এই মানুষগুলির? চিঠি লেখার মধ্যে অপরাধ কোথায়? লোকে ভদ্রভাবে চিঠি লিখিলে তার উত্তর দেওয়া যে কর্ত্তব্য, এ জ্ঞান-টুকুও কি এদের নাই? শক্তি নাই—সাধ্য নাই অরুণার, এদের সঙ্গে মানাইয়া চলা, পদে পদে বাধা আর নিষেধের বন্ধন, প্রতিটি চোখের কোণে প্রচ্ছন্ন সন্দেহ, সতর্ক সন্ধানী দৃষ্টি। অরুণা অধীর হইয়া উঠিল। অথচ এদের উপেক্ষা করিয়া চলার ক্ষমতাও তার নাই। সীমাহীন ভবিষ্যৎ জড়াইয়া গিয়াছে এদের রীতিনীতির সঙ্গে, এদের আদর-অনাদরের মধ্যে, এদের নিন্দা-প্রশংসার মধ্যে। এদের নিন্দারও তাই মূল্য আছে। গৌরবহীন বন্দিনী জীবন ত তারও কাম্য নয়! কিন্তু কে এদের বলিয়া দিবে, তার মন গঙ্গা-বারির মতই পবিত্র, কলুষতার স্থান নাই সেখানে। স্বামী যে তারও প্রিয়—তার মত ভাল কি স্বামীকে কেউ বাসে?

মিহিরের কথা মনে হইতেই অরুণার চোখে জল আসিল। জীবনের প্রিয়শ্রেষ্ঠ প্রিয়তম, সে কাছে না থাকাতেই ত তার এত ভয়—এত দুঃখ। সে যদি আজ অত দূরে না থাকিত!

(শেষাংশ ৬৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সম্পাদক-পত্নীর সখ

(রসরচনা)

—মাধব ভট্টাচার্য্য বি-এ

একদা আশ্বিন মাসের দুপুরে বেলা স্নান সমাপন অন্তে ঘরের দেওয়ালে টাঙানো আরশীর সামনে দাঁড়াইয়া মানিনীদেবী মাথায় চিরুণী দিতেছিলেন। ইঁদুর পুচ্ছের মত গুচ্ছ করিয়া চুলগুলিকে ঘাড়ের উপর ফেলিয়া রাখিয়া সিঁথায় সিঁদুর দিতে দিতে আপন মনে বলিয়া উঠিলেন—'কি সুখেই যে দিন যাচ্ছে'.........

কথাটা হয়ত এখানেই শেষ হইত, যদি দ্বিতীয় লোকের কানে না যাইত। গায়ের ফতুয়াটাকে গা' হইতে সরাইবার চেষ্টা করিতে করিতে হরনাথবাবু ঘরে ঢুকিয়াই পত্নীর মুখ হইতে এরূপ বাক্য শুনিয়া হতভম্ব হইলেন। করুণ স্বরে কহিলেন—আহা হা কিযে বল! সুখের অভাবটা কি বলুলেই ত হয়......আমি যখন আছি......

মানিনীদেবী মুখ ঘুরাইলেন। আলাপের ধারাটা খোলামাঠের সীমানা হইতে গহন বনে ঢুকিবার চেষ্টা করিতেছে, ছাড়িয়া দেওয়া ভাল নয়। কহিলেন—অভাব আর কি! দিব্যি সুখে আছি, খাইদাই, ঘুমাই......

হরনাথবাবুর বুকে শেল বিঁধিল। কহিলেন—আহা হা, কিসের অভাব তাই একবার বল না......বৃথা মনোকষ্ট কেন?

মানিনীদেবী কহিলেন—অভাব আবার কি! তোমার হাতে পড়ে তো অভাবে পড়িনি!

হরনাথবাবুর চোখে হাসি খেলিল।—তবে?

—বলছিলাম কি, তুমিতো দুপুরে বেলা অফিসে যাও, বাড়ীতে থাকি আমি একা। সারাটা দুপুর কি করে' কাটাই বলতো? তাই একটা সখ হয়েছে......

—কি সখ...... কি সখ......

মানিনীদেবী হাসিয়া কহিলেন—তেমন দামী কিছু নয়। একটা বেড়াল পুষতে চাই।

শুনিয়া হরনাথবাবু চক্ষু বুজিলেন। মৃদুকণ্ঠে কহিলেন—এতো উত্তম প্রস্তাব। আচ্ছা, কালই আমি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে দেব।

কথামত পরদিনই হরনাথবাবু পত্রিকার প্রথম পাতায় বড় হরফে বিজ্ঞাপন দিলেন—'একটি ছোট্ট ফুটফুটে বেড়াল-বাচ্চা চাই। সত্বর সম্পাদকের সহিত সাক্ষাৎ করুন। মূল্য দেওয়া হইবে।'

এতক্ষণ আপনারা যে হরনাথবাবুর কথা শুনিলেন, তিনিই সুবিখ্যাত "মানিনী বার্ত্তা'র সম্পাদক। আর ইনিই তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষ, নাম মানিনী দেবী। হরনাথবাবুর বয়স সম্বন্ধে কিছু বলা ভদ্রতাবিরুদ্ধ। তবে এটুকু শুনিয়াছি তাহার বিপক্ষ দল বলে যে, 'মানিনী বার্ত্তা'র সম্পাদক অফিসে আসিবার সময় মুখে লজেনচুস ভরিয়া আসেন। আর পত্নীর মনোরঞ্জনের জন্য রাত্রিতে ফাঁকমত বিলাতী স্নো প্রভৃতি তরুণকারক পদার্থাদি মাখেন—বাড়ীর চাকর ভজহরি কাহার পয়সার লোভে কর্ত্তার বিপক্ষ দলের কাছে নাকি এরূপ বলিয়াছে। কিন্তু, এসব কথা অপ্রাসঙ্গিক। তবে আমরা জানি, হরনাথবাবুর পত্নীপ্রেম বড়ই প্রবল। প্রথমটির জীবদ্দশায় তিনি অপরের এক প্রেসে কম্পোজিটারী করিতেন, তারপর, দ্বিতীয়পক্ষ হইলে ষোড়শী-পত্নী ভাগ্যে কম্পোজিটারী ছাড়িয়া একেবারে সম্পাদক সাজিয়া বসিয়াছেন। পত্নীর নামে পত্রিকার নামকরণ করিয়াছেন—'মানিনী বার্ত্তা'।

(২)

অফিসের বেয়ারা নিত্যানন্দ বিজ্ঞাপনটি বার বার বানান করিয়া পড়িল। পড়িয়া ভাবিল—মন্দ নয়, কিছু উপায়ের পন্থা হইল। সেইদিনই বাড়ীফেরতা নিত্যানন্দ পথ চলিতে চলিতে দুইদিকে চাহিতে লাগিল, যেন কি খুঁজিতেছে। মেছুয়াবাজারের এক বস্তির সামনে আসিয়া সে দাঁড়াইল। হাতখানেক দূরে একটা ডাষ্টবিন, তাহার পাশে একটি জীব বসিয়া আছে, চোখ দুইটি মিটিমিটি করিতেছে। নিত্যানন্দ গায়ের চাদরখানা দিয়া জীবটিকে ধরিল; তারপর কাঁধে নিয়া আপন আবাসে রওনা হইল।

পরদিন অফিসে আসিয়া প্রথমেই সে সম্পাদক মহাশয়ের খাসকামরায় গিয়া উপস্থিত হইল। সঙ্গে রহিল, দিব্যি ফুটফুটে একটি মার্জ্জার।

হরনাথবাবু সবেমাত্র আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, প্রিয় বেয়ারা নিত্যানন্দকে হাসিমুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া শুধালেন—কি খবর নেত্য?

নিত্যানন্দ ধূপী জোড়করে প্রণাম পর্ব্ব শেষ করিয়া একগাল হাসিয়া কহিল—আজ্ঞে, কালকের বিজ্ঞাপনের বেড়াল এনেছি।—বলিয়া গায়ের লম্বাঝোলা কোটের পকেট হইতে বিড়াল শিশুটিকে বাহির করিয়া সম্পাদকীয় টেবিলে রাখিল।

হরনাথবাবু দুইচোখ ভরিয়া দেখিয়া কহিলেন—বেশ করেছিস্। নীচে কিছু দিয়ে ঢেকে রেখে দে, বাড়ী যাবার সময় নিয়ে যাব। আর, তোর মূল্য পাবি মাসকাবারে।

নিত্যানন্দ একবার সম্পাদকের চেয়ারটাকে ও আরেক বার ধামা-ঢাকা মার্জ্জারটিকে নমস্কার করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

সম্পাদক-গিন্নী সন্ধ্যাবেলা বেড়াল পাইয়া খুশী হইলেন। এতটা খুশী হইয়াছিলেন যে, সেই রাত্রিতে হরনাথবাবুর পথ-হাঁটা-পা' দুখানি টিপিয়া দিয়াছিলেন এবং ভজহরিকে দিয়া তিন পয়সায় আধপো দধি আনাইয়া চিঁড়া সঙ্গে স্বামী-সেবা করিয়াছিলেন।

ইহার পরের যে ঘটনা, তাহা বড়ই করুণ ও মর্ম্মন্তুদ। ক্রমে দেখা গেল, মানিনীদেবী তাঁহার 'সখটি'কে নিয়াই ব্যস্ত থাকেন, হরনাথবাবু দশবার ডাকিলেও উত্তর পান না। আর মানুষী হইয়া অমানুষী জীবটিকে এত আস্কারা দিতে লাগিলেন যে ইহার দৌরাত্ম্য ক্রমেই শুক্লপক্ষের শশিকলার মত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে দুধ, মাছ ভক্ষণ করিয়া দেহটিও দিনে দিনে পরিপুষ্ট হইতে লাগিল। হরনাথবাবু ইহাতে বিশেষ আপত্তি করেন নাই; কারণ তাহা হইলে সারাদিন খাটিয়া আসিয়া দ্বিতীয় পক্ষের মুখের এখনও যে মধুর আস্বাদ পান, তাহাও ফুরাইয়া যাইবে। কিন্তু ব্যাপার ক্রমশই জটিলতর হইয়া উঠিল। সীতাদেবীকে লক্ষ্য করিয়া স্বর্ণলঙ্কা ধ্বংস হইয়াছিল, হেলেনকে মধ্যস্থ করিয়া ট্রয়নগরী ছারখার হইয়া

গেল, আর বিংশ শতাব্দীতে বাঙলা দেশে একটি মার্জ্জার শিশুকে উপলক্ষ্য করিয়া হরনাথবাবুর সংসারে অনাসৃষ্টি বাধিল। ব্যাপারটি এই—

একদিন রাধুনে বামুন কর্ত্তাবাবুর ভাত বাড়িয়া একটু বাহিরে গিয়াছে ইত্যবসরে সদা-ক্ষুধার্ত্ত বিড়াল শিশু আসিয়া বাটী হইতে ইলিশ মাছ দুখানি মাটিতে নামাইয়া দিব্যি আস্বাদ গ্রহণ করিতে সুরু করিয়াছে। এমন সময়ে কর্ত্তাবাবু আসিয়া এই দৃশ্য দেখিলেন ও নিজের দুরদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া শুধু ডালভাত খাইয়াই অফিসে গেলেন। পত্নীকে কিছু বলিলেন না; কারণ বলিলে লাভ নাই, শুধু লোভী আখ্যা মিলিবে মাত্র।

আর এক দিন অফিস-ফেরতা ক্ষুধার্ত্ত হরনাথবাবু একপো দই ও কিছু মুড়ি কিনিয়া আনিয়া নিজের ঘরের টেবিলের উপর রাখিয়া হাতপা ধুইতে গেলেন। কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন—খোরাইশুদ্ধ সমস্ত দধি মাটিতে গড়াগড়ি যাইতেছে, ঠোঙ্গার মুড়ি চতুর্দ্দিকে ছড়ান, আর মধ্যখানে বসিয়া নবাবজাদী বেড়াল বাচ্চাটি। এই দৃশ্য হরনাথবাবুকে পাগল করিয়া তুলিল। বর্ব্বর জন্তুটার দিকে ক্ষিপ্ত হইয়া ধাইয়া গেলেন, কিন্তু জন্তুটা একলাফে টেবিলের উপর হইতে নীচে নামিয়া দরজা দিয়া পলায়ন করিল। হরনাথবাবু ছুটিয়া গিয়া পত্নীকে ডাকিয়া আনিয়া সব দেখাইলেন। বলিলেন—ইহার ব্যবস্থা কর, না হয় আমি আমার ব্যবস্থা করি।

মানিনীদেবী কৌতুক অনুভব করিলেন। বলিলেন—আহা বেড়ালটার ক্ষিদে পেয়েছিল, তাই খেয়েছে... স্ত্রীর মুখে এবম্বিধ বাক্য শুনিয়া হরনাথ তখনই নিজের সুটকেশ গুছাইয়া অফিসে রওনা হইলেন। বলিয়া গেলেন—বেড়াল না তাড়ালে, আমাকে তাড়াতে হবে। দুইজনের এক বাড়ীতে ঠাঁই হবে না।

(৪)

এই ঘটনার পর দিন পাঁচেক চলিয়া গিয়াছে। মানিনীদেবী রোজই আশা করিতেন, কর্ত্তা আসিবে, কিন্তু কর্ত্তা আসিতেছেন না। হরনাথবাবুও ক্রোধে ফুলিতেছেন, একবার বাড়ী হইতে একছত্র লেখা পর্যন্ত আসে না! আচ্ছা, এইবার দেখাইতে হইবে যে হরনাথ মাইতি কাহাকেও গ্রাহ্য করে না। নিত্যানন্দকে দিয়া হোটেল হইতে ভাত আনাইয়া খাইতেন ও অফিস ঘরেই দুঃখের রাত্রি কাটান।

এদিকে পূজাসংখ্যা কাগজ বাহির করিবার সময় সমাগত। তিনদিন পরেই অন্যান্য পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যা বাহির হইবে; 'মানিনী বার্ত্তা'ও বাহির না করিলে চলে না। লেখক-লেখিকাদের গল্প-কবিতাদি অনেকটা ছাপা হইয়া গিয়াছে, শুধু সম্পাদকীয় বাকি। হরনাথবাবু সম্পাদকীয় সবেমাত্র শেষ করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া ছাদের উপরে পায়চারী করিতে গেলেন। ইত্যবসরে মানিনীদেবীর কথামত ভৃত্য ভজহরি সম্পাদকের টেবিলে, সম্পাদকীয়ের মধ্যে গিন্নীমার দেওয়া গোপনীয় কাগজখানি ভরিয়া রাখিয়া পলাইল। সেইদিন সন্ধ্যায় সম্পাদকীয় প্রেসে গেল।

(৫)

তিনদিন পর 'মানিনী বার্ত্তা' পূজা সংখ্যা বাহির হইল। পাঠকেরা যে যাহার অভিরুচি মত গল্পাদি পাঠ করিতে লাগিল। কিন্তু সম্পাদকীয় যাহারা পড়িল, তাহারা সকলে একবাক্যে স্বীকার করিল যে হরনাথবাবু ইদানীং কলিকা ধরিয়াছেন। একজন সম্পাদকের নামে এরূপ অপবাদের কারণ জিজ্ঞাসা করায় জনৈক পাঠক কহিলেন—দেখুননা মশায়, নিজের চশমা-পরা চোখে পড়ে দেখুন। ভদ্রলোকের কথামত চশমা-পরা চোখে পড়িলাম। প্রথমেই মা দুর্গাকে আবাহন করিয়া লম্বা এক প্রশস্তি—'মা এসো মা; বর্ষার জল শেষ হইয়া গিয়াছে, মাটি আর কর্দ্দমাক্ত নেই, এইবার তুমি অনায়াসেই নামিতে পারিবে......ইত্যাদি।' ইহার পরের একটি লাইন—'ওগো, মেনি বেড়ালকে তাড়িয়ে দিয়েছি, এইবার তুমি এস—মানিনী।' (তারপর)—'ঘরে ঘরে শাঁখ বাজাও, মা আসিতেছে......ইত্যাদি।

প্রবন্ধটি পড়িলাম, পড়িয়া হাসিলাম। হরনাথবাবু কি পাগল হইলেন নাকি? আসল ব্যাপার পরে জানিলাম—ব্যাপারটা প্রেস-ভূতের কাণ্ড।

সম্পাদকীয় অংশের শেষ প্রুফ দেখিয়া সম্পাদক খান দুই শিল্পে লেখা নূতন 'কাপি' যোগ করিয়া দিয়াছিলেন; আর প্রুফ দেখার সময় ছিল না, কম্পোজ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা পেজে জুড়িয়া ছাপা হইয়াছে। নূতন শিল্পের সঙ্গে ভুলে সম্পাদক-পত্নীর চিঠিখানাও কম্পোজ হইতে যায়। তাই এই হাস্যকর ব্যাপার।

ব্যাপারটার হদিস পাইয়া হরনাথবাবু কম্পোজিটার প্রভৃতিদের একদফা বাক্যবর্ষণ ও আগত বর্ষের মাহিয়ানা বর্দ্ধনের আশা পরিত্যাগ করিতে বলিয়া রাত্রির অন্ধকারে সুটকেশটি হাতে নিয়া বাড়ীর ছেলে বাড়ী ফিরিলেন ও দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী হইয়া চোরের মত ঘরে প্রবেশ করিলেন।

প্রলয়ের পরে

(৬১৬ পৃষ্ঠার পর)

আবার আমায় ঘরে আনলে? যে আসনে তুমি একের মূর্ত্তি গড়িয়ে পূজো করছিলে সে আসনের পাশে কেন আমায় টেনে আনলে। তুমি তাকে ভোলনি—হয়ত ভুলতে পারবে না। আমার স্বামী হয়ে আর একজনকে ভালবাসার তোমার কি অধিকার আমায় বুঝিয়ে দিতে পার?"

প্রভার কথা অপ্রিয় হইলেও অসংগত বা অসত্য নয়—ঝাঁজাল হইলেও নূতন—প্রভার এ সুরের সঙ্গে অমর পরিচিত নয়। আর সত্য কথা বলিতে কি প্রভাকে জানিবার কতটুকু চেষ্টাই বা অমর করিয়াছে আজ পর্য্যন্ত। প্রভার অভিযোগ—প্রভার দাবী অমর অস্বীকার করিতে পারে না। অমর চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। (ক্রমশ)

সাহিত্য সম্মেলনে অধ্যাপক কাজী আব্দুল ওদুদের অভিভাষণ

কুমিল্লায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের দ্বাবিংশ অধিবেশনের সাহিত্য শাখার সভাপতি কাজী আব্দুল ওদুদ কতিপয় মুসলমান ছাত্র কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় সম্মেলন মণ্ডপে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। প্রফেসর নলিনীকান্ত ভট্টশালী তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। সমগ্র অভিভাষণটিই নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

আপনাদের প্রীতির জন্য আপনারা আমার আন্তরিক প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন। আপনারা যে আসন আমাকে দান করেছেন সেটি একটি সম্মানিত সাহিত্যিক আসন। কিন্তু আমরা সবাই জানি যে সাহিত্যিক সম্মান বড় দুর্ল্লভ সামগ্রী—তার ভাণ্ডারী একমাত্র কাল। তাই শুধু আপনাদের অমূল্য প্রীতিই পরমশ্রদ্ধান্বিত অন্তরে গ্রহণ করবার অধিকার আমার আছে। আপনাদের আয়োজন সফলতামণ্ডিত হোক এই কামনা করি।

সাহিত্য-সম্মেলনকে আমাদের দেশের অনেক সাহিত্যিক দিন দিন বেশী করে' জ্ঞান করছেন সাহিত্যিক উৎসব। গুণিজনরঞ্জন ত্রিপুরাধিপের দেশে সে উৎসব যে পূর্ণাঙ্গতা লাভ করবে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু রস ধারণ করে কঠিন পাত্র, উৎসবও স্বরূপতঃ শক্তির ছটা—সাহিত্যিকেরা এসব কথাও ভাল করেই জানেন। তাঁদের এবারকার সংযোগ দেশের জন্য একটি শুভ যোগ হোক।

আমাদের জন্মভূমি বাঙ্গলার বেশ এক দুঃসময় উপস্থিত হয়েছে প্রায় একশত বৎসরের বিচিত্র ঘটনায় ও বিচিত্রতর সাধনায় যে প্রতিষ্ঠা এদেশের লাভ হয়েছিল আজ তাতে বিপর্য্যয় দেখা দিয়েছে। পরিবর্ত্তন জগতের নিয়ম। সে পরিবর্ত্তন যদি আমূল হয় সেটিও স্বভাবের বহির্ভূত হয় না। কিন্তু আমাদের দুঃখ এই যে এই পরিবর্ত্তন-স্রোতে আমরা যেন অসহায়ভাবে ভেসে চলেছি—একে নিয়ন্ত্রিত করবার কথা আমরা যেন ভাবতে পারছি না। এতকাল যাঁরা এদেশে নেতৃস্থানে ছিলেন তাঁরা আজ বাস্তবিকই দিশাহারা, আর যাঁরা এই সন্ধিক্ষণে নব-নেতৃত্বের দাবি করছেন তাঁরাও মর্ম্মে মর্ম্মে জানেন প্রতি মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় তাঁরা উত্তেজিত হয়ে চলেছেন মাত্র।

জাতীয় জীবনের এমন সন্ধিক্ষণ সাহিত্যিকদের জন্য বড় পীড়াদায়ক। তার প্রধান কারণ তাঁরা আনন্দজীবী—আনন্দিত পরিবেষ্টন ভিন্ন তাঁরা যেন নিশ্বাস গ্রহণ করতে পারেন না। কিন্তু আত্মরক্ষার অনুকূল একটি গোপন শক্তিরও তাঁরা অধিকারী। মাছ যেমন শত্রুর তাড়া পেয়ে আশ্রয় করে জলের গভীর তলদেশে, সঙ্কটকালে সাহিত্যিকেরাও তেমনি সবলে আঁকড়ে ধরেন আনন্দের ভিত্তিভূমি যে সত্য তাকে। জাতীয় জীবনের সন্ধিক্ষণের সাহিত্য তাই চিরদিন সৌন্দর্য্য ও আনন্দের পূজারি মুখ্যভাবে নয় বরং মুখ্যভাবে নিরাভরণ সত্যের পূজারি। মনে হয়, সেই নিরাভরণ সত্যের সম্মুখীন হবার দিন বাঙ্গলার সাহিত্যিকদের এসেছে।

বাঙ্গলার একালের জীবন ও সাহিত্যের যোগ

সাহিত্য-সম্মেলনে অর্থাৎ সাহিত্যিকদের সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণও

কাজী আব্দুল ওদুদ

একটি সাহিত্যিক আলোচনা ভিন্ন আর কিছু নয়, আর কিছু হবার চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হবার সম্ভাবনাই বেশী—এই আমার ধারণা। আপনাদের জীবন ও সাহিত্যের যোগ সম্পর্কে দুই জীবনও সাহিত্যের যোগ সম্পর্কে দুই একটি কথা বলতে চেষ্টা করব।

যাকে বলা হয় Renaissance নবজন্ম তেমন একটি ব্যাপার উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় বাঙ্গলা দেশে আরম্ভ হয়েছিল, আর পরে তার প্রভাব শুধু বাঙ্গলায় নয় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে অনুভূত হয়েছিল, আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় একথা জানেন। কিন্তু যে ভাবে জানলে এমন একটি ব্যাপার যোগ্যভাবে জানা হয়, দুর্ভাগ্যক্রমে সেদিকে তাঁদের অনেকের মন কমই ধাবিত হয়েছে। বৃহত্তর দেশের এই নব-জন্মের বা নব-জাগরণের অর্দ্ধ শতাব্দী পরে আমাদের একালের গৌরবময় সাহিত্যের অভ্যুদয়। সে অভ্যুদয় এক পরমাশ্চর্য্য ঘটনা। দেশের নব-জন্মের এক পরিচয়-স্থল রূপেই এর আবির্ভাব হলো নিঃসন্দেহ, কিন্তু যে-রূপ নিয়ে এ আবির্ভূত হলো তা যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি অশেষ সম্ভাবনাপূর্ণ—এর সামনে দেশের বিস্ময়ের আর অবধি রইল না। সৌভাগ্যক্রমে বিস্ময়জাত সাহিত্যিক অক্ষমতা আমাদের কেটে যেতে বেশী দেরী হলো না। পদ্য ও গদ্য উভয় ক্ষেত্রে অচিরে যে সোনার কমল ফল্‌লো তাতে দেশ ও জাতি ধন্য হলো।

অনেকের এই মত যে বাঙ্গলার একালের এই নব-জন্মের শ্রেষ্ঠ পরিচয়-স্থল তার একালের সাহিত্য। সাহিত্য ভিন্ন অন্যান্য ক্ষেত্রে, যেমন ধর্ম্মে ও শিল্পে, উচ্চাঙ্গের সাধকের আবির্ভাব একালের বাঙ্গলা দেশে ঘটেছে এবং তাঁদের ভাব সুদূরপ্রসারী হয়েছে। তবু বাঙ্গলার একালের সাহিত্যকেই তার একালের নব-জন্মের শ্রেষ্ঠ পরিচয়-স্থল জ্ঞান করা যায় এই বিবেচনা থেকে যে সেই নব-জন্মের প্রায় সমস্ত লক্ষণ সুলিখিত হয়েছে এই সাহিত্যে। তা ছাড়া এই সাহিত্যেরই একজন শ্রেষ্ঠ সাধকের প্রভাব দেশের রাজনৈতিক জাগরণের সহায় হয়েছে, অপর একজন শ্রেষ্ঠ সাধকের প্রভাব বাঙ্গলার সর্ব্ববিধ কলাবিদ্যার উপরে অসামান্য।

সাহিত্যের ও সাহিত্য-সাধকের এমন সার্থকতা গৌরবময়। কিন্তু আমাদের সেই গৌরবময় সাহিত্য এত শীগগির আনন্দহীনতা ও নিষ্ফলতার ভয় জাগলো কেন? অবশ্য বাঙ্গালীর সাহিত্য-প্রতিভা নিষ্ক্রিয় হয়নি আজো। আমাদের নবীন সাহিত্যিকদের হাত দিয়েও এখনো এমন দুই একখানি বই মাঝে মাঝে বেরুচ্ছে যা থেকে বুঝতে পারা যায় এই নূতন সাহিত্যিক-বোধ জাতির মর্ম্মে সঞ্চারিত হয়েছে। তবু এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে আমাদের সাহিত্যের গতি-পরিণতি সম্বন্ধে আমাদের মনে সন্দেহ জেগেছে। আমাদের জীবন ও সাহিত্যের মধ্যে যে বিচ্ছেদ দেখা দিয়েছে তাকে গুরুতর জ্ঞান না করে' আমরা পারছি না।

জাতীয়তাবাদী সাহিত্যিক

আমাদের এই সাহিত্যিক দুর্গতি সম্বন্ধে আমাদের যে-সব সাহিত্যিক চিন্তা করতে আরম্ভ করেছেন তাঁদের

প্রধানতঃ দুই দলে ভাগ ক'রে দেখা যেতে পারে। এক দলের নাম দেওয়া যেতে পারে জাতীয়তাবাদী। তাঁদের কথাই প্রথমে বুঝতে চেষ্টা করা যাক। তাঁরা অনেকখানি দ্বিধাহীন হ'য়ে বলতে চাচ্ছেন, বাঙলা সাহিত্যের বর্ত্তমান দুর্গতির কারণ—বাঙালী জাতির সঙ্গে তার সম্পর্কচ্ছেদ ঘটেছে। এই সব জাতীয়তাবাদী আবার কয়েকটি উপদলে বিভক্ত। তাঁদের একদল বলছেন, বাঙলার সত্যকার সাহিত্য তার পল্লী-সাহিত্য। আমাদের একালের যে-সাহিত্যের এত গৌরব করা হয়, তা ইয়োরোপের অনুকরণ মাত্র। কাজেই তা দেখতে যত জমকালো হোক তার মর্য্যাদাহীন হ'তে সময় না লাগবারই কথা। মনে হয় এই সাহিত্যের সেই পরীক্ষার দিন এসেছে। অপর দল বলছেন, বাঙালীর সত্যকার জাতীয় পরিচয় এই যে সে হিন্দু। আজ যারা ধর্ম্মে অহিন্দু যুগযুগান্তের ইতিহাসের দিক দিয়ে দেখলে তাদেরও হিন্দু ভিন্ন আর কিছু বলবার উপায় থাকে না। বাঙলার একালের সাহিত্যে বাঙালীর সেই হিন্দুত্ব এক নূতন মহিমায় ফুটে উঠেছিল বলে' তার এত গৌরব। কিন্তু ইয়োরোপের অন্ধ অনুকরণে আজ বাঙালী তার স্বধর্ম্ম ভুলেছে। আর যে ধর্ম্মভ্রষ্ট—দুর্গতিই তার ভাগ্য।—তৃতীয় দল বাঙালীত্বের কিছু নূতন ব্যাখ্যা দেন। তাঁহাদের ব্যাখ্যা বোঝা কিছু কঠিন কেননা তা প্রকৃত প্রস্তাবে ব্যাখ্যা নয়, বরং এক ধরণের মরমী অনুভূতির বিবৃতি। তাঁরা বলেন, বাঙালীর একটা নিজস্বতা আছে—সেইটিই হচ্ছে সব চাইতে বড় কথা। তার সেই নিজস্বতাকে যদি হিন্দুত্ব বলতে চাও বলতে পার, কেননা বাঙালীর হিন্দুত্ব বহুকালের; কিন্তু এই সঙ্গে এই কথাটি মনে রাখতে হবে যে হিন্দুত্বের উৎস যে আর্য্যত্ব তার সঙ্গে বাঙালীর যোগ নেই। আর্য্যের কাঠিন্য বাঙালীতে দুর্লভ। সে বরং ভাবে-ভোলা অনার্য্য—বুদ্ধির চাইতে হৃদয়াবেগের উপরে তার বেশী নির্ভর। এই বাঙালীকে দেখতে পাওয়া যায় বাঙলা দেশের সর্ব্বত্র তা তার সামাজিক ও ধর্ম্মগত পরিচয় যাহাই হোক। আর এই বাঙালীত্বই রূপ পেয়েছে নব নব ভঙ্গিতে তার সাহিত্যের বিভিন্ন পর্য্যায়ে। এই মূল বাঙালীত্বের সঙ্গে তার একালের সাহিত্যে যোগ ঘটেছিল বুদ্ধির ও চারিত্র শক্তির। ফলে বাঙালীত্বের এক অপূর্ব্ব সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু বাঙালী বিভ্রান্ত হয়েছে ইয়োরোপের ছটায়। তাই জীবনে ও সাহিত্যে সে আজ এমনভাবে বিড়ম্বিত।

বলা বাহুল্য আমাদের জাতীয়তাবাদের এই সব কথা মূলতঃ খেদোক্তি। বাঙলার সমসাময়িক জীবনে যে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে তার সামনে এ'রা বিহ্বল হয়ে পড়েছেন—এ'দের বলবার কিছু নেই। বাঙলার একালের সাহিত্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে এ'দের উক্তিতেও রয়েছে এ'দের অক্ষমতার পরিচয়। মানুষের জীবনের ভূমিকা হচ্ছে দেশ ও কাল; তার সমস্ত প্রয়াসের উপরে এদুয়ের প্রভাব যে পড়বে এ বোঝা কঠিন নয়। কিন্তু কাল পরিবর্ত্তনশীল ত বটেই, দেশও মানুষের জন্য গূঢ়ভাবে পরিবর্ত্তনশীল। একালের বাঙালী চিত্তের উপরে শুধু ইয়োরোপের নয় প্রায় সমস্ত জগতের চিন্তা-ভাবনা কি বিচিত্র ভাবে ক্রিয়াশীল হয়েছে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের তাতে ভুল হওয়া উচিত নয়। এই প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার ফলস্বরূপ যে-সাহিত্য আমাদের লাভ হয়েছে তাতে আমাদের যুগযুগান্তের বাঙালীত্ব লাঞ্ছিত হয়নি নিশ্চয়ই, কিন্তু সেই বাঙালীত্বই যে সে-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পরিচয় একথা বলে একটি হেঁয়ালির অবতারণা করা হয় মাত্র, মানুষের ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের দিকে তাকানো হয় না। এতে আমাদের এ যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের মূলে সাহিত্যিক প্রেরণার দিকেও তেমন মনোযোগ দেওয়া হয় না। মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সাহিত্যিক প্রেরণার ক্ষেত্র মুখ্যভাবে বঙ্গদেশে বা ভারতবর্ষে আবদ্ধ রাখেন নি একথা সবাই জানেন। এমন কি যাঁকে বাঙালীত্ব বা হিন্দুত্বের শ্রেষ্ঠ সাধক বলা হয় সেই বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর অন্তর্জীবন পুষ্ট করেছিলেন ইয়োরোপীয় ভাবরসে, একথাও আজ দেশের শিক্ষিত সমাজে সুবিদিত। সাহিত্যে তথা জীবনে জাতীয়তার তত্ত্ব এইখানে বিশেষ অর্থপূর্ণ যে মানুষ তার মানস জীবন লাভ করতে পারে না যদি পরিবেষ্টনের সঙ্গে তার যোগ দৃঢ় না হয়—যেমন গাছ গাছ হতে পারে না যদি তার শিকড় মাটি যথেষ্ট জোরে আঁকড়ে না ধরে। কিন্তু মানুষের জন্য এই দৃঢ় যোগের অর্থ হচ্ছে তার চার পাশের জীবনের সঙ্গে তার গভীর প্রেমের যোগ, তার আচারগত বা সান্নিধ্যগত এমন কি শোণিতগত যোগ মাত্র নয়। এই প্রেমে যে বলীয়ান্ স্রষ্টা হবার অধিকার কেবল তারই আছে। সেই প্রেমের ভূমিকায় সে নির্ম্মাণ করতে পারে তার কীর্ত্তি-সৌধ বিচিত্র উপকরণে—যেমন তাজমহল নির্ম্মিত হয়েছিল দেশ বিদেশের উপকরণে ও নৈপুণ্যে কিন্তু মোগলদের সুনিবিড় ভারত প্রেমের ভিত্তিতে।

আন্তর্জাতিকতাবাদী সাহিত্যিক

আমাদের অপর ভাবুক দলকে পরিচিত করা যেতে পারে আন্তর্জাতিকতাবাদী বলে। তাঁদের চিন্তা ভাবনার ধারা কতকটা এইঃ—মানুষ দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে বিভক্ত নিঃসন্দেহ কিন্তু সভ্যতার প্রথম থেকেই এই সব বিভিন্ন দেশের ও জাতির মধ্যে শুধু উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময় হয়নি চিন্তা-ভাবনার বিনিময়ও হয়েছে। সেজন্য কোনো জাতির সাহিত্যকে একান্তভাবে জাতীয় ভাবা অবিবেচনা মাত্র তা হোক না তাদের ভাষাগত বিভিন্নতা যথেষ্ট। সাহিত্যের প্রবণতা আন্তর্জাতিকতার দিকেই—যান বাহনের উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের সেই প্রবণতা দিন দিন প্রখরতর হয়ে উঠছে। সাহিত্যকে বলা যেতে পারে উৎকৃষ্ট জ্ঞান ও উৎকৃষ্ট রুচির বাহন। সেজন্য জগতের যেখানে উৎকৃষ্ট জ্ঞান ও উৎকৃষ্ট রুচির প্রকাশ ঘটেছে সে দিকে সহজেই অন্যান্য দেশের মনস্বীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এ কালে ইয়োরোপের দিকে জগতের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে সেই এক কারণেই। তাই এ যুগে ইয়োরোপের অনুসরণের বা অনুকরণের প্রশ্ন ঠিক ওঠে না, কেননা যে নামেই বলা হোক এ ভিন্ন আর কারো কিছু করবার নেই, কেউ কিছু করছেও না। বিজ্ঞান একান্তভাবে নৈর্ব্যক্তিক ও আন্তর্জাতিক। সাহিত্য তেমন নৈর্ব্যক্তিক নয়। কিন্তু যেহেতু তা মুখ্যতঃ জ্ঞানের কথা সেজন্য সাহিত্যকেও মুখ্যভাবে আন্তর্জাতিক ভাবাই সঙ্গত। একালের বাঙলা সাহিত্য যে জ্ঞাতসারে আন্তর্জাতিক হতে পেরেছে এ তার সৌভাগ্যের কথা এবং এই পথেই তা দেশে নূতন জ্ঞান-প্রবাহ এনেছে। কিন্তু একালে বাঙলা সাহিত্যে ত্রুটি দেখা দিয়েছে এই প্রধান কারণে যে ইয়োরোপের, অর্থাৎ একালের শ্রেষ্ঠ জীবনায়োজনের, অনুসরণ তাতে যোগ্যভাবে হয়নি। ইয়োরোপীয় সাহিত্য ও ইয়োরোপীয় জীবন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সেই সম্প্রসারণশীল জীবনে যত সমস্যা দেখা দিয়ে চলেছে সাহিত্যে তার নিপুণ বিশ্লেষণ ও রূপায়ন হচ্ছে। কিন্তু বাঙলা সাহিত্যিকদের এই ভুল হয়েছে যে, বিশ্বের নিয়মে তাঁদের দেশের ও সমাজজীবনে যে পরিবর্ত্তন এসেছে তার দিকে তাঁদের দৃষ্টি যায়নি। তার পরিবর্ত্তে যে সমাজের

ভিতরে এই সাহিত্যের জন্ম হয়েছিল তারই সুখ-দুঃখ বর্ণনার অন্তহীন পুনরাবৃত্তিতে তাঁরা সন্তুষ্ট থাকতে পেরেছেন। তাই বলা যেতে পারে একালের বাংগলা সাহিত্যে শক্তিহীনতা দেখা দিয়েছে ইয়োরোপের অনুকরণ বা অনুসরণ তাতে বেশী হয়েছে বলে নয় বরং বেশী অর্থাৎ যোগ্যভাবে হয়নি বলে'। দেশের জন্য এটি একটি সাহিত্যিক সংকট সন্দেহ নেই। তবে আশা করা যায়, এই সংকট কাটানো আমাদের সাহিত্যিকদের পক্ষে খুব কঠিন হবে না। কেন না নিজেদের ত্রুটি সম্বন্ধে তাঁরা সচেতন হয়েছেন। গণ-জীবনের যে মহিমা ও সম্ভাবনা একালের মানুষের চোখে পড়েছে তাকে যথাযোগ্য রূপ দেবার চেষ্টা হলেই আমাদের সাহিত্য আবার নূতন শ্রী ধারণ করবে। তাতে এর অব্যবহিত পূর্ব্বের সাহিত্যের সংগে এর পার্থক্য দেখা দেবে। কিন্তু সেইটিই স্বাভাবিক। সেই অব্যবহিত পূর্ব্বের সাহিত্যও তার পূর্ব্বের সাহিত্যের সংগে তুলনায় শুধু আকৃতিতে বিভিন্ন নয় প্রকৃতিতেও বিভিন্ন। বাংগলার একালের প্রগতিপন্থী সাহিত্য সম্বন্ধে যে অশ্লীলতার অভিযোগ উঠেছে, মোটের উপর তা অজ্ঞতার কথা। মহামনীষী ফ্রয়েড এখানে মানুষের মনের কার্যকলাপের যে অপূর্ব্ব পরিচয় দিয়েছেন তার প্রভাব একালের সব দেশের সাহিত্যের মতো বাংগলা সাহিত্যের উপরেও পড়েছে। মানুষ দিন দিন তার নিজের মন ও বাহ্য বস্তু দুয়েরই পূর্ণতর পরিচয় লাভের দিকে যাচ্ছে। সেই অভিযানের দিকে সন্দেহের দৃষ্টি নিক্ষেপ করা দুর্ব্বলতার পরিচয় দেওয়া মাত্র। জ্ঞানের অগ্রগতির পথে যত বাধা জ্ঞানের শক্তিতেই সে সব অপসারিত হয়েছে—ভবিষ্যতেও হবে।

অনুভূতি ও প্রত্যয়

জাতীয়তাবাদীদের মতো নৈরাশ্যপরায়ণ আন্তর্জাতিকতাবাদীরা নন দেখা যাচ্ছে। কিন্তু দেশের জীবনের, অথবা ভাব-জীবনের, বর্ত্তমান সংকট সম্বন্ধে তাঁরা হুঁশিয়ার; আর এও দেখা যাচ্ছে যে, এই সংকট থেকে উদ্ধারের পথ তাঁরা খুঁজে পাচ্ছেন না যদিও আশা করছেন যে উদ্ধার তাঁরা পাবেন। কিন্তু তাঁদের যা সম্বল তা দেখে বলা যায়—সফলতার সম্ভাবনা তাঁদের জন্য কম। তাঁদের অনেক কথা যুক্তিপূর্ণ। জীবন্ত ইয়োরোপের দিকে তাঁরা যে দেশের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছেন এও ভাল কাজ করেছেন কেননা জ্ঞান ও শক্তি সংক্রামক। যুগে যুগে সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের সংগে সংগে সাহিত্যের রূপও বদলায়, তাঁদের এই মত ভাববার মতো—অন্ততঃ উড়িয়ে দেবার মতো নয়। তবু তাঁদের দীনশক্তি না বলে উপায় নেই এই কারণে যে তাঁদের প্রধান সম্বল উৎসাহ-প্রাচুর্য্য—যাকে বলা হয় অনুভূতি সেই শ্রেষ্ঠ ধনে আজো তাঁরা বঞ্চিত। অবশ্য উৎসাহ-প্রাচুর্য্যের মূলেও অনুভূতি রয়েছে। কিন্তু যে-অনুভূতি মানুষকে সৃষ্টি-শক্তি দান করে তার প্রকৃতি উৎসাহ-প্রাচুর্য্যের চাইতে স্বতন্ত্র রকমের। এ সম্পর্কে রুষ সাহিত্য একটি ভাল দৃষ্টান্ত। জনসাধারণের কল্যাণ-কামনা সব দেশের চিন্তাশীলেরাই করেছেন; কিন্তু রুষ সাহিত্যিকদের মনে ক্রিয়া করেছিল যে ভাব তার নাম জনসাধারণের শুভকামনা দিলে তার যোগ্য পরিচয় দেওয়া হয় না, তার নাম দেওয়া উচিত—জনসাধারণের অন্তর্নিহিত মাহাত্ম্যে অসীম প্রত্যয়। —অনুভূতি ও প্রত্যয় এই দুটি কথা আজ আমার একান্ত শ্রদ্ধার উপহার আপনাদের সামনে। মনে হয়, ভাগ্য যে আমাদের প্রতি বিমুখ হয়েছেন, তাঁকে নূতন করে' জয় করবার উপায় রয়েছে এই দুটি কথার মধ্যে।

অনুভূতি ও প্রত্যয়—এ দুটোকে বলা যেতে পারে মানুষের মনোজীবনের ভিত্তি—যে-মনোজীবনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় মানুষের সমস্ত চেষ্টার মতো তার সাহিত্যিক চেষ্টাও। জাতীয়তাবাদী আর আন্তর্জাতিকতাবাদী আমাদের এই উভয় দলের ভাবুকতার নিষ্ফলতা অংগুলি নির্দ্দেশ করছে আমাদের মনোজীবনের বিকৃতির দিকে।

বাংগলার নবজন্ম

এই সম্পর্কে 'বাংগলার নব-জন্ম বা নব-জাগরণের কথা সহজেই ওঠে। সে-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ আমাদের নেই, কিন্তু এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করবার আছে যে সেই জাগরণ একটা সহজ ক্রম-বিকাশের পথে অগ্রসর হতে পারে নি, তার পরিবর্ত্তে বাধা ও অস্বীকৃতি পেয়েছে প্রচুর। বাধা এক হিসাবে গতির আনুষংগিক। কিন্তু এমন বাধা আছে যা গতিকে ছন্দ-দান করে না, যেমন করে ব্যাহত। আমাদের একালের জাগরণে তেমন বাধাই ঘটেছে। একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেব। রামমোহন ও বঙ্কিমচন্দ্র দুজনেই এই নবজাগরণের প্রতীক। রামমোহন পূর্ব্ববর্ত্তী; বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্ত্তী। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র রামমোহনকে মুখ্যভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি, অন্ততঃ তাঁর প্রথম জীবনে। তাতে ক্ষতি ছিল না। বিভিন্ন সাধক সত্যকে দেখেন বিভিন্ন দিক থেকে। তাই তাঁদের মত-ভেদ যেমন স্বাভাবিক তেমনি সংগত। তাতেই সমৃদ্ধ হয় মানুষের সত্যের অভিজ্ঞতা। কিন্তু রামমোহন ও বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি-ভংগীর এই বিরোধ আমাদের দেশের শিক্ষিতদেরও সত্যের অভিজ্ঞতা বাড়ায়নি, বাড়িয়াছে সাম্প্রদায়িকতা। বলা বাহুল্য, সত্যের সাধনার পথে এর চাইতে বড় দুর্গতি নেই।

এমনি বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে যা থেকে বোঝা যায়, যে-জাগরণ আমাদের দেশে এসেছিল তার লক্ষণ যত অভ্রান্ত এবং যত বিচিত্রই হোক আমাদের দেশের শিক্ষিতেরাও তাকে বুঝতে যথেষ্ট চেষ্টা করেন নি। তাঁদের এমন অক্ষমতার একটি বড় কারণও আছে। রাজনৈতিক ভাগ্য যাঁদের মন্দ জীবনের পূর্ণ দায়িত্ব উপলব্ধির সুযোগ তাঁদের জন্য সংকীর্ণ। ফলে জীবনের পথে কোনটি প্রধান আর কোনটি অপ্রধান এ-তর্কের মীমাংসা আর তাঁদের জন্য হতে চায় না। বাস্তবিক এ এমন একটা সমস্যা যার সামনে আমাদের সমস্ত চিন্তা-ভাবনা আশা-উদ্দীপনা যেন স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়াতে চায়। কিন্তু নৈরাশ্যের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় এই কথা বুঝলে যে যে-জীবনে আমাদের দেশে নব-জাগরণ ঘটেছিল তার সংগে তুলনায় আমাদের আধুনিক জীবন কোনো দিক দিয়ে বেশী মন্দ নয়। সংকট এ-কালের জীবনে যথেষ্ট দেখা দিয়াছে, সেকালেও কম ছিল না। বাধা যত বড় হতে পারে মানুষের শক্তি যেন তার চাইতেও বড়—এ আশ্বাসে আশ্বস্ত হওয়া যায়।

অনুভূতি ও প্রত্যয় এ দুয়ের বাস্তবিক এমন ক্ষমতা আছে যার দ্বারা আমাদের মনোজীবনের বিকৃতি নিরাকৃত হতে পারে। অনুভূতির সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে—আমাদের চারপাশের জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে আমাদের চেতনা। আর প্রত্যয়ের সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে—জীবন ব্যর্থ হবার জন্য নয়, এমন একটা প্রসন্নতা অন্তরে লালন। সহজেই বোঝা যায় এ দুটি বাদ দিয়া কোনো মানুষেরই চলে না। কিন্তু কাজে আমরা এ দুটিকে অনেক সময়ে বাদ দিই, অন্ততঃ এদের পরিস্ফূর্ত্তির পথে বাধা উপস্থিত করি। মনোজগৎকে সীমাবদ্ধ করবার চেষ্টা মাত্রই হচ্ছে অনুভূতি ও প্রত্যয়কে বিপন্ন করা। অবশ্য যখন আমরা কোন একটি বিষয়ের বিশেষ অনুশীলনে রত হই আমাদের অনুভূতি ও প্রত্যয় তখন বিপন্ন হয় না বরং প্রবলভাবে সক্রিয় হয়। অনুভূতি ও প্রত্যয় বিপন্ন হয় যখন অন্ধ সংস্কারের কালোমেঘে আমাদের চোখের সামনের সীমাহীন জগৎ সংকুচিত হয়। অনুভূতি ও প্রত্যয় নিবদ্ধ

হয়ে মানুষের মনোজীবনে যে পূর্ণতার সঞ্চার করে সৃষ্টির ব্যাপারে সেইটিই মানুষের পরম নির্ভর। সেই পূর্ণাঙ্গতার বিরোধী সমস্ত অন্ধতা ও বাস্তবতা তাই সৃষ্টির ক্ষেত্রে তার জন্য বাধা ভিন্ন আর কিছু নয় তা সে সবের নাম যত জমকালো হোক।

অনুভূতি ও প্রত্যয় চর্চ্চার সঙ্গে আমাদের দেশের নবজাগরণ আমাদের জন্য চিরযুক্ত, কেননা অনুভূতি ও প্রত্যয়ের অপূর্ব্ব প্রকাশ তাতে আমরা দেখি। যথেষ্ট বড় বাধা অতিক্রম করে আমাদের দেশ একালে যে জয়ী হয়েছিল আমাদের সেই সাফল্যের দিকে যদি সত্যকার অনুসন্ধিৎসার দৃষ্টি আমরা নিক্ষেপ করতে পারি তবে একটা বড় যুগকেই যে আমরা রূপ দিতে পারব তা নয়, তাহলে আমাদের মনোজীবনে নূতন শক্তি-সঞ্চার হবে--সত্যের অকুণ্ঠিত অন্বেষণের সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমাদের সমস্ত অভিমান ও ভাববিলাস মর্ম্মান্তিক লজ্জায় মাথা নীচু করবে। রুষ সাহিত্যের মূলে আমরা দেখেছি জনসাধারণের মাহাত্ম্যে অসীম প্রত্যয়, আমাদের একালের নবজাগরণের যদি মূল লক্ষণের নাম করতে হয় তবে বলা যায়--তার নাম আত্ম-বিশ্বাস ও সীমাহীন কৌতূহল। পরমহংস রামকৃষ্ণের কথা ভাবা যাক; পল্লীর নিরক্ষর ব্রাহ্মণ-সন্তান ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসার তীব্রতায় ছুটেছেন বিধর্ম্মীর ধর্ম্ম-সাধনার দিকে, সে-সাধনায় সিদ্ধির জন্য বিধর্ম্মীর সমস্ত রকমের খাদ্য গ্রহণে তিনি উদ্যত! এই অসীম কৌতূহলের প্রভাবে এই যুগের অনেক সাধকের মতবাদে স্ববিরোধিতা দেখা দিয়াছে--যেমন বঙ্কিমচন্দ্র একই সঙ্গে প্রবলভাবে হিন্দু এবং প্রবলভাবে সাম্যবাদী। কিন্তু জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিতে তাতে এ যুগের মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ হয়নি--সত্যান্বেষণের প্রতিক্রিয়া চিরদিন এমন বিচিত্র এবং গভীরভাবে অর্থপূর্ণ। এই যুগ যে আমাদের অন্তরে সত্যের অকুণ্ঠিত অন্বেষণের প্রবর্ত্তনা দেয়, সে জন্যে কাল এর মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ করতে পারবে বলে' মনে হয় না।

সাহিত্যিক দৃষ্টিতে মানুষ মুখ্যতঃ মনোজীবী অনুভূতি ও প্রত্যয়ের লালন, এবং যে জাগরণ আমাদের একালের সর্ব্ববিধ সৌভাগ্যের মূলে তার সম্বন্ধে অনাবিল চেতনা--আমাদের বর্ত্তমান সংকটে অমূল্য একথা বলতে চেষ্টা করেছি। মনে হ'তে পারে সাম্যবাদ ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দিনে শুধু মনোজীবনের উপরে এতখানি জোর দিয়ে আমি আমাদের বর্ত্তমান সংকটকে অত্যন্ত ছোট করে দেখেছি। কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। আর যিনি যাই বলুন, সাহিত্যিক-দৃষ্টিতে মানুষ মুখ্যতঃ মনোজীবী। সে দৃষ্টিকে ভ্রান্ত বলা যায় না। চিরউপেক্ষিতগণ যে আজ নূতন মহিমা লাভ ক'রেছে, সন্ধান করে' দেখলে বোঝা যাবে, তারো প্রথম আভাস সাহিত্যের, অন্য কথায় মনোজীবনের, নিঃশব্দ শৈল-চূড়ায়। মনোজীবনের সঙ্গে মানুষের অর্থনৈতিক কিংবা অন্য কোনো প্রয়োজনের বিরোধ নেই, বরং জীবনের সমস্ত প্রয়োজনের সঙ্গে মনোজীবন সুসঙ্গত। কিন্তু মনোজীবন তার স্বতন্ত্রতা বিসর্জ্জন দিতে কখনো রাজী নয়--তার সেই স্বতন্ত্রতার তুঙ্গ শৃঙ্গ হচ্ছে মানব-সমাজে ভাব-তরঙ্গের চির সহায়।

কিন্তু মনোজীবন শুধু স্বতন্ত্র নয়, সংযুক্তও। যাকে বলা হয় যুগধর্ম্ম, অর্থাৎ বিভিন্ন যুগের বিচিত্র প্রবণতা, তার সঙ্গে তার যোগ অত্যন্ত নিবিড়--এত নিবিড় যে মনোজীবনের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ যাতে সেই সাহিত্যকে সেজন্য কেউ কেউ বলতে চান মুখ্যতঃ যুগ-ধর্ম্মী। তাঁদের মতে, সাহিত্য সার্থক হয় যদি যুগধর্ম্ম তাতে ভাষা পায় আর সেইভাবে যুগধর্ম্ম সুসংহতি লাভ করে। এই চিন্তাধারার বশবর্ত্তী হয়েই আমাদের আন্তর্জাতিকতাবাদীরা বলেন যে একালের যে ধন-সাম্যের বাণী তাকে স্বীকার করলে মানুষের সমাজের যে-রূপ হবে, উচ্চ-নীচ-নির্ব্বিশেষে মানুষ যে আপনার এক অপূর্ব্ব মহিমা উপলব্ধি করবে, সে প্রেরণার ফলে এক পরম গৌরবময় নূতন সাহিত্যের জন্ম হবে।

যুগধর্ম্মের প্রভাব সাহিত্যের উপরে যে অত্যন্ত বেশী তাতে সন্দেহ মাত্র নেই। এমনকি, যা যুগধর্ম্মী নয় তা সাহিত্য নয় এই মত যদি কেউ প্রকাশ করেন তবে তার প্রতিবাদ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। দুই একজন সাহিত্যিকের দৃষ্টান্ত অবশ্য আছে যাঁদের সম্বন্ধে একথা যেন খাটতে চায় না। যেমন আমাদের সাহিত্যে মধুসূদন ও ইংরেজী সাহিত্যে কীট্স। মধুসূদন লালিত হ'য়েছিলেন "ইয়ং বেঙ্গল"-পরিবারের ফরাসী-বিপ্লবের প্রভাব যেখানে অননুভূত ছিল না। কিন্তু সেই মধুসূদন কেমন করে' তাঁর কালের সমস্ত মানসিক দ্বন্দ্ব অতিক্রম করে অবলীলাক্রমে উপনীত হলেন হোমরীয় যুগে! I hate philosophy in poetry একজন 'ইয়ং বেঙ্গল'-পরিবারের যুবকের মুখে এ কথা অতি অদ্ভুত। কিন্তু যত অদ্ভুতই হোক বাস্তবিকই মধুসূদন Philosophyর সমস্ত কুটিল-বর্ত্ম অবহেলা করে' আশ্চর্য্য সহজ ভঙ্গিতে গিয়ে উপস্থিত হলেন আদিম কবির প্রসন্ন রূপ-লোকে! কীটস্‌ও তেমনি পরম শান্তিতে ডুবে যেতে পারলেন গ্রীসীয় সৌন্দর্য্য-সাগরে যদিও বিদ্রোহী শেলী আর অশান্ত বায়রণ তাঁর সঙ্গী।—তবে একটু তীক্ষ্ণভাবে দেখলে বোঝা যায় এমন একান্ত রূপ-রসিক মধুসূদন ও কীটস্‌ও তাঁদের যুগের প্রভাব অতিক্রম করতে পারেন কি। কীটস্ কোন্ যুগের লোক তাঁর কাব্যের সঙ্গে তাঁর চিঠিগুলো মিলিয়ে পড়লে তাতে ভুল হয় না। আর মধুসূদনের দেবতাদের প্রতি বিতৃষ্ণা পুরোপুরি হোমরের কাছ থেকে নেওয়া নয়, হিন্দু-কলেজের তরুণ বিদ্রোহীদের যে তিনি অন্যতম এই তত্ত্বও লুকিয়ে রয়েছে ওতে। বাস্তবিক যুগধর্ম্মের সঙ্গে সাহিত্যের যোগ এমন নিবিড় যে বলা যায়, যুগধর্ম্ম যেন পাত্র, আর সাহিত্য রস—পাত্রে ভিন্ন রস পরিবেশন অসম্ভব।

সৌভাগ্যক্রমে এই উপমাটীর মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে সাহিত্য ও যুগ-ধর্ম্মের সত্যকার যোগের তত্ত্বটি। রস এক বস্তু, পাত্র অন্য বস্তু, তবু এদুয়ের মধ্যে একান্ত যোগ। তেমনি সাহিত্যের যা প্রাণবস্তু একান্তভাবে তা যুগ-ধর্ম্মের ব্যাপার নয়, তবু সেই প্রাণবস্তু নিজেকে প্রকাশ করে যুগ-ধর্ম্মের পরিচ্ছদে। আর একটী উপমা দেওয়া যায়, সেটি এর চাইতেও ভাল—সাহিত্য ফুল আর যুগ-ধর্ম্ম তার বৃন্ত, পাত্রের সঙ্গে রসের যা সম্পর্ক, ফুলের সঙ্গে বৃন্তের সম্পর্ক তার চাইতে নিবিড়তর—অঙ্গাঙ্গী। তবু বৃন্ত আর ফুল ঠিক এক জিনিস নয়। ফুলকে বৃন্ত ধারণ করেছে—সেটি বৃন্তের সৌভাগ্য, ফুলেরও শোভা।

অনুভূতির গভীরতা সাহিত্য সৃষ্টির মূল

সাহিত্য আর যুগধর্ম্ম অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়েও কেমন করে' পৃথক, সে কথাটি বুঝতে হলে সাহিত্য-সৃষ্টির গোড়ার ব্যাপারে মন দিতে হয়। সাহিত্য-সৃষ্টির মূলে অনুভূতির গভীরতা যার সঙ্গে ভাষা-শক্তির যোগ হয়েছে। সেই অনুভূতির গভীরতা কোনো যুগধর্ম্মের ব্যাপার নয়, মানব-মনের চিরন্তন ব্যাপার—যুগের কোনো বিশেষ ঘটনা উপলক্ষ হয়ে সেই গভীর অনুভূতি জাগিয়েছে, —অথবা কোনো যুগের বিশেষ ঘটনা আশ্রয় করে' সেই অনুভূতি জেগেছে। এ দুইয়ের শেষের কথাটি ভাল; অনু-

(শেষাংশ ৬৪৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ডাক্তার হরদয়াল

ডাক্তার হরদয়ালের পরলোক গমনে ভারত তাঁহার একজন শ্রেষ্ঠ সন্তানকে হারাইয়াছে। ডাক্তার হরদয়াল, লালা হরদয়াল এই নামেই ভারতে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৫৪ বৎসর হইয়াছিল। বাল্যকাল হইতেই স্বদেশ-প্রেম তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিয়াছিল এবং কিশোর বয়সেই তিনি ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিতেন। তাঁহার বয়স যখন বিংশতিও হয় নাই, তখনই তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেন এবং স্বামীজী কৃষ্ণ বর্ম্মার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ১৯০৫ হইতে ১৯০৮ সাল পর্য্যন্ত তিনি অক্সফোর্ডে ছিলেন। এই সময় হইতেই তিনি ভারতের স্বাধীনতার সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। ডাক্তার হরদয়ালের পক্ষে ভারত প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। নির্ব্বাসিত জীবনে তিনি ইংলণ্ড, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, তুরস্ক, হাওয়াই, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, আলজিরিয়া প্রভৃতি

বহু দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। সর্ব্বত্রই ভারতের স্বাধীনতার বাণী তিনি প্রচার করিতেন। ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিবার জন্য আমেরিকায় যে গদের আন্দোলন হয়, ডাক্তার হরদয়াল সেই আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন।

ডাক্তার হরদয়ালের পাণ্ডিত্য অসামান্য ছিল। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল, ইহা ছাড়া, তিনি ইংরেজী, ফরাসী, জার্ম্মানী এবং সুইডিস ভাষাতেও অনর্গল-ভাবে বক্তৃতা করিতে পারিতেন। তাঁহার স্মৃতিশক্তি অসাধারণ রকমের ছিল এইজন্য যৌবনে তিনি তাঁহার সতীর্থ-সমাজে ভারতের মেকলে বলিয়া অভিহিত হইতেন।

গত ১৯১১ সালে মার্কিন পণ্ডিতদের আমন্ত্রণক্রমে ডাক্তার হরদয়াল স্যানফ্রান্সিস্কোতে গমন করেন। আমেরিকার বিদ্বজ্জন সমাজ তাঁহার গুণগ্রাহী হইয়া পড়েন এবং মার্কিন সমাজে তিনি অনেক বিশিষ্ট বন্ধু লাভ করেন। এই সময় তিনি ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

গত অক্টোবর মাসে তিনি আমেরিকায় গমন করেন, এবং তথায় তাঁহার মৃত্যু ঘটে। ফিলাডেল-ফিয়াতে তাঁহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সাধিত হয়। গত ১২ই মার্চ্চ নিউ ইয়র্কে তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া একটি সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় জগতের বিভিন্নদেশে এবং বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকিয়া ভারতের এই স্বদেশ প্রেমিক সন্তানের স্মৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন। দেশপূজ্য লালা লাজপৎ রায় তাঁহার 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পুস্তকে ডাক্তার হরদয়ালের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"ডাক্তার হরদয়াল একজন অসামান্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ। তিনি শুদ্ধচারী এবং সংযত জীবন যাপন করেন, অপরকেও তাহাই করিতে বলেন। তিনি ভাব-রসিক ব্যক্তি। অসামান্য রকমের ছিল তাঁহার সরলতা এবং আর্জ্জব; লোকের নিন্দা-স্তুতিতে তিনি উদাসীন। তিনি কাহারও অনুগ্রহের ভিখারী নহেন এবং নিগ্রহকেও ভয় করেন না। তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাব সহস্র সহস্র লোকের চিত্ত তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করে।"

কিছুদিন পূর্ব্বে মহামতি এণ্ডরুজ ডাক্তার হরদয়ালকে ভারত প্রবেশে অনুমতি প্রদান করিবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়া একটি বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন। এই বিবৃতিতেও তিনি ডাক্তার হরদয়ালের পাণ্ডিত্য, আদর্শ জীবন এবং ভগবদ্ভক্তি বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন এবং দুঃখের বিষয় যে, ভারতের আধ্যাত্মিক আদর্শ ডাক্তার হরদয়ালের জীবনের সাধ্য এবং সাধনা ছিল, তিনি সেই ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিতে পারেন নাই। বিদেশেই ভারতের এই বিশিষ্ট সন্তানকে চিরতরে নেত্র নিমীলিত করিতে হইয়াছে।

তিনি ভারতের লোক-ব্যবহার, সমাজ-নীতি এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে ইংলণ্ড, আমেরিকা, সুইডেন, জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশের প্রধান প্রধান সাময়িক পত্রে অনেক মূল্যবান্ প্রবন্ধ লিখেন। 'সংস্কৃত সাহিত্যে বোধিসত্ত্বের সাধনা' নামক তাঁহার প্রগাঢ় গবেষণা পূর্ণ গ্রন্থখানি বৌদ্ধ-দর্শন সম্বন্ধে জগতের সর্ব্বত্র একখানা প্রামাণ্য পুস্তক বলিয়া সম্মান লাভ করিয়াছে। ১৯৩৪ সালে লণ্ডনের ওয়াটস্ কোম্পানী, তাঁহার লিখিত 'আত্মানুশীলন' নামক গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন। এই বইখানারও বিশেষ নাম আছে। ১৯৩৮ সালে 'দ্বাদশ ধর্ম্ম এবং আধুনিক জীবন' শীর্ষক পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়, এইখানাই তাঁহার শেষ পুস্তক।

আমেরিকায় গমন করিয়া ডাক্তার হরদয়াল বিভিন্ন বিদ্বৎ-প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে বহু স্থানে বক্তৃতা করেন এবং তাঁহার এই সব বক্তৃতার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। আমেরিকার আরও অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বক্তৃতা করিবার নিমিত্ত আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন এবং কথা ছিল যে, এপ্রিল মাসে তিনি লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

ডাক্তার হরদয়ালের নির্ব্বাসিত প্রবাস-জীবন অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। ভারত যদি কোন দিন স্বাধীনতা লাভ করে, তাহা হইলে হয়ত তাঁহার কর্ম্ম-সাধনার সব কথা প্রকাশ হইবে

ইটালীর আলবেনিয়া অধিকার

জার্ম্মানী চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করিয়াছে, মেমল হাত করিয়াছে, রুমেনিয়ার সঙ্গে চুক্তি করিয়া প্রকারান্তরে রুমেনিয়ার তেলের খনিগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এখন সে পোল্যাণ্ডের দ্বারদেশে সসৈন্য বলবাহনে দণ্ডায়মান, বাকী শুধু কৃপা করিয়া একটু পা বাড়ান। ওদিকে জার্ম্মানীর দোস্ত ইটালীর পালা এবার আরম্ভ হইয়াছে। আজকালকার বড় খবর হইল ইটালী কর্ত্তৃক আলবেনিয়া অধিকার। আলবেনিয়া গ্রীস ও যুগোশ্লাভিয়ার মাঝখানে একখানি ছোট রাজ্য। ১৯২০ সালে আলবেনিয়ায় সর্ব্বপ্রথম সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তুরস্ক এবং আলবেনিয়া এই দুইটিই ছিল ইউরোপের মধ্যে মুসলমান রাজ্য, আলবেনিয়া ইটালীর হাতে

রাজা জোগ

যাওয়ার ফলে ইউরোপে একমাত্র তুরস্কই মুসলমান রাজ্য থাকিল

ক্ষুদ্র আলবেনিয়ার এই পার্ব্বত্য রাজ্যের ইতিহাস বৈচিত্র্যপূর্ণ। এখানকার অধিবাসীরা যেমন দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির, এই রাজ্যের ইতিহাসও নানারূপে অন্তর্দ্রোহ এবং যুদ্ধ বিগ্রহের দ্বারা পূর্ণ। ইটালীর সহিত আলবেনিয়ার অভ্যান্তরীণ ব্যাপারের সম্পর্ক বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে বিশেষভাবেই আরম্ভ হয়। বিগত মহাযুদ্ধের পর ইটালী, ফ্রান্স এবং যুগোশ্লাভিয়া ইহারা প্রত্যেকেই আলবেনিয়ায় এক একটি অংশ দখল করে কিন্তু পরে আলবেনিয়া ইটালীয়ানদিগকে তাড়াইয়া দেয়। ১৯২০ সালের আগষ্ট মাসে ইটালী আলবেনিয়ান গবর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিয়া ঐ রাজ্য ত্যাগ করে। শক্তিবর্গ যুগোশ্লাভিয়াকেও আলবেনিয়া ত্যাগ করিতে বাধ্য করেন। ১৯২২ সালে আলবেনিয়ার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন জোগ। ইটালীর ভাবাভাষী অঞ্চলকে ইটালীর অন্তর্ভুক্ত করিবার বিরোধী হওয়ায় তাঁহার বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়, ইহার ফলে তিনি পদত্যাগ করেন; কিন্তু ১৯২৫ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী জোগই আলবেনিয়ার গণতন্ত্রের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ১৯২৩ সালে ইটালীর নিকট হইতে আলবেনিয়া অনেক টাকা ঋণ গ্রহণ করে। ১৯২৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর জোগকে আলবেনিয়ার রাজা বলিয়া ঘোষণা করা হয়। রাজ্য ত্যাগ করিয়া গ্রীসে পলায়ন করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্তও তিনি ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

রাজা জোগের পিতা আলবেনিয়ার পার্ব্বত্য জাতির একজন সর্দ্দার ছিলেন। রাজা জোগের পিতা ছিলেন জেলাল বে। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে আহম্মদ জোগ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের পরিবার নিষ্ঠাবান মোশ্লেম পরিবার ছিলেন। জোগ কনস্তান্তিনোপলে শিক্ষা লাভ করেন। তাঁহার বয়স যখন ২০ বৎসর তখনই তিনি বলকান প্রদেশের রাজনীতিতে বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল হইয়াছিলেন। জোগের পিতৃ-পুরুষেরা বহুবার দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়াছেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে আলবেনিয়া স্বাধীনতা লাভ

রাণী গেরাল্ডাইন

করে। কিন্তু জোগ আলবেনিয়ায় শান্তিপূর্ণ প্রজা স্বরূপে জীবন-যাপনের সুযোগ লাভ করেন নাই। তিনি বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ হইতে বিগত মহাসমর শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত জোগ ভিয়েনাতে ছিলেন। দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জোগ আলবেনিয়ার স্বাধীনতাকামী সামরিক দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং ইটালীয়ানদিগকে ও যুগোশ্লাভদিগকে আলবেনিয়া হইতে বিতাড়িত করেন। ২০ বৎসর বয়স হইতেই স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে তিনি লিপ্ত হইয়াছিলেন। চোরাগুলী চালান হইতে প্রকাশ্যভাবে শত্রুর সম্মুখীন হইয়া ছোরা চালান —সকল রকম কসরৎই তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ১৯২০ সালে জোগ আলবেনিয়ার নরম দলের নেতা হন, এই দল যুগোশ্লাভিয়ার পক্ষপাতী ছিল, সরকারপন্থী দলের নেতা ছিলেন ফান নোল, তিনি এবং তাঁহার দলবল ইটালীর পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯২৩ সালে জোগ সরকারপন্থী দলের মন্ত্রিসভার প্রভুত্ব ধ্বংস করেন; কিন্তু ১৯২৪ সালে ইটালীয়ানদের সহায়তায় ফান নোল জোগের প্রভুত্ব নষ্ট করেন এবং

জোগ যুগোশ্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডে পলায়ন করেন। বেলগ্রেডে গিয়া জোগ প্রবাসী আলবেনিয়ানদিগকে লইয়া দল পাকাইতে থাকেন এবং এই দল লইয়া তিনি আলবেনিয়া আক্রমণ করেন। তাঁহার আক্রমণের ফলে ফান নোল পলায়ন করিতে বাধ্য হন। ফান নোল একজন খৃষ্টান পাদরী। ইনিই সর্ব্বপ্রথম আলবেনিয়ান ভাষায় সেক্সপিয়ারের নাটকের অনুবাদ করেন। নোল পলায়ন করিয়া বহু দিন আমেরিকাতে ছিলেন। টাকার অভাবে তাঁহার চিকিৎসা চলিতেছে না, এই সংবাদ পাইয়া জোগ শত্রুপক্ষীয় দলের এই নেতার শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিবার জন্য টাকা পাঠাইয়া দেন। চিকিৎসার পর বহরের ঘাঁটী, যুদ্ধের তোড়জোড় যত আছে সব ইটালীর কাছে বিক্রয় করিতে হইবে। রাজা জোগ এইগুলিতে স্বীকৃত হন নাই, কিন্তু উচ্চ বিদ্যালয়সমূহে ইটালীয় ভাষা শিক্ষা তিনি বাধ্যতামূলক করেন এবং সরকারী বৃত্তিধারী যত ছেলে, ঠিক হয়, তাহাদিগকে ইটালীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পড়াইবার জন্য পাঠান হইবে। তাঁহার নীতিতে এই ইটালীয় বশ্যতা প্রতিফলিত হওয়ার ফলে তাঁহার শাসনের বিরুদ্ধে কয়েকবার বিদ্রোহ ঘটে। কিন্তু রাজা জোগ কঠোর হস্তে বিদ্রোহ দমন করেন। দেশের জনসাধারণের নিকট রাজা জোগ যে খুব প্রিয় ছিলেন, এ কথা বলা যায় না, তাহা
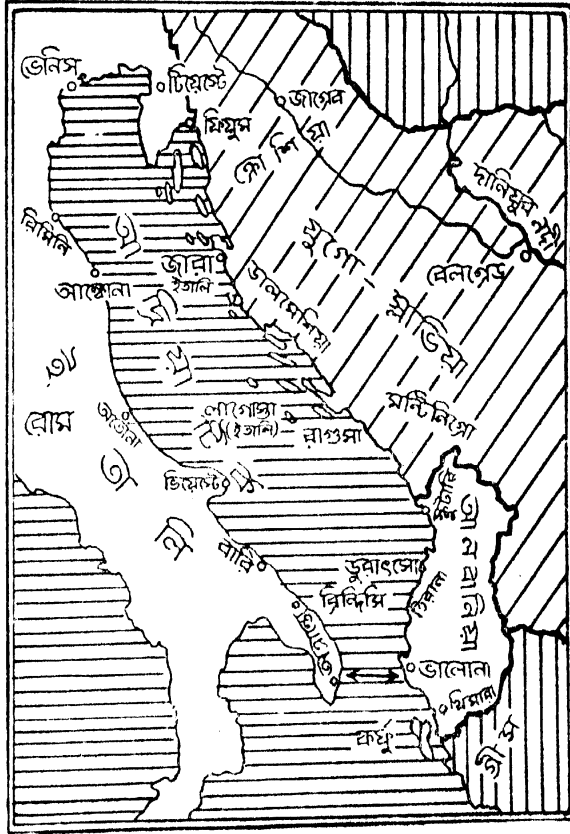
আলবেনিয়ার মানচিত্র

আরোগ্যলাভ করিয়া ফান নোল আলবেনিয়াতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং পরে তিনি জোগের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু হন।

জোগ ইটালীর পক্ষপাতী বলিয়া পরে পরিচিত হইয়াছিলেন। ১৯৩৩ সালে সিনর মুসোলিনী জোগের নিকট সাতটি দাবী উপস্থিত করেন, জোগ এইগুলির মধ্যে চারিটি দাবী অস্বীকার করেন। এই চারিটির মধ্যে একটি দাবী ছিল এই যে, যে-সব কর্ম্মচারী ইটালীয়ান নয়, কিম্বা ইটালীতে শিক্ষালাভ করে নাই, তাহাদিগকে বরখাস্ত করিতে হইবে এবং পুলিশ বিভাগে যে-সব ইংরেজ কর্ম্মচারী আছে তাহাদিগকে বিতাড়িত করিতে হইবে। ইহা ছাড়া [illegible] সত্ত্বেও তাঁহার শাসনকালে আলবেনিয়ার অনেক উন্নতি ঘটে। তিনি প্রাচীনপ্রথার নাগপাশ হইতে জাতিকে মুক্তিদান করেন। নারীদিগকে স্বাধীনতা দেন, পর্দ্দাপ্রথা নিষিদ্ধ হয়। তাঁহার শাসনাধীনে আলবেনিয়ার কার্য্যেও নারীদিগকে নিয়োগ করা হইয়াছে। জোগের শাসনকালে আলবেনিয়ায় ৬২২টি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি এই নিয়ম করেন যে, প্রত্যেক আলবেনিয়ানকে বৎসরের মধ্যে ১০ দিন করিয়া সরকারের কাজ করিতে হইবে।

দেশের সংস্কারকার্য্য সাধনের জন্য ইটালীর নিকট হইতে

বেনিয়া ইউরোপের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অনুন্নত দেশ। সে দেশের উন্নতি সাধন করিতে হইলে অর্থের আবশ্যক; কিন্তু সে টাকা দিবে কে? ইংরেজ কিংবা ফরাসী কেহই আলবেনিয়ার জন্য টাকা ধার দিতে রাজী হয় নাই, যুগোশ্লাভিয়ার নিজের টাকার অভাব। ইটালী টাকা ধার দিয়া আলবেনিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত কতকগুলি অধিকার নিজের একচেটিয়া করিয়া লয়। ইটালী ছাড়া অন্য কাহারও নিকট পেট্রল বিক্রয় করিবার অধিকার আলবেনিয়ার ছিল না। ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি সামরিক চুক্তিও ছিল। ইটালীর নিকট এই সুবিধা ছিল বড় সুবিধা, কারণ, আলবেনিয়ার উপর কর্ত্তৃত্ব থাকিলে আদ্রিয়াটিক উপসাগরের উপর কর্ত্তৃত্ব থাকে, এবং তাহার অর্থই যুগোশ্লাভিয়ার উপর কর্ত্তৃত্ব।

পররাষ্ট্র নীতির উপর এই কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার স্পৃহাই ইটালীর আলবেনিয়া অধিকারের কারণ যে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। সিনর মুসোলিনী প্রথমটা ঠিক তাঁহার বন্ধু হিটলারের নীতিরই অনুসরণ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, আলবেনিয়ার স্বাধীনতা হরণের ইচ্ছা তাঁহার আদৌ নাই; কিন্তু পরে কাজে দাঁড়াইল অন্য রকম। হিটলার এবং মুসোলিনী দুইজনে জোট বাঁধিয়া কাজ করিতেছেন। তাঁহারা যাহা ধরেন, তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া ছাড়েন। এই নীতিরই পরিণতি আলবেনিয়া অধিকার। হিটলার মুসোলিনীর এই কার্য্যকে বাহবা দিয়াছেন। সে বাহবা শুনিয়া ইংরেজ, ফরাসী কি মনে করিতেছেন জানা যায় না; তবে তাঁহারা ইহা স্পষ্টই বুঝিতেছেন, হিটলার এবং মুসোলিনী, ইঁহাদের যে জোট তাহা ভাঙ্গা দুঃসাধ্য। ইংরেজরা একদিকে কর্ণেল যে বেককে খানাপিনা দিয়া নিজেদের দলে ভিড়ান যায় কিনা সেই চেষ্টা দেখিতেছেন; ওদিকে আদ্রিয়াটিক উপসাগরের কূলে জগতের ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। এই অধ্যায়ের শেষ কোথায় এখনও কেহ বলিতে পারিতেছেন না। তবে ইহা নিশ্চয় যে, ইহার শেষ এইখানে নয়। হিটলার যাহা বলিতেছেন, তাহার মধ্যে লুকো ছাপা কিছু নাই। মুসোলিনী যাহা বলিতেছেন, তাহাও সোজাসুজি। মুসোলিনীর যে নীতির ফলে স্পেনে ফ্রাঙ্কোর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে এবং যে নীতির ফলে আলবেনিয়ার স্বাধীনতা অপহৃত হইল, সে নীতির লক্ষ্য আরও অনেক দূর পর্য্যন্ত। ইংরেজ আজ উপরে উপরে আশ্বস্তির ভাব দেখাইয়া বলিতেছে বটে যে, আলবেনিয়ার ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে তাঁহাদের স্বার্থের কোন সংস্রব নাই; কিন্তু মুসোলিনী যে নীতি লইয়া কাজে নামিয়াছেন, তাহা যে ক্রমে পরিপুষ্ট হইয়া এশিয়ার পশ্চিমদিকে এবং আফ্রিকার উপকূলভাগে ইংরেজ এবং ফরাসীদিগকে বিপন্ন করিবে ইহা নিশ্চিত। ইটালী আজ আলবেনিয়া অধিকার করিল, অদূর ভবিষ্যতেই সে দাবী করিবে যে, তিনটি প্রণালীপথ আমরা চাই। ভূমধ্যসাগরের উপকূলভাগে আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য আরম্ভ করিয়াছেন যে, বহু শতাব্দীকাল ইংরেজ এবং ফরাসী ভূমধ্যসাগরের উপর প্রভুত্ব করিয়াছে, জগতে নিজেদের কর্ত্তৃত্ব চালাইয়াছে। সে যুগ এখন অতীত হইয়াছে। এখন আসিয়াছে আমাদের পালা। এখন আমরাই ভূমধ্যসাগরের মালিক। ইংরেজের জিব্রালটার—মাল্টা? সেগুলির প্রয়োজনীয়তা ইতিমধ্যেই লুপ্ত হইয়াছে। স্পেনে ইটালীর প্রভুত্ব, ম্যাজরকা দ্বীপে ইটালীর প্রাধান্য জিব্রালটারকে অকেজো করিয়া দিয়াছে। এখন ইটালীর দরকার টিউনিস আর চাই টিউনিসের ধার দিয়া যে প্রণালীটা গিয়াছে সেই বাইজারটা (Bizerta) প্রণালী। আর চাই সুয়েজ খালের অধিকার।

ইটালী অবিলম্বেই এই দাবী করিবে যে, আবিসিনিয়ার যখন আমিই কর্ত্তা, তখন জিবুটি আমার হাতে থাকা দরকার। ইতিমধ্যেই সে জিবুটিতে ফরাসীদের অবস্থান অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। আবিসিনিয়া হইতে ফরাসী এবং ইংরেজদিগকে বিতাড়িত করিয়াছে। আবিসিনিয়াতে ব্যবসা-বাণিজ্য করিবার অধিকার ইটালীয়ান ছাড়া অন্য কাহারও নাই। তারপর জিবুটি যদি সে একবার দখল করিয়া বসিতে পারে, তাহা হইলে এডেনের উপরও তাহার প্রভুত্ব পরোক্ষভাবে আসিয়া বর্ত্তিবে। তখন ইংরেজ আর—১৯৩৫ সালে যাহা পারিত, তেমনভাবে ইটালীকে লোহিতসাগরের পথে অবরুদ্ধ রাখিতে পারিবে না। ইটালীর এই নীতিকে লক্ষ্য করিয়াই প্যারিসের 'লা তাঁ' পত্র লিখিয়াছেন—ইংরেজ এবং ফরাসী, জগতে এতদিন এই দুই শক্তির প্রভুত্ব ছিল, এখন তাহাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে এই সত্যকে যে, তাহাদের প্রভুত্বের যুগ অতীত হইয়াছে এবং তাহারা কিছুতেই নিজেদের শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহাদের ধ্বংসোন্মুখ সাম্রাজ্যকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না।

প্রবল শক্তির আক্রমণে ইউরোপের একটি অসহায় রাষ্ট্রের স্বাধীনতা আজ অপহৃত হইল। রাজা জোগ আজ পলাতক, রাণী জেরাগডাইন সদ্যপ্রসূত শিশুসন্তান সহ গ্রীসের ফ্লোরিণায় আশ্রয় লইয়াছেন। তথা হইতে তিনি কাতরকণ্ঠে বিশ্ববাসীকে জানাইয়াছেন—'প্রবলের আক্রমণ রোধ করিবার কি শক্তি আমাদের আছে?' আলবেনিয়ার সৈন্যসংখ্যা মোট ২৬ হাজার; কিন্তু ইটালীর সেনাদের মত তাহারা সুশিক্ষিত নয়, অস্ত্রশস্ত্রও তেমন ভাল ছিল না। সংবাদে দেখা যায়, তবু তাহারা স্থানে স্থানে ইটালীর সেনাদিগকে কিছু বাধা দেয়। কিন্তু ৩৫ হাজার আধুনিক সশস্ত্রে সুসজ্জিত ইটালীয় সেনার গতি রোধ করিতে তাহারা সক্ষম হয় নাই। ইটালীয়দের বোমা বর্ষণের ফলে আলবেনিয়ার কয়েকটি শহর

বর্ত্তমান পরিস্থিতির আলোচনা করিয়া বিলাতের ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' পত্র লিখিয়াছেন,–

"ইটালী ভূমধ্যসাগরের কর্ত্তৃত্ব করিবে, ইহাই তাহার সংকল্প। স্পেনে জার্ম্মান এবং ইটালীয়ানেরা তাহাদের ঘাঁটি পাকা করিতেছে। ম্যাজরকা দ্বীপে তাহারা যে আধিপত্য লাভ করিয়াছে, স্পেনের বিভিন্ন বন্দরে এবং স্পেনের অধিকৃত মরক্কোতে আজ তাহাদের যে প্রাধান্য, তাহাকে আশ্রয় করিয়া তাহারা ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম অংশের দিকে অগ্রসর হইতেছে; জার্ম্মানী চেকোশ্লোভাকিয়ার উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতেছে। আর ইটালী আলবেনিয়া দখল করিয়া ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্ব দিকে দক্ষিণ দিক জুড়িয়া অধিকার বিস্তারে চেষ্টিত হইয়াছে। এখনও যদি কেহ বলেন যে, ইটালীর এই কার্য্যের ফলে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্ববৎ অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, কাজেই ইংগ-ইটালীয় সন্ধি ভঙ্গ হয় নাই, তাঁহার সে উক্তি নিতান্তই হাস্যকর হইবে। হিটলারের সম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের যেমন চোখ খুলিয়াছে, সেইরূপ মুসোলিনীর সম্বন্ধেও তাঁহাদের চোখ খোলা উচিত।" কিন্তু চোখ খুলিলে কি হইবে, বুঝাপড়া যে শক্তির।

সাহিত্য সম্মেলনে অধ্যাপক কাজী আব্দুল ওদুদের অভিভাষণ

(৬৩৮ পৃষ্ঠার পর)

ভূতির গভীরতা থেকেই যে সাহিত্য উৎসারিত হয় সেই উৎসারিত হওয়ার ভঙ্গিমাটী এতে আছে।

যুগধর্ম্মের সঙ্গে সাহিত্যের এমন যোগ বলেই একালের যে যুগধর্ম্ম তা যে সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করবে এ অত্যন্ত স্বাভাবিক। হচ্ছেও তাই। একালের প্রত্যেক বড় সাহিত্যিকের রচনার উপরে বিজ্ঞানের প্রভাব যেমন পড়েছে তেমনিভাবে পড়ছে গণতন্ত্র ও ধন-সাম্য তত্ত্বের প্রভাব। বাংলা সাহিত্যও যে সেদিকে যাবে তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। বরং না গেলেই আশ্চর্য্যের বিষয় হবে। তবু বুঝবার আছে যে, যুগধর্ম্ম যত প্রবল যত মহান্ হোক সাহিত্য-সৃষ্টির ব্যাপারে তা উপলক্ষ। সাহিত্য জ্ঞান মাত্র নয় কল্যাণ-বুদ্ধি মাত্র নয়, সাহিত্য জ্ঞান-কল্যাণ-আনন্দ-ঘন মূর্ত্তি —সাহিত্য ব্যক্তিত্বের পরম দান। মনো-জীবনের উপরে জোর সেইজন্য দিতে হয়।

আমার বক্তব্য শেষ হয়েছে। আমাদের এ কালের সাহিত্যে যে শ্রীহীনতা দেখা দিয়েছে সেটি একটি তুচ্ছ সাময়িক ব্যাপার নয়, তার মূল কারণ আমাদের চিৎশক্তির দৈন্য, এই কথা বলতে চেষ্টা করেছি। আমাদের সেই দৈন্য দূর করে' সুস্থ ও সবল মানসিকতা লাভের একটি সুযোগ আমাদের ঘটেছিল; কিন্তু তার সদ্ব্যবহার করা হয়নি—একথাও উঠেছে। সমস্যাটিকে এই দিক দিয়ে দেখেছি বলে আমাদের সাহিত্যের প্রচলিত সমস্যাগুলোর দিকে তাকাবার সুযোগ হয় নি। আমাদের সাহিত্যের, তথা জীবনের, যে সঙ্কটের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি সেটি বাস্তবিকই একটি সঙ্কট, না আপনাদের স্বস্তিহীন করবার ফন্দি মাত্র —সে বিচারের ভার আপনাদের হাতে।

পরলোকে জলধর সেন

রায় বাহাদুর জলধর সেন গত ১ই এপ্রিল, রবিবার অপরাহ্ণ তিনটার সময় পরলোকগমন করিয়াছেন। যে বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, বাঙ্গালীর পরমায়ুর হিসাবে তাহাকে অকাল মৃত্যু বলা চলে না, কিন্তু এই একটি মানুষ তাঁহার উদারচিত্ত ও প্রসন্নহাস্যের সহযোগে বাঙ্গলার সাহিত্য ও সাহিত্যিক সমাজের সহিত এমন নিবিড়ভাবে জড়িত ছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যু অকালমৃত্যুর মতই বেদনাদায়ক বোধ হইতেছে। আর, আমরা, যাহারা তাঁহার স্নেহ ও সান্নিধ্যলাভের সুযোগ পাইয়াছিলাম, আমাদের পক্ষে সে বেদনা স্বজনবিয়োগ-বেদনার মতই মর্ম্মান্তিক।

১২৬৬ ১লা চৈত্র কুমারখালির সুপ্রসিদ্ধ কায়স্থ বংশে জলধর সেন মহাশয়ের জন্ম হয়। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে কুমারখালি বিদ্যালয় হইতে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া
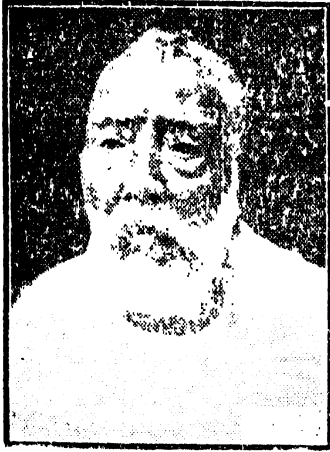
তিনি ১০ বৃত্তি পান। এফ-এ পরীক্ষায় তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অল্প বয়স হইতেই বাঙ্গলা সাহিত্যে তাঁহার অনুরাগ দৃষ্ট হইত। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি "গ্রামবার্ত্তায়" লিখিতে আরম্ভ করেন। "গ্রামবার্ত্তায়" প্রকাশিত তাঁহার প্রথম রচনা—"ভজহরির মেলা দর্শন।" তখন তাঁহার বয়স মাত্র ১৬।১৭।

১৮৮১ সালে "গ্রামবার্ত্তার" সম্পাদক স্বর্গীয় হরিনাথ মজুমদার মহাশয় যখন অসুস্থতা হেতু পত্রিকা পরিচালনে অসমর্থ হইলেন, তখন তিনি কিছু দিনের জন্য উক্ত পত্রিকার সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। "গ্রামবার্ত্তায়" তাঁহার ২০।২৫টি রচনা প্রকাশিত হয়। "সোম প্রকাশে"ও তাঁহার রচনা প্রকাশিত হইত।

এই হরিনাথ মজুমদার 'কাঙ্গাল হরিনাথ' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি গ্রামে জাতীয়তামূলক আন্দোলনের প্রবর্ত্তক। 'গ্রামবার্ত্তা'র মধ্য দিয়া তিনি এই জাতীয়তার ভাব সাধারণের মধ্যে উন্মেষ করিতে থাকেন। তিনি জাতীয়তামূলক ও ভগবৎভক্তি বিষয়ক বহু গান ও কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। এ গানগুলি ফকির ফিকিরচাঁদের গান নামে তখন সাধারণের নিকট পরিচিত হয়। জাতীয়তার ভিত্তি ভগবৎপ্রেম ও ভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত—তিনিই প্রথম তাঁহার সংগীতে ও রচনায় তাহা ব্যক্ত করেন। জলধরবাবু তাঁহারই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। কাঙ্গাল হরিনাথের কথা বলিতে বলিতে তিনি অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিতেন না। তিনি কাঙ্গাল হরিনাথের একখানা জীবনীও লিখিয়া গিয়াছেন।

জলধরবাবুর পিতার নাম হলধর সেন। ইনি কুমারখালি গ্রামের রামজয় প্রামাণিকের দেশী কাপড়ের দোকানের গোমস্তার কাজ করিতেন। তাঁহার এক জ্যেষ্ঠা সহোদরা ছিলেন, ছোট ভাই-এর মৃত্যুর পর তাঁহার মৃত্যু হয়। কনিষ্ঠ সহোদর শশধর সেন বি-এ মহাশয় ১৩১৩ সালে বসন্ত রোগে মারা যান।

জলধর সেন মহাশয় প্রথমে গোয়ালন্দে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই সময়ে কলেরায় তাঁহার প্রথমা পত্নীর অকাল বিয়োগ ঘটে। ইহারই এক মাস পরে তাঁহার মাতাঠাকুরাণী পরলোকগমন করেন। তখন তাঁহার বয়স ২৭ বৎসর। ইহার তিন বৎসর পরে তিনি প্রবাস-যাত্রা করিয়া দেরাদুনে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হন।

১২৯৭ সালে তাঁহার হিমালয় যাত্রা সুরু হয়। ঐ সময় তিনি হিমালয় পর্ব্বতের দুর্গম স্থানও ভ্রমণ করেন। তাঁহার সেই ভ্রমণ কাহিনী সম্বলিত "হিমালয়" নামক গ্রন্থ বাঙ্গলা সাহিত্যের এক অপূর্ব্ব সম্পদ। দুই বৎসর পরে তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করেন। প্রত্যাবর্ত্তনের পর ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দ্বিতীয়বার বিবাহ হয়। প্রায় তিন বৎসরকাল তিনি মহিষাদল রাজের গৃহ-শিক্ষকের কাজ করেন। তারপর "বঙ্গবাসীর" সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। কিছু দিন পরে তিনি সাপ্তাহিক "বসুমতীর" সহকারী সম্পাদক ও পরে সম্পাদক পদে বৃত হন। ১১ বৎসরকাল তিনি "বসুমতী" সম্পাদন করেন। স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদের মৃত্যুর পর তিনি "হিতবাদী"র সম্পাদকীয় বিভাগে কিছুকাল কাজ করেন, পরে তিনি ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে "হিতবাদী"র সম্পাদক নিযুক্ত হন। ইহার দুই বৎসর পরে তিনি সন্তোষের ভূম্যধিকারী প্রমথনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র-কন্যাদের গৃহ-শিক্ষক হন। কিছুকালের জন্য তিনি সন্তোষ ষ্টেটের দেওয়ানের কার্য্যও করেন। "সুলভ সমাচার" প্রকাশিত হওয়ার পর জলধর সেন মহাশয় উহার সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেন। "সুলভ সমাচারের" সম্পাদক স্বর্গীয় নরেন্দ্রনাথ সেনের মৃত্যু হইলে, তিনি ১৯১১ খৃষ্টাব্দে উক্ত পত্রিকার সম্পাদক হন। তৎপরে ১৩২০ সালে তিনি "ভারতবর্ষে"র সম্পাদক হন।

ভ্রমণবৃত্তান্ত, ছোট গল্প, উপন্যাস ইত্যাদিতে তাঁহার বহু গ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে "প্রবাস চিত্র" "হিমালয়" "নৈবেদ্য" "দুঃখিনী", "বিশুদাদা", "অভাগী" প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীতও তিনি কয়েকখানি গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন। ১৯২২ সালে ইনি রায় বাহাদুর উপাধি লাভ করেন।

"গ্রামবার্ত্তা"র সম্পাদক সাধু প্রকৃতির হরিনাথ মজুমদার মহাশয় 'কাঙ্গাল হরিনাথ' নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার স্মৃতি এখনও অনেকের হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে।

জলধরবাবুর সাত পুত্র ও চারি কন্যা বর্ত্তমান। বিগত মাঘ মাসে তাঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রীর মৃত্যু হয়।

জলধরবাবু ১৩২৯-১৩৩০ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ১৩৩৫ সালে তিনি প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের "ইন্দোর" অধিবেশনে সাহিত্য শাখার সভাপতিত্ব করেন।

১৩৪১ সালে জলধরবাবুর পঞ্চসপ্ততিতম জন্মতিথি উপলক্ষে বাঙ্গলার জনগণ ও সাহিত্যিকগণ তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করেন।

তিনি 'রবিবাসরের' সঙ্গে ইহার প্রতিষ্ঠা অবধি যুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন ইহার প্রাণ। তাঁহাকে সভ্যগণ 'সর্ব্বাধ্যক্ষ' পদ দান করিয়াছিলেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে দমদমে তুলসীমঞ্জরী উদ্যানে রবিবাসরের উদ্যোগে তাঁহার অশীতিতম জন্মতিথি উপলক্ষে একটি সভার অধিবেশন হয়। তখন তাঁহাকে অতি কষ্টে সভাস্থলে আনয়ন করা হয়। তখনকার অবস্থা দেখিয়াই উপস্থিত সকলে শঙ্কিত হইয়াছিলেন।

বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীকাল ধরিয়া তিনি অকৃত্রিম ও অনলস সেবায় বঙ্গভারতীকে যেভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছেন, সুদীর্ঘকাল বাঙ্গলা দেশ সে ঋণ সকৃতজ্ঞ অন্তরে স্মরণ করিবে। তাঁহার কাছে তাঁহার সাহিত্যের উল্লেখ করিবার উপায় ছিল না। বাণী লক্ষ্মীর মন্দিরে তিনি ছিলেন সাধু তুকারাম। কোন দিন মন্দিরের পুরোভাগে আসিবার চেষ্টা করেন নাই। চিরকাল তিনি নিজেকে সাহিত্যিকের সেবক বলিয়া গর্ব্ব করিতেন। এ শুধু তাঁহার মুখের বিনয় নয়, সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী সকল চিন্তা ও সকল কর্ম্মে এই সত্য তিনি প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেন।

সাহিত্য ছিল তাঁহার অন্তরের ধন, সাহিত্যিক মাত্রেই ভাই। সদাহাস্যময় নিরহঙ্কার জলধরদাদার প্রতি সাহিত্যিকমাত্রেরই শ্রদ্ধা ও প্রীতির অবধি ছিল না। স্নেহ দিয়া, সাহস দিয়া, উৎসাহ দিয়া কত অখ্যাত সাহিত্যিককে তিনি খ্যাতির শিখরে উত্তীর্ণ করিয়াছিলেন, কত অলস সাহিত্যিককে সাহিত্য রচনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং কত কর্ম্মীর মনে সাহিত্যের প্রেরণা যোগাইয়াছিলেন—সে ইতিহাস বাহিরের লোকে না জানিলেও তাঁহার সান্নিধ্যে যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের অবিদিত নাই। নিজেকে সাহিত্যিকের সেবক বলিতে তিনি কি বুঝিতেন জানি না। আমরা জানি, "ভারতবর্ষে"র সম্পাদক হিসাবে বাণীমন্দিরের দ্বারে বসিয়া যে দাক্ষিণ্য তিনি ছোট বড় সকল সাহিত্যিকের শিরে অকাতরে বর্ষণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার সীমা নাই। বস্তুত পক্ষে গত অর্দ্ধ শতাব্দীকালে তাঁহার নিকট সাহিত্যিক সমাজের ঋণও সামান্য নয়। সাহিত্যিক হিসাবে, সাংবাদিক হিসাবে বাঙ্গলার সাংস্কৃতিক জীবনে তাঁহার দান অক্ষয় হইয়া থাকিবে। আর অগ্রজ হিসাবে, বন্ধু হিসাবে, সুহৃদ হিসাবে সাহিত্যিকের অন্তরে যে আসন তিনি অধিকার করিয়া আছেন তাহাও কোন দিন ম্লান হইবে না। তাঁহার পুত্র-পৌত্রাদি পরিজনবর্গের শোকে সহানুভূতি জানাইবার কিছু নাই। সমগ্র বাঙ্গলা দেশ সেই শোকের অংশ গ্রহণ করিতেছে।

নব-বর্ষ

সুষমারাণী সেন (চৌধুরী)

ঘন-ঘোর রজনীর কৃষ্ণ যবনিকা,
প্রশান্ত প্রভাতে আজ ছিন্ন ভিন্ন করি'
প্রাচী-র ললাটে ওই নবারুণ লিখা
উদিয়াছে অপরূপ দীপ্ত তেজ ধরি!

পুরাতন হ'ল গত, এসেছে নবীন
দিকে দিকে উড়াইয়া বিজয় নিশান:
কাল ঘূর্ণী বায়ুতলে হ'য়েছে বিলীন,
মুমূর্ষুর শেষ শিখা ক্ষীণ কম্প্রমান।

যারা যায় তারা ফিরে আসে নাকো আর
পুরাতন বর্ষ তব ছায়াবীথি তলে
কেটেছে যে দিনগুলি তারা পুনর্ব্বার
সৌরভ দিবে না মোর জীবন কমলে।

ক্ষোভ নাহি তারি তরে জানি চিরদিন
পুরাতন হ'তে সৃষ্টি হ'তেছে নবীন।

সাহিত্য-সংবাদ

আবৃত্তি ও রচনা প্রতিযোগিতা

(সালকিয়া বিষ্ণুপদ স্মৃতি পাঠাগার)

সাধারণের জন্য। (মহিলাগণও যোগ দিতে পারিবেন)

বিষ্ণুপদ মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ কাপ

বিষয়ঃ—১। "বেকার সমস্যা ও তাহার প্রতিকারের উপায়।" প্রথম পুরস্কার—চ্যালেঞ্জ কাপ ও একটি মিনিয়েচার কাপ। দ্বিতীয় পুরস্কার—একটি রৌপ্য পদক

স্কুলের ছাত্রদের জন্য। (ছাত্রীগণও যোগ দিতে পারিবেন)

শৈলেন্দ্রনাথ মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ কাপ

বিষয়ঃ—২। "নিরক্ষরতা ও তাহা দূরীকরণের উপায়।" প্রথম পুরস্কার—চ্যালেঞ্জ কাপ ও একটি মিনিয়েচার কাপ। দ্বিতীয় পুরস্কার—একটি রৌপ্য পদক। রচনা ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালিতে লিখিয়া আগামী ১৫ই এপ্রিল মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

সাধারণের জন্য আবৃত্তি

সত্যচরণ মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ কাপ

বিষয়ঃ—১। রবীন্দ্রনাথের "ভারত-তীর্থ।" (চয়নিকা ও প্রবেশিকা বাঙলা পুস্তক দ্রষ্টব্য)। প্রথম পুরস্কার—চ্যালেঞ্জ কাপ ও একটি মিনিয়েচার কাপ। দ্বিতীয় পুরস্কার—একটি রৌপ্য পদক।

স্কুলের ছাত্রদের জন্য আবৃত্তি

অনাথনাথ মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ কাপ

বিষয়—২। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর "বেলা যায়।" (প্রবেশিকা বাঙলা পুস্তক দ্রষ্টব্য)। প্রথম পুরস্কার—চ্যালেঞ্জ কাপ ও একটি মিনিয়েচার কাপ। দ্বিতীয় পুরস্কার—একটি রৌপ্য পদক। প্রতিযোগিগণকে আগামী ১৫ই এপ্রিলের মধ্যে তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। প্রতিযোগিতার সময়—১৬ই এপ্রিল, রবিবার বেলা আড়াই ঘটিকা। স্থান—সালিখা হিন্দু স্কুল, ২৮৭, গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড, সালিখা, হাওড়া।

নিবেদক—

পান্নালাল আঢ্য, শ্রীবিশ্বনাথ বসু-মল্লিক, যুগ্ম-সম্পাদক; ১৫১, শ্রীরাম ঢ্যাং রোড, সালিখা, হাওড়া।

দ্রষ্টব্যঃ—১। রচনার সমস্ত স্বত্ব বিষ্ণুপদ স্মৃতি পাঠাগারের থাকিবে এবং পাঠাগারের কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

২। রচনা ও যাবতীয় পত্রাদি সম্পাদকের নিকট উপরি উক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৩। কোনরূপ পত্রের উত্তর পাইতে হইলে উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প পাঠাইতে হইবে।

ছোট গল্প প্রতিযোগিতা

"খেয়া" পত্রিকার উদ্যোগে দুইটি ছোটগল্প প্রতিযোগিতা হইবে। যাঁহাদের গল্প সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে, গল্পের গুণানুসারে পুরুষদের মধ্যে দুইটি ও মহিলাদের মধ্যে দুইটি পদক পুরস্কার দেওয়া হইবে। গল্পগুলি মৌলিক হওয়া চাই এবং একসারসাইজ খাতার ১৬ পৃষ্ঠার মধ্যে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ১৫ই মের মধ্যে গল্পগুলি নিম্ন ঠিকানায় পাঠান চাই। একজন একাধিক গল্প পাঠাইতে পারেন।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মল্লিক,
২।২, বিশ্বনাথ মতিলাল লেন, বহুবাজার,
কলিকাতা।

চিত্র ও গল্প প্রতিযোগিতা

সচিত্র পথিকের পক্ষ হইতে একটি গল্প ও একটি চিত্র প্রতিযোগিতা আহ্বান করা যাইতেছে। গল্প বা চিত্র প্রতিযোগিগণ নিজেদের ইচ্ছামত পাঠাইবেন; তবে চিত্রটি ৫"×৭" ইঞ্চি অপেক্ষা বড় এবং ৩"×৫" অপেক্ষা ছোট না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। প্রতিটি বিষয়ের জন্য দুইটি করিয়া পুরস্কার পদক ও পুস্তকাদি দ্বারা দেওয়া হইবে। ১৫ই বৈশাখ ১৩৪৬-এর মধ্যে গল্প বা চিত্র নিম্ন ঠিকানায় পৌঁছান চাই। প্রতিযোগিগণের সংখ্যাধিক্য দেখিলে পুরস্কারের সংখ্যা বাড়াইয়া দেওয়া যাইবে। শ্রীরমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নগেনগঞ্জ; যোকাজান পোঃ আঃ; আপার আসাম।

রচনা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

ঝরণা সম্প্রদায়ের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে

১। রচনার বিষয়ঃ—"জাতি গঠনে সাহিত্যের সহায়তা"।

নারী পুরুষ নির্ব্বিশেষে যে কোন ব্যক্তি এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারিবেন। প্রবন্ধ ফুলস্কেপ সাইজের ছয় পৃষ্ঠার অধিক হইবে না। উহা কালি দিয়া লেখাই বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধ পাঠাইবার শেষ তারিখ ২০শে এপ্রিল ১৯৩৯।

[রচনা প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কার একটি "রূপার কাপ" ও দ্বিতীয় পুরস্কার একটি "রূপার পদক"।]

২। আবৃত্তির বিষয়ঃ—"ওরে নবীন ওরে আমার কাঁচা"। [রবীন্দ্রনাথের বলাকা হইতে।]

আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানীয় ব্যক্তিকে একটী 'রূপার কাপ' দেওয়া হইবে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় রচনা ও নাম সাদরে গৃহীত হইবেঃ—

শ্রীমৃণালকান্তি রায় [সম্পাদক ঝরণা]—হুগলী মহেশতলা, হুগলী।

"যাত্রী" প্রতিযোগিতার ফলাফল

১। গল্পঃ—১ম শ্রীপ্রবোধ ব্যানার্জী। ২২-সি চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গল্পের নাম—"স্বপ্ন"

২য়—শ্রীবাদল রায়। পোঃ—গাইবান্ধা, রংপুর।

গল্পের নাম "ফিরে পাওয়া"

২। কবিতাঃ—১ম—কুমারী কল্পনা মিত্র। আশুতোষ কলেজ চতুর্থ বর্ষ কলা, ভবানীপুর, কলিকাতা।

কবিতার নাম—"মনের গহন বনে"।

২য়—কুমারী শান্তি দাসগুপ্তা, C/o নির্ম্মলচন্দ্র দাসগুপ্ত, উকিল। কালীবাড়ী ওয়ার্ড, বরিশাল।

কবিতার নাম—"কবি"

পুরস্কার খুব শীঘ্র পাঠান হইবে।

শ্রীসত্যেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক "যাত্রী" সালিখা হাওড়া

হইয়াছে। অপর একটি দলকে ও উক্ত দলের অনুসরণ করিতে হইত, কেবল শেষের কয়েকটি খেলায় সাফল্য লাভ করায় রেহাই পাইয়া গেল। অপর যে কয়েকটি বাঙালী হকি দল প্রথম বিভাগীয় হকিতে বর্ত্তমান আছেন, তাহাদের কোনটিকেও প্রথম শ্রেণীর হকি দল বলা চলে না। নেহাৎ এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান খেলোয়াড়গণের খেলার ষ্টাণ্ডার্ড পড়িয়া গিয়াছে বলিয়াই তাঁহারা নিজ নিজ অস্তিত্ব রাখিতে পারিয়াছেন। আগামী বৎসরে ঐ সমস্ত দল প্রথম বিভাগীয় লীগে বর্ত্তমান থাকিবে কি না সেই বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

পূর্ব্ববর্ত্তী হকি লীগ বিজয়িগণ

১৯০৫-৬ বি ই কলেজ, ১৯০৭ ক্যালকাটা, ১৯০৮ বি ই কলেজ, ১৯০৯-১০ কাষ্টমস, ১৯১১ বি ই কলেজ, ১৯১২-১৩ কাষ্টমস, ১৯১৪-১৭ রেঞ্জার্স, ১৯১৮ মিলিটারী মেডিক্যাল, ১৯১৯ গ্রীয়ার স্পোর্টিং, ১৯২০ বি ই কলেজ, ১৯২১-২২ কাষ্টমস, ১৯২৩ গ্রীয়ার স্পোর্টিং, ১৯২৪-২৫ জেভেরিয়ান্স, ১৯২৬-২৭ কাষ্টমস, ১৯২৮-২৯ রেঞ্জার্স, ১৯৩০-৩৩ কাষ্টমস, ১৯৩৪ রেঞ্জার্স, ১৯৩৫ মোহনবাগান, ১৯৩৬-৩৮ কাষ্টমস, ১৯৩৯ কাষ্টমস।

"নববার্ষিকী" সম্বন্ধে শেষ কথা

শ্রীসজনীকান্ত দাস

আমার "নববার্ষিকী সম্পর্কে বিতর্ক" নিবন্ধটি কিঞ্চিৎ খণ্ডিত আকারে শ্রীবনবিহারী গুপ্ত মহাশয়ের "প্রত্যুত্তর" সহ গত ২৫শে চৈত্র, ১৩৪৫ তারিখে আপনার সুবিখ্যাত পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন দেখিয়া আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। কিয়দংশ আমার অজ্ঞাতসারে বাদ যাওয়াতে আমার লেখার শেষাংশ একটু সামঞ্জস্যহীন হইয়াছে। প্রভাতবাবুর পিতার কৃতিত্ব লোপের প্রসঙ্গ কেন তুলিয়াছিলাম, ওই কর্ত্তিত অংশেই তাহার কারণ ছিল।

এই অপ্রিয় প্রসঙ্গের জের টানিবার ইচ্ছাও আমার ছিল না, তবে বনবিহারীবাবু তাঁহার উত্তরের শেষে আমাকে লক্ষ্য করিয়া একটি 'চ্যালেঞ্জ নিক্ষেপ' করিয়াছেন বলিয়া বাধ্য হইয়াই 'চ্যালেঞ্জ' গ্রহণ করিতে হইল।

গুপ্ত মহাশয়ের চ্যালেঞ্জটি এই—।

"সজনীবাবু বলিয়াছেন যে, তাঁহার নিকট যে 'নববার্ষিকী' আছে, তাহাতে নাকি '১২—২৩ পৃষ্ঠায় বাঙলা ১২৮৪ সালের পঞ্জিকা আছে।'...সজনীবাবু যদি ১২৮৩ [১২৮৩ মুদ্রাকর-প্রমাদ, ১২৮৪ হইবে] সালের পঞ্জিকা-সম্বলিত নববার্ষিকী 'দেশ' সম্পাদককে কিম্বা কোনও নিরপেক্ষ বিচারকমণ্ডলীকে দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে আমি আমার সকল অভিযোগ প্রত্যাহার করিব এবং সজনীবাবু ও ব্রজেন্দ্রবাবু উভয়েই যে বলিতেছেন, আমার চিকিৎসার প্রয়োজন, তাহা স্বীকার করিয়া লইব। কিন্তু উহা না দেখাইতে পারিলে সজনীবাবু কি করিবেন?"

স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, বনবিহারী গুপ্ত মহাশয় আমার ১২৮৪ সালের পঞ্জিকা-বিষয়ক উক্তি বিশ্বাস করেন নাই। তাঁহার বিশ্বাস যাহাই হউক, আপনারা সহজেই এই বিতর্কের চরম নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন। ১২৮৪ সালের পঞ্জিকা-সম্বলিত 'নববার্ষিকী' আপনার প্রত্যক্ষ অবগতির জন্য এই সঙ্গে পাঠাইতেছি। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয়কে নিরপেক্ষ জানিয়া উক্ত 'নববার্ষিকী' তাঁহাকে দেখাইয়াছি। তাঁহার সাক্ষ্যও আপনি লইতে পারিবেন। আশা করি, ইহার পর শ্রীযুক্ত বনবিহারী গুপ্ত মহাশয় তাঁহার সকল অভিযোগ প্রত্যাহার করিবেন।

আরও দুইটি কথা নিবেদন করিবার অনুমতি চাহিতেছি। গুপ্ত মহাশয়ের "প্রত্যুত্তরে" তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছেন, 'নববার্ষিকী' ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাস ১২৮৪ বঙ্গাব্দের আষাঢ়-শ্রাবণ মাস। ১২৮৪ বঙ্গাব্দের আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে যে বার্ষিকী বাহির হইয়াছিল, তাহাতে ১২৮৪ বঙ্গাব্দেরই পঞ্জিকা থাকা স্বাভাবিক। ১২৮৭ সালের পঞ্জিকা থাকিবার কি সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে? সুতরাং, গুপ্ত মহাশয়ের 'নববার্ষিকী'টি যে পরবর্ত্তী কালের—এই সহজ অনুমান তিনি করিতে পারিতেছেন না কেন?

আমার দ্বিতীয় কথা, বিপিনবিহারী রায় সম্পর্কে। গুপ্ত মহাশয় যে 'নববার্ষিকী' হইতে বিপিনবিহারী রায় মহাশয়কে ধন্যবাদের প্রসঙ্গ উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেটি পরবর্ত্তী কালে অন্য কাহারও দ্বারা প্রকাশিত, সম্ভবত, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী মহাশয় কর্ত্তৃকই প্রকাশিত। বিপিনবাবু তখন ভিক্টোরিয়া-যন্ত্রের অধ্যক্ষ। কিন্তু 'নববার্ষিকী' প্রথম বাহির হয় ২১নং ভবানীচরণ দত্ত লেনের ডিরেক্টরী প্রেস হইতে। সুতরাং, পরবর্ত্তী কালে যদি কেহ তাঁহাকে ধন্যবাদই দিয়া থাকেন, তাহাতে কি প্রমাণিত হয়, রায় মহাশয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী কৃতিত্ব বাতিল?

সাপ্তাহিক সংবাদ

৪ঠা এপ্রিল—

নৈহাটী রেল ষ্টেশনের কর্ম্মচারিগণ একটি তৃতীয় শ্রেণীর কামরার মধ্যে দুইটি বস্তার ভিতর চারিটি মানুষের মাথা ও দুইটি দেহের কতকগুলি খন্ড খন্ড অংশ পায়। চারিটি মাথার মধ্যে দুইটির খুলী ছাড়া আর কিছুই ছিল না এবং অপর দুইটি অত্যন্ত বিকৃত অবস্থায় ছিল। বিস্তৃত সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

দিল্লীতে মহাত্মা গান্ধী বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করেন। উভয়ের মধ্যে দেড় ঘণ্টাকাল আলোচনা হয়।

কাশীর মহারাজা স্যার আদিত্যনারায়ণ সিংহ বহুদিন রোগ ভোগের পর পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৫ বৎসর হইয়াছিল।

বরিশাল শহরে ব্যাপক খানাতল্লাস হয়। কয়েকজন যুবককে থানায় লইয়া যাওয়া হয় এবং তাহাদের বিবৃতি লিপিবদ্ধ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। প্রকাশ, সম্প্রতি মগড়পাড়া ও অন্যান্য কয়েকটি স্থানে যে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে, তৎসম্পর্কে এই তল্লাস হয়।

আসামের বড়দলই মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে যে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করিবার কথা ছিল, তাহা আর উত্থাপিত হয় নাই। সরকার-বিরোধী দলের সমর্থক সংখ্যা হ্রাস পাইবার ফলেই, সম্ভবত অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় নাই।

এক পক্ষ কালের মধ্যে হুগলী জেলায় মোট ছয়জন কংগ্রেসকর্ম্মীর বিরুদ্ধে ১৪৪ ধারা জারী করা হইয়াছে। এই ছয় জনের নাম :—মনোরঞ্জন হাজরা, মহীতোষ নন্দী, আনন্দ পাল, বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়, তুষারকান্তি চট্টোপাধ্যায় ও কালীচরণ ঘোষ।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে কয়লার খনি বিল বিনা ডিভিশনে গৃহীত হইয়াছে।

এলাহাবাদে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্পর্কে এ পর্য্যন্ত মোট ২৪৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। দাঙ্গা সুরু হওয়ার পর হইতে এ পর্য্যন্ত মোট আট জন নিহত ও ২৬ জন আহত হইয়াছে।

বিহার-সীমান্তে ইষ্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে আর একটি ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটাইবার চেষ্টা ধরা পড়িয়াছে।

মাঝে সাহেবা আন্দোলন সম্পর্কে ধৃত তিন হাজার বন্দীকে যুক্তপ্রদেশের বিভিন্ন জেল হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু ও মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে পত্র-বিনিময় হইতেছে। উহা লইয়া নানারূপ জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে।

ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে ভীষণ অগ্নিকান্ডের খবর পাওয়া গিয়াছে। বর্দ্ধমানের ভাতার থানার অধীন গ্রামডিহি গ্রামে ভীষণ অগ্নিকান্ডের ফলে প্রায় ১১২ খানি গৃহ ভস্মীভূত হইয়াছে। স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুত আদ্যাচরণ হাজরার বৃদ্ধা মাতা একটি রুদ্ধ কক্ষে দূষিত বাষ্পে অজ্ঞান হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। মুঙ্গের জেলার রামডিয়ারী গ্রামে অগ্নিকান্ডের ফলে দুইজন নিহত ও আট জন আহত হইয়াছে।

ইরাকের রাজা গাজী মোটর দুর্ঘটনায় নিহত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ২৭ বৎসর হইয়াছিল। রাজা গাজী পরলোকগত রাজা ফৈজলের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ১৯৩৩ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন।

মসৌলে রাজা গাজীর মৃত্যুতে বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় আততায়ীর গুলীর আঘাতে ব্রিটিশ কন্সাল মিঃ জি এস ম্যাসস নিহত হইয়াছেন।

পরলোকগত রাজা গাজীর তিন বৎসর বয়স্ক পুত্রকে ইরাকের রাজা বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। নূতন রাজার খুল্লতাত আমীর আবদুল্লাহ রিজেন্ট নিযুক্ত হইয়াছেন।

৫ই এপ্রিল—

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের যে কয়টি সরকারী বিলের আলোচনা হয়, তন্মধ্যে বঙ্গীয় সরকারী দলিল বিল ও বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন (তৃতীয়) সংশোধন বিলটি উল্লেখযোগ্য। বঙ্গীয় সরকারী দলিল বিলটি ইতিপূর্ব্বে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে; সংবাদপত্রে ও সভাসমিতিতে অপ্রকাশিত সরকারী দলিলের বিষয় বিনা অনুমতিতে প্রকাশ করিয়া দিবার একটা ঝোঁক নাকি সম্প্রতি গবর্ণমেণ্টের মতে দেখা দিয়াছে। এই ঝোঁক বন্ধ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট বিলটি আনিয়াছেন। পরিষদে বহু সদস্য বলেন যে, এই বিল আইনে পরিণত হইলে জনমত ও সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হইবে। বিলটি সম্বন্ধে জনমত সংগ্রহের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। ১৫ই মের মধ্যে জনমত সংগৃহীত হইবে।

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন (তৃতীয়) সংশোধন বিলটি কিছু আলোচনার পর গৃহীত হইয়াছে।

লালা হরদয়াল আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া শহরে পরলোকগমন করিয়াছেন। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার ফলে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৪ বৎসর হইয়াছিল। রাজনৈতিক কারণে যে সব বিশিষ্ট ভারতবাসী মার্কিনে নির্ব্বাসিতের জীবনযাপন করিতেছিলেন লালা হরদয়াল তাঁহাদের অন্যতম।

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু গত ২৫শে মার্চ্চ যে বিবৃতি দিয়াছিলেন, তাহাতে লোকের মনে একটা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে দেখিয়া তাহা নিরসনের নিমিত্ত তিনি অদ্য আর একটি বিবৃতি দিয়াছেন। এই বিবৃতিতে তিনি বলেন যে, কংগ্রেসের অধিবেশনে পন্ডিত পন্থের যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, সেই প্রস্তাব তিনি মানিতে বাধ্য। যদি কোনও কারণ বশত উক্ত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে না পারেন তাহা হইলে তিনি বিধিমত নিজের পথ বাছিয়া লইবেন। তিনি আরও বলেন যে, তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা মহাত্মা গান্ধীর মতামতের উপর নির্ভর করিবে।

আসাম ব্যবস্থা পরিষদে সরকার বিরোধী দলের আশা ব্যর্থ হইয়াছে। তাঁহারা অনাস্থা প্রস্তাবটি উত্থাপনে সাহসী না হইয়া উহা বর্ত্তমানের জন্য প্রত্যাহার করিয়াছেন।

বন্দী-মুক্তি কমিটির সুপারিশ অনুসারে বাঙলা সরকার নিম্নলিখিত ৬জন বন্দীর মুক্তির আদেশ দিয়াছেন :—রঙ্গলাল গঙ্গোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস সেন বনাম লালু, অনাথবন্ধু চক্রবর্ত্তী,

প্রশান্তকুমার সেনগুপ্ত, সতীশচন্দ্র বসু রায় এবং পরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

৬ই এপ্রিল—

মহাত্মা গান্ধী পুনরায় বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করেন। উভয়ের মধ্যে একঘণ্টাধিককাল আলোচনা হইয়াছিল।

ঢাকায় এক নরহত্যার মামলায় ঢাকার দায়রা জজের বিচারে জনৈক নেপালী আসামী যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। এক নেপালী পাহারাদার একদিন তাহার মনিবের ঠাকুর ঘরের সম্মুখে উন্মুক্ত ভোজালী-সহ নৃত্য করিয়া ভোজালী দ্বারা বাড়ীর সকলকে তাড়া করিয়া ত্রাস সঞ্চার করিয়াছিল এবং শেষ পর্য্যন্ত বাড়ীর এক ভদ্রলোককে ভোজালী দ্বারা আঘাত করিয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটাইয়াছিল, এই ঘটনারই চাঞ্চল্যকর কাহিনী এই মামলায় বর্ণিত হইয়াছে।

গতকল্য লর্ড সভায় ভারত সচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড ভারত শাসন আইনের একটি সংশোধন বিল পেশ করিয়াছেন। এই বিলের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিধান এই যে, যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ তাঁহাদের ক্ষমতা কি ভাবে পরিচালনা করিবেন, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের শাসন-বিভাগ সেই সম্পর্কে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহকে নির্দ্দেশ দিতে পারিবেন। বিলের আর একটি বিধান এই যে, আগামী ১লা আগষ্ট তারিখ হইতে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের হাতে যাইবে।

আসাম ব্যবস্থা পরিষদে আসাম কৃষি আয়কর বিল (১৯৩৯), আসাম রাজস্ব বিল (১৯৩৯) এবং আসাম আবগারী বিল (১৯৩৯) পাশ হইয়াছে। আসাম ব্যবস্থা পরিষদের বর্ত্তমান অধিবেশন শেষ হইয়াছে।

৭ই এপ্রিল—

সম্প্রতি কলিকাতায় রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে একটি তরুণী ছাত্রীর শোচনীয় ও সন্দেহজনকভাবে মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। তরুণীটির নাম শ্রীমতী সরস্বতী। বাল্যকালে সে বিধবা হয়। প্রকাশ যে, কয়েকটি যুবক কোনও সিনেমায় অভিনেত্রী করিয়া দিবে, এই লোভ দেখাইয়া তরুণীকে মাঝে মাঝে বাহিরে লইয়া যাইত। গত ফেব্রুয়ারী মাসে একদিন তাহাকে তাহার পিতার অনুপস্থিতিতে বাড়ী হইতে লইয়া যাওয়া হয়। তরুণী ঐদিন সমস্ত রাত্রি দমদমের কোনও এক প্রমোদদ্যানে যাপন করে। শেষ রাত্রিতে তরুণী ফিরিয়া আসে। পরদিন সকাল বেলা তরুণীকে বাড়ীর বারান্দায় মৃতাবস্থায় পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে এ পর্য্যন্ত ৪জন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

কলিকাতা কলেজ স্কোয়ারস্থ ব্যাপটিষ্ট মিশন হলে নিখিল বঙ্গ জনস্বাস্থ্য সম্মেলনের ৫ম অধিবেশন আরম্ভ হয়। বাঙলার স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর লেঃ কর্ণেল এ সি চ্যাটার্জ্জি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার সারগর্ভ অভিভাষণে যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি নিবারণ যোগ্য ব্যাধি, খাদ্য ও জল সরবরাহ, শিশু ও মাতৃমঙ্গল এবং পল্লী স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন।

অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী মিঃ লায়েন্স পরলোকগমন করিয়াছেন। বাণিজ্য-সচিব স্যার আর্ল পেজ প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন।

৮ই এপ্রিল-

কুমিল্লায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের দ্বাবিংশ অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। ছিন্নাংশ "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীতটি গীত হইবার পর সম্মেলনের কার্য্য আরম্ভ হয়। ত্রিপুরাধিপতি মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। অতঃপর অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দত্ত এই সম্মেলনে বাঙলার বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত প্রায় দুইশত প্রতিনিধিকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। ইহার পর সম্মেলনের মূল-সভাপতি ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। তৎপর বিজ্ঞান শাখার সভাপতি ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী, দর্শন শাখার সভাপতি শ্রীযুত বিধুশেখর শাস্ত্রী, সঙ্গীত শাখার সভানেত্রী শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী, ইতিহাস শাখার সভাপতি ডাঃ সুরেন সেন তাঁহাদের অভিভাষণ পাঠ করেন। কাজী আব্দুল ওদুদকে (সাহিত্য শাখার সভাপতি) কতিপয় মুসলমান ছাত্র সম্মেলনের বৈঠকে যোগদান করিতে বাধা দেওয়ায় তিনি সম্মেলনের বৈঠকে উপস্থিত হইতে পারেন না।

হুবলী হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ যে, গতকল্য সহস্রাধিক লোক সমবেত হইয়া রামদুর্গ রাজ্যের জেল আক্রমণ করে এবং ৮জন পুলিশ কনেষ্টবল ও জেলওয়ার্ডারকে পিটাইয়া মারিয়া ফেলে। প্রকাশ, উক্ত রাজ্যের প্রজাসঙ্ঘ বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত ও প্রজাসঙ্ঘের কয়েকজন নেতা ধৃত হইবার পর উত্তেজিত জনতা জেলে অগ্নি সংযোগ করে, পুলিশের কয়েক ব্যক্তিকে হত্যা করে এবং কয়েদীদিগকে মুক্ত করিয়া দেয়। টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া দেয়। পুলিশ তখন গুলী চালায়। ফলে উত্তেজিত জনতার মধ্যে ৫জন নিহত হইয়াছে।

রোমের এক সংবাদে প্রকাশ যে, ইতালীয়ান সৈন্যেরা অদ্য বেলা ৮॥ ঘটিকায় (গ্রীনউইচের সময়) আলবানিয়ার রাজধানী তিরানায় প্রবেশ করে। রাজা জোগ এবং মন্ত্রিগণ ইতিপূর্ব্বেই রাজধানী ত্যাগ করিয়া অজ্ঞাত স্থান অভিমুখে যাত্রা করেন। রাজা জোগের প্রাসাদ ও তাঁহার ভগ্নীদ্বয়ের বাসভবন লুণ্ঠিত হয়।

বার্লিনের সংবাদে প্রকাশ যে, আলবানিয়া অভিমুখে ইতালীয় সৈন্য প্রেরণের পূর্ব্বে হিটলার ও মুসোলিনীর মধ্যে টেলিফোনে সুদীর্ঘ আলোচনা হইয়াছিল। হিটলার না কি ইতালী কর্ত্তৃক আলবানিয়া আক্রমণের প্রস্তাব সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়াছেন।

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু জানাইয়াছেন যে, আগামী ২৭শে এপ্রিল নবগঠিত ওয়ার্কিং কমিটির প্রথম অধিবেশন হইবে এবং তৎপর দিবস হইতে নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির বৈঠক হইবে। শীঘ্রই রাষ্ট্রপতি নূতন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করিবেন এবং তৎপূর্ব্বে তিনি মহাত্মার মতামত জানিয়া লইবেন।

সম্ভবত এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহেই ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের নাম জানা যাইবে।

চুং কিং হইতে প্রাপ্ত চীনাদের এক সংবাদে প্রকাশ, চীনা সৈন্য-বাহিনী ক্যাণ্টন শহরের ১১ মাইল ব্যবধানের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাহারা উত্তর ও পশ্চিম দিক হইতে যুগপৎ ক্যাণ্টনের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

৯ই এপ্রিল—

বাঙলার প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় তাঁহার বাগবাজারস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮০ বৎসর হইয়াছিল।

কুমিল্লায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন শেষ হইয়াছে। অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ গতকল্য কয়েকজন মুসলমান পিকেটার কর্তৃক আটক হওয়ায় অধিবেশনে যোগদান করিতে পারেন না। তিনি আজ সাহিত্য শাখার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। গতকল্য সম্মেলনের অধিবেশনের শেষে শ্রোতৃবৃন্দের পীড়াপীড়িতে পূর্ণ "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীতটি গীত হয়। স্বরাজ লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত রাষ্ট্রভাষার সমস্যার ও ঐ সম্পর্কে বাঙলা ভাষার দাবীর বিষয় আলোচনা স্থগিত রাখিতে দাবী জ্ঞাপন করিয়া সম্মেলনে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। অদ্য সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনে বহু মুসলমানও যোগদান করেন।

মহাত্মা গান্ধী দিল্লী হইতে রাজকোটে গিয়াছেন। সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল বিমানযোগে রাজকোটে গিয়া মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করেন।

মধ্যপ্রদেশের ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি ও আর্য্য লীগের সভাপতি শ্রীযুত ঘনশ্যামদাস গুপ্ত শোলাপুর হইতে রাজকোটে গিয়াছেন। হায়দরাবাদ সত্যাগ্রহ আন্দোলন সম্পর্কে তিনি মহাত্মা গান্ধীর সহিত আলোচনা করেন।

"দেশীয় রাজ্যগুলির প্রজাদের সংগ্রাম নৃপতিদের বিরুদ্ধে ততটা নহে, যতটা ভারত-সরকারের রাজনৈতিক বিভাগ এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে।"—পাঞ্জাব দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মেলনের উদ্যোগে আহুত এক জনসভায় সভাপতিত্ব করিবার সময় কাশ্মীরের জনপ্রিয় নেতা সেখ আবদুল্লা উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

তিরানা হইতে প্রকাশিত একটি ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ইতালীয়ান সৈন্যেরা দক্ষিণ আলবেনিয়ার আর্গিরো কাষ্টরণ নামক স্থান দখল করিয়াছে। অপর একটি ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, "বিশিষ্ট আলবেনিয়ান রাজপুরুষ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে" লইয়া গঠিত আলবেনিয়া শাসন-ব্যবস্থা কমিটি সাময়িকভাবে আলবেনিয়ার শাসন ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইস্তাম্বুলের সংবাদে প্রকাশ যে, জার্ম্মানীর প্রচার-সচিব ডাঃ গোয়েবেলস্ বুধবার ইস্তাম্বুলে পৌঁছিবেন। ইতালীর পররাষ্ট্র-সচিব কাউণ্ট সিয়ানো তিরানা হইতে বিমানযোগে রোমে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

১০ই এপ্রিল—

নিজাম সরকার হায়দরাবাদ ষ্টেট-কংগ্রেস সত্যাগ্রহ সম্পর্কে দণ্ডিত সমস্ত বন্দীকে মুক্তি দিয়াছেন। ইঁহাদের সংখ্যা প্রায় দুই শত।

নিজাম রাজ্যে ২৭জন আর্য্য সত্যাগ্রহী একদল সশস্ত্র মুসলমান কর্তৃক আক্রান্ত হয়। ইহাদের মধ্যে ১৩ জনকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে। দুইজনের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন।

সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া প্রকাশ্যভাবে 'তাবকরা' আবৃত্তি করায় লক্ষ্ণৌয়ে ১২৬জন সিয়াকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

মাদারীপুরের ভূতপূর্ব্ব রাজবন্দী শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী যাদবপুর হাসপাতালে ক্ষয়রোগে পরলোকগমন করিয়াছেন।

রাজকোটে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সহিত মহাত্মা গান্ধীর দীর্ঘকাল আলোচনা হইয়াছে। আলোচনার বিষয় গোপন রাখা হইলেও, অনুমান করা যাইতেছে যে, প্রস্তাবিত শাসন সংস্কার কমিটির সাতজন বে-সরকারী সদস্য মনোনয়ন এবং উহাতে স্থানীয় মুসলমানদের প্রতিনিধি গ্রহণ সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে।

গয়ায় শ্রীযুত নরেন্দ্র দেবের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত কিষাণ সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে।

রাইখ ব্যাঙ্কের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট ডাঃ সাখট বোম্বাই পৌঁছিয়াছেন।

ইতালীয়ান গোলন্দাজ বাহিনী গ্রীস সীমান্তের নিকটবর্ত্তী কোরিৎসা নামক স্থান দখল করিয়াছে।

বুখারেষ্টের রাজনৈতিক মহলের অনেকেই মনে করেন যে, আগামী ২০শে এপ্রিল তারিখে হের হিটলারের জন্মদিবসে জার্ম্মানী সমগ্র বল্কান উপদ্বীপকে একটি 'অর্থনৈতিক যুক্ত-রাষ্ট্রে' পরিণতির পরিকল্পনা প্রকাশ করিবে। ওদিকে ম্যাসিডোনিয়ায় ঘোর গুজব যে, যুগোশ্লাভিয়া, গ্রীস ও বুলগেরিয়ার সংখ্যালঘিষ্ঠ অঞ্চল লইয়া একটি স্বায়ত্তশাসন-শীল রাষ্ট্র ম্যাসিডোনিয়া প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য মুসোলিনী এক পরিকল্পনা করিয়াছেন।

আলবেনিয়া দখল করা সম্পর্কে ইতালী যে নজীর দেখাইয়াছে, তাহাতে ফ্রান্স অস্বস্তি বোধ করিতেছে। প্যারিসের রাজনৈতিক মহল মনে করেন যে, ইতালী গ্রীস আক্রমণ করিলে "অতি জটিল আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি"র উদ্ভব হইবে।

ওয়াশিংটনের রাজনৈতিক মহল মনে করেন যে, ডানজিগে সঙ্কট আসন্ন।

ইউরোপে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তৎসম্পর্কে আলোচনার জন্য বৃটিশ মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়। সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, ১৩ই এপ্রিল পার্লামেণ্টের লর্ড ও কমন্স সভার অধিবেশন হইবে। গ্রীসের উপকূলবর্ত্তী কর্ফু দ্বীপে ভূমধ্যসাগরস্থিত বৃটিশ নৌ-বহর সন্নিবেশ করার যে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে, নৌ-সচিবের দপ্তর হইতে উহা সরাসরিভাবে অস্বীকৃত হইয়াছে।

৬ষ্ঠ বর্ষ] শনিবার, ২৫শে চৈত্র, ১৩৪৫ সাল, Saturday, 8th April 1939. [২১শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন—

আগামী ৯ই এবং ১০ই এপ্রিল কুমিল্লা শহরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। ডাক্তার সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মূল-সভাপতি এবং মৌলবী আব্দুল ওদুদ, পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী, ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন, অধ্যাপক পঞ্চানন নিয়োগী, শ্রীযুত ধূর্জ্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ই'হারা যথাক্রমে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, এবং সংগীত শাখার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বাঙালীর যদি কিছু গর্ব্ব করিবার থাকে, তবে সব চেয়ে বড় গর্ব্ব হইল দেশের সাহিত্য। আধুনিকেরা একথা স্বীকার করুন আর নাই করুন, বাঙলা দেশের এই সাহিত্য সাধনার ভিতর দিয়া একদিন সমগ্র ভারতে নব জাতীয়তার উদ্বোধন ঘটে। ভারতের বর্ত্তমানে যে রাষ্ট্রীয় জাগরণের স্থূলরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহার ভিতরে প্রাণশক্তির কার্য্য করিয়াছে বাঙলা দেশেরই সাহিত্য। রাষ্ট্রীয় জাগরণের মূলে সব দেশেই কাজ করে এই সাহিত্য! সমষ্টি-চৈতন্যের স্ফূর্ত্ত রূপ হইল যেমন সাহিত্য, তেমনই চেতনাকে সমষ্টির মধ্যে সংহতভাবে জাগাইবার শক্তিও আছে শুধু সাহিত্যেরই। যে জাতির সাহিত্য নাই, সে জাতির কোন আশা এবং কোন ভরসাই নাই এবং যে জাতির সাহিত্য আছে, সে জাতির সকল আশা এবং ভরসাই আছে। সাহিত্য সকল জাতির আত্ম-সংবিদস্বরূপে, কারণ আত্ম-সংস্কৃতিকে জাগ্রত রাখে সাহিত্য এবং আত্ম-প্রত্যয়ই হইল রাষ্ট্রীয় শক্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যত সংগ্রাম তাহার মূলে। এই সত্যকে উপলব্ধি করিয়াই বৈদেশিক শক্তির প্রথম চেষ্টা হয়, অধীনস্থ দেশ এবং জাতির সাহিত্যকে ধ্বংস করার দিকে। বাঙলাদেশেও যে এ চেষ্টা একেবারে না হইয়াছিল এমন নয়, কিন্তু বৈশিষ্ট্য আছে বাঙলার জল বায়ু এবং বাঙলার মাটীর, সেই বৈশিষ্ট্য বাঙলা দেশে এমন কয়েকজন মানুষকে গড়িয়া তুলিয়াছিল, যাঁহারা জাতীয় সাহিত্যকে সঞ্জীবিত করিয়া তোলেন; বৈদেশিক প্রভুত্বের প্রতিকূল প্রতিবেশ প্রভাবের মধ্য দিয়া ও সাহিত্যের রসস্পর্শে জাতির আত্মমর্য্যাদা এবং আত্মপ্রত্যয়কে প্রখর করিয়া তোলেন। বাঙলার এই সব বাণী-সাধককে অনেক অসুবিধার ভিতর দিয়া অপরিসীম ধৈর্য্যসহকারে কাজ করিতে হইয়াছিল; কিন্তু দেশের সে অবস্থা অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। বাঙলা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন প্রাধান্য ছিল বিদেশী সাহিত্য এবং বিদেশী ভাষার, আজ বাঙলার বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবাণী অপেক্ষাকৃত অধিক মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। বর্ত্তমানে বঙ্গবাণীর সাধনার পথ অনেকদিক হইতে উন্মুক্ত। এখন প্রয়োজন একনিষ্ঠ সাধক দলের এবং সাহিত্যের এই যে সাধনা এ বড় সহজ সাধনা নয়। বাণীর প্রতিষ্ঠা হয় যজ্ঞে, অর্থাৎ আত্মনিবেদনে। আজ দেশের প্রধান প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, সেই আত্মনিবেদিত একনিষ্ঠ সাধক দলের, যাঁহারা দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সকল দিক দিয়া বঙ্গবাণীকে জগতের মধ্যে মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবেন। দীর্ঘ পরাধীনতার ফলে জাতির আত্মায় যে অবসাদ আসিয়াছে তাঁহাদের সাধনার জ্ঞানালোক প্রভাবে জাতির সেই অবসাদ কাটিয়া যাইবে। কবির ক্ষেত্র এখন প্রসারিত হইয়াছে, এখন প্রয়োজন প্রকৃত কর্ম্মীর এবং কর্ম্ম-প্রকরণের। আমরা আশা করি, কুমিল্লার এই অধিবেশনে এদিকে দেশে নূতন প্রেরণার সঞ্চার হইবে। শুধু কথা না হইয়া আগাইয়া যাইবার উপযোগী কাজের পথ নির্ণীত হইবে। কুমিল্লার বর্ত্তমান অধিবেশনের পৌরোহিত্য-পদে যাঁহারা ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ সাধক ও মনীষী সন্তান। আধুনিক বাঙলার রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে—স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে এপর্য্যন্ত কুমিল্লা বাঙলা দেশের কর্ম্মপ্রেরণার অন্যতম প্রধান কেন্দ্রস্বরূপে কাজ করিয়াছে এবং যে শক্তি বাঙলার ভবিষ্যকে নিয়ন্ত্রিত করিবে, গণ-জাগরণের সেই শক্তি কুমিল্লার জনগণের মধ্যে যে উপচিত হইতেছে, সে পরিচয়ও বাঙলার জাতীয় জীবনের স্পন্দন কোথায়, কিরূপভাবে কতটা ঘটিতেছে, সে পরিচয় যাঁহারা কিছুমাত্র অবগত আছেন তাঁহারাই জানেন। সুতরাং, বঙ্গীয় সাহিত্য

সম্মেলনের কুমিল্লার এই অধিবেশন জাতির মধ্যে নূতন শক্তির সঞ্চার করিবে। মাতৃভাষার সাধনায় ভেদবুদ্ধি যদি কোথাও থাকে, সম্প্রদায়গত, শ্রেণীগত বা তেমন কিছু, এবং এই আশা পোষণ করিতেছি যে, কুমিল্লার এই অধিবেশন তাহা সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত করিবে এবং বাঙলা মায়ের সন্তান দলকে মায়ের সাধন-বেদীমূলে সমবেত করিয়া বঙ্গে নূতন যুগের উদ্বোধন করিবে।

সাহিত্য সম্মেলনে বন্দে মাতরম্—

'বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতের সম্মান রক্ষিত হইবেই'—বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুত নিবারণচন্দ্র ঘোষ মহাশয় শ্রীযুত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নিকট ১৮ই চৈত্র তারিখে লিখিত একখানা পত্রে এই কথা জানাইয়াছেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন,—"বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত পরিত্যক্ত হইয়াছে আশঙ্কা করিয়া শ্রীযুত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীযুত কামিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের নিকট এক টেলিগ্রাম করিয়া বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন এবং জানাইয়াছেন, এই বিষয় লইয়া কলিকাতার লোক উত্তেজিত। ব্যাপার কি বুঝিতে পারিলাম না। উত্তেজনার কারণই বা কোথায়, তাহাও বুঝিলাম না। কে তাঁহাদিগকে জানাইল যে, 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত পরিত্যক্ত হইয়াছে। এই সংবাদ তাঁহারা কোথায় পাইলেন? আপনি দয়া করিয়া শ্রীযুত রমাপ্রসাদবাবুর সঙ্গে এবং কলিকাতার অন্যান্য সাহিত্যিকদের সঙ্গে দেখা করিয়া বলিবেন, 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতটি মোটেই পরিত্যক্ত হয় নাই।' আমরা এই সংবাদ পাইয়া সুখী হইয়াছি। 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত বাঙলার জাতীয়তার মূলমন্ত্রস্বরূপ। কতকগুলি সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমান উহার উপর আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে, শুধু নিজেদের সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবারই উদ্দেশ্যে। প্রকৃতপক্ষে 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতে সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী-ভাব—আছে জাতীয়তার প্ররোচক সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী-ভাব—আছে জাতীয়তার প্ররোচন অগ্নিময় প্রেরণা। বাঙালীর দেহে রক্ত বিন্দু থাকিতে, তাহার জাতীয়তার মূলমন্ত্রস্বরূপ এই 'বন্দে মাতরমে'র অবমাননা বরদাস্ত করিবে না। এবং বাঙলার সজ্জন সমাজ, বিশেষভাবে যাঁহারা সাহিত্যিক, যাঁহারা সাহিত্য-রসের প্রকৃত মূল্য বুঝেন, তাঁহারা এমন যুক্তি কিছুতেই মানিয়া লইবেন না যে, 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতের কোন অংশে কোন রকমভাবে কিছুমাত্র সাম্প্রদায়িকতা আছে। যাঁহারা সাহিত্য বুঝে না, জানে না—সংস্কৃতি বা সভ্যতার মূল্যকে হীন সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত উপেক্ষা করিতে চায় বাঙলার সাহিত্যিক সমাজ অন্তত তাঁহাদের অসঙ্গত আবদারকে অস্বীকার করিবার শক্তি রাখেন, কারণ, তাঁহাদের তেমন প্রচারকার্য্যের অনিষ্টকারিতা তাঁহারা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেন।

জাতীয় সপ্তাহ—

জাতীয় সপ্তাহ চলিতেছে, সেই ১৩ই এপ্রিল, যেদিন অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে হিন্দু-মুসলমানের রক্ত এক স্রোতে বহিয়াছিল সম্মুখে সেই দিন। জাতি কি ভুলিয়াছে সেদিনকে? ভুলিতে পারে না, জাতির আত্মসম্বিৎ যতই প্রখর হইবে, ততই সেই স্মৃতি তীব্র আকার ধারণ করিবে। বিদেশীর যে প্রভুত্ব এবং পরাধীনতার উৎকট এবং বিভীষিকাময় প্রকট রূপ জালিয়ানওয়ালাবাগ, জাতিকে আজ উপলব্ধি করিতে হইবে, সূক্ষ্মতরভাবে ভারতের রাষ্ট্রীয় দেহের সর্ব্বত্র তাহার যে ক্রিয়া চলিতেছে তাহার মর্ম্মগত মর্ম্মান্তিকতাকে এবং সেই উপলব্ধি যদি আমাদের ভিতর প্রখর হইয়া উঠে জাতীয় সপ্তাহের এই কয়েক দিনে তবেই আমরা বুঝিব যে, আমাদের জাতীয় সপ্তাহ প্রতিপালন বাস্তবিকই সার্থক হইতেছে। মামুলীভাবে যেমন দিন আসে, এবং দিন যায়, যদি সেইভাবেই জাতীয় সপ্তাহও কাটিয়া যায় এবং আমাদের মনের উপর স্পর্শ না করে, তাহা হইলে শুধু খবরের কাগজে জাতীয় সপ্তাহ এই নামটা বাহির হওয়ার ভিতরে কোন মূল্য নাই। বৈদেশিক অধীনতার বেদনা আজ আমাদের মধ্যে তীব্র আকার ধারণ করুক, জাতীয় সপ্তাহ আমাদিগকে এই বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত করুক যে, স্বাধীনতা, বৈদেশিক প্রভাব-মুক্ত, পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া, অন্য কোন ভাবেই আমরা মানুষের মর্য্যাদা লাভ করিব না। খাঁচা লোহারই হউক, এবং সোনারই হউক, তাহাতে খাঁচার ভিতরে যে বন্ধ তাহার পশুত্বের পার্থক্য কিছু হয় না। আজ জগতে একটা যুগ-সন্ধিক্ষণ ঘনাইয়া [illegible]ছে, এই সময়ে মোহ-মুক্ত অবস্থায় রাষ্ট্রীয় পূর্ণস্বাধীনতার লক্ষ্যে আমাদিগকে স্থির থাকিতে হইবে, এবং এই সত্যকে মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে হইবে যে, পশুর মত বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ নাই, যদি বাঁচিতে হয় মানুষের মতই বাঁচিতে হইবে। জানি, মানুষের মত বাঁচিতে হইলে জগতে তাহার জন্য মূল্য দিতে হয়, স্বাধীনতা শুধু ফাঁকা কথায় আসে না, আসে কাজে, আসে মৃত্যুঞ্জয়ী সংকল্প এবং তেমন সঙ্কল্প অনুযায়ী সাধনারই ভিতর দিয়া। জাতীয় সপ্তাহ তেমন সঙ্কল্প আমাদের মধ্যে সুদৃঢ় করিয়া তুলুক। আত্মদাতাদের শোণিত ব্যর্থ হয় নাই, ইহা ঐতিহাসিক সত্য, ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সংগ্রামে যাঁহারা আত্মবলি দিয়াছেন তাঁহাদের সে আত্মদান কি ব্যর্থ হইবে? কখনই নয়।

রাজনীতি ও অধ্যাত্মজীবন—

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র এপ্রিল সংখ্যায় 'মডার্ন রিভিউ' পত্রে 'আমার অদ্ভুত অসুখ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। বিভিন্ন পত্রে এই প্রবন্ধটি উদ্ধৃত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে রাষ্ট্রপতির বর্ত্তমান অসুস্থতা এবং সেই প্রসঙ্গে দেশের রাষ্ট্রনীতিক পরিস্থিতি বিশেষভাবে, ত্রিপুরী কংগ্রেসের ব্যাপারের উপর অনেকটা আলোক-সম্পাত করা হইয়াছে। এই প্রবন্ধের উপসংহারের দিকে রাষ্ট্রপতি লিখিয়াছেনঃ—

"ত্রিপুরীর অস্বাস্থ্যকর নৈতিক পারিপার্শ্বিকতার

ফলে ঐস্থান ত্যাগ করিবার সময় আমি রাজনীতির উপর অখণ্ড বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়ি—গত ১৯ বৎসরে তেমন ভাব মনে কখনও আসে নাই। জামডোবাতে রুগ্ন শয্যায় পড়িয়া থাকিয়া দিবারাত্র মনে হইয়াছে যে, বড় মহলেও যদি এইরূপ ক্ষুদ্রতা ও প্রতিহিংসার ভাব থাকে, তাহা হইলে দেশের রাজনীতিক জীবনের ভবিষ্যৎ কি? সুতরাং আমার জীবনের প্রথম আকর্ষণ—হিমালয়ের শাশ্বত আহ্বান—তাহার প্রতি আমার মন আকৃষ্ট হইল। আমার মনে প্রশ্ন উঠিল যে, ইহাই যদি রাজনীতির পরিণতি হয়, তাহা হইলে আমি কেন শ্রীঅরবিন্দের মতে যে জীবন 'দিব্য জীবন', সেই দিব্য জীবনের আকর্ষণে সাড়া দেই নাই! আমার কি মায়ার বন্ধন কাটাইয়া সর্ব্বপ্রেমের আধার সেই দিব্য জীবনের সাধনা করার সময় আসিয়াছে? আমি অনিশ্চয়তা ও মানসিক সন্দেহে দিনের পর দিন কাটাইয়াছি। সময় সময় হিমালয়ের আহ্বান দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিয়াছে। আমি আমার অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে আলোক দানের জন্য ভগবানের নিকট ঐকান্তিক প্রার্থনা জানাইয়াছি। ক্রমে ধীরে ধীরে আমার মনের সম্মুখে এক নূতন আলোক জাগিয়া উঠিল—আমি মানসিক শান্তি ফিরিয়া পাইলাম এবং সেই সঙ্গে মানুষের উপর এবং আমার দেশবাসীর উপর আমার আস্থা ফিরিয়া আসিল।" আমরা আধ্যাত্মিকতা বলিতে আজকাল যাহা বুঝি, সেইভাবে নির্জ্জনতায় সাধন-ভজন করার মধ্যে একটা আকর্ষণ আছে, অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু তাহাই সব চেয়ে বড় জিনিষ নয়, বড় জিনিষ হইল সেই যে একান্ত সুখ, প্রকৃতপক্ষে সে সুখও আত্মসুখ, সে সুখকে তুচ্ছ করিয়া, মুক্তিকে পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিয়া লোকের সেবা করা এবং তেমন সেবার মধ্যেই রাজনীতি পরম আধ্যাত্মিকতার প্রতিষ্ঠালাভ করে। ঝঞ্ঝাট এড়ানটাই ধর্ম্ম নয়, লোক-সেবার জন্য ঝঞ্ঝাটের মধ্যে সাহসের সঙ্গে আগাইয়া যাওয়াতে যে অভয়ত্ব তাহাই আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি। সেইখানেই আধ্যাত্মিকতার প্রতিষ্ঠা এবং গীতা সেই আদর্শই উজ্জ্বল করিয়া ধরিয়াছেন। সুভাষচন্দ্র যে সেই আদর্শকেই বড় বলিয়া বুঝিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তিরই পরিচয় পাওয়া যায়। গীতার সেই যে আধ্যাত্মিক আদর্শ, তাহা না বুঝিয়া, প্রকারান্তরে নিজের সুখ খোঁজাকে আধ্যাত্মিকতা বলিয়া বুঝিবার ফলেই ত দেশের এমন দুর্দ্দশা। আইরিশ কবি ইয়েট্স সত্যই বলিয়াছেন, গীতার আদর্শ যদি ভারতে প্রতিষ্ঠিত থাকিত, তবে ভারতবর্ষ কিছুতেই পরাধীন হইত না।

জওহরলালের সতর্ক-বাণী—

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সম্প্রতি 'ন্যাশনাল হেরাল্ড' পত্রে সমসাময়িক রাজনীতিক ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ করিয়া একটি বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। এই বিবৃতিতে তিনি বলেন—"ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে সম্প্রতি বলা হইয়াছে যে, ভারত-শাসন আইন বলবৎ রহিয়াছে এবং উহাই চলিবে। ইহাই যদি আমাদের প্রতি ব্রিটিশের উত্তর হয়, তাহা হইলে আমাদের কর্ত্তব্য স্পষ্ট। ফল যাহাই হউক না কেন, আমাদিগকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিরোধ করিতে হইবে। এরূপ কথাও শোনা যাইতেছে যে, যুদ্ধ বাধিলে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির ক্ষমতা সংযত করা হইবে; প্রাদেশিক শাসন-ক্ষমতা ভারত গবর্ণমেণ্ট নিয়ন্ত্রণ করিবেন। যদি এরূপ চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে যথাসাধ্য সংগ্রাম করিতে হইবে।" শুধু এইটুকুই নয়, পণ্ডিতজী আরও আগাইয়া গিয়াছেন, তিনি বলিতেছেন,—"বলা হয় যে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের দৌড় কতটা দ্রুত শেষ হইয়া যাইতেছে। জাতীয় ও আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে এমন একটা সময় আসিয়াছে, যখন অগ্রসরমূলক কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করিতে হইবে; যদি মন্ত্রীরা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলি এবং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানগুলি এই পরিবর্ত্তিত অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হন এবং দেশের লোকের মনোভাব বুঝিয়া তাহার সহিত সুর মিলাইতে প্রস্তুত হন, তাহা হইলে তাঁহাদের কল্যাণ অন্যথায় তাঁহাদের মুষ্টি শিথিল হইবে এবং ব্যর্থতা বাড়িবে এবং ক্ষুদ্র সমস্যা ও বিঘ্নের চাপে তাঁহারা অভিভূত হইয়া পড়িবেন। ভাসিয়া চলার নীতি ছাড়া বৈপ্লবিক যুগে বড় বড় সমস্যার মীমাংসা করা যায় না; তাহার ফলে আমরা কোথায় চলিয়া যাইব তাহা কেহ জানে না।"

জওহরলালজীর এই বিবৃতি হইতে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, ত্রিপুরী কংগ্রেসের অভিজ্ঞতা তাঁহার এই বিবৃতির মূলে কাজ করিয়াছে। ত্রিপুরী কংগ্রেসের আবহাওয়ার মধ্যে আমরা পণ্ডিতজীকে তাঁহার স্বরূপে দেখি নাই। তাঁহার তৎকালীন আচরণ আমাদের নিকট কতকটা রহস্যের মতই মনে হইয়াছে। তাঁহার এই বিবৃতির ভিতর দিয়া তাঁহার স্বাভাবিক সুরটি আবার যেন ফুটিয়া উঠিবার প্রয়াস পাইয়াছে। জওহরলালজী বলিতেছেন—প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের নিয়মতান্ত্রিকতার পথে কতকটা ক্ষমতা পাওয়া গিয়াছে, তাহা দেখিবার পালা শেষ হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে আরও অগ্রসরমূলক কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করিতে হইবে এবং সেই যে অগ্রসরমূলক কর্ম্মপন্থা তাহা কিরূপ আকার ধারণ করিবে, পণ্ডিতজী সুস্পষ্টভাবে তাহা নির্দ্দেশ না করিলেও ইহা জানাইয়া দিয়াছেন যে, কংগ্রেসী মন্ত্রীদিগকে দেশের লোকের মনোভাব বুঝিয়া সেই মনোভাবের সঙ্গে সুর মিলাইতে হইবে অর্থাৎ ফিকির-ফন্দীতে মন্ত্রিত্বটা বজায় রাখিবার তালে থাকিলে চলিবে না। কিন্তু আমাদের মনে প্রশ্ন শুধু জাগে এই যে, ভবিষ্যতের বরাত আর কেন? সময় কি আসে নাই দেশকে কাজের পথে প্রস্তুত করিবার? ঢাক ঢাক গুড় গুড় নীতি আগলিয়া ধরিয়া চলিবার মনোবৃত্তির মধ্যে যে দুর্ব্বলতা সেই দুর্ব্বলতার প্রতিক্রিয়া কি ইতিমধ্যেই দেখা যাইতেছে না। ত্রিপুরী কংগ্রেস যে সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার মূলে আমরা তো সোজা বুঝি—রহিয়াছে সেই দুর্ব্বলতা। এখন সাহসের সঙ্গে সেই দুর্ব্বলতা ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিলেই সব সমস্যার সমাধান হইতে পারে এবং গড়িমসি করিলে দেশের অনিষ্ট ছাড়া ইষ্ট ঘটিবে না।

রাজকোট সিম্ধান্ত—

রাজকোটের ব্যাপার সম্বন্ধে স্যার মরিস গায়ার যে রায় দিয়াছেন, তাহাতে মহাত্মা গান্ধী ও সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলেরই জয় হইয়াছে। স্যার মরিস তাঁহার রায়ে বলিয়াছেন যে, ঠাকুর সাহেব যে চুক্তিতে আবন্ধ হইয়াছেন, সেই চুক্তি অনুসারে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল যে সকল ব্যক্তিকে শাসন-সংস্কার কমিটিতে লইবার জন্য সুপারিশ করিবেন তাঁহাদিগকেই তিনি কমিটিতে নিযুক্ত করিবেন, এমন প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। সেই সব লোকেদের মধ্যে কেহ যদি ঠাকুর সাহেবের মনের মত না হন, সে ক্ষেত্রেও তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিবার অধিকার ঠাকুর সাহেব নিজের হাতে রাখেন নাই। যদি সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সুপারিশ করা লোকদের মধ্যে কেহ রাজ্যের প্রজা বা কর্ম্মচারী নহেন, ইহা প্রমাণিত হয়, তবে শুধু সেই ক্ষেত্রেই ঠাকুর সাহেবের আপত্তি টিকিবে, নতুবা সর্দ্দার বল্লভভাইয়ের সুপারিশই চূড়ান্ত হইবে। কমিটির সভাপতি নিয়োগের সম্বন্ধে স্যার মরিস এই রায় দিয়াছেন যে, কমিটির সদস্য সংখ্যা দশ জন হইবে, ঠাকুর সাহেব এমন প্রতিশ্রুতি দেন সুতরাং ঐ দশজনের মধ্যেই একজনকেই তিনি সভাপতি নিযুক্ত করিবেন। কাহাকেও বাহির হইতে সভাপতি করার অধিকার চুক্তি মত ঠাকুর সাহেবের নাই। সুতরাং এই রায়ে দেখা যাইতেছে যে, শাসন-সংস্কার কমিটির মোট দশজন সদস্যের মধ্যে ৭জনকে সর্দ্দার বল্লভভাইয়ের সুপারিশ মত নিযুক্ত করিবার বাধ্যতাই ঠাকুর সাহেবের উপর আরোপিত হইয়াছে এবং এই রায়ে ইহাও সুস্পষ্টভাবে নির্দ্দেশিত হইয়াছে যে, ঠাকুর সাহেব স্বেচ্ছাবশেই এই চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছেন। চুক্তির ভাষ্য স্যার মরিস যেভাবে করিয়াছেন, ইহার মধ্যে নূতনত্ব কিছুই নাই, চুক্তির ভাষার সোজা অর্থ যে উহাই—বাহিরের লোকও অনেকে তাহাই বুঝিয়াছিলেন; কিন্তু কতকগুলি ফন্দীবাজ লোক ভিতরে পড়াতে এবং তাহাদের ভিতর দিয়া উপর মহল হইতে কলকাঠি ঘুরাইতে পারে, ইহা লইয়া একটা বিভ্রাট ঘটে। মহাত্মা গান্ধী স্যার মরিসের ভাষ্যে সন্তুষ্ট হইয়াছেন, অর্থাৎ তিনি যাহা চাহিয়াছিলেন, তাহাই যে তিনি পাইয়াছেন, এইরূপ ভাবই ব্যক্ত করিয়াছেন; কথা হইতেছে এই যে, জয় তো হইল, কিন্তু সে জয়ের মূল্যটা কি? চুক্তিতে এমন কোন সর্ত্ত নাই যে, রাজকোটের ঠাকুর সাহেব রাজ্যে গণতন্ত্র শাসন প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন কিংবা কমিটির সুপারিশ মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবেন। কমিটি শুধু তাঁহার উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করিবে, কমিটির সুপারিশ তিনি মানিতেও পারেন, না মানিতেও পারেন। নীতির দিক হইতে এই কমিটি নিয়োগে প্রজার কোন অধিকার প্রত্যক্ষভাবে স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না, সামন্ত-শাসনের স্বৈরাচারের আবহাওয়ার মধ্যে প্রজার প্রতি কর্ত্তব্যের স্থানটা ইহাতে কিঞ্চিৎ সুস্পষ্ট হইয়াছে মাত্র—এই দিক হইতে প্রজাদের যাহা লাভ; কিন্তু দেশীয় রাজ্যের যে সমস্যা, সে সমস্যাকে আমরা আরও ব্যাপক সমস্যা বলিয়া মনে করি। দেশীয় রাজ্যসমূহের সমস্যা হইল সেইগুলির শাসন ব্যাপার পরিচালনে প্রজাদের প্রত্যক্ষ অধিকারের সমস্যা, সেদিক হইতে এই যে চুক্তি বা বহু আয়াসলব্ধ চুক্তির এই যে ভাষ্য, ইহার বিশেষ কিছু মূল্য আমরা মনে করি না। দেশীয় রাজ্যের সমস্যার সমাধান নির্ভর করে, প্রজাদের মধ্যে অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রেরণা জাগরণের উপরে, রাজাদের অনুগ্রহের উপরে নয়। মহাত্মাজী কিম্বা সর্দ্দার বল্লভভাই রাজকোটের ব্যাপারের ভিতর দিয়া যে পথ ধরিয়া আগাইতে চাহিতেছেন, সে পথ উক্ত পথ নয়। তাঁহারা রাজাদের রাজাগিরি এবং রাজমর্য্যাদা অব্যাহত রাখিয়াই দেশীয় রাজ্যের সমস্যার সমাধান করিতে চাহেন, অন্ততপক্ষে আপাতত তাঁহাদের অবলম্বিত নীতির অর্থ তাহাই। এ পথ জোড়াতালির পথ—পূর্ণ আদর্শের প্রতিষ্ঠা ইহার মধ্যে নাই, রাজকোটের এই সমস্যা সমাধানের মধ্যে যে নীতি দেখিতেছি, ইহারই কি প্রতিফলন দেখিতে পাইব, যুক্তরাষ্ট্র শাসন প্রণালী সম্পর্কিত নীতির মধ্যে? সেখানেও এমনই একটা আপোষ-রফা হইবে বাস্তব রাজনীতির ধুয়া দেখাইয়া, যদি তাহাই হয়, তবে বাঙলার অন্তর তাহাতে সাড়া দিবে না।

প্রস্তাবিত মিউনিসিপ্যাল বিল—

প্রস্তাবিত কর্পোরেশন বিলের সম্বন্ধে কংগ্রেসের মনোভাব কি, সম্প্রতি শ্রদ্ধানন্দ পার্কে আহূত একটি জনসভায় শ্রীযুত সন্তোষকুমার বসু সুস্পষ্টভাবে বুঝাইয়া বলিয়াছেন। বিলে সাধারণ ৪৬, মুসলমান ২২, সাহেব সওদাগর ১২, এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ২, শ্রমিক ২, সরকারী মনোনীত ১০ এবং অল্ডারম্যান ৫ মোট ৯৯টি আসন বরাদ্দ করা হইয়াছে। অথচ লোকসংখ্যার অনুপাতে হিন্দু সমাজের জন্য আসন হওয়া উচিত ৬২টি, সেখানে বরাদ্দ করা হইয়াছে ৪৬টি আসনের। কংগ্রেস পক্ষ বলিতেছে ৪৬ হইতে এই ১৬টি আসন বাড়াইয়া ৬২টি করা হউক। এ সম্বন্ধে আমাদের কথা আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের প্রথম কথা হইল এই যে, কলিকাতার লোকসংখ্যা হিসাবে শহরে যাহারা সংখ্যালঘিষ্ঠ কৃত্রিম উপায়ে তাহাদিগকে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ে পরিণত করাতে এই বিলে গণতান্ত্রিকতার মূলে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে। প্রশ্নটি হিন্দু বা মুসলমান, এই সম্প্রদায়গত নয়, প্রস্তাবটি হইল নীতিগত। এই গেল প্রথম কথা, তারপর আমরা চাই যুক্ত নির্ব্বাচন প্রথা পাকা রাখিতে, অন্ততপক্ষে কর্পোরেশনের মোট আসনের সংখ্যা যত হইবে, তাহার মধ্য হইতে স্থায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন যৌথ নির্ব্বাচনের ভিত্তিতে সাধারণের পক্ষে নির্দ্দিষ্ট রাখিতে হইবে। আমরা চাই উহার দৃষ্টিকে জাতির মধ্যে সম্প্রসারিত করিতে; কিন্তু প্রস্তাবিত বিলে উদার দৃষ্টি কোথাও তো নাই, আছে আগাগোড়া অনুদার দৃষ্টি এবং শুধু তাহাই নহে, কলিকাতার পৌর-কর্তৃত্ব মুষ্টিমেয় বিদেশীর হাতে দিবারই আগাগোড়া একটা কৌশল। কলিকাতার লোকসংখ্যার অনুপাতে হিন্দুদেরই প্রাধান্য, তাই কি রাগ করিয়া থালা ছাড়িয়া মাটিতেই ভাত খাইতে হইবে। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়, আরও শুনিতেছি

যে, ২ শত টাকার উপর কর্পোরেশনে যত কর্ম্মচারী তাহাদিগকে নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা আইন করিয়া বাঙলা সরকারের হস্তে লওয়া হইবে; সুতরাং কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা, চীফ ইঞ্জিনিয়ার, হেলথ অফিসার প্রভৃতি যত উপরওয়ালারা সবই গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবেন, দুই শত টাকার কম বেতনের পদগুলিতে লোক নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা থাকিবে প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার, অর্থাৎ কর্পোরেশন পুরাপুরি বাঙলা সরকারের মুঠার মধ্যে যাইবে। আমলাতন্ত্রের আমলেও কর্পোরেশনের অধিকার ক্ষুণ্ণ করিবার চেষ্টা কম হয় নাই, কিন্তু বাঙলার বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডল কর্পোরেশনে সকল অধিকার ধ্বংস করিবার জন্য আজ যে ভাবে প্রস্তুত হইয়াছেন, আমলাতন্ত্রও ততটা সাহসী হয় নাই। গণতান্ত্রিক সকল অধিকারকে উচ্ছেদ করিবার এই যে হীন অপকৌশল, আজ বাঙলা দেশের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থলকে আক্রমণ করিতে প্রযুক্ত হইতে চলিয়াছে, বাঙলার সমাজ এবং জাতীয় জীবনের সুস্থতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে সমগ্র শক্তি লইয়া সে উদ্যমকে বাধা দিতে হইবে।

পরলোকে সন্তোষের মহারাজা

সন্তোষের জমিদার স্যার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী সন্ন্যাস রোগের আক্রমণে পরলোক গমন করিয়াছেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পুত্রগণ এবং মহারাণীর প্রতি গভীর সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি। মহারাজা শিক্ষিত এবং সুবক্তা ছিলেন। তাঁহার তরুণ বয়স হইতেই বাগ্মিতার জন্য তিনি খ্যাতি অর্জ্জন করেন। তরুণ বয়সে তিনি স্যার সুরেন্দ্রনাথের অন্যতম অনুরাগী ছিলেন। বাঙলার জমিদার সমাজে মহারাজার প্রভূত প্রতিপত্তি ছিল। ইংরেজ সদস্যগণের আনুগত্য এবং আশ্রয়ে অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন, সন্তোষের পরলোকগত মহারাজা তাঁহাদের অন্যতম অগ্রণী ছিলেন। মহারাজা শরীরচর্চ্চা সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহসম্পন্ন ছিলেন। কলিকাতার ফুটবল ক্রীড়া সমিতির তিনি সভাপতি ছিলেন। বাঙলা দেশের কায়স্থ সমাজের আন্দোলনের সংশ্লিষ্ট কার্য্যেরও তিনি একজন উদ্যোগী ছিলেন। তাঁহার পরলোক গমনে কলিকাতার ইংরেজ-শাসক, বণিক-সমাজ এবং তাঁহাদের সহিত সখ্যসূত্রে সম্মান ও প্রতিষ্ঠাবান সমাজ একজন বিশ্বস্ত বন্ধু হারাইলেন।

ইংরেজের নূতন নীতি—

ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন গত ৩রা এপ্রিল কমন্স সভায় যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, তাঁহারা জার্ম্মানীর কাজে যেন কতই গরম হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"জার্ম্মানীর প্রতিশ্রুতি এখন মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। তাহার ফলে, সমস্ত আস্থা নষ্ট হইয়াছে এবং আমরা পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে নূতন নীতি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছি। আমরা এতদিন পর্য্যন্ত যে সমস্ত নীতি অবলম্বন করিয়া আসিয়াছি, তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। আমাদের পররাষ্ট্র নীতিতে নূতন যুগের সূচনা না হইলেও নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইয়াছে। পোলাণ্ড যদি আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে আমরা ফ্রান্সের সহিত মিলিত হইয়া অবিলম্বে পোলাণ্ডের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইব।"

সুর নূতন বটে, কিন্তু সুর বাহির হইয়াছে যে মনোবৃত্তি হইতে, তাহাতে যে বিশেষ নূতনত্ব কিছু আছে, ইহা মনে হয় না। অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজের সাম্রাজ্য স্বার্থ বিপন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত চেকদের উপর ইংরেজের যেমন দরদ দেখা গিয়াছিল, পোলদের সম্বন্ধেও যে সে দরদের বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটিবে না, জার্ম্মানী ইহা ভাল করিয়াই জানে। তাঁহারা ভাল করিয়াই ইহা জানে যে, রাজনীতির ব্যাপারে যেখানে যত বড় বড় কথা, সেখানে ততই ভণ্ডামি এবং তাহার মূলে ততখানি ভীরুতা। উচ্চ আদর্শের অনুভূতি কাহার অন্তরে কতখানি, তাহা বুঝিতে কোন পক্ষেরই বাকী নাই। জঙ্গী নীতি আজ ইউরোপে বড় নীতি। শক্তিই সকল নীতির শ্রেষ্ঠ নিরিখ। ইংরেজ আজ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে, লণ্ডন শহর রণাঙ্গনের আকার ধরিয়া উঠিতেছে। দেওয়ালে দেওয়ালে, সেনাদলে যোগদানের আয়োজনসূচক বিজ্ঞাপন, দিবারাত্র শহরের উপর উড়োজাহাজের ঘূর্ণচক্র, ঘরে ঘরে খাদ্য-দ্রব্য মজুত রাখিবার ব্যস্ততা এবং দরকার হইলে যথাসম্ভব সত্বর লণ্ডন ছাড়িয়া গ্রামে ঢুকিয়া ভূগর্ভস্থ গর্ত্তে আশ্রয় গ্রহণের আঁট-ঘাট বাঁধা—এসব দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, কর্ত্তারা নিজেদের বিপদটা বুঝিয়াছেন, সে বিপদ এড়াইতে হইলে অপরকে বিপন্ন করিবার ক্ষমতা যে তাঁহাদের বেশী আছে, হিটলার মুসোলিনীর মনোভাব দেখিয়া মনে হয় না যে, তাঁহারা তাহা মনে করেন। ইংরেজ প্রভুদের নীতি রহিয়াছে শুধু কথায় আর হিটলার-মুসোলিনীর কথা এবং কাজে এক। প্রভেদ যা এইটুকু নতুবা পরাধীন জাতি আমাদের দৃষ্টিতে সাম্রাজ্যবাদী হিসাবে ইঁহাদের মধ্যে কোন ইতরবিশেষ নাই।

গান্ধী-সুভাষ পত্রালাপ—

মহাত্মা গান্ধীর সহিত রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের পত্রালাপ চলিতেছে এবং সেই পত্রালাপ ত্রিপুরী কংগ্রেসের ফলে যে সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে, সেই সমস্যারই সম্পর্কে, ইহা জানা গিয়াছে। এই পত্রালাপের ভিতরের কথা জানিবার উপায় নাই। তবে এই সমস্যা যে এখনও মেটে নাই, ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে মহাত্মা গান্ধী মনে করেন যে, সুভাষচন্দ্রের সহিত তাঁহার বিশেষ রকমের মত-পার্থক্য রহিয়াছে। অবশ্য, এই মত-পার্থক্য কি, আমরা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। রাষ্ট্রপতি মহাত্মাজীর নীতিকেই অনুসরণ করিয়া চলিবেন, এ-কথা বহুবারই বলিয়াছেন; সুতরাং মত-পার্থক্য নীতির দিক হইতে থাকিবার কোন কারণ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না, ব্যাপারটা জড়াইয়া উঠিয়াছে যে ব্যক্তির গতি হইতেই—ত্রিপুরীতেই তাহা প্রকট হইয়াছে, নতুবা দেশের বাস্তব স্বার্থ সম্পর্কিত ব্যাপারের সঙ্গে যে প্রস্তাবের কোন

সম্পর্ক নাই, এবং যে প্রস্তাবটা একান্ত অবান্তরভাবেই কংগ্রেসের অধিবেশনের মধ্যে টানিয়া আনিয়া দেশের বর্ত্তমান সংকটকালে প্রত্যক্ষভাবেই ভেদের ভাব বাড়ান হইয়াছে, তেমন প্রস্তাব আনিবার মূলে কোন যুক্তিই ছিল না। রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র সভাপতি নির্ব্বাচিত হইবার পূর্ব্বে পর্যান্ত—তাঁহার ব্যক্তিগত মত লইয়া সমালোচনা, বিবেচনা-গবেষণা চালানটা অযৌক্তিক নয়, কিন্তু সমগ্র দেশের প্রতিনিধিদের দ্বারা তিনি কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইবার পর মুহূর্ত্তেই সে-সব বন্ধ করিয়া সংহতি এবং শৃঙ্খলার খাতিরে তাঁহার পদগত মর্য্যাদাকে স্বীকার করিয়া লওয়াই ছিল উচিত। সব দেশে, সব জাতির মধ্যে ইহাই হইয়া থাকে। কিন্তু ত্রিপুরীতে নীতি দেখা হইল না, শুধু ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়াই অহিংস আক্রোশের লীলা-খেলা মূর্ত্ত হইয়া উঠিল; আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এখনও ব্যক্তিগত সেই বিচারগত বিভ্রাট কাটিল না। মহাত্মাজী নাকি রাষ্ট্রপতিকে জানাইয়াছেন যে, নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে অধিকাংশ সদস্য যদি সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন করেন, তাহা হইলে গান্ধীপন্থীরা তাঁহার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিবেন না; কিন্তু অধিকাংশ সদস্য যদি তাঁহার সমর্থক না হন, তাহা হইলে গান্ধীপন্থীরা নিজেদের ইচ্ছামত কাজ করিবেন। আগামী ২৮শে এপ্রিল কলিকাতায় নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন আরম্ভ হইবে, ইহাও ঠিক হইয়াছে। এখন ব্যাপার যেমন দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে ইহাই একমাত্র পথ বলিয়া মনে হয় বটে; কিন্তু আমাদের কথা এই যে, ব্যাপারটা এতদূর পর্যান্ত টানিয়া না আনিলেই কি চলিত না? নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সিদ্ধান্ত যেদিকেই হউক, সেই পথে কংগ্রেসের এই দুই দলের মধ্যে আন্তরিক ঐক্যের পথ কি প্রশস্ত হইবে? আপাতত ব্যক্তিগত মতামতের প্রশ্নটা খাটো করিয়া যিনি জাতির নির্ব্বাচিত রাষ্ট্রনায়ক, তাঁহাকে মানিয়া লইয়া কাজের পথে আগাইয়া চলিবার চেষ্টা করাই কি ভাল ছিল না? নীতিগত এমন মৌলিক রকমের কোন পার্থক্য যদি দেখা দিত, পরে সে বিষয়ে বুঝা-পড়া করিলেও ত চলিত; কিন্তু দক্ষিণমার্গীদল নিজেদের গোঁ ছাড়িলেন না—তাঁহাদের ব্যক্তিগত বিবেচনাকেই বড় করিয়া দেখিলেন, এবং "হয় আমরা না হয় তাহারা" এই জিদই তাঁহাদের কাছে বড় হইল, ইহা বাস্তবিকই দুঃখের বিষয়।

বাঙলার রাজনীতিক বন্দী—

বাঙলা সরকার সম্প্রতি রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তি সম্পর্কে এক বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। এই বিবৃতিতে তাঁহারা বলেন যে, তাঁহারা ইতিমধ্যে শতাধিক রাজনীতিক বন্দীকে মুক্তি প্রদান করিয়াছেন, এবং বর্ত্তমানে ১৩০ জন রাজনীতিক বন্দী কারারুদ্ধ আছেন। গবর্ণমেণ্ট ধীরে ধীরে ইহাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া ইহাদের মুক্তির সম্বন্ধে ইতিকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতেছেন। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যে, প্রত্যেক বন্দীর সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে বিবেচনা করিয়া ক্রমে ক্রমে তাহাদিগকে মুক্তি দিবার এই যে নীতি আমরা ইহার কোন সার্থকতা দেখি না। ব্যক্তিগত বিচারে নয়—রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া কর্ত্তব্য বৃহত্তর নীতির দিক হইতেই। অন্যান্য বন্দী হইতে রাজনীতিক বন্দীদের পার্থক্য আছে। রাজনীতিক বন্দীরা স্বভাব-দুর্ব্বৃত্ত নহেন, কতকগুলি বিশেষ রাজনীতিক প্রতিবেশ প্রভাবের মধ্যেই তাহারা কাজ করিয়াছিলেন; দেশের সেই যে প্রতিবেশ প্রভাব, তাহা যখন কাটিয়া গিয়াছে এবং নানা কারণে রাজনীতিক বন্দীদের মনেরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তখন তাহাদিগকে বন্দী রাখিবার প্রয়োজনীয়তা দেশের শান্তি এবং আইন রক্ষার দিক হইতে নাই বরং রাজনীতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দেওয়ার মধ্যে যে উদার নীতি রহিয়াছে, তাহা দেশের ভিতরকার রাজনীতিক অপ্রীতি এবং অসন্তোষের ভাব দূর করিয়া শান্তি ও আইন রক্ষার অনুকূল আবহাওয়াই সৃষ্টি করিয়া থাকে। বাঙলার হক মন্ত্রিমণ্ডল, নিজেদের দূরদৃষ্টির অভাব বশত কিংবা তাহাদের চেয়ে বড় শ্বেতাঙ্গ বণিকদের মনস্তুষ্টির জন্য সেই নীতি অবলম্বন করিতে পারিতেছেন না। বাঙলা দেশে জনমতানুকূল এবং স্বাতন্ত্র্য মর্য্যাদা বুদ্ধি সম্পন্ন মন্ত্রিমণ্ডল প্রতিষ্ঠিত থাকিলে অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বাঙলা দেশেও বহু পূর্ব্বেই এ সমস্যার সমাধান হইয়া যাইত। একজন রাজনীতিক বন্দীও আজ কারা-প্রাকারের মধ্যে আবরুদ্ধ জীবন-যাপন করিত না।

ইংরেজ ও সোভিয়েট—

ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেন সাহেব সেদিন পার্লামেণ্টের কমন্স সভায় পররাষ্ট্র ব্যাপার সম্পর্কিত বিতর্কের উত্তরে বলিয়াছেন—"অপর দেশকে আক্রমণ করিবার জন্য নয়, আক্রমণকারীকে বাধা দিবার জন্য যে-কোন দেশ আমাদিগকে সাহায্য করিবে, আমরা তাঁহারই সাহায্য আনন্দের সহিত গ্রহণ করিব, সে দেশের আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থা যে আকারেরই হউক না কেন।" চেম্বারলেন সাহেব এই উক্তির দ্বারা সোভিয়েট রুশিয়াকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। এতদিন পর্য্যন্ত ইংরেজের নীতি ছিল রুশিয়াকে একঘরে করিয়া রাখা। মিউনিক চুক্তি সেই নীতিরই পরিণতি, রুশিয়াকে একঘরে করিয়া রাখিবার সেই নীতির উপর ইংরেজ যদি ঝোঁক না দিত তাহা হইলে চেক জাতির স্বাধীনতা বলি পড়িত না। রুশিয়া চেকদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুতই ছিল; কিন্তু ফরাসীকে থাকিতে হইল ইংরেজের লেজুড় ধরিয়া; ইংরেজ সোভিয়েটের পক্ষে যোগ দিতে গররাজী, সুতরাং ফরাসীও সেই পথ ধরিল। চেক জাতির স্বাধীনতা বিমর্দ্দিত হইল। আজ ইংরেজ রুশিয়াকে মিতা বলিয়া ডাকিলেও রুশিয়া যে সে আহ্বানের মধ্যে আন্তরিকতার সন্ধান পাইবে না বরং ইংরেজেরই দূরভিসন্ধিমূলক চালবাজী বলিয়া সন্দেহ করিবে, ইহা সম্পূর্ণই স্বাভাবিক

মানবীয় ঐক্যের আদর্শ

শ্রীঅরবিন্দ

(১৩)

অধিজাতি ঐক্য সংগঠন—তিনটি স্তর

[অধিজাতি রূপের মধ্যযুগীয় ও আধুনিক বিকাশে তিনটি স্তরের নীতি—প্রথম শিথিলতর ব্যবস্থা হইতে আভ্যন্তরীণ ঐক্যের দিকে অগ্রসর হইবার নীতি—প্রারম্ভিক ও পরবর্ত্তী স্তরসমূহ—ইউরোপ, জাপান ও চীন—ইউরোপে চার্চ্চ ও রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব—কড়াকড়ি সামাজিক উচ্চ নীচ শ্রেণীবিভাগ—অধিজাতি-ঐক্য বিকাশের দ্বিতীয় স্তর—জাতীয় বিকাশ এবং আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা খর্ব্ব করিবার দিকে প্রবৃত্তি—এই পরিকল্পনার দৃষ্টান্ত—রাজতন্ত্রের বিকাশ—সাম্যের দাবী।]

অধিজাতি-রূপের মধ্যযুগীয় ও আধুনিক বিকাশে তিনটি স্তর দেখিতে পাওয়া যায় এবং যেখানে বাহ্যিক পদ্ধতির দ্বারা জটিল অবস্থানিচয় ও অসমধর্ম্মী উপাদান সকল হইতে একটা নূতন ঐক্য সৃষ্টি করিতে হয় সেখানে এইটিকেই স্বাভাবিক পদ্ধতি বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। নিজেই নিজের যথাযোগ্য ও প্রয়োজনীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠান সকল বিকাশ করিবে এমন একটা নূতন মানসিক অবস্থা সাক্ষাৎভাবে সৃষ্টি না করিয়া ঐ পদ্ধতি বরং পারিপার্শ্বিক ও প্রতিষ্ঠানসমূহের চাপে মানুষের আভ্যন্তরীণ মানসিক অবস্থাকে নূতন রূপে,নূতন অভ্যাসে গড়িয়া তুলিবে। স্বভাবতঃই প্রথমে থাকা চাই শিথিল অথচ যথেষ্ট আধিপত্যশালী কোনরকম একটা সামাজিক শৃঙ্খলা এবং সাধারণ সভ্যতার আদর্শ, তাহা কাঠামো বা মণ্ডস্বরূপ হইবে, তাহার মধ্যেই নূতন সৌধটি গড়িয়া উঠিবে। পরে এমন একটা কঠিন সময় আসা চাই যাহার জন্য শাসনের ঐক্য ও কেন্দ্রীয়তা আবশ্যক হইবে এবং সম্ভবতঃ সেই কেন্দ্রীয় ঐক্যের অধীনে শেষ পর্য্যন্ত সকলকে সমান ও একাকার করা হইবে। শেষতঃ, নূতন সংবিধানটিকে যদি শিলীভূত ও অচলায়তন হইয়া পড়িতে না হয় তাহা হইলে অবাধ আভ্যন্তরীণ বিকাশের একটা যুগ তখনই আসা চাই যখনই গঠনটি নিশ্চিত হইয়াছে এবং ঐক্যটি এমনভাবে জীবনের অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, এই মুক্তের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া আর বিশৃঙ্খলা বা ধ্বংসের বিপদকে ডাকিয়া আনিবে না, সংবিধানটির নিরাপদ বিকাশ ও সংগঠন আর ব্যাহত হইবে না।

যে-সব উপাদানকে লইয়া নূতন ঐক্যটি গড়িয়া তুলিতে হইবে তাহাদের অতীত ইতিহাস ও বর্ত্তমান অবস্থার উপরেই প্রথম শিথিলতর ব্যবস্থাটির রূপ ও নীতি নির্ভর করে। কিন্তু ইহা দ্রষ্টব্য যে, ইউরোপ ও এশিয়া উভয় স্থানেই চারিটি বিভিন্ন সামাজিক কর্ম্ম অনুসারে সামাজিক শ্রেণী-বিভাগ বিকাশ করিবার দিকে একটা সাধারণ প্রবৃত্তি ছিল; ভাবের ঘনিষ্ঠ আদান-প্রদানের দ্বারাই যে এইরূপে সাদৃশ্য হইয়াছিল সে-বিষয়ে আমরা কোন প্রমাণ পাই না, অতএব স্বীকার করিতে হয় যে একই স্বাভাবিক কারণ ও প্রয়োজন হইতে ঐ প্রবৃত্তি উদ্ভূত হইয়াছিল। চারিপ্রকার সামাজিক কর্ম্ম হইতেছে,—আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকলাপ, রাজনৈতিক আধিপত্য এবং উৎপাদন ও আদান-প্রদান রূপে অর্থনৈতিক কর্ম্ম এবং শ্রম বা সেবা। এই বিভাগের অন্তর্নিহিত ভাব, বাহ্যরূপ ও সামঞ্জস্য অবস্থানুসারে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে খুবই বিভিন্নভাবে বিকশিত হইয়াছে, কিন্তু প্রারম্ভিক নীতিটি সর্ব্বত্র প্রায় একই ছিল। সর্ব্বত্র ইহা ছিল সামাজিক জীবনের এমন একটা প্রশস্ত কার্য্যকরী রূপ সরবরাহ করিবার প্রয়াস যাহার মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর পদমর্য্যাদা সুনির্দ্দিষ্ট থাকিবে, তাহার দ্বারা ব্যক্তিগত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক স্বার্থসমূহকে একটি যথেষ্ট ধর্ম্মনৈতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঐক্যের অধীন করা যাইবে। আর ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে ইসলামীয় সভ্যতা তাহার সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের প্রভাবশালী নীতি লইয়া এবং তাহার বিচিত্র ক্রীতদাস প্রথা (এই প্রথা অনুসারে ক্রীতদাসের পক্ষেও সিংহাসনে আরোহণ করা অসম্ভব হয় নাই) লইয়া কখনই এই ধরণের সমাজ বিকাশ করিতে সক্ষম হয় নাই এবং রাজনৈতিক ও প্রগতিশীল ইউরোপের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ থাকিলেও সুদৃঢ় ও জীবন্ত অধিজাতি-সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিতে পারে নাই, খলিফাদের সাম্রাজ্য ভাঙিয়া পড়িবার পরেও নহে।

কিন্তু যেখানে এই প্রাথমিক প্রয়োজনীয় স্তরটি সাফল্যের সহিত গঠিত হইয়াছিল সেখানেও পরবর্ত্তী স্তরগুলি অবশ্যম্ভাবীরূপেই আগত হয় নাই। ইউরোপের যে সামন্ত-যুগ (feudal period) ও তাহার চারি শ্রেণী যাজক সম্প্রদায়, রাজা ও অভিজাত সম্প্রদায়, বুর্জ্জোয়া এবং জনগণ, ইহার সহিত ভারতের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চাতুর্ব্বর্ণ্যের খুবই ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য রহিয়াছে। অবশ্য শেষোক্ত প্রথাটি অন্য চিন্তাধারার মধ্যে উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অপেক্ষা বেশী স্পষ্টভাবেই ছিল ধর্ম্ম ও নৈতিক। তথাপি কালক্রমে ঐ প্রথার প্রধান উপযোগিতা হইয়াছিল প্রকৃতপক্ষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক, এবং প্রথম দৃষ্টিতে এমন কোন কারণই দেখিতে পাওয়া যায় না যাহার জন্য উহা খুঁটিনাটিতে বিভিন্ন হইলেও মোটের উপর একইভাবে বিকাশলাভ না করিতে পারিত। জাপান মিকাডোর আধ্যাত্মিক ও ঐহিক শাসনের অধীনে এবং পরে মিকাডো ও শোগান উভয়ের যুক্ত শাসনের অধীনে নিজ মহান্ সামন্ততন্ত্র লইয়া জগতের মধ্যে এক বলিষ্ঠতম ও আত্ম-চেতন অধিজাতি ঐক্যের বিকাশ করিয়াছিল। চীন একাধারে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের উপযোগী আধ্যাত্মিক ও ঐহিক জ্ঞান এবং শাসনদক্ষতাসম্পন্ন তাহার মহান্ শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং তাহার অধ্যক্ষ ও তাহার জাতীয় ঐক্যের প্রতীকস্বরূপ স্বর্গপুত্র সম্রাটকে লইয়া এক ঐক্যবদ্ধ অধিজাতিতে গড়িয়া উঠিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিল। ভারতে যে ভিন্ন পরিণাম হইয়াছিল, তাহার অন্যান্য কারণের মধ্যে একটি কারণ ছিল সামাজিক বিকাশের বিভিন্নতা। অন্যত্র সেই বিকাশের ফলে হইয়াছিল জাতির মধ্যেই একটি ঐহিক অধ্যক্ষতা, একটি সুস্পষ্ট রাজ-

নৈতিক আত্মচেতনা এবং হয় যাজক শ্রেণীর পক্ষে সাম্বরিক ও শাসক শ্রেণীর অধীনতা অথবা উভয় শ্রেণীর সাম্য অথবা এক সাধারণ আধ্যাত্মিক ও ঐহিক অধ্যক্ষতার অধীনে তাহাদের সংমিশ্রণ। অন্যপক্ষে মধ্যযুগের ভারতবর্ষকে ঐ বিকাশ যাজক শ্রেণীরই প্রাধান্যের দিকে এবং জাতীয়বোধের ভিত্তি-স্বরূপ এক সাধারণ রাজনৈতিক চেতনার পরিবর্ত্তে এক সাধারণ আধ্যাত্মিক চেতনার দিকেই অগ্রসর হইয়াছিল। কোন স্থায়ী ঐহিক কেন্দ্র বিকশিত হয় নাই, এমন কোন সাম্রাজ্যিক বা রাজকীয় অধ্যক্ষতার বিকাশ হয় নাই, যাহা নিজের মর্য্যাদা, শক্তি, প্রাচীনত্ব এবং সাধারণের শ্রদ্ধা ও আনুগত্যের উপর তাহার দাবী দ্বারা ঐ যাজকীয় মর্য্যাদা ও প্রাধান্যকে অবনমিত করিতে অন্তত তাহার সহিত ভারসাম্যের বিধান করিতে এবং আধ্যাত্মিক ঐক্যের সঙ্গে সঙ্গেই রাজনৈতিক ঐক্যবোধও সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইত।

চার্চ্চ ও রাজতন্ত্রের মধ্যে বিরোধ হইতেছে ইউরোপের ইতিহাসের একটি সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও বিশিষ্ট লক্ষণ। ঐ দ্বন্দ্বের ফল যদি বিপরীত হইত তাহা হইলে মানবজাতির সমগ্র ভবিষ্যতই বিপর্যস্ত হইত। বস্তুত যাহা হইয়াছিল তাহাতে চার্চ্চকে স্বাধীনতা এবং ঐহিক শক্তির উপর প্রভুত্ব করিবার দাবী পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। এমন কি যে-সকল জাতি ক্যাথলিক থাকিয়া গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যেও ঐহিক প্রভুত্বের প্রকৃত স্বাধীনতা ও প্রাধান্য সাফল্যের সহিত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কারণ ফ্রান্সের রাজা গ্যালিকান চার্চ্চ ও যাজক সম্প্রদায়ের উপর যে শাসন বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহাতে পোপের পক্ষে ফ্রান্সের ব্যাপারে সকল প্রকার কার্যকরী হস্তক্ষেপ অসম্ভব হইয়াছিল; এমন কি স্পেনে পোপের সহিত রাজার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা এবং পোপের পূর্ণ আধ্যাত্মিক আধিপত্য মতবাদ হিসাবে স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও কার্যত ঐহিক অধ্যক্ষই যাজকীয় ব্যাপারেও নীতি নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেন এবং ইনকুইজিশনের (Inquisition) মহা বিভীষিকা তাঁহার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। ক্যাথলিকতন্ত্রের আধ্যাত্মিক অধ্যক্ষ রোমে সাক্ষাৎ বিদ্যমান থাকায় তাহা ইটালীতে রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ অধিজাতির বিকাশের পথে বৃহত্তম নৈতিক বাধাস্বরূপ হইয়াছিল; স্বাধীনতা লাভের পর ইটালীর জনগণ রোমে তাহাদের রাজাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে আবেগময় দৃঢ়সংকল্প দেখাইয়াছিল, তাহা এই মনোভাবেরই পরিচায়ক যে, একটি আত্ম-চেতন ও সঙ্ঘবদ্ধ অধিজাতি নিজের মধ্যে কেবল এক অধ্যক্ষতাই স্বীকার করিয়া লইতে পারে এবং তাহা হইবে ঐহিক অধ্যক্ষতা। যে অধিজাতি এই স্তরে উপনীত হইয়াছে বা হইতেছে তাহাকে হয় ধর্ম্মকে ব্যক্তিগত করিয়া দিয়া সাধারণ ঐহিক ও রাজনৈতিক জীবন হইতে ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতার দাবীকে পৃথক করিয়া দিতে হইবে, অথবা এই দুইটিকে রাষ্ট্র ও চার্চ্চের সখ্যের দ্বারা মিলিত করিয়া ঐহিক অধ্যক্ষতার একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, অথবা যেমন জাপান ও চীন রিফর্মেশনের যুগে ইংলণ্ডে হইয়াছিল। আধ্যাত্মিক ও ঐহিক অধ্যক্ষতাকে একই অধ্যক্ষতার মধ্যে যুক্ত করিতে হইবে।* এমন কি ভারতেও প্রথমে যে জনগণ, প্রধানত আধ্যাত্মিক প্রকৃতির নহে এমন একটা আধিজাতিক আত্ম-চেতনার বিকাশ করিয়াছিল তাহারা হইতেছে রাজপুত, বিশেষত মেবারের, তাহাদের নিকট রাজাই ছিলেন সর্ব্বপ্রকারে সমাজ ও জাতির অধিনায়ক, আর যাহারা আধিজাতিক আত্ম-চেতনা সুসিদ্ধ করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ রাজনৈতিক ঐক্যসাধনেরও খব নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল তাহারা হইতেছে শিখ ও মারাঠা, শিখদের জন্য গুরুগোবিন্দ সিং বিবেচনাপূর্ব্বক ইচ্ছা করিয়াই সাধারণ ঐহিক ও আধ্যাত্মিক কেন্দ্ররূপে খালসার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, আর মারাঠাগণ যে সচেতন অধিজাতির প্রতিভূস্বরূপ ঐহিক অধ্যক্ষতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল শুধু তাহাই নহে পরন্তু তাহারা নিজেদিগকেও ঐহিক ভাবাপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল, ব্রাহ্মণশূদ্রনির্ব্বিচারে সমগ্র জাতিই কিছুকালের জন্য সৈন্য, রাজনীতিক ও রাষ্ট্র-পরিচালকে পরিণত হইয়াছিল।

অন্য কথায়, যদিও বাঁধাধরা সামাজিক শ্রেণী বিভাগ (a fixed social hierarchy) অধিজাতি সংগঠনের প্রথম প্রবৃত্তি সকলের পক্ষে একটি প্রয়োজনীয় স্তর ছিল বলিয়াই মনে হয় তথাপি পরবর্ত্তী স্তরগুলিকে সম্ভব করিয়া তুলিবার জন্য ইহার পরিবর্ত্তিত হওয়া এবং নিজেকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন ছিল। কোন বিশেষ কার্য্যের জন্য বিশেষ অবস্থা নিচয়ের মধ্যে যে যন্ত্রটি উপযোগী, যখন অন্য কার্য্য করিতে হয় এবং অবস্থানিচয়েরও পরিবর্ত্তন হয় তখনও যদি সেই যন্ত্রটিকে ধরিয়া রাখা হয় তাহা অবশ্যম্ভাবীরূপেই প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়। এক শ্রেণীর আধ্যাত্মিক আধিপত্য এবং অন্য এক শ্রেণীর রাজনৈতিক আধিপত্য এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তে বিকাশশীল অধিজাতির সাধারণ জীবনকে কেন্দ্রীভূত করার প্রয়োজন ছিল ঐহিক অধ্যক্ষতার অধীনে, আধ্যাত্মিক অধ্যক্ষতার অধীনে নহে অথবা, যদি লোকের মধ্যে ধর্ম্ম প্রবৃত্তি এমনই প্রবল হয় যে, আধ্যাত্মিক ব্যাপার ও ঐহিক ব্যাপারকে পৃথক করা না চলে তাহা হইলে এমন একজন জাতীয় অধ্যক্ষের প্রয়োজন ছিল যিনি হইবেন উভয় বিভাগেই আধিপত্যের উৎসস্বরূপ। বিশেষত একটা রাজনৈতিক আত্ম-চেতনা [এইরূপ চেতনা ব্যতীত কোন স্বতন্ত্র আধিজাতিক ঐক্য সাফল্যের সহিত গড়িয়া তোলা যায় না] সৃষ্টির জন্য ইহা প্রয়োজন ছিল যে,

---

* এই প্রবৃত্তিটি কিরূপ স্বাভাবিক এবং একটা আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের কিরূপ পরিচায়ক তাহা এই আধুনিক কৌতুকাবহ ঘটনা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, কাইজার দ্বিতীয় উইলমেল্‌ম্ জার্ম্মাণ জাতির কেবল সামরিক, রাজনৈতিক ও শাসন বিষয়ক অধ্যক্ষ হইবার নহে পরন্তু তাহাদের পক্ষে ভগবানের প্রতিনিধি হইবার দাবী করিয়াছেন, এবং যে সব শিক্ষিত জার্ম্মাণের ধর্ম্মে বিশ্বাস নাই তাঁহারাও এই দাবী কার্য্যতঃ মানিয়া লইয়াছেন; তাঁহারা তাঁহাকে তাঁহাদের সামরিক ও রাজনৈতিক মহত্ত্বের এবং সেই সঙ্গে জার্ম্মাণ কৃষ্টি ও আধ্যাত্মিক ঐক্যেরও প্রায় অলৌকিক প্রতীক ও অধিনেতারূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এটা খুবই বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ইহার মূলে রহিয়াছে আধ্যাত্মিক ও শাশ্বত একত্বকে একটা দৃশ্য কেন্দ্র ও প্রতীকের মধ্যে অনুভব করিবার প্রয়োজনীয়তা।

এই সৃষ্টির উপযোগী হৃদয়বৃত্তি, কর্ম্মধারা প্রতিষ্ঠান-গুলিকেই সাময়িকভাবে প্রাধান্য দিতে হইবে এবং অন্য সব কিছুকে পশ্চাতে থাকিয়া এইগুলির সমর্থন করিতে হইবে। একটা চার্চ্চ কিম্বা একটা প্রাধান্যশালী যাজক বা পুরোহিত শ্রেণী একটি অধিজাতির সঙ্ঘবদ্ধ রাজনৈতিক ঐক্য গড়িয়া তুলিতে পারে না; কারণ তাহা রাজনৈতিক ও শাসনবিষয়ক ভাবনা ভিন্ন অন্য ভাবনার দ্বারা পরিচালিত হয় এবং তাহা যে নিজের বিশিষ্ট অনুভূতি ও স্বার্থ সকলকে ঐসবের নিম্নে স্থান দিবে ইহাও আশা করা যায় না। এইরূপ হইতে পারে কেবল যদি তিব্বতে যেমন হইয়াছিল সেইভাবে ধার্ম্মিক শ্রেণী বা পুরোহিত শ্রেণীটিই সমাজের কার্যত শাসনশীল রাজনৈতিক শ্রেণী হইয়া উঠে। ভারতে যে জাতির প্রাধান্য হইয়াছিল তাহা যাজকীয়, ধার্ম্মিক এবং অংশত আধ্যাত্মিক স্বার্থ ও ভাবনাসমূহের দ্বারা পরিচালিত হইত, সে জাতি সমাজের চিন্তাধারা ও জীবনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল কিন্তু বস্তুত শাসন ও রাষ্ট্রকার্য্য নির্ব্বাহ করে নাই—এইরূপ ব্যবস্থা সকল সময়েই ইউ-রোপীয় ও মঙ্গোলীয় জাতি যেভাবে বিকাশলাভ করিয়াছিল তাহার পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেবল এখন ইউ-রোপীয় সভ্যতার আবির্ভাব হইবার পর ব্রাহ্মণ জাতি যে শুদ্ধ জাতীয় জীবনের উপর তাহার অনন্য আধিপত্য অধিকাংশই হারাইয়াছে তাহাই নয়ে পরন্তু নিজেকেও অনেকখানি ইহকাল-পরতন্ত্র করিয়া তুলিয়াছে, কেবল এখনই রাজনৈতিক ও ঐহিক ধ্যানধারণা-সকল সম্মুখে আসিতে পারিয়াছে, একটা ব্যাপক রাজনৈতিক আত্মচেতনা জাগিয়া উঠিয়াছে এবং আধ্যাত্মিক ও কৃষ্টিগত ঐক্য হইতে স্বতন্ত্র একটা সঙ্ঘবদ্ধ আধিজাতিক ঐক্য কার্যত সম্ভব হইয়া উঠিয়াছে, তাহা আর কেবল একটা রূপহীন অবচেতন প্রবৃত্তি মাত্র নাই।

অতএব আধিজাতিক ঐক্যের বিকাশে দ্বিতীয় স্তরটি হইয়াছে সমাজের গঠনে এমন পরিবর্ত্তন যাহাতে রাজনৈতিক ও শাসনবিষয়ক ঐক্যের একটা শক্তিশালী ও দৃশ্যমান কেন্দ্রের জন্য স্থান হইতে পারে। এই স্তরের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যম্ভাবীরূপেই আসিয়াছে বাঁধাধরা শ্রেণীবদ্ধ সমাজের মধ্যেও যে-সব স্বাধীনতার ব্যবস্থা হয় সে-সবকেও বিলুপ্ত করিবার এবং রাজতন্ত্রের হস্তে শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিবার প্রবৃত্তি, যে রাজতন্ত্র সকল সময়েই সম্পূর্ণ নিরঙ্কুশ না হইলেও প্রাধান্যশালী হইয়াছে। আধুনিক গণতান্ত্রিক ভাব-ধারায় রাজাকে বরদাস্ত করা হয় কেবল একটি নামেমাত্র অংলঙ্কররূপে রাষ্ট্রজীবনের একজন ভৃত্যরূপে অথবা শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহের একটি সুবিধাজনক কেন্দ্ররূপে কিন্তু বাস্তবিক নিয়ন্ত্রণের জন্য রাজপদ আর অপরিহার্য্য নহে; কিন্তু অধিজাতিরূপের বিকাশে, বস্তুত মধ্যযুগে ইহা যে-ভাবে বিকাশলাভ করিয়াছে তাহাতে শক্তিশালী রাজতন্ত্রের ঐতিহাসিক উপযোগিতা যে খুবই বেশী ছিল তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। এমন কি স্বাধীনতাপ্রিয়, দ্বীপবাসী সুলভ সংস্কারসম্পন্ন, ব্যক্তিতান্ত্রিক ইংলণ্ডেও প্লাণ্টাজেনেট ও টিউ-ডররাই ছিল প্রকৃত ও সক্রিয় নিউক্লিয়স, তাহাদিগকে কেন্দ্র করিয়াই অধিজাতিটি সুদৃঢ় গঠনে এবং পরিণত শক্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছিল; আর ইউরোপের প্রধান ভূভাগে কাপে (Capets) ও তাহাদের উত্তরাধিকারিগণ ফ্রান্সে, কাস্তিল (Castile) বংশ স্পেনে এবং রোমানফ্ (Romanoff) ও তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীগণ রুশিয়াতে যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা আরও সুস্পষ্ট। শেষোক্ত দৃষ্টান্তটিতে এমনও বলিতে পারা যায় যে, ইভান, পিটার ও ক্যাথারিণগণ ব্যতীত রুশিয়া বলিয়া কিছু হইতেই পারিত না। এমন কি আধুনিক যুগেও জার্ম্মানীর ঐক্য সাধন ও বিবৃদ্ধিতে হোহেন জলরণগণ (Hohen Zollerns) প্রায় মধ্যযুগীয় যে-ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন গণতান্ত্রিক জাতি সকল তাহা উদ্বেগ-পূর্ণ বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্য করিয়াছে, তাহাদের নিকট এরূপ ঘটনা আর বোধগম্য নহে; ইহার গুরুত্ব তাহারা ধারণা করিতে পারে না। কিন্তু আমরা ইহাও উল্লেখ করিতে পারি যে, বলকান প্রদেশের নূতন অধিজাতিগুলি যে তাহাদের বিবৃদ্ধিকে কেন্দ্রীভূত ও সাহায্য করিবার জন্য একজন রাজার সন্ধান করিতেছে এবং সেই সঙ্গে নানা অপ্রত্যাশিত হাস্যোদ্দীপক ও শোকাবহ ঘটনা ঘটিতেছে—ইহা সম্পূর্ণই বোধগম্য হয়, প্রাচীন প্রয়োজনটির অনুভূতির প্রকটনরূপে। আধুনিক ধরণের একটি অধিজাতিরূপে জাপানের নব-সংগঠনে মিকাডো এইরূপ ভূমিকাই গ্রহণ করিয়াছেন, নবজীবনের অগ্রদূতগণ তাঁহাকে তাঁহার নিঃসহায় নির্জ্জনবাস হইতে বাহির করিয়াছে, আর আজিকার চীনে স্বল্পকালস্থায়ী যে স্বৈরনেতৃত্ব (Dictatorship) সম্প্রতি নিজেকে এক নূতন আধিজাতিক রাজতন্ত্রে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল,* একটি ব্যবহারকুশল মনে এই একই অনুভূতি তাহার কারণ হইতে পারে, কেবল ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাহার কারণ নাও হইতে পারে। আধিজাতিক জীবনকে তাহার বিকাশের সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্গীন মুহূর্ত্তে কেন্দ্রীভূত ও সংগঠিত করিতে রাজতন্ত্র এই যে মহান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে ইহারই অনুভূতি হইতে প্রাচ্য দেশে ইহাকে প্রায় পুণ্যবস্তু করিয়া তুলিবার প্রবৃত্তি উদ্ভূত এবং পাশ্চাত্য দেশের ইতিহাসেও এই প্রবৃত্তি যে কখনও দেখা যায় নাই তাহা নহে; ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়, কেন গৌরবময় আধিজাতিক রাজবংশ ও তাহাদের উত্তরাধিকারিগণ তাঁহাদের গ্লানি ও অধঃপতনের সময়েও আবেগময় আনু-গত্যের সহিত সেবিত হইয়াছেন।

---

* ১৯১১ সালের বিপ্লবের পর ডাঃ সান ইয়াৎ সেন নব-প্রতিষ্ঠিত চীন গণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯১২ সালে তিনি সে পদ ইউয়ান-শি-কাইকে (Yuan Shi K'ai) ছাড়িয়া দেন। ইউয়ান ১৯১৩ সালে পার্লামেণ্টকে ভাঙ্গিয়া দিয়া স্বৈরনেতা হন এবং ১৯১৫ সালে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া চীনের সম্রাট হইবার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করেন। কিন্তু ইহার জন্য যে ব্যক্তিগত মর্য্যাদা ও অর্থসম্বল প্রয়োজন তাহা তাহার ছিল না এবং সেই সময়ে ইউরোপে যুদ্ধ চলায় এবং মিত্রশক্তিবর্গ ও জাপান চীনে রাজতন্ত্রের বিরোধী হওয়ায় তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

কিন্তু আধিজাতিক বিকাশের এই গতি ইহার বিশিষ্ট কার্য্যকারিতায় যতই হিতজনক হউক না কেন, ইহা গুরুতর-ভাবে আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করিয়া থাকে এবং ইহার জন্যই আধুনিক মন স্বভাবত (যদিও অবৈজ্ঞানিক-ভাবে) প্রাচীন স্বৈররাজতন্ত্র ও তাহার প্রবৃত্তি সকলকে বিচার করিতে এত কঠোর হইয়া উঠে। কারণ সকল সময়েই ইহা হইতেছে কেন্দ্রীয়তা, কড়াকড়ি ও সমরূপতার দিকে গতি; এক আইন, এক শাসন, এক কেন্দ্রীয় আধিপত্যকে সর্ব্বব্যাপী করা—এই প্রয়োজন ইহাকে মিটাইতে হয় এবং সেইজন্যই ইহার প্রবৃত্তি হয় আধিপত্যকে জোর করিয়া প্রযুক্ত ও কেন্দ্রীভূত করিতে, স্বাধীনতাকে সঙ্কুচিত অথবা সম্পূর্ণভাবেই বিলুপ্ত করিতে। ইংলণ্ডে চতুর্থ এডওয়ার্ড হইতে এলিজাবেথ পর্য্যন্ত নবরাজতন্ত্রের যুগ, ফ্রান্সে চতুর্থ হেনরী হইতে চতুর্দ্দশ লুই পর্য্যন্ত মহান্ বুরবোঁ যুগ, স্পেনে যে-যুগ ফার্ডিনাণ্ড হইতে দ্বিতীয় ফিলিপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, রুশিয়ায় পিটার দি গ্রেট ও ক্যাথারিনের রাজত্বকাল-- এই সব যুগে এই অধিজাতিগুলি তাহাদের পরিণত অবস্থা লাভ করিয়াছিল, তাহাদের জাতীয়ভাব পূর্ণভাবে গঠন ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল এবং বলিষ্ঠ অর্গানিজেশনে উপনীত হইয়াছিল। আর এইসব যুগই ছিল স্বৈরাচারের যুগ অথবা স্বৈরাচারের দিকে এবং সমরূপতা প্রতিষ্ঠা বা প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের দিকে গতির যুগ। বস্তুত ইহা সেই রাষ্ট্রবাদেরই আর একটি রূপ ছিল যাহা এখন পুনরুজ্জীবিত হইয়া জনগণকে এক, অবিভক্ত, পূর্ণভাবে দক্ষ, পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত মন ও দেহে গড়িয়া তুলিবার জন্য তাহাদের জীবন ও চিন্তা ও বিবেকের উপর রাষ্ট্রের নিজের ইচ্ছা জোর করিয়া চাপাইয়া দিবার অধিকার দাবী করিতেছে।

এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলেই আমরা সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমত্তার সহিত বুঝিতে পারিব যে, ইংলণ্ডে টিউডর ও স্টুয়ার্টগণ কর্ত্তৃক দেশবাসীর উপর রাজতান্ত্রিক আধিপত্য ও ধর্ম্মবিষয়ক সমরূপতা দুইই জোর করিয়া চাপাইয়া দিবার প্রয়াস, ফ্রান্সে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় যুদ্ধগুলি, স্পেনে ক্যাথলিক রাজতন্ত্র ও তাহার আনুষঙ্গিক ইনকুইজিশনের নৃশংস-পদ্ধতি এবং রুশিয়াতে স্বৈরাচারী জারদের পক্ষে দেশের উপর একটা স্বৈরাচারী জাতীয় চার্চ্চও চাপাইয়া দিবার অত্যাচারমূলক সঙ্কল্প—এ-সবের প্রকৃত অর্থ কি ছিল। ইংলণ্ডে এই প্রয়াসটি ব্যর্থ হইয়াছিল, কারণ এলিজাবেথের পর উহার আর কোন প্রকৃত আবশ্যকতা ছিল না, যেহেতু অধিজাতিটি তখন সুগঠিত এবং শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল এবং বাহিরের আক্রমণে ভাঙ্গিয়া পড়িবার আশঙ্কা দূর হইয়াছিল। অন্যত্র উহা প্রোটেষ্টাণ্ট ও ক্যাথলিক উভয় প্রকার দেশেই কৃতকার্য্য হইয়াছিল, আর পোলাণ্ডের ন্যায় কচিত কোথাও যেখানে উহা ব্যর্থ হইয়াছিল সেখানে পরিণামও বিভ্রাটজনক হইয়াছিল। অবশ্য প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ইহা ছিল মানবাত্মার উপর অত্যাচার, কিন্তু শাসকবর্গের স্বাভাবিক দুষ্টাশয়তার জন্যই যে এইরূপ হইয়াছিল তাহা নহে; রাজ-নৈতিক ও যান্ত্রিক উপায়ে অধিজাতি ঐক্য গঠনে ইহা ছিল একটি অপরিহার্য্য স্তর। ইউরোপের মধ্যে একমাত্র ইংলণ্ডেই যে ইহার পর স্বাধীনতা স্বাভাবিক অনুক্রমে বিকাশ লাভ করিতে পারিয়াছিল তাহার কারণ অনেকটা ঐ জাতির বলিষ্ঠ গুণ সকল সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা আরও বেশী হইতেছে ঐ জাতির সৌভাগ্যময় ইতিহাস এবং দ্বীপসুলভ পরিস্থিতি।

এই ক্রমবিবর্তনে রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র মানুষের ধর্ম্মবিষয়ক স্বাধীনতা সকল ধ্বংস বা খর্ব্ব করিয়াছিল এবং অনুগত বা পরিপোষিত যাজক সম্প্রদায়কে নিজের ভগবদ্দত্ত অধি-কারের পুরোহিত করিয়াছিল, ধর্ম্মকে ঐহিক সিংহাসনের দাস করিয়াছিল। উহা অভিজাত শ্রেণীর স্বাধীনতা সকল লুপ্ত করিয়া দিয়াছিল এবং তাহাদের কেবল বিশেষ অধিকার-গুলি এইজন্য বজায় রাখিয়াছিল যেন তাহারা রাজার শক্তিকে সমর্থন ও রক্ষা করে। উহা বুর্জোয়া শ্রেণীকে প্রথমে অভিজাতদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিয়া পরে ইহার নাগরিক স্বাধীনতা সকল নষ্ট করিয়া দিয়াছিল এবং ইহার জন্য কেবল কতকগুলি বাহ্যিক লৌকিকতা অবশিষ্ট রাখিয়াছিল; আর জনসাধারণের ত কোনরূপ স্বাধীনতাই ছিল না যাহা লুপ্ত করিতে হইবে। এইরূপে রাজতন্ত্র নিজের কর্ম্মধারার মধ্যেই সমগ্র জাতীয় জীবনকে কেন্দ্রীভূত করিয়াছিল। চার্চ্চ তাহার নৈতিক প্রভাবের দ্বারা ইহার সেবা করিত, অভিজাতবর্গ তাহাদের সামরিক ঐতিহ্য ও সামর্থ্যের দ্বারা ইহার সেবা করিত, বুর্জোয়া শ্রেণী তাহাদের আইনজীবি-গণের বুদ্ধি বা চাতুরীর দ্বারা এবং তাহাদের বিদ্বান, মনীষী এবং সহজাত ব্যবসায় বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের সাহিত্যিক প্রতিভা ও কার্য্যনির্ব্বাহক শক্তির দ্বারা ইহার সেবা করিত; জনসাধারণ টেক্স দিত এবং নিজেদের বুকের রক্ত দিয়া রাজ-তন্ত্রের ব্যক্তিগত ও জাতিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার সেবা করিত। কিন্তু এই যে শক্তিশালী সংগঠন ও দৃঢ়নিবদ্ধ ব্যবস্থা ইহার বিজয়ই ইহার ধ্বংসকে অনিবার্য্য করিয়া তুলিয়াছিল এবং নূতন নূতন প্রয়োজন ও শক্তির সম্মুখে ইহা যে অকস্মাৎ ভাঙ্গিয়া পড়িবে অথবা অল্পাধিক অনিচ্ছার সহিত ক্রমে ক্রমে নিজের সমস্ত প্রভুত্ব ছাড়িয়া দিবে ইহাই ছিল ইহার পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ভাগ্য। ইহাকে সহ্য বা সমর্থন করা হইয়াছিল কেবল যতদিন অধিজাতিটি চেতন বা অবচেতনভাবে ইহার প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা অনুভব করিয়াছিল, একবার সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া যাইলে অথবা তাহার অবসান হইলে সেই পুরাতন প্রশ্ন আবার অবশ্যম্ভাবীরূপেই উত্থিত হইল এবং তাহা এখন সম্পূর্ণভাবে আত্ম-চেতন হইয়া উঠায় তাহাকে দমন করা বা চিরতরে ব্যাহত করা আর সম্ভব হইল না। প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থাটিকে কেবল তাহার ছায়ামাত্রে পরিবর্ত্তিত করিয়া রাজতন্ত্র নিজের ভিত্তিটি নিজেই ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল। চার্চ্চের রাজকীয় আধিপত্যকে যখন একবার অধ্যাত্মকারণেই সন্দেহ করা হইল তখন আর তাহাকে ঐহিক উপায়ের দ্বারা তরবারি ও আইনের দ্বারা বেশী দিন বজায় রাখা অসম্ভব হইল; অভিজাত সম্প্রদায় যখন তাহাদের প্রকৃত কার্য্যকারিতা হারাইয়াও কেবল তাহাদের বিশেষ অধিকারগুলি ধরিয়া রাখিল তখন

তাহারা নিম্নতর শ্রেণীর চক্ষে হেয় এবং সন্দেহের বস্তু হইয়া উঠিল; বুর্জ্জোয়া শ্রেণী নিজেদের বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া নিজেদের রাজনৈতিক ও সামাজিক হীন অবস্থায় কুপিত হইয়া তাহাদের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের বাক্যে উদ্বুদ্ধ হইয়া বিদ্রোহের আন্দোলনে নেতৃত্ব করিল এবং জনসাধারণের নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন করিল; মূক, অত্যাচারিত, দুর্দ্দশা-গ্রস্ত জনসাধারণ এই যে নূতন সাহায্যে পূর্ব্বে বঞ্চিত ছিল তাহা লাভ করিয়া উত্থিত হইল এবং মর্য্যাদানুক্রমিক সমগ্র সমাজব্যবস্থাকে উল্টাইয়া দিল। এইভাবেই হইল প্রাচীন জগতের অবসান এবং নবযুগের জন্ম।

এই মহতী বৈপ্লবিক আন্দোলনের আভ্যন্তরীণ ন্যায্যতা কি তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। অধিজাতি-ঐকটি যে গড়িয়া উঠে এবং বর্ত্তিয়া থাকে তাহা শুধু বর্ত্তিয়া থাকিবার জন্যই নহে; ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে মানবীয় সমুচ্চয়ের জন্য এমন এক বৃহত্তর ছাঁচ জোগাইয়া দেওয়া যাহার মধ্যে জাতিটি—কেবলমাত্র শ্রেণীসকল ও ব্যক্তি সকলই নহে—তাহার পূর্ণ মানবীয় বিকাশের দিকে অগ্রসর হইতে পারে। যতদিন গঠনের আয়াস চলিতে থাকে, ততদিন এই বৃহত্তর বিকাশটিকে পিছনে রাখা হইতে পারে এবং প্রভুত্ব ও শৃঙ্খলাকেই প্রথম প্রয়োজন বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে, কিন্তু যখন সমুচ্চয়টি নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়াছে এবং আভ্যন্তরীণ বিস্তারের প্রয়োজন অনুভব করিতেছে তখন আর নহে। তখন পুরাতন বাঁধনগুলিকে ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইবে; গঠনের উপায়গুলিকেই বিকাশের প্রতিবন্ধক বলিয়া বর্জ্জন করিতে হইবে। স্বাধীনতাই তখন হয় জাতির মন্ত্র। যে যাজক-সম্প্রদায় চিন্তার এবং নৈতিক ও সামাজিক বিকাশের স্বাধীনতা চাপিয়া দিয়াছিল তাহাকে তাহার স্বৈরাচারী প্রভুত্ব হইতে বঞ্চিত করিতে হয় যেন মানুষ মানসিক ও আধ্যাত্মিকভাবে স্বাধীন হইতে পারে; রাজা ও অভিজাত-সম্প্রদায়ের অনন্যসাধারণ অধিকার ও বিশেষ সুবিধাগুলি নষ্ট করিয়া দিতে হয় যেন সকলেই জাতীয় শক্তি, সম্পদ ও কর্ম্ম-ধারায় আপন আপন অংশ গ্রহণ করিতে পারে; বুর্জ্জোয়া ধনতন্ত্রকে এমন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সম্মত বা বাধ্য করিতে হয়, যাহাতে দুঃখ, দারিদ্র্য ও শোষণ দূরীভূত হইবে এবং যাহারা জাতির ধন-সম্পদ সৃষ্টি করিতে সাহায্য করিতেছে তাহারা সকলেই আরও সাম্যের সহিত তাহাতে ভাগ পাইবে। সকল দিক হইতেই মানুষকে তাহার আপন অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে, নিজের মধ্যে যে মনুষ্যত্ব রহিয়াছে, তাহার মর্য্যাদা ও স্বাধীনতা উপলব্ধি করিতে হইবে এবং মানুষের পূর্ণতম সামর্থ্যকে কাজ করিবার সুযোগ দিতে হইবে।

কারণ স্বাধীনতাই যথেষ্ট নহে, ন্যায়বিচারও প্রয়োজন এবং তাহার দাবী প্রবল হইয়া উঠে; সাম্যের বাণী ঘোষিত হয়। অবশ্য, সম্পূর্ণ সাম্য এ জগতে কোথাও নাই; তবে প্রাচীন সামাজিক ব্যবস্থায় যেসব অন্যায় ও নিষ্প্রয়োজনীয় অসাম্য ছিল সেই-সবের বিরুদ্ধেই ঐ বাণী প্রচারিত হইয়াছিল। ন্যায়সঙ্গত সামাজিক ব্যবস্থায় সকলেই যাহাতে তাহাদের শক্তি-সমূহ বিকাশ করিতে পারে এবং সেই সব প্রয়োগ করিবার জন্য সমান সুযোগ, সমান শিক্ষা পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং যাহারা নিজেদের সামর্থ্য প্রয়োগ করিয়া সাধারণ জীবনের অস্তিত্ব, শক্তি ও বিকাশে সাহায্য করিতেছে তাহারা যেন যতদূর সম্ভব ঐ জীবনের সুযোগ-সুবিধা সকলে সমান অংশ পায় তাহার বিধান করিতে হইবে। আমরা দেখিয়াছি যে, এই প্রয়োজনটি সাধারণের ইচ্ছার মুখপাত্র স্বরূপ এক সুবিজ্ঞ ও উদারনৈতিক কেন্দ্রীয় অধ্যক্ষতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও সাহায্যপ্রাপ্ত মুক্ত সহযোগিতার আদর্শ গ্রহণ করিতে পারিত কিন্তু বস্তুত ইহা স্বৈর ও দক্ষ রাষ্ট্রের প্রাচীন আদর্শটিতেই ফিরিয়া গিয়াছে,—সে আদর্শ রাষ্ট্র এখন আর রাজতান্ত্রিক, যাজকীয় বা আভিজাতিক নহে, তাহা হইতেছে, ঐহিক, গণ-তান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক। এই প্রত্যাবর্ত্তনের মনস্তত্ত্ব-মূলক কারণগুলি এখন আমরা আলোচনা করিব না। সম্ভবত স্বাধীনতা ও সাম্য, স্বাধীনতা ও প্রভুত্ব, স্বাধীনতা ও সুব্যবস্থিত দক্ষতা, এ-সবের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য কখনই হইতে পারে না, যতদিন মানুষ ব্যষ্টিতে ও সমষ্টিতে অহংভাবের দ্বারা চালিত হইবে, যতদিন না সে এক মহান আধ্যাত্মিক ও মানসিক রূপান্তর সাধন করিয়া মাত্র কম্যুনিষ্ট সঙ্ঘবদ্ধতার ঊর্দ্ধ্বে সেই তৃতীয় আদর্শটির মধ্যে উঠিতে পারিবে যেটিকে ফ্রান্সের বৈপ্লবিক মনীষিগণ একটা অস্পষ্ট আভ্যন্তরীণ অনুভূতির বশে তাহাদের স্বাধীনতা ও সাম্যের বাণীর সহিত যোগ করিয়া দিয়াছিলেন—তাহা হইতেছে মৈত্রীর (fraternity) আদর্শ এবং তিনটির মধ্যে সেইটিই শ্রেষ্ঠতম যদিও এখন পর্য্যন্ত তাহা মানুষের মুখে কেবল একটি ফাঁকাকথা মাত্র হইয়া রহিয়াছে। সেইটিকে কোন সামাজিক রাজনৈতিক বা ধর্ম্মনৈতিক যন্ত্রবৎ প্রতিষ্ঠান এ পর্য্যন্ত কখনও সৃষ্টি করে নাই, কখনও সৃষ্টি করিতে পারিবে না; তাহার জন্ম চাই আত্মার মধ্যে, অন্তরের নিগূঢ় ও দিব্য গভীরতা সকল হইতেই তাহা উত্থিত হইবে। *

(ক্রমশ)

---

* The Ideal of Human Unity হইতে শ্রীঅনিলবরণ রায় কর্ত্তৃক অনূদিত।

—

বিশ্বরাজনীতিতে পোল্যাণ্ড

বিশ্বরাজনীতির পট এত দ্রুত পরিবর্ত্তিত হইতেছে যে, কিছুই নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। নিশ্চয় করিয়া কিছু বলার বিপদও কম নয়। আজ যা সত্য বলিয়া প্রতীত হইতেছে কাল এমন সব ঘটনার উদ্ভব হইতে পারে যাহার ফলে সবই খানচাল হইয়া যাইবে। গত সপ্তাহে ইউরোপের ছোট রাষ্ট্রগুলির কথা বিশেষভাবে বলিয়াছি। তাহারা এক সময়ে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সদিচ্ছার উপর খুবই নির্ভর করিত। ব্রিটেন ফ্রান্সও সমষ্টিগত নির্ব্বিঘ্নতার দোহাই দিয়া তাহাদের সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি বরাবর দিয়া আসিয়াছে। কিন্তু গত কয়েক বৎসরে ইহার বিপরীত ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপে হিটলার মুসোলিনীর সহযোগে যতই নিজ পক্ষপুট বিস্তার করিতেছিলেন, ইহারাও তেমনি আস্তে আস্তে আসর হইতে যেন সরিয়া পড়িতেছিল। ইহার ফল কি বিষময় হইয়াছে, ঐ সব স্থানের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যাইবে। হিটলার অষ্ট্রিয়া কুক্ষিগত করিয়াছেন। বড় শক্তিদের সম্মতি অনুসারে প্রথমে চেকোশ্লোভাকিয়ার সুদেতেন জার্ম্মান অঞ্চল আত্মসাৎ করিয়াছেন। ইহার ছয় মাস যাইতে না যাইতেই কাহাকেও না বলিয়া কহিয়া সমগ্র চেকোশ্লোভাকিয়াই হিটলার গ্রাস করিয়া ফেলিলেন! হিটলারী ক্ষুধা বিশ্বগ্রাসী। ইহার পর মেমেল ভক্ষণ করিয়াছেন! রুমানিয়ার সঙ্গে হঠাৎ চুক্তি করিয়া ফেলিয়াছেন। জগতে প্রচার করা হইল, পোল্যাণ্ড হিটলারের বিরুদ্ধে যাইবে না। যদি কোনরূপ অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সে নিরপেক্ষ থাকিবে।

সত্য কথা বলিতে কি, কিছুকাল যাবৎ মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপের ছোট রাষ্ট্রগুলি বড়দের কার্য্যকলাপে হতভম্ব তো হইয়াছিলই, ভীষণ অস্বস্তির মধ্যেও কাল কাটাইতেছিল। ফ্রান্স ও ব্রিটেন হাত গুটাইয়া লইতে থাকিলে এখানকার ছোট রাষ্ট্রগুলির হিটলারের দিকে মুখ না ফিরাইয়া উপায় ছিল না। তথাকথিত ডিমোক্রাসিগুলি এযাবৎ বাগাড়ম্বরই করিয়া আসিয়াছে, কার্য্যকালে তাহাদের টিকিটিও দেখা যায় নাই। যদি বা তাহারা কখনও আসরে দেখা দিয়াছে তাহা তাহাদের অমঙ্গলেরই কারণ হইয়াছে। আবার তাহাদের দুয়ারে ধর্ণা দিয়া পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি, রাষ্ট্র-সঙ্ঘ, সমষ্টিগত নিরাপত্তা প্রভৃতির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াও কোনই ফল এই রাষ্ট্রগুলি পায় নাই। কাজেই তাহারা যে অন্য কাহারও কাছে আশ্রয় খুঁজিবে তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। করিয়াছিলও তাহাই। জার্ম্মানী প্রথমে বাণিজ্য উপলক্ষে এই সব স্থলে প্রবেশ করে। তারপর নানাভাবে ইহাদের হাত করিবার চেষ্টা করে। ইহারা কিন্তু ইহাতে মোটেই সোয়াস্তি পাইতেছিল না। তথাপি কেন ইহারা হিটলারকেই অভিনন্দন জানাইয়াছে তাহা আপনাদের নিকট এখন আর অস্পষ্ট নয়। তাহারা ভাবিয়াছিল, হয়ত কেহ কেহ এখনও ভাবে যে, নানাভাবে স্বাধীনতা খর্ব্ব হইলেও হয়ত শেষ পর্য্যন্ত কোন মতে বাঁচিয়া যাইতে পারিবে। ব্রিটেন বা ফ্রান্সের অনুগ্রহ লাভের আশায় বসিয়া থাকিলে তাহাদের অস্তিত্বই ধরাপৃষ্ঠ হইতে ধুইয়া মুছিয়া যাইবার সম্ভাবনা!

হিটলার যখন অষ্ট্রিয়া অধিকার করিলেন তখন হইতেই তাহাদের মনে এই ধারণা জন্মে। গত সেপ্টেম্বর মাসে চেকোশ্লোভাকিয়ার অঙ্গচ্ছেদের সময় কিন্তু ইহারাও কেহ কেহ বিশিষ্ট রূপ ধারণ করিয়াছিল। ছোট রাষ্ট্র চেকোশ্লোভাকিয়ার সহায়তা করা দূরে থাকুক, হাঙ্গারী ও পোল্যাণ্ড নিজ নিজ দিকে তাহার কতক অংশ ছিনাইয়া লয়। তখন সাধারণের মনে হইয়াছিল ইহাদের নেতারাও কি একটি ক্ষুদে হিটলার হইয়াছে? হিটলারের ভাবেও কি তাহারা অনুভাবিত হইতেছে? মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপে হিটলারী নীতি এত দ্রুত প্রসারলাভ করিয়াছে দেখিয়া সকলেই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিল। বিশেষজ্ঞদের কিন্তু ইহার রহস্য ভেদ করিতে বিলম্ব হইল না। আজ যাহারা হিটলারের পথে চলিয়া অন্যের উপর চড়াও হইতে চাহিতেছে কাল আবার তাহাদেরই পালা আসিবে, হিটলার তাহাদের উপরই শ্যেনদৃষ্টি হানিবেন তখন। আশ্চর্য্য এই যে, অতি অল্পকালের মধ্যেই ইহার সত্যতা প্রমাণিত হইতে চলিয়াছে; কিন্তু ইহার পূর্ব্বে আরও কয়েকটি বিষয় আমাদিগকে ভাবিয়া লইতে হইবে।

মিউনিক চুক্তির পর কিন্তু ইউরোপের তথাকথিত শান্তিকামীরা নিরস্ত থাকিতে পারিলেন না। ব্রিটেনের নৌ-বিভাগের মন্ত্রী মিঃ ডাফ্ কুপার পদত্যাগ করিয়া প্রমাণ করিয়া দিলেন যে, যুদ্ধের জন্য ব্রিটেন মোটেই প্রস্তুত ছিল না! অমনি সকলে অস্ত্র-শস্ত্র, নৌবহর, বিমানপোত প্রভৃতি বাড়াইবার দিকে মন দিল। ব্রিটেন এবং ফ্রান্স একযোগেই সমস্ত কাজ আরম্ভ করিয়াছিল। এ দুইটি দেশে এখন সব কার্য্যই ভাবী যুদ্ধের কথা ভাবিয়া করা হইতেছে। তাহারা রণ-সম্ভার কিরূপ বাড়াইবার আয়োজন করিতেছে তাহা এ পত্রে বহুবার বলিয়াছি, এখন আর পুনরুল্লেখ করিব না। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের অন্য কার্য্যকলাপও হিটলার নিরীক্ষণ করিলেন। বিজয় লাভের মুখে স্পেনের বিদ্রোহী ফ্রেঙ্কোকে স্বীকার করিয়া নিজ নিজ শক্তি দৃঢ় করিতে চাহিয়াছিল তাহারা। হিটলার কালবিলম্ব না করিয়া মূলে আঘাত দিলেন। আগে যদি বা কিছু চক্ষুলজ্জা ছিল, এখন তাহাও আর রহিল না। ব্রিটেন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী আগে হইতেই অস্ত্রশস্ত্র তৈরী হইতেছিল। তাহার উপর বর্ত্তমান বর্ষে চারিশত সাড়ে চারিশত কোটি টাকা ব্যয় নূতন করিয়া ধার্য্য হইয়াছে এই সব আরও দ্রুত বাড়াইয়া লইবার জন্য। হিটলার কিন্তু দেখিলেন, লক্ষণ ভাল নয়; শীঘ্রই ইহার প্রতিষেধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাস সম্বন্ধে আলোচনা কালে বলিয়াছিলাম, অঙ্গহানির পরও তাহার যেটুকু শক্তি-সামর্থ্য ছিল তাহা দ্বারাই স্বাধীন রাষ্ট্রের মত সে চলিতে চাহিয়াছিল। ইহা হিটলারের মোটেই পছন্দসই হয় নাই। চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাধীন সত্তা বিলোপ করিয়া নিজের মতানুযায়ী তাহাকে

চালাইতে চাহিয়াছিলেন তিনি। হিটলার তাই উহার কার্য্যের মধ্যে এমন কিছু অছিলা খুঁজিয়া পাইলেন, যাহা দ্বারা তাঁহার উদ্দেশ্য অতি দ্রুত সিদ্ধ করিয়া ফেলিয়া লওয়া সম্ভব হইল। চেকোশ্লোভাকিয়াকে গ্রাস করা তাঁহার যতটা উদ্দেশ্য ছিল তাহার চেয়ে গুরুতর উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটেন ও ফ্রান্স, বিশেষভাবে ব্রিটেনের একপ্রকার রণসম্ভার বৃদ্ধির সঙ্গে আড়ি দেওয়া। কি উপায়ে তিনি ইহা করিতে পারেন? ব্রিটেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়া অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করিতে হইলে বিস্তর অর্থের প্রয়োজন, সময়েরও আবশ্যক খুব। কিন্তু জার্ম্মানীর পক্ষে এ উভয়ই এখন অসম্ভব। বিনা ব্যয়ে অথচ অতি দ্রুত হিটলারকে সব কাজই হাসিল করিয়া লইতে হইবে! বিশ্ববাসীর বিশেষতঃ জার্ম্মান জাতির মনে বুঝি তাঁহার অতিমানবত্বার প্রমাণ দেওয়ার সুযোগও উপস্থিত হইল! তাই তিনি এক চালে কিস্তিমাত করিলেন। বলা নাই, কহা

মুসোলিনী

হিটলার

কর্ণেল জোসেফ বেক

নাই, চেকোশ্লোভাকিয়া সম্পূর্ণই গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। শ্লোভাকদের বা রুথেন বা ইউক্রেনদের স্বাধীন করিয়া দেওয়ার আবশ্যকতা সম্বন্ধে আপনারা কত কথাই না শুনিয়াছেন। এ সব কিন্তু ষোলআনাই ভূয়া কথা। 'শাক দিয়া মাছ ঢাকা' আর কতদিন চলিবে? যতই দিন যাইতেছে ততই হিটলারের আসল উদ্দেশ্য প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। ব্রিটেন অত টাকা ব্যয় করিয়া অস্ত্র-শস্ত্র তৈরী করিতেছে, আর দেখুন দেখি, হিটলার স্বল্প সময়ের মধ্যে এক হুমকীতে চেকোশ্লোভাকিয়ার সমস্ত ধন-সম্পদ, আর রণসম্ভার হাত করিয়া ফেলিলেন! সুশিক্ষিত সৈন্য দুই লক্ষ, পনর শত খানা প্রথম শ্রেণীর যুদ্ধ বিমানপোত, অধুনিকতম কামান, বন্দুক, ট্যাঙ্ক, কত-কি তাঁহার হস্তগত হইয়াছে! হিটলারের মূল উদ্দেশ্য একদিনে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার সঙ্গে এখন পারে কে?

হিটলারের কার্য্যে সমগ্র জগতে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইয়াছে তাহার বিষয় আগে বিশদভাবে উল্লেখ করিয়াছি। ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়া, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া সর্ব্বত্রই ইহার ফলে চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। হিটলার এক বৎসরের মধ্যে প্রায় তিন কোটি লোক জার্ম্মানীভুক্ত করিয়াছেন। তাহার লোকসংখ্যা এখন প্রায় দশ কোটি! তাঁহার সৈন্য-সংখ্যা, রণসম্ভার—নৌবহর বিমানবহর প্রভৃতি আশাতীতরূপে বাড়িয়া গিয়াছে একরূপ নিখরচায়! কাজেই তাঁহার দ্বারা বিশ্বে যে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? কিন্তু এ চাঞ্চল্য কি শুধু কথায়ই পর্য্যবসিত হইবে? তথা-কথিত ডিমোক্রাসিগুলি কি কোন সার্থক পন্থা অবলম্বন করিবে না? চেকোশ্লোভাকিয়ার বেলায় ত তাহারা বলিয়াছে, হিটলার অতর্কিতে এইরূপ করিয়াছেন। অতঃপর আর কোন দেশও কি তিনি এইরূপ অতর্কিতে গ্রাস করিয়া ফেলিতে পারিবেন? এই সব প্রশ্ন আজ সর্ব্বত্র উপস্থিত হইয়াছে। যাহারা ডিমোক্রাসিগুলিকে আঁকড়াইয়া থাকিতে চায় তাহাদের মনেও এই প্রশ্ন জাগিয়াছে, যাহারা হিটলার-মুসোলিনীকেই ত্রাণকর্ত্তা ভাবিতেছিল তাহারাও আজ এই প্রশ্ন করিতেছে। এই সমস্যা সমাধানের কোন উপায়, হইতেছে কি?

চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাসের অব্যবহিত পরেই হিটলারের রুমানিয়ার সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হওয়া ও মেমেল গ্রাস—এ দুইটি কার্য্যে মনে হইয়াছিল যে, তাঁহার প্রভাব অক্ষুণ্ণ ত থাকিবেই, ক্রমশ বাড়িয়াও যাইবে। কিন্তু ইহা হইতে পারিবে না বলিয়াই এখন মনে হইতেছে। ডিমোক্রাসিগুলি পূর্ব্বের মত আবার বাক্‌চাতুরীর আশ্রয় লইতে সুরু করিয়াছিল, কিন্তু ইদানীং এমন কিছুর আভাষ পাওয়া গিয়াছে যাহাতে তাহাদের পক্ষে আর বাক্‌চাতুরী করিয়া কাল কাটাইবার সময় নাই। এরূপ করিলে তাহাদের আত্মহত্যা অনিবার্য্য। ছোট রাষ্ট্রগুলিও তাই কতকটা আশ্বস্ত হইয়াছে।

ব্যাঙ্গ-চিত্র চেম্বারলেন দালাদয়ের সঙ্গে শান্তির ধাঁধাঁয় ঘুরিতেছেন। দালাদয়ের (চেম্বারলেনকে লক্ষ্য করিয়া)—"প্রভু 'চেক'-রাণীর প্রতি আমাদের সব প্রতিশ্রুতিই ভুলে গেলাম!" "ছিঃ ছিঃ, ওসব তচ্ছ কথা মনে করে থাকতে হয়?"

হিটলার আর কাহাকেও অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিলে তাহা ব্রিটেন ও ফ্রান্স সহ্য করিবে না। তাহাদের কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবারও সময় বুঝি উপস্থিত হইয়াছে। এখন পোল্যাণ্ডের পালা আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। চেকো-শ্লোভাকিয়ার রাজ্য লুঠের সময় সেও তাহার খানিকটা পাইয়াছে। তখন কে ভাবিয়াছিল পোল্যাণ্ডের উপরও হিটলারের অভিসন্ধি এত শীঘ্র প্রকাশ পাইবে? গত কয়েক মাস যাবৎ আমরা শুনিতেছি নাৎসী জার্ম্মানদের উপর পোলরা অত্যাচার চালাইতেছে। আবার ইহাও শুনিয়াছি, তথাকার পররাষ্ট্র সচিব কর্ণেল বেক হিটলারেরই পক্ষপাতী! তিনি যখন ফ্রান্সে ছুটি উপভোগ করিতেছিলেন তখন যে-সব সমস্যা দেখা দেয় তাহার মীমাংসার জন্য লণ্ডন বা প্যারিসে ভাবী ইউরোপীয় যুদ্ধে পোল্যাণ্ড নিরপেক্ষ থাকিবে রটনা করা হইতেছে। ইহা স্বার্থপরেরই মিথ্যা প্রচার বলিয়া মনে হইবে। তথাপি পোল্যাণ্ড কেন এত দৃঢ়তার সহিত বিরাট শক্তি জার্ম্মানীর অভিপ্রায় জানিয়া তাহা প্রতিরোধ করিতে ভরসা পাইতেছে দেখা যাক।

ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেন সম্প্রতি পার্লামেণ্টে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, পোল্যাণ্ড আক্রান্ত হইলে সে নিজে যদি যুদ্ধ করিতে রাজী হয়, তাহা হইলে ব্রিটেনও তাহাকে সাহায্য করিবে। ফ্রান্স যে তাহাকে সাহায্য করিবে ইহা এখানে উল্লেখ না করিলেও চলে, কারণ প্রথমত সে পোল্যাণ্ডের সহিত আত্মরক্ষামূলক সন্ধিতে আবদ্ধ; দ্বিতীয়ত ব্রিটেন যাহা করিবে তাহা সে অতি তৎপরতার

মঃ লিট্‌ভিনফ্‌

রুমানিয়ার রাজা কেরল

মিঃ এণ্টনী ইডেন

না গিয়া জার্ম্মানীর বার্‌চটেশ্‌গাডেনে হিটলার ভেটিতে ছুটিয়াছিলেন! ইহা তখন সাধারণের কাছে রহস্যপূর্ণই বিবেচিত হইয়াছিল। এখন আমরা এই রহস্য কতকটা ভেদ করিতে পারিতেছি। হিটলারের রাজ্যলোভ দুর্দ্ধার। কর্ণেল বেক শত চেষ্টা সত্ত্বেও হিটলারী ক্ষুধা প্রশমনে সক্ষম হন নাই। অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, মেমেল অধিকার করিয়া তাঁহার ক্ষুধা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। ভের্সাই সন্ধিতে নিজ জার্ম্মানী ও পূর্ব্ব প্রুসিয়াকে আলাদা করিয়া সমুদ্রে বাহির হইবার জন্য মাঝখানে একটা ফালির মত জায়গা রাখা হইয়াছে। এই ফালি এখন পোলাণ্ডের অধীন। এই ফালির উপরে ডানজিগ শহর অবস্থিত। হিটলার ইহার উপরে কর্তৃত্ব করিতে চান। পোল্যাণ্ড কিন্তু স্পষ্টই জানাইয়া দিয়াছে যে, এই স্থানের উপর হস্তক্ষেপ তাহার স্বাধীনতার উপরই হস্তক্ষেপ বলিয়া গণ্য হইবে। আগে বলিয়াছি, সহিতই করিয়া চলিবে। ব্রিটেনের উপরই যে তাহার এখন একান্ত নির্ভর। অনেকে প্রশ্ন করিতেছে যে, চেকো-শ্লোভাকিয়র মত খাঁটী গণতন্ত্রকে রক্ষা করিবার জন্য ব্রিটেন অগ্রসর হইল না, এখন পোল্যাণ্ড সম্পর্কে তাহার এত মাথাব্যথা কেন হইল। ইহার একটি বিশেষ কারণ আছে। গত সপ্তাহে বলিয়াছি ইউরোপে শক্তি সমতা (Balance of Power) রক্ষিত না হইলে ব্রিটেন একেবারে শক্তিহীন হইয়া পড়িবে। আপনাদের মধ্যে যাহারা ব্রিটিশ রাজনীতির ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত তাহারা এই শক্তি-সমতার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবেন। যুগে যুগে ব্রিটেন কখন ফ্রান্স, কখনও প্রুসিয়া, কখনও রুশিয়া, কখনও তুরস্ক—ইহাদের শক্তি ঠেকাইয়া রাখিতে অথবা যাহাতে শক্তি অত্যধিক বাড়িয়া না যায় তাহার জন্য সচেষ্ট ছিল। গত মহাযুদ্ধের পর রাষ্ট্রসঙ্ঘের আওতায় আসিয়াও যে, সে এই নীতি ভুলিয়া

গিয়াছিল তাহা নহে। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জার্ম্মানীকে, জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে ফ্রান্স-ইটালীকে আবার কখনও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইটালী-জার্ম্মানীকে লাগাইয়া নিজের শক্তি অটুট রাখিতে তৎপর হইয়াছে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত জার্ম্মানী ও ইটালী একত্র হওয়ায় তাহার এই নীতির মূলে আঘাত লাগিয়াছে খুবই। চেকোশ্লোভাকিয়া সুদেতেন জার্ম্মান অঞ্চল যখন জার্ম্মানীকে দিয়া দিতে বাধ্য হইল তখনই ব্রিটেন বুঝিতে পারিল তাহার পূর্ব্বনীতি কতখানি বানচাল হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। তাহার অত দ্রুত ও অত ব্যাপকভাবে রণসম্ভার বৃদ্ধিকার্য্য ইহাই সূচিত করে। হিটলারের চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাস তাহার পক্ষে হইল বিনা মেঘে বজ্রাঘাত তুল্য। চেকোশ্লোভাকিয়া গিয়াছে। কিন্তু এমন কিছু আঁকড়াইয়া থাকা দরকার যাহাদের সাহায্যে জার্ম্মানীর ব্যাপক শক্তি ব্যাহত করা যাইবে অথবা ইহার রাশ্ টানিয়া রাখা যাইবে। পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা রক্ষা হউক, কি না হউক তাহার জন্যই যে ব্রিটেনের খুব মাথাব্যথা তাহা নয়। ইউরোপে শক্তি সমতা রক্ষা করাই তাহার এখন প্রধান উদ্দেশ্য ও সমস্যা। আবার চেম্বারলেনের কথায় একটা প্যাঁচও রহিয়াছে। টাইমস্ পত্রিকা সেদিন তাহার ভাষ্য করিয়া দিয়াছে। পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ব্রিটেন প্রতিশ্রুত। তাহার integrity বা পোল্যাণ্ডের সমগ্র ভূখণ্ডই অটুট ও অক্ষুন্ন থাকুক ইহা কিন্তু বলা হয় নাই অর্থাৎ হিটলারের সঙ্গে যদি কতকাংশ ছাড়িয়া দিয়া আপোষ রফা করা চলে এইভাবে তাহার দ্বার উন্মুক্ত রাখা হইয়াছে। পোল্যাণ্ডের পররাষ্ট্র-সচিব কর্ণেল বেক লণ্ডন পৌঁছিয়াছেন। ব্রিটিশ ধুরন্ধরদের সঙ্গে তাঁহার কিরূপ বোঝাপড়া হয় ইহাই এখন দেখিবার বিষয়!

হিটলার মুসোলিনীকে অনেকে অনেক রকম কটু-কাটব্য করেন, কিন্তু তাঁহাদের যে রাজনৈতিক দূরদর্শিতা আছে তাহা অনেকেই স্বীকার করিবেন। ব্রিটিশ মনোভাবের ঐরূপ দৃঢ় অভিব্যক্তি দেখিয়া তাঁহারা কিন্তু ইতিমধ্যেই সুর নামাইয়া দিয়াছেন। মুসোলিনী ইদানীং যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাতে তিক্ততা ও তীব্রতা প্রকাশ পাইয়াছে যথেষ্ট কিন্তু চট্ করিয়া কিছু করিয়া ফেলিবেন তাহার কোন আভাসও কিন্তু ইহাতে পাইবেন না। হিটলারও সম্প্রতি একটি ভাষণ দিয়াছেন। তাহাতে তিনি ব্রিটেনকে নানারূপ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-শ্লেষ করিয়াছেন,—বুড়ো বয়সে ধার্ম্মিক হওয়ার কথাও বলিয়াছেন কিন্তু আসলে ব্রিটেনকে চটাবার মনোভাব ইহাতে প্রকাশ পায় নাই। এসব ব্রিটিশ সংবাদপত্রগুলিরই ভাষ্য, আমার নিজের কথা নহে। ব্রিটেন, ফ্রান্স, রুশিয়া, এমন কি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র পর্যন্ত আজ হিটলারের পররাজ্য হরণ ব্যাপারে অতি মাত্রায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ হইবার কারণ উপরে বলিয়াছি। সম্প্রতি প্রকাশ, ইউরোপে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের শক্তি-দৌর্ব্বল্য ঘটিলে যুক্তরাষ্ট্রেরও নাকি স্বাধীনতা বিপন্ন হইবে! অনেকে হিটলার মুসোলিনীর প্রচারকার্য্যে বিস্মিত হন, ব্রিটিশের প্রচারকার্য্য যে কত গভীর ও সূক্ষ্ম নিয়মে চলে তাহা ঐ কথাটি হইতেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন। যাহা হউক, পোল্যাণ্ড লইয়াই এখন সমস্যা। সকলে আট্‌ঘাট বাঁধিতেছে যাহাতে হিটলার পোল্যাণ্ডকেও গ্রাস বা অঙ্গহীন না করিতে পারে। বিশ্ব-রাজনীতিতে আজ পোল্যাণ্ড একটি বিশেষ সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৩৯।

সহজ সুর

শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়

এমনি করেই সহজ সুরে
বেজে ওঠে পৃথিবীর মর্ম্মবাণী
এমনি বসন্ত কাননের নব পল্লব মর্ম্মরে,
কুসুমিত পুষ্পস্তবকে ভ্রমরের গুঞ্জরণে
আলোছায়ার নিয়ত চপল খেলায়
প্রথম প্রেমের অনুভূতির স্বপ্ন জাগে
মাতৃত্বের নিবিড় ব্যাকুলতায়।

অন্তর সবারেই বলতে চায়
'তোমায় ভালবাসি'
যখন বিনিময়ে ফিরে পায় ভালবাসা
দুটি হৃদয়ের সহজ সুরের বিকাশে
তখন হয় জন্ম নব সৌন্দর্য্যের।

ক্ষণিক জীবনের মাঝে নেমে আসে
অসীমের আনন্দ আহ্বান
সূর্য্য-চন্দ্র-তারার সাথে তখন
সুর মিলিয়ে বলতে পারি
এই যে আমি আছি
তোমাদেরি সাথে আনন্দ-পথের যাত্রী
জন্মের পর জন্ম
মৃত্যুর পর মৃত্যু
পার হয়ে চলেছি
সহজের সন্ধানে।

পত্রপাঠ

(গল্প)

শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ

বাবা, অর্থাৎ বৈকুণ্ঠবাবুকে নিজের কাছে আনার জন্যে তপতীর আগ্রহের সীমা নেই। এর মধ্যে অন্তত পঁচিশ দিন সে সুধাংশুকে বলেছে,—বাবাকে আসতে লিখে দাও। মা মারা গেছেন, বুড়ো বয়েসে কত কষ্টই না জানি হ'চ্ছে।

সুধাংশুর বিশেষ মত নেই। বলেছে, থাক না। আমাদের এই টানাটানি, এর ভেতর ওঁকে টেনে এনে কি হবে! শুধু শুধু ওঁকে অশান্তি দেওয়া, আমাদেরও......

—আহাহা কি কথাটাই না হ'ল! স্বকীয় বিশিষ্টতায় তপতীর মুখখানা বেঁকে উঠেছে, তারপর বলেছে,—আমি যেন খালি বাবার অসুবিধের জন্যেই বলছি......

তারপর সুধাংশুর গা' ঘেঁসে এসে বলে,—এও বুঝলে না হাঁদারাম? বাবা অনেকদিন রেলে চাকরী করেছেন,......চাই কি আমাদের এই তো নিত্য অভাব,...ইত্যাদি।

আর একদিনও এমনি। সুধাংশু কিসের জন্যে টাকা চাইতে এসেছিল। তপতী বলেছে,—তোমায় এত বলি, শুনবে না তো। বাবাকে এখানে আসতে বলতে ওঁর মাথা কাটা যাবে। এর পর অণুর ওখানে গিয়ে উঠুন, অণুই সব হাতিয়ে নিক, শেষে খেয়ো'খন কাঁচকলা! টাকা চাইছ? যাও পাবে না। টাকা কোথা থেকে আসবে? আমার বাক্সে টাকা নেই। যেমন শুনবে না আমার কথা!

বাবার সম্পর্কে তপতীর এই উক্তিগুলো সুধাংশুর রুচিকে বুঝি আহত করে! কিন্তু সুধাংশু মানুষ, তার ওপর সুধাংশু স্বল্পবিত্ত। মাসে মাসে কুড়ি টাকার লোভে চেয়ারটায় একটু নড়ে চড়ে বসে! তবু মুখে অনিচ্ছার ভাব দেখিয়ে বলে,—কিন্তু......

—ওসব কিন্তু-কিন্তু আর নয় বাপু! তপতী এবার চটে যাবার ভঙ্গী করে,—ঢের হয়েছে। আমি আজই ওঁকে আসতে লিখে দিচ্ছি। শেষটায় ফসকে যায় তো আমারই যাবে......

খানিক পরে তপতীকে একটা চিঠি নিয়ে আসতে দেখা গেল।

চিঠির উত্তর এল চারদিন পর। বৈকুণ্ঠ বাবু আসছেন। চিঠিটা তপতী সুধাংশুকে পড়ে শোনাল।

সুধাংশু বিশেষ উৎসাহ দেখায় নি। শুধু অন্যমনস্ক ভঙ্গীতে বলেছে,—হুঁ।

তা হোক, তপতী নিশ্চয় জানে, মনে মনে সুধাংশুও কিছু কম খুশী হয়নি। বাইরেটা সুধাংশুর চিরকালই অমন চাপা।

ছেলেদের তপতী ডেকে শুনিয়ে দিয়েছে,—এই হাবলা, মণ্টু, গোবরা, কে আসছে জানিস? তোদের দাদু। সেই যে সেবার কত খেলনা, পুতুল, পোষাক এনেছিলেন, সেই তিনি! দেখিস এবারও কত কিছু নিয়ে আসবেন!

খেলনা এবং পোষাক লাভের আশু সম্ভাবনায় মণ্টু, গোবরা এবং হাবলার উৎসাহ শোভনতার সীমা লঙ্ঘন করারই কথা।

তপতী অমনি ধমকে দিয়েছে; দিনকে দিন অসভ্য হচ্ছ তোমরা। খবর্দ্দার মণ্টু, উনি এলে কক্ষণো অমন বেয়াড়াপনা করবে না, বাবা এসব একদম পছন্দ করেন না।

বৈকুণ্ঠবাবু বোধ হয় আগে থেকেই ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা যে অসভ্যতা করবে, তা অনুমান করে থাকবেন। দেখা গেল, ছেলে-পিলের জন্য কিছুই তিনি আনেন নি।

জিনিষপত্রের মধ্যে একটা রঙ্-চটা টিনের তোরঙ্গ, ছোট ক্যাশ বাক্স একটা, আর ছেঁড়া সতরঞ্চি দিয়ে জড়ান একটা বিছানা।

তপতী প্রথমটা একটু হতাশ হয়ে গিয়েছিল বইকি! বাবার সঙ্গে বেশী মালের প্রত্যাশা সে করেনি, তবু...হ্যাঁ,... তবু সে আশা করেছিল, বৈকুণ্ঠবাবু অন্তত আর কিছু সঙ্গে আনবেন।

ভেবেছিল, আর কিছু না আনুন, তার জন্যে একখানা শাড়ীও কি বাবা আনবেন না! তারপর ছেলে-মেয়েদের জন্যে খেলনা—

ভেবেছিল, সে কৃত্রিম একটা অসন্তোষ দেখিয়ে বলবে,—কেন যে এতসব খরচ করতে গেলেন বাবা?

বলবে, না আপনার এখনো হিসেব করে খরচ করার স্বভাব হল না!

রাতে সুধাংশু ঠাট্টা করে বলেছে,—কিগো, জিনিষপত্তর কোথায় ঠাঁই দেবে ভেবে ভেবে তুমি যে অস্থির হয়ে পড়েছিলে? জায়গায় ধরেছে তো?

গম্ভীর গলায় তপতী বলেছে, দেখ সব সময় ফাজলেমি ভাল লাগে না। বাবা চিরকালই একটু কৃপণ!

পরদিন সকালে,—

—আপনি এ কি হয়ে গেছেন বাবা? ইস্, শরীরে আর কিছু নেই যে? অযত্নে অযত্নে...

তারপর।—আপনি নিশ্চয়ই আমাদের পর মনে করেন, নইলে...আরো পরে। 'এমন করে থাকলে আর কতদিন বাঁচবে বাবা'—তপতীর মুখে 'তুমি' চোখে জল,—'আমার তিনকুলে আর কেই-বা আছে—'আঁচল দিয়ে চোখ ঘষা—' নাও, এবার গায়ের জামাটা খোল দিকি?

বৈকুণ্ঠবাবু কথা ক'ন কম।

—তপতী?

—কি বাবা?

—সুধাংশু কত টাকা মাইনে পায় রে?

এই তো সুযোগ!—সে কথা আর জিজ্ঞেস করে কি হবে বাবা? কোন রকমে চলে,—এই! তা তুমি ভেব না বাবা কোন অসুবিধা হবে না।

তারপর তপতী ঘরের এক কোণে বৈকুণ্ঠবাবুর জিনিষ-পত্তর দেখিয়ে বলে,—ওর ভেতর কি আছে বাবা?

—ওর ভেতর? কুণ্ঠিত, যেন বলতে অনিচ্ছুক, এমন ভঙ্গীতে বৈকুণ্ঠ বাবু বলেন,—'ওর ভেতর কি আর থাকবে? ঐ খানকতক কাগজপত্তর, কাপড়, আর, আর, এই'—বৈকুণ্ঠ বাবু ইতস্তত করেন।

তপতীর কি আর বৈকুণ্ঠবাবুর এই ইতস্তত করার কারণ জানতে বাকি আছে! বাবা কৃপণ, সে জানে,—তাই, ওর ভেতরই যে তাঁর পুঁজি আছে সে কথা ব'লতে তাঁর এত সঙ্কোচ!

তপতী জানে দু'দিন বাদে, ওই বাক্সটার চাবী তার আঁচলেই উঠবে। বাবা এখানেই থাকতে এসেছেন, দু'দিন বাদে অন্তত চক্ষু লজ্জার খাতিরেও তপতীকে বলবেন,—এই নে মা! তোর কাছে রাখ। যখন যা দরকার হবে তখনই তা নিস!

তপতী অবিশ্যি প্রথমটা কিছু দ্বিধা দেখাবে! ব'লবে, থাক না বাবা, আপনার কাছেই থাক! পরে বেশী পীড়াপীড়ি করলে....তখনকার কথা স্বতন্ত্র!

খানিক পরে—

-তোমাকে খুব তাড়াতাড়ি চলে আসতে হয়েছে, না বাবা!

তাড়াতাড়ি? না, বিশেষ তাড়াতাড়ি আর কি? তবে,... হ্যাঁ—

একটু থেমে তপতী বলে, তুমি আমার জন্যে শাড়ী আননি বলে আমি মনে কিছু করিনি বাবা?

শাড়ী? এ্যাঁ কি বলছিস?

না, এমনি...এই তাড়াতাড়িতে আসবার জন্যে কিছু হাতে করে আসতে পারনি...সে জন্যে আমি মনে কিছু করিনি!

—হুঁ। বৈকুণ্ঠবাবু সরে বসলেন বোধ হ'ল।

কিন্তু তপতীর এমন স্থূল ইঙ্গিতটাও কোন কাজে লাগল না।. দু'দিন কেটে গেল। কিন্তু বৈকুণ্ঠবাবু না আনলেন তপতীর জন্যে শাড়ী, না দেখালেন তার হাতে চাবী তুলে দেবার উৎসাহ।

সুধাংশু আড়ালে জিজ্ঞেস করে,—কি গো, বাবা কি দিলেন তোমাকে?

সুধাংশুর সঙ্গে কথা কওয়ার সময় বুঝি তপতীর মনের আসল চেহারাটার কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়।

মুখখানা ঘুরিয়ে কুটিল হেসে তপতী বলে,—কিছু না, একদম না। বুড়ো টাকা নিয়ে স্বর্গে যাবে। জানি, চিরকালই কৃপণ..ওর কাছ থেকে টাকা বার করা সহজ কথা নয়, একটু মেহনৎ চাই.....

তারপর নীচু গলায় বলে,—ওঁকে দিনরাত তোয়াজ করতে হবে। এই ধর, শরীর খারাপ, ওঁর জন্যে দুধ ঠিক করে দিলাম কিম্বা ঘি, কি বল?

সুতরাং পরদিন থেকে বৈকুণ্ঠবাবুর জন্যে আধসের করে দুধ ঠিক করা হ'ল। তারপর পুষ্টিকর নানা রকম ফল, যথা আঙুর, বেদানা, আপেল, নাসপাতি।

—বাবা?

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বৈকুণ্ঠবাবু তপতীর দিকে তাকান।

আঁচলের একটা প্রান্ত দিয়ে আঙুলগুলো জড়াতে জড়াতে তপতী বলে, তোমার জন্যে দুধ ঠিক করে দিলাম বাবা! মা নেই, আমরা তো আছি! চোখের ওপর তোমার এই অযত্ন সয় না......

বৈকুণ্ঠবাবু কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকান। অস্পষ্ট গলায় বলতে গেলেন,—কেন আর মা, এত খরচ.....

—না, না, না, তপতী প্রায় ঝগড়া করে ওঠে,—তোমার কোন কথা শুনব না বাবা! তুমি খালি আমায় পর ভাব। কেন, মেয়ে কি পর? তপতী আঁচলে চোখ মোছে।

সন্ধ্যায়, সুধাংশু তখন বেরিয়ে গেছে।

তপতী একটা মালিশের ওষুধ নিয়ে বৈকুণ্ঠবাবুর ঘরে ঢোকে।

—বাবা! এস তোমার গায়ে পায়ে একটু মালিশ করে দি। ব্যথা হয়েছে বলছিলে না?

—তুই বড্ড ব্যস্ত তপতী! কি হয়েছে না হয়েছে, মালিশের দরকার নেই, দে বরং আমি...

অভিমানে তপতীর ভ্রূরেখা চোখের ওপর নুয়ে পড়ে।

—আমি এক মুহূর্ত তোমার কাছে থাকি, তুমি তা চাওনা, কেমন বাবা? পর মনে কর। অথচ আমরাই তোমার জন্যে ভেবে মরি। এই তো তোমার জামাইকে কাল তোমার ব্যথার কথাটা বলেছি, আজই আফিস ফেরৎ ওষুধটা নিয়ে এসেছে। বেশ, তুমি যদি না চাও......

অভিমানে তপতীর গলা রুদ্ধ হয়ে আসে।

অগত্যা বৈকুণ্ঠবাবু পা দু'খানা বার করে দেন।

মালিশ করে দিতে দিতে তপতী এক সময় জিজ্ঞেস করে,—ওখানে থাকতে অণুর চিঠিপত্র পেতে বাবা?

বৈকুণ্ঠবাবু মাথা নাড়েন।

মনে মনে তপতী খুশী হয়ে ওঠে। যাক্, অণু তা'হলে বাবাকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেনি!

বলে,—জানি বাবা, জানি। ও ছেলেবেলা থেকেই অমন। মায়া-দয়া মোটে নেই। তবু যদি কোলে-পিঠে পাঁচটা থাকত। কেন, এই যে আমরা গুষ্টিশুদ্ধ ছেলে-মেয়ে নিয়ে মরবার ফুরসৎ পর্যন্ত পাই না, কই আমরা কখনো বাপ-মায়ের কথা ভুলেছি? কি করবো বাবা,—কপালে করাঘাত করে কাঁদ কাঁদ হয়ে তপতী বলে,—ভগবানই মেরে রেখেছেন, নইলে তোমার কষ্ট হ'চ্ছে জেনেও এ্যাদ্দিন চুপ করে থাকি?

খানিকটা থেমে তপতী বলে,—তাইতো যে দিন তোমার জামাই কথাটা পাড়লে, আমি তৎক্ষণাৎ লিখে দিলাম। অথচ অণু...থাক, পরের কথা বলে আর লাভ নেই!

বৈকুণ্ঠবাবুর পায়ের কড়ে আঙুলে একটা ফোসকা-পড়া ক্ষত দেখিয়ে তপতী বলে,—এখানে কি হয়েছিল বাবা? গরম দুধ পড়ে গিয়েছিল? ইস্, আমাদেরই সব সময় ঠিক

থাকে না, তোমার তো অপটু হাত—; এমনিধারা আরো কত কষ্ট না জানি তোমার হয়েছে। আর তুমি বে-মালুম আমাদের খবরটাও না দিয়ে থাকতে পেরেছিলে?

চোখ দুটো নিমীলিত করে ব্যস্ত অস্পষ্ট গলায় বৈকুণ্ঠবাবু বলেন, তা নয়, এমনি,...শুধু শুধু দুশ্চিন্তায় থাকতিস্—

—আর তুমি বুঝি ভেবেছ, তোমার জন্যে আমার এমনি কোন কষ্টই হ'ত না? বুঝি বাবা বুঝি,—দম নিয়ে তপতী বলে, বিয়ে দিলেই মেয়ে পর হয়ে যায়......

এবার বুঝি তপতী সত্যি সত্যিই কেঁদে ফেলে......

বৈকুণ্ঠবাবু ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তপতীর মাথাটা বুকের কাছে এনে চুলে হাত বুলাতে বুলাতে বলেন,—তুই ঠিক তেমনি ছেলেমানুষই আছিস তপতী!

তপতীর কান্না তবু থামে না। ইনিয়ে বিনিয়ে বিচিত্র ভঙ্গীতে কাঁদিতে থাকে, বিচিত্র ভঙ্গীতে চলে তার আধো আধো কথা। বলে, তা জানি বাবা, জানি। সকলেই যে যারটা গুছিয়ে নিয়েছে, একা আমিই নিজের পরের আলাদা করে দেখতে শিখিনি। এর জন্যে কি আমায় কম হাঙ্গামা পোয়াতে হয়েছে? কারও বিপদ হয়েছে শুনলে এই পোড়া চোখ দুটাতেই জল আসে যে! এই তো অণু, বিয়ে হয়েছে কি স্বামীর সংসার চিনেছে, তোমাদের কথা ভাবেও না। এই যে এ্যাদ্দিন একটা বোন দূর দেশে পড়ে আছি, ডেকেও জিজ্ঞাসা করেছে কখনও? সেদিন যেই জেনেছে, তুমি আমার এখানে এসেছ, ওমনি কি লিখেছে জান?

দৃষ্টিতে একটা রহস্যময় গোপনতা এনে ইতস্তত করার ভঙ্গীতে নুয়ে পড়ে তপতী বলে,—লিখেছে, তোমার উইলের টাকা কাকে কাকে দিয়েছ,...এই সব। শুনলে বাবা কথাটা? টাকার কথাটা বলবার সময় তপতীর গলাটা অবলীলাক্রমে ছোট হয়ে গিয়েছিল, এখন আবার বড় হয়, উত্তেজিত স্বরে বলে,—যেন টাকার জন্যেই তোমার ওপর আমার দরদ!

বলে,—যার যেমন মন, অপরকেও তো সে তেমনি ভাববে? কই, এই যে তুমি ক'দিন হ'ল এসেছ, আমি ভুলেও কি জিজ্ঞেস করেছি, তোমার ক'হাজার টাকা আছে, কি মায়ের গহনা আছে? করেছি বাবা, কখনো করেছি?

তপতী কাঁদে। বৈকুণ্ঠবাবুর কোলের ওপর মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। আর বৈকুণ্ঠবাবু সস্নেহে তার মাথায় আঙ্গুল বুলিয়ে দিতে থাকেন।

মাথায় যতই হাত বোলান, বৈকুণ্ঠবাবু তাই বলে কি আর সহজে টাকা বার করেন! বুড়া মানুষ তিনি, পৃথিবীর দেখেছেন অনেক, বুঝেছেন বহু।

তপতী কাছে বসে খাওয়ায়। বাতাস দেয়।

বলে,—না, না, মাছের মুড়াটুকু তোমায় খেতেই হবে বাবা! তোমার জন্যেই আনিয়েছি যে! ওমা, দুধটুকু আবার পড়ে রইল কেন? ছেলেরা খাবে? ওরা ঢের খেয়েছে, তোমায় আর কথা বাড়াতে হবে না, খেয়ে নাও দিকি!

ব'লে নিজেই বুঝি বৈকুণ্ঠবাবুর ঠোঁটের কাছে দুধের বাটীটা তুলে ধরেছে।

বৈকুণ্ঠবাবুর জন্যে এমন বেশী খরচ প্রায়ই হচ্ছে। তার ভাল বিছানা নেই। সুধাংশু বাড়ী ভাড়ার টাকা না দিয়ে খরচ করে নরম তুলোর বিছানা করায়। কি জানি, টাকার বেলায় যা শক্ত মন বুড়ার, যদি নরম বিছানায় শুয়ে মনটা একটু নরম, একটু শিথিল হয়ে ওঠে!

—তপতীকে বলে,—বুড়া বলে কি?

তপতী বলে,—সবুরে মেওয়া ফলে।

সুধাংশু বলে,—মেওয়া ফলতে ফলতে এদিকে যে ফতুর হয়ে এলাম! দুধ-ঘি, ফল-টলের জন্যে বাজারে কত দেনা জমেছে জান? হাত দিয়ে দেনাটার পরিমাণ করে মুখখানা তপতীর কাছে নিয়ে বলে,—পঞ্চাশ টাকা!

সেদিন সুধাংশু বলে, আজ একটু মাংস খেতে লোভ হচ্ছে। তোমার বাবার কাছ থেকে যদি দুটো টাকা খসাতে পার......

—দু'টাকা? তপতী বলে, নিশ্চয়ই পারব।

বৈকুণ্ঠবাবুর জন্যে আরেকখানা ঘর ভাড়া নেওয়া হয়েছে। তপতী গিয়ে প্রথমটা পায়ের বুড়া আঙ্গুল দিয়ে মেজের সিমেণ্ট চটানো যায় কি না, পরীক্ষা করে: তারপর বলে,—বাবা!

বৈকুণ্ঠবাবু চোখ মেলে তাকান।

আজ একটু মাংস আনবে বাবা? ওর সখ হয়েছে...... একটু প্রগল্‌ভ হাসি হেসে তপতী বলে,—বলছিল......

—মাংস? বেশ তো, সুধাংশুকে ডাক বলে দিচ্ছি—

—তা' হ'লে তুমি......

—না, না, আমার কোন আপত্তি নেই। মাংসটা বরং ভালই লাগবে কি বলিস? দাড়িতে হাত বুলিয়ে বৈকুণ্ঠবাবু স্নিগ্ধ হাসলেন।

সুধাংশুকে ডেকে বলেন, বাবাজী?

আজ্ঞে!

—তা হ'লে মাংসটা নিয়ে এস গে! দেড় সের হলেই হবে, কি বল?

—আজ্ঞে। সুধাংশু উসখুস্ করে বলে।

বৈকুণ্ঠবাবু তবুও টাকা বার করবার কোন লক্ষণই দেখান না।

যাও, যাও, বেলা হ'ল। শুধু শুধু দেরী করে...... আর ওই সঙ্গে যদি পোলাওয়ের ব্যবস্থা করতে পার......

সুধাংশুর সেদিন মাংস খেতে খেতে চোখে জল এসেছিল। ঝালের জন্যে নয়। তপতীকে বলেছে,—মাংস খাবার সখ মিটল তো? যাঃ, ও বুড়ো আবার টাকা বার করবে, তবেই হয়েছে! সব টাকা ও ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে রেখেছে। ওর পাশ বইখানাও চিতেয় তুলে দেব......

ফেরিওয়ালা এসে ছেলেদের নানা রকম খেলনা দেখায়। স্প্রিং দেওয়া কলের মোটর, কলের পুতুল, এরোপ্লেন।

ছেলেরা তপতীকে ধরে বসে,—মা, এরোপ্লেন দাও!

তপতী তাড়া দিয়ে ওঠে,—তোরা সব মেনীমুখো। দাদুর কাছে চাইতে পারিস না? আবদার ক'রবি...যা না, গিয়ে একটা এরোপ্লেন চেয়ে নে......

ছেলেরা গিয়ে দাদুকে বলে,—এরোপ্লেন দাও।

এরোপ্লেন? দাদু নড়ে বসেন,—কত দাম?

—পাঁচ টাকা।

—তপতী?

তপতী ব্যস্ত হয়ে ছুটে আসে; ডাকছ বাবা?

—তুই বুঝি দরজার কাছেই ছিলি, নারে? ওদের একটা এরোপ্লেন কিনে দেত!

—কেন এমন বাজে খরচ করছ বাবা? থাক না। তোমার টাকা ও তো আর অপরের নয়, বলতে গেলে আমাদেরই, কেন যে—

—তপতী!

—কি বাবা?

বৈকুণ্ঠবাবু আরেকবার নড়ে বসেন। বলেন,—টাকা তুই ই না হয় দিয়ে দে!

—টাকা? বিরস গলায় তপতী বলে,—তোমার কাছে বুঝি সব একশো টাকার নোট আছে বাবা, খুচরো নেই?

বৈকুণ্ঠবাবু মাথা নাড়েন। নোট? না, তাঁর কাছে নেই।

সেদিন বিকেলে—বৈকুণ্ঠবাবু কোথায় বেরিয়েছেন।

তপতী কি মনে করে তাঁর ঘরে ঢোকে। ঘরের কোণে বৈকুণ্ঠবাবুর বাক্স আর বিছানা, তপতীর মাথায় কেমন একটা অসঙ্গত কৌতূহল চাপে।

বাবা যা কৃপণ, কোন দিন নিজের হাতে কিছু দেবেন, সে সুবিবেচনা তাঁর কাছে আর প্রত্যাশা করা চলে না। আজ তপতী স্বচ্ছন্দে গোটা দুই নোট তুলে নিতে পারে!

কি আর মনে করবেন! তাঁরই মেয়ে তপতী, তাঁরই ওপর তিনি আছেন, হ্যাঁ, তাঁর অগোচরে তপতীর গোটা দুই নোট তুলে নেবার অধিকার আছে বই-কি?

আর যদি নেহাৎই কিছু বলেন, তবে তার উত্তরও তপতীর জানা আছে। না, একেবারে অস্বীকার সে করবে না।

একটু আবদারে ভরা, একটু রহস্যময় হেসে বলবে,—তোমায় এত বলি বাবা, শুনবেনা। ভাঙা বাক্স, টাকা কিম্বা পাশ বই হারাতে কতক্ষণ!

কৌতুকের হাসি হেসে বলবে—পাইনি তো! একটা শিক্ষা না হ'লে তোমার হুঁস হবে না! তারপর শাসনের ভঙ্গীতে বলবে, এই টাকাকড়ি, পাশ-বই সমস্ত আমার জিম্মায় রইল। তোমার জিনিস আর আমার জিনিষ আলাদা নয় তো, এমন অযত্নে রেখে ওসব খোয়াতে আর পারব না।

বাবা হয়ত একটু ক্ষুণ্ণ হবেন। টাকা তাঁর প্রাণ। হোক গে। তপতী না হয় আরও আধসের দুধ ঠিক করে দেবে, আরও সেবা করবে—অনেক বেশী।

সন্তর্পণে তপতী তোরঙ্গটা খোলে। কই, পাশবই আর নোটের তোড়াটা কোনখানে?

বোধ হয় নীচে। বাবার সাবধানতা দেখে তপতীর হাসি পায়। এদিকে যে তোরঙ্গটা ভাঙা সে হুঁস নেই!

কিন্তু কোথায় টাকা?

খানকতক কাপড়, তাও ছেঁড়া। উইয়ে কাটা কাগজপত্র বোধ হয় মোকদ্দমার দলিল, পাশ বইয়ের নামগন্ধও নেই।

প্রথমটা তপতীর পা টলে ওঠে। বাবার এক পয়সাও নেই!

তারপর পাগলের মত অস্থিরতায় মাথায় করাঘাত করে।

তারপর ধীরে ধীরে তার মুখখানা কঠিন হয়ে ওঠে।

রাত্রে—

সুধাংশু বলে,—কি গো? বাবা কি বলেন? হুঁ, হুঁ ও বুড়ো বড় শক্ত ঠাঁই। থাক্ বাবা, আমার আর শ্বশুরের টাকায় দরকার নেই। দেনায় এদিকে নাক কান অবধি তলিয়ে গেল যে! খামখা কতকগুলো খরচ অদৃষ্টে ছিল..............

তপতী সুধাংশুর কাছে ঘেঁসে আসে। চাপা গলায় বলে,—ভাবছি কালই ও'কে কোন একটা ছুতায় বিদেয় করে দেব। তুমি ভাবছ, নিজের বাপকে ওকথা বলতে পারব না? তা নয় মশাই,..............তা নয়। বিয়ে হ'লে মেয়ে ত পর। ও'র একপয়সাও পুঁজি নেই জানতে পেরেও ও'কে আমি আরও পুষব ভেবেছ? যাকে দিয়ে কোন উব্গারের আশা নেই তার জন্যে আমি অমন বেহিসেবী খরচ করতে পারি না!

পরদিন সকালে উঠেই তপতী বৈকুণ্ঠবাবুর ঘরে যায়।

চৌকাঠের ওপর থেকেই ডাকে,—বাবা?

—কে, তপতী? আয়। ক্ষীণ সাড়া পাওয়া গেল।—কাল আমার দুধের বাটিটা খালি দেখলাম তপু! বোধ হয় বেড়ালে খেয়েছে। তুই কোন দিকে নজর দিবি না..............

বুকের কাছটাতে হাত বুলাতে বুলোতে বলেন,—আর, —আর কাল রাত থেকে বুকের ব্যথাটাও বেড়েছে। কথা কইতে কি যে কষ্ট হচ্ছে! তোকেই বা কি বলি, তুই একলা আর কতদিক সামলাবি না?

—আমি বলি কি বাবা,—বৈকুণ্ঠবাবুর একেবারে কাছে এসে তাঁর বুকের ওপর হাত বুলিয়ে দিতে দিতে তপতী বলে,—আমি বলি কি, তুমি দিনকতক অণুদের ওখানে গিয়েই থাক! সেও তো তোমারই মেয়ে, পর তো নয়! তাছাড়া ওর ছেলে পুলে নেই, নির্ঝঞ্ঝাট সংসার, তোমাকে বেশ সেবা শুশ্রূষাও করতে পারবে। আমি তো এই সংসারের চাপেই প্রাণান্ত হয়ে আছি, ভাল মত যে তোমার দেখাশোনা করব, তাও পারিনা। তার চেয়ে অণুর ওখানেই সুখে থাকবে। আমার যে ক্ষমতা নেই—

তপতী কেঁদে ফেলে। আঁচলে চোখ মোছে।

বলে, ভগবানই মেরে রেখেছেন বাবা। মনের মত করে তোমাকে যে আদর যত্ন করব, তাও পারি না। আমার মত হতভাগীর মরণই মঙ্গল!

উত্তরবঙ্গের শাঁখবোল

(আলোচনা)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ বি-এ

১৩৪৫ সালের ১১শ সংখ্যা 'দেশে' আমি 'উত্তরবঙ্গের শাঁখবোল' শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, ১৬শ সংখ্যা 'দেশে' শ্রীযুক্ত নলিনেশ মৌলিক এম-এ মহাশয় লিখিত তাহার এক আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচনা করিতে গিয়া নলিনেশবাবু বলিতেছেন, "ছড়াগুলি সম্পর্কে প্রকৃত সত্য নির্দ্ধারণ করিতে সুরেন্দ্রবাবুকে কিছু সাহায্য করা হইবে মনে করিয়াই বর্ত্তমান প্রবন্ধ রচিত হইল।" এইরূপ সাধু উদ্দেশ্য লইয়া প্রবন্ধের আলোচনা করিয়া তিনি আমার কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় শাঁখবোল প্রচলিত আছে বলিয়াই আমি প্রবন্ধের নাম 'উত্তরবঙ্গের শাঁখবোল' দিয়াছিলাম। কিন্তু নলিনেশবাবু আলোচ্য 'প্রবন্ধের এইরূপ নামকরণের হেতু বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার এইরূপ নামকরণের হেতু বুঝিতে না পারাও আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তিনি পরে বলিতেছেন "উত্তরবঙ্গ বলিতে রংপুর ও দিনাজপুরকেও বুঝায়; কিন্তু এই ধরণের ছড়া গানের প্রচলন এই দুই জেলায় আছে বলিয়া শুনি নাই।" আমিও এইরূপ কথা বলি নাই। প্রবন্ধ লিখিবার সময় বঙ্গের অন্যান্য বিভাগে এই শাঁখবোল প্রচলন আছে কি না, তাহা জানিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলাম। মুর্শিদাবাদ জেলারও কোনও কোনও ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহারা সকলেই একই উত্তর দিয়াছিলেন যে, ঐ জেলায় এই ছড়া গানগুলির প্রচলন নাই। এতৎ সত্ত্বেও নলিনেশবাবু যখন বলিতেছেন আছে, তখন ইহা অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ নাই। মুর্শিদাবাদ জেলার কোন্ কোন্ অঞ্চলে ইহাদের প্রচলন আছে তাহা তিনি আমাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া জানাইলে বা প্রবন্ধাকারে কোথাও প্রকাশ করিলে সেগুলির সহিত উত্তরবঙ্গের ছড়াগুলির প্রকৃতিগত সাদৃশ্য কতখানি তাহা বুঝা যাইবে।

আমার বর্ণিত "শাঁখবোল" ও সমগ্র বাঙলার "বাঘপূজো" যে দুইটি স্বতন্ত্র ব্যাপার ইহা নলিনেশবাবু উপলব্ধি করিতে পারেন নাই বলিয়াই শাঁখবোল ও বাঘপূজো উৎসবদ্বয়কে একই উৎসব মনে করিয়া এইরূপ বিতর্কের মধ্যে পড়িয়াছেন। শাঁখবোল বরেন্দ্রভূমির নিজস্ব মৌলিক বৈশিষ্ট্য বলিয়াই আমার প্রবন্ধে শুধু উক্ত ঘটনা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম এবং সারা বাঙলার বাঘপূজো সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব ছিলাম। শাঁখবোল বরেন্দ্রভূমির নিজস্ব মৌলিক সম্পদ্ (মূল প্রবন্ধেই বলিয়াছি)—এই সম্বন্ধে পুনরায় আলোচনা করিবার পূর্ব্বে বাঙলার বাঘপূজো সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করিব।

উত্তরবঙ্গে পৌষ সংক্রান্তির দিনে সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দু ও অদ্যাপি বহু মুসলমান কর্ত্তৃক এই বাঘপূজো অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সংক্রান্তি দিনের তিন চারি দিন পূর্ব্বে হইতেই মুসলমান যুবকরা দল বাঁধিয়া সন্ধ্যাকালে গৃহস্থদের বাড়ী বাড়ী যায় এবং দান গ্রহণ করে। তাহারা দান গ্রহণের সময় নানা প্রকার ছড়া গান গায়। এই সব ছড়া এতদঞ্চলে "সোনা পীরের গান" নামে পরিচিত। হিন্দু যুবকরা এই উপলক্ষে শিববন্দনা জাতীয় গান গাহিয়া থাকে। অনেক গ্রামে প্রাচীনকাল হইতেই একটি বাঘের মণ্ডপ রহিয়াছে। কোনও কোনও স্থানে মুসলমানের পীরের দরগাতেই বাঘপূজো হইয়া থাকে। মণ্ডপে সকাল বেলা মাটি দিয়া একটি ব্যাঘ্র মূর্ত্তি রচিত হয়। এই উপলক্ষে দিনাজপুর জেলার পল্লীর মৃৎশিল্পীরা মাটি দিয়া নানা প্রকারের বাঘমূর্ত্তি তৈয়ার করে এবং লাল, শাদা, কাল প্রভৃতি বর্ণে এই মূর্ত্তি রঞ্জিত করে। এই সব মূর্ত্তি উক্ত সময়ে হাটে ও মেলায় বিক্রীত হয়। দুপুরে মণ্ডপে মূর্ত্তির পূজো হইয়া থাকে। যুবকগণ ভিক্ষা করিয়া যে অর্থ সংগ্রহ করে তাহা দ্বারা খৈ, চিড়া, দৈ প্রভৃতি ক্রয় করে এবং সমবেত ব্যক্তিগণের মধ্যে ঐগুলি বিতরণ করে। এই বাঘপূজো উপলক্ষে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, মাহিষ্য প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুই যোগদান করিয়া থাকেন। পশ্চিমবঙ্গে ও দক্ষিণবঙ্গে পৌষ সংক্রান্তি দিবসের অনুরূপ বাঘপূজো "দক্ষিণ রায়ের পূজো" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পূর্ব্ববঙ্গে (ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায়) পৌষ সংক্রান্তি দিবসে অনুষ্ঠিত বাঘপূজো "বাঘাইর বরাত" নামে পরিচিত। এই বাঘপূজো উপলক্ষে যে সব ছড়া প্রচলিত আছে, তাহাদের অধিকাংশগুলিতেই বাঘের কথাই বর্ণিত হয়।*

এখন শাঁখবোলের আলোচনায় ফিরিয়া আসা যাউক। আমি শাঁখবোলের আনুষঙ্গিক সংগীতগুলির চেয়ে কৃত্য অনুষ্ঠানগুলিকেই অতীত সংস্কৃতির ক্রমধারা (ancient cultural tradition) হিসাবে বেশী মূল্য দিয়াছি। আনুষঙ্গিক সাংস্কৃতিক ক্রমধারা ও ছড়াগুলির উপরই ভিত্তি করিয়া শাঁখবোলের ঐতিহাসিকতাও নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। নলিনেশবাবশ শাঁখবোলের আনুষঙ্গিক সংস্কৃতিগত ক্রমধারার দিকে বোধহয় কোনও লক্ষ্য না করিয়া শুধু আনুষঙ্গিক ছড়াগুলি বিচার করিয়া শাঁখবোলের সত্য নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা প্রাচীনকালের কোনও বিষয়ের সত্যতা আবিষ্কার করিতে গিয়া প্রাচীন সাংস্কৃতিক ক্রমধারা উপেক্ষা করিতে পারি কি? জাতির অতীত শিক্ষা, অতীত সভ্যতা ও অতীত গৌরবকাহিনী লোক-উৎসব, লোক-নৃত্য প্রভৃতির ভিতর অন্তর্নিহিত আছে। জাতির অতীত সংস্কৃতি ধারার মূল্য সম্বন্ধে কবি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "দেশের জনসাধারণ বলতে যাদের বোঝায় সেই পল্লীবাসীরা তাদের নৃত্য-গীতে, কাব্য-কলায় অজস্রভাবে

---

* পৌষ সংক্রান্তি দিনে পাবনা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর বরিশাল জেলার পল্লী অঞ্চলের হিন্দুরা ভূমি পূজো করিয়া থাকে। এই উৎসব বাস্তুপূজো নামে পরিচিত।

"শাঁখবোল" ও "চড়ুইভাতি" এক প্রকারের উৎসব নহে। ফরিদপুর ময়মনসিংহ, ঢাকা প্রভৃতি জেলার পল্লী অঞ্চলের বালক ও যুবারা প্রত্যহ সন্ধ্যায় গীতসহ বাড়ী বাড়ী ফিরিয়া ধান, চাউল, সংগ্রহ করে এবং কোনও নির্দ্দিষ্ট দিনে জঙ্গলে বনভোজনের অনুষ্ঠান করে। উত্তর ও পূর্ব্ব-বঙ্গে যাহা "বনভোজন" নামে পরিচিত, তাহাই পশ্চিম-বঙ্গে "চড়ুইভাতি" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই আনন্দোৎসব সাধারণতঃ পৌষ মাস হইতে ফাল্গুন মাসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

প্রাণের আনন্দ প্রকাশ করেছে। মরা নদীর মাঝে মাঝে জল-কুণ্ডের মত এখনও তার অবশেষ দেখা যায়। কিছুদিনের মধ্যে তা অবলুপ্ত হবে এমন আশঙ্কা আছে। আমাদের শিক্ষিত সমাজের মূঢ়তা তার অন্যতম কারণ।.........বিদেশীর শিল্প-কলা সম্বন্ধে পণ্ডিতী করতে আমাদের উৎসাহ কিন্তু সেই রসবোধ নেই যাতে ঘরের কাছে সাধারণের মধ্যে যে সব সৌন্দর্য্য প্রকাশের উপকরণ আছে তার যথাযোগ্য মূল্য নিরূপণ করতে পারি।" উত্তরবঙ্গের অনেক কৃষক পৌষ সংক্রান্তির দিনই ধান্য ছেদন শেষ করিয়া আজও যখন শস্য দেবতার উদ্দেশ্যে জয়ধ্বনি করে, শাঁখবোল গাহিবার সময় শঙ্খ, শিঙ্গা প্রভৃতি বাজাইবার রীতি ও "বল শিব" বলিয়া উচ্চধ্বনি করিবার বিধি আছে, শাঁখবোলের সমাপ্তি উৎসবে বেদীমূলে কলা-গাছের পূজার অনুষ্ঠান রহিয়াছে এবং আষাঢ় মাসে ধান্য রোপণের প্রারম্ভ দিবসে উত্তরবঙ্গের অনেক কৃষক ঢাক, ঢোল, শানাই, শঙ্খ বাজাইয়া মহাসমারোহের সহিত একটি কলাগাছের পূজা করিয়া ধান্য রোপণ আরম্ভ করে, তখন আমরা শাঁখ-বোলকে (বীর্য্যাত্মক ঘটনা হইতে সৃষ্ট) কৃষকদের শস্যোৎসব বলিয়া অভিহিত করিতে পারি।*

শাঁখবোলের আনুষঙ্গিকে কয়েকটি গান সম্বন্ধে খুব সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছিলাম। এই গানগুলি হইতে যে তথ্যটুকু পাইয়াছি তাহাই শাঁখবোলের সত্যতা বাহির করিতে অনেকখানি সাহায্য করিয়াছে। "এলাম রে ভাই গিরস্তের বাড়ী...........লাঙ্গল ভাঙ্গা খাবি কি?" গানটিতে চোরের কথা, দস্যু দলকে ধরার নির্দ্দেশ, গৃহস্থ, কৃষক, লাঙ্গল, শস্য-ক্ষেত প্রভৃতির কথা বর্ণিত হইয়াছে। এখানে যখন আমরা দস্যুদের অত্যাচার, দস্যুদিগকে শাস্তি বিধান ও শস্য সম্বন্ধীয় বিষয়েরই ইঙ্গিত পাইতেছি, তখন ইহা হইতে আমরা দস্যুর অত্যাচার ও শস্য বিষয়ক অনুষ্ঠানের কথাই অনুমান করিতে পারি। আমরা যেখানে গৃহস্থের বাড়ী, শস্যক্ষেত, লাঙ্গলের ফাল, হলচালনা প্রভৃতির উল্লেখ দেখিতেছি, সেখানে আমরা সোনারায়কে শস্য দেবতা বা ভূমির অধিকারীই মনে করিব। ('সোনার' লাঙ্গল ও 'রূপার' ফাল কবির অতিশয়োক্তি)। যেখানে ব্যাঘ্র সম্বন্ধীয় কোনও কথাই নাই, সেখানে হঠাৎ সোনারায়কে ব্যাঘ্র দেবতা বলিয়া কল্পনা করি কি প্রকারে?

নলিনেশবাবুও দস্যু-তস্কর ভীতির পরিচায়ক একটি গানের উল্লেখ করিয়াছেন। ছড়াটির যে স্থানে চৌর্য্যকাহিনী বিবৃত হইয়াছে, শুধু সেইটুকুই উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"কাহুকে মারে চড় থাপড়
কাহুকে মারে জুতা।
এই মুখে চুরি করল্যাম
বঠ্যানীদের সুতা॥"

এই গানগুলি যে প্রাচীনকালে পল্লী-কবিগণ রচনা করিয়াছেন, তাহা আমরা এই গানগুলির ভাষা বিচার করিয়া বুঝিতে পারি। কি কি ঘটনা অবলম্বন করিয়া এই গীতিকাগুলি রচিত হইয়াছে, তাহা আমরা নিশ্চিতভাবে বলিতে পারি না। তবে শাঁখবোল উৎসবে যখন এইগুলি গীত হইয়া থাকে, তখন শাঁখ-বোলের সহিত এইগুলির সংশ্রব আছে—ইহা অনুমান করিতে পারি।

নলিনেশবাবু কর্ত্তৃক শাঁখবোলের ছড়াগুলির ব্যাখ্যা পড়িয়া মনে হইতেছে তিনি বোধ হয় বলিতে চান, যেহেতু এই সব কবিতার ভিতর অপ্রাসঙ্গিকতা, হাস্যরস ও ব্যঙ্গকৌতুক রহিয়াছে, সুতরাং যে সমস্ত ঘটনা উপলক্ষ করিয়া এই সব কবিতা রচিত হইয়াছে সেই ঘটনাগুলিও লঘু এবং কবিতা-গুলির বিষয়বস্তুও গুরুতর হইতে পারে না। পল্লী কবিতার বৈশিষ্ট্যের (characteristics) দিক দিয়া বিচার করিলে এই মত সমর্থন করা চলে না। পল্লী কবি কোনও কঠিন বিষয় বা কোনও বৈচিত্র্যকে এমন সহজ ব্যঙ্গের ভিতর দিয়া বর্ণনা করিতেন যে, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই তাহা অতি সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত। পল্লী সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে, ভাষার স্বাধীনতায় ও ভাবের মাধুর্য্যে। সুতরাং যদি পল্লী-কবি শাঁখবোলের দস্যুদের অত্যাচার কাহিনী বা শস্য সম্বন্ধীয় কাহিনী সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য উদ্দেশ্যে হাস্য-কৌতুকের ভিতর দিয়া লঘুভাবে প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা বিষয়বস্তুতে গুরুত্ব নাই—ইহা অনুমান করিতে পারি না।

কবি রবীন্দ্রনাথ যে জাতীয় ছড়াকে 'ছেলে ভুলানো ছড়া' নামে অভিহিত করিয়াছেন, সেই জাতীয় দুই একটি ছড়া যদি পরবর্ত্তীকালে শাঁখবোলের ছড়াগুলির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে কি আমরা শাঁখবোলের বিষয়বস্তুকে হাস্য-রসের খোরাক বলিতে পারি? নলিনেশবাবু প্রাচীনকালে রচিত ছড়া গানগুলিকে কৃষক ও রাখাল সম্বন্ধীয় অতি আধুনিক পরিস্থিতির সহিত তুলনা করিয়া প্রাচীনত্বের অনুসন্ধান পাইতে চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া মনে হইল। কিন্তু আধুনিক পরিস্থিতির আবেষ্টনীতে এইগুলিকে রূপ দিয়া কি আমরা জাতির অতীত সভ্যতা ও শক্তির পরিচয় পাইতে পারি? অতীতের চোখে অতীতকে না দেখিলে, অতীতের সত্যকার পরিচয় পাওয়া যাইবে না।

আমার সংগৃহীত একটি কবিতায় 'হুম্মা' অর্থাৎ ব্যাঘ্রের উল্লেখ আছে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি অরাজকতার জন্য গ্রামগুলিতে বিরাট জঙ্গলের সৃষ্টি হওয়ায় ব্যাঘ্র, শূকর প্রভৃতি জন্তুর অত্যাচারে ধান্যের অনিষ্ট হইতেছিল। সুতরাং গানে এই সব ব্যাঘ্রের কথা উল্লিখিত হইবে—ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? 'হুম্মা' শব্দ দেখিয়াই ব্যাঘ্র দেবতার কল্পনা করি কি প্রকারে? নলিনেশবাবু "ইরকুলারে ধীরকুলা.........ভাত খায় দাড়ি মোচড়ায়" যে গানটির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, সেটি শাঁখবোলের গান নয়, দক্ষিণ রায়ের (বাঘপূজার) গান বলিয়া মনে করি। কাজেই এই সম্বন্ধে আলোচনা করা অবান্তর।

আমার নিকট মালদহ জেলার আরও যে সকল শাঁখবোলের ছড়া সংগ্রহ আছে, সেগুলি এখানে স্থানাভাবে উদ্ধৃত করিতে

(শেষাংশ ৫৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

* কলাগাছের পূজা মঙ্গলের সূচনা করে। দুর্গাপূজা, বিবাহ, অন্নপ্রাশন, রাজ্যাভিষেক প্রভৃতি অনুষ্ঠানে কলাগাছের অভিষেক এখনও বর্ত্তমান। সুতরাং শাঁখবোলে কলাগাছের ব্যবহার দেখিয়া মনে হয় বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ উৎসবগুলির মধ্যে শাঁখবোল স্থান লাভ করিবার যোগ্য।

অবিশ্বাসী

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

(২৩)

মাণিক যখন বাসায় আসিল তখন বেলা অনেকখানি হইয়াছে। রণছোড়্জীর ভোগ-পূজার ঘণ্টাধ্বনি থামিয়া গিয়াছে, ধর্ম্মশালার কোলাহল অনেকটা নিস্তব্ধ।

ঘরে ঢুকিতেই নজরে পড়িল, পাশের ঘরে জন-মানবের সাড়া নাই, দুয়ারে শিকল তোলা। রেণু সুরেনবাবুকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছে?

একতলে ধর্ম্মশালার ম্যানেজারের স্ত্রী নাতিবৃহৎ দোলনা-টায় কোলের মেয়েটিকে বুকে চাপিয়া আপনি আপনি দোল খাইতেছে ও গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতেছে। দুধোলো গাইটি তাহার দালানের একপাশে চক্ষু মুদিয়া জাবনা খাইতেছে।

এতক্ষণ মাণিকের ক্ষুধা-তৃষ্ণা কিছুই ছিল না। মেয়েটিকে দেখিয়া মনে পড়িল, সকালে সমুদ্র-ভ্রমণ সারিয়া সে বাসায় আসিতেই দোলনা হইতে নামিয়া সে দুধ দুইতে বসিত ও তাড়াতাড়ি টাট্‌কা দুধ আনিয়া হাঁকিত,—'দুধ লেও বাবুজী।'

মাণিক সেই কাঁচা গরম দুধ চুমুক দিয়া পান করিত, তারপর অনেক বেলায় পাণ্ডা আসিয়া ভোগ রাখিয়া যাইত। দুটি বেলার আহার প্রায় অপরাহ্ণ সময়ে সারিয়া মাণিক আর একবার সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে যাইত। ফিরিত সেই সন্ধ্যার পর। কখনও কখনও রাত্রি কিছু বেশীই হইত।

গত দুইদিন রেণু আসিবার পর এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল।

আজ রেণুর ঘরে শিকল আঁটা। তাহাকে বারান্দায় দেখিয়াও দোলনা হইতে নামিয়া মেয়েটি দুধ দুহিতে বসিল না। তেমনই নিরুদ্বেগে ছড়া কাটিয়া দোল খাইতে লাগিল। হয়ত বা সে মনে ভাবিতেই পারে নাই, এত বেলা পর্য্যন্ত কেহ অভুক্ত থাকিতে পারে!

সম্মুখের বারান্দায় গাড়ু-গামছা, বালতি রহিয়াছে। ঘড়া ঘটিগুলো নাই। আরও অনাবশ্যক জিনিষগুলো ঠিক মনে পড়ে না, বারান্দা হইতে যেন কোথায় সরিয়া গিয়াছে। জায়গাটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিতেছে।

কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া মাণিক আসিয়া সন্তর্পণে দুয়ারের শিকলটা খুলিয়া ফেলিল এবং তেমনই ধীরে ধীরে দুয়ারটা ঠেলিয়া দিয়াই একটা অস্ফুট চীৎকার করিয়া চৌকাঠ ধরিয়া পাথরের মূর্ত্তির মত নিশ্চল হইয়া গেল।

কক্ষ শূন্য।.........

ঘর-বোঝাই জিনিষপত্রের কিছুই নাই, শুধু এককোণে দু'খানা তালের পাখা পড়িয়া আছে। নূতন হাঁড়ি, কলসী ও আনাজপাতির কিছু কিছু আর এক কোণে ছড়ান' রহিয়াছে।

রেণু চলিয়া গিয়াছে।

দাবদগ্ধ হরিণীর মত ছুটিয়া পলাইয়াছে।

বহুক্ষণ হতসংজ্ঞের মত মাণিক চৌকাঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, একটি দীর্ঘনিশ্বাসও সে ফেলিতে পারিল না। সেটুকুর অধিকারও যেন তাহার খর্ব্ব হইয়া গিয়াছে।

পরদিন প্রভাতে সে দ্বারকা ত্যাগ করিল। যাইবার সময় বাতায়ন বাহিরের নীল সমুদ্রের পানে ফিরিয়াও চাহিল না, রণছোড়্জীর পীত পতাকা শোভিত মন্দিরচূড়ার উদ্দেশ্যে ভক্তিহীন একটা প্রণতিও জানাইল না।

ট্রেন চলিয়াছে রুক্ষ লবণাক্ত প্রান্তর ভেদ করিয়া, ছোট বড় কলিয়ারীর মধ্য দিয়া। কখনও বা নীলাঞ্জন লেখা উল্ডা-সিয়া, কখনও বা ধূসর প্রান্তরের শোভাহীন অসীম প্রান্ত নয়ন সম্মুখে মেলিয়া ধরিয়া।

উজ্জ্বল রৌদ্রালোকে লবণরাশি জ্বলিতেছিল। গুর্জ্জর সীমান্তে এত নুন অথচ বাঙলার প্রান্তে বসিয়া প্রকৃতিদত্ত এই দানকে আমরা মূল্যে না দিয়া মুখে তুলিতে পারি না।

কিন্তু এসব ভাবিবার অবসর মাণিকের বড় ছিল না। তাহার চোখের উপর দিয়া মায়া আলেখ্যের মত মাঠ, প্রান্তর, লোকজন দ্রুতবেগে সরিয়া সরিয়া যাইতেছিল। সে শুধু ভাবিতেছিল,—মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় অভ্যস্ত সংযমকে ভাসাইয়া এ সে কি করিয়া বসিল? এই কি ভালবাসার গভীরতা! মর্ম্মান্তিক আঘাত দিয়াই মর্ম্মোত্থিত সুখকে সে জানিয়া লইতে চাহিয়াছিল!

দীর্ঘপথ কোথা দিয়া, কেমন করিয়া শেষ হইতেছে মাণিক ভাবিতে পারিল না। জ্যোৎস্নার মায়ালোকে যমুনা সেতু হইতে তাজমহলের অপূর্ব্ব দৃশ্য ফুটিয়া উঠিল। মাণিকের অন্তরে গাঢ় অন্ধকার, সেদিকে সে ফিরিয়াও চাহিল না।

স্মৃতিমর্ম্মরে মৃত্যুকে ঘিরিয়া রাখিবার অদম্য প্রয়াস একমাত্র যে ভালবাসিয়া সর্ব্বস্ব উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিতে পারে, তাহারই শোভা পায়! তার অন্তরের নিষ্ঠাময় দানকে অশ্রদ্ধা করিবার মত মানুষ কোন কালে মিলিবে না সত্য। তবু মাণিক দুচোখ ভরিয়া সে অপরূপ শোভা দেখিয়া ধন্য হইতে পারিল না।

সঙ্কুচিত অন্তর তাহার কুণ্ঠিতস্বরে বার বার যেন উচ্চারণ করিতে লাগিল, সংযম, নিষ্ঠা, পবিত্রতায় যে ভালবাসার অতুল মর্ম্মর যমুনার ধারে জগতের শ্রেষ্ঠ পার্থিব সম্পদরাজির উপরে স্বপ্নলোকের মত বিরাজ করিতেছে, তাহা দেখিবার মত চক্ষু, অসংযত বাসনাময় মানুষ, তোমার নাই।

অথচ আশ্চর্য্য, মানুষের মনেই একদা বাসনা, কামনার আদান-প্রদানে এই স্বর্গভিত্তির প্রথম পরিকল্পনা।

কে জানে, জীবিতকালে উগ্র ভালবাসা স্বর্গ ও নরক একসঙ্গে টানিয়া আনিয়া জীবন-দোলাকে দোলাইয়া কি নিষ্ঠুর খেলাই না খেলিতে ভালবাসে। মরিলে সে ভালবাসা অমর হইয়া উঠে। সমুদ্রের ফেনা মরিয়া নীল জলের প্রকাশ যেমন সুন্দর।

তাজমহলকে পশ্চাতে ফেলিয়া ট্রেন ছুটিয়া চলিল। তারপর কত প্রান্তর, পর্ব্বত, শস্যক্ষেত্র, কয়লা খাদ ভেদ করিয়া ট্রেন আসিয়া হাওড়ায় থামিল।

মাণিক যন্ত্রচালিতের মত আলোকনাথের বাসার সম্মুখে ট্যাক্সি হইতে নামিল।

মানুষের অজ্ঞাতসারে মন তাহার ব্যথা জড়াইবার আশ্রয়-স্থানেই আনিয়া উপস্থিত করে।

ছোট বাগানটিতে আলোকনাথ পায়চারি করিতেছিল। মাণিককে দেখিয়া হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিতে গিয়া মুখে তাহার ভাষা জুয়াইল না। নীরবে তাহার হাত ধরিয়া মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

আলোকের করস্পর্শে মাণিকের বাহ্য চেতনা যেন ফিরিয়া আসিল। পাণ্ডুর অবসন্ন নিদ্রাশিথিল চোখ দুইটি মেলিতে গিয়া তাহার গৌরবর্ণ ললাটে নীল শিরা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। ক্ষীণ কণ্ঠস্বর সহজ করিবার চেষ্টায় সে অদ্ভুত-স্বরে বলিল, "আমার বড্ড ঘুম পেয়েছে, একটু শোব।"

আলোকনাথ তাহার হাত ধরিয়া গৃহে আনিয়া ফরাসের ওপর বসাইয়া কহিল, "একটু ব'স, আমি অনীতাকে ডেকে আনছি।"

অনীতাকে লইয়া ফিরিয়া আসিয়া আলোকনাথ দেখিল, মাণিক সেই ফরাসের উপর লুটাইয়া পড়িয়া অঘোরে নিদ্রা দিতেছে। মাথায় বালিশটা টানিয়া লইবারও তর সহে নাই। সন্তর্পণে জানালা দুয়ার বন্ধ করিয়া দিয়া অনীতা বলিল, "চল দাদা আমরা যাই, উনি একটু ঘুমালেই সুস্থ হ'য়ে উঠবেন।"

সারাদিনের মধ্যে ঘুম ভাঙ্গিল না। আলোকনাথও পরিশ্রান্ত মাণিকের ঘুম ভাঙ্গাইয়া খাইবার অনুরোধ করিল না।

সন্ধ্যাবেলায় চক্ষু মেলিয়া মাণিক আশ্চর্য্য হইয়া আলোকনাথের পানে চাহিল। এ যেন সে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না।

সমুদ্রতীরের শান্ত প্রভাতের পর এই স্বপ্নময় সন্ধ্যার আবির্ভাব। মাঝের দ্বিপ্রহরটা প্রহার বেদনায় অজ্ঞানের আলোকে অবচৈতন্যের মধ্যেই কাটিয়া গিয়াছে।

আলোকনাথ কথা কহিল,—"মাণিক, তোমার চেয়ে বেশী আশ্চর্য্য হবার কথা আমাদের। হঠাৎ এমন বয়সের সীমা লঙ্ঘন ক'রে অবসন্ন শরীর নিয়ে কোথা থেকে আসছ? রেণু-দেবীর—"

মাণিকের সারা মুখে আতঙ্কের কালো ছায়া ঘনাইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি সে ওষ্ঠে অঙ্গুলী স্থাপন করিয়া আলোকনাথকে চুপ করিতে বলিল।

আলোকনাথ অন্য প্রসঙ্গ পাড়িল, "একটু চা ও খাবার—"। শিরসঞ্চালনে মাণিক সম্মতি জানাইতেই দ্বারান্তরাল হইতে অনীতা আসিয়া কক্ষমধ্যে দাঁড়াইল। তার পশ্চাতে চায়ের সরঞ্জাম লইয়া দাসী।

মাণিক উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া জলযোগ শেষ করিল। অনীতা কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ কাটিবার পর মাণিক মৃদুস্বরে বলিল, "আলোক, একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি ভাই, তুমি কবি, তুমিই হয়ত এর ঠিক উত্তর দিতে পারবে! তোমরা যখন তখন কলমের ডগায় মানুষকে দেবতার আসন দিয়ে থাক, কিন্তু যথার্থই কি মানুষ দেবতা হতে পারে?"

আলোকনাথ বলিল, "মানুষ যখন নীচে নামতেও পারে, তখন তার উৰ্দ্ধগতি কি একান্তই অসম্ভব! আমরা কবি এবং চিত্রকর। সাধারণ মানুষের ছবি আঁকি, কিছু রঙ ফলিয়ে।"

মাণিক বাধা দিয়া বলিল, "কিন্তু রঙটা না ফলানই উচিত। তাতে নিজেকে উচ্চ মনে হ'লেও দম্ভটা বেশীক্ষণ থাকে না। আর—"

আলোকনাথ বলিল, "আত্মনিগ্রহ নয়,—আত্মসংযমই মানুষকে দেবতা করে। মাটীর দেহে মাটীর টান খুবই প্রবল, স্বাভাবিক; কিন্তু বিবেক দিয়ে আমরা অনায়াসে তাকে শাসন ক'রতে পারি। তাতে সুফল বই কুফল ফলে না। তোমার ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডীর উপরে যে পবিত্রতা উৰ্দ্ধায়িত তাকে এনে মনে স্থাপন করার তপস্যাই ত দেবত্ব। সে তপস্যা আরম্ভ ক'রতে হয় ত্যাগের হোমানল জেলে। কথাগুলো যদিও পুরাতন, তবু নূতন ক'রে ভাবতে গেলে এর মধ্যে পুরাতনের নামগন্ধও পাবে না। মহাত্মা গান্ধী যে জগতের পূজো উপচার পাচ্ছেন, তার মূলে এই মহান্ ত্যাগ,—সংযম,—সত্যনিষ্ঠা।"

মাণিক হাসিয়া বলিল, "আমার মনে হয় এ-ও একটা মোহ মাত্র! মাটীর মোহের চেয়ে আরও দুশ্ছেদ্য—আরও কঠিন।"

আলোকনাথ বলিল, "কিন্তু সে বিচার তোমার আমার না করাই ভাল, কারণ মাটীর মধ্যে আমাদের বাসনা কামনার বীজ। ও যে কি মহান্ মোহ, কি পবিত্র ধ্যান, সে ধারণা কলুষিত জ্ঞান, বিচার-বুদ্ধির দ্বারা না করাই ভাল। শোন ভাই, স্বর্গ আমিও মানি না, পরলোকে বিশ্বাস আমার একটুও নাই; কিন্তু যখনই এই সব অদ্ভুত মনীষীদের অদ্ভুত দৃষ্টান্ত চোখের সম্মুখে ভেসে ওঠে, তখন মনে হয়, স্বর্গ আর কোথাও নয়—এই মাটীর পৃথিবীতেই আছে। ইচ্ছা ক'রলে দেবতা হওয়াও বিচিত্র নয়। তাই তাঁদের মহিমাকে প্রণতি না জানিয়ে আমি পারি না।"

মাণিক এ কথার উত্তর না দিয়া ভাবিতে লাগিল।

বহুক্ষণ পরে সে চিন্তাচ্ছন্ন মুখখানি তুলিয়া বলিল, "মানুষ মানুষ—এইটাই আমরা বিশ্বাস ক'রে থাকি; কারণ তার ভুল ভ্রান্তি, তার অহঙ্কার প্রবৃত্তি, ইচ্ছা দুৰ্ব্বলতা সব কিছু তাকে নিয়ে খেলা ক'রছে।......আমার জীবন মনে হয় স্বপ্ন। এত চেষ্টা ক'রেও বালির বাঁধ দিয়ে কই রাখতে পারলাম না ত?"

আলোকনাথ প্রশ্ন করিল, "রেণুদেবীর দেখা পেয়েছিলে?"

মাণিকের মুখে যন্ত্রণার কালো ছায়া ঘনাইয়া উঠিল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে কহিল, "কিন্তু না পেলেই যে ভাল হ'ত। আমি, আমি আলোকনাথ—আমি শয়তান!" কথাশেষে তাহার চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

আলোকনাথ তাহাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে কহিল, "সব খুলে বল ভাই—।"

......এবার আর মাণিক দ্বিধা করিল না, অকপটে আলোক-নাথের কাছে আদ্যোপান্ত বলিয়া গেল।

বলিয়া বুকের বোঝাটা যেন তার হাল্কা হইয়া গেল। আলোকনাথ কোন কথা কহিল না। আসন ত্যাগ করিয়া

অবহেলা ক'রলে সত্যিই তোমার দুর্দ্দশার অন্ত থাকবে না, মাণিক।"

মাণিক কোন কথা না বলিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিতে লাগিল।

যুগে যুগে এই তপস্যার কাহিনীই নারীকে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় গৌরবময়ী করিয়া তুলিয়াছে। সীতা, সাবিত্রী, পদ্মিনী—!

অনীতাই বা না পারিবে কেন?

আলোকনাথ সত্য কথাই বলিয়াছে, রেণুর কাছে বিশ্বাসী থাকিয়া চিরজীবন ধরিয়া দাহন করার অপেক্ষা বাহিরে অবিশ্বাসের আবরণ দিয়া এই ছলনাও শ্রেয়। রেণু তাহার বিশ্বাসী থাকার প্রয়োজন বিন্দুমাত্র মনে স্থান দেয় না, এ-কথাটা তাহাকে বুঝাইয়া দিবার জন্য অনীতাকে বিবাহ করাই একমাত্র কল্যাণের পথ। রেণু সাত বৎসর পূর্ব্বে ইহাই চাহিয়াছিল। তখন সে যদি তাহার কথা রাখিত, সেদিন সমুদ্রতীরে তাহার মনের অমার্জ্জনীয় দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইবার অবকাশ ঘটিত না। রেণু তাহার নিকট হইতে অমনভাবে পলায়ন করিত না। বিবাহের দ্বারা এখন সে বুঝাইয়া দিতে পারিবে, সে কোন দিনই রেণুকে ভালবাসে নাই, ভালবাসিতে পারে নাই। তাহাতে রেণু শান্তি পাইবে।

এই আত্মদান ভালবাসার জন্য এই আত্মোৎসর্গ—এ যেন আগুনে ঘিরিয়া অমৃতকে রক্ষা করার মত।

বহুক্ষণ পরে মাণিক মাথা তুলিয়া দেখিল আলোকনাথ নিঃশব্দে ব্যগ্রচোখে তাহারই পানে চাহিয়া বসিয়া আছে।

সরল, উদার, সুন্দর আলোকনাথ। কল্পনাময় কবি আলোকনাথ—পৃথিবীর পুরুষ জাতির পবিত্রতম প্রতীক আলোকনাথ।

সম্মতি সে না দিয়া পারিল না।

......অন্ধকার রাত্রি। বাতায়ন-বাহিরে যেটুকু নীল আকাশ দেখা যায়—নক্ষত্রে ঠাসাঠাসি। চাঁদ নাই, আলো নাই। নক্ষত্রগুলোকে যেন বেশী উজ্জ্বল বলিয়া বোধ হইতেছে।

ওরা কি মানুষের আত্মজয়ের সাধনার নীরব সাক্ষী? মানব মহিমার জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান ওই উজ্জ্বল বিন্দু—দিনের ব্যথাভরা প্রহরগুলির মধ্যে আত্মগোপন করিয়া নিশীথের নিরালায়ই বা আত্মপ্রকাশ করে কেন? ওরা জ্বলে, নেভে, কিন্তু আলোর বিন্দু জ্বলিবার বা নিভিবার সঙ্গে সঙ্গে পথরেখাকেও সুস্পষ্ট করিয়া তুলে।

সে আলোকে মানুষে কেনই-বা তাহার পথ না চিনিয়া লইতে পারিবে?

মাণিক শয্যায় উঠিয়া বসিয়া যুক্তকর ললাটে স্পর্শ করিয়া আপন মনেই বলিল, "ক্ষমা ক'র মা, আমায় ক্ষমা ক'র।"

রাত্রি গভীর হইলে তারাগুলি আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

মাণিকের মনে হইল কর্ম্মক্লান্ত ধরণীর দিনেকসঞ্চিত অশ্রুবিন্দুগুলি তারায় তারায় দীপালী হইয়া জ্বলিতেছে।

কত বেদনার কথা, কত অপ্রকাশিত কাহিনী, কত না সাধনা, ভালবাসা, ত্যাগের রচনা।

রাত্রির সুকোমল অংকে ক্লান্ত মানব ঘুমাইয়া পড়ে। কিন্তু যে জাগিয়া থাকে তাহার চোখের সম্মুখে এই অশ্রু উজ্জ্বল কাহিনীর এক প্রকাণ্ড ইতিহাস জীবনের অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যতের লেখা লইয়া নীরবে খোলা পড়িয়া থাকে।

নক্ষত্রের পানে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে বড় তৃপ্তিতেই সে রাত্রিতে মাণিকের দুটি চক্ষু ঘুমভারে মুদিত হইয়া আসিল। (শেষ)

ধূ ধূ করা প্রান্তর

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি হেরিলাম সম্মুখে শুধু ধু ধু করা প্রান্তর;
উষ্ণ, ধূসর সাহারার বালি উড়িছে বিরামহীন,
ক্লান্ত উটের শ্রান্ত যাত্রা—সুদূরে দেশান্তর
আমি হেরিলাম ঘূর্ণি-ঝড়েতে শঙ্কা-ফেনিল দিন।

হে পৃথিবী, মোরে কেন বারবার আবার পিছনে ডাকো
তুমি কি জানোনা আমার উটের বল্গা গিয়েছে ছিঁড়ে,
তুমি কি জানোনা ঝড়ের মেঘেতে সারাটা আকাশ ঢাকা?
অন্ধকারের আত্মা যে কাঁদে এ মোর মনেরে ঘিরে!

আমি হেরিলাম সম্মুখে শুধু জ্বালাময়ী দাবদাহ,
তারি উত্তাপে সব ঘর মোর পুড়ে গেল একে একে,
হে পৃথিবী, মোরে ঘরে ফিরাবার কেন মিছা গান গাহ?
রতনেতে ভরা তরীখানি মোর ডুবেছে ঘূর্ণিপাকে।

আজ শুধু মোর গান গেয়ে যাওয়া এ ঘোর ঘোরালো পথে
আজ শুধু মোর দীরঘ-যাত্রা সুদূরে দেশান্তর;
এই পৃথিবীর মায়া-মমতার দুর্গ-প্রাকার হ'তে
আমি যে দেখেছি সম্মুখে শুধু ধু ধু করা প্রান্তর!

কক্ষমধ্যে বহুক্ষণ ধরিয়া পদচারণা করিতে লাগিল এবং পদচারণা করিতে করিতে সহসা এক সময়ে বাহির হইয়া গেল।

(২৪)

অনীতার কক্ষে আসিয়া আলোকনাথ ডাকিল, "অনি।"

জানালার গরাদে দুটিতে হাত রাখিয়া বোধ করি বাহিরের উন্মুক্ত আকাশের শোভা দেখিতেছিল, মুখ ফিরাইয়া উত্তর দিল, "কি দাদা?"

"শোন, তোর সঙ্গে পরামর্শ আছে। ব'স......।"

অনীতা ফিরিয়া বসিলে আলোকনাথ বলিল, "মাণিকের সম্বন্ধে এইমাত্র যা শুনে এলাম--"

অনীতা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "আমিও সব শুনেছি, দাদা। ঘরে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ কথাগুলো কানে গেল—না দাঁড়িয়ে পারলাম না। হয়ত অন্যায় করেছি—"

স্বরে জোর দিয়া আলোকনাথ কহিল, "কিছুমাত্র না। একথা শোনা তোরও খুব দরকার। কি বলিস তুই?"

অনীতা প্রশ্ন-ভরা চক্ষু তুলিয়া কহিল, "কি ক'রতে বল তুমি?"

আলোকনাথ বলিল, "আমি কিছুই ব'লব না, সে বিবেচনার ভার তোমার।"

অনীতার গণ্ডে অরুণাভা ফুটিয়া উঠিল। মুখখানি নামাইয়া সে মৃদুকণ্ঠে কহিল, "এর পরেও ত আর আমার বোর্ডিংয়ে থাওয়া চলে না।"

আলোকনাথ উৎফুল্ল হইয়া কহিল, "কিন্তু ভেবে দেখ বোন, সারাজীবন এই ভার বইবার সামর্থ্য তোমার থাকবে কি না? জানি দুঃখ সইতে তোমরা আমাদের চেয়েও ঢের বেশী পার, এজন্য তপস্যা তোমাদের খুব বেশী ক'রতে হয় না, বিধাতা এ গুণ তোমাদের জন্মের সঙ্গেই দিয়ে থাকেন। তবু বোন, অবিশ্বাসী মন—"

অনীতা মাথা নাড়িয়া মৃদুস্বরে কহিল, "আমি পারব।"

আলোকনাথ কহিল "ভবিষ্যতের কষ্ট?—সমাজ—সংসার? যে ভয়ে আগে অস্বীকার করেছিলে?"

অনীতা মৃদুস্বরে বলিল, "ভয় আমার জন্য সেদিনও করিনি দাদা, আজও করিনা। ওঁর ক্ষমতা যদি এসব তুচ্ছ বিষয়কে তুচ্ছ ক'রে রাখতে পারে ত কিসের জন্য ভাবব আমি?"

আলোকনাথ হাসিমুখে অগ্রসর হইয়া ডান হাতখানি তার মাথার উপর রাখিয়া বলিল, "আমি আশীর্ব্বাদ [illegible] এই আত্মদান তোমার ব্যর্থ হবে না। এ সাধনা জয়যুক্ত [illegible]

[illegible] আঁচল দিয়া হেঁট হইয়া আলোকনাথের [illegible] টাইয়া দিল।

[illegible] গম্ভীর করিয়া ঘাড় নাড়িয়া [illegible] র মধ্যে টেনে আনতে [illegible] এই [illegible] দেবতা [illegible] মানুষ [illegible] হতে পারে?"

তিনি তাই মাথায় ক'রে আজীবন চলুন—এই তোমার ইচ্ছা বুঝি?"

মাণিক বলিল, "কিন্তু আমার ইচ্ছা অনিচ্ছায় ত তার শাস্তির লঘু গুরুত্ব নির্ভর করে না।"

আলোকনাথ দৃঢ়স্বরে বলিল, "করে বই কি, মাণিক! এ শুধু তোমারই হাত।"

মাণিক বিস্ময়ান্বিত হইয়া তাহার পানে চাহিয়া বলিল, "হেঁয়ালী ছাড়, খুলে বল।"

আলোকনাথ বলিল, "তুমি যে কথা ব'লে তাঁকে মর্ম্মান্তিক দুঃখ সেদিন দিয়ে এলে তার খণ্ডনের একমাত্র পথ হচ্ছে এই বিবাহ। রেণুদেবী যেদিন শুনবেন তুমি বিবাহ ক'রেছ, সেই দিনই তাঁর মনে হবে সমুদ্রের ধারে সেদিন যা বলেছিলে তা তরঙ্গ ফেনরাশির বুদ্বুদ্। সত্য তার কোথাও লেশ মাত্র ছিল না।"

মাণিক ব্যাকুলস্বরে কহিল, "কিন্তু তার একবিন্দুও ত মিথ্যা নয়, আলোক।"

আলোকনাথ বলিল, "জানি। মৃত্যুর মত তা ধ্রুব সত্য। তবু মাণিক তাঁকে অশান্তি থেকে বাঁচাতে—এ ছলনারও প্রয়োজন আজ তোমার আছে। এ-ত' ছলনা নয়, তাঁর ভালবাসার যূপকাষ্ঠে তোমার আত্মবলিদান।"

মাণিক বলিল, "তবু এ ছলনা। আমার সুখ দুঃখ—"

আলোকনাথ বলিল, "শুধু সুখ দুঃখ নয়, আমার আমিত্ব পর্য্যন্ত ভুলতে হবে। ভালবাসার জগতে এই একমাত্র সাধনা।"

মাণিক বলিল, "মানলাম, তার জন্য আমি ত্যাগ করলাম, কিন্তু আর একজনের সঙ্গে যে প্রতারণা ক'রব তার ফলভোগ—"

আলোকনাথ বলিল, "আর একজন যদি স্বেচ্ছায় সে ভার মাথায় তুলে নেয়? মাণিক, নারীকে তুমি জান না। এঁরা ধরিত্রীর অংশসম্ভূতা মহিমময়ী। ব্যথা বহনেই এঁদের বৈশিষ্ট্য।"

মাণিক বলিল, "কথার হেঁয়ালীতে আমায় ভুলাতে চেষ্টা ক'র না, আলোক। মানি, নারী মহিমময়ী, কিন্তু দেহের অন্তরালে প্রাণ তারও আছে। সে প্রাণে সাধ আশা—"

আলোকনাথ বলিল, "সবই আছে, যেমন আছে আমাদের। তথাপি নারী—নারী, পুরুষ—পুরুষ। নারী জয় করেন পুরুষের রূঢ় পৌরুষকে—তাঁর হ্রী দিয়ে, মহিমা দিয়ে, সাধনা দিয়ে। নারীর একমুখী নিষ্ঠার তলে চঞ্চলের দল আমরা মাথা নীচু করেই আছি। বিশ্বাস হচ্ছে না? অনীতা সমস্ত জেনে শুনেই রাজী হ'য়েছে।"

মাণিক বিস্ফারিত নয়নে তাহার পানে চাহিয়া কহিল, "বল কি! এই অপদার্থের ভার—এই অবিশ্বাসীর ভার—"

আলোকনাথ বলিল, "অনীতা সানন্দে নিতে স্বীকৃত হয়েছে। সে যখন রাজী হ'য়েছে, তখন আমারও বিশ্বাস, তার [illegible] ও [illegible] নিষ্ঠার গুণে একদিন ওই মন্দ বিশেষণ- [illegible] তার এই পৌরবের দানকে

পোড়া কপালের তরে যাই নাই বাপ ঘরে
একতিল ছাড়া নাহি রয়!
চতুর্দ্দিকে বুলে ছুটে বৃষের উপর উঠে
চেয়ে দেখে চতুর্দ্দিকময়॥

প্রভৃতি ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী অসংস্কৃত সংস্করণ নিঃসন্দেহ।

শিবায়ন কাব্যে সৌন্দর্য্যের অভাব নাই। বিশেষত কয়েকটি স্থলে কবি আপন রচনা-নৈপুণ্য বিলক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছেন।

(১) নারীর রূপ বর্ণনা।

"কেহ কারে নহে টুটা সবে রূপরাশি।
ইন্দুমুখে বিন্দু ঘর্ম্ম মন্দ মন্দ হাসি॥
খঞ্জন গঞ্জন আঁখি অঞ্জন রঞ্জিত।
কটাক্ষে কন্দর্প কত কোটি মূরছিত॥
বল্লকী বিশেষে ভাষা নাসা তিল ফুল।
কুচ কুম্ভ কদম্ব-কোরক সমতুল॥

রুক্মিণী ও বাগ্দিনীর রূপ বর্ণনাও ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু গৌরীর পিতামাতার সঙ্গে পুনর্মিলনের যে ছবিটি কবি আঁকিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। পতিগৃহ হইতে ফিরিয়া গৌরী প্রথমেই পিতামাতাকে প্রণাম করিল। একটি মাত্র ক্ষুদ্র বাক্যে স্নেহময়ী কন্যা আপন অভিমান-ভরা স্নেহ ব্যক্ত করিল। "তোমরা নিষ্ঠুর" এই একটি কথায় পিতৃগৃহের সঙ্গে কন্যার কি নিবিড় ভালবাসাই না ব্যক্ত হইয়াছে? কথা শুনিয়া মেনকা কাঁদিয়া ফেলিলেন। আর কবির কলা-নৈপুণ্যে বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে পিতামাতার সঙ্গে কন্যার আনন্দাশ্রুজড়িত মধুর মিলনের ছবিটি পাঠকের চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল।

প্রাচীন কবিগণের গ্রন্থ শেষে গ্রন্থের আরম্ভ বা সমাপ্তির একটি তারিখ রাখিয়া দিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। রামেশ্বরের গ্রন্থে কিন্তু ঐ তারিখটি সুস্পষ্টই নয়।

"শকে হল্য চন্দ্রকলা রাম করতলে।
বাম হল্য বিধিকান্ত পড়িল অনলে॥
সেই কালে শিবের সঙ্গীত হ'ল সারা।"

যদিও এই শ্লোকের তারিখ অস্পষ্ট তবুও পণ্ডিতেরা অন্যান্য প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা ইহাকে ১৬৩৪ শক বা তন্নিকটবর্ত্তী সময় স্থির করিয়াছেন। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন—১৬৫৬ শকে যশোমন্ত সিংহ দেওয়ান হইয়া ঢাকায় গিয়াছিলেন সুতরাং সেই সময় রামেশ্বরের জীবিতকাল ধরিয়া ১৬৩৪ শক গ্রন্থ রচনাকাল হওয়া বিচিত্র নয়।

রামেশ্বরের সময়ে দেশের সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল তাহার কিছু আভাস শিবায়ন কাব্যে পাওয়া যায়। দেখিতে পাই কবিকঙ্কণ ও ভারতচন্দ্রের ন্যায় রামেশ্বরও রাজকর্ম্মচারী দ্বারা উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। রামেশ্বরের সময়ে দেশে বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্তের দ্বন্দ্বও প্রশমিত হইয়াছে। কবি তাঁহার কাব্যে বিষ্ণু ও চণ্ডীর এত প্রশংসাবাদ করিয়াছেন যে, তাহা দ্বারা তিনি নিজে শৈব কি বৈষ্ণব কি শাক্ত কোন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন তাহা নির্ণয় করা দুরূহ।

পূরবী

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসাক

অস্তাচল ধৌত ক'রে বাসনার বক্ষরক্ত ধারা
জীবনের প্রদোষের ছায়া,
যাত্রার সুরের মাঝে বিহঙ্গিনী আপনারে হারা
রাখালের বেণু গীতিকায়।
শাল বনে নেমে এল অন্ধকার অলখিতে ধীরে,
যে পাখী হারাল নীড় পুনঃ কভু আসিবে কি ফিরে?
কাহারে জিজ্ঞাসা করি, 'কোথাও কি রচিল সে নীড়
শান্ত সুনিবিড়'।

স্রোতহারা শীর্ণা নদী শৈবালেতে নিঃশেষিত প্রাণ,
বক্ষে বহে গৌরবের স্মৃতি,
বামতীরে শ্মশানেতে গৃহছাড়া সাধকের গান—
মায়াতীত অশ্রুজলে তিতি।
যে বিধবা কাঁদে বসি' বিনাইয়া মৃত পুত্র তরে
কে বুঝায় যাবার যে যাত্রা তার নূতনের ঘরে;
নিষাদের শায়কের নিষ্ঠুরতা আঘাত কি আনে
বিহঙ্গের প্রাণে?

জীবনের যত সুর, রূপ, রস, গন্ধ, অনুভূতি
উচ্ছিষ্টের রহে অনাদরে,
বৃথা কি হইল গান, বসুধার আলোকের স্তুতি,
কুসুম কি শুধু যায় ঝরে
'গান কি হারাবে সুর ধ্বনি তার দিবে না ঝঙ্কার?'
সব যাত্রা করে' শেষ শেষ-যাত্রী ভাবে আর বার,
নীলাকাশে ধ্রুবতারা দিল যারে পথের নির্দ্দেশ—
'কোথা তার দেশ'।

মরে না মরে না সুর জন্ম যারে দিল প্রাণবীণা,
আবর্ত্তিয়া ফিরে বিশ্বময়,
যে গান হ'ল না শেষ ধ্বনি তার হইবে না ক্ষীণা
তমিস্রায় লভিবে না লয়।
পিছনের দীর্ঘ শ্বাস নবতম যাত্রার পুলক
সুধা-অভিষিক্ত করি' কে গাঁথিছে পূরবীর শ্লোক,
গান গায় শেষ রশ্মি নিখিলের সব সুর টানি'—
পূরবীতে আনি॥*

* বাণীপীঠ ও ভারতী সেবা-সঙ্ঘের যুক্তসাহিত্য সভার অধিবেশনে পঠিত।

দুগ্ধচোর

(গল্প)

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেনগুপ্ত

গ্রীষ্মের এক মধ্যাহ্নে পলতাগ্রামের ছোটবাড়ীর ঠান্‌দি ঈষৎ কম্পিতকণ্ঠে ডাকিলেন, "ওগো অ বিন্দ্‌ঠাকুরুণ্‌!"

তরলকণ্ঠের কোনও জবাব পাওয়া গেল না। কিন্তু অচিরেই দেখা গেল ছোট্ট একটি মেয়েকে,—উচ্চতা চার ফিট তিন ইঞ্চি হইবে কি না সন্দেহ। অবগুণ্ঠন ললাট হইতে প্রায় সাড়ে সাত ইঞ্চি লম্বমান।

"এখানে অপর কেউ নেই, তুমি ঘোমটা ফেলে আমার কাছে এসে বস।"

এদিক ওদিক তাকাইয়া বিন্দু ঘোমটা ফেলিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। তারপর ধীরে ধীরে ঠান্‌দির পাশে বসিয়া তাঁহার পাকা চুল হাতড়াইতে লাগিল। বাছিয়া ফেলিতে হইলে কাঁচা চুলই বাছিয়া ফেলিতে হয়। ঠান্‌দির আদেশ উপেক্ষা করিবার উপায় নাই। রোজই একবার কিছুক্ষণের জন্য তাঁহার মনোরঞ্জন করিতেই হইবে। ঠাকুর্দ্দা ষাট বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিবার পর অর্থাৎ ঠান্‌দি পঞ্চাশ বৎসর বয়স হইতেই আয়নায় আর মুখ দেখেন না। বিধবা হইবার পর কালো মুখ দেখিবার কাহার বা সাধ হয়। কাজেই পঞ্চাশ বৎসর বয়সের আধ্‌-পাকা চুলগুলি যে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া কাগজের মত শাদা হইয়া যাইবে, ইহা যেন তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। অন্যান্য সবাই আদেশ বা অনুরোধ অমান্য করিতে সাহসী হইলেও নাতবৌ-এর ত আর বিদ্রোহ করিবার সাহস ছিল না। এইজন্যই বিন্দুর প্রতি ডাকসাঁইটে ঠান্‌দি একটু প্রসন্ন।

যাহা হউক বিন্দুর অদৃষ্টটা সেদিন ভালই ছিল বলিতে হইবে। দুই তিন মিনিট শাদা চুলগুলি নাড়াচাড়া করিবার পরমুহূর্ত্তেই বাহিরে বড়বাড়ীর নির্ম্মল হাঁকিয়া উঠিল—"ঠান্‌দি ঘুমিয়েছ নাকি? অ ঠানদি—!"

"কেরে, নিমু নাকি?"

"হ্যাঁ,—"

ঠান্‌দি চুপি চুপি বিন্দুকে বলিলেন—"বড়বাড়ীর নিমু এসেছে, তোমার ভাসুর, পাশের দোর দিয়ে ও ঘরে যাও। আয়রে নিমু এখানে—"

বিন্দুও বাঁচিল!

নির্ম্মল ঘরে ঢুকিয়া ঠান্‌দিকে প্রণাম করিয়া তাঁহার বিছানার পাশেই বসিয়া পড়িল।

"কেমন আছিস?"

"ভালই।"

"এলি কখন?"

"ভোরে এসেছি।"

এতক্ষণে মনে পড়ল বুঝি ঠান্‌দির কথা।"

"আসতাম প্রাতেই, কিন্তু গাঁয়ের ছিঁচকে চুরির গল্প শুনতে শুনতে—"

"কি রকম?

"জান না নাকি? নবু গয়লার ঘর থেকে গেছে নাকি থালা একখানি। যোগেশ খুড়োর কলাবাগানে নেই কলা—"

"সে সব ত শুনেছি। আরও কিছু হয়েছে নাকি?"

"কাল দুপুরে নাকি নবৌদির নূতন একখানা কাপড়ও গেছে—"

"কোথায় ছিল?"

"বাইরে রোদ্দুরে।"

"দিন দুপুরে উঠান থেকে কাপড় নিয়ে গেল চোরে। গিন্নিরা কি যে হচ্ছে দিন দিন, কেবল থাকবে সোয়ামীর সোহাগ পাবার ফিকিরে—"

"এমন ত তোমার বাড়ীতেও হতে পারে!"

"মুখের কথা আর কি, ষাট বছর বয়স ত হ'ল কই দেখলাম না ত এরূপ চুরি। আট বছর বয়স থেকে এ বাড়ীতেও রয়েছি, মানুষ ত দূরের কথা বিড়ালেও চুরি করে কিছু খেতে পারেনি ত এতকাল।"

"তোমার ঘরে চুরি করে খাওয়া ত অতি সহজ।"

"সহজ বলেই ত একটি চুলও কেউ সরাতে পারে নি।"

"সেয়ানার পাল্লায় ত পড়নি।"

"রেখে দে তোর সেয়ানা! ঘোমটা দিতে জানলে পিঠ দেখা যাবে কেন? বুদ্ধি থাকলে দুষ্ট আর চোর কি করবে?"

"বেশ কথা। দেবতা করুন তোমার দিনগুলো—"

দরজাটা একটু খট্‌ খট্‌ করিয়া উঠিল। ঠান্‌দি ও নির্ম্মল সেদিকে তাকাইল। কাহাকেও দেখা গেল না। কিন্তু দেখা গেল পানের খিলিভরা একটা বাটী।

ঠান্‌দি বলিলেন—"পান নিয়ে এসে খা।"

"কে রেখে গেল ঠান্‌দি?"

"গণশার বৌ।"

"ও বৌমা! বেশ।" বলিয়া নির্ম্মল উঠিল। বাটী হইতে পানের দুইটি খিলি মুখে পুরিয়া নির্ম্মল বাহিরের দিকে অগ্রসর হইল।

"ফিরে এখুনি চললি যে!"

"জ্যেঠামশাইর সঙ্গে দেখা করে আসি।"

"আচ্ছা আবার আসিস্‌।"

"নিশ্চয়ই তা না হলে বিরহে মারা যাব যে।" হাসিয়া নির্ম্মল চলিয়া গেল।

* * * * *

কিছুদিন পরে........

অভাবনীয় ব্যাপার। যে ঠান্‌দির প্রতাপে ঘোষ-পরিবার সুখে শান্তিতে দিন কাটাইতেছিল সেই পরিবারে এ কি ভয়াবহ কাণ্ড সংঘটিত হইতে লাগিল। নানা দিক হইতে চুরির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। কাজেই টাকা পয়সা গহনাপত্র চুরি গেলেও বিস্মিত হইবার কোনও কারণ ছিল না বা থাকিতে পারে না। চোরে সুযোগ বা সুবিধা পাইলেই চুরি করিবে। এ ত সে সকল চুরি নয়, এ চুরি যে গহনা হইতেও ভয়ানক। এযে দুধ চুরি। রান্নাঘরে উনানের উপরে কড়াইতে থাকে দুধ, পুরু হইয়া পড়ে সর। সর থাকিয়া যায় দুধ থাকে না অনেকখানি; কী ভয়ানক। একদিন নয় দুইদিন নয় ক্রমান্বয়ে তিন-

দিন এহেন ভীষণ ব্যাপার সংঘটিত হইল। বিন্দু ছেলে মানুষ হইলেও এইরূপ অপকর্ম্ম সে কিছুতেই করিতে পারে না। দুধ ত বিবাহ হওয়া অবধি সেই জ্বাল দেয়। নাঃ ঘরের বৌ তাহাকে কি অবিশ্বাস করা যায়? তবে! অন্য সব চুরি যায় না—দুধ কি করিয়া উড়িয়া যায়! ঠানদি ভাবিয়া পায় না, কিন্তু বিন্দুর মুখ শুখাইয়া যায়। ননু, গোপাল ত অতি ছেলে-মানুষ, শিশু বলিলেও চলে, আর সবাই ত ধেড়ে।

নির্ম্মল শুনিয়া বলে—"ঠানদি বাহাদুরী রইল কোথায়?"

"তাই ত ভাবছি দাদু, এ দুঃসাহস কা'র!"

"নজর রাখতে পার না

"চোখদুটো রান্নাঘরের দোরের ওপরেই থাকে, কিন্তু কি যে হয়, কে যে করে—"

"তা হলে বলতে হয় তোমার চাইতেও বুদ্ধিমান আছে।"

"চোর আমি ধরবই।"

"খবর দিও, তাকে আমি বখশিস দেব।"

ঠানদি উঠিয়া পড়িয়া লাগিল, কিন্তু বৃথা চেষ্টা। পঞ্চম দিন দুপুরে নাতবৌকে বলিলেন—"এক গ্লাস জল নিয়ে আয় ত—।"

বিন্দু রান্নাঘরের দুয়ার খুলিয়াই চমকিয়া উঠিল। ঘরে প্রবেশ না করিয়াই পুনরায় পা টিপিয়া টিপিয়া ঠানদির কাছে আসিয়া বলিল—"ঠানদি দুধচোর—।"

"কোথায় রে?" ঠানদি উঠিয়া বসিলেন।

"ঘরের দোর খুলতেই দেখতে পেলাম 'নলে'র মত কি যেন একটা খচ্ করে বেড়ার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেল।"

"ওঃ 'নল' দিয়ে চুষে চুষে দুধ খাওয়া হয়। তাই সব থাকে দুধ থাকে না। আচ্ছা তুই ডান দিক দিয়ে ধীরে ধীরে যা আমি বাঁ দিক দিয়ে যাচ্ছি।"

ঠানদি ও নাতবৌ ধীরে ধীরে যথানির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইল।

চোর ত দুয়ার খোলার শব্দেই 'নল' তুলিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কেহ যে 'নল' দেখিতে পাইয়াছিল, ইহা যেন তাহার কল্পনারও অগোচর ছিল। কিন্তু দাঁড়াইয়া থাকা উচিত হইবে না ভাবিয়া সরিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেই দুই দিক হইতে আক্রমণ করিল ঠানদি ও নাতবৌ। ঠানদি হাঁকিয়া উঠিল—"তবে রে—আরে তুই নিমু? চুরি করে দুধ খেয়ে বাহাদুরী করে বেড়াচ্ছিলি!"

"নল-সহ ধরা পড়িয়া নির্ম্মল হাসিয়া উঠিল

"হাসছিস যে! শেষে ধরা পড়লি ঐ ছোট্ট ভাদ্রবৌ-এর হাতে ছি ছি ছি। মুখ দেখাবি কি করেরে হতভাগা।"

বিন্দু লজ্জা পাইয়া ঘোমটা টানিয়া সরিয়া পড়িবার সময় ঠানদিকে ফিস্ ফিস্ করিয়া মনে করাইয়া দিল—চোর ধরায় বখশিস আদায় করিতে।

হাতে-নাতে ধরা পড়িয়া নির্ম্মল ঠানদির হুকুম মত চোর ধরার বখশিসের টাকা কটা দিতে বাধ্য হইল।

উত্তরবঙ্গের শাঁখবোল

(৫৪০ পৃষ্ঠার পর)

পারিলাম না। ইহাদের কোনটিতেই ব্যাঘ্র সম্বন্ধীয় কোনও কথা নাই। এইগুলির মধ্যে সাধারণ পল্লীজীবন ও গৃহস্থ-পরিবারের কথাই চিত্রিত হইয়াছে। আমার সংগৃহীত পূর্ব্বে প্রকাশিত ছড়াগুলিতেও (একটিতে 'হুম্মা' শব্দ ছাড়া) ব্যাঘ্র ভীতির পরিচায়ক কোনও বর্ণনাই নাই। সুতরাং ইহা হইতে এই প্রমাণিত হইতেছে যে, শাঁখবোল ও বাঘপুজোর ছড়া সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয়।

নলিনেশবাবু লিখিতেছেন, "প্রতি পল্লীতে রাখাল বালকেরাই এই ছড়া গাহিয়া থাকে, কৃষক বা অন্য কোন সম্প্রদায়ের বালকেরা ইহাতে বড় একটা যোগদান করে না। অধুনা দু একজন দরিদ্র গৃহস্থের বালকপুত্র শাঁখবোল গাহে বটে কিন্তু তাহা নিতান্তই পয়সার লোভে এবং কখনও বা রাখাল বন্ধুগণের সহিত সৌহার্দ্দ্যবশত।" তাঁহার মতে বাঙলায় 'রাখাল' বলিয়া একটি সম্প্রদায় রহিয়াছে। কিন্তু আমরা যতদূর জানি তাহাতে বাঙলায় রাখাল বলিয়া কোনও সম্প্রদায় কখনও ছিল না বা আজও নাই। বাঙলা দেশের পল্লীর সাধারণ গৃহস্থ এবং কৃষকের বালক বা কিশোর-যুবারা যখন গৃহে ও মাঠে গো-জাতির পরিচর্যা ও সেবা করিয়া থাকে তখন তাহারাই 'রাখাল' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তাহারাই যখন কর্ম্মঠ যুবক হয় এবং কৃষিকার্য্যে রত হয় তখনই তাহারা কৃষক বা গৃহস্থ নামে পরিচিত হইয়া থাকে। এখানে তিনি পল্লীর এই রাখাল বালকদের চরিত্রের উপরও বেশ কটাক্ষপাত করিয়াছেন। আমরা জানি রাখালদের চরিত্র অতি সরল ও তাহাদের মন নিষ্পাপ। অশিক্ষা ও দারুণ দারিদ্র্যের কশাঘাতে আজ ইহারা নিষ্পেষিত তবুও ইহারা সরলতাকে ত্যাগ করে নাই। আজও ইহাদের মধ্যে যে সরলতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, তাহা তথাকথিত উচ্চ শিক্ষিত যুবকগণের অধিকাংশেরই মধ্যে অতি বিরল'

আদিম যুগের চারুকলা

ডোগলাস নি ফক্স

(২)

১৮৮০ সালের কাছাকাছি ফরাসী প্রত্নতাত্ত্বিক কার্তা-লহাক্ ও রিভিয়েরের মতবাদ প্রচারে ইউরোপ ব্যাপিয়া যে ঘোর প্রতিবাদ ও বিরোধ উত্থিত হয়, তাহার স্বরূপ বিগত সংখ্যায় দেওয়া হইয়াছে। দক্ষিণ ফরাসী দেশ ও স্পেনের গুহাগারের চিত্রসমুদয় যে আধুনিক চাষাভূষার সৃষ্টি নয় এই মতবাদ পরিশেষে দেশের চিন্তাশীলগণ গ্রহণ করিলেও এবং ঐ সকল চিত্র তুহিন যুগের বলিয়া সমর্থন করিলেও প্রত্নতাত্ত্বিকগণ প্রমাণ করিলেন যে, এই তুহিন যুগীয় চারু-কলা বাস্তবপক্ষে লোপ পাইয়া গিয়াছিল। তাঁহারা আরও প্রমাণিত করিলেন যে, শেষ বিগলন যুগের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এই চারুশিল্প পৃথিবী হইতে নিঃসন্দেহে লোপ পাইয়া গিয়াছে; নব প্রস্তর যুগীয় (Neolithic) সংস্কৃতি, যাহা উহার কয়েক হাজার বৎসর পরে উন্মেষপ্রাপ্ত হয়, তাহা কোনই সংস্পর্শ প্রাপ্ত হয় নাই তুহিন যুগের ঐ শিল্প-সংস্কৃতির। আর এই কথা যখন নিশ্চিত যে এই শিল্পধারা এক সময়ে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, তখন এই সত্যও অবিস-ম্বাদিত যে, ঐ শিল্পধারার মূলে যে সংস্কৃতি তাহাও আর জীবন্ত নাই, তাহাও শিল্পকলার সহিত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

বহু পণ্ডিতের এই প্রকার অভিমত হইলেও ফ্রোবে-নিয়াস প্রথম হইতেই এই মতবাদের উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। তিনি বিশ্বাস করিতেন—যে সংস্কৃতি এমন অপূর্ব্ব কীর্ত্তি-স্তম্ভ সৃষ্টি করিতে পারে যাহা হাজার হাজার বৎসরেও জীবন্ত সৌন্দর্য্য হারায় না, তেমন সংস্কৃতি-গুলি কখনও বেমালুম অদৃশ্য হইয়া যাইবার জন্য দেখা দেয় নাই। বস্তুত কোন সংস্কৃতিই একেবারে নিশ্চিহ্ন লুপ্ত হয় না, উৎকৃষ্টতর অন্য সংস্কৃতির সহিত অঙ্গাঙ্গী মিলনেও কিছুটা বাঁচিয়া থাকে। সুতরাং যদি ঐ দুইটি সংস্কৃতি মৃত না হয়, তাহা হইলে অদৃশ্য হইবার আর কি যুক্তি থাকিতে পারে? সেই শক্তি হইতেছে উহাদের স্থান ত্যাগ। ইউরোপে যখন আর কোথাও উহাদের চিহ্ন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না, তখন নিশ্চয়ই ঐ দুই সংস্কৃতি অন্য দেশে ক্রমাভিযান করিয়াছে।

কোথায় তাহা হইলে এই সংস্কৃতিদ্বয়ের অপসরণ সম্ভব? যুক্তিসঙ্গত স্থান আফ্রিকা বলিয়াই মনে হয়। ফ্রোবেনিয়াসের মনে প্রশ্ন উদিত হইল—"আচ্ছা আমি যদি অনুরূপ পরি-স্থিতিতে নিপতিত হইতাম, তবে আমি কি করিতাম? আমি যদি সত্য সত্যই সে সময়ে জীবিত থাকিতাম, তাহা হইলে আমি কি অতিকায় জীব ম্যামথটির পূর্ব্বাঞ্চলে চলিয়া যাই-বার পথের অনুসরণ করিয়া মধ্য-ইউরোপের জলাভূমি অতি-ক্রম করিয়া সাইবেরিয়ার নিদারুণ তুষারাবৃত স্টেপেজ-রাজ্যে উপনীত হইতাম? নিশ্চয়ই আমি সেই দুর্গম পথের যাত্রী হইতাম না। আমার চলার পথ হইত উত্তর আফ্রিকা অভিমুখে যেখানে আবহাওয়া হইল নাতিশীতোষ্ণ, যেখানে ইউরোপীয় তুষার-বরফ বিগলনের ফলে বন্যায় এবং প্রচুর বৃষ্টিপাতে এমন উর্ব্বর পারিপার্শ্বিক সৃষ্ট—যাহার চিরসবুজ প্রাকৃতিক লীলা-নিকেতনে জীব ও উদ্ভিদের প্রচুর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছে।

"ইউরোপের তুষারক্ষেত্র যখন ক্রমশ অপসারিত হইয়া উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিল এবং সমগ্র উত্তর-ইউরোপের শেষ সীমায় যাইয়া জুড়িয়া বসিল, তখন উত্তর-আফ্রিকার বন্যা-প্লাবন তিরোহিত হইল; বৃষ্টিপাতও বিরল হইল; ফলে দাঁড়াইল এই যে, আফ্রিকার উত্তরাংশ ব্যাপিয়া ধীরগতিতে হইলেও মরুমণ্ডলের সূত্রপাত। এই সময়ে আমার পক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক যে, আমি তখন মরুভূমির নীরস রুক্ষ আবহাওয়া এড়াইতে পূর্ব্বদিকে মিশরে যাইয়া উপস্থিত

১। খৃষ্ট পূর্ব্বে ৮০—৫১ সালে ত্রয়োদশ টলেমি রাজত্ব করিতেন; তাঁহারই রেখা-খোদাই চিত্র—শত্রু নিধনে উদ্যত অবস্থার দৃশ্য

হইতাম। অথবা দক্ষিণে অভিযান আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ-আফ্রিকার উর্ব্বর অঞ্চলে অথবা দক্ষিণ-পশ্চিমের সুদান রাজ্যে যাইয়া হাজির হইয়া পড়িতাম এবং ঐ দুই সংস্কৃতি-সম্পন্ন জাতিগুলি করিয়াছিল ইহাই।"

ইহার পর যখন ফ্রোবেনিয়াস দক্ষিণ আফ্রিকায় যাইয়া দেখিলেন যে, তথাকার 'বুশম্যান' বলিয়া কথিত জাতি এখনও পর্ব্বতগাত্রে, প্রস্তরপৃষ্ঠে নানাপ্রকার চিত্র আঁকিয়া থাকে, তখন তাঁহার ধারণা জন্মিল যে ইহাই হয়ত ইউরোপীয় তুহিন যুগের সংস্কৃতির অবশিষ্ট নিদর্শন; তাহা হইলে ঐ ইউ-রোপীয় তুহিন যুগের সংস্কৃতি যে মৃত এবং ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত, একথা কেমন করিয়া সমর্থন করা যায়? আর এই ত অপূর্ব্ব সুযোগ পাওয়া গিয়াছে ঐ জীবন্ত সংস্কৃতির যথাযথ পর্য্যবেক্ষণ ও গবেষণা করিবার।

এই ব্যাপার ঘটিয়াছিল ১৮৮০ সালের সান্নিধ্যে, যখন

ফ্রোবেনিয়াস নিবিড়ভাবেই ব্যাপৃত ছিলেন আবিষ্কার করিতে যে, ঐ সকল জীবন্ত সংস্কৃতির পরিণতি কোথায় কি ভাবে গড়াইয়া গিয়াছিল। যে সংস্কৃতি সারা বিশ্বের নিকট মৃত বলিয়াই নিশ্চিত ছিল, তাহার অতীত সম্ভাব্যতার প্রতি মনোযোগ দিয়া উহার গমন পথের আবছা সূত্র ধরিয়া অগ্রসর না হইয়া ফ্রোবেনিয়াস জীবন্ত সংস্কৃতির পরিণত অবস্থা হইতে পশ্চাৎ দিকে অনুসরণ করিতেই লিপ্ত রহিলেন। কাজেই তখনকার মত কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার প্রচেষ্টা স্থগিত রাখিয়া তিনি বাস্তব কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন—

২। নিউ মেক্সিকোর গুহাবাসী যাযাবরদের আবাসগাত্রের চিত্র—হরিদ্রা রঙের পাহাড়ে শাদা রঙে অংকিত

সেই কার্য আর কিছুই নয়—আফ্রিকার জীবন্ত সংস্কৃতিগুলির সূক্ষ্ম অনুসন্ধান ও আলোচনা।

এই অভিযানকালে তিনি পাঁচ বৎসর কাটাইলেন—অশ্বপৃষ্ঠে, পদব্রজে আর মনুষ্য স্কন্ধে বাহিত 'লিটার' বা চেয়ারে। সুদানের প্রায় সমুদয় অংশ তিনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলেন এবং বারম্বারই সেই সময়ে তিনি এমন সব রীতি-নীতি ও বিশ্বাসের সম্মুখবর্তী হইলেন, যাহা সমগ্র বিশ্বের নিকট বিলুপ্ত বলিয়া পরিকল্পিত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়—তিনি এমন এক জাতীয় লোকের দেখা পাইলেন, যাহারা শিকারে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে তীরের ফলা দ্বারা বালুকাক্ষেত্রে জানোয়ারের চিত্র আঁকে এবং তীর দ্বারা সেই জানোয়ার-চিত্রকে বিদ্ধ করিয়া তবে পা বাড়ায় শিকার-যাত্রায়। এই যে চিত্র আঁকে তাহা খেয়ালের বশে যে কোন জানোয়ারের নয়, বিশেষ করিয়া যে জন্তু শিকার করিতে তাহারা আশা করে সেই নির্দ্দিষ্ট অভিযানে, সেই জানোয়ারটিরই চিত্র আঁকা হয়। আবার এমন এক জাতিও তাঁহার নজরে পড়ে, যাহারা শিকারের নিহত জানোয়ারটিকে জীবন্ত বলিয়া কল্পনা করিয়া নানা প্রকার ক্রীড়া-কৌতুক করে উহার সহিত। এই কৌতুক আবার সময়ে অতি বিচিত্র আকার ধারণ করে, কেননা শিকারীরা জানোয়ারটির সমগ্র ছাপ তোলে কাদা-মাটিতে, তাহার পর জানোয়ারটির ছাল ছাড়াইয়া ঐ কাদা-মাটির উপর লাগাইয়া দেয়। দক্ষিণ ফরাসীদেশে সুড়ঙ্গ-গুহাগুলিতে যে সকল জানোয়ার-দেবতা-মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হুবহু এই জাতীয় পশম-সংযুক্ত চামড়ায় মণ্ডিত "বিগ্রহ।" ইহা ব্যতীত হোম্বুরি পর্ব্বত-অঞ্চলে এমন এক জাতীয় লোক তিনি দেখিতে পান, যাহাদের সাবালক হইয়া দীক্ষা গ্রহণের উৎসব সময়ে আশ্চর্য এক চিত্রণের আচার একেবারে বংশপরম্পরা অনুষ্ঠিত হয়। বর্ণ-হিন্দুদের ভিতর উপবীত গ্রহণ যেমন অবশ্য কর্ত্তব্য সেই প্রকার কোনও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি তাহার সাবালকত্বে অধিকার পাইবার নিদর্শন স্বরূপ চিত্র অংকন করে। অংকনের জন্য নির্দ্দিষ্ট পর্ব্বতগাত্রে লাল ও শাদা রংয়ে উহারা চিত্র আঁকিয়া থাকে। অংকনের বিষয়-বস্তু হয় কোনও সময়ে মানবের বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান, জন্তু-জানোয়ার এবং রক্ষা-কবচ, তাবিজ, মাদুলী প্রভৃতি বহন করিবার চামড়ার থলিয়া প্রভৃতি নানাবিধ জিনিষ। কবচ-মাদুলী প্রভৃতি উহারা সাধারণত লাল-চামড়ায় তৈরী থলিয়ায় বহন করে; সুতরাং লাল আর শাদা রঙে অংকনে উহা প্রধান স্থান গ্রহণ করে, বিশেষ করিয়া উহা জাদু-বিদ্যার প্রতীক বলিয়া উহার অংকনে সৌভাগ্য আনয়ন করে, এমন বিশ্বাসও উহাদের রহিয়াছে। কিন্তু এমন পদ্ধতি ও নিপুণতা অনুসরণ করিয়া এই সকল চিত্র অঙ্কিত যে, চিত্র-সমালোচকগণ ইহাকে 'আদিম' আখ্যাই দিবেন এবং সংস্কৃতি-সম্বন্ধীয় গঠন ও বিবর্ত্তনের গবেষকগণ, যাঁহারা এই 'আদিম' শিল্পপ্রতিভার ভিতরেও বহু কৃতিত্বপূর্ণ নিপুণ কৃতিত্বের বিদ্যমানতা প্রমাণিত করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারাও এই সকল চিত্রণকে নিকৃষ্ট বলিয়া অভিহিত করিবেন। দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপের প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতি এবং পশ্চিম ও মধ্য সুদানের জীবন্ত সংস্কৃতি—এই দুইয়ের সহিত সাদৃশ্যযুক্ত উপরোক্ত চিত্র এবং অন্যান্য বহু অংকন লক্ষ্য করিয়াই ফ্রোবেনিয়াস উৎসুক হন ফরাসী অধ্যাপক গাউতিয়ার ও ফ্লামাণ্ড-য়ের সহিত সাক্ষাৎ যোগাযোগ স্থাপন করিতে। কারণ সেকালে এই দুই পণ্ডিতই ছিলেন—সাহারার উত্তরে প্রাপ্ত যত কিছু খোদাই-চিত্রের প্রধান প্রামাণ্য ব্যক্তি, যদিও তখনও এই সকল চিত্র প্রাগৈতিহাসিক বলিয়া নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় নাই। পণ্ডিতগণের সহিত এই পরিচয়ের ফলেই সাহারা-য়াটলাস পর্ব্বত-অঞ্চলের পাহাড়ের গায়ের চিত্রগুলির সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ সম্ভব হইয়াছিল ফ্রোবেনিয়াসের পক্ষে এবং পরে তাঁহার যে প্রাগৈতিহাসিক মতবাদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অভিযান, তাহাও বাস্তবে পরিণত হইয়াছিল—লিবিয়া ও নিউবিয়া অঞ্চলের মরুভূমি, দক্ষিণ-আফ্রিকা এবং ফেজান প্রভৃতি স্থানের অভিযান পরিচালিত হইবার পরিণামেই ফ্রোবেনিয়াস নিশ্চিতরূপে ধারণা করিতে পারিয়াছিলেন যে, ঐ সকল প্রস্তর-গাত্রে খোদাই চিত্র প্রাগৈতিহাসিক যুগের শিল্পপ্রতীক।

খুটি-নাটির জঞ্জালে প্রবেশ না করিয়াও ইহা অনায়াসেই

বলা যায় যে, এই সকল অভিযানের ফলস্বরূপ ক্যানভাসের উপর এই সমস্ত চিত্রের অনুলিপির প্রথম সংগ্রহ পাওয়া গিয়াছে। সমুদয়ে প্রায় তিন হাজার অবিকল নকল চিত্র তৈরী হইয়াছে, এবং ইহাই হইল প্রাগৈতিহাসিক যুগের চিত্রের সর্ব্বাদি সংগ্রহ সমগ্র বিশ্বের ভিতর। আবার ইহাও অনুরূপ দৃঢ়তার সহিত বলা যায় যে, ইউরোপীয় শেষ তুহিন যুগের সংস্কৃতিসম্পন্ন জাতি ক্রমে ইউরোপ হইতে আফ্রিকায় অপসৃত হইয়াছিল; অবশ্য যতদিন অন্য প্রকার মতবাদ সৃষ্ট হইবার প্রমাণাদি সংগৃহীত ও উদ্ঘাটিত না হয়, ততদিন এই সংস্কৃতির আধুনিক আফ্রিকায় অস্তিত্বই হইবে উক্ত অপসারণের পশ্চাতের প্রধান হেতু ও সংস্কৃতির জীবন্ত অবস্থার প্রধান সাক্ষী।

সাহারা-য়্যাট্‌লাস অঞ্চলে যে প্রস্তর-চিত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে শিল্পদক্ষতায় ও পদ্ধতিতে তাহা দক্ষিণ-ফরাসীদেশ ও উত্তর-স্পেনের গুহা-চিত্রের নিতান্তই সাদৃশ্যযুক্ত, সুতরাং উহাকেই ফ্রাঙ্কো-ক্যান্টাব্রিয়ান আর্ট বলা যায়। আর লিবিয়ার মরু-অঞ্চলে ফ্রোবেনিয়াস এমন সকল চিত্র দেখিতে পাইয়াছেন, যাহা পূর্ব্ব-স্পেনের লিভ্যাণ্ট জাতীয়ের চিত্রের সহিত পৃথক নয়; কাজেই এই কথা অনায়াসেই বলা যায় যে লিভ্যাণ্ট জাতি ও লিবিয়ার আদিম জাতি সংস্কৃতিতে হুবহু এক। আবার সাহারা-য়্যাট্‌লাস অঞ্চলের পূর্ব্বদিকে ও লিবিয়া মরুভূমির পশ্চিম দিকে যে পার্ব্বত্য উপত্যকা রহিয়াছে ফেজান নামে, সেই স্থানে এই উভয় সংস্কৃতিরই (ফ্রাঙ্কো-ক্যান্টাব্রিয়ান এবং লিভ্যাণ্ট) প্রতীক লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে—পদ্ধতিতে এবং শিল্পকৃতিত্বে উভয়ের সমতুল্য। অনুরূপ অবস্থা দেখিতে পাওয়া যাইবে দক্ষিণ-আফ্রিকায়ও। দক্ষিণ-আফ্রিকা ইউনিয়নে যে সকল প্রাচীনতম খোদাই চিত্র পাওয়া গিয়াছে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায় আবিষ্কৃত হইয়াছে যে সকল চিত্র তাহার সমুদয়ই ফ্রাঙ্কো-ক্যান্টাব্রিয়ান। ঐ সকল স্থানের অপেক্ষাকৃত কম প্রাচীন যে সকল চিত্র, তাহাতে পাওয়া যাইবে উভয় সংস্কৃতির নিকৃষ্ট একটা মিশ্র-পদ্ধতি। খোদাই-চিত্র সম্বন্ধে এই কথা সত্য হইলেও নানা বর্ণে রঞ্জিত চিত্র সম্বন্ধে পর্য্যবেক্ষণের ফলে ইহাই নির্ণীত হইয়াছে যে, স্থানে স্থানে স্বতন্ত্রভাবেই উভয় সংস্কৃতির নিখুঁত প্রতীক রহিয়াছে; তথাপি যেগুলি পরবর্ত্তী যুগের অর্থাৎ আধুনিক বলিতে পারা যায় অপরগুলির প্রাচীনত্বের হিসাবে, সেইগুলি মিশ্র-পদ্ধতিতেই অঙ্কিত—উভয় সংস্কৃতির ছাপই ঐ সকল নিদর্শনে সুস্পষ্ট।

এই সকল গবেষণার সারমর্ম্ম উদ্ধার করিলে দাঁড়ায় এই যে, দুইটি প্রাগৈতিহাসিক যুগের সংস্কৃতি হাজার হাজার বৎসর ব্যাপিয়া আপন আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া স্বাধীনভাবেই বিরাজ করিয়াছিল পাশাপাশি-উহাদের উদ্ভবের স্থান ছিল দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপ; এবং একটির প্রভাব অন্যটির উপর ছায়াপাতও করে নাই সামান্য রকমও। আবার স্বাধীনভাবে উদিত হইয়াছে সাহারা-য়্যাটলাস-লিবিয়া মরুভূমিতে; যদিও উভয় সংস্কৃতির পরস্পর সাক্ষাৎ হইয়াছে ফেজান অধিত্যকায়, তবুও মিলন সংসাধিত হয় নাই। আবার স্বাধীনভাবে অভ্যুত্থান দেখা যায় দক্ষিণ-আফ্রিকায়—বহুকাল এমন কি যুগ-যুগান্তর পর্য্যন্ত স্বাতন্ত্র্য অটুট রাখিয়া কেবল আধুনিক কালেই সেখানে উভয় সংস্কৃতির অঙ্গাঙ্গী মিলন দেখিতে পাওয়া যায়—যাহাদের পূর্ব্বপুরুষ শত শত কেন, হরি মরুভূমির বুশম্যানগণ প্রস্তর-চিত্র অঙ্কনে ব্যাপৃত দেখিতে পাওয়া যায়। ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে কালাসহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হয়ত এই শিল্প শিক্ষা করে লিভ্যাণ্ট এবং ক্যান্টাব্রিয়ান সংস্কৃতির বাহক ইউরোপ হইতে সমাগত জাতিগুলির নিকট হইতে। সুদানে আজিও প্রস্তর-চিত্র অঙ্কিত হইয়া থাকে।

ফ্রোবেনিয়াস এই যোগাযোগ আবিষ্কার করিয়া প্রাগৈতিহাসিক যুগের সংস্কৃতির গবেষণা-পথের মোড় ঘুরাইয়া দিয়াছেন; তাঁহারই প্রদর্শিত পথে অনুগমন করিয়া আধুনিক আফ্রিকায় ইউরোপীয় তুহিন যুগকে পুনরায় প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হইয়াছে।

একটি বিষয় আমি উল্লেখ করি নাই—তাহা হইল দক্ষিণ-রোডেশিয়ার প্রস্তর-চিত্র; উল্লেখ না করিবার কারণ ইহা নহে যে, উহা গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং উপেক্ষার যোগ্য; প্রকৃত কারণ ইহা যে সেই সকল চিত্রণপ্রণালী একেবারে স্বতন্ত্র এবং উহার জন্ম এমন এক সংস্কৃতি হইতে যাহার উৎসের সহিত ইউরোপের কোনই সংশ্রব নাই।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের এই সকল চিত্রের কয়েক শতখানি আমেরিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে—উহার ভিতর রহিয়াছে অতি ক্ষুদ্র অর্থাৎ সামান্য কয় ইঞ্চি বিস্তারযুক্ত চিত্র হইতে একশত বর্গফুট আকারবিশিষ্ট বিরাট আলেখ্য। কিন্তু বাস্তবে ঐ সকল চিত্রের যে বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্ব, তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইবার নহে, প্রত্যক্ষ দর্শন না করিলে ফ্রোবেনিয়াসের ধারণার যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করা সহজ নহে।

ইউরোপ হইতে আফ্রিকায় অভিযান প্রাচীনকালের জাতিগুলির পক্ষে কি প্রকারে সুবিধাজনক মনে হইল, সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই, যেহেতু সেকালে সাগর অতিক্রম না করিয়াই ইউরোপ হইতে আফ্রিকায় পৌঁছান যাইত। ১৮৯০ সালেও এই বিশ্বাস দৃঢ় ছিল যে, তুহিন যুগের কালে জিব্রাল্টার প্রণালীর অস্তিত্ব ছিল না—দুই মহাদেশ সঙ্কীর্ণ স্থলভাগে সংযুক্ত ছিল যেখানে এখন জিব্রাল্টার প্রণালীর স্রোতোধারা দুই দেশকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে।

প্রশ্নের পরে

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীসত্যকুমার মজুমদার

(৫)

অমরের বিবাহের পর হইতেই বিশ্বেশ্বরবাবু লীলার বিবাহের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। কিন্তু কোথাও কোন সম্বন্ধ স্থির করিতে পারিলেন না। কত স্থান হইতে কত ছেলের খবরই আসিল, কত জনেই মেয়ে দেখিয়া গেলেন, কোনটাই বিশ্বেশ্বর বাবুর মনঃপূত হইল না।

স্বামীর ব্যবহারে নন্দরাণী একদিন বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "যত সম্বন্ধ আসছে সবই যে ফিরিয়ে দিচ্ছ কোন্ রাজপুত্তুর তোমার মেয়ের জন্য ব'সে আছে। যার যা কপাল তাই জুটবে ত! বলে—জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে তিনই নির্ব্বন্ধ দিয়ে।"

বিশ্বেশ্বরবাবু নরম সুরেই বলিলেন, "তাই ব'লে ত মেয়েকে জলে ফেলে দিতে পারিনে। বরং আইবুড়ো হয়ে মেয়ে চিরকাল আমার ঘরে থাকবে তবুও প্রাণ থাকতে মাকে আমার অপাত্রে দিতে পারব না।"

নন্দরাণীর বিরক্তি রাগে পরিণত হইল। কহিলেন, "সবই যদি তোমার চোখে অপাত্র কোন্ জজ ম্যাজিষ্টরের ঘর থেকে সুপাত্র আনবে শুনি! মুরোদ নেই যার টাকা খরচ করবার তার আবার অত বাছ-কোচ! রকম দেখে পিত্তি জ্বলে যায়!"

কথাটা নন্দরাণীর নিজের কানেও রূঢ় ঠেকিল। একটু থামিয়া নন্দরাণী বলিলেন, "সেদিন যে বলছিলে তোমার কোন বন্ধু কলকাতায় এক ছেলে দেখেছেন!"

বিশ্বেশ্বরবাবু পত্নীর বাক্যবাণ বেমালুম হজম করিয়া কহিলেন, "লিখেছে ত দু'চার দিন মধ্যেই তাঁরা মেয়ে দেখতে আসবেন। খুব বড়লোকের ছেলে। বি-এস-সি পাশ ক'রে মেডিক্যাল কলেজে পড়ছে। টাকা চায় না, ছেলের বাপ চায় ভাল মেয়ে!"

পূর্ব্বের কথাগুলিই নিতান্ত অপ্রিয় হইয়াছিল। মুখে যে কথা আসিয়াছিল, চাপিয়া যাইয়া নন্দরাণী শুধু অবিশ্বাসের হাসি হাসিলেন।

পরদিন লীলা আর তার মেজ বোন মণি পুকুর হইতে জল লইয়া বাড়ী ফিরিতেছিল বহির্ব্বাটির পার্শ্বে অপরিচিত প্রৌঢ় বয়স্ক দুইটি ভদ্রলোককে দেখিয়া লীলা পথিমধ্যে থমকিয়া দাঁড়াইল। আগন্তুক দুটির মধ্যে একটি একটু অগ্রসর হইয়া মেয়ে দুটিকে জিজ্ঞাসা করিল, "এটা কি বিশ্বেশ্বর চাটুয্যের বাড়ী?"

লীলার ইসারায় মণি বলিল, "এই বাড়ীই, কোত্থেকে আসছেন আপনারা?"

আগন্তুক বলিলেন, "কলকাতা থেকে, তোমরা এই বাড়ীর মেয়ে?"

মণি সলজ্জ হাস্যে মাথা নোয়াইল, লীলাও আর মুখ তুলিতে পারিল না।

আগন্তুক মেয়েদের এই বিপন্ন অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, "লজ্জা কি মা, আমরা তোমাদের বাবার কাছে এসেছি। তোমরা ভেতরে যাও তোমার বাবাকে খবর দাও।"

মণি তাড়াতাড়ি জল লইয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। লীলা অতি ধীর পদক্ষেপে অতি সঙ্কোচের সহিত অগ্রসর হইতে লাগিল। আগন্তুক ভদ্রলোক দুইটি অতি মনোযোগের সহিত লীলার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। লীলার সলজ্জ—নম্র গতিভঙ্গীর দিকে চোখ রাখিয়া একে অপরকে বলিলেন, "চমৎকার মেয়ে গিরীশ, আপনি যেমনটি চান, ঠিক তেমনটি!"

লীলা ততক্ষণ অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। গিরীশবাবু বলিলেন, "ভরা কলসী কাঁখে মেয়ে দেখা—সেকেলে লোকেরা ভাবতেন শুভ লক্ষণ। এখন বিধাতার ইচ্ছে।"

মণি ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "বাবা বাড়ী নেই—এক্ষুণি আসবেন,—ভেতরে এসে বসবেন আসুন!"

মণি গিরীশবাবু আর তাঁর সঙ্গী ভদ্রলোকটিকে লইয়া গিয়া বৈঠকখানায় বসাইল। ভিতর হইতে দুইখানা তালের পাখা আনিয়া দিল। তারপর পল্লীর চির আচরিত প্রথা মত বাহিরে একখানা জলচৌকী বিছাইয়া দিয়া পার্শ্বে গাড়ু ভরিয়া জল রাখিল দুইখানা ফর্সা তোয়ালে আনিয়া জলচৌকীর দুই পার্শ্বে রাখিয়া দিল। ভদ্রলোক দুইটি মুগ্ধ চক্ষে এক ফোটা মেয়ের এই কর্ম্মনিপুণতা চাহিয়া দেখিতেছিলেন। সর্ব্ব আয়োজন শেষ করিয়া মণি নিকটে যাইয়া বলিল "হাত মুখ ধুয়ে বসুন!"

হাসিয়া গিরীশবাবু বলিলেন, "আমরা কে, কেন এসেছি তা ত জিজ্ঞেস করলে না মা?"

মণি বলিল "বড়দিকে দেখতে এসেছেন ত!"

কচি মেয়ের মুখে পাকা কথা গিরীশবাবুর ভালই লাগিল। বলিলেন "তোমার নামটি কি মা?"

"মণি।"

"তোমার বড়দির নাম?"

"শ্রীমতী লীলাবতী দেবী।"

"তোমরা ক'ভাই বোন?"

"আমাকে নিয়ে তিনটি বোন—আর ছোট্ট এতটুকুন এক ভাই" বলিয়া মণি হাত উঁচু করিয়া শিশু-ভাইয়ের উচ্চতা দেখাইল। গিরীশবাবু বলিলেন, "তোমার মাকে বল মণি, তোমার বড়দিকেই দেখতে এসেছি আমরা।"

মণিমালা মাতাকে সঠিক সংবাদ দিতে ভিতরে চলিয়া গেল।

গিরীশবাবুর সঙ্গী ভদ্রলোকটি গিরীশবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "চমৎকার সুন্দর এই দুটি মেয়ে! আজ বুঝতে পারছি—শহরে এত সুরূপা সুশ্রী মেয়ে থাকতে পাড়াগাঁয়ে কেন মেয়ে খুঁজতে আপনি যান!"

গিরীশবাবু একটু হাসিলেন মাত্র। বিশ্বেশ্বরবাবু বাড়ী ফিরিয়াই বিশিষ্ট অতিথিগণের জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া যখন জানিলেন, উঁহারা আজই রাত্রির গাড়ীতে কলিকাতা ফিরিবেন এবং সকালবেলার দিকেই মেয়ে দেখিবেন তখন ভিতরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "কারকে ডেকে আনব?"

নন্দরাণী বলিলেন, "লীলার রাঙাদিদিকে নিয়ে এস না, সেকেলে মানুষ ও'রা জানেন এসব।"

বাক্যব্যয় না করিয়া বিশ্বেশ্বরবাবু অশীতিপর শ্রীযুক্ত বেণী গাঙ্গুলীর তৃতীয়পক্ষ ওরফে লীলার রাঙাদিকে আনিবার জন্য চলিয়া গেলেন। তৃতীয়পক্ষ হইলেও রাঙাদিদি ষাটের কোঠার মাঝামাঝিতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। সুরসিকা বলিয়া রাঙাদিদির একটা খ্যাতি ছিল। রাঙাদাদাকে কোন যুবতী বুড়া বলিলে এমন কথা রাঙাদিদি শুনাইয়া দিতেন যে, কানে আঙুল দিয়া পলাইতে পারিলে যুবতীরা বাঁচিয়া যাইত। মেয়ে দেখাইতে তিনি অদ্বিতীয়া। এমন ছিল তাঁর মেয়েদের রূপ-গুণ বর্ণনা করিবার ভঙ্গী যে মেয়ে দেখিতে আসিয়া অনেক কুশ্রী মেয়েকেও বরপক্ষীয়েরা সুশ্রী বলিয়া স্বীকার করিয়া যাইতে বাধ্য হইতেন।

রাঙাঠাকুরাণী আসিয়াই লীলার বেশ রচনায় লাগিয়া গেলেন। বয়সের দোষে দাঁতগুলি প্রায় তাঁর সবই পড়িয়া গিয়াছিল। তবুও তাঁর অদন্তের হাসির মধ্যেও যে একটা মাধুর্য্য ছিল তা রাঙাঠাকুরদা ত বলিতেনই নাতি নাতনীরাও অস্বীকার করিতে পারিতেন না। সেই দন্তহীন হাসি হাসিয়া রাঙাঠাকুরাণী বলিলেন, "কি শুনেছি লো, নাতনী কাল বোশেখীর দিনে যে ফাগুনের হাওয়া!"

"তোমার মনে চিরবসন্ত লেগেই আছে কি না ঠানদি তাই।"

"থাকবে না কেন লো! তোদের মত ত পেটে পেটে বুদ্ধি নয়—মুখে রা নেই।"

কি বলিতে যাইয়া লীলা থামিয়া গেল। সে যে কুমারী, এ রহস্য কি তার শোভা পায়। আজিকার এই মুহূর্ত্তটা যে তার জীবনে শুভ হইয়াই দেখা দিবে কি নিশ্চয়তা তাহার আছে! আর হইলেই বা ইহা তাহার পক্ষে এমন কি শুভ যার আগমনের আশায় এত বড় ব্যথা সে এক নিমেষে ভুলিয়া যাইতে পারে। ভুলিতে সে চেষ্টা করিয়াছে। ভুলিতে সে চেষ্টা করিবে। এত শীঘ্র না পারিলেই কি তার অপরাধ!

রাঙাদিদি হাসিয়া বলিলেন, "হঠাৎ বড় থেমে গেলি যে!"

"কথায় তোমার সঙ্গে কে পেরে উঠবে ঠানদি, তাই আগে থাকতেই হার মেনে যাচ্ছি।"

অন্তর্দৃষ্টি দিয়া রাঙাঠাকুরাণী লীলার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "হার মানবার মেয়ে তুই নোসরে লীলা, তা আমি জানি। বরং আমার মত বুড়ীকে হার মানাবার শক্তি যে তোর নেই তা বললে আমি স্বীকার করব কেন! অত বুদ্ধি তোর পেটে—তাই থেমে গেলি! আমি আশীর্ব্বাদ করছি—আমার মত মুখরা হবার সুযোগ যেন ভগবান তোকে দেন। প্রাণের মধ্যে অত দুঃখু নিয়ে তোরা বাঁচিস কি ক'রে। খুব হাল্কা হবি খুব হাসবি। একটু হেসেই অমনি মুখ ভার করলে আজকাল এমন বোকা কেউ নেই যে কিছুই বুঝবে না।"

বেশ-বিন্যাস সম্পূর্ণ করিয়া রাঙাঠাকুরাণী লীলাকে সঙ্গে লইয়া গিরীশবাবুর সম্মুখীন হইলেন। লীলা আগন্তুকদ্বয়কে প্রণাম করিয়া পিতাকে প্রণাম করিল, তারপর গিরীশবাবু লীলাকে বসিতে বলিলেন, লীলা বসিল। পরে বলিলেন, "তোমার নামটি কি মা?" লীলা নাম বলিল।

"পড়তে পার মা?" লীলা মাথা নাড়িয়া স্বীকৃতি জানাইল। রাঙাঠাকুরাণী নিকটেই দাঁড়াইয়াছিলেন বলিলেন, "লেখা-পড়া বেশ জানে বাছা, ইংরেজী, বাঙলা সবই। তা আপনাদের শহুরে মেয়েরা হুটকরে হটিয়ে যেতে পারবে না। হাতের লেখা যেন মুক্তো—লিখে দেখা ত লীলা।"

লিখিবার কাগজ কলম পূর্ব্বেই প্রস্তুত করা ছিল, লীলা লিখিল। লেখা দেখিয়া গিরীশবাবু খুশী হইলেন।

"কি না জানে আমার নাতনী। কত বই ঘরে, আলমারী ভর্ত্তি, দেখলে আপনারা অবাক হয়ে যাবেন অত পুঁথিপত্তর এই এক ফোঁটা মেয়ে পড়েছে কি করে। রাতদিন ত পড়া নিয়েই থাকে। শহুরে মেয়ে হ'লে এদ্দিন তিন চারটে পাশ দিতে পারত।"

গিরীশচন্দ্র মাথা নাড়িয়া তুষ্টির হাসি হাসিলেন। পরে বলিলেন, "রাঁধতে জান না মা?"

লীলার কিছু বলিবার পূর্ব্বেই রাঙাঠাকুরাণী বলিয়া উঠিলেন, "পাড়াগাঁয়ে সে কথা আর বলতে। চাকর বামুন ত আর আমাদের গেরস্তর ঘরে ঠাঁই পায় না। একবার ওর হাতের রান্না যে খাবে সে জীবনে ভুলবে না। আমরা পাড়াগাঁয়ে থাকি, মেয়েদের নাচ-গান তেমন শেখাতে পারিনে—রান্না-বান্না সংসারের কাজ এসব ভাল করেই শেখাই।"

গিরীশবাবু সায় দিয়া বলিলেন, "মাথার চুলটা একবার দেখতুম!"

লীলার চুলের খোঁপা খুলিয়া বেণী এলাইতে এলাইতে রাঙাঠাকুরাণী কহিলেন, "চুলের আর কি দেখবেন নেয়ে উঠলে চুলের ভারে মেয়ের যা কষ্ট হয়। অত চুল কি ঐ একরত্তি মেয়ে গুছিয়ে রাখতে পারে।"

গিরীশবাবু দেখিলেন, সত্য সত্যই ঘনবিন্যস্ত সুদীর্ঘ কুঞ্চিত কেশ লীলার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য শতগুণে বাড়াইয়া তুলিয়াছে।

গিরীশবাবুর মেয়ে দেখা প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছিল। বলিলেন, "মেয়ের বয়স?"

রাঙাঠাকুরাণী কহিলেন, "এই ত সবে চৌদ্দ পেরুতে চলল। নিতান্ত ছেলে মানুষ। তা মাথায় একটু ডাগর হয়েছে কি না—ঐ ত সেদিন জন্মাল। আর ওর বাবাই জন্মাল সেদিন!"

লীলার হাতে দুইটি মোহর দিয়া গিরীশবাবু লীলাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বাহিরে আসিলেন।

গিরীশবাবুদের পূর্ব্বনিবাস হুগলী জেলায়। তাঁর পিতা চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আলীপুর কোর্টে সেরেস্তাদারের কাজ করিয়া কিছু পয়সা জমাইয়া গিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর পিতার সঞ্চিত অর্থে গিরীশচন্দ্র কাঠের ব্যবসা আরম্ভ করিয়া বিশেষ লাভবান হইয়া উঠিয়াছিলেন। এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী হইতে অল্প দিনের মধ্যেই বড়লোকের পর্য্যায় উঠিয়া আসিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আজকাল কলিকাতাবাসী হইয়াও গিরীশবাবু দেশের মায়া ত্যাগ করিতে

(শেষাংশ ৫৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

চমকে উঠলাম। এ কি কাপাসীর মাঠ! না হ'লে এ তল্লাটে এক বড় বিশাল বন্ধ্যা মাঠ আর কোথায়! ...

গাড়োয়ানকে জিজ্ঞেস করলাম, সে বললে, 'হ্যাঁ এটা কাপাসীর মাঠ-ই পার হচ্ছে। এটা পার হয়ে আর ক্রোশটাক্ গেলেই চাঁদপোড় পেঁছিবে। একটু পরে গলাটা খাট করে বললে, বাবু আস্তে এখানে বড় ভয়। এই ত সেদিন ডাকাতি হয়ে গেল এখানে। এখনও এটা পার হতে এক ঘণ্টা।'

ওর কথায় ভয় না পেলেও ভরসা যে পেলাম তা নয়। বাস্তবিকই এই জনমানবহীন সুবিশাল প্রান্তর মাঝে ডাকাতি কেন অনেক রকম সাংঘাতিক কাজই হতে পারে। হ'লে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। না হতে পারাটাই আশ্চর্য্য। মুখে গাড়োয়ানকে বললাম, 'ভয় কিরে?'

ছইয়ের নীচ থেকে মুখ বাড়ালাম। ধু ধু করে বিশুষ্ক মাঠ। তার ওপর ক্লান্ত জ্যোৎস্নার আভা পড়ে তাকে প্রহেলিকার মত মনে হচ্ছে। দূরে মাঠের মাঝে গোটা দুই বট পাকুড় দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারা যেন এক শয়তান! ওদের ঘিরে প্রেত-পুরীর অন্ধকার। আমাদের সামনে একটা শেয়াল-কাঁটার ঝোপ থেকে একটা শেয়াল দৌড়ে অদৃশ্য হ'ল। কাপাসীর মাঠের নামে কি ভয়ঙ্কর ইতিহাসই না মনে পড়ে যায়।

আমাদের চাঁদপেড়ে গ্রাম-এর গা ঘেঁসে যে নদীটা গিয়েছে তারই তিন বাঁক ছেড়ে চার বাঁকের মুখে ছিল এই কাপাসী গ্রাম। অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও বর্দ্ধিষ্ণু। পাঠশালা, ডাকঘর সবই ছিল এর। কিন্তু খ্যাতির মূলই ছিল কাপাসীর হাট। এ পরগণায় অত বড় হাট আর কোথাও হ'ত না। মনে আছে ছোটবেলায় যখনই যে বাড়ীতে কোন উৎসব-এর আয়োজন হ'ত; যেমন, বিয়ে, উপনয়ন, অন্নপ্রাশন তখনই আমাদের আসতে হ'ত এই কাপাসীর হাটে। এমন কোন জিনিষ নেই যে এ হাটে পাওয়া যেত না। হাঁড়ি-কুঁড়ি থেকে আরম্ভ করে জামা, কাপড়, বাসন-পত্র, গয়না পর্য্যন্ত, সব। কাপাসীর হাটে যাওয়া মানেই বুঝতে হবে বৃহৎ অনুষ্ঠানের তোড়জোড়

দু'দিন আগ থেকেই জিনিষপত্রের ফর্দ্দ হত।

যাবার দিন ভোরে মেয়েরা চটপট্ স্নান সেরে আসত। ডাল-ভাত রান্না হয়ে যেত। সেদিন এ বেলায় রান্নার বহর বড় একটা হ'ত না। কারণ জানাই ছিল সন্ধ্যায় কাপাসীর হাট থেকে মাছ আস্‌বে। তখন মাছের ঝোল-ঝাল কোনটাই বাকী থাকবে না।

ছোটবেলায় হাটে যাবার জন্যে আমরা আবদার ধরতাম। অনেক দিন আমাদের ভাগ্যে হুকুম জুটত, অনেক দিন জুটত না। জুটলে পর আগেই যেয়ে নৌকায় বসে থাক্‌তাম। সেদিন আর পায় কে। তার পর 'রামা', 'শ্যামা', 'যদু' 'খোকা' সবাই যখন এসে নৌকা ভর্ত্তি করত, তখন নৌকা ছাড়ত 'বদর বদর' করে।

ফেরার পথে নৌকা ভরে বাজার করে দিতাম ছেড়ে। আমাদের গ্রামটা ছিল ভাটিতে। একটানে নৌকা এসে পড়ত বাড়ীর ঘাটে। দেখ্‌তাম, মা কেরোসিনের লম্প হাতে করে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন ঘাটে!

শুধু এই নয়। বড় হয়ে আমরা ছেলেরা সরস্বতী পূজোয় পলাশ ফুল আনতে ডিঙি বেয়ে যেতাম কাপাসীর হাট-খোলায়। সেখানে গোহাটায় অনেক পলাশ গাছ ছিল। মাঘ ফাল্গুনে সমস্ত গাছের গা লালে লাল হয়ে উঠত। কে যেন আবীর গুলে দিয়েছে গাছের মাথায়। মৌমাছিরা ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করত। যেন কতই তারা কাজের লোক। আমরা ডাল ভেঙে গাছগুলোকে হতশ্রী করে ছাড়তাম। ওরা কিন্তু নীরবে অত্যাচার সহ্য করত।

হাটে ঢুকবার মুখেই ছিল গোটা দুই বটগাছ। ওদের গায় সেঁদেল মাটি শক্ত হয়ে জমেছে। গা বেয়ে ঝুলছে লম্বা লম্বা জটা। অনেক বুড়া কিনা, ওরা নাকি আমার বাবার বাবা তার বাবাকেও হ'তে দেখেছে।

ঠাকুরদাদার যেমন নাতী-নাত্‌নীর ওপর থাকে একটা অপার মমতা, এই বটগাছগুলোরও হাটের জনতার ওপর ছিল তেমনি মায়া। লক্ষ লক্ষ সবুজ পাতার ছাউনি দিয়ে ওরা পুঁজি করে রাখত একগাদা ছায়া। গরমের দিনে ক্লান্ত হয়ে হাটুরে-রা ওর গায়ে ঠেঁস দিয়ে বসত। হয়ত কারও খিদে পেয়েছে। কোঁচড়ে বেঁধে নিয়ে এসেছে চিঁড়া আর গুড়। তাই খাচ্ছে বসে। আর না হ'লে কেউ আরামে বসে টানছে শালপাতার বিড়ি। আবার কেউ হয়ত আঁচল পেতে শুয়ে পড়েছে ওর তলায়। গ্রামের কোন ছেলে হয়ত নিম্নতম শাখায় দড়ি বেঁধে দোল খাচ্ছে। কতকগুলো ছেলে-মেয়ে হয়ত হাঁ করে দাঁড়িয়ে সেই মজা দেখছে। শিশুবেলার সব-ই যেন অর্থহীন, আবার অর্থময়।

ওদের অনেকগুলো ডাল ঝুঁকে এসে পড়েছে নদীর ওপর। গ্রামের ছেলেরা সেখান থেকে ঝাঁপ খায় জলে। ডালগুলো এমনি করে দুলে ওঠে, যেন হাতছানি দিয়ে আবার আসতে ডাকে। দুরন্ত ছেলেরা জল ছিটিয়ে দেয় ওর পাতায়। সেগুলো ভিজে ওঠে অন্য রঙ ধারণ করে। সবুজ ঘন গন্ধ-ময় সে রঙ। দুরন্ত ছেলেদের এ একটা সখের খেলা।

এমন কি ইস্কুলের ছুটির দিনে আমরাও কোন দিন চলে যেতাম ওখানে স্নান করতে—ঝাঁপ খেলতে। ওখানে এলে যেন আমাদের মনের মধ্যে জাগত একটা মমতা। একটা স্নিগ্ধ মায়া কারও জন্যে, যে মরে গেছে। এই কাপাসীর ঘাট আমাদেরকে এমনি করে আকর্ষণ করত। এমনি করে সে আমাদেরকে ঘরছাড়া করত।

শরৎ কালে কাশের বনে ফাগুন লাগত। ঝির ঝির করা বাতাসে কাশের ফুল উড়ে বেড়াত এদিক ওদিক। নিরলস, নিশ্চিন্ত জীবন! থর থর করে কাশ-বনে ঢেউ উঠত আহ্বানের। হয়ত দেখা যেত একটা কাঠ বিড়ালীর বাচ্চা কি খুঁজে বেড়াচ্ছে। না হ'লে একটা ছোট হলদে পাখী লাফালাফি করছে পদ্ম তুলে।

বকুল তলায় বকুল বিছিয়ে রাখত বিছানা। আমরা তারে আদর করে কুড়িয়ে নিতাম। কাছেই ঝোপ থেকে ছিঁড়ে আন-তাম লতা। মালা গাঁথতাম মস্ত বড় একটা।

কোনদিন দেখতাম গ্রামের একপাল গরু এসে বুড়া বটের নীচে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রাখালটা একটা নেংটি পরে ঘুমিয়ে আছে লম্বা ঘাসের ওপর। পাতার ফাঁক দিয়ে রৌদ্রের এক

ঝলক এসে ওর মুখে পড়েছে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেত হয়ত। তখন গরুর ল্যাজে মোচড় দিয়ে বলত 'চ—চ এখানে দাঁড়িয়ে হাওয়া খেলে চলবে না, নবাবের ব্যাটা।' কোন সময় হয়ত মারে দুই-ঘা মনের খোশ-মেজাজে।

ওদিকে কতকগুলো ক্ষুদে জাম গাছ ছিল। ওতে কতকগুলো দিগম্বর ছেলে উঠে দাপাদাপি করে জাম খাচ্ছে। তাদের মধ্যে কেউ ধরত রাধার মানভঞ্জনের গান। তখন ঠাট্টা করে হয়ত কেউ বলত : 'স্যাঙ্গাৎ আমার কি গানই করত্যাছে। য্যেন কলি-কালের কৃষ্ণ।'

অন্য জন উত্তর দিতঃ'হ, হ তুমি যে আমার রাধা গো।'

হাটের দিন ছাড়া বৌ ঝিরা আসে নদীতে নাইতে। শনিবার আর বুধবার হাট বসে। তাদের ঘোমটা যায় এখানে খুলে। বাড়ীতে লজ্জার যে আড়ম্বর থাকে তা এই নিভৃত নদীঘাটে স্বাভাবিক হয়। এ যেন শ্বশুর ঘর করার পর মেয়ে-দের বাপের বাড়ী আসা। বড়ই খোলাখুলি ওরা এখানে। দুপুর হতে-হতেই ওরা ব্যস্ত হয়ে পড়ে আসতে এই বটের তলায় নদীর ঘাটে। ওরা এখানে পা মেলে বসে। এ'টেল মাটি দিয়ে মাথা রগড়ায়। খুব কতক্ষণ ডুবাডুবি করে, তারপর কলসী ভরে জল নিয়ে দুলতে দুলতে ঘরে ফিরে। ওদের ভিজা কাপড়ে শব্দ হয়, ছল ছলাৎ ছল। কঙ্কণ বাজে রিণি ঝিনি।

বেলা পড়লে গ্রামের ছেলেরা আসে নদীর ধারে। কাগজের নৌকা ভাসিয়ে দেয় নদীতে। ওরা ভেসে চলে নাচতে নাচতে। ওরা সবাই মিলে হাততালি দেয়। যার নৌকা আগে যায় সে অমনি চেঁচিয়ে ওঠে বিজয়গর্বের আতিশয্যে হেইয়া হো, হেইয়া হো......। হয়ত তখন কোন যাত্রী নৌকা থেকে কেউ গেয়েও উঠেঃ 'ওগো মাঝি তরী হেথা বাঁধবে না আজকের এই সাঁঝে।' তখন ছেলেরা মুগ্ধ হয়ে শোনে। সারি বেঁধে তীর দিয়ে নৌকার সঙ্গে ছুটতে থাকে।

দুর্গা পুজার সময় কাপাসীর বোসেদের বাড়ীর সে কি ধুম! জোড়া মোষ বলি হ'ত, পাঁঠা পড়ত গোটা কুড়ি পঁচিশ। তারপর যাত্রা গান তিন দিন ধরে। বোসেদের বাড়ীর মত অত বড় প্রতিমা-ই আমরা এ পর্য্যন্ত দেখিনি। চালি যেন আকাশ ছোঁয়। বিজয়ার মেলার দিন আমরা বাড়ী ফিরতাম তাল-পাতার ভেপু বাজিয়ে, কদম বনের মধ্যে দিয়ে, আম বাগান পাশ কাটিয়ে, হিজিম বনের ছায়ায় ছায়ায়। কার-ও হাতে থাকত ঠোঙ্গা ভরা খাবার, কারুর হাতে মাটির রঙ-করা 'দেশবন্ধু'। কেউ বা বাজাচ্ছে ডুগডুগি।

কিন্তু যেই এল শনিবার আর বুধবার তখন দেখা যায় মজা।

কত নৌকা এসে ভিড় করে বটের তলায় বাসা বেঁধেছে। লোকের মাথায়, গরুর গাড়ীতে, ঘোড়ার পিঠে আসছে মাল-পত্রের বোঝা। পালে পালে আসছে গরু, ছাগল, ঘোড়া বিক্রী হবার জন্যে। লোক আর জিনিসপত্রে গিস্ গিস্ করে। "ও জিনিসটা কত", "নাও", "না—না" এই সব মিলে হট্টগোল সুরু হ'ত।

বর্ষার দিনে লোকের পায়ের চাপে সমস্ত হাট জুড়ে কাদার ফোয়ারা ছুটত। গরম দিনে গাছ তলার ছায়া নিয়ে মারামারি। যে যেখানে সুবিধা পায় জিনিস-পত্তর নিয়ে বসে। নদীর পারে অনেকদূর পর্য্যন্ত চাটাই বিছিয়ে বসে ব্যাপারীরা। ধান, চাল, পাট, তিসি, সরষে, হাঁড়ি, কলসী সেখানে।

খদ্দের বলছেঃ 'কি হে ধানের দর এত বাড়ল কেন? মানুষ না খেতে পেয়ে মরে যাবে যে।'

দোকানদার জবাব দেয়ঃ 'কি আর করি, আমরা ত আর সস্তায় কিনতে পারিনে।'

তরকারির দোকানে কেউ বলছেঃ 'বেগুনের দর কত করে? আমাকে একসের দাও ত ভাই; এ লাউটা শক্ত হয়ে গেছে'......ইত্যাদি কতরকম।

'ও মিয়া ইলিশ মাছটা কতুকের হ'ল।' তিসি বিক্রী করতে করতে চাষা জিজ্ঞেস্ করে। তারও আজ একটা নিতে হবে। দুই হাট থেকে বৌ বায়না ধরেছে। গত হাটে নিতে পারেনি, তাই অভিমান করে বৌ একদিন কথাই বলেনি। 'ভারী সস্তা হয়েছে ত!' এই বলে অন্য দোকানীকে দোকানের ওপর নজর রাখতে বলে সে দৌড়ায় মাছ-হাটার দিকে।

মুদির দোকানে গুড় কিনতে যেয়ে চাষা বলেঃ 'চাচা কল্কি যে একেবারে ফাইটা যাইব গো। চর্‌চর্ করতিছে। আমাগো এক টান দাও।' তাড়াতাড়ি কল্‌কে নিয়ে সজোরে টানতে থাকে।

ওদিকে গোহাটাতে গরুর দাম নিয়ে ব্যাপারী আর ক্রেতার একরকম ঝগড়া বাধে।

এই হ'ল কাপাসীর হাট। ঠিক দুপুরে লাগে, রাত আটটায় ভাঙে।

এই হাটখানাকে কেন্দ্র করে আশেপাশের পাঁচ সাতখানা গ্রামের লোক জড় হয়। কাপাসী গ্রামকে জাগ্রত ক'রে তোলে।

একদিন ভরদুপুরে হঠাৎ ভরা হাটে একটা সোরগোল উঠল। অনেক কানাঘুসা হতে লাগল। অনেকের চোখে-মুখে কি একটা আতঙ্কের ছায়া! অস্পৃশ্য, নির্ম্মম আতঙ্ক! দেখতে দেখতে হাট পাৎলা হ'তে সুরু হ'ল। বিদ্যুৎবেগে অনেক কয়খানা নৌকা দড়ি খুলে দিয়ে মাঝ গাঙে পাড়ি জমাল। দোকানীরা দোকান পশার বেঁধে চল্‌ল বাড়ীর মুখে। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! সবাই ছুটোছুটি করছে ব্যস্ত-ত্রস্ত হয়ে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এ পরিপূর্ণ হাট একরকম জনশূন্য হয়ে উঠল। আমরাও সেদিন আদ্ধেক হাট ক'রে ফিরলাম। আমরা ছেলেরা ব্যাপারটা কিছুই উপলব্ধি করতে পারি না। বড়দের কাছে জিজ্ঞেস করলে তারা বলে বাড়ী যেয়ে বলবে। আশ্চর্য্য! কি এমন ব্যাপার!

বাড়ীতে মেয়েরা জিজ্ঞেস করতেই জানতে পারলাম কাপাসী গ্রামে মহামারী লেগেছে। প্লেগ। সামান্য জ্বর হয়, কান আর গলা ফোলে। তারপরদিন ব্যস্ ঠান্ডা! এ রোগ নাকি ভয়ানক সাংঘাতিক ছোঁয়াচে।

আমরা ত এ রোগের নামও শুনিনি কোনদিন।

(শেষাংশ ৫৬৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শেষ আর সুরু

(গল্প)

শ্রীঅময়কুমার ঘোষ বি-এ

'অন্তরীণ সনাতন আজ ছাড়া পেয়েছে। পাঁচটি বছর তাকে আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব ছেড়ে সুদূর 'এক বন্ধনাগারের মধ্যে কাটাতে হয়েছে। সেখানকার সেই পূতিগন্ধময় আবেষ্টনী তার জীবনের পরমায়ু হতে এক একটি করে দিন কেড়ে নিয়েছে। পূর্ব্বে তার শরীর ছিল কত মজবুত—ইস্পাতের মত দৃঢ়—আর আজ সেই শরীর তার স্বাস্থ্য-শূন্যতায় স্তিমিত হয়ে পড়েছে। দিনগুলি তার যেভাবে কেটেছে সেই জানে। কোন কাজই ছিল না সেখানে—শুধু বই পড়া। তাও কি সকল সময় পড়া চলে? আর ছিল চিন্তা করবার অপরিমেয় অবকাশ। কিন্তু চিন্তা করলে মাথা গরম হয়ে ওঠে, সমস্ত শরীর জেগে ওঠে উত্তেজনার তরঙ্গে। কোন ফল নেই! সেই উত্তেজনা, সেই কর্ম্মব্যাকুলতাকে রূপ দেবার সুযোগ তখন তার নিকট হতে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল।

আজকে সে গ্রামে ফিরে এসে দেখলে এখানকার অনেক পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে।......

যে সংসার তার উপার্জ্জনে ‧েত তা কয় বছর অর্থের অভাবে অচল হয়ে পড়েছে। চাকরি করে সে পেত পঁচাত্তর টাকা। কিন্তু সরকারী ভাতা তাকে দেওয়া হত পনের। সেই টাকায় তার চলত না। তার মা ত এরই দুঃখে একদিন প্রাণত্যাগ করলেন। শেষ বারের মত তাঁকে একবার দেখতেও পেলে না। তারপর সংসারের সমস্ত ভার নিয়েছে তার ছোট ভাই রমেশ। তার-ই সামান্য উপার্জ্জনে কোন রকমে এ সংসার চলে এসেছে।

সনাতন যখন তাদের গ্রামের খেয়াঘাটে নামল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। রমেশ তাকে নিয়ে এল। অত্যন্ত জীর্ণ শরীর। এইটুকু পথ আসতেই যেন কেমন নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল। তার স্ত্রী নির্ম্মলার সঙ্গে প্রথম যখন এতদিন পরে দেখা হ'ল তখন পুনর্ম্মিলনের পুলক ব্যক্ত হ'ল অশ্রুর উচ্ছ্বাসে—কত দুঃখ-বিলাপের কথা-কাহিনীতে। নির্ম্মলা বলছিল সেই তো তুমি চলে গেলে, তারপর আমার কি ভাবেই যে দিন কেটেছে কি বলব। সে বারটা কি মাস মনে নেই। বর্ষাকাল। মণ্টুর ভীষণ জ্বর। গ্রামের নকড়ি কবিরাজকে ডেকে আনা হল। কিন্তু কি যে ওষুধ দিলে সেই জানে। তার ওষুধ খাবার পর থেকেই মণ্টুর অসুখ বেড়ে গেল। জ্বরের ঝোঁকে প্রলাপ বকতে লাগল। "বাবা! বাবা!" বলে ক'বার ডেকে উঠল। বললে,—"বাবা! দেখে যাও আমি ফার্ষ্ট হয়েছি!" আমার কাছ থেকে প্রাইজের বইখানা নিয়ে মলাটের উপরের মহাত্মাজীর ছবিখানা বুকে চেপে ধরলে। ধরে বললে—মা বাপুজী বলেছে মিথ্যে কথা বলতে নেই। আমি আর মিথ্যে কথা বলব না।...তারপর আরও কি যেন বলেছিল। কিন্তু ক্রমশ বাছার শরীর ঠাণ্ডা হয়ে এল—গলার স্বর মিলিয়ে গেল। তারপর সমস্ত শেষ।

রমেশ সে কথায় বাধা দিল—"থাক সে কথা এখন। দেখছনা দাদার শরীর খারাপ।"

সে-দিনটা কেটে গেল। তারপরে আরও দিন পর দিন কেটে যেতে লাগল। দিন দিন তার সংসারের অবস্থা তার চোখের সম্মুখে প্রকাশ হয়ে পড়ল। নির্ম্মলার অনুযোগের গুঞ্জরণ দিন দিন বেড়ে যেতে লাগল। অভাব-অনটনে বোধ হয় মানুষ এমনি হয়! সে জানত সনাতনের শরীর কতই খারাপ, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে ইঙ্গিতে বোঝাতে চাইত তার এইবার চাকরি-বাকরি একটা কিছু ধরলে ভাল হয়। নির্ম্মলার পরণে কাপড় নেই। বড় ছেলে তরুণের স্কুলের মাহিনা বাকী। ইত্যাদি দরিদ্র সংসারের দুঃখ-দুর্দ্দশার কতই ইতিবৃত্ত!

একদিন নির্ম্মলার ভাই বিমান কলকাতা থেকে এল। কাপড়-চোপড় কত কি সে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। সে সমস্ত পেয়ে বড় দু'ছেলে তরুণ, অরুণ কত খুশী, নির্ম্মলারও আনন্দ ধরে না। যাবার সময় বিমান বললে—দেখুন এমনি করে আর ক'দিন কাটবে? সবই তো বুঝতে পারছেন। এখন আর হুজুগের কাল নেই—চাই কাজ। আমি বলি কি একটা চাকরি-বাকরি কিছু করলে ভাল হয় না? আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে, আমি আমার আফিসে একবার চেষ্টা করে আপনাকে পঁচিশ ত্রিশ টাকায় বসিয়ে দিতে পারি। অবশ্য আপনি যে অন্তরীণ ছিলেন এ-কথা জানতে দেব না।...ইত্যাদি কত কথা বলে বিমান চলে গেল।

সনাতনের শরীর ক্রমশ খারাপ হয়ে আসতে লাগল। বুকে সেই পুরোনো বেদনাটা দিন দিন আরও জেঁকে বসতে লাগল। সন্ধ্যায় রোজ বেশ একটু জ্বর হয়। অস্থিরতায় সারা রাত্রি তার কাটে বিলাপে। বুঝতে সে পারে যে শেষ-দিনের ডাক ঘনিয়ে আসছে। দেশকে সে ভাল বেসেছিল। দেশের জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে নামবার সেই বিপুল উদ্দীপনা তার কোথায় গেল? পূর্ব্বেকার তার সেই স্বাস্থ্য, কর্ম্ম-ব্যাকুলতা, তার দেহ হতে কোথায় বিলুপ্ত হয়েছে! আজ কি তার কোন মূল্যই নেই—সে কি আজ পৃথিবীর সবার কাছে অতীত তারিখের মত পিছিয়ে পড়ল?

দাওয়ায় শুয়ে শুয়ে এমনি কত কথা সনাতন ভাবছিল। হঠাৎ একদল দশবার বছরের ছেলে এসে তার বাড়ীর সামনে ডাকতে লাগল—'তরুণদা! তরুণদা! চল আমরা যাই।'

সনাতনের ছেলে তরুণ আর অরুণ না হলে গ্রামের বালকদের কোন কাজ করা হয় না। এরা ওদের দু'জনের কথায় ওঠে বসে।...

সনাতনের এ দৃশ্য দেখতে লাগল মন্দ নয়। সে তাদের জিজ্ঞেস করলে—তোমরা কোথায় যাচ্ছ?

তারা বললে—আমরা দত্ত বিলে কচুরী পানা সাফ করতে চলেছি। ওদিকটায় বড় অসুখ-বিসুখ।

সনাতন একটু বিস্ময় প্রকাশ করে বললে—সে কি, তোমরা ছেলেমানুষ ও সব পারবে?

তরুণ বললে—খুব পারব। আমাদের কি শুধু এই

কাজ? রোজ বিকেলে আমাদের ব্যায়ামাগারে ব্যায়াম করি, নৈশবিদ্যালয় আছে, রাত্রে পড়বার সময় গ্রামের ছেলে-পিলেদের পড়াই—ছুটির দিনে গ্রামের জঙ্গাল পরিষ্কার করি।

ছেলেরা সবাই দল বেঁধে চলে গেল। তাদের দেহে তরুণ স্বাস্থ্যের লক্ষণ, মনে অসামান্য আশার দীপ্তি। সনাতনের আজ এদের দেখে বড়ই আনন্দ হল। সে ভাবলে তার মৃত্যু হলেও কোন দুঃখের হবে না। কারণ, আজ দেশের তরুণ প্রাণের মাঝে যে বাণী জেগে উঠেছে তার মরণ নেই। তার নিজের ছোট ছোট ছেলেরা যে ভাবে দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি করবার জন্যে লেগেছে, এতে সে এখন নিশ্চিন্তে মহাকালের আহ্বানকে বরণ করে নিতে পারবে। তার অসমাপ্ত কার্য্য-পরিকল্পনা যে তারই স্থলাভিষিক্ত হয়ে তরুণ, অরুণ হাতে তুলে নিয়েছে। মরবার আগে এমনি একটা দৃশ্য দেখতে পেয়ে তার বুক থেকে আজ একটা স্বস্তির নিশ্বাস মুক্তি পেল।

কাপাসীর মাঠ

(৫৬২ পৃষ্ঠার পর)

এই ছোঁয়াচে রোগটি যদি বা তার গ্রাম ছেড়ে এই চাঁদ-পেড়ের উপর নজর দেন, এই ভয়ে আমাদের গ্রামবাসীরাও আতঙ্কিত হয় উঠল অশেষ। সারা দিনরাত্রি চলল খোল বাজিয়ে হরি সঙ্কীর্ত্তনের মাতামাতি। গ্রামের পথে পথে ঘরে ঘরে ছেয়ে গেল গন্ধকের তীব্র গন্ধ। তুলসীতলায় হরিলুট, আর মসজিদে সিন্নির বিরাম নেই। বিপদে পড়লে আমাদের ধর্ম্মপ্রীতিটা বেশী হয়।

রোজই শুনা যায়, আজ কাপাসীতে পনের জন মরেছে। কাল মরেছে বিশজন, তার পরদিন ত্রিশজন। দিন থেকে দিনে মৃতের সংখ্যা বেড়ে চলল। কাপাসীর ওপর যেন কোন অপদেবতা ভর করেছে। একে ধ্বংস করবেই। জীবন আর মৃত্যুতে সেই নিত্যকালের কাড়াকাড়ি।

এইবার সবাই গ্রামের মায়া ছাড়তে সুরু করল। পড়ে রইল বাড়ী, ঘর, ইমারত, ধন দৌলৎ, গোলাভরা ধান, গোয়াল-ভরা গরু। সবাই ছুটল দূর গ্রামে আশ্রয় নিতে। আগে প্রাণ, আগে ধন নয়। এই হ'ল জীবনের রহস্য। জীবনকে আমরা যত আঁকড়ে ধরি, সে তত আমাদের সঙ্গে জালিয়াতী করে।

যারা পারলে তারা পালিয়ে বাঁচলে। যারা পারলে না তারা মরল অসহায়ের মত। অতি করুণ। এর চেয়ে শোকাবহ ঘটনা আর বোধ হয় নেই,—যেখানে বাঁচার সামর্থ্য থাকতে মানুষ অসহায়ের মত মরে। প্রথম মরল মানুষ, তারপর পশু—জীবনের সাড়া রইল না সে তল্লাটে—সবশেষে।

হায় সেই কোলাহলময়ী কাপাসীর আজ দুর্দ্দশা!

এক মাসের মধ্যে কাপাসী শ্মশানে পরিণত হল। নিয়তির ক্রূর ইঙ্গিত পরিসমাপ্ত হ'ল।

তাই আজ কাপাসী শুধু বিরাট প্রান্তর। সে হয়ে আছে মানুষের নিষ্ফলতার ইতিহাস। যেন দুর্ব্বার নশ্বরতায় ভস্মীভূত কঙ্কাল।

এখনও এখানকার লোকের বিশ্বাস, এই কাপাসীর মাঠে গভীর রাতে আর ঠিক দুপুর বেলায় অপদেবতা চলে। তাই রাখালেরা গরু চরাতে এলেও ভরা দুপুর বেলায় মাঠ ছেড়ে এক প্রান্তে এসে গ্রামের গা ঘেঁসে বসে বাঁশের বাঁশীটা বাজায়।

ফরাসী গোয়েন্দা বিভাগ

শ্রীবরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী

বিগত ৩২ বৎসর ব্যাপিয়া ফরাসী দেশে নৌ-বিভাগীয় কোনও অফিসার দণ্ডিত হয় নাই বিশ্বাসঘাতকতা কিম্বা গোপন সংবাদ দানের অপরাধে। কিন্তু ১৯৩৯ সালের আবির্ভাব হইতে না হইতেই জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে এই সুদীর্ঘ ৩২ বৎসর পরে একটি বিশিষ্ট নৌ-বিভাগের অফিসার অভিযুক্ত হইয়াছে। অপরাধ তাহার অতি গুরুতর। বিগত এই জাতীয় সকল অপরাধের রেকর্ড একেবারে অতিক্রান্ত হইল, যখন তুলোঁর কোর্ট মার্শিয়াল সেকেন্ড ক্লাশ এনসাইন (Second Class Ensign—দ্বিতীয় শ্রেণীর এনসাইন অর্থাৎ ইংলন্ডের লেফটানেন্ট পর্য্যায়ের সমকক্ষ ফরাসী নৌ-কর্ম্মচারী) এলোফে মারে ঔবার্টকে দণ্ডিত করা হয়—সরকারী পদের অযোগ্যতার হীনতম প্রতীক বলিয়া, তৎপর আদেশ দেওয়া হয় প্রাণদণ্ডের।

এনসাইন ঔবার্ট কোন সাধারণ গুপ্তসন্ধানীর কাজ করে নাই—এই ২৬ বৎসর বয়সের এনসাইন এমন বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, যাহা কোন ফরাসীবাসী এ পর্য্যন্ত করিয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। নোর্ডের কোন সম্ভ্রান্ত বুর্জোয়া পরিবারের একমাত্র পুত্র ঔবার্ট অতি ছোটকালেই—সে যখন নিতান্ত বালক—তখনই নৌ-বিভাগের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সাগরে গমনের প্রতি তাহার প্রলোভন ছিল অপরিসীম। তাই বালক বয়সে সে নেভেল স্কুলে ভর্ত্তি হইতে চেষ্টা করে। কিন্তু ভর্ত্তি হইবার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া সামরিক নৌ বিভাগের অতি নিম্নস্তরের চাকুরীতে প্রবেশ করে। এত উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের সহিত সে কার্য্য করিতে থাকে যে, অগৌণে সে সকল প্রকার বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চতরের নিপুণতার সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হয়। ইহার পর আর তাহার পদোন্নতিতে কোন অন্তরায় থাকে না। শীঘ্রই তাহাকে অফিসারের শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়। ১৯৩৫ সালে সমগ্র সামরিক নৌ বিভাগ হইতে বিশেষ পরীক্ষার জন্য যে পাঁচ জন অফিসারকে নেভেল কলেজে পাঠান হয় নৌ-সেনা-নায়কের সুপারিশে, তাহার ভিতর ঔবার্টও স্থান প্রাপ্ত হয়। এই সময়ই যত জটিলতা গ্রাস করে ঔবার্টকে।

ব্রেষ্ট শহরে কোনও নৃত্য-পার্টিতে যোগদান কালে সে প্রথম দেখা পায় মারি জিন মাউরেল-যের। প্রথম দর্শনেই এই ভ্রমর কৃষ্ণ-কেশবতী অপূর্ব্ব রূপসীর প্রেমে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়। কিন্তু তাহার সামান্য বেতনে এমন এক বিলাসিনীর সকল ব্যয় সরবরাহ করিয়া নিতান্ত নিজস্ব করিয়া লওয়া ঔবার্টের পক্ষে হইল অসম্ভব এবং ব্যয় বহনের দিক দিয়া স্বপ্নেরও অতীত ব্যাপার। নৌ বিভাগীয় সাব-অল্‌টার্ন যে বেতন পায়, তাহাতে মারি মাউরেলের পরিচ্ছদ যোগাড়ই কঠিন, ইহার উপর ত কত শত দিকে কতই না রহিয়াছে দাবী। মারির পরামর্শে সে জার্ম্মান নেভেল মন্ত্রীর দপ্তরে এক চিঠি লিখিয়া পাঠাইল যে, তাহাকে মাসিক উপযুক্ত পারিতোষিক প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া দিলে, সে ফরাসী দেশীয় জঙ্গী বিভাগের যে সকল সংবাদ জানিতে পারিবে, তাহা সমস্তই জার্ম্মান মন্ত্রীর দপ্তরে পাঠাইয়া দিবে।

নেভেল একাডেমির শিক্ষার্থী ঔবার্টের পক্ষে তেমন গোপন সরকারী সংবাদও সংগ্রহ করা কঠিন হইল না। প্রতি সপ্তাহে সে যখন তাহার রক্ষিতা মারি মাউরেলের সাহচর্য্য লাভ করিতে গমন করিত, সে মুখে মুখে সেই সকল গোপন সংবাদ বলিয়া যাইত আর তরুণী মাউরেল তাহা লিখিয়া লইত। তাহার পর সকল খুঁটি নাটি যথাযথভাবে সাজাইয়া মাউরেল উহা ডাকযোগে প্রেরণ করিত। ইহাতে কোনও প্রকার বেগ পাইতে হয় নাই। কারণ মাউরেল ছিল একটি নৃত্যশিক্ষা দানের প্রতিষ্ঠানের শিক্ষয়িত্রী—বয়স ২৭ বৎসর। যে সকল চিঠি সে পাঠাইত তাহা জার্ম্মান মন্ত্রীর দপ্তরে পেঁৗছাইবার জন্য জার্ম্মানীর বিভিন্ন শহরের কয়েকটি পরিচ্ছদের দোকান ও জুয়েলার্সের ঠিকানা ছিল নির্দ্দিষ্ট। পর্য্যায়ক্রমে ঐ ছয়টি ঠিকানায় চিঠি প্রেরিত হইত। আবার মারি মাউরেল শুধু ব্রেষ্ট শহর হইতেই চিঠি ডাকে দিত না—সময়ে নিকটবর্ত্তী শহর বা শহরতলীসমূহে যাইয়া চিঠি ডাকঘরে দিয়া আসিত। প্রতি মাসে বার্লিন হইতে হাজার ফ্রাঙ্ক নোট পেঁৗছিত মারির নিকট। তাহাও প্রতি বারে ব্রেষ্ট শহরে আসিত না। কোন কোনও বার প্যারিসস্থ জার্ম্মান কনসালের মারফতও টাকাটা সে পাইত অতি গোপনে। অতি সুখেই দিন কাটিতেছিল এই যুগল সেয়ানা তরুণ-তরুণীর।

কিন্তু ঔবার্টের এই গোপন সংবাদ দানের স্রোতে পড়িল বাধা—নেভেল একাডেমির পড়া শেষ হওয়ায় পরীক্ষার্থ এক বৎসরের জন্য তাহাকে পাঠান হয়—'জোয়ান ড' য়ার্ক' নামক ট্রেনিং জাহাজে। এই ট্রেনিং জাহাজখানি এক বৎসর সাগরে সাগরে ঘুরিয়া বেড়াইবে আমেরিকার পথে। ঔবার্টের মস্তকে যেন বজ্রপাত হইল। একদিকে তাহাদের প্রধান আয় জার্ম্মানী হইতে যে আসিবে তাহার বিনিময়ে এখন সংবাদ প্রেরণ করা যাইবে কি প্রকারে, এই ভীষণ বিপদ তাহাকে অস্থির করিল; অপর দিকে সাধের প্রেয়সীর নিকট হইতে বিচ্ছেদই বা সে কি করিয়া কোন্ প্রাণে বরদাস্ত করিবে। তথাপি নিস্তার নাই, জঙ্গী বিভাগের আদেশ, কোন অজুহাতের সেখানে মর্য্যাদা নাই। ঔবার্টকে জাহাজে যাইতেই হইল।

এখানেও আবার উপস্থিত হইল নানা বিপদ। তাহার চাকুরীকালের ভিতর এই সর্ব্বপ্রথম তাহার উপরওয়ালা অফিসারগণ দেখিতে পাইল যে ঔবার্টের পূর্ব্ব রেকর্ডের তুলনায় তাহার বর্ত্তমান কর্ম্মশক্তি একেবারেই খাপ খায় না; তাহা হইলে কোন কারণে নিশ্চয় উহার মেজাজে-মনোবৃত্তিতে একটা আমূল পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। এই জন্য জাহাজের কাপ্তেন পর্য্যন্ত একদিন তাহাকে ডাকিয়া হুঁসিয়ার করিয়া দিল। তথাপি সাময়িক মনে প্রাণে অবসাদ ঔবার্টকে পাইয়া বসিত—তখন আর সে কর্ত্তব্যে অটল থাকিতে পারিত না। এইজন্য দেখা যাইত যেদিন সে কাজ করিতে মন দেয়, সেদিন অমানুষিক পরিশ্রমে সকলকে ছাপাইয়া যায়, আবার যেদিন অবসাদ তাহাকে পাইয়া বসে, সেদিন সে আলস্যেই দিন কাটাইয়া দেয় সকল কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়া। অধিকাংশ

দিনই উপরওয়ালাদের মনে হইত, ঔবার্ট যেন কুড়ের বাদশা আর আহাম্মোকের বেহদ্দ। কিন্তু এক এক দিনের নিপুণ ও কঠোর কর্ত্তব্য সম্পাদন এমনই অসাধারণ হইত যে, তাহাতেই উপরওয়ালারা তাহার উপর সন্তুষ্ট হইত, তাহার উপর যত বিরক্তি পোষণ করিত—সকলই উবিয়া যাইত। এইভাবে ছয় মাসের উপর কাটিয়া গেল।

এই সময় (১৯৩৮) জাহাজখানি একবার কিছুদিনের জন্য দেশে ফিরিল। তখন ঔবার্টের ছুটি মিলিল এক মাসের। সে অবিলম্বে ব্রেস্ট শহরে চলিয়া আসিল এবং সমগ্র মাসটি মারি মাউরেলের সঙ্গে কাটাইল। ইহাই হইল তাহার গ্রহের ফের। তাহার জাহাজে থাকাকালীন অদ্ভুত শিথিলতা ও পর্য্যায়ক্রমে আশ্চর্য্য তৎপরতা কাপ্তেনের চক্ষু এড়ায় নাই। ছুটি সে কোথায় কিভাবে কাটায় এইজন্য গোয়েন্দা-বিভাগের উপর নির্দ্দেশ দান করা হয় অনুসন্ধানের। তাহার রক্ষিতার সংবাদ ও ধনবতীর ন্যায় ব্যয় বাহুল্য নৌ-বিভাগের তথা গোয়েন্দা বিভাগের সন্দেহ আকৃষ্ট করে। ইহা ছাড়াও ফরাসী সাবমেরিন নির্ম্মাণে জার্ম্মানীর উপরেও যে আধুনিকতা ফরাসী মেকানিকদের বিশিষ্টতা বলিয়া গবর্ণমেণ্টের জানা ছিল এবং যে উন্নতির আভাসও অন্য কোন শক্তি পায় নাই বলিয়া বিশ্বাস ছিল, তাহাতেও খটকা লাগে—নেটেল্যাণ্ডের তীরের অদূরবর্ত্তী দ্বীপস্থ নৌ ও বিমান মিশ্র-ঘাঁটির গোপন সংবাদ যখন ফরাসী সুরিতায় পেঁছে। কাজেই নানা ছদ্মবেশে গুপ্তচরেরা এনসাইন ঔবার্ট ও নৃত্য শিক্ষয়িত্রী মারি মাউরেলকে ছাঁকিয়া ধরিল।

জাহাজ হইতে ছুটিতে আসিয়া অবধি ঔবার্ট পুনরায় তাহার গোপন সংবাদ দান আরম্ভ করিয়াছে। ক্রমে সেপ্টেম্বর মাস (১৯৩৮) আসিল। জার্ম্মান মন্ত্রীর দপ্তর হইতে জরুরী চাহিদা উপস্থিত হইল বিশেষ সংবাদ দানের জন্য ; কারণ সেই সময়ে ইউরোপের গুরুত্বপূর্ণ ঐ চেক সমস্যা আসন্ন। সংবাদ জার্ম্মান দপ্তরের নিতান্তই প্রয়োজন। পারিতোষিকের প্রলোভন দেওয়া হইল দ্বিগুণ। তদুপরি ঔবার্টের অর্থের প্রয়োজন বিষম। ঔবার্ট অতিশয় গোপনে নানা তথ্য সংগ্রহ করিল—ফরাসী নৌ-বাহিনীর সমরশক্তির সঠিক তালিকা সম্বলিত। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি একদিন তাড়াতাড়ি সেই গোপনীয় কাগজপত্র সে পাঠাইল মারি মাউরেলের নিকট।

এই কাগজ-পত্র ডাকে প্রেরণের সংবাদ কাউণ্ট মোরেনো নামধারী গুপ্তচরের নিকট তন্মুহূর্ত্তেই পেঁছিয়া গেল। কাউণ্ট মোরেনো সুন্দরী তরুণীর বেশে মারি মাউরেলের গৃহ হইতে তাহা বেমালুম সরাইয়া ফেলে এবং সঙ্গে সঙ্গেই এনসাইন ঔবার্ট ও তাহার রক্ষিতা মারি জিন্ মাউরেল গ্রেপ্তার হয়।

বিচার চলিল অতি গোপনে। কোন সংবাদ দৈনিক পত্রে প্রকাশ করা হইল না। বিচার কক্ষে সাধারণের প্রবেশও অতি কড়াকড়িভাবে নিষিদ্ধ করা হইল। দর্শকগণ যাহারা মুখে মুখে গুজবমাত্র শুনিয়া হাজির হইয়াছিল, তাহারা দেখিতে পাইল—তুলোঁর সিভিল ট্রিবিউন্যালের প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট পেরেগনড্ বিচার কক্ষে গমন করিলেন; তাহার পশ্চাতে কোর্ট মার্শিয়ালের নৌ-কর্ম্মচারিগণ প্রবেশ করিলেন। নৌ-বিভাগীয় কর্ম্মচারী ছিলেন চারিজন—তাঁহাদের ভিতর দুইজন সুপিরিয়র বা উচ্চপদের, বাকি দুইজন অভিজ্ঞ এনসাইন্ শ্রেণীর।

নৌ-বিভাগীয় অফিসার চারিজন বিচার কক্ষে প্রবেশ করিলে পরে সেই সহকারী বিচারকগণকে প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট পেরেগনড্ জিজ্ঞাসা করেন—"আপনাদের বিবেকের প্রেরণানুযায়ী বিচার কার্য্য সমাধা করিতে এবং আজ এই বিচার কক্ষে যে সকল আলোচনা হইবে তাহার গোপনতা রক্ষা করিয়া আদালতের যোগ্য মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে আপনারা শপথ গ্রহণ করিতেছেন কিনা?" বিচারক চারিজন আবেগ-গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"হাঁ, আমরা শপথ করিতেছি।" তখন যথারীতি সেই গোপন কক্ষে বিচার আরম্ভ হইল।

উদ্বেগ-কম্পিত গোপন সংবাদদাতা ঔবার্ট অতি মৃদুস্বরে আপন নাম, বয়স ও পেশার বিষয় প্রশ্নের উত্তরে বলে। ইহার পর মারী মাউরেলকে হাজির করা হইল এবং সে তাহার নামধামাদি বলিতে থাকিলে ঔবার্ট অবসন্ন দেহে অসাড়বৎ কক্ষ-মেঝেয় বসিয়া পড়ে। কোন্ সময়ে প্রথম সংবাদ জার্ম্মানীতে প্রেরণ করা হয়, সমুদয়ে কত টাকা জার্ম্মানী হইতে তাহারা পাইয়াছে সেই সকল সংবাদও মাউরেল যথাযথ উল্লেখ করে। ঔবার্টের সহকারিণীরূপে কি কি কাজ মাউরেলকে করিতে হইয়াছে তাহাও সে ক্রমান্বয়ে বলিয়া যায়, কেবল তাহারই প্রেরণায় যে ঔবার্ট এই বিশ্বাস ঘাতকতার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে, এই কথা সে অস্বীকার করে। অপরাহ্ণ সাত ঘটিকা পর্য্যন্ত এই প্রকারের প্রশ্ন ও উত্তর চলে। ইহার পর তিন ঘণ্টাকাল পর্য্যন্ত বিচারকগণ নিজেদের ভিতর দণ্ডদান সম্বন্ধে নানা আলোচনা করেন। পরে ৯-৪০ মিনিটের সময় রায় দান করেন। এই সময়ে বিচার কক্ষের দ্বার অর্গলমুক্ত করা হয়। প্রতীক্ষাকারী জনতা তখন হুটোপাটি করিয়া বিচার কক্ষে প্রবেশ করে অপরাধীদের দর্শন পাইবার আশায়। কিন্তু তাহাদের হতাশ হইতে হয়। কারণ কোর্ট মার্শিয়ালের নিয়ম ইহা নহে যে, দণ্ডাজ্ঞা উচ্চারণ করিবার সময় অপরাধী তথায় উপস্থিত থাকিবে। সুতরাং তুলোঁ শহরের যাবতীয় অগ্রণী এবং নৌ-বিভাগীয় ছোটবড় কর্ম্মচারিগণ বিচার-কক্ষে যখন প্রবেশ করিল, তাহার পূর্ব্বে অপরাধী দুইটিকে জেলখানায় স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

ঠিক রাত্রি দশটার সময় জেলখানার প্রাঙ্গণে অপরাধী দুইজনকে আনা হইল—সেখানে আলোক ছিল না বলিতে গেলে—পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষের আলোক আসিয়া যেটুকু অন্ধকার দূর করিয়াছে। কোর্ট ক্লার্ক ভিলার্ড তখন টর্চ্চ সাহায্যে বিচারকগণের রায় পড়িয়া শুনাইল। ঔবার্ট সামরিক পদের চরম অবমাননা করিয়াছে সুতরাং তাহাকে সামরিক পদ অধিকারে অযোগ্য ঘোষণা করা হইল (ইহাই ফরাসী জঙ্গী-বিভাগের অফিসারের পক্ষে চূড়ান্ত অপদস্থ হইবার সাজা) এবং পরে তাহাকে গুলী করিয়া হত্যা করা হইবে। মারি জিন্ মাউরেলকে তিন বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল।

বিজ্ঞানের সাহায্যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা

আমাদের আইন সভাগুলিতে সম্প্রতি যেভাবে আইনের পর আইনের পাণ্ডুলিপি পেশ ও প্রস্তাব পাশ হইতেছে, তাহাতে মনে হয়, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের দেশের সত্যিকারের কল্যাণ সাধনের চেয়ে নিজেদের ভোটের জোর দেখাইবার মনোভাবটাই যেন বেশী। দলগত ও শ্রেণীগত স্বার্থের উর্দ্ধে উঠিয়া দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধনের শুভেচ্ছা ও সদিচ্ছা সদস্যগণের মধ্যে কাহারও কাহারও থাকিলেও দলের চাপে পড়িয়া কিম্বা অপরের মতামত বিচার করিয়া লইবার অভিজ্ঞতার অভাবে অনেকে বিভ্রান্ত হইয়া পড়েন। সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধি দ্বারাও আইন সভার সদস্যগণ অনেক সময় পরিচালিত হয়েন বটে; কিন্তু তাঁহাদের প্রস্তাবিত সবগুলি বিলই যে সকল সময়ে নিজেদের সম্প্রদায়বিশেষের উপকার সন্তোষজনকভাবে করিতে পারিবে, সে সম্পর্কেও তাঁহাদের সুস্পষ্ট ধারণা পরিলক্ষিত হয় না। অনেক ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করিয়া কোন এক অধিবেশনে যে বিল পাশ হইয়া যায়, কিছুদিন পরেই কার্য্যক্ষেত্রে তাহার বিষময় ফল আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। যাঁহারা সর্ব্বপ্রথম ব্যবস্থাপক সভা বা পরিষদে প্রবেশ লাভ করেন, আইন সভার কার্য্যাদি সম্পর্কে তাঁহাদের বিশেষ কোন অভিজ্ঞতাও থাকে না। অনেক সময় দেখা যায়, কোন বিলের বিবেচনার্থ যে সমস্ত সিলেক্ট কমিটি গঠিত হয়, তাহাদের মধ্যে এরূপ নূতন সদস্য কম স্থান লাভ করেন না। ফলে, শাসনকার্য্য ব্যবস্থায় অদল-বদল সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলির যেভাবে সংস্কার হওয়া প্রয়োজন, অভিজ্ঞতার অভাবে তাহাও ঘটিয়া উঠে না।

আধুনিক যুগে গণতান্ত্রিক প্রথায় যেখানে আইনসভার কার্য্যাদি পরিচালিত হয়, উপরোক্ত বিবিধ সমস্যা অল্পবিস্তর সকল দেশেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশের ন্যায় যেই দেশে সাম্প্রদায়িক সমস্যা প্রবল নহে, সেই সমস্ত দেশেও বিবিধ বিলের আলোচনায় নানারূপ সমস্যার উদ্ভব হইতে দেখা যায়। যেস্থানে জনসাধারণের ও দেশের কল্যাণ সাধনই আইন সভার মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহাতে প্রত্যেকটি প্রস্তাবিত আইন যাহাতে সর্বদিক হইতে বিবেচিত হইতে পারে, তাহা লক্ষ্য করা প্রয়োজন হইয়া উঠে। প্রগতিশীল কোন কোন রাষ্ট্রে তাই জন-নেতাগণ আইন সভার কার্য্যে যাহাতে সর্ব্বাধিক সুফল লাভ হয়, তৎপ্রতি বিশেষভাবে মনোযোগী হইয়াছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ক্যানসাস্ ষ্টেটের ব্যবস্থাপকমণ্ডলীর কার্য্যের সৌকর্য্যার্থ বর্ত্তমানে যে অভিনব প্রণালী অনুসৃত হইতেছে, এ সম্পর্কে তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যাঁহার চেষ্টায় ও যত্নে এই রাষ্ট্রের আইনসভার কার্য্যপ্রণালীর বিবিধ ত্রুটীর প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি প্রথম আকৃষ্ট হয়, তিনি 'ক্যানসাস্ ষ্টেট চেম্বার অব কমার্সের' ম্যানেজার সাম উইলসন। ক্যানসাস্ আইন-সভায় পূর্ব্বে যেভাবে বিলের পর বিল পেশ হইত এবং কোনটি বা আইনে পরিণত করা হইত, তাহা তত সন্তোষজনক ছিল না। এক ঘরোয়া বৈঠকে তাই উইলসন ঘোষণা করিলেন, "কোন গাড়ী রাস্তার উপযোগী কিনা, তাহা বিচার না করিয়া নিত্য নূতন ধরণের এঞ্জিন-ফিট করা গাড়ী রাস্তায় বাহির করিবার মত বুদ্ধি দ্বারাই যদি অটোমোবাইল কোম্পানীগুলি পরিচালিত হইত, তবে রাস্তায় রাস্তায় শুধু ভাঙ্গা গাড়ী পড়িয়া থাকিতেই দেখা যাইত। আইনসভায় নির্ব্বিচারে বিলের পর বিল পাশ করিলে, তাহারও কতকগুলি এইভাবে অকেজোই থাকিয়া যায়, পরীক্ষিত ঘটনার উপর নির্ভর না করিয়া কোন কাজ করিতে গেলে হিতে বিপরীত ফলই ফলিয়া থাকে। বর্ত্তমানে যেভাবে আইনসভাসমূহে বিল পাশ করা হয়, তাহাও প্রায় এই ধরণের
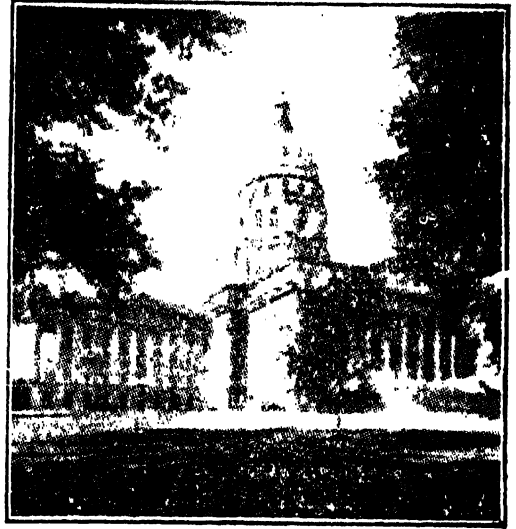
ক্যানসাস্ ষ্টেটে ক্যাপিটল বা ব্যবস্থাপক-সভার অধিবেশন গৃহ

—শুধু অনুমান আর দল বা ব্যক্তিবিশেষের খেয়াল বা অভিমতের উপর নির্ভর করিয়াই কাজ চলিতেছে, কোন বিষয়ে প্রকৃত তথ্যের উপর কোন গুরুত্বই আরোপ করা হইতেছে না! প্রস্তাবিত আইন আদৌ কার্য্যকরী হইবে কিনা কিম্বা কি ভাবে কাজ করিবে, আইনের আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কি না, তৎসম্পর্কেও সদস্যগণ নিঃসন্দেহ নহেন, অথচ আইন-সভার সদস্যগণ নির্ব্বিচারে আইন পাশ করিয়া যাইতেছেন, যেন আর কিছু দেখিবার বা করিবার নাই। ব্যুরো অব ষ্ট্যাণ্ডার্ডস্ (Bureau of Standards) এ যেরূপ ভাবে দ্রব্যাদির পরীক্ষা করিয়া লওয়া হয়, প্রস্তাবিত প্রত্যেকটি বিল আলোচনা করিবার পূর্ব্বে তৎসংক্রান্ত সমস্ত বিষয় বৈজ্ঞানিক উপায়ে তেমনিভাবে বিচার করিয়া দেখা, তাই বিশেষ প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে।"

উইলসনের এই অভিমত অনুযায়ী ক্যানসাসের প্রভাবশালী জন-নেতাগণ ১৯৩৩ সাল হইতে ক্যানসাস্ ষ্টেটে যে ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করেন, তাহাতে কোন বিষয়ে আইন প্রণয়নকার্য্যে আর অনুমানের উপর সদস্যগণকে নির্ভর করিতে হয় না। এই নূতন বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার সুফল দেখিয়া ইতিমধ্যেই মার্কিনের ইলিনয়েস, কেণ্টাকি, কনেক্টিকাট্, ভার্জ্জিনিয়া ও মিশিগান ষ্টেট অনুরূপ ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ওয়াশিংটন রাষ্ট্রেও এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা হইবে কি না, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা হইতেছে। শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত রাষ্ট্রসমূহেই নহে, মেক্সিকো, চিলি প্রভৃতি ল্যাটিন আমেরিকার রাষ্ট্রগুলিতেও আইন-সভার কার্য্যাদির সৌকর্য্যার্থে ক্যানসাস্ ষ্টেটের আদর্শে এই অভিনব ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন হইয়াছে।

ক্যানসাস্ ষ্টেটে যে নয়া ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন হইয়াছে, আসলে তাহা খুব কষ্ট-কল্পিত নহে। যাহাতে প্রত্যেকটি বিল আলোচনার পূর্ব্বে আইন-সভার নির্ব্বাচিত সদস্যগণ তৎসম্পর্কে সর্বদিক হইতে ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন, তজ্জন্য এস্থানে একটি কাউন্সিল রহিয়াছে। এই কাউন্সিলে নির্ব্বাচিত সদস্যদের যোগাযোগে একটি স্থায়ী বৈজ্ঞানিক পরিষদও কাজ করিয়া থাকে। নির্ব্বাচিত সদস্যগণ যেরূপ তাঁহাদের নির্ব্বাচন কেন্দ্রের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ বুঝিয়া কি ধরণের আইন করা প্রয়োজন, তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারেন; উপরোক্ত স্থায়ী বৈজ্ঞানিক পরিষদ সকল প্রকার রাজনীতিক প্রভাব-বিমুক্ত হইয়া শুধু অভিজ্ঞতা ও তথ্যের দিক হইতে বিচার করিয়া নির্ব্বাচিত সদস্যদের নির্দ্দেশিত অবস্থায় কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে পারে, তৎসম্পর্কে পরামর্শদাতার কাজ করিয়া থাকেন। শেষোক্ত বিশেষজ্ঞগণ ব্যতীত কাউন্সিল সাধারণত, সেনেটের দশ জন এবং নিম্নতন পরিষদ বা হাউসের পনর জন সদস্য এবং দুই পরিষদের স্পীকার দুই জন লইয়া গঠিত হয়। সেনেটে বা হাউসে বিভিন্ন রাজনীতিক দলের যে সংখ্যানুপাত থাকে, উপরোক্ত কাউন্সিলেও সেই অনুপাতেই নির্ব্বাচিত সদস্যগণকে লওয়া হইয়া থাকে। কাউন্সিলের পরামর্শদাতারূপে কাজ করিবার জন্য যে বিশেষজ্ঞগণকে নিযুক্ত করা হয়, তাহাও বিশেষভাবে দেখিয়া শুনিয়া লওয়া হইয়া থাকে। এইভাবে নির্ব্বাচিত সদস্যদের যোগাযোগে বিশেষজ্ঞগণকে লইয়া যে কাউন্সিল গঠিত হয়, তাঁহারা 'সেনেট' বা 'হাউস'কে কোন বিষয় বিবেচনা করিতে যে সমস্ত তথ্যের (facts) প্রয়োজন হয়, তাহাই সরবরাহ করিয়া থাকেন; সেনেট বা হাউসের কোন ক্ষমতা নিজেরা গ্রহণ করেন না। কোন আইনের প্রস্তাব আসিলে, তৎসম্পর্কে যতপ্রকার তথ্য থাকিতে পারে, উপরোক্ত কাউন্সিল সেনেট বা হাউসের নিকট তাহাই উত্থাপন করেন মাত্র। অতঃপর আইন পাশ করা বা না করা ব্যবস্থাপকগণের উপরেই অবশ্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া থাকে। তবে এই ব্যবস্থায় দেখা যায়, আজ ক্যানসাস্ ষ্টেটে সেনেট কিম্বা হাউস কর্ত্তৃক যে সমস্ত আইন পাশ হয়, তাহার কার্য্যকারিতায় বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

সাধারণত, বিভিন্ন দেশে ব্যবস্থাপক পরিষদ বা সভাসমূহের যেভাবে অধিবেশন হয়, তাহাতে এক অধিবেশনের পর হইতে অন্য অধিবেশন কাল পর্য্যন্ত বহু সময় অতিবাহিত হইয়া থাকে। এই সময়ে বহু রকমের সমস্যা দেশের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু অধিবেশন স্থগিত থাকে বলিয়া ইহার কোন সমাধান সম্ভবপর হয় না। তারপরে অধিবেশনকাল উপস্থিত হইলে তাড়াহুড়া করিয়া এমন সব বিল উপস্থিত করা হয়, কখনও বা তাহা আইনে পরিণত হয়, যাহার ভবিষ্যৎ ফল সকল সময় সন্তোষজনক বিবেচিত হয় না। নব নির্ব্বাচিত সদস্যদের অভিজ্ঞতার অভাবও কম অসুবিধার সৃষ্টি করে না এবং অনেকে আইন-সভায় এমন অনেক বিলের নোটিশ দিয়া বসেন, যাহা সাধারণ দৃষ্টিতেও একান্ত হাস্যকর বলিয়া প্রতিভাত হইবে।

ক্যানসাস্ ষ্টেটে উপরোক্ত কাউন্সিল বা পরামর্শ-পরিষদ গঠিত হইবার পর হইতে বহু অবান্তর বা অপ্রধান বিষয় পূর্ব্ব হইতেই বাদ দেওয়ার সুবিধা হয়। সম্বৎসরকাল ধরিয়া এই পরিষদের কাজ চলে বলিয়া উহারা সমস্ত বিষয় ধীর, স্থিরভাবে বিচার করিয়া যথাসময়ে শুধু প্রধান বিষয়গুলি সেনেট বা হাউসের গোচরে আনয়ন করিতে পারেন। কাউন্সিলের নির্ব্বাচিত সদস্যগণ শুধু নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন, তাহাদের কোন্ কোন্ বিষয়ে তথ্যের প্রয়োজন, বিশেষজ্ঞগণ তখন সে সম্পর্কে সমস্ত তথ্য যোগাড় ও বিশ্লেষণ করিয়া নির্ব্বাচিত সদস্যদের কাজের সুবিধা করিয়া দেন।

প্রতি তিন মাস অন্তর তিন-চার দিন ব্যাপিয়া কাউন্সিলের বৈঠক বসে। এই সময় রাষ্ট্রের গবর্ণর সেনেট বা নিম্নতন পরিষদের যে কোন সদস্য, এমন কি, যে কোন নাগরিক পর্য্যন্ত তাহাদের সম্মুখে রাষ্ট্র-সংক্রান্ত কোন বিষয়ে অভিমত জানাইতে পারেন। প্রত্যেকটি প্রস্তাব প্রথমত, বিষয়ভেদে ভারপ্রাপ্ত ছোট ছোট সাব-কমিটি কর্ত্তৃক বিবেচিত হয়। প্রস্তাবটির যথার্থ কোন মূল্য থাকিলে, তাহা উপরোক্ত কাউন্সিল বিশেষভাবে বিবেচনা করেন এবং ঐরূপ প্রস্তাব কার্য্যকরী হইবে কি না এবং তদনুযায়ী কোন আইন পাশ করা হইলে দেশের কোন দিক দিয়া কিরূপ লাভ বা ক্ষতি হইতে পারে, তাহা বৈজ্ঞানিক গবেষণার অনুরূপ নির্ণয় করিয়া সেনেটে বা হাউসের বিবেচনার নিমিত্ত প্রস্তুত করিয়া দিয়া থাকেন। এভাবে বাজে বা অপ্রধান বিষয়ে আলোচনার পথ বন্ধ হওয়াতে সেনেট বা হাউসের সদস্যগণ দেশের যাহাতে সত্যিকারের কল্যাণ সাধিত হইতে পারে সেইরূপ বিষয়েই অধিকতর মনোযোগ দিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। যে প্রস্তাব প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা আইনে পরিণত হইল যাহাতে সেই আইনের কার্য্যকারিতা রক্ষিত হইতে পারে, কাউন্সিলের মারফতে সেইভাবেই আইনটি ব্যবস্থাপকমণ্ডলীর নিকট বিবেচনার্থ আসে বলিয়া বাজে বিতর্কে অধিবেশনের সময়ও নষ্ট হইতে পারে না। ধরুন, কাউন্সিলের কোন এক বৈঠকে জনৈক কৃষক আসিয়া

জানাইলেন যে, কচুরীপানার দৌরাত্ম্যে চাষ-বাস অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে; ইহার প্রতিরোধে আইন করা প্রয়োজন। কাউন্সিলের স্থায়ী বিশেষজ্ঞ গবেষক মণ্ডলীকে তখনই এ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য বলা হইল। গবেষকগণ তখনই কচুরীপানা কি ভাবে বৃদ্ধি পায়, কি পরিমাণ জমি ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে, ইহা পরিষ্কার করিতেই বা কি কি প্রণালী অবলম্বন করা যাইতে পারে—কোন্ পদ্ধতিতে কিরূপ খরচ হইতে পারে, এ সমস্ত বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করিলেন। সমস্ত বিষয় অবগত হইবার পর আইন-সভার সদস্যগণ তখন অনায়াসেই বিচার করিয়া দেখিতে পারেন, কিরূপ আইনের বিধান প্রয়োজন। জনসাধারণকে তাহাদের ইচ্ছাধীন ব্যবস্থা করিতেই বলা হইবে কিম্বা বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা দ্বারা উহা পরিষ্কার করাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে, ব্যবস্থাপকমণ্ডলী তখন তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারেন। কাউন্সিলের মারফতে সমস্ত তথ্য জানিয়া তাহারা এইভাবে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যেই কোন বিষয়ে যথাবিহিত ব্যবস্থার বিধান করিতে পারেন।

বর্ত্তমানে বহু দেশে অনেক বিষয়ে শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বা অতিরিক্ত আয়ের আশায় ট্যাক্সের উপর ট্যাক্স বসান হয়। ক্যানসাস্ ষ্টেট উপরোক্ত ব্যবস্থার দ্বারা আইন-সভার সদস্যগণকে অনুমান ও অমূলক আশা-নিরাশার হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন। উপরোক্ত ষ্টেটে কিছু-ছিল। কোন ব্যক্তি বার বার তিনবার জঘন্য কোন অপরাধ করিলে তাহার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হইত। এই আইনের কার্যকারিতায় লোকের শীঘ্রই সন্দেহ উপস্থিত কাল পূর্ব্বে 'হ্যাবিচুয়াল ক্রিমিনাল এক্ট' নামে এক আইন হইল। সামান্য সামান্য কয়েকটি অপরাধ করিয়া কেহবা যাবজ্জীবন দণ্ডভোগ করিত, কিন্তু অনেকে বড় রকমের অপরাধ করিয়াও উহার হাত এড়াইয়া যাইত। সদস্যগণের নিজেদের এ বিষয়ে নানারূপ অভিমত থাকিলেও আসল তথ্য কাহারও জানা ছিল না। উপরোক্ত কাউন্সিল গঠিত হওয়ার পর ষ্টেটের জেলগুলিতে আবদ্ধ কয়েদীদের সম্পর্কে নানারূপ তথ্য সংগৃহীত হওয়ার পর দেখা গেল, যথার্থই আইনের আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে নাই। সুতরাং ঐ আইনের বিলোপ সাধন করা হইল।

আইন সভার কোন কোন সদস্যকে অনেক সময়ে নির্ব্বিচারে কোনও বিষয়ে অতিরিক্ত ট্যাক্স বসাইবার প্রস্তাব আনিতে দেখা যায়। কোনরূপ যুক্তিতর্ক দ্বারাও কখন কখন ইহাদের নিরস্ত করা সম্ভবপর হয় না। ক্যানসাস্ ষ্টেট্ আজ উপরোক্ত কাউন্সিল মারফতে উহাদের সজাগ করিতে পারিতেছেন, ফলে উদ্ভট বা অসঙ্গত বা সন্দেহজনক কোন বিল আনিয়া কেহ আইনসভার সময় নষ্ট করিতে পারেন না।

কাউন্সিলের সহযোগিতায় যেভাবে তথ্য সংগ্রহ ও অপ্রয়োজনীয় বিষয় বাদ দেওয়ার সুবিধা হইতেছে তাহাতে আইনসভার শুধু সময়ই বাঁচিতেছে না, পরন্তু বহু সিলেক্ট কমিটি নিয়োগ প্রভৃতি ব্যয়বাহুল্যও অনেক হ্রাস পাইয়াছে। অবান্তর বিষয় বাদ দেওয়ার সুবিধা হওয়াতে এক একটি অধিবেশনে সদস্যগণ দেশের বহু প্রয়োজনীয় সমস্যার প্রতি বিশেষভাবে মনোনিবেশ করিতেও পারিতেছেন। ক্যানসাস্ ষ্টেট ও মিসৌরী ষ্টেট পাশাপাশি রাষ্ট্র। উভয় রাষ্ট্রের আইনসভার সম্মুখে সমস্যাও প্রায় একরূপ। ক্যানসাস্ ষ্টেটে উপরোক্ত কাউন্সিল গঠিত হওয়ার পরে দেখা যায়, ১৯৩৭ সালে উভয় রাষ্ট্রের আইনসভার অধিবেশন এক সময়ে আরম্ভ হইলেও কাউন্সিল বহু প্রস্তাব সম্পর্কে পূর্ব্ব হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া রাখার ফলে ক্যানসাস্ পরিষদ মিসৌরী ষ্টেট আইনসভার প্রায় দুই মাসকাল পূর্ব্বেই তাহাদের অধিবেশনের পরিসমাপ্তি করিতে পারেন। কাউন্সিল বিভিন্ন প্রস্তাবিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য পূর্ব্বেই সদস্যদের গোচরীভূত করায় কোন বিষয়ে বিবেচনা করিতে তাঁহাদের অতি অল্প সময়ই ব্যয় করিতে হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কাউন্সিলের কোন আইন পাশ করা বা না করা সম্পর্কে কোন হাত নাই। তাহারা শুধু প্রস্তাবিত বিষয়ে আইনসভার নিকটে তৎসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য (facts) তুলিয়া ধরেন। ইহাতে অভিমত বা বিশেষ কোন মতামত বিজ্ঞাপিত হয় না বলিয়া রাজনীতিক দলাদলির কোন ইন্ধনও যোগায় না। আইনসভার সদস্যগণ প্রত্যেক বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য জানিয়া যাহাতে যথাবিহিত ব্যবস্থা করিতে পারেন, ইহা তাহারই প্রচেষ্টা মাত্র।

আইন সভার সদস্যবৃন্দকে সহায়তা করা ছাড়াও কাউন্সিলের বিশেষজ্ঞগণ কোনও প্রস্তাবিত বিল সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করেন, তাহার মূল্য জনসাধারণের নিকটও কম নহে! এই সমস্ত সংগৃহীত তথ্যের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম সংবাদপত্র ও নাগরিকগণকেও সরবরাহ করা হয়। সুতরাং সদস্যগণ আইনসভায় আলোচনা করিবার পূর্ব্বে সেই বিষয়ে তাহার নির্ব্বাচকমণ্ডলীর অভিমতও অনেকটা বুঝিতে পারেন। কোন বিষয়ে কোনরূপ কাণাঘুষা চুপচুপ্ ভাব নাই। জনসাধারণ ও আইনসভার সদস্য সকলেই সকল বিষয় জানিতে পারিতেছেন।

উপরোক্ত অভিনব ব্যবস্থায় ক্যানসাস্ ষ্টেটে আইনসভার কার্য্যে যে সুবিধা হইয়াছে তাহার মূলে অবশ্য কাউন্সিলের গবেষণা পরিষদের অধ্যক্ষের কার্য্যকুশলতা বিশেষভাবে বিদ্যমান। ফ্রেডারিক এইচ গিল্ড বর্ত্তমানে উক্ত কাউন্সিলের রিসার্চ্চ ডিরেক্টর। তিনি ক্যানসাস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। আইন সভার কার্য্যাবলী সম্পর্কেও তিনি বিগত ২৫ বৎসর যাবৎ বহু অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার কাজের সহায়তা করিবার জন্য বহু শিক্ষিত গবেষক নিযুক্ত করা হইয়াছে। কাউন্সিলের গবেষণা পরিষদের বার্ষিক ব্যয় বিশ হাজার ডলার হইবে। কিন্তু গবেষণা পরিষদ হইতে যে কাজ পাওয়া যায় তাহা বিবেচনা করিলে ইহা খুব বেশী বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। কারণ মার্কিন মুল্লুকের ছোটখাট অনেক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পর্য্যন্ত তাহাদের নিজেদের বাণিজ্যসম্ভার সম্পর্কে গবেষণার নিমিত্ত এরূপ অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় আইনসভার জন্য এরূপ কাউন্সিল অবশ্য এখন পর্য্যন্ত গঠিত হয় নাই। তবে দুই অধিবেশনের ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য সেখানেও বহু সমিতি রহিয়াছে। ক্যানসাস্ ষ্টেট যে পথ দেখাইয়াছে, তাহাতে ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রের নিমিত্ত অনুরূপ কেন্দ্রীয় পরিষদ গঠিত হওয়া বিচিত্র নহে। আর কিছু না হউক, ক্যানসাস্ পরিকল্পনা যে ভুল করিবার পথ অনেকটা রোধ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কোন বিষয়ে সঠিক তথ্য অবগত না হইয়া আইনের বিধান করিতে আজ ক্যানসাস ষ্টেটের ভোটার ও সদস্যবৃন্দের উভয়েরই অনিচ্ছা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। শুধু গুজবের দ্বারা পরিচালিত হইয়া বা কাহারও বক্তৃতাজালে মুগ্ধ হইয়া আইনের পরে আইন পাশ করার মধ্যে যে মারাত্মক দোষ দেখা যায়, ক্যানসাসের ব্যবস্থায় তাহা দূর হইয়াছে। ডিমোক্র্যাসীর সফলতায় ক্যানসাস্ ষ্টেট এই দিক দিয়া বিশেষর সম্মুখে এক নূতন পথের সন্ধান দিয়াছে। বিজ্ঞানের যুগে বিজ্ঞানের সহায়তা দ্বারাই আইনের বিধান হওয়া প্রয়োজন—ক্যানসাস্ ষ্টেটের এই ব্যবস্থা, তাই সভ্য জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

বর্ষ-শেষ

শশাঙ্ককুমার পাত্র

(১)

জনমের লগ্ন হতে জীবনের যাত্রাপথে
তীর্থযাত্রী চ'লেছি একাকী ;
আসিয়াছি বহুদূরে প্রত্যহের কুশাঙ্কুর
রক্তচিহ্ন পায়ে গেছে রাখি'।
পথশ্রমে ক্লান্ত দেহে আসিয়াছে অবসাদ,
জমেছে অনেক ক্ষতি, ঘটিয়াছে পরমাদ,
ল'য়ে সে ক্ষতির বোঝা কভু বাঁকা কভু সোজা
চলি পথে, আর কত বাকী !!

(২)

পাথের ফুরায়ে আসে, বুক ভরে হুতাশ্বাসে
ধূলোয় মলিন হ'ল বেশ ;
রবিকরে তৃষ্ণাতুর কণ্ঠে নাহি ফোটে সুর
ধূম্রজট মস্তকের কেশ।
পথে পথে নিশিদিন কত গ্রীষ্ম-বরষায়
জীর্ণ-শীর্ণ তনুদেহ লুটায়ে পড়িতে চায়,
কোন দিকে দৃষ্টি নাই, সম্মুখে চলিয়া যাই
কবে এই যাত্রা হ'বে শেষ !!

(৩)

বসন্ত বিদায়-গানে কহিছে করুণ তানে :
বর্ষশেষ, সময় যে নাই।
অন্ধকার দশদিশি বরষের শেষ নিশি
ফুকারিছে : যাই তবে যাই।
তোর যাত্রা হ'ল শেষ, ওরে বর্ষ পুরাতন
মোর তীর্থযাত্রা বলো কোন্‌খানে সমাপন ?
পায়ে-চলা পথ কবে, কোথায় সমাপ্ত হ'বে ?
সেই কথা শুনিবারে চাই !!

(৪)

পুরাতন বর্ষ কহে : "শেষ সে তো শেষ নহে,
এ জগত অশেষের ধন ;
মৃত্যু নবজন্ম আনে বাজে বিদায়ের গানে
নূতনের শুভ উদ্বোধন।
হয়তো সেখানে সুরু, সমাপ্তি কহিছ যারে,
"বর্ষশেষ" এই কথা শুনিয়েছি বারে বারে,
প্রাচীনের শেষ হয় নবীনের অভ্যুদয়,
এই বাণী আছে চিরন্তন।

(৫)

দৃষ্টি নাহি চলে যেথা সৃষ্টিকার্য্য হয় সেথা,
মরণের ঘন অন্ধকারে ;
বিরতির আড়ে হয় হৃতশক্তি পুনর্জয়
শেষ তুমি কহিছ কাহারে ?"
কি আর বলিব তবে, সমাপ্তি নাহিক চাই,
এই যাত্রা চিরযাত্রা হয় যদি হোক্ তাই,
শুধু কর আশীর্ব্বাদ, ঘুচে যা'ক্ অবসাদ,
সর্ব্বদুঃখ পারি সহিবারে !

(৬)

প্রাত্যহিক হীনতার ক্ষুদ্র স্বার্থ-দীনতার
লোভ যেন মনে নাহি জাগে ;
যৎটুকু পথ চলি শ্রেয় কর্ম্মে নাহি টলি,
ব্যবহারে কাহারো না লাগে।
আপনার পরাজয়-বিজয়ের কথা তুলে'
বৃহৎ জগৎ হ'তে দূরে নাহি থাকি ভুলে,
কাল-হস্তে মানবক আমি তুচ্ছ ক্রীড়নক,
এই বাক্য রাখি পুরোভাগে॥

নানসেন

গ্রীনল্যাণ্ড থেকে নানসেন ফিরে এলেন নরওয়েতে। একুত্রিশে তিনি পা দিয়েছেন। গ্রীনল্যাণ্ডের অভিজ্ঞতা এস্কিমোদের প্রতি তাঁর অন্তরে জাগিয়েছে অসীম বেদনা। হায়রে দুর্ভাগা জাত! খৃষ্টান পাদ্রী সাহেবের দল আর, পাশ্চাত্য সভ্যতার বিষাক্ত আবহাওয়া মেরুচারী এস্কিমোদের স্বাধীন, সরল জীবনে এনেছে দারুণ অভিশাপ। তাদের জীবনীশক্তির ঘটছে অপচয়—তাদের নৈতিক জীবনে লাগছে দুর্নীতির কালিমা। এস্কিমোদের দুর্দ্দশা দেখে নানসেনের প্রাণ হু হু ক'রে কেঁদে উঠলো। পাদ্রীসাহেবেরা নিজেদের ধর্ম্মবিশ্বাস এবং আচার-ব্যবহারকে এস্কিমোদের উপরে জোর ক'রে চাপাতে গিয়ে কি সর্ব্বনাশ যে ডেকে এনেছে তাদের জীবনে—নানসেন তা স্পষ্ট দেখতে পেলেন আর সে দৃশ্য দেখে ধর্ম্মধ্বজী মিশনারী সাহেবদের উপরে গেলেন তিনি হাড়ে চটে। এস্কিমোদের দেশ থেকে ফিরে এসে নানসেন বিয়ে করলেন ইভা সারসকে। নানসেনের রক্তে যেমন পথের নেশা, ইভারও তাই। বসন্তকাল এলে ইভা স্বামীর সংগে বেরুতেন সাঁতার দিতে আর বনে বনে শীকার করতে।

বিয়ের পর নানসেন বাড়ী তৈরী করলেন। বাড়ীর প্ল্যান করলেন তিনি নিজেই—আসবাব-পত্রও বানালেন সব নিজের হাতে। নীড়-বাঁধার জায়গাটি কি চমৎকার! সবুজ বনানী আর শ্যামল প্রান্তর চোখ জুড়িয়ে দেয়। বাড়ীতে প্রিয়তমা পত্নী আর আদরিণী শিশু-কন্যা। মানুষ পৃথিবীতে সুখী হবার জন্য যা কিছু চায়—নানসেনের জীবনে তার কিছু অভাব নেই! স্বাস্থ্য, যৌবন, সম্পদ, খ্যাতি, তরুণী প্রেয়সী, প্রিয়তমা কন্যা, মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে ছবির মতো গৃহখানি! নানসেনের মনে তবুও তৃপ্তি নাই। নীলাভ দিগন্ত হাতছানি দিয়ে ডাকে! সেই ডাক গার্হস্থ্য জীবনের আনন্দের মধ্যে নানসেনকে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক ক'রে দেয়। ঘর আর ভালো লাগে না। অজানার জন্য প্রাণের মধ্যে জাগে কান্না। কোথায় নেই! স্বাস্থ্য, যৌবন, সম্পদ, খ্যাতি, তরুণী প্রেয়সী, প্রিয়তমা জন্য নানসেনের রক্তে জাগে নেশা! নানসেন দিন-রাত্রি কেবল স্বপ্ন দেখে—উত্তরমেরুর স্বপ্ন। ঘুমের মধ্যে দেখা দেয় মেরু-প্রদেশ তার পেংগুইন পাখী, শীল আর সাদা ভালুক নিয়ে। জাগরণের মাঝেও প্রাণের তারে বাজতে থাকে বারম্বার "But I must go to the North Pole."

নানসেনের মধ্যে যে মানুষটি ছিলো নাবিক আর শিকারী, আবিষ্কারক আর পদানত এস্কিমোদের বন্ধু—দিগন্তের দুর্ব্বার আহ্বান তাকে ক্রমাগত ডাকতে লাগলো সামনের দিকে। ঘরে থাকা শেষে সত্যি সত্যিই দায় হ'য়ে উঠলো। সাগরে পাড়ি দেবার সব আয়োজন শেষে সম্পূর্ণ হোলো। গবর্ণমেণ্ট নিজের খরচে নানসেনের জন্য জাহাজ বানিয়ে দিলো। জাহাজের পরিকল্পনা নানসেনের সম্পূর্ণ নিজের। জাহাজের নামকরণ করলেন তিনিই। নাম দিলেন Fram অর্থাৎ সামনে চল।

অবশেষে যাত্রার দিন উপস্থিত হোলো। স্ত্রী-কন্যাকে পিছনে রেখে নানসেন জাহাজে গিয়ে উঠলেন। সাগরের উপর দিয়ে জাহাজ ভেসে চললো মেরুপ্রদেশের অভিমুখে। উপকূল আর জাহাজের মধ্যে ব্যবধান ক্ষণে ক্ষণে বেড়ে চলেছে। নানসেন জাহাজের পাটাতনের উপরে দাঁড়িয়ে। চোখে দূরবীন যন্ত্র। ঐ দেখা যায় পাইন আর দেবদারু বনের মধ্যে পরিচিত গৃহখানি। পিছনে অরণ্যে ঢাকা গিরিশ্রেণীকে লাগছে মসীরেখার মতো। ক্ষুদ্র প্রান্তরটী রৌদ্রালোকে হাসছে। দেবদারু গাছটীর তলায় বেঞ্চির পাশে গরমকালের পরিচ্ছদ প'রে দাঁড়িয়ে আছে ইভা। কতদিন পরে ইভার সংগে দেখা হবে কে জানে? শূন্যগৃহে বিচ্ছেদের দুঃসহ বেদনার মধ্যে বিরহিণীকে কাটাতে হবে দিনের পর দিন। নানসেনের চোখদুটী জলে ভ'রে এলো। হৃৎপিণ্ড কে যেন মুঠোর মধ্যে চেপে ধরেছে!

বিয়ের পরে দুটো বছর যেতে না যেতে এলো পথের ডাক। কিসের জন্য অজানার বুকে ঝাঁপ দেবার এই উন্মাদনা? টাকার জন্য? খ্যাতির জন্য? দুটো জিনিষই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে। ওতে আর নানসেনের প্রয়োজন নেই। কোনো মতবাদকে প্রতিপন্ন করবার জন্য? না, তার জন্যও নয়। তবে কিসের জন্য? বিপদের সংগে লড়াই করবার, বাধার পর বাধাকে পেরিয়ে যাবার, মৃত্যুর সংগে খেলায় মাতবার যে আনন্দ—বীরের সেই আনন্দকে শিরায় শিরায় অনুভব করতে। কূলে নোঙর ফেলে বন্দরের নিরাপদ জীবন যাপনের মধ্যে আছে শুধু ক্লান্তি। সুখ পথে চলার মধ্যে, বিঘ্নের পর বিঘ্নকে অতিক্রম করবার মধ্যে।

> "কোন দিকে যে বাইবো তরী
> বিরাট কালো নীরে—
> মরবো না আর ব্যর্থ আশায়
> সোনার বালুর তীরে"-

এই ব'লে যুগে যুগে কলম্বাস আর নানসেনের দল নোঙর তুলে দিয়েছে অকূল সাগরে পাড়ি আর তাদের মৃত্যু নিয়ে খেলা করবার পৌরুষকে আশ্রয় ক'রে মানবসভ্যতার ঘটেছে নব নব উন্মেষ।

জাহাজে জাহাজে কাটলো নয় মাস। নূতন বছর আরম্ভ হবার প্রাক্কালে নানসেন তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন,—

"দীর্ঘ বছর কেটে গেলো। সুখও পেয়েছি প্রচুর, দুঃখও পেয়েছি প্রচুর। আনন্দের পালা সুরু হ'লো আমার কন্যা লিভের জন্মকে আশ্রয় ক'রে। সে যখন পৃথিবীতে এলো—কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দকে অনুভব করলাম মর্ম্মের মধ্যে! তারপর এলো বিদায় নেবার পালা। লিভকে যখন ছেড়ে আসতে হোলো—সে কি অবর্ণনীয় বেদনার মুহূর্ত্ত! জীবনে এমন দুঃখ আর কখনো পাইনি। তারপর থেকে দিবারাত্রিকে পূর্ণ ক'রে রেখেছে গৃহে ফিরে যাবার দুর্ব্বার কামনা।"

তিন দিন পরে তিনি লিখলেন,

"আর আমি আছি কেমন? হাঁ, আমার মনেও আনন্দ আছে। সহজ ছন্দে চলেছে জীবনের প্রবাহ। মনের উপরে চেপে নেই কোনো দুর্ব্বহ বোঝা। চিঠি নেই, সংবাদপত্র নেই—এমন-কিছু নেই যা চিত্তকে করে বিচলিত। ছেলে বয়সে আমি কল্পনার চোখে দেখতাম

আমার ভাবী জীবনের ছবি। একটা সৃষ্টি-ছাড়া জগতে আমার সেই কোলাহলশূন্যে জীবনের দিনগুলি অতি-বাহিত হচ্ছে কেবল জ্ঞানের মধু আহরণে। আমার এখনকার জীবনের সঙ্গে ছেলেবেলার স্বপ্নের সেই তপস্বীর জীবনের একটা সাদৃশ্য আছে। বিচ্ছেদের গভীর বেদনার মধ্যেও একটা আনন্দ আছে। আমরা মনের মধ্যে যে আদর্শ পোষণ করি—বাস্তবজীবনে সে আদর্শকে অনুসরণ করবার সৌভাগ্য হয় কতজনের? ভাগ্য যখন প্রসন্ন হ'য়ে মানুষকে সুযোগ দেয় তার আদর্শকে অনুসরণ করবার—তখন মনের মধ্যে কোনো ক্ষোভ পোষণ করা তার পক্ষে আদৌ উচিত হয় না।"

১৮৯৪ সালের ২৬শে মার্চ্চ নানসেন লিখলেন,

"দেখা যাক—স্রোতের টানে কোথায় গিয়ে পৌঁছাই। যদি পথেরই ভুল হয় তবে পিছনে ফিরে যাবার সমস্ত সম্ভাবনাকে বিলুপ্ত ক'রে আমি তুষারের উপর দিয়ে যাত্রা করবো উত্তর দিকে। এ ছাড়া আমার কাছে আর কিছু করণীয় নেই। পথ যে অতি দুর্গম—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে নাও পারি। কিন্তু আমার সামনে দ্বিতীয় কোনো পথ কি খোলা আছে?

একটা সংকল্পকে কার্য্যে পরিণত করবার ব্রত নিয়ে যে মানুষ বিপদ দেখে ভয় পেয়ে সেই ব্রতকে পরিত্যাগ করে—সে মানুষ নামের অযোগ্য। একটা পথই আমার সামনে খোলা আছে আর সে পথ হ'চ্ছে—সামনে চল—Forward."

ঐ বছরেরই অক্টোবরে তিনি ডায়েরীতে লিখলেন,

"মাঝে মাঝে গৃহে ফেরার জন্য আসে একটা ব্যাকুলতা—আগেকার সেই উদ্দাম ব্যাকুলতা। বিচ্ছেদের বেদনায় জীবন যেন শতখণ্ডে টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে ভেঙে যায়। দিন যেন আর কাটতে চায় না। ধৈর্য্য শেখাবার এমন ইস্কুল আর পাবো কোথায়? অবসর সময়ে ব'সে ব'সে শুধু ভাবি—বাড়ীতে ওরা দু'জনে বেঁচে আছে না ম'রে গেছে। ভাবতে ভাবতে মনে হয়—বুঝি পাগল হয়ে গেলাম।"

জাহাজের কেবিনে নানসেনের কাটে নিঃসঙ্গ জীবন। চারিদিকে মেরুপ্রদেশের সমুদ্র। সূর্য্যালোকের নামগন্ধ নেই। দিনের পর দিন চলে যায় তবু আলোর দেখা পাওয়া যায় না—যেন চির-অন্ধকারময় প্রেতরাজ্য। সামনে বরফে ঢাকা অজানা দেশ—পশ্চাতে—বহু পশ্চাতে রৌদ্রালোকিত অরণ্যের পটভূমিতে জেগে রয়েছে ছবির মতো গৃহখানি। সেই গৃহের গৃহিণী গৃহস্বামীর আসার পথ চেয়ে বিরহ-যাতনার মধ্যে কাটায় দিনের পর দিন একমাত্র কন্যাটিকে বুকে নিয়ে। নানসেনের কিছুই ভালো লাগে না! অনেক সময় তুচ্ছ কারণে নাবিকদের উপরে যান রেগে। একটা মদের বোতল-হারানোর মতো সামান্য ব্যাপার নিয়ে কখনো কখনো বিষম কাণ্ড ক'রে বসেন—জাহাজের সমস্ত নাবিকদের মাথার উপরে অকস্মাৎ ভেঙে পড়ে নানসেনের ক্রোধের ঝটিকা! পরে অনুতাপ করেন যথেষ্ট। জাহাজ থেকে নানসেন যেদিন চিরতরে বিদায় নিলেন সেদিন আপনার পুরানো দিনের দুর্ব্যবহারের কথা স্মরণ ক'রে নানসেন নাবিকদের কাছে ক্ষমা-প্রার্থনা করতে ভুলে যান নি।

দ্বিতীয় বছরের শীতকালে নানসেন আর সবাইকে জাহাজে রেখে জোহানসেনকে সাথী ক'রে চিরতুষারের উপর দিয়ে উত্তরমেরুর অভিমুখে চলবার জন্য সংকল্প করলেন। এই যাত্রার মধ্যে সাহসের পরিচয় থাকলেও গোঁয়ার্ত্তুমির কোনো ঠাঁই ছিলো না। জাহাজ থেকে নেমে গিয়ে কিছুদূরে নানসেন তাঁর তাঁবু গাড়লেন। সেই তাঁবুতে তিনি এক পক্ষকাল বাস করলেন—তাঁর সাজসরঞ্জামগুলিকে পরীক্ষা করবার জন্য। এই পরীক্ষার ফলে নানসেন বুঝতে পারলেন নিজের এবং সঙ্গীর জন্য কি পরিমাণ আহার্য্যের প্রয়োজন হবে পথে। তাঁবু থেকে জাহাজে তাঁরা ফিরে এলেন। পোষাক বানালেন নেকড়ে বাঘের চামড়া দিয়ে আর ঘুমানোর বড় থলির জন্য ব্যবহার করলেন মৃগচর্ম্ম। তারপর পোষাক-আহার্য্য ইত্যাদির ব্যবস্থা ক'রে তাঁরা যাত্রা করলেন উত্তর মেরুর দিকে। দু'জন মানুষে—সঙ্গে কুকুর, স্লেজ আর বন্দুক। বরফের উপর দিয়ে চলেছেন দু'জন। জন-মানবের সাড়াশব্দ নেই কোনো দিকে। সেই অনন্ত তুষারের চিরমৌন রাজ্যে ইতিপূর্ব্বে আর কোন মানুষ পদার্পণ করেনি। কবরের ভিতরটা যেমন নিস্তব্ধ—চারিদিক তেমনি নিস্তব্ধ। কি কন্‌কনে ঠাণ্ডা—তার উপরে তুষারের ঝড়! অজানা জানোয়ারের হস্তে মরবার যথেষ্ট সম্ভাবনা! কুকুর-টানা গাড়ীতে চড়ে তুষার-রাজ্যের উপর দিয়ে এই যে অভিযান—এই অভিযানের কাহিনী লিপি-বদ্ধ করতে গিয়ে নানসেন তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন

"আমাদের গায়ের পোষাকগুলি এখন পরিণত হয়েছে বরফের বর্ম্মে। গা থেকে খুলে রাখলে তারা নিজে থেকেই খাড়া হয়ে থাকতে পারতো—এত শক্ত আর কঠিন হয়ে গেছে আমাদের পরিচ্ছদ। আমরা একটু নড়া-চড়া করলেই আমাদের পোষাকগুলি শব্দ করে। গায়ের জামা এত কঠিন হ'য়ে গেছে যে আস্তীনের সঙ্গে চামড়ার ঘাস লাগতে লাগতে কব্জির কাছটায় রীতিমতো ঘা হয়ে গেছে। সন্ধ্যাবেলায় আমরা যখন ঘুমানোর থলির মধ্যে ঢুকে যেতাম—আমাদের বরফের বর্ম্ম তখন ধীরে ধীরে গলতে আরম্ভ করতো। ফলে শরীরের গরমটুকুর অধিকাংশই যেতো ফুরিয়ে। ব্যাগের মধ্যে এমন ক'রে নিজেদের বন্দী করতাম যে, মৃগচর্ম্ম আর শরীরের মধ্যে কোনো ফাঁক থাকতো না। তবুও সে কি শীত! এক ঘণ্টা থেকে দেড় ঘণ্টা পর্য্যন্ত হিঃ হিঃ ক'রে কাঁপতাম। তারপর শরীর একটু গরম হোতো। বরফ গ'লে অবশেষে জামা ভিজে যেতো—পরিচ্ছদের মধ্যে সে কাঠিন্য থাকতো না। সকালে ব্যাগের মধ্য থেকে যেই বেরিয়ে আসতাম বাহিরে অমনি কয়েক মিনিটের মধ্যে জামা হ'য়ে যেতো বরফের সুকঠিন বর্ম্ম। যতদিন শীত ছিলো ততদিন পোষাক-পরিচ্ছদ থাকতো সব সময়ের জন্য ভিজে। সে পরিচ্ছদ শুকানোর কোনোই উপায় ছিলো না।

রান্না চাপিয়ে ব্যাগের মধ্যে এসে ঢুকতাম আর শুয়ে শুয়ে কাঁপতাম! সে কি কাঁপুনি! আমি ছিলাম পাচক। সুতরাং উঠে উঠে রান্নার এটা-ওটা দেখতে হোতো। অবশেষে খাবার হোতো তৈরী! ভাগ ক'রে নিয়ে খেতে বসতাম! খেতে লাগতো অমৃতের মতো সুস্বাদু। এই খাবার সময়টাই ছিলো আমাদের পথিক-জীবনে সবচেয়ে মধুময়। সারাদিন প্রতীক্ষা ক'রে থাকতাম রাত্রের এই ভোজনের সময়টীর জন্য! কিন্তু মাঝে মাঝে ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়তাম। রান্না উনুনে চাপানোই থাকতো—মুখের মধ্যে এসে আর পৌঁছাতো না।"

পুরো একটী বছর ধ'রে এই দুইজন মানুষ এই তুষারের রাজ্যে যাপন করলেন রবিনসন ক্রুসোর নিঃসঙ্গ জীবন। আরও বেশী দিন থাকবার ইচ্ছা ছিলো তাঁদের—কিন্তু বরফ ঠেলে ঠেলে যাওয়া তাঁদের পক্ষে এমনই দুঃসাধ্য হ'য়ে দাঁড়ালো যে ফেরা ছাড়া আর কোনো উপায় রইলো না। খাবার অবশেষে ফুরিয়ে গেলো একদিন। মৃগয়ালব্ধ খাদ্য ছাড়া ক্ষুন্নিবৃত্তির আর কোনো উপায় রইলো না তখন। কিন্তু কুকুরগুলির জন্য খাবারের কি ব্যবস্থা করা যায়? তাদের খাবারও নিঃশেষ। দুঃখ আর তাদের দেখা যায় না। খিদের জ্বালায় কুকুরগুলো লাগামের দড়ি খায়! কুকুরগুলোকে মেরে ফেলাই অবশেষে ঠিক হোলো। কিন্তু ভালুক মারায় আর কুকুর মারায় তফাৎ অনেকখানি। ভালুক মারতে হাত কাঁপেনা—কিন্তু কুকুর মারতে যে বন্দুক ওঠে না! এরা চতুষ্পদ হ'লেও মানুষের মতোই যে দুঃখ-সুখের বন্ধু! নানসেন আর তাঁর বন্ধু এই চতুষ্পদ সঙ্গীদের জীবন নেবেন কেমন ক'রে? কিন্তু উপায় তো নেই। একটীর পর একটী ক'রে কুকুর মৃত্যুর অন্ধকারে বিলীন হ'তে লাগলো। তারপর এলো নানসেনের নিজের কুকুর Koikএর মরবার পালা। নরওয়ে থেকে এই একটী কুকুরই সঙ্গে এসেছিল। কুকুরটী নানসেনের বাড়ীর কুকুর। সকলেরই প্রিয় ছিলো সে। ঘটনাকে নানাসেনের কাছ থেকে যথাসম্ভব আড়ালে রাখবার জন্য জোহানসেন কয়েককে দূরে নিয়ে গিয়ে রাত্রির অন্ধকারে বর্শা দিয়ে তাকে মেরে ফেললেন। সে রাত্রে নানসেনকে মনে হয়েছিলো আর এক মানুষ।

তুষারের বুকে জীবনযাত্রার কাহিনীর উল্লেখ ক'রে জোহানসেন লিখেছেন,

"আমাদের গায়ের জামায় এত ময়লা যে জামা চামড়ার সঙ্গে লেগে থাকে। আমাদের চুল আর দাড়ি বুনোমানুষের মতো। আমাদের হাত আর মুখ কালো হ'য়ে গেছে। আমরা অসভ্য ব'নে গেছি। গা-ভরা ময়লা অথচ হাত-খানা ভালো ক'রে পরিষ্কার করবার মতো নেই কিছু। ময়লা জ'মে জ'মে নানসেনের উরুতে ঘা হ'য়ে গেছে। মাঝে মাঝে সে কাপের বরফ-গলা জলে ব্যাণ্ডেজের কাপড় দিয়ে নিজেকে পরিষ্কার করে।"

অবশেষে পথিক একদিন ঘরে ফিরে এলেন। এই দিনটীর জন্য ইভা পর পর তিনটী বছর প্রতীক্ষা করেছেন। এখন রেডিওর সাহায্যে জাহাজ থেকে বাড়ীতে খবর পাঠানো সহজ। তখনকার দিনে রেডিয়ো ছিলোনা। সুতরাং ইভার পক্ষে স্বামীর সংবাদ পাওয়া ছিলো অসম্ভব। ইভাকে কিছু না বললেও সবাই বিশ্বাস করতো—নানসেন অনাহারে অথবা জাহাজ-ডুবি হ'য়ে মারা গেছে। কেবল ইভার মনের আকাশে ধ্রুবতারার মতো জ্বলতো—স্বামী বেঁচে আছেন এবং একদিন ফিরে আসবেন—এই জ্বলন্ত বিশ্বাস। অবশেষে পত্নীর ধারণাই সত্য হ'য়ে দেখা দিলো। বহুদিন পরে নানসেন অবশেষে আপন গৃহে পদার্পণ করলেন। দেখলেন গৃহিণী সামনে দাঁড়িয়ে আছে—চোখে নিয়ে আনন্দের অশ্রু—পাশে তার নানসেনের চার বছরের কন্যাটী। নানসেনের বয়স এখন চল্লিশ।

মেরুপ্রদেশ থেকে প্রত্যাগমনের পর নানসেনের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো দিক থেকে দিগন্তরে। প্রবন্ধ পড়বার জন্য শত শত সভা থেকে তাঁর কাছে নিমন্ত্রণ আসতে লাগলো। অধ্যাপনায়, লেখায় এবং অন্যান্য কাজকর্ম্মে নানসেন দিন কাটাতে লাগলেন। ইতিমধ্যে একদিন এ্যাণ্টন এমাণ্ডসেন এসে হাজির। Amundsen তাঁর স্বদেশবাসী এবং মেরুযাত্রায় ছিলেন তাঁর সহযাত্রী। এমাণ্ডসেন দক্ষিণ-মেরু আবিষ্কারে যাবেন।—তাই নানসেনের কাছে জাহাজ চাইতে এসেছেন। শেষপর্য্যন্ত দক্ষিণ-মেরু আবিষ্কারের গৌরব নেবে এমাণ্ডসেন আর নানসেন গৃহে যাপন করবে গৃহস্থের শান্ত জীবন? তার যৌবন কি ফুরিয়ে গেছে? এমন কি সুখ আছে পারিবারিক জীবনের গণ্ডীর মাঝে যা নানসেনকে বেঁধে রেখে দিতে পারে? না, নানসেন আবার চলে যাবে মেরুপ্রদেশের সেই বরফরাজ্যে। সেখানে তুষার আর সাদা ভালুকদের মধ্যে যাযাবরের সেই মুক্ত জীবনের আনন্দ! সে আনন্দকে যে মানুষ একবার আস্বাদন ক'রেছে—তার কাছে গৃহের সুখ তুচ্ছ। নানসেন ফিরিয়ে দিলেন এমাণ্ডসেনকে।

আট মাস পরে আবার এমাণ্ডসেনের আগমন। নানসেনের মনে তখনও অভিসারের স্বপ্ন। তাই এমাণ্ডসেনকে অপেক্ষা করতে বলে তিনি স্ত্রীর সঙ্গে গেলেন দেখা করতে। দেখা হ'তেই স্ত্রী বললেন, 'আমি জানি, কেন এসেছো তুমি! আমাকে তুমি আবার ছেড়ে যাবে!' এই কথা শুনে নানসেন ফিরে গেলেন এমাণ্ডসেনের কাছে এবং তাঁকে জাহাজ দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। এমাণ্ডসেন চলে গেলেন অজানার অভিসারে। নানসেন র'য়ে গেলেন ঘরে।

নানসেনের মতো যারা যুগে যুগে বাহির হোলো অজানার সন্ধানে—তারাই মানুষের সভ্যতার ইমারতকে গড়ে তুললো চোখের জল আর বুকের রক্ত দিয়ে। তারা সুখের জন্য মাথা ঘামায় নি একটুকুও। পিছনপানেও তাকায়নি তারা। সুখের মধ্যে আছে কি?............সুখ দুদিনে বাসি হ'য়ে যায়! জানা থেকে অজানার পানে নিত্যনূতন অভিসার—এই অভিসারের মধ্যেই আনন্দ। এই অভিসারের মধ্যে দুঃখ আছে, আঘাত আছে, তবুও এই দুঃখ-আঘাতই জীবনে বৈচিত্র আনে। দুঃখ-আঘাত জীবনে শত্রু নয়। শত্রু হ'চ্ছে মনের সেই অবস্থা যেখানে দুঃখেরও অনুভূতি নেই—সুখেরও অনুভূতি নেই—আছে কেবল একটা জড়ত্ব।

'নব বার্ষিকী' সম্পর্কে বিতর্ক

শ্রীসজনীকান্ত দাস

['নববার্ষিকী' লইয়া যে বাদ-প্রতিবাদ চলিতেছিল, তৎ-সম্বন্ধে শ্রীযুত সজনীকান্ত দাসের উত্তর এবং মূল লেখক বনবিহারী গুপ্তের বক্তব্য প্রকাশিত হইল। এ সম্বন্ধে আর বাদ-প্রতিবাদ হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। আমাদের মতে ঐতিহাসিক বিষয়ের আলোচনায় কোনরূপ ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ উত্থাপন করা বা অপ্রিয়ভাষা ব্যবহার করা উচিত নহে। সুতরাং, বর্ত্তমান বাদ-প্রতিবাদে যে সব ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে বা অপ্রিয়ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা সকলেরই ভুলিয়া যাওয়া উচিত। এই ব্যাপারে আমাদের পূর্ব্বে প্রকাশিত সম্পাদকীয় মন্তব্যে কাহারও মনে যদি আঘাত লাগিয়া থাকে, সেজন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত] —দেশ—সম্পাদক।

গত ১৩ ফাল্গুন তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত বনবিহারী গুপ্ত মহাশয়ের "একখানি পুরাতন পুস্তক" প্রবন্ধ, তাহার আলোচনায় ২৭ ফাল্গুন তারিখে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "চিকিৎসকের চিকিৎসা" এবং তৎসম্পর্কে বনবিহারী গুপ্ত মহাশয়ের "প্রত্যুত্তর" এবং সম্পাদকীয় ভদ্রতাবোধের অসামান্য নিদর্শনসম্বলিত মন্তব্য আমি দেখিয়াছি। এই আলোচনায় পরোক্ষভাবে আমার নামও জড়িত হইয়াছে বলিয়া আমি আমার বক্তব্যও লিখিতে বাধ্য হইতেছি। আমি সম্পাদকীয় সুমহৎ ভদ্রতা ও রুচিজ্ঞানকে যথাসাধ্য লঙ্ঘন না করিবার চেষ্টা করিব।

কিন্তু সেই প্রসঙ্গে গোড়াতেই একটা কথা বলিতে চাই। ভদ্রতা-অভদ্রতা বিচারে সম্পাদকীয় মন্তব্যে কিঞ্চিৎ একদেশদর্শিতা লক্ষিত হইল। ব্রজেন্দ্রবাবুর যে দুইটি বাক্যে বনবিহারীবাবু উত্তেজিত হইয়া সুধী পাঠকের নিকট সুবিচার চাহিয়াছেন, তাহা এই—"চিকিৎসকের চিকিৎসা" এবং "ঐতিহাসিক গবেষণা-কণ্ডূয়ন নিবৃত্তির পরিচয়।" এই দুইটি উক্তির জন্যই সম্পাদকীয় মন্তব্যে ব্রজেন্দ্রবাবুকে "অবাধ অসংযত ভাষা" প্রয়োগের দোষ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সেই সংখ্যাতেই গুপ্ত মহাশয়ের "আহা! বেচারী ব্রজেন্দ্র!" জাতীয় মন্তব্য অতিশয় ভদ্র ও রুচিসম্মত বিবেচিত হইয়াছে।

যাক, মূল প্রসঙ্গ সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য তাহা বলিতেছি। ব্রজেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, যে-'নব-বার্ষিকী'র নজির দেখাইয়া বনবিহারীবাবু কোলাহলের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই 'নববার্ষিকী'র প্রকাশকাল সম্বন্ধেই তাঁহার সঠিক ধারণা নাই। এই কারণেই তিনি "চিকিৎসকের চিকিৎসা" এই শিরোনামা ব্যবহার করিয়াছেন। বনবিহারীবাবু লিখিয়াছিলেন, "তিনি (দ্বারকানাথ) সর্ব্বপ্রথম......বিলাতী ইয়ারবুকের অনুসরণে 'নববার্ষিকী' নামে একটি ইয়ারবুক ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে কয়েক বৎসর প্রকাশ করেন।"

ব্রজেন্দ্রবাবু বলেন, ১৮৭৬-৭৭ খৃষ্টাব্দের (১২৮৩ বঙ্গাব্দের) 'নবার্ষিকী' তিনি দেখিয়াছেন। ইহার উত্তরে দীর্ঘ দেড় কলম যুক্তি প্রয়োগ করিয়া বনবিহারী গুপ্ত মহাশয় বলিতেছেন, "১৮৭৮-এর পূর্ব্বে 'নববার্ষিকী' বাহির হইতে পারে না। এইরূপে আভ্যন্তরিক রচনা হইতেই প্রমাণিত হইবে যে, পুস্তকখানি ১৮৭৮ অব্দের পূর্ব্বে কিছুতেই প্রকাশিত হইতে পারে না। আমার ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ গণনা করিবার একটু কারণ আছে, তাহা এই যে, পুস্তকের ১২ পৃঃ হইতে ২৩ পৃঃ অবধি যে পঞ্জিকা আছে, তাহা ১২৮৭ সালের অর্থাৎ ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের............ব্রজেন্দ্রবাবু যে বলিতেছেন উহা ১৮৭৬-৭৭তে প্রকাশিত, তাহা যে নিশ্চয়ই ভুল তাহাতে সন্দেহ নাই।"

ভুল এবং মিথ্যাকে যাঁহারা এইরূপ তেজের সহিত জাহির করেন, তাঁহাদের যে চিকিৎসার প্রয়োজন, তাহাতে আমাদেরও সন্দেহ নাই। ব্রজেন্দ্রবাবুর বিশেষ অপরাধ হইয়াছে বলিয়া তো মনে হয় না।

আমার সম্মুখে একটি 'নববার্ষিকী' রহিয়াছে, তাহাতে দেখিতেছি, ১২-২৩ পৃষ্ঠায় বাংলা ১২৮৪ সালের পঞ্জিকা দেওয়া আছে, ১২৮৭ সালের নয়। * অর্থাৎ, বার্ষিকীটি ১৮৭৬-৭৭ খৃষ্টাব্দেরই। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ১৭ অক্টোবর তারিখের 'দি ক্যালকাটা গেজেটে'র সাপ্লিমেণ্টে দেখিতেছি (পৃষ্ঠা ৪, ১৪৩৪ সংখ্যক বই) 'নববার্ষিকী' ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ৭ জুলাই তারিখে ২১, ভবানীচরণ দত্ত লেন হইতে বিপিনবিহারী রায় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং গুপ্ত মহাশয়ের বড় সাধের দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় থিওরি টিঁকিতেছে না। তাঁহার রাগ কি সেই কারণেই হইয়াছে? শ্রীযুক্ত প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতার কৃতিত্ব-লোপে শ্রীযুক্ত বনবিহারী গুপ্ত মহাশয় আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন এবং ব্যক্তিগত ক্রোধে ব্রজেন্দ্রবাবুর এবং আমার গবেষণা সম্বন্ধে নানাবিধ "ভদ্র এবং রুচিসঙ্গত" ইঙ্গিত করিয়াছেন। এগুলির প্রতিবাদ নিষ্প্রয়োজন। আমি সমসাময়িক প্রমাণেই বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করিতেছি। প্রসঙ্গত ফুটনোটে এবং অন্যত্রও পরবর্ত্তী কালের নজির দিতেও কার্পণ্য করি নাই। 'নববার্ষিকী' আমি পূর্ব্বে দেখি নাই, দেখিলে তাহার উল্লেখ করিতাম। এদিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন বলিয়া গুপ্ত মহাশয়কে ধন্যবাদ দিতেছি। তবে 'নববার্ষিকী' জাতীয় ইয়ারবুকের (ডেলি মেল, স্টেট্সম্যান ইয়ারবুকও এই পর্য্যায়ে পড়ে) নজির পূর্ব্ববর্ত্তীকালের ইতিহাসবিষয়ক গবেষণার কাজে যে বিশেষ সহায়তা করে না, ব্রজেন্দ্রবাবুর মতো আমারও তাহাই বিশ্বাস।

পরিশেষে কর্ত্তব্যবোধে ব্রজেন্দ্রবাবুর একটু সাফাই গাহিতে চাই। বনবিহারীবাবু ব্রজেন্দ্রবাবুর 'সংবাদপত্রে

---

* গুপ্ত মহাশয় সম্ভবতঃ চতুর্থ বর্ষের নববার্ষিকী একখণ্ড পাইয়া সেটিকেই প্রথম বৎসরের 'বার্ষিকী' মনে করিয়া এই গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছেন।

সেকালের কথা' ১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণে প্রকাশিত 'বেঙ্গল গেজেটি'র প্রকাশকাল এবং পরবর্ত্তী সংস্করণে তাহার সংশোধন লইয়া রসিকতা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে উক্ত পুস্তকের ২য় সংস্করণে ব্রজেন্দ্রবাবু নিজের ভুল সংশোধন করিয়াছেন অথচ ৬ কার্ত্তিক ১৩৪৫, রাঁচির হিন্দুতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে পূর্ব্ব বৎসরের সভাপতি যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের ভুলের জন্য (তাঁহারই নজিরে) কটাক্ষ করিয়াছেন এই বলিয়া—"তিনি (যোগেন্দ্রবাবু) জানিতেন না যে, আমি বহুদিন পূর্ব্বেই আমার এই ভ্রান্ত মত পরিত্যাগ করিয়াছি।" বনবিহারীবাবু পূর্ব্ববৎ তেজের সহিত বলিতেছেন—'বহুপূর্ব্বে এই মত পরিত্যাগ'-এর যে প্রসঙ্গ ব্রজেন্দ্রবাবু তুলিয়াছেন, তাহা সত্য নহে।"

কাহাকেও অসত্যবাদী প্রমাণ করিবার পূর্ব্বে বুদ্ধিমান শহুরে "ভদ্র এবং রুচিসম্মত" ব্যক্তিরা ইহা অপেক্ষা অধিক সাবধানতা অবলম্বন করিয়া থাকেন, জংলিদের বিচার-বুদ্ধির বালাই না থাকিতে পারে। আমরা কিন্তু জানি, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'র ২য় সংস্করণ প্রকাশের বহুপূর্ব্বে অন্ততঃ তিনবার ব্রজেন্দ্রবাবু নিজের ভ্রান্তমত খণ্ডন করিয়াছেন—

১। "The First Bengali Newspaper"—Bengal Past & Present, vol L, Pt II, 1935.

২। 'দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস' (১৩৪২) পৃঃ ১২-১৩।

৩। 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ৩য় খণ্ড (আষাঢ়, ১৩৪২) পৃঃ ২৫২।

গুপ্ত মহাশয় ব্রজেন্দ্রবাবুর অসংশোধিত সন তারিখের অন্ততঃ দশটি ভুল ধরাইয়া দিতে পারেন বলিয়া শাসাইয়াছেন। বাংলা মায়ের সুসন্তান তিনি, ব্রজেন্দ্রবাবু কর্ত্তৃক বিপথে-নীত দেশবাসীর মঙ্গল ভাবিয়াই এই জঙ্গল সাফ করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। তবে আশা করি, তিনি কিঞ্চিৎ আঁটঘাট বাঁধিয়া এই কার্য্য করিবেন। বর্ত্তমান "প্রত্যুত্তরে" তিনি যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা পুনরায় অবলম্বিত হইলে তিনি নিজে তো হাস্যাস্পদ হইবেনই, 'দেশের'ও নাম ডুবাইবেন। দেশের বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে 'দেশে'র নাম ডুবান অন্যায় হইবে।

প্রত্যুত্তর

শ্রীবনবিহারী গুপ্ত

সজনীবাবু 'নববার্ষিকী' সম্পর্কে বিতর্কে যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, আমি কেবলমাত্র তাহাতে যে সমস্ত তথ্য-ঘটিত বিতর্ক আছে, সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য নিবেদন করিব। কারণ, 'রুচিজ্ঞান', 'ভদ্রতা', 'নিরহঙ্কার ভাব' প্রভৃতি মানসিক বৃত্তি কাহার দ্বারা ক্ষুণ্ণ হইতেছে, সে বিচার-ভার ব্রজেন্দ্র-বাবুর বক্তব্যের উত্তরে আমার পূর্ব্ব প্রকাশিত বক্তব্যে আমি সুধী পাঠকজনের উপরই অর্পণ করিয়াছি, এ বিচার-ভার তাঁহারাই গ্রহণ করুন।

আমার ঐতিহাসিক বলিয়া কোনও খ্যাতি নাই এবং ঐতিহাসিকরূপেও আমি আমার প্রবন্ধ 'একখানি পুরাতন পুস্তক' রচনা করি নাই। 'নববার্ষিকী' নামক অধুনা বিস্মৃত একখানি পুস্তকে ঊনবিংশ শতাব্দীর বহু তথ্য আছে দেখিয়া, তাহার সম্বন্ধে পাঠক সমাজের কৌতূহল জাগাইবার এবং উহাতে প্রকাশিত কয়েকটি তথ্য সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া তাহার সত্যাসত্য যাহাতে নির্দ্ধারিত হয়, সেই উদ্দেশ্যেই আমি প্রবন্ধটি রচনা করি। আমার প্রবন্ধের প্রথম প্যারার শেষ দুই লাইনে আমি পরিষ্কার বলিয়া-ছিলাম যে, "এই দুইটি বিষয়ে 'নববার্ষিকী'তে কিছু কিছু নূতন তথ্য দেখিতে পাইতেছি। আলোচনার সুবিধার্থে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিব।"

আমি এমন কথাও বলি নাই যে, আমার উদ্ধৃত তথ্য-গুলি ঠিক, আমি কেবলমাত্র সে বিষয়ে আলোচনা চাহিয়া-ছিলাম।

আমি সন, তারিখ বিশারদ নহি এবং সে সম্পর্কে ভুল হওয়া আমার কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। আমার প্রথম প্রত্যুত্তরে স্পষ্টই আমি বলিয়াছি যে, আমার পুস্তকটির টাইটেল-পেজ নাই; সেজন্য আভ্যন্তরিক প্রমাণ হইতে আমি প্রকাশকাল স্থির করিয়াছি। মৎপ্রদত্ত প্রকাশকাল সম্বন্ধে আমার ধারণার কারণও দিয়াছিলাম; কিন্তু সেই সঙ্গে স্পষ্টই উল্লেখ করিয়াছি যে, "টাইটেল-পেজ না থাকাতে আমি নিঃসন্দিগ্ধ নহি।"

অথচ সজনীবাবু বলিতেছেন যে, 'ভুল ও মিথ্যাকে' আমি নাকি তেজের সহিত জাহির করিয়াছি। সজনী-বাবু আমার প্রবন্ধের অংশবিশেষ তুলিয়া আমার 'তেজ' প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন এবং কৌশলে আমার লেখার এই অংশ "টাইটেল-পেজ না থাকাতে আমি নিঃসন্দিগ্ধ নহি" বাদ দিয়াছেন। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে, "Give the dog a bad name and hang it" ইহাও কি সেই নীতি নহে?

সজনীবাবু কলিকাতা গেজেট হইতে প্রমাণ করিয়াছেন যে, 'নববার্ষিকী' ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুলাই প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইলে তিনিও ত স্বীকার পাইতেছেন যে, ব্রজেন্দ্রবাবু আমার চিকিৎসা করিতে গিয়া আমার ভ্রম প্রদর্শন করিয়া যে প্রকাশকাল দিয়াছেন, অর্থাৎ ১৮৭৬-৭৭ খৃষ্টাব্দ (অর্থাৎ ১২৮৩ বঙ্গাব্দের), তাহা ঠিক নহে। উহা ১২৮৪ বঙ্গাব্দের। সজনীবাবু ও ব্রজেন্দ্রবাবুর সন-তারিখ বিশারদ হিসাবে খ্যাতি আছে; অপরের তারিখ-ঘটিত ভুল দেখিলে তাঁহারা তাহার তীব্র সমালোচনা করেন। এ ক্ষেত্রেও আমার ভুল দেখাইবার উৎসাহের আতিশয্যে ব্রজেন্দ্রবাবু 'চিকিৎসকের চিকিৎসা' করিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সে ক্ষেত্রে ব্রজেন্দ্রবাবুর ভুল হইলে তাহা অধিক দূষণীয়, না আমার ভুল-ভ্রান্তি দূষণীয়?

আমি পুস্তকের আভ্যন্তরিক প্রমাণ হইতে বলিয়া-ছিলাম যে, পুস্তকের ১৯৬ পৃষ্ঠা, ২৬৫ পৃষ্ঠা ও ২৬৯ পৃষ্ঠা দেখিলেই ব্রজেন্দ্রবাবু বুঝিতে পারিতেন যে, ওই পুস্তক কখনই ১২৮৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হইতে পারে না।

কারণ, উহাতে ১৮৭৭ খৃঃ ২৭শে মে তারিখ পর্য্যন্ত ঘটনার উল্লেখ আছে। সজনীবাবু দেখাইয়াছেন যে, ওই পুস্তক ৭ই জুলাই প্রকাশিত হইয়াছে। ২৭শে মে অবধি খবর ৭ই জুলাইয়ের ভিতর পুস্তকাকারে বহির্গত হওয়া সে সময়ে নিশ্চয়ই লেখকের তৎপরতার পরিচয় দান করে। আমি আভ্যন্তরিক প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া, উহা আরও কয়েক মাস পরে হইয়াছে ধরিয়া লইয়াছিলাম; কিন্তু তাহাই যে ঠিক এমন কথা বলি নাই। তবে জোরের সহিত বলিয়াছিলাম যে, ব্রজেন্দ্রবাবুর দেওয়া প্রকাশকাল ঠিক নহে। ওইরূপ জোর আমি প্রমাণের বলেই করিয়াছি। সজনীবাবুও ক্যালকাটা গেজেট হইতে যে প্রকাশকাল দিতেছেন, তাহাতেও সেই উক্তিই সমর্থিত হইতেছে। অতএব 'তেজের' সহিত ব্রজেন্দ্রবাবুর ভুলকে ভুল যদি আমি বলিতাম, তাহা হইলেও অন্যায় হইত না।

আমিও অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি যে, উহা ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে বাহির হইয়াছিল। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুলাই তারিখের ইণ্ডিয়ান মিরার পত্রিকায় 'নববার্ষিকী'র বিস্তৃত পরিচয় এবং ওই পুস্তক হইতে 'অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনীর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ১৮৭৭ ও ৭৮ খৃষ্টাব্দের Miss Collet's 'Bramho Year Book'-এও নববার্ষিকীর পরিচয় আছে। যে ব্লুমহার্ডের ক্যাটালগের কথা সজনীবাবু বহুবার উল্লেখ করিয়াছেন এবং যে ক্যাটালগ হইতে আপজন কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত অভিধানের পুনরাবিষ্কারের দাবী তিনি করেন, সেই ক্যাটালগেও 'নববার্ষিকী'র উল্লেখ ও প্রকাশকাল ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ দেওয়া আছে।

ঐতিহাসিকরূপে খ্যাত সজনীবাবু বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করিতেছেন এবং ওই বিষয়ে অধরচন্দ্র ফেলোশিপ বক্তৃতাও দিতেছেন। তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির কাছে ইতিহাসসম্মত বিচার আশা করা অন্যায় নহে। অথচ দেখিয়া বিস্মিত হইতেছি যে, তিনি লিখিতেছেন যে, "নববার্ষিকী' ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুলাই তারিখে ২১, ভবানীচরণ দত্ত লেন হইতে বিপিনবিহারী রায় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং গুপ্ত মহাশয়ের বড় সাধের দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়-থিওরি টি'কিতেছে না।" প্রকাশকই যে গ্রন্থ প্রণেতা এই যুক্তি কোন ইতিহাস রচনা-প্রণালী-সম্মত? বিপিনবিহারী রায় মহাশয় ওই পুস্তকের প্রকাশক, তাহাতে আমারও কোনই সন্দেহ নাই; কিন্তু তিনি যে প্রণেতা নহেন, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই। সজনীবাবু যদি 'নববার্ষিকী' পুস্তকটির প্রারম্ভে যে 'আত্ম-নিবেদন'টি আছে, তাহা পড়িয়া দেখিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে এই মারাত্মক ভ্রমে পতিত হইতে হইত না। ওই নিবেদনের তৃতীয় প্যারার ষষ্ঠ লাইনে স্পষ্টই আছে, "ভিক্টরিয়া যন্ত্রের অধ্যক্ষ শ্রীযুত বিপিনবিহারী রায় মহাশয় আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।" বিপিনবাবু যদি গ্রন্থ প্রণেতা হইতেন, তবে কি তিনি নিজেকেই ধন্যবাদ দিতেন? তিনি যে প্রণেতা বা সংগ্রাহক নহেন, এই ধন্যবাদজ্ঞাপন হইতে তাহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে। তবে প্রশ্ন উঠিতে পারে, 'দ্বারকানাথ যে লেখক, তাহার প্রমাণ কি?' ইহার প্রমাণ এই, যে, 'দ্বারকানাথের অভিন্নহৃদয় বন্ধু ও বিপিনবাবু কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকাবলীর কয়েকটির লেখক 'পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তদীয় "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ" পুস্তকের ৩৪৬ পৃষ্ঠায় (তৃতীয় সংস্করণ) স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, 'দ্বারকানাথই 'নববার্ষিকী'র লেখক। Indian Messenger পত্রিকার ২১শে আগষ্ট ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও সেই কথা বলিয়াছেন।

কাজে কাজেই আমার 'সাধের থিওরী' ভূমিসাৎ করিবার প্রয়াস সজনীবাবুর বৃথাই গেল। আমার থিওরী অথবা প্রভাতবাবুর পিতার কৃতিত্ব লোপের অলীক স্বপ্নে সজনী-[illegible]ইতে চান, হউন, কিন্তু অকারণে আমার উষ্মা দেখিতেছেন কেন? সজনীবাবু বলিতেছেন যে, ব্রজেন্দ্রবাবু ১৩৪২ বঙ্গাব্দে "দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস" ও "সংবাদপত্রে সেকালের কথা, তৃতীয় খণ্ডে" বেঙ্গল গেজেট সম্বন্ধে আপনার পূর্ব্বমত ত্যাগ করিয়াছিলেন।

আমি ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও আমার বক্তব্য তাহাতে খণ্ডিত হয় না। ১৩৪২-এ ব্রজেন্দ্রবাবুর যে মতই থাকুক না কেন, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে প্রকাশিত পরবর্ত্তী মতই ব্রজেন্দ্রবাবুর তখনকার মত। ব্রজেন্দ্রবাবু ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে বলিতেছেন যে, "বাঙলা ভাষার প্রথম সংবাদপত্র কি, সে বিষয়ে একটু সংশয়ের অবকাশ আছে। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের বাঙ্গলা গেজেটি ও সমাচার দর্পণ, দুই-ই এইসম্মানের দাবী করে। * * দুইটি পত্রিকার প্রকাশকালের ব্যবধান থাকিলেও দশ-পনের দিনের বেশী নহে।" তিনি আরও বলিয়াছেন যে, "বেঙ্গল গেজেটি ঠিক কোন তারিখে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার উপায় নাই।" কাজে কাজেই ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে ব্রজেন্দ্রবাবু যখন এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন যোগেন্দ্রবাবুর ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে প্রদত্ত হিনুতে বক্তৃতার 'বহু পূর্ব্বে' ব্রজেন্দ্রবাবু যে সে মত পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়াছেন, তাহা ঠিক সত্য নহে, ইহাতে সংশয়ের অবকাশ কোথায়?

সজনীবাবু বলিয়াছেন যে, তাঁহার নিকট যে 'নববার্ষিকী' আছে, তাহাতে নাকি "১২-২৩ পৃষ্ঠায় বাঙলা ১২৮৪ সালের পঞ্জিকা আছে।" আমারখানিতে ঠিক ওই কয় পাতায় ১২৮৭ সালের পঞ্জিকা আছে। আমারখানিই যে প্রথম বৎসরের 'নববার্ষিকী', তাহা মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। ওই পুস্তকের 'আত্ম-নিবদেন'এ দেখিতেছি যে, লেখক লিখিতেছেন—'ইহাকে পাঠক-সমাজে যেভাবে উপস্থিত করিবার ইচ্ছা ছিল, তাহা হইয়া উঠে নাই। অনুষ্ঠানপত্রে যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছিল, অনাবশ্যক বোধে তাহার কতক পরিত্যক্ত এবং আবশ্যক বোধে অনেক পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করা হইয়াছে, আবার কোন বিষয় নূতন সংযোজিত হইয়াছে। * *

তবে যদি এইরূপ গ্রন্থ বর্ষে বর্ষে প্রকাশ করিবার প্রয়োজন বোধ হয়, আশা করি, ক্রমে ইহার অভাব সকল দূর করিতে পারিব; এমন কি, আগামী বর্ষেই ইহার আর এক-প্রকার নূতন গঠন প্রদান করিয়া সৌষ্ঠব বিধানের চেষ্টা করা যাইবে।'

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে "অনুষ্ঠানপত্র"প্রকাশিত হওয়ার পর এইখানিই প্রথম পুস্তক এবং পূর্ব্বে উহা প্রকাশিত হইয়া থাকিলে "যদি এইরূপ গ্রন্থ বর্ষে বর্ষে প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হয়" এরূপ লেখা থাকিতে পারিত না। এবং "আগামী"তেই পরিবর্ত্তন ইচ্ছাও তাহা হইলে প্রয়োজন ছিল না। সেজন্য সজনীবাবু যদি ১২৮৩ সালের পঞ্জিকা সম্বলিত নববার্ষিকী 'দেশ' সম্পাদককে কিম্বা কোনও নিরপেক্ষ বিচারক-মণ্ডলীকে দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে আমি আমার সকল অভিযোগ প্রত্যাহার করিব এবং সজনীবাবু ও ব্রজেন্দ্রবাবু উভয়েই যে বলিতেছেন আমার চিকিৎসার প্রয়োজন, তাহা স্বীকার করিয়া লইব। কিন্তু উহা না দেখাইতে পারিলে সজনীবাবু কি করিবেন? আমার লেখায় হয়তো 'দেশে'র নাম ডুবিতেছে, কিন্তু প্রকাশককে গ্রন্থকাররূপে জাহির করিলে, কিম্বা 'বঙ্গভাষা সমালোচনী সভা'য় প্রদত্ত বক্তৃতাকে 'জাতীয় সভা'য় প্রদত্ত বক্তৃতা বলিয়া লিখিলে কি পত্রিকার গৌরব বাড়ে? আরও বহুতর বিষয়ে আমার বক্তব্য ছিল, কিন্তু প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি পাওয়াতে ন্যায়ান্যায় বিচারের ভার পাঠকবর্গের হস্তে সমর্পণ করিয়া আমি বিদায় লইলাম।

চিরন্তন

শ্রীইনা দেবী

হে ধরণী, একদিন মেলিয়া নয়ন,
সবিস্ময়ে হেরেছিনু সর্ব্বমন দিয়া,
কখন বেসেছি ভালো গগন তোমার,
কখন আলোক দেছে পরাণ ভরিয়া।
সেদিন মালঞ্চে তব ছিল কত ফুল
মাটিতে আলপনা আঁকি রেখেছে বকুল
বাতাস হইয়াছিল সৌরভ আকুল
ছিল মোর নয়নে অঞ্জন,
ধরণীর কোলাহলে শুনেছিনু গান
সে আমার প্রথম যৌবন।

আজ, ভাবি বড় রুক্ষ এ মাটির ধরা
সর্ব্ব সরসতা বুঝি গেছে শুখাইয়া
মলয় হয়তো আর বহেনা হেথায়
ফুলমধু নেছে সব মধুপ লুটিয়া।
মনে হয় কমে গেছে আলোকের ভাতি,
মনে হয় কমে গেছে শুক্লা মধু রাতি
থেমে গেছে মনে হয় সব গীতি সুর
কানে বাজে শুধু কলরব,
শুধু দেখি অবিশ্বাস বিষাদ সন্দেহ
নিঃশেষিত আনন্দ উৎসব।

ভাবি মনে পড়ে আছে আরও তো দিন,
এ নয়নে দৃষ্টি মোর পুনঃ নব হবে,
সেদিন বার্দ্ধক্য-চোখে কি হবে জগৎ,
আজো যে মাধুর্য্য আছে সেদিন কি রবে?
আজ যারা জীবনের প্রথম সোপানে,
জয়গাথা গাহে তারা উচ্ছ্বসিত প্রাণে,
তারা দেখে ধরণীকে সোনার স্বপনে
আমাদের অতীতের মত,
সেদিনেরে পশ্চাতে ফেলিয়া কেন হেন
গেল ভাঙি স্বপ্ন ছিল যত।

কোথা গেল সেদিনের সে মায়া অঞ্জন
চোখে কেন নেমে এলো সন্দেহের ঘোর
কেন প্রাণ মধু দেখি তুষ্ট নাহি হয়,
গরল খুঁজিয়া কেন বিষে হই ভোর।
ফুল হেরি আজি কেন ভরে না নয়ন,
ফল চাহি মন কেন খোঁজে অকারণ,
কেন বৃথা নাহি পারি করিতে বয়ন
স্বর্ণ সূত্রে ভবিষ্যের ছবি,
কেন প্রাণে জেগেছে বিষয়ী
কোথা গেল সে স্বপন-কবি।

স্‌ইজারল্যাণ্ডে শীতকালে পথঘাট

আমাদের দেশে পল্লীগ্রামের বালকেরা বর্ষাকালে স্কুলে যাইতে জলকাদার জন্য যথেষ্ট দুর্ভোগ ভুগিয়া থাকে। শীতকালে স্‌ইজারল্যাণ্ডের কোন কোন অঞ্চলের পথঘাট এমনি তুষারাবৃত থাকে যে, বালক-বালিকাদের স্কুলে যাওয়া হইয়া পড়ে দুর্ঘট ব্যাপার। অবশ্য আমাদের দেশের বর্ষার সহিত ও দেশের শীতের এইটুকু সাদৃশ্য যে, বৃষ্টির বদলে সেখানে থাকে তুষারপাত। অনেক ক্ষেত্রেই কয়েক মাইল পথ অতিক্রম করিয়া স্কুলে পেঁাছিতে হয়; অথচ যানবাহনের ব্যবস্থা অনেক স্থানেই সম্ভবপর নয়। তাই বালক-বালিকারা পাততাড়ি পিঠে বা কাঁধে বাঁধিয়া শী (ski) চালাইয়া তুষারাবৃত পথের উপর দিয়া অতি অল্পায়াসে স্কুলে গমন করে। সমগ্র শীতকালটাই তাহাদের এই প্রকারে শীয়ের সাহায্য গ্রহণ করিতে

হয়। কোনও চাকাওয়ালা যান সে পথে চালান যায় না। এইজন্য ছোট শিশুদের বেড়াইতে বাহির করা হয় চাকাহীন লিউজ বা পেরাম্বুলেটারে—ঠিক যেমন মেরু অঞ্চলে চাকাহীন স্লেজ গাড়ী ব্যবহার করা হয়। দুইখানি হকি-ষ্টিক পাশাপাশি রাখিয়া এড়োভাবে ও লম্বালম্বি সরু সরু কাঠের ফালি জুড়িয়া বাক্সপানা কাঠামো তৈরী করিলে যাহা হয়—তাহাই লিউজ। লিউজের উপর ছোটখাট শয্যা বা বাকসপানা গদি বসাইয়া উহাকেই স্লেজ-শকটে পরিণত করা হয়। উহাকে পেছন হইতে ঠেলিয়া বা সম্মুখ হইতে টানিয়া তুষার বরফের উপর দিয়া অনায়াসে নেওয়া যাইতে পারে। সেখানে সমগ্র শীতকাল সারা অঞ্চল থাকে তুষার ঢাকা, তাহার উপর পাহাড়িয়া মুল্লুক, রাস্তায় যে পরিমাণ চড়াই-উৎরাই, অন্য শকটের ব্যবস্থা করা অসাধ্য না হইলেও দুঃসাধ্য একেবারে চরম।

আইনের কবলে

ফরাসী দেশে ১৮৮৪ সালের এক আইন রহিয়াছে মিউনিসিপ্যাল অফিস বিধিরূপে,—তাহার ফলে কোনও ব্যক্তি এক টেবিলে বসিয়া তাহার শ্যালক, ভায়রা ভাই বা ভগ্নীপতির সহিত কাজ করিতে হয় এমন পদে নিযুক্ত হইতে পারিবে না।

মঃ রু বহু বৎসর যাবৎ নারবোনে শহরের মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলে মেয়রের সহকারীর কার্য্য করিতেছে। সে হইল অডিট ডিপার্টমেণ্টের প্রধান সহকারী। তাহারই টেবিলের অংশীদার হিসাবে বসিয়া যে ব্যক্তি কাজ করে, তাহার ভগ্নীকে মঃ রু সম্প্রতি বিবাহ করিয়াছে।

কিন্তু বিবাহের সংবাদ কর্তৃপক্ষের গোচরে আসা মাত্র মঃ রুকে পদত্যাগ-পত্র দাখিল করিতে বাধ্য করা হইয়াছে। এক টেবিলের সহকর্ম্মী এই বিবাহের ফলে শ্যালকে পরিণত; আইনের কবল হইতে মঃ রু তবে কোন্ অজুহাতে রেহাই পাইবে?

১১০ বয়স্কা ফুলবিক্রেত্রী

আইসল্যাণ্ডের হেলসিংফোরস্ নগরের সর্ব্বাপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ অধিবাসী হইল মিস মেরিয়া এণ্ডারসন। তাহার ১১০শ জন্মবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ভেদেরল্যাকস্ গ্রামে সে ১৮২৮ সালে জন্মগ্রহণ করে। বহুদিন পর্য্যন্ত পরিচারিকার কার্য্যেই সে নিযুক্ত ছিল। পরে ফুল বিক্রয়ের কার্য্য গ্রহণ করে। তাহার স্বাস্থ্য এখনও অটুট রহিয়াছে এবং সে বলিষ্ঠতায় কোনও প্রৌঢ়া অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। ফুল বিক্রয়ের ব্যবসায়ে লিপ্ত আছে বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ছাত্র-ছাত্রীর সহিত তাহার পরিচয় আছে। তাহার জন্মতিথি উপলক্ষে উৎসবে, এইজন্য হেলসিংফোরস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের গায়ক-গায়িকা দল তাহার আবাসের বাহিরে জমায়েত হইয়া ফুলবিক্রেত্রীর শিরে পুষ্প বর্ষণ করিয়াছে।

শতাব্দী পূর্ব্বের পকেট-ঘড়ি

মার্কিনের কলোরেডো অঞ্চলের রকি ফোর্ড নামক স্থানে এক জুয়েলারি দোকানে একটি পকেট-ঘড়ি মেরামতের জন্য হাজির করা হয়। উহার ঘণ্টার অঙ্ক বিচিত্র V (ভি) আকারে অঙ্কিত। দোকানের মালিক কৌতূহলপরবশ হইয়া ঘড়িটির নির্ম্মাতার নিকট উহার সকল বিবরণ জানিতে চাহেন। নির্ম্মাতা বলে—

ঐ প্রকার ঘণ্টাঙ্ক হইতে বুঝা যায় যে এই ঘড়ি ১৭৯৫ সাল হইতে ১৮৪০ সালের ভিতর যে কোন সময়ে প্রস্তুত এবং তুরস্ক বা পারশ্য দেশের জন্যই বিশেষ করিয়া নির্ম্মিত। তুরস্কে ঐ সময়ে এই বিশেষ ধাঁজের ভিন্ন এবং নির্দ্দিষ্ট নির্ম্মাতা কয়েকজনের ব্যতীত অন্য ঘড়ি প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত না।

মিশরের নিত্য খাদ্য রুটি

প্রাচ্যের পূর্ব্বভাগে যেমন ভাতের প্রচলন তেমনিই পশ্চিম অংশে রুটির রেওয়াজ। রুটির প্রচলন যে সকল দেশে তাহার ভিতর আবার নানা আকার ও পদ্ধতিতে প্রস্তুত করার

ব্যাপার দেখা যায়। মিশরে গোলাকার চাকার মত রুটি দেশবাসীর নিত্য ব্যবহারের বস্তু, তাহা আমাদের প্রচলিত পাউরুটির মত নয়। বরং বোম্বাই অঞ্চলের সহিত কিছুটা সাদৃশ্য রহিয়াছে। ছবিতে দেখা যাইতেছে সে দেশের রুটি কি প্রকার এবং কি প্রকারে ফিরিওয়ালা তাহা বহন করিয়া বেড়ায়।

ইলিনয়স্ ষ্টেটে কাকমেধ যজ্ঞ

শোনা যায় সর্পযজ্ঞ ছিল সেকালে ভারতে বিপক্ষ নিম্মূল করিবার এক রাজসিক ব্যবস্থা। একালে তেমন ব্যাপক কোনও যজ্ঞের কথা জানা যায় না—অবশ্য মানবনিধন যজ্ঞ ব্যতীত। সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ইলিনয়স্ ষ্টেটের নিউ বার্লিন শহরের নিকটে উক্ত ষ্টেটের কনজারভেসন বিভাগ কাকের বংশ নিম্মূল করিতে কাকমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছে। পরশুরাম একোবিংশবার নিঃক্ষত্রিয় করিলেও পৃথিবী ক্ষত্রিয়হীন হইয়া যায় নাই। কাজেই ইলিনয়স সরকারের কাকমেধ-যজ্ঞের দুই-এক অনুষ্ঠানে যে কাকবংশ লোপ পায় নাই সেদেশ হইতে ইহা ত অবধারিত। কাক-মেধের অনুষ্ঠান মাত্র একটি মরসুমে সেদেশে চলিয়াছিল ত্রয়োদশ বার। শেষবারের যজ্ঞের আয়োজনে বিশেষভাবে তৈরী ১৮০টি ডিনামাইট বোমা ব্যবহার করা হইয়াছিল, কারণ সেস্থানে কাকেদের উপনিবেশ ছিল একটানা সিকি মাইল লম্বা। একসঙ্গে এই ১৮০টি নিদারুণ বোমার বিস্ফোরণে অনুমান করা হয় ২৫০০০ হইতে ৩০,০০০ কাক নিপাত করা হইয়াছে। সমগ্র মরসুমে (সারা শীত ব্যাপিয়া)একুন ১,৫০,০০০ কাক নিধন করিয়া যজ্ঞ অর্থাৎ বিস্ফোরণ বন্ধ করা হইয়াছে।

বৃক্ষারোহী মৎস্য

কুইনসল্যাণ্ডের উত্তর তীরের সামান্য দূরে রহিয়াছে ম্যানগ্রোভ দ্বীপ। এই দ্বীপে এক জাতীয় মাছ আছে যাহা জলে বেশী সময় থাকিতে পারে না। দিনরাতের বেশীর ভাগ সময় উহা ডাঙ্গায় কাটায়, তীরের কাদায়। কিন্তু রাত্রি যাপন করে গাছে। গাছে চড়িতে উহার বক্ষের দুই পাশের ফোড় (fins) এবং চাক্তির মত কান্কো আশ্চর্য্য রকমে সাহায্য করে। ফোড় দুইটি হুবহু হাতের আঙুলের মত আঁকড়াইয়া ধরিতে সমর্থ। উহার কান্কো বেশ বড়—ভিতরে আবার ফাঁকও প্রশস্ত, কাজেই জল অপেক্ষা স্থলে উহার সাহায্যে শ্বাস টানিবার সুবিধা। ইহা ছাড়াও লেজেও উহার শ্বাস লইবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। ডাঙায় উহা লাফাইয়া চলে সাধারণত ৩।৪ ইঞ্চি এক-এক লম্ফে আগাইয়া। কিন্তু যদি মানুষ বা কোন দুরন্ত জানোয়ার দেখিতে পায়, তবে লেজ বাঁকাইয়া এমন ঝাপটা মারে যে উহার ফলে ৩।৪ ফুট দূরে ছিট্কাইয়া পড়িতে পারে।

জলমগ্ন জাহাজে আগুন

নিমজ্জিত হইবার দুই বৎসর পরে সাগরতলে থাকা অবস্থায় 'কারিকিরি' নামক জাহাজে লাগিল আগুন। মেলবোর্ন তীরে হবসন উপসাগরে এই কাণ্ডটি হইয়াছে।

জাহাজটি তুলিবার জন্য পাম্প সাহায্যে জল নিষ্কাশন চলিতেছে। নয় ফুট পর্য্যন্ত যখন জল কমাইয়া আনা হইয়াছে জাহাজের মধ্য হইতে, তখন বেদম তোড়ে কাজ চলিতে থাকে। এই সময়ে ইঞ্জিনীয়ার-ইন-চার্জ্জ পেট্রল ঢালিতে থাকে ইঞ্জিনে। সাগরবক্ষের প্রায় চল্লিশ ফুট নীচে এই পেট্রলে আগুন ধরিয়া যায়। ইঞ্জিনীয়ারের পরিচ্ছদেও আগুন লাগে। সে জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে—কিন্তু জলের ভিতর দিয়াও জ্বলন্ত পেট্রল তাহাকে অনুসরণ করে ; সে ষ্টীল চোঙের ভিতরকার মই বাহিয়া উপরে আসিতে বাধ্য হয়।

এক ঘন্টা পর্য্যন্ত জাহাজের চোঙ দিয়া (যাহা সাগরবক্ষের উপরে মাথা জাগাইয়া ছিল) আগুনের শিখা বাহির হইতে থাকে। নিরুপায় হইয়া বাহিরের জল প্রবেশ করাইতে হয় জাহাজের গহ্বরে। আবার নূতন করিয়া জল নিকাশের কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে গোড়া হইতে।

ইংলণ্ডে পত্নীর মূল্য

ইন্টারন্যাশনেল নিউজ সার্ভিসের সংবাদদাতা হাওয়ার্ড বেরি ইংলণ্ডের বিবাহ-বিচ্ছেদ আদালতের ৮টি রায় হইতে ইংলণ্ডে পত্নীর মূল্য ১৩৫ ডলার হইতে ১৭,৫০০ ডলার পর্য্যন্ত নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ইংলণ্ডে তিনটির স্থলে পাঁচটি ডাইভোর্স কোর্টে জজ করা হইয়াছে। জজগণ ইংলণ্ডে ডাইভোর্স মামলা কমাইবার জন্য উত্তরোত্তর অর্থদণ্ডের পরিমাণ বাড়াইতেছেন। একদিনে লণ্ডন শহরের ডাইভোর্স কোর্টে ২০,০০০ ডলার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় বিভিন্ন স্বামীদের—পত্নীগণের অবিশ্বাসিনী হইবার জন্য। এই ক্ষতিপূরণের নির্দ্দেশ দিবার পূর্ব্বে জজগণ স্থির করেন পত্নীটির 'সঙ্গিনী' 'মাতা' বা 'গৃহিণী' হইবার যোগ্যতামূলক মূল্য কত এবং স্বামী স্ত্রী হইতে বঞ্চিত হওয়ায় অর্থ ও সম্পদ এবং সাহায্যের দিক দিয়া কি পরিমাণ ক্ষতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। সুতরাং উক্ত জজদের প্রদত্ত ক্ষতিপূরণই হইল ঐ ক্ষেত্রে পত্নীর মূল্য। গড়ে তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি ইংলণ্ডে পত্নীর মূল্য প্রায় ২০০০ ডলার।

সাহিত্য-সংবাদ

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলন
ডেলিগেট প্রেরণ সম্বন্ধে বিজ্ঞপ্তি

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির ১২ই মার্চ্চ তারিখের সভার প্রস্তাবানুযায়ী বাঙলার মুসলিম প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক আগামী ৭ই এপ্রিলের পূর্ব্বে তাঁহাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদিগের নাম সমিতির সাধারণ সম্পাদক মিঃ আয়নুল হক খাঁর (৪৯, অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা) নিকট প্রেরণ করেন। উহার পরে যাঁহাদের নাম পাওয়া যাইবে, তাঁহাদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব সমিতির কর্ত্তৃপক্ষের উপর অর্পণ করা বাঞ্ছনীয় নহে।

উক্ত সভায় স্থির হইয়াছে, "কলিকাতা ও মফঃস্বলের যে কোন মুসলিম সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে অনধিক পাঁচজন প্রতিনিধি সম্মেলনের কার্য্যে যোগদান করিতে পারিবেন। কোনও জেলার সদরে অথবা মফঃস্বল কেন্দ্রে যদি মার্চ্চ মাসের মধ্যে মুসলমানদিগের কোন সাহিত্য প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়, তবে উহার পক্ষ হইতে দুইজন প্রতিনিধি সম্মেলনের কার্য্যে যোগদান করিতে পারিবেন। সাহিত্য প্রতিষ্ঠান ভিন্ন মুসলমানগণের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্মে-[illegible] তিনজন করিয়া মিত্র-প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারিবেন।"

প্রতিনিধিগণকে অন্যূন এক টাকা চাঁদা নাম পাঠাইবার সঙ্গে প্রেরণ করিতে হইবে। মফঃস্বলের প্রতিনিধিগণ অতিরিক্ত দুই টাকা চাঁদা প্রদান করিলে, তাঁহাদের জন্য আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হইবে।

বিনীত

খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দিন, প্রচার-সম্পাদক।

প্রতিযোগিতার ফলাফল

গত মাঘ মাসে কাঁঠালগাড়িয়া "সবুজচক্রে"র পরিচালকবর্গ যে গল্প প্রতিযোগিতা আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহার ফলাফল প্রকাশিত হইল। প্রতিযোগীর সংখ্যা বেশী হওয়ায় দুইটি পুরস্কার দেওয়া গেল। প্রথম পুরস্কারঃ—শ্রীহিমাংশু পাল—৫ পাঁচ টাকা দামের পুস্তক। দ্বিতীয় পুরস্কার—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ দাস—একটি রৌপ্য পদক। পুরস্কার উপযুক্ত সময়ে পাঠান হইবে। ব্রহ্ম চৌধুরী, সম্পাদক, কাঁঠালগাড়িয়া "সবুজচক্র"। ভাণ্ডাড়া পোঃ (হুগলী)।

প্রবন্ধ, গল্প ও চিত্র প্রতিযোগিতা

পূর্ব্বধলা "কিশোর সঙ্ঘে"র উদ্যোগে গত আশ্বিন মাস হইতে "কিশোর" নামে একটি হাতে লেখা মাসিক পত্রিকা বাহির হইতেছে। আমরা উক্ত পত্রিকার জন্য একটি প্রবন্ধ, গল্প ও চিত্র প্রতিযোগিতা আহ্বান করিতেছি। ইহাতে সকল প্রদেশের স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে যোগদান করিতে পারিবেন। প্রত্যেক বিষয়ের শ্রেষ্ঠ লেখক ও চিত্রকরকে একটি করিয়া রৌপ্য পদক পুরস্কার দেওয়া হইবে। পুরস্কৃত প্রবন্ধ, গল্প ও চিত্রগুলি ব্যতীত অবশিষ্ট উপযুক্ত লেখা ও চিত্রগুলি আমাদের "কিশোরে" প্রকাশিত হইবে। রচনা পাঠাইবার শেষ তারিখ ১৩৪৬ সনের ১৫ই বৈশাখ। কোন প্রবেশ-মূল্য নাই। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিতে হইবে। বিশেষ ব্যবস্থা দ্বারা চিত্রকর বা লেখকবৃন্দ উক্ত "কিশোর" পড়িবার নিমিত্ত পাইবেন। কোন অনুসন্ধানের জন্য উপযুক্ত টিকিট প্রয়োজন। পত্রিকার বিচারকমণ্ডলীর মীমাংসাই চূড়ান্ত।

রচনাদি পাঠাইবার ঠিকানাঃ—সম্পাদক—"কিশোর" (কিশোর সঙ্ঘ) পোঃ পূর্ব্বধলা। ময়মনসিংহ।

মহিলা সাহিত্য সম্মিলন

আগামী ইষ্টারের ছুটিতে কলিকাতায় মুসলিম মহিলা সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন হইবে। কোম শামসুন নাহার সভানেত্রী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সভায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির বিশেষভাবে আলোচনা হইবেঃ—

"বাঙলার নারী-আন্দোলন." "স্ত্রী-শিক্ষার সিলেবাস", "নার্সারি স্কুল", "বাঙলা সাহিত্যে নারী-চরিত্র" "মেয়েদের স্বাস্থ্য ও ব্যায়াম", "নারীর আইনগত অধিকার অনধিকার," "সহশিক্ষা", "বঙ্গনারীর বিবাহ সমস্যা", "শিক্ষিতা নারীর বেকার সমস্যা", "শিশুর শিক্ষা ও চরিত্র গঠন", "পর্দ্দা-প্রথা"। প্রবন্ধাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

আনোয়ারা চৌধুরী, সেক্রেটারী ৬নং গোরাচাঁদ রোড, কলিকাতা।

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা
বালী সরস্বতী পাঠাগার

আগামী এপ্রিল মাসে বালী সরস্বতী পাঠাগারের দ্বাবিংশতি বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে শিক্ষাকেন্দ্র বিভাগ দ্বারা পরিচালিত (সর্ব্বসাধারণের জন্য) একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হইবে। উহাতে নিম্নলিখিতরূপ পুরস্কার দেওয়া হইবেঃ—

(১) 'গোপীকান্ত স্মৃতিপদক'—দাতা—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায়; প্রবন্ধ বিষয়—"অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক গণশিক্ষা ভারতের বেকার সমস্যা সমাধানের উপযোগী হইবে কি না।" (২) 'কার্ত্তিকচন্দ্র স্মৃতিপদক'—দাতা—শ্রীতারকচন্দ্র ঘোষ,—প্রবন্ধ বিষয়—"রাষ্ট্রভাষারূপে বঙ্গভাষার দাবী।" (৩) 'জ্যোতির্ম্ময়ী স্মৃতিপদক'—দাতা—ডাঃ মনোভিলাষ বন্দ্যোপাধ্যায়; প্রবন্ধ বিষয়—"রাজনীতির উপর ধর্ম্মনীতির প্রভাব।" (৪) 'মানদা স্মৃতিপদক'—দাতা—শ্রীঅবনীমোহন চট্টোপাধ্যায়; প্রবন্ধ বিষয়—"বিবাহ বিচ্ছেদ বিধির প্রবর্ত্তন হিন্দু সমাজের পক্ষে হিতকারী অথবা অন্তরায়।"

উপরিউক্ত প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় নরনারী নির্ব্বিশেষে সর্ব্বসাধারণকে যোগদান করিতে আহ্বান করা যাইতেছে। চতুর্থ প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় কেবলমাত্র স্কুল, কলেজের ছাত্রী এবং সাধারণ মহিলাগণ যোগদান করিতে পারিবেন। প্রতিযোগিগণ নিজ নিজ প্রবন্ধের নকল পাঠাইবেন, কোন প্রবন্ধই ফেরৎ দেওয়া সম্ভব হইবে না। প্রত্যেক বিষয়ের জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখকগণকে উল্লিখিত বিভিন্ন রৌপ্য-

পদক পুরস্কার দেওয়া হইবে। প্রবন্ধ বাঙলায় লেখা হইবে এবং আগামী ৯ই এপ্রিলের মধ্যে শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল সম্পাদক, বালী সরস্বতী পাঠাগার, ১০৪ দাওনাগাজী রোড, পোঃ বালী, জেলা হাওড়া, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রবন্ধ লেখক-লেখিকাগণকে পাঠাগারের আগামী বার্ষিক সভায় উপস্থিত হইয়া পদক গ্রহণ করিতে হইবে; অন্যথায় পদক পাঠাইবার ডাক খরচা পাঠাইতে হইবে। শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল সম্পাদক, বালীসরস্বতী পাঠাগার, দেওনাগাজী রোড, বালী জেলা হাওড়া।

হিন্দু ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব রজত জয়ন্তী উৎসব

আগামী ঈষ্টারের ছুটিতে 'হিন্দু ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের' পঞ্চবিংশতি বর্ষ কার্য্যকাল পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে একটি রজত-জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠানের বন্দোবস্ত হইতেছে। এতদুপলক্ষে বক্তৃতা, সংগীত প্রতিযোগিতা, মহিলা সম্মেলন, বালক-বালিকা সম্মেলন ও নানাবিধ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা হইতেছে। ক্লাবের প্রাক্তন সভ্য ও শুভানুধ্যায়ীদের মধ্যে যাঁহারা দূরে অবস্থান করিতেছেন এতদ্দ্বারা তাঁহাদিগকে এই উৎসবে যোগদান করিতে সাদর নিমন্ত্রণ জানাইতেছি। সময়োপযোগী কোন রচনা বা প্রবন্ধ পাঠাইলে তাহা সানন্দে গৃহীত হইবে।

এই উপলক্ষে একটি সংবাদপত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইতেছে। অধুনা ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষায় যতপ্রকার দৈনিক, সাপ্তাহিক ও অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক চলিতেছে তাহাদের সকলগুলিকেই স্থান দেওয়া অভিপ্রায়। ঐ সকলের স্বত্ত্বাধিকারী, সম্পাদক ও প্রকাশকদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে তাঁহারা যেন প্রত্যেকখানার এক একটি নমুনা সংখ্যা পাঠাইয়া দেন এবং প্রত্যেকের বিষয়ে একটু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও প্রচার সংখ্যা ইত্যাদি জানাইয়া বাধিত করেন।

নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট পত্রাদি লিখিবেন। শ্রীপ্রমথনাথ বসু, সম্পাদক, হিন্দু ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের রজত জয়ন্তী উৎসব কমিটি। পোঃ—হিনু, রাঁচি। বি এন আর।

পুস্তক পরিচয়

ছত্রপতি শিবাজি—রায় সাহেব রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি-এ কর্ত্তৃক প্রণীত। প্রকাশক সন্তোষ লাইব্রেরী, ৬৪নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

মহারাষ্ট্রপতি শিবাজীর জন্মের ও পূর্ব্বের ঘটনা নিয়া আখ্যানভাগ আরম্ভ করা হইয়াছে। তারপর শিবাজীর জন্ম, রণজয়, মারাঠা জাতির গৌরব রক্ষা প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত সমুদয় কাহিনী সাবলীল ভাষায় গ্রন্থকার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বইখানি ছোট বড় সকলেরই নিকট ভাল লাগিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

ছাত্রজীবন:—শ্রীগুরুদাস গুপ্ত এম-এ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—গ্রন্থকারের নিকট—পোঃ রতনগঞ্জ, নড়াইল, যশোহর। দাম মাত্র আট আনা।

বর্ত্তমানে তরুণ ছাত্র সমাজ স্বাবলম্বন, স্বাস্থ্যরক্ষা, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি বিষয়ে উদাসীন হইয়া অধঃপতিত হইতে বসিয়াছে। গ্রন্থকার সেই সমস্ত বিষয়ে মনোযোগী হইতে ছাত্রগণকে উপদেশ দিয়াছেন। বিভিন্ন বিষয়ে যে সমস্ত উপদেশ তিনি দিয়াছেন তাহা পালন করিলে ছাত্রগণ উপকৃত হইবে।

কামাল পাশা ও নব্যতুরস্ক:—শ্রীহরিদাস মজুমদার কর্ত্তৃক লিখিত এবং অমৃত পাব্লিশিং হাউজ, ৬নং মুরলীধর সেন লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

এসিয়ার নবজাগরণের ইতিহাসে কামালপাশার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। নব্যতুরস্কের তিনি জন্মদাতা পিতা। এইরূপ একজন অসামান্য পুরুষের জীবন-কাহিনী বঙ্গভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থকার বাঙালী পাঠক সমাজের, বিশেষত তরুণ সমাজের কাছে যে আদর্শ উপস্থিত করিলেন তাহা জাতি গঠনের কাজে বিশেষ সাহায্য করিবে। ছাপা, কাগজ ভালোই। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করিতেছি।

সরল সীবন শিক্ষা:—প্রণেতা শ্রীমতী প্রতিভারাণী বসু। প্রকাশক—শ্রীআদিত্যনাথ বসু মল্লিক। ৮।২, জগন্নাথ সুর লেন, কলিকাতা। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

এই বেকার সমস্যার দিনে ঘরে বসিয়া স্ত্রী-পুরুষ যাহাতে শিল্পের সাহায্যে কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে পারে তাহার জন্য গ্রন্থকর্ত্রী বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই পুস্তকখানি লিখিয়াছেন। ভাষা সহজ ও প্রাঞ্জল। বিষয়টিকে সকলের কাছে বোধগম্য করিবার জন্য বহু চিত্রের সাহায্যও লওয়া হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস এইরূপ পুস্তক আমাদের ঘরে ঘরে সমাদর লাভ করিবে।

চলচ্চিত্র দর্শক সমিতি নামে একটি সমিতি গত এক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সমিতির উদ্দেশ্য কি তাহা আমরা ঠিক জানি না, কারণ এ সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু কাগজপত্র পাই নাই, তবে এই রকমের একটি সমিতি গঠনের যে প্রয়োজনীয়তা আছে সে বিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না। কারণ বাঙলাদেশে যাঁহারা ছবি দেখেন তাঁহারা যাহাতে ছবির ভাল মন্দ বুঝিতে শেখেন; যাহাতে দর্শকগণ এই রকম সমিতির মধ্যে দিয়া এদেশের চলচ্চিত্রের মধ্যে যাহা কিছু অন্যায়, যাহা কিছু ত্রুটি তৎসম্বন্ধে চিত্র-নির্ম্মাতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারেন; যাহার ফলে বাঙলাদেশের চিত্র-শিল্পের উন্নতি হয়, তাহার ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এই উদ্দেশ্য লইয়া যে সমিতি গঠিত হয়, সেই সমিতির মধ্যে যাঁহারা থাকিবেন তাঁহারা যে কেবলমাত্র চলচ্চিত্র দর্শক হইবেন সে আশা আমরা অবশ্যই করিতে পারি। কিন্তু আলোচ্য চলচ্চিত্র দর্শক সমিতির কর্ম্মকর্ত্তাদের তালিকা দেখিলে ইহা যে 'চলচ্চিত্র দর্শক সমিতি' তাহা বুঝা কঠিন এবং নাম না দেখিয়া কেবলমাত্র কর্ম্মকর্ত্তার তালিকা দেখিলে ইহা 'চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতি', 'চলচ্চিত্র প্রযোজক সমিতি' বা অন্য কি তাহা বুঝা বড় দুষ্কর।

* * *

গত ৩০শে মার্চ্চ ক্লার্ক গেবল ক্যারল লম্বার্ডের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন।

ক্লার্ক গেবল ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী ক্যাডিজ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বর্ত্তমানে মেট্রো গেল্ডউইন মেয়রের অভিনেতা। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার দুইবার বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার প্রথম স্ত্রী জোসেফিন ডিলন ও দ্বিতীয় স্ত্রী রিটা ল্যাঙহাম।

ক্যারেল লম্বার্ডের ন্যায় অভিনেত্রী অতি বিরল। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। বিশ্ববিখ্যাত অভিনেতা উইলিয়ম পাওয়েল তাঁহার পূর্ব্বে স্বামী।

* * *

চার্লি চ্যাপলিন নূতন যে ছবিখানি তুলিয়াছেন তাহার নামকরণ হইয়াছে, "দি ডিকটেটরস্।" তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী চিত্র মডার্ন টাইমস্-এ চার্লি আধুনিক সভ্যতা তথা যন্ত্রযুগকে তীব্র শ্লেষ এবং পরিহাস করিয়াছিলেন। "দি ডিক্টেটরস' ছবিতে চ্যাপলিন যন্ত্রযুগের দানবর্গ অর্থাৎ 'এক-নায়ক'দিগের সম্বন্ধে কি ব্যঙ্গোক্তি করেন তাহার জন্য জগৎবাসী সাগ্রহে অপেক্ষা করিবে।

* * *

হলিউড ছায়া-ছবিরাজ্যে শ্রেষ্ঠতম শিল্পীদিগকে আমেরিকার একাডেমি অব মোশন পিকচার্স আর্টস এন্ড সাইন্সেস কর্ত্তৃক প্রতি বৎসর পুরস্কৃত করা হয়—একথা আজ কাহারও অবিদিত নাই। একাডেমি কর্ত্তৃপক্ষ নির্ব্বাচিত শিল্পীদিগকে ছোট ছোট মূর্ত্তি (Statue) উপহার দিয়া থাকেন। মূর্ত্তিগুলির পরিচয় বা নাম আজ পর্য্যন্ত সাধারণ লোক বা সাংবাদিক মহলে প্রায় অজ্ঞাতই ছিল। কিন্তু ১৯৩৮ সালের কৃতকার্য্য শিল্পীদিগকে মূর্ত্তিগুলি দিবার সময়ে উহার নাম সম্বন্ধে কয়েকটি উপভোগ্য কাহিনী শুনা গিয়াছে।

কেহ কেহ বলেন যে, ওয়ার্নার ব্রাদার্সের খ্যাতনাম্নী শিল্পী বেটী ডেভিস ১৯৩৫ সালে যখন প্রথমবার শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হিসাবে একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন, তখন নাকি মূর্ত্তিগুলিকে দেখামাত্রই একান্ত আকস্মিকভাবে তাহার মুখ হইতে "অসকার" কথাটি বাহির হয়। হলিউডের ছায়ামায়ার রাজ্যে হুজুগপ্রিয় লোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়। তাই সাধারণ সমাজে মূর্ত্তিগুলির নাম "অসকার" বলিয়া চল হইল। বেটী ডেভিসের কথা—যে-সে লোকের তো আর নয়!

এই তো গেল একটি গল্প। আরও একটি চমৎকার কাহিনী সম্প্রতি শুনা গিয়াছে। একাডেমী অফিসের কর্ম্মকর্ত্তা ডোনাল্ড গ্লেডহিল এবং তাঁহার স্ত্রী এই শেষোক্ত গুজব-কাহিনীর প্রধান দুই চরিত্র। গ্লেডহিল-গৃহিণীর বিশেষ সুরসিকা বলিয়া খ্যাতি আছে।

মিসেস গ্লেডহিল মাঝে মাঝে স্বামীর অফিসে দর্শন দিতেন এবং তাঁহার স্বামী রহস্যচ্ছলে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "তোমার অস্কারকাকা কেমন আছেন?" বাস্তবে কিন্তু ঐ নামে কোন আত্মীয় মিসেস গ্লেডহিলের ছিল না। তিনি স্বামীর রসিকতা সহজে ধরিতে পারেন নাই। কয়েক মিনিট তিনি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন এবং শেষ স্বামীর রহস্য বুঝিতে পারিয়া পার্শ্বস্থ টেবিলে রক্ষিত একাডেমীর একটি মূর্ত্তির দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন—"অস্কারকাকা ঐতো বসে আছেন—তাঁকেই জিজ্ঞাসা কর।" মিঃ গ্লেডহিল সহাস্যে পত্নীর তীক্ষ্ণ উপস্থিত বুদ্ধির তারিফ করিলেন।

কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর রসিকতার জের গড়াইল বহুদূরে। কেননা সেই ঘরেই বা কাছাকাছি ছিলেন—একাডেমী অফিসের জনৈক কর্ম্মচারী। সেই ব্যক্তি স্বামী-স্ত্রীর রসিকতার উপর বেশ রং চড়াইয়া তাহা জনসমাজে প্রচার করিয়া দিল।

ইহাই হইল "অস্কার" নামের আরেকটি মূল।

একাডেমীর কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের মূর্ত্তিগুলির "অস্কার" নামকরণে নাকি বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন—কিন্তু তাঁহারা নিরুপায়!

ঙলার ফুটবল খেলা

শীঘ্রই বাঙলার ফুটবল মরসুম আরম্ভ হইবে। এই মাসের শেষ হইতেই একরূপ সারা বাঙলায় ফুটবল খেলার অভাবনীয় উৎসাহ পরিলক্ষিত হইবে। বড় বড় শহর হইতে আরম্ভ করিয়া সুদূরে পল্লীগ্রামে ইহার অভাব থাকিবে না। প্রতি বৎসর এইরূপ হইয়া থাকে; সুতরাং, এইরূপ উৎসাহ দর্শনে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। ফুটবল খেলা বাঙলার জাতীয় খেলায় পরিণত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উৎসাহের অনুপাতে খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড উন্নত হয় নাই, বরঞ্চ প্রতি বৎসর নিম্নস্তরের হইতেছে। এই বৎসরেও যে গত বৎসর অপেক্ষা উন্নততর স্তরের খেলা বাঙালী খেলোয়াড়গণ প্রদর্শন করিবেন, ইহার প্রমাণ এখনও পর্য্যন্ত আমরা পাই নাই। প্রতি বৎসর বাঙলার ফুটবল দলসমূহ যেভাবে পরিচালিত হইয়া থাকে, এই বৎসরেও ঠিক সেইভাবেই পরিচালিত হইবে। উৎসাহী বাঙালী খেলোয়াড়গণকে নিয়মিতভাবে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ফুটবল খেলার কৌশল শিক্ষা দিবার কোনই আয়োজন হয় নাই। এমন কি, খেলা আরম্ভের পূর্ব্বে খেলোয়াড়গণকে খেলার উপযুক্ত দৈহিক শক্তিলাভ করিবার জন্য যে সকল ব্যায়াম ব্যবস্থার অনুসরণ করিতে হয়, বাঙলার বিশিষ্ট খেলোয়াড়গণ যাহাতে নিয়মিতভাবে তাহা পালন করেন, তাহার কোনই ব্যবস্থা হয় নাই। খেলা আরম্ভের পূর্ব্বে কোন দিনই যে হইবে, সেই সম্বন্ধেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। গত দশ বৎসর ধরিয়া সমানে প্রতি বৎসর ফুটবল খেলার মরসুমের পূর্ব্বে আমরা পরিচালকগণের এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি; কিন্তু কোনই ফল হয় নাই। বাঙালী খেলোয়াড়গণ ফুটবল খেলায় ভারতের মধ্যে, তথা পৃথিবীর মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, ইহাই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা। সেই ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়াই আমরা প্রতি বৎসর পরিচালকগণকে আধুনিক প্রচলিত বিজ্ঞানসম্মত ফুটবল খেলার কৌশল শিক্ষার নির্দ্দেশ অনুসরণ করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতে চাহিয়াছি। কারণ, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে, শিক্ষার ব্যবস্থা হইলেই খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড খুব দ্রুত উন্নত হইবে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের ফুটবল খেলার ইতিহাস আলোচনা করিয়াই আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি।

অর্থের অভাব নাই

কেহ কেহ বলিতে পারেন, অর্থের অভাবের জন্যই শিক্ষার ব্যবস্থা হইতেছে না। আমরা তাহা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহি। কারণ, আমরা জানি বিভিন্ন ক্লাবের পরিচালকগণ নিজ নিজ দল পুষ্ট করিবার জন্য বিভিন্ন দল হইতে খেলোয়াড় ভাঙ্গাইবার জন্য অথবা অন্য প্রদেশ হইতে খেলোয়াড় আমদানী করিবার জন্য সহস্র সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন। এই বৎসরেও কয়েকটি বিশিষ্ট ফুটবল দলের পরিচালকগণ কয়েক সহস্র টাকা ব্যয় করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে। সুতরাং, অর্থাভাববশতই যে শিক্ষার ব্যবস্থা হইতেছে না, ইহা সাধারণে বিশ্বাস করিতে পারে, কিন্তু আমরা পারি না।

উৎসাহী খেলোয়াড়গণের সুবিধা

তবে এই বৎসরে অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা অন্য প্রদেশের খেলোয়াড়গণ বাঙলার বিশিষ্ট দলসমূহে কম সংখ্যক খেলিবেন বলিয়া মনে হইতেছে। মহীশূরের ফুটবল এসোসিয়েশনই এই ব্যবস্থায় বাধা সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারা নিজ প্রদেশের খেলার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়াই এইরূপ প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ফুটবল মরসুম আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে ঐ প্রদেশের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়গণকে কলিকাতার বিভিন্ন দলে যোগদান করিয়া খেলিতে দেখা যায়। বাঙলার ফুটবল মরসুম শেষ হইলে, তবে তাঁহারা দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই সময়ের মধ্যে মহীশূর হইতে কোন বিশিষ্ট দল কোন প্রদেশে খেলিবার জন্য প্রেরণ করা সম্ভব হয় না। এমন কি, মহীশূরের ফুটবল প্রতিযোগিতার সময়েও বিভিন্ন দল শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হন। শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়গণের অবর্ত্তমানে খেলার উৎসাহ ও উদ্দীপনাও দিন দিন কমিয়া আসিতেছে। খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড পড়িয়া আসিতেছে। আরও কয়েক বৎসর এইভাবে চলিতে দেওয়া অর্থে মহীশূরের ফুটবল খেলার যবনিকাপাত করা। এইজন্যই তাঁহারা নিজ প্রদেশের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়গণকে ফুটবল মরসুমের সময় নিজ প্রদেশে রাখিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের নিকট তাঁহারা আবেদন করিয়াছেন। কলিকাতার আই এফ এর নিকটও এই পত্র প্রেরিত হইয়াছে। আই এফ এর কর্তৃপক্ষগণ এখনও কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই। তবে ইতিমধ্যে অন্য প্রদেশের খেলোয়াড়গণকে বাঙলায় খেলিতে হইলে, যে সকল নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে, তাহার এক খসড়া প্রস্তুত হইয়াছে। এই খসড়া ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, অন্য প্রদেশের খেলোয়াড়গণকে বাঙলায় আনাইয়া খেলাইবার কোনই অসুবিধা নাই। অথচ যাঁহারা এই নিয়মাবলী গঠন করিয়াছেন, তাঁহারা জোর গলায় বলিতেছেন যে, অন্য প্রদেশের খেলোয়াড়গণ বাঙলায় আসিয়া যাহাতে খেলার মাঠে ভীড় জমাইতে না পারেন, তাহারই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যাঁহারা রক্ষক, তাঁহারাই যদি ভক্ষক হন, তবে এইরূপই ব্যবস্থা হইয়া থাকে। সুতরাং, আমরা বিশেষ আশ্চর্য্য হই নাই। তবে এই গণ্ডগোল উত্থাপিত হওয়ায় হয় ত অন্য প্রদেশের কোন কোন খেলোয়াড় বাঙলায় পদার্পণ করিবেন না। বাঙলার উৎসাহী কয়েকজন খেলোয়াড় তাঁহাদের স্থানে খেলিবার সুযোগ পাইবেন। সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে খেলোয়াড়গণ যদি এখন হইতে প্রাণপণ চেষ্টা করেন, তবে আমাদের বিশ্বাস আছে, তাঁহারা খেলায় ভালই ফল প্রদর্শন করিবেন।

সাপ্তাহিক সংবাদ

২৮শে মার্চ—

ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য-চুক্তি অনুমোদনের জন্য বাণিজ্য-সচিব স্যার মহম্মদ জাফরুল্লা ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে প্রস্তাব পেশ করিয়াছিলেন, দুই দিন আলোচনার পর অদ্য তাহা ৫৯-৪৭ ভোটে অগ্রাহ্য হইয়াছে। কংগ্রেস ও জাতীয় দলের সদস্যেরা এই চুক্তির বিরোধিতা করেন। আর সরকারী ও ইউরোপীয় সদস্যগণ উহা সমর্থন করেন।

ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদে বড়লাটের সুপারিশযুক্ত ফাইন্যান্স বিল ২৭-১২ ভোটে পাশ হইয়াছে। মুসলিম লীগ দল নিরপেক্ষ ছিলেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে দুইটি বে-সরকারী বিলের আলোচনা হয়; তন্মধ্যে একটি বিল অগ্রাহ্য হয়, অপরটি গৃহীত হইয়াছে। যে বিলটি অগ্রাহ্য হইয়াছে, কৃষক-প্রজাদলের সভ্য মৌলবী আবুহোসেন সরকার তাহা উত্থাপন করেন। মিঃ সরকার তাঁহার বিল দ্বারা খাসমহাল ও কোর্ট অব ওয়ার্ডস্-ভুক্ত জমিদারীগুলিতে সার্টিফিকেট জারী করিয়া খাজনা আদায়ের প্রথা বিলোপ করিতে চাহেন। যে বিলটি পরিষদে গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে বাঙলার পল্লীঅঞ্চলের গরীব ও বেকারদের সাহায্য করিবার একটি ব্যবস্থা করা হইয়াছে, যদিও এই ব্যবস্থায় গবর্ণমেণ্টকে এক কপর্দ্দকও দিতে হইবে না।

করাচীতে ওঁমণ্ডলীবিরোধী সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখা হইয়াছে। সাধু ভাস্বানী সমরপরিষদের সভাপতির পদ ত্যাগ করিয়াছেন।

আলীপুরের সিনিয়র ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস এন ভৌমিক কুমারী সুজাতা সরকারের মৃত্যু সম্পর্কিত মামলার রায় দিয়াছেন। তিনি আসামীদের বিরুদ্ধে চার্জ্জ গঠন করিয়া সকল আসামীকেই দায়রা সোপর্দ্দ করিয়াছেন। আসামীগণের বিরুদ্ধে কুমারী সুজাতা সরকারের গর্ভপাত করাইবার ষড়যন্ত্র, বেপরোয়া ও অসতর্কতামূলক কার্য্য দ্বারা সুজাতা সরকারের মৃত্যু ঘটাইবার এবং সাক্ষ্য প্রমাণাদি লোপের ষড়যন্ত্র—এই সকল চার্জ্জ গঠন করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ডাঃ এস এন চ্যাটার্জ্জির বিরুদ্ধে থানায় মিথ্যা এজাহার দানের অতিরিক্ত চার্জ্জ গঠিত হইয়াছে। আসামীদের নাম—(১) শ্রীমতী ঊষানলিনী ঘোষ, (২) ডাঃ এস এন চ্যাটার্জ্জি, (৩) মণি ভট্টাচার্য্য এবং (৪) বারীন্ মুখার্জ্জি।

প্রায় আড়াই বৎসর অবরুদ্ধ থাকার পর মাদ্রিদ ফ্রাঙ্কো গবর্ণমেণ্টের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

২৯শে মার্চ—

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে চক্ষু চিকিৎসা বিভাগের ফার্ষ্ট সার্জ্জন লেফটেনাণ্ট কর্ণেল কারোয়ানের পদে দ্বিতীয় সার্জ্জন বিখ্যাত চক্ষু চিকিৎসক ডাঃ সুশীলকুমার মুখার্জ্জির দাবী উপেক্ষা করিয়া হক মন্ত্রিমণ্ডল ঐ পদে তৃতীয় সার্জ্জন ডাঃ টি আমেদকে নিযুক্ত করিয়াছেন। ডাঃ মুখার্জ্জি বাঙলা সরকারের এই অবিচারে ও পক্ষপাতিত্বের প্রতিবাদে পদত্যাগ করিয়াছেন।

কলিকাতা কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে ফুটপাথের উপর (সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মুখে) একটি লোক খুন হইয়াছে। লোকটি প্রৌঢ় এবং ঝাড়ুদার শ্রেণীর। এই শোচনীয় মৃত্যুর কারণ এখনও সঠিকভাবে নির্ণীত হয় নাই।

এলাহাবাদে কিদগঞ্জে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হয়। দাঙ্গার সময় মুসলমানের গুলীতে দুইজন হিন্দু নিহত হইয়াছে। প্রকাশ, সেখানে কিছুদিন যাবৎ কিদগঞ্জের কালিকা মন্দিরে আরতি ও শঙ্খ বাজান লইয়া যে অসন্তোষের বহ্নি ধূমায়িত ছিল, অদ্য তাহা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে এবং প্রস্তর বর্ষণে পরিণতি লাভ করে। দাঙ্গায় উভয়-পক্ষে ১২ জন আহত হইয়াছে। শহরে সান্ধ্য-আইন ও ১৪৪ ধারা জারী হইয়াছে।

হাজারীবাগ হইতেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার খবর পাওয়া গিয়াছে। রামনবমী মিছিল উপলক্ষে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বাধে। ফলে উভয়পক্ষে কয়েকজন আহত হইয়াছে।

কাশীতে আবার হাঙ্গামা বাধে। অদ্য ছোরার আঘাতে একজনের মৃত্যু হইয়াছে।

৩০শে মার্চ—

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে অর্থসচিব কর্তৃক উত্থাপিত বেঙ্গল ফাইন্যান্স বিলটি ১০৬-৬৯ ভোটে পাশ হইয়াছে। এই বিলে বলা হইয়াছে যে, বাঙলাদেশে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কোনও ব্যবসায়ে, পেশায়, স্বাধীন-জীবিকা বা চাকুরীতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যাহাদের আয়-কর দিতে হয়, ১৯৩৯ সালের ১লা এপ্রিল হইতে তাহাদের প্রত্যেকেরই প্রতি বৎসর বার্ষিক ৩০ টাকা হারে একটি অতিরিক্ত ট্যাক্স দিতে হইবে। এস্থলে উল্লেখযোগ্য এই যে, সর্ব্বনিম্ন বার্ষিক দুই হাজার টাকা যাহাদের আয়, তাহাদেরই আয়-কর দিতে হইবে।

সিন্ধু ব্যবস্থা পরিষদে আল্লাবক্স মন্ত্রিমণ্ডলীর বিরুদ্ধে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব সম্পর্কে সুদীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টাকাল তুমুল আলোচনা হয়। সিন্ধুর ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী ডাঃ হেমন দাস অনাস্থা প্রস্তাবটি পরিষদে পেশ করেন।

নিজাম রাজ্যে শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তন সম্পর্কে শীঘ্রই এক সরকারী ঘোষণা প্রচার করা হইবে। এরূপ আশা করা যাইতেছে যে, স্যার আকবর হায়দরী আগামী এপ্রিল মাসের মধ্যেই রাজনৈতিক বন্দীদিগের মুক্তি এবং শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তন সম্পর্কে প্রকাশ্যভাবে এক ঘোষণাবাণী প্রচার করিবেন।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলিতেছে। এলাহাবাদে দাঙ্গায় এ পর্যন্ত ৪ জন মারা গিয়াছে এবং ২৪ জন জখম হইয়াছে। এলাহাবাদে সান্ধ্য-আইন জারী হইয়াছে। হাজারীবাগ দাঙ্গা সম্পর্কে এ পর্য্যন্ত ৮ জন হিন্দুকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। গিরিডিতে দাঙ্গায় বহু লোক আহত হইয়াছে। কাশীতে দাঙ্গার ফলে ছয়জন আহত হইয়াছে, তন্মধ্যে একজনের মৃত্যু হইয়াছে। জব্বলপুরে ১৪৪ ধারা জারী হইয়াছে। করাচীতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে ৪০ জন আহত হইয়াছে।

বাঙলা গবর্ণমেণ্ট এডভাইসরী কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী আরও ৫ জন রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির আদেশ দিয়াছেন। বন্দীদের নাম—(১) শ্রীঅতুলচন্দ্র সেন রায়, (২) জালালুদ্দিন চৌধুরী ওরফে জব্দু, (৩) যামিনীকুমার দে, (৪) অমরচন্দ্র সূত্রধর এবং (৫) আবদুল সোমেদ।

বর্দ্ধমানে রিজার্ভ পুলিশ লাইনের নিকট এক ভীষণ বাস দুর্ঘটনার ফলে ১৮ জন গুরুতররূপে আহত হইয়াছে।

কোলাপুর রাজ্যের প্রজা-পরিষদ রাজ সরকার কর্ত্তৃক বে-আইনি বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

পাঞ্জাব সরকার 'বিপ্লব' নামক উর্দ্দু পত্রিকার ১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারী সংখ্যা বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন।

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের বর্ত্তমান অচল অবস্থা সম্পর্কে গান্ধীজীর সহিত পত্র ব্যবহার করিতেছেন।

দিল্লীতে বিরলা ভবনে গান্ধীজীর সহিত কংগ্রেস সমাজ-তন্ত্রী দলের নেতাগণের আলোচনা হয়। ইঁহাদের মধ্যে আচার্য্য নরেন্দ্রদেব, শ্রীযুত অচ্যুত পট্টবর্দ্ধন ও শ্রীযুত জয়-প্রকাশ নারায়ণ উপস্থিত ছিলেন। ইঁহারা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ গ্রহণের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

৩১শে মার্চ্চ—

সন্তোষের মহারাজা স্যার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী তাঁহার আলিপুরস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন।

লাহোরে কিষাণ সত্যাগ্রহ সম্পর্কে সোধি পিণ্ডিদাস প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট কিষাণ নেতা ধৃত হইয়াছেন। আজ সত্যাগ্রহের নবম দিবস।

হুগলীর বিশিষ্ট কৃষক নেতা শ্রীযুত তুষারকান্তি চ্যাটার্জ্জির উপর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ১৪৪ ধারা জারী করিয়াছেন।

লক্ষ্ণৌয়ে মাধে-সাহেবা আন্দোলন অকস্মাৎ গুরুতর আকার ধারণ করে এবং হাজার হাজার সিয়া ও সুন্নীর মধ্যে ভয়ানক সংঘর্ষ হয়। পুলিশকে গুলী চালাইতে হয় এবং পুলিশ এগারবার গুলী বর্ষণ করেন। ১২ জনেরও অধিক কনেষ্টবল ও তিনজন পুলিশ অফিসার ও অনেক দাঙ্গাকারী জখম হইয়াছে। শহরে সান্ধ্য আইন জারী হইয়াছে।

সিন্ধুর আল্লাবক্স মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হইয়াছে। স্বতন্ত্র হিন্দুদলের সহিত মন্ত্রীদের একটা আপোষ হইয়া যাওয়ায় এইরূপ করা হইয়াছে।

দমদম সেন্ট্রাল জেল হইতে নিম্নলিখিত চারিজন রাজ-নৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছেঃ—(১) শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত, (২) শ্রীচন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, (৩) শ্রীজলধর বন্দ্যোপাধ্যায় ও (৪) শ্রীসচীন্দ্রকুমার নন্দী।

প্রস্তাবিত মৃত্যুকর সম্পর্কে প্রাদেশিক সরকারসমূহ বিরুদ্ধভাব প্রকাশ করিয়াছে বলিয়া ভারত সরকার এ সম্বন্ধে আর কিছু না করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

চীনারা জাপ-সৈন্যদের বিরুদ্ধে গরিলাযুদ্ধ চালাইতেছে। শানসি প্রদেশে গুহা নির্ম্মাণ খুব সহজ; চীনারা তাহার সম্পূর্ণ সুবিধা গ্রহণ করিয়াছে। মার্শাল ইয়ান সি-শান চারি-দিকে পর্ব্বত বেষ্টিত গুহার মত একটি শহর হইতে সমগ্র শানসি প্রদেশ এবং হোপেই, চাহার ও সুইউয়ানের কতক অংশে যুদ্ধ চালাইতেছেন।

বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেন কমন্স সভায় ঘোষণা করেন যে, পোলাণ্ড আক্রান্ত হইলে, বৃটিশ তাহাকে সাহায্য করিবে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট পোলাণ্ডকে এই মর্ম্মে প্রতিশ্রুতিও দিয়াছেন। মিঃ চেম্বারলেন ইহাও ঘোষণা করেন যে, ফ্রান্স যে এই ব্যাপারে বৃটেনের সহিত একমত, ফরাসী সরকার তাঁহাকে তাহা ঘোষণা করিবার অনুমতি দিয়াছেন।

লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ যে, গতকল্য বৃটিশ মন্ত্রিসভার এবং বৃটিশ, ফরাসী, পোলাণ্ড এবং রুমানিয়া গবর্ণমেণ্টের মধ্যে গভীর আলোচনা হয়।

১লা এপ্রিল—

রাজকোটের ব্যাপারে বড়লাটের হস্তক্ষেপের ফলে এক নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। সংবাদে প্রকাশ, নরেন্দ্র-মণ্ডলের চ্যান্সেলার নবনগরের জামসাহেব ভারত সচিবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যে শীঘ্রই বিলাত যাত্রা করিবেন। দেশীয় রাজন্যবর্গ ও সার্ব্বভৌম শক্তির মধ্যে কি সম্বন্ধ, তাহা পরিষ্কারভাবে অবগত হইবার জন্যই জামসাহেব ভারত সচিবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন।

বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন মজুমদার তাঁহার ভবানীপুরস্থ ভবনে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭২ বৎসর হইয়াছিল।

লণ্ডনের রাস্তায় আবার পর পর বোমা বিস্ফোরণ হয়। প্রকাশ, সন্ত্রাসবাদীরা মোটরে চড়িয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া এই বিস্ফোরণ ঘটায়।

এলাহাবাদ ও কাশীতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। এলাহাবাদে ৪ জন লোক ছুরিকা-ঘাতে আহত হইয়াছে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু স্থানীয় কতিপয় কংগ্রেসকর্ম্মীসহ দুই ঘণ্টাকাল শহরের উপদ্রুত অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করিয়া বেড়ান। তাঁহাদের সম্মুখেই তিনজনকে ছুরিকাঘাত করা হয়।

এলাহাবাদ ও কাশী উভয় শহরেই পূর্ণমাত্রায় আতঙ্ক বিরাজ করিতেছে এবং অধিকাংশ দোকানপাট বন্ধ আছে।

মিশরীয় প্রতিনিধিদল ভারতে তিন সপ্তাহ অবস্থানের পর অদ্য বোম্বাই হইতে জাহাজযোগে স্বদেশ যাত্রা করিয়াছেন।

বৃটেন ও ফ্রান্সের সাবধান-বাণীর উত্তরে হের হিটলার উইলহেলম হেভেনে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন যে, কোন রাষ্ট্র যদি জার্ম্মানীর সহিত শক্তি পরীক্ষা করিতে চাহে, তবে জার্ম্মান জাতি তজ্জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছে। বৃটেনকে উপহাস করিয়া হের হিটলার বলেন, "তিনশত বৎসর ধরিয়া বৃটেন অধর্ম্মাচরণ করিয়া আসিতেছে; অথচ এখন বুড়া বয়সে ধর্ম্মের বুলি আওড়াইতেছে।"

আসাম ব্যবস্থা পরিষদে নিম্নলিখিত পাঁচটি সরকারী বিল পাশ হইয়াছেঃ—(১) মোটর স্পিরিট ও লুব্রিকেট বিক্রয়ের উপর ট্যাক্স ধার্য্যকরণ বিল, (২) আসামের ট্যাক্স বিষয়ক বিল (১৯৩৯), (৩) প্রমোদকর ও বাজি রাখার উপর ট্যাক্স ধার্য্যকরণ বিল, (৪) আসামের কমিশনারগণের কার্য্য বণ্টন বিষয়ক বিল, (৫) মোটর যানসমূহের উপর ট্যাক্স ধার্য্যকরণ বিল।

ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ মহিলাকর্ম্মী ভূতপূর্ব্ব আইন [illegible]

ও "জয়শ্রী" মাসিক পত্রিকার সম্পাদিকা শ্রীমতী লীলাবতী নাগ এম-এ-র সহিত ঢাকার প্রসিদ্ধ কর্ম্মী, ভূতপূর্ব্ব উকিল ও আটক বন্দী শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র রায় এম-এ, বি-এল-এর শুভবিবাহ স্থির হইয়াছে।

বোম্বাই হইতে ইতালীয়-গামী একখানি জাহাজের কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতীয় যাত্রী ঐ জাহাজেরই যাত্রী ভারতীয় সৈন্যদলের কয়েকজন বৃটিশ সামরিক কর্ম্মচারীর দুর্ব্যবহার সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসুর নিকট এক পত্র লিখিয়াছেন।

২রা এপ্রিল—

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধন বিলের প্রতিবাদকল্পে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির উদ্যোগে কলিকাতা শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক বিরাট জনসভা হয়। শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

কলিকাতা লাইট হর্স পদাতিক সৈন্যদলের রতন সিং (৩০) রাইফেলের গুলীতে প্রাণ হারাইয়াছে। প্রকাশ যে, গত শনিবার সে যখন বালীগঞ্জ বডি-গার্ড লাইনের নিকট দিয়া যাইতেছিল, তখন সুলতান সিং (৪৫) নামক অপর একজন সৈনিক হঠাৎ তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া গুলী করে। সঙ্গে সঙ্গে রতন সিংএর মৃত্যু হয়। আসামী ধৃত হইয়াছে।

গত ২৯শে মার্চ্চ শ্রীমতী বীণা দাস প্রেসিডেন্সী জেল হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন। স্মরণ থাকিতে পারে যে, ১৯৩২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী বাঙলার তদানীন্তন গবর্ণর স্যার ষ্ট্যানলী জ্যাকসন যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন সভায় বক্তৃতা করিতেছিলেন, তখন শ্রীমতী বীণা দাস তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলী ছোড়েন। এই সম্পর্কে শ্রীমতী বীণা দাস কলিকাতা হাইকোর্টের স্পেশ্যাল ট্রাইবুন্যালের বিচারে ৯ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

৩রা এপ্রিল—

স্যার মরিস গায়ারের রায় অবগত হইয়া মহাত্মা গান্ধী স্বস্তি বোধ করেন। ইহার ফলে তাঁহার স্বাস্থ্যোন্নতির লক্ষণ দেখা যাইতেছে। দুই একদিনের মধ্যেই গান্ধীজী দিল্লী ত্যাগ করিবেন। তৎপূর্ব্বে সম্ভবত তিনি বড়লাটের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিবেন।

প্রিভি কাউন্সিল ত্রিবাঙ্কুর ন্যাসনেল এণ্ড কুইলন ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরগণের আপীল অগ্রাহ্য করিয়াছেন। মাদ্রাজ হাইকোর্টের ফুলবেঞ্চ ও ডিভিসনাল বেঞ্চের আদেশ বহাল রাখা হইয়াছে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের ক্ষমতা আরও খর্ব্ব করার জন্য আয়োজন চলিতেছে। এই উদ্দেশ্যে বাঙলা সরকার পরিষদের বর্ত্তমান অধিবেশনেই একটি বিল আনিবার মনস্থ করিয়াছেন। এই বিলের উল্লেখযোগ্য বিষয় এই হইবে যে, প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা, চীফ-ইঞ্জিনিয়ার, হেলথ অফিসার এবং ডিপার্টমেণ্টের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

জেনারেল ইসমেত ইনোনু পুনরায় চার বৎসরের জন্য তুরস্কের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

সিন্ধুর মন্ত্রিসঙ্কটের অবসান হইয়াছে। হিন্দুমন্ত্রী নিছলদাস ও দিয়ালমল দৌলত রামকে পুনরায় সিন্ধু মন্ত্রিসভায় লওয়া হইয়াছে।

বাঙলার বিভিন্ন স্থানে অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে মুর্শিদাবাদের এক গ্রামে অগ্নিকাণ্ডের ফলে একটি বালকের শোচনীয় মৃত্যু হইয়াছে। কুমিল্লা জিলার নবিনগর থানার একগ্রামে অগ্নিকাণ্ডের ফলে ২শত বাড়ী ভস্মসাৎ হইয়াছে। একজন স্ত্রীলোকের আগুনে পুড়িয়া মৃত্যু হইয়াছে এবং অপর একজন স্ত্রীলোককে ব্রাহ্মণবাড়িয়া হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হইয়াছে।

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করিতেছেন।

দমদম সেন্ট্রাল জেল হইতে আরও ৫জন রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। ইঁহাদের নাম—(১) শ্রীরঙ্গলাল গাঙ্গুলী, (২) শ্রীপ্রশান্তকুমার সেন, (৩) শ্রীঅনাথবন্ধু চক্রবর্ত্তী, (৪) শ্রীকৃষ্ণদাস সেনরায়, (৫) শ্রীসতীশচন্দ্র বসুরায়।

বাঙলার গবর্ণর স্যার রবার্ট রীড আউটরাম ঘাটের সম্মুখে ষ্ট্রাণ্ড রোডের উপর পরলোকগত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের প্রতিমূর্ত্তি আবরণ উন্মোচন করিবেন।

যুক্তরাষ্ট্রের আদালতের প্রধানবিচারপতি স্যার মরিস গায়ার রাজকোটের ব্যাপার সম্পর্কে রায় দিয়াছেন। তিনি রায়ে এই মর্ম্মে মন্তব্য করিয়াছেন যে, আলোচ্য দলিলের প্রকৃত অর্থ এই যে, সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল যে সকল ব্যক্তিকে সুপারিশ করিবেন, ঠাকুর সাহেব তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন এবং ঠাকুর সাহেব তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদিগকে অনুমোদন করেন না, তাঁহাদিগকে অগ্রাহ্য করার অধিকার তিনি নিজের হাতে রাখেন নাই। তিনি অবশ্য সুপারিশের সমালোচনা করিতে এবং পুনর্ব্বিবেচনার জন্য কারণ দেখাইতে পারেন, কিন্তু সুপারিশ করা লোকদের মধ্যে রাজ্যের প্রজা বা কর্ম্মচারী নহেন, ইহা প্রমাণিত না হইলে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সুপারিশই চূড়ান্ত হইবে।

শ্রীযুক্ত বি এন করঞ্জিয়া (কংগ্রেস) বোম্বাইয়ের মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে মহাজনী কারবার নিয়ন্ত্রণ বিলের আলোচনা হয়। অতিমাত্রায় সুদখোর পেশাদার মহাজনদের নির্য্যাতন হইতে দুঃস্থ খাতকদের রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্ট বিলটি উত্থাপন করেন। কিন্তু সিলেক্ট কমিটি বিলে যে পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাতে বিলের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া অনেকে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কংগ্রেসীদলের সদস্য শ্রীযুক্ত জে সি গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস রিপোর্টে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট মাফিক বিলটি যদি আইনে পরিণত হয়, তাহা হইলে পল্লী-অঞ্চলে টাকা পয়সা লেন-দেনের কারবার একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে এবং দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসারে বিঘ্ন ঘটিবে।
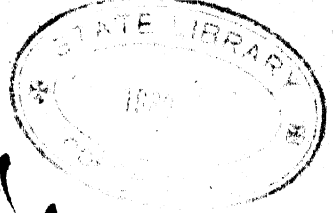
৬ষ্ঠ বর্ষ]　　শনিবার, ১৮ই চৈত্র, ১৩৪৫ সাল, Saturday, 1st April, 1939.　　[২০শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

রাষ্ট্রপতির বিবৃতি—

ত্রিপুরী অধিবেশনে পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থের প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার ফলে যে সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে, রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র সম্প্রতি সে সম্বন্ধে একটি বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। সুভাষচন্দ্রের মতে কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি গঠন করিবার পূর্ব্বে পন্থপ্রস্তাবানুযায়ী তাঁহার জানা দরকার যে, (১) চলতি কংগ্রেস বৎসরে কংগ্রেসের কার্য্যক্রম কিরূপ হওয়া উচিত বলিয়া মহাত্মাজী মনে করেন? (২) ত্রিপুরী কংগ্রেসের পূর্ব্বের এবং পরের ঘটনাগুলির পর কংগ্রেসের প্রধান দুই দলের মধ্যে পরস্পর সহযোগিতা করা সম্ভবপর কি না, তাহা গান্ধীজীর সহিত আলোচনা করিয়া স্পষ্ট হওয়া দরকার, (৩) মহাত্মা গান্ধী কিরূপ সদস্য লইয়া কার্য্যকরী সমিতি গঠন করিতে চাহেন? উহা কি এক দলের লোক লইয়াই গঠিত হইবে, না, সুভাষচন্দ্রের মতানুসারে সকল দলের লোক লইয়া গঠিত হইবে। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি, ত্রিপুরী কংগ্রেসে সমবেত হইয়া গান্ধীজীর নামের দোহাই দিয়া কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী দল যে প্রস্তাব পাশ করাইয়া লইয়াছেন, তাহা সুস্পষ্টভাবে কংগ্রেসের বিধি-বিধানের বিরোধী। এরূপ অবস্থায় ইহা লইয়া একটা সমস্যা দেখা দিবে যে, ইহা জানা কথা, এবং এই সমস্যার সমাধান করিতে হইলে গান্ধীজী এবং সুভাষচন্দ্রের মধ্যে খোলাখুলিভাবে আলোচনা হওয়া দরকার। মহাত্মা গান্ধী ত্রিপুরী কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন না বটে; কিন্তু বল্লভভাই-পন্থী দক্ষিণ মার্গাবলম্বীগণ যে মহাত্মাজীর মতেরই খানিকটা প্রতিধ্বনি করিয়াছেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। পন্থ-প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর দক্ষিণ পন্থীদের মতের ঘোরপ্যাঁচ যে একেবারে কাটিয়া গিয়াছে, তাঁহারা মুখে সে কথা যতই বলুন না কেন, আমরা তাহা মনে করি না; এমন অবস্থায় রাষ্ট্রপতি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোন কাজ করিতে গেলেই হয়ত তাঁহারা তাহার নূতন রকম একটা ব্যাখ্যা করিয়া বসিবেন, এবং তাঁহাদের মনের বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাইবে। এরূপ অবস্থায় বিষয়টা একেবারে পরিষ্কার হইতে পারে শুধু তখন, যখন মহাত্মাজী নিজে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আলোচনা করিয়া একটা সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারেন; তৎপূর্ব্বে নহে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি নিজে রোগ-শয্যায় শায়িত, মহাত্মাজীও অসুস্থ। এই সব নানা কারণে এই আলোচনা সম্ভব হইয়া উঠিতেছে না। কিন্তু সেজন্য রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের উপর দোষ চাপাইলে বিষয়টি যে শুধু ঘোরালো করিয়াই ফেলা হয়, তাহা নহে, সেই সঙ্গে রাষ্ট্রপতির প্রতি তাঁহার মর্য্যাদার অনুরূপ সৌজন্য এবং শিষ্টাচারও প্রদর্শন করা হয় না। এই ধরণের একচোখা মনোবৃত্তি জাতির পক্ষে হিতকর বলিয়া আমরা মনে করি না। সুভাষচন্দ্র বিষয়টি কোন দলের দিক হইতে দেখেন নাই, নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়াছেন। কংগ্রেসের সভাপতিস্বরূপে তিনি জাতির প্রতি কর্ত্তব্য সাধনের দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। সব নির্ভর করিতেছে এখন মহাত্মাজীর উপর। তিনি বর্ত্তমানের এমন একটা সন্ধিক্ষণে জাতিকে অভীষ্ট সিদ্ধির দিকেই লইয়া যাইবেন, এই সব তুচ্ছ সংশয়-সন্দেহ এবং দলাদলির মনোবৃত্তি দূর হইয়া কংগ্রেসের মধ্যে ঐক্যের প্রতিষ্ঠা হইবে, এই বিশ্বাসই আমরা অন্তরে অন্তরে পোষণ করিতেছি।

মিশরীয় প্রতিনিধিদের স্বদেশ যাত্রা—

মিশরীয় প্রতিনিধিদলের মধ্যে দুইজন পীড়িত হওয়ায় তাঁহাদের কলিকাতা পরিদর্শন করা হয় নাই। তাঁহারা বোম্বাইতে ফিরিয়া দেশে যাত্রা করিয়াছেন। ভারতের জাতীয়তাবাদের জন্মক্ষেত্রই বাঙলা—মিশরের প্রতিনিধিদল

এই কলিকাতায় আসিতে পারিলেন না, এজন্য বাঙালীমাত্রেই দুঃখিত হইয়াছেন। মিশরের স্বদেশ-প্রেমিক এবং স্বাধীনতার উপাসকদলকে দেখিবার জন্য সকলেই বিশেষ আগ্রহ সহকারে অপেক্ষা করিতেছিলেন, এবং বাঙলা দেশের পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে সাধ্যশক্তি মত অভ্যর্থনা করিবার আয়োজনও হইয়াছিল। বাঙালীর আর একটা দিক হইতেও বড় আশা ছিল। বাঙলার আজ বড়ই দুর্দ্দিন। বিপন্ন ইস্‌লামের বুজরুকী ধরিয়া একদল সাম্প্রদায়িকতাবাদী বাঙলার সভ্যতা এবং সংস্কৃতিকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। মিশরীয় প্রতিনিধিদল যদি বাঙলা দেশে আসিতেন, তাহা হইলে এই দলের বুজরুকী অনেকটা ভাঙ্গিত। যাহারা বিপন্ন ইসলামী জিগীরে ভুলিতেছে, তাহারা বুঝিতে পারিত, সেই জিগীরের মূলে দৃষ্টিটা কোথায়? মিশরীয় প্রতিনিধিদল মুসলীম সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের সেই মনস্তত্ত্বটা ধরাইয়া দিয়াছেন। ইহা হইতেছে তাঁহাদের ভারত পরিদর্শনে ভারতের পক্ষে একটা মহান্ লাভ। মিশরীয় প্রতিনিধিরা যে বাণী এদেশে বহন করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহা স্বাধীনতার বাণী। তাঁহারা বাঙলা দেশে আসিতে পারেন নাই, ইহা অবশ্যই দুঃখের বিষয় কিন্তু আমাদের বিশ্বাস আছে যে, তাঁহাদের যে বাণী, সেই স্বাধীনতার বাণী, বাঙালীর অন্তরকে স্পর্শ করিয়া সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের চেষ্টাকে শিথিল করিয়া দিবে। বাঙলার মুসলীম সমাজ—বিশ্ব মুসলিম সমাজ আজ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে যে সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছে, তাহার মূলীভূত উদার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবে।

ত্রিপুরী ও বাঙালীর মনোভাব—

গত ১২ই চৈত্র, রবিবার কলিকাতায় শ্রদ্ধানন্দ পার্কে ত্রিপুরী কংগ্রেসে গৃহীত পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থের প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য যে সভা হয়, তত বড় সভা কলিকাতায় সম্প্রতি খুব কমই হইয়াছে। এই সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব দুইটি গৃহীত হইয়াছে—(১) ত্রিপুরী কংগ্রেসে পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থের প্রস্তাব সম্পর্কে কংগ্রেসের কতিপয় বিশিষ্ট সদস্য যে মনোভাব দেখাইয়াছেন, কলিকাতা নাগরিকদের এই সভা তাহাতে দুঃখপ্রকাশ করিতেছে। কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রের সহিত পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাবের অসঙ্গতি অত্যন্ত বেশী। এই প্রস্তাব এতাবৎকাল প্রচলিত প্রথার বিরোধী। এই সভার মতে প্রস্তাবটি কংগ্রেসে গৃহীত হওয়ায় কংগ্রেসকর্ম্মীদের মধ্যে অনৈক্য ও ভেদ-বিভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। (২) রাষ্ট্রপতির স্বাস্থ্য সম্পর্কে এই সভা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছে। সভা বাঙলার জনগণকে অনুরোধ করিতেছে যে, তাঁহারা যেন আগামী ২রা এপ্রিল বাঙলার সর্ব্বত্র সভা-সমিতি করিয়া (১) ত্রিপুরী কংগ্রেসের প্রস্তাবের আলোচনা করেন এবং (২) রাষ্ট্রপতির সত্বর রোগ মুক্তির জন্য প্রার্থনা করেন। পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভের প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া বাঙলা দেশে কিভাবে দেখা দিয়াছে এই প্রস্তাবটি সে পক্ষে প্রমাণ। এ সম্বন্ধে আমরা দক্ষিণমার্গী নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। সমস্যা সকল দিক হইতে যেভাবে ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে কংগ্রেসের মধ্যে যদি একটা ভেদ-বিভেদের ভাব বিস্তার লাভ করে, তাহা দেশের পক্ষে ঘোরতর অনিষ্টের কারণ হইবে এবং ভারতের স্বাধীনতার যাহারা বিরোধী, তাহাদেরই হইবে সুবিধা। এই যে আশঙ্কা আজ দেখা দিয়াছে, ইহার জন্য দায়ী হইতেছেন দক্ষিণপন্থী নেতারা। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইবার পর মহাত্মাজী যে বিবৃতি প্রচার করেন, তাহাতে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছিলেন যে,—"সংখ্যালঘিষ্ঠ হইলেন যাঁহারা, ত্রিপুরী কংগ্রেসের সাফল্য কামনা করাই তাঁহাদের উচিত। তাঁহারা যদি পারেন, সংখ্যাগরিষ্ঠদের শক্তি বর্দ্ধিত করুন, সংখ্যালঘিষ্ঠগণ যেন কোনক্রমেই সংখ্যাগরিষ্ঠদিগকে বাধা না দেন।" কিন্তু দক্ষিণপন্থীরা মহাত্মাজীর এই নির্দ্দেশ প্রকাশ্যভাবে এবং নিতান্ত উপেক্ষা সহকারে ও আক্রোশপূর্ণভাবে ভঙ্গ করেন, তাহার ফলে যে গরলের উদ্ভব হইয়াছে, একমাত্র মহাত্মাজীই নীলকণ্ঠের মত তাহা পান করিয়া বর্ত্তমান সংকট হইতে দেশকে রক্ষা করিতে পারেন।

সমর বিভাগে বাঙালী—

ভারত সরকারের মতে বাঙালী অসামরিক জাতি। সিপাহীর ব্যবসায়ের তাহারা বাহিরে; কিন্তু বাঙালী যে সিপাহীগিরিতে পশ্চাৎপদ ছিল না, ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বাড়ুয্যে যুক্তিসহকারে তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। ডাক্তার বন্দ্যোপাধ্যায় এই অভিযোগ করিয়াছিলেন যে, সরকারী ব্যবস্থা অনুসারে সিপাহীগিরি শুধু উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পাঠানদের পক্ষে একচেটিয়া হইয়াছে। গত ১৪ই চৈত্র 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল মুখুজ্যে এই সম্পর্কে একখানি চিঠি প্রকাশ করিয়াছেন। মুখুজ্যে মহাশয় একজন ভূতপূর্ব্ব সিপাহী। ইনি ব্রহ্মযুদ্ধে গিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন—

'সমর বিভাগে বাঙালীর দাবী শীর্ষক আপনাদের সম্পাদকীয় মন্তব্য পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের যুক্তি নিখুঁত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব্বে লাল-পল্টন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজ্য বিস্তারের শ্রেষ্ঠ সম্বল ছিল। ভরতপুর যুদ্ধের যদি কিছু নথি বাহির হয় ও জাঁদরেল কালুর (কালীচরণ ঘোষ) নথি দেখাইতে পারা যায়, তবে স্যার মহম্মদেরও চক্ষুলজ্জা হইতে পারে। তবে সুযোগের অপচয় বাঙালী নিজেই করিয়াছে। বাঙালী চিরকালই ঘরমুখী। অন্নপ্রাচুর্য্য হেতু পাইক বৃত্তি গ্রহণে তাহারা লজ্জিত হইত। অন্য প্রদেশবাসীরা আর, এফ-এ এবং আর-জি-এ প্রভৃতি ব্যাজ লাগাইয়া হাবিলদার, জমাদার প্রভৃতি হইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে; কিন্তু বাঙালী তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। তাহারা ইনফ্যানট্রিতে রাইফেলম্যান, গ্রিনেডিয়ার, মেশিনগানার প্রভৃতিতে কৃতিত্বের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইবার দাবী রাখে।

নাইট মহোদয়ের উল্লিখিত যে কোন প্রদেশের মেসিনগান যোদ্ধার সঙ্গে এই অযোগ্য প্রদেশে ২০ বৎসরের অনভ্যাসের পরেও প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার লোক বর্ত্তমান

আছে। নাইট মহোদয় সুবেদার মজুমদারের কৃতিত্বের খোঁজ রাখেন কি? ব্রহ্মের সৈন্যবাহিনীতে খোঁজ করুন। সেখানে এমন অনেক কৃতিত্বসম্পন্ন বাঙালীর সন্ধান মিলিবে—যাহারা কৃতিত্বের সহিত এন সি ও ও কমিশনপ্রাপ্ত অফিসারের কর্ত্তব্য পালন করিয়াছে। আমিও জনকয়েক বাঙালী মেকানাইজড ট্রান্সপোর্টের মূলে ছিলাম। তখন সবেমাত্র ইউনিটটি পরীক্ষামূলকভাবে খোলা হইয়াছিল এবং এখন পর্য্যন্ত যে কয়জন জীবিত আছে তাহারা ড্রাইভিং ছাড়া মাস্কেট্রি বেয়নেট ফাইটিং, ইনফ্যানট্রি ও ক্যাভেলরী ড্রিল, গার্ড এবং ফিউনারেল প্যারেডে যে কোন প্রদেশের উল্লিখিত ইউনিটে নিযুক্ত লোকদের সহিত প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে প্রস্তুত আছে।"

মহামতি গোখলে দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, ইংরেজ শাসনের সবচেয়ে বড় দোষ হইল এই যে, এই শাসন ভারতবাসীদিগকে নিস্তেজ এবং মনুষ্যত্বশূন্য করিয়াছে। জগতের রাষ্ট্রনীতির অবস্থা যেমন আকার ধারণ করিতেছে, তাহাতেও কর্ত্তাদের চোখ খুলিতেছে না। তাহাদের যে নীতি সে নীতির ফলেই ভারতবাসীরা অসহায় থাকিতেছে, দেশ-রক্ষার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতেছে না এবং ভারতবাসীরা যখন দেশের স্বাধীনতা দাবী করিতেছে, তখন তাঁহারাই আবার ভারতবাসীর উপর উল্টা চাপ দিয়া বলিতেছেন,—তোমরা অসহায়, দেশ রক্ষা করিবার ক্ষমতা তোমাদের নাই। সমর বিভাগে আমাদের কর্ত্তৃত্ব না থাকিলে তোমরা যে মারা যাইবে। যুক্তি অপূর্ব্ব। এমন রোকা বুঝে ভারতবাসীরা আর ভুলিতে প্রস্তুত নয়। সাম্রাজ্য স্বার্থের জন্য গোরা পুষিবার নিমিত্ত ভারতবাসীদের জন্ম হয় নাই, বিশেষত যে সাম্রাজ্যে ভারতবাসীদের অবস্থা কুকুর বিড়ালেরও অধম।

হিন্দু মন্ত্রিগণের প্রতিবাদ—

শুনা গিয়াছিল যে, হক মন্ত্রিমণ্ডলে আর এক নূতন সঙ্কট দেখা দিয়াছে এবং কয়েকজন হিন্দু মন্ত্রী পদত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন এবং ইহাও শুনা গিয়াছিল যে, কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল লইয়াই এই সঙ্কটের আবির্ভাব। পরে জানা গিয়াছে যে, হিন্দু-মন্ত্রীদের এই যে গোসা, ফকীরের ফিকীরীতে তাহা ঠাণ্ডা হইয়াছে এবং প্রকারান্তরে হিন্দু মন্ত্রীরা এই গোসা করিয়া ভারতের মুসলমান সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য যিনি ফকীরী লইয়াছেন বাঙলার সেই যে প্রধান মন্ত্রী তাঁহারই কেরামত বাড়াইয়া মুরীদগিরির মাহাত্ম্য বজায় রাখিয়াছেন। হিন্দু মন্ত্রীদের এই গোসা হইয়াছিলই বা কেন এবং গেলই বা কেন, ইহা জানিবার জন্য সাধারণের আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। ভিতরের কথা যতদূর জানা যায়, তাহা এই যে, প্রস্তাবিত কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিলে তপশিলী হিন্দুদের জন্য ৭টি আসন পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে; সিলেক্ট কমিটির সদস্যেরা এই প্রস্তাব করেন যে, মুসলমানদের জন্য যেমন স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনপ্রথা প্রবর্ত্তন করা হইতেছে, তেমনই তপশিলীদের জন্য ও কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটিতে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তন করা হউক। হিন্দু মন্ত্রীদের বিবেকে ইহাতে নাকি খোঁচা লাগে এবং তাঁহারা মন্ত্রিমণ্ডলে থাকিতে কলিকাতার হিন্দুদের স্বার্থের হানি হইবে, ইহা তো তাঁহারা বরদাস্ত করিতে পারেন না, তাই তাঁহারা বাঁকিয়া বসেন। ইহার ফলে তপশিলীদের জন্য স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনপ্রথা প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং মন্ত্রীরা সেইভাবে হিন্দু স্বার্থ রক্ষা করিয়া তাঁহাদের বিবেককে তাজা রাখিয়াছেন। হিন্দু স্বার্থরক্ষার এমন ন্যাকামি যে প্রভুরা দেখাইতে গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে কি বলিব, আমরা ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না। নিতান্ত অন্যায়ভাবে হিন্দুদের অধিকারকে ক্ষুণ্ন করিবার যে প্রচেষ্টা রহিয়াছে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিলের মধ্যে, যদি তাঁহাদের বিবেকে সে জিনিষই না বাধে তবে আর ঐ ভড়ংয়ের মূল্য কি? কলিকাতার করদাতাদের মধ্যে হিন্দুদের সংখ্যা শতকরা ৭৫ জন, হিন্দুদের এই যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা, প্রস্তাবিত মিউনিসিপ্যাল বিলে কূটকৌশল প্রয়োগে সেই সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে ধ্বংস করিয়া হিন্দুদিগকে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ে পরিণত করা হইয়াছে। কলিকাতার যে পৌর-প্রতিষ্ঠানের প্রধানত কর্ত্তৃত্ব ছিল বাঙালীদের হাতে, জাতীয়তার বিরোধী সর্ব্বনাশকর ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়া পৌর-প্রতিষ্ঠানের সেই কর্ত্তৃত্ব দেওয়া হইতেছে মুষ্টিমেয় শ্বেতাঙ্গ স্বার্থবাহদের হাতে। ম্যাকডোন্যাল্ডী বাঁটোয়ারোর মহিমায় এই বাঙলা দেশের শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে কর্ত্তৃত্ব যেমন প্রকৃতপক্ষে মুষ্টিমেয় শ্বেতাঙ্গদের হাতে গিয়াছে, কি হিন্দু, কি মুসলমান কেহই তাহা পায় নাই; কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিলে সেইরূপ স্বদেশ এবং স্বজাতির সমূহ সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া কলিকাতার পৌরপ্রভুত্ব সমর্পণ করা হইয়াছে বিদেশীদের হাতে। এমন ব্যবস্থায় যাঁহারা সায় দিতে পারেন, যাঁহাদের বিবেকে বাধে না এমন অনিষ্টকর ব্যবস্থার মূলীভূত নীতি, তাঁহারা আবার হিন্দু স্বার্থরক্ষার ভড়ং দেখাইতে চাহেন কোন্ মুখে? আমরা তাঁহাদের এমন নির্লজ্জতার পরিমাপ করিয়া উঠিতে পারি না। হিন্দু স্বার্থের বিন্দুমাত্র অনুভূতি যাহাদের মধ্যে আছে, অনুভূতি আছে জাতীয়তার এবং গণতান্ত্রিকতার—তাঁহারা এমন ব্যবস্থা এক মুহূর্ত্তের জন্যও মানিয়া লইতে পারেন না। তাঁহারা এই যে ঢং মাঝে মাঝে দেখাইতে চাহেন, তাঁহাদের এটুকু বুঝিবার মত ক্ষমতা থাকা উচিত যে, ইহাতে দেশের লোকের শ্রদ্ধা তাঁহাদের উপর বাড়ে না, বরং অশ্রদ্ধাই বৃদ্ধি পায়। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিলের ব্যাপারে তাঁহারা যে কুকীর্ত্তি অর্জ্জন করিলেন, বাঙালীর অন্তরে অন্তরে তাহা চিরদিন গাঁথা হইয়া থাকিবে। জাতীয়তার অনুভূতিতে উত্তরোত্তর জাগ্রত বাঙলা তাঁহাদিগের নাম শুনিয়া ধিক্কার দিবে।

এই প্রসঙ্গে আমরা শুনিতে পাইতেছি যে, কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল সম্পর্কিত সিলেক্ট কমিটির বৈঠকে মতের অনৈক্য বশত কংগ্রেসী দলের সভ্যগণ বৈঠক হইতে বাহির হইয়া যান। প্রথমে নাকি গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে এই আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল যে, সাধারণ নির্ব্বাচন কেন্দ্রগুলিতে আসনসংখ্যা ৪৫ হইতে বাড়াইয়া ৬০ করা হইবে, কিন্তু পরে

গবর্ণমেণ্ট জানান যে, তাঁহারা ৪৫টি আসনের পক্ষেই থাকিবেন। যাহা হউক, আমাদের ধারণা এই যে, এই ধরণের তুকতাকে কুলাইবে না, বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী সাম্প্রদায়িকতার যে মনোবৃত্তি লইয়া চলিতেছেন, কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিলের প্রতিরোধের আন্দোলনের ভিতর দিয়া সেই মনোবৃত্তিকে ধ্বংস করা দরকার হইয়া পড়িয়াছে। ইহাকে আর বাড়িতে দিলে বাঙলা দেশের সর্ব্বনাশ হইবে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির এইদিক হইতে বর্ত্তমানে একটা বড় কর্ত্তব্য আসিয়া পড়িয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশনে দেশবাসীর যে অধিকারের প্রতিষ্ঠা সুরেন্দ্রনাথ করিয়াছিলেন, গণতান্ত্রিকতার ভিত্তি রহিয়াছে তাহার উপর, দেশবাসীর সকল অধিকারের মূলে রহিয়াছে সেই নীতি, আজ সেই নীতির উপর আঘাত আসিয়া পড়িয়াছে। সেই নীতিকে নষ্ট করিয়া মুষ্টিমেয় বিদেশীর অধিকার গণতান্ত্রিকতার স্থলে প্রতিষ্ঠিত করিবার কৌশলের কারসাজী সুরু হইয়াছে। জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেস ইহাতে উদাসীন থাকিতে পারে না; কংগ্রেসের উচিত এইখানে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় দেশের লোককে নূতনভাবে সচেতন করিয়া তোলা। বাঙলায় আজ যে নীতি বিপন্ন হইয়াছে, তাহার উপর দেশবাসীর সকল অধিকার নির্ভর করিতেছে। বাঙালীকে ইহা উপলব্ধি করিতে হইবে। বাঙালী সেই অধিকার প্রতিষ্ঠার সংকল্পে শক্ত হইয়া ভারতের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে আজ নূতন শক্তির করুক সঞ্চার আমরা ইহাই চাই।

হক মন্ত্রিমণ্ডলের অনুরাগ তত্ত্ব—

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের আত্মস্বার্থসিদ্ধির যে নীতি উদ্ধর্বস্তরে থাকিয়া ম্যাকডোনাল্ডী ভাগ-বাটোয়ারার ভিতর দিয়া কাজ করিতেছে, তাহাই অনুস্যূত হইতেছে হক মন্ত্রিমণ্ডলের নীতির ভিতর দিয়া। মুসলমানদের সাম্প্রদায়িকতা বুদ্ধির বহিরাবরণে হক মন্ত্রিমণ্ডলের তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের প্রতি মৌখিক অনুরাগের মূলতত্ত্বটি উপলব্ধি করিতে হইলে এইটুকু আগে বুঝা দরকার। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রতিনিধি শ্রীযুত প্রমথরঞ্জন ঠাকুর এই তত্ত্বটি ভাঙিয়া বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, তপশিলী সম্প্রদায়কে হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনিয়া সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধ করাই হইল মন্ত্রীদের উদ্দেশ্য। তিনি ক্ষোভের সহিত বলিয়াছেন,—এখন আইনের অনুগ্রহে বাঙলার আইনসভায় মুসলমান সমাজের স্থায়ী সংখ্যাধিক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সুতরাং তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের বরাতে জুটিতেছে শুধু ফাঁকা কথা আর মাঝে মাঝে কিছু পিঠ-চাপড়ানী। শ্রীযুত ঠাকুর বলিতেছেন,—'হক মন্ত্রিমণ্ডলীর অধীনে তপশীলভুক্তগণ নিরাপদ নহেন, এখন বর্ণ হিন্দু এবং তপশিলী হিন্দুগণ ঐক্যবদ্ধ হইয়া বাঙলায় হিন্দু-স্বার্থ সংরক্ষণ করিবার সময় আসিয়াছে।' আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি,—হিন্দু সমাজের একটা অংশকে 'তপশিলী' বা 'হরিজন' এইরূপ লেবেল মারিয়া দেওয়ার আমরা বিরোধী। সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ 'চলার পথে' নামক মাসিকপত্রে এ সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন, আমরা সেই মতের সম্পূর্ণ সমর্থন করি। আমাদের মতও এই যে, 'হরিজন' এই আখ্যার মধ্যে মহৎ ভাব যতই থাকুক না কেন, প্রকারান্তরে ঐ আখ্যা দিয়া হিন্দু সমাজের একটা অংশকে চিরকালের জন্য তাহারা যে কৃপার যোগ্য এই গ্লানির বোঝা তাহাদের ঘাড়ে চাপান হইয়াছে। আজ হিন্দু সমাজকে এই ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে হইবে, সকলকে হইতে হইবে হিন্দু।

ভারত সরকারের বাজেট—

গত শনিবার দিন ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে বড়লাটের সুপারিশ সহ রাজস্ব বিল পুনরায় উপস্থিত করা হইলে তাহাও অগ্রাহ্য হইয়াছে। লবণ শুল্ক মণ-প্রতি ছয় আনা হ্রাস করিবার যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল বড়লাট তাহা অনুমোদন করেন নাই। অন্য সব জিনিষের উপর হইতে অতিরিক্ত শুল্কে বা সারচার্জ্জ রহিত করা হইয়াছে, কিন্তু গরীবের নুনটুকু রেহাই পায় নাই। পোষ্ট কার্ডের মূল্য তিন পয়সা হইতে দুই পয়সা করিবার প্রস্তাব এবারও বড়লাট অগ্রাহ্য করিয়াছেন। সুতরাং কর্ত্তারা গরীবের কেহই নহেন। তাঁহারা শুধু নিজেদের কোলে ঝোল টানিতেই ব্যস্ত। এ ক্ষেত্রে অন্যবারের মত এবারও পথ এক, অর্থাৎ বড়লাটের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ এবং জনমতের প্রতি উপেক্ষা। কেন্দ্র গবর্ণমেণ্টে আজও এমন প্রহসন যেখানে চলিতেছে, সেখানে প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থায় সামান্য দুই একটু ক্ষমতা পাইয়া যাঁহারা দুনিয়াদারীর স্বপ্নে মশগুল আছেন এবং সেই মেকীর মোহ কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না, দেশের স্বাধীনতা এবং জাতির স্বাধীনতা, এ সব বড় বড় কথা তাঁহাদের মুখে শোভা পায় না!

প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে শিক্ষা প্রচার—

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখুজ্যে মহাশয়ের নেতৃত্বে বাঙলার প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে শিক্ষা প্রচারের যে চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তিনি বলেন—"চিরকালই আমাদের দেশের অবস্থা এইরূপ ছিল না। অতি প্রাচীনকালে নাগরিক ও পল্লীজীবনের মধ্যে এতটা ব্যবধান ছিল না। সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি হইতে দেখা যায় যে, আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির স্রোত পল্লীঅঞ্চলে গিয়াও পৌঁছিত। যাত্রা, ধর্ম্মকথা এবং আরও নানারূপ আমোদ-প্রমোদের দ্বারা উহা গ্রামে বিস্তার লাভ করিত, তাহাতে শিক্ষিতগণের ও যাহারা শিক্ষালাভের সুযোগ পান নাই, তাঁহাদের উভয়ের চিন্তাধারার একটা সামঞ্জস্য সম্পাদিত হইত। সকলেই শিক্ষার আলো না পাইলেও সমাজে মানসিক উন্নতি সাধনের চিন্তাশক্তি প্রয়োগের আকাঙ্ক্ষা অতি ব্যাপকভাবেই পরিলক্ষিত হইত।"

রবীন্দ্রনাথ গ্রামবাসীদের পক্ষে সহজবোধ্য ভাষায় পুস্তক প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের একটা কথা মনে হয়, তাহা এই যে, আমরা মুখে অনেক সময় স্বাদেশিকতা, জাতীয়তা এ সব

বড় বড় কথা বলি বটে, কিন্তু মনে প্রাণে প্রকৃত স্বদেশী, এবং জাতীয় মর্য্যাদাসম্পন্ন হইতে হইলে জাতির জনগণের প্রতি যে শ্রদ্ধাবুদ্ধি থাকা প্রয়োজন, পাশ্চাত্যের অনুকরণ স্পৃহার ফলে তাহা হারাইয়া ফেলিয়াছি। আমরা বাঙলা ভাষা বলি বটে; কিন্তু মনে চিন্তা করি ইংরেজীতে এবং ইংরেজী বা বিদেশী আলঙ্কারিতার ছোপ লাগাইয়া হয় আমাদের ভাবের অভিব্যক্তি, এইজন্য গ্রামবাসীদের চিন্তার যে ধারা, তাহার সঙ্গে আমাদের যোগ হয় না—আমাদের কথা তাহাদের প্রাণকে স্পর্শ করে না। আমরা তাহাদের উপদেষ্টা হইতে চাই; কিন্তু উপদেষ্টা হইতে হইলে তাহাদের মনুষ্যত্বের মনে প্রাণে যে স্বীকৃতি আবশ্যক আমাদের সে অনুভূতি নষ্ট হইয়াছে। গ্রামবাসীদের মধ্যে শিক্ষা প্রচার করিতে হইলে, যে ভাষা তাহারা বুঝিবে তাহা ফুটিবে তখন যখন তাহাদের সঙ্গে আমাদের মনে-প্রাণে আত্মীয়তার ভাব জন্মিবে, বিদেশী পাণ্ডিত্যের প্যাঁচ কাটাইয়া আমরা তাহাদের কাছে আত্ম-নিবেদন করিতে পারিব।

জগতের আন্তর্জ্জাতিক সমস্যা—

সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট দলের অষ্টাদশ কংগ্রেসে সোভিয়েট রুশিয়ার কমিউনিষ্ট দলের জেনারেল সেক্রেটারী স্বরূপে ষ্ট্যালিন যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে খোলসা করিয়া বর্ত্তমান জগতের আন্তর্জ্জাতিক অবস্থা বলা হইয়াছে এবং রুশিয়া এই সমস্যাকে কি দৃষ্টিতে দেখিতেছে এই বক্তৃতা হইতে তাহারও সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ইটালী কর্তৃক আবিসিনিয়া অধিকার, জাপানের চীন আক্রমণ এবং জার্ম্মানী কর্তৃক চেকোশ্লোভাকিয়া এবং অষ্ট্রিয়া অধি-কারের মূলগত আক্রমণাত্মক নীতির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিয়া ষ্ট্যালিন বলিয়াছেন, এই সব দেখিয়া স্বতঃই লোকের মনে এই প্রশ্ন উঠে যে, জার্ম্মানী এবং ইটালী কি ইউরোপে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের স্বার্থের বিরুদ্ধে জোট বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছে? দ্বিতীয়তঃ জার্ম্মানী, ইটালী এবং জাপান কি প্রাচ্যদেশে আমেরিকা, ইংলণ্ড এবং ফরাসীর বিরুদ্ধে সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া কাজে নামিতেছে? প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আমরা শুনিতেছি—না, না, আমাদের মধ্যে কোন রকম সামরিক চুক্তি বা তেমন কিছুই নাই, আছে নির্দ্দোষ রোম-বার্লিনে যোগাযোগ মাত্র! দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরেও ঐরূপ বলা হইতেছে—"আমাদের মধ্যে সামরিক চুক্তি কিছুই নাই, বার্লিন-রোম-টোকিও প্রীতির বন্ধন মাত্র।" যদি প্রশ্ন করা যায়, ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে, জাপান, জার্ম্মানী, ইটালী লড়াইতে নামিবে কি? অমনই উত্তর পাওয়া যাইবে—"পাগল, আমরা লড়াইতে নামিয়াছি ঐ দুষ্টু কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে। যদি তোমাদের বিশ্বাস না হয়, তাহা হইলে ইটালী, জার্ম্মানী এবং জাপানের মধ্যে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যে চুক্তি হইয়াছে তাহার সর্ত্তগুলি পড়িয়া দেখ।" কিন্তু ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং আমেরিকা কি সত্যই ফ্যাসিষ্ট দলের ঐ জবাবে সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছে? ষ্ট্যালিনও তাহা বিশ্বাস করেন না। তবে তাহারা নিজেদের স্বার্থকে এমন-ভাবে ক্ষুণ্ণ হইতে দিতেছে কেন? ষ্ট্যালিন বলেন, "ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং আমেরিকা ইহারা যদি সঙ্ঘবদ্ধ হয়, তাহা হইলে ফ্যাসিষ্টদিগকে জব্দ করিবার ষোল আনা শক্তিই তাহাদের আছে। কিন্তু তাহারা তাহা না করিয়া ফ্যাসিষ্টদিগকে ক্রমাগত সুবিধা ছাড়িয়া দিতেছে। ছাড়িয়া দিতেছে তাহার প্রধান কারণ এই যে, ফ্যাসিষ্টদের নীতির সঙ্গে তাহাদের মনের মিল আছে। সে নীতির বিরুদ্ধতা করিতে গেলে বিপ্লবাত্মক মনোবৃত্তির প্রশ্রয় পাইবে এবং তাহার ফলে সাম্রাজ্যবাদীসুলভ স্বার্থের যে হানি ঘটিবে।"

মঃ ষ্ট্যালীন

ইহার পর ষ্ট্যালিন বলিতেছেন—"ইউরোপ এবং আমে-রিকার রাজনীতিকেরা এইরূপ আশা পোষণ করিতেছিলেন যে জার্ম্মানীকে যদি সুবিধা ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে জার্ম্মানী রুশিয়াকে আক্রমণ করিবে; কিন্তু জার্ম্মানী সে বিষয়ে তাহাদিগকে নিরাশ করিয়াছে। তাহারা পূর্ব্বদিকে রুশিয়ার বিরুদ্ধে সৈন্যচালনা না করিয়া পশ্চিম দিকে ফিরিয়াছে, এবং উপনিবেশ দাবী করিতেছে। সাম্রাজ্যবাদীরা মনে করিয়াছিলেন যে, চেকোশ্লোভাকিয়া যদি জার্ম্মানীকে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে জার্ম্মানী সোভিয়েট ইউ-নিয়নের বিরুদ্ধে অভিযান করিবে, প্রকৃতপক্ষে সেই মূল্যেই চেকের স্বাধীনতাকে বিক্রয় করা হইয়াছে। কিন্তু ঐ নীতির বিষক্রিয়া এখন সাম্রাজ্যবাদীদের নিজেদের উপরই গিয়া পড়িয়াছে।" যাঁহারা এই আশায় ছিলেন যে, রুশিয়াকে জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে লাগাইয়া দিয়া পরে পরে শত্রু মারিবার ব্যবস্থা হইবে, এবং তাঁহারা নিজেরা সাম্রাজ্য শোষণের মজা লুটিবেন, তাঁহারা নিরাশ হইয়াছেন। রুশিয়া তাঁহাদের স্বরূপ জানে, সুতরাং রুশিয়ার সঙ্গে চতুঃশক্তির যে চুক্তির কথা হইয়াছিল তাহা যে ফাঁসিয়া গিয়াছে, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই।

বাণিজ্য-চুক্তি অগ্রাহ্য—

ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ইংগ-ভারতীয় বাণিজ্য-চুক্তি ৫৯—৪৭ ভোটে অগ্রাহ্য হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমাদের মত আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই চুক্তির ধারাগুলি একটু অনুধাবন করিলেই দেখা যাইবে যে, ল্যাঙ্কাসায়ারের স্বার্থ-রক্ষার জন্যই ইহা পরিকল্পিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে ল্যাঙ্কাসায়ারের কাপড়ওয়ালারা ভারতের বাজারে তাহাদের সূতী মাল বেচিবার যে বিশেষ শুল্ক-সুবিধা ভোগ করিতেছে, নূতন চুক্তিতে সে সুবিধা আরও বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার ফলে প্রতিযোগিতায় ভারতীয় বস্ত্রশিল্প ধ্বংস হইবে, এমন আশঙ্কার কারণ রহিয়াছে। স্যার মহম্মদ জাফরুল্লা এই চুক্তির পক্ষে বড় যুক্তি দেখাইয়াছেন যে, এই চুক্তি বিলাতের কাপড়ের ব্যবসায়ীদিগকে যে সুবিধা দেওয়া হইয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তে তাহারা ভারত হইতে বেশী পরিমাণে তুলা খরিদ করিবে সুতরাং ভারতের চাষীদের লাভ হইবে; কিন্তু একটু খতাইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, বাণিজ্য-সচিবের এই যুক্তির কোন মূল্য নাই। কারণ, বিলাতের কাপড়ওয়ালা-দিগকে এই যে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হইবে, তাহার ফলে ভারতের বস্ত্র ব্যবসার সংগে তাহারা তীব্রভাবে প্রতিযোগিতায় সুবিধা পাইবে এবং এ কথা সত্য যে, সেই সুবিধা পাইবার জন্যই তাহারা ভারত হইতে তুলা খরিদ করিতে চাহিতেছে; ইহা ছাড়া ভারতের প্রতি অহেতুকী প্রীতি তাহাদের কিছু নাই; কিন্তু সেই সুবিধা তাহাদিগকে দেওয়ার অর্থ, ভারতের বস্ত্র শিল্পের ক্ষতি সাধন করা। ভারতের কাপড়ের কলগুলি ভারতের অনেক তুলা খরিদ করিয়া থাকে। বিলাতের প্রতি-যোগিতায় টিকিতে না পারিয়া ভারতের অনেক কাপড়ের কল বন্ধ হইবে, ফলে ভারতের তুলার বাজারে সে সব খরিদ্দার থাকিবে না; সুতরাং যে দিক দিয়াই দেখা যাউক না কেন, এই চুক্তিতে ভারতের লোকসানই ষোল আনা এবং সেই লোকসানও স্থায়ী রকমের। চুক্তি বাতিল হইল ত ব্যবস্থা-পরিষদে; কিন্তু এখন কথা হইতেছে এই যে, কর্ত্তারা খুব সম্ভব, এবারও ব্যবস্থা-পরিষদের এই সিদ্ধান্ত বাতিল করিয়া চুক্তি বলবৎ করিবেন। বাণিজ্য-সচিব একটি প্রশ্নের উত্তরে এ সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ করিবার খুবই কারণ রহিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, চুক্তি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিবার সময় ভারত গবর্ণমেণ্ট পরিষদের সিদ্ধান্ত বিশেষ-ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, অর্থাৎ মানিয়া লইবেন যে, এমন কোন নিশ্চয়তা নাই বরং বিপরীত দিকেই নিশ্চয়তার অনেকটা আভাষই এমন উত্তরের মধ্যে পাওয়া যায়। ভারত গবর্ণমেণ্ট যদি তাহাই করেন, তাহা হইলে তাহার অনিবার্য্য ফল হইবে এই যে, ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে বিরোধ এবং বিদ্বেষের ভাব তিক্ত হইয়া উঠিবে। কর্ত্তারা কি সেই জিনিষটাই চাহেন?

আসিয়াছে কাঁদিবার দিন

শ্রীশশধর বিশ্বাস

কুসুমের হাসি নিয়ে নিয়ে শুধু মলয় সুবাস
ওরে কবি! মধু-কাব্য করিলি রচনা।
নিয়ে দুঃখ হাহাকার—অশ্রুজল মরম বেদনা,
কাব্য যে রচিতে হ'বে এ তার সূচনা!

অনাহারে কাঁদে ভ্রাতা—কাঁদে তোর আপন ভগিনী,
তার মাঝে কোথা পাবি হাসির নির্ঝর!
কুসুম ঝরিয়া গেছে কেঁদে ফেরে ভ্রমর ভ্রমরী,
সরসীর বক্ষে নাই কমল সুন্দর।

যেথায় সবুজ মাঠে সবুজের খেলিত তুফান,
সেথায় বন্যার জলে খেলে আজি দোল।
আর্ত্তনাদ প্রতিগৃহে অভাবের ভ্রূকুটি ভীষণ
আকাশ ব্যথিয়ে তোলে ক্রন্দনের রোল!

এ সব লিখিতে জানি কেঁদে ওঠে লেখনী তোমার
ওরে কবি! এ দুর্দ্দিনে কাঁদ আজি তুই
আজি তোর প্রাঙ্গণের স্নিগ্ধ শ্যাম কাননের ছায়ে
চেয়ে দেখ ফুটিয়াছে বেদনার যুঁই!

নাহি আর পৌর্ণমাসী নামিয়াছে দীর্ঘ অমানিশা
আঁধারে বসিয়া গা রে বেদনার গান;
হাসিবার দিন গেছে আসিয়াছে কাঁদিবার দিন
কাঁদ আজি ওরে কবি! দুঃখ দিয়ে বেঁধে নে রে প্রাণ!

মানবীয় ঐক্যের আদর্শ

শ্রীঅরবিন্দ

(১২)

অধিজাতি বিকাশের পূর্ব্ববর্ত্তী সাম্রাজ্য গঠনের প্রাচীন ধারা—অধিজাতি গঠনের আধুনিক ধারা।

[প্রকৃত অধিজাতি ঐক্যের গঠন—ঐক্য সাধনের প্রয়াস—রোম ও গ্রীস—প্রাচীন সাম্রাজ্যগুলির ধ্বংসের কারণ পরম্পরা—প্রাচীন সাম্রাজ্য ঐক্যের দুর্ব্বলতা—প্রকৃতির পদ্ধতি—নূতন রাষ্ট্র গঠনের আস্থারূপে নগরতন্ত্রের পুনরাবির্ভাব-- অধিজাতি গঠনের ইউরোপীয় ধারা—বিকাশের তিনটি স্তর।]

আমরা দেখিয়াছি যে, মানবীয় সমুচ্চয় গঠনে প্রকৃত আধিজাতিক ঐক্য (national unity) গড়িয়া তোলার সমস্যাটি প্রাচীন যুগ কর্ত্তৃক মধ্যযুগের উপর অর্পিত হইয়াছিল। প্রাচীন জগৎ উপজাতি (tribe), নগরতন্ত্র (City State), কুল, ক্ষুদ্র প্রাদেশিক রাষ্ট্র বা জনপদ এই সব লইয়াই আরম্ভ করিয়াছিল—এ সবই ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমুচ্চয়, তাহারা তাহাদেরই অনুরূপ অন্যান্য সমুচ্চয়ের সহিত বাস করিত, সাধারণ গঠনে এবং সচরাচর ভাষাতে এবং প্রায়ই জাতিতেও তাহারা পরস্পরের সদৃশ ছিল, অন্ততঃ এক সাধারণ সভ্যতার দিকে প্রবণতার জন্য মানবজাতির অন্যান্য বিভাগ হইতে তাহারা পৃথক ছিল, আর পরস্পরের সহিত সেই ঐক্যে এবং অপরের সহিত তাহাদের পার্থক্যে তাহারা অনুকূল ভৌগোলিক পরিস্থিতির দ্বারা রক্ষিত ছিল। এইরূপে গ্রীস, ইটালী, গল, মিশর, চীন, পারস্য, ভারত, আরব, ইস্রায়েল, সকলেই আরম্ভ করিয়াছিল এক শিথিল কৃষ্টিগত ও ভৌগোলিক সমুচ্চয় লইয়া তাহারা আধিজাতিক ঐক্যে গড়িয়া উঠিবার পূর্ব্বেই ইহা তাহাদিগকে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট কৃষ্টিগত সঙ্ঘরূপে গড়িয়া দিয়াছিল। সেই শিথিল কৃষ্টিগত ও ভৌগোলিক সমুচ্চয় লইয়া, তাহারা আধিপ্রাদেশিক রাষ্ট্র সকল বহু বিষয়ে সুস্পষ্ট, সতেজ ও দৃঢ়বদ্ধ ঐক্যের এতদূর বিকাশ করিয়াছিল যে, তাহারা তাহাদের বৃহত্তর কৃষ্টিগত ঐক্যের সহিত বাহিরের জগতের পার্থক্য ও বিরোধ বেশী বেশী তীব্রভাবে অনুভব করিলেও নিজেদের মধ্যেই পার্থক্য, অসাম্য ও বিরোধ অধিকতর ঘনিষ্ঠ ও তীব্রভাবে অনুভব করিত। যেখানে স্থানীয় পার্থক্যের এই অনুভূতি সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র ছিল সেখানে আধিজাতিক ঐক্য সাধনের সমস্যা স্বভাবতঃই অধিকতর দুরূহ হইয়াছিল এবং যখন ইহার সমাধান হইয়াছিল তখন সে সমাধানও বাস্তব হইয়া উঠে নাই।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমাধানের চেষ্টা হইয়াছিল। মিশর জুড়িয়ায় ইহা ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের সেই প্রাচীন যুগেও সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই এবং সম্ভবত প্রথম ক্ষেত্রেও পরাধীনতার কঠোর শাসনের ভিতর দিয়াই পূর্ণ ফলটি লব্ধ হইয়াছিল। যেখানে এই শাসন আসে নাই, যেখানে আধিজাতিক ঐক্যটি কোন রকমে ভিতর হইতেই সংসিদ্ধ হইয়াছিল—সাধারণত কোন একটি বলশালী কুল, নগর বা প্রাদেশিক রাষ্ট্র অবশিষ্টগুলিকে বশীভূত করিয়াছিল যেমন রোম, ম্যাসিডন বা পারস্যের পার্ব্বত্য জাতিসকল করিয়াছিল—সেখানে নূতন রাষ্ট্রটি নিজের কীর্ত্তিটি সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে এবং আধিজাতিক ঐক্যের ভিত্তি গভীর ও সুদৃঢ়ভাবে স্থাপন করিতে অপেক্ষা না করিয়াই তাহার উপস্থিত প্রয়োজনকে ছাড়াইয়া দিগ্বিজয়ে অগ্রসর হইয়াছিল। আধিজাতিক ঐক্যের চৈতন্যগত মূলগুলি গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে, অধিজাতিটি দৃঢ়ভাবে আত্ম-চেতন হইবার, তাহার একত্ব অদম্যভাবে লাভ করিবার এবং অজেয়ভাবে তাহাতে অনুরক্ত হইবার পূর্ব্বেই, শাসক স্থানীয় রাষ্ট্রটি যে সামরিক শক্তি ও প্রেরণা তাহাকে এতদূরে লইয়া আসিয়াছে তাহারই দ্বারা চালিত হইয়া অবিলম্বে সেই উপায়েই বৃহত্তর সাম্রাজিক সমুচ্চয় গঠন করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। এসিরিয়া, ম্যাসিডন, রোম, পারস্য এবং পরবর্ত্তীকালে আরবদেশ সকলেই ঐ একই প্রবৃত্তি এবং একই চক্র অনুসরণ করিয়াছে। সকলেই সুগঠিত আধিজাতিক ঐক্যের মূলে কেন্দ্রস্বরূপে হইবার পূর্ব্বেই বিরাট সাম্রাজিক-আন্দোলনের সূত্রপাত করিয়াছিল।

সেইজন্য এই সকল সাম্রাজ্য স্থায়ী হয় নাই। কতকগুলি অপরগুলি অপেক্ষা অধিককাল টিকিয়াছিল, কারণ তাহারা কেন্দ্রীয় আধিজাতিক ঐক্যে দৃঢ়তর ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল; ইটালীতে রোম এইরূপই করিয়াছিল। গ্রীসদেশের প্রথম ঐক্যসাধক ফিলিপ দ্রুত কিন্তু অসম্পূর্ণভাবে ঐক্যের কাঠামো স্থাপন করিয়াছিলেন, পূর্ব্ববর্ত্তী অপেক্ষাকৃত শিথিল স্পার্টান শাসনের দ্বারাই ইহার দ্রুতত্ব সম্ভব হইয়াছিল, আর যদি তাঁহার পর একজন বিরাট-কল্পনাশীল ও মহান প্রতিভার মানুষ না আসিয়া বরং ধীর বুদ্ধির উত্তরাধিকারিগণ আসিতেন তাহা হইলে এই প্রথম মোটামুটি ব্যবহারিক কাঠামোটিকে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন ও সুদৃঢ় করা এবং একটা স্থায়ী জিনিষ গড়িয়া তোলা সম্ভব হইত। কোন ব্যক্তি প্রথমে বৃহৎ আয়তনে দ্রুত ভিত্তি স্থাপন করিয়া যাইলে তাহার পরে সকল সময়েই এমন একজন লোক প্রয়োজন হয় যাহার মধ্যে বিস্তারের প্রেরণা অপেক্ষা সংগঠনেরই বুদ্ধি বা প্রতিভা থাকিবে। একজন সীজারের পর যখন একজন অগষ্টস আইসে তখনই গুরুভার স্থায়িত্বপূর্ণ জিনিষ গড়িয়া উঠে; একজন ফিলিপের পর যখন একজন আলেকজান্ডার আইসে তখন যে কর্ম্ম সংসাধিত হয় তাহার ফল জগতের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু নিজে সে কর্ম্মটি হয় কেবলমাত্র একটা ক্ষণস্থায়ী দীপ্তির সমারোহ। রোম যতদিন না ইটালীকে সুদৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ করিয়াছিল এবং তাহার সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল ততদিন সতর্ক প্রকৃতি রোমকে কোন সমুন্নত প্রতিভার মানুষ দেয় নাই, সেইজন্য রোম অনেক বেশী দৃঢ়ভাবে গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছিল; তথাপি সে এক মহান অধিজাতির কেন্দ্র ও শীর্ষরূপে সেই সাম্রাজ্যটি স্থাপন করে নাই, পরন্তু একটি প্রাধান্যশীল নগররূপে অধীন ইটালীকে পাদপীঠ স্বরূপ ব্যবহার করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী দেশসমূহকে জয় করিয়াছিল। সেই জন্যই তাহাকে অনেক বেশী কঠিন সমস্যায় পড়িতে হইয়াছিল প্রাচীন ইটালীর অধিবাসী গেলিক, ল্যাটিন, আম্ব্রিয়ান, ওস্কান ও গ্রীকো-আপুলিয়ান জাতি সকলের সাদৃশ্য ও পার্থক্য সকলকে লইয়া। ক্ষুদ্রতর ও সহজতর আয়তনে এক জীবন্ত সঙ্ঘ গঠন করিয়া প্রকৃত ঐক্যসাধনের কৌশল শিখিবার পূর্ব্বেই তাহাকে তাহা হইতে বিভিন্ন নানা ভ্রূণ অধিজাতি ও গঠিত বা অপরিণত কৃষ্টিকে আয়ত্ত করিবার অনেক বেশী কঠিন

সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। অতএব যদিও তাহার সাম্রাজ্য কয়েক শতাব্দী ধরিয়া টিকিয়াছিল, তাহাকে প্রাণশক্তি ও আভ্যন্তরীণ তেজস্বিতা ক্ষয় করিয়াই এই সাময়িক স্থায়িত্ব বিধান করিতে হইয়াছিল; সে আধিজাতিক ঐক্যও সিদ্ধ করিতে পারে নাই, স্থায়ী সাম্রাজিক ঐক্যও সিদ্ধ করিতে পারে নাই, আর অন্যান্য প্রাচীন সাম্রাজ্যের ন্যায়ই তাহাকে ধ্বংস হইতে হইয়াছিল এবং প্রকৃত অধিজাতি গঠনের নবযুগের জন্য স্থান ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল।

কোথায় ভুল হইয়াছিল তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দেওয়া আবশ্যক। ক্ষুদ্র বা বৃহৎ আয়তনের সমুচ্চয়ে মানবজাতির শাসনমূলক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মূলত জড়-প্রকৃতিতে জৈব অঙ্গ সৃষ্টি ব্যাপারেরই সমজাতীয় ক্রিয়া। অর্থাৎ, ইহা প্রধানত ভৌতিক প্রাণশক্তির নিয়ম অনুযায়ী বাহ্যিক ও স্থূল পদ্ধতি ব্যবহার করে, যদিও ইহার লক্ষ্য হইতেছে প্রাণ ও শরীরের ক্রিয়াসমূহের পশ্চাতে যে অতি-ভৌতিক ও মানসিক তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে তাহাকেই উদ্ধার করা, প্রকট করা, নিশ্চিতভাবে কার্যকরী করিয়া তোলা। একটি সুস্পষ্ট, শক্তিমান, সু-কেন্দ্রীভূত, সু-পরিব্যাপ্ত সমষ্টিগত অহং-এর জন্য একটি দৃঢ় ও মজবুত শরীর ও প্রাণক্রিয়া গঠন করাই হইতেছে ইহার সমগ্র লক্ষ্য ও প্রণালী। আমরা দেখিয়াছি, এই প্রক্রিয়ায় প্রথমে বৃহত্তর শিথিল ঐক্যের মধ্যে ক্ষুদ্রতর সুস্পষ্ট ঐক্য গড়িয়া উঠে; ইহাদের থাকে একটা সতেজ চৈতন্যমূলক সত্তা (Psychological existence) এবং একটা সুগঠিত শরীর ও প্রাণক্রিয়া; কিন্তু বৃহত্তর সমুচ্চয়টিতে চৈতন্যগত বোধ এবং প্রাণশক্তি থাকে বটে, কিন্তু তাহারা সুসংবদ্ধ নহে, এবং নির্দ্দিষ্ট প্রক্রিয়ার ক্ষমতাও তাহাদের থাকে না আর শরীরটি হয় একটা তরল বস্তু, অথবা একটা অর্দ্ধ-গঠিত বা বড় জোর অর্দ্ধ-তরল, অর্দ্ধ-কঠিন স্তূপ। ইহাকেও যথাক্রমে গঠিত হইতে হইবে, সুসংবদ্ধ হইতে হইবে, একটা সুদৃঢ় শারীরিক রূপ ও সুনির্দ্দিষ্ট প্রাণক্রিয়া এবং একটা স্পষ্ট চৈতন্যমূলক বাস্তব সত্তা, আত্মচেতনা এবং বাঁচা বাড়ার মানসিক সংকল্প লাভ করিতে হইবে।

এইভাবে একটা বৃহত্তর ঐক্য গঠিত হয়; আবার ইহা নিজেকে ইহারই সদৃশ অন্যান্য ঐক্যের দ্বারা বেষ্টিত দেখিতে পায়, প্রথমে সে-সকলকে সে শত্রুরূপে দেখে, নিজ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলিয়া মনে করে, তাহার পর তাহাদের সহিত পার্থক্যের মধ্যেই একটা ঐক্য সম্বন্ধ স্থাপন করে, যতক্ষণ না আবার আমরা সেই পূর্ব্ব ব্যাপারের, বৃহৎ শিথিল ঐক্যের পরিধির মধ্যে ক্ষুদ্রতর সুস্পষ্ট ঐক্য সকলের পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাই। অন্তর্গত ঐক্য সকল পূর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তর হয় এবং অধিকতর জটিল হয়, কিন্তু মূল ব্যাপারটি একই থাকে এবং একই রকম সমস্যা উপস্থিত হয়। এইরূপে প্রারম্ভে ইটালী বা হেলাস (Hellas, গ্রীস) ছিল একটা শিথিল ভৌগোলিক ও কৃষ্টিগত ঐক্য, তাহার অন্তর্গত বিচ্ছিন্ন অংশরূপে নগরতন্ত্র ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদগুলি যুগপৎ বিদ্যমান ছিল, আর তখন সমস্যা ছিল হেলেনিক বা ইটালীয় অধিজাতি গড়িয়া তোলা। পরে তাহার পরিবর্ত্তে আমরা দেখিতে পাই অধিজাতি সকল প্রথমে খৃষ্টরাজ্যের (Christendom) তাহার পর ইউরোপের শিথিল ভৌগোলিক ও কৃষ্টিগত ঐক্যের অন্তর্গত বিচ্ছিন্ন অংশরূপে যুগপৎ বিদ্যমান রহিয়াছে, আর সেই সঙ্গেই আসিয়াছে এই খৃষ্টরাজ্যকে অথবা এই ইউরোপকে ঐক্যবদ্ধ করিবার সমস্যা; যদিও শার্লেমান (Charlemagne) ও ফ্রান্সের চতুর্থ হেনরী এবং পরে নেপোলিয়ন এই সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনা ও প্রয়াস করিয়াছিলেন, ইহা কখনই সিদ্ধ হয় নাই। এইটি সিদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই আধুনিক জগৎ তাহার ঐক্যসাধক শক্তি-সকল লইয়া আমাদের সম্মুখে এক নূতন ও জটিলতর ব্যাপার উপস্থিত করিয়াছে, তাহা হইতেছে মানবজাতির শিথিল কিন্তু ক্রমবর্দ্ধমান কৃষ্টিগত ঐক্য ও বাণিজ্য বিষয়ক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের অভ্যন্তরে কতকগুলি অধিজাতি ও সাম্রাজ্যের অবস্থান, এবং সেই সঙ্গেই সমগ্র মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিবার যে-সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে তাহা ইউরোপকে ঐক্যবদ্ধ করিবার সমস্যাকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে।

ভৌতিক জগতে (Physical Nature) জৈব শরীর সকল সম্পূর্ণভাবে নিজেদিগকে লইয়াই বাঁচিয়া থাকিতে পারে না; তাহারা হয় অন্যান্য জৈবদেহের সহিত আদান প্রদানের দ্বারা বাঁচিয়া থাকে, অথবা কতকটা আদান প্রদান করে, কতকটা অপরকে গ্রাস করে কারণ বিচ্ছিন্ন ভৌতিক জীবনের পক্ষে এইরূপে আত্মকরণ পদ্ধতিই হইতেছে সাধারণ। অন্যপক্ষে জীবনের ঐক্যসাধনে এমন এক আত্মকরণ (assimilation) সম্ভব যাহা একের দ্বারা অপরকে গ্রাস করা নহে অথবা পরস্পর হইতে এমনভাবে বিচ্ছিন্ন থাকাও নহে যাহাতে এক জীবন হইতে যে-শক্তি নিঃসৃত হয়, অপরের পক্ষে কেবল তাহা গ্রহণ করাতেই আত্মকরণ সীমাবদ্ধ থাকে। ইহা ছাড়া এমন এক প্রকারের মিলন আছে যাহাতে পৃথক পৃথক সঙ্ঘগুলি পরস্পরের সংস্পর্শে আসিয়া এক সাধারণ সঙ্ঘ গড়িয়া তোলে এবং নিজেদিগকে তাহার অধীন করে। অবশ্য ইহাদের মধ্যে কতকগুলি নিহত হয় এবং নূতন জিনিষের উপাদানরূপে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু সকলের প্রতিই এইরূপ ব্যবহার করা যায় না, একটি প্রধান সঙ্ঘের দ্বারা অন্য সঙ্ঘগুলি ভক্ষিত হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে ঐক্যসাধন হয় না, একটা বৃহত্তর ঐক্য গড়িয়া তোলা যায় না কেবল ভক্ষকটি ভক্ষিতগণের শক্তিকে গ্রহণ ও ব্যবহার করিয়া কিছুদিনের জন্য টিকিয়া থাকে। তাহা হইলে মানবীয় সমুচ্চয়-সকলের ঐক্যসাধনে এইটিই হইতেছে সমস্যা, কেমন করিয়া ক্ষুদ্রতর ঐক্য সকলের ধ্বংস সাধন না করিয়াও তাহাদিগকে এক নূতন ঐক্যের অধীন করিয়া তোলা যায়।

সামরিক বিজয়ের দ্বারা সৃষ্ট সাম্রাজ্যগুলির দুর্ব্বলতা ছিল এই যে, রোমের ন্যায় তাহারা যে-সকল সঙ্ঘকে অঙ্গীভূত করিয়া লইত সে-গুলিকে ধ্বংস করিয়া দিবার প্রধান যন্ত্রটির জীবনের জন্য তাহাদিগকে খাদ্যে পরিণত করিবার দিকেই তাহাদের ঝোঁক ছিল। গল, স্পেন, আফ্রিকা, মিশরকে এই ভাবেই ধ্বংস করা হইয়াছিল, প্রাণহীন পদার্থে পরিণত করা হইয়াছিল এবং তাহাদের শক্তিকে কেন্দ্র রোমের মধ্যে

টানিয়া আনা হইয়াছিল; এইরূপে সাম্রাজ্যটি হইয়াছিল একটি বিরাট মরণশীল স্তূপ, তাহা হইতে রোমের জীবন কয়েক শতাব্দী ধরিয়া খাদ্য সংগ্রহ করিয়াছিল। কিন্তু এইরূপ পদ্ধতিতে অধীন অংশগুলির প্রাণশক্তি অবসন্ন হইয়া পড়ায় শেষ পর্যন্ত প্রভুত্বশীল ঔদরিক কেন্দ্রটির নূতন শক্তি সঞ্চয়ের আর কোন উৎস থাকে না। প্রথমে বিজিত দেশ সকলের শ্রেষ্ঠ ধীশক্তি রোমে গিয়াছিল এবং তাহাদের প্রাণশক্তি সেখানে সামরিক শক্তি ও শাসন দক্ষতা প্রচুর পরিমাণে আনিয়া দিয়াছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুটিরই অভাব হইয়াছিল এবং প্রথমে রোমের ধীশক্তি এবং পরে সামরিক ও রাজনৈতিক দক্ষতা ব্যাপক মৃত্যুর মধ্যে ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল। আর রোমক সভ্যতা এতদিনও বাঁচিত না, যদি না সে প্রাচ্য হইতে নূতন ভাবধারা ও প্রেরণা লাভ করিত। তবে বর্ত্তমান জগতে নিত্য নূতন ভাবতরঙ্গ ও প্রেরণা যেমন জীবন্তভাবে অনবরত যাতায়াত করিতেছে, সেই আদান প্রদান সেরূপ কিছুই ছিল না এবং তাহা বস্তুত সাম্রাজ্যিক শরীরটির ক্ষীণ প্রাণশক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে, এমন কি তাহার ধ্বংসের গতিকে বেশী দিন বাধা দিতেও সক্ষম হয় নাই। যখন রোমের মুষ্টি শিথিল হইয়া পড়িল, যে-জগৎকে সে এইরূপ দৃঢ়ভাবে চাপিয়া রাখিয়াছিল তাহা বহুদিন যাবৎ এক বিরাট শোভনশীল জীবন্মৃত স্তূপ হইয়াই ছিল, তাহার নূতন সৃষ্টির বা নিজেই পুনর্জীবন লাভের আর কোনই সামর্থ্য ছিল না, কেবল জার্ম্মানীর সমতল ভূমি, দানিউবের পরপারস্থিত শালক্ষেত্র এবং আরবের মরুভূমি হইতে আগত বর্ব্বর-জাতি সকলের প্লাবনের ভিতর দিয়াই প্রাণশক্তির পুনরুদ্ধার সম্ভব হইয়াছিল। সুষ্ঠুতর সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ধ্বংসের প্রয়োজন হইয়াছিল।

অধিজাতি সংগঠনের মধ্যযুগে আমরা দেখিতে পাই প্রকৃতি এই পূর্ব্বতর ভুলটি সংশোধন করিয়াছে। বস্তুত যখন আমরা প্রকৃতির ভুলের কথা বলি, আমরা কেবল আমাদের মানবীয় অভিজ্ঞতা ও মনস্তত্ত্ব হইতে একটা রূপকের প্রয়োগ করি; কারণ প্রকৃতিতে কোন ভুল নাই, আছে কেবল পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ছন্দে তাহার অগ্রগমন ও পশ্চাদ্বর্ত্তনের সতর্ক ধারা; সেখানে প্রতিটি পদক্ষেপের একটা অর্থ আছে এবং প্রকৃতির ক্রমিক প্রগতির ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে তাহার যথাযথ স্থান আছে। রোমান সমীকরণের পেষণকারী প্রভুত্ব ছিল প্রাচীন ক্ষুদ্রতর সঙ্ঘগুলিকে চিরদিনের জন্য ধ্বংস করিবার নহে পরন্তু তাহাদের অত্যধিক স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় জীবনকে খর্ব্ব করিবারই একটা কৌশল যেন যখন তাহারা পুনরুজ্জীবিত হইবে তখন তাহারা প্রকৃত আধিজাতিক ঐক্যবিকাশে দুরতিক্রম্য বাধাস্বরূপ না হয়। আর এই নিষ্ঠুর শাসনের ভিতর দিয়া না গেলে আধিজাতিক ঐক্যের কি ক্ষতি হয় (ইহাতে বস্তুত যে মৃত্যুর বিপদ আছে, যেমন এসিরিয়া কেলডিয়া দেশে ঘটিয়াছিল এবং ইহাকে এড়াইতে পারিলে আধ্যাত্মিক ও অন্যান্য যে-সব লাভ হইতে পারে সে-সবের কথা তুলিতেছি না) তাহার দৃষ্টান্ত হইতেছে ভারতবর্ষ, সেখানে যদিও মৌর্য্য, গুপ্ত, অন্ধ্র ও মোগল সাম্রাজ্য বিরাট ও শক্তিমান ও সুশৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল, তাহারা পল্লীসঙ্ঘ হইতে আরম্ভ করিয়া জনপদ ও ভাষাগত প্রাদেশিক বিভাগ পর্যন্ত নিম্নতর সঙ্ঘগুলির অতি তীব্র স্বাতন্ত্র্যময় জীবনের উপর দিয়া একটা স্টীম-রোলার চালাইয়া দিতে কখনই সক্ষম হয় নাই। দুই সহস্র বৎসর ব্যাপী শিথিল সাম্রাজ্যিক শাসন যাহা পারে নাই, এক শতাব্দীর মধ্যেই সেই কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য প্রয়োজন হইয়াছে এমন এক শাসনের চাপ যাহা এ-দেশে উদ্ভূতও নহে অথবা এদেশের মধ্যে কেন্দ্রীভূতও নহে, তাহা হইতেছে বৈদেশিক জাতির শাসন, সে জাতি কৃষ্টিতে সম্পূর্ণ বিজাতীয় এবং এদেশের কৃষ্টির প্রভাব ও আকর্ষণ সকলের বিরুদ্ধে নৈতিকভাবে বর্ম্মাবৃত। এরূপ একটা প্রক্রিয়ায় একটা নিষ্ঠুর এবং প্রায়ই বিপজ্জনক চাপ এবং প্রাচীন প্রতিষ্ঠানসমূহের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী, কারণ প্রকৃতি সুদীর্ঘকালব্যাপী বাধার দৃঢ় নিশ্চলতায় অধৈর্য্য হইয়া কত সুন্দর ও মূল্যবান জিনিষ যে নষ্ট হইতেছে সেদিকে যেন আর দৃক্‌পাত করে না, তাহার প্রধান উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ হইলেই হইল; কিন্তু ইহা নিশ্চয়ই যে, যদি ধ্বংস করা হয় তাহার কারণ ঐ উদ্দেশ্যটি সিদ্ধির জন্য ঐরূপ ধ্বংস অনিবার্য্য ছিল।

ইউরোপে রোমান চাপটি অপসৃত হইবার পরে নগর ও জনপদগুলি নূতন গঠনের অঙ্গরূপে পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিল; কিন্তু কেবল একটি দেশ ছাড়া ইহা কৌতূহলজনক যে, ইটালীই সেই দেশ। নগর-তন্ত্র আধিজাতিক ঐক্যসাধন প্রক্রিয়ায় কোনরূপে প্রকৃত বাধা প্রদান করে নাই। ইটালীতে ইহার প্রবল পুনরুজ্জীবনের আমরা দুইটি কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারি; প্রথমত, ইটালীর প্রাচীন স্বাধীন নগর-জীবন তাহার সম্ভাবনাসমূহের পূর্ণ বিকাশ করিবার পূর্ব্বেই অকালে তাহার উপর রোমান পীড়ন আসিয়া পড়িয়াছিল; দ্বিতীয়ত, উহার বীজ রক্ষিত হইয়াছিল রোমের সুদীর্ঘকালব্যাপী নাগরিক জীবনে এবং ইটালীয় মিউনিসিপিয়াতে (municipia) স্বতন্ত্র জীবনের অনুভূতির স্থিতিশীলতায়, তাহা উৎপীড়িত হইয়াছিল বটে কিন্তু কখনই গল ও স্পেনের স্বতন্ত্র উপজাতি-জীবন বা গ্রীসের স্বতন্ত্র নগর জীবনের ন্যায় সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয় নাই। অতএব, মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া ইটালীয় নগর-তন্ত্র তৃপ্ত ও বিকশিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই অথবা এমনভাবে ধ্বংসও হয় নাই যাহাতে তাহার পুনরুদ্ধার অসম্ভব হইত; নূতন রূপের মধ্যে তাহা নবজীবন লাভ করিয়াছিল। আর এই পুনরুজ্জীবন ইটালীর অধিজাতি-জীবনের পক্ষে বিভ্রাটজনক হইয়াছিল, যদিও জগতের কৃষ্টি ও সভ্যতার পক্ষে ইহা অপরিমেয়ভাবে শুভকর হইয়াছিল; কারণ যেমন গ্রীসের নাগরিক জীবন প্রথমে গ্রীকো-রোমান জগতের চারুকলা, সাহিত্য, চিন্তাধারা ও বিজ্ঞান সৃষ্টি করিয়াছিল তেমনিই ইটালীর নাগরিক জীবন সেগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিল এবং নূতন রূপের ভিতর দিয়া আমাদের আধুনিক যুগকে অর্পণ করিয়াছিল। অন্যত্র নগরতন্ত্র টিকিয়াছিল কেবল মধ্যযুগীয় ফ্রান্স, ফ্লাণ্ডার্স ও জার্ম্মানীর স্বাধীন বা অর্দ্ধ-স্বাধীন মিউনিসিপ্যালিটিগুলিতে; আর এই গুলি কখনই ঐক্যসাধনের অন্তরায়

হয় নাই, বরঞ্চ ইহার জন্য একটা অবচেতন ভিত্তি স্থাপন করিতে এবং ইতাবসরে চিন্তা ও আর্টের সমৃদ্ধ প্রেরণা ও স্বচ্ছন্দ গতির দ্বারা মধ্যযুগের বুদ্ধিগত একরূপতা, শ্লথতা ও আচ্ছন্নতা নিবারণ করিতে সাহায্য করিয়াছিল।

আয়ার্ল্যান্ড এবং উত্তর ও পশ্চিম স্কটল্যান্ডের ন্যায় যে-সকল দেশকে রোমান চাপের অধীন হইতে হয় নাই, সেই সব দেশ ভিন্ন অন্যত্র উপজাতিমূলক জাতীয়তা (clan-nation) ধ্বংস হইয়াছিল; আর, আমরা দেখিয়াছি, ঐ সকল দেশে এই জাতীয়তা ইটালীর নগরতন্ত্রের ন্যায়ই ঐক্যসাধনের পক্ষে মারাত্মক হইয়াছিল; উহা আয়ার্ল্যান্ডকে এক সঙ্ঘবদ্ধ ঐক্য বিকাশ করিতে দেয় নাই এবং হাইল্যান্ড কেল্ট্‌গণকে এংলো-কেল্টিক স্কচ্ অধিজাতির সহিত মিলিত হইতে দেয় নাই যতদিন না ইংরেজ শাসনের চক্র তাহাদের উপর দিয়া চালিত হইয়াছিল এবং তাহাই সম্পাদন করিয়াছিল যাহা রোমান শাসন করিতে পারিত যদি না তাহার বিস্তার গ্রাম্পিয়ান পার্ব্বত্য প্রদেশ ও আইরিশ সমুদ্রের দ্বারা ব্যাহত হইত। পশ্চিম ইউরোপের অবশিষ্ট অংশে রোমান শাসনের দ্বারা সম্পন্ন কার্য্যটি এত নিখুঁত হইয়াছিল যে, পশ্চিম দেশগুলির উপর জার্ম্মানীর উপজাতি সকলের প্রভুত্ব আর সেই প্রাচীন সুস্পষ্ট এবং অদম্যভাবে বিচ্ছেদপ্রিয় জাতীয়তার পুনরভ্যুত্থান করিতে সমর্থ হয় নাই। তাহার পরিবর্ত্তে তাহা সৃষ্টি করিয়াছিল জার্ম্মানীর রাষ্ট্রসমূহ এবং ফ্রান্স ও স্পেনের সামন্ততন্ত্র ও প্রাদেশিক বিভাগ সকল, কিন্তু কেবল জার্ম্মানীতেই এই প্রাদেশিক জীবন ঐক্যসাধনের বিষম অন্তরায় হইয়াছিল, কারণ জার্ম্মানী আয়ার্ল্যান্ড ও স্কচ্ হাইল্যান্ডের মতই কখনও রোমান শাসনের অধীন হয় নাই। ফ্রান্সে ইহা ঐক্য-সাধন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করিতেছে বলিয়াই কিছুকাল মনে হইয়াছিল, কিন্তু বস্তুতঃ ইহা কিছুকাল বাধা প্রদান করিয়া কেবল ফ্রান্সের চরম ঐক্যে সমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্যের উপাদানরূপেই মূল্যবান হইয়া উঠিয়াছিল, আর সেই ঐক্যের অতুলনীয় পূর্ণতা হইতেছে আমরা ফ্রান্সের ইতিহাসে যে অতিদীর্ঘ প্রক্রিয়া দেখিতে পাই তাহার অন্তর্নিহিত নিগূঢ় বিচক্ষণতার পরিচায়ক, যদিও সে-ইতিহাস আমাদের অগভীর দৃষ্টিতে মনে হয় এই শোচনীয় ও বিভ্রান্ত, কখনও অরাজকতা, কখনও সামন্ততন্ত্র বা রাজতন্ত্রের অত্যাচার পুনঃ পুনঃ আসিতেছে ইংলন্ডের জাতীয়তার ক্রমিক, নিশ্চিত ও অনেক বেশী সুশৃঙ্খল বিকাশ হইতে তাহা এত ভিন্ন। কিন্তু ইংলন্ডে শেষ পর্য্যন্ত যে সঙ্ঘজীবন গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার জন্য প্রয়োজনীয় বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি অন্যভাবে লব্ধ হইয়াছিল, যে-সকল জাতিকে লইয়া নূতন অধিজাতিটি গঠিত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে বহুল পার্থক্য ছিল এবং ওয়েলস্, আয়ার্ল্যান্ড ও স্কটল্যান্ড বৃহত্তর ঐক্যটির মধ্যে নিজেদের একটা নিম্নতর আত্মচেতনা লইয়া স্বতন্ত্র কৃষ্টিগত ঐক্য হইয়া থাকিতে চেষ্টা করিয়াছিল।

অতএব যে প্রাচীন ক্রমপর্য্যায় প্রাদেশিক তন্ত্র ও নগর-তন্ত্র হইতে একেবারে সাম্রাজ্যে গিয়াছিল, ইউরোপে অধিজাতি গঠনের ক্রমপর্য্যায় তাহা হইতে দুইটি বিষয়ে বিভিন্ন, প্রথমত, ইহা প্রয়োজনীয় মধ্যবর্ত্তী সমচ্ছেয়কে অবহেলা করিয়া নিজের উর্দ্ধে একেবারে একটা বৃহত্তর ঐক্যের দিকে অগ্রসর হয় নাই, দ্বিতীয়ত, ইহা মন্থরগতিতে পরিপক্ক হইতে হইতে পর পর তিনটি অবস্থার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়াছিল, এইভাবে ঐক্যটি সমাধিত হইয়াছিল, অথচ অন্তর্ভুক্ত অংশগুলি ঐক্যসাধনের প্রণালীর দ্বারা বিনষ্ট অথবা অকালে বা অনুচিতভাবে দমিত হয় নাই। প্রথম অবস্থাটি অগ্রসর হইয়াছিল কেন্দ্রাভিমুখী ও কেন্দ্রাতিগ শক্তি সকলের সুদীর্ঘ দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া, তখন সামন্ততন্ত্রই শৃঙ্খলার এবং একটা শিথিল অথচ জীবন্ত ঐক্যের বিধান করিয়াছিল। দ্বিতীয়টি ছিল ঐক্যসাধনের এবং ক্রমবর্দ্ধমান সমরূপতার প্রচেষ্টা, তাহাতে রোমের প্রাচীন সাম্রাজ্যিক ব্যবস্থার কতকগুলি বিশিষ্টতার পুনরাবৃত্তি হইয়াছিল, কিন্তু সে-সবের পেষণশক্তি এবং নিঃশেষ করার প্রবৃত্তি কম ছিল; কারণ ইহার বৈশিষ্ট্য হইয়াছিল প্রথমত, একটা প্রধান নগর-কেন্দ্রের সৃষ্টি করা তাহা রোমের ন্যায় অন্যান্য সকল অংশের শ্রেষ্ঠ প্রাণশক্তি নিজের মধ্যে টানিয়া লইতে আরম্ভ করিয়াছিল, দ্বিতীয়ত, এক নিরঙ্কুশ সার্ব্বভৌম প্রভুত্বের বিকাশ, তাহার কাজ ছিল জাতির জীবনের উপর আইন, রাষ্ট্রপরিচালন, রাজনীতি ও ভাষা বিষয়ে সমরূপতা ও কেন্দ্রীয়তা স্থাপন, আর তৃতীয়ত, আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের জন্য একটি সংস্থান গঠন, তাহার কাজ ছিল ধর্ম্মচিন্তা এবং মানসিক শিক্ষা ও মতবাদে অনুরূপ সমরূপতা স্থাপন করা। এই ঐক্যসাধক প্রচেষ্টা বেশী দূর অগ্রসর হইলে রোমের ন্যায়ই বিভ্রাটজনকভাবে পর্য্যবসিত হইতে পারিত যদি না বিদ্রোহমূলক এক তৃতীয় অবস্থার আবির্ভাব হইত, তাহা সামন্ততন্ত্র, রাজতন্ত্র ও চার্চ্চ প্রভৃতি রূপ অনুষ্ঠানগুলিকে তাহাদের কার্য্য শেষ হইবামাত্র ধ্বংস অথবা অবনমিত করিয়াছিল এবং তাহাদের পরিবর্ত্তে এক নূতন আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার লক্ষ্য ছিল সুদৃঢ় ও সুব্যবস্থাবদ্ধ রাজনৈতিক, আইনবিষয়ক, সামাজিক ও কৃষ্টিগত স্বাধীনতা ও সাম্যের ভিতর দিয়া জাতীয় জীবনের ব্যাপক বিস্তার। ইহার চেষ্টা হইয়াছে এই দিকে যে, যেমন প্রাচীন নগরে তেমনিই আধুনিক অধিজাতিতে যেন সকল শ্রেণী এবং সকল ব্যক্তি মুক্ত জাতীয় জীবনের সকল সুবিধা ভোগ করিতে পারে এবং তাহার স্বাধীন কর্ম্মধারার অংশ গ্রহণ করিতে পারে।

আধিজাতিক জীবন বিকাশের এই তৃতীয় অবস্থা দ্বিতীয় অবস্থা কর্ত্তৃক সৃষ্ট ঐক্য এবং যথেষ্ট সমরূপতার সুযোগ উপভোগ করিতে পারে এবং প্রাদেশিক ও নাগরিক জীবনের যে সম্ভাবনাগুলি প্রথম অবস্থা কর্ত্তৃক সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয় নাই সেইগুলিকে নির্ব্বিঘ্নে নূতনভাবে কাজে লাগাইতে পারে। আধিজাতিক প্রগতির এইরূপ সমন্বয়ে বিকাশের দ্বারা আমাদের আধুনিক যুগের পক্ষে এমন এক সংহত অধিজাতির (federated nation) আদর্শ অনুধাবন করা সম্ভব হইয়াছে যাহা এক মূলগত ও সুসিদ্ধ চৈতন্যমূলক ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং কমিউন ও প্রাদেশিক নগর-সকলের ভিতর দিয়া আংশিক বিকেন্দ্রীকরণের (decentralisation) দিকে অগ্রসর হইবে, এবং ইহা

শেষাংশ ৫১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ইংরেজের সম্বন্ধে ইটালীর মনোভাব

স্পেনের সাধারণতন্ত্রীদের শেষ সংগ্রামের অবসান হইয়াছে। সুদীর্ঘকাল রক্তপাতের পর স্পেন জেনারেল ফ্রাঙ্কোর করতলগত হইয়াছে, এবং করতলগত হইয়াছে, প্রধানত ইটালীর সাহায্যে। জার্ম্মানীর সাহায্য না ছিল এমন কিছু নয়; কিন্তু ইটালীর সাহায্য ছিল জেনারেল ফ্রাঙ্কোর পক্ষে স্পেনের অন্তর্দ্রোহ আরম্ভ হইবার পর হইতে আগাগোড়া। জেনারেল ফ্রাঙ্কোর স্পেনে প্রতিষ্ঠালাভের ফলে ইটালীর কি কি সুবিধা হইবে এবং সেই সব সুবিধা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যস্বার্থের উপর কি ভাবে প্রতিক্রিয়া করিবে, ইংরেজ ও ইটালীর ভিতরকার আসন্ন রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতির স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে আগে সে কথা বিবেচনা করা দরকার। অবশ্য স্পেনের লড়াই বাঁধিবার পর হইতেই ইটালী আগাগোড়া এই কথা মুখে বলিয়া আসিতেছে যে, স্পেনে ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী একটা শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, ইটালী ইহা চাহে না; ইহা ছাড়া স্পেনের ব্যাপারের ভিতর দিয়া নিজের সুবিধা করিয়া লইয়া ভূমধ্যসাগরের বর্ত্তমান পরিস্থিতির কোনরূপ পরিবর্ত্তন সাধনের ইচ্ছা ইটালীর নাই; সেই সঙ্গে ইটালীর ফ্যাসিষ্ট কর্ত্তারা এ কথাও বলিয়া আসিতেছেন যে, স্পেনের স্বাধীনতায় কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবার অভিপ্রায় ইটালীর নাই। সে স্পেনে রাষ্ট্রনীতিক বা কোনরূপ আর্থিক সুবিধা পাইবে, এমন মতলব মনে লইয়াও জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য করিতেছে না।

ইংরেজ, ফরাসী ও ইটালী এবং রুষিয়ার প্রধান নৌ-বহরের ঘাটিসমূহ

রাজনীতিক দৃষ্টি লইয়া যাঁহারা জগতের বর্ত্তমান পরিস্থিতিকে বিবেচনা করেন তাহাদের কাছে কিন্তু ঐ সব সদিচ্ছা বা সাধু অভিপ্রায়ের কোন মূল্যই নাই। তাঁহারা বিবেচনার মধ্যে গণ্য করেন বাস্তব অবস্থাকে, স্পেনের সাধারণতন্ত্রীদের পতনের ফলে বাস্তব যে অবস্থা দাঁড়াইল, তাহা ইটালীর মূলে কতটা সুবিধাজনক হইল তাহাই হইতেছে প্রধান বিবেচ্য বিষয়। অর্থাৎ এখন যে অবস্থা দাঁড়াইল তাহাতে ইংরেজের সঙ্গে ইটালীর যদি কোন দিন যুদ্ধ বাধে তাহা হইলে ইটালীর পক্ষে কি কি বিশেষ সুবিধা লাভ সম্ভব হইবে, ইহাই হইল আসল কথা এবং সেই আসল কথার উপরই ইংরেজের সম্বন্ধে ইটালীর আসল মনোবৃত্তিটাও প্রধানত নির্ভর করে। নতুবা রাজনীতিক ক্ষেত্রে প্রেম, ভালবাসা, এ সব কথার কোন মূল্যই নাই। স্বার্থ চাহে সকলেই, কেহই এখানে বিশ্বপ্রেম বিতরণ করিতে বসে নাই।

বিশেষত মিউনিক চুক্তি একেবারে চোতা কাগজের মধ্যে গণ্য করিয়া হিটলার যেভাবে সমস্ত চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাস করিয়াছেন এবং গ্রাস করিবার পর যেভাবে তাহা বাড়াইতেছেন, তাহাতে বাগে পাইলে কাহাকেও যে তিনি কসুর করিবেন না, এ সম্বন্ধে কোন শক্তির মনেই কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মেমেল হিটলারের মুঠার মধ্যে গিয়াছে, রুমেনিয়াটা এ পর্য্যন্ত জবর দখল হয় নাই বটে, কিন্তু হইতেই বা কত দেরী? রুমেনিয়ার সঙ্গে জার্ম্মানীর যে সন্ধি হইয়াছে, তাহাতে রুমেনিয়ার আর্থিক স্বাধীনতা একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই এবং রুমেনিয়ার তেলের খনিগুলি হিটলারের ষোলআনা দখলে আসে নাই, এই কথা বলিয়া কোন কোন শক্তি আশ্বস্তি বোধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন বটে; কিন্তু অন্তরে অন্তরে কাঁপুনি ধরিয়াছে দস্তুর মত; কারণ হিটলারী ধারাই হইল ইহাই। চেকোশ্লোভাকিয়ার ক্ষেত্রে এবং অষ্ট্রিয়ার সম্পর্কেও এইরূপ নীতি অনুসৃত হইয়াছিল। বসিবার জায়গা করিয়া লইলেই শুইবার জায়গা হয়, ইহাই হিটলারের নীতি। রুমেনিয়ার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হিটলার আজ সূচ হইয়া ঢুকিয়াছেন, দেখিতে দেখিতে তিনি রুমেনিয়ার স্বাধীনতাকে উৎখাত করিয়া লাঙ্গলের ফলা হইয়া বাহির হইবেন, ইহা বুঝিতে বাকী কাহারও নাই।

ইটালীর সঙ্গে জার্ম্মানীর যে জোট, ইহা ভাঙ্গিবার জন্য বহু চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু কোন চেষ্টাই সফল হয় নাই। ইটালী এবং জার্ম্মানী ইহাদের দুইয়ের নীতি এতই সুস্পষ্ট এবং সুনির্দ্দিষ্ট যে, এ পর্য্যন্ত কি ইংরেজ, কি ফরাসী, কেহই এই দুই ফ্যাসিষ্ট শক্তির মনে কোন পাকে-প্রকারেই কিছুমাত্র সন্দেহ সংশয়ের সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। এখন

প্রশ্ন দাঁড়াইয়াছে এই যে, স্পেনের পতনের পর জার্ম্মানীর সংগে জোট বাঁধিয়া ইটালী যদি ফরাসীদের ঘাড়ে চাপিয়া বসে অর্থাৎ টিউনিস দাবীর উপর জোর দেয়, তাহা হইলে তাহাকে ঠেকান যাইবে কি করিয়া? জার্ম্মানী ক্রমিকভাবে দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে যেমন গতিতে অগ্রসর হইতেছে, ইটালীও যদি সেইভাবে আফ্রিকার উপকূলভাগে এবং পশ্চিম এশিয়ার দিকে হাত বাড়ায় তাহা হইলে ইংরেজের অবস্থা তখন কি দাঁড়াইবে? মুসোলিনী ২৬শে মার্চ্চ ফ্যাসিষ্ট-প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার বিংশতিতম বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে এ সম্বন্ধে সকল সন্দেহের নিরসন হইয়াছে। মুসোলিনী বলিয়াছেন—গত ১৭ই ডিসেম্বর আমরা আমাদের দাবী ফ্রান্সকে জানাইয়া দিয়াছি। আমরা টিউনিস, জিবুতি ও সুয়েজ খাল সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান চাই। ফ্রান্স ইচ্ছা করিলে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে রাজী না হইতে পারে, কিন্তু তাহার ফলে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে যে ব্যবধান আছে, তাহা আরও বিস্তৃত ও গভীর হইলে আমরা দায়ী হইব না। ভূমধ্যসাগরের ভৌগোলিক, সামরিক এবং ঐতিহাসিক অবস্থান লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়, ইটালীর পক্ষে উহা অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজন। ইটালীর জন্য আমরা নিজেদের এবং অপরের রক্তপাত করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিব না। সোজা কথা—ঘোর প্যাঁচ কিছুই নাই!

বলা বাহুল্য, জার্ম্মানীও সেই সুরে সুর মিলাইয়া বলিবে, ইটালীর যে সব দাবী আমরা সে সব পূর্ণভাবে সমর্থন করিব এবং প্রয়োজন হইলে সেগুলি আদায় করিয়া লইবার জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতেও পশ্চাৎপদ হইব না। হিটলার সেদিন সেই কথাই বলিয়া দিয়াছেন।

ইংরেজের টনক নড়িয়াছে; টনক যে এতদিনও না নড়িয়া ছিল এমন নয়, কর্ত্তারা বুঝিতেছিলেন সবই, কারণ হিটলার ও মুসোলিনী যে নীতি ধরিয়া চলিতেছেন তাহাতে আকস্মিকতা একটুও নাই। ঘটনার কারণ পরম্পরার ক্রমিক বিকাশের সংগে সংগেই তাঁহাদের নীতি পরিপূর্ণতা লাভ করিতেছে, এই ঘটনার গতিকে ঘুরাইয়া দিবার মত উপযুক্ত রাজনীতিক দূরদর্শিতা কিংবা সাহস ইংরেজ দেখাইতে পারে নাই; মনে করিয়াছে নিজেদের সাক্ষাৎ-সম্পর্কে যেটুকু স্বার্থ, সেইটুকু বজায় রাখিয়া চলিতে পারিলেই হইল, আর যে মরুক আর বাঁচুক। কিন্তু এখন আর সে যুক্তিতে কুলাইতেছে না; সুতরাং রব উঠিয়াছে যে, ইংরেজ, ফরাসী এবং রুশিয়ার জোট বাঁধিতে হইবে; কিন্তু এই জোট বাঁধার মধ্যে আন্তরিকতা যেটুকু আবশ্যক, ইহাদের পরস্পরের মধ্যে তাহা নাই। রুশিয়ার সংগে ইংরেজের সম্পর্ক এতদিন পর্য্যন্ত কতকটা আদা-কাঁচকলার সম্পর্কের মতই ছিল; স্পেনের ব্যাপারে ইংরেজের বিশ্বাসঘাতকতার কথা রুশিয়া ভুলিতে পারিবে না, এবং ফরাসীর সংগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মনে প্রাণে কি আন্দাজ মিল, উভয় পক্ষই দস্তুরমত জানেন। ফরাসী প্রেসিডেণ্টকে লণ্ডনে অভ্যর্থনাতে যত আড়ম্বরই দেখান হউক, ফরাসীরা জানে, সে সবই ফাঁকা। যদি ইংরেজ এবং ফরাসী পিরীত এমন পাকাই হইত তাহা হইলে আবিসিনিয়ার ব্যাপার হইতে আরম্ভ করিয়া স্পেনের এমন পরিণতি, ফ্যাসিষ্টদের এতটা অনুকূল কিছুতেই হইতে পারিত না। ইংরেজ এবং ফরাসীর মধ্যে বর্ত্তমানের এই যে মনের মিল দেখা যাইতেছে তাহার তত্ত্বকথাটা কি 'ফরেন এফেয়ার্স' পত্রে মিঃ হেরল্ড নিকলসন তাহা ভাঙ্গিয়া বলিয়াছেন। তিনি বলেন,—'চেকোস্লোভাকিয়ার সমস্যা ইংরেজ এবং ফরাসীকে কেমন করিয়া এক করিয়াছিল ইহা এক অপূর্ব্ব রহস্য। প্রথমত এই ব্যাপার সম্পর্কে আমাদের মনে এই ধারণা জন্মে যে, ফরাসীদের সংগে আমাদের যে সম্পর্ক সেটা সাম্রাজ্যের পক্ষে বিপজ্জনক এবং সুদেতেন জার্ম্মানদের ব্যাপার লইয়া ফরাসীদিগকে পেলা দিতে গিয়া আমাদিগকে যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইবে। তাহার পর আমরা দেখিতে পাইলাম যে, আমাদের চেয়ে ফরাসীরাই জার্ম্মানদের কাছে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য বেশী ব্যগ্র, তখন আমাদের মনের গতি বদলাইয়া গেল। একদিকে আমরা এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম যে, আমাদের চেয়ে ফরাসীরাই বেশী বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে এবং ভীরুতার পরিচয় দিয়াছে; পক্ষান্তরে ফরাসীরাও এই যুক্তিতে তাহাদের মনকে প্রবোধ দিতে লাগিল যে মিঃ চেম্বারলেনের পিঠের উপর দিয়াই তাহাদের পরাজয়ের অবমাননার কালিটা চুঁয়িয়া গেল, তাহাদের নিজেদের গায়ে আর লাগিল না। ইহার ফলে আমাদের দুইয়ের মধ্যে মনের মিল এবং একতা ভাব জন্মিল। আমরা উভয়েই ভিতরে ভিতরে নিজদিগকে অপরাধী মনে করিতে লাগিলাম, আমরা উভয়েই ভীত হইলাম এবং উভয়েই লজ্জিত হইলাম। আমরা উভয়েই বোধ করিলাম যে, আমরা সমভাবেই বিপন্ন। দুইয়ের সমান অবমাননা এবং প্রীতির ভাবকে ভিত্তি করিয়া ভবিষ্যতে সহযোগিতার কোন সুদৃঢ় ভিত্তি গঠিত হইতে পারে কিনা ইহা সন্দেহের বিষয়। আমাদের উভয়ের কাপড়েই অপমানের কালি এতটা লাগিল যে, আমরা উভয়েই কৌশলে পুঁটলী পাকাইয়া তাহা ধামাচাপা দিব ঠিক করিলাম। এই অপমান এবং ভীতিকে ভিত্তি করিয়া যে নীতি নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা হইতেছে, তাহাকেই বলা হইতেছে গণতান্ত্রিকতা রক্ষার নীতি।'

এই ত এ পক্ষের ভিতরের অবস্থা। এখন দেখা যাইতেছে, কি ইটালী, কি জার্ম্মানী রাজ্য বিস্তারের যে ব্যবসাতে ইহারা নামিয়াছে, তাহা সহজে বন্ধ হইবে না। ফরাসীরা চীৎকার তুলিয়াছে, এই বিপদকে এড়াইতে হইলে একমাত্র উপায় কাগজে যুক্তি নয়, অস্ত্রশস্ত্র বাড়ান, একমাত্র উপায় হইল যুদ্ধ। ইটালী এবং জার্ম্মানীর ভিতরকার জোট ভাঙ্গিতে হইলে প্রবলভাবে বাধাদানের নীতি ছাড়া অন্য নীতি নাই।

এখন দেখা যাউক, যদি তেমন একটা যুদ্ধ সত্যই বাধে তাহা হইলে ইটালীর অবস্থা বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে যেমন দাঁড়াইয়াছে তাহাতে ইংলণ্ডের অবস্থা কিরূপ।

পাঠকদিগকে এ কথা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন নাই যে, ভূমধ্যসাগর এবং লোহিত সাগর, এতদুভয়বে

যন্ত্র করিতেছে যে সুয়েজ খাল, ব্রিটিশের সাম্রাজ্য বজায় রাখিবার পক্ষে তাহাই প্রধান পথ। এই পথ যদি বন্ধ হয়, তাহা হইলে উত্তমাশা অন্তরীপের ঘোরা পথ ছাড়া এশিয়ায় আসিবার পক্ষে ইংরেজের আর দ্বিতীয় পথ নাই। তিন বৎসরের মধ্যে ঘটনার গতি যেভাবে ঘুরিয়া গিয়াছে, তাহাতে ইংরেজের এই পথ আর নিরাপদ নহে। সিসিলীতে ইটালী যে পাকা বিমান-বহরের ঘাঁটী করিয়াছে, সেই ঘাঁটী হইতে, ইটালী যদি ইচ্ছা করে তাহা হইলে জিব্রালটার এবং হাইফা বন্দরে অবস্থিত ইংরেজ নৌবহরকে বিপর্যস্ত করিয়া দিতে পারে। ১৯৩৮ সালে ইটালীর সঙ্গে মিঃ চেম্বারলেনের মোড়লগিরিতে ইংরেজের যে সন্ধি হইয়াছে তাহাতে ইংরেজ ভূমধ্যসাগরে ইটালীর সমান অধিকার স্বীকার করিয়া লইয়াছে ঐ সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইবার সময় মুসোলিনী ইংরেজকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, ভূমধ্যসাগরের পথ বিপন্ন করিবার জানে। ইটালী এই কথা বলিতেছে যে, আমরা প্যালেস্টাইনের জাতীয়তাবাদীদিগকে সাহায্য করিতেছি, এ কথা সত্য নয়; তবে আমাদের মত হইল এই যে, নিজেদের দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার আরবদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। এবং সেই জন্যই আমরা প্যালেস্টাইনে 'ইহুদী নিবাস' করিবার নীতিকে যথেচ্ছাচার বলিয়া মনে করিয়া থাকি। ঐ সম্বন্ধে হিটলার এবং মুসোলিনী এই দুইজনের মতই ইহুদী-বিরোধী এবং ইংরেজের অবলম্বিত নীতির প্রতিকূলে।

আবিসিনিয়া অধিকারের পর ভারত মহাসাগরেও ইটালীর অধিকার সম্প্রসারিত হইয়াছে। ম্যাসুয়া এবং আমানে ইটালীর দুইটি নৌঘাঁটি এখন সুদৃঢ়। ইহা ছাড়া দক্ষিণে সোমালিয়াতে ইটালীর আর একটি বিমানবহরের ঘাঁটি রহিয়াছে। এখন এইদিক হইতে সহজেই সে লোহিতসাগরের মুখ বন্ধ করিয়া দিতে পারে। এইখান হইতে ভারত মহা-

লোহিত সাগরের মুখে ইংরেজ ফরাসী ও ইটালীর অবস্থান
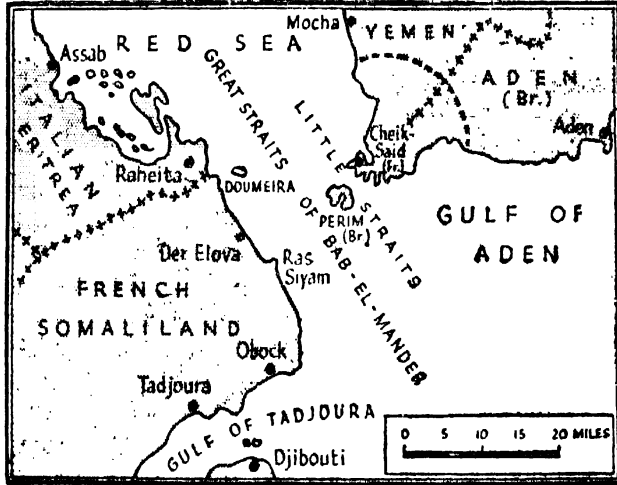
ইচ্ছা আমাদের নাই। আমরা এই পথ ছিন্ন করিতেও চাই না, কিন্তু আমরা চাই যে আমাদের স্বার্থ সুরক্ষিত হইবে এবং সেই স্বার্থ সুরক্ষিত করিবার জন্যই স্পেনের ব্যাপারে যে ইটালী এতটা গরজ দেখাইয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই। ইটালী মুখে এখনও এই কথা বলিতেছে বটে যে জিব্রালটারের পথটা আমাদের পক্ষে যাহাতে নিরাপদ থাকে, সেই জন্যই আমরা মাদ্রিদ-ভ্যালেনসিয়া গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধতা করিয়াছি, কিন্তু এই নিরাপদ রাখার অর্থ যে, জিব্রালটারের ধারে ইটালীর ঘাঁটী পাকা করিয়া ইংরেজের মাল্টাকে অকেজো করিয়া ফেলাই, ইংরেজও ইহা বুঝিতে পারিতেছে। লোহিতসাগরের তীরে ইংরেজ এবং ইটালীর সম্পর্ক কি হইবে, সে সম্বন্ধে একটা যুক্তি আছে বটে; কিন্তু ইহা সত্য যে, ইসলাম প্রীতির ঢাক পিটাইতে ইটালী কসুর কিছুই করিতেছে না। লিবিয়াতে গিয়া মুসোলিনী প্রকাশ্য-ভাবেই ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি ইসলামের রক্ষাকর্তা। প্যালেস্টাইন সম্পর্কে মুসোলিনীর নীতি কি, ইংরেজ তাহা সাগরেও ইটালী প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম। সোমালী-ল্যাণ্ডের ধারে ইটালী কয়েকটি বন্দর গড়িয়া তুলিবার চেষ্টায় আছে, এইগুলি তৈয়ার হইয়া গেলেই ইটালী ভারত মহা-সাগর ও লোহিতসাগরের দিক হইতে এবং আফ্রিকার দিক হইতে নিজেদের আওতার মধ্যে লইয়া যাইবে এবং উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ভারত মহাসাগরে ঢুকিবার পথেও ব্রিটিশ রণতরীসমূহকে বাধা দিতে সক্ষম হইবে।

মধ্য ইউরোপের রাষ্ট্র-নীতির গতি এখন কোন দিকে ঘুরিবে—পূর্ব্বে না পশ্চিমে? অনেকেরই বিশ্বাস যে মুসোলিনী এইবার সুর ধরিবেন এবং তাঁহার দাবীর উপর জোর দিবেন, এবং একথাও বলা বাহুল্য যে, জর্ম্মানী ইটালীর সেই দাবীকে সমর্থন করিবে, কারণ জার্ম্মানী এবং ইটালীর যে জোট তাহা ভাঙ্গিতে পারে এমন কোন সমস্যা এখনও দেখা দেয় নাই। কি ইংরেজ, কি ফরাসী কেহই এমন রাজনীতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে পারে নাই, যাহাতে ইহাদের মধ্যে ভেদ ঘটিতে পারে। কারণ ইহাদের নিজেদের মধ্যেই কোন উচ্চ আদর্শ বা নীতি নাই।

কূটনীতির কসরত

যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাস করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি মেমেলও উদরস্থ করিয়াছেন, রুমানিয়ার সঙ্গে একটি চুক্তিতেও আবদ্ধ হইয়াছেন! শেষোক্ত কার্য্য দুইটি ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে সম্পন্ন হইয়াছে।

হিটলার কর্তৃক চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাস ও ইউরোপের চাঞ্চল্য সম্বন্ধে গত সপ্তাহে আপনাদের অনেক কথা শুনাইয়াছি। ব্রিটেন ফ্রান্সের সংবাদপত্রগুলি রব তুলিল 'গেল রাজ্য গেল মান'! নেতারা সুরে সুর মিলাইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'বেশ এবারকার মত সহ্য করিলাম। ভবিষ্যতে যদি আর কখনও এরূপ কর, তাহা হইলে দেখিয়া লইব।' এরূপ কথার ব্যঞ্জনা কাহারও বুঝিতে বাকি নাই। ভবিষ্যতে ইউরোপের অন্য কোন দেশ হিটলার গ্রাস করিতে চাহিলে তাঁহারা সদলবলে তাহাকে বাধা দিবেন' এই উদ্দেশ্যে ইউরোপের বিভিন্ন ডিমোক্রাসিগুলির মধ্যে সলাপরামর্শও সুরু হইল। ব্রিটেন ইহাতে নেতৃত্ব গ্রহণ করিল। ব্রিটেন, ফ্রান্স, রুশিয়া, পোল্যান্ড ও পূর্ব্ব ইউরোপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি একযোগে জার্ম্মানীকে বাধা দিবে এইরূপ আভাষও পাওয়া গেল। লন্ডনের 'টাইমস' পত্রিকা একথাও বলিলেন যে, নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও এবার আবার জার্ম্মানীকে ঘেরাও করিয়া ফেলিতে হইবে। হিটলারের হঠকারিতাই এজন্য সর্ব্বাংশে দায়ী।

ইউরোপের ডিমোক্রাসিগুলি একদিকে যখন এইরূপ কসরত করিতেছিল, তাহার মধ্যেই হিটলার মেমেল অধিকার করিয়া বসিলেন! আগেকার নীতি অনুসারেই তিনি ইহা করিয়াছেন। সকল জার্ম্মানকে একরাষ্ট্রভুক্ত করা—এ নীতি আগেই স্বীকৃত হইয়াছে। নহিলে সুদেতেন জার্ম্মান অঞ্চল দেওয়া হইয়াছিল কি হেতু? এ ব্যাপারটি—অর্থাৎ হিটলারের মেমেল গ্রাস চাঞ্চল্য উপস্থিত করিলেও তথকথিত ডিমোক্রাসিগুলির কর্তারা ইহার প্রতিবাদ করিতে মুখ পান নাই। মেমেল আগে জার্ম্মানীরই একটি অংশ ছিল। ভার্সাই সন্ধিতে ইহাকে আলাদা করিয়া রাষ্ট্র-সঙ্ঘ নিযুক্ত একটি কমিশনের উপরে ইহার শাসন ভার দেওয়া হয়। গত ১৯২৩ সালে মেমেলকে লিথুয়ানিয়ার অন্তর্গত করা হইয়াছিল।

ইউরোপে ভীষণ চাঞ্চল্যের মধ্যেই হিটলার মেমেলও গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছেন। সাধারণে হয়ত ভাবিয়াছে, হিটলার বেপরোয়া হইয়া উঠিয়াছেন। ইংরেজীতে একটি কথা আছে, "Now or Never" 'হয় এখন করিয়া ফেল, নহিলে এরূপ সুযোগ আর আসিবে না।' হিটলার কি তবে ভাবিয়াছিলেন যে, সকলেই যখন তাঁহাকে ঘেরাও করিয়া ফেলিতে চাহিতেছে, তখন এখনই মেমেল অধিকার করিয়া নিজ শক্তি পাকা করিয়া লইবেন? এ অভিলাষ তাঁহার মনে থাকা নিতান্ত স্বাভাবিক। তবে তিনি যে একটা সুনির্দ্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে কাজ করিয়া চলিয়াছেন তাহা তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যায়। কিন্তু তাঁহাকে যাহারা বাধা দিতে চাহিতেছে, তাহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি নাই। তাহারা কাজের চেয়ে কথাকেই যেন বেশী প্রয়োজনীয় মনে করিয়া থাকে। আবার শুধু কথা হইলেও ক্ষতি ছিল না, মিথ্যা ছলনারই তাহারা আশ্রয় লইয়াছে বলিয়া বোধ হয়! রুমানিয়া সম্পর্কে এবার এই বিষয়ই প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে।

হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়াকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন। শ্লোভাকিয়া ও রুথেনিয়াকে তিনি স্বাধীনতা দিয়া বাকী অংশ দুইটি প্রদেশে ভাগ করিলেন বোহিমিয়া ও মোরাভিয়ায়। বোহামিয়া ও মোরাভিয়াকে নিজ শাসনে আনিলেন, শ্লোভাকিয়াকে রক্ষা করিবেন, বলিয়া আশ্বাস দিলেন, রুথেনিয়ার ভাগ্য হাঙ্গেরীর হাতে ছাড়িয়া দিলেন। এই সব কার্য্য এত দ্রুত হইয়া গেল যে কাহারো 'টু' শব্দটি করিবারও অবসর রহিল না। হিটলারের তথাকথিত বিরুদ্ধবাদীরা একাজ নিতান্ত গর্হিত বলিয়া অতঃপর মত প্রকাশ করিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও রটাইল যে, রুমানিয়ার উপর হিটলার 'আলটিমেটাম' বা চরমপত্র দিয়াছেন। একথাটি এমনভাবে প্রচার করা হইল যে, মনে হইল চেকোশ্লোভাকিয়ার মত রুমানিয়াকেও হিটলার গ্রাস করিয়া ফেলিবেন! তাই তাহারা ধুয়া তুলিল—অন্য কোন রাষ্ট্র—যেখানে জার্ম্মান ছাড়া অন্য জাতির বাস—আক্রান্ত হইলে সকলে মিলিয়া হিটলারকে বাধা দিবে। কিন্তু চেকোশ্লোভাকিয়া সম্পর্কে তাহারা যেরূপ ভুল করিয়াছে, বা ভুলের ভাণ করিয়াছে, রুমানিয়া সম্পর্কেও কি তাহাই করিল? না ইহার অন্য মতলব আছে? যখন চারিদিকে রুমানিয়া সম্পর্কে এইরূপ হিটলারী চরমপত্রের কথা শুনা গেল, তাহার কিছু সময়ের মধ্যেই আবার সংবাদ আসিল, রুমানিয়া ও জার্ম্মানীর মধ্যে একটি চুক্তির কথাবার্ত্তা হইতেছে! হিটলারের মেমেল অধিকার ও রুমানিয়ার সঙ্গে চুক্তি এই দুইটি কাজই দেড় দিনের মধ্যে সম্পন্ন হইয়াছে, আগে বলিয়াছি। এ দুইটি বিষয়ের মধ্যে কি সম্পর্ক রহিয়াছে? সম্পর্ক থাকুক আর নাই থাকুক, তথাকথিত হিটলার-বিরোধীরা যে কোন একটি কূটচাল চালিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা বেশ বুঝা যায়। চেকোশ্লোভাকিয়াকে গ্রাস করিবার পর জার্ম্মানী একেবারে রুমানিয়ার সীমান্তে আসিয়া পড়িয়াছে। কাজেই এই সময় যদি প্রচার করা যায় যে, হিটলার রুমানিয়াকেও চরমপত্র দিয়াছে, তাহা সাধারণে বিশ্বাস না করিয়া পারিবে না, নিকটবর্ত্তী দেশগুলিও আতঙ্কিত হইয়া উঠিতে বাধ্য হইবে। আর ইহা দ্বারা নিজেদের উদ্দেশ্য ভাল করিয়া সম্পন্ন করিতে পারিবে।

রুমানিয়ার সঙ্গে জার্ম্মানীর চুক্তি বা সন্ধির কথা শুনিয়া সাধারণে বিস্ময় মানিয়াছে। কিন্তু যখন সন্ধির সর্ত্ত প্রকাশিত হইল, তখন সাধারণের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। দেশরক্ষার জন্য রুমানিয়া লক্ষাধিক সৈন্য জড় করিয়াছিল এবং বহু সহস্র সীমান্তের দিকে পাঠাইয়াছিল। রুমানিয়ার পক্ষে হাঙ্গেরীকে ভয় করিবার কোন কারণ নাই। জার্ম্মান সৈন্য রুমানিয়ার দিকে অগ্রসর হইতেছিল বলিয়াই রুমানিয়া

ঐরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছে—লোকের এরূপ ধারণা হইয়াছিল। কিন্তু এহেন ভাবী শত্রুদের একে অন্যকে অস্ত্র-শস্ত্রের জোগান দিবে এ কি কখনো বিশ্বাস করা যায়? কিন্তু সন্ধি বা চুক্তির একটি প্রধান সর্ত্তই এইরূপ। জার্ম্মানী রুমানিয়াকে আধুনিকতম অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করিবে! কিন্তু এর পরিবর্ত্তে রুমানিয়াকে কি করিতে হইবে? ইহা একবার শুনুন। শুনিলেই বুঝিবেন রুমানিয়া জার্ম্মানীর সঙ্গে কিরূপ অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হইতে চাহিতেছে। রুমানিয়ায় তেলের খনি বিস্তর, আর ইহার উপর অনেকেরই লোভ। আধুনিক যুদ্ধে তেল একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় বস্তু। রুমানিয়া এই তেল বেশীর ভাগ জার্ম্মানীকেই বিক্রয় করিবে। রুমানিয়ার কৃষি-শিল্প প্রভৃতি বিষয় জার্ম্মান বিশেষজ্ঞদের নির্দ্দেশে পরিচালিত হইবে! জার্ম্মানী যে তেল কিনিবে তাহা নগদ মূল্যে কিনিবে না, বিনিময়ে তাহাকে অস্ত্রশস্ত্র জোগান দিবে স্থির হইয়াছে! এখন বুঝা যাইতেছে, এই চুক্তিকেই তথাকথিত হিটলার-বিরোধীরা রুমানিয়ার প্রতি হিটলারের চরমপত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিল!

এই চুক্তি দ্বারা রুমানিয়া যে জার্ম্মানীর মিত্র হইল, তাহাতে দ্বিমত নাই। কিন্তু রুমানিয়া স্বেচ্ছায়ই এইরূপ হইতে চাহিয়াছিল। চারিদিকে যখন গুজব রটে যে, রুমানিয়ার উপর জার্ম্মানী চরমপত্র পেশ করিয়াছে, তখনও সে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিল। কিন্তু সর্ব্বত্রই, আর আমেরিকায় পর্যন্ত প্রচারিত হয় যে, ইহা চরমপত্রেরই মত। ইহা কম রহস্যপূর্ণ নয়। তবে জার্ম্মান-রুমানিয়ান চুক্তির সর্ত্তগুলি প্রকাশ হইবার পর সব রহস্যেরই নিরসন হইয়াছে। ইহা দ্বারা কিন্তু একটি বিষয় বেশ স্পষ্টই বুঝা গিয়াছে। মিউনিক চুক্তির পর মধ্য ও পূর্ব্ব ইউরোপে জার্ম্মানীর আধিপত্য যেরূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা ক্রমশঃ পাকাই হইতেছে, তাহা টুটিয়া যাইবার কোনই লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাস করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার পূর্ব্ব নীতি ভঙ্গ করিয়াছেন, এরূপ করা তাঁহার কোনক্রমেই উচিত হয় নাই—এইরূপ নানা কথা তাঁহার তথাকথিত বিরুদ্ধ-পক্ষ বলিতেছে। ইহাদের উপর নির্ভর করিতে অন্যেরা কিন্তু ভরসা পাইতেছে না। ইউরোপীয় হট্টগোলের মধ্যেই তাই রুমানিয়া জার্ম্মানীর সঙ্গে চুক্তি করিয়া লইয়াছে। ডেনমার্ক, নরওয়ে-সুইডেন তাহাদের নিরপেক্ষতার কথা জোর গলায় ঘোষণা করিতেছে। জার্ম্মানীকে ঘেরাও করিবার জন্য যাহাকে একান্ত আবশ্যক সেই পোল্যান্ড ও নিরপেক্ষ থাকিবে বলিতেছে। হাঙ্গেরী হিটলারের নির্দ্দেশেই যে চলিতেছে তাহা সহজেই বুঝা যায়। রুথেনিয়া হস্তগত করায় তিনি বাধা জন্মান নাই। মনে হইয়াছিল, ছোট রাষ্ট্রগুলি আর হিটলারের গায়ে ঢলিয়া পড়িবে না। কিন্তু একি হইল? কয়েকদিন যাইতে না যাইতেই আবার ইহারা যে হিটলারকেই নেতা বলিয়া মানিয়া লইতে চাহিতেছে। ইহার কারণ কি?

সত্য কথা বলিতে কি, হিটলারের তথাকথিত বিরুদ্ধবাদী ব্রিটেন ও ফ্রান্সের উপর অন্যদের বিশ্বাস নাই। এমন কি, যে রুশিয়াকে লইয়া ইহারা ইদানীং খুবই টানা-হেঁচড়া সুরু করিয়া দিয়াছে, সে-ও ইহাদের বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। গত পক্ষ কালের মধ্যে অনেকের অনেক গোপন কথাই সাধারণে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। গত সেপ্টেম্বর মাসে রুশিয়ার সঙ্গে যোগ না দিয়া ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্ম্মানী কর্ত্তৃক চেকোশ্লোভাকিয়ার অঙ্গচ্ছেদে সম্মতি দিয়াছিল। কেন এরূপ ঘটিয়াছে? ইহাদের রুশিয়াকে একঘরে করিবার ইচ্ছাই তখন লোকে বুঝিতে পারিয়াছিল। কিন্তু ইহারা যে আর একটি উদ্দেশ্য দ্বারাও তখন পরিচালিত হইয়াছিল, তাহা লোকে জানিতে পারে নাই। সাধারণের পক্ষে জানা হয়ত সম্ভবও ছিল না। রুশিয়া কিন্তু তাহা জানিতে পারে। সেই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিবার জন্য সোভিয়েট রুশিয়ায় ইউক্রেন প্রদেশটি (ইহা সোভিয়েট রুশিয়ার এগারটি রিপাবলিকের একটি) হিটলার আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন বলিয়া রটনা করিয়াছে! আর ইহাতে সাধারণের বিশ্বাস না হইয়াই যাইবে না। কারণ হিটলার তাঁহার আত্মজীবনীতে ত এই অঞ্চলটি সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছেন। ইউরোপ আমেরিকায় সমস্বরে এই বিষয় ঘোষণা করা হইতে লাগিল। লোকে বিশ্বাস করিল, নিশ্চিত বুঝিয়া লইল, জার্ম্মানী ও রুশিয়ায় যুদ্ধ বাধিয়া যাইবে। কিন্তু শেষে সব ফাঁস হইয়া গিয়াছে। স্বার্থপরদের ফাঁকি ধরা পড়িয়াছে। গত পক্ষকালের মধ্যে যত রকম বিষয় প্রকাশ হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটি এই—ব্রিটেন ও তাহার পোঁ-ধরা ফ্রান্স, জার্ম্মাণী ও রুশিয়ার মধ্যে যাহাতে যুদ্ধ বাধে সেই চেষ্টায়ই ছিল। মস্কো হইতে প্রথম এই খবর আসে। ইদানীং কলিকাতার সংবাদপত্রে রুশিয়ার কর্ণধার ষ্ট্যালিনের একটি বক্তৃতা প্রকাশিত হইয়াছে। এ বক্তৃতাটি অষ্টাদশ সোভিয়েট কংগ্রেসে প্রদত্ত। পাঁচ বৎসর পরে এবার আবার কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছে ষ্টালিনের বক্তৃতায় জার্ম্মানীর তথাকথিত শত্রু এবং সোভিয়েট রুশিয়ার তথাকথিত মিত্র শক্তিদ্বয়ের ঐরূপ উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থায় হিটলার কর্ত্তৃক ইউক্রেন আক্রমণের কথা তিনি তাচ্ছিল্যভরে অস্বীকার ও অবিশ্বাস করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এরূপ 'পাগল' জার্ম্মানীতে থাকা হয়ত অসম্ভব নয়, যাহারা ইউক্রেন অধিকারের স্বপ্ন দেখিতেছে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। আর এই 'পাগল'রা ইউক্রেন আক্রমণ করিলে তাহাদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার ক্ষমতা রুশিয়ার আছে।

রুশিয়া সম্বন্ধে এখানে এত কথা বলিতেছি কেন তাহা আপনারা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেছেন। ব্রিটেনের কূট-নীতির একটি প্রধান কথা হইল 'যায় শত্রু পরে পরে'। জার্ম্মানী ও রুশিয়ার মধ্যে বিবাদ জটিল হইয়া উঠিলে সংঘর্ষ অনিবার্য্য। আর এই সংঘর্ষের ফলে উভয়েরই শক্তি-ক্ষয় হইবে, জার্ম্মান বন্ধু ইটালীরও নিশ্চয়ই হইবে। কিন্তু এইরূপ উদ্দেশ্য চরিতার্থ হইবে এরূপ মনে করিবার এখন আর কোন সঙ্গত কারণ নাই। ব্রিটিশ কূটনীতি বানচাল হইবার উপক্রম হইয়াছে। এখন ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে বাধ্য হইয়া

আবার রুশিয়ার সঙ্গেই কথা পাড়িতে হইতেছে। যে-রুশিয়ার নিধন ঐসব দেশের পুঁজিবাদীরা বরাবরই কামনা করে, যাহার জন্য তাহাদের চেষ্টারও অন্ত অবধি নাই। প্রকাশ, ইতিমধ্যে দুই দিনে সোভিয়েট রাষ্ট্র-দূতকে যত-বার ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে হইয়াছে ততবার গত দুই বৎসরেও করিতে হয় নাই। রুশিয়াকে এখন এরূপ ডাকাডাকি কেন? যাহাকে এতদিন শত্রু বলিয়া গণ্য করিয়া আসিতেছে, তাহার সঙ্গে মাথামাখি করিতে হইলে অস্বাভাবিক কিছু ত করিতে হইবে!

ইহার অন্য কারণও আছে। এই সব রাষ্ট্রের সঙ্গে সঙ্ঘ বন্ধ হইলে বিপদও কম নয়। চেকোশ্লোভাকিয়া সম্পর্কে ইহাদের ব্যবহার তাহারা কখনও ভুলিতে পারিবে না। তাহা ছাড়াও বিশেষ কারণ রহিয়াছে। কোন কাজ করিতে হইলে ইহারা নানা রকম জটলা করিবে, নানা দেশে লেখালেখি করিবে, মত পাওয়া গেলে আবার আলোচনা হইবে, তারপর আততায়ীকে আক্রমণ করা চলিবে কি-না স্থির হইবে। ছোট রাষ্ট্রগুলি এ পন্থায় আস্থা স্থাপন করিতে আর ভরসা পাই-তেছে না। কেননা তাহারা দেখিতেছে, এরূপভাবে আত-তায়ীকে নিরস্ত করা অসম্ভব। তাই তাহারা হিটলার মুসোলিনীর নানা গর্হিত কর্ম্মে চঞ্চল হইয়া পড়িলেও তাঁহাদের কাছেই ধর্ণা দিতেছে। তাহারা ভাবে, যদি আত্ম-রক্ষা করা শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়, তাহা হইলে ইঁহাদের দ্বারাই হইতে পারে। পোল্যান্ড ব্যক্তিগতভাবে রুশিয়াকে পছন্দ করে না। কিন্তু সে যদি বুঝে রুশিয়ার পক্ষে থাকিলে তাহার আত্মরক্ষা সম্ভব হইবে তাহা হইলে সে নিরপেক্ষ থাকিবে কেন, বা অন্য পক্ষে যাইবে কেন? ফ্রান্স ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্যমূলক চুক্তি বলবৎ রহি-য়াছে। সে তো ইহা ভাল করিয়া জানে যে, তাহার পক্ষে ফ্রান্স যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়িলে ব্রিটেনও তাহার পক্ষে লড়িতে বাধ্য হইবে। তথাপি সে নিরপেক্ষ থাকিতে চাহি-তেছে কেন? ইহার একমাত্র উত্তর, কি রুশিয়া, কি ফ্রান্স, কি ব্রিটেন কাহারও উপর ইহার আস্থা নাই। এরূপ ব্যাপার কেন হইল উপরের আলোচনা হইতে আপনারা তাহার খানিকটা আভাষ পাইয়াছেন। এক কথায় বলিতে গেলে, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের কূটনীতির কসরত জার্ম্মানী-ইটালীর নিকট হার মানিয়াছে। এই বিষয় আর একটু পরিস্কার করিয়া এখানে বলা আবশ্যক।

মিউনিক চুক্তির পর মাত্র ছয় মাস অতীত হইয়াছে। কাজেই এখনই ঐ সময়কার সব কথা আপনারাও নিশ্চয়ই ভুলিয়া যান নাই। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেন বলিলেন, হিটলারের ক্ষুধা মিটিয়াছে। জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ পরিস্কার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সত্যই কি তাহাই হই-য়াছে? রাষ্ট্রনেতাদের মধ্যে দুই একজন হয়ত সরল বিশ্বাসে একথা প্রত্যয় করিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু অধিকাংশই ইহাতে আশ্বস্ত হইতে পারেন নাই। নিজ নিজ দেশে পূর্ণ মাত্রায় যুদ্ধ-সরঞ্জাম বাড়াইতে লাগিয়া গেলেন। ব্রিটেন ও ফ্রান্স, বিশেষ করিয়া ব্রিটেন এ বিষয়ে অগ্রণী হইল। জার্ম্মানী ও ইটালীতে প্রশ্ন উঠিল, যদি শান্তির পথই পরিস্কার হইয়া যাইবে, তাহা হইলে ইহারা এরূপ অস্ত্র-শস্ত্র বাড়াইতে মরিয়া হইয়া লাগিয়া গিয়াছে কেন? চেকোশ্লোভাকিয়ার অঙ্গ-চ্ছেদের পর ছোট রাষ্ট্রগুলি ক্রমশ হিটলারের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছিল, এখন আবার ব্রিটেনের শক্তিবৃদ্ধি প্রচেষ্টায় কতকটা যেন আশ্বস্ত হইল। চেকোশ্লোভাকিয়া তখন মনে করিল, সুদেতেন অঞ্চল চলিয়া-গেলেও তাহার স্বাধীনতা অতঃ-পর অক্ষুন্নই থাকিবে। একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মতই চলিতে চেষ্টা করিল। তখন কে বুঝিয়াছিল তাহাদের ব্যবহার হিটলারকে এমনভাবে চটাইবে! হাঙ্গেরী জার্ম্মানী ঘেঁসা কিন্তু পোল্যান্ড, রুমানিয়া যুগোশ্লাভিয়া, গ্রীস, তুরস্ক প্রভৃতি জার্ম্মানীর কবল মুক্ত হইতে পারিবে মনে করিল। বলকান আতাতভুক্ত রাষ্ট্রগুলি একযোগে আশী লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করিবার পরিকল্পনা করিয়া লইল। ওদিকে ফ্রাঙ্কোর সঙ্গে চুক্তি করায় ভূমধ্যসাগরে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের ক্ষমতা দৃঢ় হইতেছে বলিয়া বোধ হইল। ভূমধ্যসাগর হইল ব্রিটিশ ও ফরাসী শক্তির মেরুদণ্ড। ব্রিটিশ কূটনীতি একদিকে যেমন জার্ম্মানী ও রুশিয়ার মধ্যে সংঘর্ষ আগাইয়া দিবার চেষ্টায় ছিল, অন্য দিকে তেমনি স্পেনে ফ্রাঙ্কোর আধিপত্য স্বীকার করিয়া ভূমধ্যসাগরের নিজ শক্তি পাকা করিয়া রাখিতে মনস্থ করিল। এইরূপ করা তাহাদের পক্ষে একান্ত দরকার যদি মুসোলিনীকে বাগ মানাইতে হয়। তাহাদের আশা হইয়াছিল, এরূপ করিলে মুসোলিনী ফরাসী সাম্রাজ্যের উপর দাবি কতকটা ছাড়িয়াও দিবে। হিটলার এসব পরখ করিয়া দেখিলেন। ব্রিটিশ কূটনীতির কসরত বেশী দূর অগ্রসর না হইতেই হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়াকে গোটা আস্ত গ্রাস করিয়া ফেলিলেন! ব্রিটিশ নেতৃবর্গ ভাণ করিয়াছেন, তাঁহারা এ বিষয়ে আগে কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু যতই দিন যাইতেছে ততই বুঝা যাইতেছে, ব্রিটিশ কূটনীতিই, পরোক্ষ-ভাবে হইলেও, চেকোশ্লোভাকিয়ার পতনের জন্য দায়ী। বিভিন্ন শক্তির মধ্যে মনান্তর বাড়াইয়া দিয়া স্বার্থ-সিদ্ধির সেই মধ্যযুগীয় চেষ্টা ব্রিটিশের আর কতদিন চলিবে?

চেকোশ্লোভাকিয়ার বিলোপের পর বিভিন্ন রাষ্ট্র সলা-পরামর্শ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এ আলোচনার এখনও পরিণতি কিছুই হয় নাই। কাজেই যদি ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলি এইরূপ সংশয়-সন্দেহের মধ্যে না থাকিয়া নিরপেক্ষ থাকি-বার বা হিটলারের সঙ্গে যোগ দিবার অভিলাষ জানায় তাহা-হইলে তাহাতে তাহাদের মোটেই দোষ দেওয়া চলে না। ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রুশিয়া এ তিনটিই ইউরোপে প্রধান ডিমো-ক্রাসি বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু ইহাদের স্বার্থ ও আদর্শ এত বিভিন্ন যে, ইহাদের মিলন একরূপ অসম্ভব বলিয়াই বোধ হইতেছে। মধ্য ইউরোপে হিটলারের প্রাধান্য যতই বাড়িতে থাকিবে, ততই ফ্রান্স ও রুশিয়া উভয়েরই আশঙ্কা বাড়িয়া যাইবে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়াছে। পূর্ব্ব ইউরোপে জার্ম্মানী যাহাতে বেশী দূর প্রভাব বিস্তার না

(শেষাংশ ৫০৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দাবী

(গল্প)

শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত

(১)

গ্রামের আর দশ জনের ন্যায় গোরাচাঁদেরও মনে এই ধারণাটাই একপ্রকার বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, মাধব দাসের মেয়ে রাধা তাহাকে বাদ দিয়া আর অন্য কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিতে পারিবে না। কিন্তু যেদিন ফাগুনের এক ধূসর সন্ধ্যায় রাধা তাহার নবপরিণীত স্বামী রসিকের সঙ্গে গো-যানে চাপিয়া তিনক্রোশ দূরবর্ত্তী বল্লভপুরে স্বামীর ঘর করিতে চলিয়া গেল, সেদিন গোরাচাঁদ আপনার কুটীরের দাওয়ায় বসিয়া মনে মনে, সেই বহুদিন আগেকার মীমাংসিত প্রশ্নটির নূতন মীমাংসা খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল; আর তাহার দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

রাধার বয়স যখন ছয় বৎসর, সেই সময় তাহার মা মারা যায়। সেই দিন হইতেই মাধব একাধারে রাধার পিতা ও মাতার সকল দাবী-দাওয়া মিটাইয়া আসিতেছিল। রাধাদের বাটীর ঠিক গোটা দুই তিন বাড়ীর পরের বাড়ীখানা ছিল হরিহর দাসের। হরিহরের সংসারেও তাঁহার একমাত্র পুত্র গোরাচাঁদ ব্যতীত আর কেহই ছিল না। হরিহরের গলাটি ছিল অত্যন্ত মিঠা। সে যখন খঞ্জনী বাজাইয়া সুমধুর স্বরে গান করিত—

'রাই অভিমানে মুখ ফিরায়ে
কে আর আমায় কাঁদাবি বল—"

তখন সে গান যে শুনিত তাহারই দুই চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িত। মাতৃহারা পুত্র গোরাকে পিঠে করিয়া হরিহর গ্রামে গ্রামে গান গাহিয়া ভিক্ষা করিয়া ফিরিত। ক্রমে গোরা যখন একটু বড়সড় হইল তখন সেও আধ-আধ স্বরে পিতার কণ্ঠের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া গান ধরিত—

"দেখে এলাম গৌর বরণ সন্ন্যাসী এক নদীয়ার পথে—"

তখন হরিহরের চোখের জল যেন আর কোন মতেই বাধা মানিত না।

এমনি করিয়া দিন চলিতেছিল। মাধবের আর্থিক অবস্থা হরিহরের চাইতে অনেক ভাল ছিল। একই গ্রামে পাশা-পাশি থাকার দরুন উভয়ের মধ্যে বেশ একটা প্রীতির সম্পর্কও গড়িয়া উঠিয়াছিল। সেদিন সকালে অন্যান্য দিনের মত হরিহর একহাতে গোরার একটি হাত ধরিয়া ও অন্য হাতে প্রিয় খঞ্জনীটি লইয়া গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে মাধবের বাটীর সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল। মাধব ঘরের দাওয়ায় বসিয়া—সম্মুখে রথযাত্রা আসিতেছে, সেই সময় কেমন একটা ছোটখাট দোকান দেওয়া যায় তারই চিন্তায় বিভোর ছিল; অনতিদূরে নিমগাছটার তলায় তাহার ৭ম বর্ষীয়া কন্যা রাধা তাহার 'খেলা-বাড়ী' লইয়া ব্যস্ত ছিল। সহসা হরিহরকে গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে যাইতে দেখিয়া মাধব তাহাকে ডাকিল, 'এই যে হরে, এদিকে একবার এস হে!'......

হরিহর গোরার হাত ধরিয়া উঠানের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল,—

'এস ভাই এস......অনেক দিন তোমার গান শোনা হয়নি হে! নূতন কিছু গান-টান যদি বেঁধে থাক তবে দু'-একটা শোনাও না হে।'

মৃদু হাসিয়া হরিহর বসিতে বসিতে কহিল, 'তেমন আর সময় কোথা ভাই যে নূতন গান বাঁধব......তবে যদি সেই পুরাতন কিছু শোন ত'......

—'বেশ, তাই না হয় একটা গাও।'

হরিহর খঞ্জনী বাজাইয়া গান ধরিল,—

—"রাই মুখ ফিরিয়ে দেখ্‌লো চেয়ে
কে এয়েছে ওই দুয়ার ধারে"

পিতার সঙ্গে সঙ্গে দশম বর্ষীয় পুত্র গোরাচাঁদও কণ্ঠ মিলাইল,—"রাই মুখ ফিরিয়ে দেখ্‌লো চেয়ে......।"

দুইটি অসমবয়সী গায়কের সুমধুর কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া কাঁপিয়া যেন একটা সুরের মায়াজাল সৃষ্টি করিতেছিল। মাধব তন্ময় হইয়া গান শুনিতেছিল আর তার দুই চোখের কোল বাহিয়া অবিরাম অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল।

—'তোমার ছেলে গোরা, না? আহা! বেশ গাইতে শিখেছে ত'! এস ত' বাবা!......'

গোরা ধীরসঙ্কুচিত পদে মাধবের নিকট গিয়া দাঁড়াইল। গানের শব্দ শুনিয়া রাধা বহুক্ষণ পূর্ব্বেই খেলা ফেলিয়া পিতার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে এমন সময় ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিয়া, পিতার কানে কানে কহিল,—"বাবা, ওকে আমার সঙ্গে খেলতে বল না!"

হোঃ হোঃ করিয়া হাসিতে হাসিতে মাধব কহিল, 'শুনলে হরি, আমার বেটী কি বলে?......'

বিস্মিতভাবে হরিহর শুধাইল, 'কি!'

—'বলছে, গোরাকে ওর সঙ্গে খেলতে......'

—'বেশ ত' যা না গোরা, ওর সঙ্গে খেল গিয়ে।'

রাধা গোরার একখানি হাত ধরিয়া খেলিতে চলিয়া গেল। সেইদিকে তাকাইয়া মাধব হরিহরের দিকে ফিরিয়া কহিল—'আহা যেন হর-গৌরী মিলন হয়েছে!' তারপর অল্প একটু থামিয়া হরির দিকে তাকাইয়া মাধব কহিল, 'আমার একটা কথা রাখবে ভাই?'

হরিহর কহিল—'কি?'

—'তোমার গোরাচাঁদ বড় হলে, আমার রাধার সঙ্গে ওর বিয়ে দেবে ভাই?'

একটুক্‌রা বিষণ্ণ হাসি হাসিয়া হরিহর কহিল, "ও যদি তোমার আশীর্ব্বাদ পায় তবে জানব—সত্যিই হরি ওকে কৃপা করেছেন।...........আজ তা'হলে উঠি ভাই.........গোরা রইল; যাবার পথে ওকে ডেকে নিয়ে যাব'খন" গোরাকে বলিয়া গেল, "কোথাও যাস্‌নে গোরা, ফেরার পথে ডেকে নিয়ে যাব রে!"

গোরা নীরবে ঘাড় হেলাইল।

(২)

একদিন রাত্রে বিছানায় শুইয়া রাধা দুইহাতে তাহার পিতার গলদেশ জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, 'জান বাবা, গোরা-দা'র সঙ্গে আমার আজ কণ্ঠিবদল হয়েছে!'

—'কণ্ঠিবদল! সে কি রে—'

—'বাঃ, তা বুঝি তুমি জান না!......ওই যে সেদিন কুসুমদি' মদনের সঙ্গে 'কণ্ঠিবদল' করলে!......'হাঁ বাবা এখন ওই ত' আমার বর!'

স্নেহমাখা সুরে মাধব মেয়ের মাথায় হস্ত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, 'হাঁ মা, ওই এখন তোমার বর!'

পরের দিন প্রত্যূষে যখন হরিহর পাড়ায় গান গাহিতে যাইতেছিল তখন মাধব তাহাকে ডাকিয়া কহিল—'শুনছ' হরি, মা-যে আমার কাল তোমার গোরাচাঁদের সঙ্গে "কণ্ঠিবদল" করেছে।' বলিয়া পার্শ্বে উপবিষ্ট কন্যার দিকে তাকাইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। রাধা পিতার কথায় লজ্জা পাইয়া কাপড়ের মধ্যে মুখ লুকাইল।

খেলার ছলে যাহা একদিন গোরাচাঁদ ও রাধা করিয়াছিল, সেই ব্যাপারটাই অদূর ভবিষ্যতে একদিন দশজনের সম্মুখে ঘটা-করিয়া করিবার ইচ্ছাটা মাধব বেশী দিন চাপা দিয়া রাখিতে পারিল না এবং অল্প দিনের মধ্যেই মাধবের সেই 'ইচ্ছাটা' সকলেই জানিল।

রাধা যে একদিন গোরার গৃহে বৌ হইয়া আসিবে, এ কথা ভাবিতেই সে আনন্দে দিশেহারা হইয়া উঠিত। সে একদিন রাধার একখানি হাত ধরিয়া গাঢ় স্বরে ডাকিল 'রাধা!'

রাধা কহিল, 'কি—'

—'দেখ্ তুই যখন সত্যি সত্যিই আমার বৌ হচ্ছিস, তখন তোকে এবার হতে 'বৌ' বলেই ডাকব, কেমন?'

মৃদু হাসিয়া রাধা জবাব দিয়াছিল, 'বেশ ত' তোমার যা ইচ্ছা তাই বলেই ডেক।'

গোরা রাত্রে বিছানায় শুইয়া শুইয়া স্বপ্ন দেখিত, যেন ওই ছোট্ট রান্না-ঘরটার মধ্যে মাথায় কাপড় দিয়া রাধা রান্না করিতেছে; আর সে যেন দাওয়ায় বসিয়া একতারা বাজাইয়া গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতেছে,

—'রাই কেমন করে কইব আমি
কেন আমি তোমায় চাই—'

রাধা যেন মধ্যে মধ্যে খোলা-দরজা দিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া দেখিতেছে। সহসা চোখা-চোখি হইয়া গেল। একটু হাসি উভয়ের ঠোঁটের ওপর খেলিয়া গেল।.........রাধা হয়ত কোন একটা কাজে উঠান দিয়া বড় ঘরের দিকে যাইতেছে; সে ডাকিল, 'বৌ—'

রাধা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, 'কি!'

সে কহিল, 'না! এমনি!......'

রাধা মৃদু হাসিয়া আবার আপন কাজে চলিয়া গেল।

আবার হয়ত' একদিন সে স্বপ্ন দেখিয়াছে আকাশ ভর্ত্তি জ্যোৎস্না উঠিয়াছে.....ওই দাওয়ার একধারে যেন রাধা তাহার কোলে মাথা দিয়া শুইয়া। সে যেন রাধার সেই সবচাইতে প্রিয় গানটি গাহিতেছে,—

'রাই অভিমানে মুখ ফিরিয়ে
আমায় আর কত কাঁদাবি বল—'

তাহার দুই চক্ষের কোলে জল!

রাধা আসিবে! লাল টুকটুকে একখানি রাঙা শাড়ী পরিয়া আলতা পায়ের ছাপ ফেলিয়া ঐ প্রাঙ্গণ দিয়া পায়ে পায়ে একদিন সে তাহার ঘরে আসিবে। রাধার আসার স্বপ্নে গোরাচাঁদ যখন একপ্রকার বিভোর হইয়া পথপানে চাহিয়াছিল, এমন সময় সহসা একদিন মাত্র তিন দিনের জ্বরে হরিহর পৃথিবীর সকল মায়া-মমতা কাটাইয়া ওপারের উদ্দেশে পা বাড়াইল। মরিবার সময় সে মাধবের দুটি হাত ধরিয়া কাতর কণ্ঠে কহিয়া গেল, 'গোরা রইল, ওকে দেখ ভাই।'

গোরা তখন সবে মাত্র কুড়ি ছাড়াইয়া একুশে পড়িয়াছে। আর রাধার বয়স ১৫ বৎসর।

পিতার শেষ-কাজ করিয়া আসিয়া যখন গোরা মাটির উপর গড়াইয়া পড়িল। রাধা ধীরে ধীরে আসিয়া তাহার শিয়রের ধারে বসিয়া তাহার মাথার উপর একখানি হাত রাখিয়া অশ্রুসজল কণ্ঠে ডাকিল, "গোরা-দা—"

গোরা কাঁদিয়া উঠিল, 'বৌ, এ সংসারে আমার আর কেহই রইল না যে......।'

—'কেন এইত' আমিই আছি তোমার......।'

হরিহরের মত চাল-চুলো হীন একটা ভিক্ষুক, যাহার গান গাহিয়া পেট চলে, তাহার মত লোকের ছেলের সহিত মাধব দাসের ন্যায় অবস্থাপন্ন লোকের একমাত্র মেয়ের বিবাহ হইবে, এই কথা শুনা অবধি গ্রামের অন্য পাঁচজনের প্রাণের মধ্যে যেন হুল ফুটিতেছিল। তবে নাকি এই কার্য্যে মাধবের একান্ত ইচ্ছা এই ভাবিয়া মনে মনে তাহাদের যাহাই কিছু থাকুক না কেন বাহিরে তাহারা ততটা এ বিষয় লইয়া ঘাঁটা-ঘাঁটি করিত না। কিন্তু হরিহরের মৃত্যুর পর গ্রামের অনেকেই একান্ত রাধারই ভবিষ্যত ভাবিয়া মধ্যে মধ্যে মাধবের কানের গোড়ায় দুই-একটা উপদেশের বাণী শুনাইয়া যাইতে লাগিল।

—'ঐ চালচুলো হীন গোরাটার সঙ্গে নাকি রাধির বিয়ের ঠিক করলে মাধু! তোমার মত একজন বিদ্যান বুদ্ধিমান লোকের শেষটায় এমন মতিচ্ছন্ন হবে—এ যে আমরা ভাবতেও পারি না......।' বলিয়া বৃদ্ধ রতন দাস মাধবের মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টি মেলিয়া ধরিল।

মানুষের স্বাভাবিক একটা দুর্ব্বলতা আছে। যদি কোন জিনিষ সে মনে মনে ভালভাবে, অথচ অন্য দশজনে অহরহ তাহার চোখে আঙুল দিয়া বোঝাইবার চেষ্টা করে, সে যাহা করিতেছে তাহা ভুল, তবে সে নিজের দিক দিয়া যতই ঠিক থাকুক না কেন একটা অহেতুক শঙ্কার মোহ আসিয়া তাহার সহজ বিচারবুদ্ধিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। যাহার ফলে সে যাহা ঠিক ভাবিয়া আগাইয়া গিয়াছিল তাহাকে সে-ই আবার ভুল ভাবিয়া পিছাইয়া আসে। মাধবও একদিন ঠিক একইভাবে অতীতের সব কিছুই ভুলিয়া গিয়া বল্লভপুরের রসিক দাসের

সহিত রাধার বিবাহের সব ঠিক করিয়া ফেলিল। রসিক দাসের বয়স যদিও একটু বেশীই হইয়াছিল, তাহার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি তাহার বয়সের সকল দোষত্রুটিই ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল।

রাধা যেদিন প্রথম একথা শুনিতে পাইল সে ধীরে ধীরে পিতার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কাজটা ঠিক করা অবধি মাধবের একমাত্র চিন্তা উপস্থিত হইয়াছিল কন্যার কাছে একথা সে তুলিবে কেমন করিয়া! সে যতবারই এর একটা মীমাংসা করিবার জন্য কন্যার কাছে আগাইয়া গিয়াছে ততবারই যেন তাহার অন্তরের মধ্য হইতে একটি ক্ষীণ প্রতিবাদ তাহার চরণ দুটির সব গতিটুকুই হরণ করিয়া লইয়াছে। সে ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিয়াছে। মনের সহিত যুদ্ধে সে যখন একপ্রকার ক্ষত-বিক্ষত হইয়া হাল ছাড়িয়া দিবার উপক্রম করিতেছে এমন সময় একদিন রাধা নিজেই তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

—"বাবা এ সব কি শুনছি।"

মাধব দেখিল, যে প্রশ্ন উত্থাপনের জন্য তাহার দিক দিয়া তাহাকে কন্যার সম্মুখে এতখানি দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতেছিল, কন্যা নিজেই যখন সে প্রশ্ন তুলিল, সে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া স্নেহমাখা সুরে কহিল,—"বস মা তোমার সঙ্গে আমার গোটাকতক কথা আছে।"

রাধা উৎসুক দৃষ্টিতে পিতার মুখের দিকে তাকাইল। তারপর একটা ঢোক গিলিয়া মৃদুস্বরে কহিল,—"আজ যদি তোমার মা বেঁচে থাকত মা তবে হয়ত আমায় তোমার এ কথা না বললেও চলত। কিন্তু আজ যখন সে নেই তখন আমারই তার কর্ত্তব্য করতে হবে। আমি বৃদ্ধ হয়েছি আমার যাবার সময় হয়ে এসেছে; কিন্তু যাওয়ার আগে আমার যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় কর্ত্তব্য এখনও পড়ে আছে সে হচ্ছে তোমার একটা কিছু স্থায়ী বন্দোবস্ত করা। তুমি হয়ত বলবে তার মীমাংসা ত বহুদিন পূর্ব্বেই হয়ে গেছে......না মা তা হয়নি। আর হয়নি বলেই তোমায় আমার এ কথাটা বলতে হচ্ছে। হরিহরের ছেলে গোরাচাঁদ অন্যদিক দিয়ে হয়ত তার যোগ্য কোথাও মিলবে না, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বড় যে দিকটা সেই দিক দিয়েই আজ সে তোমার পাশে একেবারেই অযোগ্য। ঘরে একটি কপর্দ্দকও নেই যে সে একটা দিনের জন্যও অন্তত ভাতের সংস্থান করতে পারে। ঐ ত' বাড়ীখানা, বর্ষায় চাল ফুঁড়ে জল পড়ে ঘর ভাসিয়ে দেয়...........আত্মীয়স্বজন এমন কেউ কোথাও নেই যে বিপদের দিনে তার পাশে এসে দাঁড়ায়। এই সব সাত পাঁচ ভেবে...........আমারও ত বাপের প্রাণ মা, আমিই বা কেমন করে দেখে শুনে......"

—"কিন্তু বাবা, আপনি এসব জেনে শুনেই ত একদিন..........."

—"হাঁ মা সেটা ঠিক...........কিন্তু মানুষ যখন নিজের ভুল বুঝতে পারে, তখন কি আর জেনে শুনে সেই ভুল পথে চলে?"

রাধার একবার ইচ্ছা হইল বলে, এতদিন যাহা ঠিক ছিল, আজ ইহা সহসা তাহা ভুল হইয়া গেল কেমন করিয়া। পিতার প্রতি একটা অদম্য অভিমান রাধার কণ্ঠস্বর চাপিয়া ধরিল। সে আর একটি কথাও না বলিয়া ধীর পদে সেখান হইতে গিয়া আপনার ঘরে মাটীতে লুটাইয়া পড়িল।—ওগো এ বিপদে কে আমায় পথ দেখাবে গো!—

গোরাচাঁদ যখন শুনিল তখন কোন মতেই সে এ কথা বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। দূর! এও কি সম্ভব তার বৌ—তার সে-ই রাধা সে হইবে অন্যের!

ওপাড়ার কেষ্টা একদিন আসিয়া কহিল, "কিরে গোরা তোর বৌ যে অন্যের বৌ হতে চলল!

বন্ধুর কথায় গোরা মৃদু হাসিয়া জবাব দিল, "তুইও যেমন! কে বললে রাধার অন্যের সাথে বিয়ে হবে!"

—"আর কে বললে। গ্রামের সকলেই বলছে!"

সে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, একদিন এক পা এক পা করিয়া মাধবের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল।

মাধব যখন স্পষ্টই একপ্রকার বলিয়া দিল তাহার সহিত রাধার বিবাহ হইবে না; সে একটা কথাও না বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিল। আসার সময় মনে হইয়াছিল, রাধাকে একবার সে জিজ্ঞাসা করিবে তারও এই মত না কি। কিন্তু পরক্ষণেই একটা দুর্নিবার অভিমান তাহার সে ইচ্ছাকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। রাধা জানিতে পারিয়াছিল গোরা তাহার পিতার কাছে আসিয়াছে। মাধবের কথা শুনিয়া হতবাক্ গোরাচাঁদ যখন সেখানে কিছুক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া ফিরিবার জন্য পা বাড়াইল, তখন একটা অসহনীয় বেদনায় রাধার সমগ্র বুকখানি মোচড় দিয়া উঠিল। সে দ্রুতপদে ছুটিয়া গিয়া খিড়কীর দুয়ার দিয়া গোরার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল।

—"গোরাদা!"—

—"কে? ও রাধা!"

—"তুমি তোমার 'বৌ'কে কার কাছে রেখে যাচ্ছ?"

অতিবড় ব্যথায় গোরার দুই চক্ষু সিক্ত হইয়া উঠিল—"বৌ তোর বাবা যা করেছেন হয়ত তোর ভালর জন্যই করছেন! বাড়ী যা বৌ—এই রাস্তায় এমন সময় আমার সঙ্গে তোকে কেউ কথা বলতে দেখলে হয়ত মন্দ বলবে।"

রাধা ভাবিল একবার বলে তোমার কাছে আমার আবার লজ্জা কোথায়!......প্রকাশ্যে কহিল, "গোরাদা—?"

—"কি রে বৌ!"

—"তার চাইতে চল আমরা দু'জনে কোথাও পালিয়ে যাই!......আমি যে তোমায় ছেড়ে একটা দিনও থাকতে পারব না গো!..."

গভীর স্নেহে রাধার মাথার উপর একখানি হাত রাখিয়া গোরা কহিল, "তা কি হয় রে! পাগ্‌লামী করিস্‌নে। আর সত্যিই ত' তোর বাবা ত' ঠিকই বলেছেন—আমার ও ভাঙ্গা ঘরে কোথায় আমার এ লক্ষ্মী স্থাপন করব বলত! দুঃখ করিস্‌ নে বৌ, হয়ত এই আমাদের ভাল হ'ল। নইলে ভগবানই বা কেমন করে এটা সহ্য করলেন!"

(৪)

বিবাহ হইয়া গেল!

কাল বৈকালে রাধা স্বামীর সহিত শ্বশুর ঘর করিতে

চলিয়া যাইবে। আকাশ ভর্ত্তি জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। উঠানের একধারে শ্বেত-করবী গাছটা চাঁদের আলোয় যেন ঝিমাইতেছে। দাওয়ার একটা খুঁটিতে হেলান দিয়া গোরা তাহার একতারাখানি লইয়া আপন মনে গাহিতেছিল,

"রাই অভিমানে মুখ ফিরায়ে
কত আর আমায় কাঁদাবি বল?—"

—"গোরাদা— ?"

—"কে? ও রাধা!" সে একটা নিশ্বাস রোধ করিল।

—"কাল যাচ্ছি, তাই তোমার কাছে বিদায় নিতে এলাম।"

—"ও কালই চলে যাচ্ছিস্ বুঝি!"

সে অন্যমনস্কভাবে জ্যোৎস্নাসিক্ত আকাশের দিকে তাকাইল। আজ তাহার অনেকদিনকার অনেক কথাই মনে পড়িতেছিল। তাহার বড় আদরের রাধা তাহার নিকট হইতে দূরে বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে। রাধা বাড়ী হইতে আসিবার সময় মনে মনে অনেক কথাই ভাবিয়া আসিয়াছিল কিন্তু এখানে আসিয়া গোরার মুখের দিকে তাকাইয়া সে সব ভুলিয়া গেল। অনেকক্ষণ ধরিয়া উভয়ে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, অবশেষে রাধা গোরার পায়ের কাছে নত হইয়া প্রণাম করিতে করিতে কহিল,—"নিজের শরীরের দিকে একটু নজর দিও! মনে থাকে যেন 'বৌ' আর নেই যে সে এসে তোমার খবরদারি করবে।"

আজ পুনরায় অনেকদিন পরে রাধার মুখে তাহার সেই অতিপ্রিয় সম্বোধনটি শুনিয়া সে ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল, এবং মৃদু হাসিতে গালদুটি ভরাইয়া কহিল,—"তা জানি রে তা জানি! রাধা, আজ আর এত বড় সংসারটার মধ্যে আমার বলতে কেউ রইল না রে! আজ আমি একা—একেবারেই একা!"

রাধার চোখের জল যেন আর কোন মতেই বাধা মানিতে ছিল না।

—"কতদিন তোকে কত গাল-মন্দ দিয়েছি; খেলার সময় একটু অমত হ'লেই তোর চুলের মুঠো ধরে কত সময় তোর অমন সুন্দর চুল ছিঁড়ে দিয়েছি! আজ যাবার সময় তোর গোরাদাকে মাপ করে যা ভাই!......আজ আর এ সময় মনে কোন দুঃখ রাখিস্ নে"

—"ও গোরাদা গো, আর যে আমি পারি নে গো........."

রাধা চোখে আঁচল চাপা দিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। রাধার মাথার উপরে একখানি হাত রাখিয়া মৃদু-স্বরে গোরা কহিল......"লক্ষ্মী ছি কাঁদে না ওরে চুপ্ কর!"

•

আজ দিন দুই হইল গোরাচাঁদ ভিক্ষায়ও বাহির হয় না, শুধু চুপ করিয়া একাকী দাওয়ায় বসিয়া একতারা বাজাইয়া গান করে। ঘরে একদিনের মত চাউল ছিল, তাহা কাল দুপুরেই শেষ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু সে বিষয়ে তার এতটুকু খেয়াল মাত্র নাই। গোরার সমবয়সী বন্ধু-বান্ধবেরা প্রায় সকলেই তাড়ি খায়, সকলের দেখাদেখি গোরাও একদিন একচুমুক টানিয়াছিল। কিন্তু সেই দিন তাহার মুখে গন্ধ পাইয়া রাধা আপনার মাথায় হাত দিয়া গোরাকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়াছিল, সে কখনও আর উহা স্পর্শ করিবে না। সেই হতেই যদি কখনও কোন বন্ধু-বান্ধব তাহাকে এক চুমুক টানিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিত তবে সে কহিত, না ভাই বৌ মানা করেছে। বন্ধু-বান্ধবেরা এই ব্যাপার লইয়া তাহাকে কত ঠাট্টা তামাসা করিত—বিয়ে না হতেই দাসখৎ!

সেদিন সন্ধ্যার সময় কেষ্টা আসিয়া ডাকিল—"গোরাচাঁদ বাড়ী আছিস!"

—"কে কেষ্ট, এস ভাই; আছি!"

একটা ভাঁড় লইয়া কেষ্টা আসিয়া প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল।

—"তারপর ব্যাপার কি বলত! তোমার বিরহের ব্রত উদ্‌যাপন আজও শেষ হ'ল না নাকি! না তার জের এখনও চলেছে! আজ দু' তিনদিন ত গানেও বের হও না দেখি। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা একেবারে ছেড়ে দেবে ভেবেছ নাকি, না ওই রাধির ধ্যান করলেই আপসে পেট ভরে যাবে।"

একটুক্‌রা বিষণ্ণ হাসি হাসিয়া গোরা কহিল, "না ভাই ঠিক তা নয়; মনটাও তত ভাল নেই, তাই গানে এ দুদিন বের হওয়া হয়নি!"

"মনটার আর দোষ কি বল! দিন রাত ভূতের মত ঘরের মধ্যে চুপ করে বসে আছ। আরে রাধা ছাড়া কি আর এ সংসারে মেয়ে মিল্‌বে না। একবার শুধু হাঁ বল দেখবেখন কয় গণ্ডা মেয়ে নিয়ে আসি। ও সব বাজে চিন্তা ছেড়ে এস দেখি এক এক পাত্তর গলায় ঢেলে দাও ত;" বলিতে বলিতে সে একটা নারিকেলের মালায় হস্তস্থিত মাটীর ভাঁড় হইতে খানিকটা ঢালিয়া তাহার দিকে আগাইয়া দিল।

—"না ভাই ওসব"

—"আরে রাখ্ রাখ্! কেন খাবে না কেন বল দেখি! রাধা মানা করেছে। কিন্তু কই সে ত' তোমার কথা একটিবারের জন্যও না ভেবে দিব্যি হাসতে হাসতে স্বামীর ঘর করতে চলে গেল; তবে তুমিই বা কেন তার সেই কবেকার একটা কথা মনে করে তাড়ি স্পর্শ করবে না!"

—"না ভাই ঠিক তাই নয়, তবে—"

"তবে...তবে আবার কি...এর মধ্যে আর কোন 'তবে' 'টবে' নেই; চোখ, কান, নাক বুজে চোঁ করে এক ঢোক মেরে দাও। দেখবেখন' দিব্যি মনটা চাঙ্গা হয়ে উঠেছে।......কেন এতই যদি সে তোমায় ভাল বাসত' তবে সে নিজেও কি তার বাপকে ধরে মত করাতে পারত' না! আর চাল-চুলো হীন! কেনরে বাপু তোরও ত একটা মাত্র মেয়ে; তোর বিষয় সম্পত্তি ত মেয়ে জামাই-ই পাবে...সব ও বেটা মাধব দাস আর তার মেয়ে রাধির চাল। তুমি যেমন ভাল মানুষ তাই, নইলে আমি যদি হ'তাম...তবে শালাকে একবার দেখে নিতাম!"

সে রাত্রে কেষ্টা যখন বাড়ী ফিরিবার জন্য উঠিল, গোরাচাঁদ তখন নেশার ঘোরে বকিতেছে—বৌ আজ দু'দিন আমার খাওয়া হয়নিরে......ওই কেষ্টা, হাঁ কেষ্টাইত' আমায় একপ্রকার জোর করে খাইয়ে দিলে...লক্ষ্মী মণি রাগ করিস্ নে...এই তোর গা ছুঁয়ে দিব্যি করছি আর আমি ও ছোঁব না।

৫

বল্লভপুরে বসিয়াই রাধা একদিন শুনিল তাহার গোরাদা' এখন একেবারে যাহাকে বলে 'উচ্ছন্নে' গিয়াছে! দিন রাত নেশা-ভাঙ্গ করিয়া ঘরে পড়িয়া থাকে। কদাচিৎ কখন ভিক্ষায় বাহির হয়। যেদিন হয়ত নেশার ঘোর কাটাইয়া গ্রামে যায়, সেইদিন চারটি আহার জোটে, নইলে একপ্রকার উপবাসেই দিন কাটিয়া যায়। রাধার দুই চোখের কোল বাহিয়া জল গড়াইয়া পড়িল, তাহার সেই গোরাদা, তাহার আজ এই অবস্থা...আর সে কথা আবার তাহার বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতেই শুনিয়া যাইতে হইল!

দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে পিতার মৃত্যুর খবর শুনিয়া রাধা একদিন আবার গ্রামে ফিরিয়া আসিল। আসিয়া অবধি নানা কাজে ব্যস্ত থাকার দরুন সে আজ পর্য্যন্ত গোরাদার সহিত দেখা করিয়া উঠিতে পারে নাই। পাড়ার একটা ছোট ছেলেকে সে দু'তিন বার গোরার কাছে পাঠাইয়াছে, কিন্তু সে প্রত্যেক বারই ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছে—"না রাধাদি। গোরাদা' বাড়ীতে নেই...কোথায় মেলা বসেছে সে নাকি সেখানে গেছে!"

বস্তুত যেদিন গোরা লোকের মুখে শুনিল রাধা আবার দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে, সেইদিন হইতেই সে যাহাতে রাধার সম্মুখে না পড়িয়া যায় তাহার জন্য পলাইয়া পলাইয়া ফিরিতেছিল। মাধব দাসের শ্রাদ্ধে রাধা লোক পাঠাইয়া গোরাকে নিমন্ত্রণ করিল। যথাসময়ে সকলেই আসিয়া খাইয়া গেল, আসিল না শুধু একমাত্র গোরাচাঁদ। রাধা বস্ত্রাঞ্চলে চোখের-জল মুছিয়া ফেলিল। পিতার শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকিয়া গেলে একদিন সন্ধ্যার আঁধারে আবার বহুদিন পরে রাধা গোরার গৃহের দিকে পা বাড়াইল। সেই তাহার চিরপরিচিত প্রাঙ্গণ ... কে একজন অবগুণ্ঠন টানিয়া তুলসী তলায় সন্ধ্যা প্রদীপ দিতেছিল। রাধা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া ডাকিল "গোরাদা"—। এমন সময়ে যে স্ত্রীলোকটি সন্ধ্যা দিতেছিল সে মুখ ফিরাইয়া রাধাকে দেখিয়া আগাইয়া আসিয়া কহিল, "তিনি ত বাড়ী নেই!" স্ত্রীলোকটিকে দেখিয়া রাধা তখুনি ফিরিতেছিল, এমন সময় পিছন হইতে সে কহিল, "বসুন না! এখুনি হয়ত তিনি এসে পড়বেন!"

গোরার অন্যান্য গুণে কীর্ত্তনের সহিত রাধা একথাও শুনিয়াছিল বটে, গোরা নবদ্বীপ হইতে কণ্ঠিবদল করিয়া একটি স্ত্রীলোককে লইয়া আসিয়াছে। কিন্তু সে একথা কোন মতেই বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারে নাই! তাহার সেই গোরাদার যে এ প্রবৃত্তি হইতে পারে ইহা তাহার ধারণারও অতীত ছিল। কিন্তু এখন গোরার গৃহে পা দিবামাত্র তাহার সে ভুল ভাঙিয়া গেল। একটা অস্বস্তিতে তাহার সর্ব্ব শরীর কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল। তখুনি সে ফিরিতেছিল। এমন সময় সহসা পিছন হইতে ডাক আসিল—'বসুন না।'—রাধা একবার ভাবিল সে ফিরিয়াই যাইবে। কিন্তু পরক্ষণেই এইভাবে চলিয়া যাওয়াটা যেন প্রাণে বাজিল। তাই সে কতকটা অনিচ্ছা আবার কতকটা কৌতূহলবশেই ফিরিল। সেই স্ত্রীলোকটি একটি আসন বিছাইয়া রাধাকে বসিতে দিল।

—"তোমার নাম কি গা?"

—"আমার নাম কুসুম!"

—"তোমাকেই বুঝি গোরাদা নবদ্বীপ হতে আমার সময় নিয়ে এসেছে?

—"হাঁ, আমায় দয়া করে উনি কণ্ঠিবদল করে পায়ে স্থান দিয়েছেন।"

"এখানে তোমার আর কে কে আছেন?"

"আমার আর কেউ নেই! সেখানকার এক বৈষ্ণব আমায় দুটি খেতে পরতে দিতেন, আমি তাঁর সব কাজ কর্ম্ম করে দিতাম।"

অনেক রাত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াও গোরা ফিরিল না দেখিয়া রাধা উঠিল।

৬

হঠাৎ সেবার গ্রামে ভীষণ বসন্ত দেখা দিল। ঘরে ঘরে প্রত্যহই প্রায় দু' চারজন করিয়া লোক মরিতে লাগিল। গোরা-চাঁদও রোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইল না। ফলে একদিন সে কুসুমকে ও সঙ্গে সঙ্গে তাহার দুটি চক্ষুই হারাইয়া বসিল। ও পাড়ার কেষ্টাই তাহার সকল খবরদারী করিত। দুই বেলা আসিয়া সে তাহাকে চারিটি করিয়া খাওয়াইয়া যাইত। একদিন গোরা কেষ্টার দুটি হাত ধরিয়া গাঢ়স্বরে কহিল—"কেষ্ট ভাই তোমার ঋণ আমি এ জীবনে আর শোধ করতে পারব না। আর জন্মে নিশ্চয়ই তুমি আমার মায়ের পেটের ভাই ছিলে।" তাহার দুই অন্ধ চক্ষুর কোল বাহিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

—"থাক্ থাক্........ও সব কথার আর দরকার নেই!"

অন্ধ হইবার পর গোরার একটি মাত্র কার্য্য ছিল একতারাটি বাজাইয়া গান গাওয়া! রাত্রে খাওয়াইতে আসিয়া কেষ্টা কহিত—"গান গা গোরা শুনি!" গোরা তাহার হৃদয়ের সমস্ত বেদনা সেই একতারাটির মধ্যে ঢালিয়া দিত। এমনি করিয়াই তাহার দিন চলিতেছিল। এমন সময় কেষ্টা একদিন আসিয়া কহিল—"ওরে গোরা শুনেছিস্! বল্লভপুরের রসিক দাস যে মারা গেছে রে!"

চম্‌কাইয়া উঠিয়া গোরা শুধাইল—"রসিক, কোন রসিক রে?"

—"আরে রাধার স্বামী রসিক!"

সে রাত্রে গোরা একটিবারের জন্যও চোখের পাতা দুটি বুজাইতে পারিল না। কেবলই তাহার অন্ধ চোখের কোলে রাধার নিরাভরণা মূর্ত্তি ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। অনেক রাত্রে সে ধীরে ধীরে শয্যা হইতে উঠিয়া লাগিল। কোণ হইতে হাতড়াইতে হাতড়াইতে একতারাটি লইয়া দাওয়ায় আসিয়া বসিল,—

—'রাই কেমন করে সে খবর
তোরে আমি বলি'—

ভোর বেলা পথ দিয়া কাজে যাইবার সময় কেষ্ট পথ হইতে গোরার গান শুনিয়া প্রাঙ্গণে আসিয়া প্রবেশ করিল।

—"একি এত সকালে উঠেই গান গাইতে আরম্ভ করে-ছিস্!"

একদিন সন্ধ্যার অস্পষ্ট আঁধারে গরুর গাড়ী হইতে গ্রামে পা দিয়াই রাধা শুনিল, বসন্ত রোগে তাহার গোরাদা চিরদিনের মত তাহার দুটি চক্ষুই খোয়াইয়াছে। সহসা তাহার চোখের উপর সেই শৈশবের সাথীর অসহায় করুণ মুর্ত্তিটি ভাসিয়া উঠিল। একটা করুণার অসহ প্লাবন তাহার অন্তরের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ভীষণভাবে একটা দোলা দিয়া গেল। আহা তাহার সেই গোরাদা; তাহার এ দুর্দ্দিনে কে তাহাকে দেখিতেছে! কে তাহাকে ক্ষুধার সময় মুখে আহার তুলিয়া দিতেছে। সে আর মুহূর্ত্তে মাত্রও বিলম্ব না করিয়া গোরার গৃহের উদ্দেশে পা বাড়াইল। সঙ্গের লোকটি কহিল, "এত রাত্রে কোথায় যাচ্ছ মা?"

—"দাঁড়াও বাবা! তাকে একটিবার দেখে আসি।"

সপ্তমীর বাঁকা চাঁদখানি তখন সবে মাত্র ওদিককার ওই প্রকাণ্ড জামগাছটার ঘন সন্নিবেশিত পত্রান্তরাল হইতে উঁকি দিতে আরম্ভ করিয়াছে। সমস্ত দিনের অসহ্য গরমের পর একটা ঠাণ্ডা হাওয়া গাছের পাতাগুলিকে দোলাইয়া দোলাইয়া বহিয়া যাইতেছে। আজ প্রায় দিন দশেক হইল গোরার জ্বর। কেষ্ট শহর হইতে ডাক্তার ডাকিয়া দেখাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু গোরা বলিয়াছে—"না ভাই এমনিই ত তোমার কাছে আমার ঋণের অন্ত নেই, এর উপরে আবার ও সব হাঙ্গামায় আর কাজ নেই ভাই, জ্বর আমার এমনিই ভাল হয়ে যাবে।"

কিন্তু জ্বর যখন কমার দিকে না যাইয়া ক্রমেই বৃদ্ধির দিকে চলিল কেষ্টা আর তাহার নিষেধ না শুনিয়া একদিন সকাল সকাল উঠিয়া ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিল। ডাক্তার রোগীর অবস্থা দেখিয়া মাথা নাড়িলেন। সেদিন বৈকালের দিকে ক্রমেই গোরার অবস্থা মন্দের দিকে যাইতেছে দেখিয়া কেষ্টা ডাক্তারের কাছে ছুটিয়া গেল। প্রবল জ্বরের উত্তাপে মুহ্যমান গোরা বিছানায় পড়িয়া কাতরাইতেছিল। রাধা আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। ঘরে তখনও সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালান হয় নাই। রাধা ডাকিল 'গোরাদা'—কিন্তু তখন আর জবাব দেওয়ার মত গোরার অবস্থা নাই। রাধা শয্যার অতি নিকটে আগাইয়া আসিয়া গোরার মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া ব্যাকুল স্বরে ডাকিল—"গোরাদা!"—দু' তিনবার ডাকিবার পর গোরা মৃদু স্বরে জবাব দিল "উ"—

—"চেয়ে দেখ আমি রাধা!" এবার গোরা চক্ষু মেলিয়া চাহিল।

—"কে?"

—"আমায় চিনতে পারছ' না আমি যে তোমার বৌ! দেখ ভাল করে চেয়ে দেখ।"

—"কে বৌ" গোরার ওষ্ঠে একটুক্‌রা হাসি ফুটিয়া উঠিল।

—"হ্যাঁ গো হ্যাঁ বৌ! আমি যে সেখানকার সকল দাবী-দাওয়া মিটিয়ে তোমার কাছে চলে এসেছি!"

—"কিন্তু আমার যে যাওয়ার সময় হয়ে এল"

—"তোমার বৌকে ফেলে কোথায় যাবে গো—সে যে অনেক দিন পরে তোমার কাছে ফিরে এসেছে।"

গোরা ধীরে ধীরে তাহার একখানি হাত রাধার দিকে আগাইয়া দিল, কিন্তু সেটা অর্দ্ধ পথেই কাঁপিতে কাঁপিতে শয্যার উপর পড়িয়া গেল।

—শেষ—

স্বর্গের সিঁড়ি *

প্রভাত বসু

আকাশের বুকে, মানুষের ভালবাসা
বৈকালী মেঘে রামধনু রঙ আঁকে;
রাতের তিমিরে ফুটায় ঊষার আলো,
সোনালি বিজলি নিকষ মেঘের ফাঁকে।

মানুষের প্রেমে দেখনা বক্র চোখে,
বলনা—মিথ্যা তাহার স্বপন বোনা!
আকাশের নীলে ফুটিত না তারা তবে,
থামিত ধরায় দেবতার আনাগোনা।

আমার মনের গোপন বাসনা যত
গোলাপের বুকে জ্বালায় অগ্নিশিখা,
আমারি কামনা পরায় সগৌরবে
বিশ্বের ভালে নবজনমের টীকা

বলনা, মিথ্যা মানুষের কল্পনা,
করনা ক্ষুদ্র মানুষের স্বপনেরে,
জাননা কি ভাই, এদেরি সোপান বাহি'
প্রবেশ করিনু প্রভুর গোপন ঘরে।

* হারীণ চট্টোপাধ্যায়ের "Ladders" নামক কবিতা অবলম্বনে।

শরৎ-সাহিত্যে আদর্শবাদ

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বিশী

অনেক দিন হইতেই শুনিয়া আসিতেছি যে, শরৎ সাহিত্যের মূল প্রাণ হইতেছে 'realism' অর্থাৎ 'বাস্তববাদ' বা বস্তুতান্ত্রিকতা। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে আদর্শবাদের রূপ সুস্পষ্টরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং শরৎ-সাহিত্যে তার স্থান অত্যন্ত কম, নাই বলিলেও চলে। অনেকেই এই কথা বলিয়া থাকেন।

যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের আদর্শবাদ সম্বন্ধে কি ধারণা জানি না—তবে মনে হয় ইহা ঠিক নহে। কেন ঠিক নয় সেই কথাই বলিব।

শরৎ সাহিত্যে আদর্শবাদের স্থান নিরূপণ করিতে গেলে প্রথমেই আদর্শবাদ ও বাস্তববাদ অর্থাৎ Idealism এবং realism সম্বন্ধে গোড়ার দু'একটি কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ এ বিষয়েও মতভেদের অন্ত নাই।

'আদর্শবাদ' বলিতে আমরা কি বুঝি, Ideal অথবা আদর্শ হইতে আদর্শবাদের উৎপত্তি। একটা উদাহরণ লইলেই বিষয়টি প্রাঞ্জল হইবে। রাম একজন আদর্শ পুরুষ; অমুক হিন্দু সমাজের আদর্শ ইত্যাদি। অর্থাৎ রাম এবং অমুক আমাদের দল গোত্র হইতে পৃথক নয়, তাহারা আমাদের মতনই রক্ত-মাংসের মানুষ অথচ আমাদের চাইতে অনেক উন্নত স্তরের। অনেকের মনের ধারণা যাহা কিছু কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাই আদর্শবাদ—বাস্তব সত্যের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু তাই কি? তাহা হইলে 'আরব্যোপন্যাস' 'ঠাকুরমার ঝুলি' প্রভৃতিকেও ত 'আদর্শবাদের' কোঠায় স্থান দেওয়া চলিতে পারে। ইঁহারা আদর্শবাদের সঙ্গে অস্বাভাবিক কথাটা জুড়িয়া মস্ত ভুল করিয়া বসেন। কেবলমাত্র নীতি এবং সারগর্ভ উপদেশের ছড়াছড়ি থাকিলেই আদর্শবাদ হইল—এ ধারণাও এক পক্ষ পোষণ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের যুক্তির বিপক্ষে বলিতে গেলে 'চারুপাঠ,' 'বোধোদয়' প্রভৃতি শিশুপাঠ্যের নাম করিতে হয়। উভয় পক্ষেরই বুঝিবার ভুলে আদর্শবাদ কথাটা বাস্তব জগৎ হইতে যেন অনেকটা স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি রাম আদর্শ পুরুষ বলিলে রামকে বাস্তব জগৎ হইতে পৃথক করিয়া দেখিবার কোন হেতু নাই—অস্বাভাবিক আখ্যাও দেওয়া চলে না। তবে সাধারণের তুলনায় অসাধারণ এই মাত্র বলা যাইতে পারে।

সাহিত্যেও আদর্শবাদের স্বরূপ ঠিক তাই। ইহাকে বাস্তব অর্থাৎ স্বাভাবিক হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিলে চলিবে না। বাস্তব যখন নূতনরূপে আপনাকে আত্মপ্রকাশ করিবে তখনই তাহা আদর্শে পরিণত হইবে। বাস্তবকে বাদ দিয়া আদর্শ গড়িয়া উঠিতে পারে না। যদি সেরূপ প্রচেষ্টা হয় তাহা হইলে আরব্যোপন্যাসের মতই রূপকথায় পর্য্যবসিত হইবে।

আবার আদর্শকে বাদ দিয়া কেবল বাস্তব লইয়াই যাঁহারা কারবার করেন তাঁহাদের দ্বারা সাহিত্য সৃষ্টি হয় না; হয় দৈনন্দিন জীবনের হুবহু প্রতিচ্ছবি। ইহাতে যথেষ্ট কৃতিত্ব আছে বটে, কিন্তু তাহা সাহিত্য বা art হইল না। কারণ art মানেই artificial। 'Nature as it is'কে art বলা চলে না, তাহা হইলে Natureএর সহিত artএর প্রভেদ কোথায়? 'emphasis on nature'ই হইতেছে artএর মূল মন্ত্র। আবার যা কিছু artificial তাহাই art এরূপ ভুল করিবারও প্রয়োজন নাই। artificialএর মধ্যে consistency বা সঙ্গতি না থাকিলে তাহা art হইতে পারে না। অতি আধুনিক লেখকগণ 'Nature as it is'কে 'art for art's sake' নাম দিয়া সাহিত্যে পঙ্কিলতার সৃষ্টি করিতেছেন। ইহা পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই।

সাহিত্য মনোজগতের বস্তু। আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি গল্প, উপন্যাস, কবিতায় হুবহু নকল করার মধ্যে কৃতিত্ব আছে বটে, কিন্তু তাহা পাঠকের মনের খোরাক জোগাইতে সমর্থ হয় না। কারণ মানুষের মন নূতনের সন্ধানী, সে চায় জীবনের নবরূপ দেখিতে। প্রত্যহ যাহা দেখিতেছে তাহাতে সে তৃপ্ত নয়—তার দৃষ্টির গণ্ডী অনেক বেশী বিস্তৃত। এই যে দেখিবার প্রচেষ্টা ইহাই, তাহার বিকাশ—তাহার মানবতার উৎকর্ষ।

সুতরাং সাহিত্যের উদ্দেশ্য হইবে জীবনের নবরূপ দেখান। যে জীবন রাস্তায়, মাঠে, ঘাটে আমাদের মতনই বহু সুখ-দুঃখের আশা-নিরাশার ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তাহাদেরই মহত্তর করিয়া বৃহৎ করিয়া তার নিজের বুকের ওপর স্থান দিবে। জীবনের সেই নূতন রূপ সাহিত্যকে নব কলেবর দান করিবে। তার বিরাট কায়ায় আমাদের বিশ্বরূপে দর্শন হইবে—আমরা অরূপরতনের সন্ধান পাইব। সেই জন্যই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—

"রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি অরূপরতন আশা করি"—অর্থাৎ অরূপরতনের সন্ধান পাইতে হইলে রূপের ভিতর দিয়াই পাইতে হইবে। সেইরূপ সাহিত্যের অরূপরতন বাস্তবের ভিতর দিয়াই আত্মপ্রকাশ করে, বাস্তব যখন নূতন রূপে আদর্শে রূপায়িত হইয়া উঠে।

'আদর্শবাদ' সম্বন্ধে উপরোক্ত কথা কয়টি স্মরণ করিয়া রাখিলে শরৎ-সাহিত্যের যথার্থ স্বরূপ নিরূপণের পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিবে।

তাঁর প্রত্যেকটি উপন্যাসের বিস্তৃত সমালোচনার স্থান এ নয়। তাহাতে পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবার বিশেষ আশঙ্কা আছে। তাই বিশিষ্ট কয়েকখানি উপন্যাস সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব

প্রথমেই ধরা যাক 'চরিত্রহীন'। চরিত্রহীন যখন প্রথম আত্মপ্রকাশ করে তখন ইহার বিরুদ্ধে সমালোচনার অন্ত ছিল না। প্রায় সকলেরই ধারণা ছিল দৈহিক ভোগের তীব্র লালসার যে ছবি 'কিরণময়ী' চরিত্রে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহা দ্বারা সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষা করা বোধ হয় কঠিন হইয়া পড়িবে। তাঁহারা কেবল বাস্তব দিকটাই দেখিলেন। অপরদিকে প্রেমের কল্যাণময় স্নিগ্ধ যে রূপটি পতিতা 'সাবিত্রীর'

মধ্যে প্রস্ফুটিত হইয়া পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীকে গন্ধে আমোদিত করিয়াছে—তাহা নীতিবাগীশদের অলক্ষেই থাকিয়া গেল। 'উপেন্দ্র' চরিত্রকে আদর্শে রাখিবার জন্যই 'কিরণময়ী'কে সৃষ্টি করা হইয়াছে, আবার 'সতীশে'র সাবিত্রীর প্রতি মিলনাকাঙ্ক্ষা না থাকিলে সাবিত্রীর আদর্শ রূপটা সজীব হইয়া উঠিত না। প্রেমের পবিত্র অনুভূতি দৈহিক ভোগ-লালসাকে বাদ দিয়াও যে হৃদয়ের মণিকোঠায় চিরস্থায়ী আসন লাভ করিতে পারে—'সাবিত্রী' তাহারই জ্বলন্ত প্রতীক। তাই চরিত্রহীন আদর্শবাদসম্পন্ন।

এইস্থলে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, 'কৃষ্ণকান্তের উইল' কোনরূপ আদর্শে গঠিত হইয়া উঠিতে পারে নাই। যুবতী বিধবা রোহিণী চায় ভোগ। গোবিন্দলাল বিবাহিত, তার ওপর তরুণ—রোহিণীর রূপের ফাঁদে তিনি আটকাইয়া পড়িলেন। এদিকে তাঁর পতিগতপ্রাণা স্ত্রী ভ্রমর মনের দুঃখে অসুস্থ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। গোবিন্দলালের রূপের নেশা কাটিয়া গেলে, সে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। ইহাই 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র মূল বিষয় বস্তু।

পাপ করিলে ফলভোগ করিতেই হইবে—রূপের মোহ ক্ষণস্থায়ী ইত্যাদি 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র অন্তর্নিহিত ভাব। ইহা নীতি বা উপদেশের দিক হইতে শ্রেষ্ঠ তাহা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু সাহিত্যে আদর্শ হইল কি?

'গৃহদাহে' আমরা দেখিতে পাই অহঙ্কারী শিক্ষাভিমানী অতি আধুনিকা "অচলা" চরিত্রের পার্শ্বে সরল অনাড়ম্বরা গ্রাম্য যুবতী "মৃণাল" অপূর্ব্ব আদর্শে প্রাণস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে। 'মহিমে'র প্রতি মৃণালের ভালবাসা যে পবিত্র মহিমময়ী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহা কি আদর্শ বলা চলে না? অনেকে বলেন, এ সম্ভব নয়। সাধারণ দৃষ্টিতে সম্ভব নয় স্বীকার করি, কিন্তু অসম্ভবও যে নয় শরৎচন্দ্র তাহাই জীবন্ত করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন।

"পল্লীসমাজে"—বিধবা 'রমার' 'রমেশের' প্রতি আন্তরিক ভালবাসা অনুরূপ আদর্শকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। আর রমেশ? নিজের স্বার্থ বলি দিয়া সমাজের মঙ্গলের জন্য যে আদর্শ সে গড়িবার চেষ্টা করিয়াছিল তাহা কি সাধারণের মনে নব অনুপ্রেরণার সঞ্চার করে নাই?

"দত্তা"কে অনেকে ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি তাঁর অহেতুক বীতরাগ বলিয়া মনে করেন। প্রকৃতপক্ষে তাহা ঠিক নহে। ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি শরৎচন্দ্রের কোন দিন অশ্রদ্ধা দেখা যায় নাই। তার বিকৃত রূপটাকেই তিনি 'দত্তা'তে কটাক্ষ করিবার সমাজের বিকৃত রূপ 'রাসবিহারী', 'বিলাসবিহারী'তে যে

সমাজের বিকৃত রূপ 'রাসবিহারী,' 'বিলাসবিহারী'তে যে রূপ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, তেমনি 'বিজয়া' চরিত্রে ব্রাহ্ম মহিলার আদর্শ রূপে অঙ্কিত করিয়া ভাল-মন্দ দুইটা দিকই তিনি নিরপেক্ষরূপে বিচার করিয়াছেন। ব্রাহ্ম সমাজের কথা ছাড়িয়া দিলেও 'বিজয়া'-চরিত্র যে-কোন সমাজের মহিলার আদর্শরূপ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। শিক্ষায়, ব্যক্তিত্বে, সেবায়, করুণায়, কমনীয়তায় 'বিজয়া'-চরিত্র 'দত্তার' ভিতর একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করিয়াছে!

'দেবদাসে'র ভিতরে আমরা দেখিতে পাই, ব্যর্থ প্রেমিক 'দেবদাসে'র ভয়ানক উচ্ছৃঙ্খলতার নিকট 'পার্ব্বতী'র কঠোর আত্মসংযম। কেবলমাত্র সেবা ও করুণার ভিতর দিয়া তার অন্তরের সুনিবিড় প্রেম রূপে রসে পল্লবিত হইয়া দূর হইতে আত্মপ্রকাশ করিয়াই সুখী। সে প্রেম প্রতিদান চায় না। ইহাকে আদর্শ বলিব না তবে বলিব কাহাকে? ঘৃণ্য পতিতা 'চন্দ্রমুখী'র পঙ্কিলময় জীবনের নূতন পরিবর্ত্তন আমাদের প্রাণে সহানুভূতির সঞ্চার করে। চন্দ্রমুখীকেও এখন আমরা পর বলিয়া দূরে ঠেলিয়া রাখিতে পারি না। সে যেন আমাদের দৃষ্টিতে নব চেতনার অন্য এক আদর্শ।

'বিপ্রদাসে'র সুমহান আদর্শ সম্বন্ধে নূতন করিয়া কিছু বলিবার প্রয়োজন আছে কি? হিন্দু সমাজের প্রাচীন আদর্শকে যাঁহারা বিকৃত করিয়া এতদিন ক্ষুণ্ণ করিয়া আসিতেছিলেন তাঁহাদের স্থূল দৃষ্টির গণ্ডী 'বিপ্রদাসে'র বিরাট চরিত্রের নিকট খেই হারাইয়া দিশাহারা হইয়া পড়িল। নব জাগরণের প্রতীক 'বন্দনার' নির্ভীক মতবাদ প্রাচীন আদর্শের নিকট একেবারে তুচ্ছ ম্লান হইয়া দেখা দিল।

'শ্রীকান্তে'র ভিতর 'রাজলক্ষ্মী'র যে কল্যাণময়ী নারীত্বের আদর্শ আমরা দেখিতে পাই, তাহা যেমনি অভিনব তেমনি মর্ম্মস্পর্শী। বাস্তব জগৎ হইতে রাজলক্ষ্মী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অথচ তার স্নিগ্ধ স্পর্শ আমরা প্রাণের ভিতরই উপলব্ধি করিতে পারি। 'আদর্শকে' বাস্তব পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে সুসঙ্গতরূপে সন্নিবেশিত করিয়া কিরূপে প্রাণবন্ত করা যাইতে পারে, শরৎচন্দ্র তাহাই নিপুণ লেখনীতে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাই তাঁর আদর্শ-চরিত্রগুলি মনকে এত সহজেই স্পর্শ করে। এইখানেই তিনি artist!

পরিশেষে একটিমাত্র কথা বলিয়া এ প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি করিব। কথাটি এই! কেবলমাত্র শরৎ-সাহিত্যেই নয়, যে কোন সত্যিকারের সাহিত্যের মূল ভিত্তিই হইতেছে 'আদর্শবাদ'। 'আদর্শবাদ' ব্যতীত সাহিত্য সৃষ্টির সার্থকতা নাই—থাকিতে পারে না। অতি-আধুনিক লেখকদের এই কথাটি স্মরণ রাখিতে বলি।

প্রলয়ের পরে

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীসত্যকুমার মজুমদার

(৪)

ভাবিয়া তার প্রশ্নের উত্তর দিবে বলিয়া অমর সেদিন ভারাক্রান্ত মন লইয়া লীলাকে বিদায় করিয়া দিয়াছিল। তারপর অমীমাংসিত প্রশ্নের উত্তর না দিয়াই একদিন লীলাকে না জানাইয়া কলিকাতা চলিয়া গিয়াছিল। তারপর আরও একবৎসর কাটিয়া গেল। লীলা এ সমস্যার কোন উত্তর অমরের নিকট হইতে পাইল না। লীলা নিজেও বহুদিন ঐ সমস্যার মীমাংসা করিতে চাহিয়াছে, পারে নাই। কেন যেন ঐ এক প্রশ্ন এক সমস্যা লীলার সারা চিন্তারাজ্য জুড়িয়া বসিল। সমাধানে পৌঁছিতে না পারিয়া লীলা ভাবিল এখন উপায়!

কর্ম্মস্থান হইতে ফিরিয়া আহারে বসিলে নন্দরাণী স্বামীকে বলিলেন, "মুখুজ্জে গিন্নিকে আজ বলেছিলাম। তিনি বললেন, আমার ত ওতে অমত নেই বোন্, বরং লীলাকে অমরের জন্য নিই এ ত আমার বরাবরকার ইচ্ছে! কিন্তু আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন মূল্যই ত তাঁর কাছে নেই, তিনি নিজে যা ভাল বুঝবেন করবেন। জান ত টাকাটাকে বড় ক'রে দেখা তাঁর স্বভাব!"

বিশ্বেশ্বরবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "যোগীন মুখুজ্জেকে তুমি চেন না রাণী, টাকা ছাড়া লীলাকে তিনি নেবেন না। অমন পাশ করা ছেলে দিয়ে দশটি হাজার টাকা তিনি সিন্ধুকে তুলবেন! এ প্রস্তাব নিয়ে আমার যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না!"

নন্দরাণী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিলেন, "কি হবে তবে, মেয়েকে যে আর ঘরে রাখা চলে না!"

বিশ্বেশ্বরবাবু আহার শেষ করিয়া উঠিয়া বলিলেন, "অমন লক্ষ্মী মেয়েকে ফেলে দেওয়াই কি চলে রাণী! মেয়ে জন্মেছে—বরও তার জন্মেছে নিশ্চয়, কিন্তু মেয়েটাকে অমরের সঙ্গে এতটা মিশতে দেওয়া ভাল হয়নি!"

নন্দরাণী বলিলেন, "ভাই-বোনের মত দুজনে মিশেছে—তাতে এমন দোষ আর কি হয়েছে। তবে মেয়েমানুষের মন সহজেই দাগ কেটে যায়—এই যা!"

বিশ্বেশ্বরবাবু বলিলেন, "যা হবার হয়ে গেছে, তবু একবার যোগীনবাবুর সঙ্গে কাল দেখাটা ক'রে দেখি। যেতাম না আমি, শুধু ঐ মেয়েটার মুখ চেয়ে।"

পরদিন বিশ্বেশ্বরবাবু যোগীনবাবুর সঙ্গে দেখা করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "আমি জানি রাণী ও হবে না। শুধু পায়ে ধরতে বাকী রেখেছি। বলে ছেলের এখন বে' দেবে না। অথচ আমি শুনে এলাম কোথায় নাকি মেয়ে দেখতে যাওয়া হয়েছিল। কি মিথ্যাবাদী! এত টাকা ওর ঘরে, আট দশ হাজার টাকা আয়ের জমিদারী, তবু মেয়ের বাপের রক্ত না চুষলে ওর চলবে না!"

ঝড়ের মত বেগে কোথা হইতে লীলা আসিয়া পিতার সম্মুখে দাঁড়াইল। রাগে তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। বলিল, "কেন গেলে বাবা, শুধু অপমান হ'তে। তোমার মেয়ে চিরকাল আইবুড়ো থাকলেও তোমার মুখে চুন-কালী পড়বে তেমন মায়ের মেয়েই আমি নই।"

বলিয়াই তেমনি বেগে লীলা অদৃশ্য হইয়া গেল। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। তবে বুঝি তাদের সন্দেহ অমূলক—লীলা অমরের অনুরাগিণী নহে!

ঠিক ইহারই পরদিন লীলা অমরের এক চিঠি পাইল। অমর লিখিয়াছে—

স্নেহের লীলা,

বহুদিন তোমার কাছে কোন চিঠিপত্র লিখি নাই। রাতদিন পড়া নিয়ে থাকি, চিঠি লিখবার অবসর হয় না। আশা করি কুশলে আছ। এক বৎসর পূর্ব্বে সীতা-সাবিত্রী সম্বন্ধে যে প্রশ্নটি আমায় করেছিলে, আজ সে সম্বন্ধে দু'চারটি কথা লিখব ভাবছি। সমস্যার মীমাংসা হয়ত এতে হবে না। তবু আমার অনুভূতিতে যা এসেছে তার মূল্য অন্যের কাছে খুব বেশী না হ'লেও লীলার কাছে খুব কম হবে না বলেই আমার বিশ্বাস। তখনও বলেছিলাম, সীতা-সাবিত্রী কাব্যে আঁকা আদর্শ চরিত্র। মানব চরিত্রের খাঁটি সত্যকার অর্থাৎ রিয়াল যাকে বলে, সে বাস্তব দিকটা ফুটিয়ে তুলবার গরজ রামায়ণ বা মহাভারতের কবিদের বড় ছিল না। তাঁরা চেয়েছিলেন আদর্শ সতী গড়তে—একেবারে নিখুঁৎ; গড়েছেনও ঠিক তাই। জানতেন তাঁরা—রামের সঙ্গে হবে সীতার বিয়ে, সত্যবানের গলায় সাবিত্রী দিবেন মালা। সুতরাং তাঁদের মুখ দিয়ে কবি যে কোন কথা বলাতে পারতেন। সেটা ছিল স্ত্রী-স্বাধীনতার যুগ। স্বয়ম্বর হ'ত মেয়েদের! ইচ্ছামত পতি নির্ব্বাচনে ছিল তাদের অধিকার। সাবিত্রীর পিতা অল্পায়ু সত্যবানের হাতে প্রাণপ্রিয় কন্যাকে সমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ঐ স্বয়ম্বরের যুগে সত্যবানকে পতিরূপে না পাওয়ার অর্থই হচ্ছে অল্পায়ু জেনে সত্যবানকে সাবিত্রীর বিয়ে না করা। তাতে বিয়ের সংকট এড়াবার জন্য তাকে আদর্শ সতী বলা চলত না। কিন্তু সাবিত্রী যদি এ যুগের মেয়ে হতেন, বিয়ের স্বাধীনতাও তাঁর থাকত না। পিতা আত্মীয় সমাজ সকলের কল্যাণের জন্য সাবিত্রী অন্য পাত্রে সমর্পিতা হতেন এবং তাঁকে সতী-সাধ্বী বলা হত, যদি সাবিত্রী বিবাহিত জীবনে প্রকৃত স্ত্রী-ধর্ম্ম পালন করতেন।

তারপর সীতার কথা একটু স্বতন্ত্র। প্রথম দর্শনেই সীতা রামকে পতিত্বে বরণ করেন নাই। একটু অনুরাগ দেখিয়েছিলেন মাত্র। ইংরেজিতে ওকে বলে এডমিরেশন। বাঙলায় ওর প্রতিশব্দ নেই। ওকে অনেকটা আকুতি বলা চলে। ঐরূপ আকুতি রূপবান বীর পুরুষকে দেখে সীতার হওয়া স্বাভাবিক। রাম যদি হরধনু ভাঙ্গতে নাই পারতেন সীতা অন্য পাত্রে সমর্পিতা হতেন। পিতৃপণ তাঁকে রক্ষা করতে হ'ত! তারপর মানুষের যা স্বাভাবিক বৃত্তি, সুন্দরের প্রতি আকুতি, তার জন্য তাকে দোষী করা যায় না। সীতা অন্য পাত্রে অর্পিতা হয়েও যদি রামের প্রতি অনুরাগিণী থাকতেন তবে তাঁকে সতী বলা যেত না। বিবাহিত জীবন আর কৌমার্য্য ঠিক এক জিনিষ নয়। কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণে মানুষের মন থাকে কল্পনাপ্রবণ—স্বপ্নময়। কত কথাই তার

(শেষাংশ ৪৮০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ইউরোপের যুগ্ম-নেপোলিয়ন

শ্রীগুণময় আচার্য্য

মুসোলিনি ও হিটলারের ২৩ বৎসর বয়সের ফটোচিত্র দুইখানির দিকে তাকাইয়া যদি তুলনা করা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে—বিস্ময়াকর্ষক মস্তক-শোভিত এবং দৃঢ়তা ও গভীরতা ব্যঞ্জক এক মূর্ত্তি একদিকে, অপর দিকে বিশিষ্টতা-বর্জ্জিত অদ্ভুত এক তরুণ, যাহার নাকি জীবনের ঐ সবুজ সজীবতার কালেও নিজস্ব তেমন কোন সনাক্তকারী ছাপ ছিল না মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত। জীবনের সুস্পষ্ট ডৌল গড়িয়া উঠিবার বয়সেও হিটলার ছিল নেহাৎ নিষ্কর্ম্মা —খেয়ালী। শিক্ষার দিকে কোন আকর্ষণ স্থান পায় নাই তাহার মনে; না ছিল তাহার বিশেষ প্রতিভা, না ছিল উদ্যম, না উদ্ভাবনী শক্তি; এমন তরুণ আর কি করিতে পারে? তাই সে মাঝে মাঝে বেপরোয়ার মতই রোজগার করিতে চেষ্টা করিত ছবিওয়ালা কার্ড (Picture Post Card) বিক্রয় করিয়া, যাহা হইতে আয় কয়েক সেণ্টের বেশী হইত না কোন দিন।

তরুণ বয়সে মুসোলিনি কাজে লাগিয়া গিয়াছিল পিতার লৌহ-কর্ম্মশালায়। ১৮ বৎসর বয়স হইতেই আপন খরচ চালাইয়া পায়ে দাঁড়াইতে সে অভ্যস্ত ছিল, শুধু তাহাই নয়, সংগে সংগে শিক্ষাকে সে করিয়া লইয়াছিল চিরসাথী। তাহার সমগ্র যৌবন ভরপুর ছিল বিপুল উদ্যম ও উচ্চ লক্ষ্যের অপার গৌরবে। ২৬ বৎসরে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই মুসোলিনি নয়বার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল রাজনীতিক আন্দোলনকারী বলিয়া। ইটালির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যে সোস্যালিষ্ট সংবাদপত্র উহারই সম্পাদক হইল মুসোলিনি।

ইহার পর মুসোলিনি যুদ্ধক্ষেত্রে পর পর কৃতিত্ব অর্জ্জন করিতে লাগিলেন; কিন্তু হিটলার—আজিকার জার্ম্মান তরুণ যে সকল দুঃসাহসিক সমর-কৌশল ও বীরত্বমূলক কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠায় জীবন পণ করিতেছে তেমন কোনও উচ্চ সমর-শিক্ষার অধিকারী হইতে পারেন নাই—সেনা-বিভাগে এই হিসাবে বিশিষ্ট রেকর্ড তাঁহার নাই বলিলেও চলে। অপর পক্ষে ইহাও জানিতে পারা গিয়াছে যে ১৯২৩ সালে তাঁহার মিউনিচ অভিযানের সময় পশ্চাৎ অপসৃত হইয়া আসেন—যখন রাজপথে তাঁহার সংগী ও সহকর্ম্মিগণ রাইফেল ও মেশিনগানের মুখোমুখী দাঁড়াইয়া পণরক্ষা করিতে থাকে। আর আজ দেখা যায় হিটলার জার্ম্মান-সেনার কুচ-কাওয়াজ পরিদর্শন করিতে উপস্থিত হন, কিন্তু তিন সারি রক্ষী সৈন্য তাঁহার গমনপথকে সকল প্রকারে নিরাপদ করিয়া রাখে।

বিশেষ করিয়া জার্ম্মান জনগণের উপর হিটলারের যে অমিত প্রভাব, তাহা সম্ভব হইয়াছে তাঁহার বাগ্মিতাশক্তিতে —জনসাধারণের চিত্ত জয় করিবার মত অকাট্য যুক্তির সময়োচিত উপস্থাপনে। কিছুকাল যাবৎ জার্ম্মানীতে জনপ্রিয় শ্রেষ্ঠ বক্তার অভাবই পরিলক্ষিত হইত, কিন্তু হিটলারের অভ্যুদয়ে এমন সকল অভিনব বক্তৃতা-উত্তেজনায় জার্ম্মানগণ মুগ্ধ হইল, যে সকলের ভিতর ছিল কিছুটা ভাগনারের সুর—যুগযুগাগত জার্ম্মান জাতীয়তার অমূল্য প্রাণীয় কিছুটা পুনরাবৃত্তি, বীররসে ও করুণরসে শতগুণ বর্দ্ধিত-প্রভাব এবং সকলের উপরে প্রায় অবোধ্য কিন্তু জাতির পক্ষে মুখরোচক—দেবতা ও বীরনেতা, অনাবিল আর্য্যরক্ত ও জাতীয় বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় পরম্পরার বিচিত্র সংমিশ্রণ!

হের হিটলার

মুসোলিনি স্বাভাবিক সাহসিকতাব্যঞ্জক কণ্ঠস্বরে মন্ত্র হয় সংক্ষিপ্ত সরল বাক্যধারা, যাহাতে ফুটিয়া উঠে পৌরুষ-প্রতীক গম্ভীর মোটা সুরে। হিটলার যখন জনতাকে সম্বোধন করে, উচ্ছ্বাস উত্তেজনায় মূর্চ্ছারোগীর ন্যায়ই সে হইয়া পড়ে আক্ষেপযুক্ত। বক্তৃতা-মঞ্চের উপর তাহার হাতের কাছে থাকে দেহের উপর প্রক্ষিপ্ত করিবার সন্ধানী আলোক-ব্যবস্থার যন্ত্র, যাহার বোতাম টিপিবামাত্র উজ্জ্বল প্রখর আলোকে উদ্ভাসিত আপন মূর্ত্তিটি সে বক্তৃতায় জোরদানের জন্য জনতার সম্মুখে তেজোদীপ্ত করিয়া ধরিতে পারে। এই উপযুক্ত মুহূর্ত্তে নিজেকে উজ্জ্বল-আলোকিত করিবার যে সুনিপুণ কৌশল, ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় কি কৃত্রিম উপায়ে হিটলার ভাবাধিক্য সৃষ্টি করিতে উন্মুখ।

এবিসিনিয়া জয়ের পর মুসোলিনির যে বিজয়-অভিভাষণ তাহাতে 'আমি' শব্দ তিনি ব্যবহার করিয়াছেন মাত্র দুইবার। আর হিটলার—তিনি প্রতি বক্তৃতায়ই শত শতবার আপন নামের আবৃত্তি করিয়া থাকেন। যেহেতু মুসোলিনি আপন নিয়ন্তৃ-পদের অবিসম্বাদিত্বে নিশ্চিত, তিনি নিজের সম্বন্ধে অতি অল্প কথাই বলেন, নিজের নামের উল্লেখ প্রায় করেন না। কিন্তু হিটলার একেবারে বিপরীত—তিনি আপন প্রভাব সম্বন্ধে নিতান্তই অনিশ্চিত, তাই আত্ম-কর্ত্তৃত্বই তাঁহার বক্তৃতার অধিকাংশ জুড়িয়া থাকে—নিজের নামই তাঁহার মুখে শোনা যায় অবিরাম। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দ্বিতীয় উইলহেলমের মতই হিটলার নিজেকে বলিষ্ঠ ও প্রতিপত্তিশালী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, কারণ অন্তরের অন্তরে রহিয়াছে তাঁহার সহজাত দুর্ব্বলতার সন্দিগ্ধতা! জার্ম্মান-চরিত্রের ইহা নমনীয়

পক্ষপাতিত্ব বলিতে হইবে যে, সমগ্র জাতির ভাগ্য তাহারা ন্যস্ত করিয়া রাখিয়াছে এমন একজন চোখ-ধাঁধান কৌশলী, এমন একজন বাক্যবীর, এমন একজন সদা-সন্দিগ্ধ জটিল মানসিকতা-চকিত ব্যক্তির উপর।
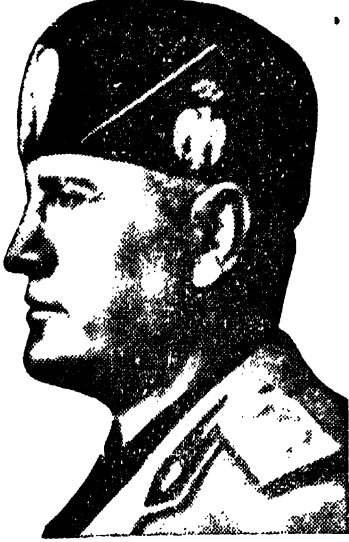
সিনর মুসোলিনী

বিশেষ করিয়া এই ব্যাপারে হিটলারের সহিত মুসোলিনির পার্থক্য একেবারে জ্বলন্ত। শরীর গঠনে বলিষ্ঠতার আদর্শ মুসোলিনি সকল দিক দিয়াই মানুষের মত মানুষ। তাঁহার নিজ কর্ম্মক্ষমতা দ্বারা জনগণের সম্মুখে উদাহরণ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি কুঠারহস্তে কাষ্ঠ কর্ত্তন করেন, চাষের কল নিজ হাতে চালনা করেন; প্রকাশ্যে এই সকল শ্রমিকের কাজ করিতে তাঁহার কুণ্ঠা নাই, সঙ্কোচ নাই। কর্ম্মবীর মুসোলিনি ৫৩ বৎসর বয়সেও উড়ো জাহাজ পরিচালনার পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইয়া চালকের লাইসেন্স গ্রহণ করেন।

হিটলার কোন প্রকার খেলাধূলা শিকার প্রভৃতিতে যোগদান পছন্দ করেন না; মোটর গাড়ী স্বহস্তে চালাইতে পারেন না; কোনও প্রকার কায়িক শ্রমের কার্য্যে লিপ্ত হইতে দেখা যায় না কোন দিন। অপরপক্ষে অভিনেতোচিত পরিপাট্যে মধ্যযুগীয় রাজার ভূমিকা অভিনয় করিতেই যেন তাঁহার ইচ্ছা অপরিসীম।

ডিক্টেটরশিপ-আসনে অধিরোহণ করিয়াই মুসোলিনি তাঁহার শিক্ষা-সংস্কৃতির ভাণ্ডার প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ করিতে আলস্য প্রকাশ করেন নাই সামান্য মাত্রও। তিনি যেমন জার্ম্মান ভাষায় অনর্গল কথা বলিতে পারেন, তেমনই আবার ফরাসী ও ইংরেজী ভাষায়ও তাঁহার অবাধ অধিকার। যে কোনও ব্যক্তি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাক্ না—সেই সাক্ষাতের ফলে কোন-না-কোন নূতন তথ্য মুসোলিনি সংগ্রহ করিতে জানেন—সে তথ্য যে বিষয়েরই হউক, মুসোলিনি পরম আগ্রহে তাহাই গ্রহণ করিয়া জ্ঞান সঞ্চয় করেন।

কিন্তু হিটলারের সহিত সাক্ষাৎলাভ করিতে পারিলে, সাক্ষাৎকারীর কথা বলিবার সুযোগ অতি সামান্যই জোটে, কারণ হিটলারই অবিরাম কথা বলিয়া যাইতে থাকেন। এখানেও অন্য মানুষের মত সংযত শান্তভাবে বাক্যস্রোত বহির্গত হয় না; বিকৃত মুখ হইতে হিটলার বজ্রনির্ঘোষে আপন বক্তব্য নিক্ষেপ করেন সাক্ষাৎকারীর প্রতি চোখ ঘুরাইয়া টেবিল-জানালা চাপড়াইয়া এবং অকস্মাৎ বাক্যপ্রবাহ নিরুদ্ধ করিয়া বিস্ময়চকিত সাক্ষাৎকারীকে মুহূর্ত্তে জানাইয়া দেন সাক্ষাৎকার সমাপ্ত হইয়াছে; সাক্ষাৎকারীর উদ্দেশ্য সাধিত হউক না হউক তন্মুহূর্ত্তে তাহাকে বিদায় হইয়া আসিতে হয়।

মুসোলিনির দপ্তরে যে সকল অফিসার রহিয়াছেন—শিক্ষা-দীক্ষা, ধী-ধারণা কোন কিছুতেই তাঁহারা মুসোলিনির পাশেও দাঁড়াইতে পারে না—মুসোলিনির নির্দ্দেশ শিরোধার্য্য করাই সেই সকল সহকর্ম্মী ও সহকারীর একমাত্র কাজ—পরামর্শদানের স্পর্দ্ধা তাঁহাদের পক্ষে ধৃষ্টতা-মাত্র। কিন্তু হিটলার সদা সর্ব্বক্ষণ পরিবেষ্টিত থাকেন, তাঁহার একদল মিনিষ্টার কর্ত্তৃক—বুদ্ধির প্রখরতায় কিম্বা অভিজ্ঞতায় যাঁহারা হিটলার অপেক্ষা ন্যূন নহে কোন ক্রমে, কিন্তু প্রচারকার্য্যের নিপুণতায় হিটলারের সমকক্ষ কেহই নাই। মুসোলিনি রাষ্ট্র-কার্য্যের চাপে অবকাশ পান না পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদের নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজদানে আপ্যায়িত করিবার—কোনও দিন সামাজিক কোন অনুষ্ঠানে যোগদানও সম্ভব হয় না অবসরের অভাবে—এমন কি গ্রীষ্মের সময় কিছুকাল ভিন্ন রাজধানী ত্যাগ করিয়া যাওয়াও তাঁহার সাধ্যাতীত। হিটলার বরং একাকী থাকিতেই ভীত হন, নীরবতা তাঁহার অসহ্য ঠিক যেমন শিক্ষাগ্রহণের শ্রম ও সহিষ্ণুতা তাঁহার আতঙ্কের বিষয়। বৎসরের অধিককাল তিনি অতিবাহিত করেন রাজধানী বার্লিন হইতে বহুদূরে স্থিত তাঁহার পল্লীভবনে; সময়ে সাহচর্য্য গ্রহণ করেন সিনেমা-তারকাদের, কারণ অন্য লোক অপেক্ষা এই পেশার পক্ষপাতীদের প্রতি তাঁহার একটু যেন অনুরাগ রহিয়াছে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তারকাদের একজন বলিয়াছেন—একদিন হিটলারের নিমন্ত্রণে প্রায় কুড়িজন অভিনেতা সমবেত হন ভোজে। হিটলার স্বয়ং শুধু জলপান করিলেন, কিন্তু নিমন্ত্রিতদের জন্য প্রচুর মদ্যপানের ব্যবস্থা করিলেন। সেই সময়ে অবিচ্ছিন্ন তিন ঘণ্টা সময় হিটলার বক্তৃতা দিয়া চলিলেন। সেই ভোজ সভায় আর কাহারও কথা বলিবার অবকাশ মিলে নাই। এই ব্যাপার হইতে এই সত্যই উদ্ঘাটিত হয় যে, সুযোগ-বঞ্চিত অভিনেতা আপন শক্তি প্রকাশের যোগ্য শ্রোতৃমণ্ডলী অন্বেষণ করিতেছেন। ইহা হইতে আবার ইহাও বুঝিতে পারা যায় কেন তাঁহার সকল সিদ্ধান্ত ও কার্য্যাবলী এতটা অভিনয়ের ছাঁচে ঢালাই করা এবং কেনই-বা তাহা এতটা সংকটময়। কোথায় তিনি আঘাত করিবেন এবং কখন—এ কথার আভাষ বুঝাও কাহার সাধ্যায়ত্ত নয়।

এই তুলনামূলক সীমারেখায় গণ্ডীবদ্ধ যে দুই মূর্ত্তি আমরা পাই—সেই দুই নেতার গুণাগুণে এবং রুচি-প্রবৃত্তিতে সাদৃশ্যের কিছুমাত্র নিদর্শন নাই। কিন্তু এই কথা নির্দ্ধারিত সত্য যে মুসোলিনি এবং হিটলার উভয়েই নিজ নিজ জাতির

হৃতগৌরব ফিরিয়া পাইতে চাহেন। মুসোলিনি চাহেন পূর্ব্ব রোমক-সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত করিতে—তবে যতটা বিনা রক্তপাতে সম্ভব ততটাই মঙ্গল। কূটবুদ্ধি ও শ্রেষ্ঠ ইটালীয় রাজনীতিক চালে অঘটন ঘটানই মুসোলিনির অন্তরের কামনা। প্রতীক্ষায় থাকিয়া বিজয়ী দলে যোগদান করিতেও তাঁহার কুণ্ঠা থাকিবে না, যেমন থাকিবে না ইটালীর স্বপ্ন সফল করিতে যে কোন সন্ধি বা মৈত্রীকে বলিস্বরূপ প্রদান করিতে। কিন্তু হিটলার যেন জুয়াখেলায় প্রবৃত্ত জার্ম্মান-শক্তিকে ইউরোপে সর্ব্বপ্রধান করিতে। সম্প্রতি তাঁহাকে বিনা রক্তপাতে কার্য্যোদ্ধার করিতে দেখা গেলেও উহা মুসোলিনির অঙ্কিত পথ নয়—কারণ হিটলার জানেন জার্ম্মান জাতির ক্ষুধা কোথায়! ইউক্রেন, উপনিবেশ—সমস্ত কুক্ষিগত হইলেও জার্ম্মানীর সেই ক্ষুধার তৃপ্তি হইবে না। তাহাদের চাই জয়—ইউরোপীয় যুদ্ধে জয়—যতদিন না তাহারা বিজয়ীর সদম্ভ পদক্ষেপে পুনরায় ভার্সাইয়ের "হল অফ্ মিররস্"-এ প্রবেশ করিতে পারিতেছে সন্ধির সর্ত্ত আপন আদেশে রূপায়িত করিতে, ততদিন জার্ম্মানীর শান্তি নাই—স্বস্তি নাই—ক্ষুধা তাহাদের অতৃপ্তই থাকিবে।

এই প্রকার যুদ্ধজয়ের মাদকতা মুসোলিনির নাই—হিসাবী ধুরন্ধরের লক্ষ্য হইল প্রতি পদক্ষেপে ইটালীর জন্য নবসমৃদ্ধি আহরণ—জেদ বা কল্পিত গৌরবের মোহে ত নয়ই, প্রতিশোধের কামনায়ও নয়। *

* এমিল লুড্উইগ্-এর প্রবন্ধ অবলম্বনে।

প্রশ্নের পরে

(৪৭৭ পৃষ্ঠার পর)

মনে আসে—কত ছবিই সে নির্জ্জনে বসে আঁকে! কৈশোরের স্বপ্ন সকলের জীবনে সফল হয় না। বিবাহিত জীবনে বাল্যের রঙীন স্বপ্ন সে ভুলে যায়। ভুলে যাওয়াই তার স্বভাব, ভুলে যাওয়াই তার উচিত। এবং যে ভুলে যেয়ে বর্ত্তমানকে কায়মনোবাক্যে বরণ ক'রে নিতে পারে—তাদের অতীত স্বপ্নের জন্য দোষ দেওয়া যায় না।

হিন্দুশাস্ত্রকারেরা কারুর ওপর অনুরাগ যে বয়সে জন্মে তার পূর্ব্বেই মেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থা দিয়ে গিয়েছিলেন। অবশ্য এযুগে নানা কারণে তা আর চলছে না। ভুলে যায় মানুষ সবই। তবুও দাগ সহজে মুছে না। এই জন্য কোন কুমারীর কারুর প্রতি অনুরাগিণী হওয়া উচিত নয়। পাপ তাতে হয় কি না জানি না, দুঃখ কিন্তু অনেক পেতে হয়; জীবন হয়ে যায় কারুর ব্যর্থ। তবুও অবস্থার ফেরে বা ভাগ্য দোষে কেউ যদি কারুর অনুরাগী বা অনুরাগিণী হয়ে পড়ে, দোষ দেওয়া যায় না। তাদের দুর্ভাগ্যের জন্য দুঃখ হয়। সে দুর্ভাগ্যকেও সৌভাগ্যে পরিণত করা যায় যদি পূর্ব্ব অনুরাগ ভুলে যেয়ে নব অনুরাগে মেতে উঠতে পারে,—ভালবাসতে পারে তার স্বামীকে, ভালবাসতে পারে পুরুষ তার স্ত্রীকে।

পাপ পূর্ব্ব-অনুরাগে নয়, পাপ—সেই অনুরাগ বিবাহিত জীবনের পরেও বাঁচিয়ে রাখায়! বঙ্কিমবাবুর "চন্দ্রশেখর" পড়েছ। শৈবলিনী প্রতাপকে ভালবেসেছিল। ছিল সে জ্ঞাতি কন্যা। বিয়ে হবে না লেখক তা জানতেন। শুধু ভালবাসায় শৈবলিনীর অন্যায় হয়েছিল লেখক একথা কোথাও বলেননি! কিন্তু চন্দ্রশেখরকে বিয়ে করেও শৈবলিনী প্রতাপকে ভুলতে পারলেন না। এইটি হয়েছিল শৈবলিনীর দোষ।

এ হ'ল আমার নিজের মত, এই জন্য শুধু আমিই দায়ী। সন্দেহ থাকলে লিখে জানিও! কেমন আছ, কাকীমা, কাকা-আমার প্রণাম দিও।

আশীর্ব্বাদক

অমরদা

উত্তরে লীলা লিখিল

শ্রীচরণকমলেষু—

অমরদা, আজ তোমার চিঠি পেয়েছি। আমার প্রশ্নের উত্তর ঠিকই হয়েছে। কিন্তু ঐ একটা কথা লিখতে যেয়ে এত কথা যে কেন লিখেছ তা যে আমি না বুঝতে পেরেছি এমন নয়। তোমার কাছেই লীলা লেখাপড়া শিখেছে। ছেলেবেলাকার স্বপ্ন সবার ভাগ্যে সফল হয় না তা জেনে লীলা অনেকদিন থেকেই সাবধান হয়েছে। তার জন্য তুমি ভেব না। অত কথা না লিখলেও চলত। একদিন যে তুমি আমাকে এইরকম কিছু লিখতে বাধ্য হবে তা আমি আগে থাকতেই জানতাম। ভাল আছি প্রণাম নিও। ইতি—

তোমার স্নেহের বোন লীলা

তারপর দুইমাস যাইতে না যাইতেই মুখার্জ্জী বাড়ীতে সানাইয়ের বাজনা বাজিয়া উঠিল। নন্দরাণী একটু বিস্ময় হইলেন, লীলা চিঠিতে যাই লিখুক শেষ পর্য্যন্ত নিজেকে অচঞ্চল রাখিতে পারিল না। বিশ্বেশ্বরবাবু নন্দরাণীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দেখলে যোগীনদার কাণ্ডখানা! কথাটা শুনিয়ে না এলে সোয়াস্তি পাচ্ছি নে!"

সত্য সত্যই বিশ্বেশ্বরবাবু যোগীনবাবুর বৈঠকখানায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "তবে না অমরের বে দেওয়া আপনার ইচ্ছে নয়!"

যোগীন্দ্রনাথ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ইচ্ছে ত ছিলই না ভায়া, তা পাঁচ জনে যেমন নাচিয়ে তুললে—বললে অত বড়-লোক, তাদের অনুরোধ কি উপেক্ষা করা চলে! বিশেষত অমর যখন কলকাতাতেই থাকছে, শ্বশুর বাড়ীটা কলকাতা-তেই হ'লে ভাল হয়!"

আত্মদমন করিয়া বিশ্বেশ্বরবাবু শুধু বলিয়াছিলেন "তা বটেই ত!"

অমরের বিবাহ নির্ব্বিঘ্নেই সম্পন্ন হইয়াছিল। সমস্ত অভিযোগ সমস্ত দাবী লীলা হাসিমুখেই ত্যাগ করিয়া অমরের নববিবাহিতা পত্নী প্রভার সঙ্গে সহজভাবেই মিশিতে পারিয়া-ছিল। অমরের বিবাহের প্রায় মাস ছয়েক পরে অমরের প্রেরিত সেই পার্শ্বেলটি প্রভার হাতে দিয়া লীলা কম্পিত-পদে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

(ক্রমশ)

অবিশ্বাসী

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

২২

সুরেনবাবু একদৃষ্টে বাতিঘরের পানে চাহিয়াছিলেন, মাণিককে লক্ষ্য করেন নাই।

রেণুর দৃষ্টি প্রথমে এই দিকে গিয়া পড়িল। তাহার নয়নে তড়িৎ প্রবাহের মত একটা চমক খেলিয়া গেল, মুখের নির্ব্বিকারত্ব তাহাতে একটুও বিকৃত হইল না।

সুরেনবাবুকে ডাকিয়া সে বলিল, "বাবা, মাণিকবাবু এসেছেন।"

সুরেনবাবু প্রচণ্ড বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "মাণিক! কোথা থেকে এ সময়ে? কেমন আছ? কবে এলে?"

মাণিক তাঁহার এতগুলি প্রশ্নের একটারও উত্তর দিতে পারিল না। রেণুর নির্লিপ্ত আচরণ তাহার অন্তরে শেলের মত বাজিয়া গেল। শুধু নীরবে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

সুরেনবাবু বলিলেন, "উঃ, হাঁপিয়ে মরছিলাম দুটো কথা বলতে না পেরে। এমন কাট-খোট্টার দেশেও কি মানুষ থাকে? তুমিও বুঝি বেড়াতে বেরিয়েছ?"

পূর্ব্ব প্রশ্নের আবৃত্তি আর তিনি করিলেন না।

এবারও মাণিক উত্তর দিল না।

সুরেনবাবু তাহাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "ওই বাতিঘরটা দেখছিলাম। দেখেছ এখানে সমুদ্রের ঢেউ নেই বললেই হয়—ছোট আর ভাঙ্গা ভাঙ্গা। কিন্তু টান বড্ড বেশী, একটু নামলেই জলও গভীর।"

রেণু মৃদুস্বরে বলিল, "বাবা, মাণিকবাবু বোধ হয় অসুস্থ। জিজ্ঞাসা করুন না, উনি এখানে কেন এসেছেন।"

মাণিক এ আঘাত সহ্য করিতে পারিল না। কম্পিত-কণ্ঠে বলিল, "সে কথা বোধ হয় তুমিও জিজ্ঞাসা ক'রতে পার রেণু।"

রেণু মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "অনধিকার চর্চ্চা আমি করি না।"

মাণিকের মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। আবেগভরে কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু প্রাণপণ শক্তিতে সে আবেগ দমন করিয়া লইল।

সুরেনবাবু তাহাদের কথার গতি আদপে লক্ষ্য করেন নাই। হাসিমুখে তিনি বলিলেন, "ঠিক কথা রেণু-মা, মাণিক তোমার পরমাত্মীয়, ওর কথা তুমিও জিজ্ঞাসা ক'রতে পার। আমার কেমন ভুলো মন, কোন বিষয়ে কিছু ঠিক থাকে না। মাণিক ভাল আছ ত, বাবা?"

এতক্ষণ পরে এ প্রশ্ন অনাবশ্যক। কিন্তু সুরেনবাবু সংসারের আদব কায়দা আবশ্যক অনাবশ্যকের ধার বড় একটা ধারেন না।

মাণিক ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল।

রেণুর মুখে অল্প একটু হাসি ফুটিয়া উঠিল, কহিল, "চলুন বাবা, বাসায় যাই।"

সুরেনবাবু বলিলেন, "চল, সূর্য্যাস্তটা দেখে যাই। চল, ওই দিকে গিয়ে একটু পায়চারী করা যাক।"

তিনজনে অগ্রসর হইলেন।

কিছুক্ষণ পরে সুরেনবাবুই বলিলেন, "দেখেছ কেমন আঁসটে দুর্গন্ধ, বেড়াবার যো নেই। অথচ পুরীর সমুদ্রের ধারে এ দুর্ভোগ ভোগ ক'রতে হয় না। আচ্ছা, মাণিক, এখানকার সূর্য্যাস্ত তোমার কেমন মনে হয়? খুব সুন্দর—নয়?"

মাণিক ঘাড় নাড়িল।

আরও খানিকক্ষণ কাটিয়া গেল। সুরেনবাবু একাই তাঁহার ভ্রমণের বিচিত্র অভিজ্ঞতা বলিয়া যাইতে লাগিলেন।

মাণিক মনে করিল, জগতে এইসব আত্মভোলা লোকেরাই সুখী। বৃদ্ধ বয়সে যে প্রচণ্ড শেল পাইয়াছেন, তাহাতে অন্য লোক হইলে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িতেন। কিন্তু প্রকৃতির শিশু ইনি, প্রকৃতি মাতার স্নেহস্পর্শে সমস্ত ব্যথা ভুলিয়াছেন। নূতন সম্পদের সঞ্চয়ে ইঁহার মন ভরিয়া গিয়াছে।

রেণু কিন্তু একেবারে নির্ব্বিকার।

এ কি ক্রোধ? কে জানে, মাণিকের সেই পত্রই রেণুকে এমন নিস্পৃহ করিয়া দিয়াছে কি না?

মাণিকের চিত্ত অস্থির হইয়া উঠিল। সে অপরাধী, সুতরাং লজ্জা করিলে তাহার অপরাধের গুরুত্ব হ্রাস হইবে না। রেণুর অন্তরে যে প্রচণ্ড আঘাত লাগিয়াছে তাহাই হয়ত এই পরম ধৈর্য্যশীলা নারীকে একেবারে মাটির সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছে। সহজভাবে কথা কহিবার সে শক্তি উহার কোথায়?

না, কথার ছলে এতটুকু বক্রোক্তি করাও মাণিকের উচিত হয় নাই।

চলিতে চলিতে মাণিক বলিল, "রেণু দ্বারকা কেমন লাগছে?"

রেণু সংক্ষেপে উত্তর দিল, "ভাল"।

মাণিক পুনরায় প্রশ্ন করিল, "এখানকার ঠাকুর দেখা সব

রেণু মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল।

মাণিকের মনে একটু ক্ষোভের সঞ্চার হইল। কিন্তু জোর করিয়া সেটুকু দমন করিয়া কহিল, "আমি এখানে কেন এসেছি জিজ্ঞাসা ক'রলে না ত?"

রেণু সমুদ্রের পানে চাহিয়া উত্তর দিল, "কারণ না থাকলে কেউ কোন কাজ করে না।"

মাণিক অল্প আহত হইয়া বলিল, "বিদেশে একজন সম্পূর্ণ অপরিচিতকে দেখে মনে কত আনন্দ হয়, কত কথা ব'লতে ইচ্ছে করে। কিন্তু তুমি আমায় দেখে—"

রেণু সমুদ্রের পানে চাহিয়াই উত্তর দিল, "সকলের মন ত সমান নয়। তা ছাড়া—"

মাণিক আগ্রহভরে বলিল, "তা ছাড়া কি?"

রেণু বলিল, "মনের এমন অবস্থা আছে, যখন সামান্য কথা নিয়ে খুব আমোদ ক'রতে ভাল লাগে। আবার সময় বিশেষে ভালও লাগে না।"

মাণিক ব্যথিত স্বরে বলিল, "তোমায় যদি আঘাত করে থাকি রেণু, আমায় মাপ ক'র।"

এবার রেণু সমুদ্রের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া পূর্ণ দৃষ্টিতে মাণিকের মুখের পানে চাহিয়া স্বরে বিশেষ জোর দিয়া কহিল, "আঘাত করা যত সহজ, ক্ষমা করা তত সোজা নয়।" বলিয়া দ্রুতপদে সুরেনবাবুর নিকটে আসিয়া বলিল, "বাসায় চলুন, বাবা।"

সুরেনবাবু বলিলেন, "দাঁড়াও মা, মাণিক আসুক।"

মাণিক বিবর্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ রেণুর গমনপথের পানে চাহিয়া মনে মনে বলিল, এ ঠিকই হইয়াছে। সমস্ত সম্পর্কের শেষ যাহার সঙ্গে হইয়াছে, তাহাকে লইয়া এ সব প্রশ্ন-তর্ক, ভাল-মন্দের বিচার করা চলে না।

আঘাতের বদলে আঘাত দিলে কি হৃদয়ের সন্ধান মিলে?

রাত্রিতে সুরেনবাবু ডাকলেন, "মাণিক খাবে এস।"

মাণিক উত্তর দিল, "আমার খিদে নেই, আপনারা খেয়ে নিন।"

সুরেনবাবু তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "তবে থাক। অখিদেয় খেয়ে শেষ পরে অসুখ ক'রবে।"

কিছুক্ষণ পরে রেণু এ ঘরে আসিয়া বলিল, "সত্যিই খিদে নেই, না আর কিছু?"

মাণিক বলিল, "আর কি হ'তে পারে?"

রেণু বলিল, "সে তুমিই জান। কিন্তু এতদিন পরে এখানে আমাদের পিছু পিছু ধাওয়া করে এ সবগুলো না ক'রলেই কি ভাল ছিল না?"

মাণিক উঠিয়া বসিয়া কহিল, "রেণু, বারবার এমন রূঢ় আঘাত ক'রতে তোমার কষ্ট বোধ হ'ল না!"

রেণু হাসিয়া উঠিল। সে হাসিতে প্রাণ ছিল না।

মুখ ফিরাইয়া সে বলিল, "অনেকদিন কাউকে আঘাত করিনি ব'লে যাচাই ক'রে দেখছি—সেগুলো মরচে ধ'রে গেছে কি না।"

মাণিক বলিল, "তবে আঘাতই কর। তোমার আঘাত করা শেষ হ'লে আমি উত্তর দেব।"

রেণু বলিল, "তোমাকে আঘাত করা ছাড়া জগতে আর আমার কাজ নেই বুঝি? এত জ্বালাতেও পার তুমি! যাও, উঠবে কিনা বল।"

মাণিক রেণুর পানে চাহিতেই সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া বাহির হইয়া গেল।

প্রদীপের অনুজ্জ্বল আলোয় মনে হইল, রেণুর থমথমে চোখের কোণে কি যেন চিক চিক করিতেছে। উদ্গত অশ্রুর রেখা কি? গলার স্বরটাও ভারী।

মাণিকের মনে আনন্দ হইল। ভর্ৎসনা ও আঘাতের মধ্য দিয়া আবার পূর্ব্বের রেণু ফিরিয়া আসিয়াছে।

সে আহার করিতে উঠিল।

* * * * *

নির্ম্মল প্রভাতে দুইজনে সমুদ্রতীরে বেড়াইতেছিল।

সহসা রেণু প্রশ্ন করিল, "দেশে কবে ফিরবে, মাণিক-দা?"

মাণিক বলিল, "আমার সঙ্গ কি তোমার ভাল লাগছে না?"

রেণু বলিল, "সত্যই ভাল লাগছে না। ওকি, মুখ কালি ক'রছ কেন? সত্যি কথা শোনবার শক্তিও তোমার নেই বুঝি?"

মাণিক কণ্ঠে জোর দিয়া বলিল, "সত্যি কথা শোনবার বল বুকে আছে, কিন্তু মিথ্যাকে সত্য ব'লে ভাবতে পারি না।"

রেণু গম্ভীরভাবে বলিল, "তোমার অনেক পরিবর্ত্তন হ'য়েছে, মাণিক-দা।"

মাণিক বলিল, "ও কথা আমিও তোমায় ব'লতে পারি।"

রেণু বলিল, "মিছে কথা কাটাকাটিতে লাভ নেই। একটা কথা সত্যি ব'লবে কি?"

"—জিজ্ঞাসা কর—ব'লব।"

—"তুমি এখানে কেন এসেছ?"

মাণিক বলিল, "তুমি যা ভেবেছ সে জন্য নয়।"

রেণু অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "আমার ভাবনা তুমি বুঝতে পার?"

মাণিক মৃদু হাসিয়া কহিল, "কিছু কিছু পারি বৈকি।"

রেণু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "মস্ত গণকঠাকুর হ'য়েছ ত তুমি! এ বিদ্যে বুঝি আগে শিখতে পারনি?"

মাণিক মৃদু নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "তখন বিদ্যা-লাভের মত জ্ঞান আমার ছিল না।"

রেণু উত্তপ্তস্বরে কহিল, "থাক, ও নিয়ে আর বড়াই ক'রতে হবে না। কৈ ব'ললে না ত কেন এসেছ এখানে?"

মাণিক এক মুহূর্ত্ত থামিয়া অনীতার কাহিনী আদ্যোপান্ত বলিল।

রেণু দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "আমি জানি কতক কতক। তা কি ক'রতে চাও এখন?"

মাণিক বলিল, "তোমাকেই জিজ্ঞাসা ক'রতে এসেছি রেণু, এ বিষয়ে আমার কর্ত্তব্য কি?"

রেণু মুখখানি গম্ভীর করিয়া নীরস স্বরে বলিল, "যে অপরকে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতে পারে, তার এ কথার মানে কি?"

মাণিক ব্যাকুলকণ্ঠে কহিল, "সে চিঠির কথা ভুলে যাও, দোহাই রেণু।"

রেণু তেমনই নীরস স্বরে বলিল, "আচ্ছা ভুলে না হয় গেলাম, কিন্তু তোমাকে উপদেশ দিতে পারি এমন কি সাধ্য আছে আমার?"

মাণিক ব্যথিতস্বরে ডাকিল, "রেণু।"

রেণু থামিল না, বলিতে লাগিল, "তোমার ভার তুমি স্বেচ্ছায় একজনের ঘাড়ে চাপিয়ে যখন চলে গিয়েছিলে, তখন একবারও ভেবেছিলে কি যে, সে ভার সে সইতে পারবে কি না? যে কর্ত্তব্য তার ছিল না, তারই সাধনে তাকে সর্ব্বস্ব খোয়াতে হ'য়েছে। দেশে মুখ দেখাবার যো তার নেই! ব্যথা তোমার মনে প্রতিনিয়ত আমি দিচ্ছি, কালও ব'লেছ এ কথা, কিন্তু তোমার মনে ব্যথা বোঝবার ক্ষমতাটুকু আছে কি?"

বাক্য শেষে রেণুর স্বর কাঁপিয়া উঠিল। সে মাণিকের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিল, কাজেই মাণিক বুঝিতে পারিল না—রেণু কাঁদিতেছে কি না।

মাণিক ব্যথিত স্বরে বলিল, "সত্য রেণু, আমিই আগা-গোড়া ভুল করেছি। মাকে ব্যথা দিয়ে দগ্ধে মেরেছি, তোমায় জ্বালা দিচ্ছি, নিজেও কম কষ্ট পাচ্ছি না। তুচ্ছ বিষয় যদি সেদিন আমি নিজের হাতে তুলে নিতাম ত তোমায় বোধ হয় এমন ক'রে মুখ লুকিয়ে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াতে হ'ত না!"

রেণু বালু প্রান্তরের উপর বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

মাণিক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "কিন্তু যা হবার তা ত হ'য়ে গেছে। উপস্থিত আমার প্রায়শ্চিত্তের কিছু বাকী আছে। অনীতার কথা ব'লছি।"

রেণু অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "মনে আছে, একদিন তোমার হাতেই তাকে দিতে চেয়েছিলাম!"

মাণিক বলিল, "কিছুই ভুলিনি, রেণু।"

রেণু বলিল, "তাহ'লে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে তাকে গ্রহণ কর, সুখী হও।"

মাণিক শুষ্কহাসি হাসিয়া বলিল, "সুখী হব! এ জীবনে বোধ হয় নয়।"

রেণু ভ্রূকুটি করিয়া কহিল, "কেন?"

মাণিক রেণুর পানে উজ্জ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "সে ত তুমি ভাল রকমেই জান, রেণু। এই একটু আগে আমায় জ্যোতিষী ব'লে উপহাস ক'রছিলে! কিন্তু আমি শুধু অজ্ঞ নই, অন্ধও বটে। তাই অনায়াসলব্ধ সুখকে ত্যাগ ক'রে দাবদগ্ধের মত ছুটে বেড়াচ্ছি।"

রেণু কঠিনস্বরে বলিল, "এই সব কথা শোনাবার জন্যই কি তুমি এখানে আমায় ডেকে এনেছ?—"

মাণিক আর আপনাকে সম্বরণ করিতে পারিল না। উজ্জ্বল মুখ তাহার আবেগে, উত্তেজনায় উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। বিহ্বলস্বরে সে বলিল, "ঘরের মধ্যে সে কথা ব'লতে পারিনি, তাই এই মুক্ত আকাশের নীচে—সীমাহীন সমুদ্রের সামনে সে কথা বলছি, আমি তোমায় ভালবাসি, রেণু।"

রেণুর সারা দেহ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত একবার কাঁপিয়া উঠিল। চক্ষুর জ্যোতি নিবিয়া গেল, মুখখানি রক্তবর্ণ ধারণ করিল।

কিন্তু পরক্ষণেই সেই বিদ্যুৎ বজ্রে রূপান্তরিত হইয়া চক্ষুতে অনলশিখা জ্বালাইয়া কণ্ঠের মধ্য দিয়া নামিয়া আসিল।

সে ক্রোধে ক্ষোভে কাঁপিতে কাঁপিতে ভগ্নকণ্ঠে কহিল,—"আমায় এমনভাবে অপমান ক'রতে তোমার একটুও বাধল না! তোমায় সরলভাবে মনে প্রাণে বিশ্বাস করি ব'লে তুমি এত বড় শাস্তিটা আজ অনায়াসে দিতে পারলে? উঃ, নিষ্ঠুর, তুমি বুঝবে না—বুঝবে না, কিসের এ জ্বালা। মা-গো।"... বাক্য শেষে সে আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না।...টলিতে টলিতে একরূপ ছুটিয়াই চলিয়া গেল।

মাণিকের মোহ মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া গেল। কণ্ঠ হইতে আর্ত্তধ্বনি স্খলিত হইয়া পড়িল, "রেণু।"

সেই ক্ষীণধ্বনি তরঙ্গায়িত সমুদ্র কল্লোলে মিশিয়া গেল—প্রতিধ্বনি বাজিল না।

রেণু আর ফিরিয়া আসিল না।

দারুণ বেদনায় হতসংজ্ঞের মত দুই করে বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া অবিশ্বাসী মাণিক ধীরে ধীরে বালুবেলায় বসিয়া পড়িল।

তখন প্রভাতের শান্ত সমুদ্র রৌদ্রদীপ্তি পাইয়া ক্রমশই অশান্ত হইয়া উঠিতেছিল।

(আগামীবারে সমাপ্য)

জীবন বেদ

শ্রীসত্যাংশু দাশগুপ্ত

বন্ধু আমার, চলো চলো রাজপথে
অনুভব করো নবীন জীবন
স্ফুরিত হতেছে চঞ্চল কণিকায়
তুমি আমি হেথা আছি।

চলো চলো হের তাহাদের চলা স্রোতে
শত তরঙ্গে আলোকের বিকীরণ
ঝলমলি উঠে জীবন্ত তুলিকায়
সত্যিই মোরা বাঁচি।

আদিমযুগের চারুকলা

ডোগ্লাস সি ফক্স

(১)

কথিত হইয়াছে যে, কালে কালে সকল ভাল জিনিষই আমেরিকায় আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহা অবশ্য অতিরঞ্জন-বিলাস, একটা আত্যন্তিক সংজ্ঞা-প্রসার,—তবু ইহাতে কিছুটা সত্য যে অন্তর্নিহিত নাই, এমনও নয়; বিশেষ করিয়া চারু-কলার ক্ষেত্র যদি ধরা যায়—তাহা আধুনিক, রেনেসাঁ, মধ্যযুগীয় অথবা প্রাচীনই হউক, কিম্বা আজ ১৯৩৭ সালে যাহাকে প্রাগৈতিহাসিক বলা হয়, সেই শিল্পচারুতাই হউক, আমেরিকার শিল্প-প্রদর্শনীতে কোন না কোন সময়ে সকল পর্য্যায়ের নিদর্শনই স্থান পাইবে। এই বৎসর আমেরিকাবাসী প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাইবে—আফ্রিকা এবং ইউরোপের প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানবের গঠিত চিত্রণ, খোদাইকার্য্যাদির ব্যাপক ও বিভিন্ন ধারার প্রতীক—যাহা অদ্যাবধি আমেরিকায় প্রবেশ লাভ করে নাই। কুড়ি হাজার বৎসরের প্রাচীন চিত্রাদি হইতে আরম্ভ করিয়া পাঁচ বৎসরের মাত্র পুরাতন পর্য্যন্ত নানা শিল্পকলা প্রতীক এইবার সর্ব্বপ্রথম নিউ-ইয়র্কের চারুকলা প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইবে।

বিংশ শতকের আরম্ভ হইতেই জার্ম্মান পর্য্যটক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষক লিও ফ্রোবেনিয়াস আফ্রিকার দিকে দিকে অভিযান পরিচালনা করিয়াছেন। তিনি ফ্রাঙ্কফোর্ট-অন্-মেন শহরস্থ "ফরস্যুংস-ইনষ্টিটিউট ফর্ কাল্চার মর্ফোলজি"র অধ্যক্ষ। ইঁহার আফ্রিকা অভিযানের একমাত্র উদ্দেশ্য ঐ মহাদেশের মৃত ও জীবিত সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণা পরিচালিত করা। উহার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার বহু সহকর্ম্মীকে ইউ-রোপের অপেক্ষাকৃত অধিকতর গুরুত্ব-সম্পন্ন প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন সম্বলিত স্থানসমূহেও প্রেরণ করিয়াছেন এই জন্য যে, ঐ সকল স্থানের প্রত্নতাত্ত্বিক বিবরণ সংগৃহীত হইলে আফ্রিকা এবং ইউরোপের পেলিওলিথিক (অর্থাৎ আদি প্রস্তর যুগের) সংস্কৃতির তুলনামূলক চর্চ্চা-গবেষণা সম্ভব হইবে। এই গবেষণা নিয়ন্ত্রণের সময় তিনি আদিম মানবের শিল্পকলা সম্বন্ধীয় কৃতিত্বের এক ধারাবাহিক চিত্র-সংগ্রহের 'গ্যালারি' গড়িয়া তুলিয়াছেন—এই জাতীয় চারুকলা-সংগ্রহ সমগ্র বিশ্বে আর কখনও কোনও স্থানে সূচিত হয় নাই। কোনও একটি জলাশয়ের পূর্ণতা-প্রাপ্তিতে যেমন নগণ্য একটা ক্ষুদ্র ব্যাঙেরও প্রয়োজন, ঠিক সেই ভাবেই আমি এই ইনষ্টিটিউটের অপেক্ষাকৃত আধুনিক প্রচেষ্টায় সাহায্য করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। সেই সময়ে আরব, লিবিয়া ও সাহারার মরু-অঞ্চল হইতে আবিষ্কৃত পর্ব্বত-গাত্র-চিত্রগুলির (rock pictures) মূল পর্য্যবেক্ষণ করিবার

দণ্ডায়মান বাইসন—উত্তর স্পেনের ফ্রাঙ্কো-ক্যাণ্টারিয়ানদিগের বহুবর্ণরঞ্জিত চিত্র—আলতামিরা সুড়ঙ্গ-গুহায় পর্ব্বত-বক্ষ-গাত্রে চিত্রিত

শিকারের দৃশ্য—পূর্ব্ব-স্পেনের লিভ্যাণ্ট জাতীয়দের চিত্র। জানোয়ারগুলির তীরবিদ্ধ হইবার অবস্থায় অপূর্ব্ব ভঙ্গী—যাহা এই চিত্রে প্রকটিত—ফ্রাঙ্কো-ক্যাণ্টাব্রিয়ানদের নিশ্চল একক মূর্ত্তি অঙ্কনের ইহা একেবারে বিপরীত ধারা

সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। ইহা ছাড়া ইউরোপে ফ্রাঙ্কো-ক্যান্টাব্রিয়ার সুড়ঙ্গ-গুহাগুলি, পূর্ব্ব-স্পেনের পর্ব্বতাবাস-সমূহ,—এই জাতীয় সুদূর অতীতের বহু চারুকলা প্রত্যক্ষ করিতে সুযোগ পাইয়াছি এবং ইহা অপেক্ষা আধুনিক উত্তর-পশ্চিম স্পেনের ব্রোঞ্জ-যুগের পর্ব্বত-গাত্রের খোদিত চিত্রসমূহও পর্য্যবেক্ষণ কালে আমি উপস্থিত ছিলাম।

ইউরোপের রাজধানীসমূহে এই চিত্র-সংগ্রহ হইতে আংশিকভাবে কতক প্রাচীন নিদর্শন সময়ে সময়ে প্রদর্শিত হইয়াছে। বিগত গ্রীষ্মকালে বিশিষ্ট বিশিষ্ট কতিপয় আমেরিকাবাসী ফ্রাঙ্কফোর্টে আগমন করেন তথাকার যতগুলি সম্ভব চিত্র দেখিবার জন্য (ফ্রাঙ্কফোর্টে অন্যূন ৩০০০ চিত্র রহিয়াছে) এবং উহা হইতে মনোনীত কতকগুলি চিত্র মার্কিনের বিশ্বমেলায় প্রদর্শনীরূপে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থার জন্য। ইঁহাদের ভিতর ছিলেন -নিউ ইয়র্কের মিউজিয়াম অফ মডার্ন আর্টের ডিরেক্টর মিঃ আলফ্রেড এইচ বার (জুনিয়র), মিঃ ও মিসিস্ জন ইয়্যাবট, মিঃ জন হে হুইট্নি এবং আর্টের পৃষ্ঠপোষক মিঃ ওয়াল্টার পি ক্রিসলার।

ত্ত্বের হিসাবে যাহাকে অন্তিম তুহিন যুগ (Ice Age) বলা হইয়া থাকে। এই অন্তিম তুহিন যুগ হইল পশ্চিম ইউরোপের চারটি তুহিন যুগের শেষ ধারা এবং ভূতাত্ত্বিকগণের মতে এই শেষ ধারা ৩০ হাজার বৎসর ব্যাপিয়া চলিয়াছিল। উহার সমাপ্তি ঘটিয়াছিল আজি হইতে অন্যূন পনর হাজার বৎসর অতীতে ত নিশ্চয়ই এমন কি বিশ হাজার বৎসর হওয়াও অসম্ভব নয়। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার জটিল খুঁটি-নাটির অবতারণা না করিয়াও ইহা সংক্ষেপে অনায়াসেই বলা যায় যে, ফ্রাঙ্কো-ক্যান্টাব্রিয়ান জাতিগুলি দক্ষিণ-ফ্রান্স ও উত্তর-স্পেনের পার্ব্বত্য প্রদেশে মৃত্তিকা নিম্নের সুড়ঙ্গ গুহায় বাস করিত। উহারা বল্লম সাহায্যে শিকার করিত এবং গুহা সকলের যে অংশ তাহারা পূজা-আরাধনার জন্য দেবস্থানে পরিণত করিয়াছিল, সেই সকল গুহা-গাত্রে নানাপ্রকার জীব-জন্তুর চিত্র খোদাই করিয়া রাখিত। অঙ্কিত জানোয়ারদের ভিতর যে তাহাদের পরিচিত জীবগুলিই স্থান পাইবে, ইহা ত স্বাভাবিক। গুহাগুলির প্রবেশমুখে এবং উহার সন্নিহিত গাত্রেই থাকিত উহাদের আবাস-গৃহগুলি, এজন্য অসংখ্য সুড়ঙ্গ পথ থাকিত

সাহারা-য়্যাটলাস মরু-অঞ্চলে আবিষ্কৃত চুণপাথরে খোদিত সীমারেখা চিত্র। শাবককে আক্রমণোদ্যত চিতাবাঘের কবল হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে হস্তিনীর সরোষে পাল্টা আক্রমণ—সামান্য কয়েকটি খোদিত রেখায় এই অভিব্যক্তি অতি সুন্দর ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে—যুগোপযোগী শিল্পধারায় অপূর্ব্ব ভাব-প্রকাশ বলিতে হইবে

এই প্রদর্শনী নিউ-ইয়র্কের মিউজিয়াম অফ মডার্ন আর্ট ভবনে খোলা হয় ২৭শে এপ্রিল। ইহার পর জুলাই মাস হইতে মার্কিনের প্রধান প্রধান শহরসমূহে প্রদর্শিত হইতে থাকে। পরে কানাডায়ও প্রদর্শিত হইবার কথা। ডি ফ্রেবেনিয়াস এই সময়ে উপস্থিত ছিলেন; সেই সময়ে নিউ-ইয়র্ক এবং পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে এই সকল চিত্র সম্বন্ধে তিনি কয়েকটি বক্তৃতা করেন। পরে আবার ধারাবাহিক বক্তৃতা করিবার ব্যবস্থাও হইয়াছিল।

এইবার চিত্রগুলির স্বরূপ সম্বন্ধে এবং যে সকল লোক উহার গঠনের কার্য্য করিয়াছিল তাহাদের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাউক। সমগ্র বিশ্বের যে প্রাচীনতম চিত্র তাহা হইল —যতদূর পর্য্যন্ত আমাদের জ্ঞান আজ প্রসারিত তাহাতে বলা যায়, ফরাসীদেশ ও স্পেনের পর্ব্বতগাত্র-খোদিত নানা মূর্ত্তি ঐ চিত্রগুলির ভিতর আবার দুইটি স্বতন্ত্র সংস্কৃতি লক্ষ্য করা যায়—ফ্রাঙ্কো-ক্যান্টাব্রিয়ান এবং দি লিভ্যান্ট—যাহার অভ্যুদয় হইয়াছিল, প্রত্নতাত্ত্বিকগণ যাহার নাম দিয়াছেন 'আপার পেলিওলিথিক' অর্থাৎ অন্তিম প্রস্তর-যুগ, সেই কালে; ইহাই ভূতত্ত্বের (diluvium) নির্দ্দেশে শেষ বিবর্ত্ত-স্তর অর্থাৎ ভূত-

ভূপৃষ্ঠে আরোহণ করিবার। কিন্তু কোনও উৎসব বা পূজাদির স্থান থাকিত গুহাগুলির শেষপ্রান্তে—সুড়ঙ্গ-পথ যেখানে প্রশস্ত কক্ষে সমাপ্তি লাভ করিয়াছে। এই কক্ষের দেওয়ালে ও ছাদে চুন-পাথরের উপর রেখা খোদাই করিয়া কিম্বা পাথর বেশী রকম দৃঢ় হইলে রং দ্বারা লেপিয়া জীব-জন্তুর চিত্ররূপ দেওয়া হইত—উহার ভিতর বাইসন, গুহা-ভালুক, বুনো-শূয়োর, ম্যামথ, হরিণ, গণ্ডার এবং বুনো-ঘোড়া সাধারণত দেখিতে পাওয়া যায়। একেবারে প্রাচীনতম চিত্রগুলি খোদিত রেখায় কুটাইয়া তোলা মোটামুটি একটা আভাষ মাত্র; ইহার পরে কালো রেখায় অঙ্কিত চিত্রের যুগের উদ্ভব; কিছুকাল পরে কালো রংয়ের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয় লাল রং; পরিশেষে দেখা দেয় হরেক রং-য়ের শোভায় ভূষিত চিত্র, ইহার ভিতর কিন্তু বাইসন জন্তুটির যেমন নানাবর্ণরঞ্জিত চিত্র প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায় এমন আর অন্য কোন জীবজন্তুর নয়।

লিভ্যাণ্ট জাতীয়েরা বাস করিত পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব স্পেনে; ইহারা কিন্তু ভূ-নিম্নের সুড়ঙ্গ-গুহায় বাস করিত না, বাস করিত পাহাড়ের গায়ের গুহাসমূহে। পাহাড়ের যে পার্শ্ব সোজা খাড়া এবং অতি দুর্গম, অধিকাংশ স্থলে সেই সকল

অংশেই উহারা গুহায় বাস করিত ; আবার অনেক সময় এমন উচ্চ পর্ব্বত-গাত্র বাছিয়া লইত, যেখান হইতে চারিদিকে বহুদূরে পর্য্যন্ত স্থান উহাদের নজরে পড়ে অথচ উহাদের আবাস বাহির হইতে কাহারও দৃষ্টিতে পড়ে না সহজে। ইহারা বর্শা-বল্লমের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া তীর-ধনু ব্যবহার করিত শিকার ব্যাপারে। একরঙা তীর-ধনুই সাধারণত তাহারা ব্যবহার করিত ; কিন্তু যখন এক দলের সহিত অন্য দলের যুদ্ধ উপস্থিত হইত, তখন শুধু আপন পক্ষীয় যোদ্ধা চিনিয়া লইবার জন্য শাদায় লালে রঞ্জিত করা হইত। এতদ্ব্যতীত সমবেত জনতার কোনও প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রেও একরঙা ধনুকে লালের ছোপ দেওয়া হইত স্বাতন্ত্র্য রক্ষার নিমিত্ত। ইহাদের রাখিয়া যাওয়া চিত্রে সাধারণত জীব-জন্তু স্থান পায় নাই—যদি বা কদাচিৎ জীব-জন্তু অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা কেবল শিকারের অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া এবং কিভাবে উহাকে হত্যা করা হইয়াছে কেবল তাহাই দেখাইবার জন্য। ফ্রাঙ্কো-ক্যান্টাব্রিয়ানদের অঙ্কনের মত বৃহৎ একক জীব-জন্তুর কোনও প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না ইহাদের চিত্রের ভিতর। ফ্রাঙ্কো-ক্যান্টাব্রিয়ানগণ একক নিশ্চল জন্তুই আঁকিয়াছে, একসঙ্গে কতকগুলিকে একচিত্রে কখনও তাহারা স্থান দেয় নাই, অথবা সেই একক জন্তুটির চিত্রেও কোন প্রকার চলা বা অঙ্গ-ভঙ্গীর ভাব দেওয়া হয় নাই। তুলনায় লিভ্যান্ট জাতীয়েরা আঁকিয়াছে অপেক্ষাকৃত অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি সচল মানব বা জানোয়ার একত্র ; জন্তুগুলি অধিকাংশ স্থলেই শিকারে নিহত হইবার মুহূর্ত্তের অবস্থানে চিত্রিত। মানব বা জানোয়ারগুলির চঞ্চল গতি, লম্ফ-ঝম্প, প্রভৃতির চিত্র যাহা লিভ্যান্ট জাতীয়েরা আঁকিত আকারে-প্রকারে তাহা উত্তর অঞ্চলবাসীদের নিশ্চল বৃহৎ জন্তু চিত্রের একেবারে বিপরীত। মোটামুটি সাধারণভাবে আমরা বলিতে পারি—ফ্রাঙ্কো-ক্যান্টাব্রিয়ানগণ অঙ্কন করিত নানা বর্ণরঞ্জিত জীব-জন্তুর প্রতিকৃতি আর লিভ্যান্ট জাতীয়েরা আঁকিত এক-রঙা সচল মানব-মূর্ত্তি।

এই দুই স্বতন্ত্র সংস্কৃতিসম্পন্ন জাতি—উত্তরে এবং দক্ষিণে পাশাপাশি বাস করিয়াছে হাজার হাজার বৎসর—অথচ একজাতি অন্য জাতীয়ের সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয় নাই সামান্য মাত্রও। এই কথা বর্ত্তমানের যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে সঠিক হৃদয়ঙ্গম করা শক্ত ব্যাপার—সুদূর অতীতের সেই পারিপার্শ্বিকের স্বরূপ নির্ণয় করা আমাদের নিকট সহজ নয় আদপেই ; অথচ মানব-সংস্কৃতির জন্ম ও ক্রমোৎকর্ষের ইতিহাস অনুসরণ করিলে এই প্রকার চরম রক্ষণশীলতার দৃষ্টান্ত একমাত্র এখানেই পাওয়া যাইবে, এমন নয় ; বরং পাওয়া যাইবে অগণিত ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকে। এই চিত্রগুলির বিচিত্রতা আরও সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত করিবার জন্য ইহাদের প্রকৃত পরিচয় উদ্‌ঘাটনের যুগ—সেই ১৮৮০ সাল ও তৎপরবর্ত্তী কয় বৎসরের বিশেষ আন্দোলনের দিকে নজর ফিরান যাউক। ১৮৮০ সালের কাছাকাছি সময়েই প্রাগৈতিহাসিক-তত্ত্ব-বিশারদ প্রথর প্রতিভাশালী ফরাসী পণ্ডিতদ্বয়—কার্ত্তালহাক ও রিভিয়েরে সর্ব্বপ্রথম প্রচার করেন যে, এই পর্ব্বত-গাত্রচিত্রগুলি তুহিন যুগের সৃষ্টি। উহার পূর্ব্বে একেবারে সমগ্র বিশ্বের ধারণা ছিল যে, এই চিত্রগুলি চাষা-ভূষাদের আঁকা। ঐ সময়ের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মাত্র উত্তর স্পেনের আলতামিরা গুহাগুলির একক পশু-চিত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। রংয়ের বাহার ও রুচির হিসাব হইতে তখন ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল ঐ অঞ্চলের মেষপালক ও অশিক্ষিত পটোদের দ্বারাই উহা চিত্রিত হইয়াছে।

কিন্তু ফরাসী পণ্ডিতদ্বয়ের বাণী একেবারে বাদ-বিতণ্ডার ঝঞ্ঝা উপস্থিত করিল। নব আবিষ্কারের ঘোষণামাত্র সমগ্র ইউরোপময় যে প্রতিবাদ ও আন্দোলনের সৃষ্টি হয়, তাহা আজ আমাদের ধারণা করাও সাধ্যাতীত। কারণ, প্রথমত আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বৈজ্ঞানিকগণও ঠিক ততটাই ভাবপ্রবণ, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে, ঠিক সেই পরিমাণই বিশ্বাসপ্রবণ বা গোঁড়া অবিশ্বাসী—যেমন অজ্ঞ জনসাধারণ ; বৈজ্ঞানিকগণও তেমনই ঈর্ষা ও অহঙ্কারের দাস, তেমনই অযৌক্তিক দৃঢ় প্রত্যয়ে অটল যেমন অপর দশজন হইয়া থাকেন। দ্বিতীয়ত ঠিক সেই সময়েই ডারউইনের মতবাদ শত সহস্র অন্তরায় কাটাইয়া বিপক্ষের সকল যুক্তিতর্ক পরাভূত করিয়া বিজয়ী হইয়াছে, এমন কি যে সকল সমাজ উহার বিরোধী ছিল সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, তাহারাও উহাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে এবং উহার প্রশংসায় উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছে। এখন আল্‌তামিরার চিত্রগুলি, বর্ত্তমানের ষ্ট্যাণ্ডার্ডেও অতিসূক্ষ্ম আর্টের প্রতীক এবং সৌন্দর্য্যজ্ঞানের এমন এক উন্নত স্তরের নির্দ্দেশ করে যাহা ডারউইনপন্থীদের নিকট উচ্চ সভ্যতার প্রভাবে সৃষ্ট বলিয়া নিশ্চিতরূপেই উপলব্ধি হয়। অথচ সেই কালে (১৮৮০ সাল ও তৎসমীপ) প্রস্তর যুগের মানবের যে জীবনধারা সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারণা সমগ্রদেশে বলবৎ, তাহার সহিত ডারউইনপন্থীরা কিছুতেই এই চিত্রের সংস্রব প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেছিল না। অন্য কথায় ইহাই দাঁড়ায় যে, আদিম-কাল হইতে মানবের বিবর্ত্তন যখন অতি ধীরবেগেই চলিয়াছে এবং প্রতিপদে অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষালাভ করিয়া ধাপের পর ধাপে উচ্চদিকে আরোহণ করিয়াছে এবং যেহেতু উনবিংশ শতকের শেষ পাদের ইউরোপীয় সভ্যতার অপূর্ব্ব অবস্থায় পৌঁছাইতে মানবের স্মরণাতীত দীর্ঘকাল পার হইয়া গিয়াছে—সুতরাং প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানবের শিল্প-ধারণা ও অন্যান্য শক্তি এনথ্রোপয়েড এপ্ (anthropoid ape) বা সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর মর্কট অপেক্ষা বেশী উচ্চ স্তরের হইবে—ইহা যুক্তি দ্বারা সমর্থন করা যায় না, এই বিশ্বাসেই ডারউইন-পন্থীরা দৃঢ়বদ্ধ থাকিতে বাধ্য হইয়াছে। কাজেই সহসা যদি কেহ আবিষ্কার করিয়া বসে যে, তুহিন যুগের সেই "মর্কটোপম বনমানুষ"ও উচ্চ চারুকলাবোধের বিকাশ প্রতিপন্ন করিয়াছে, প্রকৃত উচ্চ সংস্কৃতির উদ্ভব হইবার হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে—তাহা হইলে দৃঢ়ালম্বিতে নির্ভরশীল বৈজ্ঞানিকের নিকট তাহা একটা আলোড়নের আকারেই যে দেখা দিবে, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছু নাই।

ক্রমে ক্রমে আন্দোলনের তীব্রতা ক্ষীণ হইয়া আসিল। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ অবশেষে ঘোষণা করিলেন যে, এই তুহিন যুগের শিল্পকলা এক সময়ে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। অন্তিম তুহিন যুগের পরে বিগলন কালের (Melting Period) শেষাশেষি এই জাতি এবং তৎসহ ইহাদের চারুশিল্প নিশ্চিতরূপেই লোপ পাইয়া গিয়াছে। উহার কয়েক হাজার বৎসর পরে নবপ্রস্তর যুগের (Neolithic) সংস্কৃতির অভ্যুদয়ের যে শিল্পকলা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে ঐ প্রাচীন চারুশিল্পের লেশও খুঁজিয়া বাহির করা যায় না। যদি শিল্পটিই ধরাপৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইয়া থাকে, তবে সে সংস্কৃতির প্রভাবে উহার সৃষ্টি তাহারও বিলোপ হওয়া স্বাভাবিকভাবেই ধরিয়া লওয়া যায়।

(আগামীতে সমাপ্য)

চলার পথে

শ্রীশৈলেন গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ, বি-টি

পথে যেতে যেতে যদি পায়ে কাঁটা বেঁধে
চরণ-চিহ্ন রক্তের রঙে আঁকি
গুল্ম লতায় গতি তব যদি বাধে
ঘন অরণ্য তনু তব রাখে ঢাকি;
বিশ্বাস তুমি রেখ—
কাঁটার আগায় গোলাপেরে তুমি পাবে
চরণ-চিহ্নে লাগিবে স্বর্ণ রেণু,
ঘন অরণ্যে নন্দন বন মাঝে
পারিজাতমালা ঢেকে দেবে তব তনু;
বিশ্বাস রেখ তবে—
চলার পথেতে যেতেই যখন হবে।

পথ পাশে তব মুকুল ঝরিয়া গ্যাছে
বন মর্ম্মরে সুর কম্পন নেই
অবসাদ মাখা তব গতিটির কাছে
সুদূর পথের কোন বন্ধন নেই
মনে মনে রেখ আশা—
দূরের যে পথে তোমারে চলিতে হবে
সেই পথে নেই মিথ্যা মরুর মায়া,
নব বসন্ত মুকুলিত হবে যবে
সেই পথে পাবে পুষ্প তরুর ছায়া;
আশা রেখ মনোমাঝে—
পথে যেতে যদি নিরাশার সুর বাজে।

আঁধার পথেতে চলিয়াছ তুমি একা
নীরব নিশীথে কেহ নাই তব সাথে
ঘন নীরবতা বিরহ-বেদনা মাখা
চলিয়াছে তুমি সঙ্গীবিহীন পথে;
ভালবাসা তুমি পাবে
পথে যেতে কোন মৌন বিমনা সাঁঝে
চিরজনমের সাথীটির পাবে দেখা,
তব পাশে তারে দেখিবে নিরত কাজে
আঁধারের গায়ে লাগিবে তড়িৎ রেখা;
জেন' সাথীটিরে পাবে—
একা একা পথে চলিতে যখন হবে।

উপেক্ষিতা

(গল্প)

শ্রীবীরু চট্টোপাধ্যায়

বিয়ের পর এক বছর বুঝি দীপ্তি সুখে ঘর করিয়াছিল, কিন্তু আর তার কপালে সহিল না,—স্বামী অসিত পাগল হইয়া গেল। নিতান্ত আকস্মিক দুর্ঘটনা; সে কেন—বাড়ীর কেহই প্রথমে ঘটনাটা বিশ্বাস করিতে পারিল না। দীপ্তি ভয়ে বিবর্ণ হইয়া উঠিল।

যে প্রভাতে সকলে শুনিল অসিতের মাথা খারাপ হইয়াছে, তার আগের দিন পর্যন্ত সে সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল। কোন কিছু অস্বাভাবিক ছিল না তার ব্যবহারে। সে রাত্রের কথাও দীপ্তির স্পষ্ট মনে আছে। যেমন সে নিয়মিত পড়ে, তেমনি পড়িতেছিল; দীপ্তি তাকে এ সময় কোনদিনই বিরক্ত করিত না, সেদিনও করে নাই, তার এম-এ পরীক্ষা ক্রমেই নিকটতর হইতেছিল।

গতানুগতিকভাবে দীপ্তি আসিয়া বিছানার নিজের যায়গাটিতে শুইয়াছিল।

মাঝরাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইতেই সে অবাক্ হইয়া দেখিল, অসিত উঠিয়া ঘরময় পায়চারী করিতেছে আর কি যেন জোরে জোরেই আবৃত্তি করিতেছে। প্রথমে দীপ্তি কিছু বলিতে সাহস করে নাই, কিন্তু পায়চারী এবং আবৃত্তি অদ্ভুত হইতে অদ্ভুততর হওয়ায় সে উঠিয়া বসিল, কহিল, ও আবার কি রকম পড়া হচ্ছে, থিয়েটার করছ নাকি?

অসিত থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, ঘোলাটে চোখ নিয়া আগাইয়া আসিল দীপ্তির কাছে—কি বললে, থিয়েটার? জানো, সেক্‌সপীয়র কি বলেছেন, 'অল দি ওয়ার্লড্‌ ইজ্ এ ষ্টেজ'—

দীপ্তি বোঝে নাই, হাসিয়া কহিয়াছিল—'নাও, কে কি বলেছেন তা শুনে আর কাজ নেই। অনেক রাত্তির হয়েছে, আজকের মত দয়া করে ঘুমোও এসে।'

ঘুম! এত সকালেই, অসিত কি রকম অদ্ভুত ভাবে বলে—এখনো আমার অনেক কাজ—অনেক কাজ বাকী, আমায় এক্‌জামিন দিতে হবে, পাশ করতে হবে, সংসার করতে হবে, বৃদ্ধ হতে হবে, এত সকালেই ঘুম। একেবারে শেষ-ঘুম ঘুমোব যখন চুল হবে শণের মত শাদা।

দীপ্তি এবার যেন বিস্মিত হইল! একি যা তা বলিতেছে, পূর্ব্বে ত এরূপ ধরণের কোন কথাবার্ত্তাই অসিত বলে নাই; সে কহিল—এ সব কি যত অলক্ষুণে কথা বলছ তুমি? মাথাখারাপ হল নাকি তোমার?

মাথা খারাপ বল না, খবরদার। অসিত রক্ত চোখ করিয়া উঠিল, তোমার অসুবিধে হয় চলে যেতে পার বাপের বাড়ী, তাতে আমার এতটুকুও কষ্ট হবে না।

দীপ্তির কাছে কথাগুলি অবোধ্য শোনাইল। যে অসিত তাহাকে বাড়ীর সবার ঘোরতর অমতের বিরুদ্ধে একা জোর করিয়া এখানে রাখিয়াছে, সেই কিনা আজ আবার ঠিক উল্টা কথা বলিতেছে! দীপ্তি ঠিক কথাগুলি বিশ্বাস করিবে কিনা ভাবিতেছে, এমন সময় অসিত বলিয়া উঠিল—এক্‌স্‌-কিউজ্ মি, ক্ষমা কর দীপু। তুমি চলে যেওনা, প্লিয়—বাপের বাড়ী যেওনা, গেলে—আই মাষ্ট ডাই,—ঠিক মরে যাব। কি বলছিলে ঘুমোতে? এই ত আমি লক্ষ্মী ছেলে হয়ে শুয়ে পড়ছি। বলিয়া এক লাফে বিছানার উপর উঠিয়া লেপটা গায়ে টানিয়া দিল।

দীপ্তির তখন বুঝিতে সত্যই কষ্ট হইয়াছিল।

পরের দিন সকাল হইতে মাথা ক্রমে আরও খারাপ হইয়া গেল।

দীপ্তি দুঃখে আর ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। তার সমস্ত আশা-ভরসা, সুখ-শান্তি যে এমনভাবে নষ্ট হইবে ইহা ভাবিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। তার কোনদিকেই যে আর চাহিবার যায়গা রহিল না!

নেহাৎ নিজের সুন্দর চেহারার জোরেই সে এরূপ উপযুক্ত স্বামী আর ধনী শ্বশুরবাড়ী পাইয়াছিল। বাপ মা গরীব, বিবাহের সময় কি একটা তুচ্ছ দেনা-পাওনা নিয়া একটা গোলমাল হইয়াছিল, তারই জন্যে বিয়ের পর আজো তার বাপের বাড়ী যাইবার হুকুম নাই। নির্য্যাতন,—হ্যাঁ নির্য্যাতন তাকে অল্পবিস্তর সহিতে হইয়াছে বৈ কি! শাশুড়ী তাহাকে ভাল চোখে দেখিতে পারেন না, ননদ প্রতি কথায় বাপের দারিদ্র্যের খোঁচা দেয়। প্রথম প্রথম তার অসহ্য বোধ হইয়াছে, উত্তরও দু'একটা দিত, কিন্তু হিতে বিপরীত হইত তাতে। আজকাল সে কিছু বলে না, নীরবে সহিয়া যায় সমস্ত।

তার মত অভিমানী মেয়ের এ বাড়ীতে জীবন দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠিত যদি না অসিতের প্রাণভরা ভালবাসা সে পাইত। এর চেয়ে ভাল স্বামী দীপ্তি আকাঙ্ক্ষা করে নাই। এই পান্থপাদপের আশায়ই সে মরুভূমির উপর দিয়া দিন কাটাইতেছিল। একমাত্র অসিতই তার জীবনের, ভালর দিকটা দেখিতে পাইয়াছিল।

স্বামীর ভালবাসা পাইয়াও তাহাকে কম কথা শুনিতে হয় নাই! সে নাকি কুহকিনী, সে নাকি তাহাদের সোনার ছেলে অসিতকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছে—অর্থাৎ তাহারা চাহিয়াছিল, অসিতও যেন তাদের সঙ্গে সঙ্গে দীপ্তিকে নির্য্যাতন করিতে সাহায্য করে। কিন্তু অসিত অকৃতজ্ঞ (?) তা করিল না। উলটে বউএর পক্ষ নিয়ে আবার নির্লজ্জের মত আসে মা-বোনের বিরুদ্ধে কথা বলিতে! বোন আর মা নাকি তার এ ব্যবহারে থ' বনিয়া গিয়াছেন!. ইহা ঐ এক মায়াবিনী ছাড়া আর যে কারও কাজ নহে, এই সম্বন্ধেও তারা নিঃসন্দেহ। তবু নির্য্যাতিত দীপ্তির এইটুকু সান্ত্বনা ছিল যে, সে স্বামীর ভালবাসা পাইয়াছে!

অসিত পাগল হইল। দীপ্তির পৃথিবী অন্ধকার। সে চারিদিকে আলো দেখিতে পাইল না। তার আর বাকী কি রহিল? কার ভরসায় আর সে বাঁচিয়া থাকিবে?

—দুই—

পাড়ার পিসী-মাসীরা আসিয়া উপস্থিত হয় সবারই

গালে হাত—কি করে এমন হল গা? আহা বাছারে—ইত্যাদি নানারূপে মন্তব্যে বাড়ী ভরিয়া যায়।

দীপ্তি ভয়ে ভয়ে কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকে, কান থাকে দাওয়ার দিকে। শুনতে পায়, ননদ বলছেন—এ রকম যে হবে তা আমি আগেই জানি, ও ডাইনির হাতে যখন পড়েছে, তখন দাদার প্রাণটুকু থাকে তবেই হয়। ননদের গলা কান্নায়ই বোধ হয় গাঢ় হইয়া ওঠে

পাড়ার পিসী, মাসীরা কি উত্তর দেয় তা দীপ্তির কানে যায় না। সে রান্নাঘরের কাজে সমস্ত মন নিয়োগ করিবার বৃথা চেষ্টা করে

হঠাৎ কানে আসে, শাশুড়ীর গলা—কি মাটি খেয়ে যে ঐ ছোটলোকদের মেয়ে ঘরে এনেছিলুম, জান সোনাখুড়ী সেই থেকেই বাছা আমার কি রকম হয়ে গেল। আগে যে অসিতের মা-ছাড়া বাক্য ছিল না, সে কিনা পেটের ছেলে হয়ে আসে আমার উপর খবরদারী করতে। তখনই বুঝেলাম সোনাখুড়ী, আমার সুখের সংসারে আগুন লেগেছে। বলিয়া তিনি রাগে ফুলিতে লাগিলেন।

শুধু শুধুই কি এ রকম মাথা খারাপ হতে পারে, সোনাখুড়ী বিজ্ঞের মত কহিলেন—এ কি একটা কাজের কথা; এ অঞ্চলে প্রবাদ আছে, নারদের পরিবর্ত্তে ইহার নাম নিলে নাকি যে কোন মুহূর্ত্তে, যে কোন যায়গায় ঝগড়া বাধিতে পারে।

আমিও তাই বলছিলাম, পাশের বাড়ীর জন্মবিধবা ঠাকরুণ ধুয়া ধরিলেন—কারণ কিছু না থাকলে যে এমন একটা আচম্বিত ঘটনা ঘটে, এ ত—'

মাঝখান হইতে ননদের কি যেন মনে পড়িয়া যায়—আচ্ছা মা দাদা শ্বশুরবাড়ী যেন কবে গেছল?

শ্বশুরবাড়ী গেছল! সোনাখুড়ী যেন চমকাইলেন বেশী।

এই ত ও মাসের আটুই—শাশুড়ী বলিলেন। চমকালে যে সোনাখুড়ী?

ওমা বলিস কি, চমকাব না, সোনাখুড়ীর চোখ কপালের শেষাংশে উঠিয়া আসিল—আমিও বলিহারি যাই তোর সাহসকে? বলি এরকম যখন সাপে-নেউলে তোদের সঙ্গে, তখন তুই কি ব'লে দুধের বাছাকে ঐ শত্রুপুরীতে পাঠাতে পারলি? গাল হইতে হাত তাহার আর নামিল না'

পরের কথাগুলি কহিতে লাগিল জন্মবিধবা ঠাকরুণ,—ওলো তোর চৌদ্দ পুরুষের ভাগ্যি যে, তুই ছেলেকে ফিরে পেয়েছিস। ওরা কি না করতে পারে। আমার শ্বশুর বাড়ীর পাশের গাঁয়ে একজনকে ভেড়া ক'রে রেখে ছিল—শুনলে পেত্যয় হবে না—এ একেবারে চোখে দেখা, শেষ পর্য্যন্ত অমন সোনার চরিত্তির ছেলে মা বাপের মুখে লাথি মেরে, শাশুড়ীর পায়ের তলায় পড়ে রইল।

—বল কি পিসিমা! ননদ প্রায় আঁৎকাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—কি সর্ব্বনেশে কথা গো—

খানিকক্ষণ শাশুড়ীর বোধ হয় বাকস্ফূর্ত্তি হইল না।

কিন্তু যখন হইল, তাহা দুঃসহ, অশ্রাব্য। দীপ্তি রান্নাঘরে দাঁতে দাঁত চাপিয়া উনানে কয়লা দিতে লাগিল।

অসিত তখন ঘরের মধ্যে চেঁচাইয়া গান গাহিতেছে—মাঝে মাঝে "বহুৎ আচ্ছা" বলিয়া নিজেই নিজের তারিফ করিতেছে। হাসির শব্দও মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। দীপ্তির চোখে রান্নাঘর ঝাপসা হইয়া ওঠে।

অসিত ঘর হইতে দাওয়ায় বাহির হইয়া আসিল। এত লোক দেখিয়া সে অবাক, ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিয়া উঠিল—কিসের মিটিং হচ্ছে? রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্স, না ভার্সাই প্যাক্ট? শীঘ্র কহ, নতুবা হইবে মৃত্যু মম হাতে, আজি সবাকার।

সোনাখুড়ী ও পিসীমা ভয় পাইলেও মুখে মমতায় গলান হাসি বাহির করিয়া কহিলেন,—এস বাবা, বস, তোমার কথাই হচ্ছিল মাণিক!

—আমার কথা! কিবা প্রয়োজনে, অসিত ভ্রূ কোঁচকাইয়া বলিল—কে তুমি নারী?

—তুমি কি বলছ দাদা, ননদ সংশোধন করিয়া কহিল—এ যে আমাদের সোনাদি'।

শাশুড়ী ফিস্ ফিস্ করিয়া জন্মবিধবার কানের কাছে কহিল,—দেখছ ত দিদি, বাছা আমার কি হয়ে গেছে। পরে অসিতের দিকে চাহিয়া কহিলেন, লক্ষ্মী বাপ আমার, একটু মাথা ঠাণ্ডা ক'রে ব'স ত বাবা। কি বলছেন এঁরা শোন একবার।

—নো বিলিফ্ ইন্ আইড্‌ল্ গসিপস্—অসিত বলিয়া ওঠে,—নো টেষ্ট, ইন পপুলার—

—ওসব কি বলছ মাণিক, সোনাখুড়ী হাত ধরিয়া অসিতকে বসাইতে চেষ্টা করেন।

দীপ্তির কড়ার উপর ভাজা পুড়িয়া ওঠে, কানে আসে শাশুড়ীর আর সোনাখুড়ীর জেরা,—অসিত শ্বশুরবাড়ী গিয়ে কি খেয়েছিল; কোন রকমের শিকড়-বাকড় খাইয়েছিল কিনা। তুক্‌তাক্ বশীকরণের কোন কিছুর আঁচ পাইয়াছে কিনা।

অসিতের কোন উত্তর শোনা যায় না। হঠাৎ সে বলিয়া ওঠে—দীপু কোথায়?

—সে রাঁধছে। ননদ বলে।

—কেন? সে রোজ রোজ রাঁধবে কেন? অসিত রাগিয়া যায়—তুই কি করিস, এ্যাঁ, তুই রাঁধতে পারিস না?

শুনিয়া ত সবার চক্ষু ছানাবড়া হইল। অসিত দীপু দীপু করিতে করিতে একপ্রকার ছুটিয়াই রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

—দেখলে দিদি, আমায় যে বিশ্বাস কর না—শাশুড়ীর কণ্ঠ শোনা যায় এই দেখ, ঐ ডাইনীর কাজ নয় এগুলো? —নাহ'লে মাথার যার ঠিক নেই, সে কি ক'রে—আঁচল ফুঁপাইয়া উঠিলেন।

জন্মবিধবা পিসী দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন—এমন সর্ব্বনাশও মানুষে মানুষের করে।

অসিত রান্নাঘরে আসিতেই দীপ্তি কাঁদিয়া উঠিল।

চাপাগলায় কহিল,—তুমি এসব কি আরম্ভ করেছ। আমায় কি বাঁচতে দেবে না?

—তুমি রাঁধতে পারবে না—অসিত আদেশ করল। তোমার হাতের রান্না আমার বিষের মত লাগে—বলিয়া দীপ্তির হাত ধরিয়া বাহিরে আনিবার জন্য টানাটানি আরম্ভ করিল—

—ওগো ছেড়ে দাও, তোমার পায়ে পড়ি, ওঁরা কি ভাববেন। কি কলঙ্কের কথা—

অসিত গাহিয়া উঠিল,—

'বঁধু তোমার লাগিয়া
কলঙ্কের হার;
গলায় পরিতে সুখ।'

বলিয়া হঠাৎ দীপ্তিকে ছাড়িয়া দিয়া বাহির হইয়া আসিল।

(তিন)

এমনি করিয়া দিন কাটিতে থাকে। উৎপাত ক্রমেই বাড়িয়া যায়। অসিত স্নান করিতে গেলে দুই ঘণ্টার আগে তা শেষ হয় না। আবার এক সপ্তাহ ধরিয়া হয়ত স্নানই করে না। যে বই তাহার প্রাণ ছিল, সেগুলি দেখিলেই এখন সে খিঁচাইয়া ওঠে, লাথি মারিয়া দূরে ফেলিয়া দেয়। কখন-বা দীপ্তিকে দেখিলে জ্বলিয়া উঠে। সারারাত্রি ঘুম তাহার কমই হয়, নিজেও ঘুমায় না সঙ্গে সঙ্গে দীপ্তিকে পর্যন্ত ঘুমাইতে দেয় না। দীপ্তির রাত্রি জাগিয়া আর নানাপ্রকার দুশ্চিন্তায় দিন দিনই শরীর কাহিল হইতেছে।

কোন কিছু বুঝাইতে গেলে কি সব আবোল-তাবোল ইংরেজীতে বলিতে থাকে, দীপ্তি তার একবর্ণও বোঝে না। ওদিকে শাশুড়ী ননদের কথার তীক্ষ্ণতা এমন বাড়িয়া গিয়াছে যে, কোন্ মুহূর্তে যে সে আত্মহত্যা করে তার ঠিক নাই।

রাত্রে হয়ত জানালার কাছে দাঁড়াইয়া অসিত ঘণ্টার পর ঘণ্টা আবৃত্তি করিয়া যাইতেছে। কতক্ষণ বসিয়া থাকা যায়, রাত্রি দুইটা বাজিয়া যায়। দীপ্তি এগিয়ে হাতটি ধ'রে, মিনতি ক'রে বলে,—এখন শোবে চল লক্ষ্মীটি, এমনি ক'রে শরীরটা যে কি হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ কি? চল, শোবে চল।

—আমায় কোন কথা বলতে এস না ব'লে দিচ্ছি। অসিত বলে, আমার যা ইচ্ছে তাই করব

—তুমি কেন এমন হলে, দীপ্তি বলে—আগে তো আমার কথা শুনতে, আমায় ভালবাসতে, ওগো শোন—

—let the dead past bury its dead. অসিত বলিয়া যায় সে সব দিন চলে গেছে, 'যৌবনের উত্তপ্ত উচ্ছ্বাস, থাকে নাকো বার মাস'। যাও আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যাও।

দীপ্তি আর কি করিতে পারে। কেবল কাঁদিতে ইচ্ছা করে, তবু বলে, এরকম করলে দেখ ঠিক আমি একদিন ম'রে যাব। আমার কষ্ট কি তুমি দেখতে পাও না?

অসিত কথায় কান দেয় না। চুপ করে আকাশের দিকে চাহিয়া থাকে। কি ভাবে সে-ই জানে, তারপর পায়চারী করিতে থাকে ঘরময়। দীপ্তি হতাশ হইয়া বিছানায় শুইয়া পড়ে, দেহে তার শক্তি নাই, ঘুমে চোখ বন্ধ হইয়া আসিতেছে।

কতক্ষণ কেটে যায় এইভাবে। এক সময় হয়ত অসিত আসিয়া বিছানায় শুইয়া পড়ে। দীপ্তিকে ঠেলিয়া ঘুম ভাঙায়, বলে,—রাগ করলে রাণী? দীপু শুনছ। দীপ্তির অভিমানে আর মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না। বুকের কান্না ঠেলিয়া উঠিতে চায়, বলে—কেন জ্বালাতন করছ। তুমি তো আমায় ভালবাস না, আমি হয়েছি তোমার দু' চোখের বিষ।

—বিষ! হো হো করিয়া অসিত এমন জোরে হাসিয়া ওঠে যে, দীপ্তিকে তার মুখ হাত দিয়া চাপিয়া ধরিতে হয়। অসিত সেই হাতখানা বুকের উপর টানিয়া নেয়, অনর্গল বলিতে থাকে—Doubt thou the sun doth move......... বুঝলে But never doubt I love.

দীপ্তি নিজে ছাড়াইয়া নিবার চেষ্টা করে না। স্বামীর কোলের উপর শুইয়া শুনিয়া যায় তার অশেষ পাগলামি। তারপর এক সময় দেখে সকাল হইয়া গিয়াছে, অসিত ঘরে নাই। ধড়ফড় করিয়া সে উঠিয়া পড়ে। তার দৈনন্দিন বিরক্তিকর, অসহনীয় কাজের জন্য প্রস্তুত হইয়া ওঠে।

* * *

অত্যধিক মানসিক দুশ্চিন্তা আর রাত্রি জাগরণেই বুঝি শরীর ভাঙিয়া পড়িল, এই অবস্থায়ই কয়েকদিন কাজ করিয়াছিল কিন্তু আর পারিল না, শয্যা নিতে হইলই। অসম্ভব গা ব্যথা আর জ্বর। দীপ্তি অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া রহিল। পথ্য দিতে কেহই আসিল না। কেউ না কি তার কেনা বাঁদী নয়। ধর্ম্মই না কি ডাইনীকে হাতে হাতে ফল দেখাইয়াছে। ওর না মৃত্যু হইলে এ সংসারের সুখ-শান্তি ফিরিয়া আসা দুষ্কর।

চিকিৎসাপত্রে কোন ফল হয় নাই। অসিতের মাথা পূর্ব্ববৎই আছে। নানাবিধ মাদুলী আর সদুপদেশেও কোন ফল হয় নাই।

ইতিমধ্যে দীপ্তির বাবা আসিয়াছিলেন উহাদের এরূপ অবস্থা শুনিয়া দেখিতে। ভদ্রলোককে শুধু মারিতেই বাকী ছিল, আর সব কিছুই তাহারা মায়ে-ঝিয়ে করিয়াছে। দীপ্তিকে দেখা পর্যন্ত করিতে দেয় নাই। ভদ্রলোক চোখের জল ফেলিয়া অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে ফিরিয়া যাইতেছিলেন। অসিত অকস্মাৎ কোথা হইতে আসিয়া পায়ের ধুলা লইয়া তাঁহাকে ঘরে আনিয়া বসাইল। মা বোনের মুখ নিমেষে কালো হইয়া উঠিল।

তবু সম্পূর্ণ হাল তাহারা ছাড়ে নাই। পুত্রের মঙ্গল কামনায় তিনি সর্ব্বদাই পুত্রবধূর অমঙ্গল চিন্তা করিয়াছেন। এতদিনে বুঝি তাহাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতে চলিল। অসিতকে অনুনয় বহু করিয়াছে ছোট বোন। মা বুঝাইয়াছেন যে, তাহার সর্ব্বনাশের জন্য শ্বশুর বাড়ীর উহারা বদ্ধপরিকর। ঐ বউ যাহাকে সে মিত্র মনে করে, সে কিন্তু পরম শত্রু।

কিন্তু খারাপ মাথাতেও বোধ হয় এ হিতোপদেশ(?) তাহার ভাল লাগে নাই। সে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছে। সমস্ত দিন এইভাবে একই কথা শুনিতে শুনিতে তার মাথা ঠাণ্ডা হওয়ার পরিবর্ত্তে ক্রমে আরও গরম হইয়া উঠিতে লাগিল।

আজকাল তার বাহ্যজ্ঞান একরকম শূন্যে বলিলেও ভুল হয় না।

দীপ্তি বিছানায় পড়িয়া জ্বরে গোঙাইতেছিল। দেহেতে আসিয়াছে মরুর উত্তপ্ততা। মাথায় কে যেন হাতুড়ী মারিতেছে। বুকের ভেতরটা যে কি রকম জ্বলিতেছে। অসহ্য! ছট্‌ফট্‌ করাই তার সার হইল—তাহাকে দেখিবার কেহ নাই এ বাড়ীতে। সে পরিত্যক্তা।

টেবিলের উপর বসিয়া অসিত পেন্সিল দিয়া দেওয়ালে কি লিখিতেছে—আর বিড় বিড় করিয়া কি কহিতেছে, ভগবানই জানেন।

দীপ্তির পেটে কিছু পড়ে নাই, সে চাহিয়াছিল অপলক-দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে। সমস্ত শরীরে তার এক ফোঁটাও সমর্থ্য নাই—সমস্তই কে যেন নিঙড়াইয়া লইয়াছে। চোখ দুটি দিয়া অত্যধিক জ্বরেই বোধ হয় জল গড়াইয়া পড়িতেছিল। ক্ষীণকণ্ঠে সে ডাকিল,—ওগো শুনছ?

কথা অসিতের কানে গেল না।

—শুনছ, দীপ্তি গলায় একটু জোর দিল—একবার আমার কাছে এস না।

অসিত মুখ তুলিয়া চাহিল, কিন্তু কিছু কহিল না।

—একবার কাছে এসে ব'স, মিনতি করিয়া দীপ্তি বলিল, এস; তুমি আমার তো একটুও খোঁজ নিলে না।

অসিত কি ভাবিল, আবার দেওয়ালে লেখা আরম্ভ করিল।

—ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, একবার কাছে এস। দেখে যাও, জ্বরে আমি ম'রে যাচ্ছি। দীপ্তি কাঁদিতে লাগিল—আমি আর বাঁচব না। শুনছ, আমি ম'রে গেলে তোমার কি একটুও কষ্ট হবে না।

—একটুও না—এবার অসিত কথা বলিল—নট্‌ এ বিট্‌। তুমি ডাইনী।

—তুমি আমায় এমন কথা বলতে পারলে—দীপ্তির এত দুঃখেও হাসি পায়—হা-রে অদৃষ্ট, তুমিও তাই ভাব! আর কিছু সে কহিল না—বালিশে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল।

কার ঠাণ্ডা হাত কপালে ঠেকিতেই সে চাহিয়া দেখিল অসিত। আনন্দে তার বুক দুলিয়া উঠিল, আস্তে সে অসিতের হাতটি লইয়া গালের উপর চাপিয়া ধরিল। কিছু বলিতে পারিল না। চোখ তেমনি বুজিয়াই রহিল।

অসিত বুকের কাছে বসিয়া পড়িল। দীপ্তির চুলের ভেতর আঙুল চালাইতে লাগিল অতি স্নেহে। দীপ্তি বিশ্বাস করিতে পারিল না,—এ কি সে স্বপ্ন দেখিতেছে নাকি? এ রকম ব্যবহার অপ্রকৃতস্থতার মধ্যে তো একদিনও করে নাই। বিশ্বাস হইতেছে না বলিয়াই সে চোখ খুলিতে সাহস করিল না।

—দীপু! এমন কোমল ডাক সে বহুদিন শোনে নাই। চোখ বুজিয়া সে আর থাকিতে পারিল না। চাহিয়া দেখে অসিতের দুই গাল বাহিয়া জল গড়াইতেছে।

—তুমি কাঁদছ কেন? দীপ্তি রুদ্ধকণ্ঠে কহিয়া উঠিল—ছি পুরুষ মানুষ না তুমি? আমি মরব না ভয় নেই। এ অভাগীর মরণ নেই জেন।

অসিত কিছু বলিল না। তেমনি চুপ করিয়া রহিল।

—আমি এমনি বলেছিলুম—দীপ্তি কহিল—আমি জানি তুমি আমায় ভালবাস। বলিয়া সে স্বামীর চোখ হাত দিয়া মুছাইয়া দিল।

তবু অসিত কিছু কহিল না। নীচু হইয়া দীপ্তির কপালে চুম্বন করিল। হাত দুইটি তাহার দীপ্তির চুল হইতে গালের উপর দিয়া গলার কাছে নামিয়া আসিল।

খানিকক্ষণ কেহই কোন কথা কহিল না।

—তুমি একটু ভাল হয়ে চল—দীপ্তিই আরম্ভ করিল—আমি যে আর ওদের কথা সইতে পারি না। আচ্ছা তুমিও কি ওদের মতো আমাকে সন্দেহ কর না কি? চুপ করে রইলে কেন বল না গো।

অসিত কথাও কহিল না, নড়িলও না। দীপ্তিও আর কিছু কহিল না—যাক মাথা যখন একটু শান্ত হইয়াছে তখন আর বকাইয়া দরকার নাই। তাছাড়া উত্তেজনায় নিজেরও মাথা ধরা বাড়িয়া গেল। মনে হইতে লাগিল কে যেন মাথায় হাতুড়ী পিটিতেছে। সে আস্তে চোখ বুজিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিল।

অসিতের কিন্তু ঘুম আসে নাই; পাশে দীপ্তির দিকে একবার অপলক দৃষ্টিতে চাহিল। সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সে সৌন্দর্য্য আর নাই—গালের হাড় জাগিয়া উঠিয়াছে—সোনার মত রঙ যেন মড়ার মত ফ্যাকাশে হইয়া গেছে। একান্ত নির্ভরতায় ডান হাতখানি অসিতের বুকের উপর পড়িয়া রহিয়াছে। চুলগুলি কপাল ও গালের উপর এলোমেলোভাবে ছড়ান।

অসিতের মাথায় আজ যেন কি এক উদ্ভট চিন্তার উদয় হইয়াছে। চোখ তার অপলক; সত্যই কি এ মুখের অন্তরালে 'ডাইনী' লুক্কায়িত? অসিত ঠিক মত ভাবিতে পারিল না—দৃষ্টি তাহার একবার ঘোলাটে হইয়া উঠিল। পরক্ষণেই সে বিছানা হইতে নামিয়া টেবিলটার কাছে গেল—টেবিল ল্যাম্পটাকে একটু 'ডিম্‌' করিয়া ঘরময় পায়চারী করিতে লাগিল।

মনে কেবল ডাইনী—ডাইনী এই কথাটাই ঘুরিতে লাগিল। মা আর বোনের কথা মনে পড়িল। তৎক্ষণাৎ সে থমকিয়া দাঁড়াইল—হাতের আঙুলগুলি কঠিন হইয়া উঠিল। না, আজই শেষ, এই মুহূর্ত্তে শেষ করিয়া দেওয়া যাক্‌। দুই হাত বজ্র কঠিন করিয়া সে দীপ্তির ঘুমন্ত দেহের দিকে আগাইয়া আসিল, বেশীক্ষণের কাজ নয়; গলার দিকে চাহিল, বুকের হাড় স্পষ্ট দেখা যায়, ক্ষীণ দুর্ব্বল দেহ, এক সেকেণ্ডেই শেষ হইয়া যাইবে। চোখ তার জ্বলিতে লাগিল বাঘের মত।

মৃদু আলো আসিয়া দীপ্তির মুখের ডান অংশে পড়িয়াছে—সমস্ত মুখটিই যেন বিষাদে পূর্ণ। শোবার ভঙ্গিটিও বড় অসহায়।

অসিত আস্তে হাত দুটি দীপ্তির গলার দুই পাশে দিল—মুহূর্ত্তে একটি আঙুলের চাপেই তার মৃদু নিশ্বাস বন্ধ

(শেষাংশ ৪৯৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

হত্যার সন্ধানে রসায়ন

শ্রীসমীরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অপরাধ উদ্‌ঘাটনের সংগ্রামে লিপ্ত সরকারী তদন্ত-কারক ও ভেষজ-পরীক্ষকদিগের গুরুত্বপূর্ণ একটি অস্ত্র হইল রসায়ন শাস্ত্র। পরিমাণগত এবং গুণাগুণ-গত উভয় প্রকার রাসায়নিক বিশ্লেষণ বিশেষভাবেই সহায়ক হয়, যখন নির্দ্ধারণ করিবার প্রয়াস চলে যে, কোনও দুর্ঘটনা, সঙ্ঘাত প্রভৃতি ও তজ্জনিত মৃত্যু স্বাভাবিক, কিম্বা হত্যার সহিত সংশ্লিষ্ট, অথবা আত্মহত্যারই পরিণাম। শুধু অপরাধ নির্দ্দেশ অর্থাৎ দুর্ঘটনা বা হত্যার স্বরূপ নির্ণয় মাত্র সমাধাই ঐ প্রকার বিশ্লেষণ দ্বারা হয় না, অধিকন্তু উহার ফলে অপরাধীকে সন্ধান করিয়া সনাক্ত করাও সম্ভব হয়।

রাসায়নিক উপায় সকলের ভিতর আবার সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বসম্পন্নের অন্যতম হইল সুরাসার বিশ্লেষণ, যে সকল ক্ষেত্রে মারাত্মক দুর্ঘটনা এবং অস্বাভাবিক বা সঙ্ঘাতজনিত অপমৃত্যু সংঘটিত হইয়াছে। কোনও মৃতদেহে প্রাপ্ত সুরাসার-উপাদান এবং ব্যক্তিটির উপর ঐ উপাদানের অনুপাতে মাদকতা-ক্রিয়া—এই দুইয়ের ভিতর যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে, ইহা বহু সাক্ষ্য-প্রমাণদ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রক্তে যদি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সুরাসার বিদ্যমান বলিয়া রাসায়নিক পরীক্ষায় আবিষ্কৃত হয়, তাহা হইলে উহার ফলে মাদকতার সৃষ্টি নিশ্চতই আরোপ করা যায়—ব্যক্তিটি অভ্যাস-গত মদ্যপায়ী হউক কি না হউক তাহাতে কিছু যায় আসে না।

মৃতব্যক্তির দেহে কি পরিমাণ মাদকতার ক্রিয়া চলিতে-ছিল তাহার মৃত্যু-মুহূর্ত্তে তাহার সঠিক মাত্রা জানিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালী হইল মৃতের রক্তে বা মস্তিষ্কে সঞ্চিত সুরাসার উপাদানের বিশ্লেষণ। এই বিশ্লেষণ প্রণালী এতই সরল-সহজ এবং উহার ফলাফল এতই গুরুত্ববিশিষ্ট যে, প্রায় সকল বড় শহরেই বাঁধাধরা নিয়মের মত এই বিশ্লেষণ সর্ব্বাগ্রে সম্পাদিত হয়—অবশ্য যে সকল স্থলে স্বাভাবিক মৃত্যু নয় বলিয়াই সন্দেহ হয়।

ইহার পর গুরুত্বে দ্বিতীয় হইল,—রক্তে কার্ব্বন মনোক্‌-সাইড্‌ রহিয়াছে কি না এবং থাকিলে কি পরিমাণে বিদ্যমান তাহা নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারণের জন্য রাসায়নিক বিশ্লেষণ। এই বিশেষ বিশ্লেষণের হেতুর উদ্ভব তিনটি বিভিন্ন অনু-সন্ধান-ধারার পথ প্রশস্ত করণে।

প্রথম—ইহার ব্যবহার হয় যে ক্ষেত্রে মোটর গাড়ীর দুর্ঘটনার ফলে মৃত্যু ঘটিয়াছে তাহার সূক্ষ্ম অনুসন্ধানকালে। রক্তে কার্ব্বন মনোক্‌সাইডের প্রকৃতি ও পরিমাণের সহিত দুর্ঘটনায় আপতিত ব্যক্তির উপসর্গের তুলনামূলক তালিকা এই কারণে বহু গবেষণা ও অনুসন্ধানে প্রস্তুত হইয়াছে। সুতরাং অপেক্ষাকৃত অজটিল পরীক্ষাদ্বারা সামান্য কয়েক ঘন-সেণ্টিমিটার মাত্র রক্ত হইতেই আভাস পাওয়া যায় প্রকৃতই কার্ব্বন মনোক্‌সাইড উহাতে রহিয়াছে কি না এবং সেই ফলাফল হইতে দুর্ঘটনায় নিপতিত ব্যক্তির মৃত্যু কার্ব্বন মনোক্‌সাইড বিষ-ক্রিয়ায় সাধিত হইয়াছে কি না ঠাওরাইয়া লইতে বেগ পাইতে হয় না।

দ্বিতীয়—এই বিশেষ বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় যে ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির গৃহে গ্যাস্‌ সাহায্যে আলোক দানের ব্যবস্থা থাকে, ইহার অনুসন্ধানেও এই কথা সর্ব্বাগ্রে নির্দ্ধারণ করা নিতান্ত দরকার যে, রক্তে কার্ব্বন মনোক্‌সাইডের অস্তিত্ব পাওয়া যায় কি না। গ্যাস্‌-সাহায্যে আলোক-ব্যবস্থা নানা-প্রকারেই আশঙ্কাকর, কারণ পাইপ ফাটিয়া বা অন্যপ্রকারে চুয়াইয়া বাহির হইয়া উহা প্রাণ বিনাশ করিতে পারে; বস্তুত অনেক ক্ষেত্রে গ্যাস্‌ পাইপ রুদ্ধ ঘরে খুলিয়া বা নাকের কাছে ধরিয়া আত্মহত্যা করিতে বহুতর ক্ষেত্রে জানা গিয়াছে। কোন কোন সময় মৃত্যুর পরবর্ত্তী পারিপার্শ্বিক একটা অনিশ্চিত সিদ্ধান্তের মধ্যে টানিয়া আনিতে পারে অথবা অদৃষ্টপূর্ব্ব একটা অদ্ভুত পরিস্থিতির উদ্ভবও করিতে পারে, যাহা হইতে শুধু মৃতদেহের সংস্থান বা গঠনগত বিকার বা অবিকার দ্বারা কোনও মীমাংসাই সম্ভব নয়। এই [illegible] [illegible] কোনও অনিশ্চিততার স্থলেই কার্ব্বন মনোক্‌সাইডের অস্তিত্বের অগোণে বিশ্লেষণ করা নিতান্ত প্রয়োজন।

তৃতীয় প্রকার—যে অনুসন্ধান-ধারার জন্য রক্তের কার্ব্বন মনোক্‌সাইড্‌ সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া দরকার, তাহা হইল যে সকল স্থলে অগ্নিকাণ্ডের ফলে মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। যেহেতু অগ্নিকাণ্ডের সময়ে বিভিন্ন প্রকারের জৈব পদার্থের জ্বলনে যে গ্যাস উৎপন্ন হয়, তাহার ভিতর কার্ব্বন মনোক্‌সাইড্‌ বিদ্যমান থাকিবেই—সুতরাং যে কোনও অগ্নিকুণ্ড হইতেই উত্থিত ধূমে কার্ব্বন মনোক্‌-সাইড্‌ রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যাইবে। হয়ত অগ্নিশিখা যখন মৃতের দেহ স্পর্শ করে, তখন পর্য্যন্ত যদি ঐ ব্যক্তি জীবিত থাকিয়া থাকে, তবে সে নিশ্চয়ই অগ্নির ধূম নিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকিতে পারে; সেইরূপ ব্যাপার প্রকৃতই হইয়া থাকিলে তাহার রক্ত বিশ্লেষণে কার্ব্বন্‌ মনোকসাইডের অস্তিত্ব নিশ্চিতরূপে পাওয়া যাইবে।

ইহা ছাড়াও রাসায়নিক বিশ্লেষণ অতি মূল্যবান ফল প্রদান করিয়াছে কতকগুলি শ্রেণীর বিষ-ক্রিয়া উদ্‌ঘাটনে। এই সকল বিষের ভিতর রহিয়াছে—ধাতুজ শ্রেণীর, যেমন আর্সেনিক (সেঁকো বিষ), য়্যাণ্টিমনি (রসাঞ্জন), মার্কারি (পারদ) এবং লেড্‌ (সীসক);—উদ্ভিজ্জ ক্ষারধর্ম্মী (alkaloids) যেমন, ষ্ট্রিকনিন্‌, মর্‌ফিন্‌, কোকেন্‌ এবং অন্যান্য শত শত প্রকার; ভেরোনেল্‌, লুমিনেল্‌—উদ্বায়ী বিষ, যেমন সায়েনাইড্‌ ও ক্লোরোফর্ম; ফস্‌ফরাস্‌। ইহা ছাড়াও বহু এসিড ও য়্যালকেলি রহিয়াছে যাহা জারকধর্ম্মী। ইহা ব্যতীতও আবার মন্থর বিষ বহু রহিয়াছে, যাহার উদ্ভব বিশেষ করিয়া শিল্প কারখানায়।

প্রবল তীব্র বিষক্রিয়ায় পাকস্থলী হইতে অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণে বিষাক্ত দ্রব্যটির উপাদান বহিষ্করণ আশা করা যাইতে পারে, যকৃত এবং মূত্রাশয় হইতে কম মাত্রায় আর অস্থি হইতে অতি সামান্য পরিমাণে উদ্‌ঘাটিত হইবার কথা। কিন্তু মন্থর বিষক্রিয়ার বেলায় ইহার বিপরীত অবস্থাই সচরাচর হইতে দেখা যায় অর্থাৎ পাকস্থলীতেই

সুর্ব্বাপেক্ষা কম পরিমাণে বিষাক্ত দ্রব্য লক্ষিত হয়।

রাসায়নিক বিশ্লেষণ বিলক্ষণ ফল দর্শাইতে পারে, সেই সব স্থলে—যেখানে বিষক্রিয়া মৃত্যুর প্রত্যক্ষ ও অব্যবহিত কারণ নয়। অগ্নিকাণ্ডে মৃত বলিয়া অনুমিত ব্যক্তির রক্তে যে কার্বন মনোকসাইডের অস্তিত্ব—ইহা হইতেই উপরোক্ত মন্তব্য ভাল রকম প্রমাণিত হয়। এতদ্ব্যতীত ইহাও নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে জল ডুবিতে মৃত ব্যক্তির হৃৎপিণ্ডে কি পরিমাণ লবণ রহিয়াছে তাহা নির্ণয় করা হইলে উক্ত প্রকার মৃত্যুর সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্ত করা সহজ হইয়া থাকে।

এইবার বিষদ্রব্যের বিশ্লেষণের ব্যাপার সম্পর্কিত কয়েকটি লক্ষণ বিচার করা যাউক। সকল প্রকার বিষই সমপরিমাণে দেহে প্রবিষ্ট করিলে সমান ফল প্রদান করে না। "Legal Medicine and Texicology" নামক পুস্তকে ওয়েবষ্টার নিম্নলিখিত মাত্রা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন— উহাই মারাত্মক মাত্রা অর্থাৎ ঐ পরিমাণ সেবন করিলেই মৃত্যু হওয়া অনিবার্য্য।

বাইক্লোরাইড অফ্ মারকারি—.১ গ্রাম; আর্সেনিক ট্রাই-ওক্সাইড—.৩ গ্রাম; ষ্ট্রিকনিন্—.১ গ্রাম; য়্যাট্রোপিন্—.১ গ্রাম। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এই সকল মৃত্যু-আনয়নকারী মাত্রা .১ গ্রাম বা ২ গ্রেনের কাছাকাছি। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, সমগ্র মানবদেহ ওজনে ৬০ কিলো-গ্রাম, তাহা হইলে দেখা যাইবে—রাসায়নিক বিশ্লেষণে সমগ্র দেহের ৬০০,০০০ ভাগ আবিলতা হইতে ১ ভাগ মাত্র পৃথক করিবার প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। খড়ের গাদা হইতে একটি সূচ খুঁজিয়া বাহির করা অপেক্ষাও ইহা শক্ত ব্যাপার, কারণ রাসায়নিক পরীক্ষক সমগ্র দেহাংশ পান না তাঁহার বিশ্লেষণ চালাইবার সময়—পান মাত্র নগণ্য অংশবিশেষ দেহের বিভিন্ন স্থানের। সাধারণত এই প্রকার পরীক্ষা বা বিশ্লে-ষণের জন্য ১০০ গ্রামের অধিক পাইবার কথা নয়; সেইক্ষেত্রে ব্যাপার দাঁড়ায় এই যে, উক্ত পরিমাণ মিশ্র পদার্থ হইতে .২ মিলিগ্রাম অপেক্ষাও কম পরিমাণ বিষ-উপাদান তাঁহাকে নিষ্কাশন করিতে হয়—এই পরিমাণ এতই নগণ্য যে স্বাভাবিক চোখের প্রায় অদৃশ্য।

আবার এই নগণ্য পরিমাণ বিষদ্রব্য কত সহজে বিশ্লিষ্ট ও নিষ্কাশিত করিতে পারা যাইবে তাহা নির্ভর করে বিষের জাতীয় গুণাগুণের উপর। ধাতুজ বিষ (যেমন আর্সেনিক, য়্যান্টিমনি, লেড্ এবং মারকারি) দ্বারা আবিষ্ট হইবার স্থলে বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। কারণ এইগুলি সবই মৌলিক উপাদান (elements); ইহারা যে ভাবেই যে অবস্থায় থাকুক না কেন রাসায়নিক পরীক্ষার কালে কিছুতেই বিনষ্ট হইবার নহে। যে প্রণালীতে ইহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় পরখ করা হয়, তাহা অতিশয় প্রবল অনুভূতি-সমাশ্রিত। প্রকৃত কথা হইল—স্পেক্ট্রোগ্রাফের সাহায্যে সঙ্গত বা যুক্তি-যুক্ত পরিমাণ টিশু হইতে এই বিষের .০১ মিলিগ্রামেরও কম ওজনের অংশ পৃথককরণ বা ঐ অংশের অস্তিত্ব নির্দ্ধারণ সাধারণত সম্ভব। কারণ এই অনুভূতিপ্রবণতা, সাধারণত বিষ-বিশ্লেষণের জন্য যে মাত্রায় দরকার তাহা অপেক্ষা দশগুণ বেশীই বলিতে পারা যায়। কিন্তু অন্য সকল বিষ—বিশেষত মিশ্র জৈবপদার্থীয় বিষ, যেমন ষ্ট্রিকনিন্—ইহার বেলা অবস্থা একেবারে অন্য প্রকার। এই বিষ নিষ্কাশনের পদ্ধতি যেমন জটিলতাপূর্ণ ও শ্রমসাধ্য তেমনই ফলাফল অনিশ্চিত। আবার বিশ্লেষণকালে বিষ-উপাদানের বিনাশেরও যথেষ্ট আশঙ্কা রহিয়াছে। এক মিলিগ্রাম কিম্বা তাহা অপেক্ষাও কম পরিমাণের উদ্ভিজ্জ ক্ষারধর্ম্মী বিষের পৃথক্-করণ অতিশয় দুরূহ ব্যাপার, কারণ যে পরিমাণ টিশু হইতে তাহা নিষ্কাশিত করিতে হইবে তাহা অপেক্ষাকৃত বিশালই বলিতে হইবে; এবং ইহার পর সেই নগণ্য পরিমাণ বিষের স্বরূপ নির্ণয় আরও দুঃসাধ্য কার্য্য।

যদি অল্প সময় পূর্ব্বে ধাতুজ বিষ দেহে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহা কোন প্রকার অসুবিধা বা জটিলতা ব্যতীতই আবিষ্কার করা যায়। কিন্তু কতকগুলি বিষ রহিয়াছে, (বিশেষ করিয়া বার্বিটিউরেটস্ (Barbiturates) শ্রেণীর যাহা মাথাধরার ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়) যেমন লুমিনেল—উহা দেহান্তঃ প্রবিষ্ট হইলে অন্য অজানা মিশ্র পদার্থে পরিণত হইয়া সকল অনুসন্ধান এড়াইয়া থাকিতে পারে। আরও বহু বিষ-পদার্থ এই প্রকারে রূপান্তরিত হইয়া, কিম্বা অংশত উবিয়া গিয়া যে অবশিষ্ট অজানা পদার্থ রাখিয়া যায় তাহা হইতে বিষপদার্থের উপাদান আবিষ্কার অসম্ভব ব্যাপার। যদি ফরমেলিন্ অথবা কোন সুরভিত ও পচননিবারক দ্রব্যসার ব্যবহার করা হয় তরল কিম্বা বাষ্পীয় আকারে, তাহার ফলেও হয়ত বিষ-পদার্থের উপাদানবিশেষ বিনষ্ট হইয়া যাইবে, নয়ত বিষ-উপাদানকে কোনও অজানা পদার্থে পরিণত করিয়া ব্যাপার আরও জটিল করিয়া তুলিতে পারে, কারণ ঐ ফরমেলিন প্রভৃতির প্রয়োগে হয়ত বিষ-পদার্থের বিশ্লেষণ হইয়া এক অংশ গ্যাসের আকারে সত্বর উবিয়া যাইবে শ্বাসক্রিয়ায়, ঘর্ম্মে অথবা প্রস্রাবে—গ্যাসের আকার ধারণ না করিলে এমন উদ্বায়ী গুণবিশিষ্ট হইবে তাহাও গ্যাসের ন্যায়ই দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবে; অথচ মূলে বিষপদার্থে দেহের যে অনিষ্ট সাধন করিয়াছে তাহা রহিয়াই যাইবে।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে ইহা বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না যে, বিষাভিভূত ব্যক্তির দেহাভ্যন্তর-ভাগের রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা বিষ-পদার্থের নিষ্কাশন বা অস্তিত্ব নির্দ্ধা-রণ অতিশয় জটিলতাপূর্ণ প্রক্রিয়া। আবার এই প্রকার বিশ্লেষণের জন্য দেহাভ্যন্তরের সামান্য একটু অংশমাত্র পাইলে চলিবে না,বিশেষ করিয়া দরকার হয়— সমগ্র যকৃত(liver), মূত্রাশয়(kidneys), মগজ (brain), পাকস্থলী (stomach) ও উহার সঞ্চিত সমগ্র ভুক্ত পদার্থ, হৃৎপিণ্ড (heart), অন্ত্র-সমূহের সঞ্চয়, প্রস্রাব এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ইহা ব্যতীতও প্রয়োজন হয়—রক্ত, অস্থি ও কেশ।

অজানিত বিষের সন্ধানে বিশ্লেষণ করিতে হইলে অর্থাৎ বহিঃলক্ষণ হইতে যদি কোনও নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর বিষ-ক্রিয়ার আভাষ না পাওয়া যায়, তাহা হইলে একটি একটি করিয়া

সকল প্রকার বিষেরই যথাযোগ্য প্রণালীতে বিশ্লেষণ-মূলক অনুসন্ধান পরিচালনা করিতে হয়। নির্দ্দিষ্ট একটি বিষের উদ্দেশ্যে বিশ্লেষণই মহাজটিল ব্যাপার, আর যদি অনির্দ্দিষ্ট পথে সকল বিষের উপযুক্ত বিশ্লেষণই চালাইতে হয়, যতক্ষণ না বিষের অস্তিত্ব ধরিয়া ফেলা যায় তাহা হইলে এমন ব্যাপক বিশ্লেষণে এক সপ্তাহ বা তাহারও বেশী সময় লাগিতে পারে।

মানবদেহ ভিন্ন অন্য যে শ্রেণীর বিশ্লেষণ রাসায়নিককে সময় সময় করিতে হয় তাহা হইল রক্তের দাগের স্বরূপ নির্ণয়, পরিচ্ছদাদির পর্য্যবেক্ষণ, উহাতে যে ধূলা-কাদার নানা জাতীয় নিদর্শন পাওয়া যায় তাহার বিশ্লেষণ। ইহা ব্যতীতও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইল গুলী-বারুদের প্রভাবে পরিচ্ছদাংশের পুড়িয়া যাওয়ার প্রতিকৃতি গ্রহণ এবং পরিচ্ছদে যে গুলী-বারুদচূর্ণ লাগিয়া থাকে তাহার বিশ্লেষণ।

ইহার জন্য এক নব-প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহার সাহায্যে পরিচ্ছদে গুলীর জন্য পোড়া দাগ ও বারুদকণার সংস্থান প্রভৃতি সম্পূর্ণ লক্ষ্য করিবার মত প্রতিকৃতি গ্রহণ সম্ভব হইয়াছে। গুলী কালোই হউক আর ধূম-বিহীনই হউক উহার প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র কণা কোথায় কি ভাবে কাপড়ের উপরে রহিয়াছে তাহা পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যাইবে। ইহার ফলে প্রায়ই নিরূপণ করা যায় মৃতব্যক্তির অবস্থান হইতে কতদূরে আগ্নেয়াস্ত্রটি ছিল, যাহা হইতে গুলী বাহির হইয়া তাহাকে আঘাত করিয়াছে। এই দূরত্ব দুই ফুটের অধিক না হইলে অভ্রান্তভাবেই নির্দ্দেশ করা যায়। দূরত্বের নির্ণয় বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ সেই সকল ক্ষেত্রে যেখানে হত্যাকে আত্মহত্যা বলিয়া ধাপ্পা দিবার চেষ্টা চলে। কারণ সাধারণ উচ্চতার কোনও ব্যক্তি দুই ফুটের অধিক দূরে আগ্নেয়াস্ত্র রাখিয়া তাহার গুলী দ্বারা নিজ দেহে মারাত্মক আঘাত করিতে পারে না, কাজেই এই দূরত্ব পরীক্ষা এই সকল ক্ষেত্রে অপরিহার্য্য। পরিচ্ছদের পোড়াদাগের বিশিষ্টতা ও বারুদ-কণার অবস্থান নির্ণয় প্রয়োজন এইজন্য যে, কোন্ দিক হইতে গুলী করা হইয়াছে, তাহা অনেক সময় এই পরীক্ষা দ্বারা স্থির করা যায়।

ইহার পর বিশেষভাবে পরীক্ষার বিষয় হইয়া দাঁড়ায়—গুলীর আঘাতে পরিচ্ছদে যে গর্ত্ত হইয়াছে, তাহার সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ। এই স্থলে স্পেকট্রোগ্রাফ সাহায্যে বিশ্লেষণ করিতে হয়—পরিচ্ছদে গুলীভেদের গর্ত্তের চারিদিকের দাগ-বিশিষ্ট বস্ত্রাংশ। তীব্র অনুভূতি ও প্রখর পর্য্যবেক্ষণ—যাহা এই কার্য্যের জন্য প্রয়োজন, তাহা ঐ প্রকার শক্তিশালী যন্ত্র ভিন্ন অসম্ভবই বলিতে হইবে। যখন একটা গুলী অতি ক্ষিপ্রগতিতে ছুটিয়া আসিয়া বস্ত্রাদির গায়ে আঘাত করে, তখন গুলী-গাত্রের কিছুটা সীসক ঘর্ষণে উন্মুক্ত হইয়া বস্ত্রতন্তুর উপরে সঞ্চিত হয়। এই সীসকের পরিমাণ এত কম যে, উহা নগ্নচোখে দেখা যায় না; এমন কি অতি সূক্ষ্ম অনুভূতি-সমাশ্রিত রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা ভিন্ন অন্য কোন কৌশলেই বস্ত্রে সীসকের অস্তিত্ব জানা যায় না। এই জন্যই এই সকল ক্ষেত্রে স্পেকট্রোস্কোপ সাহায্যে বিশ্লেষণ ভিন্ন উপায় থাকে না।

সীসকের অস্তিত্ব না হয় আবিষ্কৃত হইল, কিন্তু তাহাতে হত্যা-নির্ণয়ে কি সাহায্য করিবে? সাহায্য করিবে এই যে, ইহা গুলীর আঘাতেরই গর্ত্ত, অন্য কোনও অস্ত্রের বা পদার্থের নয়—ইহা নিশ্চিত নিরূপিত করিয়া। কারণ অনেক স্থলে হত্যাকাণ্ড লুকাইবার জন্য দুর্ঘটনার আরোপ করা হয় এবং বলা হয় লোহার দাণ্ডা বা পাথরের টুকরার আঘাতে ঐরূপ গর্ত্ত হইয়াছে পরিচ্ছদে এবং দেহেও ক্ষত হইয়াছে। কিন্তু সীসক চূর্ণ আবিষ্কার করা গেলে সেই ধোঁকা যে নিরর্থক, তাহা ধরিয়া ফেলিতে কোনও বেগ পাইতে হয় না। আদৌ গুলীর আঘাত লাগিয়াছিল কিনা, ইহা উদ্ধারে এই রাসায়নিক পরীক্ষা অপূর্ব্ব সাহায্য করিয়া থাকে।

এই প্রকার সহায়তা পাওয়া যায় বলিয়াই আধুনিক কালে যে কোনও শব পরীক্ষায় পুলিশ বিভাগ সর্ব্বাগ্রে রাসায়নিক পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের পক্ষপাতী হয়। আর এই বিশ্লেষণের সুফল হইতে কত গোপন হত্যাকাণ্ড যে উদঘাটিত হইয়াছে এবং তৎপরবর্ত্তী অনুসন্ধানে কত অপরাধীকে আইনের কবলে আনয়ন সম্ভব হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

রক্তবিন্দু এবং রক্তের দাগ সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে আর বিশেষ আলোচনা সম্ভব হইল না। প্রবন্ধান্তরে সেই বিষয়ের অবতারণা করিবার বাসনা রহিল।

সংশোধন

(গল্প)

শ্রীকাশীনাথ চন্দ্র

সৃষ্টির পুরাতত্ত্ব আলোচনা করিলে যদি কিছু মূল্য পাওয়া যায় তাহা হইলে এ-কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, অনীতা ও প্রতিমার সাক্ষাৎ হওয়াটা মোটেই উচিত হয় নাই, উভয়ের মধ্যে সখিত্ব স্থাপন ত নয়ই; কারণ প্রতিমার জন্ম এবং বিবাহ উভয়ই পূর্ব্ব বঙ্গের একটা জেলায় এবং অনীতার ঠিক তাহার বিপরীত। অর্থাৎ বাঙলা দেশের অপর প্রান্তে বীরভূম জেলায়। অথচ ভাগ্যচক্রের এমনই বিড়ম্বনা যে, উভয়ের সাক্ষাৎ হইল ই বি রেলওয়ের কাঁচড়াপাড়ায় আসিয়া—তাহাও উভয়ের স্বামীর চাকুরী উপলক্ষ করিয়া। অনীতা এবং প্রতিমা......দুই বধূ......এবং বয়সেও বোধ হয় দুই জনেই এক; তাই সংসার সম্বন্ধে দুইজনার জ্ঞানও প্রায় এক—অর্থাৎ কিছুই নহে। দুইজনেই সংসারে প্রথম প্রবেশ করিয়াছে, কিসে সংসারের উন্নতি হয়, সে জ্ঞানও উভয়ের কাহারও নাই। হাসি, গান, বাজনা, সিনেমা, থিয়েটার এই লইয়াই উহাদের দিন কাটে। তফাতের মধ্যে অনীতার কোলে একটি নব অতিথি এবং প্রতিমার তাহা নাই।

উভয়েরই স্বামী লোকো ডিপার্টমেণ্টে কাজ করে, মাহিনাও পায় মন্দ নয়, অন্ততঃ আজকালকার যুগে—এবং দুজনেরই মাহিনা এক। কপালক্রমে বাসাও জুটিয়াছে এক জায়গায় এবং ঘনিষ্ঠতাও সেই সূত্রে। সুতরাং দুই সখীর খাতিরে দুই সখারও বন্ধুত্ব হইয়াছে এবং ঘনিষ্ঠভাবেই হইয়াছে।

দুইজনাই দুইজনার স্বামীর সঙ্গে কথা বলে, সামনে গান গায়, এক সঙ্গে সিনেমায় যায়, এমন কি এক জায়গায় বসিয়া নির্জ্জন কক্ষে দু'ঘণ্টা গল্প করিতেও সঙ্কোচ হয় না। ফল দাঁড়াইয়াছে এই, প্রতিমার বাড়ীতে পুঁইশাক চচ্চড়ি হইলে এ বাড়ীতে অনীতার স্বামী বিমল ভাতের থালা কোলের কাছে লইয়া বসিয়া থাকে সেই পুঁই শাকের ব্যঞ্জনটুকুর আস্বাদ গ্রহণ করিতে। অনীতা বাটি হাতে প্রতিমার কাছে ছুটিয়া গিয়া বলে সই, কি রেঁধেছিস শীগ্‌গির দে—ভাত কোলে করে বসে রয়েছে, বলে সুন্দর হাতের রান্না না খেয়ে উঠবে না—

প্রতিমা হাসিতে হাসিতে ব্যঞ্জনের অংশ সখীর হাতে দিয়া বলে তবু ভাল—এঁর যে আবার কালো হাতের রান্নাই ভাল লাগে, বলে কালো লোকেরা রাঁধে ভাল—

কথাটার মধ্যে একটু রহস্য আছে—আর কিছুই নহে প্রতিমা সুন্দরী এবং অনীতা ঠিক কালো না হইলেও প্রতিমা অপেক্ষা কালো।

পাড়ার লোকে বলে ছি-ছি—যত সব খৃষ্টানী আচার-ব্যবহার......পর পুরুষের সঙ্গে মেশামিশি, ও মা কি ঘেন্নার কথা—

উহারা সে কথা গায়ে মাখে না; বলে......লোকে ত কত কথাই বলে, লোকের কথায় কান দিতে গেলে সংসারে বাস করা চলে না—

কর্ত্তারাও বড় বিশেষ কাহারও কথায় কান দেয় না; বলে খৃষ্টান আছি আমরাই আছি, লোকের তাতে কি?

প্রতিমার স্বামী মণিও তাহাতে সায় দিয়া বলে......আসল কথা কি জান হে বিমল, তোমার আমার বন্ধুত্ব থাকে—এটা লোকে পছন্দ করে না। দেখছে যে, বা......দুজন বিদেশী এসে ত খাসা সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘর-সংসার করে যাচ্ছে একি সহ্য হয়; কোন গতিকে তোমার আমার মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দিতে না পারলে আর—

কথাটা অসমাপ্তই থাকিয়া যায়। বাধা দিয়া বিমল বলে...... তোমার সঙ্গে ঝগড়া, বল কি মণি? তবেই হয়েছে ...পেটের দায়ে দেশছাড়া ত অনেক দিন আগেই হয়েছি আবার যদি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করি তাহলে এবার আমায় গৃহ ছাড়াও হতে হবে। তোমার সখীর সখী যেদিন শুনবেন যে, তোমার সঙ্গে ঝগড়া করেছি, সেই দিনই এ বান্দাকে বলে বসবেন, ইওর সার্ভিস্ ইজ নো লঙ্গার রিকয়ার্ড—

দুই বন্ধুতে এক সঙ্গে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠে।

কথাটা অন্তঃপুরচারিণী দুই সখীতেও শোনে।

অনীতা একখানা পুরাতন কাপড় ছিঁড়িয়া তাহার পাড় হইতে সুতা তুলিতে তুলিতে বলে, "শুনেছিস কর্ত্তারা কি বলেছে—"

প্রতিমা তখন অনীতার এক বৎসর বয়স্ক শিশুপুত্রকে আদর করিতেই ব্যস্ত; সযত্নে শিশুকে বুকের উপর তুলিয়া লইয়া চুম্বন করিতে করিতে প্রতিমা উত্তর দেয়, "শুনেছি—"

—"সত্যি ভাই",—অনীতা বলে, "আমাদের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দিতে না পারলে এখানকার লোকগুলোর যেন ঘুম হচ্ছে না"—

প্রতিমা উত্তর দেয়, "কিন্তু দুঃখের বিষয়, ওদের সে সাধ কোনদিনই মিটবে না"—

এমন সময় ছেলেটা কাঁদিয়া উঠে।

প্রতিমা চেষ্টা করিয়াও ছেলেটার কান্না থামাইতে পারে না। অন্তরে তাহার জাগিয়া উঠে অতৃপ্তের ক্ষুধা। সে নিজের স্তন্য পান করিবার অধিকার দেয় শিশুকে। অনীতা, প্রতিমার কাণ্ড দেখিয়া মনে মনে হাসে, কিন্তু কিছুই বলে না। শিশু প্রথমটায় থামিয়া যায়, কিন্তু একটু পরে দুধের স্বাদ না পাইয়া কাঁদিয়া উঠে। প্রতিমা বিষাদভরা মুখে অনীতার কাছে আগাইয়া আসিয়া বলে, "নে তোর ছেলে নে—এমন ছেলেও কখন বাবার জন্মে দেখিনি, কিছুতেই থামল না"—

অনীতা মৃদু হাসিয়া বলিল, "পারলি না থামাতে"—

—"কি করব ওর যে ক্ষিদে পেয়েছে"—

—"তবু ত চেষ্টার ত্রুটি করলিনে"—

প্রতিমা যেন অনীতার কথায় একটু ব্যথা পাইল, তবু হাসিতে লাগিল। হঠাৎ এক সময় তাহার দৃষ্টি ছেঁড়া কাপড়ের পাড় থেকে তোলা সুতাগুলির উপর পড়িল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কাপড় ছিঁড়ছিস, ন্যাকড়া কি হবে রে"—

—"কাঁথা"—

—"কাঁথা কি করবি"—

অনীতা একটু সলজ্জভাবে হাসিয়া বলিল, "ঘরে বড় মশা হয়েছে কি না তাই ধোঁয়া দেব। ওদিকে আর এক মহাপ্রভু যে আসছেন"—

অর্থাৎ সে অন্তঃসত্ত্বা...

প্রতিমা অবাক হইয়া গেল, বলিল, "তাই নাকি—কই আমায় বলিসনি ত"—

সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের ভিতর হইতে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসে। সে চেষ্টা করিয়াও দীর্ঘ-নিশ্বাসটা চাপিয়া রাখিতে পারে না। মুখখানি বিষাদে ম্লান হইয়া উঠে। ভাবটা যেন, তোমার একটি সন্তান হইয়াছে, আর একটি হইবে, কিন্তু আমার—আমার একটিও হইল না।

অনীতা প্রতিমার দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দে চমকাইয়া উঠে। তাহার অন্তর যেন মুহূর্ত্তের জন্য ঢিপ ঢিপ করিয়া উঠে পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায়। কিন্তু সে ভাব তাহার বেশীক্ষণ থাকে না। একটুখানি পরিহাস করিবার সুযোগ পাইয়া মুখ-খানি প্রফুল্ল হাসিতে ভরিয়া উঠে। হাসিয়া বলিল, "ভয় কি, তোরও ছেলে হবে"—

প্রতিমা অন্তরের দুঃখকে অন্তরে চাপিয়া রাখিয়া মুখে হাসিয়া বলিল, "আর হয়েছে—এর পর কি বুড়ো বয়সে হবে নাকি, তার চেয়ে একেবারে না হওয়া ঢের ভাল"—

অনীতা দুষ্টুমীর হাসি হাসিয়া বলে, "বরের সঙ্গে ভাল করে মানত কর—হবে বই কি ছেলে, রাঙ টুকটুকে ছেলে হবে"—

কথাটা বলিয়াই কিন্তু সে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠে। দ্বিপ্রহরের নিস্তব্ধ পাড়াটা তাহার উচ্ছ্বাসে সজীব হইয়া উঠে। প্রতিমা উঠিয়া আসিয়া অনীতার পিঠে গুম্ গুম্ করিয়া গোটাকতক কিল বসাইয়া দিয়া বলে, "আ মরণ আর কি! চুপ কর, চুপ কর হতচ্ছাড়ী"—

অনীতা হাসিয়া লুটাইয়া পড়ে আর প্রতিমা লজ্জায় লাল হইয়া বসিয়া থাকে। এমনিভাবেই তাহাদের দিনগুলি কাটে—এবং ভালভাবেই কাটে—

ছেলে একজনের, কিন্তু তাহাকে ভোগ করে দুজনে।

প্রতিমার আদরের মাত্রাটা যেন একটু বেশীই।

পাড়ার লোকে বলে, "মা'র চেয়ে দরদী যে তারে বলে ডান"—

অনীতা যে ওই প্রবাদটার অর্থ বোঝে না তা নয়, বোঝে। সময় সময় তাহারও মনে হয় প্রতিমা বড় বাড়াবাড়ি করিতেছে, কিন্তু মুখে প্রতিমাকে কিছু বলে না। ভাবে, "মরুক গে, যা খুশী তাই করুক, আমার ছেলে ত আর সত্যিই পর হ'য়ে যাবে না। ওর ছেলে-পিলে নেই, আহা, আদর করে করুক"—

পাড়ার লোকে কিন্তু তাহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইবার আর একটা সূত্র খুঁজিয়া পায়। প্রতিমা অনীতার ছেলের অমঙ্গল কামনা করে এই সহজ কথাই যদি অনীতাকে বুঝাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলেই ত...কিন্তু অনীতা কি তাহা বুঝিবে? প্রতিমার সহিত তাহার যে ভাব...কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি করে না।

কি একটা কারণে প্রতিমা বাপের বাড়ী গেলে ভটচায গৃহিণীকে শিখণ্ডী দাঁড় করাইয়া একদিন দ্বিপ্রহরে সকলে আসিয়া অনীতাকে আক্রমণ করিল।

ঝি বলে, "তোমার পেটের ছেলে যে পর করে দিলে বাছা"—

বোস গিন্নি বলিলেন, "ছেলে কোলে করে পেরথম যখন এলে বাছা, আহা, ছেলের কি রূপ, ছেলে নয় ত, যেন সোনার চ্যাঙড় —আর সেই ছেলে আজ সর্ব্বনাশীর চোখে চোখে কি হয়েই গেছে"—

কথাটা সমাপ্ত হইতে না হইতে অপর একজন বলিয়া উঠে, "যাবে না, যাবে না শুকিয়ে? ওই সর্ব্বনাশী আঁটকুড়ি মাগী কি কম, ওর চোখে চোখেই ত এমন সোনার চাঁদের মত ছেলেটা শুকিয়ে গেল"—

বলিয়া পাশের বিছানা হইতে ছেলেটাকে কোলে তুলিয়া খানিক আদরও করিল। সকলের শেষে কথা বলিলেন ভটচায গিন্নি। আঁচলে বাঁধা ছোট্ট কৌটাটি বাহির করিয়া তাহা হইতে বেশ খানিকটা তামাক পোড়া বাহির করিয়া নিজের কালো রংএর দাঁত কয়টিতে প্রলেপ দিলেন। বারকয়েক পিচ ও ফেলিলেন। তারপর বেশ মোলায়েম সুরে চিবাইয়া চিবাইয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি হক্ কথার মানুষ বাছা, ওই মেয়েটি যে তোমার ছেলের কিছু অনিষ্ট কামনা করছে এমন কথা আমি বল্‌তে চাই না—তবে লোকের চোখ লাগে মা চোখ লাগে...অমন সোনার চাঁদের মত নাদুস-নুদুস ছেলেটি ...কার মনে কি আছে তা কি বলা যায় মা, তার ওপর তুমি পেরথম পোয়াতি, তোমার ওপর ওর হিংসে ত সহজেই হতে পারে মা। ও বাঁজা বৌটা লোক, ওর দীঘ্‌ঘ শ্বাসেও যে তোমার ছেলের অমঙ্গল হবে। তাই বলছি, বলা ত যায় না, কথায় বলে সাবধানের বিনেশ নেই—একটু সাবধানে থেক মা সাবধানে থেক"—

ভট্চায গৃহিণীর কথাগুলি অনীতার মনে লাগে। সত্যই ত প্রতিমা তাহার ছেলেকে কোলে লইয়া মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে...তবে...না, সংসারে কাহাকেও বিশ্বাস নাই। প্রতিমা ফিরিয়া আসিলে সে আর কিছুতেই খোকাকে প্রতিমার কোলে দিবে না। তাহাতে না হয় খোকার একটু কষ্টই হইবে, কিন্তু তাই বলিয়া ত আর...

কিন্তু সে ওই পর্য্যন্ত...

মাসখানেক পরে প্রতিমা যখন আবার ফিরিয়া আসিল, তখন সে কিছুতেই নিজেকে দৃঢ় করিয়া রাখিতে পারিল না। হাসিতে হাসিতে খোকাকে সখীর কোলে তুলিয়া দিল। মনের মধ্যে বিদ্বেষের যে বাষ্প ধূমায়িত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা দূর হইয়া আবার সরলতা দেখা দিল। পাড়ার লোকের ষড়যন্ত্র হইল ব্যর্থ।

তাহারা একদিন সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল যে, প্রতিমা অনীতার রোরুদ্যমান শিশুকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া দ্বিতলের কক্ষসংলগ্ন বারান্দাটুকুতে পায়চারী করিতেছে এবং শিশুকে ভোলাইবার জন্য মাঝে মাঝে ডাকিতেছে, "আয় পাখী আ-আ"—

অনীতার কোন পাত্তাই নাই—

কিন্তু সত্যই একদিন মনোমালিন্য দেখা দিল এবং সূত্রপাত করিল অনীতার নব নিযুক্ত ঝি বুড়ির মা। যে কারণেই হউক না কেন, বুড়ির মা'র প্রতিমাকে ভাল লাগে নাই, প্রতিমা অনীতার ছেলেকে আদর করে তাহাও না। সে হঠাৎ একদিন অনীতাকে প্রশ্ন করিয়া বসিল, "ও মেয়েমানুষটি তোমার কে হয় গা"—

—"কেন রে বুড়ির মা"—

—"উনি ত লোক ভাল নয় মা ঠাকরুণ, উনি যেন তোমার হিংসে করেন"—

অনীতা বুড়ির মার কথায় হাসিয়া উঠিল, বলিল, "করলেই বা হিংসে বুড়ির মা, তাতে কি আর আমার ছেলে কেড়ে নিতে পারবে?"

বুড়ির মা তাহার ডান হাতখানি এক অভিনব কায়দায় নিজের গালের উপর স্থাপন করিয়া বলিল, "ওমা, কত কথা, ছেলে কি কেউ কারও কেড়ে নিতে পারে, তা পারে না। তবে তুমি হচ্ছ গিয়ে জ্যাওচ পোয়াতি, আর উনি হলেন গিয়ে বাঁজা ...উনি যদি তোমার খোকাকে নিয়ে দিবে রাত্তির হা হুতাশ করেন, তা'হলে যে তোমারই ছেলের অকল্যেণ হবে মা—এই সহজ কথাটা আর তুমি বুঝতে পার না"—

অনীতা চুপ করিয়া থাকে, কোন কথা বলে না; কিন্তু তাহার অন্তরে একটি সন্দেহের ছায়া আশ্রয় লইয়া তোলপাড় করিতে থাকে।

এমন কথা সে প্রত্যহই শোনে—বুড়ির মা-ই বলে...

শেষে অনীতা তাহার সন্দেহকে সত্য বলিয়াই মনে করে।

একদিনকার ঘটনায় তাহার ধারণা সত্য বলিয়া মনে বদ্ধমূল হইয়া যায়। বুড়ির মা খোকাকে লইয়া প্রতিমাদের বাড়ীতে বেড়াইতে যায়। প্রতিমাও অভ্যাসমত খোকাকে কোলে করে আদর করে। সন্ধ্যাবেলা দেখা গেল খোকার হঠাৎ অসুখ। বার দুই-তিন বমি করিয়াছে এবং খানিকটা কাহিল হইয়াও পড়িয়াছে। বুড়ির মা বলিল, "তোমায় বল্‌লে বাছা শোন না হেসে উড়িয়ে দাও, এখন হ'ল ত'—তোমার কথা শুনে খোকাকে ওই ওনাদের বাড়ী নিয়ে গেনু, কি যে বাছাকে খাইয়ে দিলে—কেন আমি মরতে নিয়ে গেনু"—

অনীতার অন্তর হাহাকার করিয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল, "তুই খাওয়াতে দেখেছিস্"—

বুড়ির মা বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিল, "তবে আর বনুনু কি বাছা"—

অনীতা ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। বিমল বাড়ী আসিল, ছেলের অবস্থা দেখিয়া ভয়ও পাইল। তারপর সব কথা শুনিয়া ডাক্তার বাড়ী ছুটিল। ব্যাপার শুনিয়া পাড়ার আর পাঁচজনের সহিত প্রতিমা ও মণি আসিল। অনীতা প্রতিমার হাত দুখানি ধরিয়া বলিল, "খোকাকে কি খাইয়েছিলি ভাই যে খোকা এমন হয়ে পড়ল? তুই খোকাকে আমার কাছে চেয়ে নিলিনে কেন, আমি তোকে দিয়ে দিতাম—তুই এমন সর্ব্বনাশ আমার কেন করলি?"

প্রতিমা বিস্ময়ে হতবাক, বলিল, "আমি ত কিছু খাওয়াইনি"—

বোস গিন্নি বলিলেন, "এখন আর ভাল মানুষ সেজে কি হবে বাছা, যে সর্ব্বনাশ ওর করেছ—এখন কি করেছ তাই বল যে চিকিচ্ছে হক"—

প্রতিমা একবার বোস গিন্নির দিকে চাহিয়া দেখিল, তারপর চোখের জল মুছিতে মুছিতে নিঃশব্দে সেখান হইতে বাহির হইয়া গেল, তাহার পিছনে পিছনে মণিও চলিয়া গেল।

ডাক্তার আসিয়া রোগী পরীক্ষা করিলেন, বলিলেন, "ও কিছু নয়, দামাল ছেলে, বোধ হয় কিছু একটু তুলে মুখে দিয়ে থাকবে, তারি জন্যে এমন হয়েছে, ভয় নেই, এখনই সামলে যাবে"—

খোকা ক্রমশই সামলাইয়া উঠিতে থাকে।

পরদিন দেখা গেল সে বুড়ির মার সহিত বেড়াইতে বাহির হইয়াছে।

কিন্তু প্রতিমা ও অনীতার সে প্রীতি আর ফিরিয়া আসে না, বরং বিচ্ছেদের ভাবটা আরও ঘনীভূত হইতে থাকে... ভাঙ্গা মন আর জোড়া লাগে না, দিন যায়, মাস যায়...ক্রমে বছরও যায়...তারপর একটা দুইটা করিয়া গোটা আষ্টেক বছরও কাটিয়া যায়। অনীতার আর একটি ছেলে হইয়াছে, একটি মেয়েও হইয়াছে; কিন্তু প্রতিমা আট বছর আগেও যেমন একা ছিল, আজও তেমনই একা। তাহার অপূর্ণ মাতৃত্বকে পূর্ণ করিতে কেহই আসিয়া দেখা দেয় নাই।

খোকা এখন বেশ বড় হইয়াছে। এখন আর সে খোকা নয়, এখন সে মন্টু...দেখিতেও বেশ হইয়াছে। বই শ্লেট লইয়া প্রতিমাদের বাড়ীর সামনে দিয়া স্কুলে যায়। প্রতিমা মন্টুর যাইবার এবং আসিবার সময় জানালার কাছে গিয়া দাঁড়ায়, যদি মন্টুকে একবারও দেখিতে পায়। মণি দেখে আর হাসে, বলে "ওকে দেখে আর কি হবে—নিজে ত চিরকাল পরের ছেলের কানাইয়ের মা হয়ে রইলে"—

প্রতিমা স্বামীর কথায় ব্যথা পায়। মুখে কিছু না বলিলেও তাহার মৌন সজল দৃষ্টি তাহার অন্তরের ব্যথা জানাইয়া দেয়। মণিও ব্যথা পায়, সান্ত্বনা দিবার ছলে সে স্ত্রীকে নিবিড়ভাবে কাছে টানিয়া লয়, কিন্তু কেহই সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে না, দুইজনেই সমদুঃখী...দুইজনার ব্যথা দুজনে অন্তর দিয়া অনুভব করে।

অনীতা ডাকে, "খোকা খাবি আয়"—

মন্টু এইমাত্র স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। সে একটা বিরাট ঢেকুর তুলিয়া বলে, "আজ আর কিছু খাব না মা"—

—"কেন রে?"

—"খেয়ে এসেছি"—

অনীতা মৃদু হাসিয়া বলিল, "তোর কোন শাশুড়ী খাওয়ালে, শুনি?"

মন্টু বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া বলিল, "সে আছে—সে আছে"—

—"কি খাওয়ালে?"

—"সে অনেক, লুচি, কপির তরকারী, মিহিদানা-আবার কাল যেতে বলেছে"—

—"সে কেরে?"—

—"হ্যাঁ তোমার কাছে বলি, আর তুমি সেখানে যাওয়া বন্ধ কর, নয়? সে তোমায় বল্‌তে বারণ করেছে—বলে তা'হলে তুমি নাকি আর তার কাছে যেতে দেবে না।"

—"সে কোন্ বাড়ীতে থাকে?"—

খাওয়ার গল্প করিতে করিতে মণ্টু আত্মহারা হইয়া গিয়াছিল। হাত তুলিয়া বলিল, "ওই যে লাল বাড়ীখানা—ওইখানায়"—সে প্রতিমাদের বাড়ী দেখাইয়া দেয়। "আমায় খুব ভালবাসে মা—কত আদর করে"—

রাগে অনীতার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া যায়, ছেলেকে এক তাড়া লাগাইয়া বলে, "থাম, ফের যদি ও বাড়ীতে যাবি ত মেরে ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব"—

মণ্টু কিন্তু তাহা মানিতে চায় না, সে লুচির গন্ধ পাইয়াছে। সে নিজের জিভটা উল্টাইয়া কতকটা অবহেলার সুরে একটা শব্দ করে "ক্যাও"—

—"দাঁড়া ত' মুখপোড়া ছেলে"—মণ্টুকে অনীতা তাড় করিয়া যায়।

পরদিন অনীতাকে মণ্টুর আসবার সময় ঘর ও বাহির করিতে দেখা যায়। মণ্টু এখনও আসে নাই, কিন্তু আসিবার সময় হইয়াছে। ক্রমে অনীতা অধীর হইয়া উঠে। সহসা তাহার মনে পড়িল, মণ্টু প্রতিমাদের বাড়ী যায় নাই ত। হইতেও পারে—যে ছেলে সে। সে প্রতিমাদের বাড়ীর উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়ে। প্রতিমাদের বাড়ী গিয়া দেখে সে যা ভাবিয়াছিল তাই। প্রতিমা মণ্টুকে কোলে বসাইয়া খাওয়াইয়া দিতেছে, চোখের কোণে তাহার অশ্রু, আর মণ্টু আপন মনে বকিয়া চলিয়াছে। অনীতা দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া সব শোনে। মণ্টু বলে, "আমি না এলে তুমি কাঁদ মাসীমা, আর মা এমনি ষ্টুপিড যে, কিছুতেই আমায় তোমার কাছে আসতে দেবে না"—

প্রতিমা মণ্টুর শির চুম্বন করিয়া বলে, "ছি বাবা মাকে ষ্টুপিড্ বল্‌তে নেই, মা যদি আসতে বারণ করে, তা'হলে আর এস না"—

বলিতে বলিতে তাহার দুই চোখ দিয়া হু হু করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়ে।

অনীতা ধীরে ধীরে প্রবেশ করে। তাহাকে দেখিয়া প্রতিমা মণ্টু উভয়েই অবাক হইয়া যায়। মণ্টু লাফাইয়া একটা জানালার পাশে গিয়া দাঁড়ায় আর প্রতিমা যেন কত দোষ করিয়া ধরা পড়িয়াছে এমনিভাবে মুখ ফ্যাকাশে করিয়া অনীতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকে। তাহার উদ্গত অশ্রু ফোঁটা ফোঁটা করিয়া ঝরিতে থাকে। অনীতা ছেলের দিকে চাহিয়া বলে, "খেতে খেতে পালিয়ে গেলি কেন বাঁদর, আয় খেতে বস"—

মণ্টু কিছুক্ষণ অবাক হইয়া মায়ের দিকে চাহিয়া থাকে, তারপর খুশী হইয়া খাইতে বসে।

আর অনীতা ধীরে ধীরে প্রতিমার দিকে অগ্রসর হইয়া নিজের আঁচলে প্রতিমার অশ্রু মুছাইয়া দিয়া ধরা গলায় বলে, "কাঁদছিস কেন, মণ্টু যে তোরও ছেলে।"

উপেক্ষিতা

(৪৯১ পৃষ্ঠার পর)

হইয়া যাইবে। নিজের বুকের শব্দ অসিত শুনিতে পাইতেছে। আর দেরী নয়।

হঠাৎ হাত দুটি দিয়া গলা টিপিতে গিয়া সে দীপ্তিকে সজোরে ধাক্কা দিয়া জাগাইতে জাগাইতে প্রায় কম্পিত রুদ্ধ-কণ্ঠে কহিতে লাগিল—দীপু, দীপু, শীগ্‌গির জাগ। ঘুমিও না, তুমি তাহলে'—

দীপ্তি চমকিয়া জাগিয়া উঠিল—কি হয়েছে ভীতকণ্ঠে সে কহিল—অমন করছ কেন—এ্যাঁ কি হল। দীপ্তি উঠিয়া বসিতে চাহিল কিন্তু অসিত বাধা দিল—না-না উঠতে হবে না তোমার, রোগা শরীর নিয়ে তুমি উঠ না। আমিই শুয়ে পড়ছি। তারপর রুদ্ধশ্বাসে কহিতে লাগিল—কিন্তু দীপু ঘুমিও না, তাহলে আমি—আমি—

উদ্বিগ্ন হইয়া দীপ্তি কহিল—তাহলে তুমি, কি? বল—অসিতের সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, সে দীপ্তিকে বুকে টানিয়া প্রায় কাঁদিয়াই উঠিল—জান দীপু, আমি তোমায় আজ খুন করতে যাচ্ছিলুম—এই এক্ষুণি, একটু আগে আমি তোমার গলা টিপে—

আর কিছু না কহিয়া সে ছেলেমানুষের মত ফোঁপাইতে লাগিল। দীপ্তি কিন্তু কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিল না। —হয়ত কোন দুঃস্বপ্ন দেখছে? তুমি চুপ করে একটু ঘুমাও দেখি।

—না-না, দীপু এ স্বপ্ন নয়, সত্যি; কঠোর সত্যি। দীপু, আগে আমাকে ঘুমুতে দাও, না হলে তুমি বাঁচবে না—সত্যিই বাঁচবে না।

দীপ্তি সান্ত্বনা দিতে লাগল স্বামীকে।

জাপানের নারী গোয়েন্দা

—সতী তরু মজুমদার

কিছুদিন পূর্ব্বে চীনা সরকার হইতে সংবাদ প্রচার করা হয় যে, জাপানের প্রসিদ্ধ নারী-গোয়েন্দা মাঞ্চু রাজকুমারী তুং চিনো, যাহাকে "জাপানের মাতাহরি" আখ্যা প্রদান করা হয়, সে টিয়েনসিনে গুপ্তঘাতকের গুলীর আঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সকল প্রধান জাপানী সংবাদ-পত্রে প্রতিবাদ মুদ্রিত হয় যে, তাহাদের 'মাতা হরি' মরিয়া যায় নাই; গুরুতররূপে আহত অবস্থায় টিয়েনসিন্ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রহিয়াছে।

সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে উক্ত হাসপাতালে 'জাপানের মাতাহরি' মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। বিগত নববর্ষ দিনের সন্ধ্যায় এই রাজকুমারী যখন তাহার বন্ধু মিসিস ওয়াং-চু-লিন্ (কোনও ক্রোরপতি ব্যবসায়ীর পত্নী) কে ফরাসী কনসেশনে ম্যাকেঞ্জি মেমোরিয়াল হাসপাতালে দেখিতে যান, তখন একটি চীনা গুপ্তঘাতক

মাঞ্চু-রাজকুমারী তুং চিনো, পরে মিস্ কাওয়াশিমা এবং জাপানের 'মাতা হরি' নামে প্রসিদ্ধ

তাহাকে আক্রমণ করে। আক্রমণ কালেই মিসিস ওয়াং-য়ের মৃত্যু ঘটে। যদিও রাজকুমারীর ক্ষত গুরুতরই হইয়াছিল, তথাপি সকলেই আশা করিয়াছিল সে আরোগ্যলাভ করিবে। কিন্তু আঘাত মারাত্মকই হইয়া দাঁড়ায়। রাজকুমারীর হত্যায় জাপান এমন একটি নারীর সাহায্য হারাইল, যে আপন কর্ম্ম-কুশলতায় ইউরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নারী-গোয়েন্দার সহিত সমানে পাল্লা দিতে পারিত,—যে নারী "ভয়" বলিয়া শব্দটির সহিত আজীবন অপরিচিতই ছিল—যে নারীর উপর ন্যস্ত ছিল সুদূর প্রাচ্যের সবচেয়ে বিপজ্জনক দৌত্যের ভার।

বিধাতার বিধানে এই নারী—যে আজীবন একক সকল বিপদের ঝুঁকি মাথা পাতিয়া লইতে অভ্যস্ত ছিল—সেই একক অবস্থায় বিপদের সম্মুখীন হইয়াই প্রাণ বিসর্জ্জন দিল। জাপানে এই অসমসাহসিক নারীর কীর্ত্তিকলাপ মুখে মুখেই প্রচার লাভ করিবে ঘরে ঘরে—জাপানীরা এই বীর নারীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিবে প্রতিদিন। অথচ এই নারী জাতিতে জাপানী ছিল না—সে ছিল মাঞ্চু রাজকুমারী।

রাজকুমারী তুং-চিনো মিস্ কাওয়াশিমা নামেই পরিচিত ছিল। ইদানীং সে ছিল টিয়েনসিনের জাপানী কনসেশনের মাৎসুশিমা ষ্ট্রীটের এক চীনা রেস্তোরাঁর মালিক। মাঞ্চু-রাজবংশের প্রিন্স্ সিয়াও—যে ১৯১২ সালে পোর্ট আর্থারে পলাইয়া যায়—সেই প্রিন্সের তৃতীয় কন্যা, বর্ত্তমান মাঞ্চুকুও সম্রাটের দূর সম্পর্কিত ভগ্নী সে। মাঞ্চুরীয় নাম তাহার প্রিন্সেস্-তুং চিনো।

মাঞ্চু রাজবংশের পতনের পর এবং তাহার পিতার মৃত্যুর পর মিঃ নানিওয়া কাওয়াশিমা ইহাকে পোষ্য গ্রহণ করে। মিঃ কাওয়াশিমা ছিল প্রাচীন চাইনিজ ইম্পিরিয়েল গবর্ণমেণ্টের উপদেষ্টা। পোষ্য গ্রহণের ফলে রাজকুমারীর নাম হয় মিস্ কাওয়াশিমা। সে তখন জাপানে প্রেরিত হয় শিক্ষা-দীক্ষার জন্য।

তাহার পরবর্ত্তী রক্তরাঙা জীবনের তুলনায় তাহার শিক্ষাকালীন জীবন ছিল নিতান্তই বৈচিত্র্যহীন। জাপানের মাৎসুমোটো নগরীর নিকটস্থ আসামা নামক উষ্ণ-প্রস্রবণে থাকিয়া তাহার শিক্ষাকাল কাটে। সাধারণ জাপানী কন্যার ন্যায়ই এই রমণীয় পারিপার্শ্বিকে সে জীবন-যাপন করে। মিঃ কাওয়াশিমা ছিল জাপানের প্রসিদ্ধ সামরিক সামুরাই বংশধর। সেই পরিবারের সন্তান-সন্ততির সহিত চিরাগত প্রথায়ই সে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে থাকে। কাওয়াশিমা আবাস হইতেই সে মাৎসুমোটো হাইস্কুলে (বালিকাদের) অধ্যয়ন করে। কখনও সে হাঁটিয়াই স্কুলে যাইত, কখনও যাইত অশ্বপৃষ্ঠে।

মিঃ কাওয়াশিমা দেহ সবল ও পটু রাখিবার জন্য সমীপ-বর্ত্তী অরণ্য হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া তাহা চিরিত। তাহার ছেলে-মেয়েরাও শারীরিক ব্যায়াম করিত। এই পোষ্য পুত্রী উষাকালে জিমন্যাষ্টিক্‌স্ অভ্যাস করিত প্রতিদিন। উন্মুক্ত বায়ুতে নগ্নবেশে সে এই ব্যায়াম চর্চ্চা করিত। তাহার স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যময় দেহগঠন হইতে যেন রাজকুমারীর আভিজাত্য বিচ্ছুরিত হইত। এই প্রকারে প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবগণের প্রশংসা দৃষ্টির ভিতর সে পঠদ্দশা সমাপন করিল। ১৯২৪ সালে ১৮ বৎসর বয়সে সে গ্রাজুয়েট হইল।

এই সময়ে তাহার একটি বন্ধু জুটিল—নাম তাহার লেফ্‌টানেণ্ট ইয়ামাগা। এই লেফ্‌টানেণ্ট মাৎসুমোটো রেজি-মেণ্ট ভুক্ত ছিল এবং একদিন জিঙ্গু মন্দির দর্শন কালে উভয়ের সাক্ষাৎ হয়।

এই সামরিক বীরের সাহচর্য্যে মিস্ কাওয়াশিমার জীবনের গতি ফিরিয়া যায়। ক্রমে উভয়ের ঘনিষ্ঠতা নিবিড় হয়—ইয়ামাগা অবশেষে প্রেম-নিবেদন করে রাজকুমারীর নিকট। ইয়ামাগার পরামর্শে উৎফুল্ল হইয়া মিস্ কাওয়াশিমা এখন হইতে তরুণের বেশে চলাফেরা আরম্ভ করে; লম্বা চুল কাটিয়া ফেলে, শার্ট ও হাফ-শার্ট পরে—পায়ে থাকে সামরিক বুট হাঁটু অবধি উঁচু।

১৯২৭ সালে যখন মিস্ কাওয়াশিমা ২১ বৎসরে পদার্পণ করে তখন মিঃ কাওয়াশিমা উহাকে ত্যাজ্য করে এবং তাহার

পরিবারের সহিত সকল সংস্রব বিচ্ছিন্ন করিতে বাধ্য করে। মিস্ কাওয়াশিমা জাপান ত্যাগ করিয়া দেইরেনে চলিয়া যায়।

কিন্তু দেইরেনে পেঁৗছিয়া বোধ হয় রাজকুমারী আর তরুণ সাজিতে ভুলিয়া যায় বা সে ইচ্ছা তাহার শিথিল হইয়া আসে; সে পুনরায় লম্বা চুল রাখিতে আরম্ভ করে। চুল যথেষ্ট লম্বা হইলে পুরুষের বেশ পরিত্যাগ করিয়া চীনা মহিলার পরিচ্ছদ পরিধান করিতে আরম্ভ করে।

প্রায় এক বৎসর এইভাবে কাটাইয়া মিঃ কাঞ্জু নামক এক তরুণের পত্নীত্ব বরণ করিয়া লয়। এই তরুণ জাপানী সামরিক বিদ্যালয় হইতে পাশ করিয়া বাহির হইয়াছিল আর সে ছিল প্রিন্স ব্যাব্-চাব্ নামক মঙ্গোলীয় ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পার্টির এক নেতার পুত্র।

ইহার পর স্বামীর সহিত অন্তর্মঙ্গোলিয়ায় গমন করে এবং তাহার জীবনের পরবর্ত্তী ঘটনা 'জাপানের মাতাহরি' শীর্ষক প্রবন্ধে দেশ পত্রিকায় বর্ণিত হইয়াছে।

তাহার কার্যকলাপ প্রথম জানিতে পারা যায়—মুকদেন ব্যাপারে ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। এই সময়ে সে তাহার দূর সম্পর্কীয় ভ্রাতা প্রিন্স পুইয়েইর সমর্থন জন্য টিয়েনসিনে আগমন করে। এই প্রিন্স পরে মাঞ্চুকুওর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়। রাজকুমারীর প্রথম দুঃসাহসিক কাণ্ড ও কৌশলে বিপদ উত্তীর্ণ হইবার ব্যাপার হইল উক্ত প্রিন্সকে তাহার অবরুদ্ধ অবস্থা হইতে উদ্ধার। এই সময় রাজকুমারী নিজে মোটর চালাইয়া প্রিন্সকে লইয়া প্রস্থান করে।

পরবর্ত্তী জীবনে যে সকল কীর্ত্তির জন্য রাজকুমারীর নাম বিখ্যাত হয়, তাহার ভিতর একটি হইল—চীনাদের প্রধান এক ষড়যন্ত্র ভেদ। জাপানী জাহাজ 'ইদজুমো'-কে মাইন দ্বারা ঘায়েল করিবার ব্যবস্থার সংবাদ পূর্ব্বে হইতে সংগ্রহ করিয়া রাজকুমারী জাপানী কর্ত্তৃপক্ষকে হুঁসিয়ার করিয়া দেয়। ফলে জাহাজখানি বাঁচিয়া যায়।

সৈনিকের পোষাকে সজ্জিত হইয়া রাজকুমারী জাপানীদের অভিযান সেনার প্রধান আড্ডা ইয়াংসিপুর কুনডাস্ কটন মিলে উপস্থিত হয়।

আর একটি কার্য্য হইল—রাজকুমারীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মিঃ চিন লি এবং চিচিহারের মেয়রের সহিত একযোগে জেনারেল সু-পিং-ওয়েন-এর সহিত বন্দোবস্ত চালাইতে থাকে। এই মাঞ্চুকুও বিরোধী জেনারেল তিনশত জাপানীকে আটক রাখিয়াছিল—ঐ জাপানীদের মুক্তির জন্যই রাজকুমারী নানা প্রয়াস করে।

এই সময়ে জাপানীদের গোপন সন্ধানীর কার্য্যে লিপ্ত থাকাকালীন একদিন উড়োজাহাজযোগে বিপক্ষ সেনাদলের গণ্ডীর ভিতর যাইয়া প্যারাশুট সাহায্যে অবতরণ করে এবং চীনা মহিলার বেশে ঘুরিয়া নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া নিরাপদে ফিরিয়া আসে।

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে জেহোলে একদল অশ্বারোহী সেনা গঠন করিয়া সামরিক শিক্ষায় নিপুণ করিয়া তোলে। এই সেনার নামকরণ করা হয় তিং-কুওচুন। ইউরোপের ইতিহাস প্রসিদ্ধ জোয়ান অব আর্কের ন্যায় সে এই সেনার নেতৃত্ব গ্রহণ করে। শাংহাই শহরে সে অতিশয় পরিচিত ছিল। প্রায়ই হোটেল প্রভৃতিতে পুরুষের বেশে তরুণীদের সহ যাতায়াত করিত। ছড়ি হাতে পূর্ব্ববর্ণিত পুরুষ বেশে তাহাকে দেখিয়া মেয়েমানুষ বলিয়া তাহাকে ঠাহর করিতে কেহই পারিত না। সময়ে মহিলা পরিচ্ছদ গ্রহণ করিলেও, পুরুষের বেশই তাহার পছন্দ ছিল বেশী।

জাপানী সেনার বর্ত্তমান চীন অভিযান কালে চীনের প্রাচীরে জাপানী পতাকা যাহারা সর্ব্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, রাজকুমারী তাহাদের অন্যতম। এইজন্য জাপানী সেনা ও নৌ-বিভাগে তাহার সম্মান ও প্রতিপত্তি অপ্রতিহত ছিল।

এই রমণীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে চীনাদের এক অতি ধূর্ত্ত শত্রুর নিপাত হইল। কারণ কখন কোথায় কি বেশে উদয় হইয়া গোপন দলিল ও সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পলায়ন করিবে—তাহার কোন স্থিরতা ছিল না। চীনা-গোয়েন্দা বিভাগ উহার চতুরতা ধরিয়া ফেলিতে কখনও সমর্থ হয় নাই। কাজ হাসিল করিয়া চলিয়া গেলে পরে চীনারা বুঝিতে পারিয়াছে যে, জাপানের মাতাহরি আসিয়াছিল।

সমগ্র জীবন রাজকুমারী তুং-চিনো অতি বিপজ্জনক পারিপার্শ্বিকেই নির্ভীক হৃদয়ে কাটাইয়া গিয়াছে। যে প্রকার বেপরোয়া ও ডানপিটে জীবনের প্রতি আকর্ষণ তাহার ছিল, তাহার অনুরূপ মৃত্যুও তাহার ভাগ্যে জুটিয়াছে। তাহার মত নারী কখনও শান্তিময় জীবনে স্বাভাবিক বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইতে আশা করিতে পারে না—তাই অধিকাংশ গুপ্ত সন্ধানীর যে মৃত্যু হামেশা হইতে দেখা যায়, তাহারও সেই মৃত্যুই আসিয়াছে—আততায়ীর অতর্কিত আক্রমণে।

মিস্ কাওয়াশিমার দুঃসাহসিক কার্য্যাবলী জাপানবাসীর নিকট জাতীয় সঙ্গীতের মতই আদরণীয় হইয়া থাকিবে বংশপরম্পরা। কাওয়াশিমার সমাধি-স্থান জাপানীদের শ্রেষ্ঠ তীর্থে পরিণত হইবে।

মনস্তত্ত্ববিদের দৃষ্টিতে ইউরোপের ডিক্টেটরত্রয়

আধুনিক যুগের প্রধান ডিক্টেটর এডোলফ্ হিটলার, বেনিটো মুসোলিনি এবং জোসেফ ষ্ট্যালিনকে যদি মনোবিজ্ঞানাগারে পরীক্ষা করিয়া দেখা সম্ভবপর হইত, তবে তাহার ফলে তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব ও চালচলন সম্পর্কে অনেক রহস্যই যে উদ্‌ঘাটিত হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। আর কিছু না হউক, এরূপ মনোবিশ্লেষণ পরীক্ষায় অন্ততঃ ইঁহাদের সঠিক স্বরূপ যে প্রকাশ পাইত এবং সাধারণ সংবাদপত্রসেবীদের নানারূপ জাঁকজমকপূর্ণ বর্ণনার মধ্য হইতে আমরা আধুনিক যুগের শক্তিমান এই পুরুষ কয়জনকে ভালরূপে বুঝিবার ও জানিবার যে সুযোগ পাইতাম, তাহা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। মনোবিজ্ঞানাগারে ইঁহাদের পরীক্ষা অবশ্য সম্ভবপর নহে। সুতরাং এ অবস্থায় শুধু দূর হইতে ডিক্টেটরত্রয়ের বক্তৃতা ও রাজনীতিক ক্রিয়া-কলাপ বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহাদের মনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করার চেষ্টা করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

হিটলারের চ্যান্সেলার পদে নিয়োগ (১৯৩৩)

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এরূপ বিশ্লেষণেও আমরা ডিক্টেটরগণের মনোপ্রকৃতির কম সন্ধান পাই না!

হিটলারকে সাধারণতঃ 'mad man of Europe' বা 'ইউরোপের পাগলা মানুষ' বলিয়া উল্লেখ করা হয়। বস্তুতঃ জার্ম্মানীর এই সর্ব্বাধ্যক্ষের চরিত্রে যে সমস্ত জটিল ধরণের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, তাহাতে এরূপ সংজ্ঞা তাঁহার পক্ষে একেবারে বে-মানান নহে! বেনিটো মুসোলিনি এবং জোসেফ ষ্ট্যালিনকেও কেহ কেহ অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। মনস্তত্ত্বের দিক হইতে তাই বিশ্লেষণ করা আবশ্যক—উপরোক্ত ডিক্টেটরগণের চরিত্র সাধারণ সুস্থ প্রকৃতির (Sane) মানুষের চেয়ে যথার্থই অন্য রকমের কি না!

হিটলারের প্রকৃতি একটি কথাতেই ব্যক্ত করা যাইতে মনোবিজ্ঞানবিদের দৃষ্টিতে তিনি একজন Paranoid বা বুদ্ধ্যুন্মাদ মাত্র। ডাঃ এফ এ মোস্ এরূপ মনোবিকারের উদ্ভব সম্পর্কে বলিয়াছেন,—"Paranoia অনেকটা মজ্জাগত (constitutional) বলিয়া মনে হয়। কি কারণে এরূপ মনোবিকারের উদ্ভব ঘটে, তাহা সঠিক জানা যায় নাই এবং এ পর্য্যন্ত উহা দূর করাও সম্ভবপর হয় নাই। তবে দেখা যায় এরূপ বুদ্ধ্যুন্মাদনাগ্রস্ত লোকের (Paranoid) তেজ, বীর্য্য থাকে অসীম। ফলে এরূপ লোকেরা জীবনে বহু অসাধারণ কাজ করিতে সমর্থ হয়। সংগঠনেও ইহাদের অসাধারণ কৃতিত্ব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।"

বুদ্ধ্যুন্মাদ ব্যক্তিদের মধ্যে বিবিধ লক্ষণ প্রকটিত হইতে দেখা যায়। কাহারও কাহারও নিজেদের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে এরূপ উচ্চ ধারণা জন্মে যে, ফলে ইহাদের মনে অত্যধিক অহমিকার ভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে। শুধু তাহাই নয়, নিজের মত ও নিজের ব্যক্তিত্ব অপরের উপর জোর করিয়া

মঃ ষ্ট্যালিন

চাপাইয়া দেওয়ার এক অশোভন জেদও ইহাদের অনেক সময় এমনিভাবে পাইয়া বসে যে, কোন কাজেই ইহারা পশ্চাৎপদ হয় না। ফলাফল যাহাই ঘটুক না কেন কোনদিকেই ভ্রূক্ষেপ নাই। আবার আর এক প্রকারের বুদ্ধ্যুন্মাদনা দেখা যায়, যাহা একান্ত নিজেকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠে। এরূপ বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিগণ সমাজের পক্ষে তেমন ক্ষতিকর নহে। নিজেদের অহমিকায়ই ইহারা বেশীর ভাগ মসগুল থাকে, অপরের কোন ধার ধারিতে চাহে না।

যাহাদের মধ্যে বুদ্ধ্যুন্মাদনার পুরোদস্তুর বিকাশ হয়, মনোবিজ্ঞানবিদ্‌গণ তাহাদের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ স্তর আবিষ্কার করিয়াছেন।

প্রথমত, একান্ত অহমিকা যাহাতে নিজেকে মস্ত একজন রাজা, মহারাজা বা মাতব্বর বলিয়া ধারণা হয়,

আঁতে বা অহমিকায় কোনওরূপ আঘাত লাগিলে ইহারা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠেন। দ্বিতীয়ত, কোন 'অভিযোগ' পোষণ করার ভাব—যাহাতে সর্ব্বদাই মনে হইতে থাকে, অহেতুকভাবেই যেন নিপীড়ন ও নির্য্যাতন ভোগ করিতেছি। এ অবস্থায় মনের মধ্যে একটা প্রতিহিংসার ভাব জাগ্রত হওয়াও অস্বাভাবিক নহে। স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায়ও এরূপ বুদ্ধ্যুন্মাদ ব্যক্তির অতিরিক্ত আগ্রহ লক্ষিত হয়।

তৃতীয়ত, কোন প্রকারের সংস্কার-সাধনের বাতিক। শিক্ষা, দীক্ষা, ধর্ম্ম, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায়—যাঁহারা নিজেদের বিশেষ কোন পরিকল্পিত সংস্কার গ্রহণ করাইবার জন্য অতি-মাত্রায় উদ্‌গ্রীব হইয়া পড়েন ; সাধারণত ইঁহারা তত ক্ষতিকর হন না বটে, কিন্তু যেখানে উপরোক্ত মনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তিকে সকলের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার একটা দুর্জ্জয় আকাঙ্ক্ষায় পাইয়া বসে এবং রাজনীতি ক্ষেত্রকেই তিনি নিজের কর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া বাছিয়া লন, সেখানেই গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে এবং 'ডিক্টেটরে'র আবির্ভাব হয়।

উপরোক্ত লক্ষণ অনুযায়ী ডিক্টেটর হিটলারের চরিত্র বিশ্লেষণ করিতে বসিয়া তাঁহার জীবনের 'অভিযোগ' খুঁজিতে মনোবিজ্ঞানবিদ্‌কে খুব বেশীদূর যাইতে হয় না। তাঁহার জীবনে যে সমস্ত 'অভিযোগ' পুঞ্জীভূত হইয়া আছে, তাহাই তাঁহাকে আগুনের মত পাইয়া বসিয়াছে। যুবা বয়সেই হিটলার আত্মকর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার যে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন, তাহা বার বার শুধু ব্যর্থতায় পরিণত হয়। তাহাই আজ অন্ধ ক্রোধে পরিণতি লাভ করিয়াছে।—আজ তাঁহার মধ্যে ক্ষমা নাই, নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড করিতে দ্বিধা নাই। তাঁহার বুদ্ধ্যুন্মাদ মনকে একান্ত আচ্ছন্ন করিয়া আছে তীব্র ঘৃণা—যাহার প্রকাশ আজ আমরা দেখিতে পাইতেছি—ইহুদী-দলনে, পুঁথিপত্র বিসর্জ্জনে ও তাঁহার প্রতিবাদীদের বিনা দ্বিধায় অন্ধকার কারাকক্ষে নিক্ষেপণে। তাঁহার অহমিকা আজ ইতিহাসের শিক্ষাকে তুচ্ছ করিতেছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানকে নির্ব্বাসন দিতেছে এবং নিজের স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত স্ত্রীলোকদের সন্তানোৎপাদনের সামান্য যন্ত্ররূপে নির্দ্দিষ্ট করিতেছে। তাঁহার নিকট ধর্ম্ম তুচ্ছ।—অপর জাতির নিন্দা করিতে তিনি কখনও পশ্চাৎপদ হন না। প্রতিবাদকারীদের তাড়াইতে ও মুখ বন্ধ করিতে তাঁহার জুড়ী বিরল। ক্ষমতা হাতে পাইবার পর হইতে এ পর্য্যন্ত হিটলার যে সমস্ত আদেশ ও নির্দ্দেশবাণী প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মধ্যে বুদ্ধ্যুন্মাদনা paranoia বহু লক্ষণই প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।

উন্মাদাগারের রোগী যেমন তাহাদের নিজেদের 'স্বপ্ন-জগৎ' রচনা করে, হিটলারের সৌভাগ্যক্রমে তিনিও এমন এক দেশে আবির্ভাব হইয়াছেন, যেখানকার আবহাওয়া রোগীর উপরোক্ত স্বপ্ন-জগৎ হইতে বিভিন্ন নহে। কি কারণে ঐদেশে এরূপ অবস্থা উদ্ভব হইতে পারিয়াছে, হিটলারের তিরোধানের পরেও হয়ত বহু বৎসর পর্য্যন্ত ইহা লইয়া ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা চলিবে। তবে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে, মহাযুদ্ধের পরিণামে যে ভার্সাই সন্ধির সৃষ্টি হয়, তাহা যদি না হইত কিংবা রাষ্ট্রসংঘের আলাপ-আলোচনা যদি এভাবে ব্যর্থ পরিণতি লাভ না করিত, তবে বুঝি জার্ম্মানীতে হিটলারের মনের অনুকূল পাগ্‌লা (paranoid) আবহাওয়ার প্রকাশও সম্ভবপর হইত না। ডিক্টেটরকে তাঁহার অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হইলে স্বাধীনতার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া শক্তির সাহায্যে সর্ব্বদা ভয়কে জীয়াইয়া রাখিয়াই চলিতে হয় এবং জার্ম্মানীতে আজ তাহাই চলিতেছে।

'আর্য্য বংশ' এবং 'Nordic'—এই দুইটি কথার প্রচলন হয় জার্ম্মান যুদ্ধেরও বহু আগে। একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে আজ ইহাই গোলমালের সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছে। ১৯১৪ সালে গোবিনো (Gobineau) নামে ফ্রান্সের একজন মাথা-পাগ্‌লা সাহিত্যিক এক থিসিস্ লিখিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে, জগতে টিউটন জাতেরাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার থিসিসের বিষয় ছিল The Inequality of Human Races. লিওনার্ডো মাইকেল এঞ্জেলো এবং আরও অনেকের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া তিনি ইহাতে দেখান যে টিউটনিক রক্ত ইঁহাদের ধমনীতে ছিল বলিয়াই ইঁহারা এত বড় হইতে পারিয়াছিলেন। হাউসটন চেম্বারলেন নামে আর একজন বিপক্ষসেবী ইংরেজও 'আর্য্য' বংশের এই সুরে তান ধরিলেন। এভাবে ১৯১০ সাল হইতে ১৯১৪ সালের মধ্যে 'রাজনীতিক জাতিবিচারে' নানারূপ প্রবন্ধাদি বাহির হইতে লাগিল। মনে রাখিতে হইবে, জার্ম্মানীতে এসময় বিদ্যাচর্চ্চার আদর বড় কম ছিল না এবং এ সমস্ত বিষয়ে স্বতঃই তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল।

গোবিনো, চেম্বারলেন এবং অপরাপর বহুলোকের উপরোক্ত কুখ্যাত লেখা জার্ম্মানীতে যেরূপ সমাদর লাভ করে, তাহা হইতে জার্ম্মান জাতের বিচিত্র চিন্তাধারার পরিচয় কম মিলিবে না! প্রকৃত ঐতিহাসিকগণ এবিষয়ে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে ইহাই বলিতে হয় যে, জার্ম্মানগণ ব্যক্তি-স্বাধীনতার যথার্থ মর্ম্ম ঠিক উপলব্ধি করিতে পারে নাই। এমন কি ইহার অভাব পর্য্যন্ত আজ তাহারা উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না বলিয়া মনে হয়। বহু বিধি-নিষেধ কণ্টকিত হইলেও নিজেদের দেশকেই ইহারা ভালবাসিতে শিখিয়াছে এবং দ্রুতগতিতে দেশের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিবার নিমিত্তই যেন আজ ইহারা অধিকতর লালায়িত!

মনস্তত্ত্ববিদগণ হিটলারকে যে পর্য্যায়ে ফেলিয়াছেন মুসোলিনী ও ষ্টালিনকে ঠিক সে পর্য্যায়ে ধরা যায় না বটে, তবে একথা বলা যাইতে পারে যে, ইটালী ও রুশিয়ার এই দুইজন ডিক্টেটরও যদি সাধারণ প্রকৃতির সুস্থ মানবের কাছাকাছি দাঁড়াইতে পারিতেন, তবে আজ জগতের ইতিহাস হয়তো সম্পূর্ণ অন্যরূপেই লিখিত হইত। জন গান্থারের সহিত এবিষয়ে মনোবিজ্ঞানবিদগণ প্রায় একমত যে, "সকল ডিক্টেটর-গণই অনেকটা অস্বাভাবিক ধরণের (abnormal) এবং ইহা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ", কারণ, সাধারণ সুস্থ প্রকৃতির মানুষের অহমিকা কখনই এতদূর প্রসার লাভ করিতে পারে না যাহাতে সে এরূপ অতিরিক্ত রকমের গুরু দায়িত্বের ঝুঁকি গ্রহণ করিতে রাজী হইতে পারে।"

মুসোলিনীর আত্মপ্রতিষ্ঠার অতিরিক্ত খেয়ালের কথা (megalomania) বাদ দিলে মুসোলিনীকে আর পাঁচজন সাধারণ প্রকৃতির মানুষের গণ্ডীর মধ্যেই ফেলা যাইতে পারে। তবে তাঁহার আত্মপ্রতিষ্ঠার ঝোঁকও সাধারণ লোকের অনুরূপ মনোভাবের কম বড় ব্যতিক্রম নহে! একথা ঠিক যে মুসোলিনীর মধ্যে সাধারণ সুস্থ মনের পরিচায়ক অনেক কিছু থাকিলেও তাহার ক্ষতিপূরণস্বরূপ বিপরীত গুণাবলীর সমাবেশও অতিরিক্ত মাত্রায়ই রহিয়াছে। তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন যাত্রায় অহমিকার চূড়ান্ত বিকাশ পরিলক্ষিত হয় এবং এইরূপ অহমিকার জন্য পৃথিবীকে এপর্যান্ত কম মূল্য দিতে হয় নাই।

ইটালীর এই একচ্ছত্র নায়ক ইতিহাসাভিজ্ঞ বলিয়াই সম্ভবত ছোট বেলা হইতেই স্বেচ্ছায় 'ম্যাকিয়াভেলী'র নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। 'রাজনীতি দস্যুবৃত্তি মাত্র এবং দস্যুতার নিয়মেই ইহা পরিচালিত হইবে—সভ্যতা বা ভব্যতার প্রতি খুব বেশী শ্রদ্ধা না রাখিলে বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না'-এরূপ ধারণার মধ্যে মনোবিকারের অবশ্য কোন লক্ষণ নাই; কিন্তু এ ধারণার ফল কম মারাত্মক নহে!

কিছুদিন পূর্ব্বে মুসোলিনী এমিল লাডইউগকে বলিয়াছিলেন যে, ইতিহাসের শিক্ষাই এই যে ডিক্টেটরগণ প্রথম আঘাত করিতে শিখিবে। 'সিংহ যেমন থাবার দ্বারা আপন প্রভুত্ব বিস্তার করে, তেমনি আমার ইচ্ছাশক্তিদ্বারা আমি ইতিহাসে আমার নাম রাখিয়া যাইব।' এই হইল মুসোলিনীর কথা। তাঁহার সবচেয়ে বড় আনন্দ জয়ে ও তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতায় লোকের প্রশংসমান হাততালিতে। তাঁহার নিজ গৌরব-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত তিনি অধিক দূর অগ্রসর হইতেও পশ্চাৎপদ হন না। আধুনিক যুগের 'সিজার' এই মুসোলিনী। পিতার পদাঙ্ক অনুসরণক্রমে তাঁহার পুত্র পর্যান্ত লিখিয়াছেন, নির্দ্দোষ আবিসিনিয়াবাসীদের শূন্যে উৎক্ষিপ্ত করিয়া হত্যা করার মধ্যে তিনি অভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন।

মুসোলিনী একবার নিকোলাস মারে বাটলারকে বলিয়াছিলেন যে, স্বাধীনতা আজ শুধু মৃতকল্প নহে। পরন্তু ইহার সমাধি ঘটিয়াছে। একদিকে মানবজীবনে স্বাধীনতা হইতে উদ্ভূত অশেষ কল্যাণ, অপর দিকে ব্যক্তিবিশেষের নিজের খেয়াল চরিতার্থ করিবার অহমিকা—এই দুইয়ের মধ্যে শেষোক্তটিকেই তিনি বাছিয়া লইয়াছেন।

ডিক্টেটরগণের মধ্যে রুশিয়ার সর্ব্বাধ্যক্ষ জোসেফ ষ্ট্যালিন বরং সাধারণ প্রকৃতির মানুষের অধিকতর নিকটবর্ত্তী। ব্যক্তিগত চালচলনে তিনি অনেকটা গম্ভীর প্রকৃতির। হাস্যরসও তাঁহার মধ্যে না আছে এমন নহে। ষ্ট্যালিন খুবই কার্য্যদক্ষ। ইতিহাসের বিভিন্ন উত্থান-পতনের দৃষ্টান্ত সম্পর্কেও তাঁহার সম্যক ধারণা রহিয়াছে। তাঁহার ব্যক্তিত্ব ঠিক করিয়া বুঝিয়া উঠা কঠিন। বহু বিষয়েই উহা প্রহেলিকাময় ও দুর্ব্বোধ্য।

হিটলার এবং মুসোলিনীর সহিত তাঁহার তুলনামূলক বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই, যে রাষ্ট্রের উপর ষ্ট্যালিন আজ অধিনায়কত্ব করিতেছেন সেইটি তাঁহার সৃষ্ট নহে। লেনিন তাঁহার জীবদ্দশাতেই তাঁহার দলকে ষ্ট্যালিন সম্পর্কে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যে, ষ্ট্যালিনের কার্য্যপদ্ধতি অনেক বিষয়ে মান্ধাতা আমলের (crude), হিংসাত্মক ও আতঙ্কজনক। লেনিনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত রাষ্ট্রে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের উদ্ভব হয় এবং রুশিয়ার সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র পরিচালন করিবার ক্ষমতা লইয়া বিভিন্ন দলের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে থাকে। নিজের অফুরন্ত তেজ ও সংগঠন শক্তির দ্বারাই বলিতে গেলে ষ্ট্যালিন ধীরে ধীরে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সে বড় কঠিন সময় গিয়াছে। চারিদিকে বিপ্লব ও বিদ্বেষের মধ্যে অতি ছোট খাট ব্যাপারেও ষ্ট্যালিনের সুনিপুণ কৌশল অবলম্বন করার শক্তিই ষ্ট্যালিনকে এই পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তাঁহার অতীত কার্য্যাবলী হইতে এবং আধুনিক কালেও তিনি দল হইতে তাঁহার প্রতিরোধীদের নিম্মূল করিবার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা হইতেই সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে তিনি নিজ স্বার্থ প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত জবরদস্তিমূলক অমানুষিক কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বন

মুসোলিনীর রোম-অভিযান (১৯২২)

করিতেও দ্বিধা বোধ করেন না। কোন প্রকার ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তিনি নির্ব্বিবাদে নিজস্ব নীতি চালাইতেছেন। ষ্ট্যালিনের মনে একটা অবিশ্বাস বা সংশয়ের ভাব যেন বিদ্যমান, তাই সর্ব্বদাই তিনি নিজকে 'আড়ালে ঢাকিয়া রাখিতে চাহেন।' রাজনীতিবিদ্ বা সংবাদপত্রসেবীদের সঙ্গে তিনি ক্বচিৎ দেখা সাক্ষাৎ করেন। এমন কি কোন উৎসবে যোগদান করিতে হইলে তিনি কদাচিৎ বাহিরে আসেন।

আপাত দৃষ্টিতে আমরা দেখিতে পাই বটে, ডিক্টেটরগণ তাঁহার অনুগত জনসমুদ্রের বাহবাই লাভ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের জীবন স্বেচ্ছাচারী রাজা বা রুশিয়ার পূর্ব্বতন জারদের মত কম আশংকার মধ্যে অতিবাহিত হয় না! ফলে এই সব ডিক্টেটরগণের প্রকৃত মনোবিকারগ্রস্ত লোকের মতই নানারূপ আতঙ্কের (phobia) উদ্ভব ঘটে। ষ্টালিনকে তাই আগে পাছে দুই তিনখানি অতিদ্রুতগামী গাড়ী লইয়া সন্তর্পণে 'ক্রেমলিন' হইতে বাহির হইতে হয়। শহর হইতে দূরে যে গৃহে তিনি বাস করেন তাহাও অতি উচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। মুসোলিনীর আতঙ্কও কম নহে। তাই তিনি যে মোটর গাড়ীতে বহির্গত হন তাহাতে এমনি কাচ লাগান রহিয়াছে যাহাতে অদৃশ্য থাকিয়াও নিজে বাহিরের সব কিছু দেখিতে পারেন। হিটলারের আবাসস্থলও কম সুরক্ষিত নহে! পাহাড়ের উপরে তাঁহার যে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে তাহা শুধু সতর্ক প্রহরীদের দ্বারা বেষ্টিতই থাকে না, পরন্তু ইহার চারিদিক কাঁটাতারে পরিবেষ্টিত এবং এই তারের ভিতর দিয়াও আবার বৈদ্যুতিক শক্তি চলাচল করিতেছে। যে নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে হিটলার বাস করেন তাহাও এমনিভাবে প্রস্তুত যে, বারুদ বা বোমা বিস্ফোরণেও উহার কোনরূপ ক্ষতি করা অসম্ভব। পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিমান পুরুষ ইহারা। অনুচরদের মতে ইউরোপের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রদ্ধার পাত্র—কিন্তু তাঁহাদেরও জীবনের জন্য পদে পদে এই যে আতঙ্ক—ইহা ঠিক সুস্থ মনের পরিপোষক নহে!

ডিক্টেটরগণের অনুচর সাধারণত প্রথমে সেইরূপ লোকদের মধ্যেই বেশী মিলে যাহারা নিরুৎসাহে নিরুদ্যমে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তারপর অবশ্য জোর প্রচারকার্য্যের ফলে অনুচরদের সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। একবার ক্ষমতা বিস্তারের পথ করিয়া লইতে পারিলে ডিক্টেটরদের আর অসুবিধা হয় না। কারণ, তখন নানারূপ বাধ্যতামূলক ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন দ্বারা তিনি নিজেই প্রতিপক্ষদের মুখবন্ধ করিতে পারেন।

---

* Current History'তে প্রকাশিত জোশেফ জ্যাষ্ট্রোর Dictatorial Complex নামক প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত।

কূটনীতির কসরত

(৪৬৮ পৃষ্ঠার পর)

করিতে পারে, সোভিয়েট রুশিয়া তাহাই চায়। ফ্রান্স চায়, পশ্চিম ইউরোপে সে আর অগ্রসর না হয়। ব্রিটেন উভয়ের উপর কর্তৃত্ব করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু ইহাদের ভিতর এই অমিল আছে বলিয়া অন্যেরা, নানারূপ গর্হিত কর্ম্ম পরেও করিয়া যাইতে সাহস পাইবে। আক্রমণকারীকে শাস্তি দেওয়া ইহাদের ক্ষমতার বহির্ভূত। ব্রিটেন ফ্রান্স নিজ নিজ শক্তি বাড়াইতেছে বটে, কিন্তু ইউরোপের শক্তির সমতা (balance of power) প্রতিষ্ঠিত না হইলে তাহা ব্যর্থ হইবার খুবই সম্ভাবনা।

২৮শে মার্চ্চ, ১৯৩৯

টিফিন-ক্যারিয়ারের দৌত্য

(গল্প)

শ্রীসুধাংশুকুমার ঘোষ

ফাইনান্স্ ডিপার্টমেণ্টের কম্পিটিটিভ্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রশান্ত কলিকাতায় চাকরী পাইয়া সম্প্রতি বাসা বাঁধিয়াছে।

বাসায় বৃদ্ধ পিসিমা কেবল বাসাড়ে। সকাল দশটা হইতে সন্ধ্যা ছ'টা পর্য্যন্ত প্রশান্ত বাহিরে থাকে। বাকী সময়টা বাড়ীতে বিশ্রাম ও আফিস যাইবার প্রস্তুত হওয়ায় কাটে।

নূতন চাকরী—একটু পাংচুয়াল হতে হয় বেশী—যদিও চাকরীর নাম এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট্ এ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল।

বাড়ীতে চাকর, বামুন, ঝি, হরিণ, পাখী—যতটা পারে কোলাহল দ্বারা পাড়া সজাগ রাখে। আফিসের উৎকলবাসী তক্‌মা আঁটা পিওন—প্রশান্তর টিফিন্ লইয়া যায়।

একদিন তাহার পিসিমাকে রাগ করিয়া বলিল, অত অযত্ন করিয়া আফিসে টিফিন্ পাঠাইবার দরকার নাই। সে আফিসেই ব্যবস্থা করিতে পারিবে। পিসিমা অবাক্ হইয়া কারণ জানিতে চাহিয়া অবগত হইলেন, বাড়ী হইতে যে খাবার আফিসে পাঠান হয় তাহা প্রশান্তর নিকট পৌঁছে না। উৎকলবাসী পিওনের কৈফিয়ৎ চাহিয়া জানা গেল—সে খাদ্যগুলি নিজে খায় না, তবে চিলে যদি তাহার অজ্ঞাতে খাইয়া ফেলে তাহার কথা সে বলিতে পারে না। যাহা হউক সে এখন হইতে বাঁধিয়া খাবার লইয়া যাইবে।

ঢাকা দেওয়া টিফিন্ ক্যারিয়ারে পাঠান খাদ্য চিলে খাইয়া যাইতে পারে এরূপ প্রস্তাব শুনিয়া প্রশান্ত ব্যাপারটা সম্যক্ অবগত হইল।

পিসিমা তাঁহার এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট মিনি ওরফে মিনতিকে ডাকিয়া একটা এন্‌কোয়ারি করিয়া লইলেন—তাহার পর ওই উড়ে মুখপোড়ার কাজ এই সিদ্ধান্ত করিয়া লইলেন যদিও উক্ত মুখপোড়া নানারূপ দৈহিক ভঙ্গী সহকারে এবং শ্রীশ্রী 'জগন্নাথব' দিব্য দ্বারা নিজের নির্দ্দোষিতার প্রমাণ দেখাইল।

এন্‌কোয়ারির সময়ই প্রশান্ত প্রথম মিনির অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনকোরা তথ্য অবগত হইল এবং তাহার পরিচয় পিসিমার কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল সে পিসিমার এক দেবর-ঝি—বিবাহ হয় নাই—পিতামাতা নাই—গ্রামের স্কুল হইতে ম্যাট্রিক্ পাশ করিয়া কলিকাতায় কলেজে পড়িতে আসিয়াছে এবং তাহারই বাড়ীতে থাকে। প্রশান্তর টিফিন আফিসে ডেস্‌প্যাচ্ সেই করিয়া থাকে।

তাহার পরদিন হইতে টিফিন্ ক্যারিয়ারে তালা দিয়া টিফিন্ পাঠাইবার ব্যবস্থা হইল। ডুপ্লিকেট চাবি। একটি প্রশান্তর কাছে থাকে—অপরটি মিনির কাছে। পিসিমার নির্দ্দেশ অনুযায়ী খাবার যাহা আফিসে পাঠান হয় তাহার একটা ইন্‌ভয়েস বা লিষ্টও উহার মধ্যে যায়। উক্ত ইন্‌ভয়েস মিনিকেই লিখিতে হয়।

আবার মিনির লিখিত জিনিস প্রশান্ত ঠিকমত পায় কি না পরীক্ষা করিবার জন্য—তাহাকে খাদ্যের নামের উপর দাগ দিয়া ইন্‌ভয়েস্ ফেরৎ দিতে হয়। পিসিমার তাই নির্দ্দেশ।

মিনি প্রথম দিন লেখে একটা ছোট শ্লিপে—"টোষ্ট, পোচ, নেবু, পুডিং।'

দ্বিতীয় দিনঃ—"সাণ্ডউইচ্, মামলেট, নাসপাতি, ঘরের দুধের ক্ষীর একটু।"

তারপর দিনঃ—"কড়াইশুঁটির কচুরি, প্লামকেক্, কম মিষ্টি দিয়ে সন্দেশ—সব আমার তৈরী—ভাল হয়নি বোধ হয়।"

আর একদিনঃ—"ফুলকপির সিঙ্গাড়া, মার্ম্মালেড, আইস-ক্রীম, পেয়ারা-জেলি—এসব আমি আজ সকালে ক'রেছি। সেদিন আমার তৈরী সন্দেশ খুব ভাল হয়েছিল লিখেছিলেন—বোধ হয় বাজে কথা। মিনতি।"

কয়েকদিন পরেঃ—"আজকের খাবারের নাম ব'লব্ না—কি কি পাঠালাম খেয়ে লিখে দেবেন। আমি ক'রেছি ব'লেই ভাল হ'য়েছে ব'লবেন না। সত্যি সত্যি কেমন হয়েছে লিখ্‌-বেন। আপনি বড্ড বাজে কথা লেখেন। আমি কলেজে কখন যাই লিখেছেন? কলেজে গিয়ে কি হবে? ভাল লাগে না। আমার এ খাবারগুলো ক'রতে কষ্ট কেন হবে? খুব ভাল লাগে—সত্যি। আপনার হয়ত' খেতে খুব খারাপ লাগে। কোথা থেকে শিখেছি? জেঠাইমা ব'লে দেন—আমি তাঁর কাছে আপনার জন্য খাবার ক'রতে শিখি। আপনার কি কি খাবার ভাল লাগে? বোধ হয় এগুলো খুব বিশ্রী লাগে।

—ইতি বিনীতা মিনতিরাণী।"

এত বড় বড় চিঠি লেখালেখি হইতেছে—চাবি বন্ধ টিফিন্ ক্যারিয়ারের ভিতর—পিসিমা কিছুই জানেন না। দুটি ডুপ্লিকেট চাবি দুজনের কাছে। বাড়ীতে কখনও এদের দেখা হয় না। টিফিন্ ক্যারিয়ারের ভিতরের চিঠির মারফৎ আলাপন চলিতেছে।

এ অবস্থায় পিসিমা একদিন গঙ্গাসাগরে স্নান করিতে গেলেন। মিনিকে কয়েকদিনের জন্য কাশীপুরে তাঁহার এক মাসতুতো ভগিনীর বাড়ী রাখিয়া গেলেন। প্রশান্ত আফিসে টিফিন্ খায়।

পিসিমা ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন ভ্রাতুষ্পুত্র তিনদিনে শরীর আধখানা করিয়া বসিয়া আছে। তিনি ভাবিলেন কোন অসুখ হইয়াছিল। আনি আনি করিয়া মিনিকে কাশীপুর হইতে আনিতে দু'দিন আরও বিলম্ব হইয়া গেল। প্রশান্তর ধৈর্য্যচ্যুতি হইল।

পিসিমা তাহাকে শরীরের কথা জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল—টিফিন্ খাইতে না পাইয়া তাহার শরীর খারাপ হইয়া গিয়াছে।

পিসিমা বলিলেন, কেন তুই যে বলিস্ আফিসে টিফিন্ রোজ খাস্।

প্রশান্ত বলিল, বাড়ীর তৈরী নিত্য নূতন খাবারের সহিত অন্য খাদ্যের তুলনা করিও না।

(শেষাংশ ৫১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ম্যাজারিক

অস্ট্রিয়ার সম্রাটের বিরাট রাজ-সংসারের এক প্রান্তে বাস করে জনৈক শকট-চালক আর এক পরিচারিকা। তারা ভালবেসে ফেলেছে পরস্পরকে। বিয়ে ক'রে নীড় বাঁধবার ভারি ইচ্ছা মনে—কিন্তু ভাগ্য বিরূপ! তারা যে ক্রীতদাস আর ক্রীত-দাসী! প্রভুর বিনা অনুমতিতে বিয়ে করবার অধিকার নেই তাদের। তখনকার দিনে মালিকের হুকুম না নিয়ে দাস-দাসীরা না পারতো এক জায়গা ছেড়ে আর এক জায়গায় যেতে, না পারতো একটা কাজ ছেড়ে দিয়ে আর একটা কাজে হাত দিতে। নব্বুই বছর আগে এই ছিলো ইউরোপের আইন-কানুনের রূপ।

কিন্তু পরিবর্ত্তন পৃথিবীর নিয়ম। ইউরোপের বুকের উপর দিয়ে বইতে আরম্ভ করলো বিপ্লবের ঝড় আর সেই ঝড়ের ঝাপটায় পুরোনো অনেক-কিছু ভেঙে পড়লো। দাস-দাসীরা মনিবের বিনা অনুমতিতে বিয়ে করতে পারবে না—এই নিয়মেরও পরিবর্ত্তন ঘটলো। এতদিনে প্রেমিক-প্রেমিকার জীবনে একত্র ঘর বাঁধবার সুযোগ মিললো। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে তারা পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হোলো।

এই দরিদ্র দম্পতির ঘরে এলো প্রথম যে শিশুটি—ইতিহাসে সে আজ প্রেসিডেণ্ট ম্যাজারিক নামে বিখ্যাত। মা ছিলেন ঈশ্বরে বিশ্বাসী। ছেলেটিকে শেখাতেন ঈশ্বরকে ডাকতে আর সেই সঙ্গে নিজেও প্রার্থনা করতেন, ভগবান, আমার পুত্রটি যেন বড়ো হ'য়ে দারিদ্র্যের দুঃখ না পায়। মায়ের মনে পুত্রের ভাবী জীবন রঙীন হ'য়ে দেখা দিতো। কল্পনায় হয়তো মা দেখতো, ছেলে বড়ো হ'য়ে মহালের নায়েব হ'য়েছে এবং অনেক লোক 'হুজুর' 'হুজুর' ব'লে তাকে সেলাম দিচ্ছে।

ছেলে নায়েবের চেয়েও বড়ো হবে—গরীব মা এত বড়ো আশাকে কেমন ক'রে মনের কোণে স্থান দেবে? শকট-চালকের গৃহিণী হ'য়ে কেমন ক'রে সে ভাববে—অস্ট্রিয়ার সম্রাটকে তাড়িয়ে দিয়ে পুত্র তার একদিন প্রাগের রাজ-প্রাসাদে চেকোস্লোভাকিয়ার রাষ্ট্রপতির জীবন যাপন করবে? রূপ-কথার কাহিনীর মতোই শোনায় বটে—যদিও রূপ-কথা নয়। শকট-চালকের পুত্র নিজেও কোনোদিন ভাবেনি, পরিণত বয়সে একদা স্বাধীন কোনো রাজ্যের রাষ্ট্রপতি হ'য়ে শাসনদণ্ড পরিচালনা ক'রতে হবে তাকে। সত্য অনেক সময়ে রূপ-কথার চেয়েও অদ্ভুত। আমাদের জীবন-নাট্যের অঙ্কগুলিকে লিখে চলেছে কোন্ অদৃশ্য-হস্তের লেখনী? পটের পর পটের পরিবর্ত্তন হ'চ্ছে আর নূতন নূতন ভূমিকার অভিনয় করছি আমরা। এক অনুর্ব্বর দ্বীপের পটভূমিকায় আজ যে করছে পিতৃহীন বালকের অভিনয়—কাল তাকে দেখতে পাচ্ছি এক বিশাল সাম্রাজ্যের দিগ্বিজয়ী সম্রাটের আসনে। হাতে তার রাজ-দণ্ড। ইউরোপের রাজন্যবর্গের ভাগ্য নিয়ে খেলছে সে ছিনিমিনি খেলা। ঘটনার পর ঘটনাকে কে যে এমন ক'রে ঘটিয়ে চলেছে—জানিনে। দেখতে পাচ্ছি শুধু—ধাক্কায় ধাক্কায় আমাদের জীবনের তরী নূতন নূতন ঘাটে গিয়ে ভিড়ছে। দস্যু হ'য়ে যাচ্ছে মহার্ষি, রাজপুত্র নিচ্ছে সন্ন্যাস, দাসীপুত্র হচ্ছে রাষ্ট্রপতি—জীবনের রঙ্গ-ভূমিতে এমনি সব অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে চলেছে।

বালক ম্যাজারিক। দুঃসহ দারিদ্র্যের মধ্যে কাটে দিনের পর দিন। বাবার চকচকে-বোতাম-লাগানো কচুয়ানের উর্দ্দি। সেই উর্দ্দি যখন জীর্ণ হ'য়ে যায় মা তাকে কেটে ছেলের জন্য জামা বানিয়ে দেয়। জামা গায়ে দিতে বালকের চোখ ফেটে জল আসে। অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর আঘাত! ধনীর দুলালেরা শীকার ক'রে ফিরে আসবার সময় অনুকম্পা ক'রে তার দুঃখিনী মায়ের হাতে ছুড়ে দেয় নিজেদের ব্যবহৃত গরম পোষাক—তাই দিয়ে বালক ম্যাজারিকের শীত নিবারণ হয়। জীবনের সে কি তিক্ত অভিজ্ঞতা! ধনী আর দরিদ্রের জীবন-যাত্রা-প্রণালীর মধ্যে কি বিপুল পার্থক্য! এরকম অভিজ্ঞতার সম্পদ ক'জনের ভাগ্যে ঘটে!

দরিদ্র বালক গ্রামের কামার-শালায় কাজ করে। আগুনের তাতে হাতুড়ির শব্দের মধ্যে কৈশোরের দিন কেটে যায়। বয়স বাড়তে বাড়তে এখন ষোলোয় এসে পৌঁছিয়েছে। ঝরণায় যুবক একদিন জল আনতে গিয়েছে—কামারের কাজে জলের প্রয়োজন—এমন সময় ইস্কুলে মাষ্টারি করবার জন্য ডাক এলো এক পুরাতন শিক্ষকের কাছ থেকে। শিক্ষক মশাই বললেন, মাষ্টারি করলে দু' কাজ হবে—পকেটে কিছু পয়সাও আসবে—জ্ঞানও কিছু সঞ্চয় করা যাবে। ইতিপূর্ব্বে গ্রাম্য ইস্কুলে জ্ঞানের সঙ্গে যে টুকু পরিচয় হ'য়েছিলো—তা কিছু নয় ব'ল্লেই হয়। কামারের কাজ ক'রে যা দু'-চার পয়সা রোজগারের সম্ভাবনা আছে মাষ্টারি করতে গিয়ে তাও যদি কপালে না জোটে! অনেক ইতস্তত ক'রে যুবক শেষে মাষ্টারি করতে সম্মত হোলো।

ম্যাজারিকের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার পরিচয় আমরা প্রথম থেকেই পাই। অস্ট্রিয়ার সঙ্গে তখন প্রুসিয়ার আর ইটালির লড়াই লেগেই আছে। তখনকার দিনে সৈনিকেরা ছিলো লুণ্ঠনে ওস্তাদ। যাবার পথে লুটপাট করতে করতে চলতো। একদিন শোনা গেল, প্রুসিয়ান সিপাহীরা ম্যাজারিকের গ্রামের দিকে আসছে। পল্লীর লোকজন ভয়ে তটস্থ। গ্রামে ঢুকতে হয় যেখান দিয়ে—ম্যাজারিক একদৌড়ে ছুটে গেলো সেইখানে। তারপর যে বাড়ীখানা ঢুকবার পথে প্রথমে চোখে পড়ে, তার দেওয়ালে খড়িমাটি দিয়ে বড়ো বড়ো অক্ষরে লিখে দিলে "এ গ্রামে ভীষণ কলেরা লেগেছে।" বাস—এক চালেই বাজিমাৎ। সিপাহীরা দূরে থেকে দেওয়ালের লেখা প'ড়েই গ্রামে আর ঢুকলো না। সেদিনের সন্ধ্যাবেলায় গ্রাম্য মজলিসে কি হাসির রোল!

এর কিছুকাল পরে নবীন শিক্ষকটি এক পাদ্রীর কাছে ল্যাটিন পড়া সুরু ক'রে দিলো। ব্যাকরণের সঙ্গে কোনো পরিচয় ঘটলো না বটে কিন্তু অভিধান থেকে ল্যাটিন শব্দ-গুলির অর্থ মুখস্থ করা খুব জোরের সঙ্গেই চলতে লাগলো। ল্যাটিন শব্দ-সম্পদের উপরে যুবকের অসাধারণ অধিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকবার পথ প্রশস্ত ক'রে দিলো।

গ্রাম ছেড়ে ম্যাজারিক সহরে চললেন কলেজে ভর্ত্তি

হবার জন্য। ভাগ্য সহায় হোলো। ম্যাজারিকের জীবন-দেবতা তাঁর সামনে আগিয়ে দিলো পুলিশের একজন বড়ো কর্ত্তাকে। পাদ্রি ভাগ্যের প্রথম আশীর্ব্বাদ, পুলিশের কর্ত্তা দ্বিতীয় আশীর্ব্বাদ। ম্যাজারিকের আত্মপ্রকাশের পথকে প্রশস্ত করবার জন্য তাঁর জীবন-রঙ্গ-ভূমিতে দু'জনেরই আসবার প্রয়োজন ছিলো।

ব্রুণ (Brunn) সহরের যে বিদ্যালয়ে ম্যাজারিক ভর্ত্তি হলেন সেখানে শব্দের উচ্চারণ নিয়ে জার্ম্মান শিক্ষকের সঙ্গে তাঁর প্রায়ই বাদানুবাদ হোতো। সহরে চেকদের সঙ্গে জার্ম্মানদের হাতাহাতি ছিলো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। শিক্ষকের সঙ্গে বাদানুবাদের ফলে ম্যাজারিক জার্ম্মানদের বিষ-নজরে প'ড়ে গেলেন। তারপর কোনো একটা প্রেমের ব্যাপার নিয়ে ম্যাজারিকের ঘটলো ধৈর্য্যচ্যুতি—সঙ্গে সঙ্গে ইস্কুল থেকেও তিনি বিতাড়িত হ'লেন। যুবকের পকেটে একটি কপর্দ্দকও নেই, সহরে থাকা অসম্ভব। কি খেয়ে থাকবে? গ্রামের সেই কামারশালায় ফিরে যাবার জন্য ম্যাজারিক যেই পা বাড়িয়েছে—অমনি পুলিশের বড়ো কর্ত্তার সঙ্গে দেখা। তাঁর ছেলের জন্য একটি সঙ্গীর বড়ো প্রয়োজন। সব রকমের নরনারীর সঙ্গে কারবার করতে করতে মানুষ চিনবার বিলক্ষণ ক্ষমতা তিনি অর্জ্জন করেছিলেন। ম্যাজারিকের যে-টুকু পরিচয় তিনি পেয়েছিলেন তার ফলে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন—যুবক একটি হীরের টুকরো। এই রত্নটীর সাহচর্য্য তার পুত্রকে মানুষ ক'রে তুলবে। পুলিশের বড় কর্ত্তা নিরাশ্রয়, নিঃসম্বল যুবককে সাদরে আপনার গৃহে আশ্রয় দিলেন। এই ঘটনার অল্প কয়েকদিন পরেই তিনি ভিয়েনায় বদলি হ'য়ে গেলেন। ম্যাজারিকের ভাগ্যেও রাজধানীতে আসবার সুযোগ মিলে গেল। যুবকের জীবনকে ফুটিয়ে তুলবার জন্য ঘটনার পর ঘটনাকে আগে থেকেই কে যেন সাজিয়ে রেখেছে! কোথা থেকে এলো পাদ্রী সাহেবটী! কোথা থেকে এলো পুলিশ সাহেব! ভিয়েনায় এসে বাইশ বৎসর বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন সুরু করবার সুযোগ মিললো। রাজধানীতে কত দেশের কত ধর্ম্মের মানুষের সঙ্গে মিশবার সৌভাগ্য হোলো তাঁর। তাদের ভাষা, পোষাক, আদব-কায়দা বিচিত্র। পুলিশ সাহেবের বাড়ীতে থাকার ফলে রাজনৈতিক জগতের বহু রহস্যের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটবার সুযোগ মিলে গেলো।

এর পরেই ম্যাজারিকের জীবনে সুযোগ এলো এক ধনী ইহুদী পরিবারে বাস করবার। জনৈক ইহুদী ব্যবসায়ী থাকবার জন্য স্থান দিলো গৃহে—ছেলের গৃহ-শিক্ষক হ'য়ে থাকবার জন্য। এই ঘটনার কিছু পূর্ব্বে যুবক-ম্যাজারিক একটী ইহুদী বালকের সঙ্গে খেলা করতে যায়। খেলার শেষে সন্ধ্যাবেলায় ম্যাজারিক দেখলো—সঙ্গীটী একমনে প্রার্থনা করছে। এই দৃশ্য ম্যাজারিকের চিত্তকে অভিভূত ক'রে দিলো। ইহুদী জাতির প্রতি শ্রদ্ধায় যুবকের মন ভ'রে গেলো। চেক জাতি ছিলো অস্ট্রিয়ানদের পদানত। অপরের পদানত হয়ে থাকবার বেদনা কি সুগভীর—নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে যুবক তা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি ক'রেছিলো

সেই অভিজ্ঞতার আলোয় ম্যাজারিকের দৃষ্টি সহজেই দেখতে পেলো লাঞ্ছিত ইহুদী জাতির ক্ষতবিক্ষত হৃদয়কে। স্বাধীন মানুষের সঙ্গে শৃঙ্খলিত মানুষের এবং স্বাধীন জাতের সঙ্গে পরাধীন জাতের পার্থক্য কতখানি—নিজের জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে ম্যাজারিক খুব ভালো ক'রেই তা বুঝেছিলেন।

জ্ঞানের মধু দিয়ে মনের মৌচাককে ভরিয়ে তুলবার সুতীব্র বাসনা যুবকের হৃদয়কে অধিকার ক'রে বসেছিলো। ভিয়েনার বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের আর অর্থনীতির ক্লাশে তিনি যোগ দিতে লাগলেন। প্রাচীন-সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় হ'তে লাগলো। জ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রকেও তিনি দূরে রেখে দিলেন না।

এই সময়ে বাহিরের বৃহত্তর জগতকে দেখবার জন্য তাঁর মন আকুল হ'য়ে উঠ্‌লো। পুঁথির জগতে এতকাল বিচরণ ক'রে যাদের তিনি সত্য ব'লে জেনেছেন—বাস্তব জগতের অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে তাদের মূল্যকে যাচাই করবার জন্য তাঁর প্রাণ ছটফট করতে লাগলো। স্বাধীন জাতির জীবনেরই বা রূপ কি, আর পরাধীন জাতির জীবনেরই বা সমস্যা কি—নিজের চোখ দিয়ে একবার দেখা চাই। পরের মুখে ঝাল খেয়ে কতকাল আর কাটবে? শাসনতন্ত্রের বিচিত্র রূপকে দেখবারও তো প্রয়োজন আছে। ম্যাজারিক আরবি পড়তে লাগলেন বিদেশে রাজদূত হ'য়ে যাবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। বংশ-মর্য্যাদা না থাকলে এই পদের যে অধিকারী হওয়া যায় না—এ জ্ঞান ম্যাজারিকের ছিলোনা। ভুল তাঁর ভেঙে গেলো। ম্যাজারিক প্লেটোর মধ্যে ফিরে এলেন। ঘরের মধ্যে বই নিয়ে থাকতে যখন ভালো লাগতো না—ম্যাজারিক তখন বেরিয়ে পড়তেন আকাশের তলায়। মুক্ত বাতাসের মধ্যে হাঁটায় কি আনন্দ! হাঁটায় ম্যাজারিকের কোনোদিনই ক্লান্তি ছিলো না। একদিকে গ্রন্থ—আর একদিকে শ্যামল অরণ্য এবং অবারিত প্রান্তর। গ্রন্থের মধ্যে যা তিনি পেতেন না।—প্রান্তরের মুক্তি আর অরণ্যের শ্যামলিমা থেকে তা তিনি আহরণ করতেন।

ম্যাজারিকের প্রথম বই মৃত্যু সম্পর্কে। বইখানা লিখে ম্যাজারিক মনে করলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের কাজ পাওয়ার পথ এবার প্রশস্ত হবে। কিন্তু তা হ'লো না। ম্যাজারিক লিপজিগে এলেন। এখানে পড়বার সময় তাঁর ভাবী পত্নীর সঙ্গে দেখা। বোষ্টন থেকে তিনি জার্ম্মানীতে এসেছেন সঙ্গীত শিখবার জন্য। দু'জনেরই দু'জনকে দেখে ভালো লেগে গেলো। একত্র ইংরেজ দার্শনিকদের বই পড়া চলতে লাগলো। প্রেয়সীকে গৃহলক্ষ্মীরূপে পাওয়ার জন্য ম্যাজারিক আমেরিকা পর্য্যন্ত ধাওয়া করলেন। তখনকার দিনে আমেরিকা যাওয়া এখনকার মত সহজ ছিলো না। None but the brave deserves the fair—একথা খুবই সত্য। পঞ্চাশ বৎসর ধরে যে দাম্পত্য-জীবন অতিবাহিত করলেন তাঁরা—সে জীবন আদর্শ-জীবন! দু'জনের মধ্যে কেউ ছিলেন না খ্যাতির অথবা ক্ষমতার কাঙাল। ম্যাজারিক তাঁর জীবনে পত্নীর প্রভাব সম্পর্কে বলতেন, I taught her much, but it was she who shaped me. জীবনের অন্ধকারময় অবসাদের মুহূর্ত্তগুলিতে ম্যাজারিককে

প্রেরণা যুগিয়েছে তাঁর স্ত্রীর সাহচর্য্য এবং উৎসাহপূর্ণ বাণী।

যৌবনে ম্যাজারিকের চেহারা ছিলো চমৎকার। দেহের সৌষ্ঠব আর আত্মার সৌন্দর্য্য—এ দুয়ের সুন্দর সমন্বয় ঘটেছিলো ম্যাজারিকের মধ্যে। গরীবের ঘর থেকে এসেছিলেন তিনি—কিন্তু তাঁর পোষাকে-পরিচ্ছদে, চলা-ফেরায়, কথাবার্ত্তায় ছিলো আভিজাত্যের ছাপ। বোহিমিয়ান বলতে যা বোঝায় ম্যাজারিক ছিলেন তার বিপরীত।

দৈব তাঁকে টেনে আনলো প্রাগ সহরে সংগ্রামের মধ্যে। তখন চেকজাতি রাজনীতির এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আপনাদের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য লড়ায়ে ব্যস্ত। ম্যাজারিক আসলেন প্রাগে নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের কাজ নিয়ে। শাসকেরা মনে করেছিলো ম্যাজারিকের আওতায় এসে ছেলেরা ঠাণ্ডা হবে। এতদিন ম্যাজারিক নিজের জাতকে সম্যকরূপে জানবার অবসর পাননি। ভিয়েনাতে যে সব সমস্যা নিয়ে তিনি মাথা ঘামাতেন—তার সঙ্গে চেকজাতির মুক্তি-সমস্যার যোগ ছিলো না। প্রাগে এসে তিনি দেখলেন অস্ট্রো-জার্ম্মানদের সঙ্গে চেকদের দা-কুমড়ো সম্পর্ক। ঘটনার প্রবাহ ম্যাজারিককে রাজনীতির আবর্ত্তের মধ্যে টেনে আনলো। তিনি একখানি সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা করলেন।

ছেলেদের সঙ্গে ম্যাজারিকের ব্যবহার অপূর্ব্ব! এমন অধ্যাপক প্রাগে ইতিপূর্ব্বে আর কেউ আসেনি। ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুর মতো তিনি মিশতে লাগলেন। তাঁর লাইব্রেরীতে তাদের গতিবিধি ছিলো অবাধ—তাঁর বাড়ীতে তাদের চায়ের নিমন্ত্রণ ছিলো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। অধ্যাপকের মধ্যে ছাত্রেরা পেলো তাদের পরামর্শদাতা বন্ধুকে—তাদের সুখ-দুঃখের সাথীকে। ম্যাজারিকের বাড়ীতে যুবকদের ঘনঘন আনাগোনা দেখে কর্ত্তৃপক্ষ শঙ্কিত হ'য়ে উঠলেন।

বয়স যখন তাঁর ষাট বৎসর অর্থাৎ যে বয়সে আমরা কাশী অথবা বৃন্দাবনে যাই ধর্ম্ম-চর্চ্চা করবার জন্য সেই বয়সে ম্যাজারিক রাজনীতির কুরুক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'লেন অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়া বসনিয়াকে উদরসাৎ করলো। এর পরেই সে রাজদ্রোহের অপরাধে তিপ্পান্ন জন সার্ব্ব্ আর ক্রোচকে করলো কারারুদ্ধ। ম্যাজারিক এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করলেন। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাজারিকের যে ঐতিহাসিক অভিযান—এইখানে সেই অভিযানের আরম্ভ। ম্যাজারিক তখন জানতেন না—এই অভিযানের একদিন শেষ হবে স্বাধীন চেকোশ্লোভাকিয়ার অভ্যুদয়ের মধ্যে। জীবনের এত ঝড়তুফানের মধ্যে ম্যাজারিক আপনার সাধনাকে যে সাফল্যমণ্ডিত করতে পেরেছিলেন তার কারণ তাঁর স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্য। খাওয়া-দাওয়া সম্পর্কে অসংযমকে একেবারেই তিনি প্রশ্রয় দিতেন না—ভিয়েনার উপকণ্ঠ থেকে রোজ হেঁটে যাতেন সহরে ইম্পিরিয়াল পার্লামেণ্টে—আবার হেঁটেই ফিরে যেতেন বাড়ীতে। পঞ্চাশ বৎসরের পর থেকে ম্যাজারিক মদ্য আর স্পর্শ করেননি। গান্ধীজী যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্যারিষ্টারি করতেন তখন তিনিও পদব্রজে বাড়ী থেকে যাতায়াত করতেন।

১৯১৪ সাল। ইউরোপে মহাযুদ্ধের দাবানল ধূ ধূ ক'রে জ্বলে উঠলো। ম্যাজারিকের বয়স তখন ষাট থেকে পঁয়ষট্টির মাঝামাঝি। শরীরে এবং মনে প্রচুর শক্তি। পঞ্চাশ বৎসর ধ'রে বিন্দু বিন্দু ক'রে জ্ঞানের যে মধু আহরণ ক'রেছেন সেই মধু তাঁর মনের মৌচাককে পূর্ণ ক'রে রেখেছে। কত দেশ-দেশান্তরে পরিভ্রমণ করেছেন তিনি! কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা কুড়িয়েছেন সংসারের পথে চলতে চলতে! কত প্রতিভাবান মানুষের সঙ্গে ঘটেছে তাঁর পরিচয়। যে বিরাট কাজ করবার জন্য পৃথিবীতে তাঁর আবির্ভাব—সেই কাজের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার সময় নিকট হ'য়ে এসেছে। দৈহিক এবং মানসিক শক্তির প্রাচুর্য্য নিয়ে তিনি প্রস্তুত কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য। সে কাজ কি? অস্ট্রিয়ার উদ্ধত রাজতন্ত্রের অবসান ঘটানো এবং স্বাধীন চেকোশ্লোভাকিয়ার সৃষ্টি। মিত্রশক্তি ইউরোপে অস্ট্রিয়ার রাজতন্ত্রকে খাড়া রাখতে চেয়েছিলো। অস্ট্রিয়ার রাজতন্ত্রের পতনকে সম্ভব করলো ম্যাজারিকের ব্যক্তিত্ব। ষাটের কোঠায় পা দিয়ে ম্যাজারিক স্পষ্ট বুঝতে পারলেন—জাতির মঙ্গল ঘটানো জোড়াতালির কাজ নয়। বিপ্লবের পথ ছাড়া মঙ্গলের আর কোনো পথ খোলা নেই। যে বয়সে মানুষ বাণপ্রস্থ অবলম্বন করে শান্তির কামনায়—সেই বয়সে ম্যাজারিক যাত্রা করলেন বিপ্লবের কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম শৈল-পথে। এই বিপ্লবী জীবনের মুক্তি সাধনাকে জয়যুক্ত করবার জন্য যে ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন—সেই ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলবার জন্য বিধাতার কত আয়োজন, কত পরিচর্য্যা! কত নূতন নূতন ঘটনার অবতারণা! প্রণাম করি সেই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তিকে যিনি আমাদের জীবনকে দান করছেন নব নব বিচিত্র অভিজ্ঞতা—তাঁরই কাজকে করিয়ে নেবার জন্য।

যুদ্ধ বাধবার পর প্রথম কয়েক সপ্তাহ ম্যাজারিক প্রাগে ঘুরে বেড়ালেন। মাথায় তাঁর অনেক রকমের পরিকল্পনা ঘুরে বেড়াতে লাগলো। তারপর তিনি চলে গেলেন হল্যাণ্ডে। অষ্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের মধ্যে গুপ্তচরের ছড়াছড়ি। পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে কিছু করবার যো নেই। কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে ম্যাজারিক কথাবার্ত্তা কইলেন। তারা জানলো—ম্যাজারিক বিদেশে চলেছেন সেখান থেকে দেশে বিপ্লব ঘটাবার জন্য। এই গোপন কথাবার্ত্তা কাগজে কলমে কিছু রইলো না। বিপ্লবের পরিকল্পনার কথা—ম্যাজারিক আপন স্ত্রীর কাছেও ভাঙলেন না। তিনি জানতেন পুলিশ এসে তাঁর পত্নীকে জ্বালাতন করবে—আর মিথ্যা কথা কখনো তিনি বলতে পারবেন না।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে ম্যাজারিক কন্যাদের মধ্যে একজনকে নিয়ে ইটালী যাবার ট্রেনে আরোহণ করলেন। কন্যাটি তখন অসুস্থা, অষ্টিয়ার সীমান্তে পেঁাছে তিনি বাধা পেলেন। গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে বিদেশে যাবার অনুমতি পাননি তিনি। ম্যাজারিক পঁয়ষট্টি বছরের মধ্যে যা করেন নি—তাই ক'রে ফেললেন। আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে চলন্ত গাড়ীতে কন্যাকে নিয়ে তিনি উঠে বসলেন। তারপরই ইটালি। ইটালিতে তাঁকে

ধরে কে ? আইনের চোখে কাজটা অবৈধ হবে—এই বিবেচনা ক'রে ম্যাজারিক যদি অষ্ট্রিয়ায় থেকে যেতেন তবে স্বাধীন চেকো-স্লোভাকিয়ার অভ্যুদয় কোন দিনই ঘটতো না। চলন্ত ট্রেনে ম্যাজারিকের ঝাঁপ দেখার উপর অষ্ট্রিয়ার ভাগ্য নির্ভর করছিল। রাসিয়ার ভাগ্যও কি একদিন নির্ভর করেনি সেই রেলগাড়ীখানির উপরে—যা লেনিনকে পেঁছে দিয়েছিলো রাসিয়ার মাটিতে? এই ঘটনা ম্যাজারিকের অষ্ট্রিয়া ত্যাগের তিন বৎসরের পরের ঘটনা। এই দুইটি ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে একটা জায়গায় বিপুল সাদৃশ্য আছে। লেনিন আর ম্যাজারিক—দু'জনকেই সীমান্ত ত্যাগ করতে হয়েছে জীবনের মহাব্রত উদ্‌যাপন করবার জন্য। লেনিন তাঁর স্বদেশে ফিরেছেন সেখানে বিপ্লবের দাবানলকে জ্বালিয়ে দিতে। ম্যাজারিক তাঁর স্বদেশকে পরিত্যাগ করেছেন মাতৃভূমিতে বিপ্লব ঘটানোর জন্য বিদেশে মাল-মসলা সংগ্রহের কাজে। রোমে এসে ম্যাজারিকের সঙ্গে দেখা হোলো কয়েকজন নির্ব্বাসিত বিপ্লবীর সঙ্গে। অষ্ট্রিয়ার অত্যাচারের অবসান ঘটাবার জন্য তারা ম্যাজারিকের সঙ্গে যোগ দিলো। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে জেনেভায় এসে ম্যাজারিক সুরু করলেন তাঁর ষড়যন্ত্রের সূক্ষ্ম জাল বুনতে। গোপনে গোপনে অষ্ট্রিয়ায় তিনি চিঠি পাঠাতে লাগলেন। অদৃশ্য কালি দিয়ে চিঠি লিখবার কৌশল আগেই তিনি শিখে নিয়েছিলেন। ম্যাজারিকের জীবনে লুকোচুরির খেলা এই প্রথম সুরু হোলো। মানুষের তৈরী আইনের চেয়েও যে বড়ো আইন আছে—এই বিশ্বাস ছিলো বলেই ম্যাজারিকের পক্ষে ষাট বৎসর বয়সে বে-আইনী কাজ করা সম্ভব হয়েছিলো।

কেন তিনি জীবনের অপরাহ্নে বিদেশে নির্ব্বাসিতের জীবনকে বেছে নিলেন ? কারণ মিত্রশক্তিকে একথা বোঝানোর প্রয়োজন ছিলো, তাদের স্বার্থের জন্যই অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির বিলোপসাধন প্রয়োজনীয়। ফ্রান্স, ইংলণ্ড, ইটালি—এই তিন দেশের রাষ্ট্রনীতি-বিশারদেরা, কিন্তু, অষ্ট্রিয়াকে নিশ্চিহ্ন করবার বিরোধী ছিলো। তাদের লক্ষ্য ছিলো জার্ম্মানীর সঙ্গে অষ্ট্রিয়ার বিচ্ছেদ ঘটানো এবং অষ্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যকে একটা নূতন ভিত্তির উপরে গ'ড়ে তোলা। ম্যাজারিক মহা মুস্কিলে পড়লেন। কতদিনে যে মিত্র-শক্তির ভুল ভাঙবে ?

ইউরোপের ও আমেরিকার রাষ্ট্রনীতি-বিশারদেরা একটা জায়গায় ম্যাজারিকের কাছে হার মানতে বাধ্য হোলেন। ইউরোপ সম্পর্কে ম্যাজারিকের জ্ঞান ছিলো অপরিমেয়। ইউরোপের রাজনীতি সম্পর্কে ম্যাজারিকের জ্ঞান জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে। তাছাড়া জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচরণ ক'রে ম্যাজারিক যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের অধিকারী হয়েছিলেন। ইউরোপ সম্পর্কে তিনি ছিলেন একটী চলন্ত এন্‌সাইক্লোপিডিয়া। ইংরেজ মন্ত্রীরা নিজেদের ভাষা ছাড়া অন্য ভাষা বোঝে না। তাদের বিদেশ-ভ্রমণের অভিজ্ঞতাও খুব বেশী নয়। ফরাসীরা স্বভাবতই কুণো—আমাদের বাঙালীদের মতো। আমেরিকানরা ইউরোপকে জানে—কিন্তু জ্ঞান একেবারেই গভীর নয়। জানার দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে ম্যাজারিকের সঙ্গে তাদের কোনো তুলনাই হয় না।

তাছাড়া ম্যাজারিকের চরিত্রের মহত্ত্ব, তাঁর নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম, তাঁর জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, তাঁর পাণ্ডিত্যের বিশালতা —সব কিছু মিলে ম্যাজারিকের চারিদিকে এমন একটা মহিমা রচনা করেছিলো যার কাছে মাথা না নুইয়ে কোনো উপায় ছিলো না। ম্যাজারিকের আচরণ ছিলো সর্ব্বপ্রকার হীনতার ঊর্দ্ধে। তিনি তাঁর সহচরগণকে বলতেন, মিথ্যার আর অত্যুক্তির স্বারা প্রচার কার্য্যের যত ক্ষতি হয় এমন আর কিছুতে নয়। যারা রাজনীতির সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে জড়িত নয়—তাদেরও মুক্তি সংগ্রামের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে আর তার উপায় হ'চ্ছে শিল্প আর সাহিত্যের আলোচনা। অষ্ট্রো-জার্ম্মানদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনারও তিনি বিরোধী ছিলেন। ম্যাজারিক ছিলেন দার্শনিক আর কাজের মানুষ। কেমন ক'রে মানুষের হৃদয় জয় করতে হয় তার রহস্য তিনি ভালো ক'রেই জানতেন। বিদেশে তাঁর কাজের অন্ত ছিল না। বিভিন্ন রাষ্ট্রের কর্ণধার এবং বড়ো বড়ো কাগজের সম্পাদক যাঁরা—তাঁদের নিজের মতে নিয়ে আসাই ছিলো তাঁর সব চেয়ে বড়ো কাজ, আর এই কাজকে সুসম্পন্ন করবার জন্য তাঁকে কম বেগ পেতে হয়নি। মন্ত্রীদের কাছে সোজাসুজি গিয়ে তিনি কখনো আলাপ করতেন না। যাঁরা তাঁর বন্ধু এবং মন্ত্রীদেরও পরিচিত—তাঁদের দিয়ে আগে কথা বলাতেন—পরে নিজে গিয়ে আলাপ করতেন। লণ্ডনে এসে এক বৎসর তিনি লয়েড জর্জ্জের সঙ্গে দেখা করেন নি। ধীরে ধীরে এক বন্ধুর সাহায্যে বিলাতের দশখানি সংবাদপত্রকে তিনি হাতের মধ্যে পেলেন। এই সময়ে ম্যাজারিকের প্রকাশিত গ্রন্থগুলি লণ্ডনের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে তাঁর ঢুকবার পথ প্রশস্ত ক'রে দিলো। ম্যাজারিক লণ্ডনে অধ্যাপকের কাজ পেলেন। যে কাজ করবার জন্য তিনি জন্মভূমি পরিত্যাগ করেছিলেন—অধ্যাপকের সম্মানিত আসন পাওয়ায় সেই কাজের অনেক সুবিধা হয়ে গেলো।

এই সময়টা যে কত কাজের মধ্য দিয়ে তাঁর কেটে গেছে। ইউরোপের রাজনৈতিক মানচিত্রে প্রতিটি পরিবর্ত্তনের উপরে তাঁর দৃষ্টি রাখতে হোতো। রাজনীতিবিশারদেরা কোথায় কি করছেন—কখন কি চাল্ চাল্‌ছেন—প্রত্যেকটি ঘটনার দিকে দৃষ্টি রেখে তাঁকে চলতে হ'য়েছে পদে পদে। তিনি ছিলেন একেবারে নিঃসঙ্গ। কাজের বোঝা ছিলো এত প্রকাণ্ড যে, ঘুমানোর অবসর ছিলো না। এমিল লুড্‌উইগ ম্যাজারিকের এই সময়কার জীবনের কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন—

> He hardly slept at all, and though now in the middle sixtees, he learned to ride on horse-back in order to maintain his physical fitness.

এরই নাম বলে তপস্যা।—

এই সময়ে তাঁর কন্যা অবশ্য তাঁকে অনেক রকম সাহায্য করেছে। ম্যাজারিকের প্রতিটি মুহূর্ত্ত ব্যবহার করতে হয়েছে তপস্যায় সিদ্ধি লাভের জন্য। সিনেমায় যেতেন মিত্রপক্ষের নেতৃবৃন্দের প্রতি জনসাধারণ কি মনোভাব পোষণ করে তা জানতে। কোনো সমস্যা যখন অত্যন্ত জটিল হ'য়ে দেখা দিতো, ম্যাজারিক তখন সহর থেকে গ্রামে চলে

যেতেন নীরবতার মধ্যে সমস্যার সমাধান করতে। অন্ধকারের মধ্যে আশার ক্ষীণ জ্যোতিঃ দেখা দিলো। ব্রিঁয়াকে তিনি বোঝাতে পারলেন, চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাতন্ত্র্যলাভের অধিকার আছে।

এইবার এলো কাজের কঠিনতম অংশ। জাতিকে স্বাধীনতা লাভ করতে হ'লে তার পক্ষে লড়াই করবারও প্রয়োজন আছে। চেকোশ্লোভাকিয়ার নিজস্ব যদি সৈন্যবাহিনী না থাকে, তবে মিত্রশক্তির কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া কঠিন। কি করা যায়? ম্যাজারিক জীবনে বন্দুক ধ'রে একটা খরগোসও মারেন নি। তিনি কেমন ক'রে রাতারাতি সৈন্যদল সৃষ্টি করবেন? অস্ট্রিয়ার সৈন্যদল থেকে পালিয়ে গিয়ে অনেক চেকোশ্লোভাক সৈনিক রাসিয়ায় আশ্রয় নিয়েছে। তাদের একত্রিত ক'রে যদি সৈন্যবাহিনীতে পরিণত করা যায়, তবেই কার্য্যোদ্ধার হয়। ম্যাজারিক স্থির করলেন—রাসিয়ার মাটিতে চেকোশ্লোভাক সৈন্যবাহিনী গ'ড়ে তুলতে হবে। কিন্তু জার যে একাজে প্রকাণ্ড অন্তরায়! ম্যাজারিক অপেক্ষা করতে লাগলেন। জারের পতন হোলো। তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব্বতন সহকর্ম্মী মিলজুকো রাষ্ট্রের একজন কর্ণধার হোলেন। ম্যাজারিকও লণ্ডন থেকে পেট্রোগ্রাডে এসে হাজির। অবশ্য অনেক ঘুরে আসতে হোলো। পেট্রোগ্রাডে ব'সে দু'জন দর্শনের অধ্যাপক—কোনোদিন যারা সৈনিকের উর্দ্দি পরেনি—যুক্তি করে ঠিক করলেন, চল্লিশ হাজার চেকোশ্লোভাক স্বেচ্ছাসেবক দিয়ে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী গঠন করতে হবে। পরিকল্পনাকে কাজে পরিণত করবার জন্য কমিটি গঠিত হ'য়ে গেলো। অস্ট্রিয়ান সৈন্যদল পরিত্যাগ ক'রে এসেছিলো যারা রাসিয়ায়—তাদের সামনে সিভিলিয়ান পোষাকে দাঁড়িয়ে ম্যাজারিক বললেন, 'অস্ট্রো-জার্ম্মান সৈন্যদলের হাতে বন্দী হওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই তোমাদের যদি তারা বিজয়ীর বেশে রাসিয়ায় আসে। তোমরা হাতে তুলে নাও হাতিয়ার—স্বদেশের মুক্তির জন্য মিত্রপক্ষের হ'য়ে তোমাদের লড়াই করতে হবে। তার জন্য হয়তো ফ্রান্সের সমরক্ষেত্রে যেতে হবে তোমাদের।' স্বেচ্ছাসেবকেরা নিঃশব্দে তাঁর কথা শুনলো—তারপরে নিঃশেষে আপনাদিগকে সমর্পণ করলো তাঁর হাতে। শুনতে লাগে রূপকথার মতো। একজন নিরীহ প্রকৃতির অধ্যাপক—জীবন কাটিয়েছেন দর্শনের সমস্যা নিয়ে—একটা মাছি মারতেও মনের মধ্যে কুণ্ঠা বোধ করেছেন—তিনি একদিন সহসা রূপান্তরিত হ'লেন সৈন্যদলের অধিনায়কে। ম্যাজারিক এই স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে শিবিরে যাপন করতে লাগলেন সৈনিকের জীবন। দিনের পর দিন তাদের তিনি বোঝাতে লাগলেন—যে স্বাধীন স্বদেশ রয়েছে তাদের স্বপ্নের মধ্যে তাকে বাস্তবের রূপ দিতে গেলে লড়াই করতে হবে বিদেশের মাটিতে হাতে হাতিয়ার নিয়ে। সেই স্বপ্ন ধূলিসাৎ হ'য়ে যেতেও পারে, যদি জার্ম্মানী জয়লাভ করে অথবা মিত্রশক্তি অস্ট্রিয়ার সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়।

এইবার এমন একটা কিছু করার দরকার যা জগতকে চমকে দেবে—বিশেষত আমেরিকাকে। ম্যাজারিক ঠিক করলেন সাইবিরিয়া অতিক্রম করবেন তিনি সৈন্যবাহিনী নিয়ে। সেখান থেকে আমেরিকা হ'য়ে তাঁর সৈন্যদল ইউরোপের সংগ্রাম-ক্ষেত্রে পেঁছাতে পারবে। ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে আর কোনো দিক দিয়ে পেঁছানোর উপায় ছিল না। রাসিয়ার দক্ষিণ দিক দিয়ে ছিলো শত্রুদলের আধিপত্য। আটষট্টি বছর বয়সে রেলগাড়ীর তৃতীয় শ্রেণীতে ব'সে ম্যাজারিক জাপানের উপকূলে পেঁছালেন। গাড়ীতে তাঁর লেখনী চলতে লাগলো অক্লান্তভাবে। এসিয়ার বুকের উপর দিয়ে চলেছে গর্জ্জমান রেলগাড়ী—সেই গাড়ীর মধ্যে লেখনী হস্তে একজন বৃদ্ধ অধ্যাপক—ইউরোপ থেকে আমেরিকায় তাঁর তীর্থযাত্রা—তাঁর পিছনে চল্লিশ হাজার চেকোশ্লোভাক সৈনিক—সামনে উড্রো উইলসন—তাঁরই মতো আর একজন অধ্যাপক যিনি দৈবক্রমে এসে পড়েছেন রাজনীতির ক্ষেত্রে। উইলসন ইচ্ছা করলে চেকোশ্লোভাকিয়াকে স্বীকারও করতে পারেন, অস্বীকারও করতে পারেন। টোকিয়ো পেঁছে ম্যাজারিক আমেরিকার রাষ্ট্রপতিকে একটা দীর্ঘ তার ক'রে দিলেন। তারের শেষের দিকে তিনি লিখলেন—চল্লিশ হাজার চেকোশ্লোভাক স্বেচ্ছাসেবক তাঁর পিছনে পিছনে আসছে।

১৯১৮ সালের মে মাসে চিকাগো রাজসমারোহে তাঁকে অভ্যর্থনা করলো। তাঁর কীর্ত্তির কথা আমেরিকায় আগেই পেঁছেছিলো। দলে দলে মানুষ এসে তাঁকে ঘিরে দাঁড়ালো—এতদিনে বুঝি তাঁর স্বপ্ন সফল হ'তে চলেছে।

উইলসনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত ঘটিয়ে দিলেন উভয়েরই পরিচিত বন্ধু। দু'জন অধ্যাপক মিলে কি কেবল রাজনীতির কথাই বললেন? ইতিহাস আর দর্শন নিয়ে দুই মহাপণ্ডিত বহু আলোচনা করলেন। দু'জনেই দু'জনের লেখার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। কথাবার্ত্তার ফলে উইলসন অস্ট্রিয়া থেকে চেকোশ্লোভাকিয়াকে বিচ্ছিন্ন করতে সম্মত হ'লেন। মধ্য ইউরোপের মানচিত্র সম্পর্কে উইলসন যে ধারণা ক'রে রেখেছিলেন, সে ধারণার তিনি পরিবর্ত্তন করলেন।

এতদিনে ম্যাজারিকের মনস্কামনা পূর্ণ হোলো। অস্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের পতন ঘটলো—চেকোশ্লোভাকিয়ার হাতে দুলে উঠলো তার স্বাধীন পতাকা তিনশত বৎসরের পরাধীনতার পরে। আমেরিকায় তাঁর স্বদেশবাসীদের কাছ থেকে টেলিগ্রাম এলো—তাঁকেই চেকোশ্লোভাকিয়ার রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত করা হয়েছে।

অনেকদিন পরে নির্ব্বাসিত বীর স্বদেশের দিকে যাত্রা করলেন। ইতিমধ্যে তাঁর পরিবারের উপর দিয়ে কত ঝড়-ঝঞ্ঝা ব'য়ে গেছে। তাঁর কার্য্য-কলাপের কথা জানতে পেরে পুলিশ ম্যাজারিক-পত্নীকে গ্রেপ্তার করেছে, তাঁর কন্যাকে জেলখানায় নিয়ে গেছে, তাঁর একটি পুত্র কারাগারে টাইফয়েডে প্রাণ হারিয়েছে এবং আর একটি পুত্রকে অস্ট্রিয়ান সৈনিকের দুঃসহ জীবনযাপন করতে হয়েছে। অনেকদিন পরে ম্যাজারিক ফিরে এলেন দেশে রাষ্ট্রপতির মুকুট মাথায় প'রে। স্ত্রী তখন স্যানাটোরিয়ামে রোগশয্যায় প'ড়ে আছেন।

যে দুর্গ ছিলো অস্ট্রিয়ান সম্রাটদের বিলাসিতার রঙ্গভূমি—সেখানে ম্যাজারিকের প্রিয়াহীন প্রথম রাত্রি কেমন ক'রে কেটেছিলো—কে জানে? অতীত জীবনের নির্ব্বাসনের দিনগুলির কথা নিশ্চয়ই বারে বারে তাঁর মনের মধ্যে জেগে উঠেছিলো। জীবন সত্যই বিচিত্র—তার ঘটনাগুলি আরব্যোপন্যাসের কাহিনীর চেয়ে কি কম চিত্তাকর্ষক? আর এই জীবনের ভাঙা-গড়ার খেলার পিছনে কি কোনো অদৃশ্যশক্তির হাত নেই? কে যে আমাদের জীবনে ঘটনার পর ঘটনাকে ঘটিয়ে চলেছে! অসম্ভব হ'য়ে যাচ্ছে সম্ভব—বাস্তব কল্পনাকেও হার মানিয়ে দিচ্ছে।

ইতিহাসে ম্যাজারিকের সঙ্গে তুলনা হয় শুধু লিঙ্কনের। দু'জনেই এসেছেন দরিদ্রের ঘর থেকে—দু'জনেই হয়েছেন রাষ্ট্রপতি। দু'জনেই রাজনীতির ক্ষেত্রে হয়েছেন অবতীর্ণ জীবনের মধ্যাহ্ন পার হ'য়ে গেলে। চরিত্রের দুর্জ্জয় শক্তি দু'জনকে করেছে লোকচক্ষে বরণীয়—বাহিরের খোলা হাওয়ায় মুক্ত-জীবনের আনন্দকে দু'জনেই বেসেছেন ভালো। ম্যাজারিককে গুলি করতে গিয়ে আততায়ীর হাত ওঠেনি তাঁর চোখে শিশুর দৃষ্টি দেখে। লিঙ্কনকে যে গুলি করেছিলো পিছন থেকে সে যদি তাঁর চোখের দিকে চাইতে পারতো, হাত তার নিশ্চয়ই কেঁপে যেতো।

ম্যাজারিকের জীবন থেকে আমরা কি শিখি? শিখি—দর্শন প'ড়ে এবং অধ্যাপক হ'য়েও আমরা রাষ্ট্রনীতিবিশারদ হ'তে পারি। অধ্যাপনা ক'রলে মানুষ অকেজো হ'য়ে যায়—এর কোনো মানে হয় না। আর শিখি—লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয় জয় করতে হ'লে হিটলারের অথবা মুসোলিনীর মতো বক্তা না হ'লেও চলে। আর একটা জিনিষ শিখি—বিপ্লবের জয়রথকে চালাতে হ'লে অর্থের প্রাচুর্য্যের প্রয়োজন নেই। সর্ব্বোপরি—ম্যাজারিক শিখিয়েছেন—রাজনীতিকে মিথ্যার এবং কপটতার ঊর্দ্ধে রাখবার আদর্শ।

টিফিন ক্যারিয়ারের দৌত্য

(৫০৫ পৃষ্ঠার পর)

পিসিমা খুশী হইয়া বলিলেন—তুই কি করিয়া জানিস বাড়ীর খাবার।

প্রশান্ত অপ্রস্তুত হইয়া গেল। সে আমতা আমতা করিয়া যাহা বলিল, তাহা অনেকটা উৎকলবাসী পিওনের চিলে খাবার খাইয়া ফেলার গল্পের মত শুনাইল।

পিসিমা মিনিকে সেইদিনই আনাইলেন। মিনি নূতন উদ্যমে খাবার প্রস্তুত ও ডেস্‌প্যাচ্‌ করিতে লাগিল। টিফিন্‌ ক্যারিয়ারের ভিতর বেশ বড় বড় লেটার পেপারে চিঠি লেখা চলিতে লাগিল।

খাবার করিতে যত সময় মিনির না লাগে, চিঠি লিখিতে আজকাল তত সময় লাগে। উত্তর প্রত্যেক চিঠির সেইদিনই আসা চাই। প্রশান্তর আফিসের আরজেণ্ট্‌ ফাইল পড়িয়া থাকিত—যতক্ষণ না চিঠির উত্তর লেখা হইত। লেটার পেপারের রঙ্‌ সাদা হইতে হ'লদে, নীল ও ক্রমে লাল হইল। উভয়ে চিঠির পূর্ব্বে যোগ্য পাঠ ও নীচে নামের আগে যোগ্য বিশেষণ ব্যবহার করিতে লাগিল।

মিনি লেখে—"জেঠাইমা সেদিন ব'লছিলেন"—তারপর কি একটা লিখিতে গিয়া কাটিয়া দিয়া—"না, লিখতে ও কথা আমার ভারী লজ্জা করে।"

প্রশান্ত উত্তরে লিখিল "আমারও ভারী লজ্জা করে।"

মিনি লিখিল "আপনি ভারী ঠাট্টা করেন।"

প্রশান্ত লিখিল "আমি ভারী দুষ্টু, না?"

মিনি উত্তর দেয়, "যান্‌, আপনি ভারী ইয়ে। জেঠাইমা ব'লছিলেন এটা চৈত্র মাস না হলে এই মাসেই আমাদের"—তারপর কি লিখিয়া কাটিয়া দিয়াছে।

বৈশাখ মাসে একদিন এ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল আফিসের অফিসারগণ প্রশান্তর বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়া মিনি ওরফে মিসেস্ প্রশান্তকে অনেক উপহার দিয়া গেল।

তার মধ্যে একটি আইভরির টিফিন্‌ ক্যারিয়ার দেখিয়া প্রশান্ত মিনিকে বলিল, ভাগ্যে পিওনটা খাবার চুরি ক'রে খেয়েছিল—তাই তোমাকে পেলাম।

মিনি বলিল, না খেলেও আমি তোমাকে পেতাম। আমি না সেজে দিলে ত বাবুর পান খাওয়াই হয় না। পানের খিলিতে চিঠি পুরে দিতে ওবাড়ীর বৌদি আমায় শিখিয়ে দিয়েছে ত।

—হুঁ, কিন্তু আমি বেচারা কি করতাম্‌?

—তুমি না হয় রুমাল কাচতে দিতে আমার কাছে কোণে একফালি কাগজ মুড়ে বেঁধে। ইন্‌ভিজিব্‌ল্‌ কালিতে লিখে।

তারপরের কথাবার্ত্তা হয়েছিল চুপি চুপি।

মানবীয় ঐক্যের আদর্শ

(৪৬২ পৃষ্ঠার পর)

প্রধান নগরী কর্ত্তৃক জাতির শ্রেষ্ঠ শক্তি সকলকে অত্যধিকভাবে টানিয়া লইবার ব্যাধিটির প্রতিকার করিবে এবং বহু কেন্দ্র ও চক্রের ভিতর দিয়া তাহাদের চলাচলের সুবিধা করিয়া দিবে। সেই সঙ্গে আমরা ধারণা করিতে পারি যে, সমগ্র সচেতন, সক্রিয়, প্রাণময় জাতিটির এখন সজ্ঞান প্রতিনিধিস্বরূপে রাষ্ট্রটিকে ব্যষ্টির ও সমষ্টির জীবনের পূর্ণতা সাধনের উপায়রূপে ব্যবস্থাবদ্ধভাবে প্রয়োগ করা যাইবে। আধি-জাতিক ঐক্যের বিকাশ এখন এই অবস্থাতেই আসিয়া পৌঁছিয়াছে, এখন আবার আমরা সাম্রাজ্যিক ঐক্যের বৃহত্তর সমস্যার এবং সমগ্র মানবজাতির ক্রমবর্দ্ধমান কৃষ্টিগত ঐক্য এবং বাণিজ্য ও রাজনীতিতে পরস্পরের উপর নির্ভরতার দ্বারা সৃষ্ট আরও বিশালতর সমস্যা-সকলের সম্মুখীন হইয়াছি।*

(ক্রমশ)

* The Ideal of Human Unity (Arya, 1916) হইতে শ্রীঅনিলবরণ রায় কর্ত্তৃক অনূদিত।

বিচিত্র বার্তা

গুপ্ত সংবাদদাতাদের কৌশল

সাধারণত শান্তির সময়ে গোপন সংবাদ সংগ্রহ বা প্রেরণে বিশেষ সতর্কতার আবশ্যক হয় না, কারণ সন্দেহের উদ্রেকে পাল্টা-গোয়েন্দাগিরির কড়া ব্যবস্থা থাকে না। কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হইলে কিম্বা বিপ্লব-বিক্ষোভের সূচনা হইলে অতি হুঁসিয়ারি ব্যবস্থার প্রয়োগ করা হয়। তখন গোপন সংবাদ সংগ্রহকারীর নিতান্তই সতর্ক হইবার প্রয়োজন। ডাকে প্রেরণ করিলে সংবাদ আটক পড়িবে, সঙ্গে করিয়া স্থানত্যাগ করিতে চাহিলে হয়ত সীমান্তপ্রদেশে খানা-তল্লাসীর ফলে ধরা পড়িতে হইবে। এমন অবস্থায় ঐ সকল সেয়ানা গোপন-সংবাদবাহকগণ অতি চতুর কৌশলের উদ্ভাবনা করে।

একটি জার্ম্মান মহিলা-স্পাই তাহার সংবাদ বহন করিয়াছিল গলার মুক্তার মালার অভ্যন্তরে। মুক্তার মালার ভিতর একটি মুক্তা ছিল ফাঁপা—উহার ভিতরে সরু লম্বা ফালি কাগজে অদৃশ্য কালিতে লিখিত সংবাদ ছিল। যথাযোগ্য রাসায়নিক পদার্থের প্রয়োগে ভিন্ন ঐ লেখা দেখিতে পাওয়া যাইবে না। দুই লহর মালার ভিতর কোন মুক্তাদানাটিতে এই কারসাজি করা হইয়াছে, সন্দেহ হইলেও তাহা ঠাওরান সহজ কথা নয়। আর এক ছড়া মুক্তার মালায় সাধারণত সন্দেহ করিবার মত কিছুই থাকে না। স্পাইগণ এমন মালা পরিধানের সময় আগেই সতর্ক হয় যাহাতে কোনপ্রকারে মুক্তাদানাগুলির অস্বাভাবিক কোন কিছু না নজরে পড়ে—না আকারে আকৃতিতে, না চমকপ্রদ সৌন্দর্য্যে।

অদৃশ্য কালিতে লিখিত না হইয়া অনেক সময় সাঙ্কেতিক বাণী থাকে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত এমন কোন সাঙ্কেতিক ভাষা গঠিত হইতে পারে নাই, যাহা (সহজে হউক আর অতি কষ্টে হউক) বিপক্ষ কর্ত্তৃক উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই।

একটি ফরাসী গোয়েন্দা তাহার গুপ্ত সংবাদ লুকাইয়া রাখিয়াছিল নিজের কৃত্রিম কাচ-চক্ষুর নীচে। তাহার বিনষ্ট দক্ষিণ চোখটিতে ছিল কৃত্রিম কাচচক্ষু পরিবার ব্যবস্থা। সংবাদের সরু ফালি কাগজ কৃত্রিম চক্ষুতারকার নীচে লুক্কায়িত রাখিয়া নিরাপদে স্বদেশে ফিরিতে তাহার বেগ পাইতে হয় নাই।

কৃত্রিম দাঁতের সঙ্গে সংবাদ

কৃত্রিম কাচ-চক্ষুতারকার নিম্নে গোপনে রক্ষিত সংবাদ-সম্বলিত ভাঁজকরা কাগজ

কৃত্রিম চক্ষুর মতই কৃত্রিম দাঁতের সহিত কোন কোন গোয়েন্দা কাগজে লিখিত গোপন সংবাদ বহন করিয়া থাকে। মুখের ভিতর রাখার সময় খুব মিহি জল-নিরোধক কাগজে ঢাকিয়া সংবাদের কাগজখানি রাখিলে কোনই অনিষ্ট হইতে পারে না। এই কৌশলও জানিতে পারা গিয়াছে গোপন সংবাদবাহক ধরা পড়িবার পর সূক্ষ্ম খানাতল্লাসীতে।

পুস্তক পরিচয়

বিপ্লবী চীন :—শ্রীসুধাংশুলাল দাশগুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক—অগ্রণী, ১০নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৭১; দাম আট আনা।

চীন-জাপান লড়াই প্রসঙ্গে এ দুইটি দেশের কথা আমরা অনেক শুনিয়াছি। চীনের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্পর্ক বহু দিনের। কিন্তু আজিকার দিনে চীন কোন্ বিষয়ে কতটা অগ্রসর হইয়াছে সে বিষয়ে আমাদের জ্ঞান অতি সঙ্কীর্ণ। আলোচ্য পুস্তকখানিতে চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টির ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। চীনের জাতীয় সংগঠন ও সংহতি সাধনে এই দলের কৃতিত্ব অসামান্য। এদেশটির বিরাট জনসমাজের মধ্যে জাগরণ আনিয়াছে এই দলভুক্ত লোকেরা বিশেষ করিয়া। ইহাদের এই সব [illegible] কার্য্য ও চীন সরকার পক্ষীয় কুমিংটাং দলের সঙ্গে সংঘর্ষের কথা এই পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে। চীন যে জাপানের বিরুদ্ধে দেড় বৎসরের অধিক-কাল লড়িতে সক্ষম হইয়াছে, তাহা এই দুই দলের মধ্যে মিলনের ফলে। পাঠক-পাঠিকা এইসব বিষয় পুস্তকখানি পাঠে বিশেষভাবে জানিতে পারিবেন।

মহাচীনে মহাসমর : শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর প্রণীত। এম সি সরকার এণ্ড সন্স্ লিমিটেড, ১৪, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৯৮; দাম বার আনা।

চীন-জাপান যুদ্ধের কথা আমরা অনেক পড়িয়াছি। সংবাদে, প্রবন্ধে, পুস্তকে ইহার কথা কতই না বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু গল্পচ্ছলে এবিষয় বোধ হয় আমরা এই প্রথম পাঠ করিলাম। পুস্তকখানি ছেলেদের উপযোগী করিয়া লেখা। লেখক কয়েকটি বিশেষ বিশেষ বিষয়ের উপর আলোকপাত করিবার জন্য গল্পগুলি রচনা করিয়াছেন। ঠিক বাস্তব ঘটনা হইতেই যে এগুলি আহৃত তাহা মনে হয় না। তথাপি অনুরূপ ঘটনা হইতে এসব সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়া পাঠকের নিকট বাস্তব বলিয়াই বোধ হইবে। নান্‌কিন্ ফ্রণ্টে, সানইয়াতের সমাধি, জাপানী যুদ্ধ, মৃত্যুর মুহূর্ত্তে, জাপানী সংবাদ, মহাচীনে মহাসমর—এই কয়টি গল্প বা কাহিনী ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কয়েকটি রেখা-চিত্রও দেওয়া হইয়াছে। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া ছেলে-মেয়েরা আনন্দ পাইবে।

বুকের বীণা :—শ্রীহরেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত। মূল্য পাঁচ সিকা। প্রাপ্তিস্থান—৭৫নং বংশী গলি, বারাণসী। কবিতার বই। ছাপা বাঁধাই ভাল। অনেকগুলি কবিতা আছে।

সাহিত্য-সংবাদ

তারিখ পরিবর্ত্তন

গত ১২শ সংখ্যা দেশ পত্রিকায় ঢাকার 'সাহিত্য-সংসদ' হইতে আমরা যে ছোট গল্প ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা আহ্বান করিয়াছিলাম, উহাতে রচনা পাঠাইবার শেষ তারিখ ১১ই মার্চ্চের পরিবর্ত্তে কোন অনিবার্য্য কারণ বশতঃ ১১ই এপ্রিল পর্য্যন্ত পিছাইয়া দেওয়া হইল। নিয়মাদি পূর্ব্ববৎ। রচনা পাঠাইবার ঠিকানা।

শ্রীবিভূতিভূষণ রায়, ২নং ঢাকেশ্বরী মিলস্, পোঃ লক্ষ্মী-নারায়ণ মিলস্, জিলা ঢাকা।

অনুবাদ-গল্প প্রতিযোগিতা

অনুবাদ সাহিত্যের উন্নতিকল্পে "যাত্রীদলে"র সাহিত্য বিভাগ হইতে বাঙলা ভাষায় একটি ছোট অনুবাদ-গল্প প্রতি-যোগিতা আহ্বান করা যাইতেছে। গল্প যে কোন সাহিত্য হইতে অনূদিত হইলেই চলিবে—কিন্তু উহা সমর-গল্প হওয়া আবশ্যক। দুইটি পুরস্কার দেওয়া হইবে। বঙ্গের ও বঙ্গের বাহিরের প্রত্যেক নবীন লেখক-লেখিকাদের এই প্রতি-যোগিতায় যোগদান করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। অনুবাদকদের অনূদিত গল্পের মূল লেখক ও মূল গল্পের নাম উল্লেখ করিতে হইবে। গল্পসমূহ আগামী ৫ই এপ্রিলের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় পৌঁছান প্রয়োজন;—সম্পাদক, সাহিত্য বিভাগ, "যাত্রীদল", ২৭ গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড (সাউথ), হাওড়া।

নিখিল বঙ্গ রচনা প্রতিযোগিতা ১৯৩৯

হাওড়া ওয়েষ্ট য়েণ্ড ক্লাবের সাহিত্য বিভাগের উদ্যোগে একটি 'নিখিল বঙ্গ রচনা প্রতিযোগিতা'র ব্যবস্থা হইয়াছে। রচনার বিষয়—"বাঙলা সাহিত্যে আধুনিকতা।" রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টভাবে লিখিয়া আগামী ১৫ই এপ্রিল ১৯৩৯ তারিখ মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। উপযুক্ত প্রতিযোগিগণকে পুরস্কারাদি দ্বারা সম্মানিত করা হইবে। এই প্রতিযোগিতায় বঙ্গবাসী সকলেই যোগদান করিতে পারেন। সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্তভাবে মানিয়া লইতে হইবে। বিশেষ কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য ষ্ট্যাম্পসহ পত্র লিখুন।

শ্রীশ্রীগোবিন্দ ভট্টাচার্য্য, সম্পাদক—সাহিত্য বিভাগ ওয়েষ্ট য়েণ্ড ক্লাব, ১নং কালি কুণ্ডু লেন, হাওড়া।

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

(প্রভাতী সঙ্ঘ)

বিষয়—

১। "বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালীর দান"—১ম পুরস্কার—রৌপ্য কাপ; ২য়—পদক।

২। "ভারতের রাজনীতিতে প্রবাসী বাঙ্গালীর দান, স্থান ও কর্ত্তব্য।"—১ম পুরস্কার—১৫৲ টাকা; ২য়—পদক।

৩। "প্রবাসী বাঙ্গালীর সামাজিক ও [illegible]নৈতিক সমস্যা"—১ম পুরস্কার—পুস্তক; ২য়—পদক।

শেষ দিন—১৫ই বৈশাখ, ১৩৪৬ সাল।

ঠিকানা—প্রভাতী সঙ্ঘ, বেহার হেরাল্ড কার্য্যালয়, বাঁকী-পুর।

রচনাগুলি বৃহত্তর বঙ্গের মুখপত্র "প্রভাতী" বা বিহারের অন্যান্য পত্রিকায় যথাসম্ভব প্রকাশ করা হইবে। প্রকাশিত রচনাগুলির লেখক-লেখিকাদের এক বৎসর বিনামূল্যে "প্রভাতী" পুরস্কার দেওয়া হইবে।

আমেরিকার একাডেমি অফ মোশন পিকচার আর্টস এন্ড সায়েন্সেস কর্তৃক ১৯৩৮ সালের চিত্র-শিল্পের শ্রেষ্ঠ নির্ব্বাচনের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

শ্রেষ্ঠ ছবিঃ—"ইউ ক্যান্‌ট্‌ টেক্‌ ইট উইথ ইউ"—কলম্বিয়া।

শ্রেষ্ঠ অভিনেতাঃ—স্পেন্সার ট্রেসি; মেট্রোর 'বয়েজ টাউন' চিত্রে।

শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীঃ—বেটী ডেভিস; ওয়ারনার ব্রাদার্সের "জেজেবেল" চিত্রে।

শ্রেষ্ঠ পরিচালকঃ—ফ্রাঙ্ক কাপরা; কলম্বিয়ার "ইউ ক্যান্‌ট্‌ টেক্‌ ইট উইথ ইউ"।

চিত্রনাট্যঃ—জর্জ্জ বার্নার্ড শ'।

ছোট ছবিঃ—(কার্টুন) ওয়াল্ট ডিসনের "ফার্ডিনান্ড দি বুল"—রেডিও পিকচার্স।

ছোট ছবিঃ—(১০০০ ফিটের মধ্যে) "দ্যাট্‌ মাদার্স মাইট লিভ"—মেট্রো গোল্ডউইন মেয়ার।

ছোট ছবিঃ—(১০০০ হইতে ৩০০০ হাজার ফিটের মধ্যে)—"দি ডিক্লেয়ারেশন অব ইণ্ডিপেনডেন্স"—ওয়ারনার।

* * * * *

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীর "যখের ধন" ছবি আগামী শনিবার হইতে উত্তর কলিকাতার উত্তরা চিত্রগৃহে দেখান আরম্ভ হইবে। শ্রীযুত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের উপন্যাস অবলম্বনে শ্রীযুত হরি ভঞ্জ ছবিখানি পরিচালনা করিয়াছেন। শ্রীযুত অহীন্দ্র চৌধুরী, জহর গাঙ্গুলী, সুশীল রায়, শীলা হালদার, রবি রায়, মৃণাল ঘোষ, কুমার মিত্র, শিশুবালা, রাধারাণী, ছায়া, নিভাননী, জানকী ভট্টাচার্য্য, তুলসী চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি এই ছবিতে অভিনয় করিয়াছেন, যতীন দাস এই ছবির চিত্রগ্রহণ করিয়াছেন এবং অবনী চ্যাটার্জ্জি ও গোবিন্দ ব্যানার্জ্জি শব্দগ্রহণ করিয়াছেন।

'যখের ধন' ছবির সহিত হাস্যমুখর ছবি **'পরাণ পণ্ডিত'** দেখান হইবে। ছবিখানি পরিচালনা করিয়াছেন **তুলসী** লাহিড়ী এবং তিনি নিজেই প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন। সত্য মুখার্জ্জি, ঊষাবতী, প্রকাশমণি প্রভৃতিও এই ছবির ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন।

* * * * *

"বাণী প্রেসে"র স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত **ললিতমোহন** মল্লিক মহাশয়ের ১৬নং হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীটের ভবনে গত ১৯শে মার্চ্চ রবিবার কলিকাতা ঝামাপুকুর জ্যোতির্ম্ময় নাট্য-সমাজের সভ্যগণ কর্ত্তৃক "শ্রীশ্রীরূপসনাতন" নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। ঐদিন স্থানাভাবে বহুদর্শক ফিরিয়া যাওয়ায় ২৫শে মার্চ্চ শনিবার উক্ত বাণী প্রেসের প্রাঙ্গণে উক্ত নাটকখানি পুনরাভিনয় হইয়াছিল। নাটকের রচয়িতা শ্রীযুক্ত রাখালদাস রায়। ঝামাপুকুরের জ্যোতির্ম্ময় নাট্য-সমাজের সভ্যগণ উক্ত নাট্যকারের "ভক্ত-হরিদাস" নাটকখানি শতাধিকবার অভিনয় করিয়া জনসাধারণের নিকট হইতে প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে নূতন নাটকখানির দ্বাদশ অভিনয় হইল। নাটকের ভাষা, ভাব ও দার্শনিক সিদ্ধান্তগুলি বৈষ্ণব সমাজে আদরণীয় হইবে। অভিনয়স্থলে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়, শ্রীযুক্ত কানুপ্রিয় গোস্বামী, শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার বি-এ বিদ্যাবিনোদ ও বহু শিক্ষিত গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলে নাটকখানির রচনা ও অভিনয় সম্বন্ধে প্রশংসা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সনাতন গোস্বামীর ভূমিকায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র, শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় বালক শ্রীমান জয়রামের অভিনয় উপভোগ্য। অভিনেতাগণ সকলে শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বংশীয়। ইঁহাদের পোষাক-পরিচ্ছদ অতি সুন্দর হইয়াছে।

বৃন্দাবন রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম—

বৃন্দাবন রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের দ্বাত্রিংশৎ বার্ষিক বিবরণী আমরা পাইয়াছি। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ এবং প্রেরণায় অনুপ্রাণিত এই প্রতিষ্ঠান বৃন্দাবনের ন্যায় ভারতের একটি প্রধান তীর্থক্ষেত্রে যেভাবে সেবাকার্য্য চালাইয়াছেন, রিপোর্টে তাহার পরিচয় পাইয়া আমরা সুখী হইয়াছি। আলোচ্য বর্ষে সেবাশ্রমের হাসপাতালে প্রায় ৬ সহস্র রোগী চিকিৎসার সুবিধা লাভ করিয়াছে। সেবাশ্রমের কাজের গুরুত্ব এই একটা বিষয় হইতে বুঝা যাইবে যে, বৃন্দাবন মিউনিসিপ্যালিটির যে হাসপাতাল তাহাতে মাত্র ৬টি রোগীর 'বেড' আছে। পক্ষান্তরে সেবাশ্রমের হাসপাতালে আছে ২৪টি 'বেড'। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, কলিকাতার কোন দানশীল মহিলা আশ্রমের হাসপাতালের জন্য ৬ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এই টাকা হইতে তাহারা আধুনিক ধরণের একটি হাসপাতাল তৈয়ার করিতে চাহেন; কিন্তু এজন্য আরও অর্থের প্রয়োজন; সেজন্য সেবাশ্রম সাধারণের নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস আছে, সহৃদয় জনসাধারণ এই পুণ্য সেবাব্রত পরিচালনে আশ্রমকে সাহায্য করিয়া নরনারায়ণ সেবার সুযোগ লাভ করিবেন

কলিকাতা হকি লীগ প্রতিযোগিতা

কলিকাতা হকি লীগ প্রতিযোগিতার খেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিল। আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে বিভিন্ন বিভাগের লীগের কে চ্যাম্পিয়ান হইবে তাহার মীমাংসা হইয়া যাইবে। প্রথম ডিভিশন লীগে চ্যাম্পিয়ানসিপ লইয়া কাষ্টমস ও রেঞ্জার্স দলের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে। মাত্র দুইটি করিয়া খেলা বাকী আছে। এই দুইটি খেলার ফলাফলের উপর উক্ত দুই দলের চ্যাম্পিয়ানসিপ নির্ভর করিতেছে। এখনও পর্যন্ত কে লীগ চ্যাম্পিয়ান হইবে বলা খুবই কঠিন, তবে অনেকের মতেই কাষ্টমস দল গত বৎসরের সম্মান রক্ষা করিতে পারিবে। উক্ত লীগ তালিকার নিম্নভাগে দুইটি ভারতীয় দলের অবস্থা বিশেষ সুবিধাজনক নহে। ইহাদের দ্বিতীয় ডিভিশনে নামিয়া যাইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। উক্ত দুইটি দলের পরিচালকগণের দোষেই যে এইরূপ অবস্থা হইল ইহা বলিলে অন্যায় করা হইবে না।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় ডিভিশন

দ্বিতীয় ডিভিশনে সেণ্ট জোসেফ ও লিলুয়ার মধ্যে চ্যাম্পিয়ানসিপের জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছে। লিলুয়া দলেরই সাফল্যলাভের বিশেষ আশা দেখা দিয়াছে। তৃতীয় ডিভিশনে হাইবার্নিয়ান্স দল চ্যাম্পিয়ান হইবে ইহা একরূপ জোর করিয়াই বলা চলে।

নিম্ন স্তরের খেলা

লীগের বিভিন্ন বিভাগের খেলা শেষ হইলে কোন্ দল কোন্ বিভাগে চ্যাম্পিয়ান হইবে এই চিন্তা সাধারণ ক্রীড়ামোদিগণকে চঞ্চল করিয়াছে। কিন্তু আমরা বিচলিত হইতেছি বাঙলার হকি খেলার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া। এই বৎসরের হকি লীগের খেলা অবলোকন করিয়া আমাদের এই ধারণাই হইয়াছে যে, বাঙলা দেশের হকি খেলার ষ্টাণ্ডার্ড দিন দিন নিম্নস্তরের হইতেছে। গত বৎসর অপেক্ষাও এই বৎসরের খেলা অনেক নিম্নস্তরের হইয়াছে। তাহা না হইলে অধিকাংশ প্রবীণ খেলোয়াড় দ্বারা গঠিত কাষ্টমস ও রেঞ্জার্স প্রথম ডিভিশন লীগ তালিকার শীর্ষস্থান দুইটি দখল করিতে পারিত না। এই সমস্ত খেলোয়াড়গণের খেলায় না আছে তীব্রতা, না আছে ক্ষিপ্রতা, না আছে উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্য। সত্য কথা বলিতে হইলে বলিতে হয় ইহাদের অনেকেরই খেলা হইতে অবসর গ্রহণের সময় হইয়াছে। কিন্তু বাঙলা দেশের এমই দুর্ভাগ্য যে, এই সমস্ত প্রবীণ খেলোয়াড়গণও বর্ত্তমানে যেরূপ খেলিয়া থাকেন সেইরূপ ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে পারেন এইরূপ তরুণ খেলোয়াড়গণ পাওয়া যায় না। ফলে উক্ত খেলোয়াড়গণের মধ্যে কাহারও খেলা হইতে অবসর গ্রহণ করিবার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাহা সম্ভব হইতেছে না।

নিয়মিত শিক্ষার অভাব

হকি মরসুমের সময় নিয়মিতভাবে হকি খেলা শিক্ষা দিবার জন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যবস্থা না থাকার ফলেই বাঙলা দেশের হকি খেলার এই অবস্থা হইয়াছে। এইজন্যই একটি বিশিষ্ট খেলোয়াড় খেলা হইতে অবসর গ্রহণ করিলেই দল শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছে। পরিচালকগণকে দলের শক্তিবৃদ্ধির জন্য অ-বাঙালী খেলোয়াড়দের সাহায্য ভিক্ষা করিতে হইতেছে। ফলে বাঙলার উদীয়মান খেলোয়াড়গণ যাঁহারা নিয়মিতভাবে খেলা শিক্ষার সুবিধা পাইলে উচ্চাঙ্গের ক্রীড়ানৈপুণ্যের অধিকারী হইতে পারিতেন, তাঁহারও দুই-এক বৎসর উন্নতির চেষ্টা করিয়া খেলা হইতে অবসর গ্রহণ করিতেছেন। পরিণামে এই হইবে যে, ফুটবল খেলার ন্যায় অ-বাঙালী খেলোয়াড়গণ বাঙলার হকি খেলার মাঠে অর্থোপার্জ্জনের সুবিধা পাইবেন।

বাইটন কাপ প্রতিযোগিতা

১০ই এপ্রিল হইতে কলিকাতায় বাইটন হকি কাপ প্রতিযোগিতার খেলা আরম্ভ হইবে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বিশিষ্ট দলসমূহ উক্ত প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছে। বাঙলার কোন দল এই প্রতিযোগিতায় বিশেষ সুবিধা করিতে পারিবে বলিয়া আমরা মনে করি না। যোগদানকারী কয়েকটি বিশিষ্ট দলের নাম প্রদত্ত হইল:—

লুসিটেনিয়ান্স (বোম্বাই) দিল্লীর সম্মিলিত দল, ঈগলস ক্লাব (বেরিলী) লক্ষ্ণৌ স্পোর্টস এসোসিয়েশন খালসা কলেজ (অমৃতসর) এল ওয়াই এ (লক্ষ্ণৌ) আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়, গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয় (হরিদ্বার), ঝাঁন্সি হিরোজ।

প্রথম ডিভিশন হকি লীগের খেলার বর্ত্তমান ফলাফল

উপরের তিনটি দল

	খে	জ	ড্র	প	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
কাষ্টমস	১৬	১৫	১	০	৭৯	৪	৩১
রেঞ্জার্স	১৬	১৫	০	১	৫১	৫	৩০
পুলিশ	১৩	১১	২	০	২৮	৬	২৪

সর্ব্বনিম্ন তিনটি দল

	খে	জ	ড্র	প	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
ভবানীপুর	১৪	২	২	১০	৬	৩৯	৬
ইষ্টবেঙ্গল	১৪	২	১	১১	৮	৩২	৫
বর্ডার রেজিঃ	১৫	০	২	১৩	৫	৪৬	২

হকি লীগ খেলায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গোলদাতাগণের নাম

এল ওয়েষ্টন (কাষ্টমস) ২১টি, রেণ্টন (কাষ্টমস) ১৮টি, আর লামসডেন (রেঞ্জার্স) ১৫টি, হেণ্ডার্সন (কাষ্টমস) ১৪টি, ম্যাকডোন্যাল্ড (বি জি প্রেস) ১৪টি এস সি ওয়েন্স (রেঞ্জার্স) ১২টি, সীম্যান (কাষ্টমস) ১২টি, ডি সেনা (মিলিটারী মেডিক্যাল) ১২টি, নাইম (মহমেডান স্পোর্টিং) ১১টি।
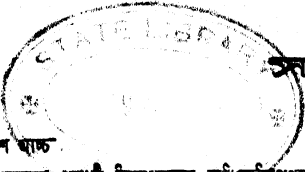
সাপ্তাহিক সংবাদ

২১শে মার্চ্চ

মহাত্মা গান্ধী ত্রিবাঙ্কুরের অধিবাসিগণকে আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখিবার জন্য পরামর্শ দিয়াছেন।

কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় ১৯৩৯-৪০ সালের বাজেট সম্পর্কে বাজেট স্পেশ্যাল কমিটির সমুদয় সুপারিশ গৃহীত হইয়াছে। ঐ সুপারিশসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি হইতেছে এই যেঃ—(১) আগামী এপ্রিল মাস হইতে কর্পোরেশন হইতে ওয়ার্ড স্বাস্থ্য সমিতিগুলির সাহায্য বন্ধ হইবে; (২) যে সব ওয়ার্ডে কর্পোরেশন অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন বা করিবেন সেই ওয়ার্ডগুলিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে কর্পোরেশনের সাহায্য দান বন্ধ করার সিদ্ধান্ত হয়; (৩) কর্পোরেশনের নূতন লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে বেতনের শতকরা ১৫ ভাগ কর্ত্তন করার প্রথা ১লা এপ্রিল হইতে তুলিয়া দেওয়া হইবে। এবং (৪) ইমারতাদি নির্ম্মাণের পরিকল্পনা এবং ইমারতাদি ভাঙ্গিয়া দেওয়ার প্রস্তাবের উপর ফি ধার্য্য করা হইবে।

কর্পোরেশনের আর্থিক অবস্থার উন্নতিবিধানকল্পে কর্পোরেশনের একটি "ডেভেলাপমেণ্ট কমিটি" গঠন করেন।

কলিকাতা কর্পোরেশনের ২৯নং ওয়ার্ডের উপনির্ব্বাচনে কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দালাল বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করিয়াছেন।

অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত জে কে বিশ্বাস "এডভান্সের" ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত মূলচাঁদ আগরওয়ালা ও একাউট্যাণ্ট শ্রীমণীন্দ্রকুমার দের বিরুদ্ধে "চার্জ্জ" গঠন করিয়াছেন। এই মামলায় দেশবন্ধু পাবলিশিং কোম্পানী লিমিটেডের পক্ষে মিঃ জে সি গুপ্ত তাঁহাদের বিরুদ্ধে হিসাব জালের অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন।

কৃষক নেতা শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন হাজরার উপর হুগলীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারা অনুযায়ী এক আদেশ জারী করিয়াছেন।

২২শে মার্চ্চ—

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ফাইন্যান্স বিলের আলোচনা হয়। উক্ত বিলে বৃটিশ ভারতে আমদানী লবণের উপর প্রতি মণে ১ টাকা ৪ আনা হিসাবে যে শুল্ক ধার্য্যের প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহা ৪ আনা হিসাবে হ্রাস করার জন্য কংগ্রেসী দলের পক্ষ হইতে এক সংশোধন প্রস্তাব আনা হয়। সংশোধন প্রস্তাবটি ৫৫-৩৮ ভোটে গৃহীত হইয়াছে। মুসলিম লীগ পার্টি নিরপেক্ষ ছিলেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাঙলা গবর্ণমেণ্টের ১৯৩৯-৪০ সালের পুলিশ বিভাগের ও বিচার বিভাগের ব্যয়-বরাদ্দ যথাক্রমে ২১৪৫৫০০০, ও ৭৪০৯০০০, টাকা মঞ্জুর হয়। পুলিশের ব্যয়-বরাদ্দ সম্পর্কে সরকার বিরোধী দল ৭টি ছাঁটাই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল, সবগুলি ছাঁটাই প্রস্তাবই অগ্রাহ্য হয়। বিচার বিভাগের ব্যয়-বরাদ্দ সম্পর্কে একটি ছাঁটাই প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহাও অগ্রাহ্য হয়।

হায়দরাবাদ আর্য্য সত্যাগ্রহের তৃতীয় ডিক্টেটর লালা কুশলচাঁদ ১৫৪ জন সত্যাগ্রহীসহ গ্রেপ্তার হইয়াছেন। হায়দরাবাদে এ পর্য্যন্ত ৩ হাজার ৭ শত আর্য্যসমাজী সত্যাগ্রহী কারাবরণ করিয়াছেন।

লিথুনিয়ান গবর্ণমেণ্ট বিনাসর্ত্তে মেমেল অঞ্চল জার্ম্মানীকে অর্পণ করিয়াছে। হের হিটলার তাঁহার চরমপত্রে লিথুনিয়ানকে মাত্র ৪৮ ঘণ্টার সময় দিয়াছিলেন। হের হিটলার সমুদ্র পথে মেমেল যাত্রা করিয়াছেন।

২৩শে মার্চ্চ—

মহাত্মা গান্ধীর উপদেশানুসারে ত্রিবাঙ্কুরে আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখা হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ফাইন্যান্স বিলের দফাওয়ারী আলোচনা কালে কংগ্রেসী দলের পক্ষ হইতে তুলার উপর আমদানী শুল্ক বৃদ্ধির প্রতিবাদ করিয়া একটি সংশোধন প্রস্তাব আনা হয়। প্রস্তাবটি পরিষদে গৃহীত হইয়াছে।

পোষ্ট কার্ডের মূল্য দুই পয়সা এবং জোড়া পোষ্ট কার্ডের মূল্য এক আনা করিবার জন্য কংগ্রেসী দলের সংশোধন প্রস্তাব কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ৫৯-৪৯ ভোটে গৃহীত হইয়াছে।

জার্ম্মান সৈন্যেরা মেমেল প্রবেশ করিয়াছে। হের হিটলারকে মেমেল অধিবাসীরা বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করে।

জার্ম্মানী এবং লিথুনিয়ার মধ্যে একটি অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

২৪শে মার্চ্চ—

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে গবর্ণমেণ্টের আবগারী বিভাগের জন্য ২০৫৮০০০, ঋণ-সালিশী বিভাগের জন্য ২১১২০০০, এবং কার বিভাগের জন্য ৩৩৭৩০০০, টাকা ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুর হয়। পরিষদে আবগারী বিভাগের ও ঋণ-সালিশী বিভাগের ব্যয়-বরাদ্দ সম্পর্কে বাঙলা গবর্ণমেণ্টের নীতি ও কর্ম্মপন্থার তীব্র সমালোচনা হয়। সব কয়েকটি ছাঁটাই প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। সব গুলি ছাঁটাই প্রস্তাবই অগ্রাহ্য হইয়া যায়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইস্‌লামিক সংস্কৃতি ও ইসলামের বাণী শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে একটি বিভাগ খুলিবার জন্য ভাইস-চ্যান্সেলার খাঁ বাহাদুর আজিজুল হক সিণ্ডিকেটের নিকট একটি প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। ভাইস-চ্যান্সেলারের এই প্রস্তাব বিবেচনার জন্য ছয়জন সদস্যকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে।

টিটাগড় ধর্ম্মঘটের সময় ১৪৪ ধারার আদেশ অমান্য করার অভিযোগে শ্রমিক নেতা শ্রীযুক্ত নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার এম-এল-এ'র বিরুদ্ধে ব্যারাকপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে এক মামলা আনা হইয়াছে।

সিন্ধুতে ওঁম মণ্ডলী-বিরোধী আন্দোলন ক্রমেই গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে। ওঁম মণ্ডলীর বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ সুরু হইয়াছে। সাধু ভাস্বানী দশ হাজার স্বেচ্ছাসেবক লইয়া সত্যাগ্রহ আরম্ভ করেন। সাধু ভাস্বানী ও একশত সত্যাগ্রহীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে। আদালতের বিচারে সাধু ভাস্বানী প্রমুখ ২৬ জন সত্যাগ্রহীর কারাদণ্ড হইয়াছে। এদিকে ওঁম মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা দাদা লেখরাজ ১৪৪ ধারার আদেশ এবং ওঁম মণ্ডলীতে স্ত্রী-পুরুষদিগকে পৃথক স্থানে রাখিবার যে আদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা অমান্য করিতেছেন। সাধু ভাস্বানী ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকদের গ্রেপ্তারের ফলে সিন্ধুর হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে। সিন্ধু ব্যবস্থা পরিষদের স্বতন্ত্র হিন্দু দলের নির্দ্দেশ অনুসারে সিন্ধুর মন্ত্রিসভার দুইজন হিন্দু মন্ত্রী মিঃ নিছলদাস ভাজিবাণী ও মিঃ দয়ালমল দৌলৎরাম পদত্যাগ করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা সিন্ধু মন্ত্রিসভা আর এক নূতন সঙ্কটের সম্মুখীন হইল।

২৫শে মার্চ্চ—

কংগ্রেসের নূতন ওয়ার্কিং কমিটি গঠনে বিলম্বের কারণ সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু এক বিবৃতি দিয়াছেন। তিনি বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, কংগ্রেস পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থের প্রস্তাব গ্রহণ করায় মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাতের পর আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়া ঐ প্রস্তাবের মূল বিষয়গুলি যতক্ষণ পরিষ্কার না হইতেছে, ততক্ষণ ওয়ার্কিং কমিটি গঠন প্রভৃতি বিষয়ে কিছু করা যাইতেছে না। শ্রীযুত বসু বলেন যে, মহাত্মা গান্ধী পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাবকে কি ভাবে দেখেন তাহা তিনি গান্ধীজীর নিকট হইতে বুঝিতে চাহেন। গান্ধীজী ঐ প্রস্তাবকে অনাস্থাজ্ঞাপক মনে করেন কিনা, তিনি শ্রীযুত বসুর পদত্যাগ করা বাঞ্ছনীয় মনে করেন কিনা, অথবা তিনি ঐ প্রস্তাবকে গান্ধীজীর সহিত তাঁহার পুনর্ম্মিলন জ্ঞাপক মনে করেন কিনা তাহা তিনি বুঝিতে চাহেন। শ্রীযুত বসু অবশ্য মনে করেন না যে, গান্ধীজীর সহিত তাঁহার নিজের কোন বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে।

চট্টগ্রামে জেলা যুব-সম্মেলনের অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্রনাথ রায় সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাঙলা গবর্ণমেণ্টের ১৯৩৯ সালের বাজেটের বিভিন্ন দফার ব্যয় বরাদ্দের আলোচনা শেষ হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে বড়লাটের সুপারিশযুক্ত ফ্যাইন্যান্স বিল ৫০—৪২ ভোটে অগ্রাহ্য হইয়াছে।

সিন্ধু গবর্ণমেণ্ট ওঁমমণ্ডলী সমিতি বন্ধ করিয়া দিতে অসমর্থ হওয়ায় উহার প্রতিবাদে সরকারী দপ্তরখানার প্রবেশ পথে ৮ হাজার লোক সত্যাগ্রহ করে। অদ্য ১২৫ জন সত্যাগ্রহী ধৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে কয়েকজন মহিলাও আছেন। ওঁমমণ্ডলী বন্ধ করিয়া না দেওয়া পর্য্যন্ত খাদ্য গ্রহণ করিবেন না বলিয়া সঙ্কল্প করিয়া ২০ জন সরকারী দপ্তরখানার সম্মুখে অনশন আরম্ভ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সাভারকরের সভাপতিত্বে মুঙ্গেরে বিহার প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়।

মীরাটে মুসলিম লীগ সম্মেলনের এক অধিবেশন হয়। নবাবজাদা লিয়াকত আলি খাঁ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

লণ্ডনের এক সংবাদে প্রকাশ যে, পোলিশ-জার্ম্মান সীমান্তে পোল ও জার্ম্মানদের এক গুরুতর সংঘর্ষ বাধে। জার্ম্মানেরা না-কি পোলিশ রাজ্যে প্রবেশ করিতে চাহিয়াছিল। পোলিশ রক্ষীদের সহিত কিছুক্ষণ লড়াই চলার পর জার্ম্মান সৈন্যেরা ফিরিয়া যায়।

২৬শে মার্চ্চ—

ত্রিপুরী কংগ্রেসে পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থের প্রস্তাব ও গান্ধীপন্থী নেতাদের কার্য্যকলাপের প্রতিবাদে কলিকাতা শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্ত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় দক্ষিণপন্থী নেতাদের কার্য্যকলাপের তীব্র নিন্দা করিয়া ও রাষ্ট্রপতির রোগমুক্তি কামনায় ২রা এপ্রিল বাঙলার সর্ব্বত্র সভাসমিতি অনুষ্ঠানের জন্য দেশবাসীকে অনুরোধ জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

মহীশূর সরকার হরিজনদিগকে মন্দিরে প্রবেশাধিকার দিয়া এক আদেশ জারী করিয়াছেন।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন। অদ্য রঞ্জন রশ্মির সাহায্যে তাঁহার ভগ্ন হাড়ের অবস্থা পরীক্ষা করা হইয়াছে।

কাশীতে অনেক মুসলমানের ছোরার আঘাতে একজন হিন্দু নিহত হইয়াছে। ইহার ফলে সেখানে সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য পুনরায় গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। লক্ষ্ণৌ হইতেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার খবর পাওয়া গিয়াছে। সেখানে একটি মসজিদের সম্মুখে হিন্দুদের এক শোভাযাত্রা আক্রান্ত হয়। ফলে বহু লোক আহত হইয়াছে।

আসামে আফিঙ্গ বর্জ্জন করার জন্য বড়দলুই মন্ত্রিসভা দুই বৎসরের জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। আফিঙ্গ বর্জ্জন আরম্ভ করিবার জন্য ১৫ই এপ্রিল দিন স্থির হইয়াছে।

বোম্বাই শহরে সুরাবর্জ্জন সপ্তাহ আরম্ভ হইয়াছে। এই সম্পর্কে এক বিরাট জনসভায় বোম্বাইয়ের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত বি জি খের বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, "মাদক দ্রব্য হইতে যে রাজস্ব আদায় হয়, তাহার উপর নির্ভর করা অপেক্ষা আমরা বরং ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে লইয়া বাহির হইব।"

যুক্তপ্রদেশ ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেসী সদস্য শ্রীযুক্ত কে এন কাটজু যুক্তপ্রদেশ গবর্ণমেণ্টের মুসলিম-প্রীতির প্রতিবাদে পদত্যাগ করিয়াছেন।

টোকিওর সংবাদে প্রকাশ যে, জাপানীরা উহুচেচেন দখল করিয়াছে এবং জাপ-বাহিনী কিয়াংসি প্রদেশের রাজধানী নানচাং সম্পূর্ণরূপে দখল করিয়াছে বলিয়া দাবী করিতেছে।

রোমে ফ্যাসিস্ট দলের বিংশতিতম বার্ষিক উৎসবে সিনর মুসোলিনী এক গরম বক্তৃতা করেন।

২৭শে মার্চ্চ—

মহাত্মা গান্ধীর রক্তের চাপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। মহাত্মাজী দিল্লীতে আছেন।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি দেখা যাইতেছে। শ্রীযুক্ত বসু ধানবাদের অন্তর্গত জামাডোবায় [illegible] করিতেছেন।

[illegible] এক খবরে প্রকাশ যে, কংগ্রেসের সম্মুখে গুরুতর [illegible]। ত্রিপুরী কংগ্রেস ও ঘটনাসমূহের ফলে নেতৃবর্গের মধ্যে মতভেদ ক্রমশ প্রবল হইয়া উঠিতেছে। অবস্থা এতটা সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে যে, মহাত্মাজীও কোন প্রতিকারের পন্থা খুঁজিয়া পাইতেছেন না। ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের বিলম্বের কারণ বর্ণনা করিয়া রাষ্ট্রপতি যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, গান্ধীজী নাকি তাহার উত্তরে সহস্র শব্দের এক তার রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান অবস্থায় নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতির অধিবেশন আহ্বান করাই একমাত্র উপায়। গান্ধীজী নাকি এরূপ পরামর্শ দিয়াছেন।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ইংগ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি সম্বন্ধে অলোচনা আরম্ভ হইয়াছে।

হায়দরাবাদে সত্যাগ্রহ সম্পর্কে আদালতের বিচারে আর্য্য সমাজী নেতা লাল কুশলচাঁদ ও তাঁহার ১৫৯ জন সঙ্গীর দেড় বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।

ঢেনকানল জেলের কর্ত্তৃপক্ষের আচরণের প্রতিবাদে ৪০ জন বন্দী জেলে অনশন ধর্ম্মঘট সুরু করিয়াছে। ঢেনকানলে ধৃত শ্রীযুত রবি ঘোষকে সং ফৌঃ আইনে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

লক্ষ্ণৌয়ে প্লেগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৮ই মার্চ্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে লক্ষ্ণৌতে ২৯৫ জন প্লেগে আক্রান্ত হয় এবং তন্মধ্যে ১৯১ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

বিহিটা ট্রেণ দুর্ঘটনা সম্পর্কে দণ্ডিত দানাপুরের ডেপুটি কণ্ট্রোলার মিঃ বাল্‌ফ যে আপীল করিয়াছিলেন, পাটনার জেলা ও দায়রা জজ রায় বাহাদুর এ এন ব্যানার্জ্জি সেই আপীল ডিসমিস করিয়া দিয়াছেন।

লাহোরে ১২০ জন কিষাণ সত্যাগ্রহী ধৃত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত মোট ৩০০ জন সত্যাগ্রহী ধৃত হইল।

২৮শে মার্চ্চ—

আলীপুরের সিনিয়র ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস এম ভৌমিক কলিকাতা ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশনের ছাত্রী কুমারী সুজাতা সরকারের মৃত্যু সম্পর্কিত মামলায় আসামীদের বিরুদ্ধে চাজ্জ গঠন করিয়াছেন।

মাদ্রিদ ফ্রাঙ্কো হস্তে সমর্পিত হইয়াছে

নবীন যাত্রী

শ্রীরাজেশ্বর মিত্র

ফাগুন তোমারে অভিনন্দন করি
    আমরা নবীন বন্ধনহীন পান্থ
অন্ত মোদের এখনো অনেক দূরে
    ফুরায়নি তাই কণ্ঠে মোদের গান তো;
মনের খুসিতে যেতে যেতে পথে তাই
যৌবন-সুধা সুরে সুরে ঢেলে যাই
মাতাল হোয়েছি চলার নেশায় ভাই
    আমাদের চলা নহে বুঝি তাই শান্ত
যৌবনে তাজা ভরি জীবনের রসে
    মোদের পাত্র উঠেছে আজিকে ভ'রে
বাহিরে ফাগুন ফুটেছে রঙিন্ হোয়ে
    প্রাণের ফাগুনে রং দিল অন্তরে;
সম্মুখে শুনি বাজে পুলকের বাঁশি
আশার স্বপন নয়নে ফুটিল হাসি
বিদায় দিয়েছি মিছে ভাবনার রাশি
    পদে পদে ভয়ে কভু মোরা নহি ক্লান্ত।
একদিন জানি এ যাত্রা হবে সারা
    একদিন জানি সবই হবে অবসান
শ্রান্ত শরীরে শেষের পরশখানি
    জানাইয়া দিবে ওপারের আহ্বান;
আজিকার মতো সেদিনও চাহিব হেসে,
পিছনের পানে একবার ভালোবেসে,
স্মরিব আবার জীবনের উন্মেষে
    সুন্দর সেই সোনার পুবালি প্রান্ত।

ছিল, সেগুলি এখনও অটুট রহিয়াছে এবং পূর্ব্বের মতই সুগঠিত অবস্থায় আছে। ইহারা সমাজের মধ্যে বিপ্লব আনয়ন করিয়া বিদ্রোহ সৃষ্টি করিতে চায়। বাঙলা দেশের আসন্ন বিভীষিকার যে চিত্র স্যার নাজিমুদ্দিন আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন, তাহাকে আমরা একটুও গুরুত্ব দেই না। মন্ত্রীরা সম্প্রতি বায়স্কোপের ফিল্মে নিজেদের ছবি তুলিয়া আমাদিগকে তাঁহাদের গমন-নটন লীলা উপভোগ করিবার যে সুবিধা দিয়াছেন, তাহাতে দেশের লোক যেমন মুগ্ধ হইবে না, তেমনই তাঁহাদের মুখে বৈপ্লবিক বিভীষিকার কথা শুনিয়াও তাঁহাদের গোস্তৃত্ব কিম্বা রক্ষিত্ব শক্তির মহিমায় পরিতৃপ্ত হইবে না। কারণ, দেশের লোক জানে পুলিশ-প্রভাবিত এবং শ্বেতাঙ্গ স্বার্থবাদী দলের অঙ্গুলী সঙ্কেতে পরিচালিত মন্ত্রিমণ্ডলের পক্ষে এই সব ছেঁদো যুক্তি উপস্থিত করা ছাড়া অন্য উপায় নাই, অন্য কোন উপায় নাই, দেশের জনমতের বিরুদ্ধতা করিয়া মন্ত্রীরা যে-সব দমন এবং পীড়ন-নীতি চালাইতেছেন, সেগুলিকে সমর্থন করিতে হইলে। আমরা এ বিশ্বাস করি, আমরা অস্বীকার করি না একথা যে, মণ্টেগু সাহেব যাহাকে নিজ্জীবের জড়বৎ শান্তি বলিয়াছেন, বাঙলা দেশের জনসমাজের মধ্যে সে জড়বৎ শান্তি এখন আর নাই। তাহারা অধিকতর সচেতন হইয়াছে, নিজেদের স্বার্থবুদ্ধি তাহাদের প্রখর হইয়াছে। তাহারা এখন মানুষের অধিকার চায়, মানুষের মত খাইয়া-পরিয়া বাঁচিয়া থাকিতে চায়। মানুষের এই যে ন্যায্য অধিকার—এটুকু লাভ করিবার জন্য তাহাদের যে সচেতনতা, বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলের পক্ষে তাহা আতঙ্ককর হইয়াছে। কারণ, দেশের লোকের এই সব দাবী মিটাইবার সামর্থ্য তাঁহাদের নাই। সেজন্য যে সব নীতি অবলম্বন করিতে হয়, তাহা অবলম্বন করিতে তাঁহারা পারেন না; কারণ, তাহা হইলে একদিকে পুলিশ, অপর দিকে তাঁহাদের প্রধান সমর্থক শ্বেতাঙ্গ দল বিগড়াইয়া বসিবে। সুতরাং, জাগ্রত জন-সাধারণের সকল আন্দোলনকে কঠোর হস্তে দমন করা ছাড়া অন্য গতি নাই এবং তাহা করিতে গেলেই ঐ সব গণ-আন্দোলনের একটা কুব্যাখ্যা করিতে হয়, বুঝাইতে হয় একটা বিভীষিকাময় ব্যাখ্যা বা ভাষা দিয়া যে, ঐ সব আন্দোলনকে পিষ্ট না করিতে পারিলে দেশের সর্ব্বনাশ! কিন্তু আমরা তাঁহাদিগকে বহুবার সে কথা বলিয়াছি, আজও সেই কথাই আমরা শুনাইতেছি যে, অশান্তি, অসন্তোষ যদি বাঙলা দেশ হইতে সত্যই দূর করিতে হয়, তবে তাঁহারা যে পথ ধরিয়াছেন সে-পথ নয়, সে-পথ নয়—দমন-নীতির এবং পীড়ন-নীতির, সে-পথ নয়—পুলিশ, গোয়ান্দা প্রভৃতি পোষ্য দল বাড়ানোর, সে পথ হইল—জনসাধারণের মধ্যে যে-সব সমস্যা আজ উগ্র হইয়া উঠিয়াছে, সেগুলির সমাধানের জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করা। তাঁহারা সেই যে কাজের পথ, সে দিকে যাইতেছেন না, তাঁহারা জনমতের সহিত বিরোধের পথই ধরিয়াছেন। বাঙলায় সত্যই আজ যদি অশান্তি ও অসন্তোষ বাড়িয়া থাকে, তবে আমরা বলিব, বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর নীতিই সে জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। তাঁহাদের অবলম্বিত নীতির ফলে বাঙলা দেশের সমস্ত স্তরে আজ যে সাম্প্রদায়িকতার আগুন ধোঁয়াইয়া উঠিতেছে, বাঙলা দেশে যদি কোন আতঙ্কের কারণ ঘটিয়া থাকে, তবে একমাত্র হইল তাহাই। বাঙলায় মন্ত্রিমণ্ডলের এই নীতির পরিবর্ত্তন যদি না ঘটান যায়, তাহা হইলে বাঙলার সর্ব্ব-নাশের দিন যে ঘনাইয়া আসিতেছে, এ বিষয়ে আমাদেরও সন্দেহ নাই।

সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্য—

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বর্ত্তমানে ধানবাদের অন্তর্গত জামাডোবাতে আছেন। সুখের বিষয়, তিনি এখনও নিরাময় না হইলেও, তাঁহার জ্বর আগের চেয়ে একটু কমিয়াছে এবং চিকিৎসকগণ এই আশা করিতেছেন, যদি এইভাবে তাঁহার চিকিৎসা এবং বিশ্রামের ব্যবস্থা চালান যায়, তাহা হইলে অবস্থার উন্নতি সাধিত হইবে। জ্বর সম্পূর্ণ ত্যাগ করাইতে আর কিছুদিন দেরী হইতে পারে কিন্তু এজন্য উদ্বেগের বিশেষ কিছু কারণ এখন নাই।

মুসলমান স্বার্থের ধুয়া—

গত ১৮ই মার্চ্চ নদীয়া জেলা কৃষক সম্মেলনে মিঃ আবুল হায়াত খান সভাপতিস্বরূপে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; কারণ মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ-সিদ্ধির ধুয়া তুলিয়া যাহারা পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া খাইবার ব্যাপারে নামিয়াছে, তিনি তাঁহাদের স্বরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন,—'ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, সাম্প্রদায়িকতাবাদী নেতারা আসিয়া আমাদের কৃষক সম্মেলন ও স্বাধীনতা আন্দোলনে খানিকটা বাধা দিতে সমর্থ হইয়া-ছেন। ইহাদের রূপ আমরা ভালভাবেই জানি। দেশের লোক যাহাতে বড় বড় সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন না থাকিতে পারে, তজ্জন্য ইহারা ঢাক পিটাইতে থাকে। ইহারা সর্ব্ব স্থানে সাম্রাজ্যবাদ ও তাহাদের সঙ্গোপাঙ্গদের অনুচরগিরি করিয়া থাকে। বাঙলার বিভিন্ন জেলায় আমরা কৃষক আন্দো-লন করিতে যাইয়া দেখিতেছি, ইহারা আমাদের মিটিং ভাঙ্গিবার ও আমাদের সমিতি ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতেছে। মুসলিম লীগের ধুয়া তুলিয়া মুসলমানদিগকে সরাইয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে।'

মুসলমান যুবকদিগকে সম্বোধন করিয়া বক্তা বলেন,—'আমাদের শিক্ষিত মুসলমান যুবকদের অনেকেই এই জগতের কোন সংবাদ রাখিতে চেষ্টা করেন না। ফিলিস্তিন বা প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে বহু লোককে কথা বলিতে শুনা যায়, কিন্তু প্যালেষ্টাইনের সমস্যা যে আসলে কি এবং তাহা হইতে আমাদেরই বা কি শিক্ষা পাইবার আছে, অনেক মুসলমান যুবকই অনুসন্ধান করেন না। মুসলিম জাহান বলিতেই অনেক শিক্ষিত মুসলমানের বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠে শোনা যায়, সত্য সত্য উঠিলে খানিকটা মঙ্গল কিন্তু ইঁহাদেরই বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলিতে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কিরূপ আন্দোলন চলি-

তেছে সুধাইলে অধিকাংশ স্থলেই কোন জবাব পাওয়া যায় না।"

আমরা আশা করি, মিশরীয় প্রতিনিধি দল ভারতে আসিয়া মিশরের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্বন্ধে যে সব কথা বলিয়াছেন এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের জিদের ফলে প্যালেষ্টাইনের স্বদেশ-প্রেমিকদের অধিকতর আত্মোৎসর্গের যে আয়োজন আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে, বাঙলার শিক্ষিত মুসলমান যুবক সম্প্রদায়কে তাহা সচেতন করিবে, এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের চরের কাজ করিয়া বিশ্বের মুসলমান সমাজের কি ঘোরতর অনিষ্ট করিতেছে, তাঁহারা তাহা উপলব্ধি করিবেন, এদেশের স্বার্থের কথা এক্ষেত্রে নাই তুলিলাম।

ওয়াফদ প্রতিনিধি দল—

মিশরীয় প্রতিনিধি দল ত্রিপুরী কংগ্রেস পরিদর্শন করিয়া সম্প্রতি উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করিতেছেন। কয়েকদিন হইল তাঁহারা মহাত্মা গান্ধীর সহিতও সাক্ষাৎ করিয়াছেন। উত্তর ভারত পরিভ্রমণ শেষ করিয়া প্রতিনিধি দল কলিকাতায় আগমন করিবেন। আমরা আশা করি, ভারতের জাতীয়তাবাদের জন্মস্থান এই বাঙলা দেশ প্রতিনিধি দলকে উপযুক্ত ভাবে সম্বর্দ্ধনা করিবে। মিশরের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা হইলেন জগলুল পাশা। প্রতিনিধি দল সেই জগলুল পাশার নীতি এবং আদর্শেরই সাধক। জগলুল পাশার প্রতিষ্ঠিত ওয়াফদ দলের তাঁহারা সদস্য। এই ওয়াফদ দল মিশরের স্বাধীনতা আন্দোলনে কত বড় শক্তি যোগাইয়াছে, জগতের ইতিহাসে তাহা পাওয়া যাইবে। অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ, আদর্শে অসীম নিষ্ঠা এবং শত্রুপক্ষ সাম্রাজ্যবাদীর গুলীতে অকাতরে মৃত্যু বরণে—ওয়াফদ দলের ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠা রুধিরাক্ত হইয়া রহিয়াছে। এই ওয়াফদ দলের প্রবর্ত্তক জগলুলের স্বদেশ প্রেম এবং মৃত্যুঞ্জয়ী তপস্যার তেজ বাঙলার স্বদেশ-প্রেমিক সাধকদিগকে যথেষ্ট উদ্দীপনা দান করিয়াছে। বাহির হইতে আধুনিক জগতের দুইজন মহাপ্রাণ ব্যক্তির সাধনা বাঙলার জাতীয় জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে,—ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেন এবং জগলুল পাশা। আজ সেই জগলুল পাশার প্রবর্ত্তিত আদর্শের সাধক দল আমাদের মধ্যে আসিতেছেন, ইহা আমাদের বিশেষ সৌভাগ্য বলিতে হইবে। আমরা আশা করি, বাঙলা দেশে তাঁহারা এমনভাবে সম্বর্দ্ধিত হইবেন, যাহা বাঙলার পক্ষে গর্ব্বের বিষয় হয়, এবং সেই অভ্যর্থনা বাঙলা দেশের স্বাধীনতা-সাধনার ঐতিহাসিক স্মৃতির পক্ষে উপযুক্ত হয়। কলিকাতার পৌরজনগণ এজন্য প্রস্তুত হউন, ইহাই আমাদের অনুরোধ।

স্বাধীনতার আদর্শ—

মিশরীয় প্রতিনিধি দল সম্প্রতি ভারতের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সমস্যা সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন, আমরা সকলকে—বিশেষভাবে, মুসলমান বন্ধুদিগকে তাহা প্রণিধান করিতে অনুরোধ করিতেছি। তাঁহারা মুসলিম লীগের মোড়ল জিন্না সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার পর এই বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, সুতরাং জিন্না সাহেবের দলে তাঁহাদের কথাগুলি কিছু কাজ করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। প্রথম নম্বরেই তাঁহারা জিন্নাই দলের এক ধাপ্পাবাজী ভাঙিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, 'জগলুল পাশা সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের জন্য বিশেষ দাবী খাড়া করিয়াছিলেন, জিন্না সাহেবের এ কথার কোন ভিত্তি নাই। মিশরে সংখ্যালঘিষ্ঠ বলিয়া কোন দল নাই। মিশরের স্বাধীনতাবাদীরা ধর্ম্ম বা সম্প্রদায়গত ভিত্তিতে কোন দল স্বীকার করেন না—তাঁহারা সকলেই মিশরীয়, যে যে ধর্ম্মের, যে সম্প্রদায়ের লোকই হউন না কেন। তাঁহারা আরও বলেন যে, সোসিয়েলিজম, কমিউনিজম, এই সব 'ইজম' লইয়া ঝগড়া করিবার সময় আমাদের নাই। আমাদের মধ্যে আছে শুধু একটি আন্দোলন, এবং সে আন্দোলন হইল স্বাধীনতার আন্দোলন। যে পর্যন্ত দেশের স্বাধীনতা লাভ না হয়, সে পর্যন্ত ঐ সব আন্দোলনের কোন মূল্য নাই।' আমরা, বাঙলা দেশের যাঁহারা জাতীয়তাবাদী, তাঁহাদেরও ঐ একই কথা। যাহারা দেশের স্বার্থ চায়, চায় জাতির স্বার্থ, তাহাদের পক্ষে ভারতেও আন্দোলন মাত্র একটি এবং সে আন্দোলন স্বাধীনতার আন্দোলন। তাঁহাদের দৃষ্টিতে দল আর দশটি নাই। একদল হইল স্বাধীনতার সমর্থক দল এবং অপর দল তাহাদের গায়ে যে নামের লেবেলই মারা হউক না কেন—স্বাধীনতার বিরোধী দল অর্থাৎ দেশের শত্রুপক্ষ। এই দুইয়ের মধ্যে আপোষ-রফা বা মিটমাট হইতে পারে না। মুসলিম লীগের সঙ্গে কংগ্রেসের মিতালীকে লইয়া যাঁহারা বেশী রকমের বাড়াবাড়ি করেন আমরা তাঁহাদের কথায় কোন রকম গুরুত্ব দিতে পারি না। মুসলিম লীগ হইল সুস্পষ্টভাবে সাম্প্রদায়িকতারই উপাসক। দেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধ পথ হইল সাম্প্রদায়িকতার পথ, যাঁহারা ভারতের স্বাধীনতা চাহেন এবং ভারতের সেই স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার উপরই দেশের বিভিন্ন স্বার্থ এবং সম্প্রদায়ের স্বার্থ নির্ভর করিতেছে, অন্ততঃ এটুকু স্বীকার করেন, তাঁহাদের সঙ্গে মুসলিম লীগওয়ালাদের মিল হইতে পারে না। ওয়াফদ প্রতিনিধি দলের বিবৃতি বাঙলার জাতীয়তাবাদীদের এই যে বিশ্বাস—এই বিশ্বাসের জোরই বাড়াইয়া দিয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রের স্বরূপ—

মিঃ মার্ডি জোন্স বিলাতের পার্লামেণ্টে কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রমিক দলের সদস্য ছিলেন। তিনি সম্প্রতি পুণার "তিলক মন্দিরে" বক্তৃতাতে বলেন,—'ভারত শাসন আইনের অংশভূত যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনায় স্বৈরাচার ও গণতন্ত্রের যে অপূর্ব্ব যোগাযোগ দেখা যায়, তাহা ব্রিটিশ ভণ্ডামীর চূড়ান্ত নিদর্শন। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-সভায়, স্বেচ্ছাচারী দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি ব্রিটিশ ভারতীয় প্রতিনিধিদের সহিত একত্র

বসিবেন, ইহা কল্পনাও করা যায় না। যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তিত হইলে প্রগতিশীল মনোভাব যাহাতে বিস্তারলাভ না করিতে পারে, সেই অভিপ্রায়ে ভারতগবর্ণমেণ্টের পররাষ্ট্র-বিভাগ এবং রাজন্যবর্গের মধ্যে গোপন চক্রান্তের ফলে ইহার উদ্ভব হইয়াছে।' মিঃ মার্ডি জোন্স যে কথা বলিয়াছেন, তাহাতে আমাদের মতদ্বৈধ নাই; কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, চক্রান্তটা গোড়া হতেই আসিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদীদেরই মাথায় যে দুরভিসন্ধিটা ছিল, তাহাই কর্ম্ম পরিকল্পনা পাইয়াছে যুক্তরাষ্ট্র প্রণালীর ভিতর দিয়া। ব্রিটিশ জাতির সাম্রাজ্য-স্বার্থকে কায়েম করাই হইল উদ্দেশ্য, দেশীয় রাজ্যের নৃপতি-দিগকে দিয়া সেই উদ্দেশ্যের একদিক সিদ্ধ করিবার ফন্দী রহিয়াছে, কিন্তু তাহাই সব নয়। অন্য অনেক রকমও আছে। এ ফন্দী কর্ত্তারা ছাড়িবেন না, খাটাইয়া লইবেনই; এই জিদ তাঁহাদের। গত ২১শে মার্চ্চও স্যার জন সাইমন পার্লামেণ্টে বলিয়াছেন, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া যুক্তরাষ্ট্র প্রণালীটা বাহির করা হইয়াছে, উহার আর কোন রদ্-বদল হইবে না। ভারতবাসীদিগকে ও গবর্ণমেণ্টকে যে ক্ষমতা ঐ আইনে দেওয়া হইয়াছে, তাহা আর বাড়ান হইবে না। ভারতের জনমত যাহাই বলুক, কংগ্রেস যাহাই বলুক। কর্ত্তারা শুনাইয়া দিতেছেন যে, ত্রিপুরীর সিদ্ধান্তে তাঁহারা ভড়কাইবেন না। ফাঁদ পাতা হইবেই। এ ফাঁদে একবার পা দিলে ভারতের স্বাধীনতা অন্তত আরও ৫০ বৎসর পিছাইয়া যাইবে; কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রাদেশিক মন্ত্রিত্বের মোহ যেমনভাবে এ দেশের এক দল লোককে বিভ্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে, তেমনই যুক্তরাষ্ট্রতন্ত্রের একটা মোহও ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করিতেছে, এই মায়া এবং মোহকে কঠোর এবং নির্ম্মমভাবে কাটাইয়া উঠিতে না পারিলে, ভারতের স্বাধীনতা সুদূরপরাহত।

নূতন ইংগ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি—

নূতন ইংগ-ভারত বাণিজ্য চুক্তির সর্ত্ত প্রকাশিত হইয়াছে, অটোয়া চুক্তির এ এক অভিনব সংস্করণ। এই চুক্তির মধ্যে আমাদের প্রথমেই নজর পড়িবে ল্যাংকাসায়ারের সংগে ভারতের বাজারে বিকি-কিনির সম্পর্কটা, সর্ত্তগুলির মধ্যে ইহা সুস্পষ্ট যে, এ ক্ষেত্রে ল্যাঙ্কাসায়ারের স্বার্থকেই বড় করিয়া দেখা হইয়াছে এবং ভারতে আমদানী বিলাতী সুতী মালের উপর ট্যাক্স কমাইয়া ল্যাংকাসায়ারের স্বার্থকেই বড় করিয়া তৃপ্ত করা হইয়াছে। জাপান ইংলণ্ডের চেয়ে ভারতের তুলা বেশী খরিদ করিয়া থাকে, অথচ এই চুক্তিতে জাপানী সুতী মালের চেয়ে বিলাতী সুতী মালের উপর আমদানী শুল্ক কমান হইয়াছে। এই চুক্তিতে তুলা বিক্রয়ের বিষয়ে ভারতবর্ষ কোন বিশেষ সুবিধা ত পায়ই নাই, বরং এখন তাহার যেটুকু সুবিধা আছে, তাহা না পাইলে বিলাতী সুতী মালের শুল্কে কম লইয়া ভারতের ক্ষতিগ্রস্ত হইবার পথ খোলাসা হইয়াছে। এই বাণিজ্য চুক্তি সর্ত্তে ল্যাংকাসায়ারের বণিকেরা নাকি বড়ই খুশী হইয়াছে। ল্যাংকাসায়ারের বণিক সভার ভারতীয় বিভাগের কর্ত্তা মিঃ এ এইচ হিণ্ডিক্লিফ্ত আহ্লাদে আটখানা। আনন্দ ইঁহাদের হইবারই কথা। এই চুক্তিতে লাভবান করা হইয়াছে ল্যাংকাসায়ারকেই সকল দিক দিয়া। আমরা আশা করি, ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যেরা কর্ত্তাদের রায়ে সায় দিবার মতিগতিতে পরিচালিত হইয়া কাজ করিবেন না,—এই সর্ত্তের ভিতরে ল্যাংকাসায়ারী দলের স্বার্থ সিদ্ধির যে কার-সাজী রহিয়াছে, তাহা তাঁহাদের নজরে পড়িবে। চুক্তির অন্তত এই বিশেষ দিকটার যদি পরিবর্ত্তন সাধিত না হয়, তাহা হইলে উহাকে একেবারে নাকচ করিয়া দেওয়া ছাড়া ভারতবাসীদের স্বার্থের দিক হইতে অন্য কর্ত্তব্য থাকিতে পারে না, আমাদের ত ইহাই বিশ্বাস। ব্রিটিশ জাতির জল টানিবার এবং কাঠ কাটিবার জন্য যে ভারতবাসীদের সৃষ্টি হয় নাই, এই অপ্রিয় সত্যটা সাম্রাজ্যবাদীদিগকে স্পষ্টভাষায় শুনাইয়া দিবার সময় আসিয়াছে, তাহাদের মগজে এটুকু ঢুকাইয়া দিবার প্রয়োজন আছে যে, ভারতবাসীদেরও বুদ্ধি-শুদ্ধি কিছু আছে, তাহারা কর্ত্তার রায়ে সায় দিবার জন্যই সৃষ্ট হয় নাই।

যুদ্ধে ভারত কি করিবে—

ইউরোপের আকাশে অশান্তির মেঘ এবার সত্য সত্যই জমাট হইয়া উঠিয়াছে। গ্রেট-বৃটেন, ফ্রান্স, সোভিয়েট গণ-তন্ত্র এবং আমেরিকা এক হইয়া একটা সন্ধিপত্রে আবদ্ধ হইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, এবার আর এ কাজে গড়িমসি চলিবে না, ত্বরিৎগতিতে কিছু করিতে হইবে, সকলের এমন মনোভাব। যদি সত্যই যুদ্ধ বাধে, তবে ভারত কি করিবে, পণ্ডিত জওহর-লালজী বলিতেছেন,—"জাম্মানী ও রুমানিয়ার মধ্যে সংঘর্ষ বাধিলে ইংলণ্ড দূরে দাঁড়াইয়া জাম্মানীর রুমানিয়া গ্রাস দেখিতে পারিবে না; সেক্ষেত্রে যুদ্ধে তাহাদিগকে ঝাঁপাইয়া পড়িতেই হইবে। রুমানিয়ার তেলের খনিগুলি ইংরেজ জাম্মানীর হাতে নির্ব্বিবাদে ছাড়িয়া দিতে পারে না। জাম্মানীর চেক গ্রাস অবশ্য তাহারা নির্ব্বাক দর্শকের ন্যায় দূরে দাঁড়াইয়া দেখিয়াছে, আর মনে মনে শান্তির আকাশ-কুসুম কল্পনা করিয়াছে; অন্তত মনে করিয়াছে যে, যাক্, আপাতত শান্তি রক্ষিত হইল ত! কিন্তু রুমানিয়ার প্রতি জাম্মানীর লোলুপদৃষ্টিতে অবস্থা চরমে উঠিয়াছে! যদি যুদ্ধ বাধে

তবে ভারত কোন দিকে যাইবে! গণতন্ত্রীদের দিকে কি? এই প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিতজী বলেন, "ভারতে যতদিন পর্য্যন্ত স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত না হইতেছে ততদিন পর্য্যন্ত তথাকথিত গণতন্ত্রীদের পক্ষে নামিয়া ভারতের কোন লাভ নাই; কারণ তথাকথিত গণতন্ত্রীরা নিজের স্বার্থপদ্ধতির মতলবেই ভারতে শোষণ-নীতি চালাইবেন।" সুতরাং ভারতের সর্ব্বাগ্রে দেখিতে হইবে নিজের স্বাধীনতা। বড় বড় ছেঁদো কথায় বা ভবিষ্যতের ভরসায় ভুলিলে যে কত বড় বোকামী করা হয়, ভারতবাসীদের তাহা দেখিতে বাকী নাই। বর্ত্তমানে ভারতবাসীদিগকে তাহাদের বিচার বুদ্ধি পরিষ্কার রাখিতে হইবে এবং বড় বড় কথা যখনই কর্ত্তাদের মুখ হইতে বাহির হয়, তখনই যে তাহাদের অন্তরে অন্তরে থাকে বড় ধাপ্পাবাজী—এই সত্যটি সদা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া কাজ করিতে হইবে।

বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতিকে বুদ্ধির সংগে খাটাইতে পারিলে, সত্যই ভারতের স্বাধীনতা লাভের পক্ষে ইহা যে বড় একটা সুযোগ, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ক্ষুধা ও ভিক্ষা

শ্রীসিতাংশু দাশগুপ্ত

একটি পান নিন, একটি পান নিন,
একটি পয়সা আজ আমায় কেউ দিন,
ছোট্ট মেয়েটি ডেকে যায়—
মাথায় কালো চুল ঝাঁকড়া কালো চুল
ছোট্ট মুখ তার শুষ্ক ছোটো ফুল
করুণ চোখে কেন চায়!

কপালে রোদ লাগে ঝলসি উঠে রোদ
নিরীহ এত সে যে না আছে তাপ বোধ
অথবা নাহি অবসর,
কে জানে নাম তার পারুল চাঁপা যূঁই
সোহাগ করে ডাকা আথর ছোট দুই
মায়ায় ভরা বুঝি ঘর!

শীতের বেলা শেষ দিবস হলো ক্ষীণ
টিনের বাক্স হাতে একটি পান নিন্.....
করুণ সুরে ডেকে যায়—
পথিক দয়া করে নিকটে আসি তার
জঠর জ্বালা ভার মেটাতে বালিকার
একটি পান কিনে খায়!

বলে না তবু মেয়ে ভারী চালাক মেয়ে
রঙীন খেলা কিনে দাওনা এর চেয়ে
আমার খুব ভালো লাগে,
হঠাৎ খুসি হয়ে উঠে না জোরে হেসে
নাচে না এতটুকু মলিন চীর বেশে
শঙ্কা পাছে কারো জাগে!

বিশাল রাজপথে অযুত লোক চলে
তাদের পানে চেয়ে সে শুধু কেন বলে
একটি পান কেউ নিন—
মুখর কোলাহল নগরী শোভা পায়
সবার মাঝে তার মিনতি শোনা যায়
বাতাসে স্বর হয় লীন।

মানবীয় ঐক্যের আদর্শ

শ্রীঅরবিন্দ

ক্ষুদ্র মুক্ত সমুচ্চয় এবং বৃহত্তর কেন্দ্রীভূত সমুচ্চয়

(রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ধারায় মানবজাতির ঐক্য সাধনের সম্ভাবনা)

অতএব আমরা দেখিতেছি যে, যদি আমরা রাজনৈতিক, শাসন-বিষয়ক ও অর্থনৈতিক ধারায় মানব জাতির ঐক্য সাধনের সম্ভাবনা সকল বিবেচনা করি, তাহা হইলে মনে হয়, কোন রকমের একটা ঐক্য অথবা সেইদিকে প্রাথমিক একটা প্রয়াস শুধু যে সম্ভব তাহাই নয়, পরন্তু মানব জাতির মধ্যে একটা বর্দ্ধনশীল ভাব ও প্রয়োজন-বোধ অল্পাধিক নির্ব্বন্ধ সহকারে উহা দাবী করিতেছে। এই ভাবটি সৃষ্ট হইয়াছে অনেকটা পারস্পারিক জ্ঞান ও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের দ্বারা এবং আংশিকভাবে প্রগতিশীল মনীষার উদারতর ও মুক্ততর বুদ্ধিগত আদর্শ ও হৃদ্গত সহানুভূতিসমূহের দ্বারা। আর এই প্রয়োজন-বোধ আসিয়াছে আংশিকভাবে ঐ সকল আদর্শ ও সহানুভূতির দাবী হইতে, আংশিকভাবে অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য বৈষয়িক পরিবর্ত্তন হইতে; এই সব পরিবর্ত্তন বিভক্ত জাতীয় জীবনের ফলস্বরূপ যুদ্ধ, ব্যবসাগত প্রতিযোগিতা এবং তজ্জন্য জটিল এবং সহজ-ভঙ্গুর আধুনিক সামাজিক অর্গানিজেশনের অনিশ্চয়তা বিপদকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মানব এবং আদর্শবাদী চিন্তাশীল মানব উভয়ের নিকটেই ক্রমশ বেশী বেশী পীড়াদায়ক করিয়া তুলিয়াছে। অংশত এই নূতন প্রবৃত্তিটির আরও কারণ এই যে, কৃতকৃত্য জাতিসকল নিজেদেরই প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতার বিপদকে এড়াইতে চাহিতেছে এবং তাহার পরিবর্ত্তে নিজেদের মধ্যে কোন রকম সুবিধাজনক বুঝাপড়া ও মীমাংসার দ্বারা অবশিষ্ট জগৎকে অধীনে রাখিতে, ভোগ করিতে, শোষণ করিতে চাহিতেছে। এই নূতন প্রবৃত্তিটির প্রকৃত শক্তি হইতেছে, ইহার বুদ্ধিগত, আদর্শগত ও ভাবগত অংশে। ইহার অর্থনৈতিক কারণগুলি আংশিকভাবে চিরস্থায়ী এবং সেইজন্য শক্তি ও নির্ব্বিঘ্ন সাফল্যের আধার; আংশিকভাবে সেগুলি কৃত্রিম ও ক্ষণ-স্থায়ী এবং সেইজন্য অনির্ব্বিঘ্নতা ও দুর্ব্বলতার আধার। ইহার রাজনৈতিক কারণগুলি হইতেছে, অপেক্ষাকৃত নীচ প্রেরণা, তাহারা শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যবস্থাটিকেই দূষিত করিয়া তুলিতে পারে এবং সম্প্রতি যে-কোন ঐক্যই সিদ্ধ হউক না কেন, অবশ্যম্ভাবীরূপেই তাহার ধ্বংস ও বিপর্য্যয় ঘটাইতে পারে।

বর্ত্তমানের প্রবৃত্তি

তথাপি, নিকট বা অধিকতর দূর ভবিষ্যতে কোন রকম একটা ফল সম্ভব। যদিই তাহা হয়, তাহা হইলে কোন্ ধারা অনুসরণ করিয়া ইহা নিজেকে সিদ্ধ করিয়া তুলিবে, তাহা আমরা বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারি,—প্রথমতঃ যেগুলি হইতেছে খুবই আসন্ন সাধারণ প্রয়োজন, ব্যবসা সম্বন্ধে ব্যবস্থা, শান্তি ও যুদ্ধ সম্বন্ধে ব্যবস্থা, সাধারণ সালিশের দ্বারা বিবাদ মিটাইবার ব্যবস্থা, জগতের শান্তি রক্ষার জন্য পুলিশের ব্যবস্থা, এই সবের জন্য একটা বুঝা-পড়া ও প্রারম্ভিক মিলন হইবে। আর এই সমুদয় স্থূল ও প্রারম্ভিক ব্যবস্থা একবার স্বীকৃত হইলে, সেইগুলি মুখ্য আদর্শ ও অন্তর্নিহিত প্রয়োজনের চাপে স্বভাবতঃই ঘনিষ্ঠতর ঐক্যে পরিণত হইবে, এমন কি, দূর ভবিষ্যতে এক সাধারণ উচ্চতম গবর্ণমেণ্টও হইতে পারে, সে গবর্ণ-মেণ্ট ততদিন স্থায়ী হইতে পারে, যতদিন না প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাটির দোষসমূহের দ্বারা এবং ইহার স্থায়িত্বের বিরোধী অন্যান্য আদর্শ ও প্রবৃত্তি সকলের অভ্যুত্থানের দ্বারা ইহার মূলগত পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, অথবা ইহা সম্পূর্ণভাবেই ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং ইহার স্বাভাবিক অংশ ও অঙ্গগুলি পৃথক হইয়া পড়ে। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, এখন যে সব পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের দ্বারা কতকটা রূপান্তরিত বর্ত্তমান জগতের ভিত্তির উপরেই এই-রূপ একটা মিলন সম্ভবত প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে; আন্ত-র্জাতিক ব্যাপারে কোন নূতন মূলগত নীতির প্রবর্ত্তন হইবে না, কেবল একটা বুঝাপড়া হইবে এবং জাতিদের নিজেদের মধ্যে অধিকতর দূরপ্রসারী সামাজিক পরিবর্ত্তন সকল সাধিত হইবে। অর্থাৎ বর্ত্তমানে যে সকল স্বাধীন অধিজাতি ও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যেই ঐ মিলন হইবে, কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্র-শাসন ব্যাপারে আভ্যন্তরীণ অবস্থা কড়াকড়ি রাষ্ট্রগত সমাজতন্ত্র (State Socialism) এবং সাম্যের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইবে এবং তাহার দ্বারা প্রধানত, নারী ও শ্রমিকেরাই লাভবান হইবে।* কারণ এইগুলিই হইতেছে বর্ত্তমানের প্রধান প্রবৃত্তি। অবশ্য কেহই নিশ্চিতভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারে না যে, সমগ্র ভবিষ্যতের উপরেই বর্ত্তমান জয়ী হইবে। আমরা জানি না মহান্ মানব-নাট্যের কোন বিস্ময়কর সংঘটন, পুরাতন অধি-জাতি ভাবের কোন্ প্রচণ্ড পুনরভ্যুত্থান, নূতন সামাজিক প্রবৃত্তিগুলির কার্য্যধারায় কোন সংঘর্ষ, ব্যর্থতা, অপ্রত্যাশিত পরিণতি, দুর্দ্ধর্ষ ও যন্ত্রবৎ রাষ্ট্রীয় সমূহতন্ত্রের বিরুদ্ধে মানবাত্মার কোন্ বিদ্রোহ, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও মুক্ত আত্মবিকাশের জন্য মানুষের দৃঢ়মূল আকাঙ্ক্ষার ব্যাপক একটা দার্শনিক অরাজকতাবাদের (Philosophic Anarchism) কোন্ অভ্যুদয় ও শক্তি, কোন্ অদৃষ্টপূর্ব্ব ধার্ম্মিক ও আধ্যাত্মিক বিপ্লব মানব জাতির বর্ত্তমান গতি-ধারাতেই আসিয়া পড়িবে এবং তাহাকে এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন পরিণতির দিকে পরিচালিত করিবে। মানব মন এখনও সেই জ্ঞান, সেই নিশ্চিত বিদ্যা লাভ করে নাই, যাহা দ্বারা এমন কি আগামীকল্য তাহার কি হইবে, তাহা সে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে।

---

* এখন [illegible]ই সম্ভাবনা বিশেষ দেখা যাইতেছে না কারণ টোটালিটেরিয়ান [illegible]গুলিতে নারী ও শ্রমিককে পুনরায় তাহাদের পুরাতন অবস্থাতেই ফেলিয়া দেওয়া হইতেছে, যদিও কিছু ইতর-বিশেষ হইয়াছে।

কোন্ পরিস্থিতিতে মানবজাতির রাজনৈতিক ঐক্য সংসিদ্ধ হইতে পারে

তবে ধরিয়া লওয়া যাউক যে, এরূপ অপ্রত্যাশিত কিছু মাঝে আসিয়া পড়িবে না। তাহা হইলে মানব জাতির কোন এক রকম রাজনৈতিক ঐক্য গড়িয়া উঠিবে। তথাপি এই প্রশ্নটি থাকে যে, এখন এইভাবে উহা গড়িয়া উঠা বাঞ্ছনীয় কিনা, আর যদিও তাহা হয় কোন্ পরিস্থিতির মধ্যে, কোন্ আবশ্যকীয় বিধানে তাহা বাঞ্ছনীয়, যেগুলি না হইলে প্রাপ্ত ফলটি পূর্ব্ব পূর্ব্ব মানব জাতির আংশিক মিলনের ন্যায় কেবল ক্ষণস্থায়ী হইবে? আর প্রথমেই দেখা যাউক মানব জাতি অতীতে যে সব বৃহত্তর ঐক্য বস্তুত গড়িয়া তুলিয়াছে তাহাদের জন্য কি মূল্য দিতে হইয়াছে। অব্যবহিত অতীত আমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে,—অধিজাতি, জাতি ও কৃষ্টিতে আত্মীয় অথবা ভৌগোলিক প্রয়োজনে ও পারস্পরিক আকর্ষণে মিলিত অধিজাতি সকলকে লইয়া স্বাভাবিক সমধর্ম্মী সাম্রাজ্য, এবং যুদ্ধের দ্বারা অধিকৃত কৃত্রিম অসমধর্ম্মী সাম্রাজ্য, তাহা বল-প্রয়োগের দ্বারা, আইনের শৃঙ্খলের দ্বারা, ব্যবসায়িক ও সামরিক উপনিবেশ স্থাপনের দ্বারা সংরক্ষিত, কিন্তু এ পর্য্যন্ত সত্য চৈতন্যমূলক ঐক্যে পরিণত নহে। এই যে সব সমুচ্চয়ের নীতি, ইহারা প্রত্যেকেই সাধারণভাবে মানব-জাতিকে কিছু বাস্তব লাভ অথবা প্রগতির কিছু সম্ভাবনা প্রদান করিয়াছে, কিন্তু প্রত্যেকেই সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে নানা অস্থায়ী বা অন্তর্নিহিত অসুবিধা এবং প্রত্যেকেই পূর্ণ মানবীয় আদর্শে কোন না কোন ক্ষতের সৃষ্টি করিয়াছে।

নূতন ঐক্যের সৃষ্টি

যখন কোন নূতন ঐক্যের সৃষ্টি বাহিক এবং যান্ত্রিক পদ্ধতির দ্বারা অগ্রসর হয়, তখন তাহাকে প্রায়ই এবং বস্তুত প্রায় অপরিহার্য্য ব্যবহারিক প্রয়োজনেই একটা আভ্যন্তরীণ সঙ্কোচ পদ্ধতির ভিতর দিয়া যাইতে হয়, তাহার পর সে পুনরায় তাহার আভ্যন্তরীণ জীবনের এক নূতন ও মুক্ত সম্প্রসারণে প্রবৃত্ত হইতে পারে; কারণ, তাহার প্রথম প্রয়োজন এবং সহজ প্রেরণা হইতেছে, নিজের অস্তিত্বকে গড়িয়া তোলা এবং রক্ষা করা। তাহার প্রধান প্রেরণা হইতেছে, কোনরূপে তাহার ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করা এবং সেই প্রধান প্রয়োজনের সম্মুখে তাহাকে বৈচিত্র্য, সুসমঞ্জস বহুমুখীনতা, বিবিধ উপাদানের সমৃদ্ধি, আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধে স্বাধীনতা—এই সবকে বলি দিতে হয়, আর এই সব না হইলে জীবনের প্রকৃত পূর্ণতা অসম্ভব। একটা বলিষ্ঠ, সুদৃঢ় ঐক্য প্রতি-ষ্ঠিত করিবার জন্য ইহাকে এক প্রধান কেন্দ্র, এক ঘনীভূত রাষ্ট্রশক্তি সৃষ্টি করিতে হয়, তাহা রাজতন্ত্রই হউক, সামরিক অভিজাততন্ত্রই হউক, ধনিকতন্ত্রই হউক, অথবা অন্য কোনরূপ শাসন ব্যবস্থা হউক, তাহার নিকটে ব্যক্তি, কমিউন, নগর, প্রদেশ বা অন্যান্য ক্ষুদ্রতর ঐক্যের স্বাধীনতা ও মুক্ত জীবনকে অবনমিত করিতে হয়, বলি দিতে হয়। সেই সঙ্গেই থাকে উচ্চ, নীচ শ্রেণীবিভাগ-সহ দৃঢ়ভাবে যন্ত্রবৎ গঠিত ও কড়াকড় সমাজ-ব্যবস্থা, সেখানে নীচের শ্রেণীকে নিম্নতর স্থান ও কর্ম্ম দেওয়া হয়, তাহারা ঊর্দ্ধের শ্রেণী অপেক্ষা সঙ্কীর্ণতর জীবন যাপন করিতে বাধ্য হয়; ইহার দৃষ্টান্ত ইউরোপে নগর ও উপজাতির সমৃদ্ধ ও মুক্ত জীবনের পরিবর্ত্তে রাজা, যাজক সম্প্রদায়, অভিজাত সম্প্রদায়, মধ্যবিত্ত শ্রেণী, কৃষক শ্রেণী, সেবক শ্রেণী—এই সব লইয়া উচ্চ, নীচ পদমর্য্যাদানুক্রমে শ্রেণীবদ্ধ সমাজের প্রবর্ত্তন, আর ভারতে তেজস্বী আর্য্যকুল সকলের মুক্ত ও স্বাভাবিক জীবনের পরিবর্তে কড়াকড়ি জাতিভেদ ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন। তাহা ছাড়া, আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, ক্ষুদ্র কিন্তু স্বাধীন প্রাচীনতর সমাজগুলিতে যে একটি মহান সুবিধা ছিল, সকলে বা অধিকাংশ লোকেই সাধারণ জীবনের পূর্ণ প্রাণ-ময় ক্রিয়ায় সক্রিয় উৎসাহজনকভাবে অংশ গ্রহণ করিত, এইটি বৃহত্তর সমুচ্চয়ে অধিকতর কঠিন এবং প্রথম প্রথম অসম্ভবই। ইহার পরিবর্ত্তে জীবনীশক্তিকে কোন প্রধান কেন্দ্রে, অথবা বড়জোর কোন শাসক ও নিয়ন্ত্রণশীল শ্রেণী বা শ্রেণীসমূহে কেন্দ্রীভূত করিতে হয়, কিন্তু সমাজের অধিকাংশ লোককেই অপেক্ষাকৃত জড়তার মধ্যে পড়িয়া থাকিতে হয়, তাহারা সেই জীবনীশক্তির খুব কমই গৌণভাবে উপভোগ করিতে পায়, উপর হইতে যেটুকু চুয়াইয়া নীচে পড়ে কেবল সেইটুকুই নীচের স্থূলতর, দরিদ্রতর, সঙ্কীর্ণতর জীবনকে গৌণভাবে স্পর্শ করে। অন্তত, মানব জাতির বিকাশের ঐতিহাসিক যুগে আমরা এইরূপই দেখিতে পাই।

প্রাচীন সমাজে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার দিকে প্রবৃত্তি

ক্ষুদ্র মানবীয় মণ্ডলীতে সকলেই সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করিতে পারে, ভাব ও আন্দোলনগুলি সকলেই দ্রুত ও জীবন্তভাবে অনুভব করে এবং সেগুলিকে বৃহৎ ও ও কঠিন অর্গানিজেশনের সাহায্য ব্যতীতও দ্রুত কার্য্যে পরিণত করিতে ও গড়িয়া তুলিতে পারা যায়; আত্মরক্ষার ঐকান্তিক প্রয়োজনে ব্যস্ত থাকিতে না হইলেই এইরূপ মণ্ডলী স্বভাবত স্বাধীনতার দিকে মনোযোগ দেয়। এই-রূপ পারিপার্শ্বিকের মধ্যে স্বৈর রাজতন্ত্র বা স্বৈর মুখ্য-তন্ত্র, পোপের স্খলনাতীত অধিকার বা অলঙ্ঘ্য পবিত্র যাজকতন্ত্র, এ-সব সহজে বর্দ্ধিত হইতে পারে না; জন-সাধারণ হইতে দূরে থাকার উপরে, ব্যক্তিগত মনের প্রাত্যহিক সমালোচনা হইতে দূরে থাকার উপরে তাহাদের মান সম্মান নির্ভর করে, কিন্তু এখানে তাহাদের সে সুবিধা নাই; অন্যত্র বৃহৎ গণমণ্ডলী ও বিস্তৃত পরিসরে সমরূপতার যে গুরুতর প্রয়োজন, তাহার জন্য তাহাদের একটা উপযোগিতা আছে, কিন্তু এখানে সে প্রয়োজন নাই। সেই জন্যই আমরা দেখিতে পাই যে, রোমে রাজতন্ত্র নিজেকে দাঁড় করাইতে সক্ষম হয় নাই এবং তাহা অস্বাভাবিক ও সাময়িক অবৈধ অধিকার বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছিল, আর মুখ্যতন্ত্র অধিকতর শক্তিশালী হইলেও, স্পার্টার ন্যায় বিশুদ্ধভাবে সামরিক-সমাজ ব্যতীত অন্যত্র উচ্চ ও অন্যান্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে বা নিজেকে দৃঢ়ভাবে স্থায়ী করিতে সমর্থ হয় নাই। গণ তান্ত্রিক স্বাধীনতায় প্রত্যেক মনুষ্যেরই রাষ্ট্রের নাগরিক

এবং সংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠানসমূহে একটা স্বাভাবিক স্থান আছে, আইন ও কর্ম্মনীতি নির্দ্ধারণে মত প্রকাশের সমান অধিকার আছে এবং নাগরিক হিসাবে তাহার অধিকার অনুযায়ী ও ব্যক্তি হিসাবে তাহার সামর্থ্য অনুযায়ী সে সবের সম্পাদনে অংশ লাভ করিবার নিশ্চয়তা আছে—এইরূপ গণতান্ত্রিক প্রবৃত্তি হইতেছে নগরতন্ত্রের (The City State) সহজাত প্রবৃত্তি এবং ইহার গঠনের অন্তর্নিহিত নীতি। রোমে এই প্রবৃত্তি সমানভাবেই বিদ্যমান ছিল, কিন্তু উহা গ্রীসের ন্যায় অত দ্রুত বিকশিত হইতে অথবা ঐরূপ সম্পূর্ণতার সহিত নিজেকে সিদ্ধ করিয়া তুলিতে সক্ষম হয় নাই, কারণ রোম ছিল সামরিক ও বিজয়শীল রাষ্ট্র, বৈদেশিক নীতি বা সামরিক কর্ম্মধারা নিয়ন্ত্রণের জন্য তাহার পক্ষে প্রয়োজন ছিল একজন স্বৈর সম্রাট (an imperator), অথবা স্বল্পসংখ্যক লোক দ্বারা পরিচালিত একটি ক্ষুদ্র মুখ্যতন্ত্র (Oligarchy); কিন্তু তাহা হইলেও গণতান্ত্রিক নীতিটি সকল সময়েই বিদ্যমান ছিল এবং গণতান্ত্রিক প্রবৃত্তিটি এতই প্রবল ছিল যে, প্রায় প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে রোম যখন আত্মরক্ষা ও বিস্তারের জন্য নিরন্তর সংগ্রামে প্রবৃত্ত ছিল, তাহার মধ্যেও উহা কার্য্য করিতে এবং বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, কেবল ভূমধ্যসাগরের উপর আধিপত্য লইয়া কার্থেজের সহিত মহাযুদ্ধের ন্যায় চরম সংগ্রামসকলের জন্যই উহা স্থগিত হইয়াছিল। ভারতে প্রাচীন মণ্ডলীগুলি ছিল স্বাধীন সমাজ, সেখানে রাজা ছিলেন কেবল সামরিক অধিনায়ক, কিম্বা নাগরিক নেতা; আমরা দেখিতে পাই, বুদ্ধের সময়েও এই গণতান্ত্রিক নীতিটি টিকিয়া রহিয়াছে, এমন কি, চন্দ্রগুপ্ত ও মেগাস্থিনিসের সময়ে যখন আমলাতান্ত্রিকভাবে শাসিত বৃহৎ রাজ্য ও সাম্রাজ্যগুলি পরিশেষে প্রাচীনকালের স্বাধীনতন্ত্রগুলির স্থান গ্রহণ করিতেছিল তখনও তাহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে নিজেকে রক্ষা করিয়াছে। কেবল যখন ভারতীয় জীবনের এক সুবৃহৎ অর্গানিজেশন্ সমগ্র দেশের উপর, অন্তত উত্তরাংশের উপর গড়িয়া তোলার প্রয়োজন ক্রমশ বেশী বেশী অনুভূত হইয়াছিল তখনই সেই প্রয়োজনের অনুপাতে দেশের উপর স্বৈর রাজতন্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছিল, এবং পণ্ডিত ও পুরোহিতশ্রেণী জাতির ঐক্যের শৃঙ্খলরূপে সমাজের উপর নিজেদের ধর্ম্মমূলক আধিপত্য এবং নিজেদের কড়াকড়ি শাস্ত্রবিধান চাপাইয়া দিয়াছিল।

যেমন রাজনৈতিক ও নাগরিক জীবনে তেমনই সামাজিক জীবনেও। কোন ক্ষুদ্রমণ্ডলীতে কতকটা গণতান্ত্রিক সাম্য প্রায় অবশ্যম্ভাবী; সুস্পষ্ট শ্রেণী বিভাগ ও শ্রেণী প্রাধান্য লইয়া যে বিপরীত ব্যবস্থা তাহা কুল বা উপজাতির সামরিক যুগে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে, কিন্তু সুপ্রতিষ্ঠিত নগরতন্ত্রের ঘনিষ্ঠতায় তাহা বেশী দিন স্থায়ী হইতে পারে না, যদি না স্পার্টা ও ভিনিসে যেমন হইয়াছিল তেমনই কৃত্রিম পদ্ধতি সকল অনুসৃত হয়। এমন কি যখন বিভেদটি বর্ত্তমান থাকে তখনও তাহার কড়াকড়ি কমিয়া যায় এবং তাহা গভীর ও তীব্র হইয়া পদমর্য্যাদা অনুযায়ী বাঁধাধরা শ্রেণী বিভাগে পরিণত হইতে পারে না। ক্ষুদ্রমণ্ডলীর স্বাভাবিক সামাজিক রূপটি আমরা দেখিতে পাই এথেন্সে, সেখানে যে চর্ম্মকার ক্লেয়ন উচ্চবংশজাত ও ধনী নিসিয়াসের সহিত সমশক্তিতে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করিত এবং উচ্চতম রাজপদ ও নাগরিক অনুষ্ঠানসমূহ সকল শ্রেণীর লোকের পক্ষেই উন্মুক্ত ছিল, শুধু তাহাই নহে, পরন্তু সামাজিক ব্যাপার এবং সম্বন্ধেও অবাধ মেলামেশাও সাম্য ছিল। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিবৃত্তেও আমরা অনুরূপ গণতান্ত্রিক সাম্য দেখিতে পাই, যদিও তাহা ভিন্ন রকমের ছিল। জাতিভেদ অনুসারে কড়াকড়ি উচ্চ-নীচ শ্রেণী বিভাগ, জাতির অভিমান ও উচ্চতার গর্ব্ব, এসবের বিকাশ হইয়াছে পরে; প্রাচীনকালের সরলতর জীবনে কর্ম্মের পার্থক্যে, এমন কি কর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্বের সঙ্গেও ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত শ্রেষ্ঠত্বের কোন অভিমান থাকিত না; প্রথম যুগে সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র ও উচ্চ যে কর্ম্ম, ঋষি ও যাজ্ঞিকের কর্ম্ম, তাহাও সকল শ্রেণী, সকল বৃত্তির লোকের পক্ষেই উন্মুক্ত ছিল বলিয়া মনে হয়। পুরোহিত-তন্ত্র, জাতিভেদ, স্বৈর রাজতন্ত্র, মধ্যযুগীয় ইউরোপের চার্চ্চ ও রাজতন্ত্রের ন্যায় বৃহৎ সামাজিক ও রাজনৈতিক সমুচ্চয়ের দ্বারা সৃষ্ট নূতন পরিস্থিতির বাধ্যতায় যুগপৎ বিকাশ লাভ করিয়াছিল।

প্রাচীন সামাজিক জীবনের পরিপূর্ণতা এবং তাহার ত্রুটিসমূহ

প্রাচীন গ্রীক্, রোমান ও ভারতীয় নগরতন্ত্র ও উপজাতিসমূহের এইরূপ পরিস্থিতিতে যে-সকল সমাজ সভ্যতায় অগ্রসর হইয়াছিল তাহারা অবশ্যম্ভাবীরূপেই জীবনের এবং সংস্কৃতি ও সৃষ্টির সক্রিয় শক্তির সাধারণ প্রগাঢ়তা বিকাশ করিয়াছিল, কিন্তু পরবর্ত্তীকালের আধিজাতিক সমুচ্চয় সকল সে সমুদয়কে উপেক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিল, একটা নূতন সংবিধানকে গড়িয়া তুলিবার আনুষঙ্গিক বাধা সকলকে জয় করিয়া বহুকালব্যাপী আত্মগঠনের পরই সে সবকে পুনরায় উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। গ্রীক্ নগরতন্ত্রের কৃষ্টিগত ও নাগরিক জীবন এথেন্সে যাহা শ্রেষ্ঠতম সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, যে-জীবনে জীবনধারণ করাটাই ছিল একটা শিক্ষা, যেখানে সমৃদ্ধতম ও দরিদ্রতম ব্যক্তিগণও থিয়েটারে একসঙ্গে বসিয়া সফোক্লেস ও ইউরিপিডিসের নাটকাভিনয় দর্শন করিত, বিচার করিত এবং এথেন্সের ব্যবসাদার ও দোকানদারগণ সক্রেতিসের সূক্ষ্ম দার্শনিক আলোচনায় যোগদান করিত, তাহা ইউরোপের জন্য কেবল তাহার রাজনৈতিক সংগঠনের মূল রূপ ও আদর্শগুলিই সৃষ্টি করিয়া দেয় নাই, পরন্তু তাহার বুদ্ধিবিষয়ক, দার্শনিক, সাহিত্যিক ও কলাসম্বন্ধীয় কৃষ্টির প্রায় সকল মূল রূপগুলিই সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল। এক রোম নগরীর সমানভাবেই প্রগাঢ় রাজনৈতিক, বিচারবিষয়ক ও সামরিক জীবন ইউরোপের জন্য তাহার রাজনৈতিক কর্ম্মধারা, সামরিক বিজ্ঞান ও নিয়মানুবর্ত্তিতা, আইন ও ন্যায়ের ব্যবহারু শাস্ত্র, এমন কি সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ স্থাপনেরও আদর্শ রূপসকল সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল। আর ভারতে অধ্যাত্মজীবনের যে প্রথম উৎফুল্লতার আভাস আমরা বেদ ও উপনিষদ ও বৌদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে পাই, তাহাই সেই সব ধর্ম্ম, দর্শন, অধ্যাত্ম সাধনার প্রণালী সৃষ্টি করিয়াছিল, যেগুলি তখন হইতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবের দ্বারা তাহাদের অন্তর্নিহিত ভাব

ও জ্ঞানের কতকটা এশিয়া ও ইউরোপের উপর বিস্তার করিয়াছিল। আর সর্ব্বত্র সকল প্রভেদের মধ্যেও এই সজীবতা ও ক্রিয়াত্মক শক্তির মূল হইতেছে একই। আধুনিক জগৎ কেবল এখনই কতকটা তাহার পুনরুদ্ধার করিতেছে। সেই মূল হইতেছে সমাজের বহুমুখী জীবনে কেবল সীমাবদ্ধ শ্রেণী বিশেষের নহে, পরন্তু সাধারণভাবে সকল ব্যক্তিরই অংশ গ্রহণ, প্রত্যেকের মধ্যেই এই অনুভূতি যে, সে সকলের শক্তিতে পূর্ণ এবং সে সেই সর্ব্বজনীন শক্তির অপ্রতিহত বন্যায় বর্দ্ধিত হইতে, আত্মবিকাশ করিতে, কর্ম্ম করিতে, চিন্তা করিতে, সৃষ্টি করিতে মুক্ত ও স্বাধীন। এই যে অবস্থা, সমষ্টি ও ব্যষ্টির মধ্যে এই সম্বন্ধ, আধুনিক জীবন কতকটা ইহার পুনরুদ্ধার করিতে চেষ্টা করিয়াছে স্থূলে, অনিপুণ ও অসম্পূর্ণভাবে, তবে প্রাচীন মানব সমাজের পক্ষে যাহা সম্ভব ছিল তাহা অপেক্ষা জীবন ও চিন্তার অনেক বিশালতর শক্তি লইয়া ইহা করা হইয়াছে।

ইহা সম্ভব যে, যদি প্রাচীন নগরতন্ত্র ও উপজাতিমূলক রাষ্ট্রগুলি টিকিয়া থাকিতে পারিত এবং নিজেদিগকে এমনভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতে পারিত যাহাতে বৃহত্তর মুক্ত সমুচ্চয় গঠন করিয়াও সেই নূতন সমুচ্চয়ের মধ্যে নিজেদের জীবনকে না হারাইত, তাহা হইলে বহু সমস্যাই অধিকতর সরলতা ও প্রত্যক্ষ দৃষ্টির সহিত এবং প্রকৃতির সত্য অনুসরণে সমাধান হইতে পারিত, সে-সব সমস্যা এখন আমাদিগকে অতিশয় জটিল ও ক্লেশকরভাবে এবং মহাবিপদ ও বহু দূর প্রসারী বিপ্লবের সম্ভাবনা মাথায় লইয়াই সমাধান করিতে হইতেছে। কিন্তু তাহা হইতে পারে নাই। সেই প্রাচীন জীবনের কতকগুলি মারাত্মক দোষ ছিল, সেগুলি সে দূর করিতে সক্ষম হয় নাই। ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তী জাতিসকলের মধ্যে সমাজের পূর্ণ নাগরিক ও কৃষ্টিগত জীবনে সকল ব্যক্তি সাধারণভাবে অংশ গ্রহণ করিত, কিন্তু দুইটি অতি প্রয়োজনীয় শ্রেণী বঞ্চিত ছিল; কারণ ক্রীতদাসদিগকে সে অধিকার দেওয়া হয় নাই, আর স্ত্রীলোকদের জন্য যে সংকীর্ণ জীবন নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহাতে তাহারাও কার্য্যত প্রায় সম্পূর্ণভাবেই উহা হইতে বঞ্চিত ছিল। ভারতে ক্রীতদাস প্রথা একরকম ছিল নাই বলিতে হয়, এবং প্রথম প্রথম স্ত্রীলোকদের গ্রীস ও রোমে যেরূপ ছিল তাহা অপেক্ষা স্বাধীনতর ও অধিকতর মর্য্যাদাসম্পন্ন স্থান ছিল; কিন্তু শ্রমিক শ্রেণী শীঘ্রই ক্রীতদাসের স্থান গ্রহণ করিয়াছিল, ভারতে তাহাদিগকে শূদ্র বলিয়া অভিহিত করা হইত, এবং স্ত্রী ও শূদ্রগণকে সাধারণ জীবন ও কৃষ্টির উচ্চতম সুবিধাগুলি না দিবার ক্রমবর্দ্ধমান প্রবৃত্তি ভারতীয় সমাজকে তাহার সমধর্ম্মী পাশ্চাত্য সমাজের স্তরে নামাইয়া আনিয়াছিল। ইহা সম্ভব যে, যদি প্রাচীন সমাজ আরও অধিকদিন টিকিয়া থাকিত তাহা হইলে অর্থনৈতিক দাসত্ব ও স্ত্রীলোকের পরাধীনতা এই দুইটি গুরুতর সমস্যাই আক্রান্ত ও সমাধিত হইত, যেমন আধুনিক রাষ্ট্র কর্ত্তৃক ঐ দুইটি সমস্যা আক্রান্ত হইতেছে এবং তাহাদের সমাধান চলিতেছে। কিন্তু ইহা সংশয়পূর্ণ; কেবল রোমেই আমরা কয়েকটি প্রারম্ভিক প্রবৃত্তির ইঙ্গিত পাই, যে-গুলি ঐদিকে ফিরিলেও ফিরিতে পারিত, আর সেগুলি কখনই ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ক্ষীণ সংকেত অপেক্ষা আর অধিকতর অগ্রসর হইতে পারে নাই।

সমাজের সহিত সমাজের সম্বন্ধ

আরও গুরুতর ছিল মানব সমাজের এই প্রথম রূপের পক্ষে সমাজের সহিত সমাজের পারস্পরিক সম্বন্ধের প্রশ্নটির সমাধানে সম্পূর্ণ অকৃতকার্য্যতা। যুদ্ধই ছিল তাহাদের স্বাভাবিক সম্বন্ধ। মুক্ত ফেডারেশনের সকল প্রয়াসই ব্যর্থ হইয়াছিল এবং যুদ্ধে বিজয়লাভই ঐক্য সাধনের একমাত্র পন্থা অবশিষ্ট ছিল। যে ক্ষুদ্র সমুচ্চয়ের মধ্যে প্রত্যেক মানুষই নিজেকে পূর্ণতমভাবে জীবন্ত বলিয়া অনুভব করিত তাহার প্রতি আসক্তি একটা মানসিক ও প্রাণিক সংকীর্ণতার সৃষ্টি করিয়াছিল; বৃহত্তর প্রয়োজন ও প্রবৃত্তি সকলের প্রেরণায় চালিত হইয়া দার্শনিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা জীবনের ক্ষেত্রে যে-সব নূতন ও উদারতর ভাব আনয়ন করিয়াছিল, ঐ সংকীর্ণতা নিজেকে সে-সবের অনুগত করিতে সক্ষম হয় নাই। সেই জন্যই সেই প্রাচীন রাষ্ট্রগুলিকে ধ্বংস ও লোপ পাইতে হইয়াছিল। ভারতে সেগুলি গুপ্ত ও মৌর্য্যগণের বিরাট আমলাতান্ত্রিক সাম্রাজ্যের মধ্যে লুপ্ত হইয়াছিল, পাঠান, মোগল ও ইংরেজগণ সেই সাম্রাজ্যেরই উত্তরাধিকারী হইয়াছিল, আর পাশ্চাত্যদেশে আলেকজান্দার, কার্থেজ মুখ্যতন্ত্র এবং রোমান সাধারণতন্ত্র ও সাম্রাজ্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত বিরাট সামরিক ও বাণিজ্যমূলক বিস্তারের মধ্যে সেগুলিকে লুপ্ত হইতে হইয়াছিল। শেষোক্তগুলি আধিভৌতিক সমুচ্চয় ছিল না, তাহারা ছিল অতি আধিজাতিক (Supra-National Unities) সমুচ্চয়; মধ্যবর্ত্তী অধিজাতি সমুচ্চয় পূর্ণ ও সুস্থভাবে সম্পাদিত হইবার পূর্ব্বে মানবজাতির যেরূপ অতি বৃহদাকার ঐক্য বস্তুত কোনরূপ পূর্ণতার সহিত সম্পাদিত হওয়া সম্ভব নহে, উহারা ছিল তাহারই অকাল প্রয়াস।

আধিজাতিক সমুচ্চয় গঠন

অতএব রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হইবার পরবর্ত্তী সহস্র বৎসর আধিজাতিক সমুচ্চয় গঠনের জন্যই সংরক্ষিত ছিল এবং এই সমস্যাটির সমাধানের জন্য ঐ সময়ে জগৎকে প্রাচীন নগরতন্ত্রগুলি কর্ত্তৃক মানবজাতির জন্য অর্জ্জিত লাভ সকলের মধ্যে অনেকাংশই পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কেবল যখন ঐ সমস্যা সমাধিত হইয়াছিল তখনই সে শুধুই দৃঢ়ভাবে ব্যবস্থাবদ্ধ সমাজ নহে, পরন্তু প্রগতিশীল ও সর্ব্বাঙ্গসিদ্ধ সমাজ বিকাশের প্রয়াসে, শুধুই সামাজিক জীবনের সুদৃঢ় ছাঁচ গড়া নহে পরন্তু জীবনেরই মুক্ত বিকাশ ও সম্পূর্ণতা সাধনের প্রকৃত প্রয়াস করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই যে আবর্ত্তন, আমাদিগকে প্রথমে সংক্ষেপে ইহা পর্য্যালোচনা করিতে হইবে, তবেই আমরা অনুধাবন করিতে পারিব যে, এখন বৃহত্তর সমুচ্চয় গঠনের কোন নূতন প্রয়াস আরম্ভ হইলে একটা বাহ্যিক ঐক্যের বিকাশ ও প্রতিষ্ঠার উপর ঝোঁক দিতে গিয়া মানবজাতির আভ্যন্তরীণ প্রগতিকে অন্তত সাময়িকভাবে বলি দিতে হইতে পারে, এরূপ কোন পশ্চাদ্বর্ত্তনের আশঙ্কা আছে কি না।

ইউরোপে অশান্তির ঘনঘটা

ইউরোপে আবার চাঞ্চল্য উপস্থিত। কোন কোন বিশেষজ্ঞ বলিয়াছিলেন, বসন্তকালেই অর্থাৎ আগামী এপ্রিল মাসেই একটা যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা। তখন সাধারণে একথার তাৎপর্য্য সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে নাই। কে কাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিবে—এই প্রশ্নই সকলে করিয়াছে। আগে লোকে মনে করিত, ভবিষ্যতে যুদ্ধ বাধিলে এক পক্ষে থাকিবে ইটালী, জার্ম্মানী ও জাপান, আর অন্য পক্ষে থাকিবে ফ্রান্স, ব্রিটেন ও রুশিয়া। পরে দেখা গেল, ফ্রান্স ও ব্রিটেন কিছুতেই রুশিয়ার সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিবে না। তাহারা প্রতি পদে জার্ম্মানী ও ইটালীরই তোয়াজ করিয়া চলিবে, ইহারা যত সব দাবী করিবে, সবই তাহারা মানিয়া লইতে থাকিবে। মিউনিক চুক্তি দ্বারা চেকোশ্লোভাকিয়ার

নোবেল জুটিল ভাগ্যে নেভিলের আশ!

তার মধ্যে রণবাদ্য একি সর্ব্বনাশ!

অঙ্গচ্ছেদ করানো পর্য্যন্ত লোকে ইহাই দেখিয়া আসিয়াছে। তখন বাস্তবিকই লোকে বুঝিতে পারে নাই, বসন্তকালে যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিবে কেন।

তাহার পর, অর্থাৎ মিউনিক চুক্তির পর পাঁচ মাস চলিয়া গিয়াছে। জার্ম্মানী নিজ দেশে ইহুদী দলন পূর্ণ মাত্রায় চালাইয়াছে, উপনিবেশের দাবীও নূতন করিয়া পেশ করিয়াছে। সাধারণের এই সব জিনিষ গা-সহা হইয়া যাওয়ায় বহির্জ্জগতে বিশেষ কোন চাঞ্চল্য দেখা যায় নাই। ইটালী হঠাৎ কর্সিকা, টিউনিস প্রভৃতি এমন কতকগুলি জায়গা দাবী করিয়া বসিল, যাহা ফ্রান্স ও ব্রিটেন উভয়ের পক্ষেই বিশেষ প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ। এই ব্যাপারটি কিন্তু তাহাদের মনে কেমন যেন একটা ধোঁকা লাগাইয়া গেল। জগতের সর্ব্বত্র শান্তির হাওয়া বহিতেছে। দেশ-নেতারা সর্ব্বত্রই শান্তির শান্তবার্ত্তা পরিবেশন করিতেছেন। বিভিন্ন দেশের মধ্যে নেতাদের আনাগোনাও চলিয়াছে খুবই। এ সময় ইটালীর ঐ দাবী ঈশান কোণে ঘন কৃষ্ণ মেঘের মত উঠিয়া আবার যেন কোথায় মিলাইয়া গেল। লোকে বুঝিল, মিউনিকে বসিয়া যে শান্তি-সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা আর শীঘ্র ভাঙ্গিয়া পড়িবে না; অন্তত, এমন কোন ঝড়-ঝাপ্‌টা আসিবে না, যাহাতে ইহার কোন ব্যাঘাত হইতে পারে।

'বসন্তকালেই যুদ্ধের সম্ভাবনা বেশী'—কোন কোন বিশেষজ্ঞের এরূপ কথায় গবেষকগণ শান্তির অনাবিল আবহাওয়ার মধ্যে নূতন কোন সূত্র খুঁজিয়া পাইবার আশ্বাস পাইলেন। এরূপ সূত্র যদি মাঝে মাঝে না পাওয়া যায়, তবে রাজনীতিক গবেষকদের ব্যবসা যে একেবারে মাটি হইবার উপক্রম হইবে! কেহ বলিলেন, ভূমধ্যসাগর তীরেই একটা প্রলয় কাণ্ড হইয়া যাইবে হয়ত। ইটালীর ঐ সব দাবীর কথার উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহাদের গবেষণা সুরু হইয়াছে। স্পেনে ব্রিটিশ ও ফরাসীরা তাহাদের নীতি-চাতুর্য্য দেখাইতে লাগিয়া গিয়াছিল। ফ্রাঙ্কোকে হাত করিয়া ইটালীয়ানদের (এবং জার্ম্মানদেরও) সেখান হইতে হটাইয়া দিবার চেষ্টায় ছিল ইহারা। তাই স্বতঃই ধারণা হইয়াছিল, ভূমধ্যসাগরকে কেন্দ্র করিয়াই হয়ত ভাবী মহাসংগ্রাম আরম্ভ হইবে। গবেষকদের এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইয়াছিল ফ্রাঙ্কোকে স্বীকার করিবার পর হইতে ব্রিটেন ও ফ্রান্স, বিশেষ করিয়া ব্রিটেনের রণসম্ভার বৃদ্ধির তোড়জোড় দেখিয়া। গত সেপ্টেম্বর মাসে মিউনিক চুক্তির প্রাক্কালে ব্রিটেনের সমরশক্তি যেরূপ ছিল, তাহার পর গত পাঁচ মাসের মধ্যে তাহা আশাতীতভাবে বাড়িয়া গিয়াছে। বিটিশ মন্ত্রীরা নানা জায়গায় প্রকাশ্য বক্তৃতায় বলিতে লাগিলেন, 'ব্রিটিশের এখন আর ভাবনার

কোন কারণ নাই। তাহার শক্তি দৃঢ় ও অনমনীয়। যে কোন বড় শক্তিকে সে এখন সার্থকভাবে বাধা দিতে পারে।' ইত্যাদি ইত্যাদি। এক দিকে রাষ্ট্রনেতাদের এই সব বাণী, অন্য দিকে স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী ও ব্যোমবাহিনী বৃদ্ধির অসম্ভব রকম আয়োজন, বিমান আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য দেশ-ব্যাপী ব্যাপক প্রচেষ্টা, এই সব মিলিয়া গবেষকদের ঐ ধারণা আরও পাকা করিয়া দিতেছিল। কিন্তু ব্যাপার অকস্মাৎই, অন্যের অলক্ষিতেই অন্যরূপ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। সাধারণের ত কথাই নাই, ওয়াকিবহাল মহলও হকচকিয়া গিয়াছে। এর মধ্যে এক দিন ব্রিটিশ প্রাধন মন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেন বলিয়া বসিলেন, মিউনিক চুক্তিতে ক্ষুধিতদের ক্ষুধা মিটিয়া গিয়াছে, ইউরোপের আর বিশেষ কোন ভয় নাই। তাহাদের রণসম্ভার বৃদ্ধি হঠকারীদের নিরস্ত করিতে পারিবে অতঃপর। সাধারণেও বুঝিল ব্রিটিশ কূটনীতি ও সমর শক্তিবৃদ্ধি উভয়ে মিলিয়া তাহাকে ত বড় করিয়াছেই, অন্যদেরও তাহাকে সমীহ করিয়া চলিতে বাধ্য করিয়াছে। কিন্তু একি হইল? চেম্বারলেন মহোদয়ের উক্তির দুইদিন পরেই মধ্য ইউরোপে ভীষণ সমস্যা উপস্থিত হইল। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী কি এ সব বিষয়ে খোঁজখবর রাখিতেন না? ব্রিটেনের পররাষ্ট্র-বিভাগ তাহা হইলে কি দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে? পার্লামেণ্টে প্রশ্ন উঠিল, সংবাদপত্রে তীব্র আলোচনা সুরু হইল। পররাষ্ট্র-বিভাগে কৈফিয়ত তলব করা হইল। পররাষ্ট্র-বিভাগ জবাব দিল যে, তাহাদিগকে না জানাইয়াই নিজ দায়িত্বে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী ঐরূপ উক্তি করিয়াছিলেন! তাহা হইলে দায়িত্বশীল অঞ্চল হইতে এ যাবৎ যতকিছু বাণী ঘোষিত হইয়াছে তাহা কি নিছক প্রচারোদ্দেশ্যে করা হইয়াছে? একি অপরকে ছোট করিয়া নিজেদের সম্বন্ধে বিশ্বাস বা আস্থা বাড়াইবার অপচেষ্টা? পররাষ্ট্র-বিভাগ বলিয়াছে, মধ্য ইউরোপের অবস্থা সম্বন্ধে তাহারা আগেই আঁচ পাইয়াছিল, কর্ত্তাদেরও জানাইয়া দিয়াছিল। তাহা হইলে সত্য ঘটনা চাপা দিবার এ ব্যর্থ চেষ্টা কেন? সম্প্রতি প্রকাশ, চেকোশ্লোভাকিয়া বর্ত্তমান মাসের গোড়াতেই একটা অনর্থের সম্ভাবনার বিষয় জানিতে পারিয়াছিল, জানিতে পারিয়া মিউনিক চুক্তির স্বাক্ষর-কারীদের জানাইয়াছিল, ফরাসী মন্ত্রিসভাও ব্রিটেনকে এ বিষয় জানাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু ব্রিটেনের কর্ত্তারা কিছুতেই কর্ণপাত করিলেন না। কেন এইরূপ হইল—সকলেই জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছে। ইহার সদুত্তর এখনও পাওয়া যায় নাই, আশা হয়, শীঘ্রই পাওয়া যাইবে। তবে হিটলার যে অতর্কিতে চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাস করিয়া বসিবে ইহা বোধ হয় সেখানকার কর্ত্তারা জানিতে পারেন নাই। যদি জানিতে পারিতেন তাহা হইলে হয়ত আর একটু হুসিয়ার হইয়াই চলিতেন। ঘটনার আশ্চর্য্য রকম দ্রুত পরিণতিতে তাঁহারাও হয়ত বিস্ময় মানিয়াছেন। মিউনিক চুক্তির পর চেকোশ্লোভাকিয়া জার্ম্মানীর আওতার মধ্যে আসে। আভ্যন্তরিক ও বৈদেশিক নীতিতে তাহারই নির্দ্দেশ তাহাকে মানিয়া চলিতে হয়। এ কারণ লোকে ভাবিয়াছিল, চেকোশ্লোভাকিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় হয়ত আরও কিছুকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে। মিউনিক চুক্তির স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র-গুলি চেকোশ্লোভাকিয়ার অখণ্ডতা মানিয়া লইয়াছিল। কিন্তু তাহাতেও তেমন আশ্বস্ত হওয়া চলিত না, যদি-না হিটলার বলিতেন, ইউরোপে তিনি আর সূচ্যগ্র-পরিমাণ ভূমিও চান না। চেকোশ্লোভাকিয়া সুদেতেন জার্ম্মান অংশ হারাইল, পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরীও নিজ নিজ দিকে তাহার কতকটা অংশ ছিনাইয়া লইল। অজুহাত, জার্ম্মানদের যখন জার্ম্মানীর সঙ্গে যুক্ত করা হইয়াছে তখন পোলদের পোল্যাণ্ডে ও মেগিয়ারদের হাঙ্গেরীতে দিয়া দিতে আপত্তি হইবে কেন? চেকোশ্লোভাকিয়া ইহাও মানিয়া লইল। হিটলার জিদ ধরিয়াছিলেন, চেকোশ্লোভাকিয়ার বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিরোধ লোপ করাইবার জন্য তাহাদিগকে আত্মকর্ত্তৃত্ব বা স্বায়ত্তশাসন দান করিতে হইবে। মিউনিক চুক্তির অব্যবহিত পরে ইহার শ্লোভাকিয়া ও রুথেনিয়া অঞ্চলকে আত্মকর্ত্তৃত্ব দেওয়াও হইল। আভ্যন্তরিক সকল ব্যাপারেই হইল তাহারা স্বরাট্, সর্ব্বক্ষমতা সম্পন্ন। মাত্র পররাষ্ট্র ব্যাপারে ও সর্ব্ব-দেশীয় বিষয়গুলিতে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা বাহাল রহিল। এইসব প্রদেশের মন্ত্রিসভা চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রেসিডেণ্টের নিকট দায়ী। প্রেসিডেণ্ট মন্ত্রিসভাগুলিকে বরখাস্ত করিতে পারেন। এই নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী কার্য্য আরম্ভ হইবার পর হইতে কেন্দ্রীয় সরকার এবং শ্লোভাকিয়া ও রুথেনিয়ার মধ্যে খিটিমিটি যেন বেশী করিয়াই সুরু হয়। সাধারণের দৃষ্টি অন্য দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া এদিকে তখন ইহা তেমন পড়ে নাই।

সোভিয়েট রুশিয়ার ইউক্রেন প্রদেশের উপর হিটলারের অনেক দিনের লোভ। তাঁহার আত্মজীবনীতেও তিনি একথা ব্যক্ত করিয়াছেন। ইউক্রেন প্রদেশকে রুশিয়ার কোষাগার বলা হয়। খনিজ ও কৃষিজ দ্রব্যে এ-দেশটি খুবই সমৃদ্ধ। শিল্পাদি ব্যাপারেও ইহার জুড়ি কমই মিলে। নূতন স্বায়ত্তশাসন-প্রাপ্ত রুথেনিয়ায় ইউক্রেন জাতির এক অংশের বাস। পোল্যাণ্ডের ভিতরেও বহু লক্ষ ইউক্রেন বাস করিতেছে। হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়ার এই রুথেনিয়া অঞ্চলকে ভিত্তি করিয়া একটা নিখিল ইউক্রেন রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন সুরু করিয়াছিলেন। বার্লিনে একটা ইউক্রেন বাহিনীও গঠিত হইতে লাগিল। তখন লোকে ভাবিয়াছিল, রুশিয়ার ইউক্রেন অংশসমেত একটা নিখিল ইউক্রেন রাষ্ট্র গঠন করিয়া এবং তাহাকে নিজ তাঁবে রাখিয়া হিটলার সেখানকার ধনসম্পদ আহরণের চেষ্টা করিতে থাকিবেন।

কিন্তু আজ একি হইল? এই সেদিনকার মিউনিক চুক্তি ও সমস্ত আশ্বাসবাণী অগ্রাহ্য করিয়া চেকোশ্লোভাকিয়াকেই হিটলার গ্রাস করিয়া বসিলেন কেন? মাঝে মাঝে সংবাদ আসিত, মিউনিক চুক্তির পর চেকোশ্লোভাকিয়ার উপর হিটলারের দাবী-দাওয়া ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছিল। বাড়িবারই কথা। তাহার ধন-সম্পদ, শিল্প-কারখানা, অস্ত্রশস্ত্র অন্যের লোভের উদ্রেক করিবে বৈকি? চেকোশ্লোভাক রাষ্ট্রের বর্ত্ত-মান কর্ণধারগণ বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন, সুদেতেন-জার্ম্মান অঞ্চল জার্ম্মানীকে দিয়া, আর হিটলারেরই নির্দ্দেশমত জাতি

হিসাবে বিভিন্ন অংশকে স্বায়ত্তশাসন দিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াই থাকিবেন, হিটলার তাঁহাদের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে আর হস্তক্ষেপ করিবেন না। তাই তাঁহার দাবীও তাঁহারা বাহিরের অবাঞ্ছিত চাপ বলিয়াই মনে করিয়াছেন। কিন্তু হিটলারের নব নব দাবী ভবিষ্যৎ অমঙ্গলেরই সূচনা করিয়াছিল এখন বুঝা যাইতেছে। প্রাগের জার্ম্মান-নেতা হেরকুণ্ড স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, চেকোশ্লোভাকিয়ায় এখনও যে কয়জন জার্ম্মান আছে, তাহারা জার্ম্মানীকেই স্বদেশ বলিয়া মনে করিবে, অন্যকে নহে। ইহাতেও অনেকে বিস্মিত হইয়াছিলেন। ইতিমধ্যে আরও কতকগুলি ঘটনা অতি দ্রুত ঘটিতে লাগিল। শ্লোভাকরা এতকাল চেকদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া কাজকর্ম্ম চালাইয়াছে। ডক্টর হ্লিঙ্কার নেতৃত্বে আগে হইতে তাহারা স্বাতন্ত্র্যের দাবী করিতেছিল, কিন্তু মন্ত্রীকে বরখাস্ত করিয়া মন্ত্রিসভা ভাঙ্গিয়া দিলেন। শ্লোভাকরা এবং হিটলারও ইহাই চাহিয়াছিলেন। কর্ম্মচ্যুত মন্ত্রীরা বার্লিনে গিয়া হিটলারের নিকট হইতে স্বাধীন শ্লোভাকিয়ার সনদ লইয়া আসিলেন। ডক্টর হাচাকেও বার্লিনে ছুটিতে হইল। কিন্তু তিনি গিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে মরমে মরিয়া গেলেন। হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়ার আধুনিকতম ম্যাপও ছিড়িয়া ফেলিয়াছেন! তিনি শ্লোভাকিয়া ও রুথেনিয়াকে সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করিতে চান। বাকী চেক রাজ্য বোহেমিয়া ও মোরাভিয়া এই দুইটিও স্বতন্ত্র অঞ্চলে বিভক্ত হইবে। কেন্দ্রীয় সরকার বলিয়া কিছুই থাকিবে না, এদুটিকে তাঁহারই নিযুক্ত শাসনকর্ত্তার অধীন করা হইবে। হিটলারের দাবী—হয় ডক্টর হাচাকে এই প্রস্তাবে রাজি হইতে হইবে, নচেৎ প্রাহার উপরে অবিলম্বে বোমা
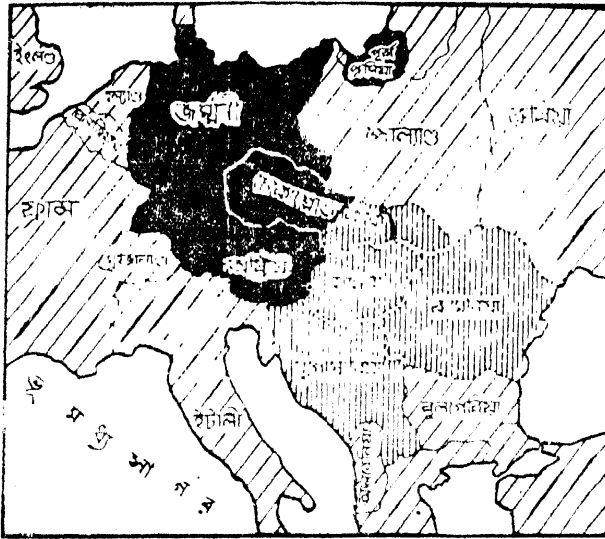
বর্ত্তমান জার্ম্মানী (কৃষ্ণবর্ণ অংশ)।
বলকান উপদ্বীপের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির উপরও তাহার নজর পড়িয়াছে।

আত্মকর্তৃত্ব লাভের পর তাহাদের স্বাতন্ত্র্য উগ্র আকার ধারণ করিয়াছে। তাহারা কমিউনিষ্ট দল তাড়াইয়া দিয়াছে, ইহুদী দলন সুরু করিয়াছে। মধ্য ইউরোপে জার্ম্মানীর আধিপত্য যাহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় তাহার চেষ্টা করিতেছে। শ্লোভাক প্রধান মন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছিলেন যে, নাৎসীদের সঙ্গে তাঁহারা এক হইতে চান।

নূতন চেকোশ্লোভাকিয়ার কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট শ্লোভাকদের এতাদৃশ ব্যবহার বরদাস্ত করিতে পারিল না। ইহাদের কে উষ্কাইতেছে, তাহা যে তাহারা টের পায় নাই এরূপ নহে। তবে ভাবিয়াছিল, আগে হইতে সতর্ক করিয়া দিলে তাহারা অল্পতেই থামিয়া যাইবে। শ্লোভাক সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কথায় ভ্রূক্ষেপ করিল না, বৈদেশিক ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ বেশী করিয়া করিতে লাগিল। নিয়মতন্ত্র অনুসারে চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রেসিডেণ্ট ডক্টর হাচা শ্লোভাক প্রধান নিক্ষিপ্ত হইবে। ইহার অর্থ সকলেই জানেন! ইহার ফলে চেক রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যাইত। ডক্টর হাচা প্রমাদ গণিলেন, কিন্তু নিরুপায়। চেকোশ্লোভাকিয়াকে সকলেই ত্যাগ করিয়াছে, সে এখন হিটলারের মুষ্টিগত। তাহাকে তাঁহার মুষ্ট্যাঘাত সহ্য করিতেই হইবে। হিটলারের সব কার্য্য আগে হইতেই ঠিক হইয়াছিল। যখন ডক্টর হাচাকে তিনি এই দাবী জানাইলেন তাহার পূর্ব্বেই জার্ম্মান সৈন্য জার্ম্মান সীমান্ত পার হইয়া চেকোশ্লোভাকিয়ায় প্রবেশ করিয়াছিল। ডক্টর হাচা সব দাবীই মানিয়া লইলেন। হিটলার প্রাহা গেলেন, সৈন্যবাহিনীও অবিলম্বে প্রাহায় উপস্থিত হইল। পররাষ্ট্র-সচিব হের ফন রিবেনট্রপ চেকোশ্লোভাকিয়ার বিলোপ-বার্ত্তা প্রাহা হইতে ঘোষণা করিলেন! ঘড়ির কাঁটার মত সবই ঠিক হইয়া গেল! চেকোশ্লোভাকিয়া বলিয়া এখন আর কোন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নাই। বোহিমিয়া, মোরাভিয়া

জার্ম্মান শাসনকর্ত্তার অধীন। স্বাধীন শ্লোভাকিয়া জার্ম্মানীর নেতৃত্ব স্বীকার করিয়াছে। স্বাধীন রুথেনিয়া এখন প্রায় হাঙ্গেরীর কুক্ষিগত। হিটলার রুথেনিয়া নিজে না গ্রহণ করিয়া হাঙ্গেরীকে দিয়া দিতেছেন কেন—ইহা কতকটা রহস্যপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। কেহ কেহ বলেন, হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়া যেমন গ্রাস করিয়াছে, হাঙ্গেরীকেও তেমনি গ্রাস করিবে, চিন্তা কি? ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছুই নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে জার্ম্মানী ও হাঙ্গেরীর মধ্যে কোনরূপ বোঝাপড়া হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। হাঙ্গেরী জার্ম্মানী ছাড়া এক পাও চলিতে পারিবে না। তাহার তিন দিকেই এখন জার্ম্মানী। এইরূপ হয়ত একটা চুক্তি হইয়াছে যে, হাঙ্গেরীর কাঁচা মাল সকলই জার্ম্মানীকে সরবরাহ করিতে হইবে। এইরূপ আভাষও পাওয়া গিয়াছে।

চেকোশ্লোভাকিয়া বিনাশ এত দ্রুত সংঘটিত হইয়াছে যে, কেহ ইহার বিষয় তেমন ভাবিয়া দেখিতেও অবসর পায় নাই। ফ্রান্স, ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রুশিয়া সকলেই আজ হতভম্ব। দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপের ক্ষুদ্র দেশগুলির ত চিন্তার অবধিই নাই। ইহারা একসঙ্গে কি পন্থা আবলম্বন করিবে তাহা ভাবিতে না ভাবিতে খবর আসিল রুমানিয়ার উপরেও জার্ম্মানীর চরমপত্র পেঁ‌ৗছিয়াছে! রুমানিয়া সরকারীভাবে এ কথা অস্বীকার করিয়াছে বটে, কিন্তু একটা বিষয়ে যে জার্ম্মানী তাহার উপর দাবী পেশ করিয়াছে তাহা সুনিশ্চিত। তাহার সব রকম ভূমিজ জিনিষের উপর হিটলার একচেটিয়া আধিপত্য চান। রুমানিয়া এরূপ দাবী মানিয়া লইতে রাজি নয়। উপরন্তু সীমান্ত সুরক্ষিত করিবার জন্য বিস্তর সৈন্য-সামন্ত সেখানে পাঠাইতেছে। কখন কি হয়—বিশ্বাস ত আর নাই!

জার্ম্মানীর এই কার্য্যে জগতে একটা যে ভীষণ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। ব্রিটেন এই বলিয়া জার্ম্মানীর উপর দোষারোপ করিতেছে যে, চেক সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতি, তাহাদের রাজ্য অধিকার করিয়া হিটলার পররাজ্যাপহারকই হইয়াছেন। তাঁহার একার্য্য মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়। তিনি পূর্ব্ব-নীতি—সমগ্র জার্ম্মান জাতিকে এক রাষ্ট্রভুক্ত করা—হইতে স্খলিত হইয়াছেন। তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে বাধা দান করিবার সময় উপস্থিত। প্রকাশ, ব্রিটিশ মন্ত্রিসভায় হিটলারের অগ্রগমন সম্পর্কে নাকি দুইটি মত দেখা দিয়াছে। এক দল তাঁহাকে পোল-রুমানিয়া সীমান্তেই বাধা দিতে চান, অন্য দল তাঁহার অগ্রগমনের সীমরেখা টানিয়াছেন বস্‌ফরাস্ পর্য্যন্ত। ইহার ওপাশে গেলেই তাঁহাকে বাধা দেওয়া হইবে। বার্লিন হইতে বস্‌ফরাস পর্য্যন্ত একটি রেল লাইন স্থাপনের পরিকল্পনাও নাকি হিটলারের আছে। ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-সচিব লর্ড হালিফাক্স প্রথমোক্ত মতের সমর্থক। দ্বিতীয় মত সমর্থন করিতেছেন, স্যার জন সাইমন। এই মতে মিঃ নেভিল চেম্বারলেনরও নাকি সায় আছে। কিন্তু জনমত তিনি উপেক্ষা করিতে পারিতেছেন না। বার্ম্মিংহামে তিনি যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাতে ভাষার চাতুরী থাকিলেও তাহা হিটলারের প্রতি স্পষ্টোক্তিই বলা চলে। লর্ড হালিফাক্স গতকল্য লর্ড সভায় যে বক্তৃতা করিয়াছেন, ব্রিটিশ মনোভাব তাহাতে সুব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। মধ্য ও পূর্ব্ব ইউরোপে জার্ম্মানীর প্রাধান্য কতকটা ইঁহারা স্বীকার করিয়া লইতে চান, যেমন ব্যবসা-বাণিজ্যে তাহার প্রাধান্যলাভ ঘটিয়াছে, কিন্তু এখানকার রাজ্যগুলি একে একে জার্ম্মানী ভুক্ত হউক ইহা কেহই চান না। ব্রিটিশ ও ফরাসী গবর্ণমেণ্ট জার্ম্মানীকে তাহার হটকারিতার জন্য নিন্দা করিয়া 'নোট' দিয়াছেন, জার্ম্মানী হইতে তাহার কড়া জবাবও আসিয়াছে! সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট চেকোশ্লোভাকিয়া অধিকার স্বীকার করিবে না—বলিয়া দিয়াছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট রুজেভেল্ট সেখানকার 'নিউট্রালিটি এ্যাক্ট' বা বিদেশে যুদ্ধ ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকিবার আইন সংশোধনের আবশ্যকতা জানাইয়া কংগ্রেসে নোটিশ দিয়াছেন। সেখানকার চেক দূত নিজ দূতাবাস জার্ম্মানীকে ছাড়িয়া দিতে অস্বীকার করিয়াছেন। কলিকাতায়ও অদ্য এইরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছে। আমেরিকা প্রবাসী চেকোশ্লোভাকিয়ার ভূতপূর্ব্ব করিয়াছেন। আমেরিকা প্রবাসী চেকোশ্লোভাকিয়ার ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট ডক্টর এডোয়ার্ড বেনেশ একটা নূতন চেক রাষ্ট্র সাময়িকভাবে গঠন করিয়াছেন, যেমন তিনি গঠন করিয়াছিলেন গত যুদ্ধের সময় প্যারিসে বসিয়া। জার্ম্মানীর ব্যবহারে ফ্রান্স বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। প্রধানমন্ত্রী মর্ঁসিয়ে দালাদিয়ের "Full Powers Bill" বা পূর্ণ ক্ষমতামূলক আইন উভয় প্রতিনিধি সভায় পাশ করাইয়া লইয়াছেন। সামরিক, আর্থিক ও রাজস্ব বিষয়ক সর্ব্বরকম ক্ষমতা তিনি আগামী ছয় মাসের জন্য হস্তে লইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এরূপ ক্ষমতা না পাইলে দেশরক্ষা ভার গ্রহণ তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। তাঁহার দৃষ্টি এখন ফরাসী সীমান্তের দিকে নিবদ্ধ। ব্রিটিশ ও ফরাসী ব্যাঙ্কগুলিতে চেক-রাষ্ট্রের যে-সব স্বর্ণ মজুত রহিয়াছে তাহা ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না—ঐ ঐ দেশের সরকার এইরূপ আদেশ দিয়াছেন। ইটালী কিন্তু বিশেষ উচ্চবাচ্য করিতেছে না। ভারতবর্ষেও এই চাঞ্চল্যের ঢেউ আসিয়া পেঁ‌ৗছিয়াছে। করাচীতে নাকি বিমান আক্রমণ ব্যাহত করিবার আয়োজন হইতেছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় ইহা কতই সামান্য। ব্রিটেন, ফ্রান্স, সোভিয়েট রুশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও পূর্ব্ব ইউরোপের ছোট দেশগুলি আজ গভীরভাবে চিন্তা করিতেছে—ভবিষ্যতে জার্ম্মানীর পররাজ্য হরণ কার্য্যকে কিরূপে বাধা দেওয়া যাইবে। ইউরোপের আকাশে আজ কালো মেঘের ঘনঘটা। যুদ্ধ বাধিবে কি?

২১শে মার্চ্চ, ১৯৩৯।

বিহঙ্গের প্রব্রজন রহস্য

বসন্তের সমাগমে কত রকমের পাখী দেশ দেশান্তর হইতে উড়িয়া আসে, বসন্তের অবসানে তেমনি আবার তাহারা কোথায় যেন উধাও হইয়া যায়! ঋতুভেদে বিভিন্ন পাখীর এইভাবে দেশে দেশে প্রব্রজন চলিয়াছে। কেমন করিয়া উত্তুংগ পর্ব্বত ও দুস্তর সাগর লঙ্ঘন করিয়া পাখীরা ঋতুভেদে বিভিন্ন দেশে নিজেদের গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হয়,—পথভ্রষ্ট না হইয়া যথাসময়ে আবার অপর দেশে গমন করে, প্রাকৃতিক ইতিহাসে তাহা এক বিচিত্র রহস্য। এই রহস্যের সন্ধানে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিভিন্নভাবে গবেষণা করিয়া তাঁহাদের অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রীক দার্শনিক এরিষ্টটলের পর হইতে বিহংগের এই প্রব্রজনশীলতার ব্যাখ্যা বহু বৈজ্ঞানিক বহুভাবে করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, পঞ্চেন্দ্রিয় ব্যতীত পাখীদের অপর একটি ইন্দ্রিয় বা অনুভূতি শক্তি রহিয়াছে, যাহার স্বরূপ সঠিক জানা না গেলেও মনে হয় ইহারই সাহায্যে বিহংগগণ এভাবে ঋতুভেদে দেশ-বিদেশে প্রব্রজন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। আবার একদল বিজ্ঞানীর অভিমত এই যে, পাখীরা স্থানবিশেষের দৃশ্যাবলী এমনভাবে স্মরণ করিয়া রাখিতে পারে যে, বহুদূরবর্ত্তী দেশেও দৃশ্যাবলী নিরীক্ষণ করিয়া ইহাদের গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে কখনও ভুল হয় না! আবার কোন কোন বৈজ্ঞানিক এই অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, বায়ুমণ্ডলের সুউচ্চ স্তরে এক-প্রকার বায়ুপ্রবাহ রহিয়াছে। ইহারাই বিহংগের পথ নির্দ্দেশ করিয়া তাহাদের গন্তব্যপথে চালাইয়া নিয়া যায়—এই কারণেই অসীম শূন্যপথ দিয়া তাহাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিতে বিহংগকুল কখনও পথভ্রষ্ট হয় না।

বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকগণের উপরোক্ত মতামত বিশ্লেষণ করিলে কোনটিকেই নির্ব্বিচারে মানিয়া লওয়া যায় না। প্রব্রজনশীল বিহংগগণ যদি ভূপৃষ্ঠের দৃশ্যাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই গন্তব্যপথে অগ্রসর হয় বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তবুও প্রশ্ন উঠে ক্ষুদ্র বিহংগগণ কিভাবে স্থল পথ ছাড়িয়া বিপুল জলরাশির উপর দিয়া অগ্রসর হইতে পারে! ভূপৃষ্ঠের বিশেষ কোন দৃশ্য তখন তাহাকে খুব বেশী সাহায্য করিতে পারে বলিয়া মনে করা যায় না! বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তরে পথনির্দ্দেশক বায়ুপ্রবাহ বিহংগদের পথ চিনিতে সহায়তা করে বলিয়া যে অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে তৎসম্পর্কে বলা যাইতে পারে, এমন অনেক বিহংগ আছে যাহারা খুব বেশী উচ্চে উড়িতে পারে না অথচ প্রব্রজনে ইহাদের কেহ পশ্চাৎপদ হয় না। এ সমস্ত বিহংগই বা কিভাবে বৎসরের পর বৎসর ঋতুভেদে তাহাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিতে পারে! সুতরাং উচ্চস্তরে বিশেষ কোন বায়ুপ্রবাহের দ্বারা পরিচালিত হইয়াই যে বিহংগগণ প্রব্রজন করিতে সমর্থ হয়, একথা জোর করিয়া বলা যায় না।

আধুনিক যুগে পরীক্ষা-প্রণালীতে বহু উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং বিহংগের প্রব্রজনের এই বিচিত্র রহস্য উদ্ঘাটনে নানারূপ প্রচেষ্টা চলিতেছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে "আমেরিকান মিউজিয়ম অব ন্যাচারেল হিষ্ট্রির" কয়েকজন বিশিষ্ট প্রকৃতিতত্ত্ববিদ্ পাখীদের এইরূপ নির্ভুল প্রব্রজনের কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, হয়তো 'রেডিও কম্পাস' দ্বারা ইহারা পরিচালিত হইয়া থাকে। 'রেডিও কম্পাস' বলিতে তাঁহারা ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, প্রকৃতিদেবী বিহংগদের এমনি এক 'অনুভূতি' দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহার ফলে
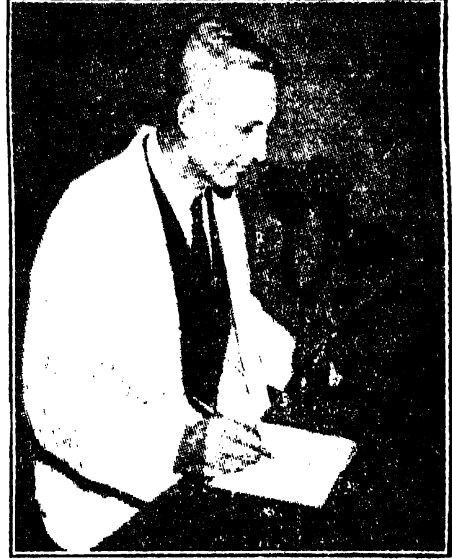
ডাঃ ওয়ালটার আর মাইলস্

ইহারা পৃথিবীব্যাপী যে চুম্বকশক্তি রহিয়াছে তাহার রেখা ধরিয়া চলিতে সমর্থ হয়। বিমান-চালক যেরূপ একটি রেডিও আলোক (Radio-beam) লক্ষ্য করিয়া তাঁহার গন্তব্যপথ ঠিক রাখে—এ অনেকটা তাহারই অনুরূপ। বহু দূরবর্ত্তী স্থান অভিমুখে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে দেখা যায়, পাখীরা কয়েকবার বৃত্তাকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যেন 'দম' লইতে থাকে। পৃথিবীর চুম্বকরেখা কিভাবে গিয়াছে তাহাই ঠিক করিয়া বুঝিয়া লইবার জন্যই উহারা প্রথমতঃ বৃত্তাকারে পাক দিতে থাকে বলিয়া মনে হয়। এরূপ চুম্বকরেখা ধরিয়া পাখীদের চলার সম্ভাবনা সম্পর্কে আর একটি কারণও বিজ্ঞানীরা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া থাকেন। পৃথিবীর দুই চুম্বক-মেরুকে যোগ করিয়া উত্তর-দক্ষিণে এই রেখা বরাবর চলিয়া গিয়াছে—তদুপরি এরূপ রেখার চুম্বকশক্তিতেও বিশেষ কোন তারতম্য পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং ইহাদের অনুগামী হইয়া চলা পাখীদের পক্ষে সুবিধাজনক বলিয়াই মনে হয়।

সম্প্রতি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পরীক্ষা করিয়া বিজ্ঞানীদের উপরোক্ত ব্যাখ্যার সমর্থনও কম পাওয়া যাইতেছে না। আমেরিকার অন্তর্গত ওহিয়ো প্রদেশে এক শক্তিশালী রেডিও ষ্টেশনের সন্নিকটে কতকগুলি পায়রা ছাড়িয়া দিয়া দেখা গিয়াছে, রেডিও ষ্টেশনের কাজ বন্ধ থাকিলে পায়রাগুলিকে ছাড়িয়া দিবামাত্র উহারা কয়েক সেকেণ্ড

বৃত্তাকারে ঘুরিয়া অবশেষে দলবদ্ধভাবে নিজেদের আবাসের দিকে উড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু ষ্টেশন খোলা থাকিলে পায়রাদের মধ্যে এক বিস্ময়কর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। বিভ্রান্ত হতবুদ্ধি পায়রার দল তখন অর্দ্ধ ঘণ্টারও উপরে বহুবার বৃত্তাকারে ঘুরিয়াও যেন কোন্ দিকে উড়িয়া গেলে নিজেদের আবাসে পৌঁছিতে পারিবে ঠিক করিয়া উঠিতে পারে না। অবশেষে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া যে যেদিকে পারে সেইদিকেই উড়িয়া যায়। শুধু এক স্থানের পরীক্ষায়ই নহে, পরন্তু ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশে পরীক্ষা করিয়াও পাখীদের অনুরূপ ব্যবহারই লক্ষিত হয়।

এখন প্রশ্ন এই—পাখীগুলি এইরূপে বিভ্রান্ত হয় কেন? যে পাখী অনন্ত আকাশে পথ খুঁজিয়া অনায়াসে দূর-দূরান্তরে গিয়া উপস্থিত হয়, রেডিও তরঙ্গের প্রভাবে তাহাদের এইরূপ হতবুদ্ধি ও বিভ্রান্ত হইবার কারণ কি,—তাহাদের স্বাভাবিক পথ চেনার শক্তিতে বাধা জন্মিল কেন? এই 'কেন'র সুস্পষ্ট উত্তর শুধু এই হইতে পারে যে, রেডিও-তরঙ্গের সঙ্ঘাতে আসার ফলে পাখীদের দেহে তড়িৎপ্রবাহের সঞ্চালন ঘটে। এই তড়িৎপ্রবাহ উহার পূর্ব্বলিখিত 'অনুভূতি' বা ইন্দ্রিয়বিশেষের মধ্যে সূক্ষ্ম মাত্রায় অবস্থিত বিদ্যুৎশক্তির (voltage) প্রভাব এমনভাবে নিষ্ক্রিয় (neutralise) করিয়াছে যে, ফলে পাখীর পূর্ব্বোক্ত 'কম্পাস' সদৃশ গুণাবলী লোপ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহার পথ নিরূপণ করার ক্ষমতাও যেন নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

'কম্পাস' সদৃশ গুণের আধার যে পক্ষীদেহের কোন্ অংশে বিরাজ করিতেছে, এতাবৎ বৈজ্ঞানিকদের গবেষণায় তাহা নিরূপিত হয় নাই। সম্প্রতি ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব-বিদ্ অধ্যাপক ডাঃ ওয়ালটার আর মাইলস্ আমেরিকার 'একাডেমী অব সায়েন্স' বা বিজ্ঞান পরিষদের নিকট যে গবেষণামূলক প্রবন্ধ দাখিল করিয়াছেন তাহাতে মনে হয়, বহুদিনের অজানা রহস্যের সন্ধান বুঝি এতদিনে লাভ হইবে। তিনি পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, প্রাণীদের চক্ষুগুলি বলিতে গেলে এক একটি জীবন্ত ব্যাটারিসদৃশ। তাঁহার পরীক্ষাগারে তিনি মানুষের ও অন্যান্য জীবজন্তুর চক্ষুর উপর, নীচে ও পাশে ধাতুনির্ম্মিত চাক্তি লাগাইয়া তাহার সহিত তার দিয়া 'এমপ্লিফায়ার'যোগে অতি সূক্ষ্ম বিদ্যুৎ পরিমাণযন্ত্রের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া দেখিয়াছেন, চক্ষুরূপ ব্যাটারির বিদ্যুৎশক্তির গড় পরিমাণ এক ভোল্টের দুই হাজার ভাগের এক ভাগ। এই পরিমাণের বড় একটা তারতম্য লক্ষিত হয় না। আলোকে বা আঁধারেও ইহার কোন পরিবর্ত্তন হয় না। চক্ষুর 'লেন্স' ব্যাটারিটির 'পজেটিভ্' দণ্ড,—চক্ষু-তারার পিছনে যে অক্ষিপট (Retina) রহিয়াছে, উহা ব্যাটারির 'নেগেটিভ' দণ্ডের কাজ করে।

আমাদের শারীরিক অনেক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্ম-মাত্রায় বিদ্যুৎপ্রবাহের যে উৎপত্তি ঘটে, বিজ্ঞানীরা আজ কয়েক বৎসরই তাহার সন্ধান পাইয়াছেন। শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ, কোন-কিছু চিবানো, চক্ষুর পলক-পাত এ সমস্ত প্রক্রিয়ায় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তড়িৎপ্রবাহ আমাদের অজ্ঞাতে খেলিয়া যায়। এই সমস্ত তথ্য হইতে আধুনিক বিজ্ঞানে কয়েক বৎসর হয় গবেষণার এক নূতন ধারার প্রবর্ত্তন হইয়াছে। আমাদের চক্ষু সম্পর্কে ডাঃ মাইল্সের এই আবিষ্কার উপরোক্ত গবেষণাকে যে অধিকতর পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করিবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। বিশেষ করিয়া নীল অসীমে শূন্য পথে পাখীরা কিভাবে কুয়াসা, কুজ্ঝটিকা ও অন্ধকারের মধ্যেও নির্ভুলভাবে নিজেদের গন্তব্যপথে যাইতে সমর্থ হয়, মাইল্সের এই আবিষ্কৃত তথ্য হয়ত সেই রহস্যেরও সন্ধান দিতে পারিবে! পাখীদের কথা ছাড়িয়া দিলেও—মাইল্সের এই গবেষণায় যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে স্বতঃই প্রশ্ন জাগে—আমাদের চক্ষু কি তাহা হইলে 'ইলেকট্রিক কম্পাসের' ন্যায় কাজ করিতেছে! জীবনপথে চলিতে গেলে তবে আমরা পদে পদে এত ভুল করি কেন?

সাধনা

শ্রীবিষ্ণুপদ রায়চৌধুরী বি-এ

যতবার আমি গিয়েছি দুয়ারে
দিয়েছ আমারে ফিরায়ে
বহিয়া এনেছি ফুল্লচিত্তে
পদধূলি তব কুড়ায়ে।
তুমি মনে কর 'কাঁদুক সাহারা
দেব না'ক তারে বৃষ্টির ধারা'
তবু 'ওয়েসিস' করিগো রচনা
শুষ্ক হৃদয় রসায়ে
হে নিঠুর! তুমি যাবে নাকি মোর
ফল ফুলে শাখা হাসায়ে?

পায়ে ঠেলে দাও লাগিবে না ব্যথা
শৃঙ্খলে মোরে বাঁধ না
উপহাস নিয়ে চলিবে আমার
যুগ যুগ ধরি সাধনা।
সাজাব অর্ঘ্য গাঁথিব মালিকা
উৎসাহহীন হবে না বালিকা
ফুটাব কুসুম, জ্বালাব ইন্দু
আমার আঁধার সরায়ে
সুরভি আমার নাহি লও যদি
যাক্ সমীরণে হারায়ে।

মায়ের পূজা

(গল্প)

শ্রীসুষমা দেবী

লোকে বলে করালীচরণের অনেক টাকা। তাহার শুইবার ঘরে মাথার শিয়রের দিকে যে বড় লোহার সিন্দুকটি আছে, সেটা নাকি তাহাদের গাঁয়ের মত অমন সাত-আটটি গাঁ কিনিতে পারে। যাই হোক, কিন্তু করালীচরণ চক্রবর্ত্তী সে কথা মোটেই মানিত না। কেউ কিছু বলিলেই সে গম্ভীর হইয়া কহিত, "হুঁ তোমরা আমার কেবল টাকাই দেখছ। এদিকে পেটদুটি যে আমাদের কি করে চলে, তা শুধু অন্তর্য্যামীই জানেন।"

তা করালীচরণের যে টাকা আছে, সেরূপ কিছু দেখা যাইত না। সে হাঁটুর উপর আট হাতি কাপড় পরিয়া এবং কাঁধে একটি গামছা ফেলিয়া খালি পায়ে, রুক্ষ মাথায় লোকের বাড়ী বাড়ী সুদের তাগাদায় ঘুরিয়া বেড়াইত। তা কে-বা জানিত গ্রীষ্ম, আর কে জানিত বর্ষা। তাহার বেড়ানর ব্যতিক্রম কোন কালেই ঘটিত না। আর তাহার পত্নী ক্ষেমঙ্করী, গাঁয়ের আর পাঁচজন মেয়ে-বৌ-এর মত চালার ঘর ও দর্ম্মা দিয়ে ঘেরা ছোট উঠানটি লেপিয়া, মুছিয়া, ধান ভানিয়া, জল তুলিয়া, রাঁধিয়া-বাড়িয়া স্বামীর অপেক্ষায় বসিয়া থাকিত। আবার কোনদিন বা পাড়ায় কোঁদল করিতে বাহির হইত।

ক্ষেমঙ্করী একদিন করালীচরণের নিকট তীর্থ ভ্রমণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, সে রানিঠাকুরের মত 'পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য নহিলে খরচ বাড়ে', এই ধরণের উত্তর গম্ভীর ও চিন্তাযুক্ত মুখে করিয়াছিল, "টাকা কোথায় ?" তারপরে হয়ত পত্নীর অভিমানের ভয়ে একটু নরম সুরে বলিয়াছিল, "তীর্থ-টীর্থ কিছু নয়, ক্ষেমু, ওসব করে কি আর পুণ্য হয়। এই যে তুমি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত স্বামীর সেবা পরিচর্য্যায় একান্তমনে মগ্ন রয়েছ, এতে কি তীর্থ ভ্রমণের চেয়ে তোমার কম পুণ্য হচ্ছে মনে কর ?"

ক্ষেমু কি বুঝিয়াছিল জানা নাই, তবে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সেই যে উঠিয়া গিয়াছিল আর কোন দিন ও বিষয় উত্থাপন করে নাই।

নিঃসন্তান করালীচরণ সকলকে বেশ মোটা টাকা ধার দিয়া, তাহারই উপযুক্ত চড়া সুদে দিনাতিপাত করে। অন্ততঃ লোকে তাই বলে।

শরতের স্বচ্ছ, নির্ম্মল, মেঘমুক্ত আকাশ। সকালের স্নিগ্ধ, মধুর, শিউলি ফুলের ভুরভুরে গন্ধ মাখান বাতাস, মায়ের শুভাগমনের বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছিল। পূজা আসিয়া পড়িয়াছে। সে গ্রামে বরাবর বারোয়ারি পূজা হয়। এবারে পাড়ার সকলে স্থির করিল যে, করালীচরণ এবার পূজা করিবে, আর নয়ত পূজার খরচ সে দিবে। পাড়ার ছেলে-ছোকরার দল, দল বেঁধে চাঁদা আদায় করিতে বাহির হইল। যথাসময়ে করালীর বাড়ী গিয়া করালীকে এই কথা বলিতে সে আঁৎকাইয়া প্রায় সাত হাত জিব বাহির করিয়া কহিল, "বাবাঃ! মায়ের পূজা করা কি আমার ক্ষ্যামতা বাপরে।"

ছেলেদের অগ্রকর্ত্তা নাম ব্রজেন; সে মিনতির সুরে কহিল, "না, করালী কাকা এবার পূজো তোমায় করতেই হবে।" পরে অতি আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল "আচ্ছা পূজো না কর, কিন্তু পূজার অর্দ্ধেক খরচ তোমায় দিতেই হবে। সে শুনছি না। কারণ, জান ত গাঁয়ে দু'বছর ধরে অজন্মা হওয়াতে কি হাল আর কি দুর্দ্দশা। কেউ এক পয়সা দিতে পারছে না। এবার তুমি একটু বেশী সাহায্য না করলে ত পূজো বন্ধ হয়। তারপর এবার আমরা ঠিক করেছি যে, থিয়েটার, যাত্রায় আর অন্যবারের মত বাজে পয়সা খরচ করব না, তার পরিবর্ত্তে গাঁয়ের যত দরিদ্র কাঙালীদের তিন দিন খাওয়ান হবে, আর কাপড়-চোপড়-পয়সা দান করা হবে। বল করালী কাকা এই সৎকাজেও তুমি কিছু বেশী সাহায্য করবে না ?" তাহাদের মধ্যে একটি ছেলে চাঁদার খাতা খুলিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "বলে ফেল করালীকাকা তোমার নামে কত লিখি ?"

করালীচরণ সোৎসাহে কহিল, "সে ত খুব ভাল উদ্দেশ্য, ভাল কথা বাবা। ঈশ্বর তোমাদের সুমতি দিন, ভাল রাখুন। এর চেয়ে সৎ ও বড় কাজ কি আছে ? দরিদ্রদের খাওয়ানর মত তৃপ্তি আর মহৎ উদ্দেশ্যের চেয়ে জগতে কিছুই নেই। ওদের তৃপ্তির মধ্যেই যে তিনি দেখা দেন।" পরে মুখটি করুণ করিয়া কহিল,—"তা জান কি বাবা, আমার যে কি ভয়ানক টানাটানি যাচ্ছে, তা আর কি বলব। ব্যাটারা ত এক পয়সা কেউ দেয় না। এই সেদিন গিন্নীর রূপোর গোট ছড়াটি বিক্রী করে এ কদিন চালালাম। আর হাতে কিছুই নেই, তা মরুকগে আমি নিজের জন্য ভাবি না, তোমরা যখন এসেছ আমার কাছে এত আশা করে, তা অমনি ফেরাব না, আমরা না হয় কদিন উপোসই করব। সেই একটি টাকা বেঁচেছে, সেইটে নয় খাতায় লিখে নাও।" তাহার পর কি ভাবিয়া একটুখানি চুপ করিয়া কহিল, "এবার যদি খরচে না কুলোয় ত আমি বলি কি মায়ের পূজো নয় থাক, যা কিছু চাঁদা উঠবে তাতে গরীব দুঃখীদের খাওয়ানই হবে।"

এতক্ষণ যাহারা করালীচরণের উদ্দেশে মুচকি হাসিতেছিল, আর যাহারা ক্রোধে অস্ফুটে জোচ্চোর, চামার ইত্যাদি সুমিষ্ট সম্ভাষণগুলি আবৃত্তি করিতেছিল, তাহারা সকলেই করালীচরণের পূজো বন্ধ করিবার কথায় প্রায় ক্ষেপিয়া উঠিয়া, সেই শ্রুতিমধুর বাক্যগুলি পঞ্চমে চড়াইয়া করালীর শ্রুতিগোচর করিবার বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিল।

ব্রজেন আর একবার ধৈর্য্যের সহিত চেষ্টা করিয়া যখন তাহার অচল ও অটল বাক্যের নিকট পরাস্ত হইল, তখন সেও ক্রুদ্ধ হইয়া রক্তবর্ণ মুখে কহিল, "থাক করালী কাকা আর দয়া দেখিয়ে উপোস করে মরতে হবে না তোমায়। তুমি যে এত নীচ আর এত কসাই, তা জানা ছিলনা। তোমার মত কসাইএর

টাকায় পূজোয় পাপ হয়; তাই মার বোধ হয় ইচ্ছে নেই। যাক, তুমি আর ও মুখ নিয়ে পূজোবাড়ী পবিত্র করতে এস না। আহা, যেন দয়া করে ভিক্ষে দিচ্ছেন।"

করালী তেমনি নিৰ্ব্বিঘ্ন ও নিরুদ্বিগ্ন মুখে যেন কিছুই হয় নাই এরূপভাবে কহিল, "তা বাপু তোমাদের ইচ্ছে। চাইতে এসেছ তোমরা, আমি ত আর যাই নি!"

ক্ষেমঙ্করী ঠাকুরাণী নারীর শ্রেষ্ঠ বস্তু মাতৃত্বের গৌরব হইতে বঞ্চিত বেদনা-পরিপূর্ণ অন্তরটাকে কোনও অতর্কিত আঘাতের ভয়ে সর্ব্বদা সামলাইয়া রাখিত। কিন্তু সেদিন আর পারিল না। অপমানে ও অভিমানে অন্তরটা নাকি বড়ই জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।

ঘাট হইতে কলসী কাঁকে বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে, ক্ষেমঙ্করীর পিতা-মাতা যে তাহাকে হাত-পা বাঁধিয়া একেবারে জলে ফেলিয়া দিয়াছেন, আজ পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে সে শোক উথলাইয়া উঠিতে, তাহাই অস্ফুটে আবৃত্তি করিতে করিতে বাড়ী ফিরিল। করালীকে নিশ্চিন্তে দাওয়ার উপর বসিয়া তামাকু সেবন করিতে দেখিয়া, দুম করিয়া কলসীটি রাখিয়া কাংস্যবিনিন্দিত কণ্ঠে তারস্বরে চীৎকার করিয়া কহিল, "বলি ও হতচ্ছাড়া মিনসে, প্রাণে কি একটু ভয়-ডর, মায়াপীতি ভগবান দেয় নি গা। ইহকালের ত কিছুই করলে না, পরকালের মাথাটা খাচ্ছ কেন? ও মুখপোড়া মিনসে বলি সংসারে থেকে মাথাতে ত কেউ নেই, বলি মুখে আগুন দেবার ত কেউ দেয় নি,—টাকাগুলো বুকে নিয়ে চিতেয় শোবে নাকি, যে ওর জন্যে বুকে এত কবকরাণি।"

ক্ষেমঙ্করীর চীৎকারে করালীর তামাকুর নেশা একেবারে ছুটিয়া গেল। সে খানিকক্ষণ থতমত খাইয়া হতভম্ব হইয়া আশ্চর্য্যের সুরে জিজ্ঞাসা করিল, "আহা, খামকা সকালে চেঁচাচ্ছ কেন? কি হয়েছে? আর আমিই বা কি করেছি?"

ক্ষেমঙ্করী দ্বিগুণস্বরে চীৎকার করিয়া কহিল, "আবার ন্যাকামী হচ্ছে। উনি কিছু জানেন না! গাঁ শুদ্ধু যে ঢিঢিক্কার পড়ে গেছে। আমার আর মুখ দেখাবার যো টুকুন নেই। বলি মিনসে মা'র কাজে দুটো টাকা বেশী দিলে কি হ'ত তোমার? তোমার কাণ্ড দেখে যে গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করছে।"

করালীচরণ এতক্ষণে একটু বুঝিতে পারিয়া নিজেকে সামলাইয়া ধীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিল "কোত্থেকে শুনলে?" ক্রমাগত একটানা চীৎকারে গলার ভিতর জ্বালা হওয়াতে বোধ হয় ক্ষেমঙ্করী পূর্ব্বাপেক্ষা নরম সুরে কহিল, "ঘাটে গিয়ে দেখি বাঁড়ুয্যে বাড়ীর বড়গিন্নী আর ছোটগিন্নী তাড়াতাড়ি চান করে উঠে গেল। তাই আমি শুধালাম, হাঁগা আজ তাড়া কিসের আজ? তা বড় মুখ টিপে উত্তর করলে—'আজ ষষ্ঠী পুজো বাড়ীর পূজোর ও ভোগ রাঁধবার সব জোগাড়যন্ত্র করতে হবে।' আমি আশ্চর্য্য হয়ে বললাম, 'কেন সে সব ত বরাবর আমি করি—এবার তোমরা হঠাৎ?' তা ওদের ছোটবোটা ভাল, সে বললে, 'আহা মাসিমা কিছু জান না; দুবার অজন্মা হওয়াতে ত কেউ টাকা দিতে পারল না, তাই সেদিন সকলে মেসোমশায়ের কাছ থেকে দুটো টাকা বেশী চাওয়াতে তিনি নাকি মারতে এসে অপমান করে বললেন,—আমি তোমাদের বাজে কাজে এক পয়সাও দিতে পারব না। পূজো বন্ধ করে দাও আর তাছাড়া আমরা ওসবে নেই। সেইজন্যই মাসিমা তুমি ত এবার ভোগ রাঁধতে যাবে না, তাই কাল আমরাই সব করব।' এই কথা শেষ করিয়াই ক্ষেমঙ্করী ঠাকুরাণী ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। "দশ বছর ধরে মায়ের ভোগ আমি রাঁধছি, আর আজ তুমি থাকতে কি না অন্যে..............."আর বলিতে পারিল না। কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

নারীর শ্রেষ্ঠ গৌরব ও সম্পদ মাতৃত্ব হইতে বঞ্চিতা ক্ষেমঙ্করী, গাঁয়ের সকল মেয়ে-বৌয়ের চেয়ে বয়সে ও সম্মানে বড় হইলেও, বিবাহ-উপনয়ন প্রভৃতি শুভকর্ম্মের কোন অনুষ্ঠানের অধিকারিণী হইতে না পারায় সকলের নিকট যেন একটু খাটো ও অনুকম্পার দৃষ্টিতে রহিয়া গিয়াছিল। কিন্তু রন্ধনে দ্রৌপদীসমা হওয়ায় শুভকর্ম্মের যজ্ঞিতে তাহাকেই সকলে সাদরে আহ্বান করিত। সেজন্য ক্ষেমঙ্করী পুত্রশোক ভুলিয়া ইহারই ভিত্তিতে সগর্ব্বে দাঁড়াইয়া, তাহার সমবয়সি ও অসমবয়সিদিগের নিকট বেশ সম্মান-প্রতিপত্তি লাভ করিয়া তাহাদের নেত্রীস্থানীয়া হইয়া গিয়াছিল। সে কারণে দশ বৎসর ধরিয়া বরাবর মায়ের ভোগ রাঁধিয়া সকলের প্রশংসা লাভ করিবার সৌভাগ্য তাহারই লাভ হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু এবার হঠাৎ বিধির কি বিড়ম্বনা, যে তাহারই সম্মুখে তাহার একমাত্র শেষ অধিকার অন্যে লইয়া লইতেছে—এই ভাবিয়া অপমানে ও অভিমানে বুকটা যেন পুড়িয়া পুড়িয়া উঠিতেছিল।

গতিক সুবিধার নয় বুঝিয়া করালীচরণ উঠিয়া দাওয়ার একধারে কলকেটা রাখিতে রাখিতে কহিল, "হুঁ, আরে রামঃ রামঃ তুমি ওসব কিছু ভেবনা। তোমার রান্না যে খেয়েছে, সে কি আর ভুলতে পেরেছে। তোমার মত রাঁধবার ক্ষমতা এ গাঁয়ের কোন মেয়ে-বৌয়ের আছে শুনি? হুঁ, দেখ না, তোমায় ঠিক ডাকবে।—ডাকবেনা আবার!"

সর্ব্বসন্তাপহারিণী দুঃখনিবারিণী করুণাময়ী জননী আপনাকে জ্যোতির্ম্ময় মহিমায় পূর্ণ করিয়া অপূর্ব্ব প্রীতিভায় দশদিক আলোকিত করিয়া, সুবিমল সহাস্য কোমল প্রসন্ন নেত্রে রামহরির মুখুয্যের চণ্ডিমণ্ডপে বিরাজ করিতেছেন। কোন সকালে রোশনচৌকী বিনাইয়া বিনাইয়া মায়ের শুভাগমনের বন্দনা শেষ করিয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন গ্রামকে জাগরিত করিয়াছে। বেলা পড়িয়া গিয়াছে। উঠান, দালান ভর্ত্তি করিয়া গাঁয়ের সব দরিদ্র কাঙালীরা মায়ের প্রসাদ পাইতে বসিয়াছে! মা জগজ্জননী তাঁহার ক্ষুধার্ত্ত, পীড়িত সন্তানদের প্রফুল্ল আনন গভীর তৃপ্তিভরে পুলকিত হইয়া নিরীক্ষণ করিতেছেন; হাঁক-ডাক, সোরগোলে পূজাবাড়ী একেবারে গম গম করিতেছে। ছেলে-ছোকরারা মালাকোঁছা

মারিয়া পরিবেশনে লাগিয়া গিয়াছে। ওদিকে দালানে গ্রামের তর্কচূড়ামণি ও রামহরি মুখুয্যের কথা হইতেছিল।

তর্কচূড়ামণি কহিলেন "ওহে এবার যে বড় করালীকে দেখতে পাচ্ছি না?"

রামহরি মুখুয্যে নাক সিঁটকাইয়া কহিলেন, "আর ভাই ওর নাম ক'র না। ওর নামেও পাপ হয়। না এসেছে, বাঁচা গেছে। ব্যাটা বলে কি না পূজো বন্ধ করে দাও, এক পয়সা দিতে পারব না। লোকটা কি কসাই। ওর কি আর মানুষের গন্ধ গায়ে আছে!"

তর্কচূড়ামণি সম্প্রতি কিছুদিনের জন্য বিদেশ গিয়াছিলেন, আজই ফিরিয়াছেন, সেজন্য করালীর বিষয়ে বিশেষ জ্ঞাত ছিলেন না। তিনি সবিস্ময়ে কহিলেন "বল কি? মায়ের পূজো বন্ধ করা? ব্যাটার কি ভীমরতি ধরেছে, টাকা নিয়ে করবে কি, বলি........"

তাঁহার কথা আর শেষ হইতে পাইল না। এমন সময়ে দুজন হিন্দুস্থানী লোক—একজনের কোলে চার পাঁচ বৎসরের একটি কন্যা, পূজো বাড়ীতে প্রবেশ করিতেই সকলেরই কৌতূহলপূর্ণ জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তাহাদের উপর পড়িল। অপরিচিত হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকটি আপনাদের অবস্থা বুঝিয়া আধা বাঙলা হিন্দীতে যাহা কহিল তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ:—

তাহারা আগ্রা হইতে কলিকাতা বেড়াইবার উদ্দেশ্যে যখন টুণ্ডলা জংশনে গাড়ী বদল করিয়া কালকাতাগামী গাড়ীতে উঠিল, তখন তাহারা এই মেয়েটিকে তাহাদের কামরার উপরের বাঙ্কে নিদ্রিত অবস্থায় পায়। পরে মেয়েটি জাগিয়া মা মা বলিয়া কাঁদিয়া উঠে। অনেক খোঁজ করা সত্ত্বেও তাহার পিতামাতা বা কোন আত্মীয়-স্বজনের সন্ধান পায় নাই। তবে মেয়েটি যে কোন বাঙালীর সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দুমাস ধরিয়া অনেক খোঁজ করা সত্ত্বেও মেয়েটির পিতামাতা বা আত্মীয়ের সংবাদ না পাওয়াতে তাহারা আপনাদের দেশে ফিরিয়া যাইতেছিল। সেই ষ্টেশনে গাড়ী বদল করার কথা ছিল। কিন্তু গাড়ী দুঘণ্টা লেট থাকাতে তাহারা বাঙালী ষ্টেশন মাষ্টারকে মেয়েটির বিষয়ে সব জানায়। ষ্টেশন মাষ্টারটি তাহাদের এই পূজো বাড়ীতে আসিতে কহিয়া দিয়াছে, যদি পূজো বাড়ীর অনেক লোকের মধ্যে তাহার (মেয়েটির) কোন আত্মীয় মিলিয়া যায় বা অন্য কোন উপায় হয়।

রামহরি মুখুয্যে মুখ গম্ভীর করিয়া কহিলেন, "ইহা উসকা কোই নেহি হ্যায়, তুম লোক অন্য জায়গায় মে যাও।" তাহারা সবিনয়ে কহিল যে, না-ই বা রহিল তাহার কেউ আত্মীয় এখানে। তাঁহারা যদি কেহ তাঁহাদেরই জাতের এই মেয়েটির ভার লন এবং তাহার পিতামাতার খোঁজ তল্লাস করেন তাহলে বড় উপকার হয় ও বড়ই ভাল হয়। তাহারা আরও কহিল যে, বাঙালী হইয়া যদি বাঙালীর মেয়ের অবস্থা না বুঝেন তাহলে মেয়েটির কি দুর্দ্দশা হইবে।

রামহরি ঝাঁজিয়া উগ্রস্বরে কহিলেন "আ' মর, কেউ নাহি হ্যায় ত হামলোক কেয়া করেগা! বড় বড় বুলি আওড়ানে হিঁয়া আয়া, অন্য জায়গায় জায়গা নাহি মিলা? সেখানে গিয়ে আওড়াও না বাবা!" তর্কচূড়ামণি একটু শ্লেষের হাসি হাসিয়া কহিলেন "হুঁ মেয়েটি যে কোন সতীলক্ষ্মীর তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। তা, মর্, তোরা কেন শুধু শুধু পরের বোঝা নিয়ে বেড়াচ্ছিস, ফেলে দেনা যেখানে সেখানে। তা নয়, নিশ্চয় কোন মতলব, ভায়া, নইলে শুধু শুধু আর এ বোঝা কে নেয়?"

মুখুয্যে মহাশয় মাথা নাড়িয়া কহিলেন "হুঁ তা আর বুঝিনে, নইলে আবার কেউ ফেলে যায়।"

মেয়েটি দেখিতে বড়ই সুশ্রী। বড় বড় কালো চোখ দুটিতে যেন কি আকর্ষণ-শক্তি নিহিত। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া এলোমেলো কালো, কোঁকড়ান চুলগুলি যেন রুক্ষতার অবতার। রংটা উজ্জ্বল শ্যাম। তাহার শীর্ণ ক্ষুদ্র দেহলতাটি ক্ষুধাতৃষ্ণা ও ভয়ের তাড়নায় রৌদ্রে ঝলসান লতাটির মত হইয়া গিয়াছে। যেন স্নেহ-বারিতে সিক্ত হইলেই আবার সজীবতা লাভ করিবে! সত্যই মেয়েটিকে দেখিলে ভারি মায়া হয়! কিন্তু মুখুজ্যে মহাশয়ের বলা সত্ত্বেও তাহাদের নড়িবার কোন লক্ষণ না দেখাতে, তিনি তারস্বরে চীৎকার করিয়া তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের নামে কোন অশ্রাব্য বাক্য প্রয়োগ করিয়া কহিলেন "লে যাও, নিকালো ইঁহা উসকা কোই ভার নাহি লে সকতা।"

ইহা শুনিয়া আগন্তুক দুটিও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। তাহারা নয় উঁহাদের জাতের মেয়ের একটু আশ্রয় ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে, তা বলিয়া ত আর চুরির দায়ে বাঁধা পড়ে নাই, যে অপমান সহ্য করিবে। সেজন্য তাহারাও মুখুজ্যে মহাশয়ের শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিয়া বেশ প্রতিশোধ লইতেই ক্রুদ্ধ মুখুজ্যে মহাশয় অপমানে রক্তবর্ণ মুখে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন "ওরে আজ এখানে কি কেউ নেই? সকলেই কি একসঙ্গে বলি হয়েছে নাকি? যে কোথাকার ম্লেচ্ছো বিদেশী জানোয়ার দুটো এসে মায়ের সামনে আমাদের অপমান করে, পূজো-বাড়ীর সব ছয়লাপ করছে।. জাত যে আর রইল না। পরে যে মায়ের কোপে নরকেও স্থান হবে না। এমন কেউ নেই যে জানোয়ার দুটোকে কান ধরে এখান থেকে বের করে?"

সঙ্গে সঙ্গে সকলেই যে যার কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া আসিল এবং মুহূর্ত্তে মধ্যে পূজোবাড়ী এক নিষ্ঠুর প্রলয়ংকর ব্যাপারে মাতিয়া উঠিল।

বরাবর ষষ্ঠীর সকালে বা পঞ্চমীর বিকালে পাড়ার সকলে করালী ও ক্ষেমঙ্করীকে মায়ের প্রসাদ রাঁধিবার ও প্রসাদ পাঠাইবার নিমন্ত্রণ করিয়া যাইত। কিন্তু এবারে ষষ্ঠী চলিয়া গেল এমন কি সপ্তমীও গেল ভোগ রাঁধিবার ও পূজো দেখিবার কোন আহ্বানই পূজো বাড়ী হইতে আসিল না।

এক একসময় ক্ষেমঙ্করীর ব্যাকুল প্রাণে ইচ্ছা করিতেছিল যে ছুটিয়া চলিয়া যায় পূজো বাড়ী। না-ই বা আসিল কেউ ডাকিতে—মাকে দেখিতে যাওয়া, তা আবার ডাকাডাকি কি? কিন্তু পরক্ষণেই তাহার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিতেছিল তাহারই অধিকারে বাঁড়ুয্যে বাড়ীর বড় বৌয়ের গর্ব্বোৎফুল্ল মুখ। উঃ সে অসহ্য, তাহা সে সহ্য করিতে পারিবে না।

(শেষাংশ ৪১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

হস্তিহত্যায় চরম দণ্ড

রাজা অশোক

প্রাচীন ভারত ইতিহাসে এমন উল্লেখও নিতান্ত বিরল নয় যে, যুদ্ধের পর যুদ্ধে হস্তীই বিজয়লাভের হেতু হইয়া পড়িয়াছে। প্রাচীনকালে ভারতীয় সেনা যে প্রধান চারিভাগে বিভক্ত ছিল, উহারই একটি শ্রেষ্ঠ বিভাগ ছিল গজারূঢ় যোদ্ধার দল। সমগ্র অক্ষৌহিণীর শক্তি বেশীর ভাগই নির্ভর করিত এই সেনাদলের শিক্ষা-দীক্ষা ও নিপুণতার উপর। কাজেই প্রাচীন ভারতীয় নৃপতিগণের সেনাগঠন ব্যাপারে প্রধান কর্ত্তব্যের অন্যতম ছিল হস্তীকে উপযুক্ত শিক্ষাদান এবং উহার সাহায্যে শক্তিশালী একদল নির্ভীক যোদ্ধা সমবেত করা। সেকালের শাসনতন্ত্রসমূহের এই কারণে হস্তী পালন-পোষণ—সমর পরিচালনার যোগ্যরূপে উহাদের নানাপ্রকার কৌশলে অভ্যস্ত করা শুধু স্বীকৃতই ছিল না, এই প্রকার সুশিক্ষিত হস্তিযূথ ব্যতীত কোন শাসকই তাহার সমর-সেনা যথাযোগ্য শক্তিশালী বলিয়া মনে করিতেন না।

সেকালের এই প্রকার গবর্ণমেণ্টসমূহের ভিতর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বলিতে হইবে সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের বিখ্যাত হস্তিবাহিনী, যাহার শক্তি ছিল প্রকৃতই অপরিসীম। এবং যথেষ্ট সংখ্যায় উৎকৃষ্ট ও সমরোপযোগী হস্তী সংগ্রহের সুবিধার জন্য চন্দ্রগুপ্ত ঘোষণা করিয়াছিলেন যে যদি কেহ হস্তী শিকার করিবে, যে উহাকে হত্যা করিবে উহার দন্তাদি মূল্যবান পদার্থের জন্য, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের আমলে একটি বিশেষ বিভাগই প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল হস্তিকুলের যথাযথ সংরক্ষণের জন্য। এই বিভাগে দায়িত্বশীল উচ্চ কর্ম্মচারিবর্গ ছিলেন, যাঁহাদের কর্ত্তব্য ছিল এই তত্ত্বাবধান করা, যেন বন্য হস্তীরও সতত যত্ন লওয়া হয় এবং কোন প্রকারেই যেন উহার সংখ্যা কমিয়া না যায়। আবার এই সকল উচ্চ কর্ম্মচারিগণের উপরে ছিলেন একজন মূল তত্ত্বাবধায়ক—যিনি হস্তী-সম্বলিত বনাঞ্চলসমূহের যথারীতি সংরক্ষণের ব্যবস্থার তদারক করিতেন—নিম্নতন কর্ম্মচারীসমূহের কার্য্যের পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ করিতেন। এই সকল ছাড়াও তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল নিপুণ শিক্ষক নিয়োগ করিয়া হস্তীর সর্ব্ববিধ শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

বিভিন্ন অঞ্চলের বনভূমিতে যে সকল হস্তী বসবাস করে, উহাদের অবস্থিতি, উহাদের বসতিক্ষেত্র প্রভৃতি সুব্যবস্থার জন্য অবশ্য মূল তত্ত্বাবধায়ক দায়ী ছিলেন না। সেই কার্য্যের নিমিত্ত ব্যবস্থার জন্য অভিজ্ঞ [illegible] তত্ত্বাবধায়ক থাকিতেন পৃথক। সংরক্ষিত বনাঞ্চলের হস্তীর সংখ্যা ও [illegible] ন্যস্ত ছিল এই শ্রেণীর তত্ত্বাবধায়কের উপর। তাঁহার অধীন বহু নিম্নতন কর্ম্মচারী থাকিত [illegible] বনাঞ্চলের পথ-ঘাট সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এবং সংরক্ষিত বনের গণ্ডী নির্দ্দেশ সম্বন্ধে সকল তথ্য সংগৃহীত হইত ইহাদেরই দ্বারা। পার্ব্বত্য অঞ্চল, বিল বা জলাভূমি, নদীতীর বা হ্রদবহুল ভূমি—বিশেষ করিয়া এই সকল দুর্গম স্থানে সতত গমনাগমন করিয়া উহার পথ-ঘাট ও যান-বাহন প্রভৃতির সকল [illegible] ঐ দলের কাজ। ইহার উপর [illegible] ছিল। ইহারাই গোপনে সংবাদ সংগ্রহ করিত কোথায় কোন ব্যক্তি হস্তি-হত্যা সম্বন্ধীয় আইন ভঙ্গ করিল। দক্ষ হস্তী বন্দীকারীদের সহায়তায় একদল কর্ম্মচারী ব্যাপৃত থাকিত নূতন নূতন বন্যহস্তী ধৃত করিতে। ইহা ছাড়াও একদল ছিল হস্তিচালক, উহাদের কাজ ছিল বন্যহস্তী ধরিবার সময় দড়ির ফাঁস জড়াইয়া দেওয়া বন্যগুলির অঙ্গে; উহারা পোষা হস্তী লইয়াই এই কার্য্যে অগ্রসর হইত, কিন্তু হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিত না—উহাদের পেটের নীচে খোলার ভিতর বসিয়া থাকিত, যাহাতে বন্যহস্তীগুলির নজর সহজে উহাদের উপর পতিত না হয়। এতদ্ব্যতীত ছিল সীমান্তরক্ষিগণ; প্রাণিতত্ত্বাভিজ্ঞগণ; বনবিভাগীয় বিশেষজ্ঞ বর্গ ও বিবিধ কার্য্যের পরিচারকগণ। ইহা ছাড়া জানোয়ারগুলির নিপুণ শিক্ষাদাতা যে থাকিত এক দল, তাহা বলাই বাহুল্য।

হস্তী বন্দী করিবার ব্যাপারেও নানা প্রকার বিধি-নিষেধ ছিল। নিম্নলিখিত হস্তীগুলিকে কখনও বন্দী করা হইত না:—(১) যে সকল হস্তীর বয়স ২০ বৎসরের নিম্নে অথবা যেগুলির দাঁত বাহির হয় নাই; (২) মদোন্মত্ত হস্তী; (৩) আসন্নসন্তান সম্ভবা হস্তিনী অথবা যে হস্তিনীর সন্তান অতিশয় শিশু; (৪) যে সকল হস্তী রুগ্ন। সন্তান-সহ হস্তিনী ধৃত হইলেও ঐ সকল বৎসকে আবদ্ধ রাখা হইত না। খেলাধূলায় শিক্ষাদানের জন্য সামান্য দু-চারটি শিশুহস্তী ধরা হইত মাত্র। এই প্রকারে, হত্যা যেমন নিষিদ্ধ ছিল, তেমনই সকল শ্রেণীর হস্তী অবাধে এবং নির্বিচারে বন্দী করিতেও দেওয়া হইত না। বন্দী করা সম্বন্ধে নিয়ম-কানুনও অতি কঠোরতার সহিত প্রতিপালন করা হইত।

হস্তী ধৃত করিবার ঋতু ছিল নির্দ্দিষ্ট—গ্রীষ্মকাল ব্যতীত অন্য সময় কোন হস্তী ধরিবার চেষ্টা করা হইত না। তবে যে সময় কোনও দুর্দ্দান্ত মদোন্মত্ত হস্তী যদি হস্তিযূথের অনিষ্ট করিতে সুরু করিত, তবে রাজাদেশ গ্রহণ করিয়া উহাকে বধ করা হইত। হস্তী ধরিবার সময় ৫।৭টি হস্তিনীকে সঙ্গে লওয়া হইত। এইগুলিকে বন্যহস্তী বন্দী করিবার ফন্দী-ফিকিরে [illegible] করিয়া তোলা হইত। এই হস্তিনীগুলিকে জঙ্গলে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। ইহারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া [illegible] উহাদের হাঁটাপথ আবিষ্কার করিত। [illegible] সঙ্গে ঐ পথে ভ্রমণ করিয়া উহারা বন্যহস্তীর [illegible] সন্ধান করিয়া ফেলিত। কখনও কখনও উহাদের জলপানের বিল অথবা নদী কিম্বা উহাদের জলকেলি স্থান খুঁজিয়া বাহির করিত। কখনও বা নদী তীর বা হ্রদের কিনারা তছনছ হইয়া আছে দেখিয়া বন্যদলের গতিবিধি নির্ণয় করা সম্ভব হইত। বন্য হস্তিযূথের যেমন জলপানের স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকে, তেমনই আবার প্রখর রৌদ্র হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বড় বড় গাছের নিবিড় ছায়া উহারা বাছিয়া লয়, আহারের পর বিশ্রামের জন্য। বন্দীকারী ও হস্তিচালকগণ এই সকল বৃক্ষের সারি লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইত। এই সকল স্থানে বন্য হস্তীর দেখা মিলিতই। উহার অন্য

কারণ ঐ সকল বৃক্ষের পাতা ও কচি ডাল-পালা হস্তীর প্রিয় খাদ্য। বিশেষ করিয়া পিপ্‌লজাতীয় বৃক্ষ হস্তীদিগের নিকট ঔষধরূপে জানিত। লেফটানেন্ট কর্নেল ইভ্যানস বলেন,—সেমার-কার্পাস য়্যানাকার্ডিয়াম জাতীয় বৃক্ষ হস্তীদিগের বহু ব্যাধির উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার পাতা যেমন বলকারক তেমনি হস্তীর পক্ষে খাইবার এবং অঙ্গে প্রলেপ দিবার—উভয় প্রকার ব্যবহারের ঔষধ।

প্রসিদ্ধ গ্রীক পর্যটক মেগাস্থেনিস বলেন,—ভারতে হস্তী বন্দী করিবার কৌশল অসম সাহসিকতার কার্য্য। বনমধ্যস্থ এক খণ্ড উন্মুক্ত জমি বেড়িয়া খাল কাটা হয় গভীর—খালের দৈর্ঘ্য হয় ৫ কি ৬ স্টেডিয়া (এক স্টেডিয়াম প্রায় ২০২ গজের সমান); এই খাল পার হইয়া অভ্যন্তরস্থ জমিটিতে যাইবার জন্য একটি সঙ্কীর্ণ সেতু নির্ম্মাণ করা হয়। জমিটিতে রাখা হয় হস্তিনীদের ও কিছু পরিমাণ লোভনীয় খাদ্য। বন্দীকারীরা খালের ভিতরে কিম্বা আশে পাশে লুক্কায়িত পাতার ঘরে গা-ঢাকা দিয়া থাকে।

বন্যহস্তীগুলি দিনের বেলা উহার চারিপাশে ঘুরিয়া বেড়ায় কিন্তু সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে ঐ স্থানে প্রবেশ করে না। রাত্রিবেলা উহারা একে একে খালবেষ্টিত স্থানটিতে প্রবেশ করে সেতুর সাহায্যে। একে একে আসিবার কারণ আর কিছুই নয়—সেতুটি এমনই সঙ্কীর্ণ যে, একটির বেশী হাতী একসঙ্গে পাশাপাশি উহাতে যাইতে পারে না। লোকগুলি দিনরাত চোরা আড্ডা হইতে বন্যহস্তীর চলাফেরা সতর্কতার সহিত লক্ষ্য করে। কাজেই রাত্রিতে যেমন বন্যহস্তীর দল আনা-যেনাও জমিতে আসিতে থাকে—লোকগুলি হুঁসিয়ারই থাকে। যেমন উহারা দেখিতে পায় যে বন্যহস্তীর দলের সবগুলিই ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে—বাহিরে আর একটিও দেখা যাইতেছে না, তখন লোক-গুলি অতর্কিতে আসিয়া সেতুটি ভাঙ্গিয়া ফেলে আর বন্যহস্তী-গুলির ফিরিয়া যাইবার উপায় থাকে না।

ইহার পর চলে বন্যহস্তীগুলিকে কোন প্রকার খাদ্য না দিয়া দুর্ব্বল করিবার ফিকির। মাঝে মাঝে পোষা হস্তীগুলির ভিতর যে সমুদয় অতি বলিষ্ঠ ও প্রচুর শক্তিশালী রহিয়াছে, সেইগুলিকে বন্যহস্তীর সহিত লড়াইয়ে প্রবৃত্ত করা হয়। ক্রমে বন্যহস্তীগুলি অতিশয় দুর্ব্বল ও কাবু হইয়া পড়ে। তখন উহাদের ঐ শ্রান্ত-ক্লান্ত অবস্থায় বন্দীকারী ও হস্তি-চালকদের ভিতর যাহারা অতিমাত্রায় সাহসী, তাহারা বন্যগুলির অলক্ষ্যে নিজ নিজ হস্তীর পেটের নীচের থলিয়ায় ফাঁস হস্তে অপেক্ষা করিতে থাকে। যেমন এক একটি বন্য কাছে আসে হস্তিনীর তখনই বন্যের পিছনের দুই পদে ফাঁস জড়াইয়া দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া দেয়। আবার কখনও কখনও চালকেরা থলিয়া হইতে সহসা নামিয়া হামাগুড়ি দিয়া যাইয়া বন্যহস্তীর পিছন হইতে দুই পদে বন্ধন আঁটিয়া দেয়।

সেকালে উৎকৃষ্ট জাতীয় হস্তী পাওয়া যাইত বেহার অঞ্চলের সাহাবাদ জেলায়, বিশেষ করিয়া উক্ত জেলার পূর্ব্ব-ভাগের বনকাননে ও সামান্য সামান্য পাহাড়িয়া অঞ্চলে। ইহার পরই হস্তীর জন্য বিখ্যাত ছিল ভারতের পূর্ব্বাংশ—উড়িষ্যা আসাম প্রভৃতি; আবার পশ্চিমাঞ্চলের পার্ব্বত্য প্রদেশেও প্রচুর মিলিত। কিন্তু এই সকল হস্তী সাহাবাদের হস্তীর মত উৎ-কৃষ্ট জাতীয় ছিল না। এইগুলি ছিল কতকটা মাঝারী গোছের। ইহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট জাতীয় হাতী মিলিত গুজরাটে। সম-রোপযোগী হস্তীর অধিকাংশই পূর্ব্বাঞ্চল হইতে ধরিয়া নেওয়া হইত।

সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের শাসনকালে হস্তিশালা ছিল দুই শ্রেণীর। এক শ্রেণীর সংরক্ষণ স্থান কেল্লাগুলির অভ্যন্তরে। এখানে অবশ্য রাখা হইত যেগুলিকে বিশেষভাবে সমরশিক্ষা প্রদান করা হইয়াছে। আর যেগুলি কিছুতেই শিক্ষাগ্রহণে অগ্রসর হয় না, কিম্বা যেগুলিকে শিক্ষা দেওয়া হইতে থাকে, অথচ শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় নাই—সেইগুলিকে রাখা হইত রাজকীয় হস্তিশালায়, যাহা থাকিত কেল্লার গণ্ডীর বাহিরে—নগর হইতে দূরবর্ত্তী স্থানে। কতকগুলিকে ভারবহনে নিয়োগ করা হইত এবং কতকগুলি শুধু সওয়ারের বাহনের কাজে পটু হইত। সেকালে রাজা-রাজড়া এমন কি পল্লীর সমর্থ তালুকদার হস্তিপৃষ্ঠে গমনাগমন করিত। তাহার প্রধান কারণ সেকালে দূরপথ যাত্রা নিরাপদ ছিল না, আর হস্তী ভিন্ন এক সঙ্গে ৫।৭ জন একক বহন করা অশ্বাদির সাধ্যাতীত ছিল।

সেকালের হস্তিশালা খুব উঁচু করিয়াই নির্ম্মিত হইত—গৃহের উচ্চতা থাকিত হস্তীর দৈর্ঘ্যের দ্বিগুণ, প্রস্থে গৃহগুলি হইত হস্তীর দৈর্ঘ্যের সমান। প্রত্যেক হস্তি-শালাই গড়িয়া তোলা হইত হয় পূর্ব্বমুখীন অথবা উত্তর-মুখীন করিয়া। হস্তিনীগুলির জন্য পৃথক কামরা থাকিত প্রাচীর দ্বারা আলাদা করা। হস্তিশালার বৃহৎ গৃহের লম্বা-লম্বি থাকিত বারান্দা। ইংরেজী টি (T) যের আকারে গঠিত মসৃণ স্তম্ভ থাকিত বন্ধনের—স্তম্ভগুলিও লম্বা থাকিত যতটা একটা হাতীর দৈর্ঘ্য। প্রতি দুইটি স্তম্ভের মাঝে সরু গলিপথ থাকিত আবর্জ্জনাদি দূর করিবার জন্য।

এই দাঁড়াইবার বা খাইবার স্থানের অদূরেই ছিল উহা-দের নিদ্রাস্থান। শুধু তফাৎ এইটুকু মাত্র ছিল যে, তাহাতে এক পাশে প্রতি হস্তীর জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানের অর্দ্ধ ব্যাপিয়া থাকিত উঁচু বাঁধান চত্বর—যাহাতে হাতীগুলি ভর দিয়া নত হইয়া থাকিতে পারে। মোটকথা উহাদের আরাম বিরামের ব্যবস্থা করা হইত নিপুণতার সহিত, তাহা ছাড়া মুক্তবায়ুতে চলাফেরার জন্যও নিয়মিত টহল দিবার সময় ধার্য্য করা থাকিত।

যে সকল হাতীর বদমেজাজ লক্ষ্য করা যাইত—যেগুলি অতি সহজেই ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িত, এমন কি যে সময়ে সিদ্ধহস্ত চালক পর্য্যন্ত উহাকে বাগ মানাইতে পারিত না—সেই জাতীয় রগচটা হাতীকে ঠান্ডা রাখিবার চেষ্টা করা হইত অপর কোনও জানোয়ার দোস্ত জুটাইয়া দিয়া—যেমন মর্কটছানা, বিড়ালছানা প্রভৃতি। আশ্চর্য্যের বিষয় হস্তী অন্য সকলের বেলা দুরন্ত-পনা করিলেও, ঐ ক্ষুদ্র ছানাগুলির কোনই অনিষ্ট করিত না। বেশীর ভাগ উহাদিগকে শুঁড়ে তুলিয়া ধরিয়া নানা প্রকারে আদর করিত, খেলা করিত।

হস্তীকে শিক্ষাদানের সময় কোনও কঠিন কৌশল আয়ত্ত করিবার পুরস্কার স্বরূপ মধু দেওয়া হইত প্রচুর। অনেক সময় এই সুস্বাদু খাদ্যের লোভে হস্তী অসাধ্য সাধন করিয়া ফেলিত, যাহা অন্য সময়ে উহা দ্বারা পনর দিনে আয়ত্ত করান যায় না—তেমন দুঃসাধ্য নূতন শিক্ষাও উহা অতি অল্প কয়দিনে সমাধা করিত—ঐ মুখরোচক খাদ্যটি পাইবার আশায়।

হস্তিশালায় রক্ষাকালে হস্তীর তত্ত্বাবধানের জন্য বহু প্রকার অভিজ্ঞ লোক নিযুক্ত থাকিত। উহাদের ভিতর তিন শ্রেণী ছিল প্রধান—(১) হস্তীদের চিকিৎসক, (২) হস্তীদের পোষ-মানান ও শিক্ষাদান পরিচালক, (৩) মাহুত অর্থাৎ হস্তিচালক। এমন বহু মাহুত দেখা যাইত যাহারা শুধু মুখের কথায় বা নির্দ্দিষ্ট আদেশে হস্তীর গতি ও আচরণ নিয়ন্ত্রণ করিতে সমর্থ হইত।

ইহা ছাড়া অশ্বের যেমন 'দলাই-মলাই' করিবার সহিস বা পরিচারক রাখা হয়, সেই প্রকার সহিস থাকিত প্রতি হস্তীর পৃথক পৃথক। এই সকল হস্তীসেবক ছাড়াও ঘেসেড়া, রাঁধুনী ও সাধারণ পরিচারক থাকিত অগণিত। হাতীর পায়ে বেড়ি দিবার লোক, রক্ষী এবং রাত্রিকালের প্রহরী— এই সকলও প্রত্যেক হস্তিশালায় রাখার রীতি ছিল। এই সকল কর্ম্মচারীদের আহার ও বাসস্থান দেওয়া হইত, তাহা ছাড়া নির্দ্দিষ্ট হারে বেতন পাইত। তাহাদের কর্ত্তব্যে অবহেলা ধরা পড়িলে অর্থদন্ড দেওয়া হইত এবং বেতনের টাকা হইতে তাহা কাটিয়া রাখা হইত। তাহাদের নির্দ্দিষ্ট দৈনিক কর্ত্তব্যের ত্রুটির জন্য ঐরূপ সাজা দেওয়া হইত, কিন্তু অন্যান্য অপরাধ—যেমন অপরিচিত বাহিরের লোককে হস্তীর পৃষ্ঠে সওয়ার করা কিম্বা হস্তীর কোমল দেহাংশে আঘাত প্রদান প্রভৃতির জন্য অতি কঠোর দণ্ডের বিধান ছিল।

মায়ের পূজা

৪০৭ পৃষ্ঠার পর

কিন্তু মহা অষ্টমীর দিন আর থাকিতে না পারিয়া ক্ষেমঙ্করী ঠাকুরাণী কাঁদিয়া করালীচরণকে কহিল "হ্যাঁগা সত্য সত্যিই এবার আমি মায়ের মুখ দেখতে পাব না ?"

করালী উত্তর করিল, "কেন পাবে না, চল তোমায় আমি পাশের গাঁয়ের পূজা দেখিয়ে আনি। তুমি তৈরী থাক, আমি গাড়ী ডেকে আনি।"

করালীচরণের গাড়ী পূজো বাড়ীর পাশ দিয়া যাইতেছিল। সেখানে হঠাৎ ভীষণ রকমের গোলমাল শুনিয়া, গাড়োয়ানকে গাড়ী থামাইতে কহিয়া, করালী ক্ষেমঙ্করীকে কহিল "তুমি একটু বস আমি চট করে দেখে আসি এত গোলমাল কিসের। এই বলিয়া করালী পূজো বাড়ীর বিপুল জনতার মধ্যে মিশিয়া গেল।

সেখানে গিয়া করালীচরণ দেখিল দুটি হিন্দুস্থানী লোককে লইয়া খুব মারপিট চলিতেছে আর তাহাদের পাশে একটি ছোট মেয়ে কাঁপিয়া কাঁপিয়া ফোঁপাইতেছে।

করালী একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া বহু কষ্টে ব্যাপারটা বুঝিয়া লইল। পরে সোজা গিয়া সেই হিন্দুস্থানী লোক দুটিকে তাহাদের আক্রমণকারীর নিকট হইতে টানিয়া এবং মেয়েটিকে কোলে লইয়া নিরাপদে নির্ভীক ও গম্ভীর কণ্ঠে কহিল "চলা আও ভেইয়া পরোয়া মৎ কর। হাম জোড়কী কো লেগা।"

এই কহিয়া কোন দিকে দৃকপাত না করিয়া রাজার মত দৃপ্ত চালে পূজোবাড়ী হইতে বাহির হইতে হইতে কহিল "আয় মা আয়, আমার অন্ধকার ঘর আলো করবি আয়! এত সহজে যখন তোকে পেয়েছি তখন আর ছাড়ব না।" পরে আনন্দের সুরে চীৎকার করিয়া কহিল "গিন্নী তুমি যে মাকে দেখতে পেলে না বলে দুঃখ করছিলে, এই দেখ, মা আমার স্বয়ং দেখা দিতে এসেছেন; আর তোমারই হাতের রান্না খাবার লোভ সামলাতে না পেরে তোমারই কাছে চিরদিনের জন্য বাঁধা পড়লেন। দেখ আমি ঠিক বলেছিলাম কিনা, যে তোমার হাতের রান্না খেয়েছে সে কি আর ভুলতে পেরেছে। তাই মা আমার ভুলতে না পেরে সকলকে ছেড়ে তোমার কাছে এলেন।" এই বলিয়া মেয়েটিকে ক্ষেমঙ্করীর কোলে বসাইয়া দিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

পূজোবাড়ীর সকলে কিছুক্ষণ হতভম্ব হইয়া নিস্তব্ধ রহিল। মুখুজ্যে মহাশয় মৌনতা ভঙ্গ করিয়া কহিলেন "যাক আপদ গেল।"

প্রণয়ের পরে

(উপন্যাস—পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীসত্যকুমার মজুমদার

(৩)

এমনই কত আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়াই না লীলা বড় হইয়া উঠিয়াছে। অমর সেবার প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া কলেজে পড়িবার উদ্দেশ্যে কলিকাতা যাওয়ার জন্য নিজের বাক্স-বিছানা গুছাইতেছিল। লীলা ম্লানমুখে পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। অমর নিজের প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্র লইতে লইতে বলিয়াছিল, "আমি ত চ'লে যাচ্ছি,—ছুটীতে ছুটীতে আস্‌ব। খুব মন দিয়ে পড়বি। আমি নূতন নূতন বই কিনে পাঠিয়ে দেব, সব প'ড়ে ফেলবি!"

চোখের জলে বুক ভাসাইয়া লীলা সেদিন অমরকে বিদায় দিয়াছিল। তারপর দীর্ঘ চার বৎসর কাটিয়া গেল, চারি বৎসরে সে অনেক লেখাপড়া শিখিল। সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল—কত রকমের বই-ই অমর পাঠাইয়াছে, লীলা একে একে সমস্তই আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে। এই সুদীর্ঘ চার বৎসরে স্বাস্থ্যবতী লীলা একটু অতি মাত্রায় বড় হইয়া উঠিল। নব বর্ষায় ক্ষীণতোয়া নদীর মত বসন্ত সমাগমে বনবল্লরীর মত—লীলার ক্ষীণ তনু হঠাৎ পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। বিশ্বেশ্বরবাবু একদিন চাহিয়া দেখিলেন, মেয়ে বড় হইয়াছে। নন্দরাণী মনে মনে ভাবিলেন, এখন উপায়! ঠিক এমনি সময়ে ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীর সম্মান লইয়া বি-এ পাশ করিয়া অমরনাথ নন্দরাণীর গৃহদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

প্রণত অমরকে আশীর্বাদ করিয়া নন্দরাণী ডাকিয়া কহিলেন, "তোর অমরদা এসেছে রে লীলা! একখানা আসন নিয়ে আয়।"

লীলা সসঙ্কোচে নতবদনে আসন লইয়া আসিয়া মায়ের কাছে দাঁড়াইয়াছিল। আজ অমরদার কাছে বাহির হইতেও তার লজ্জা করিতেছিল—ছি ইহারই মধ্যে সে কত বড় হইয়া উঠিয়াছে!

অতি সন্তর্পণে অমরের পায়ের কাছে মাথা নোয়াইয়াই লীলা সরিয়া যাইতেছিল, অমর বলিল, "বারে পাগলী এরি মধ্যে এত লজ্জা হয়েছে তোর যে আমার সামনেও দাঁড়াতে পারছিস্‌নে!"

লীলা দাঁড়াইল, সহসা কথা কহিল না। নন্দরাণী বলিলেন, "আজকাল ও একটু লাজুক হয়েই উঠেছে অমর। তা মেয়েদের একটু লজ্জা-সরম থাকা ভাল। তারপর অনেক-দিন তোমায় দেখেনি কিনা। প্রায় এক বছর তুমি ত বাড়ী আসনি। শোন্‌না তোর অমরদা কি বল্‌ছে!"

এইবার লীলার মুখে কথা ফুটিল; কহিল, "এগ্‌জামিনের রেজাল্ট বেরিয়েছে অমরদা?"

অমরনাথ বলিল, "হাঁ, কাল জানতে পেরেছি। ফার্স্ট-ক্লাশ সেকেণ্ড!"

"আমার চিঠি পেয়েছিলে?"

অমর সম্মতি জানাইলে লীলা বলিল, "কালীঘাট গিয়েছিলে, মাকে পূজা দিয়ে এসেছ?"

হাসিয়া অমর কহিল, "সে আবার কিরে?"

বিষণ্ণমুখে লীলা অমরের পানে চাহিয়া বলিল, "তবে তুমি আমার চিঠি পড়ে দেখনি! আমি মানসিক ক'রেছিলাম তুমি ফার্স্ট-ক্লাশ পেলে কালীঘাটে ডালা দেব!"

অমরনাথ হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, "রাত জেগে জেগে পড়াশুনা ক'রে পাশ হব আমি আর সন্দেশ খাবেন কালীঘাটের কালী! আমি না পড়লে মা কালী কেন, তাঁর বাবা এসেও আমাকে পাশ করিয়ে দিতে পারবেন না। তার চেয়ে ঐ সওয়া-পাঁচ আনার সন্দেশ আমায় খেতে দিস্, দিব্যি পাশের পর পাশ হয়ে যাবখন।"

লীলার বিষণ্ণ মুখ আরও বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। অমরদার এই নাস্তিকতা তার মোটেই ভাল লাগিল না। ভয়ও নিতান্ত কম হইল না। পাছে কোন দিন মা স্বপ্নে দেখা দিয়া ঐ সন্দেশ না দেওয়ার জন্য রাগিয়া ঘাড় মট্‌কাইয়া চলিয়া যায়! যে সে দেবতা ত নয়, স্বয়ং মা কালী, অমন খড়্গ হাতে!

ভয়ে বিবর্ণ হইয়া লীলা বলিল, "কি যে বল অমরদা, ছি ওকথা বল্‌তে নেই যে! তুমি না দাও কারুর হাতে আমিই পাঠিয়ে দেব।"

লীলা অগাধ বিশ্বাস ও ভীতিবিহ্বল মুখ দেখিয়া অমর হাসি থামাইয়া কহিল, "ভয় নেইরে পাগ্‌লী, তোর মানসিক আমি শোধ দিয়ে এসেছি! নইলে তোর মা কালী কি আমায় আস্ত রাখ্‌ত! সওয়া-পাঁচ আনা ছিল তোর মানসিক—আমি সওয়া-একটাকার সন্দেশ দিয়েছি। কিন্তু তোর মা কালী তা খেলেও না, চেয়ে দেখলেও না। মাঝখান থেকে হালদার মশায়েরা কিছু দক্ষিণা আদায় ক'রে নিয়ে নিলে! খানকয়েক সন্দেশ ফিরিয়ে দিয়ে বল্‌লে, মায়ের প্রসাদ। দেখে ত আমার চক্ষুস্থির এতগুলো সন্দেশ কিনে দিলাম!

"বেশ করেছ" বলিয়া লীলা আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। অমর বলিতে লাগিল "মনে হ'ল, মা বুঝি আর ক'খানা খেয়ে নিয়েছেন। ও ক'খানাও খাননি যে কেন ভেবে পাইনি। বেশী খিদে ছিল না বোধ হয়! না-কি মার মনে হয়েছিল—লীলা মানৎ করেছে, তাকে ত কিছু দিতে হবে! এই নে ক'খানা মা ফিরিয়ে দিয়েছেন।"

বলিয়াই অমরনাথ রুমালে বাঁধা প্রসাদের ঠোঙ্গা লীলার হাতে ধরিয়া দিল। লীলা মায়ের প্রসাদ কপালে ঠেকাইয়া বলিল, "দেবতাকে খেতে বুঝি কেউ দেখে, আর মা বুঝি মানুষের দেওয়া খান।"

অমরনাথ বলিল, "দেখে না সে কথা ঠিক, কারণ পুরুত ঠাকুরের হাত সাফাই এত পরিষ্কার যে বোঝবার উপায় নেই। নইলে চোখের ওপর অতগুলো সন্দেশ উড়ে যায়। হাঁরে লীলা, দেবতা যদি মানুষের দেওয়া নাই খাবে তবে তাঁকে দেওয়া কেন?"

লীলা বলিল, "মুখ দিয়ে না খেলে বুঝি খাওয়া হয় না! মানুষে যে ভক্তি ক'রে ঠাকুর দেবতাকে দেয়, দেবতা সে ভক্তিই চান!"

"তবে দুবেলা কালীর দোরে যেয়ে কপাল ঠেকালেই ত চলে। তাতে গাঁটের পয়সাও বেঁচে যায়—ভিড়ের ঠেলায়ও প্রাণ অতিষ্ঠ হ'য়ে ওঠে না।"

"তোমার সঙ্গে আমি অত বক্‌তে পারিনে বাপু, তুমি কালী মান না, ঠাকুর দেবতাকে বিশ্বাস কর না—তুমি ত নাস্তিক! যদি অবিশ্বাস তবে পূজো দিতে গেলে কেন?"

অমরনাথ লীলার রুষ্ট সুন্দর মুখখানির পানে চাহিয়া বলিল, "ও যে তোরই মানসিক—তাই, নতুবা"

"নতুবা কিছু নেই, না!" বিরক্ত হইয়া লীলা ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। অমর ডাকিয়া বলিলেন, "যাসনে, ওরে শুনে যা, তোর ঠাকুর দেবতা আমি মানি, এক'শবার মানি!"

হাসিয়া লীলা বাহিরে আসিল। অমর বলিল "তুই ত মানসিক ক'রেছিলি সওয়া পাঁচ আনার সন্দেশ। আর আমি বলেছিলাম, যদি ফার্ষ্ট ক্লাস পাই তবে টাঙ্গাইলের একখানা শাড়ী!"

অমরনাথ কাগজের বাক্সে ভরা জরীর পাড় টাঙ্গাইলের সূক্ষ্ম একখানা নীল শাড়ী বাহির করিয়া লীলার হাতে দিল। তারপর বলিল, "যা, এক্ষুণি প'রে আয় দেখি।"

লীলা শাড়ী হাতে সলজ্জরোষে বলিল, "হ্যাঁ ভারী দায় পড়েছে আমার ঐ পাত্‌লা শাড়ী এক্ষুণি পর্‌তে; তোমার কাপড় তুমি নিয়ে যাও—চাইনে আমি!"

"তবে তোর কালীর প্রসাদ আমায় ফিরিয়ে দে। শুদ্ধ প্রসাদ নয়—মায় যেটুকু হালদার মশায়দের হাত থেকে মা খেয়ে নিয়েছেন।"

লীলা ঘরের ভিতর কাপড় রাখিয়া ফিরিয়া আসিল। অমর কহিল, "থাক্‌গে যখন খুশী পরিস! দেখ্‌রে লীলা, তোর মানৎ করা সন্দেশ দেবতা হাত বাড়িয়ে নিলে না, খেলে না! আর আমার"—খানিক থামিয়া অমর বলিল, "কোন্‌টা সত্যিকার—কোন্‌টা ভাল?"

লীলা চাহিয়া রহিল কথা কহিল না। অমর লীলার হাতে তক্‌তকে বাঁধান একখানা নূতন বই দিয়া বলিলেন, "নূতন বেরিয়েছে-রে পড়ে দেখিস্।"

লীলা অনেক রাত্রি জাগিয়া বইখানা পড়িয়া ফেলিল। পরদিন বিকাল বেলায় অমরের পড়বার ঘরে যাইয়া অমরের পার্শ্বে দাঁড়াইল। অমর বলিল, "ভেবেছিলাম দুপুর বেলায় একবার আসবি, তা যে লজ্জা কাল দেখে এসেছি—আস্‌বি বলে আর ভরসা পাইনি।"

লীলা একটু সলজ্জ হাসি হাসিল, বলিল, "আসতাম না অমরদা, কালকার সেই বইখানা পড়ে ফেলেছি। কয়টি কথা তোমায় জিজ্ঞেস কর্‌ব ভাব্‌ছি!"

অমর জিজ্ঞাসু নেত্রে লীলার পানে চাহিল। লীলা কহিল, "এই যে সব সতীদের চরিত্র ওতে রয়েছে ওদের মধ্যে কে সব চেয়ে বড় সতী অমরদা?"

অমরনাথ ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, "বড়ই শক্ত প্রশ্ন-রে লীলা। সব ত কাব্যে গড়া সতী চরিত্র—সব কটি প্রায় এক ছাঁচে ঢালা।"

সন্দেহের সুরে লীলা বলিল, "শুধুই কাব্যে গড়া, সত্যি-কার সীতা সাবিত্রী কেউ ছিলেন না!"

অমর কহিল, "হয়ত ছিল, অথবা ছিলও না, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার ত নেই! সতীত্বের আদর্শ ক'রে কবি তাদের রূপ দিয়েছেন—মানুষ যাতে তাদের আদর্শ নিয়ে চল্‌তে পারে।"

লীলা বাধা দিয়া বলিল, "থাক্, আর আমি শুন্‌তে চাইনি অমরদা। আমি জান্‌তে চাই, কার চরিত্রে সতীত্বের আদর্শ বেশী ফুটে উঠেছে!"

অমর বলিল, "তাই ত বলছি, কম কোনটাতেই ফোটেনি! প্রথমে সীতার কথাই ধর, জন্মদুঃখিনী সীতা জীবনে কোন সুখ পায়নি। রাজার মেয়ে রাজকুলবধূ স্বামীর সঙ্গে বনে গেলেন, কত কষ্ট পেলেন, আবার যুদ্ধের শেষে তাকেই কিনা সতীত্ব পরীক্ষার জন্য আগুনে ঝাঁপ দিতে হ'ল! তারপর শেষ জীবনে—যৌবনে না হয় দুঃখ-কষ্ট সওয়া যায়। —অন্তঃসত্ত্বা সীতা, রাম লোকনিন্দার ভয়ে বনে পাঠালেন। তবু সেই সীতাই বলেছিলেন 'জন্মে জন্মে রাম হোক্ পতি'! এত বড় আদর্শ ক'রে জগতের কোন কবি সতীর ছবি আঁকতে পেরেছে কি!"

খানিক থামিয়া অমর বলিতে লাগিল, "তারপর সাবিত্রী—সুখের কোলে লালিতা রাজকন্যা বনবাসী দরিদ্র সত্যবানকে পতিত্বে বরণ করলেন। বৎসরকাল তার পরমায়ু জেনেও নিজের সংকল্পে অটল রইলেন। সমস্ত সুখ ঐশ্বর্য্য ছেড়ে দীন বেশে বনবাসী শ্বশুর গৃহে গিয়ে নিজেও বনবাসী হলেন। সমস্ত আভরণ অলঙ্কার ত্যাগ ক'রে পতির সহধর্ম্মিণী হলেন। শেষে যমকেও ঠকিয়ে পতির আত্মা ফিরিয়ে আন্‌লেন!"

"তারপর এই বেহুলা" অমর আস্তে আস্তে ভাবিত মনে বলিতে লাগিল "কত কষ্টে মৃত স্বামীর দেহ ভেলায় ভাসিয়ে কত যত্নে সেবা কর্‌লেন! আহার নেই, নিদ্রা নেই,—ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই! দুর্গন্ধ শব—মাংস খসে পড়্‌ল—কঙ্কাল নিয়েই ভাস্‌তে লাগলেন। শেষে ইন্দ্রপুরে নেচে গেয়ে স্বামীর জীবন ফিরিয়ে পেলেন!"

লীলা অধৈর্য্য হইয়া বলিল, "আর থাক্, এই তিনটি দিয়েই বুঝিয়ে দাও না কে কত উঁচুতে উঠেছে!"

অমর বলিলেন, "অলৌকিক কাজ এরা তিনজনেই করেছেন। কেউ কারুর চেয়ে এতটুকু খাট নন। কিন্তু ভালবেসে স্বামীর নির্য্যাতন কেউ সীতার মত পাননি। এই জায়গায় সীতার চরিত্র আমার মতে একটু উঁচুতে উঠেছে সব চেয়ে মর্ম্মস্পর্শী এই বাল্মীকির সীতা। সীতার দুঃখে আমি ছেলে বেলায় কত কেঁদেছি লীলা!"

আবার অমর একটু থামিল। পরে বলিল, "কি অলৌকিক কাজ এঁদের! সীতা আগুনে পুড়ে মরলেন না, বললেন অমনি পৃথিবী দ্বিধা হয়ে গেল। সাবিত্রী যমের সঙ্গে কথা কইলেন! বেহুলাও স্বামীর কঙ্কাল নিয়ে স্বর্গে চলে গেলেন। কত রূপকই এতে আছে! রূপক আর অলৌকিক

(শেষাংশ ৪১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ফেরাওদের প্রতিকৃতি

শ্রীসমীরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মিশরের প্রাচীন যুগের ফেরাওদের প্রতিকৃতি রক্ষার এক প্রশস্ত উপায় ছিল সেকালের সমাধি ব্যবস্থা। মৃতের কিছু প্রতিকৃতি ও মূর্ত্তি তাহা প্রস্তরেই হউক, গজদন্তেই হউক আর ব্রোঞ্জ প্রভৃতি ধাতুতেই প্রস্তুত হউক—সমস্তই শবের সহিত সমাধিস্থ করা হইত। এইজন্য উত্তর মিশরের সাক্কারা ও য়্যাবাইডোস্—এই দুইস্থানের রাজকীয় সমাধি আগার হইতে বহু প্রাচীন প্রতিকৃতি পাওয়া গিয়াছে। এবং ঐগুলির পরিচয় উদ্ধারেও বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই, কারণ পৃথক পৃথক ফেরাও বা রাজবংশধরের জন্য পৃথক পৃথক কক্ষ বা সৌধ নির্দ্দিষ্ট ছিল। উহার কোন না কোন স্থানে বা পদার্থ বিশেষে নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির নাম খোদিত পাওয়া গিয়াছে।

বিগত সংখ্যায় আমরা সর্ব্বাদি রাজবংশ হইতে ষষ্ঠ রাজবংশ পর্যন্ত ফেরাওদের প্রতিকৃতি উদ্ধার ও তাহা হইতে ব্যক্তিত্বের ছাপ নির্দ্দেশের ব্যাপারের আলোচনা করিয়াছি। এইবারে পরবর্ত্তী ফেরাওদের প্রতিকৃতির বিষয় উল্লেখ করিব।

ষষ্ঠ রাজবংশের পরবর্ত্তী প্রতিকৃতি

ফেরাও প্রথম পিওপ্‌-য়ের মূর্ত্তি পাওয়া যায় ব্রোঞ্জ নির্ম্মিত। পিওপ্‌-য়ের শাসনকাল খৃষ্টপূর্ব্ব ২৫৫৪ সালে সমাপ্ত হয়। প্রতিকৃতির সাদৃশ্য হইতে ইহাকে ফেরাও টেলের পুত্র বলিয়া অনুমান করা হয়। পাঠক-পাঠিকাগণের বোধ স্মরণ রহিয়াছে যে হত্যাকারীর হস্তে ফেরাও টেল অকস্মাৎ নিহত হন।

এই ষষ্ঠ রাজবংশের শাসনকাল অতীত হইবার পর পাঁচ শত বৎসর ব্যাপিয়া যে রাজত্ব, তাহার কোনই নিদর্শন (প্রতিকৃতি সম্বন্ধীয়) অদ্যাপি হস্তগত হয় নাই। দ্বাদশ রাজবংশের আমল আরম্ভ হয় খৃষ্টপূর্ব্ব ২১১১ সালে। এই বংশের কয়েকজন ফেরাওরই প্রতিকৃতি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। সেই সমুদয়ের ভিতর সর্ব্বপ্রকারে উল্লেখযোগ্য ও আকর্ষণের বস্তু হইল ফেরাও তৃতীয় আমেনেমহেৎ (১৯৫৯-১৯১০ খৃষ্টপূর্ব্ব)-য়ের প্রতিকৃতি; একটিমাত্র মূর্ত্তি নয়, এই ফেরাওর বিভিন্ন বয়সের এবং বিভিন্ন অবস্থানের সমগ্র এক প্রস্থ প্রতিকৃতি। বয়স অনুসারে পর পর এই প্রতিকৃতিগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ইহাই উপলব্ধি হয় যে, শক্তিশালী ও দাম্ভিক তরুণের উগ্র সজীবতায় রাজ্যশাসন আরম্ভ করিয়া ফেরাও আমেনেমহেৎ পরিশেষে বিষাদমগ্ন সংসারে বীতস্পৃহ এক বৃদ্ধে পর্য্যবসিত হয়। তবে এই ফেরাওটির বীরত্ব-ব্যঞ্জনা মূর্ত্তিতে পরিস্ফুট করিবার জন্য সিংহভাবে (lion-sphinx) অনুরঞ্জিত করা হইয়াছে—সেই জন্য মুখাবয়বও অস্বাভাবিক প্রশস্ত করা হইয়াছে। এই মূর্ত্তিতে এই প্রকার সিংহ প্রতিকৃতির ছাপ রহিয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন, উহা প্রকৃত ফেরাও আমেনেমহেৎয়ের প্রতিকৃতি-পুঞ্জ, কেবল বদনমণ্ডল প্রশস্ততর করা হইয়াছে বীরত্ব প্রতীক পশুরাজের সাদৃশ্য আরোপ করিবার জন্য।

এই শ্রেষ্ঠ প্রতিকৃতি অপর তিনটির সহিত নীলনদের ব-দ্বীপে ট্যানিস নামক স্থানে পাওয়া যায়। এই চারিটিই এখন কেইরো যাদুঘরে রক্ষিত। গ্রেনাইট প্রস্তরে খোদাই করা এই ফেরাওর মুণ্ডটি পাওয়া গিয়াছে য়্যাবাইডোস রাজকীয় সমাধি-সৌধে। মুণ্ডটিতে দেখিতে পাওয়া যায় আমেনেমহেৎ-য়ের জরাজীর্ণ বৃদ্ধাবস্থা—হতাশা ও বিরাগ সে বদনের প্রতিটি রেখায় লুকোচুরি করিয়া বেড়ায়।

ফেরাও থুৎমোজে (তৃতীয়)—অষ্টাদশ রাজবংশের এই ফেরাওটির তরুণ বয়সের প্রতিকৃতি—ধূসর বর্ণের বাসাল্টে তৈরী (১৪৯০ খৃষ্ট-পূর্ব্ব)

ত্রয়োদশ রাজবংশের নিদর্শনস্বরূপ একটি অতি সুন্দর কাষ্ঠমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। উহা ফেরাও ফুইব্রে-হেরওয়েৎ-য়ের দাহশূন্য সমাধি হইতে উদ্ধৃত। পূর্ব্বে বলিয়াছি ফেরাওদের পৃথক পৃথক সমাধি কক্ষ বা সৌধ ছিল এবং তৎসংলগ্ন কারুকার্য্যাদিতে নির্দ্দিষ্ট ফেরাওর নাম খোদিত ছিল। এই কাষ্ঠমূর্ত্তি যে উক্ত ফেরাওর ইহাতে

সন্দেহের অবকাশ নাই। কাষ্ঠমূর্ত্তি রাজার "কা" অর্থাৎ আত্মার প্রতীক, যেহেতু ঐ "কা" রাজার শবেরই অবিকল অনুকৃতি, সুতরাং কাষ্ঠ-মূর্ত্তিটিকে রাজার প্রকৃত প্রতিকৃতি বলিয়াই ধরা যায়।

ইহার পর আবার তিন শত বৎসরের কোনও প্রতীক পাওয়া যায় নাই। অন্যান্য প্রকারের প্রাচীন নিদর্শন কিছু কিছু হস্তগত হইলেও প্রতিকৃতিরূপে গ্রাহ্য কোনও মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহার পর খৃষ্টপূর্ব্ব ১৫৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় অষ্টাদশ রাজবংশের শাসন। এই যুগের বহু মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, যাহা রাজকীয় প্রতিকৃতিস্বরূপ গ্রহণযোগ্য; কিন্তু তাহার ভিতরও বহু মূর্ত্তি রহিয়াছে যাহা ঐতিহাসিকের নিকট মূল্যবান নয়; কারণ উহাদের অনেক-গুলিরই শিল্প-কার্য্যে কোনও প্রকার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের ছাপ দিবার চেষ্টা করা হয় নাই। সেগুলির পরিচ্ছদ পারিপাট্য ও রাজোচিত আড়ম্বরের ঘটায় বদনমণ্ডলের ডৌলে ব্যক্তিত্বের আরোপ একেবারেই উপেক্ষিত হইয়াছে। যাহা হউক অষ্টাদশ রাজবংশের মূর্ত্তিসকলের ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা জীবন্তবৎ ও অভিব্যক্তিতে শ্রেষ্ঠ হইল ছাই রংয়ের 'বাসাল্ট' প্রস্তর নির্ম্মিত ফেরাও তৃতীয় থুৎমোজের প্রতিকৃতি। এই ফেরাও ১৪৯৩ হইতে ১৪৪০ খৃষ্টপূর্ব্ব সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। কর্নাক নামক স্থানে সমাধি-সৌধের ধ্বংসাবশেষ খননকালে লেগ্রেন্ কর্ত্তৃক প্রাপ্ত। ফেরাওর তরুণ বয়সের প্রতিকৃতি বলিয়া অনুমিত হয়। ইহাও কেইরো যাদুঘরে স্থান পাইয়াছে।

একটি বিরাট প্রস্তর মূর্ত্তির মস্তক ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত। বালিপ্রস্তরে খোদাই করা এই প্রকাণ্ড মুণ্ডটি পাওয়া যায় থিব্‌স্ নগরের খননকালে। ফেরাও তৃতীয় আমেনহোতেপ-য়ের প্রতিকৃতি এইটি—এইরূপ নির্দ্দেশ ঐতিহাসিকগণ দিয়াছেন। ফেরাও আমেনহোতেপ (তৃতীয়) রাজ্য শাসন করেন খৃষ্টপূর্ব্ব ১৪০৮ হইতে ১৩৭০ সাল পর্যন্ত। এই ফেরাও তাহার আকার-আকৃতি তাহার মাতার মতই পাইয়াছিল নিশ্চয়; কারণ, তাহার নাক ছিল সোজা খাড়া—লম্বিত নয়। তাহার পুত্র আখ্‌নাতন্ তাহার মতই ছোট নাকের অধিকারী হইয়াছিল। কিন্তু তৃতীয় আমেনহোতেপের পিতা চতুর্থ থুৎমোজে পাইয়াছিল দীর্ঘ নাসিকা—তাহার পিতা তৃতীয় থুৎমোজের যেমনটি ছিল। আমেনহোতেপ তৃতীয়ের প্রতিকৃতি হইতে বুঝিতে পারা যায় সে যেমন গর্ব্বিত ছিল, তেমনই ছিল পরম রমণীয়। এই জন্য ইতিহাসে তাহাকে "the magnificent" পরম সুন্দর আখ্যা প্রদান করা হয়। দেহগঠন তাহার যেমন পরম রমণীয় ছিল তেমনই ছিল তাহার বিলাসের আড়ম্বর—বিরাট আকারের সুদৃশ্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ, রাজসভার বিলাসিতা প্রভৃতি কিম্বদন্তীতে পরিণত হইয়াছিল বহু পরবর্ত্তী যুগ পর্যন্ত। পরিণত বয়সে সে অতিশয় হৃষ্টপুষ্ট হইয়া পড়ে এবং মৃত্যুর ছয় বৎসর পূর্ব্বে হয় তাহার দেহ—নয় তাহার মন রুগ্ন হইয়া পড়ে। ইতিহাসে উহার প্রমাণস্বরূপ বলা হয় যে, —র রাজত্বকালের শেষ ছয় বৎসর তাহার রাণীই স্বয়ং রাজকার্য্য পরিচালনা করে। রাজা দৈহিক কি মানসিক অপটু না হইলে সেকালে রাণী কখনই শাসন-বল্গা নিজ হাতে গ্রহণ করিত না। এই রাজা ও রাণী উভয়েরই অতি সুন্দর নিখুঁত প্রতিকৃতি রহিয়াছে—আজিও কেইরো যাদুঘরে অতি যত্নে তাহা প্রদর্শিত নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত হইয়া রহিয়াছে।

ফেরাও আখ্‌নাতন্ ও তুতান্‌খামেন

এই রাজা ও রাণীর পুত্র আখনাতন ফেরাওদের প্রাচীন ইতিহাসে সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ নৃপতি বলিয়া বর্ণিত। নানা কারণেই ইহার শাসনকাল গুরুত্বসম্পন্ন। ইহার প্রতিকৃতির ভিতর আবক্ষমূর্ত্তিটিই ভাস্কর্য্য নিপুণতায় উৎকৃষ্ট। ১৯১২ সালে মধ্য মিশরে যখন জার্ম্মান খননকারী দল কার্য্য-নিরত, সেই সময়ে তেললআমার্না নামক স্থানে এই মুণ্ডটি পাওয়া যায়। উহা বর্ত্তমানে বার্লিন যাদুঘরে রক্ষিত রহিয়াছে। তেলেল-আমার্না শহরটি উৎসর্গীকৃত ছিল আখ্‌নাতনের পিতার পবিত্র নামে। ঐ শহরেই ফেরাও আখনাতনের সমাধি স্থাপিত ছিল।

এই ফেরাওর রাণীর নাম ছিল নেফারতাইতি—সুন্দরী বলিয়া এই রাণীর যশ ছিল অশেষ, কিন্তু রাজকার্য্যে তাহার কোন স্থান ছিল না। এই রাণীর আবক্ষ মূর্ত্তিও জার্ম্মান খননকারী দল উদ্ধার করে পরে—মহাসমরের ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বে। এই মূর্ত্তিটিও অতিশয় সূক্ষ্ম অভিব্যক্তির জন্য বিখ্যাত। চুন পাথরের উপর স্বাভাবিক বর্ণে ইহা রঞ্জিত। রাণীর বয়স যখন আনুমানিক পঁচিশ বৎসর হইবে সেই সময়কার প্রতিকৃতি ইহা; ইহাতে আশ্চর্য্য নিপুণতার সহিত ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে যে রাণীর বাম চক্ষুটি দৃষ্টিশক্তি-হীন। কথিত আছে ছানি পড়ায় রাণী এই বাম চোখে দেখিতে পাইত না। এই রাণীর সাত কন্যা জন্ম গ্রহণ করে, কিন্তু কোনও পুত্র-সন্তান জন্মে নাই। মিশরের একটি প্রসিদ্ধ রাজকীয় প্রথা এই যুগের ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যায়। কারণ এই সাত রাজকন্যাদের ভিতর একটিকে নিতান্ত শিশুকালে বিবাহ দেওয়া হয় (ফেরাও) তুতান খামেনের সহিত। কথিত আছে তুতনখামেনও ফেরাও আখানাতনের পুত্র, কিন্তু অন্য স্ত্রীর গর্ভে তাহার জন্ম। সেকালে মিশরের রাজপরিবারে এই প্রকার ভ্রাতা-ভগ্নীতে বিবাহ প্রচলিত ছিল। কোনও রাজকন্যার পক্ষে তাহার ভ্রাতাকে বিবাহ করাই ছিল বাঁধাধরা নিয়ম। সহোদর, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা প্রভৃতি বর্ত্তমান না থাকিলে পরে অন্য পাত্রে তাহাকে সমর্পণ করা হইত।

মাত্র ত্রিশ বৎসর বয়সে ফেরাও আখনাতনের মৃত্যু হয়। সেই সময়ে তুতানখামেন শিশু মাত্র ছিল। সেই শিশুকেই সিংহাসনে স্থাপন করা হয়। ইহার একটি প্রতিকৃতি রহিয়াছে কেইরো যাদুঘরে, আজ জীবিতকালের প্রস্তর মূর্ত্তি যাহা সমাধিতে রক্ষিত ছিল, তাহাও উদ্ধার করা হইয়াছে। আবার একটি অতি সুন্দর মস্তক রহিয়াছে গ্রেনাইট প্রস্তরের। এই মস্তকটি কার্নাকে পাওয়া যায় দেব-মূর্ত্তির মস্তক বলিয়া কথিত হয়, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উহা ফেরাও

তুতানখামেনেরই প্রতিকৃতি। ইহাও কেইরো যাদুঘরে সংরক্ষিত।

দেব-মূর্ত্তি বলিয়া এই ফেরাওর প্রতিকৃতির উল্লেখের একটু ইতিহাস রহিয়াছে। পূর্ব্বেও আমরা লক্ষ্য করিয়াছি—দ্বিতীয় পিরামিড্ নির্ম্মাতা ফেরাও খেফরের যে প্রতিকৃতি পাওয়া গিয়াছে তাহা স্ফিনক্স মন্দিরের নিকট, এই মন্দির যাদুবিদ্যার দেবতা সোকারিস ও সাইরিশয়ের উদ্দেশ্যে

(১৩৬০ খৃষ্টপূর্ব্বে) অষ্টাদশ রাজবংশের ফেরাও আখনাতনের রাণী নেফের্‌তাইতি—প্রসিদ্ধ ফেরাও তুতন্‌খামেনের বিমাতা

উৎসর্গীকৃত বলিয়া কথিত হয়। এই মন্দিরে সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট মূর্ত্তি দেবতার বলা হইলেও প্রকৃত পক্ষে উহা ফেরাও খেফ্‌রের প্রতিকৃতি। আবার দ্বাদশ রাজবংশের তৃতীয় আমেনেমহেৎ-য়র বিখ্যাত সিংহ মূর্ত্তি দেবতাজ্ঞানে ভ্রান্তি উৎপাদন করিলেও উহার সহিত ফেরাওর প্রতিকৃতির সাদৃশ্য রহিয়াছে। এখন তুতানখামেনের বেলাও সেই সাদৃশ্য ও দেবতা বলিয়া সম্মানিত হওয়ার ব্যাপার দেখা যাইতেছে। সুতরাং ইহা বলিলে প্রমাদ করা হইবে না যে, প্রাচীন মিশরে কোন কোনও ফেরাও এতদূর শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রজাদের নিকট প্রাপ্ত হইত যে, প্রজাগণ রাজার মূর্ত্তিই মন্দিরে স্থাপন করিয়া দেবজ্ঞানে পূজা করিত। এই জন্যই পূর্ব্বোক্ত ফেরাওদের প্রতিকৃতির সহিত দেবতার মূর্ত্তির সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইয়াছে, প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ সকল প্রতিকৃতি দেবতা বলিয়া প্রদর্শন করিবার প্রয়াস হইলেও যে প্রতিপত্তিশালী ফেরাও-দেরই মূর্ত্তি, ইহা নিঃসন্দেহ।

ফেরাও তুতানখামেন বিশ বৎসর বয়সে উপনীত হইবার পূর্ব্বে প্রাণত্যাগ করে (খৃষ্ট পূর্ব্ব ১৩৫৫ সাল)। তাহার কোন সন্তান ছিল না; কোনও উত্তরাধিকারী না থাকায় নূতন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ঊনবিংশ রাজবংশ ঐতি-হাসিকের নিকট গুরুত্বসম্পন্ন, কারণ ইহাদের বংশের ফেরাও-দের কতকগুলি উৎকৃষ্ট প্রতিকৃতি রহিয়াছে। তাহাদের সকলের ভিতর কালো গ্রেনাইট পাথরে খোদাই করা দ্বিতীয় র‍্যামেসিস-য়ের প্রতিকৃতিই শ্রেষ্ঠ। এই ফেরাও ১২৯৫ সাল হইতে ১২২৯ খৃষ্ট পূর্ব্ব সাল পর্যন্ত রাজ্য শাসন করে। ১৬ বৎসর বয়সে দ্বিতীয় রেমেসিস রাজা হয়। প্রতিকৃতিতে প্রদর্শিত হইয়াছে রাজার মধ্য বয়স। ইহা ব্যতীত অন্য প্রকার প্রস্তরে নির্ম্মিত এই রাজার বিভিন্ন মূর্ত্তিও রহিয়াছে। তবে কালো গ্রেনাইটের মূর্ত্তিটিই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও স্বাভাবিক বলিতে হইবে, উহা হইতে রাজার তেজস্বিতা ও চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

এই রাজবংশের পর আবার ছয় শতাব্দী উত্তীর্ণ হইলে পুনরায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রতিকৃতির সন্ধান মিলে। এই ছয় শত বৎসরের নিদর্শনে যে সকল মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে ব্যক্তিত্ব উদ্ধার করিবার উপযোগী অতি সামান্যই মিলিয়াছে এবং তাহাতে তেমন নূতনত্ব কিছুই মিলে নাই। ইহার পর ২৬শ রাজবংশের প্রতিকৃতিতে কতকগুলি নিখুঁত ব্যক্তিত্ব-ব্যঞ্জনা সম্বলিত খোদাই মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। কার্লস্‌বার্গের যাদুঘরে একটি ফেরাও মূর্ত্তি রহিয়াছে, যাহার অভিব্যক্তি অতি সুন্দর। কোন কোন পণ্ডিতগণের অভিমত ফেরাও দ্বিতীয় আহমোজের প্রতিকৃতি এইটি। এই ফেরাও খৃষ্ট পূর্ব্ব ৫২৩ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

ক্লিওপেট্রা

ত্রিংশ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা নেক্তানেবোর প্রতিকৃতি ফ্লোরেন্স শহরের যাদুঘরে রক্ষিত। এই মূর্ত্তিতে ফেরাওদের পরম্পরাগত আড়ম্বর ও গর্ব্বের সুষ্ঠু প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। খৃষ্টপূর্ব্বে ৩৬১ সালে এই ফেরাও ইহলীলা সংবরণ করে। কিন্তু মিশরের শিল্পজগতে এই সময় হইতেই প্রবল আক্রমণ উপস্থিত হয় গ্রীসীয় শিল্পধারার প্রভাবের। গ্রীক শিল্পিগণের উন্নত পারদর্শিতা মিশরের শ্রেষ্ঠ কারুকার্যকেও হেয় প্রতিপন্ন করিতে থাকে, ফলে মিশরবাসী ক্রমশ গ্রীসীয়

শিল্পধারার পক্ষপাতী হইয়া পড়িতে থাকে। ক্রমে গ্রীসীয় শিল্পের পথে গ্রীসের রাজশক্তিও মিশরে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং ফেরাওদের সিংহাসন কাড়িয়া লইয়া আপন বংশ-ধারা প্রতিষ্ঠিত করে। ইতিহাসে এই শাসকগণের নাম ৩৩শ রাজবংশ বা টলেমেইক রাজবংশ।

এই রাজবংশের সর্ব্বশেষ যিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন তিনিই হইলেন ইতিহাস প্রসিদ্ধ ক্লিওপেট্রা (৫১-৩১ খৃঃ পূঃ)। ইঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মিশর রোমান্‌দিগের আয়ত্তাধীন হয়। ইঁহার আবক্ষ মূর্ত্তি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রহিয়াছে। সাধারণের বিশ্বাস ক্লিওপেট্রা ছিলেন অনিন্দ্যসুন্দরী, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি ততটা সুন্দরী ছিলেন না। যতটা ছিলেন ছলাকলাময়ী। তাঁহার অপূর্ব্ব প্রসাধন, তাঁহার চলন-বলন-ভঙ্গী, তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তাঁহার আকর্ষণ ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। এই চোখ-ধাঁধান ঔজ্জ্বল্যই সিজার ও য়্যাণ্টনিকে মুগ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু ক্লিওপেট্রার মৃত্যু এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার পুত্রের মৃত্যু—এই সুপ্রাচীন ফেরাও রাজবংশের লীলা অবসান করে। যে প্রসিদ্ধ রাজবংশধারা তিন হাজার চার বৎসর ব্যাপিয়া সমগ্র বিশ্বকে অভূতপূর্ব্ব শিল্পচাতুর্য্যের নিদর্শন উপহার দিয়াছে, তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিল খৃষ্টপূর্ব্ব ৩১ সালে।

প্রশ্নের পরে

(৪১২ পৃষ্ঠার পর)

কাজগুলো বাদ দিলে সীতার আসনই উপরে দিতে ইচ্ছে হয়। নিজের দুঃখে নয়, তাকে বনে পাঠিয়ে না জানি রামের কত কষ্ট হচ্ছে, এই ভেবেই সীতা আকুল হয়েছিলেন।"

মাঝখান হইতে লীলা বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা অমরদা, এসব যদি রূপকই হ'ল, তবে সীতা সাবিত্রীর চরিত্র কি মিথ্যে?"

অমর বলিল, "সত্যি মিথ্যে জানিনে লীলা, স্বচক্ষে সতী না দেখলে ত অত বড় সতী চরিত্র আঁকা যায় না! তবে এইটুকু ধরে নিলে বোধ হয় কোন তর্কই থাকে না যে, সতীত্বের শক্তি থাকলে আগুনে দেহ পোড়ে না, মাটীকে ফাটতে বল্‌লে সে ফাটে, অপায়ু মৃত স্বামীকেও ফিরিয়ে আনা যায়—এই প্রতিপন্ন করাই ছিল কবির ইচ্ছা।"

"কি ক'রে কোথায় এশক্তি সতীরা পায় আমায় ব'লে দিতে পার অমরদা?"

অমর বলিল, "সামান্য কিছু হয়ত পারি, কিন্তু ভাল ক'রে বুঝবার বয়স তোর হয়নি লীলা—সে যে বড় বড় সাধনার কথা।"

"তুমি কি ক'রে তবে বুঝলে, তুমিও ত বুড়ো হওনি!"

অমরনাথ একটু হাসিল। লীলা বুঝিল; বুড়ো না হইলেও অমর তার অপেক্ষা বয়সে অনেকখানি বড়, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সম্মানীয় গ্রাজুয়েট এবং বহু বই পুস্তক সে পড়িয়াছে।

লীলা বলিল, "তা দিও একদিন বুঝিয়ে! আজ শুধু এইটুকু বলে দাও যে, রাম যখন মিথিলায় ধনুক ভাঙ্গতে গেলেন সীতা তখন রামকে দেখে মুগ্ধ হলেন এবং মনে মনে বললেন, নারায়ণ করুন রাম যেন ধনুক ভাঙ্গতে পারেন। আচ্ছা, রাম যদি ধনুক ভাঙ্গতে না পারতেন! সীতার কি অবস্থা হ'ত—সীতার মন অপবিত্র হ'ত না? সাবিত্রী ত সত্যবানকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করলেন, সাবিত্রীর পিতা যদি বনবাসী সত্যবানের সঙ্গে মেয়ের বে' না দিতেন, যদি অন্যত্র সাবিত্রীর বে' হ'ত, তবে কি সাবিত্রীকে প্রকৃত সতী বলা যেত?"

অমর চমকিয়া উঠিল। এ কি কূট প্রশ্ন—এই প্রশ্নের মধ্যেই কি তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের পরিস্ফুট সত্যের ইঙ্গিত উঁকি মারিতেছিল! তার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা এই গ্রাম্য বালিকার চতুর প্রশ্নের সহসা কোন উত্তর দিতে না পারিয়া যেন নিঃশেষে ফুরাইয়া যাইতেছিল।

অমরকে নীরব দেখিয়া লীলা বলিয়াছিল, "বল-না অমরদা, চুপ ক'রে রইলে যে! কি বল্‌ত তোমাদের শাস্ত্র-কারেরা তাদের, কি দিত ঐ সীতা সাবিত্রীর আখ্যা—সতী না অসতী?"

(ক্রমশ)

(চিত্র)

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়

কুশভদ্রা নদীর তীরে হরিহরপুর একটি ছোট গ্রাম। গ্রামের দরিদ্র অধিবাসীরা অধিকাংশই ক্ষেতে কাজ করে; শীতের শেষে বোরো ধান আর আখের শ্যামল শোভা ক্ষেত্রগুলির শ্রী বর্দ্ধন করেছে। চন্দ্রভাগা নদীর পুণ্যস্নানের দিন অতিবাহিত হইয়া গিয়েছে। সহস্র সহস্র নরনারী হেঁটে ও গরুর গাড়ী চড়ে এই পথ দিয়ে গিয়েছে, পুণ্যদিনে স্নান করে নবারুণোদয় দেখ্‌বে বলে। তাদের সঙ্গে যারা অন্যরকম যানাদি ব্যবহার করে এসেছিল, তাদের মধ্যে সাইকেল আরোহী একটি যুবক হরিহরপুরে থেকে গিয়েছে। বড়লোকের ছেলে সে। চন্দ্রভাগায় স্নানের দিনে তার শরীর না জানি কেমন করে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, তাই সে আর যেতে পারেনি। থাক্‌তে পারত সে কোণার্কের ডাক বাংলোয়, থেকেও ছিল ত সে একদিন। কিন্তু সেখানে তার মন তৃপ্ত হতে পারেনি। তাই স্নানে দেখা এবং কোণার্ক সহযাত্রী এক নবপরিচিত পরিবারের সঙ্গে সে এখানে এসেছে।

ভোরের পাণ্ডুর আলোয় রাঘবেশ্বর দেখেছিল একটি সুন্দর মুখ। কিশোরী বালিকার সদ্যস্নাত দেহ থেকে শ্রী যেন উপ্‌চিয়ে পড়ছে, মুখে তার তন্ময় ভাব; রাঘবের লোভাতুর মন একেবারে নেচে উঠ্‌ল। সে গিয়ে যেচে পড়ে মেয়েটির বাবার সঙ্গে ভাব জমিয়ে তুল্‌ল। মেয়েটির বাবা গোবর্দ্ধন পাণিগ্রাহীর দোকান আছে তাদের গ্রামে; চল্‌তি কারবার, দু'পয়সা বেশ উপার্জ্জন হয়, অবস্থা স্বচ্ছল। ক্ষেত খামারও আছে কিন্তু তার উপর তার নির্ভর নয়। এক ছেলে আর এক মেয়ে। ছেলেটি পুরী জিলা স্কুলে পড়ে, মেয়েটিকেও সে কাছেরই একটা গ্রামের উচ্চ প্রাইমারী বালিকা স্কুলে দিয়েছিল, সেখান থেকে সে বৃত্তি পেয়ে পাশ করেছে, কটকে পড়্‌তে যেতে চায়। রাঘব বড়লোকের ছেলে, তার কথাবার্ত্তা চালচলন অন্যরকম; সে কত দেশবিদেশ ঘুরেছে, লেখাপড়াও শিখেছে অনেক, পাটনায় বড় চাকুরী করে—এই সব শুনে গোবর্দ্ধনের বিস্ময় আর গর্ব্বের সীমা নাই। লাট বেলাটের সঙ্গে যার কারবার, যে জজ ম্যাজিস্ট্রেটদের সঙ্গে বসে খানা খায়, এমন ধারা লোক এসে কি না অযাচিতভাবে, গায়ে পড়ে গোবর্দ্ধনের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে তুল্‌ল।

কোণার্কের মন্দিরে গিয়ে রাঘবেশ্বর তাদের কত ঐতিহাসিক তথ্য শোনাল। উড়িষ্যার পূর্ব্ব গৌরব, তার শ্রীসম্পদ, তার কীর্ত্তির বিবরণ শোনাল। গোবর্দ্ধনের স্ত্রী বনজা আর তার মেয়ে সুভদ্রা রান্না করলে পলাশ গাছের তলায় দুটো পাথরের উনান পেতে, আলু আর কুমড়া খণ্ড দেওয়া খিচুড়ি আর একটা ঘাঁটিয়া তরকারী। জিজ্ঞাসা করল সুভদ্রা এসে বাবাকে যে তাদের রান্না রাঘবেশ্বরবাবু খাবেন কি না। রাঘবেশ্বর বল্‌ল, "নিশ্চয়ই, আমরা যে এক জাত"।

তারপর করল রাঘবেশ্বরের শরীর খারাপ। সে ডাক বাংলোয় গেল থাক্‌বে বলে। নিরীহ ভাল মানুষ গোবর্দ্ধন বললে—"সে কি বাবু! ডাক বাংলোয় অসুস্থ শরীরে আপনি একা থাকবেন কি করে? আপনার বাড়ীতে যান; কোথায় বলুন, আমিই না হয় পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি।"

"বাড়ীতে কেই বা আমার আছে? সেখানেও যে রকম দেখাশুনা হবে, এখানেও তাই। এখানেই বরং থাকি, সমুদ্রের ঠাণ্ডা হওয়ায় শরীরটা শীগ্‌গির সেরে উঠ্‌বে।"

গোবর্দ্ধন উদ্বিগ্নচিত্ত নিয়ে বাড়ী ফিরে এল। বাবুটিকে আসার সময় বার বার করে বলে এল যে বেশী শরীর খারাপ করলে যেন তাদেরকে খবর দেওয়া হয়, তাদের বাড়ী বেশী দূর নয়। এই গোপের চেয়ে কোশ-বাট হবে; তাছাড়া গোপেও তার একটা দোকান আছে, সেখানে খবর দিলেও হবে।

পরদিন রাঘবেশ্বর নিজেই এসে হাজির। কোণার্কের নির্জ্জন পুরীতে সে হাঁপিয়ে উঠ্‌ছিল, তার দেহটা এখনও সুস্থ হ'ল না; হরিহরপুরে কি কোনও জায়গা নাই সে থাকতে পারে? হাঁ, আছে বৈ কি। গোবর্দ্ধনের ভাই যদুপতি থাকে গোপে-ই; বাড়ীর সেই খালি অংশটায় যদি বাবুর থাকতে কষ্ট না হয় ত থাকতে পারেন।

"অমনি কিন্তু থাকব না। ডাক বাংলোয় থাকতে যা খরচ হ'ত তাই দিয়ে থাক্‌ব, বুঝলে?"

গোবর্দ্ধন ভাবল, রাঘবেশ্বর ত খুব ভাল লোক। অর্থ উপার্জ্জনের এই সহজ পন্থাটিকেও সে পরিত্যাগ করতে চাইল না। স্ত্রীর পরামর্শ নিতে সে চল্‌ল। স্ত্রী বল্‌ল, "ছেলেটি ত শুনেছি আমাদেরি জাত, তাছাড়া কেউ নাইও ওর বলছে; যদি ভদ্রার কপালে থাকে ত ভাল বরও জুটে যেতে পারে।. অসুখের কয়টা দিন থাকবে তার আর ক্ষতি কি? এক দুই দিন বই ত নয়?"

এক দুই দিন এক দুই সপ্তাহে পরিণত হ'ল। রাঘবেশ্বর গোবর্দ্ধন আর তার স্ত্রীর খুব প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছে। কিন্তু পাড়ার লোকে ব্যাপারটাকে কিছু ভাল চোখে দেখ্‌ছে না; তারা গোবর্দ্ধনকে বিরক্ত করতে আরম্ভ কর্‌ল। কথাটা রাঘবেশ্বরের কানেও পৌঁছাল। সে নিজেই একদিন কথাটা পাড়্‌ল। "আপনাকে নাকি সমাজপতিরা বকাবকি করছেন, আমাকে ঘর ছেড়ে দেওয়ার জন্য? শুনে আমি খুব দুঃখিত হ'লাম। দেখুন, ভদ্রাকে আমি যে কি চোখে দেখেছি বল্‌তে পারি না; ও শাপভ্রষ্টা দেবী এই মর্ত্ত্যধামে এসেছে; আমাকে দিয়ে ওর অনিষ্ট হবে এ অসহ্য। আমি কোথায় ওকে পূজা করব,—না, আমার জন্যই আপনাদের গ্লানি, আর কলঙ্ক। আমার এ প্রাণ আজই ত্যাগ করতে ইচ্ছা করছে।" রাঘবেশ্বরের চোখে জল এল।

উঠানের ও-পাশের ঘরে কর্ম্মরতা ভদ্রার কানেও সে স্বর পৌঁছিয়াছিল। রাঘবেশ্বরের চোখের মুগ্ধ দৃষ্টি এই কয়দিনেই তার প্রাণে একটা নূতন চেতনা আন্‌ছিল; নিজের কাছেই ওর নিজেকে এক বিস্ময় ও আনন্দের বস্তু বলে মনে হচ্ছিল। "শাপভ্রষ্টা দেবী? তাই ত! দেবীর আসনে বসে ও মুগ্ধ ভক্ত পূজারী রাঘবেশ্বরকে বর দান করবে! কি দেবে?

"হ্যাঁ, তা ও দিতে পারে বৈ কি? না, না! ওর কি ই বা আছে? রাঘবেশ্বর হ'ল বড়লোকের ছেলে; আর ওরা পাড়াগেঁয়ে মানুষ। দাদাই ত কত গল্প করে—বিজলী বাতি আর হাওয়া গাড়ী আর বি এন্ আর হোটেলের আশ্চর্য্য বাড়ীর কথা। রাঘবেশ্বর হয় ত অমন একটা বাড়ীতেই থাকে। সে ত ময়ূর-ভঞ্জ, খল্লিকোটা, পারিকুড, বামড়া কত জায়গার রাজারাজড়ার কথা বলে। ভদ্রা কাজ করে আর শোনে রাঘবেশ্বর পাড়ার ছোট ছেলেমেয়েদের কত গল্প বলছে—রাজারাজড়ার কাহিনী, ছৌ-নাচ আর টকি বায়োস্কোপের কথা।" ভদ্রা দেবী আর রাঘবেশ্বর পূজারী ভক্ত? তাও কি হয়?" ভদ্রার সমস্ত শরীর বেয়ে কি একটা পুলক শিহরণ খেলা করে যায়।

রাঘবেশ্বরের কথা শোনা যায়, "ভদ্রাকে তা'হলে কটকে পাঠিয়ে দেবেন? কেন? ওর ত পড়াশুনো অনেক হয়েছে। বলুন ত, আমাদের মধ্যে কতজন মেয়ে অত পড়াশুনো করেছে? কি দরকার অত লেখাপড়া শিখে?"

"আমার ঐ এক মেয়ে। আর দেখতেও ত ও মন্দ নয়, কাজেই ইচ্ছা আছে মাকে আমার ভাল ঘরে দিতে। লেখা-পড়া শিখলে চাই কি জজ ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা পুলিশের বড় সাহেব জামাই হতে পারে। লেখাপড়া না জানা থাকলে হাজার সুন্দরী হোক মেয়ের ত আজকাল ও রকম ভাল বর জোটে না।"

"হ্যাঁ; আমাদের জাতের মধ্যে আবার লেখাপড়া জানার অত ঝোঁক আছে না কি? মেয়েই কি এত বড় করে রেখে বিয়ে দেয় কেউ যে মেয়েকে কলেজে পড়াবে? আপনি কি ওকে পাশ-টাশ করিয়ে তবে বিয়ে দেবেন?"

"না, তা ঠিক নয়; তবে ভাল বর না জোটা পর্যন্ত ওকে পড়াব। ওর নিজেরও খুব ইচ্ছা পড়ে, একটি মাত্র মেয়ে কি না, তাই বড় আদুরে। দাদার মতই পড়বে বলে। আর আমার ছেলেরও সেই রকম ইচ্ছা। ছেলে-ছোকরা কি না বাবু!"

"ওঃ, সে বুঝি ঐ কংগ্রেসী না কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট দলের লোক। ও সব করবেন না, ও সব আমাদের ধাতে সয় না। মেয়ের বিয়ে দিয়ে ফেলুন।"

"বর কোথায় পাচ্ছি, বলুন।"

"মনে করুন, আমি যদি খুঁজে দিই। আমার সন্ধানে ভাল বর আছে। জমিদারের ছেলে, বাপ-মা কোনও অভিভাবক নেই, নিজের কর্তা সে নিজেই। তবে বয়স একটু বেশী।"

"কত বয়স হবে বাবু?"

"এই আমারই বয়সী, এই ২৮।২৯ আর কি? কিম্বা ৩০।৩২ও হ'তে পারে। ভদ্রার পক্ষে বড় বেশী বড় হবে না?"

"না, বাবু, আমাদের ত অমন হয়ে থাকে। তবে ২৮ হ'লেই ভাল বাবু, তিনের ঘরে যেতে চাই না। তা আপনার বয়েস কি তিরিশ পেরিয়ে গেছে বাবু?" রাঘবেশ্বর যেন চমকিয়ে উঠল, বলল, "আমার বয়স—না—এই ২৮ হ'ল। আমার বয়সের কথা কেন জিজ্ঞাসা করলেন? আমি ত কিছু বলি নি।"

"না, আমি অনুমান করছি যে আপনি নিজের কথাই বলছেন। তাই কি নয়?"

রাঘবেশ্বর মাথা চুলকিয়ে বলল, "আপনারা যদি আমার হাতে মেয়ে দেন ত আমি নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করব। কিন্তু আমাকে কি আপনাদের পছন্দ হবে?"

রাঘবেশ্বরের সঙ্গে ভদ্রার বিয়ে ঠিক! রাঘবেশ্বর লুকিয়ে ভদ্রাকে প্রেমপত্র দিয়েছে। লেখাপড়া জানা লোকেরা ওরকম চিঠিপত্র দেয়ই। বিয়ে ঠিক হয়ে গেলে মেলামেশায় বাধা থাকে না। ভদ্রার কাছে সে এক সুখস্বপ্ন, যার মাদকতা ওর মনে আনে রাঘবেশ্বরের প্রতি স্বামীজ্ঞানে প্রেম ও পূজা নিবেদন।

লোকনাথের মেলা পর্যন্ত রাঘবেশ্বর ওদের ওখানে থাকবে। মেলায় ওদের নিয়ে যাবে, তারপর যাত্রা দেখে সেখান থেকেই বিদায় নেবে। পরে দোলপূর্ণিমার আগে শুভদিন দেখে বিয়ে হবে। তখন ভদ্রার দাদা ছুটিতে বাড়ী আসবে। লোকনাথের মেলায় ভদ্রার দাদা জগমোহনের সঙ্গেও আলাপ পরিচয় হবে।

মেলার দিন লোকনাথে সারাদিন পূজা দিয়ে, জিনিষ কিনে আমোদেই দিন কাটল। সেবাদলের ক্যাম্পে আছে জগমোহন, তাদের ওখানে ওরা কিছুক্ষণ বসেছিল। তবে জগমোহনরা আজ বড় ব্যস্ত। রাঘবেশ্বরই খুব আদর যত্ন করে বনজা দেবীকে সব দেখিয়ে নিয়ে বেড়াল। সন্ধ্যার পর আসরে গিয়ে বসা হ'ল। পালা যখন জমজমাট, বনজা দেবী আর গোবর্দ্ধন তন্ময় হয়ে শুনছেন, তখন রাঘবেশ্বর ভদ্রাকে জানাল যে জগমোহন তাকে ডাকছে কি জানি দরকার আছে। ভদ্রা রাঘবেশ্বরের সঙ্গে এগিয়ে এল। ভিড়ের মধ্যে রাঘবেশ্বর ভদ্রাকে বলল, "জগমোহনের দেহ ভাল নাই, তাই সে ক্যাম্প থেকে স্থানান্তরে গিয়েছে, গাড়ী চড়ে যেতে হবে; আমি গাড়ী ঠিক করি।" ভদ্রা ব্যস্ত হয়ে বলল, "মা বাবাকে ডাক-বেন না? তাঁদেরও ত যাওয়া উচিত?" "না না তাঁদের ব্যস্ত করে লাভ কি? এমন কিছু বেশী হয় নি। ও তোমাকে একটু দেখতে চাচ্ছে।"

ভদ্রা কেঁদে ফেলল। রাঘবেশ্বর গাঢ়স্বরে বলল, "তুমি কাঁদছ ভদ্রা, আমাকে তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না? তবে, চল মা-বাবাকে ডেকে আনি। আমার যেমন দুরদৃষ্ট; আজ বাদে কাল যে স্ত্রী হবে—

"ছি না। আমি বিশ্বাস করি বৈ কি! আপনাকে বিশ্বাস করবো না ত কাকে করবো?"

ইহার পর সরলা মুগ্ধা ভদ্রাকে নিয়ে রাঘবেশ্বরের ডাক-বাংলোয় উঠতে বেগ পেতে হ'ল না। রাত্রে ভদ্রা কেঁদেই আকুল।—"আপনি এ কি করলেন? জানেন না কি আমার এ কত বড় কলঙ্কের কথা হবে? বাবা মা মুখ দেখাবেন কি করে লোক-সমাজে?"

"ভদ্রা, আমি তোমায় ভালবাসি। তা ছাড়া আমার হাতে তোমার বাবা মা ত তোমায় সঁপেই দিয়েছেন। তাঁরা কিছু মনে করবেন না।"

এদিকে ভদ্রার বাবা-মা ভদ্রাকে ভোরের কাছা-কাছি খোঁজ ক'রে না দেখতে পেয়ে অস্থির। জগমোহনও কত খোঁজা-

খুঁজি করল, সারাদিন যায় ভদ্রার দেখা নাই, রাঘবেশ্বরেরও না।

সারা রাত নানা সান্ত্বনায়ও ভদ্রার আকুল কান্না থামল না, বরং কিছুতেই ডাক-বাংলোয় আর এক মুহূর্ত্ত থাকবে না—পণ করে বসল,—তখন রাঘবেশ্বর বা'র হ'ল গোবর্দ্ধনের খোঁজে। সন্ধ্যায় তাদের পাওয়া গেল জগবন্ধুর মন্দিরে। উস্ক-খুস্ক রাঘবেশ্বর তাদের এসে জানাল যে ভিড়ের মধ্যে পথ হারিয়ে ভদ্রা আর রাঘবেশ্বর গিয়ে পড়েছিল অজানা জায়গায়। এখন ভদ্রার সুনামের জন্যও এখনই তাকে বিয়ে করতে প্রস্তুত—ওঁরা চলুন।

সকলে মিলে বাড়ী ফিরে এলেন; পুরীতে ভদ্রার বিয়ে হয়ে গেছে। এইবার গাঁয়ে আত্মীয়-স্বজন ডেকে খাওয়ান হ'ল। ভোজের ব্যাপারে রাঘবেশ্বর অনেক পয়সা খরচ করলে। অবশ্য গোবর্দ্ধনও খরচ ক'রল বিস্তর। কাপড় পয়সাও বিতরণ হ'ল। আত্মীয়দের মুখ নৈলে যে বড়ই প্রখর।

রাঘবেশ্বর আরও কিছুদিন ওদের বাড়ীতেই রহল। দোল-পূর্ণিমার শেষে বনজা দেবী বলল, "ভদ্রা, জামাই তোকে বাড়ী নেবে না? এ যে ভাল দেখাচ্ছে না মা।"

রাঘবেশ্বর ভদ্রাকে নিয়ে চিল্কার তীরে মধুযামিনী যাপন করতে গেল। গোবর্দ্ধন জানল মেয়ে গেছে শ্বশুর বাড়ী। এদিকে রাঘবেশ্বরের খোঁজে এল লোক। অনেক দিন সে অফিসে যায় না, ছ'মাসের ছুটি নিয়েছিল বটে, কিন্তু ছুটির আগেই তাকে ফিরতে হবে।

তখন ধরা পড়ল যে রাঘবেশ্বরের জাতি গোবর্দ্ধনের জাতি নয়; তার বৌ ছেলে-পিলে আছে। ভদ্রার সঙ্গে তার বিয়ে বিয়েই নয়। সমাজ গোবর্দ্ধনের উপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠল। এমন সময় ভদ্রা এসে উপস্থিত—সন্তান-সম্ভাবিতা সে, মার কাছে এখন থাকতে এসেছে। গোবর্দ্ধন তখন বাড়ীতে ছিল না। বনজা তাকে দেখেই বুক মাথা চাপড়িয়ে যে কান্না সুরু করলেন, ভদ্রা ত স্তম্ভিত। তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল; রাঘবেশ্বরের দিকে ফিরে প্রশ্ন করতে গিয়ে দেখে রাঘবেশ্বর পালাচ্ছে। ভদ্রার মাথা ঘুরে উঠল, মায়ের পায়ের কাছে সে লুটিয়ে পড়ল।

অচেতন ভদ্রাকে জড়িয়ে ধরে মায়ের কান্না আর থামে না। গোবর্দ্ধন বাড়ী ফিরে এসে সব দেখে শুনে বলল—"চল, ভদ্রাকে নিয়ে আমরা অন্য জায়গায় চলে যাই। ওর কি দোষ?'

ভদ্রা রাঘবেশ্বরকে চিঠি লিখল, "তুমি সব জেনে শুনে আমার এ সর্ব্বনাশ করলে কেন? এই কি তোমার ভালবাসা?"

রাঘবেশ্বর উত্তর লিখল, "তোমায় ভালবাসি—এটা যদি অপরাধ হয়ে থাকে, তা হ'লে আর আমি কি বলবো! আমায়ও যে একদিন অন্তত তুমি ভালবাসতে তারই স্মৃতি সম্বল করে বাকি জীবনটুকু কাটাতে পারবে না? আমি ত শুধু স্মৃতি নিয়েই কাটাবো। দয়াপরবশ হয়ে আমি তোমায় বিয়ে করতেও যদি পারতাম, তাই বা করি কি করে, আমার সরলা, বিশ্বপরায়ণা, একান্ত নির্ভরশীলা পত্নীর মুখ ত চাইতে হবে—আর আমার সন্তানরা!"

ভদ্রার মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল। এই লোকের কথায় ভুলে সে নিজেকে দেবীর মহিমায় মহিমান্বিত মনে করেছিল? রাঘবেশ্বরকে চেপে ধরাতে সে অস্বীকার করল সব—সে বলল, শিবরাত্রির রাত্রে ভদ্রা কোথায় গিয়েছিল কে জানে? সে ওকে বিয়ে করেনি মোটেই। গ্রামে আশ্রয় পেয়েছিল বলে খাইয়েছিল একদিন। গ্রামেরও কোন কোন মাতব্বর সেই একই সাক্ষ্য দিলেন।

গোবর্দ্ধন জাতিচ্যুত হ'ল। সমাজপতিরা দীর্ঘ শিখা নেড়ে বললেন, "লেখাপড়া শেখালেই মেয়েরা এরকম হয়।" পিতৃপরিচয় জানা সত্ত্বেও ভদ্রার নিষ্পাপ শিশু পতিত বলে পরিচিত হ'ল। সমাজ সগৌরবে মাথা উঁচু করে রইল—রাঘবেশ্বরের পয়সার জোরে এবং পুরুষ হয়ে জন্মানর সৌভাগ্যের দরুন তার সমাজে স্থান সমান উঁচুই রইল।

পলায়ন

শ্রী বঙ্কুপদ ভট্টাচার্য বি-এ

আর তো বাসনা নাহি;—
পথের প্রান্তে রাখিনু আমার বোঝা,
এ বারের মত শেষ ক'রে দিনু খোঁজা,
অদেখা পুরীতে গোপন করিতে চাহি
যা কিছু আমার ছিল হৃদয়ের ধন
আঁখির অতীত সঙ্গী অনুক্ষণ।
কল-কোলাহলে মুখর নগরী হ'তে
আসিবে আবার নব-জীবনের পালা,
দুলায়ে কণ্ঠে বন-মল্লিকা মালা
মুক্ত হৃদয় বিচারিব পথে পথে॥

গত জীবনের কথা
বিলুপ্ত হবে বিস্মৃতি অন্তরালে,
জ্বলিবে আমার নব রাজটীকা ভালে
মুছায়ে সকল অতীত অশ্রু-ব্যথা।
সন্ধ্যা নামিবে নির্জ্জন নদীতীরে,
আকাশের বুকে ফুটিয়া উঠিবে ধীরে
অচেনা গ্রহের অস্ফুট কালদল
বনাঙ্গনার চারু চরণ ধ্বনি
তারি সাথে মিলি নূপুরের রণরণি,
জাগায়ে তুলিবে আঁখি প্রেম চঞ্চল॥

পোপ নির্ব্বাচনের বিচিত্র অনুষ্ঠান

গত ১০ই ফেব্রুয়ারী পোপ একাদশ পায়াস ৮১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। গত ২রা মার্চ্চ ইতালীয় কার্ডিনাল পার্সেল্লি নূতন পোপ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। নব পোপ এখন দ্বাদশ পায়াস নামে অভিহিত হইবেন। দ্বাদশ পায়াস্ পোপ-পরম্পরার ২৬২তম পোপ।

পোপ একাদশ পায়াস

এককালে খৃষ্টধর্ম্মজগতে পোপের অপ্রতিহত প্রভাব ছিল। তখন রোমান ক্যাথলিক চার্চ্চের একাধিপত্য। খৃষ্টানদের উপর রোমান ক্যাথলিক চার্চ্চের এই অখণ্ড প্রতিপত্তি প্রথম ব্যাহত করেন ষোড়শ শতাব্দীতে মার্টিন লুথার। তাহার পূর্ব্বেও রোমান ক্যাথলিক চার্চ্চের বিরুদ্ধে নানাস্থানে বিক্ষোভ দেখা দিয়াছিল। কিন্তু ধর্ম্মবিপ্লবী লুথারই প্রথম তাহাতে ভাঙ্গন ধরাইলেন। এখন খৃষ্টানগণ নানাভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এখনও ৩৫॥ কোটি খৃষ্টান পোপের অনুশাসন মানিয়া চলেন।

পোপ নির্ব্বাচন রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টানদের এক বিরাট ব্যাপার। ইহাতে মধ্যযুগীয় অনুষ্ঠানপ্রিয়তা ও রহস্যময়তা এখনও পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান আছে। চার্চ্চের ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে পোপ নির্ব্বাচনের বিধি-বিধান নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া আসিয়া বর্ত্তমানে কি রূপ নিয়াছে আমরা সংক্ষেপে তাহাই বিবৃত করিব।

পূর্ব্ব ইতিহাস

খৃষ্টীয় যুগের প্রথম দিকে পোপ নির্ব্বাচন করিতেন প্রতিবেশী বিশপ, খৃষ্ট-যাজক সম্প্রদায় ও রোমের খৃষ্টধর্ম্ম-বিশ্বাসিগণ। পরে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী সম্রাটগণ পোপ নির্ব্বাচন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন। তাঁহারা বলেন যে, তাঁহাদের অনুমোদন না পাইলে নির্ব্বাচিত পোপের অভিষেক হইতে পারিবে না। ইহার ফলে পোপের সিংহাসন মাঝে শূন্য থাকিত এবং কারণে অকারণে সম্রাটগণ পোপের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন। ৭ম শতাব্দীতে এই কড়াকড়ি শিথিল হইয়া আসে এবং একাদশ শতাব্দীতে সম্রাটগণের প্রভাব হইতে পোপগণ একেবারে মুক্ত হন। পোপ সপ্তম গ্রেগরীই তাঁহার নির্ব্বাচন সম্বন্ধে সর্ব্বশেষ সম্রাটের অনুমোদন প্রার্থনা করেন (১০৭৩ খৃঃ)।

"মৎস্য-জীবীর অঙ্গুরীয়" ইহাতে পোপ দ্বাদশ পায়াসের নাম খোদিত হইয়াছে।

ইহার পর রাজারাজড়ারা যাহাতে পোপদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে না পারেন, তজ্জন্য পোপেরা অনেক চেষ্টা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে, এমন কি তাহার পরেও স্পেন, ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশে ক্যাথলিক নৃপতিগণ পোপ নির্ব্বাচন ব্যাপারে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের অবাঞ্ছিত কোন ব্যক্তি যাহাতে পোপ নির্ব্বাচিত না হন, তজ্জন্য তাঁহারা কারসাজির ত্রুটি করেন নাই। ১৭২১ সালে জার্ম্মাণ সম্রাটের কারসাজিতে বাদ পড়েন কার্ডিনাল পাওলুসি, ১৭৩০ সালে কার্ডিনাল ইম্পিরিয়ালির নির্ব্বাচিত না হওয়ার পিছনে ছিল স্পেনের রাজার কার-

সাজ। ১৭৫৮ সালে কার্ডিনাল ক্যাভাল-ক্রিনির, ১৮৩০ সালে সেভারোলি ও কার্ডিনাল গিউস্তিনিয়ানের নির্ব্বাচিত না হওয়ার ব্যাপারে ছিল যথাক্রমে ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া ও স্পেনের অধিপতিদের ইঙ্গিত। পোপ নির্ব্বাচনের ব্যাপারে সর্ব্বশেষ হস্তক্ষেপ করেন, অষ্ট্রিয়ার সম্রাট ফ্রান্সিস জোসেফ। কার্ডিনাল রাম্পোলার নির্ব্বাচনে তাঁহার পক্ষ হইতে আপত্তি উত্থাপিত হয়। ফলে তাঁহার পরিবর্ত্তে নির্ব্বাচিত হন কার্ডিনাল সার্টো। কার্ডিনাল সার্টো দশম পায়াস্ নাম গ্রহণ করেন। পোপ দশম পায়াস পোপ নির্ব্বাচন ব্যাপারে রাজশক্তির হস্তক্ষেপের ব্যাপার একেবারে বন্ধ করিয়া দেন। তিনি কড়াকড়িভাবে এই হুকুম জারী করেন যে, যদি কোন কার্ডিনাল তাহার গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশ সংক্রান্ত কোন প্রস্তাব 'কনক্লেভে' করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ধর্ম্ম-মন্দিরে বসিতে দেওয়া হইবে না। ইহার ফলে পোপ নির্ব্বাচন ব্যাপার রাজশক্তির প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়াছে।

পোপ নির্ব্বাচনের আইন-কানুন সর্ব্বপ্রথম সুনির্দ্দিষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করেন দ্বিতীয় নিকোলাস তাঁহার ঘোষণাপত্রে (১০৫৯ খৃঃ)। ১১৭৫ খৃষ্টাব্দে ল্যাটারান কাউন্সিলে তৃতীয় অ্যালেকজেণ্ডার পোপ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়মের প্রতিষ্ঠা করেন। এই নিয়মানুসারে (১) সমস্ত কার্ডিন্যালই পোপ নির্ব্বাচনে ভোট দিবার অধিকারী হন। কিন্তু অধস্তন যাজকগণ বা জনসাধারণ পোপ নির্ব্বাচনে ভোট দিতে পারিবেন না বলিয়া স্থির হয়। (২) দুই-তৃতীয়াংশ নির্ব্বাচকের ভোট পাইলে প্রার্থী পোপ নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন। ১২৬৮ সালে চতুর্থ ক্লিমেণ্টের মৃত্যুর পর কার্ডিনালগণ দুই বৎসরেও পোপ নির্ব্বাচন করিতে পারেন না। পরে খাদ্যাভাবের দরুণ এবং কড়াকড়িভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখার ফলে ১২৭১ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর কার্ডিনালগণ দশম গ্রেগরীকে পোপ নির্ব্বাচন করেন। এই ব্যাপারের যাহাতে পুনরাভিনয় না হয়, তজ্জন্য ১২৭৪ খৃষ্টাব্দে লিয়নসের কাউন্সিলের দ্বিতীয় অধিবেশনে পোপ দশম গ্রেগরী এই নিয়ম করেন যে, পোপের মৃত্যুর দশদিন পরে কার্ডিনালগণ পোপের যে প্রাসাদে মৃত্যু হইয়াছে, সেই প্রাসাদে সমবেত হইবেন এবং বহির্জ্জগতের সহিত সম্পর্ক শূন্য হইয়া সম্পূর্ণ আবদ্ধভাবে পোপ নির্ব্বাচনের সভা করিবেন। যদি তিন দিনের মধ্যে তাঁহারা কোন সিদ্ধান্তে না পৌঁছাইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের রসদ কমাইয়া দেওয়া হইবে। পাঁচদিন পরে তাঁহারা খাদ্যের জন্য রুটি ও সামান্য মদ্য-মিশ্রিত জল মাত্র পাইবেন।

পোপ দ্বাদশ পায়াস
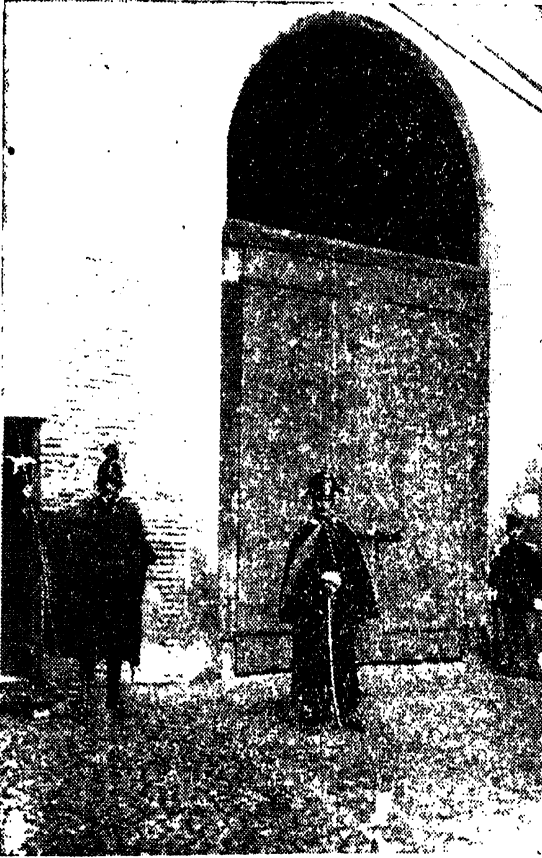
কনক্লেভের সময় তালাবন্ধ দরজার সম্মুখে কড়া পাহারার ব্যবস্থা

এইরূপে কার্ডিনালদের গুপ্ত কক্ষে গুপ্তসভায় পোপ নির্ব্বাচনের প্রথার প্রবর্ত্তন হয়।

পোপের নির্ব্বাচকগণ পূর্ব্বেও স্বেচ্ছায় গুপ্তকক্ষে সমবেত হইতেন। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীতে এই প্রথা বাধ্যতামূলক হয়। পোপ নির্ব্বাচনের জন্য নির্ব্বাচকদের এইরূপ বাহিরের সহিত সংস্রবশূন্য হইয়া অবস্থানের রীতিকে ইংরেজীতে conclave বলে। ল্যাটিন cum শব্দের অর্থ 'দ্বারা' এবং clavis শব্দের অর্থ চাবি। কাজেই conclave-এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ চাবি দ্বারা বন্ধ কক্ষ বা কক্ষসমূহ। ১৫৬২ খৃষ্টাব্দে চতুর্থ পল 'কনক্লেভ' সম্পর্কিত আইনের আরও কিছু সংস্কার করেন। এই আদেশপত্রে কার্ডিন্যালগণও সকলে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। ইহার পর ১৬২১ খৃষ্টাব্দের ১৫ই নবেম্বর পঞ্চদশ

গ্রেগরী ভোট দেওয়ার প্রণালী, ব্যালট পেপার, ভোট গণনা করা, পরীক্ষা করা প্রভৃতি নির্ব্বাচনের সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাপার ও প্রত্যেক কার্ডিন্যালকে নির্ব্বাচন সম্পর্কে যে শপথ গ্রহণ করিতে হয়, তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। শপথের মর্ম্ম এই যে, যাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত মনে করিবেন, তাঁহাকেই কেবল তিনি নির্ব্বাচিত করিবেন। ১৬২২ খৃষ্টাব্দের ১২ই মার্চ্চ পঞ্চদশ গ্রেগরী দ্বিতীয় এক আদেশপত্রে পোপ নির্ব্বাচনের বিধিসমূহের আরও সংস্কার সাধন করেন। এই সংশোধিত বিধিগুলি সেক্রেড কলেজ পোপের পরামর্শদাতা ও সহকারীদের লইয়া গঠিত সঙ্ঘ। সেক্রেড কলেজের সভ্য বা কার্ডিন্যালগণই পোপ নির্ব্বাচন করেন। ইহাতে অনধিক ৭০ জন সভ্য থাকিতে পারেন—ছয় জন কার্ডিন্যাল বিশপ, ৫০ জন কার্ডিন্যাল প্রিষ্ট, ১৪ জন কার্ডিন্যাল ডীকন। পোপ একাদশ পায়াসের মৃত্যুকালে সেক্রেড কলেজের সভ্য সংখ্যা ছিল ৬২ জন। তন্মধ্যে ৩৫ জন ছিলেন ইতালীয় এবং ২৭ জন অন্যান্য দেশের। ২৭ জনের মধ্যে ছয় জন ফরাসী, চার জন জার্ম্মাণ, তিন জন স্পেনীয় কার্ডিন্যাল। পোল্যাণ্ড, পোপের শয্যাপার্শ্বে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পোপের মুখের আচ্ছাদন খুলিয়া ফেলেন এবং রূপার একটি ছোট হাতুড়ি দিয়া তাঁহার কপালে তিনবার আঘাত করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষাকালীন নাম —এ্যামব্রয়েস ড্যামিয়েন, এ্যাচিলি (Ambroise, Damien, Achille) বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে তিনবার ডাকেন। এইরূপে পোপের মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়া তিনি ঐ গৃহে যাঁহারা উপস্থিত থাকেন, তাঁহাদের নিকট ঘোষণা করেন,—'পোপের সত্যই মৃত্যু হইয়াছে।'
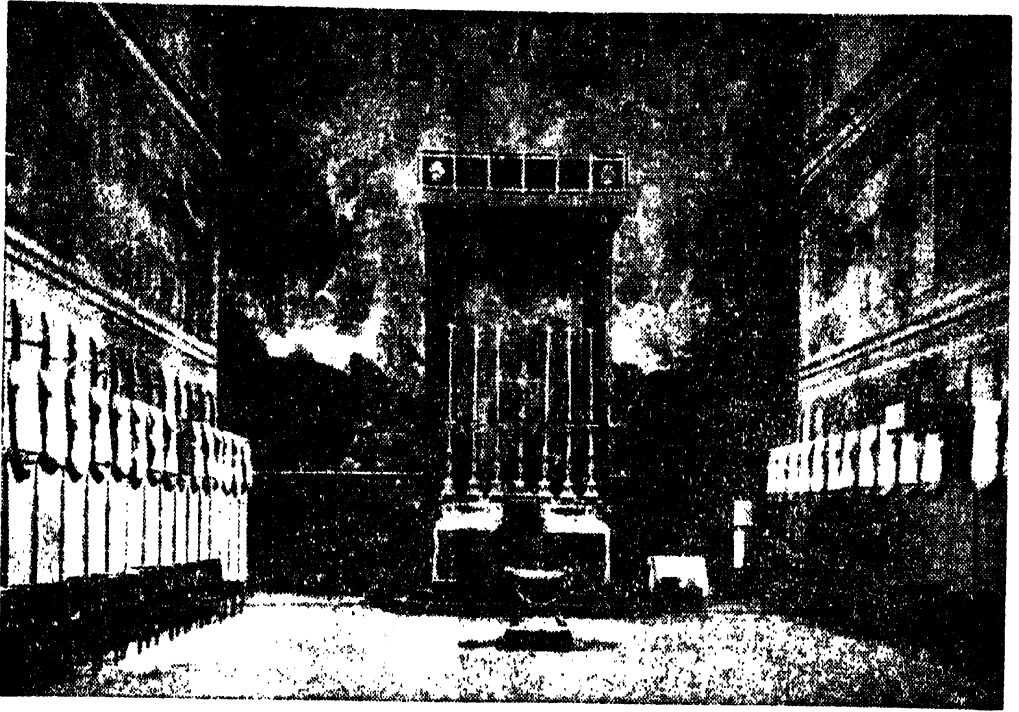
সিস্টাইন চ্যাপেলের অভ্যন্তর। যে সমস্ত সেলে বসিয়া কার্ডিনালগণ ব্যালট-পেপার লেখেন তাহা উভয়পার্শ্বে দেখা যাইতেছে

আজ পর্য্যন্তও অপরিবর্ত্তিতভাবে পোপ নির্ব্বাচন ব্যাপারে প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে। পোপ দশম পায়াস ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ২৫শে ডিসেম্বর পূর্ব্ববর্ত্তী আইন-কানুনসমূহ একত্র করিয়া এক নূতন আদেশপত্র প্রকাশ করেন।

বিশেষভাবে পোপ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে পোপের মৃত্যুতে যে সমস্ত অনুষ্ঠানাদি প্রতিপালিত হয়, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। ইহা হইতে পোপের মৃত্যুতে সাধারণতঃ কিরূপে অনুষ্ঠান করা হয় তাহার আভাস পাওয়া যাইবে

পোপের মৃত্যু হইলে তাঁহার ক্ষমতা ও দায়িত্ব সেক্রেড কলেজের উপর বর্ত্তায়। চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গারী, বেলজিয়াম, পর্ত্তুগাল, ইংলণ্ড ও আয়ারের একজন করিয়া কার্ডিন্যাল ছিলেন। আর একজন কার্ডিন্যাল ছিলেন, সিরিয়ার। এসিয়াখণ্ডের তিনিই একমাত্র কার্ডিন্যাল। তিনি এ্যান্টিওকের পেট্রিয়ার্ক। তাহা ছাড়া উত্তর আমেরিকার চার জন ও দক্ষিণ আমেরিকার দুইজন কার্ডিনাল ছিলেন।

যাহা হউক, পোপের চিকিৎসক প্রফেসার মিলান পোপের মৃত্যু হইয়াছে বলিলে সেক্রেড কলেজের অধ্যক্ষ কার্ডিনাল পার্সেলি পরম্পরাগত প্রথা অনুসারে তাঁহার সত্যই মৃত্যু হইয়াছে কিনা, তাহা পরীক্ষা করেন। তিনি

অতঃপর অনুতাপসূচক প্রার্থনা করা হয়। প্রার্থনা শেষ হইলে কার্ডিনাল পার্সেলি পোপের অঙ্গুলী হইতে "মৎস্যজীবীর অঙ্গুরীয়" Fisherman's Ring) খুলিয়া লন। এই অঙ্গুরীয়টিই পোপের ক্ষমতার প্রধান প্রতীক। সেণ্ট পিটার একটি নৌকাতে চড়িয়া জল হইতে জাল টানিয়া তুলিতেছেন, অঙ্গুরীয়তে এই চিত্র অঙ্কিত থাকে। সেইজন্যই ইহার নাম 'Fisherman's Ring' হইয়াছে। এই অঙ্গুরীয়টি ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। (নূতন পোপের জন্য আবার একটা নূতন অঙ্গুরীয় তৈয়ারী করা হয়। ঐ অঙ্গুরীয়ে নূতন পোপের নাম খোদাই করার

স্থানটি খালি থাকে। এই অবস্থায় উহা কনক্লেভে লইয়া যাওয়া হয়। পোপ নির্ব্বাচিত হইলে এই অঙ্গুরীয় তাঁহার অঙ্গুলীতে পরাইয়া দেওয়া
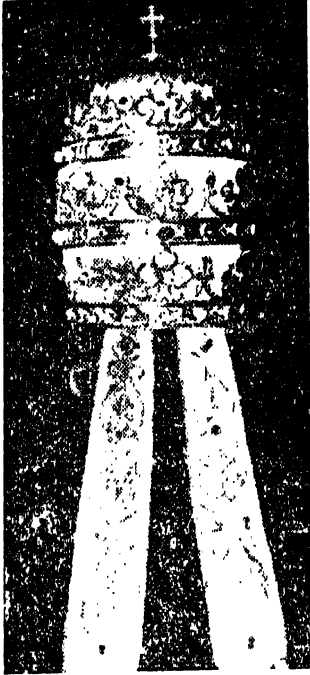
নব-পোপ এই মুকুট পরিয়াছেন

হয়। তখন তিনি কি নাম গ্রহণ করিবেন, তাহা ঘোষণা করেন। তৎপর ঐ নাম খোদাই করিবার জন্য তিনি অঙ্গুরীয়টি খুলিয়া দেন।) তৎপর, পোপের আদেশপত্রে যে শীল-মোহর অঙ্কিত করা হয় সেই শীল-মোহরটি তিনি নষ্ট করিয়া ফেলেন পোপের বিচার বিভাগের কর্ম্মচারিগণের সমক্ষে (officials of Papal Chancery) কার্ডিনাল পাসেল্লি এই সমস্ত কাজ করেন। তৎপর তিনি 'সাধারণ মণ্ডলী' (general congregation) আহ্বান করেন। কার্ডিনালদের সঙ্ঘে তিন শ্রেণীর ধর্ম্মযাজক থাকেন বিশপ, প্রীষ্ট ও ডীকন। এই তিন শ্রেণীর তিনজন নেতাকে লইয়া 'সাধারণ মণ্ডলী' গঠিত হয়। এই সাধারণ মণ্ডলী পোপের মৃত্যু সংবাদ ইতালীর রাজা ও ইতালীয় গবর্ণমেণ্টকে জানান এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্র পোপের প্রতিনিধিদের নিকট ঐ সংবাদ পাঠান।

এদিকে পোপের শরীর একটা সাদা পশমের পরিচ্ছদে আবৃত করা হইল, তাহার উপরে পরান হইল কার্ডিনালদের রক্তবর্ণ প্রাবরণ।

অপরাহ্ণে পোপের শব সিষ্টাইন চ্যাপেলে একটি সুসজ্জিত মঞ্চে স্থাপন করা হইল। তিন দিন পরে শবকে নূতন করিয়া পোপের পরিচ্ছদ পরাইয়া শবাধারে স্থাপন করিয়া সেণ্ট পিটার্স গির্জ্জার চ্যাপেল অব দি ব্লেসেড্ স্যাক্রামেণ্টে স্থানান্তরিত করা হইল। এই সময় ইতালীয় সৈন্যগণ পোপের দেহের পাহারায় নিযুক্ত ছিল। তখন জনসাধারণ পোপের শব দেখিবার অনুমতি পাইয়াছিল।

মৃত্যুর পঞ্চম দিবসে তাঁহার শব চ্যাপেল অব দি ব্লেসেড্ স্যাক্রামেণ্ট হইতে সাইপ্রেস, ওক ও সীসার তিনটি শবাধারে স্থাপন করা হয়। সেখান হইতে উহা লইয়া সমাধিস্থ করা হয়। এই সমাধি ব্যাপারও শোভাযাত্রাদি দ্বারা খুব আড়ম্বরপূর্ণভাবে করা হইয়া থাকে। বাহুল্য ভয়ে তাহার উল্লেখ করা হইল না।

নূতন পোপ নির্ব্বাচন

ইহার পর হয় নূতন পোপ নির্ব্বাচনের জন্য কনক্লেভের ব্যবস্থা। কনক্লেভে প্রত্যেক কার্ডিনাল একজন সেক্রেটারী ও একজন ভৃত্য লইয়া যাইতে পারেন। চিকিৎসক, পাচক ও অন্যান্য ভৃত্যাদি সহ ২৫০ হইতে ৩০০ ব্যক্তি গৃহে অবরুদ্ধ হন। কেবলমাত্র একটি প্রবেশ পথে কনক্লেভে প্রবেশ করা যায়। ঐ দ্বারটি বাহির হইতে মার্শাল ও ভিতর হইতে কার্ডিনাল ক্যামারলেঙ্গো বন্ধ করিয়া দেন এবং বাহিরে প্রহরী নিযুক্ত থাকে। চারিটি স্থান দিয়া, ভিতর ও বাহিরে কড়া পাহারায়, বাহির হইতে
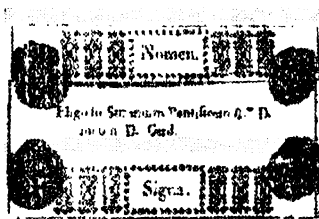
ব্যালট পেপারে লেখার পর ভাঁজ-করা ও শীলমোহর করা অবস্থা

খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য দেওয়া যায়। কনক্লেভ আরম্ভ হইলে নির্ব্বাচন শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আর দ্বার খোলা হয় না। অবশ্য যদি কোন কার্ডিনালের কনক্লেভে আসিতে বিলম্ব হইয়া থাকে তবে তাঁহার জন্য নির্দ্দেশ দ্বার খোলা হয়। বাহিরের সহিত কোন প্রকার সংস্রব রাখিতে দেওয়া হয় না। তবে খাদ্যাদি ঘূর্ণমান সংকীর্ণ দরজার সাহায্যে এবং চিঠিপত্রাদি ঘূর্ণমান পিপার সাহায্যে ভিতরে দেওয়া হয়। লটারীতে যে 'সেল' যে কার্ডিনালের জন্য স্থির হয় তাঁহাকে সেই 'সেলে' প্রবেশ করিতে হয়।

এই চুল্লীতে ব্যালট পেপার পোড়ান হয়

তৎপর একটি ঘণ্টা বাজান হয়। তখন যাহারা কনক্লেভে যোগ দিবেন তাহারা ব্যতীত সকলে বাহিরে চলিয়া যান। তৎপর তিনজন কার্ডিনাল ও অপর এক ব্যক্তি তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখেন যে, কেহ লুকাইয়া আছে কি না।

কনক্লেভ আরম্ভ হওয়ার পর বাহির হইতে কেহ যদি ভিতরের কাহাকেও কোন কথা বলিতে চাহেন তবে তাহা উচ্চৈঃস্বরে এবং ঐ অনুষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়কগণের সমক্ষে ও তাঁহাদের পরিচিত ভাষায় বলিতে হইবে। বাহির হইতে যে সমস্ত কাগজপত্র ভিতরে যাইবে বা ভিতর হইতে যে সব কাগজপত্র বাহিরে আসিবে তাহার সমস্তই খুব কড়াকড়িভাবে পরীক্ষা করিয়া দেওয়া হয়।

পোপ নির্ব্বাচন করিবার অধিকার কেবল কার্ডিনালদের, কিন্তু বিশপ, প্রীষ্ট এমনকি সাধারণ লোকদের মধ্য হইতেও পোপ নির্ব্বাচিত হইতে পারে। কিন্তু ১৫২২ খৃষ্টাব্দ হইতে ইতালীর একজন কার্ডিনালই নির্ব্বাচিত হইয়া আসিতেছেন। পোপ দশম পায়াস এই আদেশ জারী করিয়াছিলেন যে, কনক্লেভে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে যদি

কাহাকেও নির্ব্বাচন করিতে হয় তবে একজন কার্ডিনালকেই নির্ব্বাচিত করিতে হইবে।

সিস্টাইন চ্যাপেলে ভোট গৃহীত হয়। দুই তৃতীয়াংশ ভোট না পাইলে কেহ নির্ব্বাচিত হন না। কিন্তু এই ভোট সংখ্যা নিজের ভোট সহ হইলে হইবে না। কার্ডিনালদের জন্য সিংহাসন নির্ম্মিত হয় এবং প্রত্যেক কার্ডিনালের সিংহাসনের উপরই চাঁদোয়া থাকে।' ইহাতে ইহাই সূচনা করে যে, পোপের অভাবে চার্চ্চ পরিচালনার ভার কার্ডিনালদের হস্তেই আছে। পোপ নির্ব্বাচিত হইলে অন্যান্য সকলের চাঁদোয়া নামাইয়া দেওয়া হয়।

ভোট ব্যালট-পেপারে দিতে হয়। ব্যালট-পেপারের তিনটি অংশ। এক

ব্যালট পেপারের বহির্ভাগ ভাঁজ-না-করা অবস্থা
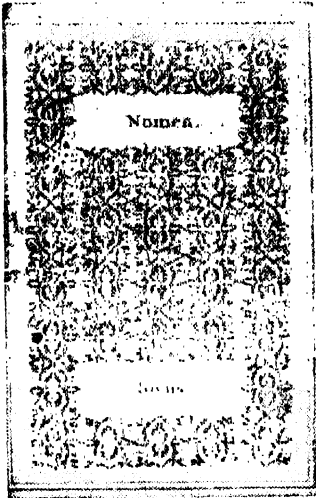
লিখিতে হয় যে, "আমি.....কে পোপ অংশে ভোটদাতা তাঁহার নিজের নাম লিখেন। মধ্যের অংশে ল্যাটিন ভাষায় নির্ব্বাচিত করিতেছি।' শেষাংশে ভোটদাতা যাহাতে নিজের ব্যালট-পেপার চিনিতে পারেন, তজ্জন্য একটি সাংকেতিক চিহ্ন দেন। মধ্যের অংশ ব্যতীত অপর দুইটি অংশ তিনি ভাঁজ করিয়া শীলমোহর করেন। কাজেই এ অংশ ব্যতীত উপর দুইটি অংশের লেখা দেখা যায় না। ধর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যবহৃত পানপাত্র ব্যালট বাক্সের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। প্রত্যেক কার্ডিনাল পালাক্রমে বেদীর নিকটে উপস্থিত হইয়া হাঁটু গাড়িয়া বসেন, প্রার্থনা করেন এবং শপথ করেন—"আমি আমার ভবিষ্যৎ বিচার কর্ত্তা যীশু খৃষ্টকে সাক্ষী রাখিয়া ভগবানের নির্দ্দেশ অনুসারে যাঁহাকে নির্ব্বাচিত করা উচিত বলিয়া মনে করি তাঁহাকেই নির্ব্বাচিত করিতেছি।" তৎপর তিনি উল্লিখিত পানপাত্রে ব্যালট-পেপার রাখেন। যদি কোন কার্ডিনাল অসুস্থতাবশতঃ চ্যাপেলে আসিতে না পারেন তাহা হইলে তিনজন কার্ডিনাল গিয়া একটি বাক্সে করিয়া তাঁহার ব্যালট-পেপার লইয়া আসেন।

ভোট দেওয়া শেষ হইলে উক্ত পানপাত্রটি একটি টেবিলের উপর আনিয়া আর একটি পানপাত্রের মধ্যে ঢালা হয়। তৎপর ব্যালট-পেপারগুলি গণনা করা হয়। যদি উপস্থিত কার্ডিনালের সংখ্যা ও ব্যালট-পেপারের সংখ্যা সমান না হয় তাহা হইলে ঐগুলি পুড়িয়া ফেলিয়া পুনরায় নির্ব্বাচন করা হয়। বেদীর সম্মুখে তিনজন পরীক্ষক একটি টেবিলে বসেন। প্রথম একজন একটি করিয়া ব্যালট পেপার লইয়া শীলমোহর না খুলিয়া শুধু যাঁহাকে ভোট দেওয়া হইয়াছে তাঁহার নাম দেখেন। তৎপর তিনি উহা পরীক্ষার জন্য দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট দেন। তাহার পর তৃতীয় ব্যক্তি যাঁহাকে ভোট দেওয়া হইয়াছে তাঁহার নাম উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করেন। এইরূপে যদি দেখা যায় যে, একজন প্রার্থী দুই তৃতীয়াংশ ভোট পাইয়াছেন তাহা হইলে ব্যালট-পেপার খুলিয়া দেখা হয় যে, উহার মধ্যে উক্ত কার্ডিনালের নিজের ব্যালট-পেপার আছে কি না। তাহা থাকিলে নির্ব্বাচন নাকচ হইয়া পুনরায় ভোট গৃহীত হয়। বেদীর নিকটে একটি ক্ষুদ্র চুল্লীতে প্রত্যেক বারই ব্যালট-পেপারগুলি পোড়া হয়। সিস্টাইন চ্যাপেলের চিমনী দিয়া যে রঙের ধূম বাহির হয় তাহা দেখিয়াই বাহিরের সকলে বুঝিতে পারে যে পোপ নির্ব্বাচন হইয়াছে কি না। যদি ভোট গণনায় কোন স্থির সিদ্ধান্ত না হয় তবে ব্যালট-পেপারগুলির সহিত ভিজা খড় পোড়ান হয়। তাহাতে চিমনী দিয়া কাল ধূম নির্গত হয়। কিন্তু পোপ নির্ব্বাচন হইয়া গেলে ব্যালট-পেপারের সহিত শুষ্ক খড় পোড়ান হয়। তাহাতে সাদা ধূম নির্গত হয়।

যেমন কার্ডিনাল দুই তৃতীয়াংশ ভোট পাইলে কার্ডিনাল ডীন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, এই নির্ব্বাচনে তাঁহার সম্মতি আছে কিনা এবং তিনি কি নাম গ্রহণ করিতে চাহেন। তখন দ্বার খুলিয়া দেওয়া হয় এবং পোপের উত্তর শুনিবার জন্য অনুষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়কগণ ঐ স্থানে প্রবেশ করেন। দ্বাদশ জনের সময় (৯৫৫-৬৪ খৃঃ) হইতে প্রত্যেক পোপই নূতন নাম গ্রহণ করেন।

নব নির্ব্বাচিত পোপ নির্ব্বাচনে তাঁহার সম্মতি জ্ঞাপন করিলে পোপ ব্যতীত অপর সকল কার্ডিনালের চাঁদোয়া নামাইয়া দেওয়া হয়, এবং পোপকে একটি ঘরে নিয়া তাঁহাকে পোপের পরিচ্ছদে ভূষিত করা হয়। তৎপর তিনি সিংহাসনে উপবেশন করেন। তখন অন্যান্য কার্ডিনালগণ নব পোপকে তাঁহাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। পোপ তখন আর একজন কার্ডিনাল ক্যামারলেঙ্গো নিযুক্ত করেন। তিনি পোপের হাতে "মৎস্যজীবীদের অঙ্গুরীয়" পরাইয়া দেন।

এদিকে ধূম দেখিয়া পোপ নির্ব্বাচন হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া বাহিরে বহু লোক আসিয়া তাঁহার নাম জানিতে, তাঁহাকে দেখিতে ও তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে জমায়েৎ হয়। তখন সেণ্ট
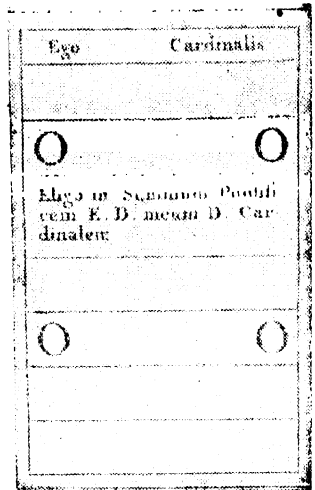
ব্যালট পেপারের ভিতরের অংশ

পিটার্স গির্জ্জায় প্রবেশ পথের উচ্চ অলিন্দে কার্ডিনাল ক্যামারলেঙ্গো উপস্থিত হন। তিনি জনতাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন,—"আমি তোমাদের আনন্দের সংবাদ জানাইতেছি। আমাদের আবার একজন পোপ (নির্ব্বাচিত) হইয়াছেন।" তারপর পোপের নাম ঘোষণা করা হয়।

নির্ব্বাচনের কয়েক দিন পরে অভিষেক হয়। এই দিন কার্ডিনাল ডীকন পোপের মস্তকে ত্রি-মুকুট পরাইয়া দেন।

এ পর্য্যন্ত ২০৯ জন ইতালীয়, ১৬ জন ফরাসী, ৯ জন গ্রীক, ৭ জন জার্ম্মাণ পোপ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাহা ছাড়া এশিয়ার, আফ্রিকা ও স্পেনের ৩জন করিয়া, ডালমাসিয়ার ২ জন এবং প্যালেষ্টাইন, থ্রেস্, হল্যাণ্ড, পর্তুগাল ক্যাণ্ডিয়া, ও ইংলণ্ডের একজন করিয়া পোপ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। নব নির্ব্বাচিত পোপও ইতালীয়।

অবিশ্বাসী

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

পরদিন বেলা দশটায় মেসেনায় গাড়ী বদল করিয়া মাণিক রাজকোটগামী গাড়ীতে চাপিল। প্রভাতে রাজকোটে গাড়ী বদল করিয়া জামনগর-দ্বারকার ছোট ট্রেনে চাপিল। ট্রেন দিনে মাত্র একবার চলে। যাত্রীর ভিড় হইয়াছে অসম্ভব। দারুণ গ্রীষ্মে চারিদিক উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। যাত্রীরা ঠাসাঠাসি বসিয়া পরমানন্দে চীৎকার করিতেছে,

'জয়—রণছোড়্‌জী কি জয়।'

তাহারা গৃহের আরাম ছাড়িয়া দেবদর্শনে বাহির হইয়াছে; জানে, এ অসহ্য কষ্টে যদি মৃত্যুবরণও করিতে হয় ত পরলোকে স্বর্গেরই কোন প্রান্তে তাহাদের চিরস্থায়ী আসনের বন্দোবস্ত হইবে। ধর্ম্মের জন্য যে কোন লাঞ্ছনা বরণ করিয়া লইতে তাহারা পরাঙ্মুখ নহে।

অপরাহ্ণে গাড়ী দ্বারকায় আসিয়া শেষ শ্রান্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিল। যাত্রীদল সহর্ষে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

পাণ্ডা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি জাত, বাবু?"

মাণিক জাতি বলিলে সে বলিল, "তাহ'লে আসুন আমার ঘরে।"

মাণিক বলিল, "তোমাদের এখানে যাত্রী নিয়ে কাড়াকাড়ি নেই কেন, ঠাকুর?"

পাণ্ডা কহিল, "এখানে জাতি হিসাবে যাত্রী বিভাগ হয়। যাঁরা ব্রাহ্মণ, তাঁরা আমাদের যাত্রী। অন্যান্য জাতের অন্যান্য পাণ্ডা আছে।"

মাণিক আনন্দিত হইয়া বলিল, "দিন দুই আগে তোমাদের এখানে কোন বুড়ো ভদ্রলোক আর তাঁর সঙ্গে—"

পাণ্ডা বলিল, "হাঁ বাবু, তাঁরা আজ দুদিন হ'ল এসেছেন। বাবুর নাম সুরেনবাবু; সঙ্গে মায়ী লোক।"

মাণিক বলিল, "ওঁদের যেখানে বাসা দিয়েছ আমাকেও সেইখানে নিয়ে চল।"

পাণ্ডা বলিল, "বাবু, তাঁরা ধর্ম্মশালায় উঠেছেন। চলুন আপনাকেও সেইখানে নিয়ে যাই। কিন্তু আজ ত বাবুর দেখা পাবেন না।"

"—কেন?"

"—বাবু বেটনাথজী দর্শনে গেছেন। বলে গেছেন—সেখানে দু-একদিন দেরী হ'তে পারে।"

মাণিক জিজ্ঞাসা করিল, "বেটনাথ কোথায়? এখন যাওয়া যায় না?"

পাণ্ডা বলিল, "না বাবু, সকালে একবার মাত্র গাড়ী ছাড়ে। ওখাপোর্ট ষ্টেশনে নেমে সমুদ্র পার হ'য়ে দ্বীপে যেতে হয়। মুসলমানের অত্যাচারের ভয়ে পাণ্ডারা ঠাকুরকে নিয়ে ঐখানে লুকিয়েছিলেন। তাই ওঁর নাম বেটনাথ। বেট্ মানে দ্বীপ।"

মাণিক ব্যাকুলকণ্ঠে বলিল, "কিন্তু তাঁদের সঙ্গে আমার যে একবার দেখা ক'রতেই হবে, পাণ্ডাজী?"

পাণ্ডা বলিল, "দেখা হবে বৈকি বাবু। ধর্ম্মশালায় তালাবন্ধ তাঁদের জিনিষপত্র আছে। তাঁরা ব'লেছেন, এখানে কিছুদিন থাকবেন। দ্বারকায় এসে তাঁরা খুব খুশী হ'য়েছেন।"

মাণিক আশ্বস্ত হইয়া বলিল, "বেশ, গাড়ী ডাক।"

চারিধারে ফাঁকা মাঠ। নোনা জমি বলিয়া আবাদ বিশেষ হয় না। মাঠের বুকে এখানে ওখানে বৃক্ষ সকল অবনত শিরে কাহাকে যেন প্রণতি জানাইতেছে।

পাণ্ডা বলিল, "দেখুন বাবু, ঠাকুর আমাদের কতকাল হ'ল চ'লে গেছেন, কিন্তু গাছপালারা আজও মাথা নুইয়ে তাঁকে প্রণাম ক'রছে।"

মাণিক দেখিল, সমুদ্রের দিক হইতে প্রবল বায়ু সমগ্র মাঠের উপর দিয়া অবিরাম বহিয়া যাইতেছে। সেই বায়ুবেগে বৃক্ষ সকল অবনত-শীর্ষ।

প্রাচীর ঘেরা বহু পুরাতন শহর।

অবশ্য দ্বাপরের সে দ্বারকা আর নাই। যদুকুল ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র তাহাকে গ্রাস করিয়াছে। যুগাবতারের পুণ্যস্মৃতি কাহিনী বক্ষে লইয়া তাহাঁরই কূলে জাগিয়া উঠিয়াছে—নবযুগের এই নবীন দ্বারকা।

গৃহ সৌধ দেখিলে পশ্চিমের যে কোন পুরাতন জনবহুল নগরীর কথাই মনে পড়ে।

ধর্ম্মশালার দ্বিতল কক্ষে পাণ্ডা বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিল। তখন সবেমাত্র সূর্য্য পশ্চিম দিগন্তে জল-তল শায়ী হইতেছেন। ধর্ম্মশালার বাতায়ন পথে মাণিক সূর্য্যের বসুমতীকে শেষ বিদায় অভিনন্দন দেখিবার জন্য আগ্রহভরা নয়নে চাহিয়া রহিল।

পুরীর সমুদ্রতীরে সূর্য্যাস্তের এ মধুর লীলা উপভোগ করা যায় না। ধীরে ধীরে সপ্তাশ্ববাহন সারথি সহ জলতলে নামিয়া গেলেন। রক্তবর্ণের একটা দ্যুতি তরঙ্গশীর্ষে কিছুক্ষণ ধরিয়া উজ্জ্বল হইয়া ভাসিতে লাগিল। আকাশ সে রক্তবিম্বের জ্যোতিতে পরিপ্লাবিত হইয়া গেল। মুহূর্ত্তমাত্র সে অপরূপ শোভা; পরক্ষণেই রক্তলেখা তরঙ্গে তরঙ্গে আহত হইয়া সমস্ত জল গাঢ় রক্তবর্ণে ভাসাইয়া দিয়া মিলাইয়া গেল। আকাশের জ্যোতি নিবিয়া গেল এবং ধীরে ধীরে সন্ধ্যার ধূসর যবনিকাখানি জল স্থল পরিব্যাপ্ত করিয়া নামিয়া আসিল।

হাত মুখ ধুইয়া মাণিক সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে গেল। গাঢ় অন্ধকারে জল স্থল ঢাকিয়া গিয়াছে। বালুরাশি অন্ধকারে আবছা আবছা দেখা যাইতেছে। আকাশের নীল চন্দ্রাতপ নক্ষত্রের মণি মাণিক্যে মুক্তাখচিত। পায়ের তলায় সমুদ্রের মৃদুগম্ভীর তরঙ্গ গর্জ্জন। অন্ধকারে ভগ্ন তরঙ্গের চকিত জ্যোতিরেখা ঝলকিয়া উঠিতেছে; সোঁ সোঁ করিয়া বায়ু বহিতেছে। কান পাতিয়া শুনিলে মনে হয়, মর্ম্মন্তুদ বেদনার সমুদ্র গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতেছে। ব্যথা তার কিসের, কে জানে?

মাণিকের মনে হইল, এই অনন্ত সিন্ধুর কূলে বিন্দুবৎ মানুষের জীবন একটি ক্ষুদ্র বালুকণার চেয়েও মূল্যবান নহে। উপকূলে তরঙ্গ আঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া গলায় গলায় জড়াইয়া এই যে অসংখ্য শুভ্র বালুরাশি পড়িয়া আছে, কাল সমুদ্রের কূলে কূলে মানব বালুরাশি অমনই অচৈতন্যের মত পড়িয়া আছে। তাহাদের একের সঙ্গে অপরটির গ্রন্থি হয়ত আছে, কিন্তু তরঙ্গ প্রহারে সে গ্রন্থি ত প্রতিক্ষণেই শিথিল হইয়া যাইতেছে। কামনার দুর্দ্দম আবেগে আমার বলিয়া যে রত্ন মুষ্টিবদ্ধ করিতে যাইতেছি, মুষ্টি খুলিয়া দেখি সে রত্ন অন্তর্হিত হইয়াছে, সেখানে আছে একমুঠো ভস্ম।

অদূরে একটা চিতা জ্বলিয়া উঠিল। বায়ুবেগে চিতার লোলিহান অগ্নিশিখা বক্র সর্প-জিহ্বা বাহির করিয়া সমুদ্রের পানে লেহন ইঙ্গিত জানাইতে লাগিল।

সমুদ্র পূর্ব্বের মতই ভ্রূক্ষেপহীন হইয়া আপন গম্ভীর-কণ্ঠে অভয়ের গান গাহিতে লাগিল।

হয়ত সে বলিতেছে, একটি মাত্র চিতার আগুনে আমায় ভয় দেখাইবার এই বৃথা প্রয়াস কেন? উপকূলে লক্ষ লক্ষ চিতা এমনই নিশীথ অন্ধকারে জ্বলিয়া উঠুক, আমার বিক্ষোভিত অন্তর্লীন অভয় সঙ্গীতের সুরে সুরে কণ্ঠ মিলাইয়া গর্জ্জন করুক। আর যাহার হাতে চিতা জ্বলিবে সে যেন আমার ভাষা পড়িয়া তবে তাহাতে অগ্নিসংযোগ করে, নতুবা এমনই ফুৎকারে তার সারা জীবনের শ্রম আমি নির্ব্বাণ করিয়া দিব।

চিতা নিবিয়া গেল। চারিদিক আবার অন্ধকারে ভরিয়া উঠিল। অদূরে মন্দিরে শঙ্খ ঘণ্টার মধুর ধ্বনি শ্রুত হইতেছিল। মাণিক যুক্তকর ললাটে স্পর্শ করিয়া কহিল, "হে সর্ব্ব-বন্ধনমুক্ত, তোমায় প্রণাম।"

পরদিন প্রভাতে পাণ্ডা আসিয়া কহিল, "বাবু, দেব-দর্শনে চলুন।"

সমুদ্রেরই খাঁড়ি, নাম গোমতী গঙ্গা। চারিদিকে তার পাষাণ সোপান—সোপানশীর্ষে পদচারণারত প্রহরী।

পাণ্ডা বলিল, "ঐ গুমটী ঘরে গিয়ে ১/০ আনা মাশুল দিয়ে হাতে ছাপ লাগিয়ে আসুন। তারপর, গোমতী গঙ্গায় স্নান ক'রবেন।"

মাণিক বলিল, "এক টাকা এক আনা দিতে হবে কেন?"

পাণ্ডা বলিল, "ওটা ষ্টেটের আয়, প্রত্যেককেই দিতে হয়। না দিলে গোমতী গঙ্গার জল স্পর্শ ক'রতে দেওয়া হয় না।"

মাণিক বলিল, "বটে! তোমাদের রাজরাজেশ্বর ঠাকুরের এত অভাব, তাই বুদ্ধি খাটিয়ে আয়ের এমন সুন্দর পথ বার ক'রতে হয়েছে! কিন্তু পাণ্ডাজী, ধর্ম্মপ্রাণ যাত্রী-দের এমনভাবে শোষণ ক'রে কোন্ মোক্ষপদ এই পবিত্র বারি দিতে পারে আমায় ব'লতে পারেন? না, জুলুমের দাবী পুরাতে আমার একটি পয়সাও খরচ ক'রব না। তাতে মুক্তি যদি আমার না হয় না-ই হবে। ঐ সমুদ্রের মুক্ত জল এই বদ্ধ জলের চেয়ে ঢের ভাল।"

গোমতী গঙ্গার বুক হইতেই উন্নত সোপান উঠিয়া দ্বারকানাথের মন্দির প্রান্তে গিয়া মাথা রাখিয়াছে।

উচ্চ মন্দিরে বিশাল পীত বর্ণের পতাকা বায়ুভরে দুলিতেছে। সে পতাকা যেন উন্মুক্ত আকাশের কোলে—মুক্ত সমুদ্রের কূলে মুক্তিরই প্রতীক্।

রণছোড়্জীর রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি।

রাজত্বের আদব কায়দা চারিদিকে। দর্শনে কোন মূল্য নাই, স্পর্শনে দক্ষিণা দিতে হয়।

কৃষ্ণ প্রস্তরের অতি সুন্দর মূর্ত্তি—হীরা-মণি-মাণিক্য-খচিত।

সাম্রাজ্যবাদের মদোন্মত্ততা ধ্বংস করিবার জন্য যিনি একদা আপন বংশধরগণকে হাসিমুখে বলি দিয়াছিলেন, তাঁহার এই সুচারু বসন, মহার্ঘ্য ভূষণ সাজে না।

মাণিকের ইচ্ছা হইল, উঁহাকে মন্দিরের অন্ধকারময় গর্ভগৃহ হইতে বাহিরে আনিয়া মণি-মাণিক্যের জঞ্জাল দূরে ফেলিয়া একবার সমুদ্রের কূলে বসাইয়া প্রাণ ভরিয়া দেখে।

দ্বাপর অতীত হইয়াছে বলিয়াই কি তাহার নিয়ন্তাকে এমনই অন্ধকারময় বিস্মৃতগর্ভে রাখিয়া দিন দিন ভক্তির ভারে ভুলিয়া যাইবার প্রয়াস শোভা পায়?

সম্মুখের মন্দিরে জননী দেবকী। মুখোমুখী মা ও ছেলে।

এ দৃশ্যটি মাণিকের ভারি সুন্দর লাগিল। ধরণী মাকে সম্মুখে রাখিয়া যেমন আমরা প্রতিনিয়ত চলিতেছি। পৃথিবীতে সব চেয়ে মধুর ও পবিত্র সম্পর্ক মা ও ছেলের। প্রতি পদক্ষেপটি আমরা স্বার্থ গণিয়া করিয়া থাকি, কিন্তু মায়ের সাম্নে ছেলে আসিয়া যখন দাঁড়ায়, তখন সেই স্নেহ-সুন্দর দৃষ্টির মধ্যে স্বার্থের লেশমাত্র থাকে না। জগতে যদি কিছু নিষ্কাম ধর্ম্ম থাকে ত ছেলের প্রতি মায়ের ভালবাসা। ভগবানকে ভালবাসিয়া যে মোক্ষ পদের কামনা করা যায় তাহার চেয়েও বুঝি ইহা পবিত্র, সর্ব্ব-ক্লেদ-গ্লানি পরিশূন্য।

সমস্ত দর্শন করিয়া মাণিক বলিল, "কাল সকালেই আমি বেটনাথে যাব।"

ওখাপোর্টে রেল লাইনের শেষ হইয়াছে। ভারতবর্ষের শেষ স্থলভাগ। আরব সাগরের মৃদু মৃদু তরঙ্গাভিঘাত কচ্ছ উপসাগরের উপর দিয়া এই নির্জীব স্থলভাগের কানে কত দূর দূরান্তের জাগরণ কাহিনী ঢালিয়া দিতেছে।

মাণিকের ইচ্ছা হইল, এই বালুরাশির উপর দাঁড়াইয়া একবার চক্ষু ভরিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখে। চারিদিকের দিকচক্রবাল সীমারেখা ঘেরিয়া উদার আকাশের নীল চন্দ্রাতপখানি আস্তৃত। সম্মুখে গর্জ্জনোল্লাসে আত্মহারা মহাসমুদ্র সীমাহীন মুক্তির গান গাহিতেছে। পশ্চাতে রেল লাইনের শেষ বন্ধনরেখা জীর্ণ পরিত্যক্ত রজ্জুর মত অবহেলায় পড়িয়া আছে।

এখানে দাঁড়াইয়া কি বলিতে ইচ্ছা হয় না, আকাশ, সমুদ্র ও অসীমশূন্যের মাঝে বন্ধনমুক্ত আমি অনন্তকাল ধরিয়া ক্লান্তিশূন্য নয়নে এমনই অপলকে চাহিয়া থাকি? পশ্চাতের জীর্ণ বন্ধন টুটিয়া পড়িয়া থাকুক ওই বালু

প্রান্তরে; পথ আমার সম্মুখে—সমুদ্র তরঙ্গের মাঝে, সীমা-রেখার অপর প্রান্তে, রাত্রিহীন দিনের আলোয়, শঙ্কা দুঃখ বেদনার উপরে মুক্তির চির সুন্দর দেশে!

নৌকায় করিয়া পরপারে যাইতে হয়। এখানেও মাশুলের অত্যাচার।

মাণিকের সারা চিত্ত জ্বলিয়া উঠিল। অক্ষম অশক্ত যে কত দূর দূরান্তর হইতে কত কষ্ট বিপদ মাথায় লইয়া ছুটিয়া আসিয়াছে ভারতের এই সীমান্ত প্রদেশে দেব দর্শন লালসায়—এখানেও তাহাদের পুণ্য সঞ্চয়ের উপর রাজপ্রভুত্ব অমোঘ শাসন-দণ্ড উত্তোলন করিয়া উৎপীড়ন করিতে ছাড়িতেছে না। ছার রাজত্ব। দরিদ্রের বুকের রক্ত লইয়া যাহার পরিপুষ্টি তেমন ধর্ম্ম না থাকিলেও জগতের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না।

সুতরাং বেটনাথ দর্শন হইল না। রেণুরও কোন সন্ধান মিলিল না। এই ক্ষুদ্র দ্বীপে বাড়ী ঘর বেশী নাই—রাস্তাও অঙ্গুলির পর্ব্বে গোনা যায়। যে কোন পরিচিতকে দু-এক ঘণ্টার মধ্যে খুঁজিয়া বাহির করা কিছুমাত্র কঠিন নহে। তথাপি রেণুর দেখা মিলিল না। মাণিক অস্থির হইয়া উঠিল। তাঁহারা কোথায়?

ওখাপোর্টে আসিয়া সে আবার ট্রেনে চাপিল। সন্ধ্যা-বেলায় দ্বারকায় নামিয়া পাণ্ডাকে বলিল, "তাঁদের দেখা ত কোথাও পেলাম না।"

পাণ্ডা একখানি পত্র বাহির করিয়া কহিল, "বাবুরো ভোজরাজ্যে বেড়াতে গেছেন।"

মাণিক পত্রখানি পড়িয়া কহিল, "সে কোথায়?"

পাণ্ডা বলিল, "ওই কচ্ উপসাগরের ওপর দিয়ে গেলে নাগাৎ সন্ধ্যায় পৌঁছান যায়। বোধ হয় তাঁদের ফিরতে দু-চার দিন দেরী হবে।"

মাণিক হতাশাভরে বলিল, "যত দেরীই হোক, আমায় এখানে অপেক্ষা করতেই হবে।"

দিন তিনেক পরে।

বৈকালে গোমতী গঙ্গার ধারে মাণিক বেড়াইতেছিল। সহসা রমণীর চীৎকার ধ্বনিতে সে চমকিত হইয়া উঠিল।

তাহার পাশেই একজন বৈরাগী গোছের লোক বসিয়া সমুদ্রের পানে চাহিয়া ভজন গান গাহিতেছিল।

মাণিক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি?"

বৈরাগী বলিলেন, "একটি স্ত্রীলোক ভুলে গোমতী গঙ্গার জল ছুঁয়ে ফেলেছে ব'লে শান্ত্রীরা এসে তাকে ধরে। কিন্তু তার হাতে কোন ছাপ না থাকায় টাকার জন্য জুলুম ক'রছে। স্ত্রীলোকটি গরীব, টাকা দিতে পারবে না ব'লে কাঁদছে। ঐ দেখুন।"

মাণিক দেখিল, অদূরে এক দরিদ্র রমণীকে লইয়া জন-তিনেক প্রহরী খুব তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে। স্ত্রীলোকটি হাতজোড় করিয়া মাপ চাহিতেছে। বলিতেছে, "গরীব মানুষ টাকা কোথায় পাব? না জানিয়া এ কার্য্য করিয়াছি, কসুর মাপ করিতে হুকুম হয়।"

কিন্তু ফাঁকি দিয়া পুণ্য সঞ্চয়ের প্রথা এখানে নাই। রাজার আইন গরীব বড়লোকের সকলের জন্য!

প্রহরীরা টাকার জন্য সমানভাবেই উৎপীড়ন করিতে লাগিল। সহসা এক সময়ে রমণীর চীৎকার থামিয়া গেল।

মাণিক দেখিল কে একজন মেয়েটির প্রতি করুণা পরবশ হইয়া একটি টাকা প্রহরীদের ফেলিয়া দিলেন। প্রহরীরা দ্রুতপদে গুমটী ঘর হইতে একটা ষ্ট্যাম্প আনিয়া স্ত্রীলোকটির হাতে ছাপ মারিয়া দিয়া আইনের ধারা বজায় রাখিয়া চলিয়া গেল। স্ত্রীলোকটি কৃতজ্ঞকণ্ঠে বারম্বার তাহার ত্রাতার মঙ্গল কামনা করিতে লাগিল।

আরও খানিকটা অগ্রসর হইয়া মাণিক যাহা দেখিল, তাহাতে আনন্দে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। কোন কথা সে বলিতে পারিল না।

সুরেনবাবুর পাশে দাঁড়াইয়া রেণু বাতিঘরটার দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া কি যেন বলিতেছে।

গুমটীর আড়াল ছিল বলিয়া মাণিক এতক্ষণ তাহাদের দেখিতে পায় নাই।

ক্রমশ

গান

শ্রীমমতা ঘোষ

আজিকে আলোর নাই প্রয়োজন—
নিবায়ে দাও গো বাতি,
তিমির বসন জড়ায়ে অঙ্গে
নিকটে আসুক রাতি।
আঁখিতে আঁখিতে দেখা নাহি হবে,
অধরেতে বাণী মূক হ'য়ে রবে,—
শুনিব তোমার হৃদয়ের কথা—
রেখেছি হৃদয় পাতি।

তোমার মাঝারে হারায়ে ফেলেছি
আজি আপনার সব,
প্রাণ মন দিয়ে তোমারেই করি
অহরহ অনুভব।
কি জীবন মোর ছিল তোমা বিনা
আজিকে সেকথা ভাবিতে পারি না,
আমার জগৎ তোমারে ঘিরিয়া
খুঁজিতে পুনঃ পাই।

শৈবলিনী

অধ্যাপক শ্রীফণীভূষণ রায়

বঙ্কিমচন্দ্রের শুভ নাম উচ্চারণ না করিয়া আমাদের উপন্যাস সাহিত্যের কথা আলোচনা করিতে বসিলে প্রত্যবায় হয়, সুতরাং বঙ্কিম সাহিত্য লইয়াই কথা আরম্ভ করিতেছি। শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন,—বঙ্কিমচন্দ্র "বন্দেমাতরম্" এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের ঋষি। "বন্দেমাতরম্" মুখ্যত আমাদের জাতীয় মন্ত্র, কিন্তু এই মহামন্ত্রকে আমরা আমাদের সামাজিক মন্ত্র বলিয়াও গ্রহণ করিতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্রের নারী-চরিত্রগুলির পর্য্যালোচনা করিলে এই "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রের কথাই মনে উদিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র নারীকে মুখ্যত মাতার আদর্শে সৃষ্টি করিয়াছেন। মাতৃত্বের তপস্যাই বঙ্কিম-সাহিত্য-জগতে চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে। তবে নারীর নারীত্ব (আধুনিক কালের পরিভাষায়) ফুটাইয়া তুলিতেও যে তিনি কম কৃতিত্ব দেখান নাই, তাহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের শৈবলিনী বঙ্কিমচন্দ্রের যুগের পক্ষে অত্যাশ্চর্য্য সৃষ্টি। সে যুগে আধুনিক কালের যৌন-মনস্তত্ত্ব বহুলভাবে প্রচারিত হয় নাই, তারপর পাশ্চাত্য প্রভাবের সংস্পর্শে আসিয়া ধর্ম্ম ও বিশ্বাস জগতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন ঘটিলেও পিতা-পুত্র, ভ্রাতা-ভগ্নী, স্বামী-স্ত্রী লইয়া যে বঙ্গীয় সমাজ, তাহার ভিত্তি অসংযত এবং অসামাজিক মত-বাদের প্রচারের দরুন ধ্বসিয়া পড়ে নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগেও বাঙলা দেশে গ্রাম ছিল, গ্রামে সমাজবন্ধন দৃঢ় ছিল, সমাজ-বন্ধন দৃঢ় থাকার দরুনে চিরাগত সামাজিক প্রথা ও আদর্শ একপ্রকার অক্ষুণ্ণভাবেই বর্ত্তমান ছিল। সেই যুগের পটে শৈবলিনীর চরিত্রচিত্র অংকন করা কম সাহস এবং কুশলতার কর্ম্ম ছিল না। প্রকৃষ্টরূপে বঙ্কিমচন্দ্র সেই সাহস এবং কুশলতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

বঙ্কিম-সাহিত্য-জগতে শৈবলিনী অপরূপ—উপমারহিত। দেহকে যাহারা পণ্যরূপে মনে করে, সেই জাতীয় স্ত্রীচরিত্র রোহিণী ছাড়া বঙ্কিম-সাহিত্য-জগতে আর দ্বিতীয়টি নাই। ধর্ম্ম, সমাজ, কুল, মান—সব কিছু পরিত্যাগ করিয়া প্রেমের বেদীতে আপনাকে উৎসর্গ করিয়া জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করিবার ইচ্ছা ও প্রয়াস নবাব নন্দিনী আয়েষা ছাড়া আর কোন চরিত্রে পরিদৃষ্ট হইবে না। আয়েষা এবং রোহিণী—বঙ্কিম-সৃষ্ট নারী চরিত্রের দুইটি দিক—প্রেম এবং ভোগের সুমেরু ও কুমেরু। এই দুই গণ্ডীর মধ্যে আমরা আর সব নারী চরিত্রগুলিকে বিন্যস্ত করিতে পারি—যাহারা পুত্রের মাতা, ভ্রাতার ভগ্নী, স্বামীর স্ত্রী অর্থাৎ যাহারা প্রধানত পারিবারিক জীবন যাপন করে, ঘর ছাড়া আর কোনখানে যাহাদের কোন স্থান নাই। এই "ঘরণী", "গৃহিণী"দের দলে আমরা "দেবী চৌধুরাণী", "চঞ্চলকুমারী", "শ্রী" এমন কি "কপালকুণ্ডলা"কেও অভ্যর্থনা করিয়া বসাইব। মোগল অন্তঃপুরের বিলাসিতার বিচিত্র প্রবাহে যে সুন্দরী রাজহংসীর মত এতকাল সন্তরণ করিয়া বেড়াইয়াছে, সেই মতিবিবিও সপ্তগ্রামের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে প্রবেশ-মর্য্যাদা লাভ করিলে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করে, সুতরাং মতিবিবিও ঘরের সামগ্রী। কুন্দনন্দিনীরূপ বিষবৃক্ষটিও ঘরের আঙিনাতেই উপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু শৈবলিনী ঘরেরও নহে, বাহিরেরও নহে—শৈবলিনী হইল—দিনক্ষপামধ্যগতেব সন্ধ্যা। যে অর্থে আয়েষাকে প্রেম-ব্যাকুলা বলি, সে অর্থে শৈবলিনীকে প্রেমিকা বলা চলে না, অথচ শৈবলিনী যে প্রেমিকা নয়—প্রেমের অর্থ বোঝে না, ইহা বলিতে পারি না। যে অর্থে রোহিণীকে ভোগ-লালায়িতা বলি, সে অর্থে শৈবলিনীকে ভোগ-ব্যাকুলা বলা যায় না, অথচ শৈবলিনীর চরিত্রে যে ভোগ-লালসা নাই, তাহাই বা বলিতে পারি কৈ? বস্তুত শৈবলিনীর মত এইরূপ অপরূপ চরিত্র, অনন্যসাধারণ চরিত্র বঙ্কিম-সাহিত্য-জগতে আর দ্বিতীয়টি নাই।

কিশোর কিশোরীর ভালবাসা, গঙ্গাবক্ষে প্রতাপ-শৈবলিনীর সন্তরণ—বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রশেখরে এইরূপে কথা আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু বাল্যপ্রণয়ের উপর (কবির ভাষাতেই বলি) কাহার যেন অভিসম্পাত আছে, তাই প্রতাপ ও শৈবলিনীর প্রেম পরিণামে রমণীয়ত্ব লাভ করিল না। প্রতাপ হৃদয় নিঃশেষে সঁপিয়া দিয়া হঠাৎ আবিষ্কার করিল যে, শৈবলিনী জ্ঞাতিকন্যা, সুতরাং শৈবলিনীকে বিবাহ করিবার সুযোগ জীবনে তাহার ঘটিবে না। বিবাহ হইবে না, সুতরাং তাহারা যদি পরস্পরকে ভুলিতে পারিত তাহা হইলেই সুষ্ঠু হইত; কিন্তু প্রেম সাধারণত সুবোধ বালকের মত গতানুগতিক পন্থায় পাদচারণা করে না; তারপর সামাজিক কর্ত্তব্য এবং প্রেমের কর্ত্তব্য ঠিক এক মাপকাঠিতে বিচার করা যায় না।...... যাক্, কালক্রমে শৈবলিনী চন্দ্রশেখরের গৃহিণী হইল, কিন্তু তাহার যৌবনের মধুকুঞ্জের পুষ্পোপস্তীর্ণ বেদীতে আনন্দময় বিগ্রহের মত প্রতিষ্ঠিত রহিল...প্রতাপ। এইরূপে প্রতাপের অনুরাগিণী চন্দ্রশেখরের ঘরণী হওয়াতে কবি শৈবলিনীকে "নদীরুভয়কূলভাক্" রূপে চিত্রিত করিবার অবকাশ পাইয়াছেন এবং এই চিত্র এমন বিজ্ঞানসম্মত অথচ সৃজনকুশল হইয়াছে যে, ইহা বঙ্গসাহিত্য জগতে দুর্ল্লভ বস্তু হইয়া উঠিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। এখন আমরা শৈবলিনীর বিবাহিত জীবনের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া লই।

ভীমার জলে আগ্রীব ডুবিয়া ফষ্টরের সঙ্গে বাদানুবাদ করিয়া যেদিন গৃহে ফিরিতে শৈবলিনীর রাত্রি হইয়া গিয়াছিল সেই দিন দেরী করিয়া আসিবার কৈফিয়ৎ গায়ে পড়িয়া দিতে যাইয়া শৈবলিনী বলিয়াছিল,—

শৈ। আমি জানিতেছি, না জানি আমায় তুমি কত বকিবে।

চন্দ্র। কেন বকিব?

শৈ। আমার পুকুরঘাট হইতে আসিতে বিলম্ব হইয়াছে তাই......

স্বামী-স্ত্রীর এই কথোপকথন শুনিলে ইহাদের মধ্যে যে কোন প্রীতির সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে নাই, তাহা বলা যায় না। তবে "বালক যেমন খেলাঘরের পুতুলকে আদর করে" অধ্যয়ন-নিরত পণ্ডিত চন্দ্রশেখর তাহার রূপসী বধূকে হয়ত সেইরূপ

আদর করিত—তবুও শৈবলিনী চন্দ্রশেখরের গৃহে উপবাসী ও তৃষিত আত্মা লইয়া কাল কাটাইতেছিল, এইরূপ বলিলে অযথা-ভাষণ হইবে। সুন্দরী ঠাকুর-ঝি হইয়া বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে এবং শৈবলিনী-ত্যক্ত শূন্যগৃহে চন্দ্রশেখরের বুকে যে অশনি-সম্পাত করিয়াছিল তাহাও ইহা প্রমাণ করিবে। তবুও শৈবলিনী প্রতাপের চোখের উপর চোখ রাখিয়া বলিয়াছিল—"তুমি কি জান না, তোমারই রূপ ধ্যান করিয়া গৃহ আমার অরণ্য হইয়াছিল? তুমি কি জান না যে, তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে যদি কখনও তোমাকে পাইতে পারি, এই আশায় গৃহত্যাগিনী হইয়াছি? নহিলে ফষ্টর আমার কে?"......এই উভয় উক্তির—চন্দ্রশেখরের কাছে "আমি ভাবিতেছি, না জানি তুমি আমায় কত বকিবে" আর প্রতাপের কাছে—"যদি কখনও তোমায় পাইতে পারি"—মধ্যে আপাতত কোন সামঞ্জস্য আমরা খুঁজিয়া পাই না। প্রতাপ ও চন্দ্রশেখরের মধ্যবর্ত্তিনী শৈবলিনী যেন অন্তঃসলিলা ফল্গুধারা—বুকের বালু সরাইলে যেখানে যেখানে স্রোতস্বতীর স্বচ্ছ জল আবির্ভূত হয় সেখানে নীলাকাশের ছায়া পড়ে—শৈবলিনীর বুকে চন্দ্রশেখরের ছায়াও ঐরকম পড়ে ক্বচিৎ এবং কদাচিৎ; কিন্তু প্রতাপের সঙ্গে শৈবলিনীর একটা মনের গোপনের নিরবচ্ছিন্ন সংযোগধারা আছে, তবে এই সংযোগধারাকেও সংশয়ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়া মনস্তত্ত্বের গূঢ় এবং অপূর্ব্ব জ্ঞানের পরিচয় কবি দিয়াছেন। যেদিন গঙ্গাবক্ষে প্রতাপ ডুবিল, শৈবলিনী ডুবিতে পারিল না—শৈবলিনী মনে ভাবিল—কেন মরি! প্রতাপ আমার কে? আমরা বলিব—আয়েষা হইলে অবশ্যই ডুবিত এবং রোহিণী হইলে ডুবিবার কথাটাও তাহার মনে আসিত না। যেদিন প্রতাপ রায়ের গৃহ হইতে জনসন্ আসিয়া প্রতাপকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল, সেদিন শৈবলিনী ভাবিতে বসিল—"প্রতাপ আমার কে? আমি তাহার চক্ষে পাপিষ্ঠা......আমি কেন গৃহত্যাগ করিলাম, ম্লেচ্ছের সঙ্গে আসিলাম—কেন সুন্দরীর সঙ্গে ফিরিলাম না?" প্রতাপ-পাখীকে ধরিবার সাধ আর তাহার ছিল না; বরঞ্চ বেদগ্রামের গৃহের দৈনন্দিন শত সুখ-দুঃখের কথা ভাবিতে ভাবিতে শৈবলিনী উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিল। এই সব ভাবনার মধ্যে স্বামী চন্দ্রশেখরের কথা মনে পড়ায় সে শত বৃশ্চিক-দংশন-জ্বালা অনুভব করিতে লাগিল।......আর একদিনের কথা এখন বলিতেছি। প্রতাপকে সাহেবের বজরা হইতে উদ্ধার করিবার পর আত্মরক্ষার জন্য প্রতাপ এবং শৈবলিনীকে গঙ্গাবক্ষে ভাসিতে হইল। সেদিনও আকাশে জ্যোৎস্নার বান ডাকিয়াছিল, গঙ্গা-তরঙ্গের উপর ভাসিতে ভাসিতে শৈবলিনীর সঙ্গে প্রতাপের অনেক কথাবার্ত্তা হইল; কোন কিছুরই যখন মীমাংসা হইল না, অনন্যোপায় হইয়া প্রতাপ বলিল "কে সাধ করিয়া এ পাপ জীবনের ভার সহিতে চায়? চাঁদের আলোয় এই স্থির-গঙ্গার মাঝে যদি এ বোঝা নামাইতে পারি, তবে তার চেয়ে আর সুখ কি?" শৈবলিনীর বুকে প্রতাপের এই কথা-গুলি যে বেদনার সৃষ্টি করিল, তাহা প্রতাপকে না পাইবার বেদনা হইতে অনেক বেশী। যে শৈবলিনী একদিন প্রতাপকে ডুবিতে দেখিয়াও ডুবিতে সাহস পায় নাই, সেই শৈবলিনী মনে মনে ভাবিল—"আমি মরি, তাহাতে ক্ষতি কি? কিন্তু আমার জন্যে প্রতাপ মরিবে কেন" সুতরাং বরাভয়দাত্রী জননীর কণ্ঠে শৈবলিনী বলিল "তীরে চল"—এইরূপে অখ্যাত, অবজ্ঞাত মৃত্যুর গ্লানি হইতে প্রতাপকে রক্ষা করিয়া শৈবলিনী প্রমাণ করিল যে, প্রেম অর্থাৎ আত্মোৎসর্গের মর্য্যাদা সে জানে। তবে শৈবলিনীর মনে যে বহুমুখীনতা আছে, তাহা দেখাইতে কবি কোনখানেও কোন কিছু কার্পণ্য করেন নাই। বলিতে কি, শৈবলিনীর মনের পরিচয় রবীন্দ্রনাথের গানের ছন্দে যেন ধরা পড়িয়াছে—"সে কোন বনের হরিণ ছিল আমার মনে"......বনের হরিণের মতই শৈবলিনীর মন ক্ষণচঞ্চল, প্রাণবন্ত, সতেজ ও সবল। কাব্যে ও সাহিত্যে আমরা আর একপ্রকারের মনের পরিচয় পাই, মন যেখানে সমাহিত বুদ্ধের মত ধ্যানে বসিয়াছে—সংযত, শান্ত, সুগভীর, দ্বিপ্রহর রজনীর সুপ্তিমৌন নৈশ গাম্ভীর্য্যের মত যে মন আমাদিগকে অভিভূত করে। যে মনের মালিক বঙ্কিম-সাহিত্য-জগতে—নবাব-নন্দিনী আয়েষা। প্রেমাস্পদকে "প্রিয়ানাং প্রিয়পতিম্" বলিয়া যাহারা প্রেমের তপস্যায় বসে, বেহুলার মতন মৃতস্বামীর অস্থি আঁকড়াইয়া থাকা যাহাদের পক্ষে পরম সৌভাগ্য, সেই প্রকারের নারীচরিত্র অঙ্কিত করিতে বঙ্কিমচন্দ্র কম কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন নাই—কিন্তু শৈবলিনীর চরিত্র সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। শৈবলিনীর চরিত্রে প্রেম ও ভোগ গঙ্গা-যমুনার মত পাশাপাশি বহিয়া চলে। তাহাতে আধেক রৌদ্র, আধেক মেঘের খেলা অবাক বিস্ময়ে আমাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে হয়। সে যাই হোক্—এই প্রাণবন্ত এবং সতেজ নারীচরিত্রের অভিব্যক্তি এবং বিকাশে বঙ্কিমচন্দ্র মনস্তত্ত্বের যে গূঢ় পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অতিশয় আশ্চর্য্যজনক। আধুনিক কালের মনস্তত্ত্ব আলোচনায় আমরা একটা কথা বিশেষভাবে শিখিয়াছি—যৌন-প্রতিকূলতা অর্থাৎ অনুরাগের বস্তুর উপরেই বিরাগ সমধিক মাত্রায় প্রদর্শিত হয়। শৈবলিনী ও প্রতাপের মর্ম্মজীবনের ইতিহাসে কবি এই সত্যই ফলাইয়া তুলিয়াছেন। এই জন্য কবিকে সত্যদ্রষ্টা বলা হয়। বস্তুত গঠন-পটুত্ব হিসাবেই ধর কিংবা বিজ্ঞানসম্মত সৃষ্টিকুশলতার জনাই ধরি—শৈবলিনীর চরিত্র বঙ্গীয় সাহিত্য জগতে অনুপম—উপমা-রহিত।

এখন এই চরিত্রের মহাপরিণামের কথা অল্পকথায় বলিয়া লইতেছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—চন্দ্রশেখর এবং প্রতাপের মধ্যে শৈবলিনী "উভয়কূলভাক্" নদীর মত দাঁড়াইয়াছে পৃথিবীর সাহিত্যে আরও গুটিকতক নারীকে আমরা শৈবলিনীর মত উভয় সংকটের মধ্যে দাঁড়াইতে দেখি। ইহা-দিগের মধ্য হইতে আমরা বিশ্ববিদিত দুইটি উদাহরণ এইস্থলে উদ্ধৃত করিব—যথা হোমার কাব্যের হেলেনা এবং আর্থারীয় উপকথার রাজ্ঞী গুইনেভার.........দুই প্রতিদ্বন্দ্বী আরণ্যগজের মধ্যে করিণীর মত—প্যারিস ও মেনেলাউসের মধ্যে হেলেন এবং রাজা আর্থার ও ল্যান্সলটের মধ্যে গুইনেভার আমাদের নয়নপথের পথিক হয়। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় এই চরিত্র ত্রয়ের মধ্যে কোন কিছুর প্রভেদ নাই, কিন্তু যৎকিঞ্চিৎ অভি-নিবেশসহকারে বিচার করিয়া দেখিলে ইহাদের মধ্যে যে একটু

মূলগামী পার্থক্য রহিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারি। হোমার মেনেলাউসের পত্নীচোর প্যারিসকে কাপুরুষরূপে চিত্রিত করিয়াছেন—প্যারিস রমণী-রঞ্জক, বেশভূষায় পণ্ডিত, কিন্তু যেখানে "খড়্গে খড়্গে ভীম পরিচয় হয়" সেই যুদ্ধক্ষেত্রে প্যারিস কেমন যেন স্বভাবতঃই নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। কিন্তু রাজা আর্থারের পত্নীচোর ল্যান্সলট বীর, ভদ্র, মহাযোদ্ধা অর্থাৎ এমন সব সদ্‌গুণে বিভূষিত যাহা মানুষের হৃদয়কে স্বভাবতই আকর্ষণ করে। সুতরাং দেখি বিবাহিতা নারীর দুই-পার্শ্বে দুইজন পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দাঁড়াইলে তাহাদের একতমকে লঘু-চরিত্র, হীন-সত্ত্ব, নিষ্প্রভ না করিয়া উপায় নাই, তবে হোমারের চরিত্র-চিত্রণ-আদর্শই যে শ্রেয়স্কর পন্থা তাহা বলাই বাহুল্য, কারণ পত্নীচোরকে উজ্জ্বলচরিত্রবান করিয়া তুলিলে আমাদের স্বাভাবিক ন্যায়বোধকে, সহজাত সামাজিক বুদ্ধিকে অযথারূপে ক্ষুণ্ণ করা হয়। চন্দ্রশেখর কাব্যে কবি অপরূপভাবে এই সমস্যার সমাধান করিয়াছেন। তিনি চন্দ্রশেখর এবং প্রতাপ কাহাকেও লঘুচরিত্র করিয়া সৃজন করেন নাই। আমাদের সমাজ এই বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছে। হোমারের কিম্বা মধ্যযুগের ইউরোপীয় সমাজে "ব্রাহ্মণ" বলিয়া কোন জীব ছিল না। সুতরাং দুইজন অধিবাসীর মধ্যে এক-জনকে অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রভ চরিত্র না করিয়া স্রষ্টাদিগের উপায় ছিল না, অর্থাৎ মেনেলাউস এবং প্যারিসের, রাজা আর্থার এবং ল্যান্সলটের মধ্যে কবিদ্বয় কোন স্তর-বিভেদ খুঁজিয়া পান নাই; বঙ্কিমচন্দ্র প্রতাপ ও চন্দ্রশেখরের মধ্যে স্তর-বিভেদ খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। মসীজীবী চন্দ্রশেখরের সহিত অসিজীবী প্রতাপের বিবাদ—ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের বিবাদ—কিন্তু এই বিবাদ উভয়ের কেহই মহিমাহীন হয় নাই; পরন্তু স্ব স্ব কক্ষে জ্যোতিষ্কের মত দীপ্তপ্রভায় বিরাজমান রহিয়াছে। সাগরের জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে তুঙ্গ শৈল যেমন আপনার আকাশস্পর্শী মহিমাকে অব্যাহত রাখে, প্রতাপের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চন্দ্রশেখরও সেই মত আপনার মহিমাকে অব্যাহত রাখিতে পারিয়াছে। তারপর চন্দ্রশেখরের সহিত প্রতাপের কৃতজ্ঞতা সম্বন্ধ (প্রতাপের প্রাণরক্ষা এবং দরিদ্র প্রতাপকে রাজদ্বারে প্রতিষ্ঠিত করা) চন্দ্রশেখর-শৈবলিনীর বিবাহকে অপরূপ মহিমায় মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে......যাক, এই মহিমার পথেই কবি প্রতাপ ও শৈবলিনীর জীবনকে পরম পরিণামের দিকে লইয়া গিয়াছেন।

চন্দ্রশেখর কাব্যে দেখি রাজসিক স্তর হইতে সাত্ত্বিক স্তরে উঠিয়া শৈবলিনী যেন পুনর্জন্ম লাভ করিল। শীত-ঋতুর পরে বসন্তে বৃক্ষে যেমন নবীন পত্রোদ্গম হয়, ঘোর মানসিক বিপ্লবের পরে শৈবলিনীর মনে সেইরূপ স্বামীপ্রেমের কোমল কিশলয় আবির্ভূত হইল। তবে, বসন্ত-সহকারের পক্ষে আম্রমঞ্জরী যেমন সহজ, শৈবলিনীর পক্ষে পাতিব্রত্যও তেমনি সহজ হইয়া উঠিল। এই নবারব্ধ পারিবারিক জীবনের গৌরবে গৌরবান্বিতা হইয়া চিরপ্রেমাস্পদ প্রতাপকে মৃত্যুমুখে পাঠাইতে শৈবলিনী দ্বিধাবোধ করিল না। ব্যাঘ্রী যেমন স্বীয় শাবককে রক্ষা করে, প্রতাপের হস্ত হইতে শৈবলিনী সেইরূপ চন্দ্রশেখরকে রক্ষা করিল—না করিয়া তাহার উপায় ছিল না। এই গেল শৈবলিনীর জীবনের পরম পরিণামের কথা। প্রেমের এইরূপ বৈজ্ঞানিক অথচ সত্যসুন্দর চিত্র পৃথিবীর সাহিত্যে বিরল—ইহা আমরা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি। এখন প্রতাপের কথা বলি। সম্মুখ যুদ্ধে আহত প্রতাপ মরণোন্মুখ—সেই মরণোন্মুখ বীরের উদ্দেশে চন্দ্রশেখরের গুরু রামানন্দ স্বামীর বলিতে বাধিল না—"যদি পরোপকারে স্বর্গ থাকে, তবে দধীচির অপেক্ষাও তুমি স্বর্গের অধিকারী..." দধীচির অস্থিতে বজ্র অর্থাৎ বিনাশক বস্তু নির্ম্মিত হইয়াছিল; প্রতাপ নিজের অস্থির দ্বারা চন্দ্রশেখরের ভগ্নগৃহ পুনর্নির্ম্মিত করিয়া দিয়া গেল—অবশ্যই প্রতাপ দধীচির অপেক্ষাও স্বর্গের অধিকারী। যাক্, এই মহিমার সুরেই চন্দ্রশেখর কাব্য পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে। স্ত্রীঘটিত বিবাদরূপ অশোভন ব্যাপার যে এমন শোভন রুচিরতায় পরিসমাপ্ত হইতে পারে, তাহা বঙ্কিমচন্দ্র অঙ্কন করিয়া না দেখাইলে আমরা বিশ্বাসই করিতাম না। হোমারের কাব্য কিম্বা আর্থারীয় উপকথায় আমরা এই মহিমার সুর পাই না—ইহা বলিতেই হয়। চন্দ্রশেখর-কাব্যে কিন্তু শুনি—প্রতাপকে লক্ষ্য করিয়া চন্দ্রশেখর বলিতেছেন—প্রতাপ তুমি ধন্য, এবং প্রতাপও চন্দ্রশেখরের পদধূলি লইয়া বলিতেছেন—আপনিই মানুষ মধ্যে ধন্য। বলিতে কি শৈবলিনী প্রতাপের জীবনের শেষ অধ্যায় পঙ্কিলতার গহন আবর্ত্ত পরিত্যাগ করিয়া সুদূর নক্ষত্রলোকের দিকে সমুচ্ছ্রিত হইয়াছে।

চন্দ্রশেখর ও প্রতাপের চরিত্র যথাযথরূপে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিবার সময় এখন নয়। শৈবলিনী-চরিত্রের সম্পর্কে আসিয়া তাহারা যতখানি বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহাই এ প্রবন্ধে বলিবার চেষ্টা পাইয়াছি। তবে শৈবলিনী চরিত্র-কথাও আনুপূর্বিক বলিতে পারি নাই; কারণ, আধুনিক উপন্যাস-জগতের নারীচরিত্র বিকাশের একটা বিশেষ ধারা খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টাই এই প্রবন্ধের ভিত্তি। এই ধারা খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টার ফলে বুঝিতে পারিয়াছি—নারীচরিত্র বিকাশের যে বিশেষ ধারা আমাদের সাহিত্য জগতে এখন চলিতেছে, বঙ্কিমচন্দ্রের শৈবলিনী-চরিত্র তাহার উৎপত্তি ও আদর্শ স্থল। শৈবলিনীর চরিত্রের দুর্জয় সাহস (ফষ্টরের সঙ্গে নিভৃতে কথোপকথন এবং তাহার সঙ্গে গৃহত্যাগ), অপূর্ব্ব শক্তিমত্তা (প্রতাপকে বজরা হইতে উদ্ধার করা ইত্যাদি), অদ্ভুত বাগ্-নৈপুণ্য, ক্ষিপ্র চিন্তাশীলতা—চিন্তার স্রোতে বিপরীত তরঙ্গ উঠিবার ফলে ঘোর মানসিক বিপ্লব—পরে মস্তিষ্ক বিকৃতি... এগুলিই বঙ্কিম-পরবর্ত্তী যুগের সাহিত্য-সাধককে অনুপ্রেরণা দিয়াছে।

* ময়মনসিংহ বঙ্কিমচন্দ্র শতবার্ষিকী সভায় পঠিত।

শিবানীর স্বপ্ন

(গল্প)

শ্রীসুবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

নীলিমা সেদিন ধরা পড়িয়া গেল।

কলিকাতা শহরের পূর্ব্ব সীমান্তে নীলিমার শ্বশুর-বাড়ী। শ্বশুর-শাশুড়ী নাই, উপরে আছেন মাত্র তাহার বড় জা' জগত্তারিণী, তিনি এখন বাতে পঙ্গু হইয়া শয্যা লইয়াছেন। আসলে নীলিমাই সংসারের ঘরণী। বিরাট একান্নবর্ত্তী পরিবার, আপন এবং সম্পর্কীয় ননদ, জা', ভাসুরঝি, ভাগিনেয়ী প্রভৃতিতে একেবারে জমজম করিতেছে। বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ ত' আছেই, প্রত্যহ গৃহ-দেবতা লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা এবং সাধু-সন্ন্যাসী অতিথি-অভ্যাগতেরও আগমনের বিরাম নাই। তাহার উপর দুপুরের বেলা তাহাদের দোতলার হলঘরটিতে পাড়ার প্রায় পাঁচ-ছয়জন মহিলা জাঁকাইয়া বসিয়া তাসের মজলিস জমাইয়া থাকেন। নীলিমাকে একবার হাসিমুখে সেখানেও আসিয়া দাঁড়াইতে হয়। শান্ত, স্নিগ্ধ, বিনম্র স্বভাব তাহার, মুখে মৃদু মধুর হাসিটি যেন লাগিয়াই আছে ছেলে-মেয়েদের আদর-আবদার যাহা কিছু সব তাহারই কাছে। সংসারের প্রত্যেকটি অণু-পরমাণু পর্য্যন্ত তাহার কল্যাণ-স্পর্শে রমণীয় হইয়া উঠিয়াছে।

অথচ মনে হয় এই জনতার মাঝখানে সে একান্ত একা, নির্লিপ্ত এবং সুদূর। মনের গহনে সে কি যেন খুঁজিয়া বেড়ায় সারাক্ষণ। মাঝে মাঝে বিমনা হইয়া কি যেন ভাবিতে সুরু করে, কাহারও ডাকে চমক ভাঙিয়া লজ্জিত হইয়া সে উঠিয়া পড়ে।

বিবাহ হইয়াছে আজ প্রায় পনেরো বৎসর। গরীব বিধবার একটিমাত্র মেয়ে সে, শুধু শান্ত প্রকৃতি এবং লক্ষ্মী-প্রতিমার মতো রূপের জোরেই সে এ সংসারে প্রবেশ করিতে পারিয়াছে।

ছেলেবেলার কথা তাহার মাঝে মাঝে মনে পড়ে। বিধবা মা দূরসম্পর্কের এক ভাইয়ের বাড়ীতে রান্না এবং সংসারের অন্যান্য কাজ করিয়া দিনাতিপাত করিতেন। সেখানে অনেক দুঃখ, অনেক লাঞ্ছনা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, অপমান আর অত্যাচারের ভিতর দিয়া তাহার জীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাই সে হইয়াছে ধরিত্রীর মতো সর্ব্বংসহা, তাহার চারিদিকে ছিল শাসন এবং শৃঙ্খলার দুর্ভেদ্য প্রাচীর, তাই তাহার মন হইয়া উঠিয়াছে ধীর এবং কঠিন, চারিদিকে মানুষ সম্বন্ধে সে অতিমাত্রায় সজাগ এবং সচেতন হইয়া উঠিয়াছে।

—'এইবার ধরে ফেলেছি মেজ বৌদি! তাই ত' বলি, দুপুর বেলা চিলে ছাদের ঘরে খিল দিয়ে রোজ কি কর! যাই বল, তোমার গল্পটা কিন্তু বেশ হয়েছে বৌদি। হুবহু ঠিক মিনি-বৌদির বরের কাণ্ডটা লিখেছ কিন্তু!'

নীলিমা অবাক্ হইয়া বলিয়া উঠিল, 'কি যা তা বলছিস্ বল্ ত' রমা? আমি আবার গল্প লিখলুম কখন? কই দেখি!'

রমা গল্পটা বাহির করিতেই নীলিমা হাসিয়া বলিল, 'ওমা এ-যে অসিতা দেবীর লেখা!'

রমা হাসিয়া বলিল, 'উঁহু, সব তোমার চালাকি মেজ বৌদি। নীলিমা দেবীর নামে কাগজ এল, অসিতা দেবীর গল্পের ফাইল এল, আমাদের বিন্দি ঝিটার কথা পর্য্যন্ত লিখেছ যে!'

নীলিমা এবার রমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, থাকগে এ-নিয়ে আর চ্যাঁচামেচি করিসনে তুই। তাহলে আর লেখা-টেখা হবে না।'

রমা মিনতির সুরে কহিল, 'না ভাই, মেজবৌদি লিখতে তোমাকে হবেই। কি চমৎকার লেখা! কাউকে বলব না, কিন্তু আমাকে ভাই একটু একটু করে গল্প লেখা শেখাবে?'

নীলিমা হাসিয়া বলিল, 'আচ্ছা, আচ্ছা শেখাব।'

মাস তিনেক পরে নীলিমার স্বামী বিনোদবাবুর অফিসের কিসের যেন ছুটি ছিল, বৈকালে তিনি ঘরেই ছিলেন, নীলিমা গিয়াছিল তাঁহাকে চা দিতে।

হাতে একটি কাগজ লইয়া রমা হাসিতে হাসিতে চাপা-গলায় দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া ডাকিল, মেজবৌদি, শীগ্‌গির একটা কথা শুনে যাও।'

বিনোদবাবু বলিলেন, 'কেন রে রমা, ভেতরে আয় না!'

দরজা দিয়া মুখ বাড়াইয়া চাপা হাসিতে মুখখানি উজ্জ্বল করিয়া রমা কহিল, 'না দাদা মেজবৌদির বারণ আছে। আমাদের মফঃস্বলী কথা।'

বিনোদবাবু কপট গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে কহিলেন, 'না এ-ত' ভাল কথা নয়। স্বামীর কাছে স্ত্রীর কোন কিছুই গোপন থাকা ত' উচিত নয়! শাস্ত্রে বলেছে, সহধর্ম্মিণী!'

নীলিমা কহিল, 'শাস্ত্রের কথা থাক্। কি আমার শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত গো! জিজ্ঞাসা করছিলেন, ছোট ডিম আছে?'

বিনোদবাবুর দৃষ্টি তখন রমার হাতের দিকে নিবদ্ধ। তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'দেখি দেখি রমা তোর ছবি বেরিয়েছে বুঝি কাগজে?'

আর গোপন করা চলিল না।

বিনোদবাবু কাগজটি হাতে লইলেন। পাতা উলটাইতেই চোখে পড়িল, শিবানীর স্বপ্ন,—গল্প—শ্রীমতী নীলিমা দেবী।

বিনোদবাবু বলিয়া উঠিলেন, 'বাহবা বাহবা, লেখিকার স্বামী হয়ে গেলাম যে!' তারপর অভিবাদনের ভঙ্গীতে মাথা হেলাইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'পত্নীগৌরবে আজ আমি গৌরবান্বিত।'

নীলিমা বিস্মিত হইয়া বলিল, 'সে কি রমা, এ নিশ্চয় তোরই কাজ। অসিতা দেবীর জায়গায় তুই-ই নীলিমা বসিয়ে দিয়েছিস?'

রমা হাসিয়া বলিল, অসিতা নামটা আমার পছন্দ হয় নি বৌদি, মঞ্জুলিকা-টিকা একটা দেবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত লিখতে গিয়ে নীলিমা দেবীই লিখে ফেললাম। ভাল হ'ল না?

নীলিমা রাগিয়া বলিল, 'তোমার মাথা হ'ল!'

তারপর জনান্তিকে রমার কানে কানে বলিল, 'তোমার

দাদাকে জানাবার ইচ্ছেটা ছিল মনে-মনে তা' আমি আগেই বুঝেছিলাম। ভাইয়ের প্রতি বোনের ভালবাসার একটা নমুনা পাওয়া গেল যা-হ'ক!'

বিনোদবাবু বলিল, 'ননদ-ভাজের চিরন্তন কলহটা মুলতুবি রেখে তোমরা চুপ করে' আমার সামনে বস। আমার মেঘ-নিন্দিত কণ্ঠস্বরের দরদ দিয়ে গল্পটি পাঠ করি, তোমরা শোন।'

নীলিমা উঠিয়া পড়িয়া বলিল, 'আর শুনে কাজ নেই।'

রমা ব্যগ্রভাবে তাহার আঁচল চাপিয়া ধরিয়া মিনতির স্বরে কহিল, 'বস না বৌদি!'

বিনোদ গম্ভীরকণ্ঠে বলিল, 'তা যাও, গল্পের ভেতর দিয়ে তোমাকে পাওয়া যাবে। যাঁরা বলেন, 'কবিকে খুঁজ না কাব্যে তাহার' আমি তাদের দলে নই। তা' যাচ্ছ যাও, দুটো ছোট ডিম আর দু'কাপ চা পাঠিয়ে দিও কিন্তু।'

বিনোদবাবু গল্প পড়িতে সুরু করিলেন।

পুবদিকের জানালাটি খুলিয়া দিলেই চোখে পড়ে একটি ছোটখাট মাঠ, সেটি ওই বাড়ীরই সীমানার মধ্যে। সেখানে গাছ এবং আগাছার একটি বিরাট মিলন-মহাতীর্থ রচিত হইয়াছে। ঘনসবুজ সুপারি-নারিকেল-তাল ও খেজুর হইতে সুরু করিয়া শ্যাওড়া, আকন্দ, শিমুল প্রভৃতি সকলেরই অবারিত অবকাশ। অবসাদ-পীড়িতা স্নেহময়ী জননীর অযত্নলালিত শিশুর মত প্রকৃতি মাতার গভীর গোপন স্নেহস্পর্শ লাভ করিয়া ছায়া-রৌদ্রের ঝিকিমিকির মধ্যে সেই অজস্র তরুলতা আকাশের দিকে নানাজাতীয় পাতাগুলি মেলিয়া তাকাইয়া থাকে। তাহারই কিছুদূরে কয়েকটি বাড়ী। শহরের অভূতপূর্ব উন্নতিসাধন করিবার আগ্রহে একটি বিশাল রাজপথ আসিয়া তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তর্জনী-সংকেত করিতেছে।

মাঠের ওপারে যে বাড়ীটি আসন্ন ধ্বংসের প্রতীক্ষা করিতেছে, সেই বাড়ীর ওই পুবদিকে জানালার ওপারে প্রশান্ত তাহার নিরালা জীবন যাপন করে।

পুবদিকের জানালাটি খোলাই ছিল। হেমন্তকাল। ভোরের হিমশীতল বাতাস গায়ে আসিয়া লাগিতেই প্রশান্তর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তন্দ্রাজড়িত অর্দ্ধনিমীলিত চোখ দুইটি মেলিয়া সে জানালার বাহিরের দিকে তাকাইল। সবুজ ঘাস-গুলির উপর সারারাত্রি ধরিয়া অবিরাম যে শিশির-কণা ঝরিয়া পড়িয়াছে, এই নবীন অরুণোদয়ের মুহূর্তে তাহা কি অপরূপ অনির্বচনীয় শোভা,—প্রশান্ত যেন মুগ্ধ বিস্ময়ে স্বপ্নময় দুই চোখ ভরিয়া দেখিতে লাগিল। আশে-পাশের বাড়ীগুলি এখন জাগে নাই,—এই সময়টুকুই তাহার কাছে অমূল্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

কিন্তু পাখীর ডাক নয়, সহসা একটি কান্না-কোলাহলের সাংঘাতিক ঐকতান শোনা গেল, বোধকরি পাশের বাড়ী হইতে। প্রশান্ত একটি মৃদু নিশ্বাস মোচন করিয়া চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু সে হয় নাই, তাহার অশান্ত মনে সে দুঃখ আনিতে পারিল, হালদার বাড়ীর সর্বময়ী গৃহিণী কান্তমণি এইমাত্র আসিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ বিরাট একান্নবর্ত্তী পরিবারের সতেরোটি ছেলে-মেয়ে বিকট ভৈরবরাগে কণ্ঠস্বরের প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইয়াছে।

প্রতিদিনকার জীবনযাত্রার ভূমিকায় সেই পুরাতন পুনরাবর্ত্তনের কাহিনীর ধারা গড়াইয়া গড়াইয়া চলে।

মৃতবৎসা, মাদুলির ভারে জর্জ্জরিতা, চিররুগ্না মেজ-গিন্নী হয়ত তখন তাঁহার হাঁপানির একটানা দমকের সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়া চলিয়াছেন:

'আর পারিনে মা ওই ধিঙ্গি মেয়েকে নিয়ে! রোজ রোজ কাঁহাতক আর ওই এক-কথা বলবো? ওলো ও শিবি, আপিসের ভাত কি তুই মন্তর পড়ে হাজির করবি?'

ভোর হইতে দুপুর-রাত্রি পর্য্যন্ত অক্লান্ত নীরব পরিশ্রমের পরেও চোখে যাহার ঘুম নাই, হয়ত রাত্রি শেষের মদির-মন্থর পথ-ভোলা বাতাসে বেদনা-পরিম্লান দুইটি চোখের পাতায় বাঞ্ছিত তন্দ্রা এইমাত্র নিবিড় হইয়া ঘনাইয়া আসিয়াছে, প্রতিদিনকার নিষ্ঠুর নিয়মের কথা বোধকরি সে মনে রাখিতে পারে নাই।

ওদিকে কিন্তু বাড়ীর যিনি বড়কর্ত্তা, তাঁহার সাধা কালোয়াতি কণ্ঠে গভীর বৈরাগ্যের গান ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে: তারা আর কতদিনে তাঁহাকে তারণ করিবেন!

কুম্ভকর্ণের মেজকর্ত্তার সুখ-নিদ্রার ঘর্ঘর শব্দ বোধকরি এবার তরল হইয়া আসিয়াছে, একটু পরেই উঠানের গাঁদাফুলের চারার পাশে কালি-জমিটুকুর উপরে তাহার কুস্তীর কসরতের সঙ্গে সঙ্গে বিভীষণ হুংকার শোনা যাইবে।

মেজকর্ত্তা মেটেবুরুজের কোন এক মার্চেন্ট আফিসের কেরাণী, কাজেই তাঁকে ট্রেন ধরিতে হইবে সাড়ে আটটায়। সুতরাং ঠিক পাঁচটায় চা না পাইলে তিনি চীৎকার করিতে সুরু করিবেন।

মেজগিন্নীর স্বামী-ভক্তির তুলনা নাই। একক্ষণে তিনি ঘুমন্ত কন্যার পিঠে সজোরে একটি চিমটি কাটিয়া তাহাকে তার কঠোর কর্ত্তব্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন।

অন্যমনস্কের মত প্রশান্ত কি যেন ভাবিতেছিল। ধীরে ধীরে সে এবার পুবদিকের জানালাটা বন্ধ করিয়া দিল।

স্বপ্নের সময় যায়-যায়, রাজপুত্রের সাড়া মেলে না।

সময়ে-অসময়ে মেজগিন্নী কন্যার আপাদমস্তকের পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া আপন মনেই বিড়বিড় করিয়া কি যেন বলিতে সুরু করেন। শিবানীর সমস্ত দেহ-মন এক অজানা লজ্জায়, সকরুণ আতঙ্কে থরথর করিয়া কাঁপিতে থাকে।

শিবানী হয়ত অত্যন্ত ভীরু, মৃদু কণ্ঠে বলে, 'তোমার পাঁচনটা এখন এনে দোব মা?'

মেজগিন্নীর ভাঙা কাঁসরের মত দীর্ণ কণ্ঠস্বর হঠাৎ উঁচু পর্দায় ঝনঝন করিয়া বাজিয়া ওঠে; 'আদিখ্যেতা করে' আবার কি সোহাগই যে পড়েছে!'

এই পাঁচনের, কুমারী এই মেয়েটির এবং সর্ব্বোপরি ওই পাঁচনের প্রতি তাঁহার দারুণ বিতৃষ্ণা—সব মিলিয়া যেন সেই চিরন্তন মৃত্যু প্রার্থনার মুখেই আগাইয়া চলে।

কান্তমণি যাইতেছিলেন সেই পথ দিয়া। তিনিও সুরু

করিলেন ঃ 'বয়স ত' তোর কম হল না শিবি...আহা রোগা মা-টা ভুগছে, একটু চারদিকে চোখ রেখে ত' কাজকর্ম্ম করতে হয় বাছা!'

মেজ গিন্নীর মেজাজ বোধ করি নিতান্ত খারাপ ছিল, তিনি হঠাৎ রাগিয়া আগুন হইয়া গেলেন।—'তুমি তোমার কাজে যাও পিসি—আমার মেয়েকে কেমন করে' শাসন করতে হয় তা আমি জানি। তোমাকে কেউ সালিশি করতে ডাকে নি।'

রসনার ধার ক্ষান্তমণিরও কম নয়, তবু তিনি এই অভাবনীয় আক্রমণে একেবারে যেন হতচকিত হইয়া গেলেন। কোথায় এই দরদ প্রকাশের জন্য তিনি কৃতজ্ঞতা আশা করিয়াছিলেন, আর তাহারই ফলে এই অদ্ভুত বিপরীত আচরণ!'

ধীরে ধীরে সেখান হইতে সরিয়া যাইবার সময় তিনি যেন দেওয়ালকে উদ্দেশ করিয়া চাপা কণ্ঠে কহিলেন, 'জানি মা জানি ত' সবই, নৈলে চোখ আছে তাই না দেখে উপায় নেই, মুখ আছে তবু বলতে পারি নে।'

তাহার পর সে এক সাংঘাতিক কাণ্ড! চোখে না দেখিলে বিশ্বাস করা কঠিন। যে তুমুল তোলপাড় সুরু হইল তাহাতে আশ-পাশের বাড়ীগুলি পর্যান্ত ভীত এবং সন্ত্রস্তভাবে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল।

আবাল্য এই বিষাক্ত পরিমণ্ডলের মধ্যে জীবন যাপন করিতে অভ্যস্ত হইয়া শিবানী আজকাল মূক এবং নির্ব্বিকার হইয়া গিয়াছে। ঘৃণায় এবং গ্লানিতে তাহার সমস্ত মনটা পাথরের মতো কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। তৎক্ষণে সে গিয়া রান্নাঘর আশ্রয় করিয়াছে।

চন্দ্রাতুর মধ্যাহ্ন ধীর গতিতে অপরাহ্নের দিকে অগ্রসর হইতেছিল।

বড়কর্ত্তার বিধবা পুত্রবধূ ইন্দ্রাণী শিবানীর পিছু পিছু আসিয়া দাঁড়াইল।

পুরো এক বৎসর না পার হইতেই স্বামীর পরলোক গমনের পর এই সংসারে বসিয়াই বোধ করি এখন সে শেষের দিন গুনিতেছে। বয়স যদিও উনিশ পার হইয়াছে তথাপি দিন-দিন ছেলেমানুষী যেন তাহার বাড়িয়াই চলিয়াছে। স্বামীর সুবুদ্ধিকে সে মনে মনে নমস্কার জানায়, তিনি মৃত্যুর বিনিময়ে তাহার ইহলোকে বাঁচিয়া থাকিবার সংস্থান রাখিয়া গিয়াছেন। প্রকাশ্যে, সকলেই, এমন কি ক্ষান্ত পিসিমাও তাহার প্রশংসাই করিয়া থাকেন।

পা টিপিয়া টিপিয়া চুপি চুপি কখন সে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে শিবানী টের পায় নাই। হঠাৎ সে শিবানীর চোখ টিপিয়া ধরিল। কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব গম্ভীর করিয়া তাহার কানে কানে প্রশ্ন করিল, 'বল ত' কে?'

শিবানী ম্লান একটুখানি হাসিল। কহিল, 'তুমি যম হলেই ভাল হ'ত।—উহু—হু ছাড় ছাড় লাগছে, উহু ভাল হচ্ছে না রাণী-বৌদি!'

গুন গুন করিয়া গান গাহিতে গাহিতে কমলাও আসিয়া হাজির। মেজ কর্ত্তার পুত্রবধূ কমলা।

'—ওইরে আদরিণী এসেছেন। আমরা দুঃখী মানুষ, বেশ আছি, তুমি চন্দ্রমুখে আবার এখানে কি করতে? দ্যাখ রাণী, মাঝে মাঝে আমার ভীষণ ইচ্ছে হয়, ঠাস করে' ওই দুগালে দিই দুই চড় বসিয়ে। ওর বর কি করে একবার দেখলে হ'ত!'

শিবানী হাসিয়া বলিল, 'কি আর করবে। সেজদা বাইরে স্বদেশী বক্তৃতা দিয়ে বেড়ালে কি হবে, ঘরে একেবারে ভালোমানুষ, যেন ভাজা মাছটি উল্‌টে খেতে জানেন না—না পারবে কিছু কইতে না পারবে সইতে। তাছাড়া তোমাকে ত' ভয় করে খুব।'

কমলা এক অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, 'হু, তাই দিয়েই একবার দ্যাখনা, কি করে!'

গলায় কাপড় দিয়া অভিনয়ের ভঙ্গিতে ইন্দ্রাণী বলিয়া উঠিল, 'বহুৎ আচ্ছা আদরিণী কমলরাণী, কি মেঘই বানিয়েছ! এখন যাও ত' মানে মানে, প্রাইভেট কথাটা আমরা সেরে নিই।'

—'একদৃষ্টে চেয়ে-চেয়ে 'প্রাইভেট কথা'র চোখদুটি যে এতক্ষণ ঠিক্‌রে গেল!'

—'দূর পোড়ারমুখী'—ইন্দ্রাণী শিবানীকে হাত ধরিয়া টানিয়া একেবারে বিব্রত করিয়া তুলিল। লজ্জায় শিবানীর মুখ-চোখ তখন রাঙা হইয়া উঠিয়াছে।

—'বাবারে বাবা, দাঁড়াও, দাঁড়াও—হাত পুড়ে যাবে। পাঁচনটা দিয়ে আসি ওদিকে।'

কমলা উদারভাবে কহিল, 'না সত্যি, বেচারী এক-একবার বিড়বিড় করে পড়ছে, আর সামনের দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছে। হাসি চাপতে না পেরে পালিয়ে এলাম। এখন সত্যি কষ্ট হচ্ছে। তোমরা যাও, পাচনের ব্যবস্থা আমি করছি।'

ইন্দ্রাণী বলিল, 'অসংখ্য ধন্যবাদ। না, তোর বরকে আর কষ্ট দেব না।—নে, চল্ এবার।'

পরীক্ষার শেষ বৎসরে পৌঁছিয়া প্রশান্ত তাহার পূর্ব-দিকের জানালার পথে একদিন হঠাৎ তাকাইতেই একটি দুর্লভ মুহূর্ত্তের লঘুচপল অথচ মধুর মদির অনুভব মোহের বিদ্যুৎ-শিখার মতো তাহাকে যেন স্পর্শ করিয়া গেল।

অন্যমনস্কের মতো তাহার পূর্বদিকের জানালা দিয়া সুমুখে তাকাইতেই সে দেখিল একটি সুন্দরী শ্যামলী কিশোরী,—শিশিরধৌত নব দুর্ব্বাদলের মতো লাবণ্যে ঢল-ঢল তাহার শরীরের অপূর্ব্ব শ্রী, টানা-টানা দীর্ঘায়ত কালো দুইটি চোখের পল্লবে তাহার মন্থর ক্লান্ত বিষাদ যেন ঘনায়িত হইয়া আসিয়াছে, মৃদু পূবালি বাতাসে কানের পাশে একরাশ চূর্ণকুন্তল ঝিলমিল করিয়া কাঁপিতেছে। একটি আসন্ন মধুর সম্ভাবনার স্বপ্নে, আবেগে ও উৎকণ্ঠায় তাহার দেহে আর মনে যেন চন্দ্রালোকায়িত সমুদ্রের ফেনিল তরঙ্গ উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে।

হঠাৎ প্রশান্তর চোখে পড়িতেই ভীত চকিতভাবে মেয়েটি সেখান হইতে সরিয়া গেল।

সেই মেয়েটি শিবানী এবং পুরাতন সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি চলিয়াছে আজ প্রায় এক বৎসর ধরিয়া।

মৃদু অথচ স্পষ্টকণ্ঠে ইন্দ্রাণী কহিল, 'ধ্যান ভাঙলো

ভোলানাথের? কিন্তু বলুন, আর কতদিন তপস্যা চলবে আমার ননদিনীর?'

প্রশান্ত স্পষ্ট অনুভব করিতে পারে, সিঁড়ির পাশে দুইটি করুণ ব্যগ্র দৃষ্টি আশায় এবং আগ্রহে থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। তাহার কান দুইটি ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল। অত্যন্ত লজ্জিত এবং বিব্রত হইয়া সে বলিয়া উঠিল, কি যে বলেন বৌদি, সব কথাতেই আপনার ঠাট্টা!.........'

ইন্দ্রাণী মুহূর্ত্তকাল চুপ করিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল। তাহারপর গম্ভীরকণ্ঠে বলিল, 'না, প্রশান্তবাবু, আর ঠাট্টা নয়—মাকে আপনার বলেছেন?'

প্রশান্ত তখন আশঙ্কায়, লজ্জায় একেবারে ঘামিয়া উঠিয়াছে। কোনরকমে সে যেন বলিয়া গেল, 'দেখুন, আর কিছুদিন অপেক্ষা করলে হয় না—পরীক্ষাটা শেষ না হ'লে —আমার কেমন যেন—'

ইন্দ্রাণীর সহাস্য-সুন্দর নির্ম্মল চোখ দুইটির দৃষ্টি ধীরে ধীরে কঠিন হইয়া উঠিল।—'দেখুন, আচ্ছা, আর সাত-দিন আপনাকে সময় দিলাম। আগামী সোমবার আপনাকে এইখানে দাঁড়িয়ে কথা দিতে হবে। আর একটা কথা, এ-কদিন আমাদের দেখা পাবেন না, অনর্থক চেষ্টা করে' মন খারাপ করবেন না।'

প্রশান্ত কাঠের মতো গুম্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সাতদিন পরে প্রশান্তর দেখা পাওয়া গেল না, কিন্তু রাত প্রায় দশটার সময় শিবানীদের সদর দরজার কড়া হঠাৎ ঝনঝন করিয়া বাজিয়া উঠিল।—'হরিহরবাবু বাড়ী আছেন, ও মশায়'—

অফিস হইতে ফিরিয়া মেজকর্ত্তা হরিহরবাবু তখন কলিকায় ফুঁ দিতেছিলেন।

—'রাতের বেলাতেও একটু নিশ্চিন্দি নেই রে বাবা! কোন্ ব্যাটা পাওনাদার আবার এলেন কে জানে'—বলিতে বলিতে আসিয়া দরজা খুলিতেই, 'আরে, কি সৌভাগ্য, আসুন, আসুন প্রমথবাবু, তারপর হঠাৎ গরীবের বাড়ী এত রাতে?'

প্রমথবাবু আপ্যায়িত হইলেন না। অত্যন্ত পরুষকণ্ঠে বলিলেন, 'দেখুন, আপনার সঙ্গে একটু বিশেষ কথা আছে।'

ভূমিকার এই অপ্রত্যাশিত ভঙ্গিতেই হরিহরের চাকুরী-পীড়িত বুক ঢিপঢিপ করিতে সুরু করিয়াছে। শুষ্কস্বরে তিনি বলিলেন, 'কি, বলুন!'

প্রমথবাবু যেন এক নিশ্বাসে বলিয়া গেলেন।—'আমার ছেলের সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে যে হ'তে পারে না, তা' আপনি জানেন—তবু মেয়েদের দিক দিয়ে—বুঝলেন কি-না—সমানে-সমানে দেবার চেষ্টা করুন—'

এইবার মরিয়া হইয়া তিনি চরম কথায় আসিয়া পড়িলেন।—'টোপ্ ফেলবার চেষ্টা করে' লাভ কিছুই হবে না—মনে রাখবেন।'

এই আকস্মিক অভাবনীয় তীব্র অপমানে হরিহরবাবু যেন হতচকিত হইয়া গেলেন। রাগে, দুঃখে তিনি চোখে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন, পরিক্লান্ত পা দুইটি তাঁহার থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। নীচে একটা গোলমাল শুনিয়া মেজকর্ত্তা কুস্তীগীর বিষ্ণুচরণ নামিয়া আসিলেন, তাঁহার পিছনে ক্ষান্তমণি।

বিষ্ণুচরণ লাঠির আঘাতে সেই একদা অভিজাত বাড়ীটির ভিৎ পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'শালা পালালো কোথা? মাথাটা এইখানে রেখে দিতাম তা'হলে! আমরা হলাম গিয়ে বর্নেদি ঘুঘু, তোমার ও ফকিরনগরের জমিদারী ফলাতে এসেছ এইখানে—'

সংসার-বৈরাগী বড়কর্ত্তাও ততক্ষণে সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তিনি তাঁহার প্যাঁকাটির মতো সরু হাতখানি দিয়া বিষ্ণুচরণের একটি হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, 'যাক্ যাক্ বিষ্ণু, তুই আর কেন নিমিত্তের ভাগী হবি শুধু-শুধু—'

ক্ষান্তমণি ধমক দিয়া সুরু করিলেন, 'কেন? বড়লোক বলে' কি হাতে মাথা কাটবে না-কি? খেংরে বিষ ঝেড়ে দিতে হয়—'

হরিহর কিন্তু ততক্ষণে আসল নিমিত্তটির কাছে, রান্না-ঘরে। কঙ্কালসার মেজগিন্নী হাঁপানির দুর্দ্দমনীয় রোগের বেগের সঙ্গে অনর্গল বাক্যের গরলস্রোত উদ্গার করিয়া চলিয়াছেন। কমলা ফিস্ ফিস্ করিয়া তাঁহাকে চুপ করাইবার বৃথা চেষ্টা করিতেছে। সতেরোটি ছেলে-মেয়ের মধ্যে দশটি বোধকরি নিদ্রাগত, বাকী সাতটি সেখানে দাঁড়াইয়া তারস্বরে চীৎকার করিতেছে। আর ওদিকে এককোণে শিবানী পরম ক্ষেদে দুইটি হাত পুড়াইয়া ফেলিয়াও মন্দিরে উৎকীর্ণ মূর্ত্তির মতো নিস্পন্দভাবে একদৃষ্টে তাকাইয়া আছে। নিষ্পলক দুইটি বিশাল চোখের কোণে একফোঁটা অশ্রুও চিক্‌চিক্ করিতেছে না। তাহার সেই রূপসিত কোমল বলয়িত দুইটি হাত একটু-একটু করিয়া কাঁপিতেছে, আর ইন্দ্রাণী মুখ নীচু করিয়া স্পিরিট্ দিয়া সেখানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিতেছে।

এই করুণ দৃশ্যে হরিহরের পিতৃ-হৃদয় বিচলিত হইবার কথা, কিন্তু তাঁহার চোখের সুমুখে তখন বড়সাহেবের রোষ-রক্তিম চোখ জ্বলিয়া উঠিতেছে;

তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া তিনি শিবানীর সেই ঘনমেঘের মতো আজানুলম্বিত একপিঠ কালো এলোচুলের গোছ সজোরে টানিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'উঃ, রাক্ষসী—'

পিছনদিক হইতে বিষ্ণুচরণ তাঁহার হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'খবরদার বলছি মেজদা, ভাল হবে না' বলে দিচ্ছি। কেন, ওর দোষটা কি শুনি? আজ ত' ব্যাটা গিয়ে ভয়ে খিল দিয়েছে। কাল ওর মাথাটা না ফাটাই ত' আমার নাম বদলে রেখ।'

বিহ্বল, বিভ্রান্ত হরিহরের শীর্ণ, তামাটে কপোল বাহিয়া এতক্ষণে টস্‌টস্ করিয়া অশ্রুর ধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

বড়কর্ত্তা নিতান্ত নিরীহ সর্ব্বজ্ঞের মতো। পরম উদাসীন। এ-ব্যাপারের বিন্দুমাত্র তাঁহার বৈরাগ্যকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। ধীরে-ধীরে তিনি বলিলেন, 'তখনি

বলেছিলাম ওই বিপিনবাবুর সঙ্গেই দিয়ে ফেল্‌গে যা। তা' কেউ গেরাহ্যি করলে? হ'লই বা দোজপক্ষের বর? আর মোটর-ড্রাইভারি করলেই কি জাত গেল নাকি? তা'ছাড়া বিপিন কাঁচা পয়সাও মন্দ রোজগার করে না।'

কুন্তীগীর বিষ্ণুচরণ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, তুমি থাম বড়দা—'

অগত্যা বড়দা' থামিয়াই গেলেন।

চিরাচরিত দিনযাপনের ধারা আবার গড়াইয়া গড়াইয়া চলে।

প্রশান্তর পূর্বদিকের জানালা থাকে বন্ধ।

আর এদিকে ইন্দ্রাণী, শিবানী এবং কমলার পৃথিবী আজকাল ওই সীমাবদ্ধ প্রায়ান্ধকার জীর্ণ বাড়ীটির মধ্যে আরও সংকীর্ণ এবং সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে। বহুদূরে ভাঙা প্রাচীরের ধারে দীর্ঘদেহ সুপারি গাছটার কথা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে, সুরকি-কলের যে কালো একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী রোজ স্তিমিত রৌদ্রোজ্জ্বল বিকালের স্বচ্ছ নীলাকাশের দিকে উঠিয়া ধীরে ধীরে আবার মিলাইয়া যাইত, তাহাও যেন আজ বিস্মৃতির অন্ধকারে ঝাপ্‌সা হইয়া আসিয়াছে।

স্বামীর সঙ্গে চিরকালের বিচ্ছেদ-বেদনাকে যে হাসি দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছিল সেই ইন্দ্রাণীও আজকাল অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া গিয়াছে। দরিদ্র পিতার মেয়ে হইয়া পৃথিবীতে আসিবার যে-অপরাধ শিবানী করিয়া ফেলিয়াছে নিতান্ত কুণ্ঠিতভাবে সে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে থাকে। সারাদিন লুকাইয়া লুকাইয়া বেড়ায়, কাহারও সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হইলেই অপরাধীর মতো মাটির দিকে করুণচোখে তাকাইয়া থাকে। এই অস্বস্তিকর আবহাওয়ার মধ্যে কমলারও হাঁপ ধরে। মাঝে-মাঝে হঠাৎ তার চোখ ছলছল করিয়া আসে।

কি একটা কাজে ইন্দ্রাণী সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতেছিল। পিছন হইতে বড়কর্তা ঢোক গিলিয়া ডাকিলেন, 'বড়বৌমা!'

থমকিয়া থামিয়া ইন্দ্রাণী কহিল, 'আমায় ডাকলেন বাবা?'

বড়কর্তা একটু কাশিয়া অপ্রস্তুতের হাসি হাসিয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ এই বলছিলাম কি,—আমার ওষুধের কথাটা বোধ করি তুমি ভুলে গিয়েছ—'

অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া ইন্দ্রাণী বলিল, 'ও হো, একেবারেই মনে ছিল না বাবা—এখুনি আসছি—'

ইন্দ্রাণী তাড়াতাড়ি একটি টাকা আনিয়া বড়কর্তার হাতে দিল।

অন্ধকার সিঁড়ির কোণে মাকড়সার জালটির দিকে তাকাইয়া তিনি তাঁহার বাখারির মতো শিরাবহুল হাতটি প্রসারিত করিয়া দিলেন।

তিনদিন অন্তর একটি করিয়া টাকা তাঁহার পাওনা আফিমের জন্য।

একটি-একটি করিয়া দিন চলিয়া যায়, মহাসময়ের সমুদ্রে ক্ষণজীবী বুদ্বুদের মতো, মহাকালের আগামী সম্ভাবনার মধ্যে আর তাহাদের পরিচয় মেলে না। এমনই করিয়া তিনটি মাস কাটিয়া গেল।

প্রশান্তর পূর্বদিকের জানালা এখন মাঝে-মাঝে খোলা, এমনও দেখা যায়। সময়ের মানাইয়া লইবার ক্ষমতা অসাধারণ।

একদিন সেই পূর্বদিকের জানালার ঠিক উপরেই দেখা গেল, প্রকাণ্ড ছাদে হোগলা বাঁধিয়া ম্যারাপ টাঙান হইয়াছে। সকাল হইতে ঘনঘন শঙ্খধ্বনি, শানাইয়ের একটানা ইমন রাগিণী বাজিতেছে, বহু বিচিত্র নারী-পুরুষকণ্ঠের প্রবল কোলাহলের বিরাম নাই। প্রশান্ত আজ নববধূকে আনিতে যাইবে, তাহার মায়ের জন্য একটি দাসী।

পুষ্প-খচিত দেবদারু-তোরণদ্বার, বসুধারাঙ্কিত মঙ্গল-কলসে আম্রপল্লব, জ্যোতির্ম্ময় বিদ্যুৎ-দীপাবলীর অপরূপ শোভা,—প্রশান্তর মুখে চন্দনের পত্রলেখা, সর্ব্বদেহে উন্মাদক কস্তুরীগন্ধ!

তাহার জীবনের পরম রমণীয় শুভ মুহূর্ত্ত দেখা দিয়াছে। এখনই মনোহর বরযাত্রা সুরু হইবে।

সুমুখের সেই একদা-অভিজাত জরাগ্রস্ত জীর্ণ বাড়ীটি দীন ভিখারীর মত দাঁড়াইয়া আছে।

সারাদিন ধরিয়া শিবানী ইন্দ্রাণীর মুখের দিকে আর তাকাইতে পারে নাই, ইন্দ্রাণীর অবস্থা ত' শুধু অনুভব করিবার।

শ্রাবণের শেষ। সন্ধ্যা হইতেই মেঘ-মন্দ্রিত নিবিড় ঘনান্ধকার আকাশ পরিব্যাপ্ত করিয়া সহসা কখন রিমঝিম শব্দে শ্রাবণ-রাত্রি যেন বর্ষণ-মুখর নৃত্য সুরু করিয়াছে।

নিশীথ-রাত্রি ক্রমশ এই ধারাপতনধ্বনির মধ্যেই নামিয়া আসিল। ঝিল্লী-মুখরিত শ্রাবণ-রাত্রির নীরন্ধ্র অন্ধকারে শিবানী আর ইন্দ্রাণীর নিভৃতশয়ন,—নিশ্বাসে স্তব্ধতা-নীরব অশ্রুপাতে ভারাতুর হইয়া উঠিয়াছে। ইন্দ্রাণীর চোখ দুইটি অদম্য বাষ্পোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। অন্ধকারে কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইতেছে না, গুরু গুরু মেঘগর্জ্জনের সহিত চকিত বিদ্যুৎস্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে দুজনেই তাহারা দুজনের কাছে মুখ লুকাইতে চেষ্টা করিতেছে।

বহুক্ষণ চলিল এই নীরব কথালাপ। তাহার পর শিবানীর অবিন্যস্ত রুক্ষ্ম কেশপুঞ্জিত মাথায় ধীরে ধীরে সস্নেহভাবে হাত বুলাইতে বুলাইতে ইন্দ্রাণী কহিল, 'ঘুমোলি রাণী?'

শিবানী কোনও জবাব দিল না।

ইন্দ্রাণী যেন বহির্জগতের চেতনায় ফিরিয়া আসিয়াছে। আপনার মনেই সে অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিল, 'প্রশান্তর কি টাকাটাই বড় হ'ল? না-হয় আমার টাকাটাই খরচ করতাম; কিন্তু...........উঃ, কি সাংঘাতিক'—

দুর্দ্দমনীয় বেদনার আবেগে ইন্দ্রাণীর ঠোঁট দুইটি থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

এইবার শিবানীর স্পষ্ট, দৃপ্ত, সতেজ কণ্ঠস্বর শোনা গেল।—'ছি রাণী বৌদি!

নীলাঞ্জনবর্ণ অন্ধকার যেন প্রেতের মত শ্বাস রোধ করিয়া

ধরিয়াছে—সে-অন্ধকার বোধ করি হাত দিয়া স্পর্শ করিতে পারা যায়। কোথায় যেন হঠাৎ কোন্ ইঁটের ফাটল হইতে একটা চামচিকা ডাকিয়া উঠিল, বাদুড়ের ডানা ঝাপটানির কাতর শব্দও যেন শোনা গেল।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। শিবানীই স্তব্ধতা ভঙ্গ করিল।—'কাল কিন্তু ছাদে গিয়ে একবার বৌ দেখে আস্তে হবে বৌদি!'

অন্ধকারে শিবানীর মুখ দেখিবার জো নাই, কিন্তু ইন্দ্রাণীর যেন মনে হইল, অদ্ভুত এক অস্পষ্ট ক্ষীণ হাসি একবার ফুটিয়াই আবার মিলাইয়া গেল।

ইন্দ্রাণী সস্নেহে শিবানীর মাথায় হাত দিতে গিয়া,—'একি বাণী কাঁদছিস তুই, ছি তুই ভারী ছেলেমানুষ কিন্তু'..........তাহার পর অতিকষ্টে ভগ্নকণ্ঠ লইয়া সে বলিয়া উঠিল, 'ছি ছি তুই হাঁসি কি বল্ দেখি?...........এবার দয়া করে একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর ত!'

ওবাড়ীর পূবদিকের জানালাটি বন্ধ ছিল, তারই অন্তরালে দুটি প্রাণীকে দেখা গেল।

প্রশান্ত এবং তাহার নবপরিণীতা বধূ বনলতা দেবী।

অগুরু-ধূপ-সুরভি সমাচ্ছন্ন বিবিধ কুসুমসুগন্ধি ঘরটিতে একটি অপার নীরবতা বিরাজ করিতেছে। অর্দ্ধ-শায়িতভাবে প্রশান্ত চোখদুইটি অর্দ্ধমুদ্রিত করিয়া বসিয়াছিল, পায়ের কাছে বসিয়া আছে অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা বনলতা, আনত রক্তিম মুখমণ্ডলে লজ্জারুণ স্বপ্নাবেশ। বাহিরে ঘনবর্ষণ-ধারামুখরিত ঝঝরিত শ্রাবণ-রাত্রির মৃদঙ্গধ্বনিতে গুরু গুরু শব্দে মল্লার-রাগিণী অবিশ্রাম বাজিয়া চলিয়াছে, প্রশান্তর মনে একটি অব্যক্ত বেদনা ধীরে ধীরে ঘনাইয়া আসিতেছে। দীর্ঘ-পক্ষ্ম, বেদনা-পরিম্লান একটি সুন্দরী শ্যামলীর মূর্ত্তি ভাসিয়া উঠিতেছে তাহার দুই বাষ্পবিধুর চোখে, কল্পনার দর্পণে।

সে যেন মনের গভীর গহন অন্ধকারে প্রেমের স্বরূপ কি তাহাই খুঁজিয়া বাহির করিতে চাহিতেছে। ভাষাহীন সেই মিনতিভরা চাহনি দিয়া কি যে সে আশা করিয়াছিল কি চাহিয়াছিল তাহার কাছে। সেই অনন্ত গভীর ভীরু প্রেমের সে কি মর্য্যাদা দিল! অনাঘ্রাত স্ফুটনোন্মুখ একটি পদ্ম কোরককে সে নির্ম্মমভাবে পদদলিত করিয়াছে। এই সীমা-হীন অপমানের কোনও ক্ষমা আছে কি?

অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে প্রশান্ত চোখ মেলিয়া শূন্য-দৃষ্টিতে চাহিল। বনলতা এতক্ষণ স্বামীর দিকে একদৃষ্টে অশ্রুসিক্তচোখে চাহিয়াছিল, এইবার তাহার চোখে চোখ পড়িতেই লজ্জাস্মিত রাঙিত মুখখানি সে সরাইয়া লইল। কিছুক্ষণ তাহার দিকে অর্থহীন উদাস দৃষ্টিতে তাকাইয়া প্রশান্তর কেমন যেন মায়া হইতে লাগিল। হঠাৎ বিদ্যুৎ-চমকের মত তাহার মনে হইল কেহ না জানুক, প্রেম ত' প্রকাশ চাহে না, নীরবে গোপনে সে শিবানীর প্রেমকে ধ্যান করিবে চিরদিন। বনলতার মধ্যে সে শিবানীকেই ভালবাসিবে। শিবানীর স্বপ্নের মধ্যে সে জাগিয়া রহিবে। আবেগকম্পিত কণ্ঠে সে ডাকিল, 'বনলতা!'

তীব্র মদির আনন্দে বনলতার চোখের পাতা বুজিয়া আসিল। কোনও জবাব না দিয়া সে স্বামীর এই প্রথম সম্ভাষণের গভীর আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল।

প্রশান্ত আবার ডাকিল, 'বনলতা!'

—উঁ!

তোমাকে যদি আমি বাণী বলে' ডাকি, তুমি কি কিছু মনে করবে।

বনলতা মৃদুকণ্ঠে বলিল, 'না, কেন মনে করব?'

প্রশান্তর মনে আবার দ্বন্দ্বের ঝড় বহিতে সুরু করিয়াছে। প্রেম কি এতই তুচ্ছ, এত ভঙ্গুর, এত চপল? বনলতার প্রতি উদাসীন হইয়া সে ধন্য করিবে 'বাণী'কে, আর ওদিকে শিবানী তাহাকে চিরদিন নিষ্ঠুর এবং চপল বলিয়া জানিয়া রাখিবে!

অসহ্য যন্ত্রণায় প্রশান্ত উঠিয়া ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে সুরু করিল।

ধীরে ধীরে মৃদুকণ্ঠে বনলতা বলিল, 'তুমি এস।'

প্রশান্ত বনলতার কাছে আসিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, 'মাথাটা হঠাৎ কেমন ধরেছে।' আবার অন্যমনস্কভাবে কিছুক্ষণ পরে বনলতাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, 'আচ্ছা বাণী বল ত' আমার কি দোষ, এ-ছাড়া আমার কি কোনও উপায় ছিল?'

বনলতা বিস্মিত হইয়া কি যেন একবার ভাবিল। তাহার পর সমস্ত সঙ্কোচ কাটাইয়া প্রশান্তর প্রতপ্ত কপালে তাহার পুষ্পপেলব কোমল শীতল হাতখানি ধীরে ধীরে বুলাইয়া দিতে দিতে বলিল, 'তুমি আর কথা কয়ো না, একটু ঘুমও।'

বিনোদবাবুর গল্প পড়া শেষ হইল।

রমা অবাক্ হইয়া শুনিতেছিল, কিছুক্ষণ পরে বলিল, 'চমৎকার লিখেছে বৌদি, না মেজদা?'

বিনোদবাবু বলিলেন 'চমৎকার! কিন্তু একটু দোষ আছে, ডাক তোর বৌদিকে বলি।'

রমা উৎফুল্লকণ্ঠে চীৎকার করিয়া ডাকিল, 'বৌদি শীগ্‌গির এস ওপরে।

নীলিমা তখনই ছুটিয়া আসিল। কহিল, 'এখনও তোর ছেলেমানুষি গেল না রমা, এমন চেঁচাচ্ছিস যেন মনে হচ্ছে বুঝি-বা ডাকাত পড়েছে।'

বিনোদবাবু বলিলেন, 'তোমাকে পুরস্কার দেওয়া উচিত। সত্যিই চমৎকার লিখেছ গল্পটা। পত্নীভাগ্যে আমি মহাভাগ্য-বান, সন্দেহ নেই। কিন্তু তোমাদের ওই কেমন একটা দোষ, পুরুষজাতটার নিন্দে করতে না পারলে যেন ঘুম হয় না তোমাদের। আর তা' ছাড়া শেষদিকটা ত' একদম্ স্রেফ মিথ্যে কথা লিখেছ। প্রশান্ত ত শিবানীকেই বিয়ে করেছে, বাপ-মায়ের অমত থাকা সত্ত্বেও। পনেরো বছর আগেকার কথা হ'লে কি হবে, নিজের কথাটা কি মানুষ কখনও ভুলতে পারে?'

রমা কহিল, 'ও বাবা, তোমাদের বিয়ে কি এমনি করে' হয়েছিল না কি বৌদি?'

নীলিমা ধমক দিয়া কহিল, 'তুই থাম্। বড্ড ফাজিল হয়েছিস দেখছি। তুমিও একেবারে কি রকম ছেলেমানুষ!

করপোরেশনে মুসলিম স্বার্থ

রেজাউল করীম এম-এ, বি-এল

কলিকাতা কর্পোরেশন সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে যে আলোচনা করিয়াছি, তাহা হইতে পাঠকবর্গ বুঝিবেন যে, উহার অধিকার লোপের অপচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য আর যাহাই হউক, তাহা মুসলিম স্বার্থ নয়। নির্ব্বাচনপদ্ধতি পরিবর্ত্তন করিলেই যে মুসলিম স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে সংরক্ষিত হইবে,' এরূপ ধারণা ভ্রমাত্মক। নির্ব্বাচনপদ্ধতি পরিবর্ত্তন কর, অথবা মুসলমানদের জন্য আর দু'চারটা আসন বাড়াইয়া দাও, কোন অবস্থাতেই সেখানে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হইবে না। সব সময় সংখ্যালঘিষ্ঠ হইয়া রহিবে। মুসলমানের জন্য সুবিধাজনক কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইলে, তাহাকে অমুসলমান উপাদানের সহযোগিতা ও সাহায্য লইতে হইবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ অমুসলমান উপাদান ইচ্ছা করিলে মুসলমানের প্রত্যেকটি দাবী, প্রত্যেকটি প্রস্তাব হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারে। মুসলমান দুইভাবে অমুসলমানদের সহযোগিতা লাভ করিতে পারে। জাতীয়তাবাদী ও প্রগতিপন্থীদের সহিত মিলিত হইয়া যুক্ত দল গঠন করিয়া অথবা ইউরোপীয়ান, সরকার মনোনীত ও প্রতিক্রিয়াশীলদের সহিত মিলিত হইয়া। কর্পোরেশনে মুসলমান মাইনরিটি হইলেও, যে-কোনও দলে তাহারা যোগ দিবে, সেই দলকেই ভারী করিয়া তুলিতে পারিবে। এবং সম্ভবত সেই দলই মেজরিটি হইতে পারিবে। যে দল মুসলিম স্বার্থ রক্ষা করিতে পারিবে, তাহারা সেই দলেই যোগ দিবে। এখন দেখিতে হইবে, কোন দলে যোগ দিলে মুসলিম স্বার্থ অধিকতর তৎপরতার সহিত পূর্ণ হইতে পারে। ইহা কি কখনও সম্ভব যে, ইউরোপীয়ান—তথা প্রতিক্রিয়াশীল দলে যোগ দিলে বা সেই দলের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে সহায়তা করিলে, মুসলমানের উপকার হইবে? এই দলের প্রধান কাজ হইবে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ রক্ষা করা। এই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইলে, মুসলমানের জন্য লোক-দেখান যতটুকু কাজ করা দরকার, ততটুকুই তাহারা করিবে। তাহার অতিরিক্ত কিছুই করিবে না। ইহারা কলিকাতার নাগরিক জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য চেষ্টা করার চেয়ে লাট-বেলাটদের সম্বর্দ্ধনায় অধিকতর মনোযোগী হইবে। কিন্তু জাতীয়তাবাদী ও প্রগতিবাদী দলের শক্তি বৃদ্ধি করিতে পারিলে, মুসলমানের বেশী উপকার হইবার সুযোগ উপস্থিত হইবে। কারণ এই দলের প্রধান উদ্দেশ্য হইবে, দেশের সকল শ্রেণীর লোকের সহানুভূতি আকর্ষণ করা। কারণ এই সহানুভূতি যে-পরিমাণ পাইবে, সেই পরিমাণে দেশে জাতীয় ভাব-ধারা প্রচারিত হইবে। সাধারণের কল্যাণ হইবে ইহাদের আসল কাজ। জনহিতকর কার্যেই ইহারা কর্পোরেশনের অর্থ ব্যয় করিতে সর্ব্বদাই সচেষ্ট হইবে। সাধারণ-কল্যাণ হইলে, তাহার যথোপযুক্ত অংশ হইতে মুসলমান বঞ্চিত হইবে না। সুতরাং, মুসলিম স্বার্থের দিক হইতে প্রত্যেক মুসলমানকে দেখা কর্ত্তব্য, যাহাতে কর্পোরেশনে জাতীয়তাবাদী ও প্রগতিবাদী দল অধিক সংখ্যায় প্রবেশ করিতে পারে। গবর্ণমেণ্ট যদি এমন কোন আইন প্রণয়ন করিতে চান, যাহাতে এই দলের গুরুত্ব ও শক্তি কমিয়া যাইবার সুদূরতম সম্ভাবনা থাকে, তাহা সমর্থন করা কোন মুসলমানের কর্ত্তব্য নহে। এই কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল সংশোধনের জন্য সম্প্রতি বাঙ্গলা-সরকার যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে ইউরোপীয়ান তথা প্রতিক্রিয়াশীলদের শক্তি বৃদ্ধি করিবার অপচেষ্টা মাত্র। এই বিল আইনে পরিণত হইলে, জাতীয়তাবাদিগণ একেবারে কোণঠাসা হইয়া পড়িবে। তাহারা নগণ্য মাইনরিটিতে পরিণত হইবে। পৃথক নির্ব্বাচনের কারণে কোন জাতীয়তাবাদী মুসলমান নির্ব্বাচিত হইতে পারিবে না। জাতীয়তাবাদী হিন্দুদেরও সেইরূপ দুর্দ্দশা হইবে। ফলে, ইউরোপীয়ান, সরকার মনোনীত ও জাতীয়তা-বিরোধী দল প্রবল হইবে। শক্তির সমতা রক্ষা নির্ভর করিতেছে মুসলমানের উপর। ইহাদের অধিকাংশ প্রতিক্রিয়াশীল ও অবাঙ্গালী দল হইতে নিযুক্ত হইবে। এই সব দল মিলিয়া এমন একটা যুক্ত দল গঠিত হইবে, যাহা কলিকাতার নাগরিক জীবনকে ব্যথাময় করিয়া তুলিবে। ইহাদের চাপে কলিকাতার মুসলমান করদাতাগণ ত্রাহি ত্রাহি করিতে থাকিবে।

এইবার দেখাইতে হইবে, যুক্তনির্ব্বাচনের কালে মুসলমানের কোন সুবিধা হইয়াছে কিনা। মুসলমান ভয় করিয়া থাকেন যে, যুক্তনির্ব্বাচন অব্যাহত থাকিলে, তাহাদের মনোমত প্রার্থী নির্ব্বাচিত হইতে পরিবে না। কিন্তু কর্পোরেশনের গত কয়েক বৎসরের নির্ব্বাচনের ইতিহাস আলোচনা করিলে , উক্ত অভিযোগ অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। যে-সব মুসলমান সমাজে খুব প্রতাপশালী, তাঁহারা সকলেই নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। একথা সত্য যে, একজন প্রার্থী দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়াছিলেন বলিয়া মৌলবী ফজলুল হক সাহেব একবার পরাজিত হন; কিন্তু হাইকোর্টের বিচারে সেই নির্ব্বাচন নাকচ হইয়া গেলে, হক সাহেব বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্ব্বাচিত হন। মনে দুষ্টবুদ্ধি থাকিলে দ্বিতীয়বারও হক সাহেবের বিরুদ্ধে প্রার্থী খাড়া করা চলিত। আর ভোটারের সংখ্যা যখন হিন্দুদেরই অধিক ছিল, তখন হক সাহেব অপেক্ষা তাঁহার বিরোধী প্রার্থীরই জয়ের সম্ভাবনা অধিক ছিল। কিন্তু সেরূপভাবে হক সাহেবের বিরোধিতা কেহ করে নাই। সুতরাং, তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্ব্বাচিত হইতে পারিয়াছিলেন। খান বাহাদুর আবদুল মোমিন, মিঃ দবিরুদ্দীন, মিঃ ইস্পাহানী প্রমুখ "বিশ্বাসভাজন" মুসলমান নেতারা যুক্ত নির্ব্বাচন-প্রথা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও অল্পায়াসে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। আর এই নির্ব্বাচনে তাঁহারা হিন্দুর ভোট কম পান নাই! এতদ্ব্যতীত কতকগুলি কংগ্রেসপন্থী ও প্রগতিবাদী মুসলমানও নির্ব্বাচিত হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন; যেমন ডাঃ আর আহম্মদ, মিঃ সামসুদ্দীন। বিগত নির্ব্বাচন হইতে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, দুই শ্রেণীরই মুসলমান নির্ব্বাচিত হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইহাদের একদল সরকার পক্ষে যোগ দিয়াছিল, অন্য দল কংগ্রেস পক্ষে যোগ দিয়াছিল। এইভাবে রাজনৈতিক দলের আদর্শ রক্ষা করা সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু পৃথক নির্ব্বাচন-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে, জাতীয়তাবাদী কোন মুসলমানই নির্ব্বাচিত হইতে পারিবে না। তাহারা

নির্ব্বাচিত না হইলে ইউরোপীয়ান ও সরকার পক্ষেরই দল বৃদ্ধি হইবে। তাহার যেসব কুফল হইতে পারে, তাহা উপরে আলোচনা করিয়াছি। এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে যে, যেসব বিষয়কে মুসলমান কাউন্সিলারগণ তাঁহাদের বিশেষ স্বার্থ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, সেখানে পার্টির আদর্শ ভুলিয়া তাঁহারা একযোগেই কাজ করিয়াছিলেন। দুইবার এরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছিল, আর দুইবারই সমস্ত মুসলমান একত্র হইয়াছিলেন। মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকারের সহিত যখন মৌলবী ফজলুল হকের মেয়র পদ লইয়া প্রতিযোগিতা হয়, তখন হক সাহেব কংগ্রেসের মনোনয়ন পাইলেও, কংগ্রেস-বিরোধী মুসলমানগণ একবাক্যে তাঁহাকেই সমর্থন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়বার মুসলমানগণ একত্র হন—চাকুরীর ব্যাপার লইয়া। মিঃ আবদুল মোমিন মুসলমানদের জন্য চাকুরীর একটা নির্দ্দিষ্ট হার বাঁধিয়া দিবার জন্য কর্পোরেশনে একটি প্রস্তাব আনয়ন করেন। কিন্তু তাহা গৃহীত না হওয়াতে সমস্ত মুসলমান কাউন্সিলার একযোগে পদত্যাগ করেন। কংগ্রেসপন্থী ডাঃ আর আহম্মদ ও মিঃ সামসুদ্দীন এই দলে যোগ দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহাদের কাজ সমর্থন বা অসমর্থনের কথা উঠিতেছে না। কিন্তু লীগপন্থীরা যে অভিযোগ করিয়া থাকেন যে, কেবলমাত্র মুসলমানের দ্বারা নির্ব্বাচিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য মুসলমান তাহাদের স্বার্থ দেখে না, এই দুইটি ঘটনা সেই অভিযোগ মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতেছে। সুতরাং, যুক্ত নির্ব্বাচন অক্ষুণ্ণ থাকিলেও, মুসলমান স্বার্থের কোনই ক্ষতি হইবে না। বরং অন্যান্য বিষয়ে মুসলমানের লাভ হইবে।

কংগ্রেস প্রভাবিত কর্পোরেশন মুসলমানের স্বার্থ কিভাবে রক্ষা করিয়াছে, একবার সেদিকে লক্ষ্য করিলে মনে আনন্দ হয়। আগেই বলিয়াছি, কর্পোরেশনে মুসলমান চিরকালই মাইনরিটি থাকিবে। কিন্তু মাইনরিটি থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেসের নিকট মুসলমান কোনওরূপ অবিচার পায় নাই। কর্পোরেশনের সমস্ত সদস্য মিলিত হইয়া পাঁচজন অল্ডারম্যান নির্ব্বাচিত করেন। কংগ্রেস সভ্যগণ ইচ্ছা করিলে এই পাঁচজন হইতে মুসলমানকে একেবারেই বাদ দিতে পারিতেন। কিন্তু মুসলিম স্বার্থবিরোধী বলিয়া যে কংগ্রেসকে নিন্দা করা হয়, সেই কংগ্রেসের প্রভাবকালে প্রতিবারেই একজন করিয়া মুসলমান অল্ডারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়া আসিতেছেন। মুসলিম অল্ডারম্যানদের মধ্যে বড় বড় মুসলিম নেতাও নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। শ্রদ্ধেয় মৌলানা আক্রাম খাঁ, মৌলবী মুজিবর রহমান, মোঃ ওয়াহেদ হোসেন, মিঃ খাজা নূরুদ্দিন এই শ্রেণীর মুসলমানগণই নির্ব্বাচন পাইয়াছেন। মেয়র, ডেপুটী মেয়রের মত বিশিষ্ট পদগুলি হইতেও মুসলমান বঞ্চিত হয় নাই। অথচ মাইনরিটি মুসলমানদের এ-সব পদ লাভের সম্ভাবনা খুবই কম ছিল। কর্পোরেশনের অধীনস্থ ছোট-বড় সকল শ্রেণীর চাকুরীই মুসলমান পাইয়াছে। হয়ত যতটা মুসলমান দাবী করে, ততটা পায় নাই। সেই দাবী মত চাকুরী বাঙ্গলা সরকারও দিতে পারেন নাই। কিন্তু একথাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে, কংগ্রেস-অধিকারের পূর্ব্বে কর্পোরেশনের মুসলমান কর্ম্মচারীর সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। কিন্তু যেদিন হইতে কংগ্রেস কর্পোরেশন অধিকার করিয়াছে, সেই দিন হইতে মুসলমান কর্ম্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কতকগুলি দায়িত্বপূর্ণ পদও পাইয়াছে। সম্প্রতি কংগ্রেস প্রভাবিত কর্পোরেশনেই মুসলমানদের জন্য চাকুরীর একটা নির্দ্দিষ্ট হারও বরাদ্দ করা হইয়াছে। এইসব উদাহরণ চোখের উপর বিদ্যমান থাকিতেও লীগপন্থিগণ কোন্ যুক্তি বলে অভিযোগ করেন যে, পৃথক নির্ব্বাচন না হইলে মুসলমানের যথার্থ স্বার্থ রক্ষা হইবে না?

মুসলমানের আর একটা প্রধান স্বার্থ সংরক্ষিত হইয়াছে, কর্পোরেশন পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহে। কর্পোরেশন দুই শতাধিক বিদ্যালয় পরিচালিত করে। ইহার মধ্যে কতকগুলি সাধারণ বিদ্যালয়, সেখানে হিন্দু-মুসলমান ছাত্র পড়িতে পারে। আবার কতকগুলি বিদ্যালয় বিশেষভাবে মুসলমানের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সব বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষক সবই মুসলমান। উহাতে প্রায় কয়েক হাজার মুসলমান ছাত্র পাঠাভ্যাস করে ও কয়েক শত মুসলমান শিক্ষক চাকরী করে। এই সব কি মুসলিম নিপীড়নের প্রমাণ? ব্যক্তিগতভাবে যে-সব প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হয়, তাহাতেও কর্পোরেশনের সাহায্য কম নহে। এই সাহায্যের উপযুক্ত অংশ মুসলমান পাইয়া থাকে। মুসলমানের দ্বারা পরিচালিত পাঠাগারসমূহে সাহায্য দান করিতে কর্পোরেশন কার্পণ্য করে নাই। এতদ্ব্যতীত কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্য্যে কলিকাতার যে সব সুবিধা হইয়াছে, তাহার ফলভোগ মুসলমানও করিয়া থাকে। পার্কে পার্কে ছেলেমেয়েদের ব্যায়াম শিক্ষার জন্য যে-সব ব্যবস্থা হইয়াছে, ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে চিকিৎসার যে সব ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহার শুভ ফল হইতে মুসলমান বঞ্চিত হয় নাই। জাতীয়তাবাদী ও প্রগতিশীল কংগ্রেস শক্তিশালী না হইলে, এই সব কাজের একটাও হইতে পারিত না। হক সাহেবের কলমের খোঁচায় কর্পোরেশন হইতে কংগ্রেসের আধিপত্য লোপ পাইতে বসিয়াছে। সংশোধিত বিল কার্য্যকারী হইলে, কর্পোরেশন প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে পড়িবে। তাহারা কি কংগ্রেসের মত গঠনমূলক কাজ সুচারুরূপে করিতে পারিবে? কংগ্রেসকে কোণঠাসা করিলে হক সাহেব আত্মপ্রসাদ পাইতে পারেন, কিন্তু তাহাতে মুসলিম কল্যাণের ক্ষীণমাত্র আশা নাই। প্রস্তাবিত বিল কর্পোরেশনের এতদিনের সাধনাকে পণ্ড করিবে—কলিকাতাবাসীর শান্তিপূর্ণ জীবনকে অশান্ত ও দুর্ব্বিষহ করিয়া দিবে। আমরা চাই, হক সাহেব আবার পুরাতন দিনে ফিরিয়া আসুন, যখন তিনি উচ্চকণ্ঠে জাতীয়তা ও দেশ কল্যাণের বাণী প্রচার করিতেন। আজ প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে পড়িয়া তিনি তাঁহার অতীত দিনের সমস্ত মহিমাকে বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছেন। কর্পোরেশনের মধ্য দিয়া যদি মুসলমানের উপকার করিবার ইচ্ছা তাঁহার থাকে, তবে যুক্ত নির্ব্বাচনকে অব্যাহত রাখাই তাঁহার কর্ত্তব্য হইবে। পৃথক নির্ব্বাচন কখনই মুসলিম স্বার্থ রক্ষা করিতে পারিবে না—উহা অভিশাপস্বরূপ হইবে।

আপন ও পর

(গল্প)

শ্রীহিমাংশু রায়

চিঠি পড়িয়া বাবুলাল মুসড়াইয়া পড়িল। স্ত্রী চিঠি দিয়াছে, রামুর মারাত্মক অসুখ, বাঁচিবার আশা কম। টাকার অভাবে চিকিৎসা চলিতেছে না, ইত্যাদি। শেষের দিকটায় সে অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া তাহাকে আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছে।

চিঠিটা হাতের মুঠায় চাপিয়া ধরিয়া বাবুলাল স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। সুদূর বাঙলা দেশের এক কোণে বসিয়া সে যেন স্পষ্ট দ্বারভাংগা জেলায় তাহার নিজের গ্রামটিকে দেখিতে পাইল।

ছোট্ট তাহার কুটীরটি। সামনে প্রশস্ত আঙ্গিনা। ইহারই একধারে লাউয়ের মাচা। ঘরে ঢুকিবার দুই পাশে রঙ-বেরঙের ফুল গাছ। প্রবাসী কোন এক বাঙালী হাকিমের ফুলবাগানের মালীর বদান্যতায় সংগৃহীত। গ্রামের পাঁচজন এজন্য তাহাকে বলিতঃ বাবুলালের দেখছি হাকিমি সখ! সখ কেবল হাকিমদের জন্যই কি না ই' লইয়া সে কোন-দিনই মাথা ঘামায় নাই। ফুল তাহার কাছে ভাল লাগে, তাই আনিয়াছে। সেগুলি হয়ত আজ অযত্নে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

রান্নাঘর সমেত কুটীরটিতে মাত্র তিনখানি ঘর। পশ্চিমের ঘরটিতে ফুলি ও রামু থাকিত। তাহার নিজের জন্য বরাদ্দ ছিল ইহার পাশের ঘরটা। ফুলি বোধ হয় এখন রামুর শিয়রে বসিয়া তাহাকে বাতাস করিতেছে, অথবা হয়ত রামুর ব্যথাতুর বিবর্ণ মুখে হাসি ফুটাইবার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে। কখনও বা মাথাটা একটু টিপিয়া দিতেছে। কাল সারারাত এক দণ্ডের জন্যও বোধ হয় দুই চোখের পাতা এক করিতে পারে নাই। চোখ দুইটি তাই আজ জবাফুলের মত লাল। হয়ত শুশ্রূষা করিতে করিতে সে দারুণ অবসাদে ঢুলিয়া পড়িতেছে।

তাহার দৃষ্টি কি অসহায়! আশা-নিরাশার দোলায় সে দুলিতেছে। কেহ হয়ত ভুলেও তাহার ঘরে একবার উঁকি দেয় না। তবে মঙ্গলু......সে নিশ্চয়ই দিনে দুই-তিনবার আসিয়া দেখিয়া যায়। সেবার তাহার অসুখের সময় সে কি-না করিয়াছে।

এ সময় যদি সে থাকিত তবে কিছুতেই ফুলিকে রোজ রোজ রাত জাগিতে দিত না।

এমনি করিয়া ক্রমেই সে নিজেকে তাহার ছোট্ট কুটীর-খানির মধ্যে হারাইয়া ফেলে। অকস্মাৎ বামুন-ঠাকুরের আহ্বানে তাহার সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল।

এ'টোটা উঠিয়ে নে যা বাবুলাল!

নিঃশব্দে বাবুলাল উঠিয়া দাঁড়াইল। শরীরটা যেন দ্বিগুণ ভার বোধ হইতেছে। এ'টোটা সরাইয়া সে বসিয়া পড়িল। বামুন-ঠাকুর তাহার ব্যথাভরা শুষ্ক মুখের দিকে তাকাইয়া ঈষৎ চমকাইয়া উঠিলঃ কি হয়েছে রে তোর? ব্যথা পেয়েছিস না-কি কোথাও?

কোন ভূমিকা না করিয়া বাবুলাল সব খুলিয়া বলিল।

বামুন-ঠাকুর লোকটি ভাল। ঠিক বৃদ্ধ না হইলেও প্রৌঢ়ও নয়। জীবন-ঝুলিতে তাহার যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইয়াছে তাহা নেহাৎ কম নয়। এ রকম দুঃসংবাদ গরীবের পক্ষে যে কত মর্ম্মন্তুদ তাহা উহার অজানা নয়। আজ তাহার আপন বলিতে কেহ না থাকিলেও একদিন ত সবই ছিল। বাবুলালের মত সে-ও একদিন তাহার ছেলের কচি গাল দুইটি চুম্বনে চুম্বনে ভরিয়া দিত। দুই হাতে শূন্যে তুলিয়া, কখনও বা উপরের দিকে ছুড়িয়া, অথবা শুধু ছোড়ার ভঙ্গি করিয়াই তাহাকে হাসাইত।

তাহার চোখ দুইটি ছলছল করিয়া উঠিল। গভীর সহানুভূতি ভরা কণ্ঠে বলিলঃ তুই আজই বাড়ী চলে যা বাবুলাল।

বাবুলাল অভিভূতের মত বসিয়াছিল। ধীরে ধীরে বলিলঃ টাকা পাব কোথায়?

এই প্রশ্নের জবাব বামুন-ঠাকুর হঠাৎ দিতে পারিল না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিলঃ বাবুর কাছে সব বলগে যা। এমন বিপদে তিনি নিশ্চয়ই তোকে সাহায্য করবেন।

'রায়-মজুমদার এন্ড কোং'-এর চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার পলাশ দত্ত ও তাহার পত্নী বৈকালিক জলযোগ সমাপন করিতে-ছিলেন। এমন সময় বাবুলাল আসিয়া দাঁড়াইল।

কেকের খানিকটা মুখে পুরিয়া পলাশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেনঃ কি রে? কি চাস?

বাবুলাল বলিল।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তিনি বলিলেনঃ তা আমি কি করব?

আজ্ঞে এ মাসের মাইনেটা আর গোটা কয়েক টাকা........

বাধা দিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেনঃ মাস না ফুরোতেই মাইনে! আচ্ছা আব্দার ত!

আরতি দেবী এতক্ষণ কোন কথা বলেন নাই; এবার স্বামীকে সমর্থন করিয়া বলিলেনঃ মাস না পেরুতে পেরুতেই ওদের তাড়াহুড়ো লেগে যায়। পহেলা তারিখ মাইনে পেতে পেতে ওদের এমন হয়েছে যে..............

পলাশবাবু চায়ের কাপটা হাতে তুলিয়া বলিলেনঃ ঠিকই বলেছ।

বাবুলাল তাহাদের করুণা লাভের জন্য আরও বিনয়-নম্র কণ্ঠে বলিলঃ ছেলেটা তা হ'লে আর বাঁচবে না বাবু। ঐ আমার একটি মাত্র ছেলে; টাকার অভাবে ডাক্তার বদ্যি কিছুই দেখান হচ্ছে না। শক্ত ব্যারাম।

কিন্তু বৃথা।

শেষটা মরিয়া হইয়া বাবুলাল বলিলঃ আমার এই কুড়ি দিনের মাইনেই দিন, আমি আর থাকব না।

তাহার কণ্ঠস্বর একটু রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল।

আরতি দেবী চোখের ইসারায় স্বামীকে কি যেন বলিলেন। পলাশবাবুর সে ইসারার অর্থ বুঝিতে বেগ পাইতে হইল না। তিনি বেশ দৃঢ়কণ্ঠেই বাবুলালকে জানাইয়া দিলেন, মাস কাবারের পূর্ব্বে সে এক পয়সাও পাইবে না।

বাবুলাল ইহার প্রতিবাদ করিয়া প্রাপ্য টাকার জন্য জেদ করিতে লাগিল।

আরতি দেবী সামান্য একটা চাকরের এ প্রকার ঔদ্ধত্য সহ্য করিতে না পারিয়া স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেনঃ দেখছ কি রকম বেয়াদর; তোমার সামনে—

পলাশবাবুর সুপ্ত পৌরুষ চকিতে গর্জ্জাইয়া উঠিল বের হ হারামজাদা এখান থেকে! একটি পয়সাও দিচ্ছিনে তোকে; দেখি তুই কি করতে পারিস!...........

কি একটা কটু কথা যেন বাবুলাল বলিতে যাইতেছিল। কোন মতে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া বাহির হইয়া গেল।

দোর-গোড়ায় বামুন-ঠাকুরের সঙ্গে দেখা। সবই সে শুনিয়াছিল। পাঁচ টাকার একটা নোট তাহার হাতের মধ্যে গুঁজিয়া দিয়া সে বলিলঃ যা দেরি করিস নে আর!

হতভম্বের মত খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে বাহির হইয়া গেল। ধন্যবাদ দিবার মত শক্তিও তাহার ছিল না।

সে রাত্রে বাবুলালের যাওয়া হইল না। যে টাকা সে পাইয়াছে ইহাতে তাহার গাড়ী ভাড়াও চলিবে না, উদ্বৃত্ত থাকা ত দূরের কথা। তাহাকে আরও টাকা জোগাড় করিতে হইবে।

পরদিন ভোর না হইতেই সে বাহির হইয়া পড়িল টাকার খোঁজে। স্বজাতি বিজাতি অনেক বন্ধু-বান্ধবের দোরেই হানা দিল, কিন্তু কিছুই হইল না। কেউ বা মৌখিক সহানুভূতি দেখাইয়া বিদায় দিল, কেউ বা অপারগের ওজর তুলিয়া রেহাই পাইল। যাহারা একটু অধিক চালাক তাহারা বক্তব্য শেষে একথা কয়টি যোগ করিয়া দিতে ভুল করিল নাঃ তোর এ বিপদ...... . তোকে দেব তাতে আর কি; কিন্তু........ বুঝলি ত?

বাবুলাল শুনিল; বুঝিল তাহার অন্তরঙ্গদের গভীরতা। বাস্তবের কঠিন চিত্র তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল।

দুপুরের কাঠ-ফাটা রোদ এমনি করিয়া তাহার মাথার উপর দিয়া কাটিয়া গেল।

তৃষ্ণায় তাহার ছাতি ফাটিয়া যাইতেছিল। রাস্তার কল হইতে প্রাণ ভরিয়া জল পান করিয়া সে একটা গাছের ছায়ায় আসিয়া বসিল। ক্লান্তিতে তাহার শরীর ভাঙিয়া আসিতেছে। কাঁধ হইতে মলিন গামছাটা লইয়া সে সর্ব্বাঙ্গের ঘাম মুছিয়া ফেলিল। তারপর গামছা ঘুরাইয়া বাতাস খাইতে লাগিল।

সম্মুখে জনশূন্য রাজপথ। নীরব........নিস্তব্ধ! রোদ খাঁ খাঁ করিতেছে।

বাবুলাল বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। রামুর কথা ফুলির কথা, পলাশবাবুর ও আরতি দেবীর কথা, বামুন-ঠাকুরের কথা, নিজের দুরদৃষ্টের কথা, এমনি আরও কত কি! কিন্তু আশ্চর্য্য, কিছুই সে ঠিকমত ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছে না, সমস্তই এলোমেলো [illegible] যাইতেছে। নিজের অজ্ঞাতেই সে এক সময় তাহার গামছাটাকে একটা কুণ্ডলী পাকাইয়া মাথার তলায় দিয়া শুইয়া পড়িল এবং অচিরেই গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হইল।

নয়টা বাজিতে আর বিলম্ব নাই। ঘারভাঙ্গাগামী শেষ ট্রেন ছাড়িতে আর কয়েক মিনিট মাত্র বাকী। বাবুলাল তাড়াতাড়ি তৃতীয় শ্রেণীর একটা টিকিট কাটিয়া উঠিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গেই গার্ডের বাঁশী বাজিয়া উঠিল; গাড়ী ছাড়িয়া দিল। স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া সে বসিয়া পড়িল। দুই দিনের প্রাণান্তকর পরিশ্রমের ফলে সে পাথেয় জোগাড় করিয়াছে।

বাহিরের ঘন-অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া সে রামু ও ফুলির কথা ভাবিতে লাগিল।

এই একটু সরে বস।

ভাবিতে ভাবিতে বাবুলালের চেতনাশক্তি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। সে ইহা শুনিতে পাইল না। পার্শ্বস্থ যাত্রীটি মহা বিরক্তি সহকারে তাহার কাঁধ ধরিয়া প্রবল এক ঝাঁকুনি দিয়া পুনশ্চ বলিলঃ এই সরে বস!

বাবুলাল জ্ঞান ফিরিয়া পাইল।

ফিরিয়া চাহিতেই যাত্রীটির রোষকষায়িত দৃষ্টি তাহার মুখের উপর আসিয়া পড়িল। ইহার কণ্ঠস্বরের তীব্রতা তাহাকে অত্যন্ত ক্লেশ দিয়াছিল। অন্য সময় হইলে সে হয়ত ইহার প্রতিবাদ করিত। কিন্তু আজ কিছু না বলিয়াই সে সরিয়া বসিল।

ভোরের আলো ভাল করিয়া এখানে ওখানে ছড়াইয়া পড়িবার পূর্ব্বেই গাড়ী আসিয়া বাবুলালদের গ্রামের ষ্টেশনে থামিল। সে নামিয়াই উর্দ্ধশ্বাসে বাড়ীর দিকে পা চালাইয়া দিল। দুইধারে লঙ্কার ক্ষেত। ইহার ভিতর দিয়া সরু এক পায়ে-আঁকা পথ তাহার বাড়ী কাটাইয়া সর্পিল গতিতে চলিয়া গিয়াছে দূরে—অনেক দূরে। সে দ্রুত পথ চলিতে লাগিল। অর্দ্ধক্রোশের উপর পথ সে বিনা ক্লান্তিতে মাত্র কয়েক মিনিটে অতিক্রম করিল। আর কয়েক মিনিটের পথ, তার পরেই তার বাড়ী। ঐ যে বাড়ীর সামনের আম-বাগানটা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। কিন্তু তাহার পা যে আর চলিতেছে না। দূরত্বের ব্যবধান যতই কমিয়া আসিতেছে, কে যেন ততই তাহার শক্তি কাড়িয়া লইতেছে। ঠিক অবসাদে নয়; অনিশ্চিত সম্ভাবনায়। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে তাহার মনের যে অবস্থা ছিল, এখন অবিকল তাহার বিপরীত।

শ্লথপদে চলিতে থাকিলেও একসময় নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া পৌঁছিতে হয়। বাবুলালও পৌঁছে।

দোরগোড়ায় পা দিতে না দিতেই ফুলির বুক-ভাঙ্গা আর্ত্তনাদ আকাশ বাতাস মথিত করিয়া তাহার মর্ম্মে আসিয়া দারুণভাবে আঘাত করে।

অস্ফুট কাতরোক্তি করিয়া বাবুলাল উঠিয়া বসিল। তাহার গা বাহিয়া দর দর করিয়া ঘাম বহিতেছে গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে। শরীর অবসন্ন।

(শেষাংশ ৪৪২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বিচিত্র বার্ত্তা

সোপ্‌বক্স ডার্বি

একরন্ (ওহিও, মার্কিন যুক্তরাজ্য) শহরের ডার্বি ডাউন্‌স্-এ যে বাঁধান দৌড়ের মাঠ রহিয়াছে ক্রমশ ঢালু-ভাবে তৈরী, উহাতে প্রতি বৎসর আগষ্ট মাসের ১২—১৪ তারিখ পর্য্যন্ত ছোটদের মোটর দৌড় হয়। বাড়ীতে তৈরী অতি ক্ষুদ্রাকার গাড়ী ব্যবহৃত হয় এই প্রতিযোগিতায়; এই-জন্য গাড়ীগুলিকে বলা হয় সোপ বক্স (Soap-Box)। বিগত ছয় বৎসর ধরিয়া এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইতেছে এবং দর্শক-সংখ্যা বর্ত্তমানে এক লাখেরও উপরে উঠিয়া গিয়াছে। ১৯৩৮ সালে বিজয়ী হয় ১৪ বৎসর বয়স্ক রবার্ট বার্জার (নেব্রাস্কা অঞ্চলের)। পুরস্কার হইল চারি বৎসরব্যাপী যে কোন কলেজের স্কলারশিপ, একটি সোনার পদক, ও একটি রূপার কাপ। কনক্রিটের তৈরী ঢালু চত্বরটির গা বাহিয়া উপরে উঠিয়া যাইতে নিজ নিজ "সোপ বক্সে"র গতি দ্রুত রাখা কিশোরদের পক্ষে সহজ নয়। বিশেষ করিয়া যন্ত্রটি যখন গৃহনির্ম্মিত। এই প্রতিযোগিতার পৃষ্ঠপোষক বিখ্যাত শেভ্রোলে মোটর কোম্পানি।

সোপবক্স ডার্বি অর্থাৎ ছোটদের মোটর প্রতিযোগিতা

খেলা-ধূলার বয়সে সোনার যুগ

ওহিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ হার্ভে সি লেহ্‌ম্যান্ নিপুণ খেলোয়াড়দের বয়স ও চরম কৃতিত্ব-কাল লইয়া গবেষণা করিয়া নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন আমেরিকান্ সাই-কোলজিক্যাল এসোসিয়েশনের নিকট ঃ—

খেলোয়াড়গণের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ নিপুণতা অর্জ্জনের বয়স—২৫ হইতে ৩০ পর্য্যন্ত গড়ে।

'বেস্‌বল্' খেলার যোগ্যতম বয়স—২৮। এবং এ খেলায় যাহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহাদের বয়স ২৫ হইতে ৩০ পর্য্যন্ত রহিয়াছে।

টেনিসে ২২ হইতে ২৬ পর্য্যন্ত বয়সের খেলোয়াড়গণই শ্রেষ্ঠ। যাহারা ঘরের ভিতর কৃত্রিম আলোকে টেনিস খেলেন, তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা ২৫ হইতে ৩০ বৎসরের মধ্যে। কৃত্রিম আলোকে টেনিস খেলোয়াড়দের বয়স বেশী দেখা যায় এইজন্য যে, তাহারা বিষয়কর্ম্মের জন্য মুক্তবায়ুতে খেলার সময়ে যোগদান করিতে পারে না।

বন্দুক, পিস্তলের গুলীর তাগ করিতে, বিলিয়ার্ড খেলায়, মোটর গাড়ীর দৌড়ে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিদের বয়স ২৫ হইতে ২৯।

ক্রিকেট খেলার—৩০ হইতে ৩৪।

মুষ্টিযোদ্ধাদের ভিতর ২৪ হইতে ২৭ বৎসরই দেখা যায় তাহাদের চরম উন্নতির বয়স

বহুরূপী ব্যাঙ্

এক জাতীয় গেছো-ব্যাঙ্ আছে 'হাইলা' (Hyla) নামে—উহা দেড় ইঞ্চির বেশী লম্বা নয়; কিন্তু উহার দুইটি থাবায় এমন আঠাবৎ পদার্থ রহিয়াছে, যাহার বলে উহারা গাছের ছাল আঁকড়াইয়া থাকিতে পারে, এমন কি কাচের পরকলার গায়েও লাগিয়া থাকিতে পারে, পড়িয়া যায় না। ইহারা প্রকৃতিতে উভচর; কিন্তু বাস করে গাছে। গাছের ছালের সংগে বেমালুম রঙ্ মিলাইয়া উহারা গা-ঢাকা দিয়া থাকে, কাজেই দুষমনরা উহাদের খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে না। রঙ্ মিলাইবার শক্তি উহাদের সহজাত—সাধারণত ইহারা সবুজ রঙের হইলেও, সবুজ হইতে ছাই-রঙ্, খয়েরি, হলুদ-রঙ্, এমন কি বেগুনে-লালও ইহাদের সময় সময় হইতে দেখা যায়। গাছের ছালের যে রঙ্ সেই রঙের আভার নকল করিয়া উহারা নিজ দেহের রঙ্ বদ্‌লায়। আবার দেহ এতটুকু হইলেও অতি উচ্চ ও গম্ভীর স্বরে ডাকিতে আরম্ভ করে, তখন উহাদের গলার দুই পাশের থলিয়া ফুলিয়া উহার মাথার চেয়েও বড় হয়।

কাফির রেওয়াজ

কাফির জন্ম আফ্রিকায় হইলেও, বাস্তবে উহার প্রথম চাষ চলে আরবে—সুদূর পঞ্চদশ শতকে। যতদূর জানা যায় ইহাই প্রাচীনতম ব্যবহারের নির্ভরযোগ্য বিবরণ। কিন্তু কি উপায়ে কাফিপানের রেওয়াজ সর্ব্বপ্রথম প্রচলিত হইল সিরিয়ায় সে সম্বন্ধে একটি জনশ্রুতি সমগ্র সিরিয়া প্রদেশে প্রসারলাভ করিয়াছে।

সিরিয়ার কোনও মসজিদে এক মোল্লা তাঁহার চেলা-চাপাটি সহ বাস করিতেন। একদল ছাগল ছিল তাঁহাদের দুগ্ধ ও পশম সংগ্রহের জন্য। কিছুদিন পরে দেখা গেল ঐগুলি অতিশয় দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিয়াছে—কিছুতেই আর উহাদের বাগ মানাইয়া রাখা যায় না। মোল্লা সাহেব উৎকণ্ঠিত হইয়া ছাগ-পালকের উপর আদেশ দিলেন—কি কি দ্রব্য উহারা বনে চরিতে যাইয়া ভক্ষণ করে তাহার উপর লক্ষ্য রাখিতে। কারণ মসজিদে উহাদের তেমন কোন খাদ্য দেওয়া হয় না, তথাপি যখন উহারা এতটা তেজস্বী হইয়া উঠিতেছে, তাহার কারণ নিশ্চয়ই কোন বন্য খাদ্য। কয়েকদিন ছাগ-যূথের উপর নজর রাখিয়া পালক সংবাদ দিল যে, ছাগগুলি বন্য এক প্রকার গাছের পাতা ও উহার লাল লাল ফলই খায়। অন্য গাছ বা ঘাস ছোঁয় না, যেখানে ঐ নির্দ্দিষ্ট গাছ পাওয়া যায়—দুর্গম হইলেও উহারা খুঁজিয়া খুঁজিয়া তথায় যায় এবং তাহাই মাত্র খায়। মোল্লা সাহেবের অতিশয় কৌতূহল হয়; তিনি বনে যাইয়া গাছগুলি পরীক্ষা করেন। তাঁহার মনে হয়, ছাগলগুলির যাহাতে এত পুষ্টি সম্ভব হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই মানবের পক্ষেও পুষ্টিকর। তাই প্রথম তিনি পাতার রস ব্যবহার করিতে বলেন অনুচরদের; কিন্তু উহা অতিরিক্ত কষায় বলিয়া পরিশেষে উহার ফল খাইবার ব্যবস্থা করেন। তাহাও শুধু রুচিকর হয় না। পরিশেষে উহা জলে সিদ্ধ করিয়া সরবৎ পানের প্রণালী গৃহীত হয়। ইহার আশ্চর্য্য গুণ তিনি দেখিতে পান তাঁহার চেলাদের উপর—কেননা, পূর্ব্বে তিনি যখন ধর্ম্মকথা আলোচনা করিতেন তখন চেলারা বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতে থাকিত, কিন্তু কাফি ফলের সরবৎ পান করিবার পর হইতে তাহারা আর সেইপ্রকার নিদ্রালু হয় না। এই প্রকারে পণ্ডিত ব্যক্তি ও ধার্ম্মিকগণের ভিতর কাফি পান নিয়মে দাঁড়ায়। এবং উৎসবাদিতে ও সামাজিক অনুষ্ঠানে কাফির সরবতের ব্যাপক ব্যবহার চলে। বহুবর্ষ পরে উহা জনসাধারণের ভিতর সমাদর প্রাপ্ত হয়।

আবাসের কাল্পনিক বিক্রয়

পরলোকগত অভিনেতা উইলিয়ম গিলেট্ (শার্লক্ হোম্‌স্ ভূমিকা অভিনয়ের জন্য প্রসিদ্ধ) কনেক্‌টিকাট্ নদীতীরে এক টিলার উপরে যে বিচিত্র গৃহাবাস নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বিক্রয়ের সর্ত্ত রহিয়াছে অদ্ভুত। আবাস-নির্ম্মাণে যে সকল বিচিত্র ইঞ্জিনীয়ারিং কৌশলের নিদর্শন সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহার কোনপ্রকার অদল-বদল করা চলিবে না। পাহাড়ের গোড়া হইতে চূড়াস্থিত প্রাসাদে গমন করিবার জন্য রেলপথ, ছোট রেলগাড়ী, ইঞ্জিন প্রভৃতি রহিয়াছে। রেলপথে আবার সেতু, সুড়ঙ্গ প্রভৃতি আছে। কোথাও ঝরণা, কোথাও ফোয়ারা, কোথাও দীর্ঘিকা নির্ম্মাণ করা আছে। প্রাসাদের প্রাচীর কোথাও কোথাও চার ফুট পুরু। তাঁহার ভাঁড়ার ঘর রহিয়াছে একটি টিলার উপর—চওড়া সিঁড়ি টিলাটির পাদদেশ হইতে চূড়া পর্য্যন্ত—পাদদেশে দোর আছে। পরলোকগত গিলেটের এইরূপ সর্ত্ত দিবার উদ্দেশ্য, যে তাঁহার ইঞ্জিনিয়ারিং কৃতিত্ব পছন্দ করিবে এবং সকল জিনিষ হুবহু অটুট রাখিবে, সে-ই যেন ক্রেতা হয়। গিলেট নিজেই এই গৃহ নির্ম্মাণের সমগ্র পরিকল্পনা করিয়াছেন; সেইজন্যই তাঁহার এত দরদ।

হোটেল-মালিকের প্রচার-কার্য্য

কানসাস্ সিটির (ক্যানসাস, আমেরিকা) এক প্রসিদ্ধ হোটেল-মালিক নিজ হোটেলের মর্য্যাদা ও সুনাম বৃদ্ধির জন্য অভিনব পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। সাধারণভাবে বিজ্ঞাপন সে দেয় না কোনও দৈনিক বা সাময়িক পত্রে। একটি ছোকরা নিযুক্ত রহিয়াছে, সে হোটেলের ফটকে দাঁড়াইয়া ট্যাক্সী ভিন্ন যে সকল মোটর গাড়ী হোটেলে সমাগতদের বহন করিয়া আনে, সে সকল গাড়ীর নম্বর টুকিয়া লয়। ইহার পর প্রতি নম্বরের জন্য এক সেণ্ট 'ফি' কোর্ট-হাউসে প্রদান করিয়া মোটরের মালিকের নাম-ঠিকানা জানিয়া লয়। পরদিন প্রাতে দৈনিকপত্রে এই হোটেলে সমাগতদের নামের তালিকা ছাপা হয়। এইখানেই শেষ নয়; হোটেল-মালিক ঐ সকল নাম-ঠিকানা অনুযায়ী স্বয়ং চিঠি লিখিয়া দেন—পুনরায় এই হোটেলে পদার্পণ করিবার আহ্বান সহ। মোটর-মালিকেরা অবশ্য বিস্মিত হয়, হোটেল-মালিকের তৎপরতার প্রীতিও হয় কম নয়। কাজেই হোটেলের ব্যবসা বেশ জাঁকাইয়া চলে।

আপন ও পর

(৪৪০ পৃষ্ঠার পর)

অনেকক্ষণ পর বুঝিতে পারে যে, সে স্বপ্ন দেখিতেছিল।

কিন্তু কি ভীষণ দুঃস্বপ্ন! সে ভাবে আর মনে মনে শিহরিয়া উঠে। তবু স্বপ্ন।

কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া সে মস্ত একটা নিশ্বাস ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আবার তাহাকে টাকার জন্য ছুটিতে হইবে।

পথে নামিতেই পলাশবাবুর মোটরটা একরাশ ধূলি উড়াইয়া বাবুলালের সম্মুখ দিয়া দ্রুত চলিয়া গেল। মোটরে পলাশবাবু, আরতি দেবী এবং তাহাদের একমাত্র সন্তান রবি। রবির হাতে সুদৃশ্য এবং মূল্যবান খেলনা; আর আরতি দেবীর হাতে একখানা দামী শাড়ী। বোধ হয় মার্কেটিং করিয়া তাঁহারা বাড়ী ফিরিতেছিলেন।

চাঁদ সওদাগর

(গল্প)

শ্রীমনোরঞ্জন হাজরা

মানুষের পথের পাথেয় যখন ফুরিয়ে যায়, তখন হয় নিঃসম্বল অবস্থায় তাকে কোন এক জায়গায় ব'সে পড়তে হয়, নয়ত ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা পাথেয় যোগাড় ক'রে গন্তব্য-স্থানে পৌঁছুতে হয়। বন্দর গ্রামের শ্যামাদাসের জীবনে একদিন এই সমস্যা অত্যন্ত বাস্তবরূপে দেখা দিল। জীবনের চারভাগের তিনভাগ কাটিয়ে দিয়ে এসে আজ সে একান্তরূপে নিঃসম্বল হ'য়ে পড়েছে--নিঃসম্বল শুধু আর্থিক দিক দিয়েই নয় নিজের কর্ম্মশক্তির দিক দিয়েও। লোকে তাকে বলে, তার কোন মেয়ের বাড়ীতে যেতে—সেখানে অন্তত প্রতিদিন দুমুঠো খেতে পাবে সে। শ্যামাদাস যেতে চায় না। জীবন-যাত্রায় পথে এমন জিনিষ তার ফুরিয়েছে, যার অভাবে বেচারা কোথাও না পারে বসতে এবং না পারে কারও কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে স্বচ্ছন্দে জীবনের বাকী কটা দিন কাটিয়ে দিতে। তার যা' অভাব সে অভাব পূরণ করতে কেউ পারবে না। তবু বাইরের অভাবটা, অর্থাৎ পেটের ক্ষুধার যে সমস্যাটা, সেটা যদি তার মিটে যায় তাহ'লেও না হয় একবার সে চেষ্টা ক'রে দেখত। কিন্তু দুর্দ্দিনের বাজারে তাও হবার জো নেই।......

সারাদিন ধ'রে বন্দরের কোল দিয়ে বয়ে যাওয়া রূপ-নারায়ণের তীরে ব'সে ব'সে শ্যামাদাস যাত্রীবাহী ও মালবাহী শত শত নৌকার দিকে তাকিয়ে থাকে। বার্দ্ধক্য এসে তাকে পঙ্গু ক'রে ফেলেছে, মাথার চুল হ'য়ে গেছে শাদা—যে লাঠি-খানায় ভর ক'রে সে চলাফেরা করে, সেখানা পাশে প'ড়ে থাকে। সারাদিনের মধ্যে কেউ যদি তাকে ডেকে দুটো খেতে দিলে ত তার খাওয়া হ'ল, তা'নাহ'লে উপবাস দিয়েই তাকে কাটাতে হয়। দিনান্তে সন্ধ্যা আসে, আকাশে ফুটে ওঠে একটি একটি ক'রে তারা, জলে পড়ে সে-সবের ছায়া—শ্যামাদাস লাঠিটায় ভর ক'রে উঠে পড়ে; তারপর ঠুক্ ঠুক্ ক'রে চলতে থাকে বাজারের দিকে। বাজারের কোন দোকানের দাওয়ায় অথবা আটচালায় শুয়ে রাত কাটিয়ে দেয়। গ্রীষ্ম নেই, বর্ষা নেই, সকল সময়েই সে এমনি ক'রে কাটিয়ে আসছে।

এই বন্দরগ্রামেই শ্যামাদাসের জন্ম এবং এখানেই তার জীবনের সমস্ত দিনকটা কেটে গেছে। জায়গাটা মন্দ নয়। দারকেশ্বর ও শিলাবতী—এই দুটি নদী এইখানে এসে একত্র মিশেছে এবং এদের মিলনে এখান থেকে রূপনারায়ণের উৎপত্তি হ'য়েছে। এই রূপনারায়ণের পূর্ব্বদিকে বন্দরগ্রাম-খানি অবস্থিত। এই গ্রামখানি এদিককার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী গ্রাম এবং একটি ব্যবসার কেন্দ্র। শ্যামাদাস একদিন খুব বড় আলু-ব্যবসায়ী ছিল। এই আলুর ব্যব-সায়ের দ্বারাই সে তিন তিনটি মেয়ের বিবাহ দিতে সমর্থ হ'য়েছিল; তার ছেলে ছিল না--থাকলে মানুষ করার দিক দিয়ে আদৌ অসুবিধা ঘট্‌ত না। কিন্তু সেকথা যাক্, একদিন আলুর ব্যবসায়ে অসম্ভব রকমে লোকসান দিয়ে তাকে ব্যবসা থেকে বিদায় নিতে হ'ল। সেদিনকার কথা মনে ক'রে আজও শ্যামাদাস বুকের ভিতরে একটা ভয়ানক রকমের জ্বালা অনুভব করে। সমস্ত আলুর নৌকাগুলো বন্দর থেকে বাক্সীর হাটে যাবার পথে ঝড়ো হাওয়ায় রূপনারায়ণের অতলজলে তলিয়ে গেল। তারই ব্যথায় আজও তার বুক-খানা ব্যথিয়ে ওঠে এবং আজও তাই সে রূপনারায়ণের তীরে ব'সে ব'সে যাত্রীবাহী হোক্ বা মালবাহী হোক্, নৌকাগুলো গেলেই একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখে এবং ভাবে তার ব্যবসা যদি ভালভাবে চল্‌ত, তাহ'লে তারও নৌকাগুলো এমনি ক'রে দূর-দূরান্তরে পাড়ি দিত। সারাদিন ধরে এমনিতর ভাবনায় মনের ভিতরটা তার হাহাকার ক'রে ওঠে এবং সে পাগলের মত চীৎকার ক'রতে থাকে—ঐ-ঐ চাঁদসদাগরের সপ্তডিঙা ডুবে গেল।

শ্যামাদাসের এই চীৎকারে গ্রামের ছোট ছেলের দল বেশ আনন্দ উপভোগ করে। তারা দল বেঁধে শ্যামাদাসের পিছনে লাগে। বলে, ও চাঁদসদাগর, তোমার সপ্তডিঙায় আমাদের বেড়াতে নিয়ে যাবে ?

শ্যামাদাস ক্ষেপে ওঠে। হাতের লাঠিটা ঠুকে সে ছেলের দলকে তাড়া ক'রে যায়। ছেলেরা খানিকটা সরে গিয়ে শ্যামাদাসকে পুনরায় আক্রমণ করে। বলে, পথ ছেড়ে দাও—পথ ছেড়ে দাও চাঁদসদাগর আসছে !

মুখে যা আসে তাই ব'লে শ্যামাদাস ছেলেদের গালাগালি দেয়। ছেলেরা কেউ তার গায়ে থুতু দেয়। কেউ ঢিল ছুড়ে মারে। শ্যামাদাস খানিকটা নড়ে' গিয়ে বসে। বয়স্ক যদি কেউ পথ দিয়ে যায় ত ছেলেদের খানিকটা শাসন ক'রে দেয়। ছেলেরা পালিয়ে যায়, শ্যামাদাস খানিকটা বাঁচে।

এমনিতর শ্যামাদাসের জীবন। জীবনের তিনকাল বন্দরগ্রামে কাটিয়ে দিয়ে শ্যামাদাস আর শ্যামাদাস নেই—ছোট ছেলেদের কাছে যেমন, তেমনি সকলের কাছেই সে চাঁদসদাগর নামে পরিচিত। সবাই তাকে এই নামেই ডাকে।

ধীরে ধীরে শীতের দিন আসে।......

শীত পড়লেই যত বুড়োবুড়ীদের বিপদ। শীতের হাওয়ায় তারা টিঁকে থাকতে পারে না—জীবনের সবকিছু ফেলে রেখে চ'লে যেতে হয় পরপারে। লোকে আশঙ্কা করল চাঁদসদাগরও বোধ হয় এ শীতে আর বেঁচে থাকতে পারবে না। স্বাভাবিক, কয়েকদিনের দুরন্ত শীতের মধ্যেই শ্যামাদাস যেন মৃতপ্রায় হ'য়ে উঠল। প্রত্যহ রাত্রে মলমূত্র মাথা অবস্থায় বেচারা বাজারের কোন না কোন জায়গায় প'ড়ে থাকে। কে একজন দয়া ক'রে তাকে একখানা চাদর দিয়েছিল, তাইতেই বেচারাকে শীত নিবারণ করতে হয়। কিন্তু প্রত্যহই সে সব এমনিতর নোংরা হ'য়ে যায় যে তাতে শীত নিবারণ করা আর চলে না। সকালে উঠে সে নিজেই এসব ধুয়ে ফেলে, রৌদ্রে শুকোতে দেয়। লোকে দেখল, এমনি ক'রে চললে সে বেশী দিন বাঁচতে পারবে না, তাই তারা জোর ক'রে তাকে কলকাতায় তার ছোট মেয়ের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিল।

একদিন তার যথেষ্ট পয়সা ছিল, তাই দেখে শুনেই সে মেয়েদের বিবাহ দিয়েছিল। ছোট মেয়ে বীণা বেশ পয়সা-ওয়ালা ঘরে পড়েছিল। জামাইয়ের কলকাতায় বাসনের কারবার আছে, তাতেও বেশ দু'পয়সা আসে। বীণার পাঁচ-ছ'টি ছেলেমেয়ে। বাবাকে পেয়ে সে বেশ আনন্দিত হ'ল। অনেকদিন হ'ল তার মা মারা গিয়েছে, বুড়োবয়সে বাবাকে দেখবার কেউ নেই, সে কথা ভেবে বীণা প্রাণপণে বাবার সেবা ক'রতে লাগল। মাসখানেকের মধ্যে শ্যামাদাসের অনেক পরিবর্ত্তন হ'ল। তার স্বাস্থ্য ফিরে গেল, চাঁদসওদাগরের সপ্তডিঙা ডুবে গেল ব'লে তার চীৎকারও বন্ধ হ'ল। ছোট ছোট নাতি-নাতনীদের নিয়ে সে খেলা করে, তাদের গল্প বলে, তাদের কোলে-পিঠে ক'রে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

সকাল-বিকাল ক'লকাতার পার্কে পার্কে সে বেড়াতে যায়। ক্রমে ক্রমে মন তার প্রফুল্লতায় ভ'রে উঠ্‌ল। বুড়ো-বয়সে মানুষের প্রয়োজন অনেক কমে আসে, কিন্তু তবুও বীণা বাবাকে প্রায়ই পয়সা-কড়ি দেয়। যাতে অন্তত নিজের ইচ্ছেমত খরচ ক'রে সে মনের আনন্দে থাকতে পারে। পথে বেরিয়ে শ্যামাদাস এইসব পয়সা খরচ ক'রে ফেলে। হয় নাতি-নাতনীদের জন্য খেলনা প্রভৃতি কেনে, নয়, তাদের জন্য নানারকমের খাবার কেনে। বড় নাতনী লীলার বয়স প্রায় বার। সে তার দাদুকে খুবই ভালবাসে। খেলনা প্রভৃতিতে তার মন ওঠে না, সে কেবল বুড়োর কাছে বসে গল্প শুনতে চায়। লীলার এই আব্দার, তার ভাইবোনেদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়, তারাও দাদুর কাছে গল্প শুনতে চায়।

এমনি ক'রে মাসতিনেক কেটে গেল।......

হঠাৎ একদিন বৈশাখের এক সন্ধ্যায় শ্যামাদাসের অদ্ভুত একটা পরিবর্ত্তন দেখা গেল। লীলা ছোট ভাইবোনেদের নিয়ে দাদুর কাছে গল্প শুনবে ব'লে এসে বস্‌ল। শ্যামাদাস বসেছিল ছাদে, আকাশের নক্ষত্র দলের দিকে তার দৃষ্টি ছিল নিবদ্ধ; সে যেন কি ভাবছিল। সন্ধ্যাটা ছিল অত্যন্ত গুমোট, গরম হচ্ছিল ভয়ানক।

লীলা দাদুর একখানা হাত ধ'রে বল্‌লে, দাদু একটা গল্প বল না?

শ্যামাদাস ঈষৎ হেসে বল্‌লে, কি গল্প বল্‌ব দিদি—সব যে ফুরিয়ে গেছে।

লীলা শুনল না। আব্দারের ভঙ্গীতে বল্‌লে, না বলতেই হবে একটা। লীলার ছোট ছোট ভাইবোনগুলিও এই একই কথা বল্‌লে!

নিরুপায় হ'য়ে শ্যামাদাস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌ল। তারপর বল্‌লেঃ একান্তই যখন ছাড়বিনা তোরা, তখন শোন্—

দাদু, কিন্তু ভাল গল্প বল্‌তে হবে আর বড়ঃ বড় নাতি মণ্টু বল্‌লে।

আচ্ছা দাদু তাই হবেঃ শ্যামাদাস বল্‌লেঃ চাঁদসদাগরের গল্প শুনবে—চাঁদসদাগর?

চাঁদসদাগরের গল্প লীলা খানিকটা জানত। সে বল্‌লেঃ সেই তো নৌকো ডুবি হবে?

তুই তাহ'লে জানিস্ দেখ্‌ছিঃ শ্যামাদাস বল্‌লে। অন্য সবাই এ গল্প জানে না, তারা হৈ-চৈ ক'রে ব'লে উঠ্‌লঃ আমরা জানি না—আমরা জানি না দাদু, তুমি বল!

লীলা বল্‌লেঃ আমিও সবটা জানি না।

মণ্টু অধীরভাবে ব'লে উঠ্‌লঃ তুমি আরম্ভ কর দাদু—

শ্যামাদাস গল্প আরম্ভ কর্‌ল। নাতি-নাতনীরা একাগ্রচিত্তে শুনতে লাগ্‌ল। অন্যদিন গল্প বলার সময় নাতি-নাতনীরা 'হুঁ' না দিলে শ্যামাদাসের গল্প বলাই হয় না, কিন্তু এখন আর 'হুঁ' দেবার প্রয়োজন হ'ল না, সে শুধু আপন খেয়ালেই গল্প ব'লে চল্‌ল। যেখানে চাঁদসদাগরের সপ্তডিঙা ডুবে যাবে, সেখানে এসে শ্যামাদাস একটু থাম্‌ল।

নাতি-নাতনীরা তাকে থামতে দেখে সমস্বরে ব'লে উঠ্‌লঃ তারপর?

তারপরঃ শ্যামাদাস বল্‌লেঃ আমি যে চাঁদসদাগরের কাহিনী বল্‌ছি এর সাতখানা ডিঙি নয়, বিশখানা ডিঙি—ঝড়ো হাওয়ার বেগ সহ্য ক'রতে না পেরে মোচার খোলার মত রূপনারায়ণের জলে ডুবে গেল।...... এই কথাগুলি বল্‌তে বল্‌তে শ্যামাদাসের চোখে জল এসে পড়েছিল। তাই সে নিজেকে সম্বরণ করবার জন্য একটু থাম্‌ল।

নাতি-নাতনীরা পুনরায় সমস্বরে ব'লে উঠ্‌লঃ তারপর দাদু—তারপর?

শ্যামাদাস উত্তর দিতে যাবে এমন সময় সিঁড়ির পথ হ'তে কণ্ঠস্বর শোনা গেলঃ বাবা আবার ঐসব গল্প বলছ?

শ্যামাদাস চমকে উঠ্‌ল। বীণার কণ্ঠস্বর। বীণা কি তাহ'লে দাঁড়িয়ে সব শুনেছে? শ্যামাদাস বল্‌লেঃ না মা এরা ধরেছিল গল্প শোনার জন্যে—

বীণা এগিয়ে এল। তারপর বল্‌লেঃ কিন্তু আর কি গল্প ছিল না বাবা?

শ্যামাদাস চুপ ক'রে আকাশের দিকে তাকাল। হঠাৎ তার নজরে পড়ল—পশ্চিমাকাশ ছেয়ে কাল মেঘ জমাট বেঁধে উঠেছে। যেন ঝড়ের পূর্ব্বাভাষ, এখনই ঝড় উঠে সমস্ত পৃথিবীতে প্রলয়কাণ্ড সুরু ক'রে দেবে। শ্যামাদাসের মাথাটা যেন কেমন ঘুলিয়ে উঠ্‌ল।

বাণী তার ছেলেমেয়েদের ধমক দিয়ে বল্‌লেঃ এই তোরা সব নীচে চল্—খাবার দেওয়া হয়েছে খাবি চল্—

ছেলেমেয়েরা সব মাকে ভয় করে। তাড়াতাড়ি সবাই নীচে নেমে গেল। বীণা এবার বাবাকে বল্‌লেঃ চল বাবা খাবে চল—

শ্যামাদাস কোন কথা বল্‌ল না, নীরবে উঠে দাঁড়াল। তারপর পশ্চিমাকাশের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে নীচে নেমে গেল।

নীচে খাবার দেওয়া হ'য়েছিল। নাতি-নাতনীদের সাথে শ্যামাদাস এক সঙ্গে খেতে বস্‌ল। মণ্টু হঠাৎ ব'লে উঠ্‌লঃ দাদু গল্পটা এখনও শেষ হয়নি—বিশখানা ডিঙি ডুবে যাবার পর কি হ'ল?

কি হ'লঃ এদিক ওদিকে তাকিয়ে নিয়ে শ্যামাদাস

বল্‌লেঃ ডিঙিগুলো ডুবে যেতে চাঁদসদাগরের মাথা খারাপ হ'য়ে গেল। সে সময়ে তার বউ অসুখে ভুগছিল, চিকিৎসার অভাবে মারা গেল। তারপর মহাজনের টাকার তাগিদে চাঁদসদাগরের বাস্তু ভিটেটুকু পর্য্যন্তও বিক্রী হ'য়ে গেল।

তারপরঃ মণ্টু জিজ্ঞাসা ক'রল।

তারপর থেকে চাঁদসদাগর শুধু পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লঃ ব'লে শ্যামাদাস যেন খানিকটা উৎসুকভাবে কান পেতে কি শোনবার চেষ্টা ক'রতে লাগ্‌ল।

বাইরে ঝড় উঠেছে। ধুলো ও জঞ্জালে পাছে ঘরদোর সব নোংরা হ'য়ে যায় তারই জন্য বীণা সব দরজা-জানালা বন্ধ ক'রে বাবার কাছে এসে বস্‌ল। শ্যামাদাস কেমন যেন অন্যমনস্ক। বীণার দৃষ্টিতে সেটুকু এড়িয়ে গেল না। বাবাকে ভালভাবে রাখবার জন্য তার প্রাণপণ চেষ্টা। কিসে সে বাবাকে আনন্দে রাখ্‌তে পারবে, সদাসর্ব্বদা সে এইকথা ভাবে। তাই কয়েকদিন ধ'রে স্বামীর সঙ্গে সে পরামর্শ ক'রে একটা কিছু পথ বের করবার চেষ্টা করছিল। গত রাত্রে সে একটা পথ পেয়েছে। বাবাকে সেটা বল্‌বার এই উপযুক্ত সময় ভেবে, সে বল্‌লেঃ বাবা একটা কথা বল্‌ব?

ঃকি কথা মা?

ঃএই ধর যদি কিছু টাকা তোমাকে দিই, তুমি আবার আলুর ব্যবসা ক'রবে?

ঃনা মা আর ওপথে নয়। আগেকার মত আমার আর সামর্থ্যও নেই, তাছাড়া হয়ত, হয়ত আবার আমার সব ডুবে যাবে—

বীণা ধীরভাবে শুধু বল্‌লেঃ একবার চেষ্টা ক'রে দেখ্‌লে হ'তনা?

না-না-নাঃ শ্যামাদাসের কণ্ঠস্বরে যেন বিরক্তির আভাষ পাওয়া গেল। বীণা আর কোন কথা বল্‌ল না। শ্যামাদাস খাওয়া শেষ ক'রে উঠে পড়ল।

বাইরে ঝড়ো হাওয়ার আর্ত্তনাদ উত্তরোত্তর বেড়ে উঠ্‌ল। হয়ত বা কালবৈশাখী হবে। শ্যামাদাসের মাথা ক্রমশই যেন আরও ঘুলিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। গোটা দুই পান মুখে দিয়ে সেই ঝড়ে শ্যামাদাস পথে বেরিয়ে পড়ল। বীণা দরজার কাছে ছুটে এসে বল্‌লেঃ এই কালবোশেখী মাথায় ক'রে কোথায় বেরুচ্ছ বাবা?

ঃআস্‌ছি এখুনিঃ ব'লে শ্যামাদাস সোজা চল্‌ল হাওড় ষ্টেশনের দিকে। ষ্টেশনে পৌঁছেই সে কিন্‌লে রাণীরচকে এক টিকিট। রাণীরচক থেকে সে যাবে বন্দর। ঝড়ের দাপা দাপি সুরু হ'য়েছে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে। মনের মধ্যেও তা অমনিতর ঝড় উঠেছে। তার কেবলই মনে হ'চ্ছে, এখন এই ঝড়ের মুখ থেকে সে নৌকাগুলোকে বাঁচাতে পারবে তাই সে যেন এক মুহূর্ত্তও স্থির থাক্‌তে পারছে না! কখ গাড়ী ছাড়বে—কখন গাড়ী ছাড়বে!

* * * * *

সেইদিনই শেষরাত্রির কথা।

তখনও বন্দর গ্রামখানির চারিদিকে ঝড়ের তুমুল মাতা মাতি চলেছে। বৃষ্টি পড়ছে মুষলধারে। ঝড়ের দুর্দ্দম নীয় বিক্রমে গাছপালার অসহায় আর্ত্তনাদ শোনা যাচ্ছিল কোথাও গাছপালা সব সমূলে উৎপাটিত হ'য়ে যাচ্ছিল কোথাও ভেঙে পড়ছিল শাখা-প্রশাখা। লোকজন সব সভয়ে আপন আপন ঘরের অন্তরালে, দেবতার নিকট সানুন প্রার্থনা জানাচ্ছিল—যেন এই বিপদের রাত্রি কোন রকমে তারা পার হ'য়ে যেতে পারে।

মাঝে মাঝে বন্দরবাসীদের কানে একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর এসে লাগ্‌ছিল।...ঐ... চাঁদসদাগরের সপ্তডিঙ্গা ডুবে গেল কিন্তু লোকে ঠিক ঠিক ধরতে পারল না যে, ঐ কণ্ঠস্বর শ্যামাদাসের কিনা! সবাই জানে শ্যামাদাস ক'লকাতায় তা ছোট মেয়ের বাড়ীতে আছে।

কিন্তু সেই দুর্য্যোগের রাত্রি প্রভাত হতেই যখন বন্দরে বাঁধের ধারে প্রকাণ্ড একটা বটগাছের নীচে চাপাপড়া অবস্থায় মৃত শ্যামাদাসকে দেখ্‌তে পাওয়া গেল তখন লোকে বিস্ময়-বিমূঢ়ভাবে হায় হায় ক'রতে লাগ্‌ল।

গত সন্ধ্যাতেও তাকে কেউ দেখেনি—কাজেই কি ক'রে লোকে বুঝ্‌বে যে, সেই চাঁদসদাগর আবার ফিরে এসেছে এবং রাতে যে চীৎকার শোনা যাচ্ছিল, সে চীৎকার তারই? এবং সে চীৎকারই চাঁদসদাগরের জীবনের শেষ চীৎকার। কেউ বল্‌ল—আহা! কেউ বল্‌ল—বেঁচেছে! কিন্তু রূপনারায়ণের নির্জ্জন বালুতটে আর কেউ শুন্‌তে পাবে না করুণ চীৎকার—চাঁদসদাগরের সপ্তডিঙা ডুবে গেল!

সাহিত্য-সংবাদ

আবৃত্তি, রচনা ও গল্প প্রতিযোগিতা

(ষ্টুডেণ্টস লাইব্রেরী কর্তৃক পরিচালিত)

আবৃত্তি

সাধারণের জন্য

টি আর ধিমান মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ কাপঃ—রবীন্দ্রনাথের "এবার ফিরাও মোরে।" (চয়নিকা ও চিত্রা দ্রষ্টব্য)। ("সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শত কর্ম্মে রত" হইতে......"শত শত অসন্তোষ মহাগীতে লভিবে নির্ব্বাণ" পর্য্যন্ত)। প্রথম পুরস্কার—চ্যালেঞ্জ কাপ ও একটি মিনিয়েচার কাপ। দ্বিতীয় পুরস্কার—একটি রৌপ্যপদক।

স্কুলের ছাত্রদের জন্য

আশালতা মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ কাপঃ—নবীনচন্দ্র সেনের "অমিতাভ" অষ্টাদশ সর্গ হইতে (১৯৩৯-এর প্রবেশিকা বাঙলা পুস্তক "বুদ্ধের উপদেশ" দ্রষ্টব্য)। ("একদিন বুদ্ধদেব শ্রাবস্তি নগরে" হইতে......"আপনার কর্ম্ম-চক্র কর অনুসার" পর্য্যন্ত)। প্রথম পুরস্কার—চ্যালেঞ্জ কাপ ও একটি মিনিয়েচার কাপ। দ্বিতীয় পুরস্কার—একটি রৌপ্যপদক।

ছাত্রীদের জন্য

সুষমা মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ কাপঃ—রবীন্দ্রনাথের "অতীত" (চয়নিকা ও উৎসর্গ দ্রষ্টব্য)। প্রথম পুরস্কার—চ্যালেঞ্জ কাপ ও একটি রৌপ্যপদক। দ্বিতীয় পুরস্কার—একটি রৌপ্যপদক। প্রতিযোগিগণ ৫ই এপ্রিল বুধবারের মধ্যে তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা লাইব্রেরীর সম্পাদকের নিকট ৩৫৪নং গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড, সালিখা, হাওড়ায় পাঠাইবেন। প্রতিযোগিতার সময় ও স্থানঃ—৮ই এপ্রিল, শনিবার বেলা ১॥ ঘটিকা। "কুন্ডুগড়" ৮২নং ভৈরব দত্ত লেন, সালিখা, হাওড়া।

রচনা

সাধারণের জন্য

বসুমতী মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ শীল্ডঃ—"বাঙলায় কৃষির উন্নতির উপায়"। প্রথম পুরস্কার—চ্যালেঞ্জ শীল্ড ও একটি রৌপ্যপদক। দ্বিতীয় পুরস্কার—একটি রৌপ্যপদক।

স্কুলের ছাত্রদের জন্য

বসন্তকুমারী মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ শীল্ডঃ—"যুদ্ধে ছাত্রের কর্ত্তব্য"। প্রথম পুরস্কার—চ্যালেঞ্জ শীল্ড ও একটি রৌপ্যপদক। দ্বিতীয় পুরস্কারঃ—একটি রৌপ্যপদক।

স্কুল, কলেজের ছাত্রী ও মহিলাগণের জন্য

কৃষ্ণদাস মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ কাপঃ—"ভারতের স্ত্রীশিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত"। প্রথম পুরস্কার—চ্যালেঞ্জ কাপ ও একটি মিনিয়েচার কাপ। দ্বিতীয় পুরস্কার একটি রৌপ্যপদক। রচনা ফুলস্কেপ্ কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালিতে লিখিয়া আগামী১৬ই এপ্রিলের মধ্যে লাইব্রেরীর সম্পাদকের নিকট ৩৫৪নং গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড, সালিখা; হাওড়ায় পাঠাইতে হইবে।

গল্প

সাধারণের জন্য

রায় অতুলচন্দ্র মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ কাপঃ—একটি "রোমাঞ্চমূলক" গল্প। প্রথম পুরস্কার—চ্যালেঞ্জ কাপ ও একটি রৌপ্যপদক। দ্বিতীয় পুরস্কার—একটি রৌপ্যপদক। গল্প এক্সসাইজ বুকের এক পৃষ্ঠায় কালিতে লিখিতে হইবে এবং কুড়ি পৃষ্ঠার বেশী হইবে না। আগামী ১৬ই এপ্রিলের মধ্যে লাইব্রেরীর সম্পাদকের নিকট ৩৫৪ গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড, সালিখা, হাওড়ায় গল্প পাঠাইতে হইবে।

নিখিল বঙ্গ রচনা প্রতিযোগিতা ১৩৪৫

১নং কালী কুণ্ডু লেনস্থ 'ওয়েষ্ট য়েণ্ড ক্লাবে'র সাহিত্য-শাখার উদ্যোগে একটি 'নিখিল বঙ্গ রচনা প্রতিযোগিতা'র ব্যবস্থা হইয়াছে। ব্যাপকভাবে প্রতিযোগিতা ও বহুবিধ উপায় দ্বারা মানব মনের উৎকর্ষ সাধনই এই সাহিত্য-বিভাগের মর্ম্মকথা। রচনার বিষয়ঃ—'বাঙলা সাহিত্যে আধুনিকতা'।

রচনা কাগজের একপৃষ্ঠায় কালিতে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। বাঙলার যে-কেহই এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারেন। শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিগণকে পারিতোষিকাদি প্রদান করা হইবে। কোন রচনাই ফেরৎ দেওয়া হইবে না। সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। এই প্রতিযোগিতায় কোনরূপ প্রবেশিকা নাই। আগামী ১৫ই এপ্রিল ১৯৩৯ তারিখ মধ্যে উপরোক্ত ঠিকানায় সমস্ত রচনা পৌঁছান চাই।

বাঙলার সাহিত্যানুরাগী প্রত্যেককেই এই প্রতি-যোগিতায় যোগদানের জন্য সাদরে আমন্ত্রণ করিতেছি।

—শ্রীশ্রীগোবিন্দ ভট্টাচার্য্য, সম্পাদক, সাহিত্য-শাখা "ওয়েষ্ট য়েণ্ড ক্লাব"।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন—দ্বাবিংশ অধিবেশন (কুমিল্লা)

(৮ই ও ৯ই এপ্রিল শনি ও রবিবার, ১৩৪৫ সাল)

বিজ্ঞপ্তি—

১। যিনি অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য হইবেন, তাঁহাকে অন্যূন ১৲ এক টাকা চাঁদা দিতে হইবে।

২। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের নিয়মাবলীর ৩য় বিধান অনুসারে যিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের সাধারণ সদস্য হইবেন, তিনি সম্মেলনের অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ করিবার এবং প্রস্তাবাদিতে ভোট দিবার অধিকার পাইবেন এবং তিনি সম্মিলনের মুদ্রিত বিবরণ ও অন্যান্য পুস্তকাদিও বিনামূল্যে পাইবেন। ছাত্র-সদস্যগণ সম্মিলনে পাঠার্থ প্রবন্ধাদি কোনও সাধারণ বা সাময়িক সদস্যের দ্বারা পাঠাইতে পারিবেন; কিন্তু তাঁহারা মুদ্রিত বার্ষিক বিবরণ প্রভৃতি বিনামূল্যে পাইবেন না।

যাঁহারা বার্ষিক তিন টাকা চাঁদা দিবেন, তাঁহারা সাধারণ সদস্য; সম্মেলনের অধিবেশনে প্রতিনিধিরূপে অথবা সাহিত্যা-নুরাগীরূপে যাঁহারা বার্ষিক দুই টাকা চাঁদা দিবেন, তাঁহারা সাময়িক সদস্য; যাঁহারা এককালীন একশত টাকা দান করিবেন, তাঁহারা আজীবন সাধারণ সদস্য; এবং যাঁহারা ছাত্র এবং বার্ষিক

এক টাকা চাঁদা দিবেন, তাঁহারা ছাত্র-সদস্য। এ সমস্ত চাঁদা সম্মেলনের সাধারণ সমিতির প্রাপ্য।

ঠিকানা—**বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দির**, ২৪৩।১ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যগণ উক্ত নিয়মানুসারে বার্ষিক দুই টাকা চাঁদা না দিলেও সাময়িক সদস্যরূপে পরিগণিত হইবেন।

৩। অধিবেশনে পাঠের জন্য প্রবন্ধ চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে অভ্যর্থনা সমিতির হস্তগত হওয়া আবশ্যক। উক্ত সময় মধ্যে যে প্রবন্ধ পাওয়া যাইবে না, অধিবেশনে তাহা পাঠের বন্দোবস্ত করা সম্ভবপর হইবে না।

৪। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন ও সঙ্গীত—প্রবন্ধ-লেখক এ সমস্তের যে কোনও বিষয়ে তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে প্রবন্ধ লিখিতে পারিবেন।

(ক) কিন্তু অধিবেশনের সময়ে সম্যক আলোচনা (Symposium) কেবল নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে হইতে পারিবে ঃ—

সাহিত্য শাখা—ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গলার মহাকাব্য।

ইতিহাস শাখা—ভারতে গুপ্ত রাজগণের সাম্রাজ্যবাদের সফলতা।

দর্শন শাখা—শঙ্করাচার্য্যের বিজ্ঞানবাদ।

বিজ্ঞান শাখা—বঙ্গে বৈজ্ঞানিক শিল্প প্রচলনের সুবিধা ও অসুবিধা।

সঙ্গীত শাখা—সঙ্গীত।

সভাপতির নির্দ্দেশ অনুসারে অন্যান্য বিষয়ের আলোচনাও হইতে পারিবে।

৫। পাঠের জন্য প্রাপ্ত প্রবন্ধগুলি সভাপতিগণ পরীক্ষা করিবেন।

৬। যাঁহারা অধিবেশনে যোগদান করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক বিছানা ও মশারি সঙ্গে আনিবেন। কোন্ দিন কখন কুমিল্লায় আসিয়া পৌঁছিবার সম্ভাবনা, তাহাও অন্তত সাত দিন পূর্ব্বে অনুগ্রহপূর্ব্বক অভ্যর্থনা সমিতিকে জানাইয়া বাধিত করিবেন। ইতি—

বিনীত নিবেদক— শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘোষ,

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, কার্য্যালয় ও গঠনকার্য্য এবং চিঠি-পত্র ও সংবাদ আদান-প্রদান বিভাগ, অভ্যর্থনা সমিতি।

পুস্তক পরিচয়

বাঙলার রূপ—তৃতীয় সংখ্যা, প্রথম বর্ষ, মাসিক পত্র। সম্পাদক—শ্রীজ্যোতি সেন, ৭০নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। বার্ষিক—দেড় টাকা। বর্ত্তমান সংখ্যায় শ্রীযুত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের "সত্যের জয়" গল্পটি ভাল। 'ভাঙনের পর' উপন্যাস ধারাবাহিক বাহির হইয়াছে।

ভাই-বোন—চিত্র সম্ভার। সম্পাদক—শ্রীপ্রভাতমোহন বসু। প্রথম বর্ষের শেষ সংখ্যা। বার্ষিক মূল্য দুই টাকা। কয়েকটি ভাল প্রবন্ধ আছে। 'কাশ্মীর রাজ ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়', 'রবারের কথা', 'লুই পাস্তুর', 'বিজ্ঞানের কৌতুক', 'আলোর গতি', বালক-বালিকাদের উপভোগ্য করিয়া বৈজ্ঞানিক এবং ঐতিহাসিক এই লেখাগুলির মধ্যে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। কবিতাগুলিও ভাল। শ্রীযুক্ত শিবরাম চক্রবর্ত্তীর হর্ষবর্দ্ধন অপহরণ যোগ জমিয়া উঠিয়াছে।

শ্রীভারতী—ফাল্গুন, সম্পাদক, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। প্রকাশ কার্য্যালয়—ইণ্ডিয়ান রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউট, ১৭০ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। বার্ষিক মূল্য চারি টাকা। মেশ্বর সঙ্ঘ সুগভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ সারগর্ভ রচনা। 'তথাকথিত 'হর্ষার' ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ। 'বিভিন্ন চিত্রকলা পদ্ধতি', 'দাক্ষিণাত্যের আলোয়ারগুণ' লেখাগুলি জ্ঞানগর্ভ। পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা এবং গবেষণা শ্রীভারতীর বিশিষ্টতা।

ইংরাজী সহজ বানান শিক্ষা—শ্রীমতী বাণী দত্ত প্রণীত। মূল্য তিন আনা মাত্র। বুক কোম্পানী, ৪।৩।বি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। শিশুদের ইংরেজী বানান শিক্ষা করিবার পক্ষে এই পুস্তকে সুবিধা হইবে।

"রূপশ্রী" ঃ—(৫ম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা), মাসিক পত্রিকা; সম্পাদক শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ; ২৫নং ডি এল রায় ষ্ট্রীট, কালিকা প্রেস হইতে শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

আলোচ্য সংখ্যাখানি নানা গল্প, প্রবন্ধ ও আলোচনাতে পূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রায় বাহাদুর জলধর সেন, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, সৌরীন্দ্র মজুমদার, প্রতিমা ঠাকুর, ডাঃ মেঘনাদ সাহা প্রভৃতির রচনায় সমৃদ্ধ। বিচিত্র-বার্ত্তা, মহিলা-মহল, চিত্র-চয়ন, খেলা-ধুলা, সঙ্গীত-বিভাগ প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগ সম্বন্ধে লেখা অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান দেয়। চিত্র-চয়নের নির্ভীক লেখার আমরা প্রশংসা করি। সুদৃশ্য আর্ট পেপারে অনেকগুলি ছবি এই পত্রিকাখানির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। 'মেক্ আপ' ও ছাপা চমৎকার।

কাশীখণ্ড—আনন্দকানন-প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম হইতে স্বামী শ্রীসর্ব্বানন্দ মহারাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত নিবারণ দাস মহাশয়কৃত বঙ্গানুবাদ-সহ কাশীখণ্ড গ্রন্থখানি দেখিলাম। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবিষ্ট থাকায় সংস্কৃতানভিজ্ঞ জনগণের পক্ষে এই 'শ্রুতিসিদ্ধ বহু জন্ম-জন্মান্তর সাধ্য জ্ঞানলব্ধ মোক্ষ' বাদ সম্বলিত অধ্যাত্ম কথার স্বাদ গ্রহণ সম্ভব হইয়াছে। গীতায় বর্ণিত "বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে" বাক্যে যে জ্ঞানের কথা উক্ত, সেই জ্ঞান কাশীর স্থান মাহাত্ম্যে পশু-পক্ষী-কীটাদি জীবমাত্রেরই তাহা [illegible] বিশদভাবে প্রতিপন্ন। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণ এই পুস্তক যথাযোগ্য সমাদরে গ্রহণ করিবেন, আশা করা যায়।

নিউ সিনেমায় 'দুষমন'

"দুষমন"—নিউ থিয়েটার্সের হিন্দি ছবি; পরিচালক, চিত্রনাট্যকার ও চিত্রশিল্পী—নীতীন বসু; শব্দযন্ত্রী—মুকুল বসু; কাহিনী—পণ্ডিত সুদর্শন, শৈলজানন্দ মুখার্জ্জি ও বিনয় চ্যাটার্জ্জি; সংগীত পরিচালনা—পংকজ মল্লিক; সম্পাদনা—সুবোধ মিত্র; বিভিন্ন ভূমিকায়—সায়গল, লীলা দেশাই, নাজাম, নিমো, দেববালা, মনোরমা, জগদীশ শেঠী, বোকেন চট্টোপাধ্যায়, পৃথ্বীরাজ কাপুর, বিক্রম কাপুর, হুয়া প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন। গত ১১ই মার্চ্চ হইতে নিউ সিনেমায় দেখান হইতেছে।

নিউ থিয়েটার্সের এই ছবিখানি ক্ষয়রোগকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। একটি সুন্দর কাহিনীর মধ্য দিয়া—এই মারাত্মক রোগ সম্বন্ধে দেশবাসীকে সচেতন কারার চেষ্টা করা হইয়াছে। ধনীশ্রেষ্ঠ রায় বাহাদুর হীরালালের একমাত্র কন্যা গীতা দরিদ্রের সন্তান মোহনকে ভালবাসিত। কিন্তু গীতার গর্ব্বিতা মাতার তাহাদের বিবাহের আপত্তি ছিল। মোহন চিররুগ্ন এবং ইহাই গীতার মাতার পক্ষে বিবাহে বাধা দেওয়ার সুন্দর অজুহাত হইয়াছিল। তিনি ডাঃ কেদার নামক এক ধনী, সুপুরুষ ডাক্তারের সহিত গীতার বিবাহের কথাবার্ত্তা চালাইতে থাকেন। এদিকে মোহনের সহিত ডাঃ কেদারের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু মোহন যেমন জানিত না যে কেদারের সহিত গীতার বিবাহের কথাবার্ত্তা চলিতেছে—তেমনি কেদারও মোহন ও গীতার প্রেমের খবর জানিত না। ডাঃ কেদার মোহনকে পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন যে তাহার ক্ষয়রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে—সেই জন্য তাহাকে অবিলম্বে শহরের বাহিরে উন্মুক্ত স্থানে যাইয়া থাকিতে এবং ভাল ভাল পথ্যের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিল। তারপর একদিন মোহন যখন ডাঃ কেদারের বাড়ী গেল তখন ডাঃ কেদার তাহাকে জানাইল যে, যে মেয়েটির সঙ্গে তাহার বিবাহের কথাবার্ত্তা চলিতেছে তাহাদের বাড়ীতে তাহার (ডাঃ কেদার) নিমন্ত্রণ আছে এবং মোহনকে তাহার সহিত যাইতে হইবে। মোহন সম্মত হইল এবং ডাঃ কেদারের সহিত সেই বাড়ীতে যাইয়া বুঝিল যে গীতার সহিত ডাঃ কেদারের বিবাহ স্থির হইয়াছে। ইহা দেখিয়া সে যে আঘাত পাইল তাহার ফলে তাহার রোগ বাড়িয়া গেল এবং সে চিরকালের জন্য শহর ত্যাগ করিল। যতই দিন যাইতে লাগিল গীতা মোহন সম্বন্ধে ততই নিরাশ হইয়া উঠিল এবং অবশেষে তাহার মাতার চাপে বাধ্য হইয়া ডাঃ কেদারকে বিবাহ করিতে রাজী হইল। বিবাহের পূর্ব্বে একদিন গীতা আকস্মিকভাবে রেডিওতে মোহনের গান শুনিয়া বুঝিতে পারিল যে মোহন বাঁচিয়া আছে। ইহা বুঝিতে পারিয়া গীতা কি করিল এবং কি ভাবে অবশেষে মোহনের সহিত তাহার মিলন হইল তাহা এই ছবিতে সুন্দরভাবে দেখান হইয়াছে।

শ্রীযুত নীতীন বসু অতি সুষ্ঠুভাবে এই কাহিনীটিকে চিত্রিত করিয়াছেন। সায়গল মোহনের ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন। তাঁহার অভিনয় আমাদের বেশ ভাল লাগিয়াছে এবং তিনি বেশ দরদপূর্ণ অভিনয় করিয়াছেন। এই ছবিতে তিনি যে কয়খানি গান গাহিয়াছেন তাহা অপূর্ব্ব এবং ইতিপূর্ব্বে কোন ছবিতে তাঁহাকে এমন চমৎকার গান গাহিতে আমরা শুনি নাই। গীতার ভূমিকায়—শ্রীমতী লীলা দেশাই—যথাসাধ্য সুন্দর অভিনয় করিলেও তাহা নায়িকার ভূমিকার উপযোগী অভিনয় হয় নাই। ছবির লঘু দিকটা তিনি চমৎকার ফুটাইয়া তুলিয়াছেন কিন্তু দুঃখের ও করুণ দিকটা তিনি একেবারেই ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই। তাঁহার নৃত্য আমরা বেশ উপভোগ করিয়াছি। ডাঃ কেদারের ভূমিকায় নাজাম; গীতার পিতার ভূমিকায় নিমো; গীতার মাতার ভূমিকায়—দেববালা; রেডিওর ষ্টেশন ডাইরেক্টর—জগদীশ শেঠী এবং স্যানিটোরিয়ামের ডাক্তারের ভূমিকায় পৃথ্বীরাজ কাপুর ভাল অভিনয় করিয়াছেন।

শ্রীযুত নীতীন বসুর 'দুষমন' ছবির চিত্রগ্রহণ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলার আবশ্যক করে না। সংগীত পরিচালনা এই ছবির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। শ্রীযুত পংকজ মল্লিক সংগীত পরিচালনা করিয়া এই ছবির প্রাণসঞ্চার করিয়াছেন। শব্দ-গ্রহণ ও চিত্র-সম্পাদনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

'দুষমন' ছবির কথা লিখিতে গিয়া স্বতঃই আমাদের মনে হইতেছে সম্প্রতি নিউ থিয়েটার্সের ছবির মধ্যে 'ঝড়ের' প্রাবল্য একটু বেশী রকম দেখা যাইতেছে। 'ঝড়' দিয়া 'সিচুয়েশন' তৈয়ারী করার যে মোহ নিউ থিয়েটার্সকে পাইয়া বসিয়াছে, আমাদের মনে হয় ইহাই তাহার একমাত্র কারণ। মোটর দৌড় সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা বলা যাইতে পারে। তাই 'দুষমনের' ঝড়ের দৃশ্যটি খুব সুন্দর হইলেও এবং
তাই 'দুষমনের' ঝড়ের দৃশ্যটি খুব সুন্দর হইলেও এবং
ঝড়ের মধ্যে পাগলের বেহালা বাজানো দেখাইয়া নায়ক-নায়িকার অন্তর্দ্বন্দ্বের নিখুঁত ছবি ফোটাইয়া তোলা হইলেও নূতনত্বের সন্ধান ইহাতে পাওয়া যায় না।

ফ্রাঙ্ক কাপরা

আমেরিকার একাডেমি অব মোশন পিকচার্স অব আর্টস এণ্ড সায়েন্স এইবার কলম্বিয়া পিক-চার্সের—"ইউ ক্যান্ট টেক ইট উইথ ইউ" ছবিখানির গত বৎসরের শ্রেষ্ঠ ছবি বলিয়া নির্ব্বাচিত করিয়াছেন এবং এই ছবির পরিচালক ফ্রাঙ্ক কাপ-রাকে শ্রেষ্ঠ পরিচালক বলিয়া নির্ব্বাচিত করিয়াছেন।

কুচবিহার ক্রিকেট কাপ প্রতিযোগিতা

কুচবিহার ক্রিকেট কাপ প্রতিযোগিতার খেলা শেষ হইয়াছে। এরিয়ান্স দল এই খেলায় মহমেডান স্পোর্টিং দলকে ৪ উইকেটে পরাজিত করিয়া বিজয়ী হইয়াছে। এই বৎসর লইয়া এরিয়ান্স দল পর পর তিন বৎসর উক্ত কাপ বিজয়ী হইল। এরিয়ান্স দলের এই সাফল্য প্রশংসনীয়।

প্রতিযোগিতার ইতিহাস

বাঙলাদেশের ক্রিকেট খেলোয়াড়গণকে ক্রিকেট খেলায় উৎসাহ দান করিবার উদ্দেশ্যে কুচবিহারের তরুণ মহারাজা ১৯৩৬ সালে এই প্রতিযোগিতার প্রবর্ত্তন করেন। সেই বৎসর মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব দল ফাইনালে মোহনবাগান ক্লাব দলকে পরাজিত করিয়া কাপ বিজয়ী হয়। ১৯৩৭ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর এরিয়ান্স ক্লাব দল এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হইয়াছে।

বাঙলার সকল দল যোগদান করে না

বাঙলার ক্রিকেট খেলোয়াড়গণ প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়া উচ্চাঙ্গের ক্রীড়ানৈপুণ্যে অধিকারী হয় সেই উদ্দেশ্যেই এই প্রতিযোগিতা প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। কিন্তু গত চারি বৎসরের প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান দেখিয়া সে উদ্দেশ্য যে কোনদিনই সফল হইবে এরূপ মনে হয় না। পরিচালকগণ প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়াই সন্তুষ্ট। বাঙলার সকল ক্রিকেট দল এই প্রতিযোগিতায় যাহাতে যোগদান করে বা সারা বাঙলাদেশের ক্রিকেট খেলোয়াড়গণের মধ্যে এই প্রতিযোগিতা লইয়া যাহাতে সাড়া পড়ে, তাহার কোন চেষ্টাই করেন না। কলিকাতার নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি ক্লাব লইয়া এই অনুষ্ঠানের পরিচালনা করিয়াই তাঁহাদের কর্ত্তব্য শেষ করেন। তাঁহাদের পরিচালন দক্ষতা এতই বৃদ্ধি পাইয়াছে যে ফাইনাল খেলার সময়েও মাঠে ৫০জন দর্শক সমবেত হইয়াছেন বলিয়াও দেখা যায় না। উৎসাহহীন, প্রাণহীন প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানে উদ্দেশ্য সফল কেমন করিয়া যে হইতে পারে ইহা আমাদের ধারণাতীত।

নিম্নে এই বৎসরের ফাইনাল খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইলঃ

মহমেডান স্পোর্টিংঃ—১ম ইনিংস ১৩৬ রাণ (এ জব্বর ৪৪ রাণ, এ কামাল ২০ রাণ, এ ওবেদালী ২৮ রাণ; এইচ সাধু ৩২ রাণে ৪টি, বি মিত্র ২৭ রাণে ৩টি, কে ভট্টাচার্য্য ২৪ রাণে ২টি উইকেট পাইয়াছেন)।

এরিয়ান্স দলঃ—১ম ইনিংস ২৩৪ রাণ (এস দত্ত ২৫, আই সুরিটা ৬০, সুশীল বসু ৮০, পি গাঙ্গুলী নট আউট ২৫ রাণ; এম ওবেদালী ৬৩ রাণে ৫টি, এম ওবেদালী (ছোট) ৭৪ রাণে ৩টি ও এম ফজলউদ্দীন ১২ রাণে ২টি উইকেট পাইয়াছেন)।

মহমেডান স্পোর্টিংঃ—২য় ইনিংস ২৩৯ রাণ (এ জব্বর ১২৮ রাণ, ফজললউদ্দীন ২৪, এ ওবেদালী ২২, এ ওয়ালী ২৬; এস দত্ত ৪৮ রাণে ৩টি, এইচ সাধু ৫৮ রাণে ২টি উইকেট পান)

এরিয়ান্সঃ—২য় ইনিংস ৬ উইঃ ১৪২ রাণ (এস চ্যাটার্জ্জি ৪৭, কে ভট্টাচার্য্য নট আউট ৩০, বলাই মিত্র নট আউট ২৯ রাণ, এম ওবেদালী (ছোট) ৪১ রাণে ২টি, এম ওবেদালী ৬২ রাণে ২টি, জি আরাম ২৬ রাণে ২টি উইকেট পান)।

(এরিয়ান্স দল ৪ উইকেটে বিজয়ী)

কুচবিহার কাপের পূর্ব্ববর্ত্তী বিজয়িগণঃ—

১৯৩৫-৩৬ সাল	মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব
১৯৩৬-৩৭ সাল	এরিয়ান্স ক্লাব
১৯৩৭-৩৮ সাল	এরিয়ান্স ক্লাব
১৯৩৮-৩৯ সাল	এরিয়ান্স ক্লাব

ডেনমার্কের জনসাধারণের ব্যায়াম স্পৃহা

ইউরোপের সকল দেশ অপেক্ষা ডেনমার্কের জনসাধারণের মধ্যে ব্যায়াম স্পৃহা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী এই সংবাদ আমরা বহুকাল ধরিয়া শুনিয়া আসিতেছি। বিভিন্ন খেলাধুলা, ব্যায়াম বিষয়ে কত সংখ্যক নর-নারী যোগদান করিয়া থাকেন বা তাহার জন্য কিরূপ ব্যবস্থা আছে ইহা আমাদের অনেকেরই জানা নাই। সম্প্রতি ড্যানিস সরকার ব্যায়াম বিষয়ের এক তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। নিম্নে ঐ তালিকার কতকাংশ প্রকাশিত করা হইল।

ফুটবল খেলাঃ—৭৭০০০ হাজার লোকে খেলিয়া থাকেন। ইহারা সকলেই উক্ত খেলার পারদর্শী। ডেনমার্কের বিভিন্ন স্থানে উক্ত খেলোয়াড়দের জন্য ১৩০০ ফুটবল মাঠ আছে। গ্রামের প্রতি ফুটবল মাঠে গড়পড়তায় ৫৮জন ও কোপেন্‌হেগেনের প্রতি ফুটবল মাঠে গড়পড়তায় ৩০৬জন খেলোয়াড় খেলিয়া থাকেন।

হ্যাণ্ড বল খেলাঃ—২৮০০০ বিশিষ্ট খেলোয়াড় আছেন। ইহার জন্য ৭৮৫টি মাঠ ও ৮৫টি হল ডেনমার্কের বিভিন্ন স্থানে গঠিত হইয়াছে।

টেনিস খেলাঃ—১১৫০০জন খেলোয়াড়। খেলিবার জন্য ২০টি বিরাট হলের মধ্যে ২৬টি লন আছে। ইহা ছাড়া ৮২৫টি খেলিবার লন আছে।

ব্যাডমিণ্টন খেলাঃ—১৫০০০ হাজার খেলোয়াড়। ২৫৭টি খেলিবার মাঠ আছে।

গলফ খেলাঃ—১০০০ হাজার খেলোয়াড়। ৮টি বিরাট মাঠে খেলা হয়।

হকি খেলাঃ—৪৫৩জন খেলোয়াড়। ২৭টি খেলিবার মাঠ আছে।

জিমন্যাষ্টিকস্‌ঃ—২৩৪০০০ ব্যায়ামকারী জিমন্যাসিয়ামে যোগদান করেন। ইহাদের মধ্যে ১২৭০০০জন ব্যায়ামকারীকে বিশিষ্ট বলা যাইতে পারে। ১৬০০টি জিমন্যাসিয়াম আছে।

এ্যাথলেটিকস্‌ঃ—১২৬০০ হাজার যোগদান করেন। ইহার শতকরা দশজন মহিলা। ১২১টি এ্যাথলেটিকস্‌ শিক্ষা করিবার মাঠ আছে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

১৩ই মার্চ্চ

মহাত্মা গান্ধী রাজকোটের ব্যাপার সম্পর্কে বড়লাটের সহিত দেখা করিবার জন্য রাজকোট হইতে দিল্লী রওনা হইয়া গিয়াছেন।

"জয়পুর দিবস" উপলক্ষে পুলিশ এক সভার উপর লাঠি চালনা করে। ফলে কয়েকজন আহত হয়। এই সম্পর্কে ১৩ জন সত্যাগ্রহী ধৃত হইয়াছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে জন-স্বাস্থ্য বিভাগের ব্যয়-বরাদ্দ দাবী মঞ্জুর হইয়াছে। সমস্ত ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি পরিষদে অগ্রাহ্য হয়।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কলিকাতা ও সহরতলী পুলিশ আইন সংশোধন বিলের আলোচনা হয়। বিলটি জনমত নির্দ্ধারণার্থ প্রচার করিবার জন্য যে সমস্ত প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে।

আসাম ব্যবস্থা পরিষদে একটি প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বড়দলই জানাইয়াছেন যে, শ্রীহট্ট জেলাকে বাঙলার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য শীঘ্রই একটি বিল আনা হইবে।

চেকোশ্লোভাকিয়ায় সংকটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। প্রাগের সংবাদে প্রকাশ যে, ব্রাটিস্লাভার রাস্তা-সমূহে সাঁজোয়া গাড়ী অনবরত টহল দিতেছে। প্রেসোভেসে লিঙ্কা রক্ষীবাহিনীর সহিত চেক-সৈন্যদের সংঘর্ষের ফলে ১১ জন হতাহত হইয়াছে। প্রাগের অপর এক সংবাদে প্রকাশ যে, শ্লোভাকিয়ার পদচ্যুত প্রধান মন্ত্রী ডাঃ টিসো হের হিটলারের জরুরী আহ্বানে বার্লিন যাত্রা করিয়াছেন।

জার্ম্মানী প্রাগস্থিত কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টকে (১) শ্লোভাকিয়াকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিতে, (২) বর্ত্তমান চেক দেশরক্ষা-সচিব জেনারেল সিরোভি ও স্বরাষ্ট্র-সচিবকে পদচ্যুত করিতে এবং (৩) বোহেমিয়া ও মোরাভিয়ার সংখ্যা-লঘু জার্ম্মানদের নিরাপত্তা সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দিতে অনুরোধ জানাইয়াছে।

কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদে "মুস্লিম বিবাহ-বিচ্ছেদ বিল" পাশ হইয়াছে।

১৪ই মার্চ্চ—

দিল্লীর উর্দ্দু দৈনিক "ওয়াহদৎ" এবং অর্দ্ধ সাপ্তাহিক "আন্সোমানে"র সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী মৌলানা মজহর উদ্দীন আততায়ী হস্তে নিহত হইয়াছেন। দুইজন অজ্ঞাত ব্যক্তি তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে গলা কাটিয়া হত্যা করিয়াছে। প্রকাশ, আততায়ীগণের একজন বলিয়াছে, "মৌলানা উলেমাদের গালি দিতেন।" নিহত মৌলানা (৫২) কাণপুরের জমিয়ত-উল-উলেমা-ই-হিন্দের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং উহার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।

শ্লোভাকিয়া ও কার্পাথো-ইউক্রেনে স্বাধীনতা ঘোষিত হইয়াছে। হের টিসো শ্লোভাকিয়ার প্রেসিডেণ্ট ও প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। হের টিসো হের হিটলারকে শান্তিরক্ষার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিয়া তার প্রেরণ করিয়াছেন। ভিয়েনার খবরে প্রকাশ, জার্ম্মান বাহিনী ইতিমধ্যেই শ্লোভাকিয়া অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে।

বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি বি জে ওয়াদিয়া স্বর্গীয় পেটেলের উইল মামলার রায় দিয়াছেন। রায় দান প্রসঙ্গে তিনি স্বর্গীয় বিঠলভাই পেটেলের উইলের সমস্ত টাকা তাঁহার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিবার নির্দ্দেশ দেন। বিচারপতি বলেন যে, ভারতের কল্যাণের জন্য এই টাকা ব্যয়িত হইবে কিনা উত্তরাধিকারীরাই তাহা স্থির করিবেন।

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু ত্রিপুরী হইতে কলিকাতা অবতরণ করেন। সেখানে শ্রীযুক্ত বসু তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র বসুর ভবনে অবস্থান করিতেছেন। শ্রীযুক্ত বসুর স্বাস্থ্য পূর্ব্ববৎ আছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কলিকাতা ও সহরতলী পুলিশ আইন সংশোধন বিল সম্পর্কে বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলের পরাজয় হইয়াছে। "সাধারণ সভা" সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়া বিলের যে ব্যবস্থামূলক ধারা আছে, তাহা তুলিয়া দিবার জন্য ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের উত্থাপিত একটি সংশোধন প্রস্তাব সম্বন্ধে ভোট লওয়া হইলে দেখা যায় যে, উভয় পক্ষে ও বিপক্ষে ১৮টি করিয়া ভোট হয়। সরকার বিরোধী পক্ষের তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে প্রেসিডেণ্ট মহাশয় সংশোধন প্রস্তাবের অনুকূলে তাঁহার "কাষ্টিং" ভোট দেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় হক্ মন্ত্রিমণ্ডলীর পরাজয় এই প্রথম।

১৫ই মার্চ্চ—

মহাত্মা গান্ধী দিল্লীতে বড়লাট ভবনে লর্ড লিন-লিথগোর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। সম্প্রতি রাজকোটের আন্দোলন সম্পর্কে একটা আপোষ হইয়াছে,—এই সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে তাঁহাদের মধ্যে আলোচনা হইয়াছে। দুই ঘণ্টাকাল তাঁহাদের মধ্যে হৃদ্যতাপূর্ণ কথাবার্ত্তা হইয়াছে।

বড়লাট ভবনে যাইবার পূর্ব্বে বিরলা ভবনে মহাত্মা গান্ধী, সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা করেন।

বড়লাট ভবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে মহাত্মা গান্ধী দিল্লী জেলে গিয়া অনশনব্রতী তিন আইনের বন্দিত্রয়কে অনশন ভঙ্গ করিতে অনুরোধ জানান, মহাত্মাজীর অনুরোধে তাঁহারা অনশন ভঙ্গ করিয়াছেন।

প্রাগের সংবাদে প্রকাশ, জার্ম্মান বাহিনী সকাল সাতটার (গ্রীনউইচ টাইম) সময় প্রাগের উপকণ্ঠে পৌঁছিয়াছে। হের হিটলার অদ্য প্রাতে ট্রেনযোগে বার্লিন ত্যাগ করিয়া-ছিলেন। তিনি বোহেমিয়া ও মোরাভিয়া অভিমুখে অভিযানকারী জার্ম্মান বাহিনীর সহিত যোগ দিয়াছেন। বিনা রক্তপাতে ঘড়ির কাঁটার মত চেকোশ্লোভাকিয়ার অধিকার কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে।

প্রাগ হইতে প্রাপ্ত শেষ খবরে জানা গিয়াছে যে, জার্ম্মান বাহিনী উক্ত নগর অধিকার করিয়াছে। জার্ম্মান অধিকৃত চেক অঞ্চলের নাম দেওয়া হইয়াছে, "প্রটেক্টরেট অব চেকি" বা "জার্ম্মানাশ্রিত চেক রাজ্য।" প্রাগ এই রাজ্যের রাজধানী হইল।

জার্ম্মান বাহিনী পিলসেন, অলমুৎস নগরে এবং রেমিনষ্টাডের দুর্গে প্রবেশ করিয়াছে। ঐ দুর্গে জার্ম্মান সেনারা চেক সেনাপতিবৃন্দকে তাঁহাদের অস্ত্র রাখিবার অনুমতি দিয়াছে। সেনাবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে জার্ম্মান পুলিশ যাইয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছে।

অদ্য রাত্রি সাতটা পনের মিনিটের (কলিকাতা ঘড়ি অনুসারে রাত্রি একটা নয় মিনিটের সময়) হের হিটলার প্রাগ নগরীতে প্রবেশ করিয়াছেন এবং পুরাতন প্রাসাদে নিজ সরকারী বাসস্থান প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। প্রাসাদ শীর্ষে হিটলারের জয় পতাকা উড্ডীন করা হইয়াছে। হের হিটলার বোহেমিয়া এবং মোরাভিয়াতে রাজ ক্ষমতা প্রয়োগের ভার দিয়াছেন জেনারেল ফন ব্রাউমিচের উপর।

চেক মন্ত্রিমণ্ডল পদত্যাগ করিয়াছে। ফাসিস্ত নেতা জেনারেল গামদাকে চেক জাতির নায়ক করা হইয়াছে।

১৬ই মার্চ্চ—

রণপুরে ইষ্টার্ণ ষ্টেটস এজেন্সীর পলিটিক্যাল এজেন্ট মেজর ব্যাজালগেটের হত্যা সম্পর্কে ২৪ জন আসামীকে দায়রায় সোপর্দ্দ করা হইয়াছে। প্রমাণাভাবে দুইজন আসামীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। প্রকাশ, গয়ার দায়রা জজ এই মামলার বিচার করিবেন।

সীমান্ত প্রদেশের পেশোয়ারে অজ্ঞাত আততায়ীদের ছোরার আঘাতে চারজন হিন্দু আহত হইয়াছে। ঐ ব্যাপারে হিন্দু ও শিখদের মধ্যে দারুণ ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছে। ডেরাইসমাইল খাঁ জেলার চারিটি গ্রামে লুঠতরাজের ফলে একজন হিন্দু স্ত্রীলোক ও তিনজন হিন্দু পুরুষ অপহৃত হইয়াছে।

আসাম ব্যবস্থা পরিষদে আবগারী বিভাগের মন্ত্রীর প্রস্তাব ক্রমে গবর্ণমেণ্টের আফিং বর্জ্জন পরিকল্পনা অনুমোদিত এবং উহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ব্যয় মঞ্জুর করা হইয়াছে।

মহাত্মা গান্ধী পুনরায় বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করেন। আড়াই ঘন্টাকাল উভয়ের মধ্যে আলোচনা হয়। মহাত্মা ও বড়লাটের মধ্যে কি বিষয় আলোচনা চলিতেছে তাহা জানা যায় নাই। প্রকাশ, যুক্তরাষ্ট্র আদালতের বিচারপতি স্যার মরিস গয়ারের বিচার্য্য বিষয় নিরূপণ সম্পর্কেই মহাত্মা ও বড়লাটের মধ্যে এই আলোচনা চলিতেছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে বাঙলা গবর্ণমেণ্টের আগামী বৎসরের বাজেটে 'সাধারণ শাসন' বিভাগে ১ কোটি ১৯ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা ব্যয়-বরাদ্দ সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হয়। স্বরাষ্ট্র সচিব খাজা স্যার নাজিমুদ্দিন পরিষদে ঐ ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুরের দাবী উত্থাপন করেন। সরকার বিরোধী দলের বিভিন্ন সদস্য বাঙলা গবর্ণমেণ্টের শাসননীতির তীব্র সমালোচনা করিয়া বলেন যে, এই নীতির ফলে দেশে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের প্রসার হইতেছে এবং বহু ক্ষেত্রে সরকার বিরোধী ব্যক্তিগণের সরকারের কার্য্যাবলী সম্পর্কে স্বাধীন ম[illegible] প্রকাশের পথে বাধার সৃষ্টি হইতেছে; অথচ মন্ত্রিমণ্ডলী এই অবস্থার প্রতি দৃকপাত করিতেছেন না। ঐ দাবী সম্পর্কে ৮টি ছাঁটাই প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। কংগ্রেসী দলের ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল প্রথম ছাঁটাই প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি জানিতে চান যে, এই ব্যয়-বরাদ্দের মধ্যে একস্থানে যে পাঁচ লক্ষ চৌদ্দ হাজার টাকার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, উহার সহিত প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তনের কোন সম্পর্ক আছে কি না। অর্থ-সচিব শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তনের ব্যয়ের সহিত উহার কোন সম্পর্কই নাই। ডাঃ সান্যাল অতঃপর তাঁহার ছাঁটাই প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন।

ত্রিপুরী কংগ্রেসে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল কর্ত্তৃক অনুসৃত নীতির প্রতিবাদে উক্ত দলের কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য পদত্যাগ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে মুক্ত কাকোরী বন্দী মন্মথনাথ গুপ্ত অন্যতম।

হের হিটলার শ্লোভাক রাষ্ট্রকে তাঁহার আশ্রিত রাষ্ট্র করিয়া লইয়াছেন, সম্ভবত শ্লোভাকিয়ায়ও বোহেমিয়া এবং মোরাভিয়ার ন্যায় শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তন করা হইবে।

হাঙ্গেরীয় সৈন্য দল রুথেনিয়া অধিকার করিয়াছে। রুথেনিয়ার প্রধান মন্ত্রী মঃ ভলসীন পলায়ন করিয়া রুমানিয়ায় গিয়াছেন। রুথেনিয়ার গবর্ণমেণ্ট রুথেনিয়ার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিয়া মিউনিক চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী চতুঃশক্তির নিকট তার করিয়াছেন।

১৭ই মার্চ্চ—

বাঙলার স্বরাষ্ট্র-সচিব স্যার নাজিমুদ্দীন 'সাধারণ শাসন' ব্যয়বাবদ যে ১,১৯,২৯,০০০৲ টাকার দাবী উত্থাপন করিয়া ছিলেন, দুই দিন আলোচনার পর অদ্য বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে তাহা পাশ হইয়া গিয়াছে। এই সম্পর্কে ৯টি ছাঁটাই প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল। সবগুলিই অগ্রাহ্য হয়। তিনটি ছাঁটাই প্রস্তাব সম্পর্কে ভোট গণনার দাবী করা হয়।

অদ্য শ্রীযুত সত্যপ্রিয় ব্যানার্জ্জি (কংগ্রেস) বেকার সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার জন্য প্রথম ছাঁটাই প্রস্তাব উত্থাপন করেন। মিঃ আবু হোসেন সরকার (কৃষক প্রজা) কলিকাতা ও মফঃস্বলে স্বাধীন মত প্রকাশে বাধা সম্পর্কে আলোচনার জন্য যে ছাঁটাই প্রস্তাব আনিয়া ছিলেন তাহা ৭৮-১২১ ভোটে অগ্রাহ্য হয়। গত আগষ্ট মাসে মুসলমানদের জন্য শতকরা ৬০টি সরকারী চাকুরী নির্দ্দিষ্ট রাখার জন্য যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহা কার্য্যে পরিণত না করার প্রতিবাদ করিয়া মিঃ মকবুল হোসেন (কৃষক-প্রজা) যে ছাঁটাই প্রস্তাব আনিয়াছিলেন, তাহা ২২-১১৩ ভোটে অগ্রাহ্য হয়। 'আজাদ' কাগজকে ৩০,০০০৲ টাকা খয়রাত দেওয়ার প্রতিবাদে মিঃ সাহেদ আলি (কৃষক-প্রজা) একটি ছাঁটাই প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তাহা ৭৬-৯০ ভোটে অগ্রাহ্য হয়।

লণ্ডনে প্যালেষ্টাইন বৈঠক শেষ হইয়াছে। আরব প্রতিনিধিগণ প্যালেষ্টাইন সমস্যা সম্পর্কিত ব্রিটিশ প্রস্তাব মানিয়া লইতে অস্বীকৃত হইয়াছে।

১৮ই মার্চ্চ—

লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ যে, জার্ম্মানী রুমানিয়ার নিকট গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক দাবী করিয়া পত্র প্রেরণ করিয়াছে। জার্ম্মানী রুমানিয়ার সমস্ত রপ্তানি পণ্যের উপর একচেটিয়া অধিকার দাবী করিয়াছে। তদুপরি এই দাবীও করা হইয়াছে

যে, রুমানিয়া সম্পূর্ণরূপে যাহাতে কৃষি-প্রধান দেশে পরিণত হয়, তাহার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। রুমানিয়া সরকার জার্ম্মানীর এই সকল দাবী সরাসরি অগ্রাহ্য করিয়াছে।

বার্লিনে সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, ব্যারণ ভন নিউরথ বোহেমিয়া ও মোরাভিয়ার শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছেন।

চেকোশ্লোভাকিয়ার ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট ডাঃ বেনেস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং রুশিয়াকে জার্ম্মানীর চেকোশ্লোভাকিয়া অধিকার স্বীকার করিয়া না লইতে আবেদন জানাইয়াছেন।

ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং যুক্তরাষ্ট্র জার্ম্মানীর চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছে।

ওয়াশিংটন হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের অনুমোদনক্রমে মিঃ সামনার ওয়েলস জার্ম্মানী কর্ত্তৃক চেকোশ্লোভাকিয়া অধিকারের তীব্র নিন্দা করিয়া এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। উহাতে তিনি ঘোষণা করিয়াছেন, "স্বৈরাচার ও শক্তির অপপ্রয়োগ বিশ্বশান্তি ও আধুনিক সভ্যতাকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে।"

মিঃ ডাফ কুপার ব্রিটিশ কমন্স সভার গত বৃহস্পতিবারের অধিবেশনে হিটলারকে আক্রমণ করিয়া যে মন্তব্য করিয়াছেন, হিটলার তাহাতে ব্যক্তিগতভাবে অপমান বোধ করিয়াছেন।

ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন গতকল্য বার্ম্মিংহাম টাউন হলে বক্তৃতা প্রসঙ্গে জার্ম্মানী কর্ত্তৃক চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাস তথা হিটলার কর্ত্তৃক মিউনিক চুক্তি ভঙ্গের তীব্র নিন্দা করেন। এই সম্পর্কে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মনোভাব ব্যক্ত করিয়া তিনি ঘোষণা করেন, "জগতে অতি অল্প জিনিষই আছে, যাহা আমি শান্তির জন্য ত্যাগ করিতে পারি না; কিন্তু একটিমাত্র ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিবে এবং তাহা হইতেছে স্বাধীনতা। আমরা শত শত বৎসর ধরিয়া এই স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিতেছি এবং ইহা আমরা কখনও ত্যাগ করিব না।" সভায় মিঃ চেম্বারলেনের নেতৃত্বে আস্থাজ্ঞাপক একটি প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

১৯শে মার্চ্চ—

ঢাকার জজকোর্টের নিকটে জনসন রোড ও শাঁখারী বাজারের মোড়ে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে এক সংঘর্ষের ফলে ১৭ জন লোক আহত হইয়াছে।

মহাত্মা গান্ধীর পরামর্শ অনুসারে জয়পুর রাজ্যে সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখা হইয়াছে।

শ্রীযুত ভবানী সহায়, জওলাপ্রসাদ এবং বৈশম্পায়ন—এই তিনজন তিন আইনের বন্দীকে দিল্লী জেল হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং গঠন সম্পর্কে দিল্লীতে মহাত্মা গান্ধীর সহিত পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল প্রমুখ কয়েকজন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ভূতপূর্ব্ব সদস্যদের দীর্ঘকাল আলোচনা চলিতেছে।

ত্রিপুরী কংগ্রেসে পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাবে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের নিরপেক্ষ থাকার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণ এক বিবৃতি দিয়াছেন। উহাতে বলা হইয়াছে যে, পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব রাষ্ট্রপতি সুভাষবাবুর উপর অনাস্থাজ্ঞাপক নহে বলিয়া উক্ত প্রস্তাবের বিরোধিতা করা হয় নাই এবং সংকটকালে গান্ধীজীর একনায়কত্বে সমাজতন্ত্রী দলের আস্থা নাই বলিয়া উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করা হয় নাই এবং অন্যান্য কয়েকটি কারণে সমাজতন্ত্রী দল নিরপেক্ষ ছিলেন।

সোভিয়েট সরকার চেকোশ্লোভাকিয়া অধিকার স্বীকার করিতে স্বীকৃত নহেন বলিয়া মঃ লিটভিনফ জার্ম্মানীকে জানাইয়াছেন।

জার্ম্মানী বৃটেন ও ফ্রান্সকে জানাইয়া দিয়াছে যে, চেকোশ্লোভাকিয়া অধিকারের বিরুদ্ধে তাহারা যে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছে, তাহার কোন 'রাজনৈতিক, আইনগত বা নৈতিক ভিত্তি নাই' বলিয়া তাহা অগ্রাহ্য করা হইয়াছে।

২০শে মার্চ্চ—

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র-বিভাগের মন্ত্রী স্যার নাজিমুদ্দিন পুলিশ বিভাগের ব্যয়-বরাদ্দ ২১৯৫৫০০০, পরিষদে মঞ্জুরীর জন্য উপস্থিত করেন। এই ব্যয়-বরাদ্দ সম্পর্কে বিরোধী দলগুলির পক্ষ হইতে ৫টি ছাঁটাই প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছিল। কোন ছাঁটাই প্রস্তাব সম্পর্কে ভোট লওয়া হয় নাই। পুলিশ বিভাগের ব্যয়-বরাদ্দ উপস্থিত করিয়া স্বরাষ্ট্র-সচিব স্যার নাজিমুদ্দিন যে লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি পরিষদের সদস্যদের নিকট একটি আসন্ন বিপ্লবের বার্ত্তা ঘোষণা করেন যে, বিপ্লবের ফলে বর্ত্তমান সামাজিক ও আর্থিক ব্যবস্থা বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। এই বিপ্লব হইতেছে কম্যুনিজম এবং কম্যুনিজমের এজেণ্ট হইতেছে মুক্ত রাজবন্দিগণ। লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ যে, ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা স্থির করিয়াছেন যে, বৃটেন এবং পৃথিবীর অন্যান্য শান্তিকামী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে অবিলম্বে একটা যোগাযোগ স্থাপন করা হউক।

প্যারিসের সংবাদে প্রকাশ যে, এই মর্ম্মে গুজব রটিয়াছে যে, ফরাসী গবর্ণমেণ্ট তিন শ্রেণীর সামরিক যন্ত্র-বিশারদগণকে আহ্বান করিয়াছেন।

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসুর স্বাস্থ্য সম্পর্কে যে বুলেটিন বাহির হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে, রাষ্ট্রপতির স্বাস্থ্যের উন্নতি আশাপ্রদ। রাষ্ট্রপতির শরীরের তাপ একশত ডিগ্রীতে নামিয়াছে।

কলিকাতা হাইকোর্টে ভাওয়াল মামলার আপীলের শুনানীর সময় অভূতপূর্ব্ব জনসমাগম হয়। এই দিন বাদী আদালতে হাজির হইয়াছিলেন। বিচারপতিগণ বাদীর দেহের চিহ্নগুলি পরীক্ষা করেন।

বার্লিনের খবরে প্রকাশ যে, জার্ম্মানী তাহার সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছে। জার্ম্মানী ইঙ্গ-জার্ম্মান নৌ-চুক্তি বাতিল করিতে পারে। সোভিয়েট রুশিয়ার পররাষ্ট্র সচিব লিটভিনফ জানাইয়াছেন যে, রাশিয়া জার্ম্মানীর চেকোশ্লোভাকিয়া অধিকার স্বীকার করিবে না।

দেশ
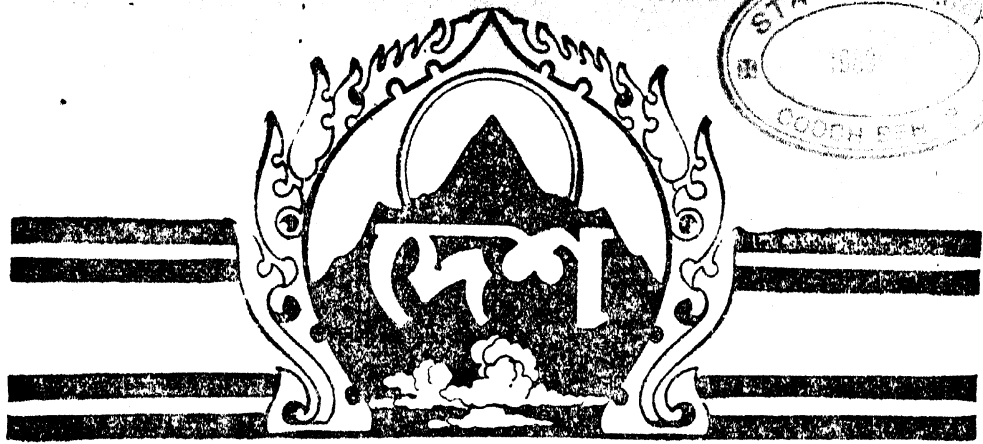
৬ষ্ঠ বর্ষ] শনিবার, ৪ঠা চৈত্র, ১৩৪৫ সাল, Saturday, 18th March, 1939 [১৮শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ত্রিপুরীর শিক্ষা—

ত্রিপুরীতে কংগ্রেস অধিবেশনের পরিসমাপ্তি হইল। প্রথমেই প্রশ্ন উঠে—ত্রিপুরীতে কি শিক্ষা পাইলাম? এ কথার উত্তরে বলিতে হয়, যেমন তেমন শিক্ষা নয়, বিশেষ রকমের শিক্ষা পাইয়াছি এই ত্রিপুরীতে। অহিংসার বাহ্যাচরণের ভিতরে কতখানি হিংসা থাকিতে পারে, অহিংসাধ্বজের আত্মার পরতে পরতে থাকিতে পারে কতখানি ক্রুরতা, ভণ্ডামী এবং মিথ্যাচার কতখানি মায়াহীন নির্ম্মম-নগ্নতার মূর্ত্তি ধরিয়া এসব উঠিতে পারে, তাহা আমরা দেখিয়াছি এই ত্রিপুরীতে। আমরা ত্রিপুরীতে দেখিয়াছি ব্যক্তি-স্বার্থ এবং প্রভুত্ব-পিপাসার আগুন কি আকারে মর্কট-বৈরাগ্যের মধ্যে লুক্কায়িত থাকিতে পারে এবং তীব্র ধূমজাল বিস্তার করিয়া ন্যায়, নীতি এবং মানবতাকে আচ্ছন্ন করিতে পারে। আমরা শুনিতেছি, পণ্ডিত গোবিন্দ-বল্লভ পন্থের প্রস্তাবটি নাকি কংগ্রেসের মধ্যে মিলনের সেতু বাঁধিয়া দিয়াছে এবং মনের মিল পাকা হইয়া গিয়াছে। আমরা সব ভণ্ডামি বরদাস্ত করিতে পারি; কিন্তু এমন ভণ্ডামি বরদাস্ত করা আমাদের পক্ষেও কঠিন। ত্রিপুরীতে যে দক্ষিণ-পন্থীদল নিতান্ত দুর্ব্বিসহ আক্রোশের পরিচয় দিয়াছেন, রোগ শয্যায়, বলিতে গেলে একরূপ জীবন-সংশয় অবস্থায় শায়িত রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের উপর তাঁহাদের সেই মনের জ্বালা যে এইখানে মিটিবে, ইহা আমরা মনে করি না। মনে করিলে মানুষের মনের ধর্ম্মকে অস্বীকার করা হয়। যে মনোবৃত্তি লইয়া দক্ষিণপন্থীরা কাজ করিয়াছেন, তাহার সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য হইল ছলে বলে কৌশলে যেমনভাবে হউক রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রকে লাঞ্ছিত, পর্য্যুদস্ত এবং যে প্রকারে হউক, কংগ্রেসের মর্য্যাদা-সম্পন্ন পদ হইতে বিতাড়িত করা। মতলব এই। ইঁহাদের মতলব যখন এই, তখন আমাদের মতে সুভাষচন্দ্র ঠিক সিদ্ধান্তই করিয়াছেন। দক্ষিণী দল যখন নিজেরাই বলি-তেছেন যে, পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থের প্রস্তাব সুভাষচন্দ্রের উপর অনাস্থার প্রস্তাব নয়, মহাত্মাজীর প্রতিই আস্থার প্রস্তাব। মহাত্মাজীর প্রতি দেশের আস্থা কোন অংশে যে কমিয়াছিল বা কমিয়াছে এমন মনে করিবার কারণ ছিল, আমরা তাহা মনে করি না; তবু ইঁহারা যখন বলিতেছেন তখন তাহাই স্বীকার। সুভাষচন্দ্রের পদত্যাগ না করাই উচিত, অন্তত এখন ত নহেই। দেখা যাউক, কর্ত্তাভজা নীতির কূটচক্রের গতি কতদূর গিয়াই উঠে। ইহাদের স্বরূপ ত ত্রিপুরীতে প্রকট হইয়াছে, সুভাষচন্দ্র পদত্যাগ না করাতে আরও পরিষ্কার হইয়া ফুটিয়া উঠিবে। দেশের লোকে কোদালকে কোদাল, কুড়ালকে কুড়াল বলিয়া চিনিয়া চলিতে পারিবে। মোহের যে খেলা অহিংসার মৌখিক আবরণের ভিতর দিয়া এতদিন জোট বাঁধা স্বার্থকে কায়েম করিবার পথে ঘুরিতেছিল, ত্রিপুরীতে তাহার উপর আঘাত পড়িয়াছে,—সুভাষচন্দ্র প্রেসিডেণ্ট পদে প্রতিষ্ঠিত থাকাতে আঘাত আরও পড়িবে—মুখোস একেবারে খুলিয়া যাইবে। বাঙলার অন্তরে দেশপ্রেমের যে তীব্র আগুন জ্বলিতেছে, যাহারা মনে করিয়াছে যে, সুভাষচন্দ্রকে আঘাতের পর আঘাত করিয়া তাহারা সে জিনিষকে নিস্তেজ করিবে, তাহারা ভুল বুঝিয়াছে। বাঙলা দেশ ভারতের জাতীয়তাবাদের জন্মদাতা। শুধু তাহাই নয়, এই বাঙলা দেশের স্বদেশপ্রেমিকেরাই রাষ্ট্রীয় সাধনার মধ্যে আত্মবলি দানের উন্মাদনা সঞ্চার করিয়া তাহাকে নূতন রূপ দিয়াছেন, ভারতবর্ষে নূতন হাওয়া বহাইয়া দিয়াছেন। বাঙালী 'ব্যক্তি' বুঝে না তিনি যতই বড় হউন, বাঙালী বুঝে জাতি। দক্ষিণী বল্লভপন্থী দলের দুর্ব্বিষহ বিদ্বেষ বিষের দাহনী সহ্য করিয়া বাঙলার স্বদেশ প্রেমিক সন্তান বীরের মর্য্যাদায় আজ সেই সত্যকে সুদৃঢ় এবং সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে, করিবে নিজের শেষ রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত দিয়া, নিজেকে অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া দিয়া। বাঙালীর স্বদেশ প্রেমিক সন্তানের এই যে মৃত্যুঞ্জয়ী শক্তি, ত্রিপুরী কংগ্রেসে তাহাই উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে।

ত্রিপুরী কংগ্রেসের ফল—

ত্রিপুরী কংগ্রেসে যোগদান করিতে যাইবার অব্যবহিত কাল পূর্ব্বে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এই অধিবেশনের

লক্ষ্য সম্বন্ধে 'ফ্রী প্রেস জার্নাল' পত্রে প্রকাশিত তাঁহার ধারাবাহিক প্রবন্ধের ক্রম অনুসরণ করিয়া লিখেনঃ—

The organisation is greater than the individuals of whom it consists, and the principles we stand than personalities, we must avoid all present bickerings and private animosity and view our problems from the high level which benefits the Congress and the chosen represntatives of the Indian people.

অর্থাৎ 'ব্যক্তির চেয়ে প্রতিষ্ঠানই আমাদের কাছে বড়; ব্যক্তিগত দ্বেষ-বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া কংগ্রেসের শক্তিবৃদ্ধির দিক হইতে আমাদের সব সমস্যার বিচার করিতে হইবে।' কিন্তু আমাদের মনে হয়, বল্লভাচারীর দলের অহিংস আক্রোশের ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া পণ্ডিতজী এই লক্ষ্যে স্থির থাকিতে পারেন নাই। ত্রিপুরী কংগ্রেসে নীতি কিংবা আদর্শ অপেক্ষা ব্যক্তিত্বকেই বড় করিয়া তোলা হইয়াছে এবং পণ্ডিতজীকেও পাকচক্রের মধ্যে পড়িয়া তাহাতেই সায় দিতে হইয়াছে। সুতরাং ত্রিপুরী কংগ্রেসের যে সিদ্ধান্ত, তাহাও একেবারে ব্যক্তিগত বা দলগত প্রাধান্যের সংস্কারবুদ্ধি হইতে মুক্ত বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি না। ত্রিপুরী কংগ্রেসে যে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, সেগুলির মধ্যে চারটি প্রস্তাবকে আমরা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করি। সেগুলি এই—(১) কংগ্রেসের গঠন-বিধি সংশোধন ও ইচ্ছামত পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির উপর সমর্পণ; (২) কংগ্রেস হইতে দুর্নীতি দূর করিবার প্রস্তাব; (৩) জাতীয় দাবী সংক্রান্ত প্রস্তাব এবং (৪) দেশীয় রাজ্য সংক্রান্ত প্রস্তাব। কংগ্রেসের মধ্যে দুর্নীতি যে না আছে আমরা এমন কথা বলিতেছি না; দুর্নীতি দূর করা যে ভাল ইহাও স্বীকার করি। কিন্তু এ বিষয়ে একটু বিবেচ্য আছে। বিবেচনা এই যে, সেই দুর্নীতি দূর করিবার ধরণটা কি,—সূক্ষ্মতত্ত্ব ইহার ভিতর অন্য কিছু আছে কি না। কিছুদিন হইল কংগ্রেসের দক্ষিণী দল এই দুর্নীতি-দলনের বিরুদ্ধে ধর্ম্মদণ্ড বড় বেশী উঁচু করিয়া ধরিতে আরম্ভ করিয়াছেন দেখা যাইতেছে এবং তাঁহাদের প্রতি কথাতেই বুঝা যায় যে, দুর্নীতি যত কিছু করিতেছে বামপন্থীরা; তাঁহারা—দক্ষিণ-মার্গাবলম্বীরা একেবারে পূর্ণভাবে অহিংসা এবং শুদ্ধ সত্ত্বের অবতার! কিন্তু সেই যে অহিংসা এবং কথায় কথায় তাঁহারা যে শুদ্ধ সত্ত্বের দোহাই দেন, তাহার যে বাস্তব মূর্ত্তি কি, ত্রিপুরীতে দেশের লোক তাহা দেখিল। দেখিল—গোষ্ঠীগত প্রভুত্ব কায়েম করিবার জন্য তাঁহারা কতদূর সংকীর্ণতা দেখাইতে পারেন! আমাদের ত মনের খোলা কথা এই যে, দক্ষিণী দলের দুর্নীতি দলনের এই যে 'শুচিবায়ু', ইহার মূলে রহিয়াছে—ঐ দলগত বা গোষ্ঠীগত প্রভুত্ব-স্পৃহা। কংগ্রেসের মধ্যে এমন একটা শক্তি জাগিয়া উঠিতেছে, যাহা অপ্রতিহত বেগে আজ আগাইয়া যাইতে চায়। আপোষ-নিষ্পত্তি মানিতে চায় না; যে শক্তি সাম্রাজ্যবাদের খুঁটি পর্য্যন্ত এ দেশ হইতে একেবারে উৎখাত করিয়া ছাড়িতে চায়। বল্লভাচারী বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান পরম পুরুষের দল কংগ্রেসের মধ্যে এই নবশক্তির জাগরণকে শঙ্কার চক্ষে দেখিতেছেন। এই শক্তিকে নষ্ট করিতে হইবে এবং সেই শক্তিকে নষ্ট করিবার জন্য হিটলার, মুসোলিনী হইলেন ইহাদের অন্তরের দেবতা, প্রেমের গুরু। এই গুরুবাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ঋষি মহাত্মাদের বহুমুখে হইয়াছে ত্রিপুরীতে। এই গুরুবাদকে কায়েম রাখিবার জন্যই সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধতা এবং সেই গুরুবাদকে কায়েম রাখিবার জন্যই দুর্নীতি দলনের ভারটা কংগ্রেসের সাধারণ প্রতিনিধিদের হাতে না রাখিয়া তাঁহাদেরই গুরুমাহাত্ম্য-পরিচালিত, নিজেদের গোষ্ঠী-নিয়ন্ত্রিত ওয়ার্কিং কমিটির হাতে আনিবার ফন্দী। ব্যক্তি অপেক্ষা নীতি যদি সত্যই বড় হয় এবং বড় হয় দেশের লোকমত, তবে দক্ষিণী দলের এই ফন্দীকে ব্যর্থ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। শুধু নাম-মাহাত্ম্য শুনিয়া গলিয়া গেলে চলিবে না। আমাদের সোজা কথা এই।

জাতীয় দাবী সম্বন্ধে প্রস্তাবের মধ্যে নূতনত্ব কিছু নাই। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় ছয় মাসের মেয়াদে যে চরম-পত্র দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, পণ্ডিত জওহরলালের সংশোধন প্রস্তাবক্রমে তাহা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমানে যে আকারে প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে ভাষার আড়ম্বর আছে, অনুপ্রাসাদি অলঙ্কারের প্রাচুর্য্য আছে। কিন্তু রাজনীতিতে ঐগুলির কোন মূল্য নাই; মূল্য আছে আদর্শের সাধনার জন্য একাগ্রতাকে একান্তভাবে উদ্দীপ্ত করিয়া তোলায় এবং দেশকে তেমন পথে তৈয়ারী করিবার বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ার নিরূপণে বা নির্দ্দেশে। জাতীয় দাবীর ভিতরে তেমন কিছু জিনিষ নাই, শরৎচন্দ্রের প্রস্তাবে বরং একটু ছিল। প্রদেশসমূহে কংগ্রেসের মন্ত্রিগিরির কাজ যেমন চলিতেছে তেমনই চলিবে অথচ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট দাবী না মানিলে তাঁহাদের সঙ্গে একটা সঙ্ঘর্ষ বাধাইয়া তুলিব, ইহা কোন্ পথে, তাহা বুঝা দুষ্কর। সুভাষচন্দ্র তাঁহার অভিভাষণে এইজন্য চরমপত্র প্রেরণের পোষকতা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে যুক্তি টিকে নাই; অথচ তেমন সঙ্ঘাত-সঙ্ঘর্ষ ভিন্ন শুধু কথায় কাজ হাসিল হইবে না; সুতরাং সাহসের সঙ্গে পথ বাহির করিতে হইবে, প্রাদেশিক কর্ত্তৃত্বের মায়ার টানে পড়িয়া থাকিলে স্বাধীনতা আসিবে না। দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে গৃহীত প্রস্তাবটি আমরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। এখন যে প্রস্তাব গৃহীত হইল, তাহাতে কংগ্রেস আর দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রজাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নির্ব্বিকার থাকিতে পারিবে না। বাজে অজুহাতে কথায় কথায়—সত্যাগ্রহ আন্দোলন স্থগিত রাখিবার যুক্তিও এখন খাটিবে না। এই প্রস্তাবের ব্যাপক প্রয়োগ যদি না হয়, তাহা হইলে কংগ্রেসের মর্য্যাদার হানি ঘটিবে।

মহাত্মার মনের কথা—

ত্রিপুরীতে এই যে ঝড়-ঝাপ্টা বহিয়া গেল, মহাত্মা গান্ধী ইহার মধ্যে নাই, অথচ রাজাগোপালাচারী মহাশয় যিনি মহাত্মাজীর একান্ত অভেদাত্মা এবং অখণ্ড রকমের অন্তরঙ্গ পুরুষ, তাঁহার সঙ্গে মহাত্মাজীর টেলিফোনে আলাপ হইল,

পণ্ডিত জওহরলালের সংগে আলাপ হইল। এই যে আলাপ এগুলি কোন নির্ব্বিষয় উৰ্দ্ধ স্তরে থাকিয়া—আমাদের মত অন্ত্যজনেরা তাহা অনুমান করিতে পারে না, করিতে গেলে বোধ হয় অপরাধ হইবে। সুতরাং অনুমান ছাড়িয়া প্রমাণের মধ্যেই আসিতে হয়। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু কংগ্রেসের অধিবেশনের পর মহাত্মাজীর সংগে টেলিফোনে আলাপ করেন। এই সময় মহাত্মাজী বলেন যে, ওয়ার্কিং কমিটির ভূতপূর্ব্ব সদস্যদের সহযোগিতার ফলে মনের গোল মিটিয়া গেল, কংগ্রেসের নেতারা যেন সুভাষচন্দ্রকে বিশ্বস্ততাসহকারে সহযোগিতা করেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, প্রকাশ্য অধিবেশনের শেষ পর্য্যন্ত ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যেরা যে খেলা খেলিতেছিলেন সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে, মহাত্মাজীর মতে তাহাই কি হইল সহযোগিতার পথ পরিষ্কার করা? দেশের লোক যাঁহাকে প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত করিয়াছে, প্রেসিডেন্টস্বরূপে তিনি কি ভাবে কাজ করেন, তাহা না দেখিয়া ব্যক্তিগত বিদ্বেষকে বলবৎ করিয়া, তাঁহার অতীত কার্য্যকে ভিত্তি করিয়া—সে কার্য্যের ভাষ্য যাহাই হউক না কেন, প্রেসিডেন্ট হিসাবে তিনি কি করেন, তাহা না দেখিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে প্রস্তাব আনিবার পক্ষে কোন যুক্তি থাকিতে পারে? ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের যোল আনা ক্ষমতা কংগ্রেসের বিধি-বিধান অনুসারে সুস্পষ্টভাবে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্টের হাতে, সেই বিধি-বিধানের পরিবর্ত্তন না করিয়া প্রেসিডেন্টের হাত হইতে সেই ক্ষমতা কাড়িয়া লইবার যে উদ্যম, সে উদ্যম কোন্ যুক্তিতে বিধিসঙ্গত হইতে পারে? কোন্ যুক্তি থাকিতে পারে, যিনি কংগ্রেসের একজন সাধারণ সদস্যও নহেন, কংগ্রেসের বিধি-বিহিত পরিচালককে শাসনতান্ত্রিকভাবে এমন কাহারও আজ্ঞাবহ করিবার পক্ষে? কর্ত্তার নামে গড় হইয়া পড়ার একটা পথ আছে, আমরা জানি, কিন্তু কংগ্রেস হইল একটা বিধি-বিহিত প্রতিষ্ঠান, সে প্রতিষ্ঠানের পথ হইল বিধিমার্গ। বিধিকে বড় না দেখিয়া ব্যক্তিকে যাঁহারা বড় করিয়া দেখিতেছেন, তাঁহারা নীতির দিক হইতে দেশের যে কত ভীষণ অনিষ্ট করিতেছেন, মহাত্মাজী কি তাহা নিজেও জানেন না? মহাত্মাজী কি নিজেও এমন কর্ত্তা-ভজাগিরির বিরুদ্ধে বহুবার বিক্ষোভ প্রকাশ করেন নাই? এ দেশ ব্যক্তিকে দেখিয়াছে, দেখে নাই জাতিকে, দেখে নাই বিধিকে। এই ত দেশের সব চেয়ে দুর্ভাগ্যের বড় কারণ। এ দেশে ব্যক্তি না জন্মিয়াছেন এমন নয়। শিবাজী জন্মিয়াছেন, জন্মিয়াছেন রণজিৎ সিং, জন্মিয়াছেন হায়দার আলী। কিন্তু জাতির কি হইয়াছে তাহাতে? তাঁহাদের জীবদ্দশার অবসানের সংগে সংগে তাঁহাদের সাধনার যে আদর্শ, তাহা শূন্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে। গিয়াছে তাহার কারণ এই যে, তাঁহারা তাঁহাদের আদর্শকে জাতির মধ্যে বিধি-বিধানবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের আকারে দাঁড় করাইতে পারেন নাই। আমরা ত জানিতাম যে, মহাত্মাজী এই বস্তুটাই চাহেন এবং কংগ্রেসকে তিনি ভারতের রাষ্ট্র-আদর্শের বিধি-রূপ দিতেই সাধনা করিতেছেন। কিন্তু ত্রিপুরী কংগ্রেসে আমরা নিরাশ হইয়াছি। নিরাশ হইয়াছি, মহাত্মাজীর প্রতি অনুরাগকে যাঁহারা তাঁহাদের একচেটিয়া সম্পত্তি বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের আচরণ দেখিয়া। তাঁহারা অন্ধ ব্যক্তি-পূজাকেই বড় করিয়া দেখিয়াছেন, মহাত্মাজী যে হিটলারের দুষ্ট-নীতি এবং স্বেচ্ছাচারের নিন্দাবাদ করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন, তাঁহারা সেই মহাত্মাজীকেই জাতির হিটলার, মুসোলিনী বলিয়া তাল ঠুকিয়া লড়াই চালাইয়াছেন। ইহাদের এই শ্রেণীর জঘন্য কার্য্য মহাত্মাজীর ন্যায়, নীতি, ধর্ম্ম এবং মানবতাকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তোলে নাই, ইহাই আশ্চর্য্য।

পণ্ডিত জওহরলাল এবং সোসিয়ালিষ্ট দল—

পণ্ডিত জওহরলালের কথাবার্ত্তা শুনিয়া বোধ হয়, তিনি কর্ত্তা-ভজা মতিগতির প্রতি বিশেষ বিশ্বিষ্ট। তিনি স্বেচ্ছা-মান পুরুষ বলিয়াই দেশের শ্রদ্ধা তিনি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ত্রিপুরীতে দেখা গেল, সম্মোহিনী বিদ্যার প্রভাব তাঁহার উপরও দস্তুরমত ফাঁসিতে আরম্ভ করিয়াছে। মহাত্মাজীর প্রতি তাঁহার অনুরাগ আছে—বুঝি ইহার কারণ, বুঝি রাজনীতিক বাস্তব কার্য্যকারিতার দিক হইতে ইহার মূলগত বিজ্ঞতার মর্ম্মকে। কিন্তু কংগ্রেসের সেই যে বাস্তব নীতির উপর মহাত্মাজীর প্রভাব সুভাষচন্দ্রের নির্ব্বাচনে কোন দিক হইতে ক্ষুণ্ণ হইল, আমরা তাহা বুঝি না। সুভাষচন্দ্র নিজে আগাগোড়া মহাত্মাজীর নীতি ও আদর্শেরই অনুসরণ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন; তবে পণ্ডিতজী কেন, কর্ত্তা-ভজা দলের লেজুড় ধরিয়া না চলিয়া পারিলেন না! সোসিয়ালিষ্টদের মতিগতিও বিচিত্র! তাঁহারা কথায় ত দীন দুনিয়াকে উড়াইয়া দিতে দ্বিধা করেন না; কিন্তু কাজের বেলা আগাইতে বলিলে তখনই কাঁচু-মাচু আরম্ভ হয়। ইহার মধ্যে মনুষ্যত্ব কোথায় সত্যনিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা? শেষটা সোসিয়ালিষ্ট দলের সর্দ্দার হিসাবে শ্রীযুত জয়প্রকাশ যে কথা বলিলেন, সে একেবারে চূড়ান্ত! তিনি বলিলেন, সুভাষচন্দ্রের নির্ব্বাচনে দক্ষিণপন্থী দল যে এতটা উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করিবেন, তাঁহার প্রথমটা তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তাহা হইলে কি ধরিয়া লইতে হইবে যে, দক্ষিণী দলই সোসিয়ালিষ্টদের গুরু, ভক্ত ও প্রভু সাক্ষী এবং তাঁহাদের অনুগ্রহ-নিগ্রহই সোসিয়ালিষ্টদের পক্ষে একমাত্র বিবেচ্য? অথচ ইঁহাদেরই মুখে দক্ষিণপন্থী দলের বিরুদ্ধে দিনরাত আগুন ছুটিতে দেখি এবং সুভাষচন্দ্রকে ইঁহারাই বিশেষভাবে সমর্থন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের দায়িত্বহীনতা এবং নীতি-নিষ্ঠার অভাব, ত্রিপুরীতে যেভাবে দেখা গিয়াছে, তাহাতে দক্ষিণপন্থী দল যেমন দেশের লোকের ধিক্কার লাভ করিবেন, তেমনই সোসিয়ালিষ্ট দলও তাহা হইতে বিশেষ রেহাই পাইবেন না। দুই নৌকায় পা দিয়া কোন আদর্শকে বড় করা যায় না। চালাকীর দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য সিদ্ধ হয় না, আমরা ত সোজা বুঝি এই কথা।

রাষ্ট্রপতির আহ্বান—

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রকে যেরূপ অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, ভারতের জাতীয় মহাসমিতির ইতিহাসে তেমন কোন দিন দেখা যায় নাই। একে নিতান্ত রুগ্ন শরীর তাহার উপর মনের উদ্বেগ এবং অশান্তি। শুধু তাহাই ন

ঘটনার গতি কোন দিকে গিয়া গড়ায়, সে সম্বন্ধে একেবারে অনিশ্চয়তা, অস্বস্তি; ইহার উপর সহকর্ম্মীদের সহযোগিতার অভাবে চিন্তায় এবং মনের উপর অবিরত চাপ। এই অবস্থায় সুভাষচন্দ্রের যে অভিভাষণ, তাহাই কংগ্রেসের ইতিহাসে সব চেয়ে ছোট অভিভাষণ না হইয়া পারে না। তবে সুভাষচন্দ্রের মনের কথা যাহা, তাহা এই সংক্ষিপ্ত অভিভাষণের ভিতর দিয়া আবেগময়ী ভাষায় তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি যে কথাটা বলিয়াছেন তাহা এই যে, জগতের আন্তর্জ্জাতিক অবস্থা যেরূপ, তাহাতে স্বাধীনতা-প্রতিষ্ঠার পক্ষে এই সময় আমাদের দিক হইতে সবচেয়ে উপযুক্ত সময়, দরকার সঙ্ঘবদ্ধভাবে সেই স্বাধীনতার জন্য শক্তিকে প্রয়োগ করা। তিনি এই কথা বলিয়াছেন যে, স্বাধীনতা-সংগ্রামের একটা শক্তিময় সবল রূপ দেখিবার জন্য দেশের লোক অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির এই অবসরে আমাদের কর্ত্তব্য হইবে, সেই ইচ্ছাকে খাটাইয়া লওয়া, শুধু ব্রিটিশ-ভারতে নয় সামন্ত রাজ্যগুলিতে পর্য্যন্ত। সুভাষচন্দ্রের এই যে বাণী, সমগ্র দেশের ইহাই মর্ম্মবাণী। দেশ এখন বুঝে না কংগ্রেসীদের মন্ত্রিত্ব—বুঝে না ফেডারেশন বা তেমন কিছু, দেশবাসী চায় স্বাধীনতা; বিদেশীর প্রভাব-বিনির্ম্মুক্ত অখণ্ড স্বাধীনতা এবং সেই যে স্বাধীনতা, তাহা ব্যতীত অন্য কোন পথে কোন রকম গোঁজামিল দিয়া দেশের কোন সমস্যার সমাধান হইবে না। লাভের মধ্যে এই—তেমন গোঁজমিল দিতে যাইবার দুর্ব্বলতার ভিতর দিয়া দেশের বিরোধী স্বার্থেরই প্রতিষ্ঠা ঘটিবে। আজ যে মুহূর্ত্ত আসিয়াছে, সে মুহূর্ত্তে, জাতির মেদ-মজ্জায় দুর্ব্বলতা যদি কোন রকমে ঢুকে, তাহা হইলে স্বাধীনতা সুচির-যুগের জন্য পিছাইয়া যাইবে। সুভাষচন্দ্রের এই যে মত, দেশের স্বাধীনতাকামী যাঁহারা, তাঁহাদের মধ্যে এ সম্বন্ধে কোন বিরুদ্ধতা যে থাকিতে পারে, আমরা বুঝি না। আমাদের ভরসা আছে, রোগ শয্যাশায়ী সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠস্বর যতই ক্ষীণ হউক, ঐক্যের জন্য তাঁহার এই যে আহ্বান, তাহা ব্যর্থ হইবে না। দল বা গোষ্ঠীগত স্বার্থের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইবে দেশের বৃহত্তর স্বার্থ। জনগণের অন্তরশায়ী বিরাট পুরুষ ব্যক্তির অহমিকা এবং স্বার্থবুদ্ধিকে অভিভূত করিয়া আপনার প্রচণ্ড মহিমায় দীপ্ত হইয়া উঠিবেন; দিকচক্রবালে যে আঁধার জমিয়াছে, তাহা দেখিতে দেখিতে কাটিয়া যাইবে। দুই-এক দিনের ভেদ-দ্বন্দ্ব বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইবে।

রাষ্ট্রপতির প্রত্যাবর্ত্তন—

গত ১৪ই মার্চ্চ মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র ত্রিপুরী হইতে ধানবাদে আসিয়াছেন, সেখানে কিছুদিন থাকিয়া পরে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। তিনি যখন কংগ্রেসে যোগদানের উদ্দেশ্যে ত্রিপুরী যাত্রা করেন, তখনও তিনি নিতান্ত অসুস্থ ছিলেন, জ্বর না কমিয়া বরং বাড়িবার মুখেই তখন ঝোঁক দেখা যাইতেছিল। স্যার নীলরতন সরকার তো সুস্পষ্টভাবে তাঁহাকে নিষেধই করিয়াছিলেন; কিন্তু দেশসেবার অত্যুগ্র নিষ্ঠায় সুভাষচন্দ্র চিকিৎসকদের সে নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়াই ত্রিপুরীতে যান, শরীরের সম্বন্ধে চিন্তাকে তিনি উপেক্ষা করেন। আমরা আশা করিয়াছিলাম, ত্রিপুরীতে গিয়া দেশপ্রেমিক নেতাদের সহযোগে এবং সংসর্গে, যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার আকুলতায় তিনি ত্রিপুরীতে যাইতেছেন, সেই ঐক্যের অনুকূল আবহাওয়ায় তাঁহার মন নূতনতর শক্তি লাভ করিবে এবং তাহার ফলে তিনি স্বাস্থ্যলাভের দিকেই অগ্রসর হইবেন। কিন্তু ফল উল্টা ফলিল। ত্রিপুরীতে অহিংস প্রভুর দল সাত্ত্বিক আক্রোশের অস্ত্র একেবারে শানাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহারা রুগ্ন রাষ্ট্রপতিকে আঘাতের উপর আঘাতই করিতে থাকিলেন। নীতি কিংবা আদর্শের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নির্ম্মম নিষ্ঠুরভাবে বিদ্বেষ-বিষ-দিগ্ধ বাণ-বৃষ্টি হইতে লাগিল বল্লভাচারীদের ব্যূহ হইতে—সুভাষচন্দ্রের অবস্থা হইল সেখানে সপ্তরথী পরিবেষ্টিত অভিমন্যুর মত। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, অবিমিশ্র অহিংসব্রতীদের আক্রোশের আগুনে যদি তাঁহাকে এমনভাবে ভাজা ভাজা না করা হইত, তিনি যদি একটু সহযোগিতা পাইতেন সেখানে, তাহা হইলে তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থা এতটা খারাপ হইয়া উঠিত না। যে আবহাওয়ার ভিতর তিনি গিয়া পড়িয়াছিলেন, অন্য কেহ তাহার মধ্যে ঠিক থাকিতে পারিত না। ত্রিপুরী দেখিয়াছে বাঙলার স্বদেশপ্রেমিক সন্তানের মনের শক্তি, দেখিয়াছে স্বদেশসেবার আন্তরিকতা এবং নিষ্ঠার অগ্নিময় রূপ। সত্য, অহিংসা এ সব বড় বড় কথা আওড়াইয়া যাহারা ভণ্ডামি চালায়—ম্লান হইয়াছে তাহাদেরই মহিমা। তাহারা নামিয়া গিয়াছে দশ হাত জলের নীচে; কিন্তু বাঙলার বীর সন্তানের মহিমা দীপ্ততর হইয়াছে। আমরা আশা করিতেছি, এই যে ঐকান্তিকতা, এই যে নিষ্ঠা, জয় তাহার হইবেই,—ব্যক্তিগত বিদ্বেষ, আক্রোশ এগুলি বুদ্বুদের মত বাষ্পাকারে বিলীন হইয়া যাইবে। যাঁহারা সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধতা করিয়াছেন, তাঁহারা নিজেদের ভ্রম সত্বরই উপলব্ধি করিবেন, যদি না করিতে পারেন—তাহাতেও আফশোষের কারণ নাই। স্বদেশসেবকের যে আত্মবদান—তাহা ব্যর্থ হয় না, তাহা দেশে নূতন শক্তি গড়িবে, শক্ত মানুষ—সত্যকার মানুষকে জাগাইবে; সুতরাং হতাশ আমরা হই নাই। রাষ্ট্রপতি শীঘ্র নিরাময় হইয়া দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করুন, ইহাই শ্রীভগবানের চরণে আমাদের প্রার্থনা।

রাজন্যবর্গ ও বড়লাট—

নরেন্দ্রমণ্ডলের অধিবেশনে বড়লাট যে বক্তৃতা করিয়াছেন, সেই বক্তৃতার কতকগুলি কথা বিশেষ কড়া কড়া আছে। বড়লাট বলেন,—"আমার মনে হয়, আপনারা পরিষ্কারভাবেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, বর্ত্তমান যুগে রাজাশাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রজাদের কোন ন্যায়সঙ্গত অভিযোগ থাকিলে তাহা দূর করা উচিত। প্রজারা যাহাতে সন্তোষ লাভ করে এবং অযোগ্য কর্ম্মচারীদের হাতে লাঞ্ছিত না হয়, তেমন ব্যবস্থা করা আপনাদের কর্ত্তব্য। আপনারা রাজ্যশাসনে কোন সংস্কার প্রবর্ত্তন করিলে, তাহাতে বাধা দিবার ইচ্ছা সার্ব্বভৌম শক্তির নাই। রাজ্য ছাড়িয়া অন্যত্র অবস্থান করা অথবা রাজস্বের অধিকাংশ নিজেদের জন্য ব্যয় করা আপনাদের পক্ষে অনুচিত।

সার্ব্বভৌম শক্তি আপনাদের সহিত সন্ধির সর্ত্তসমূহ পালন করিবে; কিন্তু তাহার অর্থ ইহা নহে যে, আপনারা নিজেরা রাজ্যের মঙ্গলের দিকে মন দিবেন না।" কথাগুলির মধ্যে ঝাঁজ আছে, কিন্তু দেশীয় রাজ্যের সমস্যা এ পথে যে মিটিবে আমরা তাহা মনে করি না। আমরা কাঁটা একেবারে অন্যদিকে ঘুরাইতে চাই। রাজারা দয়া করিবেন, করুণা করিবেন, মৈত্রী, প্রেমের অবতার তাঁহারা হইবেন, এ সব ছেঁদো কথায় আমরা ভুলি না। কিংবা কোনদিন সুপ্রভাতে স্বয়ং ভগবান আসিয়া কোন মহাপুরুষের কানে কানে দেশীয় রাজ্যের দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য কি পরামর্শ দিবেন, দেশীয় রাজ্যের প্রজাদিগকে প্রার্থনাপূর্ণ হৃদয়ে তাহার প্রতীক্ষায় থাকিতে হইবে—এ ধরণের বুজরুকীও আমরা বুঝি না। আমরা চাই, দেশীয় রাজ্যের এইভাবে অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন করিতে যাহাতে প্রজারা আর দয়া এবং করুণার পাত্র না থাকে। পাশবিক ক্ষমতার পীড়নেরই মত এই যে ব্যক্তিবিশেষের দয়া বা করুণা, ইহার উপর নির্ভরতাতেও মানুষের আত্মার বড় একটা পীড়ন আছে। আমরা এই পীড়ন হইতে মানুষের আত্মাকে মুক্ত করিতে চাই। মানুষের দৈন্য দূর করিয়া তাহাকে নিজের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই। মনাবাত্মার যেখানে দৈন্য, সেইখানেই পীড়ন—তাহা মুষ্টি-প্রহারের আকারেই আসুক আর মুষ্টিভিক্ষার আকারেই আসুক। ভারতের সর্ব্বত্র—কি ব্রিটিশ ভারত, কি সামন্ত রাজ্যে আজ জাগাইয়া তুলিতে হইবে মানুষকে।

বাঙলার সংস্কৃতি—

বাঙলার যে সভ্যতা বা সংস্কৃতি, আমরা যাহার এত গর্ব্ব করি, তাহা হিন্দুরই একচেটিয়া নয়, মুসলমানেরও; প্রকৃতপক্ষে বাঙালী মাত্রেরই। দুঃখের বিষয়, মুসলমানদের মধ্যে অনেকে দুই পাতা ইংরেজী পড়িয়া এই সত্য বিস্মৃত হইয়াছেন, এখন তাঁহারা আরব্য, পারশ্য ছাড়া কথা বলেন না। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন-উৎসবে ভাইস-চ্যান্সেলার খান বাহাদুর আজিজুল হক সাহেব যে অভিভাষণ দিয়াছেন, তাহাতে এই শ্রেণীর সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের একটু চোখ খুলিবে বলিয়া আমরা মনে করি। তিনি মাতৃভাষার প্রতি যে অনুরাগ এই বক্তৃতায় দেখাইয়াছেন, তাহা বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য! খান বাহাদুর বলেন,—ভারতে এমন কোন শিক্ষাব্রতী আছেন বলিয়া জানি না, যিনি মাতৃভাষায় শিক্ষাদান ব্যবস্থাকে জাতির রাজ-নৈতিক অগ্রগতির পক্ষে অন্তরায় বলিয়া মনে করিতে পারেন। বাঙলা ভাষা কি সত্য সত্যই এত দরিদ্র? বাঙলা ভাষা ভারতের সমৃদ্ধ ভাষা। পণ্ডিতগণ ইহার উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য জীবনপাত করিয়াছেন। বাঙলা ভাষায় পণ্ডিতগণ পৃথিবীর সর্ব্বত্র খ্যাতিও অর্জ্জন করিয়াছেন। ইংরেজী ভাষার প্রয়োজন ও গুরুত্ব—আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু এই প্রদেশে উহা কখনও বাঙলার স্থান অধিকার করিতে পারিবে না।" তরুণদিগকে সম্বোধন করিয়া খান বাহাদুর বলেন,—'আমাদের ঐতিহ্য এবং অতীতের উপর যেন আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস থাকে। আমরা সকলেই প্রাচ্য এবং ভারতীয় জাতিরূপেই অস্তিত্ব রক্ষা করিতে চাই। মুসলিম ছাত্রদিগকে এমনভাবে শিক্ষালাভ করিতে হইবে যেন আধুনিক প্রগতি-মূলক বৈজ্ঞানিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা ইসলামের সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে পরিচিত হইতে পারেন, আর সেই সঙ্গে তাঁহারা যেন ভুলিয়া না যান যে, তাঁহারা আসলে বাঙালী ও ভারতীয়।' দ্বিমত নাই এ বিষয়ে। আমাদের শুধু প্রশ্ন এই যে, সরকারের বিধানে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষানীতি অনুসৃত হইতেছে তাহা কি খান বাহাদুরের এই বিশ্বাসের অনুকূলে? পাঠ্যপুস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া শিক্ষা-বিভাগের সর্ব্বস্তরে বাঙলা ভাষা এবং বাঙলার নিজস্ব সংস্কৃতিকে পিষ্ট করিবার চক্রান্ত সুরু হইয়াছে, আমরা দেখিতে চাই খান বাহাদুর সেই ভেদনীতির বিরুদ্ধতায় নির্ভীকভাবে অবতীর্ণ হইয়া নিজের আদর্শকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিবেন। বাঙলার সভ্যতা কিংবা সংস্কৃতির উপর আঘাতের কোন প্রচেষ্টার সঙ্গে আপোষরফা না করিয়া যদি তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন, তবে জাতির শ্রদ্ধার অধিকারী হইবেন।

'বন্দে মাতরমে' বিক্ষোভ—

কিছুদিন পূর্ব্বে এডিনবরা শহরে একটি জনসভায় জগতের বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মুখে 'বন্দে-মাতরম্' সঙ্গীত যখন গাওয়া হয়, তখন উপস্থিত জগতের ২৬টি দেশের প্রতিনিধিরা দণ্ডায়মান থাকিয়া ভারতের জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি মর্য্যাদা প্রদর্শন করেন; কিন্তু এই ভারতে 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত এখনও এক শ্রেণীর বিভীষিকা উৎ-পাদন করিতেছে। হায়দরাবাদে 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত করার অপরাধে জেলের মধ্যে কয়েকজন সত্যাগ্রহীকে বেত্রাঘাত করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে 'মারহাট্টা' পত্রের সংবাদদাতা লিখিতেছেন ঃ

"গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ইন্সপেক্টর জেনারেল মিঃ হাকিন্স হায়দরাবাদ জেল পরিদর্শন করিতে গমন করেন। মিঃ হকিন্স যাঁহারা 'বন্দে মাতরম্' গান করিয়াছে, তাঁহাদের নাম জানিতে চাহেন, ইন্সপেক্টরের রূঢ় আচরণে ভীত না হইয়া রামচন্দ্র রেড্ডি নামক একজন যুবক ও তাঁহার সঙ্গে আরও কয়েকজন সত্যাগ্রহী সাহসের সহিত দণ্ডায়মান হইয়া বলেন যে, আমরা 'বন্দে মাতরম্' গান গাহিয়াছি। মুখের উপর তাঁহাদের এই জবাবে ক্ষুব্ধ হইয়া মিঃ হকিন্স রেড্ডির দিকে ধাওয়া করেন এবং তাঁহাকে সজোরে দুইটা ঘুষি মারিয়া বলেন,—ইহার পরও কি তোমরা আবার ঐ গান গাহিবে? বন্দিগণ তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন—নিশ্চয়ই। মিঃ হকিন্স রামচন্দ্র রেড্ডিকে ২৬ ঘা বেত মারিবার আদেশ দেন। ইহার পর দিন ইহাদিগকে ২৬ ঘা করিয়া বেত মারা হয়।" স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ গাহিয়াছিলেন,—বেত মেরে কি মা ভুলাবে? আমরাও বলিতেছি, এই সব অত্যাচারের ফলে, 'বন্দে মাতরম্' মহামন্ত্রের শক্তিই বৃদ্ধি পাইতেছে। হায়দরা-বাদের জেলের এই সংবাদে আমরা দুঃখিত হই নাই, উল্লাস বোধ বরং করিতেছি। জাতীয় সঙ্গীতের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার

জন্য অত্যাচার—নির্য্যাতন অম্লানমুখে যাঁহারা সহ্য করিতে-ছেন, তাঁহারা আমাদের হৃদয়ে আশা এবং উৎসাহের সঞ্চার করিতেছেন। অত্যাচার-নির্য্যাতন সহ্য করিবার এই পথের ভিতর দিয়াই স্বাধীনতার সাধকগণ জয়যাত্রার পথে অগ্রসর হইয়া থাকেন। স্বাধীনতার পথ কুসুমে আস্তৃত কোথায়ও নয়, সে পথ ত্যাগীর রুধিরে কর্দ্দমিত। কিন্তু আমরা শুধু এই প্রশ্ন করিতেছি যে, ত্রিপুরীর সিদ্ধান্তের পরও কংগ্রেস হায়দরাবাদের ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকিবেন কি? রাজকোটকেই কি ভগবান চিহ্নিত করিয়া দিয়াছেন এবং জয়পুরকে? হায়দরাবাদে, ত্রিবাঙ্কুরে, তালচের, ঢেনকানল এই সব স্থানে প্রজাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকারে যেভাবে হস্তক্ষেপ করা হইতেছে তাহার সম্বন্ধে কংগ্রেসের কি কর্ত্তব্য কিছুই নাই? হায়দরাবাদ জেলে যাঁহারা জাতীয় সঙ্গীতের জন্য নির্যাতন বরণ করিয়া লইয়াছেন, তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিয়া আমরা নিজ-দিগকে কৃতার্থ মনে করিতেছি।

শ্রীহট্টের বঙ্গভক্তি—

আসাম ব্যবস্থা পরিষদে একটি প্রশ্নের উত্তরে প্রধান মন্ত্রী বলেন যে, শ্রীহট্টকে বাঙলার অন্তর্ভুক্ত করিতে নির্দ্দেশ দিয়া আসামের মন্ত্রীরা নিজেরাই একটি প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন। এই সম্পর্কে আমাদের মনে কতকগুলি প্রশ্ন জাগে। প্রশ্নটি এই যে, শ্রীহট্ট বাঙলা ভাষা-ভাষী জেলা, এইজন্যই যদি শ্রীহট্টকে বাঙলার অন্তর্ভুক্ত করা আসামের মন্ত্রিমণ্ডল সমর্থন করেন, তাহা হইলে কাছাড় এবং গোয়ালপাড়াই বা বাদ যাইবে কেন? শ্রীহট্টের ন্যায় ঐ দুইটি জেলাতেও বঙ্গ ভাষা-ভাষী-দেরই প্রাধান্য, শুধু প্রাধান্য কেন, কাছাড় এবং গোয়ালপাড়া এই দুই জেলার লোক ষোল আনাই বাঙলা ভাষা-ভাষী। শ্রীহট্টের অধিবাসীরা যেমন বাঙলার অন্তর্ভুক্ত হইবার জন্য আন্দোলন করিতেছেন, কাছাড় এবং গোয়ালপাড়ার অধিবাসীরাও সেইরূপ করিতেছেন; তাহা ছাড়া যদি নীতির দিক হইতেই বিষয়টি দেখিতে হয়, তাহা হইলে শ্রীহট্টের সম্বন্ধে এক ব্যবস্থা আর কাছাড় এবং গোয়ালপাড়ার সম্বন্ধে অন্য ব্যবস্থা, ইহা খাটে না। কংগ্রেস ভাষাগত ভিত্তির উপরই প্রদেশ-সীমা নির্দ্ধারণ নীতি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন; সুতরাং কংগ্রেস-নীতি প্রভাবিত আসামের মন্ত্রিমণ্ডলের কর্ত্তব্য হইবে কংগ্রেস-নির্দ্ধারিত সেই নীতির উপর জোর দেওয়া। বিহারের কংগ্রেসী মন্ত্রীরা এদিকে উদাসীন থাকিয়া কংগ্রেসের নীতিকেই লঙ্ঘন করিতে-ছেন। আসামের মন্ত্রিমণ্ডল যদি সে নীতিকে প্রতিপালন করাই কর্ত্তব্য মনে করেন, তাহা হইলে কাছাড় এবং গোয়াল-পাড়ার সম্বন্ধে তাঁহারা বিভিন্ন দৃষ্টি অবলম্বন করিতে পারেন না। আমরা আশা করি, এ সম্বন্ধে কংগ্রেসের নীতির উপর জোর দিয়া তাঁহারা বিহারের মন্ত্রিমণ্ডল এবং বাঙলার প্রতি যে অবিচার করিতেছেন, তৎসম্বন্ধে তাঁহাদিগকে সচেতন করিবেন, কংগ্রেসের আদর্শকে স্থানীয় সুবিধাবাদের উপরে স্থান দিবেন।

পুলিশের নূতন ক্ষমতা—

কলিকাতা ও শহরতলীর পুলিশের হাতে নূতন ক্ষমতা দিবার জন্য মন্ত্রী মহোদয় স্যার নাজিমুদ্দীন মহা তৎপর হইয়া উঠিয়াছেন। এতদিন নিয়ম ছিল যে, সাধারণ সভাতেই পুলিশ প্রবেশ করিতে পারিবে এবং সেই সব সাধারণ সভাতেও ইনস্পেক্টরের নিম্নতন কর্ম্মচারীর প্রবেশের এক্তিয়ার থাকিবে না। নূতন বিলের ধারায় 'সাধারণ সভার' ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে একরকম সব সভাই সাধারণ সভা বলিয়া গণ্য হইবে এবং টিকিট করিয়া যে সব সভায় প্রবেশাধিকার, সে সব সভায় টিকিট না করিয়াও পুলিশের ইনস্পেক্টর কেন হেড কনেষ্টবলেরাও ঢুকিতে পারিবে। লোকের বাড়ীতে সভা করিলেও সে সভা সাধারণ সভা বলিয়া গণ্য হইবে। এই ব্যাখ্যা বিবাহের আসর হইতে গীতা সভা পর্য্যন্ত যে কোন জমায়েৎ-ই সাধারণ সভা হইতে পারে, কিছুই বিচিত্র নাই। সুখের বিষয়, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্যার নাজিমুদ্দিনের এই বিলের যে সংশোধন প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে বিলটি অকেজো হইয়া পড়িয়াছে। এজন্য সংশোধন প্রস্তাবের উত্থাপক ডাক্তার রাধাকুমুদ মুখুজ্যে মহাশয়কে আমরা ধন্যবাদ দিতেছি। তিনি তাঁহার সংশোধন প্রস্তাবে নূতন বিলে 'সাধারণ সভা' বলিতে যে ব্যাপকতর সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, সাধারণ সভার সেই নূতন ব্যাখ্যামূলক ধারাটি তুলিয়া দিবার প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব গ্রাহ্য হইয়াছে। আমরা আশা করি, বাঙলার যে সব মন্ত্রী এতদিন নিজেদের জোটবাঁধা দলের সমর্থনের জোরে ধরাকে সরা জ্ঞান করিতেন এবং কথায় কথায় লোককে শাসাইতেন, তাঁহাদের কিছু আক্কেল হইবে। তাঁহারা এই শিক্ষা লাভ করিবেন যে, দেশের লোক তাঁহাদের স্বরূপ চিনিয়া লইয়াছে, কর্ত্তার রায়ে সায় দিয়া চলিতে আর তাহারা প্রস্তুত নয়। মন্ত্রীদের ঘটে যদি সুবুদ্ধি থাকে, তাহা হইলে আশা করা যায় যে, তাঁহারা ব্যবস্থা পরিষদে এই বিল পাশ করাইয়া লইবার চেষ্টা আর করিবেন না। এখন হইতেই হুঁসিয়ার হইবেন, যদি তাঁহাদের সে আক্কেল না হয়, তাহা হইলে আরও কিছু আক্কেল-সেলামী ব্যবস্থা-পরিষদেও যে তাঁহারা লাভ করিবেন, এ বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মন্ত্রীরা যখন নিজেদের প্রদেশের লোকদের সভা-সমিতির স্বাধীনতা, বক্তৃতার স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা—এগুলি বাড়াইতেছেন, বাঙলার মন্ত্রীরা তখন জন-সাধারণের সেই সব ক্ষমতার সংকোচ সাধন করিবার সাহস পাইতেছেন, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। প্রকৃতপক্ষে নানারকম বাগ্পাবাজীতে জোটবাঁধা দলের জোর কায়েম রাখিয়া তাঁহাদের স্পর্দ্ধা দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছিল, প্রতিক্রিয়া এখন আরম্ভ হইয়াছে। ইহা আশার কথা।

মানবীয় ঐক্যের আদর্শ

শ্রীঅরবিন্দ

—১০—

ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র

(The United States Of Europe)

(স্বাধীন গণতান্ত্রিক অধিজাতির বিকাশ)

সাম্রাজ্য গঠনের সম্ভাবনাসমূহ লইয়া আমাদিগকে এতক্ষণ আলোচনা করিতে হইয়াছে, কারণ সাম্রাজ্যিক রাষ্ট্রের বিকাশই হইতেছে আধুনিক জগতের প্রধান ঘটনা; ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগের রাজনৈতিক প্রবৃত্তি সকল ইহার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, অনেকটা যেমন স্বাধীন গণতান্ত্রিক অধিজাতির বিকাশের দ্বারা আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগ নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। ফরাসী বিপ্লবের প্রধান পরিকল্পনা ছিল স্বাধীন ও সার্ব্বভৌম অধিকার-সম্পন্ন জনগণের আদর্শ এবং বৈপ্লবিক বাণীতে মৈত্রীর আদর্শের দ্বারা বিশ্বজনীন ভাব আনীত হইলেও ঐ পরিকল্পনা কার্য্যত মুক্ত স্বাধীন গণতান্ত্রিকভাবে স্ব-শাসিত অধিজাতি আদর্শেরই প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। সেই আদর্শ সমগ্র পাশ্চাত্য ভূখণ্ডেও সম্পূর্ণভাবে কার্য্যে পরিণত হয় নাই; কারণ মধ্য ইউরোপ হইতেছে কেবল আংশিকভাবে গণতান্ত্রিক এবং রুশিয়া এইমাত্র সাধারণ আদর্শটির দিকে মুখ ফিরাইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং এখনও ইউরোপে পরাধীন জাতি বা জাতির অবশেষ রহিয়াছে। তথাপি যতই অপূর্ণতা থাকুক না কেন, স্বাধীন গণতান্ত্রিক অধিজাতির আদর্শটি সমগ্র আমেরিকা ও ইউরোপে কার্য্যত জয়লাভ করিয়াছে। এশিয়ার জাতি সকলও সমানভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর এই প্রধান আদর্শটি গ্রহণ করিয়াছে, আর যদিও তুরস্ক, পারস্য, ভারত, চীন প্রভৃতি প্রাচ্য দেশে গণতান্ত্রিক জাতীয়তা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রথম প্রয়াসে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই, তথাপি আদর্শটির গভীর ও বিস্তৃত প্রভাব কোন অবহিত-দ্রষ্টাই সন্দেহ করিতে পারেন না। যে-কোন পরিবর্ত্তনই হউক, যে কোন নূতন প্রবৃত্তি মাঝে আসিয়া পড়ুক, যে-কোন প্রতিক্রিয়া বাধা প্রদান করুক, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই যে, ফরাসী বিপ্লবের প্রধান প্রধান অবদানগুলি স্থায়ী সম্পদরূপে জগতের ভবিষ্যৎ বিধানের অপরিহার্য্য অঙ্গরূপে থাকিয়া যাইবে এবং বিশ্বব্যাপী হইবে; সে-সব অবদান হইতেছে—জাতীয় আত্মচেতনা ও স্বায়ত্তশাসন, জনগণের জন্য স্বাধীনতা ও শিক্ষা এবং অন্তত এতখানি সামাজিক সাম্য ও ন্যায্যতা যাহা রাজনৈতিক স্বাধীনতার পক্ষে অপরিহার্য্য; কারণ কোনরূপ দৃঢ়নিবদ্ধ ও কড়াকড়ি অসাম্যের সহিত গণতান্ত্রিক স্বায়ত্তশাসনের সামঞ্জস্য হয় না।

পূর্ণরূপে ব্যবস্থাবদ্ধ রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের (State-Socialism) পরিকল্পনা

কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর মহৎ প্রেরণাটি সর্ব্বত্র নিজেকে **কার্য্যকরী করিয়া তুলিবার পূর্ব্বে এমন কি ইউরোপেই** উহা সম্পূর্ণভাবে সিদ্ধ হইবার পূর্ব্বে, একটি নূতন প্রবৃত্তি আসিয়া পড়িয়াছে, একটা নূতন পরিকল্পনা মানবজাতির প্রগতিশীল মনকে অধিকার করিয়াছে। এইটি হইতেছে সম্পূর্ণরূপে ব্যবস্থাবদ্ধ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা (The perfectly organised State)। সম্পূর্ণরূপে ব্যবস্থাবদ্ধ রাষ্ট্রের আদর্শ হইতেছে মূলত সমাজতান্ত্রিক (Socialistic), এবং ইহা মহান্ বৈপ্লবিক বাণীর দ্বিতীয় বাক্য 'সাম্যের' উপর প্রতিষ্ঠিত, ঠিক যেমন প্রথম বাক্য 'স্বাধীনতা' ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর আন্দোলনের কেন্দ্রস্বরূপ। ইউরোপের মহান্ অভ্যুত্থানটি যে প্রথম প্রেরণা দিয়াছিল, তাহার ফলে আসিয়াছিল, কেবল এক প্রকার রাজনৈতিক সাম্য। সামাজিক সাম্য সম্পূর্ণ হয় নাই, তাহাতে যে এক অসাম্য, যে এক প্রকার রাজনৈতিক প্রাধান্য থাকিয়া গিয়াছিল তাহা প্রতিযোগিতামূলক সমাজে অনিবার্য্য, তাহা হইতেছে "যাহাদের নাই" (have-nots) তাহাদের উপর "যাহাদের আছে" (haves) তাহাদের প্রাধান্য, জীবন সংগ্রামে যাহারা কম কৃতকার্য্য তাহাদের সহিত যাহারা অধিকতর কৃতকার্য্য তাহাদের অসাম্য; সামর্থ্যের পার্থক্য, সুযোগের অসাম্য, ঘটনাচক্র ও পারিপার্শ্বিকের প্রতিকূলতার জন্য ইহা অবশ্যম্ভাবী। সমাজতন্ত্র এই দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত অসাম্য দূর করিতে চায় সমাজের প্রতিযোগিতামূলক রূপ ধ্বংস করিয়া এবং তাহার পরিবর্ত্তে সহযোগিতামূলক সমাজ গঠন করিয়া। মানব-সমাজের সহযোগিতামূলক রূপ পূর্ব্বকালে ছিল কমিউনের আকারে; কিন্তু মূল প্রতিষ্ঠানরূপে পুনরায় কমিউন প্রবর্ত্তনের অর্থ হইবে কার্য্যত সেই প্রাচীন নগরতন্ত্রে ফিরিয়া যাওয়া, আর যেহেতু আধুনিক জীবনের বৃহত্তর সমুচ্চয় এবং অধিকতর জটিলতার জন্য তাহা আর এখন সম্ভব নহে, সমাজতান্ত্রিক আদর্শ সিদ্ধ হইতে পারে কেবল কড়াকড়িভাবে ব্যবস্থাবদ্ধ আধিজাতিক রাষ্ট্রের ভিতর দিয়া। দারিদ্র্য দূর করিয়া দেওয়া, স্থূলে পরিকল্পনা অনুযায়ী সমান বণ্টনের দ্বারা নহে, পরন্তু সকল সম্পত্তি যৌথ রাখিয়া এবং ব্যবস্থাবদ্ধ রাষ্ট্রের ভিতর দিয়া তাহার পরিচালনা করিয়া, সর্ব্বজনীন শিক্ষা প্রচারের দ্বারা যতদূর সম্ভব সকলের সুযোগ ও সামর্থ্য সমান করিয়া দেওয়া, ইহাও আবার সেই ব্যবস্থাবদ্ধ রাষ্ট্রের ভিতর দিয়া,—ইহাই হইতেছে আধুনিক সমাজতন্ত্রের মূল পরিকল্পনা। ইহার অর্থ হইতেছে সমস্ত ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিলোপসাধন। অন্ততঃপক্ষে, তাহাকে খুবই খর্ব্ব করা। সমাজতন্ত্রবাদ অবশ্য এখনও রাজনৈতিক স্বাধীনতা সম্বন্ধে ঊনবিংশ শতাব্দীর আদর্শটিকে ধরিয়া রহিয়াছে, রাষ্ট্রের মধ্যে সকলের পক্ষেই তাহাদের নিজেদের শাসকমণ্ডলী নির্ব্বাচন করিবার, বিচার করিবার, পরিবর্ত্তন করিবার সমান অধিকারের উপর জোর দিতেছে, কিন্তু অন্য সকল প্রকার স্বাধীনতাকে সে নিজের মূল পরিকল্পনার সম্মুখে বলি দিতে উদ্যত।

সমাজতান্ত্রিক আদর্শের অগ্রগতি

অতএব সমাজতান্ত্রিক আদর্শের অগ্রগতির ফল হইবে
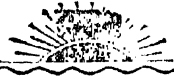
সম্যকভাবে ব্যবস্থাবদ্ধ আধিজাতিক রাষ্ট্রের বিকাশ, তাহা শিক্ষার ব্যবস্থাও নিয়ন্ত্রণ করিবে, সমস্ত অর্থনৈতিক কর্ম্ম-ধারা পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ করিবে এবং সেই উদ্দেশ্যেও পূর্ণতম দক্ষতা, নৈতিকতা, সুখ-সুবিধা এবং সামাজিক ন্যায্যতার জন্য রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণের এবং বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সমগ্র জীবনকে অন্তত তাহার অধিকাংশকে নিয়ন্ত্রিত করিবে। বস্তুত ব্যবস্থাবদ্ধ রাষ্ট্রের ভিতর দিয়া তাহাই করা হইবে, যাহা প্রাচীনতর সমাজে সামাজিক চাপ, আচারের কড়াকড়ি, খুঁটিনাটি বিধান ও শাস্ত্রের দ্বারা করিবার চেষ্টা হইত। বৈপ্লবিক আদর্শটির এইরূপে পরিণতি সকল সময়েই স্বভাবত অবশ্যম্ভাবী ছিল। ফ্রান্সের বিভীষিকার কালে (Reign of Terror—1793-94) ইহা প্রথম বাহিরের চাপে জাকোবিনদের গবর্ণমেণ্টে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে বরাবরই ইহা একটা আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের চাপে ক্রমশ প্রকট হইয়াছে এবং নিজকে সিদ্ধ করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে; বর্ত্তমান যুদ্ধের সময়ে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য—উভয়বিধ প্রয়োজনের সংযোগে ইহা সম্পূর্ণভাবে প্রকট না হইলেও, সম্পূর্ণতার দিকে আশ্চর্য্য-গতিতে অগ্রসর হইয়াছে। পূর্ব্বে যাহা ছিল শুধু একটা আদর্শমাত্র, যাহার জন্য উপস্থিত কেবল কয়েকটা প্রারম্ভিক আয়োজন করাই সম্ভব ছিল, তাহা এখন একটা বাস্তব সম্ভাবনাপূর্ণ কার্যক্রম হইয়া দাঁড়াইয়াছে. তাহার সম্পূর্ণ সম্ভবপরতা কার্য্যত পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, সে পরীক্ষা অবশ্য তাড়াতাড়ি ও অসম্পূর্ণভাবে হইলেও তাহা বিশ্বাসযোগ্য। ইহা সত্য যে, সেইটিকে কার্য্যে পরিণত করিতে রাজনৈতিক স্বাধীনতাকেও সাময়িকভাবে লুপ্ত করিতে হইয়াছে; কিন্তু যুক্তি প্রদর্শন করা যাইতে পারে যে, ইহা কেবল সাময়িক ঘটনামাত্র, অস্থায়ী প্রয়োজনে ইহাকে মানিয়া লইতে হইয়াছে। আর এখন যুদ্ধের প্রয়োজনে যে-সব গবর্ণমেণ্টের হস্তে লোকে সাময়িক দায়িত্বশূন্য নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব অর্পণ করিয়াছে, তাহারা এখন যাহা আংশিকভাবে এবং অস্থায়ীভাবে করিতেছে পরে যখন আর যুদ্ধের চাপ থাকিবে না তখন স্বায়ত্তশাসনশীল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দ্বারা তাহাই পূর্ণভাবে এবং স্থায়ীভাবে অনুষ্ঠিত হইতে পারে।

সেইরূপ হইলে মনে হয় যে, নিকট ভবিষ্যতে মানবীয় সমুচ্চয়ের রূপ হইবে স্বায়ত্তশাসনশীল অধিজাতি, তাহা রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হইবে, কিন্তু তাহার লক্ষ্য হইবে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক 'অর্গানিজেশন' এবং সেই উদ্দেশ্যে সে সমস্ত ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ব্যবস্থাবদ্ধ আধিজাতিক রাষ্ট্রের হস্তে তুলিয়া দিতে প্রস্তুত হইবে।* অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জার্ম্মানী হইয়াছে ব্যবস্থাবদ্ধ রাষ্ট্রের (the organised State) মুখ্য প্রচারক ও পরীক্ষাক্ষেত্র। সেইখানেই সমাজ-তান্ত্রিক পরিকল্পনার উদ্ভব হইয়াছে এবং সেইখানেই ইহার প্রচার সর্ব্বাপেক্ষা সাফল্যময় হইয়াছে, দেশের অধিকাংশ লোক এই সমাজতন্ত্রের নূতন বাণী গ্রহণ করিয়াছে।* সেইখানেই মহান্ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলি এবং জাতির সাধারণ কল্যাণ ও দক্ষতার জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা পূর্ণতার সহিত চমৎকারভাবে পরিকল্পিত ও কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। ইহা যে এক সমাজতন্ত্র বিরোধী, সামরিক আভিজাতিক গবর্ণমেণ্টের দ্বারা সাধিত হইয়াছে, তাহাতে বিশেষ কিছুই আসিয়া যায় না; এই সংঘটনটিই হইতেছে এই নূতন প্রবৃত্তিটির অনিবার্য্য শক্তির প্রমাণ; ইহার সম্পূর্ণ জয়ের জন্য প্রয়োজন হইতেছে কেবল বর্ত্তমান শাসকমণ্ডলীর নিকট হইতে জনসাধারণের হস্তে শাসন ক্ষমতা যাওয়া এবং ইহা অবশ্যম্ভাবী। অধুনা কয়েক দশাব্দ ধরিয়া আমরা দেখিয়াছি জার্ম্মানভাবসমূহের বিকাশ এবং অন্যান্য দেশে, এমন কি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আবাসভূমি ইংলণ্ডেও রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ এবং রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ-বিষয়ক জার্ম্মান-পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করিবার ক্রমবর্দ্ধমান প্রবৃত্তি। ইহা মনে করা ভুল যে, বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধে জার্ম্মানী পরাস্ত হইলেই তাহার আদর্শগুলি পরাস্ত হইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ইতিপূর্ব্বে ইউরোপীয় সম্মেলন কর্তৃক বিপ্লববাদী ও নেপোলিয়নিক ফ্রান্সের পরাজয়, এমন কি রাজতান্ত্রিক ও আভিজাতিক শাসনতন্ত্রের সাময়িক জয়েও সমগ্র ইউরোপে ফ্রান্সের নূতন ভাবসকলের বিস্তার নিবারিত হয় নাই। জার্ম্মান সমরতন্ত্র ও আভিজাততন্ত্র ধ্বংস হইতে পারে, কিন্তু ইহাদের পিছনে যে প্রবৃত্তি কার্য্য করিয়াছে এবং ইহাদিগকে বাধ্য করিয়া নিজের কাজে লাগাইয়াছে, সেইটি হইতেছে সম্যক ব্যবস্থাবদ্ধ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দিকে প্রবল আধুনিক প্রবৃত্তি, জার্ম্মানীর সাম্রাজ্যবাদী গবর্ণমেণ্টের পতন সেই প্রবৃত্তির পূর্ণতর বিকাশ ও বিজয়কে বিলম্বিত না করিয়া দ্রুততর করিয়া তুলিতে পারে, আর জার্ম্মানীর বিরুদ্ধ জাতিসমূহের মধ্যে বর্ত্তমান যুদ্ধের সুস্পষ্ট ফল হইয়াছে এই যে, তাহারাও ঐ আদর্শের দিকে আরও দ্রুত অগ্রসর হইতে বাধ্য হইয়াছে।

স্বাধীন অধিজাতি সকলের ফেডারেশন এবং মানব জাতির পার্লামেণ্টের আদর্শ

ইহা যদি সব হইত তাহা হইলে জার্ম্মান সাম্রাজ্যবাদের পরাজয় দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়া ঘটনাধারার স্বাভাবিক বিকাশ যথাসঙ্গতভাবেই জগতের এক নবতর বিধানের দিকে লইয়া যাইত, স্বাধীন সুব্যবস্থাবদ্ধ অধিজাতি রাষ্ট্রসকল আন্তর্জ্জাতিক প্রয়োজনে পরস্পরের সহিত অল্পাধিক ঘনিষ্ঠ-ভাবে সম্মিলিত হইয়া এবং সেইসঙ্গে নিজেদের স্বতন্ত্র সত্তা

*বর্ত্তমানে রুশিয়া, জার্ম্মানী ও ইতালীতে ইহার সম্পূর্ণতার বিরাট আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে এবং ইহা সর্ব্বত্রই ছড়াইয়া পড়িতেছে।

*হিটলারের অধীনে জার্ম্মানী বর্ত্তমানে কমিউনিজম্ বা সমস্ত সম্পত্তিকে রাষ্ট্রের যৌথসম্পত্তি করিবার নীতি বর্জ্জন করিয়াছে। কিন্তু দেশ ও জাতির সাধারণ কল্যাণের জন্য সমস্ত ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ব্যবস্থাবদ্ধ রাষ্ট্রের হস্তে তুলিয়া দিবার যে মূল সমাজতান্ত্রিক নীতি তাহা গ্রহণ করিয়াছে, ইহার নূতন নাম-করণ হইয়াছে আধিজাতিক সমাজতন্ত্র (National Socialism)। ইহারই আর একরূপ হইতেছে ইতালীর ফ্যাসিজম্। কমিউনিজমের পরীক্ষা হইতেছে রুশিয়ায়।

রক্ষা করিয়া সেই নববিধানের ভিত্তি হইত। মহান্ বিপ্লব আন্দোলনের আরম্ভ হইতেই এইরূপ আদর্শ একটি এখনও দূরবর্তী সম্ভাবনারূপে মানব-মনকে আকৃষ্ট করিয়াছে; ইহা হইতেছে মুক্ত জাতি সকলের ফেডারেশন, মানব জাতির পার্লামেণ্ট, বিশ্বের ফেডারেশন (The Federation of the World) পরিকল্পনা। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি সকল নিকট ভবিষ্যতে এইরূপ কোন আদর্শ পরিণতির আশার বিরোধী! কারণ জগতে এখন কেবল আধিজাতিক, গণতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক ভাব সকলই সক্রিয় নহে; সাম্রাজ্যবাদও সমানভাবে মাথা তুলিয়াছে। বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে কেবল কয়েকটি ইউরোপীয় জাতিই নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রত্যেকে নিজে স্বাধীন জাতি, কিন্তু অপর মানবীয় সমুচ্চয়ের উপর আধিপত্য করিতেছে, যাহারা স্বাধীন নহে অথবা কেবল আংশিকভাবেই স্বাধীন। এমন কি ক্ষুদ্র বেলজিয়ামের কংগো রহিয়াছে, ক্ষুদ্র পর্ত্তুগালের উপনিবেশ রহিয়াছে, ক্ষুদ্র হল্যাণ্ডের পূর্ব্ব-দ্বীপপুঞ্জে অধীন রাজ্য রহিয়াছে, এমন কি ক্ষুদ্র বলকান্ রাষ্ট্রগুলিও একটা সাম্রাজ্যের পুনরভ্যুত্থান করিবার এবং অন্য জাতির উপর প্রভুত্ব করিবার আশা করিতেছে, আর প্রত্যেকেই ঐ উপদ্বীপে সর্ব্বপ্রধান হইবার আশা পোষণ করিতেছে। ম্যাজিনির ইটালী ট্রিপলি, আবিসিনিয়া, আলবেনিয়া ও গ্রীক্ দ্বীপপুঞ্জে সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রয়াস করিতেছে। এই সাম্রাজিক প্রবৃত্তিটি এখন কিছুকাল দুর্ব্বলতর না হইয়া আরও শক্তিশালী হইয়া উঠিবে বলিয়াই মনে হয়। ইউরোপকেই আধিজাত্যের কড়াকড়ি নীতি অনুসারে পুনর্গঠিত করিবার যে পরিকল্পনা যুদ্ধের প্রারম্ভে ইংলণ্ডের উদার চিত্তগুলিকে আকৃষ্ট করিয়াছিল, তাহা কার্য্যতঃ সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। আর যদিই ইহা সংসাধিত হয়, তাহা হইলেও সমগ্র এশিয়া ও আফ্রিকা পড়িয়া থাকিবে পাশ্চাত্য জাতিসমূহ ও জাপানের সাম্রাজ্য বিস্তার আকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্ররূপে। যে নিঃস্বার্থপরতার প্রেরণায় আমেরিকার অধিকাংশ লোক ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের স্বাধীনতায় সায় দিয়াছে এবং মেক্সিকোতে গোলমালের সুযোগ গ্রহণ করিবার আকাঙ্ক্ষা দমন করিয়াছে, তাহা প্রাচীন গোলার্দ্ধের (The Old World) মনোবৃত্তির পক্ষে সম্ভব নহে, আর সাম্রাজ্য লিপ্সার উদীয়মান তরঙ্গের বিরুদ্ধে আমেরিকাতেও ইহা কতদিন দাঁড়াইতে পারিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। জাতীয় অহমিকা, আধিপত্যের গর্ব্ব এবং বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা এখনও মানব-জাতির মনকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে, উচ্চতর প্রেরণা ও উৎকৃষ্টতর জাতীয় নীতিবোধের প্রথম ক্ষীণ সূচনার দ্বারা তাহাদের পদ্ধতিতে যে পরিবর্ত্তনই হউক না কেন; আর যতদিন না এই মনোবৃত্তির আমূল পরিবর্ত্তন হইতেছে, ততদিন মুক্ত অধিজাতি সকলের ফেডারেশনের দ্বারা মানব-জাতির ঐক্যসাধন একটি মহান্ আকাশকুসুম হইয়াই থাকিবে।

মুক্ত সাহচর্য্য ও ঐক্যই মানব জাতির চরম লক্ষ্য

এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই যে, আমাদের বিকাশের চরম লক্ষ্য হইতেছে মুক্ত সাহচর্য্য ও ঐক্য, আর যতক্ষণ না তাহা কার্য্যতঃ সিদ্ধ হইতেছে, পৃথিবীকে অনবরত পরিবর্ত্তন ও বিপ্লবের ভিতর দিয়া যাইতে হইবে। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠিত তন্ত্র, যেহেতু তাহা অপূর্ণ, যেহেতু তাহা এমন সব ব্যবস্থার উপর জোর দেয়, যেগুলি অন্যায় বলিয়া বুঝিতে পারা যায় অথবা নূতন প্রবৃত্তি ও শক্তির পথে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়, যেহেতু তাহা তাহার উপযোগিতা ও সার্থকতা শেষ হইয়া যাইবার পরেও বিদ্যমান থাকে,--প্রত্যেক তন্ত্রই শেষ পর্য্যন্ত অশান্তি-বিরোধ ও বিক্ষোভ আনয়ন করিবে, হয় তাহাকে নিজেই পরিবর্ত্তিত হইতে হইবে, অথবা তাহাকে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে, নতুবা মহা বিপ্লবের সৃষ্টি হইবে, যেরূপ বিপ্লব মাঝে মাঝে আমাদের মানবীয় প্রগতিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া থাকে। কিন্তু যখন তন্ত্রের সত্য-নীতি তাহার কৃত্রিম ও অপূর্ণ নীতি সকলের স্থান গ্রহণ করিবে, সে-সময় এখনও আইসে নাই। মুক্ত জাতি সকলকে লইয়া একটা ফেডারেশনের আশা করা বৃথাই হইবে যতক্ষণ না জাতি ও জাতির মধ্যে বর্ত্তমানে যে অসাম্য রহিয়াছে, তাহা বিদূরিত হইতেছে, অথবা এখন যেরূপ রহিয়াছে বা যেরূপ সম্ভব, তাহা অপেক্ষা একটা উচ্চতর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত এক সাধারণ কৃষ্টির মধ্যে সমস্ত জগৎ না উঠিতেছে! সাম্রাজিক প্রবৃত্তিটি এখন জীবন্ত, প্রবল এবং জাতীয়তার নীতি অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী হওয়ায়, বৃহৎ সাম্রাজ্য সকলের বিকাশের দ্বারা অন্ততঃ সাময়িকভাবে মুক্ত অধিজাতি সকলের বিকাশ বাধা প্রাপ্ত না হইয়া পারে না! কেবলমাত্র এইটুকুই আশা করা যাইতে পারে যে, পুরাতন, কৃত্রিম, কেবলমাত্র রাজনৈতিক সাম্রাজ্যের পরিবর্ত্তে একটা সত্যতর ও অধিকতর নীতিসঙ্গত রূপ সৃষ্ট হইবে এবং বর্ত্তমান সাম্রাজ্যগুলি নিজদিগকেই শক্তিশালী করিবার প্রয়োজনে এবং নিজেদেরই গভীরতর স্বার্থবুদ্ধির প্রেরণায় হয়ত দেখিতে পাইবে যে, জীবন্ত জাতীয়তাবোধের সহিত সুবিজ্ঞ ও প্রয়োজনীয় মীমাংসা হইতেছে জাতীয় স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করা এবং ইহার দ্বারা সাম্রাজিক শক্তি ও ঐক্য দুর্ব্বল না হইয়া যাহাতে অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠে, সেরূপ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। এইভাবে যদিও স্বাধীন অধিজাতি সকলের ফেডারেশন এখন অসম্ভব তথাপি সংহিত সাম্রাজ্য ও স্বাধীন অধিজাতিগুলিকে লইয়া এমন একটা ঘনিষ্ঠতর সম্মিলন যেমনটি জগতে এ পর্য্যন্তও কখনও দেখা যায় নাই--ইহা একেবারে অসম্ভব নহে; এবং ইহাও অন্যান্য ধাপের ভিতর দিয়া মানব-জাতির পক্ষে কোনরূপ একটা রাজনৈতিক ঐক্য অল্পাধিক দূর ভবিষ্যতে সিদ্ধ হইয়া উঠিতে পারে।

ইউরোপের আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধের উপর গত যুদ্ধের প্রভাব

বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে এইরূপ একটা ঘনিষ্ঠতর সম্মিলনের অনেক রকম প্রস্তাব উঠিয়াছে, কিন্তু সাধারণত সে-সব প্রস্তাব ইউরোপের আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধের উৎকৃষ্টতর বিধানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ইহাদের একটি হইতেছে, আন্তর্জ্জাতিক আদালতের দ্বারা আরও কড়াকড়িভাবে আন্তর্জ্জাতিক আইন প্রয়োগ করিয়া যুদ্ধ উঠাইয়া দেওয়া, জাতি সকলের অনুমোদনের (Sanction) দ্বারা উহা সমর্থিত হইবে এবং তাহা-

দের সকলের শক্তির দ্বারা উহা অপরাধীর বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইবে। এইরূপ সমাধান আকাশকুসুম মাত্র, যদি না অবিলম্বেই অন্যান্য এবং বহুদূর প্রসারী পরিবর্ত্তন সকল সংসাধিত হয়। কারণ, আদালত কর্ত্তৃক প্রদত্ত বিধানটিকে বলপূর্ব্বক প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে; হয় ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও রুশিয়ার বর্ত্তমান সংযোগের ন্যায় অবশিষ্ট ইউরোপের উপর প্রভাববিস্তারী অপেক্ষাকৃত বলশালী কতিপয় শক্তির সম্মিলনের দ্বারা, অথবা ইউরোপের সমস্ত শক্তিগুলির সম্মিলনের দ্বারা, অথবা ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্রের (United States of Europe) দ্বারা, অথবা অন্য কোনরূপে ইউরোপীয় ফেডারেশনের দ্বারা। কতকগুলি প্রবলতম শক্তির প্রাধান্যশালী সমবায় হইবে কেবল 'মেটারনিকের' পদ্ধতিরই পুনরাবৃত্তি এবং কিছুকাল পরে অনিবার্যভাবেই তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িবে; অন্য পক্ষে অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে, সমস্ত ইউরোপের সম্মিলনের অর্থ হইবে প্রতিদ্বন্দ্বী দল সকলের মধ্যে একটা অনিশ্চিত মতৈক্য বজায় রাখিবার অস্বচ্ছন্দ প্রয়াস, তাহা নূতন দ্বন্দ্ব ও বিরোধকে কিছুকাল ঠেকাইয়া রাখিলেও শেষ পর্য্যন্ত নিবারণ করিতে পারিবে না। এইরূপ সব অসম্পূর্ণ ব্যবস্থায় আইনটি যতদিন সুবিধাজনক আছে, ততদিনই পালিত হইবে, যে-সকল শক্তি এখন নূতন পরিবর্ত্তন ও পুনর্ব্যবস্থা চায়, যাহা অপরের অনুমোদিত নহে—তাহাদের যতদিন না মনে হইতেছে যে, বিরোধের যথোচিত মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইয়াছে, কেবল ততদিনই উহা অনুসৃত হইবে। কোন দেশের আভ্যন্তরীণ আইন সুদৃঢ় হয় এইজন্য যে, একটি স্বীকৃত গবর্ণমেণ্টকে তাহা নির্দ্ধারণ করিবার এবং আবশ্যক মত তাহার পরিবর্ত্তন সাধন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং আইন লঙ্ঘনকারীকে সাজা দিবার মত তাহার যথেষ্ট শক্তি থাকে। একটি আন্তর্জ্জাতিক বা সর্ব্ব-ইউরোপীয় আইনের ঐ সকল সুবিধা থাকা চাই, নতুবা তাহা একটা নৈতিক প্রভাব বিস্তার করা ব্যতীত আর অধিক কিছু করিতে পারিবে না, যাহাদের অমান্য করিবার যথেষ্ট শক্তি আছে এবং যাহারা উহা অমান্য করাতে লাভ দেখিতে পাইবে, তাহারাই উহাকে অমান্য করিবে। অতএব একটা নবতর বিধান সম্বন্ধে এই যে-সব প্রস্তাব, উহাদের অন্তর্নিহিত ভাবটিকে কার্য্যতঃ সিদ্ধ করিতে হইলে কোন রকম একটা ইউরোপীয় ফেডারেশন, তাহা যত শিথিলই হউক না কেন, স্থাপন করা প্রয়োজন এবং একবার আরম্ভ হইলে এই ফেডারেশন অবশ্যম্ভাবীরূপেই দৃঢ়বদ্ধ হইবে এবং ক্রমশ একটা ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র সংগঠনের দিকে অগ্রসর হইবে।

অন্যান্য মহাদেশের উপর ঐক্যের প্রভাব কিরূপ হইবে

এইরূপ একটা ইউরোপীয় ঐক্য গঠিত হইতে পারে কিনা, এবং যদি গঠিত হয়, তাহা হইলে ধ্বংসমুখী বহু শক্তির বিরুদ্ধে বিবাদের যে-সব বহুল কারণ, সেইটিকে বহুকাল পুনঃপুনঃ প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িবার অবস্থায় লইয়া আসিবে, তাহাদের বিরুদ্ধে সেইটিকে রক্ষা করা এবং সর্ব্বাঙ্গ সিদ্ধ করিয়া তোলা সম্ভবপর কি না, তাহা কেবল অভিজ্ঞতা হইতেই জানা যাইতে পারে। কিন্তু ইহা সুস্পষ্ট যে, মানবীয় সাহচিকতার বর্ত্তমান অবস্থায় যদি ইহা গঠিত হয়, তাহা হইলে যে কয়েকটি জাতি এখন মানবীয় প্রগতির পুরোভাগে রহিয়াছে, তাহাদের দ্বারা অবশিষ্ট জগতের শাসন ও শোষণের উহা একটি অতীব বলশালী যন্ত্র হইয়া উঠিবে। অনিবার্য্যভাবেই উহা নিজের বিরুদ্ধে এশিয়াটিক ঐক্য ও আমেরিকান ঐক্যের পরিকল্পনা জাগাইয়া তুলিবে, আর যদিও বর্ত্তমান ক্ষুদ্রতর আধিজাতিক ঐক্যের পরিবর্ত্তে এইরূপ মহাদেশীয় ঐক্য মানব-জাতির চরম মিলনের দিকে অগ্রগতিই হইতে পারে, তথাপি তাহাদের কার্য্যত সিদ্ধ হওয়া উহার অর্থ হইবে এমন ধরণের বিরাট উপপ্লব যাহার তুলনায় বর্ত্তমান বিভ্রাটটি হইবে নগণ্য এবং তাহাতে মানব-জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা সিদ্ধির দিকে অগ্রসর না হইয়া বাধা প্রাপ্ত এবং সম্পূর্ণভাবেই চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, মানব-জাতির সাধারণ অনুভূতি ইতিপূর্ব্বেই মহাদেশীয় পার্থক্য সকলকে ছাড়াইয়া যাইতে এবং সে-সবকে এক বৃহত্তর মানবীয় আদর্শের অধীন করিতে চাহিতেছে; অতএব ঐ মহাদেশীয় (continental) ভিত্তিতে একটা বিভাগ করিলে সেটা হইবে একটা গুরুতর প্রতিক্রিয়া এবং তাহার পরিণাম মানবীয় প্রগতির পক্ষে যারপরনাই বিভ্রাটজনক হইতে পারে।

ইউরোপের দোটানা অবস্থা

বস্তুত, ইউরোপ এখন এক দোটানা অবস্থার মধ্যে পড়িয়াছে, নিখিল ইউরোপীয় (Pan-European) আদর্শের জন্য সে পরিপক্ব হইয়া উঠিয়াছে, অথচ সেই সঙ্গেই তাহার পক্ষে প্রয়োজন হইতেছে ঐ আদর্শকে অতিক্রম করিয়া যাওয়া। এই দুই প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বটি কিছুদিন পূর্ব্বে বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধের একটি সমালোচনায় কৌতূহলজনকভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। সেখানে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, এই যুদ্ধে জার্ম্মানীর পাপের মূল হইতেছে অতিবর্দ্ধিত অহমিকাপূর্ণ আধিজাতিক ভাব, এবং আধিজাতিক ভাবকে এখন যে মহত্তর ইউরোপীয় আদর্শের অধীন ও নিম্নবর্ত্তী করিতে হইবে, সেইটির প্রতি অবহেলা। এখন ইউরোপের সমগ্র জীবন হওয়া চাই সর্ব্বব্যাপী ঐক্য, ইহার কল্যাণকেই আর সব কিছুর উপরে স্থান দিতে হইবে এবং আধিজাতির অহমিকাকে এই বৃহত্তর অহমিকার কেবল একটা অঙ্গীকৃত অঙ্গ মাত্র হইয়াই থাকিতে হইবে। ফলত ইহা হইতেছে, নীট্‌শের আদর্শটিকেই কয়েক দশাব্দ পরে স্বীকার করিয়া লওয়া। নীট্‌শে নিঃসন্দেহসহকারে বলিয়াছিলেন যে, জাতীয়তা ও যুদ্ধ এখন আকালিক হইয়া পড়িয়াছে, এখন সকল শিক্ষিত মনেরই আদর্শ হওয়া উচিত —উত্তম দেশভক্ত হওয়া নহে, পরন্তু, উত্তম ইউরোপীয়ান হওয়া। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন উঠিল, তাহা হইলে আমেরিকা যে জগতের রাজনীতিতে ক্রমশ বেশী গুরুত্ব লাভ করিতেছে তাহার সম্বন্ধে কি? জাপান সম্বন্ধে, চীন সম্বন্ধে, এশিয়ার নবজীবনের স্পন্দন সম্বন্ধে কি? অতএব লেখককে তাহার প্রথম সূত্রটি হইতে পশ্চাদ্‌বর্ত্তন করিয়া বলিতে হইয়াছে যে, ইউরোপ বলিতে তিনি শুধুই ইউরোপ বুঝেন নাই, পরন্তু, সেই সকল জাতিকেই বুঝিয়াছেন, যাহারা তাহাদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সংগঠনের ভিত্তিস্বরূপে ইউরোপীয় সভ্যতার নীতি সকল স্বীকার করিয়া লইয়াছে। এই অধিকতর দার্শনিক

সূত্রের সুবিধা এই যে, ইহা দ্বারা আমেরিকা ও জাপান উভয়কেই আনা হয় এবং এইভাবে যে-সকল জাতি বস্তুত স্বাধীন ও প্রাধান্যশালী, তাহাদিগকে এই প্রস্তাবিত গণ্ডীর মধ্যে স্বীকার করিয়া লওয়া হয় এবং অপরকেও আশা দেওয়া হয় যে, যখন তাহারা জাপানের ন্যায় বিক্রমের সহিত বা অন্য কোনভাবে প্রমাণ করিতে পারিবে যে, তাহারা এই প্রতিমান অনুযায়ী সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছে—তখন তাহারাও প্রবেশাধিকার লাভ করিবে।

আমেরিকা ও এশিয়ার সহিত ইউরোপের সম্বন্ধ

বস্তুত, যদিও ইউরোপ এখনও নিজের ধারণায় জগতের অবশিষ্ট অংশ হইতে তীব্রভাবে পৃথক রহিয়াছে—তুর্কি এখনও ইউরোপে বিদ্যমান থাকায় উষ্মা এবং এশিয়াবাসী কর্তৃক ইউরোপীয়গণের এই শাসনকে শেষ করিবার আগ্রহ যে প্রায়ই প্রকাশিত হয়, তাহা হইতেই ইহা প্রমাণিত হয়—তথাপি, বাস্তব তথ্য হইতেছে এই যে, আমেরিকা ও এশিয়ার সহিত সে অচ্ছেদ্যভাবেই জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। কতকগুলি ইউরোপীয় জাতির উপনিবেশ রহিয়াছে আমেরিকায় এবং সকলেরই রাজ্য ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে এশিয়ায় (সেখানে একা জাপানই ইউরোপের ছায়ার বাহিরে আছে) অথবা উত্তর আফ্রিকায়, যাহা কৃষ্টির দিক দিয়া এশিয়ার সহিত এক। অতএব ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্রের (The United States of Europe) অর্থ হইবে স্বাধীন ইউরোপীয় জাতি সকলের ফেডারেশন, যাহা অর্দ্ধ-পরাধীন এশিয়ার উপর প্রভুত্ব করিবে এবং আমেরিকার কতক অংশ অধিকার করিয়া থাকিবে এবং সেখানে যে-সকল জাতি এখনও স্বাধীন রহিয়াছে, উদ্বেগজনকভাবে তাহাদের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া থাকিবে এবং তাহারা এই অতিকায় সম্মিলনের দ্বারা স্বভাবতঃই বিব্রত, শঙ্কিত, আচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল হইবে এই যে, আমেরিকায় ল্যাটিন মধ্যদেশ ও দক্ষিণ এবং ইংরেজী-ভাষী উত্তর অধিকতর ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিবে এবং মনরো নীতিকে* অত্যধিক মাত্রায় গুরুত্ব প্রদান করা হইবে, তাহার ফল কতদূর গড়াইবে বলা সহজ নহে; আর এশিয়ায় এই ব্যাপারের কেবল দুইয়ের মধ্যে একটি চরম পরিণতি হইতে পারে, হয় অবশিষ্ট স্বাধীন এশিয়াটিক রাষ্ট্রগুলি লুপ্ত হইবে অথবা এশিয়ার এক বিরাট অভ্যুত্থান হইবে এবং ইউরোপকে এশিয়া হইতে সরিয়া আসিতে হইবে। এইরূপ গতিবিধি সফল হইলে মানবীয় বিকাশের পুরাতন ধারারই বিবর্দ্ধন, আধুনিক কৃষ্টি ও বিজ্ঞানের দ্বারা বিশ্বমৈত্রীর যে-সব সুযোগ সৃষ্টি হইয়াছে, সে-সবকে অবজ্ঞাই করা হইবে। কিন্তু এইরূপ পরিণতি অনিবার্য্যই হইবে, যদি পাশ্চাত্যদেশে অধিজাতি ভাব ইউরোপীয় ভাবের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া যায়, অর্থাৎ সাধারণ মানব-জাতির এক উদারতর চৈতন্যের পরিবর্ত্তে মহাদেশীয় চৈতন্যের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া যায়।

*আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট জেমস্ মনরো (James Monroe) ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, কোন ইউরোপীয় শক্তিকে উত্তর বা দক্ষিণ আমেরিকার কোন স্বাধীন রাষ্ট্রের শাসন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া হইবে না এবং আমেরিকার রাষ্ট্রসকলও ইউরোপের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে না।

সকল স্বাধীন অধিজাতি লইয়া আন্তর্জ্জাতিক সঙ্ঘ গঠনের পরিকল্পনা

অতএব যদি বর্ত্তমান উপপ্লবের ফলে শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক, কোন নূতন অতি-আধিজাতিক বিধানের বিকাশ করিতে হয়, তাহা হইলে সেই সঙ্গে ইউরোপের ন্যায় এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকাকেও অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে হইবে এবং স্বরূপত, ইহাকে হইতে হইবে আন্তর্জ্জাতিক জীবনের সঙ্ঘ, * তাহার মধ্যে সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, যুক্তরাষ্ট্র (আমেরিকা), ল্যাটিন গণ-তন্ত্র প্রভৃতি স্বাধীন অধিজাতি থাকিবে এবং কতকগুলি সাম্রাজ্যিক ও ঔপনিবেশিক অধিজাতি থাকিবে (ইউরোপের অধিকাংশ জাতিই এইরূপ)। শেষোক্ত জাতিগুলি হয় এখন যেরূপ রহিয়াছে, নিজেরা স্বাধীন, কিন্তু অন্য জাতির উপর প্রভুত্ব করিতেছে, সেইরূপই থাকিবে, অধীন জাতিগুলি কালক্রমে তাহাদের উপর চাপাইয়া-দেওয়া-শাসনে ক্রমশ বেশী অসহিষ্ণু হইয়া উঠিবে, অথবা নৈতিকতার উন্নতি দ্বারা (তাহা সিদ্ধ হইতে এখনও বহু বিলম্ব আছে) ঐ সকল জাতি আংশিকভাবে হইবে মুক্ত সংহিত সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্বরূপ এবং আংশিকভাবে হইবে অনুন্নত ও অবিকশিত জাতি সকলের ন্যাসরক্ষক, তাহারা উহাদিগকে ততদিনই নিজেদের তত্ত্বাবধানে রাখিবে, যতদিন না তাহারা স্বায়ত্ত শাসনের যোগ্য হইয়া উঠে, যেমন আমেরিকা এখন ফিলিপাইনকে রাখিয়াছে। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে ঐ ঐক্য, ঐ বিধান, ঐ প্রতিষ্ঠিত সাধারণ আইন এক বিরাট অন্যায়মূলক ব্যবস্থাকেই চিরস্থায়ী করিবে এবং আংশিকভাবে তাহারই উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং প্রকৃতির বিদ্রোহ ও বিপ্লবের দিকেও তাহার সেই সব ভীষণ প্রতিশোধের দিকে উন্মুক্ত থাকিবে যাহাদের দ্বারা প্রকৃতি যে-সব অন্যায়কে মানবীয় প্রগতির জন্যই প্রয়োজনীয় ঘটনা বলিয়া সাময়িকভাবে সহ্য করে, সেই সবের বিরুদ্ধে শেষকালে মানবতার প্রতিষ্ঠা করে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে কতকটা সম্ভাবনা হইবে যে, নবীন বিধানটি (প্রারম্ভে সেইটি মুক্ত মানবীয় সমুচ্চয় সকলের মুক্ত সম্মিলনরূপে যে চরম আদর্শ, তাহা হইতে যতই দূরবর্ত্তী হউক না কেন) শান্তিপূর্ণভাবে এবং মানব-জাতির আধ্যাত্মিক ও নৈতিক প্রগতির স্বাভাবিক বিকাশের ভিতর দিয়া এমন এক নিশ্চিত, ন্যায্য এবং সুস্থ রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তির দিকে লইয়া যাইবে যাহা মানুষকে এই সকল নিম্নতর প্রয়োজন লইয়াই ব্যস্ত থাকার পরিবর্ত্তে তাহার উচ্চতম সত্তার বিকাশের দিকে মনোযোগ দিতে সক্ষম করিবে এবং সেইটিই হইতেছে তাহার ভবিতব্যতার মহত্তর অংশ। *

*শ্রীঅরবিন্দ এখানে যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন পরে ১৯২০ সালে জাতি সঙ্ঘে (League of Nations) তাহারই সূচনা হইয়াছিল। কিন্তু আমেরিকা, জাপান ও জার্ম্মানী লীগ হইতে সরিয়া থাকায় উহার উপযোগিতা খুবই কমিয়া গিয়াছে।

*The Ideal of Human Unity (Arya, 1916) হইতে শ্রীঅনিলবরণ রায় কর্ত্তৃক অনূদিত।

ভারতের বৈদেশিক নীতি

ভারতবর্ষের পররাষ্ট্র বা বৈদেশিক নীতির স্বরূপ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছি। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু ও রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসুর আগ্রহে কংগ্রেসের কর্ম্মতালিকার মধ্যে ইহা স্থান লাভ করিয়াছে। প্রতি বৎসরই কংগ্রেসে এখন এ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া থাকে। কংগ্রেসের অধিবেশনে এ বিষয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। নানা বিষয়ের মধ্যে এবারকার এ-প্রস্তাবটি হয়ত চাপা পড়িয়া গিয়াছে, বা সাধারণের দৃষ্টি ইহার প্রতি এখনও তেমন করিয়া আকৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু এ সম্বন্ধে ভাবিবার ও আলোচনা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

পরাধীন দেশের পররাষ্ট্র-নীতি বলিয়া কিছু নাই এ ত জানা কথা। তথাপি আজিকার দিনে জগতের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতে হইলে আমাদের এ বিষয় একটি সুস্পষ্ট নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে। মারমুখী শক্তি জগতের বিভিন্ন অঞ্চলে, এমনকি ভারতবর্ষের অতি নিকটেও যেমন মাথা উঁচাইয়া উঠিয়াছে তখন ত এ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়া একান্তই আবশ্যক। এ যে জীবন-মরণ সমস্যারই অঙ্গীভূত।

ভারতবর্ষের নিজস্ব কোন নীতি আছে বলিয়া শাসকবর্গ স্বীকার করে না। তাহারা এখনও ভারতবর্ষকে ব্রিটেনের অঞ্চলের নিধি করিয়া রাখিতে চাহে। ইহাই হয়ত তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। কাজেই আমরা বর্ত্তমানে কি অবস্থায় রহিয়াছি তাহা একবার জানিয়া রাখা আবশ্যক।

ব্রিটেন ভারতবর্ষকে বরাবর খাস জমিদারী করিয়া রাখিতেই চাহিয়াছে। জমিদারী রক্ষার আয়োজন যেমন করা হয় সে সর্ব্বপ্রকারে সেইরূপই করিয়াছে। ভারতবর্ষের পার্শ্ববর্ত্তী দেশগুলির সঙ্গে তাহার সম্পর্কের যুগে যুগে তারতম্য ঘটিয়াছে। কোন বিদেশী শক্তি ইহাদের ভিতর দিয়া ভারত আক্রমণ না করিয়া বসে সে বিষয়ে তাহার দৃষ্টি গত একশত বৎসর যাবৎ খুবই প্রখর ছিল। ভারতবর্ষের প্রায় তিনদিকে সমুদ্র। তাহার সমুদ্র তীর সাত হাজার মাইল দীর্ঘ। কিন্তু সমুদ্র-কূল রক্ষা করিতে ব্রিটিশ কখনও বিশেষ চিন্তিত হয় নাই। গত মহাসমরে জার্ম্মান সাবমেরিন এমডেন ভারতের পূর্ব্ব সমুদ্রোপকূলে কিঞ্চিৎ উৎপাত সুরু করিয়া দিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা তাহাকে তেমন ভাবিত করিয়া তুলিতে পারে নাই। কেন না সে হইল 'সমুদ্রের শাসক।' "Rule Britannia, Rule the Waves" তাহার মটো।

গত বৎসরের মধ্যে স্থলপথ আট্‌কানোই ছিল তাহার কাজ। শ্যাম, চীন, তিব্বত, আফগানিস্তান, ইরাণ এই কয়টি দেশ ভারত সীমানায় রহিয়াছে। ভারতবর্ষের সমগ্র উত্তরদিক, এবং পূর্ব্ব পশ্চিমেরও খানিকটা হিমালয় জুড়িয়া আছে। এজন্য স্থলপথে আক্রমণের পথ অনেকটা সংকীর্ণ। তথাপি ঐ সকল দেশ সম্পর্কে সে নীতি চাতুর্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে। শ্যামে ইংরেজ প্রভাব সেদিন পর্যন্ত প্রবল ছিল। চীনেও ইংরেজ আড্ডা গাড়িয়াছে খুবই। তিব্বত প্রকাশ্যে চীন-সাম্রাজ্যের একটা অংশ বটে, কিন্তু আসলে ব্রিটেনের মুঠার মধ্যেই সে আসিয়া পড়িয়াছে। আফগানিস্তান সম্পর্কে তাহার সম্পর্ক খুব বৈচিত্র্যপূর্ণ। কখনও যুদ্ধ-বিগ্রহ করিয়া, কখনও তোয়াজ করিয়া, কখন টাকা ও অস্ত্র-শস্ত্র জোগাইয়া আফগানিস্তানের বিভিন্ন রাজাকে স্বমতে রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে। রুশিয়া আফগানিস্তানের পথে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবে গত শতাব্দী ধরিয়াই তাহার এই আশংকা ছিল। রুশ-বিপ্লবের পর অবশ্য সে আতংক দূর হইয়াছে। তথাপি তাহাকে নিজের প্রভাবে রাখিবার চেষ্টার ত্রুটি নাই। ইদানীং কিন্তু আফগানিস্তানের মতি-গতি কতকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে।
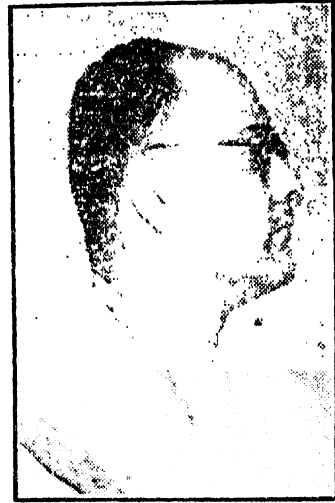
রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু

ভারতবর্ষের সঙ্গে ইরাণের (পূর্ব্ব নাম পারস্য) সম্পর্ক কিন্তু বেলুচিস্তানের পরেই ইরাণ। ইহাও আমাদের অতি নিকট প্রতিবেশী। ইহার সঙ্গেও যে ব্রিটেন কোনরূপ সম্পর্ক নির্ণয়ের ব্যবস্থা করে নাই এমন কথা আদৌ বিশ্বাস্যই নহে। বস্তুত তাহার উপরও ইংরেজের শ্যেন দৃষ্টি পড়িয়াছিল। ইরাণের তেলের খনির মালিক ইংরেজরা। এই সূত্রে তাহারা সেখানে প্রবেশ করিয়া সেখানকার গবর্ণমেণ্টের উপর খুবই প্রভাব বিস্তার করে। যুদ্ধ শেষে ১৯১৯ সালে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব ভারতের অন্যতম ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড কার্জ্জনের কুটনীতির কৌশলে ইরাণ প্রায় ইংরেজের হাতে গিয়াই পড়িয়াছিল। কিন্তু ইরাণের বর্ত্তমান রেজা শাহ্ পহলভী গত পনর বছরের অক্লান্ত চেষ্টায় ব্রিটিশ প্রভাব হইতে দেশকে মুক্তি দিতে সমর্থ হইয়াছেন। পার্শ্ববর্ত্তী দেশসমূহের সঙ্গে ভারত-প্রভু ব্রিটিশের সম্পর্কের উল্লেখ করিলাম মাত্র। ইহা হইতেই আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন, এবং ভারতবর্ষকে রক্ষা করিতে গিয়া ব্রিটেনের হস্তে যুগে যুগে কত দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হইয়াছে।

এখন কিন্তু ব্যাপার অন্যরূপ দাঁড়াইয়াছে। দশ বৎসর

পূর্ব্বে এমনটি কেহ হয়ত কল্পনাও করে নাই। গত মহাযুদ্ধের পরে সকলে মিলিয়া জার্ম্মানীকে ভীষণভাবে অপদস্থ করিয়াছিল। কেন না সে সাম্রাজ্য চাহিয়াছিল, ভারতবর্ষে আসিবার সোজা পথও ঠিক করিয়া লইয়াছিল। বার্লিন হইতে বাগদাদ পর্য্যন্ত রেলপথ বিস্তার তাহারই পরিকল্পনা। ইংরেজ ইহা সহ্য করিবে কেন? সে এতাবৎকাল বহু প্রতিদ্বন্দ্বীকে হটাইয়া দিয়া কিঞ্চিৎ সোয়াস্তি লাভ করিয়াছে, আবার নূতন উৎপাত কেন? কাজেই সমগ্র শক্তি দিয়া জার্ম্মানীকে ব্যাহত করিবার চেষ্টা করে। বর্ত্তমানে আবার জার্ম্মানীর রাজ্যলোভ দেখা দিয়াছে। এবার আসরে সে একাকী অবতীর্ণ হয় নাই। দক্ষিণ ইউরোপে ইটালী ও পূর্ব্ব-প্রান্তিক এশিয়ায় জাপান সমানভাবে রাজ্য সাম্রাজ্য চাহিতেছে। তাহারা নানাভাবে পক্ষ বিস্তার করিতেও লাগিয়া গিয়াছে। তাহারা সকলেই এখন
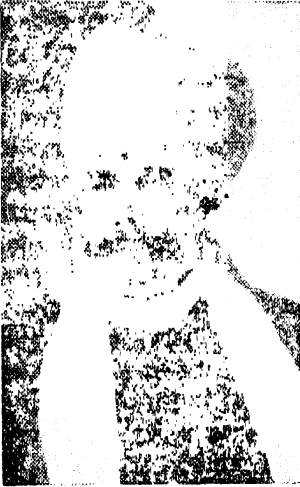
বিষ্ণুদত্ত শুক্ল। ইঁহারই নামে কংগ্রেস নগরের নামকরণ হইয়াছে।

সাম্রাজ্যওয়ালা রাষ্ট্রগুলির, বিশেষ করিয়া ব্রিটেন ও ফ্রান্সের বিশেষ আতঙ্কের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষ রক্ষাকল্পে ইংরেজ এ যাবৎ যে নীতি অবলম্বন করিয়া আসিয়াছে, তাহাতে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি একরূপ বিদ্বিষ্ট হইয়াই আছে। এইজন্য এইসব রাষ্ট্রের বর্ত্তমান মনোভাব সম্বন্ধেও আমাদের জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

চীনে জাপানের মর্ম্মান্তিক অভিযান চলিয়াছে আজ দেড় বৎসরের উপর। সে এখন আত্মরক্ষায় নিতান্তই ব্যস্ত। সে ইংরেজের দোরগোড়ায় বার বার ধর্ণা দিয়াও বিশেষ কোন সাহায্য পায় নাই। ইদানীং কিছু অর্থ সাহায্য মিলিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা তাহার প্রয়োজনের পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নয়। কাজেই চীনারা ব্রিটিশের উপর তাহাদের মনোভাব প্রকাশের অবকাশই পাইতেছে না। জাপান কিন্তু ব্রিটেনের উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়াই আছে। ভারতের পূর্ব্ব সীমা হইতে পাঁচ শত মাইলের মধ্যে জাপানী সৈন্য আসিয়া পড়িয়াছে।

ইহার পর শ্যামের কথা। শ্যামের ভূতপূর্ব্ব রাজা প্রজাধিপক ইংরেজের খুবই ভক্ত ছিলেন। গত ১৯৩৫ সালে তাঁহার সিংহাসন ত্যাগের পর হইতে সেখানে ইংরেজ প্রভাব লোপ পাইতে বসিয়াছে। বর্ত্তমানে জাপানীরা শ্যামে প্রভাব বিস্তার করিতেছে বলিয়া খুবই গুজব। আর এই গুজব রটাইতে ইংরেজরাই অগ্রণী হইয়াছে। 'ক্রা' যোজকে খাল কাটাইয়া জাপানীদের ভারতসাগরে পড়িবার সুযোগ করিয়া দিবে শ্যাম—এরূপ কথাও নানা কাগজে প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্যাম সরকার কিন্তু ইহার প্রতিবাদ করিয়াছে। ইহার পক্ষ হইতে সম্প্রতি ঘোষণা করা হইয়াছে যে, শ্যাম হইবে এশিয়ার 'সুইজারল্যাণ্ড'। অর্থাৎ বিভিন্ন শক্তির মধ্যে লড়াই বাধিলে ইউরোপের সুইজারল্যাণ্ডের মতই সে নিরপেক্ষ থাকিবে। জাপানের প্রভাব পূর্ব্ব ও দক্ষিণ এশিয়ায় যেরূপ দ্রুত বাড়িতেছে, তাহাতে তাহার ঘোষণা শেষ পর্য্যন্ত কতটা কার্য্যকরী হইবে, বলা কঠিন। ইংরেজের প্রতি তাহার মনোভাব পরিবর্ত্তন হইয়াছে ঠিকই, সে তাহার প্রভাব মুক্ত হইতে নূতন করিয়া চেষ্টাও করিতেছে হয়ত।

তিব্বত হইতে ভারত আক্রমণের আশঙ্কা নাই বলিলেই চলে। কাজেই তাহার মনোভাবের পরিবর্ত্তন হউক কি না হউক তাহাতে বিশেষ কিছুই আসিয়া যায় না। কিন্তু আফগানিস্তান, ইরাণ এসব দেশের মতিগতির উপর ভারতবর্ষের নিরাপত্তা অনেকখানি নির্ভর করে। আফগানিস্তানে ইংরেজের প্রভাবে যেন ভাটা পড়িয়াছে। রুশিয়ারও বিশেষ স্থান সেখানে নাই। ইদানীং ইটালী, জার্ম্মানী ও জাপানের বিশেষজ্ঞগণ সেখানে নিয়োজিত হইতেছে। এই সব দেশেরই প্রভাব এখন সেখানে খুব। জাপানী মালে আফগানিস্তানের হাট-বাজার ছাইয়া গিয়াছে। ভারতবাসীরা সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য করিত। এখন সরকারের বিরুদ্ধ মনোভাবের ফলে ভারতবাসীদের ব্যবসা করা ভার হইয়াছে। আফগানরা হয়ত ব্রিটিশের উপর ক্রমশই বিরূপ হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু ইহার ফলভাগী হইতেছে নিরীহ ভারতীয়েরা। ইরাণের বেলায়ও ঐ এক কথা। সে-ও ইংরেজের প্রভাবমুক্ত হইয়া এখন গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়াছে। ব্রিটেনের পরিবর্ত্তে জার্ম্মানী-ইটালী এখন সেখানে নাকি বিশেষ আদর লাভ করিতেছে।

আরব দেশ একেবারে ভারতবর্ষের গায়ে না থাকিলেও ইহার মতিগতির প্রতিও আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার। আরবরা ইংরেজের ঘাড়ে ভর করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে বটে, কিন্তু তাহাদের কারসাজিতে, বিশেষত প্যালেষ্টাইনের প্রতি ব্যবহারে ইহারা তাহাদের উপর কম বিদ্বিষ্ট হয় নাই। ইহার সুযোগ লইয়া ইটালী বহুদিন পর্য্যন্ত সেখানে ব্রিটিশ-বিরোধী প্রচারকার্য্য চালাইয়াছে। ইদানীং ব্রিটেন ইটালীর সঙ্গে সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছে। তাহাতে আরবদের খুবই সুবিধা হইয়া গিয়াছে। এখন শুনা যাইতেছে, জার্ম্মানী সেখানে তাহার প্রভাব বাড়াইতে চেষ্টা করিতেছে।

ইটালীর সোমালিল্যাণ্ড ভারত মহাসাগর তীরে

অবস্থিত। আবিসিনিয়া বিজয়ের পর এই স্থানের গুরুত্ব ঢের বাড়িয়া গিয়াছে। সোমালিল্যাণ্ডে একটি নৌ-বহরের ঘাঁটি নির্ম্মাণের পরিকল্পনা ইটালীর আছে। এখানে ঘাঁটি নির্ম্মিত হইলে, ভারতবর্ষ প্রত্যক্ষভাবে ইটালীর সান্নিধ্য লাভ করিবে। কিছুদিন পূর্ব্বে ইঙ্গ-ইটালী সন্ধি বিধিবদ্ধ হইয়া উভয়ের মধ্যে মৈত্রী স্থাপনের চেষ্টা হইয়াছে বটে, কিন্তু বিপদের সময় এই মৈত্রী কতটা কার্য্যকরী হইবে বলা যায় না। ইউরোপের জটিল অবস্থা ইটালীকে ক্রমশই জার্ম্মানীর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে বাধ্য করিতেছে।

ব্রিটিশ পরিচালিত পররাষ্ট্র-নীতির দরুন ভারতবর্ষের আর একটি বিশেষ ক্ষতি হইতেছে, তাহার প্রতি এযাবৎ কাহারও দৃষ্টি বিশেষভাবে পড়িয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। আগে বলিয়াছি, আফগানিস্তানে ভারতবাসীদের দুর্দ্দশা উপস্থিত

পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু

হইয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী অন্য রাষ্ট্রগুলিতেও ভারতবাসীর বিশেষ স্থান নাই। তাহারা ইংরেজের হাতে নাজেহাল হইয়াছে বটে, কিন্তু রাগ পড়িয়াছে নিরীহ ভারতবাসীর উপর। তাহারা নিশ্চিত জানে, ভারতবর্ষের জন্যই ইংরেজের হস্তে বার বার তাহাদিগকে নাকাল হইতে হইয়াছে। ইংরেজ শক্তিশালী, তাহার উপর প্রতি-শোধ লইবার শক্তি ইহাদের কাহারই নাই। কাজেই বেচারা ভারত-বাসীর উপরই যত আক্রোশ পড়িয়া থাকে। ফল ভুগিতে হয় ভারতবাসীকেই। এ রকম বিসদৃশ অবস্থা কতদিন থাকিবে?

বিদেশে ভারতবাসীর উপর যদি কোন রকম অত্যাচার অবিচার করা হয়, তবে তাহার [illegible] উপায় নাই। আবিসিনিয়ায় ভারতবাসীর সংখ্যায় কিছু বেশী থাকায়

তাহারা ব্যবসা-বাণিজ্য শিল্পাদি দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিত। ইটালীর অধিকৃত হইবার পর বিনা অর্থেই তাহারা তল্পি-তল্পা লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে এ ত গেল সম্পূর্ণ বিদেশী ইটালীর ব্যবহারের কথা। ব্রিটিশ ডোমি-নিয়নগুলিতেও ভারতবাসীর দুর্দ্দশার অন্ত নাই। দক্ষিণ ও পূর্ব্ব আফ্রিকায় একটা না একটা সমস্যা ত লাগিয়াই আছে। ভাল জায়গায় ভারতবাসী ঘর বাড়ী প্রস্তুত করিতে পারিবে না, ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে পারিবে না, ইত্যাদি কত রকম অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। ভারতবাসীর পক্ষে এই সব অনাচারের প্রতিশোধ লইবার উপায় নাই। কারণ, সে যে পরাধীন, পরের মতে তাহাকে চলিতে হয়।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, ব্রিটেনের পররাষ্ট্র-নীতি আর বেশী দিন যদি ভারতবর্ষেরও পররাষ্ট্র-নীতি বলিয়া পরিচিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে দুর্দ্দশার চরমে পৌঁছিতে হইবে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি যাহাদের সঙ্গে প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতবাসীর কোন বিরোধ নাই, তাহারা তাহার উপর বিদ্বিষ্ট হইয়া আছে। বিদেশে ভারত-বাসীর সম্মানের সহিত বসবাস ও ব্যবসা-বাণিজ্য করিবার ক্ষমতা নাই। উপরন্তু, বড় বড় রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ব্রিটেনের বিরোধ বাধিবার খুবই সম্ভাবনা থাকায় তাহার শক্তির প্রধান উৎস ভারতবর্ষের দিকে অনেকেরই লোলুপ দৃষ্টি পড়িয়াছে। ব্যাপকভাবে দেখিতে গেলে, আরও কতকগুলি বিষয় আমাদের চোখে পড়িবে। প্রবল শক্তিগুলির লোভ দূর করিবার জন্য ব্রিটেনকে ন্যায় নীতি ধর্ম্ম বিরোধী কতকগুলি গর্হিত কাজও করিতে হইয়াছে। মিউনিক চুক্তির দ্বারা চেকো-শ্লোভাকিয়ার একটা বৃহৎ অংশ জার্ম্মানীকে দিয়া দেওয়া হইয়াছে! কারণ, ইংরেজের ভয় চেকোশ্লোভাকিয়া লইয়া যুদ্ধ বাধিলে ইটালী, জার্ম্মানী, জাপান বিপক্ষে যাইবে। ইংরেজ নিজের ঘর সামলাইতে ব্যস্ত, এই অবসরে জাপান অনায়াসে আসিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবে। ইটালী ও জার্ম্মানীকে আপ্রাণ খুশী করিবার চেষ্টার মূলে রহিয়াছে ব্রিটিশের ভারতবর্ষের চিন্তা। ইউরোপে ও এশিয়ায় প্রবল শত্রুর সম্মুখীন হইতে হইলে, সব কূল বজায় রাখা তাহার পক্ষে খুবই কঠিন কাজ।

প্রত্যেক দেশেরই পররাষ্ট্র-নীতির সঙ্গে দেশ-রক্ষার নীতির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে। প্রত্যেকেই শত্রুর শক্তির পরিমাপ করিয়া আত্মরক্ষার আয়োজন করে। আমাদিগকে এই বলিয়া এত দিন ভুলাইয়া রাখা হইয়াছে যে, যাহারা ব্রিটেনের শত্রু, তাহারা ভারতবর্ষেরও শত্রু। এইজন্য ব্রিটিশ সরকার সাম্রাজ্য রক্ষাকল্পে একটা ব্যাপক নীতি অনুযায়ী চালিত হইয়া থাকে। এখনও তাহার এই নীতি বলবৎ রাখিয়াছে। লর্ড চ্যাটফিল্ডের নেতৃত্বে একটি কমিশন ভারতবর্ষ রক্ষার আয়োজন সম্বন্ধে কিছুদিন পূর্ব্বে অনুসন্ধান ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়া গিয়াছেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট তাঁহারা গোপনীয় রিপোর্টও পেশ করিয়াছেন। দেশ-রক্ষার আয়োজন ইংলণ্ডে খুব আরম্ভ হইয়াছে। দেড় শত কোটি

টাকা ব্যয়ে একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য্য ত চলিয়াছেই, উপরন্তু আগামী বৎসরের জন্য বাড়তি ব্যয় আশী কোটি পাউণ্ড ধার্য্য হইয়াছে। বিমান-বিভাগেও অন্যূন বিশ কোটি পাউণ্ড ব্যয় হইবে বলিয়া প্রকাশ। বিমান আক্রমণ হইতে লোকজনকে রক্ষা করিবার জন্য প্রত্যেক গৃহে মাটীর নীচে প্রকোষ্ঠ তৈরী করা হইতেছে। পার্কে, মাঠে গর্ত্ত খুঁড়িয়া রাখা হইতেছে। ইত্যাকার কত আয়োজন সেখানে চলিয়াছে। কিন্তু বৃটেনের খাস জমিদারী ভারতবর্ষে কি আয়োজন হইতেছে ?

ভারতবর্ষে আছে দুই লক্ষের উপর সৈন্য, সাতখানা ছোট ছোট যুদ্ধ জাহাজ, আর আট স্কোয়াড্রন বিমানপোত! ইংলণ্ডে অত আয়োজন চলিয়াছে, সাধারণে হয়ত ভাবিতেছে, তাহার একটি বড় অংশ ভারতবাসীরা পাইবে। কিছু কিছু সৈন্য, বিমানপোত, জাহাজ না হয় ভারতবর্ষে পাঠান হইল, কিন্তু বিমান আক্রমণ হইতে বিরাট জনসমুদ্রকে রক্ষার জন্য কি কোন চেষ্টা হইতেছে ? বিলাতের গৃহে গৃহে বা পার্কে পার্কে গর্ত্ত খুঁড়িলে ত ভারতবাসীর তাহাতে কোন লাভ হইবে না। সত্য কথা বলিতে কি, বর্ত্তমানে ভারতবর্ষকে ইংলণ্ডের আঁচল-ধরা করিয়া রাখিয়া একদিকে তাহারও শত্রুবৃদ্ধি করা হইয়াছে, অন্যদিকে তাহাকে একান্ত অসহায় ও নিরুপায় করিয়া রাখা হইয়াছে। কিন্তু দিকে দিকে যেরূপ প্রবল শক্তিগুলির সাম্রাজ্য-ক্ষুধা বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাতে ভারতবাসীর আর বসিয়া থাকিবার উপায় নাই।

ভারতবর্ষে এমন একদল বলিষ্ঠ চিন্তাশীল লোক আছেন যাঁহারা ভাবেন যে, ইংরেজের যাহারা শত্রু, ভারতবাসীরও যে তাহারা শত্রু হইবে এমন কোন কথা নাই। এ কথাগুলির মধ্যে যথেষ্ট সত্য নিহিত আছে। কিন্তু তাহা কখন সম্ভব? বৃটিশরা ভারতবর্ষ লইয়া এমনভাবে খেলা করিয়া থাকে যে, বিদেশীরা ইংরেজ ছাড়া ভারতবর্ষকে কল্পনাই করিতে পারে না। কিন্তু বিদেশীর এই প্রকার মনোভাবের পরিবর্ত্তন ঘটানই আমাদের প্রধান কাজ। আর এই কাজ সম্পাদিত হইতে পারে, যদি ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ভারতবাসীর বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট নীতি অনুসরণ করিয়া চলে। ত্রিপুরীতে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হইয়া গেল, তাহাতে বৃটিশ পররাষ্ট্র-নীতির নিন্দা করিয়া প্রস্তাব পাশ হইয়াছে। মিউনিক চুক্তি, ইঙ্গ-ইটালীয় মৈত্রী ও ফ্রাঙ্কো গবর্ণমেণ্টকে স্বীকার এ সকলেরই নিন্দা করা হইয়াছে। বস্তুত, সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিজম এই দুইটি বস্তু যে রকম দেহে দেহ মিলাইয়া চলিয়াছে, তাহাতে জগতে সত্য ন্যায় ধর্ম্মের মর্য্যাদা আর থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। ইহার ফলে শান্তি সুদূর-পরাহত হইয়াছে, পরস্পরের মধ্যে অবিশ্বাস ও অস্বস্তি বাড়িয়া গিয়াছে, ফলে প্রত্যেকেই পর্ব্বতপ্রমাণ অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। বৃটেন কিরূপ আয়োজন করিতেছে, তাহা আগেই উল্লেখ করিয়াছি। এই প্রসঙ্গে তাহা স্মরণীয়। ভবিষ্যতে যুদ্ধ কিরূপ ভীষণ হইবে, তাহা আবিসিনিয়া, স্পেন, চীন, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ প্রভৃতি দৃষ্টান্ত হইতেই বেশ বুঝা যায়। বৃটিশ পররাষ্ট্র-নীতি ইহারই ইন্ধন যোগাইতেছে। ভারতবাসী জাতীয় কংগ্রেসের মারফৎ ইহার প্রতিবাদ জানাইয়াছে। কিন্তু এখন শুধু প্রতিবাদ জানাইয়া নিরস্ত থাকিলেই ত চলিবে না। ভারতবর্ষ আগে যেমন ছিল, তাহার চেয়েও ঘনিষ্ঠভাবে যে তাহাকে বৃটিশ কক্ষীভূত করা হইতেছে, যদিও তাহার আত্মরক্ষার আয়োজনের কোন চেষ্টারই সূচনা দেখা যাইতেছে না। আমরা ভবিষ্যতে সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধে যোগদান করিব না, ইহা বলাই ত যথেষ্ট নয়। আগে যাহা বলিয়াছি, ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, এখনই অবহিত না হইলে বাধ্য হইয়াই সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে লড়িতে হইবে। কাজেই এখন হইতেই এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নীতি স্থির করা আবশ্যক। সময় থাকিতে অবহিত না হইলে, সব কথা বাগাড়ম্বরেই পর্য্যবসিত হইবে। কোন কোন ভাব-বিলাসী বৈদেশিক ব্যাপারে কণ্টকের দ্বারা কণ্টক উৎপাটন নীতি অবলম্বন করিতে চান, অর্থাৎ শত্রুকে সাহায্য করিয়া বর্ত্তমান শাসক জাতির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে তাহা হইবার নয়। দুর্ব্বলের শত্রু সকল প্রবল শক্তিই। এইজন্য ভারতবর্ষের বৈদেশিক নীতি নিজস্ব মত অনুসারে পরিচালনা করিতে হইলে, তাহাকেও যথাযোগ্য শক্তি অর্জ্জন করিতে হইবে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করিলে তাহার শক্তি বাড়িয়া যাইবে নিশ্চয়।

১৪ই মার্চ্চ, ১৯৩৯।

পুলিশের ক্ষমতা

"বাবা, তুমি দারোগা হও"—এই কথা ব'লে এক বুড়ী নাকি জেলার জজসাহেবকে আশীর্ব্বাদ করেছিলো। বুড়ীর দোষ নেই। এদেশে দারোগাগিরি মানুষকে সত্যসত্যই অসীম ক্ষমতার অধিকারী করে। গ্রাম্যজীবনের রঙ্গমঞ্চে দারোগারা হচ্ছেন এক একটী হিটলার অথবা মুসোলিনী। বুড়ী তার দীর্ঘজীবনের অভিজ্ঞতায় পুলিশের রুদ্ররূপকে বারম্বার প্রত্যক্ষ করেছিলো আর সেইজন্যই তার কৃতজ্ঞ হৃদয় জজসাহেবের জন্য কামনা করেছিলো দারোগার চাকরি।

পুলিশের এই ক্ষমতাকে সঙ্কুচিত করবার প্রয়োজন আছে। লাল-পাগড়ি এদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে আজও বিভীষিকার বস্তু হ'য়ে আছে। বার্ট্রাণ্ড রাসেল তাঁর 'Power' নামক পুস্তকে পুলিশের এই ক্ষমতাকে সঙ্কুচিত করবার কথা বিশেষভাবে বলেছেন। পুলিশের হস্তে নির্দ্দোষীদের লাঞ্ছনার কথা অবিদিত নয়। থানার কর্ম্মচারীরা আসামীর কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করবার জন্য অনেক সময়ে নির্দ্দয়ভাবে তাকে প্রহার করে—এ কথা কে না জানে? আঘাতের ফলে অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করেছে—এমন ব্যাপারও কখনো কখনো ঘটেছে ব'লে শোনা যায় এবং তা নিয়ে সংবাদপত্রে যথেষ্ট হৈ চৈ-এরও সৃষ্টি হয়েছে। দোষীদের শাস্তি হওয়া নিশ্চয়ই উচিত—কিন্তু নির্দ্দোষীরা যাতে লাঞ্ছিত না হয়—সে দিকেও কি আমাদের দৃষ্টি রাখা উচিত নয়?

পুলিশের ক্ষমতাকে সঙ্কুচিত করতে হলে আমাদের কি করবার প্রয়োজন আছে—রাসেল তা বলেছেন। তিনি লিখেছেন,—

> For the traning of the Power of the Police, One essential is that a Confession shall never, in any circumstances, be accepted as evidence.

> পুলিশের ক্ষমতাকে বশে আনতে হ'লে একটী কাজ আমাদের করতেই হবে। কোনোক্রমেই আসামীর স্বীকারোক্তিকে প্রমাণ ব'লে গ্রহণ করা চলবে না।

•

পুলিশের অনাচারের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে রাসেল ভারতবর্ষের কথাই বিশেষভাবে বলেছেন। আসামীর স্বীকারোক্তিকে কেন প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা উচিত নয় তার জবাব দিতে গিয়ে রাসেল লিখেছেন,—আসামী যাতে মুক্তি না পায়—এর দিকেই সাধারণতঃ পুলিশের লক্ষ্য থাকে। কেন? কারণ অভিযুক্ত ব্যক্তি শাস্তি পেলে পুলিশের পদোন্নতির সম্ভাবনা। আসামী যাতে শাস্তি পায় তার জন্য—সে অপরাধ করেছে—এমন প্রমাণ উপস্থিত করবার প্রয়োজন আছে। আদালতে অপরাধের এই প্রমাণ উপস্থিত করবার জন্যই আসামীর কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায়ের এত চেষ্টা। অপরাধ যে করেনি—সে কেমন ক'রে বলবে, আমি অপরাধ করেছি? আসামী দোষ অস্বীকার করে। তখন আরম্ভ হয় মার। সে মার কি যেমন তেমন মার? মারতে মারতে আসামীর প্রাণ যখন দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার উপক্রম হয় তখন বেচারা দোষ না ক'রেও ব'লে ফেলে, 'দোষ করেছি বাবু।' মার তখন বন্ধ হয়। দারোগা আসামীর সেই স্বীকারোক্তিকে প্রমাণরূপে উপস্থিত করে আদালতে। বিচারে আসামীর সাজা হ'য়ে যায়—দারোগার পদোন্নতি হয়। কারারুদ্ধ ব্যক্তির অপোগণ্ড শিশুরা অনাহারে শুকিয়ে মরে—দারোগা বাবুর গৃহিণীর অঙ্গে নতুন অলঙ্কার দীপ্তি পায়।

পুলিশের ক্ষমতাকে বশে আনবার জন্য আরও একটা কথার উল্লেখ করেছেন রাসেল। যে ব্যক্তি আসামী তাকে জেলে পাঠানোর জন্য পাবলিক প্রসিকিউটরের ব্যবস্থা আছে। গবর্ণমেণ্টের তো টাকার অভাব নেই! সুতরাং পুলিশের অভিযোগকে সপ্রমাণ করবার জন্য যোগ্য উকীলই নিযুক্ত হয়। আসামী যেখানে ধনবান সেখানে অবশ্য তার পক্ষে বড়ো উকীল নিযুক্ত করা কঠিন নয়। কিন্তু যে-সব ক্ষেত্রে আসামীরা গরীব সেখানে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তারা ভালো উকীল পাবে কোথায়? ভালো উকীলের অভাবে মোকদ্দমায় তারা হেরে যায় এবং নির্দ্দোষ হ'য়েও অযথা শাস্তি ভোগ করে। এই রকম যেখানে অবস্থা সেখানে যেমন পাবলিক প্রসিকিউটরের ব্যবস্থা আছে—তেমনি পাবলিক ডিফেণ্ডারেরও ব্যবস্থা থাকা উচিত। গরীব আসামী নির্দ্দোষী হ'য়েও আদালতের বিচারে যাতে দোষী সাব্যস্ত না হয়—তার জন্য গবর্ণমেণ্টের খরচেই তাকে অভিযোগের দায় থেকে মুক্ত করবার জন্য যোগ্য ব্যবহারজীবী নিযুক্ত করবার প্রয়োজন আছে। দোষীর যেমন শাস্তি হওয়া উচিত—নির্দ্দোষীরও তেমনি মুক্তি পাওয়া উচিত। একদিকে আসামীর স্বীকারোক্তি যদি আদালতে প্রমাণরূপে গৃহীত না হয় এবং অন্যদিকে আসামীর পক্ষ সমর্থনের জন্য গবর্ণমেণ্টের খরচে যোগ্য উকীল নিয়োগের যদি ব্যবস্থা থাকে তবে পুলিশের ক্ষমতার এই মারাত্মক প্রাচুর্য্য যে বহুল পরিমাণে সঙ্কুচিত হবে—এতে কোনোই সন্দেহ নেই।

কংগ্রেসের ত্রিপুরী অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের উদ্দীপনাময় অভিভাষণ

সভাপতির অভিভাষণ

কমরেড চেয়ারম্যান ও প্রতিনিধিগণ, ভারতীয় রাষ্ট্রীয় মহাসভার সভাপতিপদে পুনর্নির্ব্বাচিত করিয়া আপনারা আমার প্রতি যে বিপুল সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন এবং এখানে এই ত্রিপুরীতে আপনারা আমাকে যেরূপ আন্তরিকভাবে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি আপনাদিগকে আমার অন্তরের অন্তস্থল হইতে ধন্যবাদ দিতেছি। সত্য বটে, এরূপক্ষেত্রে সাধারণতঃ যেরূপ আড়ম্বর হইয়া থাকে, আমার অনুরোধে তাহার কতকগুলি আপনাদিগকে পরিহার করিতে হইয়াছে, কিন্তু এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হওয়ায় আপনাদের সম্বর্দ্ধনার আন্তরিকতা ও গভীরতার বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হয় নাই এবং আমি আশা করি যে, এক্ষেত্রে সম্বর্দ্ধনার আয়োজন সংক্ষিপ্ত হওয়ায় কেহ দুঃখিত হইবে না।

রাজকোট ব্যাপারে মহাত্মাজীর সাফল্যে আনন্দ প্রকাশ

বন্ধুগণ, কিছু বলিবার পূর্ব্বে রাজকোট ব্যাপারে মহাত্মা গান্ধীর উদ্দেশ্য সফল হওয়ায় এবং তাহার ফলে তাঁহার অনশন ব্রতের অবসান হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। সমগ্র দেশ এক্ষণে দারুণ দুর্ভাবনা হইতে স্বস্তি অনুভব করিতেছে।

অস্বাভাবিক অবস্থাবহুল বৎসর

"বন্ধুগণ, এই বৎসর বহু দিক দিয়া অস্বাভাবিক বা অসাধারণ বলিয়া মনে হয়। এবার সভাপতি নির্ব্বাচন একঘেয়ে পদ্ধতিতে হয় নাই। নির্ব্বাচনের পর চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয় এবং ওয়ার্কিং কমিটির ১৫ জন সদস্যের মধ্যে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল, মৌলানা আজাদ, ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রমুখ ১২ জন সদস্য পদত্যাগ করেন। ওয়ার্কিং কমিটির আর একজন বিশিষ্ট সদস্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যথারীতি পদত্যাগ না করিলেও একটি বিবৃতি প্রচার করেন, যাহাতে সকলেই মনে করিয়াছিলেন যে, তিনিও পদত্যাগ করিয়াছেন। ত্রিপুরী কংগ্রেসের প্রাক্কালে রাজকোটের ব্যাপারে মহাত্মা গান্ধীকে মৃত্যুপণ করিয়া অনশন ব্রত গ্রহণ করিতে হয়। তাহার পর পীড়িত

অবস্থায় সভাপতি ত্রিপুরীতে পৌঁছেন। সুতরাং এই বৎসর সভাপতির অভিভাষণ যদি দৈর্ঘ্যের দিক হইতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ক্ষুদ্র হয়, তাহা হইলে তাহা বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগীই হইবে।

ওয়াফদী প্রতিনিধিদলকে সাদর সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন

বন্ধুগণ, আপনারা জানেন যে, মিশর হইতে ওয়াফদী প্রতিনিধিদল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় মহাসভার অতিথিরূপে আমাদের মাঝে পৌঁছিয়াছেন। তাঁহাদের সকলকে আন্তরিকভাবে সম্বর্দ্ধিত করিতে আপনারা আমার সহিত যোগদান করিবেন। আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের পক্ষে ভারতে আসা সম্ভবপর হওয়ায় আমরা অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। আমরা এইজন্য শুধু দুঃখিত যে, মিশরে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নূতন অবস্থার উদ্ভব হেতু ওয়াফদী দলের সভাপতি মুস্তাফা এল নাহাস-পাশা স্বয়ং এই প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করিতে পারিলেন না। তাঁহার ও ওয়াফদী দলের বিশিষ্ট সদস্যগণের সহিত ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ আমার ঘটিয়াছিল, সেই হেতু আমার আনন্দ আজ বেশী। আমার দেশবাসিগণের পক্ষ হইতে আমি তাঁহাদিগকে সাদর সম্বর্দ্ধনা জানাইতেছি।

হরিপুর কংগ্রেসের পর আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি

১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমরা যখন হরিপুরে সমবেত হইয়াছিলাম, তাহার পর আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে বহু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছে। উহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হইতেছে ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মিউনিক চুক্তি। উহার অর্থ এই যে, নাৎসী জার্ম্মানীর নিকট ফ্রান্স ও গ্রেটবৃটেনের হীন আত্মসমর্পণ। ইহার ফলে ইউরোপে ফ্রান্স আর অন্যতম প্রধান শক্তি রহিল না এবং একটি মাত্র গুলী বর্ষণ না করিয়াও কর্ত্তৃত্ব জার্ম্মাণীর হস্তে চলিয়া গেল। সম্প্রতি স্পেনে গণতন্ত্রী গবর্ণমেণ্টের ক্রমিক পতন ফ্যাসিস্ত ইতালী নাৎসী জার্ম্মানীর শক্তি ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। তথাকথিত গণতান্ত্রিক শক্তি—ফ্রান্স ও বৃটেন ইউরোপীয় রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে সোভিয়েট রাশিয়াকে আপাততঃ ছাটিয়া দিবার জন্য ইতালী ও জার্ম্মানীর সহিত ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়াছে।

কিন্তু ইহা কতদিন সম্ভব হইবে?

রুশিয়াকে অপমানিত করিবার চেষ্টা করিয়া ফ্রান্স ও গ্রেট বৃটেনের কি লাভ হইয়াছে? ইউরোপ ও এসিয়ায় সম্প্রতি যে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে তাহার ফলে শক্তি ও মর্য্যাদার দিক হইতে বৃটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ যে যথেষ্ট পিছাইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট চরমপত্র দানের প্রস্তাব

আমি এখন ভারতের রাজনীতি সম্বন্ধে কিছু বলিব। আমার স্বাস্থ্য ভাল নাই, সেইজন্য কয়েকটি মাত্র গুরুতর সমস্যার উল্লেখ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিব। প্রথমেই কিছুদিন হইতে আমি যাহা মনে করিতেছি, তৎসম্বন্ধে স্পষ্টভাবে আমার অভিমত প্রকাশ করিব। আমার মনে হয় যে, স্বরাজের প্রশ্ন উত্থাপন এবং চরমপত্রের আকারে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট আমাদের জাতীয় দাবী দাখিল করিবার উপযুক্ত সময় আসিয়াছে। আমাদের উপর যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা চাপাইয়া দেওয়া হউক এবং আমরা নিষ্ক্রিয় মনোভাব অবলম্বন করিয়া থাকিব এরূপ অবস্থা বহুকাল পূর্ব্বেই অতীত হইয়া গিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনা কখন আমাদের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হইবে, তাহা এখন আর সমস্যা নহে। ইউরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত কয়েক বৎসরের জন্য যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনা যদি সুযোগ বুঝিয়া ধামাচাপা দেওয়া হয় তাহা হইলে আমরা কি করিব, ইহাই হইতেছে সমস্যা। চতুঃশক্তি চুক্তি দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে ইউরোপে একবার স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে গ্রেট বৃটেন যে কড়া সাম্রাজ্যবাদ নীতি অবলম্বন করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। গ্রেট বৃটেন প্যালেষ্টাইনে ইহুদীদের বিরুদ্ধে আরবদিগকে শান্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে এই কারণে যে আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে গ্রেট বৃটেন নিজেকে দুর্ব্বল বলিয়া মনে করিতেছে, সেইহেতু আমি বিবেচনা করি যে, উত্তর দিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট সময় দিয়া চরমপত্রের আকারে আমাদের জাতীয় দাবী বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট পেশ করা আমাদের উচিত। এই সময়ের মধ্যে যদি কোন উত্তর পাওয়া না যায় বা অসন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের জাতীয় দাবীসমূহ আদায় করিবার জন্য আমাদের যে সকল উপায় আছে, তাহা অবলম্বন করিতে হইবে। বর্ত্তমানে আমাদের নিকট যে উপায় আছে তাহা হইতেছে ব্যাপক আইন অমান্য বা সত্যাগ্রহ। দীর্ঘ সময়ের জন্য নিখিল ভারত ব্যাপী সত্যাগ্রহের ন্যায় বড় রকমের একটা সজ্ঘর্ষের সম্মুখীন হইবার মত অবস্থা আজ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নাই।

আমি দেখিয়া ব্যথিত হই যে কংগ্রেসে এমন সব নৈরাশ্যবাদী ব্যক্তি রহিয়াছেন যাঁহারা মনে করেন যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বড় রকমের আক্রমণ আরম্ভ করিবার উপযুক্ত সময় এখনও আসে নাই। কিন্তু বাস্তব অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমি নৈরাশ্যের বিন্দুমাত্র কারণ দেখি না। আটটি প্রদেশে কংগ্রেসের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠানের শক্তি ও মর্য্যাদা বর্দ্ধিত হইয়াছে। বৃটিশ ভারতের সর্ব্বত্র গণ-আন্দোলন যথেষ্ট প্রসার লাভ করিয়াছে।

তাহার পর দেশীয় রাজ্যসমূহে অভূতপূর্ব্ব গণ-জাগরণ দেখা দিয়াছে। স্বরাজের দিকে চূড়ান্তভাবে অগ্রসর হওয়ার পক্ষে আমাদের জাতীয় ইতিহাসে ইহা অপেক্ষা উপযুক্ত মুহূর্ত আর কখন হইতে পারে, বিশেষতঃ, আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি যখন আমাদের অনুকূলে? নিছক বাস্তববাদী হিসাবে আমি বলিতে পারি যে, বর্ত্তমানে সমগ্র অবস্থা আমাদের এত অনুকূলে যে, আমাদের খুব বেশী রকমের আশা পোষণ করা উচিত। আমরা শুধু যদি মতানৈক্য ভুলিয়া জাতীয় সংগ্রামে সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য নিয়োগ করি, তাহা হইলে আমাদের আক্রমণ এত তীব্র হইবে যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাহা প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। আমরা রাজনৈতিক দূরদর্শিতা লইয়া বর্ত্তমান অনুকূল অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিব, না এই সুযোগ হারাইব? জাতির জীবনে এমন সুযোগ খুব কম আসে।

দেশীয় রাজ্য

দেশীয় রাজ্য সমূহে গণ-আন্দোলন সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি আমার সুস্পষ্ট অভিমত এই যে, হরিপুর কংগ্রেসের প্রস্তাবে দেশীয় রাজ্য সমূহের প্রতি আমাদের যে মনোভাব নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তন করা উচিত

উক্ত প্রস্তাবে দেশীয় রাজ্য সমূহে কংগ্রেসের নামে পরিচালিত কতকগুলি কার্য্যকলাপের উপর বিধিনিষেধ আরোপিত হইয়াছে। উক্ত প্রস্তাবের ফলে পার্লামেণ্টারী কাজকর্ম্ম বা দেশীয় রাজ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, কংগ্রেসের নামে পরিচালিত হইতে পারে না। কিন্তু হরিপুরের পর অনেক কিছু ঘটিয়াছে। আজ আমরা দেখিতেছি যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সার্ব্বভৌম শক্তি দেশীয় রাজ্যের কর্তৃপক্ষের সহিত জোট বাঁধিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় আমরা কংগ্রেসের লোকগণ কি দেশীয় রাজ্যের জন সাধারণের পক্ষ লইব না? আজ আমাদের কর্ত্তব্য কি, সে সম্বন্ধে আমার মনে সংশয় নাই।

উক্ত নিষেধ তুলিয়া দেওয়া ছাড়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্রের জন্য দেশীয় রাজ্যে গণ আন্দোলন ব্যাপকভাবে ও নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিতে ওয়ার্কিং কমিটি কর্ত্তৃকই পরিচালিত হওয়া উচিত। এ পর্য্যন্ত যে সকল কাজ করা হইয়াছে, তাহা বিক্ষিপ্ত ধরণের—তাহার মধ্যে বিশেষ কোন পদ্ধতি বা পরিকল্পনা নাই কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটির পক্ষে এই দায়িত্ব গ্রহণ এবং ব্যাপকভাবে ও নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিতে দায়িত্ব পালন এবং প্রয়োজন হইলে ঐ উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ সাব-কমিটি নিযুক্ত করিবার সময় আসিয়াছে। এই বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব ও সহযোগিতা ও নিখিল ভারত দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মেলনের সহযোগিতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে হইবে।

স্বরাজের পথে চূড়ান্তভাবে অগ্রসর হওয়ার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইহার জন্য আমাদের যথেষ্টভাবে প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। প্রথমতঃ আমাদের মধ্যে যে সকল দুর্নীতি ও দুর্ব্বলতা—প্রধানতঃ ক্ষমতার লোভে

(শেষাংশ ৩৪৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রণয়ের পরে

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি) - ৪১১

শ্রীসত্যকুমার মজুমদার

অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া লীলা প্রভাকে দেখিল; দেখিতে দেখিতে সহসা লীলার বিষাদমলিন সারা মুখখানি অকারণে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। লীলা আর দাঁড়াইল না, কঠিন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী বীর যেমন গভীর আত্মতৃপ্তিতে একটু গর্ব্বও অনুভব করে, তেমনি একটা তৃপ্তির আনন্দ বুকে লইয়া প্রসন্ন গর্ব্বে লীলা অমরের পড়িবার ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল অমর তেমনই বই লইয়া বসিয়া আছে।

এবার লীলার পদক্ষেপে মৃদুতার অভাবে অমর চোখ তুলিয়া চাহিয়া বলিল, "দেখে এলি, কেমন, বেশ বৌ না?"

অমরের বিদ্রূপে যে ব্যথার সুর ফুটিয়া উঠিয়াছিল, লীলার কানে আসিয়া তাহা করুণ বেদনায় প্রতিধ্বনিত হইল। গোছান কথা লীলা ভুলিয়া গেল, ব্যথিতদৃষ্টি দিয়া অমরের পানে চাহিয়া রহিল। অমর যেন তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল, বলিল, "চুপটি করে কি ভাবছিস রে লীলা, বৌ ভাল নয়! বেশ বৌ ত! বাবা নিজে দেখে বিয়ে দিয়েছেন,—সবাই বলছে কত বড় লোক শ্বশুর,—কত টাকা কত জিনিষ দিয়েছেন, দেখবি সে সব।"

সে যেন সব কথা শুনিতে পাইল না। স্নিগ্ধকণ্ঠে ডাকিল, "অমরদা!"

অতি পুরাতন স্বরে অমর মুহূর্ত্তের জন্য আত্মবিস্মৃত হইয়া দীননয়নে লীলার পানে চাহিল। লীলা বলিল, "এ বিয়েতে তুমি সুখী হতে পারবে অমরদা?"

অমর একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিয়াছিল, "সুখ দুঃখ যাঁর দান তাঁর দানের অমর্য্যাদা কোনদিন করিনি, আজও করব না। তুই ভাবিস নি পাগলী। তোর অমরদা মরবে না, বেঁচেই থাকবে।"

— ২ —

তারপর কতদিন কাটিয়া গিয়াছে। স্মৃতির বোঝা ক্রমে অনেকটা হাল্কা হইয়াই উঠিয়াছিল। তবু কিনা সময় সময় সে নিজকে সামলাইয়া রাখিতে পারিত না। তার উপর মাঝে মাঝে প্রভার বক্র-ইঙ্গিতে সেই পুরাতন কাহিনী নূতনের রূপ ধরিয়াই মনের কোণে আসিয়া খোঁচা দিত। কোন্ দিন কেমন করিয়া তার মনে প্রথম আকাঙ্ক্ষার বীজ উপ্ত হইয়াছিল, শৈশবের সরল প্রীতি কেমন করিয়া কামনার অগ্নিশিখা হইয়া উঠিয়াছিল, আজ লীলা তাহা ভাল করিয়া স্মরণ করিতেও পারে না। মনে নাই কোন্ দিন সে ঠিক বুঝিতে পারিয়াছিল, অমরকে সে চায়—শুধু বাল্যের খেলা-ধূলার মধ্যে নয়,—সারা জীবনের সঙ্গিত্বের মধ্যে, সকল কাজে সকল ভাবনার মধ্যে, আরও আপন আরও নিকট করিয়া। সে যে কেমনটি লীলার কিশোর হৃদয় তখনও তাহা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারে নাই। সম্বন্ধ বুঝিবার মত বয়সেই লীলা অমরনাথকে অমরদা বলিয়াই জানিত। আরও জানিত, অমরদাকে তার ভাল লাগে, ফুল তুলিয়া দেয়, ফল পাড়িয়া দেয়, একবার না পারিলে বহুবার পড়া বলিয়া দেয়,—একটু বকে না, একদিনও মারে না। আরও যে কত কথা—কত দিনকার ব্যর্থ ইতিহাস, মনে হইলেই লীলার বুকে প্রলয়ের ঝড় বহিয়া যায়। আগেকার কথাই আগে মনে পড়ে।

সে একদিন বৈশাখ মাসের সন্ধ্যাবেলা—রৌদ্রতপ্ত মাঠের উপর খানিক পূর্ব্বেই এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। গরমের জন্য ভোরবেলা তখন পাঠশালা বসিত, লীলা রোজ বিকালে অমরের কাছে পড়িতে আসিত। বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছিল—বৃষ্টিস্নাত মাঠের উপর শ্যামল তৃণ গুল্ম—অদূরে গ্রামান্তের অনিবিড় বনানী এক অপরূপ শোভায় হাসিয়া উঠিয়াছিল। পড়ায় তখন অমরের মন ছিল না। এক একবার অমর লীলার পানে আবার দূরে শ্যামল প্রান্তরের পানে চাহিয়া চাহিয়া কি দেখিতেছিল। হাসিয়া লীলা বলিয়াছিল, "অমন করে বারে বারে চেয়ে কি দেখছ অমরদা?"

অমরনাথ লীলার চিবুক ধরিয়া একবার নাড়া দিয়া বলিল, "কি আর দেখব রে পাগলী,—কিছু না।"

অমরের এ দৃষ্টি বুঝিবার বয়স লীলার তখনও হয় নাই—কিন্তু অমরের এই দৃষ্টিপাতের নূতনত্বের কারণ জানিবার কৌতূহল সে দমন করিতে পারিল না। অমরের বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, "না, তোমায় বলতে হবে অমরদা! না বললে আমি ছাড়ছিই নে।"

অমর দক্ষিণ হস্তে লীলার চিবুক তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "দেখছিলাম কি—জানিস,—যা—তুই বুঝবিই না!"

লীলা ছাড়িবার পাত্রী নয়, বলিল, "বুঝব, বল না তুমি বুঝিয়ে।"

অমরনাথ আবার মাঠের দিকে চাহিয়া বলিল, "এই যে জল হয়ে গেল দেখলি না! তাই মাঠ, গাছপালা কি সুন্দর দেখাচ্ছে!"

"তাত দেখাচ্ছেই" বলিয়া লীলা দূরে প্রসারিত মাঠের পানে চঞ্চল চোখদুটি তুলিয়া চাহিল।

অমর বলিল, "দেখছি, তুই বেশী সুন্দর—না ঐ মাঠ!"

দশ বৎসরের বালিকা লীলার যে কিছুই জ্ঞান ছিল না এমন নয়, সে ভ্রূকুটি করিয়া বলিল "যাও।"

সহসা অমর উঠিয়া গেল। লীলা ডাকিল, "যেও না অমরদা।"

অমরনাথ ফিরিয়া বলিল, "আমি এক্ষুণি ফিরছি, তুই ততক্ষণ হস্তলিপিটা লিখে ফেল।"

লীলা লিখিতে বসিয়া গেল। কতক্ষণ পরে অমরনাথ রুমালে কতকগুলি ফুল বাঁধিয়া ফিরিয়া আসিল। লীলা একমনে লিখিতেছিল, পাশে বসিয়া অমর লীলার বেণীবন্ধ চুলের খোঁপায় ফুটন্ত কতকগুলি বেলফুল গুঁজিয়া দিতে লাগিল।

"ওকি হচ্ছে অমরদা!" বলিয়া লীলা মৃদু হাসিয়া জোর করিয়া মাথা সরাইয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছিল, পারে

নাই। অমর বামহস্তে লীলাকে ধরিয়া রাখিয়া ফুল গুঁজিতে গুঁজিতে বলিয়াছিল, "দাঁড়ানা হতভাগী, বাইরের গাছপালা মাঠের সবুজ ঘাস, বাগানের ফুল ওরা খুব হাসছে না, ওদের একটু জব্দ করে নিই। ওরা ভেবেছে মানুষের চেয়েও ওরা সুন্দর, আমার বড্ড রাগ হয়ে গেল। দেখছি ওরা হেরে যায় কি না। ওদের জব্দ করে তবে ছাড়ব।"

লীলা নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল। অমরের কথার একবিন্দুও বুঝিল না। তবুও জিজ্ঞাসা করিল, "কি পাগলামী তোমার অমরদা, আমি ফুল পরলে ওরা জব্দ হবে কেন?"

অমরনাথ দৃঢ়তার সহিতই বলিয়াছিল, "হবে না, খুবই হবে, হতেই হবে যে। এই যে সৃষ্টির সেরা মানুষ, এর ওপরও ওরা টেক্কা মারতে চায়। দূরে ছাই—কার কাছেই বা কি বলছি।"

লীলা বিস্মিত চোখে অমরের পানে চাহিয়া রহিল। অমরনাথ বলিতে লাগিল, "জানি—এ কথা আজ তুই বুঝবি না, তোর কাছে আমার এ সব বলাই নেহাৎ বোকামী! তবু কেন বলি জানিস লীলা, আমার ইচ্ছে হয় তুই যদি এ সব বুঝতিস, আর আমি তোর কাছে শুধু বলেই যেতাম!"

বলিতে বলিতে অমর লীলার কানের দুল খুলিয়া ফেলিয়া লীলার হাতে দিল। লীলা বলিল, "খুলে ফেললে যে অমরদা?"

অমরনাথ দুটি ফুলের কুঁড়ি হাতে লইয়া বলিয়াছিল, "সেদিন যে বিদ্যাসাগরের শকুন্তলাখানা তোকে পড়িয়ে শুনিয়েছিলেম, মনে নেই?"

লীলা কৌতূহলী হইয়া বলিল, "সেই দুষ্মন্ত রাজার গল্প ত, শিকারে যেয়ে বনের মধ্যে না?" তারপর সলজ্জ হাস্যে মুখ নত করিয়া বলিল, "যাও তুমি বড় দুষ্টু। পরব না আমি ফুল।"

লজ্জার একটা আরক্ত-প্রবাহ লীলার সারা মুখখানিতে খেলিয়া গেল। লীলাকে ফুলের দুলে সাজাইয়া অমর বলিয়াছিল, "কেমন মানিয়েছিল শকুন্তলাকে!"

লীলা উঠিয়া যাইতেছিল, অমরনাথ রাগিয়া বলিয়াছিল, "উঠে গেলে ভাল হবে না কিন্তু। এখনো, বালা পরাইনি, মালা গাঁথিনি!"

অমরনাথ সূঁচ-সূতো লইয়া অলঙ্কার প্রস্তুতে বসিয়া গেলে লীলা কিঞ্চিৎ কাতর হইয়া বলিল, "কেউ ঠাট্টা করে যদি অমরদা।"

অমর বলিয়াছিল, "ঠাট্টা করবে না আরও কিছু, কি অপরাধের কাজই হ'ল গো, তাই লজ্জায় মাটির নীচে লুকোতে হবে! যাদের চোখ আছে, তারা বাহবা দেবে।" লীলা অপ্রসন্ন মুখে বলিল, "বাড়ী গেলে মা যদি বকে!"

অমরনাথ বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিল, "হাঁ, মা মাথা কেটে নেবেন! খুড়ীমাকে বলিস, তুই পরতে চাসনি, অমরদা জোর করে পরিয়ে দিয়েছে। এক ফোঁটা মেয়ের আবার লজ্জা দেখ! তবে না হাবা তুই কিছুই বুঝিসনে!"

তবুও লীলা বিরক্ত মুখে চুপ করিয়াছিল। অমরনাথ রাগ করিয়া বলিয়াছিল, "যা উঠে যা তোকে কিছুই পরতে হবে না।"

তারপর অর্দ্ধগ্রথিত কুসুম-হার লীলার গায়ে ছুঁড়িয়া মারিয়াছিল; অবশিষ্ট ফুল ছড়াইয়া ফেলিয়া বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল। লীলা অনেকক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিয়া অর্দ্ধগ্রথিত নিক্ষিপ্ত কুসুম হার তুলিয়া লইয়াছিল, সুনিপুণ হস্তে শেষ করিয়া গলায় পরিয়াছিল, আরও ফুল লইয়া বালা ও বাজু গড়িয়া হাতে দিয়াছিল, তারপর বই ও শ্লেট হাতে লইয়া ডাকিয়াছিল, "অমরদা।"

অমরের সাড়া না পাইয়া লীলা উপরে যাইয়া দেখিল জ্যাঠাইমার ঘরে অমর বসিয়া আছে। লীলার দিকে চাহিয়া জ্যাঠাইমা হাসিয়া ফেলিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, "ফুলের জন্ম সার্থক করেছ মা!"

অমরের দিকে না চাহিয়া সেদিন লীলা বলিয়াছিল, "আমায় ছুটি দিতে বল জ্যাঠাইমা, অনেকক্ষণ আমার পড়া হয়ে গেছে!"

সেদিন একবার লীলার পানে আবার অমরের পানে চাহিয়া জ্যাঠাইমা কি ভাবিয়াছিলেন কে জানে!

সারা পথ মাটির দিকে চাহিয়াই লীলা বাড়ী ফিরিয়াছিল। ভয় পাছে কেউ উপহাস করে। লীলার মা নন্দরাণী মেয়ের অপরূপ রূপসজ্জা দেখিয়া বলিলেন, "মুখুজ্যে বাড়ীতে যেয়ে বসে বসে বুঝি এই পড়া হচ্ছিল!"

ভয়ে লীলা বিবর্ণ হইয়া গেল। মাটির দিকে মুখ রাখিয়া বলিল, "পড়া ত হয়েছে।"

মাতা বলিলেন, "তবে এসব ফুলের শ্রাদ্ধ হ'ল কখন?"

লীলা কাঁদ কাঁদ মুখে বলিল, "আমি ত পরতে চাইনি, জ্যাঠাইমা ত বল্লে।"

ধমক দিয়া নন্দরাণী বলিলেন, "জ্যাঠাইমা বল্লেন! খেয়ে দেয়ে জ্যাঠাইমারও আর কাজ ছিল না, তোমায় ফুলসাজে সাজিয়েছেন! বল্ সত্যি করে কোথায় এসব পেলি?"

লীলা কাঁদিয়া ফেলিল। এমন সময় পিতা বিশ্বেশ্বরবাবু ভিতরে আসিয়া লীলাকে কাছে টানিয়া লইয়া নন্দরাণীকে বলিয়াছিলেন, "কি করেছে ও, বকছ কেন?"

নন্দরাণী স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার অত আদরেই ত মেয়েটা বয়ে গেল! সখ্ দেখ না মেয়ের, ফুলরাণী সেজেছেন! জন্মেছে ত এই ভাগ্যবানের ঘরে, তারপর অত সখ্ যদি বেড়েই চলে, কোন রাজা বাদশার ঘরে মেয়ে দেবে বল দেখি! এই ত দশ পেরুতে চল্‌ল। তারপর গরীবের গরীবের মত থাকা চাই, থাকতে শিখতে হয়, অভ্যাস করতে হয়।"

লীলা জানিত না, আমরা জানি কথাটা বিশ্বেশ্বরবাবুকেও স্পর্শ করিতে ছাড়িল না। ভাগ্যবানের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত যে তাহার দুর্ভাগ্যকে লক্ষ্য করিয়াই করা হইল, তাহা বুঝিয়াই বিশ্বেশ্বরবাবু চুপ করিয়া গিয়াছিলেন। দরিদ্র হইয়া পুত্র-কন্যার সাধ করাও বুঝি মহাপাপ; তার উপর পূর্ব্ব জন্মে নেহাৎ কাহারও সর্ব্বনাশ না করিলে বাঙলা দেশে কন্যা সন্তান লাভ হয় না।

অনেক দিনের একটা পুরান কথা তাঁর মনে পড়িয়া গেল। লীলা যখন মাতৃগর্ভে নন্দরাণী তখন পুত্র কামনায় অনেক মাদুলী কবচ ধারণ করিয়া স্বামীকে আশ্বাস দিতেন, তাঁর ভয় নাই—তিনি কন্যাসন্তান প্রসব করিবেন না। তন্ত্রমন্ত্রে বাধা না মানিয়াও যখন পরম রূপবান কুমারের পরিবর্ত্তে কন্যা সন্তানই জন্মিল তখন সদ্য-প্রসূতি নন্দরাণীর সত্য সত্যই মূর্চ্ছা হইয়াছিল এবং সেই মূর্চ্ছা ভাঙাইতে বিশ্বেশ্বরবাবুকেও স্বয়ং সূতিকাগৃহে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। অথচ এই নন্দরাণীই তন্ত্রমন্ত্রের জোরে পর পর তিনটি কন্যা প্রসব করিয়া তাঁহার পিতৃজন্ম সার্থক করিয়া দিয়াছেন। কন্যাগণকে বিশ্বেশ্বরবাবু কিন্তু পুত্রের মতই ভালবাসিতেন। বিশেষত লীলা ছিল তাঁর পরম স্নেহের বস্তু। লীলার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই জমিদার সরকারে তাঁর চাকুরী জুটিয়া গিয়াছিল, মাঠেও সে বৎসর প্রচুর ধান জন্মিয়াছিল। অমন গৌরীর মত রূপ মেয়ের, বিশ্বেশ্বরবাবু নিজেকে ভাগ্যবান বলিয়াই মনে করিতেন।

লীলা পিতার বুকে মুখ লুকাইয়া শান্ত হইয়াছিল। নন্দরাণী বলিয়াছিলেন, "এখন ত মেয়েকে খুব সোহাগ দেখান হচ্ছে, কোন্ রাজপুত্তুরের হাতে পড়ে,-দেখব গো, ও সোহাগ তখন কোথায় থাকে।"

বিশ্বেশ্বরবাবু হাসিয়া বলিলেন, "তা তুমি দেখ, আমি বলে রাখছি এই রাণীর মত রূপ, মা আমার রাণীই হবে।"

"রাণী হবে না, আরও কিছু! টাকা ছাড়া কেউ কথা কয় না, তা লক্ষ্মীর মত রূপেই থাক আর সরস্বতীর মত গুণেই থাক্" নন্দরাণী উপেক্ষাভরে কহিলেন।

আমরা জানি নন্দরাণীর এ কথারও একটা প্রচ্ছন্ন আঘাত ছিল। নন্দরাণীর রূপের খ্যাতিও একদিন পাড়ামহলে আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। তবু কি না কেহই তাঁর কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র পিতাকে বিনাপণে অনুগ্রহ করে নাই। বিশ্বেশ্বরবাবুর পিতাও নগদ পাঁচ শতটি টাকা বুঝিয়া লইয়া ছাদনাতলায় ছেলে পাঠাইয়াছিলেন। তাও ঐ ত ছেলে। বর-যৌতুকে সোনার ঘড়ি চেন দেওয়া হয় নাই বলিয়া অনেক দিন তাঁর পিতাকে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। অবশেষে স্ত্রীর গহনা বন্ধক রাখিয়া জামাতাকে ঘড়ি চেন দিয়া তবে শ্বশুর-গৃহ হইতে নন্দরাণীকে বাড়ী আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নন্দরাণীর অমন যে সুদীর্ঘ কালো চুলের রাশ, দুধে আলতায় রং, বড় বড় টানা টানা চোখ, তারপর কমসঙ্কো জোড়া ভূরু তার দরিদ্র পিতাকে বৈবাহিকের নির্য্যাতন হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। নন্দরাণী জানিতেন—তাঁর পটে-আঁকা ছবির মত সুশ্রী মেয়েটিকে বিনাপণে কেহই বিবাহ করিবে না। সমাজের এ অত্যাচার বুক পাতিয়া একদিন তাঁহাকে সহিতে হইয়াছিল। মানুষের চাঁদমুখে যত বড় মোহেরই হউক সোনা-রূপার রূপের কাছে চিরদিন মলিন হইয়াই যায়।

কথাটা যে অতি বড় সত্য তাহাতে কোন সংশয়ই ছিল না। সৎপাত্রে কন্যাদান করিবার মত সম্পত্তি ভগবান তাঁহাকে দেন নাই। তবু তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস এই ছিল যে, এমন যে সুন্দর সে হতভাগ্যের ঘরে জন্মায় না, হতভাগ্যের হাতে পড়ে না। যোগ্যের সঙ্গেই যোগ্য মিলিত হয়। সুতরাং তাঁর সুন্দরী মেয়ের জন্য উপযুক্ত পাত্র ভগবান জুটাইয়া রাখিয়াছেন নিশ্চয়।

বিশ্বেশ্বরবাবু পত্নীর এই খোঁচাটা বেমালুম হজম না করিয়া বলিলেন, "দোষটা শুধু অন্যের ঘাড়ে না চাপিয়ে নিজের কপালের দিক্‌টায় একবার চেয়ে দেখাও উচিত। যে যার ভাগ্য নিয়েই আসে, আমার ত এই বিশ্বাস।"

নন্দরাণী আঘাতের প্রতি আঘাত বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "ভাগ্যবানের ঘরেই ভাগ্যবতী যায়। অমন ভাগ্যমানের হাতে আমার মত ভাগ্যবতী ছাড়া কে পড়বে বল!"

"তা বলে গোবরেও কিন্তু পদ্মফুল ফোটে," নন্দরাণীর মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিয়া বিশ্বেশ্বরবাবু বলিলেন।

স্বামীর উপর সহাস্য কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া নন্দরাণী কহিলেন, "শুনেছি, চোখে দেখিনি। ফুটলেও খুব কদাচিৎ। সেটা গোবরের ভাগ্য। তারপর সে ফুল দেবপূজার লাগে কি না সন্দেহ। কেই বা তার খোঁজ রাখে! কারুর চোখেও তা পড়ে না। পূজোর সময় হ'লে পদ্মবনেই লোকে পদ্ম তুলতে যায়। গোবরের আস্তাকুড়ে কেউ খুঁজতে আসে না। হয় ফুটে সেইখানেই শুকিয়ে ঝরে পড়ে, না হয় মাঠের রাখালের চোখে পড়ে যদি তুলি নিয়ে খানিক নেড়ে-চেড়ে দেখে, পরে ছিঁড়ে ফেলে, অথবা মাঠের রোদেই ফেলে আসে। গোবরের কমল মাঠের রোদ্দুরেই পড়ে শুকোয়।"

"ভাগ্যগুণে ভক্তের হাতে পড়লে কিন্তু"—বাধা দিয়া নন্দরাণী বলিলেন, "সে ত ফুলের বরাত তাতে গোবরের কি!" "নাই থাকুক, তবুও সে ধন্য যে তার বুকেও অমন সোনার কমল ভগবান ফুটিয়ে তুলেছিলেন।"

বলিয়াই বিশ্বেশ্বরবাবু বহির্ব্বাটির দিকে চলিয়া গেলেন। এমন সময় অমরনাথ বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া ডাকিল, "কাকীমা!"

নন্দরাণী বাহিরে আসিতেই অমর নন্দরাণীর সম্মুখে সেরদশেক ওজনের একটি রুইমাছ রাখিয়া বলিল, "সুলতানপুরের প্রজারা পাঠিয়েছিল, মা তার একটা পাঠিয়ে দিলেন।"

অমরের কণ্ঠস্বর শুনিয়া লীলাও বাহির হইয়া আসিল। মায়ের আঁচল ধরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "অত বড় মাছটা কোথায় পেলে অমরদা, কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?"

অমর বলিল, "আমাদের অনেক বেশী হয়েছে কিনা—কে খাবে তাই ফেলে দিয়ে যাচ্ছি।" পরে নন্দরাণীর দিকে চাহিয়া বলিল, "ও বড় দুষ্টু হয়েছে কাকীমা, আজ কিছু পড়া করতে পারেনি!"

"হ্যাঁ, তাই আর কি—! ধর না দেখি, পারি কিনা। এই ত টানা মুখস্থ হয়ে গেছে! মনোহর মুখভঙ্গী করিয়া লীলা বলিতে লাগিল ঃ—

"ফুটিয়াছে সরোবরে কমলনিকর,

"থাম, থাম, হয়েছে" বলিয়া অমরনাথ অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া হাসিল।

নন্দরাণী মাছটি তুলিয়া লইয়া বলিলেন, ভারীও ত কম নয়, এত বড় না হ'লেও আমাদের চলত।"

হাসিমুখে অমর বলিল, "খাওয়ার লোক যদি নাই থাকে—আমিই না হয় আজ এখানে খাব!" লীলা নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল, বলিয়া উঠিল, "অমরদা ঠাট্টা করছে মা। হ্যাঁ অমরদা, আমরা গরীব বলে তুমি কি মনে কর আমরা তোমায় একদিন খেতেও দিতে পারিনে?"

"হ্যাঁ, ঠাট্টা করছে, বোকা কোথাকার, তুই কথা বলতে এসেছিস কেন? সত্যি কাকীমা, আজ আমি এখানেই খাব। ওদ্মাদের উড়ে ভূতটা যা রাঁধে—আমার ভাল করে পেটই ভরে না।"

জমিদার যোগীন্দ্র মুখার্জ্জির ছেলের এই যাচিয়া নিমন্ত্রণ খাইতে চাওয়া নন্দরাণী প্রথমে বিশ্বাস করিতে না পারিলেও অমরের কথার ভঙ্গীতে কিন্তু অবিশ্বাস হইল না। রূপের খ্যাতির ন্যায় রন্ধনের খ্যাতিও তাঁর কম ছিল না। সত্যিই নন্দরাণী আজ মনের কোণে এক অননুভূত আনন্দের আস্বাদনে ভবিষ্যের দিকে চাহিয়া যেন কি দেখিতে চেষ্টা করিলেন, পরে সাগ্রহে স্বামীকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি একটু গিন্নিদিদিকে বলে এস, অমর আজ আমাদের এখানে খাবে।"

অমর বলিল, "কাকাবাবু আর কেন যাচ্ছেন, আমিই মাকে বলে আসব।"

নন্দরাণী লীলাকে সন্ধ্যার দীপ জ্বালিতে বলিয়া অমরের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "কি করতে আর যাবে বাছা, তোমার কাকাবাবুই ত বলতে গেলেন। এই ত সন্ধ্যে হয়ে গেল। তুমি ততক্ষণ লীলার সঙ্গে বসে একটু গল্প কর, কত আর দেরী হবে।"

"না কাকীমা, আমার এক্‌জামিন এসে পড়েছে কি না, বাবা শেষে বক্‌বেন। খানিক পড়ে নিইগে, ডাকলেই আমি আসব।" বলিয়াই অমরনাথ বাহির হইতেছিল, লীলা ডাকিল "অমরদা!"

"পেছু ডাকলি কেনরে পাগলী?" বলিয়া অমর ফিরিয়া দাঁড়াইল।

লীলা নিকটে আসিয়া চুপি চুপি বলিল, "আমার অঙ্কটা যে কষা হয়নি অমরদা, মাষ্টার মশায় বকবেন যে।"

অমর কহিল, "আমি যদি না আসতাম, তখন দেখে নিতে পারিসনি।"

লীলা ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "তুমিই ত দেখে নিতে দিলে না, তুমি চলে গেলে কেন?"

"তুই ফ্রক পরতে চাইলিনি কেন! তাই ত আমার রাগ হয়ে গেল। হ্যাঁরে লীলা, কাকীমা কিছু বলেছিলেন?"

লীলা প্রথমে কিছু বলিতে সম্মত হইল না। অমরের পীড়াপীড়িতে বলিল, "মা বললেন, গরীবের মেয়ের ওসব সখের জিনিষ পরতে নেই।" "তুই আমার নাম করে বলতে পারলিনে, আমি পরিয়ে দিয়েছি।"

লীলা আরও খানিক অমরের দিকে অগ্রসর হইয়া একটু দুষ্টু হাসি হাসিয়া খুব ছোট করিয়া বলিল, "জ্যাঠাইমার কথা বলেছি।"

"ভারী ত দুষ্টু" বলিয়া অমর হাসিয়া ফেলিল। পরে স্বর একটু উঁচু করিয়া কহিল, "খেতে এসে অঙ্কটি দেখিয়ে দেবখন।"

অমর চলিয়া আসিয়া বই লইয়া বসিল। নিমন্ত্রণটা নিতান্ত যেচে পাওয়া হইলেও তা রক্ষা করিবার আগ্রহ যে অমরের দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিয়াছিল তাহা তাহার পড়ার অমনোযোগিতাতেই স্পষ্ট ধরা যাইতেছিল। পাঠ্য-পুঁথি সম্মুখেই ছিল—কান ছিল তার বাহিরের পানে বহু আকাঙ্ক্ষিত আহ্বানের আশায়! এই অনিচ্ছার পড়া অমরকে অধিকক্ষণ পড়িতে হয় নাই! কারণ প্রায় ঘণ্টাখানেক পরেই নন্দরাণী অমরকে লইয়া যাইবার জন্য বিশ্বেশ্বরবাবুকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। অমর বই রাখিয়া মায়ের নিকট বিদায় লইতে গেল। তারাসুন্দরী কহিলেন, "এত শীগ্‌গির তাঁদের রান্না হয়ে গেল।"

অমরনাথ মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "কাকাবাবু ডাকতে এসেছেন যে।"

মা পুত্রের নিমন্ত্রণ রক্ষার আগ্রহ স্পষ্টই টের পাইতেছিলেন। বুদ্ধিমতী মহিলা যেন কি বুঝিতে চেষ্টা করিলেন। তারপর মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "ফিরবি কখন?"

অমর মাটির দিকে মুখ রাখিয়া বলিল, "১০টার পর ভজুয়াকে পাঠিয়ে দিও।"

"দশটার পর!" জননী বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "সবে ত আটটা বাজলো, এতক্ষণ খেতে লাগবে?"

অমরনাথ কাতর দৃষ্টিতে মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল, "লীলাকে কটা অঙ্ক বুঝিয়ে দিতে হবে।"

"তা এস, কাকীমার রান্না খুব ভাল বলে বেশী খেয়ে যেন অসুখ কর না।"

অমর চলিয়া আসিল। একটা অনাগত শুভ মুহূর্ত্তের জন্য মানুষ যেমন ব্যাকুল আগ্রহে অপেক্ষা করে অমরও এই শুভ মুহূর্ত্তটির জন্য তেমনই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। যেটা নিত্য নৈমিত্তিক তার জন্য এই আকুলতার অস্বাভাবিকত্বই বেশী করিয়া চোখে লাগে। কারণ সহজলভ্য নিত্য পাওয়ার বস্তুতে নূতনত্বের মোহও বড় থাকে না মানুষকে তার জন্য আকুল হইতেও বড় দেখা যায় না, যেহেতু নূতনত্বপ্রয়াসী মানুষের মন। কিন্তু এমনও ত হয়, পুরাতনের মধ্যেও মানুষ নূতনত্বের আস্বাদ পাইয়া নূতন বস্তুর মতই তাতে ঝুঁকিয়া পড়ে। অথবা নিত্য পরিবর্ত্তনশীল জগতে চিরপুরাতন হঠাৎ নূতন হইয়া উঠে কিম্বা যে পুরাতন একদিন নূতন ছিল সেই নূতন দিনকার যে অনুভূতি তা হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া পুরাতনকে আবার নূতন করিয়া দেয়। কালের আর মনের এই নিত্য পরিবর্ত্তনে কত ভালই না মন্দ হইয়া যায়—, কত আপন পর, কত নিকট দূরে, কত সাধারণ অসাধারণে পরিণত হয়।

কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণে মানুষের প্রাণ যখন স্বপ্নসৌন্দর্য্যে ভরিয়া উঠে—বিশ্বের তাবৎ বস্তুতে সে নূতন

রূপেই দেখিতে পায়। বিশ্বজয়ের অদম্য কল্পনা আসে তার মনে, দিকে দিকে বিকাশ করিতে চায় সে নিজকে—দেখিতে চায় সে নিজকে বহু রূপে বহু ভাবে। সৃষ্টির জন্য হয় সে উন্মাদ—চোখে লাগিয়া যায় রঙিন নেশা, স্বপ্নময় হইয়া উঠে তার নিত্যকার জীবন। এমনি একটা দৃষ্টি বুঝি হঠাৎ আজ অমরের খুলিয়া গিয়াছিল, তাই বৃষ্টিস্নাত প্রকৃতির শ্যামল অঞ্চল তার কাছে আজ এত মধুর লাগিয়াছিল, দশ বৎসরের বালিকা লীলা অতি বড় চেনা, অতি বড় নিত্যকার সঙ্গী হইলেও ফুলসাজে সাজাইবার লোভ সে কিছুতেই সম্বরণ করিতে পারে নাই।

বিশ্বেশ্বরবাবু অমরকে লইয়া বাড়ী পৌঁছিয়া বলিলেন, "অমর এসেছে লীলা।"

লীলা রান্নাঘরে লুচি বেলিতেছিল। পিতার সাড়া পাইয়া বাহিরে আসিলে নন্দরাণী বলিলেন, "অমরকে একখানা ঠাঁই করে দে লীলা।"

লীলা স্বহস্তে বোনা একখানা গালিচার আসন লইয়া বলিল, "কোথায় দেব মা?"

নন্দরাণী বলিলেন, "কোথায় আবার দিবি, দে না ঐ ঘরটার দাওয়ায়।"

অমরকে রাখিয়া বিশ্বেশ্বরবাবু বাহিরে গেলেন। অমর দাওয়ায় উঠিয়া বলিল, "আমি নতুন কুটুম এসেছি তাই কোথায় দেবে মাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে! ওর কিছু বুদ্ধি নেই কাকীমা! দে না এইখানটায়।"

লীলা আসন বিছাইয়া দিলে অমর বসিয়া বলিল, "এত শীগ্গির রান্না হয়ে গেল কাকীমা? আমাদের ঠাকুর ত এখনো হেঁসেলেই যায়নি।"

নন্দরাণী জলখাবারের থালা অমরের সম্মুখে রাখিয়া বলিল, "রান্না কি আর আমাদেরই হয়েছে। কতক্ষণ আর লাগবে রাঁধতে, তুমি ততক্ষণ একটু জল খেয়ে নাও।"

অমর বলিল, "এখন খাবার খেলে ত আর ভাত খেতে পারব না কাকীমা।"

লীলা নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল, বলিল, "ঐ ত ক'খানা লুচি, এই খেলে বুঝি কারুর পেট ভরে, আর খাওয়া যায় না।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ অমন মুখে মুখে সবাই খেতে পারে, খেয়ে দেখ দেখি।" বলিয়া অমর খাইতে বসিয়া গেল।

নন্দরাণী বলিলেন, "পাখাটা নিয়ে একটু হাওয়া কর্ না বাছা, কি গরমই কদিন পড়েছে।"

কন্যাকে আদেশ করিয়াই নন্দরাণী আবার রান্নার কাজে চলিয়া গেলেন, লীলা পাখা লইয়া অমরকে হাওয়া করিতে লাগিল। অমর এক এক খণ্ড লুচি মুখে পুরিয়া লীলার দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। লীলা চাহিয়াই ছিল। চোখে চোখ পড়ায় অমর কহিল, "অমন করে চেয়ে রয়েছিস, চোখ লেগে পেটের অসুখ করে যদি দেখিস তখন।"

লীলা সলজ্জ মৃদু হাসিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। রন্ধনশালায় বসিয়া নন্দরাণী মুখ টিপিয়া হাসিলেন।

লীলার মুখে উত্তর না পাইয়া অমর আবার বলিল, "লুচিগুলো যা ফুল্কো হয়েছে, অত জোরে হাওয়া করলে উড়েই যাবে।"

লীলার কাছেও সেদিন অমরের কথাগুলি নূতন রকমের ঠেকিতেছিল। লীলার জেদ বাড়িয়া গেল—কথাই কহিল না।

(ক্রমশ)

কংগ্রেসের ত্রিপুরী অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের উদ্দীপনাময় অভিভাষণ

(৩৪০ পৃষ্ঠার পর)

প্রবেশ করিয়াছে, সেগুলিকে নির্মমভাবে অপসারিত করিবার জন্য আমাদিগকে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রতিষ্ঠান সমূহের সহযোগিতা

তাহার পর, দেশে যে সকল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রতিষ্ঠান আছে, তাহাদের সহিত, বিশেষ করিয়া কিষাণ আন্দোলন ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সহিত, ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা রাখিয়া আমাদিগকে কাজ করিতে হইবে। দেশে যে সকল র‍্যাডিকেল পন্থী দল আছে, তাহাদিগকে একযোগে ও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা সহকারে কাজ করিতে হইবে এবং সমগ্র সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আক্রমণের জন্য কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে।

বন্ধুগণ, আজ কংগ্রেসের মধ্যে আবহাওয়া গন্ধযুক্তচ্ছন্ন এবং মতভেদ দেখা দিয়াছে। ইহার ফলে আমাদের অনেক বন্ধু বিষণ্ণ ও উৎসাহহীন হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু আমি একজন আশাবাদী; কিছুতেই আমার আশাভঙ্গ হয় না। আজ আপনারা যে মেঘ দেখিতেছেন তাহা সাময়িক মাত্র। আমার দেশবাসিগণের দেশপ্রেমে আমার বিশ্বাস আছে এবং আমি নিঃসন্দেহ যে, শীঘ্রই আমরা বর্ত্তমান বিরোধের সমাধান করিতে ও আমাদের মধ্যে ঐক্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইব।—বন্দেমাতরম্।

ত্রিপুরী কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শেঠ গোবিন্দ দাসের অভিভাষণ

ত্রিপুরীতে কংগ্রেসের ৫২তম অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শেঠ গোবিন্দদাস নিম্নলিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন—

রাষ্ট্রপতি এবং প্রতিনিধিগণ

প্রাচুর্য্যপূর্ণ গুজরাটের বিপুল অভ্যর্থনার পর আপনারা সম্ভবতঃ দেখিবেন যে, মহাকোশলে পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্যে অভ্যর্থনা অনেকটা নিকৃষ্ট, তথাপি আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আপনারা অভ্যর্থনার অনাড়ম্বর দ্বারা আপনাদের প্রতি আমাদের আন্তরিক প্রীতির গভীরতা বিচার করিবেন না। আপনারা সকলে যে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, উহার প্রতি আমাদের আস্থা পর্ব্বতের ন্যায় অটল; আমরা যে স্বাধীনতালাভের উদ্দেশ্যে এখানে সমবেত হইয়াছি, উহার জন্য আমাদের জঙ্গলের আদিম অধিবাসিগণ ও তাহাদের বহুসংখ্যক ভাষা কোলাহল করিতেছে। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে শ্রীরামচন্দ্র যখন আমাদের প্রদেশে আগমন করিয়াছিলেন, তখন এক বন্যজাতীয়া কন্যা তাঁহাকে বনজাত ফুল দ্বারা অভ্যর্থনা করিয়াছিল। শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় আপনারাও আমাদের সামান্য অর্ঘ্য গ্রহণপূর্ব্বক আমাদের আয়োজনের অসংখ্য ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন।

আমাদের এই নগর আমাদের বনজাত কাঠ ও বাঁশ দ্বারা নির্ম্মিত। আমরা ইহার নাম রাখিয়াছি বিষ্ণুদত্ত নগর। পরলোকগত পণ্ডিত বিষ্ণুদত্ত শুক্ল আমাদের মহাকোশল প্রদেশের প্রথম নেতা ছিলেন। কংগ্রেসের ১৯২০ সালের অধিবেশন সমগ্র মধ্যপ্রদেশের পক্ষ হইতে আহূত হইয়াছিল। যাহাতে জব্বলপুরে ঐ অধিবেশন হয়, তজ্জন্য পরলোকগত পণ্ডিতজী প্রাণপণ চেষ্টা করেন; কিন্তু অবশেষে নাগপুরে ঐ অধিবেশন হয়। ঐ অধিবেশনে যোগদানের জন্য নাগপুরে অবস্থানকালে তিনি পরলোকগমন করেন। মহাকোশল উঁহার প্রথম নেতাকে কিংবা তাঁহার দীর্ঘকালের আকাঙ্ক্ষা বিস্মৃত হইতে পারে না। তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্যই এই নগরের নাম বিষ্ণুদত্ত নগর রাখা হইয়াছে।

কংগ্রেসের প্রতি মহাকোশলের অনুরক্তি

১৯২০ সালে নাগপুর কংগ্রেসে ভাষার ভিত্তিতে কংগ্রেস প্রদেশসমূহ গঠিত হয়। মধ্যপ্রদেশের হিন্দুস্থানী ভাষাভাষী জিলাসমূহ লইয়া হিন্দুস্থানী মধ্যপ্রদেশ নামে এক স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠিত হয়। ১৯৩০ সালের সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময়ে ইহার পুরাতন মহাকোশল নাম পুনরুজ্জীবিত এবং পরে কংগ্রেস কর্ত্তৃক অনুমোদিত হয়। কংগ্রেসের প্রতি

অনুরক্তি বিষয়ে মহাকোশল একটি শ্রেষ্ঠ স্থান দাবী করে। ইহার গত ১৮ বৎসরের রাজনৈতিক ইতিহাস দ্বারা এই দাবী সমর্থিত হয়। এই প্রদেশের অধিবাসিগণ অসহযোগ আন্দোলন এবং আইন অমান্য আন্দোলনে সহজেই সাড়া দিয়াছিল। যে পতাকা সত্যাগ্রহ নাগপুরে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল, উহা জব্বলপুরে আরম্ভ হইয়াছিল। আমাদের প্রদেশের উদ্যোগেই বন সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইয়াছিল। পার্লামেণ্টারী ক্ষেত্রেও এই প্রদেশের কার্য্য নগণ্য নহে। ১৯২৩ সালের নির্ব্বাচনে স্বরাজ্যদল কেবল বাঙ্গলায় ও মধ্যপ্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। বাঙ্গলায় কিছুকাল পর সংখ্যাগরিষ্ঠতা ক্ষুণ্ণ হয়; কিন্তু আমাদের প্রদেশে পুরা তিন বৎসরকাল কোন মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইতে পারে নাই। ১৯২৬ সালের সাধারণ নির্ব্বাচনে যখন মধ্যপ্রদেশের অন্যান্য জিলা পারস্পরিক সহযোগিতার প্লাবনে ভাসিয়া চলিয়াছিল, তখনও মহাকোশল কংগ্রেস পতাকা উচ্চে উড্ডীয়মান রাখিয়াছিল। নির্ব্বাচনের পর পরলোকগত পণ্ডিত মতিলাল নেহরু মহাকোশলের যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া-

ছিলেন, উহা চিরকাল আমাদের গর্ব্বের বিষয় হইয়া থাকিবে। যদি কেহ ১৯৩৭ সালের নির্ব্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করেন এবং মহাকোশলের নির্ব্বাচিত প্রার্থীদের সংখ্যা মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের অন্যান্য অংশ হইতে পৃথক্ করিয়া ধরেন, তাহা হইলে তিনি দেখিবেন যে, মহাকোশলের স্থান সমস্ত প্রদেশের অগ্রে। আমাদের সাফল্যের একমাত্র কারণ এই যে, এই প্রদেশের জনসাধারণ মুহূর্ত্তের জন্যও কংগ্রেস ব্যতীত অপর কোন প্রতিষ্ঠানের কথা ভাবে নাই। যখনই কোন নির্ব্বাচন যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, তখনই এক পক্ষে কংগ্রেসসেবিগণ এবং অপর পক্ষে বৃটিশ শাসনের সমর্থকদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম হইয়াছে। হিন্দুসভা, পারস্পরিক সহযোগিতাকামী দল, আম্বেদকরের দল প্রভৃতি কখনও মহাকোশলে সুবিধাজনক স্থান পায় নাই। আমাদের প্রদেশে মাত্র গত বৎসর মুসলিম লীগ স্থাপিত হইয়াছে। আমরা সর্ব্বদাই আনন্দের সহিত স্মরণ করি যে, সাইমন কমিশনের ভারতে আগমনের পূর্ব্বে মহাকোশলের ভূম্যধিকারিগণ এক সভা আহ্বান করিয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে ঐ অনাকাঙ্ক্ষিত কমিশন বর্জ্জনের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ভারতের সমস্ত প্রদেশ দেশের স্বাধীনতার জন্য ত্যাগ স্বীকার করিবার জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতা করিয়াছে। আমরা এইমাত্র দাবী করি যে, অন্যান্য বিষয়ে আমাদের ত্রুটি যাহাই থাকুক না কেন, যে মহাকোশল প্রদেশকে আপনারা আজ আপনাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার অধিকার দিয়াছেন, উহা কংগ্রেস ভক্তিতে খাটো হয় নাই।

পৃথিবীব্যাপী সঙ্কটে ভারতের সমস্যা

হরিপুর কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আমি এখানে আমার অভিভাষণ শেষ করিতে মনস্থ করিয়াছিলাম; কিন্তু গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ভারতে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা এবং আন্তর্জ্জাতিক অবস্থা আমাকে আরও কয়েকটি কথা বলিতে বাধ্য করিতেছে। পৃথিবী এক সঙ্কটের মধ্য দিয়া চলিতেছে। ইউরোপ ও এসিয়ায় ছোট বা বড় যুদ্ধ চলিতেছে: যে কোনদিন পৃথিবীব্যাপী সংগ্রাম আরম্ভ হইতে পারে। ভারত ইচ্ছা করিলেও আপনাকে উহা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রাখিতে পারে না। এরূপ কোন যুদ্ধের প্রতি আমাদিগকে কিরূপ মনোভাব অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা স্থির করিবার জন্য আমাদিগকে এক পক্ষে ইংলন্ড ও ফ্রান্স, অপরপক্ষে জার্ম্মাণী ও ইটালী এবং তৃতীয় পক্ষে আমেরিকা ও জাপানের অবস্থা বিচার করিতে হইবে। ইটালী কর্ত্তৃক আবিসিনিয়া জয়ের পর ভারত ও ইটালীর নূতন সাম্রাজ্যের মধ্যে মাত্র আরবসাগর ব্যবধান রহিয়াছে। তদুপরি ইটালী ও জার্ম্মাণী স্পেনে পদ স্থাপনের স্থান লাভ করায় ইংলণ্ডের পক্ষে ভূমধ্যসাগরের পথ আর পূর্ব্বের ন্যায় অবারিত নহে। যখনই কোন যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখনই আমাদের সৈন্যগণকে তাড়াতাড়ি ইউরোপে পাঠান হয়। এমতাবস্থায় বাহির হইতে আক্রান্ত হইলে ভারতের আত্মরক্ষার কোন উপায় থাকিবে না। এখন আমাদের কেবল পশ্চিমের দিক হইতে নহে, পূর্ব্বদিক হইতেও আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা আছে। জাপানের ক্রমবর্দ্ধমান শক্তি অতীতে প্রতীচ্যের কয়েকটি রাষ্ট্রের পক্ষে যেরূপ অনিষ্টকর ছিল, বর্ত্তমানে আমাদের পক্ষেও সেইরূপ অনিষ্টকর। জাপান গত মহাসমর হইতে দূরে ছিল; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে উহার হাবভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। আমেরিকার এক শ্রেণীর সংবাদপত্র একথাও বলিয়াছেন যে, কেবলমাত্র জাপানের ভয়েই মিউনিকে চেকোশ্লোভাকিয়াকে বলি দেওয়া হইয়াছে। জনরব এই যে, সুদূর প্রাচ্যের বৃটিশ গুপ্তচরদের গোপনীয় রিপোর্টে প্রকাশ যে, চেকোশ্লোভাকিয়ার ব্যাপার লইয়া ইংলন্ড যে মুহূর্ত্তে জার্ম্মেণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিবে, সেই মুহূর্ত্তে জাপান ভারত ও অষ্ট্রেলিয়া আক্রমণ করিবে। এই রিপোর্ট পাইয়াই মিঃ চেম্বারলেন হিটলারের সহিত সাক্ষাৎ করিবার এবং চেকোশ্লোভাকিয়াকে বলি দিবার সঙ্কল্প করেন। ভূমধ্যসাগর প্রায় "ইটালীর হ্রদে" পরিণত হইয়াছে। সুদূর প্রাচ্যে বৃটিশ অধিকৃত স্থানসমূহ রক্ষার একমাত্র ভরসা ভবিষ্যৎ যুদ্ধে আমেরিকার ইংলণ্ডের পক্ষে যোগদান। বর্ত্তমানে ইংলণ্ডের সমস্ত চেষ্টা আমেরিকাকে যুদ্ধে যোগ দিতে প্ররোচিত করিবার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত। ইংলণ্ডের ইচ্ছা, আমেরিকা প্রীতি প্রণোদিত হইয়া প্রাচ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয়; কিন্তু রাজনীতির ইতিহাসে পরহিতমূলক মৈত্রীর উদাহরণ পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান সময়ে আমেরিকার জনমত প্রাচ্যে বৃটিশ অধিকৃত স্থানসমূহ রক্ষার জন্য আমেরিকার লোক ও অর্থক্ষয় করিবার বিরোধী ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই।

এমতাবস্থায় ইংরাজগণ ভারত রক্ষা করিতে কতদূর সমর্থ হইবেন, তাহা সন্দেহের বিষয়। ভারতকে নিজেই নিজকে রক্ষা করিতে হইবে; সৈন্যবাহিনী ও বৈদেশিক নীতির উপর সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব না পাওয়া পর্য্যন্ত ভারত আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না। সুতরাং ভারতের আত্মরক্ষা সমস্যা উহার স্বাধীনতালাভরূপ বৃহত্তর সমস্যা হইতে পৃথক্ করা যাইতে পারে না।

বিদেশে ভারতবাসীর লাঞ্ছনা

ইহা বলা হয় যে, জার্ম্মাণী, জাপান ও ইটালীর অতিরিক্ত লোকদের জন্য জমি আবশ্যক বলিয়া তাহারা যুদ্ধ বাধাইতে দৃঢ়সঙ্কল্প। এই দিক হইতে বিচার করিলে ভারতের জমির প্রয়োজন আরও অধিক। তাহার লোকসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে; কিন্তু তাহার অধিবাসীদের পক্ষে অন্যান্য দেশের প্রবেশদ্বার রুদ্ধ। বহুসংখ্যক ভারতবাসী প্রায় এক শতাব্দী যাবৎ বিদেশে বাস করিতেছে; তাহারা কঠোর পরিশ্রম দ্বারা ঐ সমস্ত দেশ মনুষ্য বাসোপযোগী করিয়াছে। ঐ সমস্ত দেশেও আমাদের স্বদেশবাসীদিগকে শান্তিতে বাস করিতে দেওয়া হয় না এবং অন্যান্য অধিবাসীদের সমান অধিকার দেওয়া হয় না।

মাত্র অল্পদিন পূর্ব্বে জাঞ্জিবারের লবঙ্গ ব্যবসায় সমস্যার সমাধান হইয়াছে। কেনিয়ার যে কোন জাতীয় শ্বেতাঙ্গ উচ্চভূমির অধিকারী হইতে পারে। তাহারা বৃটিশ প্রজা না হইলেও কিছু আসে যায় না; কিন্তু ভারতীয়গণ যাহারা বহুকাল যাবৎ তথায় বসবাস করিতেছে এবং যাহারা বৃটিশ প্রজা বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহাদের ঐ জমি ক্রয়ের অধিকার নাই। ইংলণ্ড জার্ম্মাণীকে টাংগানিয়াকা প্রত্যর্পণের কথাও সহ্য করিতে পারে; কিন্তু দক্ষিণ ও পূর্ব্ব আফ্রিকায় আপন প্রজাদের স্বার্থরক্ষায় আপনার অক্ষমতা প্রকাশ করে। মাত্র গত বৎসর বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কেন্দ্রীয় পরিষদদ্বয়ের সম্মতি ব্যতীত ভারতের স্বার্থের বিরুদ্ধে ভারতের পক্ষ হইতে দক্ষিণ আফ্রিকার সহিত এক বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদন করিয়াছেন। সেদিন সাউথ আফ্রিকার ইউনিয়নের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নাটাল ও ট্রান্সভালের ভারতীয়দিগকে স্বতন্ত্র স্থানে রাখিবার জন্য আইন প্রণয়নের আভাস দিয়াছেন। সিংহল, ফিজি, মালয় এবং বৃটিশ গিণীতেও ভারতীয় অধিবাসীদিগকে ক্রমাগত খোঁচা দেওয়া হইতেছে। গত বৎসর আফ্রিকায় আমার স্বদেশবাসীদের শোচনীয় অবস্থা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তথায়ই আমরা আমাদের রাজনৈতিক দাসত্বের বিষয় সম্পূর্ণ উপলব্ধি করি। আমরা যদি স্বাধীন হইতাম তাহা হইলে আমরা এই অবস্থা একদিনও সহ্য করিতাম না। মহাত্মা গান্ধী বিদেশে ভারতীয়দের অধিকারের জন্য এত দীর্ঘকাল সংগ্রাম করিবার পর কি জন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, ভারতীয় ঔপনিবেশিকদের সমস্যার সমাধান ভারতের স্বাধীনতার উপর নির্ভর করে, আমি আফ্রিকা পরিভ্রমণের পর তাহা উপলব্ধি করিতে পারি।

এইরূপ আমরা যেদিকে তাকাই সেই দিকেই বাধা-বিঘ্ন দেখিতে পাই। এমতাবস্থায় আমাদের পক্ষে অকৃত্রিম দেশপ্রেম, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এবং উপযুক্ত নেতৃত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। আমাদের এই সঙ্কটপূর্ণ সময়ে আভ্যন্তরীণ বিরোধের লক্ষণ অতীব দুঃখের বিষয়। আমরা মাঝ-দরিয়ায় আসিয়া এখন মাঝি বদল করার কথা ভাবিতেছি।

কংগ্রেস আন্দোলনে গান্ধীজীর প্রভাব

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস স্বাধীনতা-আন্দোলন চালাইবার জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সময় সময় আমরা ডিরেক্টর দ্বারা পরিচালিত হইতে ইতস্ততঃ করি নাই। বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্যবর্ত্তী সময়ে আমরা গণতান্ত্রিক নীতি পুরোপুরি ভাবে অনুসরণ করিতে পারি নাই। গণতন্ত্রের জন্মস্থান বলিয়া পরিচিত ইংলণ্ডেও যুদ্ধের সময়ে ডিক্টেটরশিপের ভিত্তিতে সম্মিলিত মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়া থাকে। যদিও ইটালীর ফ্যাসিষ্ট দল, জার্ম্মেণীর নাৎসী দল এবং রুশিয়ার কম্যুনিষ্ট দল হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে এবং আমরা অহিংস নীতি গ্রহণ করিয়াছি, তথাপি আমাদের কংগ্রেস দল উহাদের সহিত তুলিত হইতে পারে। ইটালীর সমস্ত অধিবাসী ফ্যাসিষ্ট নহে; জার্ম্মাণীর সমস্ত লোক নাৎসী নহে এবং রুশিয়ার সমস্ত লোক কম্যুনিষ্ট নহে; তথাপি প্রায় সমস্ত ইটালীয়ান, জার্ম্মাণ ও রুশীয়ের তাহাদের দলের উপর আস্থা আছে। প্রত্যেক ভারতবাসী কংগ্রেসের চারি আনা সদস্য নহে; তথাপি সমস্ত ভারতবাসী কংগ্রেসের পক্ষে। ফ্যাসিষ্টদের মধ্যে মুসোলিনীর, নাৎসীদের মধ্যে হিটলারের এবং কম্যুনিষ্টদের মধ্যে ষ্ট্যালিনের যে স্থান, কংগ্রেসসেবীদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীরও সেই স্থান। কংগ্রেসের বর্ত্তমান রূপ মহাত্মা গান্ধী কর্ত্তৃক সৃষ্ট, ইহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং উহা লাভের উপায় অর্থাৎ সত্য ও অহিংসা মহাত্মা গান্ধী কর্ত্তৃক নির্দ্দেশিত। গত ২০ বৎসরের মধ্যে স্বাধীনতার জন্য যে সমস্ত সংগ্রাম হইয়াছে, তাহার নির্দ্দেশ অনুযায়ী তৎসমুদয়ের আরম্ভ, পরিচালনা ও অবসান হইয়াছে। কংগ্রেসের লিখিত গঠনতন্ত্রে তাঁহার জন্য কোন স্থান নির্দ্দিষ্ট নাই ইহা সত্য; কিন্তু ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না, রাষ্ট্রপতি পদে মহাত্মা গান্ধীর মনোনীত ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন করা এবং রাষ্ট্রপতির পক্ষে ওয়ার্কিং কমিটির অধিকাংশ সদস্যপদে মহাত্মা গান্ধীর মনোমত ব্যক্তিদিগকে মনোনীত করা একটা প্রথায় দাঁড়াইয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে কংগ্রেসে তিনি সর্ব্বেসর্ব্বা। কিছুকাল পূর্ব্বে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ইউরোপে ঘোষণা করিয়াছেন যে, গান্ধীজী কংগ্রেস অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। বর্ত্তমান বৎসরের রাষ্ট্রপতি সম্প্রতি বলিয়াছেন যে, যদি তিনি অপর সকলের আস্থা লাভ করেন, কিন্তু ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির আস্থা লাভে অক্ষম হন, তাহা হইলে অতি দুঃখের বিষয় হইবে। তিনি ইহা ঠিক কথা বলিয়াছেন।

মুক্তি কোন পথে

আজ আমরা এখানে অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে সমবেত হইয়াছি। মহাত্মাজী ঘোষণা করিয়াছেন যে, এই বৎসরের রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচন তাঁহার নিজের পরাজয়। ইহাও কথিত হয় যে, নূতন কার্য্যতালিকা হইতেছে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে এক চরম পত্র দ্বারা ছয় মাস সময় দেওয়ার পর আবশ্যক হইলে পুনরায় সংগ্রাম আরম্ভ করা। আমি গোপনীয় সংবাদ জানি না; কিন্তু আমি যতদূর জানি, মহাত্মা গান্ধী কিংবা তাঁহার সহকর্ম্মীদের কেহ কখনও ভারত শাসন আইনের যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কীয় অংশ গ্রহণের অনুকূল অভিমত প্রকাশ করেন নাই। যদি ইহা স্বীকার করা হয় (আমি অনুরূপ সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখি না) তাহা হইলে আমাদের বিচার্য বিষয় অতি সরল, যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা হইবে বলিয়া পূর্ব্বেই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

কেবল ঐ সংগ্রাম আরম্ভ করিবার সময় এবং উহার পদ্ধতি স্থির করিতে বাকী আছে।

আমি আশা করি, ঐ সংগ্রাম অহিংস সংগ্রাম হইবে। মহাত্মা গান্ধী অহিংসার আচার্য্য এবং অহিংস সংগ্রামের কৌশল তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা ভালরূপ জানেন। সুতরাং স্বভাবতঃই আশা করা হয় যে, কখন এবং কিরূপে ভাবী সংগ্রাম আরম্ভ হওয়া উচিত, তাহা স্থির করিবার ভার ঐ প্রাচীন শিক্ষকের উপরই ন্যস্ত করা উচিত। বাস্তবপক্ষে সংগ্রাম ইতিপূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়াছে। দেশীয় রাজ্যসমূহ ও বৃটিশ প্রদেশসমূহের মধ্যে মীমাংসা করিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পিত হইয়াছে। আজ অধিকাংশ বৃটিশ প্রদেশ কংগ্রেসের কর্ত্তৃত্বাধীন। আমি যদি রাষ্ট্রপতির মনোভাব ঠিকভাবে উপলব্ধি করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমার মনে হয়, অবশিষ্ট প্রদেশসমূহেও কংগ্রেসী শাসন প্রবর্ত্তিত হউক, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। গান্ধীজী ইতিপূর্ব্বেই দেশীয় রাজ্যসমূহে সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছেন; ইহার ফলে শ্রীমতী কস্তুরবাঈ গান্ধী, শ্রীমতী মণিবেন প্যাটেল এবং দেশভক্ত শেঠ যমুনোলাল বাজাজকে আমাদের নিকট হইতে ছিনাইয়া লওয়া হইয়াছে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কংগ্রেস যদি অবশিষ্ট প্রদেশ কয়টিরও শাসনভার লাভ করে এবং দেশীয় রাজ্যসমূহে সংগ্রামে জয়লাভ করিবার জন্য উহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করে, তাহা হইলে দেশ আরও লাভবান্ হইবে। আমার এ বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই যে, মহাত্মাজী নিজেই সুযোগমত সংগ্রামকে নূতন অবস্থায় লইয়া যাইবেন এবং আজ রাষ্ট্রপতি যাহা চাহেন, আগামীকাল তাহা নিশ্চয়ই সংঘটিত হইবে। যাঁহারা সংগ্রাম করিবার জন্য অধৈর্য্য হইয়াছেন, আমি তাঁহাদের উৎসাহের প্রশংসা করি; কিন্তু রাজনীতি ক্ষেত্রে কেবল উৎসাহ দ্বারা সাফল্যলাভ করা যায় না; সাফল্যের মূল নেতার প্রতি অবিচলিত আস্থা এবং নিয়মানুবর্ত্তিতা। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে গত বিশ বৎসরে ভারত যে শক্তি লাভ করিয়াছে, তাহা আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব। বিচক্ষণ সেনাপতির ন্যায় তিনি কয়েকবার আমাদিগকে অগ্রসর হইতে, প্রয়োজন অনুযায়ী গতি মন্থর করিতে এবং সময় সময় থামিতে আদেশ দিয়াছেন। তাঁহার প্রদর্শিত পথে আমরা এখন পর্য্যন্ত হোঁচট খাই নাই; সুতরাং আমরা এ পর্য্যন্ত যে পথ অনুসরণ করিয়া আসিয়াছি, উহা ত্যাগ করিয়া অন্য পথ গ্রহণের কোন কারণ নাই। মহাকবি কালিদাস বলিয়াছেন, "কার্পণ্য কেবলা নীতিঃ শৌর্য্য শ্বাপদ চেষ্টিতম্"।

বজ্রাদপি কঠোরাণি, মৃদূণি কুসুমাদপি

সাহসিকতা-বর্জ্জিত যে কূটনীতি তাহা কাপুরুষতা এবং কূটনীতিবিহীন সাহসিকতাও পাশবিকতা। আমার মতে মহাত্মাজী একাধারে সাহসিকতা এবং বিচারপরায়ণতার মূর্ত্ত প্রতীক। সম্প্রতি রাজকোট ও জয়পুরের আন্দোলন সম্পর্কে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে নেহরুজী গান্ধীজীর বাণীকে "কোমল অথচ কঠোর" বলিয়া বর্ণনা করেন। তাঁহার এই উক্তিতে বিখ্যাত সংস্কৃত কবি ভবভূতির সেই কথাটিই মনে পড়ে। রামচন্দ্র সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন—

"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি" অর্থাৎ বজ্রের অপেক্ষাও কঠোর এবং কুসুমের অপেক্ষাও কোমল। নেহরুজী এবং ভবভূতির এই উক্তির মধ্যেই আমরা মহাত্মাজীর সত্য স্বরূপের সন্ধান পাইয়া থাকি। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের শত্রুগণও কুসুমের অভ্যন্তরে যে বজ্রতুল্য কঠোরতাও প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা অবিদিত নহেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা নিজেরাই আমাদের আত্মদৌর্ব্বল্যবশে মাঝে মাঝে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া থাকি।

বর্ত্তমানে জাতীয় ও আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি এক সংকট সন্ধিক্ষণে সমুপস্থিত। এ সময় সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের নিকট আমার আকুল প্রার্থনা এই যে, ত্রিপুরীতে সমবেত ভারত-জননীর প্রত্যেক পুত্র-কন্যা যাহাতে একটা ন্যায়সংগত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন, তিনি তাঁহাদিগকে সেই শুভ বুদ্ধি ও শক্তি প্রদান করুন।

ভ্রাতা-ভগ্নীগণ! সমগ্র মহাকোশল প্রদেশের পক্ষ হইতে আমি আপনাদিগকে পুনরায় আন্তরিক সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিতেছি। আমাদের আয়োজনে যে সব ত্রুটি-বিচ্যুতি রহিয়া গিয়াছে, এবং আমার অভিভাষণে যে সব ভ্রম-প্রমাদ ঘটিয়াছে, আশা করি, আপনারা নিজগুণে তাহা মার্জ্জনা করিবেন।

বন্দে মাতরম্

দেবু

(গল্প)

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

রথের মেলা বসিয়াছে। চারিদিকে দোকান-পাট। কত লোকের আনাগোনা। ফেরিওয়ালারা গলাবাজি করিয়া "যা লেবে তা দু'আনা" হরেক রকম "নিলামী মাল" বিক্রী করিতেছে। ছেলেদের দল লুব্ধ-নেত্রে সেই স্থানটিতেই ভীড় করিয়া আছে, কেহ কেহ বা খেলনাগুলি শুধু স্পর্শ করিবার লোভে কাছে আসিয়া এটা ওটা পছন্দ করিবার অভিনয় করিতেছে।

দেবু ঐ সমস্ত ছেলেদের দল হইতে একটু দূরে দাঁড়াইয়া ছিল। সাধারণ ছেলেদের মত শুধু শুধু জিনিষগুলি ঘাঁটা-ঘাঁটি করিবার আগ্রহ তার ছিল না। কারণ সে ছিল ভারী লাজুক ও অভিমানী। মোটর-সাইকেল চাপিয়া একটি মোমের পুতুল কি ভাবে ঘুরপাক খাইতেছিল তাহা জানিবার জন্য তাহার ভারী আগ্রহ হইতেছিল। কিন্তু তাহার কাছে ছিল একটি মাত্র এক-আনি। তাহা দ্বারা ত পুতুলটি কেনা যায় না অথচ মিথ্যা কিনিবার ছল করিয়া জিনিষটিকে নাড়াচাড়া করিতে তাহার মন সায় দিতেছিল না—যদি দোকানদার কিছু মনে করে?

সে বাড়ী ফিরিয়া গেল। এ বাড়ী তাহাদের নিজের পৈতৃক নয়,—পিসিমার বাড়ী। তার বাবা কতদিন হইল কোথায় সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া গিয়াছেন। এখনও তাঁর কোনও খবর নাই, আর তার মা রোগেই হোক আর দুশ্চিন্তাতেই হউক, উপস্থিত সব চিন্তার হাত এড়াইয়া দেব-লোকে চলিয়া গিয়াছেন।

এখন পিসিমাই দেবুর নিকটতম আত্মীয়া। "দেখেছ মা ঠাকুর বাড়ীতে কি সুন্দর সুন্দর খেলনা এসেছে?"—এই কথাগুলি বলিয়া দেবু তার পিসিমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বসিয়া পড়িল।—পিসিমাকে দেবু এখন মা বলিয়াই ডাকে।

মনের মধ্যে ইচ্ছাটা প্রবল ভাবে থাকিলেও সোজাসুজি ভাবে পুতুল কিনিবার জন্য বাকি পয়সাকটা দেবু চাহিয়া লইতে পারিল না। কারণ এ বাড়ীতে আদর যত্নের অভাব না থাকিলেও দেবুর সব সময়ই মনে হইত জোর করিয়া আব্দার জুলুম করিবার অধিকার তার কিছুই নাই।

পিসিমা তখন অন্যমনস্কভাবে কি একটা সেলাইয়ের কাজ করিতেছিলেন। পুতুলটি কিনিবার জন্য দেবুর মুখে চোখে যে স্পষ্ট একটা আকাঙ্ক্ষা ফুটিয়া উঠিয়াছিল তা তিনি লক্ষ্য করেন নাই। তাই তিনি বলিলেন, "হাঁ বাবা দেখেছি—কিন্তু ও-সব বাজে ঠুনকো জিনিষ; ও সমস্ত কিনে বাজে পয়সা নষ্ট করতে নেই।—বুঝলে?"

দেবু লজ্জায় সঙ্কোচে একেবারে এতটুকু হইয়া গেল, তার চোখ দুইটি জলে ভর্ত্তি হইয়া আসিল। পিসিমার অলক্ষ্যে সে চোখ দুইটি মুছিয়া লইয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল—"আমিও তাই বলছিলাম—ও বাড়ীর সুধীন একটা কিনলে কিনা।"

দেবুর চোখ দুইটি আবার জলে ভর্ত্তি হইয়া আসিল। এ অবস্থায় মুখোমুখি হইয়া অপরের সহিত কথাবার্ত্তা বলা বিপজ্জনক—ধরা পড়িয়া গেলেই মুস্কিল। দেবু রণে ভঙ্গ দিয়া নিজের পড়িবার ছোট্ট ঘরটিতে চলিয়া আসিল।

পিসিমা পার্ব্বতী দেবী তাঁর কাজে মন দিলেন।

দেবু ভাবিতে লাগিল—"ছি ছি কেন আমি এই দুর্ব্বলতা-টুকু প্রকাশ করে ফেললাম, মা হয়ত আমাকে খুব লোভী বলে মনে করছেন।" বাস্তবিক আজ পর্য্যন্ত কোনও বিষয়ে সে কিছুমাত্র লোভের পরিচয় দেয় নাই। একদিন সে তখন তার পিসিমার সঙ্গে কালীতলার মেলা দেখিয়া ফিরিয়া আসিতেছিল তখন এক পয়সার ডালমুট্ কিনিবার জন্য তার কতই না আগ্রহ হইয়াছিল; কিন্তু সে দিনও সে লোভ দমন করিতে পারিয়াছিল। কাজেই আজিকার এই দুর্ব্বলতাটুকুর জন্য তার ভারী অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। আবার সে ভাবিতে লাগিল—"অন্য ছেলেদের বাপ-মা ত কত জিনিষ তাদের ছেলেদের কিনে এনে দেন; এমন কি তারা না চাইতেই—তবুও ত তারা কত জিনিষের জন্য আব্দার করে—তবে?" দেবুর কি আর এমন দোষ হয়েছে—আর তা ছাড়া দেবু বাস্তবিক ত কিছু মুখ ফুটিয়া চায় নাই—শুধু "বিক্রী করতে এসেছে" এই পরিচয়টুকু দিলে কি আর দোষ হয়েছে?

দেবু অনেকক্ষণ ধরিয়া তার ছোট ঘরটিতে বসিয়া রহিল। বইগুলি নূতন করিয়া গুছাইল, স্কুলের রুটিন্ আর একবার ভাল করিয়া টুকিয়া গঁদের আঠা দিয়া একটা পেষ্টবোর্ডএ আঁটিল এবং তারপর সেটাকে তার টেবিলটির সামনে টাঙাইয়া দিল।

বর্ষার মেঘলা দিন। বিকাল হইতে না হইতেই ঘরের ভিতরটায় অন্ধকার জমিয়া উঠিয়াছিল। এই সময় লোকে প্রিয়জনকে কাছে রাখিতে চায়, এই সময়েই যত "ছেলেবেলার গান" মনে পড়িয়া যায়। এই সময়েই সুখী ছেলেরা ভাবিতে থাকে তেপান্তরের মাঠ পার হইয়া রাজপুত্র কি করিয়া পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চাপিয়া রাজকন্যার সন্ধানে গিয়াছিলেন, আর এই সময়েই দেবু ভাবিতেছিল কোন স্বর্গে কোন মেঘের আড়ালে তার মা লুকিয়ে আছেন, তার বাবা কেন তার কিছু খোঁজ খবর করেন না, অন্য ছেলেদের মত কেন সে ছুটোছুটি লাফালাফি করিয়া আমোদ করিয়া বেড়াইতে পারে না,—এই সব। একবার তার মনে হইল সে ছুটিয়া চলিয়া যায় মাঠের দিকে; সেখানে নির্জ্জনে বসিয়া দেখে যদি তার মাকে দেখিতে পায়। পুতুল কিনিবার আগ্রহ তার এখন কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু মনটা বিশ্রী রকম ভার ভার বোধ হইতেছিল।

সুধীন আসিয়া দেবুকে ডাক দিল—উদ্দেশ্য দুইজনে মিলিয়া বল খেলা দেখিতে যায়। সুধীন দেবুকে ভালবাসে এবং একটু শ্রদ্ধাও করে। দেবু কিন্তু সুধীনের সঙ্গে বেশী মিশিতে চায় না, কারণ সুধীন বড়লোকের ছেলে, মুখে-চোখে, পোষাকে-পরিচ্ছদে তার আশ-পাশে আভিজাত্যের একটা স্নিগ্ধ

শ্রী সব সময়েই ফুটিয়া থাকে। তাহার সঙ্গে বেড়াইতে দেবুর ভারী একটা লজ্জা করে।

আজ পর পর দুই দিন ধরিয়া দেবু সুধীনের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। কাজেই আজ তাহাকে বাহির হইতেই হইবে।

মাঠে আজ একটা বড় ম্যাচ্ খেলা "ফাইনাল্" ছিল। মাঠে যাইতে ইহাদের একটু দেরী হইয়া গিয়াছিল। অনেক দর্শক ইতিমধ্যেই আসিয়া চেয়ার বেঞ্চ প্রভৃতি দখল করিয়া বসিয়াছিল। সুধীন দেবুকে লইয়া সমুখের দিকের একটা বেঞ্চের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই বেঞ্চটায় প্রথমেই বসিয়াছিল একটি আধাবয়সী লোক, চাঁদির ফ্রেমে আঁটা পুরু কাচওয়ালা চশমাপরা মুখ। পরণে আধময়লা হাফ্ শার্ট ও ধুতি, চেহারা দেখিলে মনে হয় কোনও মুদীখানার কর্ম্মচারী হইবে।

লোকটি সুধীনের আভিজাত্য দীপ্ত সুন্দর চেহারাটি দেখিয়া একটু সরিয়া যাইয়া তাহার জন্য জায়গা ছাড়িয়া দিল, কিন্তু দেবুর জন্য সে একটুও জায়গা ছাড়িয়া দিতে রাজী হইতেছিল না। সুধীন প্রায় একটু জোর করিয়াই খানিকটা জায়গা করিয়া লইয়া দেবুকে বসিতে দিল এবং নিজে কোনও মতে জড়-সড় হইয়া পাশটিতে একটু স্থান করিয়া লইল। লোকটি তার চশমার উপর দিয়া আড়ভাবে একবার দেবুর দিকে চাহিয়া দেখিল এবং তারপর সুধীনকে পরিচিতের সুরে জিজ্ঞাসা করিল "এ ছেলেটি কে?" সুধীন ভারি আগ্রহের সহিত বলিল "ও হচ্ছে দেবু, রমেনবাবুদের বাড়ীতে থাকে, আমাদের ক্লাসের ফার্স্ট বয়।" লোকটি সুধীনের বর্ণনায় একটুও আগ্রহ প্রকাশ করিল না, ছোট্ট একটু "ও" এই কথাটুকু বলিয়া আর একটু সরিয়া যাইয়া সুধীনকে ভালভাবে বসিবার সুবিধা করিয়া দিল। সুধীন ভালভাবে বসিতে পাইয়া আবার উৎসাহের সহিত বলিতে লাগিল "ও ভারী চমৎকার ছেলে; এবারের একজামিনে সংস্কৃতে একশোর মধ্যে ছিয়া-নব্বই আর অঙ্কতে পুরো এক শ'ই পেয়েছে।" লোকটি কিন্তু এই বর্ণনাতেও বিশেষ কিছু বিচলিত হইল না। গম্ভীর অন্যমনস্কতার সহিত একটু ঘাড় নাড়িল এবং তারপর পকেট হইতে একটি আধ-পোড়া বিড়ি বাহির করিয়া অপূর্ব্ব মনোযোগের সহিত তাহাকে ধরাইয়া লইল এবং তাহার পর নিবিষ্টভাবে মাঠের দিকে চাহিয়া রহিল। অবশ্য মাঠে এখনও খেলা আরম্ভ হয় নাই।

এই প্রকারের অভ্যর্থনা পাইয়া দেবু ভারী মুসড়াইয়া গেল, খেলা দেখিবার আগ্রহ তাহার ছিল না। তাহার উপর ঐ গম্ভীর প্রকৃতির লোকটির পাশে বসিয়া তাহার মনে হইতেছিল অনেকখানি পাপের প্রায়শ্চিত্ত আজ এই অসাধু সঙ্গের তিক্ততার মধ্য দিয়াই ভোগ হইয়া গেল। খেলার শেষ বরাবর ঐ লোকটির গায়ের জামার ঘামের দুর্গন্ধে ও তাহার কড়া বিড়ির ধুঁয়ায় দেবুর মাথাটা যেন ধরিয়া উঠিয়াছিল।

খেলা শেষ হইবার পর সুধীন দেবুকে তার নিজেদের বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য টানাটানি আরম্ভ করিল। কিন্তু দেবু সেখানে যাইতে চায় না। সুধীনের মা দেবুকে যে রকম আদর যত্ন করেন তাহাতে দেবুর মনে একটা হাহাকার জাগিয়া উঠে। তাহার যদি নিজের মা থাকিত তাহা হইলে তিনিও ত দেবুকে কত যত্ন আদর করিতেন! দেবুর চোখ ছল ছল করিয়া উঠে—সে সুধীনের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে। এই প্রত্যাখ্যানের মধ্যে এমন একটা মোলায়েম দৃঢ়তা থাকে যে সুধীন আর কিছু জেদ করিতে পারে না।

একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া সুধীন চলিয়া গেল। এই খেলা দেখার হাঙ্গামার মধ্যে দেবুকে টানিয়া আনিয়া সে নিজেকে একটু অপরাধী বলিয়া মনে করিল।

দেবুরও মনটা খারাপ হইয়া গিয়াছে সুধীনকে প্রত্যাখ্যান করিবার জন্য। বাস্তবিক তাহার দোষ কি? তাহার রাগ হইল নিজের উপর,—বল খেলার মাঠের সেই অশিক্ষিত অর্দ্ধ-সভ্য লোকটার উপর, তাহার অদৃষ্টের উপর। সে ভাবিতে লাগিল ঐ অর্দ্ধ-সভ্য লোকটা তাহার প্রতি ঐভাবে অবজ্ঞা দেখাইল কেন? সুধীনকেই বা খাতির করিলে কেন? কি গুণ সুধীনের আছে যাহা দেবুর নাই? সুধীনকে দেখিতে দেবুর চেয়ে ভাল; ঐশ্বর্য্যের স্নিগ্ধতা তাহার মুখে-চোখে মাখান আছে। দুনিয়ায় শ্রদ্ধা সম্মান পাইবার ইহাই কি সকলের চেয়ে বড় গুণ? বিদ্যা, বুদ্ধি, অধ্যবসায়—ইহাদের কিছুই দাম নাই? দরিদ্রের কি কোনও গুণই গ্রাহ্য নয়? এই দুনিয়াটা কাহাদের জন্য? শুধুই কি যাহারা বড় বাড়ীর ছেলে হইয়া জন্মিয়াছে, তাহাদের জন্য? জন্মাইবার সঙ্গে সঙ্গেই আঁতুড় ঘর হইতে তাহারা যে আদর যত্ন সেবা পাইতে আরম্ভ করে বরাবরই তারা তাহা পাইতে থাকে। তারা যেন আদর যত্নের অদৃশ্য রাজটীকা লইয়াই পৃথিবীতে আসিয়াছে, ইহাতে তাহাদের জন্মগত অধিকার। আর একদল লোক আছে তারাও দুনিয়াটাকে ভোগ করিবার জন্যই জন্মায়। তারা হইতেছে অদ্ভুত প্রতিভাশালী বে-পরোয়া প্রকৃতির লোক। বিবেকের কাঁটা তাদের পথে নেই। মানসিক জগতে এক একটা তৈমুরলঙ্গ চেঙ্গিস খাঁর মত সব বাধা-বিঘ্নকে সরাইয়া দিয়া বিবেকের কাঁটাকে শক্ত পায়ে মর্দ্দিত করিয়া জীবনের সব জটিলতাকে সরল করিয়া দিয়া সোজা অগ্রসর হয়।

কিন্তু যারা লাজুক অভিমানী ভাল মানুষের দল—যাদের অসামান্য বিত্তও নেই, ক্ষুরধার প্রতিভাও নেই—তারা? দুনিয়ার এই সমস্ত লোক, যারা অভিমানী অথচ নিরন্তর ঘা খায়, যারা উপরে উঠিতে চেষ্টা করে অথচ অদৃষ্টের মোচড় খাইয়া নিয়তই নামিয়া আসে—এই সমস্ত ব্যক্তিদিগের স্থান কোথায়? এই সমস্ত ব্যর্থ জীবনের সৃষ্টি করিয়া ভগবানের কি উদ্দেশ্য সফল হয়? যদি কেহ বলেন পূর্ব্বজন্মের ফল ভোগের জন্যই ইহাদের সৃষ্টি, তাহা হইলে সেটা বুঝিতে পারিবার মত শক্তি তিনি আমাদের দেন নাই কেন? তাহা হইলে ত আমরা আমাদের নিজেদের কষ্টের একটা যুক্তি পাইতাম, আমাদের যন্ত্রণা খানিকটা হাল্কা হইয়া যাইত।

তখন একটু একটু বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল। দেবুর সেদিকে খেয়াল ছিল না, বোধ হয় তাহার চিন্তাতপ্ত মস্তিষ্কে তাহা ভালই লাগিতেছিল। সে ভিজিতে ভিজিতে একটি রাস্তা ধরিয়া চলিল যাহা দূরে গ্রামের ধান ক্ষেতের পাশ দিয়া

চলিয়া গিয়াছে। পথে সে দেখিতে পাইল একটি বছর দশেকের সুশ্রী মেয়ে একটি মোটাসোটা বাবু গোছের লোকের পাশে পাশে চলিতেছে। মনে হইল মেয়েটি কি যেন ভিক্ষা করিতেছে। অত ছোট অথচ ভদ্রবাড়ীর মেয়েকে ঐ ভাবে ভিক্ষা করিতে দেখিয়া তাহার কৌতূহল হইল, সে একটু কাছে সরিয়া আসিল।

মেয়েটি ম্লানোনটিতে বলিল, তাহার বাবার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে, গত তিন বৎসর তাঁহার কোনও সন্ধান নাই—তাহার মা একটু-আধটু সেলায়ের কাজ করিয়া সংসার চালাইতেন; উপস্থিত তাঁরও অসুখ, তাঁকে পথ্য দিবার, ঔষধ কিনিবার কোনও কিছু সম্বলই তাহাদের নাই।

মেয়েটির কাহিনী শুনিয়া দেবুর চোখ ভিজিয়া আসিল। সে ভাবিল ভদ্রলোকটি হয়ত মেয়েটিকে একটি টাকা কিংবা অন্তত একটি আধুলিও দিবেন। কিন্তু তিনি সেরূপ কিছুই করিলেন না। মেয়েটি যখন আর একবার তাঁহার কাছে চাহিল তখন তিনি তাকে একটি ধমক দিয়া হন হন করিয়া চলিয়া গেলেন নিজের পথে।

মেয়েটি ধমক খাইয়া অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। বিশেষত দেবুর মত একটি প্রায় সমবয়সী ছেলের সম্মুখে তাহার এই অপমানটা হইল ভাবিয়া তাহার আরও লজ্জা হইল। মুখটি লজ্জা এবং অভিমানে একেবারে লাল হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি সে মুখ ফিরাইয়া লইয়া চলিয়া যাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু দেবু সোজাসুজি তার সমুখের দিকে আসিয়া পড়িয়া তাহার পৈতায় পাওয়া নূতন আংটিটি এবং তাহার যথাসর্ব্বস্ব পুঁজি সেই আনিটি (যেটা দিয়ে সে পুতুল কিনতে চেয়ে ছিল) সেটাও তাকে দিতে চাহিল। মেয়েটি কিন্তু তাহা লইল না। হয়ত বা সে ভাবিয়াছিল কোনও দুষ্টু ছেলে তার সঙ্গে ফাজলামি করিবার চেষ্টা করিতেছে। সে অপমানে একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল এবং অঞ্চল দিয়া মুখটি ঢাকিয়া দূরে সরিয়া গেল। দেবু অত্যন্ত হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। বুঝিতে পারিল না কি অন্যায় সে করিয়াছে। তাহার দান প্রত্যাখ্যাত হইবার কারণ কি? মেয়েটি কি বুঝিতে পারিয়াছে যে দেবু তাহারই মত একজন নিঃস্ব নিরাশ্রয় জীব? একজনের কাছে যাইয়া সে ভিক্ষা করিতে পারে, তাহারি আবার আত্মসম্মান জ্ঞান এমনই হঠাৎ গজাইয়া উঠে যার জন্য অপর একজন লোক সাধিয়া কিছু দিতে চাহিলেও সে লইতে চাহে না। কি বাঁকা চোরা মানুষের মনগুলি!

দেবু অন্যমনস্ক ভাবে চলিতে লাগিল। বৃষ্টি এখন থামিয়া গিয়াছে। দূর হইতে কদম ফুলের একটি মিষ্টি গন্ধ তাহার দিকে ভাসিয়া আসিতেছিল। সূর্য্য তখন ধানের ক্ষেতের ওপরে লাল ফানুসের মত দুলিতেছিল, এখনই বুঝি নামিয়া পড়িবে আকাশ হইতে। পথের দুধারেই বদ্ধ জলার জল। তাহারই নিকট হইতে দেবু দেখিল অসংখ্য ভেক-শিশু রাস্তার উপর লাফাইয়া লাফাইয়া চলিতেছে। ডুবন্ত সূর্য্যের অস্পষ্ট আলোকে দেবু দেখিতে পাইল সমস্ত রাস্তাটা একেবারে ছাইয়া গিয়াছে, এই ভেক-শিশুদের ভিড়ে—পায়ের চাপে কত মরিয়া গিয়াছে—তাহাদের গলিত মৃতদেহে রাস্তাটি চটচটে হইয়া উঠিয়াছে। তবু তাহারা চলিতেছে পালে পালে, দলে দলে, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সংখ্যায়। দেবু আর অগ্রসর হইতে পারিল না। সে ফিরল—সে ভাবিল সর্ব্বমঙ্গলময় ভগবানের এ কি মঙ্গল বিধান? দায়িত্বজ্ঞানশূন্য স্রষ্টার মত শুধু সৃষ্টির আনন্দে তিনি লাখে লাখে জীব সৃষ্টি করিয়াই চলিয়াছেন। ইহাদের হিসাব নিকাশ রাখে কাহারা? জীবন লইয়া এই ছিনিমিনি খেলিবার তাঁহার কি অধিকার? স্বার্থপর ভগবান নিজেকে সৃষ্টির ধারাটিকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বিপুল সমারোহে সৃষ্টিই করিয়া চলিয়াছেন, কিন্তু তাহার সৃষ্ট প্রাণীদের প্রত্যেকেরই বাঁচিয়া রহিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা কোথায়? দুনিয়ার চারিদিকেই তাহার মনে পড়িল বিপুল ব্যর্থ সৃষ্টির বেদনা। তাহার মনে পড়িল তাহাদের বাড়ীর পাশের সেই বড় নিম গাছটির কথা। তার তলায় প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ চারা হয় গাছ হইতে বীজ পড়িয়া। কিন্তু এই অসংখ্য উদ্ভিদ-শিশুগুলির মধ্যে কয়টিই বা পূর্ণ বৃক্ষত্ব পাইবার সুযোগ পায়? প্রতি পলে পলে পৃথিবীতে যে লক্ষ লক্ষ নবাগত প্রাণী নূতন প্রাণের স্পন্দন লইয়া আসিতেছে, বাঁচিবার জন্য তাহাদের কি কাতরতা!—কি বিপুল আগ্রহ! কিন্তু তাহাদের মধ্যে কয়জনই বা জীবনের এই ছোট্ট আসর-টুকুতে স্থান পায়?

দেবু শুনিয়াছিল অষ্ট্রিচ পাখীদের কথা—তারা নাকি ডিম পাড়িবার পর তা দেওয়া কিংবা বাচ্চা হইলে তাহাদের খাওয়ান, মানুষ করা—এসব হাঙ্গামার মধ্যে থাকে না। ডিমগুলিকে তাহারা গরম বালির মধ্যে চাপা দিয়া রাখে। এই ভাবে সূর্য্যের তাপে ডিমগুলি ফুটে এবং বাচ্চাগুলি ভূমিষ্ঠ হইয়াই যা কিছু সমুখে দেখিতে পায় তাহাই খাইতে আরম্ভ করে। জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই এরা একেবারে সাবালক হইয়া উঠে। যখন বাচ্চাগুলি ডিম হইতে ফুটিয়া ভূমিষ্ঠ হয় তখন তাহার মাতাপিতা হয়ত অনেক দূর দেশে নূতন কিছু আনন্দের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

দেবু ভাবল, দুনিয়ার অনেক পিতা-মাতাই ত' এই অষ্ট্রিচ পাখীর সম-জাতীয়! তাহার নিজের পিতাই বা কি? সৃষ্টি-কর্ত্তা স্বয়ং ভগবানই বা কি? দৈবক্রমে পিসিমার আশ্রয়ে আসিয়া কোনও রকমে দুটি অন্ন খুঁটিয়া খাইয়া সে আজ পর্য্যন্ত মৃত্যুকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছে। এ জীবনের সার্থকতা কি? কে দরদ দিয়া তাহার কথা ভাবে? কোথায় তাহার পিতা কোন ধর্ম্মের পশরা বাঁধিবার জন্য তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন? তাহার প্রতি কি তাঁহার পিতা হিসাবে একটুও দায়িত্ব নাই? দেবু আর ভাবিতে পারিল না। একটা কান্না তার গলার মধ্যে জমাট হইয়া উঠিতেছিল। সে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া চুপি চুপি তার বিছানায় শুইয়া পড়িল।

খাইবার সময় অতীত হইয়া গিয়াছে। তবু দেবু খাইতে আসে না। ব্যাপারটা কি দেখিবার জন্য পার্ব্বতী দেবী তাহার ঘরে আসিয়া দেখিলেন, দেবুর চুলগুলি জলে ভিজিয়া শপ্

শপ্ করিতেছে। দু'দিন ধরিয়া তাহার একটু একটু জ্বর হইতেছিল, আজ তাহার উপর অনেকক্ষণ ধরিয়া বৃষ্টির জলে ভিজিয়া বেশ জোর জ্বর হইয়াছে। দেবু জ্বরের ঘোরে একেবারে অচৈতন্যপ্রায় হইয়া পড়িয়া আছে।

তিনি তাড়াতাড়ি নিজের আঁচল দিয়া তাহার মাথাটা মুছাইয়া দিলেন এবং পাখা লইয়া তাহার শিয়রে বসিয়া তাহার শুশ্রূষা আরম্ভ করিয়া দিলেন। তিনি ডাকিলেন "দেবু"—

দেবু বলিল—"মা তুমি স্বর্গ থেকে এসেছ? এত দিন পরে? আমাকে নিয়ে যাবে সেখানে? সেখানেও কি বাপ ধর্ম্ম করবার জন্য সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যায়? ছেলেদের দেখে না?—তা হ'লে কিন্তু আমি স্বর্গে যাব না—আমার পিসিমার কাছে থাকা তার চেয়ে ঢের ভাল।"

পিসিমা তার উষ্ণ কপালে একটি স্নেহের চুম্বন অঙ্কিত করিয়া দিয়া বলিলেন,—"হাঁ বাবা তোমাকে কোথাও যেতে হবে না—তুমি আমার কাছেই থাকবে।"

তোমারে ডাকিনু

শ্রীসুষমা দে

তোমারে ডাকিয়াছিনু একদিন পরশ অধীর
আমার পরাণে;
অকুণ্ঠ যৌবন মাঝে বিহসিত লুব্ধ ধরণীর
বর্ণে গন্ধে গানে।
নবারুণ আপনার লালিমায় ছেয়ে দিল ভীরু
প্রভাত আকাশ,
পুষ্পে পুষ্পে ঝরাশাখে বসন্তের অশোকমঞ্জরী
লভিল বিকাশ।
সেদিন জাগিয়াছিল পল্লবিত কাননের বুকে
কিশলয়োৎসব,
অস্ফুট মর্ম্মের বাণী দিল দোলা পরম কৌতুকে,
দিল কলরব।
দিল মোর চিত্তে আনি বৈশাখের খররৌদ্র শিখা
মদির পিয়াসে,
একটি দিনের তালে জ্বলি' উঠে কামনার টিকা
নিঃশঙ্ক প্রত্যাশে।
সেদিন এলে না তুমি—দূর হতে গেলে বহুদূরে
উপেক্ষা হানিয়া;
গোধূলি হইল ম্লান ডুবে যাওয়া বিদায়ের সুরে
দিগন্ত প্লাবিয়া।

তারপর বহি' চলে কত যুগ—কাল পারাবারে
নিঃশব্দ প্রাকার;
যৌবনের বেলা তটে নিঃশেষে হারাল আপনারে
ঢেউ অগণন।
জীবনে নামিল সন্ধ্যা, থেমে যায় উৎসবের বাঁশী
বিস্মৃতির বনে;
সহসা জাগিল সাড়া—শব্দহীন তামস উদ্ভাসি'
পশিল শ্রবণে
পদধ্বনি; জোছনায় এলে নাক এলে আমা রাতে
নক্ষত্র আলোয়;
তবু শিহরিত হিয়া, সচকিতে বরি' নিল মাথে
তব অভ্যুদয়।
যত ব্যথা, চিরম্লান অস্তিত্বের যত হাহাকার
বেঁধেছিল বাসা,
নিঃশেষে মুছিয়া গেল অকস্মাৎ—সাথে লয়ে তার
আদরের পিপাসা।
আজ শুধু মর্ম্মে জাগে স্বপ্নবাণী,—সর্ব্বদৈন্যপরে
তুমি রহিয়াছ,
অনন্তের এক বিন্দু উজলিয়া আজ তুমি মোরে
ভাল বাসিয়াছ।

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসুকে এ্যাম্বুল্যান্সযোগে বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির অধিবেশনে লইয়া যাওয়া হইতেছে।
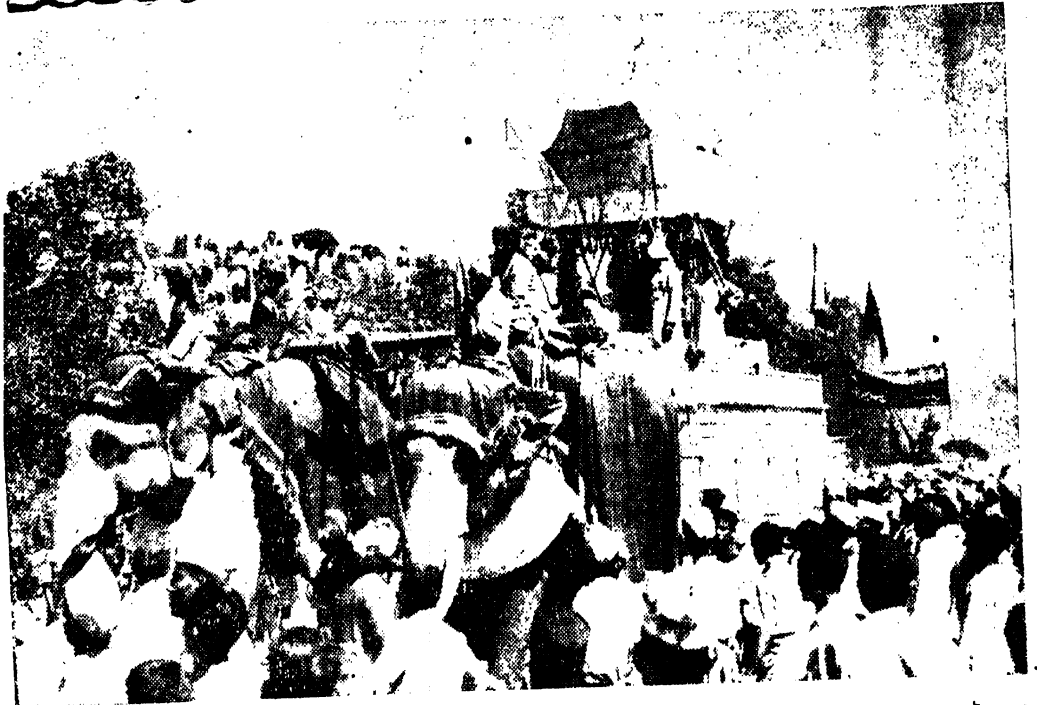
রাষ্ট্রপতির শোভাযাত্রার সাধারণ দৃশ্য। সুসজ্জিত হস্তীবাহিত রথে রাষ্ট্রপতির প্রতিকৃতি লইয়া শোভাযাত্রা অগ্রসর হইতেছে।

বিষ্ণুদত্তনগরে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকগণের কুচকাওয়াজ

অবিশ্বাসী

(উপন্যাস—পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

আলোকনাথ হাসিতে হাসিতে উপরে উঠিয়া আসিয়া অনীতাকে বলিল, "অনি, সব ঠিক ক'রে ফেললাম।"

অনীতা জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের কি ঠিক ক'রলে, দাদা?"

আলোকনাথ বলিল, "তোকে নিয়ে বড় ভাবনায় পড়েছিলাম, বোন। আজ মাণিক এসে সে ভাবনা ঘুচিয়ে দিয়ে গেছে।"

মাণিকের নাম শুনিয়া অনীতা মাথা নীচু করিল।

পরক্ষণেই সমস্ত কুণ্ঠা ত্যাগ করিয়া মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, "কিসের ভাবনা আমায় নিয়ে, দাদা?"

আলোকনাথ বলিল, "তোর বিয়ের কথা—"

অনীতা ধীরস্বরে বলিল, "এরই মধ্যে তোমার ভার হ'য়ে পড়েছি, দাদা? তাই এত শীঘ্র আমায় বিদায় করতে চাও?"

আলোকনাথ অনীতার দৃঢ়স্বরে অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "না, না, সেজন্য নয়। তোর সম্বন্ধে যা হয় একটা—"

অনীতার স্বর আরও সুস্পষ্ট হইল, "সে ভাবনা এখন রেখে, কবে আমায় বোর্ডিংয়ে ভর্ত্তি করিয়ে দিচ্ছ বল দেখি?"

আলোকনাথ বলিল, "কিন্তু মাণিকের সময় কম। এ শুভ কাজটা আগে চুকিয়ে ফেলে—"

অনীতা তাহার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া অকস্মাৎ অশ্রুপ্রবাহ মুক্ত করিয়া দিয়া কহিল, "এরই মধ্যে তোমার ভার বোঝা হ'য়ে উঠলাম, দাদা। এ যে আমি স্বপ্নেও ভাবি নি! দোহাই তোমার ও-কথা ব'ল না, ও-অনুরোধ আমি রাখতে পারব না।"

আলোকনাথ তাহার মাথায় একখানি হাত রাখিয়া স্নিগ্ধ-কণ্ঠে কহিল, "ছি বোন! কাঁদে না। তুই ত জানিস, আমার আত্মীয় যথেষ্ট আছেন, তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক কিসের তা আমি ভাল ক'রেই জানি। কিন্তু তোর সঙ্গে ত সে সম্পর্ক নয়। বিয়ে না ক'রলে চলে?"

অনীতা মুখ না তুলিয়াই উত্তর দিল, "তুমিও ওই কথা ব'লছ? কেন চলে না, খুব চলে। পুরুষের চলে আর মেয়েদের চলে না?"

আলোকনাথ বলিল, "মাণিকের মহৎ হৃদয় আমি জানি ব'লেই—"

অনীতা সবেগে মাথা তুলিয়া কহিল, "মহৎ হৃদয় হ'লেই যার তার কাছে গিয়ে আমায় দয়া ভিক্ষে করতে হবে? আমি দোষী ব'লেই এ বিধান আমায় মাথা পেতে নিতেই হবে?" কথাশেষে সে পুনরায় মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

আলোক ব্যস্ত হইয়া কহিল, "আহা! বুঝতে পারছিস না, অনি? আঃ আমিও যে ছাই বোঝাতে পারছি না! চোখটা মুছে উঠে বোস দেখি। তোদের চোখে জল দেখলে কেমন যেন সব খেই হারিয়ে ফেলি।"

অনীতা বলিল, "শুধু তাই নয়। আমায় যে ঘরে ঠাঁই দেবে, সমাজে সে অচল। পেটে ধরে, মানুষ ক'রে যে বাপ-মা আমায় সমাজের ভয়ে ঘরে ঠাঁই দিতে পারলেন না, দাদা, সে ভার কেন আর একজনের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাও?"

আলোকনাথ বলিল, "সকলের সব ক্ষমতা কি থাকে, বোন? বাপ-মা'র স্নেহ আছে মানি, কিন্তু আশ্রয় দেবার সাহস নেই। মাণিকের আছে। সে মানুষ, সমস্ত জেনে শুনেই এতে সম্মতি দিয়েছে।"

অনীতা তাহার পায়ে মাথা রাখিয়া বলিল, "তিনি উদার, তাই দয়া ক'রতে চেয়েছেন। আমি তাঁকে অশান্তি ভোগ করাতে চাই না। দাদা, দোহাই তোমার কোন কথা ক'য়ো না, তাহ'লে আমি তোমার পায়ে মাথাকুটে ম'রব বলছি।"

আলোকনাথ মৃদু নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "যা ভাল বোঝ কর।"

অনীতা উঠিয়া বলিল, "তোমার মনে ব্যথা দিলাম, এ দুঃখ আমার মন থেকে মুছে যাবে না! কিন্তু দাদা, আমি সত্যিই নিরুপায়। কাল যখন মাণিকবাবু এখানে আসবেন, আমি নিজেই তাঁকে সব জানাব।"

আলোকনাথ বলিল, "লজ্জা ক'রবে না তোর?"

এ কথায় লজ্জিতা হইয়া অনীতা মাথা নীচু করিয়া কহিল, "আমি মনকে শক্ত ক'রেছি, দাদা, লজ্জা আমার নেই। লজ্জা থাকলে তোমার সামনে এই সব কথা নিয়ে যা তা বকতে পারতাম?" বলিয়া অনীতা আর সেখানে দাঁড়াইল না।

সেইদিন অপরাহ্ণে আলোকনাথ মাণিকের বাসায় আসিয়া উপস্থিত। মাণিক বলিল, "তুমি যে হঠাৎ? আমি এখনই তোমার ওখানে যাব মনে ক'রছিলাম।"

আলোকনাথ গম্ভীরভাবে বলিল, "সুতরাং মেঘ না চাইতেই জল। কিন্তু ভাই, জলের ধারা বড় ক্ষীণ, বজ্রের দাহিকাশক্তিও তাতে আছে।"

মাণিক বলিল, "ব্যাপার কি আলোক, তোমার মুখ এত গম্ভীর?"

"বলছি। তুমি তার পূর্ব্বে তোমার যে কথা ব'লবে ব'লেছিলে বল দেখি?"

মাণিক ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "কেন, তার সঙ্গে তোমার গাম্ভীর্য্যের কোন সংস্রব আছে নাকি?"

আলোকনাথ বলিল, "খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। বল। না, না, হেস না, আমি সত্যিই খুব গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা ক'রছি।"

মাণিক বলিল, "কিন্তু আমার কথা হাসির মধ্যে বলা চলে না। তোমার গাম্ভীর্য্য দেখে আমার হাসি পাচ্ছে।"

পরম নির্ব্বিকারভাবে আলোকনাথ বলিল, "বহুৎ খুব। হেসে নাও। তারপর গম্ভীর হ'য়ে বল।"

মাণিক কোন কথা বলিল না। অগত্যা আলোকনাথকেই তাহার গাম্ভীর্য্যের কারণ বলিতে হইল।

সমস্ত শুনিয়া মাণিক বলিল, "এটা স্বাভাবিক।"

—"অর্থাৎ?"

মাণিক বলিল, "অর্থাৎ এইবার আমার কথা শোন। মনে হ'চ্ছে কিছু কিছু সম্বন্ধ এর সঙ্গে আছে।"

মাণিকের কাহিনী আদ্যোপান্ত শুনিয়া আলোকনাথ বলিল, "একটি কথা তুমি বরাবর আমায় গোপন ক'রে চলেছ।"

—"কি কথা ?"

আলোকনাথ বলিল, "রেণুদেবীকে তুমি ভালবাস—প্রাণ ভরেই ভালবাস। তোমার গোপনের প্রয়াসই আমায় তা ধরিয়ে দিয়েছে।"

মাণিক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "সেকথা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু ভাই, আগে এ ভালবাসা আমি বুঝতে পারি নি। বুঝতে পেরেছি সেই দিন, যেদিন রেণুকে হারিয়েছি। তার দুঃখ দেখে আমার বুকে অনুতাপ জেগে উঠল। বুঝলাম, অনুতাপ নয়, এ ভালবাসারই রূপ।"

আলোকনাথ বলিল, "অনীতা সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা ?"

মাণিক বলিল, "রেণু তাকে কতখানি প্রশ্রয় দিয়েছিল জানি না। একদিন সে আমার সামনে বিবাহের প্রস্তাব করে, তাতে লজ্জায় সে পালিয়ে যায়। সেই একটি দিন, তাতে কি ভালবাসা সম্ভব ?"

আলোকনাথ বলিল, "খুবই সম্ভব। আমাদের বাঙালীর মেয়ের পক্ষে ও জিনিষটা খুবই সহজ। একবার মনে-প্রাণে জানলেই হ'ল এ আমার স্বামী! তারপর তার সহস্র দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও সে শ্রদ্ধার আসন টলে না। রেণুদেবী সম্ভবত তাকে এ বিষয়ে অনেক কথাই ব'লে থাকবেন। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, তাই যদি হবে ত তোমার সঙ্গে বিবাহে তার অমত কেন ?"

মাণিক বলিল, "যদি ভালবাসা তাঁর সত্য হয় ত এই অস্বীকৃতি খুবই কারণসংগত।"

আলোকনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "কি সে ?"

মাণিক বলিল, "হিন্দু নারী স্বামীর কি চায় ? মঙ্গল। পতিতার সংস্পর্শে এসেই সমাজে দুঃখকষ্ট ভোগ অনিবার্য। তাই সে এ বিবাহে অসম্মতি দিয়েছে।"

আলোকনাথ বলিল, "হাঁ, তা সে এ সম্বন্ধে স্পষ্টই ব'লেছে। তা সত্ত্বেও তুমি যখন এ বিষয়ে দৃঢ়সংকল্প, তখন তার অসম্মতির কারণ বুঝি না। রেণুদেবীর সম্বন্ধে কোন কথা সে কি শুনেছে ?"

মাণিক ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না। একথা শুধু আমি জানি, আর জানলে তুমি। যাই হোক আজই আটটার ট্রেনে আমি রওনা হচ্ছি। ফিরে এসে যা হয় হবে।"

আলোকনাথ বলিল, "তাই হোক। আমি অনীতাকে বোর্ডিংয়ে রেখে লেখাপড়া শিখতে দি। সে পড়াশুনা ক'রতে চায়। দেখুক একবার জগতের জ্ঞান-বিদ্যার ভাণ্ডার হাতড়ে যদি কিছু সান্ত্বনাও অন্তত লাভ করতে পারে।"

মাণিক আলোকনাথের হাত ধরিয়া কহিল, "যাবার সময় আমার একটা কথা কেবলই মনে হ'চ্ছে, তুমি যদি আমাদের স্বজাতি হ'তে ?"

আলোকনাথের মুখ মধুর হাসিতে ভরিয়া উঠিল। মাণিকের হাত দুখানিতে মৃদু দোলা দিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে সে বলিল, "তাহ'লে ব্যাপারটার একটা আশু প্রতিবিধান হ'ত, না ? তা যখন হয়নি তখন গেল। কবি হ'লেও প্রেমব্যাধিগ্রস্ত নই আমি অথবা জাতিভেদের দ্বিধা সংকোচও আমার কোন কালে নেই। অনীতার সঙ্গে আমি ত মিথ্যা সম্বন্ধ পাতাই নি, সে সম্বন্ধ যে সত্যিকারের। তুমি জান, এ ক'লকাতা শহর, অর্থের আমার অভাব নেই, উদার মতও পোষণ করি, অনীতাকে অন্যভাবে পাবার কল্পনাও আমার পক্ষে কিছুমাত্র দুরূহ নয়। তবু মাণিক, এর চেয়ে ভালভাবে তাকে আমি পেতাম কি না সন্দেহ! সে বোন, আমি ভাই। শুধু তার একার ভাই নই, এই বাঙলার অত্যাচারিতা নির্য্যাতিতা সমাজ-পরিত্যক্তার সত্যিকারের ভাই।"

মাণিক আলোকনাথের প্রশান্ত মুখের পানে চাহিয়া মুগ্ধকণ্ঠে বলিল, "আমার বোধ হয় তুমিই জীবনকে যথার্থ চিনেছ। কি মহান্ তার রূপ, কোথায় তার গতি, কোন্ ভাবে সে বিকাশ লাভ করে!"

হাসিয়া আলোকনাথ বলিল, "সবই আমার কল্পনায়। মনে আছে পল্লীসেবা, মনে আছে আমার নিদারুণ অক্ষমতা। তবু ভাই লজ্জা আমার নেই। আমার কল্পনায় দুঃখকে আমি সামনে টেনে এনে নিরীক্ষণ ক'রে দেখতে চাই, মুখোমুখী তার সঙ্গে কথা কইতে চাই। সুখ, ঐশ্বর্য্য আমায় অনেক কিছুই ভুলিয়ে দিয়েছে, অনেক কিছুই নষ্ট ক'রেছে। ভাগ্যে কল্পনায় দুঃখকে আঁকড়ে পড়েছিলাম, তাই ত জীবনপথের লক্ষ্যে অনীতাকে ভগ্নীরূপে পেলাম, তোমাকে বন্ধু ব'লে ডাকলাম।"

মাণিক বলিল, "অনীতার সম্বন্ধে তা' হ'ল—"

আলোকনাথ বলিল, "আর চিন্তা ক'রব না। সেই ভাল, দুঃখ সে অনেক পেয়েছে, এবার মানুষ হোক। জগতের সঙ্গে জ্ঞান-বিদ্যার আলোর কিছু পরিচয় লাভ করুক। তারপর যার ভাবনা সেই ভাববে।"

মাণিক বলিল, "আর একটা কথা। এ পংগু নির্ম্মম সমাজকে তুমি কি মনে কর ? এ সমাজ নষ্ট হওয়াই কি উচিত নয় ?"

আলোকনাথ বলিল, "আমার মতটা কিছু অদ্ভুত শোনাবে, হয় ত তোমার রুচিকর হবে না। যদিও আমি তরুণ, সাহিত্যে সর্ব্ব বাধা মুক্তির প্রশস্তি উচ্চারণ করে থাকি, তথাপি এই পচা পুরান জিনিষগুলির ওপর আমার মমতার যেন অন্ত নেই। পুরান মাত্রই ভাল এ বিশ্বাস আমার না থাকলেও, পুরান মাত্রই যে পরিত্যজ্য, একথা আমি মানিনা। কালধর্ম্মে পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী, তার বিরুদ্ধে কুতর্ক করা মূর্খতা! তবু এ দুর্ব্বল বাঁধন-কষণগুলোর ওপর চোখ না রাঙিয়ে মমতাময় স্পর্শে যদি এর জটিল গ্রন্থিগুলি আমরা খুলতে চেষ্টা করি ত অনেক অনাবশ্যক অশান্তি থেকে দূরে থাকতে পারি। চাই সংস্কার—ধ্বংস নয়। তাতেই প্রকৃত মঙ্গল নিহিত।"

মাণিক বলিল, "আমার মনে হয়, সে চেষ্টা না করাই ভাল। ভেঙে গড়া যেমন সহজ, না ভেঙে গড়তে গেলে তেমনই ঠকতে হয়। সোনাকে গলিয়ে ইচ্ছামত ছাঁচে ঢালাই ক'রলে—"

আলোকনাথ বলিল, "ও দুটোর উপমা দেওয়া মিছে।

কেন না, উপমা-যুক্তি জীবনের সব সমস্যার সমাধান ক'রতে পারে না।"

মাণিক বলিল, "পারে না সত্যি, তবু মানব জীবনে যুক্তির প্রভুত্বও কম নয়। থাক আজ এ সব তর্ক, আর একদিন হবে।"

আলোকনাথ বলিল, "না মাণিক এ তর্কের শেষ এইখানেই। তোমার পল্লীসেবার তত্ত্ব সেদিন যেমন আমায় হৃদয়ঙ্গম করিয়ে দিয়েছিল, সেই নীরব সাধনা জীবন ভোর,—এখানেও সে কথা খাটে। বিজাতীয় প্রভাবে একে নষ্ট না ক'রে আমরা সারা জীবন ধ'রে অল্প অল্প সংস্কার এর অনায়াসে করতে পারি। যেমন এক সময়ে কালাপানি পার হওয়া ছিল প্রায়শ্চিত্তের ব্যাপার, আজকাল হয়েছে শিক্ষার প্রধান অঙ্গ। তেমনি আর সব সংস্কারও, স্বীকার কর ত ?"

মাণিক ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "করি।"

আনন্দিত হইয়া আলোকনাথ তাহার হাতখানিতে চাপ দিয়া কহিল, "তাই কর ভাই। তোমরা কর্ম্মী, তোমাদেরই কাজ এ। তোমরা ভালবেসে মমতাভরা চোখে তার পানে চাইলে সাধ্য কি সে মন্দ হ'তে পারে! শক্তির কেন্দ্রস্থলকে অবহেলা করা কারও উচিত নয়। তাতে শক্তি বাড়ে না, হ্রাসই হয়।"

সেইদিন রাত্রিতে মাণিক কলিকাতা পরিত্যাগ করিল।

(২১)

আজমীরে নামিতেই একদল পাণ্ডা আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। সকলেই নিজ নিজ গুণাবলী, আহার ও বাসস্থানের সুবিধা শতমুখে কীর্ত্তন করিয়া মাণিকের উপর তীর্থগুরুর দাবী করিতে লাগিল।

মাণিক প্রথমটা খুব অনুনয় বিনয় করিয়া জানাইল, সে তীর্থদর্শনোদ্দেশ্যে এখানে আসে নাই। কিন্তু কে শোনে সে কথা! তাহারা তীর্থমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে করিতে তাহার পিছু পিছু ফিরিতে লাগিল। অবশেষে বিরক্ত হইয়া মাণিক তাহাদের ধমক দিতেই অধিকাংশ পাণ্ডাই তাহাকে দুর্ব্বোধ্য ভাষায় গালি দিতে দিতে চলিয়া গেল। একটি শীর্ণকায় দীর্ঘাকৃতি ব্যক্তি কেবল কিছুতেই তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারিল না।

মাণিককে একাকী পাইয়া সে ব্যক্তি কহিল, "বাবুজী, ওরা সব চোর; ওদের সঙ্গে আপনি ভালই করেছেন। এইবার একখানা টাঙ্গা ভাড়া করুন—পুষ্করে যেতে হবে ত ?"

মাণিক বলিল, "আজমীরে কোন তীর্থ নেই ?"

পাণ্ডা বলিল, "না বাবুজী, এখান থেকে সাত মাইল গিয়ে পুষ্কর তীর্থ। সেখানে স্নান, তর্পণ, সাবিত্রী মায়ের পূজো—"

মাণিক বাধা দিয়া কহিল, "থাক, ও-সব পরে শুনব। গাড়ী একখানা ডাকুন।"

পাণ্ডা গাড়ী আনিলে মাণিক বলিল, "আর কথা, দিন-পাঁচ-সাত আগে কোন অল্প বয়সী মেয়ে মানুষের সঙ্গে এক বুড়ো ভদ্রলোক এখানে এসেছিলেন কি ?"

পাণ্ডা বলিল, "হাঁ বাবু, তিনি ত আমার বাসাতেই আছেন। আমার নাম লছমীস্বামী পাণ্ডা, আমরা সাড়ে সাত ভাই।"

মাণিক বলিল, "সাড়ে সাত ভাই! আধখানা আবার এল কোত্থেকে ?"

পাণ্ডা হাসিমুখে বলিল, "কেন বাবু, শাস্তরে লেখা আছে সাদী না হ'লে মানুষ পূর্ণ হয় না।"

মাণিক বলিল, "বুঝেছি। তোমাদের এক ভাই বিয়ে করেনি। তা লছমীস্বামী, তোমাদের ওখানে সে বুড়ো ভদ্রলোক এখনও আছেন ?"

পাণ্ডা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হাঁ বাবু, আছেন। আজই তিনি চলে যাবেন।"

গাড়ীতে উঠিয়া মাণিক বলিল, "জোরসে হাঁকাও গাড়ী, বেলা বারোটার আগে সেখানে পৌঁছান চাই।"

দুধারে শ্যামল শস্য ক্ষেত্র, মাঝখানে তার পাকা সড়ক পুষ্করের অভিমুখে চলিয়াছে। টাঙ্গা তীরবেগে তাহার উপর দিয়া বহুক্ষণ ছুটিয়া চলিবার পর এক জায়গায় আসিয়া থামিল। মাণিক দেখিল সম্মুখে পথ রোধ করিয়া এক অদ্রি দণ্ডায়মান। পথরেখা উহারই মধ্যে সর্পিলগতিতে গিয়া অদৃশ্য হইয়াছে। কেবল অদৃশ্য পথের অন্তরালে রুণু ঝুনু করিয়া উটের গলার ঘণ্টাগুলি বাজিয়া জানাইয়া দিতেছে, দুরারোহ পর্ব্বতের মধ্যেও মানুষের উদ্যম-চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই!

ক্রমে গাড়ী পর্ব্বত শিখরে উঠিলে পশ্চাতের শ্যামল শস্য-ক্ষেত্র অন্তর্হিত হইয়া গেল। সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল সুবিস্তীর্ণ বালু প্রান্তর, বৃক্ষশূন্য তৃণশূন্য তীক্ষ্ণ ময়ূখমালা প্রদীপ্ত। তীব্র উত্তাপ চারিদিকে মরীচিকার দাবানল জ্বালিয়াছে। মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের রোষকষায়িত নয়নের ভ্রূকুটিতে এখনই বুঝি সমস্ত ভস্ম হইয়া যাইবে! শ্রান্ত পৃথিবী অবসন্নের মত ধুঁকিতেছে।

বালু প্রান্তরের মধ্যেই ক্ষুদ্র পুষ্কর গ্রাম। যেন মরুভূমির মধ্যে এক বৃহৎ ওয়েসিস্। সুবিস্তীর্ণ হ্রদের জলরাশি রৌদ্র মাখিয়া ছোট ছোট তরঙ্গ তুলিয়া চূর্ণ হীরকের মত দীপ্তি পাইতেছে।

মাণিক আসিয়া পাণ্ডার বাসায় উঠিল।

পাণ্ডা বলিল, "আজ বিশ্রাম করুন, কাল আপনাকে পাহাড়ে নিয়ে যাব। সাবিত্রীমায়ীকে দর্শন করাব।"

মাণিক ব্যগ্রস্বরে বলিল, "সে ভদ্রলোকেরা কোথায় ?"

পাণ্ডা বলিল, "ওই যে পাশের ঘরে রান্না-খাওয়া ক'রছেন।"

"আসুন না বাবু, এ তীর্থস্থান, লজ্জা কি ?"

মাণিক দেখিল, বারান্দায় কলাপাতা পাতিয়া একজন বৃদ্ধ ও জন-দুই যুবক আহারে বসিয়াছে। একজন অর্দ্ধবয়সী স্ত্রীলোক তাঁহাদের পরিবেশন করিতেছেন।

মাণিককে দেখিয়া একজন যুবক কহিল, "এইমাত্র আসছেন বুঝি ?"

মাণিক ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "হাঁ, আপনারা ?"

যুবক কহিল, "আমরা আজ তিন দিন হ'ল এখানে আছি। আজই বিকেলে রওনা হব।"

মাণিক জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক ও

অভ্যুত্থান হইতে নয়টি শতক অতিক্রান্ত হইলে ইহার ভিতরই চুনপাথর, মর্ম্মর, কাষ্ঠ, ব্রোঞ্জ, গজদন্ত—সকলপ্রকার পদার্থেই প্রতিকৃতি খোদায়ের প্রচলন পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু ঠিক কোন্ সময়ে চুনপাথর (limestone) পরিত্যাগ করিয়া গজদন্ত বা মর্ম্মরে খোদাই আরম্ভ হয় কিম্বা কোন্ যুগে কাষ্ঠ প্রচলিত হয়, অথবা ব্রোঞ্জ ঢালাইয়ের কৌশল মিশরে আয়ত্ত হয়, তাহার নিশ্চিত বিবরণ পাওয়া যায় না। মূর্ত্তি-খোদাইয়ে যে উত্তরোত্তর শিল্পোৎকর্ষ অভিব্যক্ত হয়, আধুনিক কালেও তাহার সমকক্ষ নৈপুণ্য অতি অল্পই মিলিবে। খোদাইয়ের উপাদানে পরিবর্ত্তন বাহিরের প্রভাবে কি দেশীয় শিল্পিগণের নিজেদেরই উদ্ভাবনী শক্তির ফল তাহাও সঠিক জানিবার উপায় নাই।

ষষ্ঠ রাজবংশের পরবর্ত্তী ফেরাওদিগের প্রতিকৃতির বিবরণ বারান্তরে সন্নিবেশিত হইবে।*

* মিশরের প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডাঃ আর্থার ওয়েগেলের প্রবন্ধ অবলম্বনে।

উদাসীন

শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ খান

আজি ফাগুনের সজল সন্ধ্যা ঘনাইছে বনে বনে
পলাশের বনে পাপ্‌ড়ি ঝরিছে দুরন্ত সমীরণে;
কোকিল ফিরেছে আজিকার মত প্রেম বিতরণ করি
কাজ্‌লা দীঘিতে ঘুমায়ে পড়েছে কমলিনী অপ্সরী।
গোধন ফিরেছে ম্লান গোধূলিতে—ফিরেছে বিহগকুল
ওই দূর পথে চলিছে পথিক—হ'ল তার পথ ভুল?
প্রান্তর সব তন্দ্রা নীরব—থেমে গেছে কবে বীণ
আজি রজনীতে চলেছ একাকী—কে গো তুমি উদাসীন!

কৃষাণ ফিরেছে সারাদিন পরে কৃষাণীর ছায়াতলে
নিবিড় প্রেমের শত ঝঙ্কার কপোত-কপোতী বলে!
তুলসীর মূলে প্রদীপ জ্বালিছে সুন্দরী বধূ ত্বরা
আবাস পেয়েছে সন্ধ্যার ক্ষণে পরদেশী পথহারা!
যতদূর চলে চোখের দৃষ্টি—আজি শ্যাম সন্ধ্যায়
ক্লান্ত প্রকৃতি—নির্জন পথ—এই শুধু দেখা যায়।
ঘুমায়ে গিয়েছে নিখিল বিশ্ব—মহাতন্দ্রাতে লীন
ঘুম নাই চোখে—একেলা পথিক ভ্রমিতেছ উদাসীন!

ক্লান্তিবিহীন যাত্রা তোমার কোথা হবে সমাপন
নিরুদ্দেশের মন্দাকিনীতে যেতে করিয়াছ মন?
ভাসিয়া গিয়াছে জীবন কুসুম কবে কোন্ সন্ধ্যায়
বিরহী পরাণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহারে পাইতে চায়?
মৃত্যু-গরল কণ্ঠ ভরিয়া করিয়াছ তুমি পান
সতীরে খুঁজিতে করিয়াছ কি গো তাই এই অভিযান?
নীলকণ্ঠের সকল মহিমা পেয়েছে তোমাতে লীন
নিখিল জগৎ খুঁজিয়া খুঁজিয়া ফিরিতেছ উদাসীন!

তুমি কি যক্ষ—রামগিরি হ'তে যাত্রা করেছ প্রাতে
পৌঁছিতে হবে অলকাতে তব অনির্দ্দিষ্ট রাতে;
কুটীর দুয়ারে প্রদীপ ধরিয়া দাঁড়ায়ে রয়েছে প্রিয়া
সীমাহীন—এই অসীম যোজন মিলিবে কি সেথা গিয়া?
তুমি কি সন্ত—তপতীর আশে সাধনা করিছ পথে
পথপ্রান্তরে হার মানায়েছ ক্লান্তিবিহীন রথে:
কত যুগ ধরি চলিতেছ একা শুনিয়া বেণুর বীন্
সূর্য্যদেবের উদয়াচলের কত দেরী উদাসীন!

শুক্লা নিশির জোছনায় নেয়ে উঠেছে কাননতল,
ফুটেছে কুন্দ—সুরভি গন্ধ করিতেছে বিহ্বল!
হেনার মুকুল চাহিয়াছে হেসে—ঘুমভাঙা হেমপরী—
বেণুর কুঞ্জে মলয় পবন উঠিতেছে গুঞ্জরি?
ঘুমায়ে গিয়েছে কুসুম-কলিকা, শতদল অপ্সরী,
ঘুমায়ে পড়েছে বিরহিণী নারী বীণাখানি বুকে করি:
জোছনাও বুঝি ক্লান্ত—বিতথ-ক্লান্তিতে কত ক্ষীণ
তোমার নয়নে নাই কি নিদ্রা—উন্মাদ উদাসীন?

ধরণী তোমারে ছাড়িয়া দিয়াছে তুমি ত ধরার নহ,
তাই কি পান্থ বসুধা ছাড়ায়ে ভ্রমিতেছ অহরহ?
তুমি প্রকৃতির—তাইতে বরষা অতন্দ্র কাল জাগি,
নিশিদিন ঢালে স্বচ্ছ-সায়র তোমার সিনান লাগি!
পবন তোমার গাহে সঙ্গীত—কিশলয় কুতূহলে
পাতিয়া রেখেছে শীতল শয়ন বক্ষের ছায়াতলে!
শুন ফুলদল আরতি জানায়—বিহঙ্গ ধরে বীণ
চন্দ্রিমা ঢালে সুধার বন্যা তব তরে উদাসীন!

যুগ যুগ ধরি চলিয়া চলিয়া কবে কোন্ অবশেষে
উত্তরিবে তব ক্লান্ত চরণ কোন্ অলকাতে এসে!
কুটীর দুয়ারে প্রদীপ ধরিয়া দাঁড়ায়ে রহিবে মিতা,
রূপের আলোকে পুলকিত ধরা—সুন্দরী—সুস্মিতা!
অনাদি কালের সুরু যেইদিন মিলিবে সেখানে এসে,
সকল-পাওয়ার-তীর্থভূমিতে—অস্তাচলের দেশে—
সেই দিন লাগি নিখিল বিবাগী—রয়েছে তন্দ্রাহীন
আর কতদূরে, হে মহাতাপস—কতদূর উদাসীন!

জয়যাত্রা

(গল্প)

শ্রীরণেন্দ্রনাথ সান্যাল

উমেদারি করি—বেশ কাজ, পরিশ্রম নাই, অবসাদ আছে। ভাগ্যবিড়ম্বনায় ভারতীর পাদপীঠ থেকে যেদিন অকালে চিরবিদায় নিতে বাধ্য হয়েছিলাম, সেদিন থেকে অসীম ধৈর্য্যের সহিত দিনের পর দিন এই অনির্দ্দিষ্ট পথে চলেছি। চলায় আনন্দ ছিল না কখনও। প্রথম কিছুদিন ছিল উত্তেজনা, এখন তাও নাই। তবুও কেন যে চলি, ঠিক বুঝি না; বোধ করি অন্য কোন পথের সন্ধান মেলেনি, তাই।

উত্তেজনার অবসানে আসে অবসাদের জড়তা; কাজেই মস্তিষ্ক যদি স্বাভাবিক অবস্থায় না থাকে, আশ্চর্য্য হবার কিছুই নাই, জড়তাগ্রস্ত মগজে যদি রাশি রাশি আকাশ-কুসুমের অজস্র আবাদ হয়, বিস্ময়ের কিছুই নাই; সারাক্ষণ মগজের ভিতর যদি ওরা ভিড় ক'রে কলরব করে, যদি চঞ্চল করে, অভিযোগের কিছুমাত্র হেতু নাই। এই অবস্থায় অন্যমনস্ক হয়ে পথ চলাই বোধ করি স্বাভাবিক—চলছিলামও তাই; হঠাৎ একসঙ্গে অনেকগুলি আওয়াজ কানের পর্দ্দায় ভীষণ আঘাত করল। ব্যাপারটি সম্যক উপলব্ধি করার আগেই একটা মারাত্মক রকমের ধাক্কায় ভূমি আশ্রয় করিতে বাধ্য হলাম; খানিকটা লাল রক্ত ফিন্কি দিয়ে ছুটে বেরুল আর আমায় ঘিরে রীতিমত একটা ভিড় জড়ো হল।

এক ভদ্রলোক সহানুভূতি দেখাতে গিয়ে বললেন—"খুব বেঁচে গেছেন এ যাত্রা, আর একটু হ'লেই—"

আর একজন বললেন—"চোখ খুলে পথ চলতে হয়, অমন বেহুঁস হয়ে মাতালের মত চলে কি?"

তৃতীয় ব্যক্তি মন্তব্য করলেন—"ব্রেকটা কসতে আর এক সেকেণ্ড দেরী হ'লে, একদম ছাতু হয়ে যেতেন যে।"

উঠতে চেষ্টা করলাম, পারলাম না—পায়ের হাড় বুঝি ভেঙে গেছে। কয়েকটা যুবক তুলে এনে ফুটপাতের উপর শুইয়ে দিল—তাদের কেউ বোধ করি এ্যামবুলেন্স অফিসে খবর পাঠিয়েছিল, খানিক বাদে এ্যামবুলেন্স এসে আমায় তুলে নিয়ে ছুটল হাসপাতালের দিকে।

সাত বছর ধরে শুয়ে ভেবেছি আর ভেবেছি মাথাটা প্রকৃতিস্থ আছে কিনা, মধ্যে মধ্যে সন্দেহ জাগে। দুঃসহ ব্যথায় দেহখানি কেঁপে কেঁপে উঠছে, কিন্তু দুশ্চিন্তার প্রবাহ উদ্দাম গতিতে ছুটে চলেছে—যেন শুধু ভেবেই দুনিয়ার সব সমস্যার সমাধান করা যায়।

মনে পড়ল পথিকের মন্তব্য—"দশচক্রে ভগবান ভূত বনে গেছেন।" মনে হ'ল এত বড় তত্ত্বকথা পূর্ব্বে কেউ কখনও বলে নি। সত্যিই তিনি ভূত সেজেছেন, নইলে পায়ে হেঁটে যারা পথ চলে, তাদের পিষে মারবার জন্য কেন হয় মোটরের সৃষ্টি, নইলে অর্থগর্ব্বে স্ফীত ধনিক কেন করে সহায়-সম্বলহীন গরীবের উপর বিরামবিহীন অত্যাচার, কেন হয় না তার প্রতিকার, নইলে সাম্যের জগতে কেন এই নির্ম্মম বৈষম্য?

বিধাতার দেখা পেলে বলতাম—"ঠাকুর যত দুঃখ, যত বেদনা, ব্যথা তা কি শুধু গরীবের জন্যই জড়ো করে রেখেছ, তাদের একটুক স্নেহ দেওয়ার, একটু দরদ দেখাবার জন্য এই বড় দুনিয়ায় কাউকেই রাখ নি? যখন পাশের বাড়ীর ডলি-কুকুরটাও দুবেলা পেট পুরে খেতে পায়, তাকেও তার প্রভু-কন্যা আদর করে, গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়, চুমু খায়, তখন যে ঠাকুর তোমার অস্তিত্বে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলি।"

এ্যামবুলেন্স এসে দাঁড়াল হাসপাতালের দোরে। আমায় ধরাধরি করে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল, একটা টেবিলের উপর। জনকয়েক ডাক্তার ছাত্র নার্স মিলে পরীক্ষা করার ছলে আমার যাতনার মাত্রা দিল বাড়িয়ে—সবহারা পথের কুকুরদের হাসপাতাল কিনা? রোগের বীজাণু যদি এরা ছড়ায়, ধনিকের সুখের হবে ব্যাঘাত, তাই ত হয়েছে এদের জন্য দাতব্য চিকিৎসালয়ের সৃষ্টি, কাজেই এখানে আনা হয় ঠিক তাদেরই, দুনিয়ায় যাদের সুখ-দুঃখের দিকে নজর দেওয়ার নাই কেউ—আর ঠিক এই কারণেই চলে এদের বেওয়ারিশ দেহ নিয়ে যথেচ্ছ গবেষণা ডাক্তার ও ছাত্রের—এদের যাতনার উপশম হোক বা না হোক—সেদিকে দৃষ্টি দেওয়ার অবসর মেলে কই?

এখানে আসার পর নিঃসংশয়ে বুঝলাম আঘাতটা নিতান্ত সামান্য নয়। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ভাবলাম কয়েকদিনের পেটের ভাবনা ভাবতে হবে না।

ঘণ্টাখানেক পরীক্ষা করে 'ইন-ডোরে' ভর্ত্তি করে নিল। ধরাধরি করে নিয়ে গিয়ে ঘরের ভিতর একটা লোহার খাটিয়ায় শুইয়ে দিল। ক্ষতস্থানগুলোয় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে কি একটা ওষুধ খাইয়ে চুপ করে শুয়ে থাকতে বলে চলে গেল। ধন্যবাদ, অজস্র ধন্যবাদ—কিন্তু এ উপদেশটুকু না দিলেও চলত—ব্যথায় কুঁকড়ে কেঁদে উঠলে কেউ ত আসবে না ছুটে তার কল্যাণ হস্তের স্নিগ্ধ পরশ বুলিয়ে, অশ্রুসজল মমতাভরা চোখদুটির দৃষ্টি দিয়ে আমার যন্ত্রণা হরণ করে নিতে।

আশে পাশের সবাই হয় ত আমার চেয়েও বেশী দুঃখী, আমারই মত সবহারা, আমারই মত আশাহীন অন্ধকার জীবন বয়ে বেড়াচ্ছে, তফাৎ এই আমার পেটে একটু বিদ্যা আছে, এদের অনেককের হয়ত তাও নাই।

ডান পাশ থেকে একজন প্রশ্ন করল—"চাপা পড়লে কি করে, মাত্রাটা বুঝি খুব বেশী হয়েছিল, না?"

জবাব দিলাম—"হুঁ।"

"ঠিক ধরেছি, কিন্তু বেশী হতে দিলে কেন?" একটু চুপ থেকে আবার বলল—"বুঝি সবই, কিন্তু মাত্রা ত সব সময় ঠিক রাখা যায় না, কি বল?" একটা ঢোক গিলে ফের সুরু করল—"তা যাই বল, মদই হোক আর যাই হোক—নেশা যদি করতেই হয় ত এই ছিলিম।" ব'লে হাতের তেলোয় কি কৌশলে গঞ্জিকা বানাতে হয় দেখাল। "এই ছিলিমের কাছে কোন মিঞাই পাত্তা পান না—কি বল হে?" ব'লে পাশের লোকটির সমর্থনের আশায় তার পানে তাকাল। পাশের লোকটি সম্মতি-সূচক ঘাড় নাড়তেই সে ফের সুরু করল—"এখানে এসে ওপাট একদম বন্ধ, বড় মুস্কিলে পড়েছি, সকাল সন্ধ্যায় নিদেনপক্ষে

দ্বার না টানলে আমার ভাত হজম হ'ত না। কাল বিকেলে এক বেটা কুলি দেখে মনে হ'ল এ বেটা নিশ্চয় বাবার ভক্ত। ঠিক ধরেছিলাম দাদা, ওই কথায় বলে না—সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে। এক যুগ ধরে বাবার সেবা করছি, আমার চোখকে ফাঁকি দেয়া কি অতই সোজা। বেটাকে কিছু দেব বলে রাজিও করেছিলাম, কিন্তু কপাল, দাদা, সবই কপাল—বেটা আর এল না।" একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে থামল।

রোগের যাতনার চেয়ে নেশা করতে না পারার দুঃখটাই তার হয়েছে অসহ্য। সমস্ত দেহটা ব্যথার বিষে জ্বলছে, কথা কইতে ভাল লাগছে না; তবু ভাবলাম গল্প-গুজবে অন্যমনস্ক হলে হয়তো একটু সোয়াস্তি পাব আর এখানেই তো দিন কয়েকের জন্য আস্তানা হল—ওদের সংগে ভাব না করলে সময় কাটানো মুস্কিল হয়ে উঠবে।

প্রশ্ন করলাম—তোমার নামটি কি ভাই?

লোকটির চোখে-মুখে গর্ব্বের আলো দেখা গেল—কোটরগত নিষ্প্রভ চোখদুটি যেন একটু দীপ্তিমান হয়ে উঠল। সে যেন এই প্রশ্নটিরই প্রতীক্ষায় ছিল, বলল—"নটবেহারী ব্রজবাসী। ঠাকুর্দ্দার বাবা ব্রজে থাকতেন, কোম্পানীর সাহেবরা চাকরী দিয়ে বাঙলায় নিয়ে আসে—খুব কাজের লোক ছিলেন কিনা। সেই থেকে বাঙলায় আছি। তা বাঙলাই বল আর মথুরাই বল, আজকাল সব সমান, ব্রজবাসী বলে কেউ ভক্তি-শ্রদ্ধা করে না, আর আমায় দেখে হয় তো বুঝতেই পারে না ব্রজের সংগে কোন কালে আমার কোন সম্পর্ক ছিল।"

নটবেহারী তার জীবনের ইতিহাস বলে—চিরপুরাতন কাহিনী। পাটের কলে দিন-মজুরের কাজ সে করে—সমস্ত দিন যন্ত্র-দানবের পূজার অর্ঘ্য যোগায় বুক্ত জল করে। ভোর ছ'টায় বাজে কলের বাঁশী ঠিক সেকালে কালিন্দীকূলে কালার বাঁশী যেমন বাজত। বাঁশী শুনে ব্রজবালাগণ আলুথালু কেশ-বাসে পাগল হয়ে ছুটে যেত কেমন করে যারা দেখে নি, তারা খানিকটা আভাস পেতে পারে ভোর ছ'টায় কোন কলের আশে পাশে ঘুরে বেড়ালে; মজুরের দল কেমন উঠি তো পড়ি' করে ছুটে যায় বাঁশীর আওয়াজ শুনে। হাজিরায় একটু দেরী হলে, খেতে হয় বকুনি, দিতে হয় ফাইন। দুপুরে ছুটি পায় দুঘণ্টা মজুরের দগ্ধ উদরে কিছু দিতে হয় বলে। বাড়ী ফেরে রাত্রি ন'টায় নেশায় মসগুল হয়ে—এসে বৌকে ঠেঙায়, ছেলে-মেয়েকে বকুনি দেয়, তারপর চাট্টি গিলে ঘুমোয় কি ঝিমোয় অন্তর্যামী জানেন।

কলে হাড়ভাঙা খাটুনি আর গঞ্জিকা—দিন তার বেশ কাটে।

* * * * *

ঢং ঢং করে তিনটে বাজল। সবাই ঘুমোচ্ছে। আমি চেষ্টার ত্রুটি করিনি, কিন্তু এ অভিশপ্ত চোখে নিদ্রাদেবীর বসবার যোগ্য আসন কই? দুর্ব্বল মস্তিষ্কের ভিতর রাশি রাশি দুশ্চিন্তা কিলবিল করছে—ভিতর-বাহিরে অমানিশার ঘোর অন্ধকার—আলোর রেখামাত্র নাই।

ওগো নিদ্রাদেবি! আমার উত্তপ্ত ললাট মুহূর্ত্তের জন্যও কি স্নিগ্ধ করে দিতে পার না? ওগো করুণাময়ি! ওগো শ্রান্তিহরা! কৃপাবারি সিঞ্চনে আমার ব্যর্থ জীবনের অতৃপ্তি ভুলিয়ে মুহূর্ত্তের জন্যেও কি আমায় বাঁচার আনন্দে ডুবিয়ে দিতে পার না?

স্মরণে ভেসে ওঠে অতীতের স্মৃতি, মনে পড়ে শৈশবের কথা—মনে পড়ে বাঙলার এক অখ্যাত পল্লীর আলো-ছায়া-ঘেরা পরিচ্ছন্ন একখানি গৃহ—মনে পড়ে মায়ের বুক-ভরা স্নেহ। পল্লীর শ্যামল সমারোহ—দিগন্ত প্রসারিত উদার হেমবরণ প্রান্তর আকাশে-বাতাসে, মাঠে-ঘাটে গানের, রংএর বিচিত্র লীলা। হৃদয়ভরা উদ্দাম, প্রাণশক্তির অফুরন্ত প্রবাহ। এই মাটির পৃথিবী—কি অপরূপ সৌন্দর্য্যমণ্ডিত হয়েই না দেখা দিত। চারিদিকে কর্ম্মস্রোতের বিপুল কলগুঞ্জন, ঐশ্বর্য্যের লীলা-সমারোহ, নরনারীর বিচিত্র আনন্দমেলা। হৃদয়হীন সমাজ ব্যবস্থার বীভৎস বাস্তবতা যার নির্ম্মম নিষ্পেষণে দুনিয়ার অগণিত নরনারীর জীবন একটা মহাশূন্যতায় পরিণত হয়—এর সংগে তখন ছিল না তো পরিচয়।

হঠাৎ চিন্তার সূত্র ছিন্ন হল; পাশের খাটিয়ায় নটবেহারী ঘুমের ভিতর বিড় বিড় করছে—"দে ভাই, তোর পায়ে পড়ি, কলকেটা একবার দে।"

এক সপ্তাহ পর আজ সকালবেলায় হাসপাতাল থেকে মুক্তি পেলাম। ক্ষতগুলি সম্পূর্ণরূপে সারে নি বটে, তবে আশা হয় নূতন উপসর্গের সৃষ্টি হয়তো করবে না।

একখানি বাসি রুটি ছিল, চেয়ে নিলাম। বেশ দুবেলা যাহোক খাওয়া জুটেছিল, মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই আবার পেটের চিন্তা হাজির হল। রুটিখানিতে আজ বেশ চলে যাবে—তারপর যা হয় হবে। ও নিয়ে মাথা ঘর্ম্মাক্ত করার মত মস্তিষ্ক সবল এখনও হয় নি।

নটবেহারী ক'দিন আগে ছাড়া পেয়ে তার মিলে চলে গেছে। ওর যা হোক একটা আশ্রয় তবু আছে আমি যে একে-বারে লক্ষছাড়া। আশ্রয় এবার নিশ্চয়ই একটা খুঁজে নিতে হবে—যেমন করেই হোক এবং সে আশ্রয় হবে ওই নটবেহারীর দলে। ধনীর দুয়ারে দুয়ারে ঘুরেছি সাত বছর, আর নয়। নটবেহারী আছে মিলে ঠিক জুটবে একটা মজুরের কাজ। মন বলছে এ ব্যর্থ জীবন সার্থক করার এই একমাত্র পথ। ওগো পতিতের ঠাকুর টেনে যখন নামিয়েছ, তখন ওই সব-হারাদের সংগে মনে প্রাণে দাও এক করে।

হাঁটিতে হাঁটিতে হেদুয়ার পাশে এসে পড়েছি, রুটিখানা খেয়ে অঞ্জলি পুরে রাস্তার কল থেকে জল খেলাম। মাথাটা যেন ঝিম্ ঝিম্ করছে ছেঁড়া চাদরখানি বিছিয়ে ঘাসের উপর শুয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙলো একেবারে বিকালে, এতো ঘুম ঘুমাই নি অনেক কাল, আজ সব চিন্তার অবসান হয়েছে কি না তাই।

রাস্তার আলো একটি একটি করে জ্বলছে, কর্ম্মক্লান্ত বাবুর দল শুষ্কমুখে অচল পা-দুটো টেনে নিয়ে যাচ্ছে বাড়ীর দিকে।

বীডন ষ্ট্রীট দিয়ে চলেছি, হঠাৎ শিশুকণ্ঠের কান্নার আও-য়াজ কানে এল; চেয়ে দেখি একটি মেয়ে কাঁদছে; তার সুমুখে একটি খাবারের ঠোঙা মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। রাস্তার

উপর কতকগুলো কচুরী ছড়ান। এগিয়ে গিয়ে মেয়েটিকে আদর করে বললাম, "চিলে ছোঁ মেরেছে বুঝি, তুমি কেঁদ না, আমি কিনে দিচ্ছি।" দুনিয়াটাই চলছে এই ছোঁ-মারার উপর। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের খাবারে ছোঁ দেয় চিল পেটের দায়ে, আর মানুষ-চিল ছোঁ মারে গরীবের মুখের গ্রাসে তার বিলাসের কামনা তার লোভ চরিতার্থ করতে।

মোটর চাপা পড়ার দিন দু-আনিটি ভাঙিয়ে এক পয়সার মুড়ি-মুড়কি কিনে খেয়েছিলাম, বাকি সাতটি পয়সা পকেটে ছিল; হাত দিয়ে দেখি ঠিক আছে। আচ্ছা দুনিয়ার লোক-গুলি এত সাধু হল কবে থেকে, হাসপাতালের কুলি বেমালুম সরালেই তো পারতো।

খুকীকে বললাম, "এস আমার সাথে, আমি কচুরী কিনে দিচ্ছি।"

মেয়েটি আমার মুখের পানে তার বড় বড় চোখ দুটি তুলে একবার তাকালে।

'এস, ভয় কি?"

দোকানের সম্মুখে গিয়ে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, "ক পয়সার কচুরী কিনেছিলে।"

"তিন পয়সার।"

তিন পয়সার কচুরী কিনে দিয়ে বললাম, "চল খুকী, তোমায় বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি, আবার চিলে ছোঁ দিতে পারে।"

খুকী খুশী হয়ে বলল, "তাই চল। আবার চিলে নিলে কে কিনে দেবে? কচুরী না নিয়ে গেলে দিদি বড্ড বকবে।"

"দিদি তোমায় খুব বকে বুঝি।"

"হ্যাঁ, আর মারেও; মা কিন্তু আমায় বকে না খালি আদর করে।" একটু থেমে, তারপর তার বাঁ হাত দিয়ে আমার ডান হাতের দুটি আঙুল ধরে বললে "আমাদের বাড়ী গেলে তোমায় আমি কি খাওয়াবো বল দেখি?"

শিশুর মন—সরল, উদার—এক পলকেই কেমন আপনার করে নেয়। হেসে বললাম, "কেন কচুরী।"

"দূর বোকা, বলতে পারলে না; চন্দ্রপুলি গো চন্দ্রপুলি, মা আজ করেছে।"

"তাহলে কচুরী কিনলে কেন?"

খুকী ভয়ে ভয়ে বলল, "তুমি দিদিকে বলে দেবে না, বল।"

হেসে বললাম, "না, বলে দেব না।"

"দিদি কচুরী খেতে বড্ড ভালবাসে; মার বাক্স থেকে তিনটে পয়সা নিয়ে আমায় বললে, "দেখ অতসী, ছুটে গিয়ে কচুরী কিনে আন, মাকে লুকিয়ে আমায় দিবি বুঝলি।"

"তোমার নাম অতসী বুঝি।"

"অতসী নয় তো কি? ঠাকুমা আমার নাম দিয়েছে অতসী, সব্বাই জানে; তুমি কিছু জান না। ধ্যেৎ।"

আমার অজ্ঞতায় অতসীর বিস্ময়ের যেন অন্ত নেই।

"আচ্ছা অতসী, ক'খানা চন্দ্রপুলি আমায় খাওয়াবে?"

"যত তুমি খেতে পার; আর দেখ, তুমি যখন খাবে ভুলোটা এসে ঠিক তোমার পাশে দাঁড়াবে, ওর ওই বড় দোষ। দাদা লাঠি নিয়ে ওকে মারে আর বলে, "হ্যাংলা কুকুরটাকে বের করে দাও বাড়ী থেকে।" দিদি আর আমি ওকে কোলে তুলে নিয়ে পালিয়ে যাই। দাদা ভুলোকে মারতে গিয়ে দিদিকে তো আর মারতে পারে না—ভুলো সব বোঝে, ও দিদির কোলে চুপটি করে বসে থাকে ঠিক, ভিজে বেরালটির মত।"

অতসীদের বাড়ী এসে পৌঁছালাম। সে আমার হাত ধরে বাড়ীর ভিতর গিয়ে চেঁচিয়ে বলল, "ওমা, মাগো, দেখবে এস না, কে এসেছে।"

অতসীর মা বেরিয়ে এসে অপরিচিত আমাকে দেখে ঘোমটা টেনে ঘরের ভিতর পালিয়ে গেলেন।

মা চলে গেল দেখে অতসী হতভম্ব হয়ে গেল। আমার আঙুলদুটো তখনও ওর হাতে ধরা ছিল। ছাড়িয়ে নিয়ে বাইরে চলে এলাম। খানিকটা চলে এসেছি, পিছনে অতসীর ডাক শুনে ফিরলাম, সে হাত নেড়ে দাঁড়াতে বলছে। অতসী ছুটে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "চল, চন্দ্রপুলি না খেয়েই চলে যাচ্ছিলে যে।"

ফিরে গেলাম তার সঙ্গে। বাইরের ঘরে আমায় বসিয়ে অতসী চলে গেল ভিতরে। মিনিট পাঁচেক পর অতসীর দিদি একখানি থালায় চন্দ্রপুলি, খানকতক লুচি ও কিছু আলুর দম নিয়ে এল। অতসী এসেছে এক গেলাস জল ও একটি পান নিয়ে। বললে "খাও।"

পেটপুরে খেলাম। আজ আমার পরম সৌভাগ্যের দিন। কোথাও এতটুকু ফাঁকি নেই। ভিতর-বাহির আজ ভরপুর নতুন জীবন সুরু হওয়ার আনন্দে।

অতসীকে আদর করে বললাম, "এখন চলি অতসী।"

অতসী বললে, "আবার এস কিন্তু।"

* * * * *

কাল ভোরে বেকার জীবনের অবসান হবে নটবেহারীর মিলে। *

---

* বিদেশী গল্পের ছায়ায়

বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশন

৯ই মার্চ্চ বেলা সাড়ে তিন ঘটিকার সময় কংগ্রেস বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির অধিবেশন আরম্ভ হয়। পণ্ডিত গোবিন্দ-বল্লভ পন্থের প্রস্তাব সম্পর্কে তুমুল উত্তেজনার ভাব পরিলক্ষিত হয়; কেননা এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে কংগ্রেস সভাপতির পদত্যাগও সম্ভবপর হইতে পারে। ফলে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিকে মহাত্মার সহিত পরামর্শ করিয়া অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করিবার ভার দিয়া কংগ্রেসের বর্ত্তমান অধিবেশনেরও পরিসমাপ্তি ঘটিতে পারে।

সভাপতির আগমন

আজও এম্বুলেন্সযোগে সভাপতি সভামণ্ডপ দ্বারে আগমন করেন—তথা হইতে গতকল্যের ন্যায় ষ্ট্রেচারে করিয়াই তাঁহাকে সভাক্ষেত্রে আনা হয়। কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে সভাপতি সকলকে সভার আবহাওয়া শান্ত রাখিবার জন্য ধীর স্থিরভাবে আলোচনা করিবার অনুরোধ জানান।

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সংশোধন প্রস্তাব

শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্রনাথ পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাবের প্রথমাংশ বহাল রাখিয়া শেষাংশ পরিবর্ত্তিত করিয়া এইরূপ করিতে চাহেন যে, কংগ্রেসের মূল নীতি থাকিবে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জন, তবে কর্ম্মপন্থা দেশের অবস্থানুযায়ী পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে। প্রস্তাবে গান্ধী-নীতির প্রশংসা করা হইয়াছে, মহাত্মার ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হইয়াছে, রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের প্রতিও আস্থা জ্ঞাপন করা হইয়াছে এবং প্রতিনিধিগণ তাঁহার উপর যে গুরু দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন, তাহা বহন করিতে তিনি যাহাতে সক্ষম হন সেজন্য মহাত্মা ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে এই প্রস্তাবে অনুরোধ করা হইয়াছে।

রাষ্ট্রপতির বিবৃতি

শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্রনাথ রায় তাঁহার সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করিবার পরই রাষ্ট্রপতি এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে, ওয়ার্কিং কমিটির কোন সদস্যের সততায় আমি কখনও কোনরূপ কটাক্ষ করি নাই।

অধিবেশন স্থগিত

পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব সম্পর্কে সাড়ে সাত ঘণ্টা আলোচনার পর আগামীকল্য বেলা দেড় ঘটিকা পর্য্যন্ত বিষয়-নির্ব্বাচনী সমিতির অধিবেশন স্থগিত থাকে। এই প্রস্তাবের উপর বার-তেরটি সংশোধনী প্রস্তাব আনীত হইয়াছে এবং শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী, শ্রীযুক্ত সত্যমূর্ত্তি, আচার্য্য নরেন্দ্র দেব, শ্রীযুক্ত নীহারেন্দু দত্ত-মজুমদার, ডাঃ লোহিয়া, ডাঃ আসরফ প্রমুখ বার-তেরজন বক্তৃতা করেন।

শুক্রবার ভোট গ্রহণ

প্রস্তাবটির সাধারণ আলোচনা হইয়া গিয়াছে। আগামীকল্য পণ্ডিত পন্থ বিতর্কের উত্তর দান করিবেন, তৎপর বিভিন্ন সংশোধন প্রস্তাব ও মূল প্রস্তাবের উপর ভোট গ্রহণ করা হইবে। শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী তাঁহার বক্তৃতায় যুক্তি দেখান যে, নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে রাষ্ট্রপতি যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে কংগ্রেসের নীতি ও কর্ম্মপন্থার পরিবর্ত্তনের আভাস ছিল, এই জন্যই সুভাষচন্দ্রের জয়কে মহাত্মা নিজ পরাজয় বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন। এখন যদি প্রতিনিধিগণ মহাত্মার নেতৃত্ব ও মহাত্মার সহায়তা চাহেন, তাহা হইলে তাঁহাদের এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া মহাত্মার নেতৃত্বে আস্থা জ্ঞাপন করা কর্ত্তব্য। আচার্য্য নরেন্দ্র দেব শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশনারায়ণের আনীত সংশোধন প্রস্তাব সমর্থন করিয়া পদত্যাগকারী সদস্যগণকে মহানুভবতার পরিচয় দিতে অনুরোধ করেন। রাত্রি ১০-৪০ মিনিটের সময় বিষয়-নির্ব্বাচনী সমিতির অধিবেশন স্থগিত থাকে।

পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাবের উপর সংশোধন প্রস্তাবগুলি যতদূর সম্ভব প্রত্যাহার করিয়া নিম্নসংখ্যায় পরিণত করিতে অনুরোধ করিয়া রাষ্ট্রপতি এক বিবৃতি প্রদান করেন।

ভরদ্বাজের সংশোধন প্রস্তাব

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু বিবৃতি দিলে পর মিঃ ভরদ্বাজ এই মর্ম্মে এক সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, মূল প্রস্তাব হইতে "গান্ধীজীর অভিপ্রায় অনুসারে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনয়ন করিতে কংগ্রেস সভাপতিকে অনুরোধ করা যাইতেছে"—এই কথাগুলি তুলিয়া দেওয়া হউক।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিঃ ভরদ্বাজ বলেন, "ত্রিপুরীতে সমস্ত দলের কংগ্রেস সদস্যগণের মধ্যে যাহাতে ঐক্য স্থাপিত হয়, তজ্জন্য সোসিয়ালিষ্ট ও কমিউনিষ্টগণ চেষ্টা করিতেছেন। এমন একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত যাহাতে সমস্ত দলের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হইতে পারে। দেশের মুক্তি সংগ্রামে মহাত্মাজীর দান অপূর্ব্ব, সুতরাং মহাত্মাজীর উপর আমাদের অটুট আস্থা আছে, আবার কংগ্রেস সভাপতির উপরও আমাদের অটুট আস্থা আছে। সুতরাং তিনি ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনয়নে কোনও অন্যায় করিবেন না বলিয়া বিশ্বাস করা উচিত। কিন্তু মূল প্রস্তাবটি গৃহীত হইলে বলা হইবে যে, ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনয়নের ব্যাপারে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর উপর নির্ভর করা যায় না। কিন্তু এমন কোনও ধারণার সৃষ্টি হইলে দেশের ঘোর ক্ষতি হইবে।"

মিঃ ভরদ্বাজের পর শ্রীযুত অচ্যুত পটবর্দ্ধন এই মর্ম্মে সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, মূল প্রস্তাব হইতে "ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণের প্রতি দোষারোপ করা হইয়াছে বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করা যাইতেছে"—এই কয়টি কথা তুলিয়া দেওয়া হউক।

তিনি বলেন, "পূর্ব্বতন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণের উপর যে আমাদের আস্থা আছে, তাহাতে কোনও সন্দেহ হইতে পারে না। কংগ্রেস সভাপতি দ্ব্যর্থবিহীন ভাষায় এক বিবৃতি দিয়াছেন, এখন সমস্ত সংশয় ও সন্দেহ দূরীভূত হইয়াছে—কাজেই এখন আমাদের অন্তরের প্রকৃত ঐক্য স্থাপন করিতে হইবে;—হাত তুলিয়া লোক দেখান ঐক্য আমরা চাহি না। যাহা আমাদের সকলের লক্ষ্য, আসুন আমরা সেই লক্ষ্য পথে অগ্রসর হই। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণের প্রতি

(শেষাংশ ৩৭২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কংগ্রেসের প্রথম দিবসের অধিবেশন

বিষ্ণুদত্ত নগরে বিরাট মণ্ডপ মধ্যে ১০ই মার্চ্চ সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকায় নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভার দ্বি-পঞ্চাশৎ অধিবেশন আরম্ভ হয়। দুই লক্ষাধিক নর-নারী এই দিবসের অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন। অসুস্থতার জন্য রাষ্ট্রপতি এই দিবসের কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করেন নাই। কাজেই সভাপতিকে শোভাযাত্রা করিয়া আনার অনুষ্ঠানও পরিত্যক্ত হইয়াছে। "বন্দে মাতরম্" সংগীত গীত হইবার পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শেঠ গোবিন্দদাস তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় সভাপতির অভিভাষণ পাঠ করেন।

মৌলানা আজাদের সভাপতিত্ব—

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে তৎপুরোভে উপস্থিত কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সভাপতিদের মধ্যে প্রবীণতম মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ এবং সভাপতির ভাষণ পঠিত হইবার পর রাত্রি সাড়ে আটটায় কংগ্রেসের এই দিবসের অধিবেশন স্থগিত থাকে।

সেম সেম ধ্বনি—

রাষ্ট্রপতির ভাষণে যে স্থানে সর্দ্দার প্যাটেল, মৌলানা আজাদ ও বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রভৃতির পদত্যাগের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় ঐ অংশ পাঠ করিবার সময় প্রতিনিধিদের মধ্য হইতে সেম সেম ধ্বনি উত্থিত হয়।

শুভেচ্ছাজ্ঞাপক বাণী—

কংগ্রেসের সাফল্য কামনা করিয়া ও শুভেচ্ছাজ্ঞাপন করিয়া যে সকল বাণী আসিয়াছিল, কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরসিংহ তাহা পাঠ করেন। চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টি, জাপানস্থ ভারতীয় জাতীয় দল, শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বসু, জাঞ্জিবারের ভারতীয় সমিতি, ভারতীয় চীন মেডিক্যাল ইউনিটের পক্ষে ডাঃ অটল, মালাক্কার ভারতীয়গণ, পণ্ডিত মালব্য, মিঃ অরুণ্ডেল ও আরও অনেকে শুভেচ্ছা ও সাফল্য কামনা করিয়া বাণী পাঠাইয়াছিলেন।

মিশরীয় প্রতিনিধিগণকে সম্বর্দ্ধনা—

কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশন স্থগিত রাখিবার পূর্ব্বে মিশরীয় প্রতিনিধিগণকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। পণ্ডিত জওহরলালজী মিশরীয় প্রতিনিধিগণকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিতে উঠিয়া বলেন যে, একই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মিশর ও ভারত উভয়কেই সংগ্রাম করিতে হইতেছে। বড়ই দুঃখের বিষয়, রাজনীতিক প্রয়োজনে মিশরের ওয়াফদ্ পার্টির স্বনামখ্যাত নেতা নাহাসপাশা মিশর ত্যাগ করিয়া আসিতে পারিলেন না। মিশরীয় প্রতিনিধি দলের নায়ক মিঃ মামুদ বে তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধনার জন্য কংগ্রেসকে ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং বলেন যে, ভারতীয় জাতীয় মহাসভার অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতে পারায় তাঁহারা নিজেদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেছেন। ভারতীয়দের সঙ্ঘবদ্ধতার প্রয়োজনীয়তার উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং বলেন যে, সঙ্ঘশক্তি বলেই মিশরের সাফল্যলাভ সম্ভবপর হইয়াছে। ভারত ও মিশরের মধ্যে যাহাতে সম্প্রীতির বন্ধন দৃঢ়তর হইতে পারে, এজন্য তিনি ভারতের পক্ষ হইতে এক প্রতিনিধি দলকে মিশরে প্রেরণের অনুরোধ জানান। ১১ই মার্চ্চ সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় পুনরায় কংগ্রেসের অধিবেশন বসি ।

বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশন

(৩৭১ পৃষ্ঠার পর)

অবশ্যই আমাদের আস্থা আছে, কিন্তু অতীতে যেমন আমরা নীতি ও কর্ম্মপদ্ধতি সম্পর্কে তাঁহাদের বিরোধিতা করিয়াছি, এখনও তেমনই বিরোধিতা করিব। আমরা হিটলার বা মুসোলিনীর রাজ্যে বাস করি না। যাহা হউক, ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণের প্রতি আমাদের আস্থা আছে; কারণ তাঁহাদের হস্তে দেশের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকিবে।"

মিঃ কে এফ নরীম্যান এই মর্ম্মে একটি সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, কংগ্রেস সভাপতি গান্ধীজীর সহিত পরামর্শক্রমে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনয়ন করিবেন, কিন্তু তাঁহার নির্দ্দেশ প্রেসিডেণ্টের গ্রহণ করিতেই হইবে, এমন নহে। মিঃ নরীম্যান বলেন, পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ কথায় মতদ্বৈত ঐক্য দেখাইয়াছেন, কারণ যদি তাহার আদেশে ঐক্যতি দেখাইতেন, তবে আজো তাহার প্রস্তাবের উপস্থিত হইত না। পণ্ডিত পন্থ বলিয়াছেন, সুভাষবাবু বেশ লোক, পণ্ডিত জওহরলাল আরও ভাল, গান্ধীজী সবচেয়ে ভাল, আমরা সকলেই চমৎকার লোক। যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে সমস্ত সংশোধন প্রস্তাব প্রত্যাহারের দাবী উঠিয়াছে কেন? সংশোধন প্রস্তাবগুলি প্রত্যাহার না করিয়া পণ্ডিত পন্থের মূল প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করিয়া দেশীয় রাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবের আলোচনা আরম্ভ করা হউক না কেন?

পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ বলিয়াছেন, প্রতিষ্ঠান হইতে মহাত্মাজী শ্রেষ্ঠ; বিশ বৎসর পর এবার কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনে গণতন্ত্রের জয় হইয়াছে, অথচ গণতান্ত্রিক প্রথায় নির্ব্বাচিত এই প্রেসিডেণ্টকে হাত পা বাঁধিয়া এমন একজনের (তিনি যত বড়ই হউন না কেন) হাতে পুত্তলিকাবৎ তুলিয়া দিতে চাহিতেছি, যিনি কংগ্রেসের সদস্যও নহেন। এই চেষ্টা নিতান্তই হাস্যকর এবং কংগ্রেসের ন্যায় বিরাট গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে নিতান্তই অগৌরবজনক।

কংগ্রেসের দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশন

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভার দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশন ১১ই মার্চ্চ সাড়ে ৫ ঘটিকায় আরম্ভ হইবার কথা ছিল; কিন্তু মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এই দিবস অপরাপর নেতাদের সহিত নির্দ্দিষ্ট সময়ের দেড় ঘণ্টা পর অধিবেশন মণ্ডপে প্রবেশ করেন। ইতিমধ্যে রাষ্ট্রপতির স্বাস্থ্যের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়ায় এই দিবসের কংগ্রেস অধিবেশনের প্রাক্কালে শেষ মুহূর্ত্তে নেতাদের মধ্যে আলোচনার ফলে স্থির হইয়াছিল যে, পরে সুবিধামত সময়ে আলোচনার জন্য পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থের প্রস্তাবটি নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে তোলা হইবে।

পন্থের প্রস্তাব নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতিতে প্রেরণের প্রস্তাব

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াই মিঃ আণেকে শ্রীযুক্ত পন্থের উক্ত প্রস্তাবটি নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে প্রেরণের প্রস্তাব উত্থাপন করিতে অনুরোধ করেন।

প্রতিনিধিদের তীব্র প্রতিবাদ

প্রতিনিধিদের মধ্য হইতে সভাপতির এই নির্দ্দেশের তীব্র প্রতিবাদ হয়। তাঁহারা বলেন যে, বিষয়-নির্ব্বাচনী সমিতিতে গৃহীত প্রস্তাব সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার অধিকার প্রতিনিধিদের অবশ্যই আছে। পণ্ডিত পন্থ শ্রীযুক্ত আণের প্রস্তাব সমর্থন করিয়া প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণের অনুরোধ জানান। তীব্র বাদ-প্রতিবাদের মধ্যে প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে বলিয়া সভাপতি কর্ত্তৃক ঘোষিত হয়।

ঘোরতর বিক্ষোভের সঞ্চার

সভাপতি প্রস্তাব গৃহীত বলিয়া ঘোষণা করা মাত্র প্রতিনিধিদের মধ্যে তীব্র বিক্ষোভের সঞ্চার পরিলক্ষিত হয় এবং অনেকেই এ বিষয়ে ভোট গণনার দাবী জানান। মৌলানা আজাদ ইহাতে জানান যে, এইরূপ হট্টগোলের মধ্যে ভোট গণনা করা অসম্ভব। আগামীকল্য ভোট গণনার ব্যবস্থা করা হইবে।

অবিলম্বে ভোট গণনার দাবী

গোলযোগ ইহাতে শান্ত না হইয়া বরং বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বহু প্রতিনিধি অবিলম্বে ভোট গণনা দাবী করিয়া মঞ্চের দিকে অগ্রসর হন—সভাপতির বক্তৃতা মঞ্চে উঠিবার সিঁড়ির উপর অনুমান ৫ শতাধিক লোক ভীড় করিয়া অবিলম্বে ভোট গণনা দাবী করিতে থাকেন।

শান্তি প্রতিষ্ঠায় পণ্ডিতজীর ব্যর্থ প্রয়াস

১৫ মিনিট কাল এই অবস্থা চলিবার পর পণ্ডিত জওহরলাল শান্তি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হইয়া কিছু বলিবার চেষ্টায় মাইক্রোফোনের সম্মুখে যাইয়া দাঁড়ান কিন্তু তুমুল চীৎকার ও হট্টগোলের জন্য তিনি কিছুই বলিতে পারেন না। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় এই সময় বক্তৃতামঞ্চে উঠিয়া সকলকে বসিতে অনুরোধ করেন। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর অনুরোধে বক্তৃতামঞ্চের সিঁড়িতে সমবেত প্রতিনিধিগণ একটু শান্ত হন কিন্তু পণ্ডিত জওহরলালজী পুনরায় বক্তৃতা দিতে উঠিলেই আবার তুমুল হট্টগোল উত্থিত হয়। ১০ মিনিট কাল ধরিয়া বক্তৃতা দিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া জওহরলালজী বসিয়া পড়েন।

অবশেষে মিঃ আণে কর্ত্তৃক প্রস্তাব প্রত্যাহার

অবস্থা ক্রমেই গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে দেখিয়া মঞ্চোপরি উপবিষ্ট নেতারা এ অবস্থায় কি করা যায়, এ বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। গোলমালের জন্য ঘণ্টা দেড়েক কংগ্রেসের কাজ বন্ধ থাকে। নেতাদের অবিরত আবেদন-নিবেদনে কোন ফল হয় না। অবশেষে নেতাদের আলোচনার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যখন ঘোষণা করা হয় যে, শ্রীযুক্ত পন্থের প্রস্তাব নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে প্রেরণের যে প্রস্তাব শ্রীযুক্ত আণে আনিয়াছিলেন, তিনি তাহা প্রত্যাহার করিতে রাজী হইয়াছেন, তখন রাত্রি অনুমান ৯ ঘটিকার সময় জনতা শান্ত হয় এবং শ্রীযুক্ত আণে তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন।

জওহরলালজীর বক্তৃতা

শ্রীযুক্ত আণের প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হইবার প্রাক্কালে জওহরলালজী এক আবেগপূর্ণ বক্তৃতায় ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, কংগ্রেসের সহিত তাঁহার ২৫ বৎসরের বেশী দিনের সম্পর্ক। এই সময়ের মধ্যে এই দৃশ্য তাঁহাকে কখনও প্রত্যক্ষ করিতে হয় নাই—তিনি বলেন, এইরূপ ঘটনা ঘটা ঠিকই হইয়াছে, ইহাতে বুঝা যায় কংগ্রেসের প্রকৃত স্বরূপ কি। মহাত্মা গান্ধী যে 'হরিজন' পত্রিকায় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলার প্রাদুর্ভাবের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন, উহা যে কতদূর যুক্তিযুক্ত হইয়াছে তাহা অদ্যকার ঘটনাই স্বপ্রমাণ করিল—আজ যে অবস্থা দেখিলাম তাহাতে আমাদের ভাবী সংগ্রামের কথা চিন্তা করিয়া আমার হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইতেছে।

রবিবার প্রাতে পন্থের প্রস্তাবের আলোচনা

শ্রীযুক্ত আণে তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতে চাহিলে বিপুল ভোটাধিক্যে তাহা অনুমোদিত হয়। বিষয়-নির্ব্বাচনী সমিতিতে গৃহীত পন্থের প্রস্তাবের আলোচনার জন্য আগামীকল্য প্রাতে ৮॥ ঘটিকার সময় বিষয়-নির্ব্বাচনী সমিতি মণ্ডপে কংগ্রেসের এক অধিবেশন বসিবে—যতক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত পন্থের এই প্রস্তাবে ভোট গ্রহণ শেষ না হইবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোন দর্শককে মণ্ডপ মধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না।

রাত্রি সাড়ে ১১টায় অধিবেশন স্থগিত

পণ্ডিত নেহেরুর জাতীয় দাবী, কংগ্রেসে দুর্নীতির প্রাবল্য শীর্ষক শ্রীপ্রকাশের প্রস্তাব, পরলোকগত নেতাদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ, মিশরীয় প্রতিনিধিদিগকে সম্বর্দ্ধনা ও চীনের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশমূলক প্রস্তাব—মোট ৫টি প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর রাত্রি ১১টা ৩৫ মিনিটে কংগ্রেসের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন স্থগিত থাকে। আগামীকল্য প্রাতে ৮॥টায় একবার এবং অপরাহ্ণ ৬টায় একবার কংগ্রেসের অধিবেশন বসিবে।

কংগ্রেসের শেষ দিবসের অধিবেশন

তুমুল জয়ধ্বনি ও বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে ১২ই মার্চ্চ রাত্রি সাড়ে দশটায় নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভার দ্বিপঞ্চাশৎ অধিবেশনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। অধিবেশনের পরিসমাপ্তি ঘোষিত হইবার পূর্ব্বে এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বর্ত্তমান বৎসরের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে বিহারে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভার আগামী অধিশেন বসিবে। এই দিবসের অধিবেশনে ভারতীয় দেশীয় রাজ্যসমূহ, বৈদেশিক ব্যাপার, প্রবাসী ভারতীয়গণ, প্যালেষ্টাইন এবং বেলুচিস্থান সম্পর্কিত প্রস্তাব গৃহীত হয়।

দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে কংগ্রেসের নীতি

দেশীয় রাজ্য সম্পর্কিত প্রস্তাবের উপর শ্রীযুক্তা কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় এক সংশোধন প্রস্তাব আনিয়া মূল প্রস্তাবের হরিপুরা কংগ্রেসে গৃহীত নীতি সম্পর্কিত অংশ বাদ দিয়া এইটুকু যোগ করিয়া দিতে চাহেন যে, কংগ্রেস দেশীয় রাজ্যের প্রজা-আন্দোলনের সহিত প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করিবে এবং সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালন করিবে। সংশোধন প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হইয়া যায়। এই সময় প্রস্তাবক বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ মন্তব্য করেন যে, "বড় বড় প্রতিশ্রুতি দানের পরিবর্ত্তে কাজে যতটা বেশী পারা যায় তাহাই করা উচিত।"

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বৈদেশিক ব্যাপার সম্পর্কিত প্রস্তাবনা উত্থাপন করিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বৈদেশিক নীতির তীব্র নিন্দা করেন এবং বলেন যে, "গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতা ধ্বংসকারী নীতির" সহিত ভারত কোনই সংস্রব রাখিবে না।

শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু সকলকে ধন্যবাদ দান করেন।

প্রাতঃকালের অধিবেশনে শ্রীযুক্ত পন্থের প্রস্তাব গৃহীত

রবিবার সকাল ৯টায় শান্ত আবহাওয়ার মধ্যেই বিষয়-নির্ব্বাচনী সমিতি মণ্ডপে মহাত্মার নীতি ও কর্ম্মপন্থায় আস্থাসূচক শ্রীযুক্ত পন্থের প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনার জন্য কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হয়।

শ্রীযুত নরীম্যানের প্রস্তাব

অধিবেশনের প্রারম্ভেই শ্রীযুত কে এফ নরীম্যান প্রস্তাব করেন যে, পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থের প্রস্তাব প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রপতিকে লক্ষ্য করিয়া রচিত। রাষ্ট্রপতি অতিশয় পীড়িত বলিয়া ঐ প্রস্তাবের আলোচনাকালে স্বয়ং উপস্থিত থাকিতে অক্ষম। সুতরাং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের মর্য্যাদার খাতিরে, এই প্রস্তাবের আলোচনা স্থগিত রাখা হউক।

কতিপয় প্রতিনিধি পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি এই প্রস্তাব মানিয়া লইতে সম্মত কিনা। তিনি অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে শ্রীযুক্ত নরীম্যানের প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয় এবং অগ্রাহ্য হয়।

পণ্ডিত পন্থ তৎপর তাঁহার প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং মিঃ গ্যাডগিল উহা সমর্থন করেন। ইঁহারা কেহ কোনরূপ বক্তৃতা করেন নাই।

সমুদয় সংশোধন প্রস্তাব অগ্রাহ্য

সর্দ্দার শার্দ্দুল সিং, মিঃ নরীম্যান, মিঃ ভরদ্বাজ, মি মৈত্র প্রভৃতি ৫০৬টি সংশোধন প্রস্তাব আনিয়াছিলেন। ইঁহাদের সংশোধন প্রস্তাবসমূহের উদ্দেশ্য ছিল "দোষারোপ" ও মহাত্মার অভিপ্রায় অনুযায়ী ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করিতে হইবে, এইরূপ নির্দ্দেশমূলক অংশগুলি মূলপ্রস্তাব হইতে ছাঁটিয়া দেওয়া।

কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদের মনোবৃত্তি

কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণ ঘোষণা করেন যে, গতকল্যের ব্যাপার দেখিয়া তাঁহারা এই প্রস্তাব সম্পর্কে নিরপেক্ষ থাকিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত আনে কর্ত্তৃক প্রস্তাবের বিরোধিতা

শ্রীযুক্ত আনে প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া বলেন যে, এই প্রস্তাব প্রতিনিধিগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত সভাপতির বিরুদ্ধে অনাস্থাই সূচনা করে। গান্ধীজীর ইচ্ছানুসারে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনয়ন সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে নির্দ্দেশ দান বিষয়ে তিনি বলেন যে, উহা কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রের বিরোধী। কারণ কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রে সভাপতি নামেমাত্র সভাপতি নহেন। তিনি জনসাধারণের শক্তি ও উৎসাহ-উদ্যমের ধারক।

সর্দ্দার শার্দ্দুল সিং এক সংশোধন প্রস্তাব প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন যে, এইভাবে মহাত্মার নাম ভাঙ্গান হইলে মহাত্মাজীর প্রতিই অবিচার করা হইবে।

পন্থের জবাব

পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ বিতর্কের উত্তর দান প্রসঙ্গে বলেন যে, এই প্রস্তাবে কোনক্রমেই রাষ্ট্রপতির প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করা হয় নাই। মহাত্মার নেতৃত্ব, তাঁহার নীতি ও কর্ম্মপন্থার প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করা হইয়াছে মাত্র। মহাত্মাকে ছাড়া কংগ্রেসের কাজ চালান সম্ভবপর নহে বলিয়া আমাদের ধারণা হওয়াতেই এই প্রস্তাবের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

প্রস্তাব গৃহীত

সমুদয় সংশোধন প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়া যায় এবং মহাত্মা গান্ধী কী জয়ধ্বনির মধ্যে মূল প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাবে নিরপেক্ষ থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় বাঙলা ও যুক্ত-প্রদেশের কতিপয় সমাজতন্ত্রী সমাজতন্ত্রী-দল হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

গান্ধী-সুভাষ সাক্ষাৎকার

স্বাস্থ্যের অবস্থা একটু ভাল হইলেই ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা নিরূপণ ও নূতন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন সম্পর্কে আলোচনার জন্য রাষ্ট্রপতি মহাত্মার সহিত দেখা করিতে যাইবেন। আগামীকল্য প্রাতেই সর্দ্দার প্যাটেল ও শ্রীযুক্ত দেশাই দিল্লী রওনা হইয়া যাইতেছেন। সর্দ্দার প্যাটেল ত্রিপুরীর সমস্ত তথ্য মহাত্মার গোচর করিবেন।

প্রতীক্ষায়

(গল্প—শেষাংশ)

শ্রীমতী নলিনী দেবী

তাহার পর সুদীর্ঘ চারি বৎসর গত হইয়াছে। মাতা-পুত্রে সাক্ষাৎ হয় নাই। কেহ কাহাকেও পত্র পর্য্যন্ত লেখে নাই। পত্র বিনিময় হয় নাই সত্য, কিন্তু মা নিয়তই নির্ম্মলেন্দুর কাছ হইতে তাহার কুশল সংবাদ পাইয়া থাকেন।

কিন্তু সুগভীর অবসাদে এবং নিজের অনুচিত, অনুদারতার জন্য সুগভীর ঘৃণায় ইচ্ছা সত্ত্বেও অমিয়েন্দুকে চিঠি লিখিয়া উঠিতে পারেন নাই।

নির্ম্মলেন্দুর প্রত্যেক চিঠিতেই বিবাহ করিবার জন্য সস্নেহ অনুরোধ থাকিত। তাঁহাদের সংস্রব সে ত্যাগ করুক ক্ষতি নাই, কিন্তু সে যেন সংসারী হয়।

চিঠি পড়িয়া অমিয়েন্দুর মুখে শুধু একটু কঠিন তিক্ত হাসি ফুটিয়া উঠিত। উত্তর সে কিছুই দিত না। হয়ত বিবাহও সে করিত; কালের প্রলেপে সুদেষ্ণার উজ্জ্বল রূপ ধীরে ধীরে মলিন হইয়া একেবারে যে বিলীন না হইয়া যাইত, তাহাই বা কে বলিতে পারে। সকলে ত' এমন করিয়াই থাকে। যৌবনের প্রথম প্রেম যেমনই উদ্দাম তেমনই ক্ষণস্থায়ী, অন্ততঃ অমিয়েন্দুদের বাড়ীর সকলেই সেই আশাই করিয়াছিলেন।

কিন্তু, অমিয়েন্দু তাহাকে ভুলিতে পারিল না। যে মা তাহার সামান্য একটু মাথা ধরিলেই উদ্বেগে, আশঙ্কায় সারারাত্রি বিনিদ্র কাটাইতেন, তিনিই তাহাকে এত বড় দুঃখ দিলেন কি করিয়া? সংস্কারই তাঁহার এত বড় হইল? বিদায় বেলার সুদেষ্ণার সেই রোদন-স্ফীত নেত্র দুইটি অমিয়েন্দুর জীবনের সমস্ত শান্তিই অপহরণ করিয়াছিল।

নারীর জন্য কত সর্ব্বনাশই হইয়া যায়। অমিয়েন্দুর জীবনে আকস্মিক যে রমণীর উদয় হইল, সে তাহাদের মাতা-পুত্রে বিচ্ছেদ ঘটাইল। মা তাহার কাশী বাস করিতেছেন। নির্ম্মলেন্দু কতবার জানাইয়াছে, সে বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়াছে শুনিলেই মা ফিরিয়া আসিবেন।

অতীতের দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া অমিয়েন্দু ভাবিয়াছে, বিবাহ কি এতই সহজ? বিবাহ কি আবার সত্যই সে করিতে পারে? কই, এত মাতৃভক্তি ত' তাহার নাই, সত্যই সে পাষণ্ড।

এমনি এক সময়েই কাশী হইতে টেলীগ্রাম আসিল, "মা সাঙ্ঘাতিক পীড়িত—শীঘ্র এস,—নির্ম্মলেন্দু।"

অমিয়েন্দুর চারি বৎসরের সঞ্চিত রাগ ও অভিমান নিমেষে অন্তর্হিত হইল। অত্যন্ত উদ্বেগে অমিয়েন্দু যখন কাশী আসিয়া পৌঁছিল, তখন তাঁহার শেষ সময় উপস্থিত। পুত্রের মাথায় একটি কম্পিত কর তুলিয়া দিয়া ভগ্নস্বরে মা কহিলেন।—"খোকা, বাপ আমার! আমার দোষ ভুলে যা। বিয়ে করিস।"

নির্ম্মলেন্দু চোখের জল চাপিতে চাপিতে বাহির হইয়া গেলেন। অজিতা কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, "ঠাকুরপো! আর মাকে দুঃখ দিও না ভাই!"

অমিয়েন্দু মা'র বুকের উপর মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া বলিল, "আমায় মাপ কর মা। বিয়ে আমি করতে পারব না।"

মা'র মরণাহত মুখের শেষ রক্ত বিন্দুটিও মুছিয়া গেল। পাংশু ওষ্ঠ দুটি বারবার কি কথা বলিবার ব্যর্থ চেষ্টায় কাঁপিয়া উঠিয়া চিরতরেই নীরব হইয়া গেল।

তাহার পর শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকিবার পর, অনেক করিয়া সকলে তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল।

অজিতা ও নির্ম্মলেন্দু অনেক করিয়া বুঝাইলেন, কিন্তু তাহার সঙ্কল্প টলিল না। যাইবার আগের দিন একটা নিভৃত কক্ষে ডাকিয়া আনিয়া অজিতা বলিল, "ঠাকুরপো! একটা কথা বলব, রাগ করবে না ত'?"

"না, রাগ কেন করব?" অমিয়েন্দু একটু বিস্মিত সুরেই উত্তর দিল।

ইতস্ততঃ করিয়া অজিতা কহিলেন,—"যার জন্যে তুমি এত কষ্ট সহ্য করলে, আমাদের সকলকে এত কষ্ট দিলে, এমন কি, মাকে মৃত্যুর সময় পর্য্যন্ত শান্তিতে মরতে দিলে না, ঠাকুরপো! সে, কি ধাতের মেয়ে, তা তুমি জান?"

"বৌদি!"

"গর্জ্জন কর না ঠাকুরপো। আমি যা বলছি, তার কানাকড়িও মিথ্যে নয়, ইচ্ছে হয়, তুমি নিজে খোঁজ নিয়ে জানতে পার।"

কম্পিত, বিস্মিত সুরে অমিয়েন্দু বলিল,—"বৌদি! তুমি এ সব কি বলছ? আমি ত' কিছুই বুঝতে পারছিনে।"

"আরও স্পষ্ট করে বলতে হবে কি?" অজিতার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল, কিন্তু সবলে লজ্জাকে দমন করিয়া সে কহিল,—"জানি তোমার খুবই লাগবে। কিন্তু, তোমার চিকিৎসার দরকার হয়ে পড়েছে ঠাকুরপো। একটা তুচ্ছ মেয়ের জন্যে কেন তোমার জীবন এমন ভাবে নষ্ট করছ? তোমার মানসীর কাণ্ড শুনলে, আর তোমারও অত সহিষ্ণুতা থাকবে না, তুমিও অসহিষ্ণু হয়ে উঠবে।"

"ভূমিকা ত' অনেকই করলে বৌদি। আসল কথাটা শুনতে পাইনে?"

অজিতা খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া, অবশেষে গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া কহিল,—"তোমায় আর কি বলব ঠাকুরপো! সে গত বছর বাপ মারা যাওয়ার পর, কোথায় হঠাৎ চলে গেছে।"

"কোথায়?"

অমিয়েন্দুর বিস্মিত দৃষ্টির উপর তীক্ষ্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ব্যঙ্গ স্বরে অজিতা কহিল, "জানি না—বোধ হয়, নরকে!"

মরণাহতের মতই পাংশু মুখে, আর্ত্তস্বরে অমিয়েন্দু কহিল, "বৌদি!"

তাহার বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া অজিতার মুখের অবজ্ঞার কয়েকটি রেখা মিলাইয়া করুণ, কোমল হইয়া উঠিল।

ব্যথিত স্বরে সে কহিল,—"ঠাকুরপো, এত অল্পতে কাতর হ'লে কি চলে ভাই? পুরুষ মানুষ তুমি।"

বহুক্ষণ নতমুখে পাষাণের মতই স্তব্ধ হইয়া অমিয়েন্দু দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর সুদীর্ঘ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া তিক্ত সুরে কহিল, "হু।—তা আমায় কি করতে বল?"

আশান্বিত হইয়া অজিতা কহিল, "ঠাকুরপো! এর আর বলাবলির কি আছে ভাই? তুমি বিয়ে করে সংসারী হও, এই আমরা চাই। মা'র শেষ ইচ্ছাটাও পূর্ণ হয়।"

বাঙ্গ হাসি হাসিয়া তীক্ষ্ন বিদ্রূপের স্বরে অমিয়েন্দু কহিল, "তাই নাকি? আচ্ছা। সেই চেষ্টাই না হয় করা যাবে।।"

অজিতা এই হাসিকেও ভুল করিল, উৎফুল্ল মুখে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

নির্ম্মলেন্দু হাসিমুখে গৃহে প্রবেশ করিয়া কহিলেন,—"যাহোক অমিয়, তোর যে এত দিনে সুমতি হয়েছে, এও আমাদের অনন্ত ভাগ্য! তা'হলে এইত ঠিক ভাই?"

"কি ঠিক?"

ভ্রাতার ভ্রূকুটি-কুটিল আরক্ত মুখের দিকে সাশ্চর্য্যে চাহিয়া বিস্মিত সুরে নির্ম্মলেন্দু কহিলেন,—"বিয়ের কথা কি তাহলে সত্যি নয়?"

"না,—না—না—" তিক্ত, বিরক্ত সুরে অমিয়েন্দু কহিল, "তোমাদের অনেক অত্যাচার সহ্য করেছি, কিন্তু আর নয়। এইবার তোমরা আমায় মুক্তি দাও।"

ব্যথিত সুরে নির্ম্মলেন্দু কহিলেন,—"অমিয়, তোমার এখন মন ভাল নেই, এ সব কি বলছ?"

বিকৃত কণ্ঠে অমিয়েন্দু কহিল, "যা বলছি, ঠিকই বলছি। তোমাদের সংশ্রব আমি একেবারেই বর্জ্জন করতে চাই। হাঁ, আমি আর সইতে পারছিনে। আমার ভাগের বিষয়ের ন্যায্য দাম ধরে দিও, আর আমি এখানে আসব না।"

বজ্রাহতের মতই নিস্পন্দ হইয়া নির্ম্মলেন্দু দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইয়া সুগভীর ঘৃণায় কহিলেন,—"বেশ, তাই হবে। তোমার সংশ্রব আমাদের পক্ষেও বাঞ্ছনীয় নয়।" তিনি ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেলেন।

অজিতা একবার আসিয়া তাহাকে চুপি চুপি বুঝাইয়াছিল বই কি! কিন্তু, তাহাকে সংকল্পচ্যুত করিতে পারে নাই।

—৫—

তাহার পর, এই দীর্ঘ সাত বৎসর সে নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করিতেছে। সমস্ত নারী জাতিটার উপরে যেন বিজাতীয় ঘৃণায় তাহার সারা অন্তঃকরণ পুড়িয়া খাক্ হইয়া গিয়াছে। সেই ভস্মস্তূপের উপর আর কাহাকেও বসাইবার কল্পনা পর্য্যন্ত সে করে না।

সেই লাজুক, নম্র যূঁই ফুলটির মতই পবিত্র সুদেষ্ণা সেই যে এত বড় নিষ্ঠুর ও নির্লজ্জ কাজ করিতে পারে ইহা যে স্বপ্নেরও অগোচরে ছিল। কিন্তু, ইহা যে, দিবালোকেরই মত রূঢ় সত্য, না বিশ্বাস করিয়াই বা উপায় কি?

মাঝে মাঝে এক ঝলক দখিনা বাতাসের মতই মাধুরী আসিয়া তাহার নিঃসঙ্গ জীবন ভরাইয়া দিয়া যায়। না হইলে সে বোধ হয় পাগল হইয়া যাইত।

কিন্তু, অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে সেই পলাতকা সুদেষ্ণার জন্যই এত মধু সঞ্চিত ছিল! কত জ্যোৎস্না রাত্রি বৃথাই চলিয়া গিয়াছে। কত কোকিলকূজিত, মাদকতাময়ী, পুষ্প-সৌরভে ভরা বসন্ত রাত্রি, কত বারি ঝর-ঝর বর্ষারাত্রি, শালের বনের কাতর গুমরানি ধ্বনির মধ্য দিয়াই চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই সব ব্যর্থ রজনীর মধ্যেই যে সে এই রজনীর আগমন ধ্বনিরই শুধু প্রতীক্ষা করিয়াছিল,—এ কথা কি সত্য নহে?

অমিয়েন্দুর নিজের কাছে আজ স্বীকার করিতে বিন্দুমাত্রও লজ্জা নাই।

সুদেষ্ণার মাথার উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে একটি গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সে কহিল, "উঃ—জ্বরে যে গা' পুড়ে যাচ্ছে,—রাত আর কত?"

"হাঁ; তাহার জীবনের অমানিশা পোহাইবারই বা দেরী আর কত? এই ক্ষীণ এক ফালি চাঁদ কি তাহার গাঢ় অন্ধকার দূর করিতে পারিবে?"

অমিয়েন্দুর মুখে ধীরে ধীরে একটু ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল। দূর হউক। সে এসব কি ভাবিতেছে! এই রুগ্ন নারী বাঁচিবে কিনা তাহারই স্থিরতা নাই। আর যদি বাঁচিয়াই উঠে, অমিয়েন্দু কিসের জোরে তাহাকে ধরিয়া রাখিবে।

অবশেষে সে রাত্রিও প্রভাত হইল।

এক কাপ চা লইয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া মুকুন্দ স্তাম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অমরেন্দু কহিল,—"মুকুন্দ! শীগ্‌গির যা, ডাক্তারবাবুকে ডেকে আন। এ'র বড় অসুখ।"

সেই মলিন-বসন পরিহিতা ভিখারিণীর দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মুকুন্দ ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল। নাঃ—বড়লোকদের মেজাজ বোঝা সত্যই দুষ্কর! বিশেষ করিয়া তাহার বাবুর! এই ভিখারিণীকে সে কতদিন ভিক্ষা করিয়া ফিরিতে দেখিয়াছে। ডাক্তার লইয়া মুকুন্দ যখন ফিরিল, তখন সেই ঘরেরই সামনের বারান্দায় চিন্তিত মুখে অমিয়েন্দু পায়চারী করিতেছিল, ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল।

ডাক্তারও সুদেষ্ণাকে দেখিয়া, চমকিয়া উঠিলেন। তাহার-পর ইতস্তত করিয়া বলিলেন, "মাপ করবেন অমিয়বাবু! ইনি কি আপনার কোন আত্মীয়া?"

অমিয়েন্দুর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। অস্ফুট স্বরে সে কহিল, "হ্যাঁ—আমার স্ত্রী।"

বাহিরে মুকুন্দ অবিশ্বাসের ভরে মাথা নাড়িল। ডাক্তারের মুখেও তাহারই ছোপ্ লাগিল। কিন্তু তিনি আর কোন প্রশ্ন না করিয়া মনোযোগের সহিত সুদেষ্ণাকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। খানিকপরে তিনি কহিলেন, "যা, আশঙ্কা করেছিলাম তাই। ডবল নিউমোনিয়া। শরীরের যা অবস্থা, খুবই শুশ্রূষার দরকার। আমি হাসপাতাল থেকে এখুনি একজন নার্স পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

"তাই দেবেন।"

ভিজিটের টাকা দিয়া, অমিয়েন্দু কহিল,—"জীবনের আশঙ্কা আছে না-কি?"

"খুব বেশী রকমই আছে।" তাহারপর অমিয়েন্দুর মুখের দিকে চাহিয়া, নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইয়া ডাক্তার কহিলেন, "—প্রথম দিকে, রোগ একটু জটিল থাকেই ত অমিয়বাবু। দু'এক দিনের মধ্যেই ভালর দিকে মোড় নেবে।"

"আচ্ছা নমস্কার।" অমিয়েন্দু তাঁহাকে গেট অবধি আগাইয়া দিয়া আসিল.

—৬

নার্স আসিয়া ইতিমধ্যেই সুদেষ্ণাকে তদ্র করিয়া তুলিয়াছে। অমিয়েন্দু কলেজ হইতে আসিয়া প্রথমেই সেই ঘরে ঢুকিল।

ঘরের আর ধূলা-বালির লেশমাত্রও নাই। আয়নার মত ঝকঝকে মেঝে। তাহারই একটি চিলাহাত পাঞ্জাবী ও সরুপাড় ধোয়াধুতি পরিয়া জ্বরতপ্ত রঙীন মুখে সুদেষ্ণা শুইয়া আছে।

নার্স তাহার পাতলা চুলগুলি সযত্নে আঁচড়াইয়া দিয়াছে। পার্শ্বেই একটি টিপায়-এর উপর ঔষধের শিশি, মেজারগ্লাস, ফলের রসটুকুও সযত্নে ঢাকা দেওয়া। ইজিচেয়ারে বসিয়া, নার্স সুদেষ্ণার মাথায় 'আইসব্যাগ' ধরিয়া ছিল।

অমিয়েন্দু প্রবেশ করিতেই নার্স চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। হাত বাড়াইয়া অমিয়েন্দু কহিল, "দিন এবার ওটা আমায়। অনেকক্ষণ একভাবে বসে আছেন, এইবার একটু বিশ্রাম করুনগে।"

নার্স একটু ইতস্ততঃ করিয়া, অবশেষে বাহির হইয়া গেল। অমিয়েন্দু তাহারই পরিত্যক্ত ইজিচেয়ারটায় বসিয়া পড়িয়া আইসব্যাগটি সুদেষ্ণার মাথার উপর চাপিয়া ধরিল। কখন যে তাহার চোখ হইতে জল গড়াইয়া পড়িয়া সুদেষ্ণার রুক্ষ কেশ সিক্ত করিতেছিল অমিয়েন্দু লক্ষ্য পর্যন্ত করে নাই। বিকারের ঘোরে সুদেষ্ণা একবার শুধু চীৎকার করিল,—দেখুন অমিয়বাবু, আপনার সন্ধান করতেই আজ আমি ভিখারিণী। আমি পলাতকা, কলঙ্কিনী নই—বিশ্বাস করুন।

ডাক্তার ও নার্স সেই মুহূর্তে ঘরে প্রবেশ করিতে অমিয়েন্দুর ধ্যান ভাঙ্গিল। লজ্জিত হইয়া সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর, তাহার অশ্রুসিক্ত মুখ লুকাইবার জন্যই তাহাদের কোন সম্ভাষণ পর্যন্ত না করিয়া জানলার কাছে সরিয়া দাঁড়াইল।

যখন রুমালে তাহার চোখের জল মুছিয়া বহু আয়াসে নিজেকে সম্বরণ করিয়া সে তাঁহাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন ডাক্তার নিবিষ্টচিত্তে সুদেষ্ণাকে পরীক্ষা করিতেছেন। তাঁহার মুখ চিন্তাকুল। পার্শ্বে ঈষৎ বিস্মিতমুখে নার্স দাঁড়াইয়া আছে।

অমিয়েন্দু যথাসাধ্য সহজ স্বরে প্রশ্ন করিল,—"কেমন দেখছেন?" চমকিয়া ডাক্তার মুখ তুলিলেন। অমিয়েন্দুর আরক্ত চোখ-মুখের দিকে চাহিয়া ক্ষণকাল ইতস্তত করিয়া তিনি কহিলেন,—"শ্বাস কষ্ট আরম্ভ হয়েছে। অক্সিজেন আনতে হবে। আর অন্য ডাক্তারও ডাকতে পারেন।" মৃতের মত পাংশু মুখে অস্ফুট স্বরে অমিয়েন্দু কহিল,—"আচ্ছা।"

দখিনা বাতাস বৃথাই সে ঘরে ফুলের সৌরভ বহিয়া আনিল। চাঁদের আলো বৃথাই সুদেষ্ণার বক্ষের উপর লুটাইয়া পড়িল। রোগ-পাণ্ডুর সুদেষ্ণার ললাটের উপর, বারম্বার চুম্বন করিয়া অমিয়েন্দু কহিল,—"সুদেষ্ণা! সত্যিই কি তুমি চললে?—আমায় একটি কথাও কি বলে যাবে না?"

কিন্তু, বিকারের ঘোরে সুদেষ্ণা আর একটি কথাও বলিল না, তাহার বিবর্ণ মুখ দারুণ শ্বাসকষ্টে আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

কিছুক্ষণ পরেই অক্সিজেন সিলিণ্ডার আসিল। ডাক্তারে ডাক্তারে ঘর ভরিয়া উঠিল। বাহিরে অমিয়েন্দুর কলেজের ছাত্র এবং শহরের লোকের ভীড় জমিয়া উঠিল।

ইতিমধ্যে কি জানি কেমন করিয়া রটিয়া গিয়াছে, অমিয়েন্দুর নিরুদ্দিষ্টা স্ত্রী ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু, অমিয়েন্দু কাহারও কৌতূহল চরিতার্থ করিল না; সে বাহির হইল না

শেষ রাত্রে সুদেষ্ণার জীবনের অবসান হইল। তাহার বিমুগ্ধ ছাত্রের দল তাহার সহিত নতশিরে, শবানুগমন করিয়াছিল। তাহারা পরস্পরে বলাবলি করিতেছিল, জীবনে তাহারা অনেক লোক দেখিয়াছে, কিন্তু এমন মহৎপ্রাণ ব্যক্তির সংস্পর্শে কখনও আসে নাই! তাহাদের জীবন সার্থক হইয়াছে।

তাহাদের আলোচনা শুনিয়া অমিয়েন্দুর মুখ তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের হাসিতে ভরিয়া উঠিল।

সত্যই কি সে মহৎপ্রাণ? তাহা হইলে সুদেষ্ণার অন্বেষণ করে নাই কেন? লোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া দীর্ঘ একাদশ বর্ষ পর্যন্ত কি বলিয়া তাহাকে বিস্মৃতির গহ্বরে ফেলিয়া রাখিল? তাহার হৃদয় রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী সুদেষ্ণা যে শেষে ভিক্ষা পর্যন্ত করিয়াছে!

তাহার মিথ্যা কলঙ্কের জন্য অমিয়ই কি দায়ী নয়? কি কারণে সে গৃহত্যাগ করিয়াছিল, তাহা কে বলিতে পারে?

* * *

"বৌদি! ওদিকে কোথায় যাচ্ছ? ওদিকে ত' তুলসী তলা নয়।"

মাধুরী একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ননদের দিকে চাহিল, তাহারপর, একটি প্রদীপ ও ফুলের সাজি লইয়া এক কণ্টকাকীর্ণ প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একটি মার্বেলনির্মিত ক্ষুদ্র মন্দির। মন্দিরে কোন মূর্ত্তি নাই। মাধুরী প্রদীপটি মন্দিরের ভিতর রাখিয়া সাজি হইতে ফুল লইয়া মন্দিরের ভিতর রাখিয়া গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিল। তাহার চোখ দুইটি তখন অশ্রু পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। মনে মনে বলিল,—"কাকাবাবু—ইচ্ছে ছিল, এসব জঙ্গল কাটিয়ে একটা বাগান করব', কিন্তু কিছুই করতে পারলাম না। তোমার অযোগ্য সন্তানকে মার্জ্জনা কর।" তাহার পর আঁচলে চোখ মুছিয়া, বহুবারের পড়া মন্দিরের লেখাটির দিকে চোখ তুলিয়া চাহিয়া, আবার পড়িল:

"—একটি অভাগী নারীর চিতাভস্ম এইস্থানে আছে। যদি কেহ ঘৃণা না কর, প্রতি সন্ধ্যায় একটি দীপ জ্বালিয়া কিছু গন্ধপুষ্প দিতে ভুলিও না। তাহার আত্মা শান্তি লাভ করিবে।"

* * * * *

এক বর্ষণমুখর সন্ধ্যায়, অজিতার উপন্যাস পাঠে বাধা জন্মাইয়া শিশির কহিতেছিল, "হ্যাঁ, মা, কাকাবাবু প্রফেসরি ছেড়ে দিয়ে কোথায় গেলেন? আচ্ছা মা, দিদিদের বাড়ীটা তুমি দেখেছ? সেখানে একটা মন্দির আছে, দেখেছ মা? মন্দিরটির গায়ে, কত কি লেখা! হ্যাঁ মা, সেটা কার মন্দির?"

অজিতার মুখ বাহিরের আকাশের মতই অন্ধকার হইয়া উঠিল। বাহিরের বর্ষার মতই তাঁহার চোখেও বর্ষা নামিবার উপক্রম হইল যে! বারম্বার নিজেকে সামলাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে করিতে অবশেষে শিশিরকে বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিয়া রোদন কম্পিতস্বরে অজিতা কহিল, "শিশির।—বড় হয়ে তুমি সবই জানবে। ওটা সুযেশের, তোমার কাকীমার স্মৃতি মন্দির।"

বাহিরের ঘরে তখন নির্ম্মলেন্দু একটা পুরোনো এ্যালবাম খুলিয়া বসিয়া ছিলেন। একটি প্রফুল্লমুখ যুবকের ছবির দিকেই তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। সে ছবি—অমিয়েন্দুর। অজিতা ধীরে ধীরে তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর গাঢ়স্বরে কহিল, "ঠাকুরপোর কোন চিঠি-পত্র পেলে কি?"

নির্ম্মলেন্দু চকিতে তাহার দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন। তাঁহার সজল চোখের সহিত স্ত্রীর বাষ্পাকুল চোখ মিলিল। দুজনেই মনের কথা পাঠ করিয়া ফেলিয়াছেন।

অজিতা তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িয়া ধীরে ধীরে তাঁহার হাত নিজের হাতের ভিতর তুলিয়া লইয়া কহিল, "হ্যাগা,—কিছুতেই কি তাকে ফিরিয়ে আনা যায় না?"

মৃদুস্বরে নির্ম্মলেন্দু কহিলেন, "তাকে আমরা যত খারাপ মনে করতাম,—সে তা' নয় জিতা। এই দেখ, তার দান-পত্র; সে তার বাড়ীটা আর দশ হাজার টাকা মাধুকে দিয়েছে আর চল্লিশ হাজার টাকা শিশিরকে দিয়েছে। নিজে সে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেশ ভ্রমণের জন্য রেখেছে।"

অজিতা চোখের জল মুছিতে মুছিতে কহিল, "তুমি কি তাকে চিঠি লিখেছিলে?"

"না, জিতা। সেই আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে চিঠি লিখেছে। লিখেছে, এটাকা নিতে যেন আমরা অস্বীকৃত না হই।"

দুজনেই পরস্পরের দিকে চাহিয়া নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তখন বাহিরে ঝড়ের মাতামাতি সুরু হইয়া গিয়াছে।

বৃষ্টির অবিরাম বর্ষণধ্বনি যেন কাহার জীবনের ব্যর্থতার করুণ রাগিণীই গাহিয়া ফিরিতেছিল।

—শেষ—

কী হ'বে দুঃখ করে?

প্রজেশকুমার রায়

কী হ'বে দুঃখ করে?
জীবনে অনেক যন্ত্রণা,—তবু
কী হ'বে দুঃখ করে?

রূপ-অমৃত পান করে' নাও,
নাও দু'টি আঁখিভরে,—
পান করে' নাও, পান করে নাও,
যত পার আঁখিভরে—
কী হ'বে দুঃখ করে?

কী হ'বে দুঃখ করে?
কী হ'বে দুঃখে মরে?
যত ক্লেদাক্ত আঁধার কূপেও
সূর্য্যের আলো পড়ে,
স্বর্গের আলো পড়ে—
যত কুশ্রীতা, রূঢ়তার'পরে
চাঁদের আলো তো ঝরে,—
স্বপ্ন-মায়া তো ঝরে—
কী হ'বে দুঃখ করে?

কী হ'বে দুঃখ করে?
যত বিক্ষোভ-ক্ষোভ ভুলে' যাও
ভালবেসে সুন্দরে,—
আপনারে যাও ভুলে, যাও, যাও
ভালবেসে সুন্দরে—
রূপ-অমৃত-পরমামৃতে
নাও, নাও আঁখিভরে—
কী হ'বে দুঃখ করে?

আপন মুণ্ড লইয়া লোফালুফি ?

ছাবতে মনে হইলেও প্রকৃতই কিন্তু তরুণীটি আপন মুণ্ড লইয়া খেলিতেছে না—মুণ্ডটির মালিক সে নয়—অপর এক তরুণী। কেমেরার যাদু পঞ্চদশী মিস্ লারকিনকে করিয়াছে মুণ্ডহীন এবং সপ্তদশী মিস লি'র মুণ্ডটি ভিন্ন দেহের অন্যান্য অংশ অদৃশ্য করিয়াই ফেলিয়াছে। এই বয়সের স্কুল

বালিকাগণ রিভিয়েরা তীরে সাগর জলোপভোগ করিতে আসিয়া প্রায়ই 'মাথা হারানো'—দেহেরই বাস্তব অভিব্যক্তি প্রদর্শন করাই তরুণীদ্বয়ের উদ্দেশ্য। নহিলে সত্যই আপন মুণ্ড হারাইয়া অপরের মুণ্ড লইয়া টানাটানি করা পঞ্চদশীর অভিপ্রেত নয়—অমন কাড়াকাড়ি করিয়া লাভও নাই বিশেষ কিছু। কারণ উহা ত আর গণেশের মুণ্ড নয়।

নূতন ধরণের বারুদ

মেক্সিকো সিটির জেন্‌জি লোপেট এক নূতন ধাঁচের বারুদ আবিষ্কার করিয়াছেন যাহার বিস্ফোরণ সম্ভব হয় গ্যাসোলিন্ (gasoline) এবং অক্সিজেনের যথাযোগ্য মিলনে আর বন্দুকে পুরিয়া দাগাইবার ব্যবস্থায়। ইহার বিস্ফোরণ শক্তি যেমন প্রচলিত বারুদ অপেক্ষা অনেক বেশী, তেমনি উহার প্রস্তুত-ব্যয়ও ঢের কম। ইহা ছাড়া আরও বিশেষত্ব উহার এই যে, আপনা-আপনি বিস্ফোরণ হইবার কোনও আশঙ্কা নাই, সামান্য আঘাত, অধিক তাপ বা ঘর্ষণেও ইহা দ্বারা প্রস্তুত গোলাগুলীর উপর কোন অনিষ্টকর প্রভাব বিস্তার করে না। দুইটি পৃথক প্রণালীতে ইহার দাগিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে—একটি হইল শেল-য়ের ভিতর স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠে গ্যাসোলিন ও ক্লোরেট অফ্ পটেসিয়াম থাকে, এবং প্রচলিত পিন্ প্রথায় দাগা হয়। দ্বিতীয়টি হইল—এই বারুদের জন্য নূতন ধরণের বন্দুক ব্যবহার; ক্লোরেট অফ্ পটেসিয়াম সম্বলিত শেল্-য়ে গ্যাসোলিন প্রবিষ্ট করা হয়, সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎশক্তিতে বন্দুক দাগা হয়। গ্যাসগুলির দাহন-কার্য্য বন্দুকের নলের ভিতর শেষ হয়, সুতরাং কোনও অগ্নি-শিখা দেখা যায় না বন্দুকের নলের মুখে। গোপনে বন্দুক ছোড়ার পক্ষে উহা বিশেষ উপযোগী, বিশেষ করিয়া রাত্রিযোগে।

আজব গুদাম-ঘর

ব্যাংক প্রভৃতির ষ্ট্রং-রুমে যে প্রকার মজবুত দরজা দেওয়া হয় চোরের অভিযান প্রতিরোধ করিবার জন্য—গোলাবাড়ীর এ গুদাম-ঘরেও সেই প্রকার দরজার ব্যবস্থা। কনক্রিটে নির্ম্মিত এই গুদাম-ঘরটি শুধু চোরের অপপ্রয়াসকেই রুখিবে না,
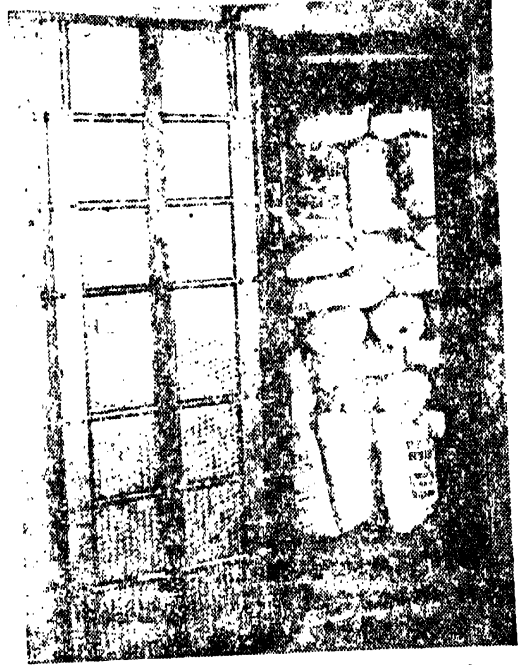
আগুন, ইঁদুর প্রভৃতির প্রকোপ হইতেও মালপত্র রক্ষা করিবে। তাহার উপর আবার ইহাতে 'এয়ার কন্ডিশন্ড্' ব্যবস্থা রহিয়াছে। গুদামে ২৫০০ বুশেল ফসল রাখার স্থান রহিয়াছে; ২৫০০ বুশেল প্রায় ৬০০ মণ ওজনের সমান। ব্যবসায়ীর লাভের অংক অনায়াসেই অনুমান করা যায়—যে আপন সংগৃহীত ফসল এমন মূল্যবান কক্ষে 'এয়ার কন্ডিশনড' অবস্থায় রক্ষা করিতে পারে।

অদৃশ্য আলোক

অদৃশ্য আলো বা কালো আলোক আবিষ্কৃত হইবার পর উহা রংগমঞ্চেই ব্যবহৃত হইতেছিল, কারণ উহাদ্বারা নানা রহস্যময় দৃশ্যের অবতারণা সম্ভব। বর্ত্তমানে উহাদ্বারা বিজ্ঞাপন প্রচারের ব্যবস্থা হইয়াছে। চাহিদা বৃদ্ধির জন্য সাধারণ লণ্ঠনের ন্যায় "কালো ল্যাম্প" (Black Lamp) নির্ম্মিত হইয়া প্রচুর সংখ্যায় বিক্রীত হইতেছে। অদৃশ্য আলো সাধারণ বিদ্যুৎশক্তিতেই নিয়ন্ত্রিত হয়, কিন্তু

ইহাতে আল্ট্রা-ভায়োলেট রশ্মিই থাকে বেশীর ভাগ। বিশেষ উপাদানে গঠিত পদার্থের উপর পতিত হইলে, এই অদৃশ্য আলোক-রশ্মির ফলে পদার্থটি রেডিয়াম প্রভৃতির ন্যায় জ্বলজ্বল করে অথচ ল্যাম্প হইতে বিচ্ছুরিত রশ্মি নয়নগোচর হয় না: কারণ যে ঘোর রঙের কাচের আবরণে ল্যাম্পটির শিখা ঢাকা, সেই আবরণ ভেদ করিয়া অদৃশ্য আলো ভিন্ন অন্য কোন রশ্মি বাহির হইতে পারে না। রঙ্গমঞ্চের শাদা আলোকে প্রদর্শিত দৃশ্যকে সহসা শাদা আলোক নির্ব্বাণ ও কালো আলোর উন্মেষে এক বিচিত্র সজ্জায় পরিণত করা যায়। স্বল্প আলোকিত কিম্বা অন্ধকার স্থানে এইজন্য "কালো ল্যাম্প" সাহায্যে বিজ্ঞাপন প্রদর্শন অনেক স্থানে রেওয়াজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রাচীন বেবিলোনিয়ায় বাড়ী বিক্রয়

সমগ্র একখানি বাড়ী মায় চারিদিকের খোলা জমি সমেত মাত্র পৌনে দুই ডলার মূল্যে বিক্রয় হইয়াছিল। আধুনিক ক্রেতাদের নিকট নিতান্ত লোভনীয় দাঁও ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বাড়ীটি বিক্রয় হইয়াছিল ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বের বেবিলোনিয়া রাজ্যে।

রিচার্ড এ মার্টিন কিছুদিন পূর্ব্বে ইরাকের কিশ নামক শহরে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান পরিচালনা কালে একখানি দলিল প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহাতে নিম্নলিখিত প্রকার বিক্রয়-বার্ত্তা পাওয়া যায়:—

"এই দলিল ঘোষণা করিতেছে যে, আমাতিলা, পিতার নাম (নামের স্থান কীটদষ্ট), বয়স ৩৭, বিধবা—শংনুমুশদা নামক নারীর বাসগৃহে সংলগ্ন সমুদয় জমি সমেত ছয় এবং পাঁচ-ষষ্ঠ শেকেল রৌপ্য মূল্যে ক্রয় করিল। শংনুমুশদার পিতা সিন মালিক এবং মাতা উম্মি ওয়াকাৎ। ....(ইহার পর বাড়ীর সীমানা চৌহদ্দি রহিয়াছে)......বিক্রয় সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয় এই চুক্তির পবিত্রতা সম্বন্ধে দেবতা জাবাবা ও মারদুকের নামে এবং রাজা সিন মুবালিৎ-য়ের নামে শপথ করিতেছে। এই সঙ্গে পনর জন সাক্ষীর নাম স্বাক্ষরিত হইল, তাহাদের উপস্থিতিতে এই চুক্তি সম্পন্ন হইল।"

দলিলের নিম্নাংশে সাক্ষীদের নামের তালিকা দলিল লেখকের হস্তাক্ষরে লিখিত, বোধ হয় লেখক ভিন্ন অন্য কেহ লিখিতে জানিত না।

এক শেকেল বর্ত্তমানের প্রায় ২৫ সেণ্ট-য়ের সমতুল্য। সুতরাং বাড়ীটির মূল্য পড়িয়াছিল প্রায় পৌনে দুই ডলার।

আরও উল্লেখযোগ্য যে, সেকালে সমগ্র বাড়ীখানির ভিতর ক্রেতার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান ছিল উহার দরজাগুলি, কারণ কাঠ সে সময়ে যেমন দুষ্প্রাপ্য ছিল, তেমনই মূল্য ছিল তাহার অতি উচ্চ। একটি ভেড়ার মূল্য ছিল ২ শেকেল এবং একজোড়া কাঠের দোর-পাল্লার মূল্যও ছিল তাহাই।

পুস্তক পরিচয়

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু—শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস এম-এ প্রণীত। মূল্য দেড় টাকা। প্রকাশক—শ্রীভুবনমোহন মজুমদার, শ্রীগুরু লাইব্রেরী; ২০৪ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের জীবনী। বিশ্বেশ্বরবাবু বাঙলা সাহিত্যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার 'রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র' পড়িয়া আমরা সুখী হইয়াছি। রাষ্ট্রপতির বাল্যজীবন হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিপুরী কংগ্রেসে সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া তাঁহার ত্রিপুরী যাত্রা পর্য্যন্ত, তাঁহার বৈচিত্র্যময় জীবনের বহু তথ্য এই পুস্তকে পাঠক-পাঠিকারা পাইবেন। দুঃখব্রতী দেশপ্রেমিকের ত্যাগপূত জীবনের প্রভাব চিত্তকে উন্নত করে, পবিত্র করে এবং দেশ ও জাতির সেবার মধ্যে আনন্দ রসের আস্বাদনে উন্মাদনা জাগায়। ঘরে ঘরে এ পুস্তকের প্রচার হওয়া বাঞ্ছনীয়। ছাপা, বাঁধাই অতি সুন্দর।

স্মল পক্স (বসন্ত রোগ)—ইংরেজী পুস্তক। নগেন্দ্রকুমার মজুমদার প্রণীত। মূল্য আড়াই টাকা। অধ্যাপক জে কে চৌধুরী এম-এ; ২১৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। ময়মনসিংহের শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার মজুমদার মহাশয়ের বসন্ত রোগ চিকিৎসক হিসাবে বিশেষ খ্যাতি আছে। ৩৪ বৎসরকাল এই রোগ-চিকিৎসায় তাঁহার অভিজ্ঞতা। পুস্তকখানি তাঁহারই লিখিত। এই পুস্তকে দেশীয় মতে বসন্ত রোগ চিকিৎসার বিধান দেওয়া হইয়াছে। রোগের নির্ণয়, লক্ষণ, নিদান, প্রতীকার এবং ঔষধ প্রভৃতির সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য পুস্তকে পাওয়া যাইবে। যাঁহারা চিকিৎসক তাঁহারা ব্যতীত, যাঁহারা সাধারণ লোক তাঁহারাও এই পুস্তকের সাহায্যে বসন্ত রোগের প্রতীকার, প্রতিবিধান এবং চিকিৎসার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারিবেন। আমরা এ পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

নীল সাগরের পারে—শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। মূল্য ছয় আনা। প্রকাশক—শ্রীবিনয়ভূষণ মিত্র, ১৬৭।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ছেলেদের বই। লেখা চিত্তাকর্ষক। কয়েকখানা ভাল ছবি আছে। ছেলে-মেয়েদের মধ্যে এই বইয়ের আদর হইবে।

প্রবর্ত্তিকা—শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ। মূল্য তিন আনা। প্রকাশক—পণ্ডিত শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ; ১১৩ তারক প্রামাণিক রোড, কলিকাতা। পুস্তিকাখানিতে ছয়টি কবিতা আছে। ছন্দেতে একটু নূতনত্ব আছে। ভাষার লালিত্য এবং মাধুর্য্য গৌরগোপাল বাবুর বৈশিষ্ট্য। 'বর্ষা' কবিতাটি আমাদের ভাল লাগিয়াছে।

সাহিত্য-সংবাদ

কবিতা প্রতিযোগিতার ফল

...তপূর্ব্বে 'দেশে' রূপলেখা সাহিত্য-মন্দিরের উদ্যোগে ...বিতা প্রতিযোগিতার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার ...নিম্নে দেওয়া হইল :—

১ম—শ্রীপ্রণবকৃষ্ণ রায়-চৌধুরী, সম্বলপুর, উড়িষ্যা; ...র নাম 'যুগের আলো'।

২য়—শ্রীশশাঙ্ককুমার পাত্র, দেবগ্রাম, নদীয়া; কবিতার ...'যুগান্তর'।

মার্চ্চ মাসে আমাদের যে বাৎসরিক উৎসব হইবে, ...সময় লেখকগণকে পুরস্কার দেওয়া হইবে। ইতি—

শ্রীবিজনকুমার রায়, সম্পাদক, বরিষা রূপলেখা সাহিত্য-...র, মাঝেরহাটী, ২৪ পরগণা।

নিখিল বঙ্গ কবিতা প্রতিযোগিতার ফলাফল

গত ১৯৩৮ সালের ৩রা ডিসেম্বর 'ঝিকারগাছা নবীন ...তি কর্ত্তৃক 'দেশ' পত্রিকায় যে 'শরৎ' শীর্ষক বাঙলা কবিতা ...যোগিতা ঘোষণা করা হইয়াছিল, তাহার ফলাফল নিম্নে ...ত হইল।

প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের শ্রীযুত সুনীতিকুমার ঘোষ (৪৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ...ফোর্ড ইউনিভার্সিটি মিশন হোষ্টেল)। তাঁহাকে একখানি ...পদক দেওয়া হইবে।

(স্বাঃ) শ্রীগোপীমোহন ঘোষ, শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাশ, যুগ্ম-...পাদক, ঝিকারগাছা নবীন সমিতি, যশোহর।

...গীয় মালাকার সম্মিলনীর প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ফলাফল

১ম পুঃ—শ্রীযুক্ত সত্যনারায়ণ দাস বি-এল ক্লাসের ছাত্র ...নলজারাটি বর্দ্ধ) একটি 'গোল্ড সেন্টার' রৌপ্যপদক; ...য় পুঃ—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকুমার মালাকার একটি রৌপ্যপদক; ...য় পুঃ—শ্রীযুক্ত অমরকুমার মালাকার একটি রৌপ্যপদক; ...র্থ পুঃ—শ্রীযুক্ত অনাদিভূষণ মালাকার একখানি পুস্তক ...তি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য—সুনীতি চট্টোপাধ্যায়); ৫মঃ পুঃ—...যুক্ত পূর্ণচন্দ্র মালাকার একটি রৌপ্যপদক; ৬ষ্ঠ পুঃ—...যুক্ত অমলকৃষ্ণ মালাকার একটি রৌপ্যপদক; ৭ম পুঃ—...যুক্ত খগেন্দ্রচন্দ্র মালাকার একটি রৌপ্যপদক; শ্রীযুক্তা কিরণময়ী মালাকার একটি রৌপ্যপদক; (মহিলাদের জন্য বিশেষ পুরস্কার)।

প্রথমে চারিটি পুরস্কার ঘোষিত হয়; কিন্তু অনেক-গুলি ভাল প্রবন্ধ পাওয়ার জন্য পুরস্কার সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। যাঁহারা এখনও পুরস্কার গ্রহণ করেন নাই তাঁহারা কে কোন্ ঠিকানায় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন সম্মিলনীর শাখা অফিসে জানান।

—শ্রীসুশীলকুমার মালাকার, সম্পাদক, বঙ্গীয় মালাকার সম্মিলনী; শাখা অফিস :—১২নং গোকুল বড়াল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রচনা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

রাজপুরস্থ "ছাত্র-সঙ্ঘে"র সমাবর্ত্তনী সাব-কমিটির পক্ষ হইতে একটি রচনা ও একটি আবৃত্তি প্রতিযোগিতা আহ্বান করা যাইতেছে। উভয় প্রতিযোগিতাতে কেবলমাত্র কলিকাতা ও ২৪-পরগণা জেলার স্কুল ছাত্র-ছাত্রীরাই যোগদান করিতে পারিবে। প্রবেশ মূল্য লাগিবে না। প্রবেশের শেষ দিন ৩১শে মার্চ্চ ১৯৩৯। আবৃত্তি প্রতিযোগিতাটি ২রা এপ্রিল অনুষ্ঠিত হইবে। প্রত্যেক বিষয়ের শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীকে একখানি করিয়া রৌপ্য পদক উপহার দেওয়া হইবে। আবৃত্তির বিষয় :—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" (চয়নিকা) রচনার বিষয় :—১। জাতীয় জীবনে প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা। ২। ছাত্র ও রাজনীতি। উপরোক্ত দুইটি বিষয়ের মধ্যে যে কোন একটি বিষয় লইয়া ফুলস্কেপ্ কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিতে হইবে। রচনা ফেরত দেওয়া হইবে না। প্রত্যেক প্রতিযোগীকে স্ব স্ব বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষরিত পরিচয়-পত্র পাঠাইতে হইবে।

নিম্ন ঠিকানায় প্রবন্ধাদি প্রেরিতব্য :—কালিদাস দত্ত, শ্রীশচন্দ্র বসু, যুগ্ম-সম্পাদক, সমাবর্ত্তনী সাব-কমিটি, ছাত্র-সঙ্ঘ, পোঃ আঃ—সোনারপুর, গ্রাম—রাজপুর বারেন্দ্রপাড়া, জেলা—২৪-পরগণা।

ছোট গল্প প্রতিযোগিতা

৫৩নং সার্পেণ্টাইন লেনের "ইষ্ট লাইব্রেরীর" উদ্যোগে আগামী এপ্রিল মাসে বাঙলা "ছোট গল্প" প্রতিযোগিতা হইবে। ছোট গল্পের জন্য গুণানুসারে তিনটি পদক পুরস্কার দেওয়া হইবে। গল্প একসারসাইজ খাতার ১৬ পৃষ্ঠার অধিক হইবে না। প্রেরিত গল্পের উপর লাইব্রেরীর সকল স্বত্ব ও অধিকার থাকিবে। গল্পের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের জন্য নির্ব্বাচিত কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া ধার্য্য হইবে। আগামী ১৫ই এপ্রিলের মধ্যে গল্প লাইব্রেরীতে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষ, সম্পাদক, ইষ্ট লাইব্রেরী; ৫৩, সার্পেণ্টাইন লেন, কলিকাতা।

(১২খানি রৌপ্যপদক পুরস্কার)

"সাথী সম্প্রদায়" কর্ত্তৃক গল্প ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গল্পের কোন নির্দ্ধারিত বিষয় নাই। প্রবন্ধ লিখিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির যে কোন একটি লিখিতে হইবে। (১) শরৎ-সাহিত্যে নারী, (২) ভারতের দারিদ্র্য—তাহার মূল ও প্রতীকার, (৩) সমাজ জীবনে নারীর স্থান। (৪) ভারতের নারী, (৫) মেয়েদের শিক্ষা, (৬) বাঙলা সাহিত্যে নারীর স্থান।

গল্প ও প্রবন্ধ উভয় বিভাগে ছয়খানি করিয়া বারখানি রৌপ্যপদক দেওয়া হইবে। মেয়েদের ও পুরুষদের পুরস্কার আলাদা আলাদা। ৩০শে এপ্রিল রচনা পাঠাইবার শেষ দিন। বিশেষ বিবরণের জন্য উপযুক্ত ডাকটিকিট-সহ নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

সম্পাদক—"সাথী সম্প্রদায়", ২৬।এ, আগামেহেদী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রচনা প্রতিযোগিতা

"যাত্রী" পত্রিকার উদ্যোগে একটি ছোট গল্প ও কবিতা প্রতিযোগিতা হইবে। গল্পটি ফুলস্কেপ্ কাগজের চার পৃষ্ঠার

অধিক না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অনুবাদ বা ভৌতিক গল্প চলিবে না। সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী ইহাতে যোগদান করিতে পারিবেন। একই নামে একের অধিক গল্প বা কবিতা পাঠান চলিবে। পাঠাইবার শেষ তারিখ ১৫ই চৈত্র, (২৯শে মার্চ্চ)। পুরস্কার—ছোট গল্পে দুইটি ও কবিতায় একটি থাকিবে।

১। গল্প :—১ম পুরস্কার—একটি রৌপ্য কাপ।

২য় পুরস্কার—একটি রৌপ্য কাপ।

২। কবিতা—১ম পুরস্কার—সত্যেন্দ্রনাথের 'কাব্যসঞ্চয়ন'।

শ্রীসত্যেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক—"যাত্রী", ১৭নং হরগঞ্জ রোড, পোঃ—সাল্কিয়া, হাওড়া।

সুধীরকুমার স্মৃতিপদক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

বর্দ্ধমান সাহিত্য সভা কর্ত্তৃক আগামী বৈশাখ মাসে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার দ্বারা একটি মূল্যবান রৌপ্যপদক প্রদত্ত হইবে। পুরস্কার প্রাপ্ত প্রবন্ধের লেখক ইচ্ছা করিলে পদকের পরিবর্ত্তে নগদ মূল্য (অন্যূন দশ টাকা) লইতে পারিবেন। প্রবন্ধের বিষয় হইতেছে, "রাঢ়ভূমির গ্রাম বা অঞ্চল-বিশেষের পুরাকাহিনী।" প্রবন্ধ চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সম্পাদকের নিকট প্রেরিতব্য।

শ্রীপ্রাণদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বি-এল, সম্পাদক, বর্দ্ধমান সাহিত্য সভা।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

(তৃতীয় গ্রন্থাগারিক শিক্ষাকেন্দ্র)

আগামী ১লা মে হইতে ভবানীপুর আশুতোষ কলেজে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্ত্তৃক যে গ্রন্থাগারিক শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হইবে, তাহাতে কেবলমাত্র গ্রন্থাগারে নিযুক্ত কর্ম্মী-গণকে এবং শিক্ষালয়ে গ্রন্থাগারের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকগণকে লওয়া হইবে। প্রবেশার্থিগণ অন্ততঃ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া চাই। তাঁহারা যেন নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষের সুপারিশ-সহ আবেদন পত্র অবিলম্বে শিক্ষাকেন্দ্রের অধ্যক্ষ ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের নিকট কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে প্রেরণ করেন। বাঙলার বিভিন্ন জেলার প্রবেশার্থিগণ যাহাতে শিক্ষাকেন্দ্রে যোগদান করিবার সমান সুযোগ পান, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হইবে। বোধ হয়, চট্টগ্রাম, বরিশাল, নোয়াখালি, ফরিদপুর, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বগুড়া, মালদহ, জলপাইগুড়ি ও দিনাজপুর জেলা হইতে এ পর্যন্ত কেহই শিক্ষাকেন্দ্রে যোগদান করেন নাই। যদি এই সকল জেলার গ্রন্থাগারগুলির সম্যক উন্নতি সাধন করিতে হয়, তাহা হইলে শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের আবশ্যকতা অপরিহার্য্য। আশা করা যায় যে, প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষগণ এ বিষয়ে সত্বর অবহিত হইবেন। শিক্ষার্থি-গণকে বাঙলা ভাষা ভিন্ন হিন্দী, উর্দ্দু, ফ্রেঞ্চ বা জার্ম্মান, অন্ততঃ যে কোন একটি অতিরিক্ত ভাষায় পুস্তক পাঠোপ-যোগী জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। শিক্ষাকেন্দ্রের অধ্যক্ষের নিকট এক আনার ডাকটিকিট-সহ পত্র লিখিলে নিয়মাবলী পাওয়া যাইবে।

শ্রীতিনকড়ি দত্ত, সাধারণ সম্পাদক। ৯।৩।২৯।

রচনা ও চিত্র প্রতিযোগিতা

বক্তারপুর (ঢাকা) বাণী-মন্দিরের উদ্যোগে নিম্নলিখিত প্রতিযোগিতাসমূহের আয়োজন করা হইয়াছে। যে কেহ এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারিবেন। দ্বিতীয় পুরস্কারটি স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে। প্রতিযোগিতায় প্রত্যেকের দুইটির বেশী রচনা বিবেচনা করা হইবে না।

১। প্রবন্ধ—"গোবিন্দ স্মৃতি" সুবর্ণ পদক। বিষয়—স্বভাব কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস—তাঁহার জীবনী ও কাব্য-প্রতিভা। প্রবন্ধটি ফুলস্ক্যাপ কাগজের কুড়ি পৃষ্ঠার মধ্যে লিখিতে হইবে। দ্বিতীয় স্থান অধিকারী স্কুল বা কলেজের ছাত্র-ছাত্রীকে একটি স্বর্ণখচিত রৌপ্যপদক পুরস্কার দেওয়া হইবে। প্রবন্ধ উপযুক্ত বিবেচিত হইলে মহিলাদের জন্য একটি বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হইবে।

২। যে কোন বিষয়ে একটি ছোট গল্প। ফুলস্ক্যাপ পৃষ্ঠার মধ্যে লিখিতে হইবে। ১ম পুরস্কার—"রমেশ স্মৃতি" সুবর্ণ পদক। ২য় পুরস্কার (স্কুল বা কলেজের ছাত্র-ছাত্রী) একটি স্বর্ণখচিত রৌপ্যপদক এবং মহিলাদের জন্য একটি বিশেষ পুরস্কার (যদি যোগ্য বিবেচিত হয়)।

৩। যে কোন বিষয়ে একটি সনেট। ১ম পুরস্কার "৺করুণ স্মৃতি" সুবর্ণ পদক। ২য় পুরস্কার একটি স্বর্ণ-খচিত রৌপ্যপদক।

৪। ছবি প্রতিযোগিতা :—ছবিটি দৃশ্য-চিত্র বা বিষয়-চিত্র (ভারতীয় জীবনের কোন ঘটনা) এবং তাহার সাইজ ৭" ইঞ্চি বাই ৫" ইঞ্চির মধ্যে হওয়া আবশ্যক। ১ম পুরস্কার—একটি স্বর্ণখচিত রৌপ্যপদক। ২য় পুরস্কার—একটি রৌপ্যপদক (মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত)।

লেখা ও ছবির ফলাফল শেষে যদি কেহ ইচ্ছা করেন, তবে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠাইলেই ফেরৎ পাইবেন। শুধু পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখাসমূহ আমাদের বার্ষিক সভায় পঠিত হইবে। লেখা ও ছবি ৩রা এপ্রিল, ১৯৩৯ তারিখ মধ্যে প্রতিযোগিগণ স্ব স্ব নাম ও ঠিকানা লিখিয়া নিম্নলিখিত যে কোন ঠিকানায় পাঠাইবেন। অন্যান্য কিছু জানিবার প্রয়োজন হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট-সহ নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

১। শ্রীসুধীরচন্দ্র নাগ, সাধারণ সম্পাদক, বক্তারপুর বাণী-মন্দির, ৮৪নং দেওয়ানবাজার রোড, ঢাকা।

২। শ্রীস্নেহলতা নাগ-বিশ্বাস, সম্পাদিকা, মহিলা বিভাগ, বক্তারপুর বাণী-মন্দির, গ্রাম ও পোঃ—বক্তারপুর, জিলা ঢাকা।

আগমনী সাহিত্য সঙ্ঘ

"আগমনী" সাহিত্য-সঙ্ঘের তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে আগামী ৪ঠা ও ৫ই চৈত্র (ইং ১৮ই ও ১৯শে মার্চ্চ '৩৯) শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকায় ও রবিবার বেলা সাড়ে তিন ঘটিকায় শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস ও শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয়দিগের পৌরোহিত্যে শ্রীরামপুর ইণ্ডিয়ান এসো-সিয়েশন হলে বর্দ্ধমানের অন্তর্গত বার্ণপুরে সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হইবে।

বাঙলা গবর্ণমেণ্ট আমেরিকার আর কে ও রেডিও পিকচার্সের তোলা "গঙ্গাদীন" ছবি এবং আর কে ও রেডিও পিকচার্সের তোলা "প্যাসিফিক লাইনার" ছবি বাঙলা দেশে প্রদর্শনী নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। "গঙ্গাদীন" ছবিখানিতে ভারতকে হীন ও বিকৃত করিয়া দেখান হইয়াছে।

"গঙ্গাদীন" ছবিখানির স্বরূপ কি তাহা হয়ত অনেকেই জানে না। ভারতকে হীন, জঘন্য, ভারতবাসীকে বর্ব্বর, অসভ্য প্রতিপন্ন করিয়া এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ভারতে এই সমস্ত বর্ব্বরদিগকে পরিচালিত করার যুক্তি সমর্থন করিয়া যে সমস্ত ছবি ইতিপূর্ব্বে তোলা হইয়াছিল, 'গঙ্গাদীন' তাহা হইতেও নিকৃষ্ট। ইহা এমন একখানি ছবি, যাহা দেখিলে প্রত্যেক ভারতবাসীর মন ঘৃণায় পূর্ণ হইয়া যাইবে। গঙ্গাদীন লুণ্ঠনকারী একদল পাঠানের হাত হইতে শ্বেতাঙ্গদের রক্ষা করিয়াছিল বলিয়া শ্বেতাঙ্গ সেন্যদল তাহার পুরস্কারস্বরূপ তাহাকে 'ভৃত্য' করিয়া রাখিয়াছে—এবং ইহাই, অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গদের ভৃত্য হইয়া থাকাই ভারতবাসীর জীবনের চরম সার্থকতা।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ভারতকে হীন প্রতিপন্ন করিয়া আজ পর্য্যন্ত যতগুলি ছবি তোলা হইয়াছে তাহার সমস্ত কাহিনী প্রায় একই রকমের। "গঙ্গাদীন" ছবির মধ্যেও সেই রকম এক কাহিনী ঢোকান হইয়াছে। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কোথাও একদল বৃটিশ সৈন্য সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। টমিদের মধ্যে কদর্য্য রসিকতা, সাধারণ টমির সেনানায়কের কন্যার প্রেমে পড়া, লুণ্ঠনকারী পাঠানদের আক্রমণ (যাহাদিগকে 'ঠগ' বলা হইয়াছে এবং যাহাদের একমাত্র কার্য্য গলা কাটা) প্রভৃতি এই ছবিতে আছে। তারপর শ্বেতাঙ্গ নায়ককে ভারতীয় পুরোহিত (যাহারা দস্যু ছাড়া আর কিছু নহে) চুরি করিল; তাহাকে ভীষণ যন্ত্রণা দিতে লাগিল এবং গোখুরো সাপ বোঝাই একটা ঘরের নিকট রাখিল। অবশ্য বৃটিশ সৈন্যটি এমন নহে যে এই সমস্ত বর্ব্বর ভারতবাসীর চোখরাঙানি গ্রাহ্য করিবে। এদিকে ভারতপ্রবাসী সমগ্র বৃটিশ এই নৃশংস ব্যাপারে ক্ষেপিয়া গেল এবং সেই সমস্ত বর্ব্বর পাঠানের শাস্তিবিধান করিয়া ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য অক্ষুন্ন রাখিল।

খাজা আমেদ আব্বাস হলিউড ভ্রমণের পর এই ছবি সম্বন্ধে ফিল্ম ইণ্ডিয়া কাগজে যাহা লিখিয়াছেন তাহা হইতেই আমরা ইহার বিস্তারিত কাহিনী জানিতে পারি। তিনি লিখিয়াছেন যে, হলিউডের আশেপাশে অনেক ভারতবাসী থাকিলেও এবং অনেকে সেখানে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিলেও যিনি এই ছবির সেট্ ও টেকনিক্যাল বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহার নাম স্যার রবার্ট আর্‌স্কিন হল্যাণ্ড। তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর এবং তাঁহার একমাত্র যোগ্যতা এই যে তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত বৃটিশ অফিসার—ভারতে কিছুদিন ছিলেন। সুতরাং তিনি ভারতের সংস্কৃতি ও রীতি-নীতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। অথচ এই সকল শাদা চামড়ার দল ভারতে দীর্ঘকাল বাস করিয়া যখন বিদায় লয় তখন অনেকে 'চাপাটী' এবং চাপরাসীর' মধ্যে প্রভেদ কি তাহাও জানে না।

ভারত সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ এই শ্বেতাঙ্গ জীবটির বুদ্ধির দৌড়ের কথা আলোচনা করা যাউক। তিনি সম্ভবত 'মাদার ইণ্ডিয়া' পড়িয়াছেন; সুতরাং 'কালী' সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান সুস্পষ্ট। তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পাঠানদের কালীপূজা দেখাইয়াছেন, মন্দির দেখাইয়াছেন, অজন্তা গুহার ন্যায় স্থপতিবিদ্যা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন; উটের বদলে হাতীর আমদানী করিয়াছেন।

বাঙলা গবর্ণমেণ্ট এই ছবির প্রদর্শনী বন্ধ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেই এই সমস্যার সমাধান হয় না। ছবিখানি পৃথিবীর সর্ব্বত্র দেখান হইতেছে এবং সমগ্র পৃথিবী দেখিতেছে ভারতবাসীরা কি রকমের জীব। ঘৃণায়, বিদ্বেষে, সমগ্র পৃথিবী শুধু এই কথাই বলিবে—যে জাতি এমন অসভ্য, বর্ব্বর, যাহাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের লেশমাত্র নাই, তাহাদের শিক্ষার জন্য, তাহাদের মানুষ করার জন্য বৃটিশেরা যে ভারতে আছে তাহাতে শুধু তাহাদের উন্নত মনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। এই যে প্রচারকার্য্য, নিজেদের রাজত্ব কায়েম করার সুব্যবস্থা, তাহা কি করিয়া বন্ধ করা যাইতে পারে? একটি মাত্র উপায় আছে এবং তাহা হইতেছে এই যে—ভারতের সমস্ত প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট আজ যদি আর কে ও রেডিও পিকচার্সকে জানাইয়া দেয় যে, যদি তাহারা সমগ্র পৃথিবীতে এই ছবির প্রদর্শনী বন্ধ না করে এবং ছবির সমস্ত কপি নষ্ট করিয়া না ফেলে তবে ভারতে রেডিও পিকচার্সের কোন ছবি দেখাইতে অনুমতি দেওয়া হইবে না। স্পেন দেশের নারীর প্রতি কটাক্ষ করিয়া তোলা ছবি "দি ডেভিল্‌ইজ এ ওম্যান" দেখান হইবার পূর্ব্বে স্পেন প্যারামাউণ্টকে জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, যদি সেই ছবি পৃথিবীর কোন স্থানে দেখান হয় তবে স্পেন প্যারামাউণ্টকে বর্জ্জন করিবে। প্যারামাউণ্ট কর্ত্তৃপক্ষ ভয়ে তখন স্পেন কর্ত্তৃপক্ষের সম্মুখে সেই ছবির নেগেটিভ পুড়াইয়া ফেলেন। আমেরিকার প্রযোজকগণ যখন "প্যারিস হনিমুন" ছবি তোলে সেই সময় বুলগেরিয়ার মন্ত্রিমণ্ডলী জানাইয়া দেয়—"হয় তোমাদের ছবি হইতে বুলগেরিয়াকে বাদ দাও, না হয় বুলগেরিয়া তোমাদের বাদ দিবে।" ভয়ে বুলগেরিয়া মন্ত্রিমণ্ডলীর কথামত কার্য্য করিতে হইয়াছিল। ভারতও যদি আজ সেই কথা বলিতে পারে তবে "গঙ্গাদীন" ছবি অবশ্যই বন্ধ হইবে।

স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "পথের দাবী" নাটকাকারে রূপান্তরিত হইয়া শীঘ্রই নাট্যনিকেতন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইবে। নাট্যকার শ্রীযুত শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এই উপন্যাসখানির নাট্যরূপ দিতেছেন। চরিত্রলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

সব্যসাচী—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতী—শান্তি, সুমিত্রা—নীহার, তারা—সরযূ, অপূর্ব্ব—ছবি বিশ্বাস, শশী—অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, তারার নফর—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য।

ব্যায়াম প্রদর্শনীর ব্যবস্থায় সকল কার্য্য শেষ হয় না

বাঙলা দেশে সম্প্রতি ব্যায়াম প্রদর্শনীর ব্যবস্থার বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হইতেছে। শারীরিক শক্তিসাধ্য ব্যায়াম, খালিহাতে ব্যায়াম, যন্ত্র সাহায্যে ব্যায়াম, সম্মিলিত ব্যায়াম প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার ব্যায়াম ব্যবস্থা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের কর্ম্মতালিকার মধ্যে স্থান পাইতেছে। বড় বড় শহর হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রামাঞ্চলের কোন কোন অনুষ্ঠানের মধ্যেও ব্যায়াম প্রদর্শনীর ব্যবস্থা থাকিতেছে। সারা বাঙলা ব্যাপী এই ব্যায়াম-চর্চ্চার উৎসাহ খুবই উৎসাহবর্দ্ধক ও আনন্দ-দায়ক। দারিদ্র্যাক্রান্ত বাঙালী জাতি নিজ্জীবতার আবরণ উন্মোচন করিয়া সজীবতার সন্ধানে ছুটিয়াছে—ইহা তাহারই প্রমাণ দিতেছে। কিন্তু এই বিপুল ব্যায়াম-চর্চ্চা আন্দোলনের পশ্চাতে নিয়মিত শিক্ষার কোন ব্যবস্থা না দেখিয়া আমরা একটু চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের আশঙ্কা হইতেছে অন্যান্য সকল আন্দোলনের ন্যায় ইহাও বুঝি বা শেষ পর্যন্ত একটা বিরাট হুজুগে পরিণত হয়। যদি তাহাই হয়, তবে অন্যান্য আন্দোলনের শেষ পরিণতি যাহা এই পর্য্যন্ত বাঙলা-দেশে হইয়াছে ইহারও তাহাই হইবে। সেইজন্য মনে হয় এখন হইতেই যাহাতে বাঙলা দেশের এই ব্যায়াম-চর্চ্চা আন্দোলন হুজুগে পরিণত না হয়, তাহার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। যাঁহারা এই আন্দোলনের সহায়ক তাঁহাদের দ্বারাই ইহা সম্ভব। তাঁহারা যদি এখন হইতেই একত্র হইয়া সম্মিলিতভাবে এই আন্দোলনের সুপরিচালনের ব্যবস্থা করেন, তবেই শেষ পরিণাম সম্বন্ধে আমরা যে ধারণা পোষণ করিতেছি, তাহা আর দেখিতে হইবে না। সুপরিচালনা অর্থে আমরা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ব্যায়াম শিক্ষার প্রবর্ত্তন কথা বলিতে চাই। কারণ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, বাঙলা দেশে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ব্যায়াম শিক্ষার ব্যবস্থা হইলে ব্যায়াম-চর্চ্চা আন্দোলন দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। রুশিয়া, জার্ম্মানী, জাপান, ফিনল্যাণ্ড, সুইডেন প্রভৃতি দেশের ব্যায়াম-চর্চ্চা আন্দোলনের ইতিহাস ভালভাবে পাঠ করিলে আমাদের উক্তির যৌক্তিকতার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। ঐ সমস্ত দেশে বর্ত্তমানে ব্যায়াম-চর্চ্চা আন্দোলন দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ঐ সমস্ত দেশের শাসকমণ্ডলী তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু ৯০ বৎসর পূর্ব্বে ঐরূপ কিছু ছিল না। তখন প্রত্যেকটি দেশেই বিভিন্ন ব্যায়াম ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। কোন দেশেই জনসাধারণ একটা নির্দ্দিষ্ট বিজ্ঞানসম্মত ব্যায়াম ধারার অনুসরণ করিত না। সেই সময় একমাত্র চেকোশ্লাভাকিয়াতে একটি ব্যায়াম আন্দোলনকারী দল গঠিত হইয়াছিল যাহাদের 'সোকোল' বলা হইত। এই সোকোলদের ঐ সমস্ত দেশে জাতীয়তাবাদী শাসকমণ্ডলী বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না। ঐ আন্দোলনকারীদের কোন মূল্য আছে বলিয়াই তাঁহারা মনে করিতেন না। সোকোলরা ইহাতে হতাশ না হইয়া নিজেদের মতবাদ প্রচার করিতে থাকেন। কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইতেই দেখা গেল চেকোশ্লাভাকিয়া একটি ছোট দেশ হইলেও হয় তথায় কর্ম্মঠ লোকের অভাব নাই। ব্যবসা, বাণিজ্য সকল বিষয়েই তাঁহারা ধীরে ধীরে উন্নতি করিতেছে। জার্ম্মানী তখন প্রথমে ইহাদের মতবাদ গ্রহণ করিল। নির্দ্দিষ্ট একটি ব্যায়াম ধারা যাহাতে দেশের সকলেই গ্রহণ করে তাহা প্রচার করিতে লাগিল। তৎকালীন জার্ম্মানীর রাজা কাইজার দ্রুত জাতির উন্নতির আশায় বাধ্যতামূলক একটি নির্দ্দিষ্ট ব্যায়াম ব্যবস্থার প্রচলন করিলেন। ফলস্বরূপ দেখা গেল জার্ম্মানী একটি বিরাট শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হইয়াছে। গত ইউরোপীয় মহাসমরে জার্ম্মানী তাহার প্রমাণ দিল। তখন ইউরোপের সকল দেশে সোকোলদের প্রবর্ত্তিত বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা অনুসরণের প্রচেষ্টা চলিল। সকল দেশের শাসকমণ্ডলী ব্যায়াম-চর্চ্চা আন্দোলন বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে যাহাতে পরিচালিত হয়, তাহার দিকে দৃষ্টি দিলেন। বিভিন্ন দেশের ব্যায়াম-চর্চ্চা আন্দোলনকারিগণ দেশের মঙ্গলের কথা চিন্তা করিয়া সকল ভেদাভেদ ভুলিয়া একত্র হইয়া ব্যায়াম আন্দোলন সুপরিচালনের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের সেই প্রচেষ্টার ফলেই গত কয়েক বৎসর হইতে ঐ সকল দেশের ব্যায়াম-চর্চ্চা আন্দোলন বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্ব্বের সকল হুজুগের অবসান হইয়াছে। সেইজন্য মনে হয় ব্যায়াম প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়া ব্যায়াম-চর্চ্চা আন্দোলনের সকল কার্য্য শেষ হইল বলিয়া মনে করিলে চলিবে না। ব্যায়াম প্রদর্শনী যাহাতে চিরকাল স্থায়ী হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। নির্দ্দিষ্ট বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা যাহাতে দেশের সর্ব্বত্র প্রচারিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাঙলা দেশের ব্যায়াম-চর্চ্চা আন্দোলনকারিগণের লক্ষ্য এক, আদর্শ এক। কিন্তু তাঁহাদের সেই লক্ষ্য ও আদর্শে পৌঁছিতে হইলে একত্র হইয়া সম্মিলিতভাবে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে। শুধু একত্র হইলেও চলিবে না, তাঁহাদিগকে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ব্যায়াম ধারা শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সেইজন্যই আমরা বলিতে চাহি যে, ব্যায়াম প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়া বাঙলা দেশের ব্যায়াম-চর্চ্চা আন্দোলনের সকল কার্য্য শেষ হয় না। তাহার পরেও প্রয়োজন আছে শিক্ষার ব্যবস্থা করা, সম্মিলিতভাবে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার।

সাপ্তাহিক সংবাদ

৭ই মার্চ্চ—

রাজকোট সমস্যার সন্তোষজনক মীমাংসা সম্পর্কে বড়-লাটের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি পাইয়া অদ্য বেলা ২-২৫ মিনিটের সময় মহাত্মা গান্ধী তাঁহার অনশন ভঙ্গ করিয়াছেন। বড়লাট এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, রাজকোটের ঠাকুর সাহেব মহাত্মাজীর নিকট যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন সেগুলি যাহাতে প্রতিপালিত হয়, তাহা তিনি করিবেন এবং সেই সব প্রতি-শ্রুতির তাৎপর্য্য সম্বন্ধে যদি বুঝিতে কোন গোল ঘটে সে সম্বন্ধে বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করিবার ভার ভারতের ফেডারেল কোর্টের প্রধান বিচারপতির উপর থাকিবে। মহাত্মাজী এই প্রস্তাবে রাজী হইয়াছেন এবং বড়লাটের অনুরোধক্রমে এ সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে আলোচনার নিমিত্ত তিনি একটু সুস্থ হইবার পরই দিল্লী যাইতেছেন।

অদ্য অপরাহ্নে ত্রিপুরীতে নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতির অধিবেশন হয়। রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু অসুস্থ থাকায় মৌলানা আবুলকালাম আজাদ সভাপতিত্ব করেন। মাত্র ২৫ মিনিট কাল অধিবেশন স্থায়ী হইয়াছিল। বার্ষিক হিসাব ও কার্য্য-বিবরণী আলোচনার পর অধিবেশন স্থগিত থাকে।

সুদীর্ঘ ৩০ বৎসর কাল নির্ব্বাসিত জীবনযাপন করিবার পর মৌলানা ওবেদুল্লা সিন্ধী ভারত প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। মৌলানা সাহেব একজন বিপ্লববাদী। বিগত মহাসমরের সময় তিনি জার্ম্মানী ও তুরস্কের সাহায্যে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিবার বিশ্বাস লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হন বর্ত্তমানে তাঁহার বয়স ৬৫ বৎসর।

কানপুরে পুনরায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হয়। দাঙ্গায় একজন নিহত ও চারজন আহত হইয়াছে। পুলিশকে আবার গুলীচালনা করিতে হইয়াছিল।

আসাম ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেস বিরোধী দলের ঝানু সদস্য শ্রীযুত হীরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিরোধিতা ত্যাগ করিয়া বিনাসর্ত্তে কংগ্রেস মিশ্র দলে যোগ দিয়াছেন এবং কংগ্রেসের প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে অর্থ-সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার ফাইনান্স বিল পেশ করেন। বিভিন্ন বিরোধী দলের ১৪ জন সদস্য এই বিলটি জনমত সংগ্রহার্থ প্রচার করার প্রস্তাব করেন। ঐ সমস্ত প্রস্তাব ৭১—১১৯ ভোটে অগ্রাহ্য হয়। বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে দিবার জন্য কংগ্রেসী দলের পক্ষ হইতে একটি সংশোধন প্রস্তাব আনা হয়। তাহা বিনা ডিভিসনে অগ্রাহ্য হয়।

এই বিলে বলা হয়, বাঙলা দেশে সম্পূর্ণত বা আংশিক-ভাবে কোনও ব্যবসায়, পেশায়, স্বাধীন জীবিকা ও চাকুরীতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যাহাদের উপর ইনকাম ট্যাক্স ধার্য্য হইবে, তাহাদের প্রত্যেকেরই প্রতি বার্ষিক ৩০৲ টাকা হারে একটি অতিরিক্ত ট্যাক্স দিতে হইবে।

প্যারিসের সংবাদে প্রকাশ, ডাঃ নেগ্রিন ও সিনর দেল-ভায়ো তথায় পৌঁছিয়াছেন। প্যারিসের আর একটি খবরে প্রকাশ, মঃ লুসিয়াঁবুর্গ তত্রত্য "পোঁত পারাসিয়াঁ" কাগজে লিখিয়াছেন যে, জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সহিত যুদ্ধ বিরতি সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য গণতন্ত্রী দলের একজন কর্ম্ম-চারী মাদ্রিদ হইতে বুর্গোস যাত্রা করিয়াছেন।

মাদ্রিদের সংবাদে প্রকাশ, জেনারেল মিয়াজা প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিয়াছেন এবং গণতন্ত্রী দলের নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে।

কাইরোতে শ্যামের ভূতপূর্ব্ব রাজা প্রজাধিপক সংবাদপত্র প্রতিনিধির নিকট শ্যামের বর্ত্তমান সামরিক অধিনায়কত্বের তীব্র নিন্দা করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করায় শ্যামের গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী এপ্রিল মাস হইতে ভূতপূর্ব্ব রাজাকে আর তাঁহার ভাতার টাকা দেওয়া হইবে না।

ওম মণ্ডলীর বিরুদ্ধে আন্দোলনের ফলে করাচীতে গুরুতর অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। এই ব্যাপারে সিন্ধু মন্ত্রিমণ্ডলীর পতন হওয়ার সম্ভাবনা পর্য্যন্ত দেখা দিয়াছে। আন্দোলনের নেতা ঘাকু টি এল ভাস্বানী মন্ত্রীদিগকে নৈতিক কারণে এই মণ্ডলী বে-আইনী ঘোষণা করিতে অনুরোধ করেন। মন্ত্রীদের সহিত তাহাদের আলোচনা ব্যর্থ হওয়ায় অদ্য হইতে সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট মণ্ডলীকে বে-আইনী সাব্যস্ত অথবা তাহা-দিগকে গ্রেপ্তার না করা পর্য্যন্ত স্বেচ্ছাসেবকগণ ঐ স্থান পরিত্যাগ করিবে না বলিয়া মনস্থ করিয়াছে। কতিপয় ব্যক্তি অনশন আরম্ভ করিয়াছে।

৮ই মার্চ্চ—

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে মন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রসন্নদেব রায়কত 'লবণ' বাবদ ১২,০০০৲; মন্ত্রী স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় 'ষ্ট্যাম্প' বাবদ ৪,৩৩,০০০৲; মন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রসন্নদেব রায়কত 'বন' বাবদ ১২,৭৪,০০০৲ ও প্রধানমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক 'রেজিষ্ট্রেশন' বাবদ ২৩,১৫,০০০৲ টাকা বরাদ্দের দাবী উত্থাপন করেন। দাবীগুলির উপর ছাঁটাই প্রস্তাব তোলা হইয়াছিল। কিন্তু সমস্ত ছাঁটাই প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয় এবং দাবীগুলি পাশ হইয়া যায়।

ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচনের পর কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতির সদস্যদের পদত্যাগের ফলে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা ক্রমেই সঙ্গীন হইয়া উঠিতেছে। কংগ্রেসে মতভেদ নিবারণের জন্য নেতৃবৃন্দ গভীর আলোচনা করিতেছেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু শান্তি স্থাপনের চেষ্টায় বিশেষভাবে ব্যাপৃত আছেন। তিনি মীমাংসার যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা এইরূপঃ—

(১) পুরাতন সহকর্ম্মীদের বিরুদ্ধে আনীত সমস্ত অভিযোগ রাষ্ট্রপতি কর্ত্তৃক প্রত্যাহার।

(২) দক্ষিণপন্থী এবং বামপন্থী এই উভয় দলের সহ-যোগিতায় কাজ চালাইবার জন্য উভয় দলের সভ্য লইয়া ওয়ার্কিং কমিটি গঠন।

সর্দ্দার প্যাটেল নূতন ওয়ার্কিং কমিটিতে তাঁহার দলের সংখ্যাধিক্য চাহিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। ইহাও প্রকাশ যে, কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী এবং বামপন্থীবৃন্দ পণ্ডিত জওহরলালের সমর্থন না পাইলে কংগ্রেস পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সম্মত নহেন। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু এখনও কোন কর্ত্তব্য স্থির করেন নাই।

কংগ্রেস বিষয়-নির্ব্বাচনী সমিতির অধিবেশনের এক ঘণ্টা পূর্ব্বে আপোষ-নিষ্পত্তির শেষ চেষ্টায় পণ্ডিত নেহরু, সর্দ্দার প্যাটেল, মৌলানা আজাদ ও বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ দক্ষিণপন্থী নেতৃগণ পুনরায় রাষ্ট্রপতির কুটীরে সমবেত হন। প্রকাশ, পদত্যাগকারী সদস্যগণ নিম্নলিখিত সর্ত্তে ওয়ার্কিং কমিটিতে থাকিতে সম্মত আছেন বলিয়া জানান,—(১) ওয়ার্কিং কমিটির অধিকাংশ সদস্যের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ করা হইয়াছে, তাহা বিনা সর্ত্তে প্রত্যাহার করিয়া লইতে হইবে; (২) পণ্ডিত জওহরলাল সহ তাঁহাদের সংখ্যা দশ হইবে এবং (৩) কংগ্রেসের নীতি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বভার পূর্ব্বের ন্যায় গান্ধীজীর উপর ছাড়িয়া দিতে হইবে। প্রকাশ, রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু এই সকল সর্ত্ত গ্রহণ করেন নাই।

ত্রিপুরীতে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশন হয়। রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসুকে 'ষ্ট্রেচারে' করিয়া বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির মণ্ডপে আনয়ন করা হয়। সভার কার্য্যারম্ভে শ্রীযুক্ত আর কে সিদ্ধ এক বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের পদত্যাগপত্র গ্রহণের ক্ষমতা কংগ্রেস সভাপতির নাই,—উত্তরে রাষ্ট্রপতি নির্দ্দেশ দেন যে, ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনয়নের শূন্য পদ পূরণের ও পদত্যাগপত্র গ্রহণে সভাপতির ক্ষমতা আছে। পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ গান্ধী-নীতিতে ও ওয়ার্কিং কমিটির পদত্যাগকারী সদস্যদের উপর আস্থাজ্ঞাপন করিয়া ও মহাত্মার নির্দ্দেশ মত নূতন ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের অনুরোধ জানাইয়া ১৬০ জন সদস্যের স্বাক্ষরিত এক প্রস্তাবের নোটিশ দিয়াছিলেন। সভাপতি ঐ সম্পর্কে নির্দ্দেশ দেন যে, ঐ প্রস্তাবটি নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতিতে আলোচিত হইতে পারে না।

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতিতে পরিণত হইবার পর সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু বলেন যে, পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থের প্রস্তাবটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রস্তাবটি যাহাতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইতে পারে প্রস্তাবটিকে তদ্রূপ রূপ দান করা কর্ত্তব্য। অতএব এই প্রস্তাবের আলোচনা আগামীকল্য বেলা তিন ঘটিকায় আরম্ভ হইবে বলিয়া তিনি নির্দ্দেশ দেন। পণ্ডিত পন্থ প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়া বলেন যে, দেশের পক্ষে মহাত্মাজীর নেতৃত্ব অত্যাবশ্যক। মিঃ গ্যাডগিল প্রস্তাবটি সমর্থন করিবার পর বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির অধিবেশন আগামীকল্য বেলা তিনটা পর্য্যন্ত স্থগিত থাকে।

পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন:—

কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচন সম্পর্কে এবং তৎপরবর্ত্তী নানা প্রকার বাক্-বিতণ্ডার ফলে দেশের ও কংগ্রেসের মধ্যে নানা প্রকার ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হওয়ায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কর্ত্তব্য অবস্থাটা পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দেওয়া এবং ইহার সাধারণ নীতি ঘোষণা করা।

গত কয়েক বৎসর যাবৎ মহাত্মা গান্ধীর পরিচালনাধীনে কংগ্রেসের মৌলিক নীতি অনুসারে যে কার্য্যক্রম অনুসৃত হইয়া আসিয়াছে এই কমিটি তাহাতে গভীর আস্থা জ্ঞাপন করিতেছে এবং দৃঢ়তার সহিত এই অভিমত ব্যক্ত করিতেছে যে, ঐ নীতি পরিহার না করিয়া ভবিষ্যতেও কংগ্রেসের কার্য্যক্রম নির্দ্ধারণের উক্ত নীতিই অনুসরণ করা উচিত। গত বৎসরের ওয়ার্কিং কমিটির কার্য্যে এই কমিটি আস্থা প্রকাশ করিতেছে এবং উহার সদস্যের উপর দোষারোপ করায় দুঃখ প্রকাশ করিতেছে।

আগামী বর্ষে সংকটজনক পরিস্থিতি উদ্ভবের সম্ভাবনা থাকায় এবং ঐরূপ সঙ্কটে একমাত্র মহাত্মা গান্ধীই কংগ্রেস ও দেশবাসীকে সাফল্যের পথে পরিচালিত করিতে সমর্থ বলিয়া এই কমিটি মনে করে যে, তাঁহার অবিচলিত আস্থা লাভ করা কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহকদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। সেজন্য এই কমিটি সভাপতিকে মহাত্মা গান্ধীর ইচ্ছানুযায়ী আগামী বৎসরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনয়ন করিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছে।

প্রকাশ, এই প্রস্তাবের পক্ষে নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতির প্রায় ১৭৫ জন সদস্য স্বাক্ষর করিয়াছেন।

সুইডেনের মিস লেসবেথ ও মিস গ্রেটা লিণ্ডার ভিক নাম্নী দুই ভগিনী পদব্রজে পৃথিবী পর্য্যটনে বাহির হইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহারা ১৯৩৮ সালের মে মাসে ষ্টকহলম হইতে যাত্রা করেন। তাঁহারা ইউরোপের পনরটি দেশ পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া পারস্যে উপস্থিত হন। তথায় তাঁহাদিগকে পদব্রজে ভ্রমণ করিতে না দেওয়ায় অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তাঁহাদিগকে মোটরে ভ্রমণ করিতে হয়।

ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের কয়েকটি নির্ব্বাচিত কেন্দ্রে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিবার জন্য ত্রিবাঙ্কুর ষ্টেট কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি ২৫শে মার্চ্চ তারিখ ধার্য্য করিয়াছেন।

৯ই মার্চ্চ—

ত্রিপুরীতে কংগ্রেস বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশন হয়। আজও এম্বুলেন্সযোগে সভাপতি সভামণ্ডপ দ্বারে আগমন করেন, তথা হইতে 'ষ্ট্রেচারে' করিয়া তাঁহাকে সভাক্ষেত্রে আনা হয়। গতকল্য বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতিতে পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন, সেই প্রস্তাব সম্পর্কেই অদ্যকার অধিবেশনে সাড়ে সাত ঘণ্টা আলোচনা হয়। এই প্রস্তাবের উপর বার-তেরটি সংশোধনী প্রস্তাব আনীত হয় এবং শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্র নাথ রায়, আচার্য্য নরেন্দ্র দেব, শ্রীযুক্ত নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণ, শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী, শ্রীযুক্ত সত্যমূর্ত্তি, ডাঃ লোহিয়া, ডাঃ আসরফ প্রমুখ বার-তের জন বক্তা বক্তৃতা করেন।

১০ই মার্চ্চ—

অদ্য বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতিতে পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থের মূল প্রস্তাব ২১৮—১৩৫ ভোটে গৃহীত হইয়াছে। সমস্ত সংশোধন প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়াছে।

অদ্য মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির অধিবেশন হয়। রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র অসুস্থ বলিয়া সভাপতিত্ব করিতে পারেন নাই। অদ্য বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির অধিবেশন আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু মহাত্মা গান্ধীর প্রেরিত একখানি তার পাঠ করেন। এই তারে মহাত্মাজী সুভাষচন্দ্রকে জানাইয়াছেন যে,—"কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দুর্নীতি যাহাতে দূর হইতে পারে, সর্ব্বাগ্রে তাহার ব্যবস্থা করাই কংগ্রেসের কর্ত্তব্য।" শরৎবাবু বলেন, রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু এ বিষয়ে মহাত্মাজীর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। অতঃপর পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থের প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হয়। পণ্ডিত পন্থের বক্তৃতা সমাপ্ত হইবার পর একে একে সংশোধন প্রস্তাবগুলি ভোটে দেওয়া হয়। শ্রীযুক্ত অচ্যুত পট্টবর্দ্ধনের সংশোধন প্রস্তাব ২০৭—১৩০ ভোটে অগ্রাহ্য হয়। মিঃ এম এন রায়ের সংশোধন প্রস্তাবও অগ্রাহ্য হয়। ইহার পক্ষে মাত্র ৩৮ ভোট হইয়াছিল। মিঃ নুরুদ্দীন বিহারীর প্রস্তাবের পক্ষে ৫২ ভোট এবং বিপক্ষে ২৩১ ভোট হওয়ায় ইহাও বাতিল হয়। শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণের সংশোধন প্রস্তাবের প্রথম অংশ ২০৬—১২৭ ভোটে অগ্রাহ্য হয়। শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণের প্রস্তাবের দ্বিতীয় অংশ—পক্ষে ১২৮ ভোট, বিপক্ষে ২১০ ভোট। মিঃ কে এফ নরীম্যানের সংশোধন প্রস্তাব—পক্ষে ১২৮ ভোট, বিপক্ষে ২০৯ ভোট। শ্রীযুক্ত ভরদ্বাজের সংশোধন প্রস্তাব—পক্ষে ১২৭ ভোট, বিপক্ষে ২১৪ ভোট। অন্যান্য সংশোধন প্রস্তাবও বহু ভোটে অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে। ওয়ার্কিং কমিটির যে ১৩ জন সদস্য পদত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহই কোনও পক্ষে ভোট দেন নাই। কেবলমাত্র জওহরলালজী শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণের সংশোধন প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার ও শ্রীযুক্ত আণে শ্রীযুক্ত পন্থের মূল প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিলেন।

ত্রিপুরীর বিষ্ণুদত্তনগরে বিরাট মণ্ডপ মধ্যে সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকায় নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভার দ্বি-পঞ্চাশৎ অধিবেশন আরম্ভ হয়। দুই লক্ষাধিক নরনারী অদ্যকার অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন। অসুস্থতার জন্য রাষ্ট্রপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করেন নাই। কাজেই সভাপতিকে শোভাযাত্রা করিয়া আনার অনুষ্ঠানও পরিত্যক্ত হয়। "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীত গীত হইবার পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শেঠ গোবিন্দ দাস তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় সভাপতির অভিভাষণ পাঠ করেন।

সর্ব্বপ্রকার মতভেদ পরিহার করিয়া সমস্ত শক্তি লইয়া একযোগে জাতীয় সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করিবার বর্ত্তমান সুযোগ গ্রহণ করিতে হইবে—এই বলিয়া রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের ৫২তম অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণে আবেগময়ী ভাষায় সমগ্র জাতিকে আহ্বান জানাইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত কংগ্রেসের আর কোনও সভাপতির অভিভাষণই এত সংক্ষিপ্ত হয় নাই :

ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন,—"কিছুদিন যাবৎ আমি যাহা উপলব্ধি করিতেছি, সুস্পষ্ট ও দ্বিধাহীনভাবে তাহাই প্রকাশ করিব। স্বরাজের দাবী উত্থাপন করিবার এবং চরমপত্রের আকারে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট আমাদের জাতীয় দাবী পেশ করিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

'যুক্তরাষ্ট্রের বোঝা আমাদের স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়া হইবে, ইহা এখন আর আমাদের একমাত্র সমস্যা নহে। যুক্তরাষ্ট্র যদি সুবিধা বুঝিয়া ধামাচাপা দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমাদের কি কর্ত্তব্য, ইহাই আজিকার প্রধান সমস্যা।

"আমরা চরমপত্রের আকারে এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের মেয়াদে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট আমাদের জাতীয় দাবী পেশ করিব এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে আমাদিগকে প্রত্যুত্তর দাবী করিতে হইবে। কংগ্রেসের মধ্যে এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা মনে করেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক আক্রমণের সময় এখনও আসে নাই। কিন্তু বাস্তব দৃষ্টিতে আবহাওয়ার দিকে তাকাইলে দেখা যায় যে, নৈরাশ্যের কোন কারণ নাই।"

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে ত্রিপুরীতে উপস্থিত কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সভাপতিদের মধ্যে প্রবীণতম মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

কংগ্রেসের সাফল্য কামনা করিয়া ও শুভেচ্ছাজ্ঞাপন করিয়া যে সকল বাণী আসিয়াছে, কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরসিংহ তাহা পাঠ করেন। চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টি, জাপানস্থ ভারতীয় জাতীয় দল, শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বসু, জাঞ্জিবারের ভারতীয় সমিতি, ভারতীয় চীন মেডিক্যাল ইউনিটের পক্ষে ডাঃ অটল, মালাকার ভারতীয়গণ, পণ্ডিত মালব্য, মিঃ অরুণ্ডেল ও আরও অনেকে শুভেচ্ছা ও সাফল্য কামনা করিয়া বাণী পাঠাইয়াছিলেন।

কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশন স্থগিত রাখিবার পূর্ব্বে মিশরীয় প্রতিনিধিগণকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। পণ্ডিত জওহরলালজী মিশরীয় প্রতিনিধিগণকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন এবং মিশরীয় প্রতিনিধি দলের নায়ক মিঃ মামুদ বে তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধিত করার জন্য কংগ্রেসকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

১১ই মার্চ্চ—

অদ্য কংগ্রেসের বিষয়-নির্ব্বাচনী সমিতির অধিবেশনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ভারতের জাতীয় দাবী সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাব সম্পর্কে,

কয়েকটি সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল। সংশোধন প্রস্তাবগুলি অগ্রাহ্য বা প্রত্যাহৃত হয় এবং পণ্ডিত জওহরলালের জাতীয় দাবী সংক্রান্ত মূল প্রস্তাব সামান্য পরিবর্ত্তন সহ গৃহীত হয়। মিউনিক চুক্তি, স্পেন, চীন প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁহার উত্থাপিত আরও কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি সম্পর্কে শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রকাশের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

অদ্য কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনের দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশনে বিষম বিশৃঙ্খলা এবং হট্টগোলের সৃষ্টি হয়। শ্রীযুক্ত আণে এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, বিষয়-নির্ব্বাচনী সমিতিতে পণ্ডিত পন্থের যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহা নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতিতে পাঠান হউক। বামপন্থীরা দাবী করেন যে, শ্রীযুক্ত আণের প্রস্তাব প্রত্যাহার করা হউক। এই সময় "ইনক্লাব জিন্দাবাদ", "সুভাষ জিন্দাবাদ" প্রভৃতি ধ্বনি উত্থিত হইতে থাকে এবং এক ঘণ্টাকাল এই হট্টগোল চলিতে থাকে। গোলযোগের সময় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু অনেকবার শৃঙ্খলা স্থাপনের চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার কথায় কেহ কর্ণপাত করেন না। অবশেষে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু যখন ঘোষণা করেন যে, শ্রীযুক্ত আণে তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিবেন, তখন সকলে শান্ত হয় এবং শ্রীযুক্ত আণে তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন।

পণ্ডিত নেহরুর জাতীয় দাবী, কংগ্রেসের দুর্নীতির প্রাবল্য শীর্ষক শ্রীপ্রকাশের প্রস্তাব, পরলোকগত নেতাদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ, মিশরীয় প্রতিনিধিদিগকে সম্বর্দ্ধনা ও চীনের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশমূলক প্রস্তাব মোট পাঁচটি প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর কংগ্রেসের দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশন স্থগিত থাকে।

১২ই মার্চ্চ—

অদ্য পূর্ব্বাহ্নে কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থের প্রস্তাব অত্যধিক ভোটে গৃহীত হইয়াছে। অদ্য সকাল ৯টায় মহাত্মার নীতি ও কর্ম্মপন্থায় আস্থাসূচক শ্রীযুক্ত পন্থের প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনার জন্য কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হয়। অধিবেশনের প্রারম্ভেই শ্রীযুক্ত কে এফ নরীম্যান প্রস্তাব করেন যে, পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থের প্রস্তাব প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রপতিকে লক্ষ্য করিয়া রচিত। রাষ্ট্রপতি অতিশয় পীড়িত বলিয়া ঐ প্রস্তাবের আলোচনাকালে স্বয়ং উপস্থিত থাকিতে অক্ষম। সুতরাং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের মর্য্যাদার খাতিরে, সমলোচিত যৌক্তিকতার খাতিরে তথা মনুষ্যত্বের খাতিরে এই প্রস্তাবের আলোচনা স্থগিত রাখা হউক। কতিপয় প্রতিনিধি পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি এই প্রস্তাব মানিয়া লইতে সম্মত কি না। তিনি অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে শ্রীযুক্ত নরীম্যানের প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয় এবং অগ্রাহ্য হয়। পণ্ডিত পন্থ তৎপর তাঁহার প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং মিঃ গ্যাডগিল উহা সমর্থন করেন। ইঁহারা কেহ কোনরূপ বক্তৃতা করেন নাই। সর্দ্দার শার্দ্দুল সিং, মিঃ নরীম্যান, মিঃ ভরদ্বাজ, মিঃ মৈত্র প্রভৃতি ৫।৬টি সংশোধন প্রস্তাব আনিয়াছিলেন। ইঁহাদের সংশোধন প্রস্তাবসমূহের উদ্দেশ্য ছিল "দোষারোপ" ও মহাত্মার অভিপ্রায় অনুযায়ী ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করিতে হইবে, এইরূপ নির্দ্দেশমূলক অংশগুলি মূল প্রস্তাব হইতে ছাঁটিয়া দেওয়া। কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণ ঘোষণা করেন যে, গতকল্যের ব্যাপার দেখিয়া তাঁহারা এই প্রস্তাব সম্পর্কে নিরপেক্ষ থাকিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত আণে প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া বলেন যে, এই প্রস্তাব প্রতিনিধিগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত সভাপতির বিরুদ্ধে অনাস্থাই সূচনা করে। গান্ধীজীর ইচ্ছানুসারে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনয়ন সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে নির্দ্দেশ দান বিষয়ে তিনি বলেন যে, উহা কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রের বিরোধী। কারণ কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রে সভাপতি নামেমাত্র সভাপতি নহেন। তিনি জনসাধারণের শক্তি ও উৎসাহ-উদ্যমের ধারক। সর্দ্দার শার্দ্দুল সিং এক সংশোধন প্রস্তাব প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন যে এইভাবে মহাত্মার নাম ভাঙ্গান হইলে মহাত্মাজীর প্রতিই অবিচার করা হইবে।

পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ বিতর্কের উত্তরদান প্রসঙ্গে বলেন যে, এই প্রস্তাবে কোনক্রমেই রাষ্ট্রপতির প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করা হয় নাই। মহাত্মার নেতৃত্ব, তাঁহার নীতি ও কর্ম্মপন্থার প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করা হইয়াছে মাত্র। মহাত্মাকে ছাড়া কংগ্রেসের কাজ চালান সম্ভবপর নহে বলিয়া আমাদের ধারণা হওয়াতেই এই প্রস্তাবের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সমুদয় সংশোধন প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়া যায় এবং মহাত্মা গান্ধীকী জয় ধ্বনির মধ্যে পণ্ডিত পন্থের মূল প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

প্রকাশ, কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাবে নিরপেক্ষ থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় বাঙলা ও যুক্তপ্রদেশের কতিপয় সমাজতন্ত্রী নেতা সমাজতন্ত্রী দল হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন।

অদ্যকার অধিবেশনে ভারতীয় দেশীয় রাজ্যসমূহ, বৈদেশিক ব্যাপার, প্রবাসী ভারতীয়গণ, প্যালেষ্টাইন এবং বেলুচিস্থান সম্পর্কিত প্রস্তাব গৃহীত হয়।

দেশীয় রাজ্য সম্পর্কিত প্রস্তাবের উপর শ্রীযুক্ত কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় এক সংশোধন প্রস্তাব আনিয়া মূল প্রস্তাবের হরিপুরা কংগ্রেসে গৃহীত নীতি অংশ বাদ দিয়া এইটুকু যোগ করিয়া দিতে চাহেন যে, কংগ্রেস দেশীয় রাজ্যের প্রজা আন্দোলনের সহিত প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করিবে এবং সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনা করিবে। সংশোধন প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হইয়া যায়।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বৈদেশিক ব্যাপার সম্পর্কিত প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বৈদেশিক নীতির তীব্র নিন্দা করেন এবং বলেন যে, "গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতা ধ্বংসকারী নীতির সহিত ভারত কোনই সংস্রব রাখিবে না।"

বর্ত্তমান বৎসরের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে বিহারে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভার আগামী অধিবেশন হইবে বলিয়া এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। অদ্য রাত্রি সাড়ে দশটায় নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভার ত্রিপুরী অধিবেশনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে।

৬ষ্ঠ বর্ষ]. শনিবার ২৭শে ফাল্গুন, ১৩৪৫ সাল Saturday, 11th March, 1939 [১৭শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

কংগ্রেস·

১৮৮৫ সাল হইতে আজ ১৯৩৮ সাল, কংগ্রেসের ইতিহাসের সহিত ভারতের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের এই ৫৩ বৎসরের স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে। সেদিন আর আজিকার দিন, তখনকার কংগ্রেস, আর এখনকার কংগ্রেসে, কি বিপুল, কত বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন! সেদিনকার কংগ্রেসের সাধ্য এবং সাধনা ছিল, ব্রিটিশ প্রভুদের নিকট আবেদন-নিবেদন করা এবং আজ কংগ্রেস ব্রিটিশ প্রভুদের সঙ্গে বুঝাপড়া করিয়া ভারতের স্বাধীনতা স্ব-শক্তিতে প্রতিষ্ঠা করিতে বদ্ধপরিকর। সেদিনের কংগ্রেস ছিল, জনকয়েক ইংরেজী শিক্ষিত, ইংরেজী মনোভাব-সম্পন্ন শিক্ষিত ব্যক্তির বাৎসরিক বক্তৃতার আসরের সামিল, আজিকার কংগ্রেসে জাতির জনগণের শক্তি সুপরিস্ফুট। আজিকার কংগ্রেসের যে শক্তি, সে শক্তির কাছে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ জাতিও শঙ্কিত হয়। আজিকার কংগ্রেসের আহ্বানে এবং ইঙ্গিতে ভারতের জনশক্তি উদ্বেলিত হইয়া উঠে—সহস্র সহস্র স্বদেশ সেবক অম্লান মুখে আত্মোৎসর্গ করিতে অগ্রসর হয়। রাষ্ট্রীয় সাধনার ভিতর অন্তরের এই যে প্রতিষ্ঠা ইহাই হইল বর্ত্তমান কংগ্রেসের শক্তিময় এবং ঐশ্বর্য্যময় স্বরূপ। এ শক্তির কাছে পশুবল দমিত হয়। ইতিহাস তাহার সাক্ষী রহিয়াছে, সাক্ষী রহিয়াছে ইহা যে, এ শক্তির কাছে বন্দুকের গুলীর বিভীষিকা ব্যর্থ, রেগুলেশন লাঠি ইহার কাছে অকেজো, কারাভয়, নির্ব্বাসন ভয়, এমন কি মৃত্যু ভয়ও কিছু নয়। কংগ্রেসের এই যে শক্তি, এ শক্তিকে রুদ্ধ করিবে এমন ক্ষমতা কাহারও নাই। পশুবলে সে যত বলীই হউক না কেন, কংগ্রেসের যে শক্তির কাছে আজ রাজকোটের ঠাকুর সাহেবকে মাথা নীচু করিতে হইয়াছে, সেই শক্তিরই কাছে পশুবলে বলবত্তর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদিগকেও হার মানিতে হইবে এবং সে দিনের আর দেরী নাই।

ত্রিপুরীর বাণী—

কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। একদিকে মহাত্মা গান্ধীর অনশন ব্রত, অপর দিকে দক্ষিণপন্থীদের ওয়ার্কিং কমিটি হইতে পদত্যাগ এবং সর্ব্বোপরি, রুগ্ন শরীর লইয়া রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের অধিবেশনে যোগদান, এইরূপে নানা উদ্বেগ এবং উত্তেজনার মধ্যে আরম্ভ হইয়াছে ত্রিপুরী কংগ্রেসের অধিবেশন। মহাত্মাজীর অনশন ব্রত ভঙ্গ হওয়ায় দেশের লোক একদিক হইতে আশ্বস্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্যের জন্য সমগ্র দেশের উদ্বেগ একটুও কমে নাই। কিন্তু এই বড় সংকট ও উদ্বেগের মধ্যেও বড় একটা সম্ভাবনা রহিয়াছে। আমরা আশা করিতেছি যে, প্রতীয়মান প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও সেই সম্ভাবনা সত্য হইবে। দক্ষিণপন্থী বল্লভভাইয়ের দলের অহিংস যে আক্রোশ মনে জ্বলিয়া উঠিয়াছে, সুভাষচন্দ্রের নির্ব্বাচনের ভিতর দিয়া রাজেন্দ্রপ্রসাদবাবুর বিবৃতি হইতেও দেখা যাইতেছে যে, সে আক্রোশের উপশম ঘটে নাই। আমরা এখনও আশা করিতেছি যে, দেশের বৃহত্তর স্বার্থই তাঁহাদের কাছে বড় হইবে এবং ত্রিপুরী কংগ্রেস ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে নূতন অধ্যায় উন্মুক্ত করিবে। ত্রিপুরী কংগ্রেসের এই অধিবেশন দেশবাসীর মনে নূতন একটা বাসনা এবং প্রেরণার সঞ্চার করিয়াছে। ত্রিপুরী কংগ্রেসের বাণী আগাইয়া যাইবার বাণী, নিয়মতান্ত্রিকতার একটা মোহ ধীরে ধীরে সব দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল, ত্রিপুরীর বাণী ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বাণী। ত্রিপুরীর বাণী হইল এই বাণী যে, আমরা পুরাপুরি স্বাধীনতা চাই, গোঁজামিল বুঝি না। যুক্তরাষ্ট্র প্রণালী আমরা মানিব না, অন্য একটা দেশের লোক অন্য একটা জাতির উপর জোর করিয়া শাসনতন্ত্র চাপাইবে, ইহার মূলে যে জবরদস্তি এবং দুর্নীতি রহিয়াছে, আমরা কোনক্রমেই তাহাকে স্বীকার করিব না। আমরা চাই স্বাধীনতা, সমগ্র ভারতের, অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা, শুধু ব্রিটিশ ভারতের নয়। সামন্ত রাজ্যগুলিতে সাম্রাজ্যবাদীরা ঘাঁটী করিয়া সেখান হইতে

গোটা ভারতের রাষ্ট্রনীতি তাঁহারাই কৌশলক্রমে নিয়ন্ত্রণ করিবে, এমন বুজরুকী চলিবে না। এইদিক হইতে বিবেচনা করিয়াই ত্রিপুরী কংগ্রেস যেমন সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে ভারতের স্বাধীনতার চরম দাবী দাখিল করিতেছে, সেইরূপ দেশীয় রাজ্যে গণ-আন্দোলন চালাইবার নীতিও প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করিতেছে। সেই সঙ্গে ব্যাপক রাষ্ট্রীয় সংগ্রামের জন্য দেশবাসীকে প্রস্তুত করিবার নিমিত্তও কার্য্যতালিকা নির্দ্ধারণ করিতেছে। মহাত্মাজী কংগ্রেসে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না; কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে এই অধিবেশনের প্রেরণা তিনি যোগাইতেছেন এবং মহাত্মাজীর মূল নীতি মানিয়া লইয়া ত্রিপুরী কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত হইবে। রাজকোটের অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মহাত্মাজী দেশকে স্বাধীনতা-সংগ্রামের কঠোরতর অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করাইবেন, সমগ্র দেশ ইহাই আশা করিতেছে।

মহাত্মার উপবাস ভঙ্গ—

রাজকোটের ব্যাপার সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর আমরণ অনশন ব্রত অবলম্বনে সমগ্র দেশে একটা দারুণ উদ্বেগের সৃষ্টি হয়, পাঁচ দিন অনশনের পর বড়লাট এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করায় এবং রাজকোট সমস্যার আশু সমাধানের সম্ভাবনা সুনিশ্চিত বুঝিয়া মহাত্মাজী অনশন ব্রত ভঙ্গ করায় দেশের সর্ব্বত্র তদ্রূপ একটা আশ্বস্তির ভাব আসিয়াছে। বড়লাট এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, রাজকোটের ঠাকুর সাহেব মহাত্মাজীর নিকট যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন সেগুলি যাহাতে প্রতিপালিত হয়, তাহা তিনি করিবেন এবং সেই সব প্রতিশ্রুতির তাৎপর্য্য সম্বন্ধে যদি বুঝিতে কোন গোল ঘটে সে সম্বন্ধে বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করিবার ভার ভারতের ফেডারেল কোর্টের প্রধান বিচারপতির উপর থাকিবে। মহাত্মাজী এই প্রস্তাবে রাজী হইয়াছেন এবং বড়লাটের অনুরোধক্রমে এ সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে আলোচনার নিমিত্ত তিনি একটু সুস্থ হইবার পরই দিল্লীতে যাইতেছেন।

মহাপুরুষেরা মরণকে ভয় করেন না। তাঁহাদের কাছে বড় তাঁহাদের আদর্শ। এই আদর্শের সাধনায় তাঁহারা আত্ম-বলিদান করাতে পরম পুরুষার্থ মনে করিয়া থাকেন এবং আত্মবলিদানের ভিতর দিয়া আদর্শের প্রতিষ্ঠা করেন। জীবন দিয়াও মানবধর্ম্মকে সঞ্জীবিত রাখেন। নিজেরা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহারা মানুষের আত্মাকে পশুত্ব হইতে অমরত্বের পথে উন্নীত করেন। মহামানব মহাত্মা গান্ধীর জীবনেও আমরা সেই সত্যেরই পরিচয় পাই। দধীচির মত তিনিও আমাদিগকে দৃঢ়তার সহিত এই সত্যই বহুবার শুনাইয়াছেন যে, আমার এই জীর্ণ শরীর যদি জগতের কোন কাজে লাগে- লোকহিতের পুণ্যব্রতে ব্রতী হয়, তাহা হইলে আমি ধন্য হইব। লোকহিত ব্রতের সেই প্রেরণাই মহাত্মার অন্তরে রাজকোট রাজ্যে অত্যাচার এবং অনাচারের প্রতিবাদে তপঃপ্রবৃদ্ধ অনলকে প্রদীপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু সে অনল অপরকে জ্বালাইতে চায় নাই,—নিজেকে হোমানলে জ্বালাইয়া দিয়া অন্যায় এবং অত্যাচারের অন্ধকারকে দূর করিতে চায়। মহাত্মাজী সংকল্প করেন, রাজকোটের অন্যায়ের যদি প্রতীকার না হয়, তাহা হইলে তিনি জীবন দান করিবেন। বার্দ্ধক্যভারে জীর্ণ তাঁহার দেহ, রুগ্ন তাঁহার শরীর, মহাত্মাজীর এই অনশনব্রতে ভারতের সর্ব্বত্র উদ্বেগের সাড়া পড়িয়া যায়।

ব্রত আরম্ভ করিবার সময় সে ব্রত কি সফল হইবে, না তাঁহাকে আত্মবলি দিতে হইবে মহাত্মাজীর মনে কোন সন্দেহ জাগে নাই, সংশয় দেখা দেয় নাই—তিনি জানিতেন, আজ আশু প্রতীকারের স্থূল আকারে যদিও তাঁহার ব্রত সাফল্য লাভ না করে, তাহা হইলেও যে পথ তিনি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার প্রয়োগ অমোঘ। তাঁহার এই যে অভিক্রম ইহার নাশ নাই। তাঁহার জীবিত অবস্থায় তাঁহার অভীষ্ট যদিও আজ সিদ্ধ না হয়, তাঁহার মৃত্যুর ভিতর দিয়া তাহা সাফল্য লাভ করিবে, আদর্শে উগ্রতর এবং দীপ্ততর হইয়া অনাচারকে দগ্ধ করিবে। মহাত্মাজীর এই যে অনশন ব্রত, বাহির হইতে দেখিতে, রাজকোটের মত একটা ছোট সামন্ত রাজ্যের স্থানীয় ব্যাপারগত বলিয়া মনে হইলেও সমগ্র ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদগত স্বার্থের সহিত সংগ্রামের ইহার একটা দিক রহিয়াছে। যাঁহারা সাম্রাজ্যবাদের ধারক এবং পোষক, তাঁহারা এই জিনিষটাকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন এবং করেন বলিয়াই তাঁহারা চঞ্চল হইয়া উঠেন। প্রকৃতপক্ষে রাজকোটের এই ব্যাপার হইতে স্পষ্ট বুঝা গিয়াছে যে, দেশীয় রাজ্যের শাসকদিগকে হাতের পুতুল করিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধি-স্থানীয় পুরুষ-দের মারফতে জটিল এবং কুটিল লীলাখেলা চলিতেছে। দেশীয় রাজাদের নিজেদের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় এবং ব্রিটিশ রেসিডেণ্টদের কথায় সায় না দিলে তাঁহাদের অবস্থা কেমন দাঁড়ায়, রাজকোটেই তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। রাজকোটের ঠাকুর সাহেবের দোষ যে না আছে, আমরা এমন কথা বলিতেছি না, অধিকাংশ দেশীয় রাজাদের যে দোষ বা যে ত্রুটি সাধারণত থাকে, অর্থাৎ তাঁহাদের নিজেদের ব্যক্তিত্ব বলিতে কোন বস্তু থাকে না, পরের পরামর্শ মতই তাঁহারা চলেন, রাজকোটের ঠাকুর সাহেবের অবস্থাও হইয়াছে তাহাই। প্রথমত তাঁহার ইংরেজ দেওয়ান স্যার প্যাট্রিক ক্যাডেল নিজে তাঁহার ভৃত্য হইয়া ঠাকুর সাহেবকেই হুকুমের চাকরের মত চালাইয়া নিজের দমন-নীতিতে সায় যোগাইতে বাধ্য করিতে চাহেন। ঠাকুর সাহেবের সম্মতিক্রমেই যে প্রজাদের দমনে স্যার প্যাট্রিক দমন-নীতি চালাইতেছেন, ইহা প্রজাদিগকে বুঝাইবার জন্য স্যার প্যাট্রিক ঠাকুর সাহেবকে হুকুম করেন যে, কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানে স্যার প্যাট্রিককে সঙ্গে রাখিয়া তাঁহাকে মিছিলে বাহির হইতে হইবে। ঠাকুর সাহেব এই হুকুমে রাজী হন নাই। স্যার প্যাট্রিক ক্যাডেলের পদত্যাগের পর উজির বীরওয়ালা উপদেষ্টা হন। এই লোকটি এক নম্বরের চালবাজ। ইঁহারই মধ্যস্থতায় সর্দ্দার প্যাটেলের সঙ্গে মিটমাট হয়—সর্ত্ত এই হয় যে, একটি শাসন সংস্কার কমিটি গঠিত হইবে এবং সেই কমিটির দশজন প্রতিনিধির মধ্যে সর্দ্দার প্যাটেলের মনোনীত প্রজাদলের

সাতজন প্রতিনিধি থাকিবেন। পরে এই প্রতিশ্রুতি প্রতিপালিত হয় নাই এবং মিঃ বীরওয়ালারই প্রভাবে সে প্রতিশ্রুতির অন্যথাচরণ ঘটে। প্রজাপক্ষের সাতজন প্রতিনিধি ত দূরের কথা, মহাত্মাজী চারজন প্রতিনিধি পর্যন্ত লইলেও সুখী হইতেন; কিন্তু তাঁহার সে প্রস্তাবও অগ্রাহ্য করা হয়। দমন-নীতি পুরাদস্তুর চলিতে থাকে। এই ত অবস্থা রাজকোটে যে অবস্থা, অধিকাংশ দেশীয় রাজ্যের অবস্থাও এমনই। প্রজাদের কোন অধিকার নাই, স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কূটচক্র শাসনতন্ত্রের পাকে পাকে ঘুরিতেছে। রাজকোটের ঠাকুর সাহেব নিজের নিব্বুদ্ধিতার জন্য একদিকে ইংরেজ দেওয়ানকে তাড়াইয়া বড় কর্ত্তাদিগকে চটান, অপর দিকে প্রজাদের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া সর্দ্দার প্যাটেলের নিকট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া প্রজাদিগকে অসন্তুষ্ট করেন। যে নীতিহীন রাষ্ট্রীয় আবহাওয়ায় পড়িয়া এই অবস্থা সম্ভব হয়, তাহারই প্রতীকারের জন্য মহাত্মা গান্ধীর অনশন ব্রত। আত্মদাতাদের ত্যাগ কোন দিন ব্যর্থ হয় না—মহাত্মাজীর এ ব্রতও বৃথা হয় নাই।

মহাত্মাজীর বিবৃতি—

অনশন ব্রত ভঙ্গের পর মহাত্মা গান্ধী একটি সুদীর্ঘ বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। এই বিবৃতিতে দেশীয় রাজ্যের সম্বন্ধে তিনি কয়েকটি মন্তব্য সাধারণভাবে করিয়াছেন, এগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন,—'এদেশের বহু ব্যক্তি মনে করেন যে, দেশীয় রাজন্যবর্গ সংশোধনের অতীত; কাজেই অতীত যুগের এই বর্ব্বরতা একেবারে ধ্বংস করিতে হইবে; নতুবা স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠার কোন সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ে আমার অভিমত অন্য প্রকার। অহিংসা এবং মানব চরিত্রের উৎকর্ষে বিশ্বাসী বলিয়া আমি সেরূপ না ভাবিয়াই পারি না। এদেশে তাঁহাদেরও স্থান আছে। অতীতের সমুদয় স্মৃতি ইচ্ছা মত মুছিয়া ফেলা সম্ভবপর নহে।'

দেশীয় রাজন্যবর্গকে আমরা অতীত যুগের বর্ব্বরতার বিগ্রহ বলিয়াই মনে করি এবং আমাদের এই বিশ্বাস যে, ইঁহাদের হাতে বর্ত্তমানে যেরূপ স্বেচ্ছাচারের ক্ষমতা আছে, যদি সেগুলি সংযত না হয়, অর্থাৎ সে সব ক্ষমতা তাঁহাদের হাত হইতে প্রজাদের হাতে না আসে, তাহা হইলে শুধু আধ্যাত্মিক উপদেশ বা রামচরিত মানসের মহিমা শুনাইয়া তাহাদিগকে শোধরান যাইবে না। 'অতীতের সমুদয় স্মৃতি রাতারাতি মুছিয়া ফেলা সম্ভবপর নহে'—বাস্তব রাজনীতির দিক হইতে মহাত্মাজীর এ কথার গুরুত্ব আমরা না বুঝি ইহা নয়; কিন্তু অবাধ ক্ষমতা যদি কেহ হাতে পায়, সে যতই মহামানব বা মহাপুরুষ হউক না কেন, ক্ষমতার অপব্যবহার তাহার দ্বারা হইবেই, জগতের নিয়মই হইল ইহাই। আমরা স্বীকার করি যে, রাজন্যবৃন্দের স্থানও এদেশে আছে; কিন্তু সে স্থান রাজা হিসাবে নয়, সেবক হিসাবে। মহাত্মাজী রাজন্যবৃন্দকে হুঁসিয়ার করিয়া দিয়া বলিয়াছেন—'আমার অভিমত এই যে, রাজন্যবর্গ অতীত অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষালাভ করিবেন এবং সময়ের দাবী উপেক্ষা করিবেন না। তাহা হইলেই মঙ্গল হইবে। তাঁহাদিগকে প্রকৃত ক্ষমতা প্রজাদের হাতে সমর্পণ করিতেই হইবে।' উপদেশ হিসাবে ইহা ভাল। দেশীয় রাজাদের সম্বন্ধে আমাদের মনের ধারণা যেরূপ তাহাতে তাঁহাদের শুভ বুদ্ধিকে আমরা বড় করিয়া দেখি না। আমাদের মতে তাঁহাদের শুভ বুদ্ধিকে প্রতিষ্ঠিত করিবার একমাত্র উপায় হইল দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রেরণাকে শক্ত করিয়া তোলা। রাজনীতির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত শুভেচ্ছা বা সুবুদ্ধির কোন মূল্য নাই, যদি তাহার পিছনে জাগ্রত জনগণের জোর না থাকে। বড়লাট এত সহজে যে রাজকোটের ব্যাপারের মীমাংসার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িলেন, ইহার ভিতরেও বড়লাটের শুভবুদ্ধিকে আমরা বড় স্থান দেই না, দেই জনমতের জোরকে। বড়লাট দেখিলেন, রাজকোট ব্যাপারের যদি একটা আশু মীমাংসা না হয়, তাহা হইলে ৯টি প্রদেশের মন্ত্রীরা পদত্যাগ করেন এবং এখনই একটা ভারতব্যাপী গুরুতর রকমের রাষ্ট্রনীতিক সঙ্কট বাধিয়া যায় এবং ইহা বুঝিবার ফলেই, মহাত্মাজীর উপবাসের সম্বন্ধে তিনি এমন ধারণা লইয়া চলিতে পারেন নাই যে,—'উপবাস ভঙ্গ না করা পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত কোন প্রকার আলোচনা করা উচিত হইবে না।" এই যে শুভবুদ্ধি, যাহা অন্যান্য ক্ষেত্রে মহাত্মাজীর এমন উপবাসের মধ্যে এত সহজে শাসকদের অন্তরে দেখা দেয় নাই, আজ যে তাহা দেখা দিল, তাহার কারণ অন্য কিছু নয়,—কথায় আছে, গরজ বড় বালাই। ইংরেজ যে অবস্থায় পড়িয়াছে তাহাতে ভারতের জনশক্তির প্রতিকূলতা হইতে উদ্ভূত কোন রাষ্ট্রনৈতিক সঙ্কটের সে সহজে সম্মুখীন হইতে চায় না। রাজকোটের ব্যাপার হইতে আমরা এই শিক্ষালাভ করিতে পারি।

অর্থ সচিবের বৈরাগ্য—

গত মঙ্গলবার বাঙলার অর্থ সচিব মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকার নূতন ট্যাক্স বসাইবার আইনের খসড়া ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থিত করেন। তিনি বলেন, ১৭০্ টাকা যাঁহাদের আয় তাঁহারা মাসে আড়াইটা করিয়া টাকা দিতে পারিবেন না, ইহা কি একটা কথা? সরকার সাহেব ধনী লোক, দেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোকদের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা এমন হওয়া অসম্ভব নয়! তিনি বোধ হয় জানেন না যে, যে আড়াইটা টাকা তিনি তুচ্ছ মনে করিতেছেন, সেই আড়াইটা টাকায় এদেশের একজন লোকের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে এবং এদেশে মধ্যবিত্ত পরিবারদের মধ্যে যাহাদের একটু সঙ্গতি আছে, তাঁহাদের ঘাড়ে নিঃস্ব, নিরন্ন আত্মীয়-স্বজনদের বোঝা যেভাবে চাপিয়াছে, তাহাতে ঐ যে আড়াইটা টাকা তাহার মূল্য তাঁহাদের কাছে কত বেশী? আর যদিই এই ট্যাক্স দিতে হয়, সে পক্ষে যুক্তি কি? দিবে লোকে কোন্ মহদুদ্দেশ্যে? সরকার সাহেব বলিয়াছেন জলকষ্টের কথা। আপশোষ করিয়াছেন এই বলিয়া যে, সমগ্র বাঙলা দেশে জলকষ্ট দূর করিবার জন্য তাঁহারা ৭॥ লাখ টাকার বেশী ব্যয়ের বরাদ্দ করিতে পারেন নাই! পারিবেন কেমন করিয়া, সেজন্য

তাঁহাদের গরজ যে বড় জবর কি না? পুলিশের ব্যয় কমিল না কেন, সরকার সাহেব কৈফিয়ৎ দিতে পারেন কি? তিনি বৈরাগ্যভরে বলিয়াছেন,—এই রাজস্ব বিলই হয়ত আমার শেষ বিল। আমরা জিজ্ঞাসা করি হক সাহেবের পাকা ফকিরীর আবহাওয়ায় থাকিয়া কি তাঁহার এই বৈরাগ্যবৃত্তি দেখা দিয়াছে, না এই বৈরাগ্য লাভ হইয়াছে 'আজাদী' মৌলানা সাহেবের বিশেষ দোয়ায়? অর্থ সচিবের এই বৈরাগ্যাত্মক উক্তিতে কোয়ালিশনী দল সচকিত হইয়া প্রশ্ন করিয়াছিল—কেন? কেন? আমরা তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিতেছি, তাঁহাদের ভয়ের কোন কারণ নাই। ঐ সবও মনের খেয়াল মাত্র। হিন্দু স্বার্থরক্ষার দোহাই দিয়া বর্ত্তমান মন্ত্রিসভায় মন্ত্রিগিরি যাঁহারা করিতে পারেন কিংবা তাঁহাদের নীতির সমর্থন করিতে পারেন, তাঁহাদের আর কিছু থাকুক বা না থাকুক বিবেক বলিয়া কোন বস্তু নাই। তাঁহারা শুধু হিন্দুর স্বার্থেরই হানি করিতেছেন না, জাতির স্বার্থেরও হানি করিতেছেন। এই পথে মিঃ নলিনী সরকার যে পথের পথিক, বর্দ্ধমানের মহারাজ কুমার উদয়চাঁদ মহতাবও সেই পথেরই পথিক। মুক্তাগাছার মহারাজা শশিকান্ত আচার্য্যও সেই পথ ধরিয়াছেন। দেশের লোক ইঁহাদিগকে চিনিয়া রাখিবে নিশ্চয়ই।

বাঙলায় বিষাক্ত আবহাওয়া—

হক মন্ত্রিমণ্ডলের আমলে বাঙলা দেশের আবহাওয়া দিন দিন বিষাক্ত হইয়া উঠিতেছে। সাম্প্রদায়িকতা শিক্ষিত এবং ভদ্রব্যক্তির রুচিসম্মত জিনিষ নয়; কিন্তু এই সাম্প্রদায়িকতাই আজ ছড়াইয়া পড়িতেছে সকল দিকে। হক মন্ত্রিমণ্ডলের এই যে দান, ইহাই দেখিতেছি বিশিষ্ট দান। সম্প্রতি বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হকের লিখিত একখানা চিঠি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। চিঠিখানা তিনি চৌধুরী সামসুদ্দীন আহাম্মদের নিকট লিখিয়াছিলেন। চিঠিতে সরকারী শিলমোহর স্পষ্ট রহিয়াছে, সুতরাং চিঠিখানার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। চিঠিখানাতে দেখান হইয়াছে যে, সেবক প্রধান মন্ত্রী হিন্দুদের পাল্লায় পড়িয়া কেমন বিপন্ন হইয়াছেন। হক সাহেব চিঠিতে বলিয়াছেন যে, হিন্দু কর্ম্মচারীরা প্রায় সকলেই কংগ্রেসকে অথবা হক সাহেবের বিরুদ্ধপক্ষকে উৎসাহ দান করিতেছেন। হক সাহেবের এই বিশ্বাস যে, হিন্দু কর্ম্মচারীরা প্রায় সকলেই গবর্ণমেণ্টের বিরোধী। ছোট বড় পাঁচ হাজারের বেশী এই শ্রেণীর বিদ্রোহী কর্ম্মচারীকে লইয়া হক সাহেবকে বিব্রত হইয়া পড়িতে হইয়াছে। তিনি এই বিপন্ন অবস্থায় পড়িয়া বলিয়াছেন, 'আমি ইহাদের প্রত্যেকের উপর নজর রাখিতে পারি না এবং ইহাদের সব কুকার্য্যের সংশোধন করিতে পারি না।' চিঠির ভাষা এবং ভঙ্গী হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে ছোট বড় এই যে প্রায় সব হিন্দু কর্ম্মচারী সরকারের কাজ করিতেছে, ইহারা হক সাহেবের মতে তাঁহার শত্রু এবং ইহাদিগের প্রত্যেককে ভদ্র ভাষায় যাহাকে বলিতে হয় সংশোধন করা, তাহাই বর্ত্তমানে হইয়া পড়িয়াছে বাঙলার প্রধান মন্ত্রীর অন্যতম ব্রত। বাঙলা ব্যবস্থা-পরিষদের মুসলমান সদস্যেরা হক সাহেবের রায়ে যদি সায় দিয়া চলেন, তাহা হইলেই দুষ্ট প্রকৃতির এই সব সরকারী আমলা হিন্দুদিগের কুকার্য্যের তিনি সংশোধন করিতে পারেন। নিজের স্বার্থ সিদ্ধ করিবার জন্য বিপন্ন ইসলামের জিগীর তোলার কূট-কলা আমরা ইতিপূর্ব্বেও অনেক দেখিয়াছি; কিন্তু এমনটি আর দেখি নাই। হক সাহেবের মন্ত্রিত্ব কাড়িতে পারে কে, যতদিন তাঁহার মাথায় এমন বুদ্ধি আছে! হক সাহেব ছোট বড় কাহাকেও বাদ দেন নাই, হিন্দু যাহারা সরকারের কাজ করে, মন্ত্রী হইতে চৌকীদার—সকলেই মনে মনে তাঁহার এবং তাঁহার গবর্ণমেণ্টের বিরোধী। হক সাহেব এই যে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন, ইহার পক্ষে প্রমাণ তাঁহার কি আছে আমরা জানি না; প্রকৃত-পক্ষে প্রমাণ তেমন কিছু থাকিতেই পারে না, যাহার মূলে—যত হিন্দু সরকারী কর্ম্মচারী আছেন, সকলেই দোষী হইতে পারেন; কিন্তু প্রমাণের প্রশ্ন হক সাহেবের কাছে বড় নয়, বড় হইল তাঁহার মন্ত্রিগিরি বজায় রাখা; কিন্তু তাঁহার এই মন্ত্রিগিরির জন্য সমগ্র বাঙালী জাতিকে কি মূল্য দিতে হইতেছে, যাঁহারা একটু বুদ্ধিমান ব্যক্তি আমরা তাঁহাদিগকে সেই কথা বিবেচনা করিয়া দেখিতে বলিতেছি। হিন্দু স্বার্থরক্ষার দোহাই দিয়া যাঁহারা মন্ত্রিত্ব লইয়াছেন, আমাদের মনে আছে, অর্থ-সচিব মিঃ নলিনী সরকার তাঁহাদের মধ্যে একজন। আমরা শুনিতে চাই তাঁহাদের শ্রীমুখের ভাষা হক সাহেবের এই পত্রীর। আত্মমর্য্যাদাবোধসম্পন্ন যাঁহারা উচ্চপদস্থ হিন্দু কর্ম্মচারী তাঁহাদের এক্ষেত্রে কর্ত্তব্য কি? বাঙলার হিন্দু সমাজের কথা আমরা বিশেষভাবে ভাবিতেছি না, আমরা ভাবিতেছি, গোটা বাঙলা দেশের কথা স্বার্থগত সঙ্কীর্ণতা যদি রাষ্ট্রনীতিতে এমনভাবে ফুটিয়া উঠে, তাহা হইলে বর্ণ-ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে কেহই নিরাপদ নহে—ব্যক্তি নিরাপদ নয়, সমাজ নিরাপদ নয়, জাতি নিরাপদ নয়। বাঙলাকে সর্ব্বনাশের পথ হইতে রক্ষা করিতে হইলে অবিলম্বে বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলের অবসান ঘটান একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

হক সাহেবের কুযুক্তি—

চৌধুরী সামসুদ্দীন আহম্মদের নিকট লিখিত চিঠি-খানা প্রকাশিত হইবার পর প্রধান মন্ত্রী হক সাহেব একটা কৈফিয়ৎ দিয়াছেন এবং গত সোমবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদেও তিনি সেই কৈফিয়তেরই পুনরাবৃত্তি করেন, সেই সঙ্গে অধিকন্তু থাকে দুঃখ প্রকাশ। কিন্তু কথা হইতেছে যে, এ দুঃখ প্রকাশেও যে কাজে কিছু আগাইবে এবং সেদিক হইতে ইহার কোন মূল্য আছে ইহা ত মনে হয় না। হক সাহেবের যুক্তি হইল এই যে, আমি চিঠিতে যাহা লিখি, উহা আমার আসল মনের কথা নহে, চিঠিতে প্রাণ খুলিয়া লিখিবার সময় অনেক আবোল-তাবোল আসিয়া যায়। হক সাহেব যখন প্রকাশ্যে বলেন, 'সাতানা' করিব, তখন চাপিয়া ধরিলে বলেন, উহা আমার মনের কথা নহে, মুখ দিয়া কেমন করিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। আবার গোপন চিঠিতে যখন লিখেন ৫ হাজার হিন্দু অফিসারকে সায়েস্তা করিতে হইবে, নিখিল মুসলমান দল আমার সহায় হও, তখন

ধরা পড়িলে বলেন, উহা আমার আসল মনের কথা নহে, কেমন মনের ঝোঁকে লেখা হইয়া গিয়াছে। এ স্থলে প্রশ্ন উঠে এই যে, হক সাহেবের আসল মনের সেই কথাটা, যে কথাটা গোপনেও ফুটে না, প্রকাশ্যেও ফুটে না—সেই নিত্য কূটস্থ তত্ত্বটা হয়ত নলিনী-নাজিম প্রভৃতি হক সাহেবের যাঁহারা একান্ত অন্তরঙ্গ শুধু তাঁহাদের কাছেই প্রকট—কিন্তু মনের তদপেক্ষা নকল যে অভিব্যক্তি গোপনে এবং প্রকাশ্যে প্রকট হইয়া পড়িতেছে কাজের ক্ষেত্রে তাহার যে অনিষ্ট-কারিতা তাহা রোধ হয় কিসে? হক সাহেব সেদিন ব্যবস্থা-পরিষদে বলিয়াছিলেন—'অনেক সময় বন্ধু-বান্ধবদের কাছে এমন সব কথা বলা হয়, গোপনে এমন অনেক জিনিষ আলোচনা করা হয়, যাহা প্রকাশ করিলে লোকে এক বিশ্রী অবস্থার মধ্যে পড়িয়া যায়।' সকলেই বুঝেন, এ একটা কৈফিয়ৎ নয়, হক সাহেবের সম্বন্ধে এই সব ব্যাপারে লোকের মনে যে ধারণা সৃষ্টি হইতেছে, এই কৈফিয়তে সে ধারণা দূর ত হয়ই না বরং আরও দৃঢ় হইয়া পড়ে। কারণ, প্রকাশ্য মুখের কথা অপেক্ষা বন্ধু বান্ধবদের কাছে এবং গোপন চিঠিতেই মানুষের মনের আসল রূপটা বেশী ধরা পড়ে। হক সাহেব বলিয়াছেন, চিঠির মধ্যে আমি মনোভাবের কথা কিছুই বলি নাই। আমি কেবল আমার মত সম্বন্ধে বলিয়াছি। আমার সেই মত হয়ত কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণের ফলে হইয়াছিল, হয়ত বা তাহা উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে হইয়াছিল। মনোভাব বা ফিলিং এবং অপিনিয়ান বা মত, এতদুভয়ের মনস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়াও প্রধান মন্ত্রীর কৈফিয়ৎকে আমরা কোন মূল্য দিতে পারি না। অধিকাংশ হিন্দু কর্ম্মচারীকে সায়েস্তা করিতে হইবে—তাহারা অবাধ্য, বিদ্রোহী—এই যে একটা ধারণা, ইহাকে মনের একটা সাময়িক ঝোঁক বলা যায় না। ইহার মূলে রহিয়াছে একটা সংস্কার। এবং তেমন সংস্কারের ঝোঁক সামলাইবার মত যুক্তি বুদ্ধি সহকারে সমঝিয়া চলিবার সামর্থ্য যাঁহার নাই, এমন লোকের স্থান অন্য কোথায়ও হইতে পারে, যেখানে এমন সব ঝোঁক মাথায় চাপিলেও সমাজের কোন অনিষ্ট হওয়া সম্ভব হইবে না; থাকিতে পারে এমন জায়গা; কিন্তু প্রধান মন্ত্রীর পদ তেমন লোকের জন্য নিশ্চয়ই নয়। এমন লোকের হাতে বাঙলা দেশের রাষ্ট্রব্যাপার পরিচালনার কোন ক্ষমতা থাকিলে বাঙলা দেশের সর্ব্বনাশ হইবে। এমন লোককে অবিলম্বে মন্ত্রিপদ হইতে বিতাড়িত করাই সমাজের শুভবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিদের পক্ষে আশু কর্ত্তব্য।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল—

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল সিলেক্ট কমিটিতে গিয়াছে, ২৫শে মার্চ্চের মধ্যে সিলেক্ট কমিটি তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করিবেন। বাঙালীর শত্রুর দল বাঙালী-দিগকে দাবাইবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছে। বাঙালীর মস্তিষ্ক, বাঙালীর বুদ্ধিকে একদল অবাঙালী ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখে, আর যাহারা সাম্রাজ্যবাদী এবং বিদেশী স্বার্থ-সেবী, তাহারা ভয় করে বাঙালীর জাতীয়তাবাদকে। এই বিভিন্ন শত্রুপক্ষ সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি প্রভাবান্বিত বাঙলার বর্ত্তমান মন্ত্রীদিগের সঙ্গে জোট বাঁধিয়া বাঙলা দেশের সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য উদ্যত হইয়াছে। মিউনিসিপ্যাল বিল সম্পর্কিত বিতর্কে ইহার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া গেল। ইহাদের প্রত্যেককে বাঙালীর চিনিয়া রাখা উচিত, জানিয়া রাখা উচিত যে, ইহারা আজ জাতির যে অনিষ্ট করিতেছে আমলাতন্ত্রও তাহা করে নাই। আমরা জানি, এই সব দেশদ্রোহী দিন পাইয়াছে বাঙলার এই দুর্দ্দিনে। কিন্তু বাঙালীকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে হইবে, দাঁড়াইতে হইবে সমগ্র জাতির স্বার্থ রক্ষার জন্য। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল আইনে পরিণত হইলে বাঙালীকে নিজ বাসভূমে পরবাসী হইতে হইবে,—সাম্প্রদায়িকতার মনোবৃত্তি দেশের মজ্জায় মজ্জায় আরও বেশী করিয়া ঢুকিবে। বাঙলার সভ্যতা বা সংস্কৃতি অক্ষুণ্ণ থাকিবে না। সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার সুদীর্ঘ সাধনায় দেশকে যেটুকু উন্নতির পথে লইয়াছিলেন, যে পথে জাতিকে উন্নত করিয়াছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন—সবই শূন্যে বিলীন হইবে। বাঙলা দেশ জুড়িয়া দেখা দিবে একটা মহা কদাচারের যুগ। বাঙালী যদি আজও না জাগে তবে তাহার মৃত্যু অবধারিত। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, বাধা দিতে হইবে এ প্রচেষ্টাকে, কংগ্রেসের সমস্ত শক্তি লইয়া বাধা দিতে হইবে, বাধা দিতে হইবে বাঙলা দেশ এবং বাঙালী জাতির শুভার্থী যত শক্তি আছে সকলগুলি লইয়া। ভণ্ডের দল, স্বার্থসেবীর দল, দেশ-দ্রোহীর দল—ইহাদের স্বরূপ সকলকে খুলিয়া দেখাইতে হইবে—এজন্য যে ত্যাগ, যে সহিষ্ণুতা এবং যে পরার্থপ্রাণতার প্রয়োজন, আমাদের বিশ্বাস আছে বাঙলা মুল্লুকে তাহার অভাব এখনও ঘটিবে না। বাঙালী তাহার সহিষ্ণুতার শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বাঙালীর সর্ব্বনাশ যাহারা করিতে বসিয়াছে, তাহারা এখনও সাবধান হউক।

'পথের দাবী'র নিষ্কৃতি—

এতদিন পরে বাঙলা সরকার শরৎচন্দ্রের সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস 'পথের দাবী'র উপর হইতে নিষেধ-বিধি তুলিয়া লইয়াছেন। শরৎবাবুর লেখার মর্য্যাদা বুঝিবার মত বুদ্ধি লালদিঘীর দপ্তরখানায় এতদিন পরেও যে দেখা দিয়াছে, ইহা মন্দের ভাল বলিতে হইবে। বিহার সরকার—বাঙলার বাহিরে যাঁহারা, তাঁহারা ইহার অনেক আগেই এই নিষেধ-বিধি তুলিয়া দিয়াছিলেন। 'পথের দাবী'র উপর হইতে নিষেধ-বিধি প্রত্যাহৃত হইয়াছে—কিন্তু বাঙলা দেশের সাহিত্য-সাধনার অনেক মূল্যবান সম্পদ হইতে এই বাঙালী মন্ত্রীদের কর্ত্তৃত্বের আমলেও বাঙলা দেশ বঞ্চিত রহিয়াছে। মহাকবি গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদৌল্লা', 'মীরকাশিম' এই সব গ্রন্থ যে-কোন জাতির সম্পদস্বরূপ; সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয়ের 'দেশের কথা' একখানা অতি মূল্যবান গ্রন্থ, স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস'ও আর একখানি মূল্যবান পুস্তক। এইরূপ আরও অনেক ভাল ভাল পুস্তক সরকারে বাজেয়াপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে। বাঙলা দেশে যদি বাস্তবিকই জাতির স্বার্থানুকূল মন্ত্রিমণ্ডল প্রতিষ্ঠিত থাকিত,

তবে চিন্তা-সাধনার ক্ষেত্রে এই যে জবরদস্তি; ইহার অবসান ঘটিত। যাঁহারা জীবনব্যাপী সাধনার সম্পদ জাতিকে দান করিয়া গিয়াছেন, সেই মনীষীদের অবদান হইতে জাতি বঞ্চিত থাকিত না। বড় দুঃখেই এ সব কথা বলিতে হইতেছে!

মৌলানা ওবেদুল্লা—

সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের অধিককাল নির্ব্বাসিত জীবন যাপন করিবার পর মৌলানা ওবেদুল্লা সিন্ধী গত ৭ই মার্চ্চ ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৯১৪ সালে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়াছিলেন। মৌলানা সাহেব নিজে একজন বিপ্লববাদী। বিগত মহাসমরের সময় তিনি জার্ম্মানী এবং তুরস্কের সাহায্যে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিবার বিশ্বাস লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। বর্ত্তমানে তাঁহার বয়স ৬৫ বৎসর। দেশে ফিরিয়া আসিয়া মৌলানা সাহেব যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ভারতের এই স্বদেশপ্রেমিক সন্তানের অন্তরে ভারতের স্বাধীনতার পিপাসা এখনও কেমন প্রবলভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। মৌলানা সাহেব বলেন,—'কংগ্রেস আমার স্বর্গ। আমি কখনও ইহার বাহিরে যাইব না। গভীর অনুসন্ধানের পর বহু বৎসর পূর্ব্বে কাবুলে আমি যখন এক কংগ্রেস কমিটি গঠন করি, তখন হইতেই আমি দৃঢ়বিশ্বাস লইয়া কংগ্রেস-সেবী হইয়াছি। ঐ সময় হইতে আমি কংগ্রেসের একজন সামান্য কর্ম্মী হিসাবে বিদেশে ভ্রমণ করিয়া কংগ্রেসের বাণী প্রচার করিয়াছি। আমি আমরণ কংগ্রেসের সেবা করিয়া যাইব। একমাত্র কংগ্রেসই ভারতকে মুক্তির পথে লইয়া যাইতে পারে এবং ভারতের স্বাধীনতা বা মুক্তিই আমার আদর্শ।' লীগওয়ালারা মৌলানা সাহেবকে দলে টানিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু মৌলানা সাহেবের ন্যায় স্বদেশ-প্রেমিকের নিকট লীগের স্বরূপ সুস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। তিনি বলেন, আমি সাম্প্রদায়িক মতে বিশ্বাস করি না। আমি চাই ভারতের স্বাধীনতা। কোন যুক্তিহীন মতবাদ আমাকে বিচলিত করিতে পারিবে না। ব্যক্তিগত স্বার্থকে তুচ্ছ করিয়া ভারতের স্বাধীনতার আদর্শের সাধনায় যিনি বলিতে গেলে জীবন পাত করিয়াছেন, তাঁহাকে হাত করিবেন লীগওয়ালারা কোন্ প্রলোভন দেখাইয়া—সে বড় কঠিন ঠাঁই!

গিরিশচন্দ্রের বাস-ভবন—

কলিকাতা বোসপাড়া লেনে মহাকবি গিরিশচন্দ্রের বসতবাটী। কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের নূতন রাস্তা বাহির করিবার পরিকল্পনার মধ্যে পড়াতে এই বাড়ীখানা ভাঙিয়া ফেলা হইবে, এমন আতঙ্ক দেখা দিয়াছে। গিরিশ-চন্দ্রের বসতবাটীকে আমরা জাতির সম্পদরূপ মনে করি। গিরিশচন্দ্রের স্মৃতি বাঙালীর কাছে চির আদরের। নাট্যকার হিসাবে, সাহিত্যিক হিসাবে, সাধক হিসাবে গিরিশচন্দ্র সমস্ত বাঙালীর শ্রদ্ধার আসনে সমাসীন। আজ যদি তাঁহার বসত বাটীখানা বিলুপ্ত হয়, তবে সমগ্র বাঙালী জাতির একটা ব্যথার কারণ হইবে। সেদিন গিরিশচন্দ্রের স্মৃতি বার্ষিকী সভায় এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, বাড়ীখানা বাদ দিয়া যাহাতে নূতন রাস্তা বাহির করা হয়, ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট তেমন ব্যবস্থা করুন। আমরাও সেই প্রস্তাব সমর্থন করিতেছি। আমরা আশা করি, কলিকাতার পৌর সমাজ যদি এ সম্বন্ধে সচেতন হন, তাহা হইলে মহাকবির বাড়ীখানা এখনও রক্ষা পাইতে পারে। এই বিষয়ে সমস্ত সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। আমরা বিশেষভাবে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে এই আন্দোলনে অগ্রণী হইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

রমেশ স্মৃতি-ভবনের প্রতিষ্ঠা—

গত ২৫শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার 'রমেশ ভবনে'র প্রতিষ্ঠা ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম সভাপতি ছিলেন স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়। তাঁহার স্মৃতিরক্ষা কল্পে সাহিত্য পরিষদ হইতে 'রমেশ ভবন' প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প হয়, এতদিনে এই ভবনের নির্ম্মাণকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। এই সঙ্গে রমেশচন্দ্রের মর্ম্মর মূর্ত্তি ও চিত্র উদ্বোধন হয়। রমেশচন্দ্র সমগ্র বাঙালী জাতির গৌরব। বঙ্গবাণীর সেবার জন্য রমেশচন্দ্র আত্মবিনিয়োগ করিয়াছিলেন। বঙ্কিম প্রতিভার প্রখর প্রভায় আলোকিত সেই যে যুগ, সেই যুগের অন্যতম জ্যোতিষ্ক স্বরূপ ছিলেন রমেশচন্দ্র। এই যুগের বাঙলা দেশের সাহিত্যাচার্য্যগণের সাধনার বিশিষ্টতা ছিল দেশপ্রাণতা, বা জাতীয়তাবাদকে বাণীমূর্ত্তি প্রদান করা, স্বাধীনতার প্রেরণা দেশের মধ্যে জাগান। রমেশচন্দ্রের সাধনার মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় জ্বলন্তভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। আনন্দমঠের মধ্য দিয়া ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র যে তত্ত্বকে প্রচার করেন, আমরা সেই তত্ত্বেরই রূপ দেখিতে পাই রমেশ-চন্দ্রের 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা' এবং 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাতে'র ভিতর। স্বদেশী যুগের সাধনার মূলে বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দ মঠ প্রধান প্রেরণা স্বরূপে কার্য্য করিলেও রমেশচন্দ্রের ঐ দুই-খানি গ্রন্থ কম কাজ করে নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ রমেশচন্দ্রের সাধনার জীবন্ত প্রতীক স্বরূপ। নবীন বাঙলার গঠনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের দান যে কতখানি তাহা দুই এক কথার মধ্যে বলিয়া শেষ করা যায় না। প্রকৃত পক্ষে রাজনীতিক বাহ্য আকারের ভিতর দিয়া আমরা বাঙলা দেশের যে শক্তির পরিচয় পাইতেছি এবং এতদিন পাইয়াছি, তাহার মূলে প্রাণশক্তি যোগাইতেছেন, বাঙলা দেশের এই বাণী-সাধকগণ। বাঙলা দেশের উন্নতি বা অগ্রগতির মূলে ইঁহাদের সাধনা যত বেশী কাজ করিয়াছে, যাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে রাজ-নীতিক, তাঁহাদের কাজ ততটা করে নাই। বাণী-সাধকের যদি মনোভূমি তৈয়ার না করিতেন, তাহা হইলে বাঙলার রাজনীতির দিককার এই যে পত্রপল্লব বিকাশ ইহা কিছুই আমরা দেখিতে পাইতাম না। জমি তৈয়ার করিয়াছেন ইঁহারাই। ইঁহারা পুণ্যশ্লোক—ইঁহারা জাতির প্রতিষ্ঠা। রমেশচন্দ্রের স্মৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া বাঙালী জাতি পবিত্র হইয়াছে, কৃতার্থ হইয়াছে, গৌরবান্বিত হইয়াছে। যাঁহারা এই পুণ্য অনুষ্ঠান সফল করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে, বিশেষভাবে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে এজন্য আমরা ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

মহাত্মাজীর অনশন ত্যাগ

রাজকোট সমস্যার সন্তোষজনক মীমাংসা সম্পর্কে বড়লাটের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি পাইয়া ৭ই মার্চ্চ বেলা ২-২৫ মিনিটের সময় মহাত্মাজী এক গ্লাস নেবুর রস পান করিয়া তাঁহার অনশন ভঙ্গ করিয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধী ত্রিপুরী কংগ্রেসে যোগদান করিতেছেন না, কারণ মীমাংসার সর্ত্তাবলী কার্য্যকরী করাইবার জন্য সুস্থ হইলেই তিনি দিল্লী যাত্রা করিবেন।

মীমাংসার সর্ত্ত অনুযায়ী রাজকোট আন্দোলন সম্পর্কিত সমস্ত বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

বড়লাটের প্রতিশ্রুতি

আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, ঠাকুর সাহেবের নোটিশ এবং পূর্ব্বোল্লিখিত পত্রে বর্ণিত সর্ত্ত অনুসারে কিরূপে কমিটি গঠন করিতে হইবে, ঠাকুর সাহেবের সম্মতি লইয়া সেই
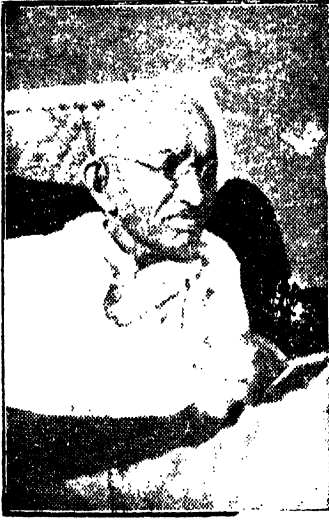
মহাত্মা গান্ধী

সম্পর্কে ভারতবর্ষের ফেডারেল কোর্টের প্রধান বিচারপতির অভিমত গ্রহণ করা হউক। আমি জানিতে পারিলাম, ঠাকুর সাহেব ইহাতে সম্মতি দিবেন। ফেডারেল কোর্টের প্রধান বিচারপতির অভিমত গ্রহণের পর তাঁহার সিদ্ধান্ত অনুসারে কমিটি গঠন করিতে হইবে; আরও সর্ত্ত থাকিবে যে, ঠাকুর সাহেবের নোটিশের কোনও অংশ সম্পর্কে সুপারিশ করার সময় ঐ অংশের ব্যাখ্যা সম্পর্কে কমিটির সদস্যগণের মধ্যে যদি মতদ্বৈধ হয়, তবে সেই সম্পর্কে বিচারের ভারও ভারতবর্ষের প্রধান বিচারপতির উপর অর্পণ করিতে হইবে এবং তাঁহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে। ঠাকুর সাহেব প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার নোটিশের সর্ত্তসমূহ পালন করিবেন। আমি প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে, তিনি যাহাতে প্রতিশ্রুতি পালন করেন, আমি তাহা দেখিব।"

বড়লাটের পত্রের উত্তরে মহাত্মা—

যদিও আপনার ঐ চিঠিতে কয়েকটি বিষয়ে কিছু বলা হয় নাই, তথাপি আমি উহাকে অনশন ভঙ্গের এবং যে লক্ষ লক্ষ লোক আমার অনশনের সঙ্গে প্রার্থনা করিতেছেন এবং সত্বর মীমাংসা ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের উদ্বেগের অবসান ঘটাইবার পক্ষে যথেষ্ট কারণ বলিয়া মনে করি। আমার পক্ষে ইহা বলা সঙ্গত যে, আপনার চিঠিতে যে সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ করা হয় নাই আমি তৎসমুদয় ত্যাগ করি নাই; আমি ঐ সমস্ত বিষয়ে সন্তুষ্ট হইব বলিয়া আশা করি।

অনশন ভঙ্গ করিয়া মহাত্মা এক দীর্ঘ বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধীর বিবৃতি

"আমি মনে করি কোটি কোটি লোকের প্রার্থনার ফলেই এই মঙ্গলময় পরিণতি সম্ভবপর হইয়াছে। চব্বিশ ঘণ্টাই আমি তাহাদের সহিত রহিয়াছি। তাহাদের কথা চিন্তা করাই আমার প্রথম এবং শেষ কর্ত্তব্য; কেননা এই অগণিত মূক

ঠাকুর সাহেব রাজকোট

জনসাধারণের অন্তরে যে ভগবান অধিষ্ঠিত, তাহা ছাড়া অপর কোন ভগবান আমি জানি না। তাহারা ভগবানের অস্তিত্ব বুঝিতে পারে না, কিন্তু আমি বুঝি; আর বুঝি বলিয়াই মূকদের সেবার মধ্য দিয়া সত্যস্বরূপ ভগবানের পূজা করিয়া থাকি। কিন্তু ইহারা ছাড়াও, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আমার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে এবং আমার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা হইয়াছে। আবার শিক্ষিত সম্প্রদায়ও অবিলম্বে একটি সম্মানজনক মিটমাট ঘটাইয়া এই অনশনের অবসান করিতে ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছেন। এ বিষয়ে ইংরেজ ও ভারতবাসী উভয় সম্প্রদায়ই সহযোগিতা করিয়াছে।

অনশনের প্রয়োজনীয়তা

রাজনীতির দিক দিয়া বলিতে গেলে, বড়লাটের চেষ্টাতেই এই মিটমাট সম্ভবপর হইয়াছে, এরূপ বলিতে হয়। ইংরেজেরা

যে উপবাসের যৌক্তিকতা সম্পর্কে, বিশেষত নিছক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের উপবাসের যৌক্তিকতা সম্পর্কে অবগত নহেন, একথা আমার অজ্ঞাত নহে। অনেক সময় তাঁহারা ইহাতে বিরক্ত হন; অনেক ভারতবাসীও উপবাসের পক্ষপাতী নহেন। আমি সবল হইলে, এ সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখিব বলিয়া আশা করি। পঞ্চাশাধিক বৎসরের অভিজ্ঞতায়—আমি নিঃসন্দেহে বুঝিয়াছি যে, সত্যাগ্রহ পরিকল্পনায় উপবাসেরও বিশেষ প্রয়োজন আছে। বড়লাটের হস্তক্ষেপের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝাইবার উদ্দেশ্যেই আমি উপবাসের প্রসঙ্গের অবতারণা করিলাম। তিনি একজন ইংরেজ; কাজেই তিনি অনায়াসে বলিতে পারেন, "এই লোকটির কার্য্যকলাপ আমি বুঝিতে পারি না; ইঁহার উপবাসের আর অন্ত নাই; কিন্তু কোথায়ও সীমারেখা থাকা আবশ্যক। এই যে তাঁহার শেষ উপবাস, এমন প্রতিশ্রুতি দিতে তিনি প্রস্তুত নহেন। কাজেই আমরা মনে করি, উপবাস ভঙ্গ না করা পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত কোন প্রকার আলোচনা করা উচিত হইবে না।" অন্তত সে ক্ষেত্রে আমি তাঁহার কার্য্য সমর্থনই করিতাম। নৈতিক বিচারের দিক দিয়া তাঁহার এই কার্য্য হয়ত অন্যায় হইত, কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে একজন ইংরেজের মনোবৃত্তি লইয়া তিনি যদি নরম না হইতেন, তবে আমি তাঁহার কার্য্য সমর্থন করিতাম। আমার আশা আছে যে, এই মঙ্গলজনক পরিণামের জন্য এবং একজন ইংরেজ হইয়াও একটি দুর্ব্বোধ্য পন্থার উপযোগিতা মানিয়া লওয়ার ফলে, সমগ্র আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন ঘটিবে এবং আমি যাহা অন্যায় বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, তাহার প্রতিকার ত হইবেই, অধিকন্তু সাধারণভাবে সমস্ত দেশীয় রাজ্যের সমস্যাগুলিরও সমাধান সম্ভবপর হইবে। অবশ্য আমি একথা বলিতে চাহি না যে, সমস্ত দেশীয় রাজ্যকেই রাজকোটের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে হইবে। রাজকোটের ব্যাপারে কয়েকটি অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল বলিয়াই তদ্বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা আবশ্যক। প্রত্যেক রাজ্যের অবস্থা বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু দেশীয় রাজ্যের প্রতি এখন জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে, কাজেই এ বিষয়ে যে আর বিলম্ব করা চলে না, আশা করি, এ কথায় কেহ প্রতিবাদ করিবে না। আমি রাজন্যবর্গকে নিশ্চিতভাবে জানাইতে চাহি যে, তাঁহাদের বন্ধুভাবে মেলা-মেশা করিয়া এবং পুরোপুরি শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্য লইয়াই আমি রাজকোটে আসিয়াছিলাম। আমি দেখিলাম যে, রাজকোটের সত্যাগ্রহীরা তাঁহাদের দাবী ত্যাগ করিতে রাজী নহেন। অবস্থানুযায়ী এরূপ মনোভাব অপরিহার্য্য, কেন-না তাঁহাদের সম্মান বিপন্ন হইতে চলিয়াছিল। অত্যাচারের কাহিনী আমার কানে আসিতে লাগিল। আমি এ কথাও বুঝিতে পারিলাম যে, সত্যাগ্রহ যদি দিনের পর দিন চালাইতে হয়, তবে পশুসুলভ জিঘাংসাবৃত্তি চারিদিকে বিস্তারিত হইবে। শুধু রাজকোটেই নহে, সাধারণভাবে দেশীয় রাজ্যের অধিপতি ও প্রজাদের মধ্যে তিক্ত সংগ্রাম আরম্ভ হইবে। আমি একথাও জানি যে, এদেশের বহু ব্যক্তি মনে করেন যে, দেশীয় রাজন্যবর্গ সংশোধনের অতীত, কাজেই অতীত যুগের এই বর্ব্বরতা একেবারে ধ্বংস করিতে হইবে; নতুবা 'স্বাধীন ভারত' প্রতিষ্ঠার কোন সম্ভাবনাই নাই। এ বিষয়ে আমার অভিমত অন্য প্রকার; অহিংসা এবং মানব-চরিত্রের উৎকর্ষে বিশ্বাসী বলিয়া আমি সেরূপ না ভাবিয়াই পারি না। এদেশে তাঁহাদেরও স্থান আছে। অতীতের সমুদয় স্মৃতি রাতারাতি মুছিয়া ফেলা সম্ভবপর নহে।

কাজেই আমার অভিমত এই যে, রাজন্যবর্গ অতীত অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষালাভ করিবেন এবং সময়ের দাবী উপেক্ষা করিবেন না। তাহা হইলে মঙ্গলই হইবে; কিন্তু এই সমাধা লইয়া গড়িমসি করা চলিবে না। রাজকোটের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু তাঁহাদিগকে প্রকৃত ক্ষমতা প্রজাদের হাতে হাতে সমর্পণ করিতেই হইবে। ইহা ছাড়া ভারতকে ভীষণ রক্তপাত হইতে রক্ষা করিবার অন্য কোন উপায় আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। দেশীয় রাজন্যবর্গের সম্পর্কে আমি যে সকল চিঠিপত্র পাইয়াছি, তাহা প্রকাশ করিবার সাহস আমার নাই। পরে আমি ঐ বিষয়ে আলোচনা করিব। এক্ষণে এই বিবৃতি দেওয়াই আমার পক্ষে কষ্টকর। উপবাসের প্রভাব এবং আধ্যাত্মিক উল্লাস বজায় থাকিতে থাকিতে আমার কয়েকটি চিন্তার ধারা প্রকাশ করা উচিত। রাজকোটে ভায়াত ও গিরাসিয়ারা রহিয়াছে। তাহাদের উত্তরে আমি তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছি যে, আমি তাহাদের বন্ধুর কাজ করিব। তাহারা ভারতীয় এবং গিরাসিয়ার ন্যায় বাস করুন, কিন্তু তাহাদিগকে কালোপযোগী ধারায় চলিতে হইবে। মুসলমান বন্ধুদিগকে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়াছি যে, তাঁহাদের বিশেষ স্বার্থ সংরক্ষিত হইবে এবং তাঁহারা ইচ্ছা করিলে, তাঁহাদের জন্য রাজকোটে যুক্ত নির্ব্বাচন এবং পৃথক আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হইবে। এমন কি মনোনয়ন দাবী করিলে আমি তাহাতেও আপত্তি করিব না বলিয়া তাঁহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছি। তাঁহাদের এবং ভারতের সকল মুসলমানকে ভরসা দিবার জন্যই এরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়া আবশ্যক হইয়াছিল। আমি তাঁহাদিগকে স্পষ্ট করিয়া দেখাইতে চাহি যে, তাঁহাদের সম্পূর্ণ বিকাশ এবং ধর্ম্ম ও কৃষ্টি রক্ষার জন্য যে সকল রক্ষাকবচ দরকার আমি অথবা কংগ্রেস তাহার একটিও বাদ দিতে চাহি না।

বড়লাট অদ্য প্রাতে ১০টা ৪৫ মিনিটের সময় আমাকে এই দুইখানি তার প্রকাশ করিলাম কেন, এক্ষণে কোন মতে এই দুইখানি তার একাকী করিলাম কেন, এক্ষণে তাহার কারণ নির্দ্দেশ করা আবশ্যক।

এই দুইটিতে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সংবাদের উল্লেখ রহিয়াছে। বড়লাটের পূর্ণ সম্মতি অনুসারে আমি ঐ তার দুইটি প্রকাশ করিতেছি না। অবশ্য বড়লাট আমাকে এগুলি প্রকাশ করিতে নিষেধ করেন নাই। আমি জানি যে, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিকট গোপনে চিঠিপত্র প্রেরণ তিনি সমর্থন করেন না। কিন্তু কতকগুলি অপ্রকাশ্য কারণে ঐগুলি প্রকাশিত হইলে উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে বিঘ্ন ঘটিতে পারে,

ই যুক্তি মানিয়া লইয়াছি। আমি আশা করি, এগুলি কখনও কাশের প্রয়োজন হইবে না। আমার ও তাঁহার তারের মধ্যে মন অনেক বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে, যাহা অবান্তব না ইলেও, জনসাধারণের জানিবার কোন প্রয়োজন নাই। সুতরাং সইগুলি প্রকাশ না করিবার দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার।

আসন্ন কংগ্রেস সম্পর্কে একটা কথা বলা প্রয়োজন। আমার অন্তরটা পড়িয়া রহিয়াছে সেখানে; কিন্তু আমি বুঝিতে পারিতেছি, আমি সেখানে পৌঁছিতে পারিব না। এখনও আমি খুব দুর্ব্বল; কিন্তু তাহার চেয়েও বেশী কথা এই যে, যদি আমাকে রাজকোট ব্যাপারের একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে হয়, তাহা হইলে ত্রিপুরী ও রাজকোট উভয়ের মধ্যে আমার মনোযোগ দেওয়া চলিবে না। বর্ত্তমানে একমাত্র রাজকোটের উপরই আমার সমস্ত দৃষ্টি নিবন্ধ করিব। এখানে আমার অনেক কাজ করিবার রহিয়াছে। সামর্থ্য পাওয়া মাত্রই আমি দিল্লী যাইব। আমি কেবল এইটুকু আশা করিতেছি যে, ত্রিপুরীতে কংগ্রেসের অধিবেশন সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে। রাষ্ট্রীয় মহাসভার অধিবেশনে যোগদান করিতে না পারা আমার পক্ষে একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা।

কিন্তু ইহার মধ্যে মঙ্গলই লুক্কায়িত রহিয়াছে। আমাকে ছাড়া গুরুতর কিছু হইতে পারিবে না, এরূপ ভাবিয়া গর্ব্বিত হওয়া আমার পক্ষে অশোভন। ত্রিপুরীতে নেতৃবৃন্দ রহিয়াছেন, যাঁহারা সর্ব্বদিক দিয়া আমার ন্যায়ই আত্মত্যাগী, আমার ন্যায়ই সাহসী ও দেশনিষ্ঠ। সুতরাং এ বিষয়ে আমার অনুমাত্র সন্দেহ নাই যে, আসন্ন রাষ্ট্রীয় মহাসম্মেলনে অপর যে কোন নীতিই উদ্ভাবিত হোক না কেন, তাঁহাদের চিন্তাধারায়, তাঁহাদের বাক্যে ও কর্ম্মে কোনপ্রকার হিংসা, কোনপ্রকার উগ্রতা থাকিবে না। পরিশেষে আমি সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণকে, যাঁহারা এই উদ্বেগসঙ্কুল দিনগুলিতে আমার সঙ্গে ছিলেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহারা সংবাদপত্র-সেবার যথার্থ মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের জন্য আমি গর্ব্ববোধ করিতেছি। সংবাদের ব্যাপারীর মত তাঁহারা কাজ করেন নাই, আমার সঙ্গে শান্তি দূতরূপেই তাঁহারা কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহারা আমার যথেষ্ট যত্ন লইয়াছেন এবং কখনও আমাকে উত্যক্ত করেন নাই।

আমার চিকিৎসক বন্ধুগণ, যাঁহারা বিনা দ্বিধায় আমার সেবা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও আমি ধন্যবাদ জানাইতেছি।

একদিক দিয়া আমার কাজ এখন হইতে আরম্ভ হইল। আমি এখন পার্থিব জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করিলাম। আমাকে গুরুতর আলোচনা চালাইতে হইবে। বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে যে সদিচ্ছা আমাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তাহা আমি হারাইতে চাহি না। আমি ঠাকুর সাহেবের কথা ভাবিতেছি, দরবার বীরওয়ালার কথা ভাবিতেছি। আমি তাঁহাদের সমালোচনা করিয়াছি, কিন্তু তাহা করিয়াছি সুহৃদ-রূপে; আমি পুনর্ব্বার বলিতেছি, আমি ঠাকুর সাহেবের পিতৃস্থানীয়। আমার বিপথগামী সন্তানের প্রতি যাহা করিতাম, তাঁহার প্রতি তদপেক্ষা বেশী কিছু করি নাই। তাঁহাদের সম্মুখে যাহা সংরক্ষিত হইল, ইহাই আমি কামনা করি। বন্ধুর ন্যায় আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা সমস্তই তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়া যদি আমি বুঝিতে পারি এবং আমি যেরূপ আশা করিতেছি, সেইরূপ সাড়া যদি তাঁহাদের নিকট হইতে পাই তবে আমার এই অনশন সার্থক হইবে। রাজকোট কাথিয়াবাড়ের চক্রনাভিস্বরূপ। রাজকোটে যদি জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া গবর্ণমেণ্ট গঠিত হয়, তাহা হইলে কাথিয়াবাড়ের অন্যান্য রাজ্যসমূহ স্বেচ্ছায় রাজকোট প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিবে। অসহযোগ প্রতিরোধের আর প্রয়োজন হইবে না। এই পৃথিবীতে পূর্ণ ঐক্য ও সমন্বয় বলিয়া কোন কিছু নাই। ইহার বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য্যই হইতেছে ইহার বহুলে বিচিত্রতা। সুতরাং কাথিয়াবাড় রাজ্যসমূহেও বিভিন্ন প্রকার শাসনতন্ত্র থাকিবে। কিন্তু মূল হওয়া উচিত খাঁটি, সত্য

মানবীয় ঐক্যের আদর্শ

শ্রীঅরবিন্দ

(৯)

বিশ্ব-সাম্রাজ্যের সম্ভাবনা

(সাম্রাজ্যিক পরিকল্পনার বিকাশ)

কিন্তু সাম্রাজ্যিক পরিকল্পনা যে কখনও কৃত্রিম ও গঠনাত্মক অবস্থা হইতে সিদ্ধ চৈতন্যমূলক ঐক্যে পরিণত হইবে এবং মানব মনকে সেইরূপ শক্তি ও প্রাণময়তার সহিত নিয়ন্ত্রিত করিবে যাহা এখন আধিজাতিক পরিকল্পনাকে বিশেষভাবে অন্যান্য সকল প্রকার সমষ্টিজীবনের উপরে স্থান দিয়াছে,—ইহা কেবল ভবিষ্যতের একটি সম্ভাবনা মাত্র, পরন্তু অবশ্যম্ভাবী নহে। এমন কি ইহা একটি অস্পষ্ট জায়মান সম্ভাবনা অপেক্ষা আর বেশী কিছুই নহে, আর এই যে অবিকশিত অবস্থায় ইহা এখনও রাজনীতিকদের বহুল নির্ব্বুদ্ধিতা, বিরাট জনগণের দুর্দ্দমনীয় আবেগ, প্রতিষ্ঠিত অহমিকা সকলের অবিবেক স্বার্থপরতা—এই সবের অধীন হইয়া রহিয়াছে, এই অবস্থা হইতে যতক্ষণ না ইহা মুক্ত হইতেছে ততক্ষণ আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না যে, এখনও ইহা জন্মের পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে না। আর যদি এইরূপই হয় তাহা হইলে মানব জাতিকে রাজনৈতিক ও শাসনবিষয়ক বিধানের দ্বারা ঐক্যবদ্ধ করিবার অন্য কি সম্ভাবনা থাকিতে পারে? তাহা সংসাধিত হইতে পারে কেবল যদি এখন যে-সব জিনিস অসম্ভব বলিয়াই মনে হইতেছে তাহাদের বিকাশের দ্বারা একচ্ছত্র বিশ্ব-সাম্রাজ্যের প্রাচীন আদর্শটি কার্য্যত সিদ্ধ হইয়া উঠে অথবা মুক্ত অধিজাতিসকলের মুক্ত সম্মিলনরূপে যে বিপরীত আদর্শ সেইটি তাহার পথে দণ্ডায়মান শতাধিক শক্তিশালী প্রতিবন্ধককে জয় করিতে সক্ষম হয়।

বল প্রয়োগের দ্বারা বিশ্ব-সাম্রাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা

আমরা দেখিয়াছি যে, শুধু বলপ্রয়োগের দ্বারা একটি বিশ্ব-সাম্রাজ্য দাঁড় করান এখন আর সম্ভবপর নহে; বস্তুসকলের প্রগতিশীল প্রকৃতির দ্বারা আধুনিক জগতে যে-সব নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহারা ঐরূপ সাম্রাজ্য-স্থাপনের সাক্ষাৎ বিরোধী। তথাপি আমরা এই সকল নূতন পরিস্থিতি হইতে বিশ্লিষ্ট করিয়া সমস্যাটিকে দেখিতে পারি। ধরিয়া লওয়া যাউক যে, রোম যেমন ভূমধ্যসাগরের তীরস্থ জাতিসমূহ এবং গল ও ব্রিটনের উপর নিজের রাজনৈতিক আধিপত্য ও প্রভাবশালী কৃষ্টি চাপাইয়া দিয়াছিল, সেইরূপ কোন একটি মহাজাতির পক্ষে সমগ্র পৃথিবীর উপর আধিপত্য স্থাপন করা সম্ভব। অথবা এমনও ধরা যাইতে পারে যে, মহান্ অধিজাতিগুলির মধ্যে কোন একটি তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী সকলকে বল ও কূটনীতির দ্বারা পরাভূত করিবে, তাহার পর অধীনস্থ জাতিসকলের কৃষ্টি ও স্বতন্ত্র আভ্যন্তরীণ জীবনকে সম্মান করিয়া এবং বিশ্ব-শান্তি, কল্যাণপ্রদ শাসন ব্যবস্থা ও মানবজাতির বর্ত্তমান অবস্থার উন্নতির জন্য মানবীয় জ্ঞান ও মানবীয় সামর্থ্য সকলের এক অভূতপূর্ব্ব 'অর্গানিজেশনের' লোভনীয় সম্ভাবনা দেখাইয়া নিজের প্রাধান্যকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিবে। আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, এই কল্পনা যে-সব পরিস্থিতির দ্বারা নিজেকে বাস্তব সম্ভাবনায় পরিণত করিতে পারে সে-সব মিলিবার আদৌ কোন সম্ভাবনা আছে কি না; বিবেচনা করিলেই আমরা দেখিতে পাইব যে, ঐরূপ কোন পরিস্থিতির অস্তিত্বই এখন নাই, বরঞ্চ সমস্তই হইতেছে ঐ বিরাট স্বপ্নকে সফল করিবার প্রতিকূল।

জার্ম্মানীর সাম্রাজ্য স্বপ্ন

সাধারণত অনুমান করা হয় যে, জার্ম্মানী যে প্রেরণার বশে জগতের সহিত বর্ত্তমান সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহার মূলে ছিল এইরূপ এক সাম্রাজ্যের স্বপ্ন।* তাহার নেতাদের মনে এইরূপ সচেতন উদ্দেশ্য কতখানি ছিল সে বিষয়ে কিছু সন্দেহ আছে; কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, সে যেমন প্রথমে আশা করিয়াছিল, সেইমত যদি সে যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিত, তখন যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হইত তাহা তাহাকে অবশ্যম্ভাবীরূপেই বৃহত্তর প্রয়াসটি করিতে প্রবৃত্ত করিত; কারণ সে এমন প্রাধান্য লাভ করিত মানব জাতির জ্ঞাত ইতিহাসে সেরূপ আর কেহ কখনও লাভ করিতে পারে নাই; আর যে-সব ধারণা সম্প্রতি জার্ম্মান মনীষাকে প্রভাবিত করিয়াছে তাহার ব্রত (mission) সম্বন্ধে ধারণা, তাহার জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব, তাহার কৃষ্টির অপরিমেয় উৎকর্ষ, তাহার বিজ্ঞান, তাহার জীবন-সংগঠন এবং জগৎকে পরিচালিত করিবার এবং জগতের উপর তাহার ইচ্ছা ও তাহার আদর্শ সকল চাপাইয়া দিবার ভগবদ্-প্রদত্ত অধিকার—এই সবের সহিত আধুনিক বাণিজ্য-নীতির সর্ব্বগ্রাসীভাব সংযুক্ত হইয়া তাহাকে অনিবার্য্যভাবেই ভগবদ্প্রদত্ত কর্ম্মভাররূপে বিশ্বের উপর আধিপত্য স্থাপনের প্রয়াস করিতে উদ্বুদ্ধ করিত। একটি আধুনিক জাতি,—ইউরোপ সভ্যতা শব্দটির দ্বারা যে দক্ষতা, বিজ্ঞানের যে বৈজ্ঞানিক প্রয়াস, যে 'অর্গানিজেশন', গবর্ণমেণ্ট সাহায্য ও বিচার বুদ্ধির দ্বারা জাতির ও সামাজিক সমস্যা সকলের সমাধান এবং অর্থনৈতিক সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করা বুঝে, যে-জাতি এই সকল বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রগামী, বস্তুত এমন একটি জাতি যে এইরূপ ধারণা ও প্রেরণার দ্বারা আবিষ্ট ও পরিচালিত হইতে পারে, ইহা হইতে নিশ্চিতভাবেই বুঝা যায় যে, সেই সব পুরাতন দেবতা মরে নাই; বলপ্রয়োগ দ্বারা জগতকে জয় করিবার, শাসন করিবার, উন্নত করিবার পুরাতন আদর্শ আজিও একটি জীবন্ত সত্য রহিয়াছে এবং এখনও তাহা মানবজাতির মনস্তত্ত্বকে পরিত্যাগ করিয়া যায় নাই। আর এরূপও কোন নিশ্চয়তা নাই যে, বর্ত্তমান যুদ্ধ এই সকল শক্তি এবং এই আদর্শকে ধ্বংস করিয়া দিবে; কারণ এই যুদ্ধের ফলাফল বলের সহিত বলের পরীক্ষার দ্বারাই নির্ণীত হইবে, 'অর্গানিজেশন' অর্গানিজে-

শনের উপর জয়লাভ করিবে, যে-সব অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া এই বিরাট আক্রমণশীল টিউটনিক জাতিটির প্রকৃত শক্তি গঠিত সেই সবেরই উৎকৃষ্টতর অন্তত অধিকতর সৌভাগ্যপূর্ণ প্রয়োগের দ্বারাই এই যুদ্ধে জয়লাভ হইবে। নিজের উদ্ভাবিত অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারাই জার্ম্মানীর পরাজয় ঘটিলে, শুধু তাহাতেই যে প্রবৃত্তি জার্ম্মানীর মধ্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহার বিনাশ হইবে না; এমনও ফল হইতে পারে যে, ঐ প্রবৃত্তিটি অন্য কোন জাতি বা সাম্রাজ্যের মধ্যে নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে এবং সমগ্র যুদ্ধটিই আবার নূতন করিয়া লড়িতে হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত প্রাচীন দেবতাগুলি জীবিত থাকিবে ততদিন তাহারা যে-সব দেহ গ্রহণ করিতেছে তাহাদের ধ্বংস বা অবসাদে কিছুই আসিয়া যায় না কারণ কেমন করিয়া দেহান্তর গ্রহণ করিতে হয় তাহা তাহারা বেশই অবগত আছে। জার্ম্মানী ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ফরাশীর নেপোলিয়নিক প্রবৃত্তিকে পরাজিত করিয়াছিল এবং ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তাহার অবশিষ্ট ইউরোপীয় নেতৃত্ব বিলুপ্ত করিয়া দিল; আর সেই একই জার্ম্মানী যে-প্রবৃত্তিকে পরাজিত করিয়াছিল তাহারই মূর্ত্ত বিগ্রহ হইয়া উঠিল। এই ব্যাপারটি সহজেই আরও ভীষণতর আকারে পুন সংঘটিত হইতে পারে।

জার্ম্মানীর অসাফল্যের কারণ

নেপোলিয়নের পূর্ব্ববর্ত্তী পরাজয়ের ন্যায় জার্ম্মানীর বর্ত্তমান পরাজয়ও এই সাম্রাজ্যিক স্বপ্নের অসম্ভাবিতার প্রমাণ নহে। কারণ এইরূপ এক বিরাট লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য যে যে জিনিষ প্রয়োজনীয়, এই টিউটনিক সম্মিলনে তাহাদের একটি ছাড়া আর সবগুলিরই অভাব ছিল। ইহার যে প্রবলতম সামরিক, বৈজ্ঞানিক ও জাতীয় 'অর্গানিজেশন' ছিল, এ পর্য্যন্ত কোন জাতিই তাহা গড়িয়া তুলিতে পারে নাই; কিন্তু একমাত্র যে বিপুল সঞ্চালক শক্তি (driving impulse) এইরূপ একটি বিরাট প্রয়াসকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে পারিত (নেপোলিয়নের যুগে ফ্রান্সের যাহা অধিকতর পরিমাণে ছিল) এখানে সেইটির অভাব ছিল। সাফল্যের জন্য অপরিহার্য্য অবস্থানিচয় সৃষ্টি করিতে যে কূটকৃত্য কূটনীতিক প্রতিভা আবশ্যক তাহারও অভাব ছিল। সহবর্ত্তী নৌ-শক্তিরও অভাব ছিল আর জগতের উপর আধিপত্য বিস্তারের প্রয়াসে নৌ-শক্তি সামরিক শক্তি অপেক্ষাও অধিক প্রয়োজনীয়, বিশেষতঃ জার্ম্মানীর ভৌগোলিক অবস্থান এবং তাহার চতুর্দ্দিকে শত্রুদের অবস্থানের জন্য তাহার স্বাভাবিক প্রতিদ্বন্দ্বী সমুদ্রে আধিপত্যশালী হইলে যে-সকল অসুবিধা হইতে পারে জার্ম্মানী সেই সবের দিকে উন্মুক্ত ছিল। কেবল কোন অতীব বলশালী স্থল-শক্তির সহিত অতীব বলশালী সামুদ্রিক শক্তি যুক্ত হইলেই এইরূপ একটা বিরাট প্রয়াস বাস্তব সম্ভাবনার মধ্যে আসিতে পারে; রোম যখন কার্থেজের মহত্তর সামুদ্রিক শক্তিকে ধ্বংস করিয়াছিল, তখনই সে বিশ্ব-সাম্রাজ্যের ন্যায় কিছুর জন্য আশা করিতে পারিয়াছিল। অথচ জার্ম্মান রাজনীতিজ্ঞতা এমনই সম্পূর্ণভাবে সমস্যাটির হিসাবে ভুল করিয়াছিল যে, পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান সামুদ্রিক শক্তিটি যখন ইতিমধ্যেই তাহার শত্রুদলের সহিত মিলিত হইয়াছে তখনই সে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। এই একমাত্র স্বাভাবিক প্রতিদ্বন্দ্বীটির বিরুদ্ধে তাহার সকল প্রয়াস একাগ্রভাবে নিযুক্ত না করিয়া, ইংলন্ডের বিরুদ্ধে ফ্রান্স ও রুশিয়ার যে চির-শত্রুতা তাহার সুযোগ গ্রহণ না করিয়া, তাহার আনাড়ী ও রূঢ় নীতির দ্বারা সে এই পুরাতন শক্তিগুলিকে নিজেরই বিরুদ্ধ দলভুক্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। ইংলন্ডকে বিচ্ছিন্ন না করিয়া সে কেবল নিজেকেই বিচ্ছিন্ন করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিল, এবং যে-ভাবে সে যুদ্ধটি আরম্ভ ও পরিচালনা করিয়াছিল তাহার দ্বারা সে নৈতিকতার দিক দিয়া নিজেকে আরও বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল, এবং ব্রিটিশ অবরোধের দ্বারা তাহার যে ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা সেইটিকে আরও প্রবল করিয়া তুলিয়াছিল। মধ্য ইউরোপ ও তুরস্ককে লইয়া এক মহৎ সামরিক সঙ্ঘ গঠন করিবার একদেশদর্শী প্রচেষ্টায়, যে একমাত্র সামুদ্রিক শক্তি তাহার পক্ষে আসিতে পারিত সেইটিকেও সে অবহেলায় বিরোধী করিয়া তুলিয়াছিল।

ইহা ধারণা করিতে পারা যায় যে, পৃথিবীর ইতিহাসে কোন ভবিষ্যৎ সময়ে সাম্রাজ্যিক প্রয়াসটির পুনরাবৃত্তি হইবে এমন কোন জাতির দ্বারা বা রাষ্ট্রবিদের দ্বারা যাহার অবস্থান, যাহার সাজসজ্জা আরও ভাল হইবে, যাহার কূটনীতিক প্রতিভা আরও সূক্ষ্মতর হইবে, প্রাচীন জগতে রোমেরই ন্যায় ঘটনা পরম্পরা, স্বভাব ও সৌভাগ্য যাহার অনুকূল হইবে। তখন তাহার সাফল্যের জন্য কি কি জিনিষ প্রয়োজন হইবে? প্রথমত, তাহার লক্ষ্য সিদ্ধির আশা খুবই সুদূর পরাহত হইবে যদি না সে সেই অসাধারণ সৌভাগ্যের পুনরাবৃত্তি করিতে পারে, যাহার দ্বারা রোম তাহার সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রু সকলকে একে একে জয় করিতে এবং বিরুদ্ধ শক্তি-সকলের সাফল্যময় সম্মিলন নিবারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এইরূপ সৌভাগ্যময় প্রগতির সম্ভাবনা আধুনিক সজাগ ও সতর্ক জগতে কতটুকু আছে? এখন সন্দিগ্ধ চক্ষু ও সক্রিয় মনসমূহ প্রত্যেক জিনিসেরই খবর রাখিতেছে, গুপ্তভাবে সন্ধান করিতেছে, গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে, আধুনিক উপায়ে বিশ্বব্যাপী সংবাদের আদান-প্রদান ও সাধারণের মধ্যে প্রচার চলিতেছে। কোন জাতি প্রাধান্যের অবস্থা লাভ করিতেছে ইহা দেখিলেই সমগ্র জগৎ সতর্ক হইয়া উঠিবে এবং অন্তর্বোধের দ্বারা তাহার গুপ্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষাসকল উপলব্ধি করিয়া তাহার বিরুদ্ধে শত্রুতা একাগ্র করিবে। অতএব এইরূপ সৌভাগ্যময় পরম্পরা সম্ভব হইতে পারে কেবল যদি, প্রথমত, ইহা অগ্রগতিশীল জাতিটি কর্ত্তৃক অর্দ্ধচেতন ভাবে সমাধিত হয়, সাধারণের ঈর্ষা উদ্রেক করিবার মত কোন সুনির্দ্দিষ্ট ও দৃশ্যমান উচ্চাকাঙ্ক্ষা না থাকে এবং দ্বিতীয়ত পর পর কতকগুলি ঘটনা ঘটিয়া বাঞ্ছিত পরিণামটির এত নিকটে

---

*মনে রাখিতে হইবে যে, এই গ্রন্থটি ১৯১৬ সালে লিখিত হয়, তখন ইউরোপে মহাসমর চলিতেছে। তাহার পর ২২ বৎসর অতীত হইয়া যাইলেও মূল বক্তব্যের গভীর সার্থকতা সমানভাবেই রহিয়াছে এবং ভবিষ্যতের পথ নির্দ্দেশ করিতেছে।

—অনুবাদক

লইয়া যায় যে, যাহারা তখনও বাধা দিতে পারিত তাহারা জাগ্রত হইবার পূর্ব্বেই সেইটি প্রায় হস্তগত হইয়া পড়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যাইতে পারে, যে চার পাঁচটি প্রবল শক্তি এখন জগতের উপর প্রাধান্য করিতেছে তাহারা যদি নিজেদের মধ্যে কতকগুলি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, এবং প্রত্যেক যুদ্ধেই আক্রমণকারী শক্তিটি এমনভাবে বিধ্বস্ত হয় যে তাহার আর উঠিবার আশা না থাকে এবং অন্য কোন শক্তিও উঠিয়া তাহার স্থান গ্রহণ না করে, তাহা হইলে ইহা কল্পনীয় যে, শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের মধ্যে একটি শক্তি ইচ্ছাকৃত আক্রমণে প্রবৃত্ত না হইয়াও অপরের আক্রমণে বাধা দিতে গিয়াই এমন স্বাভাবিক প্রাধান্য লাভ করিবে, যাহাতে বিশ্ব-সাম্রাজ্য স্বাভাবিকভাবে তাহার মুঠার মধ্যে আসিয়া পড়িবে। কিন্তু বর্ত্তমানে জীবনের যেরূপ পরিস্থিতি, বিশেষত যুদ্ধ আজকাল যেরূপ ভীষণভাবে ধ্বংসময় হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে এইরূপ পর পর কতকগুলি যুদ্ধ প্রাচীনকালে খুবই স্বাভাবিক ও সম্ভব থাকিলেও, এখন বাস্তব সম্ভাবনার অতীত বলিয়াই মনে হয়।

বিশ্ব-সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সম্মিলন

অতএব আমাদিগকে ধরিয়া লইতে হইবে যে, কোন শক্তি বিশ্ব-সাম্রাজ্যের দিকে অগ্রসর হইলে, যে-সকল শক্তি তাহাকে বাধা দিতে সক্ষম তাহারা প্রায় সকলেই কোন সময়ে অনিবার্য্যভাবে সম্মিলিত হইবে এবং তাহাদের দিকেই থাকিবে জগতের সহানুভূতি। কূটনীতি যতই উত্তম হউক না কেন, এইরূপ একটি মুহূর্ত্ত অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই মনে হয়। অতএব তাহার এমন সম্মিলিত ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে সংগঠিত সামরিক ও সামুদ্রিক প্রাধান্য থাকা চাই যাহার দ্বারা সে এইরূপ অসমান সংগ্রামে জয়ী হইতে পারে। কিন্তু কোথায় সেই আধুনিক সাম্রাজ্য যে এইরূপ প্রাধান্যলাভ করিবার আশা করিতে পারে? বর্ত্তমান সাম্রাজ্যগুলির মধ্যে রুশিয়া একদিন এমন প্রভাবশালী সামরিক শক্তি হইয়া উঠিতে পারে যাহার নিকট জার্ম্মানীর বর্ত্তমান শক্তি তুচ্ছ হইয়া পড়িবে, কিন্তু স্থলে এই শক্তির সহিত সে যে অনুরূপ সামুদ্রিক শক্তি সম্মিলিত করিতে পারিবে তাহা অচিন্তনীয়। নৌ-শক্তিতে ইংলণ্ড এতদিন পর্য্যন্ত প্রাধান্য ভোগ করিয়াছে, এবং ইহাকে সে অবস্থাবিশেষে এমনভাবে পরিবর্দ্ধিত করিতে পারে যে, সে সমগ্র জগৎকেই যুদ্ধার্থে আহ্বান করিতে পারে; কিন্তু সৈন্যদলভুক্ত হইবার বাধ্যতামূলক প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়া এবং তাহার সকল উপনিবেশের সাহায্য লইয়াও সে স্থলে অনুরূপ শক্তি গঠন করিতে পারিবে না, অবশ্য যদি সে এমন অবস্থার সৃষ্টি না করে যাহাতে সে ভারত ও মিশরের সমুদয় সামরিক সম্ভাবনাকে কাজে লাগাইতে সক্ষম হয়। তখনও তাহাকে যে-সব বিরাট জনসঙ্ঘ ও শক্তিশালী সাম্রাজ্য সকলের সম্মুখীন হইতে হইবে তাহা অনুধাবন করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব যে, স্থলে ও জলে এরূপ প্রতিপত্তি লাভ হইতেছে এমন একটি সম্ভাবনা যাহা বাস্তব পরিস্থিতিতে আকাশ-কুসুম না হইলেও, খুবই অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়।

সংখ্যায় ন্যূন হইলেও কোন জাতি উচ্চতর বিজ্ঞান বিদ্যা এবং নিজের সামর্থ্য সকলের সুদক্ষতর প্রয়োগের দ্বারা তাহার বিরুদ্ধে সম্মিলিত শক্তি সকলকে পরাজিত করিতে পারে, ইহা অভাবনীয় নহে। জার্ম্মানী তাহার প্রয়াসের সাফল্যের জন্য উচ্চতর বৈজ্ঞানিক বিদ্যার উপর নির্ভর করিয়াছিল; যে নীতি অনুসারে সে অগ্রসর হইয়াছিল তাহাতে কোন ভুল হয় নাই। কিন্তু বর্ত্তমান জগতে বিজ্ঞান হইতেছে সাধারণের সম্পত্তি, আর যদিই কোন জাতি চুপি চুপি একটা অগ্রসর হইয়া পড়ে তাহাতে প্রথম সে অন্যান্য জাতিকে অনেক নিম্নে ফেলিতে পারে, তথাপি অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে, একটুখানি সময় পাইলেই—আর কোন শক্তিশালী সম্মিলনকে প্রথম আঘাতেই বিমর্দ্দিত করা সম্ভব নহে—ঐ তফাৎটুকু শীঘ্রই দূর করা যায়, অন্ততপক্ষে আত্মরক্ষার উপায় আবিষ্কার করা যায় যাহাতে অর্জ্জিত সুবিধাটুকু অনেক পরিমাণে ব্যর্থ করিয়া দেওয়া সম্ভব হয়। অতএব সাফল্যের জন্য আমাদিগকে ধরিয়া লইতে হইবে যে, উচ্চাভিলাসী জাতি বা সাম্রাজ্যটি এমন এক নূতন বিজ্ঞান এবং নূতন আবিষ্কার সকলের বিকাশ করিবে যাহা অপরের অধিগত নহে, এবং তাহার ফলে সংখ্যায় ন্যূন হইয়াও কতকটা আজটেক্ (Aztecs) ও পেরুভিয়ানদের (Peruvians) বিরুদ্ধে কর্টেজ্ (Cortes) ও পিজারোর (Pizarro) ন্যায় অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিতে পারিবে। নিয়মানুবর্ত্তিতা ও সঙ্ঘবদ্ধতার শ্রেষ্ঠত্বের জন্য প্রাচীন রোমকদের যে সুবিধা ছিল, যাহার দ্বারা ইউরোপীয়গণ ভারতে সুবিধা করিতে পারিয়াছিল, শুধু তাহাই এইরূপ বিরাট প্রয়াসের পক্ষে আর যথেষ্ট নহে।

বলপূর্ব্বক বিশ্ব-সাম্রাজ্য স্থাপনের দ্বারা ঐক্য সাধনের অসম্ভাব্যতা

অতএব আমরা দেখিতেছি যে, বিশ্ব-সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রয়াস সাফল্যের সহিত করিতে হইলে যেরূপ অনুকূল অবস্থার প্রয়োজন তাহাতে এই পদ্ধতির দ্বারা মানব-জাতির ঐক্য সাধন বাস্তব সম্ভাবনার সীমার বাহিরে বলিয়াই মনে হয়। পুনরায় যে এই চেষ্টা হইতে পারে তাহা সম্ভব; সে চেষ্টা যে ব্যর্থ হইবে তাহাও প্রায় ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়। কিন্তু সেই সঙ্গেই আমাদিগকে প্রকৃতির অঘটন ঘটনের হিসাব লইতে হইবে; আমাদের সহিত প্রকৃতি যে অপ্রত্যাশিত ব্যবহার করে তাহার জন্য অনেকখানি স্থান ছাড়িয়া রাখিতে হইবে। অতএব এইরূপ একটা পরিণতি যে সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব তাহা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি না। অন্যপক্ষে যদি তাহার সেইরূপ উদ্দেশ্যই থাকে, সে সহসা বা ক্রমে ক্রমে প্রয়োজনীয় অবস্থা ও বিধান সকল সৃষ্টি করিয়া ফেলিবে। কিন্তু যদিই ইহা সংঘটিত হয়, এইভাবে সৃষ্ট সাম্রাজ্যটিকে এত বিভিন্ন শক্তির সহিত দ্বন্দ্ব করিতে হইবে যে, তাহার সৃষ্টি করা অপেক্ষা তাহাকে রক্ষা করা আরও কঠিন হইবে এবং তাহা শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া পড়ায় সমস্ত সমস্যাটি আবার নূতন করিয়া উপস্থিত হইবে এবং

তাহার উৎকৃষ্টতর সমাধানের সন্ধান করিতে হইবে অথবা যে বল প্রয়োগ ও প্রাধান্যের আকাঙ্ক্ষায় সে এই প্রয়াসটি করিতে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল তাহা বর্জ্জন করিয়া তাহাকে তাহার বিরাট প্রয়াসের মূল লক্ষ্যটির বিরুদ্ধে যাইতে হইবে। যাহাই হউক উহা এই আলোচ্য বিষয়ের আর একটি দিকের অন্তর্গত এবং আমরা উহার আলোচনা পরে করিব। উপস্থিত আমরা ইহাই বলিতে পারি যে, প্রকৃত চৈতন্যমূলক ঐক্যে পরিণত বৃহৎ অসমধর্ম্মী সাম্রাজ্য সকলের বিকাশের দ্বারা জগতের ক্রমিক ঐক্য সাধন এখন যদি হয় কেবল অস্পষ্ট ও জায়মান সম্ভাবনা মাত্র, একটি প্রবল সাম্রাজিক আধিপত্যের দ্বারা জগতের ঐক্যসাধন বাস্তবসম্ভাবনার বাহিরেই চলিয়া গিয়াছে বা যাইতেছে, কেবল প্রকৃতির অনন্ত বিস্ময় পরম্পরা হইতে উদ্ভূত একটা অপ্রত্যাশিত নূতন বিকাশের দ্বারাই তাহা সংসাধিত হইতে পারে।*

---

*স্পেন দেশীয়েরা যখন আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করিতে যায় তখন সেখানে দুইটি সভ্য রাজ্য ছিল, (১) মেক্সিকোর আজটেক রাজ্য এবং (২) পেরুর ইনকা রাজ্য। পিজারো ১৮৩জন মাত্র সৈনিক লইয়া স্পেন সম্রাট পঞ্চম চার্লসের জন্য পেরু জয় করিয়াছিলেন।

*শ্রীঅনিলবরণ রায় কর্ত্তৃক অনূদিত।

ভারতীর প্রতি

শশাঙ্ককুমার পাত্র

ভারত-ভারতি! তব কমল কাননে
জনম নিবে না কি গো আর হেন কবি,
মাটীর ধরাকে ভালবাসি' প্রাণে-মনে
আঁকিবে যে মানুষের বেদনার ছবি!
আকাশ-কুসুম-বনে চয়ন ছাড়িয়া
মাঠে মাঠে চাষীদের সাথে দিনমান
চষিবে যে ধানক্ষেত লাঙলে ফাড়িয়া,
কামার-শালায় গা'বে হাপরের গান!

জনম নিবে না কি গো হেন কবি আর,
সোনার ফসলে পূর্ণ করিতে এ মরু,
পাথর কাটিয়া মাঝে পথ রচিবার
প্রেরণা জাগাবে প্রাণে বাজায়ে ডমরু?

তোমার কমল বনে যে জনম লভে,
সে কি কভু মানুষের কবি নাহি হবে?

রেশম—(SILK)

শ্রীকালাচরণ ঘোষ

হিসাবমত ধরিতে গেলে, পশমের ন্যায়, রেশমের স্থানও প্রাণীজাত দ্রব্যের তালিকাভুক্ত হওয়া প্রয়োজন; কারণ, কীট-লালা হইতে এই তন্তু উদ্ভূত হইয়া থাকে। পাট, তুলা শণ, পশম প্রভৃতি অন্য নানাপ্রকার তন্তুর সহিত ইহার কোনই সংস্রব নাই।

ইতিহাস

রেশমের সহিত ভারতের এক স্মরণীয় অতীত অধ্যায় যুক্ত হইয়া আছে। একদিন যে তন্তু পৃথিবীর নানা স্থানে গিয়া বহু সমাদর লাভ করিয়াছে এবং যাহার বস্ত্রাদি বহুমূল্যে বিক্রীত হইয়াছে, যাহার দ্বারা রেশম উৎপাদক এবং রেশম শিল্পী বহু অর্থলাভ করিয়াছে, সেই দেশ এখন প্রায় সর্ব্বপ্রকারেই বিদেশীর মুখাপেক্ষী। পাঠক হয়ত বিশ্বাস করিবেন না, কিন্তু সত্যসত্যই প্রতি বৎসর আমরা আন্দাজ তিন কোটি টাকার কাঁচা রেশম ও রেশমী বস্ত্র আমদানী করি; আর এই রেশম ব্যবহারের নেশায় পড়িয়া নকল রেশম ও নকল রেশমী বস্ত্রও প্রতি বৎসরে প্রায় পাঁচ কোটি টাকার আমদানী করিতেছি।

ভারতে রেশমের ইতিহাস কত পুরাতন, তাহা সঠিক বলা যায় না? এক চীন ব্যতীত জগতের আর কোনও জাতিই যখন রেশমের পরিচয় পায় নাই, তখন ভারত রেশম-শিল্পে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে এবং তাহার বস্ত্র পাইবার জন্য বহু সমৃদ্ধ এবং সভ্য দেশের নরনারী লালায়িত হইয়াছে। যতদূর জানিতে পারা যায়, তাহাতে মনে হয়, চীনারা অন্তত পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে রেশমের গুটী পালন করিতে এবং তাহা হইতে রেশম উদ্ধার করিতে শিখিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে হিমালয়ের কয়েকটি বৃক্ষে তদ্দেশীয় কয়েকটি গুটী পাওয়াতে পণ্ডিতেরা এখন মনে করেন যে, চীনারা প্রথমে ভারতীয় গুটী সংগ্রহ করিয়া এমনভাবে লইয়া যায় যে, এখানে ঐ কীটের অবশিষ্ট আর কিছুই ছিল না। সুতরাং, ভারতই প্রকৃতপক্ষে রেশমের কীটের আদি জন্মস্থান। কিন্তু প্রচলিত ঐতিহাসিক কিম্বদন্তী হিসাবে, খোটানের কোনও রাজপুত্রের প্রতি কোনও চীন দেশীয় রাজকন্যার প্রেমেই নাকি ভারতে রেশম কীট আনিয়া দিয়াছে। প্রেমাস্পদের মনস্তুষ্টির জন্য ঐ মহিলা আপনার অবগুণ্ঠন বা অপর কোনও শিরাভরণের মধ্যে কীট বীজ লুকাইয়া আনে এবং উহা উপহার দিয়া খোটানবাসীদের কীট পালনের শিক্ষা পর্য্যন্ত দেয়।

খোটান হইতে পারস্য এবং রোম হইতে গ্রীসে এই কীট ও কীট পালনের জ্ঞান ক্রমশঃ বিস্তারলাভ করে। সেই জ্ঞান আজ পরিপুষ্ট হইয়া ইউরোপের নানা দেশে গুটী পালন ও রেশমের বিরাট ব্যবসায়ের সুযোগ দিয়াছে। মোট কথা যেখানেই তুঁতগাছ জন্মানো সম্ভব হইয়াছে, সেখানেই লোকে গুটী পালন করিতে আরম্ভ করে।

মধ্য এশিয়া (খোটান) হইতে ক্রমশ "রেশম-বিদ্যা" ভারতে আসিয়া প্রবেশ লাভ করে। আরও মনে হয়, বাঙলার এ বিষয়েও একটু বিশেষত্ব আছে। বাঙালী অসমীয়াদের সঙ্গে মণিপুর রাজ্যের ভিতর দিয়া চীনে যাতায়াত করিয়া এই শিল্প "মহাবিদ্যা" প্রভাবে দেশে লইয়া আসে। তাহার পর আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের মধ্যে বাঙলার রেশম আপনার আসন দখল করিয়া লয়। তাহার পর আবার কিভাবে এই বাণিজ্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার অন্য ইতিহাস আছে।

রেশম কীটের পরিচয়

রেশম কীটকে দেখিলে হাত দিতে ঘৃণা বোধ হইবে এবং এতৎসদৃশ সকল কীটকে দূরে রাখিতে পারিলে বা নির্ম্মূল করিতে পারিলেই আনন্দ হইয়া থাকে। কিন্তু জগতে যে সকল অতি আশ্চর্য্য বস্তু আছে, রেশম কীট তাহার মধ্যে একটি। যে সকল কীট গাছের পাতা খাইয়া শস্য নষ্ট করে, তাহারাও মোটামুটি এই জাতীয় কীট। যাহারা লোকের প্রভূত ক্ষতি করিয়া থাকে, তাহারই এক জাতি সারা পৃথিবীতে প্রতি বৎসর আপনার লালা হইতে অন্তত একশত কোটি টাকার তন্তু প্রস্তুত করে। স্বভাবত কাহারও কাহারও ইহাদের জীবনের ক্ষুদ্র ইতিহাস জানিবার ইচ্ছা হইতে পারে।

অনেক পাঠকের নিকট নিশ্চয়ই ইহা অবান্তর; তথাপি, কাহারও হয়ত প্রয়োজন আছে মনে করিয়া এই সম্পর্কে সামান্য পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন আছে মনে করি। স্ত্রী-কীটগুলি অতি ক্ষুদ্র ডিম্ব প্রসব করে; প্রতি কীট অন্তত ৩০০ হইতে ৫০০ ডিম্ব প্রসব করে। এই সকল ডিম্ব সামান্য উত্তাপে আপনা হইতেই ফুটিয়া উঠে এবং অতি ক্ষুদ্র কীটের আকার ধারণ করে। ডিম্ব ফুটিবার জন্য যে সামান্য তাপের প্রয়োজন, ইহার সুযোগ লইয়া লোকে নিজের সুবিধামত ডিম ফুটাইয়া লয়। যাঁহারা প্রয়োজনমত কয়েকদিন রাখিয়া ডিম ফুটাইতে চান, তাঁহারা উত্তাপহীন আধারের মধ্যে রাখিয়া পরে আবার আধারের তাপ বাড়াইয়া লইয়া ডিম ফুটাইতে পারেন। উত্তাপহীন পাত্রের মধ্যে রাখিয়া লোকে ডিম বা কীট দেশ হইতে দেশান্তরে চালান দিয়া থাকে। এই ডিমগুলি এত ক্ষুদ্র যে, এক গ্রেন্ ওজনে আন্দাজ একশত ডিম পড়ে। তুঁতপাতা খাইয়া যে সকল কীট জীবন ধারণ করে, আজকাল ব্যবসায়ীরা নানাপ্রকারে গৃহে ইহাদের পালন করে। কীটের আকার ধারণ করিলেই ইহাদের তুঁতপাতা খাইতে দেওয়া হয় এবং অতি দ্রুত ইহারা আকারে বাড়িতে থাকে। দুই লক্ষ কীটে পক্ষকাল মধ্যে অন্তত ত্রিশ মণ তুঁতপাতা খাইতে পারে। পোকা অবস্থায় গুটী বাঁধিবার পূর্ব্বে কীটেরা অন্তত চারবার উপবাস করে এবং মাঝে মাঝে দেহের উপরের পাতলা আবরণ বা খোলস পরিত্যাগ করে। খোলস ছাড়িবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের আবরণ আবার দেখা দেয়। এইরূপে পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইতে, অর্থাৎ দুই হইতে তিন ইঞ্চি লম্বা হইতে ইহাদের প্রায় একমাস সময় লাগিয়া যায়; অবশ্য কীটের জাতি-

ভেদ এবং দেশের তাপের উপর এই সময়ের তারতম্য আছে। জাপানে এক একবার খোলস বদলাইতে আন্দাজ পাঁচ দিন সময় লাগিয়া যায়; ইহার মধ্যে আবার প্রথমটিতে সাত দিন লাগে এবং শেষবারে দশ দিন পড়ে। খোলস ছাড়িয়া তখন ইহারা উপযুক্ত আহার ও বাসস্থান পাইলে, আপনাদের মুখনিঃসৃত লালাদ্বারা দেহের চতুর্দ্দিকে জড়াইতে থাকে; বলা বাহুল্য, প্রথমে এই লালার কোনও আকৃতি থাকে না, বাতাস পাইয়া ক্রমশ কঠিন হইতে থাকে এবং গুটীটি পক্ষী ডিম্বের আকার ধারণ করে।

মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা লালা বাহির হইবার পর কীটটিকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না এবং তিন হইতে পাঁচ দিনের মধ্যে গুটী তৈয়ারী শেষ করিয়া ফেলে। এই পরিশ্রমের জন্য কীটের দেহের পরিমাণ কমিয়া অর্দ্ধেক হইয়া যায়। এই সময় ইহারা আর একবার খোলস ছাড়ে এবং পূর্ব্ব হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন আকারের হইয়া যায়। এই অবস্থায় আবার কয়েকদিন কাটিয়া যায়, কখনও কখনও কুড়ি পঁচিশ দিন পর্যন্ত লাগে। তাহার পর মুখের লালা দ্বারা গুটীর একস্থান ভিজাইয়া লইয়া আপন চেষ্টায় বাহির হইয়া পড়ে এবং মাত্র তখন ইহাকে পতঙ্গের আকারে দেখিতে পাওয়া যায়।

লালা বাহির হইবার প্রথমাবস্থায় যে তন্তু প্রস্তুত হয়, তাহা পরে গুটীর মধ্যের রেশম হইতে গুণানুসারে অনেক তফাৎ। গুটীর অন্তর ভাগের রেশম অনেক ভাল এবং অপেক্ষাকৃত ইহার দরও অনেক বেশী।

জাতির বিভিন্নতা

রেশমকীটের নানা জাতি আছে। কোনও কোনও কীট বৎসরে মাত্র একবার জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত (univoltine) সমস্ত জীবনের খেলা শেষ করে। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে ইহারা ডিম্ব প্রসব করিয়া যায়। কাহারও বা ছয় মাসে (bivoltine) জন্ম, কীটাবস্থা, গুটী, পতঙ্গ, (ডিম্ব প্রসব) ও মৃত্যু সবই শেষ করে। এইভাবে বৎসরে তিনবার (trivoltine) চারবার (quadrivol-tine) এমন কি বহুবার (multivoltine) এই চক্রে ঘুরিতে থাকে। ইহাতে সহজেই অনুমান হয়, যাহাদের জীবনের ক্রিয়া সারা বৎসরে ছড়াইয়া পড়িবার সুবিধা হয়, তাহাদের সকল কার্যই ধীরে ধীরে চলিতে থাকে। অর্থাৎ ডিম্ব হইতে ফুটিয়া বাহির হইবার পর হইতে গুটী বাঁধার কাল পর্যন্ত তাহারা যে সময় লয়, তাহা অপেক্ষা বৎসরে বংশের ধারায় যাহাকে বহুবার আসা-যাওয়া (multivoltine) করিতে হয়, তাহাকে শীঘ্রই সমস্ত কার্য্য সমাধা করিতে হয়। বলা বাহুল্য, যে দেশে যতবার গুটী জন্মে, সে দেশের ততই সুবিধা। কীটের জাতিগত গুণ, ভক্ষ্য বস্তুর সুবিধা, পালনের জ্ঞান প্রভৃতি কারণ হইতে এক গুটী হইতে বেশী রেশম পাওয়া যাইতে পারে। এ কথা কোনও রকমে সত্য নহে যে, যে কীট জন্ম হইতে প্রাপ্ত বয়স্ক হইয়া ডিম্ব প্রসব করিয়া মৃত্যুর কাল পর্য্যন্ত মাত্র তিন মাস সময় লয়, তাহারা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার গুটী নির্ম্মাণ করে এবং ঐ গুটী হইতে প্রাপ্ত রেশমের পরিমাণ কম।

ইহা ছাড়া পালিত ও বন্য বা জঙ্গলী হিসাবে গুটীর পার্থক্য আছে; আরও আছে বিভিন্ন জাতীয় ভক্ষ্য অর্থাৎ বৃক্ষের বা তাহার পত্রের গুণাগুণের উপর। গুটীর মধ্যে যে কীট তুঁতপাতার উপর জীবন নির্ভর করিয়া আছে, তাহাই প্রধান। বন্য নানাপ্রকার কীটের মধ্যে প্রধান তসর, মুগা এবং এড়ি বা এণ্ডি। তসর-কীট মহুয়া, সিমুল, জাম, মাদার, অশ্বত্থ, এরণ্ড, শাল, সেগুন, অর্জ্জুন, সজিনা, কুল প্রভৃতি গাছে জন্মিতে দেখা যায়। মুগা কীটও তসরের ন্যায় বিভিন্ন গাছে জন্মে ও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, কিন্তু ইহা তসর অপেক্ষা অধিক মাত্রায় পালিত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং সেখান হইতেই মুগা সংগৃহীত হয়। রেড়ী গাছের পাতার উপর নির্ভর করে বলিয়া এড়ি বা এণ্ডি নামে এক জাতীয় রেশমের বহুল প্রচার আছে। ইহারাও পালিত কীটের মধ্যে পড়ে।

ভারতবর্ষে বিভিন্ন কীটের বর্ত্তমান আবাস

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তুঁত-পাতার কীটই জগতে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে; ভারতবর্ষেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই এবং তুঁতগাছের চাষের সহিত এই কীট নানাস্থানেই দেখিতে পাওয়া যাইত। বর্ত্তমানে বাঙলার মধ্যে মুর্শিদাবাদ, মালদহ, রাজসাহী ও বীরভূম জেলায়, আসামের স্থানে স্থানে, মদ্রে কইম্বাটুর জেলা (তন্মধ্যে কেল্লেগোল তালুক), মহীশূর রাজ্যে বাঙ্গালোর, মহীশূর, তুমকুড় ও কোলার জেলা কাশ্মীর ও জম্মু রাজ্য, পঞ্চনদের কতকাংশ এবং ব্রহ্মে এই কীট নিবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে।

তসরের কীট প্রধানত চীন, ভারতবর্ষ ও সিংহলে দেখিতে পাওয়া যায়; ইহা সম্পূর্ণরূপেই বন্য। পূর্ব্বে ভাগলপুর, হাজারিবাগ, পালামৌ, ছোটনাগপুর; উড়িষ্যার স্থানে স্থানে, মধ্যপ্রদেশের নাগপুর, জব্বলপুর, ছত্রিশগড় প্রভৃতি জেলায় এবং আসামের জঙ্গলে দেখিতে পাওয়া যাইত। বর্ত্তমানে এই সকল স্থান ছাড়াও যুক্তপ্রদেশের মির্জ্জাপুর জেলাও যোগ করিয়া দেওয়া উচিত। এতগুলি স্থানে তসর-কীট পাওয়া গেলেও তসরের শিল্প মুর্শিদাবাদ, মানভূম, বাঁকুড়া, বীরভূম প্রভৃতি স্থানেই বেশী মাত্রায় চলে। ধরিতে গেলে মুগা আসামের সম্পত্তি। এড়ি বা এণ্ডি আসামেই অধিক; কিন্তু বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যা এবং মদ্রেও সামান্য পরিমাণ পাওয়া যায়।

এড়ি বা এণ্ডি আসামেই অধিক; কিন্তু পূর্ণিয়া, জলপাইগুড়ি এবং সামান্য পরিমাণে রঙ্গপুর ও দিনাজপুরেও পাওয়া যায়। দার্জ্জিলিঙ, নেপাল, সাহাবাদ, গয়া প্রভৃতি স্থানেও এণ্ডি কীট জন্মে।

এণ্ডি সুতা সাধারণ রেশমের মত উঠাইয়া লইতে পারা যায় না; ইহা তুলার ন্যায় পিঁজিয়া চরকায় পাকাইয়া লইতে হয়।

মহীশূরে এবং মদ্রের কইম্বাটুর জেলায় যত রেশম সংগৃহীত হয়, তাহার সহিত অপর কোনও স্থানের তুলনা হয় না। আন্দাজে ধরা হয়, এই দুই স্থানে শতকরা চল্লিশ ভাগ রেশম জন্মে।

রেশমের উদ্ধার

গুটী হইতে রেশম পাইবার প্রণালী নিতান্ত কঠিন না হইলেও, অভিজ্ঞ লোকের প্রয়োজন আছে। গুটীগুলি জলে সিদ্ধ করিবার সময় উহা হইতে রেশমের একটি বা দুইটি মুখ বা "খেই" বাহির করিয়া লাটাইয়ে জড়াইয়া লওয়া হয়; ঐ সময় গুটীগুলি ফুটন্ত জলের উপর ভাসিতে থাকে; যাহারা এই কার্য্যে দক্ষ, তাহারা বুঝিতে পারে, কোন্ অবস্থায় খেই ধরাইয়া দিতে পারিলে অবিচ্ছিন্নভাবে রেশম পাওয়া যায়। জলেও এমন জ্বাল দেওয়া প্রয়োজন, যাহাতে অযথা তাপ নষ্ট না হয়। গুটীতে যে আঠাল পদার্থ থাকে, গরম জলে ধুইয়া গেলে তন্তু তুলিয়া লওয়া সম্ভব হইয়া পড়ে!

অবনতির কারণ

রেশম শিল্প বহু লোককে অন্নদান করিত, কিন্তু সে সম্বন্ধে পর প্রবন্ধে বলিবার ইচ্ছা রহিল। এই জাতীয় শিল্পী ছাড়া রেশম কীট পালন করিয়া বহুলোকে অন্নসংস্থান করিত। এই বিষয়ে বাঙলা ও আসামের বিশেষ সুবিধা, কারণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এখানে লোকে চারবার পর্য্যন্ত গুটী পাইয়া থাকে। যাহারা বৎসরে একবার মাত্র গুটী পায়, তাহারা শিক্ষা ও অধ্যবসায়ের ফলে, আমাদের শিল্পনাশ করিয়া দিয়াছে।

বৈদেশিক শাসনের ফলে নানা প্রকার শুল্ক বসাইয়া আমাদের বাজার নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ইহা ব্যতিরেকে নৈসর্গিক কারণেও ভারতের রেশম ব্যবসায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রেশম-কীটের প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধন করে। ভারতবর্ষে এই মারাত্মক জীবাণু এত দ্রুত প্রসার লাভ করিতে থাকে যে, তাহাতে রেশম ব্যবসায়ের সমূহ ক্ষতি হয়। এই জীবাণু ইউরোপেও ছড়াইয়া পড়ে এবং ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের রেশম-কীটের প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংশসাধন করে। ভারতবর্ষে এই জীবাণুর প্রভাব নিতান্ত কম নহে; বৎসরে চারটি "বন্দ" বা গুটীর কাল হইতে এখানে প্রকৃতপক্ষে দুইটি বন্দে নামিয়াছে; তাহাও আবার রোগগ্রস্ত কীট হইতে জন্মে বলিয়া আশানুযায়ী ফল পাওয়া যায় না। প্রকৃতির লীলায় জাপানের কীটে এই জীবাণু লাগে নাই এবং সেই স্থানের সুস্থ ডিম্ব বা কীট হইতে অন্যস্থানে "চাষ" হইতেছে।

১৮৬৬ সাল পর্য্যন্ত এই প্রবল জীবাণু ভয়ানকভাবে বাড়িতে থাকে এবং সারা পৃথিবীর রেশম-কীট লোপ পাইবে বলিয়া আশঙ্কা করা হইত। কিন্তু ঐ সালে পাস্তুর (Pasteur) অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা রেশম-কীটের ব্যাধি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া জীবাণুর জীবনেতিহাস প্রকাশ করিয়া দেন এবং কি উপায়ে কীটগুলি রোগ-জীবাণুর হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে, তাহারও ইঙ্গিত দেন। ইহাতে অনেকেই লাভবান হইল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ভারতের কীট পালকেরা "যে তিমিরে সেই তিমিরেই" রহিয়া গেল। এখনও যদি ভারত সরকার হইতে ইহার তথ্যানুসন্ধান করিয়া সাধারণ লোককে শিক্ষা দিয়া সবল, রোগশূন্য ডিম বা কীট দিবার ব্যবস্থা করে, তাহা হইলে বৎসরে চারবার গুটী পাইয়া ভারতবর্ষ জাপান ও অন্যান্য দেশকে সহজেই হটাইয়া দিতে পারে।

পর প্রবন্ধে পৃথিবী ও ভারতের রেশমের পরিমাণ ও ব্যবসা সম্বন্ধে আভাষ দিব।

তুমি লো চিরন্তনী

শ্রীরমেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী

চঞ্চল-আঁখি লজ্জা-নমিতা অনাগত যৌবনা,
চিত্ত-ভোমর নিত্য পিয়াসী তব প্রেম-মৌ-কণা!
হাসির লহরী ঢেউ দিয়ে যায় গোলাপী আঁজল ভরি,
অঙ্গ জড়ায়ে মধুর আবেশে উঠেছে নীলাম্বরী!
হিমেল্ হাওয়ায় ওড়ে চারিধার কোঁকড়ানো কালো চুল,
সারা দুনিয়ায় খুঁজেছি বৃথাই—পাইনিক' সমতুল!
অ-পলকে চাই—ভাষা ফিরে যায় দূরে কোন্ দিক-শেষে,
রূপের তোমার আলোক যেথায় সোনালি আলোয় মেশে।

গানের গীতালি ছোট্ট দু'পায়—নূপুরের রিনি-ঝিনি,
যেন মনে হয়, যুগ যুগান্ত হ'তে তোমারেই চিনি!
চিনি তোমা ওই মন্থর-গতি, উচ্ছল প্রেমময়,
চুড়ি-নিক্কণ কানে কানে কয়—মিথ্যে কিছুই নয়!
জগতের মাঝে চিনি তোমাকেই—নহ তুমি সাধারণ,
আমার প্রেমের—আমার ধ্যানের চির কামনার ধন!
তুমি লো চিরন্তনী....
জনমে জনমে ও ভুজ-কোমলে এনো প্রেম-বন্ধনী।

(গল্প)

শ্রীমতী নীলিমা দেবী

অমিয়েন্দু নির্নিমেষ নেত্রে লুণ্ঠিত রমণী-মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া হাতের টর্চটি ধরিয়া নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। —ইহাকেই সে ভালবাসিয়াছিল!

কিন্তু, সে কথা আজ বিশ্বাস করিতেও ইচ্ছা হয় না। এই কি সেই সুবর্ণ-প্রতিমা সুদেষ্ণা? ইহার কোটরগত চক্ষু বিশীর্ণ গণ্ড, স্বল্প কেশ, আর কৃশদেহ দেখিলে পথের ভিখারিণী ব্যতীত আর কিছুই মনে হয় না।

হয়ত ভিক্ষায় বাহির হইয়া আর পথ চলিতে পারে নাই, অবশেষে তাহার বাহিরের দিকের বারান্দায় আশ্রয় লইয়াছে এবং ক্লান্তি বশতই সম্ভবত ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

রাত্রে দরজা বন্ধ করিতে আসিয়া অমিয়েন্দু থমকিয়া দাঁড়াইয়া, তাহার মুখের উপর আলো ফেলিয়াছে তাহার পর নিঃস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

সুদেষ্ণার রূপের কণামাত্র ভিখারিণীর নাই সত্য কিন্তু কোটরগত চক্ষুর কাজল কালো পল্লবগুলি তেমনিই বঙ্কিম, আর তীক্ষ্ণ নাসার নীচে বিশীর্ণ ওষ্ঠের ভঙ্গিমা, চিবুকের সুকুমার গঠনটুকু—সেও কাল হরণ করিয়া লইতে পারে নাই। রং তাহার এককালে সোনার মতই ছিল, এ কথা দিব্য করিয়া বলিলেও আর এখন কেহ বিশ্বাস করিবে না। তাহা তাম্রবর্ণ ধারণ করিয়াছে।

যে চম্পক কলিকার মত আঙুলগুলি অমিয়েন্দু কত দিন ক্রীড়াচ্ছলে চাপিয়া ধরিয়া কহিয়াছে, "তোমাকে ছাড়া কাউকে আমি বিয়ে ক'রব না,—কাউকে ভালও বাসবই না।" সেই আঙুলগুলির দিকে চাহিলেই এখন কেমন বিতৃষ্ণা আসে। কিন্তু সেই সুদেষ্ণাই তো! যে একদিন রাণীর সাজে আসিতে পারিত, সে-ই আজ ভিখারিণীর বেশে দীর্ঘ একাদশ বর্ষ পরে আসিয়াছে বলিয়াই অমিয়েন্দু তাহাকে অবজ্ঞা করিবে! অমিয়েন্দু ভাবিতে পারে না। অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ সব যেন একাকার হইয়া নিবিড় অন্ধকারে ঢাকিয়া যায় আর তাহারই মাঝে ক্ষীণ-দেহা রূপসী তরুণী প্রদীপের শিখার মতই দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতে থাকে। নিজের অজ্ঞাতসারেই অমিয়েন্দু ধীরে ধীরে তাহার মাথার কাছে বসিয়া পড়িল। ধীরে ধীরে একখানি হাত তাহার কোলের উপর তুলিয়া লইয়াই চমকিয়া উঠিল। জ্বরে তাহার গা যেন পুড়িয়া যাইতেছে। অমিয়েন্দুর সমস্ত বিশৃঙ্খল চিন্তার সূত্রও যেন ছিঁড়িয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি ভিখারিণীকে উঠাইয়া লইল। ধীরে ধীরে তাহাকে নিজেরই বিছানায় শোয়াইয়া দিল।

(২)

ক্লান্তিবশত সে ঘুমায় নাই, জ্বরেই তাহার চেতনা হরণ করিয়াছে, তাহা ভাবিয়া অমিয়েন্দুর মুখের রুক্ষ কয়েকটি রেখা ক্রমশ যেন কোমল হইয়া আসিতে লাগিল।

অমিয়েন্দু পাটনা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর। জীবন তাহার নিঃসঙ্গ। কবে সে তাহার আত্মীয়-পরিজনকে ছাড়িয়া, সুজলা সুফলা জন্মভূমি বাঙলামাকে ছাড়িয়া নীড়ভ্রষ্ট পাখীর মতই এখানে আসিয়া পড়িয়াছে। একবারও পাটনা ছাড়িয়া যায় নাই। —হ্যাঁ একবার গিয়াছিল বটে, তাও জন্মভূমিতে নয়, কাশীতে।

শহর হইতে বিচ্ছিন্ন বাংলো প্যাটর্নের বাড়ীটা সে ভাড়া লইয়াছিল, এখন তাহা কিনিয়াই লইয়াছে। প্রকাণ্ড জমি আর চারিদিকে ফাঁকা মাঠ লইয়া এ বাড়ীটি ও যেন তাহারই মত নিঃসঙ্গ। গৃহকর্ম্ম করিবার জন্য একটি মাত্র চাকর। মাহিনা তাহার ২০৲ টাকা করিয়া দিয়াছে, তবু একজনের জায়গায় পাছে দুইজন হইলে গোলমাল বেশী হয়, সেই ভয়ে লোক আর রাখে নাই। সে বেচারী বিদেশী লোক। এক প্রান্তে, নীরব নিস্তব্ধ বাড়ীটায় তার যেন নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসে। তবু টাকার মায়ায় ছাড়িতে পারে না। তা ছাড়া একলা-ঘরের সুবিধাও অনেক। ভোলানাথের মত উদাসীন মনিবটিকে ঠকাইতেও বেশী বেগ পাইতে হয় না। বছরে দুইমাস করিয়া ছুটি মাহিনা সমেত পাওয়া যায়, তখন সে তাহারই এক ভাইকে রাখিয়া বাড়ী গিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে।

বন্ধু-বান্ধব বলিতেও অমিয়েন্দুর কেহই নাই। প্রথম যখন সে প্রফেসরি লইয়া এখানে আসে তখন অনেকেই এই প্রিয়দর্শন যুবকটির সহিত আলাপ করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিল, কিন্তু সেই ঔৎসুক্যের অনলটুকু অমিয়েন্দুর গাম্ভীর্য্যের বর্ম্মে ঠেকিয়া নিভিয়া যাইতেও বেশী দেরী হয় নাই। কলেজের ছেলেদের কাছে তাহার নানা শ্রুতিসুখকর উপাধিও লাভ হইয়াছে, কিন্তু কোনদিন তাহাকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলিতে কেহ শোনে নাই। যে ঘরে সে সুদেষ্ণাকে শোয়াইয়া দিল, সেই ঘরেই তাহার সমস্ত সম্পত্তির সমাবেশ। অর্থাৎ টেবিল, চেয়ার, খাট, আলমারী, জুতা প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে জড়ো হইয়া রহিয়াছে। ঘরটি ভাল এবং বড়, তাই এতগুলি জিনিষের ভার বহন করিয়াও গুদাম ঘর হইতে একটু স্বতন্ত্রই রহিয়াছে। একধারে একটি খাট। দেওয়াল ঘেঁসাইয়া একটি বড় সেক্রেটেরিয়েট টেবিল, ঘরের চারিকোণে প্রকাণ্ড বড় বড় চারিটি আলমারী নানা প্রকারের পুঁথিতে বোঝাইকরা। টেবিলের উপর রাশিকৃত বই, বিশৃঙ্খলভাবে ছড়ান। আর তাহারই নীচে নানা জাতীয় ধূলিমলিন জুতা বোঝাই। এক পাশে একটি আলনায় ধুতি, পাঞ্জাবী, সার্ট ইত্যাদি প্রায় বোঝাই—কয়েকটা ময়লা, কিছুবা ফর্সাও আছে; নীচে কিছু কিছু যে পড়িয়া নাই এমন নহে। আর গোটাকতক চেয়ার পরস্পরের সহিত আড়ি করিয়াই যেন এধারে ওধারে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া আছে।

বাড়ীতে আরও ঘর রহিয়াছে, কিন্তু ইহাই সব চাইতে বড় ঘর দেখিয়া অমিয়েন্দু পছন্দ করিয়াছে। একটি ঘরেই সব কাজই চলিয়া যায়, অনর্থক জিনিষপত্র খুঁজিয়া মরিতে হয় না। অধিকাংশ দিন আহারও তাহার এই ঘরেই হইয়া থাকে। চাকরকে বলিয়া রাখিয়াছে রাত্রি দশটার পরও সে যদি বই ছাড়িয়া না উঠে, তাহা হইলে এই ঘরেই যেন টেবিলের উপর তাহার খাবার ঢাকিয়া রাখিয়া যায়। চাকরটিও প্রভুভক্ত, অক্ষরে

অক্ষরে সে তাহার মনিবের আজ্ঞা পালন করিয়া আসিতেছে। ইজি-চেয়ারটায়ই বই মুখে লইয়া অমিয়েন্দু কখন ঘুমাইয়া পড়ে। মশকের দংশনে মশারির ভিতর আশ্রয় অবশেষে এক সময় লইতেই হয়; কিন্তু অখাদ্য ঠান্ডা খাদ্য খাইতে আর তাহার প্রবৃত্তি হয় না। ভোরবেলা আবার চাকর নিঃশব্দে তাহা বাহির করিয়া লইয়া যায়। শুধু বছর দুই হইল, তাহার জীবনের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইতেছিল। এক ঝলক ফাগুন বাতাসের মতই তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রী মাধুরী আসিয়া তাহার জীবনকে একেবারে ওলট-পালট করিয়া দিয়া যাইত।

অমিয়েন্দু যখন বাড়ী ছাড়িয়া আসে, তখন মাধুরী শিশু। কাকাকে সে বড় ভালবাসিত। আর এই ক্ষুদ্র মা-টিকেও সে-ও বড় কম ভালবাসিত না। কিন্তু তবুও সে সব ছাড়িয়া আসিল। দুঃসহ ব্যথায় মায়ের অভিমান, বৌদি ও দাদার সকরুণ মিনতি, মাধুরীর ক্রন্দন সকলই উপেক্ষা করিয়া নিষ্ঠুরের মতই সে চলিয়া আসিল। তাহাকে যাহারা এত বড় আঘাত করিল, তাহারা পরমাত্মীয় হইলেও তাহার হিতৈষী নয়।

পাটনায় প্রফেসারি লইয়া সে চলিয়া আসিল। তাহার পর লক্ষ্মণের মত সেই চির-অনুগত ভাই-ই একদিন তাহার ভাগের বিষয়ের ন্যায্য দাম ধরিয়া লইতেও দ্বিধাবোধ করিল না। বড় ভাই নির্ম্মলেন্দু বড় দুঃখেই প্রতিজ্ঞা করিলেন—তাহার সহিত আর কোন সংশ্রবই রাখিবেন না।

মাধুরী কিন্তু তাহার কাকাকে নিষ্ঠুর বলিয়া ভাবিতে কোনদিনই পারে নাই। নির্ম্মলেন্দু বা অজিতা কেহই তাহার নাম পর্য্যন্ত সহিতে পারিতেন না। তাই শিশু মাধুরীও তাহার নাম মুখে আনিত না।

কয়েক বৎসর হইল তাহার বিবাহ হইয়াছে। শাশুড়ী নাই, শ্বশুরের সংসারে সে-ই গৃহিণী। শ্বশুরবাড়ী হইতেই সে তাহার স্বামী বিকাশের সহিত তাহার স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসিত 'পুত্রকে' মাঝে মাঝে দেখিতে আসে। তখন আবার জিনিষপত্রগুলো তাহাদের নির্দ্দিষ্ট জায়গায় যায়, ঘর-দোর ঝক্ ঝক্ করিয়া হাসিয়া উঠে, চাকরটি ব্যস্ত হইয়া ছুটাছুটি করিতে থাকে।

অমিয়েন্দুর খাওয়া-দাওয়া ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় হইতে থাকে। বৈকালে তিনজনে একটু হাঁটিয়া বেড়াইয়াও আসে। তাহার পর রাত্রে, মাধুরীর স্বহস্তে প্রস্তুত আহার্য্য দ্রব্যগুলি, তাহার অনর্গল বাক্য স্রোতের মাঝে কখন তাহারা নিঃশেষে খাইয়া ফেলে। খাওয়ার পর মাধুরী তাহাদের ভোজন দক্ষিণা দেয় এস্রাজ শুনাইয়া।

ক্রমে মাধুরীর যাইবার দিন আসিয়া পড়ে, খানকয়েক নোট মাধুরীর হাতে গুঁজিয়া দিয়া অমিয়েন্দু ম্লানমুখে বলে "মিষ্টি-টিষ্টি ত কিছু আনান হ'ল না, তুই কিছু কিনে নিস মাধু!" কান্নার সঙ্গে সঙ্গেই মাধুরীর মুখে একটু হাসি ফুটিয়া উঠে, তাহার উদাসীন কাকাটি তাহা হইলে তাহারই জন্য সংসারী হইয়া উঠিল! মুখের হাসি তাহার ধীরে ধীরে মিলাইয়া যায়, নত হইয়া প্রণাম করিতে টপ্ টপ্ করিয়া কয়েক ফোঁটা জল অমিয়েন্দুর পায়ের উপর পড়ে। অমিয়েন্দু, চমকিয়া পা সরাইয়া লইয়া ম্লানহাসি হাসে।

বিকাশ কুণ্ঠিতভাবে কাছে আসিয়া বলে, "আসি কাকাবাবু!"

"হ্যাঁ এস।" বলিয়া অমিয়েন্দু তাহাকে জড়াইয়া ধরে, ধরা-গলায় বলে, "মাধুকে নিয়ে মাঝে মাঝে এস বিকাশ!"

"আসব বইকি।" বলিয়া বিকাশ তাড়াতাড়ি গাড়ীতে গিয়া বসে। মাধুরী বার বার চোখ মুছিয়া ঢোক গিলিয়া বলে, "কাকাবাবু! দেখ, শরীরের যেন অযত্ন কর না। সময়ে নেও খেও, লক্ষ্মীটি। আমি মুকুন্দকে সব বলে দিয়েছি।"

"হ্যাঁরে পাগলী- হ্যাঁ। সবই হবে, তোর মত সাবধানী মা থাকতে কি আর অনিয়ম করবার যো আছে?" অমিয়েন্দু টানিয়া টানিয়া হাসিতে থাকে। গাড়ী চলিয়া যায়। দিন কতক ঘরগুলি গোছানই থাকে। তাহার পর আবার যে সেই। প্রত্যেক ঘরে আলাদা জিনিষ থাকিলে তাহার অসুবিধা হয়, তাই এক ঘরেই আবার সব আসিয়া জোটে। মুকুন্দর কাজ দিনকতক কিছুতেই পছন্দ হয় না। সর্ব্বদাই খুঁত খুঁত করে তাহার পর আবার সব সহিয়া যায়। মুকুন্দও নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে। নিশ্চিন্ত হইয়া অভ্যাস মত কাজ করিতে থাকে। বিলাসিতার মধ্যে অমিয়েন্দুর একমাত্র পরিষ্কার বিছানায় শোওয়া অভ্যাস। সেটি এতটুকু অপরিষ্কার হইলেও সে সহিতে পারে না। মুকুন্দ বাবুর নাড়ি-নক্ষত্রের খবর রাখে। ঘরের ভিতর মাসে একবার ঝাঁট পড়িলেও বিছানা তাহার ঝক্ ঝক্ করে। রোজ সন্ধ্যায় পরিপাটি করিয়া বিছানা করিয়া গায়ে ঢাকা দিবার চাদরটি পায়ের দিকে সযত্নে পাট করিয়া রাখিয়া মশারি ফেলিয়া দেয়। আর একবার সে রাত্রি দশটার সময় ঘরে ঢোকে তাহার খাবার রাখিয়া যাইতে।

সুদেষ্ণাকে অমিয়েন্দু সেই বিছানায়ই আনিয়া শোয়াইয়াছে। তাহার দুগ্ধ-শুভ্র বিছানায় মলিন বসন পরিহিতা সুদেষ্ণাকে বড় অদ্ভুতই দেখাইতেছিল। কিন্তু অমিয়েন্দুর মুখে বিতৃষ্ণার চিহ্ন মাত্রও নাই। তাহার সমস্ত মুখ সকরুণ মাধুর্য্যে ভরিয়া উঠিয়াছে! এক দৃষ্টে সে সুদেষ্ণার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, চোখের পাতা দুইটি জলে-ভেজা পদ্মের মতই ভারী হইয়া রহিয়াছে, এখনই যেন তাহা হইতে দুঃখের মধু ঝরিয়া পড়িবে!

কী আশ্চর্য্য! দীর্ঘ একাদশ বর্ষ পরে সেই সুদেষ্ণাই যে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে আসিয়া পড়িবে তাহা কেই বা ভাবিয়া রাখিয়াছিল! খাটের পাশের ইজি-চেয়ারটায় অমিয়েন্দু বসিয়া পড়ে, তাহার পর সুদেষ্ণার রুক্ষ চুলগুলির উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে অন্যমনস্কভাবে হঠাৎ এক সময় বলিয়া উঠে—"সুষেণ! এতদিন পরে তুমি এলে? কিন্তু কি দিয়েই-বা তোমার অভ্যর্থনা করব?"

নিজের কণ্ঠস্বরে অমিয়েন্দু নিজেই চমকিয়া উঠে। নির্নিমেষ নেত্রে সুদেষ্ণার দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তাহার চোখ হইতে সত্য সত্যই জল গড়াইয়া পড়ে। পূর্ব্ব জীবনের অনেক ঘটনাই ছবির মত চোখের সম্মুখে ভাসিয়া আসিতে থাকে। প্রথমেই আসেন মা একটি অনিন্দ্যসুন্দরী তরুণীকে বক্ষে জড়াইয়া।

লজ্জিতাকে অধিকতর লজ্জা দিয়া মা বলেন,—"খোকন! একে তোকে বিয়ে করতেই হবে বাপু, এবার তুই না বলতে

পারবিনে!" অমিয়েন্দ্র আড়চোখে একবার মেয়েটির দিকে চাহিয়া দেখে, মুখ তাহার লজ্জায় রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে, পদ্মের পাঁপড়ীর মত চোখ দুটি মুদিয়া আছে, এক ঢাল কুঞ্চিত কেশ পিঠের দিকটাকে যেন অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে। অমিয়েন্দ্র কপালকুণ্ডলার কথা মনে পড়িল, কিন্তু তাহার ত এত লজ্জা ছিল না! অমিয়েন্দ্রর মুখে চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, নতমুখে, অস্ফুটস্বরে সে কহিয়াছিল, "আমি জানিনে—তোমার যা খুশী!" মার বাহু বন্ধন ধীরে ধীরে শিথিল হইয়া যায়,—চকিতা হরিণীরই মত তরুণী ছুটিয়া পলাইয়া গেল। ম্লান মুখে মা কহিলেন,—"আমি জানতাম না যে তোর এমত হবে। ভদ্রলোককে কথা দিয়েছি, কি যে করবো!" মার অভিমানাহত মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিয়া অমিয়েন্দ্র কহিল, "বাঃ বেশ ত! আমি আবার কখন বললাম যে, বিয়ে করবো না!" মার মুখে চোখে আনন্দ যেন উছলিয়া পড়ে,—"দেখিস বাবা অমত করিসনে যেন!" বলিয়া তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া যান। পরমুহূর্তেই ঘরে ঢোকেন বৌদি। "ও ঠাকুরপো! তোমার পেটে পেটে এত?" বলিয়া ঘন ঘন শাঁখ বাজাইতে থাকেন। সেই শাঁখের মঙ্গলধ্বনিতে অমিয়েন্দ্র ভাবী জীবনের কত কল্পনাই করিতে থাকে। সারা দেহে তাহার মুহুর্মুহু আনন্দের শিহরণ বহিয়া যায়।

শাঁখ রাখিয়া দিয়া বৌদি বলেন, "ঠাকুরপো, তোমার নিশ্চয়ই খুব বিরক্তি লাগছে? কোথায় তোমার মানসীর কথা শুনিয়ে তোমার প্রাণটি শীতল করবো, তা না খালি শাঁখই বাজাচ্ছি! কিন্তু এটিকে অবজ্ঞা করা চলে না ভাই, জানই ত' শাঁখই হ'ল তোমাদের পরিণয়ের অগ্রদূত!" অমিয়েন্দ্র একটা ভারী মোটা বইএর উপর চোখ রাখিয়া গম্ভীর মুখে বলে, "কই তা ত জানতাম না বৌদি! তাহ'লে ওঁকে একটা প্রণাম করা যাক্, কি বল?" বলিয়া শাঁখের উদ্দেশে হাতজোড় করিয়া নমস্কার করে। হাসিয়া উঠিয়া বৌদি বলেন, "ঈস! বিয়ের নামেই যে ভক্তি বেড়ে গেল! যাক ঠাকুরপো, জান, ঐযে আমাদের পাশের বাংলো বাড়ীটা, ঐটেই তোমার আরাধ্যা দেবীর। ঐটে কিনে ওঁরা মাস দুই হ'ল বাস করছেন। তুমি তখন কলকাতায় পড়ছ, নাহ'লে আরও কিছু আগেই তোমার বিয়ে হ'ত। যাকগে। সেজন্যে আর দুঃখু করে কি হবে ভাই? তোমার শ্বশুর জমিদার, ঐ একটি মাত্রই মেয়ে, সবই তোমরাই পাবে। অর্দ্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা পাওয়া একেই বলে। কি বল ঠাকুরপো?" বলিয়া বৌদি আবার হাসিয়া উঠিলেন।

অমিয়েন্দ্ররও মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল, রাজত্ব না হোক রাজকন্যাটির উপর তাহারও কিছু আকর্ষণ কম হয় নাই। "ঈস! ঠাকুরপোর যে আর মুখে হাসি ধরে না।" বলিয়া ব্যস্ত হইয়া বাহির হইয়া যান। অমিয়েন্দ্র ধীরে ধীরে জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন অস্তগামী সূর্য্যের রক্তরাগ নববধূর মতই আকাশকে রাঙাইয়া তুলিয়াছিল। বাগানে শিউলি গাছের তলায় গোধূলির স্বর্ণরেণু সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া একটি তরুণী নতনেত্রে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার দিকেই অমিয়েন্দ্রর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। সে সুদেষ্ণা। অমিয়েন্দ্রর সারা দেহমন অপূর্ব্ব পুলকে শিহরিয়া উঠিল। কয়েকটি শিউলি ফুল তুলিতে গিয়া অমিয়েন্দ্রর সহিত তাহার চোখোচোখী হইয়া গেল। পরমুহূর্তেই সে দুই হাতের ভিতর মুখ লুকাইয়া বাড়ীর ভিতর ছুটিয়া পলাইয়া গেল। অমিয়েন্দ্রও সরিয়া আসিয়া টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া বসিয়া পড়িল। আকাতর শিশুর মতই তখন তাহার সারাদেহ রহিয়া রহিয়া কাঁপিতেছে।

সুদেষ্ণার পিতা অবিনাশবাবু একটু আধুনিক ধরণের লোক; হয়ত একটু বেশী মাত্রায়ই আধুনিক। প্রত্যহই তিনি ভাবী জামাতাকে চায়ের নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। অমিয়েন্দ্র লজ্জিত হইয়া আপত্তি করিলে বলেন, "বিলক্ষণ! সারা দুপুর ধরে যে মা আমার খাবার করল সে সব কে খাবে শুনি? ও সব আপত্তি আমি শুনেছি না কিন্তু—" তাহার পরেই হাঁক দেন—"বড়মা—বড়মা!" অজিতা আসিয়া দাঁড়ায়। অবিনাশবাবু ব্যস্ত হইয়া বলেন, "বড়মা! অমিয়কে আমি নিয়ে চল্লাম।"

"বেশ তো কাকাবাবু—আমায় জিগ্যেস করছেন কেন? আপনার জামাই আপনি ত নিয়ে যাবেনই।" বলিয়া অজিতা অমিয়েন্দ্রর বিপন্ন মুখের দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসে।

"সেই ত বলছি বড়মা।" বলিয়া সানন্দে অবিনাশবাবু অমিয়েন্দ্রকে লইয়া প্রস্থান করেন। টেবিলের উপর নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য আর তাহার পাশেই সুসজ্জিতা আরক্তমুখী সুদেষ্ণা বসিয়া থাকে। অবিনাশবাবু অমিয়েন্দ্রর সঙ্গে তুমুলভাবে তর্ক করিতে করিতে হঠাৎ এক সময় বলিয়া উঠেন, "আচ্ছা—আমি আসছি এক্ষুণি অমিয়,—তোমরা বোস।" তিনি বাহির হইয়া যাইতেই ঘরের মধ্যে অখণ্ড নিস্তব্ধতা বিরাজ করে। বহুক্ষণ পরে ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া অস্ফুট, লজ্জাজড়িত স্বরে সুদেষ্ণা বলে,—"আপনি যে কিছুই খাচ্ছেন না!" "না।" বলিয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া থাকে। তাহার পর টেবিলের উপর রাখা তাহার সুন্দর করতলখানি মৃদুভাবে পীড়ন করিয়া অমিয়েন্দ্র বলে, —"সুষেণ! আমি কি এত ভাগ্য করেছি যে, তোমায় পাব? আমার যে বিশ্বাস করতেও ইচ্ছে করে না, ভয় হয়, মনে হয় এ স্বপ্ন বুঝি ভেঙে যাবে!" তাহার হাতের ভিতর সুদেষ্ণার হাতটি থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠে। লজ্জায় সে তাহার রাঙা মুখ আরও নত করিয়া বসে।

অমিয়েন্দ্র সস্নেহে হাসিয়া তাহার হাত সরাইয়া লয়। তাহার পর আবার সব চুপ-চাপ।

অবিনাশবাবু ঘরে আসিয়া বলেন, "একি অমিয়, কিছুই যে খাওনি? ছোটমা—তুমিও কিছু খেতে বলনি?" বিপন্নমুখে অমিয়েন্দ্র বলে, "না না—খেয়েছি ত অনেক।" "কই কি আর খেয়েছ? তোমাদের মত বয়সে যে আমরা বড় বড় বারকোস সাজিয়ে জলখাবার খেয়েছি!" বলিয়া অবিনাশবাবু উচ্চহাস্য করিয়া উঠেন। মৃদু হাসিয়া অমিয়েন্দ্র বিদায় লয়।

বিবাহের দিন ক্রমশ নিকটবর্ত্তী হইয়া আসে। নিমন্ত্রণ ও কমিতে কমিতে ক্রমশ বন্ধ হইয়া যায়। পাশা পাশি দুটি বাড়ীতেই সোরগোলের আর অন্ত থাকে না। আর তাহারই ভিতর দুটি তরুণ-তরুণী ভাবী জীবনের অসংখ্য সুখের চিত্রের উপর কল্পনার মোহন তুলিকা বুলাইতে থাকে। সে চিত্রে রংএর

অভাব হয় না। ইহারই মধ্যে মা একদিন বলিয়াছিলেন, "এদের রকম-সকম কিছুই বুঝিনে বাপু। অত বড়লোক—সন্তান বলতেও ঐ একটিই। অথচ আত্মীয়-কুটুম্বের নাম গন্ধও নেই।" অজিতা তাড়াতাড়ি সংশোধন করিয়া বলে, "মেয়ে বড় হয়েছে, পাড়াগাঁর লোকে নানা কথা বলতে পারে। সেই জন্যেই সম্ভবত কাউকে আনান নি। বিয়ের পরে একেবারে সব আনাবেন।"

"হুঁ তাই হবে। পাড়াগাঁর লোকগুলি ত আর কম কুচুটে নয়," মা বলেন। তাঁহার মনের মেঘ কাটিয়া গিয়া, আবার মুখ প্রসন্ন হয়। অমিয়েন্দুও নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে। এত আনন্দের মাঝে আবার সন্দেহ, সংশয় কেন? তাহারা যে আনন্দের রাঙা রঙের উপরে কালো কালি ঢালিয়া দেয়।

আশীর্ব্বাদও অবশেষে হইয়া যায়। বিবাহের আর দিন চার মাত্র বাকী। সন্ধ্যায় অমিয়েন্দু সেদিন খবরের কাগজ জড়াইয়া মোটা জুঁইফুলের গোড়ে মালা লইয়া অত্যন্ত সন্তর্পণে গৃহে প্রবেশ করিল।

আজ একটি দুঃসাহসিক ইচ্ছায় তাহার সারা অন্তঃকরণ ভরিয়া রহিয়াছে। তাহা সে করিবেই। ভয় যা একমাত্র বৌদিকে লইয়াই। অনুক্ষণ তিনি তাহাকেই ত পাহারা দিয়া ফিরিতে-তেছেন। কিন্তু, সেদিন অমিয়েন্দু একটু আশ্চর্য্যই হইল, সে বাড়ী আসা মাত্রই অন্যদিনের মত আর বালক-বালিকা, তরুণ-তরুণীর ভিড় লাগিল না। সকলে মার ঘরে বসিয়া বোধ হয় তাহার বিবাহ সম্বন্ধেই পরামর্শ করিতেছে। তাহার পক্ষে এই একটা মস্ত সুযোগ। অকারণেই সে একটু বেশী রকম খুশী হইয়া উঠে, তাহার পর খিড়কির দরজা খুলিয়া অত্যন্ত সন্ত-র্পণে সুদেষ্ণাদের বাগানে প্রবেশ করে। প্রতিদিন ঠিক এই সময়েই সুদেষ্ণা লাল-নীল গরদের শাড়ী পরিয়া সাজি হাতে মায়ের পূজার ফুল তুলিতে আসে। অমিয়েন্দু তাহা লক্ষ্য করিয়াছে। আজ সে তাই সাবধানে বাগানের প্রত্যেক গাছের তলায় তাহারই অন্বেষণে ফিরিতে লাগিল।

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন গাঢ় হইয়া আসিতেছে, হঠাৎ অস্ফুট রোদনধ্বনি শুনিয়া অমিয়েন্দু চমকিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে সেই দিকে অগ্রসর হইতেই অস্পষ্ট আলোকে দেখিল, একটি বকুল গাছের তলায় দুই হাতের ভিতর মুখ লুকাইয়া আকুল হইয়া সুদেষ্ণা কাঁদিতেছে। বিস্মিত, ব্যথিত অমিয়েন্দু নির্নিমেষ নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া থাকে। হাতের মালা তাহার কখন খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে

কিছুক্ষণ পরে নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইয়া অমিয়েন্দু কহিল, "সুষেণ! তুমি কাঁদছ! কেন কাঁদছ?" সুদেষ্ণা চমকিয়া মুখ তুলিল। অমিয়েন্দু আরও একটু আগাইয়া আসিয়া তাহার একটি হাত ধরিয়া কহিল, "সুষেণ! এ বিয়েতে কি তোমার মত নেই?" সুদেষ্ণা আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল,—"অমিয়েন্দু-বাবু আপনি চুপ করুন। আগে আমার সব কথা বলতে দিন। আপনি কি জানেন, আমি বিধবা? কিন্তু, আপনি বিশ্বাস করুন, এর বিন্দু-বিসর্গও আমি জানতাম না। সাত বছর বয়সে আমার বিয়ে হয়, তার দু'মাস পরেই আমি বিধবা হই; মা, বাবা আমাকে নিয়ে তারপর থেকেই বিদেশে বিদেশেই ঘুরতে থাকেন। আমার দাদামশাই এই বিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। বিয়ের এক মাসের মধ্যেই তিনিও মারা যান। আজ যদি আমার মামা এসে না বলতেন, তাহলে আমি কিছুই জানতাম না।"

উত্তেজনায় সুদেষ্ণা হাঁফাইতেছিল। অমিয়েন্দু মাটি হইতে মালাটি কুড়াইয়া লইয়া তাহার গলায় পরাইয়া দিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল, "সুদেষ্ণা! ওসব আমি কিছু জানি না! আমি শুধু জানি তুমি আমারই।"

গভীর সুখে সুদেষ্ণা বিহ্বল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কয়েকটি বকুল এই দুইটি সংসার-অনভিজ্ঞ তরুণ-তরুণীর মাথায় ঝরিয়া পড়িয়া সস্নেহে আশীর্ব্বাদ করিল।

খানিক পরে সচকিত হইয়া সুদেষ্ণা কহিল —"আমি যাই, এখুনি আবার কে এসে পড়বে!" অমিয়েন্দুরও সে ভয় ছিল। মৃদু হাসিয়া সে কহিল, "এস। সুষেণ! তুমি এটা ভুলে যেওনা, যে তোমায় একবার দেখেছে, সে আর কাউকে কখন ভালবাসতে পারবে না!"

"যাও।" বলিয়া গভীর অনুরাগভরা দৃষ্টি তাহার উপর নিক্ষেপ করিয়া চকিতে সুদেষ্ণা মিলাইয়া গেল।

অমিয়েন্দু বাগান হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিতেই একজন প্রৌঢ় কোথা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া ভ্যাংচাইয়া কহিল, "বড্ড যে ইয়ার ছোকরা দেখছি, বলি জমিদারের যুবতী মেয়ের সঙ্গে কি রসালাপটা হচ্ছিল শুনি?"

"চুপ করুন, মুখ সামলে কথা বলবেন!" বলিয়া একটানে অমিয়েন্দু তাহার হাতটা মুক্ত করিয়া লইল। প্রৌঢ় পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গেলেন। দূরে দাঁড়াইয়া চেঁচাইতে লাগিলেন, "এ কি ঢলাঢলি কাণ্ড! বলি অবিনাশ,—বিধবা মেয়েটার আবার বিয়ে দিচ্ছ হে? নরকেরও ভয় নেই?"

অমিয়েন্দুদের বাড়ী হইতে পুরুষেরা বাগানে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। অবিনাশবাবুও গম্ভীরমুখে ধীরে ধীরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ধীর গম্ভীর স্বরে তিনি কহিলেন,—"গোপেশ! এই মুহূর্ত্তে আমার বাড়ী থেকে তুমি দূর হয়ে যাও। আমার বাড়ীতে ছোটলোকের স্থান নেই।"

'ওরে তারা রে—বাবা তোকে কি চামারের হাতেই তুলে দিয়ে গেছেন রে'—বলিয়া গোপেশবাবু ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিতেই অবিনাশবাবু প্রচণ্ড এক ধমক দিয়া কহিলেন—"চুপ কর। না হলে দারোয়ান দিয়ে বার করে দেব।" মন্ত্রমুগ্ধের মতই তাহার ক্রন্দন থামিয়া গেল। অবিনাশবাবু পুনশ্চ ধীরস্বরে কহিলেন, "নির্ম্মলেন্দু তোমার কাছে কিছুই লুকোব না। মা আমার সাত বৎসরে বিধবা, তোমরা আজকালকার ছেলে, তোমা-দেরও কি তাই মত যে, আর তার বিয়ে হওয়া অনুচিত?"

নির্ম্মলেন্দু হেঁট মুখে দাঁড়াইয়া ছিলেন, মৃদুস্বরে কহি-লেন, "উচিত অনুচিত বুঝি না। চিরদিন মার মত নিয়েই সব করেছি। এ বিবাহে তাঁর মত নেই। মাকে অসুখী করে কিছুই করতে পারি না। চলে এস অমিয়েন্দু।"

অমিয়েন্দু এইবার সোজা হইয়া দাঁড়াইল। দৃঢ়স্বরে কহিল "তুমি যাও দাদা। আমি একটু পরে যাচ্ছি। হ্যাঁ বরা-বর মার অনুমতি নিয়েই আমরা সব কাজই করেছি সত্যি, কিন্তু

এমন অন্যায় আদেশ ত মা কখনও দেন নি। যাক অবিনাশবাবু, আপনি নিশ্চয় জানবেন, মার অমতেও আমি আপনার মেয়েকে বিবাহ করতে এখন তেমনই উৎসুক।"

বিস্মিত জনতার মাঝখানে অবিনাশবাবু অমিয়েন্দুকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন। তাঁহার আয়ত নেত্র তখন অশ্রুজলে টল্ টল্ করিতেছে।

নির্ম্মলেন্দুর সহিত অবশেষে অমিয়েন্দুও গৃহে প্রবেশ করিল। গৃহে প্রবেশ করিবামাত্রই সকলেই তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল, তাহার পর উপদেশ অনুযোগ আদেশের আর অন্ত রহিল না।

একা ঘরে বুঝাইয়া বলিবার জন্য মা তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অমিয়েন্দু গম্ভীর মুখে তাঁহার কাছে আসিয়া বসিল। তাহার দুটি হাত ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া মা কহিলেন,—খোকন! কথা দে অমন সর্ব্বনাশ করবিনে।

দৃঢ়স্বরে অমিয়েন্দু কহিল,—"এমন কথা আমি দিতে পারব না!"

"উঃ—আমার মুখের ওপর তুই এত বড় কথাটাও বলতে পারলি রে—এ যে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি!"

"স্বপ্নে ত অনেক জিনিষই ভাবা যায় না, আমিই কি আর কখনও ভেবেছিলাম যে, তুমি নিজে বিয়ে দেবার জন্যে জিদ করে আবার নিজেই বিয়ে ভাঙ্গবার জন্যে ব্যস্ত হবে!" বলিয়া বিরসমুখে অমিয়েন্দু ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল। বালিশের ভিতর মুখ গুঁজিয়া মূর্চ্ছাহতের মতই মা পড়িয়া রহিলেন।

অজিতা কাঁদিয়া আসিয়া কহিল,—"ঠাকুরপো! তুমি অত নিষ্ঠুর হয়ো না! যাও, মাকে বলগে। না হ'লে মা জলস্পর্শও করবেন না!"

গম্ভীর মুখে ঘাড় নাড়িয়া অমিয়েন্দু কহিল, "আমি তা পারব না বৌদি।"

ম্লান হাসিয়া অজিতা কহিল, "পারতে হবে বইকি ভাই, না পারলে চলবে কেন? তোমারই কি শুধু একা কষ্ট হচ্ছে? সুরেণকে কে না ভালবেসেছিল? কিন্তু কর্ত্তব্যের কাছে কিছুই বড় নয়।"

হাতের বইটা ছুড়িয়া ফেলিয়া তিক্তস্বরে অমিয়েন্দু কহিল,—কর্ত্তব্যের কি বড়াই করছ? সুদেষ্ণার ওপর কেমন সুন্দর ন্যায় বিচার ক'রছ তোমরা ভেবে দেখেছ কি? আমি যা বলেছি, তাই করব। বৌদি যাও,—আমায় বিরক্ত কর না।"

ব্যথিত হইয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বিস্মিত অজিতা বাহির হইয়া গেল। কত বড় বেদনায় যে এই লাজুক মুখচোরা ছেলেটিকেও প্রগলভ করিয়া তুলিয়াছে তাহা কেহ একবার ভাবিয়াও দেখিল না।

অমিয়েন্দু কক্ষদ্বার সশব্দে রুদ্ধ করিয়া দিল। সে রাত্রি মাতা-পুত্র বিনিদ্র যাপন করিল।

সারারাত্রি বিনিদ্র কাটাইয়া ভোরের দিকে অমিয়েন্দু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। যখন ঘুম ভাঙিল প্রখর রোদে ঘরদ্বার তখন একেবারে ভরিয়া গিয়াছে। চোখ মুছিয়া অমিয়েন্দু খিল খুলিয়া বাহিরে আসিল। অজিতা আসিয়া কহিল,—"মুখ ধুয়ে নাও ঠাকুরপো! একটু দুধ মিষ্টি নিয়ে আসি।"

"থাক। কোন দরকার নেই।" বলিয়া অমিয়েন্দু দ্রুত পায়ে সুদেষ্ণাদের গেটের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। পিছনে চাপা হাসির রোল উঠিল, শুধু চোখের জল চাপিবার জন্যই অজিতা ছুটিয়া অন্য ঘরে লুকাইয়া গেল। গেটের সামনে দুটো ঘোড়ার গাড়ীতে জিনিষপত্র চাপান হইতেছে। একটি গাড়ীর ভিতর সুদেষ্ণাকে কোলের ভিতর করিয়া তাহার মা বসিয়াছিলেন। তাঁহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে, বিমূঢ় অমিয়েন্দু দাঁড়াইয়া রহিল। অবিনাশবাবু ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া অমিয়েন্দুকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর বিবর্ণমুখে একটু ম্লানহাসি টানিয়া আনিয়া কহিলেন—"অমিয়! আমরা চললাম। পারলাম না বাবা, মাকে আমার তোমার হাতে তুলে দিতে, কিছুতেই আর পারলাম না!"

অমিয়েন্দু তখন ধীরে ধীরে নিজেকে সামলাইয়া লইতেছিল। মৃদুস্বরে সে কহিল, "কিন্তু এর কারণ ত কিছুই বুঝলাম না? মার অমতেও আমি বিয়ে করতে রাজী আছি, তা কি আপনি শোনেন নি?"

"শুনেছিলাম বই কি।" বলিয়া অবিনাশবাবু কয়েক মুহূর্ত্ত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর দুই হাতে অমিয়েন্দুকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া ভাঙা গলায় কহিলেন,—"অমিয় ভেবেছিলাম কিছুই বলব না। তুমি যখন আমাকেই সন্দেহ করছ তখন বলাই ভাল মনে করছি। তোমার মা আজ ভোরেই বলে গেছেন, তোমার সঙ্গে খুকুর বিয়ে দিলে, তিনি আত্মহত্যা করবেন।"

তাঁহার বক্ষের ভিতর অমিয়েন্দু শিহরিয়া উঠিল। তাহার মুখ আগুনের মত রাঙা হইয়াই পাংশু বিবর্ণ হইয়া গেল। অস্ফুট বেদনার্ত্তস্বরে সে কহিল, "তিনি তাই বললেন?"

গভীর স্নেহে অমিয়েন্দুর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে গাঢ়স্বরে তিনি কহিলেন,—"সংস্কার! অমিয়—সবই সংস্কার! যাকে তিনি ধর্ম্ম বলে মেনে এসেছেন এতদিন, তাকে ত অমান্য করতে পারেন না। তাঁর দোষ কি?"

অমিয়েন্দুর চোখের সামনে আলোকোজ্জ্বল পৃথিবীতে কে যেন কালির পর কালি লেপিয়া দিতেছিল।

অবিনাশবাবুর পায়ের কাছে একটি প্রণাম করিয়া বুকভাঙা একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অমিয়েন্দু কহিল, "হুঁ। তাঁর দোষ কি?"

চোখের জল চাপিতে চাপিতে অবিনাশবাবু গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল। যতক্ষণ দেখা যায় একদৃষ্টে তিনি উদভ্রান্ত যুবকের বেদনার্ত্ত মুখের দিকেই চাহিয়া রহিলেন।

নির্ম্মলেন্দু ধীরে ধীরে তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া সস্নেহে কহিলেন,—"অমিয় খাবি আয়। তোর বৌদি যে তোর জন্য খাবার নিয়ে বসে আছে।"

একটা তীব্র দৃষ্টি তাহার উপর নিক্ষেপ করিয়া শান্তস্বরেই অমিয়েন্দু কহিল,—"খাবার ত আমার সময় নেই দাদা, এখুনি আমাকে কলকাতা যেতে হবে।"

(শেষাংশ ২৮৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শতাধিক বৎসরের বীজ

শ্রীমতী তরু মজুমদার

মাঞ্চুরিয়ার অধুনা-শুষ্ক কোনও হ্রদ-তলদেশে পাঁচ ফুট মৃত্তিকা খননের পর যে পচা-বোদ স্তর পাওয়া যায়, তাহা হইতে ভারতীয় জল-পদ্মের বীজ উদ্ধার করা হইয়াছে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে। বলা বাহুল্য, "এই পচা-বোদ হইল জীর্ণ-গলিত ও মৃত্তিকা-মিশ্রিত পদ্মলতার অবশেষ, যাহা বহুকাল পূর্ব্বে শুষ্ক হইয়া কালে কালে মাটিচাপা পড়িয়াছে। যে চীনা কৃষক পরিবার এই শুষ্ক হ্রদের একাংশে কৃষিকার্য্য পরিচালনা করিয়াছে অতি দীর্ঘকাল বংশ-পরম্পরায়, তাহাদের কুলজি অনুসরণ করিয়া শুষ্ক হ্রদ-বক্ষের ক্রমক্ষয়ের হার হিসাব করিয়া এবং হ্রদটি শুষ্ক হইবার পর যে সকল বৃক্ষ উহাতে জন্মিয়াছে ঐগুলির বার্ষিক পর্ব্ব-চক্র বা (গ্রন্থি) পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে যে, জল-পদ্মের এই বীজগুলি কয়েক শতাব্দীর প্রাচীন। ইহাদের এই প্রকার অতিরিক্ত প্রাচীনতা সত্ত্বেও বীজকোষের ত্বক ভাঙিয়া বীজগুলি বাহির করিয়া যখন জলে রাখা হইল, তখন সকলগুলিরই অঙ্কুরোদ্গম হইল। এই পদ্মের বীজকোষের বহিরাবরণ এমন সুকৌশলে নির্ম্মিত যে, উহা ভেদ করিয়া জল ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। কাজেই প্রত্যেকটি বীজ, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অন্তরকোষে অনার্দ্র অবস্থায় রক্ষিত হইয়াছে, এই সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া।

ইহাই একমাত্র স্বতন্ত্র একটি আজব দৃষ্টান্ত নয়—যেখানে মৃত্তিকায় প্রোথিত বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গমে অতিরিক্ত দীর্ঘকাল বিলম্ব হইয়াছে। ১৮৭৯ সালে ২১ প্রকারের আগাছার বীজ গৃহের বাহিরে ভিজা বালিতে পুঁতিয়া রাখা হয়। এই বীজগুলির পরীক্ষা করা হয় প্রথম পাঁচ বৎসর অন্তর এবং পরে ১০ বৎসর অন্তর। এই বীজ পরীক্ষা চলিতে থাকিবে ১৬০ বৎসর পর্য্যন্ত। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইলে যে বিগত পরীক্ষা করা হয়, তাহাতে জানিতে পারা গিয়াছে যে, বিভিন্ন জাতীয়ের বীজের যে অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছে তাহার গড়ের হেরফের শতকরা ৪ হইতে ৬২টি পর্য্যন্ত লক্ষ্য করা গিয়াছে এবং পাঁচ জাতীয় বীজ এখনও জীবিত রহিয়াছে অথচ অঙ্কুরোদ্গম হয় নাই। ইভিং ডক্, সন্ধ্যা প্রিমরোজ, কালো মাস্টার্ড ও জাতীয় লঙ্কা উহাদের ভিতর উল্লেখযোগ্য।

মার্কিন যুক্তরাজ্যের কৃষিবিভাগ হইতে মৃত্তিকায় প্রোথিত বীজ লইয়া ব্যাপক গবেষণা পরিচালনা করা হইতেছে। তাহাদের নানা প্রকার বীজের প্রোথিত অবস্থার ২০ বৎসর কাল পূর্ণ হইবার পর পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হইয়াছে। সকল প্রকার খাদ্য-শস্যের বীজ এবং উদ্যান-বীজের অধিকাংশ শ্রেণী পুঁতিবার এক বৎসর পরেই পচিয়া বা নষ্ট হইয়া গিয়াছে; কিন্তু আগাছার বীজের বহু বিভিন্ন শ্রেণী ২০ বৎসর ভূপ্রোথিত থাকিবার পরও অঙ্কুরোদ্গমের লক্ষণ প্রদর্শন করে নাই, আবার মরিয়াও যায় নাই। যদিও কতকগুলি ইতিমধ্যে অঙ্কুর উৎপন্ন করিয়াও জীবিত রহিয়াছে। নিম্নলিখিত উৎকর্ষ-সাধিত চারাগাছের বীজ ২০ বৎসর মৃত্তিকায় প্রোথিত রাখিবার পরও সজীব রহিয়াছে অথচ কোনও প্রকার অঙ্কুর জন্মে নাই:—তামাক, কেণ্টাকি নীল ঘাস, টিমোথি, ক্লোভার, সেলারি (celery)।

বন্য চারা ও আগাছা প্রভৃতির বীজ মৃত্তিকা প্রোথিত করিলেও যে বহু বৎসর পর উহার নির্দ্দিষ্ট ঋতুতে উহা হইতে অঙ্কুর গজাইবে, তাহার পূর্ব্বে নয়, ইহা আগাছা-গুলার পক্ষে একটা বিশেষ সুবিধা—না, প্রকৃতির ইহা একটা অদ্ভুত খেয়াল মাত্র? চারাটির অস্তিত্বের দিক দিয়া ইহা একটা বিশেষ সুবিধাজনক ব্যবস্থাই বলিতে হইবে, কেননা, বীজটির বিরূপ পারিপার্শ্বিককে বাঁচিয়া থাকিতে সাহায্য হয়। মৃত্তিকায় এই জাতীয় আগাছার বীজ সকল সময়েই প্রচুর পরিমাণে পড়িয়া থাকে—ইহাই প্রকৃতির নিয়ম; এই বীজগুলি সুপ্তই থাকে, যতক্ষণ না উহার চারিপাশের মৃত্তিকায় আলোড়ন হয় অথবা অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী বীজকে অপসারিত করা হয়। প্রকৃতি যে বীজগুলির অঙ্কুরোদ্গমের কাল এত দীর্ঘ করিয়া দিয়াছেন, ইহার সার্থকতা বা উপকারিতা এই যে, চারিদিকের মৃত্তিকায় উলট-পালট হইল, কতকগুলি বীজ ঐ ক্রিয়ার ফলেই প্রতিযোগিতা হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হইল, কতকগুলি আরও গভীরতর মৃত্তিকাস্তরে চলিয়া গেল, বাকিগুলি সুপ্তি ভঙ্গ করিতে বাধ্য হইল, কারণ অধিকতর রস ও আর্দ্রতা, উচ্চতর মাত্রার তাপ, অক্সিজেন সরবরাহের উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আলোক—এতগুলি যোগাযোগ জীবন-সংগ্রামে উহাকে সাহায্য করিতে লাগিল।

অঙ্কুরোদ্গমের কালব্যাজ এবং বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন ঋতুতে বীজগুলির অঙ্কুর নির্গত হইবার নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা যদিও আগাছাগুলির অস্তিত্ব সম্বন্ধে রক্ষা-কবচ সদৃশ, তথাপি ঐ প্রকার পৃথক পৃথক ঋতুতে বা বর্ষে এক এক প্রকার বীজের উন্মোচিত হইবার স্বতন্ত্র ব্যবস্থায় চাষীর শ্রমের আর শেষ থাকে না—কারণ এক প্রকার আগাছা তুলিয়া ফেলার কিছুকাল পরে আবার নূতন আর এক পর্য্যায় দেখা দেয়—কৃষি-শস্য অটুট রাখিবার জন্য চাষীকে বৎসর ব্যাপিয়াই ব্যস্ত থাকিতে হয় বিভিন্ন আগাছার উদ্গমের বিভিন্ন সময়ে উহা নির্ম্মূল করিতে। তাই একবার উদ্যান বা শস্যক্ষেত্রের মৃত্তিকায় আগাছা বীজ প্রবেশ করিলে বৎসরের পর বৎসর উহা উৎপাটিত করিয়াও মৃত্তিকাকে আগাছা-রহিত করিতে পারা যায় না। আর যখন চাষী এমন বীজের দ্বারা চাষ করিতে চাহে, যাহার অঙ্কুর নির্গমনে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন, কিম্বা যে বীজের দীর্ঘ সময় অন্তরে পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে অঙ্কুরোদ্গম হয়, তখন বিপদে পড়িতে হয় ভয়ানক।

দীর্ঘকাল ধরিয়া গবেষণা চলিয়াছে, অঙ্কুরোদ্গমের কালব্যাজের কারণটি উদ্ধার করিতে। কেন এই বিলম্ব হয়—কেন একই বীজ একসঙ্গে বপন করিলেও অঙ্কুরোদ্গম হয় বিভিন্ন সময়ে, এমন কি সপ্তাহ, মাস বা বৎসর অন্তর, ইহা নির্ণয় করিতে পারিলে, এমন ব্যবস্থা করা কঠিন হইবে না, যাহা দ্বারা ঐ সময় সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে, অন্তত যতটা দীর্ঘ সময় উহা গ্রহণ করে, তাহা অপেক্ষা অনেক কম সময়ে চারা উৎপাদন সম্ভব হইবে। সকল বীজ একসঙ্গে অঙ্কুরিত

হওয়ার ব্যবস্থাও তখন আর অনিশ্চিত বা অসম্ভব থাকিবে না। ব্যবসার জন্য উহা বিশেষভাবেই প্রয়োজন

এই সকল গবেষণা ও পরীক্ষার ফলে কতক কতক বীজের বিলম্বে উন্মেষিত হইবার কারণ এবং সংক্ষিপ্ত সময়ে বা একসংগে অঙ্কুরিত করিবার প্রণালীর নির্দ্দেশ দান সম্ভব হইয়াছে।

'কক্‌ল্‌বার'-য়ের উর্দ্ধতন বীজ অধস্তন বীজ অপেক্ষা দেরীতে উন্মেষিত হয়, কারণ উহার মিহি বীজাবরণ অক্‌সিজেন সরবরাহ নিবন্ধ রাখে ভ্রূণে (embryo)। আবার কতকগুলি বীজে বিলম্বের কারণ এই অক্‌সিজেন সরবরাহের অল্পতা। লেটিস্‌ (Lettuce) শাকের এবং আরও কয়েকপ্রকার বীজের অঙ্কুরোদ্‌গম বন্ধ থাকে, যদি বীজটিকে এমন পারিপার্শ্বিকে রাখা হয়, যেখানকার তাপ ৮৭ ডিগ্রী ফারেনহিট্‌ বা তদূর্দ্ধে। ইহার কারণও বীজাবরণের অক্‌সিজেন সরবরাহ ভ্রূণে নিবন্ধ রাখিবার মত সূক্ষ্ম হওয়া।

কোনও কোনও বীজের অঙ্কুরোদ্‌গমের জন্য প্রয়োজন আলোক; আবার কতকগুলি এমন বীজও রহিয়াছে যাহার অঙ্কুরোদ্‌গমের পথে আলোকই অন্তরায়; ইহা ছাড়াও অনেক বীজের বেলা এমনও দেখা যায় যে আলোকপাত বা আলোকের অভাব--এই দুইয়ের কোন ক্রিয়াই নাই উহাদের অঙ্কুরোদ্‌গমের উপর। মার্কিনের কৃষিবিভাগের পরীক্ষিত বীজের ভিতর যে তামাক, সেলারি ও নীল ঘাস বীজ ২০ বৎসর পর্যন্ত অনঙ্কুরিত ছিল, তাহার কারণ হয়ত এই যে, উহাদের আলোকের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু উহারা তাহা পায় নাই।

সাধারণত ফিল্মে ফটো তুলিতে যে প্রকার আলোক-রশ্মিপাতের প্রয়োজন, ভিজা ও ফুলিয়া উঠা তামাকের বীজে তাহা অপেক্ষা সামান্য একটু বেশী সময়ব্যাপী রশ্মিপাত দরকার উহার অঙ্কুরোদ্গম সম্ভব করিতে। ঐপ্রকার সিক্ত লেটিস্‌ শাক বীজেও অনুরূপ আলোকের প্রয়োজন কিন্তু অপর পক্ষে নীল ঘাস বীজ দীর্ঘকাল শক্তিশালী আলোকের সুযোগ না পাইলে উহার অঙ্কুরের উন্মেষ হইতে পারে না। এই জন্য এই জাতীয় প্রখর আলোকসহ বীজ বপন করিবার সময় অতি সামান্য মাত্র মৃত্তিকা উহার উপর ছড়াইয়া দিতে হয়, যাহাতে অবাধ আলোকের ক্রিয়ার অধীন উহা থাকিতে পারে।

নাতিশীতোষ্ণ দেশে বহু শ্রেণীর বীজ বপন করিবার পূর্ব্বে উহাদের জলে অথবা সিক্ত আবহাওয়ায় অতি নিম্ন তাপে রাখা হয় অঙ্কুরোদ্‌গমের সাহায্যার্থে এবং অঙ্কুর উন্মেষের সূত্রপাত হইলে পরে শস্য ক্ষেত্রে বা কৃষি উদ্যানে যথারীতি বপন করা হয়। প্রাকৃতিক বিধানে এই ক্রিয়া সম্পন্ন হয় সমগ্র শীতকাল বীজটি মৃত্তিকাপ্রোথিত থাকিয়া, কাজেই উহার বসন্তকালে অঙ্কুরোদ্‌গমের যোগ্যতা অর্জ্জিত হয় এই শীতের সিক্ততা ও হিম ভোগ করিয়া। এই যে সিক্ততা ও হিমের প্রকোপে অঙ্কুর নির্গত করিবার শক্তি সঞ্চয়, ইহা অবশ্য সকল বীজের পক্ষে সমান নয়। বিশেষজ্ঞগণ পরীক্ষা-দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে সাধারণত ৩৩ ডিগ্রি হইতে ৫০ কি ৫৩ ডিগ্রি ফারেন্‌হিট্‌ তাপের আবহাওয়া প্রয়োজন হয় অধিকাংশ বীজের অঙ্কুর উন্মেষে সাহায্য করিতে এবং সময়, যাহা দরকার হয়, তাহা এক মাস হইতে এক বৎসর পর্য্যন্তও সময়ে কাটিতে দেখা যায়। যে সকল বীজের অতি নিম্ন তাপ প্রয়োজন হয় অঙ্কুর জন্মাইবার জন্য, তাহার ভিতর অরণ্য বৃক্ষ বীজ, আল্‌প্‌স পর্ব্বতের বৃক্ষ বীজ, ডগউড এবং কনিফার প্রভৃতি রহিয়াছে। নাতিশীতোষ্ণ দেশের বনফুল এবং জলজ উদ্ভিদের পক্ষেও অনুরূপ মৃদু হিমের প্রয়োজন। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে ঐ নির্দ্দিষ্ট নিম্নতাপ না হইলে বীজদেহে রাসায়নিক ক্রিয়া ও ফুলিয়া উঠার ব্যাপার সম্ভব হয় না, অথচ ঐ সকল ক্রিয়ার উদ্ভব না হইলে বহিরাবরণ ভেদ করিয়া অঙ্কুরের নির্গমন সম্ভব হয় না।

যে সকল বীজ এই প্রকার অতি নিম্নতাপমাত্রায় রাসায়নিক ক্রিয়ায় অঙ্কুরের জন্মদানে সমর্থ হয়, ঐ বীজ-গুলিরও আবার অন্য পারিপার্শ্বিকে সুপ্তির অবস্থা আসিয়া পড়ে। তাই যদি ঐ সকল বীজের বহিরাবরণ ফেলিয়া দিয়া বপন করা হয়, তাহা হইলে অতিরিক্ত শ্লথ গতিতে উহাদের অঙ্কুরোদ্‌গমের ক্রিয়াটি চলিতে থাকে। কিন্তু যদি বীজটির পূর্ব্বেই রাসায়নিক ক্রিয়া ও ফুলিয়া উঠার ব্যাপার সম্পন্ন হইত, তাহা হইলে বহিরাবরণ তখন ফেলিয়া দিলেও অতিদ্রুত অঙ্কুরের সৃষ্টি করিত। আর একটি বিষয় এই যে, বহিরাবরণ বর্জ্জিত সুপ্তবীজ হইতে যে অঙ্কুর জন্মে তাহা দীর্ঘকাল থাকে আকারে বামন। আবার যদি অপেক্ষাকৃত উচ্চতাপে যেমন ৬০ ডিগ্রি ফারেন্‌হিট্‌ কি তদূর্দ্ধে তাপ-মাত্রায় রাখা যায়, তথাপি বীজপত্র বামনই থাকে। ছয় মাস হইতে এক বৎসর কি দেড় বৎসর এই প্রকার খর্ব্বাকার থাকিবার পর একটি বা দুইটি ডগা উদ্ভূত হইয়া স্বাভাবিক দৈর্ঘ্য ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যদি বামনাবস্থায় উহাদের নিম্নতর তাপমাত্রায় (যেমন ৪৫ ডিগ্রি ফারেন্‌হিট্‌) রাখা যায় এক কি দুই মাসের জন্য, তাহা হইলে উহা খর্ব্ব আকৃতি হইতে অতি দ্রুত স্বাভাবিক দৈর্ঘ্য ও পুষ্টি প্রাপ্ত হইবে। বীজের বেলা যেমন নিম্নতাপ উহাকে রাসায়নিক ক্রিয়ায় ও অন্য প্রকারে অঙ্কুরের সৃষ্টির জন্য দ্রুত সামর্থ্য দান করে, তেমনই বামনাকার অঙ্কুরকেও দ্রুত স্বাভাবিক পরিণতিতে পৌঁছাইয়া দেয়।

কোন কোন বীজ আবার এক বসন্তকালে বপন করিলেও, পরবর্ত্তী বসন্তকাল না আসিলে অঙ্কুরিত হয় না; আবার কোন-কোনটির বেলা এই প্রকারে এক বৎসরে না হইয়া দুই বা তিন বৎসর পরের বসন্তেও অঙ্কুর জন্মাইতে দেখা যায়।

সাধারণত দুই প্রকার বীজ দেখিতে পাওয়া যায় দুই বৎসরের পরে ফলনের যোগ্য। এক প্রকারের বীজে দেখিতে পাওয়া যায় সমগ্র গ্রীষ্ম-বর্ষা ব্যাপিয়া উদ্ভিজ্জাণু ও ছত্রাক বীজের পুরু বহিরাবরণ আংশিক খাইয়া খাইয়া ভ্রূণে যথা-যোগ্য জল ও অক্‌সিজেন সরবরাহের সুযোগ করিয়া দেয়, উহার ফলে উহা পরবর্ত্তী বৎসরের জন্য অঙ্কুর উন্মেষের যোগ্য হয়। গবেষকগণ কৃত্রিম উপায়ে এই সকল বীজের অঙ্কুরোদ্‌-গম ত্বরান্বিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন বহিরাবরণ ফেলিয়া

(শেষাংশ ২৮৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রণয়ের পাত্র
(উপন্যাস)

শ্রীসত্যকুমার মজুমদার

একটা ভারী রকমের পার্শেল হাতে করিয়া হাসিমুখে যোগীন মুখুজ্জে সেদিন গৃহিণীকে ডাকিয়া বলিলেন, "তখনি ত বলেছিলাম গিন্নি, আমি যা করি, তোমার সম্মতি নিয়ে না করলেও পরিণামে ঠকেছি ব'লে তার জন্য কোন দিন অনুতাপ করতে হয়নি। একি না হ'য়ে যায়, এ-যে হিন্দু সমাজের ব্যবস্থা—সেই কোন যুগ থেকে চলে আসছে! মুনি-ঋষিদের মাথা কি যেমন তেমন ছিল! এই যে বৈদিক মন্ত্রগুলো এর এমন একটা শক্তি—! এই ধর না, তোমার আমার চার চক্ষুর মিলন ত বিয়ের রাতেই!"

গৃহিণী তারাসুন্দরী এই দীর্ঘ ভূমিকার আপাত হেতু খুঁজিয়া না পাইয়া বাধা দিয়া বলিলেন, "মুখবন্ধ ত খুবই হ'ল, কথাটা খুলেই বল না! ওটা কিসের পার্শেল, অমর পাঠিয়েছে বুঝি?"

যোগীন্দ্রবাবু পার্শেলটি গৃহিণীর হাতে দিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, বৌমাকে ডেকে দাও গে। দেখ দেখি দুদিনেই কেমন ভাব হয়ে গিয়েছে! হিন্দুসমাজ'ত নভেলী প্রেমের আদর্শে গড়ে ওঠেনি! হিন্দুর বিয়েও যা তা নয়। এর ভিতর কতখানি যে আধ্যাত্মিকতা,—তোমরা বুঝবে কি করে। জান ত,—এ শুধু দেহের সম্বন্ধ নয়, শুধু এক জন্মেরও নয়। এই যে মিলন—এতে যে দুটি প্রাণ মিশে যায়, তা অনন্তকাল মিশেই থাকে। জন্মে জন্মে যুগে যুগে আসা-যাওয়ার পথে তা'রা এক হয়েই আসে—এক হয়েই যায়!"

তারাসুন্দরী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "ওগো, থাম গো থাম! বিয়ের ঐ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শুনতে শুনতে আমার অরুচি ধরে গিয়েছে। মনকে আঁখি ঠেরে তুমি যাই বল না, অমর আমার এ বিয়েতে সুখী হয়নি এ আমি তিন সত্যি করে বলতে পারি। টাকার লোভে'ত তুমি ছেলের মুখের দিকে তাকাওনি! বাছা আমার কত করে বললে, মা, বাবাকে বারণ কর না, আমার এম-এ পরীক্ষাটা আগে হয়ে যাক! অতগুলো টাকার লোভ, তুমি সামলাতে পারবে কেন।"

হাসিয়া যোগীন্দ্রবাবু বলিলেন, "ওসব ইংরেজী শিক্ষার ফল গিন্নি, দু'পাতা ইংরেজী পড়ে ছেলের আমার মাথা বিগড়ে যাচ্ছিল। "লভ" "লভ" করে আজকাল ছেলেরা সব ক্ষেপে উঠেছে! আমরা কি আর কোন কালে ছেলে ছিলাম না, ঐ লভে পড়া ব্যারাম কিন্তু আমাদের কালে ছিল না বাপু। কি নির্লজ্জ বেহায়াপনা"—তারপর ক্ষণকাল কি ভাবিয়া বলিলেন, "আর অমর এ বিয়েতে সুখী হয়নি কি করে জানলে, দেখ না, কত জিনিষ বৌমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে।"

তারাসুন্দরী পার্শেলটির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ভগবান করুন, তাই যেন হয়। অমর আমার সুখী হোক! সংসারে স্ত্রী নিয়ে সুখী না হ'তে পারা যে কত বড় দুর্ভাগ্য—তা ত কোনদিন পেতে হয়নি তোমার, জানবেই বা কি করে!"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই গৃহিণী উপরে উঠিয়া গেলেন। সিঁড়িতেই লীলাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "কিরে লীলা, কখন এসেছিলি তুই! যাত মা, তোর অমরদা বৌমাকে কি সব পাঠিয়ে দিয়েছে, দিয়ে আয় লক্ষ্মীটি!"

লীলা পার্শেলটি হাতে লইয়া উপরের দিকে উঠিতে উঠিতে পার্শেলের উপরের লেখাগুলির পানে চাহিয়া কতক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইল। দেখিতে দেখিতে একটা বুকফাটা দীর্ঘ-নিশ্বাস তার অন্তরের অন্তস্থল হইতে সজোরে বাহির হইয়া আসিল। এই লেখাগুলি যে তার কত পরিচিত, কত আকাঙ্ক্ষিত, জগতের কাছে তাহা অজানা থাকিলেও তারও অন্তর্যামীর নিকট কিছুই গোপন ছিল না! এর প্রত্যেকটি অক্ষর আজ রূপ ধরিয়া তার তরুণ হৃদয়ের বেদনার দ্বারে আসিয়া আঘাত করিল। অস্থির পদে লীলা পার্শেলটি প্রভার হাতে তুলিয়া দিয়া দ্রুত নীচে নামিয়া আসিল।

সে সেই ছেলেবেলাকার কথা। সে কথা মনে হইলে মুখার্জ্জিবাড়ীর দিকে লীলার পা উঠিত না। তবু লীলা আসিত, তবু লীলা হাসিত, চিরপরিচিত স্মৃতিমন্দিরদ্বারে ম্লান দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিত। সেও ছিল তার এক পরম সান্ত্বনা! তবু এই সান্ত্বনার মাঝে ব্যথাও তাহাকে কম সহিতে হইত না। মাঝে মাঝেই প্রভার বক্র ইঙ্গিত সুতীক্ষ্ণ তীরের মত লীলার বুকে আসিয়া বাজিত। লীলা সব আঘাতই সহিত, প্রত্যাঘাত করিতে চেষ্টা করিত না। আর তাহার যাহাই থাকুক দরিদ্রের গৃহে জন্মান-রূপ অমার্জ্জনীয় অযোগ্যতাকে সে অস্বীকার করিবে কি করিয়া? তাই ত তাহাকে এত ইঙ্গিত এত আঘাত নীরবে সহিতে হয়। স্নেহ আর অভিমান দরিদ্রের বুকে ভগবান দেন একটু বেশী পরিমাণে। গর্ব্ব করিবার আর কিছু থাকে না বলিয়া স্নেহ জিনিষটিকে সে গর্ব্বের সামগ্রী করিয়াই গড়িয়া তোলে। স্বাভাবিক নিয়মে স্নেহ ত লীলার কম ছিলই না, অভিমান বরং স্বাভাবিকের চেয়ে অনেকখানি বেশী পরিমাণেই ছিল। প্রাণ ছিল তখন নিতান্তই কোমল, তাই লাগিয়াছিল খুব বেশী। বুঝিবা ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে রহিয়া গিয়াছিল। আশা যে তাহার কোনদিকেই নাই, ইহা সে প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিল সেইদিন যেদিন মুখার্জ্জি-বাড়ীর নহবতে সাহানার সুর বাজিয়া উঠিয়া সমস্ত গ্রামখানিতে একটা অননুভূত মাধুর্যধারা ঢালিয়া দিয়া দুঃখিনী লীলার কালো কালো চোখ দুটিতে অশ্রুর প্রবাহ বহিয়া আনিয়াছিল। সেদিনকার কথাটি লীলার বেশ মনে আছে। সদ্য শ্বশুর গৃহ হইতে ফিরিয়া অমর যেদিন লীলার মাকে প্রণাম করিতে গিয়াছিল, লীলা ইচ্ছা করিয়াই সেদিন অমরের সম্মুখে বাহির হয় নাই। অমরের সতৃষ্ণ চক্ষু সেদিন তাহারই অন্বেষণে ইতস্তত ঘুরিয়া ফিরিয়া অবশেষে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তবুও অমর জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই, লীলা কোথায়! দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া লীলা তাহা দেখিতেছিল। অমরের ভীত চক্ষু যেন বলিয়া দিতেছিল, কি যেন গুরু অপরাধ সে করিয়াছে। লীলা কিন্তু সেদিন কাঁদে নাই। নিরাশার দুর্ব্বলতা ঠেলিয়া নির্লজ্জ অপরাধীকে লজ্জা দিবার জন্যই

যেন লীলা অবশেষে অমরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। লীলা ভাবিয়াছিল লীলাকে দেখিতে পাইয়া অমর স্বকৃত অপরাধে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িবে, অথবা বাল্যপ্রীতির চিরবিচ্ছেদে তার প্রণয়-দুর্ব্বল-চিত্ত শতধা বিখণ্ডিত হইয়া যাইবে, কিম্বা উদ্গত অশ্রু দমন করিতে যাইয়া অমর মুখ না ঢাকিয়া পারিবে না। কিন্তু ইহার কোনটাই লীলা দেখিতে পাইল না। যে দর্প লইয়া সে আসিয়াছিল তার এতটুকুও অবশিষ্ট রাখিতে পারিল না। নিদারুণ অভিমানে তার কোমল বুক ভরিয়া উঠিল, চোখের জল লুকাইতে লীলা আবার ঘরে ঢুকিল।

অমর তখন স্নিগ্ধকণ্ঠে ডাকিল, "লীলা", লীলা দরজার বাহিরে মুখ বাড়াইল। অমর বলিল, "বিকালের দিকে একবার যাস আমাদের বাড়ী, তোর বৌদিকে দেখে আসবি'খন।"

অমরের এই স্নেহ আহবান লীলার কানে তীব্র বিদ্রূপের মত বাজিল। অমর চলিয়া গেলে বালিকা নির্জ্জনে বসিয়া অনেকক্ষণ কাঁদিল। এই কি তাহার সেই অমরদা, এত শীঘ্র এমন করিয়া ভুলিয়া গেল! ক্রন্দন থামাইয়া লীলা অনেকক্ষণ কি ভাবিল। মনে কৌতূহল জাগিল, লীলা দেখিবে কত বড় সুন্দরী সে, কত নিটোল তার গঠন, কত দীর্ঘ আয়ত তার চোখ, কত মধুর তার দৃষ্টি, কত সুদীর্ঘ তার কুঞ্চিত কেশ-পাশ, কত ভালই সে একদিনে বাসিয়াছে যে তাহাকে পাইয়া তার অতি বড় আপন অমরদা এমন পর হইয়া গেল।

সেদিন বিকালে লীলা তার মেজ বোন মণির হাত ধরিয়া বরাবর অমরের পড়িবার ঘরে যাইয়া উপস্থিত হইল। লীলা জানিত অমর দিবসের অধিকাংশ সময় এই ঘরেই কাটাইয়া দেয়। এই জানা ত তার একদিনের অভিজ্ঞতার বস্তু নহে। কতদিন না সকাল সন্ধ্যায় অমরদার জন্য যখন মন কেমন করিত এই ঘরে আসিয়াই না সে তাহাকে পাইয়াছে!

অমর একখানা ইংরেজী বই সম্মুখে রাখিয়া সেইদিকে চাহিয়াছিল। লীলা কখন আসিয়াছে জানিতে পারে নাই। ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া লীলা ডাকিল, "অমরদা"!

অমরনাথ সচকিতে মুখ তুলিয়া লীলার পানে চাহিল। সহসা কিছু বলিতে পারিল না। মুহূর্ত্তের জন্য বুঝি তার বাক্‌রোধ হইয়া গিয়াছিল।

"অমন ক'রে চেয়ে রইলে যে অমরদা?" লীলার স্বর করুণ হইয়া উঠিতেছিল। ব্যথার সুরে বুঝি পুরান কিছু মাখান ছিল। অমরের চমক তখনও ভাঙিল না।

লীলা আরও নিকটে আসিয়া ধরা গলায় বলিল, "তোমার কি হ'ল অমরদা?"

অমরনাথ যেন প্রকৃতস্থ হইয়া বলিল, "কিছুই হয়নি রে! ভাবছি, এমন কি পড়ছিলাম যে তুই যখন এসেছিস তা জানতেও পারিনি। এত মনোযোগী, দূর ছাই অন্যমনস্ক যে কবে থেকে হ'লাম তাই ভাবছি!"

লীলার করুণ স্বর সহসা ঝাঁজাল হইয়া উঠিল, বলিল "তাই অমন করে চেয়ে দেখছিলে! আমি কি ভেবেছি জান অমরদা, আমি ঘরে এসেছি, তাও জানতে পারনি, ভেবেছি, ওত বই পড়া নয়—বইয়ের দিকে চেয়ে বৌদির রূপ ধ্যান করা।"

অমরনাথ মৃদু হাসিয়া উত্তর করিল, "তাই হয়ত হবে রে লীলা!"

লীলা আবার বলিল, "আমার দিকে যখন চেয়েছিলে, কি ভেবেছিলাম জান, ভেবেছিলাম, হঠাৎ আমার ডাক শুনে তোমার ধ্যান ত ভাঙল সে স্বর্গের অপ্সরা ত চোখের ওপর থেকে ছুটে পালাল, আর আমায় দেখলে কি বিশ্রী, না অমরদা, ঠিক বলিনি?"

অমরনাথের দৃষ্টি কিঞ্চিৎ গম্ভীর হইয়া উঠিল, বলিল, "হাঁরে লীলা এত বাচাল হয়ে উঠলি কবে থেকেরে?"

লীলা প্রথমে খানিক থমকিয়া গেল। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, "সেই দিন থেকে অমরদা, যেদিন—"

"চুপ কর পাগলী," অমরনাথ ধমক দিয়া লীলাকে থামাইয়া দিল। পরে বলিল, "বৌ দেখতে এসেছিলি, দেখেছিস?"

লীলা নত বদনে উত্তর করিল "না।"

"না কেন, দেখে এসে আমায় বলবি কেমন বৌ।"

"তুমিই যে আমায় বৌ দেখাবে বলেছিলে, তাই ত তোমার কাছেই আগে এসেছি অমরদা।"

অমরনাথ বলিল, "আমি দেখাব কিরে, লজ্জা করবে না আমার! তুই যা-না, সবাই রয়েছে বাড়ীর ভিতর, মাও ত রয়েছেন।"

"আলাপ কিন্তু তুমিই করিয়ে দেবে অমরদা" বলিয়া লীলা অন্তঃপুরের দিকে চলিয়া গেল।

তারাসুন্দরী তখন অপ্রসন্ন মুখে সমাগত প্রতিবেশিনীদিগকে বৌ দেখাইতেছিলেন। কেহ বলিতেছিলেন "বেশ হয়েছে বেশ বৌ।" অপেক্ষাকৃত কোন দরিদ্র গৃহিণী যৌতুকের প্রাচুর্য্য দেখিয়া বলিতেছেন "খুব বড়লোকের মেয়ে বুঝি! তা বেশ করেছ দিদি।" কোন নববিবাহিতা তরুণী নিজের গহনার সঙ্গে বধূর গাত্রের রত্নমণ্ডিত অলঙ্কারের তুলনা করিয়া বলিতেছিল, "বেশ মানিয়েছে কিন্তু।" কোন বর্ষীয়সী মুখার্জ্জি-গৃহিণীকে খুশী করিবার জন্য বলিতেছিলেন, "তা রংটাই মন্দ কি মা, শাস্ত্রেই বলে শ্যামা-স্ত্রীই উত্তমা।"

এই অযাচিত প্রশংসাবার্ণীর মধ্যে লীলা আসিয়া তারাসুন্দরীর পার্শ্বে দাঁড়াইল। হাসিমুখে বলিল, "বৌ দেখতে এলাম জেঠাইমা।" নববধূ গৃহিণীর পার্শ্বেই বসিয়াছিল। অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে একবার লীলার পানে চাহিয়া সহসা চোখ ফিরাইতে পারিল না।

(ক্রমশ)

জাপানের 'মাতা হরি'

শ্রীঅমলা গুপ্তা

সারা বিশ্বের গোয়েন্দা-বিভাগে মহিলাদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম হইলেও সময়ে সময়ে মহিলা-সন্ধানীদের দ্বারা যেরূপ চতুরতা ও সফলতার সহিত গুপ্ত-সন্ধানের কার্য্য পরিচালিত হয়, এমন কিন্তু বহু নিপুণ গোয়েন্দা দ্বারাও সম্ভব হয় না। ওলন্দাজ মহিলা-গোয়েন্দা "মাতা-হরি"র নাম এই প্রসঙ্গে চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। আর আজ যাহার কথা বলিতে আমরা উদ্যত হইয়াছি, তাহার চতুর ধাপ্পা-ধোঁকাবাজির কাছে মস্কো, বার্লিন বা রোম যে সকল গোয়েন্দা-গিরির কৃতিত্বে আজ গর্ব্বিত—সে সকল সেয়ানা ধূর্ত্তপনাও আজ ম্লান হইয়া গিয়াছে। আর এই মহিলাটির অসমসাহসিক গোপন-সন্ধানের কার্য্য চীনযুদ্ধে জাপানকে সহায়তা করিয়াছে অপরিসীম।

ছয় বৎসর পূর্ব্বে যখন টোকিওর "গোল্ড্ ব্রেড্ কেবিনেট" সমগ্র চীনদেশকে আপন আয়ত্তে আনিবার স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করে, সেই সময়ই এই অপূর্ব্ব কর্ম্মশক্তি-সম্পন্না তরুণীটির স্বেচ্ছায় জাপানের পক্ষ সমর্থনে, টোকিও সরকার চিরপোষিত স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করিবার সুযোগ প্রথম দেখিতে পায়। সেই সময়ে যে বিশিষ্ট পরিকল্পনা রচনা করা হয়, তাহার ছিল তিনটি পৃথক পর্য্যায়। প্রথম পর্য্যায়—নিদারুণ হিম-জর্জ্জর অথচ উর্ব্বর মাঞ্চুরিয়া অধিকার সামরিক বলে। দ্বিতীয়—মাঞ্চু-সিংহাসন হইতে বিতাড়িত শেষ মাঞ্চু রাজ বংশধর মেরুদণ্ডহীন তরুণ হেন্‌রি পু ইয়েইকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করণ। তৃতীয় পর্য্যায় ছিল—বর্ত্তমানে যাহাতে চীনকে রক্তরাঙা করিয়াছে—চীনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাকি অংশকে পদানত করা এবং সমগ্র পূর্ব্ব এশিয়াকে জাপানী ছাঁচে ঢালাই করা। তাহা হইলেই নমনীয় পু ইয়েই তাহার পূর্ব্বপুরুষের রাজ্যে রাজত্ব করিতে পারিবে—অবশ্য জাপানের আশা-আকাঙ্ক্ষার নীতিতে বাধ্যতা-মূলক নীতি স্বীকার করিয়া।

চীন-সরকারের অস্থায়ী রাজধানী চুংকিং-এ জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে জাপানী পরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্য্যায়ের বাস্তব সূত্রপাত পাকা হইয়াছে; আর ইহার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে জাপানের "মাতা হরি" ইয়োসিম্‌কো কোয়াশিমার নির্ভীক কীর্ত্তিকলাপ।

কিন্তু চীনের সেণ্ট্রাল নিউজ এজেন্সির মতে বিগত ৩০শে ডিসেম্বর (১৯৩৮) টিয়েন্সিনের প্রকাশ্য রাজপথে অজানিত আততায়ীর হস্তে ইয়োশিম্‌কো কোয়াশিমা হত হইয়াছে।

ইয়োশিম্‌কো কোয়াশিমা মাঞ্চু রাজবংশের প্রিন্স-সুয়ের দশম কন্যা। ১৯১২ সালে যখন চীনে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রিন্স সু-কে নির্ব্বাসনে প্রেরণ করা হয় ডেইরেনে, সেই সময়ে এক জাপানী সদাগর অবোধ শিশু ইয়োশিমকোকে পোষ্যপুত্রীরূপে গ্রহণ করে। শিশু ইয়োশিম্‌কো যতই বড় হইতে থাকে ততই তাহার হৃদয়ে পিতার শত্রু, রাজবংশের শত্রু চীনা-সাধারণতন্ত্রীদের উপর বিষম বিদ্বেষ সঞ্চিত হইতে থাকে। এবং পলাতক পিতার তরফ হইতে বালিকা মনের রুদ্ধ আক্রোশ শতগুণে বর্দ্ধিত করিবার ইন্ধন যোগান হইতে থাকে সদাসর্ব্বদা। ফলে অনুক্ষণ ইয়োশিম্‌কো কেবলই পোষণ করিতে থাকে পিতৃশত্রুর উপর প্রতিহিংসা সাধনের মনোবৃত্তি।

হংকং-য়ের বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের বিবৃতি হইতে জানিতে পারা যায় যে, যে সকল জাপানী মহিলা চীনমুল্লুকে গোপন সংবাদ সংগ্রহের কার্য্যে ব্যাপৃত, তাহাদের পরিচালনে ইয়োশিম্‌কো গোয়েন্দার কার্য্য করিতেছে। সে পাঁচটি ভাষায় নিখুঁতভাবে অনর্গল কথা বলিতে পারে—চীন, মাঞ্চু, মঙ্গোলিয়, কোরিয়ান ও জাপানী ভাষার উচ্চারণ তাহার একেবারে সেই সেই দেশীয়ের মত—ভিন্ন দেশীয় বলিয়া বুঝিবার উপায় নাই। তাহার এই অসাধারণ ভাষা-আয়ত্তের ক্ষমতার গুণে সে যখন যেরূপ প্রয়োজন এই পাঁচটির যে কোন বেশ ধারণ করিয়া বিনা সন্দেহে বিচরণ করিতে পারে।

আঠার বৎসর বয়সে যখন মিস্ কোয়াশিমা টোকিও সরকারের বেতনভোগী গোয়েন্দা হিসাবে অতি গুরুত্বসম্পন্ন কার্য্যে লিপ্ত, সেই সময় তাহার বিবাহ হয় অন্তর্ম্মঙ্গোলিয়ার প্রিন্স সাঞ্জু লাব্-য়ের সহিত। কিন্তু যখন জাপান ১৯৩২ সালে মাঞ্চুরিয়া অভিযানের তোড়জোড় করিতে থাকে, তখন মিস্ কোয়াশিমা দেখিতে পাইল, তাহার আজীবনের স্বপ্ন সফল করিবার শুভলগ্ন উপস্থিত হইয়াছে। সে আর দাম্পত্য-বন্ধনের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিল না। প্রাণের অন্তস্তল হইতে যে প্রবল প্রেরণা—যে বিপুল দোলা তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিতে লাগিল তাহার পরিবার পরিজনের চিরশত্রুর উপর ন্যায্য প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার—সে আকুল আবেগকে দমন করা তাহার অসাধ্য হইল। স্বামীকে সে সমগ্র প্রাণ দিয়া ভালবাসিলেও, তাহাকে সে বর্জ্জন করিতে বাধ্য হইল—তাহার হিসাবে বৃহত্তর কর্ত্তব্যের দুর্দ্দমনীয় আহ্বানে। সে একদিন গোপনে স্বামীগৃহ ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব সহকর্ম্মিণী জাপানী মহিলা-গোয়েন্দার দলে যোগদান করিল।

সমগ্র মাঞ্চুরিয়া হইল তাহার কর্ম্মভূমি। জাপানিজ ইণ্টেলিজেন্স ষ্টাফের মাষ্টার স্পাই—"মাঞ্চুরিয়ার লরেন্স" জেনারেল কেনজি দয়হারার পরিচালনে সে অপূর্ব্ব সফলতা অর্জ্জন করিতে লাগিল। পূর্ব্ব পরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্য্যায়—সমগ্র চীন বিজয়ের সূত্রপাত এইবার দানা বাঁধিয়া উঠিল।

চীনা সমরবিভাগের এক তরুণ অফিসারের বেশে সে শাংহাই শহরে প্রবেশ করে। সমরবিভাগের নানা গোপন সংবাদ এবং নক্সা, ফটোচিত্র প্রভৃতি প্রতারণা দ্বারা হস্তগত করে। এই সময়ে চীনা সমরবিভাগের সন্দেহ উদ্রিক্ত হয়। চীনা গোপন-সন্ধানীর দল তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে থাকে। ব্যাপার সঙীন বুঝিতে পারিয়া সে দয়হারার নিকট রেডিওযোগে সংবাদ প্রেরণ করে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উড়োজাহাজ রাখিবার। তৎপর রাত্রিকালে কুষ্ঠরোগীর বেশ ধারণ করিয়া স্বীয় বাসগৃহের বৃষ্টির জল-নিকাশের পাইপ বাহিয়া অন্ধকার গলিতে রাজপথে অবতরণ করিয়া পলায়ন করে। আলোকিত রাজপথে তাহাকে দেখিয়া ঘৃণায় সকলে সরিয়া যাইতে লাগিল। এই প্রকারে ক্রমাগত উত্তরদিকে চলিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া উড়োজাহাজের নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করে। রেডিও-সংবাদটি ছিল সঙ্কেত-বাণীতে, উহার প্রকৃত মর্ম্ম সঙ্কেত ভিন্ন উদ্ধার করা যায় না। চীনা সরকারী বিভাগের কর্ম্মচারিগণ ঐ সংবাদদ্বারা কোনও সন্দেহ-

জনক কিছু বুঝিতে পারে নাই। যাহা হউক যথাসময়ে উড়োজাহাজে সে টিয়েনসিন্-য়ে পৌঁছে। গুপ্ত সংবাদ এবং দলিল-দস্তাবেজ জাপানী সন্ধানী বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা জেনারেল দয়হারার হস্তে অর্পিত হয়।

কয়েক সপ্তাহ পরে নির্ব্বাসিত প্রিন্স পু ইয়েই টিয়েন্‌সিনে আসিয়া পৌঁছে এবং তাহার সঙ্গীস্বরূপ আগমন করে তাহার শিক্ষক চেংসিয়াও-সা। এই দুই-জনের সঙ্গে ইয়োশিমকো একখানি জাপানী জাহাজযোগে মাঞ্চুকুয়োর বন্দর নিউচোয়াং অভিমুখে রওনা হইয়া যায়। দুই বৎসর পরে প্রিন্স পু ইয়েইকে সিনকিং-য়ের রাজগদিতে বসান হয়—অবশ্য জাপানী অভিভাবকত্বের অধীনে।

ইহার পর হইতে ইয়োশিমকোর সংবাদ চীনা-সরকার খুব কমই পাইয়াছে। সময়ে সময়ে সে তাহার কার্য্য উদ্ধার করিয়া যাইবার পর, চীনা গোয়েন্দারা অনুমান করিয়া লইয়াছে, এমন দুঃসাহসিকা মহিলা-সন্ধানী ইয়োশিমকো ব্যতীত অন্য কেহ নয়। ১৯৩৩ সাল হইতে জাপানীরা মাঞ্চুকুয়োতে যে "আয়রন এন্ড ব্লাড" সেনাবাহিনী গঠিত করিতে আরম্ভ করে, ইয়োশিমকো তাহার অধিকাংশ সেনা সংগ্রহ করে। নানাপ্রকারে জনচিত্ত চীনা-সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করাই ছিল তাহার জীবনের পণ।

উত্তরে জেহোলে যখন জাপানী-সেনা অমিত বিক্রমে দেশ-জয় করিয়া চলিয়াছে, সে সময় নানা বিজ্ঞপ্তি প্রচার, সাধারণ-তন্ত্রের ভক্তদের উপর হুঁসিয়ারী পরোয়ানা জারি—এই সকল কার্য্যেই ইয়োশিমকো ছিল নিযুক্ত। এই প্রকার বিজ্ঞপ্তি বিলি করিবার সময় এক গ্রামে সে গোপন আততায়ীর হস্তে আহত হয়।

৩০শে ডিসেম্বর টিয়েন্‌সিন্-য়ে তাহার নিহত হইবার সংবাদ চীনের সেণ্ট্রাল নিউজ এজেন্সি কর্ত্তৃক ঘোষিত হইলে সকল জাপানী সংবাদপত্রে একযোগে প্রতিবাদ প্রকাশিত হয় যে তাহাদের "মাতা হরি" মরিয়া যায় নাই—তবে সাঙ্ঘাতিকরূপে আহত হইয়া টিয়েন্‌সিনের জাপানী কনসেশনের অন্তর্গত কাইওরিৎসু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রহিয়াছে। কিন্তু তাহার সহিত কাহাকেও সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হয় না—নূতন কোনও বিপদের আশঙ্কায়।

শতাধিক বৎসরের বীজ

(২৭৯ পৃষ্ঠার পর)

দিয়া অথবা সাল্‌ফিউরিক এসিড দ্বারা ঐ ত্বক্ খাওয়াইয়া দিয়া পরে নিম্নতাপে রাখিলে উহা ফুলিয়া ও রাসায়নিক ক্রিয়ার প্রথম বসন্তেই অঙ্কুরিত হইতে পারে।

দ্বিতীয় বীজে (দুই বৎসর পরে ফলনের) দেখা যায় প্রথম গ্রীষ্মেই সরু শিকড় জন্মে, কিন্তু বীজদল বা ভ্রূণপত্র বাহির হইয়া আসে না, যদি না উহা কিছুকালের জন্য নির্দ্দিষ্ট নিম্নতাপমাত্রার সুযোগ পায়। জলপদ্ম, কোন কোন লিলি প্রভৃতি এই জাতীয়। এই স্থলেও কৃত্রিম উপায়ে নির্দ্দিষ্ট নিম্নতাপ প্রদান করিয়া এই জাতীয় বীজেরও অঙ্কুরোদ্‌গম সময় সংক্ষিপ্ত করা গিয়াছে।

কোন কোন বীজ আবার প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকে নিক্ষিপ্ত হইয়া এমনভাবেই নিষ্ক্রিয় বা সুপ্ত হইয়া পড়ে, পরে তাহাকে অনুকূল অবস্থায় আনিলেও অঙ্কুরিত হয় না। লেটিস্ শাকবীজের অবস্থা এই প্রকার হয় যদি উহাকে ৯০ ডিগ্রি ফারেন্‌হিট্ তাপে রাখা হয় অঙ্কুরোদ্‌গমের সময়। আবার যে সকল বীজের আলোকের দরকার উহাদিগকে নিরন্ধ্র অন্ধকারে রাখিলে, অথবা যে সকল বীজের অন্ধকার প্রয়োজন, উহাদিগকে আলোকে রাখিলে এই প্রকার নিষ্ক্রিয় অবস্থা উপস্থিত হয়। কতকগুলি বীজ আবার অতিরিক্ত নিম্ন-তাপমাত্রায় এই প্রকার অফলপ্রদ হয়। এই সকলের অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণই হইল উহার নিষ্ক্রিয়তা হইতে উদ্ধারের পথ। তবে অবস্থাভেদে বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থাও প্রয়োজন— যেমন বহিরাবরণ মোচন, আলোক বর্জ্জন প্রভৃতি। যে সকল বীজের অতি দীর্ঘকাল দরকার হয় অঙ্কুর নির্গমনে তাহা যে এই প্রকারে প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকে পতিত হইয়া কঠোর নিষ্ক্রিয়তা প্রাপ্ত হয়, ইহা ধারণা করিয়া লইতে বেগ পাইতে হয় না। নতুবা প্রকৃতির বিধানে কোন বীজ ২০ বা তদুর্দ্ধ বৎসর পরে অঙ্কুরিত হইবে, এমন কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না—কেবল প্রতিকূল অবস্থায় নিপতিত হইয়া উহাদের সক্রিয়তা স্তব্ধ হইয়া যায় মাত্র—উহা স্বাভাবিক নিয়ম কখনই বলা যায় না।

কোন কোন বীজকে ত্বরায় অঙ্কুরিত হইবার জন্য অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করা হয়। নীল ঘাস, দুর্ব্বা প্রভৃতি উদ্যান ঘাসের বীজকে সময় সময় বিভিন্ন তাপমাত্রায় পর্য্যায়ক্রমে রাখিবার প্রয়োজন হয়। উহাদের ধীরগতি উন্মেষকে যথা-সম্ভব দ্রুত করিবার জন্য প্রতিদিন দুই প্রকার তাপে রাখা-হয়—১৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ৬০ ডিগ্রি এবং বাকি ছয় ঘণ্টা ৯০ ডিগ্রিতে। লেটিস্ কি সেলারি শাককেও এই প্রকার দৈনিক উচ্চ ও নীচ তাপে রাখিলে অঙ্কুরোদ্‌গম শীঘ্র হয়, বিশেষ করিয়া উহার পরোক্ষ নিষ্ক্রিয়তার কালে। আবার অনেক বীজের অতিরিক্ত নিম্ন তাপমাত্রা—আল্‌পস্ উদ্ভিদে শূন্যে ডিগ্রিরও নিম্নের যে হিমমাত্রা তাহাই প্রয়োজন হয়।

কোনও বীজ প্রকৃতই মৃত কি না, অথবা তাহা সাময়িক নিষ্ক্রিয়তার কবলেই পতিত—ইহা নির্দ্ধারণ করিবারও পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বীজের বহিরাবরণ মোচন করিয়া সিক্ত ফিল্‌টার কাগজের উপর রাখা হয় পেট্রি-ডিশে। যদি বীজটি জীবিত থাকে তবে তাহা ফুলিয়া উঠে এবং সবুজ রং-য়ের হয়; কিন্তু মৃত বীজ ফুলিয়া উঠে না— খয়েরি রং হইয়া একেবারে গলিত বা চূর্ণীকৃত অবস্থায় পরিণত হয়।

কোন কোন বীজ স্বল্পায়ু বলিয়া এমন কি এক বৎসর পরেও ফলপ্রদ হইবার যোগ্যতায় প্রতিষ্ঠিত থাকে না। এই জন্য এই সকল বীজকে সম্পূর্ণ অনার্দ্র অবস্থায় এবং বায়ুর অক্‌সিজেনের ক্রিয়া হইতে সংরক্ষিত করিয়া বায়ু-নিরোধক পাত্রে এবং শীতলস্থানে রাখিতে পারিলে এক বৎসর পর্য্যন্ত উহার কার্য্যকরী শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হইবে।

শিকার

(গল্প)

শ্রীবিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়

সদুমণি—নামটা হয়ত এককালে সৌদামিনীই ছিল, কিন্তু এখন সদুমণিতে দাঁড়াইয়াছে—তার আট ন' বছরের ছেলে নেপালকে নিয়ে একটি কুটীরে বাস করে। এই নেপালই এখন প্রৌঢ়া সদুমণির একমাত্র 'অন্ধের নড়ি'। তাই মাতৃ হৃদয়ের সমস্ত স্নেহটুকু নিঃশেষে ঝরিয়া নেপালের সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত করিয়াছিল। এক পলকের জন্যও নেপালকে চক্ষের আড়াল করিতে সদুমণির বুকে বড় ব্যথা লাগিত। পারতপক্ষে সে তাহা হইতে দিত না। কিন্তু তবু 'পেটের ভাতে'র যোগাড় করিতে সদুমণিকে যখন বাধ্য হইয়া কোথাও যাইতে হইত তখন সে পুত্রকে নানারূপে সাবধানে থাকিতে উপদেশ দিয়া যাইত। হয়ত বা সে সময় তাহার চক্ষের কোণে এক বিন্দু অশ্রু আসিয়া জমিত—তাড়াতাড়ি সেটুকু মুছিয়া ফেলিয়া সে বারংবার সস্নেহে পুত্রের মস্তক চুম্বন করিয়া বাহিরে যাইত; পথ হইতে পিছনে ফিরিয়া হয়ত পুনরায় নেপালকে সাবধান করিত, "নেপু, কোন দুষ্টুমির করিস নি যেমন, বাবা।"

এই নেপালই যে সদুমণির একমাত্র সন্তান তাহা নহে, নেপালের পূর্ব্বে তাহার দুইটি পুত্র-সন্তান হইয়াছে। প্রথমটিকে একবার কোথায় কোন মেলা দেখিতে গিয়া তাহার শৈশবেই তাহাকে হারাইয়া আসিয়াছে। সে কথা আজও সদুমণি ভুলিতে পারে নাই। হৃদয়ের প্রত্যেক পর্দ্দায় সে স্মৃতিটুকু জ্বলন্তভাবে অঙ্কিত আছে এবং তাহারই আগুনে সদুমণির অন্তরটা আজও পুড়িয়া 'খাক' হইয়া যায়। দ্বিতীয়টি বিবাহের পর হইতেই অপর একটি কুঁড়েতে পৃথক ভাবে বাস করিতেছে। কাজেই স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে এই নেপালই দাঁড়াইয়াছে সদুমণির একমাত্র বন্ধন এবং স্নেহের পাত্র। তাই সে-ই একা তাহার মাতার গভীর স্নেহে নির্বিবাদে ভাসিতেছে।

সেদিন সেই পল্লীর কয়েকজন যুবক শিকার উৎসবে মাতিবার কল্পনা করিতেছিল। শিকার অর্থে, দুর্গম জঙ্গলে গিয়া বাঘ, ভালুকে শিকার নয়; পাড়া হইতে প্রায় মাইল দুই দূরে একটা কণ্টকগুল্মাবৃত উপবন—তাহারই মধ্যে এখানে সেখানে কচিৎ দু'একটা খরগোস দেখা যায়। নিছক খাদ্যের জন্যই তাহাদিগকে সকলে হত্যা করে—ইহারই নাম শিকার। তাই ইহার সাজ সরঞ্জামও রাইফেল, কার্ত্তুজ নয়—খান-তিন-চার শিকারের উদ্দেশ্যেই তৈরী জাল, লাঠি, কুড়ুল, দা এবং খুব জোর এক আধটা তীর-ধনুক।

পূর্ব্বে দুই একবার নেপাল মায়ের অজ্ঞাতে এইরূপ শিকারে গিয়াছিল তাই এবারও ইহাতে যোগ দিয়া আনন্দটুকু উপভোগ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছিল না। কিন্তু মা যে সম্মতি দিবে না তাহা সে জানিত। তাই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। তাহার ভাগ্যে সুযোগও মিলিয়া গেল।

একটু বেলা হইতেই সদুমণি ছেলেকে ডাকিয়া বলিল, "বাবা নেপাল, আমি ধান ভানতে চললাম, কোথাও যাস্‌নি যেমন।"

নেপাল ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, সে কোথাও যাইবে না; কিন্তু মনে মনে সে তখন খুবই উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

সদুমণি এ ব্যাপারের বিন্দু বিসর্গও জানিত না। তাই সে পুত্রকে শীঘ্রই ফিরিবে এইরূপ সান্ত্বনা দিয়া নিজের কাজে চলিয়া গেল। নেপালও তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইতে লাগিল।

কয়েক বৎসর হইতেই একটি যুবক কোথা হইতে আসিয়া সদুমণির কুঁড়েখানির পাশেই সস্ত্রীক নীড় বাঁধিয়াছিল। যুবকের নাম শ্যামলাল। নেপালের সঙ্গে তাহার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল, তাই যখন পান্থা ভাত লইয়া খাইতে খাইতে দেখিল শ্যাম কোথায় বাহির হইয়া যাইতেছে তখন সে তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "শ্যামুদা, শিকারে যাবিনি ?"

একটু থামিয়া শ্যাম বলিল, "না"।

ইহা শুনিয়াই নেপাল ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিল, বলিল, "না শ্যামুদা, তুইও চল, আমি যাচ্ছি।"

একটু বিস্মিতভাবে শ্যাম বলিল, "তুই যাবি কিরে? তোর মা তা'হলে বকবে নি ?"

"মাকে বলিনি, তাই ত তোকে বলছি—তুইও যদি না যাস্ তা'হলে মা খুব বকবে", নেপালের কণ্ঠে মিনতি ঝরিয়া পড়িল।

শিকারে যাইতে শ্যামের অনিচ্ছা ছিল না। বরং সেই ছিল এ বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহী। শিকার আছে কিনা সন্ধান দিতে, পলায়নরত শিকারের পশ্চাদ্ধাবন করিতে, তাগ্ করিয়া তীর ছুঁড়িতে তাহার সমকক্ষ কেহ ছিল না বলিলেই হয়। কিন্তু আজ সে উপায়হীন। কারণ ঘরে তাহার ভাত বা চাল কিছুই নাই। শিকারে গেলে ফিরিতে প্রায় সন্ধ্যা হইবে। কাজেই সমস্ত দিন কিছু না খাইয়া থাকা অসম্ভব। সকলের সহিত আনন্দে যোগদান করিতে পাইল না ইহাতে মনে মনে সে যথেষ্ট দুঃখ অনুভব করিতেছিল, তাই নেপালের মিনতি দেখিয়া ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল, "তাই ত রে—আমি কি করে যাই বল দিকি? আমার ঘরে যে ভাত নাই।"

নেপাল যেন গভীর অন্ধকারে আলোর রেখা দেখিতে পাইল।

"আমাদের ঘরে অনেকগুলো ভাত আছে। আমি অত খেতে পারিনি চ' তুই আমার সঙ্গে খাবি।"

সে একরূপ টানিতে টানিতেই শ্যামকে লইয়া চলিল।

নেপালের দাদা গোপাল, শ্যাম ও আরও চার পাঁচজন যুবকের সহিত নেপাল চলিল শিকারে। তাহার মনে আজ আনন্দ ধরে না। আজ কতদিন পরে এইরূপ সুযোগ আসিয়াছে। সে যে এই আনন্দটাকে পূর্ণ মাত্রায় উপভোগ করিবার সুযোগ পাইয়াছে—ইহা ভাবিয়া সে আনন্দে একরূপ লাফাইতে লাফাইতে একটা লাঠি হাতে লইয়া সকলের আগে আগে চলিয়াছে।

শিকার আরম্ভ হইয়া গেল। চারিদিকে হৈ হৈ শব্দ! একটা স্থানে কণ্টকগুল্মগুলির মাঝে মাঝে যে এক আধটু ফাঁক ছিল, সেইগুলিতে জাল খাটান হইয়াছে। এবং তাহার সম্মুখে খানিকটা দূর হইতে সকলে মিলিয়া হৈ চৈ করিতে

করিতে সমস্ত ঝোপ-ঝাড়গুলি লাঠি ইত্যাদি দ্বারা ঠেঙ্গাইয়া শিকার তাড়াইয়া জালের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

কোথায় কোন ঝোপের ভিতর নিরীহ একটা খরগোস-ছানা বোধ হয় আরামে নিদ্রা দিতেছিল। গোলমাল শুনিয়া ঝোপ হইতে বাহির হইয়া প্রাণভয়ে ছুটে দিল। অমনি চারিদিক হইতে 'গেল-গেল', 'এই যে রে', 'ওই ওদিকে গেল', 'ধর', 'মার' ইত্যাদি চীৎকার উঠিল। দুই একজন হাতের লাঠি, দা ইত্যাদি 'শিকার' লক্ষ্যে ছুড়িয়া দিল। কিন্তু খরগোসটির বোধ হয় পরমায়ু বেশী ছিল। তাই সে কোন-গতিকে জালের পাশ কাটাইয়া পলায়ন করিল। ইহাতে শিকারীরা কিছুক্ষণ নিজেদের মধ্যে মহা গণ্ডগোল পাকাইয়া তুলিল। সকলেই তাহার দোষে যে 'শিকার' ফস্কায় নাই তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিল।

সেখান হইতে জাল গুটাইয়া অন্য স্থানে পাতা হইল, এবং পুনরায় তাড়া আরম্ভ হইল। নেপালের আনন্দ এবং উৎসাহ সকলের চেয়ে বেশী। তাই সে হাতের লাঠিখানা দিয়া নিজের সম্মুখ ও পার্শ্ববর্তী ঝোপগুলি ঠেঙ্গাইতে ঠেঙ্গাইতে সকলের আগে আগে চলিয়াছে! কিছুক্ষণ মধ্যেই আবার একটি শিকারে'র আবির্ভাব হইল। সতর্ক শিকারীর দলে পুনরায় দারুণ চাঞ্চল্য উঠিল। এবার যাহাতে 'শিকার' না পলায় সকলে প্রাণপণে সেই চেষ্টায় ব্রতী হইল। দা, লাঠি অনেক নিক্ষিপ্ত হইল কিন্তু কোনটাই কাজে আসিল না। তীর-ধনুকধারী শ্যামলাল একটু তফাতে ছিল। শিকার সম্মুখে জানিয়া এবার সে ধনুকে তীর বসাইয়া চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করিল। কোনরূপে লক্ষ্য স্থির করিতে না পারায় সে একরূপ আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছিল। হঠাৎ এই সময় খানিক দূরে খরগোসটা দেখা গেল—পশ্চাতে নেপাল প্রাণপণে উদ্যত লাঠি হস্তে শিকারের পশ্চাতে ছুটিয়েছে!

সেই মুহূর্তেই দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া শ্যামলাল খরগোস লক্ষ্যে শরত্যাগ করিল। পর মুহূর্তেই নেপাল "ওঃ—দাদা গো—" বলিয়া যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে মাটীর উপর লুটাইয়া পড়িল।

নিক্ষিপ্ত তীরের প্রকাণ্ড ফলাটি নেপালের একেবারে কণ্ঠনালী ভেদ করিয়াছিল। অতিরিক্ত ভীতি ও উত্তেজনায় স্তম্ভিত শিকারীদলের কেহই উপস্থিত কর্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া বজ্রাহতের মত দাঁড়াইয়া রহিল। নেপালের রুদ্ধ-প্রায় কণ্ঠ হইতে মাত্র একটা অস্ফুট যন্ত্রণাব্যঞ্জক গোঙানি উত্থিত হইতেছিল, বেশী নড়িবার ক্ষমতাও তখন তাহার অন্তর্হিত হইয়াছিল। শ্যামলাল ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া তাহার 'শিকার' ও শিকারের অবস্থা দেখিয়া "ভাইরে—নেপাল"—বলিয়া নেপালের অসাড় দেহের উপর আছড়াইয়া পড়িল।

অপরাপর শিকারীদের প্রাণপণ চেষ্টায় শ্যামলালের জ্ঞান ফিরিল বটে কিন্তু নেপালকে বহু যত্নেও কেহ ফিরাইতে পারিল না। তখন সকলে উপায়হীন হইয়া শবদেহ একটা ছোট ডোবার ধারে সমাহিত করিয়া নিস্তব্ধভাবে অতি ধীর অলস গতিতে গৃহাভিমুখে ফিরিল

* * * * *

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সুদুমণি গৃহে ফিরিয়া পুত্রের শিকার যাত্রার সংবাদ শুনিয়া অবধি পথপানে চাহিয়া বসিয়াছিল। কে জানে কেন তাহার মাতৃহৃদয় একটা অজানা অমঙ্গল আশঙ্কায় মাঝে মাঝে দুলিয়া উঠিতেছিল। রান্না সারিয়া নিজের ও নেপালের জন্য ভাত বাড়িয়া রাখিয়া সে শ্যামলালের স্ত্রীর নিকট আসিয়া বসিল।

"আচ্ছা বৌ, আজ এদের এত দেরী হচ্ছে কেন বল ত?"

সুদূরপ্রসারী স্বল্পান্ধকার মাঠের দিকে চাহিয়া শূন্য দৃষ্টিতে শ্যামলালের স্ত্রী বলিল, "কি জানি মাসীমা—তবে আজ অন্য দিনের চেয়ে দেরী হ'চ্ছে বটে। হয়ত অনেক দূরে গেছে।"

সদুমণি বলিল, 'কে জানে মা, আমার বড় ভয় হ'চ্ছে। ছোট ছেলে—সমস্ত দিন রোদে ঘুরে একবারে আধমরা হ'য়ে যাবে আর কি! এমন হতচ্ছাড়া ছেলে আমি চোখে দেখি নি, একটা যদি কথা শুনবে।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিল, "আমার সঙ্গে একবার যাবি বৌ—চলনা একটু এগিয়ে দেখি—"

মৃদু হাসিয়া শ্যামলালের স্ত্রী বলিল, "সে কি মাসীমা—এই অন্ধকারে তাদি'গে কোথা খুঁজতে যাবে? আর তুমি অত ভয় পাচ্ছ কেন? সকলের সঙ্গে গেছে আমোদ করে—এখুনি এসে পড়বে অখন—"

কথাটা বলিল বটে, কিন্তু তাহারও মন জানি কেমন একটা আশঙ্কায় 'ছ্যাঁৎ' করিয়া উঠিল। সত্যই ত ছোট ছেলে সঙ্গে লইয়া তাহাদের কি এত দেরী করা উচিৎ?

তাহার প্রবোধবাক্য শুনিয়া সদুমণি বলিল, "যে দুষ্টু ছেলে সে, সব সময় কি ওদের সঙ্গে থাকবে?"

শিকারীর দল নিঃশব্দে অন্ধকারে গ্রামে প্রবেশ করিয়াছিল। তাই সদুমণি এতক্ষণ তাহাদের আগমন টের পায় নাই। এক্ষণে অন্ধকারে দুইটি ছায়া মূর্তিকে সেই দিকে আসিতে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "কি রে—নেপু এলি? আয়—আজ তোকে আমি ছিঁচে মারব। দিন দিন তোর দুষ্টুমির বাড়ছে, না? মায়ের একটা কথা শুনতে মন যায় নি?"

সঙ্গে সঙ্গে সে উঠিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইল।

আসিতেছিল শ্যামলাল আর নেপালের দাদা গোপাল। সদুমণির সাড়া পাইয়া তাহারা উভয়েই সেখানে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। কি বলিবে? আজ এই স্নেহান্ধ মাতাকে তাহারা কি বলিয়া বুঝাইবে? কেমন করিয়া তাহাকে জানাইবে যে তাহার স্নেহের দুলাল আর ইহ জগতে নাই! স্বাভাবিক মৃত্যু হইলেও বা বলিবার ছিল—কিন্তু এ যে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে নিদারুণ শরবিদ্ধ হইয়া মরিয়াছে সে! রোগ নয়—জ্বালা নয়—আত্মহত্যা নয়—সম্পূর্ণ প্রাণবন্ত ছেলেটাকে তাহারাই যে তীর ছুড়িয়া মারিয়া ফেলিয়াছে! কথাটা স্মরণ করিতেও মাথা ঘুরিয়া উঠে—কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যায়—চক্ষের সম্মুখ হইতে সমস্ত দুনিয়াটা মুহূর্তে মুছিয়া যায়! এ কথা কেমন করিয়া তাহারা মাতাকে জানাইবে যে, তাহার নয়নের মাণিক শিকার করিতে গিয়া আজ নিজেই শিকারের স্থান অধিকার করিয়াছে!

কোন সাড়া না পাইয়া সুদুমণি নিকটে আসিল।

"কি রে শ্যামা, গোপাল, আমার নেপু কোথা রে?"

কোনরূপে রুদ্ধকণ্ঠে পরিষ্কার করিয়া গোপাল ডাকিল, "মা—"

তাহাকে ঐভাবে কি বলিতে যাইয়া সহসা থামিতে দেখিয়া সদুমণি চঞ্চল হইয়া উঠিল, বলিল, "কেন রে, গোপাল —কি হয়েছে—শীগ্গির বল—নেপ্লা কোথা?"

গোপাল ও শ্যাম উভয়েই নীরব!

সদুমণি ব্যাকুল হইয়া উঠিল, "ওরে তোরা চুপ ক'রে রইলি কেন? কোথা—নেপাল কোথা?"

বহুকষ্টে নিজেকে সম্বরণ করিয়া গোপাল বলিল, "সে কি ফিরেনি? আমাদের কাছ হ'তে সে ত অনেকক্ষণ—"

"এ্যাঁ—কই সে ত আসেনি! সত্যি বলছিস্—?"

একটা ঢোক গিলিয়া গোপাল বলিল, "আঁ—হাঁ—সত্যি বই কি। অনেকক্ষণ সে আমাদের কাছ থেকে চলে এসেছে।"

শ্যাম পূর্ব্ববৎ কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সদুমণি কথাটার প্রমাণ জন্য তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁরে শ্যামা—সে কতক্ষণ আগে এসেছে রে?"

গলাটা ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া লইয়া মাটীর দিকে চাহিয়া শ্যাম কোন গতিকে সংক্ষেপে বলিয়া ফেলিল, "অনেকক্ষণ।"

"তাই ত, তাহ'লে সে গেল কোথা? দেখ্ দেখি, বাবা, এক সঙ্গে গেলি, আর তাকে একা ছেড়ে দিতে হয়? কোথায় এবারে খুঁজি আমি? মরুকগে, যখন পারে আসবে। আসুক একবার—আজ আমি তার হাড় মাস আলাদা করে ছড়ব! তার বদমাইসি আজ ভাঙ্গছি—"

পুত্রের উপর কৃত্রিম ক্রোধ ও অভিমানে গজ্গজ্ করিতে করিতে এবং ফিরিয়া আসিলে তাহাকে গুরুতর শাস্তি দিতে মনস্থ করিয়া সদুমণি কুঁড়ের দরজার দিকে খানিকটা আগাইয়া গেল। তাহার পর আবার কি ভাবিয়া ফিরিল; এবং একটু ফাঁকা জায়গা হইতে পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীর দিকে মুখ ফিরাইয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, "নেপ্লা—নেপা রে—"

কিন্তু কেহই উত্তর দিল না। কেবল দিগন্ত-প্রসারিত মাঠ হইতে প্রতিধ্বনি ভাসিয়া আসিয়া যেন তাহাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল।

ডাকাডাকিতে কোন ফল না হওয়ায় সদুমণি অবশেষে একটা লণ্ঠন হাতে লইয়া ওপাড়া দিয়া পুত্রকে খুঁজিতে বাহির হইল। কিন্তু হায়—কোথায় তাহাকে পাইবে! অনেক ঘোরাঘুরি এবং প্রত্যেক লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া যখন সে উৎকণ্ঠিত ও ভারাক্রান্ত-মনে ক্লান্ত পদে ফিরিল, তখন রাত্রি প্রায় দুপুর। মনে মনে আশা হইতেছিল—হয়ত ঘরে গিয়া দেখিবে নেপাল তাহারই অপেক্ষায় বসিয়া! মাকে দেখিবামাত্র হয়ত সে সেই চির পরিচিত দুষ্টামির হাসিটুকু হাসিয়া নিজের কুকর্ম্মের জন্য কোনরূপে অনুতপ্ত না হইয়াই স্বভাব-সিদ্ধভাবে মায়ের উপর নানারূপে জুলুম চালাইবে! হাঁ—নিশ্চয় এতক্ষণ সে আসিয়াছে! যেখানেই যাক্—এত রাত্রি অবধি থাকিবে কোথায়?

শ্যামলালের গৃহের পাশ দিয়া যাইবার সময় ভিতর হইতে অস্ফুট গোঙানির শব্দ শুনিয়া সদুমণি দরজা ঠেলিয়া উঁকি দিল; দেখিল মেঝের উপর পড়িয়া শ্যাম চট্, কাঁথা যাহা পাইয়াছে সমস্ত গায়ে জড়াইয়া অসম্ভব রকম কাঁপিতেছে। তাহার স্ত্রী তাহাকে ধরিয়া শীত নিবারণের চেষ্টা করিতেছে।

"কি হয়েছে রে—"

সদুমণির প্রশ্নের জবাব দিয়া শ্যামের স্ত্রী বলিল, "বড্ড জ্বর এসেছে গো, মাসীমা—দেখনা কি রকম কাঁপছে। তা, তুমি নেপুকে দেখতে পেলে?"

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সদুমণি বলিল, "না; মরুকগে হতভাগা ছেলে—"

"এরা সব বলছিল যে আজ রাত যাক্। কাল সকালে সকলে মিলে নেপলাকে খুঁজতে বার হবে। তুমি যাও মাসীমা। সমস্ত দিন কিছু খাওনি—খেয়ে লাওগে। সে আছেই, যেখানে হোক।"

* * * * *

শয্যায় পড়িয়া সদুমণি ছট্ফট্ করিতেছিল। শুইয়া অবধি তাহার মোটেই ঘুম আসিতেছিল না। বুকের কাছে নেপালের শয়নের জায়গাটুকু সর্ব্বদা ফাঁকা ঠেকিতেছিল। নেপালকে বুকের কাছে না লইয়া সে আজ পর্য্যন্ত কোন দিন শয়ন করে নাই। তাই নানারূপ দুর্ভাবনায় তাহার বিনিদ্র রাত্রি নীরবে কাটিয়া যাইতেছিল।

অনেক রাত্রে কে আসিয়া দরজা ঠেলিল।

সদুমণি চমকাইয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। "কে রে —নেপু?"

"না, মাসীমা আমি।" বাহির হইতে শ্যামলালের স্ত্রী বলিল।

"বৌ? এত রাতে কি গা? শ্যাম কেমন আছে?"

"জ্বরটা খুব বেশী। তোমাকে খুঁজছে। একবার যাবে মাসীমা?" মিনতিভরা কণ্ঠে শ্যামের স্ত্রী বলিল।

"আচ্ছা চল্।"

জ্বরের ঘোরে শ্যামলাল বেহুঁস হইয়া পড়িয়াছিল। সদুমণি আসিয়া গায়ে হাত দিয়াই চমকাইয়া উঠিলেন! "ইস্, গা যে পুড়ে যাচ্ছে! বৌ, মাথায় জলপটি দে শীগ্গির—"

তাহার কণ্ঠস্বর কানে লাগিতেই শ্যামলাল জাগিয়া গেল, বলিল, "মাসীমা—এসেছ? বেশ; এই খানটায় একটু বস, তোমাকে একটা কথা বলব—"

সদুমণি একটা পাখা হাতে লইয়া রোগীর শিয়রের নিকটে বসিয়া বলিল, "এখন থাক্। কাল সকালে জ্বরটা একটু কমলে বলবি। এখন তুই একটু ঘুমো দিকিন্।"

মাথা নাড়িয়া জানাইয়া শ্যামলাল বলিল, "না—তোমাকে সে কথা না বললে আমার ঘুম আসবে না। তারপর আমার যে ঘুম আসবে—সেই হ'বে আমার শেষ ঘুম।"

শ্যামের স্ত্রী শিহরিয়া উঠিল।

সদুমণি বলিল, "বালাই, ষাট। অমন কথা মুখে আনতে আছে?"

শ্যাম বলিল, "বেশ, আর বলবনি। কিন্তু তুমি নেপালের সন্ধান পেয়েছ মাসীমা?"

মেম-সায়েব

(গল্প)

শ্রীকেশবচন্দ্র দে

আমি একজন ছোট-খাট স্পেশালিষ্ট। আর্টে নয়, চিকিৎসা বিদ্যায়। বাঙলার গায়ে লাগান পশ্চিমের কোন একটি শহরে প্র্যাকটিস করছিলাম। বেশ কিছু দিন ধরে এই শহরে ছিলাম। সৌভাগ্যের গুণে অনেকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় আর দু-একজনের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা জমে উঠেছিল। বড় শহর থেকে এসে ছোট শহরে মন বসবে তা আগে ভাবি নি। মনে আর তেমন শূন্যতা বোধ করতাম না—আমি এদের সাহচর্য্যের জন্য কৃতজ্ঞ।

এমনি করে আমি অল্প দিনের মধ্যে এই ছোট শহরের আপন জন হয়ে উঠলাম। শহরের সকলেই আমাকে অসীম স্নেহের পাত্র করে তুললেন!...দিন সমান যায় না—তাই কিছু দিন পরে যাঁদের স্নেহের অধিকারী হয়েছিলাম—আর একদিন তাঁদেরই নিদারুণ ঘৃণাকে পাথেয় করে ফিরে আসতে হল আবার এই বড় শহরে।

কিন্তু খুব আশ্চর্য্যের সঙ্গেই লক্ষ্য করলাম যে, এই কিছুদিনের মধ্যেই আমার ভেতর একটা আমূল পরিবর্ত্তন হয়েছে। যে শহরে আমার শৈশব আর যৌবনের প্রথমটা কাটল, যার আবেষ্টনের মোহ-মদিরা আমায় আকুল করে তুলেছিল—তার সেই নিবিড় আকর্ষণ আমার মন থেকে দূরে সরে গেছে।......মনে পড়ে গেল যে-দিন এ-শহর ছেড়ে যাই, সে-দিন কি অসহ্য বেদনা আমার সমস্ত মনকে পঙ্গু করে তুলেছিল। সে-দিন বড়-শহরের অস্বাস্থ্যকর, অকল্যাণকর (যে-গুলোকে আমি চিরকাল অভিসম্পাত দিয়ে এসেছি), তার কলের চিমনীর ধুঁয়া—রাস্তার ধুলো—তার জনকোলাহল, সব গুলাই যেন আমার নিতান্ত কাম্য বলেই মনে হল। নদীর তীরের কলের চিমনীর কুণ্ডলীপাকান নিরবচ্ছিন্ন ধূমরাশি কত বিচিত্ররূপে না আকাশে ছড়িয়ে পড়ছিল আর কতরূপ অপরূপ আকার ধারণ করছিল। বুঝি বা শিল্পের তুলিও ধুঁয়ার এই বিশিষ্ট রূপ দিতে পারে না। সেদিন আমার চোখ সেই ঘন-কৃষ্ণ পুঞ্জীকৃত ধূমের এক অপূর্ব্ব রূপ দেখেছিল।

আর আজ আবার আমাদের এই বড় শহরে ফিরে এসেছি—কিন্তু পেছনে ফেলে আসা স্বল্প-পরিচয় ছোট্ট শহরখানি ভুলতে পারছি না। কিন্তু সত্যিই কি ছোট্ট শহরখানি ভুলতে পারছি না? না-আর কিছু? মনোভাব বিশ্লেষণ করে দেখলাম যে, সেই ছোট শহরের দিগন্ত বিস্তীর্ণ প্রান্তর—তার সীমাহীন পায়ে-চলার পথ—তার প্রশান্ত সুবিস্তৃত নীল সায়র—তার হাট-বাজার—তার প্রতিবেশী—তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য—জীব-জন্তু এমন কি তার কাঠ-বিড়ালীর খুর-খুর করে ছুটে যাওয়া, আসা, পুচ্ছের এবং পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সামনের দুটি ছোট্ট পায়ে ধরে কুর-কুর করে বটফল খাওয়া, হয়ত সবই ভুলতে পারি—শুধু ভুলতে পারি না একটি স্মৃতি—যেটা আমার মনের ভিতর এখনও জ্বল জ্বল করছে, যা আমি দেখেছিলাম আমার বিদায় কালে—সেই একখানি মুখ আর তার চোখের চঞ্চল দুটি সুনীল তারা।

সেদিন বেশ বেলা করেই ঘুম ভাঙল আমার ছোট বোন টুটুর ডাকে। চোখ খুলে দেখি চা নিয়ে এসেছে। ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে বুঝতে পারলাম যে, সে এসে ঘরের এলো-মেলো ভাবটা সেরে দিয়েছে। লেখবার টেবিলটা সুপরিন্যস্ত। চা-এ চুমুক দিচ্ছি দেখি টুটু একটা চেয়ার টেনে নিয়ে মুখোমুখি হয়ে বসল। একটু পরেই বললে, দাদা তোমার ছেলে বেলার অভ্যাসটা আজও গেল না।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালাম।

সে বলে চলল এক কথা বা একটা নাম লিখে লিখে কত খাতার পাতা—খবরের কাগজের শাদা পাত—চোঙার কাগজ যে ভরিয়েছ, তার হিসেব রাখলে বোধ হয় একটা অভিধানের আকার দাঁড়াত......কালকে দেখি তোমার এই খাতাটার দু-তিনটে পাতা ভরিয়েছ—কেবল 'মেম-সায়েব', 'মেম-সায়েব' লিখে। কিন্তু এ মানুষটি কে?

—আন্দাজ কর দিকি।

একটু ভেবে টুটু ঠোঁটের কোণে হাল্কা এক টুকরা হাসির রেখা টেনে বললে—তোমার সেই ইংরেজ নার্স ইভা।

—না।

—না? তাহলে তোমাদের ওখানকার ম্যাজিস্ট্রেটের মেম নন ত?

তার মুখে ফুটে উঠেছে দুশ্চিন্তার গভীর রেখা।

এবারও হল না।

তাও না?

টুটুর মুখের কঠিন রেখাগুলো নরম হয়ে এল। অস্বস্তি থেকে নিস্তার পেল বুঝি।

ওঃ—তবে সেই-যে বলছিলে কোন বাঙালী সায়েবের গিন্নী—কালোজাম বর্ণের সেই আড়াইমণ-ই মেম-সাহেব।

টুটু খিল্ খিল্ করে হাসির ঝোঁকে ভেঙে পড়ল।

আমি শুধু একটু হাসলাম।

...কি চুপ করে রইলে যে? ঠিক হল তবু স্বীকার করবে না?

কেমন করে করি বল? আগাগোড়াই যে ভুল করছিস রে টুটু।

তবে বল কে তোমার এই মেম-সায়েব।

কি করবি শুনে—ও-একটা খেয়াল—ও-কিছু নয়।

না দাদা তোমায় বলতেই হবে, তুমি বল।

টুটু আমার একমাত্র বোন, ও-ছাড়া আমার ভাই-বোন আর কেউই নেই। ওর সামান্য অনুরোধটুকুও সাধ্যমত না পুরিয়ে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। একটা নিশ্বাস ফেলে বললাম, তবে শোন টুটু আমার মেম-সায়েবের কথা।

চোখের সামনে আমার স্বল্প-প্রবাস-বাসের চিত্র ভেসে উঠল। সিনেমার পর্দ্দায় ছবি যেমন ভেসে ওঠে—একটার পর একটা, আবার চলে যায়, তেমনি যাওয়া-আসা করতে লাগল অতীত স্মৃতি। শেষে দেখা দিল সেই মেম-সায়েব। ছোট থেকে বড় হয়ে হয়ে স্পষ্ট একক হয়ে সে এসে আমার কাছে দাঁড়াল। আর কেউ নেই, সব গেল গুলিয়ে শুধু ভেসে রইল সেই কমনীয় মুখ আর ঘন-পল্লবের অন্তরালে ক্ষণ-চঞ্চল সেই নীলমণি দুটি।

কি ভাবছ দাদা? বল!

বলি—তোর কাছে অনেকবার বলেছি যে, আমি যে শহরে প্র্যাক্টিস্ করতাম সেখানকার অধিবাসীরা অতি সজ্জন। তাঁদের সাহচর্য্য এবং সৌজন্যের গুণে আমার প্রবাস-বাস একদিনও কণ্টকর হয়ে ওঠেনি।...সত্যিই টুটু ওঁদের অমায়িক ব্যবহার আমায় মুগ্ধ করেছিল। অনেকের বন্ধুত্ব লাভের সৌভাগ্য আমার গর্ব্বের ছিল।......এখানেই একটি ডাক্তারের সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুত্ব হয়েছিল। এদের পরিবারের সকলেই উচ্চ শিক্ষিত মার্জ্জিত রুচি। এঁদের বাড়ীর ছেলে-মেয়ে সকলেরই ভিতর একটা অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য ছিল। এই বৈশিষ্ট্যই তাঁদের সংসর্গে যারা আসত তাদের মুগ্ধ করত। সমস্ত শহরের ভিতর আমার মনে হত এই পরিবারটিই শ্রেষ্ঠ। এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় সুন্দর। ব্যবহারে, রুচিতে, চেহারায় সাজ-সজ্জায় সর্বদিক দিয়েই আমার মনে হত এরা সেই শিব-সুন্দরের উপাসক।

এইখানে টুটুর চোখে-মুখে আবিষ্কারের আনন্দ-হাসি খেলে গেল। চোখ দুটো বিস্ফারিত করে আমার মুখের দিকে তুলে দুষ্ট মেয়ের মত কৃত্রিম গম্ভীর হয়ে বলে উঠল আর এই ডাক্তারের বাড়ীতেই ছিল তোমার মেম-সাহেব। টুটু টিপে টিপে হাসতে লাগল।

আমিও একটু হেসে বললাম, আগে শোন।

টুটু বুঝলে এবার তার নির্ঘাত জয়।

আমি আবার বলতে লাগলাম, কিছুদিন বেশ আমোদ আহ্লাদে সময় কাটতে লাগল। ডাক্তারের বন্ধু-প্রীতি আর সহানুভূতি কোন দিনই ভোলবার নয়, সে সত্যিই ছিল আমার দরদী বন্ধু।

দিন এমনই যাচ্ছিল। এমন সময় সদ্য রোগমুক্তা এক তরুণী মেয়েকে নিয়ে একটি ভদ্র-পরিবার এখানে এলেন। পথে আলাপ হতে জানলাম তিনি আমাদের শহর থেকে এখানে এসেছেন এবং স্বদেশবাসী জেনে বিশেষ আনন্দিত হলেন। ক্রমে প্রতিদিনই তাঁদের সঙ্গে দেখা হত আর এমনি করেই পথের দেখা এক অপরিচিত পথিকের সঙ্গে বন্ধুত্বও হয়ে উঠল। তারপর প্রত্যহই একসঙ্গে বেড়ান এবং শেষে বেড়ানর পর তাদের বাড়ীতে বসে চা পান, গল্প প্রভৃতি রোজকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল, অজানার প্রভেদ অনেকটা কমে এল। মাঝে মাঝে এমন দিন হত হয়ত সুরেশবাবু বেড়াতে বেরুতে পারতেন না। আমার সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ও কন্যা বেড়াতে বার হতেন। এই মেয়েটির ব্যবহার বেশ মিষ্টি ছিল। অনাবশ্যক আড়ষ্ট ভাব দিয়ে অপরিচিতকে যেমন দূরে ঠেলে রাখত না, তেমনি সুলভ চপলতা প্রকাশ করে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের চেষ্টাও ছিল না।

টুটুর ভ্রুকুঞ্চিত হল, বুঝলাম তার মনের ভাব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে—কিছুতেই তার খুট্ ধরে রাখতে পারছে না, মনে মনে ভারী মজা লাগতে লাগল। আমি আবার সুরু করলাম—পশ্চিমের অন্য শহরের মত এ-শহরের পথে মহিলাদের অবাধ ভ্রমণের রীতি নেই—কাজেই আমাদের এই ব্যবহার ওখানকার স্থায়ী অধিবাসীদের মনমত হল না।

এমনি সময় একটি ঘটনা ঘটল নিতাইবাবুকে নিয়ে। পঞ্চাশের পর তার বয়স। আমার চিকিৎসা বাবদ কিছু টাকা বেশ নির্ব্বিবাদে বহুদিন ফেলে রেখেছিলেন। কিন্তু যখন দেখলেন ফেলে রাখা আর সম্ভব নয় তখন একদিন আমাকে একটু অপমান করেই বললেন, আপনার ত মশাই আগে এত টাকার তাগাদা ছিল না। এখন ত দেখছি তাগাদার দায়ে প্রাণ বেরিয়ে গেল। একটু পরে ঠোঁট টেনে একটু বক্র হাসি এনে চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, তা আপনারই বা দোষ কি করে দি'- আজকাল বোধ করি প্রায়ই উপহার কিনতে হয়—আর না কিনেই বা উপায় কি? অমন charming companion...... আহা, না হয় একটু বয়সই হয়েছে তা বলে কি ছাই বুঝতেও পারি না।

তার এই অভদ্র ইঙ্গিতে ভীষণ চটে গিয়ে বললাম যে, তাঁর এ বিষয়ে কোন কথা বলবার অধিকার নেই। তিনি টাকা ধারেন দেবেন—আর তা-ছাড়া তিনি আমার অভিভাবক নন। এবং এই অযাচিত মন্তব্যের উপযুক্ত শাস্তি যে কি তাও আমার বিলক্ষণ জানা আছে। কিন্তু তাঁর বয়েস তাঁকে এ-যাত্রা রক্ষা করলে, আর একটি কথা না বলে আমার সামনে থেকে যেন চলে যান তা নইলে হয়ত তাঁর বয়সের সম্মানও রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না, বললাম।

দেখলাম তিনি আর দ্বিরুক্তি না করে সুড় সুড় করে চলে গেলেন। বেশ বুঝতে পারলাম আমার তখনকার সেই মূর্ত্তির সামনে দাঁড়িয়ে থাকবার তাঁর আর সাহসে কুলিয়ে উঠল না।

আমি বলে চললাম—কিন্তু এর ফল ভাল হল না, নিতাই-বাবু স্ব-নামে বে-নামে কল্পনার সাহায্যে আমার বিরুদ্ধে এমনই প্রচারকার্য্য চালালেন যে, অতি অল্প দিনের মধ্যেই সমস্ত শহরের মধ্যে আমি একটি অনিষ্টকারী জীব বলে প্রতিপন্ন হলাম। লোকের অত্যাচার ক্রমেই বেড়ে চলল। ক্রমে ক্রমে সকলের গৃহের আর মনের দ্বার আমার জন্যে রুদ্ধ হতে লাগল। শুধু খোলা রইল ঐ ডাক্তারের গৃহের আর মনের কপাট।

এই ডাক্তারের একটি তিন-চার বছরের মেয়ে ছিল—যেন একতাল নরম মাখন। পাতলা পাতলা ছোট গোলাপের মত ঠোঁট—মুক্তাসারির মত দাঁত—ডালিমের মত রাঙা তার মুখের ভেতরটা। একমাথা সোনালী রঙের রেশম—গুচ্ছে গুচ্ছে হয়ে পড়ে আছে যেমনি মসৃণ তেমনি কোমল। মেয়েটা চঞ্চলও তেমনি!......আমি জোর করে বলতে পারি টুটু এমন নরাধম কেউ নেই যে, এই মেয়েটিকে ভাল না বেসে থাকতে পারে। কি জানি প্রথম দিন থেকে কেমন করে ঐ মেয়েটি আমাকে আপন করে নিলে। আমি হলাম তার কাকু। রোজ ডাক্তারের বাড়ী গিয়ে বুবুকে নিয়ে কিছুক্ষণ না কাটালে আমার মন মানত না। বুবুও আমায় বেশ শান্ত মনে গ্রহণ করেছিল। আমি যতক্ষণ থাকতাম এক মিনিটও সে আমার সঙ্গ ছাড়ত না। চলে আসবার সময়ও সে তার ছোট ছোট হাত দুটি দিয়ে আমার গলা আঁকড়ে থাকত। অনেক করে ভুলিয়ে তবে তাকে ঘুমাতে পাঠাতে হত। এমনও অনেক দিন হয়েছে যে, আমার কোলের ওপর ঘুমিয়েছে তবে আমি আসতে পেরেছি।‥ যদি কোন দিন না যেতে পেরেছি মন আমার

ধৈর্য্যহারা হয়ে পড়ত। রাত্রে শান্তিতে ঘুমাতে পারতাম না। ছন্নছাড়া আমার জীবনে জানিস্ রে টুটু তোর পরে এল এই মায়ার বাঁধন।

এদিকে কিন্তু নিতাইবাবু ও তাঁর দলের নিষ্ঠুরতা ক্রমে বেড়েই চলতে লাগল। যত রকম সম্ভব-অসম্ভব ঘটনা তৈরী করে আমার কুৎসা প্রচার করতে উঠে-পড়ে লেগে গেলেন। ক্রমে সুরথবাবুর বাড়ীতে বেনামী চিঠি যেতে লাগল। সুরথবাবু আমায় সে-সব চিঠি দেখাতেন আর একটু একটু অবজ্ঞার-হাসি হেসে ছিঁড়ে ফেলতেন। যখন এতে কোন কাজ হ'ল না, তখন কেউ কেউ তাঁর বাড়ী বয়ে আমার সম্বন্ধে অযাচিত উপদেশ দিয়ে আসত।

কিন্তু ডাক্তার আমার ওপর কোনদিন বিরূপ হন নি, বা অসৌজন্য প্রকাশ করেন নি—তাই তাঁর বাড়ী যাওয়া কখন বন্ধ করি নি। মাঝে মাঝে মনে হ'ত তাও বন্ধ করব। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও তা পারতাম না। বুবু আমায় টেনে নিয়ে যেত।

একদিন আমি বসে আছি, ডাক্তারের সঙ্গে কথা কইছি, বুবু আমার কোলে বসে আছে এমন সময় নিতাইবাবু এসে হাজির। আমাকে দেখেই কেমন যেন হয়ে গেল। তারপর ডাক্তারকে গোপনীয় কিছু তথ্য জানাবার জন্য কন্‌সাল্‌টেশন রুমে ডেকে নিয়ে গেল। নিতাইবাবু চলে যাবার পর ডাক্তার ফিরে এলেন। তার মুখের দিকে চেয়ে বেশ বুঝলাম যে, শত চেষ্টা সত্ত্বেও ডাক্তার তার মনে যে দ্বন্দ্ব চলেছে তাকে থামাতে পারছেন না।.....একটু পরে বুবুকে রেখে আমি চলে এলাম—বুবু ঘুমিয়ে পড়েছিল পরম আরামে আমার কোলে।

এরপর আর ডাক্তারের বাড়ী যেতাম না। দেখা হলে ডাক্তারও আর বাড়ীতে ডাকতেন না, কিন্তু এজন্যে যে তার মন বেদনায় টন্‌টন্ করত সে তার চোখ দুটো দেখেই বুঝতে পারতাম। বেচারী লজ্জায় যেন আমার দিকে আর চাইতে পারতেন না। চোখে চোখে আমরা আমাদের অব্যক্ত ভাষা বুঝতে পারতাম। ডাক্তারের বাড়ীতে যাই না সত্যি কিন্তু বুবুর জন্য মন হাহাকার করে। তাকে না দেখে আমার পক্ষে থাকা অসম্ভব। সে যখন ঝি-এর সঙ্গে পার্কে বেড়াতে যেত তার বহু পূর্ব্বেই আমি সেখানে হাজির থাকতাম। দূরে থেকে আসতে দেখেই আমার মন তৃপ্তিতে ভরে যেত। সে যতক্ষণ থাকত তার সঙ্গে খেলা করতাম—আদর করতাম—বুকে রাখতাম। বিরুদ্ধপক্ষের তীব্র জ্বালা এই শিশু হৃদয়ের মোহন স্পর্শে শীতল হয়ে যেত।

মাঝে সাত-আটদিন আর তার দেখা পাই না, মন অশান্ত হয়ে ওঠে। মনে হয় ডাক্তারের বাড়ী গিয়ে খবর নি—পারি না। খানিকটা ভয়ে—খানিকটা অভিমানে দরজা পর্য্যন্ত গিয়ে ফিরে আসি।

একদিন পথে ওদের চাকরের মুখে শুনলাম যে, বুবুর জ্বর হয়েছে, আর কেবল 'কাকুর কাছে যাব' এই বলে কাঁদছে। কথাটা শুনে মনে পাষাণ চেপে বসল—জলে চোখ ভরে উঠল। দুর্জ্জয় অভিমান লজ্জা গেল কোথায় উঠি। সোজা চলে গেলাম ডাক্তারের বাড়ী। খবর পাঠালাম আমি বুবুকে দেখব। ডাক্তার সংবাদ পেয়ে তাড়াতাড়ি নেমে এসে আমার হাত দুটি ধরে বললেন—এসেছ ভাই! লজ্জায় আমি তোমার কাছে যেতে পারি নি। তোমার বুবু তার কাকুকে দেখবার জন্যে আকুল হয়েছে—তার এখন জ্বর ১০৪°।

তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে দেখি বুবু শুয়ে আছে আচ্ছন্ন ভাবে।

ডাক্তার বললেন—বুবু তোমার কাকু এসেছেন। এক মুহূর্ত্তে বুবুর আচ্ছন্ন ভাব কেটে গেল।

কাকু, কাকু, যাব।

বুবু তার ছোট হাত দুটো বাড়িয়ে দিলে। তার চোখ রক্তজবা, গায়ে আগুনের ঝাঁজ।......সবলে তাকে বুকে তুলে নিলাম। তার উত্তপ্ত দেহ আমার গায়ে গরম বোধ হল না—তার স্পর্শে আমার সন্তপ্ত মন শীতল হয়ে গেল।

কি আশ্চর্য্য! এক ঘণ্টার ভিতর বুবুর জ্বর কোথায় গেল ডাক্তারও তা বুঝতে পারলে না।......হয়ত বুবুর জ্বর তখনই ছাড়ত—সময় হয়ত হয়েছিল। কে জানে! এই যুক্তি যতবারই দি—তবু কেন জানি না মন থেকে এ ভাবটা কিছুতেই দূর করতে পারি না যে, আমার উপস্থিতিই বুবুর জ্বর ছাড়বার কারণ। জানি এটা যুক্তি নয়, তবু মন মানে কই?

বুবুর জ্বর উপলক্ষে ডাক্তারের বাড়ী আবার আমার যাওয়া-আসা আরম্ভ হয়েছিল; কিন্তু নিতাইবাবুর শ্যেন-দৃষ্টি থেকে এটা এড়াল না। তাই একদিন এসে উড়ো উড়ো ভাবে ডাক্তারকে বললে—দেখ বাপু তোমাদের পাঁচজনের বাড়ী যাওয়া-আসা করতে হয়। তোমরা ডাক্তার, অন্দর তোমাদের কাছে মুক্ত রাখতে হয়—তাই তোমাদের আচরণ, ব্যবহার, সঙ্গ এ-সবগুলোর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে।

আবার ডাক্তারের বাড়ীতে যাওয়া-আসা বন্ধ করলাম।

আমার বেদনাতুর মনের ক্ষতে যেখানে গেলে ক্ষণেকের তরে স্নিগ্ধতার অমিয় সিঞ্চিত হ'ত—আমার এই আশ্রয়টুকুও বন্ধ করাতে আর এখানে টিকতে পারলাম না।

হঠাৎ একদিন সব তুলে দিয়ে বিছানা-বাক্স বেঁধে বেরিয়ে পড়লাম স্বদেশের দিকে। ষ্টেশনে যাবার পথে ডাক্তারের বাড়ী পড়ে। অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই একবার বুবুকে শেষবারের মত না দেখে যেতে পারলাম না। গাড়ী দাঁড় করিয়ে নেমে পড়লাম। নেমে দেখি বুবু ঝিয়ের কোলে সদরে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখেই ঝির-এর কোল থেকে নেমে এসে আমার হাঁটু দুটা জড়িয়ে ধরলে। তৎক্ষণাৎ তাকে বুকে তুলে নিলাম। সম্ভবত এই একরত্তি মেয়েটা গাড়ী দেখে আর তার ছাদে জিনিষ-পত্তর দেখে বুঝে নিলে আমি কোথাও যাচ্ছি। তার ওপর আজ ক'দিন আমায় দেখেনি—সে বললে, কাকু কোথা যাচ্ছ? আমি তোমার সঙ্গে যাব।

জবাব দিতে পারলাম না—মুখ লুকিয়ে তার কাঁধে শুধু গোটাকতক চুমা খেলাম। নামিয়ে দিতে গেলাম—নামবে না—আঁকড়ে ধরে বলে—না আমি তোমার সঙ্গে যাব।

অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম—আচ্ছা মাকে বলে এস।

(শেষাংশ ২৯৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মুসলমানের সাহিত্যিক দৈন্যের কারণ

রেজাউল করীম এম-এ বি-এল

কেহ কেহ অনুযোগ করিয়া থাকেন যে, বাঙালী মুসলমান সাহিত্যক্ষেত্রে অত্যন্ত পশ্চাৎপদ। যুগান্তকারী লেখক তাহাদের মধ্যে খুবই কম, আর ব্যাপকভাবে সাহিত্য-চর্চ্চা নাই বলিলেই চলে। হয়ত কিছুদিন পূর্ব্বে এই সব কথা সত্য ছিল। কিন্তু আজকাল মুসলমান লেখক শিল্পীর মন লইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছে এবং ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, বর্ত্তমানে বাঙালী মুসলমান সাহিত্যক্ষেত্রে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের যেরূপ সাহিত্যিক দৈন্য ছিল, আজ সেরূপ নাই। সে যুগে উল্লেখযোগ্য পুস্তকের সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল। কিন্তু আজ আর সেদিন নাই। সমাজের নানা স্তর হইতে লেখক, কবি, ঐতিহাসিক উত্থিত হইয়া বাঙলা-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির সহায়তা করিতেছেন। যদিও তাহা যথেষ্ট নহে, এবং তাহার গতি অত্যন্ত ধীর ও মন্থর। সকল যুগে যে সকল বাধা-বিঘ্ন সাহিত্যকে কলুষিত করে এবং সাহিত্যিকের প্রকৃতিদত্ত প্রতিভাকে ম্লান করে, যদি বাঙালী মুসলমানকে সেগুলির সম্মুখীন হইতে না হইত তবে হয়ত তাহাদের এরূপ দৈন্য থাকিত না। সাহিত্যের প্রসারের ও ক্রম-বিকাশের পথে প্রধান বাধা হইতেছে, অসাহিত্যিকের ডিকটেটারী নির্দ্দেশ। এই নির্দ্দেশ অনেকের সহজাত প্রতিভাকে বিনষ্ট করিয়াছে এবং অনেক জাতির মধ্যে সত্যিকারের জ্ঞানবিস্তার হইতে দেয় নাই। বাঙালী মুসলমানের সাহিত্যিক জাগরণের মাহেন্দ্র-ক্ষণে অপরের নির্দ্দেশ, স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দভাবে তাহার প্রতিভার উন্মেষ হইতে দিতেছে না,—কেহ কেহ একটু যে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা এই নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া।

যদি কোন লেখক, বা কবি সর্ব্বদাই অপরের নির্দ্দেশ অনুসারে চলিতে থাকেন, অপরকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য লেখনী ধারণ করেন, এবং হুমকী-ধমকীতে ভীত হইয়া পড়েন, তবে তাঁহার নিকট কোন উচ্চাঙ্গের সাহিত্য আশা করা যাইতে পারে না। এই অপর ব্যক্তি যদি অসাহিত্যিক হন, সাহিত্যের আদর্শ সম্বন্ধে যদি তাঁহার কোন জ্ঞান না থাকে, তবে তাঁহার নির্দ্দেশে অথবা সম্মতিক্রমে লিখিত রচনা যে কি বস্তু হইবে, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। বাঙালী মুসলমান সাহিত্যিককে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য যে সব নির্দ্দেশ আসিয়া থাকে, তাহা প্রকৃত সাহিত্যিকের নিকট হইতে নয়। তাহা আসে অসাহিত্যিকের নিকট হইতে। মৌলবী মৌলানা, রাজনীতিক ভাগ্যান্বেষী এই শ্রেণীর লোক কখনও মুসলিম-স্বার্থের নামে সাহিত্যক্ষেত্রে নিজেদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। আর সমাজ এমনি অন্ধকারে পড়িয়া আছে যে মাথা হেঁট করিয়া সেই নির্দ্দেশ গ্রহণ করিতে কাতর হয় না। উদাহরণস্বরূপ বঙ্কিম শতবার্ষিকীর প্রতি মুসলিম-সাহিত্যিকগণের আচরণ উল্লেখ করা যাইতে পারে। বঙ্কিম মুসলিম-বিদ্বেষী কিনা, তাহা সাহিত্যিকের বিচারবস্তু নহে। সাহিত্যিক তাঁহাকে সাহিত্যগুরু হিসাবে সম্মান করিবেন। কিন্তু আমাদের মৌলানারা এবং রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিতগণ ফতোয়া দিলেন, কোনও মুসলমান বঙ্কিম শতবার্ষিকীতে যোগদান করিতে পাইবে না। আর অমনি বিচার-বুদ্ধির মাথা খাইয়া দু'একজন ব্যতীত আমাদের অধিকাংশ সাহিত্যিক তাঁহাদের সাহিত্যগুরুর সম্মানের জন্যও উহাতে যোগদান করিলেন না, একেবারেই 'বয়কট' করিলেন। এইসব অন্যায় নির্দ্দেশ মানার ফলে আমাদের এমন এক সাহিত্যিক-দৈন্য উপস্থিত হইয়াছে, যাহা দূর করিতে বহুযুগের সাধনার প্রয়োজন হইবে।

সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে পরাধীন অবস্থা সাহিত্যের চরম উন্নতির পক্ষে বিশেষ বিঘ্নকর। সে পরাধীনতা রাজনৈতিক হউক, অথবা সমাজনৈতিক ও ধর্ম্মনৈতিক হউক, একই কথা। প্রত্যেক প্রকারের পরাধীনতা লেখকের সরল মনের স্বাধীন চিন্তা ও স্বতঃউৎসারিত ভাবধারাকে আড়ষ্ট, আবিল ও ব্যাহত করিয়া থাকে। কিন্তু যেখানে লেখকের কোন ভয় থাকে না, প্রলোভনের কুৎসিত ইঙ্গিত থাকে না, সেখানে তাহার প্রাণের আবেগের স্বাভাবিক ধারাকে রুদ্ধ করিবার কেহই থাকে না। সে আপনার মনে আপনার আনন্দে প্রাণের গান গাহিতে পারে, নির্ব্বিঘ্নে জগৎ-সভায় তাহার গান শুনাইতে পারে। এইরূপ অবাধ স্বাধীনতা পাইলে সাহিত্যের এরূপ দ্রুত প্রসার হয় যে, মনে হইবে যেন কোন ঐন্দ্রজালিক শক্তি আসিয়া সাহিত্যকে আগাইয়া দিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিকই সেরূপ কোন শক্তি কাহাকে সাহায্য করে না,—ইহা সম্ভব হয় বন্ধন মুক্ত মন হইতে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ইতিহাসের নজীর দেখান সম্ভব হইবে না, অনুসন্ধান করিলে প্রত্যেক দেশের ইতিহাস হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। চতুর্দ্দশ লুইয়ের যুগের ফরাসী সাহিত্য ও পিউরিটান যুগের ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস এই কথাই প্রমাণ করিবে যে, অপরের নির্দ্দেশ সাহিত্যকে কলুষিত করিয়া দেয়। (বাকলে সাহেব প্রণীত History of Civilisation নামক গ্রন্থের ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য)।

যে সব বাধা চতুর্দ্দশ লুইয়ের যুগের সাহিত্যিকবর্গকে আড়ষ্ট করিতেছিল, আমরা আজ সেই সব বাধার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। বহু দিনের তন্দ্রা ও অবসাদ হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বাঙলার মুসলমান সাহিত্যিকবর্গ দেখিলেন এক পর্ব্বত প্রমাণ বাধা। যাহা প্রত্যেক যুগের সাহিত্যিকের বিধিদত্ত প্রতিভাকে অকালে বিনষ্ট করিয়াছে। স্বাধীনভাবে কোন বিষয় চিন্তা করিবার অবসর তাহার নাই, গতানুগতিকতার মোহ কাটাইবার ক্ষমতা তাহার নাই, ধর্ম্মান্ধতার লৌহ আবরণ ভেদ করিয়া তাহার অন্তরে নবযুগের আলোক রশ্মি প্রবেশ করিবার উপায় নাই। সর্ব্বোপরি অন্যায়কে বুঝিতে পারিয়াও তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিবার সৎসাহস তাহার নাই। এত বাধা ভেদ করিয়াও যদি কেহ একটু-আধটু মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে সাহস করিয়াছে তাহার বাণীকে প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করিবার মত উদারতা কাহারও নাই। যে সমাজের বিদ্বন্মণ্ডলীর এই অবস্থা, তাহার নিকট কি কখনও সৎ-সাহিত্য আশা করা যাইতে পারে? এই বন্দীকৃত মন, শৃঙ্খলিত প্রতিভা কি কখনও বিশ্ব-সাহিত্যের জন্ম দিতে পারে? ইহাদের লেখনী হইতে যাহা উৎসারিত হইবে, তাহা ক্ষণিকের সামগ্রী হইবে, তাহা না দিতে পারে সাহিত্যিক আনন্দ, না করিতে পারে কোন একটা মহৎআদর্শের প্রতিষ্ঠা।

উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের পক্ষে যেগুলি প্রধান বাধা এবং সর্ব্বদাই পরিত্যাজ্য আজ তাহাই হইয়াছে আমাদের কণ্ঠের ভূষণ। আমাদিগকে বিনা বিচারে স্বীকার করিয়া লইতে হয় যে, আমাদের 'আলেম', 'ফাজেল'গণ (পণ্ডিতগণ) ও 'পীর মুরশিদগণ' যে সব বাণী দিয়া থাকেন, তাহা মুসলমানের জন্য একমাত্র প্রতিপাল্য বিষয়, তাহাই হইতেছে খাঁটি ইসলাম এবং তাহাতেই মুসলিম-সংস্কৃতি অব্যাহত রহিবে। সুতরাং সেইগুলিকে মানিয়া আমরা সাহিত্য সাধনায় অগ্রসর হইয়া থাকি। তাঁহাদের নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহভাব জাগিয়া উঠে না; কারণ তাহাতে আছে সামাজিক শাসনের কঠোর ভয়। ডাঃ জনসনের প্রভাবিত 'সিউডো-ক্লাসিক্যাল' যুগে যে-ভাবে সাহিত্য-রচনা হইত, যে-ভাবে অপরের নির্দ্দেশ মাথায় করিয়া লেখকগণ সাহিত্য-চর্চ্চা করিতেন, আজ বাঙালী মুসলমানের সেই যুগ। সুতরাং আমাদের সাহিত্যও কতকটা জনসনের যুগের মত হইতেছে—স্বাধীন চিন্তার আদর্শ হইতে বিচ্যুত ও গতানুগতিকতার পঙ্কে নিমজ্জিত। ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার উপায় নাই; শুধু সামাজিক শাসন নয়, প্রাণহত্যারও ভয় আছে। সে-যুগের ইংরেজী সাহিত্যের সর্ব্বাপেক্ষা দোষ ছিল—Didactism, অর্থাৎ প্রত্যেক রচনায় নীতি প্রবেশ করাইবার অহেতুকী আগ্রহ। আমাদের অবস্থাও তাহাই। প্রত্যেক রচনা কোর-আন হদীস অথবা ইসলামী ইতিহাস সম্মত হওয়া

চাই, নতুবা তাহার বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য চলিতে থাকিবে। মৌলবী মৌলানাদের কঠোর শাসনে আমাদের সাহিত্য 'ডাইডাকটিজম'এ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, এতদ্ব্যতীত যেন সাহিত্যই হইতে পারে না। সাধারণত প্রবন্ধ, উপন্যাস ও কবিতায় লেখকগন পূর্ণ-স্বাধীনতা ভোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু সাহিত্যের এই তিনটি প্রধান শাখায় আমাদের লেখকগণের স্বাধীনতা পদে পদে খণ্ডিত হইতেছে! এই সব রচনায় তুমি বাঁধাধরা নিয়মের বাহিরে যাইতে পাইবে না। প্রবন্ধে স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দিলেই তোমার বিরুদ্ধে 'কুফরী' ফতোয়া বাহির হইবে। ব্যবহৃত শব্দ-নির্ব্বাচনে একটু অসাবধান হইলেই তুমি পৌত্তলিক। উপন্যাস ও কবিতায় ইসলামের সাধারণ নীতি ঢুকাইতে হইবে, নামাজ রোজার মহিমা প্রচার করিতে হইবে, নতুবা সে লেখক কাফের। অন্য পরে কা কথা, বিখ্যাত জনপ্রিয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে ইঁহারা কাফের বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। অবশেষে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ গজল গান রচনা করিয়া তিনি আবার মুসলিম দলে স্থান পাইলেন। এই-ভাবে অসাহিত্যিকের নির্দ্দেশ অনুসারে চলিলে সাহিত্যের হত্যা-সাধন হইতে কি কিছু বাকি থাকিবে? তাই আমাদের সাহিত্য হইয়া পড়ে ইসলাম প্রচারের বাহন, অথবা ইসলাম-বৈরীদের সমালোচনা। এই সাহিত্য বিশ্বের দরবারে পৌঁছিতে পারে না। এই সাহিত্য religious in tone, manner and ideal হইয়া পড়িয়াছে। আনন্দ দান যাহার উদ্দেশ্য, প্রাণের মধ্যে একটা বিপুল পুলক জাগান যাহার উদ্দেশ্য, এ সাহিত্য সে সাহিত্য নয়। যাহারা আনন্দ চায়, তাহারা এ সাহিত্যকে আদর করিতে পারে না। কারণ সকল প্রকার আনন্দ আমাদের জন্য নিষিদ্ধ।

সাহিত্যে কেবলমাত্র ধর্ম্মভাব থাকা চাই, ইহাই যাহাদের দাবী, তাহারা ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ (Non-religious literature) সাহিত্য কোনও মতেই সহ্য করিতে পারে না। আর সমাজের দাবী অনুসারে লিখিতে হইলে লেখকগন ইহার বেশী কিছু দিতে পারেন না। সেই জন্য আমাদের লেখকবর্গের দৃষ্টি Non-moral বা Non-religious বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয় না। কেবল ধর্ম্মীয় সাহিত্য সৃষ্টি করিবার দিকে তাঁহাদের বেশী ঝোঁক। নজরুল ইসলাম যখন তাঁহার অমর কবিতা 'বিদ্রোহী' প্রকাশ করেন, তখন সমাজ তাঁহাকে বুঝিতে পারে নাই—"বিদ্রোহী" কবিতার অন্তর্নিহিত ভাব বুঝিবার মত লোক সমাজে খুবই কম ছিল,—যে "বিদ্রোহী" খোদার আসন ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উঠিতে চায়, ভগবানের বুকে লাথি মারিতে চায়—তাহাকে সমাজ ক্ষমা করিতে প্রস্তুত ছিল না। সুতরাং তাঁহার বিরুদ্ধে কাফেরী ফতোয়া জারি হইল। শ্রদ্ধেয় কাজী আব্দুল ওদুদ, কবি আব্দুল কাদের, স্বর্গীয় আবুল হোসেন প্রমুখ লেখকগণ মুসলিম চিন্তা-জগতে একটা স্বাধীন পথ ধরিয়া চলিতেছিলেন। তাঁহাদের চিন্তার স্বাধীনতা, হৃদয়ের উদারতা অপরাপর লেখক হইতে তাঁহাদিগকে একটা বৈশিষ্ট্য প্রদান করিল। কিন্তু হইলে কি হইবে, যেহেতু তাঁহারা সমাজের মন জোগাইয়া চলিতে পারেন নাই, সেইহেতু তাঁহারা আজ কতকটা অনাদৃত ও অবহেলিত। ইঁহা-দিগকে লক্ষ্য করিয়া কাজী আব্দুল ওদুদ একটা চমৎকার কথা বলিয়াছেন:—"পাঠক-সমাজের বিচারশক্তি এখনও অত্যন্ত দুর্ব্বল। সেই দুর্ব্বলতার সুযোগ পুরোপুরি নেবার উদ্দেশ্যে আমাদের অনেক লেখককে অনেক সময় লেখতে পাওয়া যায় অত্যন্ত অকিঞ্চিৎ রচনায় হাত দিতে। পাঠক-সমাজের অজ্ঞতা এইভাবে দাঁড়াচ্ছে লেখক সমাজের উৎকর্ষলাভের পরিপন্থী হয়ে।" (সমাজ ও সাহিত্য পৃঃ ১০৩)।

ধর্ম্মমূলক রচনার প্রতি সমাজের আগ্রহটা অত্যন্ত বেশী বলিয়া সাহিত্যের অন্যান্য দিক বাদ পড়িয়া যাইতেছে। যাহাকে বলে profane literature অর্থাৎ অধর্ম্মীয় সাহিত্য, তাহার প্রতি লেখকের ও সমাজের দৃষ্টি নাই বলিলেই হয়। কতকগুলি বিখ্যাত লেখকের প্রকাশ্য পথে লাঞ্ছনার পর অনেকে সহজে সেপথে যাইতে চাহিতেছেন না। প্রথমত উৎসাহ পাইবেন না, বরং সাম্প্রদায়িক ও ধর্ম্মান্ধ পত্রিকাগুলি উঁহাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা চালাইয়া লোক-সমাজে হেয় করিয়া তুলিবেন। এই সব কারণে লেখকগণকে পাঠকের মন বুঝিয়া লিখিতে হয়,— কিন্তু তাহাতে স্বাধীনভাবে লেখা হয় না, সময় ও প্রয়োজনের তাগিদে যাহা লেখা হয়, তাহার যথার্থ মূল্য অতি অকিঞ্চিৎকর। অনুপ্রেরণা ও প্রতিভা এসব সমাজের অদূরদৃষ্টির কারণে লোপ পাইতে বসিয়াছে। প্রতিভার বিচিত্র বিকাশ, কল্পনার বিশালতা, গভীর অন্তর্দৃষ্টি—এসব লেখার মধ্যে থাকে না। ফলে আজ আমাদের মধ্যে এমন এক সাহিত্যিক দৈন্য উপস্থিত হইয়াছে যে, সমাজের মানসিকতার আমূল পরিবর্ত্তন না করিলে তাহা আর সহজে দূর হইবে না।

মেমসায়েব

(২৯৩ পৃষ্ঠার পর)

না- তুমি পালিয়ে যাবে—

না—মেম-সাহেব যাব না। তুমি যাও ভিতর থেকে বলে এস। আমার মুখের পানে চেয়ে বুঝি বা আমার কথায় বিশ্বাস করে বললে—আমি এক্ষুণি ছুটে আসছি।

সে চলে গেলে আমি আর দাঁড়াতে পারলাম না, ছুটে গাড়ীর দিকে যাচ্ছি—বাইরের ঘরের দিকে নজর পড়ল—দেখলাম নিতাইবাবু আর ডাক্তার নিজে। আমায় দেখে ডাক্তার তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে বাইরে এলেন—এসে আমার হাত দুটো মুঠোর ভিতর ধরে বললেন—একি চললে নাকি? তাকি কখন হয়—ও-সব কিছু নয়—ঠিক হয়ে যাবে। তোমার যাওয়া কিছুতেই.........।

নিতাইবাবু এসে আমাদের মাঝে দাঁড়াল। ডাক্তার আর কথা বলতে পারলেন না—শুধু হাত দুটো ধরে রইলেন। বেশ উপলব্ধি করতে লাগলাম, বন্ধুকে চির বিদায় দেবার বিরুদ্ধে ডাক্তার অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছেন।

ডাক্তারের হাত থেকে একটু জোর করেই হাতটা ছাড়িয়ে নিলাম।

ছুটে গাড়ীতে গিয়ে বসলাম। গাড়োয়ানকে বললাম, 'জল্দি চালাও'।

নিতাইবাবুর কণ্ঠস্বর কানে এল—আপদ গেল। গাড়ীর পেছনের খড়খড়ি তুলে দেখি তৎক্ষণে বুবু এসে পড়েছে। ডাক্তার তাকে কোলে নিয়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু আশ্চর্য্য, ফিরে এসে আমায় দেখতে না পেয়েও বুবু আজ কাঁদছে না—শুধু আমার গাড়ীর পানে চেয়ে আছে।

আজ আমার মেম-সায়েবের ঘন-পল্লব-আবৃত ক্ষণ-চঞ্চল নীল আঁখিতারা দুটি বেদনাকাতর।

অবিশ্বাসী

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

১৯

বহুদিন পরে মাণিক গ্রামে ফিরিল।

যাইবার কালে যেমনটি দেখিয়াছিল এখনও প্রায় তেমনটি আছে। কেবল রাস্তাগুলি পাকা হইয়াছে, বন-জঙ্গল অনেক সাফ্ হইয়াছে, এখানে ওখানে কোঠাবাড়ী দেখা যাইতেছে।

একটা নূতন দাতব্য চিকিৎসালয়ে রোগীর ভিড় নেহাৎ মন্দ নহে। একজন ডাক্তার ও জনদুই কম্পাউণ্ডার ঔষধ বিলি করিতেছেন। পাঁচ সাত ক্রোশ দূর হইতে তিন চারিখানি গরুর গাড়ী রোগী লইয়া আসিয়াছে।

সে শুনিল, আট-দশখানি গ্রামের লোক নিত্য এখানে ঔষধ লইতে আসে।

পরিচিতেরা হাত তুলিয়া নমস্কার করিল, কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। মাণিক তাহাদের যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া অগ্রসর হইল।

জমিদার বাড়ীর দুয়ারে আসিয়া মুহূর্ত্তের জন্য তাহার পা দুইটা কাঁপিয়া উঠিল। সেই চিরপরিচিত লাল সুরকী-ঢালা পথটি দপ্তর ও বৈঠকখানার পাশ দিয়া অন্তঃপুর অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। পথের দু'পাশে গোলাপ মল্লিকার ঝাড়। দপ্তরে দু একজন কর্ম্মচারী খাতাপত্র গোছাইতে গোছাইতে রামপ্রসাদী সুর গুন্ গুন্ করিয়া ভাঁজিতেছিল। কেবল সুরেনবাবুর বসিবার ঘরটি তালাবন্ধ। এমন ত কখনও হয় না!

সে দ্রুতপদে বারান্দায় উঠিয়া একজন মুহুরীকে ডাকিল।

মাণিকের আকস্মিক আগমনে তাহাদের সুরচর্চ্চা থামিয়া গেল। সকলেই নমস্কার করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

মাণিক তালাবন্ধ ঘরটা দেখাইয়া বলিল, "মেসোমশায় কোথায়?"

একজন উত্তর দিল, "আজ্ঞে বাবু, তিনি ত তীর্থভ্রমণে গেছেন মাস দুয়েক হ'ল।"

মাণিক ছোট্ট একটি 'হুঁ' বলিয়া অগ্রসর হইতেছিল।

সেই ব্যক্তি বিনীতভাবে পুনরায় বলিল, "বাড়ীর মধ্যে গিন্নি-মাও নেই। তিনিও কর্ত্তার সঙ্গে গেছেন।"

মাণিক থমকিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত কোন প্রশ্ন করিবার শক্তি যেন তাহার রহিল না।

একজন একখানা চেয়ার আনিয়া বলিল, "বাবু বসুন।"

অবসন্ন মাণিক তাহাতে ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া কহিল, "কতদিন হ'ল তাঁরা তীর্থভ্রমণে গেছেন?"

সেই ব্যক্তি উত্তর দিল, "আজ মাস দুয়েক হ'ল। মদন-বাবুর জেল হবার পরের দিন মা নিজে সব গুছিয়ে নিয়ে কর্ত্তাকে সঙ্গে ক'রে বেরিয়ে প'ড়লেন।"

মাণিক রুদ্ধ নিশ্বাসে প্রশ্ন করিল, "কবে আসবেন কিছু জান?"

"—আজ্ঞে না। ব'লেছেন ফিরতে দেরী হবে।"

রেণু এ আঘাত সহিতে পারে নাই। দাবদগ্ধা হরিণীর মত ছুটিয়া পলাইয়াছে। পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মাণিক অবাধ্য অশ্রু মুছিয়া ফেলিল। এতগুলি লোক তাহার দুর্ব্বলতার সাক্ষী রহিবে? ছি!

বহুক্ষণ পরে সে বলিল, "তোমাদের জমিদারীর ভার কার ওপর, হরিপদ?"

হরিপদ বলিল, "আজ্ঞে দেওয়ানজীই সব দেখাশোনা ক'রছেন। তিনি বলেন, "এ আমার দেবোত্তর সম্পত্তি যত-দিন প্রাণ থাকবে এর একগাছি কুটো পর্যন্ত নষ্ট হ'তে দেব না'।"

মাণিক চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বলিল, "দেওয়ান কাকা বাড়ীতেই আছেন বোধ হয়?"

"—হাঁ বাবু, একবার বাড়ীর মধ্যে যাবেন না?"

"আগে দেওয়ান কাকার সঙ্গে দেখা ক'রে আসি।"

মাণিক মুখ তুলিয়া বাড়ীটার পানে আর চাহিতে পারিল না। ওখানে প্রত্যেক কক্ষে অলিন্দে সোপানে একদিন যে স্নেহের স্বর মধুর হইয়া বাজিত, এখন সে কণ্ঠ নীরব হইয়া গিয়াছে।

হয়ত শয্যা তেমনই পাতা আছে, স্নেহময়ীর বাহু উপা-ধান নাই। বালক মাণিক কতদিন এই উপাধানে মাথা রাখিয়া নিশ্চিন্তে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার স্নেহসিক্ত অন্তরের স্পর্শ তাহার দাস-জীবনের পঙ্ক গ্লানিকে নিঃশেষে মুছিয়া দিয়া একদা জগতের বুকে মানুষের সঙ্গে দাঁড় করাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু চমৎকার প্রতিদান দিয়াছে সে দেশের কর্ম্ম উপলক্ষে মাতিয়া!

সে যদি খেয়ালের বশে অমন রূঢ় আঘাত না করিত' ত সে অমূল্য সম্পদ্ অকালে নষ্ট হইত না। রেণুকে লইয়া মনে মনে যে স্বপন রচনা করিয়াছিল তাহাও অমন নিষ্করুণ আঘাতে ভাঙ্গিয়া যাইত না।

হতভাগ্য দাস-মনের অন্তরালে কোথায় অপ্রত্যয়ের বিষ-বীজ লুকান ছিল, সহসা একদিন প্রকাশ হইয়া এমন সাজান সংসারটিকে তিক্ত জর্জ্জরিত করিয়া দিল!

আগুন সে নিজের হাতে জ্বালাইয়াছে। তাহার অন্তর ত জ্বলিতেছেই, সঙ্গে সঙ্গে এ বাড়ীর যতগুলি প্রাণী তাহার চারি পার্শ্বে সুখ-স্বপ্নের মত ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহারা জ্বলিয়া জ্বলিয়া নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে। দাহ-যন্ত্রণায় রেণু তীর্থভ্রমণে গিয়াছে।

দেওয়ানের সঙ্গে দেখা হইলে মাণিক আর আপনাকে সম্বরণ করিতে পারিল না। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "আমিই এত বড় সংসারটাকে নষ্ট করলাম, কাকা! কেন মা আমায় সেখান থেকে কুড়িয়ে এনেছিলেন?"

রামরতন তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "তোমার দোষ কি বাবা! মানুষের কর্ম্মফল খণ্ডন করে কার সাধ্য। গিন্নিমার সব দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল, কেবল রেণু-মার সম্বন্ধে কেন অমন ভুল ক'রলেন ব'লতে পারি না।"

মাণিক বলিল, "তাঁর ভুল নয়, কাকাবাবু; দোষ আমার।

এই হতভাগার ওপর অভিমান ক'রে তিনি এমন কাজ ক'... গেছেন। কাকাবাবু, আমার সমস্ত উদ্যমের মধ্যে মার দীর্ঘ-নিশ্বাস যেন স্পষ্ট শুনতে পাই। তিনি বিষয়ের চেয়ে আমায় ভালবাসতেন, আর আমি এমনি অকৃতজ্ঞ, তাঁর স্নেহের সুযোগ নিয়ে তাঁকে মেরে ফেলেছি।"

কথাশেষে মাণিক ক্ষুদ্র বালকের মত ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

রামরতন প্রবোধ দিতে লাগিলেন।

মাণিক বলিল, "আমায় বোঝাবেন কি কাকা, একথা আমি কোনদিন ভুলতে পারব না। জমিদার বাড়ীর এই দুর্ঘটনার জন্য আমি দোষী, আমি দায়ী। আচ্ছা কাকা, যাবার সময় রেণু কেঁদেছিল?"

রামরতন বলিলেন, "না বাবা, মার মুখখানি আমার স্থির প্রশান্ত ছিল। তিনি যেন সব জানতেন। মদনের জেল হওয়ার সংবাদ পেয়ে একটি ছোট নিশ্বাস ফেলে ব'ললেন, 'কাকাবাবু, এ আমি জানতাম।' ব্যস, ওই দুটি কথা। তার পরদিন বললেন, 'কাকাবাবু, ভেঙে আমি কিছুতে পড়ি না—অনেক সহ্য ক'রেছি। কিন্তু আপাতত দিনকতক বাইরে না গেলে মরে যাব। লোকে যখন ব'লবে ওর স্বামী ওমুক,—আমার কাছে এসে সহানুভূতি জানাবে, আমার চোখের জল মুছিয়ে দিতে আসবে—সে আমি সইতে পারব না।' আমিই উদ্যোগ ক'রে তীর্থভ্রমণের বন্দোবস্ত ক'রে দিলাম।"

মাণিক জিজ্ঞাসা করিল, "ক্ষান্ত পিসি কোথায়?'

রামরতন বলিলেন, "বাড়ীতেই আছেন। তাঁর মুখের কাছে দাঁড়ায় কার সাধ্য। মা যে দেশ ছেড়েছেন সেও এক কারণ। আর—" বলিয়া তিনি চুপ করিলেন।

মাণিক বলিল, "বলুন কাকাবাবু, আর কি?"

রামরতন বলিলেন, "আর মদনের জেল হওয়ার আগে মা পণ ক'রেছিলেন, এর জন্য ষ্টেট্ থেকে এক পয়সা খরচ করা হবে না। আমরা কত বুঝিয়েছি, কিন্তু তাঁর সেই এক কথা। 'আমার পাপের ভোগের জন্য দেবোত্তর সম্পত্তি নষ্ট ক'রতে পারব না। ও অনুরোধ আমায় ক'রবেন না, কাকাবাবু। নিজের স্বার্থের চেয়ে কর্ত্তব্য বড়—এ শিক্ষা মা-ই আমায় দিয়ে গেছেন'।"

মাণিক পাংশুমুখে বলিল, "আর—আর আমার সম্বন্ধে কিছু বলেছিলেন?"

রামরতন বলিলেন, "মার কেমন বিশ্বাস—এ সম্পত্তি তোমারই প্রাপ্য। সে সময় তুমি যদি একবার খবর পেয়ে আসতে ত, মদনবাবুর জেলটা হয়ত হ'ত না। আর—"

মাণিক সজোরে দুটি করে বক্ষ নিপীড়িত করিয়া কহিল, "আর শুনতে চাই না, কাকাবাবু। একটু আগে আমায় প্রবোধ দিচ্ছিলেন না,—কর্ম্মফল! কিন্তু যদি জানতেন আমিই এ কর্ম্মফল তৈরী ক'রেছি। কাকাবাবু, কর্ত্তব্য ঠিক করতে না পেরে সে আমায় চিঠি লিখেছিল। আমি নিষ্ঠুরের মত জবাব দিয়েছিলাম, তোমার কর্ত্তব্য তুমিই ক'র। সেই অভিমানেই সে নিজের সর্ব্বনাশ ক'রে গেছে; বিষয়ের একটি পয়সাও প্রাণান্তে খরচ করেনি।"

রামরতন ধীরে ধীরে বলিলেন, "সে সময় তোমার একবার আসা উচিত ছিল। আমি কর্ত্তাকে অনেক অনুরোধ ক'রলাম, কিন্তু তিনিও এ সম্বন্ধে বরাবর নির্লিপ্ত রইলেন। কি জানি, কোথা দিয়ে কি হ'য়ে গেল।"

মাণিক সহসা প্রশ্ন করিল, "তাঁরা এখন কোথায়?"

রামরতন বলিলেন, "আজমীঢ়ে। সেখানে নাকি ভাল লেগেছে, দিনকতক থাকবেন। তারপর যাবেন দ্বারকায়।"

—"তবে আসি—কাকাবাবু।"

রামরতন তাহার হাত ধরিয়া কহিলেন, "খাবার সময় কোথায় যাবে বাবা। এখানেই চাট্টি খেয়ে যাও। না, না কোন আপত্তি আমি শুনব না।"

অগত্যা মাণিককে বসিতে হইল।

রামরতন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখন কোথায় যাবে?"

মাণিক উত্তর দিল, "আজমীঢ়ে। সেখানে না পাই—দ্বারকায়। সারা ভারতবর্ষ খুঁজে তাঁদের বার ক'রে দেখা আমায় ক'রতেই হবে।"

আহারান্তে মাণিক সেইদিনই যাত্রা করিল।

২০

মাণিক কলিকাতায় আসিল রাত্রি ন'টায়। পশ্চিম যাত্রার সুবিধাজনক ট্রেন তখন নাই। সুতরাং সে রাত্রিটা কোন পরিচিত মেসে তাহাকে কাটাইতে হইল।

পরদিন আটটায় গাড়ী।

সকালে উঠিয়া ভাবিল, যাইবার পূর্ব্বে আলোকনাথের সংগে একবার দেখা করিয়া আসি। ফিরিবার নিশ্চয়তা নাই, অথচ তাহার কাছে প্রতিশ্রুত আছি। একবার যাওয়াই ভাল।

বাটীর সম্মুখে ছোট্ট একটু উদ্যান। আলোকনাথ সেখানে পায়চারি করিতেছিল।

মাণিককে আসিতে দেখিয়া সহর্ষে চীৎকার করিয়া কহিল, "সুপ্রভাত—সুপ্রভাত! সত্যিই তোমায় এত শীঘ্র আশা করিনি, ডাক্তার।"

মাণিক বলিল, "আমিও ভাবলাম, চলেছি দূর দেশে, কবে ফিরব তার ঠিক নেই, একবার দেখাটা ক'রে আসি।"

আলোকনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "দূর দেশে কেন?"

"চল, সব বলছি।"

দুজনে বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলে আলোকনাথ বলিল, "তোমার কথা শোনবার আগে চায়ের ফরমাস করি।"

মাণিক ব্যস্ত হইয়া বলিল, "না, না, থাক।"

আলোকনাথ হাসিয়া বলিল, "লজ্জা কেন ডাক্তার? ওতে ট্যানিক বিষ আছে যদিও তোমরা ব'লে থাক এবং মুক্তকণ্ঠে ওর দোষ কীর্ত্তন কর, তবু আমার মনে হয়, তোমাদের চেয়ে ওর পরমভক্ত আর কেউ নেই।"

মাণিক ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "কিসে বুঝলে?"

আলোকনাথ বলিল, "ওটা সহজাত বুদ্ধিবশত অনুমান ক'রে নিতে হয়। দেখনি, মুখে যারা যে বিষয়ে যত বৈরাগ্য দেখায় অন্তরে তাদের সে বিষয়ে আসক্তি তত বেশী।"

অনীতা ট্রেতে চায়ের কাপগুলি সাজাইয়া সিঁড়ি দিয়া

নামিতেছে দেখিয়া আলোকনাথ বলিল, "না বল্‌তেই সুধা এসে হাজির।"

মাণিক বলিল, "একটু আগে ব'লছিলে ট্যানিক বিষ, এরই মধ্যে সুধা হ'য়ে গেল?"

আলোকনাথ বলিল, "লক্ষ্মী যখন সমুদ্র মন্থনে উঠেছিলেন, তখন হাতে তাঁর সুধা ভাণ্ডই ছিল। তখন—"

কথাটা শেষ হইল না। অনীতা কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া ট্রেখানি টেবিলের উপর রাখিয়া চায়ে দুধ চিনি মিশাইতে লাগিল।

চা পরিবেষণ করিয়া সে তেমনই লঘুপদে কক্ষ ত্যাগ করিল।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে আলোকনাথ বলিল, "লক্ষ্মীর সংগে ওর তুলনা ক'রে আমি কিছুই অন্যায় করিনি, ভাই। রূপে গুণে সত্যিই ও লক্ষ্মী।"

মাণিক নিরুত্তরে চা পান করিতে লাগিল।

আলোকনাথ পুনরায় বলিল, "কিন্তু ভাবনাও ওকে নিয়ে কম হয়নি আমার। শহরে এসে মনে ক'রেছিলাম, ওর চির জীবনের আশ্রয় একটা মিলিয়ে দিতে পারব; এখানে অনেক উদারনৈতিক বন্ধুও ত আছেন! যারই কাছে কথা পেড়েছি, সহানুভূতি পেয়েছি প্রচুর, আসল কাজে কেউ এগিয়ে আসেননি। যেকোন সমাজেরই লোক হোন্ না কেন, ধর্ষিতা নারীর আন্তরিক বন্ধু কেউ নেই। অথচ আমি জানি, ওর মত মনে প্রাণে নিষ্পাপ নারী আমাদের ভারতবর্ষে সতীর দেশে খুব কমই আছে।"

মাণিক জিজ্ঞাসা করিল, "তাহ'লে ও'র ব্যবস্থা এখন কি ক'রবে?"

আলোকনাথ বলিল, "সেইজন্যই তোমায় ডেকেছিলাম। উনি তোমার পরিচিত। তোমায় জিজ্ঞাসা করছি, বল।"

মাণিক একটু ভাবিয়া বলিল, "আরও একটু ভাল ক'রে অনুসন্ধান কর।"

আলোকনাথ বলিল, "সে প্রবৃত্তি আমার নেই। যারা আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু, তাদের আচরণেই বুঝেছি ও চেষ্টা আমার বৃথা। হাঁড়ির গোটাকতক ভাত টিপ্‌লেই বুঝতে পারা যায়। ভাল, তুমি ত এ বিষয়ে আমায় সাহায্য ক'রতে পার।"

মাণিক অনেকক্ষণ কোন কথা কহিল না।

আলোকনাথ বলিল, "চুপ ক'রে রইলে যে?"

মাণিক বলিল, "আলোক, তুমি যা ব'লছ, আমি বুঝেছি। আমি সেই জন্যই কর্ত্তব্য স্থির ক'রতে দেশে গিয়েছিলাম, কিন্তু দৈবচক্রে সব উল্টে গেছে।"

আলোকনাথ উঠিয়া মাণিকের হাত দু'খানি ধরিয়া বলিল, "তোমার ভদ্র আচরণ ও মহৎ অন্তঃকরণের পরিচয় আমি পেয়েছি ব'লেই একথা ব'লবার সাহস ক'রেছি। যে মুহূর্ত্তে তোমায় দেখেছি ভাই, বন্ধু ব'লে অন্তরের সংগে গ্রহণ ক'রেছি, কোন দ্বিধা করিনি। আমার বন্ধুত্বের মর্য্যাদা তোমাদ্বারা ক্ষুণ্ণ হবে না এ ভরসা আমার আছে।"

মাণিক আলোকনাথের এই আবেগপূর্ণ বাক্যের কোন উত্তর দিতে পারিল না। অনেক কথাই তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। সরল আলোকনাথের প্রাণ-পূর্ণ বন্ধুত্বের মৃদুস্পর্শ তাহার সারা চিত্তে আন্দোলন তুলিল। মানুষ সহজ বিশ্বাসে মানুষের কাছে এইটুকু প্রত্যাশা করে। অন্তরের সংগে সুখ দুঃখের সংযোগ না থাকিলেও মনুষ্যত্বের এই দাবী অস্বীকার করা যায় না!

আলোকনাথ অনীতার কেহ নহে। সে অনীতার জন্য যাহা করিয়াছে, কোন আত্মীয় কোন আত্মীয়ের জন্য তাহা করে না। আর আত্মীয় ত দূরের কথা, সমাজের ভয়ে স্নেহ-ময় পিতামাতা পর্যন্ত যাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন তাহার দুরপনেয় কলঙ্কের বোঝা আলোকনাথ হাসিমুখেই মাথায় তুলিয়া লইয়াছে। উপায় থাকিলে হয়ত আলোকনাথ তাহাকে এই শেষ অনুরোধটুকুও করিত না।

এমন মহৎ উদার মনে সে কিছুতেই ব্যথা দিতে পারিবে না।

মাণিকের সম্মতি পাইয়া আলোকনাথ তাহাকে আবেগ-ভরে বুকে চাপিয়া ধরিয়া উৎফুল্লস্বরে কহিল, "মাণিক, আমি জানতাম—জানতাম, তুমি অস্বীকার ক'রতে পারবে না। তুমি মানুষ।"

মাণিক বলিল, "আমি মানুষ হ'লে তোমার আসন আরও উঁচুতে। তোমার আসন স্বর্গে।"

আলোকনাথ হাসিয়া বলিল, "তা তুমি যাই বল বন্ধু, এত শীঘ্র স্বর্গীয় হবার বাসনা আমার নাই। এই নবীন বয়স—শ্যামা বসুন্ধরা—"

মাণিক হাসিয়া বলিল, "পৃথিবীতে যে স্বর্গ আছে তারই কথা ব'লছি আমি।"

—"সে কোথায়, মাণিক?"

—"কেন, যেখানে তুমি।"

উভয়েই হাসিতে লাগিল।

সেদিন মাণিকের যাওয়া হইল না। সে মেসে ফিরিয়া গেল।

(ক্রমশ)

"চিকিৎসকের চিকিৎসা"

(আলোচনা)

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
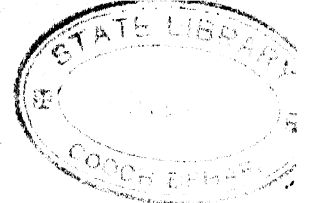
[নিতান্ত আক্ষেপের বিষয় যে, শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এই আলোচনায় অবাধ অসংযত ভাষা ব্যক্ত হইয়াছে—ভদ্র রীতি ও রুচিসঙ্গত রূপে বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করা না হইলে ভবিষ্যতে কোন আলোচনা আমরা পত্রস্থ করিতে অসমর্থ। —সম্পাদক, দেশ।]

গত সংখ্যা (১৩ ফাল্গুন, ১৩৪৫) "দেশ" পত্রিকায় শ্রীবনবিহারী গুপ্ত নামা কোনও ব্যক্তির "একখানি পুরাতন পুস্তক" শীর্ষক নিবন্ধে বাঙলা সাহিত্য সম্পর্কে ঐতিহাসিক গবেষণা-কণ্ডূয়ন-নিবৃত্তির কিছু পরিচয় পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। এদিকে সাধক ও মজুরের সংখ্যা এতই কম যে, কাহাকেও এ বিষয়ে অনধিকার চর্চ্চাও করিতে দেখিলে মন আশান্বিত হয়। গুপ্ত মহাশয়ও কিছু "নূতন তথ্য" প্রচারের আশায় এই কার্য্যে উৎসাহিত হইয়াছেন মনে হইতেছে, এবং উৎসাহের আতিশয্যে তিনি পূর্ব্বগামীদের ত্রুটি প্রদর্শনের লোভও সংবরণ করিতে পারেন নাই। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে, মৎসম্পাদিত "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা"য় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসের "বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ" প্রবন্ধে পঞ্চানন-উইলকিন্স-প্রসঙ্গে কালীকুমার রায়ের নামোল্লেখ না থাকাতে গবেষক মহাশয় দোষ ধরিয়াছেন এবং খুলনায় অবস্থানকালে বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা মরেল সাহেবের দৌরাত্ম্য নিবারণের কাহিনী "বঙ্কিম-শতবার্ষিকীর সময় কোথাও আলোচিত হইতে" না দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। নজিরস্বরূপ তিনি দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়-সম্পাদিত "নব-বার্ষিকী" নামক ইয়ার-বুকের উল্লেখ করিয়াছেন।

গবেষণা-ব্যাপারে সাধারণের ভ্রান্তি দূরীকরণার্থ অপরের দোষ ধরার প্রবৃত্তি দোষাবহ নহে, কিন্তু তাহা নিরহঙ্কারভাবে করিতে হয় এবং নিজে যাহাতে নূতন ভুল করিয়া না বসেন সে বিষয়েও সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়। বনবিহারী গুপ্ত মহাশয় সু-গবেষকের এই দুইটি মূল কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়াছেন বলিয়া এই প্রতিবাদ লিখিতে হইতেছে।

সজনীবাবু তাঁহার প্রবন্ধে যে-সকল তথ্য ব্যবহার করিয়াছেন তাহার প্রত্যেকটিরই সমসাময়িক নজির দিয়াছেন, কালীকুমার রায়ের উল্লেখ কুত্রাপি নাই। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ইয়ার-বুকে যে ভাবে গল্পচ্ছলে (প্রমাণ না দিয়া) বলা হইয়াছে তাহাতে তাহাকে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা কঠিন, তাহা ছাড়া দেখিতেছি এই "নববার্ষিকী" নানা ভুলেও ভরা; শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত প্রথম বাঙলা সংবাদপত্র—"সমাচার দর্পণে"র প্রকাশকাল পর্যন্ত "নব-বার্ষিকী"র সংগ্রহকর্ত্তা ঠিক দিতে পারেন নাই। পঞ্চানন কর্ম্মকার যে সুরু হইতেই উইলকিন্স সাহেবের সহযোগী ছিলেন তাহার বহু প্রমাণ আছে, অথচ "নববার্ষিকী"র ভ্রান্ত নজিরে গুপ্ত মহাশয় সজনীবাবুর ভুল ধরিতে বসিয়াছেন। তাঁহার অবগতির জন্য আমি দুইটি মাত্র প্রমাণ দাখিল করিতেছি :—

(ক) ১৮১৮ সনের জুলাই সংখ্যা "ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া" পত্রে পঞ্চানন সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হয় :—

"One of the very men who had assisted Wilkins in the fabrication of his types, applied to the missionaries at Serampore when they had resided there only a few months........." (P. 64.)

(খ) ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে "দি ক্যালকাটা খ্রীষ্টিয়ান অবজার্ভার" পত্রে উইলিয়ম কেরীর মৃত্যুবাসরে ডক্টর জোশুয়া মার্শম্যান বলেন :—

"About two months after Carey's arrival at Serampore, with Mrs. Carey and his four sons, a native named **Punchanan,** of the caste of smith., who had been instructed in cutting punches by Lieut. Wilkins, and had wrought at the same bench with him in cutting the Bengalee fount of types, applied to us for employment offering to cut a fount at **a rupee four annas** each letter."

বঙ্কিমচন্দ্রের মরেল-শাসন-কাহিনী অতিবিস্তৃতভাবে শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "বঙ্কিম-জীবনী"তে (৩য় সংস্করণ, পৃ ৮৯-৯৪) দেওয়া আছে। আমিও বাক্‌ল্যাণ্ড সাহেবের নজিরে এ সম্বন্ধে "আনন্দবাজার" পূজা সংখ্যায় প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছি। Rajmohan's Wife-এর সংবাদও বহু পুরাতন। এগুলি দেখিয়া অভিনবত্বের দাবী করিলে গুপ্ত মহাশয় ভাল করিতেন।

এইবার গুপ্ত মহাশয়ের গোড়ায় গলদের কথা বলিতেছি। যে মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থটিকে অবলম্বন করিয়া তিনি গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন, সেই "নব-বার্ষিকী" সম্পর্কেই তাঁহার অসাধারণ অজ্ঞতা দেখিতেছি। তিনি লিখিতেছেন :—

"তিনি [দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়] ....বিলাতী ইয়ার বুকের অনুসরণে "নববার্ষিকী" নামে একটি ইয়ার বুক ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে কয়েক বৎসর প্রকাশ করেন। এগুলির সন্ধানও বহুদিন পাই নাই।............সম্প্রতি ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের "নববার্ষিকী" একখণ্ড সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি।"

আমার নিকট এক খণ্ড "নববার্ষিকী" আছে; মিলাইয়া দেখিলাম গুপ্ত মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে ঠিকমত উদ্ধৃত করেন নাই, তাহার উপর কলম চালাইয়াছেন। কিন্তু এই "নব-বার্ষিকী"টি ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের নয় ১৮৭৬-৭৭ খ্রীষ্টাব্দের, অর্থাৎ "নববার্ষিকী" প্রকাশের ইতিহাসও গুপ্ত মহাশয় জানেন না। এই "নববার্ষিকী"র ৩ পৃষ্ঠায় লেখা হইয়াছে :—

"তাহা হইলে অনধিকালমধ্যে এক ঋতু অন্য ঋতুতে পরিবর্ত্তিত হইত, এবং এই ১২৮৩ বৎসরে আমরা প্রায় এক বৎসর হারাইতাম।"

এই সুযোগে "কালীকুমার রায়" সম্পর্কে আমাদের যাহা জানা আছে তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি, আশা করি গুপ্ত মহাশয় ইহাতে খুশী হইবেন।

কালীকুমার রায় ১৮০৩ সনের মার্চ্চ মাসে ফোর্ট উইলিয়ম

কলেজের Bengalee Writing Master (খোশনবীস) নিযুক্ত হন।* এই কর্ম্মের বেতন ছিল ৪০,; ৩ সেপ্টেম্বর ১৮০৫ তারিখে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের "বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার শিক্ষক" পাদরি উইলিয়ম কেরী একখানি পত্রে কালীকুমার সম্বন্ধে কলেজ কর্তৃপক্ষকে লিখিয়াছিলেন:—

"I observe that there is no Writing Master allowed to teach Bengalee or Sanskrit writing. One in the Bengalee Department is very necessary; if it be consistent with the proposed regulations, I very much wish the present writer, Kalee Koomar to be retained at his present salary of 40 Rupees per month, ..." (Fort William College Proceedings: Home Dept. Mis. No. 559, pp. 445-46.)

১৮১৮ সনে কালীকুমার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের "Bengalee Writing Master, and Sur-rishtudar" ছিলেন।*

কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির দ্বিতীয় বর্ষের (১৮১৮-১৯ খ্রীঃ) রিপোর্টে কালীকুমার সম্বন্ধে আর একটু সংবাদ পাওয়া যায়। তাহা এইরূপ:—

"23. Your Committee have resolved on having six copper plate engravings executed of a set of the best **Exemplars for Bengalee** writing, from the handwriting of Calee Coomar Roy, the Bengalee Khooshnuvees of the College of Fort William." (P. 7.)

১৮২২ সনে কালীকুমারের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে ২১ আগষ্ট ১৮২২ তারিখে "সমাচার দর্পণ" লিখিয়াছিলেন:—

"মৃত্যু।—সম্প্রতি পূর্ব্বস্থলীনিবাসী কালীকুমার রায় বৈদিক শ্রেণীতে উত্তমাভিজাত্যাপন্ন ব্রাহ্মণ বহুকালাবধি কলেজ কৌন্সিলের বাঙ্গলা খোসনবীসী কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন তাহাতে সুখ্যাতিমান্ ও সুলেখক ও স্বীয় সম্বক্তৃতাহেতুক বহুজন মনোরঞ্জক ছিলেন সম্প্রতি অষ্টাহের জ্বরে ৩২ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার তাঁহার পাঞ্চভৌতিক শরীর পরিহার হইয়াছে। তাঁহার কারণ অনেকের খেদোদয় হইয়াছে।"—"সংবাদপত্রে সেকালের কথা" ১ম খণ্ড (২য় সংস্করণ) পৃ. ৪৭।

প্রত্যুত্তর

সম্পাদক মহাশয়—

আমার "একখানি পুরাতন পুস্তক" নামক প্রবন্ধের প্রতিবাদে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "চিকিৎসকের চিকিৎসা" পাঠ করিয়া তদুত্তরে আমার বক্তব্য বলিতে অনুরোধ করিয়াছেন, তজ্জন্য অশেষ ধন্যবাদ। ব্রজেন্দ্রবাবুই যে ঐতিহাসিক প্রবন্ধের ভুলভ্রান্তি নিরসনের জন্য একমাত্র মহাবৈদ্য তাহা আমার জানা ছিল না, সেজন্য আমি দুঃখিত। তবে চিকিৎসাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে ব্রজেন্দ্রবাবু আমাকে চিকিৎসক সাজিতে কোথায় দেখিলেন, জানিতে পারি কি? আমার প্রবন্ধে আমি লিখিয়াছিলাম যে, বাঙলা ভাষায় রচিত একটি "ইয়ার বুক" আমি পাইয়াছি এবং তাহাতে নানা তথ্যের মধ্যে এমন একটি তথ্য দেখিলাম যাহা সজনীবাবুর "বহুশ্রমসাধ্য বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস"-এ দেখিলাম না, অথচ তাহা এই পুস্তকে আছে। সেই তথ্যটি যে ঠিক এমন কথাও আমি বলি নাই, কেবল বলিয়াছি "আলোচনার সুবিধার্থে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিব।" আলোচনায় যদি তথ্যটি মূল্যহীন প্রমাণিত হয়, তাহা হইলেও আলোচনার সার্থকতা আছে। সেইভাবে আলোচনা না করিয়া ব্রজেন্দ্রবাবু কেন যে উত্তেজিত হইয়া "চিকিৎসকের চিকিৎসায়" প্রবৃত্ত হইলেন এবং আমার "ঐতিহাসিক গবেষণা-কণ্ডূয়ন-নিবৃত্তির পরিচয়" লাভ করিলেন, তাহা আমার বুদ্ধির অগম্য। সুধী পাঠকসমাজই বিচার করিবেন যে, এরূপ অসংযত ভাষা প্রয়োগের কাহারও অধিকার আছে কি না।

কিন্তু এই উত্তেজনার কারণ কি?

সন-তারিখ বিশারদ ব্রজেন্দ্রবাবু "আমার গোড়ায় গলদ" ঠিক ধরিয়া ফেলিয়াছেন ও আমার "অসাধারণ অজ্ঞতা" দূর করিতে যে অসাধারণ বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। ব্রজেন্দ্রবাবুর কাছে একখানি "নববার্ষিকী" আছে, সম্ভবত তাহার "টাইটেল পেজ" নাই—আমার খানিরও নাই। ব্রজেন্দ্রবাবুর বইখানির উহা নাই, ইহা অনুমান করিবার কারণ এই যে, "টাইটেল পেজ" হইতে মুদ্রণের সন তারিখ না দেখাইয়া পুস্তকখানির আভ্যন্তরিক রচনা হইতে ব্রজেন্দ্রবাবু প্রকাশকাল গবেষণা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, "এই নববার্ষিকী ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের নয়, ১৮৭৬-৭৭ খৃষ্টাব্দের" এবং বলিতেছেন যে, উহা "প্রকাশের ইতিহাসও গুপ্ত মহাশয় জানেন না"। ব্রজেন্দ্রবাবু কেবলমাত্র ওই পুস্তকের তিন পৃষ্ঠা উল্টাইয়া এই বিদ্যা জাহির না করিয়া প্রকৃত ঐতিহাসিকের ন্যায় অন্যান্য পৃষ্ঠাগুলি পাঠ করিলে আমার অজ্ঞতা নিবারণের জন্য বিজ্ঞতার ভাণ তাঁহাকে করিতে হইত না।

তিনি যদি কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার পুস্তকখানির ২৬৫ পৃষ্ঠা খুলিয়া দেখেন তবে ওই পাতার নবম লাইনে দেখিতে পাইবেন যে, 'শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনীর মধ্যে এই ঘটনাটির উল্লেখ আছে যে,—"ইনি সম্প্রতি (১৮৭৭ অব্দের মে মাসে) বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ের একজন ছাত্রীর পাণিগ্রহণ করেন।" ১৮৭৬-৭৭ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ যে খৃষ্টাব্দ ওই বৎসর মার্চ মাসে শেষ হইয়াছে সেই বৎসর প্রকাশিত পুস্তকে কখনই ১৮৭৭ অব্দের মে মাসের ঘটনার উল্লেখ থাকিতে পারে না। ঘটনার পর নিশ্চয়ই এই অংশ লিখিত এবং তাহার কিছুদিন পরে অন্তত মুদ্রিত হইয়াছিল। পুস্তক মুদ্রণে যে বিলম্ব ঘটিয়াছিল তাহা পুস্তকের প্রথমে যে আত্মনিবেদন আছে তাহাতেই বুঝা যায়। আত্মনিবেদনে আছে "ইহা নববর্ষের প্রথমেই প্রকাশিত হয় ইচ্ছা করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা হইয়া উঠিল না। এই কাল বিলম্বের জন্য..................."ইত্যাদি। অতএব এই পুস্তক ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কিছুতেই বাহির হইতে পারে না, সম্ভবত আরও পরে হইয়াছিল, অন্তত সন-তারিখ বিশারদ ব্রজেন্দ্রবাবুর প্রদত্ত প্রকাশকাল ঠিক নহে। ব্রজেন্দ্রবাবু বিসমোল্লায় গলদ করিয়াছেন। ওই পুস্তকের ১৯৬ পৃষ্ঠায় লেখা আছে যে, "১৮৭৭ অব্দে ইনি

* Roebuck: Annals of the College of Fort William, Appendix No. III, p. 50.

* Ibid.

(আনন্দমোহন বসু মহাশয়) বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন।" ওই পুস্তকের ২৬৯ পৃষ্ঠায় আছে "সম্প্রতি ইনি ভারতসভার প্রতিনিধি হইয়া সিবিল সার্ব্বিসের বর্ত্তমান পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আন্দোলন করিবার নিমিত্ত পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে গমন করিয়াছিলেন।" সুরেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী "A Nation in Making"-এ ভ্রমণে বহির্গমনের তারিখ "26th May 1877" দেওয়া আছে (pp. 457), এই ভ্রমণে কয়েক মাস লাগিয়াছিল। অতএব ১৮৭৮-এর পূর্ব্বে "নববার্ষিকী" বাহির হইতে পারে না। এইরূপে আভ্যন্তরিক রচনা হইতেই প্রমাণিত হইবে যে, পুস্তকখানি ১৮৭৮ অব্দের পূর্ব্বে কিছুতেই প্রকাশিত হইতে পারে না। আমার ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ গণনা করিবার একটু কারণ আছে, তাহা এই যে, পুস্তকের ১২ পৃ হইতে ২৩ পৃ অবধি যে পঞ্জিকা আছে তাহা ১২৮৭ সালের অর্থাৎ ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের এবং পুস্তক বাহির হইতে দেরী হওয়াতে গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, "ইহা পঞ্জিকা নহে, যে বৎসরান্তে কোনও প্রয়োজনে আসিবে না। ইহাতে অপর প্রকার নানা জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করা গিয়াছে" অর্থাৎ বর্ষের প্রথমে না ছাপা হওয়াতে পঞ্জিকা হিসাবে যে মূল্যহানি হইয়াছে, তাহার ক্ষতিপূরণ আছে। সেজন্য আমি প্রকাশকাল ১৮৮০ অব্দ ধরিয়াছি। টাইটেল পেজ না থাকাতে আমি নিঃসন্দিগ্ধ নহি। তবে ব্রজেন্দ্রবাবু যে বলিতেছেন উহা ১৭৭৬-৭৭তে প্রকাশিত, তাহা যে নিশ্চয়ই ভুল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

"গোড়ায় গলদ" ধরিবার পূর্ব্বে নিজের "বিসমোল্লায় গলদ" রহিয়া যাইতেছে কি না, সে সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রবাবু আর একটু অবহিত হইলে সুখী হইব।

ব্রজেন্দ্রবাবু বলিতেছেন যে, "সজনীবাবু তাঁহার প্রবন্ধে যে সকল তথ্য ব্যবহার করিয়াছেন তাহার প্রত্যেকটির সমসাময়িক নজির দিয়াছেন।" সত্যই কি তাহা ঠিক? পঞ্চানন সম্বন্ধে গবেষণায় সজনীবাবু তো একটিও সমসাময়িক নজির দেখাইয়াছেন, এরূপ দেখিলাম না। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার ৪৫শ ভাগ, তৃতীয় সংখ্যার ১৮৬-৮৮ পৃষ্ঠায় পঞ্চানন কর্ম্মকারের বিবরণ আছে; তাহাতে "বেঙ্গল পাস্ট এন্ড প্রেজেন্ট" জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯১৬ এবং "প্রচার" ফেব্রুয়ারী ১৯০১-এর নজির দিয়াছেন। এগুলি যে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের সমসাময়িক এ জ্ঞান অন্তত আমার নাই, উহা ব্রজেন্দ্রবাবুর মতে সমসাময়িক কি না বলিতে পারি না। "বেঙ্গল পাস্ট এন্ড প্রেজেন্ট"-এর প্রবন্ধ আবার শম্ভু মুখোপাধ্যায়ের নোট অবলম্বনে লিখিত। শম্ভুবাবু যে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে নোট লিখিয়াছিলেন এমন সংবাদ ব্রজেন্দ্রবাবুর জানা থাকিতে পারে, আমার নাই।

ব্রজেন্দ্রবাবু বলিতেছেন "নববার্ষিকী" গল্পচ্ছলে লিখিত ও তাহাতে তথ্য সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ নাই। "ইয়ার বুকে" যে তথ্য সম্বন্ধে প্রমাণ সম্বলিত ফুটনোট কণ্টকিত হইয়া প্রকাশিত হয়, তাহা আমি জানি না। "স্টেটসম্যান ইয়ার বুক," "ডেইলিমেল ইয়ার বুক," "ফরেন অ্যাফেয়ার ইয়ার বুক" প্রভৃতি প্রসিদ্ধ "ইয়ার বুক"গুলি অন্তত ব্রজেন্দ্রবাবুর কল্পিত রীতিতে রচিত হয় না। আর এক কথা শম্ভুবাবুর নোট কি ভাবে রক্ষিত—গল্পচ্ছলে না প্রমাণ সম্বলিত?

ব্রজেন্দ্রবাবুর নিকট "নববার্ষিকী"র মূল্য বিশেষ কিছুই নাই, কারণ তাহাতে ভুলভ্রান্তি আছে, যথা "সমাচার দর্পণ" প্রকাশকাল সম্বন্ধে ওই পুস্তক ভুল করিয়াছেন। ওই পুস্তকে ভুলটি হইতেছে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মের স্থলে ১৮১৮ খৃঃ ৩১শে মে দেওয়া হইয়াছে অর্থাৎ আট দিন পরে বলিয়া লিখিত। এরূপ সামান্য ভুল যদি পুস্তকটিকে মূল্যহীন করে তবে ব্রজেন্দ্রবাবুর মহাগবেষণাত্মক পুস্তক "সংবাদপত্রে সেকালের কথা" প্রথম খণ্ড প্রথম সংস্করণ একেবারেই মূল্যহীন হইয়া যায়, কারণ ওই পুস্তকে গঙ্গাধরের "বেঙ্গল গেজেটি"র প্রকাশকাল ১৮১৬ ধরিয়া লইয়া উহা "সমাচার দর্পণে"র দুই বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল, এরূপ লিখিয়াছেন। দ্বিতীয় সংস্করণে ব্রজেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, "উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে ইহাদের মধ্যে 'বেঙ্গল গেজেটি' কোন তারিখে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা নির্দ্ধারণ করিবার উপায় নাই" এবং ওই দুই পত্রিকার ব্যবধান দশ পনেরো দিন মাত্র, তবে কোনটি পরে ও কোনটি পূর্ব্বে ঠিক বলা যায় না। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় আষাঢ় ১৩৪৪। তাহার পর ৬ই কার্ত্তিক ১৩৪৫ রাঁচির হিনুতে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রবাবু বলিতেছেন—"গত বৎসর আপনাদের এই সভার সভাপতি শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় 'বেঙ্গল গেজেটি'কে 'প্রথম সংবাদপত্রের গৌরব দিয়াছিলেন', 'তিনি জানিতেন না যে, আমি বহুদিন পূর্ব্বেই আমার এই ভ্রান্ত মত পরিত্যাগ করিয়াছি।" ১৩৪৫এর পূর্ব্ব বৎসর ১৩৪৪, অতএব যোগেন্দ্রবাবুর ১৩৪৪র অভিভাষণের বৎসরই ব্রজেন্দ্রবাবুর "সংবাদপত্রে সেকালের কথা" দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তাহাতেও "বেঙ্গল গেজেটি" যে "সমাচার দর্পণে"র পূর্ব্বে নহে, একথা বলেন নাই। কেবল সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন; অতএব "বহুপূর্ব্বে এই মত পরিত্যাগ" এর যে প্রসঙ্গ ব্রজেন্দ্রবাবু তুলিয়াছেন, তাহা সত্য নহে।

ব্রজেন্দ্রবাবু প্রথম সংস্করণে দুই বৎসর ভুল করিয়াছেন; সাতদিনের ভুলে যদি পুস্তক মূল্যহীন হয়, তবে দুই বৎসর ভুলে ব্রজেন্দ্রবাবুর পরিশ্রম কি নিরর্থক হইয়াছে? ব্রজেন্দ্রবাবু যদি ইচ্ছা করেন, এখনও ব্রজেন্দ্রবাবুর সন তারিখের অন্তত ডজনখানেক অসংশোধিত ভুল আমি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তাহাতেও আমি ব্রজেন্দ্রবাবুর লেখা মূল্যহীন মনে করিব না।

ব্রজেন্দ্রবাবু স্বীকার করিতেছেন যে, ঊনবিংশ শতকের প্রথমেই কালীকুমারের হস্তাক্ষরের ছাঁদ প্রসিদ্ধ ছিল ও "best exemplars of Bengalee writing" হিসাবে আদৃত হইয়াছিল। কিন্তু পঞ্চানন যে সে হস্তাক্ষরের ছাঁদ অনুকরণ করিয়াছিলেন, এই তথ্য ব্রজেন্দ্রবাবু কেন স্বীকার করিতে পারেন না, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তবে সজনীবাবু যে তথ্য উদ্ধার করিতেছেন তাহা স্বয়ংপূর্ণ এবং ততোধিক সংবাদ থাকাতে যদি উহা গ্রহণের অযোগ্য প্রমাণিত হয়, তাহা স্বতন্ত্র কথা।

আমি "পূর্ব্বগামীদের ত্রুটি প্রদর্শনের লোভ সম্বরণ করিতে পারি নাই" বলিয়া ব্রজেন্দ্রবাবু অনুযোগ করিয়াছেন;

যদিও আমি কাহারও ত্রুটি প্রদর্শন না করিয়া একটি নূতন তথ্যের সংবাদ গোচর করিয়া তাহার আলোচনা করিতেই অনুরোধ করিয়াছিলাম মাত্র। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি লোকবরেণ্য পূর্ব্বগামীদের ত্রুটি দেখাইতে ব্রজেন্দ্রবাবু কখনই কার্পণ্য করেন নাই এবং সেই ভ্রম প্রদর্শনের ভাষাও সর্ব্বজনবিদিত। ব্রজেন্দ্রবাবু ও তদীয় বন্ধু সজনীবাবুই যে একমাত্র পূর্ব্বগামী বা ঊনবিংশ শতকের ইতিহাসে আদি ও অকৃত্রিম ইজারাদার, এরূপ বোধ আমার নাই, ইহা স্বীকার পাইতেছি।

সমসাময়িক তথ্যের প্রতি ব্রজেন্দ্রবাবুর অগাধ বিশ্বাস। সেই তথ্য সংগ্রাহকের সত্য কথনের অভ্যাস, সংবাদ সংগ্রহের জন্য যত্ন প্রভৃতির বিচারের কোনও প্রয়োজন হয়ত ব্রজেন্দ্রবাবুদের নাই। কিন্তু "মরেল কাহিনী"র জন্য শচীশচন্দ্র বা বাকল্যাণ্ডের নজির অপেক্ষা ১৮৭৮ কিম্বা ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের "নববার্ষিকী" নিশ্চয়ই সমসাময়িক এবং উহার প্রকাশকালে বঙ্কিমবাবুর মাত্র ৩৯ বৎসর বয়স। তখন ব্রজেন্দ্রবাবুর নিকট তাঁহার স্বীকৃতি অনুসারে ওই পুস্তক থাকিতেও প্রবন্ধে সে ঋণ স্বীকার করেন নাই কেন? পূর্ব্বগামীদের ঋণ এভাবে অন্য কেহ স্বীকার না করিলে ব্রজেন্দ্রবাবুর হস্তে কি তাঁহার নিস্তার থাকিত?

"রাজমোহনস ওয়াইফ" সম্বন্ধে নূতন আবিষ্কারের কোনও দাবী আমি করি নাই। প্রসংগতঃ ওই পুস্তকের উল্লেখ যে "নববার্ষিকী"তে আছে তাহা বলিয়া সেই অংশটুকু আমি উদ্ধার করিয়া দিয়াছি। "রাজমোহনস ওয়াইফ" এর সংবাদ বহু পুরাতন নিশ্চয়ই, কিন্তু "Indian Field"-এ উহা প্রকাশিত হওয়ার পর ১৮৮০ খৃঃ-এর পূর্ব্বে কি উহার উল্লেখ আছে? যদি থাকিয়া থাকে এবং ১৮৮০ কিম্বা তৎপূর্ব্বের "নববার্ষিকী"তে যদি উল্লেখ থাকে তবে বিংশ শতাব্দীতে যাঁহারা মহা ঢক্কানিনাদে উহার আবিষ্কারের দাবী করিলেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রবাবুর বক্তব্য কি?

ব্রজেন্দ্রবাবুর অকারণ উষ্মার একমাত্র কারণ কি এই নহে যে, তাঁহাদের বহু নূতন আবিষ্কারের দাবী ফাঁসিয়া যাইতেছে। আহা! বেচারী ব্রজেন্দ্র! যাহা হউক, ব্রজেন্দ্রবাবু যে ভাষায় আলোচনা করিয়াছেন, সে ভাষায় আলোচনা চালাইবার প্রবৃত্তি আমার নাই, সেজন্য এইখানেই এই বাদানুবাদের পরিসমাপ্তি করিলাম। শুধু এক কথা—সমসাময়িক বিবরণই কি অভ্রান্ত? তবে ১১ই মার্চ্চের "ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া" পত্রিকায় "রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের মৃত্যু দিবস ২রা মার্চ্চের পরিবর্ত্তে ২৩শে ফেব্রুয়ারী লিখা হইল কেন? ব্রজেন্দ্রবাবু কি বলেন?

সজনীবাবুর "সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায়" লিখিত প্রবন্ধও নির্ভুল নহে। তিনি লিখিয়াছেন যে, 'জাতীয় সভায়' প্রদত্ত রাজনারায়ণ বসুর "বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা" ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত পুস্তক বঙ্গভাষা সমালোচনী সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও নূতন বাঙলা যন্ত্রে মুদ্রিত হয়। এই পুস্তকের ভূমিকায় রাজনারায়ণ লিখিতেছেন—"কয়েক বৎসর হইল আমি জাতীয় সভায় বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে উপস্থিত মতে বক্তৃতা করি; সে বক্তৃতা করিবার সময় তাহা কাহারও দ্বারা আনুপূর্ব্বিক লিখিত না হওয়াতে প্রকাশিত হইতে পারে নাই, কেবল সারমর্ম্ম "ন্যাশনাল পেপর" ও "হিন্দু পেট্রিয়ট" সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎপরে ১৭৯৮ শকের ১৯এ বৈশাখ দিবসে মেদিনীপুরে ঐ বিষয়ে উপস্থিত মতে এক বক্তৃতা করি, তাহা লিখিত হইয়া ঐ বৎসরের ৪ঠা অগ্রহায়ণ দিবসে কলিকাতার বঙ্গভাষা-সমালোচনী সভার অধিবেশনে পঠিত হয়। ....সেই বক্তৃতা এক্ষণে সংশোধিত হইয়া প্রকাশিত হইল। "ভারত সংস্কারক" সংবাদপত্রে এই বক্তৃতার সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, সংশোধনকালে তাহা হইতে কিঞ্চিৎ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।"

এই ভূমিকা হইতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, জাতীয় সভায় প্রদত্ত বক্তৃতা যাহা ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের "কয়েক বৎসর" পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছিল তাহা কোনও দিন সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয় নাই। সারমর্ম্ম ১৮৭৮এর পূর্ব্বেই বক্তৃতার সময়েই সংবাদপত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল। যে পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে তাহা ১৭৯৮ অব্দের ৪ঠা অগ্রহায়ণে বঙ্গ ভাষা সমালোচনী সভায় যে লিখিত প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল, তাহা অবলম্বনে 'ভারত সংস্কারক'এর সমালোচনার ফলে পরিবর্ত্তিত হইয়া ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কাজেকাজেই সজনীবাবু যে লিখিয়াছেন, 'জাতীয় সভায় প্রদত্ত বক্তৃতা ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়,' তাহা ভুল। মুদ্রিত পুস্তকখানি দেখিয়া লিখিলে এই ভুল হইত না।

অপরের ভুল ভ্রান্তি দেখাইবার পূর্ব্বে নিজেদের সাবধান হওয়া বাঞ্ছনীয় নয় কি?

সজনীবাবু বলিয়াছেন যে, কাঠের অক্ষরে বাঙলা বই ছাপা হইত না। এই সম্পূর্ণ ভুল ধারণা বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনার সূত্রপাত হইতে চলিয়া আসিতেছে। (সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ৪৫ ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যা ১১৭ পৃ) কিন্তু সজনীবাবুর এই মহা আবিষ্কার ছেনী কাটিয়া ধাতু নির্ম্মিত টাইপ প্রস্তুতের কাহিনী যে "নববার্ষিকী"তে আছে এবং উইলকিনস এবং পঞ্চানন কাহিনী ঠিক ঠিক বর্ণিত আছে তাহা দেখিয়াই আবিষ্কারের গৌরব নষ্ট হয় বুঝিয়াই কি ব্রজেন্দ্রবাবুর এই উষ্মা? তাহা হইলে আমি নাচার!

শ্রীবনবিহারী গুপ্ত।

আমি মার্ক্সবাদী হইলাম কেন?

হ্যারল্ড জে, লাস্কি

ইস্কুল ছাড়িবার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই সাম্যবাদ আমার চিত্তকে আকর্ষণ করিতে থাকে। সাম্যবাদে বিশ্বাস কেন আমার মর্ম্মমূলে বাসা লইল—তাহার উত্তর দেওয়া কঠিন। একটি কারণ—আমার একজন মহানুভব শিক্ষকের প্রভাব। লোভের প্রবৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া যে সমাজ টিঁকিয়া আছে—সে সমাজ যে কতখানি অন্তঃসারশূন্য—গুরুমহাশয়ের সংস্পর্শে আসিয়া আমরা তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করি। বই পড়িয়াও—বিশেষভাবে সিডনে এবং বিয়াট্রিসের বই পড়িয়া—আমার চিত্ত সাম্যবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আর একটি কারণে সাম্যবাদে বিশ্বাস আমার অন্তঃকরণে বাসা বাঁধিতে সমর্থ হয়। কারণটি কেয়ার হার্ডির বক্তৃতা। তখন আমি বালক—বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বারে দণ্ডায়মান। ম্যাঞ্চেষ্টার শহরে কেয়ার হার্ডির এক বক্তৃতা শুনিলাম। সেই বক্তৃতা আজও আমার মনে গাঁথা রহিয়াছে। সেইদিন বুঝিয়াছিলাম, সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হইলে শ্রমিকদিগকে যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে।

বিপ্লবীর দৃষ্টি লইয়া আমি অক্সফোর্ডে প্রবেশ করিলাম। যত দিন যাইতে লাগিল, সাম্যবাদে আমার বিশ্বাস ততই দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়া উঠিল। ইংলণ্ডে ধনীর সঙ্গে দরিদ্রের ব্যবধান কতখানি দুর্লঙ্ঘ্য—তাহার প্রথম পরিচয় পাইলাম অক্সফোর্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা কেমন করিয়া নূতন চিন্তার আগমন-পথকে রুদ্ধ করিয়া দাঁড়ায়—তাহারও পরিচয় পাইলাম অক্সফোর্ডে। অক্সফোর্ডের অধ্যাপকগণ সামাজিক সমস্যাগুলি লইয়া মাথা ঘামাইতেন সত্য, কিন্তু তাহাদের সমাধানের দায়িত্ব গ্রহণের বেলায় কোনো উৎসাহই তাঁহারা প্রদর্শন করিতেন না। সামাজিক সমস্যার নিখুঁত বিশ্লেষণের সার্থকতাকে তাঁহারা স্বীকার করিতেন। বিশ্লেষণের ফলে যে সত্যের সহিত তাঁহারা পরিচিত হইতেন, তাহাকে কর্ম্মজীবনে অনুসরণ করিবার কোনো আগ্রহ তাঁহাদের মধ্যে দেখা যাইত না।

অক্সফোর্ডে থাকিবার সময় ফেবিয়ান সোসাইটির (Fabian Society) কাজে আমি বহু সময় ব্যয় করিতাম। নারীগণ যাহাতে শৃঙ্খলমুক্ত হন, তাহার জন্য আমি প্রচার-কার্য্য চালাইতাম। এই কার্য্যে ব্রতী থাকিবার সময় আমি দুইজন মহাপ্রাণ ব্যক্তির সংস্পর্শে আসি—একজন জর্জ্জ ল্যান্সবেরী, অপরজন এইচ ডবলু নেভিন্‌সন। প্রথম ব্যক্তির নিকট হইতে আমি জানিতে পারি সাম্যের অর্থ এবং প্রয়োজনের কথা। দ্বিতীয় ব্যক্তি আমাকে সচেতন করেন স্বাধীনতার মূল্য সম্পর্কে। আমি যে প্রথম কাজ পাই—সেও ল্যান্সবেরীর অনুগ্রহে। তিনি তখন ডেলি হেরাল্ডের সম্পাদক। ১৯১৪ সালের গ্রীষ্মকালে আমি যখন অক্সফোর্ড পরিত্যাগ করিলাম তখন আমায় তিনি অনুরোধ করিলেন কাগজের জন্য সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিতে। এই কাজ আমাকে একটা প্রকাণ্ড অভিজ্ঞতা দান করিল। অক্সফোর্ডে আমি যাহা শিখিয়াছিলাম তাহাকে আমি একটা সুস্পষ্ট রূপ দিতে শিখিলাম। শিক্ষার দিক দিয়া ল্যান্সবেরীর সঙ্গ আমার জীবনে একটি প্রকাণ্ড সম্পদ। Straightforward, democratic এবং fearless বলিতে যাহা বুঝায়—তিনি ছিলেন তাহারই পূর্ণ প্রতীক।

আমি হেরাল্ডে ঢুকিবার ৬ সপ্তাহের মধ্যেই গ্রেট বৃটেনে রণডঙ্কা বাজিয়া উঠিল। প্রথম দিনেই সৈন্যদলে নাম লেখাইবার জন্য আমি অগ্রসর হইলাম। আমি যুদ্ধে বিশ্বাস না করিলেও মনে করিয়াছিলাম জার্ম্মানী জিতিলে জগতের সমূহ ক্ষতি। আমার হৃদযন্ত্র দুর্ব্বল বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ আমাকে সৈন্যদলে ভর্ত্তি করিলেন না। এই প্রত্যাখ্যান আমার সারা জীবনের ধারা বদলাইয়া দিল। ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপকের পদ খালি হইলে ঐ পদ গ্রহণ করিবার জন্য আমি আহূত হইলাম। আমেরিকায় এক বৎসর থাকিব—এই আশা করিয়া আমি অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিতে রাজী হইলাম। এক বৎসর থাকিব বলিয়া যাত্রা করিলাম, কিন্তু আমাকে থাকিতে হইল ১৯২০ সাল পর্য্যন্ত। প্রথমে থাকিলাম ম্যাকগিলে, শেষে চারি বৎসর কাটাইলাম হার্ভার্ডে।

একদিক দিয়া দেখিতে গেলে আমি মনে করি, আমেরিকায় অধ্যাপনা করিবার সময়ে যে অভিজ্ঞতা আমি লাভ করিলাম সেই অভিজ্ঞতাই আমার জীবনের ভিত্তিকে গড়িয়া দিয়াছে। সেখানে আমি বুঝিতে পারিলাম, অধ্যাপনাই আমার জীবনের যথার্থ কাজ। আর যে ক্ষেত্রেই আমি বিচরণ করি না কেন, অধ্যাপনার কাজেই আমার শক্তিকে নিয়োজিত করিতে হইবে। আর একটা জিনিষ আমি বুঝিলাম। রাজনীতির তত্ত্ব শিখাইতে হইলে কেবল পুস্তক পড়িলেই চলিবে না। কর্ম্মক্ষেত্রে রাজনীতি কেমনভাবে কাজ করে—তাহার সঙ্গেও অধ্যাপকের সাক্ষাৎভাবে পরিচয় থাকার প্রয়োজন আছে। থিয়োরীর সঙ্গে প্র্যাকটিসের সমন্বয়ের উপরে যে শিক্ষাদানের ভিত্তি—তাহাই শুধু মূল্যবান। তৃতীয়ত আমি শিখিলাম, আমেরিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন সামাজিক আবেষ্টনীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত। যাহা খুসী চিন্তা করিতে পারো, কিন্তু সাবধান, সমাজ-ব্যবস্থার মূল নীতিগুলিকে আঘাত করিও না। ম্যাকগিলে থাকিবার সময়ে লয়েড জর্জ্জের কোনো নীতির তীব্র সমালোচনা করিয়া আমি বক্তৃতা দিই। সঙ্গে সঙ্গে আমাকে অধ্যাপকের কাজ হইতে ছাড়াইয়া দিবার জন্য ক্রমাগত তাগিদ আসিতে লাগিল। হার্ভার্ডে কাজ করিবার সময় বোষ্টনে পুলিশেরা ধর্ম্মঘট করে। সহরে শান্তি ও শৃঙ্খলা যাহাতে রক্ষিত হয়, তাহার জন্য প্রেসিডেণ্ট লাওয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে সঙ্গে সঙ্গে সাহায্য-দানে অগ্রসর হন। আমার মনে হইল, শহরে কর্ত্তৃপক্ষ নির্দ্দোষ—এই কথা মানিয়া লইবার পূর্ব্বে জানা প্রয়োজন, পুলিশ কেন ধর্ম্মঘট করিয়াছে। যেমন মনে হইল অমনি আমি ধর্ম্মঘটের কারণ আবিষ্কারে অগ্রসর হইলাম। যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিয়া আমি জানিতে পারিলাম, পুলিশ

দীর্ঘকাল ধরিয়া অনেক অবিচার সহ্য করিয়াছে। কর্তৃপক্ষ তাহাদের অভিযোগে কর্ণপাত না করিবার ফলেই এই ধর্ম্মঘটের উদ্ভব। আমি এই কথা প্রকাশ করিয়া বলিতেই আমার মাথার উপরে নিন্দার ঝড় ভাঙিয়া পড়িল। চারিদিক হইতে রব উঠিল আমি একজন বলশেভিক, আমার কাজ হইতেছে বিপ্লববাদ প্রচার করা। আমাকে কাজ হইতে বরখাস্ত করা হইল না বটে, কিন্তু প্রেসিডেণ্ট লাওয়েল আমাকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, চলতি ঘটনা লইয়া যেখানে বাদবিতণ্ডা চলিতেছে সেখানে অধ্যাপকের পক্ষে নীরব থাকাই ভালো। হার্ভার্ডের কর্তৃপক্ষ যাহা শুনিলে অসুখী হন এমন কথা বলিবার আমার কোনো অধিকার নাই। ইহার পর লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স ও পলিটিক্যাল সায়েন্স আমাকে যখন ডাকিল, তখন আমি সানন্দে সে ডাকে সাড়া দিলাম। হার্ভার্ড আমার আর ভালো লাগিতেছিল না। সেখানে আমি ১৯২০ সাল হইতে আছি এবং সেখানেই জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত অধ্যাপনা করিব—ইহা আশা করিতেছি।

কিন্তু আমেরিকায় আমার জীবনের কাজ কি—শুধু ইহাই জানিলাম না। সেখানে আমি দেখিলাম—ইউরোপে যাহা দেখিয়াছিলাম তাহার চাইতেও স্পষ্ট করিয়া দেখিলাম—ধনিক ও শ্রমিকের সংঘর্ষের তাৎপর্য্য কি। আমি বুঝিতে পারিলাম ধনকুবেরগণের আধিপত্য যেখানে অবিচলিত, সেখানে রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাম কানা কড়িও নয়। লাড্‌লো এবং লাওয়েলের ধর্ম্মঘট আমাকে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল—আর্থিক জগতে যাহারা ক্ষমতাশালী তাহাদের কর্তৃত্বের অবসানের জন্য যে কোনো আন্দোলন সুরু হইবে তাহাকেই নিষ্পেষিত করিবার জন্য রাষ্ট্রের বিপুল যন্ত্র সর্ব্বক্ষণের জন্য উদ্যত হইয়া আছে। রাসিয়ার বিপ্লব সম্পর্কে আমেরিকার সাধারণ নরনারীর মনোভাবের বৈচিত্র্য আমাকে বুঝাইয়া দিল, মানুষের মতামতের জন্য তাহার দারিদ্র্য অথবা ঐশ্বর্য্যই বিশেষভাবে দায়ী। আমেরিকা হইতে এই বদ্ধমূল ধারণা লইয়া আমি ফিরিয়া আসিলাম যে সাম্য যেখানে নাই সেখানে স্বাধীনতা একটা অর্থহীন শব্দ ছাড়া আর কিছুই নয়। ধনোৎপাদনের উপায়গুলির উপরে যতক্ষণ সমাজের সর্ব্বসাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হইতেছে ততক্ষণ সাম্যেরও যে কোনো মানে হয় না—এ সত্যও আমার মনের মধ্যে তখন জাগিতে আরম্ভ করিয়াছে। ১৯২০ সাল পর্য্যন্ত আমার সাম্যবাদের মূলে ছিলো সমাজব্যবস্থায় অন্যায় রহিয়াছে—এই অনুভূতি। উহার ভিত্তি ছিলো না ঐতিহাসিক দৃষ্টির উপরে।

ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিয়া আঠারো বৎসর ধরিয়া আমি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিলাম তাহার ফলে আমি বুঝিতে পারিয়াছি—ইতিহাসের ঘটনাপরম্পরা সাম্যবাদের নীতিকেই সমর্থন করে। এই আঠারো বৎসর আমার কাছে সার্থকতায় ভরা। প্রথম হইতেই আমি লেবার পার্টির সদস্য আছি। সরকারী অনেক কমিটিতে আমি কাজ করিয়াছি। প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য ধর্ম্মঘটের সময় ট্রেড ইউনিয়নকে আমি সাহায্য করিয়াছি। বই লেখা এবং বই পড়ানোর বাহিরে আমার অবসর সময়ের অধিকাংশই ব্যয়িত হইয়াছে সাম্যবাদকে জয়যুক্ত করিবার কাজে। প্রাপ্তবয়স্কগণকে শিক্ষিত করিবার যে আন্দোলন—সেই আন্দোলনের সঙ্গেও আমি ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত। বিদেশে বক্তৃতা দিবার জন্য আহূত হইয়া আমি ফ্রান্স, স্পেন, জার্ম্মানী এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের রাজনীতি এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সম্পর্কে সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করিয়াছি। আমেরিকাতেও আমি বারম্বার ফিরিয়া গিয়াছি।

এই সমস্ত অভিজ্ঞতা হইতে যে মহাজ্ঞান আমি লাভ করিয়াছি, তাহা হইতেছে—মার্ক্সবাদের প্রতিষ্ঠা একটা বিরাট সত্যের উপরে। যাহা আমি দেখিয়াছি এবং যাহা আমি পড়িয়াছি তাহার ফলে মার্ক্সবাদকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা ব্যতীত আমার পক্ষে গত্যন্তর নাই। ১৯২০ সালে ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিয়া আমি আশা করিতেছিলাম, মানুষের সঙ্গে মানুষের আর্থিক সম্পর্ক গণতন্ত্রের নীতিকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিবে। এখন আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি—কোনো শ্রেণীই স্বেচ্ছায় তাহার ক্ষমতাকে পরিত্যাগ করে না। আমি বুঝিতে পারিয়াছি—শ্রমিক সম্প্রদায় যতদিন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী না হইতেছে ততদিন ধনোৎপাদনের উপরে মুষ্টিমেয় মানুষের অধিকার গণতন্ত্রের আদর্শকে সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে দিবে না। রাসিয়ার অভিজ্ঞতা, মধ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপে ফ্যাসিজমের প্রাদুর্ভাব, সমাজ-বিপ্লবের প্রতি স্পেনের ফ্রান্সের এবং আমেরিকার ধনীদের মনোভাব, জাপানে এবং ইটালিতে নূতন সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব—একে একে সমস্ত ঘটনা আমার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছে যে, মার্ক্সের দর্শনের মধ্যে কোনো ভ্রান্তি নাই। যে ব্যবস্থা টিঁকিয়া আছে শোষণের উপরে তাহা শোষণ করিবেই। এই শোষণ করিবার ক্ষমতার প্রতিবাদ যাহারা করিবে—সেই আন্দোলন ও মানুষগুলিকে শোষকেরা নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে।

আমাদের এই যুগকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন মার্ক্স। এই যুগে মানুষের সঙ্গে মানুষের আর্থিক সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা হওয়া উচিত নূতন ভিত্তির উপরে—কিন্তু ষোলো আনা সুখ-সুবিধার মালিক যাহারা তাহারা লড়াই করিবে তবুও—বঞ্চিত যাহারা তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিবে না সূচ্যগ্র মেদিনী। ধনী-দরিদ্রের স্বার্থের সংঘর্ষ যখন চরমে গিয়া পৌঁছায় তখন দরিদ্রদের সুবিধা দেওয়ার অর্থ হইতেছে ধনীদের অধিকারকে খর্ব্ব করা। এই সুবিধা দেওয়ার অর্থ হইতেছে ধনীদের আয়ের উপরে প্রচুর ট্যাক্স বসানো আর ট্যাক্স দিতে হইলে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে লাভ করা অসম্ভব। দীর্ঘকাল ধরিয়া যাহারা অন্যায় অধিকারকে ন্যায় বলিয়া মানিয়া আসিতেছে তাহাদের ন্যায় যে অবিচারের উপরে প্রতিষ্ঠিত—এমন কথা স্বীকার করিতে তাহাদের সংস্কারে বাধে।

এই পট-ভূমিকায় আমাদের স্থাপন করিতে হইবে এ যুগের সমস্ত প্রধান প্রধান সমস্যাগুলিকে। এই দিক দিয়া বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাইব, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ধনতন্ত্রের অনিবার্য্য পরিণতি যুদ্ধে। আমি দেখিতে পাইতেছি, যাহারা শ্রমিক তাহাদের সংঘবদ্ধ হইবার আজ একান্ত প্রয়োজন আছে রাষ্ট্রীয় শক্তিকে অধিকার করিবার অথবা ফ্যাসিষ্ট শক্তিকে পরাভূত করিয়া জয়ী হইবার জন্য। জার্ম্মানী ও ইটালি আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছে—শ্রমিকদের মধ্যে দলাদলির অর্থ হইতেছে তাহাদের সর্ব্বনাশ। একথা আমরা আজ স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি—ধনতন্ত্রবাদ তাহার এই দুর্দ্দিনে রাষ্ট্রশক্তিকে মুঠার মধ্যে রাখিবার জন্য যে কোনো দুর্নীতির আশ্রয় লইবে। আমেরিকায় রুজভেল্টের পিছনে জনমতের প্রচুর সমর্থন ছিলো। কিন্তু এই জনমতের সমর্থন সত্ত্বেও তিনি যে কিছু করিতে পারিলেন না তাহার কারণ ধনকুবেরদের বাধা। এখনকার যে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান-গুলি—তাহারা ধনীদের মুঠার মধ্যে। জনগণের সংকল্প এই সকল প্রতিষ্ঠানকে কোনো কাজেই লাগাইতে পারিবে না।

ধনতন্ত্রকে বাধা না দেওয়ার বৈষ্ণবীনীতিতে আমার বিশ্বাস নাই। ফেবিয়ান সোস্যালিষ্টদের ক্রমশঃ নীতিতেও (method of gradualness) আমার বিশ্বাস নাই। ক্রমশঃ নীতির অনুসরণ করিতে গেলে ধনকুবেরগণ সংঘবদ্ধ হইয়া পাল্টা আক্রমণ করিবার সুযোগ পাইবে। ধনতন্ত্রের কাঠামোকে সরাসরি আক্রমণ করিবার সময় আসিয়াছে। ধনোৎপাদনের সমস্ত উপায়গুলিকে পুরাপুরিভাবে সমাজের সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত করা ব্যতীত মুক্তির দ্বিতীয় পন্থা নাই। এই পন্থা অবলম্বিত হয় নাই বলিয়াই সোভিয়েট ইউনিয়নের বাহিরে সমস্ত পাশ্চাত্য সভ্যতাই আজ দ্রুত অগ্রসর হইতেছে ফ্যাসিজমের দিকে আর এইরূপ ঘটিলে শ্রমিকদল ঐক্যের অভাবে শক্তিহীন হইয়া পড়িবে। শ্রমিকদের মধ্যে অনৈক্যের জন্যই ইটালি ও জার্ম্মানীতে তাহাদের আজ কোনো প্রভুত্ব নাই। এই অনৈক্য আমেরিকায় এবং ইংলণ্ডেও একদিন ফ্যাসিষ্ট রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। যদি এইরূপ ঘটে, তবে আমরা দেখিব কলিযুগের অন্ধকার পৃথিবীকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে আর সেই অন্ধকারে আমাদের সভ্যতার যুগ স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত হইবে।

অপূর্ণ

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য

আদিম প্রভাত-কালে আলোড়িত মানব-হৃদয়
প্রথম চেতনালোকে ধাবমান প্রগতির পথে,
সৃষ্টির কুয়াসা-জাল ছিন্ন করি' জ্ঞান-গরিমায়
পার হ'য়ে কালান্তর ছুটিয়াছে ক্ষিপ্র মহারথে।
সে রথের যাত্রী যারা—মানুষের পথ-নির্দেশক
যুগে যুগে আবির্ভূত বক্ষে নিয়ে অমিত-বিক্রম,
জড়তার অন্ধকারে কভু তারা পেয়েছে আঘাত,
তা'দের ললাটে লেখা পরিহাস,—নিষ্ঠুর, নির্ম্মম।

কত-দ্বন্দ্বে দোলায়িত, পথে পথে কত মৃত্যু-ভয়
সংশয়ের নিরসনে অতন্দ্রিত অসংখ্য মানব;—
বিকৃতি এসেছে কভু সভ্যতার ধ্বংস-রূপ লয়ে
মানব-চিত্তের কাছে তবুও সে মানে পরাভব।
অচল বন্ধুর পথে চলিয়াছে বাধা নাহি মানি'
পূর্ণতার অধিকারে লালায়িত মানব-সন্তান,—
সংক্ষুব্ধ সাগর-তীরে মানুষের ব্যর্থ অভিযান!
অদৃষ্টের করাঘাতে অভিহত অজেয় উদম ঃ

ত্রিপুরীতে আপোষের আলোচনা

সভাপতি নির্ব্বাচনের পর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বার জন সভ্যের পদত্যাগের ফলে, যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা ক্রমেই সঙ্গীন হইয়া উঠিতেছে।

৮ই মার্চ্চ সকাল বেলায় দেখা গেল যে, সর্দ্দার প্যাটেল, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বাঙ্গলার ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ এবং অপর কয়েকজন, বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিগণের শিবিরসমূহে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। প্রকাশ যে, তাঁহারা সমর্থন সংগ্রহের চেষ্টায় আছেন।

আরও জানা গেল যে, কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল অথবা অন্যান্য বামপন্থিবৃন্দ পণ্ডিত জওহরলালের সমর্থন না পাইলে কংগ্রেস পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত নহেন।

আপাততঃ, পণ্ডিতজী শান্তি স্থাপনের চেষ্টায় ব্যাপৃত আছেন। তিনি আপোষ মীমাংসার যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহার মূল সূত্রগুলি এইরূপ ঃ—

(১) পুরাতন সহকর্ম্মীদের বিরুদ্ধে আনীত সমস্ত অভিযোগ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রত্যাহার।

(২) দক্ষিণপন্থী এবং বামপন্থী—এই উভয় দলের সহযোগিতায় কাজ চালাইবার জন্য উভয় দলের সভ্য লইয়া ওয়ার্কিং কমিটি গঠন।

সর্দ্দার প্যাটেল নাকি নূতন ওয়ার্কিং কমিটিতে তাঁহার দলের সংখ্যাধিক্য চাহিতেছেন।

আরও জানা গেল যে, নূতন ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যগণের নামের তালিকা চূড়ান্তভাবে তাঁহার দ্বারাই অনুমোদন করাইয়া লইতে হইবে এবং তাঁহার সিদ্ধান্ত সভাপতি মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিবেন।

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু এখনও কোন কর্ত্তব্য স্থির করেন নাই। তবে ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিগণের শিবিরে সুস্পষ্ট মতামত নির্দ্ধারণের চেষ্টা চলিতেছে। বাঙলার প্রতিনিধিগণের শিবিরেও আলোচনা হইতেছে। কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় নাই।

আপোষ প্রচেষ্টা সম্পর্কে বিভিন্ন দলের মধ্যে আলোচনা চলিতেছে; পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, মৌলানা আজাদ ও বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ পর পর আলোচনা করিয়াছেন; এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারা যায় নাই। ৮ই মার্চ্চ অপরাহ্নে নেতৃগণ শ্রীযুত বসুর সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিয়া আলোচনায় ব্যাপৃত হইবেন। তারযোগে মহাত্মা জানাইয়াছেন যে, তাঁহার পক্ষে কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান করা অসম্ভব। বিষয়-নির্ব্বাচনী সমিতির অধিবেশনের এক ঘণ্টা পূর্ব্বে আপোষ নিষ্পত্তির শেষ চেষ্টায় পণ্ডিত নেহরু, সর্দ্দার প্যাটেল, মৌলানা আজাদ ও বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ দক্ষিণপন্থী নেতৃগণ পুনরায় রাষ্ট্রপতির কুটীরে সমবেত হন। বেলা চার ঘটিকা পর্য্যন্ত ইঁহাদের আলোচনা চলে, এই সময় রাষ্ট্রপতিকে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে লইয়া যাইবার জন্য একখানি এম্বুল্যান্স গাড়ী রাষ্ট্রপতির দ্বারদেশে আসিয়া উপনীত হয়।

কংগ্রেস মণ্ডপের প্রবেশ দ্বার।
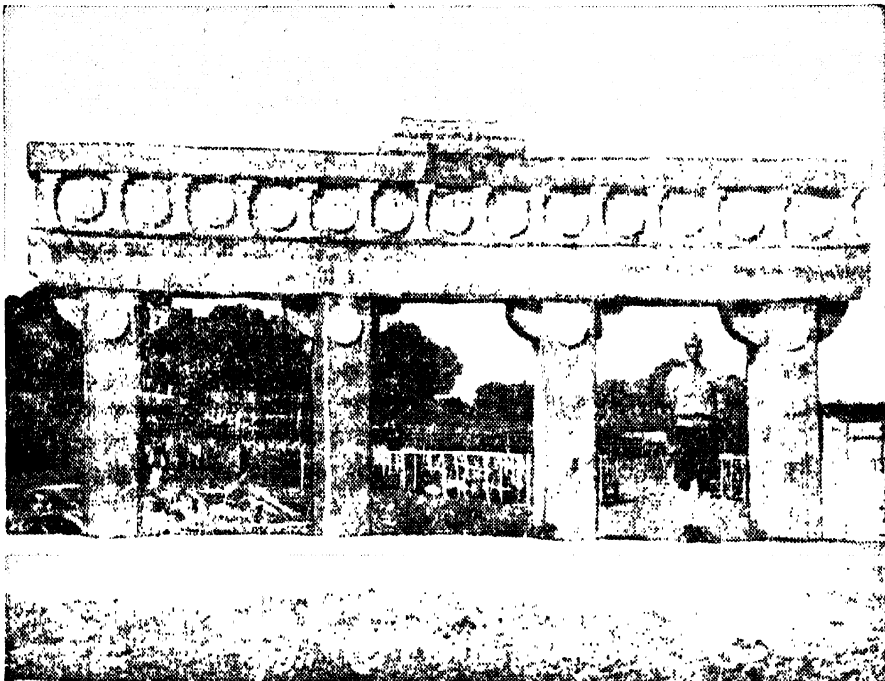
নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশন

আজ বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির মণ্ডপে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন আরম্ভ হয়। মণ্ডপে এত জনসমাগম হইয়াছিল যে, আর তিল ধারণের স্থানও অবশিষ্ট ছিল না। নেতারা মঞ্চত্যাগ করিয়া নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্যদের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানেই আসন গ্রহণ করেন এজন্য মঞ্চ অপেক্ষাকৃত জনশূন্য দেখাইতেছিল।

ষ্ট্রেচারে রাষ্ট্রপতির আগমন—

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসুকে 'ষ্ট্রেচারে' করিয়া বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির মণ্ডপে আনয়ন করা হয়, সর্ব্বত্র একটা করুণ ভাব লক্ষিত হয়। রাষ্ট্রপতির সহিত তাঁহার চিকিৎসকগণও আসেন। মঞ্চোপরি বিশেষ আসনে রাষ্ট্রপতি উপবেশন করিবামাত্র মণ্ডপের চারিদিক হইতে তুমুল হর্ষধ্বনি উত্থিত হয়। রাষ্ট্রপতি সহাস্যবদনে সকলের অভিবাদন গ্রহণ করেন।

রাষ্ট্রপতি মঞ্চোপরি প্রাক্তন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণকে না দেখিয়া তাঁহাদিগকে মঞ্চোপরি আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিবার জন্য অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম গুপ্তকে বলেন। শ্রীযুক্ত গুপ্ত তখন বলেন যে, সর্দ্দার প্যাটেল, মৌলানা আজাদ, শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই প্রভৃতি ওয়ার্কিং কমিটির যে সকল সদস্য পদত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা মঞ্চোপরি আসন গ্রহণ করুন। ইহাতে তাঁহারা সকলে মণ্ডপের শেষের দিকের আসনগুলি ত্যাগ করেন এবং সর্দ্দার প্যাটেলকে পুরোভাগে লইয়া মঞ্চাভিমুখে অগ্রসর হন। সঙ্গে সঙ্গে হর্ষধ্বনি উত্থিত হয়।

সভার কার্য্যারম্ভে শ্রীযুক্ত আর কে সিদ্ধ এক বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের পদত্যাগপত্র গ্রহণের ক্ষমতা কংগ্রেস সভাপতির নাই—উত্তরে রাষ্ট্রপতি নির্দ্দেশ দেন যে, ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনয়নের শূন্য পদ পূরণের ও পদত্যাগপত্র গ্রহণে সভাপতির ক্ষমতা আছে।

গান্ধী-নীতিতে আস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব—

পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ গান্ধী-নীতিতেও ওয়ার্কিং কমিটির পদত্যাগকারী সদস্যদের উপর আস্থা জ্ঞাপন করিয়া ও মহাত্মার নির্দ্দেশ মত নূতন ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের অনুরোধ জানাইয়া ১৬০ জন সদস্যের স্বাক্ষরিত এক প্রস্তাবের নোটিশ দিয়াছিলেন। সভাপতি ঐ সম্পর্কে নির্দ্দেশ দেন যে, ঐ প্রস্তাবটি নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে আলোচিত হইতে পারে না।
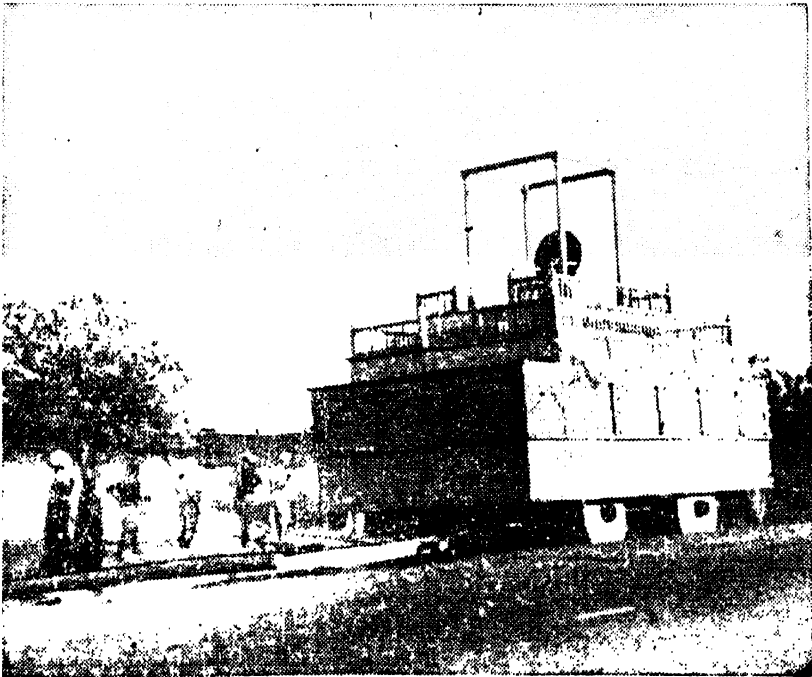
রাষ্ট্রপতিকে যে রথে করিয়া শোভাযাত্রা সহকারে লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছিল

ফটো: প্রতিমাপু

কংগ্রেস বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির

অধিবেশন আরম্ভ

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতিতে পরিণত হইবার পর সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু বলেন, পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ ১৬০ জন সদস্য স্বাক্ষরিত যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন ঐ প্রস্তাব সম্পর্কে বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখিয়াছি যে, প্রস্তাবটি নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে উত্থাপনের চেষ্টা করা হইয়াছিল। উহার নোটিশ ২৮শে ফেব্রুয়ারীর পূর্ব্বেই দেওয়া উচিত ছিল কিন্তু এক অসাধারণ পরিস্থিতির মধ্যে প্রস্তাব উত্থাপন করিতে যাওয়া হইতেছে বলিয়া আমি ঐ প্রস্তাবের পূর্ণ আলোচনার সুযোগ দানের পক্ষপাতী; তবে ইহার মধ্যে গুরুতর নিয়মতান্ত্রিক সমস্যা নিবদ্ধ আছে বলিয়া আমি মনে করি যে, সদস্যগণকে এই প্রস্তাব সম্পর্কে বিবেচনার জন্য সময় দেওয়া কর্ত্তব্য; অতএব এই প্রস্তাবের আলোচনা আগামীকল্য বেলা তিন ঘটিকায় আরম্ভ করা যাইবে। বিষয়-নির্ব্বাচনী সমিতির অধিবেশনও ৯ই মার্চ্চ বেলা তিন ঘটিকা পর্য্যন্ত স্থগিত থাকুক, ইত্যবসরে সকলে মিলিয়া প্রস্তাবটিকে এরূপ রূপ দানের চেষ্টা করুন যাহাতে উহা বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির বৈঠকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইতে পারে। আমি এজন্য সকলকে আপ্রাণ চেষ্টাকরিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি। বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির অধিবেশনের প্রারম্ভেই রাষ্ট্রপতি নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন যে, পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাবটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ঐ প্রস্তাবটিই তিনি সর্ব্বাগ্রে উত্থাপন করিতে দিবেন, তবে এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবটি যাহাতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইতে পারে প্রস্তাবটিকে তদ্রূপ রূপ দান করা কর্ত্তব্য। পণ্ডিত পন্থ প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়া বলেন যে, দেশের পক্ষে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব অত্যাবশ্যক। মিঃ গর্ডাগিল প্রস্তাবটি সমর্থন করিবার পর বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির অধিবেশন ৯ই মার্চ্চ বেলা তিনটা পর্য্যন্ত স্থগিত থাকে।

ঠাকুর ছেদীলাল
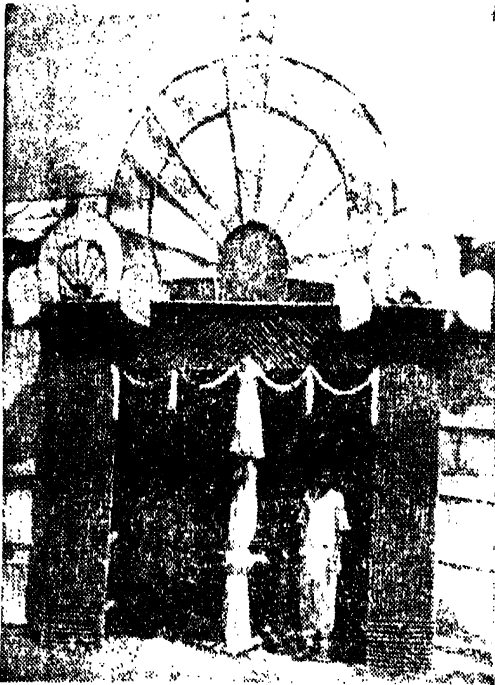
ত্রিপুরীনগরে খাদি প্রদর্শনীর অভ্যন্তরস্থ কলামণ্ডপের প্রবেশদ্বার।

পণ্ডিত শম্ভুদয়াল মিশ্র এম-এল-এ

স্বর্গীয় জমসেদজী টাটা

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যে অল্প কয়েকজন ভারতীয় নিজেদের প্রজ্ঞান ও দূরদৃষ্টিপ্রভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, শিল্পোন্নতি ব্যতীত জাতীয় উন্নতি সম্ভবপর নহে, বিজ্ঞান ও শিল্প শিক্ষার সুব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত ভারতীয়গণের জগতের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া সুকঠিন, তাঁহাদের মধ্যে পরলোকগত জমসেদজী এন টাটার নাম সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ভারতে লৌহ-শিল্পের প্রতিষ্ঠাতা কর্ম্মবীর টাটার নাম শুধু ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে, পরন্তু তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিবিধ শিল্প-প্রতিষ্ঠান আজ জগতের মধ্যেও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে এবং ব্যবসায় ও শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে তাঁহার অতুলনীয় কৃতিত্ব ও গৌরব ঘোষণা করিতেছে। তাঁহার জন্মস্মৃতি-বার্ষিকী উপলক্ষে এই বিরাট উদারহৃদয় কর্ম্মবীরের উদ্দেশ্যে আমরাও শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি।

সুরাট হইতে বিশ মাইল দূরে নবসারি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পার্শি পুরোহিত বংশে ১৮৩৯ সালের ৩রা মার্চ্চ তারিখে জমসেদজী নওশেরবানজী টাটা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা নওশেরবানজী একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। জমসেদজী তাঁহার বাল্য-জীবন স্বগ্রামেই অতিবাহিত করেন। চৌদ্দ বৎসর বয়ঃক্রমকালে জমসেদজী বোম্বাইর এলফিনষ্টোন ইনষ্টিটিউসনে আসিয়া ভর্ত্তি হন। তখনও এদেশে বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে সরকারী আইন পাশ হইবার সংগে সংগেই বলিতে গেলে ১৮৫৮ সালে তিনি উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে উত্তীর্ণ হইয়া মাত্র ১৯ বৎসর বয়সে পিতার ব্যবসায়ে যোগদান করেন। বস্ত্রশিল্পে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য ২৩ বৎসর বয়সে জমসেদজী ১৮৬২ সালে ল্যাংকাশায়ার যাত্রা করেন। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া ১৮৬৭ সালে তিনি কয়েকজন অংশী-দারের সহিত চিঞ্চপোকলির তেলের কল ক্রয় করেন এবং উহাকে 'আলেকজান্দ্রা মিলস্' নামে কাপড়ের কলে পরিণত করেন। আধুনিক কলকব্জা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করিবার জন্য ১৮৬৯ সালে তিনি পুনরায় বিলাত গমন করেন। তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং লিঃ স্থাপন করেন। ইহার পরে ১৮৭৪ সালে তিনি মধ্যপ্রদেশের নাগপুরে 'এম্প্রেস কটন মিলস' এবং 'স্বদেশী মিলস্' স্থাপন করেন। এই কারখানা স্থাপন করার সংগে সংগেই বলিতে গেলে জমসেদজীর শিল্প-প্রতিভা নূতন পথে পরিচালিত হইতে আরম্ভ করে। বিবিধ শিল্প কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া জমসেদজী বুঝিতে পারেন, কত বিষয়ে ভারতকে পরের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হয়। লোহা-লক্কর ছাড়া কল-কারখানা চালান দুষ্কর! অথচ এদেশে লোহ বা ইস্পাতের চাহিদা মিটাইবার কোন ব্যবস্থাই তখন ছিল না! কি ভাবে এই দেশে এরূপ ব্যবসায়ের পত্তন করা যাইতে পারে জমসেদজী তজ্জন্য বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিলেন। ১৮৮২ সালে মধ্যপ্রদেশের চন্দা জেলায় লৌহখনির অস্তিত্ব সম্পর্কে এক রিপোর্ট তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তদবধি ক্ষ্যাপার পরশমণি সন্ধানের অনুরূপ জমসেদজী ভারতে লৌহখনির অনুসন্ধানে দীর্ঘকাল অতি-বাহিত করেন। তিনি ইংলণ্ড ও আমেরিকার বহু বিশিষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তির সংগে এই বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেন এবং ভারতে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের প্রবর্ত্তন সম্ভবপর কি-না, তদ্বিষয়ে ইঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করেন। এজন্য তিনি অনেকবার ইংলণ্ড ও আমেরিকায় গমন করেন। এই সমস্ত কাজে তিনি যেরূপ অর্থ ব্যয় করিতে থাকেন তাহাতে দেশ-বিদেশে তাঁহার নাম বিশেষভাবে ছড়াইয়া পড়ে। দীর্ঘকাল তিনি এইভাবে অর্থ ব্যয় করিয়াও তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির কোন লক্ষণ দেখিতে পাইলেন না বটে, তবু তিনি ভারতে লৌহ শিল্পের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে একেবারে নিরাশ হইতে পারেন নাই। মধ্যপ্রদেশের বনাঞ্চলে ভবিষ্যৎ ভারতের যে অমূল্য সম্পদের তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন সেই স্বপ্নই তাঁহাকে দিবা-রাত্র পরিচালিত করিতে লাগিল। তাঁহার বদ্ধমূল ধারণা হইয়াছিল এই স্থানের ভূমিখণ্ডেই একদিন লৌহখনির সন্ধান মিলিবে। ভবিষ্যৎ ভারতকে লৌহ ও ইস্পাতের জন্য চিরদিন আর পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে না। একেবারে নিরাশ না হইলেও যখন জমসেদজী দেখিতে পাইলেন তাঁহার অনুসন্ধান পদে পদে ব্যর্থতায় পর্য্য-বসিত হইতেছে, তখন একবার তাঁহার মনে হইল আর বৃথা চেষ্টা করিয়া লাভ নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে একাজে আর একজন ভাগ্যান্বেষীরও আবির্ভাব হইল। তাঁহার নাম স্যার আর্নেষ্ট ক্যাসেল। তিনিও জমসেদজীর ন্যায় ভারতের সম্পদ আহরণ করিবার আশায় লৌহখনির সন্ধানে ফিরিতেছিলেন। জমসেদজী ও তাঁহার পুত্র

ডোরাবজী পদে পদে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া আশার ছলনে আর ঘুরিবেন না বলিয়া মনস্থ করিলেন এবং স্যার ডোরাব ইহাই মধ্যপ্রাদেশিক সরকারের চীফ সেক্রেটারীকে জানাইয়া দিবার জন্য একদিন তাঁহার সহিত সেক্রেটারীয়েটে দেখা করিতে গেলেন। সৌভাগ্যক্রমে চীফ সেক্রেটারী সেই সময় অফিসে ছিলেন না। এরূপ জানা যায়, জমসেদজীর পুত্র স্যার ডোরাবজী তখন পায়চারী করিতে করিতে অন্যমনস্কভাবে সেক্রেটারীয়েটের সন্নিকটে অবস্থিত মিউজিয়মে বেড়াইতে গেলেন, ভাবিলেন চীফ সেক্রেটারী ফিরিয়া আসিলে পরে আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিয়া পিতার অভিপ্রায় তাঁহাকে জানাইবেন। মিউজিয়মে এদিক-ওদিক ঘুরিতে ফিরিতে অকস্মাৎ একখানি মানচিত্রের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। এই মানচিত্রে মধ্যপ্রদেশের কোথায় কি খনিজ দ্রব্য পাওয়া যাইতে পারে তাহা প্রদর্শিত হইতেছিল। এই মানচিত্রের মধ্যে দ্রুগ জেলার স্থানে স্থানে কোথায় লৌহ আকর রহিয়াছে রঙীন চিহ্ন দ্বারা তাহা বিশেষভাবে চিহ্নিত ছিল। এই স্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, প্রমথনাথ বসু নামে একজন বাঙালী ভূতত্ত্ববিদ্ ১৮৮৭ সালে ভারত সরকারের নিকট যে রিপোর্ট পেশ করেন তাহাতে তিনি বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, মধ্যপ্রদেশের দ্রুগ জেলায় যে লৌহ-খনির সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা ভারতের পক্ষে অতি মূল্যবান্ সম্পদ। ঘটনাক্রমে মিউজিয়মে আসিয়া বাঙালী ভূতত্ত্ববিদের এই মূল্যবান রিপোর্টের বিষয় প্রথম অবগত হইয়া ডোরাব-জীর মত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। বাঙালী বৈজ্ঞানিকের সেই মহামূল্য তথ্যের বিষয় না জানিলে আজ টাটার বিরাট লৌহশিল্পের গঠন সম্ভবপর হইত কি-না সন্দেহ। জমসেদজী টাটার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে গিয়া আজ সেই পরলোকগত বাঙালী ভূতত্ত্ববিদ্ প্রমথনাথের স্মৃতি আমাদের অন্তরে জাগিয়া উঠে। তাঁহার আবিষ্কারের ফলেই বলিতে গেলে আজ আমরা দেখিতে পাইতেছি, যে অঞ্চল একদা জনশূন্য বনভূমিপ্রায় ছিল, আজ তাহাই কেন্দ্র করিয়া আধুনিক বিহারে গড়িয়া উঠিয়াছে এক বিরাট কর্ম্মশালা—মহানগরী টাটানগর। আজ ইহাকে কেন্দ্র করিয়া ভারতের বিভিন্ন স্থানে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য যেভাবে প্রসার লাভ করিতেছে নবভারতের তাহা এক নবীন অধ্যায়। টাটার লৌহ ও ইস্পাৎ কারখানা বিরাট দৈত্যের মত বিজ্ঞানের শক্তি ও সাধনার প্রতীকরূপে শোভা পাইতেছে। এই বিশাল কর্ম্মশালায় দরিদ্র ভারতের বহু নিরন্ন ব্যক্তি অন্নের সন্ধান পাইয়াছে। বহু উপবাসী পরিবার ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছে। টাটার এক লৌহ কারখানাতেই আজ প্রায় চল্লিশ হাজার হইতে পঞ্চাশ হাজার শ্রমিক বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত রহিয়াছে। ১৮৮৭ সালে মাত্র ২১ হাজার টাকা মূলধন লইয়া টাটা সন্স লিমিটেড কোম্পানী সংগঠিত হয়। ইহার পরিচালনাধীনে বহু শিল্পপ্রতিষ্ঠান আজ পরিচালিত হইতেছে। এই বিরাট কারবার প্রতিষ্ঠানটিকে কেন্দ্র করিয়া ভারতে যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার হইয়াছে তাহাতে বিভিন্ন কাজে ও কনট্রাক্টরের মধ্যেও কম লোক অর্থোপার্জ্জন করিবার সুযোগ পায় না!

লৌহ ও ইস্পাত কারখানা বা কয়টি কাপড়ের কল স্থাপন করিয়াই জমসেদজী ক্ষান্ত থাকেন নাই। জাতীয় উন্নতির জন্য শিল্পোন্নতি যে একান্ত আবশ্যক, একথা তিনি বিশেষভাবেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে শক্তি সঞ্চয়ন করিয়া তাহা এদেশের কাজে লাগাইবার কোন সুযোগই তিনি পরিত্যাগ করেন নাই। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিবার পর হইতে এদেশে বিবিধ সুবিধা অসুবিধার বিষয় তিনি বিশেষভাবে চিন্তা করিতেন এবং ব্যবসায়ক্ষেত্রে কি ভাবে ভারতকে স্বপ্রতিষ্ঠ করা যাইতে পারে তাহার উপায় উদ্ভাবনে মনোযোগী হইতেন। বোম্বাইকেই তিনি তাঁহার প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, বোম্বাইয়ে কোন কলকারখানা পরিচালনা করিতে হইলে হাজার হাজার মাইল দূরবর্ত্তী স্থান হইতে 'কয়লা' আনাইয়া কাজ চালাইতে হয়। শক্তি সম্পর্কে যদি পরমুখাপেক্ষী থাকিতে হয়, তাহার মত অব্যবস্থা আর কিছু থাকিতে পারে না। ভারতের গিরিকন্দরে, নদীনির্ঝরে শক্তি উৎসের অভাব নাই। জমসেদজী টাটা ইহাদিগকে কাজে লাগাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। ফলে, বোম্বাইয়ের 'হাইড্রো ইলেকট্রিক স্কীমের' উদ্ভব ঘটে। 'হাইড্রো ইলেক-ট্রিক স্কীমে' আজ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে শক্তি সঞ্চয়নের চেষ্টা চলিতেছে বটে, কিন্তু এসম্পর্কে টাটার প্রথম উদ্যম আমরা কখনই ভুলিতে পারিব না।

শিল্পপতি ও ক্রোরপতি টাটা শুধু ব্যবসায়ী সুলভ মনোভাব দ্বারাই পরিচালিত হইতেন না। শিল্প সংগঠনের যে আদর্শ দ্বারা তিনি পরিচালিত হইতেন তাহা ভারতকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছে। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন জমসেদজী টাটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন শুধু সংগঠনেই নহে, পরন্তু বৈজ্ঞানিক শিক্ষার মধ্য দিয়াই ভারতের অগণিত সন্তানের অর্থনৈতিক মুক্তির ভিত্তি রচিত হইতে পারে। তাই একান্ত যক্ষের মত ধন সঞ্চয় করিবার পথে না গিয়া তিনি তাঁহার অর্থের সদ্ব্যবহারও করিয়া গিয়াছেন। টাটার দানে এদেশে বহু বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হইতেছে। বাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স তাঁহার অর্থেই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। এতদ্ব্যতীত প্রতি বৎসর বহু ছাত্র টাটার প্রদত্ত বৃত্তি লইয়া বিদেশ হইতে নব নব জ্ঞানের সন্ধান লইয়া ভারতের শিল্পোন্নতির পথ সুগম করিতেছেন। সুযোগ ও সুবিধা পাইলে ভারতীয়গণ যে অনায়াসেই জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে বিদেশীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়াইতে পারে জমসেদজী তাহা বিশ্বাস করিতেন এবং এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি ভারতীয়দের শিক্ষাদীক্ষার উন্নতিকল্পে অর্থব্যয় করিতে কোন দিন কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। জাতিবর্ণনির্ব্বিচারে শুধু সৎকার্য্যে দেশের বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যেভাবে তিনি দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন, দানের মর্য্যাদার অবের স্থান

কম নহে। যে দানে দেশের বৃহত্তর হিত সাধিত হয়, তিনি ছিলেন তাহারই পক্ষপাতী। তিনি বলিতেন, "I prefer this constructive philanthropy which seeks to educate and develop faculties of the best of our young men." বলা বাহুল্য দানশীলতার যে আদর্শ তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা এদেশকে কম সমৃদ্ধ করে নাই।

আজ কংগ্রেস জাতীয় শিল্পোন্নয়ন সমিতি সংগঠন করিয়া এদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস নূতন করিয়া গড়িবার পরিকল্পনা করিতেছেন। এ সময় জমসেদজী টাটার নাম আমাদের বিশেষ করিয়াই স্মরণ-পথে উদিত হইতেছে। নিজ ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিলেও জমসেদজী যে দেশকে কখনও বিস্মৃত হন নাই, তাঁহার বিবিধ কার্য্যে তাহার নিদর্শন আমরা পূর্ব্বেই পাইয়াছি। জমসেদজী ছিলেন জাতির শ্রেষ্ঠ-সেবক। ১৮৮৫ সালের যে সভায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উদ্বোধন হয়, তিনি তাহাতে যোগদান করেন এবং তাঁহার জীবনের বহু কাজে তিনি জাতীয় সম্মান রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। নৌ-বাণিজ্যে ভারতীয়দের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এবং উপকূল-বাণিজ্যে বিদেশী কোম্পানীর অসংগত অধিকার সঙ্কোচ করিবার নিমিত্ত তিনি যে সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহার তীক্ষ্ণ জাতীয়তাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। নিজের সম্প্রদায়ের জন্য তাঁহার এতটুকু পক্ষপাতিত্ব কোনদিন পরিলক্ষিত হয় নাই। ভারতের বৃহত্তর স্বার্থকে তিনি চিরদিন সম্মুখে রাখিয়া কাজ করিয়াছেন এবং ভারতের ইতিহাসে তাঁহার গৌরব চিরদিন ঘোষিত হইবে সন্দেহ নাই।

সুদীর্ঘ ৫০ বৎসরের কর্ম্মবহুল জীবনের পর ১৯০৪ সালে ৬৫ বৎসর বয়সে জমসেদজী পরলোকগমন করেন। সুযোগ্য পুত্রের হাতে জীবনের কার্যভার অর্পণ করিয়া যেভাবে তিনি চিরবিদায় গ্রহণ করেন, তাহাতে তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেও ভারতবাসী তাঁহার স্মৃতিকে চিরদিন শ্রদ্ধার সহিতই স্মরণ করিবে। তিনি তাঁহার কার্য্যের দ্বারা সমগ্র ভারতের উন্নতি কামনার যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, আমরা আশা করি তাঁহার বংশধরগণ ও অনুবর্ত্তিগণ সে আদর্শের দ্বারাই অনুপ্রাণিত হইবেন। জমসেদজী বিদায় লইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তি ও কৃতিত্ব বহুকাল ভারতবাসীর হৃদয়ে জাগরূক থাকিবে সন্দেহ নাই।

সনেট

শ্রী অমিয় ভট্টাচার্য্য এম-এ-বি-টি

কবে সৃষ্টি হয়েছিল এ ধরা সুন্দর?
আমার গানেরও বুঝি আরম্ভ তখনি।
যুগান্ত চলেছে গান, শুনি নিরন্তর
নব নব রূপে ধরা গাহে আগমনী।
আমার গানের মাঝে রয়েছে লুকায়ে,
সৃষ্টির বেদনা-ক্ষুব্ধ অন্তরের কথা,
যত ফুল অকারণে গিয়াছে শুকায়ে
বহিয়া এনেছে গান তারি আকুলতা।

আজি সে সংগীতে পোড়ে আমারই পরাণ,
মৃগ-নাভি-গন্ধে যেন মৃগ সে চঞ্চল,
খুঁজিয়া বেড়াই কবে সুরু হোলো গান,
কেবা সাজাইল ধরা বিচিত্র বিহ্বল?

সেই প্রশ্নে আজও মোর বীণা করে নতি,
কাহারে ভুলিয়া করি কাহার আরতি?

ভীমরুলের বাহাদুরী

ভীমরুলের একজাতি মাটিতে গর্ত্ত করিয়া উহাতেই আপন নীড় অর্থাৎ চাক বাঁধে। এই চাকের গঠন ও আকৃতিতেই শুধু উহাদের বাহাদুরী নয়—ইহার উপরও উহারা আশ্চর্য্য বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় দেয়। উহাদের চাক তৈরী করিবার গর্ত্তটির উহারা ঠিক সেই আকারই দেয়, যে আকারের চাক উহারা বাঁধিবে। প্রায়ই দেখা যায় এই চাক হয় কতকটা ছোট একটা হাঁড়ির আকারে। গর্ত্ত খোঁড়া

হইয়া গেলে উহারা গর্ত্তের মুখটি এবং উপরিভাগ পালিশ করে এক আশ্চর্য্য কৌশলে। এই প্রকার একটি ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে উহা নিতান্তই বিস্ময়কর ব্যাপার। উহারা মুখে করিয়া একটি নুড়ি কুড়াইয়া আনে এবং উহা দ্বারা গর্ত্তের মুখের মাটির ডেলা ভাঙ্গিয়া দেয়; পরে আবার ঐ নুড়ি দ্বারা পিটাইয়া পিটাইয়া গর্ত্তের মুখ ও উপরিভাগ (রাস্তার ষ্টীম রোলারের মতই) সমতল ও মসৃণ করিয়া ফেলে। ক্ষুদ্র এতটুকু প্রাণীর এই আজব কৌশল প্রাণিতত্ত্ববিদ পণ্ডিতদেরও স্তম্ভিত করিয়াছে।

আঙুলের ছাপের বদলে চক্ষুর ছাপ

আঙুলের ছাপ হইতে অপরাধীর সনাক্তকরণ পুলিশের নিকট আজ ব্যাপক অস্ত্র। কিন্তু কিছুটা সন্দেহের উদ্রেক না করিয়া আঙুলের ছাপ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং ভাবী শার্লক হোমস্-য়ের নিকট চক্ষুর ছাপই হইবে অপরাধীকে সনাক্ত করিবার উপায়। ল্যাঙ্কেশায়ার, চেশায়ার, উত্তর ওয়েলস্ অঞ্চলের যত চক্ষু চিকিৎসক একত্র মিলিত হইয়া ডাঃ বার্কারের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন।

ডাঃ বার্কার বলেন কোনও ব্যক্তির চক্ষুর দিকে তাকাইয়া তারকার চারিদিকের শিরা-উপশিরাগুলির সংস্থান লক্ষ্য করা সহজ। আঙুলের ছাপে অনেক সময় কৃত্রিমতা করা সম্ভব, কিন্তু চক্ষুর এই শিরা-সংস্থানে কোন কৃত্রিমতা চলিবে না; বিশেষত জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত দীর্ঘকালের ভিতরও উহার প্রায় কোন পরিবর্ত্তনই ঘটে না। চক্ষুতে যদি কেহ কৃত্রিমতা করিতে চাহে, তবে উপায় চক্ষু নষ্ট করা। কিন্তু তেমন গুরুতর অপরাধীও পুলিশকে এড়াইবার জন্য চক্ষু কানা করিতে উদ্যত হইবে না স্বেচ্ছায়।

সন্দেহজনক ব্যক্তির অলক্ষিতে উহার চক্ষুর ফটো গ্রহণ করাও আঙুলের ছাপ গ্রহণের মত কঠিন ব্যাপার নয়। সুতরাং অক্ষিগোলকের রক্তবহা শিরা উপশিরার সংস্থান হইতে অপরাধীর সনাক্ত করণ প্রথা অদূর ভবিষ্যতে প্রচলিত হইবে।

বিকট মুখভঙ্গী রোগ

রোগিণী ৭ বৎসরের বালিকা।

স্থান—কলিকাতা।

ডাক্তার আসিয়া রোগিণীর কোনই রোগ-লক্ষণ আবিষ্কার করিতে পারেন না। সে কথা প্রকাশ করিবামাত্র, রোগিণীর পিতা বলেন, উহার রোগ ক্রিমি বিকার, সকল সময় টের পাওয়া যায় না নাড়ী ধরিয়া। রোগিণীর মা বলিতে থাকে—বাছা আমার কোন দিন স্তব-ধ্যান জানে না, কিন্তু বিকারের সময় সূর্য্য নমস্কার, নারায়ণ নমস্কার, দুর্গা নমস্কার পরিষ্কার বলিয়া যায়। সময়ে মা কালীর মত জিহ্বা বাহির করিয়া খাঁড়া উঁচাইবার ভঙ্গী করিয়া দাঁড়াইতে চাহে। বলিতে বলিতেই রোগিণী বিকট মুখভঙ্গী আরম্ভ করিল। বিড় বিড় করিয়া সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিতে থাকিল।

ডাক্তার লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। রোগিণী যখনই মা-কালী হইতে চায় তাহার মা জোর করিয়া ধরিয়া শোয়াইয়া দেয়। সেয়ানা ডাক্তার এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। যেমন রোগিণী মুখভঙ্গী করে, অমনি বলেন—"সব ক'টা দাঁত দেখিয়ে ভ্যাংচাও ত মা।" রোগিণী হুবহু তেমনই করে।

ডাক্তার আবার বলেন—পা দুখানা তুলে ভ্যাংচাও ত। অমনি রোগিণী পা তুলিয়া ধরিয়া ভ্যাংচায়। ডাক্তার বলেন—উবুড় হয়ে এবার ভ্যাংচাও ত। অমনি হুকুম তামিল।

সরোষে উঠিয়া বৃদ্ধ ডাক্তার ফাটিয়া পড়েন—এই সং দেখবার জন্যে আমায় ডেকেছেন?

বাড়ীওয়ালা অপ্রস্তুত। রোগিণী বাড়ীওয়ালার আত্মীয়-কন্যা, মফঃস্বল হইতে চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় বাড়ীওয়ালার বাড়ীতে আসিয়াছে। ডাক্তার বাড়ীওয়ালার বন্ধু।

অনুসন্ধানে জানা যায়, কোন মোকদ্দমার কুফল এড়াই-বার জন্য রোগিণীসহ তাহার পিতামাতা কলিকাতায় আত্মীয় বাড়ীওয়ালাটির স্কন্ধে চাপিয়াছে। কুটুম্ব বাড়ীতে বেশী দিন থাকা শোভনীয় নয়, তাই অজুহাত সৃষ্টির জন্য কন্যার এই মুখভঙ্গী রোগের উদ্ভাবন।

বিড়ালের ডিগ্‌বাজি

বিড়ালকে যেমন অবস্থায় রাখিয়াই উঁচু হইতে ফেলিয়া দেওয়া হউক না কেন— উহা পাক খাইয়া ঠিক চারি পায়ে ভর দিয়াই মাটিতে দাঁড়াইবে—কখনও কাৎ বা চিৎ হইয়া পড়িবে না মাটিতে। কেন?
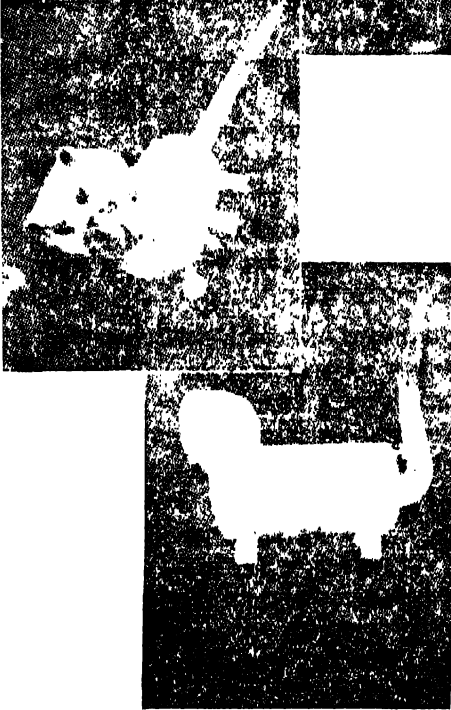
কারণ পড়ন্ত অবস্থায় শূন্যে শূন্যেই উহার লেজের সাহায্যে বিড়াল পাক খাইয়া পাগুলিকে নীচের দিকে করিয়া উবুড় হইতে পারে। এই গবেষণায় নিযুক্ত এক ইঞ্জিনীয়ার একটি খেলনা বিড়াল তৈয়ার করিয়া উহার পেটের ভিতর স্প্রিং-য়ের সাহায্যে এমন এক যন্ত্র-কৌশল নির্ম্মাণ করিয়াছেন যে, এইটিকে চিৎ করিয়া ফেলিয়া দিলেও শূন্যে থাকা অবস্থায়ই ঐ যন্ত্র সাহায্যে লেজটি ঘুরিয়া যায়—সঙ্গে সঙ্গে দেহটি ভারসাম্য স্থির রাখিতে পাক খাইয়া যায় এবং মাটিতে আসিয়া যখন খেলনা বিড়াল পৌঁছায় তখন চারি পা-ই মাটি ছোঁয় আগে। যেমন অবস্থায় রাখিয়াই কেন এই খেলনা বিড়ালকে ফেলা যাউক না, উহা কোন রকমেই কাৎ হইয়া বা চিৎ হইয়া মাটিতে পড়িবে না।

উপরের চিত্র—খেলনা বিড়ালটিকে চিৎ করিয়া সুতায় ধরিয়া ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছে; ফেলিয়া দিবার অব্যবহিত পূর্ব্বাবস্থা। সুতোটি ছাড়িয়া দেওয়া মাত্র খেলনা বিড়ালটি পড়িতে আরম্ভ করিবে এবং সুতো ছাড়িয়া দিবার দরুণ যে প্রেরণা, তাহাতেই অভ্যন্তরের স্প্রিং-য়ের ক্রিয়া সুরু হইবে। স্প্রিং-য়ের ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার লেজটিও ঘুরিতে থাকিবে।

মধ্যকার চিত্র—খেলনা বিড়ালটি মেঝে ছুঁইবার মধ্যপথে পৌঁছিয়াছে; লেজটি অনেকটা ঘুরিয়া আসিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বাকি অঙ্গও পাক খাইয়াছে; লেজটি যথাস্থানে স্বাভাবিক অবস্থায় যেমন আসিবে খেলনা বিড়ালের অঙ্গও ঠিক উবুড় হইয়া পড়িবে।

নিম্ন চিত্র—মেঝে ছোঁয়-ছোঁয় হইয়াছে; লেজও যথাস্থানে আসিয়াছে, খেলনা বিড়ালের দেহও সেই অনুসারে ঠিক হইয়াছে, এখন মেঝেতে পৌঁছিবার কালে পাগুলাই আগে ঠেকিবে মেঝেয়।

উন্মাদ চিকিৎসক

পিট্‌স্‌বার্গের আমেরিকান অস্ত্রোপচারক পিটার ল্যামণ্ট তাঁহার পত্নীকে র‍্যাবিস্ (কুক্কুর-বিষ) রোগে ছট্‌ফট্ করিয়া মারা যাইতে দেখিয়া সমগ্র মানব-জাতির উপর উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে পণ করে। ইহার পর তিন সপ্তাহ মধ্যে এই চিকিৎসকের ১২টি রোগীর ভিতর ৫টি মারা যায় এবং সে স্বীকার করে রোগ-বীজাণু সে রোগীদের দেহে ইন্‌জেক্ট করিয়া দিয়াছে, তখন পুলিশ তাহাকে পাগলা গারদে আটক করিয়া রাখে।

গারদের একটি উন্মাদ স্বকৃত দুর্ঘটনার ফলে মস্তকে এমন আঘাত পায় যে, গারদের ডাক্তারগণ উহাকে 'অসাধ্য' বলিয়া চিকিৎসার প্রয়াসই করে না। ল্যামণ্ট বলে অস্ত্রোপচার দ্বারা উহাকে সে ভাল করিতে পারিবে, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ অনুমতি দেয় না। কিন্তু ল্যামণ্ট নাছোড়, সে অপারেশন্ কক্ষে যাইয়া নার্সদের বলে যে, সে অস্ত্রোপচার করিবার অনুমতি পাইয়াছে। চারি ঘণ্টার চেষ্টায় সে ঐ রোগীকে বাঁচাইয়া তোলে, কিন্তু এই কঠোর শ্রমের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া কিছুদিনের ভিতরই নিজে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

তাহার ঐ বিচিত্র আরোগ্য করিবার সংবাদ সমগ্র মার্কিনে ছড়াইয়া পড়ে এবং বহু রোগী এই "উন্মাদ প্রতিভা"র নিকট চিকিৎসার জন্য আগমন করে। মৃত্যুর পূর্ব্বে ল্যামণ্ট ৪৮টি উন্মাদ রোগীকে অস্ত্রোপচার দ্বারা আরোগ্য করিয়াছে, নতুবা এই ৪৮ জনও পাগলা গারদে বন্দী হইত।

পুস্তক পরিচয়

জীবাণু (কবিতার মাসিক পত্র)—সুশীল রায় ও মণীন্দ্র বসু সম্পাদিত। ১২নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। প্রকাশিত। প্রতি সংখ্যা দুই আনা, বার্ষিক দেড় টাকা।

সুশীলবাবুর কবিতার ক্ষেত্রে পরিচিত। জীবাণু পত্রিকাখানায় তাঁহার সুসম্পাদনা প্রকাশ পাইয়াছে। আলোচ্য নবম সংখ্যায় সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, লীলাময় বসু, 'অনিলা সেন প্রভৃতির কবিতা বাহির হইয়াছে। আমরা পত্রিকাখানার সাফল্য কামনা করি।

চলার পথে—সচিত্র মাসিক পত্র। ১১০নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায় অনেকের নিকটই সুপরিচিত। এ দেশের বহু নির্য্যাতিত দেশপ্রেমিকদের মধ্যে তিনি একজন। বহুদিন রাজবন্দী থাকার পর কিছুদিন হইল মুক্তিলাভ করিয়াছেন। ইনিই সুবিখ্যাত "বেণু' পত্রের সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার সম্পাদিত 'চলার পথে'র প্রথম সংখ্যা পাঠ করিয়া আমরা আনন্দলাভ করিয়াছি। বর্ত্তমান সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র, পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন, কবি দিলীপ রায়, শিল্পী অসিত হালদার, শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায়, শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সান্ন্যাল, শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বক্সী, হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, মিঃ সুরাবর্দ্দী ইঁহাদের লেখা আছে। শিল্পী নন্দলাল বসু ভিতরের একখানা ছবি ও প্রচ্ছদপট আঁকিয়া দিয়াছেন। আমরা নবীন সহযোগীকে অভিনন্দিত করিতেছি।

সাহিত্য-সংবাদ

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলন

আগামী ৮ই ও ৯ই এপ্রিল কলিকাতায় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। এই উদ্দেশ্যে একটি শক্তিশালী অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে। খান বাহাদুর মৌঃ আজিজুল হক সি-আই-ই সাহেব অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং মৌলানা মোহাঃ আকরম খাঁ, খান বাহাদুর তসদ্দুক আহ্‌মদ, খান সাহেব মিঃ আনোয়ার-উল কাদির, মিঃ হুমায়ুন কবীর, কবি গোলাম মোস্তাফা প্রমুখ ব্যক্তিগণ সহঃ সভাপতি এবং মিঃ আয়নুল হক খাঁ সাধারণ সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

মূল সম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন প্রবীণ সাহিত্যিক মুনশী আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ সাহেব।

শাখাসমূহ নিম্নরূপ ভাগ করা হইয়াছে:—

১। সাহিত্য শাখা—সভাপতি মিঃ এস ওয়াজেদ আলী;
২। কথা-সাহিত্য শাখা „ খান সাহেব মৌঃ হেদায়েৎ উল্লাহ
৩। কাব্য শাখা „ কবি নজরুল ইস্‌লাম;
৪। মনন শাখা „ মৌঃ মোহাঃ বরকত উল্লাহ্‌ বি-সি-এস

সম্মেলনে যোগদান করার জন্য বাঙলার মুসলমান সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগীদিগকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণের জন্য অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদকের নিকট ৪৯নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতায় পত্র ব্যবহার করিতে হইবে।

মুজীবর রহমান খাঁ,
খান বাহাদুর মঈনুদ্দীন,
প্রচার-সম্পাদক।

ছাত্র-সঙ্ঘের বার্ষিক রচনা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

রাজপুরস্থ ছাত্র-সঙ্ঘের পক্ষ হইতে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, উক্ত সঙ্ঘের আবৃত্তি ও রচনা প্রতিযোগিতা অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরেও হইবে। কেবলমাত্র জেলা ২৪-পরগণা ও কলিকাতার স্কুলের ছাত্রসমূহ প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারিবেন। আবৃত্তি প্রতিযোগিতাটি আগামী ২রা এপ্রিল রবিবার অপরাহ্ণ দুইটার সময় "ছাত্র-সঙ্ঘ হলে" অনুষ্ঠিত হইবে। নিম্নে আবৃত্তি ও রচনার বিষয়গুলি প্রদত্ত হইল:—

আবৃত্তি—নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ—(চয়নিকা) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রচনা—(১) জাতীয় জীবনে প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা; অথবা (২) ছাত্র ও রাজনীতি।

রচনা ফুলস্কেপ সাইজের পাতায় এক পৃষ্ঠা করিয়া লিখিতে হইবে। কুড়ি পৃষ্ঠার অনধিক বাঞ্ছনীয়। রচনা ও প্রবেশার্থিগণের নাম তাহাদের স্ব স্ব বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পরিচয়পত্র সহ ছাত্র-সঙ্ঘ সম্পাদকের নামে ৩১শে মার্চ্চের মধ্যে পাঠাইতে হইবে।

আবৃত্তি ও রচনায় সর্ব্বোৎকৃষ্টকে একটি করিয়া (পৃথক-ভাবে) রৌপ্যপদক পুরস্কার দেওয়া হইবে।

পারিতোষিক বিতরণ "ছাত্রসঙ্ঘের দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশনে" ১৬ই এপ্রিল তারিখে অনুষ্ঠিত হইবে

শ্রীকালীচরণ চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক, "ছাত্র-সঙ্ঘ" (রাজপুর)। পোঃ সোনারপুর, ২৪-পরগণা।

ছোট গল্প প্রতিযোগিতা

অভিযান দল পরিচালিত

যে কেহ এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারিবেন। রচনা স্পষ্টাক্ষরে কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। রচনা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নভাবে বাঙলায় লেখা বাঞ্ছনীয়।

প্রথম পুরস্কার—১টি রৌপ্যপদক ও দ্বিতীয় পুরস্কার—১টি রৌপ্যপদক।

রচনা পাঠাইবার শেষ তারিখ—১৬ই চৈত্র (ইং ৩০শে মার্চ্চ ১৯৩৯)। রচনা পাঠাইবার ঠিকানা—শ্রীশ্যামাচরণ মিত্র; ২৮নং গোপাললাল চৌধুরী লেন, শিবপুর, হাওড়া।

বাঙলার সন্তরণ পরিচালনের দায়িত্ব

সন্তরণের মরসুম আগতপ্রায়। এই মাসের শেষ সপ্তাহ হইতেই বাঙলার শ্রেষ্ঠ সন্তরণ প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়মিতভাবে সন্তরণ শিক্ষার ব্যবস্থা করিবে। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সারা বাঙলাব্যাপী সন্তরণের বিপুল সাড়া পড়িয়া যাইবে। বড় বড় শহর হইতে আরম্ভ করিয়া সুদূর পল্লীগ্রামেও সন্তরণের তোড়জোড়ের অভাব পরিলক্ষিত হইবে না। প্রতি বৎসরই এইরূপ হইয়া থাকে। বাঙলার পক্ষে ইহা নূতন কিছুই নহে। সুতরাং উক্ত বিষয় উল্লেখ করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। বাঙলার সন্তরণ পরিচালকগণের এই বৎসরের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়াই আমাদিগকে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে। এই বৎসরের সন্তরণের বিশিষ্টতার উপর বাঙলা দেশের সন্তরণ-কারিগণের সম্মান বৃদ্ধি বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছে। আগামী বৎসরে আগষ্ট মাসে ফিনল্যাণ্ডে বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠান হইবে। এই বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানে বাঙলার সন্তরণবীরগণকে যোগদান করিতে হইলে গত বৎসর অপেক্ষাও উন্নততর নৈপুণ্যের অধিকারী হইতে হইবে। গত বৎসরে সন্তরণের বিভিন্ন বিষয় বাঙালী সাঁতারুগণ নূতন ভারতীয় রেকর্ড করিয়া যে ফলাফল প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানে যোগদানের উপযোগী হয় নাই। ঐ সকল রেকর্ড ভঙ্গ করিয়া আরও উন্নততর ফলাফল প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তা আছে। ঐ সকল বিষয়ের পৃথিবীর রেকর্ডের সহিত তুলনা করিলেই বাঙালী সাঁতারুগণ জানিতে পারিবেন যে, তাঁহারা কত পশ্চাতে পড়িয়া আছেন। এমন কি ঐ সকল বিষয়ে মহিলা সাঁতারুগণ যে পৃথিবীর রেকর্ড করিয়াছেন তাহারও সমান হয় নাই। বিশ্ব অলিম্পিক ক্রীড়াক্ষেত্রে বাঙালী সাঁতারুগণকে সম্মানলাভ করিতে হইলে বর্ত্তমান সন্তরণ নৈপুণ্যের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। তাঁহা-দিগকে আরও অধিক উন্নততর নৈপুণ্যের অধিকারী হইতে হইবে। কিন্তু তাহা কেবল বাঙালী সাঁতারুগণের আন্তরিক ইচ্ছা বা আপ্রাণ সন্তরণ অভ্যাসের দ্বারা সম্ভব নহে। তাহার জন্য প্রয়োজন আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সন্তরণ কৌশল নিখুঁতভাবে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা। বাঙলার সন্তরণ পরি-চালকগণের উপরই তাহা নির্ভর করিতেছে। তাঁহারা যদি ঔদাসিন্য ত্যাগ করিয়া কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হন, তবেই এই ব্যবস্থা হইতে পারে। গত কয়েক বৎসর হইতে এই একই বিষয় উল্লেখ করিয়া সন্তরণ পরিচালকগণকে সজাগ করিবার চেষ্টা আমরা করিয়াছি; কিন্তু সফলকাম হই নাই। পুনরুক্তির দ্বারাও যে তাঁহাদের সচেতন করিতে পারিব এইরূপ আশা আমরা পোষণ করি না। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সন্তরণকারিগণের মধ্যে বাঙালী সাঁতারুগণের স্থান হয় ইহা আমরা চাই। সেই-জন্যই প্রতি বৎসর আমাদিগকে এই একই কথা বার বার উল্লেখ করিতে হইতেছে।

শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য অর্থের উল্লেখ

অনেক সময় সন্তরণ পরিচালকগণ আমাদের উক্তির বিরুদ্ধে যুক্তি দেখান যে, অর্থাভাবের জন্যই নাকি তাঁহারা বিজ্ঞানসম্মত সন্তরণ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিতেছেন না। ভারতে কেহ আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সন্তরণ কৌশল শিক্ষা দিতে জানেন না। বৈদেশিক সন্তরণ শিক্ষক আনাইয়া সন্তরণ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারেন, কেবল অর্থের জন্যই তাহা সম্ভব হইতেছে না। সন্তরণ পরিচালকগণের যুক্তি যে সম্পূর্ণ ভীত্তিহীন ইহা আমরা বলি না, তবে বৈদেশিক সন্তরণ শিক্ষক আনাইবার খুবই যে প্রয়োজনীয়তা আছে ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। কারণ আমরা জানি যে, জাপানী সাঁতারু-গণকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাঁতারুগণের মধ্যে স্থান লাভ করিতে বৈদেশিক শিক্ষকগণের সাহায্য লাভ দরকার হয় নাই। তাঁহারা বৈদেশিক সন্তরণ শিক্ষকগণের লিখিত পুস্তকগুলি অনুসরণ করিয়াই এইরূপ অভাবনীয় উন্নতি করিয়াছেন। তাঁহারা প্রথমে সন্তরণ শিক্ষকগণের পুস্তকসমূহ ক্রয় করিয়া তাহা পাঠ করিয়া জাপানী বালক ও যুবকগণকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কয়েক মাস শিক্ষা দিবার পর বিভিন্ন জাপানী সন্তরণ শিক্ষক একত্র হইয়া তাঁহাদের শিক্ষার ফল অবলোকন করিলেন এবং সেই সময় তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষা প্রণালীর সুবিধা ও অসুবিধা সম্বন্ধে আলোচনা হইল। তাঁহাদের সকলের অর্জ্জিত শিক্ষার কৌশল একত্র করিয়া একটি সাধারণ ধারা অনুসরণ করিলে কি ফল হয় তাহা দেখিবার দিকে তাঁহাদের ইচ্ছা হইল। সাধারণ প্রণালী সকল সন্তরণ শিক্ষক গ্রহণ করিয়া পুনরায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। কয়েক মাস পরে পুনরায় তাঁহারা সম্মিলিত হইয়া শিক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন এইরূপ সন্তরণ শিক্ষকগণের সম্মেলন ও আলোচনার ফলস্বরূপ বর্ত্তমান জাপানী 'ক্রলে'র উৎপত্তি। আমাদের দেশের সমস্ত বিশিষ্ট সন্তরণ শিক্ষকগণ যদি একত্র হইয়া এইরূপ আলোচনা করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস আছে বাঙলা দেশও একদিন জাপানের ন্যায় সন্তরণ কৌশল বিষয়ে এক নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে। বাঙালী সাঁতারুগণও জাপানী সাঁতারুদের ন্যায় পৃথিবীর ক্রীড়াক্ষেত্রে সম্মান লাভ করিবে। সন্তরণ পরিচালকগণ অর্থাভাবের যে যুক্তি দেখাইয়া থাকেন তাহার কোনই মূল্য তখন থাকিবে না।

সাপ্তাহিক সংবাদ

২৮শে ফেব্রুয়ারী

ভারত গবর্ণমেণ্টের অর্থসচিব স্যার জেমস গ্রীগ ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভারত গবর্ণমেণ্টের বাজেট পেশ করিয়াছেন। ১৯৩৯-৪০ সনের বাজেটের মোটামুটি দফা এই :—

আয়—৮২ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা;
ব্যয়—৮২ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা;
ঘাটতি—৫০ লক্ষ টাকা।

এই ঘাটতি পূরণের জন্য অর্থসচিব বিদেশ হইতে আমদানী কাঁচা তুলার উপর শুল্কে দ্বিগুণ বৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন। বর্ত্তমানে আমদানী কাঁচা তুলার শুল্কে পাউণ্ড প্রতি ৬ পাই। প্রস্তাব অনুযায়ী উহা পাউণ্ড প্রতি এক আনা হইবে। অর্থসচিব মনে করেন যে, শুল্ক বৃদ্ধির ফলে ভারত গবর্ণমেণ্টের ৫৫ লক্ষ টাকা আয় বাড়িবে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিলের আলোচনা আরম্ভ হয়; কিন্তু ২৮শে ফেব্রুয়ারী বে-সরকারী কার্য্য-দিবস বলিয়া পূর্ব্ব হইতেই ধার্য্য থাকায় ঐ দিন সরকারী বিল উত্থাপনে কংগ্রেসী দল বৈধতার প্রশ্ন তুলিয়া বে-সরকারী প্রস্তাব উত্থাপন করেন, ইহাতে পরিষদে তুমুল হট্টগোলের সঞ্চার হয়। গোলমালের জন্য দুইবার পরিষদের বৈঠক মুলতুবী রাখা হয় এবং কংগ্রেসী দলের তিনজন সদস্যের উপর বহিষ্কারের আদেশ জারী হয়। ইহাতেও পরিষদের কাজ চালান অসম্ভব হওয়ায় স্পীকার আগামী ৬ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত অধিবেশন স্থগিত রাখেন।

রাজকোটের রেসিডেণ্ট মিঃ গিবসনের সহিত মহাত্মার ৯০ মিনিটকাল আলোচনা হয়। পুলিশ জুলুম সম্পর্কে মহাত্মার কাছে ৪০০ বিবৃতি আসিয়াছে। মিঃ গিবসনের সহিত আলোচনার পর মহাত্মা ৪ ঘণ্টাকাল প্রজা-কর্ম্মীদের সহিত আলোচনা করেন। শাসন সংস্কার কমিটিতে প্রতিনিধিত্বের দাবী জানাইবার জন্য মুসলমান প্রতিনিধিগণ মহাত্মার সহিত দেখা করিবেন। আজ অপরাহ্নে মহাত্মা রাজকোট জেল, সরধার জেল ও কুম্বক জেল পরিদর্শন করিয়া বন্দীদের অভিযোগ শ্রবণ করেন। মিঃ গিবসনের সহিত আলোচনার ফলে রাজকোট সমস্যার সমাধানের আশা দেখা যাইতেছে বলিয়া প্রকাশ।

রেঙ্গুনে আবার হিন্দু-মুশ্লিম দাঙ্গা আরম্ভ হইয়াছে। দাঙ্গার ফলে ২৬ জন আহত ও একজন নিহত হইয়াছে এবং সহরের কয়েকটি দোকান লুট হওয়ায় বিভিন্ন স্থানে বহু হিন্দুর দোকান বন্ধ রাখা হইয়াছে।

স্পেনের প্রেসিডেণ্ট আজানার পদত্যাগের সংবাদ আজ ঘোষিত হইয়াছে।

বিহারের ব্যবসায়িগণ বাঙলা, যুক্ত প্রদেশ, দিল্লী এবং বোম্বাইয়ের ব্যবসায়ীদের সহযোগে বাইসাইকেল তৈয়ারী করার জন্য একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। কারখানাটি খুব সম্ভব জামসেদপুরে তৈয়ারী হইবে।

১লা মার্চ্চ

রেঙ্গুনে দাঙ্গাকারীদের উপর পুলিশ তিনবার গুলী-বর্ষণ করে। এপর্য্যন্ত মোট ৫ জন নিহত ও ৭০ জন আহত হইয়াছে। দাঙ্গা হাঙ্গামা সহর হইতে সহরতলী পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সহরের বিভিন্ন মহল্লার হিন্দু ও মুসলমানগণ সহর পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে।

এসোসিয়েটেড প্রেস জানিতে পারিয়াছেন যে, কংগ্রেস সভাপতি ৬ই মার্চ্চ কলিকাতা হইতে ত্রিপুরী রওনা হইবেন স্থির করিয়াছেন। সম্ভবত একখানা এম্বুলেন্সযোগে তাঁহাকে হাওড়া ষ্টেশনে লইয়া যাওয়া হইবে—গাড়ী হইতে নামিয়াও তিনি একখানা এম্বুলেন্স যোগে কংগ্রেস নগরী যাইবেন।

ডারবান হইতে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র নিজস্ব সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, আফ্রিকার সমস্ত প্রদেশে ভারতীয় ব্যবসায়িগণকে একঘরে করিবার উদ্দেশ্যে স্বরাষ্ট্রসচিব শীঘ্রই পরিষদে এক বিল আনিবেন বলিয়া তিনি জানিতে পারিয়াছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার, বিশেষ করিয়া নেটাল ও র‍্যাণ্ডের ভারতীয় ব্যবসায়িগণই যে শুধু এই বিলের তীব্র বিরোধিতা করিয়াছেন তাহা নহে, উপরন্তু ভারত সরকারও এই বিলটির বিরোধিতা করিতেছেন।

অদ্য বোম্বাই হাইকোর্টে বিচারপতি মিঃ ওয়াদিয়ার এজলাসে স্বর্গীয় বিটলভাই প্যাটেলের উইল সংক্রান্ত মামলার সওয়াল শেষ হইয়াছে। বিচারপতি রায়দান স্থগিত রাখিয়াছেন।

ডাঃ প্রভাবতী দাশগুপ্তা টিটাগড় চটকল শ্রমিক ধর্ম্মঘটীদের দাঙ্গাহাঙ্গামায় প্ররোচনার অভিযোগে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর গুপ্তের এজলাসে অভিযুক্ত হন। গত বুধবার ম্যাজিষ্ট্রেট এই মামলার রায় দিয়াছেন। ডাঃ প্রভাবতী দাশগুপ্তাকে ২০০্ টাকা অর্থদণ্ড, অন্যথায় দুই মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। ডাঃ দাশগুপ্তা জরিমানার টাকা শোধ করিয়াছেন।

২রা মার্চ্চ

গত তিন দিন যাবত রাজকোট সমস্যার সমাধান সম্পর্কে আশার লক্ষণ দেখা যাইতেছে; কিন্তু অদ্য সকাল হইতে সম্পূর্ণ নৈরাশ্য দেখা যাইতেছে।

মহাত্মা গান্ধী রাজকোটের ঠাকুর সাহেবের বরাবরে ২৪ ঘণ্টার সময় দিয়া এক চরম পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এই পত্রের সন্তোষজনক উত্তর না পাইলে মহাত্মা শুক্রবার মধ্যাহ্ন হইতে আমরণ অনশন আরম্ভ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। মহাত্মার অনশন সঙ্কল্পে সকলের মধ্যে বিশেষ উদ্বেগ ও নৈরাশ্যের সঞ্চার হইয়াছে।

রেঙ্গুনে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার ফলে এপর্য্যন্ত ১১ জন নিহত ও ১৩২ জন আহত হইয়াছে এবং প্রায় একশত লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। সহরের অবস্থা অনেকটা স্বাভাবিকের দিকে আসিতেছে বলিয়া প্রকাশ।

লিভারপুলে চেম্বার অব কমার্শের এক ভোজ-সভায় বক্তৃতা করিতে গিয়া ভারত সচিব লর্ড জেটল্যান্ড ভারতে যেসব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে তাহার উল্লেখ করেন।

দেশীয় রাজ্যগুলির শাসন প্রণালীর মধ্যে সংস্কারযোগ্য অনেক কিছু রহিয়াছে এবং সার্ব্বভৌম শক্তির পক্ষে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর তৎপরতার সহিত ঐসব রাজ্যের শাসন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া তিনি মনে করেন।

স্পেনীয় পার্লামেন্টের প্রেসিডেন্ট মার্টিনেজ ব্যারিও স্পেন গণতন্ত্রের প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণ করিয়াছেন। জেনারেল ফ্রাঙ্কো সিনর মুসোলিনীকে স্পেন হইতে ইতালীয় সৈন্য সরাইয়া লইতে অনুরোধ করিয়াছেন বলিয়া এক সংবাদে প্রকাশ।

অদ্য লর্ড সভায় লর্ড স্নেলের প্রশ্নের উত্তরে ভারত-সচিব লর্ড জেটল্যান্ড বলেন, "গবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই ভারত শাসন আইন সংশোধনের জন্য বিল উত্থাপন করিতে মনস্থ করিয়াছেন এবং তাঁহারা আশা করেন যে, পার্লামেন্টের গ্রীষ্মকালীন অধিবেশন শেষ হইবার পূর্ব্বেই উহা পাশ হইবে।

মহরম উপলক্ষে কানপুর এবং অমৃতসরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়। দাঙ্গার ফলে কানপুরে ৪ জন নিহত ও ১০ জন আহত হয় এবং অমৃতসরে ১৬ জন আহত ও ১ জন নিহত হয়। নানাপ্রকার সতর্কতামূলক ব্যবস্থার ফলে অবস্থা শান্তিপূর্ণ হইয়াছে।

৩রা মার্চ্চ—

মহাত্মা গান্ধী রাজকোটের ঠাকুর সাহেবের নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চরমপত্রের কোন জবাব না পাওয়ায় অদ্য বেলা ১২ টায় অনশন আরম্ভ করিয়াছেন। অনশন আরম্ভের কিছু পরে ঠাকুর সাহেবের উত্তর মহাত্মার নিকট আসিয়া পৌঁছে। ঠাকুর সাহেব তাঁহার পত্রে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বলিয়াছেন,—"শাসন সংস্কার কমিটির গঠন সম্পর্কে আপনি যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা ২৬শে ডিসেম্বরের প্রথম ঘোষণার সর্ত্তসমূহের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নহে; সুতরাং আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইবার পক্ষে ন্যায়সঙ্গত কোন কারণ আছে বলিয়া মনে করি না।"

রেঙ্গুনের স্থানে স্থানে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা চলিলেও অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী হইতে অদ্য অপরাহ্ণ পর্যন্ত কয়েকদিনে মোট ১১জন মুসলমান নিহত ও ১০২জন আহত হইয়াছে এবং ৩জন হিন্দু নিহত ও ১০৩জন আহত হইয়াছে।

বাঙলা গবর্ণমেণ্টের ১৯৩৯-৪০ সালের বাজেটের বিভিন্ন দফার ব্যয় বরাদ্দ সমূহ আগামী ৮ই মার্চ্চ হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে মঞ্জুরীর জন্য উপস্থিত করা হইবে। বিভিন্ন দফার ব্যয় বরাদ্দের আলোচনার জন্য মোট ১৫ দিন সময় দেওয়া হইয়াছে।

বিভিন্ন দফার ব্যয়বরাদ্দ সম্পর্কে বিভিন্ন দলের সদস্যগণ ১৭ শতের অধিক ছাটাই প্রস্তাবের নোটিশ দিয়াছেন। ছাটাই প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় দুইটি উদ্দেশ্যে (১) ব্যয়সঙ্কোচ ও (২) গবর্ণমেণ্টের নীতির সমালোচনা।

সভাপতি নির্ব্বাচনের পর, ওয়ার্কিং কমিটির কতিপয় সদস্য শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ করিয়াছেন শ্রীযুত বসু এসোসিয়েটেড প্রেসের নিকট একটি দীর্ঘ বিবৃতি দিয়া উহার উত্তর দিয়াছেন।

বিবৃতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে,—"গান্ধীজীর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা প্রকাশের অর্থ ইহা নয় যে, অন্যের ন্যায় তাঁহার ইচ্ছা পালন করিতে হইবে, কেন না, তাঁহার বিশ্বাস যে, সত্য ও অহিংসার পথ হইতে বিচ্যুত না হইলে মহাত্মাজী কাহাকেও নিজ বিবেক ও বিচার-বুদ্ধির বিরুদ্ধে কাজ করিতে বলেন না।"

মিশরে টুটেম খানামের কবর আবিষ্কারক প্রসিদ্ধ বৃটিশ প্রত্নতাত্ত্বিক মিঃ হাওয়ার্ড কার্টারের মৃত্যু হইয়াছে। হাওয়ার্ড কার্টার ও এ সি মেছ লিখিত "টুটেম খানামের কবর" পুস্তক ১৯২৩ সালে প্রকাশিত হইয়াছে।

ত্রিপুরী কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির নিকট মহাত্মা গান্ধী নিম্নোক্ত তার করিয়াছেনঃ—

"অনশন আরম্ভ করিলাম, শীঘ্র অবসানের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং ত্রিপুরী যাওয়া অসম্ভব। দুঃখিত।"

৪ঠা মার্চ্চ—

রাজকোট রাজ্যের মন্ত্রণা পরিষদ সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দিয়াছেন। বিবৃতিতে তাঁহারা আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন এবং গান্ধীজীর বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের পাল্টা অভিযোগ আনিয়াছেন।

জানা গিয়াছে যে, বড়লাট উদয়পুর ক্যাম্প হইতে তার করিয়া গান্ধীজীর চরম পত্র ও ঠাকুর সাহেবের উত্তরের নকল পাঠাইবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধীর অনশন চলিতে থাকিলে বোম্বাইয়ের মন্ত্রিমণ্ডলী পদত্যাগ করিবেন স্থির করিয়াছেন। তবে আগামী সপ্তাহের পূর্ব্বে এ বিষয়ে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইবে না।

বিহারের প্রধান মন্ত্রী অদ্য বড়লাটের নিকট এক তার করিয়া রাজকোটের ব্যাপারে তাঁহাকে হস্তক্ষেপ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

কাশীর বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দু ও মুসলমানের দাঙ্গা গুরুতর আকার ধারণ করে। হাঙ্গামা নিবারণকল্পে পুলিশকে দুইবার গুলী চালাইতে হয়। এপর্য্যন্ত ৪জন নিহত ও ৪৩জন আহত হইয়াছে। রাস্তাঘাট প্রায় জনশূন্য অবস্থায় আছে। ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রহিয়াছে। জনগণের মধ্যে প্রবল আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে।

অমৃতসর এবং এটা জেলার অন্তর্গত মারেয়ায় হাঙ্গামা চলিতেছে। দাঙ্গা নিবারণকল্পে অমৃতসরে কাঁদুনে গ্যাস আনা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

লেডী ব্র্যাবোর্ন অদ্য পি এণ্ড ও কোম্পানীর 'ক্যাটহে' জাহাজযোগে বিলাত যাত্রা করিয়াছেন।

৫ই মার্চ্চ—

মহাত্মাজীর অনশনে যুক্তপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ এবং সিন্ধুর মন্ত্রিসভা উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন এবং হস্তক্ষেপ করিবার জন্য বড়লাটকে তার করিয়াছেন।

যুক্তপ্রদেশের কাণপুর এবং কাশীতে দাঙ্গার অবস্থা ক্রমশই সঙ্গীন হইয়া পড়িতেছে। দাঙ্গা নিবারণকল্পে পুলিশকে মাঝে মাঝে গুলী ছুড়িতে হইতেছে। রেঙ্গুনের অবস্থার সামান্য উন্নতি হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

হোলি উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা ও শহরতলীর নানাস্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে; ফলে, প্রায় দুই শত লোক আহত ও দুইজন নিহত হইয়াছে। রবিবার রাত্রি দ্বিপ্রহরে কাশীপুর অঞ্চলে দাঙ্গা বাধে; ঐ সময় মারপিট ও বে-পরোয়া লুঠ-তরাজ চলিতে থাকে। দাঙ্গা থামাইতে গিয়া দুইজন পুলিশ কর্ম্মচারী ও কতিপয় কনেষ্টবলও আহত হইয়াছে। পরে ঐ অঞ্চলে একজন হিন্দুর মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। সোমবার শহরে আর কোন সাম্প্রদায়িক চাঞ্চল্য দেখা দেয় নাই; তবে দাঙ্গার গুজব রটিয়া জনসাধারণের মনে বিষম উদ্বেগের সঞ্চার করিয়াছিল।

কংগ্রেসের ৫২তম অধিবেশনের নির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু অদ্য ত্রিপুরী যাত্রা করিয়াছেন। সঙ্গে গিয়াছেন রাষ্ট্রপতির বৃদ্ধা মাতা, পরিবারের অন্যান্য লোক এবং রাষ্ট্রপতির সেক্রেটারিদ্বয়।

প্যারিসের এক খবরে প্রকাশ, স্পেনে নেগ্রিন গবর্ণমেণ্টের স্থলে একটি জাতীয় দেশরক্ষা পরিষদ গঠিত হইয়াছে; জেনারেল কাসাদো উহার কর্ত্তা হইয়াছেন। অন্য একটি সংবাদে প্রকাশ, ডাঃ নেগ্রিন নাকি পলায়ন করিয়াছেন।

নিখিল ভারত রাজকোট দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের নির্দ্দেশ মত কলিকাতা এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে রাজকোট দিবস প্রতিপালিত হইয়াছে।

৬ই মার্চ্চ—

মহাত্মা গান্ধীর অনশনের তিন দিন অতিবাহিত হইবার পর গান্ধীজী ও রাজকোটের ঠাকুর সাহেবের মধ্যে সত্বর একটা মীমাংসা হইবার সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা যাইতেছে। সরকারী মহল আশা করেন যে, সত্বর একটা মীমাংসা হইবে। রেসিডেণ্ট মিঃ গিবসন 'এসোসিয়েটেড প্রেসের' বিশেষ প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন যে, তিনি স্বয়ং মীমাংসা সম্বন্ধে আশান্বিত। তিনি গত তিন দিন অপেক্ষা অধিকতর আশান্বিত।

রাজপুতনা সফর হইতে দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বড়লাট রাজকোটের ব্যাপার, তথা মহাত্মার অনশনের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ করিয়াছেন। সমস্ত দিন বড়লাট এই ব্যাপার লইয়া বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহিত আলোচনা করিয়াছেন।

রাত্রি ৮ ঘটিকায় রাজকোটের রেসিডেণ্ট মিঃ গিবসন মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আধঘণ্টাকাল আলোচনা করেন। এই সময় আর কেহ তথায় উপস্থিত ছিলেন না। মিঃ গিবসন চলিয়া যাওয়ার পর মহাত্মা তাঁহার সেক্রেটারীকে কিছু লিখিয়া লইতে বলেন। শ্রীযুক্তা কস্তুরবাঈ, মণিবেন প্যাটেল ও মৃদুলাবেনকে ত্রাম্বা হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। তাঁহারা রাজকোটে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিতে পারিবেন।

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র ৬ই মার্চ্চ অপরাহ্নে ত্রিপুরী যাইয়া পৌঁছিয়াছেন। তথায় পৌঁছিবার পর তাঁহার পীড়া অধিকতর বৃদ্ধি পাওয়ায় কোন শোভাযাত্রা হয় নাই। কংগ্রেসের ইতিহাসে সভাপতির শোভাযাত্রা এই সর্ব্বপ্রথম পরিত্যক্ত হইল। ত্রিপুরী পৌঁছিলে রাষ্ট্রপতির জ্বর ১০৩° ডিগ্রী ছিল।

সোমবার শহরতলীর নানাস্থানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। কামারহাটিতে শতাধিক লোক আহত হইয়াছে, নৈহাটিতে একজন মুসলমান ছোরার আঘাতে মারা গিয়াছে এবং টিটাগড়, শিবপুর প্রভৃতি স্থানেও হাঙ্গামার ফলে বহু লোক অল্পবিস্তর আঘাত পাইয়াছে। এই সম্পর্কে বহু লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। টিটাগড়ে সান্ধ্য আইন জারী হইয়াছে।

প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক কর্ত্তৃক ফরিদপুরের চৌধুরী সামসুদ্দিন আমেদের নিকট লিখিত যে পত্রের প্রতিলিপি 'আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল অদ্য ব্যবস্থা পরিষদে আলোচনা প্রসঙ্গে উক্ত পত্রে হিন্দু কর্ম্মচারীদের সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রীর আপত্তিকর মন্তব্যে তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি হওয়ায় প্রধান মন্ত্রী হিন্দু কর্ম্মচারীদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং বলেন যে, তাহাদের বিরুদ্ধে অবাধ্যতার অভিযোগ করিয়া তিনি অন্যায় করিয়াছেন।
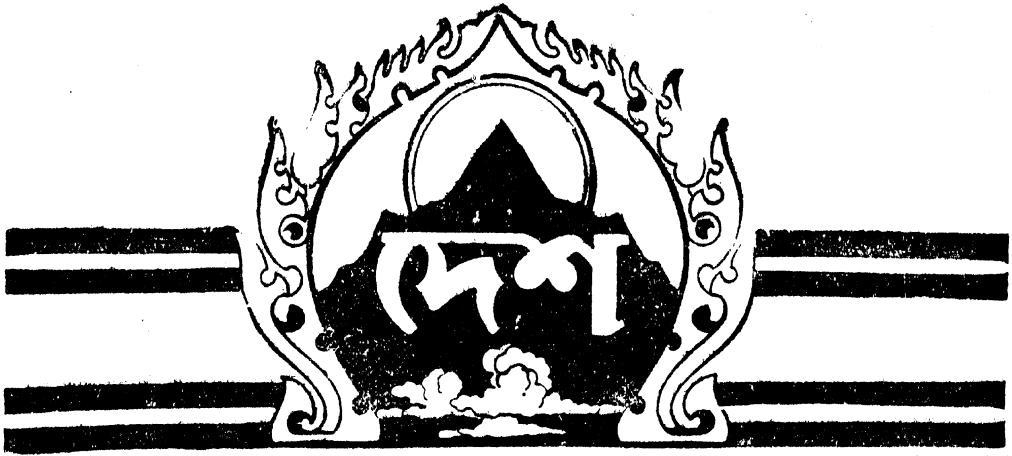
৬ষ্ঠ বর্ষ] শনিবার, ২০শে ফাল্গুন, ১৩৪৫ সাল 4th March, 1939 [১৬শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ত্রিপুরী কংগ্রেস—

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের অসুস্থতা সত্ত্বেও ত্রিপুরী কংগ্রেসের অধিবেশন পিছাইয়া দেওয়া হইল না। সুভাষচন্দ্র সংকল্প করিয়াছেন যে, তাঁহার শরীরের অবস্থা যেমনই থাকুক, তিনি আগামী ৫ই মার্চ্চ ত্রিপুরী কংগ্রেসে যোগদানের জন্য কলিকাতা হইতে রওনা হইবেন। ৭ই মার্চ্চ ত্রিপুরীতে নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন হইবে। ত্রিপুরী কংগ্রেসের যে গুরুত্ব নানা অবস্থার ভিতর দিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, বলিতে গেলে এত বড় গুরুত্ব কোন অধিবেশনেরই দেখা যায় নাই। এক শরৎচন্দ্র ব্যতীত কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যেরা সকলেই জোট বাঁধিয়া পদত্যাগ করিয়াছেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু পদত্যাগ করেন নাই, মুখে একথা বলিলেও কাজে কিছুই আগাইয়া যাইতেছেন না। তিনি যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে বিশেষ করিয়া দক্ষিণপন্থী দলের কার্য্যকেই সমর্থন করা হইয়াছে এবং সুভাষচন্দ্রের কার্য্যের প্রতিবাদ করা হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় পদত্যাগ প্রার্থীদের পদত্যাগ গ্রাহ্য করা ব্যতীত সুভাষচন্দ্রের অন্য কোন উপায় ছিল না। তাঁহাকে পদত্যাগ-পত্র গ্রহণ করিতে হইয়াছে এবং কংগ্রেসের কর্ম্ম-কর্ত্তাস্বরূপে একাই তাঁহাকে ত্রিপুরী কংগ্রেসের উত্থাপিত সকল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে। সকলের মনেই এই প্রশ্ন দেখা দিয়াছে যে, দক্ষিণপন্থী বল্লভাচারীর দল কোন্ পন্থা অনুসরণ করিবেন? পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর অভিমত এই যে, কার্য্যকরী সমিতির সদস্যগণের পদত্যাগ এখনও সমস্যা সমাধানের অতীত হয় নাই। সুভাষচন্দ্রও এই মতই পোষণ করেন বলিয়া মনে হইতেছে। সুভাষচন্দ্র দেশের সম্মুখে কিরূপ কর্ম্মতালিকা উপস্থিত করিবেন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি বাহির হইয়াছে। এই বিবৃতির প্রধান বিষয় তিনটি—(১) দেশীয় রাজ্যে গণ-আন্দোলন সম্পর্কে কংগ্রেসের অনুসৃত-নীতি সম্বন্ধে পুনর্ব্বিবেচনা; (২) পরিকল্পিত যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা; (৩) প্রবল এবং ব্যাপক আন্দোলন চালাইবার জন্য ব্যবস্থা করা, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন প্রভৃতি। প্রকৃত-পক্ষে, এই কর্ম্মতালিকায় নীতিগুলি সূত্রাকারে দেওয়া হইয়াছে মাত্র, সেগুলির প্রয়োগ প্রকরণ সম্বন্ধে বিস্তৃত কার্য্যক্রম দেওয়া হয় নাই। এই কর্ম্মতালিকায় যে তিনটি নীতিকে প্রধান বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, বাস্তবিকপক্ষে, সেই তিনটির মধ্যে একটিই হইল, প্রধান বা মুখ্য, অপরগুলি সেই মুখ্য নীতিরই পরিপূরক হিসাবে গৌণ। মুখ্য নীতি হইল যুক্তরাষ্ট্র-প্রণালীকে বাধা দেওয়া—সেই বাধা সক্রিয় এবং সার্থক করিবার জন্যই দেশীয় রাজ্যসমূহের সম্পর্কে কংগ্রেসের বর্ত্তমানের আংশিক নিরপেক্ষতার নীতির পরিবর্ত্তন এবং সেই মুখ্য নীতি যুক্তরাষ্ট্র-প্রণালীকে বাধা দানের উদ্দেশ্যেই প্রবল ও ব্যাপক আন্দোলন চালাইবার তোড়জোড় বাঁধা এবং কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের প্রয়োজনীয়তা। দক্ষিণপন্থী দল যে কথা বলিয়া আসিতেছেন, অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র-প্রণালী প্রবর্ত্তনে বাধা দেওয়া সম্পর্কে কংগ্রেসের অপর সকল দলের সমানই তাঁহারা সঙ্কল্পশীল, তাহা হইলে সুভাষচন্দ্রের এই কর্ম্মতালিকা লইয়া কাজ করিতে তাঁহাদের কোন আপত্তিই থাকিতে পারে না। প্রকৃত-পক্ষে, সুভাষচন্দ্রের এই কর্ম্মতালিকাকে দল-বিশেষের কর্ম্ম-তালিকা বলা যায় না। যুক্তরাষ্ট্র-প্রণালীতে বাধা দান সম্পর্কে দক্ষিণ দলের মনে যদি কোন দ্বিধা না থাকে, দেশের কতক লোক অন্তত তাঁহাদের সম্বন্ধে যে ধারণা করিয়া লইয়াছে, যদি সত্যই তাহা অমূলক হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের কর্ত্তব্য হইল, রাষ্ট্রপতির এই কর্ম্মতালিকাকে সমর্থন করিবার জন্য

আগাইয়া আসা—ব্যক্তিগত মান, মর্য্যাদা, ক্ষোভ এ-সব প্রশ্ন এ ক্ষেত্রে যাঁহারা প্রকৃত দেশ-সেবক, তাঁহাদের মধ্যে আসিতে পারে না। আজ হিংসাত্মক আক্রোশের চেয়ে অহিংস আক্রোশই দেশের সম্মুখে সমস্যাকে জটিল করিয়া তুলিয়াছে। আমরা আশা করি, দেশের বৃহত্তর স্বার্থ-বুদ্ধিতে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব হইবে, যে মেঘের ভয় করিতেছি, ত্রিপুরী কংগ্রেসে তাহা কাটিয়া গিয়া রাষ্ট্রীয় সংগ্রামে দৃঢ়তর শক্তির উদ্বোধন করিবে।

—

আত্মনিয়ন্ত্রণের পথ—

যুক্তরাষ্ট্র প্রণালীকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তাব করিলেই কাজ হইবে না, সেই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য দেশকে কি ভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে ত্রিপুরী কংগ্রেসে সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। শুধু 'ব্যাপক গণ-আন্দোলন'—এমন কথা বলার কোন অর্থ হয় না, সে আন্দোলন কি ভাবে, কোন্ পথে চালাইতে হইবে, ধরা-বাঁধা ছক কাটিয়া দেওয়া আবশ্যক; কিন্তু কর্ত্তব্য শেষ শুধু সেইখানেই নয়। বিদেশীর আরোপিত শাসনতন্ত্র আমরা লইব না, এই সঙ্কল্পের সঙ্গে সঙ্গে আমরা কিরূপ শাসন-তন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে চাই এবং সেই শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের কার্য্যক্রমই বা কি, তাহাও সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া লইতে হইবে। এ সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট ধারণা লইয়া বসিয়া থাকিবার সময় এখন নাই; কারণ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি কংগ্রেসের এই প্রস্তাবে রাজী হন, তাহা হইলে সে ক্ষেত্রে আমাদের নিজেদের নির্দ্ধারিত একটি শাসনতন্ত্র যদি আমাদের হাতে না থাকে, তাহা হইলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে আমরা বুঝাপড়া করিব কোন সূত্র ধরিয়া? শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় এ সম্বন্ধে ত্রিপুরী কংগ্রেসে তিনটি প্রস্তাব উপস্থিত করিবার নোটিশ দিয়াছেন। এই প্রস্তাবে দেখা যাইতেছে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট এই দাবী করা হইবে যে, ভারত-বর্ষকে তার নিয়ন্ত্রণের অধিকার ছাড়িয়া দেওয়া হউক,—এই দাবী করিবার যুগ এখন কাটিয়া গিয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি। আমরা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আরোপিত শাসনতন্ত্র মানিব না, এবং তেমন শাসনতন্ত্র আমাদের উপর চাপাইতে গেলে আমরা তাহাতে বাধা দিব, ইহাই হইল সবচেয়ে বড় কথা; এবং এ-কথা অনুযায়ী কাজের পথে আগাইতে হইলে আমাদের কর্ম্মনীতি কার্য্যে পরিণত করিবার উপযোগী একটি কার্য্যক্রম বা কর্ম্মপ্রণালী আমাদের দরকার সকলের আগে। সুভাষচন্দ্র দেশবাসীর সম্মুখে তেমন একটি বিস্তৃত এবং ব্যাপক কর্ম্মপ্রণালী উপস্থিত করিবেন, সমগ্র দেশ এমন আশাই করিতেছে। দেশের এই সঙ্কটকালে ভগবান তাঁহাকে নিরাময় করুন এবং দেশকে স্বাধীনতা সংগ্রামে আগাইয়া লইবার শক্তি দান করুন আমাদের ইহাই কামনা।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল—

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল লইয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে যে বিতর্ক হইয়া গেল, সেই বিতর্কে মৌলবী নৌসের আলী এবং ডাক্তার হরেন্দ্রচন্দ্র মুখুজ্জ্যে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই দুইজন অহিন্দু সদস্য, যে কথাটা বলিয়াছেন, কোন হিন্দু সদস্যের মুখেও আমরা সে কথাটা ঠিক তেমন ভাষায় শুনি নাই। মৌলবী নৌসের আলী দেখাইয়া দিয়াছেন যে, কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিলে যে নীতি অবলম্বন করিতে চাওয়া হইতেছে, সেই নীতি চলতি হইয়া গেলে বাঙলা দেশে স্বায়ত্ত-শাসনমূলক কোন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব থাকিবে না। কলিকাতা শহরের হিন্দু অধিবাসীদের সংখ্যা মোট জন-সংখ্যার শতকরা ৭৫জন, প্রস্তাবিত নূতন বিলে কায়দা করিয়া এই সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়কে একেবারে স্থায়ী রকমে সংখ্যালঘিষ্ঠ করিয়া ফেলা হইতেছে। বরিশালের কোন মৌলবী সাহেব আস্ফালন করিয়াছেন—সম্ভবত খুঁটার জোর বাড়াইবার জন্য—এই বলিয়া যে হিন্দুদের টুঁটি টিপিয়া ধরিয়া মুসলমানেরা অধিকার কাড়িয়া লইবে, কিন্তু মৌলবী নৌসের আলী সাহেব দেখাইয়াছেন ভিতরের ভাঁওতাটা অঙ্গিয়া যে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিলে হিন্দুদের প্রতিনিধিত্বের ন্যায্য অধিকার কৃত্রিম কৌশলে এইভাবে দাবাইয়া মুসলমানদের কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে না, কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে মুষ্টিমেয় শ্বেতাঙ্গ স্বার্থসেবীদের। নৌসের আলী দৃঢ়স্বরে বলেন, হিন্দুদের কর্ত্তৃত্বে আমি পিষ্ট হই, তবুও ভাল; কিন্তু মুষ্টিমেয় বিদেশী শ্বেতাঙ্গের প্রভুত্বে জীবন ধারণ করিতে চাহি না। আমরা জানি, মৌলবী নৌসের আলী যে সব কথা বলিয়াছেন, বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডল সেগুলির অন্তর্নিহিত যুক্তি যে না জানেন, ইহা নহে; জানিয়া শুনিয়াই তাঁহারা দেশের এই সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, হইয়াছেন নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে। হীন সাম্প্রদায়িকতাকে আশ্রয় করিয়া বাঙলা মুলুককে স্বার্থের যে বেসাতি আরম্ভ হইয়াছে, আমলাতন্ত্রী আমলেও এ জিনিষ এতটা দেখা যায় নাই। দেশের প্রতি বিন্দুমাত্র দরদ-বোধ যাঁহার আছে, বিশ্বাস আছে গণতন্ত্রের প্রতি, হীন সাম্প্রদায়িকতার প্রতি যাঁহার অন্তরে ঘৃণা আছে তদ্র মনোবৃত্তিবশত—এক কথায় যাঁহারা নির্ব্বিবেক-ভাবে কর্ত্তাভজাগিরি না করিবার মত স্বাধীন মনোবৃত্তিসম্পন্ন তাঁহারা কেহই এই বিল কার্য্যে পরিণত হইতে কোনরূপ সাহায্য করিতে পারেন না। যাঁহারা কংগ্রেসী সদস্য, তাঁহাদের কথা ছাড়িয়াই দিলাম। কিন্তু সেইখানেই কর্ত্তব্য শেষ নয়; আজ সমস্ত বাঙালী-সমাজকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে, জাগাইয়া তুলিতে হইবে, হীন স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে, জাগাইয়া তুলিতে হইবে বাঙলা দেশের সভ্যতা এবং সংস্কৃতি এবং বাঙলার বড় গর্ব্বের জাতীয়তাবোধকে যাহারা ধ্বংস করিতে বসিয়াছে তাঁহাদের বিরুদ্ধে সমগ্র জনসমাজকে। যে শক্তির কাছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কূটনীতি একদিন ব্যর্থ হইয়াছে বাঙালীর আন্দোলনে, বাঙলা দেশের সে শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে—আমরা বিশ্বাস করি না।

পরলোকে লর্ড ব্র্যাবোর্ন—

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী বেলা ১০-৪৮ মিনিটের সময় বাঙলার লাট লর্ড ব্র্যাবোর্ন পরলোকগমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে দেশব্যাপী একটা বিষাদের ছায়া আপতিত হইয়াছে। ইংরেজের বয়সের হিসাবে ৪৩ বৎসর বয়সকে যৌবন বলা যায়, তাঁহার এই অকাল মৃত্যুতে সকলেই অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়াছেন। দেশের শাসনতন্ত্র যেমন বাঁধা ছকের ভিতরে পরিচালিত হয়, তাহাতে শাসকদের কাহারও ব্যক্তিত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি করিবার অবসর দেশের লোকের নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও লর্ড ব্র্যাবোর্নের ব্যক্তিত্বের আভাষ দেশের লোকে কিছু কিছু পাইয়াছিল। তিনি আন্ডারসনী শাসনের পর বাঙলা দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। আন্ডারসনী শাসন বাঙলায় দলন, পীড়ন এবং বিভীষিকার যুগ। লর্ড ব্র্যাবোর্নের আমলে এই বিভীষিকার যুগ একটু কাটে, দেশের জনমতানুকূল মন্ত্রিমণ্ডলী থাকিলে, এই দিক দিয়া লর্ড ব্র্যাবোর্নের লোকপ্রিয়তা অধিকতর প্রকটিত হইত। কিন্তু লর্ড ব্র্যাবোর্নকে যে মন্ত্রিমণ্ডল লইয়া কাজ করিতে হয়, তাঁহারা দেশের জনমতের বিরোধী এবং লর্ড ব্র্যাবোর্নের পূর্ব্বগামী লাট স্যার জন আন্ডারসনের অনুরক্ত নলিনী-নাজিম প্রতিভায় প্রভাবান্বিত। এমন অবস্থাতেও রাজবন্দীদের মুক্তি প্রভৃতি সম্পর্কে যেটুকু জনমতানুকূলে কাজ বাঙলা দেশে হইয়াছে, লর্ড ব্র্যাবোর্নের প্রভাব তাহাতে আছে বলিয়াই দেশের লোকের মনে হয়। বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডল যদি রাজনীতিক বন্দীদের সকলকে মুক্তি দানের উদার নীতি অবলম্বন করিবার সাহস রাখিতেন—শ্বেতাঙ্গ সদস্যদের ভোটের ভয় না রাখিয়া তবে লর্ড ব্র্যাবোর্ন তাহার প্রতিবাদী হইতেন না। মহাত্মা গান্ধী নিজেই বলিয়াছেন যে রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তি সম্পর্কে অনুদার-নীতির জন্য বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলই দায়ী। তাঁহাদের মনোবৃত্তি আন্ডারসনী মহিমার মোহ কাটাইতে পারে নাই; এমন অবস্থায় এদিকে যেটুকু কাজ হইয়াছে, তাহা লর্ড ব্র্যাবোর্নেরই ব্যক্তিত্বের ফল বলিয়া বুঝা যায়। লর্ড ব্র্যাবোর্ন অমায়িক এবং উদারপ্রকৃতির পুরুষ বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে দেশের সকল শ্রেণী এবং সকল সম্প্রদায়ের লোকেই বেদনা পাইয়াছেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের আন্তরিক সুগভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

অর্থ-সচিবের ধাপ্পাবাজী—

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে সাধারণভাবে বাজেট আলোচনা শেষ হইয়াছে, অর্থ-সচিব বাজেট সমালোচনার যে উত্তর দিয়াছেন, আগাগোড়া তাহা অযুক্তি, কুযুক্তি এবং ধাপ্পাবাজী ছাড়া আর কিছুই নয়। বাঙলা সরকারের কোষাগার কুবেরের ভাণ্ডার এমন কথা কেহ বলিতেছে না। অর্থের অনটন আছে, অর্থ-বণ্টনে উপযুক্ত সাফল্যলাভ করিবার পথে অন্তরায় আছে, এ কথা কেহই অস্বীকার করিতেছে না। কথা হইল এই যে, সে সব অসুবিধা, অনটন থাকা সত্ত্বেও, যথার্থ দেশের উপকারের জন্য ব্যয় করা হইতেছে কি—না ঐ সই করিয়া নিজেদের মন্ত্রিগিরির মজা লুটিবার মতলবে উড়ানো হইতেছে। টাকা নাই, টাকা নাই, আমলাতন্ত্রী আমলের মামুলী বুলি দেশের লোক আর শুনিতে রাজী নয়। দেশের লোকে জানিতে চায় শুধু ইহাই যে, যে টাকা আছে, তাহাই কিভাবে ব্যয় করা হইতেছে। অর্থ-সচিব কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের সঙ্গে নিজেদের তুলনা করিয়া বাহাদুরী ফলাইতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু সে ক্ষেত্রেও শুধু ফাঁকা কথা। কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের কর্তৃত্বে যুক্ত-প্রদেশের বাজেটে ১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা দেশের দরিদ্র জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হইয়াছে, প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য ব্যয় করিবার প্রস্তাব হইয়াছে ১০ লক্ষ টাকা। বাঙলার অর্থ-সচিব দেখাইতে পারেন এদিকে তাঁহার কেরামতি কতদূর ফলিয়াছে। উড়িষ্যার মত ছোট রাজ্যেও জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য ৯ লক্ষ টাকা লইয়া একটি স্থায়ী ভাণ্ডার গঠন করা সম্ভব হইয়াছে। আর বাঙলার অর্থ-সচিব, শুনাইয়াছেন সে সম্বন্ধে কেবল বাজে বকুনী। ট্যাক্স দাও তবে প্রাথমিক শিক্ষা পাইবে, ট্যাক্স দাও, দুই দফায় নূতন ট্যাক্স দাও এবং আরও ট্যাক্সের জন্য তৈয়ারী থাক। প্রকাশ্যভাবে সাম্প্রদায়িকতাবাদী 'আজাদ' পত্রের জন্য ৩০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা অর্থ-সচিবের আর এক বাহাদুরী। এক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রকেও তিনি ছাড়াইয়া গিয়াছেন। 'আজাদ' নিজেদের দলের সমর্থক। 'আজাদে'র প্রচার যাহাতে বাড়ে, এবং গবর্ণমেণ্টের সমর্থক বেশী লোকে 'আজাদ' পড়িতে পারে, প্রকাশ্য বাজেটে সেজন্য টাকার বরাদ্দ করা হইয়াছে। চোরা-গোপ্তাভাবে আমলাতন্ত্রী আমলে কোন কোন সংবাদ-পত্রকে আনুকূল্য করা চলিত, ইহা আমরা জানি, কিন্তু সেই চোরা-গোপ্তা কালের মধ্যেও সুনীতির প্রতি অন্তত একটা মর্য্যাদাবোধের পরিচয় পাওয়া যাইত, অর্থ-সচিবের সেই বালাই নাই। এমন ধরণের বেহায়াপনা বাঙলা মুলুকে কতদিন চলিবে, আমরা শুধু সেই কথাই ভাবিতেছি।

সাম্রাজ্যবাদীদের চালবাজী—

প্যালেস্টাইনের সমস্যার মীমাংসার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কূটনীতির গতি যে দিকে ঘুরিয়াছে, আমরা ভারতবাসী আমাদের কাছে তাহা একটুও নূতন ঠেকিবে না। আমরা পূর্ব্ব হইতেই কতকটা অনুমান করিয়াছিলাম যে, ইংরেজ এই পথ ধরিবে—সেই গোলটেবিল বৈঠক, সেই সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার মামুলী চাল, এবং সেই সমর বিভাগে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের কর্তৃত্ব! ভারতের ব্যাপারে আমরা যে খেলা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, প্যালেস্টাইনেও সেই খেলা আরম্ভ হইয়াছে। প্যালেস্টাইনের আরবেরা দাবী করিতেছে স্বাধীনতার; তাহাদের সেই দাবীকে আপাতত ঠেকাইয়া দিবার জনাই ইংরেজের এই নীতি। একথা সুস্পষ্ট হইয়াই পড়িয়াছে যে, প্যালেস্টাইনের সম্বন্ধে ইংরেজের এত যে গরজ, তাহার মূলে কি আরব কি ইহুদী কাহাদের স্বার্থই নাই আছে শুধু

নিজেদের স্বার্থ। প্যালেষ্টাইন সম্বন্ধে ইংরেজ গোলটেবিল বৈঠকের যে চাল চালিয়াছে তাহার মূলগত উদ্দেশ্য হইল প্যালেষ্টাইনে ব্রিটিশ প্রভুত্ব কায়েম করা। আমরা জানি, আরব জাতি ইংরেজের এই ধাপ্পায় ভুলিবে না। এই নীতিতে প্যালেষ্টাইনের সমস্যা মীমাংসাও হইবে না। দলন, পীড়ন, নির্য্যাতন ত কমিবে না-ই, বরং আরও জোর বাঁধিবে। কিন্তু একটা জাতিকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের জন্য দাবাইয়া রাখিতে পারে, এমন ক্ষমতা কোন জাতিরই নাই, সে জাতি পশুবলে যতই বলীয়ান হউক না কেন। প্যালেষ্টাইনের ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণ করিবে প্যালেষ্টাইনের লোকেরা, ইংরেজ নহে। যতদিন পর্য্যন্ত ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদ-নীতি প্যালেষ্টাইনে বিপর্য্যস্ত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত প্রাচীর পশ্চিম প্রান্তের এই অশান্তির অনল নিভিবার নহে।

স্পেনের গণতন্ত্রকে বলিদান—

ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর মোড়লীতে চেকোস্লোভাকিয়ার গণতন্ত্রের বলিদান ইতিপূর্ব্বে নির্ব্বিঘ্নে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এতদিন প্রচ্ছন্নভাবে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর পদলেহন ক্রিয়া চলিতেছিল, গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে স্পেনের গণতন্ত্রের প্রকাশ্য বলিদান ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। ফরাসী গবর্ণমেণ্টও সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষাৎ ইংরেজের পথই ধরিয়াছেন। ইঁহারা দুই দোস্তই জেনারেল ফ্রাঙ্কোর গবর্ণমেণ্টকে মান্য করিয়া লইয়াছেন। সুতরাং এখন হইতে জেনারেল ফ্রাঙ্কোই হইলেন স্পেনের বৈধ শাসক এবং স্পেনের গণতন্ত্রীরা হইল বিদ্রোহী। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন যে, তাঁহারা বিনা সর্ত্তে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর গবর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিয়া লইলেন, কিন্তু সে স্বীকার কি সাধে? জেনারেল ফ্রাঙ্কো তো পরের হাতের পুতুল মাত্র, পিছনে প্রত্যক্ষভাবে রহিয়াছে ইটালী, এবং আছে জার্ম্মানী; সুতরাং বিনা সর্ত্তে ফ্রাঙ্কোকে না মানিয়া উপায় কি? ফ্রাঙ্কো কোন সর্ত্ত স্বীকার করিতে রাজী হইলে তো? আপাতত দরকার জেনারেল ফ্রাঙ্কোর মন যোগান, হিটলারের মন যোগান, মুসোলিনীর মন যোগান। ব্রিটিশ মন্ত্রী বলিয়াছেন, ফ্রাঙ্কোর গবর্ণমেণ্টের বৈধতা যদি তাঁহারা স্বীকার করিয়া না লন, তাহা হইলে স্পেনের সাধারণতন্ত্রীরা আরও লড়াই চালাইবে এবং স্পেনের লোকদের দুঃখ কষ্ট আরও বাড়িবে। এখানে প্রশ্ন উঠে এই যে, স্পেনের লোকদের জন্য ব্রিটিশ মন্ত্রীর অন্তরের বেদনাটা আজ উথলিয়া উঠিল কেন? জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সঙ্গে যোগ দিয়া মুসোলিনীর ও হিটলারের চেলারা যখন উড়ো জাহাজ হইতে বোমা-বৃষ্টি করিয়া স্পেনের হাজার হাজার নির্দ্দোষ নরনারীকে হত্যা করিতেছিল, এমন কি, ইংরেজের জ্ঞাতি গোষ্ঠীদের কোতল করিতেও যখন তাহারা কসুর করে নাই, ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর এই মহামানবতা তখন অন্তরের কোন স্তরে গিয়া লুকাইয়া ছিল? সুতরাং জেনারেল ফ্রাঙ্কোর মন যোগাইয়া চলার মূলের তত্ত্ব বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না। কিন্তু এইভাবে মন যোগাইয়া চলিবে কত দিন? স্পেন এখন মুসোলিনী-হিটলারের করতলগত হইল; সুতরাং আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই জার্ম্মানী এবং ইটালী কোন একটা অছিলা ধরিয়া ইংরেজ এবং তাহার দোস্ত ফরাসীর কাছে নূতন দাবী উপস্থিত করিবে। তাহারা জানে, ইহারা এখন যেমন অবস্থার মধ্যে পড়িয়াছে তাহাতে যুদ্ধের ভয় নাই, শুধু হুমকিতেই কাজ হইবে। স্পেনের গণতান্ত্রিকতার প্রতি নির্লজ্জভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ইউরোপের এই তথা-কথিত গণতান্ত্রিকওয়ালারা যে কি ভুল করিয়াছে, তাহা বুঝিতে বেশী দিন বিলম্ব করিতে হইবে না।

আসাম রাষ্ট্রীয় সম্মেলন—

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ একটা সঙ্কট সন্ধিক্ষণে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, এই অবস্থায় ভারতের কর্ত্তব্য কি? আসাম রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সভাপতিস্বরূপে শ্রীযুত হেমচন্দ্র বড়ুয়া তাঁহার অভিভাষণে সে কথাটা খুলিয়া বলিয়াছেন। তিনি বলেন, "জগতের উপর দিয়া একটা দ্রুত পরিবর্ত্তনের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। ইংরেজের মুখে শুনিয়াছিলাম যে, মিউনিকে জগতের সমস্যার সমাধান হইয়া গিয়াছে; কিন্তু বেশই সুস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে যে, মিউনিকের চুক্তিতে জগতের সমস্যার সমাধান হয় নাই। মিউনিকের চুক্তি একটা বারুদের আড়ত তৈয়ার করিয়াছে মাত্র। কোন দিক হইতে আগুনের একটু ফুলকি পড়িলেই বিস্ফোরণ আরম্ভ হইবে। ইউরোপ ব্যাপী একটা সঙ্কট আসন্ন এবং সে সঙ্কটে ব্রিটিশ জাতিকে জড়াইয়া পড়িতেই হইবে। আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত এই সুযোগটাকে কাজে লাগাইতে হইবে। ত্রিপুরী কংগ্রেস জাতিকে এই দিকে পথ দেখাইবে। আজ মনে হইতেছে যে, ভারতের আকাশ পরিষ্কার; কিন্তু তাহা নয়, মেঘ জমিতেছে, ত্রিপুরীতে ঝড় উঠিবে। দেশীয় রাজ্য-সমূহে জন-জাগরণ এবং যুক্তরাষ্ট্র প্রণালীকে বাধা দানে দেশবাসীর সঙ্কল্পশীলতার ভিত্তিতে নূতন সংগ্রাম আরম্ভ হইবে।"

শ্রীযুত বড়ুয়া বলেন, "আবেদন নিবেদনের দিন আজ আর নাই। আপনারা মনে করিবেন না যে, কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব গ্রহণেই সংগ্রামের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে, ইহা কেবল সংগ্রামের প্রাথমিক সোপান মাত্র। কংগ্রেসের নির্দ্দেশ পাইবামাত্র মন্ত্রীরা পদত্যাগ করিবেন।" শ্রীযুত বড়ুয়া স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন বিশিষ্ট যোদ্ধা এবং কর্ম্মী পুরুষ। তাঁহার উদ্দীপনাময়ী বাণী দেশবাসীর অন্তরে শক্তি এবং সাহসের সঞ্চার করিবে।

সুভাষচন্দ্রের অবস্থা—

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্যের অবস্থা একটু ভাল; কিন্তু এইরূপ একটা গুরুতর পীড়িত অবস্থার ঝোঁক কাটাইয়া উঠিতেও তাঁহার কিছুদিন সময়ের দরকার হইবে। ২৭শে ফেব্রুয়ারী তাঁহার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকার তাঁহাকে এক পক্ষ কাল পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে ইহাও বলিয়াছেন যে, শরীরের এইরূপ অবস্থায় কাজ-কর্ম্ম করিলে গুরুতর বিপদের আশংকা আছে। সুভাষচন্দ্র অবশ্য বলিয়াছেন বটে যে, তাঁহার শরীর যেমনই থাকুক, তিনি সেই অবস্থাতেই কংগ্রেসে যাইবেন; কিন্তু আমাদের মনে হয় এরূপ অবস্থায় কংগ্রেসের অধিবেশন অন্তত এক সপ্তাহকালের জন্য পিছাইয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য। এদিকে মহাত্মাজীও রাজকোটের ব্যাপারে ব্যস্ত। তিনি ৩রা মার্চ্চ বিষ্ণুদত্ত নগরে পেঁাছিতে পারিবেন না বলিয়া জানাইয়াছেন। তারপর ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি হওয়াতে কংগ্রেসের উদ্যোগ-আয়োজন বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে। কয়েকটি তোরণ সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মেরামত করিতেও সময়ের দরকার হইবে। এই সব বিবেচনা করিয়া কংগ্রেসের অধিবেশন কয়েকটা দিন পিছাইয়া দেওয়াই আমরা সঙ্গত মনে করি। যদি একান্তই তাহা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে অস্থায়ীভাবে একজনকে সভাপতি নিযুক্ত করিয়া কাজ চালানোও বরং ভাল; তথাপি, এইরূপ অবস্থায় সুভাষচন্দ্রকে, স্বাস্থ্যের গুরুতর রকমের বিপদের ঝুঁকি লইতে দেওয়া উচিত নহে।

লীগওয়ালাদের গুন্ডামি—

হক মন্ত্রিমণ্ডলের কৃপায় বাঙলা দেশে মুশ্লীম লীগের ধ্বজা তুলিয়া অ-বাঙালী মুসলমানদের দৌরাত্ম্য কত দূর বৃদ্ধি পাইয়াছে, টাউন হলে প্রগতিশীল মুসলমান দলের সভা ভাঙ্গিয়া দেওয়াতেই তাহা বুঝা গিয়াছে। বাঙলার উন্নতিশীল তরুণ মুসলমান সমাজ হক মন্ত্রিমণ্ডলের মধ্যযুগীয় মনোবৃত্তির বিরুদ্ধতা করিতে দাঁড়াইবেন, ইহা স্বাভাবিক; কিন্তু গুণ্ডা শ্রেণীর কতকগুলি অ-বাঙালী মুসলমান গাট্টা বাঁধিয়া সব জায়গাতেই বাধা দিবে। ইহাদের উপদ্রবে শহরে শান্তিপূর্ণভাবে সভা-সমিতি করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। সেদিন টাউন হলে বাঙালী মুসলমানেরা বাঙলা দেশের সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হিসাবে মিউনিসিপ্যাল বিলের প্রতিবাদের জন্য সভা করিতে গিয়াছিলেন, গুণ্ডার উপদ্রবে তাঁহারা অনেকে আক্রান্ত এবং আহত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর আমলে এদেশের লোকের মৌলিক স্বাধীনতা কিরূপ বিপন্ন হইয়াছে, প্রগতিশীল মুসলমানদের উপর অ-বাঙালীদের এই ধরণের বেপরোয়া উপদ্রবই তাহা প্রমাণ করিতেছে।

ভারত সরকারের বাজেট—

গত ১৬ই ফাল্গুন অর্থসচিব স্যার জেমস গ্রীগ ভারত সরকারের ১৯৩৯-৪০ সালের বাজেট কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে পেশ করিয়াছেন। বাজেট আগাগোড়া নৈরাশ্যজনক। বাজেট ঘাটতি বাজেট। ১৯৩৮-৩৯ সালের বাজেটে অনুমান করা হইয়াছিল যে, উদ্বৃত্ত হইবে নয় লক্ষ টাকা; কিন্তু ফলত উদ্বৃত্ত হওয়া দূরে থাকুক, প্রকৃত প্রস্তাবে বাজেটে এখন ঘাটতি দাঁড়াইতেছে। এই ঘাটতির ফলে, ভারত গবর্ণমেণ্ট এবার আয়-কর হইতে প্রাপ্ত টাকার মধ্যে মাত্র এক কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির মধ্যে বণ্টন করিবেন; সুতরাং, সকলের ভাগ্যে যাহা মিলিবে, তাহা ছিটে-ফোঁটা মাত্র। বাজেটের ঘাটতি মিটাইবার জন্য অর্থসচিব বিদেশ হইতে আমদানী লম্বা আঁশযুক্ত সুতার উপর যে ট্যাক্স বর্ত্তমানে আছে, তাহা দ্বিগুণ করিবেন প্রস্তাব করিয়াছেন। অর্থসচিব মুখে এই যুক্তি দেখাইয়াছেন বটে যে, ইহার ফলে, এই দেশে লম্বা আঁশওয়ালা কার্পাসের চাষের কাজ উৎসাহ পাইবে; কিন্তু এ-কথা কতকটা নাই গাছে মেওয়া ধরার মত। লম্বা আঁশওয়ালা তুলার চাষ এদেশে চলে কিনা, ইহাই এখনও পরীক্ষাধীন রহিয়াছে। অর্থসচিবের আসল উদ্দেশ্য তাহা নয়। উদ্দেশ্য হইল অন্য রকমের। লম্বা আঁশওয়ালা সুতা না হইলে মিহি কাপড় তৈয়ার করা যায় না; লম্বা আঁশওয়ালা তুলার উপর এইভাবে ট্যাক্স বাড়ানতে এদেশের মিলওয়ালারা আর সস্তা দরে মিহি কাপড় যোগাইতে পারিবে না। ল্যাঙ্কাশায়ারের তাঁতীদের বহু গর্ব্ব ছিল এই যে, মিহি কাপড় তৈয়ারীর কারিগরী শুধু তাহাদেরই আছে। ভারতে মিহি কাপড়ের চাহিদা যতদিন থাকিবে, ততদিন তাহাদের বাজার মারে কে? ইহাদের এই গর্ব্ব ভারতের কলওয়ালারা চূর্ণ করিয়া দিয়াছিল; এবার লম্বা আঁশওয়ালা বিদেশী তুলার উপর ট্যাক্স বাড়াইয়া দেওয়াতে, এই দিক হইতে ল্যাঙ্কাশায়ারের তাঁতীরা ভারতের কলওয়ালাদের সঙ্গে অন্তত মিহি কাপড়ের বাজারে প্রতিযোগিতায় সুবিধা পাইবে। অর্থসচিব ১৯৩৮-৩৯ সালের তুলনায় সামরিক ব্যয় এক কোটি টাকা হ্রাস পাইবে বলিয়া দেখাইয়াছেন; কিন্তু ইহা কেবল কথার কথা মাত্র। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট

হইতে সামরিক ব্যয়ের যে সাহায্য পাওয়া যাইবে, সে সমস্তই গোরা সৈন্য দলের সংস্কারের কল্যাণে উড়িয়া যাইবে। তাহা ছাড়াও এই খাতে ভারতবাসীদিগকেও এক কোটি এক লক্ষ টাকা দিতে হইবে। ভারতের মোট রাজস্বের অর্দ্ধেকেরও বেশী টাকা সামরিক-ব্যয় বাবদই যায়,—সে অবস্থার কোন প্রতীকার হয় নাই। অর্থসচিব এই বলিয়া বড়াই করিয়াছেন যে, এ বৎসরে সম্প্রতি এমন কোন দেশ নাই, যেখানকার সামরিক ব্যয় না বাড়িয়াছে। সুতরাং এক্ষেত্রে ভারতবাসীরা যে রেহাই পাইল, সে অর্থসচিবেরই কেরামতির জোর! এখানে প্রশ্ন একটা আছে, তাহা এই যে, অন্য দেশ স্বাধীন, আর ভারত পরাধীন। অন্য দেশের সামরিক ব্যয় বাড়িলেও অন্য দিক হইতে টাকা আসিবার পথ খোলা আছে; কিন্তু ভারতের পক্ষে শুধু টাকা বাহির হইয়া যাইবার পথই খোলা। ভারতবর্ষ—শোষিত দেশ—বর্ত্তমান বৎসরের ভারত সরকারের বাজেটেও এই শোষণ ক্রিয়ারই পুরা পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

তুমি কি আসিবে প্রিয়ে?

শ্রীশশাঙ্ককুমার পাত্র

তুমি কি আসিবে প্রিয়, আমার মানস-প্রিয়, আসিবে কি নীরব চরণে?
এখন অনেক রাত, আকাশের সীমানায় অগণিত তারকার মালা;
আমার স্বপন প্রিয়, তুমি কি আসিবে আজ চুপে চুপে এই শুভখনে?
নিরজন বালুচরে, রুপালী বালুর চরে, রুপময়ী জ্যোছনার খেলা।
আজি মধু রজনীতে তৃতীয়-চাঁদের হাসি ঝলিতেছে সুনীল গগনে,
জ্বলিছে সোনার দীপ, নরম সোনার দীপ, ক্ষীণ শিখা মেলি বাতায়নে,
তুমি কি আসিবে প্রিয়, আমার স্বপন-প্রিয়, চুপে চুপে এই শুভখনে?
এখন অনেক রাত, আতুর নয়ন মেলি', আমি আছি বসিয়া একেলা!

ধরণী ঘুমায়ে আছে, রজনী মাতাল হ'ল বিকশিত শেফালীর বাসে
প'ড়েছে নদীর বুকে, নিথর নদীর বুকে, চাঁদ আর তারকার ছায়া;
তুমি কি আসিবে প্রিয়, আমার স্বপন-প্রিয়, আসিবে কি আমার সকাশে
বাতাসে ভাসায়ে তব নরম মোমের মত সুকোমল কমনীয় কায়া?
কাঁপিছে গাছের পাতা, সবুজ গাছের পাতা, বাহিরের বাউল বাতাসে,
বাতায়নে স্থির দীপ, নরম সোনার দীপ, ধীরে ধীরে মিটিমিটি হাসে,
তুমি কি আসিবে প্রিয়, আমার মানস-প্রিয়, আসিবে কি আমার সকাশে?
এই শুভখনে আজ আসিবে কি প্রিয়তম, চোখে মায়া-কাজলের মায়া?

আজি কি দেখিতে পাব তোমার সে চারুমুখ, ভুবন-ভুলান হৃদয়েশ?
সুচিকণ ভুরু দু'টি, বিশাল আয়ত আঁখি, সুমধুর প্রতিটি পলক;
দেখিতে কি পাব প্রিয় সেই—সেই তব রুপ, দেখে যা'র নাহি হয় শেষ?
আজি এ রাতের তরে নামিবে কি মোর ঘরে, নামিবে কি সেই সুরলোক?
আমার কথার মালা যতনে গলায় পরি', চোখে মোর সুরের আবেশ,
তুমি কি আসিবে আজ, হাসিয়া মধুর হাসি, এলায়ে চিকণ কালো কেশ?
দেখিতে কি পাব প্রিয়, সে তব মোহন রুপ, দেখে যা'র নাহি হয় শেষ?
হৃদয়ের পটভূমে পড়িবে কি ক্ষণতরে সেই অপরুপের আলোক?

এখন অনেক রাত, চাঁদের তরণীখানি দুলিতেছে আকাশের গায়;
বাতায়ন-পথে মেলি' আমার আতুর আঁখি আমি একা ব'সে আছি ঘরে,
তুমি কি আসিবে প্রিয়, আসিবে আমার কাছে, চুপে চুপে অতি ধীর পায়?
বাহিরে রাতের পাখী, নীরব রাতের পাখী দু'টি পাখা ঝাপটিয়া মরে!
অভিসার-বিলাসিনী জোনাকী বধুরা সবে লীলাভরে নাচিয়া বেড়ায়,
জেগে আছে শুকতারা, ভীরু মেয়ে শুকতারা, কি জানি সে কিসের আশায়
তুমি কি আসিবে প্রিয়, আসিবে আমার কাছে, চুপে চুপে অতি ধীর পায়?
লীলায়িত কর দু'টি রাখিবে আলস ভরে ভালবেসে মোর দু'টি করে?

বাসন্তী পূর্ণিমা

কেবল মানুষে মানুষে নয়—চরাচর বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানুষের আত্মার যোগ রহিয়াছে এবং সেই যোগের উপলব্ধিতেই মানুষের আনন্দ। মানুষ সেই যোগসূত্র হইতে যতই নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিজের স্বার্থের গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে কেন্দ্রীভূত করে, ততই সে দুর্ব্বল এবং অসহায় হইয়া পড়ে। যাঁহারা ঋষি, যাঁহারা সাধক এবং তত্ত্বদর্শী, তাঁহারা বিশ্বচরাচরে সেই উদার আপন সত্তাকে উপলব্ধি করিয়া আনন্দের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হন, তাঁহারা অমৃতত্বকে লাভ করেন। বিরোধ তাঁহাদের জীবনে থাকে না, থাকে না বৈষম্যবোধ, বিশ্বপ্রকৃতি তাঁহাদের জীবনে ছন্দায়িত হইয়া উঠে—তাঁহাদের দৃষ্টিতে সুন্দর এবং মধুময় হইয়া পড়ে এবং সেই যে সৌন্দর্য্য এবং বিশ্ব পরিব্যাপ্ত মাধুর্য্য, তাহার উপলব্ধি হয় যিনি সুন্দর এবং মধুর, তাঁহার লীলার ভিতর দিয়া। তখন কোথাও আর বন্ধন থাকে না, বাঁধ থাকে না, চরাচরে নিত্য নিরবচ্ছিন্ন স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের বিকাশ হইতে থাকে। যে কার্য্যের মধ্যে বন্ধন নাই, পীড়ন নাই, যে কাজের পিছনে হুকুমের তাগিদ নাই, ভয় নাই, এমন যে কার্য্য, যে কার্য্যের উৎস শুধু আনন্দের মধ্যেই নিহিত, তাহাই লীলা। সাধক বিশ্ব পরিব্যাপ্ত সৌন্দর্য্যের মধ্যে এমন একটা লীলাকেই প্রত্যক্ষ করেন। তাঁহার দৃষ্টিতে তখন কেবল আনন্দের কারবার। বিশ্বপ্রকৃতির যে বহুধা বিকাশ, তাঁহার দৃষ্টিতে এই বহুত্ব—এ যেন পরস্পরের আনন্দ উপভোগের উপর প্রতিষ্ঠিত। বহু হইয়াও এ-সব এক আপনার অনন্ত এবং অব্যয় মাধুর্য্য উপভোগ করিবার উদ্দেশ্যেই ইহা বহু। আনন্দকে জ্ঞান রূপ, রস রূপ দিবার জন্যই একেরই এই বহুতে বিলাস। উপনিষদের ঋষিগণ বহুর মধ্যে একের এই যে আনন্দময় সত্তা তাঁহারই নাম দিয়াছেন মধু। তাঁহারা বলিয়াছেন, যিনি মধু তিনি যেমন আমার অন্তরে রহিয়াছেন, তেমনই চরাচরে বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে রহিয়াছেন। তিনি এক, অখণ্ড অদ্বয় আনন্দস্বরূপ এবং তাঁহার সেই স্বরূপতার সক্রিয় রূপেই হইল এই বিশ্ব জগৎ এবং সেই যে ক্রিয়া তাহাই লীলা।

এই লীলাই তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিলেন বসন্তের প্রকৃতির ভিতর দিয়া। বসন্তের নব কিসলয় দলে, বিকশিত কুসুমরাজিতে, ভ্রমর গুঞ্জরণে, কোকিল কুহরণে তাঁহারা দেখিলেন, যিনি মধু এবং মাধব তাঁহারই লীলাকে। শুনিতে পাইলেন তাঁহারই বংশীধ্বনি। যে ধ্বনি প্রকৃতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে নানা সুর ধরিয়া ধরিয়া বাজিতেছে, বাজিতেছে, তুমি আমার, তোমরা আমার, আমিও তোমাদের এই সুরে। সেই সুরই চেতনা জাগাইয়া প্রেরণা ছড়াইয়া দিতেছে সকলের মধ্যে, সর্ব্বত্র উঠিতেছে তাহারই প্রতিধ্বনি। সে প্রতিধ্বনি চন্দ্রে, সূর্য্যে, গ্রহে নক্ষত্রে, সরিৎ সমুদ্রে, লতায় পাতায়। একে অপরকে ডাকিতেছে, টানিতেছে, আপনার করিয়া লইতে চাহিতেছে। গাছ বলিতেছে লতাকে তুমি আমার। লতা বলিতেছে গাছকে তুমি আমার, ফুল বলিতেছে ভ্রমরকে তুমি আমার; তোমার জন্যই অন্তরে মধু সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছি। আবার ভ্রমর বলিতেছে ফুলকে তুমি আমার, তোমাকে ঘিরিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া গাহিবার জন্যই আমি এ গান বাঁধিয়া রাখিয়াছি।

ভারতের সাধক কবি বৃন্দাবন ধামে এই লীলা প্রকট দেখিতে পাইলেন; সে লীলা মাধবের মধুময় লীলা। কোথায় সে বৃন্দাবন সাধকের উত্তর—অনন্ত সর্ব্বগ বিভু কৃষ্ণ তনুসম উপর্য্যধঃ ব্যাপি আছে নাহিক নিয়ম। সব জায়গায়—সর্ব্বত্র এই বৃন্দাবন-লীলা চলিতেছে, —'চর্ম্মচক্ষে দৃষ্ট হয় প্রপঞ্চের সম, প্রেমের নেত্রেতে হয় স্বরূপ প্রকাশ।' সেই বৃন্দাবন ধামে ললিত-লবঙ্গ-লতা-পরিশীলন কোমল মলয়-সমীরে ভক্তের সঙ্গে ভগবানের লীলা। বহুর সঙ্গে যিনি বহুর মধ্যে এক—যিনি বহুবল্লভী-বল্লভ তাঁহার লীলা চলিতেছে। সে লীলা চিন্ময় লীলা, আনন্দ চিন্ময় রস—প্রেমের আখ্যান। যে ভূমিতে সে লীলা চলিতেছে সে ভূমি চিন্তামণি, সে ভূমির যে লতাপাতা তাহাও চিন্ময়, উদ্ধবাদি সাধকগণ যে চিন্ময়রস আস্বাদন করিবার জন্য সাধনা করিয়াছেন—সেই উদ্ধবাদির আশাই সেখানে গুল্ম-লতা। সেখানে ভক্তের সঙ্গে ভগবানের ভেদ নাই—দুইয়ে এক। প্রকৃতির মঙ্গল-লীলায় তিনি মানবের যে মাধুর্য্য এবং প্রগাঢ় পরমপ্রীতির পরিচয় পান, তাহাতে তাঁহাকে আপ্লুত করে; তাঁহার ব্যক্তি-অহঙ্কার একেবারে বিলুপ্ত হয়। শক্তি তখন নিয়া অখণ্ড আনন্দের মধ্যে আত্মবিসর্জ্জন করে। সৌন্দর্য্যের অবস্থা ব্যক্ত করিয়া ভক্ত কবি জয়দেব বলিয়াছেন—"মুকুরলোচন-মণ্ডল-জীলা মধুরিপুরহসিত-ভাবনশীলা।"

এই যে নিত্য বৃন্দাবন-লীলা, এই বৃন্দাবন-লীলার আনন্দরস এই বাসন্তী পূর্ণিমার তিথিতে বিগ্রহ মূর্ত্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল এই বাঙলা দেশে। সেদিন, 'জয় জয় রব ভেল নদীয়া নগরে, জনম লভিলা গোরা শচীর উদরে।' সে-দিনের সেই শুভ মুহূর্ত্ত বাঙলার এক স্মরণীয় দিন,—বিরোধ-বৈষম্য বর্ণাচার এবং আভিজাত্যের পীড়নে বাঙলার অন্তরাত্মা অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিল, সঙ্কুচিত হইয়া রহিয়াছিল পর-পীড়নের প্রবল শৈত্য প্রভাবে। বসন্তের বাতাস বহিল সেদিন—'অচম্বিতে বায়ু বহে, জুড়ায় সকল দেহে কোটি চাঁদ জিনিয়া মুরতি'—শচীর কোলে দিক উজ্জ্বল করিল। মহাপ্রভুর প্রেমের মহিমায় গোটা ভারতে এক অপূর্ব্ব খেলা আরম্ভ হইল, রাজা রাজাসন ছাড়িয়া যে পথের ভিখারী তাহাকে কোল দিল, যে পণ্ডিত সেও পতিতকে বুকে জড়াইয়া ধরিল—'না দিবা রজনী জানি, নাহি জানি তিনাতিনি, সর্ব্বলোক হরষ-অশোক।' বসন্তোৎসব ব্যস্ত হইল বাঙলায়—ছড়াইয়া পড়িল সে লীলা-মাধুরী বাঙলার বাহিরে। বৃন্দাবনের কুঞ্জকুটীর কোলে যে লীলা অপ্রকটভাবে চলিতেছিল, সেই লীলা প্রতিষ্ঠিত হইল বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে। যে দেবতা ছিলেন, গম্ভীর ভক্তগণের

তপস্যাতেও দুরবগ্রহ এবং দুরধিগম্য, তাঁহাকে ধরা দিতে হইল উচ্চ নীচ সকলের মন-বিনোদ পুষ্পাকররূপে, বসন্তের মদন মহোৎসবে। বাঙলার সেই বড় আদরের ছেলে ইতর, ভদ্র, মূর্খ, পণ্ডিত, সকলকে ডাকিয়া বলিল, 'আজি হৈতে কারো না রাখিব দুঃখ শোক;' সকলকে কোলে জড়াইয়া, ধরিয়া বলিল,—'এক আমি দুই নই সকলি আমার।'

সেই বসন্ত আসিয়াছে, আসিয়াছে, সেই বাসন্তী পূর্ণিমা, —আমরা মহাপ্রভুর বাণীর মর্ম্ম বুঝিতে পারিব কি? সেই বাণীই ভারতের অন্তরের বাণী, সেই বাণীর উপরই ভারতের আধ্যাত্মিকতা এবং ভারতের জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। বাসন্তী পূর্ণিমার পুণ্য তিথিতে সেই বাণী যদি আমাদের চিত্তে আজ চিন্ময় হইয়া উঠে তবে আমাদের জীবন ধন্য হইবে, পুণ্য হইবে এবং দোলের খেলা সার্থক হইবে।

তেপান্তর

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

রৌদ্র ঝকিত মরুভূমি মতো প্রসারিত দূরে দিশে;
শ্রান্তি অলস বিশাল তেপান্তর,
সীমাহারা সীমা চক্রবালের বনান্তে যায় মিশে,
ঝিমায় আকাশ, ঝিমায় দিগন্তর।
শ্বসিয়া শ্বসিয়া কেঁদে' ফেরে বায়ু মরুচারী প্রেত সম
গুমরি' গুমরি' ওঠে তার হাহাকার,
ধরণী তলে শিহরিছে যত তৃণমূলে দলে দলে
অসীম শ্মশান বিপুলে রিক্ততার॥

আমি খুঁজে ফিরি কোথা কারাগারে বন্দিনী মোর প্রিয়া
দুর্জ্জয় বেগে দুর্ব্বার গতি তা'র,
চরণ আঘাতে কঠিন ভূমিতে বহ্নি কণিকা জাগে,
ধূসর ধূলায় করিয়া অন্ধকার।
রুদ্রোদ্ধত কেশর গুচ্ছে আলোকে ঝলসি' ওঠে
পুচ্ছে উড়িছে ঝঞ্ঝা কেতন প্রায়,
ভরে গেছে মুখ পুঞ্জ পুঞ্জে উদ্গত ফেন জালে
অনলের মতো বহে নিশ্বাস বায়॥

মস্তকে মম ব্যথার কিরীট, ঝরে আগ্নেয় কথা
ললাটে আমার ব্যর্থতা জয়টীকা,
কটিতট তলে শাণিত কৃপাণে বাজে ঝঞ্ঝনা রব
ঠিকরিয়া পড়ে বজ্র-কিরণ শিখা।
আমি খুঁজে ফিরি কোথা কারাগারে বন্দিনী মোর প্রিয়া
অশ্রু বরিষে দিবস যামিনী জাগি',
কবরী মালিকা শুষ্ক শিথিল আয়ত নয়ন যুগে
ধুয়েছে কাজল ধারা বরষণ লাগি'॥

তারি' তরে মোর যাত্রা আজিকে, মানস লক্ষ্মী মম
চির সমাসীনা কল্পনা শতদলে,
তারি' বীণা রবে সুর জাহ্নবী প্লাবন ছন্দ লভি'
নাচে সোল্লাসে মোর অন্তর তলে।
আমার ধ্যানের তিমির মথিয়া আপনি বিকলি' ওঠে
মুখছবি তা'র অরুণ স্বপন সম,
মোর গানে-সে যে দেয় ঝঙ্কার, কবিতায় দেয় বাণী,
বর্ণ লেখন বুলায় চিত্রে মম॥

তেপান্তরের প্রান্তর পারে কোথা সে পাষাণ পুরী
অন্তরতমা যেথানে শৃঙ্খলিতা,
মোর জীবনের অমৃত বাহিনী, শাশ্বতী শুকতারা
সাধনালোকের চির অভিনন্দিতা।
মোর কিশোরের উর্ব্বশী কিশোরী চঞ্চল অঞ্চলা,
মোর যৌবন বাসনা সঞ্চারিণী,
কারাতল হ'তে বেদনা তাহার পশিছে বক্ষে মম,
আজিকে আমারে ডাকিল সে বন্দিনী॥

আমার কবিতা ভাসায়েছি তাই উন্মাদ বাণীস্রোতে,
আমার ছন্দ শৃঙ্খল টুটিয়াছে,
শিয়রে দীপিছে ব্যথার মুকুট, ললাটে অগ্নি টীকা,
নিশিত অসিতে ঝঞ্ঝনা উঠিয়াছে!
সম্মুখে মোর দিগন্তব্যাপী বিশাল জীবন মরু—
রৌদ্র ঝকিত অলস তেপান্তর,
রূপ অলকার ইন্দ্রাণী মম কাঁদে তা'র কোন্ পারে—
তারি সন্ধানে ছুটিয়াছে অন্তর॥

মানবীয় ঐক্যের আদর্শ

শ্রীঅরবিন্দ

ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক কারণে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে একটি মিশ্র অধিজাতি গঠিত হইবার নিশ্চিত সম্ভাবনা প্রথম হইতেই ছিল, কেবল তাহার পূর্ণ পরিণতি সাধন রাজনীতিজ্ঞতার অতি প্রচণ্ড ও কুটিল ভুল সকলের দ্বারাই বিলম্বিত হইয়াছে; কিন্তু গ্রেট্ বৃটেনের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের দ্রুততর অথচ ক্রমিক বিকাশ সম্বন্ধে উহা বলা চলে না, প্রায় অজ্ঞাতসারেই ঐ সাম্রাজ্য এমন অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, যেখানে উহার পক্ষে এক বাস্তব ঐক্যে গড়িয়া উঠা সম্ভব হইয়াছে। সে বেশী দিনের কথা নহে যখন উপনিবেশগুলির কালক্রমে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়া এবং অন্তত অষ্ট্রেলিয়া ও ক্যানাডার পক্ষে নূতন স্বাধীন অধিজাতিতে গড়িয়া উঠা সাম্রাজ্যটির অবশ্যম্ভাবী অবসান বলিয়া, উহার যথাসংগত, এমন কি বাঞ্ছনীয় পরিণতি বলিয়াই বিবেচিত হইত।

এইরূপ মনোভাবের স্বপক্ষে বৈধ যুক্তি ছিল। মিলনের ভৌগোলিক প্রয়োজনটির সম্পূর্ণ অভাব ছিল; অন্য পক্ষে দূরত্বের জন্য একটা প্রত্যক্ষ মানসিক বিচ্ছেদ সৃষ্ট হইয়াছিল, এবং প্রত্যেক উপনিবেশের একটা পৃথক শরীর থাকায় মনে হইয়াছিল যে, পৃথক পৃথক অধিজাতিতে গড়িয়া উঠাই উহাদের ভবিতব্যতা, ঐ সময়ে মানবীয় ক্রমবিবর্ত্তন ঐ ধারা অনুসরণ করিয়াই অগ্রসর হইতেছিল। মাতৃভূমির অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং উপনিবেশগুলির অর্থনৈতিক স্বার্থ বিভিন্ন ছিল, পরস্পরের সহিত সম্বন্ধশূন্য ছিল, অনেক সময়ে বিরোধই ছিল, তাহার প্রমাণ তাহারা বৃটিশ অবাধ বাণিজ্য নীতির (free trade policy) বিরুদ্ধে সংরক্ষণের (protection) নীতি গ্রহণ করিয়াছিল। সাম্রাজ্যে তাহাদের একমাত্র রাজনৈতিক স্বার্থ ছিল বৃটিশ নৌ-বল ও সৈন্যবল কর্ত্তৃক শাসনকার্য্য আক্রমণ হইতে নিরাপত্তার বিধান; সাম্রাজ্যটির শাসনকার্য্য এবং উহার ভাগ্য নির্ণয়ে তাহারা অংশ গ্রহণ করিত না এবং তাহাতে তাহাদের কোন প্রত্যক্ষ স্বার্থ ছিল না। চৈতন্যের দিক দিয়া একমাত্র বন্ধন-সূত্র ছিল উৎপত্তির ক্ষীণ স্মৃতি এবং একটা অনুষ্ণ প্রীতিভাব, তাহা সহজেই লুপ্ত হইতে পারিত এবং তাহার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতেছিল একটা স্পষ্ট বিচ্ছেদমুখীন প্রবৃত্তি এবং প্রত্যেক সুস্পষ্টভাবে নির্দ্দিষ্ট মানবীয় সমুচ্চয়ের পক্ষে নিজের জন্য স্বতন্ত্র জীবন ও জাতিরূপ সৃষ্টি করিবার স্বাভাবিক প্রবণতা। জাতিগত উৎপত্তি বিভিন্ন ছিল, অষ্ট্রেলিয়ায় বৃটিশ, দক্ষিণ আফ্রিকায় বেশীর ভাগ ডচ্, ক্যানাডায় অর্দ্ধ-ফরাসী, অর্দ্ধইংরেজ; কিন্তু তিনটি দেশেই জীবন-যাপনের ধারা, রাজনৈতিক প্রবৃত্তি চরিত্র ও প্রকৃতির এক নূতন রূপ, একটা নূতন কৃষ্টিই গড়িয়া উঠিতেছিল তাহা ছিল বৃটিশ কৃষ্টি, প্রকৃতি, জীবন-ধারা এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক মতিগতির সম্পূর্ণ বিপরীত। অন্যপক্ষে মাতৃভূমিটি এই সকল উপনিবেশ হইতে কোনও উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক, সামরিক বা অর্থনৈতিক সাহায্য পাইত না, তাহার ছিল কেবল একটা সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হওয়ারই মর্য্যাদা। অতএব উভয় পক্ষ হইতে সকল পরিস্থিতি নির্দ্দেশ করিতেছিল শেষ পর্য্যন্ত একটা নিরুপদ্রব বিচ্ছেদ, তাহা ইংলণ্ডের পক্ষে রাখিয়া যাইত কেবল এতগুলি নূতন অধিজাতির জননী হওয়ার গৌরবটুকু।

জড়-বিজ্ঞানের দ্বারা জগতের দূরবর্ত্তী অংশ সকলের পরস্পরের সন্নিকটবর্ত্তী হওয়া এবং তাহার ফলে বৃহত্তর সমুচ্চয় গঠনের প্রবণতা, রাজনীতি বিষয়ে জাগতিক পরিস্থিতির পরিবর্ত্তন এবং যে সুগভীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্ত্তনের দিকে গ্রেট্ বৃটেন অগ্রসর হইয়াছে—এ সবের জন্য ঐ সমুদয় অবস্থাই এখন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং ইহা সহজেই বোধগম্য যে, ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যটির পক্ষে সম্মিলিত হইয়া এক মহান সংহতি অধিজাতিতে, অথবা ঐরূপে নাম দেওয়া চলিতে পারে এমন কোন কিছুতে পরিণত হওয়া কার্য্যত অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে। এই পরিণতির পথে এখনও বাধা আছে,—প্রথমেই রহিয়াছে অর্থনৈতিক বাধা; কারণ, আমরা দেখিয়াছি, ভৌগোলিক ব্যবধান অর্থনৈতিক স্বার্থের পার্থক্যের দিকে লইয়া যায়, অনেক সময় বিরোধেরই সৃষ্টি করে, একটা সাম্রাজ্যিক জোল্‌ভেরাইন (Zollverein)* জার্ম্মান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত রাষ্ট্রসমূহের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক, অথবা বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে এক পক্ষ যে কেন্দ্রীয় ইউরোপীয়ান ফেডারেশন গড়িতে চাহিতেছে তাহার পক্ষেও স্বাভাবিক হইতে পারে; কিন্তু বহুদূরস্থিত দেশসমূহের মধ্যে এরূপ ব্যবস্থা হইবে একটা কৃত্রিম সৃষ্টি, এবং তাহাকে রক্ষা করিতে সতত সজাগ দৃষ্টি এবং সতর্ক ব্যবহার প্রয়োজন হইবে; অথচ, সেই সংগেই, রাজনৈতিক ঐক্যের দাবী হইতেছে তাহার স্বাভাবিক সহবর্ত্তীস্বরূপ অর্থনৈতিক মিলন, এবং এইরূপ মিলন ব্যতীত তাহা সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া অনুভূত হয় না। রাজনৈতিক ও অন্যান্য বাধাও রহিয়াছে, যদি ঐক্যটিকে কার্য্যত সিদ্ধ করিবার চেষ্টা হঠকারিতার সহিত বা অজ্ঞভাবে করা হয়, তাহা হইলে ঐ সকল বাধা মাথা তুলিতে পারে; কিন্তু ইহাদের কোনটিই অনতিক্রম্য বা প্রকৃতপক্ষে অন্তরায় নহে। জাতির সমস্যা, যাহা এক সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় গুরুতর ও বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছিল এবং এখনও সম্পূর্ণভাবে অপসারিত হয় নাই, তাহা ক্যানাডার ঐ সমস্যা অপেক্ষা গুরুতর হইবার কোন কারণ নাই, কারণ উভয় দেশেই ইংরেজ অংশ রহিয়াছে, তাহা, সংখ্যায় লঘিষ্ঠই হউক আর গরিষ্ঠই হউক, বন্ধুত্বমূলক ঐক্য বা মিশ্রণের দ্বারা বৈদেশিক অংশটিকে সাম্রাজ্যের সহিত যুক্ত করিতে পারে; আর সেখানে এমন কোন শক্তিশালী বাহ্যিক আকর্ষণ বা সুগঠিত কৃষ্টির সংঘাত বা প্রকৃতিগত অসামঞ্জস্য নাই যাহা অষ্ট্রো-হাঙ্গেরীর বাস্তব ঐক্যসাধন এমন কঠিন করিয়া তুলিয়াছে।

কেবল প্রয়োজন হইতেছে এই যে, ইংলণ্ড এই সমস্যাটির সমাধানে যথার্থ সহজবোধের সহিত অগ্রসর হইবে, পরন্তু

---

* Zollverein হইতেছে জার্ম্মানীর অন্তর্গত রাষ্ট্র[illegible] মধ্যে বাণিজ্যসংক্রান্ত ফেডারেশন বা সংহতি, ১৮১৮ সাল [illegible] ইহার আরম্ভ; ইহার উদ্দেশ্য নিজেদের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের শুল্ক নির্দ্ধারণ সাম্য।

আমেরিকায় তাহার যে সাংঘাতিক ভুল হইয়াছিল অথবা দক্ষিণ আফ্রিকায় সে যে ভুল করিয়া সৌভাগ্যক্রমে সংশোধন করিয়া লইয়াছিল সেইরূপ কিছুর পুনরাবৃত্তি করিবে না। তাহাকে সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, একটি প্রভুত্বকারী দেশরূপে সে তাহার রাজ্যের অংশ সকলকে তাহার সহিত সমরূপ হইতে বাধ্য করিবে অথবা চিরপরাধীন করিয়া রাখিবে ইহাই তাহার সম্ভাব্য ভবিতব্যতা নহে; পরন্তু তাহাকে হইতে হইবে রাষ্ট্র ও অধিজাতিসমূহের এক মহান সম্মেলন কেন্দ্র, তাহারা তাহার আকর্ষণে সংযুক্ত হইয়া এক নূতন অতি-আধিজাতিক (Super-national) ঐক্যে গড়িয়া উঠিবে। এখানে প্রথমেই প্রয়োজন হইতেছে, তাহাকে অতীব সতর্কতার সহিত উপনিবেশগুলির স্বাধীন আভ্যন্তরীণ জীবন ও ইচ্ছাকে তাহার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক প্রবৃত্তিসমূহকে মানিয়া লইতে হইবে, এবং সেই সঙ্গেই সাম্রাজ্যটির বৃহৎ সাধারণ সমস্যাগুলির পরিচালনায় তাহাদিগকে নিজের সহিত সমান অংশীদার করিয়া লইতে হইবে। এইরূপ একটি নূতন ধরণের সমুচ্চয়ের ভবিষ্যতে সে নিজে থাকিবে কেবল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রস্বরূপ, সংযোজনের পট্টি কিম্বা গ্রন্থিস্বরূপ, তাহার অধিক আর কিছুই নহে। ইংলণ্ডের নেতৃস্থানীয় মনীষা যদি এই পথে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে শিথিল বৃটিশ প্রভুত্বের অধীনে স্বায়ত্তশাসনশীল উপনিবেশসমূহের পরিবর্ত্তে স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এক ফেডারেশন গড়িয়া উঠিবে, কোন অপ্রত্যাশিত বিভ্রাট না ঘটিলে এইরূপ পরিণতি আর কিছুর দ্বারাই ব্যাহত হইবে না।

কিন্তু সমস্যাটি অনেক বেশী কঠিন হইয়া পড়ে যখন বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অন্য দুইটি বৃহৎ অংশের, মিশর ও ভারতের প্রশ্ন উঠে,—এতই কঠিন যে, রাজনৈতিক মনীষার প্রথম প্রলোভনই হইবে (তাহা শত সংস্কার ও বর্ত্তমান স্বার্থের দ্বারা সমর্থিত হইবে) ঐ সমস্যাটিকে ঠেলিয়া রাখিয়া একটি সংহিত ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়িয়া তোলা, এই দুইটি দেশ থাকিবে ঐ সাম্রাজ্যের অধীন দুইটি রাজ্য। ইহা সুস্পষ্ট যে, যদি এইরূপ সমাধানই করা হয় তাহা স্থায়ী হইতে পারে না, আর যদি একগুঁয়েমির সহিত এই পথ ধরিয়াই থাকা হয় তাহা অতীব অবাঞ্ছনীয় পরিণামসকলের দিকে, হয়ত শেষ পর্যন্ত উপপ্লবের দিকেই লইয়া যাইবে।* ভারতের নব অভ্যুদয় আগামী কল্যকার সূর্য্যোদয়ের ন্যায়ই অবশ্যম্ভাবী; ত্রিংশতি কোটি মানব লইয়া যে মহাজাতি গঠিত, যাহার প্রকৃতি এইরূপ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, যাহার জীবন সম্বন্ধে ঐতিহ্য ও আদর্শ এইরূপ অসাধারণ, যাহার বুদ্ধি এইরূপ তেজস্বান্‌, যাহার অন্তর্নিহিত শক্তি সকল এত প্রচুর, তাহার নব অভ্যুদয় আধুনিক জগতের একটি অতীব শক্তিশালী ঘটনা না হইয়া পারে না। ইহা সুস্পষ্ট যে, নূতন সংহিত সাম্রাজ্যটি ত্রিংশতি কোটি মানব লইয়া গঠিত এই পুনরভ্যুত্থানশীল অধিজাতির সহিত চির-বিরোধিতায় প্রবৃত্ত হইতে পারে না, আর যে অদূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞতা আজিকার স্বার্থে অবশ্যম্ভাবী পরিণতিটিকে যতদিন সম্ভব ঠেকাইয়া রাখিতে চাহিতেছে তাহাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলিবে না। এইটি বস্তুত নীতি হিসাবে স্বীকৃত হইয়াছে; ভারতীয় প্রশ্নটির কার্য্যকরী সমাধান যখন আর ঠেলিয়া রাখা চলিবে না তখন যে-সব সমস্যার উদয় হইবে তাহাদের মীমাংসা করাতেই দুরূহতা দেখা দিবে।

এইরূপ বিভিন্ন প্রকৃতির সমুচ্চয়ের মধ্যে মিলনের পথে যে-সব বাধা রহিয়াছে তাহাদের স্বরূপ খুবই স্পষ্ট। প্রথমেই রহিয়াছে ভৌগোলিক ব্যবধান, ইহা ভারতকে চিরকালই একটি পৃথক দেশ ও জাতি করিয়া রাখিয়াছে, যদিও ইতিপূর্ব্বে সে তাহার রাজনৈতিক ঐক্য সংসিদ্ধ করিতে সক্ষম হয় নাই এবং আক্রমণ ও পারস্পরিক যোগাযোগের দ্বারা তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ সভ্যতা সকলের পূর্ণ সংঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। ত্রিংশতি কোটি মানব লইয়া ইহার জনসংখ্যার বিশালতাই একটা বাধা; সাম্রাজ্যের অন্তর্গত অন্যান্য জাতির সহিত ইহাদের কোনরূপ মিশ্রণ অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা ও দক্ষিণ আফ্রিকার অপেক্ষাকৃত নগণ্য জনসংখ্যার মিশ্রণের তুলনায় সম্পূর্ণ বিভিন্ন জিনিষ হইবে। ইউরোপীয় ও এশিয়াবাসীদের মধ্যে জাতি, বর্ণ ও প্রকৃতির একটা সুস্পষ্ট ভেদরেখা রহিয়াছে; যুগ যুগ ব্যাপী অতীত, উৎপত্তিতে সম্পূর্ণ বিভিন্নতা, অনপনেয় সংস্কারসমূহ, অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তিসকল যে বাধার সৃষ্টি করিতেছে তাহাতে ভারত কর্ত্তৃক পূর্ণত কিম্বা প্রধানত ইংলণ্ডীয় বা ইউরোপীয় কৃষ্টি গ্রহণের দ্বারা সেই ভেদ রেখা মুছিয়া যাইবার কিম্বা ক্ষীণ হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। এইসব বাধা বিঘ্নের অর্থ ইহা নহে যে, মানবীয় মনীষার সম্মুখে এমন কোন সমস্যা উপস্থিত করা যায় না মানুষ ইচ্ছা করিলে যাহার সমাধান করিতে পারে না। আমরা ধরিয়া লইতেছি যে, এই ক্ষেত্রে ঐ ইচ্ছা এবং প্রয়োজনীয় বুদ্ধি দুইটিই মিলিবে, ব্রিটিশ রাজনীতিজ্ঞতা কোন অসংশোধনীয় ভুল করিবে না, এরূপ একটি সমস্যার সমাধানে সমস্যাটির সমাধান হইতে পারে না; অন্যপক্ষে আমরা জানি যে, তাহার পক্ষে যে সব ছোট খাটো ভুলভ্রান্তি অপরিহার্য্য, সেগুলি সে তাহার পূর্ব্ব প্রকৃতি ও রীতি অনুসারে যথাসময়ে বর্জ্জন করিবে এবং এইভাবে দুইদিন আগেই হউক আর পরেই হউক এই দুইটি অতি বিভিন্ন মানবীয় সমুচ্চয়ের মধ্যে কোনরূপ একটা চৈতন্যমূলক ঐক্য গড়িয়া উঠিবে।*

* ব্রিটিশ রাজনৈতিক মনীষা মিশরের সমস্যা যথাসময়ে অন্যভাবে সমাধান করিয়াছে। আজ মিশর আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একটি পরাধীন রাজ্য নহে, পরন্তু ব্রিটেনের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ একটি স্বাধীন দেশ (যদিও সে স্বাধীনতার এখনও কিছু ত্রুটি রহিয়াছে, এখনও ব্রিটিশ সৈন্য সম্পূর্ণভাবে মিশর হইতে অপসারিত হয় নাই)। ১৯৩৬ সালের আগষ্ট মাসে ব্রিটেনের সহিত মিশরের যে সন্ধি স্বাক্ষরিত হইয়াছে, মিশরের প্রধান মন্ত্রী নাহাস পাশার কথায় সেইটি হইতেছে "A symbol for Britain and Egypt to show themselves to two equal and friendly countries." মুসোলিনী কর্ত্তৃক আবিসিনিয়া অধিকৃত হওয়ায় মিশরের সহিত এইরূপ একটা মীমাংসা করা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়াছিল।

* এখানে শ্রীঅরবিন্দ যেরূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন, মহাযুদ্ধে বিজয়লাভের পর ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ ভারতীয় সমস্যা সমাধানে সেইরূপ শুভবুদ্ধি ও সঙ্কল্প আনয়ন করিতে সক্ষম হন নাই।

কোন্ অবস্থানিচয়ের মধ্যে ইহা সম্ভব হইতে পারে এবং সেই ঐক্যের স্বরূপ কি হইবে তাহাই প্রশ্ন। ইহা সুস্পষ্ট যে, শাসক জাতিটি ইতিপূর্ব্বে অন্যত্র এতখানি সাফল্যের সহিত যে নীতি প্রয়োগ করিয়াছে এবং যাহার বর্জ্জনের ফলে একটা বিশেষ অবস্থার পর সর্ব্বদাই তাহার নিজেরই বৃহত্তর স্বার্থের হানি হইয়াছে, সেই নীতিটি অনেক বেশী সতর্কতা ও দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত প্রয়োগ করিতে হইবে, সাম্রাজ্যের ঐক্যের সহিত সামঞ্জস্যে ভারতের মুক্ত ও স্বতন্ত্র বিবর্ত্তন হইতে দিতে হইবে। যতদিন না ভারত সম্পূর্ণভাবে স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করিতেছে ততদিন তাহার স্বার্থকেই শাসকবর্গের মনে প্রধান স্থান দিতে হইবে, আর যখন সে স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করিবে তাহা যেন এমন না হয় যাহাতে তাহার নিজের স্বার্থ সাধনে বিঘ্ন হইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, তাহাকে যেন এমন কোন সাম্রাজ্যিক জোল্‌ভেরাইনে (Zollverein) যোগ দিতে বাধ্য করা না হয়* যাহা তাহার বর্ত্তমান অবস্থায় তাহার বাণিজ্য-বিষয়ক ভবিষ্যতের পক্ষে বিভ্রাটজনক হইবে, যতক্ষণ না তাহার শ্রমশিল্পের বিকাশ উৎসাহিত ও সঞ্জীবিত করিবার দৃঢ়-নিষ্ঠ নীতি অনুসরণ করিয়া ঐ অবস্থানিচয়ের পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে, যদিও তাহা অপরিহার্য্যরূপে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অন্য বহু বর্ত্তমান বাণিজ্য-সংক্রান্ত স্বার্থের প্রতিকূল হইবে। ভারতের বর্দ্ধিষ্ণু জীবনের উপর ইংরেজ কৃষ্টি বা অবস্থা পরম্পরা চাপাইয়া দিবার কোনরূপ চেষ্টা করা চলিবে না বা ঐ সকলকেই তাহার পক্ষে সাম্রাজ্যের স্বাধীন জাতি সকলের মধ্যে গণ্য হইবার জন্য অবশ্য পালনীয় সর্ত্ত করা চলিবে না, এবং তাহার নিজস্ব কৃষ্টি ও স্বধর্ম্মানুগত বিকাশকে রক্ষা করিবার ও গড়িয়া তুলিবার তাহার নিজের কোন প্রয়াসে হস্তক্ষেপ করা বা বাধা দেওয়া চলিবে না। তাহার মর্য্যাদা, তাহার হৃদ্গতভাব সকল, তাহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা-সমূহকে যেমন নীতিতে তেমনিই কার্য্যত ক্রমশ বেশী বেশী মানিয়া লইতে হইবে। যদি এইরূপ অবস্থানিচয় পাওয়া যায় তাহা হইলে ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং তাহার নিজের নির্ব্বিঘ্ন বিকাশের চিন্তা তাহাকে সাম্রাজ্যটির সহিত যুক্ত করিয়া রাখিবে এবং অবশিষ্টের জন্য, ঐক্যসাধন প্রক্রিয়াটির সূক্ষ্মতর ও কঠিনতর অংশের পক্ষে অল্পাধিক দৃঢ়ভাবে সংসিদ্ধ হওয়ার জন্য সময় পাওয়া যাইবে।

সৃষ্ট ঐক্যটি কখনই একটা ইন্দো-বৃটিশ জাতির রূপ গ্রহণ করিতে পারে না; উহা হইতেছে কেবল কল্পনা-বিলাস, একটা অবাস্তব খেয়াল মাত্র, বাস্তব সম্ভাবনাগুলিকে অবহেলা করিয়া উহার পশ্চাতে ধাবমান হওয়া কিছুতেই চলিবে না। সম্ভাবনাগুলি-হইতেছে, প্রথমত, উভয়ের স্বার্থের দ্বারা সমর্থিত সুদৃঢ় রাজনৈতিক ঐক্য, দ্বিতীয়ত, সুষ্ঠু বাণিজ্যমূলক আদান-প্রদান এবং যথোচিত ধারায় শ্রমশিল্পে পরস্পরের সহায়তা, তৃতীয়ত, মানবজাতির দুইটি প্রধানতম অংশ এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে একটা নূতন কৃষ্টিগত সম্বন্ধ স্থাপন, তাহাতে তাহারা এক মানবীয় পরিবারের সমান অংশীদাররূপে উভয়ের মধ্যে যাহা কিছু মহৎ ও মূল্যবান আছে আদান-প্রদান করিতে পারিবে; এবং শেষত আশা করা যায়, অতীতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশ ও সামরিক কীর্ত্তিতে যে সাহচর্য্য অধিজাতি গঠনে প্রধানত সাহায্য করিয়াছে তাহার পরিবর্ত্তে মহত্তর মানবজীবনের জন্য এক নূতন সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় কৃষ্টি গড়িয়া তোলার সহযোগিতা ও অন্তরঙ্গ সাহচর্য্যের মহত্তর গৌরব। মানবজাতির ক্রম-বিকাশশীল ঐক্যসাধনে এইরূপ অতি-আধিজাতিক সঙ্ঘই (Super-national unit) যে সম্ভাব্য পরবর্ত্তী ধাপ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ইহা সুস্পষ্ট যে, এই পরবর্ত্তী ধাপের কোন যৌক্তিকতা বা মূল্যই থাকিবে না যদি ইহা বাস্তব পরীক্ষার দ্বারা এবং হৃদ্গতভাব, মনোবৃত্তি ও সাধারণ জীবনে নূতন রীতিনীতির সৃষ্টি করিয়া সমগ্র মানবজাতিকে এক পারিবারিক ঐক্যে গড়িয়া তোলা সম্ভব না করে। শুধুই একটা বৃহৎ সাম্রাজ্যিক সঙ্ঘ গড়িয়া তোলা হইবে একটা অশিষ্ট, এমন কি প্রতিক্রিয়া-মূলক ঘটনা, যদি না ইহার মূলে ঐ বৃহত্তর লক্ষ্যটি থাকে। রণসাজে সজ্জিত এবং অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক অহমিকা দ্বারা রুষ, ফরাসী, জার্ম্মান, মার্কিন প্রভৃতি অন্যান্য বৃহৎ সঙ্ঘ হইতে বিভক্ত, শুধুই এইরূপ এক বহু-বর্ণাত্মক ইন্দো-বৃটিশ-মিশরীয়-ঔপনিবেশিক সঙ্ঘ সৃষ্টি করা হইবে পশ্চাদ্বর্ত্তন, প্রগতি নহে। অতএব যদি আদৌ এই ধরণের বিকাশসাধন অভিপ্রেত হয়—কারণ আমরা কেবল এক সম্ভাব্য নূতন আদর্শের উৎকৃষ্ট নিদর্শনরূপেই বৃটিশ সাম্রাজ্যের দৃষ্টান্তটি গ্রহণ করিয়াছি—তাহা হইলে এইরূপ একটি মধ্যবর্ত্তী অবস্থারূপে (a half-way house) এবং আমাদের সম্মুখে এই আদর্শ রাখিয়াই ইহা মানবজাতির সেই সব প্রেমিকগণের দ্বারা স্বীকৃত হইতে পারে যাঁহারা জাতির বিরুদ্ধে জাতির প্রাচীন স্থানীয় দেশপ্রীতির সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ নহেন। সর্ব্বদা এই সর্ত্তে যে, রাজনৈতিক ও শাসন-বিষয়ক বিধানগুলি আমাদিগকে মানবজাতির ঐক্যের দিকেই লইয়া যাইবে,—কারণ সেই সংশয়পূর্ণ পরিকল্পনা লইয়াই আমরা এখন অগ্রসর হইয়াছি।*

(ক্রমশ)

*১৯৩২ সালে অটোয়া প্যাক্টের (Ottwa Pact) দ্বারা ঠিক ইহাই করা হইয়াছিল এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহা ভারতের অর্থনৈতিক স্বার্থের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর বলিয়া প্রমাণিত হওয়ায় ভারতীয় আইন পরিষদ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে।

*শ্রীঅনিলবরন রায় কর্ত্তৃক অনূদিত।

বিশ্বরাজনীতির পটে—

অন্তর্জ্জগতে প্রতিনিয়ত কত ব্যাপারই না সংঘটিত হইতেছে, তাহার কয়টিরই বা আমরা খোঁজ রাখিয়া থাকি। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটে, যাহা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেই করিবে, শত ইচ্ছা থাকিলেও আমরা তাহা এড়াইয়া চলিতে পারিব না। তাহার ঘাত-প্রতিঘাত নানা ব্যাপারের উপর পড়িবেই। আবার এই সকল জগদ্ব্যাপারের একটি স্থানেই সীমাবদ্ধ থাকে না। পূর্ব্বে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে সর্ব্বত্র ইহার ঢেউ গিয়া পৌঁছায়। এই ধরণের ঘটনাগুলি আন্তর্জ্জাতিকক্ষেত্রে এক একটা যুগান্তর আনিয়া দেয়, কাজেই ইহাদিগকে বিভিন্ন যুগের ছেদ বা সন্ধিস্থল বলা যাইতে পারে। মিউনিক চুক্তি এই সেদিনকার কথা, সমর্থক ও বিরুদ্ধবাদী সকলের মতেই এই ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেহ বলেন, মিউনিক চুক্তির পর জগতে শান্তির দ্বার খোলা হইয়া গিয়াছে, আবার কাহারও মতে মিউনিক চুক্তি ভাবী মহাসমরকে একেবারে আগাইয়া দিয়াছে। এ সম্বন্ধে আমরা এখানে আলোচনা করিব না, আমাদের আলোচ্য বিষয় অন্য।

মিউনিক চুক্তি যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের তরফে স্পেনে বিদ্রোহী ফ্রাঙ্কোকে স্বীকার করিয়া লওয়া তাহার চেয়ে কোন অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। ব্রিটেন ও ফ্রান্স কিছুকাল ফ্রাঙ্কো গবর্ণমেন্টের নিকট আনাগোনা করিবার পর তাঁহাকে স্বীকার করিয়াই লইয়াছে। আবার তাহা একরূপে বিনা-সর্ত্তেই। জনসাধারণ বলাবলি করিতেছে, কি হইল? গণ-তন্ত্রনীতি কি রসাতলে গেল? আসল কথা তলাইয়া দেখিলে এরূপ প্রশ্ন করিবার অবকাশই থাকিবে না। ব্রিটেন একটা ডিমোক্রাসী, ফ্রান্স একটা ডিমোক্রাসী—এইরকম কথা শুনিতে শুনিতে আমরা যেন একথা একরূপ ভুলিয়াই যাই যে, এ দুইটি জগতে প্রধান সাম্রাজ্যওয়ালা রাষ্ট্র। তাহাদের এত মান-মর্য্যাদা, ধন-সম্পদ, এই সাম্রাজ্যেরই কল্যাণে। কাজেই যে সাম্রাজ্য হইল ইঁহাদের জীয়নকাঠি-মরণকাঠি, তাহা রক্ষার আয়োজন ও উপায় তাহারা সর্ব্বাগ্রেই করিবে। এই কথাটি মনে রাখিলে বিদ্রোহী ফ্রাঙ্কোর গবর্ণমেন্টকে মানিয়া লওয়ার তাৎপর্য্য সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে স্পেনে শক্তির মহড়ার কথা আপনাদিগকে শুনাইয়াছি। তাহাতে বলিয়াছি যে, ফ্রাঙ্কো ইটালী ও জার্ম্মানীর সাহায্যে ন্যায়ানুগভাবে প্রতিষ্ঠিত স্পেন গণ-তন্ত্রের টুঁটি টিপিয়া মারিলেও ব্রিটেন ও ফ্রান্স তাহাকেই হাত করিতে চেষ্টা করিবে। কেননা, তাহাতে ইহাদের যথেষ্ট স্বার্থ রহিয়াছে। আপনারা এতদিন বিস্ময় মানিয়াছেন, ব্রিটেন ও ফ্রান্স এক একটি ডিমোক্রাসী বা গণতন্ত্র হইয়া অন্য একটি গণতন্ত্রকে সাহায্য করিতেছে না কেন? গণতন্ত্রের মূল উৎপাটন করিতে যে প্রয়াসী, সেই ফ্রাঙ্কোর নানারকম সুবিধা করিয়া দিতেছে কেন? এ বিষয় ইতিপূর্ব্বে বিশদ-ভাবে আলোচনা করিয়াছি। সাম্রাজ্যওয়ালা ব্রিটেন ও ফ্রান্সের পক্ষে সমাজতন্ত্র বা সাম্যের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত স্পেন গবর্ণ-মেণ্টকে সমর্থন বা সাহায্য করা কোনমতেই নিরাপদ নহে। সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদ যদি স্পেনে স্থায়ীভাবে স্থাপিত হয় ও সাফল্যমণ্ডিত হইতে থাকে, তাহা হইলে এই আদর্শ দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িতে কতক্ষণ? এক রুশিয়ায় এই আদর্শ চালু হইয়াছে, তাহাতেই রক্ষা নাই, আবার স্পেনে হইলে যে সমূহ বিপদ। তাই ব্রিটিশ ও ফরাসী ধনিক সম্প্রদায় তলে তলে গণতন্ত্রী স্পেনের বিরুদ্ধে ফ্রাঙ্কোকেই সাহায্য করিয়া আসিয়াছে। ইহাদের গবর্ণমেণ্টগুলি মুখে গণতন্ত্র ও ন্যায়-পরায়ণতার দোহাই দিলেও গণতন্ত্রী স্পেনের পথে কাঁটা পুঁতিয়া ফ্রাঙ্কোরই উপকার সাধন করিয়াছে।

এখন যখন ফলভোগের সময় উপস্থিত, তখন কি ইহারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? তাই বার্সিলোনার পতনের পর হইতেই ফ্রাঙ্কো প্রতিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্টকে কি ভাবে স্পেনের ন্যায়ানুগ গবর্ণমেণ্ট বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তাহার উপায় খুঁজিতে লাগিয়া গিয়াছিল। আজকাল ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রগুলিকে খুবই এই বলিয়া দোষ দেওয়া হয় যে, তাহারা বড়ই প্রোপা-গাণ্ডা বা প্রচার কুশলী। এ কার্য্যে সাম্রাজ্যবাদীরাই প্রথম পথ দেখাইয়াছে। তাহাদের প্রত্যেকেরই প্রচার-বিভাগ আছে এবং ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রগুলি অপেক্ষা বেশী দিনের পুরাতন বলিয়া এ বিষয়ে তাহাদের দক্ষতাও প্রচুর। তাহারা এমনভাবে জগতে কোন কোন ব্যাপারের উপর রং ফলাইয়া প্রচার করিবে যে, সাধারণে আসল কথা ধরিতেই পারিবে না, তাহারা রঙকেই বস্তু বলিয়া বিশ্বাস করিবে। সম্প্রতিকার ব্যাপারটি ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ব্রিটেন ও ফ্রান্স ফ্রাঙ্কোকে স্বীকার করিবেই। কিন্তু ইহার সঙ্গে প্রথমত কতকগুলি সর্ত্ত জুড়িয়া দেওয়া হইল, সাধারণে বুঝিল, মানবতার দিক হইতেই তাহারা ইহা করিতেছে। পরে আবার যখন সংবাদ আসিল, ফ্রাঙ্কো এ-সব সর্ত্তে রাজী হইতেছে না, তখন প্রচারিত হইলে, ব্রিটেন ও ফ্রান্স যদি এখনও স্পেনের গণতন্ত্রী গবর্ণ-মেণ্টকে সমঝাইয়া দেয় যে, ফ্রাঙ্কোর শক্তির কাছে তাহারা কিছুতেই পারিয়া উঠিবে না, তাহা হইলে তাহারা নর-হত্যার প্ররোচক হিসাবে দোষী সাব্যস্ত হইবে। কিন্তু স্পেনে আর নরহত্যা হয়, ইহা তাহারা চায় না। কাজেই বিনাসর্ত্তেই তাহারা ফ্রাঙ্কো প্রতিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্ট মানিয়া লইতেছে! সুন্দর যুক্তি বটে! আসল ব্যাপার কিন্তু অন্যরূপ। ইহার কতকটা আগেই বলিয়াছি।

আগে হইতেই স্থির হইয়াছিল, ফ্রান্স ও ব্রিটেন এক-যোগে ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ফ্রাঙ্কো গবর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিবে। ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী মঁসিয়ে দালাদিয়ের নিজের অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করিবার জন্য এই বিষয়ের উপর প্রতিনিধি সভায় আস্থাসূচক ভোট পাশ করাইয়া লইয়াছেন। গতকল্য ফ্রান্স ও ব্রিটেন একযোগে ঘোষণা করিয়াছে যে, ফ্রাঙ্কোর প্রতিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্টকেই স্বীকার করা হইল। ব্রিটেনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেন কমন্স সভায় ইহা ঘোষণা করেন, সেই সময় ইহার কারণস্বরূপ যাহা বলিয়াছেন তাহা খুব সংক্ষিপ্ত হইলেও গুরুত্বপূর্ণ। ফ্রাঙ্কো সমর্থনে ব্রিটিশ ও ফরাসীদের যুক্তি উপরে যেরূপ বলিয়াছি ইহাতে তাহার স্পষ্ট আভাষ মিলিতেছে। মিঃ চেম্বারলেন বলেন,—

"গবর্ণমেণ্ট স্পেনের অবস্থা সম্পর্কে সতর্কতা সহকারে বিবেচনা করিয়াছেন। বার্সিলোনার পতন এবং ক্যাটালোনিয়া জয় করার ফলে স্পেনের এবং স্পেনীয় উপনিবেশের অধিকাংশ ভূভাগ জেনারেল ফ্রাঙ্কোর করতলগত হইয়াছে। এই সব অঞ্চলে শিল্প-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থলসমূহ অবস্থিত এবং তদুপরি স্পেনের অধিকাংশ কৃষিসম্পদও ঐ সব অঞ্চলে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এমন কি দক্ষিণ স্পেনে গণতন্ত্রীরা সামান্য বাধা দিবার চেষ্টা করিলেও দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামের পরিণাম ফল যে কি হইবে তাহা সহজেই অনুমিত হইতেছে। ইহার ফলে শুধু দুঃখদুর্দ্দশা এবং প্রাণহানির আশঙ্কা বৃদ্ধি পাইবে। ...... জেনারেল ফ্রাঙ্কো স্পেনের স্বাধীনতা রক্ষায় নিজের ও তাঁহার গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে এবং যাহাদিগকে অপরাধী সাব্যস্ত করা হইবে তাহাদিগকে শাস্তি দানের ব্যবস্থা সম্পর্কে যে সব বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সন্তুষ্ট হইয়াছেন।"

এতদিন যাহা গুপ্ত ছিল, বর্ত্তমানে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িল। সাম্রাজ্যবাদীদের প্রচার মাহাত্ম্যে সাধারণে বুঝিবার অবকাশই পায় নাই, ব্যাপার কেন এরূপ হইতে চলিয়াছিল। ইহার প্রতিক্রিয়া কিরূপ হইবে তাহা একবার দেখা যাক্। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি বড় শক্তিবর্গের নানা কার্য্যে সেয়ানা হইয়া গিয়াছে। তাহারা এখন আর ইহাদের ভরসায় বসিয়া থাকিতে সাহস পায় না। ফ্রাঙ্কোর দ্রুত অগ্রগমনের ও ভাবী বিজয় লাভের কথা ভাবিয়া তাহাদের অনেকে আগে হইতেই ফ্রাঙ্কোকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। এমন কি আয়ার্লাণ্ডও তাহাকে মানিয়া লইয়াছে। ইটালী ও জার্ম্মানী ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকারের কার্য্যে আতঙ্কিত না হইয়া পারিতেছে না। হিটলার ও মুসোলিনীর উদ্দেশ্য খুবই স্পষ্ট। তাঁহারা উদ্দেশ্য-পথে একযোগে চলিয়াছেন। স্পেনে ফ্রাঙ্কোর বিজয় লাভের পক্ষে তাঁহারা দুই জনই প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। কাজেই আজ বিজয়ের মুখে ফ্রাঙ্কোকে ব্রিটিশ ও ফরাসী তরফে হাত করার চেষ্টায় তাঁহাদের উদ্বেগ বাড়িবে বই কি? মুসোলিনী এখন ইংরেজের সঙ্গে সন্ধিতে আবদ্ধ। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, স্পেনে তাঁহার কোন স্বার্থ নাই, সাম্যবাদ প্রচারিত না হয় ইহাই তিনি চান। আজ ইংরেজের কার্য্যে তাই তাঁহার উচ্চবাচ্য বেশী শুনা যাইতেছে না। তাঁহার চেলাচামুণ্ডারা কিন্তু আর বাক্‌সম্বরণ করিতে পারিতেছে না। তাহারা বলিতেছে, "ইংরেজের চাল ধরা পড়িয়াছে। আমরা এত টাকা স্পেনে খরচ করিয়াছি। সৈন্য সামন্ত অস্ত্রশস্ত্র দিয়া ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য করিয়াছি, এখনও সাহায্য করিতেছি। এখন কি-না, ইংরেজ আসিয়া মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতেছে!" জার্ম্মানীর মনোভাব ইহাই। সে-ও জানাইয়া দিয়াছে, যে-ই যাহা বলুক না কেন, ফ্রাঙ্কো তাহাদের ছাড়া চলিবে না, চলিতে পারিবে না।

মিঃ নেভিল চেম্বারলেন

জেনারেল ফ্রাঙ্কো

মঃ দালাদিয়ের

ইউরোপের কোন ভাবী সমরে স্পেনের গুরুত্ব কতখানি হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। স্পেন যাহার পক্ষে থাকিবে ভূমধ্যসাগরে তথা পূর্ব্ব দিকে তাহারা আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিবে। আবার এই সব স্থলে যাহারই আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হউক, সমগ্র ইউরোপে, শুধু ইউরোপে কেন, সমগ্র জগতে তাহার শক্তি অপরাজেয় হইবে। এই উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া মুসোলিনী ও হিটলার সমস্ত কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। ইংরেজের সঙ্গে মৈত্রী তাঁহাদের এই উদ্দেশ্য সাধনের সহায়, ঠিক করিয়াছেন। কিন্তু

চতুর ইংরেজ এই মতলব ধরিয়া ফেলিয়াছে। তাই স্পেন কোনমতেই হাতছাড়া হইতে দিতে রাজি নয়।

ইংরেজ ও ফরাসীরা নানা কথাই রটাইতেছে। তাহারা বলিয়াছে যে, গত সেপ্টেম্বর মাসে চেকোশেলাভাকিয়া লইয়া যখন একটা যুদ্ধ আসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল তখনও ফ্রাঙ্কো নিরপেক্ষ থাকিতে চাহিয়াছিল। এখন তাহাকে যেরূপ হাত করিবার চেষ্টা হইতেছে তাহাতে ভবিষ্যতে সে যে নিরপেক্ষ থাকিবে তাহা ত ধরিয়াই লওয়া যায়। ফ্রাঙ্কো তাহাদের কি আশ্বাস দিয়াছে তাহা সাধারণে প্রকাশ নাই। তবে সে যে একাধিক বার বলিয়াছে। ইংরেজ ও ফরাসীর ভয়, ফ্রাঙ্কো ইটালী ও জার্ম্মানীর সাহায্য ভুলিতে পারিবে না তাহা রোম-বার্লিন আঁতাতে যোগ না দেয়। বিশেষভাবে এই জন্য ও অন্য নানা কারণেও [illegible] ফ্রাঙ্কোকে চটাইতে চাহে না। তাই কয়েকদিন যাবৎ [illegible] [illegible] চলিলেও শেষ পর্যন্ত বিনা সর্ত্তেই সম্পূর্ণ স্বাধীনতার ভিত্তিতে তাহারা তাহাকেও স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে। তাহারা তাহাকে স্বীকার করিবে এ ইচ্ছা আগেও বরাবর যে না ছিল তাহা নয়। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের বিশ্বাস, স্পেনে যদি ফ্রাঙ্কোর কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় আর সে একেবারে তাহাদেরই মতানুযায়ী না চলিলেও অন্তত নিরপেক্ষ থাকে তাহা হইলেই আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে তাহারা আস্থা অনেকটা ফিরাইয়া আনিতে পারিবে। ব্রিটেন এবং ফ্রান্স উভয়েই যুদ্ধ-সরঞ্জাম বাড়াইবার ভয়ানক রকম চেষ্টা চলিতেছে। ফ্রান্সে বহু অর্থ এই জন্য বরাদ্দ হইয়াছে। সম্প্রতি ব্রিটেনেও আশী কোটি পাউণ্ড এই বাবদে খরচ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। তিন বৎসর পূর্ব্বে যুদ্ধাস্ত্র বাড়াইবার জন্য একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা স্থির হয়। তখন ব্যয় বরাদ্দ করা [illegible] দেড় শত কোটি পাউণ্ড, অর্থাৎ প্রতি বৎসর ত্রিশ কোটি পাউণ্ড করিয়া। সম্প্রতি যে আশী কোটি পাউণ্ড ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে তাহা ইহার উপরে। ব্রিটিশ ধুরন্ধরগণ স্বীকার করিয়াছেন যে, আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁহাদের শক্তির প্রমাণ দিতে হইলে এইরূপ খরচ-পত্র করিতেই হইবে। ব্রিটেনের যুদ্ধ-সরঞ্জাম বৃদ্ধি আর ফ্রাঙ্কোকে স্পেনের সর্ব্বময় প্রভু বলিয়া স্বীকার—এ দুইয়ের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক বিদ্যমান রহিয়াছে কি?

এই ঘটনাগুলির সঙ্গে আর একটি ব্যাপারেরও উল্লেখ করিতে হয়। প্যালেষ্টাইনের হাঙ্গামা আজিকার কথা নয়। ব্রিটিশের উদ্দেশ্য প্রকাশ হওয়া অবধি গত ১৯২০ সাল হইতেই এখানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা লাগিয়া রহিয়াছে। "দেশ"-এর পাঠক-পাঠিকার নিকট প্যালেষ্টাইনের ব্যাপার কিছু নূতন নয়। এই সেদিনও এ বিষয় কিছু আলোচনা করিয়াছি। এখানকার আরবদের সায়েস্তা করিবার জন্য কি আয়োজনই না হইয়াছে। আরবগণ জোট বাঁধিয়া এই আয়োজন ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। তাহাদের সঙ্গে আপোষ মীমাংসার চেষ্টা আগেও হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে ব্রিটিশের যে মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে তাহা ছিল মনিব-ভৃত্য সম্পর্কের। ইদানীং কিন্তু ব্রিটিশ ধুরন্ধরদের মনোভাবের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাঁহারা আরবদের আর অগ্রাহ্য না করিয়া তাহাদের দাবীর ন্যায্যতা স্বীকার করিয়াছেন এবং লণ্ডনে একটি সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন। শুধু প্যালেষ্টাইনের নহে, সমগ্র আরব রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিরাই ইহাতে আহূত হইয়াছেন। প্যালেষ্টাইনকে বর্ত্তমানে একটি অর্দ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করা হইবে ইহাও বলা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ভবিষ্যতে ইহাকে একটি ষোল আনা স্বাধীন রাষ্ট্র করা হইবে। আরবেরা বাস্তব রাজনীতি খুবই বুঝে। তাহারা এই প্রস্তাবে এখন হয়ত রাজিই হইবে। কেননা তাহারা জানে ইংরেজ আর প্যালেষ্টাইনকে একটি ইহুদী রাষ্ট্রে পরিণত করিয়া তাহাদের আর বিরাগভাজন হইবে না। এই ছুতা ধরিয়াই হিটলারের অনুচরগণ সেখানে আড্ডা গাড়িতে প্রয়াসী হইয়াছিল। ইংরেজেরা তাহা সমূলে নষ্ট করিয়া দিতে চায়। আরবরা যদি একবার এই আশ্বাস পায় যে, প্যালেষ্টাইনে ইহুদী প্রাধান্য হইবে না, বরং যাহাতে প্রাধান্য না হইতে পারে তাহারই উপায় করা হইবে তাহা হইলে তাহারা ইংরেজেরই হইবে, আর কাহারও হইবে না। তাহারা ইংরেজদের এরূপ আশ্বাসও দিয়াছে। কাজেই প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত করার ব্যাপারেও আন্তর্জ্জাতিক জটিল অবস্থা কার্য্য করিতেছে বলিলে অন্যায় হইবে [illegible] যে উদ্দেশ্যে ফ্রাঙ্কোকে হাত করিবার উদ্যোগ, যে উদ্দেশ্যে যুদ্ধ সরঞ্জাম বাড়াইবার এত আয়োজন, ঠিক সেই উদ্দেশ্যেই প্যালেষ্টাইনের আরবদের সঙ্গে একটা মীমাংসা করিয়া লইবার চেষ্টা চলিতেছে। একবার যদি ভূমধ্যসাগর সম্পর্কে ব্রিটেন ও ফ্রান্স নিশ্চিন্ত হইতে পারে তাহা হইলে তাহাদের আর পায় কে? ইটালী ও জার্ম্মানী ইহার কিরূপ জবাব দিবে তাহাই লক্ষ্য করিবার [illegible]। আমাদের ভারতবর্ষের উপরও ইংরেজ ও ফরাসীর কূটনীতির ঘাত-প্রতিঘাত [illegible] হইবে। ইউরোপে যদি ইহারা একবার নিশ্চিন্ত হইতে [illegible] তাহা হইলে ইহারা সাম্রাজ্য লইয়া যদৃচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিবে। মুখে যাহাই বলুক, স্বার্থের সম্মুখে যে গণতন্ত্র নীতিকে ইহারা উড়াইয়া দিতে পারে তাহা তো দেখাই গেল। এখন ভারতবর্ষ সম্পর্কেও ব্রিটেনের মনোভাব কঠোরতর হইতে পারে। তাহার সম্ভাবনা খুবই। ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯।

একটি পাঁকের ফুল

(গল্প)

শ্রীআশীষ গুপ্ত

কমলের সহিত বহুদিন পরে দেখা হইয়া গেল লোকেনদের বাড়ীতে। কমলকে দেখিয়া শশাঙ্কর মনে হইল, তাহার পায়ের তলায় যেন কেহ সুড়সুড়ি দিতেছে! শশাঙ্ক প্রতি মুহূর্ত্তেই অনুভব করিতে থাকে, এইবার বুঝি সে অভদ্ররকমে অট্টহাসি হাসিয়া অশোভন একটা কিছু করিয়া বসিবে!

লোকেন বিপুল ধনী এবং শশাঙ্কর শৈশবের বন্ধু,—স্কুলে তাহারা একসঙ্গে পড়িয়াছিল। একই শ্রেণীর অন্য শাখায় ছিল কমল,—কিন্তু ধনী লোকেনের ঐশ্বর্য্যের খ্যাতি পৌঁছিয়াছিল স্কুলের নিম্নতম শ্রেণী পর্য্যন্ত,—কমল আসিয়া বড় গাছে নৌকা বাঁধিল। অবশেষে স্কুল হইতে বাহির হওয়ার পর শশাঙ্কর সহিত বহুদিন আর কমলের দেখা হয় নাই। সেদিন অপ্রত্যাশিতভাবে সাক্ষাৎ হইয়া গেল আট বছর পরে লোকেনদের বাড়ীতে।

কয়েকদিন হইতেই শশাঙ্ক লোকেনের সহিত সাক্ষাতের প্রয়োজন অনুভব করিতেছিল—সেদিন টেলিফোনে তাহাকে ডাকিতেই বেয়ারা আসিয়া ফোন্ ধরিল,—শশাঙ্ক কহিল, "লোকেনবাবুকে বল, শশাঙ্ক মিত্র একবার কথা কইতে চান্—"

আশঙ্কা ছিল, এতগুলো বছর পরে ধনী লোকেন কেবলমাত্র নাম শুনিয়া স্কুলের সহপাঠী শশাঙ্ক মিত্রকে চিনিতে পারিলে হয়।

কিন্তু লোকেন শশাঙ্কর নাম শুনিয়া শুধু যে তাহাকে চিনিতে পারিল তাহাই নয়, খুশীও হইয়া উঠিল। সাড়া দিয়া কহিল, "কি হে শশাঙ্ক, এতদিন পরে মনে পড়্ল?"

অকৃত্রিম বিস্ময়ের সহিত শশাঙ্ক কহিল, "আশ্চর্য্য তোমার স্মরণশক্তি! এতটা আশা করিনি।"

অসহিষ্ণুভাবে লোকেন বলিল, "ওসব বাজে কথা থাক্,—আমাদের এখানে এস আজ সন্ধ্যের সময়,—না হয় বাড়ীর ঠিকানা বল, আমিই যাব—"

"ধন্যবাদ তোমার সৌজন্যের জন্য,—তোমার সঙ্গে আমার দরকার আছে একটু—কাল সন্ধ্যের দিকে আস্‌ছি তোমার ওখানে,—অসুবিধে হ'বে না?"

"আরে না না, আমি অন্য আর কারও সঙ্গে কোনও এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট কর্‌বে না,—এস কিন্তু ঠিক—"

"হাঁ নিশ্চয়, দেখা হ'লে সব কথা হবে।" বলিয়া শশাঙ্ক টেলিফোন ছাড়িয়া দিল।

* * * *

পরদিন সন্ধ্যাবেলা লোকেনদের বাহিরের বাগান পার হইয়া শশাঙ্ক গাড়ীবারান্দার মধ্যে প্রবেশ করিতেই বৈঠকখানা ঘর হইতে লোকেন বাহির হইয়া আসিল। হাসিমুখে অগ্রসর হইয়া আসিয়া কহিল, "তোমার জন্যই অপেক্ষা কর্‌ছিলাম—"

শশাঙ্ক মৃদু হাসিয়া কহিল, "তুমি ত বড়লোকের নাম ডোবাবে দেখ্‌ছি—"

হলে পদার্পণ করিয়া শশাঙ্ক দেখিল, মাঝখানের বিলিয়ার্ড টেবিলটার দুইধারে দুইজন লোক নিবিষ্টচিত্তে খেলায় মগ্ন। দুইটা আলো বিলিয়ার্ড টেবিলের খুব কাছে নামান,—সেই আলোর কিরণ পড়িয়াছে পুরোপুরি টেবিলের উপর।

ক্রীড়ারত ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে একজনের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মৃদু হাসিয়া লোকেন কহিল, "চিন্‌তে পার?"

শশাঙ্ক মনঃসংযোগ করিয়া দেখিয়া কহিল, "কমল না? A sectionএ পড়্‌ত?—বেশ মোটাসোটা হ'য়েছে দেখ্‌ছি।"

"হাঁ সে-ই!—"

"ওর সঙ্গে প্রায়ই তোমার দেখা হয় নাকি?"

"হাঁ প্রায়ই—"

"ওকে কি বলেছিলে, আমি আজ এখানে আস্‌ব?"

"আগে থেকে বলিনি, আজই সন্ধ্যেবেলা বলেছি—"

বলিতে বলিতে হল পার হইয়া শশাঙ্ককে লইয়া লোকেন তাহার বসিবার ঘরে প্রবেশ করিল, বলিল, "শশাঙ্ক, একটু বস ভাই, আমি এখুনি আস্‌ছি—"

লোকেন বাহির হইয়া যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কমল আসিয়া ঘরে ঢুকিল,—দেওয়ালের গায়ের আলমারীর পাল্লাটা চাবিবন্ধ নয়, সেইটা খুলিয়া ভিতর হইতে একখানা বই টানিয়া লইয়া কমল বাহির হইয়া গেল। কমল দেখাইতে চায়, ও এ বাড়ীর সহিত এমন সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ যে, ও আসিয়া আলমারী হইতে বই বাহির করিয়া লইলে চাকর বেয়ারারা তাড়া করিয়া আসে না। তাহারা তাহাদের সহকর্ম্মীকে চিনিয়াছে!

শশাঙ্ক কহিল, "কি হে কমল, চিন্‌তেই পার না যে!"

শশাঙ্কের দিকে না তাকাইয়াই কমল কহিল, "তাইত হে শশাঙ্ক। কোত্থেকে?" বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

হলঘর হইতে কমলের হাসির শব্দ শশাঙ্কর কানে আসিতেছে। লোকেনদের মত বড়লোকের বাড়ীতে উচ্চকণ্ঠে হাসিতে কমল ভয় পায় না, এটা প্রতিপন্ন করার জন্য ও ভারী ব্যস্ত!

শশাঙ্ক অত্যন্ত কৌতুক বোধ করিতে লাগিল।

লোকেন ফিরিয়া আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়াই কহিল, "বল এবার সব এতগুলো বছরের খবর। —কি করছ? কোথায় আছ? বিয়ে-থাওয়া কর্‌লে কিনা? বৌদি কেমন হলেন? কেমন আছেন তিনি? বল বিস্তারিত সংবাদ—"

কি ভাবিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, "কমলের সঙ্গে দেখা হ'য়েছে?"

"হাঁ, নিমেষের দেখা, বাঁশী এখনও শুনিনি—"

"সে আবার কি!" বলিয়া বিস্মিত লোকেন জোর গলায় ডাকিল, "কমল—"

"যাই" বলিয়া সাড়া দিয়া কমল একেবারে উঠি-কি-পড়ি করিয়া ছুটিয়া আসিয়া হাজির!—লোকেন কহিল, "শশাঙ্কর সঙ্গে দেখা হ'য়েছে?"

"হাঁ হ'য়েছে বৈকি!—কি হে শশাঙ্ক, কি খবর! হঠাৎ কি মনে ক'রে আমাদের স্মরণ করলে এতকাল পরে?"

বলিয়াই লোকেন যে কৌচটার উপর বসিয়া ছিল সেই কৌচটার কাছে গিয়া লোকেনের কানের ধারে মুখ লইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে ফিস্‌ফিস করিয়া কহিল, "এখন নিউ মার্কেটে যাবে তো ফুল কিনতে?"

কথাটা অতিশয় প্রয়োজনীয়,—কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলার মত প্রয়োজনীয়! শশাঙ্ক এক দৃষ্টিতে কমলের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার মনে হইল, লোকেন যদি এখন একবার "এ-ই" করিয়া উঠে তাহা হইলে কমল যেন একেবারে ছিট্‌কাইয়া গিয়া দরজার সম্মুখে হুম্‌ড়ি খাইয়া পড়িবে,—ওর যদি লেজ থাকিত, খুব সম্ভব সেটা এখন আন্দোলিত হইত অত্যন্ত দ্রুতগতিতে।

শশাঙ্কর জন্য জলখাবার আসিয়া পৌঁছিল।

কমল কহিল, "তারপর কি করছ হে? শুনেছিলাম নাকি দালালি-টালালি ওই রকম কি একটা করছ।"

একখানা লুচি একগ্রাসে মুখে পুরিয়া অত্যন্ত নির্ব্বোধের মত হাসিয়া শশাঙ্ক কহিল,-"এই ভাই সামান্য একটু যা-তা! হাইকোর্টের জজিয়তি নয় যে, ঢাক পিটিয়ে ব'লে বেড়াব—"

লুচিখানা শেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তারপর তুমি কি করছ, হাইকোর্টের জজিয়তী?"

"নাঃ, ওকালতী।" এমনভাবে কথাটা বলিল যেন হাইকোর্টের জজ ও স্বচ্ছন্দে হইতে পারিত!

শশাঙ্ক অতিশয় উৎসাহের সহিত কহিল, "ও-ই হ'ল, একই কথা!—গরীব বন্ধুদের মনে রেখ ভাই একটু-আধটু—"

লোকেন কহিল, "শশাঙ্ক, তোমার দরকারী কথাটা কি আজই বলবে? না, কালকের জন্য অপেক্ষা করবে? —আজ শেষ ক'রে ফেললে ত আবার ডুব মারবে একেবারে দু' চার পাঁচ বছরের মত—"

কমলের দিকে একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া শশাঙ্ক কহিল, "আরে না না আজই আমার দরকার,—আজই সেকথা বলতে চাই তোমাকে—"

কমল সে দৃষ্টি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিল, সরিয়া আসিয়া লোকেনের কানের কাছে মুখ আনিয়া পুনরায় ফিস্‌ফিস করিয়া কহিল, "শুনলাম ফ্রেঞ্চ মোটরকার কোম্পানী থেকে নাক এসেছিল নাকি সকালবেলা?"

বিরক্তির সহিত ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া লোকেন শুধু কহিল, "আঃ—"

কমলের মুখ একেবারে শঙ্কায় বিবর্ণ হইয়া গেল,—তাহার কান দুটো ধরিয়া কেহ যেন সজোরে মলিয়া দিয়াছে! কৌচের কাছ হইতে সরিয়া আসিয়া ম্লানমুখে সে একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

লোকেন কহিল, "শশাঙ্ক, চল তোমাকে তোমার বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসি, তারপর কাল একসময় যাবখন তোমাদের বাড়ী—"

কমল কহিল, "তোমরা সেই হ্যারিসন রোডের বাড়ীতেই আছ ত?"

'না, বালীগঞ্জের দিকে উঠে গিয়েছি।—তোমরা?'

"আমরা আছি সেই শ্যামবাজারেই, নিজেদের বাড়ী কোথায় আর যাব?"

শুনিয়া লোকেন ভ্রূ কুঁচ্‌কাইল। শশাঙ্ক কহিল "আচ্ছা, তুমি কি মাঝে মাঝে বালীগঞ্জের ওদিকে যাও?— এক একদিন তোমার মত কাউকে ওদিকে দেখেছি দেখেছি ব'লে যেন মনে হচ্ছে।"

"হ'বে প্রায়ই যাই ত,—লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের মেম্‌বার হরনাথ মুখুজ্যে আমার দাদার শ্বশুর, তাঁদেরই ওখানে যাই গড়িয়াহাট রোডে। চেন তুমি তাঁদের বাড়ী নিশ্চয়ই!"

মৃদু হাসিয়া শশাঙ্ক উত্তর দিল, "চেনা উচিত ছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় চিনিনে।"

লোকেন কহিল,"শশাঙ্ক, একটু ব'স ভাই, আমি বেরোবার জন্য তৈরী হ'য়ে আসি,—কথাবার্ত্তা কালই হ'বে—'

লোকেন বাহির হইয়া যাইতেই শশাঙ্ক জিজ্ঞাসা করিল, "স্কুলের বন্ধুদের কিছু খবর-টবর রাখ?—আমার সঙ্গে ত কারোই বিশেষ দেখা হয় না।"

"রাখি বৈকি!—কেউ হ'য়েছে পাটের দালাল, কেউ হ'য়েছে ইনস্যুরান্সের, কেউ হ'য়েছে ভ্যাগ্যাবণ্ড, দু' একজন হ'য়েছে উকীল—"

একটু থামিয়া কমল পুনরায় বলিল, "অপূর্ব্ব হালদার তোমার খুব বন্ধু ছিল না?"

"ছিল নয়, এখনও আছে।"

"সে নাকি মনোহারী দোকান দিয়েছে?

"হাঁ—" বলিয়া শশাঙ্ক সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কমলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

"ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে মনোহারী দোকান না দিয়ে অন্য লোকের জন্য ওটা রেখে দিলেই অপূর্ব্ব হালদারের পক্ষে ভাল হ'ত—"

"কিন্তু অন্য লোকের জন্য মনোহারী দোকানের field ছেড়ে দিলে অপূর্ব্ব হালদারের নিজের কি সুবিধা হ'তে পারত, তা ঠিক বুঝতে পারলাম না।"

"অন্য কিছু সুবিধে যদি না-ই হ'ত তাহ'লেও ইউনিভার্সিটির মুখে এমন ক'রে চুনকালি দেবার অধিকার নিশ্চয়ই তার ছিল না।—ডিগ্‌নিটি অভ্ লেবার একটা অত্যন্ত ভুয়ো জিনিষ, সোনার পাথরবাটি যেমন!—ম্যানুয়েল লেবারে বুদ্ধির স্থান নেই, যাতে বুদ্ধির স্থান নেই তার মধ্যে যদি জোর ক'রে ডিগ্‌নিটি খুঁজে বার করতে বাধ্যও হই তার্কিকদের পাল্লায় পড়ে, তা হ'লেও সে ডিগ্‌নিটি হ'বে আর্‌শুলাকে পাখী বলার মত। এবিষয়ে একটা প্রবন্ধ লিখে পড়েছিলাম আমি ল-কলেজ ইউনিয়নে,—আমার সহপাঠীরা এবং অধ্যাপকবৃন্দ সে প্রবন্ধ শুনে অতিশয় প্রশংসা করেছিলেন।"

শশাঙ্ক নিরীহভাবে কহিল, "হাঁ, তোমার ত আবার লেখা-টেখা আসত! আমার বেশ মনে আছে, তোমার প্রথম লেখা বেরিয়েছিল "বীথিকা"তে,—ওদের কাগজে, একটা প্রশ্নোত্তর বিভাগ থাকত, তাতে তুমি প্রশ্ন করেছিলে না, ছারপোকা মরে কিসে?—"বীথিকা" দেখে গিয়ে তোমাকে

জিজ্ঞাসা করলাম, ওই কমল তুমিই কিনা। তুমি ত কিছুতেই স্বীকার করবে না! কোন উত্তর না দিয়ে মৃদু মৃদু হেসে বিনয়ে যেন তুমি একেবারে নুয়ে পড়তে লাগলে।—দু'দিনের সাধ্য-সাধনার পর অবশেষে লজ্জিত হাস্যে তুমি স্বীকার করলে যে, "বীথিকা"র মারফৎ ছারপোকা ধ্বংসের ওষুধের নাম তুমিই জানতে চেয়েছিলে বটে!—ল-কলেজ ইউনিয়নে তুমি যে প্রবন্ধ পড়বে সেটা বিস্ময়ের নয়!"

কমল কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, পরে কহিল, "তুমিও নাকি কি সব লিখছ আজকাল,—বেশ নাম হ'য়েছে নাকি তোমার—"

সন্ত্রস্ত হইয়া শশাঙ্ক কহিল, "ওসব কথা যেতে দাও কমল,—বাজে খবর যত, ওতে কান দিতে নেই—"

কমল কহিল "অপূর্ব্ব হালদারের বাবার চাকরী গিয়েছে শুনলাম,—বেচারীরা নাকি বড্ড মুস্কিলে পড়েছে!"

অকৃত্রিম বিস্ময়ের সহিত শশাঙ্ক কহিল, "সে আবার কি!—অপূর্ব্বর সঙ্গে ত কালও আমার দেখা হ'য়েছে,—শুনিনি ত এবিষয়ে কিছু—"

গম্ভীর মুখে কমল কহিল, "তুমি জান না,—আমি তোমাকে ভিতরকার খবর বলছি।"

ঈষৎ বিরক্ত কণ্ঠে শশাঙ্ক কহিল, "আমার চেয়ে অপূর্ব্বর খবর তুমি বেশী জান না কমল, তার সঙ্গে আমার দেখা হয় প্রায় প্রত্যহ, আর তোমার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয় ন' মাসে ছ' মাসে একদিন।"

"হ'ক ন' মাসে ছ' মাসে একদিন, তবু আমি সকলেরই ভিতরকার খবর রাখি।"

তীব্র তিক্ততার সহিত শশাঙ্ক কহিল, "গোয়েন্দা নাকি!"

একটু থামিয়া কহিল, "অপূর্ব্বর বাবার চাকরী যাওয়া নিয়ে কি কারও সঙ্গে বাজী ধরেছ?—ওঁর চাকরী গেলে কত টাকা জিতবে, কত টু কত? হাণ্ড্রেড টু ওয়ান?"

কমল কহিল, "যা শুনেছিলাম তা-ই বলছি, তাতে তুমি এত চটছ কেন?

অধিকতর রুষ্টমুখে উত্তর দিতে উদ্যত হইয়াই লোকেনকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া শশাঙ্ক তখনকার মত থামিয়া গেল। লোকেন কহিল, "চল শশাঙ্ক তোমাকে বাড়ী পর্য্যন্ত নামিয়ে দিয়ে আসি—"

* * * * *

সেদিন অপরাহ্নে কলেজ ষ্ট্রীটের পশ্চিম ফুটপাথ ধরিয়া শশাঙ্ক দ্রুতগতিতে শ্যামবাজারের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, সহসা রাস্তার ওদিকে চোখ পড়িতেই দেখিল, কমলকুমার ওধারের ফুটপাথ দিয়া বিপরীত দিক হইতে আসিতেছে। নিমেষের মধ্যে নিজের কর্ম্মপদ্ধতি স্থির করিয়া লইয়া শশাঙ্ক ক্ষিপ্রপদে রাস্তা পার হইয়া এদিককার ফুটপাথে আসিয়া কমলের গা ঘেঁসিয়া সম্মুখদিকে অগ্রসর হইল,—যেন কমলকে সে দেখেই নাই, এবং যদি দেখিয়াও থাকে তাহা হইলে তাহাকে চিনিতে পারাটা যেন সম্পূর্ণ অনাবশ্যক বলিয়া সে বোধ করে। কমলের গায়ে মৃদু ধাক্কা দিয়া অগ্রসর হইতেই বিস্মিত কমল মুখ তুলিয়া চাহিল, "আরে শশাঙ্ক যে,—শোন, শোন—"

শশাঙ্কও এই অতর্কিত সাক্ষাতে অতিশয় বিস্মিত হইয়া গেছে, বুঝা গেল।—সে কহিল, "তাই ত কমলকুমার যে" বলিয়াই পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিল।

কমল কহিল, "চিনতেই পারনা দেখছি,—দাঁড়াও দাঁড়াও, তোমার সঙ্গে কথা আছে—"

বলিয়া এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া পুনরায় কহিল, "শুনলাম লোকেন নাকি তোমাদের বাড়ী গিয়াছিল?"

"হাঁ, কিন্তু সে খবরে তোমার কি বিশেষ প্রয়োজন আছে?"

"না, সেজন্য জিজ্ঞাসা করিনি, ভাবছিলাম ছোটবেলাকার বন্ধু তুমি,—তোমার ওখানে একদিন বেড়াতে গেলে মন্দ হয় না,—বিশেষ ক'রে প্রায়ই যখন ওদিকে যাই হরনাথ মুখুয্যেদের ওখানে—"

এমনতর একটা অসাধারণ সৌভাগ্যের সম্ভাবনায় শশাঙ্ক যে কৃতার্থ হইয়া গেছে তাহা বোধ হইল না, সে শুধু কহিল, "আমার পরম সৌভাগ্য—

হাতঘড়িটার উপর হইতে কোটটা সরাইয়া লইয়া তৃতীয়বারের মত ঘড়ি দেখিয়া কমল কহিল, "বড্ড দেরী হ'য়ে যাচ্ছে—"

ঈষৎ রূঢ়তার সহিত শশাঙ্ক কহিল, "তা যাও না যেখানে যাচ্ছিলে,—কে তোমাকে এখানে দাঁড়িয়ে খোসগল্প করতে বলেছিল মাথার দিব্যি দিয়ে?" বলিয়া ফস্ করিয়া কমলের হাত দুইটা নিজের বলিষ্ঠ হাত দিয়া ধরিয়া ফেলিয়া শশাঙ্ক কহিল, "হাতঘড়িটাতে তিনবার সময় দেখছ,—ঘড়িটা দামী, ওটা লোকেনের জিনিষ বুঝতে পারা যাচ্ছে! আংটি তিনটে হাত ঘুরিয়ে বারংবার দেখাবার চেষ্টা করছ, আংটি তিনটের দাম সবসুদ্ধ টাকা চব্বিশের বেশী হ'বে না,—বোধ হয় নিজের!"

নিদারুণ অপমানে কমলের মুখ কালো হইয়া গেল, জোর করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া সে ক্রুদ্ধ হইয়া বিনা বাক্যব্যয়ে চলিয়া গেল। দুই পকেটে হাত ঢুকাইয়া শশাঙ্ক কমলের দ্রুতগতিশীল মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া বক্রহাসি হাসিতে লাগিল। চীৎকার করিয়া কহিল, "ঘড়ি বার করে' আর একবার সময়টা দেখে নিয়ো—"

* * * * *

কয়েকদিন পরে রবিবার সকাল আটটার সময়ে শশাঙ্ক আসিয়া কমলদের বাড়ীর দরজার সম্মুখে দাঁড়াইল। অত্যন্ত মলিন একটা কাপড় পরিধানে, গায়ে একটা খদ্দরের ছেঁড়া জামা, খালি পা, হাতে একখানা মোটা ইংরেজী বই। চাকরের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, কমলবাবু চা খাইতেছেন। সংবাদ পাঠাইল, শশাঙ্ক মিত্র কমলবাবুর সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে চান। খবর পাঠাইয়া, শশাঙ্ক রোয়াকে বসিয়া একমনে বই পড়িতে লাগিল।

এক ঘণ্টা, দুই ঘণ্টা কাটিয়া গেল,—পকেট হইতে একটা হাতঘড়ি বাহির করিয়া শশাঙ্ক সময় দেখিল, দশটা বাজিয়া পনেরো মিনিট হইয়াছে! অবশেষে সাড়ে দশটার সময় কমল

আসিয়া দেখা দিল, গম্ভীর মুখ করিয়া কহিল, "আমার কাছে তোমার কি দরকার?"

শশাঙ্ক একেবারে কমলের হাত দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, "মার্চেণ্ট অফিসে কেরাণীগিরি করতাম ভাই, তিরিশ টাকা মাইনেয়—আজ পাঁচ দিন হ'ল রিট্রেঞ্চমেণ্টে পড়ে' চাকরীটি গেছে। পথে পথে ঘুরে বেড়াই, বাড়ীতে স্ত্রী এবং এক বছরের শিশুপুত্র আজ দু'দিন ধরে উপোস করে আছে,—মা এবং ছোট ভাইটিও অনাহারী, স্ত্রীর বোধ হয় থাইসিস্ হবে শীগ্‌গিরই—"

শুনিয়া কমল একেবারে শিহরিয়া উঠিয়া জোর করিয়া শশাঙ্কের হাত ছাড়াইয়া লইল, কয়েক পা সরিয়া গিয়া ইতস্তত করিতে লাগিল যে, শশাঙ্ককে বাড়ীর বাহির করিয়া দিবে কি না।

শশাঙ্ক কহিল, "খেটে খেটে বিশ্রী হ'য়েছে তার চেহারা,—ডাক্তার দেখাতে পারিনে পয়সার অভাবে,—দেনার দায়ে চুল পর্য্যন্ত বিকিয়ে আছে, কবে জেলে টেনে নিয়ে যাবে তার ঠিক নেই,—কি হ'বে ভাই?" বলিয়া ব্যথাভরা ছল ছল চোখে কমলের হাত দুইটা ধরিবার চেষ্টা করিবামাত্রই কমল ভয়ত্রস্ত-ভাবে পিঠের দিকে হাত সরাইয়া লইল।

মর্ম্মাহত কণ্ঠে শশাঙ্ক কহিল, "জীবনে তোমরা কৃতকার্য্য হ'য়েছ,—আমরা সংসারের রদ্দি বাজে মাল, তবুও তোমার মহৎ অন্তঃকরণ চিনি বলেই বিপদের দিনে তোমার কথাই সবার আগে মনে হয়—"

কমল কঠিন মুখে চুপ করিয়া রহিল, উত্তর দিল না।

'দেবে ভাই আমাকে কিছু টাকা ধার? শীগ্‌গিরই দিয়ে দেব তোমায়—বিশ্বাস কর মেরে দিব না। তোমার দেওয়া দানে আমি নবজীবন লাভ করব,—সে টাকা হ'বে আমার কাছে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদের মত—" বলিয়া শশাঙ্ক উদ্বিগ্ন প্রত্যাশায় কমলের দিকে চাহিয়া রহিল।

কমল কহিল, "এ দস্তুরমত ভিক্ষাবৃত্তি, তোমার মত লোকের টাকা ধার চাওয়া আর ভিক্ষাবৃত্তিতে খুব বেশী তফাৎ নেই—"

অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে কহিল, "ইয়ংম্যান তুমি, এমনি করে' তুমি জীবনধারণ করতে চাও? তোমার মত লোকের জীবনের কিই বা মূল্য!—এর চেয়ে আত্মহত্যা করা তোমার পক্ষে সম্মানজনক ছিল!"

নিদারুণ লজ্জায় শশাঙ্ক ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল, পরে আবেগকম্পিতকণ্ঠে কহিল, "কি করব ভাই, মা, ভাই, স্ত্রী, পুত্র—"

বাধা দিয়া কমল কহিল, "আপনি শুতে ঠাঁই পায় না, শঙ্করাকে ডাকে। পাই পয়সার মুরোদ নেই, তা আবার মা, ভাই, স্ত্রী, পুত্র!—সেদিন ত রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমার কাছে খুব লম্বা লম্বা চাল চালছিলে!"

শশাঙ্ক একেবারে বেদনায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, "সেকথা ভুলে যাও ভাই,—সেকথা ভুলে যাও,—তোমার কাছে সহস্রবার ক্ষমা ভিক্ষা করছি!—ভগবান আমার সকল অহঙ্কার চূর্ণ করে' আমার পাপের যথাযোগ্য শাস্তিবিধান করেছেন!"

শশাঙ্ক আধুলিটা শ্রদ্ধার সহিত মাথায় ঠেকাইল,—ভাবাতিশয্যে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, তবুও, কহিল, "এই আট আনা তোমার বন্ধুত্বের দান, তুমি আমাকে এটা ঋণ বলে' যখন দিলে না, তখন এ আমি তোমাকে প্রত্যর্পণ করব বলে' তোমার অমর্য্যাদা করব না,—কিন্তু তবুও বলছি তুমি আমাকে মুক্তিলাভ করতে দিয়ো এতবড় কৃতজ্ঞতার বোঝা থেকে, অনুমতি দিয়ো তোমার এ ঋণ সুদসুদ্ধ পরিশোধ করবার!—"

একটু থামিয়া কহিল, "এ কি আধুলি! না, লাখ টাকা এর দাম, আজ এ আমার কাছে অমূল্য!—এর পিছনের অন্তঃকরণটির দাম কি মাত্র আট আনা? তা কখনই নয়,—কত তা কে জানে!"—পুনরায় দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিয়া কহিল, "আসি তা'হলে কমল,—শীগ্‌গিরই আবার দেখা হবে।"

কমল কহিল, "তোমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আমি যে উতলা হয়ে থাকব, তা নয়।"

শশাঙ্ক কথাটা কানে না তুলিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "ভাল কথা, লোকেন তোমাকে একটা প্রয়োজনীয় কথা বলবার জন্য আমাকে বলে' দিয়েছিল, একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম!—আমার বড্ড দেরী হ'য়ে গিয়েছে, আর দাঁড়াতে পারছিনে,—এস আমার সঙ্গে গলির মোড় পর্য্যন্ত, চলতে চলতে বলছি—"

* * * *

গাড়ীখানা যেন পূর্ণিমা রজনীর স্বপ্ন—ক্রীম রংয়ের রোলস্ রয়েস্। শশাঙ্ককে গলির মোড়ে দেখিয়াই তাহার ভিতরে উপবিষ্ট ড্রাইভার, চাপরাসী এবং আর একজন লোক সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। গাড়ীখানার সৌন্দর্য্যের দিকে কমল বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল, শশাঙ্ক যে কখন্ গাড়ীর পাশে গিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা সে লক্ষ্যও করে নাই,—অকস্মাৎ চমক ভাঙ্গিতেই দেখিল, দরজা খুলিয়া চাপরাসী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, শশাঙ্কের একটা পা পাদানির উপর,—দুষ্টহাসির তীক্ষ্ণতায় তাহার চোখের তারা নৃত্যপরায়ণ,—গাড়ীর পিছনে নম্বরের পরিবর্ত্তে লাল রংয়ের প্লেটে লেখা "নবীনগড় ষ্টেট"।

কমলের মনে হইল যে, এখনই মাথা ঘুরিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যাইবে!

শশাঙ্ক তাহার পকেট হইতে একটা আধুলা বাহির করিল, —স্তম্ভিত কমলের কাছে সরিয়া আসিয়া কমলের দেওয়া আধুলি এবং নিজের আধুলা লইয়া কমলের নাকের কাছে আনিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দিয়া টাকা বাজানর ভঙ্গীতে উপরের দিকে ছুঁড়িয়া দিল। "উঃ" বলিয়া একটা শব্দ করিয়া কমল নাক সরাইয়া লইল।

গাড়ীতে উঠিতে উঠিতে শশাঙ্ক কহিল, "নবীনগড়ের মহারাজার বাড়ীতে গিয়ে মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী শশাঙ্ক মিত্রের সন্ধান কর—ভয় নেই গলাধাক্কা খেতে হবে না, তিন ঘণ্টা বসেও থাকতে হবে না হুজুরের হুকুম প্রতীক্ষায়—বন্ধুত্বের মূল্য সেখানে অর্দ্ধচন্দ্রের চেয়ে বেশী!"

(শেষাংশ ২১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন বা সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে ছাপ রাখিয়া যাইতে পারিতেছেন।

পাভ্‌লোফের পরীক্ষা হইতে কোন কিছুই বাদ যায় নাই। স্নেহ, দয়া, মমতা, মায়া, দেশপ্রেম, বীরত্ব—ইহা সমস্তই সহজাত গুণ বলিয়া লোকের ধারণা। পাভ্‌লোফ্‌ বলেন, "আপনারা শুধু বলুন, কিরূপ চালচলনের দ্বারা আপনারা এই সমস্ত গুণকে বুঝাইয়া থাকেন। আমি বিবিধ পরীক্ষা দ্বারা এই-রূপ গুণাবলী আরোপ করার ব্যবস্থা করিব যাহাতে কোনও মানুষের ভবিষ্যতে দেশপ্রেম বা বীরত্ব জন্মিবে কিনা তাহাও ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভবপর হইবে।" মানুষের সম্পর্কে এরূপ যন্ত্রবৎ ধারণা বিচিত্র বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু পাভ্‌লোফ্‌ বলেন, যন্ত্রের বিবিধ কাজ পরীক্ষা করিয়া দেখা যেরূপ সম্ভবপর, মানুষের বিবিধ কাজের ব্যাখ্যাও তেমনি একদিন সম্ভবপর হইয়া উঠিবে। শুধু তাহাই নহে, বহি-র্জগতের বিভিন্ন অবস্থায় মানুষের প্রাণ যেভাবে সাড়া দিয়া থাকে, যন্ত্রের মতই রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া বা বৈদ্যুতিক ফলোৎপাদনের মধ্যেও হয় ত তাহার অস্তিত্ব ও পরিমাপ প্রকাশ পাইবে। মানুষের প্রকৃতি কি নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা জানিতে হইলে এবং মনুষ্যরূপ জটিল যন্ত্রটিকে কিভাবে পরিচালিত করিলে বিভিন্ন সদ্‌গুণরাজির বিকাশ সম্ভবপর—এইরূপ দ্বিবিধ সমস্যার সমাধান করিতে হইলে বিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত গত্যন্তর নাই। বৈজ্ঞানিক পাভ্‌লোফ্‌ তাঁহার অসামান্য প্রতিভা দ্বারা মনস্তত্ত্বকে তাই বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার পথ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। শুধু অনুমানের উপর নির্ভর না করিয়া বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষকে বুঝিবার ও জানিবার চেষ্টা করিলে বহু সমস্যার সমাধান যে সম্ভবপর, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। পাভ্‌লোফ্‌ বলিয়া গিয়াছেন,

"Only science exact science about human nature itself, and the most sincere approach to it by the aid of omnipotent scientific method will deliver man from his present gloom and will purge him from his contemporary shame in the sphere of interhuman relations."

বস্তুত মানুষের সম্পর্কে মানুষ পদে পদে যে ভুল করে, তাহার ফলেই জগতে যত অনর্থের উদ্ভব ঘটিতেছে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সহায়তায় যদি আমরা মানব প্রকৃতি ঠিক মত বুঝিয়া উঠিতে পারি, তবেই শুধু এই অবস্থার অবসান ঘটিতে পারে। পাভ্‌লোফ্‌ তাঁহার গবেষণা দ্বারা মনো-বিজ্ঞানে যে পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, সেই পথেই হয়ত একদিন মানব জীবনের বহু সমস্যার সমাধান সম্ভবপর হইবে।

একটি পাঁকের ফুল

(২১২ পৃষ্ঠার পর)

বলিয়া সে গাড়িতে উঠিতেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল। হতবুদ্ধি কমলের দিকে চাহিয়া গাড়ী হইতে মুখ বাড়াইয়া শশাঙ্ক কথাগুলো ছুড়িয়া মারিল- "আসছে ১০ই স্যার অতুল-কৃষ্ণের মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে, দ্বিতীয় পক্ষ নয়—আনকোরা প্রথম পক্ষ। তোমাকে নিমন্ত্রণ কার্ড দেবার নমনীয় দাবী পেশ করে বন্ধুত্বের অপমান করব না—তবু যেতে পার ইচ্ছে করলে হাতে পায়ে চারটে ধার-করা রিষ্ট-ওয়াচ জড়িও—মনে রেখ আদর সেখানে মানুষের, খোলসের নয়।"

রোল্‌স্‌ রয়েস্‌ গতিশীল হইল। বিমূঢ় কমল ফুট-পাথে ছড়ান আধুলি আর আধপয়সার কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া অর্থহীন চোখে রোলসের চলিয়া যাওয়া পথের দিকে চাহিয়া রহিল।

তাহার মাথার ভিতরে তখন উতোল রোলে শশাঙ্কের বিবাহের সানাই ডুকরিয়া উঠিয়াছে।

সমাধান

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন

সুখন!

দরজার বাহিরে ভূপেনের হাঁক শোনা গেল। সুখন জাগিয়াই ছিল। ধরা গলায় "আজ্ঞে" বলিয়া সে উঠিয়া পড়িল, এবং তাড়াতাড়ি চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে দোর খুলিয়া দিল। শিবু আর দুলালী তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠিয়া বসিল।

ভূপেন দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া ভিতরের দিকে মুখ বাড়াইয়া বিষাদ-কাতর কণ্ঠে বলিয়া চলিল—"সারাটা রাতই বুঝি তোমাদের এ রকম বসে বসেই কেটেছে? পাগল সব, এমনি করে শরীরটাকে মাটি করতে চাও না কি!"

বলিলেন বটে ঐ কথা কিন্তু তাঁহারও চোখে মুখে রাত্রি-জাগরণের আবেশ মাখা।

শিবু কহিল,—"কি করি বাবা! মেয়ে আমার একেবারেই অবুঝ হয়ে পড়েছে; বলে আমি ওর মায়া কাটাবার জনাই না কি আজ এসব প্রকাশ করেছি।"

দ্বারের সন্নিকটে একখানা বহু পুরাতন এক ঠ্যাং ভাঙ্গা চেয়ার তিন পায়ের উপর ভর করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ভূপেন অন্যমনস্কভাবে তদুপরি উপবেশন করিতেই চেয়ার সমেত একেবারে সটান পড়িয়া গেলেন। মুহূর্ত্তে কক্ষের আবহাওয়া বদলাইয়া গেল। বর্ষণক্ষান্ত মেঘের ফাঁকে প্রাতঃসূর্য্যের স্বর্ণচ্ছটার ন্যায় দুলালীর অশ্রুধৌত মলিন মুখের সেই হাসিটুকু বড়ই সুন্দর দেখা গেল। তাহার একটু প্রবল রকমেরই হাসি পাইয়াছিল এবং তাহা দমন করার জন্য তাহাকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইতেছিল।

শিবু তাড়াতাড়ি ভাঙা চেয়ারটা সরাইয়া রাখিয়া বৈঠকখানা হইতে একখানি ভাল চেয়ার লইয়া আসিল। তাহার এই সামান্য অনুপস্থিতির ফাঁকে ভূপেন হাসিমুখে নিম্নস্বরে বলিলেন,—"দেখত কাণ্ড! সারাটা রাত অনর্থক কেঁদে কেটে চোখ মুখ ফুলিয়ে, এখন সক্কাল বেলায় আমাকে কেমন একটা আছাড় খাওয়ালে! আবার তাই নিয়ে কেমন হাসি হচ্ছে!'

দুলালী খিল খিল করিয়া হাসিয়া, মুখে কাপড় গুঁজিয়া দিল, কিন্তু কোন উত্তর দিল না।

ভূপেন কিন্তু আর বসিলেন না; দ্বারপার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়াই কহিলেন,—"নাঃ, সক্কাল বেলায় আজ আর এখানে বসব না।" বলিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। তারপর দুলালীকে বলিলেন,—"শোক দুঃখের কোন যথার্থ কারণ তোমার হয় নি। 'ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন,' দেবেনবাবুর এই কথাটি যে কতদূর খাঁটি, তা তুমি এখনও বুঝতে পারছ না বটে, কিন্তু মেনে নেও এবং মন স্থির কর। কেহই তোমার মায়া কাটাবার জন্য ব্যস্ত হয় নি, তোমার পরমহিতাকাঙ্ক্ষীরা তোমার মঙ্গল কামনা করেই তোমার জন্ম-বৃত্তান্ত প্রকাশ করেছেন। আমি আরও অনেক তথ্য দেবেনবাবুর কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি। সে সব অত্যন্ত মূল্যবান সংবাদ এবং তোমার জানা নিতান্ত আবশ্যক। তুমি এখন যাও, ভিতরে গিয়ে হাত মুখ ধোও এবং কিছু একটু খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে নাও। তারপর সুযোগ মত আমি সব কথা তোমাকে বলব। তুমি এখন আর একেবারে ছেলেমানুষটি ত নও! ইচ্ছা করে এবং কল্পনা করে অনর্থক দুঃখ টেনে এন না, কিম্বা অপরের প্রতি অকারণ দোষের আরোপ করে নিজকে ছোট কর না। কাল রাত্রে তো তোমার অস্থিরতার জন্য তোমার খাওয়া হয়ই নি,—তোমার বাবুয়ার এবং কনকেরও হয় নি; এবং বাড়ী শুদ্ধ লোক কেউই কাল ভাল করে খেতে পারেন নি। যাও, এখন স্তব্ধের মত বসে থেক না—সকলকে স্থির হতে দাও।" বলিয়া তিনি আর অপেক্ষা করিলেন না।

এমন সান্ত্বনার মনজুড়ান কথা, এমন স্নেহে মাখা অনুযোগ, দুলালী ভূপেনের মুখে আর কখন শুনে নাই। দুলালী অজানিতেই তাঁহার কথাগুলি মনে মনে আলোচনা করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তখনই আবার ভূপেনের ভাঙা চেয়ার লইয়া য়্যাড্‌ভেঞ্চার আর নিজের বেদম হাসির কথা মনে পড়িয়া গেল। ছি, অমন সময় ঐ রকম করিয়া হাসিয়া ফেলা তাহার বড়ই অশোভন হইয়াছে। কিন্তু ভাবিতে গিয়া সেই পতনের দৃশ্যটুকু মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠায় দুলালী পুনরায় হাসিয়া উঠিল। ঠিক এমন সময় কনক আসিয়া পড়িল।

ভূপেন যখন দুলালীকে প্রবোধ দিতেছিলেন সেই সময়ে কনকও শয্যাত্যাগ করিয়া দিদির সংবাদ লইতে আসিয়াছিল। আসিয়া দেখিল, নিবিড় আবেগে ভূপেন তাহাকে কি সব বলিতেছেন। ভূপেনকে এরূপ গম্ভীরভাবে কথা বলিতে কনক কখন দেখে নাই। সুতরাং কথার মাঝখানে আসিয়া বাধা দিতে তাহার সাহসে কুলাইল না। সে ফিরিয়া গেল, এবং কিছুক্ষণ পরে ভূপেনকে অন্তঃপুরাভিমুখে যাইতে দেখিয়া, পুনরায় আসিয়া স্নেহহাস্যে দুলালীর হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিল। দুলালীও হাসিমুখে গাত্রোত্থান করিয়া কনকের সহিত অন্দরের দিকে চলিয়া গেল।

কিঞ্চিৎ বেলা হইলে দেবেন্দ্রবাবু পুনরায় আসিয়া দর্শন দিলেন। প্রথমত আশুবাবুর সহিত তাঁহার কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল। তৎপরে শিবু, দুলালী ও ভূপেনের ডাক পড়িল। সকলে উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন,—"শিবনাথ! অন্য সব কথা ছেড়ে আজ এখন আমার নিজের কথাটাই আরম্ভ করি। আমি যে কত বড় বিপদে পড়ে সেই 'চাকধোয়া' থেকে ছুটে এসেছি, তা আর কি বলব? ভূপতি আমার ভগ্নীপতি; আমার একটি মাত্র ছোট বোন, লতিকা;—ভূপতি তার স্বামী। ভূপতি যে রকম বর্ব্বরের মত অপরাধ করেছে তাতে তার হয়ে কোন কথা বলাও পাপ। কিন্তু আমার একমাত্র স্নেহের ছোট বোনের দিকে এবং তার কোলের শিশুপুত্রটির দিকে আমি চাইতে পারছি না। লতিকার চিঠিতে আমি সংবাদ পাই, এবং এই অমানুষিক অত্যাচার যে তোমাদের উপরেই হয়েছে, —তোমরাই যে তার চিঠিতে লেখা শিবু ও দুলালী, আমার মন তৎক্ষণাৎ আমাকে তা বলে দেয়। কাজেই আমি ছুটে

এসেছি। তারপর এখানে এসে আমি সব জলের মত দেখতে পাচ্ছি। তোমরা যদি এ মোকদ্দমা চালাও তা হ'লে কিছুতেই ভূপতির রক্ষা নাই; —জেল তার অনিবার্য্য; তা হ'লে আমার বোনটিও আর বাঁচবে না। আমি মাত্র দশ দিনের ছুটি পেয়েছি; তার চারটি দিন গেল। এখন তোমরা যদি বাঁচাও তবেই আমার বোন এবং তার ছেলেটি বাঁচে। তোমাদের দয়ার উপর"—

শিবু তাড়াতাড়ি হাত জোড় করিয়া কহিল,—"এ কি বাবু! আপনি বলেন কি? কাকে আপনি কি বলছেন? আপনার আদেশ, আপনার হুকুম শিবু, সুখন, দুলালী তাদের জীবন থাকতে কখন অবহেলা করতে পারে? আপনার বোন -তার একটা দীর্ঘনিশ্বাস যে আমাদের পুড়িয়ে খাঁক করে দেবে! দুলালীকে বাঁচিয়েছিল কে? কার অন্ন-জলে সে এখন এত বড়টি হয়েছে? ভগবান! ভগবান! তা থাক্,—এখন আপনার আদেশ কি, তাই বলুন।"

দেবেন্দ্রবাবু বড় সন্তুষ্ট হইলেন এবং দুলালীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"তুমি কি বল মা?"

দুলালী হাসি হাসি মুখে একবার তাঁহার দিকে ও একবার আশুবাবুর দিকে চাহিল, তারপর শান্তভাবে কহিল,— "আপনারা যে রকম আদেশ করবেন সেই রকম কাজ হবে; এতে আর ভুল নেই। তবে আমাদের এই গুরুতর বিপদের সময় যাঁরা দয়া করে আমাদের সাহায্য করেছেন,—আমার কথাটুকুই যাঁরা খাঁটি সত্য বলে বিশ্বাস করে আমার মুখ নীচু হতে দেন নি, তাঁদের প্রত্যেককে আমার নিজের একবার সমস্ত বৃত্তান্ত বুঝিয়ে বলে তাঁদের অনুমতি গ্রহণ করা যেন আমার নিতান্ত কর্ত্তব্য বলে মনে হচ্ছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার কথা শুনে, কেউই আমার অনুরোধ পায়ে ঠেলবেন না।"

দেবেন্দ্রবাবু বলিলেন,—"বড় ভাল কথা বলেছ মা! কিন্তু তোমার নিজের বলতে যাওয়াটাই কি তুমি খুব আবশ্যক মনে কর? আশুবাবুকে সঙ্গে নিয়ে তোমার পক্ষে আমি গিয়ে তাঁদের অনুমতি আনলে হয় না কি?"

—"না বাবা, আমার নিজেরই যাওয়া ভাল। তাঁরা,— বিশেষতঃ ডাক্তারবাবু, উকিলবাবু, এমন কি বড় হাকিমবাবুও আমাকে ঠিক তাঁদের মেয়ের মতন স্নেহ করেছেন এবং বিশ্বাস করেছেন। তাঁরা প্রত্যেকেই আমার পিতৃতুল্য। আমি নিজেই তাঁদের অনুমতি নিতে চাই। নতুবা আমার অন্তরের গ্লানি এবং অপমান দূর হবে না। তবে এটাও ঠিকই জানবেন যে পিসিমাকে আমি কিছুতেই বিপন্ন হতে দিব না।"

আশুবাবু ইংরেজিতে দেবেন্দ্রবাবুকে বলিলেন,—"মেয়েটার কথাগুলি খুবই সুন্দর এবং সঙ্গত। আজকের দিনটা তার হাতে ছেড়ে দেওয়া যাক্। আজ সে যাতে সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতে পারে আমি তার সুব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তারপর কাল প্রাতে পুনরায় বসা যাবে। আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকুন গে।"

—"আমার নূতন পিসিমা কোথায় বাবা?"

—"এই শহরেই আছে মা। থানা কম্পাউণ্ডে সেই হত-ভাগার কোয়াটার্সে।'

—"এতদিন এই শহরে আছেন অথচ চিনি না! আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব।'

—"করবে মা? আচ্ছা, সন্ধ্যের সময় আমি তাকে নিয়ে আসব।"

আশুবাবুও এই কথার সমর্থন করিয়া কি যেন বলিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বেই দুলালী কহিল,—"না বাবা, এ অবস্থায় তাঁকে এখানে আনবেন না। তিনি নিশ্চয়ই নিদারুণ লজ্জা অপমানে মাটির সঙ্গে নুয়ে আছেন;—তাঁকে এখন টানাটানি না করাই ভাল। মোকদ্দমা হাঙ্গামা চুকে গেলে আমি নিজেই গিয়ে একদিন তাঁকে প্রণাম করে আসব।" বলিয়া সে আশুবাবুর দিকে চাহিল।

আশুবাবু সন্তুষ্টচিত্তে অনুমোদন করিলেন।

ভূপেনের কিন্তু অতটা পছন্দ হইল না। তিনি উঠিয়া গেলেন। দুলালীর মনে হইল, ভূপেনের মুখচোখে যেন নীরব প্রতিবাদ ফুটে উঠেছে—তিনি যেন অভিমানভরেই চলে গেলেন বুকের আগুন চাপিয়া রাখিবার জন্য।

ঘণ্টাখানেক পরে আশুবাবু দুলালীকে লইয়া বাহির হইলেন। সর্ব্বাগ্রে তাঁহারা গেলেন নরেন্দ্রবাবুর নিকট। দুলালী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ও তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া তাহার বক্তব্য আরম্ভ করিল। ভূমিকা শ্রবণ করিয়াই নরেন্দ্রবাবু একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। "অ্যাঁ? ক্ষমা? মোকদ্দমা ছেড়ে দেওয়া?" আশুবাবুর দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"বুঝেছেন মশাই আশুবাবু! অপাত্রে ক্ষমা-টমা আমার ধাতে নেই। এত বড় রাস্কেল,—তাকে আবার ক্ষমা? এই করেই ত দুষমনগুলোর স্পর্দ্ধা বাড়ান হয়।" নরেন্দ্রবাবু দুর্জ্জয় ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিলেন।

আশুবাবু হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন,—"আমাকে কেন মশাই? আমি ত এ পর্য্যন্ত একটি কথাও বলি নি? যে বলছে, তারি সঙ্গে বোঝাপড়া করুন। আমি যে সংবাদ এনেছি, তা যখন বলব, দেখবেন, আহ্লাদে হয়তো নেচেই উঠবেন।"

দুলালী মাটির দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে ছিল। সে অত্যন্ত বিনয়ের সহিত কহিল,—"কি করি বলুন? আমি যখন পৌনে দুই বৎসরের মাতৃহীন শিশু এবং আমার দাদার বয়স কিছু কম ছয় বৎসর মাত্র, সেই দুঃসময়ে আমাদিগকে নিয়ে আমার পিতা"—বলিতেই দুলালীর স্বর কাঁপিয়া উঠিল; প্রাণপণ শক্তিতে সে আপনাকে সংযত করিয়া লইয়া বলিতে লাগিল,—"আমার পিতা তখন এই দেবতুল্য ওভারসিয়ার বাবুর আশ্রয়েই উঠেছিলেন। একক্রমে দশটি বৎসর আমরা তাঁর আশ্রয়ে ছিলাম। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী আমাদের দুটি ভাই-বোনকে নিজেদের ছেলে-মেয়ের মতন করে মানুষ করেছিলেন, কত যে শিখিয়েছিলেন মানুষের মত মানুষ গড়ে তুলতে তার শেষ নেই। ঐ সময়ে তাঁদের আশ্রয় না পেলে বাবা আমাদের দুটি ভাই-বোনকে বাঁচাতে পারতেন না। আমাদের সেই দেবতার মত আশ্রয়দাতা, তাঁরই একটা বিপদের সময়, সেই অত-দূরে থেকে স্বয়ং আমাদের কাছে ছুটে এসেছেন। এ অবস্থায় আমরা 'না' বলি কি করে বলুন।"

দুলালী থামিল। নরেন্দ্রবাবুও নীরব এবং গভীর চিন্তাকুল হইলেন। মিনিট দুই পরে আশুবাবু বলিলেন,—"কি মশাই, মেয়ের প্রশ্নে চুপ মেরে গেলেন যে?"

নরেন্দ্রবাবু হাসিয়া ফেলিলেন; কহিলেন,—"কৃতঘ্নতা শিক্ষা দিতে পারব না বলেই চট করে বুদ্ধি ঠাউরে উঠ্‌তে পারছি না। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে মোকদ্দমা ছেড়েই দিতে হবে। কিন্তু সেই স্কাউন্ড্রেলের একখানা কান অন্তত কেটে দিতে পারলে ঠিক হ'ত।"

আশুবাবু প্রবলভাবে হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন,—"কান কাটার বদলে ঠোঁট কাটা গেছে—সে ছাপ এ জীবনে লোপ পাবে না।"

লজ্জায় দুলালীর কর্ণমূল পর্যন্ত আরক্ত হইয়া উঠিল এবং সে নিরতিশয় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। তদ্দৃষ্টে আশুবাবুও অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইলেন।

নরেন্দ্রবাবু তাঁহার অর্দ্ধপক্ব বিরল কেশের মধ্যে উভয় হস্তের অঙ্গুলি কয়টি চালনা করিয়া লইয়া গম্ভীরস্বরে,—যেন কতকটা নিরুপায়ভাবেই দুলালীকে বলিলেন,—"আমার মতামত আমি কাল প্রাতে তোমাদের ওখানে গিয়ে বলে আসব। কাল তোমাদের বাড়ীতে আমার চায়ের নেমন্তন্ন রইল,—বুঝলে?"

দুলালী মুখ টিপিয়া হাসিল।

আশুবাবু বলিলেন,—"নিজেকে এইভাবে বিলিয়ে দেওয়ার জন্যে আমি আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিচ্ছি। এখন আমার বক্তব্যটুকু শ্রবণ করুন। আমাদের এই মা ঠাকরুণটির সম্বন্ধে আমার একটি আন্তরিক কামনার বিষয় আমি আপনাকে একদিন বলেছিলাম,—বোধ হয় আপনার মনে আছে?"

—"আছে বৈ কি, খুব মনে আছে; কিন্তু আপনাদের সে সাহস কই?"

—"সাহসের আর তেমন প্রয়োজন নেই। সংবাদ পাওয়া গেছে, মা আমার বর্দ্ধমান জেলার বিশেষ সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী ভদ্র-বংশের মেয়ে এবং আমাদের স্ব-জাত।" বলিয়া, দেবেন্দ্র-বাবুর এবং শিবুর নিকট হইতে তিনি যে সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন তাহা নরেন্দ্রবাবুর নিকট প্রকাশ করিলেন।

নরেন্দ্রবাবু এই আশ্চর্য্য সংবাদ শ্রবণ করিয়া আহ্লাদে দিশাহারা হইলেন। তখন উল্লাসের সঙ্গে বলিলেন,—"দুলালীদের রক্ষাকর্ত্তা সেই ভদ্রলোক যখন নিজে ছুটে এসেছেন, তার উপরে আবার এত বড় একটা মূল্যবান সুসংবাদ বহন করে, তখন তাঁর খাতিরে ঐ ডেভিলটাকে ছেড়ে দিতেই হবে দেখ্‌ছি। তবুও এক্ষুণি আমার মতামত প্রকাশ করে সকাল বেলার চায়ের নেমন্তন্নটা হারাতে চাই না; আমার বক্তব্য মুলতুবী রইল।'

ডক্টর বোস ড্রেসিং রুমে আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া পুরোদস্তুর সাহেবি ধরণে 'টাই' বাঁধিতেছিলেন। রাস্তায় গাড়ী থামিবার শব্দে জানালা দিয়া দেখিলেন দুলালী ও আশুবাবু অবতরণ করিতেছেন। তিনি যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া উভয়কে ভিতরে আনিয়া বসাইলেন। তাঁহার সদানন্দময়ী গৃহিণী আড়াল হইতে হাতছানি দিয়া দুলালীকে কক্ষান্তরে ডাকিয়া নিলেন এবং এমন সময়ে এই-ভাবে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দুলালী সব বলিল। দুলালীর জন্ম-রহস্য অবগত হইয়া ডাক্তার-গৃহিণী আনন্দাতিশয্যে তাহাকে একেবারে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন, কিন্তু মোকদ্দমা ছাড়িয়া দেওয়ার প্রসঙ্গে ঠিক নরেন্দ্রবাবুর মতনই জ্বলিয়া উঠিলেন।

দুলালী তখন কাতরভাবে বলিল,—"আপনি এ অবস্থায় আমাকে কি করতে বলেন? সেই হতভাগ্য ব্যক্তি যত বড় অপরাধই করুক না কেন, তার নিরপরাধ স্ত্রী-পুত্রকে শাস্তি দেওয়ার অধিকার আমাদের আছে কি? বিশেষত আমাদের একান্ত অসময়ে আহার দিয়ে, আশ্রয় দিয়ে যিনি আমাদিগকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন, তাঁকে আজ বিমুখ করে ফিরিয়ে দিলে আমার অপরাধ, আমার অকৃতজ্ঞতা কত বড় ভয়ানক হয়ে পড়বে ভাবুন দেখি।"

একটুক্ষণ ভাবিয়া লইয়া ডাক্তার-গৃহিণী বলিলেন,—"না; তাঁকে তুমি কিছুতেই বিমুখ করতে পার না। দেও তবে—মোকদ্দমা ছেড়েই দেও। তোমার অভিভাবকেরা যা বলেন সেই রকমই কর।"

এমন সময় ডাক্তারবাবু ডাকিলেন,—"দুলালী!"

'এখন তবে আসি" বলিয়া যুক্তকরে নমস্কার করিয়া দুলালী আশুবাবু ও ডাক্তারবাবুর নিকট আসিল।

ডাক্তার বোস কহিলেন,—"আশুবাবুর কাছে আমি এতক্ষণ ধরে সব কথা শুনলাম। তোমার জন্ম-বৃত্তান্ত শুনে আমি যে কি অপরিসীম আনন্দলাভ করেছি, তা প্রকাশ করার শক্তি আমার নেই। তোমার সুন্দর পবিত্র জীবন শীঘ্রই আরও মধুময় হয়ে উঠবে। আজ আমাকে এখুনি বেরুতে হচ্ছে; একটি কঠিন রোগী দেখতে যেতে হবে। মোকদ্দমা ছেড়ে দেওয়া সম্বন্ধে আমার অমত নেই;—বরং এই সব অপ্রি[illegible] ব্যাপার নিয়ে কাছারীতে দাঁড়াতে না হ'লেই ভাল। কিন্তু আমি একটি সর্ত্তে মোকদ্দমা ছাড়তে রাজি আছি। সে আমাদের দশজনের সামনে তোমাকে 'মা' বলে সম্বোধন করবে এবং ক্ষমা চাইবে। তবেই মোকদ্দমা ছাড়া হবে;—নতুবা হবে না। মোকদ্দমা চল্‌লে কিন্তু কিছুতেই তার নিস্তার নেই;—তাকে শেষ করার পক্ষে আমার একার সাক্ষ্যই যথেষ্ট।"

আশুবাবু বলিলেন,—"তা বেশ; অতি সুন্দর কথা বলেছেন আপনি। আমরা এখন উঠি; আপনাকে আর দেরী করাব না।" তারপর হাতজোড় করিয়া বলিলেন,—"কাল প্রাতে অনুগ্রহ করে যদি আমার ওখানে একটু চা খেতে যান ত হ'লে বড় কৃতার্থ হব। নরেন্দ্রবাবুও আসবেন। তখন অমনি যা হয় একটা চূড়ান্ত মীমাংসাও করে ফেলা যাবে। দেবেন্দ্র বাবুর সঙ্গেও আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেব। ব[illegible] চমৎকার ভদ্রলোক; —শুধু লজ্জায় পড়ে কা'রও সঙ্গে দেখা করতে পারছেন না।"

যাচ্ছে—আর গ্র্যান'থারের কণ্ঠে ফুটে উঠ্‌ছে উল্লাসের চীৎকার —পরিচিত অপরিচিতের প্রতি আপ্যায়ন বাণী। মাঝে মাঝে তার ছেলেবেলাকার মেলা দেখার আজব গল্প বলে আমায় হাসিয়ে সারা করছিল। আমি যে মেলা দেখতে যাই নি একটিবারও—এতে গ্র্যান'থার একেবারে স্তম্ভিত!

'জানিস্ জো-ই তোর বয়সে আমি পালিয়ে দেখে নিয়েছি দু-দুটো মেলা আর এক দফা ঠেঙানি।'

'খুব বুঝি চাবুক কষেছিল?' কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম।

'চাবুক নয় বেত, আমি শপথ করে বলতে পারি।' বলেই হা-হা করে হেসে উঠ্‌ল।

"তার প্রত্যেকটি কথায় দুনিয়াটা যেন অসীম বড় হয়ে আমার চোখে ফুটে উঠতে লাগ্‌ল।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া অধ্যাপক ম্যালরি একবার হাঁফ ছাড়িতে থামিলেন। হাসি ফুটিয়া উঠিল তাঁহার মুখে সেই প্রাচীন স্মৃতির উন্মেষে।—"ওঃ কি দিনই ছিল সে সব।"

"জান ফারার, তখনকার দিনে টাকাকড়ি বড় একটা কারু হাতে ছিল না। গ্র্যান'থারের ৬ ডলার ৪৩ সেণ্ট দিয়ে আমরা কত কি-ই না করলাম। বুড়ীর তেলের থলির মত তা যেন অনন্ত কাল কাটিয়ে উঠ্‌ল। পিপের মত মোটা আর বেঁটে মহিলা (fat lady) দেখতে ঢুকলাম। সে সময় মনে হয়েছিল ওর ওজন দশ মণের কম হবে না। ঠাকুরদার বেপরোয়া নির্ভীকতায় তাজ্জব বনে গেলাম, যখন সে মহিলাটিকে জিজ্ঞেস করে ফেল্‌ল— ক'সের তার খোরাক আর নিজের হাতে চুল বাঁধতে পারে কি না আর ক'গজ মখমলে তার পোষাক তৈরী হয়। কি আশ্চর্য্য! চলে আসবার বেলা মহিলাটি এক থলে বাদাম দিয়ে দিল আমাদের উপহার।

"তারপর দেখলাম কুকুর মুখো ছেলেটাকে; আমার মোটেই ভাল লাগে নি। গ্র্যান'থার কিন্তু খোলাখুলি শাদা কথায় তার সন্দেহ প্রকাশ করে ফেললে যে—কুকুরের মত গোঁফ্ ছোকরাটার মুখে গঁদ দিয়ে এঁটে দেওয়া হয়েছে। এর পরে আমরা ঘুরে বেড়ালাম যেখানে ঘোড়া, গরু, শুয়োরগুলো রাখা ছিল বিক্রির জন্যে। রেলিং-য়ের ফাঁক দিয়ে হাত গলিয়ে একটা শুয়োরের পিঠে আমি খিমচি কেটে দিলাম। মেয়েদের মহলটাও দেখে এলাম। সারি সারি সাজান 'জার'—কি তার দেখ্‌ব? কিন্তু তা দেখেই ঠাকুরদার মনে পড়্‌ল যে ক্ষিদে পেয়েছে, এবারে খেতে হবে। তাঁবু খাটিয়ে বসান একটা রেস্তোরাঁতে আমরা ঢুকে পড়লাম। ওদের ফর্দ্দে সব চেয়ে বেশী দামী যে খাবার ছিল গ্র্যান'থার তারই অর্ডার দিলে।

"লাঞ্চের পর নাগরদোলার মোহে আকৃষ্ট হলাম। ওটা ঠাকুরদার কাছেও যেমন নতুন, আমার কাছেও তেমনই। একটা ছেড়ে অন্যটা এমনি করে যত রকম আসন ছিল দোলায় তার একটাও বাদ দেওয়া হ'ল না। ঠাকুরদা এক হাতে মরিয়া হয়ে আঁকড়ে ধরে বসে আছে—দোলা ঘুরছে—ঘুরছে—ঠাকুরদার সে কি ফুর্ত্তি! মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে বলছে আমায়—'আশ মিটিয়ে চেপে নে জো-ই, রাজা সলোমনও বলতে পারে না কবে আবার এ রকম সুযোগ মিলবে এ জীবনে।' শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে দোলা থেকে নেমে ভিড়ের পিছু পিছু চল্‌লাম ঘোড় দৌড়ের মাঠের দিকে। গ্র্যান'থারের মুখে খই ফুট্‌ছে 'রেস'-য়ের আদব-কায়দা খুঁটিনাটি নিয়ে। এমনই সে সব বুক্‌নি আজব যে, আমাদের পাশে দাঁড়ান এক তরুণ হেসে ফেল্‌লে! আর যায় কোথা! ঠাকুরদা তাকে পেয়ে বস্‌ল, উত্তেজনার আধিক্যে একেবারে থতিয়ে তোৎলিয়ে বলে ফেল্‌লে— "সাম্‌নের রেস-য়ে কোন্ ঘোড়াটা জিত্‌বে আমি বলে দিচ্ছি—ধর বাজি পঞ্চাশ সেণ্ট।"

"বেশ ধরলুম বাজি।" হেসে হেসে বল্‌লে সে তরুণটি।

"ঠাকুরদা আঙুল দিয়ে দেখালে একটা মোটা-সোটা কালো ঘোড়া। কিন্তু সেটা এল প্রায় সব ক'টার শেষে। তা হলে কি হবে ঠাকুরদা দমে যাবার পাত্র নয়। ৫০ সেণ্ট শোধ করে দিতে দিতে বল্‌লে—"এক-আধটা ভুলচুক অমন হয়েই থাকে, সবারই হয়। আচ্ছা এবারে ধর বাজি এক ডলার। এবার ঠিক ধরে দেব।" তরুণও লোভেই হোক আর ঠাকুরদাটি যে কি রকম ঘোড়াদৌড়ে ওস্তাদ তা চিনে ফেলেই হোক খুশীর সঙ্গে ফের সে বাজিও ধর্‌লে হাস্‌তে হাস্‌তে। আমার কিন্তু মুখ শুকিয়ে গেল—কারণ ঠাকুরদার কাছে তখন সবে মাত্র রয়েছে ৮৭ সেণ্ট। আমার রকম-সকম দেখে ঠাকুরদা চোখের ইসারায় আমায় চুপ করে থাক্‌তে বল্‌লে তরুণটি না দেখ্‌তে পায় এমনি কায়দায়।

"আমাদের ঘোড়াটাই এবার জিত্‌ল। আমরা যেন সারা দুনিয়া জুড়ে দিগ্বিজয় করে ফেলেছি—এমনিভাবেই লাফিয়ে উঠলাম আর হল্লা-হল্লোড় সুরু করলাম। ঠাকুরদা ত টুপীটা উড়িয়ে দিলে মহাশূন্যে।

"এইবার আমাদের বাড়ী ফেরাই ঠিক হল। ঘোড়া পেগির দানাপানির খরচ দেওয়া হ'ল। বাড়ীর সবার জন্য টুকু-ওটুকু নানা নগণ্য জিনিষ কেনা হ'ল। বাকি যে ক' সেণ্ট রইল তা দিয়ে লেমনেড্ খাওয়া হ'ল। ঠাকুরদা বল্‌লে— 'করবেই যখন কোন কাজ, একেবারে তাতে ডুব দেবে মাথার চুলের গোছা ডুবিয়ে।' ধুলোয় ধূসর, কপর্দ্দকহীন, খুঁটিনাটি জিনিষের বহরে নুয়ে পড়া, দেহে ও মনে একেবারে অবসাদ-গ্রস্ত—আমরা কোন রকমে হামাগুড়ি দিয়ে আমাদের আধ-ভাঙা খুদে বাক্সপানা গাড়ীতে উঠে গা এলিয়ে দিলাম। এবারে পেগ কিন্তু বাড়ীমুখো চল্‌ল বেশ যেন চট্‌পটে হয়ে। ফিরতি পথে আমাদের মুখে আর 'রা' ছিল না। কেবল ঠাকুরদা মাঝে মাঝে বলে উঠ্‌ছিল—'ওটার পিঠ্ দেখেই ত বাজি রেখেছিলুম। গোটা দঙ্গলের ভিতর তবু ওটারই যা হোক ছিল পিঠ যাকে বলে। তা নইলে সেই যে শাদাটা, আরে ছিঃ ওটা ত একটা গরু বল্‌লেই চলে।'

"ক্রমে বেলা পড়ে এল। ঠাণ্ডা বাতাস বইতে লাগ্‌ল। ঠাকুরদার হাঁফানি চাগাড় দিয়ে উঠ্‌ল। থেকে থেকে খক্ খক্ কাশি—তাছাড়া গ্র্যান'থার একেবারে নীরব!

"শেষ সাঁঝের আমেজ পড়ে চারদিক প্রায় আঁধার হয়ে উঠেছে। পেগির পা যেন আর চলে না। পাহাড়ের গায়ে চড়াই পথ—গাড়ী থমকে থমকে উঠছে অতি ধীরে। ঠাকুরদা তড়াক্ করে লাফিয়ে পড়্‌ল রাস্তায়, তারপর পেগির মুখের লাগাম ধরে টেনে নিয়ে চল্‌ল চড়াই পথে। ঐ যে আমাদের বাড়ী দেখা যাচ্ছে অবশেষে, হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম।

দুলালী থামিল। নরেন্দ্রবাবুও নীরব এবং গভীর চিন্তাকুল হইলেন। মিনিট দুই পরে আশুবাবু বলিলেন,—"কি মশাই, মেয়ের প্রশ্নে চুপ মেরে গেলেন যে?"

নরেন্দ্রবাবু হাসিয়া ফেলিলেন; কহিলেন,—"কৃতঘ্নতা শিক্ষা দিতে পারব না বলেই চট করে বুদ্ধি ঠাউরে উঠ্‌তে পারছি না। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে মোকদ্দমা ছেড়েই দিতে হবে। কিন্তু সেই স্কাউণ্ড্রেলের একখানা কান অন্তত কেটে দিতে পারলে ঠিক হ'ত।"

আশুবাবু প্রবলভাবে হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন,—"কান কাটার বদলে ঠোঁট কাটা গেছে—সে ছাপ এ জীবনে লোপ পাবে না।"

লজ্জায় দুলালীর কর্ণমূল পর্যন্ত আরক্ত হইয়া উঠিল এবং সে নিরতিশয় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। তদ্দৃষ্টে আশুবাবুও অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইলেন।

নরেন্দ্রবাবু তাঁহার অর্দ্ধপক্ক বিরল কেশের মধ্যে উভয় হস্তের অঙ্গুলি কয়টি চালনা করিয়া লইয়া গম্ভীরস্বরে,—যেন কতকটা নিরুপায়ভাবেই দুলালীকে বলিলেন,—"আমার মতামত আমি কাল প্রাতে তোমাদের ওখানে গিয়ে বলে আসব। কাল তোমাদের বাড়ীতে আমার চায়ের নেমন্তন্ন রইল,—বুঝলে?"

দুলালী মুখ টিপিয়া হাসিল।

আশুবাবু বলিলেন,—"নিজেকে এইভাবে বিলিয়ে দেওয়ার জন্যে আমি আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিচ্ছি। এখন আমার বক্তব্যটুকু শ্রবণ করুন। আমাদের এই মা ঠাকরুণটির সম্বন্ধে আমার একটি আন্তরিক কামনার বিষয় আমি আপনাকে একদিন বলেছিলাম,—বোধ হয় আপনার মনে আছে?"

—"আছে বৈ কি, খুব মনে আছে; কিন্তু আপনাদের সে সাহস কই?"

—"সাহসের আর তেমন প্রয়োজন নেই। সংবাদ পাওয়া গেছে, মা আমার বর্দ্ধমান জেলার বিশেষ সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী ভদ্র-বংশের মেয়ে এবং আমাদের স্ব-জাত।" বলিয়া, দেবেন্দ্রবাবুর এবং শিবুর নিকট হইতে তিনি যে সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন তাহা নরেন্দ্রবাবুর নিকট প্রকাশ করিলেন।

নরেন্দ্রবাবু এই আশ্চর্য্য সংবাদ শ্রবণ করিয়া আহ্লাদে দিশাহারা হইলেন। তখন উল্লাসের সঙ্গে বলিলেন,—"দুলালীদের রক্ষাকর্ত্তা সেই ভদ্রলোক যখন নিজে ছুটে এসেছেন, তার উপরে আবার এত বড় একটা মূল্যবান সুসংবাদ বহন করে, তখন তাঁর খাতিরে ঐ ডেভিলটাকে ছেড়ে দিতেই হবে দেখ্‌ছি। তবুও এক্ষুণি আমার মতামত প্রকাশ করে সকাল বেলার চায়ের নেমন্তন্নটা হারাতে চাই না; আমার বক্তব্য মুলতুবী রইল।'

ডক্টর বোস ড্রেসিং রুমে আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া পুরোদস্তুর সাহেবি ধরণে 'টাই' বাঁধিতেছিলেন। রাস্তায় গাড়ী থামিবার শব্দে জানালা দিয়া দেখিলেন দুলালী ও আশুবাবু অবতরণ করিতেছেন। তিনি যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া উভয়কে ভিতরে আনিয়া বসাইলেন। তাঁহার সদানন্দময়ী গৃহিণী আড়াল হইতে হাতছানি দিয়া দুলালীকে কক্ষান্তরে ডাকিয়া নিলেন এবং এমন সময়ে এই-ভাবে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দুলালী সব বলিল। দুলালীর জন্ম-রহস্য অবগত হইয়া ডাক্তার-গৃহিণী আনন্দাতিশয্যে তাহাকে একেবারে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন, কিন্তু মোকদ্দমা ছাড়িয়া দেওয়ার প্রসঙ্গে ঠিক নরেন্দ্রবাবুর মতনই জ্বলিয়া উঠিলেন।

দুলালী তখন কাতরভাবে বলিল,—"আপনি এ অবস্থায় আমাকে কি করতে বলেন? সেই হতভাগ্য ব্যক্তি যত বড় অপরাধই করুক না কেন, তার নিরপরাধ স্ত্রী-পুত্রকে শাস্তি দেওয়ার অধিকার আমাদের আছে কি? বিশেষত আমাদের একান্ত অসময়ে আহার দিয়ে, আশ্রয় দিয়ে যিনি আমাদিগকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন, তাঁকে আজ বিমুখ করে ফিরিয়ে দিলে আমার অপরাধ, আমার অকৃতজ্ঞতা কত বড় ভয়ানক হয়ে পড়বে ভাবুন দেখি।"

একটুক্ষণ ভাবিয়া লইয়া ডাক্তার-গৃহিণী বলিলেন,—"না; তাঁকে তুমি কিছুতেই বিমুখ কর্‌তে পার না। দেও তবে,—মোকদ্দমা ছেড়েই দেও। তোমার অভিভাবকেরা যা বলেন সেই রকমই কর।"

এমন সময় ডাক্তারবাবু ডাকিলেন,—"দুলালী!"

'এখন তবে আসি" বলিয়া যুক্তকরে নমস্কার করিয়া দুলালী আশুবাবু ও ডাক্তারবাবুর নিকট আসিল।

ডাক্তার বোস কহিলেন,—"আশুবাবুর কাছে আমি এতক্ষণ ধরে সব কথা শুনলাম। তোমার জন্ম-বৃত্তান্ত শুনে আমি যে কি অপরিসীম আনন্দলাভ করেছি, তা প্রকাশ করার শক্তি আমার নেই। তোমার সুন্দর পবিত্র জীবন শীঘ্রই আরও মধুময় হয়ে উঠ্‌বে। আজ আমাকে এখুনি বেরুতে হচ্ছে; একটি কঠিন রোগী দেখতে যেতে হবে। মোকদ্দমা ছেড়ে দেওয়া সম্বন্ধে আমার অমত নেই;—বরং এই সব অপ্রিয় ব্যাপার নিয়ে কাছারীতে দাঁড়াতে না হ'লেই ভাল। কিন্তু আমি একটি সর্ত্তে মোকদ্দমা ছাড়তে রাজি আছি। সে আমাদের দশজনের সামনে তোমাকে 'মা' বলে সম্বোধন করবে এবং ক্ষমা চাইবে। তবেই মোকদ্দমা ছাড়া হবে;—নতুবা হবে না। মোকদ্দমা চল্‌লে কিন্তু কিছুতেই তার নিস্তার নেই;—তাকে শেষ করার পক্ষে আমার একার সাক্ষ্যই যথেষ্ট।"

আশুবাবু বলিলেন,—"তা বেশ; অতি সুন্দর কথাই বলেছেন আপনি। আমরা এখন উঠি; আপনাকে আর দেরি করাব না।" তারপর হাতজোড় করিয়া বলিলেন,—"কাল প্রাতে অনুগ্রহ করে যদি আমার ওখানে একটু চা খেতে যান তা হ'লে বড় কৃতার্থ হব। নরেন্দ্রবাবুও আসবেন। তখন অমনি যা হয় একটা চূড়ান্ত মীমাংসাও করে ফেলা যাবে। দেবেন্দ্রবাবুর সঙ্গেও আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেব। বড় চমৎকার ভদ্রলোক; —শুধু লজ্জায় পড়ে কা'রও সঙ্গে দেখা করতে পারছেন না।"

যাচ্ছে—আর গ্র্যান'থারের কণ্ঠে ফুটে উঠ্‌ছে উল্লাসের চীৎকার —পরিচিত অপরিচিতের প্রতি আপ্যায়ন বাণী। মাঝে মাঝে তার ছেলেবেলাকার মেলা দেখার আজব গল্প বলে আমায় হাসিয়ে সারা করছিল। আমি যে মেলা দেখ্‌তে যাই নি একটিবারও—এতে গ্র্যান'থার একেবারে স্তম্ভিত!

'জানিস্‌ জো-ই তোর বয়সে আমি পালিয়ে দেখে নিয়েছি দু-দুটো মেলা আর এক দফা ঠেঙানি।'

'খুব বুঝি চাবুক কষেছিল?' কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম।

'চাবুক নয় বেত, আমি শপথ করে বলতে পারি।' বলেই হা-হা করে হেসে উঠ্‌ল।

"তার প্রতিটি কথায় দুনিয়াটা যেন অসীম বড় হয়ে আমার চোখে ফুটে উঠতে লাগ্‌ল।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া অধ্যাপক ম্যালরি একবার হাঁফ ছাড়িতে থামিলেন। হাসি ফুটিয়া উঠিল তাঁহার মুখে সেই প্রাচীন স্মৃতির উন্মেষে।—"ওঃ কি দিনই ছিল সে সব।"

"জান ফারাম্ব, তখনকার দিনে টাকাকড়ি বড় একটা কারু হাতে ছিল না। গ্র্যান'থারের ৬ ডলার ৪৩ সেণ্ট দিয়ে আমরা কত কি-ই না করলাম। বুড়ীর তেলের থলির মত তা যেন অনন্ত কাল কাটিয়ে উঠ্‌ল। পিপের মত মোটা আর বেঁটে মহিলা (fat lady) দেখতে ঢুকলাম। সে সময় মনে হয়েছিল ওর ওজন দশ মণের কম হবে না। ঠাকুরদার বেপরোয়া নির্ভীকতায় তাজ্জব বনে গেলাম, যখন সে মহিলাটিকে জিজ্ঞেস করে ফেল্‌ল— ক'সের তার খোরাক আর নিজের হাতে চুল বাঁধতে পারে কি না আর ক'গজ মখমলে তার পোষাক তৈরী হয়। কি আশ্চর্য্য! চলে আসবার বেলা মহিলাটি এক থলে বাদাম দিয়ে দিল আমাদের উপহার।

"তারপর দেখলাম কুকুর মুখো ছেলেটাকে; আমার মোটেই ভাল লাগে নি। গ্র্যান'থার কিন্তু খোলাখুলি শাদা কথায় তার সন্দেহ প্রকাশ করে ফেললে যে—কুকুরের মত গোঁফ্‌ ছোকরাটার মুখে গঁদ দিয়ে এঁটে দেওয়া হয়েছে। এর পরে আমরা ঘুরে বেড়ালাম যেখানে ঘোড়া, গরু, শুয়োরগুলো রাখা-ছিল বিক্রির জন্যে। রেলিং-য়ের ফাঁক দিয়ে হাত গলিয়ে একটা শুয়োরের পিঠে আমি খিম্‌চি কেটে দিলাম। মেয়েদের মহলটাও দেখে এলাম। সারি সারি সাজান 'জার'—কি তার দেখ্‌ব? কিন্তু তা দেখেই ঠাকুরদার মনে পড়ল যে ক্ষিদে পেয়েছে, এবারে খেতে হবে। তাঁবু খাটিয়ে বসান একটা রেস্তোরাঁতে আমরা ঢুকে পড়লাম। ওদের ফর্দ্দে সব চেয়ে বেশী দামী যে খাবার ছিল গ্র্যান'থার তারই অর্ডার দিলে।

"লাঞ্চের পর নাগরদোলার মোহে আকৃষ্ট হলাম। ওটা ঠাকুরদার কাছেও যেমন নতুন, আমার কাছেও তেমনই। একটা ছেড়ে অন্যটা এমনি করে যত রকম আসন ছিল দোলায় তার একটাও বাদ দেওয়া হ'ল না। ঠাকুরদা এক হাতে মরিয়া হয়ে আঁকড়ে ধরে বসে আছে—দোলা ঘুরছে—ঘুরছে—ঠাকুরদার সে কি ফুর্ত্তি! মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে বল্‌ছে আমায়—'আশ মিটিয়ে চেপে নে জো-ই, রাজা সলোমনও বল্‌তে পারে না কবে আবার এ রকম সুযোগ মিলবে এ জীবনে।' শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে দোলা থেকে নেমে ভিড়ের পিছু পিছু চল্‌লাম ঘোড় দৌড়ের মাঠের দিকে। গ্র্যান'থারের মুখে খই ফুট্‌ছে 'রেস'-য়ের আদব-কায়দা খুঁটিনাটি নিয়ে। এমনই সে সব বুক্‌নি আজব যে, আমাদের পাশে দাঁড়ান এক তরুণ হেসে ফেললে! আর যায় কোথা! ঠাকুরদা তাকে পেয়ে বস্‌ল, উত্তেজনার আধিক্যে একেবারে খতিয়ে তোৎলিয়ে বলে ফেল্‌লে— "সামনের রেস-য়ে কোন্‌ ঘোড়াটা জিত্‌বে আমি বলে দিচ্ছি—ধর বাজি পঞ্চাশ সেণ্ট।"

"বেশ ধরলুম বাজি।" হেসে হেসে বল্‌লে সে তরুণটি।

"ঠাকুরদা আঙুল দিয়ে দেখালে একটা মোটা-সোটা কালো ঘোড়া। কিন্তু সেটা এল প্রায় সব ক'টার শেষে। তা হলে কি হবে ঠাকুরদা দমে যাবার পাত্তর নয়। ৫০ সেণ্ট শোধ করে দিতে দিতে বল্‌লে—"এক-আধটা ভুলচুক অমন হয়েই থাকে, সবারই হয়। আচ্ছা এবারে ধর বাজি এক ডলার। এবার ঠিক ধরে দেব।" তরুণও লোভেই হোক আর ঠাকুরদাটি যে কি রকম ঘোড়াদৌড়ে ওস্তাদ তা চিনে ফেলেই হোক খুশীর সঙ্গে ফের সে বাজিও ধরলে হাস্‌তে হাস্‌তে। আমার কিন্তু মুখ শুকিয়ে গেল—কারণ ঠাকুরদার কাছে তখন সবে মাত্র রয়েছে ৮৭ সেণ্ট। আমার রকম-সকম দেখে ঠাকুরদা চোখের ইসারায় আমায় চুপ করে থাক্‌তে বল্‌লে তরুণটি না দেখ্‌তে পায় এমনি কায়দায়।

"আমাদের ঘোড়াটাই এবার জিত্‌ল। আমরা যেন সারা দুনিয়া জুড়ে দিগ্বিজয় করে ফেলেছি—এমনিভাবেই লাফিয়ে উঠলাম আর হল্লা-হুল্লোড় সুরু করলাম। ঠাকুরদা ত টুপীটা উড়িয়ে দিলে মহাশূন্যে।

"এইবার আমাদের বাড়ী ফেরাই ঠিক হল। ঘোড়া পেগির দানাপানির খরচ দেওয়া হ'ল। বাড়ীর সবার জন্য টুকু-ওটুকু নানা নগণ্য জিনিষ কেনা হ'ল। বাকি যে ক' সেণ্ট রইল তা দিয়ে লেমনেড্‌ খাওয়া হ'ল। ঠাকুরদা বল্‌লে— 'করবেই যখন কোন কাজ, একেবারে তাতে ডুব দেবে মাথার চুলের গোছা ডুবিয়ে।' ধুলোয় ধুসর, কপর্দ্দকহীন, খুঁটিনাটি জিনিষের বহরে নুয়ে পড়া, দেহে ও মনে একেবারে অবসাদ-গ্রস্ত—আমরা কোন রকমে হামাগুড়ি দিয়ে আমাদের আধ-ভাঙা খুদে বাক্সপানা গাড়ীতে উঠে গা এলিয়ে দিলাম। এবারে পেগ কিন্তু বাড়ীমুখো চল্‌ল বেশ যেন চট্‌পটে হয়ে। ফিরতি পথে আমাদের মুখে আর 'রা' ছিল না। কেবল ঠাকুরদা মাঝে মাঝে বলে উঠ্‌ছিল—'ওটার পিঠ্‌ দেখেই ত বাজি রেখেছিলুম। গোটা দঙ্গলের ভিতর তবু ওটারই যা হোক ছিল পিঠ যাকে বলে। তা নইলে সেই যে শাদাটা, আরে ছিঃ ওটা ত একটা গরু বল্‌লেই চলে।'

"ক্রমে বেলা পড়ে এল। ঠাণ্ডা বাতাস বইতে লাগ্‌ল। ঠাকুরদার হাঁফানি চাগাড় দিয়ে উঠ্‌ল। থেকে থেকে খক্‌ খক্‌ কাশি—তাছাড়া গ্র্যান'থার একেবারে নীরব!

"শেষ সাঁঝের আমেজ পড়ে চারদিক প্রায় আঁধার হয়ে উঠেছে। পেগির পা যেন আর চলে না। পাহাড়ের গায়ে চড়াই পথ—গাড়ী থম্‌কে থম্‌কে উঠ্‌ছে অতি ধীরে। ঠাকুরদা তড়াক্‌ করে লাফিয়ে পড়্‌ল রাস্তায়, তারপর পেগির মুখের লাগাম ধরে টেনে নিয়ে চল্‌ল চড়াই পথে। ঐ যে আমাদের বাড়ী দেখা যাচ্ছে অবশেষে, হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

গাড়ীর শব্দে বাবা এল ছুটে হুড়মুড় করে হাতে একটি লণ্ঠন—আদেশের সুরে কৈফিয়ৎ তলব করলে—"কোথায় গেছলে তোমরা?"—বাবার মুখ কালো এবং নিদারুণ দৃঢ়তাব্যঞ্জক। কাশি আর সচকিত মনোভাবের পেষণে যেটুকু বিজয়ীর গর্ব্ব তখনও অবশিষ্ট ছিল, তারই বিচিত্র স্ফুরণে গ্র্যান'থার করুণ কণ্ঠে বলে উঠল পরিষ্কার—"কেন, মেলায় গেছলাম আমরা।" কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই বেহুঁস্ হয়ে পড়ে গেল ঠাকুরদা পথের ধুলোয়। বাবা ত গ্র্যান'থারকে তুলে বয়ে বাড়ী আনতে ব্যস্ত। আমি এই তক্কে—দে ছুট্—একেবারে শয্যার আশ্রয়ে গিয়ে গা-ঢাকা দিলুম বেমালুম।

"বুঝলে, এই হ'ল আমাদের সে দিনের পালা শেষ। আমার গোটা দেহ যেন কেউ দলে পিষে দিয়েছে, রাতের খাবারের ডাকেও উঠতে মন সরলো না। একটু বাদেই ঘুমিয়ে পড়লাম। ওদিকে বাড়ীতে সুরু হ'ল বিষম উত্তেজনা—ঠাকুরদার জন্যে ডাক্তার ডাকবার। সারা রাত আর কিছুই আমি জানি নি। শুধু মনে আছে ভোরের বেলা মা আমার ঝাঁকুনি দিয়ে জাগিয়ে দিলে—'ওঠ্ ওঠ্ জো-ই, তোর ঠাকুরদা তোর সঙ্গে কথা কইতে চাইছে। সারারাত ভয়ানক কষ্ট পেয়েছে; এখন ডাক্তারের মনোভাব যে তোর ঠাকুরদা মৃত্যু-শয্যায়—সব শেষ হবার আর বেশী বাকি নেই।'

'শুনে ভারী ব্যথা পেলুম মনে। নিঃসাড়ে মার পিছু পিছু গেলাম রোগীর ঘরে—বাড়ীর সবাই সেখানে জড়ো হয়েছে। একটা বলের মত গুটিশুটি মেরে গ্র্যান'থার তাল পাকিয়ে রয়েছে। গোঁ-গোঁ এমন কাতরকণ্ঠে গোঙাচ্ছে যে আমার মনে হ'ল যেন হিম-শীতল তুষার কেউ আমার মাথার চুলের গোড়ায় চেপে ধরেছে। কিন্তু আধ-মিনিট কি তেমনি সময় পরে একটা দীর্ঘ শ্বাস ফেলে ঠাকুরদা লম্বা হয়ে হাত-পা ছড়ালে। আমার দিকে তাকালে আর মুখে হাসিরেখা ফুটাতে চেষ্টা করলে।

"কেমনরে, খুব মজা হয়েছিল, নারে জো-ই?" খুশীর আমেজে তার সুর ভরপুর; পর মুহূর্ত্তেই চোখ বুজে শান্তিময় ঘুমের আরামে মজে রইল।"

"মরে গেল নাকি?" তরুণ অধ্যাপক উৎকণ্ঠার সঙ্গে জিজ্ঞেস করে প্রবীণ অধ্যাপকের দিকে চোখ মেলে ধরলে আতঙ্কে।

"মরে গেল? ঠাকুরদা পেণ্ডলটন? বিশেষ কিছু নয়। পরের দিন ভোরবেলা লাঠিভর করে টলতে টলতে এল সে—শাদা ফ্যাকাসে যেন ভূত—কণ্ঠ গেছে বুজে—পা দুটো ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। প্রাতরাশের পরও একঘণ্টা বাড়ীর সবাইকে সে বসিয়ে রাখলে ভোজন-টেবিলে; অস্ফুট ফিস্ ফিস্ করে বলে চলল—মেলার সব ঘটনা। সব শুনে বাবা খুশী হয়ে বললে আসছে বছর মেলায় আমাদের সবাইকে নিয়ে যাবে। এর পর ফটকে বসে ঠাকুরদা এক মনে দেখতে লাগল পেগ্ ঘোড়াটির মাঠে চরে ঘাস খাওয়া। আমি যখন সেখানে এলাম, আমায় হাতছানি দিয়ে ডেকে, কানের কাছে মুখ এনে বললে—

"সেই যে ৭নং ডাক্তার, ওটা গড়িয়ে যাচ্ছে পাহাড়ের তলা দিকে, শুনলাম।" নিজে নিজেই এক দফা হেসে নিলে। হাসির সঙ্গে কাশির বেগ কেটে গেলে আবার বললে—"আমি তোকে বলছি জো-ই সুদীর্ঘকাল আমি কাটিয়েছি, আর শিখেছিও ঢের নানা মানুষের হাবভাব দেখে। মুস্কিল হচ্ছে কি জানিস্—এরা সবাই হ'ল একেবারে ভীতু বেড়ালের মত। জোয়াবোম্ ওয়ার্নার বলত—সে ছিল আমার একই রেজিমেণ্টে ১৮১২ সালে—সে বলত, জীবনের কারবারটা ভালভাবে চালাতে হলে, প্রাণের হাতেই দিতে হবে কাস্তে, সে যেমন খুশী ফসল কেটে চলুক। আর যদি তুমি ভীতু হুঁসিয়ার হয়ে আধাআধি বাঁচার পথ নাও—তবে বাকি অর্দ্ধেক মরেই তোমার বাঁচতে হবে। অমন জীয়ন্তে মরার বদ অভ্যাস বাসা বেঁধেছে তোমাদের বুকখানার ভিতরে।

"জোয়াবোম্ বলেছিল সেই সন্ধ্যেবেলা—লাণ্ডিজ লেন লড়ায়ের আগের দিন, পরের দিন সে হত হ'ল। কেউ বাঁচে, কেউ বেঁচেও মরা; কিন্তু যে লোক পুরোপুরি বাঁচে, সে-ই সুখে মরতে পারে। এ হ'ল হক কথা। আমার মটো কি বলছি তোকে........."

প্রফেসর ম্যালরি দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং তরুণ সহকারীর দিকে করুণার দৃষ্টিপাত করিয়া বাঁ হাতের তেলোর উপর ডান হাতের তেলো সজোরে আঘাত করিয়া দরাজ গলায় বলিলেন—ঠাকুরদার সেই মটো হচ্ছে—যতক্ষণ বেঁচে আছ বাঁচার মত বেঁচে থাক! তারপর মৃত্যু যেদিন আহ্বান জানাবে, হাসিমুখে তার সঙ্গে করমর্দ্দন করে ইহলীলা সাঙ্গ করে দাও। ব্যস।"*

---

*ডরোথি ক্যানফিল্ড্-য়ের "দি হে-ডে অব্ দি ব্লাড্"-য়ের অনুবাদ।

বিচিত্র বার্ত্তা

এক 'বাইসিকেলে' সমগ্র পরিবার

সুইজারল্যাণ্ডের ডেনোডিঙ্গেন নামক শহরের এক মেকানিক আপন সমগ্র পরিবারের ব্যবহারের জন্য একটি 'বাইসিকেল' গাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছে। উহাতে নয়জন বসিতে পারে। মেকানিক, তাহার স্ত্রী এবং তাহাদের সাতটি ছেলে-মেয়ে ঐ একখানি গাড়ীতে চাপিয়াই ছুটির দিনে বেড়াইতে বাহির হয়। কিন্তু গাড়ীখানিতে বাইসিকেলের মত দুই-খানি চাকা না হইয়া রহিয়াছে চারখানা চাকা। আর একক উহাকে চালান যায় না—পা দিয়া 'পেডাল' করিতে হয় পাঁচ-জনের। সর্ব্ব-সম্মুখে মেকানিক ও স্ত্রী পাশাপাশি বসিয়া পেডাল করে, তাহাদের পশ্চাতে দুইটি বড় মেয়ে ও এক পুত্র—এই তিনজন পাশাপাশি বসিয়া পেডাল করে। অপর চারিটি ছোট ছেলেমেয়ে একেবারে পশ্চাতের সারির আসনে বসিয়া থাকে, উহাদের আর পেডাল করার শ্রমে নিযুক্ত হইতে হয় না। গাড়ীখানিকে ঘুরান বাঁকান হয় মোটর-গাড়ীর মত একটি হুইল দ্বারা—হুইলটি থাকে মেকানিক ও তাহার স্ত্রীর আসনের সম্মুখে ঠিক মাঝখানে।

যুদ্ধ সমাপ্তির পরে ব্যয়

মার্কিন সরকার হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, প্রকৃত যুদ্ধ-সময়ে যে ব্যয় হয়, যুদ্ধান্তে দীর্ঘকাল যে অপটু ও মৃত সৈনিকের পেনশন্ দেওয়া হয় তাহাতে ঐ ব্যয়ের অর্দ্ধ ত হয়ই, কোন কোন ক্ষেত্রে তাহা অপেক্ষাও বেশী খরচ করিতে হয়। আর উত্তরোত্তর এই পরবর্ত্তী পেনশন্ খরচ বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৮১২ সালের যুদ্ধে ব্যয় হয় ১১০,৬২৪,০০০ ডলার আর পেনশনে খরচ হয় ৪৬,২১৬,০০০ ডলার। ১৮৮৪ সালে অর্থাৎ অন্তর্বিদ্রোহের ১৯ বৎসর পরে পেন-শনের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৫০ মিলিয়ন ডলারে। মহা-সমরের সমাপ্তির ১৯ বৎসর পরে পেনশন্ পরিমাণ দাঁড়ায় উহার ২০ গুণ। কাজেই বলিতে হয়, সমর সমাপ্ত হইবার পরেই উহার বেশীর ভাগ ব্যয় আরম্ভ হয়। বিগত মহা-সমরের অন্তে পেনশনের অঙ্ক যেভাবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সমর অপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে, ভাবী সমরের পরে ঐ অঙ্ক আর কতগুণ বৃদ্ধি পাইবে, তাহার গবেষণা এখনই চলিতেছে।

প্রকাশ্য দিবালোকে চুরির আহ্বান

টরোণ্টোর কোনও পরিচ্ছদের দোকানে এক রাত্রিতে চুরি হয়। চতুর দোকানদার ঐ ঘটনা দ্বারা বিজ্ঞাপন প্রচার করিতে তালাভাঙ্গা সিন্ধুকটি জানালায় প্রদর্শিত করে। পাশে থাকে তালা ভাঙ্গিবার যন্ত্রপাতি, টর্চ্চ প্রভৃতি। ফ্রেমে বাঁধা থাকে সংবাদপত্র হইতে কর্ত্তিত চুরির বিবরণ আর চুরির দৃশ্যের একখানি ফটো। আর একখানা কার্ডে বড় বড় হরপে লেখা হয়—

রাত্রিতে তালা ভাঙ্গিয়া চোরগুলা আমাদের বেসাতি লুণ্ঠন করিয়া নেয়—আপনারা আসুন, প্রকাশ্য দিবালোকে আমাদের ষ্টোর লুণ্ঠন করুন আশাতীত হ্রাস মূল্যে।

এই অভিনব বিজ্ঞাপনে দোকানদারের উদ্দেশ্য সাধিত হইল। দলে দলে লোক ষ্টোরে প্রবেশ করিতে লাগিল।

আনম তরুণীর বীর প্রণয়ী

সকল দেশের তরুণীই বীর প্রণয়ীকে পূজা করিয়া থাকে, কিন্তু বীরত্বের নিদর্শন সকল দেশের তরুণীর চক্ষে সমান নহে। আনমের তরুণীদেরও আদর্শ-বীরের প্রতি শ্রদ্ধা যে থাকিবে, ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই; কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে তাহাদের এই বীরত্ব-আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা এত উচ্চ স্তরের যে প্রণয়ীর দেহ-সৌন্দর্যের কোনই স্থান নাই তরুণীর মনে। কোনও গ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী তরুণীর পাণিপ্রার্থী হয় এক কুব্জপৃষ্ঠ কদাকার তরুণ। কুব্জ হইলেও তরুণ অতিশয় বলশালী। তরুণী প্রথমত উহার প্রেম-নিবেদন অগ্রাহ্য করে; কিন্তু কুব্জ তরুণ তাহার পিছনে লাগিয়াই থাকে। পরিশেষে কুব্জের অনুরাগ পরীক্ষার জন্য তরুণী বলে—তুমি যেদিন লাল পিপীলিকার নীড় মুখে করিয়া আনিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইবে জীবন্ত পিপীলিকাসহ, সেইদিন তোমাকে বিবাহ করিব। কুব্জ তরুণ উল্লসিত হইয়া সত্যসত্যই লাল পিপীলিকাসহ নীড় মুখে করিয়া তরুণীর নিকটে আসিল। তরুণীও উহাকে বিবাহ করিতে রাজি হইল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অগণিত পিপীলিকার কামড়ে তরুণ সেই মুহূর্তেই মূর্চ্ছাগত হইল, তাহার মূর্চ্ছা আর ভাঙিল না।

জিনরিকিষার আবিষ্কার

অনেকেরই বিশ্বাস, রিক্সা গাড়ী জাপানীদের দ্বারাই আবিষ্কৃত; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নয়। জাপানের ইয়কোহামা নগরে প্রথম এই জিনরিকিষার উদয় হইলেও উহার আবিষ্কর্তা একজন মিশনারী—আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশনের রেভারেন্ড জোনাথান গোব্‌ল্। তাঁহার রুগ্ন স্ত্রীকে বিনা ব্যয়ে উন্মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণের সুযোগ দান করিবার জন্য, ১৮৭১ সালে রেভারেন্ড গোব্‌ল্ জাপানী মিস্ত্রী দ্বারা জিনরিকিষা প্রস্তুত করান। গোডিজ লোডিজ বুক হইতে শিশুদের গাড়ীর ছবিকে আদর্শ করিয়া এইটি তৈরী হয়। ফলে জাপানে পাল্কী প্রভৃতির রেওয়াজ উঠিয়া যায়। জিনরিকিষা সর্বত্র ছাইয়া যায় যেখানে শ্রমিকের মজুরী অতিশয় সুলভ।

বাদুড়-দেবতার মন্দির

বালিদ্বীপে বহুপ্রকার দেবমন্দির রহিয়াছে, যাহা দর্শকদের বিস্ময় উৎপাদন করে। গণেশ বা গজ-দেবতার মন্দির, পবিত্র মর্কট-মন্দির—এইগুলি পাহাড়ের গাত্র কাটিয়া গুহার আকারে প্রস্তুত। সাঙেহ নামক গুহার মর্কটগুলিকে আহার প্রদান সকল তীর্থযাত্রীরই কর্তব্য। গণেশ গুহা মন্দিরে প্রধান করণীয় হইল এক গোছা বিড়ালী পোড়ান। অপর একটি গুহায় রহিয়াছে হাজার হাজার বাদুড় সেখানেও পূজা দিতে হয়। সেই দেশবাসীর বিশ্বাস, যে মেয়ে অথবা ছেলের বিবাহ হয় না সে একক এই মন্দিরে যাইয়া বাদুড় দেবতার যথাবিধি পূজা করিলে অগৌণে তাহাদের বিবাহ হইয়া যাইবে। কিন্তু কৃচ্ছ্রসাধন হইল এইটুকু যে—বাদুড়-দেবতার গুহা নজরে পড়া মাত্র বাকি পথ হামাগুড়ি দিয়া চলিতে হইবে। এই প্রকারে দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করিলে মানস সিদ্ধি হইবে না।

আদিম জাতীয়ের প্রেম নিবেদন

কোচিন-চীনের রাজধানী সায়গন হইতে বনমধ্যে চিতা শিকারে গমনকালে আমেরিকান মহিলা পর্যটক গ্রেস টমসন সেটন মুং-জাতীয় গাইড একটি সঙ্গে লইয়া যান। আদিম জাতীয় হইলেও উহাদেরও যে প্রাণ আছে—সভ্য মানবের ন্যায় অনুভূতি আছে, ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ মহিলা বলেন—

সন্ধ্যাকালে বনমধ্যে তাঁবু খাটান হয়—অশ্বতরের পৃষ্ঠে উহা বহন করিয়া আনা হইয়াছে। মাঝে পার্টিশান দিয়া ঐ ক্ষুদ্র তাঁবুরই দুই প্রকোষ্ঠ করা হয়। একটিতে আমি শয়ন করিব, অপরটিতে থাকিবে গাইড। শয্যা রচনা হইলে উভয়ে একস্থানে বসিলাম আহার করিতে—ভাত, আপেলের মত বন্য আম আর শূকর মাংসের বংশদণ্ডে ঝলসান কাবাব। আহারকালে গাইড বলে—"মাদাম, আমি এখানে হাজির আপনি যাহা চাহিবেন, তাহাই করিয়া দিতে। আজ এ রাতে আমরা নিতান্তই নিরালা—আমরা দুইজন—আর কোথাও জনমানুষ নাই—আমি আর আপনি নেহাৎ সঙ্গীহীন একাকী রহিয়াছি।" গাইডের কথায় মনে হইল মানবের আদিম প্রবৃত্তির—নর-নারীর শাশ্বত আকর্ষণের অভিব্যক্তিই সে প্রদর্শন করিতেছে। যখন প্রতি মুহূর্তে বাহির হইতে দুরন্ত বন্যপশুর আক্রমণের ভয়, তখন এই নর-নারী সম্পর্কের নব উন্মেষকে যেন অন্তর হইতে প্রেরণা দান করে। আহারান্তে পার্টিশানের দুই প্রান্তে দুইজন শয়ন করিলাম। কিন্তু অল্প পরেই গাইডকে ডাকিতে হইল, পিঁপড়ার কামড়ে—প্রেম-নিবেদন জন্য নয়। সে হৃষ্টচিত্তেই অনুগত ভৃত্যের মত আসিল। পিঁপড়ার কামড়ে ঘুমাইতে পারিতেছিলাম না। পিঁপড়া মারিবার আরক ছড়াইয়া সে আমার শয্যা নিষ্কণ্টক করিয়া নিজ স্থানে যাইয়া শয়ন করিল। অদ্ভুত পারিপার্শ্বিক হইলেও ঘুমের ব্যাঘাত আর হয় নাই।

দিলদরিয়া রেলযাত্রী

বসন্তকালের আরম্ভ হইতে শীতকাল পর্যন্ত মিঃ উইলিয়াম ডিয়েট্রিচ্ ট্রেনের যে কামরায় নিউ জারসির ব্লুমফিল্ড হইতে ভ্রমণ করেন, সে কামরার সকল আরোহীকে একটি করিয়া সুগন্ধ গোলাপ উপহার দেন তাহাদের কোটে পরিধান করিবার জন্য। ১৯৩৩ সাল হইতে উহা আরম্ভ হয়—তখন দৈবাৎ তাঁহার সঙ্গে একটি ফুল বেশী আসে এবং সেই ফুলটি এক সহযাত্রীকে উপহার দান করেন। ক্রমে ফুলের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে—বর্তমানে তাঁহার এক ঘণ্টা সময় লাগে প্রচুর সংখ্যায় ফুল বাগান হইতে কর্তনে, যাহাতে তিনি কামরার সকলকেই একটি করিয়া ফুল দিতে পারেন। আরোহীরাও সকলে চিনিয়া ফেলিয়াছে, তাই তিনি যে ধূমপান-নিষিদ্ধ কক্ষে ভ্রমণ করেন, পুষ্প পাইতে ইচ্ছুক আরোহিগণ সেই কামরায়ই আসিয়া উঠে। এবং একটি করিয়া ফুল পাওয়া যেন তাহাদের ন্যায্য অধিকার, ইহাই মনে করে।

বল্গা-হরিণের কুয়াসা-আকাশ

বল্গা-হরিণ বরফের দেশের জীব। তুষার-পাত ও নিদারুণ শীতে উহা কাবু হয় না কিছুমাত্র। উহার পুরু পশমাবৃত চর্ম্মই উহাকে আরামে রাখে কড়া শীতের সময়। কিন্তু যেমন শীতের আমেজ কমিতে থাকে, উহার লম্বা লম্বা পশম ঝরিয়া পড়ে। শীতান্তে যেমন আমরা গরম জামা-কাপড় বর্জ্জন করিয়া মিহি সূতী জামা পরি, কতকটা সেই রকম আর কি! কিন্তু এই কম-জোর শীতের সময় সদা-সর্ব্বদা

উহাদের উপর শূন্যে ঝুলিয়া থাকে মেঘাকৃতি কুয়াসা। উহারা স্থির হইয়া দাঁড়াইলে উহাদের সেই কুয়াসার আকাশও স্থির হয়, উহারা চলিতে থাকিলে আকাশও সচল হয়। কারণ উহাদের ত্বকে যে প্রচুর ঘর্ম্মের উদয় হয়, তাহা বাষ্পাকারে ঐ কুয়াসার সৃষ্টি করে। কিন্তু কড়া শীতের সময় ঐ প্রকার কুয়াসার আবির্ভাব হয় না, কারণ তখন উহাদের ত্বকে ঘর্ম্ম উন্মুক্ত হয় না।

দন্ত উৎপাটন

ইংলণ্ডে কিম্বদন্তী আজও প্রবল যে রাজা জন ইহুদী-দিগের নিকট হইতে ধনরত্ন আদায় করিবার এক উপায় অবলম্বন করেন। ইংলণ্ডবাসীদের মতে সে উপায় ছিল নির্ম্মমতায় নিতান্তই মৃদু। আদেশ-নির্দেশে বাঞ্ছিত ধনলাভ হইল না দেখিয়া রাজা জন বাছিয়া বাছিয়া ধনাঢ্য ইহুদের বন্দী করিয়া আনিতেন। কত টাকা রাজকোষে প্রদানে তাহারা তাহাদের স্বাধীনতা ক্রয় করিতে পারিবে তাহা শুনাইয়া দেওয়া হইত। ইহাতেও যদি ঐ ইহুদ অর্থ প্রদানে স্বীকৃত না হইত, তাহা হইলে তাহার দন্ত উৎপাটনের আদেশ দেওয়া হইত। দন্ত উৎপাটনের কার্য্যটি একবারেই সমাধা করা হইত না—তাহাও করা হইত কিস্তিতে কিস্তিতে (instalments)। একটি দন্তকেই ৪।৫ খণ্ডে উৎপাটন করিবার ব্যবস্থা হইত। তৎপর আবার দ্বিতীয় দন্তটিকে। এই প্রকারে যতক্ষণে না ইহুদ ধনিক প্রার্থিত অর্থ প্রদানে প্রস্তুত হইত, ততক্ষণ পর্যন্ত 'মৃদু' এই দন্ত-পঙক্তি উৎপাটন ক্রিয়াটি চলিতেই থাকিত। তবে রাজা জন অতিশয় দয়ালু ছিলেন কোন ইহুদ ধনিককে প্রহার করিতে আদেশ দিতেন না। তাহা হইলেও দেশবিদেশে যে ভাবে ইহুদী-নির্য্যাতন চলিয়াছে, তাহার তুলনায় এই মৃদু ক্রিয়া হয়ত প্রকৃতই মৃদু।

মাছের লেজের বাহার

সাধারণত আমরা যে মাছ দেখি, উহাদের লেজ অথবা ল্যাজা থাকে বটে, কিন্তু জলের ভিতর নৌকার হালের মত উহাদের গতি নিয়ন্ত্রণেই উহা সাহায্য করে, অন্য কোন কাজ ঐ ল্যাজা হইতে মাছেরা পায় না। কিন্তু এমন মাছও আছে দুই-একটি যেগুলি মর্কটের মতই লেজটিকে ব্যবহার করিতে পারে। মর্কট-শ্রেণী গাছের ডালে লেজ জড়াইয়া খাসা দোল খাইতে পারে—লেজে উহাদের শক্তিও অসাধারণ, তাই লেজ
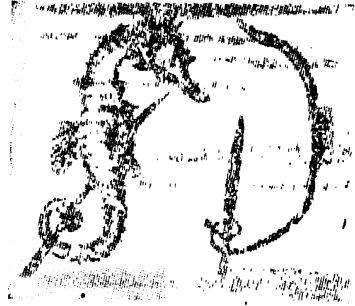
ঐ শ্রেণীর নিকট অতিরিক্ত একখানি হাতের কাজ করিয়া থাকে। সাগর-ঘোড়া (Sea-Horse) এবং নল-মাছ (Pipe-fish)— এই দুইটি অদ্ভুত আকারের মাছ উহাদের লেজটিকে কতকটা মর্কটের মতই কাজে লাগায়। অধিক স্রোতের টান এড়াইয়া উহারা থাকিতে পারে জলের তলের কোন উদ্ভিদ কিম্বা অন্য আশ্রয়ের গায়ে লেজ জড়াইয়া। সাগর-ঘোড়া দেখিতে কতকটা কাল্পনিক জলজন্তু 'মকর' বলিয়া যাহার নাম শুনি তাহারই মত, তবে আকারে অতি ক্ষুদ্র। আর নল-মাছ ত নামেই ধরা পড়ে—কেঁচোর মতই কতকটা দেখিতে।

স্কি (Ski) শব্দে জার্ম্মান প্রভাব

"Ski" শব্দটি কিছুকাল পূর্ব্বেও "স্কি" উচ্চারিত হইত। কিন্তু জার্ম্মান উচ্চারণের ফ্যাশান এমনই প্রসার লাভ করিয়াছে ইউরোপে যে উহা এখন শী বলিয়া উচ্চারিত হয়। কেবল আমেরিকা এখনও এই জার্ম্মান প্রভাব অতিক্রম করিয়া রহিয়াছে —তাহারা পূর্ব্ববৎ স্কিই উচ্চারণ করিতেছে।

দুগ্ধ-রোগে মৃত্যু

১৮১৮ সালের অক্টোবর মাসে এব্রাহাম লিঙ্কনের মাতা ন্যান্সি হ্যাঙ্কস লিঙ্কন দুগ্ধ রোগে মারা যান। "পিজিয়ন ক্রিক" পল্লীতে এই রোগের প্রাদুর্ভাবে বহু লোক মারা যায়। শেষে অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে উপনিবেশিক শ্বেতাঙ্গ-গণ ঐ স্থান পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করে। পরিশেষে নানা প্রকার পরীক্ষার ফলে রোগের হেতু নির্ণীত হয়। "স্নেক-রূট" নামক এক প্রকার জলজ লতা অতি তীব্র বিষাক্ত। যে গরু ঐ লতা খায়, তাহার দুধ বা সেই দুধ হইতে তৈরী মাখন এবং ঐ গরুর মাংস এতদূর বিষাক্ত হইয়া পড়ে যে সামান্য পরিমাণ খাইলেও মৃত্যু অনিবার্য্য।

অবিশ্বাসী

(বড় গল্প—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

১৮

মানুষে গড়ে—বিধাতা ভাঙেন।

পরদিন আলোকনাথের যাত্রা করা হইল না।

হঠাৎ সে অসুস্থ হইয়া পড়িল। গ্রামে ভাল ডাক্তার ছিল না।

অনীতা আকুল হইয়া বলিল, "তার চেয়ে নৌকায় উঠে বস, দাদা—কোন বড় গাঁয়ে গিয়ে ভাল ডাক্তার দেখাই।"

আলোকনাথ তখন দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। ক্ষীণ-কণ্ঠে বলিল, "যদি এই মাটিই আমার কেনা থাকে অনীতা—"

অনীতা সকোপ-দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া বলিল, "রোগ হ'লেই বুঝি ছেলেমানুষী বাড়ে?"

আলোকনাথ বলিল, "সত্যিই অসুখের সময় ছেলে-মানুষী ক'রতে ইচ্ছে হয়। মনে হয়, যারা আমায় ভালবাসে তারা কাছে এসে বসুক, আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দুটো মিষ্টি কথা বলুক। অনীতা, একবার ছেলেবেলায় আমার অসুখ হ'য়েছিল। আমার মনে আছে, মা সারাদিন না খেয়ে আমার শিয়রে বসে অস্থির হ'য়ে ভগবানকে ডেকেছিলেন। তাঁর হাত দুখানি মনে হচ্ছিল যেন বরফ দিয়ে তৈরী। তারপর অনেকবার ভুগেছি, কিন্তু রোগের যন্ত্রণায় তেমন মধুর শান্তি কখনও পাইনি।"

শুনিতে শুনিতে অনীতার দুটি চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। অশ্রু গোপন করিতে সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইল।

আলোকনাথ বলিল, "বড় নিষ্ঠুর আমি, না? মার কথা ব'লে তোমায় কাঁদালুম।"

অনীতা বলিল, "না, না, কাঁদব কেন?"

আলোকনাথ বলিল, "মুখ ফেরালে চোখের জল না দেখতে পারি, গলার স্বরও কি শুনতে পাই না! অনীতা, সত্যি ব'লতে কি—"

অনীতা বাধা দিয়া বলিল, "ও-সব কথা এখন থাক, আমি ডাক্তার ডাকতে পাঠাই।" বলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া তেওয়ারীকে ডাকিল।

সে আসিলে বলিল, "দেখ, মোড়লকে জিজ্ঞেস ক'রে যেখানে ভাল ডাক্তার পাওয়া যায় নিয়ে আনবে, জলদি।"

তেওয়ারী চলিয়া গেল।

আলোকনাথ বলিল, "ও-সব ভাবনা ছাড়, আমার কাছে একটু বস। একটা কথা অনীতা, তোমরা কায়স্থ, নয়?"

অনীতা মাথা নাড়িল।

আলোকনাথ বলিল, "আমরা ব্রাহ্মণ! যদিও ব্রহ্মণ্যদেবকে বহুকাল বিদায় ক'রেছি। কিন্তু ভাবছিলুম কি, তোমাদের আবার পাপ-পুণ্যের খুঁতখুঁতুনিটুকু নেই ত?"

থামিয়া অনীতা বলিল, "কেন, বল দেখি, দাদা?"

আলোকনাথ বলিল, "এমনি জিজ্ঞাসা করছি। আমায় দাদা বলে ডাক, কিন্তু মনে হয় ও পর বলে দূরে সরে থাক। যেমন চাষারা মিশতে এসে দূরে সরে গেল। না না হেস না। একটু শ্রদ্ধা—একটু ভক্তি—ওগুলো বড় বালাই কি না!"

অনীতা বলিল, "তুমি দাদা ব'লে যদি শ্রদ্ধাই করি ত সে কি খুব বালাই হয়, দাদা?"

আলোকনাথ বলিল, "বালাই এই জন্যে যে, ওগুলো মুক্তি-মার্গের অনুকূল কিনা! আমরা সংসারী—সংসারকে ছেড়ে মুক্তি নিয়ে কি ক'রব? হয়ত আমার বাপ-মা নরকে আছেন—"

বাধা দিয়া অনীতা বলিল, "ছি! ছি! ওকি কথা বল, দাদা?"

আলোকনাথ বলিল, "ওই হ'ল। নরক না হয় এক স্তর উঁচু। স্বর্গে তাঁরা যেতে পারেন নি, কারণ সংসার ছেড়ে কোনদিন কপ্নি ধরেননি ত! তাই আমিও চাই তাঁদের কাছে গিয়ে থাকতে। একলা একলা স্বর্গে গিয়ে কি হবে অনীতা? সেখানে রোগে যদি একটু সেবা না পেলুম, দুঃখে যদি দুটো মিষ্টি কথা না শুনলুম, হাসতে গিয়ে যদি প্রাণ খুলে না-ই হাসলুম ত গম্ভীরভাবে তেমন স্বর্গ ভোগ করতে চাই না।"

অনীতা হাসিয়া বলিল, "কিন্তু স্বর্গে ত রোগ-দুঃখ নেই।"

আলোকনাথ বিস্ময়ের ভাণ করিয়া কহিল, "নেই নাকি? কি সর্ব্বনাশ! তাহ'লে ত সেখানে গিয়ে একদণ্ডও তিষ্ঠুতে পারব না। আমাদের রোগ-দুঃখের মধ্যে কতটা তৃপ্তি আছে, রোগ-দুঃখহীনেরা হয়ত কল্পনাও ক'রতে পারে না। আহা বেচারীরা!"

অনীতা খিল খিল করিয়া হাসিয়া কহিল, "সবাই তোমার মত বদ্ধজীব হ'লে স্বর্গ দুদিনে মরুভূমি হ'য়ে যেত।"

আলোকনাথ বলিল, "বা, বেশ ত! তাহলে সেই কবিতাটা, 'কিংবা যদি হ'তাম আমি আরব বেদুইন' স্বর্গে যাবার উদ্দেশ্যে বেশ খাটতে পারে। উঃ পেটটা মোচড় দিয়ে উঠল, আর একবার ধরত, বোন।"

আলোকনাথ বড়ই অবসন্ন হইয়া পড়িল।

ঘণ্টা দুই পরে ডাক্তার আসিলেন। অনীতা কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। রোগী দেখিয়া তিনি বলিলেন, "কোন ভয় নেই, দুদিন ওষুধ খেলেই ভাল হ'য়ে যাবেন।"

আলোকনাথ বলিল, "একটু বসুন, দুটো কথা কই। সমবয়সী দেখে আপনাকে ছাড়তে ইচ্ছে হচ্ছে না। নতুন প্রাকটিস্ বুঝি?"

ডাক্তার বলিলেন, "হাঁ পাশ ক'রেই গাঁয়ে এসেছি।"

—"কেমন বুঝছেন?"

ডাক্তার বলিলেন, "রোগী-পত্তর খুব, কিন্তু একটা লোকের চলা ভার।"

আলোকনাথ কৌতুক অনুভব করিয়া কহিল, "বেশ মজার কথা ত! ক'লকাতা হ'লে দুদিনে লাল হ'য়ে উঠতেন যে!"

ডাক্তার বলিলেন, "মজা এই এটা ক'লকাতা নয়। সেখানে

রোগী ও ডাক্তারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে না। তাঁরা চোখে চশমা পরেন।"

হাসিয়া আলোকনাথ বলিল, "অর্থাৎ তাঁরা? না, না, আপত্তি ক'রবেন না—কথাটা ঠিক। আপনার বিশেষণ প্রয়োগ ভারী সুষ্ঠু।"

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, "অনেকদিন পরে একটু হেসে বাঁচলুম। কি করেন এখানে?"

আলোকনাথ বলিল, "বলছি, আগে আমার কথা শেষ ক'রতে দিন। হাঁ, তা রোগী সত্ত্বেও চলে না কেন?"

ডাক্তার বলিলেন, "বুঝতেই পারছেন, দিনমজুরী ক'রে খায় চাষা লোক, নগদ টাকা কোথায় পাবে?"

আলোকনাথ বলিল, "ও কথা কথাই নয়। এই গাঁয়ে, দেখছেন ত সব চাষীর বাস—একজন 'কোয়াক' আছে। কিন্তু দেখুন গে দোতলা তুলে ফেলেছেন তিনি।"

ডাক্তার বলিলেন, "তিনি বোধ হয় শহর ফেরৎ। আমি ত সে উদ্দেশ্য নিয়ে ডাক্তারী শিখিনি।"

আলোকনাথ উৎসুক দৃষ্টিতে বক্তার পানে চাহিল।

ডাক্তার একটু থামিয়া বলিলেন, "যারা অভাবের তাড়নায় প'ড়ে রোগের চিকিৎসা করাতে পারে না, যাদের পথ্য জোটে না—তাদেরই চিকিৎসা ক'রে বেড়াই। লোকে আমায় লক্ষ্মীছাড়া বলে, কিন্তু আমি জানি, লক্ষ্মীছাড়াদের ছায়ায় যে অলক্ষ্মী বাসা বেঁধে আছেন, তাঁকে অবহেলা করা মনুষ্য-ধর্ম্ম নয়।"

পরম উৎসাহে ডাক্তারের হাত চাপিয়া ধরিয়া আলোকনাথ বলিল, "ঠিক—ঠিক ব'লেছ ভাই। আমার মতের সঙ্গে খুব মিলে যাচ্ছে। আমরা তরুণেরা যেন শান্তির আশায় নিশ্চিত হ'য়ে চুপ করে না ব'সে থাকি! কবির কথা মনে আছে ত?

'—নহে রে সন্ধ্যার দীপালোক
নহে প্রেয়সীর অশ্রুমাখা চোখ
পথে পথে অপেক্ষিছে কাল বৈশাখীর আশীর্ব্বাদ।'

ডাক্তার ঈষৎ হাসিলেন।

বলিলেন, "একটু স্থির হ'য়ে ঘুমোন, কাল এসে আপনার সঙ্গে কথা ব'লব।"

আলোকনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নামটি কি, ডাক্তারবাবু?"

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "আর বাবু নয়। আপনাকেও আর 'আপনি' বলব না। তুমি—তুমি। আমায় মাণিক ব'লে ডেক ভাই।"

সহসা পাশের দুয়ারটা খুলিয়া গেল।

অনীতা দ্রুতপদে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া ডাকিল "মাণিক-দা।"

তারপর উত্তেজনার বশে কাঁপিতে কাঁপিতে ছিন্নমূল লতার মত সেইখানে এলাইয়া পড়িল।

আলোকনাথ উঠিয়া যাইতেছিল, মাণিক তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, "ব্যস্ত হ'য়ো না ভাই আমি দেখছি।"

শীঘ্রই অনীতার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। লজ্জায় সে জড়সড় হইয়া মাথার কাপড়টা টানিয়া দিল। মুহূর্ত্তের উত্তেজনার বশে সে আপনাকে সম্বরণ করিতে পারে নাই

মাণিক তাহাদেরই দেশের লোক—পরিচিত। বহুদিন আত্মীয়-স্বজন পরিত্যক্তার মনে পরিচিত মুখখানি দেখিয়া যে তরঙ্গ উঠিয়াছিল, তাহা রোধ করা বড় সহজ নহে। তাহার বর্ত্তমান জীবনের সঙ্গে যে কলঙ্ক-কাহিনীর সংযোগ ছিল তাহাও সে ভুলিয়াছিল। সে ভুলিয়াছিল, সমাজ-শাসনের বেত্রাঘাতে তাহার পিতামাতার অন্তর জর্জ্জরিত, তাহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত। অতীতের সুখ চিরদিনের জন্যই স্বপ্ন আশ্রয় করিয়াছে।

কিন্তু ভুলিব বলিলেই কি এত সহজে সে সব ভোলা যায়? তাই মুহূর্ত্তের উত্তেজনা বশে মাণিকের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। জ্ঞান জাগ্রত হইবার পর পূর্ব্বাপর সমস্ত মনে হওয়ায় লজ্জায় সে মুখ ঢাকিল।

মাণিক ব্যস্ত হইয়া বলিল, "উনি সুস্থ হ'য়েছেন, আমি আজ উঠি।"

আলোকনাথ বলিল, "তা যাও। কিন্তু দেখছি, তোমরা দুজনে দুজনের পরিচিত।"

মাণিক বলিল, "হাঁ পরিচয় আমাদের আছে। ও'কে এখানে দেখে আমি কম বিস্মিত হইনি। যাই হোক ভাই কাল যদি ভাল থাক ত একবার নদীর ধারে যেয়ো—"

আলোকনাথ বলিল, "তার প্রয়োজন কি? তোমার যা ব'লবার এইখানে স্বচ্ছন্দে ব'লতে পার। ইনি আমার বোন। রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও সত্যিকারের সম্পর্ক আছে।"

মাণিক বলিল, "তোমার কথা শুনেই বুঝেছি, কারও সঙ্গে সত্যকার সম্পর্ক পাতাতে তোমার মুহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব হয় না।"

আলোকনাথ অনীতার পানে চাহিয়া বলিল, "শুনে রাখ অনীতা।"

মাণিক বলিল, "আমি ভাবছি, উনি এখানে এলেন কি ক'রে?"

আলোকনাথ সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কতদিন গাঁ ছাড়া?"

মাণিক বলিল, "অনেকদিন। বছর সাতেক হবে বোধ হয়।"

আলোকনাথ বলিল, "ওঃ। তাহ'লে বলছি শোন।"

সে সংক্ষেপে সমস্ত বর্ণনা করিল। নির্ব্বাক প্রস্তর মূর্ত্তির মত মাণিক শুনিয়া গেল।

আলোকনাথের কাহিনী শেষ হইলে সে আপন মনে বলিয়া উঠিল, "সত্যই বিপদ—মহাবিপদ, তাই সে অমন ক'রে চিঠি লিখেছিল! কিন্তু আমি কি কঠিনভাবেই সে পত্রের উত্তর দিত

আলোকনাথ বলিল, "কি ব'লছ ভাই?"

মাণিক সহসা যেন চেতনা পাইয়া বলিল, "ও আর এক চিন্তা।"

বলিয়া পিছনে চাহিতেই আলোকনাথ বলিল, "অনীতা উঠে গেছে। দেখ ভাই, ভাবনা আমার ছিল না। দিব্যি আকাশ কুসুম চয়ন ক'রে হেসে খেলে দিন কাটিয়ে দিতুম। অনীতা আমার সব উল্টে দিয়েছে। ওকে দেখে আমার মনে হয়েছে, আমাদের পঙ্গু জীবনে কত সমস্যাই না আছে। ওই

নির্য্যাতিতা, যদিও আমি জানি সূর্য্যের আলোর মতই পবিত্র, তবু লোকের রসনা যে কালি ওর চারিদিকে ছিটিয়ে দিয়েছে, তাতে ক'রে সারা জীবনটা ওর তুষানলে প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে হবে! সমাজে ওদের স্থান নেই। যারা আত্মঘাতিনী হ'য়ে জ্বালা জুড়ায় কিংবা দেহপণে আজীবন ধ'রে প্রায়শ্চিত্ত ক'রে যায়, তাদের নিশ্বাসে কি জীর্ণ সমাজের ভিত্তি কেঁপে উঠছে না?"

মাণিক বলিল, "তুমি বড় উত্তেজিত হ'য়েছ, বন্ধু। একটু বিশ্রাম কর।" বলিয়া তাহাকে কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়া বাহির হইয়া গেল।

আলোকনাথ ডাকিল, "অনীতা।"

সে আসিতেই বলিল, "কি জানি কেন আমার মনে কিসের যেন আলো এসে প'ড়েছে। বেশ একটা তৃপ্তি পাচ্ছি মাণিককে দেখে।"

অনীতা নীরবে তাহার মাথায় বাতাস করিতে লাগিল।

পরদিন অপরাহ্ণে মাণিক আসিল।

আলোকনাথ সুস্থ হইয়া উঠিয়াছিল। দাওয়ায় মাদুর বিছাইয়া দুজনে বসিল।

মাণিক প্রথমেই বলিল, "তোমরা এখান থেকে কোথায় যাবে?"

আলোকনাথ উত্তর দিল, "কোথাও না, সোজা ক'লকাতায়।"

মাণিক বলিল, "আমিও কাল দেশে যাচ্ছি।"

আলোকনাথ বলিল, "হঠাৎ এত বছর পরে দেশে? বিশেষ কোন প্রয়োজনে নাকি!"

মাণিক বলিল, "হাঁ ভাই, বিশেষ প্রয়োজন। ফিরে এসে তোমায় সব জানাব। আমি যে কোন্ পথে চ'লব তা নিজেই ঠিক ক'রতে পারছি না। কাল সারারাত শুয়ে শুয়ে ভেবেছি।"

আলোকনাথ বলিল, "আমার কিন্তু শুনতে বড় আগ্রহ হচ্ছে।"

মাণিক বলিল, "এসে ব'লব, এখন ক্ষমা কর। তোমাদের ক'লকাতার ঠিকানাটা—"

আলোকনাথ ঠিকানা বলিলে মাণিক নোট বুকে লিখিয়া লইল।

আলোকনাথ বলিল, "কিছুই ত ব'ললে না। যদি দেখা হয় সব ব'লব। যাঁদের ওপর নির্ভর ক'রে আমায় থাকতে হবে। তাহ'লে অনীতার ভার কি তুমিই নেবে, মাণিক?"

মাণিক বলিল, "অনীতার কি ইচ্ছা আমার কাছে আসেন?"

হাসিয়া আলোকনাথ বলিল, "মিথ্যে ব'লব না, এ বিষয়ে তার সম্পূর্ণ অনিচ্ছাই দেখলুম।"

মাণিক বলিল, "তাহ'লে আমারও উত্তর আপাতত মুলতুবী থাক, পরে এসে ব'লব।"

আলোকনাথ বলিল, "আমরা কবি। মাসিকের পাতায় ক্রমশ প্রকাশ্য উপন্যাস লিখে উৎসুক পাঠকদের যে দারুণ উৎকণ্ঠা মাসের পর মাস ভোগ করাই, তুমি দেখছি তার চেয়েও নিষ্ঠুর। তাঁরা জানেন, একটা নির্দিষ্ট সময়ে তাঁদের উৎকণ্ঠার শেষ হবে, কিন্তু তোমার সময়ের কোন সীমা নাই।"

মাণিক বলিল, "সীমা না থাকলেও তোমাদের নির্দ্দিষ্ট সময়ের চেয়ে ঢের বেশী সুসহ।"

—"অর্থাৎ?"

"—অর্থাৎ আমার ফিরে আসা পর্য্যন্ত, এক মাসও তোমার অপেক্ষা করতে হবে না।"

আলোকনাথ খুশী হইয়া বলিল, "শুনে কতকটা আশ্বস্ত হলুম। ভাল কথা, পল্লী-জীবন তাহ'লে পরিত্যাগ ক'রছ?'

মাথা নাড়িয়া মাণিক বলিল, "ত্যাগ ক'রব ব'লে ত এখানে আসিনি আলোক।"

আলোকনাথ বলিল, "কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এ সঙ্কল্প তোমার ছাড়তেই হবে। আমার পল্লীজীবনের দুমাসের অভিজ্ঞতা নিয়ে এ কথা আমি জোর গলায় ব'লতে পারি।"

মাণিক অল্প হাসিয়া বলিল, "তোমার দুমাসের অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই আমার সারা জীবনের অভিজ্ঞতার চেয়ে কম। আমি এতকাল ওদের মধ্যেই বাস ক'রে এসেছি এবং ভাল ক'রে ওদের জানি।'

আলোকনাথ বলিল, "তাহ'লে নিশ্চয়ই জান, ওদের শিক্ষা দিয়ে মানুষ ক'রে তোলা এক দুরূহ ব্যাপার।"

মাণিক বলিল, "ব'লে যাও তোমার অভিজ্ঞতার কথা।"

আলোকনাথ বলিল, "ওদের ভাল ক'রতে গেলেই ওরা সন্দেহ ক'রে বসে লোকটার উদ্দেশ্য ভাল নয়। বিনা স্বার্থে কেউ যে কারও উপকার ক'রতে পারে এ ধারণা ওদের নেই। তাদের উপকার ওরা নেয় কিন্তু আড়ালে নির্ব্বুদ্ধি ব'লে নিন্দা ক'রতেও ছাড়ে না।"

মাণিক কৌতুকভরে প্রশ্ন করিল, "তারপর?"

আলোকনাথ বলিতে লাগিল, "জ্ঞান-চক্ষু ফুটিয়ে দিতে গেলে ওরা মনে মনে চটে যায়। চাষের কাজ ফেলে খাতা কলমে মনে দিতে চায় না! আদর ক'রে কাছে ডাকতে গেলে সঙ্কুচিত হ'য়ে দূরে স'রে যায়। তুমি হাসছ মাণিক! কেন, এসব কথা সত্যি নয়?"

মাণিক বলিল, "সবই সত্যি আলোক। ওরা মূর্খ, অজ্ঞান, কিন্তু শুধু দোষ দিলে কি মুক্তির পথ দেখিয়ে দিতে পারবে? দু-এক মাস কি দু-এক বছরেও যদি এ অন্ধকার দূর ক'রতে না পার ত হতাশ হও কেন? মনে কর, কত শত বৎসর ধ'রে আঘাতের পর আঘাত খেয়ে ওদের আর সব বৃত্তি ভুলে গেছে। ওরা জানে না—বুঝতে পারে না, যথার্থ উপকার কি? যারা হাসিমুখে ওদের উপকার করে, তারাই বুকের রক্ত শুষে নেয় আর এক মূর্ত্তিতে। তাই ভাল মন্দ সবেতেই স্বার্থকে ওরা বড় ক'রে দেখতে শিখেছে।"

আলোকনাথ বলিল, "এ বদ্ধমূল ধারণা উচ্ছেদ ক'রবার কি কোন অস্ত্র নেই?"

মাণিক বলিল, "আমার মনে হয় আছে। কিন্তু দু-এক বছরে তা উচ্ছেদ করা যাবে না। শহরের পানে টান রেখে সখের স্বদেশ-সেবা ক'রতে যদি চাও, তাহ'লে দু-এক মাসে ওদের অকৃতজ্ঞতার ভূরি ভূরি প্রমাণ তুমি পাবে। তাতে তোমার মন উঠবে বিষিয়ে, কর্ম্ম প্রবৃত্তি চলে যাবে এবং চলে

যাবার সময় যে মন নিয়ে শহরে গিয়ে উঠবে তাতে পল্লী সম্বন্ধে কিছুমাত্র সহানুভূতিও অবশিষ্ট থাকবে না। ভাব দেখি ভাই, তাতে কতটা অনিষ্ট হবে!"

আলোকনাথ বলিল, "তোমার মতে সারাজীবন উৎসর্গ ক'রতে হবে এই কাজে?"

মাণিক বলিল, "তোমার সারাজীবন ত ক'রতেই হবে, ভাবী বংশধরদেরও এই মন্ত্রে দীক্ষা দিতে হবে। তারা যখন দেখবে, তোমার সংসার পাড়াগাঁয়েই পেতেছ, যাযাবরের প্রবৃত্তি তোমার নেই, তখন দেখ' আর সভয়ে সন্দেহে তারা সরে যাবে না। অনাবশ্যক শ্রদ্ধাও তোমায় দেবে না। তখন তুমি হবে তাদের ভাই, তারা হবে তোমার ভাই। কিন্তু ধৈর্য্যের পরমায়ু যদি তোমার দু-এক বছরের বেশী না হয় ত এ বিড়ম্বনা ভোগ ক'র না।"

আলোকনাথ বলিল, "তুমি যা বলছ' তা সারাজীবনের তপস্যা।"

মাণিক বলিল, "তপস্যা না ক'রলে বরলাভ ক'রবে কি ক'রে? ফাঁকির কাজ ক-দিনের?"

আলোকনাথ বলিল, "বোধ হয় তোমার কথাই ঠিক, মাণিক। আমি যেন আলো দেখ্‌তে পাচ্ছি। তুমি ঠিকই ব'লেছ ভাই, শহরের ওপর টান আমার পুরো মাত্রায়। আমার ইচ্ছা ছিল, গ্রামের পর গ্রাম শিক্ষার সদ্দৃষ্টান্তে জাগিয়ে তুলে শহরে বসে অপূর্ব্ব আত্ম-তৃপ্তি উপভোগ ক'রব। কিন্তু ক্ষুদ্র জীবনের তপস্যা যে চারিদিকে ছড়িয়ে দিলে কোনটাই সফল হয় না, তা বুঝতে পারি নি। এ কাজে চাই প্রাণ উৎসর্গ করা। কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা না রেখে গীতার সেই শ্রেষ্ঠ উপদেশ স্মরণ করা—

কর্ম্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"

মাণিক বলিল, "সারা ভারতবর্ষে বারদোলী তুমি দুটি খুঁজে পাবে না। বল্লভভাইয়ের অমন জীবনব্যাপী নিষ্ঠাই না তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে! কেউ কি ভেবেছিল, এ জিনিষ সম্ভব হ'তে পারে; অশিক্ষিতের দ্বারা এত বড় স্বার্থত্যাগ? আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষমতায় যদি একখানি গ্রামকেও জাগিয়ে তুলতে পারি, তাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট ব'লতে হবে।"

আলোকনাথ বলিল, "অনীতা, যদি ভেতরে থাকিস ত শোন। এ'রা কর্ম্মী, আমাদের কল্পনাকে রূপ দিয়ে প্রাণবন্ত ক'রে তুলবার ক্ষমতা রাখেন। দেখ মাণিক, বৃথাই আমাদের জন্ম। কর্ম্মে মাতবার প্রবৃত্তি আছে, ধৈর্য্য নেই। সারা-জীবন এই পাড়াগাঁয়ে বাস ক'রবার কল্পনাও আমার অসহ্য। তাই হয়ত এদের অন্তর স্পর্শ ক'রতে পারিনি।"

মাণিক চলিয়া গেলে অনীতা বাহির হইয়া কহিল, "এত বাজে বিষয় নিয়েও বকতে পার, দাদা? তোমার ওষুধ খাবার সময় হ'য়ে গেছে যে।"

আলোকনাথ বলিল, "বাজে বিষয় নিয়েই আমার কারবার একথা আজ নতুন জানলে নাকি, অনীতা? মাণিক আমায় একটা নতুন আলোর সন্ধান দিয়ে গেছে, যার সন্ধান আমি এতকাল চেষ্টা ক'রেও পাইনি। গোড়ায় ছিল গলদ, তাই আসল কাজে হাত দিয়েও শেষ করতে পারিনি।"

অনীতা বলিল, "তাহ'লে গলদ শুধরে এবার কাজে নামবে বোধ হয়?"

আলোকনাথ তাহার পানে চাহিয়া বলিল, "নারে, সে কাজ আমার নয়! পাড়াগাঁয়ের দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর করা আমার কামনার বিলাসমাত্র! এই অকেজো জীবনে কাব্যের বুদ্‌বুদই ফোটাতে হবে!"

অনীতা বলিল, "তাই ভাল। কর্ম্মীরা কর্ম্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকুন, তাতে কেউ কিছু ব'লতে যাবে না।"

আলোকনাথ হাসিয়া বলিল, "কিন্তু তোমার ক্রোধটা যেন কিছু উগ্র ব'লে মনে হচ্ছে।"

অনীতা মুখ ফিরাইয়া উত্তর দিল, "এখনও বাজে ব'কবে, না ওষুধটুকু খাবে?"

আলোকনাথ নিরাপত্তিতে ঔষধ সেবন করিল।

ঔষধ খাওয়া হইলে অনীতা দুখানি সুপারির কুচা আলোকনাথের হাতে দিয়া বলিল, "মাণিকবাবুকে ক'লকাতার ঠিকানা দিলে কেন, দাদা?"

আলোকনাথ সুপারি চিবাইতে চিবাইতে বলিল "কি জানি ওর কি খেয়াল, কিসের সমস্যা—"

অনীতা মুখ ঘুরাইয়া কহিল, "আহা! নিজে যেন কিছুই জানেন না, এমনি ভাল মানুষ! তা যাঁর যা সমস্যা আছে বাড়ী ব'সে ব'সে পূরণ করুন গে। আমায় যেন ওর মধ্যে টেনে এন না বলে দিচ্ছি।" বলিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

অনীতার রাগ দেখিয়া আলোকনাথ হাসিতে লাগিল।

(ক্রমশ)

বিপ্লবী কেডিলোর লীলা অবসান

মেকসিকোর প্রেসিডেণ্ট কার্ডেনাস্‌য়ের কঠোর হস্তে বিপ্লব দমন এবং সমাজতান্ত্রিক নীতি পরিচালন আজ আর কাহারও অজ্ঞাত নাই। বিদেশী-স্বার্থ-সংশ্লিষ্টদের সাহায্য ও প্ররোচনায় বিপ্লবের নেতা ছিল জেনারেল স্যাটারনিনো কেডিলো—যাহার নির্ভীকতার জন্য আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল "দি বুল অফ্‌ স্যান লুইস্‌ পোটসি।"

জানুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহ। উত্তর মেক্‌সিকোর যত বাজার্ড-শকুন—বিপুল পক্ষ সঞ্চালনে তাহারা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া আসিল খয়েরি পাহাড়ের চূড়া ছাড়িয়া—কারণ উহারা মৃত দেহের সন্ধান পাইয়াছে। কিন্তু উহারা শবগুলিকে স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই মেকসিকোর ফেডারেল সেনাদল গ্রেপ্তার করিল জেনারেল কেডিলোর শবটি—অগণিত রাইফেল গুলীতে একেবারে ঝাঁজরায় পরিণত। অবশেষে এই দীর্ঘ দিন পরে সোস্যালিষ্ট প্রেসিডেণ্ট লাজারো কার্ডেনাস তাঁহার দুর্দ্ধর্ষ শত্রুর বিপক্ষতা হইতে মুক্তি পাইলেন।

মেকসিকোর আদিম বীর্য্যবন্ত জাতীয়তার অখণ্ড ও অমিশ্র উত্তরাধিকারী স্যাটারনিনো কেডিলো কোন শিক্ষার সুযোগই পায় নাই জীবনে। গত মে মাস হইতে সে ছিল ফেডারেল সেনাদলের শত অনুসন্ধানের কবল হইতে পলাতক। বিপ্লবের চরম উদ্দামতার সময় তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিল ৪০,০০০ মেকসিকান চাষাভূষা; যে যখন ফেডারেল সেনার তাড়নায় গা-ঢাকা দিতে বাধ্য হয়, তখনও হাজারের অধিক অনুগামীর গর্ব্ব সে করিতে পারিত। কিন্তু বিপক্ষের দ্রুত ও তৎপর অনুসরণে শিকারের পশুর ন্যায় তাহাকে বনে বনে লুকাইয়া ফিরিতে হইয়াছে; আহার সংগ্রহ করিতে অনেক সময় প্রাণ হাতে করিয়া চলিতে হইয়াছে; এমতাবস্থায় যে সঙ্গী আর বেশী থাকিবার কথা নয়, ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ। অবশেষে সামান্য কয়জন অন্তরঙ্গই রহিল তাহার ব্যথার ব্যথী ও পলাতক জীবনের সহচর। অনাহার, ক্লান্তি, অজ্ঞাতবাস, আবিষ্কৃত হইবার ভয় কেডিলোকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল।

সুদীর্ঘ আঠার বৎসর পর্য্যন্ত জেনারেল কেডিলো স্যান লুইস পোটসি ষ্টেট শাসন করিয়াছে সামন্ত নৃপতির মত—মধ্যযুগে ইংলণ্ডে যেমন ফিউডেল ব্যারনগণ করিতেন। যেমন অশিক্ষিত তেমনি আদব-কায়দা আচার-ব্যবহার রুচি-প্রবৃত্তি সকল প্রকারেই কেডিলো ছিল অমার্জ্জিত; সে লিখিতে জানিত না; বোধ হয় ফ্যাসিজম-এর সহিত কমিউনিজমের পার্থক্য কি এ বিষয়েও তাহার জ্ঞান ছিল না এতটুকু। শোনা যায় সে ছিল বিদেশীদের হাতের পুতুল। যে সকল বিদেশীয়ের স্বার্থ মেকসিকোতে বিশেষভাবেই দলিত অস্বীকৃত হইয়াছে কার্ডেনাসের নীতিতে, তাহারাই নাকি কেডিলোকে অস্ত্রস্বরূপে গ্রহণ করিয়াছিল প্রতিশোধের উদ্দেশ্যে।

বিগত মহাসমরের সময় উত্তর মেকসিকোতে কেডিলো ছিল বিখ্যাত দস্যু প্যাঞ্চো ভিলার সহচর। তাহার দুই ভাই ১৯১৩ সালের বিদ্রোহে (প্রেসিডেণ্ট হুয়ারতার বিরুদ্ধে) ডিনামাইট নিয়ন্ত্রণে মারা যায়। কিন্তু সমগ্র উত্তর মেক্‌সিকোতে সে ছিল প্রবল প্রতাপান্বিত প্রভু—তাহার মুখের বাক্যই ছিল আইনের মত প্রভাবময়। স্বেচ্ছাচারিতায়ও তাহার জোড়া মিলিবে না রাজ্যে। তাহার বিরুদ্ধে হাত তোলা দূরে থাকুক, কেহ একটি কথা বলিতেও সাহস পাইত না, পাছে কেডিলোর কর্ণগোচর হয় আর বিষম লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় উহার জন্য। লাস্‌ পালোমাস্‌ অঞ্চলে তাহার যে গোলাবাড়ী (কারণ তাহার মূল পেশা ছিল গো-মহিষাদি পালন) ছিল, তাহাতে বিজলী বাতির ব্যবস্থা ছিল, বহির্ব্বাটিতে স্থিত ডায়নামো হইতে উৎপন্ন বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে। তাহার শয়নকক্ষে ঝুলান ছিল নেপোলিয়নের একখানি রঙীন ভীতিপ্রদ প্রতিকৃতি। মেঝেতে ইতস্তত ছড়ান ছিল নানা পশুর চামড়া কার্পেটের পরিবর্ত্তে। জেনারেলের বাংলোর বারান্দায় টহল ফিরিত স্মিতমুখ পিস্তল-ধারী রক্ষীর দল।

কেডিলোর দলের লোকেরা কেহ কোন প্রকার নির্দ্দিষ্ট বেতন পাইত না, বিশেষ করিয়া ঐ গোলাবাড়ীর 'ক্যাম্পেসিনো'-গণ। তাহাদের খাওয়া-পরা ও বাসস্থানের সকল বন্দোবস্তই থাকিত। কৃষিতে উৎপন্ন দ্রব্যের কিম্বা গো-মেষ চাষের যে লাভ—তাহার অর্দ্ধেক বণ্টন করিয়া দেওয়া হইত উহাদের ভিতর।

১৯৩৭ সালে গুজব প্রচারিত হইল "বুল অফ্‌ স্যানলুইস্‌" কার্য্যত প্রেসিডেণ্ট হইয়া পড়িয়াছে প্রেসিডেণ্ট কার্ডেনাসের স্থলে—কারণ জমিহীন শ্রমিকদের আশ্রয় ও বাসভূমি দান, সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান 'শ্রমিক সমবায়'-এর মালিকত্বে আনয়ন, সকল লাভজনক ব্যবসাকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা, এবং বিদেশীশক্তির স্বার্থ উদ্ধারে বাধা প্রদান—প্রভৃতি কার্য্য কার্ডেনাস্‌ করিতেছেন।

গোয়াটিমালা-সীমান্তপথে জার্ম্মান ও আমেরিকান সমরাস্ত্রসমূহ আমদানী হইতে লাগিল—এয়ারপ্লেন, মেশিনগান, বিমান-ধ্বংসী ব্যাটারি, হাত-বোমা, সাধারণ বোমা প্রভৃতি প্রভৃতি। সঙ্গে সঙ্গে জার্ম্মান সমর উপদেষ্টাগণও দেখা দিল স্যান লুইসে। এই সময়ে স্যাটারনিনো কেডিলো ছিল কার্ডেনাস কেবিনেটে কৃষি-মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত। পদত্যাগ করিয়া কেডিলো চলিয়া আসিল স্যান লুইসে। পদত্যাগের অজুহাত স্বরূপ সে বলিয়া বেড়াইতে লাগিল যে "সত্যনিষ্ঠ" প্রেসিডেণ্ট কার্ডেনাসের জমাজমি বণ্টন সম্বন্ধীয় সংস্কারমূলক নীতি সে সমর্থন করিতে পারে না বলিয়া সে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। অপরপক্ষে প্রেসিডেণ্টের সমর্থনকারী দল বলিতে লাগিল যে, গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে কেডিলোকে বরখাস্ত করা হইয়াছে, কারণ সে সরকারী দপ্তর হইতে ঘোষণা দ্বারা যব-গম বিন্‌ প্রভৃতির দর চড়াইয়া ঐ অতিরিক্ত মূল্য আত্মসাৎ করিয়াছে।

স্যান লুইস পোটসিতে জেনারেল কেডিলোর সমর্থনকারিগণ বিপুল উদ্যমে ব্যাপৃত হইল নিত্য নবাগত কৃষক দলের কসরৎ ও সমরশিক্ষা নিয়ন্ত্রণে। বিগত মে মাসের ১৬ই তারিখে জার্ম্মানীতে মেক্‌সিকোস্থ রাজদূত ব্যারন রুদ ফন্‌ কলেনবার্গ স্যানফ্রানসিস্‌কোতে গমন করিলেন "অবকাশ উপভোগ" করিতে। বিদেশী তৈলকল মালিকগণ

ট্র্যাম্পিকোতে সম্মিলিত হইয়া নিজ নিজ তৈল খনির শ্রমিকগণের ধর্ম্মঘট সম্বন্ধে "কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি"র বিশেষ অধিবেশনে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। কেডিলো "অভিযান"-এর একটা জোর গুজব ছড়াইয়া পড়িল।

১৮ই মে তারিখের অতি প্রত্যূষে রাজধানী হইতে ১২ ঘণ্টার দূরবর্ত্তী পথে স্যান লুইস্ সিটির অধিবাসিগণ বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্য করিল--প্রেসিডেণ্ট কার্ডেনাস সেই নগরে উপস্থিত এবং সংগে তাঁহার একটিও সশস্ত্র রক্ষী নাই। স্যান লুইস্ নগরের পথে পথে অশ্বারোহণে নির্ভীক চিত্তে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তিনি উচ্চরবে ঘোষণা করিতে লাগিলেন—"শান্তি এবং মৈত্রী যাহার একমাত্র অস্ত্র, তাহার কোনও শত্রু থাকিতে পারে না।" নগরের একটি রাস্তাও বাকি রহিল না প্রেসিডেণ্টের পদার্পণে এবং বীণা উচ্চারণ করিয়া জনগণের চিত্ত দ্রব করিতে

ফলে বিষম প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। কেডিলো এবং তাহার সমর্থক ও সহচরগণ প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল। সুদূর পর্ব্বত ছাড়া আর তাহাদের আশ্রয়ের স্থান রহিল না। প্রেসিডেণ্ট কার্ডেনাসের এই অসমসাহসিক ও চতুরতাপূর্ণ ব্যবহার ও আচরণে জনচিত্ত কেডিলোর বিরুদ্ধে বিষম উত্তেজিত হইয়া উঠিল। পার্ব্বত্য অঞ্চলে প্রবেশ করিয়াও "দি বুল" এবং তাহার পক্ষীয় অশিক্ষিত ফৌজ শান্তিতে বাস করিতে পারিল না। দলে দলে ফেডারেল সেনা চারিদিকে ছুটিল এই বিদ্রোহীদের আস্তানার অনুসন্ধানে। এদিকে দেশের জনসাধারণ, এমন কি, সুদূর বনভূমির শান্তিকামী কৃষক-শ্রমিক পর্যান্ত কেডিলোর উপর বিরূপ হইয়া উঠিয়াছে। কেডিলো যেখানেই যায়, আশ্রয় ত পায়ই না, সহানুভূতিও না। এমন কি, সামান্য আহার্য্য দিয়াও কেহ সাহায্য করে না, উপরন্তু ফেডারেল সেনাদল নিকটে যে যে স্থানে রহিয়াছে, সেইস্থানে সংবাদ পাঠাইয়া দেয় কেডিলোর গতিবিধির। সরকার হইতে ঘোষণা করা হইল--বিদ্রোহী দল আত্মসমর্পণ করুক, অন্ততঃ অস্ত্রশস্ত্র সরকারের হাতে অর্পণ করুক নতুবা তাহাদের আইন-ভংগকারী দস্যুরূপে গণ্য করা হইবে। "দি বুল" কোনই সাড়া দিল না, অস্ত্রশস্ত্রও সমর্পণ করিল না, কাজেই আইনানুসারে তাহাকে আউট-ল (Outlaw) বলিয়া প্রচার করা হইল।

কেডিলো তখন অন্য কিছু করিতে না পারিয়া গোপনে গোপনে অকস্মাৎ চড়াও হইয়া ফেডারেল সেনার উপর বোমা বর্ষণ--ট্রেন্ বিধ্বংসকরণ এবং সুযোগ পাইলে লুঠতরাজ সুরু করিল। ফেডারেল কর্ম্মচারীর দল কেডিলোর ভগ্নী হিগেনসিয়াকে প্রেরণ করিল---এই সংবাদের বাহিকা করিয়া যে, ভবিষ্যতে যদি কেডিলো আর সরকার-বিরোধী কোনও কার্য্য না করে তবে তাহাকে ক্ষমা করা হইবে। কিন্তু কেডিলো এই সর্ত্তেও স্বীকৃত হইল না। জুন মাসে সরকারী ফৌজ ব্যাপক খানাতল্লাসী পরিচালনা করিয়া স্যাটার্নিনো কেডিলোর পত্নী য়্যানিটা লেগোসকে গ্রেপ্তার করিল। প্রায় এই সময়েই সরকারী সেনা দলের সহিত সংঘর্ষে কেডিলোর ভ্রাতুষ্পুত্র হিপোলাইট প্রাণ হারাইল।

এই সময়ে কেডিলোর দিন কাটে বিষম দুঃখ-দারিদ্র্যের ভিতর। কোনও একস্থানে তাহারা তিষ্ঠিতে পারে না বেশী সময়—বিপক্ষ ফেডারেল সেনার অলক্ষিত আবির্ভাবের আতঙ্কে। কোন দিন খাইবার সময় সামগ্রী জোটে, কোন দিন তাহাও জোটে না। একে একে অশ্বগুলি মরিয়া গিয়াছে। সংগীরাও বেশীর ভাগ এই পথকষ্ট ও আহারের বিড়ম্বনা সহ্য করিতে না পারিয়া কেডিলোকে পরিহার করিয়া চলিয়া গিয়াছে। সে একপ্রকার ভালই হইয়াছে, খাদ্যের যে অনাটন কে কাহার সংবাদ লয়, কে কাহার আহারের খোঁজ-খবর করে। অশ্বগুলি মরিয়া যাইবার পর অতি কষ্টে আবার টাট্টুঘোড়া কয়েকটি সংগ্রহ হইয়াছিল, কিন্তু তাহাও এত খাদ্য-কষ্ট ও অসময়ে অতিরিক্ত ভ্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। কেডিলো এক একবার ভাবে গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবে সম্মতি না দিয়া ভাল কাজ করে নাই। কিন্তু চিরকালের অভিমানী ও স্বাধীনতা-প্রিয় প্রাণ তাহার নানারূপ আশংকা করিয়াই আর সরকারের নিকট আত্মসমর্পণে ভরসা পায় না।

একদিন স্যান লুইস্ সিটির নিকটস্থ এক পল্লীতে আশ্রয়লাভের ও আহার সংগ্রহের বৃথা চেষ্টা করিয়া সবেমাত্র দূরবর্ত্তী এক পর্ব্বত-গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। এমন সময় দেখা গেল ফেডারেল সেনা দ্রুত অশ্বারোহণে তাহাদের ঘেরাও করিতেছে। কেডিলো আর পলায়নের চেষ্টা করিল না। যে কয়জন সংগী ও আত্মজন তখনও সংগে ছিল, তাহাদের লইয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া সশস্ত্র অবস্থায় পাথরের আড়ালে বৃক্ষের আড়ালে ছড়াইয়া রহিল। ইহা হইল জানুয়ারী (১৯৩৯) মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের কথা।

স্যান লুইস্ সিটিতে যেস্থানে ফেডারেল সেনাদলের প্রধান আড্ডা—সেইস্থানে একটি রাখাল বালক হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, সে "দি বুল"কে দেখিয়াছে। কোথায় সে, জিজ্ঞাসা করায় উত্তর হইল—খুব বেশী দূরে নয়—শাস্ ভেনেগাস্ পল্লীতে ২০টি সংগীসহ গোপনে ঘুরিয়া ফিরিতেছে আশ্রয় ও আহার প্রাপ্তির উদ্দেশে।

দুই দল সেনা তৎক্ষণাৎ প্রেরিত হইল। উহারা শহর ছাড়িয়া ফণী-মনসা ঝোপের অরণ্যের ভিতর দিয়া বেমালুম গা-ঢাকা দিয়া অগ্রসর হইল। ক্রমে ক্রমে কেডিলোর দলের গতিবিধির সন্ধান করিতে করিতে পল্লীবাসীদের নির্দ্দেশ-ক্রমে ক্ষুদ্র পাহাড়-গুহা বেষ্টন করিয়া ফেলিল।

দূর হইতে চীৎকার করিয়া ফেডারেল সেনা-নায়ক, কেডিলোকে আহ্বান করিল এবং আত্মসমর্পণ করিতে বলিল। আত্মসমর্পণ করিলে কেহ তাহার কেশাগ্রও স্পর্শ করিবে না, এইরূপ আশ্বাসও পুনঃপুনঃ প্রদান করিল।

কোলাব্যাঙের মত বিকট গলাবাজী করিয়া বিদ্রোহী জেনারেল এই আহ্বানও প্রত্যাখ্যান করিল এবং সংগে সংগে নিজ দলের লোকদের গুলী চালাইতে আদেশ দিল।

পূর্ণ তিন ঘণ্টা দুই পক্ষে গুলীর আদান-প্রদান চলিল।

(শেষাংশ ২৩৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দাবা

(গল্প)

শ্রীসারদারঞ্জন সর্ব্বজ্ঞ

নটবর দত্তের গলাসমেত মাথাটাই শুধু বসিয়াছিল। বাক দেহ সবটাই ফরাসের উপর শায়িত। মুখ হইতে সশব্দে নল ত্যাগ করিয়া গজটাকে এক ঘর টিপিলেন—কিস্তি—!

সরকার মহাশয় চালটা না বুঝিলেন তাহা নয়। রাজাকে একঘর নীচে নামাইয়া কহিলেন—স্বস্তি। তাঁহার পাশে বুড়ো জলধরদা' কি বলিতে যাইয়া ঢোক গিলিলেন। মনে হইল, চোখ ফুটিয়াই বুঝি কথা বাহির হয়। একটু দম ধরিয়া বলিলেন—'বাজী চটুল'। ইতিমধ্যে আরও দুই-তিন চাল হইয়া গিয়াছে। জলধরদা' গলা বাড়াইয়াই চক্ষু কপালে তুলিলেন।

দত্ত মহাশয়ের চাল; দাবা টিপিলেন—কিস্......

'থামো, থামো, আহা-হা থামো' বলিতে বলিতে হঠাৎ জলধরদা' ঘুটীসমেত ছকের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িলেন। সরকার ও দত্ত উভয়ে মহাবিরক্ত।

—'বলি হ'ল কি হে? করলে কি বল দেখি?'

হঠাৎ বা জোর গলায় কিছু বলিতে গেলেই জলধরদা'র কাশি আসে। তিনি তখনও সখের ঘোড়া সাজিয়া রহিয়াছেন। আসন্ন কাশি হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য শক্তি-সঞ্চয় করিতেছেন। তাঁর ভীত, শঙ্কিত দৃষ্টি দত্ত মহাশয়ের দিকে। দন্তবিহীন গোল মুখখানাকে বাঙলার পাঁচ করিয়া দত্তজা বাক্যের অপেক্ষায় রহিলেন;—'সব মাটী করলে। আর একটা কিস্তি, ব্যস মাত হ'য়ে যেত'!

"আহা-হা, গেল, গেল, থামো।" চকিতে দত্তজার বসা মাথাটা জলধরদা'র ভুঁড়ির চাপে শুইয়া পড়িল। সরকার মহাশয় বুড়ো ভদ্রলোকের এ অভিনয়ের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া অবাক।

সকলের দৃষ্টিই জলধরদা'র দিকে। কাহারও মুখে কথা নাই। দত্তজা ও বুড়ো দাদা পরস্পর মুক্ত হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কাজটা কিছু কঠিন বটে। জলধরদা' স্থূলকায় এবং ততোধিক স্থূলোদর। পড়া যত সোজা, ওঠা তত কঠিন।

ভৃত্য রামচরণ বাইরে নূতন কলিকা ধরাইতেছিল। উঁকি মারিয়াই জিব্ কাটিল,—ছিঃ। নিমেষে বারান্দা হইতে সরিয়া গেল। ভাবিল, তাইতো বুড়ো কর্ত্তা, তিনিও এ বয়সে দাবা খেলা লইয়া মারামারি সুরু করিলেন! সে ছুটিয়া দিদি-ঠাকরুণকে খবরটা দিতে চলিল।

জলধরদা' শেষটায় উঠিলেন। দশ আনা নিজের চেষ্টায়, ছ'আনা সরকার মহাশয়ের কৃপায়। দত্তজা চাপ-মুক্ত হইয়া বাপ্ বলিয়া হাঁফ ছাড়িলেন। উভয়েই ঘর্ম্মাক্ত কলেবর। দাবার ঘুটীর খোঁচায় জলধরদা'র বুকের চামড়া ঈষৎ উঠিয়া গিয়াছে।

'আরে, পুড়ে মলো, পুড়ে মলো।' এবার সরকার মহাশয়ের পালা। হঠাৎ উঠিতে যাইয়া কিসের আকর্ষণে 'ফরাসপতিত' হইলেন। 'বাপ্‌রে' বলিয়া দত্তজা'ও পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিলেন। গড়গড়া মহাপ্রভু এতক্ষণ মাথা নাড়িতে নাড়িতে শ্রান্তি-বিনোদনের জন্য গড়াগড়ি দিলেন। জ্বলন্ত টিকাগুলি কল্কিচ্যুত হইয়া দত্ত মহাশয়ের গায়ে পড়িল। সকল পতনের মূলে ঐ গড়গড়াবতার, আর তার জন্য দায়ী দত্ত মহাশয় স্বয়ং। 'বহুর' পতনের মূলে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় দায়ী 'এক'।

দত্তজা অভ্যাসদোষে পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে চাদরের এক প্রান্ত জড়াইয়া মাঝে মাঝে টানিতেছিলেন। গড়গড়া থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিতেছিল। বুড়ো জলধরদা' তাহাই বারণ করিতে যাইয়া অতি ব্যস্ততায় দুই দুইবার পড়িলেন। সরকার মহাশয় নিজে থামাইবেন মনে করিয়া হঠাৎ উঠিতে যাইয়া পড়িলেন, যেহেতু তাঁর উন্মুক্ত কচ্ছ তখন বুড়ো দাদার পায়ের চাপে।

দত্তজার নড়িতে একটু কষ্ট হয়। এক পা' বাতে প্রায় পঙ্গু। নিজের কাপড় ঝাড়িতে ঝাড়িতে ওদিকে চাদর পুড়িয়া সতরঞ্চ ধরিয়াছে। তিনজনে মিলিয়া গড়গড়ার বাকী জলটুকু ঢালিয়া আগুন নিবাইলেন। সুগন্ধে ঘর আমোদিত হইল।

ভৃত্য রামচরণকে ডাকিয়া দত্তজা চুপি চুপি কহিলেন—'চট্ করে যা', ধোপাবাড়ী থেকে শীগ্‌গির অপর চাদরটা নিয়ে আয়।' রামচরণ প্রস্থানোদ্যত হইলে, কর্ত্তা আবার ডাকিলেন—'শোন্!' রামচরণ ফিরিল।

'চাদরটাকে তোল, ভাঁজ ক'রে আলমারীটার পেছনে রেখে দে। পরে ফুরসৎ মত ধোপাবাড়ী পাঠিয়ে দিবি, বুঝলি?'

'যে আজ্ঞে' বলিয়া রামু মনিবের আদেশ প্রতিপালন করিল। রামচরণ রাস্তায় পা বাড়াইয়াছে, কর্ত্তা আবার ডাকিলেন। কানে কানে কহিলেন,—'খবরদার, তোর দিদি-ঠাকরুণকে বলিস পাছে কিছু?'

'তা কি বলতি পারি' বলিয়া রামচরণ প্রস্থান করিল। সরকার মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'এখন না হয় সামলে নিলে ভায়া, কিন্তু পরে যখন ওই পোড়া চাদরটা ঠাকরুণের হাতে পড়বে, তখন?'

'আরে ছোঃ' হাসিয়া দত্তজা জবাব দিলেন,—'সে বুঝবে, ধোপা আর তার মনিব ঠাকরুণ, আমার দায় পড়েছে ও ভাববার।'

'বটে!' সরকার মহাশয় জলধরদা'র দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিলেন। বড়র ত্রুটিতেই ছোট চিরকালই লাঞ্ছিত হয়; এ আর নূতন কি?

সরকার মহাশয় নূতন করিয়া ছক সাজাইতে লাগিলেন। দত্তজা বুড়ো দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'বল তো ভায়া, সব চেয়ে ভয় বেশী কর কাকে?' পরমোৎসাহে জবাব দিতে যাইয়া জলধরদা' ঢোক গিলিলেন। বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতে দেরী হইবে দেখিয়া সরকার মহাশয়কে কহিলেন—'ওহে সরকার তোমার মতটা কি বল দেখি? সব চাইতে বেশী ভয় কিসে?'

সরকার তর্জ্জনী কপালে ঠেকাইয়া কহিলেন—'অদেষ্টে!'

—আগুন'—সঙ্গে সঙ্গে জলধরদা'র বাক্য নির্গত হইল।

'ঠিক বলেছ ভায়া, ঠিক।' দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া সরকার কহিলেন 'নইলে আর সংসারে লক্ষ্মী নেই! মহাশয়, বিপত্নীক।' দত্তজা হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সরকারকে বুঝাইয়া দিলেন যে, জলধরদা' কোন টিপ্পনী কাটেন নাই, তাহার নিজের প্রশ্নোত্তর দিয়াছেন মাত্র। পরে কহিলেন—'সব চাইতে বেশী ভয় করি দুই জনকে—সাহেব, আর সহধর্ম্মিণী।'

সরকার ও বুড়ো দাদা দত্তজার মুখের দিকে চাহিলেন। দত্তজা ব্যাখ্যা করিলেন। 'সাহেবকে ভয় করি, ওদের ও ইণ্ডিল-বিণ্ডিল বুঝি না। আর দ্বিতীয়টি, বুঝলে ভায়া, যত বোঝাও—বোঝে কে—

হঠাৎ চোখ-কান খাড়া করিয়া কহিলেন,—'সরকার চট্ ক'রে এই দরজাটি আর জানালাটি বন্ধ কর তো?' সরকারের গতি মন্দ দেখিয়া অধৈর্য্য হইয়া বলিলেন, 'আহা, চট্ করে!' সরকার মহাশয় তাহাই করিলেন। ফরাসে আসিয়া কি জিজ্ঞাস' করিতে যাইবেন—

'শিস্'। দত্তজা ইঙ্গিতে চুপ করিতে বলিলেন। কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—'যাক, বাঁচা গেল সরকার। [একটু ইসারায়] বুঝলে, স্বয়ং এসেছিলেন। পাজী ব্যাটা রামচরণ নির্ঘাৎ বলে দিয়েছে। আসুক হারামজাদা, যদি আজ জুতিয়ে ওর মুখ না থেঁত করি!'

'তা বললেই বা, হয়েছে কি এমন?'

'হয়েছে কি? বুঝতে, একটা দিনের জন্য যদি অমন হাতে পড়তে! এই যে চাদরটা ওই একটুখানি পুড়ে গেছে কি না গেছে, ঐ নিয়ে কুরুক্ষেত্র বাধাবে'খন। বলবে, নেশাখোর, আফিংখোর, নেশার ঝোঁকে সব পুড়িয়ে দিয়েছে, আরও কত কি? তোমরাই বল, এই আফিং ছেড়ে আর কোন নেশা করেছি কোন দিন? সাধে কি বলি,বাঘ-সিঙ্গীর ভয় বল, আর ঐ আগুন, ভূমিকম্পই বল, অন্দরের কাছে কিছু নয়! ওদের মুখে লোক ক'দিন পড়ে? জোর—একদিন বা দু'দিন!'

নেপথ্যে মহিলা কণ্ঠের প্রচণ্ড চীৎকার শোনা গেল,—'রামু, অ-রামু, রামচরণ! পাজী ব্যাটা ভর সন্ধ্যের গেলি কোন্ চুলোয়?'

"শুনলে ভায়া শুনলে? ভর সন্ধ্যেবেলায় তোমারই বা কোন্ তুলসী তলায় পীদিম জ্বলছে না রামুর জন্যে? গাধার মতন চেঁচিয়ে সারা বাড়ী তোলপাড় সুরু করেছেন?'

সরকার মহাশয় প্রথম চাল সুরু করিয়াছেন। দত্তজা আর বাক্য ব্যয় না করিয়া বড়ে টিপিলেন।

দত্ত-গিন্নী প্রথম যখন জলধরদা' ও দত্ত মহাশয়ের মল্ল যুদ্ধের কথা জানিলেন, তখন তিনি হেঁসেলে। ভিজা কাঠ, কিছুতেই ধরিতে চায় না। ধোঁয়ায় সমস্তটা ঘর অন্ধকার, গিন্নীর মুখ ততোধিক। কাঠ কখনও দপ করিয়া জ্বলিয়া ওঠে, আবার পর মুহূর্ত্তেই যেই সেই। ঠাকুরুণের চোখ দিয়া জল গড়াইতেছে। আমরা হইলে বলিতাম, ভিজা কাঠ আর কলহপ্রিয়া দোসর, দুই-ই সমান। দুয়েতেই চোখের জলে নাকের জলে হইতে হয়। কোনটা হইতেই অব্যাহতি পাইবার উপায় নাই। ঠাকরুণ মনের খুশীতে দত্তজাকে বিড় বিড় করিয়া গাল-মন্দ করিতে লাগিলেন। এমন সময় রামচরণ আসিয়া সু-খবরটা দিয়া গেল, আর কোন প্রশ্নের সুযোগ না দিয়াই শ্রীমান ধাওয়া করিল।

ঠাকরুণ ধূমায়মান উনুনকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন—'হবে না? দাবা-পাশা নিয়ে দিনরাত মশগুল! যত সব ছোট-লোকের নেশা, হবে না? মারামারি, এরপর খুনোখুনি! আসুক আজ একবার ভেতরে, আমারই একদিন কি তারই একদিন।'

উনুনটা বেশ জ্বলিল। দাবার প্রসাদে মারামারির পূর্ব্ব পর্য্যায় পর্য্যন্ত দত্তজা বহুবার উঠিয়াছেন। তবু, বিশেষ নিরাপদ মনে না করিয়া গিন্নী ঠাকরুণ নাতিস্থূলকায় বপু-খানাকে বহির্ব্বাটির দিকে টানিয়া চলিলেন। তিনি বারান্দায় পৌঁছিবার আগেই সরকার মহাশয় দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এবং বন্ধুবেষ্টিত দত্ত মহাশয় তখন আর্ম্মিষ্টিস (armistice) পালন করিতেছেন। কোন প্রকার সাড়া না পাইয়া ঠাকরুণ এক নূতন দুশ্চিন্তায় পড়িলেন। তাই চেঁচাইলেন—'রামু, অ-রামু! রামচরণ!'

রামুর কোন সাড়া পাইলেন না। কর্ত্তার ফিটের ব্যারাম ছিল। ভাবিলেন, মারামারির পর সরকার মহাশয় ইত্যাদি চলিয়া গিয়াছেন, কর্ত্তা হয়তো মূর্চ্ছা গিয়াছেন। ভাবনার কথা। বিলুটাও মাঠে খেলিতে গিয়াছে। ভাবিতে ভাবিতে ঠাকরুণ হেঁসেলে ফিরিলেন। সেখানে উনুন অন্ধকার। ঝট্‌পট কড়া' নামাইয়া হাতে একখানি প্রকাণ্ড চেলা কাঠ লইলেন। নিমেষে উনুন ভাঙ্গিয়া পড়িল। এক কলসী জল এবারে উহার মধ্যে ঢালিলেন। 'খাবেন চর্ব্যচুষ্য, চলুক দাবা! বিশ দিন বলেছি, ভেজা কাঠ নিয়ে চলে না বাপু, তার কোনো ব্যবস্থা নেই, সময় হয় না। ওদিকে দাবার বেলা দিনে রাতে কামাই নেই! এমন ঘরে লক্ষ্মী থাকে?—কখ্‌খনো না।'

পরে ভাবিলেন যা হোক ছাই, কলসী খালি করিয়া ভাল করেন নাই, ঘরে জল বলিতে এক ফোঁটা নাই। তাই নিজেই শূন্য কলসী হাতে বাহির হইলেন। সম্মুখেই রামচরণ। 'বাড়ী পালিয়ে কোথা গিয়েছিলি রে হতভাগা? দ্যাখ গে যা তোর বাবু মূর্চ্ছা পড়ে আছে! ঝেঁটিয়ে বিদেয় করবো ব্যাটাকে, নচ্ছার, পাজী......!'

রামচরণ খিড়কী দিয়া বাড়ী ঢুকিয়াছে। ভাবিল হয়তো কর্ত্তা ফিট পড়িয়াছেন। ছোঁ মারিয়া কলসী লইয়া ছুট। পুকুর ঘাট হইতে কলসী ভরিয়া বারান্দা থেকে পাখা গাছটা হাতে নিয়া বরাবর বহির্ব্বাটীতে।

জলধরদা' চলিয়া গিয়াছেন। তাঁর কাসির ব্যামো। কবিরাজ ঔষধ দিয়েছেন, সন্ধ্যায় সেবা, অনুপান শয্যা। একটা ভুল চালে দত্তজার দু'দুটো বল অনর্থক মারা পড়িয়াছে। পাঠক দাবা খেলোয়াড় হইলে, তাহার মনের অবস্থাটা বুঝিবেন ভাল। সম্প্রতি বড়ে চালিবেন কি ঘোড়া চালিবেন, তাহাই মনে মনে বিচার করিতেছেন। এমন সময় দুয়ারে রামচরণ, এক হাতে জলের কলসী, অপর হাতে পাখা। কর্ত্তার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল রাগে। 'হারামজাদা, ও দিয়ে কার শ্রাদ্ধ হবে?'

রামচরণ অবাক। দিদি ঠাকরুণ তবে বলিলেন কি? কোথায় দেখিবে বাবু চিৎপাত পড়িয়া আছেন, মুখ হইতে

গোল্লা উঠিতেছে, হাত-পা খিল ধরিয়াছে, তা নয়, এযে সজীব, সরোষ মূর্ত্তি। প্রতি মুহূর্ত্তেই সে দু'এক পাটি জুতার প্রত্যাশা করিতে লাগিল,—'দিদি ঠাকরুণ বললেন—'

'আমার মাথাটা জল-বাতাস দিয়ে ঠান্ডা করতে? হতভাগা, পাজী, আটকুড়ো'; কর্ত্তা দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া উঠিলেন। অতি ক্ষিপ্রতায় মাথা নীচু করিয়া এক পাটি চটিকে নিজের মাথা বাঁচাইয়া রাস্তায় যাইবার পথ করিয়া দিল।

'সরকার মশাই, আজকার মতন থাক! এত গোলমালে দাবা চলে? চাকর দিয়ে শেষটায় অপমান করা সুরু ক'রলে? মেয়েমানুষ, দুটো মিষ্টি কথা বলেছ কি ধিঙ্গী হ'য়ে মাথায় চড়ে নাচবে! আজ হয় সব নিজ হাতে সায়েস্তা করব, নয় দাবার ছক পুড়িয়ে ফেলব?'

'তা কি পারবে দাদা? ঐ দুঃখেই তো পক্ষান্তর করলুম না!—'

সরকার মহাশয় বেশ অপ্রসন্ন হইয়াছেন। অনেকদিন পর দত্তজাকে মাৎ করিবার একটা সুযোগ পাইয়াও হারাইলেন। দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া ছক ভাঁজ করিলেন। ঘুঁটী ক'টা থলেতে পুরিয়া মুখ বাঁধিয়া ফেলিলেন।

দত্তজা কহিলেন,—'দেখলে বেটাচ্ছেলের আক্কেলটা? চটিটা রাস্তায় পড়ে গড়াগড়িই খাচ্ছে! পাষণ্ডটা ঘরে তুলে রেখে পালাতে পারলো না?'

সরকার মহাশয়ের সাহায্যে দত্তজা রাস্তায় নামিয়া নিজেই জুতা উদ্ধার করিলেন। ঘরে ঢুকিবেন, এমন সময় যদু ধোপা বাড়ীর পাশ দিয়া চলিয়া গেল।

'ওরে ও যেদো! শোন্! চাদর কোথায় রে?'

'গিন্নীমা রেখে দিলেন।' ততক্ষণ সে অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে।

সরকার মহাশয় প্রস্থান করিলেন। দত্তজা মনে মনে কহিলেন, দাঁড়াও, আজ সব ব্যাটাদের জব্দ করছি, তবে আমি হরিহর দত্তের বেটা নটবর দত্ত। হাতের কাছেই ছিল কলসীটা, সর্ব্বপ্রথম ইহাকেই জব্দ করিলেন। গড়াইতে গড়াইতে বেচারী রাস্তার ওপারে রায়েদের পুকুরে ডুবিল।

সে রাত্রিটা দত্ত-পরিবারে অনেক ওলট-পালট করিল। হেঁসেলে আগুন জ্বলিল না, গোয়ালে ধুনা পাইল না। ছোট-ছেলে বিনু পিঠে এই পেটে কিছুই পাইল না। রামচরণ কখন না খাইয়া বহির্ব্বাটীতে মেজের ওপর ঘুমাইয়া পড়িল। সব চেয়ে উল্টা হইল যে, বরাবর গিন্নীর গাল-মন্দ খাইয়া কর্ত্তা জড়সড় হইয়া থাকেন, কিন্তু আজ দত্তজা এমন রুক্ষ মেজাজে এমন সব ভাষা গিন্নীর উপর প্রয়োগ করিলেন যে, তিনি অল্প চেঁচামেচি করিয়াই মুখ থামাইলেন। বাক-বিতণ্ডার অবসানে কর্ত্তাও বহির্ব্বাটীর তাকিয়া আশ্রয় করিলেন।

বাড়ীর কর্ত্রীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া মশককুল কর্ত্তাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। আট ইঞ্চি জাজিমের পর তিন ইঞ্চি পুরু তোষকে শয়ন যার অভ্যাস, শুধু সতরঞ্চ তার সহ্য হইবে কেন? সর্ব্ব শরীরে ব্যথা ধরিয়াছে। তারপর দুরন্ত গরম, সঙ্গে মশকের প্রাচ্য সঙ্গীত; কোনটাই কর্ত্তার অন্দর ত্যাগের সহায়তা করিল না। এক ঘুমের পর রামচরণ সজাগ হইয়া দেখে অন্ধকারে তক্তপোষের উপর কি একটা পড়িয়া আছে। বুঝিতে বিলম্ব হইল না। অপর কেহ হইলে অবাক হইত বটে, কিন্তু রামচরণ পুরাতন ভৃত্য, অবাক সে হইল না। পাখা হাতড়াইয়া লইয়া মনিবকে বাতাস করিতে লাগিল। পরস্পর কোনও বাক্যবিনিময় হইল না।

দত্তজাকে শেষ পর্য্যন্ত উঠিতে হইল। অন্ধকারে দাবার থলেটা হাতে ঠেকিল। মিনিট পাঁচেক কি ভাবিলেন, তারপর ধীরে ধীরে বাইরের দরজা খুলিয়া থলেটাকে রায়েদের পুকুরে নিক্ষেপ করিলেন। এবার গতি ফিরিল। চোরের মত চুপি চুপি ঘরের দরজায় আসিয়া যখন দাঁড়াইলেন, তখন ভিতরে মাতা-পুত্রে কি কথোপকথন হইতেছিল। ডাকিলেন—বিনু, দরজা খোল।

ভিতরে ঢুকিয়া একবার চারিদিক দেখিয়া লইলেন, তারপর সন্তর্পণে বিছানায় যাইয়া লম্বা হইলেন। মশারি পড়িল।

ঘরে বাতি জ্বলিতেছিল। সমস্ত বাক্স-তোরঙ্গ খোলা। গিন্নী নূতন করিয়া সাজাইতেছিলেন। সম্মুখে ঐ দৃশ্য, বাহিরে ভোরের পাখী ডাকিতে সুরু করিয়াছে; দত্ত মহাশয়ের আর ঘুম হইল না। সমস্ত গোছ-গাছ শেষ করিয়া ঠাকরুণ বিনুকে বলিলেন—'যা' তো বিনু বৈঠকখানায় রামুকে গিয়ে বল, একখানা পাল্কী নিয়ে আসুক।'......

বিনু চলিয়া গেল।

কর্ত্তা বুঝিলেন গিন্নী তাঁহার ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিতেছেন। আগে থেকেই হাড়ে হাড়ে চটিয়াছিলেন, কহিলেন,—'যাও—বাপের বাড়ী, খবরদার আর যদি এ বাড়ীতে পা পড়ে! সাবধান!'

'বলি, ভয় দেখাচ্ছ কি? দুবেলা দুমুঠো ভাত?—তা' ভায়েরা খুব দিতে পারবে। তোমার হাঁড়ি ঠেলতে কে আসে, তাও আমি দেখে নেব এবার। তিনকুলে কি কাকেও বাকী রেখেছ?'

শেষের কথাটা দত্ত মহাশয়ের ভারী বিঁধিল। নিজের অগোচরেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। সত্যই তাঁহার সংসারে এককালে অনেক কেহ ছিল, এখন চারিদিক ফাঁকা বটে। রাগতভাবে জবাব দিলেন—'তুমিই বা চোখ রাঙাচ্ছ কাকে শুনি? যাও না তোমার ছেলে নিয়ে বাপের বাড়ী, আমিও আমার ছেলে-ছেলেবৌ এনে সংসার পাতবো। অভাব কিসের?'

ঠাকরুণ শ্লেষের সুরে কহিলেনঃ—'তাও তো ওই দাবাতেই খেয়েছে। ঘরের বউ, বিয়ের দশদিন না কাটতেই তাড়িয়ে দিলে? ছেলেটা অবধি মনের ক্ষোভে বাড়ী আসে না!'

কর্ত্তা আর কথা কাটাকাটি করিলেন না। চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিলেন। গৃহিণীর এ কথায় মিথ্যা তেমন কিছু ছিল না। ছেলের বিবাহের সাতদিন পর বেয়াই মহাশয় মেয়ে নিতে আসিলেন। যাওয়ার দিন সকালে দুই বৈঠকে দাবার চাল লইয়া তুমুল তর্ক। উভয়ে উভয়ের বাপান্ত করিলেন। ঘোষ মহাশয়ও বদরাগী কম নন। অবশেষে হাতাহাতির যোগাড়। পাড়ার পাঁচ জনে মিলিয়া উভয়কে ছাড়াইল। বউ বাপের বাড়ী গেল, কিন্তু হিতোপদেশের গল্পের

মত সাজা পাইল বালিকা বধূ। কর্ত্তা প্রতিজ্ঞা করিলেন, অমন ছোটলোকের মেয়েকে আর ঘরে তুলিবেন না, ছেলেকেও শ্বশুরবাড়ী যাইতে দিবেন না। আজ প্রায় দুই বৎসর হইতে চলিল—দত্ত মহাশয়ের প্রতিজ্ঞা অটুট রহিয়াছে।

বেলা একটু বাড়িতেই রামুকে বাহন করিয়া পাল্কীযোগে ছেলে শুদ্ধ দত্ত গিন্নী পিত্রালয়ে চলিলেন। গহনার বাক্স আর কোম্পানীর কাগজ কিছুই ভুলে ফেলিয়া গেলেন না। দত্ত মহাশয়ও সরকারের নিকট চলিলেন। সেইদিনই দুইখানি চিঠি লিখিলেন,—একখানি বেয়াই মহাশয়কে, অপরখানি ছেলে বিমলকে!

রামচরণের হইল সব চেয়ে বিপদ বেশী। সে বেচারীর শ্যামও রাখিতে হয়, কুলও রাখিতে হয়। মনিবের নিকট 'হতভাগা', 'পাজী', 'আটকুড়ে', 'গাধা' ইত্যাদি শুনিয়াই সে বড় হইয়াছে। জুতা সে পিঠে-ও পাইত, পায়েও পাইত। কিন্তু এবার সে এক কাণ্ড করিয়া বসিল, যাতে তাকে আর 'গাধা' বলা চলে না। তিন দিন পরে দত্ত গিন্নী খবর পাইল যে, দত্তজা তিন দিন হইল জ্বরে বেহুঁস। বাঁচিবার আশা কম। নিতাই কবিরাজ ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঔষধ বদলাইতেছেন।

বিমল আজ বৌ সহ বাড়ী আসিবে। দত্তজা পাড়ার দুচারজন বর্ষীয়সীদের সকাল হইতেই খবর দিয়া আনিয়াছেন। বহির্ব্বাটীর দরজায় উৎসুকনেত্রে দত্তজা বসিয়া আছেন। 'ঐ একটা পাল্কী দেখা যাচ্ছে না?' জলধরদা' বলিলেন—'হ্যাঁ'। দেখিতে দেখিতে পাল্কী বাড়ীর নিকটে আসিল। ভিতর হইতে শাঁক বাজিয়া উঠিল। পাল্কী থামিল।

দত্তজা পাল্কীর দরজা খুলিতে খুলিতে 'এস মা লক্ষ্মী আমার—' বলিয়াই মুখখানা বিকৃত করিয়া তিন হাত হঠিয়া আসিলেন। সম্মুখে যেন কেউটে! মুখখানা ডবল ফুলাইয়া দত্ত গিন্নী অন্দরে প্রবেশ করিলেন।...... বুড়ো জলধরদা' মুখ ফিরাইলেন। দূরে আমগাছের আড়ালে রামচরণ মুখ টিপিয়া হাসিল। আর দত্তজা? —তাঁহার অবস্থা গবেষণার বিষয়।

বিমলের পাল্কী আসিতেও বিলম্ব হইল না। দত্ত মহাশয় সমস্ত ভুলিয়া 'এস মা লক্ষ্মী' বলিয়া হাত ধরিয়া পুত্রবধূকে নামাইলেন। পায়ের ধূলা লইয়া দাঁড়াইতেই কোথা হইতে দত্ত গিন্নী আসিয়া ছোঁ মারিয়া তাহাকে লইয়া গেল। বিমল পিতার পদধূলি মাথায় নিল।

বিমলকে একটু আড়ালে ডাকিয়া দত্তজা চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন—'হ্যাঁরে, আমার সেই ইয়ে, ভুলিস নি তো বাবা?'

পাল্কী হইতে একটা থলে আনিয়া বিমল পিতার হাতে দিল। চট্ করিয়া থলের মুখটা খুলিয়া ঘুটীগুলি দত্তজা একবার দেখিয়া লইলেন। মুখে আর হাসি ধরে না। ডাকিলেন,

—'রামু, ওরামু, ওরে রামচরণ, যাতো বাবা, ছুটে যা'—সরকার মশাইকে একবারটী ধরে নিয়ে আয়!'.....

বিপ্লবী কেডিলোর লীলা অবসান

(২৩৩ পৃষ্ঠার পর)

মাঝে মাঝে এক একটি কাতর চীৎকার, কখনও করুণ কাতরাণি, আবার গুড়ুম, গুড়ুম, গুড়ুম রাইফেল চালনা। তিন ঘণ্টা পরে আর বিদ্রোহীদের তরফ হইতে কোন গুলী বর্ষণের রব আসে না। ফেডারেল-সেনা কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করে। বিদ্রোহীপক্ষ একেবারে নীরব। তখন ফেডারেল-সেনা গুহার দিকে অগ্রসর হয়। ৪১৫জন মাত্র জীবিত, তাহারা আত্ম-সমর্পণ করিল, বন্দুক তাহারা ফেলিয়া দিয়াছে—কেননা, গুলী-বারুদ তাহাদের একেবারে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। কেডিলো কোথায়?

কেডিলো এবং তাহার বারোজন সাথী চিরতরে চক্ষু বুজিয়াছে—দেহে তাহাদের গুলীবিদ্ধ হইবার ক্ষত অগণিত। পাহাড়-চূড়া হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে বাজার্ড পাখী উড়িয়া আসিতেছে শব লক্ষ্য করিয়া। ফেডারেল-সেনা কেডিলোর শব বহন করিয়া লইয়া চলিল। মেক্সিকো এত দিনে বিপ্লবের আগুন হইতে রক্ষা পাইল।

শাঁখবোল

(আলোচনা)

শ্রীনলিনেশ মৌলিক এম-এ

১৩৪৫ সালের ১১শ সংখ্যা (১৪ই মাঘ, শনিবার) দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশ বি-এ মহাশয়ের লিখিত 'উত্তর বঙ্গের শাঁখ-বোল' নামক প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম। মালদহ জেলার পল্লী অঞ্চল হইতে ছড়াগুলি সংগ্রহ করিয়া সাধারণের সম্মুখে এই-গুলিকে আনিয়া ধরিয়াছেন বলিয়া আমার ন্যায় প্রত্যেক মালদহবাসী তাঁহার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞ। আধুনিক সভ্যতার যুগে থিয়েটার এবং বায়োস্কোপের প্রবল প্রতাপে বাঙলার এই অনাদৃত ছড়াগুলি তাহাদের সর্ব্বপ্রকার গ্রাম্যতা দোষ লইয়া লজ্জায় পল্লীর নিভৃত প্রদেশে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে। সাধারণের রুচি-জ্ঞান ও রসবোধের ক্রমবিকাশই যে ইহার কারণ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু যে অনাড়ম্বর গ্রাম্যজীবনের সুখ-দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা এই ছড়াগুলির ভিতরে প্রচ্ছন্ন রহিয়া আজও গ্রামে গ্রামে কৌতূহলী নর-নারীর অমার্জ্জিত রুচিতে রসের যোগান দিয়া আসিতেছে, আধুনিকতম শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালীর নিকটেও তাহা উপেক্ষার যোগ্য নহে।

বাল্যকাল হইতেই আমরা এই ছড়াগুলি শুনিয়া আসিতেছি। পৌষ মাসের প্রথম দিন হইতে আরম্ভ করিয়া সংক্রান্তির দিন পর্য্যন্ত প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই গ্রামের হিন্দু-মুসলমান বালকবৃন্দ আসিয়া বাড়ী বাড়ী এই ছড়া গাহিয়া বিনিময়ে দান লইয়া যায়। প্রতি বৎসর শুনিয়া শুনিয়া কয়েকটি ছড়া আমাদের একরূপ কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছে। অনেকদিন হইতেই এই ছড়াগানগুলির প্রতি আমার একটা আকর্ষণ ছিল এবং সেই আকর্ষণেই কিছু ছড়া মালদহ এবং মুর্শিদাবাদ জেলার পল্লী অঞ্চল হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম। বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশ মহাশয় সাধারণের নিকটে এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন বলিয়া এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য প্রকাশ করার প্রয়োজন মনে করিতেছি। এইরূপ আলোচনায় ছড়াগুলি সম্পর্কে প্রকৃত সত্য নির্দ্ধারণ করিতে সুরেন্দ্রবাবুকে কিছু সাহায্য করা হইবে মনে করিয়াই বর্ত্তমান প্রবন্ধ রচিত হইল।

মালদহ জেলায় এই ছড়াগুলি 'শাঁখ-বোল' নামে পরিচিত, কিন্তু সুরেন্দ্রবাবু এইগুলিকে 'উত্তর-বঙ্গের শাঁখ-বোল' নামে অভিহিত করিলেন কেন, বুঝিতে পারিলাম না। পশ্চিম-বঙ্গেও ইহার বহুল প্রচলন আছে এবং পশ্চিম-বঙ্গের পল্লী অঞ্চলেও ইহা শাঁখ-বোল নামেই পরিচিত। আমি যতদূর জানি, বর্ত্তমানে মুর্শিদাবাদ জেলার পল্লী অঞ্চলে এই ছড়াগানগুলির যত প্রচলন আছে, মালদহ বা রাজসাহী জেলায় তত নাই। উত্তর-বঙ্গ বলিতে রঙ্গপুর এবং দিনাজ-পুরকেও বুঝায়; কিন্তু এই ধরণের ছড়াগানের প্রচলন ঐ দুই জেলায় আছে বলিয়া শুনি নাই। সুরেন্দ্রবাবু প্রাচীন গৌড়কে এই সমস্ত ছড়ার উৎপত্তিস্থল বলিয়া ধরিয়াছেন বলিয়াই হয়ত ইহার ঐরূপ আখ্যা দিয়া থাকিবেন; কিন্তু তাহা হইলে ছড়াগুলির জন্মস্থান সম্বন্ধে অবিসম্বাদিত প্রমাণ সুরেন্দ্রবাবুকে দিতে হইবে; কারণ মুসলমান রাজত্বের অধঃপতন এবং ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভ সময়ের মধ্যে বলিয়া তিনি যে কালটির নির্দ্দেশ দিতেছেন সে সময়ে বাঙলার প্রায় সর্ব্বত্রই অরাজকতা বিদ্যমান ছিল বলিয়া ইতিহাসে পাওয়া যায়। সুতরাং বরেন্দ্রে অরাজকতা ঘটিয়া-ছিল বলিয়া বরেন্দ্রই এই ছড়াগুলির জন্মস্থান,—এরূপ মনে করিবার সংগত কোন কারণ নাই।

সুরেন্দ্রবাবু এই ছড়াগুলির রচনার দুইটি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অরাজকতার ফলে (১) একদিকে দস্যু-তস্করদের অত্যাচার এবং অপরদিকে (২) গ্রামগুলিতে বিরাট জঙ্গলের সৃষ্টি হওয়ায় ব্যাঘ্র-শূকর প্রভৃতি বন্য-জন্তুর উপদ্রব। প্রথমোক্ত কারণটির উপরেই সুরেন্দ্রবাবু বেশী নির্ভর করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। আমার বিশ্বাস প্রথমোক্ত কারণের সহিত ছড়াগুলির বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই; একমাত্র ব্যাঘ্রভীতি নিবারণার্থেই এই ছড়াগুলি রচিত হইয়াছিল। বাঘের দেবতা সোনারায় বা দক্ষিণরায় আমাদের পরিচিত এবং তাঁহার সম্বন্ধে পাঁচালীও আছে। আমার মনে হয় এই ছড়াগুলিও বাঘের পূজা প্রচারকল্পেই রচিত হইয়া-ছিল। সুরেন্দ্রবাবু মালদহ জেলার পল্লী অঞ্চল হইতে যে ছড়াগুলি সংগ্রহ করিয়া "দেশ" পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার একটিতে দেখিতেছি —

*   *   *   *   *   *

দে দান যাই বরাতে (?)
সোনারায়ের পূজা দিতে।
ও সোনারায় কর কি?
সোনার লাঙ্গল গড়েছি।

এখানে সোনারায়ের পূজার স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। সোনা-রায়ের প্রসঙ্গে 'সোনার লাঙ্গল' এবং 'রূপার ফাল' এবং তৎ-পরে হালচালনার উল্লেখে সোনারায়কে ক্ষেত্র-দেবতা মনে করিবার কারণ নাই এবং ধানের ক্ষেত "সোনার রঙে রঙ্গীন হইয়া যাইত" বলিয়া সেই ক্ষেতের মালিককে সোনারায় বলিয়া ধরিলে ভুল হইবে। একটি চুরির উল্লেখ এই ছড়াটির ভিতরে আছে সত্য, কিন্তু চুরি নিবারণার্থ সোনারায়ের পূজার প্রচলন কোন দেশেই নাই। "ধুদ্ ধুদ্ ধুড়িয়ে" চোর পলাইবার মধ্যে যে সরল হাস্যরসের ইঙ্গিত আছে, গ্রাম্যবালকগণের স্বাভাবিক কৌতুকপ্রিয়তা তাহাকে অবলম্বন করিয়াই চোরের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। একটি কথা এই ছড়াগুলির প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ছেলে-ভুলানো ছড়া' নামক প্রবন্ধে ছড়া-গানের অপ্রাসঙ্গিকতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"হয়ত শব্দসাদৃশ্য অথবা অন্য কোনো অলীক তুচ্ছ সম্বন্ধ অবলম্বন করিয়া মুহূর্ত্তে একটা কথা হইতে আর একটা কথা রচিত হইয়া উঠিতে থাকে। মুহূর্ত্তকাল

পূর্ব্বে তাহাদের সম্ভাবনার কোনোই কারণ ছিল না. মুহূর্ত্তকাল পরেও তাহারা সম্ভাবনার রাজ্য হইতে বিনা চেণ্টায় অপসৃত হইয়া যায়।"......(সঙ্কলন)

আলোচ্য ছড়াগুলিতেও সে বিশেষত্ব লক্ষিত হইবে।

ও পারেতে গো (১) বগ্‌লো চ'রে
খায় কুসুমের ফুল।
জগতরাণী সিয়ান গো করে
পাঁজা পাঁজা চুল॥
চুলগাছি তার আলো ঝালো।
পিঠে কেন ধূলো
(২) গাহিল ঘরে গোবর লিতে
বল্‌দে মারে হুঁড়॥

কুসুম ফুল বকের খাদ্য না হইতেও পারে, কিন্তু ও-পারে একটি শুভ্রপক্ষ বক রৌদ্রোজ্জ্বল চরে নিশ্চুপ বসিয়া আছে এবং সুন্দরী জগতরাণী অনাবৃত পৃষ্ঠদেশে পাঁজা পাঁজা চুল এলাইয়া দিয়া স্নান করিতেছে,—এ অপূর্ব্ব দৃশ্য যে কাব্য-রসের উদ্রেক করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তন্ময় হইয়া এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে অকস্মাৎ গোহাল ঘরে গোবর লইতে যাইয়া অসাবধানতা বশত বলদের গুঁতো খাইবার মধ্যে নায়কের চিত্ত-চাঞ্চল্যের প্রতি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত থাকিলেও ব্যাপারটা এমনি অপ্রাসঙ্গিক যে হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হইয়া পড়ে।

এই অদ্ভুত অপ্রাসঙ্গিকতা ছড়াগুলির একটি বৈশিষ্ট্য। সুতরাং কোন কিছুর আকস্মিক উল্লেখ দেখিয়া ছড়াগুলির রচনার হেতু নির্দ্দেশ করিলে ভুল হইবে। বাঘ এবং সোনা-রায়ের উল্লেখ একাধিক ছড়ায় পাওয়া যায় বলিয়া ব্যাঘ্রভীতি এই ছড়াগুলির রচনার কারণ অনুমান করা যায়। মুর্শিদা-বাদের পল্লী অঞ্চল হইতে সংগৃহীত একটি ছড়া এই স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি—

ইরকুলা রে ধীরকুলা।
বাঘের নামে তিন কুলা॥
যে দেয় না বাঘকে ধান।
তার ছেল্যাকে (৩) টেন্যা আন॥
আন রে বনে।
ভাত খা' আপনার মনে॥
ভাত খায় দাড়ি মোচড়ায়
ইত্যাদি........

* * * * * *

"ইরকুলা" "ধীরকুলা" শব্দের অর্থ স্পষ্ট বুঝা না গেলেও,—'আর যাহাকে যত কুলাই দাও, বাঘের নামে তিন কুলা দান দিও।'—রচয়িতা প্রথম দুই পংক্তিতে ইহাই বুঝাইতে চাহেন এবং এই প্রবল প্রতাপান্বিত ব্যাঘ্র-দেবতাকে দান করিতে যে অমত করিবে, পরবর্ত্তী তিনটি পংক্তিতে তাহার পুত্রকে বল-পূর্ব্বক টানিয়া আনিয়া তাহাকে বন মধ্যে নির্ব্বাসন দিয়া নিশ্চিন্ত মনে আহারাদি করিবার উপদেশ দিয়াছেন। তাহার পরই অন্নাহারের প্রসঙ্গে হয়ত কোন দীর্ঘ-শ্মশ্রু বৃদ্ধের

শব্দার্থ (১) বগ্‌লো=বক (২) গাহিল=গোহাল (৩) টেন্যা=টানিয়া

দাড়িতে হাত বুলাইয়া বুলাইয়া অন্নগ্রহণ করিবার কথাটা মনে পড়িয়া গিয়াছে। অমনি বিষয়-বস্তুর দ্রুত পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সে যাই হোক ব্যাঘ্র-দেবতা এবং তাঁহার সম্মান রক্ষার্থে অবিশ্বাসীজনের পুত্রের প্রতি কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থায় দেবতার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের সুস্পষ্ট পরিচয় এই ছড়াটি হইতে পাওয়া যাইতেছে। সুরেন্দ্রবাবুর সংগৃহীত এবং আমাদের আবাল্য-শ্রুত 'হুম্মা'র (এতদঞ্চলে 'হাম্মা' নামে গীত) ছড়াটিতেও এই ব্যাঘ্র-ভীতির পরিচয় পাইতেছি।

আর একটি ব্যাপার শাঁখবোল সম্বন্ধে লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রতি পল্লীতে রাখাল বালকেরাই এই ছড়া গাহিয়া থাকে, কৃষক বা অন্য কোন সম্প্রদায়ের বালকেরা ইহাতে বড় একটা যোগদান করে না। অধুনা দু-একজন দরিদ্র গৃহস্থের বালক-পুত্র শাঁখবোল গাহে বটে, কিন্তু তাহা নিতান্তই পয়সার লোভে এবং কখনও বা রাখাল বন্ধুগণের সহিত সৌহার্দ্দবিশত। রাখাল বালকদেরই ইহা উৎসব। বাঘের ভয় রাখালেরই বেশী। গোচারণ ভূমিতে গরু ও ছাগলের পালের সহিত রাখালকে থাকিতে হয়; ব্যাঘ্র-ভীতি তাহাদের পদে পদে। আতঙ্ক হইতেই দেবতার পরিকল্পনা। গভীর আতঙ্কে রাখালগণ রক্তলোলুপ ব্যাঘ্রকে দেবতা জ্ঞান করিয়া তাহাকে পূজায় সন্তুষ্ট করিয়া তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি-লাভের জন্য উদ্‌গ্রীব হইবে, অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন রাখা-লের পক্ষে ইহা খুবই স্বাভাবিক। শাঁখ-বোল পৌষ মাসে অর্থাৎ শীতকালে অনুষ্ঠিত হয়। ইহার একটি কারণ এই হইতে পারে যে, শীতকালেই দেবতা তাঁহার অসহায় ভক্তবৃন্দ এবং তদপেক্ষা অসহায় গবাদি পশুর প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন। অন্য কারণ, সমস্ত বৎসরের মধ্যে এই মাসটিতে ধান্য লক্ষ্মীর কৃপায় গৃহস্থের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল থাকে, সুতরাং দান লইবার পক্ষে প্রকৃষ্ট সময়। গৃহস্থকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাই শস্য-ক্ষেত্র, লাঙ্গল ইত্যাদির কথা ছড়ার মধ্যে আসিয়া পড়ে এবং কৃষিজীবী গৃহস্থও এই সবের উল্লেখে স্বস্তি-বচন শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া দান দেয়।

সুরেন্দ্রবাবুর উল্লিখিত দস্যু-তস্কর ভীতির পরিচায়ক রীতিমত ডাকাতি না হইলেও ছোটখাটো চুরির কথা দু'একটি ছড়ায় পাইয়াছি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি উদ্ধৃত করিতেছি।

তাঁতীদের ছোট-বো (১)
(২) বিশ করমের তুললে জো
ঢাক বাজে ঢোল বাজে
আরো বাজে কাড়া
(৩) সুকারি লিয়্যা ব্যাং
চ'লল তাঁতীপাড়া
তাঁতীপাড়া লিয়্যা যায়্যা
ব্যাং কারকুর করে।

শব্দার্থ—

(১) ছোট-বো=ছোট-বৌ
(২) বিশকরমের=বিশ্বকর্ম্মা
(৩) সুকারি=সুপারি

* * * * * * *

ব্যাং উঠিয়্যা বলে
কুন দেবতা তুই॥
দেবা লয় রে দেবী-লয়
এই গোঁসাই।
লাল ধড়াটা বুনিয়্যা দিলে
বানিটানি নাই॥
বানিটানি লিয়্যা রে
চড়িল গাছে।
গাছুয়া ব্যাং গাছে চড়্যা
দাড়ি ধর্যা নাচে॥
কাহুকে মারে চড় থাপড়
কাহুকে মারে জুতা।
এই মুখে চুরি করল্যাম
বঠ্যানীদের সুতা॥
বল রে ভাই শিব বল॥

তাঁতীদের ছোট-বধূ বিশ্বকর্ম্মা পূজার আয়োজন করিল। ঢাক ঢোল এবং কাড়া বাজিতেছে। চতুর ব্যাং এই সংবাদ পাইয়া সুপারি লইয়া তাঁতীপাড়ার উদ্দেশে যাত্রা করিল। তাঁতী-পাড়ায় আসিয়া ব্যাং গম্ভীর চালে কড়র্ কড়র্ শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। ইহাতে নিতান্ত ভালমানুষ ছোট-বধূ বিস্মিত হইয়া কোন দেবতার আবির্ভাব হইয়াছে মনে করিয়া ব্যাংকে হাতে তুলিয়া লইল এবং তাহার পরিচয় প্রার্থনা করিল। ব্যাং গোস্বামী প্রভু বলিয়া আপনার পরিচয় দিল এবং বিনা মজুরীতে ছোট-বধূকে রক্ত-বস্ত্র বুনাইয়া দিতে আদেশ করিল। মূর্খ তন্তুবায়-বধূ গোস্বামীর প্রতি ভক্তি পরবশ হইয়া বিনা মজুরীতেই বস্ত্র বয়ন করিয়া দিল। ইত্যবসরে গোস্বামী ঠাকুর কোন এক বৈঠানীর সুতার বাণ্ডিল আত্মসাৎ করিয়া লইল এবং তাহার পর সেই আনন্দে গাছে উঠিয়া দাড়ি ধরিয়া নৃত্য করিতে সুরু করিল। বিষয়বস্তুটি এই। দেখা যাইতেছে কৌশলে সূত্রাপহরণ বৃত্তান্তের বর্ণনাটিই কবির লক্ষ্য। এই চুরির বিষয় ছড়াগুলির ভিতরে মাঝে মাঝে উল্লি-খিত হয় কেন?—একটু চিন্তা করিলেই ইহার সম্বন্ধে একটি যুক্তিযুক্ত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। পল্লীর সহিত যাহা-দের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে তাহারাই জানেন, অগ্রহায়ণের শেষ দিক হইতে প্রায় মাঘ মাসের শেষ পর্য্যন্ত পল্লীতে বড় চোরের উপদ্রব হইয়া থাকে। বিশেষ করিয়া এই সময়টিতে চুরি বৃদ্ধি পাইবার কারণ আছে। এই সময়ে গোলায় তুলিয়া রাখিবার জন্য ক্ষেত হইতে ধান কাটিয়া আনিয়া গৃহস্থ-বাড়ীর প্রাঙ্গণে প্রথমটা ঢালিয়া রাখা হয়, কোথাও বা বাড়ীর উঠানেই খৈলান* প্রস্তুত করিয়া ধান মাড়িবার ব্যবস্থা করা হয়। এই ধান গৃহস্থের এতটুকু অসতর্কতা ঘটিলেই চোরে লইয়া যায়। কেবলমাত্র ধান নহে, সুযোগ এবং সুবিধা পাইলে ঘটিটা বাটিটা লইয়া যাইতেও ছাড়ে না। এইরূপ ছোটখাটো চুরির মধ্যে লোকের আর্থিক ক্ষতি অপেক্ষা হাস্যরসের খোরাকই বেশী।

দৃষ্টান্তস্বরূপ ছড়াটিতে তাই সুতার বাণ্ডিল হারাইয়া বৈঠানীকে আক্ষেপ করিতে দেখিবার পরিবর্ত্তে গোস্বামী সাজিয়া ব্যাঙের সুতা চুরি এবং চুরির আনন্দে নৃত্য সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

এই সহজ সরল হাস্যরসের অবতারণা ছড়াগুলির প্রাণ বলিলেই হয়। গ্রাম্য রাখাল কবি অনেক সময় একমাত্র হাস্য-রসের অবতারণা করিবার জন্যই ছড়া রচনা করিয়াছেন। এই জাতীয় ছড়াগুলির মধ্যে মাহাত্ম্য কীর্ত্তন অথবা পূজা প্রচারের কোন তাগিদ নাই; নিতান্ত সাধারণ একটি চিত্র আঁকিয়াই কবি তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধি করিয়াছেন। একটি হাস্যরসাত্মক ছড়া এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিতেছি।—

আম্বল ভাতে খাম্বল গুঁড়া।
তাই খেয়্যা মাতিল বুড়া॥
বুড়া-বুড়ীর নাম কি?
ঠেকুনা ঠুকুনী॥
ভাত খায় আপনি॥
ভাত খায় বিড়ালকে দোষায়।
ঠ্যাঙার বাড়ি নেজুড়ে খসায়॥
সেই ঠ্যাঙাখান চালে।
ছাই বুড়া-বুড়ীর গালে॥
বুড়া বলে বাপরে
কাঁথা দিয়্যা চাপরে।
কাঁথা হ'ল ভারি।
দে দমাদম্ বাড়ি॥
বল রে ভাই শিব বল।

স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, একমাত্র 'আম্বল' কথাটির সহিত শব্দ-সাদৃশ্য রক্ষার জন্যই লবণ জিনিষটি এ ক্ষেত্রে 'খাম্বলে' পরিণত হইয়াছে। লবণের গুঁড়া দিয়া আমানি ভাত খাইয়া জনৈক বৃদ্ধ আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছে। কবি এই বৃদ্ধকে অবলম্বন করিয়া হাস্যরসের অবতারণা করিতেছেন। নামকরণেই কবি এই বৃদ্ধ-বৃদ্ধার কলহময় দাম্পত্য জীবনের প্রতি ইংগিত করিলেন। কলহের কারণ সম্ভবত আমানি ভাত। বার্দ্ধক্য হেতু খাদ্যদ্রব্য, বিশেষ করিয়া আমানির ন্যায় মুখরোচক খাদ্যের প্রতি একটু অতিরিক্ত রকমের আসক্তি খুবই স্বাভাবিক এবং এই স্বাভাবিক প্রেরণাবশেই দাম্পত্যজীবনের শিষ্ট রীতি-নীতি লঙ্ঘন করিয়া বৃদ্ধ গোপনে আমানি খাইয়া থাকে এবং গোপনে খাইবার অপরাধটা পোষা বিড়ালটির স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া বৃদ্ধার হস্তে লাঞ্ছনা ভোগ হইতে পরিত্রাণ পায়; এদিকে নিরপরাধ বিড়ালটি অকারণে মার খাইয়া মরে। একদা প্রহারের নিমিত্ত 'ঠ্যাঙা'খানি কোন কারণে চালের উপর থাকায় বেচারা বিড়াল নির্ভয়ে সত্য সত্যই অপরাধ করিয়া বসিল; সেদিনের আমানি বৃদ্ধ-বৃদ্ধার গালে ছাই দিয়া সত্যই বিড়ালে খাইল। মুখের গ্রাস কাড়িয়া খাওয়ায় বৃদ্ধ ভয়ানক চটিয়া উক্ত বিড়ালটিকে একখানি ভারী কাঁথা দিয়া চাপিয়া ধরিয়া দমাদম প্রহার সুরু করিল।

ট্রেন দুর্ঘটনায়

(গল্প)

শ্রীনীলিমা দত্ত

ফুটনো ফুটিতেছিলেন বীণা দেবী—শীতের সুমিষ্ট সূর্য্য তখনও প্রখর হইয়া উঠে নাই, সারা ধরিত্রীর বুকে সস্নেহ সোনালী কিরণ ঝলমল করিতেছে। রাণু ওর স্কার্টটা সামলাইয়া ফুটন্ত জল চায়ের কেটলীতে ঢালিতেছে—অদূরে দাঁড়াইয়া সমীর তাহাই লক্ষ্য করিতেছিল।

—এই-রে সেরেছে—দেখছো মা রাণুটা একটা অকর্ম্মার ধাড়ি,—এক্ষুণি গরম জল হাতে ঢালবে।

রাণু এক ঝটকায় বিনুনীটা পিঠের উপর সরাইয়া সতেজে বলিল,—বেশ, পোড়ে তো আমার হাত পুড়বে তোমার তো না?

—না তো কি? আমাদেরই তো তোর বর খুঁজতে হবে, শেষকালে বিয়ে হবে না যে?

—না হয় না হবে—ক্ষুণ্ণ অনুযোগের সুরে রাণু বলিল—দেখছো মা শুধু শুধু দাদা কি রকম আমার পেছনে লাগছে?

—লাগালাগির কি আছে শুনি? মা বলুক—তোর আর কি, দিব্যি পরের স্কন্ধে কাটাবি, হতিস যদি আমাদের মত, হ্যাঁ—সজোরে বুক চাপড়াইয়া সমীর বলিল—চিরকালটা খাটুনি খাটতে হবে।

—পরের স্কন্ধে মানে? সবিস্ময়ে রাণু জিজ্ঞাসা করিল।

—পর নয় তো কি! এখন বাবার স্কন্ধে তারপর আর এক ভদ্রলোকের স্কন্ধে তিনি অসমর্থ হলে পুত্রের স্কন্ধে—আচ্ছা মা তুমি বল আমি ঠিক বলেছি কি-না।

বীণা দেবী হাসিলেন—বাবা, তোদের কি কথা কাটা-কাটির শেষ নেই, দিনরাত কথা কাটাকাটি—সমীর তুই একটু চুপ করদিকিনি বাপু, আর রাণু তোর চা একেবারে জুড়িয়ে জল হয়ে গেল যে-রে।

মহোৎসাহে সমীর বলিল—তুমিই দেখ মা ও কি রকম কাজের মেয়ে, চা-টা আমাদের ঠাণ্ডা করে ছাড়লে।

এক কাপ চা ওর দিকে আগাইয়া রাণু বলিল—বেশ বেশ।

ওর মুখটা লাল হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া সমীর বলিল, —এদিকে রাগ তো খুব হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি, আমাকে লাইট চা ঢেলে দিয়ে নিজে কি রকম স্ট্রং ঢালা হচ্ছে শুনি?

—বেশ করছি—ওর দুই চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিল।

বীণা দেবী বকিয়া উঠিলেন—যা বাপু—খালি তোর পেছনে লাগা, তুই ওর কথা শুনিসনি রাণু তোর চা ঢেলে নে।

চায়ের কাপটা নিঃশেষ করিয়া সমীর দাঁড়াইতেই বাহাদুর চাকর আসিয়া দাঁড়াইল।

কি রে!—

একঠো বাবু বৈঠকখানামে বৈঠা হ্যায়।

সমীরের বন্ধু ইন্দ্রনাথ বাহিরের ঘরে বসিয়াছিল, সমীরকে দেখিয়া কহিল—হ্যাঁরে তোদের বাড়ীর খবর সব ভাল তো?

—ভাল—হঠাৎ একথা জিজ্ঞেস করার মানে?

—মানে আর কি এমনি।

ওই যাঃ আজকের কাগজটা দেতো ইন্দ্রনাথ দেখা হয় নি—চেয়ারে বসিয়া সমীর বলিল।

ইন্দ্রনাথ শঙ্কিত হইয়া উঠিল, আজকের খবর বড় ভয়ানক—ষ্টেটসম্যানখানা ওর হাতে দিয়া ইন্দ্রনাথ প্রশ্ন করিল অত্যন্ত ভীরু গলায়, সমীর তোর বাবা কোথায় রে?

কাগজখানা দেখিতে দেখিতে সমীর বলিল,—তিনি এখানে নেই, আজ তাঁর আসবার কথা, দেরাদুনে তিনি ফিরছেন, এ-কি! হ্যাঁরে ইন্দু এ-কি দেখছি দেরাদুন উলটে গেছে!! সর্ব্বনাশ—কাগজখানা সমীরের হাত হইতে পড়িয়া গেল। ভীত ব্যাকুল কণ্ঠে সমীর বলিল—কি হবে ভাই—আমার যে ভয় করছে!

—ভাবিসনি, আগে খোঁজ কর, হয় তো তাঁর কিছু হয় নি। বন্ধুর কাঁধে হাত রাখিয়া ইন্দু বলিল।

বাহাদুর আসিয়া বলিল—আপকো মাইজী বোলায়া হুজুর।

হামকো বোলা মাইজী? কাঁহেরে—

হামতো নেহি জান্তা দাদাবাবু। মাইজী তো জানালা পর বৈঠা হ্যায়।

—দেখি মা-কি বলছেন—তুই ভাই একটু আমার মামার বাড়ীতে খবর দিয়ে আয়।

যাচ্ছি—ইন্দ্রনাথ বাহির হইয়া গেলে সমীর উপরে উঠিল।

জানালার ধারে বীণা দেবী বসিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার পাশে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'খানা খোলা পড়িয়া রহিয়াছে, সমীর ডাকিল—মা—ওমা কি বলছো তুমি? বীণা দেবী ফিরিয়া চাহিলেন—মায়ের এ রকম দৃষ্টি ও মুখ সমীর কখনও দেখে নাই, এ যেন উন্মাদের সৃষ্টি—এ দৃষ্টির সামনে ত্রিভুবন যেন একাকার হইয়া গিয়াছে; ও তাড়াতাড়ি মাকে জড়াইয়া ধরিল, না হইলে হয়তো জানালা হইতে পড়িয়া যাইতেন।

—ওমা মাগো—কি হয়েছে তোমার? কেন এমন করছ?

ছেলের কাঁধে মাথা রাখিয়া বীণা দেবী হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—ওরে খোকোন দেখেছিস আজকের কাগজ? সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে বাবা। মায়ের মাথার উপরেই ঝরঝর করিয়া সমীরের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল—কি সান্ত্বনা ও মাকে দিতে পারে!

সমীরের বড় মামা নীরেনবাবু ঘরে ঢুকিয়া বোনের মাথার কাছে বসিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—কাঁদিসনি বীণু অফিসে খোঁজ নিতে পাঠিয়েছি, উঠে বস—রাণুকে ডাক সে তো দেখলাম বিছানায় পড়ে পড়ে কাঁদছে।

বীণা দেবী চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিলেন—হ্যাঁ দাদা মাকে বলেছ না-কী! শুনলে আবার ওঁর হাঁপ বেড়ে যাবে—এখন কিছু বল না। আবার বীণা দেবীর চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

—কে. কাঁদছিস বীণু? অধৈর্য্য হইয়া নীরেনবাবু বলিলেন—বলছি অফিসে খোঁজ নিতে পাঠিয়েছি, সে ভাল রে ভাল আছে। আমরা এমন কোন পাপ করিনি যার দরুন এত

বড় শাস্তিটা আমাদের পেতে হবে—আমি বলছি বীণু তুই কিছু ভাবিসনি। রাণু উঠে আয় চোখ পুছে ফেল, তোদের চোখের জল আমি দেখতে পারি না, মিথ্যে অমঙ্গল ডেকে আনিসনি।

সমীর বলিল—মামাবাবু আজ আপনার অফিস নেই?

—ওই দেখ সে কথা ভুলেই গেছি—যাই উঠি, আমি শীগ্‌গির শীগ্‌গির ফিরে আসব, তোরা ভাবিসনি।

নীরেনবাবু চলিয়া গেলেন।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বীণা দেবী বলিলেন—হ্যাঁরে—সমীর আজকের লেটার বক্সটা দেখিসনি-রে?

—হ্যাঁ মা—চিঠি তাতে আসেনি। মাথা নীচু করিয়া সমীর বাহির হইয়া গেল। অবরুদ্ধ বেদনায় ওর বুকের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মোচড় দিতে লাগিল—সত্যিই তিনি নেই! এত যাত্রী মারা গেছে তার মধ্যে বাবা কি বেঁচে আছেন! কে জানে!!

টেবিলে মাথা রাখিয়া সমীর ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

নিস্তব্ধ দুপুর—উজ্জ্বল সোনালী সূর্য্য ধরিত্রীর মাথার উপর থাকিয়া অগ্নিকণা বর্ষণ করিতেছে, যেন রুদ্ধরোষে সমগ্র ধরিত্রীকে দগ্ধ করিতে চায়।

বীণা দেবী বিছানাতে শুইয়া ছিলেন—রাণুটা এতক্ষণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কত চিন্তা কত অবরুদ্ধ কথা—সমুদ্রের ঢেউয়ের মত বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতেছে। অবসন্ন দেহ পরিশ্রান্ত মন যেন নিরাবলম্ব হইয়া শূন্যে ঝুলিতেছে। একি হইল। সত্যিই কি আর তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যাইবে না! সমগ্র জগৎ সমগ্র চিন্তা শক্তির বাহিরে কি তিনি চলিয়া গিয়াছেন! হে ঈশ্বর এমন যেন না হয়—অনন্ত করুণাময় তুমি, তোমার করুণায় যেন কোন অকল্যাণ তাঁহার না হয়। কিন্তু মনতো মানিতেছে না, যেন কোন রুদ্ধ দেবতার অভিশাপে পাষাণ হইয়া গিয়াছে। হে ঈশ্বর—হে ঠাকুর—এমন শাস্তি তুমি দিও না—এ আমি সইতে পারব না। বীণা দেবীর চক্ষু দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। স্বামীর সমস্ত কথাবার্ত্তা কার্য্যকলাপ বায়স্কোপের ছবির মত চোখের সামনে ভাসিতে লাগিল। কি সস্নেহ ব্যবহার! একদিনের জন্য রাগ করিয়াও কখনো কড়া কথা বলেন নি, অথচ কত অন্যায় কত অপরাধ না করিয়াছি, সমস্ত স্নেহের হাসি হাসিয়া সহিয়াছেন। দুই হাত জোড় করিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বীণা দেবী বলিতে লাগিলেন—আমি পাপ করে থাকি আমায় তুমি নাও—এ আমি সইতে পারব না, তাঁকে ফিরিয়ে দাও ঠাকুর—

মাইজী—চমকিয়া বীণা দেবী দেখিলেন মলিন মুখে বাহাদুর দাঁড়াইয়া বলিতেছে, একঠো চিঠি আয়া মাইজী।

—চিঠি! কই দেখি!—আগ্রহে আশায় বীণা দেবীর দুই চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

খামখানা হাতে লইয়াই বীণা দেবী বুঝিলেন এ-কার চিঠি—এযে তাঁর অত্যন্ত পরিচিত লেখা। আনন্দে বিষাদে বীণা দেবী চিঠিখানা খুলিলেন, তাহাতে সৌরেনবাবু লিখিয়াছেন যে, "এই ট্রেনেই ফিরিতেন কিন্তু টিকিট না পাওয়ার দরুন ওঁকে আরও দুই দিন অপেক্ষা করিতে হইবে, ওঁরা যেন না ভাবেন।" কৃতজ্ঞতার আনন্দে বীণা দেবীর দুই চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিল—ওঃ ভগবান—কত দয়া তোমার—

—এই বাহাদুর খোকাবাবুকে বোলাও তো; ওরে রাণু ওঠরে। কি শান্তি! কি তৃপ্তি! বীণা দেবী বাহিরের দিকে চাহিলেন—উচ্ছ্বসিত আনন্দে সারা ধরণীর যেন রং বদলাইয়া গিয়াছে, কি শান্ত সুনির্ম্মল আকাশ! সন্ধ্যা আসন্ন—দিগন্তের শেষপ্রান্তে অস্তারুণ সূর্য্যের ম্লান দীপ্তি—গৃহের ছাদে বৃক্ষের চূড়ায় সস্নেহ পরশ রাখিয়া গিয়াছে—সারা বিশ্বসংসার এক অনবদ্য শান্তিতে নিমগ্ন। নারায়ণ! একটা শান্ত সুগভীর নিশ্বাস আয়ত্ত করিয়া বীণা দেবী ডাকিলেন—কইরে রাণু ওঠ্।

কি-মা? ঘুমন্ত রাণু তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল।

—এই দেখ চিঠি এসেছে ভাল আছেন। আমি যাই বাহাদুরকে দিয়ে হরিরলুট পাঠিয়ে দিই। মার কাছে খবর দিই।

পরের দিন সকালে। বীণা দেবী কুটনো কুটিতেছিলেন, সামনের আসনে সমীর ও নীরেনবাবু বসিয়া আছেন, অদূরে রাণু কাপে চা ঢালিতেছে।

নীরেনবাবু বলিতেছিলেন—তোদের তো বলে গেলাম কিছু ভাবিসনি কিন্তু কি ভাবনাই যে হয়েছিল তা আর কি বলব। সকাল থেকে কাল আমি এক কাপ চা ছাড়া আর কিছুই খাইনি। মা জিজ্ঞেস করলেন "হ্যাঁরে তোর কি হয়েছে? কিছু খেলিনা শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে অসুখ করে নি তো? আমি বললাম কিছু হয় নি এমনি শরীরটা ভার ভার মনে হচ্ছে,—কিন্তু তখন যা হচ্ছিল অন্তর্য্যামীই জানেন। এখান থেকে সৌরেনের অফিসে খোঁজ নিয়ে জানলাম আজই ষ্টার্ট করবার কথা গয়া থেকে। সেখান থেকে আর্জ্জেণ্ট টেলিগ্রাম করলাম গয়াতে; ওঃ কি অস্বস্তিতে সারাদিন কেটেছে বলতে পারি না। খালি মনে হচ্ছিল বীণুকে যে ভয় নেই বলে এলাম, এখন কি বলব গিয়ে।

চায়ের কাপটা এগিয়ে দিয়ে রাণু বলিল—বাবাঃ, কাল যে করে দিন কেটেছে—এবারে বাবা এলে আমি এই ট্রেনে ঘোরার কাজ ছেড়ে দিতে বলব।

—সে আর হয় না—চায়ের কাপে চুমুক দিয়া সমীর বলিল—ছেড়ে দেওয়াই উচিত যদিও, কিন্তু সে বাবা ঠিক বুঝিয়ে দেবেন তা তুই দেখে নিস।

বীণা দেবী লজ্জিতভাবে হাসিয়া বলিলেন—ট্রেন জাহাজ আর এয়ারোপ্লেন এই কাজগুলো আমি মোটেই পছন্দ করি না।

চা খাইয়া নীরেনবাবু উঠিয়া বলিলেন—আজকে একটু সকাল সকাল অফিসে যেতে হবে, কাল যাইনি, সাহেবের আবার মেজাজ গরম না হয়ে যায়। নীরেনবাবু চলিয়া গেলেন।

—কালকে ইন্দু খবর পেয়েই আমার কাছে দৌড়ে আসে, সমীর বলিল—কি ভাগ্যি বাবা টিকিট পাননি; আড়াইশো যাত্রীর মধ্যে তাঁকে কি আর খুঁজে পাওয়া যেত। কতযে মারা

পথিক-বন্ধু

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

পথিক-বন্ধু মোর

সেই যে চলেছো না হ'তে উষার তরুণ লাবণি ঘোর,
এখনো কি তুমি ভিক্ষু মাগিবে না কোনো ছায়া-তরুতল!
কেন যাচিবে না সুখ-শান্তির আশ্রয় সুকোমল?
কত অরণ্য ভাঙি' বন-পথ, গিরিবর্ত্মিকা শেষে
যাবে গো একাকী কোন্ ঈপ্সিত অরুণালোকিত দেশে?
ফিকে হয় দিবা, নেপথ্যে ওই সন্ধ্যাগমের সুর,
মৃদু শঙ্কায় পান্থ-পরাণ কাঁপে না-কি দুরু দুরু?
টুকরো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে ম্লান স্বর্ণ-আলোর রেখা,
তুমি কি রহিবে বন্ধুবিহীন বন-নির্জনে একা?

হংস-বলাকাদল

ফিরিয়াছে নীড়ে ধরায় যখন স্তিমিত সন্ধ্যা ঢল;
ঘট ভরি' কাঁখে ফিরেছে সকল গাঁয়ের কৃষক-বধূ,
ভ্রমর ফিরেছে মৌচাকে তার ওষ্ঠে লুটিয়া মধু;
সান্ধ্য-বাতাস বুক-ফাটা কার মৌন হিয়ার বাণী
আনিছে হেথায়, সেকি গো তোমার হৃদয়ের কানাকানি?
তুমি শুধু হায় স্বেদ-বারি মেখে অঙ্গ-মাধুরী কেন
পথ চলিবার কুহক-নেশায় মলিন করিলে হেন!
তোমারে নেহারি আমার আঁখির অশ্রু যে বিগলিত,
অন্তর মোর সমবেদনায় হতেছে প্রকম্পিত।

যুগ-যুগান্ত ধরি'

তুমি ত' চলিবে শ্রান্তিবিহীন সুদীর্ঘ শর্ব্বরী।

ট্রেন দুর্ঘটনায়

(২৪৩ পৃষ্ঠার পর)

পাশে ইজিচেয়ারের হাতলের উপর বসিয়া বলিল—হ্যাঁ বাবা—আমাদের জন্যে তোমার মন কেমন করছিল?

নিশ্চয়ই—সবচেয়ে বেশী তোর জন্যে, মেয়ের মাথায় হাত বুলাইয়া সৌরেনবাবু বলিলেন—খালি মনে হ'ত আমার পাগলী মেয়েটি না জানি কত কাঁদিছে।

—আর আমার জন্যে বুঝি তোমার মন কেমন করত না? হাসিতে হাসিতে সমীর আসিয়া দাঁড়াইল—জান বাবা—মা-জননী তো প্রথমে কেঁদেই ফেলেছিলেন, তোমাকে আজই একবার যেতে বলেছেন।

—যাব রে যাব—তাঁর কাছে আজ একবার যেতেই হবে।

বীণা দেবী বলিলেন—এবার সব তোমরা ওঠ। খাওয়া-দাওয়া করতে হবে, না যে দুর্ঘটনা থেকে ঈশ্বরের অপরিসীম দয়ায় বেঁচে গেছ তারই জের টেনে দিন চলবে?

সৌরেনবাবু রিষ্ট ওয়াচের দিকে চাহিয়া বলিলেন—মোটে দু'টো বাজে।

[illegible]য়াছে [illegible]হারা করিতে [illegible] প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের প্রচেষ্টার নামে তাঁহারা করিতে চাহিয়াছেন করভার প্রপীড়িত প্রজাকুলের উপর নূতন নূতন কর বৃদ্ধি। কিন্তু ইহাতে তাঁহাদের প্রজাহিতৈষী মন তৃপ্তি পায় নাই। তাই এবার কর্পোরেশনের উপর ইউরোপীয় ও অ-বাঙ্গালীদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন।

বর্ত্তমান কর্পোরেশন প্রাতঃস্মরণীয় সুরেন্দ্রনাথের সৃষ্টি। তাঁহার পূর্ব্বে কর্পোরেশন ছিল ইউরোপীয় বণিক ও সরকারের হাতের ক্রীড়নক। কর দিত কলিকাতার লক্ষ লক্ষ অধিবাসী। কিন্তু তাহাদের হাতে কোনই ক্ষমতা ছিল না। তাহাদের কর বাবতে প্রদত্ত টাকা ধনীর সেবায় নিয়োজিত হইত। চৌরঙ্গী ও সাহেবী মহলের বিলাস-ব্যসন চরিতার্থ করিত। দরিদ্র শ্রমিক ও করদাতাদের সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। চিকিৎসার সুব্যবস্থা ছিল না, নিজেদের প্রদত্ত টাকার হিসাবনিকাশ চাহিবার অধিকার করদাতাদের ছিল না। কর্পোরেশনের গঠনতন্ত্র এমনভাবে রচিত ছিল যে তাহাতে সর্ব্বসাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না। কতকগুলি ধনীর দ্বারা সীমাবদ্ধ ভোটারের সাহায্যে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল একটা আমিরি রাজ্য। সুরেন্দ্রনাথ একবার কর্পোরেশনের দোষ ত্রুটির সংশোধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষের প্রতিবন্ধকতায় তাহা পারেন নাই। সেইদিন হইতে তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে যদি কোনদিন তিনি ক্ষমতা হাতে পান তবে এই অভিজাততান্ত্রিক কর্পোরেশনকে ভাঙিয়া চুরিয়া সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করিবেন। প্রথম চেষ্টার বহু বৎসর পর একবার তিনি ক্ষমতা হাতে পাইয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কর্পোরেশন আইনটি সংশোধন করিয়া উহাকে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাঁহার প্রচেষ্টার ফলে কর্পোরেশন হইতে সরকারী প্রভুত্ব বিলুপ্ত হইল। ইউরোপীয় বণিকদের শোষণের পথ বন্ধ হইল। এবং করদাতাদের প্রতিনিধিগণ সুতরাং করদাতাগণই কর্পোরেশনের প্রকৃত কর্ত্তা হইল। সরকার ও ইউরোপীয় বণিকগণ সুরেন্দ্রনাথের এই উদ্যমকে পণ্ড করিতে কোনরূপ চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ অচল অটল। তিনি তাঁহার সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করিলেন, পদত্যাগের ভয় দেখাইলেন। জনমতের দোহাই দিলেন। এইভাবে তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে কর্পোরেশনের আইন সংশোধিত হইল—কর্পোরেশনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। সুরেন্দ্রনাথের

[illegible] দিবে কে? সব প্রতিক্রিয়াশী[illegible] মহলে চলাফেরা করে উদ্ধর্তন বড়কর্ত্তাদের মনস্তুষ্টি সাধনের জন্য দেশের বৃহত্তর স্বার্থকে সর্ব্বদাই জলাঞ্জলি দিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের হাতে কর্পোরেশনের ভার অর্পিত হইলে, গণতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষিত হইতে পারে? তাঁহারা যে গোড়াতেই গণতন্ত্রের গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিবেন! ঠিক সেই সময় দেশের প্রকৃত বন্ধু মহাত্মা চিত্তরঞ্জন দাশ মহোদয় নবগঠিত কর্পোরেশনের সমুদয় ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। কর্পোরেশনের প্রথম মেয়ররূপে তিনি যে সুচিন্তিত পরিকল্পনা দেশবাসীকে প্রদান করিলেন তাহা এদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে নূতন বস্তু, অচিন্তিত ও অভাবনীয় সম্পদ। দেশবন্ধু কর্পোরেশনের প্রকাশ্য সভায় যে নাগরিক আদর্শ পেশ করিলেন তাহা দেখিয়া প্রত্যেকে মুগ্ধ হইল। সকলেই বুঝিল কংগ্রেস কেবল সংগ্রামেই মহৎ নহে, গঠন কার্য্যেও ততোধিক মহৎ ও আদর্শ স্থানীয়। কলিকাতাবাসীর ছিল না শিক্ষার ব্যবস্থা, চিকিৎসার ব্যবস্থা, বিশুদ্ধ খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা; ছিল না তাহাদের নাগরিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সুবিধা-আনন্দ, উন্মুক্ত বাতাস, খেলাধুলার স্থান। দেশবন্ধুর পরিকল্পনা এই সকল অসুবিধা ও অস্বাচ্ছন্দ্য দূর করিতে প্রয়াস পাইল। কর্পোরেশনের দীর্ঘদিনের ইতিহাসে যাহা সম্ভব হয় নাই, দেশবন্ধু অল্পদিনেই তাহা সম্ভব করিলেন। সুরেন্দ্রনাথ কর্পোরেশনকে নবকলেবরে গঠিত করিলেন, আর দেশবন্ধু করিলেন তাহাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা। কর্পোরেশনের কেন্দ্রে কেন্দ্রে শত শত অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহাতে সহস্র সহস্র দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রী পড়িবার অবসর পাইয়া তাহাদের জীবন সার্থক করিল। এতাবৎ এই সব দরিদ্র ছেলেদের পড়িবার ব্যবস্থা কেহই করিতে পারেন নাই। ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইল, স্বাস্থ্যরক্ষার নানারূপে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইল। ইতঃপূর্ব্বে যাহারা অর্থাভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে পারে নাই, দেশবন্ধুর কৃপায় আজ তাহারা বিনা মূল্যে চিকিৎসা পাইতেছে, ঔষধ পাইতেছে এবং প্রণষ্ট-স্বাস্থ্য রক্ষার সর্ব্বপ্রকার সুবিধা পাইতেছে। কর্পোরেশনের এই সব ব্যবস্থা এরূপ স্বাভাবিকভাবে হইয়াছে যে অনেকে হয়ত পনের ষোল বৎসর পূর্ব্বেকার কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে। কলিকাতাবাসী হইবে অকৃতজ্ঞ ও নিমকহারাম যদি তাহারা দেশবন্ধুর দানের কথা, তাঁহার আজন্ম সাধনার কথা বিস্মৃত হয়। দরিদ্র করদাতাদের যে টাকা সাহেব মহলের সখের বিলাসে

উড়িয়া যাইত, বড় বড় রাজপুরুষদের জন্য ডিনার ও অভিনন্দন বাবতে ব্যয়িত হইত; আর তাহার বিনিময়ে করদাতাদের ভাগ্যে জুটিত খুদ-কুঁড়া, সেই টাকা দেশবন্ধুর হাতে আসিয়া করদাতাদের সর্ব্বপ্রকার সেবা করিয়া সার্থক হইল, সফল হইল।

কিন্তু দেশবন্ধু কাহার বলে বলীয়ান হইয়া, কাহার শক্তি হইতে অনুপ্রেরণা পাইয়া কর্পোরেশনের মধ্যে এইরূপ অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন আনিতে সক্ষম হইলেন? তাঁহার পেছনে ছিল কংগ্রেস, ভারতের জাগ্রত মানবতার সমুদয় শক্তি এই কংগ্রেস ও এই শক্তির সাহায্য না পাইলে দেশবন্ধু একা কিছুই করিতে পারিতেন না। বাছাই বাছাই লোক লইয়া তিনি একটি পরিপুষ্ট দলসহ কর্পোরেশনে প্রবেশ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্বেতাঙ্গ-বণিকদের যুগ-যুগের প্রভুত্ব লোপ পাইল। কিন্তু কংগ্রেস যদি তথায় প্রবেশ না করিত, তাহা হইলে কি হইত? ধামাধরা ও আপকেওয়াস্তে লোকগণ প্রবেশ করিয়া সেই মান্ধাতার আমলের নীতিগুলি অনুসরণ করিত। তাহারা গবর্ণমেণ্টের সহিত টেক্কা দিয়া প্রগতিমূলক পদ্ধতি অবলম্বন করিতে পারিত না। সুগঠিত পরিকল্পনা উন্নত আদর্শ [illegible] পারিত না। বস্তুত কংগ্রেস দ্বারা কর্পোরেশন [illegible] কলিকাতাবাসীর পক্ষে একটি আশীর্ব্বাদের মত বোধ হইল। আলাদিনের প্রদীপের মত দেশবন্ধুর সাহায্যে একদিনেই কর্পোরেশনের চেহারা বদলাইয়া গেল। এইখানে কংগ্রেসের সার্থকতা—এইখানে কংগ্রেসের প্রয়োজনীয়তা।

কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীলগণ কর্পোরেশনের উপর কংগ্রেসের প্রভাব বৃদ্ধি স্থির হইয়া দেখিতে পারিল না। তাহারা তলে তলে নানাবিধ ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিল। কংগ্রেস দলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করিল। নানারূপ মিথ্যা অভিযোগ দিয়া নবগঠিত কর্পোরেশনের দুর্নাম রটাইতে লাগিল। সরকার দেখিলেন কর্পোরেশনকে বড় বেশী ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। ইহার ক্ষমতার লাঘব করিতে তাঁহারা কৃতসঙ্কল্প হইলেন। যতদিন কংগ্রেস দল বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রবল ছিলেন ততদিন বিশেষ কিছু করিতে পারিলেন না। কিন্তু আইন অমান্য আন্দোলনের সময় যখন কংগ্রেস দল আইন সভা ছাড়িয়া দিল, তখন সরকার বাহাদুর পুর্ণোদ্যমে কর্পোরেশনের ক্ষমতা হ্রাসের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কংগ্রেসের অসহযোগিতার কারণে আইন সভা হইয়া পড়িল প্রতিক্রিয়াশীল ও সরকার-পন্থীদের লীলা নিকেতন। সেই সময় স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় মহাশয় ছিলেন স্বায়ত্তশাসন-বিভাগের মন্ত্রী। এই হাতের পুতুল মন্ত্রীকে শিখণ্ডীরূপে খাড়া করিয়া সরকার-পূজকগণ কর্পোরেশনের কতকগুলি ক্ষমতা হ্রাস করিয়া ফেলিলেন। ইহাই হইল অধিকার লোপের প্রথম প্রচেষ্টা। এদেশের স্বায়ত্তশাসনের ইতিহাসে মন্ত্রী বিজয়প্রসাদের নাম চির-মহিমময় হইয়া রহিবে। মহামতি সুরেন্দ্রনাথ কর্পোরেশনকে যে সব অধিকার দিয়াছিলেন তিনি তাহা ছাঁটিয়া ফেলিলেন। নব গঠিত কর্পোরেশনে করদাতাদের অর্থের উপর তাহাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের পূর্ণ অধিকার ছিল। কিন্তু মন্ত্রী বিজয়প্রসাদের সংশোধিত আইনে এইরূপ বিধিবদ্ধ হইল যে, অতঃপর সরকারই কর্পোরেশনের খরচপত্রের উপর কর্তৃত্ব করিবেন এবং বিবেচনা মত কাটিয়া দিবেন। যাহা কাটিয়া দিবেন তাহা নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদেরকে নিজেদের পকেট হইতে পূরণ করিতে হইবে। কর্পোরেশনের কর্ম্মচারী নিয়োগ ব্যাপারেও সরকার কঠোরতা অবলম্বন করিলেন। রাজনৈতিক কারণে কারারুদ্ধ ব্যক্তিকে আর নিয়োগ করা চলিবে না। অর্থাৎ কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ যাহাদিগকে যোগ্য বিবেচনা করিবেন, গবর্ণমেণ্ট যদি তাঁহাদিগকে অযোগ্য বিবেচনা করেন তবে সেখানে কর্পোরেশনের কোনই ক্ষমতা থাকিবে না। এইভাবে সুরেন্দ্রনাথের চিরপোষিত সাধনাকে পণ্ড করিবার জন্য সরকার কুঠার হাতে কর্পোরেশনের অধিকার ছাঁটিয়া ফেলিলেন। স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের অধিকার এইভাবে লোপ পাইল।

কিন্তু কর্তৃপক্ষ ইহাতেও সন্তুষ্ট হইলেন না। তাঁহারা কর্পোরেশনকে একেবারে হাতের মুঠোর মধ্যে আনিতে সচেষ্ট হইলেন। আজ প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে ঢাকার নবাব জনাব হবিবুল্লাহ সাহেবের নেতৃত্বাধীনে কর্পোরেশনের নির্ব্বাচন বয়কটের জন্য যে আন্দোলন হইয়াছিল আমরা তখনই বলিয়াছিলাম যে উহার মূল উদ্দেশ্য হইল কর্পোরেশনের ক্ষমতা লোপের অপচেষ্টা। কারণ, তখন তাঁহারা কতকগুলি অভিযোগ তুলিয়া কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে লোক দেখান একটা জনমত সৃষ্টি করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন। সুযোগ ও অবসর হাতে পাইলে সেই তথাকথিত জনমতের দোহাই দিয়া কর্পোরেশনের স্বাধীনতা লোপের জন্য পুনঃপ্রচেষ্টা করা চলিবে। এখন দেখিতেছি, আমাদের সেদিনকার কথা বর্ণে বর্ণে খাটিয়া যাইতেছে। বর্ত্তমান প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রিমণ্ডলী নানাভাবে নিজেদের মধ্যযুগীয় মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহারা কর্পোরেশনকে নষ্ট করিবার জন্য যে ফাঁদ পাতিতে উদ্যত হইয়াছেন তাহা তাঁহাদের ভ্রান্ত মানসিকতার ফলস্বরূপ। পূর্ব্বতন আমলাতন্ত্রের হাতের পুতুল স্যার বিজয়প্রসাদ মহাশয় যাহা করিতে সাহস করেন নাই, এবার ডাল-ভাতের মন্ত্রী হক সাহেব তাহাই করিতে উদ্যত হইয়াছেন। প্রস্তাব হইয়াছে যে, করর্পোরেশনে মুসলমানদের আসন কিছু বাড়াইয়া দিতে হইবে, সাধারণ হিন্দুদের আসন কমাইয়া দিতে হইবে, তপশীলভুক্তদের জন্য কতকগুলি আসন নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে এবং যুক্ত-নির্ব্বাচন প্রথাকে রহিত করিয়া তৎস্থলে পৃথক নির্ব্বাচন প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। বলা হইয়াছে, ইহাতে নাকি সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষিত হইবে। আমি মুসলমান, সুতরাং মুসলমানদের জন্য আসন বৃদ্ধির কথা শুনিয়া আনন্দ বই ক্ষোভ করিবার কারণ দেখি না। তবুও মন্ত্রীদের এই প্রস্তাবে মোটেই সায় দিতে পারিতেছি না, কারণ আসন বৃদ্ধির প্রলোভনটা ধাপ্পাবাজীর চাল মাত্র। মূল বিষয় হইল নির্ব্বাচন পদ্ধতি। পৃথক নির্ব্বাচন প্রবর্ত্তিত হইলে মুসলমানের জন্য আরও আট দশটা আসন দিলেও মুসলমানের কল্যাণ হইবে না। বর্ত্তমানে যুক্ত নির্ব্বাচন আছে বলিয়া অতিমাত্রায় প্রতিক্রিয়-

(শেষাংশ ২৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পুস্তক পরিচয়

কেন ব্যবধান—শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহ রায় প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীজগৎকিশোর দত্ত, কলানায়ক, রাণীবিতান, নোয়াখালী। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"কেন ব্যবধান" নগেন্দ্রকুমার গুহ রায় প্রণীত একখানি উপন্যাস। এই উপন্যাসখানির প্রত্যেকটি চিত্রাঙ্কনই আমাদের ভাল লাগিয়াছে। স্বামীস্ত্রীর মধ্যে প্রেম ও দ্বন্দ্ব, ভাইবোনের ভালবাসা, ননদ ভ্রাতৃজায়ার সখীত্ব, সকল ভাবগুলিই লেখক সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। নীলিমাকেও আমাদের ভাল লাগিয়াছে। কিন্তু রাঁচিতে মণি ও জমিদার গৃহিণী শত শত প্রজার মাতৃস্থানীয়া, করুণাময়ী অন্নপূর্ণারূপিণী নীলিমার ব্যবহার একটু বিসদৃশ লাগিয়াছে। নীলিমার যে সংযম, যে দায়িত্ব, যে মহিমার পরিচয় আমরা জানিতে পারি পুরাতন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী উমাপতির নিকট, তাহার সহিত দিবসের অধিক ভাগ ও অধিক রাত্র পর্যন্ত অবিরাম গল্পগুজবে রত নীলিমার যেন মিলের অভাব পরিলক্ষিত হয়। মোটের উপর উপন্যাসখানি আমাদের ভাল লাগিয়াছে। গ্রন্থকারের লেখার সহজ ও সাবলীল ভঙ্গী আমাদের মুগ্ধ করিয়াছে। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

আমরা বাঙ্গালী—অধ্যাপক হরিসাধন চট্টোপাধ্যায় এম-এ প্রণীত। এইচ চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিঃ, ১৯নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। দাম বার আনা মাত্র।

বইখানি আগাগোড়া পড়িলাম। যদিও ইহা সংকলন-মাত্র, তবু সংকলনে অধ্যাপক মহাশয় যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। বাঙলার প্রাচীন ভৌগোলিক বিবরণ, বাঙালী জাতির প্রাচীনত্ব, বাঙালীর ভাষা ও লিপি প্রভৃতি পাঠ করিলে অতীত বাঙলা সম্বন্ধে সত্যিকার ধারণা মানুষের মনে জন্মে। কি ভাবে নানা জাতি আসিয়া বাঙলায় পত্তন গাড়িল, হিন্দু ধর্ম্মের প্রাধান্য কি ভাবে ক্ষুন্ন হইল—তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ইহাতে আছে। বাঙালী মনীষীদের সংক্ষিপ্ত জীবনী—ইহার আকর্ষণীয় বস্তু। বাঙালী জাতি কলমপেষা ভেতো বাঙালী ছিল না—সৈনিক জাতি ছিল। মহাসমরের সময় লেফটেনান্ট মিল বাঙালীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—"ইহারাই আমার সেনাদলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেনাদল।" বাঙালীর কার্যদক্ষতা দেখিয়া একজন উচ্চপদস্থ ফরাসী কর্ম্মচারী বলিয়াছিলেন—"বাঙালীদের মত আমাদের রেজিমেণ্টগুলি হইলে অনেক সুবিধা হইত।" কিন্তু সেই বাঙালী আজ আত্মবিস্মৃত, কর্ম্মভীরু বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

অধ্যাপক মহাশয় বইখানি সংকলন করিয়া প্রশংসার্হ হইয়াছেন। এই বইখানি সমস্ত বাঙালীরই পাঠ করা উচিত। আকারের তুলনায় বইয়ের দাম খুবই অল্প হইয়াছে। গরীব বাঙালীদের পক্ষেও বইখানি ক্রয় করা অসুবিধা হইবে না আশা করি।

চিত্রলেখা—লেখক খগেন্দ্রনাথ ঘোষ। এম সি সরকার এণ্ড সন্স, ১৫নং কলেজ স্কোয়ার হইতে প্রকাশিত। দাম পাঁচ সিকা।

পঞ্চাশটিরও অধিক কবিতা বইখানিতে সন্নিবেশিত। লেখক সাহিত্য-জগতে খুব পরিচিত না হইলেও নূতন নহেন—কবিতাগুলি পড়িয়া তাহা বুঝা গেল। উৎসর্গ, জন্মদিনে, জ্ঞানীর সাধনা, বিস্ময়, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি কয়েকটি কবিতা আমাদের ভাল লাগিয়াছে। প্রায় সমস্ত কবিতাগুলিতেই রবীন্দ্র-প্রভাব বিদ্যমান।

বইয়ের ছাপা ও বাঁধাই প্রশংসার যোগ্য। তবে মুদ্রণ-প্রমাদ বহুস্থানে পরিলক্ষিত হইল।

রূপ-কথা—শ্রীমন্মথ রায় প্রণীত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম বার আনা।

মন্মথবাবু নাট্যকার হিসাবে বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি বহু নাটক লিখিয়াছেন এবং তাহার অনেকগুলিই বঙ্গীয় নাট্যমঞ্চে অভিনীত হইয়াছে। কোন কোনখানি এখনও অভিনীত হইতেছে। 'রূপ-কথা' নাটক-খানি আমরা পড়িয়াছি, পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি। নাট্য-জগতের একটি নূতন উপাদান পল্লী বাঙলার রূপ-কথার মধ্যে যে লুক্কায়িত আছে, মন্মথবাবু তাহা শিক্ষিতজনকে জানাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকখানির সার্থকতা এই দিক হইতে অনেকখানি। ইহার আখ্যানভাগের অভিনবত্বই যে পাঠককে মুগ্ধ করিবে তাহা নয়, চরিত্রগুলির সাবলীল প্রকাশভঙ্গী ও নৃত্য-গীত, সবগুলি মিলিয়া তাঁহার মনে একটা অপূর্ব্ব ছাপ রাখিয়া যাইবে। 'প্রেম দ্বারাই সবরকম বিদ্বেষ ও বিপদ জয় করা সম্ভব'—নানা ছন্দে এই কথাটিই লেখক বুঝাইয়া দিয়াছেন।

বক্তৃতা-বিজ্ঞান—নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। মূল্য এক টাকা। প্রাপ্তিস্থান—ষ্টুডেণ্টস এম্পোরিয়াম লিমিটেড, ২০৪নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী বাঙলা দেশে একজন প্রসিদ্ধ বক্তা।। অসহযোগ আন্দোলনের প্রারম্ভ হইতেই বক্তা হিসাবে তিনি খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। লেখক হিসাবেও তাঁহার নাম আছে। তাঁহার লিখিত 'বক্তৃতা বিজ্ঞান' বাঙলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ একটা নূতন গ্রন্থ। বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া বক্তৃতাশক্তিও অর্জ্জন করিবার প্রকরণ এই পুস্তকে দেখান হইয়াছে। বাগ্মিতা একটা বড় সাধনা। বাঙালীর এই সাধনার সম্পদ উপেক্ষায় হারাইতে হইয়াছে। সেদিকে যদি লোকের আগ্রহ জাগে, যে বাঙালী সমাজে একদিন প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বক্তা জন্মগ্রহণ করেন এবং বাগ্মিতাশক্তির প্রভাবে বাঙলার যশগৌরব বিস্তার করেন, দেশকে জাগান, জাতিকে জাগান, সে শক্তি বাঙলায় পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এই পুস্তক পাঠে যদি বাঙালী সমাজে আগ্রহ জন্মে তবে লেখকের চেষ্টা সার্থক হইবে। রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র পুস্তকের একটি ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন।

সাহিত্য-সংবাদ

গল্প প্রতিযোগিতা

চট্টগ্রামের ছাত্র-পরিচালিত হস্তলিখিত 'দীপিকা' পত্রিকার উদ্যোগে বাঙলার স্কুলসমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একটি গল্প প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হইতেছে। যাঁহারা উক্ত প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা নিম্নলিখিত নিয়মাবলী অনুসারে রচনা পাঠাইবেন।

নিয়মাবলীঃ—

(১) বাঙলার উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের যে কোন ছাত্র-ছাত্রী প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারিবেন, কোন প্রবেশ-মূল্য নাই।

(২) রচনা সংক্ষিপ্ত হইবে এবং ফুলস্কেপ কাগজের পাঁচ পৃষ্ঠার অনধিক হইবে।

(৩) প্রতিযোগিতায় যিনি প্রথম স্থান অধিকার করিবেন, তাঁহাকে একটি রৌপ্যপদক দেওয়া হইবে, এবং যিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবেন, তাঁহাকে একখানি ভাল বই দেওয়া হইবে।

(৪) রচনা পাঠাইবার শেষ তারিখ ২০শে মার্চ্চ। প্রতি-যোগিগণকে নিজের ও বিদ্যালয়ের নাম, বাড়ীর ঠিকানা ইত্যাদি পাঠাইতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

(৫) বিস্তৃত বিবরণের জন্য উপযুক্ত ডাকটিকিট সহ পত্র লিখুন।

(৬) যথাসময়ে ফলাফল পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

শ্রীপ্রিয়ব্রত দত্ত, C/o. জে এল দত্ত বি-এল, ফিরিঙ্গী-বাজার রোড, চট্টগ্রাম।

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

বিষয়—(১) নিঃসম্বলের ধনার্জ্জনের প্রকৃষ্টপন্থা, (২) বর্ত্তমান যুগোপযোগী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কার্যপদ্ধতি।

উপরোক্ত বিষয়দ্বয় অবলম্বনে জাতিবর্ণনির্বিশেষে যে-কোন পুরুষ কিম্বা নারী প্রবন্ধ লিখিতে পারিবেন। যিনি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে পারিবেন তাঁহাকে "শান্তি আশ্রমস্থ তরঙ্গিণী লাইব্রেরী" কর্ত্তৃপক্ষ একটি করিয়া রৌপ্য-পদক পুরস্কার দিবেন। প্রবন্ধ ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া আগামী ৩০শে ফাল্গুনের মধ্যে নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠাবেন। কোন বিষয়ে প্রত্যুত্তর পাইতে হইলে ডাক টিকিট সঙ্গে দিবেন। শ্রীবিপিনচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ, সেক্রেটারী তরঙ্গিণী লাইব্রেরী, শান্তি-আশ্রম, পোঃ হোগলা, জিলা ময়মনসিংহ।

প্রভাতী সঙ্ঘ

গত শিবরাত্রি উপলক্ষে পাটনা, বাঁকীপুর 'বেহার হেরাল্ড' কার্য্যালয়ে প্রভাতী সঙ্ঘের একটি বিশেষ অধিবেশন হয়। সঙ্ঘের অধিকাংশ সভাই উপস্থিত ছিলেন। শ্রীনিবেন্দু ঘোষের গল্প, শ্রীবিমল রায়ের কবিতা পাঠের পর "বাঙলার বাহিরে বাঙালীর দান" সম্বন্ধে আলোচনা হয়। পরে প্রভাতী বার্ষিক পত্রিকাটিকে মাসিকে পরিণত করিবার যে চেষ্টা চলিতেছে সে সম্বন্ধে আলোচনা হয়। স্থির হয় যে, পত্রিকাটির নাম প্রভাতী রাখা হইবে। বৃহত্তর বঙ্গের বিভিন্ন দিক আলোচনাই এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে।

লেখা ও রেখা প্রতিযোগিতা

১। লেখাঃ—কবিতা (বিষয় নির্দ্দিষ্ট নাই। ৩০ লাইনের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।)

২। রেখাঃ—১০ ইঞ্চি × ৭ ইঞ্চি মাপের যে কোন ছবি দেওয়া চলিবে। ছবি রঙীন হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

৩। ফটোঃ— প্রাকৃতিক দৃশ্যমূলক যে কোন ফটো।

লেখা, রেখা, ফটো—ইহাদের প্রত্যেকটি মৌলিক হওয়া চাই। অন্যথায় গ্রাহ্য হইবে না। প্রত্যেক বিষয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারীকে পুরস্কৃত করা হইবে। ২৫শে মার্চ্চ তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন।

আর্টিষ্ট, বি ভট্টাচার্য্য।
৩৫, জোলাপাড়া লেন।
হাওড়া

তারিখ পরিবর্ত্তন

২১শে মাঘ, ১৩৪৫ সালের "দেশ" পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত 'তরুণ যাত্রী' রচনা প্রতিযোগিতার শেষ যোগদানের তারিখ ২৫শে ফেব্রুয়ারীর বদল ২৫শে মার্চ্চ করা হইল।

বিশ্ববন্ধু ছাত্র-সঙ্ঘ
২৪৬, রামকৃষ্ণপুর লেন।
হাওড়া।

কর্পোরেশনের অধিকার লোপের অপচেষ্টা

(২৪৭ পৃষ্ঠার পর)

শীল ব্যক্তিগণ কর্পোরেশনে প্রবল হইতে পারিতেছে না। ইহারই জন্য ইউরোপীয়ান, সরকার-মনোনীত ও প্রতিক্রিয়া-শীল হিন্দু-মুসলমান একত্র মিলিয়া সরকার পক্ষীয় দল গঠন করিতে পারিতেছে না। সেইজন্যই কর্পোরেশনে বরাবরই জাতীয়তাবাদী ও সরকার-বিরোধী দল প্রবল হইয়া আসিতেছে। আর তাহারাই দেশবন্ধুর মহৎ পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে সতত চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু পৃথক নির্ব্বাচন প্রবর্ত্তিত হইলে প্রগতিবাদী মুসলমান নির্ব্বাচিত হইতে পারিবে না। অ-বাঙ্গালী মুসলমান সম্প্রদায় বাঙ্গালী মুসলমানের উপর প্রভুত্ব করিবে। অ-বাঙ্গালী মুসলমান অপেক্ষা বাঙ্গালী মুসলমানের নিকট বাঙ্গালী হিন্দু শতগুণে বাঞ্ছনীয়। কাহার কত আসন ইহা লইয়া আমরা মাথা ঘামাইতে চাহি না। নির্ব্বাচন পদ্ধতি যুক্ত হইলে আসনসংখ্যার তারতম্য কাহারও বিশেষ ক্ষতি করিবে না। সেইজন্য আমরা বলি সকল অবস্থাতেই যুক্ত নির্ব্বাচন অব্যাহত রাখিতে হইবে। হক্ সাহেব যে বিষবৃক্ষের বীজ রোপণ করিতে চাহিতেছেন তাহার ফল আজি হউক কালি হউক মুসলমানকে ভোগ করিতে হইবে। এ বিষয়ে অন্যান্য কথা বারান্তরে বলিব।

শ্রীমতী আরতি গুপ্তা

শ্রীমতী আরতি গুপ্তা এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে 'শ্রীকৃষ্ণ' নৃত্যে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। এই বৎসর নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় ও বেঙ্গল মিউজিক এসোসিয়েশনের নৃত্য প্রতিযোগিতায় এই বালিকাটি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে ও নৃত্য-প্রতিযোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করিয়াছে। সম্প্রতি এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে 'সঙ্গীত সম্মিলনীর' ও শিশুদিগের উন্মুক্ত বায়ু সেবন সমিতির উদ্যোগে যে নৃত্য-গীতের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহাতে তিনদিনই এই বালিকাটি দর্শকবৃন্দের নিকট হইতে ভূয়সী প্রশংসা লাভ করিয়াছে। এই বালিকাটি সুবিখ্যাত নৃত্যকলাবিদ্ প্রোঃ যমুনাপ্রসাদের ছাত্রী। শ্রীমতী আরতি ডাঃ এ গুপ্তের কন্যা।

শ্রীমতী কনক দাশগুপ্তা

শ্রীমতী মঞ্জু সর্ব্বাধিকারী

শ্রীমতী নির্ম্মলা মজুমদার

শ্রীমতী মঞ্জু সর্ব্বাধিকারী

ডাঃ শচীন সর্ব্বাধিকারীর কন্যা এবং ডাঃ ভানুভূষণ দাশগুপ্তের ভাগিনেয়ী শ্রীমতী মঞ্জু সর্ব্বাধিকারী সম্প্রতি ফার্ষ্ট এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে একটি নৃত্যানুষ্ঠানে 'সরস্বতী' নৃত্য দেখাইয়া বিশেষ প্রশংসিত হইয়াছে। তাহার বয়স মাত্র ১০ বৎসর।

শ্রীমতী কনক দাসগুপ্তা

পূর্ব্ববঙ্গের সুগায়িকা শ্রীমতী কনক দাশগুপ্তা এবারে বঙ্গীয় সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় বার্ষিক প্রতিযোগিতায় গজল ও আধুনিক গানে প্রথম স্থান এবং খেয়াল ও ভাটিয়ালীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি আরো কয়েকটি সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানে পদক লাভ করিয়াছেন। শ্রীমতী কনক শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত মহাশয়ের ছাত্রী এবং মেহার নিবাসী (ত্রিপুরা) শ্রীযুত ধীরেন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত মহাশয়ের কন্যা।

শ্রীমতী সুদক্ষিণা ও শুভ্রজা বন্দ্যোপাধ্যায়

সুপ্রসিদ্ধ কথাশিল্পী শ্রীযুত বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যাদ্বয়—শ্রীমতী সুদক্ষিণা ও শুভ্রজা এবার বেঙ্গল মিউজিক প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে খেয়াল ও কীর্ত্তন গানে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন এবং পদক লাভ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ইঁহারা সঙ্গীত শিক্ষক শ্রীযুত অশ্বিনীকুমার দত্তের ছাত্রী।

উত্তরবঙ্গের যশস্বিনী সঙ্গীতজ্ঞা শ্রীমতী নির্ম্মলা মজুমদার (সৈয়দপুর) এবারে বঙ্গীয় সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় বার্ষিক প্রতিযোগিতায় খেয়াল এবং ভাটিয়ালী গানে ও ভজন গানে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। এই বৎসর কাঁচড়াপাড়া রেলওয়ে সঙ্গীত প্রতিযোগিতায়ও খেয়াল এবং বাঙলা গানে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া দুইখানি পদক এবং খেয়ালে ওপেন প্রতিযোগিতায়ও প্রথম হইয়া একটি পদক এবং আরও একটি পদক পাইয়াছেন। শ্রীমতী নির্ম্মলা বঙ্গের অন্যতম সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সুযোগ্যা ছাত্রী এবং সৈয়দপুর (রংপুর) নিবাসী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের কন্যা।

শ্রীমতী সান্ত্বনা গুহ

ব্রহ্ম প্রবাসী থারওয়াডির খ্যাতনামা ব্যবহারজীবী শ্রীযুত সুধীরকুমার গুহের কন্যা শ্রীমতী সান্ত্বনা গুহ বঙ্গীয় সংগীত সমিতির এই বৎসরকার প্রতিযোগিতায় বেহালা বাজনায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পদক লাভ করিয়াছে। শ্রীমতী সান্ত্বনা

শ্রীমতী আরতি গুপ্তা

ইস্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মের "যখের ধন" চিত্রে শ্রীমতী শীলা হালদার। শ্রীযুত হরি ভঞ্জ পরিচালনা করিতেছেন।

গুহের বয়স মাত্র ১৩ বৎসর। এই অল্প বয়সে বেহালাতে শ্রীমতী সান্ত্বনার এইরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন সত্যই প্রশংসনীয়।

* * * * *

ইস্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মের 'যখের ধন' ছবি প্রায় শেষ হইয়া আসিল। ছবিখানি মার্চ্চ মাসের শেষের দিকে উত্তরা চিত্র-গৃহে মুক্তিলাভ করিবে বলিয়া জানা গিয়াছে। শ্রীযুত হরি ভঞ্জ ছবিখানি পরিচালনা করিয়াছেন। চরিত্রলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

করালী—অহীন্দ্র চৌধুরী; শম্ভু—রবি রায়; হাবুল—জানকী ভট্টাচার্য; বিমল—জহর গাঙ্গুলী; কুমার—সুশীল রায়; রামহরি—কুমার মিত্র; লেখা—শীলা হালদার; আঙ্গুর—শিশুবালা; কাড়িং—ছায়া ও কুমারের মাতা—নিভাননী।

* * * * *

মতিমহল থিয়েটার্স লিমিটেড ইস্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম ষ্টুডিওতে 'দেবযানী' নামে একখানি বাঙলা ছবি তোলার ব্যবস্থা করিতেছেন। দেবযানীর আখ্যানভাগ লিখিয়াছেন শ্রীযুত কৃষ্ণধন দে। কচ ও দেবযানীর কাহিনী অবলম্বন করিয়া ইহার আখ্যানভাগ লিখিত হইয়াছে।

বাঙলার হকি খেলা

হকি খেলার মরসুম আরম্ভ হইয়াছে। প্রতি বৎসরের ন্যায় বালক, যুবকগণ বিপুল উৎসাহে ও উদ্যমের সহিত হকি খেলায় মাতিয়া গিয়াছে। বৈকালীন কলিকাতার মাঠে সেই-জন্যই হকি খেলোয়াড় ও দর্শকগণের ভীড় পরিলক্ষিত হইতেছে। বাঙলার বিভিন্ন জেলার খেলোয়াড়গণও পশ্চাতে পড়িয়া থাকেন নাই। তাঁহারাও হকি খেলার তোড়জোড় করিতেছেন। ঢাকার খেলোয়াড়গণই এই বিষয় বিশেষ উৎসাহী, ভারতের শ্রেষ্ঠ হকি খেলোয়াড় ধ্যানচাঁদ ঢাকায় অবস্থান করিতেছেন বলিয়া বোধ হয়। গত বৎসর অপেক্ষা বাঙালী খেলোয়াড়গণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কিন্তু ইহা হুজুগ মাত্র

খেলার উৎসাহ বৃদ্ধি, খেলোয়াড়গণের সংখ্যা বৃদ্ধি, নূতন নূতন দল গঠন সাধারণের আনন্দের কারণ হইতে পারে, কিন্তু ইহা আমাদিগকে চিন্তিত করিয়াছে। কারণ আমরা দেখিতেছি, হুজুগপ্রিয় বাঙালী হুজুগে মাতিয়াছে। এই-দল-বৃদ্ধি বা খেলোয়াড়-বৃদ্ধির পিছনে শিক্ষার কোনই ব্যবস্থা নাই। শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকিলে যখন যাহা হইয়া থাকে—অযথা লাঠিবাজী ও শোচনীয় পরাজয়, তাহাই প্রতিদিন আমাদিগকে দেখিতে হইতেছে।

শ্রেষ্ঠ বাঙালী দলগুলিও উদাসীন

মোহনবাগান, গ্রীয়ার, ভবানীপুর, ইষ্টবেঙ্গল প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বাঙালী হকি দলসমূহ যাহাদের খেলার ফলাফল বাঙালীর ভবিষ্যৎ খেলোয়াড়গণের প্রাণে উৎসাহ ও উদ্যম বৃদ্ধি করিবে, তাহারাই প্রতিদিন শোচনীয়ভাবে খেলায় পরাজিত হইতেছে। প্রথম দুই এক দিনের খেলার ফলাফল দেখিয়া অনেকেই আশা করিয়াছিলেন, উক্ত দলসমূহ নিজ নিজ অবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্য পরবর্ত্তী খেলাসমূহে আপ্রাণ চেষ্টা করিবেন, কিন্তু তাহার কোনই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। খেলোয়াড়গণের ঔদাসিনাই দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

দেশের স্বার্থ বিসর্জ্জন

দলের সুনাম বৃদ্ধির জন্য দেশের খেলোয়াড়গণকে বঞ্চিত করিয়া অ-বাঙালী খেলোয়াড়গণকে দলে স্থান দিবার প্রচেষ্টার অভাব বিশেষ দেখা যাইতেছে না। ইহা হইতেই বুঝা যায়, নূতন আইন প্রণয়ন করিয়া এই ব্যবস্থা বন্ধ করিবার যে প্রচেষ্টা হইয়াছিল, তাহা কার্য্যকরী হয় নাই। তবে এই কথা ঠিক, আইন প্রণেতা যাঁহারা, তাঁহারাই যদি আইন ভঙ্গের জন্য পথ বাহির করেন, তখন আইন কার্য্যকরী হইবে কি করিয়া? সুতরাং বাঙলার বিভিন্ন হকি দলের পরিচালকগণের মধ্যে এমন সব লোক আছেন যাঁহারা দলের স্বার্থ বড় করিয়া দেখেন, দেশের ভবিষ্যত খেলোয়াড়গণের উন্নতি কামনা করেন না। ইহারাই বাঙালী হকি খেলোয়াড়গণের শিক্ষার ব্যবস্থার বিরাট অন্তরায়। ইহারাই অর্থাভাবের জন্যই যে শিক্ষার ব্যবস্থা হইতেছে না—ইহা শতমুখে প্রচার করিয়া থাকেন। অথচ নিপুণ খেলোয়াড়কে দলভুক্ত করিতে লুক্কায়িতভাবে দলের শত শত টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন, সেই সময় অর্থাভাবের কথা তাঁহাদের মনে স্থান পায় না। তবে ইহারা যে চিরকাল খেলার মাঠে মাতব্বরী করিবেন, ইহা অনেকে বিশ্বাস করিলেও আমরা করি না। আমরা জানি বিক্ষুব্ধ বাঙালী হকি খেলোয়াড়গণই এই সমস্ত লোকেদের হাত হইতে একদিন অধিকার কাড়িয়া লইবে। শোচনীয় পরাজয়ের কালিমা চিরকাল মুখে লেপন করিয়া ভারতীয় হকি ক্রীড়াক্ষেত্র ইহাতে বঞ্চিত হইয়া বাঙালী খেলোয়াড়গণ নীরব থাকিতে পারিবেন না। দুর্দ্দমনীয় আত্মাভিমানের জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া একদিন এই শোচনীয় অবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য খাড়া হইয়া দাঁড়াইবেনই। নিম্নে বর্ত্তমান বৎসরের হকি লীগের এই পর্য্যন্ত যতগুলি খেলা হইয়াছে তাহার ফলাফল প্রদত্ত হইলঃ—

প্রথম ডিভিসন হকি লীগ তালিকা

	খে	জ	ড্র	প	স্ব	বি	পয়েণ্ট
কাষ্টমস	৬	৬	০	০	৩৫	৩	১২
মহমেডান স্পোর্টিং	৭	৪	২	১	১৫	৫	১০
রেঞ্জার্স	৪	৪	০	০	১৪	১	৮
পুলিশ	৫	৩	২	০	১২	৩	৮
ই বি আর	৪	২	২	০	৪	১	৬
মেসারার্স	৬	২	২	২	৪	৫	৬
মিলিঃ মেডিক্যাল	৫	২	১	২	৮	৫	৫
বি জি প্রেস	৫	১	২	২	২	৭	৪
জেভেরিয়ান্স	৪	১	২	১	৫	৬	৩
সি এফ সি	৪	১	১	২	৩	৪	৩
গ্রীয়ার	৪	০	৩	১	৭	১০	৩
পোর্ট কমিশনার্স	৩	১	১	১	২	৫	৩
আর্মেনিয়ান্স	৫	১	১	৩	৩	৯	৩
ডালহৌসী	৫	১	১	৩	৪	১৬	৩
মোহনবাগান	৪	১	০	৩	৩	৫	২
হাওড়া ইনস্	৪	১	০	৩	৩	৮	২
ইষ্ট বেঙ্গল	২	১	০	১	১	৫	২
বর্ডার রেজিমেণ্ট	৫	০	০	৫	৩	২৩	০
ভবানীপুর	২	০	০	২	০	৭	০

নিখিল ভারত ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা

বাগবাজার জিমন্যাসিয়াম পরিচালিত নিখিল ভারত ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এই বৎসরে বিভিন্ন বিভাগের ফলাফল উন্নতর হইয়াছে, চারিটি বিষয়ে নূতন ভারতীয় রেকর্ড হইয়াছে।

১১ ষ্টোন বিভাগে শ্রীযুত এ কে সেন দুই হস্তে স্ন্যাচে ১৮০ পাউণ্ড তুলিয়া নূতন ভারতীয় রেকর্ড করিয়াছেন। পাঞ্জাবের বিখ্যাত ব্যায়ামবীর মহম্মদ নকি দুই হস্তে ক্লিন ও জার্কে ২৯২॥ পাউণ্ড, দুই হস্তে মিলিটারী প্রেসে ২২২॥

পাউণ্ড ও মোট ৭২৭॥ পাউণ্ড তুলিয়া তিনটি নূতন ভারতীয় রেকর্ড করিয়াছেন। বার্ম্মার জা-উইকের ক্লিন ও জার্কের রেকর্ড মহম্মদ নকি ১২॥ পাউণ্ডে অতিক্রম করেন। দেহ সৌষ্ঠবের জন্য মিঃ স্মিথ ও মিঃ এস হোনলকে পুরস্কৃত করা হইয়াছে। নিম্নে ফলাফল প্রদত্ত হইল।

৮ ষ্টোন বিভাগ

১ম—ও ভাস্কর, মিলিটারী প্রেস ১৩০ পাউণ্ড, স্ন্যাচ ১৪০ পাউণ্ড, ক্লিন ও জার্ক ১৯০ পাউণ্ড, মোট ৪৬০ পাউণ্ড।

২য়—আর জ্যাকসন, মিলিটারী প্রেস ১২০ পাউণ্ড, স্ন্যাচ ১২৫ পাউণ্ড, ক্লিন ও জার্ক ১৭০ পাউণ্ড, মোট ৪১৫ পাউণ্ড।

৯ ষ্টোন বিভাগ

১ম—এস কে নায়ার, মিলিটারী প্রেস ১৫৫ পাউণ্ড, স্ন্যাচ ১৬০ পাউণ্ড, ক্লিন ও জার্ক ২১০ পাউণ্ড, মোট ৫১৫ পাউণ্ড।

১১ ষ্টোন বিভাগ

১ম—এম পি কৃষ্ণন, দুই হস্তে মিলিটারী প্রেস ১৭০ পাউণ্ড, দুই হস্তে স্ন্যাচ ১৭০ পাউণ্ড, দুই হস্তে ক্লিন ও জার্ক ২৩৫ পাউণ্ড। মোট ৫০৫ পাউণ্ড।

২য়—এ কে সেন, দুই হস্তে মিলিটারী প্রেস ১৬০ পাউণ্ড, দুই হস্তে স্ন্যাচ ১৮০ পাউণ্ড, দুই হস্তে ক্লিন ও জার্ক ২৩০ পাউণ্ড। মোট ৫৭০ পাউণ্ড।

১২ ষ্টোন বিভাগ

১ম—এম পি কৃষ্ণান, মিলিটারী প্রেস ১৭০ পাউণ্ড, স্ন্যাচ ১৭৫ পাউণ্ড, ক্লিন ও জার্ক ২৪৫ পাউণ্ড। মোট ৫৯০ পাউণ্ড।

২য়—এইচ স্মিথ, মিলিটারী প্রেস ১৭৫ পাউণ্ড, স্ন্যাচ ১৭০ পাউণ্ড, ক্লিন ও জার্ক ২৩৫ পাউণ্ড। মোট ৫৮০ পাউণ্ড।

৩য়—আর লেহানী, মিলিটারী প্রেস ১৬০ পাউণ্ড, স্ন্যাচ ১৮০ পাউণ্ড, ক্লিন ও জার্ক ১৪০ পাউণ্ড। মোট ৫৮০ পাউণ্ড।

হেভী ওয়েট বিভাগ

মহম্মদ নকি বিজয়ী—মিলিটারী প্রেস ২২২॥ পাউণ্ড, স্ন্যাচ ২১২॥ পাউণ্ড, ক্লিন ও জার্ক ২৯২॥ পাউণ্ড। মোট ৭২৭॥ পাউণ্ড।

বাগবাজার জিমন্যাসিয়াম পরিচালিত নিখিল ভারত ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় সাফল্যমণ্ডিত ব্যায়ামবীরগণ।

সাপ্তাহিক সংবাদ

২১শে ফেব্রুয়ারী—

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্যাটেলপন্থী সদস্যগণ মহাত্মাজীর সহিত ঘরোয়া আলোচনায় সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, ত্রিপুরী কংগ্রেসের পূর্ব্বেই তাঁহারা পদত্যাগ করিবেন এবং রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রকে স্বীয় মতাবলম্বী সদস্যদের লইয়া ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা নির্ণয়ের সুযোগ দিবেন। ত্রিপুরী কংগ্রেসে যে নূতন ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হইবে, তাহাতেও তাঁহারা থাকিবেন না, কংগ্রেসের কর্ম্মনীতি নির্দ্ধারণেও কোন সাহায্য তাঁহারা করিবেন না। কংগ্রেস সভাপতি অসুস্থ। ত্রিপুরী কংগ্রেস পর্য্যন্ত কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশন স্থগিত রাখিতে অনুরোধ জানাইয়া কলিকাতা হইতে ওয়ার্দ্ধায় তিনি এক তার করেন। এই তার অনুযায়ী অধিবেশন স্থগিত রাখা হইয়াছে।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অতিরিক্ত মামলার আসামী শ্রীসরোজ কান্তি গুহকে গবর্ণমেণ্ট মুক্তি দিয়াছেন। সরোজ কান্তির প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়। আন্দামান হইতে ফিরাইয়া আনিয়া তাহাকে দমদম জেলে রাখা হয়।

দিল্লী জেলে ৩ আইনের বন্দীত্রয় শ্রীযুক্ত বৈশম্পায়ন, ভবানী সহায় ও জওলাপ্রসাদ অনশন ধর্ম্মঘট সুরু করিয়াছেন। দীর্ঘ ৬ বৎসর কাল বিনাবিচারে কারারুদ্ধ থাকিবার পর তাঁহারা অবিলম্বে বিনাসর্ত্তে মুক্তিলাভের দাবী করেন এবং সেই দাবী পূর্ণ না হওয়ায় মৃত্যুপণে অনশন আরম্ভ করিয়াছেন।

অদ্য কেন্দ্রীয় পরিষদে রেল বাজেটের আলোচনার সময় কংগ্রেস দলের দুইটি এবং কংগ্রেস জাতীয় দলের দুইটি ছাঁটাই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। জাতীয় দল রেলের ভাড়া নির্দ্ধারণ-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন দাবী করিয়া যে ছাঁটাই প্রস্তাব উত্থাপন করেন তাহা বিনা ডিভিশনে এবং ২০০৲ টাকার অধিক বেতনের কর্ম্মচারীদের বেতন কর্ত্তন দাবী করিয়া যে দুইটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন, তাহা ৫৮-৪৩ ভোটে গৃহীত হয়। কংগ্রেস দল ভারতে ইঞ্জিন প্রস্তুতের ব্যবস্থা দাবী করিয়া এবং তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের অধিক সুখ-সুবিধা দাবী করিয়া যে দুইটি ছাঁটাই প্রস্তাব উত্থাপন করেন তাহা বিনা ডিভিশনে গৃহীত হয়।

হংকং হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, সীমান্তবর্ত্তী সামচুন গ্রামের উপর জাপানীরা বিমান আক্রমণ চালাইবার সময় বৃটিশ এলাকার মধ্যে বোমা পতিত হয়। বোমা বর্ষণের প্রতিবাদ জাপ গবর্ণমেণ্টের নিকট করিতে বৃটিশ সরকার বৃটিশ রাজদূতকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

সাংহাইর আন্তর্জ্জাতিক এলাকা এবং ফরাসী এলাকায় সন্ত্রাসবাদ দমনের নিমিত্ত জাপান তাহার নিজের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে বলিয়া মিঃ ইতাগাকি জাপ পার্লামেণ্টে এক ঘোষণা করিয়াছেন।

উৎকল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন, দমননীতির ফলে তালচেরের ৭০ হাজার লোকসংখ্যা এখন মাত্র ১০ হাজারে পরিণত হইয়াছে।

লিমডি রাজ্যের প্রায় দেড় হাজার প্রজা অদ্য রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ, আগামী কয়েকদিনের মধ্যে আরও বহু লোক রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া যাইবে।

২২শে ফেব্রুয়ারী—

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ১৩জন সদস্য একযোগে পদত্যাগ করিয়াছেন। সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু, শ্রীযুক্ত ভূলাভাই দেশাই, ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া, শ্রীযুক্ত শঙ্কররাও দেও, শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মহাতপ, আচার্য্য কৃপালনী, খান আবদুল গফুর খান, শ্রীযুক্ত জয়রামদাস দৌলতরাম, শ্রীযুক্ত যমুনালাল বাজাজ তারযোগে রাষ্ট্রপতিকে পদত্যাগের সংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। পণ্ডিত জওহরলাল পৃথক পদত্যাগ-পত্র প্রেরণ করিয়াছেন এবং বিবৃতি প্রসঙ্গে জানাইয়াছেন যে, নূতন ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হইলে তিনি তাহার সহিত সহযোগিতা করিতে পারিবেন না।

দিল্লী জেলে ৩ আইনের রাজবন্দীত্রয়ের অনশন ধর্ম্মঘট সম্বন্ধে ভারত সরকারের এক পত্রে প্রকাশ, অনশন ধর্ম্মঘট ত্যাগ না করা পর্য্যন্ত কর্ত্তৃপক্ষ রাজবন্দীদের বিষয়ে কোন বিবেচনা করিবেন না।

এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ব্যক্তি-স্বাধীনতা সঙ্ঘের প্রেসিডেণ্ট মিঃ সি ই গিবন-এর সভাপতিত্বে বঙ্গীয় ফাইনান্স বিল (১৯৩৯) এবং কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল সংশোধন বিল (১৯৩৯)এর প্রতিবাদকল্পে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ব্যক্তি-স্বাধীনতা সঙ্ঘের উদ্যোগে বুধবার সায়াহ্নে টাউন হলে কলিকাতার নাগরিকগণের এক সভা হয়।

পাটনার ব্যারিষ্টার মিঃ পি আর দাশ শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর সলিসিটরের নিকট হইতে এই মর্ম্মে এক সংবাদ পাইয়াছেন যে, বোম্বাই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পরলোকগত মিঃ ভি জে প্যাটেলের উইল-সংক্রান্ত মামলায় শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর পক্ষে মিঃ দাশকে মামলা পরিচালনার অনুমতি দিয়াছেন। আগামী ২৭শে ফেব্রুয়ারী বোম্বাইয়ে উক্ত মামলার শুনানী আরম্ভ হইবে।

প্রকাশ, গত বুধবার ২২শে ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার কোয়ালিশন দলের এক বৈঠক হইয়াছে। উক্ত বৈঠকে মৌলবী সামসুদ্দীন আমেদের স্থলে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার কোয়ালিশন দলের একজন সদস্যকে মন্ত্রী নিযুক্ত করিবার জন্য বলা হইয়াছে এবং মৌলবী আবদুল করিমকে উক্ত মন্ত্রী নিযুক্ত করিবার জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে।

রংপুরের দায়রা জজ মিঃ এস কে হালদার হীরালাল দে নামক এক ব্যক্তিকে মিথ্যা পরিচয় দিয়া শিবরাণী নাম্নী একটি বৈদ্য কুমারীকে বিবাহ করিবার অভিযোগে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ দিয়াছেন। এই লোকটি ইতিমধ্যে "বিবাহ বিশারদ হীরালাল" এই নামে কখ্যাত হইয়াছে। প্রকাশ

ইতিপূর্ব্বে একই অপরাধে আসামীর আরও চারিবার কারাদণ্ড হইয়া গিয়াছে।

ভারতীয় রাজ্জনা-রক্ষা আইন দ্বারা সংশোধিত প্রেস আইনের ৪ (১), (জ), (এ) ধারা অনুসারে মাদ্রাজ সরকার আর্য্য সমাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত "হায়দরাবাদ সত্যাগ্রহ" ও "হায়দরাবাদ আক্রামামলুদ" নামক দুইখানি পুস্তিকা বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। পুস্তিকাগুলিতে আপত্তিজনক অনেক বিষয় থাকাতে নাকি উহা প্রেস আইনে পড়ে।

২৩শে ফেব্রুয়ারী—

বাঙলার লাট লর্ড ব্রাবোর্ন ২৩শে ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতি-বার বেলা ১০টা ৪৮ মিনিটের সময় পরলোকগমন করিয়াছেন।

লর্ড ব্রাবোর্ন কিছুদিন যাবৎ অসুস্থ ছিলেন। এক্স-রে পরীক্ষার পর শনিবার, ১৮ই ফেব্রুয়ারী লাট-প্রাসাদে তাঁহার উপর অস্ত্রোপচার করিয়া তাঁহার অন্ত্রে একটি স্ফোটক ও তদনুষঙ্গিক প্রদাহ ও আকুঞ্চন লক্ষ্য করা যায়। এই স্ফোটক অপারেশনের পর পুনরায় ঐ ক্ষতস্থানে প্রদাহের সঞ্চার হয়। বুধবার শেষ-রাত্রের দিকে তিনি অসাড় ও অচেতন হইয়া পড়েন এবং সকল চিকিৎসা ব্যর্থ হয়।

লর্ড ব্রাবোর্নের মৃত্যুতে আসামের লাট স্যার রবার্ট রীড বাঙলার অস্থায়ী লাট নিযুক্ত হইয়াছেন। স্যার রবার্ট রীডের স্থলে মিঃ এইচ জে টুইন্যাম সি-আই-ই, আসামের অস্থায়ী লাট নিযুক্ত হইয়াছেন।

বর্দ্ধমান ক্যানাল-কর সত্যাগ্রহের অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার অফিসে খবর আসিয়াছে যে, ক্রোকী মাল নীলামের সময় পিকেটিং করিতে গিয়া নয়জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছে। পুলিশ গ্রামে গ্রামে হানা দিয়া নানাপ্রকার জুলুম করা সত্ত্বেও গ্রাম-বাসিগণ যথেষ্ট দৃঢ় আছে।

অদ্য করাচী হইতে অনুমান ত্রিশ মাইল উত্তরে ন্যাশনাল এয়ার ওয়েজের দুইটি বিমান বিধ্বস্ত হয়। ফলে বিমান চালকদ্বয় ও একজন মার্কিন যাত্রী তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। বিমান দুইটি সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়াছে। কুজ্ঝটিকা সমাচ্ছন্ন আবহাওয়ার দরুন এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া বলা হইয়াছে।

লণ্ডন হইতে 'আনন্দবাজার পত্রিকার' নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ, ইটালী ও স্পেন হইতে দক্ষিণ ফ্রান্সে আক্রমণের পরিকল্পনা সম্পর্কে ইটালী ও জার্ম্মান বিমান-বহরের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের ইটালীতে এক বৈঠক হইবে।

চীনের বড় বড় শহরে ঘনবসতির উপর যখন জাপানী বিমান বোমা বর্ষণ করে তখন লোকের বাহিরে আসিয়া আত্ম-রক্ষার পথ থাকে না। এজন্য চীন সরকার চুং কিং শহরে ঘন-বসতির মধ্যে চারিআনা পরিমাণ বাড়ী ভাঙিয়া দিতেছেন।

রণপুর পলিটিক্যাল এজেণ্ট মেজর ব্যাজালগেটের হত্যা সম্পর্কে ২৬ জনের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগে যে মামলা আনীত হইয়াছে অদ্য ২৩শে ফেব্রুয়ারী তাহার উত্থাপন হয়। আসামী পক্ষের উকিল মামলা স্থানান্তর এবং বর্ত্তমানের জন্য স্থগিত রাখার আবেদন করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট স্থানান্তরের আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

ফরাসী গবর্ণমেণ্ট জেনারেল ফ্রাঙ্কোর গবর্ণমেণ্টকে সরকারীভাবে স্বীকার করিয়া লইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টও সম্ভবত শীঘ্রই অনুরূপ সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করিবেন। ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্ট ফ্রাঙ্কোর স্পেন বিজয় স্বীকার করিয়া লইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

২৪শে ফেব্রুয়ারী—

অদ্য অপরাহ্ণে কলিকাতার সেণ্ট জন গির্জ্জায় বিরাট সামরিক আড়ম্বরের সহিত বাঙলার পরলোকগত গবর্ণর লর্ড ব্রাবোর্নের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের দ্বাবিংশ অধিবেশন আগামী ইষ্টারের ছুটিতে ২৫শে ও ২৬শে চৈত্র (৮ ও ৯ই এপ্রিল), শনি ও রবিবারে কুমিল্লায় হইবে। ত্রিপুরাধিশ্বর শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর এই অধিবেশনের উদ্বোধন করিবেন। অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মূল সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

কেন্দ্রীয় পরিষদের রেল বাজেটের আলোচনা সমাপ্ত হইয়াছে। ছাঁটাই প্রস্তাব সহ রেল বাজেটের সমগ্র দাবীগুলি পাশ হইয়াছে।

বর্দ্ধমান ক্যানেল সত্যাগ্রহ সম্পর্কে এ পর্য্যন্ত মোট পঞ্চাশজন ধৃত হইয়াছে।

২৫শে ফেব্রুয়ারী—

মহাত্মা গান্ধী রাজকোটে সত্যাগ্রহ আন্দোলন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে তদনুরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছেন। সর্দ্দার প্যাটেল এক বিবৃতিতে উক্ত সিদ্ধান্তের ঘোষণা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু অদ্য টেলিফোনে শেঠ গোবিন্দ দাসকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তাঁহার পীড়ার জন্য কংগ্রেসের অধিবেশনের তারিখ পিছাইয়া দেওয়া যাইতে পারে কি না। উত্তরে শেঠ গোবিন্দ দাস জানান যে, তারিখ পিছাইয়া দেওয়া সম্ভব হইবে না। অধিবেশনের তারিখ পিছাইয়া দিলে বিপুল ক্ষতি হইবে। ইহা শুনিয়া শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু নির্দ্ধারিত তারিখে অধিবেশনের অনুষ্ঠানে সম্মতি দিয়াছেন।

(ক) যুক্তরাষ্ট্রের তীব্রতর বিরুদ্ধতা; (খ) দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে কংগ্রেসের অনুসৃত নীতির পুনর্ব্বিবেচনা এবং (গ) যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রবল ও ব্যাপক আন্দোলন চালাইবার জন্য কংগ্রেসের অধীনে বিরাট স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন। ওয়ার্কিং কমিটির পদত্যাগের ফলে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসুর আগামী বৎসরের কার্য্য পরিচালনায় উপরোক্ত তিনটি বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

অদ্য অপরাহ্ণে কুমারী জেঠি সিপাহীমালানী (কংগ্রেস) সিন্ধু ব্যবস্থা পরিষদের ডেপুটী স্পীকার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী ও বর্ত্তমানে মন্ত্রী-পক্ষীয় দলের হিন্দু সদস্য মুন্সী গোবিন্দরাম।

উত্তর বিহারের সিওয়ানের এক সংবাদে প্রকাশ, বকাস্ত

ভূমি লইয়া বিরোধ সম্পর্কে সত্যাগ্রহ করার অভিযোগে বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাহুল সংকৃত্যায়ন এবং অপর সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

২৬শে ফেব্রুয়ারী—

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের চতুরাধিক শততম জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষে অদ্য শ্রীরামকৃষ্ণ বেলুড় মঠে বাৎসরিক মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তিন লক্ষাধিক নরনারী এই মহোৎসবে যোগদান করেন।

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু ওয়ার্কিং কমিটির ১২ জন সদস্যের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিয়াছেন। সদস্যদের নিকট পত্র প্রেরণ করিয়া তাঁহাদিগকে পদত্যাগপত্র গ্রহণের সংবাদ জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পদত্যাগপত্র গ্রহণের ফলে, পার্লামেণ্টারী সাব কমিটি ভাঙিয়া গিয়াছে। নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত জে বি কৃপালনীও আর সাধারণ সম্পাদক থাকিলেন না। বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, কংগ্রেস সভাপতি এবার প্রতিনিধিদিগকে কংগ্রেসের নীতি ও কার্যক্রম নির্দ্ধারণে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিবেন।

হায়দরাবাদ ও ওয়ারেংগাল জেলে এক গুরুতর হাংগামার ফলে একজন ওয়ার্ডার এবং একজন কয়েদী নিহত এবং তেরজন ওয়ার্ডার ও চারজন বন্দী আহত হইয়াছে। এই হাংগামা এরূপ গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছিল যে, পুলিশকে গুলী চালাইতে হয়। প্রকাশ, একশত বন্দী ঐ হাংগামায় জড়িত ছিল। ঐ সব বন্দী দীর্ঘ দিনের মেয়াদে দণ্ডভোগ করিতেছে। উহারা তাহাদের ওয়ার্ডের দরজা ভাঙিয়া বাহির হইয়া অন্যান্য বন্দীকে মুক্ত করিয়া দেয় ও ওয়ার্ডারদিগকে মারপিট করে।

রেংগুন হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, তথাকার অশান্তি প্রশমিত হওয়ার কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। লামমাডা ও কেমেনডাইন অঞ্চলে ট্রাম গাড়ীতে পিকেটিং করা হইতেছে। বর্ম্মী পুরুষ ও স্ত্রীলোকগণ ট্রামের রাস্তায় বসিয়া ও শুইয়া পড়িয়া ট্রাম চলাচলে বাধা দিতেছে। স্কুলসমূহেও পিকেটিং চলিতেছে। টারজিকে চারজন ভারতীয়কে নৃশংসভাবে হত্যা করা হইয়াছে বলিয়া খবরে প্রকাশ।

রাজকোটে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে মহাত্মাজী বোম্বাই হইতে রাজকোটে যাত্রা করিয়াছেন। সংগে যাইতেছেন তাঁহার সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত পিয়ারীলাল, চিকিৎসক ডাঃ সুশীলা নায়ার এবং একজন টাইপিষ্ট।

গোলাঘাটে আসাম প্রাদেশিক সম্মেলনের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বড়ুয়ার সভাপতিত্বে অদ্য আরম্ভ হইয়াছে।

২৭শে ফেব্রুয়ারী—

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধন বিলের প্রতিবাদ করার জন্য সোমবার অপরাহ্নে কলিকাতা টাউন হলে বঙ্গীয় প্রগতিশীল মুসলিম দলের উদ্যোগে যে সভা আহূত হইয়াছিল, সেই সভা গুরুতর হাংগামার ফলে ভাঙিয়া গিয়াছে। এই হাংগামায় কলিকাতা কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান হাজী মহম্মদ আকবর ও আরও বার তের জন লোক আহত হইয়াছেন। হাংগামাকারীরা লাঠি ও চেয়ার লইয়া মারামারি করে।

ইহুদী এজেন্সীর কার্যনির্ব্বাহক সমিতি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্যালেষ্টাইন সমস্যার সমাধানের জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা দৃঢ়তার সহিত প্রত্যাখ্যান করা হইবে।

মহাত্মাজী অদ্য রাজকোটে আসিয়া পৌঁছানমাত্র রাজকোট শাসন পরিষদের প্রধান সদস্য রাজ-সরকার হইতে আতিথ্য গ্রহণ আমন্ত্রণ-পত্রসহ মহাত্মার সহিত দেখা করেন। মহাত্মাজী এসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদদাতাকে বলেন যে, তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কোন পরিকল্পনা নাই।

সোমবার, ২৭শে ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধন বিল লইয়া প্রায় চার ঘণ্টাকাল তুমুল বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। প্রস্তাবিত বিল দ্বারা কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার নির্ব্বাচনে ঘোরতর অনিষ্টকর সাম্প্রদায়িক পৃথক নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

কংগ্রেস, কৃষক-প্রজাদল ও স্বতন্ত্র তপশীলভুক্ত সম্প্রদায় দলের সভ্যগণ সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রথার তীব্র নিন্দা করেন। অপরদিকে কোয়ালিশনী দলের সদস্যগণ জোর গলায় সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রথার সমর্থন করেন। কোয়ালিশনী দলের সদস্যগণের উত্তেজনা এত চরমে উঠে যে, ঐ দলের মিঃ মোয়াজ্জেম হক বক্তৃতা প্রসংগে বলেন যে, "রাস্তায়, হাটে-ঘাটে-মাঠে হিন্দুদের টুঁটি ধরিয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের দাবী-দাওয়া আদায় করিবার সময় আসিয়াছে।"

ইউনাইটেড প্রেস বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়াছেন যে, রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু স্থায়ী ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অফিসের শ্রীযুক্ত নরসিংহমকে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির জেনারেল সেক্রেটারীর কাজ করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন।

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি স্বর্গীয় ভি জে প্যাটেলের উইল সম্পর্কে উক্ত উইলের অছিগণ যে দরখাস্ত করিয়াছেন, অদ্য বোম্বাই হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি বি জে ওয়াদিয়ার এজলাসে তাহার শুনানী আরম্ভ হয়।

অদ্য কমন্স সভায় বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেন বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক জেনারেল ফ্রাংকোর জয় স্বীকার করিয়া লওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন।
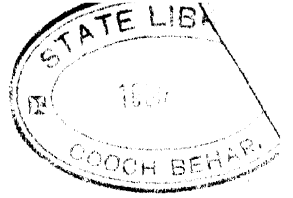
৬ষ্ঠ বর্ষ] শনিবার, ১৩ই ফাল্গুন, ১৩৪৫ সাল, 25th February, 1939 [১৫শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব—

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি প্রতিপালিত হইল, আগামী রবিবার বেলুড় মঠে উৎসব। দলে দলে নরনারী সর্ব্ব-ধর্ম্মসমন্বয়ের আদর্শস্বরূপে ঠাকুরের অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া এই উপলক্ষে নিজেদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেব যুগাবতার, এই যুগের বাণী লইয়া তিনি আসিয়াছিলেন, সে বাণী হইল প্রেমের বাণী, ভালবাসার বাণী। সেই প্রেমের বাণীকেই পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন স্বামী বিবেকানন্দ

দরিদ্র নারায়ণের সেবা-ব্রত প্রবর্ত্তনার ভিতর দিয়া। বাঙালী যখন পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষায় বিভ্রান্ত হইতে বসিয়াছিল, ভুলিয়া গিয়াছিল আপনাকে—আপনার জাতিকে; যখন শ্রৌত-জ্ঞান এবং আভিজাত্যের অহঙ্কার এ দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে অভিভূত করিয়া জাতির অন্তরের যোগসূত্রের সহিত তাহাদের সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছিল এবং জাতির একান্ত পরাভব যখন অখণ্ড আকারে অনিবার্য্যভাবে জাতির উপর আপতিত হইয়া তাহার সকল আশা, সকল ভরসাকে বিলুপ্ত করিবার ব্যাপক মোহ বিস্তার করিতেছিল, জাতির সেই সঙ্কট মুহূর্ত্তে অবতীর্ণ হইলেন ঠাকুর। অভয় বাণী তিনি উচ্চারণ করিলেন। ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার, আভিজাত্যের অহঙ্কার, পরানুকরণ-প্রিয়তার মোহকে তিনি তাঁহার অনাড়ম্বর অপূর্ব্ব এবং অনুপম জীবনের আন্তর্ব মহিমার উজ্জ্বল রশ্মি-প্রভাবে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। বাঙালী আপনাকে ফিরিয়া পাইল, পাইল আপনার অন্তরের জনকে। এবং একান্ত আত্মীয়তার সেই সরস, মধুর হাসিতে বঙ্গভূমি আলোকিত হইল। বাঙলায় আসিল আবার জাগরণের যুগ। আত্ম-প্রত্যয়ের ভিতর দিয়া সে দিন হইতে হইল বঙ্গে নব জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা। বাঙালী শিক্ষিত-সমাজ পরানুকরণের মোহে দেশ এবং জাতির প্রতি অবজ্ঞা ও উপেক্ষায় নিজেদের অন্তরকে অনুভূতিহীন করিয়া ফেলিয়াছিল; ঠাকুর আসিয়া সেখানে আনিলেন চেতনা, জাগাইলেন তিনি বেদনা। এই বেদনারই বিকাশ হইল পরবর্ত্তী যুগে দেশের প্রেমের দীপক কর্ম্ম-সাধনায়। সেই বেদনাই সার্থকতা লাভ করিল আত্মবিসর্জ্জনে, ত্যাগের আনন্দে। নূতন বাঙলার সভ্যতা, সংস্কৃতির এবং জাতীয়তার মূলে রহিয়াছে, একান্তভাবে বা অখণ্ড রকমে ঠাকুরেরই অনু-প্রাণনা—অনুপ্রেরণা। আমরা অনেক সময়, এই জিনিসটা বুঝিতে পারি না, ধরিতে পারি না, বড় করিয়া দেখি, শুধু বাহ্য আড়ম্বরের দিকটা, রাজনীতির স্থূল রূপটা—কিন্তু যে শক্তি কাজ করে রাজনীতির সেই স্থূল রূপের ভিতরে প্রাণ-স্বরূপে উহার সহিত আমাদের পরিচয় ঘটে খুব কম। আমাদের রাজনীতিক সাধনাকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে, সেই প্রাণশক্তির সঙ্গে পরিচয়টা ঘটাইতে হইবে, বুঝিতে হইবে দরিদ্র নারায়ণের মহিমা, জাগাইতে হইবে তাঁহার সেবায় শ্রদ্ধাকে। এই শ্রদ্ধাই দিবে শক্তি, এই শ্রদ্ধাই জীবন দিতে শিখাইবে এবং এই শ্রদ্ধাই জ্বালাইবে যজ্ঞানল। সেই যজ্ঞের আগুনে জাতির বাহিরের বন্ধন-পাশ পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে, আসিবে মুক্তি। আজ ঠাকুরের কৃপায় সেই যজ্ঞের প্রবৃত্তি আমাদের ভিতর প্রদীপ্ত হইয়া উঠুক, আমাদের ভিতর জাগুক সেই ত্যাগের আনন্দ, যে আনন্দ মানুষকে অমৃতত্বে প্রতিষ্ঠিত করে। যে

আনন্দের স্পর্শ লাভ করিলে মানুষ আর কিছুতে ভয় পায় না, সেই আনন্দের পিপাসা ইতর স্বার্থসেবার বাসনার জাল ছিন্ন করিয়া দেশ এবং জাতির মুক্তির প্রেরণায় আমাদিগকে পাগল করিয়া তুলুক।

অর্থসচিবের বাহাদুরী—

পাঠকেরা বাঙলা সরকারের বাজেট বরাদ্দ পাইয়াছেন এবং বিভিন্ন সংবাদপত্রে তাহার সমালোচনাও পড়িয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমাদের নিজেদের কথা বলিতে গেলে, বলিতে হয় যে, এ বাজেটের বিরুদ্ধে কড়া কথা বলিবার ভাষাতেই আমাদের কুলায় না। এমন বাজেট বাস্তবিকই আমরা দেখি নাই। অর্থ সচিব মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকার বক্তৃতায় যে বাহাদুরী ফলাইয়াছেন, যে পাণ্ডিত্যের পরিচয়ে তিনি আমাদের কৃতার্থ করিয়াছেন, সেগুলির আমরা কোন মূল্যই দেখি না। ঐ সব শুধু তিক্ততারই সৃষ্টি করে এবং বিরক্তিই বাড়ায়। কথা এই যে, তাঁহারা কাজে কি করিয়াছেন বা করিতে চাহিতেছেন? উত্তর—অষ্টরম্ভা। কোন দিক হইতেই কিছু না; অথচ সরকার সাহেব নূতন দুই দফা কর ধার্য্যের প্রস্তাব ফাঁদিয়াছেন এবং আর কয়েক দফা কর ধার্য্য করা যাইবে কি কি ভাবে, সেজন্য তিনি তাঁহার মূল্যবান মস্তিষ্ক সঞ্চালনে রত আছেন! যে দুই দফা কর ধার্য্য করা হইবে, তাহার মধ্যে এক দফা হইতেছে, কুকুরের দৌড়ের উপর ট্যাক্স, সরকার সাহেবের নজর সব সময়ই বৃহত্তের দিকে—বড়র উপর। এই কথা তিনি বহুস্থানে কৃপা করিয়া আমাদিগকে বুঝাইয়াছেন, তাহাই যদি হয়, তবে কুকুরের চেয়ে বড় রহিয়াছে ঘোড়া। তিনি কুকুরের দৌড়ের দিকে না গিয়া ঘোড় দৌড়ের দিকে গেলেন না কেন? না—সেদিকে বড় কর্ত্তা সাহেবদের বিশেষ স্বার্থ রহিয়াছে! যাহারা ইনকাম ট্যাক্স দেয়, তাহাদের উপর আর এক দফা বঙ্গীয় বিশেষ ট্যাক্স, বলিহারী করুণার! যাঁহারা ইনকাম ট্যাক্স দেন তাঁহাদের সকলের উপর কর ধার্য্য করার চমৎকারিত্ব এই যে, ঐখানে আরও আয়ের দিতে হইবে ৩০৲ টাকা, যে ৫ হাজার টাকা রোজগার করে, তাহার পক্ষেও সেই বরাদ্দ—বিচারের সূক্ষ্ম ওজন কাটায় কাটায়। রাজনীতিক বন্দিদের মুক্তি দেওয়াতে সরকারের অনেক টাকা বাড়িয়াছে; কিন্তু পুলিশ বিভাগের খরচ কমে নাই। অর্থ-সচিব আমলাতন্ত্রী সেই একঘেয়ে মাতব্বরী চালে বৈপ্লবিক আন্দোলনের বাজে ধাপ্পা দিয়া এখানে কাটাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু এ নূতন কর কোন্ কাজের জন্য? বিনিময়ে কি মিলিবে? শিক্ষা বিস্তার স্বাস্থ্যবিধান বা ব্যাধি বিতাড়ন, প্রশ্ন করিতে পারে দেশের লোক, কোন্ ব্রতে ব্রতী আজি রথী কুলশ্রেষ্ঠ—এণ্ডারসন সাহেবের আদরে অর্থসচিব? উত্তর, অন্তত বাজেটে কিছুই নাই। অর্থসচিবের অর্থ-বণ্টনের ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ করিয়া বলার কিছু দরকার হইবে না,—বাজেটে চোখ বুলাইয়া গেলেই বুঝা যাইবে তাঁহার খয়রাতীর হস্ত কোন্ দিকে খোলা? নিজেদের ভোটের দিকে বিচারটা হইয়াছে আগাগোড়া তাঁহার মাপকাঠি; সাম্প্রদায়িকতা এবং স্বার্থ-দৃষ্টি একেবারে সুস্পষ্ট—এইগুলি নিতান্ত নির্লজ্জভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, 'আজাদ' পত্রের জন্য তাঁহার ৩০ হাজার টাকা অর্থ-সাহায্যের আকারে। বেচারা 'আজাদের' উপর আক্রোশ আমাদের কিছু নাই। আমাদের শুধু প্রশ্ন এই যে, 'আজাদকে' এই অর্থসাহায্য করা হইতেছে কোন্ দিক হইতে? 'আজাদ' কি সরকারী কাগজ? 'আজাদ' নিজেকে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বলিয়াই পরিচয় দিয়া থাকেন। বাঙলা দেশের রাজত্বটা তবে সাম্প্রদায়িক রাজত্ব—মুসলিম রাজ? আমলাতন্ত্রী আমলে এক মহাপুরুষের মুখে আমরা একবার শুনিয়াছিলাম যে, গবর্ণমেণ্ট দাতব্য প্রতিষ্ঠান নয়, সেখানে দান-ছত্র খোলা হয় নাই। এখন দেখিতেছি, বাঙলার অর্থ-সচিবের কৃপায় দান-ছত্র সেখানে খোলা হইল। কিন্তু সে দান-সত্রে দেশের নিরন্ন গরীবের কোন স্থান নাই, স্থান আছে শুধু তাহাদেরই, যাহাদের কাজ আমাদের কর্ত্তা মন্ত্রী সাহেবদের গদী কায়েম রাখিবার পক্ষে অনুকূল। বর্ত্তমান বৎসরের বাঙলার বাজেটের এইটি হইল বড় বিশেষত্ব।

নকল ও আসল—

মৌলবী সামসুদ্দীন আমেদ কৃষি মন্ত্রীর পদ পরিত্যাগ করাতে ইতিমধ্যে কিছু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। গত সোমবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে সামসুদ্দীন সাহেব এক বিবৃতি প্রদান করেন, প্রধান মন্ত্রী হক সাহেবও পাল্টা জবাব দিয়াছিলেন। ইঁহাদের এই বাদ-প্রতিবাদের ভিতর হইতে কয়েকটি বিষয় সুস্পষ্ট হইয়াছে। প্রথমত মৌলবী সামসুদ্দীন সাহেব যে সকল সর্ত্তে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার একটিও প্রতিপালিত হয় নাই। ইহা আন্দাজ বা অনুমান নহে, কার্য্যতঃ দেখা যাইতেছে। সুতরাং তাঁহার পদত্যাগের যৌক্তিকতার সঙ্গতি তাঁহার নীতি এবং বিশ্বাসের দিক হইতে বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু প্রধান মন্ত্রী যে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন সেগুলি বড়ই চমৎকার। প্রথমত তাঁহার উক্তি হইতেই দেখা যাইতেছে যে, কৃষক বা প্রজাদের স্বার্থ সেবা করিবার সুবিধা হইবে, মৌলবী সামসুদ্দীন সাহেবকে নিজের দলে টানিবার চেষ্টা করিবার মূলে তাঁহার যে এমন উদ্দেশ্য ছিল, ইহা নয়। তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, সামসুদ্দীন সাহেবের দলের সমর্থন লাভ করা এবং সেইভাবে নিজের মন্ত্রিগিরির স্বার্থকে মজবুত করা। প্রধান মন্ত্রী তাঁহার বিরোধী কৃষক-প্রজা দলকে ছদ্মবেশী কংগ্রেসী দল বলিয়াছেন এবং একথাও কৃপা করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন যে, পরিষদের কৃষক-প্রজা দলকে তিনি সত্যকারের কৃষক-প্রজা দল বলিয়া স্বীকার করেন না। প্রকৃতপক্ষে কৃষক-প্রজা কাহারা, আমাদের মত অভাজনদের সে সম্বন্ধে অজ্ঞানতা দূর করিবার জন্য প্রধান মন্ত্রী তাঁহার বিবৃতি-সূত্রে সে সম্বন্ধে সুন্দর একটি ভাষ্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, "যাহারা প্রকৃত কৃষক-প্রজা তাহারা মন্ত্রীরা কে কত বেতন পায় সেজন্য মাথা ঘামায় না, তাহারা মাথা ঘামায় 'ডাল-ভাতের জন্য'।" ভাষ্য একেবারে পরিষ্কার। প্রধান মন্ত্রী এবং তস্য অনুগামীরাও মাথা ঘামান শুধু নিজেদের ডাল-ভাতের জন্য. সুতরাং ন্যায়শাস্ত্রের

বিধান অনুসারে 'সমান ধর্ম্মস্বাৎ' তাঁহারাই হইতেছেন খাঁটি কৃষক-প্রজা। তবে মন্ত্রী কৃষক-প্রজা এবং অমন্ত্রী কৃষক-প্রজাদের মধ্যে সামান্য তফাৎ একটু এই যে, মন্ত্রীদের ডাল-ভাতটা আসে মোটা মাহিয়ানার আকারে, আর, কৃষক-প্রজারা ডাল-ভাতের জন্য মন্ত্রীদের মত মাথা ঘামাইলেও সে মাথা ঘামান যথেষ্ট নয়, পাট নিয়ন্ত্রণ আর্ডন্যান্স প্রভৃতি মন্ত্রীমহোদয়দের ডাল-ভাতের জন্য মাথা ঘামানর স্বাভাবিক ক্রিয়ার ফলে যেসব মূল্যবান বস্তু বাহির হইতেছে সেগুলি অমন্ত্রী কৃষক-প্রজাদের ডাল-ভাতের জন্য মাথা ঘামানর প্রবৃত্তিটা আরও বাড়াইয়া দিয়া তাহাদিগকে প্রকৃত হইতে প্রকৃততর কৃষক-প্রজাতে পরিণত হইবার পথে আগাইয়া দিতেছে। এই যে নিগূঢ় তত্ত্বের দিকটা—মৌলবী সামসুদ্দীন সাহেব সেটি ধরিয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, 'যে দেশের অধিকাংশ লোকই দারিদ্র্য-পীড়িত, এমন কি দুই সন্ধ্যা খাইতে পায় না, সে দেশের মন্ত্রিমণ্ডলীতে জাতীয় সেবাসম্পর্কশূন্য নাইট ও নবাবকে বসাইলে চলিতে পারে না।' তিনি এই সত্যটি বুঝিতে পারেন নাই যে, মন্ত্রিমণ্ডলীতে ঐ যে নাইট এবং নবাবেরা বসিয়াছেন, বসিয়াছেন ডাল-ভাতের ভাবনা-ভাবিত হইয়াই, প্রকৃত কৃষক-প্রজার সমধর্ম্মত্ব লাভ করিয়াই এবং অমন্ত্রী অভাগা বাঙলার কৃষক-প্রজাদের ডাল-ভাতের ভাবনা তাঁহারা যতটা বাড়াইতে পারিবেন ততটাই প্রকৃত কৃষক-প্রজায় দেশে ফুটাইয়া তুলিবেন। প্রধান মন্ত্রীর এই ভাষ্য বাহির হইবার পর তাঁহার কৃষক-প্রজা দরদের সম্বন্ধে আর কাহারও কিঞ্চিৎমাত্র সন্দেহের অবসর রহিল না।

বাঙলার অবস্থা—

নিখিল ভারতের রাজনীতিক আকাশে একটা আলোড়নের আভাষ আমরা পাইতেছি, তাহাতে আশাও অন্তরে জাগিতেছে; কিন্তু বাঙলার অবস্থা? সেও ত সঙ্কটাপন্ন কম নয়। এত বড় সঙ্কটের যুগ বাঙলায় আর আসে নাই। আমলাতন্ত্রী আমলে আর কি হইয়াছে? হক মন্ত্রিমণ্ডলী আজ বাঙলার সভ্যতা, সংস্কৃতি, আদর্শ সকল ইন্ধন করিয়া দিতে উদ্যত। ক্ষমতা হাতে পাইয়া তাঁহারা ধরাকে সরা জ্ঞান করিতেছেন। ইউরোপীয় সদস্যদের সহিত যোগ দিয়া এই মন্ত্রিমণ্ডল বাঙলা দেশকে বিদেশীর পায়ে বিকাইয়া দিতে বসিয়াছে। বাঙালীর কি এখনও চোখ ফুটিবে না? বাঙলার শিক্ষা-বিভাগ, বিশ্ব-বিদ্যালয়, সরকারী চাকুরী, মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা বোর্ড, সকল ক্ষেত্রেই সাম্প্রদায়িকতার বিষ ঢুকাইবার পুরোপুরি ব্যবস্থা হইতেছে। কলিকাতা কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে হক মন্ত্রিমণ্ডলের যে অভিযান, তাহাতে বাঙালীর সভ্যতা এবং সংস্কৃতির—জাতীয়তার শক্তির একেবারে কেন্দ্রস্থলে মারাত্মক রকমে আঘাত করিবার উদ্যম হইতেছে। যে কায়দায় এই বিল করা হইয়াছে, তাহার কারিগরি সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তকেই হার মানাইয়াছে। স্যার স্যামুয়েল হোর ভারত সচিব হিসাবে একদিন গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিলেন, আমরা এমনই কায়দায় সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত বাঁধিয়া দিয়াছি যে, তাহার ফলে বাঙলা দেশের আইন সভায় জাতীয়তাবাদী দল আর কিছুতেই মাথা তুলিতে পারিবে না; তাঁহাদের সে বাসনা পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু সেখানে সাম্রাজ্যবাদীদের ঘাঁটি পাকা হইলেও, আর একটা জায়গায় তাঁহাদের অসুবিধার কারণ ছিল, তাহা হইতেছে কলিকাতা কর্পোরেশন। সুরেন্দ্রনাথের সাধনায় বাঙলার জাতীয়তাবাদের বিস্তারের কেন্দ্র ছিল এই কর্পোরেশন, এখন সেই ঘাঁটি হইতে জাতীয়তাবাদের আতঙ্ক একেবারে উচ্ছেদ করিবার জন্য আয়োজন হইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদীরা সাক্ষাৎস্বরূপে থাকিয়া বাঙলা দেশের যে অনিষ্ট করিয়াছে, সেই অনিষ্ট এখন সাধিত হইতে বসিয়াছে, কর্পোরেশনে সেই সাম্রাজ্যবাদীদের যন্ত্রস্বরূপে পরিচালিত হক মন্ত্রিমণ্ডলীর দ্বারা। বাঙালী যাঁহারা বাঙলা দেশের কল্যাণ চাহেন, কি হিন্দু, কি মুসলমান, বাঙালী বলিয়া যাঁহারা নিজেরা গর্ব্ব বোধ করিয়া থাকেন, আমরা আজ তাঁহাদিগকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে বলিতেছি। এই আইন পাশ হইলে বাঙলা দেশের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল এই কলিকাতা শহরে বাঙালীর কি অবস্থা হইবে, শুধু এই কথাটাই আমরা ভাবিয়া দেখিতে বলিতেছি। সাম্প্রদায়িকতা আমরা চাহি না, বুঝি না; কিন্তু আমরা শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে, মুষ্টিমেয় শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের স্বার্থের তুষ্টি এবং পুষ্টির দায়ে বাঙলার স্বার্থকে বিকাইয়া দিয়া ব্যবস্থা-পরিষদে বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলী যে খেলা খেলিতেছেন, তাঁহাদের সেই খেলা চলিবে কর্পোরেশনের ভিতর দিয়াও, বাঙলার শহরে বাঙালীর ঠাঁই আর থাকিবে না—বাঙালী কি ইহাতে সায় দিবে? আইন হয়ত পাশ হইয়া যাইবে। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের যে অবস্থা, তাহাতে আটক কিছুই নাই। হীন স্বার্থসেবীদের লীলাখেলাই সেখানে চলিতেছে, বিবেক বিক্রয়ের ব্যবসা সেখানে চলিতেছে; কিন্তু বাঙলা দেশ কি মরিয়াছে? যে বাঙালী মর্লে সাহেবের পাকা সিদ্ধান্তকে কাঁচা করিয়া ফেলিয়াছিল, সে বাঙালী কি আজ আর নাই? রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র কিছুদিন পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, হক মন্ত্রিমণ্ডলী যদি কর্পোরেশনের উপর হস্তক্ষেপ করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে বাঙলা দেশ তাহার বিরুদ্ধে এমন সংগ্রাম করিবে যে, পূর্ব্বে তেমন সংগ্রাম আর দেখা যায় নাই। আমরা বলি, সেই সংগ্রাম সুরু হউক। বাঙলার প্রগতিশীল তরুণ মুসলমান সমাজ এই বিলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, সম্প্রদায় নির্বিবশেষে সকল বাঙালী এই অনিষ্টকর উদ্যমকে ব্যর্থ করিয়া আজ বাঙলার আত্ম-গৌরবকে প্রতিষ্ঠিত রাখুক।

আসন্ন সংগ্রাম—

সমগ্র জাতি দ্রুতগতিতে একটা সংগ্রামের দিকে অগ্রসর হইতেছে। দেশীয় রাজ্যসমূহে গণ-আন্দোলনেই ইহার সূচনা এবং আমাদের বিশ্বাস দেশীয় রাজ্যসমূহের ভিতর দিয়া যে গণ-আন্দোলন আজ জাগিয়া উঠিতেছে, এই আন্দোলনই অদূর ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্র-প্রণালীর বিরুদ্ধে ব্যাপক সংগ্রামে পরিণত হইবে। কংগ্রেসী মন্ত্রিত্ব বড় নয়, বড় হইল, মুক্তির জন্য এই সংগ্রাম এবং মন্ত্রিগিরি লইয়া এতদিন এই যে এক-রকম মেকীর কারবার চলিল, কংগ্রেসকে সত্বরই এই মেকীর কারবার গুটাইয়া লইয়া অখণ্ড ভারতব্যাপী সেই রাষ্ট্রীয় সংগ্রামে নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে।

সুভাষচন্দ্রের নির্ব্বাচন শুধু এই সত্যকেই সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছে যে, জাতি চায় তেমন সংগ্রাম; তাহারা মেকীর কারবারের ভেজাল একেবারে ঘুচাইয়া দিতে চায়। সুভাষচন্দ্রের নির্ব্বাচনের সহিত মহাত্মাজীর প্রতি অশ্রদ্ধা বা উপেক্ষার ভাবের কোন সম্পর্ক নাই, আছে শুধু রাষ্ট্রীয় সংগ্রামের একটা সুনির্দ্দিষ্ট এবং সবল ও সতেজ কর্ম্মপন্থা পাইবার জন্য সমগ্র দেশের আকুল প্রতীক্ষারই অভিব্যক্তি। আমরা দেখিতে পাইতেছি, মহাত্মাজী সে জিনিসটা উপলব্ধি করিয়াছেন, দেশীয় রাজ্যের গণ-আন্দোলনের দিকে তীব্রতার সঙ্গে জোর দিতেছেন। কংগ্রেসের কর্ম্মসাধনা সেই একই উদ্দেশ্যের অভিমুখে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে এবং এই একাভিমুখী সাধনার পথেই কংগ্রেসের সমস্ত শক্তি সংহত হইয়া উঠে, দলাদলি, ভেদ-বিভেদের কোন কথা উঠিবারই আর অবকাশ থাকিবে না।

দায়িত্ব কাহাদের?—

কর্ণেল মুরহেড বর্ত্তমানে সহকারী ভারত-সচিব। ভারত-ভ্রমণ শেষ করিয়া সম্প্রতি ইনি দেশে ফিরিয়াছেন এবং দেশে ফিরিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনে তাঁহার ভারত-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিয়াছেন। এই বক্তৃতায় তিনি মুরুব্বিয়ানা চালে বলিয়াছেন যে, ভারতবাসীদের সর্ব্বাপেক্ষা বড় দুর্ব্বলতা হইতেছে সেখানকার সাম্প্রদায়িক বিরোধ। এই বিরোধ যতদিন থাকিতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত ভারতবাসীরা নিজেদের দেশ শাসনে যোগ্যতা লাভ করিবে না ইত্যাদি। এই ধরণের ন্যাকামী আমরা ইঁহাদের মুখে অনেক শুনিয়াছি। এসব কথা শুনিলে গা জ্বলিয়া যায়, উত্তর কিছু আসে না। আমাদের শুধু বক্তব্য এই যে, ভারতবাসীদিগকে দেশ শাসনে যোগ্য করিয়া তুলিবার মহৎ দায়িত্বের দোহাই দিয়া মুরহেড সাহেবের জ্ঞাতিগোষ্ঠীরা এই যে শতাধিক বৎসর কাল এ দেশের গরীবদের গায়ের রক্তের মত টাকা-পয়সা মোটা মাহিয়ানার আকারে শুষিয়াছে এবং এখনও শুষিতেছে, তাহার ফলে সাম্প্রদায়িক বিরোধ কমিয়াছে না বাড়িয়াছে? ভারতবাসীদের হাড়ে হাড়ে সাম্প্রদায়িকতার বিষকে ঢুকাইয়া দিবার জন্য দায়ী কাহারা? মর্লে-মিণ্টো শাসন-সংস্কার হইতে আরম্ভ করিয়া ম্যাকডোনাল্ড সাহেবের সিদ্ধান্ত—ব্রিটিশ কর্ত্তাদের এই যে দান, এগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে কি পাওয়া যায়? পাওয়া যাইবে ঐ সাম্প্রদায়িকতা। বর্ত্তমান শাসন-সংস্কারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এই সাম্প্রদায়িক বিষ ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং সেই বিষ জাতিকে জীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে; সেই বিষের জ্বালায় আজ বাঙলা দেশের সভ্যতা, সংস্কৃতি যত কিছু সব নষ্ট হইতে বসিয়াছে। নির্লজ্জতারও একটা শেষ থাকা উচিত; কিন্তু এই শ্রেণীর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের নির্লজ্জতার শেষ নাই।

আসামে আফিম বর্জ্জন—

আগামী ১লা এপ্রিল হইতে আসামে আফিম বর্জ্জন কার্য্য আরম্ভ হইবে। এই পরিকল্পনার দুই বৎসরের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে আফিম বর্জ্জন কার্য্য আরম্ভ হইবে। আসামে আফিমসেবীর আধিক্য, প্রধান মন্ত্রীর মতে তাহাদের সংখ্যা প্রায় দশ হাজার। আসাম হইতে এই বদ নেশাকে বিতাড়িত করিবার জন্য কিছু কিছু আন্দোলন ইহার পূর্ব্বেও হইয়াছে। মহাত্মা এণ্ডরুজ প্রভৃতি এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে লেখনী পরিচালনা করিয়াছেন; কিন্তু তত্রাপি কোন কাজ হয় নাই। আমলাতন্ত্রের আমলে যাহা সম্ভব হয় নাই, আজ কংগ্রেসী মন্ত্রিত্বের উদ্যোগে সেই কুপ্রথা বিতাড়িত হইতে চলিল। ফলে আসামের রাজস্ব অবশ্য অনেকাংশে কমিয়া যাইবে, এই ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৫ লক্ষ টাকা হইবে। অবশ্য গবর্ণমেণ্টের আর্থিক অবস্থাও তেমন স্বচ্ছল নয়; তথাপি আসামের প্রধান মন্ত্রী বাঙলার অর্থ সচিবের ন্যায় শুধু হুঁসিয়ারী বুদ্ধিকেই বড় করিয়া দেখেন নাই। তিনি সাহসের সঙ্গে আগাইয়া যাইবার নীতি ধরিয়াছেন, যে কুপ্রথা দেশের শক্তিকে নিঃশোষিত করিতেছে, হিসাবী বুদ্ধির মোহে সে জিনিষকে পুষিয়া রাখিতে পারেন নাই তিনি দেশ-প্রেমের ঐকান্তিক টানে। এই যে সাহস, আজ দেশে চাই এই জিনিষটি। আসামের প্রধান মন্ত্রীর এই উদ্যম সাফল্যমণ্ডিত হইলে, শুধু আসামে নহে সমগ্র ভারতের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। আমরা এই প্রচেষ্টার সর্ব্বান্তকরণে সাফল্য কামনা করিতেছি।

বাঙলায় বীর সাভারকর—

শ্রীযুত বিনায়ক দামোদর সাভারকর ছয় দিন বাঙলা দেশে ছিলেন। তিনি নিঃস্বার্থ ত্যাগী-কর্ম্মী এবং স্বদেশ-প্রেমিক। তিনি স্পষ্টবাদী এবং নির্ভীক পুরুষ। তাঁহার রাজনীতিক নির্দ্দিষ্ট মতবাদ যাহাই হউক, তাঁহার বাণী দেশের বর্ত্তমান সমস্যাগুলির উপর যে আলোক সম্পাত করিয়াছে, তাতে আমাদের অনেক সহজ হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এলবার্ট হলে তাঁহাকে বিদায় অভিনন্দন দান করিবার জন্য শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখুজ্জো মহাশয়ের সভাপতিত্বে যে সভা হয়, তাহাতে তিনি বলেন—"যখন কোন নূতন সমস্যার উদ্ভব হয়, তখন মহারাষ্ট্রে আমরা কি ভাবে তাহার সমাধান করি জানেন? বাঙলার দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। বাঙালীরা কি করিতেছে তাহা না জানিয়া মহারাষ্ট্র কোন পন্থাই অবলম্বন করে না। মনে মহাত্মা রানাডে হইতে লোকমান্য তিলক পর্য্যন্ত আমরা এই নীতি অনুসরণ করিয়া আসিয়াছি। শুনিয়াছি কলিকাতার উত্তরে মারাট্টা-খাত নামে একটি খাল আছে। বর্গীরা যাহাতে এই নগরে প্রবেশ না করিতে পারে সেই জন্যই উহা খনন করা হইয়াছে। আজ মারাট্টা-খাতের উপর সেতু নির্ম্মিত হউক, বাঙলার সঙ্গে মহারাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠতম যোগসূত্র স্থাপিত হউক। জাতীয়তার আদর্শের ভিতর দিয়া অখণ্ড ভারতের ঐক্যবোধের প্রতিষ্ঠাই হইল বাঙলার সাধ্য এবং সাধনা। ছত্রপতি শিবাজীর সাধনার মধ্যে এই আদর্শের অনুপ্রেরণা উপলব্ধি করিয়াই বাঙলার কবি একদিন বলিয়াছিলেন—'বঙ্গ মারাঠারে এক করি দিন বিনা রণে।' এ দেশের সকল বর্ণ, সকল সম্প্রদায়, ভারতের স্বার্থকেই

একমাত্র সার বলিয়া বুঝুন, বাঙলার জাতীয়তাবাদীরা ইহাই চায়। এই জন্যই মুসলমানদের মধ্যে যাঁহারা মায়ের দরদ ছাড়িয়া আরব, পারস্য প্রভৃতি দেশের সঙ্গে দরদ দেখাইতে যান, তখন তাহাদের অন্তরে বেদনা বোধ হয়। শ্রীযুত সাভারকরেরও এই বেদনাই বড় বেদনা। তিনি বহু ক্ষেত্রে তাঁহার এই কথা বলিয়াছেন যে, ভারতের মুসলমানদের ভারতের চেয়ে আরবের উপর দরদ বেশী। তিনি এই কথা বলেন যে, এদেশের মুসলমানেরা ভারতের বাহিরের মুসলমানদের অধীন থাকাটাকে ভারতের স্বাধীনতার চেয়ে ভাল বলিয়া মনে করেন। শ্রীযুত সাভারকরের এই বিশ্বাসের মূলে যে কতকগুলি কারণ না আছে, এমন নহে। জিন্না সাহেবের জোরই হইতেছে এই মনোবৃত্তির উপর। জগতের অন্য কোন দেশের মুসলমানদের মধ্যে এমন মনোবৃত্তি নাই, যাহা দেখা যায় এই শ্রেণীর সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের মধ্যে। এমন মনোবৃত্তি নাই, তুরস্ক, পারস্য কিংবা ইরাণ প্রভৃতি মুসলমান দেশের মুসলমানদের। তাঁহারা নিজেদের দেশের স্বাধীনতাকেই বড় বলিয়া বুঝেন, এবং সেই স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য অন্য স্থানের মুসলমানদের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত নহেন। জাতীয়তাবাদীরা চাহেন সকলের আগে ভারতের স্বাধীনতা,—কংগ্রেসেরও তাহাই আদর্শ, সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানেরা যেদিন ভারতের এই স্বাধীনতাকেই তাঁহাদের একমাত্র সাধ্য এবং সাধনা বলিয়া লইবেন, শুধু তাহাই নহে, তদনুযায়ী কাজ অর্থাৎ দুঃখ-কষ্ট এবং ত্যাগ স্বীকারে প্রবৃত্ত হইবেন, সেদিন সেই জাতীয়তার সুদৃঢ় ভিত্তির উপর কংগ্রেসের সঙ্গে তাহাদের খাঁটি মিল হইবে। হিন্দু মুসলমানের ঐক্যের যত কথা আমরা শুনি,—আজও যেমন শুনিতেছি, মহামান্য আগা খাঁ ও মহাত্মাজীর মধ্যে আপোষ-আলোচনার কথা, সব সময়ই ঐ একই সত্য আমাদের মনে উদিত হয়। আমরা স্থির বুঝিয়াছি সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দর-দস্তুর চালাইয়া এই মিল হইবে না, এবং যদিও সাময়িক একটা মিল হয়ও, তাহার ফলও ভাল হইবে না। সমগ্র জাতিকে সত্যকার শক্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে না সে মিলন। সাভারকরজী এই সত্যটিকে সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন, অনেকের নিকট এটি অপ্রিয়; কিন্তু অপ্রিয় হইলেও সত্য, রাজনীতিতে যেমন অপ্রিয় সত্যের মূল্য আছে।

রাষ্ট্রপতির অসুস্থতা—

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু ব্রঙ্কো নিউমোনিয়া রোগে পীড়িত আছেন। এজন্য ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে তিনি উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। দীর্ঘ পরিশ্রমের ফলে, তাঁহাকে পীড়িত হইয়া পড়িতে হইয়াছে বলিয়া চিকিৎসকেরা অনেকে মনে করেন। সুখের বিষয়, উদ্বেগের বিশেষ কোন কারণ নাই। কিন্তু তাঁহাকে দীর্ঘকাল বিশ্রাম গ্রহণ করিতে হইবে। এদিকে দেশের রাষ্ট্রনীতিক সমস্যা নানা কারণে ক্রমেই জটিল আকার ধারণ করিতেছে। ভারতের দেশপ্রেমিক রাজনীতিকদের দস্তুরমত এখন আসিয়া পড়িয়াছে বড়ই একটা পরীক্ষার সময়। দূরদর্শিতার সহিত জাতির সমস্ত শক্তিতে সংহত করাই হইল এখন সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। কর্ম্ম-তালিকার খুঁটিনাটি পার্থক্যের উপর জোর দিবার সময় এখন নয়। রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র এই সংহতির উপরই জোর দিয়াছেন। 'ন্যাশন্যাল ফ্রন্ট' পত্রিকায় তিনি এ সম্পর্কে যে বাণী প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলেন,—'জাতীয় সংগ্রামের ঐক্যই বজায় রাখিতেই হইবে। এ কথা পরিষ্কারভাবে বলিতে চাই যে, আমরা বামপন্থীদের পদমর্য্যাদার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি না, কংগ্রেস দখল করিয়া দক্ষিণপন্থীদিগকে বিতাড়িত করিতে চাহি না। আমরা তাঁহাদিগকে সেই কথা বলিতে চাই; এমন কি আমাদের আন্দোলনের পুরোভাগেই তাঁহাদিগকে রাখিতে চাই। ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থ, প্রতিষ্ঠা বা মান-অভিমানের সামান্য প্রশ্নও যদি এখন দেখা দেয়, তাহা হইলে দেশের গুরুতর রকম অনিষ্ট ঘটিবে। ইতিমধ্যেই শত্রুপক্ষীয়দের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। সুভাষচন্দ্রের নির্ব্বাচনকে ভিত্তি করিয়া কংগ্রেসের মধ্যে একটা ভেদ-বিভেদের ভাব বাড়াইবার চেষ্টা সুরু হইয়াছে। তথাকথিত ভারত হিতৈষীদের অন্যতম রাসব্রুক উইলিয়ামস সাহেব 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্জ্জিয়ান' পত্রে দেশীয় রাজ্যে প্রজা-আন্দোলন সম্পর্কে গবেষণা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, কংগ্রেসের বর্ত্তমান ওয়ার্কিং কমিটির মতলব ছিল, দেশীয় রাজ্যের রাজাদের সঙ্গে একটা মিটমাট করিয়া ফেলিয়া যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্র, আইন সভায় নিজেদের পক্ষের জোর বাড়ান এবং সেইভাবে জোর বাড়াইয়া বর্ত্তমানে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহে কংগ্রেস যেভাবে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, সেইভাবে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টেও কংগ্রেসের জোর বাড়াইয়া যুক্তরাষ্ট্র প্রণালী লইয়া কাজ চালিবে। সুভাষচন্দ্রের নির্ব্বাচন-সাফল্যে দক্ষিণপন্থী ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সে চাল ব্যর্থ হইয়াছে। সুভাষচন্দ্র সামন্ত রাজ্যসমূহের কর্ত্তাদের পছন্দ করেন না; সুতরাং, তাঁহাদিগকে দলে আনিবার চেষ্টার সহিতও তাঁহার সহানুভূতি নাই। তাঁহার মতলব হইল, ব্রিটিশ-ভারতের অধিবাসীদের শক্তির দ্বারাই ভারতের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং অবশেষে সামন্ত রাজাদিগকে বিতাড়িত করিয়া সামন্ত রাজ্যগুলি স্বায়ত্তশাসনাধিকারলব্ধ ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা। আমরা আশা করি, মহাত্মা গান্ধী লর্ড লোথিয়ানের চিঠির জবাবে সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র প্রণালী সম্বন্ধে তাঁহার যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে রাসব্রুক উইলিয়ামস সাহেবের এই ভ্রান্তি দূর হইবে। মহাত্মাজী দৃঢ় ভাষায় বলিয়াছেন যে, দেশীয় রাজ্যের প্রগতি-বিরোধীদের প্রতিনিধিত্ব রহিয়াছে যে যুক্তরাষ্ট্র প্রণালীতে, তাহা কিছুতেই সমর্থনযোগ্য হইতে পারে না। সুতরাং, দেশীয় রাজ্যের অধিকারীদের সঙ্গে আপোষ-নিষ্পত্তি করিবার উদ্দেশ্য দক্ষিণপন্থীদের যে ছিল, এ ধারণার কোন ভিত্তিই থাকিতে পারে না, আর দেশীয় রাজ্যের এই সব প্রগতি-বিরোধীদের সঙ্গে খাতির দক্ষিণপন্থীদের কি পরিমাণে আছে—দেশীয় রাজ্যসমূহের আন্দোলনের ভিতরেই সে পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। দেশীয় রাজ্যের প্রজা-আন্দোলনে কংগ্রেসের যাঁহারা নেতৃত্ব করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই দক্ষিণপন্থী। সুতরাং, নীতির দিক হইতে এ-সব যুক্তি নিতান্তই অসার, এ-সব চালে ভেদ সৃষ্টি করা যাইবে না। এ-সব চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। আমরা

আশা করি, সুভাষচন্দ্র সত্বর নিরাময় লাভ করিয়া সুসংহতভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশের সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিতে সমর্থ হইবেন।

প্যাটেলপন্থীদের পদত্যাগ—

ওয়ার্কিং কমিটির দক্ষিণপন্থী ১২জন সদস্য অর্থাৎ সর্দ্দার প্যাটেল, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মৌলানা আজাদ, ভুলাভাই দেশাই, শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু, আচার্য্য কৃপালনী, শ্রীযুত শংকররাও দেব, শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ মহাতাপ, খান আবদুল গফুর খান, শ্রীযুত জয়রামদাস দৌলতরাম, ডাক্তার পট্টভী সীতারামিয়া এবং শেঠ যমুনালাল বাজাজ—ইঁহারা পদত্যাগ করিতেছেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আপাতত পদত্যাগ করিতেছেন না, তবে শুনা যাইতেছে, তিনিও নাকি নবগঠিত ওয়ার্কিং কমিটিতে থাকিতে রাজী হইবেন না। আমাদের মতে দক্ষিণ-পন্থীদের এমন তাড়াহুড়ার সঙ্গে জোট বাঁধিয়া পদত্যাগ এখন না করিলেই ভাল হইত। ত্রিপুরী কংগ্রেসের অধিবেশনের অধিক বিলম্ব নাই, কংগ্রেসের বিধি অনুসারে নূতন ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের সময়ই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত কার্য্যে পরিণত হইতে পারিত, এই কয়েকটা দিনের জন্য অপেক্ষা না করিয়া অভিনয়োচিত এই পদত্যাগ, ইহাতে কংগ্রেসের মধ্যে একটা দলাদলি, এই ধারণাই বাহিরে বড় হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইল, অথচ সে জিনিষটা আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। সুভাষচন্দ্রের নির্ব্বাচনে দক্ষিণপন্থীদের কর্ম্মতালিকার প্রতি পরোক্ষভাবে দেশের লোকের অনাস্থাই সূচিত হইয়াছে, সুতরাং দক্ষিণ-পন্থীদের ওয়ার্কিং কমিটি গণতান্ত্রিক বিধিবিহিত হয় না এই যুক্তি যাঁহারা দেখাইতেছেন, তাঁহাদের উত্তরে এই কথা বলা যায় যে, ইঁহারা এতদিন যখন পদত্যাগ করেন নাই, তখন আর কয়েকটি দিন পদত্যাগ না করিলেও কোন ক্ষতি হইত না। নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সিদ্ধান্ত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেও পারিতেন। দক্ষিণপন্থীরা বলিতেছেন যে, তাঁহাদের এই পদত্যাগ হইতে ইহা কেহ বুঝিবেন না যে তাঁহারা সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধতা করিবেন। ইহা আমরাও বুঝি, কিন্তু শুধু বিরুদ্ধতা না করাই আমাদের মতে তাঁহাদের কর্ত্তব্যের দিক হইতে বড় কথা নয়। সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন করা—তাঁহার কর্ম্মনীতিকে সার্থক করিতে সাহায্য করাও আমরা তাঁহাদের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। তাঁহারা খাঁটি গণতান্ত্রিক হিসাবে জাতির সেবক, তাঁহাদের কর্ত্তব্য হইল জাতির ব্যাপকতর যে কর্ম্মতালিকার যে অংশে তাঁহাদের বিবেকের বিরুদ্ধতা নাই, প্রত্যক্ষভাবে সেই অংশের ভিতর দিয়া কাজ করার উপর জোর দিয়া যে অংশে অ-মিল সে অংশকে প্রস্ফুট করিয়া না তোলা। প্রকৃতপক্ষে সুভাষচন্দ্রের এই যে নির্ব্বাচন, ইহার মধ্যে কংগ্রেসের কর্ম্মতালিকার বা কংগ্রেসের নীতির সহিত কোন বিরোধের প্রশ্ন উঠে নাই, প্রশ্ন উঠিয়াছে কংগ্রেসের পরিগৃহীত কর্ম্মতালিকা কার্য্যে পরিণত করায় আরও জোর দিবার—শুধু এই মাত্র কথা চলে। সুতরাং এক্ষেত্রে নির্ব্বাচনকে মহাত্মা গান্ধীর নীতি-নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মতালিকার প্রতি অনাস্থা বুঝিয়া লইয়া একেবারে পদত্যাগ করার প্রশ্ন যে কেমন করিয়া আসে, আমাদের ধারণা হয় না। পণ্ডিত জওহরলালও সেই মতেরই সমর্থন করিয়াছেন। কংগ্রেসের কর্ম্মতালিকা লইয়া কাজের উপর জোর দিতেই দেশবাসী নির্দ্দেশ করিয়াছে, কংগ্রেসের কর্ম্মতালিকাকে ভ্রান্ত বলে নাই। গোষ্ঠীগত বা সম্প্রদায়গত মতের উপর জোর দিলে কাজ চলে না। সে মনোবৃত্তি মারাত্মক, বিশেষত, দেশের সম্মুখে যখন বৃহত্তর সমস্যা আসিয়া দেখা দেয়, তখন এই সব উপদলীয়তাকে চাপিয়া যাইতে হয়। ইংরেজ এই জিনিষটা জানে বলিয়াই রাজনীতিক্ষেত্রে এতটা প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে। অমৃতসর কংগ্রেসে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক বলিয়াছিলেন, রাজনীতিতে দেশের লোক-মত আমাকে যাহা নির্দ্দেশ করিবে আমি অভ্রান্তভাবে তাহার সাধনাতেই আত্মনিয়োগ করিব। আমাদের মতে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের এই দিক হইতে বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত ছিল। দেশের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার বৃহত্তর ক্ষেত্রে যে সমস্বার্থ রহিয়াছে, যে ব্যাপকতর আদর্শ রহিয়াছে, আজ স্বদেশ-সেবকদের সকলের দৃষ্টি সূক্ষ্ম ভেদ-বিভেদের উপর না পড়িয়া সেই দিকেই আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

পরলোকে রামদয়াল মজুমদার—

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী পণ্ডিত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। মজুমদার মহাশয় একজন সাধন-নিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। সাধু-জীবন বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তিনি সেই সাধু-জীবন যাপন করিয়াছেন। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার জীবনের বৈশিষ্টাই ছিল, ভারতের ঋষিদের আদর্শের সাধনা। তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনে তিনি জ্ঞান-নিষ্ঠ ঋষিদের সেই আদর্শের প্রচারকেই ব্রতস্বরূপে গ্রহণ করেন। এই আদর্শের প্রচারের জন্য ১৯১৩ সালে তিনি 'উৎসব' পত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। 'উৎসব' এদেশে আধ্যাত্মিকতার গতি ধরাইয়া দিতে সামান্য সাহায্য করে নাই। মজুমদার মহাশয় যেমন পণ্ডিত ছিলেন, সেইরূপ তিনি ছিলেন সুদক্ষ লেখক এবং সাহিত্যিক। দুরূহ অধ্যাত্ম-তত্ত্বের উপর আলোকসম্পাত করিতে তাঁহার একটা নিজস্ব বিশিষ্টতা ছিল। এই বৈশিষ্ট্য তাঁহার লিখিত 'গীতা-পরিচয়', 'বিচার-চন্দ্রোদয়' প্রভৃতি গ্রন্থের ভিতর দিয়া বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মজুমদার মহাশয়ের গীতা-ভাষ্য বাঙলাদেশে তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। গীতা-ভাষ্যের ভিতর দিয়া তিনি ভারতীয় দর্শনের অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব যেরূপ ভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়াছেন, তাহা তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয়। হিন্দু দর্শন সম্বন্ধে তিনি যে-সব গ্রন্থ লিখিয়াছেন, সেগুলির দ্বারা বাঙলা সাহিত্য বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হইয়াছে। পরিণত বয়সেই তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার পরলোকগমনে বাঙলার সংস্কৃতির যে বিশেষ ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নয়। আমরা তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

মানবীয় ঐক্যের আদর্শ

শ্রীঅরবিন্দ

(৭)

সংহিত (Federal) সাম্রাজ্যের একমাত্র দৃঢ় ভিত্তি হইতেছে অসমধর্ম্মী অংশ সকলের মধ্যে এক সত্য চৈতন্যমূলক ঐক্য গড়িয়া তোলা; এইরূপ সাম্রাজ্যগঠনের সমস্যা দুইটি প্রশ্নে দাঁড়ায়, ইহার বাহ্যরূপ কি হইবে এবং সেই রূপের দ্বারা কোন্ সত্যবস্তুর প্রয়োজন সাধিত হইবে। রূপটি কার্য্যত খুবই প্রয়োজনীয়, কিন্তু বস্তুটিই হইতেছে মূল। ঐক্যের কোনও রূপ সেই ঐক্যবস্তুটিকে সম্ভব করিয়া তুলিতে পারে, তাহার অনুকূল হইতে পারে, এমন কি তাহার সৃষ্টিতে সক্রিয়-ভাবে সাহায্য করিতে পারে, কিন্তু কখনও তাহার অভাব পূর্ণ করিতে পারে না। আর আমরা দেখিয়াছি যে, প্রকৃতির এই ক্ষেত্রে প্রকৃত সত্যবস্তু হইতেছে চৈতন্যমূলক, কারণ কেবল রাজনৈতিক বা শাসনবিষয়ক মিলন হইতেছে স্থূল তথ্য, তাহা একটা সাময়িক ও কৃত্রিম সৃষ্টি ভিন্ন আর কিছুই না হইতে পারে, যখনই তাহার উপস্থিত উপযোগিতার শেষ হইবে অথবা তাহার স্থায়িত্বের অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার আমূল কিম্বা গুরুতর পরিবর্ত্তন হইলে তখনই তাহা অপ্রতিকার্য্যভাবে ভাঙিয়া পড়িবে। অতএব আমাদিগকে প্রথমেই এই প্রশ্নটি আলোচনা করিতে হইবে—এই যে বস্তুটিকে সংহিত সাম্রাজ্যের রূপের মধ্যে সৃষ্টি করিতে হইবে, এটি কি? বিশেষত প্রকৃতি ইতিমধ্যেই মানবীয় সমুচ্চয়ের যে অধিজাতি আদর্শ সৃষ্টি করিয়াছে ইহা কি কেবল তাহারই বিস্তার হইবে, না ইহা নূতন ধরণের সমুচ্চয় হইবে, তাহা অধিজাতিকে ছাড়াইয়া যাইবে, তাহাকে রহিত করিয়াই দিতে চাহিবে, ঠিক যেমন অধিজাতি একদিন উপজাতি, কুল এবং নগরতন্ত্র বা জিলাতন্ত্রের স্থান গ্রহণ করিয়াছে?

মানুষের মন যখন এইরূপ কোনও সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন তাহার প্রথম স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয় সেই মতটি সমর্থন করিতে যেটি তাহার পরিচিত ধ্যানধারণা সকলেরই সর্বাধিক পক্ষপাতী হয় এবং সেই সবকেই বজায় রাখিতেছে বলিয়া মনে হয়। কারণ সমষ্টিগত মানবমন ধ্যানধারণার আমূল পরিবর্ত্তনের বিরোধী এবং যখন উহা কোন অভ্যস্ত রূপের অন্তরালে অথবা কোন আনুষ্ঠানিক, আইনগত, যৌক্তিক বা ভাবগত সত্যাভাসের অন্তরালে আসে তখনই তাহাকে খুব সহজে গ্রহণ করে। কেহ কেহ এইরূপ একটি সত্যাভাসের (Fiction) সৃষ্টি করিয়া স্বাভাবিক ঐক্যের আধিজাতিক আদর্শ হইতে সাম্রাজ্যিক আদর্শে যাইতে চাহিতেছেন। বর্ত্তমানে যেটি মানুষকে সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ করিতেছে সেটি হইতেছে বাস করিবার এবং রক্ষা করিবার একটি সাধারণ দেশের ভৌগোলিক ঐক্য, সেই ভৌগোলিক ঐক্যের উপর নির্ভরশীল এক সাধারণ অর্থনৈতিক জীবন এবং সেই ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করিয়া বিকশিত দেশমাতৃকার প্রতি ভক্তি ও প্রেম; সেই দেশ-প্রেম একটা রাজনৈতিক ও শাসনবিষয়ক ঐক্যের সৃষ্টি করে অথবা যখন এইরূপ ঐক্য সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার দৃঢ় স্থায়িত্বের বিধান করে। তাহা হইলে এই শক্তিশালী হৃদয়বৃত্তিকেই একটি সত্যাভাসের দ্বারা বিস্তৃত করা হউক, সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক অসমধর্ম্মী অংশের নিকট দাবী করা হউক সে যেন সাম্রাজ্যটিকেই মাতা বলিয়া বিবেচনা করে, তাহার নিজের ভৌগোলিক দেশমাতৃকাকে নহে, অথবা যদি সে তাহার পুরাতন অনুরাগ ত্যাগ করিতে না পারে তাহা হইলে সাম্রাজ্যকেই অন্তত মহত্তরা মাতা বলিয়া প্রথমে ও সর্ব্বাগ্রে ভক্তি করিতে শিক্ষা করুক। দেশমাতৃকা ফ্রান্স সম্বন্ধে ফরাসীদের যে ধারণা তাহা এই আদর্শেরই একটি প্রকারভেদ; সাম্রাজ্যের অধিকৃত অন্য সকল দেশকে (ইংরেজী বাক্যবিন্যাসে সেই সব দেশকে বহু রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া হইলেও অধীন দেশ, dependencies, বলিয়া গণ্য করা হয়) মাতৃভূমি ফ্রান্সের উপনিবেশ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, সমুদ্রপারের ফ্রান্স বলিয়া একশ্রেণীভুক্ত করিতে হইবে এবং সকলের সাধারণ মাতা ফ্রান্সের মহত্ত্ব, গৌরব ও প্রীতিপ্রদতাকে তাহাদের জাতীয় ভাব অনুশীলনের কেন্দ্র করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে। এইরূপ পরিকল্পনা টিউটনিক্ প্রকৃতির অনুযায়ী না হইলেও ইহা কেল্টো-লাতিন প্রকৃতির পক্ষে স্বাভাবিক; জাতিটির অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলতা ও বর্ণগত সংস্কার এই পরিকল্পনার অনুকূল এবং সকল কেল্টিক জাতির ন্যায় ফরাসী-দের যে আকর্ষণ ও আত্মকরণের শক্তি আছে, তাহার দ্বারাও ইহা সমর্থিত হইয়াছে।

এইরূপ সত্যাভাসের শক্তি, অনেক সময় আশ্চর্য্যময় শক্তি, মুহূর্ত্তের জন্যও অস্বীকার করা চলে না। প্রকৃতিকে যখন তাহার মনোময় জন্তু মানুষের মধ্যে বদ্ধমূল তাহার নিজেরই পরিবর্ত্তনবিরোধিতাকে জয় করিতে হয় তখন এইটিই হইতেছে প্রকৃতির সর্ব্বাপেক্ষা সাধারণ ও কার্য্যকরী পদ্ধতি। তথাপি এমন কতকগুলি জিনিষ আছে সেইগুলি না হইলে সত্যাভাস কৃতকার্য্য হয় না; প্রথমত ইহাকে এক সন্তোষজনক বাহ্যিক সাদৃশ্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে; দ্বিতীয়ত ইহার পরিণামস্বরূপ এমন কোন সম্ভাব্য বস্তু থাকা চাই, যাহা এই সত্যাভাসেরই স্থান গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে অথবা শেষ পর্য্যন্ত সেইটিকেই সমর্থন করিবে; তৃতীয়ত এই সম্ভাব্য বস্তুটিকে ক্রমশ বাস্তবে পরিণত হইতে হইবে, খুব বেশী দিন তাহার পক্ষে অস্পষ্ট রূপহীন নীহারিকার ন্যায় হইয়া থাকা চলিবে না। এমন এক সময় ছিল যখন এই সকল জিনিষ তত অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজনীয় ছিল না, তখন সাধারণ মানুষ ছিল অধিকতর কল্পনাপ্রবণ, অতার্কিক একটা ভাব বা আভাসেই সন্তুষ্ট; কিন্তু মানবজাতি যেমন অগ্রসর হই-য়াছে, ততই সে মননশীল, আত্মচেতন, সমালোচনাপ্রবণ এবং সত্য ও ছলের অসামঞ্জস্য ধরিতে পটু হইয়া উঠিয়াছে। তাহা ছাড়া এখন সর্ব্বত্র চিন্তাশীল ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছে। এখন তাঁহাদের কথা লোকে যে ভাবে শুনিতেছে, হৃদয়ঙ্গম করিতেছে, মানবজাতির ইতিহাসে ইতিপূর্ব্বে সেরূপ আর কখনও হয় নাই; এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ক্রমশ বেশী বেশী অনু-সন্ধিৎসু, সমালোচক এবং ছলের শত্রু হইয়া উঠিতেছেন।

তাহা হইলে এই সত্যাভাসটি কি কোনও সম্ভাব্য

সাদৃশ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত,— অন্য কথায়, ইহা কি সত্য যে, যখন প্রকৃত সাম্রাজ্যিক ঐক্য সিদ্ধ হইবে তখন তাহা কেবল আধিজাতিক ঐক্যেরই একটা বৃহত্তর রূপ হইবে? আর তাহা যদি না হয়, তাহা হইলে সেই সম্ভাব্য বস্তুটি কি যাহাকে এই সত্যাভাসের দ্বারা গড়িয়া তুলিতে চাওয়া হইতেছে? ইতিহাসে মিশ্র অধিজাতি বৃহদায়তনে গড়িয়া তোলাই সংহিত সাম্রাজ্যের প্রথমোক্ত আদর্শটিই গৃহীত হয়, তাহা হইলে এইরূপ একটি মিশ্র আধিজাতি বৃহদায়তনে গড়িয়া তোলাই সংহিত সাম্রাজ্যের কার্য্য হইবে। অতএব কৃতকার্য্য মিশ্র অধিজাতির সর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্ট দৃষ্টান্তগুলির প্রতি আমাদিগকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে হইবে, দেখিতে হইবে এই সাদৃশ্য কতদূর পর্যন্ত যায়, দেখিতে হইবে তাহার পথে এমন কোনও বাধা আছে কিনা যাহা হইতে বুঝা যায় যে, একটা প্রাচীন সাফল্যের প্রকারভেদ অপেক্ষা একটা নূতন কিছু বিকাশ করাই আবশ্যক। বাধাগুলি সম্বন্ধে যথার্থ ধারণা করিতে পারিলে তাহাদের সমাধানের পথও মিলিতে পারে।

মিশ্র বা অসমধর্ম্মী অধিজাতির সাফল্যময় বিকাশ এবং সৌভাগ্যের সহিত বিকাশশীল অসমধর্ম্মী সাম্রাজ্য উভয়েরই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের চক্ষুর সম্মুখে রহিয়াছে. অতীতে বৃটিশ অধিজাতি গঠিত হইয়াছে ইংরেজীভাষী য়্যাংলো-সাফল্যের মধ্যে কিছু ত্রুটি আছে, বহু সমস্যা অসমাধিত থাকায় ঐ সৌভাগ্যের মধ্যেও বিপদের সম্ভাবনা রহিয়াছে। বৃটিশ অধিজাতি গঠিত হইয়াছে ইংরেজীভাষী অ্যাংলো-নর্ম্মান ইংলন্ড, ওয়েল্শ্ভাষী কিম্রিক (Cymric) ওয়েলশ্ ও অর্দ্ধ-স্যাক্সন অর্দ্ধ-গেলিক ইংরেজীভাষী স্কটল্যান্ডকে লইয়া এবং খুবই অপূর্ণভাবে, খুবই আংশিকভাবে গেলিক আয়ার্ল্যান্ডকে লইয়া,—একটি প্রভাবশালী স্যাক্সন-নর্ম্মান উপনিবেশ ইহাকে বলপূর্ব্বক সম্মিলিত দেহটির সহিত যুক্ত করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু কোন সত্য মিলনে বাধ্য করিতে সমর্থ হয় নাই। এই সংগঠনে সেদিন পর্য্যন্ত আয়র্ল্যান্ড ছিল অসাফল্যের দিক, কেবল এখন এবং ইহার অন্যান্য অংশের অন্য পরিস্থিতির মধ্যে সমগ্রটির সহিত আয়র্ল্যান্ডের চৈতন্যগত ঐক্য সম্ভব হইতেছে এবং কার্য্যে পরিণত হইতে আরম্ভ করিতেছে।* এই যে সাধারণ কৃতকার্য্যতা এবং আংশিক অকৃতকার্য্যতা ইহা কোন অবস্থানিচয়ের দ্বারা নিৰ্ম্মিত হইয়াছে এবং বৃহত্তর সমস্যাটির সম্ভাবনা সকল সম্বন্ধে ইহা হইতে কি আলোক পাওয়া যাইতে পারে?

প্রকৃতি তাহার ভৌতিক সমুচ্চয় গঠনেও মূলত সেই নীতি পালন করে, মানবীয় সমুচ্চয় গঠনেও মূলত সেই নীতিরই অনুসরণ করিয়াছে। প্রথমত সে একটা নৈসর্গিক শরীর দিয়াছে, দ্বিতীয়ত যে সকল অংশ লইয়া শরীরটি গঠিত তাহাদের জন্য এক সাধারণ জীবন ও প্রাণিক স্বার্থ দিয়াছে, তৃতীয়ত দিয়াছে ঐক্য সম্বন্ধে একটা জাগ্রত অনুভূতি এবং একটা কেন্দ্র বা নিয়ামক যন্ত্র যাহার ভিতর দিয়া সেই সাধারণ অহংবোধ নিজেকে প্রকট করিতে পারে এবং কর্ম্ম করিতে পারে। তাহার সাধারণ পদ্ধতিতে বংশ ও অতীত সম্বন্ধের একটা যোগসূত্র থাকা চাই, তাহা সদৃশকে সদৃশের সহিত সংযুক্ত হইতে এবং বিসদৃশ হইতে নিজকে পৃথক করিতে সক্ষম করিবে অথবা চাই একটা সাধারণ বাসস্থান, একটা দেশ তাহা এমনভাবে ব্যবস্থিত হওয়া চাই যেন তাহার প্রাকৃতিক সীমানার মধ্যে যাহারা বাস করিবে তাহারা একটা ভৌগোলিক প্রয়োজনের দ্বারাই মিলিত হইতে বাধ্য হয়। প্রাচীনতর কালে যখন জনসমষ্টিসকল মাটিতে তেমন বদ্ধমূল হয় নাই, তখন প্রথমোক্ত বিধানটিই ছিল অধিকতর প্রয়োজনীয়; বর্ত্তমানের সুপ্রতিষ্ঠিত সমাজ সকলে দ্বিতীয়টিরই প্রাধান্য হইয়াছে; কিন্তু জাতিগত ঐক্য (সে জাতি শুদ্ধই হউক বা মিশ্রই হউক তাহাতে আসিয়া যায় না, কারণ তাহা যে এক মূল হইতেই উৎপন্ন হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই) এখনও একটি প্রয়োজনীয় বিষয় হইয়া রহিয়াছে কারণ তীব্র বৈষম্য বা প্রভেদ ভৌগোলিক প্রয়োজনটির প্রতিষ্ঠার পথে সহজেই গুরুতর বাধাসমূহের সৃষ্টি করিতে পারে। যাহাতে এই প্রয়োজনটি নিজকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে তাহার জন্য দ্বিতীয় প্রাকৃতিক বিধানটিতে সমধিক শক্তি থাকা আবশ্যক; অর্থাৎ চাই অর্থনৈতিক ঐক্য বা সাধারণভাবে ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করার অভ্যাস আর চাই রাজনৈতিক ঐক্য বা উদ্বর্ত্তন, কর্ম্ম ও বিবৃদ্ধির জন্য সাধারণভাবে প্রাণিক সংগঠনের অভ্যাস। আর যাহাতে এই দ্বিতীয় বিধানটি নিজকে পূর্ণশক্তিতে সংসিদ্ধ করিয়া তুলিতে পারে সে জন্য এমন কোন কিছু থাকিলে চলিবে না যাহা তৃতীয় বিধানটিকে দমিত বা ধ্বংস করিয়া দিবে, তাহার সৃষ্টি বা স্থায়িত্বের পরিপন্থী হইবে; অর্থাৎ, এমন কোন কিছু করা চলিবে না যাহাতে ভাবগত বৈষম্যের উপরেই জোর দেওয়া হইলে অথবা সমগ্র সংবিধানটির অন্যান্য অংশের সহিত পার্থক্যের অনুভূতিকে স্থায়ী করিয়া তুলিবে এবং এইরূপে কেন্দ্র বা রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্রটি চৈতন্যগতভাবে সমগ্রের প্রতিনিধি-স্বরূপ থাকিবে না এবং সেই জন্যই তাহার অহংবোধের প্রকৃত কেন্দ্র থাকিবে না। আর ইহা আমাদিগকে সকল সময়েই মনে রাখিতে হইবে যে, সম্বন্ধচ্ছেদ প্রবৃত্তি বলিতে সাম্প্রদায়িক আনুগত্যের অভাব বুঝায় না, কিন্তু ইহা হইতেছে প্রকৃত মিলনের অসম্ভাবিতার অনুভূতি।

বৃটিশ অধিজাতির সংগঠনে ঐক্যের ভৌগোলিক প্রয়োজন অতি স্পষ্টভাবেই বর্ত্তমান ছিল; ওয়েলশ ও আয়ার্ল্যান্ড বিজয় এবং স্কটল্যান্ডের সহিত মিলন হইতেছে কেবল এই প্রয়োজনের ক্রিয়ার ফলস্বরূপ ঐতিহাসিক ঘটনা; কিন্তু জাতিগত ঐক্য এবং অতীত সাহচর্য্যের ঐক্য সম্পূর্ণভাবেই অবর্ত্তমান ছিল এবং তাহার সৃষ্টি করিতে অল্পাধিক বেগ পাইতে হইয়াছিল। ওয়েলশ ও স্কটল্যান্ডের সহিত এই মিলন অল্পাধিক কালের মধ্যে সাফল্যের সহিত সম্পাদিত হইয়াছিল কিন্তু আয়ার্ল্যান্ডের সহিত আদৌ হয় নাই। ভৌগোলিক প্রয়োজন হইতেছে কেবল একটি সাপেক্ষ শক্তি; অনৈক্যের ভাব সবল থাকিলে ইহা পরাভূত হইতে পারে যদি এই বিচ্ছেদ প্রবৃত্তিকে ভাল করিয়া নষ্ট করিবার জন্য কিছু করা না হয়; অতএব যখন ঐক্যটি রাজনৈতিকভাবে সংসিদ্ধ হইয়াছে তখনও তাহার নষ্ট হইবার দিকে প্রবণতা থাকে, বিশেষত [illegible]

*এই প্রবন্ধ লিখিত হইবার পর আয়র্ল্যান্ডের উপর দিয়া যে ঝড় বহিয়া গিয়াছে তাহাতে সে যে আর কখনও বৃটিশ অধিজাতির সহিত মিলিত হইয়া তাহার একটি অচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হইতে পারিবে এরূপ সম্ভাবনা খুবই কম।

ভৌগোলিক ঐক্যের এমন একটা ভৌতিক ব্যবধান বা বিভাজক প্রাচীর থাকে যাহা অর্থনৈতিক স্বার্থসংঘাতের ভিত্তি হইতে পারে—বেল্‌জিয়ম ও হল্যাণ্ড, সুইডেন ও নরওয়ে, আয়ার্ল্যাণ্ড ও গ্রেটবৃটেন এইভাবেই বিভক্ত। আয়ার্ল্যাণ্ডের ক্ষেত্রে বৃটিশ শাসকগণ যে অর্থনৈতিক বিভাগের এই ব্যবধানকে নষ্ট করিয়া দিতে কিম্বা তাহার উপর সেতু বাঁধিয়া দিতে এবং আইরিশ জাতির মনে একটা পৃথক শরীর, পৃথক ভৌতিক দেশের প্রতি অনুরাগকে প্রতিহত করিতে কোনই চেষ্টা করেন নাই, শুধু তাহাই নহে, পরন্তু কার্য্য ও কারণ সম্বন্ধে একটা প্রচণ্ড ভুল হিসাব করিয়া তাঁহারা এই দুইটিকেই যতদূর সম্ভব তীব্র করিয়া তুলিয়াছিলেন।

প্রথমত বৃটিশ ব্যবসা ও বাণিজ্যের স্বার্থের জন্য আয়ার্ল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক জীবন ও সমৃদ্ধিকে ইচ্ছা করিয়াই ধ্বংস করা হইয়াছিল। তাহার পর এক সাধারণ আইন পরিষদ, এক সাধারণ শাসনতন্ত্রে দুইটি দ্বীপের রাজনৈতিক "ঐক্য" সম্পাদন করাও কোন কাজের হয় নাই (আর যে উপায়ে ইহা সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহা আলোচনা করিতেও সংকোচ বোধ হয়); কারণ সেই শাসনযন্ত্র চৈতন্যমূলক ঐক্যের কেন্দ্র ছিল না। যেখানে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় স্বার্থগুলিতে কেবলই পার্থক্য নাই, পরন্তু বিরোধ রহিয়াছে, সেখানে ঐ শাসনযন্ত্র কেবল বড় "অংশীদার"টির স্বার্থেরই স্থায়ী প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠার প্রতিভূ হইতে পারে, এবং যে বৈদেশিক শরীরটি ব্যবস্থাপক শৃঙ্খলের দ্বারা বৃহত্তর আয়তনটির সহিত বদ্ধ কিন্তু প্রকৃত সংমিশ্রণের দ্বারা মিলিত নহে তাহার স্বার্থ উপেক্ষিত ও অস্বীকৃত হইতে থাকে। ইংলণ্ড যখন সুখ-সমৃদ্ধিতে বাড়িয়া চলিয়াছে তখন যে দুর্ভিক্ষ আয়ার্ল্যাণ্ডকে জনশূন্য করিয়া দিয়া গেল, তাহাই এই "মিলনের" অমঙ্গল স্বরূপ সম্বন্ধে প্রকৃতির ভীষণ প্রমাণ, সে মিলন ঐক্য নহে, পরন্তু গভীরতম স্বার্থ সকলের মধ্যে তীব্রতম বিরোধ; আয়ার্ল্যাণ্ডে যে স্বায়ত্তশাসন (Home-rule) ও সম্বন্ধচ্ছেদের আন্দোলন—সে সব হইতেছে আইরিশ জাতির ভূমণ্ডলে টিকিয়া থাকিবার সংকল্পের স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী প্রকাশ, আত্মরক্ষার সহজাত প্রেরণা কর্ত্তৃক আত্মরক্ষার একমাত্র সুস্পষ্ট উপায়ের উদ্ভাবন এবং দৃঢ়ানুবদ্ধ অনুসরণ ভিন্ন সে সব আর কিছুই নহে।

মানবজীবনে অর্থনৈতিক স্বার্থ হইতেছে এমন জিনিষ যাহাতে সাধারণত নির্ব্বিঘ্নে হস্তক্ষেপ করা চলে না, কারণ সে সব হইতেছে জীবনেরই সহিত জড়িত এবং অনবরত সে সবকে দলন করিলে, যদি তাহা উৎপীড়িত জীবনটিকে একেবারে বিনষ্ট করিয়া না ফেলে, তাহা অপরিহার্য্যরূপেই তিক্ততম বিদ্রোহ জাগাইয়া তোলে এবং প্রকৃতির কোনও নির্ম্মম প্রতিশোধে পর্য্যবসিত হয়। কিন্তু প্রাকৃতিক বিধানগুলির তৃতীয় পর্য্যায়েও আয়ার্ল্যাণ্ড বৃটিশ রাজনীতিজ্ঞতা আইরিশ স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তার সকল অঙ্গগুলিকে বলপূর্ব্বক নষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়া সমানভাবেই গুরুতর ভুল করিয়াছিল। আয়ার্ল্যাণ্ডের ন্যায় ওয়েলশও বিজয়ের দ্বারা অর্জ্জিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাকে অঙ্গীভূত করিবার জন্য এত বিস্তারিত আয়োজন করা হয় নাই; কোন উপদ্রবাত্মক ক্রিয়ার ফলে প্রথমত যে অস্বস্তি আসে তাহার পর, বাধা দান করিবার দুই একটা ব্যর্থ চেষ্টা করিবার পর, ওয়েলশকে স্বাভাবিক বিধানের নিরুপদ্রব চাপের ক্রিয়ার দ্বারাই পরিবর্ত্তিত হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল, এবং ওয়েলশ তাহার নিজস্ব জাতি ও ভাষা রক্ষা করা সত্ত্বেও কিম্‌রিক (Cymric) জাতি ও স্যাক্‌সন জাতি মিলিত হইয়া এক সাধারণ বৃটিশ অধিজাত্য গড়িয়া উঠিতে কোনই বাধা হয় নাই। এইরূপেই হস্তক্ষেপ না করিবার পদ্ধতির দ্বারা ইংরেজ জাতির সহিত স্কচ্ জাতির মিশ্রণ (হাইল্যাণ্ড জাতির অপ্রধান সমস্যাটির কথা ছাড়িয়া দিলে) আরও দ্রুত সম্পাদিত হইয়াছে; এখন গ্রেট-বিটেন দ্বীপে রহিয়াছে এক মিশ্র বৃটিশ অধিজাতি, তাহার আছে এক সাধারণ দেশ, তাহা মিশ্রিত সাম্যের দ্বারা, অতীত সাহচর্য্যের স্মৃতির দ্বারা, ভৌগোলিক প্রয়োজনের দ্বারা, এক সাধারণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের দ্বারা, এক সাধারণ অহংভাবের বিকাশের দ্বারা ঐক্যবদ্ধ। আয়ার্ল্যাণ্ডে যে বিপরীত প্রণালী অনুসৃত হইয়াছে, যেখানে স্বাভাবিক পরিস্থিতি সকলের ক্রিয়াতেই কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারিত, কেবল একটু তত্ত্বাবধান ও মৈত্রীসূচক ব্যবহারের দ্বারা সাহায্য করিলেই চলিত, সেখানে তাহার পরিবর্ত্তে একটা কৃত্রিম প্রণালী চেষ্টা করা হইয়াছে, প্রাচীনযুগোপযোগী পদ্ধতি-সকল নূতন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে প্রয়োগ করা হইয়াছে, ইহাতে ফলও হইয়াছে বিপরীত। আর যখন ভুলটি ধরা পড়িল, তখন অতীতের কর্ম্মফল মানিয়া লইতে হইল, আইরিশ স্বার্থ ও আইরিশ স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তার দাবী অনুসারে হোম্‌-রুলের দ্বারা মিলন সাধন করিতে হইল, এক ব্যবস্থাপক সভার অধীনে পূর্ণ মিলন আর হইল না।

এই পরিমাণটি নিজেকে ছাড়াইয়া গিয়াছে, ইহা শেষ পর্য্যন্ত সংহিতত্ত্বের নীতিকে ভিত্তি করিয়া নূতন ধরায় শুধু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নহে, পরন্তু সমগ্র অ্যাংলো-কেল্টিক অধিজাতির পুনর্গঠন আবশ্যকীয় করিয়া তুলিয়াছে। কারণ, ব্রেঁত, আল্‌সাসিয়ান, বাস্ক ও প্রোভাঁসাল যেমন ফ্রান্সের অবিভাজ্য ঐক্যে মিশিয়া গিয়াছিল, ওয়েলশ ও স্কটল্যাণ্ড ইংল্যাণ্ডের মধ্যে সেরূপ সম্পূর্ণতার সহিত মিশ্রিত হয় নাই। যদিও কোন অর্থনৈতিক স্বার্থ বা ভৌগোলিক প্রয়োজনের জন্য ওয়েলশ ও স্কটল্যাণ্ডে সংহিতনীতি প্রয়োগের আবশ্যকতা নাই, তথাপি তাহাদের মধ্যে সামান্য হইলেও এমন যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা অবশিষ্ট রহিয়াছে যাহা আইরিশ সমস্যা সমাধানের প্রভাব অনুভব করিবে, এবং এই দুইটি কেল্‌টিক দেশের জন্য প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের অনুরূপ স্বীকৃতির তৃপ্তি ও সুবিধা সম্বন্ধে জাগ্রত হইয়া উঠিবে। আর এখন যে গ্রেট-ব্রিটেন কর্ত্তৃক শাসিত ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের সংহিতনীতি অনুসারে পুনর্গঠিত অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে, * তাহা হইতে এই ভাব নিশ্চয়ই

* মহাযুদ্ধ শেষ হইবার পর উপনিবেশগুলি আর স্বায়ত্তশাসনেই সন্তুষ্ট না থাকিয়া স্বাধীন দেশ হইবার দাবী করে, তাহারা স্বতন্ত্র স্বাধীন দেশ হিসাবে ভার্সাই সন্ধিতে স্বাক্ষর করে এবং জাতিসঙ্ঘে যোগদান করে। ১৯৩১ সালের Statute of Westminsterএর দ্বারা তাহাদের পূর্ণ স্বাধীনতা আইনতঃ স্বীকৃত হইয়াছে এবং শ্রীঅরবিন্দের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী উপনিবেশ সাম্রাজ্যটি একটি সংহিত সাম্রাজ্যে পরিণত হইয়াছে, ইহার নূতন নাম হইয়াছে The British Commonwealth of Nations. তবে বর্ত্তমানে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে এই সাম্রাজ্যের মধ্যে সহযোগিতা ঘনিষ্ঠ হইতেছে।
—অনুবাদক

(শেষাংশ ১৮৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দেশের কথা

পশমের বাণিজ্য ও ব্যবহার

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

জগতের বাজারে পশমের বাণিজ্য একটি বিরাট স্থান অধিকার করিয়া আছে; অবশ্য এই ব্যবসায়ে অষ্ট্রেলিয়ার স্থান প্রধান। আমেরিকা আর্জেণ্টাইন প্রভৃতি দেশও প্রচুর ব্যবসা করে। জগতের মধ্যে জাপান ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ (বা দ্বীপ?) বেশী পশম না জন্মাইলেও পশম শিল্পে তাহারা পৃথিবীর বাজারে নিতান্ত নগণ্য নহে। বিশেষত ভারতে পশমজাত দ্রব্যের ইহারাই প্রধান বিক্রেতা।

ভারত বাণিজ্যের অঙ্ক দিবার পূর্ব্বে পশমের এক নূতন ব্যবহারের কথা বলা যাইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ইহা পশমের ব্যবহার নহে; পশমে যে আঠাল পদার্থ লাগিয়া থাকে, তাহা লোকে বুদ্ধিপূর্ব্বক কাজে লাগাইয়াছে, তাহারই পরিচয়। শীত বস্ত্রাদি, শাল, আলোয়ান, কার্পেট, পশমী সূতা প্রভৃতি করিতে পশম লাগে; কিন্তু সদ্য সংগৃহীত পশমে বসাজাতীয় পদার্থ (ইহার বিশেষ নাম "yolk") শতকরা ২০ হইতে ৩০ভাগ পর্যন্ত পাওয়া যাইতে পারে। লোকে এই বসা পশম হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লয়; ইহাকে ইংরেজিতে "Scouring" বলে। ইহার জন্য বিশেষ উপায় অবলম্বন করা হয়। পশমগুলিকে ক্ষারের জলে ফুটাইলে (সাবান ও সোডার জল) কতক বসা ঘনীভূত হইয়া যায় এবং বাকী অংশ ঐ জলে মিশিয়া থাকে। এই জল ভিন্ন পাত্রে ধারণ করিয়া অম্ল বা য়্যাসিড (বিশেষত সলফিউরিক য়্যাসিড) যোগে একেবারে নির্দ্দোষ করা হয়। য়্যাসিড যোগ করাতে অবশিষ্ট বসা উপরে ভাসিয়া উঠে (wool grease); তখন তাহাকে ছাঁকিয়া তুলিয়া লওয়া হয়। সাধারণত অম্ল বা য়্যাসিড দিবার পূর্ব্বে এই জল স্বাস্থ্যহানিকর বলিয়া পরিগণিত হয় এবং যেখানে সেখানে ফেলিতে দেওয়া হয় না। য়্যাসিড দিয়া ফুটাইয়া লইবার পর ইহা আইনত দোষ শূন্য হয়।

এই বসার পরিমাণ নিতান্ত কম নহে; নিতান্ত অপরিষ্কার অবস্থায় ইহা দেখিতে কালো রঙ এবং ইহাতে দারুণ দুর্গন্ধ থাকে। সাধারণত শতকরা ৩০ভাগ অবিমিশ্র অম্ল (free acids) এবং প্রায় সমপরিমাণ কোলেষ্টেরল (cholesterol) এবং স্নেহজ সুরাসার (allied wax alcohols) থাকে। এই বসা নানাকাজে লাগে। অর্দ্ধদ্রব অবস্থায় গাড়ীর চাকা প্রভৃতি স্থানে লাগাইয়া ঘর্ষণরোধ করা হয়। বিশেষত যেস্থানে ball bearing থাকে সেখানে ইহা সর্ব্বাধিক উপযোগী। বিশেষজ্ঞরা ইহার ব্যবহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

> "For the more crude kinds of lubrication such as that of the axles of railway wagons or other vehicles, stiffling boxes at the glands of pastons or rotating shafts in closed vessels, etc.---wool grease is very suitable."

বলা বাহুল্য প্রচুর পরিমাণে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

"পশমী বসা"র অপর একটি সুন্দর ব্যবহার রহিয়াছে। বসা উঠাইয়া লইয়া যে জল থাকে তাহার মধ্যে বৈজ্ঞানিক পটাশ মিশ্রিত বা পটাশজাত লবণ (Potashsalts)এর সন্ধান পাইয়াছে। পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে, এই পটাশ জমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা ধারণ করে। বুদ্ধিমানেরা এই অকিঞ্চিৎকর বস্তুকে যেরূপ কাজে লাগাইতেছে তাহা দেখিয়াও আমাদের চৈতন্য হয় না। সারের অভাবে আমাদের দেশের জমি ক্রমেই অনুর্ব্বর হইয়া পড়িতেছে, প্রতিবৎসরই ফসলের পরিমাণ কমিয়া যাইতেছে। জীবের বিষ্ঠা এবং পশুর হাড় এতদিন ইতস্তত পড়িয়া থাকিয়া জমির উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে। এখন আমরা গোবর জ্বালাইয়া থাকি এবং বৈদেশিকেরা নানাস্থানের হাড় সংগ্রহ করিয়া তাহা সার প্রভৃতি নানাকাজে লাগাইতেছে। এই রূপান্তরিত হাড় যে মূল্যে বিক্রীত হয়, আমাদের তাহা ক্রয় করিবার সামর্থ্য থাকে না। পশমের আবর্জ্জনা হইতে যে এত মূল্যবান পদার্থ হয়, তাহা উদ্ধার করিবার আমাদের কোনও চেষ্টা নাই। এদিকে কি কেহ মনোযোগ দিতে পারেন না? বাঙলা দেশে খুব বেশী ভেড়া নাই, কিন্তু যাহা সামান্য আছে, তাহা লইয়া পরীক্ষা করিবার পর পঞ্চনদ প্রভৃতি প্রদেশে গিয়া পশম সাফ করিয়া দিবার এক কারখানা খুলিলে, বোধ হয়, উহার মজুরি পাওয়া যায়; উপরন্তু, পশমী বসা এবং পটাশজাত সার লাভ হইতে পারে।

পরিশুদ্ধ পশমী বসার আরও সূক্ষ্ম ব্যবহার আছে। মনুষ্য ত্বকের মধ্যে অতি দ্রুত প্রবেশ করে বলিয়া লোকে ইহাতে নানারকম মলম প্রভৃতি প্রস্তুত করে। এইরূপ বসাকে ইংরেজিতে 'ল্যানোলিন' (lanolin) বলে। অম্ল বা ক্ষার সকল প্রভাব হইতেই ইহা মুক্ত, সহজে চট্‌চটে হয় না বা ক্ষারযোগে সাবান প্রভৃতি বস্তুতে পরিণত হয় না। জলের সহিত মিশ্রণের ইহার অসাধারণ ক্ষমতা আছে, এমন কি একশত ভাগ ল্যানোলিনের সহিত ১১০ ভাগ জল মিশাইয়া লইলেও মলমের বা cream'এর মত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। গ্লিসারিনের সহিতও ঐ পরিমাণে মিলনের শক্তি আছে। লোমকূপ দিয়া ইহা অতি দ্রুত প্রবেশ লাভ করে এবং রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। করোসিভ সাব্লিমেট (corrosive sublimate) বা পারদ-জাত লবণ এক হাজার ভাগ ল্যানোলিনের সহিত এক ভাগ মিশাইয়া দেহের যে কোন স্থানে প্রলেপ দিলে কয়েক মিনিটের মধ্যে জিহ্বায় ধাতব আস্বাদ উপস্থিত করে। এই কারণে ইহা প্রলেপ, পমেটম, কসমেটিক প্রভৃতি প্রসাধনের ব্যবহারে লাগিয়া থাকে। আমাদের দেশে কি একটি স্থানেও ল্যানোলিন প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা আছে?

বিশেষ ব্যবহার ছাড়িয়া দিয়া আমি এইবার আন্তর্জ্জাতিক পশম ব্যবসায়ের হিসাব দিতে চেষ্টা করিব। প্রথমেই দেখা দরকার পৃথিবীতে কত পশম প্রতি বৎসরে উৎপন্ন হয় এবং ইহাতে কোন দেশের স্থান কোথায়?

১৯৩৭ সালে পৃথিবীতে আন্দাজ পৌনে উনিশ লক্ষ টন (১৮,৭৫,০০০) পশম সংগৃহীত হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন দেশের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হইল:—

	টন	শতকরা অংশ
অষ্ট্রেলিয়া	... ৫,৯৬,০০০	৩১·৭
আমেরিকা	... ২,০৬,০০০	১০·৯
আর্জ্জেণ্টাইনা	... ১,৭০,০০০	৯·২
নিউজীলণ্ড	... ১,৪২,০০০	৭·৫
রুশ গণতন্ত্র	... ১,১৮,০০০	৬·২
দক্ষিণ আফ্রিকা		
যুক্তরাজ	... ১,০৪,০০০	৫·৫
চীন	... ৫৫,০০০	২·৯
উরুগায়	... ৫১,০০০	২·৭
ইংলণ্ড	... ৪৮,০০০	২·৫
ভারতবর্ষ	... ৪৫,০০০	২·৪

স্পেন, ফরাসী, তুরস্ক, ইরাণ প্রভৃতি দেশেও পশম উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এখন ভারতীয় বাণিজ্যের হিসাব লওয়া যাইতে পারে। প্রথমেই দেখা যাউক, ভারতবর্ষ পশমের ব্যবসায়ে কত টাকা বাহির হইতে আনে।

কাঁচা পশমের রপ্তানি

	হাজার পাউণ্ড	মূল্য=হাজার টাকা
১৯৩৫-৩৬	৪,৯৩,৫২	২,০৯,৬৬
১৯৩৬-৩৭	৫,১৯,৩৮	২,৮৬,০৮
১৯৩৭-৩৮	৩,৮৭,৮৯	২,৬৪,৫৬

বন্দর হিসাবে রপ্তানি

(১৯৩৭-৩৮)

	হাজার পাউণ্ড	হাজার টাকা	টাকার শতকরা অংশ
সিন্ধু	২,৬৯,৬১	১,৮৭,৭১	৭০·৯
বোম্বাই	৮৯,২২	৭০,৭৮	২৬·৭
মদ্র	১৭,৬৩	৪,৯৯	১·৮
বাঙলা	৩,৪৩	১,০৮	·৪
মোট	৩,৭৯,৮৯	২,৬৪,৫৬	৯৯·৮

ক্রেতার নাম ও অংশ

(১৯৩৭-৩৮)

	হাজার পাউণ্ড	হাজার টাকা	টাকার শতকরা অংশ
ইংলণ্ড	৩,১০,৩৮	২,০৯,১৬	৭৯·০
আমেরিকা	৫০,৫৩	৪৩,০৯	১৬·২
বেলজিয়ম	৪,৪২	৩,০১	১·১
অন্যান্য	১৪,৫৬	৯,৩১	৩·৫

রপ্তানি—কার্পেট ও কম্বল ইত্যাদি

	হাজারপাউণ্ড	হাজার টাকা
১৯৩৫-৩৬	৯৩,৪৭	৮০,৬৫
১৯৩৬-৩৭	৯৮,৯৮	৮৫,৬৪
১৯৩৭-৩৮	১,১৩,৬১	১,০২,৪৭

বন্দর হিসাবে রপ্তানি

(১৯৩৭-৩৮)

	হাজার পাউণ্ড	হাজার টাকা	টাকার শতকরা অংশ
বাঙলা	৭৭,৮৮	৬৮,১৪	৬৩·৫
মদ্র	১৮,৮৫	১১,৮৮	১১·৫
বোম্বাই	৯,৬২	১৭,১৭	১৬·৭
সিন্ধু	৪,২৬	৫,২৮	৫·১

ক্রেতার নাম ও অংশ

(১৯৩৭-৩৮)

	হাজার পাউণ্ড	হাজার টাকা	টাকার শতকরা অংশ
ইংলণ্ড	৮৩,৭৪	৭৮,২০	৭৬·৩
আমেরিকা	১৭,৮৫	১৩,৮৩	১৩·৪
কানাডা	৪,০৭	৭,৩০	৭·১
অষ্ট্রেলিয়া	১,০৭	১,০৯	১·০
অন্যান্য	৩,৮৮	৪,০৫	৩·৯

মোট রপ্তানি—পশম ও পশমজাত দ্রব্যাদি

		হাজার টাকা
১৯৩৫-৩৬	...	২,৯২,৫৬
১৯৩৬-৩৭	...	৩,৭৩,৮৯
১৯৩৭-৩৮	...	৩,৭২,০৭

আমদানী মালের পুনঃ রপ্তানি (Re-exports)

কাঁচা পশম

	হাজার পাউণ্ড	হাজার টাকা
১৯৩৫-৩৬	১,১৩,৪৭	২৮,০১
১৯৩৬-৩৭	১,০২,৪৯	৩৮,৩৯
১৯৩৭-৩৮	৮৬,১৯	২৭,৯৬

এই আমদানীর মধ্যে ভারতের বাহির অর্থাৎ তিব্বত, আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশ হইতে আনীত পশম ধরা হয়।

পশমজাত দ্রব্যাদি

		হাজার টাকা
১৯৩৫-৩৬	...	৭,২৪
১৯৩৬-৩৭	...	১৪,৬৫
১৯৩৭-৩৮	...	১১,৯৪

আমদানী—পশম

	হাজার পাউণ্ড	হাজার টাকা
১৯৩৫-৩৬	৭৪,৮৫	৪৪,১০
১৯৩৬-৩৭	৬৭,৭৪	৫৯,৫২
১৯৩৭-৩৮	৮১,৭৩	৮৪,৮০

বিক্রেতার নাম ও অংশ

(১৯৩৭-৩৮)

	হাজার পাউণ্ড	হাজার টাকা	টাকার শতকরা অংশ
অষ্ট্রেলিয়া	৪৯,৯৪	৫০,২১	৫৯·২
ইংলণ্ড	২০,৫৬	২৭,১৮	৩২·০
অপরাপর	১১,২৩	৭৪১	৮·৭
মোট	৮১,৭৩	৮৪,৮০	

পশম ছাড়াও পশমজাত দ্রব্যাদি আসে তিন কোটি টাকার উপর। এই মালের তালিকা জানিবার জন্য সাধারণ পাঠকের অনুসন্ধিৎসা জাগিতে পারে, সে কারণে গত তিন বৎসরের বিভিন্ন প্রকারের জিনিষের নাম ও মূল্য দিয়া দিলাম।

	১৯৩৫-৩৬ হাজার টাকা	১৯৩৬-৩৭ হাজার টাকা	১৯৩৭-৩৮ হাজার টাকা
বুননের সুতা	৩৫,৩৯	৪১,৭৭	৬৮,২৯
কম্বল (Rug) প্রভৃতি	৩৫,১৩	২৫,৪৯	৩৯,৩৮
কার্পেট প্রভৃতি	৩,৯২	৪,১৩	৪,০৫
গেঞ্জি (Hosiery) মোজা প্রভৃতি	১৭,৪৮	১৪,৪৯	১৩,৯৮
গরম কাপড় (জামার ছিট) প্রভৃতি	৮১,১০	৮৪,২৯	১,১২,৫২
পশম ও অন্যান্য তন্তু মিশ্রিত	৩০,৪৭	৩১,৩৬	৫১,০৬
শাল, লোহি প্রভৃতি	১১,৪৬	১২,৯০	১৮,৩১
অন্যান্য সকল প্রকার	—	—	—
মোট—	২,৩৪,৪৪	২,২৭,৪২	৩,৩০,০৬

আমদানী কম্বল প্রভৃতি

বিক্রেতার নাম ও অংশ

(১৯৩৭—৩৮)

	হাজার পাউণ্ড	হাজার টাকা	টাকার শতকরা অংশ
ইটালী	৪৯,৯১	৩৭,২১	৯৪·৫
অপরাপর	২,২১	২,১৭	৫·৫

আমদানী—গেঞ্জী, মোজা ইত্যাদি

বিক্রেতার নাম ও অংশ

(১৯৩৭—৩৮)

	হাজার পাউণ্ড	হাজার টাকা	টাকার শতকরা অংশ
জাপান	১,৩৮	৭,১১	৫৩·৮
ইংলণ্ড	২,৪৫	৫,৬৯	৪০·৭
অপরাপর	২৩	৭৭	৫·৫

আমদানী—গরম কাপড় প্রভৃতি

বিক্রেতার নাম ও অংশ

(১৯৩৭—৩৮)

	হাজার গজ	হাজার টাকা	টাকার শতকরা অংশ
জাপান	৪৫,৩৩	৫৬,৬৮	৫০·৩
ইংলণ্ড	১৪,৮৩	৪০,৯৫	৩৬·৩
ইটালী	৩,৩৪	৭,৮৮	৭·০
জার্ম্মানী	৩,১৩	৫,৪২	৪·৮
অপরাপর	৯৫	১,৫৮	২·৬

আমদানী—পশম ও অন্যান্য তন্তুমিশ্রিত বস্ত্রাদি

বিক্রেতার নাম ও অংশ

(১৯৩৭—৩৮)

	হাজার গজ	হাজার টাকা	টাকার শতকরা অংশ
ইংলণ্ড	২৬,৬৭	৩৭,৯৮	৭৪·৩
জাপান	৬,৪৪	৭,৫৭	১৪·৮
ইটালী	১,৫৪	২,২৯	৪·২
জার্ম্মানী	৩৮	১,১৮	২·৩
অপরাপর	১,১৬	২,০৪	৪·০
মোট—	৩৬,১৯	৫১,০৬	

আমদানী—শাল ও লোহি

বিক্রেতার নাম ও অংশ

(১৯৩৭—৩৮)

	সংখ্যা হাজার	হাজার টাকা	টাকার শতকরা অংশ
জার্ম্মানী	২,৮৬	১১,৬৫	৬৩·৬
জাপান	১,৭৬	৫,৩১	২৯·০
অপরাপর	৩০	১,৩৫	৭·৪
মোট—	৪,৯২	১৮,৩১	

আমদানী—মোট পশমী বস্ত্র

বন্দরের অংশ

(১৯৩৭—৩৮)

	হাজার টাকা	শতকরা অংশ
বোম্বাই	১,৫৮,৮১	৪৮·১
মদ্র	৯৫,৩৮	২৮·৮
বাঙলা	৭০,২৫	২১·২
সিন্ধু	৫,৬২	১·১
মোট—	৩,৩০,০৬	৯৯·৯

মোট আমদানী—পশম ও পশমজাত দ্রব্যাদি

	হাজার টাকা
১৯৩৫—৩৬	২,৭৮,৫৪
১৯৩৬—৩৭	২,৮৬,৯৪
১৯৩৭—৩৮	৪,১৪,৮৭

চেষ্টা করিলে ভারতীয় শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়া এই আমদানী হ্রাস করা যাইতে পারে। হায়দরাবাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলে দেখা যায় যেখানে ১৯৩৫-৩৬ সালে মাত্র ২০ হাজার টাকার কার্পেট রপ্তানি হইত, সেখানে শিল্প বিভাগের চেষ্টায় যখন কারিগরের নূতন শিক্ষা দেওয়া হইল এবং জিনিষের উন্নতি সাধিত হইল, তখন ১৯৩৭-৩৮ সালে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকার মাল রপ্তানি হয়। আমার বিশ্বাস চেষ্টা করিলে সকল স্থলেই এরূপ লাভ করা অসম্ভব নহে। বাহিরে চালান না গেলেও ভারতেই যে বিরাট বাজার পড়িয়া আছে, তাহার রত্ন অপরে লুটিয়া খায় কেন?

স্পেনে শক্তিবর্গের মহড়া

স্পেন বিপ্লবের কথা আজ মোটেই নূতন নয়। আর মাসে চারেক পরই এর তৃতীয় বর্ষ পূর্ণ হইবে। স্পেন সম্বন্ধে বিস্তর আলোচনা হইয়াছে। ইহার এমন সব খুঁটিনাটি তথ্যও আজ আপনারা বলিতে পারিবেন যাহা অন্য কোন সময় হয়ত বলা সম্ভব হইত না। স্পেনের দিকে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি এতই পড়িয়াছে।

স্পেনে রীতিমত শক্তির মহড়া চলিয়াছে। বার্সিলোনার পতনের সংগেই বুঝা গিয়াছিল, স্পেন বিদ্রোহী ফ্রাঙ্কোর অধীন হইতে আর বেশী বিলম্ব নাই। যদি-বা কিছু বিলম্ব থাকিত, ইউরোপের প্রধান শক্তিগুলি এ সামান্য বিলম্বটুকুও যেন বরদাস্ত করিতে পারিতেছে না। তাহারা চায় আজই ফ্রাঙ্কো সমগ্র স্পেনের কর্ত্তা হইয়া বসুক। তাহারা আগে কি ইহা চাহে নাই? আগেও ইহাই চাহিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের অভিলাষ এমনতর নগ্নভাবে তখন প্রকাশ পায় নাই। লণ্ডনের নিরপেক্ষতা কমিটির কারসাজি এখন আর কাহারও অজানা নাই। স্পেন যুদ্ধ স্পেনেই আবদ্ধ রাখিবার ছলে স্পেন সরকারকে কেহ সাহায্য করিতে আসে নাই। ওদিকে আন্তর্জাতিক আইন অমান্যকারী ইটালী ও জার্ম্মানী বিদ্রোহী ফ্রাঙ্কোকে বরাবর সাহায্য করিয়া আসিয়াছে, এখনও সাহায্য করিতেছে। কাজেই একথা এখন বলা মোটেই অসঙ্গত হইবে না যে, ইউরোপের প্রধান শক্তিবর্গ স্পেনকে ফ্রাঙ্কোর কবলে দেখিতে প্রথম হইতেই চাহিয়াছিল।

বার্সিলোনার পতনের পরে কতকগুলি ব্যাপার অতি দ্রুতই সংঘটিত হইতেছে। নূতন রাজধানী ফিগেরাসের পতন হইয়াছে। ইহা এখন মাদ্রিদে স্থানান্তরিত। মাদ্রিদ এখন একটি অবরুদ্ধ নগরী। ইহা কতদিন বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিবে বলা যায় না। ওদিকে স্পেন রিপাব্লিকের প্রেসিডেণ্ট আজানা ও প্রধান মন্ত্রী সেনর নেগ্রিনের মধ্যে মতদ্বৈধ দেখা দিয়াছে। প্রেসিডেণ্ট আজানা ফ্রাঙ্কোর সংগে আপোষের পক্ষপাতী, সেনর নেগ্রিন ইহার বিরোধী। তবে যেরূপ দেখা যাইতেছে আজানার চেষ্টাই শেষ পর্যন্ত হয়ত কতকটা কার্য্যকরী হইবে। প্রেসিডেণ্ট আজানা এখন প্যারিসে অবস্থান করিতেছেন

বার্সিলোনার পরে প্রধান গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ফ্রাঙ্কো কর্ত্তৃক মাইনর্কা দ্বীপ অধিকার। ইংরেজ বলিয়াছিল, ফ্রাঙ্কো নিজে যেন ইহা অধিকার করিতে আসে, কেহ বাধা দিবে না। কিন্তু ইংরেজের এ অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই, ইটালীর সেনানীর সাহায্যেই ইহা অধিকৃত হইয়াছে। এই একটি ব্যাপারেই ইংরেজের মনোগত অভিপ্রায় ধরা পড়িয়াছে। এ অভিপ্রায় কি পরে বলিতেছি। মাইনর্কা দ্বীপটির গুরুত্ব নাকি সাম্রাজ্যবাদীদের মতে ঢের বেশী। ফ্রান্সের উত্তর আফ্রিকায় যাইতে হইলে এ দ্বীপটি অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে ইংরেজের প্রভুত্ব বজায় রাখিবার পক্ষেও ইহার গুরুত্ব যথেষ্ট। কাজেই এ দ্বীপটিতে অবাঞ্ছিত জনের প্রাধান্য লাভ ঘটিলে স্বার্থ-সংশ্লিষ্টদের শঙ্কিত হইবারই কথা। এই প্রসংগে আর একটি কথা বলিতেছি। স্পেনের সংগে ইহার সাক্ষাৎ সম্পর্ক না থাকিলেও সাম্রাজ্যবাদীদের বিচারে তাহা একই পর্য্যায়ভুক্ত। পশ্চিমে যখন ইটালীয়দের সাহায্যে ফ্রাঙ্কো মাইনর্কা দখল করে ঠিক সেই সময় প্রাচ্যে জাপান দক্ষিণ চীনের হাইনান দ্বীপ অধিকার করিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদীরা হাইনান দ্বীপটিকেও মাইনর্কা দ্বীপের ন্যায় সমান গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। চীন হইতে ইউরোপীয় বিতাড়নের পক্ষে এটি হইবে না কি একটি মারাত্মক ঘাঁটি।

স্পেনে ফ্রাঙ্কোর বিজয়লাভ সাম্রাজ্যবাদী মাত্রেই কামনা করে। ইটালী, জার্ম্মানী তো ইহার জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছে। সৈন্য, যুদ্ধাস্ত্র ও বিমানপোত আজও তাহাকে জোগাইতেছে। বৃটেন ও ফ্রান্সও ইহা চাহিয়াছিল একথা আগেই বলিয়াছি। কিন্তু এই দুইটি রাষ্ট্রের এই চাওয়ার ভিতরে কতকটা রহস্য জড়িত আছে। এতদিন ইহারা বিদ্রোহী ফ্রাঙ্কোকে পরোক্ষে সাহায্য করিয়াছে, এখন কিন্তু তাহাদের সাহায্যের রকম-ফের হইয়াছে। ফ্রাঙ্কো যাহাতে দ্রুত স্পেনের মালিক হইয়া পড়ে ইহারা বর্ত্তমানে তাহার চেষ্টায় নিরত। স্পেন রিপাব্লিকের কর্ণধারগণ ফ্রাঙ্কোর সংগে আপোষ-রফা করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িবে ইহা বুঝি। ইহা হওয়াই এখন স্বাভাবিক। নহিলে ফ্রাঙ্কো একবার কর্ত্তা হইয়া বসিলে তাহাদের দুঃখের অন্ত থাকিবে না। এই সময় ইংরেজ ও ফরাসী দূত বিদ্রোহী স্পেনের রাজধানী বার্গোসে আনাগোনা করিতেছেন তাহার উদ্দেশ্য কি?

ফ্রাঙ্কো সম্প্রতি একটা ফরমান জারি করিয়াছে। তাহাতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, স্পেন তাহার অধিকারে আসিলে অপরাধীদের, এক্ষেত্রে যাহারা স্পেন সরকারকে সাহায্য করিয়াছে তাহাদের, দণ্ডদান করিবে। তবে সে মানবতাকে বিসর্জ্জন দিবে না। গত ১৯৩৪ সন হইতে স্পেনের ভিতরে যত রক্তপাত হইয়াছে তাহার প্ররোচকদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হইবে। অন্যদের অপরাধের গুরুত্বের তারতম্য অনুসারে দণ্ডেরও তারতম্য হইবে। দোষীদের ছয় মাস হইতে পনর বৎসর পর্য্যন্ত কারাগারে পাঠান হইবে। আর সম্পত্তি বাজেয়াপ্তি, স্পেনে বসবাসের অধিকার বিলোপ এ সবও সংঘটিত হইবে। এই সময়ে ইংরেজ ও ফরাসী দূতের আসরে অবতীর্ণ হওয়ায় স্বতঃই মনে হইতে পারে বিশ্বমানবতার দিক হইতেই ইঁহারা ইহা করিতেছেন। তাহা কিন্তু মোটেই নয়। প্রেসিডেণ্ট আজানার সর্ব্বশেষ প্রস্তাবেই ত প্রকাশ, সরকারপক্ষীয়দের দণ্ডদান করা হইবে না এরূপ আশ্বাস পাইলেই তাঁহারা সমস্ত দাবী-দাওয়া ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত। কাজেই ইংরেজ ও ফরাসীর দূতিয়ালীর আর আবশ্যকতা বিশেষ নাই। তবে ইহারা কি চাহে?

এতকাল ফ্রাঙ্কোর বিজয় কামনা করিলেও ইদানীং একটি ব্যাপারে ইংরেজ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের টনক নড়িয়াছে। কেন ইহারা ফ্রাঙ্কোর বিজয়লাভ কামনা করিয়াছে তাহা আগে অনেকবার বলিয়াছি। কোন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বদলে ধনিক রাষ্ট্রের সূচনা হইলেই বৃটিশ ধনিকদের প্রভাব স্পেনে অব্যাহত থাকিবে, এই তাহাদের আশা ছিল। ফ্রাঙ্কো ইটালী

ও জার্ম্মানীর সাহায্যে জয়লাভ করুক, সে ত ভাল কথা। তাহাদের গাঁটের কড়িতে হাত পড়িবে না। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ফ্রাঙ্কোকে তাহাদেরই শরণাপন্ন হইতে হইবে। বৃটেন ও ফ্রান্সের ধনিক ও শাসক সম্প্রদায় একই সম্প্রদায়ভুক্ত, আবার তাহারা ঘোর সাম্রাজ্যবাদীও। বিধ্বস্ত স্পেনকে পুনর্গঠিত করিতে হইলে বিস্তর অর্থের প্রয়োজন হইবে, তাহার জন্য ধর্ণা দিতে হইবে ইংরেজ ও ফরাসীর দুয়ারে। ইংরেজ ও ফরাসীরা এখন দেখিতেছে, বসিয়া থাকিলে আর ত চলে না। এখন থেকেই ফ্রাঙ্কোর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করা দরকার। এই কারণেই তাহাদের এত আনাগোনা।

এখন ফ্রাঙ্কোর অবস্থা কি? সামান্য কিছু ছাড়া প্রায় সমগ্র স্পেনের উপরই তাহার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত। ইটালী ও জার্ম্মানীর ধন, জন, অস্ত্র, বিমানপোতের সাহায্যেই সে ইহা করিতে পারিয়াছে। কাজেই ফ্রাঙ্কোর প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে স্পেনে এই দুইটি রাষ্ট্রেরও যে প্রাধান্য স্থাপিত হইবে তাহা ত জানা কথা। মাঝে মাঝে সংবাদ আসিত, আজকালও আসিতেছে যে, ইটালীয়ান সেনানায়কদের সঙ্গে ফ্রাঙ্কোর কম্যাণ্ডারদের খিটিমিটি লাগিয়াই আছে। ইহার কারণস্বরূপ বলা হইয়াছে, স্পেনিয়ার্ডরা খুবই স্বাধীনতাপ্রিয়, পরের কথা তাহারা মানিয়া চলিতে পারে না। অথচ আজ তিন বৎসর যাবৎ কিন্তু এই সব বিদেশীর আদেশ ইহারা মানিয়া চলিয়াছে। স্বার্থ-সংশ্লিষ্টদের প্রচারকার্য্য কি ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে? যত কথাই বল না কেন, বৃটিশ ও ফরাসী সরকার কিন্তু সোয়াস্তি পাইতেছে না।

বার্সিলোনার পর পতন হইল মাইনর্কা দ্বীপের। ইহার পরই লণ্ডন ও প্যারিসে সরকারপক্ষে বিশেষ আলোচনা সুরু হইয়াছে। তাহারা ফ্রাঙ্কোকে স্পেনের সর্ব্বময় কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিতে চাহিতেছে। তবে ইহাতে যে সামান্য বাধা আছে তাহাই যেন সব বানচাল করিয়া দিবে, উহারা এখন এইরূপ মনোভাব প্রকাশ করিতেছে। প্যারিসে মন্ত্রিসভার অধিবেশন হইয়াছে, লণ্ডনেও হইয়াছে। সর্ব্বত্রই এক কথা। ফ্রাঙ্কোকে মানিয়া লইতে বাধা কি? এখানে বিশ্বমানবতার দোহাই আসিয়া পড়িয়াছে। আবার এতকাল মুখে হইলেও যে গণতন্ত্রের দোহাই ইহারা দিয়া আসিয়াছে, আজ তাহার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কার্য্য করিতে নাকি বাধ-বাধ ঠেকিতেছে! কিন্তু এ-সব মনে হয় বাজে কথা। আসল কথা, ফ্রাঙ্কোকে মানিয়া লইলে তাহাদের কতখানি স্বার্থসিদ্ধি হইতে পারিবে তৌল-দণ্ডে তাহাই পরখ করিয়া দেখিতেছে।

বৃটেন ও ফ্রান্স উভয়েরই সাম্রাজ্যরক্ষার জন্য কতকগুলি ঘাঁটি আগলান প্রয়োজন। স্পেনে, ভূমধ্যসাগরে, সুয়েজ খালে, লোহিত সাগরে এইরূপ নানাস্থানে এইরূপ ঘাঁটি আছে। ইটালী ভূমধ্যসাগরে প্রাধান্য লাভ করায় আর আবিসিনিয়া অধিকার করায় সাম্রাজ্য পথে ভীষণ বিঘ্ন উপস্থিত। বৃটেন ইটালীর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া এই বিঘ্ন দূর করিতে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু ইটালীর তাঁবে স্পেন আসিলে এই বন্ধুত্ব নাকচ করিতে তাহার মোটেই আটকাইবে না। আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে স্বার্থই পরস্পরের একমাত্র বন্ধন। ইটালী যখন দেখিবে বৃটেনের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখা স্বার্থের দিক হইতে নিরর্থক ও বিঘ্ন উৎপাদক, তখন সে ইহা বাতিল করিতে পশ্চাৎপদ হইবে না। এইজন্য সাক্ষাৎভাবে স্পেনকে নিরপেক্ষ রাখা আর তলে তলে নিজের তাঁবে আনা তাহার একান্তই স্বার্থ। স্পেনকে নিজের তাঁবে রাখার আর একটি প্রধান উদ্দেশ্য আছে। এখানে প্রাধান্যলাভ করিলে অতলান্তিক মহাসাগরে পাড়া সম্ভব হইবে। তাই নিজেকে নিরাপদ করিতে হইলেও বৃটেনকে স্পেনে নিজ প্রাধান্য বাহাল রাখা দরকার, স্পেনের নিরপেক্ষ থাকাই তাহার স্বার্থের পক্ষে যথেষ্ট নয়। বৃটেন-বিরোধী কোন রাষ্ট্র স্পেনে প্রাধান্যলাভ করে ইহা তাহার কাম্য হইতেই পারে না। কাজেই সাম্রাজ্যরক্ষা এবং স্বদেশ-রক্ষা উভয়ের জন্যই স্পেনে বৃটেনের স্বার্থ রহিয়াছে। ইটালী যদি সেখানে প্রাধান্যলাভ করে তাহা হইলে বৃটেনের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হইলে সাম্রাজ্যবাদই বিপন্ন হইবে না, খাস বৃটেনও তাহার লক্ষ্যীভূত হইতে পারিবে। ইংগ-ইটালী চুক্তির সময় ইটালী অবশ্য বার বার ইংরেজকে এই আশ্বাস দিয়াছে যে, স্পেনে ইটালীর কোন বিশেষ স্বার্থ নাই। অর্থাৎ সে এমন কিছু সেখানে চাহিবে না যাহা দ্বারা বৃটিশ স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। কিন্তু তাহার কথা বিশ্বাস করা ভার। সে যে সেখানে এত অর্থ ঢালিয়াছে, এত ধন জন দিয়া তাহাকে সাহায্য করিয়াছে সবই কি নিষ্কাম ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া সে করিয়াছে? আন্তর্জ্জাতিক পরিভাষায় নিষ্কাম ধর্ম্ম বলিয়া কিছুই নাই।

জার্ম্মানীও ফ্রাঙ্কোকে বিস্তর সাহায্য করিয়াছে। স্পেনে ফ্রাঙ্কোর আধিপত্য স্থাপিত হইলে জার্ম্মানীর স্বার্থ কিরূপে গড়িবে বা সংরক্ষিত হইবে? বৃটেন ও জার্ম্মানীতে ইদানীং কোন বিরোধ নাই, বরং বৃটেন মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপে জার্ম্মানীকে বড় করিয়াই দিয়াছে। কিন্তু জার্ম্মানীর উদ্দেশ্য ইহাতেই নিবদ্ধ নয়। সে বিদেশে উপনিবেশ দাবী করিতেছে। বৃটেন তাহার হৃত উপনিবেশগুলির অধিকাংশেরই মালিক। সে যে সহজে ও সহসা এ-সব ছাড়িবে তাহার কোনই লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে না। জার্ম্মানী বোধ হয়, এই সব বিবেচনা করিয়াই ইটালীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়া স্পেনে তাহার সহযোগে বিদ্রোহীপক্ষে লড়াই করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে। স্পেনে যদি ইটালীর প্রাধান্য হয় তাহা হইলে জার্ম্মানীর যে সুবিধা হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। ইংরেজের সাম্রাজ্য ও স্বদেশ রক্ষার্থ ইটালীর সঙ্গে বোঝাপড়া করিতেই হইবে। এই বোঝাপড়ার একটা প্রধান সর্ত্ত হইবে জার্ম্মানীকে তাহার হৃত উপনিবেশ দান।

স্পেনে ফ্রাঙ্কোর জয়লাভ সম্ভাবনায় তাই বৃটেনে যে চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে তাহা মোটেই অমূলক নয়। ফ্রান্সের চাঞ্চল্যের সঙ্গে কিন্তু ইহার তুলনাই হয় না। প্রথমে বার্সিলোনা ও পরে মাইনর্কার পতনের পর ফরাসী মন্ত্রিসভা ফ্রাঙ্কোকেই স্পেনের সর্ব্বময় প্রভু বলিয়া স্বীকার করিবে কি-না আলোচনা সুরু করে। এ আলোচনার এখনও শেষ হয় নাই। কাজেই কোন সিদ্ধান্তই এখন পর্য্যন্ত হইতে পারে নাই। তবে কোন কোন প্রতিপত্তিশালী পত্রিকা এই মত প্রকাশ করিয়াছে যে, সময় থাকিতে ফ্রান্সের পক্ষে ফ্রাঙ্কোকে স্বীকার করিয়া লওয়া

(শেষাংশ ১৮৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মহাজাগরণ

নিশীথ রাতের স্তব্ধ আকাশকে অকস্মাৎ জল-কল্লোলে মুখরিত ক'রে যেমন আসে সর্ব্বগ্রাসিনী বন্যা—ঠিক তেমনি ক'রেই অসংখ্য মানুষের বুকের শোণিতে বাঁধন-ভাঙার উন্মাদনা জাগিয়ে সহসা দেখা দেয় গণ-জাগরণের বসন্ত। জোর ক'রে যেমন ফুল ফোটানো যায় না—তার সময় হ'লে আপনা থেকেই সে ফুটে ওঠে—জোর ক'রে তেমনি জনসাধারণকেও জাগানো যায় না। জাগার যখন সময় হয় তখন আকাশ-বিদারী হুঙ্কার দিয়ে গণসিংহ আপনি জাগে। বিপ্লব আসে নিঃশব্দে। কাউকে কিছু না জানিয়ে আপনার আকস্মিক আবির্ভাবের দ্বারা সবাইকে চমকে দেওয়াই তার স্বভাব।

দেশীয় রাজ্যগুলিতে শৃঙ্খলিত জনসাধারণ আপনাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে আদায় ক'রে নেবার জন্য এত শীঘ্র কোমর বেঁধে দাঁড়াবে—এ কথা দুদিন আগেও জানতো না কেউ। সহসা ভারতবর্ষকে সচকিত ক'রে আকাশকে কাঁপিয়ে তুললো ক্ষুব্ধ ফেনিল জন-সমুদ্রের কর্ণবিদারী কলগর্জ্জন। দেশীয় নৃপতিদের রাজ্যে রাজ্যে সুরু হোলো সহস্র সহস্র মানুষের দুর্ব্বার অভিযান। লক্ষ হৃদয়ের পাতালপুরীতে ঘুমন্ত ছিলো যে বাসুকীনাগ—সহসা তার ফণা উঠলো দুলে। রাজনৈতিক জগতে আরম্ভ হ'য়ে গেল ভূমিকম্প। সেই ভূমিকম্পের দোলা লেগে আজ টলমল করছে কাশ্মীর আর হায়দ্রাবাদ, রাজকোট আর জয়পুর, ঢেনকানল আর তালচের। দেশীয় রাষ্ট্রগুলিতে এই মহাজাগরণের প্রতীক্ষায় দিন গুনছিল কংগ্রেস এবং কংগ্রেসের জননায়কগণ। কংগ্রেস বহু পূর্ব্ব থেকেই জানতো দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের দুর্ব্বহ জীবন-যাত্রার কথা। কিন্তু প্রজারা নিজেরা যেখানে শিকল-ভাঙার জন্য তৈরী নয় সেখানে জোর ক'রে তাদের ঘুম ভাঙানোর জন্য কংগ্রেস যদি দেশীয় রাষ্ট্রে জন-জাগরণের কাজে হস্তক্ষেপ করতো তবে হিতে হোতো বিপরীত। বিপ্লব ঘটানোর উন্মাদনায় যারা বাস্তবের সঙ্গে যোগ হারিয়ে ফেলে তাদের অবিমৃষ্যকারিতা নূতনের আবির্ভাবের প্রভাতকে সুদূরে পিছিয়ে দেয়। দেশীয় রাজ্যের অধিবাসীদের প্রতি বৃটিশ ভারতের অধিবাসীদের কোনো কর্ত্তব্য নেই—তারা এবং আমরা স্বতন্ত্র এবং চিরকাল স্বতন্ত্রই থাকবো—এমন মনোভাবকে কংগ্রেস কোনদিনই পোষণ করে নি। যে স্বাধীনতার জন্য আমরা দীর্ঘকাল ধ'রে লড়াই ক'রে আসছি—তার একটা রূপ হচ্ছে একতাসূত্রে আবদ্ধ অখণ্ড ভারতবর্ষ। দেশীয় রাজ্যের প্রজারা যতদিন শৃঙ্খলিত থাকবে ততদিন অখণ্ড মুক্ত ভারতবর্ষের জন্ম অসম্ভব। কংগ্রেস যে এতদিন দেশীয় রাজ্যগুলিতে জনগণকে মুক্ত করবার কাজে ব্রতী হয় নি—সে কোনো রাজামহারাজের ইচ্ছাকে মেনে নেবার জন্য নয়। সেখানকার জনগণ আত্মশক্তিতে এতদিন নির্ভরশীল ছিলো না বলেই কংগ্রেস দেশীয়রাজ্যে মুক্তি-সংগ্রামকে ডেকে আনতে সাহসী হয়নি। জনসাধারণ যেখানে স্বাধীনতার জন্য উপযুক্ত মূল্য দিতে প্রস্তুত নয় সেখানে জোর ক'রে তাদের মুক্তি-সংগ্রামের মধ্যে ঠেলে দেবার কোনো মানে হয় না। দেশীয় রাজ্যগুলি সব স্বাধীন—খোদ ইংলণ্ডেশ্বরের সঙ্গে তারা যে সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ আছে সেই সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে তাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা বে-আইনী—এই রকমের অনেক কথা আজকাল শুনতে পাওয়া যায়। জওহরলাল লুধিয়ানার সম্মেলনে পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন,

> We recognize no such treaties and we shall in no event accept them. The only final authority and paramount power that we recognise is the will of the people, and the only thing that counts ultimately is the good of the people.
>
> আমরা এই রকমের কোনো সন্ধিকেই স্বীকার করিনে এবং কোনো ক্ষেত্রেই এই সব সন্ধিপত্রকে গ্রহণ করব না। আমরা যে শক্তিকে এবং কর্ত্তৃত্বকে চরম ও পরম ব'লে স্বীকার করি তা হ'চ্ছে জনগণের ইচ্ছা। তাদের কল্যাণের কষ্টিপাথরে আমরা সব-কিছুর যাচাই করবো।

যেহেতু কবে কোন্ মান্ধাতার আমলে ইংরেজ আর এদেশের রাজামহারাজার দল একত্র মিলিত হ'য়ে কতকগুলি সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করেছিলো—সেই হেতু আবহমানকাল ধ'রে সেগুলিকে ফুলবিল্বপত্র দিয়ে পূজো করতে হবে—এর পিছনে কি কোন যুক্তি আছে? ন্যায় আছে? এই সব সন্ধিপত্র যখন স্বাক্ষরিত হ'য়েছিলো তখন কি জনসাধারণের মতামতকে গণনার মধ্যে আনা হয়েছিলো? সন্ধিপত্রের আকাশস্পর্শী গরিমার দ্বারা অভিভূত হ'য়ে জনসাধারণ চিরকাল ধ'রে শৃঙ্খলে বাঁধা থাকতে রাজী হবে—এমন একটা উদ্ভট ধারণাকে মনের মধ্যে পোষণ করবার যুগ আর নেই। জগত ত চুপ ক'রে একটা জায়গায় বসে নেই। দুরন্ত ছেলেরা রাস্তার উপর দিয়ে লোহার চাকা যেমন চালিয়ে নিয়ে যায় তেমনি ক'রে কোন্ অদৃশ্য ক্ষ্যাপা যেন জগতটাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে মহাকালের স্কন্ধের উপর দিয়ে। সবই অস্থির, সবই চঞ্চল। গর্ব্বিত মস্তক থেকে কত রাজমুকুট ধূলোয় লুটিয়ে পড়ছে—রক্ত সাগরের মধ্যে কত সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্য ডুবে যাচ্ছে। কত কাইজার আর আমানুল্লা সিংহাসন এবং রাজদণ্ড হারিয়ে বিদেশে যাপন করছে সাধারণ নাগরিকের অখ্যাত জীবন। পৃথিবীর মানচিত্রে ক্ষণে ক্ষণে ঘটছে কত যুগান্তকারী পরিবর্ত্তন। কত জাতির শৃঙ্খল খ'সে পড়ছে—কত জাতি স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলছে। এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে ইংরেজ যদি মনে ক'রে থাকে দেশীয় রাজ্যের রাজারা চিরকাল ধ'রে তাদের হাতের ক্রীড়া-পুত্তলি হ'য়ে থাকবে এবং দেশীয় রাজ্যের প্রজারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে মুখ বুজে শৃঙ্খলভার বহন ক'রে চলবে—তবে বুঝতে হবে তার বুদ্ধির ধার একেবারেই ভোঁতা হ'য়ে গেছে।

আইনের দোহাই দিয়ে যা অন্যায় তার শাসনকে চিরন্তন ক'রে রাখবার চেষ্টা চিরকাল ধ'রে চলে আসছে। দেশীয় রাজ্যগুলির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আমরা কোন হস্তক্ষেপ করতে পারব না—এরকম আইন তৈরী করবার সময় কি ভারতবর্ষের জনসাধারণের সঙ্গে কর্ত্তৃপক্ষেরা কোন পরামর্শ করেছিলেন? যে আইন তৈরী হয়নি জনসাধারণের প্রতিনিধিগণের সঙ্গে পরামর্শক্রমে—সেই আইনকে মান্য করবার কোন নৈতিক দায়িত্ব থাকতে পারে না জনসাধারণের। দেশীয় রাজ্যের যারা অধিবাসী তারা ভারতবাসী। ভারতবাসী [illegible] কাশ্মীরে আর [illegible]

হাদরাবাদে, রাজকোটে আর জয়পুরে ন্যায্য অধিকার দাবী করার জন্য নির্য্যাতিত হবে এবং ভারতবাসী হ'য়ে আমরা ভারতবাসীর এই জীবনমরণের সংগ্রামে কোন সাহায্য করতে পারব না—যেহেতু সেটা বে-আইনী—এমন একটা বিধিকে আমরা ন্যায়সংগত ব'লে একেবারেই মনে করিনে। কোন্ আইন শুভ এবং কোন্ আইন অশুভ—কোন্ শাসনতন্ত্র কল্যাণপ্রদ এবং কোন্ শাসনতন্ত্র ক্ষতিকর—সে বিচার করবার অধিকার রয়েছে কার? নিশ্চয়ই প্রত্যেকটি নাগরিকের। রাষ্ট্রের যে সব বিধান—তাদের ফলাফল ভোগ করে তারাই যারা দেশের নাগরিক। সুতরাং কোন আইন ভাল কি মন্দ সে সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশের অধিকার আছে কেবল নাগরিকেরই। তারা আইনকে বৈধ করে তাকে স্বীকার ক'রে নিয়ে আর এই স্বীকার করার পিছনে থাকে তাদের ইচ্ছার পরিতৃপ্তি। লাস্কি তাঁর Studies in Law and Politics নামক পুস্তকে লিখেছেন, —

> A good law, therefore, is a law which has, as its result, the maximum possible satisfaction of desire; and no law save a good law is, except in a formal sense, entitled to obedience as such

সেই বিধান হ'ল শুভ যার পরিণতি হচ্ছে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তিতে। যে আইন শুভ —সে আইন ব্যতীত অন্য কোন আইনের অধিকার নেই মানুষের শ্রদ্ধার উপরে।

দেশীয় রাজ্যগুলি বিদেশী রাজ্যের সামিল—সুতরাং সেগুলির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আমাদের হস্তক্ষেপ করবার কোন অধিকার নেই—এই রকম কৃত্রিম আইনকে আমরা কিছুতেই মানতে পারিনে। মানলে ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলন পঙ্গু হ'য়ে যাবে। আমাদেরই যারা পরমাত্মীয়, আমাদেরই যারা স্বদেশবাসী তারা স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ লড়বে এবং আমরা তাদের সাহায্য না ক'রে সাংখ্যের উদাসীন পুরুষের মত সেই লড়াইকে কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব—এ হবে ভীরুতার চরম। ভারতবর্ষের যে কোন স্থানে জাগ্রত মানুষ স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে, সে লড়াইকে মনে করতে হবে সমস্ত ভারতবর্ষেরই স্বাধীনতার লড়াই। হায়দ্রাবাদের আর কাশ্মীরের, রাজকোটের আর তালচেরের মানুষ যারা—তাদের সঙ্গে জাতি হিসাবে আমাদের পার্থক্য কোথায়? ত্রিবাঙ্কুর আর ঢেনকানল কি ভারতবর্ষ ছাড়া? কংগ্রেস থেকে Non-intervention-এর প্রস্তাব উঠেছিল ব'লেই দেশীয় রাজ্যে স্বাধীনতা-আন্দোলনে আমাদের যোগ দেওয়া না-দেওয়ার প্রশ্ন উঠেছে। নইলে এমন একটা প্রশ্ন ওঠার আদৌ কোন মানে হয় না। গান্ধী যখন কংগ্রেস দেশীয় রাজ্যে মুক্তি-আন্দোলনে যোগ দিতে বারণ করেছিলেন, তখন তাঁর মনে আইন অথবা বে-আইনের কোন প্রশ্নই জাগেনি। আজও তাঁর মনে তেমন কোন প্রশ্নের অণুমাত্র ঠাঁই নেই। তিনি কেন কংগ্রেসকে দেশীয় রাজ্যে হস্তক্ষেপ না করবার নীতি অবলম্বন করতে উপদেশ দিয়েছিলেন—তার কথা গত ২৮শে জানুয়ারী 'হরিজনে' লিখেছেন,—

> I was wandering about in the States and I knew as a matter of fact that the people of the States were not ready.

যে মুহূর্তে শৃঙ্খলিত জনগণের চিত্তে বাঁধন-ছেঁড়ার উন্মাদনা জাগল সেই মুহূর্তে গান্ধী এসে এই মহাজাগরণকে সাদরে বরণ ক'রে নিলেন। নিমেষের মধ্যে তিনি গিয়ে স্থান নিলেন নবজাগ্রত জনগণের পুরোভাগে। যমুনালাল বাজাজকে পাঠালেন জয়পুরে স্বাধীনতার জন্য কারাবরণ করতে—আপনার সহধর্ম্মিণীকে পাঠালেন রাজকোটে শৃঙ্খলকে বরণ ক'রে নিতে। দিগন্ত ব্যেপে সুরু হয়েছে স্বাধীনতার জয়যাত্রা। এই জয়যাত্রার নবপ্রভাতে দেশীয় রাজ্যগুলিতে সুরু হয়েছে যে স্বাধীনতার সংগ্রাম এই সংগ্রামে আমাদের যোগ দেওয়া আইনসংগত হবে কিনা—এ-সব প্রশ্ন এখন তুচ্ছ। স্বাধীনতার অভিযানে ভাই ভায়ের পাশে গিয়ে তার স্থানটি অধিকার ক'রে দাঁড়াবে—এখানে আবার ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন কি? গান্ধী লিখলেন,—

> Constitutionalism, legality and such other things are good enough within their respective spheres, but they become a drag upon human progress immediately the human mind has broken these artificial bonds and flies higher.

গান্ধীজীর কাছে মানুষের আত্মপ্রকাশের মূল্যই সবচেয়ে বেশী। বিধি-নিষেধের ততক্ষণই দাম আছে যতক্ষণ তারা এই আত্মপ্রকাশের পথকে প্রশস্ত করে। যে মুহূর্তে মানুষের প্রাণ বিধি-নিষেধের বাঁধন ভেঙে উচ্চতর রাজ্যে বিচরণ করবার অধিকারী হয় সেই মুহূর্তে নিয়ম-কানুন মানুষের উন্নতির পথে অন্তরায়ের সৃষ্টি করে। ভারতবর্ষের নবজাগ্রত প্রাণ আজ সমস্ত অন্যায়কে চূর্ণ ক'রে মুক্ত হবার জন্য অধীর হ'য়ে উঠেছে। প্রাণ যেখানে জেগে উঠেছে সেখানে নিয়ম-কানুনের মূল্য কানাকড়িও নয়। তাই ত গান্ধী মানুষের গড়া সমস্ত কৃত্রিম নিয়ম-কানুনকে তুচ্ছ ক'রে কংগ্রেসকে ডাক দিয়েছেন দেশীয় রাষ্ট্রের মুক্তি-পাগল জনসাধারণের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াতে।

আসলে এই লড়াই তো দেশীয় রাজ্যের রাজাদের আর সেখানকার স্বাধীনতাকামী জনসাধারণের মধ্যে নয়। দেশীয় রাজ্যের রাজারা তো বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের হাতের অসহায় ক্রীড়নক। রাজকোটের শাসনকর্ত্তা তো প্রজাদের সঙ্গে মিতালি করতে প্রস্তুতই ছিলেন—পারলেন না সিংহাসনচ্যুত হবার ভয়ে। দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের বাঁধন-ছেঁড়ার অভিযানের সম্মুখে দাঁড়িয়েছে কংগ্রেস। এই যে লড়াই সুরু হ'য়েছে—এ লড়াই সাম্রাজ্যবাদী বৃটেনের সঙ্গে স্বাধীনতাকামী ভারতবর্ষের লড়াই। এই সংগ্রাম ততদিন থামতে পারে না যতদিন ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ছায়াটুকু পর্য্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে। এ লড়াই যেখানে গিয়ে শেষ হবে সেখানে সাম্রাজ্যবাদের অবসান এবং অখণ্ড মুক্ত ভারতের সৃষ্টি।

কনে দেখা

(গল্প—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীমতী আশারাণী মুখোপাধ্যায়

তৃতীয় সম্বন্ধ এল বউবাজার থেকে। পাত্রীপক্ষ থাকেন দেশে, কন্যার বিবাহ দেবার অভিপ্রায়ে সম্প্রতি কলকাতায় বাসা-ভাড়া করে আছেন। যেহেতু কলকাতা সর্ব্ববিষয়ে ব্যাপকস্থান, পাত্রের সন্ধান অন্যত্র চেয়ে এ স্থানে মিলবার সম্ভাবনা বিলক্ষণ।

অলকা বললেন, 'পাড়াগাঁয়ে যখন থাকে তখন নিশ্চয় সাজগোজের বিষয় অতশত জানে না। কাজেই মেয়েটির আসল চেহারাই দেখতে পাবে। দেখতে যদি ভাল হয়, হোকগে পাড়াগেঁয়ে, দু'দিন শহরে থাকলেই ঠিক হয়ে যাবে।' আবার যথাযোগ্য বেশ-বিন্যাস করে অতুলকৃষ্ণ দুর্গানাম স্মরণ করে বেরুলেন।

একটি বাড়ীর দোতলায় সাড়ে তিনখানা ঘর নিয়ে পাত্রীপক্ষ অধিষ্ঠান করছেন, অতুলকৃষ্ণ সাদরে অভ্যর্থিত হলেন।

তক্তপোষের ওপর বিস্তৃত চাদর বিছান, একটি বড় তাকিয়া। বসবার পর চাকর তামাক নিয়ে এল গড়গড়ায় করে। অতুলকৃষ্ণ জানালেন, তিনি ধূমপান বিরোধী। অনুমতি নিয়ে পাত্রীর পিতা মহা আনন্দের সঙ্গে গোটাকয়েক টান দিয়ে হাঁকলেন,—'ওরে দেখ্‌ দিদিমণির হ'ল কিনা।' একটু পরে চাকরটি ফিরে এসে জানালে, হয়েছে। ভদ্রলোক প্রস্থান করলেন এবং অনতিবিলম্বে কন্যাসহ আগমন করলেন। মেয়েটি তক্তপোষের একধারে বসল। পরণে ঘোর খয়ের রঙের ঢাকাই শাড়ী, হাতে গোছাভর্ত্তি কার্নিস চুড়ি, বালা, তাগা, গলায় দু'তিন ছড়া হার, সর্ব্বোপরি বিস্ময়ের বিষয় নাকে নোলক। অতুলকৃষ্ণ জানতেন না যে, মেয়েটি কলকাতায় এসে পর্যান্ত চারিধারে নোলকের কোন চিহ্ন না দেখতে পেয়ে একদিন নিজের নোলকটি খুলে ফেলেছিল এবং আজও পরবার সময় অত্যন্ত আপত্তি জানিয়েছিল, কিন্তু নোলক পরার দরুন মুখখানি নাকি বেশ ঢলঢলে দেখায় এবং পছন্দ হওয়ার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করে (বিশেষ যখন বরের বুড়ো বাপ দেখতে এসেছে) বলে অভিভাবিকারা জোর করে পরিয়েছেন এবং সেইজন্য মেয়েটির মুখটিও ভার ভার। কানের ওপরের একাংশ ঢেকে সিঁথির দুপাশ দিয়ে পাতা নেমে এসেছে প্রায় ভুরুর কাছে, কপালে একটি সিঁদুরের টিপ, মুখখানি ফরসা হলেও কানের পিঠে গলায় ঘাড়ে তেল চকচক করছে সুস্পষ্ট। গ্রাম্য মেয়েটিকে যতদূর সম্ভব শহুরে করতে চেষ্টা করা হয়েছে, রং ফরসার দিকেই, মুখশ্রী ভাল কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে আড়ষ্ট এবং গ্রাম্যতা-কুণ্ঠিত থাকাতে অতুলকৃষ্ণের মন বিরূপ হয়ে উঠল, কিন্তু অচলার কথাটা মনে পড়ল, 'দেখতে যদি ভাল হয়, হোকগে পাড়াগেঁয়ে, ও আমি দু'দিনে ঠিক করে নেব।'

'নামটি কি?' অতুলকৃষ্ণ প্রশ্ন করলেন।

'শ্রীমতী অমিয়বালা দাসী'।

'লেখাপড়া জান?' অতুলকৃষ্ণের ধারণা, এ মেয়ে নিতান্ত মূর্খ, তবু একবার নিশ্চয় করে জানবার জন্যেই এই প্রশ্ন। মেয়ের হয়ে বাপই উত্তর দিলেন—'বাঙলা মোটামুটি জানে। আমি মশাই বেশী লেখাপড়া শেখাবার পক্ষপাতী নই। বিয়ের পর ত আর লেখাপড়ার চর্চ্চা করবার সময় থাকবে না, সারাজীবন সেই ছেলে মানুষ আর রান্না-বান্না করা, এ হ'ল গিয়ে মেয়েদের আসল কাজ। কি হবে লেখাপড়া শিখে! যখন সংসারের সকল লোকের ভার নিজের কাঁধে তুলে নিতে হবে, তখন লেখাপড়া কি কোন কাজে আসবে বলতে পারেন মশাই? যা কাজে আসবে তাই শিখিয়েছি ভাল করে, রান্না-বান্নায় খুব ভাল, একলাই এক'শ লোকের রান্না করতে পারে। গৃহস্থালীর কাজে যে দিকে দেবেন, চরকীর মত ঘুরবে।'

ভদ্রলোক দম্‌ নিলেন, আর সেই অবকাশে অতুলকৃষ্ণের মানসচক্ষে হঠাৎ ভেসে উঠল তাঁর ছোটখাট ছবির মত বাড়ীতে চারিদিকে ছেলেপিলের চেঁচামেচি মারামারি ইত্যাদি। এবং তারই মাঝখানে এই মেয়েটিও কোমরে কাপড় জড়িয়ে সমান-তালে চেঁচাচ্ছে আর ছেলেমেয়েদের মুণ্ডপাতের প্রার্থনা করছে।

ভদ্রলোকের দম্‌ নেওয়া শেষ হয়েছিল, পুনরায় আরম্ভ করলেন, 'আজকালকার মেয়েরা শুধু লেখাপড়া শিখে কতকগুলো ছাই পাঁশ নভেল পড়া আর ফ্যাসান করা ছাড়া আর কিছু জানে বলতে পারেন? সংসারের কাজ তাদের দ্বারা কিছুটি হবে না মশাই, এই বলে দিলুম। আমার মেয়ে কিন্তু সেদিকে খুব, আপনার এখন যা দরকার অর্থাৎ সেবা, তা আমার মেয়ে নিখুঁতভাবে করবে এ আপনাকে জোর গলায় বলছি।' পাত্রীর পিতার নেহাৎ দুর্ভাগ্য তিনি জানতেন না যে অতুলকৃষ্ণ সেবার জন্যে ততটা আকুল নন যতটা আকুল তিনি তাঁর নিৰ্জ্জন কন্যাহীন গৃহে একটি কিশোরী মেয়ের পদার্পণ, তার বালিকাসুলভ চপলতা, মেয়ের মত আবদার করা ইত্যাদি বিষয়ে। ভদ্রলোক মনে করেছিলেন, বরের বাপ মেয়ে দেখতে এসেছেন, তিনি সংসারের আবশ্যকীয় গুণাবলীই চাইবেন, অল্পবয়স্ক ছেলেদের মত লেখাপড়া গান-বাজনায় ঝোঁক দেবেন না, তাই তিনি একটু নিশ্চিন্তও ছিলেন, কিন্তু অতুলকৃষ্ণ যখন প্রশ্ন করলেন, 'গান গাইতে জান' তখন তিনি আকাশ থেকে পড়লেন। এহেন বিস্ময়কর ব্যাপার তিনি ধারণা করতে পারেননি যে, বরের বাপও গানের খবর নেবে।

যদিচ অতুলকৃষ্ণের ধারণা ছিল এ মেয়ে গানের গ'ও জানে না, তবু কৌতূহলে এবং কতকটা অভ্যাসবশতও বটে, প্রশ্নটা বেরিয়ে গেল মুখ থেকে। ভদ্রলোক অতিশয় বিনয়ের সহিত বললেন, 'গান ত জানে না, ইচ্ছে করলে অবশ্য শেখাতে পারতাম, কিন্তু কি হবে বলুন শিখিয়ে। ঐ যা বললাম দেখলাম ত কত, যা একটু-আধটু গান বা লেখাপড়া ঐ বিয়ের সময়েই দরকার হয়, তারপর সেই সারাজীবন সংসার ঠেলা। কত বড়লোকের বাড়ীও ত দেখলাম—

আর কিছু বলবার পূর্ব্বেই, পুনর্ব্বার পূর্ব্ব কথার পুনরাবৃত্তি শোনার বিতৃষ্ণা বোধ হওয়ায় বাধা দিয়ে অতুলকৃষ্ণ বললেন, 'তা বটে, আচ্ছা, আজ তা'হলে উঠি।'

মেয়েকে চলে যেতে বলে ভদ্রলোক অতুলকৃষ্ণের সঙ্গে যেতে যেতে বলেলন, 'যদি দয়া করে নেন মশাই মেয়েটিকে, বড়ই উপকৃত হই' ইত্যাদি।

অতুলকৃষ্ণ বিনয়ের সঙ্গে 'আমার কি আপত্তি, তা দেখি গিন্নী কি বলেন'—ইত্যাদি বলতে বলতে রওনা হ'লেন। রাস্তায় আসতে আসতে ভাবলেন, মেয়েটি মন্দ নয়, গৃহিণীর কথাও স্মরণ হ'ল, কিন্তু অতুলকৃষ্ণের মনে হ'ল, এ মেয়ের পাড়াগেঁয়ে ভাব জন্মেও ঘুচবে না, তা'ছাড়া প্রধান আপত্তি গান জানে না, শিখিয়ে নেবারও উপায় নেই, মেয়ের বাপের কথামত বৌয়ের গান না শুনে হয়ত পৌত্রের কান্নাই শুনতে হবে বিয়ের পর; আসল কথা মনটা কিছুতেই বেশ সায় দিচ্ছে না। বাড়ী এসে গৃহিণীর সঙ্গে মেয়ের বিষয়ে আলোচনা হ'ল, কিন্তু মত উভয়েরই শেষে এক পর্য্যায়ে দাঁড়াল, 'এ মেয়ে চলবে না।'

৪

বালীগঞ্জ থেকে এল চতুর্থ সম্বন্ধ, মেয়েটির একটু বয়স হ'য়েছে, অবশ্য অতুলকৃষ্ণের মতে, নইলে আধুনিক মতে নেহাৎ বালিকাও বলতে পারা যায়। আঠার বছর বয়স, আই-এ পড়ছে। বাবা মা নেই, দুই ভাইবোনে দূর সম্পর্কের এক মামার বাড়ীতে থাকে, বাপ কিছু টাকা রেখে গেছেন, মেয়েটি দেখতে নাকি ভাল। বয়েসটার জন্যে অতুলকৃষ্ণ একটু খুঁতখুঁত করছিলেন, বিশেষ কলেজে পড়ছে, এমন মেয়ে হয় ত সন্ধ্যের সময়ে তাঁর কাছে ব'সে গান করার চেয়ে ছাতে বা বারান্দায় পায়চারী করতে করতে ইংরেজী কবিতা পড়াই বাঞ্ছনীয় মনে করবে। শেষে গৃহিণীর সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করলেন, আন্দাজে ঢিল মারা উচিত নয়; দেখেই আসা যাক্ না কেন।

যথাসময়ে রওনা হ'লেন বালীগঞ্জের উদ্দেশে। বাঙলা ধরণের ছোট একতলা শাদা বাড়ী, মেয়েটির ভাই হবে বোধ হয়, বেশ সুন্দর অল্পবয়স্ক একটি ছেলে তাঁকে নিয়ে গিয়ে বসালে। ঘরটি ফিটফাট পরিষ্কার, অল্পদামী সুশ্রী আসবাব দিয়ে সাজান। ছেলেটি তাঁকে বসিয়ে ভিতরে চলে গেল। একটু পরেই একটি মেয়েকে নিয়ে ঘরে ঢুকল। মেয়েটি তাঁকে নমস্কার করে একটি চেয়ারে বসল।

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে অতুলকৃষ্ণ খুশী হলেন। সেজেগুজে সুন্দরী হবার চেষ্টা কিছুমাত্র নেই, শাদাসিদে-ভাবে একটা রঙিন শাড়ী পরা, হাতে শুধু দু'গাছা চুড়ী, রংটা ফরসার দিকেই, বয়স হিসাবে ছোট দেখায়, রোগা পাতলা, অনেকটা অতুলকৃষ্ণের কল্পনায় গড়া মেয়ের সঙ্গে যেন মেলে। কেবল মুখের ভাবটা খুব সরল নয় বরং একটু যেন রুক্ষ্মভাব। অতুলকৃষ্ণ ভাবলেন, ওটা অতিরিক্ত পড়ার জন্যেই নিশ্চয়। যাই হোক, অতুলকৃষ্ণ নাম জিজ্ঞাসা করলেন, উত্তর হ'ল, 'কুমারী অণিমা বসু'। অতুলকৃষ্ণ আরও খুশী, নামের আগে কুমারী শব্দ যোগ করায়। আই-এ পড়ছে বটে কিন্তু ইংরেজী শব্দটার প্রতি ততটা মোহ নেই। মনে মনে বললেন, এ যে হতেই হবে; লেখাপড়া যদি যথার্থ মানসিক এবং বাহ্যিক উন্নতির জন্যেই প্রকৃত শেখা হয় তা হ'লে সে লেখাপড়া শেখায় বাইরের আদব কায়দার প্রতি তেমন ঝোঁক থাকে না।

'গান গাইতে জান?' 'জানি', মেয়েটি স্পষ্ট [illegible] উত্তর দিলে।' আগের দেখা তিনটি মেয়ের মত কোনখানে [illegible]জ্জা বা আড়ষ্টতার আভাষ নেই। অতুলকৃষ্ণ আবার [illegible] মনে বললেন, 'বাঃ এই ত চাই, লেখাপড়া শেখায় যে একটা গুণ আছে, সকলের কাছে নিজেকে সহজ করে তোলা, এ কথা কে অস্বীকার করবে?' মেয়েটি শুধু জানি বললে, কিন্তু ছেলেটি একেবারে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠে বললে, 'গান ও খুব ভাল জানে, কীর্ত্তন যা গায় চমৎকার, শুনবেন কি?'

কীর্ত্তনের নামে অতুলকৃষ্ণ তাড়াতাড়ি বলতে যাচ্ছিলেন নিশ্চয় শুনব, মনে মনে ভাবছেন, কি আশ্চর্য্য সবই যে প্রায় মিলে যাচ্ছে, কিন্তু তিনি কিছু বলবার পূর্ব্বেই মেয়েটি পূর্ব্বের মতই স্পষ্টস্বরে বললে, 'এখন আমি গান করতে পারব না দাদা, কাল থেকে সর্দ্দি করে আমার গলা ধরে আছে।'

ছেলেটি একটু অনুনয়ের সঙ্গে বললে, 'তা থাকগে, সকালেও গাইছিলি, গা-না একটা গান। হারমোনিয়ামটা আনতে বলব?'

মেয়েটি এবার বিরক্তস্বরে বললে, 'বলছি গাইতে পারব না, তবু জেদাজিদি করছ কেন বল ত? আসল কথা, আমি গানের এগ্‌জামিন দিতে পারব না।' কথা শেষ ক'রে সে উদাসীনভাবে অন্য দিকে তাকিয়ে রইল, আর অতুলকৃষ্ণ কিছুক্ষণ হতভম্বের মত চুপ করে বসে রইলেন। একজন অপরিচিত, বিশেষ করে যিনি ভবিষ্যতে শ্বশুর হতে পারেন, এমন লোকের কাছে গান গাইতে লজ্জা হ'তে পারে সে কারণে লাজুকভাবে অসম্মতি জানালে না, স্পষ্ট মুখের ওপর বলে দিলে, গানের এগ্‌জামিন দিতে পারব না। এ অপমান ছাড়া আর কি। বয়সের একটা সম্মান মেয়েটা রাখলে না, কেন গলা ধরার অজুহাত ত বেশ দিয়েছিলি বাপু। তবু অতুল-কৃষ্ণ আবার মনে মনে ভাবতে চেষ্টা করলেন, 'ছেলেমানুষ, তায় লেখাপড়া শিখেছে, কলেজে পড়া শিক্ষার ফলে স্পষ্ট কথা বলবার উগ্র ঝোঁকটা সামলাতে পারেনি।' আসল কথা মেয়েটিকে অতুলকৃষ্ণের তখনও পর্য্যন্ত ভালই লাগছিল।

আর কোন প্রশ্ন না করে যদি অতুলকৃষ্ণ উঠতেন, তাহলে এই মেয়ের সঙ্গেই তাঁর ছেলের বিয়ে দিয়ে গল্পেরও পূর্ণ-চ্ছেদ দেওয়া যেত, কিন্তু যে ঘটনা ঘটবেই তাকে আমরা রোধ করি কি করে? 'হঠাৎ' বলে যে শব্দটি আছে, সেটি অনেক কিছু ঘটায়, এবং হঠাৎ শব্দটি আছে বলেই লেখকদের গল্প, উপন্যাস লেখা চলে, কারণ যে কোন ঘটনা 'হঠাৎ'এর ঘাড়ে চাপিয়ে অনায়াসে চালান যায়, গল্প উপন্যাসের কলেবরও বৃদ্ধি পায়। এখানেও সেই হঠাৎ—অতুলকৃষ্ণ যে প্রশ্ন এ পর্যন্ত আর তিনটি মেয়েকে করেননি সেই প্রশ্নটি করে বসলেন, না করলেই অবশ্য ভাল ছিল, তবু মানে মানে যেতে পারতেন। তবে এক্ষেত্রে হঠাৎও বুঝি ঠিক বলা যায় না, আগের তিনটি মেয়ের সঙ্গে অতুলকৃষ্ণের কল্পনায় গড়া মেয়ের সঙ্গে কোন সাদৃশ্য না থাকায় তিনি তেমন উৎসাহ বোধ করেননি। কিন্তু এ মেয়েটিকে গোড়া থেকে ভাল লাগায়, বিশেষ করে 'কীর্ত্তন' কথাটার সঙ্গে মিলে যাওয়ায় (অবশ্য ইতিমধ্যে মেয়েটির স্পষ্ট কথা বলায় তিনি একটু

আমার পৃথিবী
(গল্প)

শ্রীজগদ্বন্ধু ভট্টাচার্য্য
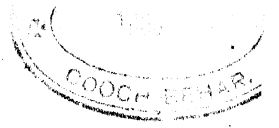
নিতান্ত গতানুগতিকভাবে বিনতার সহিত আমার প্রথম আলাপ। এক অভিজাত গৃহের চায়ের মজলিসে বসে প্রথম দিনই বিনতা বলে ফেল্‌ল—আপনার লেখা আমার ভাল লাগে।

এ কথা শুনে আমি মোটেই বিস্মিত হই নাই। আমাদের ভাল লাগা আর না-লাগা নির্ভর করে অনেক কিছুর উপর। কোন বন্ধুর লেখা আমাদের ভাল লাগতেই হয়। কোন বিশেষ ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে লিখিত উচ্ছ্বাসও কবিতা না হয়ে যায় না। আসলে সকল কিছু ভাল লাগার সংগে স্বার্থের একটা নিবিড় যোগ আছে। তাই কাল ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে যদি জানি আমার লেখা পড়ে আমাদের গলির মুখের মুদী ও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, আমি মোটেই বিস্মিত হব না।

বিনতার সংগে আমার প্রথম আলাপ সত্যই গতানুগতিক রোমাঞ্চহীন।

একদিন তেমনই আমাদের চায়ের মজলিস বসেছে। এতদিন বিনতা ছিল শ্রোতা, সেদিন উঠে এল বক্তার পর্যায়ে। আলাপ সেদিন মধ্যযুগে রোমান সম্রাটদের অত্যাচার পার হয়ে এলিজাবেথিয়ান সাহিত্যে মৃদু আলোড়ন দিয়ে নেমে এসেছে বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষে।

—কত দেশ দেশান্তর ঘুরে আসা যায় দুদিনে, বললাম আমি।

—ঘুরেই আসা হল, হল না চেনা, হল না জানা—

কথা ক্রমে চলে গেল আর এক পথে, বিংশ শতাব্দীর নারী জাগরণের দিকে। আশা হ'ল, বিনতা নিশ্চয়ই এবার নারী-প্রগতি নিয়ে গবেষণাত্মক একটা কিছু বলে বসবে। কিন্তু বিনতা সে পথে গেল না। বল্‌ল, ঘুমের গৌরবই বা কম কি? তৃপ্তি আছে—।

বেশ লাগত বিনতার এ যুক্তিহীন আলাপ। তাতে ক্লান্তি আসে না বা উপসংহারে লাভ-লোকসানের হিসাব নিয়েও সে বসবে না, সত্যি এ বেশ।

বিনতার সংগে এমনই করে আলাপ হল আমার। নিতান্ত সাধারণ একটা লেখায় সে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল একদিন, আজ তাই আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট লেখাটিকে তার সামনে হাজির করতে গিয়ে আশা করেছিলাম বিনতা প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠবে। কিন্তু বিনতা সর্ব্বোৎকৃষ্ট লেখার সর্ব্বোৎকৃষ্ট কটি লাইন পড়ে মুখের একটা বিশেষ অর্থপূর্ণ ভংগী করে বল্‌লে, মামুলি—

সেদিন বাড়ী ফিরে আসার কালে বারবারই মনে হয়েছিল, ভীড়ের মাঝে একরঙা পোষাক পরে চলবার মত দীনতা বিনতার নাই। তাই দশজন যা বলে তার বিপরীত দিক থেকে তাকে কথা আরম্ভ করতে হয়—।

সেদিন আমাদের আলাপ চল্‌ল দেশ বিদেশ আবিষ্কারের বিচিত্র কাহিনী নিয়ে। আমি বল্‌লাম সাম্রাজ্যবাদ সভ্যতার পতাকা উড়িয়ে দিলে সাগর পারে।

স্বার্থপরতার মালাও দিলে উপহার।

বেশ লাগত বিনতার এ সমস্ত উক্তি, বিনতা ছাড়া আমাদের আসর জমত না

সেই বিনতা যেদিন আমার সংসারে প্রবেশ করল, বধূ বিনতাকে ডেকে নেবার কালে বান্ধবী বিনতাকে হারাব, সে ত স্বাভাবিক, কিন্তু তথাপি প্রস্তুত ছিলাম না। বাসর রাতে নব-জীবনের ভূমিকায় বল্‌লাম তা হলে এতদিনে তুমি আমার ঘরে এলে বিনতা

—তুমিও তাই এতদিনে আমার ঘর থেকে বেরিয়ে চল্‌লে, উত্তর দিল বিনতা।

—সম্পূর্ণ হ'ল প্রেম আমাদের, বল্‌লাম আমি।

—অসম্পূর্ণ হল এ বাসর—বিনতা বল্‌লে।

তার কথায় বিস্মিত হলাম। কিন্তু বিস্মিত হবার কিই বা ছিল? বান্ধবী বিনতা না চলে গেলে বধূ বিনতা আসে কোন পথে। তথাপি, বল্‌লাম—এতদিনে বাঁচলাম।

—মরলাম এতদিনে, বল্‌লে বিনতা।

(২)

তারপর বহু কটা ঋতু গেল, পাতা ঝরিয়ে, ফুল কুঁড়িয়ে, আকাশে আকাশে মহাকালের স্বাক্ষর এঁকে দিয়ে। বিনতার জন্মদিন সেটা।

—আজ না তোমার জন্মদিন বিনতা, জানতে চাইলাম।

—মৃত্যুর দিনও বলতে পার, বল্‌লে সে।

—জীবনের দেবতা তোমায় করবেন আশীর্ব্বাদ।

—মৃত্যুর দেবতা করবেন কৃপা।

—দীর্ঘজীবন পাবে তুমি—বল্‌লাম আমি—

—সাথে থাকবে দীর্ঘ মৃত্যু—। বল্‌লে সে।

বিনতার মুখের দিকে তাকিয়ে তার জন্মদিনের কথা আমি ভুলে গেলাম। দুবছর আগেকার বিনতাকে কি আমি একটিবারও খুঁজে পাব না? একদিন আমাদের আশা ছিল, এমনি করেই চিরদিন মিলনান্ত রজনীর দোরে অরুণোদয়ের আশায় বসে থাকব। কিন্তু সেদিন দেখলাম সব কিছু পেয়েও কি যেন পাওয়া হল না। কি যেন পেতে হবে আমাদের। না পেয়ে উপায় নাই। বসন্ত বাতাস বইল সাগরে উঠল তরঙ্গ, শুধু আকাশে উঠল না চাঁদ। বিনতা সেদিন মাত্র এ কথা জানল।

নবযৌবন আর্ত্তনাদ করে করে মরে গেল। তবু এল না একটি সন্তান, আমার পৃথিবী থেকে আর একটা পৃথিবী উঠল না ভেসে।

তবু দিন বয়ে চল্‌ল। আর এক জন্মদিনে বিনতা নিজেই বল্‌ল, ঠিক এমনই দিনে এসেছিলাম পৃথিবীতে—

হাঁ, এমনই দিনে পৃথিবীর সঙ্গে তোমার প্রথম পরিচয় হল—।

—প্রথম অপরিচয়টা এদিনে কেমন হতে পারে বল ত?

উত্তর দিতে হল না আমাকে। বিনতা আমার লিখবার টেবিলের পাশে বসে ধ্যানস্থ হয়ে গেল। জানালার মধ্য দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে সে বল্‌লে—দেখ'ত কেমন ফুট্‌ফুটে ছেলেটি—

—হাঁ, বেশ সুন্দর, অমলবাবুর ছেলে—

—সুপ্রীতির ছেলে—।

হার্ডির কল্পনামুখর রোমাঞ্চময় অধ্যায়টি আমার মন থেকে মুছে গেল। তিন বছর আগেকার বিনতাকে আমি আবার খুঁজে পেয়েছি। কোন কথা সহজে মেনে নেবে না বিনতা, প্রতি কথায় নূতন একটা কিছু বলা চাই তার। তাই যে মুহূর্ত্তে বন্ধুত্বের পরিচয়কে বড় করবার তাগাদায় আমি ঘোষণা করলাম, ছেলেটি অমলবাবুর, বিনতা অনায়াসে বলে ফেল্‌ল ছেলেটি সুপ্রীতির। সুপ্রীতি তার বান্ধবী কিনা, তাই। বিনতার দিকে ফিরে তাকিয়েছি, বিনতা নাই এ ঘরে। পাশের ঘরে গিয়ে দেখলাম সে স্থির হয়ে বসে আছে।

—চল বিনতা, বা'র থেকে ঘুরে আসি একটু।

সে আপত্তি করল না। এ পথ ও পথ ঘুরে নদীর ঘাটে দু'দণ্ড কাটিয়ে যখন গলিতে পা দিয়েছি, নিতান্ত অসাবধান-ভাবেই আমি বিকালের কথাটি তুলে ফেল্‌লাম: দেখলে বিনতা ছেলেগুলা বাঁদরাম করছিল কি রকম—।

—আমি যদি এদের মা হতাম, দিতাম ঠেঙিয়ে বাড়ীর বার করে—নচ্ছার সমস্ত ছেলেপিলে—

অন্ধকারে এ কথা বলবার কালে বিনতার মুখখানা আমি দেখি নাই। বল্‌লাম, কিন্তু শাসন করলেই কি ছেলেপিলে ভাল মানুষ হয়ে যাবে?

—শাসন না করলেই যে হয়ে যাবে এমন কথাই বা কে বল্‌লে?

(৩)

দিন দু'এক পর আমার উপন্যাসের একটা পাণ্ডুলিপি নিয়ে বসেছি। চাকর পুণ্য আমার পায়ের উপর এসে লুটিয়ে পড়ল। তার বিচ্ছিন্ন কথার কিছুটা রেখে কিছুটা বাদ দিয়ে এ কথাই বুঝে নিলাম, অন্দরের দিকে আমার উপস্থিতি সে মুহূর্ত্তেই প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। ভেতরে গিয়ে দেখ্‌লাম, বিনতা একটি নগ্নগাত্র ভিখারী মেয়েকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করছে। আর পেছনের দরজার পাশে অন্যান্য ভিখারীরা তাই আর্ত্তনাদ করছে। অসহায় মেয়েটি বারবার পুণ্যের দিকে ইঙ্গিত করে বল্‌ছে: ওই'ত আমায় দিয়েছে, নইলে কি আমি নিতে আসি? ওই'ত আমায় আধখানা রুটি, দুমুঠো ভাত রোজ দিয়ে আসে। বিনতা সেদিকে কর্ণপাতও করল না। দ্বিগুণ জোরে এক ঘা চাবুক বসিয়ে দিয়ে বল্‌লে, এ বয়সেই কলাটা, আনাজটা চুরি করতে শিখেছ, বয়স হলে যে লোকের গলায় ছুরি দেবে তুমি—!

—কিন্তু বিনতা, এ তুমি করছ কি? এক্ষুণি যে পুলিশ আসবে—।

—তা আসবে—আসতে দাও। ফাঁসি কাঠে ঝুলিয়ে দেবে? তা ভাল, আরও ভাল—।

আর কিছু বল্‌লাম না বিনতাকে। আমার জীবনে বিনতার আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে যদি কোন দিন কিছু না পেয়েও থাকি, তবু এ কথা সত্য, এ কথা সত্য হয়ে থাক চিরদিন, বিনতাকে আমি ভালবাসব, ক্ষমা করব। তার কোন অন্যায়ের বা অধর্ম্মের হিসাব-নিকাশ আমি করতে পারব না। এসে আমার উপন্যাসে মুখ গুঁজেছি, বিনতা ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করল দিই, বল ত? অনেকটা কেটে গিয়েছে আয়োডিন দেব কি?

—জানি নে, বিরক্ত হয়ে বল্‌লাম।

—জান না? নাই জান্‌লে। বেদনায় বিনতার কণ্ঠ ভ[illegible] হয়ে এল।

বাইরের কলরব থেমে গিয়েছে, ভেতরের দিকের এ[illegible] কোঠায় মেয়েটিকে কোলের উপর নিয়ে বিনতা বাতাস দি[illegible] মুহূর্ত্তে জীবনের আগত অনাগত লোপ হয়ে গেল, সম[illegible] স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর যখন স্বাভাবিকত[illegible] ফিরে এলাম, জানলাম, আমার দোরে যে ভিক্ষার সাজি নি[illegible] প্রতিদিন এসে দাঁড়ায়, সে শুধু তার অপরিসীম দারিদ্র্যের প[illegible] চয়েই নয়, দুমুঠি ভিক্ষা নিয়ে সেই অপার ঐশ্বর্য্যশালি[illegible] কত মুঠি ভরে কতদিন ধরে কত কি যে দিয়ে এসেছে, সে আমি জানি না। সে ত এ সংসারের কোন কিছু দিয়েই প[illegible] শোধ করবার মত নয়।

তারপর থেকে আমাদের ঘরের আশে পাশে মেয়েটির আ[illegible] গোনা প্রতিদিনই লক্ষ্য করে আসছি। কৌতূহল হয়, পুণ্যে[illegible] ডেকে ওর কথা জিজ্ঞাসা করি, একদিন করলামও। আমা[illegible] বাড়ীর পেছনের ডাঙায় এ সময় গ্রাম থেকে ভিখারীর দলে আবির্ভাব হয়, এ সময়টা এরা শহরে ভিক্ষা করে বেড়াবে মেয়েটির আর কেউ নাই—এক প্রতিবেশিনী বৃদ্ধার হাত ধ[illegible] ভিক্ষা করতে এসেছে শহরে। এই তার সবটুকু পরিচয় আমার টেবিলের পাশে বসে বিনতাও এ কথা জেনে নিল। ফস্‌ করে বলে ফেল্‌ল, আচ্ছা, মেয়েটার একটা নাম রাখলে কেমন হয়? রেখে দাও না একটা নাম।

—ভিখারীর আবার নাম?

বিনতা আহত হল। ওকে শান্ত করবার উদ্দেশ্যে বল্‌লাম, নাম চাও? আচ্ছা, ডেকো ওকে "অসীমা" বলে? হল ত?—যাও এখন।

বইয়ের উপর মাথা ফেলে হাই তুলছি দেখে বিনতা এ ঘরে এল। আগেকার কথার ভূমিকা টেনে বল্‌ল, আচ্ছা, চোখদুটির দিকে তাকিয়ে দেখেছ মেয়েটার? কেমন কোঁকড়ান চুল, বেণী বেঁধে দিতে ইচ্ছা করে, সত্যি ইচ্ছে করে চুমো খাই—

—রুচিকে ধন্যবাদ তোমার, বিদ্রূপ করে বল্‌লাম বিনতাকে।

আবার আর একটা অধ্যায়ের উপর আমার চোখ স্থির হয়ে এসেছে দেখে বিনতা উঠে গেল। খানিক পর এসে বল্‌ল, চল না ঘুরে আসি একটু, অনেকদিন ত বের হইনি কোথাও।

আচ্ছা, বেশ চল—।

বেশী দূরে যাব না, একটু পরেই ফিরে আসব ঠিক করেছি, কিন্তু বাড়ী থেকে খানিক দূরে গিয়েই বিনতা বললে, দেখ।

দেখলাম, পুণ্য তার মানসী কন্যার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে কি যেন বল্‌ছে, শুনা যায় না। মুহূর্ত্তে তার হ'ল কি? আর একটু নুয়ে প'ড়ে অজস্র চুম্বনে অসীমাকে চঞ্চল ক'রে তুললে। বিনতা তাই দেখে নিল একবার।

—এ কি বিনতা চলু, থেমে গেলে কেন?

—না, আর পারছি না আমি, চল, এক্ষুণি ফিরে যাই, বড্ড
া ধরেছে।

পরের দিন আমার লিখবার টেবিলে এসে বসেছি, একটি
ট গল্প চাই। কিছু না, একটি বা বড় জোর দু'টি চরিত্র,
দন কি বড় জোর চারটি দিনের কথা থাকবে তাতে, কিন্তু
জ পাচ্ছি না। বিনতা এসে আমায় উদ্ধার করল।

—আচ্ছা, অসীমার কথা লেখ না কেন, গল্পে তোমার?

—ভিখিরীর মেয়েকে নিয়ে আবার গল্প! লোকে বলবে
।

তবু বিনতার অনুরোধে বসতে হ'ল। একটি নিঃসহায়
া এসেছে শহরে ভিক্ষে করতে। দেখা হ'ল একটি বৃদ্ধের
সাথে, সে আমার পুণ্য, দৃশ্যপটে দেখা গেল এক নিঃসন্তান
মানবীকে, সে বিনতা।

—জীবনে যা' করিনি কোনদিন, তাই তুমি আজ করালে,
বিনতা।

দুপুরে বেলা পুণ্য চ'লে যায় অসীমার কাছে। মাঠের ধারে
গাছের ছায়ায় ব'সে তাদের কত কথা হয়।

পুণ্য বলে, বড় হ'লে যাবি কোথায় মেয়ে—

মেয়ে বলে, বড় সাজি নিয়ে ভিক্ষেয় বেরব তখন্

—বড় সাজি নিলেই কি বেশী চাল আসে-রে?

—কম দিলে ত নেবই না।

পুণ্য জিজ্ঞাসা করেঃ মেলার দিনে কিনবি কি?

মেয়ে বলেঃ এক পয়সার ফুলুরি।

এমনই রোজ তাদের এক কথা হয়, এক যায়গায় ব'সে
একই স্বপ্ন তারা দেখে। তবু তা পুরান হয় না। পুণ্য
আর একটু পরেই বেরিয়ে যাবে দেখে বিনতা বললে, পুণ্য
যাবার কালে কিছু খাবার নিয়ে যাস্ মেয়েটার জন্য—।

পুণ্য কিছু জবাব দিল না। যাবার কালে বিনতা আবার
মনে করিয়ে দিতেই পুণ্য তাচ্ছিল্য ক'রে ব'লে উঠল, ওর
অনেক খাবার আছে আজ, দরকার হবে না। ক্রোধে, ক্ষোভে,
গ্লানিতে বিনতা জ্ব'লে উঠ্‌ল। এদিকের ঘরে এসে আমাকে
দৃঢ়স্বরে বল্‌ল, তুমি এক্ষুণি ওকে জবাব দাও, অমন চাকর
নিয়ে আমি আর কিছুতেই পারছি না।

—বেশ, তাই দেব, বিনতা, এখন তুমি যাও লক্ষ্মীটি—।

বিনতা গেল, কিন্তু উপন্যাসের জটিল অধ্যায়টি আর ফিরে
এল না। পাহাড়ে নদীর কলরব থেমে গেছে, পর্ব্বতরেখা
অস্পষ্টতায় মিশে গেছে। আমার সামনে তিনটি প্রাণী উঠ্‌ল,
বিনতা, পুণ্য আর অসীমা। ওদের দিকে তাকিয়ে সেদিন
নীরবে স্বীকার ক'রে নিলাম, মহত্তর জীবনের উচ্ছ্বসিত
অনুভূতির তুলনায় এরই বা মূল্য কম কি? একটি মানব-
শিশুকে কেন্দ্র ক'রে যে ইতিহাস আমারই চোখের সমনে রচিত
হ'য়ে যাচ্ছে, বৃহৎ ইতিহাসে মহামানবের তীর্থযাত্রার কলরবে
যদি তাকে খুঁজে না পেলাম, ক্ষতি কি তাতে? তবু ত
একটি কথা, দু' ফোঁটা চোখের জলের পরিচয়ে অনন্ত জীবনের
পরিচয় পেলাম—।

পরদিন পুণ্যকে ডেকে বল্‌লাম, তার ব্যবহারে আমি
ক্ষুব্ধ হয়েছি। তার কাজকর্ম্মে অবহেলাও আমি লক্ষ্য ক'রে
এসেছি। শুষ্কদেহ পুণ্যর এতে কোন ভাবান্তর হ'ল না।
কিন্তু যে মুহূর্ত্তে বিনতা অসীমাকে উপলক্ষ্য ক'রে পুণ্যকে
আমাদের সংসার থেকে দূরে ক'রে দেবার কথা সুস্পষ্ট ক'রে
ব'লে দিল, দেখলাম, পুণ্যর মুখখানা ক্রমশ একটা দীপ্তিতে
ভ'রে গেল। কারণ খুঁজে পেলাম না। আমার শৈশব-
জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আমি এ মানুষটিকে ত ঠিক একইভাবে
দেখে এসেছি। তবু ত একে চিনলাম না। তবু ত জীবনের
এতদিন পরেও অপরিচয়ের অন্ধকার থেকে ওকে ডেকে এনে
প্রসন্ন দিবালোকে ওর দিকে তাকাতে পারলাম না।

বিনতা বললে, এ বাড়ীতে যতদিন আছ তুমি পুণ্য, এক
হতচ্ছাড়া মেয়েকে ডেকে এনে আদর দেখাতে আমি দেব না,—
না, কিছুতেই না।

আবার এসে সংসারের কাজের মধ্যে পুণ্য ডুবে গেল।
অপ্রয়োজনেও অনেক কাজ সে ক'রে ফেলল। দোতলার
কোঠায় আমাদের বাতি নিভে গেছে, নীচে পুণ্যর ঘরে একটা
প্রদীপ স্তিমিত আলোকে জ্বল্‌ছে। বিনতা এবার বিছানা
ছেড়ে উঠে ব'স্‌ল। একখানা চাদর দিয়ে স্বামীর আপাদমস্তক
ঢেকে দিয়ে নগ্নপদে নেমে এল।

এদিকে নির্ব্বাপিতপ্রায় প্রদীপের আলোকে পুণ্যর বুকের
কাছে মেঝেতে শুয়ে আছে অসীমা। বিনতা জানালার মধ্য
দিয়ে তার দৃষ্টিকে পাঠিয়ে দিল। কিন্তু ঐ কি হৃদয়ের
নির্লজ্জ ভীষণ রূপ! রাত্রির তপোমগ্ন নিস্তব্ধতা, অসীমা
এসেছে পুণ্যর কাছে, স্নেহের কাছে এসেছে প্রাণ, কিন্তু
তারই পাশে আজ বিনতার বাসনা শীর্ণহাত মেলে
দাঁড়িয়েছে। বিনতার ইচ্ছা হ'ল, একবার আর্ত্তনাদ
ক'রে ব'লে ওঠে, অসীমা আমার। অসীমা আর কারু নয়, আর
কারু হ'তে পারে না সে—।

কিন্তু সে মুহূর্ত্তে অসীমাকে আরও নিবিড় ক'রে কাছে
নিল পুণ্য—।

বিনতা আর দাঁড়াতে পারল না, কম্পিতপদে সে উঠে এল
উপরে। মসৃণ, কৃষ্ণ আঁধারের মধ্যে আপন হৃদয়ের নির্লজ্জ
সত্যের ভীষণ রূপটি দেখে বিনতা ভয়ে, গ্লানিতে, নিঃশব্দে
এসে আমার পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল। তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে
পড়তেই আমি চম্‌কে উঠ্‌লাম—।

—এ কি, বিনতা!

বিনতা কহিল না কিছু, শুধু নিঃশব্দ বেদনায় ফুঁপিয়ে
কাঁদিতে লাগল। নিঃসঙ্গ পৃথিবীর স্পন্দনহীন বুকের উপর
ব'সে সে রাতে চোখের জলের নীরব আকুতিতে যার নিরুদ্ধ
হৃদয়ের বেদনাকে আপন হৃদয়ে অনুভব ক'রলাম সে শুধু
আমারই বিনতা নয়—। সে অনন্ত জীবনের, অসীম
পৃথিবীর—। তাই ত চোখের জলের চরম পরিচয়ে আজ নূতন
ক'রে এসেছে সে।

—চল বিনতা, কোথাও চ'লে যাই আমরা—। আনন্দের
লোরে হতাশার দীর্ঘশ্বাস, বিনতা, কেনই বা আমরা দিতে
যাব? সেই কি আমাদের চিরদিনের পরিচয় ব'লে পৃথিবীর
কাছে রেখে যাবে? না, বিনতা, তা' হয় না। চল আমরা
যাই কোথাও—।

—হ্যাঁ, তাই চল।

—হাঁ, বেশ সুন্দর, অমলবাবুর ছেলে—

—সুপ্রীতির ছেলে—।

হার্ডির কল্পনামুখর রোমাঞ্চময় অধ্যায়টি আমার মন থেকে মুছে গেল। তিন বছর আগেকার বিনতাকে আমি আবার খুঁজে পেয়েছি। কোন কথা সহজে মেনে নেবে না বিনতা, প্রতি কথায় নূতন একটা কিছু বলা চাই তার। তাই যে মুহূর্ত্তে বন্ধুত্বের পরিচয়কে বড় করবার তাগাদায় আমি ঘোষণা করলাম, ছেলেটি অমলবাবুর, বিনতা অনায়াসে বলে ফেল্‌লে ছেলেটি সুপ্রীতির। সুপ্রীতি তার বান্ধবী কিনা, তাই। বিনতার দিকে ফিরে তাকিয়েছি, বিনতা নাই এ ঘরে। পাশের ঘরে গিয়ে দেখলাম সে স্থির হয়ে বসে আছে।

—চল বিনতা, বা'র থেকে ঘুরে আসি একটু।

সে আপত্তি করল না। এ পথ ও পথ ঘুরে নদীর ঘাটে দুদণ্ড কাটিয়ে যখন গলিতে পা দিয়েছি, নিতান্ত অসাবধান-ভাবেই আমি বিকালের কথাটি তুলে ফেল্‌লাম ঃ দেখলে বিনতা ছেলেগুলো বাঁদরাম করছিল কি রকম—।

—আমি যদি এদের মা হ'তাম, দিতাম ঠেঙিয়ে বাড়ীর বার করে—নচ্ছার সমস্ত ছেলেপিলে—

অন্ধকারে এ কথা বলবার কালে বিনতার মুখখানা আমি দেখি নাই। বল্‌লাম, কিন্তু শাসন করলেই কি ছেলেপিলে ভাল মানুষ হয়ে যাবে?

—শাসন না করলেই যে হয়ে যাবে এমন কথাই বা কে বল্‌লে?

(৩)

দিন দু'এক পর আমার উপন্যাসের একটা পাণ্ডুলিপি নিয়ে বসেছি। চাকর পুণ্য আমার পায়ের উপর এসে লুটিয়ে পড়ল। তার বিচ্ছিন্ন কথার কিছুটা রেখে কিছুটা বাদ দিয়ে এ কথাই বুঝে নিলাম, অন্দরের দিকে আমার উপস্থিতি সে মুহূর্ত্তেই প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। ভেতরে গিয়ে দেখ্‌লাম, বিনতা একটি নগ্নগাত্র ভিখারী মেয়েকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করছে। আর পেছনের দরজার পাশে অন্যান্য ভিখারীরা তাই আর্ত্তনাদ করছে। অসহায় মেয়েটি বারবার পুণ্যের দিকে ইঙ্গিত করে বল্‌ছেঃ ওই'ত আমায় দিয়েছে, নইলে কি আমি নিতে আসি? ওই'ত আমায় আধখানা রুটি, দুমুঠো ভাত রোজ দিয়ে আসে। বিনতা সেদিকে কর্ণপাতও করল না। দ্বিগুণ জোরে এক ঘা চাবুক বসিয়ে দিয়ে বল্‌লে, এ বয়সেই কলাটা, আনাজটা চুরি করতে শিখেছ, বয়স হলে যে লোকের গলায় ছুরি দেবে তুমি—!

—কিন্তু বিনতা, এ তুমি করছ কি? এক্ষুণি যে পুলিশ আসবে—।

—তা আসবে—আসতে দাও। ফাঁসি কাঠে ঝুলিয়ে দেবে? তা ভাল, আরও ভাল—।

আর কিছু বল্‌লাম না বিনতাকে। আমার জীবনে বিনতার আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে যদি কোন দিন কিছু না পেয়েও থাকি, তবু এ কথা সত্য, এ কথা সত্য হয়ে থাক চিরদিন, বিনতাকে আমি ভালবাসব, ক্ষমা করব। তার কোন অন্যায়ের বা অধর্ম্মের হিসাব-নিকাশ আমি করতে পারব না। এসে আমার উপন্যাসে মুখ গুঁজেছি, বিনতা ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করল, কি দিই, বল ত? অনেকটা কেটে গিয়েছে আয়োডিন দেব কি?

—জানি নে, বিরক্ত হয়ে বল্‌লাম।

—জান না? নাই জান্‌লে। বেদনায় বিনতার কণ্ঠ ভারী হয়ে এল।

বাইরের কলরব থেমে গিয়েছে, ভেতরের দিকের একটা কোঠায় মেয়েটিকে কোলের উপর নিয়ে বিনতা বাতাস দিচ্ছে। মুহূর্ত্তে জীবনের আগত অনাগত লোপ হয়ে গেল, সমস্ত স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর যখন স্বাভাবিকতায় ফিরে এলাম, জানলাম, আমার দোরে যে ভিক্ষার সাজি নিয়ে প্রতিদিন এসে দাঁড়ায়, সে শুধু তার অপরিসীম দারিদ্র্যের পরিচয়েই নয়, দুমুঠি ভিক্ষা নিয়ে সেই অপার ঐশ্বর্য্যশালিনী কত মুঠি ভরে কতদিন ধরে কত কি যে দিয়ে এসেছে, সে ত আমি জানি না। সে ত এ সংসারের কোন কিছু দিয়েই পরিশোধ করবার মত নয়।

তারপর থেকে আমাদের ঘরের আশে পাশে মেয়েটির আনাগোনা প্রতিদিনই লক্ষ্য করে আসছি। কৌতূহল হয়, পুণ্যকে ডেকে ওর কথা জিজ্ঞাসা করি, একদিন করলামও। আমার বাড়ীর পেছনের ডাঙায় এ সময় গ্রাম থেকে ভিখারীর দলের আবির্ভাব হয়, এ সময়টা এরা শহরে ভিক্ষা করে বেড়াবে। মেয়েটির আর কেউ নাই—এক প্রতিবেশিনী বৃদ্ধার হাত ধরে ভিক্ষা করতে এসেছে শহরে। এই তার সবটুকু পরিচয়। আমার টেবিলের পাশে বসে বিনতাও এ কথা জেনে নিল। ফস্ করে বলে ফেল্‌ল, আচ্ছা, মেয়েটার একটা নাম রাখলে কেমন হয়? রেখে দাও না একটা নাম।

—ভিখারীর আবার নাম?

বিনতা আহত হল। ওকে শান্ত করবার উদ্দেশ্যে বল্‌লাম, নাম চাও? আচ্ছা, ডেকো ওকে "অসীমা" বলে? হল ত?—যাও এখন।

বইয়ের উপর মাথা ফেলে হাই তুলছি দেখে বিনতা এ ঘরে এল। আগেকার কথার ভূমিকা টেনে বল্‌ল, আচ্ছা, চোখদুটির দিকে তাকিয়ে দেখেছ মেয়েটার? কেমন কোঁকড়ান চুল, বেণী বেঁধে দিতে ইচ্ছা করে, সত্যি ইচ্ছে করে চুমো খাই—

—রুচিকে ধন্যবাদ তোমার, বিদ্রূপ করে বল্‌লাম বিনতাকে।

আবার আর একটা অধ্যায়ের উপর আমার চোখ স্থির হয়ে এসেছে দেখে বিনতা উঠে গেল। খানিক পর এসে বল্‌ল, চল না ঘুরে আসি একটু, অনেকদিন ত বের হইনি কোথাও।

আচ্ছা, বেশ চল—।

বেশী দূরে যাব না, একটু পরেই ফিরে আসব ঠিক করেছি, কিন্তু বাড়ী থেকে খানিক দূরে গিয়েই বিনতা বললে, দেখ।

দেখলাম, পুণ্য তার মানসী কন্যার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে কি যেন বল্‌ছে, শুনা যায় না। মুহূর্ত্তে তার হ'ল কি? আর একটু নুয়ে প'ড়ে অজস্র চুম্বনে অসীমাকে চঞ্চল ক'রে তুললে। বিনতা তাই দেখে নিল একবার।

—এ কি বিনতা চলু, থেমে গেলে কেন?

—না, আর পারছি না আমি চল, এক্ষুণি ফিরে যাই, বড্ড মাথা ধরেছে।

পরের দিন আমার লিখবার টেবিলে এসে বসেছি, একটি ছোট গল্প চাই। কিছু না, একটি বা বড় জোর দু'টি চরিত্র, দু'দিন কি বড় জোর চারটি দিনের কথা থাকবে তাতে, কিন্তু খুঁজে পাচ্ছি না। বিনতা এসে আমায় উদ্ধার করল।

—আচ্ছা, অসীমার কথা লেখ না কেন, গল্পে তোমার?

—ভিখিরীর মেয়েকে নিয়ে আবার গল্প! লোকে বলবে কি?

তবু বিনতার অনুরোধে বসতে হ'ল। একটি নিঃসহায় মেয়ে এসেছে শহরে ভিক্ষে করতে। দেখা হ'ল একটি বৃদ্ধের সাথে, সে আমার পুণ্য, দৃশ্যপটে দেখা গেল এক নিঃসন্তান মানবীকে, সে বিনতা।

—জীবনে যা' করিনি কোনদিন, তাই তুমি আজ করালে, বিনতা।

দুপুর বেলা পুণ্য চ'লে যায় অসীমার কাছে, মাঠের ধারে গাছের ছায়ায় ব'সে তাদের কত কথা হয়।

পুণ্য বলে, বড় হ'লে যাবি কোথায় মেয়ে—

মেয়ে বলে, বড় সাজি নিয়ে ভিক্ষেয় বেরব তখন্

—বড় সাজি নিলেই কি বেশী চাল আসে-রে?

—কম দিলে ত নেবই না।

পুণ্য জিজ্ঞাসা করেঃ মেলার দিনে কিনবি কি?

মেয়ে বলেঃ এক পয়সার ফুলুরি।

এমনই রোজ তাদের এক কথা হয়, এক যায়গায় ব'সে একই স্বপ্ন তারা দেখে। তবু তা পুরান হয় না। পুণ্য আর একটু পরেই বেরিয়ে যাবে দেখে বিনতা বললে, পুণ্য যাবার কালে কিছু খাবার নিয়ে যাস্ মেয়েটার জন্য—।

পুণ্য কিছু জবাব দিল না। যাবার কালে বিনতা আবার মনে করিয়ে দিতেই পুণ্য তাচ্ছিল্য ক'রে ব'লে উঠল, ওর অনেক খাবার আছে আজ, দরকার হবে না। ক্রোধে, ক্ষোভে, গ্লানিতে বিনতা জ্বলে উঠল। এদিকের ঘরে এসে আমাকে দৃঢ়স্বরে বল্ল, তুমি এক্ষুণি ওকে জবাব দাও, অমন চাকর নিয়ে আমি আর কিছুতেই পারছি না।

—বেশ, তাই দেব, বিনতা, এখন তুমি যাও লক্ষ্মীটি—।

বিনতা গেল, কিন্তু উপন্যাসের জটিল অধ্যায়টি আর ফিরে এল না। পাহাড়ে নদীর কলরব থেমে গেছে, পর্ব্বতরেখা অস্পষ্টতায় মিশে গেছে। আমার সামনে তিনটি প্রাণী উঠল, বিনতা, পুণ্য আর অসীমা। ওদের দিকে তাকিয়ে সেদিন নীরবে স্বীকার ক'রে নিলাম, মহত্তর জীবনের উচ্ছ্বসিত অনুভূতির তুলনায় এরই বা মূল্য কম কি? একটি মানব-শিশুকে কেন্দ্র ক'রে যে ইতিহাস আমারই চোখের সমনে রচিত হ'য়ে যাচ্ছে, বৃহৎ ইতিহাসে মহামানবের তীর্থযাত্রার কলরবে যদি তাকে খুঁজে না পেলাম, ক্ষতি কি তাতে? তবু ত একটি কথা, দু' ফোঁটা চোখের জলের পরিচয়ে অনন্ত জীবনের পরিচয় পেলাম—।

পরদিন পুণ্যকে ডেকে বল্‌লাম, তার ব্যবহারে আমি ক্ষুব্ধ হয়েছি। তার কাজকর্ম্মে অবহেলাও আমি লক্ষ্য ক'রে এসেছি। শুষ্কদেহ পুণ্যর এতে কোন ভাবান্তর হ'ল না। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে বিনতা অসীমাকে উপলক্ষ্য ক'রে পুণ্যকে আমাদের সংসার থেকে দূর ক'রে দেবার কথা সুস্পষ্ট ক'রে ব'লে দিল, দেখলাম, পুণ্যর মুখখানা ক্রমশ একটা দীপ্তিতে ভ'রে গেল। কারণ খুঁজে পেলাম না। আমার শৈশব-জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আমি এ মানুষটিকে ত ঠিক একইভাবে দেখে এসেছি। তবু ত একে চিনলাম না। তবু ত জীবনের এতদিন পরেও অপরিচয়ের অন্ধকার থেকে ওকে ডেকে এনে প্রসন্ন দিবালোকে ওর দিকে তাকাতে পারলাম না।

বিনতা বললে, এ বাড়ীতে যতদিন আছ তুমি পুণ্য, এক হতচ্ছাড়া মেয়েকে ডেকে এনে আদর দেখাতে আমি দেব না,—না, কিছুতেই না।

আবার এসে সংসারের কাজের মধ্যে পুণ্য ডুবে গেল। অপ্রয়োজনেও অনেক কাজ সে ক'রে ফেলল। দোতলার কোঠায় আমাদের বাতি নিভে গেছে, নীচে পুণ্যর ঘরে একটি প্রদীপ স্তিমিত আলোকে জ্বলছে। বিনতা এবার বিছানা ছেড়ে উঠে ব'সল। একখানা চাদর দিয়ে স্বামীর আপাদমস্তক ঢেকে দিয়ে নম্রপদে নেমে এল।

এদিকে নির্ব্বাপিতপ্রায় প্রদীপের আলোকে পুণ্যর বুকের কাছে মেঝেতে শুয়ে আছে অসীমা। বিনতা জানালার মধ্য দিয়ে তার দৃষ্টিকে পাঠিয়ে দিল। কিন্তু ঐ কি হৃদয়ের নির্ল্লজ্জ ভীষণ রূপ! রাত্রির তপোমগ্ন নিস্তব্ধতা, অসীমা এসেছে পুণ্যর কাছে, স্নেহের কাছে এসেছে প্রাণ, কিন্তু তারই পাশে আজ বিনতার বাসনা শীর্ণহাত মেলে দাঁড়িয়েছে। বিনতার ইচ্ছা হ'ল, একবার আর্ত্তনাদ ক'রে ব'লে ওঠে, অসীমা আমার। অসীমা আর কারু নয়, আর কারু হ'তে পারে না সে—।

কিন্তু সে মুহূর্ত্তে অসীমাকে আরও নিবিড় ক'রে কাছে নিল পুণ্য—।

বিনতা আর দাঁড়াতে পারল না, কম্পিতপদে সে উঠে এল উপরে। মসৃণ, কৃষ্ণ আঁধারের মধ্যে আপন হৃদয়ের নির্ল্লজ্জ সত্যের ভীষণ রূপটি দেখে বিনতা ভয়ে, গ্লানিতে, নিঃশব্দে এসে আমার পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল। তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে পড়তেই আমি চমকে উঠ্‌লাম—।

—এ কি, বিনতা!

বিনতা কহিল না কিছু, শুধু নিঃশব্দ বেদনায় ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। নিঃসঙ্গ পৃথিবীর স্পন্দনহীন বুকের উপর ব'সে সে রাতে চোখের জলের নীরব আকুতিতে যার নিরুদ্ধ হৃদয়ের বেদনাকে আপন হৃদয়ে অনুভব ক'রলাম সে শুধু আমারই বিনতা নয়—। সে অনন্ত জীবনের, অসীম পৃথিবীর—। তাই ত চোখের জলের চরম পরিচয়ে আজ নূতন ক'রে এসেছে সে।

—চল বিনতা, কোথাও চ'লে যাই আমরা—। আনন্দের দোরে হতাশার দীর্ঘশ্বাস, বিনতা, কেনই বা আমরা দিতে যাব? সেই কি আমাদের চিরদিনের পরিচয় ব'লে পৃথিবীর কাছে রেখে যাবে? না, বিনতা, তা' হয় না। চল আমরা যাই কোথাও—।

—হাঁ, তাই চল।

আমেরিকার শিল্পীদের আজব পোষাকের নাচ

আমেরিকার কমার্শিয়াল চিত্রকরদিগের এক ইউনিয়ন আছে। প্রতি বৎসর এপ্রিল মাসে নিউইয়র্ক শহরে তাহাদের সম্মিলিত নৃত্য হয়। এই পার্টিতে কমার্শিয়াল শিল্পীরা পরিচ্ছদে নানা প্রকার বিজ্ঞাপনী অদ্ভুত আকারে জুড়িয়া লয়। কেহ হয়ত মুখোস ও পোষাকে নিজের দেহকে সিগারেটের আকারে পরিণত করিয়া কোনও সিগারেটের বিজ্ঞাপন প্রচার করে। কেহ সারা অঙ্গের পরিচ্ছদে বিজ্ঞাপন জুড়িয়া জুড়িয়া নিজ পোষাককে সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠার মত করিয়া ফেলে। এই নৃত্যে এক শিল্পী আসিলেন কাঁধ, মুখ, মাথা বেড়িয়া একটি খাঁচা পরিয়া—ভাবটা সোনালী খাঁচায় পাখী—এই সারমর্ম ফুটাইয়া তোলা। আর এক ব্যক্তি আসিলেন একখানি টেবিলের আকারে; তাঁহার মুণ্ডটি মাত্র উঁচু হইয়া উঠিল ঠিক টেবিলের মাঝখানটা ফুঁড়িয়া, তাঁহার বাকি অঙ্গ রহিল টেবিল, টেবিল-ক্লথ আর তদুপরি সাজান ডিশ কাঁটা-চামচ প্রভৃতির আবরণে ঢাকা। হঠাৎ দেখিলে মনে হইবে কেউ যেন একটি কাটামুণ্ড টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়াছে। টেবিলে শিল্পীটির আজব মুখভঙ্গী তদুপরি এই টেবিলের আকার কোন দর্শকেরই মুখে হাসি না ফুটাইয়া পারে না। আর একজন আসিলেন কালো পোষাকে সাজিয়া, কিন্তু তাহার উপর এমন নিপুণতায় তাঁহার অস্থি-কঙ্কাল আঁকা যে, ইহাতেই বীভৎস রসের সৃষ্টি না হইয়া পারে না।

মোটের উপর ইহা শিল্পীদের কৌতুক প্রকাশের ভঙ্গী হইলেও ইহাতে কিন্তু তাঁহাদের পেশার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশ পায় না, বরং তাহার বিপরীতই।

কমার্শিয়াল আর্টিস্টদের নৃত্যানুষ্ঠানে আজব পরিচ্ছদ ও সাজগোজের পরিকল্পনা—"জীবন্ত টেবিল"

অন্ধকারে জ্বলন্ত খড়িমাটি

এক প্রকার মিশ্র খড়িমাটি প্রস্তুত করা হইয়াছে, যাহা দ্বারা লিখিলে সাধারণ আলোকে উহা আমাদের পরিচিত খড়িমাটির লেখার মতই দেখা যায়। কিন্তু অন্ধকারে ঐ লেখা হইতে জোরাল সবুজ আভা ঠিকরাইয়া বাহির হয়। এবং ঐ লেখা দূর হইতেও পরিষ্কার পড়া যায়—কোনও বেগ পাইতে হয় না।

বিশেষ করিয়া ম্যাজিক-ল্যাণ্টার্ন বক্তৃতার সময় এই খড়ির ব্যবহার সুফল প্রদান করিবে। কারণ, এই খড়িতে লেখা বাণী, ল্যাণ্টার্ন বক্তৃতা হইতে তথ্যসংগ্রহেচ্ছু শিক্ষার্থী সহজেই কণ্ঠস্থ করিতে বা লিখিয়া লইতে পারিবে।

মার্কিন যুক্তরাজ্যে আত্মহত্যা

মার্কিন যুক্তরাজ্যে প্রায় প্রতি ২৪ মিনিটে একজন লোক আত্মহত্যা করে। প্রত্যহ প্রায় ষাটজন লোক গড়ে আপন প্রাণ নাশ করে, কারণ সরকারী বিবৃতি হইতে জানিতে পারা যায় যে, সমগ্র মার্কিন যুক্তরাজ্যে এক বৎসরে ২২,০০০ নরনারী আত্মহত্যা করে। কোন কোনও ইউরোপীয় জাতির ভিতর নাকি আত্মহত্যার সংখ্যা ইহার দ্বিগুণ, এবং কোন জাতির ভিতরই গড়ে এবং অনুপাতে ইহার কম নহে।

বিমান-ট্রামগাড়ী

বিমানপথে ট্রামগাড়ীর প্রথম প্রচলন হইয়াছে উত্তর আমেরিকার ক্যানন পর্ব্বত অঞ্চলে। বিগত জুন মাসে এই ট্রামের যাতায়াত সুরু হয়। প্রত্যেক গাড়ীতে ২৭ জন করিয়া আরোহী স্থান পাইতে পারে। পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে ৪০০২ ফুট উচ্চ শিখর পর্য্যন্ত এই বিমান ট্রামগাড়ী যাতায়াত করে। নীচে হইতে পর্ব্বত চূড়ায় উঠিতে ৮ মিনিটেরও কম সময় লাগে। চূড়ার ষ্টেশনটিতে রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে যাহাতে আরোহী দর্শকগণ চূড়ার চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে পারে।

কমার্শিয়াল আর্টিষ্টদের বার্ষিক আজব পোষাক নৃত্যে—"সোনার খাঁচায় পাখী" পরিকল্পনার অদ্ভুত অভিব্যক্তি

ভূতে পাওয়া বালিকা

ভ্যাঙ্কুবারের জোনেসভিলে হইতে এক আশ্চর্য্য সংবাদ পাওয়া যায় ভূতে ভর-করা বালিকার শয্যায় শায়িত অবস্থায় আন্দোলিত হইবার,—বালিশ গদি বিছানা লাফাইতে থাকে, এমন কি খাটখানি পর্য্যন্ত মেঝে ছাড়িয়া শূন্যে উঠিয়া নাচিতে থাকে। চেয়ার আপনা-আপনি ঘুরিয়া বেড়ায়, রহস্যজনক মুহূর্ত্তে, অদৃশ্য অথচ অস্তিত্বশীল মূর্ত্তি বিছানার চারিপাশে ঘুরিয়া ফিরে, ভূতের হাত বালিশে বিছানায় থপ্ থপ্ শব্দ করে ইত্যাদি।

পাউয়েল পর্ব্বতের এক কুটীরে এই বালিকা তাহার পিতা-মাতা, পিতামহী ও ছোট ভাইবোন সহ বাস করে। বিরল বসতি এই পার্ব্বত্য অঞ্চলে যাহারা বাস করে, তাহাদের সকলেই কায়িক শ্রমের কার্য্য করে। শিক্ষা-দীক্ষা তেমন কিছু নাই—কুসংস্কার তাহাদের ভিতর রহিয়াছে অগণিত এবং তাহা তাহারা বিশ্বাস করে সকল প্রাণ দিয়া।

সংবাদপত্রে এবং রেডিওযোগে এই অদ্ভুত সংবাদ প্রকাশিত হইবার পর টেনিসি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইকোলজি বিভাগের দুইজন অভিজ্ঞ পণ্ডিত রিপোর্টার প্রভৃতি সহ পাউয়েল পর্ব্বতে গমন করেন। তথায় পল্লীবাসীদের জিজ্ঞাসা করিয়া এমন অতিরঞ্জিত পৃথক পৃথক কাহিনী শুনিতে পান যে, তাঁহাদের সন্দেহ ঘনীভূত হয়। তবে যে সকল গ্রামবাসীকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তাহাদের কেহই নিজ চোখে দেখে নাই এই ব্যাপার—কেবল

উক্ত নৃত্য-অনুষ্ঠানে আর একটি আশ্চর্য্য পরিচ্ছদ পরিকল্পনা—কালো পোষাকের উপর শাদা রঙে আঁকা কঙ্কাল—নৃত্য-কক্ষের আলোকে হঠাৎ নজরে পড়িলে সচল কঙ্কাল বলিয়া ভ্রম হয়

এক প্রতিবেশিনী রমণী ভিন্ন। গ্রামবাসীদের নিকট হইতে এক বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় যে, খাটখানা মেঝে ছাড়িয়া শূন্যে উঠে না অথবা ঐ বালিকা ভিন্ন অপর কেহ ভূতের হাত দেখে নাই।

তখন অনুসন্ধান চলে অতি সতর্কতার সহিত। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ভূত আসে না, তাই ডাঃ বি এবং ডাঃ এইচ সন্ধ্যার

পর বালিকার কক্ষে উপস্থিত হন। বালিকা পূর্ণ পরিচ্ছদে গা ঢাকিয়া খালি পায়ে আসিয়া শয্যায় শয়ন করে, তিন পাল্টা লেপ-কম্বল মুড়ি দিয়া। ঘরে শুধু মিট্‌মিটে একটা কেরোসিনের লণ্ঠন আধ খাটখানি দূরে কোণে প্রায় অন্ধকারে ঢাকা। বালিকাটির বয়স ৯ বৎসর। সে এক তাল চিবাইবার 'গাম' মুখে দিয়া হাত দুখানি বাহির করিয়া মাথার কাছে আনিয়া শুইল—বাকি অংগ ঢাকিয়া। তাহার মুখের গাম চিবাইবার শব্দ বন্ধ হয় আর তাহার দেহ বিছানার উপর উঠে নামে। খাটের মাথার কাছে স্প্রিংগুলি ঢিলা ও জীর্ণ উহাতে ক্যাঁচ-প্যাঁচ শব্দ হয়, যেন কেউ কাঠের উপর নখ দিয়া আঁচড় কাটিতেছে। বালিকাকে ডাকিলে কিম্বা কিছু খাইতে দিলে লাফান বন্ধ হইয়া যায়। ডাঃ বি এবং এইচ কৌশলে কম্বলের নীচে হাত দিয়া বুঝিতে পারিলেন, বালিকাটি হাত বাহিরে রাখিলেও প্রতিবার আন্দোলনের পূর্ব্বে তাহার পেট সে শক্ত করে এবং মুখ বুজিয়া গাম চিবান বন্ধ করে। এই আবিষ্কারে তাঁহাদের বুঝিতে বাকি রহিল না যে, বালিকাটি সজ্ঞানে এবং কৃতিত্ব অর্জ্জনের জন্য ভূতের কারসাজির অনুকরণ করিয়া সকলকে ধাপ্পা দিতেছে। তখন পণ্ডিত দুইজন চেয়ারের নৃত্য দেখাইতে বলে—তৎক্ষণাৎ বালিকা শয্যা ছাড়িয়া আসিয়া চেয়ারে বসে। পদদ্বয় চেয়ারের পায়া দুইটির সহিত জড়াইয়া এবং দুই হাতে হাতল শক্ত করিয়া ধরিয়া সে চেয়ার সহ মেঝেয় ঘুরিতে লাগিল।

পণ্ডিতদ্বয় জিজ্ঞাসা করিলেন—যে ভূতটি আসে সে দেখিতে কেমন? বালিকা বলিল—"বড় ভাল ভূত এইটি। ঘরঝাড়া "ব্রুম"টিতে চড়িয়া সে আসে ডাইনী বুড়ীর মত।" বলিয়াই সে তাহার ছোট ভাইয়ের পাঠ্যবইখানি আনিয়া ছবি দেখাইয়া দিল ব্রুম-চড়া এক ডাইনীর।

পণ্ডিতদ্বয় তাই অভিমত দিয়াছেন ভূতের কথা সবই ভূয়া—মেয়েটা ইচ্ছা করিয়াই পেট শক্ত করিয়া দেহ নাড়াইয়া বিছানায় লাফায়। উহাতে অখণ্ড মনোযোগের দরকার, তাই কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে বা মনোযোগ অন্যদিকে আকর্ষণ করিলে আর সে লাফাইবার কাজটি চালাইয়া যাইতে পারে না।

অবিবাহিত থাকিতে পারা মানস-চাতুরতা

ব্রাজিলের মহিলা-আইনজীবী মিস্ বার্থা লাট্‌জ বলেন—অবিবাহিত থাকিতে পারা হইল এক আর্ট। মিস্ লাট্‌জ শুধু আইনজ্ঞ নহেন, তিনি কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন এবং নারী-প্রগতির নেত্রী। অবিবাহিতদের উপর ব্রাজিল রাজ্যে ট্যাক্স বসিতেছে; ইহার উপর অভিমত প্রকাশেই ঐ প্রকার উক্তি করিয়াছেন প্রকাশ্য সভায়। তিনি আরও বলেন—"কেহই স্বেচ্ছায় ট্যাক্স দিতে স্বীকার করে না, কিন্তু অবিবাহিত থাকিবার সুযোগকে বরণ করিবার জন্য আমি ট্যাক্সে আপত্তি করিব না। অপরপক্ষে নিঃসন্তান বিবাহিতদিগেরও যখন ট্যাক্স দিতে হইবে, আর অধুনা মাতৃত্ব যখন ফ্যাশানে বাধে, তখন একক থাকিয়া ট্যাক্স দেওয়াই বরং ভাল।" ফ্যাশানের সমর্থনে তিনি উল্লেখ করেন—মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ছিল ১২টি সন্তান, কিন্তু রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জের মাত্র দুইটি। মহিলা কবি লিয়া কোরিয়া ডাটরেল বলেন—তিনি সন্তুষ্টচিত্তে ট্যাক্স দিবেন, কারণ বিবাহ অপেক্ষা ট্যাক্সকে তিনি পছন্দ করেন বেশী।

চিঠিদ্বারা প্রেমমুগ্ধ

অষ্ট্রেলিয়া প্রবাসী মিষ্টার রবার্ট ফ্রায়েডল্যাণ্ডার ব্যবসায়ে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিয়া ৪৬ বৎসর বয়সে বিবাহেচ্ছু হয় এবং সংবাদপত্রের সাহায্যে জীবনসঙ্গিনী বাছিয়া লইতে চেষ্টা করে। তাহার প্রধান চুক্তি কিন্তু এই—পাত্রীর বয়স ত্রিশ হইতে পঁয়ত্রিশ হইবে এবং সে সকল প্রকার রান্নায় পারদর্শিনী হইবে।

বিজ্ঞাপনে সাড়া আসে তিন স্থান হইতে। একটি ইংলণ্ড, একটি দক্ষিণ আফ্রিকা এবং তৃতীয়টি অষ্ট্রেলিয়ার অন্য একাংশ হইতে। কিন্তু ইংলণ্ডবাসিনী পাঠায় তাহার রান্নার সার্টিফিকেটসমূহ, যাহার ভিতর প্যারিসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রান্না-স্কুলের ডিপ্লোমা ছিল প্রথমশ্রেণীর। অপর দুই পত্নীপদপ্রার্থিনী শুধু পাঠায় তাহাদের ফটোগ্রাফ এবং লিখিত বাণী যে, তাহারা রান্নায় নিপুণ।

মিঃ ফ্রায়েডল্যাণ্ডার ইংলণ্ডবাসিনী মিস্ জেন ডাউডেন্‌কেই বাছিয়া নেন, যদিও সে ফটো পাঠায় নাই। কিন্তু ব্যবসায়ের খাতিরে তাঁহার ইংলণ্ডে যাওয়া ঘটে না দুই বৎসর কাল। এই দুই বৎসর তাহাদের চিঠির আদান-প্রদান চলে।

পরে একদিন ফ্রায়েডল্যাণ্ডার সত্যই ইংলণ্ডে পেঁৗছে, মিস্ ডাউডেন্ তাঁহাকে অভ্যর্থনার জন্য জাহাজ-ঘাটে উপস্থিত হয়। কেহই কাহাকে পূর্ব্বে দেখে নাই, কিন্তু চিঠির মারফৎ তাহাদের চেহারার পরিচয় উভয়েই এমনভাবে পাইয়াছে যে শত শতের ভিতর হইতেও বাছিয়া লইতে তাহাদের কষ্ট হইবে না, এরূপই উভয়ের মনোভাব। ফলে হইলও তাহাই।

ফ্রায়েডল্যাণ্ডার জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া তীরে পেঁৗছা মাত্র জেন্ চীৎকার করিল—বব্! আর সংগে সংগেই জেনের উপর নজর পড়িবা মাত্র ফ্রায়েডল্যাণ্ডার চীৎকার করিল—জেন্!

হাতে হাত মিলাইয়া দুইজনে গমন করিল।

৩৬ ঘণ্টা মধ্যে বিবাহকার্য্য সমাধা করিয়া ফ্রায়েডল্যাণ্ডার নববধূ সহ অষ্ট্রেলিয়া যাত্রা করিল। উভয়েই বলে, চেহারা ও চাল-চলনে উভয়ে যাহা আশা করিতেছিল হুবহু তাহার সহিত মিলিয়া গিয়াছে তাহাদের বাস্তব মিলনের সংগী-সংগিনী।

প্রথম দর্শনে অনুরাগের উদয় হয় এতকাল ইহাই দেখা যাইত; এখন বোঝা গেল চিঠিও দর্শনের কাজ সুচারুরূপেই সম্পন্ন করিতে পারে, অনুরাগের সৃষ্টি করিয়া।

জুতার ডগার ছাপ

হাত-পায়ের আঙুলের ছাপ হইতে বহু অপরাধীকে সনাক্ত করা হইয়া থাকে। এমন কি অপরাধী যদি কক্ষের বাতায়ন বা টেবিল-চেয়ার সামান্য স্পর্শ করে আঙুল দ্বারা, সেই ছাপের আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা দ্বারাও অপরাধীকে সনাক্ত করা যায়। লিভারপুলে একটি চোর জুতার ডগার ঠক্করে বাক্স খুলিয়া অর্থ আত্মসাৎ করায় ছয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। বাক্সটি পাঠান হয় পুলিশের হেড-কোয়াটার্সে। তথায় অণুবীক্ষণ সাহায্যে পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে ধৃত ব্যক্তির জুতার ডগার ঠক্করেরই ছাপ রহিয়াছে বাক্সটির গায়ে। পরে অপরাধী স্বীকার করিয়াছে যে, ঐ ভাবেই সে বাক্সটি খুলিয়াছে।

অবিশ্বাসী

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

(১৭)

দিন দুই পরে।

নৌকা যেখানে আসিয়া নোঙ্গর করিল, সেটি গঞ্জের একটি বাজার। নদীর উপর উচ্চ পাড়, অনেকখানি পরিষ্কৃত জমিতে সারি সারি খড়ের চালা। সেদিন রবিবার, হাট বসিয়াছে; বিস্তর লোক কেনা-বেচা করিতেছে।

মাঝিরা একপাশে নৌকা বাঁধিয়া বাজার করিতে গেল।

আলোকনাথ বাহিরে আসিয়া একটি উঁচু জায়গায় দাঁড়াইয়া লোকজনের কেনা-বেচা দেখিতে লাগিল।

মাছের বাজারে ভিড় খুব বেশী, তরিতরকারীও কিনিতেছে অনেকে। কিন্তু একপাশে রাশি রাশি পাট লইয়া শুষ্ক মুখে গরীব চাষীরা দাঁড়াইয়া আছে। ক্রেতা নাই। এবার পাট নাকি জন্মিয়াছে প্রচুর, গেলবারও প্রচুর জন্মিয়াছিল। সেই অনুপাতে চাহিদা একদম নাই। মহাজনেরাও দাঁও কসিয়া হাত গুটাইয়াছেন। বাজার যে মন্দা হইবে অনেকেই অনুমান করিয়াছিল, কিন্তু লোভ—বড় শত্রু। পাটের চাষে নগদ পয়সা হাতে আসিলে বাবুয়ানীর সুবর্ণ সুযোগ মিলিয়া যায়। সে লোভ ত্যাগ করা বড় সহজ কথা নয়। ধানের চাষে মহাজনের কর্জ্জ শোধ করিয়া জমিদারের খাজনা গণিয়া যৎসামান্য থাকে। তাহাতে কোনরূপে পেটের ভাত ও পরণের কাপড় চলিতে পারে। কিন্তু পাটের পয়সায় শহরের সুলভ চাকচিক্যময় বিলাসিতার স্বাদ পূর্ণমাত্রায়ই পাওয়া যায়।

ভারতের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত এই বিলাস-লালসার জড় ইচ্ছা ধীরে ধীরে এখানকার বায়ু পর্য্যন্ত দূষিত করিয়া তুলিয়াছে। অজগরের তীক্ষ্ণদৃষ্টির সম্মোহ!

মরিলে ভোগ করিবে কে? অতএব সমস্ত সত্তা দিয়া ভোগ কর। বিষয় যাক্ সর্ব্বস্ব যাক্ শুধু ভোগ করিয়া যাও, এই নীতির অনুসরণে আজ সারা বাঙলা তথা ভারতের অধিবাসীরা প্রাণপণ করিতেছে!

মুটে-মজুর হাসিমুখে বাজার সারিয়া বাড়ী ফিরিতেছে, হাতে তাদের বড় ইলিস, গামছা ভর্ত্তি তরিতরকারী। পরণে ছেঁড়া ময়লা কাপড়, পায়ে চকচকে জুতা, মাথায় টেরি এবং ঠোঁট দু'খানি পানের রসে লাল টুকটুকে। কাহারও কাহারও মাথায় বিলাতী এসেন্সের উগ্র গন্ধ, কাহারও বা চক্ষু সুরাপানে রক্তবর্ণ।

জলস্রোতের মত জনস্রোত চলিয়াছে, মেরুদণ্ড কাহারও সোজা নহে। বাতের ব্যথায় ন্যুব্জ, হাত-পা ফুলা পেটের অসুখে, গলায় হাতে মাদুলীর বোঝা, জ্বরে লিকলিকে দেহ, উদরটি প্লীহায় ভরা, চক্ষু নিষ্প্রভ, গতি মন্থর। ইহারাই পল্লীবাসী, বাঙলার প্রাণ! ইহাদের লইয়া অনেকে অনেক স্বপ্ন দেখেন!

এই লুপ্তপ্রায় নদীটির মত উহাদেরও জীবনস্রোতে বালির প্রাচুর্য্য, গতিতে শৈবালরাশি। যে কোন মুহূর্ত্তে মজা নদীটির মত পঙ্ক-পানায় রুদ্ধ হইয়া যাইবার অপেক্ষা-মাত্র।

আলোকনাথ একজনকে ডাকিল।

তাহার চেহারাটা উহারই মধ্যে একটু বলিষ্ঠ। চক্ষু দু'টি হইতে দীপ্ত জীবনের আলো এখনও নিঃশেষে নিবিয়া যায় নাই।

আলোকনাথ তাহার পানে চাহিয়া কহিল, "তোমার নাম কি?"

সে বলিল, "মনিরুদ্দি।"

আলোকনাথ বলিল, "আচ্ছা মনিরুদ্দি, তোমার বাড়ীতে ক'জন লোক উপায় করে?"

মনিরুদ্দি বলিল, "আর বাবু, সবই মরে-হেজে গেল। উপায় ক'রতে এখন আমি একা।"

—"তোমার সংসারে কে কে আছেন?"

মনিরুদ্দি বলিল, "তা বাবু অনেকগুলি। আমার ছেলে-মেয়ে, আমি, বউ; এই গেল ছ'জন। বুড়ো মা আছে, দু' ভায়ের বউ আছে, ফুপু আছে।"

আলোকনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "দিনমজুরী ক'রে কত পাও?"

—"মেরে কেটে বার আনা।"

আলোকনাথ বলিল, "বল কি, মোটে বার আনা! তাতে চলে কি ক'রে?"

মনিরুদ্দি বলিল, "কি করি বাবু, ওতেই চালাতে হয়। কাপড়ে ফুল তুলে, ধান ভেনে—মেয়েরা কিছু রোজগার করে, তাতেই খোদাতালার ইচ্ছের কোন রকমে চলে যায়।"

আলোকনাথ তাহার পানে চাহিয়া কহিল, "মাছটির দাম কত?"

মনিরুদ্দি হাতের ইলিস মাছটাকে একটা দোলা দিয়া কহিল, "অনেক ক'রে ১।৵০ আনায় নিয়েছি। ১॥০ টাকার কমে কিছুতেই দেবে না, আমিও ছাড়ব না।" বলিয়া মাছ কিনিবার কৌশল ও আপনার বুদ্ধিমত্তার তারিফ করিতে লাগিল।

অলোকনাথ বলিল, "যার আয় বার আনা, তার ১।৵ আনা দিয়ে ইলিস মাছ কেনবার পয়সা কোত্থেকে জোটে বলতে পার?"

এবার মনিরুদ্দি লজ্জিত হইয়া মাথা নীচু করিল। কুণ্ঠিত স্বরে কহিল, "কি করি বাবু, ছেলেপুলেগুলো কখনও পেট ভরে খেতে পায় না, ভাল মাছ দূরের কথা! কাল ধান রোয়া হবে, নিয়ে এলাম ২৫৲ টাকা ধার করে মহাজনের কাছ থেকে। তাই ভাবলাম, রোজ রোজ 'নেই নেই' রব ত আছেই, কিনি একটা মাছ। তবু একদিন ছেলেগুলো আমোদ ক'রে খাবে। বাবু, আমি বাপ হয়েছি বটে, তাদের মুখে হাসি কখনও দেখিনি।"

আলোকনাথ তাহার পানে আর চাহিতে পারিল না। পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া চক্ষু দুটি একবার মুছিল। পরে পাঁচটি টাকা তাহার হাতে দিয়া কহিল, "সন্দেশ কিনে

খোকাদের জন্যে নিয়ে যেও, মনিরুদ্দি। ব'ল, তাদের নতুন দাদা দিয়েছে।"

মনিরুদ্দি লম্বা সেলাম করিয়া বলিল, "খোদা-তোলা আপনার ভাল করুন, বাবু।"

তার পর সে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

আলোকনাথ তাহার পানে চাহিয়া আপন মনে বলিল, "এ সংগ্রামের শেষ কোথায়? বাঙলার জল-মাটি প্রচণ্ডবেগে এদের শোষণ করছে। এক শতাব্দী পরে উর্ব্বরা ভূমি-লক্ষ্মী এই সব হতভাগ্য স্নেহবঞ্চিত সন্তানকে আপনার কোলে তুলে নেবেন। পল্লীতে থাকবে বন-জঙ্গল, অকর্ষিত জমি, আর এই সব হতভাগাদের চিতার চিহ্ন ও কবরের নিশানা।"

বাধ্য হইয়া আলোকনাথকে এখানে একদিন থাকিতে হইল।

হাটের মাঝেই একটা লোক কলেরায় অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল, কেহ মুখে জলটুকু দেয় নাই। সকলেই মুখে 'হায়, হায়' করিয়া বলিতেছিল, 'আহা! কেনা মাটি।'

আলোকনাথের শুশ্রূষার ফলে লোকটি মৃত্যুমুখ হইতে ফিরিয়া আসিল। সে শতকণ্ঠে কৃতজ্ঞতা জানাইতেই আলোকনাথ বলিল, "ভাই, আমি মানুষ, কর্ত্তব্যের বেশী ত কিছু করিনি।"

লোকটি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া আলোকনাথের পানে চাহিয়া জবাব দিল, "আপনি দেবতা, বাবু।"

আলোকনাথ হাসিয়া বলিল, "কেন, তোমার ভাই হ'তে পারি না?" বলিয়া হাত ধরিতেই লোকটি তাহার পায়ের কাছে উপুড় হইয়া পড়িয়া দু'হাত দিয়া ধূলা লইয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখিতে মাখিতে বলিল, "ও কথা বলবেন না, বাবু। আমরা গরীব, ও কথা শুনলেও আমাদের পাপ হয়।"

আলোকনাথ কিছুতেই তাহার এই অপূর্ব্ব শ্রদ্ধা টলাইতে পারে নাই। ক্ষুব্ধচিত্তে নৌকায় আসিয়া অনীতাকে বলিল, "বলতে পার, কত বৎসরের পরাধীনতার ফল এ সব?"

অনীতা বলিল, "ওর অন্যায়টা কিসের?"

আলোকনাথ কথায় জোর দিয়া বলিল, "অন্যায়? ও মানুষ হ'য়ে জন্মেছিল কেন? কেন ওর মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হ'ল না যে, মানুষের শ্রেণী দু'টো নেই—একটাই আছে। দেবত্ব জিনিষটা সময় বিশেষে মন্দ নয়, কিন্তু মনুষ্যত্বের পরিপন্থী।"

অনীতা হাসিয়া বলিল, "দাদা, তোমার হেঁয়ালি-ভরা কথা আমিই বুঝতে পারি না, তা ওরা বুঝবে কি?"

আলোকনাথ বলিল, "আচ্ছা, নৌকা ফেরাতে বলি। দেখি, এ কথাটা ওদের বুঝিয়ে দিতে পারি কি না?"

অনীতা বলিল, "ওখানেই বা যেতে হবে কেন? সব গাঁয়ের অবস্থাই ত এক। যেখানে হোক নেমে বুঝিয়ে দিতে পার।"

আলোকনাথ মাঝিদের হুকুম দিল, "বাঁধ নৌকা।"

খেয়ালী মানুষের খেয়ালে ইহারাও অভ্যস্ত। নৌকা নোঙর করিল।

গ্রাম।

সেইখানিরই মত। নদীর ধারে ক্ষেতের সারি। ছোট ছোট 'আল' দিয়া জমিগুলি পৃথক করা। কাঁটা-ভরা বাব্লা পালায় কোন কোনখানি ঘেরা, কোনটির বুকে ভগ্নপ্রায় কুটীর।

দূরে ঘন বনরেখা। তাহার মাথায় কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়া উড়িতেছে। চাষীদের বসতি ওখানে।

আলোকনাথ বলিল, "কাল সকালে ওখানে যাব আমি। দেখি, ওদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হ'য়ে মিশতে পারি কি-না?"

অনীতা বলিল, "আমায় একা নৌকায় ফেলে যাবে, দাদা?"

আলোকনাথ একটু ভাবিয়া বলিল, "তাহ'লে এক কাজ করা যাক। গাঁয়ে একখানা ঘর ভাড়া নিই। দিনকতকের জন্য পল্লী-জীবনটা উপভোগ করে যাই।"

তাহাই হইল।

নূতন ঘরে আসিয়া অনীতা তাহার নূতন সংসার গুছাইয়া লইল। আলোকনাথ পল্লী মধ্যে কৃষকদের মাঝে চলিল—সুখ-দুঃখের আদান-প্রদান করিতে।

সকলে শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে আসন পাতিয়া দিল। প্রণাম করিয়া দূরে দাঁড়াইল। আলোকনাথ এক বৃদ্ধের হাত ধরিয়া কাছে টানিতেই সে ব্যক্তি ভয়ে আঁতকাইয়া উঠিয়া দূরে সরিয়া গেল।

আলোকনাথ বলিল, "আমি মানুষ, তোমাদেরই ভাই। আমার কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছ কেন?"

বৃদ্ধ হাতজোড় করিয়া কহিল, "মুখ্যু চাষা আমরা, আমরা কি আপনার সঙ্গে এক আসনে ব'সতে পারি? মাপ ক'র বাবু।"

আলোকনাথ ব্যথিত হইয়া কহিল, "বেশ ভাই, আজ দূরেই থাক। কিন্তু জেন, একদিন না একদিন কাছে টেনে নেবই। আমরা মনে ক'রেছি একটা স্কুল খুলব। তোমাদের ছেলে-পুলেদের সেখানে পাঠিয়ো, মাইনে কিছু লাগবে না।"

আলোকনাথের পীড়াপীড়িতে তাহারা সম্মত হইল।

স্কুল খুলিল। আলোকনাথ সমস্ত মন-প্রাণ তাহাতে ঢালিয়া দিল। এইভাবে দুইমাস কাটিয়া গেল।

সেদিন আলোকনাথ বাসায় আসিয়া দেখিল, অনীতা বিছানায় মুখ লুকাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে।

বিস্মিত আলোকনাথ কিছু বুঝিতে না পারিয়া ডাকিল, "অনীতা!" অনীতা মুখ না তুলিয়াই রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "আর কতদিন এখানে থাকবে দাদা?"

বিস্মিত আলোকনাথ বলিল, "এ কথা কেন অনীতা? আমার সাধনাকে রূপ না দিয়ে আমি এখান থেকে যাব না।"

অনীতা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আমি কিন্তু এখানে এক-দণ্ডও থাকতে পারব না। আমায় মাপ ক'র।"

চৌকীর উপর বসিয়া আলোকনাথ বলিল, "একথা কেন অনীতা, তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে?"

এইবার অনীতা মাথা তুলিয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে কহিল, "কষ্ট! গরীবের মেয়ে আমি অনেক সহ্য ক'রেছি। কোন কষ্টই আমাকে কষ্ট দিতে পারে না।"

—"তবে?"

অনীতা মুখ অন্যদিকে ফিরাইয়া কহিল, "তোমাকে কি ব'লব দাদা, জানি না তুমি শুনেছ কিনা, আমাদের নামে, ...না, না আমি এখানে থাকতে পারব না।"

আলোকনাথ মৃদু নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "বুঝেছি। আমি মনে করেছিলুম, মিথ্যা কথায় তোমার কোন কষ্ট হবে না। অজ্ঞাত, অপরিচিত নরনারীর সম্বন্ধ নিয়ে মূর্খেরা চিরকাল এমনই রটনা ক'রে থাকে। তাতে কান দিতে গেলে চলে না।"

অনীতা বলিল, "তুমি বাইরে থাক, কতটুকুই বা এর জান? কিন্তু দিনরাত ত আগুনে পুড়িয়ে মারে আমাকেই। দোহাই দাদা, আমায় না হয় বোর্ডিংএ রেখে এসে তোমার পল্লীজীবন যাপন কর।"

আলোকনাথ মাথা নাড়িয়া হতাশাভরে বলিল, "না অনীতা, এদের মিথ্যার মূল্য নিয়েই এরা থাক। কালই আমরা চলে যাব। অনেকটা গড়ে তুলেছিলাম এ গাঁখানিকে, কিন্তু হ'ল না।

অনীতা উঠিয়া বসিল। দৃপ্তকণ্ঠে কহিল, "গ'ড়ে তুলতে একটুও পারনি দাদা, এ আমি জোর গলায় ব'লতে পারি। ওরা তোমার সামনে ভাল মানুষটির মত ঘাড় নীচু ক'রে দাঁড়ায়; কিন্তু তুমি চ'লে গেলে তোমারই নিন্দার শতমুখ হয়। পরশু মোড়লের বউ আমায় বল্‌লে 'তোমরা কতদিন এ গাঁয়ে থাকবে গা?' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন?' সে বল্‌লে, 'লেখাপড়া শিখে ছেলেগুলো বড় ব্যাদড়া হ'য়ে যাচ্ছে, ক্ষেতে খামারে যেতে চায় না। কর্ত্তাদের কথাও শোনে না। আমাদের চাষাদের ঘরে কি ও-সব খিষ্টেনী চলে, মা? কর্ত্তারা ব'লছিল, আর দিন কতক দেখে পাঠশালা বন্ধ ক'রে দেনে, ঘোঁট ক'রবে।"

আলোকনাথ যেন আকাশ হইতে পড়িল। বলিল, "বল কি অনীতা, তারা এমন?"

অনীতা বলিল, "তারা যা ব'লেছে, তাই বলছি। তারপর আমার কথা নিয়ে পাকে-প্রকারে অনেক কথাই বল্‌লে। তোমার ক্ষমতা আছে, টাকা আছে, তাই তারা চুপ ক'রে স'য়ে আছে। নইলে—"

—"নইলে কি ক'রত অনীতা?"

আলোকনাথের পাংশু মুখের পানে চাহিয়া অনীতার চক্ষু অশ্রুবাষ্পে ভরিয়া উঠিল। সে ধরা গলায় কহিল, "থাক, সে আর শুনে না। শুনলে ব্যথা পাবে। তোমার মন আমি ত জানি দাদা। তাতে যারা এমন কালি ছিটিয়ে দিতে পারে, তাদের অন্ধকারে প'চে মরাই ভাল।"

আলোকনাথ ম্লান হাসিয়া বলিল, "অনীতা, তোমার বড্ড রাগ হয়েছে। ওদের দোষ কি বোন, আমারই অযোগ্যতা। না সহ্য ক'রলে কি পাওয়া যায় কিছু?"

অনীতা ঈষৎ বেগের সহিত বলিল, "সহ্যেরও ত একটা সীমা আছে! এরা গরীব—মূর্খ, কিন্তু ভালমন্দ বোঝবার জ্ঞানটুকুও কি এদের নেই?"

আলোকনাথ বলিল, "ওদের স্থূলদৃষ্টিতে ভালমন্দ যা বোঝে, তাতে মাঠখানির বাইরে চাইবার দৃষ্টিশক্তি ওদের নেই। ভালমন্দ ওদের সংসারের ছোটবড় কাজে, ক্ষেত-খামারের মধ্যে। আমার শিক্ষা যদি ওরা ভুল ক'রেই বুঝে থাকে, সে দোষ আমারই—ওদের নয়।"

অনীতা কোন কথা কহিল না।

আলোকনাথ বলিতে লাগিল, "কিন্তু অনীতা, আজ আমার সব চেয়ে বড় দুঃখ এই যে, ইচ্ছা থাকলেও ক্ষমতা আমার নেই। বড় বড় কল্পনা আছে, কাজের ক্ষেত্রে এসে সব মিলিয়ে যায়।"

শেষের দিকে হতাশায় তাহার কণ্ঠস্বর ভাঙ্গিয়া পড়িল। শূন্যদৃষ্টিতে আলোকনাথ বাহিরের পানে চাহিয়া রহিল।

অনীতা বলিল, "তুমি একদিন ব'লেছিলে দাদা, সকলের সব যোগ্যতা থাকে না। যে যেটুকু পারে—তার কাজের সার্থকতা সেইটুকুতেই। লাঙ্গল থেকে ছাড়িয়ে এনে ওদের যদি কবিতা লিখতে অভ্যাস করাও ত সে হবে হাস্যকর! ওরাও না পারার দরুন লজ্জায় মাথা হেঁট ক'রবে, তুমিও নিজেকে দোষী মনে ক'রবে। তেমনি কবিতা ছেড়ে লাঙ্গল হাতে নিলেই ফসল ফলান যায় না।

আলোকনাথ বলিল, "অর্থাৎ আমার দ্বারা এই কাজ হবে না। কল্পলোকই আমার কাজের ক্ষেত্র! আচ্ছা অনীতা, কবিরা সকলেই কি অকেজো? তারা চিরকাল বড় বড় কল্পনা নিয়ে মিছে সময় নষ্ট করবে?

অনীতা বলিল, "তাদের কল্পনা রূপ পাবে কর্ম্মীর হাতে। তুমিই ত একদিন ব'লেছিলে, আবার ভুলে যাও কেন? তোমার কাজ—সৃষ্টি করা, তাদের কাজ—"

আলোকনাথ বলিল, "তাদের কাজ সংসারের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। যাই হোক, আমার জীবনে কেমন যেন বিতৃষ্ণা ধ'রে গেছে। কাজে নেমে অসম্পূর্ণ রেখে চলে যাচ্ছি, এ আক্ষেপ জীবনে যাবে না। দুঃখকে আমরা সাহিত্যে রূপ দেব, অনুভব ক'রে নয়—কল্পনায়। কল্পনা যার যত প্রখর, রূপ তার তত সুন্দর। কিন্তু অনীতা, আসল দুঃখের ক্ষেত্রে নেমে কেমন যেন সব গোলমাল হ'য়ে যাচ্ছে। যে সমস্যা আমাদের নয়, তাকেই আমরা বড় ক'রে দেখি। যে দুঃখ এদের নয়, তারই ব্যথায় আমরা লেখনীকে কাঁদাই। কোন্ দেশের দুঃখের কাহিনী কোন্ দেশে টেনে এনে হা-হুতাশ করি, তাই বা কে বলতে পারে?"

আলোকনাথ বাহিরে আসিয়া মোড়লকে ডাকিল।

পাশেই তাহার বাড়ী। ছুটিতে ছুটিতে সে আসিয়া দাঁড়াইল।

আলোকনাথ বলিল, "কালই আমরা চলে যাব, মোড়ল।"

মোড়ল বলিল, "আর দু'দিন থেকে গেলেন না কেন, বাবু?"

আলোকনাথ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া বলিল, "তোমাদের সত্যিকার ইচ্ছা কি তাই বল, মিথ্যা বল না।"

মোড়ল কোন উত্তর না দিয়া অধোবদনে মাথা চুলকাইতে লাগিল।

আলোকনাথ বলিল, "তবে শোন, দু'দিন নয়—চিরদিন তোমাদের সঙ্গে বাস ক'রব ব'লে এসেছিলাম, তোমরা ঠাঁই দিলে না আমাদের। আমাদের দোষ কি জানি না, কিন্তু মন খুলে তোমরা মিশতে পারলে না। আমি যতই কাছে টেনেছি, তোমরা ততই দূরে চলে গেছ। তোমাদের দোষ কি জানি

না ভাই, আমার দোষটাই যেন বেশী ক'রে আমায় পুড়িয়ে মারছে।"

মোড়ল আলোকনাথের কথায় কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার পায়ের নিকটে অবনত হইয়া বলিল, "আপনি দেবতা, আমরা মুখ্যু মানুষ, তাই কাছে আসতে পারি না। সবাই আমরা চাষা, ভালমন্দ জানি না। দয়া ক'রে রাগ ক'রবেন না, বাবু।"

ম্লান হাসিয়া আলোকনাথ বলিল, "রাগ! না পাগল, রাগ আমি করিনি।"

মোড়ল বলিল, "বাবু, কথায় বলে চাষার বুদ্ধি। তোমার কথা নিয়ে কত ঘোঁট হয়ে গেছে আমাদের; কেউ ভাল ব'লে মানে নি। তোমরা বাবু বড়লোক, তোমরা কি গরীবের দুঃখু বুঝতে পার? পাঠশালা হ'য়ে আমাদের কি লাভ হবে। ধানের জমি নেই, পরণে কাপড় নেই, মহাজনের ঠেলা; কাচ্চা-বাচ্ছা নিয়ে আধ-উপোসী হ'য়ে দিন কাটাতে হয়। বর্ষার দিন মাথার ওপর দিয়ে যায়—জ্বরে রোগে ধুঁকে। কিন্তু ঘর খুঁজলে দু'টা টাকা মেলে না, সব মহাজনের সুদ দিতে যায়—।"

আলোকনাথ বলিল, "এ-সব অত্যাচার যাতে আর না হয়, তা-ত অনেকদিন তোমাদের ব'লেছি। কিন্তু সাহস তোমাদের নেই।"

মোড়ল বলিল, "পেটে দু' মুঠো না গেলে গায়ে জোর হয় না। গায়ে জোর না হ'লে সাহস কোথা পাব, বাবু?"

আলোকনাথ বলিল, "আমি যদি সে ব্যবস্থা করি, তোমরা শুনবে সেকথা?"

মোড়ল মাথা নীচু করিয়া অস্পষ্টস্বরে কহিল, "তুমি বাবু আর এখানে থেক না, লোকে সন্দেহ করে।"

—"কেন, আমার দোষ?"

মোড়ল হাতজোড় করিয়া কহিল, "ব'লেছি ত বাবু—আমরা মুখ্যু।"

আলোকনাথ শুষ্কহাস্যে কহিল, "মোড়ল, তোমাদের সন্দেহ যা নিয়ে আমি বুঝি। যদি—না থাক, কালই আমি চলে যাব। চাষা ভাইদের ব'ল, আমার ওপর যেন রাগ না করে। আমি ভগবানের নাম নিয়ে ব'লছি কোন মন্দ কাজ ক'রে এখানে লুকাতে আসিনি; বা কোন মন্দ অভিপ্রায়ও আমার ছিল না।"

মোড়ল কথা না বলিয়া আলোকনাথের পায়ে প্রণাম করিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

আলোকনাথ অনীতাকে ডাকিয়া বলিল, "ডাক এসেছে অনীতা, সংসার ভেংগে দাও। কালই আমরা যাত্রা ক'রব।"

(ক্রমশ)

খুকুর বাঁশী

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী

খুকুর বাঁশীটি ফেলে গেছে ভুলে
তুলিয়া রেখেছি তাকে
নীরব ভাষায় ঐ বাঁশী যেন
খুকুকে কেবল ডাকে।
বেড়ানোর পথে খুকুর কথায়
কিনেছিনু ঐ বাঁশী
সারাদিবসের বাঁশীটি ফেলিয়া
খুকু চলে গেছে হাসি'।
এক পয়সার বাঁশীর মর্ম্ম
তুমি কি বুঝিবে হায়,
কত যে উহাতে স্মৃতির মুলো
যতনে রেখেছি তায়!
একটানা সুরে বাজায়ে সে বাঁশী
কত যে আমোদ পেত
সে সুর তখন মরমে মরমে
হৃদয়ে পশিয়া যেত।

আধেক নিশীথে এখনো যে শুনি
খুকুর বাঁশীটি বাজে,
পুরানো সে সুর রহিয়া রহিয়া
ঘুরে ঘুরে সব কাজে!
আজো যে কাঁদায় ভোলা নাহি যায়
সেই কথা, সেই মুখ—
চাঁদের বরণ ফুলের গড়ন
দেখিলে ভরিত বুক।
অবহেলে আজ ফেলে সে গিয়েছে
বুঝেছে মুল্যহীন,
এখন সে খুকু সেই বাঁশী শুনে
জাগিবে না কোন দিন!
দুঃখময় সুর তবু সে মধুর
নয়নে যে আনে জল,
ফুল ঝরে' গেছে কবে, তবু তার
জেগে আছে পরিমল!

যুক্তরাজ্যে উদয়শঙ্করের প্রভাব

শ্রীমতী কমলা মুখার্জ্জি, নিউইয়র্ক

বিলাস-নৃত্যে উদয়শঙ্কর ও জোহরা

বাঙলার গৌরব ভারতমায়ের কৃতী-সন্তান উদয়শঙ্করের নৃত্য-প্রভাব যুক্তরাজ্যে কি রকম প্রসার লাভ করেছে, তা দেখ্‌লে বাস্তবিকই বিস্মিত হ'তে হয়। প্রতীচ্যের আবাল-বৃদ্ধবনিতা, যে কেউ উদয়শঙ্করের অপূর্ব্ব নৃত্যভঙ্গী দেখেছে তাদের সঙ্গে আলাপ হ'লেই বলে, "ভারতের নৃত্য-কলা যে এত সুন্দর তা আমার ধারণাতীত ছিল। কি চমৎকার ভাবের অভিব্যক্তি! কি অদ্ভুত কল্পনা! পৃথিবীর অন্য কোথাও বোধ হয় এমন উচ্চতর ধরণের নৃত্য নাই। উদয়শঙ্করকে দেখলে মনে হয় সে যেন Symphony Orchestra! অর্থাৎ সকল বাদ্য-যন্ত্রের সমাবেশে- সুরে, তালে, লয়ে যে অপূর্ব্ব একতান শ্রুত হয়, উদয়ের দেহশ্রী ও নৃত্য-ভঙ্গিমা পাদ-প্রদীপের সামনে সেই রকমই মনে হয়।" এখানকার একজন বিখ্যাত অভিনেত্রী একদিন বলেছিলেন, "নৃত্যশিল্পের জন্য আমি কেবল মেয়েদেরই পছন্দ করতাম, পুরুষ শিল্পী দ্বারা কখন আকৃষ্ট হই নাই। কিন্তু উদয়ের নাচ দেখে আমার রুচি বদলে গেছে। আমি তাঁর নৃত্যে মুগ্ধ, তাই যখন যেখানে সুযোগ পাই উদয়ের নাচের কথা না বলে পারি না। উদয়শঙ্করের নৃত্য শুধু ভারতের নয়, সমস্ত বিশ্বের গৌরবের বস্তু। যে আনন্দ মানুষকে সাংসারিক সকল দুঃখ ও দুর্ভাবনা থেকে এক নূতনতর জগতে নিয়ে যায়, তা যে দেশেরই নিজস্ব বস্তু হোক না কেন, সারা বিশ্বের সকল নৃত্যানুরাগীরই তাতেই দাবী আছে।"

মনে পড়ে গত বছরের প্রথম দিকটার কথা। এক সন্ধ্যায় কার্নেগী হলে (Carnegie Hall) উদয়শঙ্করের নাচ। বিখ্যাত ও বিশাল কার্নেগী হলের চারিপাশের রাস্তায় জনতার ভীড়ে চলা নিতান্ত মুস্কিল। (এ দেশের লোকগুলি ধুতি ব্যবহার করে না, নতুবা, এই ভীড়ের ঠেলা-ঠেলিতে হয় তো অনেককে দিগম্বর হয়েই ফিরতে হ'ত!) এবং এই ভীড় ও ঠেলাঠেলি সামলাতে পুলিশের ভীড়ও বড় কম নয়। কিন্তু "চোরে না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী।" পুলিশই বুঝি "পুলি পিঠে" হয়ে যায়! Box office-এ অতিরিক্ত লোক রেখেও সময়ে টিকিট দিতে দেরী হ'য়ে যাচ্ছে; কিন্তু এই বিলম্বে ও ঠেলাঠেলিতে কারও ধৈর্য্যচ্যুতি হচ্ছে না, বরং সকলেই যেন বেশ একটা আনন্দানুভব করছে। ভারতের গৌরব, নটরাজ উদয়শঙ্করের নৃত্য; তাই সকলের মুখে কেবল উদয়শঙ্করের কথা। কেবল একজন বাঙালী আমার পাশে দাঁড়িয়ে আক্ষেপ করছিলেন যে, এই উপলক্ষে দশ সেণ্ট খরচ করে তার জুতা পালিশ করিয়ে এনেছিলেন, কিন্তু কেউ তা দেখবার আগেই লোকে পদদলিত করে সব নষ্ট করে দিল! সান্ত্বনা দিলাম এই বলে যে, আজকের এই সুন্দর রাতে এই ভীড় শুধু উদয়শঙ্করের নৃত্যরত পায়ের দিকেই তাকিয়ে দেখবে ও আনন্দ পাবে আর কারও দিকে নয়; অতএব শান্ত হও।

কার্নেগী হলে পাঁচ হাজার লোক একত্রে বসে সঙ্গীত শুনে থাকে। পৃথিবীর খ্যাতনামা শিল্পীরা এই হলে বাদ্য-

যন্ত্রের ঝঙ্কার তুলে নাম, যশ ও প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করে থাকেন। কিন্তু সেদিন ছিল উদয়ের নাচ। বাইরে কন-কনে শীতের হাওয়া ও বরফে আবৃত নিউ-ইয়র্কের রাস্তাগুলি হয়েছিল অত্যন্ত পিচ্ছিল। কার্নেগী হলের সামনে লোকের ভীড়ে রাস্তার মোটরগুলিকেও 'কচ্ছপ গতি'তে চলতে হচ্ছিল। ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে নানা লোকের নানা মত ও নানা কথা শুনে বেশ আনন্দ উপভোগ করছিলাম।

ভারতীয় সংগীত, সাধারণত এদেশবাসীদের কানে শ্রুতি-মধুর নয়; নৃত্যের অঙ্গ-ভঙ্গিমারও এদেশের নৃত্যের তুলনায় পার্থক্য অনেক; কিন্তু সৌন্দর্য্যানুরাগী যারা, তারা সব দেশের কলা-সৌন্দর্য্য থেকে রসাস্বাদ পেতে পারে। ভারতের নৃত্য এদেশবাসীদের কাছে যে কত চিত্তাকর্ষক তা টের পেলাম সেদিন লোকের ভীড় দেখে ও গভীর ও ঘন করতালির শব্দ শুনে। রঙ্গ-মঞ্চের পর্দ্দা উঠল, পাদ-প্রদীপ জ্বলে উঠ্‌ল। একের পর এক উদয়শঙ্করের অপূর্ব্ব নাচ আরম্ভ হ'ল। ইন্দ্র নাচটি মার্কিনদের বড় প্রিয়। এই নাচ শেষ হবার সঙ্গে কয়েক হাজার নর-নারীর যুক্ত করতালিতে মনে হয়েছিল বুঝি-বা প্রচণ্ড শিলা-বৃষ্টি পড়ছে। উদয় পাদ-প্রদীপের সামনে দাঁড়িয়ে করজোড়ে এই বিরাট জনতাকে বহুবার নমস্কার জানিয়েও যখন তাদের ঠাণ্ডা করতে পারলেন না, তখন আবার তাঁকে সেই নাচের কিয়দংশ পুনরাবৃত্তি করতে হ'ল; তাও আবার বিনা সঙ্গীতে! এদেশের লোকের তাতে বিস্ময়ে তাক্ লেগে যায়। যুক্তরাজ্যের "হুজুগে" লোকদের এই রকম হুজুগ দেখে মনে হয়েছিল, যা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও মানুষের মনে বিমল আনন্দ আনে, তার কোন জাতিভেদ, ধর্ম্মভেদ নাই। সে প্রাচ্য বা প্রতীচ্যের সংকীর্ণ প্রাচীর ঘেরার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, ছড়িয়ে পড়ে—দেশ, পাত্র বা কালের অতীত দিগন্তে—যেখানে অসীমের প্রেমগুঞ্জন।

আমেরিকার নৃত্যানুরাগীরা উদয়শঙ্করের নাচ প্রাণ দিয়ে ভালবাসে সত্য, কিন্তু উহা যে কারও শারীরিক অসুস্থতায় "টনিকের" মত কাজ করে ইহা আমার এর আগে জানা ছিল না। আর এক দিনের কথা মনে পড়ছে। নাচ আরম্ভ হ'তে তখনও ১৫ মিনিট বাকী। "হংস মধ্যে বক যথা" হ'য়ে ২।৪ জন ভারতবাসী এদিকে ওদিকে পায়চারী করে যেন মার্কিন শ্বেত-পদ্মদের জানিয়ে দিচ্ছিলেন যে, তাঁরা উদয়-শঙ্করের মত খ্যাতনামা শিল্পী না হ'লেও প্রায় কাছাকাছি! নানালোকের নানা ভাব-ভঙ্গী দেখতে দেখতে ও পরিচিত ও অপরিচিতের সঙ্গে আলাপে সে কয় মিনিট বেশ জমে গেল। যেন একটা হিন্দু বিয়ে বাড়ীর বিরাট উৎসব। এই রকম হাসি-আনন্দের মেলাতে হঠাৎ একটি মহিলার আগমন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। কারণ তিনি সাধারণের মত নন। নিজে হাঁট্‌তে পারেন না। তাঁর মোটর চালক ও অন্যান্য লোকের সাহায্যে অতিকষ্টে এসে এখানে পোঁছেন। কাছে যেয়ে আলাপ করে জানলাম, তাঁর বয়স ৮১ বৎসর। বয়সের আতি-শয্যে ও একটা মোটর দুর্ঘটনায় তাঁর দেহ এখন প্রায় পঙ্গু। নিজে হাঁট্‌তে অক্ষম। তাই wheel chair-এ বসিয়ে তাঁকে হলে আনা হয়েছে। তাঁর শারীরিক দুরবস্থা দেখে দুঃখিত হলাম। কিন্তু মনের উৎসাহ দেখে বিস্মিত ও সুখী হলাম। মৌখিক আলাপের পর মহিলাটি বললেন, "উদয়শঙ্করের এদেশে প্রথম থেকে আসা অবধি আমি তার নাচের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত, এবং যতবারই দেখেছি, প্রতিবারই নূতন নূতন রূপে দেখেছি। এই সেদিনও আমার গায়ে ও পায়ে বেশ জোর ছিল এবং আমিও তোমাদের দশ জনের মতই স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতাম। কিন্তু গত বৎসর একটা মোটর দুর্ঘটনায় প'ড়ে আমি প্রায় মরতে মরতে বেঁচে গেছি। হাসপাতালের বিছানায় ডাক্তার ও নার্সদের সুতীক্ষ্ণ নজরে তিন মাস মরণাপন্ন অবস্থায় কাটিয়ে অপেক্ষাকৃত সুস্থতা লাভ করেছি। বার্দ্ধক্যের দরুন কতকটা এবং মোটর দুর্ঘটনার দরুন কতকটা, আমি এখন পঙ্গু। তাই লোকের সাহায্য ব্যতীত স্বাধীনভাবে চলাফেরা এখন আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার দিন যে আগতপ্রায় তা ডাক্তাররা আমার মুখের সামনে স্পষ্ট না বললেও তা আমি বুঝি। তবে আমি এটুকু জানি যে, দেহ আমার বার্দ্ধক্যের ভারে চলতে অক্ষম হ'লেও মনেপ্রাণে এখনও নবীন আছি। উদয়শঙ্করের সুমোহন নৃত্যই আমাকে তাজা করে রেখেছে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি সে যেন জগতকে এমনই আনন্দ দেয়।" এই মহিলাটি একটি বিশিষ্ট ধনীর কন্যা ও ধনীর গৃহিণী। ভারতের প্রতি অগাধ ভালবাসার পরিচয় তাঁর প্রতি কথার সঙ্গেই পাওয়া যায়।

নিউ-ইয়র্কের একজন বিখ্যাত চিত্র-শিল্পী একদিন বলেছিলেন, "উদয়কে আমরা চাই, তাঁর অপূর্ব্ব নৃত্য নৈপুণ্য ও ঈশ্বর-দত্ত দৈহিক গঠন ভারতীয় নৃত্যের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। আশা করি সে তার স্কুল স্থাপনের জন্য এত শীঘ্র রঙ্গমঞ্চ হ'তে অবসর নিয়ে আমাদের হতাশ করবে না।"

আর একটি লোকের কথা না লিখে পারছি না। দর্শক তরুণ যুবক। শিশুকালে পক্ষাঘাত হওয়ার দরুন বর্ত্তমানে সে পঙ্গু। ইণ্টারমিশনের সময় আমার সঙ্গে আলাপের জন্য নিতান্ত উৎসুক। কিন্তু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার শক্তি নাই বলে তার সঙ্গিনীকে প্রথম আমার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য পাঠিয়েছে। তার দুরবস্থার কথা শুনে, তার কাছে গেলাম, এবং নাচ কেমন লাগল জিজ্ঞাসা করলাম। আনন্দে তখন তার মুখখানা ভ'রে গেছে। উদয়ের নাচের প্রশংসা সে বহুকাল থেকে শুনে এসেছে, কিন্তু কখন কল্পনায় আনতে পারেনি যে, ভারতীয় নাচ এত সুন্দর ও প্রাণবান হতে পারে। শারীরিক অক্ষমতা ও দরিদ্রতার দরুন এ-যাবত তার উদয়ের নাচ দেখার সুযোগ ঘটে নি, কিন্তু আজ নাচ দেখে তার এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে, সে এই রকম প্রাণ-মন মুগ্ধকর নাচ মাঝে মাঝে দেখতে পেলে তার নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরে পেতে বেশী দেরী লাগবে না। আমেরিকার নানা বয়সের, নানা অবস্থার, নানা ধর্ম্মের লোকের মুখে উদয়শঙ্করের বহুমুখী প্রশংসা আজও কানে ঝঙ্কার দেয়। সকলের মুখে উদয়শঙ্করের প্রশংসা যেন বৈদ্যুতিক গতিতে ছুটে চলেছিল; এবং মনে হয় আজও যেন সে গতি থামে নাই। যেখানে যখন যে কোন কিছু দেখলে উদয়ানুরাগীরা জিজ্ঞাসা করে, "উদয় কবে ফিরে আসছে জান?"

(শেষাংশ ১৬৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সত্য ও মিথ্যা

(গল্প)

শ্রীবিমলকান্তি সমদ্দার

আজকের এই সত্তর বছরের বুড়োর কথা ভুলে যাও। তার শিরাবেরকরা বিপুল হাত দুখানা, তার বসে যাওয়া দুটো চোখ, তার ধরা-গলায় আর্ত্তনাদের মত অস্ফুট চীৎকারের কথা মনে রেখ না। কল্পনা কর—পঁচিশ বছরের একটি বাঙালী যুবক; স্বাস্থ্যবান, দীর্ঘ, বলিষ্ঠ তার দেহ, অর্থচিন্তা তার অজানা, হাতে তার গুলী ভরা রাইফেল, সুন্দরবনের নিবিড় জঙ্গলে তাঁবু ফেলেছে—আজ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর আগে। সুন্দরবনের পূর্ব্বে নিবিড় বন-জঙ্গল গাছের সারির ভিতর থেকে উঠছে আরক্ত প্রভাত সূর্য্য। তার অরুণ আলোর রেখা ঝলমলিয়ে তুলেছে শিশির ভেজা গাছের আগা; আর তরুণ শিকারী—পিঠে তার খাবারের থলে, চায়ের ফ্লাস্ক, বুকে বাঁধা গুলীর ব্যান্ড, বুলডগ নিয়ে নেমেছে শিকারে,—যেন গ্রীক বনদেবতা প্যান্-এর সহচর। এই হাড়বেরকরা ধনুকের মত চেহারাওয়ালা এই বুড়োই পঁয়তাল্লিশ বছরের আগেকার মৃগাঙ্ক। হায়রে! যাক্, দুঃখ প্রকাশ করার মত, পুরান দিনের কথা নিয়ে কাঁদুনি গাইবার মত দুর্ব্বল আজও ভগবান করেন নি,—তাঁকে ধন্যবাদ। ওতে আমার প্রভাত-আলোর মত উজ্জ্বল সেই বিগত জীবনধারা ঘোলা হয়ে ওঠে। সে থাক,—সে আক্ষেপ করব না। সেই পুরান শিকারী মৃগাঙ্কর একটা রাত্রির একটা ঘটনা—যা এই সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর পার হয়ে এসেও ক্লান্ত ম্লান হয়নি, তাই বলেই আমি থামব।

আমি ছিলাম স্ত্রী-বিদ্বেষী, যাকে বলে মিসোজিনিষ্ট। মনে করতাম, নির্ম্মল পবিত্র জীবনের এরা অন্তরায়। দাম্পত্য-জীবন, আমার মনে হত, অশ্লীল, স্বাভাবিক দেহ ও মনের স্বাস্থ্যের বিরোধী। আমি তাই অবিবাহিত। কিন্তু আমার জীবনে এমন একটা মুহূর্ত্ত এসেছিল, হঠাৎ এমন একটা ঘূর্ণিবাতাস উঠেছিল যে, আমার ধারণার মূল ভিত্তিটা ভূমি-কম্পের মত ভীষণ নাড়া দিয়ে উঠেছিল। জোয়ারের জল এসে বালু-খ'য়া নদীতীরকে আচমকা কেমন একটানে বুকের মধ্যে টেনে নেয়, নিজের চোখে দেখেছ কেউ?

কবিত্ব করছি না, কল্পনা নয়। আমার ঘটনা শোন তার পরে বিচার ক'র, ধারণাটা আমার ভাঙল কেমন করে। আমি যেখানে থাকি তার এক মাইল উত্তরে তখন কুলী লাগিয়ে বন আবাদ করা হ'চ্ছে। ওখানে দুটি ছোট মুদী-দোকান আছে, হাট-বাজার কিছু নেই, কারণ কুলীরা বরাবর এক জায়গায় থাকে না। অফিসার থাকেন আরও এক মাইল উত্তরে।

সেদিন আমার রসদ ফুরিয়ে গিয়েছিল, তাই আবাদী জায়গার কুলীদের দোকানে চললাম। অন্তত সাত আট দিনের জিনিষ একসঙ্গে আনতে হ'বে। সঙ্গে চলল কুকুর আর রাইফেল—যদি পথে কিছু মেলে যাবার সময়; আসবার সময়ে অন্ধকার হয়ে যাবে তখন আর সুবিধে হবে না।

যাবার পথে দু'-একটা খরগোস চোখে পড়ল, কিন্তু গুলীর ঘায়ে তারা কেউই পড়ল না। ফেরবার পথে, বা কিছু কিনেছিলাম, নিয়ে দোকান থেকে বেরোতেই আরম্ভ হ'ল বৃষ্টি। দোকানে দাঁড়াব ভেবেছিলাম, দুটো দোকান-ই দিলে বন্ধ করে। বললে,—"বাবু বন্ধ যদি না করি, কুলীগুলো এক্ষুণি তাড়ি খেয়ে এসে বীভৎস কান্ড সুরু করবে। দিনে অমন শান্ত দেখেন, কিন্তু তাড়ি খেলে—"

বুঝলাম, আশ্রয় মিলবে না। বুলডগটা নিয়ে একটা বড় গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ভিজছি, আর জল পড়ে ঠোঙার মধ্যের আটাগুলো আপনা থেকেই ডেলা পাকাচ্ছে। হঠাৎ চোখে পড়ল, বেশী দূরে নয়, কাছেই একটা ছোট মেটে ঘরে আলো জ্বলছে। মনে করলাম, কোন কুলী-সর্দ্দারের ঘর। কুকুরটা নিয়ে এগিয়ে দরজায় ধাক্কা দিয়ে বললাম,—"কেয়াড়ি খোল।"

পরিষ্কার বাঙলায় মেয়েলি গলায় প্রশ্ন হল,—কে?

দরজা খুলে গেল। চেয়ে দেখি একটি বাঙালী মেয়ে—যুবতী। ভদ্র-ঘরের মেয়ের মত চেহারা, কপালে সিঁদুর, কিন্তু ময়লা ছেঁড়া কাপড় বয়সটাকে একটু চাপা দিয়েছে। আমি ঘরে উঠে দাঁড়াব কি না ভাবছি, মেয়েটি বললে,—"আসুন। বৃষ্টিতে খুব ভিজে গেছেন।"

সহসা আমার সমস্ত শরীর শিউরে উঠল। কৌতূহল হ'ল, এই বাঙালী মেয়েটি কি করে এতদূরে এসে পড়ল, এই খবরটা জানবার জন্যে। ঘরে ঢুকলাম। দরজার কাছে কুকুরটা দাঁড়িয়ে রইল। আমি ঘরে ঢুকতে প্রদীপের সলতেটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে আমার দিকে চেয়ে-ই সে চেঁচিয়ে উঠল—"আপনি?—তুমি তুমি?"

আমি অবাক্ হয়ে গেলাম। পাগল না কি?

—"তুমি? আমায় চিনলে না, তুমি? আমায় চিনতে পারলে না?" বললাম—"আমি ত কিছু বুঝতে পারছি না! এর মানে কি?" মেয়েটি কাঁপতে কাঁপতে বলল,—"মানে? মানে আমি বলছি। বলত তোমার নাম।'

'শ্রী'-সুদ্ধ নামটা বললাম। মেয়েটি চেঁচিয়ে উঠল—"কি? কি বললে? তোমার নাম অজিত ঘোষাল নয়?" বললাম,—"বাপ-মা আমার নাম অজিত ঘোষাল রাখেননি বলে এই পঁচিশ বছর পরে তাঁদের দোষ দেওয়ায় লাভ নেই। কিন্তু ব্যাপারটা কি?"

ও বলে উঠল—"ঠাট্টা রাখ। হ'লে কি হয় এক রাত্তিরের জানাশুনা, তবু তুমিই আমার সব, জানি আমার এ অপরাধের ক্ষমা নেই। তবু ক্ষমা কর।" বলে কেঁদে আমার পা জড়িয়ে ধরল। বাধা দিয়ে পা সরিয়ে নিয়ে বললাম—"এসব বাজে কথার মানে কি?" ও চেঁচিয়ে উঠে বললে,—"মানে? এই দেখ মানে' বলে আঁচল থেকে একটা চিঠি খুলে ছুড়ে আমার দিকে দিল। কুড়িয়ে দেখলাম উপরে লেখা,—শ্রীমতী চারুবালা দেবী, শ্রীচরণেষু। অশ্রুবিকৃত সুরে ও বললে—"এখানকার অফিসারের স্ত্রী।"

প্রদীপটা বাড়িয়ে নিয়ে পড়তে আরম্ভ করলাম।

"শ্রীচরণেষু—আপনার সঙ্গে কথা বলে বুঝেছি, আপনার দয়ার প্রাণ তাই এই চিঠি লিখছি। কেন কিসের জন্যে বাঙলা-দেশের এই প্রান্তে আমার ঘর থেকে তাড়িত হয়ে কুলীমেয়েদের সঙ্গে ভিড়ে এখানে এসেছি, মেয়ে হ'য়ে যখন সংসারে এসেছেন, তখন তা' আপনি নিশ্চয়ই বুঝবেন। ভদ্রঘরের মেয়ে বিপদে পড়ে ভিক্ষা চাচ্ছি, বিমুখ করবেন না। মনের সব ঘৃণিত গোপন কথা আজ আপনাকে খুলে জানাচ্ছি, আপনার কাছ থেকে উপকারের আশায়।

২৪-পরগণার দমদমের নাম জানেন বোধ হয়, ওরই কাছে গৌরীপুর গ্রাম। আমার বাবার নাম কৃষ্ণদাস মুখোপাধ্যায়। টাকার অভাবে যখন বয়স ষোল পেরতেও বিয়ের নাম গন্ধও ঘরে উঠল না, তখন বাইরে তা' নিয়ে অনেক কলরব উঠল। বাবা ক্রমে ক্রমে ভুলে গেলেন, সময় মত বিয়ে দিতে না পারার অপরাধ তাঁর, আমার নয়। ঝি-চাকরের উপরেও লোকে যে রকম ব্যবহার করে না, মুখবুজে তাই আমায় সহ্য করতে হ'ত, চোখের জল ফেলতে হ'ত আড়ালে। এমন সময়ে আমার কপাল পুড়ল। আমি ভালবেসে ফেললাম আমারই সমবয়সী আমাদের প্রতিবেশী একটি ছেলেকে। আমাদের বিয়ে হবে কি না, তা' নিয়ে আমাদের মনে কোন প্রশ্নই ওঠে নি। কিন্তু তিন বছর পরে আপনা থেকেই ওই প্রশ্নটা এসে সামনে দাঁড়াল, তখন আর তাকে অবজ্ঞা করা গেল না। আমি আশ্বাস পেলাম সে আমাকে বিয়ে করবে। কিন্তু কি করে যে বিয়ে সম্ভব হবে তা আমি তলিয়ে দেখিনি। আমার বাবার মেয়ের উপর মর্জ্জি তেমন প্রসন্ন ছিল না, বংশমর্য্যাদার উপর যেমন ছিল। কুলীনের মেয়ে শ্রোত্রিয়ের হাতে দেওয়ার আগে যে যমের হাতে দিতে তিনি রাজী, সে কথা উনিশ বছরেও আমার খেয়াল হ'ল না কি করে, তাই ভাবি।

বিয়ের সম্বন্ধ দুই এক যায়গা থেকে আসতে লাগল। আমি কখনও অসুখের ছল করে, কখনও এমন কি নিজের চরিত্র সম্বন্ধে বিশ্রীভাবে পাত্রপক্ষের কাছে বেনামী চিঠি লিখে সম্বন্ধ ফিরিয়ে দিতে লাগলাম। কিন্তু এমন করে আর কত-দিন পারা যায়? আমার সম্বন্ধ এক জায়গায় পাকা হয়ে গেল। কিন্তু আমি পাকাটাকে নষ্ট করে দেবার জন্যে পরামর্শ চাইলাম ওর কাছে। ও যেন কেমন চুপচাপ রইল। শেষে একদিন বললে, আমায় নিয়ে পালিয়ে যাবে। ওর বাবার টাকা ছিল, আমার ভরসা হ'ল। কিন্তু শেষে একদিন আমার বিয়ে হয়ে গেল, পালান-টালান হ'ল না। পাশের গ্রামের টাকাওয়ালা এক ভদ্রলোকের ছেলের সঙ্গে হ'ল বিয়ে।

শুভদৃষ্টির সময়ে মুহূর্ত্তে দেখলাম প্রশান্ত মুখশ্রী আমার স্বামীর। লজ্জায়, কি সম্ভ্রমে, কি গোপনভয়ে, আমি মাথা নত করে থাকতে বাধ্য হলাম।

নিশুতি রাত। নৃত্য-গীত-মুখর বাসরঘর কখন নিঝুম হ'য়ে গেছে। ঘণ্টাখানেক এপাশ-ওপাশ করেও কিছুতে ঘুম এল না। স্বামী অঘোর ঘুমে। আমার যেন বদ্ধঘরের আতপ্ততায় দমবন্ধ হয়ে আসছে। আস্তে আস্তে উঠে দোর খুলে বারান্দায় গিয়ে বসে পড়লাম মুক্ত হাওয়ার শীতল পরশে।

কতক্ষণ বসে আছি মনে নেই। হঠাৎ কে যেন মুখ চেপে ধরল। অস্ফুট কণ্ঠে শাসিয়ে উঠল,—"চেঁচিও না—ছোরা দেখছ ত!" এ যে সেই ছোকরার কণ্ঠস্বর। আমি একেবারে স্তব্ধ।

গায়ের গয়না যখন সব ক'খানা খুলে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে তখন আমার হুঁস হ'ল। টম কুকুরটা সে সময় ঘেউ ঘেউ ক'রে পলাতকের পিছু নিয়েছে। আমিও আর চুপচাপ থাকতে পারলাম না।

তাকে খোঁজার জন্যে খানিক ছুটোছুটি করে বাড়ীর দিকে ফিরলাম, যদি এখনও তারা টের না পেয়ে থাকে। দূর থেকে দেখি—সবাই আমায় খুঁজছে। এমন কোন ছল খুঁজে পেলাম না, যা'র অজুহাতে বাড়ীতে গিয়ে সবার সামনে দাঁড়াতে পারি। জগতে তখন আর আমার ঠাঁই কোথায়? নিজের জীবনে ধিক্কার এল। কান্না পায়নি তখন, চোখের সব জল ভিতরে শুকিয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ মনে হ'ল আমার স্বামীই এখন আমার সব। তা'র সঙ্গে যে-ক'রে হ'ক দেখা করব, তা'কে সব কথা খুলে বলব। সেই আমার প্রায়শ্চিত্ত। তা'র পরে —তাঁর পায়ে ঠাঁই পাই ভাল, না পাই ক্ষোভ নেই, কারণ, এত অপরাধের কি মার্জ্জনা আছে? তবু আমার এ দীর্ঘ দিনের সাধনা আমার গ্লানির কিছুমাত্র কি ধুয়ে দেয় নি?

আমার স্বামীর বাড়ী পাশের গ্রামে। আমি তাঁর গাঁয়ে গোপনে গিয়ে শুনলাম, বিয়ের পর তিনি আর বাড়ী আসেন নি। কলকাতা চলে গেছেন, সেখানেই থাকেন তিনি। কোন-ক্রমে ঠিকানা যোগাড় করে এলাম কলকাতা। কিন্তু সে ঠিকা-নায় তিনি নেই। কলকাতায় এক বাড়ী ঝিগিরি করে দিন চল-ছিল। যে-বাড়ী কাজ করতাম সেই বাড়ীর কর্ত্তা এখানে আসেন কেরাণীর কাজ নিয়ে। আপনার স্বামীর আগে যিনি ফরেষ্ট অফিসার ছিলেন, তাঁর নিজের কেরাণী হ'য়ে এসেছিলেন কিন্তু এখানে এসে পৌঁছবার তিন দিন পরে ভদ্রলোক মারা যান এবং তাঁর বিধবা স্ত্রী তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে কলকাতা চলে গেলেন। আমি তাঁদের সঙ্গে এখানে এসেছি। ভদ্রলোক বলেছিলেন, আমার স্বামী এখানে ফরেষ্ট অফিসে কাজ করে। শেষে আমি জেনেছি কলকাতা থেকে কোন বাঙালী ঝি এত-দূর আসতে চায় না বলে তিনি এই মিথ্যে কথা বলেছিলেন। ভদ্রলোকের স্ত্রী যাবার সময়ে আমায় নিয়ে গেলেন না, বললেন, —তোমার ভাড়া দেবে কে?

এখন এই বনের মধ্যে কুলী-মজুরদের মেয়েদের সঙ্গে সকাল থেকে সন্ধ্যা কাজ করে যাচ্ছি। দেশে গিয়ে দাঁড়াবার জায়গা নেই জানি, তবু দেশে যেতে চাই। যদি বলেন, "এর পরেও বাঁচতে চাও তুমি?" তবে আমার উত্তর এই, "যে পর্য্যন্ত তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতে না পারব, সেই ক'টা দিন শুধু বাঁচতে চাই। তা'র বেশী এক মুহূর্ত্ত-ও নয়।" আমি জানি, তাঁকে খোঁজার সময় পড়ে আছে আমার সমস্ত জীবন; তবে আমি বেঁচে থাকব, কিন্তু বেঁচে থাকবে না বুঝি আমার নারীত্ব। এত ঝড়-ঝঞ্ঝা, এত অনাহার-অনিদ্রা, বছরের পর বছর তা'র আয়ু যেন কমে আসছে।

যেমন করে কথাগুলো প্রকাশ করতে চাই মুখে তা' সম্ভব নয়,—তাই এই চিঠি লিখলাম; তবু মনের ভাবের সহস্রাংশও

বোধ হয় ধরা পড়েনি। যদি ভরসা দে.., আপনার কাছে যাব। শুধু দেশে ফিরে যাবার ভাড়াটা, হতভাগিনীকে সাহায্য করলে ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন।

প্রণতা—
দেবী

চিঠি পড়ে চুপ করে রইলাম। আমার নিষ্ঠুর সত্যটা এর কতখানি বাজবে মনে মনে তাই ভাবতে লাগলাম। মনে হ'ল একবার স'ত্যের চেয়ে মিথ্যাই ভাল। এতবড় আঘাত দেব না। কিন্তু তা' সম্ভব হ'ল না। চিঠি পড়া হ'তেই সে আমার পায়ের উপর মাথা রাখল। চোখের জলে আমার পা ভিজে যেতে লাগল। কারণে ও অকারণে মিথ্যা জীবনে অনেক বলেছি। কিন্তু এখন পারলাম না। বললাম,—"ভুল করছেন আপনি, আমি সে লোক নই।"

সে শুনলে না কোন কথা। সেই অবস্থায়, আমার পায়ে জোর করে মাথা রেখে বলতে লাগল,—"ক্ষমা, ক্ষমা কর,—ক্ষমা।"

নিঃশব্দে পা সরিয়ে নিলাম। ও সহসা উঠে দাঁড়াল। প্রদীপের ম্লান আলো ওর অশ্রুস্নাত মুখের উপর পড়েছে। ওর মুখে দীর্ঘ সাধনার অন্তে তপস্বিনীর সিদ্ধিলাভের গৌরব যেন ওর দুঃখকেও ছাপিয়ে উঠেছে

দাঁড়িয়ে বলল,—"দেবেনা তোমার পায়ে ঠাঁই, যাক আমার কাজ শেষ হয়েছে। পরজন্মে যেন তোমায় আবার পাই।"

*আর সহ্য হ'ল না। কি মিছেকথা বলতে পারে মেয়েটা। রাগ ক'রে বেরিয়ে পড়লাম ঘর থেকে, জলে ভিজেই ফিরে যাব ডেরায়। হঠাৎ মনে পড়ল, ওঃ ঠিক কথা আমার মামাত ভাই মণ্টুর নাম ত অজিত আর তার চেহারা ত আমারই মত। তার বিয়ের রাতে তার স্ত্রী......

ছুটে এলাম ফিরে—স্ত্রীলোকের চীৎকার কানে এল—'মা গো'—আরও দ্রুত ছুটলাম। সর্ব্বনাশ মেয়েটি মাটিতে গড়িয়ে পড়া আর একটা গোখরা সাপ ছোবলের পর ছোবল দিচ্ছে। রাইফেলের বাঁট দিয়ে সাপটাকে মেরে ফেললাম। কিন্তু মেয়েটিকে বাঁচাবার আর কোন উপায়ই করতে পারলাম না। দেখতে দেখতে সে নীল হ'য়ে গেল।—নিস্পন্দ অসাড় সে দেহের সম্মুখে আর নিমেষও অপেক্ষা করতে পারলাম না।

*এক বৃদ্ধ শিকারীর ডায়েরী থেকে।

যুক্তরাজ্যে উদয়শঙ্করের প্রভাব

(১৬৬ পৃষ্ঠার পর)

উদয়শঙ্কর তাঁর অপূর্ব্ব নৃত্য-কুশলতায় প্রতীচ্যের নর-নারীকে মুগ্ধ ও স্তম্ভিত করেছেন। তাই তারা বিশেষভাবে উদয়ের প্রতি আকৃষ্ট। যে বিমল আনন্দে তিনি এদেশবাসীকে মুগ্ধ ও মাতোয়ারা করে দিয়ে গেছেন সেই আনন্দই তিনি ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন। ভারতের নিরানন্দ ও বিষাদপূর্ণ ঘরে যাতে এই প্রাচীন ও প্রায় লুপ্ত গরিমা পুনঃপ্রতিষ্ঠ হয়ে চিরস্থায়িত্ব লাভ করে, বর্ত্তমানে এই তাঁর বাসনা ও সাধনা। যে নৃত্য-কলা তিনি জীবনের বহু বাধা-বিঘ্ন ও দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে সাধনা করে আজ সার্থক করে তুলেছেন, ভারতের পুণ্যতীরে আলমোড়াতে একটি ৯০ একার জমিতে তারই প্রাণ প্রতিষ্ঠার বিরাট আয়োজন চলছে। এই স্কুল প্রতিষ্ঠায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে যে নিবিড় সম্বন্ধ গড়ে উঠবে, তার ফল অতি সুমধুর হবে সন্দেহ নাই। তাঁর এই মহৎ সংকল্প পরিপূর্ণতা লাভ করুক—ইহাই সকল শুভাকাঙ্ক্ষীর আন্তরিক কামনা ও প্রার্থনা।

বিশ্ববরেণ্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর আশীর্ব্বাণীতে বলেছেন—

"Let your dancing too wake up that spirit of spring in this cheerless land of ours; let her talent power of true enjoyment manifest itself in exultant language of hope and beauty."

অকাল-প্রসূত শিশু

ডাঃ ডি এন মুখার্জ্জী

যে সকল শিশু জন্মের একমাস মধ্যে মারা যায়, তাহাদের প্রায় অর্দ্ধপরিমাণই যে অকাল-প্রসূত—এই সত্য নির্ণীত হইয়াছে ওয়াশিংটনের চিল্ড্রেন্‌স ব্যুরোর বিশেষজ্ঞগণ কর্ত্তৃক। তাঁহারা বলেন, ১৯৩৫ সালে সমগ্র মার্কিন যুক্তরাজ্যে এই প্রকারে উপযুক্ত কালের পূর্ব্বে জন্মপ্রাপ্ত ৩২,০২১টি শিশুর মৃত্যু হইয়াছিল।

শিশু-জন্মের নানাদিক পর্য্যবেক্ষণের ফলে জানিতে পারা গিয়াছে যে, সারা বিশ্বে যত শিশু জন্মগ্রহণ করে তাহার প্রায় শতকরা ৫টি অকালপ্রসূত। মার্কিনের সকল অঞ্চলেই শিশু-মৃত্যুহার (স্বাভাবিক সময়ে জাত অর্থাৎ উপযুক্ত কালের পূর্ব্বে নয়) যতদূর সম্ভব নিম্নে আনয়ন করা হইয়াছে; কাজেই আশা করা যায়—যথাকালের পূর্ব্বে যে সকল শিশু জন্মপ্রাপ্ত হয়, তাহাদের মৃত্যুহারও হ্রাস করা সম্ভব হইবে।

১৯২২ সালে যখন চিকাগোতে অকাল-প্রসব ষ্টেশন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সময়ে এই জাতীয় শিশুর যত্ন ও তত্ত্বাবধানের তেমন কোনও উন্নত উপায় অবলম্বিত হয় নাই, এইদিকে বিশেষ উন্নতি করাও তখন সম্ভব হয় নাই। অতি অল্প হাসপাতালই ছিল যেখানে এই অকালপ্রসূত শিশুর চিকিৎসার সরঞ্জামপত্রের ব্যবস্থা ছিল, এমন কি এই চিকিৎসায় বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত ডাক্তার বা নার্স ছিল না বলিলেই চলে। কিন্তু আজ মার্কিন যুক্তরাজ্যে দুইটি শহর রহিয়াছে, যাহার দিকে মার্কিনবাসীর দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত এই প্রকার শিশু-চিকিৎসার কি নূতন কৌশল আবিষ্কৃত হইতে পারে তাহার জন্য। এই দুইটি শহর হইল চিকাগো এবং নিউ ইয়র্ক। চিকাগোর হাসপাতালসমূহে বর্ত্তমানে বৎসরে ৪০০০এরও অধিক অকালপ্রসূত শিশুর নিরাপদ জন্মলাভ হইয়াছে ও তৎপর উহাদের বিহিত চিকিৎসা চলিয়াছে। একটি হাসপাতালে এমনই ব্যাপক ব্যবস্থা যে, এককালীন ৬৮টি অকাল-প্রসবের নিয়ন্ত্রণ ও জাত শিশুর যথাযোগ্য তত্ত্বাবধান সম্ভব হইয়াছে। বিশেষ আনন্দের বিষয় এই যে, অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে এই সকল হাসপাতালে অকালপ্রসূত শিশুর শতকরা ৮০টিরও বেশী জীবিত থাকে। ইহা অপেক্ষা সুফল আর কি আশা করা যাইতে পারে।

৪৬০ খৃষ্টপূর্ব্ব সালে হিপোক্রেটিস্ মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, সাতমাস গর্ভবাস পূর্ণ করিবার পূর্ব্বে যে ভ্রূণ পৃথিবীর আলোকে আনীত হয়, উহাকে বাঁচাইয়া রাখা সম্ভব নয়। এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত এই নিয়মের ব্যতিক্রম অতি সামান্যই দেখা গিয়াছে।

হানস-মুরেনী অর্থাৎ এ নিয়া তিন ফুটো- ইহা যেন কতকটা অকালপ্রসূত শিশুকে তাপদানে বাক্সে পরিণত করিবার প্রয়াস। পক্ষীমাতার মত তাপ দানের আধুনিক যন্ত্র ইনকুবেটর (incubator) আবিষ্কৃত হয় ১৮৮০ সালে প্যারিসে ম্যাটার্নিটি হাসপাতালের ডিরেক্টর টার্নিয়ার কর্ত্তৃক। এক সময় প্যারিস চিড়িয়াখানায় অকালপ্রসূত সিংহশিশুকে তাপদানের জন্য যে যন্ত্র তৈরী হইয়াছিল, ঐ যন্ত্রটিও ইহারই আদর্শে প্রস্তুত। অনেক অকালপ্রসূত মানবশিশু আধুনিক এই ইনকুবেটরের সাহায্যে জীবনলাভ করিয়াছে, অন্যথায় যাহাদের মৃত্যু ছিল অবধারিত।

মার্কিন যুক্তরাজ্যে প্রথম যে চিকিৎসক অকালপ্রসূত শিশু-তত্ত্বাবধানে বিশেষত্ব অর্জ্জন করেন তিনি হইলেন জার্ম্মানী হইতে আগত ডাঃ মার্টিন কাউনি। ১৮৯৪ সালে ইনি মার্কিন রাজ্যে উপস্থিত হন। ১৯০৬ সালে চিকাগোর হোয়াইট সিটিতে য়্যামিউজমেণ্ট পার্কে "ইনকুবেটর বেবি ষ্টেশন অর্থাৎ অকালপ্রসূত শিশু চিকিৎসাগার ইনি স্থাপন করেন। তিনি প্যারিসে ডাঃ টার্নিয়ারের অধীনে এই চিকিৎসায় ব্যাপক অভিজ্ঞতা লাভ করেন। কিন্তু ঔষধ প্রয়োগের অধিকার-সম্বলিত কোন লাইসেন্স ইঁহার ছিল না। সেইজন্য তিনি শিশু-চিকিৎসা-বিশারদ ডাঃ জুলিয়াস হেস্‌কে আহ্বান করেন—এই ষ্টেশনের শিশু-তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করিতে। ডাঃ হেস্ অর্জ্জিত জ্ঞানের প্রচারের জন্য উৎসুক ছিলেন, তিনি সানন্দে ভার গ্রহণ করেন। বর্ত্তমানে তিনি সর্ব্ববাদীসম্মত শিশু-চিকিৎসা-অভিজ্ঞ প্রামাণ্য ব্যক্তি।

ডাঃ হেসের প্রভাবে আর্থার লোয়েনষ্টিন প্রদত্ত অর্থে সারা মরিস হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২২ সালে প্রায় ১০,০০০ ডলার ব্যয়ে। ডাঃ হেসের অভিমত এই—অনেক প্রতিষ্ঠানই এই ব্যয়বাহুল্যে ভীত হইয়া "ইনকুবেটর শিশু বিভাগ" খোলে না; কিন্তু ব্যয়বাহুল্য ব্যতীতও যে কোন হাসপাতাল সামান্য অল্প মূল্যের যন্ত্রাদির সাহায্যে অকাল-প্রসূত শিশুদের ভার গ্রহণ করিতে পারে। তিনটি জিনিষ হইল এইজন্য প্রধানঃ—উপযুক্ত খাদ্য, অভিজ্ঞের সেবা-শুশ্রূষা এবং প্রচুর তাপদান।

সারা মরিস হাসপাতালে অকালপ্রসূত শিশু-আগারে প্রবেশ করিলে প্রথমই দৃষ্টি আকর্ষণ করে ২২টি অদ্ভুত পদার্থ—যাহাকে ছোট ছোট ধাতুজ টব বা চৌকা কাপড়-কাচা কল বলিয়া মনে হয়। কক্ষটির চারিদিকে এইগুলি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রক্ষিত। কোন কোনটির আবার ঢাকনি রহিয়াছে, ভিতরে রহিয়াছে দুইখানি চৌকা কাচের পরকলা। অপর-গুলিতে ঢাকিবার জন্য রহিয়াছে শাদা ফ্লানেলের আবরণ—গোয়ালারা শীতের দিনে দইয়ের হাঁড়ি ঢাকিবার জন্য যেমন কম্বল ব্যবহার করে, কতকটা তেমনি। ঐ কক্ষে ইহা ছাড়া রহিয়াছে অক্সিজেন সিলুণ্ডার, থার্ম্মোমিটার (যাহা দিনের সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন তাপ প্রদর্শন করে), হাইগ্রোমিটার (বায়ুর সিক্ততা পরিমাপক যন্ত্র), আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মির বাতি, স্থানান্তর-করণযোগ্য ইনকুবেটর (তাপদান যন্ত্র), এবং উত্তপ্ত ধাতুজ টেবিল (যাহার উপরে শিশুদের পশমী জামার স্তূপ গরম করা যায়)। শিশুদিগকে কদাচিৎ তাহাদের ইন-কুবেটরের বাহিরে আনা হয়। কক্ষটির দূর কোণে রহিয়াছে আর একখানি ধাতুজ টেবিল, উহাতে গরম করা হয় শিশুদের যাবতীয় দুগ্ধাদি খাদ্য পরিশোধক, কাচের আই-ড্রপার, দুগ্ধ-বোতল, বোটা প্রভৃতি। শিশুর ব্যবহারের যে-কোন জিনিষকে

আগে উপযুক্ত মাত্রায় গরম করিয়া তবে শিশুর অঙ্গে স্পর্শ করান হয়।

হাসপাতালে নানা জাতীয় ইনকুবেটর থাকে, কিন্তু উদ্দেশ্য উহাদের এক। নির্দ্দিষ্ট তাপেই শিশুকে রক্ষা করা হয় এই যন্ত্রের সাহায্যে—এই তাপ হইল স্বাভাবিক রক্তের তাপ-মাত্রা অর্থাৎ ৯৮ ডিগ্রী। নিউ ইয়র্কে জনপ্রিয় হইয়াছে সিক্ততা বিশিষ্ট তাপ প্রদান—সেইজন্য "মরগ্যানথেলার" ইনকুবেটরই ব্যবহৃত হয় বেশী, কারণ ইহাতে জল মধ্যে স্থাপিত বিজলী বাতি দ্বারা তাপ প্রদান করা হয়। ডাঃ হেস্ আবিষ্কার করিয়াছেন এলুমিনিয়াম সিন্ধুক, উহা চিকাগোতে প্রচলিত। চিকাগো হাসপাতালসমূহ এই যন্ত্রটিরই পক্ষ-পাতী—ইহাতেও আর্দ্র তাপ পাওয়া যায়, কিন্তু ইহার গঠন অন্য প্রকার। চারিদিকে বেষ্টিত জল-কোর্ত্তা (water jacket) সহ শয্যা-সমন্বিত একটি ছোট টব (জলের সহিত সংযোগ রহিত)—ওয়াটার জ্যাকেট উত্তপ্ত হয় বিদ্যুত শক্তি বিশিষ্ট একখানি পাত হইতে। যে কেহ ইহার ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। সর্ব্বসমেত এই শয্যার মূল্য ৪৩৫ ডলার এবং অতি দীর্ঘকাল স্থায়ী।

এইভাবে ইনকুবেটরে স্থাপিত শিশুর পাহারা দেওয়া দরকার অবিরাম। ডাঃ হেস এই সতর্ক তত্ত্বাবধানের উপরই জোর দেন বেশী। শিশুকে এই প্রকার যত্ন লওয়া ও পর্যবেক্ষণের সাহায্যে প্রতিটি লক্ষণ লিপিবদ্ধ করা হয় ঘণ্টায় ঘণ্টায় সময় উল্লেখ করিয়া। যথাকালে জন্মপ্রাপ্ত শিশুদের যে প্রকার আহার ও বিশ্রাম ব্যবস্থা ইনকুবেটরে স্থান প্রাপ্ত অকালপ্রসূত শিশুর বেলাও তদনুরূপ। প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর দুগ্ধপান (স্তন্য); নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর দেহাবস্থানের পরিবর্ত্তন; সপ্তাহে দুইবার ম্যাসেজ বা মার্জ্জনা, প্রতিবার দেহ মার্জ্জনার পর ভায়োলেট রশ্মি প্রয়োগ; প্রাতে ও সন্ধ্যায় শরীরের তাপ গ্রহণ; প্রতিদিনের দেহাবস্থার ইতিহাস সমগ্র খুঁটিনাটির সহিত লিপিবদ্ধ করণ।

সারা মরিস শিশু বিভাগে দেশের বিভিন্ন স্থল হইতে প্রেরিত ৩৫টি গ্রাজুয়েট নার্স শিক্ষা লাভ করিয়াছে। জরুরী প্রয়োজনে ডাঃ হেস তাঁহার প্রধান নার্সকে অন্য হাস-পাতালেও পাঠাইয়া থাকেন। এই প্রকারে যখন মেমফিস্ হাসপাতালে অকালপ্রসূত শিশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় বেশী রকম এবং এমন সকল শিশু জন্মপ্রাপ্ত হয়, যাহার তত্ত্বাবধান উক্ত হাসপাতালের নার্সগণ কর্ত্তৃক সম্ভব হয় না, তখন ডাঃ হেস তাঁহার প্রধান নার্সকে তথায় পাঠাইয়া দেন; উক্ত হাস-পাতাল কর্তৃপক্ষের অনুরোধে। তাহার পর হইতে ঐ হাসপাতালে অকালপ্রসূত শিশুর মৃত্যু সংখ্যা উল্লেখযোগ্য-রূপে কমিয়া যায়।

পূর্ব্বে অকালপ্রসূত অনেক শিশু মারা যাইত গৃহ হইতে কিম্বা অন্য হাসপাতাল হইতে সারা মরিস হাসপাতালে স্থানান্তরিত করিবার সুযোগ বা ব্যবস্থার অভাবে। কি কৌশলে শিশুর প্রাণের আশঙ্কা দূর করিয়া অন্যত্র নেওয়া যায়, তাহা সে সময়ে ছিল এক শোচনীয় সমস্যা। ডাঃ হেস সে আশঙ্কাও মূলত বিদূরিত করিয়াছেন অভিনব এক "য়্যাম্বুলেন্স" উদ্ভাবন করিয়া। এই য়্যাম্বুলেন্সে বিজলী ব্যবস্থা রহিয়াছে এবং তাহার শক্তিতে তাপ দানের ইন্‌কুবেটরও রহিয়াছে। সুতরাং যখনই কোন গৃহ বা হাস-পাতাল হইতে কোন আহ্বান আইসে তখনই বিদ্যুৎ-শক্তিতে ইনকুবেটর উত্তপ্ত হইতে থাকে এবং য়্যাম্বুলেন্স যথাস্থানে পৌঁছিতে পৌঁছিতে উহা শিশুর ব্যবহারের উপযুক্ত হয়। তিনটি পৃথক বিদ্যুৎ প্রবাহের ব্যবস্থা করা আছে, একটি হাসপাতালে পৃথকভাবে রক্ষাকালে ব্যবহারের জন্য; দ্বিতীয়টি ঠেলা গাড়ী এবং তৃতীয়টি মোটর ব্যাটারির জন্য।

ইহা ছাড়া ইনকুবেটরে পেঁজা তুলো, স্পিরিট য়্যামোনিয়া (যদি শিশুকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য প্রয়োজন হয়); পশমী কম্বল এবং যথেষ্ট পশমী জামা, গায়ের কাপড় প্রভৃতি দেওয়া হয়। জরুরী প্রয়োজনের জন্য ঐ য়্যাম্বুলেন্সে অকসিজেন সিন্ধুকও থাকে। কারণ অনেক সময় দেখা যায় অকালপ্রসূত শিশু শ্বাস কষ্টে ভোগে। প্রথমত ঠেলা গাড়ীতে শিশুটিকে তোলা হয় গৃহ বা হাসপাতাল হইতে।

প্রাচীন চিকিৎসকের সহিত আধুনিক বিশেষজ্ঞগণও একমত যে, অকালপ্রসূত শিশু অন্তত ছয় মাস মাতৃগর্ভে বাস না করিলে জীবিত অবস্থায় প্রসূত হয় না। ছয় মাস গর্ভবাসের পর জন্মপ্রাপ্ত শিশু সময়ে ২ পাউণ্ডেরও কম হয় ওজনে। এই অবস্থায় শিশুর শতকরা ১৫টির বেশী বাঁচে না। ছয় মাসে প্রসূত শিশুর ওজন যদি ২ হইতে ৩ পাউণ্ড পর্যন্ত হয়, তবে উহাদের শতকরা ৪৩টির প্রাণ রক্ষা করা অনেক স্থলেই সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু যে স্থলে ছয় মাসে প্রসূত শিশুর ওজন ৩ পাউণ্ডের বেশী কিন্তু ৪ পাউণ্ডের কম হয়, উহাদের শতকরা ৭৫টিই জীবিত থাকে যদি যথাসময়ে ইনকুবেটর-সাহায্য প্রদান করা যায়। ওজনে ৪ পাউণ্ডের অধিক হইলে, শতকরা ৮৫টি পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকে।

শিশুকে কতদিন এই হাসপাতালে থাকিতে হয় তাহা নির্ভর করে উহার আকার ও ক্রমোন্নতি গ্রহণের সামর্থ্যের উপর। ছোট আকারের শিশুদের তিন হইতে চার মাস থাকিতে হয়, কিন্তু যদি শিশু আকারে বড় হয় এবং স্বাভাবিক বলিষ্ঠতা সহজেই প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহা হইলে দুই সপ্তাহের বেশী উহাকে হাসপাতালে থাকার দরকার হয় না।

ছয় মাস অপেক্ষাও কম সময় গর্ভবাসে প্রসূত অতি দুর্ব্বল শিশুকে রাখা হয় আবরণ-সংযুক্ত ইনকুবেটরে—ভিতরে থাকে অকসিজেন সরবরাহের পাত্র। উহারা শব্দও করে না, নড়েও না, শুধু খায় আর ঘুমায়। উহারা, সাধারণ বায়ুতে যে পরিমাণ অকসিজেন অংশ থাকে তাহার সিকি ভাগ বেশী না হইলে বাঁচিতে পারে না। উহাদের জন্য এলুমিনিয়াম বেসিন ইনকুবেটর নির্দ্দিষ্ট। উহা এমনভাবে প্রস্তুত যে কাচের আবরণ-ঢাকা অবস্থায়ই উহাদের খাওয়াইতে কাপড় বদলাইতে হয়। বাহিরে মুক্ত বায়ুতে আনিলে কিম্বা নড়াচড়া করিলে উহাদের জীবনী-শক্তি কমিয়া যায়।

(শেষাংশ ১৭৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জীবন নাট্য

(গল্প)

শ্রীঅমিয়া সেন

মার্চেন্ট অফিসের কেরাণী..........যেমন শতকরা নব্বুইজন বাঙালী হইয়া থাকে। অনিমেষও তাই......৫০, টাকা মাহিনা।

মাহিনা পঞ্চাশ টাকা বটে, কিন্তু সংসার ত আর সেই অনুপাতে গড়িয়া উঠে নাই। বাড়ীতে আছেন মা-বাবা, ৫।৬ জন ভাইবোন, আর নিজের তরুণী স্ত্রী রেণু। এতগুলি লোকের গ্রাসাচ্ছাদন, ভাইবোনদের পড়ার খরচ, সবই অনিমেষের ঘাড়ে।

ব্যয় ক্রমশ বাড়তির পথেই চলে, কিন্তু আয়ের অঙ্ক একচুলও উপরের দিকে উঠে না।

অনিমেষ অফিসে বসিয়া মাথা নীচু করিয়া কাজ করে, আর চিন্তা করে নিজের ভবিষ্যৎ। কর্ত্তব্য—আর কর্ত্তব্য—সংসারটা যেন কর্ত্তব্যের ঠুলি চোখে পরিয়া অন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই বিপুল কর্ত্তব্য অনিমেষ কি করিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিবে!

সংসার শুধু দাবী করিতেই জানে।......ভাইবোনেরা চায়, দাদা তাহাদের লেখাইয়া পড়াইয়া মানুষ করিয়া দিক। মা বাবা চান বৃদ্ধ বয়সে একটু নিরুদ্বিগ্ন শান্তি। ছেলে উপযুক্ত হইয়াছে, এখন এ শান্তি সে যদি দিতে না পারে, কবে আর পারিবে। দুটী বোন বড় হয়েছে, তারা চায় আরও কিছু ......যৌবনের কামনা তাহাদের দেহ-মনে উঁকি মারিয়াছে।

অথচ মাহিনা মাত্র ঐ পঞ্চাশটি টাকা। চিন্তাকুল অনিমেষের হাতের কলম আপনা আপনি থামিয়া যায়। এরা ত সবাই-ই চায়, অথচ কে কি দিবে অনিমেষকে? কেহ কিছু দিবে না, অনিমেষ জানে, এরা কেহ কিছু দিবে না। দিতে শুধু একটি লোকই পারে, অথচ সংসারে তার দাবীই নগণ্য,—তার প্রেমই নিষ্কাম। সে কোনদিন কিছু চাহিল না, কোনদিন কিছু চাহিবে না, সে রেণু।

অনিমেষের তৃষার্ত্ত দৃষ্টির সম্মুখে ভাসিতে থাকে একখানি ম্লান মুখের অপরূপ মাধুরী। দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে সে বঞ্চিত হইয়া আছে সকল দিক দিয়া। অনিমেষ তাহাকে কিছুই দেয় নাই।

হাতের কলম সহসা অস্থির প্রাণ-চাঞ্চল্যে জীবন্ত হইয়া উঠে।......অনিমেষের শ্রান্ত-বিমর্ষ মুখে-চোখে আশার প্রলেপ পড়ে......রেণুর প্রতি কর্ত্তব্যপালন করিতে হইবে।

সহসা একদিন বাড়ী হইতে একখানি পত্র আসিল, মায়ের অসুখ, বেশী অসুখ। বাবা লিখিলেন টাকার প্রয়োজন, নাহিলে তাঁকে বাঁচান যাইবে না। ভাইবোনেরা কাঁদিয়া লিখিল, দাদা, মাকে বাঁচাও—অনিমেষের মাথা ঘুরিয়া গেল। দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া সে শুধু ধারই করিতে লাগিল।

টাকা জুটিল, মা বাঁচিয়া উঠিলেন। সকলের মুখে হাসি ফুটিল, কিন্তু সে হাসির পরেই একজনের চোখে আসিল অশ্রু, সে রেণু,—এত টাকা তিনি কি ক'রে শুধবেন?

অনিমেষও সেকথা ভাবিল, কিন্তু সে কাঁদিল না। সে শুধু ভাবিল, দুঃখের পর সুখ এই ত বিধির বিধান! রেণুর জন্যই আমাকে জয়ী হইতে হইবে। অনিমেষ কাজ বাড়াইয়া দিল, চাকুরীর উপরে দুইটি টিউশনী নিল। সে ডিষ্টিংশনে বি-এ পাশ করিয়াছিল। সকাল সন্ধ্যায় টিউশনী, দশটা-ছয়টা অফিস, রাত্রিটা তবুও উদ্বৃত্ত থাকে। অনিমেষ একটি সেকেণ্ড হ্যাণ্ড টাইপরাইটিং মেশিন কিনিয়া রাত্রিটুকুও কাজে লাগাইল।

বছর ঘুরিয়া আসিল। অনিমেষের দেনা শোধ হইয়া গিয়াছে।......শীর্ণমুখে নিশ্চিন্ততার একটি স্নিগ্ধ হাসি ফুটিল। সে দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ করিয়া চলিল। এইভাবে কিছুদিন খাটিতে পারিলেই সে রেণুকে সুখী করিতে পারিবে, ভাইবোন, মা, বাবার প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিবে। কিন্তু শরীর আর কুলায় না,......বুকের সব ক'খানা হাড় গোনা যায়।......চক্ষের জ্যোতি নিষ্প্রভ হইয়া আসিয়াছে। মাথায় মাঝে মাঝে অসহ্য যন্ত্রণা হয়।

কিন্তু নিজের মনেই অনিমেষ নিজেকে সান্ত্বনা দেয়, আর কিছুদিন—আর কিছুদিন—

এই অবিশ্রাম খাটুনির পুরস্কারে কি ভগবান তাহাকে একটু শান্তিও দিবেন না? শান্তির ভগবান উপরে বসিয়া মুখ টিপিয়া প্রশান্ত হাসি হাসিলেন।

আরও ছ'মাস কাটিল। অনিমেষ কিছুটা গুছাইয়া আনিয়াছে। অনেক দিন বাড়ী যায় নাই, এবার সে ছুটির দরখাস্ত পেশ করিবে নাকি ভাবিতে লাগিল। রেণুও লিখিয়াছে,—দু'বছর তোমাকে দেখি নাই, বড্ড মন-কেমন করে, একবারটি কি আসতে পার না? এই অবিশ্রান্ত খাটুনি একটু যদি বিশ্রাম না নেও, শরীর কি ক'রে টিঁকবে? ভয়েতে আমার বুক মাঝে মাঝে দুরু দুরু ক'রে ওঠে, ভগবান তোমায় আশিস্ দিন—সকল বিপদ থেকে রক্ষা করুন।

অনিমেষ ছুটির জন্য দরখাস্ত করিল। দরখাস্ত করিয়া সেদিন আর সে সন্ধ্যার টিউশনী করিতে গেল না। সোজা মেসে ফিরিল। মা, বাবা, ভাইবোন—সর্ব্বোপরি রেণু, দু'বছর যাহাদের দেখে নাই, তাহাদের প্রিয় মুখগুলি আজ স্বপ্নের মত অনিমেষকে ঘিরিয়া ধরিল। সে শীষ্ দিতে দিতে নিজের ঘরে ঢুকিল। টেবিলের উপর একখানা চিঠি......অনিমেষ সাগ্রহে তুলিয়া লইল। বাবা লিখিয়াছেন, "বীণাকে আর কিছুতেই রাখা যায় না, তাই তার একটি সম্বন্ধ তোমাকে না জানাইরাই হঠাৎ ঠিক করিয়া ফেলিয়াছি। ভাল সম্বন্ধ পাছে হাতছাড়া হইয়া যায় এই ভয়ে তাড়াতাড়ি করিতে হইয়াছে বলিয়া পূর্ব্বে তোমাকে জানাইতে পারি নাই। হাজারখানেক টাকা হইলেই সব হইবে। এদিকে আমি ধার করিয়া শ'দুয়েক যোগাড় করিয়াছি। বাকী আটশ' টাকা লইয়া তুমি সত্বর চলিয়া এস।"

অনিমেষ ধপ্ করিয়া মেঝের উপর বুক চাপিয়া বসিয়া পড়িল। সব হইল—সবই সে করিল! আটশ' টাকা—এত টাকা সে কোথা হইতে দিবে? অথচ দিতে তাহাকে হইবেই। না দিলে বোনের বিয়ে হইবে না, বাবার মান থাকিবে না।

অনিমেষের মাথার যন্ত্রণা সহসা অসম্ভব বাড়িয়া গেল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘরময় পায়চারী করিতে লাগিল,—পারলাম না রেণু, তোমার কথা আমি রাখতে পারলাম না, দুঃখ কি—দুর্দ্দিনের শেষ আছে। দুঃখের পর সুখ, দুঃখের পর সুখ—এতদিন বুকের রক্ত জল করিয়া যে তিনশ' টাকা সে জমাইয়াছিল তার সংগে আর চারশ' টাকা অফিস হইতে ধার করিয়া অনিমেষ বাবাকে পাঠাইয়া দিল। মেসে ফিরিয়া সেদিন অনিমেষ আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিল, এখনও সে বাঁচিয়া আছে! সমস্ত জীবনে যার একবিন্দু আশা নাই, একবিন্দু আনন্দ নাই বাঁচিয়া থাকার সখ্ তারও আছে!

পাশের দেওয়ালে রুমমেট নিখিলবাবু একখানা সস্তা দামের জাপানী বড় আয়না আনিয়া টাঙাইয়া রাখিয়াছিলেন, ঘুরিয়া দাঁড়াইতে অনিমেষের চোখ পড়িল সেইদিকে। অনেকদিন—দীর্ঘদিন পরে সে দর্পণে নিজের চেহারার প্রতিবিম্ব দেখিল। শুকাইয়া চুপ্‌সি হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বাংগে যেন শুধু হাড়ের উপর চামড়া লাগান রহিয়াছে। আর একি? বিস্ফারিত চোখে অনিমেষ দেখিল তার মাথার চুলেও পাক ধরিয়াছে। ......অথচ বয়েস তার মাত্র ঊনত্রিশ!......

অনিমেষ বসিয়া পড়িল। বুকের মধ্যে তাণ্ডব নৃত্য সুরু হইয়া গিয়াছে......তার মনে হইতেছিল জীবনে সে সবচেয়ে বেশী ভুল করিয়াছে রেণুকে তার জীবনে টানিয়া আনিয়া। উঃ—একী ভুল—ভয়ানক ভুল করিয়াছে সে! দীর্ঘ সাতটা বৎসর রেণু তার মুখের আশা-বাণীতে নির্ভর করিয়া পথ চাহিয়া আছে,—"দুর্দ্দিনের শেষ আছে"......

কিন্তু সে কি ভয়ানক মিথ্যা কথা! অনিমেষের দুর্দ্দিনের শেষ নাই।

রেণুর যৌবনকে সে হত্যা করিল, হত্যা করিল তার আশাকে তার আনন্দকে, তার বিপুল ভবিষ্যৎকে। সাত বৎসরের মধ্যে একদিনও সে রেণুকে সুখী করে নাই। অথচ এই ঊনত্রিশ বছর বয়সেই অনিমেষের দেহের যৌবন, মনের যৌবন সংসারের ঘূর্ণী-চক্রে ভাঙিয়া চুরিয়া ছাই হইয়া উড়িয়া গেল। অনিমেষ পাগলের মত চীৎকার করিয়া উঠিল,—একা একা আমি আর পারছি না রেণু তুমি দেখে যাও, আমি পারছি না।

এক মাস পরে অনিমেষ বাড়ী আসিল। একা আসিল না, সে অবস্থা তার ছিল না; যে অফিসে সে কাজ করিত, সেই অফিসেই তার একজন দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ও কাজ করিতেন, তিনিই অনিমেষকে নিয়া আসিলেন।

অপ্রত্যাশিত আগমন......আত্মজনেরা অনিমেষকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। আত্মীয় ভদ্রলোক ইংগিতে সকলকে সরিয়া যাইতে বলিয়া অনিমেষের বাবার দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

এ্যাঁ—অনিমেষের বাবা ভয়চকিত চোখে চাহিয়া কহিলেন, এ্যাঁ, সত্যি?

—হ্যাঁ সত্যি।

অনিমেষের বাবা অবসন্নভাবে বসিয়া পড়িয়া কহিলেন,—কি করে হল?

ভদ্রলোক একটু কাল চুপ করিয়া রহিলেন, পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, অসম্ভব খাটত। অফিসের হাড়-ভাঙা খাটুনি, দুটো টিউশনী, তার উপর রাত জেগে টাইপের কাজ। এত কোন মানুষের শরীরে সয় না, ওর ওযে সয়নি, তা' চেহারা দেখেই বুঝতে পারছেন। মাথাটি অনেকদিন থেকেই বোধ হয় একটু কেমন কেমন হয়েছিল যেন। তবে কাজে ভুল করত না, মাঝে অফিস থেকে ছুটি দিতে চেয়েছিল, একটানা দু'বছর ও একদম ছুটি নেয়নি। কিন্তু ছুটি দিতে চাইলেও তখন তা অনিমেষ নিলে না, তখন অনেক লোক ছাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল, কোম্পানীর ব্যয় সংকোচের জন্য। পাছে ছুটি নিলে চাকুরী যায়, এই ভয়ে অনিমেষ ছুটি নিলে না।

এততেও কিছু হ'ত না, যদি না এই মাসখানেক আগে ওকে অফিস থেকে পাঁচ শ' টাকা ধার করতে হ'ত। দেনা করেই যেন ওর মাথা বিগড়ে গেল। সর্ব্বদা যাকে দেখত তার কাছে বলত, "আমি কি করে এ দেনা শুধব, কেউ বলে দিতে পার ভাই?" কর্ম্মচারীরা সন্দেহ করে ম্যানেজারের কাছে রিপোর্ট করলে। ম্যানেজার লোক ভাল, আবার অনিমেষকে ছুটি নিতে বললে। কিন্তু অনিমেষ ত্রস্ত হয়ে জানালে, ছুটি সে চায় না। চারপাশের কানাঘুষো ওর কানেও আসত। ও ভয়েতে মরিয়া হয়ে উঠল, ওর যে মাথা খারাপ হয়নি তাই প্রমাণ করবার জন্য।

কিন্তু মাথায় সত্যিই আর তখন কিছু নেই। অনবরত সব কাজে ভুল করতে লাগল। শেষ যেদিন ম্যানেজার এল ওর কর্ম্মচ্যুতির নোটিশ দিতে সেদিনের কথা বোধ হয় জীবনেও ভুলতে পারব না। ম্যানেজারকে দেখে ও চেয়ার ছেড়ে উঠল না। বসে থেকেই করুণ কণ্ঠে বললে, "আমার মাথা মোটেই খারাপ হয়নি মিঃ বোস, ওরা মিছিমিছি আমার পিছনে লেগেছে। আপনি এর একটা প্রতিকার করুন। ওদের সবার ইচ্ছা, আমার চাকরীটি যাক, আর আমার বা-বাপ ভাই-বোন স্ত্রী সব উপোস করে মরুক।' সেদিন ম্যানেজারের চোখেও জল এসেছিল।

ভদ্রলোক চুপ করিলেন।

অনিমেষ মলিন মুখে তাঁর মুখপানে চাহিয়াছিল, কথা শেষ হইতে পিতার মুখপানে চাহিয়া কাতরস্বরে বলিল, জানেন বাবা, আমার কথা ঠিকই আছে, কিন্তু ওরা কিছুতেই স্বীকার করবে না। বলে, অনিমেষ রায় পাগল হয়ে গেছে।......পাগল অনিমেষের চোখের কোণ বহিয়া দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

* * * * *

অনিমেষ ঘুমাইতেছে।

দীর্ঘ দুই বৎসরের উপর সে ঘুমায় নাই—পেট ভরিয়া খায় নাই। অবিশ্রান্ত পরিশ্রম আর চিন্তায় জর্জ্জরিত হইয়া কোন মতে জীবনটাকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। আজ তার চিন্তা করার শক্তি ফুরাইয়াছে, সংগে সংগে কর্ম্মময় জগতে তার মত লোকের প্রয়োজনও ফুরাইয়াছে। জগতে সে আজ অকর্ম্মণ্য—নিষ্প্রয়োজনীয়, তাই আজ সে পূর্ণ বিশ্রাম পাইয়াছে। বিশ্রাম পাইয়া ঘুমাইতেছে।

ধীরে ধীরে ভেজান দ্বার ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল রেণু। দ্বারের কাছে একবার থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে শয্যাপ্রান্তে অগ্রসর হইয়া আসিল। দীর্ঘ দুই বৎসর পরে মাথার মণি ঘরে ফিরিয়াছে।

রেণু ধীরে ধীরে অনিমেষের পায়ের কাছে বসিল। সারা-দিন সে একটুও কাঁদে নাই। জমাট বাঁধা বরফের মত তার জ্ঞান বুদ্ধির শেষ উত্তাপটুকুও হঠাৎ ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছিল।

অনিমেষ অঘোরে ঘুমাইতেছে কিন্তু ললাটের উপর হইতে চিন্তারেখার ভাঁজগুলা মিলাইয়া যায় নাই। রেণুর রূপ-রাজ স্বামী আজ শ্মশানের কঙ্কাল হইয়া ঘরে ফিরিয়াছে। ভাগ্যবঞ্চিত যুবক স্বামী........বুকের মধ্যে বুভুক্ষু যৌবন কাঁদিয়া কাঁদিয়া আজ চির সমাধি লাভ করিয়াছে। রেণু উচ্ছ্বসিত রোদনাবেগে অনিমেষের দুই পায়ের মধ্যে মুখ গুঁজিল :

অজস্র অশ্রুতে তার সমস্ত সত্তা যেন ডুবিয়া গেল। অনেক-ক্ষণ পরে সে আপনাতে আপনি ফিরিয়া আসিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভগবানের কাছে অনুযোগ করিতে লাগিল, "আমাকে দুঃখ দিয়াছ আমি কাঁদি নাই, কিন্তু আমার স্বামী—নিরপরাধ স্বামীকে এত বড় শাস্তি কেন দিলে ঠাকুর! জীবনে যাহাকে একদিনের তরেও সুখী করলে না!"

ঘুমের ঘোরে অনিমেষ পাশ ফিরিল। তন্দ্রা চিরিয়া জাগিয়া উঠিল, তার করুণ কণ্ঠ,--সবই হ'ল, কিন্তু তোমাকে কিছু দিতে আমি পারলাম না রেণু। কি করব, ওরা আমাকে আর একটু সময়ও দিলে না। কিন্তু আমি সত্যিই পাগল হইনি, তোমার কি বিশ্বাস হয় রেণু?

—না—না—না—

পা ছাড়িয়া রেণু অনিমেষের বুকের উপর আছাড় খাইয়া পড়িল।

স্তব্ধ রাত্রির বুকে অনিমেষের কণ্ঠস্বর হাহাকার করিয়া ঘুরিয়া মরিতে লাগিল,—তোমাকে ছুঁয়ে বলতে পারি রেণু, বিশ্বাস কর, আমি সত্যিই পাগল হইনি। কথা বলার সুযোগও ওরা আমাকে দিলে না। তুমি যদি আমার কাছে থাকতে, নিশ্চয় ওদের বুঝিয়ে বলতে পারতে।..আমি কতজনার পায়ে ধরেছি, রেণুকে একবার আমার কাছে এনে দিতে পার! সে প্রমাণ করিয়ে দেবে আমি পাগল নই। কিন্তু কেউ শুনল না আমার কথা। ষড়যন্ত্র, ভীষণ ষড়যন্ত্র......জান রেণু, এ শুধু তোমাকে দুঃখ দেবার জন্য, আর কিছু না। কিন্তু তুমি ভেব না রেণু, দুর্দ্দিনের শেষ আছে। ......দুঃখের পর সুখ—দুঃখের পর সুখ......রেণু আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, উঃ ভগবান! অনিমেষ তেমনি অঘোরে ঘুমাইতে লাগিল।........

অকাল-প্রসূত শিশু

(১৭১ পৃষ্ঠার পর)

হাসপাতালে এই সকল অকালপ্রসূত শিশুকে স্তন্য পান করাইবার জন্য তরুণীও সংগ্রহ করা হয়, যাহাদের আপন শিশু-সন্তান রহিয়াছে। তাহাদের বসবাসের এবং তাহাদের সহিত আপন শিশু-সন্তানদের বাসের বিশেষ ব্যবস্থা রহিয়াছে। উহারাই অকালপ্রসূত শিশুদের পালাক্রমে আপন স্তন্য দুগ্ধ পান করায়।

নিউ ইয়র্কের হাসপাতালসমূহে, সিনসিনাটির প্রোক্টর হাসপাতালে এবং ইয়েল ও হার্ব্বার্ড মেডিকেল স্কুল সংশ্লিষ্ট হাসপাতালসমূহে ইনকুবেটর যন্ত্র না রাখিয়া সমগ্র কক্ষটিকেই ইনকুবেটরে পরিণত করা হয়। যদিও জরুরী ক্ষেত্রের জন্য ইনকুবেটরের ব্যবস্থাও রহিয়াছে। সমগ্র কক্ষটি ইনকুবেটরের ন্যায় রক্ত-তাপে (৯৮ ডিগ্রী) রক্ষিত হইলে সুবিধা এই যে, কোন সময়েই তাপ-পরিবর্ত্তনের কুফলের ভিতর শিশুকে আসিতে হয় না। কিন্তু অনেক বিশেষজ্ঞের মত এই যে সমগ্র কক্ষটিতে যোগ্য তাপমাত্রা রক্ষা করা কঠিন ব্যাপার—বিশেষ করিয়া গ্রীষ্মকালে।

অদ্যাবধি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রাকার যে ইনকুবেটর ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা একটি জুতার বাক্সের সমান। এক পাউণ্ড বা তন্নিম্ন ওজনের শিশুর জন্য উহা ব্যবহার করা যায় এবং উহাতে তাপদানের জন্য গরম জল ভর্ত্তি একটি বোতলই যথেষ্ট কার্য্যকর।

এই প্রকারে পাখীদের ডিমে তা দিবার প্রাকৃতিক উপায়কে অকালপ্রসূত শিশুর জীবন রক্ষায় নিয়োজিত করা হইয়াছে এবং প্রতি বর্ষে হাজার হাজার এই প্রকার শিশুকে বাঁচাইয়া রাখা সম্ভব হইয়াছে।

শ্রীবিনায়ক দামোদর সাভারকর

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে নাসিক শহরে মারাঠা ব্রাহ্মণগণের প্রসিদ্ধ চিৎপাবন বংশে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সভাপতি শ্রীবিনায়ক দামোদর সাভারকর জন্মগ্রহণ করেন। এই বিখ্যাত বংশে পর পর কয়েকজন দেশপ্রাণ বীরের উদ্ভব হইয়াছিল। বালাজী বিশ্বনাথ (১ম পেশোয়া) বাজীরাও, প্রসিদ্ধ সৈন্যাধ্যক্ষ নানা ফড়নবিশ, ভারতের অদ্বিতীয়—কূটরাজনীতিবিদ্ নানাসাহেব—ইনি ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন,—বাসুদেও, বলচণ্ড—ইনি ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন—চাপেকর ভ্রাতৃবৃন্দ এবং রাণাডে ব্রিটিশ অফিসারগণকে হত্যার অপরাধে দণ্ডিত হন। শ্রীযুত গোখলে, জষ্টিস রাণাডে এবং লোকমান্য তিলক—ইঁহারা সকলেই উক্ত প্রসিদ্ধ বংশের বংশধর।

সুকুমার কৈশোরেই অসাধারণ প্রতিভা, দেশপ্রাণতা ও কার্য্যপ্রিয়তার জন্যই শ্রীবিনায়ক সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতৃদেব যখন রামায়ণ মহাভারতের উপাখ্যানগুলি পাঠ করিতেন, প্রতাপ ও শিবাজীর কীর্ত্তি কাহিনী—ইউলিসিস্ ও আগামেমনের বিস্ময়কর কাহিনী বর্ণনা করিতেন এবং বামন, মোরোপন্থ এবং তুকারামের মারাঠী কবিতা আবৃত্তি করিতেন, বালক বিনায়ক তখন মৌনী-তপস্বীর ন্যায় অখণ্ড মনোযোগে পিতার বর্ণনা শ্রবণ করিতেন এবং উল্লাসে তাঁহার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। মাত্র দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি মারাঠী কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। ঐ সময় প্রসিদ্ধ মারাঠী সংবাদপত্রসমূহে তাঁহার রচনাবলী প্রকাশ করিতেন, তাঁহারা জানিতেন না যে, উক্ত রচনাবলী এক কোমলমতি বালকের লেখনী হইতে উদ্ভূত। বিদ্যালয়ে তাঁহার সহপাঠীরা তাঁহাকে বিদ্যোৎসাহী, দেশপ্রাণ এবং একজন নিপুণ বক্তা বলিয়াই সম্মান করিতেন। সময়ে সময়ে মহারাষ্ট্রের গৌরবময় ইতিহাস ও রাজস্থানের যশোমণ্ডিত কীর্ত্তি-কাহিনীর মধ্যে তাঁহাকে ধ্যান-নিমগ্ন দেখা যাইত, কখনও বা ভারত সম্পর্কে বহু উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা ও গুরুতর সেবাব্রতের আলোচনা এবং ভারতীয় স্বাধীনতার আদর্শ ও কিরূপে স্বাধীনতা লাভ করা যাইবে তৎসম্পর্কে গভীর সমালোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন—আর সহপাঠিগণ তাঁহার আবেগময়ী আলোচনার অংশ গ্রহণে অসমর্থ হইয়া নির্ব্বাক বিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতের সর্ব্বত্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল

স্ব-শক্তি প্রণোদিত বালক সাভারকর ঐ সময় তাঁহার বিদ্যালয়ের সহপাঠিগণকে লইয়া এক সমর-পরিষদ গঠন করেন এবং বোম্বাইয়ের মন্দিরসমূহ অপবিত্র করার প্রতিশোধ গ্রহণার্থ নির্জ্জন স্থানে এক পরিত্যক্ত মসজিদ অপবিত্র করার ব্যবস্থা করেন এবং তাঁহার পরিকল্পনানুসারে উক্ত কার্য্য সমাধা হয়। পরবর্ত্তী সপ্তাহে কয়েকজন মুসলমান বালক ঐ সংবাদ পাইয়া বালক সাভারকরের দলকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করে। সেনাপতি সাভারকর তখন মাত্র চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স্ক ১২জন বালক লইয়া—মুসলমান বালকদিগকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাস্ত করেন। ছুরি, কাঁটা, পিন—ইহাই ছিল তাঁহাদের অস্ত্র। তাঁহার দলের কয়েকটি বন্ধুকে শিক্ষাদানার্থ তিনি এক খেলার সৃষ্টি করেন এবং এই খেলাতে সমুদয় হিন্দু বালককে শৃঙ্খলা, সামরিক তৎপরতা ও কৌশল শিক্ষা দেওয়া হইত। একদল বালক ইংরেজ ও মুসলমান এবং অপর দলকে হিন্দু সৈন্য সাজান হইত এবং শেষ পর্য্যন্ত সংগ্রামে হিন্দুদলই জয়ী হইতেন।

ভারতের স্বাধীনতার চিন্তায় নিমগ্ন সাভারকারের ইহাই বাল্য জীবন। তাঁহার গৃহদেবী দুর্গাপ্রতিমার চরণতলে বসিয়া তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যান-নিমগ্ন থাকিতেন। বহির্জ্জগতের কোনরূপ চিন্তাই তখন তাঁহার থাকিত না। মায়ের নিকট সন্তান যেরূপে আশা-আকাঙ্ক্ষা জানায়—সেইরূপভাবেই তিনি তাঁহার দেশ ও জাতির উদ্ধারের জন্য, তাঁহার স্বপ্ন সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য দেবীর নিকট কায়মনে প্রার্থনা জানাইতেন।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে সমগ্র মহারাষ্ট্রে এক গভীর রাজনৈতিক আলোড়নের আবহাওয়া সৃষ্টি হইল। ঐ সময় কংগ্রেসের অধিবেশন, সমাজতান্ত্রিক সম্মেলন, শিবাজী উৎসব এবং গাণপত উৎসবে সমগ্র মহারাষ্ট্র যেন মাতিয়া উঠিল। এই সময় পুণার যে অঞ্চলে প্লেগ হইতেছিল, সেই অঞ্চলে অব্যবস্থার জন্য কয়েকজন ইংরেজ কর্ম্মচারীকে হত্যা করা হইল। এই কার্য্যের মূলে ষড়যন্ত্র বিদ্যমান বলিয়া গবর্ণমেণ্ট সন্দেহ করিলেন। ফলে চতুর্দ্দিকে ধর-পাকড়ের হিড়িক আরম্ভ হইল। এই সময় লোকমান্য তিলককেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল এবং যারবেদায় চাপেকর ভ্রাতৃবৃন্দ ও রাণাডের ফাঁসী হইল। এই ঘটনায় তরুণ সাভারকরের হৃদয় বিগলিত হইল।

জীবন প্রভাতেই তাঁহাদের জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত হওয়ায় সাভারকরের হৃদয়ে ক্রন্দনের রোল উঠিল। তিনি তাঁহার গৃহদেবতার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন ভারতের বন্ধন মুক্ত করিবার জন্য তাঁহার সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিবেন, ইহাই হইল তাঁহার নিত্যকার ধ্যান-ধারণা ও স্বপ্ন। এই সময় হইতেই তিনি প্রকাশ্যে ও গোপনে সমিতি গঠন দ্বারা ও সভা-সমিতিতে বক্তৃতাদি দিয়া নিজ মত প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পর তিনি পুণায় ফার্গুসন কলেজে যোগদান করিলেন। এই সময় তিনি যুবক দলের অবিসম্বাদী নেতা বলিয়া গণ্য ছিলেন। ১৯০৫-৬ সালের স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করিয়া তিনিই প্রথম বিদেশী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব কার্য্য আরম্ভ করেন। সাভারকর একদিনে তিন চারিটি বক্তৃতামঞ্চে বক্তৃতা করিতে সমর্থ হইতেন। তাঁহার এরূপ শক্তি ছিল যে, হাজার হাজার শ্রোতা মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিত। এই সময়ে লণ্ডনে পণ্ডিত শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্মা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিবাজী বৃত্তি তাঁহাকে দেওয়া হয় এবং তিনি ইংলণ্ডে রওনা হন। ইংলণ্ডে গিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান সঞ্চার করা সম্ভব, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি ইংলণ্ড রওনা হইতে মনস্থ করেন। তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী ও আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলেই সাশ্রুনেত্রে তাঁহাকে বিদায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

লণ্ডনে উপস্থিত হইয়াই তিনি ভারতভক্ত পণ্ডিত শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্মার সাথী হইলেন। পণ্ডিতজী পূর্ব্ব হইতে হোমরুল সম্পর্কে প্রচারকার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি শ্যামজীর একখানি বাড়ী ভাড়া লইয়া উক্ত বাড়ীটির আখ্যা দেন "ভারতীয় নিবাস" এবং ভারতীয় সমিতি নামে এক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এই সমিতির মাসিক অধিবেশনে সমুদায় ভারতীয়কেই যোগদান করিতে দেওয়া হইত। ফ্রান্স, ইটালী ও আমেরিকার বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস সম্পর্কিত আলোচনায় তিনি অকাট্য যুক্তি প্রদর্শন করিয়া তীব্র বক্তৃতাদি আরম্ভ করিলেন এবং ফলে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের তীক্ষ্ণদৃষ্টি তাঁহার উপর পড়িতে বিলম্ব হইল না। তিনি ইংলণ্ডে অবস্থান কালে মারাঠী ভাষায় ম্যাজিনীর পুস্তকাদির অনুবাদ করেন এবং নাশিকে আসিয়া উহা প্রকাশ করেন। লণ্ডনে বসিয়াই তিনি ভারতীয় প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনা করেন এবং তাহাতে তিনি ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহকে মিথ্যা প্রচার-কার্য্য বলিয়া উল্লেখ করেন। ১৯০৭ সালে ইংরেজগণ যখন ১৮৫৭ সালের সংগ্রাম বিজয়ের ৫০তম উৎসবের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, সেই সময় সাভারকরও নানা সাহেব, ঝাঁসীর রাণী এবং তান্তিয়া তোপী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের স্মৃতির সম্মানার্থ এক বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি করেন। তিনি আয়ার্ল্যাণ্ডের সিনফিন পার্টি ও অপরাপর বৈপ্লবিক দলের সংশ্রবেও আসিয়াছিলেন। ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে সমগ্র বিশ্বের শিক্ষিত সম্প্রদায় যাহাতে অবহিত হন, এই উদ্দেশ্যে আইরিশ ও আমেরিকান সংবাদপত্রে তিনি প্রবন্ধাদি লিখিতে আরম্ভ করেন এবং প্রবন্ধাদি লিখাইয়া ও অনুবাদ করাইয়া তৎসমুদায় জার্ম্মান, ফ্রেঞ্চ, পর্ত্তুগীজ, চাইনীজ ও রুশিয় সংবাদপত্রাদিতে প্রকাশিত করেন। গুরু গোবিন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে লণ্ডনে যে বিরাট উৎসব সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল সেই সকল অনুষ্ঠানে লালা লাজপৎ রায় এবং বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ বিশিষ্ট ভারতীয় নেতৃবৃন্দও যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সাভারকর পাঞ্জাবের শিখ সম্প্রদায়ের কীর্ত্তি বর্ণনা করিয়া তেজোদৃপ্ত বক্তৃতা দেন ও প্রবন্ধাদি রচনা করেন। ইংলণ্ডের গ্রেজ ইন নামক আইন কলেজের পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি রাজনৈতিক আন্দোলন পরিত্যাগ না করিলে তাঁহাকে ব্যারিষ্টারী করিতে তাঁহারা অনুমোদন করিবেন না বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছিলেন।

ঠিক এই সময় তৎকালীন ভারত সচিব লর্ড মার্লের এডিকং স্যার কুর্জ্জন ওয়ালিকে লণ্ডনে প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করা হয় এবং শ্রীযুক্ত সাভারকরের সহচর মদনলাল ধিঙ্গড়াকে উক্ত হত্যাপরাধে অভিযুক্ত করা হইল। এই সময় স্যার আগা খাঁ সমেত কতিপয় ভারতীয় এক জনসভায় সমবেত হইয়া উক্ত কার্য্যের প্রতি নিন্দাসূচক এক প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন এবং তৎক্ষণাৎ প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে পাশ হইয়া গেল বলিয়া প্রেসিডেণ্ট ঘোষণা করেন। সঙ্গে সঙ্গেই এক যুবকের তীব্র প্রতিবাদ শ্রুতিগোচর হইল—"না উক্ত প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে গৃহীত নহে।" এই কথা সাভারকরই উচ্চারণ করিয়াছিলেন। সভাপতি ভ্রূকুটি ভঙ্গিতে তাঁহাকে চুপ করিয়া থাকার ইঙ্গিত করিয়া পুনরায় ঘোষণা করেন যে, প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল; কিন্তু পুনরায় সেই দৃঢ় প্রতিবাদ "না সর্ব্বসম্মতিক্রমে নহে।" তখন নেতৃবৃন্দ জানিতে চাহেন—"এই প্রতিবাদকারী কে?" "সে কোথায়?" "তাহার নাম কি?" সঙ্গে সঙ্গে য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান দল তাঁহার দিকে বেগে ধাবিত হইল। শত শত প্রশ্নের উত্তরে বজ্রনির্ঘোষে উচ্চারিত হইল—"আমি, আমারই এই প্রতিবাদ, আমার নাম সাভারকর।" এই কথায় জনৈক ইউরোপীয়ান তাঁহার নিকট যাইয়া তাঁহার মুখে এক প্রচণ্ড ঘুষি মারেন। ইহাতে বিচলিত না হইয়া রক্তাক্ত মুখে তিনি অধিকতর দৃঢ়তার সহিত পুনরায় প্রতিবাদ করিয়া বলেন "ইহা সত্ত্বেও আমি উক্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিতেছি।" স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি (তৎকালীন মিঃ সুরেন্দ্রনাথ) প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, উক্তরূপ ব্যবহার সম্পূর্ণ কাপুরুষোচিত এবং সাভারকরের উক্তরূপে প্রতিবাদ জানাইবার পূর্ণ স্বাধীনতা বর্ত্তমান। এই বলিয়া তিনি (স্যার সুরেন্দ্রনাথ) সভাস্থল পরিত্যাগ করেন। রক্তাক্ত নেতার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া তাঁহার সহচরগণ অধীর হইয়া উঠেন এবং এক ব্যক্তি উক্ত য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ানকে লক্ষ্য করিয়া রিভলভার ছুড়িতে উদ্যত হন; কিন্তু সাভারকর তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ক্ষান্ত করেন। আর এক ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া এক লাঠির আঘাতে সাভারকরের মাথা ফাটাইয়া দেয়। এই আঘাতে সাভারকর বাধ্য হইয়া নিজ আসনে বসিয়া পড়েন। গবর্ণমেণ্ট সাভারকরকে উক্ত ঘটনায় জড়িত করিবার বহু উপায় অনুসন্ধান করিয়াও ব্যর্থ হন। যথেষ্ট প্রমাণাভাবে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে তাঁহারা বাধ্য হন। পুলিশের কড়া পাহারায় উত্তক্ত হইয়া ও ইংলিশ বোর্ডিংয়ে আশ্রয় না পাইয়া অধিকন্তু ভারতে তাঁহার পরিবারবর্গ ও বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি যথেষ্ট নির্য্যাতন চলিতেছে সংবাদ পাইয়া তিনি

মর্ম্মাহত হন এবং বাধ্য হইয়াই প্যারী অভিমুখে রওনা হন। তথায় প্রসিদ্ধা পার্শী মহিলা মাদাম কামা তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। তথায় স্বল্পকাল অবস্থান করিয়াই তিনি তাঁহার অনুচরবর্গ ও কর্ম্মিবৃন্দের মধ্যে এক নূতন জীবনের সন্ধান দেন। অতঃপর বন্ধু-বান্ধবের নিষেধ এবং নিশ্চিত গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা সত্ত্বেও তিনি লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কারণ তিনি লণ্ডনই তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রের অধিকতর উপযোগী স্থান বলিয়াই মনে করিতেন। ১৯১০ সালের মার্চ্চ মাসে তাঁহাকে লণ্ডনে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ইংরেজের আদালতে লণ্ডন হইতে বিতাড়িত করিয়া তাঁহাকে ভারতে পাঠাইবার জন্য আদেশ হইল। তাঁহার বন্ধু-বান্ধবগণ প্রিভিকাউন্সিলে আপীল করিয়াও উক্ত আদেশ নাকচ করিতে পারিলেন না।

এই বিপজ্জনক রাজবন্দীকে লইয়া এক ষ্টীমার মার্সেলিশ বন্দরে নোঙ্গর করিল।

এই সময় রক্ষিগণ কোনরূপ কড়া পাহারার প্রয়োজন বোধ না করায় অবহেলা করিতে আরম্ভ করিল। সাভারকর তাঁহাকে শৌচাগারে লইয়া যাইবার জন্য রক্ষীদিগকে অনুরোধ করিলেন। তিনি শৌচাগারে প্রবেশ করিয়াই একটি পোর্টহোল দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহার জামা হুকে লাগাইয়া রাখিয়া উক্ত গর্ত্তের মধ্য দিয়া সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। রক্ষিগণ তৎক্ষণাৎ শৌচাগারের দুয়ার ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে গুলী ছুঁড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সাভারকর ডুব দিয়া অতি সতর্কতার সহিত গুলী এড়াইয়া সাঁতার দিতে দিতে ফরাসীর উপকূলে পৌঁছিলেন। তিনি স্বয়ং এক ফরাসী পুলিশের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন এবং পরে উহাকে তাঁহার বৃটিশ রক্ষীদিগের হস্তে অর্পণ করা হইল। এই সময় এই ঘটনা লইয়া সমগ্র বিশ্বের সংবাদপত্রাদিতে দারুণ সমালোচনা করা হইয়াছিল। ফরাসী গবর্ণমেণ্ট সাভারকরকে ফেরত পাইবার দাবী জানাইলেন, কিন্তু বৃটিশ উক্ত প্রস্তাবে রাজী হইলেন না। এই ব্যাপার হেগের আন্তর্জ্জাতিক বিচারালয়ের বিচারাধীন হইল এবং উক্ত আদালতও সাভারকরের বিরুদ্ধে রায় দিলেন।

ভারতে এক স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুনালে শ্রীযুত সাভারকরের বিচারকার্য্য হইল, সে এক স্মরণীয় ঘটনা। সাভারকর প্রকাশ্য ভাবে বৃটিশ আদালতের কর্ত্তৃত্ব অস্বীকার করিয়া বলিলেন যে, তিনি নিজেকে ফরাসী আদালতের বিচারাধীন বলিয়া মনে করেন। সম্রাটের গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার অপরাধে তাঁহার প্রতি বিভিন্ন দফায় পঞ্চান্ন বৎসরের কারাদণ্ডের আদেশ হয়। অতঃপর তাঁহাকে আন্দামানে প্রেরণ করা হয়। তথায় তিনি ১৪ বৎসর আটক থাকেন। পরে তাঁহাকে রত্নগিরিতে স্থানান্তরিত করা হয় এবং এখানেও তিনি ১৪ বৎসর অন্তরীণ অবস্থায় অতিবাহিত করেন। ১৯৩৭ সালের মে মাসে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়

ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাঁহাকে স্বমতে আনিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হন। তিনি স্বীয় স্বাধীন চিন্তা ছাড়িয়া সকলের সহিত সমস্বরে 'মহাত্মা গান্ধী কি জয়' বলিয়া রাজনৈতিক কর্ত্তব্য পালন করিতে অস্বীকার করেন।

ইহাই হইল বীর সাভারকরের পরিচয়। বহুপূর্ব্বে ভারতীয় যুবসম্প্রদায়ের উপর শ্রীযুত সাভারকরের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তাঁহার স্বলিখিত বহু প্রবন্ধ ও পুস্তক আজ নিষিদ্ধ। ঐ সকল প্রবন্ধ ও পুস্তকে অখণ্ড যুক্তির সহিত তাঁহার মতের সারবত্তা প্রমাণিত হইয়াছিল। বিভিন্ন ভাষায় তাঁহার অভিজ্ঞতা প্রচুর। ইংরেজী, হিন্দী ও মারাঠী ভাষায় তাঁহার দক্ষতা অতুলনীয়। বাঙলা, গুজরাটী ও পাঞ্জাবী ভাষায় তাঁহার অভিজ্ঞতাও প্রশংসনীয়। আমরা এইরূপ একজন যোগ্যতম ব্যক্তিকে বন্ধু ও পথপ্রদর্শক হিসাবে পাইয়া ধন্য হইয়াছি। তিনি আমাদের নিকট ঈশ্বরের দান স্বরূপ। তাঁহার যৌবনে যে রাজনৈতিক মত ও পথ ছিল তাহা আজ যথেষ্ট পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সে বীর হৃদয় এখনও অক্ষুণ্ণ ও অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। ন্যায়ের সমর্থনে তিনি পৃথিবীর যে-কোন শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। আজ সাভারকরকে সম্মান প্রদর্শন করিতে উঠিয়া আমরা দেশাত্মবোধ ও আত্মোৎসর্গের প্রতিই সম্মান প্রদর্শন করিতেছি। আজিকার স্বাধীনতা আন্দোলনের বহু পূর্ব্বে যখন কেহ ইহার স্বপ্নও দেখেন নাই, তখন এই দেশমাতৃকার বন্ধন মোচনের জন্য বীর সাভারকর যে ভাবে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন তাহা অনেকের কল্পনারও অতীত। এই শক্তিশালী পুরুষকে আমাদের মধ্যে পাইয়া আমরা তাঁহার নিকট প্রকৃত কর্ম্মীর প্রেরণালাভে সমর্থ হইব বলিয়াই মনে করি।

আজ সেই কারণেই আমরা সমগ্র হিন্দুকে সমবেত হইবার জন্য আহ্বান করিতেছি। কোন অহিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অযথা প্রতিবাদ করিবার জন্য নহে—আত্ম রক্ষার্থই আমাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে। বাহিরের আক্রমণ হইতে রক্ষা লাভের জন্য আজ নিজদিগকে শক্তিশালী করিবার জন্যই আমরা এই আহ্বান জানাইতেছি।

আজ সমগ্র হিন্দু যদি প্রকৃত সঙ্ঘবদ্ধ হইতে সমর্থ হন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে অপরের কর্ত্তৃত্বে পরিচালিত হইতে হইবে না আর এই উপায়েই তাঁহারা শান্তিস্থাপনে সমর্থ হইবেন। 'বন্দে মাতরম'

'বন্দে মাতরমের দেশে' বীর সাভারকর

কলিকাতা টাউনহলে সম্বর্দ্ধনা সভায় বক্তৃতা

কলিকাতার হিন্দু নাগরিকগণের পক্ষ হইতে মিঃ এস এন ব্যানার্জ্জি শ্রীবিনায়ক দামোদর সাভারকরকে অভিনন্দন পত্র দেন।

সাভারকরের বক্তৃতা

মানপত্রের উত্তরে বিপুল আনন্দ ধ্বনির মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীযুক্ত সাভারকর বলেন,—'বন্দেমাতরম্'-এর দেশে আসিয়া আমি নিজকে ধন্য মনে করিতেছি। যৌবনের প্রারম্ভে বাঙ্গলা-দেশ যাদুমন্ত্রের মত আমাকে মোহাবিষ্ট করিয়াছিল এবং এই দেশটিকে দেখিবার জন্য আমার মনে প্রবল আকাঙ্ক্ষার সঞ্চার হইত আজ 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতের জন্মভূমিতে আসিয়া আমার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছে। এখানে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। গত ৩০।৩৫ বৎসর যাবৎ যাঁহারা জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্য অকাতরে আত্মবলিদান করিয়াছেন এই তাঁহাদের লীলাভূমি বাঙ্গলাদেশ। আমি মিথ্যা কথা বলিব, যদি বলি আমি বাঙ্গলা দেশকে অন্তরের সহিত ভালবসি না। বাঙ্গলাদেশ বলিতে আমি গর্ব্ব অনুভব করি। এদেশের হাজার হাজার যুবক দেশের জন্য অন্তরীণ, কারাদণ্ডে দণ্ডিত, নির্ব্বাসিত এমন কি ফাঁসীকাষ্ঠে পর্য্যন্ত গিয়াছে। এখানকার প্রত্যেক ধূলিকণা আমার কাছে পবিত্র। আজ অবস্থার কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আরও কত পরিবর্ত্তন হইবে। যাহারা আত্মবলিদান করিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের পথ আজকার দিনে কেহই সমর্থন করিবে না। কিন্তু দেশের স্বাধীনতাই যে তাহাদের লক্ষ্য ছিল তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। সর্ব্বপ্রকার বৈধ উপায়ে কংগ্রেস ভারতীয় সমস্যার সমাধানে যে চেষ্টা করিতেছে সেজন্য আমি তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

গত বিশ বৎসর যাবৎ বাঙ্গলার হিন্দুদের মধ্যে অনেক বীর হৃদয় যুবকের আবির্ভাব হইয়াছে। অভ্রভেদী হিমালয়ও তাহাদের হৃদয়ের মহত্ত্বের পরিমাপ করিতে পারে না। তাহারাই ভারতের ইতিহাস রচনা করিয়াছে। সুতরাং ভবিষ্যতের জন্য নিরাশার কোন কারণ আমি দেখি না। অতীতে যদি হিন্দুরা নিজের পায়ে ভর দিয়া আপন শক্তিতে সংগ্রাম করিয়া থাকে ভবিষ্যতেও তাহারা সেইরূপ করিতে পারিবে। তাহারা কাহারও অনুগ্রহ বা ভ্রুকুটিতে দৃকপাত করিবে না। লক্ষ্যে স্থির থাকিয়া অদম্য শক্তিতে তাহারা সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইবে।

আজ ভারতের হিন্দুদের অভাব-অভিযোগের কোন প্রতিকার হইতেছে না। হিন্দুদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার বা উন্নতির চেষ্টা করিলে তাহা সাম্প্রদায়িকতা বলিয়া গণ্য হয়। আমি জিজ্ঞাসা করি, সাম্প্রদায়িকতা ও জাতীয়তা কাহাকে বলে? সাম্প্রদায়িকতা খারাপ, কারণ উহা মানুষকে সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে। টলষ্টয় বলিয়াছেন, বিশ্বভ্রাতৃত্বের ও বিশ্বমানবতার পথে অন্তরায় বলিয়া জাতীয়তাও খারাপ, কারণ উহা মানুষকে সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখে। বিশ্বমানবতার অজুহাতে আজও পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে বিভিন্ন জাতির বিলোপ ঘটে নাই। যতদিন পর্য্যন্ত পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতির অস্তিত্ব থাকিবে এবং তাহারা আক্রমণাত্মক নীতির পথ অনুসরণ করিবে ততদিন পর্য্যন্ত আদর্শকে দর্শন শাস্ত্রের গণ্ডীর মধ্যে রাখিয়া বাস্তব ক্ষেত্রে আমাদিগকে জাতিয়তার আশ্রয় লইতে হইবে—বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব যতই উঁচু দরের জিনিষ হউক না কেন। সাম্প্রদায়িকতা সম্বন্ধেও একই কথা। যতদিন পর্য্যন্ত অন্য সম্প্রদায় আমাদিগকে আক্রমণ করিতে থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত আমাদিগকে সাম্প্রদায়িক হইতেই হইবে, নচেৎ অন্যের আক্রমণে আমরা ধ্বংস প্রাপ্ত হইব। এখানে সন্দেহের অবকাশ নাই। তাই হিন্দুদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার জন্য হিন্দু সংগঠনের উদ্ভব হইয়াছে। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে জাতীয়তা ও সাম্প্রদায়িকতা উভয়টিই সমান মূল্যবান। আসল কথা আক্রমণাত্মক নীতিই খারাপ। আক্রমণাত্মক নীতি হইতে আত্মরক্ষা করিতে না পারিলে হিন্দুরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। 'বন্দেমাতরম্'এর উপর যখন আক্রমণ সুরু হয় তখন সমস্ত মহারাষ্ট্র 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠে। ইহাই আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়।

ভারতবর্ষ আমাদের এত প্রিয় কেন? ভৌগোলিক কারণে নহে, কারণ এখানে রামায়ণ মহাভারতের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি-গাথা পুণ্য সলিলা গঙ্গা-যমুনার তীরে তীরে কত বিরহ মিলনের কাহিনী আমাদের হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া তোলে। ভাষাগত, ধর্ম্মগত, সংস্কৃতিগত সংস্পর্শ পবিত্র জিনিষ। আমরা বাড়ীর ছাদ বা দরজাকে ভালবাসি না, আমরা ভালবাসি সেই স্মৃতিকে, যেখানে প্রিয়তমা স্ত্রী বা স্নেহময়ী ভগ্নী বা কন্যা এবং প্রিয়তম পুত্র থাকে। তাহারা যদি নিপীড়িত হয়, চোখের সম্মুখে যদি লাঞ্ছিত হয়, তবে ত মানুষের বনে যাওয়াই ভাল। হিন্দু মহাসভা মাতৃভূমির সেই আদর্শ আপনাদের সম্মুখে স্থাপন করিয়াছে।

আজকাল সাম্প্রদায়িকতার কথা শোনা যায়। বিহারে বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে, গুজরাটের মারাঠার বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিতেছে। প্রাদেশিকতা হইতে এই আক্রমণাত্মক নীতি যখন অপসারিত হইবে তখনই উহা জাতীয়তার ভিত্তি দৃঢ় করিবে। হরিজন আন্দোলনের অর্থ কি? কতকগুলি লোক অন্যের দ্বারা নিপীড়িত হইতেছে তাহাদিগকে রক্ষা করা প্রয়োজন। যতদিন নিপীড়ন থাকিবে ততদিন হরিজন আন্দোলন চালাইতে হইবে। সাম্প্রদায়িকতা সম্বন্ধেও একই কথা। যখন সাম্প্রদায়িক আক্রমণ থাকিবে না, তখন আমরা একই রাষ্ট্রের সমান অধিকারী বলিয়া সকলে দাবী করিতে পারিব।

ভারতবর্ষে হিন্দুরা কি একটা সম্প্রদায়? ইংলণ্ডে ইংরেজ, জার্ম্মাণীতে জার্ম্মাণ, তুরস্কে তুর্কীরা সম্প্রদায় নহে, তাহার জাতি—সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়। সেইরূপ ভারতের ২৮ কোটি হিন্দুই ভারতের জাতি। মুসলমানগণ সম্প্রদায় মাত্র। হিন্দুরাই অনাদিকাল হইতে এদেশে বাস করিয়া আসিয়াছে। একের পর এক বিদেশীরা হিন্দুকে আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু যুগযুগান্তর ধরিয়া হিন্দুদের উপর এই আক্রমণ চলিলেও আজও তাহারাই ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ—এবং ইহাই হিন্দুদের গৌরব। এত আক্রমণ, অভিযান, লুণ্ঠন প্রভৃতির পরেও যদি তাহাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে, তবে ভবিষ্যতেও পারিবে। যে সমস্ত সম্প্রদায় এদেশে আছে তাহারা যদি দেশকে ভালবাসে ও আপন বলিয়া গ্রহণ করে তাহা হইলে সংখ্যানুপাতে তাহারা সমান অধিকার পাইবে। সুখের বিষয় খৃষ্টান, ইহুদী, পার্শি প্রভৃতি সম্প্রদায় হিন্দুদের সঙ্গে বন্ধুভাবে থাকিয়া এক জাতি গঠন করিতে ইচ্ছুক। মুসলমানদের উপর আমার রাগ নাই। তাহারা সাধ্যমত আমাদের অনিষ্ট চেষ্টা করুক। তাহারা হিন্দুদের কিছুই করিতে পারিবে না। বরং হিন্দুরা এই বিপদ হইতে অপূর্ব্ব গৌরবে মণ্ডিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিবে। সংখ্যা-

গারষ্ঠতা আমাদের অপরাধ নহে। যেহেতু আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেইজন্যই কি আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিসর্জ্জন দিতে হইবে? তাহা কিছুতেই হইতে পারে না। হিন্দুরাই ইংরেজের অনিচ্ছুক হস্ত হইতে শাসন সংস্কার আদায় করিয়াছে, মুসলমানেরা নহে। তাহারা দলে দলে জেলে গিয়াছে, নির্ভয়ে বিপদকে বরণ করিয়াছে। যে আন্দোলন তাহাদের স্বার্থ ক্ষুন্ন করিতে চাহে তাহা অন্যায় ও মিথ্যা আন্দোলন—বৈপ্লবিক দিনেও এই আদর্শই আমার হৃদয়কে সঞ্জীবিত করিয়াছিল, এখনও তাহা করিতেছে, আমি মনে প্রাণে হিন্দু।

ডাঃ মুঞ্জে বলেন যে, বাঙ্গালীরা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরোধিতা করিতে সংকল্প করিয়াছিল। কিন্তু চাকুরীর ব্যাপারে বাঁটোয়ারার নীতিকে কেহ কেহ সমর্থন করিতেছে দেখিয়া বক্তা দুঃখ প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ অন্য সব দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের জন্য তুমুল আন্দোলন করিতে সংকল্প করিয়াছেন; কিন্তু হায়দরাবাদ, ভূপাল, রামপুর প্রভৃতি মুসলমান রাজ্য সম্বন্ধে নীরব রহিয়াছেন, হিন্দু মহাসভা সেই কাজে হাত দিয়াছে।

শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায় চৌধুরী চিত্তরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর কেশবচন্দ্র ব্যানার্জ্জি এম-এল-সি, বিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী, কুমার শরদিন্দু রায় চৌধুরী, ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ সেন, মাখনলাল সেন, মদনমোহন বর্ম্মন, সরলা দেবী, মিথি বেন, মাখনলাল বিশ্বাস, এস এন রুদ্র, সুধীর মিত্র, শান্তি রায় চৌধুরী, যোগেন্দ্র মৈত্র, চন্দ্রশেখর সেন, নরেন শেঠ, দুলালচন্দ্র মিত্র, গণেন বন্দ্যোপাধ্যায়, হারাণচন্দ্র ঘোষ চৌধুরী, ডাঃ কানাই গাঙ্গুলী, পদ্মরাজ জৈন, আশুতোষ লাহিড়ী, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, ভূপেশ লাহিড়ী প্রভৃতি অনেকে সভায় উপস্থিত ছিলেন।

পাওনাদার

শ্রীজ্যোতিপ্রসন্ন সেনগুপ্ত

সারাটি রাত দুর্ভাবনায়
আসেনি ঘুম নয়নপাতে
শয্যা ছেড়ে উঠ্‌তে হলো
পাওনাদারের তাগাদাতে।
গয়লা এসে জানিয়ে গেল
দুধ করেছে বন্ধ আজি;
মুদি বুড়ো কোন মতেই
সময় দিতে নয়কো রাজী।
বাড়ীওয়ালা ভাড়ার লাগি'
নোটিশ হাতে হাজির দ্বারে
তিনটি মাসের প্রাপ্য টাকা
নগদ দিতে হবেই তারে।
রক্ত চক্ষু দয়াল বাবু
শুনিয়ে গেছে অনেক কথা—
—'সুদের টাকা না দেবারই
মতলবেতে বল্‌ছি যা-তা।'

* * * *

তিরিশ টাকা মাইনে-ধারী
শিক্ষকের এ দুঃখ ব্যথা-
কেই-বা বোঝে কেই-বা শোনে
ব্যর্থ তাদের জীবন-কথা।
বাণীর বর-পুত্ররূপী
বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা
লক্ষ্মী দেবীর করুণ আঁখির
প্রসাদ কিছুই পায়নি এরা!
সহাধ্যায়ী যে-সব ছিল
'খারাপ ছেলে'—'দুষ্টু ছেলে'
আজকে তাদের উপদেশের
পাত্র এরা গরীব ব'লে।
যাদের হাতে ভবিষ্যতের
সমাজ গড়ার সকল দাবী
উপেক্ষা আর অবহেলায়
নিত্য তারাই খাচ্ছে খাবি!

* * * * *

ভগ্ন-বুকে ফির্‌ছি ঘরে
অদৃষ্টেরে ধিক্কারিয়া
পেছন থেকে হঠাৎ কে যে
টান্‌ছে আমায় আঁচল নিয়া।
তাকিয়ে দেখি হাস্যমুখে
হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে
ছোট্ট আমার দেড় বছরের
লক্ষ্মী মেয়ে পায়ের কাছে।
সকল পাওনাদারের শেষে
সবার বড়ো দাবীটি তার
কড়ায় গণ্ডায় দিতেই হবে
সবুর কিছুই সইবে না আর।
আদর করে কোলে নিতেই
অজানা তার 'নাগরি' ভাষায়
কতই অভিযোগ সে জানায়
কতই কাঁদা-য় কতই হাসা-য়।
মুহূর্ত্তেতেই ভুলিয়ে দিল
মনের যত গোপন ব্যথা
পরাজয়ের সকল গ্লানি
জীবন-রণের এ ব্যর্থতা।
হাল্‌কা হাসির পরশ দিয়ে
জুড়িয়ে দিল সকল হিয়া
'তা-না-না-না' গানটিতে তার
কর্ণে ঢালে কি অমিয়া।
ধরার ধূসর মরুর মাঝে
এরাই পারিজাতের মালা
নন্দনেরই গন্ধ ঢালে
ভুলায় সবার দুঃখ জ্বালা!

খুলনায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ

শ্রীবিনায়ক দামোদর সাভারকর

খুলনায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার অষ্টম অধিবেশনের সভাপতি শ্রীযুত বিনায়ক দামোদর সাভারকর গত শুক্রবার নিম্নলিখিত অভিভাষণ দেন—

বন্ধুগণ, আমি জানি আমি আপনাদিগকে নানা অসুবিধায় ফেলিয়াছি; তজ্জন্য আমি আপনাদের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাহিতেছি। প্রথমতঃ আমার অভিভাষণ লিখিবার সময় আমি পাই নাই। দ্বিতীয়তঃ; বাঙলায় আমি প্রথম আসিলাম বলিলেই হয়। বাঙলার হিন্দুর দুঃখ-দুর্দ্দশার কথার সহিত আমার যতটুকু পরিচয় থাকা উচিত ছিল ততটুকু নাই। সুতরাং বঙ্গজননীর যে সকল সুসন্তান আজ এখানে সমবেত হইয়াছেন, তাঁহাদের উপর বাঙলার হিন্দুদের দুঃখ-দুর্দ্দশা মোচনের ভার ছাড়িয়া দেওয়াই আমার পক্ষে উচিত। আমি শুধু ভারতে হিন্দু সংগঠন আন্দোলন সম্পর্কে এবং বিশেষভাবে বাঙলায় হিন্দু সংগঠন আন্দোলন কি ভাবে চালান যাইতে পারে তৎসম্পর্কে কয়েকটি কথা বলিব।

প্রথমতঃ কয়লা যে সোনা হইতে কাল, অথবা চন্দ্রালোক হইতে সূর্য্যালোক যে উজ্জ্বলতর তাহা প্রমাণ করিবার জন্য আমি আপনাদের সময় নষ্ট করিতে চাই না। আমি ধরিয়াই লইয়াছি যে,—(এবং আশা করি তজ্জন্য কোন যুক্তির অবতারণা করিতে আপনারা আমাকে বলিবেন না)—আমাদের মুসলমান ভাইগণ হিন্দুদের সহিত মিলিয়া একটা সাধারণ জাতিরূপে পরিগণিত হইতে চাহেন না। যতই দিন যাইতেছে, যতই কংগ্রেস মুসলমানদিগকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা পাইতেছেন এবং মুসলমানদিগকে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা দিতেছেন ততই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ আরও তীব্র হইয়া উঠিতেছে।

ভাষার কথাটাই ধরুণ না কেন? ভাষার দিক দিয়া বাঙলার হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যত মিল আছে অন্য কোন প্রদেশের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে তত নাই। কিন্তু এক্ষণে উর্দ্দুকে জাতীয় ভাষা করিবার জন্য মুসলিম লীগ প্রকাশ্যভাবে চেষ্টা করিতেছেন। বাঙলায় স্কুলের ছাত্রদের ইতিহাস পাঠ্য-পুস্তক পর্য্যন্তও অর্দ্ধেক উর্দ্দু ও অর্দ্ধেক বাঙলায় রচনা করিবার চেষ্টা চলিতেছে। হিন্দু-মুসলমানকে এক জাতিতে পরিণত করিবার চেষ্টা যে কিরূপ অদ্ভুত তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে? আমার নিজের মত এই যে, দুইটি ভাষার দুইটি ধর্ম্মের ও দুইটি জাতির মিলন কখনও পূর্ণাঙ্গ হইবে না যদি না এই সব রকমের মিলন একই মানুষের মধ্যে একসঙ্গে রূপ পরিগ্রহ করে।

আমার একটি প্রস্তাব আছে; প্রত্যেক মানুষ হিন্দু-মুসলমান মিলনের এক একজন অবতার সাজ[illegible]! প্রত্যেকে মুখের এক দিকে দাঁড়ি রাখুক ও অপর দিক কামাইয়া ফেলুক; প্রত্যেকে একসঙ্গে তুর্কী ফেজ পরিধান করুক, সঙ্গে সঙ্গে টিকিও রাখুক, যেন আন্তরিক মিলন ঘটা সম্ভব হয়। আসুন আমরা এক পায়ে পায়জামা পরি ও অপর পায়ে ধুতি পরি। কিন্তু আমি আপনাদিগকে বলিতে চাই যে, আমরা যদি পূর্ব্বোক্ত কাজও করি মুসলমানগণ তাহা প্রত্যাখ্যান করিবে। হিন্দু মহাসভা যদি এইরূপ প্রস্তাবও গ্রহণ করে যে, হিন্দুরা এক পায়ে পায়জামা ও অপর পায়ে ধুতি পরিবে তাহা হইলেও মুসলমানেরা বলিবে দুই পায়ে পায়জামা না পরিলে চলিবে না।

সহজ কথায় আমি বলিতে চাই যে, মুসলমানগণ নিজেদের লইয়াই ভারতে একটা জাতি গঠনে কৃতসংকল্প। এই কথা শুধু যে কোন কোন মৌলানা বলিতেছেন তাহা নয়, মুসলমান সমাজের নেতারা, মুসলিম লীগ এবং মিঃ জিন্নার মত নেতাও প্রকাশ্যভাবে ভারতবর্ষকে দুইটি যুক্তরাষ্ট্রে, মুসলমান ও হিন্দু যুক্তরাষ্ট্রে ভাগাভাগি করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন তাঁহারাই যখন এইরূপ কথা বলিতেছেন, তখন আপোষের কথাবার্ত্তার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। পুরুষানুক্রমে আমরা ভারতের একতার জন্য প্রাণপাত করিয়া আসিয়াছি। যতদিন একটি হিন্দুও বাঁচিয়া থাকিবে ততদিন আমরা মাতৃভূমিকে বিভক্ত করিতে দিব না। (হিয়ার, হিয়ার)

সুতরাং ভাষা, ধর্ম্ম ও রাজনীতির দিক দিয়া মুসলমানগণ হিন্দুদের বাদ দিয়া নিজেদের লইয়াই যে একটা জাতি গঠনে কৃত সংকল্প তাহা নিশ্চিত ধরিয়া লইয়া চলাই ভাল। মুসলমানদের এই সংকল্প অতি সুস্পষ্ট; অন্ততঃ পক্ষে আরও একশত বৎসর পর্য্যন্ত হিন্দু এই সংকল্প নিশ্চিত বলিয়া ধরিয়া লইতে পারে। আমি চাই যে আমার কংগ্রেসী হিন্দু ভাইগণ ইহা বুঝুন; কিন্তু তাঁহারা যেন অন্ধচক্ষে দূরবীক্ষণ যন্ত্র লাগাইয়া বিষয়টি বিচার করিতেছেন, তাঁহাদের সুবিচার করিবার কোন সামর্থ্য নাই। কিন্তু হিন্দু আপনারা; আপনারা স্পষ্টই দেখিতেছেন যে, ভারতে একটি নয়, দুইটি জাতি রহিয়াছে এবং এই দুই জাতির অস্তিত্বের বোধ লইয়াই রাজনীতি ক্ষেত্রে আপনাদের মনোভাব গড়িয়া তুলিতে হইবে।

স্মরণ রাখিবেন অন্ততঃ আরও একশত বৎসর এই অবস্থা চলিতে থাকিবে। বন্ধুত্ব জন্মাইতে হইলে দুইজনেরই ইচ্ছা থাকা দরকার। কিন্তু একজন যদি বন্ধুত্ব না চায়, অপরের শত চেষ্টা সত্ত্বেও মিলন হয় না। হিন্দু-মুসলমান মিলনের জন্য কংগ্রেস যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা হয়ত সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে; কিন্তু সে মিলন হইবে বাঘে ও গরুতে একসঙ্গে জল পান করার মত। বাঘে ও গরুতে একসঙ্গে জল পান বাঘের পেটে গরুটি গেলেই সম্ভব, নচেৎ নহে। আমার অভিমত এই যে, হিন্দু-মুসলমান মিলনের জন্য কংগ্রেস যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহা চলিতে থাকিলে কোন কালেও মিলন হইবে না। পক্ষান্তরে হিন্দুরা বৃটিশের হাত হইতে যে সব অধিকার কাড়িয়া লইবে মুসলমানদের হাতেই সেইগুলি চলিয়া যাইবে, হিন্দুদিগকে নিজ বাসভূমিতে পরবাসী হই[illegible] থাকিতে হইবে।

বাঙলা, পাঞ্জাব, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, এমন কি কংগ্রেসী গবর্ণমেণ্টের আমলে যুক্ত প্রদেশেও—যেখানে হিন্দুরা সংখ্যায় গরিষ্ঠ—প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে হিন্দুদের অবস্থা যেরূপ ছিল এক্ষণে তাহা অপেক্ষা খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। ইহা কি সত্য নহে? সত্য কি না আপনারাই বিচার করিয়া দেখুন।

তারপর, মুসলমানদের তুষ্ট রাখিবার জন্য কংগ্রেসের এত বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও মুসলমানগণ পূর্ব্বের তুলনায়, গত ২০।২৫ বৎসরের তুলনায় কি সন্তুষ্ট হইয়াছে? কংগ্রেস মুসলমানগণের সহিত মি[illegible]লি করিতে চাহেন। কিন্তু কার স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়া কংগ্রেস মিতালি করিতে চাহেন? আমি অবশ্যই বলিব হিন্দুর স্বার্থ। মুসলমান আজ-

কাল কংগ্রেসের মত অপর কোন প্রতিষ্ঠানকে ঘৃণা করে কি? আমি অবশ্যই বলিব ইহা কংগ্রেসের নীতির কুফল। মুসলমানদের অভিযোগগুলি মিথ্যা প্রমাণ করিবার জন্য কংগ্রেসী মন্ত্রীরা কেবল বিবৃতির পর বিবৃতি প্রকাশ করিতেছেন। বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে মিঃ খের এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, আমাদের মধ্য-প্রদেশের মিঃ শুক্ল, যুক্তপ্রদেশের মিঃ পন্থ দু'চার জন মুসলমানদের বন্ধু বনিবার জন্য কি কি করিয়াছেন তৎসম্পর্কে বিবৃতি দিয়াছেন। আমি সুবিচার করিতেছেন। কংগ্রেসী মন্ত্রীরা হয়ত মুসলমানদের উপর সুবিচার করিয়াছেন। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি হিন্দুদের বেলায় কি করা হইয়াছে? কংগ্রেসী মন্ত্রিগণ, যদি জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের প্রতিনিধিই হইয়া থাকেন, হিন্দুদের ভোটেই যদি তাঁহারা মন্ত্রিত্ব লাভ করিয়া থাকেন, তবে মুসলমানের প্রতি যেরূপ সুবিচার করিতেছেন, হিন্দুদের প্রতি তদনুরূপ সুবিচার করা তাঁহাদের উচিত নয় কি? এক সম্প্রদায় অপেক্ষা অপর সম্প্রদায়কে বেশী দেওয়ার নাম কি জাতীয়তা? যাঁহাদের ভোটে তাহারা বলিয়া বসে যে, "মহরম আমাদের শোক প্রকাশের সময়, কাজেই মহরমের দশ দিনই হিন্দুদের বাজনা বন্ধ থাকিবে।"

আমি কয়েকদিন যুক্তপ্রদেশে ছিলাম। তথাকার মুসলমানরা বলিয়াছে মহরমের দশ দিন হিন্দুদের বাজনা হইতে পারিবে না, সে হিন্দুদের বিবাহের বাজনাই হউক বা অন্য কোন পর্ব্বের বাজনাই হউক না কেন: ফলে কি হইল? কংগ্রেসী গবর্ণমেণ্ট আদেশ দিলেন যে, মহরমের দশ দিন মসজিদের সম্মুখে কোন বাজনা চলিবে না।
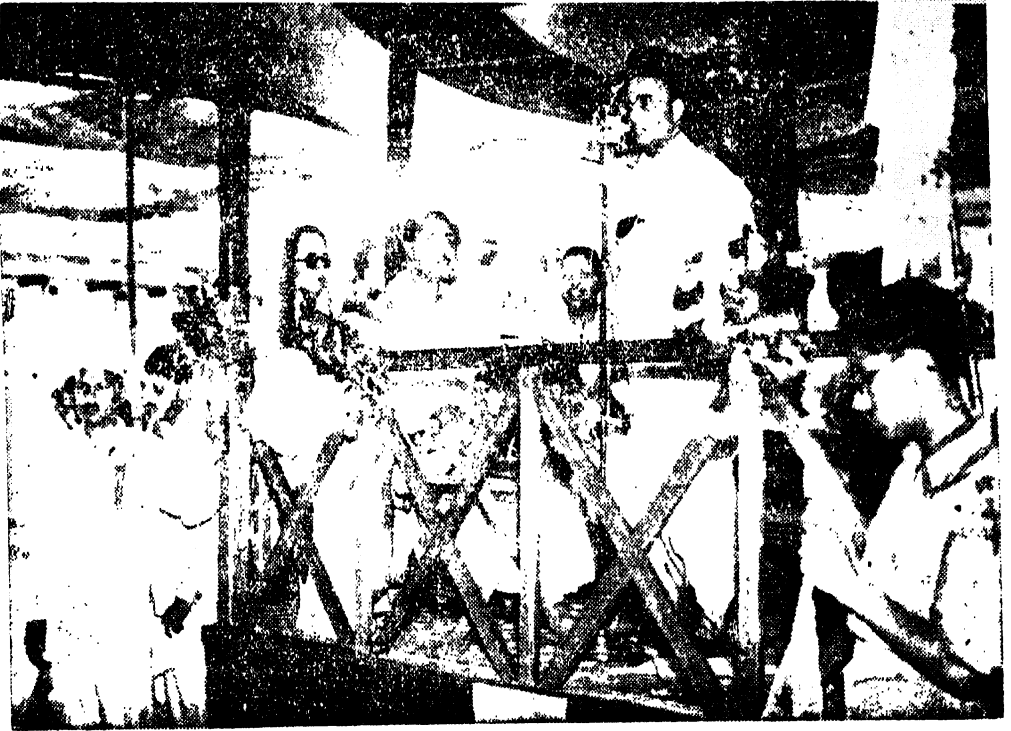
খুলনা বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলনে সভাপতি বীর সাভারকার

কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিতেছি। বিহারের কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল মুসলমানদিগকে তুষ্ট রাখিবার জন্য ও তাহাদের অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণ করিবার জন্য এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহারা বলিয়াছেন যে, "মুসলমানগণ বিহারে সংখ্যায় শতকরা বার জন হইলেও ডেপুটি কালেক্টরদের শতকরা ২৮ জন মুসলমান। শিক্ষা বিভাগের চাকুরীতেও মুসলমানেরা শতকরা ৪১ জন এবং স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিতে শতকরা ২৬জন।" কংগ্রেসী নীতির মাহাত্ম্য এই। কংগ্রেস এইভাবেই সকল সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহারা মন্ত্রী হইয়াছেন তাঁহাদের উপর অবিচার করা কি ন্যায়নীতি? (হিয়ার হিয়ার)

আর একজন কংগ্রেসী মন্ত্রীর বিবৃতি শুনুন। তিনি বলিয়াছেন, "মুসলমানদের উপর অত্যাচার করা হইতেছে, সাধ্য থাকে ত প্রমাণ করুন। যেখানেই মুসলমানদের ধর্ম্ম-সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন দেখা দিয়াছে সেখানে আমরা তাহাদিগকে সাহায্য করিতেছি। মহরম যাহাতে শান্তিতে সুসম্পন্ন হয় তজ্জন্য হিন্দুদের বাজনা বন্ধ করা হইয়াছে।"

মুসলমানগণ উহাতে সন্তুষ্ট হয় নাই; দ্বিতীয়তঃ কোন কোন সময় শঙ্খ বাজানও নিষেধ করা হইয়াছে বলিয়া যুক্তপ্রদেশের প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন। স্মরণ রাখিবেন বৃটিশ আমলাতন্ত্রের আমলেও বাড়ীর পূজায় শাঁখ বাজান বন্ধ হয় নাই। কিন্তু কংগ্রেসের—যে কংগ্রেস হিন্দু মহাসভাকে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান বলিয়া অভিহিত করেন, সেই কংগ্রেসের প্রধান মন্ত্রী শাঁখ বাজানোর উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছেন, কি উদ্দেশ্যে?—যেন মহরম শান্তিতে সমাধা হইতে পারে। ঘণ্টা বাজাইতে দেওয়া হয় না। প্রধান মন্ত্রী এই বলিয়া উহা

সমর্থনের চেষ্টা করিতেছেন যে, জাতীয়তার দিক হইতে ঘণ্টা বাজানো বন্ধ করাই নীতি হওয়া উচিত। (হাস্য) কংগ্রেসী প্রধান মন্ত্রী আরও বলিয়াছেন যে, অনুমতিপত্র ব্যতীত তিনি মহরমের সময় হিন্দুদের শোভাযাত্রা বাহির করিতে দেন নাই। কিন্তু মুসলমানের উপর সেইরূপ কোন নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয় নাই।

আমি আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি—জাতির নীতির দোহাই দিয়া—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের দোহাই দিয়া কি ইহা সমর্থন করা যায়? যে কংগ্রেসী মন্ত্রীরা এই নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন, সেই কংগ্রেস যে হিন্দু মহাসভার নিন্দা করে—তাহা কি কিছুতেই সমর্থন করা যায়? যদি মস্‌জিদের সম্মুখে বাজনা বাজাইলে মুসলমানদের আপত্তি হয় তবে আমি জিজ্ঞাসা করি রাস্তার পার্শ্বে মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করা হয় কেন? হিন্দুদের পাশাপাশি থাকিলেই যদি তাহাদের ব্যাঘাত জন্মে তবে তাহারা লোকালয় ছাড়িয়া হিন্দু-সাধুদের মত বনে-জঙ্গলে গিয়া কেন উপাসনা করে না?

কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার সমর্থনে তাঁহারা এইরূপ অদ্ভুত যুক্তি দেখাইয়া থাকেন; সুতরাং আমি মনে করি, আমরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ করিয়া থাকি তাহার সমর্থনে কোন যুক্তি দেখানো সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। আমি জানি আমার কংগ্রেসী বন্ধুগণ সৎ; তাঁহারা স্বদেশভক্ত এবং তাঁহাদের উদ্দেশ্য মহান। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমি ইহাও জানি যে, তাঁহাদের নীতি দিনের দিনই খারাপ হইতে খারাপ হইয়া চলিয়াছে। তাঁহাদের নীতি যে শুধু হিন্দু বিরোধী তাহা নহে; উহা জাতীয়তা বিরোধীও বটে। কিন্তু এখন তাঁহাদের সেই নীতি পরিত্যাগের সময় আসিয়াছে। যত শীঘ্র তাঁহারা নীতি পরিবর্ত্তন করিবেন; যত শীঘ্র তাঁহারা মিথ্যা ঐক্যের মোহ পরিত্যাগ করিবেন, ততই সর্ব্বসাধারণের পক্ষে মঙ্গল হইবে। জাতীয় গবর্ণমেণ্ট যদি এইরূপ নীতি অবলম্বন করিয়া চলেন, তবে আমি আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, এই সম্পর্কে হিন্দুদের একটু 'জাতীয়তা বিরোধী' হওয়ার সময় কি আসে নাই? হিন্দুদের পক্ষে যাহা মঙ্গলকর ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, তাহা জাতীয়তাবিরোধী হইতে পারে না। কংগ্রেস যদি তাহার বর্ত্তমান নীতি পরিত্যাগ না করে, তবে মুসলমানেরা ক্রমেই অধিক দাবী উত্থাপন করিতে থাকিবে এবং তাহার ফলে হিন্দুরা দাস হইয়া পড়িবে।

মুসলমানদিগকে আমি কোন দোষ দিই না। এই জগতে যাহারা দাবী উত্থাপন করিতে জানে তাহাদেরই উন্নতি হয়; তাহারাই সুখ-সুবিধা সম্ভোগ করিতে পারে। আজ মুসলমানেরা দেখিতেছে হিন্দুদিগের নিকট হইতে তাহারা নিজ সম্প্রদায়ের সুখ-সুবিধা আদায় করিয়া লইতে পারে। আমি মনে করি, তাহারা যে যতদূর সম্ভব সুবিধা আদায় করিবার চেষ্টা করিতেছে, ইহা তাহাদের পক্ষে কিছু অন্যায় নহে। একমাত্র হিন্দুরাই সমস্ত মানব জাতির উপর সুবিচার করিতে চাহে; অথচ নিজেদের উপর সুবিচার করিতে জানে না।

সেদিন হিন্দু রাজাদের সম্বন্ধে আমি কয়েকটী ঐতিহাসিক সত্য আলোচনা করিতেছিলাম। কথাটা এই যে ধর্ম্ম-সংক্রান্ত বিষয়ে মুসলমানদের উপর সুবিচার করার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক হিন্দু রাজা মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই নীতি যদি ভাল হইত, তবে আমি খুব সুখীই হইতাম। কিন্তু মন্দির ও মসজিদ নির্ম্মাণের এই সমদর্শিতার নীতি হিন্দু রাজাদের পক্ষে অত্যন্ত ভ্রান্ত নীতি ছিল। আজ হিন্দুদের এই মনোবৃত্তি অবলম্বন করা উচিত যে একমাত্র হিন্দু সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কোন সম্প্রদায়ের জন্য তাহাদের ভাবিবার কিছু নাই। যখন অন্যান্য সম্প্রদায় হিন্দুদের উপর সুবিচার করিবে, শুধু তখনই অন্যান্য সম্প্রদায়ের উপর হিন্দুদের সুবিচার করা উচিত, তৎপূর্ব্বে নহে। যে হিন্দুরা নাগপঞ্চমী দিবসে দুরন্ত কালসর্পকেও দুধকলা উপহার দেয় সেই হিন্দুরা কি কাহারও প্রতি অবিচার করিতে পারে? কিন্তু নির্ব্বিচারে সুবিচার করিতে গেলে চলিবে না। বুঝিয়া-শুনিয়া কখনও কখনও অবিচার করিতে হইবে।

হিন্দুদের পক্ষে অন্ততঃ বাঙ্গলার হিন্দুদের পক্ষে দ্বিতীয় কর্ত্তব্য হইতেছে, একটী শক্তিশালী হিন্দু প্রতিষ্ঠান গঠন করা। আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, বাঙ্গলার হিন্দুদের যে এই শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহার প্রকৃষ্টতম প্রতিকারের উপায় কি? আমি আপনাদের অতি আন্তরিকভাবে বলিতেছি যে, আমি একটী মাত্র উপায় জানি। সেই উপায় অতি সহজ কিন্তু অমোঘ। ভ্রাতৃগণ! আমি আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, আপনারা যদি সেই একমাত্র উপায়—একমাত্র সহজ উপায় অবলম্বন করিতে চাহেন, তবে ভারতবর্ষে হিন্দু রাজনীতির প্রবর্ত্তন করিতে হইবে এবং এমন একটী শক্তিশালী হিন্দু প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে হইবে, যে প্রতিষ্ঠান সর্ব্বদা হিন্দুর স্বার্থ রক্ষা করিবে—হিন্দুর স্বার্থ রক্ষা করিতে বাধ্য থাকিবে। সেই হিন্দু প্রতিষ্ঠান কি করিবে? অগণিত ভারতবাসীর আত্মত্যাগের ফলে আমরা এখন একরূপ প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব লাভে সমর্থ হইয়াছি, যদিও উহা ত্রুটীপূর্ণ। এই প্রাদেশিক শাসন সংস্কারের ফলে যতটুকু সুবিধা পাওয়া গিয়াছে, তাহা শুধু আমাদের ভোটের জোরেই উপভোগ করা যাইতে পারে। হিন্দু নির্ব্বাচকমণ্ডলীও আছে; আবার পৃথক মুসলমান নির্ব্বাচক-মণ্ডলীও আছে। হিন্দুরা যদি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয় যে, অতঃপর স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ ও আইন সভার নির্ব্বাচনে তাহারা শুধু এমন লোকদিগকেই ভোট দিবে, যাঁহারা হিন্দুস্বার্থ রক্ষা করিবেন, হিন্দুর পক্ষ সমর্থন করিবেন—তবে আগামী নির্ব্বাচনেই দেখিবেন ভারতের সাতটী প্রদেশে হিন্দু মন্ত্রিমণ্ডল গঠন সম্ভব হইবে।

মিঃ গোবিন্দবল্লভ পন্থের কথাই ধরুন। হিন্দুর ভোটে তিনি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনি একজন হিন্দু মন্ত্রী। তিনি আপনাদিগকে বুঝাইতে চাহেন যে, হিন্দু মুসলমান সম্পর্কে তিনি যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ জাতীয় নীতি। ধরুন মিঃ পন্থের পরিবর্ত্তে হিন্দুদের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হিন্দু মহাসভার কোন সদস্য যদি নির্ব্বাচিত হইতেন, তবে অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইত? লীগপন্থীরা যখনই সেই হিন্দু মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিত, তখনই তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন, তোমাদের জনসংখ্যার অনুপাত কত? মুসলমানেরা যদি বলিত 'শতকরা ৩০জন' তবে তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন, 'কোনও সরকারী বিভাগে কি মুসলমান কর্ম্মচারীর সংখ্যা শতকরা ৩০জন?' তদুত্তরে যদি তাহারা বলিত 'না'; তবে তিনি বলিতেন, 'আমি খাঁটি জাতীয়তাবাদী মন্ত্রী। আমি হিন্দুদের ভোটে জয়লাভ করিয়াছি! সুতরাং হিন্দু স্বার্থরক্ষা করা আমার দশগুণ কর্ত্তব্য। এইরূপ কর্ম্মদক্ষ ও সাহসী লোক যদি হিন্দুদের ভোটে নির্ব্বাচিত হইতেন এবং মন্ত্রী নিযুক্ত হইতেন তবে দেখিতেন হিন্দু-নারীদের দুর্দ্দশা কতদূর লাঘব হইত। বাঙ্গলাদেশে যদি কোথাও নারীহরণ হইত তবে তিনি একদল পুলিশ পাঠাইয়া তাহা নিবারণ করিতে পারিতেন এবং জাতীয় মন্ত্রী হিসাবে তিনি দুষ্কৃতকারীদের উপর এমন উপযুক্ত শাস্তি বিধান করিতে পারিতে ইংরাজ নারীর শরীর স্পর্শ করিতে তাহারা যেমন ভয় পায়, হিন্দু নারীর শরীর স্পর্শ করিতেও তদ্রূপ ভয় পাইত। দুর্ব্বৃত্ত মুসলমানগণ ইউরোপীয়ানদের উপর অত্যাচার করিতে সাহস পায় না কেন? সীমান্ত প্রদেশের বান্নুতে দেখুন, শুধু হিন্দুদের বাড়ী লুটতরাজ হইয়াছে; শুধু হিন্দু নারী অপহৃত হইয়াছে। আপনারা ইংরাজ মেয়ে মিস্ এলিসের কথা শুনিয়াছেন। পাঠানেরা তাহাকে অপমান করিয়া লইয়া গিয়াছিল। তজ্জন্য তাহারা কি শাস্তি পাইয়াছিল! একটা আস্ত গ্রাম ধূলিসাৎ করা হইয়াছিল। তাহার পর আর কখনও পাঠানেরা ইংরাজ নারী স্পর্শ করিবার সাহস পায় নাই। আপনারা যদি এমন মন্ত্রী পাইতেন, তবে নারী হরণের কথা শুনা যাইত না। প্রাদেশিক শাসন সংস্কারে অপরাধীদিগকে এইরূপ শাস্তি দানের ক্ষমতা আপনারা পাইয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা কি? হিন্দু মন্ত্রীরা হিন্দুদের ভোটে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, অথচ তাঁহারা মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

নির্ব্বাচনের পরই তাঁহারা নির্ব্বাচক-মণ্ডলীকে লাথি মারিয়া তাড়াইয়া দেন। অবশ্য মানুষ হিসাবে যে তাঁহারা খারাপ তাহা নহে। বরং তাঁহারা স্বদেশসেবক। কিন্তু স্বদেশভক্তিও অনেক সময় বাতুলতায় পর্য্যবসিত হইতে পারে। ইহা কাহার দোষ? আমাদেরই। গোটা নীতিটাই ভ্রান্ত।

এখন মুসলমানদের দৃষ্টান্ত দেখুন। তাঁহারা কি নীতি অবলম্বন করিয়াছেন! তাঁহারা জানিতেন যে নির্ব্বাচকমণ্ডলী দুই রকমের আছে। নির্ব্বাচনপ্রার্থীদিগকে ভোট দিবার সময় তাঁহারা বাছিয়া বাছিয়া গোঁড়া মুসলমানদিগকে ভোট দিয়াছেন। দুইটী প্রদেশে যে মুসলমানদের স্বার্থ-রক্ষার জন্য প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ মুসলমান-গণ মন্ত্রী হইয়াছেন, ইহাই তাহার কারণ। বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক প্রকাশ্যতঃই একজন লীগপন্থী। তিনি ইসলামী বক্তৃতা করিতেছেন; যতদূর সম্ভব মুসলমানদের উপকার করিতেছেন; খোলাখুলি বলিয়া বেড়াইতেছেন যে বাঙ্গলায় মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি বলিতেছেন, তাঁহার গবর্ণমেণ্ট মুসলমানদের জন্য শতকরা ৬০টী সরকারী চাকুরী নির্দ্দিষ্ট রাখিবেন। এখন তিনি তাঁহার আদর্শ অনুসারে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধন করিতে চলিয়াছেন। লোকটীর কি অদ্ভুত সাহস দেখুন। মুসলমান হিসাবে আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিই; আমি তাঁহার প্রশংসা করি। তারপর পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী স্যার সেকেন্দর হায়াৎ খাঁর দৃষ্টান্ত দেখুন। এই লোকটীরই বা কি দুর্জ্জয় সাহস। ইঁহারা যে মুসলমানদের জন্য এতসব করিতে পারিতেছেন, তাহার কারণ তাঁহারা শুধু এই কড়ারেই মুসলমানগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন যে, তাঁহারা মুসলমান-দের স্বার্থরক্ষা করিবেন।

পক্ষান্তরে আপনারা—হিন্দুরা জাতীয়তার ভিত্তিতে যে সকল হিন্দুদিগকে নির্ব্বাচিত করিয়াছেন, আজ মন্ত্রী হইয়া তাঁহারা কি করিতেছেন! কংগ্রেস ত জাতীয় প্রতিষ্ঠান। অথচ কংগ্রেস যে নীতি অবলম্বন করিয়াছে, উহা জাতীয়তা-বিরোধী। হিন্দুদের ভোটে নির্ব্বাচিত হিন্দু মন্ত্রীরা হিন্দু মহাসভার সদস্য হইতে পারেন না। অথচ মুসলমানদের ভোটে নির্ব্বাচিত মুসলমানদের সম্বন্ধে তেমন কোন বাধা নাই। হিন্দু মহাসভার সদস্যদিগকে বলা হয়, তোমাদিগকে জাতীয় প্রতিষ্ঠান হইতে বিতাড়িত করা হইবে। যেন হিন্দু থাকিয়া জাতীয়তাবাদী হওয়া যায় না; যেন জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সহিত হিন্দুদের কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে না। হিন্দু মহাসভার সদস্যগণ কংগ্রেসের সদস্য হইতে পারিবে না—এমন নিষেধাজ্ঞা জারী হয় নাই কি? আর যদি আমি কংগ্রেসের সদস্য হইতে চাই, তবে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে 'আপনি কি হিন্দু মহাসভার সভাপতি পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন?' আমি উত্তর করিব, 'আমি একজন জাতীয়তাবাদী' কিন্তু কংগ্রেস যাহাকে জাতীয়তাবাদী বলে, আমি তেমন জাতীয়তাবাদী নহি। আমি আমার বিবেকানুযায়ী জাতীয়তাবাদী (হর্ষধ্বনি)। আমি আপনাদিগকে নিশ্চিত বলিতেছি, আমার ধমনীতে এক বিন্দু শোণিত যতদিন থাকিবে, ততদিন আমি হিন্দুই থাকিব।

হিন্দু মন্ত্রীদের আজ যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, আপনারা ঠিকমত ভোট দিতে পারেন নাই। আবার যখন নির্ব্বাচনের সময় আসিবে, আবার যখন প্রার্থীরা আপনাদের নিকট ভোট প্রার্থনা করিতে আসিবেন, তখন তাঁহাদিগকে সুস্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিবেন 'আপনি কি হিন্দুদের পক্ষ হইতে দাঁড়াইয়াছেন?' প্রার্থী যদি উত্তর করেন, 'না আমি একজন জাতীয়তাবাদী', তবে আপনারা তাঁহাকে বলিবেন, 'আপনি জাতীয়তাবাদী নির্ব্বাচকমণ্ডলীর কাছে ভোট প্রার্থনা করুন; আর যদি জাতীয়তা-বাদী নির্ব্বাচকমণ্ডলী না থাকে, তবে ঐরূপ কোন নির্ব্বাচকমণ্ডলী যতদিন না হয়, ততদিন অপেক্ষা করুন।' আজ দেশে যে শাসনতন্ত্র চলিয়াছে, উহা নিছক সাম্প্রদায়িক। মুসলমান নির্ব্বাচকমণ্ডলী সৃষ্টি করা হইয়াছে, অথচ হিন্দু নির্ব্বাচক-মণ্ডলী নাই। শাসনতন্ত্রেও হিন্দু নামটা নিষিদ্ধ; মুসলমান নির্ব্বাচকমণ্ডলী আছে, খৃষ্টান নির্ব্বাচকমণ্ডলী আছে অথচ হিন্দু নির্ব্বাচকমণ্ডলী নাই। তাহারা সাধারণ নির্ব্বাচকমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত। হিন্দুরা ভারতবর্ষের আদিম জাতি; তজ্জন্যই কি এই অবস্থা। আজ যদি মঙ্গলগ্রহ হইতে কোন মানুষ পৃথিবীতে নামিয়া আসে, তবে সে দেখিবে, ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্রে হিন্দুর নাম নাই। হিন্দুদের জন্য আছে কেবল সাধারণ নির্ব্বাচকমণ্ডলী। আজ এই ভারতবর্ষে একটা আছে মুসলমান ধর্ম্ম, আর একটা আছে খৃষ্টান ধর্ম্ম, আর তৃতীয় আর একটা আছে, 'সাধারণ ধর্ম্ম'। এই নীতিরই আমরা বিরোধী। যাহাই ঘটুক না কেন, আমরা ইহার বিরোধিতা করিবই করিব। যখন কেহ আসিয়া বলে, 'জাতীয়তাবাদী হউন' তখন আমি তাহাকে বলি, 'প্রত্যেক কংগ্রেস সদস্যই ত হিন্দু। নির্ব্বাচনের দিন তাহারা সকলেই হিন্দু। কিন্তু নির্ব্বাচন হইবার পরই যদি তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যায়, আপনি কি? তখন তিনি বলেন 'আমি একজন জাতীয়তাবাদী'। ইহা ভণ্ডামি—শুধু ভণ্ডামি বলা যথেষ্ট নয়, ইহা ঘোরতর ভণ্ডামি। আপনার ভোটের জোরে যাঁহারা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, নির্ব্বাচনের দিন তাঁহারা হিন্দু বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু পরদিন তাঁহারা বলিয়াছেন যে তাঁহারা জাতীয়তাবাদী। নিন্দনীয়—অতি নিন্দনীয় এই কাপট্য ও বিশ্বাসঘাতকতা।

সুতরাং আপনাদের নিকট আমার অনুরোধ, আপনারা হিন্দুর দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া আপনাদের রাজনীতি বিচার করিবেন। তাহা ছাড়া কোনও জাতীয়তাবাদী রাজ-নীতি হইতে পারে না। যাঁহারা হিন্দুদের স্বার্থরক্ষা করিবেন, হিন্দুদের শুধু তাঁহাদিগকেই নির্ব্বাচন করা উচিত।

হউন না বাঙ্গলায় আপনারা সংখ্যা-লঘিষ্ঠ। বর্ত্তমান বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরি-ষদে আপনাদের ৮০জন প্রতিনিধি আছেন। তাঁহাদের সকলেই যদি হিন্দু-পক্ষ হইতে নির্ব্বাচিত হইতেন; হিন্দুর স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেন, তবে অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইত? তাঁহারা সর্ব্বদাই হিন্দু স্বার্থ রক্ষার জন্য ভোট দিতেন। কিন্তু আজ বাঙ্গলার পরি-ষদের অবস্থা কি? শতকরা ৬০টি সরকারী চাকুরী মুসলমানদের জন্য নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। ব্যবস্থা পরি-ষদে হিন্দু প্রতিনিধিরা যদি হিন্দুদের টিকিটে নির্ব্বাচিত হইতেন, তবে কিছুতেই এমন অবস্থা হইতে পারিত না। এই ৮০জন হিন্দু সদস্য যদি হিন্দুদের পক্ষ হইতে নির্ব্বাচিত হইতেন তবে তাঁহারা ঐ প্রস্তাব সোজাসুজি অগ্রাহ্য করিতেন। তাঁহারা কখনও না গ্রহণ ও না বর্জ্জনের নীতি অবলম্বন করিতেন না।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার কথাই ধরুন। কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে না গ্রহণ না বর্জ্জন নীতি অবলম্বন করিয়াছে। কিন্তু এই বাঁটোয়ারা কিরূপ পদার্থ? এই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা হিন্দুর রাজনৈতিক উন্নতির সম্ভাবনা সম্পূর্ণ বিনষ্ট করিয়াছে। এইরূপ একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সুমহান্ জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস বলে কি না 'হিন্দু মহাসভা একটা সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান।' প্রথমে না গ্রহণ না বর্জ্জনের ধুয়া তুলিয়া —এখন কংগ্রেস বলিতেছে—সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার কোনই পরিবর্ত্তন হইবে না (সেম সেম) কংগ্রেস হিন্দু মহাসভাকে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান বলে কিন্তু সাম্প্র-দায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে হিন্দু মহা-সভা কি করিয়াছে? আমরা উহা গ্রহণ করি নাই। বরং আমরা বলি এই বাঁটোয়ারার পরিবর্ত্তে একটি জাতীয় বাঁটোয়ারা করা হউক।

আমার আর একটি প্রস্তাব এই, এখন হইতে বাঙ্গলায় একটি শক্তিশালী হিন্দু দল গঠন করা হউক। যতদিন পর্য্যন্ত কংগ্রেস উহার বর্ত্তমান নীতি পরিবর্ত্তন না করিবে ততদিন পর্য্যন্ত কংগ্রেসের সহিত ঐ দলের কোন সম্পর্ক থাকিবে না। যদি কংগ্রেস প্রকৃতপক্ষে জাতীয়তা-বাদী হইয়া উঠে শুধু তবেই আমরা কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতা করিতে

পারি। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত কংগ্রেসের বর্ত্তমান নীতি পরিবর্ত্তনের কোন সম্ভাবনা থাকিবে না, ততদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গলায় এমন একটি শক্তিশালী হিন্দু দল থাকিবে যে দল তথাকথিত জাতীয়তা-বাদ সমর্থন করিবে না এবং বাঙ্গলার হিন্দুদের স্বার্থ রক্ষা করিবে। হিন্দু-দের পক্ষ হইতে নির্ব্বাচন প্রার্থী হইতে লজ্জার কি আছে? আমাদের মধ্য হইতে প্রতিভাবান ও তেজস্বী লোক-দিগকে আমাদের স্বার্থরক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া পাঠাইতে হইবে। আমার মতে বাঙ্গলার হিন্দুদের সমস্যা মীমাংসার ইহাই একমাত্র অমোঘ পন্থা। যিনি হিন্দুর স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য প্রকাশ্যে প্রতিশ্রুতি দিতে না পারিবেন ভবিষ্যতে আর কখনও যেন আমরা তাঁহাকে ভোট না দিই।

ধরুন, ডাঃ মুঞ্জের ন্যায় একজন দৃঢ়ব্রত হিন্দু হিন্দুটিকিটে নির্ব্বাচিত হইয়া মন্ত্রিত্ব লাভ করিলেন। এই অবস্থায় তিনি কি করিতেন? ধরুন, আমি হিন্দুটিকিটে নির্ব্বাচিত হইলাম। (অবশ্যই আমি আপনাদিগকে সুস্পষ্ট জানাইয়া দিতেছি যে আমি কদাপি কোন আইন সভার সদস্য পদ প্রার্থী হইব না।) এবং প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিলাম। তাহা হইলে আমি কি করিতাম? যখনই আমি সংবাদ পাইতাম যে যুক্ত প্রদেশে মহরমের দরুণ মসজিদের সম্মুখে বাজনা নিষিদ্ধ হইয়াছে, এমন কি বিবাহের শোভাযাত্রা যাইতে দেওয়া হইতেছে না, তখনই আমি আদেশ জারি করিতাম যে মধ্যপ্রদেশে (এখানে হিন্দু-দের সংখ্যাগরিষ্ঠ) মসজিদে মুসলমান-দের নীরবে নমাজ পড়িতে হইবে; কারণ নমাজ শুনা গেলে ১২ মাইল দূরে হিন্দু মন্দিরের উপাসনায় বিঘ্ন ঘটিতে পারে। আপনারা যদি এমন সাহস দেখাতে পারেন, তবে মুসলমানেরা আপনাদের সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিবে। এইরূপ নীতি প্রবর্ত্তনের উপায়—প্রত্যেক হিন্দুর এমন লোককে ভোট দিতে হইবে যিনি হিন্দুর স্বার্থ রক্ষার প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ যেন হিন্দু মহাসভার সদস্যদের মধ্য হইতেই ৭জন মন্ত্রী নিযুক্ত হইতে পারেন।

যদি এরূপ করা হয়, তবেই দেখিবেন, সঙ্গে সঙ্গে লোকচক্ষুতে হিন্দু মহাসভার মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইবে এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা তাহার আয়ত্তে আসিবে। তখন দেখিবেন কংগ্রেসের সদস্যেরা আপনাদের নিকট আসিয়া বলিবেন যে, তাঁহারা বরাবরই হিন্দু ছিলেন—তখন তাঁহারা সাদা টুপীর বদলে গৈরিক রংএর শিরস্ত্রাণ ধারণ করিবেন (হাস্য)। আপনাদের ভোটের উপরই ইহা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে।

বাঙ্গলাতে 'হিন্দু' ও তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের হিন্দু লইয়া একটি পৃথক সমস্যা সৃষ্টি করা হইয়াছে। তপশীল-ভুক্ত সম্প্রদায়গুলি তাহাদের সংখ্যার অনুপাত অপেক্ষা অধিক সংখ্যক প্রতি-নিধি পাইয়াছে। অস্পৃশ্য জাতির সৃষ্টি করা মোটেই সঙ্গত হয় নাই। অস্পৃশ্যতা আছে বলিয়াই এই সকল অনর্থের উদ্ভব হইয়াছে। আমরা সকলেই হিন্দু, আমাদের মধ্যে জাতিভেদ থাকা অত্যন্ত নিন্দনীয়। নমঃশূদ্র, ডোম, সনাতনী, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য সকলকেই একযোগে অগ্রসর হইতে হইবে। সনাতনীরা গৃহে যথেচ্ছ-ভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাহাতে কোন সকলেই সমান।

সকল শ্রেণীর হিন্দুদিগকেই আমি বলিতেছি, আপনারা নমঃশূদ্র এবং অন্যান্য জাতিগুলির মধ্যে যে ভেদ বিভেদ আছে তাহা তুলিয়া দিতে চেষ্টা করুন। হয়ত তাহাতে কয়েক বৎসর সময় লাগিবে—কিন্তু তথাপি তাহা করিতেই হইবে। মুসলমানদের বেলায় এই সমস্যার সমাধান অসম্ভব—কিন্তু সকল জাতির হিন্দুই আমাদের ভাই—ভাষা, কৃষ্টি এবং জাতি সকল বিষয়েই আমরা এক। প্রদেশভেদে কিঞ্চিৎ তারতম্য থাকিলেও, আমাদের নামও এক। রাজনীতি ক্ষেত্রে আপনাদের প্রথম কর্ত্তব্য হইল, কেবলমাত্র প্রকৃত হিন্দু প্রার্থীকেই আইনসভায় নির্ব্বা-চিত করা। তপশীলভুক্ত জাতিগুলিকে ভালবাসার দ্বারাই আমাদের পক্ষভুক্ত করিতে হইবে। দেশ—তাহাদেরও দেশ, আমাদেরও দেশ। কিন্তু ইহাতে মুসল-মানদের দেশ নহে।

বাঙ্গলাতে হিন্দু মহাসভা, হিন্দু সভা এবং হিন্দু মিশন—এই তিনটি প্রতিষ্ঠান হিন্দুদের স্বার্থরক্ষার জন্য সচেষ্ট। যদি এই তিনটি প্রতিষ্ঠানটি মিলাইয়া এক করিতে পারেন, তবে সেজন্য সচেষ্ট হউন।

সমাধানের তিনটি উপায়ের কথা আপনাদিগকে বলিলাম। প্রস্তাবগুলি আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। আমাকে যে আপনারা আমার বক্তব্য বলি-বার সুযোগ দিয়াছেন, তজ্জন্য আপনা-দিগকে আমি ধন্যবাদ দিতেছি। আশা করি, সম্মেলনের পর আপনারা সাহস সহকারে আমি যে প্রণালীর উল্লেখ করি-লাম, তদনুসারে কার্য্য আরম্ভ করিবেন।

যুক্তরাষ্ট্রই শেষ কথা নহে। হিন্দুরা যদি ঐক্যবদ্ধ এবং শক্তিশালী হয়, তবে আমরা ইংরেজের বিরুদ্ধে পুনরায় সংগ্রাম আরম্ভ করিব। (উচ্চ করতালি-ধ্বনি)।

মানবীয় ঐক্যের আদর্শ

(১৩৫ পৃষ্ঠার পর)

নূতন শক্তি ও উৎসাহ পাইবে—এতদিন ঐ সাম্রাজ্য সংহত-নীতি ব্যতীত স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতেই পরিচালিত হইয়া আসিয়াছে। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে যে সকল জাতির বাস তাহাদের আধিজাতিক ও ঔপনিবেশিক সংগঠন ও প্রসার যেরূপ বিশিষ্ট পরিস্থিতিতে হইয়াছে তাহাতে মনে হয় যে, প্রকৃতি তাহার কর্ম্মধারায় বরাবর এই সাম্রাজ্যটাকে মানবীয় সমন্বয়ের ইতি-হাসে এই নূতন যুগের অনুবর্ত্তী সংহিত সাম্রাজ্যের মহান পরীক্ষাক্ষেত্র করিতে চাহিয়াছে এবং এই মত প্রস্তুত করিয়া তুলিয়াছে।

—(ক্রমশ)

একখানি পুরাতন পুস্তক

শ্রীবনবিহারী গুপ্ত

প্রাচীন দলিলাদি এবং মুদ্রিত পুস্তকাদি যত্ন করিয়া রাখার প্রয়োজনীয়তা আজিও আমাদের দেশে ভাল করিয়া উপলব্ধ হয় নাই; তাই ইতিহাস রচনার অতি প্রাচীন মাল-মসলা পাওয়া দূরে থাকুক ঊনবিংশ শতকের ইতিহাসের মাল-মসলা অনেক সময় পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠে। সুখের বিষয় এই যে, এই সময়কার মাল-মসলা হইতে উপাদান সযত্নে সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিবার আয়োজন বিগত কয়েক বৎসর হইতে দেখা যাইতেছে। ঊনবিংশ শতকের প্রখ্যাত সমাজ সংস্কারক ও রাষ্ট্রনৈতিক নেতা ৺দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনীর মাল-মসলা সংগ্রহ করিতে গিয়া আমি এ সম্বন্ধে নানা অসুবিধা ভোগ করিতেছিলাম। তাঁহার জনহিতকর ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের অনেক বিষয়েই সংবাদ সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারি নাই। এমন কি তাঁহার রচনাবলীর অনেকগুলির সন্ধান মিলিতেছে না। তৎসম্পাদিত "অবলাবান্ধব" ও "সমালোচক"-এর এবং "সঞ্জীবনী" পত্রিকার প্রথম বৎসরের ফাইল কোনও জায়গায় সন্ধান করিয়াও পাই নাই। তিনি সর্ব্বপ্রথম "জাতীয় সঙ্গীত" সংগ্রহ পুস্তক ও বিলাতী ইয়ার বুকের অনুসরণে "নববার্ষিকী" নামে একটি ইয়ার বুক ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে কয়েক বৎসর প্রকাশ করেন। এগুলির সন্ধানও বহুদিন পাই নাই। সম্প্রতি জানিতে পারিয়াছি যে, "জাতীয় সঙ্গীত"-এর দ্বিতীয় সংস্করণ সাহিত্য পরিষদে আছে এবং সম্প্রতি ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের "নববার্ষিকী" একখণ্ড সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। এই পুস্তকে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের বহু জ্ঞাতব্য তথ্য আছে, তদ্ব্যতীত তৎকালীন প্রধান প্রধান জীবিত ব্যক্তিদের জীবনী ও মুদ্রাযন্ত্রের ও ইংরেজি বিদ্যার প্রসারের ইতিহাস প্রভৃতি বহু মূল্যবান জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বর্ত্তমানে বাঙলা-দেশে দুইটি বিষয়ে আলোচনা বিশেষভাবে হইতেছে। প্রথম বঙ্কিম শতবার্ষিকীকে উপলক্ষ্য করিয়া বঙ্কিম জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা, দ্বিতীয় শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয়ের বহু শ্রমসাধ্য বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসের আলোচনা। এই দুইটি বিষয়ে "নববার্ষিকী"তে কিছু কিছু নূতন তথ্য দেখিতে পাইতেছি। আলোচনার সুবিধার্থে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিব।

সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার ৪৫শ ভাগ, তৃতীয় সংখ্যায় সজনীবাবুর "বাঙলা গদ্যের প্রথম যুগ (৩)" বাহির হইয়াছে। ইহাতে পঞ্চানন কর্ম্মকারের জীবনীর বহু তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ফরষ্টার অনুদিত কর্ণওয়ালিশ কোড পুস্তকের হরফ "পঞ্চানন কৃত ও উইলকিন্সের হরফ হইতে অনেক বেশী সুন্দর" এই সংবাদ দেওয়া থাকিলেও এই হরফের ছাঁদ কাহার বর্ণিত হয় নাই। সম্ভব সজনীবাবু সে সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। "নববার্ষিকী"র ১৪৫ পৃষ্ঠায় দেখিতেছি লেখা আছে—"অতঃপর ফরষ্টার সাহেব কর্ণ-ওয়ালিশের ১৭৯৩ অব্দের ব্যবস্থা যখন সরল ও চলিত ভাষায় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন যে অক্ষরের প্রয়োজন হয়, পঞ্চানন নূতন এক সেট তাবা নিৰ্ম্মাণ করিয়া তাহা প্রস্তুত করেন। সেই মুদ্রাক্ষর উৎকৃষ্ট বলিয়া তৎকালে বিশেষ আদৃত হইয়াছিল। কালীকুমার রায় নামক এক ব্যক্তি সুছাঁদ লিখিতেন, তাঁহারই লেখা দেখিয়া বর্ত্তমান মুদ্রাক্ষরের ছাঁদ হইয়াছে।

পঞ্চানন এণ্ড্রুসের ছাপাখানা হইতে শ্রীরামপুরে কিভাবে কর্ম্ম গ্রহণ করেন তাহারও বিবরণ এই পুস্তকে দেখিতে পাই।

১৮০০ অব্দে শ্রীরাপুরে কেরি সাহেবদের মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়। এই সময়ে সুবিখ্যাত পাদরি কেরি সাহেবের একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ আহরণ করিয়া তাহার মুদ্রাঙ্কনে যাত্নিক হন। কিন্তু মুদ্রাক্ষরাভাবে কিরূপ গ্রন্থ মুদ্রিত করিবেন, যখন এই চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে পঞ্চানন কর্ম্মকার শ্রীরাম-পুরে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট কর্ম্মপ্রার্থনা করেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়া দেবনাগর অক্ষরের ছেনী প্রস্তুত করিতে দেন। পঞ্চানন এই কার্য্যে তাঁহার জামাতা মনোহর কর্ম্মকারকে সহকারী নিযুক্ত করেন। এই যুবা নিজ অবলম্বিত কার্য্যে বিশেষ দক্ষতা ও শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। ইহার পর তিনি মিসনরিদিগের অধীনে ক্রমাগত ৩৪ বৎসরকাল কার্য্য করেন। ১৮০৩ অব্দে সংস্কৃত মুদ্রাক্ষর প্রস্তুত হয়।

সজনীবাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে মনে হইতে পারে যে, উইলকিন্স যখন প্রথম হরফ প্রস্তুত করেন তখন হইতেই পঞ্চানন তাঁহার সহকারী ছিলেন, কারণ সজনীবাবু লিখিতেছেন,—"১৭৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দে উইলকিন্স যখন হালহেডের ব্যাকরণের জন্য হুগলিতে ছেনী কাটিয়া বাঙলা হরফ প্রস্তুত করিতেছিলেন, তখন পঞ্চানন কর্ম্মকারের সাহায্য গ্রহণ করেন।"

কিন্তু "নববার্ষিকী"তে দেখিতেছি—"১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম বাঙলা মুদ্রাক্ষর ব্যবহার হয়। এণ্ড্রুস সাহেব নামক জনৈক পুস্তকবিক্রেতা হুগলীতে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত করেন; তথায় হাল্হেড সাহেবের বাঙলা ব্যাকরণ প্রথম মুদ্রিত হয়। উইলকিন্স সাহেব (যিনি পরে স্যার চার্লস্ উইলকিন্স নামে খ্যাত হন) নিজ হস্তে প্রথমে বাঙলা মুদ্রাক্ষর প্রস্তুত করেন। তৎপর পঞ্চানন কর্ম্মকার নামক এক ব্যক্তিকে ছেনী প্রস্তুত করিবার পন্থা শিখাইয়া দেন।"

এই গ্রন্থের মতে উইলকিন্স নিজহস্তে প্রথমে অক্ষর প্রস্তুত করেন, তৎপরে পঞ্চাননকে ছেনী কাটাইতে শিখাইয়া দেন। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে জোনাথান ডানকান সাহেব কর্ত্তৃক স্যার ইলাইজা ইম্পে কর্ত্তৃক সংগৃহীত ইংরেজী ব্যবস্থা সকলের বাঙলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের অক্ষরই কি তবে পঞ্চাননের?

বঙ্কিম সম্বন্ধে নানা তথ্য বঙ্কিম-জীবনীতে আছে। তন্মধ্যে তাঁহার কর্ম্মজীবনী সম্বন্ধে এক কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী দেখিতেছি। ইহা শতবার্ষিকীর সময় কোথাও আলোচিত হইতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাহা এই—"এক [illegible] নগরের (এক্ষণে [illegible]) কার্য্য করিয়া ইনি খুলনায় বদলি হইলেন। এই স্থলে যে ইনি কিরূপ

দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা অনেকেই অবগত আছেন। মরেলগঞ্জের মরেল সাহেবের দৌরাত্ম্য যে ইনি কি প্রকারে নিবারণ করিয়াছিলেন, এবং কি প্রকারে যে ইঁহার প্রতাপের ভয়ে পলায়িত হিলি সাহেব ও অন্যান্য দুরাত্মা প্রজা-পীড়ক কর্ম্মচারীকে আসাম, বৃন্দাবন ও অন্যান্য স্থান হইতে ধৃত করিয়া আনিয়া দণ্ড দিয়াছিলেন, তাহা এখানে বলা বাহুল্য। এইমাত্র বলিলেই হইবে যে ইঁহার সময় হইতে খুলনার পাঁচ-খানার প্রজাগণ নির্ভীক হইয়াছিল—নীলকরগণ যে দেশের রাজা নহে তাহা জানিয়াছিল। সেই অবধি সুন্দরবনের অসংখ্য নদী দিয়া নির্ভয়ে নৌকা যাতায়াত করিতে লাগিল, দস্যুদল নির্ম্মূল হইল, একে একে সকলকে ইনি কারাগারে পাঠাইয়া দিলেন। দেশ-দেশান্তরের—শ্রীহট্ট, সুধারাম, ময়মনসিংহ, ঢাকা জিলার মাঝি-মাল্লারা তাহাদিগের এ উপকার কে করিল তাহার নাম জানিল।"

ইহাতে রাজমোহন্‌স ওয়াইফের সংবাদও আছে।

"ইঁহার উপন্যাসের মধ্যে কোন্‌খানি প্রথম, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। দুর্গেশনন্দিনীকে অনেকেই প্রথম বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা নহে। Rajmohan's wife নামে ইংরেজি ভাষায় একখানি উপন্যাস লেখেন, উহা মৃত কিশোরীচাঁদ মিত্রের সম্পাদিত "ইণ্ডিয়ান ফিল্ড" (Indian Field) নামক সংবাদপত্রে ক্রমশ প্রকাশিত হয়।" এই জীবনী বঙ্কিমের বয়ঃক্রম যখন মাত্র ৩৯ বৎসর তখন লিখিত হয়। অনুমান হয় যে ইহাই বঙ্কিমের প্রথম জীবনী।

স্পেনে শক্তিবর্গের মহড়া

(১৪০ পৃষ্ঠার পর)

যুক্তিসঙ্গত। কারণ একবার যদি সেখানে ইটালী ও জার্ম্মানীর সাহায্যে ফ্রাঙ্কো সমগ্র স্পেনের মালিক হইতে পারে তাহা হইলে ঐ দুইটি রাষ্ট্রেরই সেখানে প্রাধান্য হইবে নিশ্চিত। ফ্রান্সের দক্ষিণ সীমায় স্পেন। তাহার তিন দিকই ফাসিষ্ট রাষ্ট্র দ্বারা পরিবেষ্টিত হইবে। ওদিকে মাইনর্কা অধিকৃত হওয়ায় সাম্রাজ্য রক্ষার পথও বিপন্ন। আবার, কিছুদিন আগে হইতে ইটালীর যেরূপ মতলব প্রকাশ পাইতেছে তাহাতে তাহার আশঙ্কা বাড়িয়া যাওয়াই স্বাভাবিক। ফরাসী অধিকৃত কর্সিকা, টিউনিস, সুয়েজ ও জীব্রাল্টার ইটালী চাহিতেছে। কাজেই ফ্রাঙ্কোর সঙ্গে আগে থেকেই বুঝাপড়া করিতে যে সে চঞ্চল হইয়া উঠিবে তাহা বলাই বাহুল্য।

ফ্রান্স ও বৃটেনের দূতিয়ালীতে ইটালী, জার্ম্মানীতে খুবই সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছে। তবে ফ্রাঙ্কো সহসা তাহাদের বিরুদ্ধে যে যাইতে পারিবে না তাহা তাহারা ভাল করিয়াই জানে। তথাপি তাহারা বৃটেন ও ফ্রান্সকে সাবধান করিয়া দিয়াছে। ফ্রাঙ্কোও যেন এই সব দূতিয়ালীতে ভুলিতেছে না। স্পেনের রিপাব্লিকান তথা সরকার পক্ষের সঙ্গে আপোষ করিতে সে একেবারেই নারাজ। অদ্যকার সংবাদে প্রকাশ, ফ্রাঙ্কোর সর্ত্তেই তাহাদের পুরোপুরি রাজী হইতে হইবে, তাহাদের কোন সর্ত্ত সে মানিয়া লইতে পারিবে না। উপরন্তু, আরও বলিয়াছে যে, রিপাব্লিকান দল যে ফ্রাঙ্কোকে মানিয়া চলিবে তাহার প্রাক্‌প্রমাণ স্বরূপ তাহা-দিগকে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ও বিমানপোত তাহার নিকট জমা রাখিতে হইবে! এখন স্পেনে ফ্রাঙ্কোর শক্তিই প্রবল, কাজেই তাহার আদেশ বাধ্যতামূলক সরকার পক্ষকে মান্য করিয়াই চলিতে হইবে। বৃটেন ও ফ্রান্স ফ্রাঙ্কোকে অর্থাৎ ফ্রাঙ্কো প্রতিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিয়া লইতে অত্যধিক আগ্রহ প্রকাশ করায় তাহার শক্তি আরও দৃঢ় হইয়া থাকিবে। তাহার এক-খানি মুখপত্র কিন্তু ইতিমধ্যেই বলিয়াছে যে, বৃটেন ও ফ্রান্স যতই কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ করুক না, ফ্রাঙ্কো তাহাতে ভুলিবে না, ইটালী ও জার্ম্মানীর সঙ্গে সে অহি-নকুল রাখিয়াই চলিবে। প্রকাশ, এখন ভূমধ্যসাগরীয় ব্যাপারে স্পেনেরও দাবী-দাওয়া মানিয়া লইতে হইবে, আর এখানে যে-সব সমস্যা দেখা দিবে তাহার মীমাংসায় তাহার হাত থাকিবে খুবই। অর্থাৎ, ইটালী বৃটেনের নিকট যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে,—স্পেনে তাহার স্বার্থলিপ্সা কিছুই নাই, তাহা হয়ত রক্ষা করিবে, কিন্তু পরোক্ষে স্পেনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া তাহার স্বার্থসিদ্ধির উপায় করিয়া লইবে। ফ্রাঙ্কো গবর্ণ-মেণ্টকে ইতিমধ্যেই পোলাণ্ড ও আয়র্লণ্ড স্বীকার করিয়াছে। মিশরও নাকি স্বীকার করিবে। এমন দিন শীঘ্রই আসিতেছে যখন বৃটেন ও ফ্রান্সকেও স্বীকার করিতে হইবে তবে তাহারা সুযোগের অপেক্ষায় রহিয়াছে। স্পেনে বিভিন্ন শক্তির মহরা বিশ্ববাসীর নিকট কম উপভোগ্য নহে। সাম্রাজ্যবাদীদের কিন্তু ইহা ভাবিত করিয়াই তুলিয়াছে।

২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯।

পুস্তক পরিচয়

আর্থিক জগৎ—ব্যবসায়-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক। সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। ৩৯শ সংখ্যা। বর্ত্তমান সংখ্যার 'আর্থিক জগৎ' প্রবন্ধ গৌরবে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। ভারতের রেল বিভাগের সম্বন্ধে বিভিন্ন দিক হইতে ১৫টি প্রবন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি সারগর্ভ এবং বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ।

সাম্যবাদের গোড়ার কথা—মূল্য এক টাকা চার আনা। ৪৬-এ বোসপাড়া লেন, বাগবাজার, কলিকাতা। কবি বিজয়লালের সাম্যবাদের গোড়ার কথা এতদিন বাঙলা সরকারের কৃপায় নিষিদ্ধ পুস্তক ছিল। সম্প্রতি এই পুস্তকখানার সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হইয়াছে। সাম্যবাদের গোড়ার কথার নূতন সংস্করণ দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। এবারকার সংস্করণের ছাপা, বাঁধাই আরও চমৎকার।

রুদ্র—লেখক শ্রীরাখালদাস চক্রবর্ত্তী; প্রাপ্তিস্থান—সরস্বতী লাইব্রেরী, ১নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম চার আনা।

কবিতার বই। সবহারাদের জন্য লেখকের একটা আন্তরিক দরদের সন্ধান পাওয়া যায় কবিতাগুলির মধ্যে। কিন্তু কবিতার উৎকর্ষ কেবল ভাবের উপরে নির্ভর করে না—ভাষার উপরেও নির্ভর করে। ভাষার দিক দিয়া বিচার করিলে রুদ্রের বেশী প্রশংসা করা চলে না। স্থানে স্থানে ছন্দের পতন কর্ণকে পীড়িত করে।

আধুনিক শিক্ষক—আবদুল হাকিম এম-এ (ক্যান্টাব), বঙ্গদেশের প্রাথমিক শিক্ষার স্পেশাল অফিসার। মূল্য আড়াই টাকা। প্রাপ্তিস্থান—আসাদুল হাকিম, ৬৪-এ বেকবাগান রো, কলিকাতা।

এ ধরণের পুস্তক বাঙলা দেশে ছিল না। মিঃ হাকিম সেই গুরুতর অভাব কতকটা মোচন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। এজন্য তিনি দেশবাসীর ধন্যবাদার্হ। শিক্ষকেরা এই পুস্তকখানি পাঠে বিশেষ উপকৃত হইবেন। লেখকের ভাষা সহজ এবং সরল, বিষয়বস্তু বুঝাইবার তাঁহার যে নিজস্ব একটি ধারা দেখা যায়, তাহা বড়ই সুন্দর।

চারণ-গীতি—বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য দুই আনা। ৪৬-এ বোসপাড়া লেন, নবজীবন সঙ্ঘ হইতে প্রকাশিত।

বইখানিতে ৬টি গান এবং 'ব্রহ্মচর্য্য' এবং 'সাম্যবাদ ও ধর্ম্ম' শীর্ষক দুইটি প্রবন্ধ আছে। কবি বিজয়লাল গান্ধীজী এবং হুইটম্যানের ভাবে ভাবুক। চারণগীতিতে এই দুইজন মহাপুরুষের আদর্শের উদ্দীপনার স্পর্শ তরুণেরা পাইবে।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলামৃত—(পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ)। গ্রন্থকার স্বামী যোগানন্দ। গারোহিল যোগাশ্রম হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৷০ আনা।

শ্রীকৃষ্ণের জাগতিক জীবনীসহ তাঁহার লীলা-তত্ত্ব এক স্থানে এইভাবে সন্নিবেশিত ও সাধনোচিত মনোবৃত্তির সহিত ব্রজলীলা, মথুরালীলা, দ্বারকা-লীলা, কুরুক্ষেত্র-লীলা প্রভৃতি গুণাতীত, সাত্ত্বিক, ঐশ্বর্য্য-প্লুত তটস্থভাবের লীলার গূঢ় উদ্দেশ্যের বিশ্লেষণ অন্য কোথাও একত্র পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ। উপসংহারে সাধনার ক্রম এইরূপ দৃষ্টি-ভঙ্গীতে ব্যাখ্যাত যাহাতে কৃষ্ণ-চরিত ও লীলা-তত্ত্ব পরিষ্কার এক ভাবধারা লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণচরিত আলোচনায় প্রীতি যাঁহারা অনুরক্ত, এই পুস্তক পাঠে তাঁহারা পরিতৃপ্ত হইবেন।

সাহিত্য-সংবাদ

বারাকপুরে সাহিত্য সভা

গত ২৫শে জানুয়ারী বুধবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় চাণক লালকুঠীর প্রাঙ্গণে স্থানীয় ছাত্রগণের উদ্যোগে বারাকপুর পাঠচক্রের উদ্বোধন উপলক্ষে একটি সাহিত্য সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ডাঃ নরেন্দ্রনাথ বাগচী মহাশয় সভার পৌরোহিত্য করেন। শ্রদ্ধেয় জন-নায়ক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী মহাশয় সভায় সমাজের ক্রম-বিবর্ত্তনের ইতিহাস সম্বন্ধে এবং শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সাহিত্য সম্বন্ধে সুচিন্তিত অভিভাষণ দেন। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি ও বহু যুবক ও ছাত্র বন্ধুগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীরাসবিহারী ঘোষ।

তারিখ পরিবর্ত্তন

খুলনা জেলা ছাত্র ফেডারেশনের সংস্কৃতি বিভাগ হইতে কলেজ ও স্কুলের ছাত্রদের জন্য যথাক্রমে "বেকার সমস্যা" ও "পল্লীগঠনে ছাত্র" শীর্ষক যে দুইটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা পরিচালিত হইতেছে তাহাতে যোগদান করিবার শেষ তারিখ ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত পিছাইয়া দেওয়া হইল।

শ্রীসুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক, সংস্কৃতি বিভাগ, খুলনা জেলা ছাত্র ফেডারেশন।

বনফুল সাহিত্য সমিতি

(সপ্তম বার্ষিক আবৃত্তি প্রতিযোগিতা)

শ্রীরামপুর বনফুল সাহিত্য সমিতির উদ্যোগে সপ্তম বার্ষিক আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হইবে।

বিষয়ঃ—

(স্কুলের ছাত্রীদের জন্য) বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে কোন কবিতা (৮০ লাইনের অনধিক)।

(সকলের জন্য)

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ('অর্কেষ্ট্রা' ও 'ক্রন্দসী'), প্রেমেন্দ্র মিত্র ('প্রথমা'), বুদ্ধদেব বসু ('বন্দীর বন্দনা' ও 'কঙ্কাবতী') ও বিষ্ণু দে'র ('চোরাবালি') যে-কোন কবিতা।

আগামী ১৪ই মার্চ্চ, ৩০শে ফাল্গুনের মধ্যে সম্পাদকের নিকট প্রতিযোগিদের নাম এবং আবৃত্তির নির্দ্দিষ্ট কবিতার নাম পাঠাইতে হইবে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য সম্পাদকের নিকট উপযুক্ত ডাক টিকিট সহ পত্র প্রেরিতব্য।—সম্পাদক, বনফুল সাহিত্য সমিতি, শ্রীরামপুর (হুগলী)।

গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী শিবরাত্রির দিন চিত্রায় এমন একটি শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে যাহার সম্বন্ধে চলচ্চিত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তির এবং জনসাধারণের অবহিত হওয়া বিশেষভাবে প্রয়োজন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, "চিত্রার" কর্ত্তৃপক্ষ, শিবরাত্রি পূজা উপলক্ষে ঐ সিনেমায় সারারাত্রিব্যাপী চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন। ১৮ই ফেব্রুয়ারী সকাল ৮টা হইতে অগ্রিম টিকিট বিক্রয়ের কথা ছিল, কিন্তু নির্দ্ধারিত সময়ের বহু পূর্ব্বে হইতেই উক্ত সিনেমা হাউসের সম্মুখে বহু লোক সমবেত হইতে থাকে। টিকিটঘর খুলিলে টিকিটঘরের সম্মুখে ভীষণ ঠেলাঠেলি আরম্ভ হয়। সেই সময় ভীড়ের চাপে একজন লোক অজ্ঞান হইয়া পড়ে। তাহাকে এম্বুলেন্সে করিয়া হাসপাতালে লইয়া যাইবার পথে লোকটি মারা যায়। ভীড়ের চাপে আরও ৭ জন লোক গুরুতরভাবে আহত হয়। তন্মধ্যে তিনজন সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়াছিল।

মৃত ব্যক্তির নাম কাশীনাথ বসু। তাহার বয়স মাত্র ২০ বৎসর।

চিত্রায় এই যে শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিল ইহার জন্য দায়ী কে? দায়ী অবশ্যই কেহ হইবেন। দর্শকদের উপর অনেকে হয়ত দোষ দিবেন, কেননা তাহারা ঠেলাঠেলি না করিলে এই দুর্ঘটনা ঘটিত না। ইহা আমরাও জানি। কিন্তু এইখানে যে কথা উঠে তাহার সম্বন্ধে আমরা বহুবার আলোচনা করিয়াছি। সিনেমা দেখিতে একদল গুণ্ডাপ্রকৃতির লোকের যে অর্থাগমের সুযোগ হয়—তাহারাই এই শোচনীয় দুর্ঘটনার কারণ। একজন ভদ্রযুবক সারারাত্রি সিনেমা দেখার ইচ্ছায় টিকিট কিনিতে গিয়াছিল। কিন্তু টিকিট ঘরের সামনে গুণ্ডারা এমন ঠেলাঠেলি করিল যাহার ফলে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া যুবকটির মৃত্যু হইল। দোষ যে গুণ্ডাদের তাহা আমরা জানি, কিন্তু গুণ্ডারা যে এই গুণ্ডামি করে তাহা কাহার দোষে অথবা কাহাদের উদাসীন্য ও অবহেলায়। 'আমরা জানি না' অথবা 'আমরা নিরুপায়' অথবা 'আমরা যতদূর করার করিয়াছি' এই সমস্ত কথায় এখন এই ব্যাপারের গুরুত্ব একটুও কমিবে না এবং এইভাবে এখন দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা করিলেও চলিবে না। সিনেমা কর্ত্তৃপক্ষ এই বিষয়ে কতখানি করিতে পারেন, অথবা পুলিশ কতখানি করিতে পারে সেই সম্বন্ধে আমরা আর এক সময় আলোচনা করিব। কিন্তু এই ব্যাপার যাহাতে ভবিষ্যতে না ঘটে তাহা দেখা যাঁহাদের কাজ তাঁহারা অবিলম্বে তাহা করুন এবং জনসাধারণকে জানান যে, তাঁহারা কি করিতেছেন। তাহা না হইলে জনসাধারণ কিছুতেই সন্তুষ্ট হইবে না। তারপর যে ব্যাপার ঘটিয়াছে তাহা কেন ঘটিল, কি করিয়া ঘটিল এবং কাহার দোষে ঘটিল, তাহারও একটা অনুসন্ধান হওয়া এবং জনসাধারণের জানা প্রয়োজন। পুলিশ এ বিষয়ে তদন্ত করিতেছে সুতরাং আমরা এখন এ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করিব না, কিন্তু আমরা দেখিতে চাই যে, ইহার একটা সন্তোষজনক তদন্ত হয়। আমরা জানি যে, চিত্রা কর্ত্তৃপক্ষও এই ব্যাপারে বিশেষ বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু শুধু বিচলিত হইলেই চলিবে না, ভবিষ্যতের ব্যবস্থা দ্বারা আন্তরিকতা প্রমাণ করা আবশ্যক। জীবন-মরণের প্রশ্নও সমস্যা যাহার মধ্যে দেখা দিয়াছে তাহার একটা সুচিন্তিত মীমাংসা চিত্রা কর্ত্তৃপক্ষ করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

শ্রীমতী নীলিমা বড়ুয়া। তিনি সুরশ্রী সংগীত সঙ্ঘের প্রতিযোগিতায় ধ্রুপদ ও বড়গীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

শ্রীযুত মধু বসুর পরিচালনায় সি এ পি সম্প্রদায় বোম্বাইএর সাগর ফিল্মের হইয়া একখানি ছবি তুলিবেন বলিয়া স্থির হইয়াছে। ছবিখানির নাম "লাইফ অব এ ড্যান্সার"। হিন্দী এবং বাঙলা উভয় ভাষাতেই এই ছবি তোলা হইবে। আখ্যানভাগ লিখিয়াছেন শ্রীযুত মন্মথ রায়। সাধনা বসু, মধু বসু ও সি এ পি সম্প্রদায় এই ছবিতে অভিনয় করিবেন। সঙ্গীত পরিচালনা করিবেন তিমিরবরণ। "লাইফ অব এ ড্যান্সার" ছবির আখ্যানভাগ আমরা শুনিয়াছি। চলচ্চিত্রের পক্ষে ইহা এক অতি সুন্দর কাহিনী।

* * * * *

শ্রীযুত জ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিচালনায় দেবদত্ত ফিল্ম কোম্পানী "রুক্মিণী" নামক একখানি পৌরাণিক ছবি তুলিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। অহীন্দ্র চৌধুরী, নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, জহর গাঙ্গুলী, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, পান্না, প্রতিমা, দেববালা প্রভৃতি এই ছবিতে অভিনয় করিবেন। চিত্র গ্রহণ করিবেন মিঃ মায়ার্স ও শব্দগ্রহণ করিবেন সত্যেন দাশগুপ্ত।

শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিয়াছেন এবং "পথ ভুলে" নামক একখানি সামাজিক ছবি তুলিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে বাঙলা দল, দক্ষিণ পাঞ্জাব দলকে ১৭৮ রাণে পরাজিত করিয়া রণজি ক্রিকেট কাপ বিজয়ী হইয়াছে। বাঙলা দলের এই সাফল্য বাঙলার উদীয়মান খেলোয়াড়গণের প্রাণে বিপুল আনন্দ ও উৎসাহ দান করিল। ভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রে বাঙলার খেলোয়াড়গণ যে এতদিন উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছিলেন তাহা বিদূরিত হইবার সম্ভাবনা দেখা দিল। আন্তঃপ্রাদেশিক শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় বাঙলা দলের জয়লাভ, বাঙলার ক্রিকেট ইতিহাসে নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিল।

রণজি কাপ বিজয়ী বাঙলা দলের ক্রিকেট খেলোয়াড়গণ। ফটো—আনন্দবাজার

বাঙলার ক্রিকেট খেলোয়াড়গণ অন্যান্য প্রদেশের খেলোয়াড়-গণের ন্যায় উচ্চাঙ্গের ক্রীড়ানৈপুণ্যের অধিকারী ইহা প্রমাণিত হইল। বাঙলার ক্রিকেট ইতিহাসে ইহা চির-স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

১৯৩৩ সালে ভারতের শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড় স্বর্গীয় রণজিৎ সিংহের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই প্রতিযোগিতার প্রবর্ত্তন করা হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের খেলোয়াড়গণের মধ্যে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া স্থির হয়। প্রথম দুই বৎসর বাঙলা দল যোগদান করে না; অর্থাভাব বশতঃই যোগদান করা সম্ভব হয় না। তৃতীয় বৎসর হইতে বাঙলা দল যোগদান করে। ১৯৩৭ সালে বাঙলা দল ফাইনালে নবনগরের নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। ১৯৩৮ সালে জোন ফাইনালে উঠিয়াও বাঙলা দল সেমিফাইনালের খেলায় যোগদান করে না। পরিচালকগণের সহিত মতদ্বৈধই না-কি বাঙলা দলকে খেলা হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য করে।

বাঙলা দলের এই জয়লাভের মূলে ছিল দলের খেলোয়াড়-গণের মধ্যে সম্পূর্ণ সহযোগিতা। প্রত্যেক খেলোয়াড়ই দলের সম্মানের কথা স্মরণ করিয়া নিজ নিজ শক্তিমত দলকে সাহায্য করিয়াছেন। তবে ব্যাটিংয়ে ভ্যান্ডারগাট, বেরহেন্ড, ম্যালকম, মিলার, কার্ত্তিক বসু ও জব্বর এবং বোলিংয়ে কমল ভট্টাচার্য্য, টি সি লংফিল্ড ও জে এন ব্যানার্জ্জির নাম বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাঙলা দলের এই সাফল্যে আনন্দলাভ করিলেও এই কথা আমরা কিছুতেই ভুলিতে পারি না যে, বাঙলা দলের এই সম্মানলাভ সম্পূর্ণত বাঙালীর হয় নাই; কয়েকজন ইউ-রোপীয় খেলোয়াড়ের সাহায্যে হইয়াছে

রণজি প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দলসমূহঃ—১৯৩৩-৩৪ সালে বোম্বাই, ১৯৩৪-৩৫ সালে বোম্বাই, ১৯৩৫-৩৬ সালে নবনগর, ১৯৩৬-৩৭ সালে নবনগর, ১৯৩৭-৩৮ সালে হায়দরাবাদ। ১৯৩৮-৩৯ সালে বাঙলা।

সাপ্তাহিক সংবাদ

১৪ই ফেব্রুয়ারী—

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু সেবাগ্রামে গিয়া মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। শ্রীযুত বসু জানান যে, মহাত্মাজীর সহিত তাঁহার কোন জটিল প্রশ্নের আলোচনা হয় নাই। আগামী ২২শে তারিখ ওয়ার্দ্ধায় ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন হইবে চূড়ান্তভাবে স্থির হইয়া গিয়াছে এবং মহাত্মা গান্ধী ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে যোগদানের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিয়াছেন।

'উৎসব' পত্রিকার সম্পাদক সুপণ্ডিত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮০ বৎসর হইয়াছিল।

ক্যানাল ট্যাক্স প্রদানের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহার উপর নজর রাখিবার জন্য বর্দ্ধমান দামোদর ক্যানাল অঞ্চলের বিভিন্ন কেন্দ্রে পাঁচশতাধিক পুলিশ প্রহরী মোতায়েন করা হইয়াছে। দামোদর ক্যানাল অঞ্চলের সর্ব্বত্র এবং বর্দ্ধমান সহরে ১৪৪ ধারার আদেশ জারী করিয়া দুই মাস কাল ক্যানাল আন্দোলন সম্পর্কে কোন প্রকার সভা সমিতি এবং শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

বাঙলা সরকার আরও ৮ জন রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দিয়াছেন। বন্দীদের নাম:—(১) শ্রীচন্দ্রশেখর পাঠক, (২) শ্রীহরিপদ সিকদার, ওরফে পাটনী, (৩) শ্রীমহাদেও মহাতো, (৪) শ্রীকৃষ্ণকান্ত দেবনাথ (৫) শ্রীফণিভূষণ বসু, (৬) শ্রীপ্রফুল্লকুমার বিশ্বাস, (৭) শ্রীযোগেশচন্দ্র দাস ও (৮) শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুস্তাফা।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুত মোহনলাল সকসেনার প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র সচিব বলেন যে, গবর্ণমেণ্ট শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর "ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রাগল" পুস্তকের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

কাণপুরে সান্ধ্য আইন জারী হইয়াছে। যাহারা সাম্প্রদায়িক ধ্বনি বা সঙ্গীতাদি করিবে, আবশ্যক হইলে বাড়ীর দরজা ভাঙিয়া তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশ ও সেনাবাহিনীকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে। সহরের মধ্যস্থ অস্ত্রশস্ত্রের ও মদের দোকান বন্ধ রাখিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। দাঙ্গার অবস্থা অনেকটা শান্ত। ছয়শত লোক গ্রেপ্তার হইয়াছে। সরকারী মহলের সংবাদে প্রকাশ, এতাবৎ ৩১ জন মারা গিয়াছে এবং ২২৫ জন আহত হইয়াছে।

দিল্লীতে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলেন যে, বর্ত্তমানে দেশীয় রাজ্যসমূহে যে সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে, তাহা একটি প্রথম শ্রেণীর সর্ব্বভারতীয় সমস্যায় পরিণত হইতে পারে এবং উহার ফলে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলসমূহের পদত্যাগের সম্ভাবনা আছে।

১৫ই ফেব্রুয়ারী—

কেন্দ্রীয় পরিষদে, কুটির-শিল্পে উৎসাহ দিবার জন্য হাতে প্রস্তুত দিয়াশলাইয়ের উপর "রিবেটের" মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া দিতে ও উহার লাইসেন্স-ফীর মাত্রা হ্রাস করিতে কংগ্রেস দলের পক্ষ হইতে আনীত একটি প্রস্তাব ৬০-৪২ ভোটে গৃহীত হইয়াছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হয়। শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার বাঙলা গবর্ণমেণ্টের ১৯৩৯-৪০ সালের বাজেট পরিষদে পেশ করেন। বাজেটে দেখা যায়, ঐ বৎসরে বাঙলা গবর্ণমেণ্টের আয় হইবে ১৩ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হইবে ১৪ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ ঘাটতি হইবে প্রায় ৮৭ লক্ষ টাকা। ইহার সঙ্গে ১৯৩৮-৩৯ সালের ঘাটতি প্রায় ২২ লক্ষ টাকা যোগ দিলে, দুই বৎসরে মোট ঘাটতি প্রায় এক কোটি নয় লক্ষ টাকা দাঁড়ায়। এই ঘাটতি পূরণের জন্য অর্থসচিব এক কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করিবার এবং দুইটি নূতন ট্যাক্স ধার্য্য করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। কুকুর দৌড়ের উপর ট্যাক্স বসান হইবে এবং যাহারা ইনকাম ট্যাক্স দেয়, তাহাদের উপর (ব্যবসায়, স্বাধীনবৃত্তি এবং চাকুরীতে নিযুক্ত প্রত্যেকের উপর) বার্ষিক ৩০ টাকা করিয়া কর ধার্য্য করা হইবে।

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু পুনরায় সেবাগ্রামে গিয়া মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। দেশের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাসমূহ সম্পর্কে উভয়ের মধ্যে তিন ঘণ্টাকালব্যাপী হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনা হয়।

মাদ্রাজের ভিজাগাপট্টমের নিকটস্থ চিতাভালসা মিলের শ্রমিকগণ যে অবস্থান ধর্ম্মঘট করিয়াছিল, তাহা ভাঙিবার জন্য গতকল্য গুলী ও লাঠি চালান হইয়াছিল। চারিবার গুলী চালান হয়। একজন লোক গুরুতর আহত হইয়াছে।

১৬ই ফেব্রুয়ারী—

বর্দ্ধমান জেলায় দামোদর ক্যানাল অঞ্চলে ক্যানাল-কর আদায়ের জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তৎসম্পর্কে কংগ্রেসী সদস্য শ্রীযুক্ত প্রমথ ব্যানার্জ্জি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটি মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সরকার পক্ষের অভিমত বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্র সচিব খাজা স্যার নাজিমুদ্দিন বক্তৃতা প্রসঙ্গে পরিষদে ব্যক্ত করেন যে, ঐ অঞ্চলের জনসাধারণের সত্যিকার কোন অভাব অভিযোগ কিছু নাই। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কংগ্রেসীরা ও সাম্যবাদী দলের লোকজনের "হীন" প্রচারকার্য্যের ফলেই বর্ত্তমান পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। দেড় ঘণ্টাকাল আলোচনার পর পরিষদে মুলতুবী প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হয়। তবে এই সম্পর্কে কোন ভোট গণনার দাবী করা হয় না।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলনের খুলনা অধিবেশনের নির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রীযুত বিনায়ক দামোদর সাভারকরকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য কলিকাতা টাউন হলে এক বিপুল জনতার সমাবেশ হয়। কলিকাতার নাগরিকগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তরে শ্রীযুত সাভারকর বলেন,—যতদিন পর্য্যন্ত ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়সমূহ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া হিন্দুদের উপর আক্রমণাত্মক নীতি অবলম্বন করিবে,

৬ষ্ঠ বর্ষ] শনিবার, ৬ই ফাল্গুন, ১৩৪৫ সাল, 18th February, 1939 [১৪শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

স্বাধীনতার সাধক সাভারকর—

প্রতাপাদিত্যের জন্মভূমি যে খুলনা জেলায়, সেই খুলনা শহরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সভার অধিবেশন হইতেছে। এই অধিবেশনের সভাপতিস্বরূপে শ্রীযুক্ত বিনায়ক দামোদর সাভারকর বাঙলা দেশে আসিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সাভারকর ভারতের সর্ব্বজনমান্য নেতা। তাঁহার জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেম এবং স্বদেশের স্বাধীনতার সাধনায় একাগ্রতা এবং আন্তরিকতার তুলনা দুর্লভ। স্বদেশপ্রেম পরাধীন ভারতে একটি প্রধান অপরাধ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। দেশ-জননীর শ্রেষ্ঠ সন্তানদের মধ্যে যাঁহারা বন্ধন, পীড়ন, দুঃখ এবং অসম্মানের উপচারে অভিনন্দিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত সাভারকর অন্যতম। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার জীবনের অধিকাংশই কারাগারের মধ্যে কাটিয়াছে। রাজদ্রোহ প্রচারের অপরাধে ভারতের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ দন্ড অর্থাৎ যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দন্ড লাভের সম্মানের অধিকারী হইয়াছিলেন এই সাভারকার। সুদীর্ঘকাল কারাগারের নির্জ্জন কক্ষে অতিবাহিত করিয়া তিনি বাহিরে আসিয়াও পড়েন আর এক কারাগারে। দীর্ঘকাল তাঁহাকে রত্নগিরিতে আটক রাখা হয়। এদেশের আমলাতন্ত্র স্বাধীনতার এই দুর্দ্ধর্ষ সাধকের উপর হইতে তাঁহাদের সন্দেহের দৃষ্টি দিনেকের তরেও এড়াইতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত সাভারকরের সহিত বাঙালীর অন্তরের যোগ আজ নূতন নহে। বাঙলার জাতীয়তাবাদের উদ্বোধকদের সঙ্গে সহানুভূতির সূত্রে তাঁহার যোগ স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতেই রহিয়াছে। বাঙালীর সঙ্গে শ্রীযুক্ত সাভারকরের সেই যোগ অন্তরের যোগ, তাহা শুধু পাশ্চাত্যের মক্করা রাজনীতিক সূত্রের ভিতর দিয়া নয়, সে যোগকে অনেকটা আধ্যাত্মিক যোগই বলা যাইতে পারে। এ যোগ রহিয়াছে বাঙলা এবং মহারাষ্ট্রের স্বাধীনতা সাধনার বিশিষ্ট ধারার ভিতর দিয়া। সুতরাং শ্রীযুক্ত সাভারকর, বাঙালীর কাছে অপরিচিত নহেন, সুপরিচিত; কিন্তু সুপরিচিত হইলেও বাঙলা দেশে তাঁহার আগমন এই প্রথম। স্বদেশের বরেণ্য সন্তানকে অভ্যর্থনার জন্য বিপুল আয়োজন হইতেছে, তাঁহাকে অভিনন্দন করিবার নিমিত্ত যে আন্তরিকতা বাঙলা দেশের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহাতে আমাদের মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে। আমরা বুঝিয়াছি জাতি জাগিয়া উঠিতেছে। আপনার জনকে সে চিনিয়াছে, জানিয়াছে, ঝুটা এবং সাচ্চার বিচার জাতি করিতে শিখিয়াছে। মহতের প্রতি শ্রদ্ধার ভিতর দিয়াই জাতির প্রাণ-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত সাভারকরের সম্বর্দ্ধনায় আমরা সেই পরিচয় পাইয়াছি। ভারতের এই বরেণ্য সন্তানকে আমরা শ্রদ্ধাভরে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

ভারত সরকারের রেলওয়ে বাজেট—

গত সোমবার ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে এবং রাষ্ট্রীয় পরিষদে ভারত সরকারের রেলওয়ে বাজেট পেশ হইয়াছে। রেলওয়ে বাজেট বাহির হইলেই আমাদের প্রথমে দৃষ্টি পড়ে এ দেশের যাহারা গরীব, রেলওয়ের বড় আয় হয়, যাহাদের দৌলতে, তাহাদের জন্য কর্ত্তারা কি ব্যবস্থা করিলেন, তাহাদের সুখ-সুবিধার জন্য, তাহাদের অভাব-অভিযোগের প্রতীকারের নিমিত্ত নূতন বাজেটে কি করা হইল সেইদিকে। বর্ত্তমান বাজেট দাখিল করিতে গিয়াও রেলবিভাগের সদস্য স্যার টমাস ষ্টুয়ার্ট এবং চীফ কমিশনার স্যার গুথরী রাসেল উভয়েই বড় বড় কথা অনেক বলিয়াছেন। কিন্তু কাজে গরীবের জন্য তেমন কিছু যে করা হইয়াছে, ইহা আমাদের নজরে পড়িল না। স্যার টমাস ষ্টুয়ার্ট গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছেন, রেলবিভাগ তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সম্বন্ধে উদাসীন এমন কথা এখন আর কেহ বলিতে পারিবেন না। এ ত গেল কথা; কিন্তু কাজে কি দেখা যাইতেছে? বাজেটে দেখা যাইতেছে, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সুখ-সুবিধা অর্থাৎ, তাহাদের জল সরবরাহ, পায়খানা প্রভৃতির ব্যবস্থা এবং বসিবার ঘর, চায়ের দোকান প্রভৃতি বাবদ সরকারী রেলপথগুলিতে মোট ৩৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ করা হইয়াছে, অথচ রেলবিভাগের মোট ব্যয় ৬৪ কোটি টাকা। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের প্রতি

রেল কর্তৃপক্ষ যে উদাসীন নহেন, তাহার সেরা নজীর নয় কি? ভারতের তৃতীয় শ্রেণীর নারীদের জন্য যে কর্ত্তারা মোট ব্যয়ের শতকরা আট আনা খরচ করিতেছেন, এ কি কম কথা! রাষ্ট্রীয় পরিষদে স্যার গুথরী রাসেল, স্যার টমাসের উক্তিরই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন, বোম্বাই, কলিকাতার ডাকগাড়ীতে হওয়াদার কোচ গাড়ীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তিনি সদস্যদিগকে উৎসাহিত করিয়া বলেন, এই সব গাড়ীতে চড়ার যে কি আরাম যাঁহারা কোন দিন চড়িয়াছেন তাঁহারাই জানেন। আরাম ত বুঝা গেল; কিন্তু সে আরাম কয়জনের জন্য? তেমন আরাম ভোগ করিবার মত পয়সা আছে কয়জনের? তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য কি আরামের ব্যবস্থা কর্ত্তারা করিয়াছেন, কৃপা করিয়া সেইটুকু জানিতে পারিলেই আমরা কৃতার্থ হইতাম। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর সংখ্যা যাহাতে বাড়ে সেজন্য খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিবার ভাল ব্যবস্থা করা হইতেছে, এই আশ্বাস আমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু কেবল বিজ্ঞাপনের জোরেই বস্তুর কদর বাড়ে না। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সংখ্যা বাড়াইতে হইলে ঐ শ্রেণীর যাত্রীদের সুখ-সুবিধার জন্য আরও ভাল ব্যবস্থা আগে করিতে হইবে।

সম্প্রতি রেলপথে ঘন ঘন যে রকম দুর্ঘটনা ঘটিতেছে, তাহাতে এই সব দুর্ঘটনার প্রতীকারের জন্য কর্ত্তারা কি ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহা জানিবার জন্য সকলের মনেই উদ্বেগ রহিয়াছে। স্যার টমাস স্টুয়ার্ট কথাটা তুলিয়াছেন। যাত্রীদের নির্বিঘ্নযাত্রার জন্য রেল-পথের অতীতের সুনামের কথা তিনি শুনাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু অতীতের সুনাম শুনিলেই ত লোকের মন বুঝ মানে না। এখন যে সব ব্যাপার ঘটিতেছে, তাহার প্রতীকারের জন্য কর্ত্তারা কি করিতেছেন ইহা জানিতে পারিলেই লোকে আশ্বস্ত হইতে পারে। জানান দরকার ছিল তাহাই।

স্বদেশী আন্দোলন ও রবীন্দ্রনাথ—

বিশ্বভারতী সম্মেলনের উদ্বোধন করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার আলোচনায় বাঙলার অতীত ইতিহাসের উপর একটা আলোকসম্পাত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ কবি; বিশেষভাবে তিনি বাঙলা মায়ের কবি, এইভাবেই আমরা তাঁহাকে মনে-প্রাণে জানি। বাঙলা দেশের প্রতি প্রগাঢ় প্রেমের প্রাচুর্য্য কবির অন্তরকে সৌন্দর্য্যে এবং মাধুর্য্যে পূর্ণ করিয়া যে আনন্দ ধারা উপচাইয়া দিতেছে, বাঙলা দেশের মাটিতে তাহাতে সঞ্জীবনী শক্তির সঞ্চার করিয়াছে। বঙ্গভূমি পুষ্পিত এবং পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে, দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে সেখান হইতে মধুময় মলয় সমীরণ। বঙ্গভূমির প্রতি এই প্রগাঢ় প্রেম-প্রাচুর্য্যই একদিন কবি-হৃদয় হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া বাঙলা দেশের মানুষকে জাগাইয়াছিল, মানবতার উদ্বোধন করিয়াছিল। দেশাত্মবোধের দীপক রাগিণী বাজিয়াছিল কবির বীণায়। আমরা স্বদেশী যুগের কথাই বলিতেছি। কবি আজ সার্ব্বভৌমত্বের অনুভূতির মধ্যে মুক্তিলাভ করিয়াছেন; কিন্তু এই সার্ব্বভৌম অনুভূতির মূলে যে কবির স্বদেশ রহিয়াছে, এ কথা আমরা ভুলিব কেমন করিয়া? কবি বলিয়াছেন,—'আমি বঙ্গ-ভঙ্গের আন্দোলনের মধ্যে ছিলাম। দেখলাম কি করে ওটা কলুষিত হইতে আরম্ভ করলো। একটা জেনারেশনকে ভেঙ্গে দিলো। আলো নাই, তেজ নাই, শক্তি নাই, এত মিথ্যা, যারা তরুণ, যারা বীর তাদেরকে পিষ্ট ক'রে দিয়েছে। রাষ্ট্রকে যারা আপনার ক'রে বীরের মত দেখতে পারত তারা নেপথ্যে চলে গেছে। মিথ্যা সত্যের দীপ্তি দেখাতে পারে না।' কবি তাঁহার বিশ্বাত্মতার উচ্চ অনুভূতির লোক হইতে বাঙলার স্বদেশী আন্দোলনকে যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, আমরা ঠিক তেমন দৃষ্টিতে দেখি না। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বাঙলার যে শক্তিটা বিকশিত হইয়াছিল, তাহার মূলে কবি যাহাকে দ্বেষ, বৈষম্য, কিংবা তিনি রাজনীতির যেগুলি লক্ষণ 'দলাদলি, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, পঙ্কিলতা বলিয়াছেন, শুধু তাহাই ছিল না—ছিল প্রেম। যে প্রেম আনন্দরূপ, ছিল সেই প্রেমও; এবং সেই প্রেমের জোরেই বাঙলার তরুণেরা সেদিন অসাধ্য সাধন করিয়াছে, হাসিতে হাসিতে প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়াছে। শুধু মিথ্যার উপর, শুধু ফাঁকিবাজীর উপর, ভাবের ঘরে ষোল আনা চুরির উপর এ জিনিষটা হয় না। এবং এই যে জিনিষ এ কেবল ভাঙ্গেই না, গড়েও। দৌর্ব্বল্য, ত্রুটি আছে এ পথে, অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সেই দুর্ব্বলতা, সেই ত্রুটির ভিতর দিয়াই জাতি গড়িয়া উঠে। নির্ব্বিঘ্নতা, নিরাপত্তা—মাপা-বাঁধা বিধিমার্গে জগতে কোন দিন কোন জাতির জাগরণ ঘটে না। স্বদেশী আন্দোলন নিজের ভাল এবং মন্দ নিঃশেষে অর্ঘ্য দিয়াই জাতিকে আগাইয়া দিয়াছে। এই আন্দোলনের মূলে শুধু মিথ্যা নাই, বাঙালী জাতির বিশিষ্ট জীবনধারার যোগও রহিয়াছে। যে জাতির বিশিষ্টতা রবীন্দ্রনাথের বিমল প্রতিভায় বিকশিত হইয়া সমগ্র বিশ্বকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে, সে জাতি পিষ্ট হইবার নয়।

রাজনীতি ও মনুষ্যত্ব—

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—'রাজনীতি মানুষের পূর্ণ বিকাশের সহায়তা করে না। তার ভিতর দলাদলি, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, পঙ্কিলতা রয়েছে। এই পরিবেষ্টনীর ভিতর দিয়ে জগৎ-সংসারকে দেখলে, ছোট ছোট ছেলেরা এইভাবে রাষ্ট্রনীতিতে জড়িয়ে পড়লে, বেঞ্চ ভাঙ্গাভাঙ্গি, সভা থেকে এক দলের বিরুদ্ধে আর এক দলকে লাগানো—চলতে থাকে।' রবীন্দ্রনাথ এ ক্ষেত্রেও এক দিক হইতেই বিষয়টি দেখিয়াছেন। দলাদলি প্রভৃতি কবি যে কথা বলিয়াছেন, রাজনীতির ভিতর ঐ গুলির কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাই রাজনীতির স্বরূপ নহে, বা সব কথা নয়। যে-সব সম্পূর্ণ অ-রাজনীতিক সেগুলির মধ্যেও ঠিক ঐ ধরণের না হইলে অন্য রকম জঞ্জালের কারণ আছে। যে রাজনীতি আমার দেশ এবং আমার জাতির প্রতি কর্ত্তব্যবোধ ছেলেদের মধ্যে জাগায়, সে রাজনীতি তাহাদের মনুষ্যত্ব গঠনে সাহায্যই করিয়া থাকে। অধিকন্তু তরুণদের চিত্তবৃত্তির স্বচ্ছন্দ বিকাশের পক্ষে রাজনীতি যতটা অনুকূল, বিশ্বপ্রেম বা অন্য দিক হইতে আনন্দের অনুভূতি ততটা অনুকূল অনেক ক্ষেত্রেই হয় না। তাহারা ঐ সব আনন্দের সারভূত যে সূক্ষ্ম জিনিষ, সেগুলি সব সময়

ত ধরিতে পারেই না, অনেক সময় ঠিক বিপরীত দিকেই তাহাদের গতি হয়—সাত্ত্বিকতার দিকে গতি না হইয়া তাহারা ডুবিয়া পড়ে তামসিকতার মধ্যে। রাজনীতিতে ষোল আনা সাত্ত্বিকতা না থাকিলেও যে রাজসিকতা আছে, তাহা অন্ততপক্ষে একেবারে তামসিকতার মধ্যে—প্রমাদ, আলস্য, নিদ্রা, আরাম, সংকীর্ণ সুখের হিসাব নিকাশের মধ্যে তরুণদের চিত্তকে ডুবাইয়া মারে না। জগতের রাজনীতির মধ্যে ছেলেদের স্থান অনেক দিন হইতেই আছে। জাতির ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিয়াছে প্রধানত তাহারাই। কবির কথাতেই বলা যায়—'অল্প বয়সের বালকেরা যখন প্রকাণ্ড বীর্য্য ও ঔদার্য্য নিয়ে প্রকাশিত হয়, তখন বুঝতে হল তার ভিতর মস্ত একটা কিছু আছে। ঝাঁপিয়ে পড়ে অল্পবয়স্ক ছেলেরা, বাড়ী-ঘর-দোর-সংসার কিছুর কথা ভাবে না, ভবিষ্যৎ ভাবে না। প্রত্যক্ষ মৃত্যুর সামনে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার মধ্যে আনন্দের প্রেরণার অভাব নাই।' এই প্রেরণাই ত জীবন, এই প্রেরণাই ত মনুষ্যত্বের মূলে। রাজনীতি সব ক্ষেত্রে সার্ব্বভৌম অনুভূতির অদ্বয় [illegible] দিয়া মানুষকে অমৃতত্বে প্রতিষ্ঠিত না করিতে পারে; কিন্তু এই দিক হইতে মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য যেটুকু কাজ করে, এই পরাধীন দেশে তাহার প্রয়োজনকে আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। এবং আমাদের বিশ্বাস এই যে, কবি ভারতের ঋষিদের যে বিশ্বাত্মতার অমৃতময়ী বাণী শুনাইতে উৎসুক, রাজনীতিক তপস্যার প্রভাবে পরাধীনতার তমোজাল কাটিয়া দিতে না পারিলে সে অমৃতময়ী বাণীর মহত্ত্ব বিশ্ববাসী উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবে না। বলহীন যে সে আত্মাকে লাভ করিতে পারে না। রাজনীতিতে যে বলের বিকাশ হয়, আগে দরকার সেই বলের; এবং সেই বলেরও মূলে রহিয়াছে প্রেম—কাম-রাগ-বিবর্জ্জিত বল। তাহাই রাজনীতির মূলে শক্তি।

সাম্রাজ্যবাদের দাতিয়ালী-

মিঃ এইচ জি ওয়েলস্ ইংলণ্ডের একজন বড় সাহিত্যিক। এজন্য তাঁহার জগৎ-জোড়া খ্যাতি আছে। তিনি সম্প্রতি ভারতে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। ফিরিবার পথে করাচী শহরে সংবাদপত্রের প্রতিনিধির মারফতে ভারতের অভাজন কালা আদমীদিগকে তিনি কিঞ্চিৎ উপদেশ দিয়া কৃতার্থ করিয়া গিয়াছেন। উপদেশের মর্ম্ম হইল এই যে, ভারতের যে জাতীয়তাবাদ তাহা ইউরোপেরই নকল এবং মহাত্মাজী এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, ইউরোপের রাজনীতির নকল করিতেছেন। ওয়েলস্ সাহেব ভারতের জাতীয়তাবাদের যেমন খুশী ভাষ্য করিতে পারেন, আমাদের তাহাতে কোন মাথা ব্যথা নাই; কারণ তিনি যত বড় পণ্ডিতই হউন, আমরা রাজনীতি বিষয়ে তাঁহার চেলাগিরি করিতে যাইতেছি না; কিন্তু তিনি আমাদিগকে উদ্দেশ করিয়া যে উপদেশামৃত বৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই আমাদের আপত্তি। তিনি বলেন, স্পেনের ব্যাপার হইতে ভারতবাসীদের শিক্ষালাভ করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে, ভারতের জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে ওয়েলেস্ সাহেবের ভাষ্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে তাঁহার এই যে উপদেশাংশ, এইটুকুই আগে বুঝা দরকার। স্পেনের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার সম্বন্ধে ভারতবাসীদের অন্তরে বিভীষিকা জাগাইয়া ভারতের জাতীয়তার আন্দোলনের ভিতর বৃটিশ জাতির প্রতি একান্ত বশ্যতার বিরোধী ভাবটা দাবাইয়া দেওয়াই হইল ওয়েলসের ভাষ্যের ভিতরের কথা। ওয়েলস্ সাহেব যে ধরণের ধাপ্পা-বাজী দিয়াছেন, সে ধরণের ধাপ্পা আজ নূতন নয়। ভারতের ভবিষ্যৎ-ভাবনায় যাঁহাদের মস্তিষ্কের বিরাম নাই, বৃটিশ জাতির এমন বিশ্বপ্রেমিক সন্তানদের অনেকের মুখে আমরা ঐ ধরণের কথা আগেও অনেক শুনিয়াছি। তাঁহারা কেহ চীনের অবস্থার কথা তুলিয়া আমাদের জ্ঞান-নেত্র উন্মীলিত রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কেহ দেখাইয়াছেন বোলশেভিক জুজুর ভয়। কিন্তু ওয়েলস্ সাহেব এবং তাঁহার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে এই ধরণের ভারত-প্রেমিক যাঁহারা, তাঁহাদের প্রতি আমাদের নিবেদন এই যে, দেড় শত বৎসরের অধিককাল হইল ভারতের এই হতভাগাদিগকে মানুষ করিবার জন্য তাঁহারা চেষ্টার অন্ত কিছু রাখেন নাই। ইহাতেও যখন আমাদের আটাশেপনা কাটিল না, তখন তাঁহারা আর কি করিবেন? ভারতবাসীরা আর তাঁহাদের নিজেদের জন্য বৃটিশ বন্ধুদিগকে কষ্ট দিতে চায় না। চক্ষুলজ্জা বলিয়া একটা বস্তুও ত আছে!

ইংরেজের বিপদে ভারতবাসী—

ইংরেজের বিপদ ঘনাইয়া আসিতেছে। আন্তর্জ্জাতিক আকাশে মেঘমালা আসিয়া জমিতেছে—হয়ত প্রাবৃট উদয়ের পূর্ব্বে কাল-বৈশাখীর প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা আরম্ভ হইবে। ভারতবর্ষ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বড় ঘাঁটি এবং বলিতে গেলে এখন একমাত্র আশ্রয়। সুতরাং ওয়েলস্ সাহেব, যত বড় বিশ্ব-প্রেমিক বা সাহিত্যিকই হউন, তিনি ইংরেজ তো বটে; ইংরেজের বড় গুণই হইল এই যে, বিশ্ব-প্রেমের বাঁধা বুলি তাঁহারা মুখে যতই বলুন না কেন, নিজের দেশের স্বার্থ এবং জাতির স্বার্থের বুদ্ধি তাহাদের সব সময়ই টনটনে। ওয়েলস্ সাহেবের উক্তির ভিতর দিয়া বৃটিশ প্রকৃতির সেই বৈশিষ্টটাই ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে; যেটুকু লুকানো-ছাপান ছিল তাহাও জলের মত পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে, তাঁহার বন্ধু লর্ড ষ্ট্রাবলগী সাহেবের কথায়। লর্ড ষ্ট্রাবলগী করাচী ত্যাগের প্রাক্কালে বলিয়াছেন, ইংরেজের এই সঙ্কটের সময়, ভারতবাসীরা তাহাদের দাবীর উপর যদি জোর দেয় তাহা হইলে ভারতের যাঁহারা বন্ধু মহল, তাঁহারাও সে জিনিষটা সঙ্গত বলিয়া দেখিবেন না। ভারতের এই যে বৃটিশ বন্ধু মহলের ধোঁকা ষ্ট্রাবলগী সাহেব দিয়াছেন, এ ধোঁকা অনেক দিন আগেই ভারতবাসীদের কাটিয়া গিয়াছে। ধোঁকা ভাঙিয়াছে, ম্যাক-ডোনাল্ডী আমলের পর হইতেই। ভারতবাসীরা ভাল করিয়াই বুঝিয়াছে যে, ইংরেজের কাছে ইংরেজ জাতির স্বার্থই হইল বড়, যাঁহারা ভারতের অতি বড় বন্ধু বলিয়া নিজদিগকে ফলাইয়া থাকেন, তাঁহাদের গায়ে আঁচড় কাটিলেও বাহির হইয়া পড়ে সেই একই বৃটিশ স্বার্থের স্বরূপ। এবং ভারত-বাসীরা ইহাও বুঝিয়াছে যে, ইংরেজ জাতি, এমন একটা প্রকৃতিতে গড়া যে, নিতান্ত বেগতিকে না পড়িলে তাহারা

অপরের নিতান্ত যে ন্যায্য অধিকার তাহাও ছাড়িয়া দেয় না। আমেরিকা এবং আয়র্লণ্ডের ইতিহাস এ পক্ষে অভ্রান্ত প্রমাণ। লর্ড ষ্ট্রাবলগী সে ঐতিহাসিক সত্যকে উল্টাইয়া দিতে পারেন না, উল্টাইয়া দিতে পারেন না সে সত্যকে যে সত্য ইংরেজ জাতির প্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সকল উপদেশকে অতিক্রম করিয়া যায় সে প্রকৃতি। এতদিন ইংরেজের সঙ্গে থাকিয়াও ভারতবাসীরা যদি ইংরেজ চরিত্র সম্বন্ধে এইটুকু অভিজ্ঞতা লাভ না করিয়া থাকে, তবেই আশ্চর্যের বিষয় হইবে।

লজ্জার নিরিখ—

মিঃ লয়েড জর্জ্জ কিছুদিন হইল লানডাডনো নামক স্থানে এক বক্তৃতা দিয়াছেন। তাঁহার এই বক্তৃতা লইয়া বিলাতে বেশ একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। এই বক্তৃতায় তিনি বলেন, জার্ম্মানীর এবং ইটালীর দুইজন কূট রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ শাসকের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইবার জন্য যে মানসিক ক্ষমতা, যে কল্পনা-শক্তি এবং মানব-প্রকৃতি বুঝিবার যে অন্তর্দৃষ্টি এবং অভিজ্ঞতার প্রয়োজন—চেম্বারলেন সাহেবের তাহা নাই। লয়েড জর্জ্জ প্রথমে আবিসিনিয়ার কথা তোলেন। তিনি বলেন, "প্রধানমন্ত্রী দুই বৎসর পূর্ব্বে এই কথা ঘোষণা করেন যে, আবিসিনিয়ার স্বাধীনতা সমর্থন তাঁহারা করিবেন, ভীরুর মত ইটালীর দাবীতে আত্মসমর্পণ করিবেন না। কিন্তু রোমে গিয়া আবিসিনিয়ার সম্রাটরূপে তিনিই ইটালীর রাজার স্বাস্থ্য কামনা করিয়া বক্তৃতা দেন। ইহার পর স্পেনের ব্যাপারের কীর্ত্তি।" মিঃ লয়েড জর্জ্জ চেম্বারলেন সাহেবের সেই কীর্ত্তির কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, "ইটালী এবং জার্ম্মানী স্পেনের ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকিবে, চেম্বারলেন এই চুক্তির ছিলেন বড় একজন পাণ্ডা। কিন্তু সেই চেম্বারলেন সাহেব রোমে অবস্থানকালেই জার্ম্মানী এবং ইটালী হইতে প্রেরিত গোলাগুলী এবং বোমার সাহায্যে বিদ্রোহী ফ্রাঙ্কোর সেনারা অরক্ষিত শহর এবং গ্রামসমূহ ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিতেছিল। ফ্যাসিষ্ট এবং নাৎসীদের কামানের মুখে নিরপেক্ষতা চুক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়াছে। চেম্বারলেন বিমানপোতযোগে লণ্ডনে অবতরণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই হের হিটলার মিউনিক চুক্তি আবর্জ্জনাস্তূপে নিক্ষেপ করেন। চেম্বারলেন সাদরে মুসোলিনীর করমর্দ্দন করেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি সেই করকেই মর্দ্দন করিতেছিলেন, যে কর ব্রিটিশ জাহাজ-ডুবি এবং নাবিকগণকে হতাহত করার জন্য দায়ী। যে ব্যক্তির আদেশে বহু ব্রিটিশ নাবিক হতাহত হইয়াছে সেই ব্যক্তির সহিত চেম্বারলেন যখন আহার করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময় একজন আহত নাবিকের মৃত্যু হয়।" মিঃ লয়েড জর্জ্জ উত্তেজিতভাবে বলেন, "১০টি ব্রিটিশ জাহাজ আটক রহিয়াছে, ২০টি জলমগ্ন হইয়াছে, ৯০ খানা জখম হইয়াছে, ৪০ জন অফিসার নিহত হইয়াছে, ৭০ জন আহত হইয়াছে, চেম্বারলেন কি মুসোলিনীর সঙ্গে এ সম্বন্ধে কোন বুঝাপড়া করিয়াছেন? তিনি ভীরুর মতই আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। এজন্য তাঁহার বংশধরগণ সহস্র পুরুষ পর্য্যন্ত লজ্জায় অধোমুখে হইয়া থাকিবে।'

কিন্তু কথা শুধু হইতেছে এই যে, এই সব ব্যাপারের পরও লজ্জা বলিতে কোন পদার্থ ইংরেজ জাতির থাকিবে কি? আমাদের ত মনে হয় না। চেম্বারলেনের এই যে আত্মসমর্পণ, ইহা অকারণে নয়; যে শক্তি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ধরিয়া রাখিয়াছিল, সেই শক্তি আজ এলাইয়া পড়িয়াছে। এমন করিয়াই জগতে বড় বড় সাম্রাজ্য এলাইয়া পড়িয়া থাকে। গ্রীস, রোম, পারস্য প্রাচীন সাম্রাজ্যগুলিও এইভাবে এলাইয়া পড়িয়াছে। অতিমাত্র স্বার্থপরতার ফলে সাম্রাজ্যবাদীরা যে পাপ জমাইয়া তুলে, সেই পাপই ভিতরে ভিতরে তাহাদিগকে ফোঁপরা করিয়া ফেলে—বাহির হইতে বুঝা যায় না, ধরা যায় না। ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদও সেই অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইহার অস্তিত্ব এখন এক রকম শূন্যে ঝুলিতেছে, ভিত্তি মূলে কিছুই নাই। শুধু লজ্জায় আর কতটুকু শক্তি দিবে?

মেশিনগানে জবাব—

শেঠ যমুনোলাল বাজাজকে জয়পুর রাজ্যে আবার গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। গ্রেপ্তার যে করা হইবে, ইহা জানাই ছিল। সত্যাগ্রহ করিবার পূর্ব্বে বাজাজজী পুরুলিয়ার 'মুক্তি' পত্রের সম্পাদকের নিকট লিখিয়াছিলেন—'জয়পুর সরকার অন্যান্য দেশীয় রাজ্যসমূহের শাসকবর্গের এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহায়তালাভ করিয়াছেন। মহাত্মাজী 'হরিজন' পত্রে সম্প্রতি যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেশীয় রাজ্যসমূহে প্রজা আন্দোলন দাবাইবার জন্য পিছনে থাকিয়া কোন শক্তি কাজ করিতেছে, ইহা স্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। রাজকোটের ব্যাপার হইতেই বুঝা গিয়াছে যে, ইংরেজ রেসিডেণ্টরাই হইতেছেন দেশীয় রাজ্যগুলির হর্ত্তা-কর্ত্তা বিধাতা। ইহাদের ভিতর দিয়া ভারতের গণ-আন্দোলনকে দমিত করিবার নিমিত্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের শক্তিই কাজ করিতেছে। হিংসা অহিংসার প্রশ্ন নয়, প্রধান প্রশ্ন হইল এই যে, দেশীয় রাজ্যের প্রজারা যাহাতে জাগে, এমন কিছুই করিতে দেওয়া হইবে না। শেঠ যমুনালাল বাজাজ নিতান্ত নিরীহ প্রকৃতির শান্তিপ্রিয় লোক, কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে; তিনি সেখানে গেলে, এবং বিশেষভাবে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত জনসাধারণের সঙ্গে মিশিলে, প্রত্যক্ষভাবে হউক, পরোক্ষভাবেই হউক, লোকের মধ্যে রাজনীতিক চেতনা জাগিতে পারে; সুতরাং সেইটি করিতে দেওয়া হইবে না। দেশীয় রাজ্যে হিংসামূলক আন্দোলন দূরের কথা, অহিংসা আন্দোলনেরই জবাব দেওয়া হইবে বল প্রয়োগে—তেমন আন্দোলনের জবাব দেওয়া হইবে মেশিন কামানে। মহাত্মাজী 'হরিজন' পত্রে জয়পুরের প্রধান মন্ত্রী স্যার বোচাম্পের সহিত ব্যারিষ্টার চুদগারের আলোচনার যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য হইল ইহাই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শেষ আশ্রয় হইল দেশীয় সামন্ত রাজ্যসমূহ। এই সামন্ত রাজ্যগুলির ভিতর দিয়াই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতে নিজেদের ঘাঁটি শক্ত করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র প্রণালীর মধ্য দিয়াও খেলান হইয়াছে সেই কারসাজী। সুতরাং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সেই শেষ দুর্গ সুরক্ষিত

রাখিতেই হইবে এবং যতদিন সেগুলি সুরক্ষিত থাকিবে, ততদিন সেই সব দুর্গ হইতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বাহু বিস্তার চলিবে ভারতকে পরাধীনতার পাশে আবদ্ধ রাখিবার জন্য। সুতরাং ভারতের স্বাধীনতার সঙ্গে দেশীয় রাজ্যের এই আন্দোলন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত রহিয়াছে; জড়িত রহিয়াছে যুক্তরাষ্ট্র প্রণালীর নিয়ন্ত্রণ নীতি ব্রিটিশের স্বার্থমূলক অভিসন্ধির। এই জন্যই আমরা পূর্ব্ব হইতেই বলিয়া আসিতেছি যে, কংগ্রেস দেশীয় রাজ্যসমূহের জন-আন্দোলন হইতে দূরে থাকিতে পারে না—বরং যুক্তরাষ্ট্র-প্রবর্ত্তনের এই কারসাজীর মুখে কংগ্রেসের বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া উচিত, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ঐ সব ঘাঁটির দিকে। মহাত্মাজী সেই কথা বলিতেছেন—তিনি বলিয়াছেন, কংগ্রেস আর দূরে দাঁড়াইয়া নিরপেক্ষ থাকিতে পারে না। আমরা দেখিতে পাইতেছি, ভারতের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন আবার নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া উঠিতেছে এবং দেশীয় রাজ্য হইতেই জাগিবে ভারতের জনশক্তির নূতন সেই আন্দোলন, ইহা সুস্পষ্ট। মাননীয়া কস্তুরবাঈ এবং শেঠ যমুনালাল বাজাজের কারাবরণ সেই জাগ্রত জন-আন্দোলনেরই পূর্ব্বাভাস দিতেছে।

প্রজাদরদীদের দমননীতি—

বাঙলা সরকার অতিরিক্ত সরকারী গেজেটে একটি ঘোষণা জারী করিয়া আসানসোল মহকুমা বাদে বর্দ্ধমান জেলার সর্ব্বত্র ফৌজদারী কার্য্যবিধি সংশোধন আইনের ৭ ধারা জারী করিয়াছেন। এই ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, সরকার হইতে কতকগুলি বিশেষ সুবিধা দেওয়া সত্ত্বেও দামোদর খালের জন্য ট্যাক্স না দিবার নিমিত্ত লোককে প্ররোচিত করিবার উদ্দেশ্যে আন্দোলনকারীরা চেষ্টা করিতেছে। ইহাও জানা গিয়াছে যে, দামোদর খালের ট্যাক্স সম্পত্তি ক্রোক করিয়া আদায় করিবার নিমিত্ত ১৭ হাজার সার্টিফিকেট জারী করা হইয়াছে। এবং দামোদর খাল বিভাগের সরকারী আমলারা এই সব পরোয়ানা লইয়া পুলিশের দলবল সহ গ্রাম অঞ্চলে হানা দিতে যাইতেছেন। দামোদর খাল মহলে এই সব সরকারী দলবলকে লইবার জন্য ৪খানা মোটর বাস ১৫ দিনের জন্য রিজার্ভ করা হইয়াছে, সেই সঙ্গে দুইখানা মোটর লরীও আছে, সেই সব লরীতে করিয়া ক্রোকী সম্পত্তি বর্দ্ধমান শহরে লইয়া আসা হইবে। জরুরী কাজ করিবার জন্য বর্দ্ধমানের পুলিশ-ব্যারাকে ২০ সংখ্যক গুর্খা রাইফেল বাহিনীর প্রায় দুইশত সিপাহী মোতায়েন রাখা হইয়াছে। ইডেন ও দামোদর খাল-কর লইয়া বর্দ্ধমানবাসী যতপ্রকারে সম্ভব আপনাদের অভাব-অভিযোগ জানাইয়াছে। তাহারা বহু আবেদন-নিবেদন করিয়া কর্ত্তাদিগকে বলিয়াছে যে, ফসলের দর নাই, অথচ খালের কর এত বেশী যে, এই দুর্ব্বৎসরে তাহা দেওয়া তাহাদের ক্ষমতার অতীত। তাহারা কর দিবে না এমন কথা বলিতেছে না, তাহাদের কথা এই যে, করের হার বেশী হইয়াছে, উহা কমান উচিত। কিন্তু তাহাতে কি হইবে? ট্যাক্স নির্দ্ধারিত হারে দিতেই হইবে, সুতরাং পুলিশ ও পল্টন তৈয়ারী হইয়া ছুটিয়াছে, জরুরী আইন জারী হইয়াছে। সেদিন ফরিদপুর শহরে গিয়া বাঙলার রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় মহাশয় একাধারে জমিদার এবং চাষী এই দুই দলের প্রতি দোধারা দরদ ফলাইয়া বলিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্ট বিভিন্ন জেলার কালেক্টরদিগকে রাজস্ব আদায় সম্পর্কিত বিধিবিধানের কড়াকড়ি এবং সার্টিফিকেট জারীর কড়াকড়ি কমাইবার জন্য পরামর্শ প্রচার করিয়াছেন। সেই সঙ্গে দুর্দ্দশাগ্রস্ত কৃষকদের আর্থিক কষ্টের নিরসনের জন্য গবর্ণমেণ্টের কীর্ত্তির কথাও তিনি কত কি বলিয়াছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, প্রজাদরদী বাঙলার বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলের প্রজাদরদের চূড়ান্ত পরিচয় তো ফুটিয়া উঠিয়াছে বর্দ্ধমানে, ডালভাত সমস্যা সমাধানের এমন সুন্দর উপায় আবিষ্কারে ভূভারতে তাঁহাদের তুলনা মিলিবে না।

বাঙলার বাজেট সেসন—

বাঙলা ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট সেসন আরম্ভ হইয়াছে এবং গত বুধবার বাঙলা সরকারের বাজেট পরিষদে উপস্থিত করা হইয়াছে। বাজেটের ব্যাপার সেই মামুলী—অর্দ্ধেক মা ষষ্ঠী, অর্দ্ধেক ঘরগোষ্ঠী, দিও কিঞ্চিৎ না করো বঞ্চিত; সুতরাং উল্লেখযোগ্য নূতন কিছুই নাই। জাতীয় গঠনমূলক কোন ব্যাপক কার্য্যতালিকা নাই। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, এই ধরণের তুকতাকে এ দেশের সমস্যার সমাধান হইবার কোন উপায় নাই। একটা বড় রকমের সংস্কারের কার্য্যতালিকা ধরিয়া সাহসের সঙ্গে আগাইয়া যাইতে হইবে; কিন্তু বাঙলার বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলের সেই সাহস, সে দূরদৃষ্টি এবং সে উদারতার একান্তই অভাব। একদিকে সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা এবং অপরদিকে বিদেশী স্বার্থবাহদের মন যোগাইয়া তাঁহাদিগকে চলিতে হইতেছে। এ অবস্থায় উদার কার্য্যতালিকা লইয়া কাজের আশা তাঁহাদের নিকট হইতে নাই। আমরা আগামী সপ্তাহে বাজেটের বিষয়গুলি ধরিয়া এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিব। আপাতত বাজেট সম্বন্ধে আমাদের মোটামুটি মন্তব্য হইল ইহাই। আমাদের মন্তব্য এই যে, দেশের গরীব যাহারা, তাহাদের দিক হইতে, দেশের গঠনমূলক কার্য্যের অভাব পূরণের দিক হইতে বাজেট আদৌ সন্তোষজনক হয় নাই এবং বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী বজায় থাকিতে তাহা হওয়া সম্ভবপরও নয়।

বাঙলার বিপদ—

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। এই অধিবেশনে মন্ত্রীরা নিজেরাই ১২টি আইনের খসড়া উপস্থিত করিতেছেন। এইগুলির মধ্যে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিধি সংশোধন বিল, বঙ্গীয় কৃষক-খাদ সংশোধন বিল, বাঙলার রেকর্ড বিল, এই কয়েকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এক একটি সরকারী বিল হক-মন্ত্রিমণ্ডলের এক একটি বিজয়-স্তম্ভ। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিধি সংশোধন বিলের স্বরূপ কেমন আমরা ইতিপূর্ব্বেই সে পরিচয় কিছু দিয়াছি। কলিকাতার জনপ্রিয় মেয়র জ্যাকেরিয়া সাহেব এই বিলের স্বরূপ কি ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইয়াছেন। দেখাইয়াছেন সুরেন্দ্রনাথের জীবনের সাধনাকে, গণতান্ত্রিকতার মূল সূত্রকে হক-সরকার এই বিলের দ্বারা ধ্বংস করিয়া কেমনভাবে দেশের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। সহযোগী 'কৃষক' এই

বিলের স্বরূপ বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, কলিকাতা কর্পোরেশন হইতে বাঙালী মুসলমানদিগকে তাড়াইয়া বিদেশী মুসলমানদিগের প্রাধান্যের প্রতিষ্ঠার ইচ্ছাই ইহার মূলে। বাঙলার প্রগতিশীল মুসলমান সঙ্ঘ, যে সঙ্ঘের নেতা শ্রদ্ধেয় মৌলবী আব্দুল করিম, সে সঙ্ঘও এই বিলের বিরুদ্ধতা করিবেন এই সঙ্কল্প করিয়াছেন। মৌলবী নৌসের আলীর সভাপতিত্বে এই আন্দোলন চালাইবার জন্য সভা করা হইতেছে। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, এই বিলের ফলে কলিকাতা শহরে বাঙালীর কর্ত্তৃত্ব ধ্বংস হইবে। বাঙালী বহু কারণে ইতিমধ্যেই নিজ বাসভূমে পরবাসী ত হইয়াছেই, এই বিলে তাহাদের অসহায়ত্বকে আরও বাড়াইয়া তুলিবে। সরকারী রেকর্ড বিলের স্বরূপ ত অনেকেই বুঝিয়া লইয়াছেন। হক-মন্ত্রিমণ্ডল সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বলিয়া কোন জিনিষ বাঙলায় বজায় রাখিবেন না এ বিষয়ে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। পাকা ব্যবস্থা কাঁচা ব্যবস্থা বিশেষ অবিশেষ সবিশেষে সংবাদপত্রের উপর দমননীতি ত চলিতেছে। এখন উদ্দেশ্য হইল, সংবাদপত্রগুলো যাহাতে তাহাদের রুচি-মর্জ্জির একেবারে অধীন হইয়া গোলামগিরি করিতে বাধ্য হয়, তাহাই করা। আমরা জিজ্ঞাসা করি, বিবেক বলিয়া কোন পদার্থ যাঁহাদের মধ্যে আছে, তাঁহারা কি এ-সব বরদাস্ত করিতে পারিবেন? বাঙলার এমন দুর্দ্দিন আর আসে নাই। দেশের এই আসন্ন দুর্দ্দিনে দেশের স্বার্থ, জাতির স্বার্থ—বাঙালীর স্বার্থের প্রতি—ক্ষুদ্র হীন স্বার্থের তাড়নায় যাহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিবে, দেশবাসী কিছুতেই তাহাদিগকে ক্ষমা করিতে পারিবে না।

যুক্তরাষ্ট্র-প্রণালীর দালালী—

লর্ড লোথিয়ান জানুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে মহাত্মাজীর নিকট একখানা চিঠি লিখেন। এই চিঠিতে তিনি এই কথা বলিতে চাহিয়াছেন যে, জগতের বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি একটা সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত অহিংস নীতি বিশ্বজগতের রাজনীতিক সমস্যাসমূহ সমাধানের পক্ষে কার্য্যকর হইতে পারে না। প্রসঙ্গটা এইভাবে তুলিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ভারতে যুক্তরাষ্ট্র-প্রণালীর প্রবর্ত্তনে ব্রিটিশের পরিকল্পনার জন্য ওকালতি করা হইয়াছে। মহাত্মাজী অল্পের মধ্যে যে সোজা জবাবটি দিয়াছেন, তাহাতে লর্ড মহোদয়ের মনের কোণের সকল খেদ মিটিয়া যাইবে বলিয়াই আমরা মনে করি। তাঁহার কথা হইল এই যে, জগতের বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি যদি আগে নিজেরা মনেপ্রাণে অহিংস হয়, অর্থাৎ পরের স্বার্থ শোষণ করিবার প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করে, তবে তখনই সত্যকার রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠন সম্ভব হইতে পারে। তেমন সঙ্ঘ গঠন করিতে গেলে ছোট বড় সকল রাষ্ট্রের সমান অধিকার স্বীকার করিয়া লইতে হইবে—সর্দ্দারীর ভাব ছাড়িতে হইবে। এই যুক্তির ভিতর দিয়াই মহাত্মাজী ভারতের যুক্তরাষ্ট্র-প্রণালীর ভিতরকার প্রশ্নটিরও উত্তর দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যুক্তরাষ্ট্র-বিধানে নিজেদের রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণে ভারতবাসীদের অধিকার স্বীকৃত হয় নাই, উহা জোর করিয়া বাহির হইতে চাপান হইতেছে। দেশের লোকের দ্বারা গঠিত শাসন-তন্ত্রকে তৎপরিবর্ত্তে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। ব্রিটিশের পরিকল্পিত যুক্তরাষ্ট্র প্রণালীর ভিতর দিয়া যত রকম বৈষম্য এবং বিরোধকে এক সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যযুগীয় স্বৈরাচারকে এই রাষ্ট্রতন্ত্রে গণ-তান্ত্রিকতার আদর্শের সঙ্গে খাপ খাওয়াইবার একটা ভড়ং দেখান হইয়াছে। মহাত্মাজী বলেন, এই সব দেশীয় রাজ্য-গুলির শাসন ব্যাপারের ভিতর যে কত গলদ তাহা ক্রমেই স্পষ্ট হইতেছে। যে মনোবৃত্তি লইয়া এই যুক্তরাষ্ট্র-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করা হইতেছে—তাহা নিশ্চয়ই গণতান্ত্রিক প্রবৃত্তি নয়। মহাত্মাজী বলেন, এই সব দিক হইতে তাঁহার মতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পরিকল্পিত যুক্তরাষ্ট্র প্রণালী কিছুতেই সমর্থন করা যাইতে পারে না। আমরা আশা করি, লর্ড লোথিয়ান মহাত্মাজীর উত্তরের তাৎপর্য্যটি উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

ভারতে নাহাস পাশা—

মিশরের ওয়াফদ দলের নেতা মুস্তাফা নাহাস পাশা এবং তাঁহার কর্ম্মীরা কয়েকজন আগামী ভারতীয় কংগ্রেসে উপস্থিত থাকিবার জন্য আমন্ত্রিত হন। তাঁহারা আনন্দের সহিত এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন। নাহাস পাশা সম্প্রতি কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারীর নিকট লিখিয়াছেন—'যদি আকস্মিক কোনও রাজনৈতিক কারণে আমাকে দেশে আটক পড়িতে না হয়, তাহা হইলে মিশরবাসীর পক্ষ হইতে মৈত্রীর বাণী বহন করিয়া যে প্রতিনিধি দল ভারতে যাইতেছেন, আমি তাঁহাদের নেতা হইবার আনন্দ ও সৌভাগ্য লাভ করিব।' এদেশের লীগওয়ালারা কেহ কেহ রটাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন যে, কংগ্রেস হিন্দু প্রতিষ্ঠান, সুতরাং নাহাস পাশার ন্যায় একজন বিশ্বজগতে সুপ্রতিষ্ঠ মুসলমান জননায়ক, সে প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন না। তিনি কংগ্রেসে উপস্থিত থাকিবেন, এ সব কথা নিতান্তই ভুয়া। আমরা জিজ্ঞাসা করি, স্বয়ং নাহাস পাশার এই চিঠি প্রকাশ হইবার পর, তাঁহারা কি বলিবেন? নাহাস পাশা মুসলমান নেতা, তিনি প্রকৃতপক্ষে নেতা, স্বদেশের জন্য তাঁহার ত্যাগ, তপস্যা এ সব কথা না তুলিয়াও বলা যায়, বিশ্বের মুসলমান সমাজের দিক হইতেও তিনি প্রকৃতপক্ষে বড় নেতা। সাম্রাজ্যবাদীদের প্রভাবে পীড়িত মুসলমানের জন্য বেদনা আছে সত্যকার তাঁহার বুকে, তাই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতীক স্বরূপ যে প্রতিষ্ঠান, সেই কংগ্রেসের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি থাকিবেই; সুতরাং লীগওয়ালাদের মতিগতির সঙ্গে তাঁহার অমিল হইবেই, কারণ লীগওয়ালাদের আন্তরিকতা স্বাধীনতার জন্য সিকি পয়সারও ত নাই-ই, মুসলমান সমাজের স্বার্থের দিকেও নাই। লীগ-ওয়ালারা সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থের তুষ্টিপুষ্টি করিতেছেন, আর নাহাসের জীবনের মূলমন্ত্র হইল সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সংগ্রাম।

মানবীয় ঐক্যের আদর্শ

শ্রীঅরবিন্দ

ইউরোপীয় জাতিগুলি তাহাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছে প্রাচীন রোমান প্রণালী অনুযায়ী সামরিক বিজয় ও উপনিবেশ স্থাপনের দ্বারা। রোমানদের পূর্ব্বে যে-সকল অধিরাজ্য বা সার্ব্বভৌমত্বের নীতি আসিরীয় ও মিশরীয় রাজগণের দ্বারা, ভারতীয় রাজ্যসকল এবং গ্রীক নগরসমূহের দ্বারা কার্য্যতঃ অনুসৃত হইয়াছিল, উহারা সেই নীতি অধিকাংশেই বর্জ্জন করিয়াছে; অথচ এই নীতিটিও প্রোটেক্টোরেট স্থাপনের ভিতর দিয়া সাধারণ উপায়ে দেশ অধিকারের পথ পরিষ্কার করিতে কখনও কখনও প্রযুক্ত হইয়াছে। উপনিবেশগুলি রোমান ধরণের নহে, পরন্তু কার্থেজিয়ান ও রোমান পদ্ধতির মিশ্রণ, তাহারা আমলাতান্ত্রিক ও সামরিক এবং রোমান উপনিবেশের ন্যায় তাহারা দেশীয় জনসাধারণ অপেক্ষা উচ্চতর নাগরিক অধিকার ভোগ করে, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা তদার আরও বেশী হইতেছে শোষণমূলক বাণিজ্য-সংক্রান্ত উপনিবেশ। রোমান ধরণের নিকটতম দৃষ্টান্ত হইতেছে আলষ্টারে ইংরেজদের উপনিবেশ; আর পোলাণ্ডে জার্ম্মানেরা আধুনিক অবস্থানিচয়ের মধ্যে প্রাচীন রোমান বেদখলের নীতির বিকাশ করিয়াছে। কিন্তু এইগুলি হইতেছে ব্যতিক্রম।

বিজিত দেশটি একবার অধিকৃত ও আয়ত্তাধীন হইবার পর আধুনিক জাতি সকলকে একটি বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, রোমানগণ সে বাধাটিকে যে ভাবে অতিক্রম করিয়াছিল, ইহারা তাহা করিতে সক্ষম হয় নাই,—সে বাধাটি হইতেছে দেশীয় কৃষ্টিকে এবং সেই সঙ্গে দেশীয় আধিকারিকে নির্ম্মূল করিবার সমস্যা। এই সকল সাম্রাজ্যই প্রথমে ভিতরে ভিতরে এই উদ্দেশ্য লইয়া অগ্রসর হইয়াছে যে, তাহাদের পতাকার সহিত তাহাদের কৃষ্টিকেও চাপাইয়া দিবে; প্রথমে সেটা ছিল কেবল বিজেতার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এবং রাজনৈতিক আধিপত্যের একটি অঙ্গ ও তাহার স্থায়িত্বের একটা ভিত্তি, কিন্তু পরে জ্ঞাতসারে তাহারা যে উদ্দেশ্য লইয়া ইহা করিতে অগ্রসর হইয়াছে সেইটিকে ধর্ম্মধ্বজীর ভাষায় কখন কখনও বলা হয়, "অপকৃষ্ট" জাতি সকলকে সভ্যতার সুখ-সুবিধা আনিয়া দেওয়া। এই প্রয়াস যে কোথাও খুব কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছে তাহা বলিতে পারা যায় না। এই প্রয়াস খুবই সম্পূর্ণতা ও নির্ম্মমতার সহিত করা হইয়াছিল আয়র্লণ্ডে, কিন্তু যদিও আইরিশ ভাষাকে কনটের জঙ্গল ভিন্ন অন্য সকল স্থান হইতে দূর করা হইয়াছিল এবং প্রাচীন আইরিশ কৃষ্টির সকল বিশিষ্ট লক্ষণ অদৃশ্য হইয়াছিল তথাপি বিধ্বস্ত জাতীয়তাটি বৈশিষ্ট্যের যে-কোন অন্য উপায় পাইয়াছিল তাহা যতই স্বল্প হউক, তাহার ক্যাথলিক ধর্ম্ম, তাহার কেল্‌টিক জাতি ও আধিজাত্য, সেইটিকেই সে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল, আর যখন সে ইংরেজ ভাবাপন্ন হইয়া পড়িল তখনও ইংরেজ হইয়া উঠিতে অস্বীকার করিয়াছিল। চাপটি সরিয়া যাওয়ার পরিণাম হইয়াছে ভীষণ প্রতিক্রিয়া, গেলিক ভাষাকে পুনরুজ্জীবিত করিবার, প্রাচীন কেল্‌টিক মনকে এবং কেল্‌টিক কৃষ্টিকে পুনর্গঠিত করিবার প্রয়াস। জার্ম্মানিরা পোলাণ্ডকে, এমন কি যে আল্‌সাসিয়ানগণ তাহাদের কুটুম্ব এবং তাহাদেরই ভাষাতে কথা কয়, তাহাদিগকেও প্রুসিয়ান-ভাবাপন্ন করিয়া তুলিতে অসমর্থ হইয়াছে; রুশিয়াতে ফিন্ জাতি অদম্যভাবেই ফিনিশ রহিয়া গিয়াছে। অষ্ট্রিয়ানদের নম্র পদ্ধতি অষ্ট্রিয়ান পোলকে জার্ম্মান পোজেনে তাহার অত্যাচারিত ভ্রাতার ন্যায়ই পোলীয় রাখিয়া দিয়াছে। অতএব আমরা কেবল কঠোর ও শিখিতে অতৎপর প্রুসিয়ান মন ছাড়া সর্ব্বত্রই বেশী বেশী এই উপলব্ধি দেখিতে পাইতেছি যে, ঐ প্রয়াস বৃথা, বিজিত জাতির আত্মাকে মুক্ত রাখাই আবশ্যক, অধিপতি রাষ্ট্রের কাজ কেবল নূতন শাসনতন্ত্রের ব্যবস্থা এবং অর্থনীতিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করাতেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত, তাহার সহিত কেবল ততটুকু সামাজিক সংস্কার করা চলিতে পারে যাহা স্বচ্ছন্দে গৃহীত হয়, অথবা শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার শক্তিতে আপনিই সংসাধিত হয়।

নূতন ও বহুদর্শিতাহীন জাতি জার্ম্মানী বস্তুত প্রাচীন রোমান সমীকরণের নীতিটিকে ধরিয়া রাখিয়াছে এবং সেইটিকে রোমান ও অ-রোমান প্রণালীতে প্রয়োগ করিতে চাহিতেছে। এমন কি সে প্রাচীন গীজারগণকেও অতিক্রম করিয়া কানানের ইহুদী এবং পূর্ব্ব বৃটেনের স্যাক্সনদের পদ্ধতি, হত্যাকাণ্ড ও বিতাড়নের পদ্ধতিতে ফিরিয়া যাইবার প্রবৃত্তি দেখাইতেছে। অথচ বস্তুত আধুনিক ভাবাপন্ন হওয়ার এবং অর্থনৈতিক প্রয়োজন ও সুবিধা সম্বন্ধে বোধ থাকার সে ঐ নীতিকে সম্পূর্ণভাবে কিম্বা শান্তির সময়ে সত্য সত্যই কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেছে না। তথাপি সে প্রাচীন রোমান পদ্ধতির উপরেই ঝোঁক দিতেছে, দেশীয় ভাষা ও কৃষ্টির পরিবর্ত্তে জার্ম্মান ভাষা ও কৃষ্টি চাপাইয়া দিতে চাহিতেছে, আর সে ইহা নিরুপদ্রবে করিতে সমর্থ নহে বলিয়া বলপ্রয়োগের দ্বারাই করিতে চাহিতেছে। এই প্রয়াসের ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী; ইহার লক্ষ্য যে চৈতন্যমূলক ঐক্য তাহা সংঘটিত না করিয়া ইহা কেবল আধিজাত্যের ভাবটিকেই প্রবল করিয়া তোলে এবং এক দৃঢ়মূল ও অদম্য বিদ্বেষের সৃষ্টি করে, তাহা সাম্রাজ্যটির পক্ষে বিপজ্জনক এবং বস্তুত উহাকে ধ্বংস পর্য্যন্ত করিতে পারে, যদি বিরোধী অংশগুলি সংখ্যায় অতি ক্ষুদ্র এবং শক্তিতে দুর্ব্বল না হয়। আর ইউরোপে যেখানে বৈষম্যগুলি হইতেছে কেবল এক সাধারণ জাতিরূপেরই বৈচিত্র্য এবং যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলি এত ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল, সেখানেই যদি অসমধর্ম্মী কৃষ্টিগুলিকে লুপ্ত করিয়া দেওয়া অসম্ভব হয়, তাহা হইলে বহু শতাব্দী ধরিয়া এক প্রাচীন ও সুগঠিত জাতীয় কৃষ্টিতে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে, এইরূপ এশিয়া ও আফ্রিকার বিরাট জনসমূহকে লইয়া যে-সকল সাম্রাজ্যকে ব্যবহার করিতে হয়, তাহাদের ত কথাই নাই। যদি চৈতন্যমূলক ঐক্য সৃষ্টি করিতে হয়, তাহা হইলে অন্য উপায় দেখিতেই হইবে।

অবশ্য বিভিন্ন কৃষ্টি সকলের পরস্পরের উপর সংঘাত এখনও বন্ধ হয় নাই, বরঞ্চ আধুনিক জগতের পারিপার্শ্বিক অবস্থায় উহা প্রবলই হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু ঐ সংঘাতের,

স্বরূপ, যে-সকল লক্ষ্যের দিকে উহা অগ্রসর হইয়াছে, এবং যে-সকল উপায়ের দ্বারা ঐসব লক্ষ্য সর্ব্বাপেক্ষা সাফল্যের সহিত সাধিত হইতে পারে—এই সকলের গভীর পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। পৃথিবী আজ সমগ্র মানব-জাতির জন্য এমন এক সাধারণ উদার নমনীয় সভ্যতা প্রসব করিবার প্রয়াস করিতেছে—যাহার মধ্যে প্রত্যেক আধুনিক ও প্রাচীন কৃষ্টি আপন আপন অবদান লইয়া আসিবে এবং প্রত্যেক সুস্পষ্ট মানবীয় সমুচ্চয়ই তাহাতে প্রয়োজনীয় বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিবে। এই লক্ষ্যকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে কিছু জীবন-সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী; প্রকৃতি মানব-জাতির মধ্যে যে-সকল প্রবৃত্তির বিকাশ করিতেছে—কেবল সাময়িক প্রবৃত্তি নহে, পরন্তু, অতীতের যে-সব প্রবৃত্তি পুনরুজ্জীবিত হইতে চাহিতেছে এবং ভবিষ্যতের যে-সব প্রবৃত্তি এখনও স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই—যাহাদের দ্বারা সেই সকল প্রবৃত্তির সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য হইবে, তাহারাই ঐ সংগ্রামে উদ্বর্ত্তনের জন্য যোগ্যতম হইবে। আর অগম্যতার প্রচেষ্টা সকলের নিগূঢ় অর্থ-প্রকটনের জন্য এবং সামঞ্জস্য ও সমন্বয়ের জন্য যে-সকল মুক্তি-সাধক ও মিলন-সাধক শক্তি কার্য্য করিতেছে, যাহারা সেই সকলকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য করিবে, তাহারাও উদ্বর্ত্তনের জন্য যোগ্যতম হইবে। কিন্তু এই সংগ্রামের কৃতকার্য্যতায় সামরিক উপদ্রব বা রাজনৈতিক চাপ নিকৃষ্টভাবে সাহায্য করে, উৎকৃষ্টভাবে নহে। জার্ম্মান কৃষ্টি ভালর জন্যই হউক আর মন্দের জন্যই হউক জগৎ জুড়িয়া দ্রুত বিস্তারলাভ করিতেছিল, যতক্ষণ না জার্ম্মানীর শাসকদের দুর্ব্বুদ্ধি হইল সশস্ত্র উপদ্রবের দ্বারা বিরোধী আদর্শ-সকলের সুপ্ত শক্তিকে জাগাইয়া তুলিতে; আর এখনও উহার মধ্যে যেটি মূল বস্তু, রাষ্ট্রবাদ এবং রাষ্ট্রের দ্বারাই সমাজ-জীবনের নিয়ন্ত্রণ, যাহা জার্ম্মান সাম্রাজ্যবাদ এবং জার্ম্মান সমাজতন্ত্রবাদ উভয়েরই সাধারণ লক্ষণ—সেইটি বর্ত্তমান যুদ্ধে জার্ম্মান সাম্রাজ্যবাদের বিজয় অপেক্ষা পরাজয়ের দ্বারাই সাফল্য লাভ করিবে, ইহাই অনেক বেশী সম্ভব।

জগতের প্রবৃত্তিগুলির গতি ও অভিমুখীনতায় এই পরিবর্ত্তনে এক আদান-প্রদান ও সামঞ্জস্যের নীতির এবং বহু জিনিসের সংঘাত হইতে এক নবজন্ম আবির্ভাবের সম্ভাবনা সূচিত হইতেছে। যে-সকল সামাজিক সমুচ্চয় এই নূতন নীতিকে মানিয়া লইবে এবং তদনুযায়ী তাহাদের সংবিধানকে গড়িয়া তুলিবে, কেবল সেইগুলিরই কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা। অবশ্য বিপরীত প্রকারের বিজয় এখনই লব্ধ হইতে পারে, কিন্তু ইতিহাস পুনঃপুনঃ প্রমাণ করিয়াছে যে, এইরূপ সামরিক সাফল্যের দ্বারা জাতির ভবিষ্যৎ চিরদিনের জন্য নষ্ট হইয়া যায়। যাতায়াত ও খবরা-খবরের সুবিধাবৃদ্ধি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তারের ফলে, নূতন নীতিটি ইতিমধ্যেই গৃহীত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল; বৈচিত্র্যের মূল্য ও উপযোগিতা স্বীকৃত হইতেছিল এবং কোন কৃষ্টির পক্ষে নিজেকে জোর করিয়া প্রতিষ্ঠা করিবার এবং অন্য সকলকে পিষ্ট করিয়া ধ্বংস করিবার প্রাচীন উদ্ধত দাবীগুলি তাহাদের শক্তি ও আত্মবিশ্বাস হারাইতেছিল, এমন সময়ে সেই প্রাচীন জরাজীর্ণ মতটি বিনাশের পূর্ব্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবার শেষ প্রয়াস করিতে জার্ম্মানীর তরবারিতে সজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান হইল। ইহার একমাত্র ফল হইয়াছে এই যে, সে যে সত্যকে অস্বীকার করিতে চাহিয়াছিল, সেইটিকেই অধিকতর শক্তি এবং সুস্পষ্ট সমর্থন দেওয়া হইয়াছে। ইউরোপীয় পরিবারের মধ্যে বেলজিয়াম ও সার্ব্বিয়ার ন্যায় ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্রগুলিরও কৃষ্টিগত বিশিষ্ট সত্তার উপযোগিতা প্রায় ধর্ম্মবিশ্বাসের মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে, এশিয়ার কৃষ্টি-সকলের গুণ গ্রহণ ইতিপূর্ব্বে কেবল চিন্তাশীল ব্যক্তি, পণ্ডিত এবং শিল্পিগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, এখন যুদ্ধক্ষেত্রে সহযোগিতার ফলে তাহা সাধারণের মনের মধ্যে স্থান পাইয়াছে; জাতি-সকলের মধ্যে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট ভেদ আছে এই সিদ্ধান্ত,—এবং নিজের কৃষ্টির সহিত সাদৃশ্যের হিসাব করিয়া সেই উৎকর্ষ অপকর্ষের নির্দ্ধারণ—ইহা যে আঘাত পাইয়াছে, তাহাতেই ইহার শেষ হইবে বলিয়া মনে হয়। মানব-জাতির সচেতন মানস সত্তার মধ্যে এক নববিধানের বীজ দ্রুত উপ্ত হইতেছে।

কৃষ্টির সংঘাতের যে নূতন ধারা তাহা স্পষ্টতমভাবে দেখা দিয়াছে, যেখানে ইউরোপীয় ও এশিয়াটিক্ কৃষ্টির সংস্পর্শ হইয়াছে। উত্তর আফ্রিকায় ফরাসী কৃষ্টি, ভারতে ইংরেজ কৃষ্টি এশিয়াটিক্ কৃষ্টির সম্মুখীন হইয়া আর স্বতন্ত্র ফরাসী বা ইংরেজ কৃষ্টি থাকে না, পরন্তু তৎক্ষণাৎ এক সাধারণ ইউরোপীয় সভ্যতা হইয়া পড়ে; উহা আর সাম্রাজ্যিক আধিপত্যের পক্ষে সমীকরণের দ্বারা নিজেকে নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস থাকে না, উহা হয় মহাদেশের সহিত মহাদেশের বুঝাপড়া। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যটি তুচ্ছ হইয়া পড়ে; তাহার স্থান গ্রহণ করে জাগতিক প্রয়োজনের প্রেরণা। আর এই সম্মুখীনতার আত্ম-প্রত্যয়ী ইউরোপীয় সভ্যতা অর্দ্ধ-সভ্য এশিয়াবাসীকে জ্ঞানের আলোক ও সুখ-সুবিধা দিতে চাহিতেছে এবং এশিয়াবাসী কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিতেছে, এইরূপটি আর থাকিতেছে না। এমন কি, গ্রহণশীল জাপানও তাহার গ্রহণ করিবার প্রথম উৎসাহ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে এবং অন্য সর্ব্বত্রই ইউরোপীয় স্রোতটি এক আভ্যন্তরীণ বাণী ও শক্তির দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা তাহার বিজয়ী বেগকে প্রতিহত করিয়াছে। প্রাচ্য কিছু সন্দেহ ও কুণ্ঠা সত্ত্বেও মোটের উপর আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার প্রকৃত মূল্যবান অংশগুলি গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক, আর যেখানে সম্পূর্ণ ইচ্ছুক নহে, সেখানেও পারি-পার্শ্বিক অবস্থানিচয়ের দ্বারা এবং মানব-জাতির সাধারণ প্রবণতার দ্বারা বাধ্য,—সে অংশগুলি হইতেছে তাহার বিজ্ঞান, অনুসন্ধিৎসা, সর্ব্বজনীন শিক্ষা ও উন্নতির আদর্শ, বিশেষ শ্রেণীগত অধিকার ও সুযোগ সকলের বিলোপ সাধন, তাহার উদারনৈতিক গণতন্ত্রমুখী প্রবৃত্তি, তাহার স্বাধীনতা ও সাম্যের সহজ প্রেরণা, বাতাস ও স্থান ও আলোর জন্য সমস্ত সংকীর্ণ ও অত্যাচারমূলক অনুষ্ঠানকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবার আহ্বান। কিন্তু একটা বিশেষ স্থানে আসিয়া প্রাচ্য আর অধিক দূরে অগ্রসর হইতে চাহে না, আর তাহা হইতেছে ঠিক

সেই সকল বিষয়ে যে-গুলি গভীরতম, মানব-জাতির ভবিষ্যতের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়, সে-সব হইতেছে আত্মার সামগ্রী, মন ও প্রকৃতির নিগূঢ়তম জিনিস। এখানেও আবার সকল দিক হইতেই সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে বিজয়ের নহে, একটিকে সরাইয়া তাহার স্থলে আর একটির প্রতিষ্ঠার নহে, পরন্তু, পরস্পরের মধ্যে বুঝাপড়া ও বিনিময়ের, পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্য সাধন ও নবগঠনের।

প্রাচীন প্রবৃত্তিটি এখনও সম্পূর্ণভাবে মরে নাই। এখনও এমন লোক আছে, যাহারা স্বপ্ন দেখিতেছে, ভারত খৃষ্টান হইবে, ইংরেজী ভাষা দেশীয় ভাষাগুলির স্থান গ্রহণ করিতে না পারিলেও চিরস্থায়ী প্রাধান্য লাভ করিবে, ইউরোপীয় সামাজিক রীতি-নীতি অবলম্বিত হইবে, কেবল তাহা হইলেই এশিয়াবাসী ইউরোপীয়গণের সমান পদমর্য্যাদা লাভ করিতে পারিবে। কিন্তু ইহারা হইতেছে মনে-প্রাণে বিগত যুগের লোক, বর্ত্তমান কালের যে-সব লক্ষণ এক নব যুগের সূচনা করিতেছে, সে-সবের মূল্য নির্দ্ধারণ করিবার শক্তি ইহাদের নাই।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, খৃষ্টান ধর্ম্ম কৃতকার্য্য হইয়াছে কেবল সেই ক্ষেত্রে, যেখানে সে তাহার যে দুই-একটি উৎকৃষ্ট বিশেষত্ব আছে, সেইগুলি প্রয়োগ করিতে পারিয়াছে, জাতিভেদের গণ্ডিতে আবদ্ধ হিন্দু পতিত ও উৎপীড়িত লোককে স্পর্শ বা সাহায্য করে নাই, খৃষ্টান ধর্ম্ম নীতি স্বীকার করিয়া তাহাদিগকে উত্তোলিত করিবার আগ্রহ দেখাইয়াছে, যেখানে দুঃখ প্রশমন আবশ্যক, সেখানে সে অধিকতর ক্ষিপ্রতা দেখাইয়াছে। এককথায় তাহার উৎকর্ষ হইতেছে, কর্ম্মশীল করুণা এবং সাহায্যদান প্রবৃত্তি, এইটি সে তাহার জনকস্থানীয় বৌদ্ধ-ধর্ম্মের নিকট হইতেই লাভ করিয়াছিল; যেখানে সে এই বিশেষত্বটি প্রয়োগ করিতে পারে নাই, সেখানে সে সম্পূর্ণভাবেই অকৃতকার্য্য হইয়াছে; আর এই বিশেষত্বটিও সে সহজেই হারাইতে পারে, কারণ ভারতের আত্মা নূতন সংঘাতে পুন জাগ্রত হইয়া তাহার হৃত প্রবৃত্তিগুলি পুনরুদ্ধার করিতে আরম্ভ করিতেছে। অতীতের সামাজিক প্রথাগুলি যেখানে নূতন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা আদর্শের উপযোগী হইতেছে না, অথবা স্বাধীনতা ও সাম্যের দিকে ক্রমবর্দ্ধমান প্রবৃত্তির সহিত খাপ খাইতেছে না, সেখানেই তাহারা পরিবর্ত্তিত হইতেছে; কিন্তু প্রসারিত ও সঙ্কীর্ণতা-মুক্ত এক নূতন এশিয়াটিক সমাজ ছাড়া অন্য কিছুর যে উদ্ভব হইবে, তাহার কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। সর্ব্বত্র লক্ষণগুলি একই রকমের; সর্ব্বত্র শক্তিগুলি একই অর্থে কার্য্য করিতেছে। কি ফ্রান্স, কি ইংলণ্ড কাহারও সামর্থ্য নাই (আর তাহাদের সে ইচ্ছাও কমিয়া যাইতেছে) যে, আফ্রিকায় ইসলামীয় কৃষ্টিকে কিম্বা ভারতে ভারতীয় কৃষ্টিকে নষ্ট করিয়া দিবে, অথবা তাহার স্থলে অন্য কিছুর প্রতিষ্ঠা করিবে। তাহারা তাহাদের মধ্যে মূল্যবান যাহা কিছু আছে, শুধু তাহাই প্রাচীনতর জাতিগুলির প্রয়োজন অনুসারে এবং তাহাদের আভ্যন্তরীণ সত্তার ধর্ম্ম অনুসারে অঙ্গীভূত হইবার জন্য প্রদান করিতে পারে।

আমাদিগকে এই প্রশ্নটির আলোচনা করিতে হইল, কারণ সাম্রাজ্যবাদের ভবিষ্যতের পক্ষে এইটি বিশেষ প্রয়োজনীয়। স্থানীয় কৃষ্টির স্থলে সাম্রাজিক কৃষ্টির স্থাপন এবং যতদূর সম্ভব বিজেতার ভাষাও স্থাপন—এইটি ছিল প্রাচীন সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে মূলত প্রয়োজনীয়। আর যে মুহূর্ত্তে ইহা একেবারেই অসম্ভব হইয়া পড়িল, এমন কি, ঐরূপ সঙ্কল্পও বৃথা বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইল, তখনই সমস্যাটির সমাধানে রোমান সাম্রাজ্যের মডেল বা আদর্শ আর কোন কাজেরই রহিল না। রোমান অভিজ্ঞতার কিয়দংশ বলবৎ রহিয়াছে, বিশেষত সেই সব বিশেষত্বগুলি যে-গুলি সাম্রাজ্যবাদের মূল ঐক্যের জন্য এবং সাম্রাজ্যের সার্থকতার জন্য অপরিহার্য্য, কিন্তু নূতন মডেল (model) আবশ্যক। সেই নূতন মডেল আধুনিক যুগের প্রয়োজনানুযায়ী ইতি-মধ্যে গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ হইয়াছে; তাহা হইতেছে সংহতি সাম্রাজ্যের মডেল (Federal Empire)। অতএব আমাদিগকে যে সমস্যা বিবেচনা করিতে হইবে, তাহা সংক্ষেপে এইরূপ দাঁড়াইতেছে, বিরাট আয়তনবিশিষ্ট এবং অসম-ধর্ম্মী জাতি ও কৃষ্টি সকলকে লইয়া গঠিত সংহতি সাম্রাজ্য গড়িয়া তোলা কি সম্ভব? আর যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, ভবিষ্যৎ এই পথ ধরিয়াই অগ্রসর হইবে, এমন একটি সাম্রাজ্য, যাহা দৃশ্যত এইরূপ কৃত্রিম, ইহাকে কেমন করিয়া স্বাভাবিক এবং চৈতন্যমূলক ঐক্যে রূপান্তরিত করা যাইবে?* (ক্রমশ)

* শ্রীঅনিলবরণ রায় কর্ত্তৃক অনূদিত।

দেশের কথা

পশম বা পশুলোম

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

হিসাবমত ধরিতে গেলে পশমের স্থান প্রাণিজাত দ্রব্যাদির তালিকায় হওয়া উচিত; রেশমের পক্ষেও সেই কথাই প্রযোজ্য। কিন্তু রপ্তানি দ্রব্যের সরকারী পণ্য-তালিকায় সকল প্রকার তন্তুরই একস্থানে উল্লেখ আছে এবং সাধারণ পাঠকের পক্ষে বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়া পশম সম্বন্ধে এইস্থানে আলোচনা করা গেল।

পশমের বস্ত্র শাস্ত্রমতে অত্যন্ত শুচি। সাধারণত যে সকল স্থলে পবিত্রতা রক্ষার জন্য বস্ত্র পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন, সে সকল স্থলে পশমজাত বস্ত্র হইলে আর অন্য কোনও উপায় দ্বারা নূতন করিয়া শুচিতা আচরণের প্রয়োজন হয় না।

ভারতবর্ষে লোকে তুলার বস্ত্রের সহিত বা তৎপূর্ব্বেও পশমের বস্ত্রের ব্যবহার জানিত। ব্রহ্মার আদি সৃষ্টির কয়েকটি বস্তুর মধ্যে পশমের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইউরোপ বা শীতপ্রধান অন্যান্য দেশে তুলার বিষয় তিনশত বৎসরের পূর্ব্বে কেহই জানিত না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তথায় পশমের পোষাকই প্রচলিত ছিল।

ভারতবর্ষের মধ্যে পঞ্চনদ, সীমান্ত প্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানই পশমের জন্য প্রসিদ্ধ। মধ্যপ্রদেশ, ভারতের পশ্চিমাংশ এবং সিন্ধু প্রদেশেও অনেক পশম পাওয়া যায়। রাজপুতানা ও মধ্যভারতের নানা অংশেও উৎকৃষ্ট পশম সংগৃহীত হইয়া থাকে। এই সকল প্রদেশের মধ্যে আবার কয়েকটি জেলার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। পঞ্চনদ ও সীমান্ত প্রদেশের মধ্যে হিসাবের স্থান প্রথম; অন্যগুলি, ফিরোজপুর, লাহোর, পেশোয়ার, ডেরাইসমাইল খাঁ, অমৃতসর, মুলতান, রাওয়ালপিণ্ডি, যুক্তপ্রদেশের মধ্যে কয়েকটি পার্ব্বত্য স্থান যথা, নৈনীতাল, আলমোড়া, গাড়োয়াল এবং সমতলক্ষেত্রের মধ্যে মির্জ্জাপুর ও আগ্রা; খান্দেশ ও দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণ পশম এবং সিন্ধু, গুজ্জর ও কাথিয়াবাড়ের শ্বেত পশম বিশেষ প্রসিদ্ধ। সিন্ধুর মধ্যে বেলুচিস্থান ও বিকানীর করদরাজ্যে বড় বাজার আছে। মধ্যপ্রদেশের ওয়ার্দ্ধা, জব্বলপুর, নাগপুর ও রায়পুর; রাজপুতানা ও মধ্যভারতের মধ্যে বিকানীর যোধপুর, জয়পুর ও আজমীর এবং দক্ষিণ ভারতের মধ্যে মহীশূর, কইম্বাটুর, বেলারী ও কর্ণৌল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিকানীরের পশম ভারতের সর্ব্বত্রই বিশেষ সমাদৃত হইয়া থাকে; বিশেষত উৎকৃষ্ট কার্পেট প্রস্তুত করিতে এই পশম সর্বাধিক উপযোগী। ফাজিলকা ও বেওয়ার, এই দুই স্থানে বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পশম ক্রয়-বিক্রয় হইয়া থাকে।

সাধারণত অনুমান করা হয়, ভারতে আট কোটি সত্তর লক্ষ পাউণ্ড পশম সংগৃহীত হয়। এখানে ভেড়ার সংখ্যার তুলনায় এই পরিমাণ নিতান্ত কম বলিয়া লোকে মনে করিয়া থাকে। অষ্ট্রেলিয়ায় প্রতি ভেড়া হইতে আট পাউণ্ড আন্দাজ লোম পাওয়া যায়; সে স্থলে ভারতের পরিমাণ ইহার এক চতুর্থাংশ মাত্র।

ভারতে এত পশম উৎপন্ন হইলেও, উত্তর-পশ্চিমের পার্ব্বত্য স্থানসমূহ হইতেও অনেক পশম রেল পশুবাহনে ভারতে প্রবেশলাভ করে। ইহাদের মধ্যে আফগানিস্থান, তিব্বত ও নেপালের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কোয়েটা, শিকারপুর, অমৃতসর, মুলতান প্রভৃতি স্থানে এই সকল পশমের বাজার বসে অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয় হইয়া থাকে। তিব্বতের পশম কালিম্পং ও টঙ্কাপুরেই বিক্রীত হয়।

প্রকৃতপক্ষে পঞ্চনদই ভারতের পশমের ক্রয়-বিক্রয়ের প্রধান কেন্দ্র এবং সেই কারণেই এইস্থানে বিশেষভাবে পশমের শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। এত কাঁচা মাল ভারতের আর কোথাও পাওয়া যায় না। লুধিয়ানা, গুরুদাসপুর, শিয়ালকোট, লাহোর, অমৃতসর প্রভৃতি স্থানে শাল, লোহি, জামিয়ার, পট্টু, কার্পেট প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। যুক্তপ্রদেশেও নানারূপ গরম কাপড়ের সহিত ভাল কার্পেট তৈয়ারী হয়।

কাশ্মীর সূক্ষ্ম এবং মূল্যবান শালের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। বর্ত্তমানে ঐস্থানের আর সে সুনাম নাই। কলে প্রস্তুত শাল আসিয়া শিল্পীর অনাহার ঘটাইয়াছে এবং একসময় যাহাদের নাম লোকে গর্ব্বের সহিত উচ্চারণ করিত, আজ তাহাদের বংশধর বা শিষ্যেরা হয় অনাহারে আছে, নয় চাষ করিতে মনঃসংযোগ করিয়াছে।

পৃথিবীতে যে সকল স্থানে পশম উৎপন্ন হয়, তাহার মধ্যে ভারতের স্থান মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। অষ্ট্রেলিয়া পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম। পরে আমেরিকা, আর্জ্জেণ্টাইন, নিউজীলণ্ড, দক্ষিণ আমেরিকা, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি পড়ে।

ভারতবর্ষে প্রতিবৎসর ৯ কোটি পাউণ্ড পশম সংগৃহীত হয় বলিয়া অনুমান করা হয়। ইহার মধ্যে ৩ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড বা আধাআধি, বিদেশে রপ্তানী হয়, ইহাতে আন্দাজ তিন কোটি টাকা পাওয়া যায়। ইংলণ্ড আমাদের প্রধান খরিদ্দার; মোটামুটি শতকরা সত্তর ভাগ একা সেই-ই লয়; পরে আমেরিকা বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশের স্থান।

পশম বাদে দেশ হইতে কার্পেট ও কম্বল চালান যায়; অন্য সকল প্রকার পশমজাত দ্রব্যাদি মিলিয়া ৫ লক্ষ টাকাও হয় না। কম্বল ও কার্পেটের ওজন ১ কোটি ১১ লক্ষ পাউণ্ড, ইহা ১৯৩৭-৩৮ সালে ১ কোটি ২ লক্ষ টাকায় বিক্রীত হইয়াছে; এখানেও ইংলণ্ড আমাদের প্রধান খরিদ্দার। প্রতি একশত টাকার মধ্যে পঁচাত্তর টাকার মাল ইংরেজ লইয়াছে; গত তিন বৎসর ধরিয়া এই পরিমাণ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু চলতি বৎসরের অবস্থা অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক।

এত পশম উৎপন্ন হওয়া সত্ত্বেও বহু পরিমাণ পশম বিদেশ হইতে আমদানী করা হয়; ইহার ওজন ৮২ লক্ষ পাউণ্ড এবং মূল্য কমবেশ ৪০ লক্ষ টাকা।

এই আমদানী প্রতিবৎসরই বৃদ্ধি পাইতেছে; (পরিশিষ্ট গ)। কাঁচা পশম ব্যতীত পশমজাত দ্রব্যাদির আমদানীর মূল্য প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা; তন্মধ্যে পশমী কাপড়ের মূল্য

সওয়া এক কোটি টাকা; পরিমাণ ৬৭ লক্ষ গজ বা ৩৩ লক্ষ পাউন্ড; (পরিশিষ্ট ঘ)। কাপড়ের বিক্রেতার মধ্যে জাপানের স্থান প্রথম; পরেই ইংলণ্ড। আমদানী করা পশমজাত দ্রব্যাদির মধ্যে পশম এবং অন্যান্য তন্তু মিশ্রিত দ্রব্যাদির পরিমাণ ২১ লক্ষ ৪২ হাজার পাউন্ড বা ৫১ লক্ষ টাকা। কম্বল প্রভৃতি যাহা আসে তাহার ওজন ৫২ লক্ষ পাউন্ড এবং মূল্য ৫০ লক্ষ টাকা। আমদানী করা পশমী সূতা, বুননের জন্য, তাহাও নিতান্ত কম নহে; ওজনে সওয়া ষোল লক্ষ পাউন্ড দিয়া আমাদের দেশ হইতে বৎসরে আটত্রিশ লক্ষ টাকা লইয়া যায়। এই বস্তুর আমদানী প্রতিবৎসরই বাড়িতেছে।

ভারতবর্ষে এত পশম জন্মাইলেও প্রায় ৪২ লক্ষ পাউন্ড পশম বিদেশ হইতে আমদানী করা হয়, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ইহার উপর আন্দাজ ২ কোটি ২০ লক্ষ পাউন্ড পশম তিব্বত, আফ্‌গানিস্থান, নেপাল প্রভৃতি স্থান হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়। যতপ্রকার পশম আছে, অর্থাৎ মেরিনো, ক্রশব্রেড (Crossbred) ও কার্পেটের পশম (Carpet Wool), তন্মধ্যে ভারতের পশমই নিকৃষ্ট। সুতরাং বাহির হইতে পশম আমদানী করিবার কারণ বুঝা কঠিন নহে। নানারূপে আমদানী করা পশম হইতে ৮৬ লক্ষ পাউন্ড বা ২৮ লক্ষ টাকার মাল আবার বিদেশে চলিয়া যায় (re-export); যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা দেশীয় কারখানা বা তাঁত প্রভৃতি দ্বারা রূপান্তরিত হইয়া থাকে।

যে পরিমাণ পশম এবং পশমজাত দ্রব্যাদি ভারতবর্ষে আমদানী করা হয়, তাহার পরিমাণ প্রায় সওয়া ৪ কোটি টাকা। সুতরাং এখানে এখনও পশম শিল্পীর প্রকাণ্ড বাজার পড়িয়া আছে। এত বেকার চারিদিকে, যদি কেহ সুবিধা করিতে পারেন, হয়ত পশমজাত দ্রব্যাদি তৈয়ারী করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারেন। বিশেষত বাঙলা দেশে পশমজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন করিবার কোনই কারবার বা কারখানা নাই। বাঙলায় পশম পাওয়া না যাওয়াতে এই অসুবিধা।

ব্রিটিশ ভারতে আন্দাজ পঁচিশ এবং করদরাজ্যে বারো হইতে পনেরোটি পশমের বড় মিল আছে। আরও অনেকগুলি স্বচ্ছন্দেই স্থাপিত হইতে পারে। অনুমান করা হয় এই সকল মিল হইতে বৎসরে আড়াই কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। পশমজাত দ্রব্যের ব্যবহার ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে, আশা করা যায় এদিকে লোকে ক্রমে নজর দিতে আরম্ভ করিবে।

আগামী প্রবন্ধে পশম এবং পশমের আবর্জ্জনার কি অদ্ভুত ব্যবহার আবিষ্কৃত হইয়াছে সেই বিষয়ে এবং এতৎসংক্রান্ত সমস্ত অঙ্ক তালিকা দিতে চেষ্টা করিব।

আমার কবিতা

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার নাগ বি-এ

চঞ্চল হৃদয়ের উচ্ছল কল কথা
সহজ ছন্দে গেঁথে রাখি যে!
মনের আকাশে জাগে হরষ ব্যথার মায়া
সহজ তুলির টানে আঁকি যে
গম্ভীর সাগরের উদাত্ত গীতিরব
গানে মোর খুঁজে তুমি পাবে না
চঞ্চল নির্ঝর, হালকা গানের সুর,
ছাড়া তাই, সেত কভু গাবে না!
আকাশের প্রভাতের মুসাফির পাখীটি
প্রভাতী তাহার গান গাহে যে,
বেদনার ধরা ছাড়ি দূরে নভো নীলিমায়
গানে গানে ভেসে যেতে চাহে সে।
সুনাবিড় বনানীর রহস্য-ভরা গান
পাপিয়ার কণ্ঠেতে বাজে কি?

অনন্ত আকাশের সুগভীর সে নীলিমা
কিশোরীর আঁখিতটে রাজে কি?
গভীর কাব্যকথা শুনিবারে চাহ যদি
গানে মোর খুঁজে তাহা পাবে না।
গিরিদরী বিহারী এ চঞ্চল নির্ঝর
সাগরের গান কভু গাবে না!
আমার সহজ গান ভাল যদি লাগে কারো,—
ভাল কথা;—সুখ পাব মরমে
নাই যদি লাগে ভালো কি আর করিব বল?
শুনে তাহা মরিব না সরমে!
আমার এ হৃদয়ের উচ্ছল কল কথা
সহজ ছন্দে গেঁথে চলিব,—
হৃদয়ের ব্যথা সুখ ভালবাসা কৌতুক
নিতান্ত সোজা সুরে বলিব।

বিশ্ব রাজনীতির পটে প্যালেষ্টাইন

গত সপ্তাহে একটি প্রবন্ধে বর্ত্তমান বিশ্ব-রাজনীতির গতি নির্দ্দেশের চেষ্টা করিয়াছি। বিশ্ব-রাজনীতির পটভূমিতে নিত্য দৃশ্য বদল হইতেছে। গত কয়েক দিনের মধ্যে স্পেনের বিদ্রোহী নেতা ফ্রাঙ্কো পশ্চিম ভূমধ্য-সাগরের মাইনর্কা দ্বীপ অধিকার করিয়াছে। ওদিকে পূর্ব্ব এশিয়ায় জাপানও চীনের হাইনান দ্বীপ দখল করিয়া লইয়াছে। হাইনান দ্বীপকে বলা হইতেছে প্রাচ্যের 'মাইনর্কা'। এই দুইটি দ্বীপই বিশ্ব-রাজনীতির দিক হইতে নাকি বড়ই গুরুত্বপূর্ণ! লণ্ডন নগরীতে বর্ত্তমানে আর একটি ব্যাপার ঘটিতেছে। তাহা যুদ্ধ-বিগ্রহের মত রোমাঞ্চকর নয় বলিয়া সাধারণের দৃষ্টি হয়ত ততটা আকৃষ্ট হয় নাই। তথাপি বিশ্ব-রাজনীতির দিক হইতে ইহাও কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। লণ্ডনে বৃটিশ সরকার প্যালেস্টাইন সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন।

প্যালেস্টাইনের দাঙ্গা-হাঙ্গামা আজিকার ব্যাপার নহে। গত কয়েক বৎসর যাবৎ কয়েক লক্ষ মাত্র প্যালেস্টাইনবাসী আরব বিশাল বৃটিশ-শক্তিকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। ইহার আগে যে সেখানে হাঙ্গামা হয় নাই তাহা নহে। তবে তাহা ছিল অল্প দিন স্থায়ী। এবারকার আন্দোলন বা 'বিদ্রোহ' শুধু দীর্ঘকাল স্থায়ীই হয় নাই, ইহা রীতিমত যুদ্ধে পরিণত হইয়াছে। ইহুদীরা প্যালেস্টাইনে নীত হইয়া সংখ্যাধিক্য ও প্রাধান্য লাভ করিবে ইহাতেই আরবদের আপত্তি। পূর্ব্বে পূর্ব্বে বারের হাঙ্গামা ইহুদী ও আরবদের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। এবার আরবরা ইহা বৃটিশদের বিরুদ্ধে চালাইয়াছে। কারণ তাহাদের বিশ্বাস, বৃটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য না থাকিলে ইহুদীরা প্যালেস্টাইনে গিয়া আড্ডা গাড়িতে ভরসা পাইত না।

গত তিন বৎসর যাবৎই প্যালেস্টাইনে এই সংগ্রাম চলিয়াছে। এখনকার আরবদের অবস্থা, বৃটিশ স্বার্থ, ইহুদীদের জাতীয় আবাস স্থাপনে ইংরেজের প্রতিশ্রুতি দান, প্রভৃতি নানা বিষয় আগে এই পত্রে আলোচিত হইয়াছে। হাঙ্গামা আরম্ভ হইবার পর বৃটিশ-নীতি কোন্ ধারা অবলম্বন করিয়াছে তাহাও মধ্যে মধ্যে বিবৃত করিয়াছি। পীল কমিশ্যন প্যালেস্টাইন ব্যবচ্ছেদের কি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাও আপনাদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে। আরবেরা কিন্তু ইহাতে মোটেই সন্তুষ্ট হয় নাই। এইবারে, পীল কমিশ্যন প্রকাশ হইবার পরই প্যালেস্টাইনের দাবিতে সমগ্র আরব জগতের যে সহানুভূতি রহিয়াছে তাহা প্রথম প্রকাশ পাইল। প্যালেস্টাইনের আরবগণ ছাড়া ইরাক, সৌদিআরব, ইমেন, মিশর প্রভৃতি আরব রাষ্ট্রও সরকারী-ভাবে এই কমিশ্যনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। স্থানীয় আরবদের আন্দোলন অতঃপর আরও তীব্র ও ব্যাপক হইয়া উঠে। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলিয়াছেন, প্যালেস্টাইন বৃটিশ সৈন্যে একেবারে ছাইয়া গিয়াছে। কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব পুলিশ কমিশ্যনার স্যার চার্লস টেগার্ট, যাঁহার কথা আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, বিলাতে গার্হস্থ্য সুখ উপভোগ

৬১৮ মাইল দীর্ঘ মোজাল পাইপ লাইন। ইরাকের মোজাল তৈল খনি হইতে তৈল এই পাইপ দিয়া ভূমধ্যসাগর তীরে লইয়া যাওয়া হয়। সেখান হইতে জাহাজে বৃটেনে ইহা চালান দেওয়া হয়।

করিতেছিলেন। আরব বিদ্রোহীদের দমনের জন্য তাঁহারও ডাক পড়ে। একদিকে বৃটিশ অন্যদিকে আরব দুই পক্ষে রীতিমত যুদ্ধ চলিয়াছে বহুদিন। আরবরা আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রের সাহায্যে গরিলা যুদ্ধ চালাইয়া বৃটিশ বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। গত এক বৎসরের মধ্যেই মোজাল পাইপ (যাহাতে মোজাল তৈলখনি হইতে তৈল ভূমধ্য-সাগর তীরে যায়) আরবরা দেড়শত বার জখম করিয়া দিয়াছে!

আভ্যন্তরিক ব্যাপারেও আরবরা ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে সম্পূর্ণ অসহযোগ করে। দেশের শাসন-কার্য্য বৃটিশের হাতছাড়া হইবার উপক্রম হয়। আইন-আদালত তাহারা নিজেরা স্থাপন করিয়া বিবাদের বিচার ও মীমাংসা করিতে আরম্ভ করে। শাসনের অন্যান্য বিভাগ-গুলিও তাহারা প্রতিষ্ঠা করে ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিতে থাকে। মাঝে মাঝে খবর আসিত, বৃটিশ পুলিশ বাহিনী এই সব বিচারকদের ধরিয়া জেলে পুরিতেছে, ইত্যাদি, ইত্যাদি! ক্রমে বহু আরবকে, আরব নেতাকে সন্দেহক্রমে ধরিয়া আটক করা হইল, আরব-নেতা গ্রাণ্ড বা প্রধান মুফ্‌তি সিরিয়ায় গিয়া আশ্রয় লইলেন। বৃটেনের উপনিবেশ-সচিব একবার অতি সংগোপনে প্যালেস্টাইন পরিদর্শনে গেলেন। তিনি এ আন্দোলনের গুরুত্ব ও ব্যাপকত্ব বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়, কারণ তিনি দেশে গিয়া দমন-নীতির সমর্থন করিলেও আরবদের দাবির ন্যায্যতা অস্বীকার করিতে পারেন নাই।

[illegible]নীতি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের একটি প্রধান অস্ত্র।

এতদিন বিশ্ববাসী জানিত, আরবরা এককভাবে বৃটিশদের সঙ্গে প্যালেষ্টাইনের স্বাধীনতার জন্য যুঝিতেছে। কিন্তু একদিন রয়টার সংবাদ দিল, রাজভক্ত আরব নরমপন্থিগণ একটি সমিতি স্থাপন করিয়াছেন, এবং জনসাধারণের অনাচারের নিন্দা করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। সর্ব্বত্রই যেমন হয়, রাজভক্ত আরবগণ প্রভুদের মহিমা কীর্ত্তনেও পশ্চাৎপদ হইল না। আরবদের ভেতর এইবার দলাদলি সৃষ্টি হইতে দেখিয়া এক বন্ধু আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, এইবার প্যালেণ্টাইনে বৃটিশ-নীতির জয় হইল! কিন্তু এক দিকে আরবগণ মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে, অন্য দিকে বিশ্ব-রাজনীতিতে নিত্য নূতন গুরুত্বপূর্ণ অবস্থার উদয় হইতেছে—এই দুই অবস্থার পাকে পড়িয়া বৃটিশ সিংহ আরবদের দাবীর ন্যায্যতা আর অধিক দিন অস্বীকার করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। বৃটিশ নেতাদের ভাষণ হইতে বুঝা গেল, 'হাঁ, আরবরা বাস্তবিকই পাগল নহে, তাহাদেরও কিছু বলিবার আছে'। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, 'হে স্বজাতীয় বৃটিশগণ, তোমরা তাহাদের কথাও একটু শ্রবণ কর।'

এই মাত্র বলিয়াছি, বিশ্ব-রাজনীতিতে নিত্য নূতন অবস্থার উদ্ভব হইতেছে। বর্ত্তমান কালে পর পর দ্রুত সংঘটিত ব্যাপারগুলি যাঁহারা কিছুমাত্র অনুধাবন করিয়াছেন, তাঁহারাই একথা স্বীকার করিবেন। রাজ্য জয় তো সকলেই করে, সব যুগেই শক্তিমান দুর্ব্বলকে ঘায়েল করিয়াছে, কখনও আত্মসাৎ করিয়াছে, কখনও-বা মারিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু আজকাল যেমন এক একটি ঘটনা ঘটিলেই বিশ্বব্যাপী একটা অস্বস্তি দেখা দেয় আগে এমনটি ছিল না। ইউরোপে ইটালী-জার্ম্মানী ও এশিয়ায় জাপান অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। ইহাদের তাপে দুর্ব্বলরাই যে পুড়িয়া মরিতেছে তাহা নয়, সবলেরাও উদ্ব্যস্ত ও আতঙ্কিত হইয়া উঠিতেছে। ইহারা ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করিয়া সবল শক্তিগুলির সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতেছে। কিন্তু তাহাদের এই শক্তি সঞ্চয়েই যেন বসুন্ধরা কাঁপিয়া উঠিতেছে।

ইটালী, জার্ম্মানী ও জাপান—দুইটি বিভিন্ন মহাদেশে অবস্থিত হইলেও কিছুদিন হইল একজোটে কার্য্য করিতেছে। সম্প্রতি প্রকাশ, ইহারা সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইবারও উদ্যোগ আয়োজন করিতেছে। এই শক্তিগুলি জগতের বিভিন্ন স্থানে কিরূপে আধিপত্য বিস্তার করিতেছে একবার দেখা যাক্। তাহা হইলে বৃটিশের পররাষ্ট্র-নীতি ব্যাপকভাবে এবং বর্ত্তমানে প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে যে নীতি অবলম্বিত হইয়াছে তাহার কারণ বিশেষভাবে বুঝা যাইবে। জার্ম্মানী অষ্ট্রিয়া সম্পূর্ণ ও চেকোশ্লোভাকিয়ার খানিকটা দখল করিয়া পূর্ব্ব ও পূর্ব্ব-দক্ষিণ ইউরোপে প্রবল হইয়াছে এবং অন্য সকলকে সেখান হইতে হাত গুটাইতে বাধ্য করিয়াছে। কাইজার যেমন বার্লিন হইতে বাগদাদ পর্য্যন্ত রেলপথ বিস্তারের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, জার্ম্মানীর বর্ত্তমান নায়ক হিটলারও সেইরূপ স্বপ্ন দেখিতেছেন। ইদানীং জার্ম্মানীর দাবী বাড়িয়া গিয়াছে, সে হৃত উপনিবেশ-গুলি সকলই ফিরিয়া পাইতে চায়। ইটালী আবিসিনিয়া অধিকার করিয়াছে। লিবিয়া সুরক্ষিত হইয়াছে। ফ্রাঙ্কোর জয়লাভ ঘটিলে স্পেনে তাহারই প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়িয়া যাইবে। সে এখনই ফরাসীর কতকগুলি উপনিবেশের উপর কর্তৃত্ব করিতে চাহে। আরও প্রকাশ, ফ্রান্স ইহাতে রাজী না হইলে ইটালী যুদ্ধ করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না। ফ্রাঙ্কো মাইনর্কা দখল করায় ফ্রান্সের উপনিবেশ পথ বিঘ্নসঙ্কুলই হইল। এইরূপে ইটালীর শক্তি ভূমধ্যসাগরে ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহাতেও বৃটেনেরও শঙ্কিত হইবার ঢের কারণ আছে। আবিসিনিয়া অধিকার করায় ইটালীয়ানরা একেবারে বৃটিশের তাঁবেদার আরব-ভূমিতে আসিয়া পড়িয়াছে। প্রকাশ, ইমেনের রাজা ইটালীর সঙ্গে চুক্তিতেও আবদ্ধ হইয়াছেন। ওদিকে চীনে জাপান যেরূপ দ্রুত অগ্রসর হইতেছে তাহাতে ব্রিটেনের শঙ্কিত হইবার কারণ খুবই। ভারত সীমান্তের পরপারেই চীন। আবার শ্যামে যদি জাপানীরা সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহা হইলে তো কথাই নাই। অবশ্য এরূপে সম্ভাবনা ইদানীং হয়ত খুব কমই, যদি শ্যামের রাষ্ট্রনায়কদের কথা বিশ্বাস করিতে হয়। তাঁহারা নাকি সম্প্রতি বলিয়াছেন যে, শ্যাম হইবে ইউরোপের 'সুইজারল্যাণ্ড'। বিভিন্ন শক্তির মধ্যে সংঘাত আরম্ভ হইলে শ্যাম নিরপেক্ষ থাকিবে!

মোজাল পাইপ গত বৎসরে আরবগণ দেড় শতবার জখম করে

এই সব দেখিয়া আপনারা হয়ত সিদ্ধান্ত করিবেন, বিশ্বের

দিকে দিকে যখন কতকগুলি রাষ্ট্র অত্যধিক শক্তিমান হইয়া উঠিতেছে, তখন প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে বৃটিশ মনোভাবের পরিবর্ত্তন হইবেই। ইহা অবশ্য একটা কারণ বটে, কিন্তু ইহাই সবখানি নহে। বৃটিশরা এতাবৎকাল প্যালেষ্টাইনকে সায়েস্তা করিতেই বেশী মাত্রায় তৎপর হইয়াছিল। আর উপরে যেসব ঘটনার ফিরিস্তি দিলাম তাহা তো একদিনে ঘটে নাই, কাজেই অধুনা বৃটিশ মনোভাবের যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহার হেতু কি? এই কারণ অন্যত্র খুঁজিতে হইবে। তাহাই এখন বলিব।

আরব জাতি সংখ্যায় ছয় কোটি। মোরোক্কো হইতে আরবের শেষপ্রান্ত ওমেন পর্য্যন্ত একটা বিশাল ভূখণ্ডের উপর তাহারা ছড়াইয়া আছে। সৌদি আরব আর ইমেন এই দুইটি রাজ্য ছাড়া আর সকল বৃটিশ ও ফরাসীর হয় অধীন নয় তাঁবেদার। ইহার মধ্যে মাত্র লিবিয়া ইটালীর অধিকারে আছে। এই মুসলমান আরবজাতির সহায়ে ইংরেজ ফরাসী বহু উদ্দেশ্য হাসিল করিয়াছে। বিগত মহাসমরে তাহাদের সাহায্য ইহারা লইয়াছে প্রচুর। এই সাহায্যের বিনিময়ে যুদ্ধের পরে আরবদের স্বাধীনতা দেওয়া হইবে এরূপ প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হইয়াছিল। বিশেষ করিয়া আরব দেশের আরবদের এই প্রতিশ্রুতি দিয়া তুর্কির বিরুদ্ধে প্ররোচিত করা হয়। তখন আরব তুরস্কের অধীন ছিল। যুদ্ধের শেষে এ প্রতিশ্রুতি প্রতিপালিত হয় নাই। কতকগুলি অঞ্চলের (যেমন প্যালেষ্টাইন, সিরায়া) শাসন ইহারা স্বহস্তে গ্রহণ করে। কতকগুলি দেশ, যেমন সৌদি আরব, ইমেন, নিজের চেষ্টায় স্বাধীন হয়। ইরাক (মেসোপোটেমিয়া) ইংরেজের শাসনে আসিলেও পরে স্বাধীনতা লাভ করে। উত্তর আফ্রিকার আরব দেশগুলিতে বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই। মিশর কিছুটা স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে, মাত্র দুই বৎসর পূর্ব্বে। আরব নেতারা, কোন কোন ক্ষেত্রে সত্য সত্যই, আবার অনেক স্থলে মৌখিকভাবে, ইংরেজ বা ফরাসীর আনুগত্য স্বীকার করিলেও জনসাধারণ তাহাদের ব্যবহারের কথা ভুলিতে পারে নাই। বিশেষ করিয়া প্যালেষ্টাইন তো ভুলিতেই পারিল না। কারণ যুদ্ধের শেষে প্যালেষ্টাইনকে স্বাধীনতা তো দেওয়া হইলই না, উপরন্তু ইহাকে একটি ইহুদী নিবাসে পরিণত করিবার চেষ্টা চলিতে সুরু হইল। ইহাতে উচ্চ-নীচ নির্ব্বিশেষে আরবগণ ইংরেজদের বিরুদ্ধে বাঁকিয়া বসে। ইহার ফলে যে গুরুতর অবস্থার উদ্ভব হয়, তাহা আগেই বলিয়াছি।

আরবদের এই অসন্তোষের সুযোগ ইউরোপের ডিক্টেটরদ্বয়—হিটলার ও মুসোলিনী পূর্ণভাবে লইয়াছেন। ইটালীর বারি ষ্টেশন হইতে কয়েক বৎসর যাবৎই আরবভূমিতে বেতারে প্রচারকার্য্য চলিয়াছে। জার্ম্মানীও পরে ইহাতে যোগ দিয়াছে। ইদানীং ইঙ্গ-ইটালী চুক্তি সংঘটিত হওয়ায় ইটালীর তরফে প্রচারকার্য্য নাকি থামিয়া গিয়াছে। জার্ম্মানীর প্রচারকার্য্য কিন্তু পূর্ণোদ্যমেই চলিয়াছে। প্রকাশ, প্যালেষ্টাইনের আরবগণ খণ্ডযুদ্ধে যেসব অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহার করিয়াছে তাহা আমদানী হইয়াছে জার্ম্মানী হইতে! জার্ম্মানরাই নাকি ইহাদের এই সব অস্ত্র-শস্ত্র সরবরাহ করিতেছে। ডিক্টেটরদের হাব-ভাব, কল-কৌশল এতদিনে বিশেষ কাহারও অবিদিত থাকিবার কথা নয়। প্যালেষ্টাইনের আরবেরা ইহার সাহায্য লইতেছে পূর্ণভাবে। কাজেই বৃটেন ও ফ্রান্স, আর প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে বৃটেন একা, ইদানীং খুবই অবহিত হইয়াছে। হিটলার মুসোলিনী ইউরোপের চারিদিকে এবং অন্যত্রও যেমন বাহু প্রসারিত করিয়া লইতেছেন, তাহাতে প্যালেষ্টাইন তথা সমগ্র আরবভূমি যে তাঁহাদের আওতার মধ্যে পড়িবে না কে বলিতে পারে? আরবদের লইয়া আজ শক্তিমানের মধ্যে টানা-হেঁচড়া চলিয়াছে। বৃটেনের অবাধ প্রভুত্ব ও স্বৈরাচার এখন আর সেখানে চলিতে পারিবে না। বিশ্ব-রাজনীতির চাপে এবং প্রধানত এই কারণেই আজ বৃটেন ক্ষুদ্র প্যালেষ্টাইনের সঙ্গে আপোষ আলোচনা চালাইতে বাধ্য হইয়াছে।

আলোচনা চালাইবার পক্ষে শান্তিজনক আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য বহু আরব নেতাদের মুক্তি দিতে হইয়াছে। ইঁহারা গ্রাণ্ড মুফ্‌তি হুসেনীরই অনুচর। ইঁহাদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ লণ্ডনে প্যালেষ্টাইন সম্মেলনে যোগ দিয়াছেন। ইংরেজ সৃষ্ট রাজভক্ত আরবদলের প্রতিনিধিও সেখানে গিয়াছেন। অন্যান্য আরব দেশের—মিশর, সৌদিআরব, ইমেন, ট্রান্সজর্ডনের প্রতিনিধিও এই সম্মেলনে আহূত হইয়াছেন। ইহুদী নেতারাও এই বৈঠকে যোগ দিয়াছেন। বৃটিশ পক্ষেও প্রতিনিধিত্ব কয়েকজন করিতেছেন। আজ কয়েক দিন মাত্র হইল এই বৈঠকের আলোচনা সুরু হইয়াছে। ইহাতে যে পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে, তাহা কতকটা অভিনব, এ কারণ ইহাকে গোল-টেবিল বৈঠক বলা চলে না। বৃটিশ প্রতিনিধিগণ আলাদা আলাদাভাবে আরবদের দাবী শুনিবেন, ইহুদীদের কথাও শ্রবণ করিবেন। এই দুই পক্ষের কথা শুনিয়া একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছিবেন। আরব প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রথমে মতদ্বৈধের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল, কিন্তু পরে সংবাদ আসিয়াছে যে, নরমপন্থী জাতীয়তাবাদী সকলেই একমত হইয়া দাবী পেশ করিতে পারিবেন। আরব প্রতিনিধিগণ সমবেতভাবেই ইতিমধ্যে তাঁহাদের দাবী জানাইয়াছেন। তাঁহাদের মূল বক্তব্য চারিটি—(১) প্যালেষ্টাইনের 'ম্যাণ্ডেট' তুলিয়া দিতে হইবে, (২) ইহাকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, (৩) এখানে ইহুদী-আমদানী বন্ধ করিয়া দিতে হইবে এবং (৪) বালফুর ঘোষণা—যাহার ফলে ইহাকে একটি ইহুদী আবাসে পরিণত করিবার চেষ্টা হইয়াছে, তাহা রদ করিতে হইবে। ইহুদীদের তরফে ডক্টর হ্বাইসম্যানও একটি বিবৃতিতে তাঁহার কথা জানাইয়াছেন। তিনি নাকি দাবী করিয়াছেন যে, আগেকার প্রতিশ্রুতি অনুসারে প্যালেষ্টাইনে ইহুদী আবাস স্থাপন করিতে দিতে হইবে। তবে এদেশ স্বাধীন হউক ইহাও তিনি চান। এইখানে আর একটি কথা বলিতেছি। আরব দল তাঁহাদের বিবৃতিতে ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে কোন বিপদ উপস্থিত হইলে আরবগণ ইংরেজেরই সহায় হইবে। ইংরেজ রাষ্ট্রনেতারা তো আজ ইহাই চান। আর তাঁহারা সাম্রাজ্য রক্ষার চিন্তায়ই তো আকুল। প্যালেষ্টাইনকে ঘাঁটি করিবার ইচ্ছা তাঁহাদের বরাবরই, এখন এই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার তাগিদও খুব বেশী। মাইনর্কা ও হাইনান দ্বীপের মত প্যালেষ্টাইনও সুতরাং আন্তর্জ্জাতিক গুরুত্ব লাভ করিয়াছে।

১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯।

কস্তুরীবাই

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জগতের বিশাল পটভূমিকায় এক বিরাট মহামানবের বাম পার্শ্বে দাঁড়িয়ে আছেন একটি মহীয়সী নারী যাঁর নাম কস্তুরীবাই গান্ধী। নিশীথরাতের তারার মত নীরব, অনবগুণ্ঠিতা উষার মতো দীপ্তিময়ী। এই নারী আপনার সৌন্দর্য্য, সরলতা, তেজস্বিতা এবং চরিত্রের অনমনীয় দৃঢ়তার দ্বারা প্রথম থেকেই স্বামীর হৃদয়ে আপনার অবিচলিত আসনটিকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। নিরক্ষর কিন্তু তেজস্বিনী বধূটিকে বালক-স্বামী চাইতো আপনার আজ্ঞানুবর্তিনী ক'রে রাখতে। বালিকা কস্তুরী-বাই-এর পক্ষে স্বামীর বিধি-নিষেধের কারাগারের মধ্যে বন্দিনী থাকা অসম্ভব ছিলো। গান্ধীজী তাঁর আত্মজীবনীতে বালিকাবধূর এই দৃপ্ত স্বভাবের কথার উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন,

> "She made it a point to go out whenever and where-ever she liked. More restraint on my part resulted in more liberty being taken by her, and in my getting more and more cross.

জীবনসঙ্গিনীর মধ্যে এই যে শিকল-ভাঙা বিদ্রোহিণীর ভীষণমধুর রূপ—এই রূপ বধূর প্রতি স্বামীর আকর্ষণকে দুর্ব্বার করেছে। যাকে আমরা সহজে জয় করতে পারিনে সে আমাদের মনকে বেশী ক'রে টানে। বালিকা-বধূর প্রতি বালক-স্বামীর আকর্ষণ কিরূপ দুর্ব্বার ছিলো তার বর্ণনা আমরা গান্ধীর আত্মজীবনীর মধ্যে পাই।

> "I must say I was passionately fond of her. Even at school I used to think of her, and the thought of night-fall and our subsequent meeting was ever haunting me. Separation was unbearable.

গান্ধী-চরিত্রের একটা প্রচ্ছন্ন দিকের আভাস এখানে আমরা পাই। গান্ধীর স্বভাবের মধ্যে একটা গভীর ভাবপ্রবণতা আছে। বাইরে যিনি কৌপীন-পরা তপস্বী, অন্তরে তাঁর রয়েছে একটা প্রকাণ্ড আবেগ আর এই আবেগ তাঁকে করেছে এত বড়ো কর্ম্মবীর। যেখানে কেবল আইডিয়া রয়েছে—ভাবপ্রবণতা নেই সেখানে মানুষের জীবন বুদ্ধির সঙ্কীর্ণ-জগতে ঘুরপাক খেয়ে মরে। বধূর সঙ্গে প্রেমগুঞ্জনের মধ্যে রাত্রির পর রাত্রিজাগরণের কথা গান্ধীর আত্মজীবনীতে আছে। I used to keep her awake till late in the night with my idle talk. এই রাত্রি-জাগরণের মধ্যে হৃদয়াবেগের যে আতিশয্য আমরা দেখতে পাই—এই আতিশয্য গান্ধীকে রুগ্নদেহে অকালমৃত্যুর মধ্যেও নিয়ে যেতে পারতো—কিন্তু তাঁকে বাঁচিয়ে দিয়েছে কর্ত্তব্যের প্রতি দুর্ব্বার অনুরাগ। গান্ধী লিখেছেন,

> "If with this devouring passion, there had not been in me a burning attachment to duty, I should either have fallen a prey to disease and premature death, or have sunk into a burdensome existence."

প্রতিভা আর পাগলামির এ দুয়ের মধ্যে ভেদ-রেখা খুব সরু। পাগল আর প্রতিভাবান—এ দুয়েরই চরিত্রের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে হৃদয়াবেগের প্রাচুর্য্য। একজন প্রবৃত্তির দুর্ব্বার বন্যায় ভেসে গিয়ে আপন শক্তির অপব্যয়ের ফল ভোগ করে পাগলা-গারদের চতুঃসীমানার মধ্যে আর একজন আপনার হৃদয়াবেগকে কর্ত্তব্যবুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ক'রে ললাটে পরে বিজয়ীর বরমাল্য। যে মানুষের sentiment নেই—কেবল আইডিয়া আছে সে মানুষ বড়ো কাজ করতে পারে না। যে মানুষের মধ্যে প্রচুর হৃদয়াবেগ রয়েছে কিন্তু তাকে মঙ্গলের পথে পরিচালিত করবার শক্তি নেই—সে মানুষও কোনো বড়ো কাজ করতে পারে না। বড়ো কাজ করতে পারে সেই মানুষ যাকে বিধাতা দিয়েছেন প্রচুর ভাব-প্রবণতার সঙ্গে প্রচুর কর্ত্তব্যবুদ্ধি এবং সংযম। গান্ধীর এত বড়ো গগনস্পর্শী প্রতিভা ব্যর্থ হতো যদি সদাজাগ্রত কর্ত্তব্যবুদ্ধির দ্বারা তাঁর দুর্ব্বার হৃদয়াবেগ পদে পদে নিয়ন্ত্রিত না হোতো।

কস্তুরীবাইয়ের কথা-প্রসঙ্গে আমরা অনেক দূর এসে পড়েছি। তাঁর সম্পর্কে আমরা যে কথা বলছিলাম। কস্তুরীবাই আজীবন স্বামীর পিছনে পিছনে চলেছেন ছায়ার মতো—দক্ষিণ আফ্রিকায় স্বামীর দুরূহ কার্য্যের অংশ নেওয়া থেকে আরম্ভ ক'রে রাজকোটে কারাবরণের পালা পর্য্যন্ত তাঁর জীবনের সকল কার্য্যে আমরা দেখতে পাই পতি-ব্রতা হিন্দুনারীর বিনয়-মধুর নম্রতা। কিন্তু এই নম্রতা দেখে আমরা যদি মনে ক'রে বসি—তাঁর চরিত্রে স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা ব'লে কিছু নেই, তিনি শুধুই ছায়া, শুধুই প্রতিধ্বনি—তবে একদিকে তাঁর প্রতি যেমন অবিচার করা হবে, আর একদিকে গান্ধীর ব্যক্তিত্বকেও তেমনি ছোট করা হবে। প্রকৃতিই স্বহস্তে কস্তুরীবাইয়ের চরিত্রে দিয়েছে তেজস্বিতার অগ্নি-শিখা। গান্ধী আপনার সহধর্ম্মিণীর স্বভাবের এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লিখেছেন,

> By nature she was simple, independent, persevering and with me at least, reticent.

কস্তুরীবাইয়ের চরিত্রের এই তেজস্বিতাকে মধুর ক'রেছে স্বামীর সঙ্গে নিজেকে একান্তভাবে মিলিয়ে দেবার অপূর্ব্ব ক্ষমতা। স্বামীর সব কাজে মন সায় দেয়নি, চিত্ত অনেক সময়ে বিদ্রোহী হ'য়ে উঠেছে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত হৃদয় প্রিয়-জনের ইচ্ছার কাছে মাথা নত করেছে আর এই নম্রতার জন্যই গান্ধী-কস্তুরীবাইয়ের দাম্পত্যজীবন আজ পর্য্যন্ত মধুময় হয়ে আছে। গান্ধীজী আপন পত্নীর প্রতি কখনো যে দুর্ব্যবহার করেন নি তা নয়। সমস্ত আদর্শবাদীর চরিত্রের মধ্যেই একটা কঠোরতার প্রকাশ আমরা দেখতে পাই। কিন্তু স্বামীর দেওয়া সমস্ত আঘাত পত্নী নিঃশব্দে সহ্য করেছেন। পত্নীর এই ধৈর্য্য এবং সহিষ্ণুতা গান্ধীজীর মনে জাগিয়েছে নারী-জাতির প্রতি অসীম শ্রদ্ধা। আপন দুর্ব্যবহারকে কি অসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে কস্তুরীবাই বারম্বার ক্ষমা করেছেন—তার কথা উল্লেখ ক'রে গান্ধীজী আত্মজীবনীতে লিখেছেন,

> "Only a Hindu wife tolerates these hardships, and that is why I have regarded woman as an incarnation of tolerence."

গান্ধীজীর আত্মজীবনীতে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্যকলহের পট-ভূমিকায় কস্তুরীবাইয়ের যে ছবি বারম্বার ফুটে উঠেছে—সেই ছবিতে আমরা আদর্শবাদী পুরুষের সঙ্গে বাস্তববাদী নারীর চিরন্তন দ্বন্দ্বের একটা রূপ দেখতে পাই। গান্ধীজী তখন দক্ষিণ আফ্রিকার দর্ব্বান সহরে ব্যারিষ্টারি করেন। তাঁর মুহুরীরা তাঁর গৃহে নিজের আত্মীয়স্বজনের মতোই বাস করতো। এই মুহুরীদের মধ্যে একজন ছিল জাতিতে খৃষ্টান—তার বাপ মা ছিলো অন্ত্যজ। ইউরোপীয় ফ্যাসানে তৈরী বাড়ীতে মূত্রত্যাগের জন্য ঘরের মধ্যে পাত্রের ব্যবস্থা ছিলো। অন্যান্য মুহুরীরা নিজের পাত্র নিজেই পরিষ্কার করতো। কিন্তু খৃষ্টান মুহুরীটি নবাগত হওয়ায় কস্তুরী-বাই এই গান্ধীকে নিতে হোলো তার পাত্র পরিষ্কারের ভার। কস্তুরীবাই কিছুতেই অস্পৃশ্যের ময়লা পরিষ্কার করবেন না, গান্ধীজীও ছাড়বার পাত্র নন। অবশেষে স্বামীর পীড়া-পীড়িতে খৃষ্টান মুহুরীর পাত্র পরিষ্কার তাঁকে করতেই হোলো—কিন্তু হাসিমুখে নয়, অশ্রুজলে। সেদিনের সেই অশ্রুমুখী রোষ-কষায়িতলোচনা পত্নীর কথা উল্লেখ ক'রে গান্ধীজী আত্মজীবনীতে লিখেছেন,

> "Even to-day I can recall the picture of her chiding me, her eyes red with anger, and pearl drops streaming down her cheeks, as she descended the ladder, pot in hand. But I was a cruelly kind husband."

কিন্তু স্বামী এমনই উৎকট রকমের আদর্শবাদী যে পত্নীকে কেবল ময়লার পাত্র বহন করিয়েই তিনি খুশী নন। তাঁকে পাত্র বইতে হবে হাসিমুখে। সাশ্রুনয়না পত্নীকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, 'আমার বাড়ীতে এই ন্যাকামি আমি কিছুতেই সইবো না।' এইবার পত্নীর ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে গেলো। অপমানিতা গৃহিণী তারস্বরে স্বামীকে জবাব দিলেন, 'থাকলো তোমার ঘরবাড়ী, আমাকে যেতে দাও।' ক্রোধে আত্মহারা হয়ে স্ত্রীর হাত চেপে ধরলেন গান্ধী এবং তাঁকে টানতে টানতে দরজার দিকে টেনে নিয়ে চললেন। দরজা খুলে যখন তাঁকে বাইরে বের ক'রে দেবার উপক্রম করছেন তখন অসহায় নারীর অশ্রুবিকৃত কণ্ঠস্বর থেকে বেরিয়ে এলো, "তোমার কি লজ্জা ব'লে কিছু নেই? কি করছো তা কি এমন করেই ভুলতে আছে? এখানে আমার পিতামাতা আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই। আমি তোমার স্ত্রী—তাই কি তুমি ভাবো তোমার সবকিছু আমাকে সহ্য করতে হবে? দোহাই তোমার—প্রকৃতিস্থ হও—দরজা বন্ধ কর—কেলেঙ্কারী কোরো না। লোকে দেখলে বলবে কি?" লজ্জিত স্বামী তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন।

দাম্পত্য-কলহের আর একটা ছবির যে বর্ণনা আছে গান্ধীর আত্মজীবনীতে, এখানে তারও উল্লেখ করা গেলো। দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর কাজ ফুরিয়ে গেছে। তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করবার উপক্রম করছেন। তাঁর স্বদেশ-বাসীগণের কাছ থেকে রাশি রাশি উপঢৌকন এসেছে তাঁর গৃহে। জনসেবার পুরস্কার। উপহারের মধ্যে সোনা-রূপোর দ্রব্যের সঙ্গে হীরার অলঙ্কারও আছে। এই অলঙ্কারগুলির মধ্যে গান্ধীজীর সহধর্মিণীর জন্য ছিল একটি বহুমূল্যের স্বর্ণাভরণ। যেদিন সন্ধ্যাকালে গান্ধীজীর হাতে এইসব উপহার এসে পৌঁছলো—সেদিন রাত্রিতে তাঁর চোখে ঘুম এলো না। ঘরের মধ্যে সারারাত্রি তিনি পদচারণা ক'রে কাটালেন। অপরিগ্রহ যাঁর জীবনের নীতি—তিনি কেমন ক'রে গ্রহণ করবেন এত সব মহার্ঘ্য সম্পদ? স্বেচ্ছায় যিনি বৈরাগ্যের কঠিন পথকে অবলম্বন করেছেন—তাঁর গৃহে এসব জিনিষ তো মানাবে না! সেবার জন্যই তো সেবা। তার আবার পুরস্কার কি? কিন্তু এতসব মূল্যবান সম্পদরাশি পরিত্যাগ করাও গান্ধীর পক্ষে সহজ ছিল না। আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন,

> "It was difficult for me to forego gifts worth hundreds, it was more difficult to keep them."

অবশেষে দ্বন্দ্বের সমাধান হোলো। গান্ধী স্থির করলেন, উপহার তিনি নিজের জন্য রাখবেন না—সমাজকে ফিরিয়ে দেবেন। কিন্তু পুরুষ যত সহজে সোনার জিনিষ ত্যাগ করতে পারে—মেয়েরা তত সহজে পারে না। গান্ধী যখন পত্নীর কাছে নিজের সংকল্পের কথা জানালেন, স্ত্রী বেঁকে বসলেন। কস্তুরীবাই কিছুতেই গয়না দিতে রাজী হলেন না; বললেন, 'তুমিতো আমাকে গয়না পরতে দেবে না—কিন্তু আমার পুত্র-বধুরা যখন আসবে তখন তাদের জন্য তো গয়না লাগবে। কে জানে—কখন কি ঘটে? আমি কিছুতেই এইসব গয়না দেবো না।' অবশেষে অনেক সাধ্য-সাধনার পর পত্নী স্বামীর ইচ্ছাপালনে সম্মত হলেন।

আদর্শবাদী পুরুষের বিবাহিত জীবনে প্রেমের সঙ্গে কর্ত্তব্যের এই দ্বন্দ্ব চিরন্তন। ভালোবাসা আর কালচার—এ দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে বিরোধের সম্পর্ক। একটা মহান আদর্শকে অনুসরণ করতে গেলে প্রিয়জনের প্রেমের আবেদনে কর্ণপাত করা চলে না। সংস্কৃতি, সভ্যতা—মানুষকে বাহিরের বৃহত্তর জগতের পানে টানে। নারীর মিনতি তাকে টানে নীড়ের পানে। এই দুইয়ের আকর্ষণের মধ্যে আদর্শ-বাদী পুরুষ পরাজয় স্বীকার করে বাহিরের আকর্ষণের কাছে। জ্যান্থিপ অন্দরে গর্জ্জন করেন—সক্রেটিশ এথেন্সের মন্দিরচ্ছায়ায় শিষ্যদের সঙ্গে জ্ঞানালোচনায় মগ্ন থাকেন। গান্ধীজী স্বপ্ন দেখেন নূতন মানব-সমাজের, কস্তুরীবাই ভাবেন স্বর্ণাভরণে সজ্জিতা অনাগতা পুত্রবধূদের মুখচ্ছবির কথা। আদর্শ যাদের পাগল ক'রেছে মনকে—তাদের পত্নী হওয়া একদিক দিয়ে যেমন সৌভাগ্যের কথা—আর একদিক দিয়ে তেমনি দুর্ভাগ্যের কথা। কাঁদতে কাঁদতে তাদের জীবন যায়। তাদের নারীমনের নিভৃতে নীড়-রচনার স্বপ্ন বাস্তবে কোনদিন রূপ নেবার অবসর পায় না।

তবে আকাশের সঙ্গে নীড়ের এই দ্বন্দ্বে গান্ধীর গুরু টলষ্টয়ের দাম্পত্যজীবন যেমন তিক্ততায় ভরে উঠেছিলো শিষ্যের জীবন কখনো সে তিক্ততার আস্বাদন পায়নি। কস্তুরীবাঈ যদি হিন্দুনারী না হ'য়ে আর কিছু হতেন তা হ'লে গান্ধীকেও বোধ হয় টলষ্টয়ের মতোই ঘরের সঙ্গে লড়াই করতে করতে অভিশপ্ত জীবন অবসান করতে হ'তো। কস্তুরীবাই স্বামীর

(শেষাংশ ১১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ঘুরন্ত চাকা

(গল্প)

দুটি প্রাণী।

তাদের বাড়ীখানি ছিল ছোট্ট শহরটার সেই এক নিরালা কোণে—মস্ত বড় একটা ঢিবির ওপর। আসামের এ অঞ্চলে ঢিবি-টিলার অভাব নেই—শহরেও নয়।

আপ্তা—তার বয়স চল্লিশের ওপরে, তাই ছোট বোন দীপ্তাকে সে নেহাৎ শিশুর মতই বিদ্রোহী মনের অধিকারিণী বলে জানে—যদিও দীপ্তা তেইশ বছর পূর্ণ করে চব্বিশে পা দিয়েছে।

সদৃশ আবেষ্টনীতেও মানব-প্রকৃতির প্রতিক্রিয়া একদিকেই নিবদ্ধ থাকে না রুচিভেদে তা বিচিত্রই হয়ে দাঁড়ায়। তার দৃষ্টান্ত খুঁজতে এ বাড়ীখানি ছেড়ে বাইরে যেতে হবে না।

একতলা বাড়ীখানির সমুখে বাগান। রাস্তার ধারের পাঁচীলের পাশে পাশে রয়েছে কয়েকটি ঝাউ আর ফলের গাছ। তারই পাতার ফাঁকে ফাঁকে বাড়ীখানি উঁকি মারে জনবিরল রাস্তাটির দিকে। বৃহৎ হলঘরটির সংলগ্ন বাগানখানির যে অংশ, তাতে ফুলেভরা গাছ আর পাতাবাহারের বাহারে এক ঝলক হাসি ছড়িয়ে আছে।

বাগানের ঠিক মাঝ বরাবর রাস্তার ধারে জাঁকালো বড় ফটকটি। আবার কোণের দিকে ছোট একটি সদর দরজা নতুন করা হয়েছে, দুই ভগ্নীর ব্যবহারের জন্য। কারণ বাড়ীর প্রায় অর্দ্ধেকেরও বেশী পার্টিশান করে ভাড়া দেওয়া হয়েছে।

হলঘরের মাঝখানে একখানি টেবিলের ওপরে সাজান রূপার একটি বড় কাপ আর দুটি মেডেল, তার পাশে একটি ফুটবল—চর্ব্বি মাখিয়ে তেলকুচকুচে করা। ঐটিই মাত্র স্মৃতি রয়েছে দুই ভগ্নীর পিতার—যিনি যেমন ছিলেন দিলদরিয়া, তেমনি ছিলেন ফুটবল খেলোয়াড়। কিন্তু খেলোয়াড় পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বে মাতা যে তাদের মায়া কাটিয়ে পরপারের যাত্রী হয়েছে, এ একরকম ভালই হয়েছে। কারণ খেলোয়াড় বীরটির দিলদরিয়া খরচের বহরে, একদিন যে সংসারে অভাবের নামগন্ধ ছিল না, সে সংসারেও অনটনের দৌরাত্ম্য হীরাজহরৎ, সোনারূপা সবই অন্তর্হিত করে দিল। রূপার কাপ, মেডেল যে সে পথ অনুসরণ করতে পারে নি, তার কারণ আপ্তা পরম পিতৃ-ভক্ত—ও তিনটি জিনিষকে সে পবিত্রজ্ঞানে পূজো করে প্রতিদিন। কোন প্রাণে পারে সে এমন বুকের কলিজা ছিঁড়ে ফেলতে—পিতার শেষ-স্মৃতিকে নিশ্চিহ্ন করতে।

দীপ্তা কচি মেয়ে, সে কি জানবে আপ্তা কি ভাবে সংসার চালিয়েছে—খেলোয়াড় পিতাকে নিয়ে—যাঁর সেবার জন্য দু'জন চাকর লাগত রাতদিন। তবু যা হোক মা রেখে গিয়েছিল দু'হাজার করে টাকা এক-এক বোনের জন্য। সে টাকার সুদ আর বাপের রেখে যাওয়া বাড়ীখানার আদ্ধেকটা ভাড়া খাটিয়ে যে আয়—এ হ'ল এখন দু'বোনের সম্বল।

দুটি প্রাণীর সংসার—তা আবার দুটিই মেয়ে— অবিবাহিতা। ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা নেই। খেলোয়াড় পিতার সংসার অটুট রাখতে গিয়ে আপ্তা বেশীদূর পড়তে পায় নি। সে আপশোষ মিটিয়ে নিয়েছে দীপ্তাকে ম্যাট্রিক পাশ করিয়ে। তার জন্য আপ্তাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। একে ত মফঃস্বল শহরে বাড়ীভাড়া বেশী নয়, তার ওপর সময়ে বাড়ী রয়েছে খালি ভাড়াটের অভাবে। তবু ছোট বোনটির পড়া সে বন্ধ করে নি।

কিন্তু আর একটি যে আশা তার প্রাণে ছিল, ছোট বোনকে প্রতিষ্ঠিত করবে জীবনে—ভাল ঘর বর দেখে, সে কাজটি হয়ে উঠে নি পুরুষ অভিভাবকের অভাবে। যত জায়গায়ই কথা উঠেছে, পাত্রী দেখে পছন্দ করবার পরও যেন কেমন করে প্রসঙ্গ খতম হয়ে গেছে, আর এগোয় নি কোন ক্ষেত্রে।

আপ্তার মায়ের আমলের একটি ঝি আছে বুড়ী—সে আর কাজ করতে পারে না। বুড়ীর ছেলের বউ এসে দুই বোনের সংসারের ঘষা-মাজার কাজ সেরে দেয়। বাজার আপ্তার করাতে হয়—পাড়ারই মুদী দোকানের লোকটিকে দিয়ে।

আপ্তার বয়স হয়েছে, নিরালা জীবনে চিরকাল অভ্যস্ত, তার মনে তেমন দুঃখ নেই, সংসার ত চলে যাচ্ছে। কিন্তু ছোট বোন দীপ্তা ভাবে—এ নিরালা জীবন, এ বনবাসের অভিশাপ অসহ্য।

দীর্ঘ শীতের রাত। রাত্তিরের খাওয়া শেষ করে দু'বোনে সেলাই নিয়ে বসে, নইলে এত শীগ্‌গির শয্যায় গেলে যে রাত আর ফুরাতে চায় না।

সে সময়ে সেলাই করতে করতে দীপ্তা বলে—দিদি দেখ, আমরা যেন সন্ন্যাসিনীর জীবন কাটিয়ে দিচ্ছি। বইয়ে পড়েছি, স্পেনদেশে এমন সব মঠ রয়েছে যেখানে পুরুষ ঢুকতে পায় না—সবই মেয়ে। মেয়েরা কোন পুরুষের সঙ্গে কথা বলা দূরে থাক—চোখেও দেখতে পায় না একটি।

—ও কথা বলিস নি দীপা! কেন আমরা সন্ন্যাসিনী হব। এই ত ভাড়াটে-গিন্নি আসে, ঝি আসে। তা ছাড়া মুদী-দোকানী বাজার এনে কত রাজ্যের খবর দিয়ে যায়। আর এটা ত হক্ কথা—বেশী হৈ-চৈ কি ভাল গেরস্তর বাড়ীতে। সে ছিল বাবার আমলে, কত নামজাদা খেলোয়াড়, বাবার কত সাকরেদ আসত, মাসকে মাস থাকত। সে আমার আর ভাল লাগে না। নইলে বিভাষবাবুকে চিঠি.........না, না, ওসব ভাল নয়। লোকে কত কি বলবে কি দরকার!

—তুমি যা-ই বল দিদি, মেয়েদের জীবনেও একটিবার য়্যাডভেঞ্চার দরকার। ছেলেদেরই ওটা একচেটে থাকবে কেন? তা ছাড়া বইয়ে পড়েছি—

—রেখে দাও তোমার বইয়ে পড়া। য়্যাডভেঞ্চার কথাটিই মেয়েদের সঙ্গে খাপ খায় না। ওটার সঙ্গে একটা বেপরোয়া ডানপিটেপনার ভাবই এসে পড়ে। না না, ওসব মন থেকে মুছে ফেল।

—ডানপিটেপনা? তা ত থাকবেই, নইলে আর য়্যাডভেঞ্চার হ'ল কি? তা ব'লে খারাপ কিছু নয়। এই ধর না—

—ও-সব কলেজী বইতে লেখা থাকে। বাস্তবে হয় না। মেয়েদের ডানপিটেপনা! কি সর্ব্বনাশ!

দীপ্তা ভাড়াটে-গিন্নিকেও একথা একদিন বলে ফেলেছিল। তখন আপ্তা এগিয়ে এসে ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলেছিল—"বুঝলেন দিদি, দীপাটা এখনও ছেলেমানুষ! সংসারের কিছু জানেও না, বোঝেও না। কত কত আবোল তাবোল কথা বলে। বলে—সাহেব-মেমরা অমুক করে, তমুক করে। আরে সে সব হ'ল ম্লেচ্ছদের ব্যাপার। পাগলী বোন আমার! আজ যদি বাবা থাকত, তা হলে কি বোনকে আমার আর আইবুড়ো থাকতে হ'ত। কি করব, সবই বরাত। ও পাগলীর কথার মাথামুণ্ডু নেই, যখন তখন মস্করা।"

ও-কথার পর অবশ্য ভাড়াটে-গিন্নি একটু ম্লান হাসি হেসেই উঠে পড়েছিলেন—কিন্তু গিন্নিটির বয়স ত্রিশের বেশী না হওয়ায় সে 'ছোট্ট বোনটিকে' পাগলী আর ছেলেমানুষ ধরে নিতে পারছিল না কিছুতে। তাই পাগল আর অবোধ ছেলেমানুষের আবোল-তাবোলকে সে ক্ষমা করতে পারে নি।

কিন্তু দীপ্তা তা বলে ও-কথায়ই নিরস্ত হবার হেতু পেল না কিছু। সে ভাড়াটে-গিন্নির গমন-মুখে আরও কিছু রঙ চড়িয়ে বলে যেতে লাগল। ভাড়াটে-গিন্নিও সিদ্ধান্ত করে নিলে ধাড়ী মেয়েকে আইবুড়ো রাখা—বিশেষ করে যে মেয়ে ইস্কুলে-কলেজে পড়েছে—একেবারেই নিরাপদ নয়।

আর, ভাড়াটে-গিন্নির সন্দেহাকুল মূর্ত্তি অপসৃত হবার পর মুহূর্ত্তে দীপ্তার দিদি তার শিশু-বোনটিকে ভাল করেই সমঝিয়ে দিতে বক্তৃতা সুরু করল—

জানিস্ দীপা, বোকার মত কতকগুলি বেয়াড়া কথা বলা, যার উল্টোই হ'ল তোর নিজের মত—তাতে শুধু পাগলাম করাই হয় না, লোকেও এতে ধরে নেয় তোমার রুচি খারাপ, অসংগত। কৌতুক, ঠাট্টা করবারও বিষয় বেছে নিতে হয় হুঁসিয়ার হয়ে—বিশেষ করে মেয়েদের। জানিস্! এ সব নিয়ে কথা তোলা আমার মতে একেবারে আহাম্মুকি। কৌতুক করবারও জিনিষ আছে। এ কেন?

—কৌতুক আবার কি?

—কৌতুক নয়? মেয়েদের য়্যাডভেঞ্চার আবার কি হতে পারে অসংগত ছাড়া। ছি ছি পাঁচজনের সম্মুখে ভদ্রঘরের মেয়ে কি ও-কথা বলে?

বলতে বলতে আপ্তার সজল চোখ নিবদ্ধ হ'ল টেবিলের রূপার কাপটির ওপর। এ অভ্যাস তার চিরন্তন। যখনই তার মন ভারাক্রান্ত হয় আঘাতে বা দুঃখে, তখনই চোখদুটি আকুতি জানায় পিতার শেষ চিহ্নের কাছে—যেন রজতাংগ কাপ্‌টি জড়তা বর্জ্জন করে আপ্তাকে সান্ত্বনা দেবে শত প্রকারে। বিশেষ করে যখন তাদের অমলিন বংশমর্য্যাদা এমনভাবে বিপদগ্রস্ত সে মনে করে, তখন যে আপ্তার চোখের সংগে প্রাণটিও পবিত্র পিতৃ-প্রতীকের ওপর নির্ভর করবে প্রতিবিধানের জন্য এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই।

কিন্তু ফল তারও ভাল হ'ল না। দীপ্তাও যে, সে ইংগত না জানে এমন নয়। সে ত অসংগত কিছু করতে চায় নি, বরং তার বিপরীত! বন্দী-জীবনই তার ভাল লাগে না, তা বলে অন্যায় কোন কাজ ত সে সমর্থন করতে যায় নি। সে ক্ষোভে অভিমানে আরও বেশী দৃঢ় হ'ল যে, দিদি যেন কেমন—বোনের মনোভাব ধরতে পারে না এতটুকু। একদিন সে সত্য সত্যই দেখিয়ে দেবে—মেয়েদের য়্যাডভেঞ্চার মানে আত্ম-নির্ভরতা, আর কিছুই নয়।

দু'জনেই দু'জনের ওপর বিরক্ত হয়ে সে রাত্রে শয্যায় আশ্রয় নিলে। কিন্তু পরদিন প্রাতে মনে হ'ল কালো-মেঘ কেটে গিয়ে সব পরিষ্কার হয়ে পড়েছে। যেমন তাদের ছোট্ট সংসারে আরও কতবার হয়েছে। বাগানে দাওলি হাতে ফুল গাছের গোড়ায় মাটি আলগা করে দিতে দিতে—সূর্য্যরশ্মিতে চারিদিক উদ্ভাসিত দেখতে দেখতে দীপ্তার মনে হ'ল য়্যাডভেঞ্চারের যতই তারিফ সে করে থাক রাতের রহস্যময় মায়ায়, মেয়েদের বেলা যে তা খাটে তা ত সম্পূর্ণ তার নিজেরই বিশ্বাস হয় না। আর বাগানের ফুলেভরা গাছগুলির দিকে চেয়ে চেয়ে আপ্তা, দীপ্তার নিপুণ কৃষির তারিফ করতে করতে একেবারে স্থির সিদ্ধান্ত করে ফেল্‌লে ছোট বোনটি তার ছেলেমানুষীই করেছে রাতের বেলা, নইলে দীপ্তাও কিছুতে মেয়েদের য়্যাডভেঞ্চার বিশ্বাস করে না নিশ্চিত। আপ্তা ঠাউরে নিলে, যাদের জীবনে প্রণয়ের ছোঁয়া লাগে নি, তারাই এমন কথা বলে থাকে। জানে না ত। দীপ্তার দোষ কি! আপ্তার কথা হ'ল আলাদা। সে সংসারের দেখেছে অনেক কিছুই। তার পিছনে-ফেলে-আসা একটি দিন—জীবনের সেই পরম মুহূর্ত্তটির কথা মনে পড়ে যায়। কুড়ি বছর আগেকার সে জীবন। মা মারা গেছে। আপ্তার বয়স আর কত! তবু সে সংসারের নিপুণ কর্ত্রী।

একটি ছোকরা খেলোয়াড় ছিল তার পিতার সব চেয়ে প্রিয়। কি সুন্দর তার চেহারা—কতই না অমায়িক তার আচরণ। কথাগুলিও ছিল তেমনি মিষ্টিমধুর। "আপ্তা দেবীর তৈরী চা যেন অমৃত। আর বাড়ীতে খাই সেগুলো কি! তুলনাই হয় না। আপ্তা দেবীর সবেতেই যেন দরদের ছোঁয়া।"

ছোকরার নামটি ছিল বিভাষ।

সেদিন একটা বড় ম্যাচ জিতে এসে ভোজের ব্যবস্থা হ'ল পিতার আদেশে। খাওয়া-দাওয়ার পরে এ বাগানেই ত বলেছিল বিভাষবাবু—যে কথাটি শুনবার জন্যে আপ্তার পিয়াসী প্রাণ দিন গুনছিল।

কিন্তু খেলোয়াড় পিতার কাছে যখন এ প্রস্তাব পেশ হ'ল বিভাষের বন্ধুদের মারফত, তিনি মত দিতে পারেন নি। কৌলিন্যের বাধা ততটা বাজে নি তাঁর প্রাণে—যতটা বেধেছিল বয়সের বৈষম্য—আপ্তা যে বিভাষের চাইতেও এক বছরের বড়।

তা ছাড়া, সমস্যাও ছিল জটিল। ছোট্ট বোনটি সে সময় নিতান্তই শিশু। তাকে দেখবে কে? সংসার চালাবে কে? পিতা ত খেলা নিয়েই মত্ত। অন্য কিছু দেখবার অবকাশও ছিল না—সামর্থ্যও ছিল কি না সন্দেহ।

তাই এ বাগানেই একদিন বিভাষবাবুকে বিদায় দিতে

হ'ল চোখের জলে ভেসে। সে গেল ব্রহ্মদেশে বেতনভোগী খেলোয়াড় হয়ে। বিভাষ বলেছিল—"যাচ্ছি বটে বর্ম্মায়, কিন্তু হৃৎপিণ্ডটা উপড়ে রেখে গেলাম এখানে, আপ্তা দেবী। একদিন ফিরে আসব, সে আশাই আমায় বাঁচিয়ে রাখবে—সে-দিন আমার হৃদয় ফিরে পাব, তার আগে নয়। সে-দিন হত-ভাগ্যকে ভুলে যাবেন না।"

ভুলে যাবে আপ্তা? আপ্তা ত পাষাণী নয়—তার হৃদয় যে ক্ষতবিক্ষত, তার সংবাদ রাখে কে!

পিতা এবং পিতার লোকান্তরে তারই প্রতীক কাপ-মেডেল্ দৃঢ় বন্ধনে আপ্তাকে বেঁধে রেখেছে এ সংসারে। ছোট্ট খুকী দীপ্তাকে মায়ের স্নেহে মানুষ করেছে সে। দীপ্তা ত জানে না দিদির বুক-নিঙড়ান রক্তের মূল্যে তার আজিকার সজীবতা—কি করে জানবে-সে যে তখন তিন বছরের শিশু। প্রেমের দেবতা আর ত ফিরে আসে নি, অন্তরের হাহাকারে কুড়িটি বছর কেটে গেছে। আপ্তা প্রাণ ধরে তার মরমের গোপন কথাটি ছোট বোনকেও বলতে পারে নি। পাছে সে পবিত্র ব্রতের অমর্য্যাদা হয়—নিষ্ঠা ভঙ্গ হয়। এখনকার তরুণ-তরুণী ত বুঝবে না, পূজারিণীর সে অপার্থিব প্রেম-পূজা। তাদের দৃষ্টি যে আজ অন্য রকম। তবে কেমন করে সে ভরসা পায় কথাটি বলতে, বিশেষ করে দীপ্তাকে, যে নাকি আজীবন প্রণয়-ব্যাপারের সঙ্গে একেবারেই অপরিচিত। দীপ্তা ত আবোল-তাবোল বলবেই—জানে না ত কিছুই। শিক্ষক যেমন প্রথম শিক্ষার্থীর ভুল-ভ্রান্তি সহানুভূতির চোখে দেখে, তেমনই একটা দরদ-মাখা অনু-কম্পার দৃষ্টিতে ছোট বোনকে দেখতে সুরু করে সে।

সংসারের নানা কাজের ঝামেলার ভিতরও আপ্তার মনে মাঝে মাঝে আসে জিজ্ঞাসা—আচ্ছা ৪০ বৎসর বয়সেই কি মানুষ বুড়া হয়? জীবনের সব কিছুই কি নিভে যায়? না, না, ৪০ই হ'ল অভিজ্ঞতার বয়স। এ বয়সে ছাড়া কে পারে আপন জীবনকে সুনিপুণ হাতে রূপ দিতে যেমনটি তার কাম্য? দিশেহারা ছোটরা ত হুজুগেই ভেসে যায়।

বছরে দু'বার তাদের যেতে হয় ট্রেজারীতে কোম্পানী কাগজের সুদ তুলে আনতে। আপ্তাই যায়। দীপ্তাও ক'বার গেছে দিদির সঙ্গে। বুড়া খাজাঞ্চি মশাই তাদের পিতাকে চিনত। একটুও দেরী হয় না, বেগ পেতে হয় না কিছু, টাকা তুলতে। দীপ্তা সে সময় লক্ষ্য করেছে তাদের দেখে লোকগুলো ব্যস্ত হয়ে সরে যায়—তাদের পথ খোলসা করে দেয় সসম্ভ্রমে। কিন্তু আবার এক-একটা লোক বেহায়ার মত চেয়ে থাকে তাদের দিকে। দীপ্তার ভাল লাগে না। ইস্কুলেও ত দেখেছে এক-একটা মেয়ে অমনি তাকিয়ে থাকত তার দিকে এক নজরে। ও একটা রোগ, দীপ্তা ভাবে।

এবার ট্রেজারীতে যেতে হবে দীপ্তাকে। দিদি সাত দিন শয্যাগত জ্বরে। ডাক্তার বলেছে, সে যেন বিছানা ছেড়ে না ওঠে।

দীপ্তাকেই যেতে হবে। তাতে সে অসুখী নয়। তবু ত দুনিয়াকে জানান হবে, তারাও এ দুনিয়ারই জীব। দিদি রাতদিন শুধু বলছে ঐ এক কথা, খুব হুঁসিয়ার হয়ে যেন যায় সে। টাকা নিয়ে সোজা যেন বাড়ী ফেরে। রাস্তায় কারু সঙ্গে যেন কথা না বলে। কত রকম লোক থাকে—তাদের সঙ্গে কথা কওয়া ভদ্র-রীতি নয়।

টাকা নিয়ে বেরুল দীপ্তা ট্রেজারী থেকে। কোন গোল নেই সেখানে। ছোট্ট শহর হলেও এখানে সিনেমা আছে। সিনেমার রেস্তোরাঁ আছে—চা', কেক্। আবার আছে সরবৎ —আইস-ক্রীম।

ঐ যে মহিলা নিয়ে এক ভদ্রলোক ঢুকলেন। দীপ্তাও ত ঘেমে উঠেছে। উঃ কি গা-পোড়ান রোদ। সান-শেড কি রুখতে পারে সে ঝলসান গরম! দেখে আসবে দীপ্তা সরবতের ষ্টলটা? না, দিদি তা হ'লে হয় ত কত কথা বলবে। দেরী হ'ল কেন জিজ্ঞেস করবে।

কিন্তু সরবতের ষ্টলে ঢোকা দীপ্তার হ'ল না, সিনেমার মস্ত বড় সচিত্র বিজ্ঞাপন তার চোখ দুটিকে বন্দী করল। আগুনের কুণ্ড—একটি মেয়েকে উদ্ধার করছে এক বীর-পুরুষ! এতক্ষণে দীপ্তা গ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গে মুখোমুখী হয়েছে। হ্যাঁ, সে একাই যাবে সিনেমা দেখতে। ৩টার শো, আজ যে শনিবার।

কত রঙীন আশা নিয়ে ছবি দেখতে ঢুকেছিল, কিন্তু শেষটায় মেয়েটির যে উদ্ধারকর্ত্তার মূর্ত্তি সে দেখেছিল বিজ্ঞাপনে, প্লাকার্ডে, সেটা নায়ক হ'ল না—সেটা হয়ে পড়ল গুণ্ডা বদমাস। যাক, তাতে কি এসে যায়। গ্যাডভেঞ্চার হ'ল ত।

এবার সরবত। দীপ্তা আর ইতস্তত করলে না। দিদি একা একা বসে দুর্ভাবনায় কাতর হচ্ছে কি না, সে কথা ভাব-বার মত ফুরসৎ বা মেজাজ তার ছিল না। টেবিলে বসে দু-আনার আইস-ক্রীম অর্ডার দিলে। দীপ্তার যেন আজ কেমন একটা পরিবর্ত্তন এসেছে। সে যেন স্বপ্নের মাঝে চলে বেড়াচ্ছে। তার জীবনে, সিনেমা দেখা—সরবতের দোকানে বসে খাওয়া— এ যেন স্বপ্ন, কখন না জানি এর সোনালী মায়া টুটে যায় আর দেখতে পায় সে বসে আছে তার সেলাই নিয়ে চক্ষুশূলে রূপার কাপটার সমুখে।

আর একটা আইস-ক্রীম অর্ডার দিবে কিনা ভাবছে,—

"কিছু মনে করবেন না, যদি আপনি কথা বলতে না চান, সোজা সে-কথা বলে দেবেন দুঃখিত হব না, তবে যদি দোষ না ধরেন......"

কি মিষ্টি বিনয়-নম্র সুর—ভদ্রতা প্রকাশের কি সুন্দর ভঙ্গীটি—দীপ্তা চোখ তুলে ধরল—সুরের মালিকের কি আকুতি-ভরা চোখ দুটি যেন প্রাণ-ভিক্ষা চাইছে চরম দণ্ডের পর। দীপ্তার মন বলে, এ ত স্বপ্ন, স্বপ্নে কথা বললে কোন দোষ হয় না, দিদির মাষ্টারিয়ানা মনও এ-কথা মানতে বাধ্য। কিন্তু এখান অবধি পৌঁছে দিয়ে চিন্তা তাকে বর্জ্জন করে গেল। কিছুই সে মনে করতে পারছিল না, কোথায় কেন সে বসে আছে, আর কোন লোক তার সঙ্গেই বা কথা বলতে আসবে কেন!

দীপ্তার সচকিত ঘুলিয়ে-যাওয়া ভাব দেখে ভদ্রলোক

বললে—"অনেক সময় মৌনতা দিয়েই জবাব দেওয়া হয় অসম্মতি জ্ঞাপন না করে, কিন্তু আজকের এ পারিপার্শ্বিক তেমন মনে হচ্ছে না যেন।" বলেই দীপ্তার পাশের চেয়ারে সে বসে পড়ল।

—এ অসহ্য! দীপ্তার দীপ্ত মন্তব্য।

ভদ্রলোক হেসে ফেল্‌ল—এক ফালি মেঘ-মুক্ত চাঁদ যেন।

—না, অসহ্য নয়, অন্তত সত্যিকার সপ্রতিভ লোকের কাছে নয়।

দীপ্তার মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ভাবে বেশ কড়া কড়া দু'কথা শুনিয়ে দেবে। দিদি ঠিক বলেছিল মেয়েদের ঠ্যাডভেঞ্চার কলেজি কেতাবে, দীপ্তা এখন তা নিজেও স্পষ্ট বুঝতে পারছে। কিন্তু এ লোকটার সুরটিতে যেন কি একটা জিনিষ আছে, যাকে দূরে ঠেলে দেওয়া যায় না। তবু—

—আপনি কি মনে করেন আমি তা হলে পাগল, না আর কিছু?

প্রতিটি কথায় একটা অনাবশ্যক দাম্ভিকতা ফুটিয়ে তোলে দীপ্তা।

—যা-ই বলুন, এখন আপনাকে যেমন তেজস্বিনী আর সুন্দরী দেখাচ্ছে, গোড়ায় কিন্তু তেমন দেখায় নি। আমায় ক্ষমা করবেন, আমি কথা বলতে ওস্তাদ নই।

—ও, তা হলে আপনি ওস্তাদ দেখছি লোকের ধমক খেতে আর অপমান কুড়াতে।

—হয় ত তাও ঠিক! আবার এও ঠিক যে অনেক পুলক-শিহরণ পুরস্কার পেতেও।

পুলক-শিহরণ!—এ-কথা ত তাকে কেউ বলে নি আগে একদিনও। পুলক-শিহরণ আখ্যাটি ত সত্যই স্পন্দন-মুখর। দীপ্তা সে স্পন্দনের আমেজে অবগাহন করতে থাকে—যতক্ষণ তার প্রতিধ্বনি শিরায় শিরায় তরঙ্গায়িত হয়।

দমন করবার শত চেষ্টা সত্ত্বেও দীপ্তার মুখে হাসিরেখা ফুটে ওঠে। লোকটার দিকে তাকাবে না—এ পণ আঁকড়ে ধরে থাকলেও অলক্ষ্যে চোখ দুটি অবাধ্য হয়ে কেবলই তাকিয়ে থাকে অপর চক্ষুজোড়ার কেন্দ্রে কেন্দ্রে। আপ্তা যদি জানতে একথা তা হলে হয়ত বিষাদভরা স্থির দৃষ্টিতে রূপোর কাপটার পালিশে রং ধরিয়ে দিত।

—পুলিশ একটা ডাকতে হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। দীপ্তা যেন সত্যই চেয়ার ছেড়ে উঠতে চায়।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর আসে হয় পুলিশ, নয় ত আপনার স্বামীকে।

উত্তরটা তাকে চমকিত করে বিদ্যুৎপ্রবাহের তোড়ে দীপ্তার কণ্ঠস্বর বেজে ওঠে—আমার স্বামী-টামী নেই ত।

—তা হলে পুলিশই ডাকতে হবে। তা আপনার কষ্ট করতে হবে না, আমিই ডেকে দেব'খন। এখন আপনার যদি আপত্তি না থাকে একটা চুরুট ধরাতে পারি, কি বলেন?

—আপত্তি থাকলেও দেখতে পাচ্ছি আপনি তাতে নিরস্কুশ। আমি কি মনে করি না করি তাতে যে কিছু এসে যায় আছে আপনার কাছে একটি ত মনে হয় না।

ভদ্রলোক চুরুটে এক টান দিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে ধোঁয়ার দিকেই তাকিয়ে থাকে। ধোঁয়ার কুণ্ডলীকে আহ্বান করেই সে বলতে থাকে—স্বামী নেই, মানে অবিবাহিত। পাউডার মাখান না। লিপ্‌স্টিক্ ব্যবহার করেন না। আপনি বিংশ শতাব্দীর সাংঘাতিক তরুণী।

সাংঘাতিক তরুণী! দীপ্তা রায় একটি সাংঘাতিক তরুণী! এমন কথার উল্লেখও যে তার চিরপোষিত আত্ম-নির্ভরতার সঙ্গে ঠ্যাডভেঞ্চার তাণ্ডব নর্ত্তন সুরু করে চারিদিকে। দীপ্তা পরিষ্কার দেখতে পায় হলঘরের টেবিলের উপরে রূপোর কাপ-মেডেলগুলি পর্য্যন্ত সে নৃত্যে যোগদান করেছে। তা হলে হয়ত সে প্রকৃতই সাংঘাতিক নারী!

নীরবেই কাটে কিছু সময়।

'থাক্, ঝগড়া-লড়ায়েরও শেষ আছে। আমি উঠি। বাড়ী যেতে হবে, এমনি বড্ড বেশী দেরী হয়ে গেছে।"—বলে দীপ্তা ভাবে খাসা বিজ্ঞ ও সংসারী লোকেদের মতই কথা বলা হয়েছে। আত্মপ্রসাদের সঙ্গে সে উঠতে যায়।

এখনই না। বলে ভদ্রলোক, তার স্বাভাবিক ভদ্র সুরে, কিন্তু এমন একটা দৃঢ়তার সঙ্গে যে, সে-ই যেন দীপ্তার গতিবিধির নিয়ন্ত্রক অভিভাবক।

ক্ষিপ্র বিস্ময়-চকিত দৃষ্টিতে দীপ্তা তাকায়। লোকটির মুখে হাসি উঁকি মারে, যেন তাতে এক রহস্য জড়িত—যেন ভদ্রলোক দীপ্তার চেয়েও দীপ্তার সংসারের সকল খবর রাখে বেশী—যেন দুষ্ট হাসি বলতে চায়—'তুমি ত সেদিনের বালিকা, তোমার বাপ-দাদা চৌদ্দপুরুষে আমি চিনি।' দীপ্তা যেন পরাজিত মনে করে নিজেকে।

—একটি কথা শুধু আমি জানতে চাই। কোথায় আপনার বাড়ী?

—কেন, ঝাউ-টিলা, সেই যে জোড়া দেবদারু আর ঝাউ-গাছ।

—আপনার চোখ দেখেই বুঝেছিলাম, এ কি কেউ ভুলতে পারে।

আবার সেই হাসি—এবার যেন লোকটির কৌতুকের বৃথা চেষ্টা ধরা পড়ে যায় দীপ্তার চোখে। তা হোক লোকটার ধৈর্য্য আছে আর আছে কথার ভঙ্গীতে একটা অপরূপ রহস্যাবৃত কমনীয়তা—দীপ্তা এমনটি দেখেনি জীবনে।

—তবে চলুন। বাইরে আমার মোটর আছে।

—কোথায় চলব?

কেন ঝাউটিলা, আর কোথায়?

আবেগের সঙ্গেই কথা কয়টি বললে ভদ্রলোক এবং মহোল্লাসে তৃপ্তির সঙ্গেই পুনরায় আবৃত্তি করলে—

"ঝাউটিলা, নইলে আর কোথায়?"

দীপ্তার স্বপ্ন কয়েক মিনিট যেন তাকে পরিহার করে চলে গিয়েছিল, কিন্তু মোটর গাড়ীর উল্লেখের সঙ্গে আবার সোনালী মূর্ত্তিতে দেখা দিলে। এমন লোককে ত 'না' বলা যায় না। কই, তার মনে ত ভয় নেই কিছুই। তা ছাড়া এ ত আর দীপ্তার ঠ্যাডভেঞ্চার নয়। যে লোকের সঙ্গে কোন্দল করে সুরু হয় পরিচয়—যে লোক কড়া কথা শুনেও

যে যায় না—এমন আবহাওয়ার আর যা-ই হোক য়্যাড্‌ভেঞ্চার হতে পারে না।—এ স্বপ্ন—নেহাৎ আনকোরা অনাবৃত স্বপ্ন। মোটরের হর্নের সঙ্গে সঙ্গেই হয়ত দীপ্তার ঘুম ভেঙে যাবে। দীপ্তার আর হাসি পায়—স্বপ্নেও ত মজা দেখা যায় কম নয়।

মোটর চলতে থাকে। ভদ্রলোকের মুখে হাসি এবার হাস্যের চরমে ওঠে—

—আপনি কি ঘূর্ণন্ত চাকা বিশ্বাস করেন?

—কি?

—ঘূর্ণন্ত চাকা!

—সে আবার কি?

—কেন, এই যে গাড়ীর চাকা ঘুরে যাচ্ছে, এমনি একেবারে ঘুরে একটা পুরো পাক খাওয়া?

—কি জানি, বুঝলুম না। দীপ্তা মাথা নাড়ে, ভাবে, বড়লোক-গুলো ভদ্রলোকেরই বুঝি অমন এক-একটা ছেলে মানুষী খেয়াল থাকে। ছেলেবেলা ও লোকটা নিশ্চয় রাস্তায় রাস্তায় লাঠির ঘায়ে চাকা ঘুরিয়ে ছুটোছুটি করেছে। লোকটির মুখে কি যেন বিড় বিড় বকুনি। একটা কথা দীপ্তা স্পষ্ট শুনলে ভদ্রলোক বলছে—"আমার চেহারার নিশ্চয় ভোল বদলে গেছে, চেনবার মত আর কিছু নেই।"

দীপ্তা ভাবে, লোকটি এখনও সেই ছেলে বেলাকার কথাই ভাবছে। চেহারা বদল হয়েছে তাতে দীপ্তার কিছু বলবার নেই। সে লোকটির দিকে তাকায়। আবার চলন্ত গাড়ীর পাশের ঝোপঝাড় দেখে। প্রতিবার তাকায় আর একটা আকর্ষণের শক্তি প্রবলতর হয়। নীরবে যেন ভদ্রলোক প্রেম নিবেদন করছে—দীপ্তা যেন আর পারে না প্রতিরোধ করতে। হাঁ, লোকটির গাম্ভীর্য্য তাকে পাগল করে—দূরে সরে বসেছে তবু মনে হয় যেন লোকটি তার হাতখানি তুলে নিয়েছে হাতে—তার পুঞ্জ পুঞ্জ কেশে আঙুল চালিয়ে খেলা করছে। দীপ্তা যতটা পারে আরও সরে গাড়ীর ধার ঘেঁসে বসে। কিন্তু ও-লোকটি যেন দীপ্তার ভালবাসা দাবী করে তার যেন কতকালের অধিকার বলে—যেন দীপ্তা তাকেই আজীবন ভালবেসে এসেছে, আজ তাদের সে মিলন বাস্তবতার স্বপ্নে পুষ্পিত।

বড় ফটকের সম্মুখে গাড়ী থামল।

দীপ্তা বললে—এখানে কেন? ঐ কোণে যে ফটক, সেখানে।

—ও, এটুকু নতুন মনে হচ্ছে। তবু মনে হয় তোমার জন্য আমি যুগ যুগ প্রতীক্ষা করে আস্‌ছি।

বারুদস্তূপে যেন স্ফুলিঙ্গ পড়ল আচমকা। দীপ্তা কম্পিত কণ্ঠে বল্‌লে লোকটির কানে কানে—আমিও যেন যুগ যুগ প্রতীক্ষায় ছিলাম আজকের দিনটির জন্যে।

দীপ্তার স্বপ্ন তখনও ক্ষীণায়ু হয় নি। সে হিসেবেই আনলে না, ভদ্রলোক কি করে গাড়ী চালিয়ে এল ফটকে—দীপ্তার নির্দ্দেশ ছাড়া।

ভদ্রলোক একটা আরামের দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললে—কি বৃথাই না কেটেছে এতকাল!

মোটর থেকে নেমে, দীপ্তা অন্য দিন হ'লে বিষণ্ণ হয়ে পড়ত দিদিকে মুখ দেখাবে কি করে—সে কথা ভেবে। কিন্তু আজ তার কোন দ্বিধা নেই, কোন সঙ্কোচ নেই, নেই কুণ্ঠা এতটুকু।

মোটরের শব্দে—পদক্ষেপের ধ্বনিতে আপ্তা দেওয়াল ধরে ধরে এগিয়ে এল—দীপা, দীপা, এত দেরী.........

আর কথা বলা হ'ল না—সঙ্গে যেন কে রয়েছে।

দিদির কথায় বাধা দিয়ে দীপ্তা উত্তেজিত সকম্প কণ্ঠে বললে—দিদি লক্ষ্মীটি, শোন, দেখ কাকে এনেছি সঙ্গে করে! আজ দেখা পেলাম, আর নিয়ে এলাম আমার......

দীপ্তার ভাষা ফুরিয়ে গেল। লজ্জারুণ নতমুখী দীপ্তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগ্‌ল, জিহ্বা তার অসাড়।

আপ্তার শ্যেন দৃষ্টি দীপ্তাকে ত্যাগ করে সঙ্গীটির ওপর পড়ল—অস্ফুট সুরের ক্ষীণ রেশ বেজে উঠ্‌ল—বি-ভা-ষ-বা-বু!

এক মুহূর্ত্তে বিজয়ীর আনন্দোচ্ছ্বাস, পর মুহূর্ত্তেই চোখে অঞ্চল দিয়ে আপ্তা ছুটে পালাল। শয়ন কক্ষের মেঝেতে আছড়ে পড়ে আপ্তা কাঁদতে লাগল দুহাতে বুকটা চেপে ধরে। কিছুক্ষণ এভাবে কাট্‌ল। তারপর আপ্তা উঠে দাঁড়াল—চোখের জল তার বাষ্প হয়ে গেছে অন্তরের তাপে। দৃঢ় সংকল্পে ওষ্ঠ তার বদ্ধ হ'ল। মহিমময়ী নারী-মূর্ত্তিতে সে সিঁড়ি বয়ে নেমে এল।

দুর্ব্বলতার নামগন্ধ নেই—দিব্য হাসিমুখে সুস্ফুট কণ্ঠস্বরে সে বাড়ীর দেওয়ালে দেওয়ালে প্রতিধ্বনি তুললে—বিভাষবাবু!

সে দৃষ্টি—সে স্বর যেন বিভাষ সহ্য করতে পারে না। সে একহাতে নিজ চোখের ওপর আবরণ দেয়—তীব্রতা হতে রক্ষা পেতে। আর ফিস্ ফিস্ করে বলে—ছোট বোনটি, সেই যে এতটুকু খুকী ছিল, এখানে এসে বুঝলাম।

আপ্তা নীরব।

বিভাষ আম্‌তা আম্‌তা করে কি যে বলে গেল তা নিজেই বুঝতে পারলে না—বিশ বছর পরে কাল ফিরে এলাম বাড়ীতে। ওর চোখ দেখে মনে পড়ে গেল—ঠিক এমনি দুটি চোখই দেখবার আকুল তৃষা নিয়েই ত ছুটে এসেছি। মুহূর্ত্তে অন্তরের ক্ষত যেন মিলিয়ে গেল। এখন বুঝছি, এটি ছিল তখন ছোট্ট খুকী—কিন্তু আমি যে মানস প্রতিমা নিত্যপূজো করেছি, সে ত ঐ বোনটির চোখ—

—হ্যাঁ, বিশ বছরের প্রতীক্ষায় আমি যে বৃদ্ধা। বেশ, ভগবান আপনাদের আশীর্ব্বাদ করুন। দীপা আমার স্বর্গের দেবী—আপনি সুখী হবেন।

আর বেশী কথা বললে না সে। যেন তেমন গুরুতর কিছুই ঘটে নি তার জীবনে এমনি এক অপরিসীম ধৈর্য্য নিয়ে আপ্তা—দেবী আপ্তা রূপার কাপটি হাতে করে পালিশ করতে বসে গেল। জীবনের বাকি কটা দিনের সম্বল নয় নামান্য নয়—সুদীর্ঘ বিশ বছরের নিষ্ঠা। আজ ঘূর্ণন্ত চাকা পূর্ণ এক পাক ঘুরে এসেছে, আবার দ্বিতীয় পাক ঘোরে ঘুরুক, আপ্তা আজ নির্লিপ্ত।

সভ্যতার প্রভাবে ব্যাধি

শ্রীসুবোধ চট্টোপাধ্যায়

ব্যাধি উৎপাদনে সভ্যতার প্রভাব—রক্ষণশীলদের আলোচনার এক অতি লোভনীয় বিষয়। আলোচনার অবশ্য নানা প্রকার মতবাদেরই প্রচার লক্ষ্য করা যায়। শুধুই যে অবৈজ্ঞানিকই এই বিষয়ে নিজ নিজ অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন, এমন নয়, সময়ে বৈজ্ঞানিকও এই শত-নিন্দিত সভ্যতার প্রভাবকে রেহাই দেন নাই। কোনও চিকিৎসক বিশেষ কোনও ব্যাধির গবেষণায় ব্যাপৃত হইয়া যখন যুক্তি-তর্কের অতীত জটিল এক সমস্যায় উপনীত হইয়াছেন, তখন তিনি সভ্যতার কুপ্রভাবের উপরই সকল দায়িত্ব আরোপ করিয়াছেন। কোনও সাংবাদিক হয় ত বর্ত্তমান স্ব-জাতীয়ের তৃতীয় শ্রেণীর মর্য্যাদার অধোগতি আবিষ্কার করিয়া "সভ্যতা"কেই ইহার হেতু প্রতিপন্ন করিয়াছেন এবং পুনরায় প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইবার একমাত্র উপায়স্বরূপ অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছেন, সেই আদিম কালের জীবনযাত্রা। আবার এমন এক সম্প্রদায় রহিয়াছেন যাঁহাদের বিশ্বাস, বর্ত্তমান সভ্য জীবনধারা আমাদের কায়িক শ্রমহীন পেশায় নিযুক্ত রাখিয়া জাতি হিসাবে আমাদের অ-মানুষের পর্য্যায়ে পৌঁছাইয়া দিয়াছে; সুতরাং আমাদের প্রয়োজন হইল একমাত্র ব্যায়াম চর্চ্চার আশ্রয় গ্রহণ; কল্পিত "পটুতা"র অনিশ্চিত আদর্শের মোহে লুব্ধ করিয়া তাঁহারা চাহেন ব্যায়াম দ্বারা সমগ্র জাতিকে অ-মানুষ হইতে মানুষে পরিণত করিতে। আবার এক দল আছেন যাঁহারা আমাদের অবনতির যাবতীয় কারণকে রান্নাঘরের চারি দেওয়ালের মধ্যেই গণ্ডীবদ্ধ করেন প্রমাণ প্রয়োগের লম্বা তালিকার সাহায্যে।

এই খাদ্য-সংস্কারকগণ আমাদের খাদ্যের অপ্রচুরতা বা অপূর্ণতাকে যেমন আক্রমণ করা সহজ মনে করেন, তেমনই আবার আধুনিক পরিচ্ছন্নতাকেও লক্ষ্য করিয়া উহাকেই রোগের আকর বলিয়া প্রমাণিত করিতে চাহেন। এমন কি কয়লার বা গ্যাসের সাহায্যে রান্না অথবা কোনও খাদ্যের পচনশীলতা নিবারণের সাময়িক কৌশল—এই সকলও তাঁহাদের চক্ষুশূলে; তাঁহারা চাহেন আদিম জীবন-যাত্রার অজটিলতায় ফিরিয়া যাইতে।

এই প্রকারে সভ্যতার বিরুদ্ধে যে কোনও সমালোচনাই প্রকাশ করা হউক না কেন, সকল সময়ই এমন একটি মনোবৃত্তি উহার পশ্চাতে ক্রিয়া করে যে, আধুনিক মানব আজ সকলপ্রকারে অবনত এবং ক্রমশই নিম্নদিকে গড়াইয়া চলিয়াছে। কিন্তু সকল ঐতিহ্যের প্রতিপত্তি এড়াইয়া স্থিরভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে, সভ্যতার প্রভাব যে পরিমাণে মানব জাতির হিত-সাধন করিয়াছে, তুলনায় অহিত আনিয়াছে অনেক কম।

জনচিত্তে হামেশা যে ধারণা বলবৎ যে, আদিম কালে মানব ছিল স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্যে প্রতিষ্ঠিত এবং ব্যাধি হইতে প্রায় সম্পূর্ণ বিনিমুক্ত ছিল তাহার জীবন; ইহা অমূলক আবিষ্কার অথবা অনবধান অনুসন্ধানকারীর বিচারহীন ধারণা। আদিম কালের মানব এমন অনেক রোগের আক্রমণের গণ্ডীর ভিতর ছিল, বর্ত্তমানে সুসভ্যদেশ হইতে যে সকল ব্যাধি প্রায় নির্ম্মূল করা সম্ভব হইয়াছে। যদি আদিম কালের ও আধুনিক জনস্বাস্থ্য তুলনা করিবার তেমন নির্ভরযোগ্য কোন রোগেতিহাস পাওয়া যাইত, তাহা হইলে দেখা যাইত আধুনিক রোগপ্রবণতার জন্য আমরা যতটা হতাশ হই, আদিম কালের রোগ-প্রভাব ত অপেক্ষা খুব বেশী আশাপ্রদ ছিল না।

আদিমকালের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে যেমন একটা আ[illegible] মাত্রই আমরা পাই, বাকিটা কল্পনা দ্বারা পূরণ করা [illegible] তাহাদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও তেমনই। অনেক ব্যাধিরই বা[illegible] প্রকাশটুকুই জানিত ছিল, এই জন্য পৃথক পৃথক ব্যাধিকে [illegible] সাধারণ নামেই অভিহিত করা হইত। নাম সৃষ্টি হয় [illegible] ইহা দ্বারা কখনও ইহা প্রমাণিত হয় না যে, সে ব্যাধি-[illegible] যে দেহ-বিকার তাহাও ছিল না।

আদিম মানব আমাদের অপেক্ষা নীরোগ থাকুক আর ন[illegible] থাকুক, তথাপি ইহা কিন্তু অস্বীকার করা যায় না যে, সভ্য[illegible] প্রভাব আমাদের জীবনধারায় যে সকল পরিবর্ত্তন আন[illegible] করিয়াছে, তাহার ফলে কোনও কোনও নূতন ব্যাধিরও স[illegible] হইয়াছে।

চারিটি রোগকে সভ্যতার সহিত সংশ্লিষ্ট করা হয়—[illegible] ব্লাড-প্রেশার (রক্তচাপ), ডায়েবেটিস (বহুমূত্র), এক্সফ[illegible] থ্যালমিক গয়টার (গলগণ্ড) এবং পেপ্‌টিক ক্ষত—পরস্প[illegible] সহিত সম্পর্ক রহিত বলিয়া সাধারণত গণ্য করা হ[illegible] প্রত্যেক সভ্যদেশ হইতেই সংবাদ পাওয়া যায় যে, এই রো[illegible] গুচ্ছ বাড়িয়াই চলিয়াছে। সম্প্রদায় হিসাবে যে সকল [illegible] নারী মস্তিষ্ক চালনার কার্য্যে ব্যাপৃত তাহাদিগকেই এই রো[illegible] ভোগ করিতে দেখা যায় বেশী; অপর পক্ষে যাহারা কায়ি[illegible] শ্রমের কার্য্যে নিরত, তাহারা কিন্তু এই সকল রো[illegible] কবলে পতিত হয় খুবই কম। আবার উত্তরাধিকার-স[illegible] বংশবিশেষে এই ব্যাধি প্রসারলাভ করে পুত্র-পৌত্রাদি পর্য্য[illegible] এমন কথাও শুনিতে পাওয়া যায়, যদিও বাস্তবে এই পর[illegible] পরম্পরায় প্রভাব দূর-প্রসারী নয় বলিয়া চিকিৎসাশা[illegible] বর্ণিত। আবার ক্ষেত্র বিশেষে দেখা যাইবে এই চারিটি ব্যা[illegible] একযোগে একই ব্যক্তিকে আক্রমণ করে।

ডাঃ সি পি ডনিসন্ আফ্রিকার আদিম অধিবাসী[illegible] ব্লাড-প্রেশার পরীক্ষা করিয়াছেন। তিনি বলেন,—"১৫ বৎ[illegible] হইতে ৮০ বৎসর বয়স্কদের প্রায় এক হাজারটির ব্লাড-প্রেশ[illegible] আমি পরীক্ষা করিয়াছি। ৪০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত গড়ে [illegible] আদিম আফ্রিকানদের সহিত সুসভ্যদের ব্লাড প্রেশারে বিশে[illegible] কোন পার্থক্য দেখা যায় না। কিন্তু ঐ বয়সের [illegible] আফ্রিকানদের ব্লাড প্রেশার হয় নিম্নগামী। অপর প[illegible] সুসভ্যদের ভিতর উহা বাড়িতেই থাকে ৮০ বৎসর ব[illegible] পর্য্যন্ত।"

এস্কিমোদের ভিতর উচ্চ ব্লাড-প্রেশার পাওয়া যায় না [illegible] অনুপাতে কোন বয়সেই। জাপানে আবার চল্লিশের প[illegible] হইতেই উচ্চ ব্লাড-প্রেশার লক্ষ্য করা যায় এবং এই ব্যা[illegible] প্রসার ঐ দেশেই বিশেষ প্রকার অধিক। আমেরিকায় [illegible] আফ্রিকান বাস করে, তাহাদের বেলা দেখা যায় তাহাদের ব[illegible] অনুপাতে স্বাভাবিক ব্লাড-প্রেশারের পরিমাণ খাশ আফ্রি[illegible] বাসী অপেক্ষা বেশী, আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ হইতেও বেশ[illegible] কিন্তু আরও বেশী পার্থক্য ৫০ কিম্বা তদূর্দ্ধে, কারণ ত[illegible] বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকা প্রবাসী আফ্রিকানদের ব্ল[illegible] প্রেশারের বৃদ্ধি শ্বেতাঙ্গ অপেক্ষাও বেশী। কিন্তু ই[illegible]

রোপীয়ানদের পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, উহাদের শীতপ্রধান দেশেও যে প্রকার ব্লাড-প্রেশার, গ্রীষ্মপ্রধান দেশেও তাহাই. তাহাতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন নাই।

অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, উচ্চ ব্লাড প্রেশার আদিম জাতীয়ের ভিতর বিরল; আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, হার প্রসার বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায় শহর-বাসের প্রচলনে এবং আধুনিক পদ্ধতির শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান প্রবর্ত্তনের আরম্ভ হইতে। হার প্রভাব ইউরোপ ও আমেরিকায় যত বেশী এমন আর কোথাও নয়। আর একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, আফ্রিকায় হার প্রকোপ বেশী না হইলেও আমেরিকায় যে সকল আফ্রিকান রহিয়াছে তাহাদের ভিতর ইহা প্রবেশলাভ করিয়াছে য় শ্বেতাঙ্গেরই সমান।

উচ্চ ব্লাড-প্রেশার অবশ্য আয়ুষ্কালের শেষার্দ্ধে অর্থাৎ রিণত বয়সেই উদয় হয় সভ্য-মানবের ভিতর। ৩০ বৎসরের পূর্বে ইহার প্রকাশ বড় একটা দেখা যায় না। ৪০ বৎসরের পূর্বেও কদাচিৎই দেখা মিলিবে। পারিবারিক ইতিহাস র্য্যালোচনা করিয়া অনেক গবেষক এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে. ইহার আক্রমণ পুরুষ পরম্পরায় অধস্তন পুং-স্ত্রী কলকেই সমানভাবে লক্ষ্যীভূত করে। কোনও কোনও লে এইরূপ উত্তরাধিকারী বা উত্তরাধিকারিণীতে এই গের সংক্রমণের অনুপাত, যাহা পারিবারিক রোগ-প্রবণতার তহাস হইতে উদ্ধার করা গিয়াছে, তাহা শতকরা ৬০ ভাগের ম অন্ততঃ হইবে না।

দেহের ওজন এবং ব্লাড-প্রেশারের যেন একটা নিকট সম্পর্ক রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। যদি আহারের সহিত ইহার কোন যোগাযোগ থাকে, তাহা ব্যাপক অতি-পুষ্টির রিণাম বলা যাইতে পারে, তদ্ভিন্ন আহারের প্রভাব সামায়িক ছা আর কিছুই নয়। যাহারা বেশীর ভাগ নিশ্চল উপবেশনাত্মক কার্য্যে নিযুক্ত, বিশেষ করিয়া তাহারাই এই রোগের কবলে পড়িয়া থাকে; যে সকল ব্যবসায়ী মস্তিষ্ক চালনা করিলেও ব্যবসার জন্য যাতায়াত প্রভৃতি সচল কার্য্যেও লিপ্ত য়, তাহারা এবং শ্রমিকের দল এই রোগে সচরাচর আক্রান্ত হয় না। হকর্ত্রীরা অনেক সময় এই রোগ ভোগ করিয়া থাকেন। রোগী বা রোগিণী প্রায়ই ক্ষিপ্রকারী, বলিষ্ঠ আর উদ্বিগ্ন লক্ষণেরই নিদর্শন হইয়া থাকে এবং তাহার জীবনেতিহাসে মানসিক চাপ ও প্রচন্ড ঝক্কি ঝামেলার উল্লেখ পাওয়া যাইবে পুনঃপুনঃ।

ব্লাড-প্রেশারের বৃদ্ধির জন্য দুইটি কারণকে উৎপাদক—রূপে ধরা হয়। একটি হইল রক্ত-প্রবাহে টক্সিন (বিষ-বিশেষ)—ইহাই উদ্দীপকরূপে কার্য্য করিয়া থাকে; আর দ্বিতীয়টি হইল মনোবিকার উৎপাদক বৃত্তি, যাহার ফলে দৈহিক ভাসো-মোটর (Vaso-Motor) ক্রিয়া-পদ্ধতিতে অতিরিক্ত উত্তেজনা প্রতিফলিত হয়।

মানসিক উত্তেজনা, ক্রোধ, ভয়, বিষাদ, আনন্দ, লজ্জা প্রভৃতির আতিশয্য, কোন কিছু গোপন রাখিবার উৎকণ্ঠা, অপমান-বোধ, বাক্য-যন্ত্রণা প্রভৃতির দরুনও রক্তের চাপ বৃদ্ধি হয়, কারণ ভাসো-মোটর যন্ত্রসংক্রান্ত রক্তবহা নাড়ীতে এড্রেনেলিন বাহিত হয় মাত্রাধিক্যে; শুধু রক্তের চাপ বৃদ্ধি নয়, রক্ত-শর্করারও বৃদ্ধি ঘটে। জীবজগতে এই প্রকার উত্তেজনার ফলে প্রচন্ড শারীর ক্রিয়ার জন্যই প্রাণীকে প্রস্তুত করে।

কোন সভ্যজাতীয়ের ভিতর যে রক্তচাপ বৃদ্ধি সংঘটিত হয় অতি সহজে আর অসভ্য আদিম ভাবাপন্নদের দেহে সেই প্রকার হয় না—তাহার কারণ পাওয়া যায় এই ব্যাপারে যে, উপরি-উক্ত মানসিক উত্তেজনার পরে আদিম জাতীয়দের কঠোর শ্রম করিবার সুযোগ থাকে, যাহা দ্বারা সমগ্র দেহক্রিয়ায় একটা ভারসাম্য বা স্বাভাবিক সঙ্গতি আবর্ত্তিত হয়। কিন্তু সভ্যদিগের পক্ষে এই প্রকার প্রতিক্রিয়ার সুযোগ নাই। কায়িক-শ্রম দ্বারা রক্তপ্রবাহের উদ্দীপনা মাংসপেশীসমূহে পরিবেষিত হইয়া যায়, ষ্টিম ইঞ্জিনের অতিরিক্ত বাষ্প সেফ্‌টিভ্যাল্‌ভ পথে নিষ্ক্রমণের মত, কাজেই কিছু সময় পরে রক্ত-চাপের বৃদ্ধি হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া স্বাভাবিকে পরিণত হয়। সভ্যদের এই সেফটি-ভালভের সাহায্যলাভ করিবার তেমন কোন উপায় থাকে না। রক্তচাপের বৃদ্ধি কমিয়া যাইবারও সুযোগ হয় না কতক সময় পর্য্যন্ত।

গবেষকগণ এবং ক্লিনিশিয়ানগণ বলিয়া থাকেন যে, উচ্চ রক্তচাপের রোগীর ব্যক্তিত্বে কতকগুলি লক্ষণ থাকে একেবারে বিশিষ্টতাপূর্ণ। সাধারণত তাহারা অতি সহজে ক্রোধপ্রবণ হইয়া পড়ে অথবা মনে মনে অতি সামান্য কারণে চরম বিরক্তি পোষণ করে। তাহারা নিতান্ত অভিমানী ও অস্বাভাবিক রকম অভিভূত হইবার প্রবণতা প্রাপ্ত হয়। অকিঞ্চিৎকর হেতু পাইলেও বিষম ত্রুটি গ্রহণ করিবে, তুচ্ছ অভাবেও কুণ্ঠিত হইয়া পড়িবে, সহজেই হতবুদ্ধি হইবে। দৈনিক বিধিবন্ধ একেবারে গুরুত্বহীন কার্য্য করিতেও অতিরিক্ত রকম আগ্রহ ও সতর্কতা অবলম্বন করিবে, উপেক্ষার যোগ্য ব্যাপার লইয়াও অতিশয় মনস্তাপ ভোগ করিবে। বাড়ীতেই হউক, আর কর্ম্মস্থলেই হউক সকল কার্য্যই তাহারা অতিশয় ক্ষিপ্রতা ও ত্রুটিহীনতার সহিত করিবে, যাহা যে কোন সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। তাহারা খায় তাড়াতাড়ি, কথা বলে তাড়াতাড়ি। মোটের উপর শারীরিক সক্রিয়তার দিক হইতে তাহারা অস্বাভাবিক রকম ক্ষিপ্র এবং এই ক্ষিপ্রতার সহিত কার্য্য শেষ করিতে না পারিলে, প্রতিক্রিয়ায় মানসিক উৎকণ্ঠা আরও বৃদ্ধি পায়।

সভ্যতার পারিপার্শ্বিক আমাদের আহার প্রণালীতে কতকগুলি পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে। কৃষি-শিল্প প্রভৃতির উন্নতিতে খাদ্য-দ্রব্যের সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়াছে অগণিত। রান্নার বিভিন্ন পদ্ধতিতে আহার্য্য সামগ্রীর রকমওয়ারিত্বে ও মুখ-রোচকতারও বৃদ্ধি হইয়াছে শতগুণে; ফলে আহারের প্রতি প্রলোভন হইয়া পড়িয়াছে অসীম—আদিম যুগের সহিত তুলনায়। ইহার পরিণামে যে সভ্যদের অপেক্ষাকৃত গুরুতর আহার একেবারে রেওয়াজ হইয়া দাঁড়াইবে, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছু নাই।

আদিম যুগের কথা তৎসহ বর্ত্তমান অসভ্য জাতীয়ের আহার ব্যবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায়, এত প্রকার লোভনীয় খাদ্যের সুযোগ তাহাদের ছিল না, এখনও নাই। একঘেয়েমির দরুনও অতিরিক্ত ভোজন হইবার সম্ভাবনা

তাহাদের ভিতর অনেকাংশেই কম। খাদ্য সংগ্রহই যাহাদের ভিতর কঠোর শ্রমের কার্য্য, ভোজন-বিলাসের জন্য তাহাদের আরও কত বেশী পরিশ্রম করিতে হইবে, অথচ ফলাফল তখনও থাকিবে অনিশ্চিত; এমতাবস্থায় যে টায়টোয় দৈনিক ক্ষুধানিবৃত্তির মত যেমন তেমন খাদ্য সংগ্রহ করিয়াই তাহাদের তৃপ্ত থাকিতে হইবে, ইহা ত স্বাভাবিক। অপর দিকে সুযোগ সুবিধায় সভ্যদের অতি ভোজনই স্বাভাবিক - প্রলোভনে পড়িয়া অতি ভোজন এবং হজম শক্তি বৃদ্ধির নানা ঔষধ সভ্যদিগকে আদিম জাতীয়ের তুলনায় ঔদরিকেই পরিণত করে। আর সহজপ্রাপ্য বলিয়া আহার পরিমাণ সভ্যদের বাড়িয়াই চলে—বিশেষ করিয়া যদি কোন খাদ্যের প্রতি তাহাদের প্রবৃত্তি থাকে বিশেষ রকম, তাহা হইলে ত কথাই নাই।

যে সকল রোগ পুষ্টিকর খাদ্যের অপ্রাচুর্য্যে উৎপন্ন হয়, তাহা সভ্য জীবনযাত্রার প্রভাবে সৃষ্ট নয়। আবার চিকিৎসা-শাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে যে, অতিরিক্ত পুষ্টি এবং বহুমূত্রের ভিতর একটা যোগাযোগ রহিয়াছে সুস্পষ্ট; আর উচ্চ রক্ত-চাপের সঙ্গেও অতি পুষ্টির সম্পর্ক কম ঘনিষ্ঠ নয়।

ইহাতে অবশ্য সন্দেহ নাই যে, এই অবস্থায় সহনশীল মাত্রায় শারীরিক শ্রম সম্ভব হইলে সুফল প্রদান করে। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও ব্যায়ামের পূর্ণফল আশা করা যায় না, এবং ক্ষেত্র-বিশেষে সুফল প্রদান না করিয়া অনুচিত উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়া ক্ষয়ের পথই প্রশস্ত করিবে।•

সাধারণ গলগণ্ড রোগের আক্রমণের কোনও নির্দিষ্ট ধারা পাওয়া যায় না—প্রায় সকল জাতীয়ের ভিতরই ইহার কিছু-না-কিছু প্রভাব দেখা যায়—সুসভ্য অসভ্য বাছ-বিচার লক্ষ্য করা যায় না। টক্সিক এক্সফ্থেলমিক (ex-ophthalmic) গয়টার (গলগণ্ড) শুধু সভ্যজাতীয়েরই ব্যাধি বলিয়া চিকিৎসাশাস্ত্রে বর্ণিত।

রোগী-সংখ্যা পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারা যায় যে, দীর্ঘকালের পেপটিক ক্ষত আদিম জাতীয়দের ভিতর নাই এবং যে জাতি যে পরিমাণে সভ্যতার সংস্পর্শ পাইয়াছে, সে জাতি সে পরিমাণেই এই রোগের বর্দ্ধিত প্রভাবে পতিত হইয়াছে। পৃথিবীর শ্বেত-জাতীয়েরা এই রোগে যে সংখ্যায় ভোগে, তাহার অর্দ্ধেক সংখ্যাও পাওয়া যাইবে না শ্বেত ভিন্ন অন্য জাতির ভিতর। আর ক্রমশঃই ইহার প্রভাব সভ্য জগতে বৃদ্ধি পাইতেছে। অনুমান করা হয় যে, গ্রেট ব্রিটেনের প্রাপ্ত-বয়স্ক অধিবাসীর ভিতর শতকরা ১০জন এই রোগে কোন না কোন বয়সে আক্রান্ত হয়। শহরবাসীকে সচরাচর আক্রমণ করিলেও এই রোগ যেমন দেখা যাইবে মস্তিষ্কচালনায় নিরত-দিগের ভিতর তেমনই দেখা যাইবে দেহে ও মনে সচল ক্রিয়া-শীলদের ভিতরও।

তথাপি ব্লাড-প্রেশারের বৃদ্ধির ন্যায় এই রোগপ্রবণ ব্যক্তির জীবনেতিহাসেও মানসিক উত্তেজনা বা আঘাত একটা প্রধান লক্ষণ। তবে ইহাই সব নয়, ইহার অতীত শারীর-গঠন—প্রকৃতিগত একটা প্রবণতাও বর্ত্তমান থাকিতে দেখা যায় এবং উহার প্রধান নিদর্শন হইল অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়াশীলতা।

প্রখর অনুভূতি, সহজ অভিভূতত্ব ও অসহিষ্ণুতা বিশেষের বিশিষ্টতা বলিয়া আমরা প্রায়ই দেখি এই সকল বিশিষ্টতার প্রভাবে আবার যে পরিবার য প্রতিক্রিয়াশীল, সেই পরিবারেই সভ্যতা-সংশিলষ্ট (বিশেষ করিয়া ব্লাড-প্রেশার ও পেপ্টিক ক্ষত) বেশী এবং এই কারণেই সময়ে ইহাও দেখা যায় রোগীর উপর যুগপৎ চারিটি ব্যাধিরই আক্রোশ প

আদিম জাতীয়কে যে এই সকল রোগের প্রভা থাকিতে দেখা যায়, তাহার প্রধান কারণ হইল 'মান তাহাদের প্রায় অজানিতই বলিতে হইবে। তাহার লক্ষ্য যেমন অনুচ্চ, তেমনই অসাফল্যের প্রতিক্রিয়াও

আদিম জাতীয়েরা ব্যক্তিগত গোপনতা বা সুযোগ অতি অল্পই পায় জীবনে। সমগ্রটি পরি নয়, সমগ্র সম্প্রদায়ই বসবাস করে—জীবনযাপন সকলে মিলিয়া একটি মাত্র ব্যক্তি; জনেজনের স্বতন্ত্র থাকে না; তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা, রুচি, এক। আহার সংগ্রহে একজন অপারগ হইলে, অ তাহা পূরণ করে। তাহাদের জীবনে—ঐশ্বর্য দারিদ্র্যের প্রভেদ নামমাত্র। দ্রব্য-বিনিময় অবস্থা প্র যেখানে 'ক্রয়'-য়ের স্থান অধিকার করিয়া থাকে, সেখানে প্রভাব বা স্বরূপ অনুভূত হইতে পারে না।

ইহার সহিত তুলনায় সভ্যদের মানসিক চাপ বেশী তাহা একটু চিন্তা করিলেই ধরিতে পারা যা ব্যক্তির জীবন—প্রথমত জটিল অর্থনীতিক সমস্যার দ্বিতীয়ত সামাজিক রীতি-নীতি, তৃতীয়ত পারিবারি কানুন, চতুর্থত তাহার চাকুরী বা ব্যবসার জগ বিধান, পঞ্চম রাজনীতিক ও ষষ্ঠ ধর্ম্ম মত। ইহা একটি ক্ষেত্রে অসাফল্য যে মনোবিকারের উদ্ভব করি শতাংশের একাংশও আদিম জাতীয়কে বরদাস্ত ক না সমগ্র জীবনে। তদুপরি যদি সভ্য ব্যক্তি সকল অসাফল্যে পীড়িত হয়, তবে সে মানসিক আঘাতে প্রভাবেই পতিত হয়।

যেখানে অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়াশীলতাই রোগের সেখানে আদিম জাতীয়ের সে পীড়ার গণ্ডীতে পড়িবার সুতরাং মানসিক এবং স্নায়বিক প্রতিক্রিয়ায় যে স অধিকতর প্রবণ, ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ থা

কাজেই সভ্য জাতির যে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রবণতা তাহা শুধু ব্যায়াম বা শুধু খাদ্য সংস্কার হইবে না। আদিম জীবনে ফিরিয়া গেলে সভ্যতার ব্যাধি হইতে মুক্তি মিলিলেও, সভ্যতার প্রভাবে অধুনা অন্য যে শত-সহস্র মারাত্মক ব্যাধির কবলে পড়ি তাহার জন্যও পুনরায় সভ্যতাকে বরণ করিয়া লইবে তাহা ছাড়াও যে উচ্চ সংস্কৃতির মালিক সভ্যজাতি তাহার পক্ষে সে সংস্কৃতির প্রভাব বর্জ্জন করাও স কোনক্রমেই। সেই জন্যই সভ্য জীবনযাত্রায় প্রতিকার খুঁজিতে হইবে মধ্যপন্থায়—অর্থাৎ, যে অ উপর রোগের ভিত্তি, সে আতিশয্যকে আয়ত্তে চেষ্টাই করিতে হইবে।

অবিশ্বাসী

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

(১৫)

অনীতা আলোকনাথের নৌকায় স্থান পাইল।

পাছে তাহার সেবা-যত্নের কোন ত্রুটি হয়—এজন্য ...লোকনাথ একজন দাসী নিযুক্ত করিলেন।

অনীতার পিতৃ-পরিচয়, গ্রামের নাম, আলোকনাথ খুড়ার পূর্ব্বেই শুনিয়াছিল। কিন্তু সহসা তাহাকে সেখানে ...ইয়া দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করিল না। সাহিত্যের জগতে ...রুণ কবি হইলেও এটুকু সাংসারিক জ্ঞান তাহার ছিল ...র্ষিতা নারী সম্বন্ধে বাঙলার হিন্দু-সমাজ অত্যন্ত ...শীল। পিতামাতা স্নেহময়, কিন্তু সমাজ কঠিন। ...দের আরও পাঁচটি সন্তান আছে এবং সেগুলির মুখ ...য়াই বুকের এ হাড়খানি তাঁহারা অনায়াসে তুলিয়া ...তে পারেন,—তাতে যত ব্যথাই বাজুক না কেন! আর ...খানগুলির সে আঘাত—এই বালিকা যদি সহ্য করিতে পারে?

কাজেই অনীতাকে নৌকায় রাখিয়া আলোকনাথ নিজে ...ল এ বিষয়ের নিষ্পত্তি করিতে।

চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিল, কেন মনুষ্যত্বের প্রবৃত্তির ...জনায় মানুষে এমন সর্ব্বনাশ করে। এই যে ... ...তি ...রূপো পরিপ্রান্ত আদরিণী মেয়েটির মত নিত্য ... ...লে মানবের সৌন্দর্য্য-পিপাসু চিত্তকে শান্তিতে, ...বে ভরাইয়া দিতেছে, ইহার আনন্দ-স্পর্শ কি তাহার ...ল ইন্দ্রিয়ের মর্ম্মকোষে আনন্দ রাগিণী ধ্বনিয়া তুলে না? ...ল আকাশ প্রভাত সন্ধ্যায় বর্ণ-বিভ্রমে বিকশিত, পদতলে ...মল শষ্প সোহাগে কণ্টকিত, ফলভারে অবনত তরু, ...ভারে সজ্জিত শাখা—স্রষ্টার নির্ম্মল হাসিটি পত্রে-পুষ্পে জলে-স্থলে—কাননে-কান্তারে—গোধূলি-ঊষায়, কত বিচিত্র ...রূপ রূপেই না ফুটিয়াছে, তবু মাটির কদর্য্য আকর্ষণ ...নুষের ভোগ-পঙ্কিল চিত্তকে প্রতিনিয়ত নিম্নগামী ...রিতেছে! প্রকৃতিকে সে বিলাসের দাসী করিতে চাহে। ...বিনয় পবিত্র যা কিছু ভোগের আহুতি মুখে জ্বালাইয়া ...য়াই ... ...

কে জানে,—স্থূলে ইন্দ্রিয়ের কদর্য্য কামনা দিনে দিনে ...তিলে তিলে মানুষের যাহা কিছু সদ্‌বৃত্তি, যাহা কিছু ...ন্দর, তাহাকেই ক্লেদাক্ত পঙ্কিল আলিঙ্গনের পেষণে ...শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যা করিতে চাহিতেছে কিনা? কাব্যে, ...াহিত্যে আজ এই উদগ্র কামনার জয় গান নিনাদিত। তাহা ...কি যৌবনেরই শাশ্বত রূপ!

সৃষ্টি করিবার যখন কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, কিম্বা ...ঙ্কিত লেখনী দাস-জীবনের পরম অনুদ্বেগময় সুখের ...স্বপনায় মাতিয়া উঠে, তখনই তাহার মুখে ধ্বনিয়া উঠে এই ...র মিথ্যা স্তুতি, অগৌরবময় আত্মপ্রবোধ, আধ্যাত্ম-দম্ভের ...জয় ভেরীনাদ!

সুন্দরের একরূপ মৃত্যু। দাস-জীবনের পক্ষে তাহা ...অনিবার্য্য বাহুল্যমাত্র। নরনারী যৌবনে যে দুঃসহ আবেগে প্রমত্ত হইয়া পৃথিবীকে নব নব সম্পদশালী করিতে স্ফীত-বক্ষে, সদম্ভে জয়যাত্রার আয়োজন করে, সে আয়োজন যদি সত্যের সূর্য্য কিরণে উদ্ভাসিত না হইয়া এমনই মিথ্যা মেঘের আবিলতায় কুহেলিকার সৃষ্টি করিয়া পথভ্রান্তকে বিপথে টানে ত কি প্রয়োজন সে অগ্রগতির? তাহাতে তাহার গর্ব্বই বা কিসের? না-ই বা জ্বলিল প্রেমের বাতি, না-ই বা হইল কাব্য-রসে অন্তর ভরপুর, না-ই বা আসিল অজানা-অচেনা প্রিয়া—একদা এক বসন্তক্ষণে দখিনা বায়ুতে অঞ্চল উড়াইয়া ফুলের বুকে চরণ রাখিয়া আকাশের নীলিমা চক্ষুতে ভরিয়া ও বীণার ঝঙ্কার কণ্ঠে বাঁধিয়া? অভাব, আর্ত্তনাদ কম্পিত অন্তর মুমূর্ষুক্ষণে ধুঁকিতে ধুঁকিতে না-ই বা দেখিল প্রেমের স্বপ্ন? জগৎ-সাহিত্যে আমাদের সাহিত্য স্থান যদি না-ই পায়, তাহাতেই বা ক্ষতি কি, যদি না উচ্চ আসনে সকলের সঙ্গে হাত ধরাধরি করিয়া আমরা বসিতে পারি!

আলোকনাথ গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল।

অনীতার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, "আপনি যদি বলেন তাঁকে এখানে পাঠিয়ে দিতে পারি।"

তিনি ম্লান মুখে কপালে হাত দিয়া বলিলেন, "আপনি মহৎ, কিন্তু পাড়াগাঁর কথা হয় ত ঠিক জানেন না? আমাদের সমাজ—"

আলোকনাথ বলিল, "সমাজের ওপর আমার অশ্রদ্ধা নেই। হয়ত পুরাতনের কিছু গলদ, কিছু ত্রুটি এর আছে, তবু একে আমি শ্রদ্ধা করি উচ্ছৃঙ্খলতার পরিপন্থী বলে। যাই হোক, আপনার মেয়ে নিষ্পাপ, একথা যদি সকলের সম্মুখে মুক্তকণ্ঠে বলতে হয়,—আমি বলব।"

অনীতার পিতা শুষ্ক মুখে বলিলেন, "আপনি বসুন, আমি আসছি।"

আলোকনাথ বসিল।

দুই-তিন মিনিটের মধ্যে অনেকগুলি প্রবীণ ব্যক্তি হুঁকা হাতে গামছা কাঁধে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনীতার পিতাও ফিরিয়া আসিলেন।

আলোকনাথের পুনঃ পুনঃ শপথ সত্ত্বেও অনীতাকে গ্রহণ করিতে কেহ অনুমতি দিলেন না।

সকলেই এক বাক্যে বলিলেন, "আপনার কথা সত্য বলেই মেনে নিচ্ছি, কিন্তু স্বেচ্ছায় হোক, আর অনিচ্ছায় হোক, কন্যার শাতিত্য দোষ ঘটেছে। এ অবস্থায় তাকে সমাজে স্থান দেওয়া অসম্ভব।"

আলোকনাথ বলিল, "আগেই বলেছি, সমাজকে আমি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু মানুষের শুচিত্বকে এত ক্ষণভঙ্গুর মনে করা উচিত নয়। ভেবে দেখুন দেখি—মেয়েটি কোন দোষে দোষী নয়, অথচ তার অবস্থা—"

কে একজন বলিল, "তার কর্ম্মফল।"

আলোক হাসিয়া বলিল, "দুঃখ এই, কর্ম্মফল মানুষ নিজের হাতেই তৈরী করে এবং তার উপর ... ... দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হবার বৃথাই চেষ্টা করি! যদি তাকে গ্রহণ

করা যায়—তার কর্ম্মফলে হয়ত একটা জীবন নষ্ট হ'য়ে যাবে না। কিন্তু তাকে পরিত্যাগ করার ফল, না, না;—এ আমি ভাবতেই পারি না।"

বলিয়া অনীতার পিতার পানে চাহিয়া বলিল, "আপনি কি বলেন? মেয়েকে এতটুকু বেলা থেকে মানুষ ক'রে, এই অনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মফলের মুখে অনায়াসে ছেড়ে দিতে পারেন? একবারও ভাববেন না—তার সুখ-দুঃখের কথা? একবারও ভাববেন না—আজীবন তাকে কত আদরে, কত সোহাগে লালন-পালন ক'রে এসেছেন?"

অনীতার পিতা অশ্রুপূর্ণ নয়নে সমাগত জনমণ্ডলীর পানে চাহিলেন।

তাঁহারা মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "উহুঁ, এ অসম্ভব।" বলিয়া একে একে স্থান ত্যাগ করিতে লাগিলেন।

অনীতার পিতা অসহায়ের মত আলোকনাথের পানে চাহিয়া বলিলেন, "আমি কি বলব আলোকবাবু, আমার হাত-পা বাঁধা। যদি পারেন ত তাকে বলবেন, একটু বিষ কিনে খায়, কিম্বা নদী আছে—" বলিতে বলিতে হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

আলোকনাথ বিরক্ত হইয়া কহিল, "ছোট্ট মেয়ে—যে জীবনকে এখনও ভাল ক'রে জানে নি—চেনে নি, তাকে এসব উপদেশ দেওয়া খুবই সহজ, নয়? কাঁদিবেন না, কাঁদলে হয়ত আপনার স্নেহ যথেষ্ট আছে ব'লে ভুল ক'রব, কিন্তু মানুষের মর্য্যাদা ওতে একটুও পাবেন না। ছি! এমনি দুর্ব্বল হ'য়ে গেছে আমাদের মন যে, অলীক ভয়ের কল্পনায় সত্যকে পর্য্যন্ত স্বীকার ক'রতে পারে না! অথচ অন্তরে তার অক্ষম স্নেহ অপর্য্যাপ্ত!"

অনীতার পিতা মুখ তুলিয়া আলোকনাথের পানে চাহিতে পারিলেন না।

আলোকনাথ বলিয়া চলিল, "অথচ আসবে একদিন, যখন এ সব মিথ্যা মোহ, দুর্ব্বলতা, ভয় অন্তরে থাকবে না। সমাজ লুপ্ত হবে না, কিন্তু নব ধর্ম্মের কিরণ সম্পাতে তা উজ্জ্বল হ'য়ে উঠবে। পৃথিবী সুন্দর হ'য়ে উঠবে মানব ধর্ম্মের নবীন শ্লোকে, নবীন বেদে, নবীন ভাষ্যে। গ্লানি, আবর্জ্জনা ধৌত ক'রতে সে নির্ম্মল স্রোত প্রবল বেগে আসছে।"

আলোকনাথকে গমনোদ্যত দেখিয়া অনীতার পিতা বলিলেন, "কোথায় আছে সে?"

আলোকনাথ মুখ ফিরাইয়া রূঢ়স্বরে বলিল, "এখন এ প্রশ্নেরও আপনার অধিকার নেই।" বলিয়াই মনে হইল, কথাটা রূঢ় হইয়া গেল। অকারণে এই অসহায় সমাজভীত দুর্ব্বলকে আঘাত দিয়া লাভ কি?

পরক্ষণেই সে কোমল কণ্ঠে কহিল, "আমার নৌকায় আছে। যদি দেখতে চান, আমার সঙ্গে আসুন।"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অনীতার পিতা বলিলেন, "না, আলোকবাবু, আর অপরাধের বোঝা বাড়াব না। সে সুখে থাক—শান্তিতে থাক; হতভাগ্য বাপ-মার কথা ভুলে যাক। আপনি—আপনি হতভাগীকে একটু দেখবেন।"

আলোকনাথ আর কোন কথা না বলিয়া তাঁহাকে নীরবে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল।

নৌকায় আসিয়া অনীতাকে ডাকিয়া বলিল, "আ[illegible] কাছে কোন সঙ্কোচ ক'রবেন না। বলুন, এখন কো[illegible] থাকতে চান?"

অনীতা উত্তর না দিয়া কাঁদিতে লাগিল।

আলোকনাথ বুঝিল প্রশ্নটা সময়োচিত হয় নাই। নে[illegible] নীড়হারা অক্ষম সন্তান এখনও নীড়ের মায়া ভুলিতে [illegible] নাই। এখনও অন্তরে তাহার বেদনা! সুতরাং সে আর [illegible] প্রশ্ন না করিয়া নীরবে নৌকার তলে জলের ছল্‌ছল্‌ [illegible] একমনে শুনিতে লাগিল।

খাতার পাতা বন্ধ পড়িয়া রহিল, আলোকনাথ পরি[illegible] ধরণীর কোন সৌন্দর্য্যই তুলিকায় ধরিতে পারিল না।

মনের মধ্যে যে প্রবল সমস্যা যুক্তি-তর্কের জাল বি[illegible] করিয়া তাহার অনভিজ্ঞ কল্পনাপ্রয়াসী চিত্তকে বাস্ত[illegible] কঠিন ভূমিতে দাঁড় করাইয়া দিয়া আর সব ভুলাইয়া দিয়াছে, [illegible] করিয়া তাহার সহজ সমাধান করিবে এই চিন্তাতেই সে [illegible] তন্ময়।

দিন দুই পরে, একদিন দাসীকে দিয়া আলোক[illegible] তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইল।

অনীতা আসিলে বলিল, "দেখুন, একটা উপায় আ[illegible] ঠিক করেছি। আপনাকে ক'লকাতায় নিয়ে গিয়ে কোন কলে[illegible] ভর্ত্তি করিয়ে দেব। বোর্ডিংয়ে থাকবেন। তারপর শি[illegible] শেষে আপনার পথ আপনি বেছে নিতে পারবেন, এ ভর[illegible] আমার আছে।"

অনীতা নীরবে ঘাড় হেলাইয়া সম্মতি জানাইল।

আলোকনাথ পুলকিত হইয়া বলিল, "কতদূর পড়েছে[illegible] যদি জানতে পারি—"

অনীতা অসঙ্কোচে তাহার যৎসামান্য বিদ্যাচর্চ্চা[illegible] কাহিনী বলিয়া গেল।

আলোকনাথ বলিল, "পাড়া গাঁ হ'লেও শিক্ষা আপন[illegible] মন্দ হয় নি। যাই হোক, মন স্থির ক'রে পড়তে পারবেন ত[illegible]

অনীতা মাথা নাড়িয়া কহিল, "পারব।"

আলোকনাথ কহিল, "বেশ, মামলাটা মিটে যাক, প[illegible] আমরা কলকাতায় যাব।"

অনীতা কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, "মামলাটা কি এম[illegible] মিটে যায় না?"

আলোকনাথ উৎসুক হইয়া প্রশ্ন করিল, "কেন, সে [illegible] শাস্তি পায়—এ আপনার ইচ্ছে নয়?"

অনীতা নত মুখে উত্তর দিল, "আমাকে গিয়ে সা[illegible] দিতে হবে ত?" লজ্জায় তাহার সারা মুখ আরক্ত হই[illegible] উঠিল।

আলোকনাথ দীপ্ত কণ্ঠে কহিল, "হাঁ, হবে। যে ন[illegible] পশুরা নারীর লজ্জা-সম্ভ্রম রাখতে পারে না, তাদের শা[illegible] দিতে হ'লে মনকে কঠিন ক'রতে হয়। আর—আর—শা[illegible] না হ'লে কি আপনার লজ্জা কিছুমাত্র কমবে? লাভে হ'[illegible] তার সাহস যাবে বেড়ে। আরও অবাধে সে সমাজের ওপ[illegible] জুলুম ক'রবে।"

অনীতা মৃদুস্বরে বলিল, "আমায় আপনি মাপ করু[illegible] সাক্ষীর কাঠগড়ায় আমি কিছুতেই দাঁড়াতে পারব না।"

আলোকনাথ বলিল, "যাতে না দাঁড়াতে হয়, সে ব্যবস্থা আমি ক'রব। কিন্তু শাস্তি ওর হওয়া চাই।"

কথা শেষে আলোকনাথের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত করিয়া সে শুষ্ক বালুচরের পানে চাহিয়া রহিল।

অনীতা আর কোন কথা বলিতে সাহস করিল না।

কয়দিনের মধ্যে অনীতা আলোকনাথের সঙ্গে সহজ সম্পর্ক পাতাইয়া লইল। এ সব বিষয়ে নারীর জন্মগত পটুতা ও সুকোমল সহজাত বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা আছে।

একদিন অনীতাকে 'আপনি' বলিয়া ডাকিতেই সে অনুযোগ করিয়া বলিয়াছিল, "আপনাকে আমি দাদা ব'লে ডাকি, আর আপনি কেন আমায় 'আপনি' ব'লছেন?"

আলোকনাথ সবিস্ময়ে তাহার পানে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিয়াছিল, "আচ্ছা—তাই হবে।"

অনীতা আলোকনাথের ছোট-বড় কাজগুলি পরিপাটি-রূপে সুসম্পন্ন করিত; কেবল রন্ধনের ভারটা সে নিজে লয় নাই।

কিন্তু এত সুশৃঙ্খলতা সত্ত্বেও কাব্যের পৃষ্ঠা ভরিতেছিল না।

প্রত্যূষে উঠিয়া সে দেখে, নৌকার পাটাতনের উপর ছোট টেবিলটি পাতা, তার বুকে খাতা কলম কাচের পেপার-ওয়েট। চেয়ারখানা পূর্ব্ব-মুখ করিয়া পাতা; আলোকনাথ সেখানে আসিয়া বসে। পূর্ব্ব দিকে চাহিয়া সূর্য্যের উদয়, আকাশের বর্ণ-বিকাশ দেখে। নদীর ছলছল জল-তরঙ্গ ও বনের মৃদু বায়ুবিকম্পিত সর্ সর্ শব্দ শোনে। প্রাণ হয়ত প্রকৃতির বৈচিত্র্য লীলায় আনন্দে উদ্বেল হইয়া নব নব রচনার উদামে চঞ্চল হয়, কিন্তু ছন্দের পর ছন্দ মিলাইয়া কবিতার মোহন মালা সে গাঁথিতে পারে না। অনীতা তেমন সুন্দরী নহে যে, কাব্যময়ীর স্থান অধিকার করিয়া সমস্ত কল্পনাকে গ্রাস করিবে! আর, বিপন্না তরুণীর প্রতি আলোকনাথের মমতাময় হৃদয় যৌবনের অকারণ উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া দু-দণ্ডের মোহ-নীড় রচনা করিতে বসিতে—কবি হইলেও তেমন মনোভাব তাহার কোন কালে ছিল না।

বিপন্নার সামান্য ব্যথায় সে চঞ্চল হইয়া উঠিত। নর-পশুদের কাম-লালসার আগুনে না জানি আরও কত শত অসহায়া প্রতিদিন এমনি নিৰ্ম্মমভাবে জীবন আহুতি দিতেছে। সমাজ ইহাদের রক্ষার জন্য অঙ্গুলি মাত্র উত্তোলন করিতে পারে না, অথচ পরিত্যাগের বিধান কঠোরভাবেই দেয়। কাপুরুষ ক্লীব-পুরুষ পরাধীনতার দুশ্চ্ছেদ্য শৃঙ্খলে এমনই করিয়া সৰ্ব্বদিক দিয়া আপনাকে পাকে পাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। নির্য্যাতনে তার পশু-প্রবৃত্তি প্রবল, রক্ষায় সে অসমর্থ!

"দাদা।"

"কি অনীতা?"

'কৈ, কিছুই ত লিখলেন না?"

আলোকনাথ কহিল, "কি জানি বোন, লেখার সামর্থ্য আমি হারিয়ে ফেলেছি। আমার আগেকার জীবনের সঙ্গে এ জীবনের যেন আকাশ-পাতাল প্রভেদ।"

অনীতা কুণ্ঠিতস্বরে বলিল, "আমার জন্যই আপনার সব গেল!"

আলোকনাথ হাসিয়া বলিল, "কি গেল অনীতা! আমার ছিল-ই বা কি? মাটির সম্পর্ককে ফাঁকি দিয়ে আকাশের সঙ্গে মিতালী পাতিয়েছিলাম। হাল্কা ফানুস খেয়ালের বাতাসে উড়িয়ে ভেবেছিলাম, এমনি আকাশ-কুসুম নিয়েই বুঝি পৃথিবীর বুকে সম্পদ ভোগ করব! কিন্তু বোন, এযে বিলাস—তা আমার মনে হয় নি! ফাঁকির ফানুস দমকা হাওয়ায় ফেঁসে গেছে, মাটির মা আমায় দু বাহু বাড়িয়ে কোলের দিকে টানছেন। তাই যেখানকার খাতা-কলম, সেই-খানেই পড়ে থাকে, কাব্যের অলীক ফুল আর ফোটাতে পারি না।"

অনীতা সব বুঝিল না। শুধু পূর্ব্ববৎ কুণ্ঠিতস্বরে বলিল, "যাই হোক দাদা, এ ক্ষতি বড় কম নয়।"

আলোকনাথ তেমনি মৃদু মধুর হাসি হাসিয়া বলিল, "সত্যিই অনীতা, এ ক্ষতি আমি সহ্য ক'রতে পারছি না! কাব্য-লক্ষ্মী তাঁর পেলব বাহুর লীলা-বিভঙ্গে আমায় ডাক দিচ্ছেন, মাটি মা আমার কানে কানে বলছেন, 'ওরে অভাগ্য কবি! যে দেশের নারী পুরুষের ভোগ্যা, বিলাসের বস্তু, অথচ ভোগের সামগ্রী রক্ষা করবার সামর্থ্য তার নাই, সেই অভিশপ্ত দেশের লক্ষ্মীছাড়াদের কোমল সঙ্গীত শুনিয়ে আর ঘুম পাড়াস নি। তাদের আঘাত কর—জাগিয়ে দে। তারা বিশ্বের পানে চেয়ে দেখুক—মাটির মাকে চিনুক। আপনাদের শত শত বৎসরের দাসত্বের পুঞ্জীভূত লজ্জা কাটিয়ে উঠে, মানুষের সঙ্গে এক আসনে বসুক।' আমরা ডাক শুনেছি, কিন্তু অগ্রসর হবার সামর্থ্য কই?"

অনীতা আলোকনাথের ভাবোদ্বেলিত প্রশান্ত মুখের পানে চাহিয়া মুগ্ধ হইল। নির্ম্মল স্বপনময় দুটি বিস্ফারিত উজ্জ্বল চক্ষু দূর-দিগন্তে ন্যস্ত, সমগ্র মুখের ওপর একটা স্নিগ্ধ আলোক-রেখা, কণ্ঠস্বর উদাত্ত গম্ভীর।

অনীতার মৃদু দৃষ্টির আঘাতে আলোকনাথের ভবিষ্যৎ স্বপ্ন টুটিয়া গেল। হঠাৎ অপ্রতিভ হইয়া সে কহিল, "আমরা স্বপ্নের জীব; স্বপ্নকে ভুলব মনে ক'রে, আবার এক বৃহৎ স্বপ্নের জাল বুনছি। সেন্টিমেন্টালদের এ এক মহৎ দোষ।"

অনীতা কোন দিন এ সব তর্ক আলোচনা করে নাই, কাজেই সে চুপ করিয়া রহিল।

আলোকনাথ বলিল, "কিন্তু যাই হোক বোন, স্বপ্ন দিয়েই জগৎ গড়া যায়। হয়ত সত্যের কঠোর আঘাতে তার মিথ্যা মধুরতার খানিকটা ঝরে পড়ে, হয়ত বাস্তবের দেখা পেলে সে নিঃশেষে তার মাঝে মিলিয়ে যায়, তবু একথাও ত অস্বীকার করা যায় না যে, মহৎ সত্যকে স্বপ্নে রূপ দিয়ে মহাত্মারাই পৃথিবীতে নামিয়ে আনেন। নৈলে গান্ধী আন্দোলনের একদিন যেমন নিষ্ফল হাস্যকর, অন্যদিক তেমনি নির্ভীক পরম সত্য-পূর্ণ। 'অভী'—এই তাঁর মূলমন্ত্র। অজর অমর আত্মা—

শস্ত্র, জল, অনল ও বন্ধনের বিধান বহির্ভূত। সে মৃত্যুহীন, সুতরাং নির্ভয়। তাই এ স্বপ্ন সফল।"

অনীতা কোন উত্তর দিল না।......

আর একদিন। সেদিন বোধ হয় অমাবস্যার রাত্রি। চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার। নদীর জল, তীরের বালু, বনের রেখা সমস্তই মসীলেপে মুছিয়া গিয়াছে। শুধু নির্ম্মল আকাশ তারার প্রাচুর্য্যে আলো-ছায়াময়। রাশি রাশি মণি-মাণিক্য কে যেন মুঠা মুঠা করিয়া নীলের থালায় ছড়াইয়া দিয়াছে। পৃথিবী দারুণ অন্ধকারে নিশ্বাস বন্ধ করিয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া আছে ওই ম্লান আলোভরা অবগাঢ় নীলিমার পানে সতৃষ্ণ নয়নে। থমথমে প্রকৃতির কোন দিকে কোন শব্দ নাই, শুধু নিঃশব্দ আবেগে মৌন আকুতির নীরব ভাষায় আলো-ছায়ার ব্যথা মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

অনীতা নৌকার মধ্য হইতে ডাকিয়া বলিল, "অন্ধকারের পানে চেয়ে কি ভাবছ, দাদা?"

আলোকনাথ বলিল, "আমাদের স্বপ্ন অন্ধকারেই রচনা ক'রতে হবে, অনীতা। আলোর স্পর্শ সে সইতে পারে না। যদি চোখের তেমন আলো থাকত' ত এই অন্ধকারে ব'সে এমন মহাকাব্য লিখতাম, যা পৃথিবীতে কেউ কোনদিন লেখেনি।"

অনীতা বলিল, "বেশ ত লেখনা, আলো জেলে দিই।"

হাসিয়া আলোকনাথ বলিল, নারে, আলো দেখে কল্পনা টুটে যাবে। বিরাট অন্ধকারের বিশাল রূপ আমাদের জীবনের ওপর যে স্বপ্নটি নিয়ে আবির্ভূত হ'য়েছে, তার চেয়ে সত্য যেন আর কোথাও নেই। এই-ই আমাদের জীবন এবং এর মধ্যে যুগ যুগ ধরে আমরা বাস করছি। নাগালের বাইরে ওই নক্ষত্রের আলো—ও নাগালের বাইরেই চিরদিন থাকবে। পৃথিবীর নিষ্ফল আকুতির মত বৃথাই আমাদের ওর পানে চেয়ে থাকা।"

অনীতা বলিল, "নিতান্ত অকবির মত কথা ব'ললে, দাদা। চাঁদের আলো—"

আলোকনাথ বাধা দিয়া দ্রুতকণ্ঠে বলিল, "চাঁদের আলো! কি তার মূল্য? কোথায় তার দণ্ড কয়েকের আয়ু? যাকে ইচ্ছে ক'রলেও বেঁধে রাখতে পারি না,—সে মিথ্যা। কিন্তু যে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক আমায় দেখা দেয়, আমায় ভুলিয়ে দেয়, আমায় নূতন নূতন সত্যের সন্ধান দেয়, সে ওই অন্ধকার। সে আছে—সে থাকবে। আলোর জন্মদাতা আয়ুর্দাতা হ'ল অন্ধকার, তার চেয়ে পরম সত্য আর কি আছে?"

অনীতা সে কথার কোন উত্তর না দিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "কি জানি দাদা, আমার মনে হয় যারা লেখে, তারা সুখী নয়!"

আলোকনাথ উৎসুক হইয়া প্রশ্ন করিল, "কেন— কেন?"

অনীতা বলিল, "দুঃখ না পেলে কেউ কোন বিষয় ভাবে না। না ভাবলে লিখবে কি?"

আলোকনাথ উৎসাহদীপ্ত কণ্ঠে কহিল, "ঠিক বলেছিস অনীতা, যার দুঃখ যত গভীর তার প্রকাশ তত সুন্দর। জীবনকে জানতে হয় দুঃখের আগুনে জ্বেলে; যেমন সোনা খাঁটি হয়—পুড়ে। এই অন্ধকার,—যদি কিছু সত্য থাকে, এর বুকেই আছে, আলোয় তা নেই। আলো সত্য, কিন্তু স্র[illegible] তার অন্ধকার, তাই অন্ধকার আরও সত্য।"

অনীতা মৃদুস্বরে বলিল, "আমার জীবনও মনে [illegible] এমনি অন্ধকারে ভরা, কিন্তু ব্যর্থ নয়। তাই আজও সা[illegible] ক'রে ম'রতে পারিনি।"

আলোকনাথ পুলকিত হইয়া কহিল, "জগতে কিছু ব্যর্থ নয়, অনীতা। নৈরাশ্য যার যত বড়ই হোক—সার্থক[illegible] তাতে আছেই। জগত-সৃষ্টির ক্ষুদ্র তৃণগাছিও অকার[ণ] খেয়ালে জন্মায় না, জেন।"

আলোকনাথ এমনই করিয়া আপন নূতন দর্শনের ব্যাখ[্যা] করিত, অনীতা নীরবে শুনিয়া যাইত। সে বিশেষ কিছু বুঝিত না। কিন্তু আলোকনাথের কণ্ঠে যে আশার বাণ[ী] ধ্বনিয়া উঠিত, মুখে যে অপূর্ব্ব নিষ্ঠার জ্যোতি ফুটিয়া উঠিত, চক্ষুতে যে দীপ্তি খেলিত—তাহার মহিমা যেন তা[হার] চিত্তকে শান্তি স্নান করাইয়া দিত।

কবির কবিত্ব হয়ত দুর্ব্বোধ্য, মনও খেয়ালী, কিন্তু নিষ্ঠার তুলনা তার নাই। তাহা যেন মানুষের সাধার[ণ] জগতের একটু ঊর্দ্ধে। যখন এই জগতে পা রাখিয়া আকাশের পানে তাকান যায়, তখন তুচ্ছ ক্ষোভ ,ব্যথা ,গ্লানি মনকে স্পর্শ করিতে পারে না। সে তখন সমস্ত মানব সত্তার উপরে, জগতের দুঃখ-ব্যথার উপরে আনন্দ শতদল ফুটাইয়া মুগ্ধ অপলক নেত্রে সে শোভা দেখিতে থাকে। কোথায় পড়িয়া থাকে দৈনন্দিন তুচ্ছ আহার বিহারের অভাব অভিযোগ,—কোথায় বা থাকে মনের তীব্র দাহ, স্বার্থের অশান্ত হাহাকার?

আলোকনাথের কল্পনা-রঙ্গীন অন্তরের সাহচর্য্যে অনীতার বেদনাও অনেকটা জুড়াইয়া আসিতেছিল।

সেদিন মোকদ্দমার শেষ দিন। সকলের সাক্ষ্য দেওয়া শেষ হইয়াছে, রায় বাহির হইবে।

আলোকনাথ আহারাদি সারিয়া নৌকা হইতে নামিতেছিল, অনীতা বলিল, "দাদা আমার মনটা এমন ক'রছে কেন? পাপীর শাস্তি হ'লে কোথায় আহ্লাদ হবে, না, থেকে থেকে প্রাণটা কেঁদে উঠছে!"

আলোকনাথ বলিল, "ও মনের দুর্ব্বলতা। আমরা পুরুষজাতি, কাব্যব্যাধিগ্রস্তেরা যতই ভাবপ্রবণ হই না কেন, মেয়েরা সাহিত্যের সম্পর্ক না রেখেও তার চেয়ে ঢের বেশী মমতাময়ী।"

অনীতা বলিল, "না দাদা, তা নয়। তার শাস্তিতেই যদি এ ব্যাপারের শেষ হ'ত তাহ'লে আমার ভাবনা ছিল না। কিন্তু—"

আলোকনাথ সাগ্রহে প্রশ্ন করিল, "তার সংগে আবার কে শাস্তি পাবে?"

অনীতা বলিল, "তাঁর স্ত্রী। তাঁকে আমি জানি। মেয়েদের মধ্যে হাজারে অমন একটি মেলে না, দাদা। এই অল্প বয়সে তাঁর মনের মাঝে যে অশান্তি জমে উঠল, জীবনভোর তা বইতে হবে।"

(শেষাংশ ১০০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কনে দেখা

(গল্প)

শ্রীমতী আশারাণী মুখোপাধ্যায়

(১)

অতুলকৃষ্ণ মিত্র সম্প্রতি পেন্সন প্রাপ্ত হয়েছেন। পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট অফিসে মোটা মাহিনার চাকরী করতেন, তখন ভাবতেন কোনরকমে চাকরীর মেয়াদটা উত্তীর্ণ করতে পারলে ভাল হয়; না আছে বিশ্রাম, না আছে জাতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ইত্যাদি। কিন্তু এখন পেন্সন পাওয়ার পর বিশ্রাম ভাল রকম উপভোগ হচ্ছে না। অফিস জীবনের সঙ্গে এমন জড়িয়ে গেছে যে, সব দিনই রবিবার একথা মনে করে তেমন আনন্দও হয় না (যেহেতু বরাবরের অভ্যাস খাটুনী কমে যাওয়ায় খিদেটাও কমে এসেছে অথচ সেটা যে কমে এটা তাঁর মোটেই ইচ্ছা নয়—) বরং এই নিরবচ্ছিন্ন অবকাশ নিয়ে কি যে করা যায়—সেইটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে চিন্তার বিষয়। অবশ্য আপাতত একটি কার্য্যভার আছে কাঁধের ওপর—একটি মাত্র উপযুক্ত পুত্রের বিবাহ দিয়ে তাকে সংসারে কায়েম করে প্রতিষ্ঠিত করা।

বন্ধুরাও তাই বলেন—"ছেলের বিয়ে দাও তার পরে আবার সময় কাটাবার অভাব কি,—বিয়ে হলেই পুত্র-কন্যা আসে যেন প্রবল বন্যা।" এত অনেকদিন পরেই জানা, তখন আবার ভাববে—এতগুলো সামলাবার সময় কখন। তবে তোমার অবস্থা ভাল—এই যা ভাবনার বিষয়। মা লক্ষ্মী দয়া করেছেন বলে মা ষষ্ঠী অজস্র দয়া না করতেও পারেন। তিনি বিশেষ করে গরিবদের দেবী কিনা।"

অতুলকৃষ্ণের অবস্থা ভাল। কলকাতায় বাড়ী আছে, গাড়ী মনে করলে কিনতে পারেন, কিন্তু মিতব্যয়িতার জন্যে ও প্রয়োজনীয়তার অভাবে কেনেন নি। একমাত্র সন্তান অনিল তেইশ চব্বিশ বছরের। যদিও কলেজে পড়ে, তবু কোন তরুণীকে এ পর্য্যন্ত হৃদয় দান করে নি এবং বিবাহের প্রতি যথেষ্ট আগ্রহশীলতা থাকলেও নীরবে প্রতীক্ষা করছে শুভদিনের জন্যে। সহসা কোন দিন জানায় নি মাকে। ছেলের বিবাহ দেবার ইচ্ছে অনেকদিনই অতুলকৃষ্ণ এবং তাঁর গৃহিণী অচলার মনে জেগেছে, কিন্তু অফিসের কাজে ব্যস্ত থাকার দরুন ইচ্ছেটা কাজে পরিণত হয় নি। আর অতুলকৃষ্ণের ইচ্ছা তাড়াতাড়ি না করে ধীরে সুস্থে দেখে শুনে একটি টুকটুকে বউ আনবেন। টাকা-কড়ির ওপর তাঁর তেমন ঝোঁক ছিল না। একটি কিশোরী টুকটুকে বউ আসবে, তার মুখে থাকবে সরলতার ছাপ, সলজ্জ হাসি, পাতলা ছিপছিপে—এঘর ওঘর ঘুর ঘুর করে বেড়াবে মেয়ের মত—এই তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা। আর একটি সখ ছিল, বধূটি লেখাপড়া না জানুক, গান জানা চাই। এ সম্বন্ধেও আবার তেমন কড়াকড়ি ছিল না, গলাটি মিষ্টি হবে সন্ধ্যেবেলায় তাঁর কাছে বসে গান করবে, যদি ভজন কি কীর্ত্তন হয় তাহ'লে ত কথাই নেই। হাঁ, বলতে ভুলে গেছি আর একটি দরকারী বিষয় রান্নার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা আর আগ্রহশীলতা থাকা চাই-ই, যেমন যদি কোন দিন ঠাকুর না আসে আর গৃহিণীর অসুখ করে তাহ'লে এই যোগাযোগের ফলে এখনকার মত হোটেলে যেন না খেতে হয়। এক আধবেলা রেঁধে-বেড়ে শ্বশুর স্বামীকে খাওয়ান, শাশুড়ীকে একটু সাহায্য করে দেওয়া—এতে যেন পশ্চাৎপদ না হয়। গানের সম্বন্ধে গৃহিণী আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, এখনকার মেয়েরা সবাই গান জানে।

লেখাপড়া ছাড়ার পর চাকুরীতে ঢুকে অবধি এ পর্য্যন্ত অতুলকৃষ্ণ অন্য কোন দিকে তেমন লক্ষ্য রাখতে পারেন নি। তিনি একটু অন্যমনস্ক প্রকৃতির লোক ছিলেন, সেইজন্যে এই ক'বছরে মেয়েরা যে কতটা প্রগতির পথে অগ্রসর হয়েছে সে সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ কোন ধারণা ছিল না। অবশ্য এটা তিনি জানতেন যে ঝুমকুরি ও তোড়ার যুগ গিয়ে কানচাকা আর স্যাণ্ডেলের যুগ এসেছে; কিন্তু আর কতরকম যে পরিবর্ত্তন হয়েছে—অঙ্গরাগে প্রসাধনে নিত্য নতুন ফ্যাসানের শাড়ী, ব্লাউজ আর লিপ্‌ষ্টিক, কথাবার্ত্তায় আধুনিকতা ইত্যাদি, এসব বিষয়ে তিনি নিতান্ত অজ্ঞ ছিলেন। নিজের মেয়ে নেই; গৃহিণীর দিক দিয়ে অবশ্য তাঁর ভাইঝি-বোনঝির সংখ্যা নেহাৎ অল্প না হলেও এবং এ বাড়ীতে তাদের ঘন ঘন আগমন সত্ত্বেও তিনি তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচিত ছিলেন না।

অনিলের মত পাত্রের কনে জুটতে দেরী হয় না। এক-সঙ্গে অনেকগুলো পাত্রীর সন্ধান এসেছে। দুপুরবেলা ইজিচেয়ারে শুয়ে অতুলকৃষ্ণ অচলার সঙ্গে এই সব বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। আজ বিকেলে এক জায়গায় মেয়ে দেখতে যাবার কথা আছে। গৃহিণী উপদেশ দিচ্ছিলেন যে—মেয়ে দেখাটা বেলা থাকতে সেরে ফেল, নইলে রাত্তির বেলায় কিছু বোঝা যাবে না। অতুলকৃষ্ণ বললেন 'সে আর বলতে, গিয়েই সবার আগে মেয়ে দেখে আসব'।

একটা কথা বলে রাখি মেয়ে দেখা ব্যাপারে অতুলকৃষ্ণ কারো সাহায্য নিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তাঁর নিজের বেলায় তাঁর পিতা এক বন্ধুর সহযোগিতা গ্রহণ করে কন্যাটির নম্রতা ও তৎপরতা এবং নিজের চক্ষুলজ্জা একটু বেশী পরিমাণে থাকায় একপ্রকার অনিচ্ছা সত্ত্বেও অচলার সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিয়েছিলেন। অচলা দেখতে মাঝামাঝি, অতুলকৃষ্ণ একটু হতাশ হয়েছিলেন। তাই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন ছেলের বিয়ের ব্যাপারে তিনি কাউকে সঙ্গী করে অমন ফাঁদে পড়বেন না। দেখে শুনে আনবেন।

আর একটা পান মুখে দিয়ে গালের ওপর দোক্তার পরিমাণ ঠিক করতে করতে অচলা বললেন—তা ছাড়া ব'ল যে মেয়েকে সাজাবার গোছাবার দরকার নেই—এমনি একখানি ফরসা কাপড় পরিয়ে আনতে আর চুলগুলো খুলে দিতে ব'ল মনে করে যা এখনকার খোঁপা হয়েছে বাপু, বোঝবার জো নেই চুল আছে কিনা।

যথোপযুক্ত সাজগোজ করে গায়ে [illegible] চাদর দুর্গা দুর্গা বলে অতুলকৃষ্ণ মেয়ে দেখতে চললেন।

(২)

অতুলকৃষ্ণ থাকেন শ্যামবাজারে, মেয়ে দেখতে এলেন ভবানীপুরে। পাত্রীর পিতা যথেষ্ট আদর-আপ্যায়নের সঙ্গে অভ্যর্থনা করলেন। যে ঘরে এসে অতুলকৃষ্ণ বসলেন, সে ঘর আধুনিক কেতায় সজ্জিত, জানালায় জানালায় পর্দ্দা, মেঝেয় কার্পেট, মাথার ওপর বিজলী পাখা, ঘরের মধ্যে কিন্তু যথেষ্ট আলো নেই, মনে মনে অতুলকৃষ্ণ একটু উদ্বিগ্ন হলেন। একটু কথাবার্ত্তার পর বললেন, 'এইবার মেয়েটিকে নিয়ে আসুন আমার আবার আর এক জায়গায় যেতে হবে, হুঁ দেখুন, বেশী সাজাবার দরকার নেই অমনি আসতে বলুন।'

'এই যে আনি' বলে ভদ্রলোক ব্যস্ততা দেখিয়ে পর্দ্দা ঠেলে প্রস্থান করলেন। প্রায় দশ মিনিট পরে যখন ফিরে এলেন তখন সঙ্গে এল চাকর চা খাবার ইত্যাদি নিয়ে। অতুলকৃষ্ণ বিলক্ষণ ব্যস্ত হ'য়ে বললেন 'ওকি ওসব আবার কেন, আপনি মেয়েটিকে নিয়ে আসুন।' শেষের কথাটা যেন শুনতে পাননি এমনিভাবে প্রথম কথার উত্তরে ভদ্রলোক অমায়িকভাবে হেসে বললেন 'তাকি হয়, ভদ্রলোক বাড়ীতে এলে একটু মিষ্টিমুখ করাতে হয়, সম্পর্ক হওয়া না হওয়া ভগবানের ইচ্ছা, কিন্তু আপনাকে এমনি করে আর কবে পাব। গেরস্ত ঘরে এটা ত কর্ত্তব্য।'

কিছুক্ষণ ধরে আগত নানা প্রকার খাবারগুলির সদ্ব্যবহারের জন্যে পীড়াপীড়ি, খাওয়ার পর পান ইত্যাদিতে বেশ খানিকটা সময় কেটে গেল। এদিকে জানালায় জানালায় সুদৃশ্য পর্দ্দা মণ্ডিত ঘরে তখন আবছায়া ঘনিয়ে এসেছে আরও একটু কথাবার্ত্তার পর ভদ্রলোক বললেন 'তাহ'লে এইবার যদি অনুমতি করেন ত' মেয়েটিকে নিয়ে আসি।'

অতুলকৃষ্ণ মনে মনে বিলক্ষণ চটে গেলেন, কিন্তু সভ্যতার যুগ কাজেই মনের প্রকৃত ভাব দমন করে বললেন 'হ্যাঁ নিয়ে আসুন'।

ভদ্রলোক প্রস্থান করলেন চাকর এসে লাইট জ্বেলে দিলে অতুলকৃষ্ণ ভাবলেন, ভাল বিপদ দেখছি, গিন্নী যা বারণ করেছিলেন তাই হ'ল শেষে।

এইবার ভদ্রলোক অতুলকৃষ্ণের উৎকণ্ঠা দূর করে কন্যাসহ আগমন করলেন। মেয়েটি এসে হাতদুটি একত্র করে অতুলকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে নমস্কার জানিয়ে তাঁর সামনে কার্পেটের ওপর হাঁটুমুড়ে বসল। অতুলকৃষ্ণ মেয়ে দেখবেন কি তার পরণের শাড়ী দেখেই তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। এবং হঠাৎ মনে পড়ল দুদিন আগে দুপুরবেলা শুয়ে শুয়ে তিনি একখানা বই পড়ছিলেন বইখানা বোধ হয় অনিলই এনেছিল, যেমনি বইয়ের উৎকৃষ্ট বাঁধাই তেমনি প্রচ্ছদপট। প্রচ্ছদপটই তিনি কতক্ষণ ধরে দেখেছিলেন তার ঠিক নেই, ভেবেছিলেন যে বইয়ের ওপর এত সুন্দর তার ভেতর না জানি আরও কত সুন্দর। অসীম আগ্রহ নিয়ে পাতা ওল্‌টালেন, মোটা সুদৃশ্য কাগজে চারপাশে ফাঁক রেখে মাঝখানে দশ বারো লাইন করে লেখা হয়েছে একশো ছত্রিশ পাতায় এবং সে বইয়ের মধ্যে যে গ্রন্থকার কি ভাব প্রকাশ করতে চেয়েছেন একমাত্র তরলতা ছাড়া তা কিছুতেই তাঁর মাথায় ঢুকল না।

সেই বইয়ের প্রচ্ছদপটের মতই লাইটের তীব্র আলোকের নীচে উপবিষ্টা মেয়েটির ডান বাহুর ওপর ঈষৎ জড়ান বিস্তৃতভাবে শাড়ীর আঁচলটা ঝলমল করছে, শাড়ীর রং ঘোর সবুজ জরির চকমকি। মুখের ওপর দৃষ্টি পৌঁছলে প্রথমেই দেখলেন প্রায় কাঁধের উপর এসে পড়েছে ইয়া বড় বড় দুটি চাকা। দেখতে যে মেয়েটি কি রকম তা ভাল বোঝা গেল না, আগাগোড়া সাজসজ্জায় সে ঝলমল করছে।

অতুলকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন 'তোমার নামটি কি মা?'

উত্তর হল 'মিস লিলি সেন।'

গান গাইতে জান?

মেয়েটি উত্তর দিবার পূর্ব্বে পিতা ব্যস্ত হয়ে বললেন-জানে বইকি, মাষ্টার রেখে গান শিখিয়েছি, গান গেয়ে তিন চারখানা মেডেল পেয়েছে,' পরে চাকরকে ডেকে হারমোনিয়াম আনতে বললেন। হারমোনিয়াম আনীত হলে বললেন, সেদিন গীত সম্মিলনে যে গানটা করেছিলে সেইটেই গাও। অতুলকৃষ্ণের দিকে চেয়ে বললেন, তবে তত্টা ভাল বোধ হয় হবে না কারণ তবলা নইলে গান তেমন জমে না। সঙ্গীত বিষয়ে অতুলকৃষ্ণ নিতান্ত অজ্ঞ; অতএব কোন মন্তব্য প্রকাশ না করে নিরুত্তর থাকাই সমীচীন মনে করলেন। মেয়েটি গান ধরলে, একটি দুরূহ শব্দযুক্ত হিন্দী গান—তান লয় ভঙ্গী সহকারে শেষ হ'ল। গান অবশ্য উৎকৃষ্ট সন্দেহ নেই, কিন্তু নিজের অনভিজ্ঞতার দরুন অতুলকৃষ্ণ সে গানের মাধুর্য্য তেমন উপভোগ করতে পারলেন না, বললেন 'উঠি তাহ'লে।'

ভদ্রলোক বললেন 'মেয়ে আপনার পছন্দ হ'ল কি না সে বিষয়ে একটা মত—'

'পরে বলব', বলে অতুলকৃষ্ণ প্রস্থান করলেন।

বাড়ী এসে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর অচলা শুধালেন, 'কেমন মেয়ে দেখলে?'

উদাসীনভাবে অতুলকৃষ্ণ বললেন 'মেয়ে দেখিনি।'

'সে কি? তবে কি করতে গেলে?' রীতিমত বিস্মিত হয়ে অচলা বললেন।

'মেয়ে দেখব কি, কাপড় দেখেই চক্ষুস্থির, বউ যদি এসে ওরকম কাপড়ের ঝোঁক ধরে তাহলে যে কটা টাকা জমিয়েছি সব শেষ হয়ে যাবে।'

'কি কাপড়?' অচলা জিজ্ঞাসা করলেন।

'তা জানি না, বেনারসী নয়, এইটুকু বলতে পারি, কি তার জরির বাহার আর কানের চাকারই বা বাহার কি।'

অচলা হেসে বললেন 'ও তাই বল যে জর্জ্জেট শাড়ী, আর কানে বোধ হয় কানবালা পরেছে, এখনকার যে ঐ ফ্যাসান হয়েছে।'

কর্ত্তা জবাব দিলেন 'তা হোক, ও মেয়ে আলমারীতে রাখলে বেশী মানাবে আমাদের ঘরের চেয়ে। নাম জিজ্ঞাসা করলাম বলে মিস লিলি সেন কেন শ্রীমতী বলতে কি হয়? আবার কলেজের মেয়েরা শুনি পিকেটিং করে, আগে মিস-এর বিরুদ্ধে পিকেটিং করুক না, নামের আগে ইংরেজী শব্দ না জুড়লে হয় না?

গৃহিণী বিরক্ত হয়ে বললেন—'তা বাপু, আমাকে বলে কি হবে।'

ভুল বুঝতে পেরে অতুলকৃষ্ণ সাধারণ অবস্থায় নেমে এসে বললেন 'তা বটে, যাকগে ও মেয়ে আমি ঘরে আনব না।'

(৩)

দ্বিতীয় সম্বন্ধ এল মাণিকতলা থেকে। গৃহিণীর কাছ থেকে পূর্ব্বের মত যথোপযুক্ত উপদেশ নিয়ে অতুলকৃষ্ণ রওনা হলেন। এবারে আর বিকেলে নয় সকাল আটটার সময়, কি জানি আবার যদি সন্ধ্যা হয়ে যায়। ভবানীপুরের মত ত্রিতল অট্টালিকা নয়, ছোট-খাট দোতলা বাড়ী. পাত্রীর পিতা এবং আরও দু'তিনজন এসে অভ্যর্থনা করে উপরে নিয়ে গেলেন। কিন্তু যে ঘরে বসতে দিলেন সে ঘরে ঢুকে অতুলকৃষ্ণের মন খুঁতখুঁত করতে লাগল, ঘরে যথেষ্ট জানালা নেই। অবশ্য কলকাতার অধিকাংশ ঘর এমনিই হয়, তবু অতুলকৃষ্ণের মনে হ'ল মেয়ের বাপ যেন সবাই ষড়যন্ত্র করে তাঁকে অন্ধকার ঘরে এনে বসায়।

আধ ঘণ্টা পরে মেয়ে এল, সামনের একটি চেয়ারে কোলের ওপর হাত দুটি রেখে মেয়েটি বসল। হাত দুটির রঙ ফরসা ধপধপ করছে, অতুলকৃষ্ণ মনে মনে বললেন, বা বেশ সুন্দর ত। মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন মেঝের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ, টানাটানা ভুরু, ঠোঁট দুটি লাল টুকটুক করছে, কিন্তু কিছুক্ষণ দেখবার পর যেন মনে হ'ল মুখের রঙটা কেমন বেশী শাদা দেখাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলেন 'তোমার নামটি কি মা?'

'শ্রীবাসন্তী দেবী' মেয়ে উত্তর দিলে।

'একবার আমার দিকে তাকাও ত!'

মেয়েটি কুণ্ঠারভাবে তাঁর দিকে চোখ দুটি তুলে ধরল এবং এইবার হঠাৎ অতুলকৃষ্ণের মনে হ'ল, হুবহু সিনেমা আর্টিষ্টের প্রসাধন। ঠিক সেইরকম দেখাচ্ছে। তেমনি চোখে স্পষ্ট কাজলের রেখা, বোধ হয় তাড়াতাড়ির জন্যে কপালের ওপর চুলের কাছে কানের কাছে পাওডার লেগে আছে ঘন হয়ে, পরণের শাড়ী অবশ্য খুব দামী নয়, কিন্তু ভবানীপুরের মেয়ের মতই কেমন একটা বেয়াড়া ফ্যাসানে পরা।

গান গাইতে জান?

মেয়ের পিতাই উত্তর দিলেন, 'জানে একটু-আধটু। আজকাল আবার সব ঐ চর্চ্চা হয়েছে কিনা, তাই অল্প শিখিয়েছি। গাইবে কি?'

অতুলকৃষ্ণ কিছু বলবার আগে আর একজন বললেন 'মোটামুটি সবই জানে, কাজের মেয়ে, শিল্পকর্ম্মে খুব পটু, ঐ যে ছবি দেখছেন না ও ত ওই করেছে, তাছাড়া বোনাবুনি রান্নাবান্না সবই জানে।'

হারমোনিয়াম এল, মেয়েটি চেয়ার ছেড়ে হারমোনিয়ামের কাছে এসে বসল এবং অমনোযোগবশঃ হাঁটু মুড়ে বসবার সময় পায়ের কাপড়টা অল্প উঠে গেল, তৎক্ষণাৎ মেয়েটি কাপড় টেনে পা ঢেকে ফেললে, কিন্তু ঐটুকু অতুলকৃষ্ণের দৃষ্টি অতিক্রম করেনি। বিস্ময়ের সংগে তিনি ভাবলেন—'এ আবার কি! পায়ের থেকে হাতমুখের রঙ এত ফরসা হল কি করে? বরং মেয়েদের পায়ের রঙই ত বেশী ফরসা হয়।'

যা হোক অতুলকৃষ্ণের মানসিক নানারূপ গোলযোগের মধ্যে গান শেষ হ'ল। ভবানীপুরের মেয়ের মত উচ্চদরের না হ'লেও মাঝামাঝি, গানটি হিন্দী। অতুলকৃষ্ণ জানতেন না যে, যে গান গায় এবং যারা গান শোনে উভয়পক্ষই হিন্দী গান সম্বন্ধে অভিজ্ঞ না হ'লেও সমাদর এবং তারিফ করে, সুতরাং হিন্দী গান গাইবার জন্য মেয়েটিকে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু অতুলকৃষ্ণ পূর্ব্বেকার মতই গানের রস উপলব্ধি করতে পারলেন না। তাছাড়া মেয়েটির মোটা গলা সরু করবার চেষ্টা তিনি ধরে ফেললেন। মেয়ে পছন্দ হ'ল কি না প্রশ্ন করায় 'পরে জানাব' বলে অতুলকৃষ্ণ বেরিয়ে এলেন।

বাড়ী যখন ফিরলেন তখন আহারের সময়, সুতরাং কথাবার্ত্তা বিশেষ হ'ল না। আহারে বসবার পর অচলা পাখা হাতে অনর্থক বাতাস করতে করতে বললেন, 'কেমন দেখলে মেয়েটি?'

অতুলকৃষ্ণ বললেন 'দেখলাম ত ভালই, তবে আসল কি মেকী বোঝা কঠিন।'

কেন, জিজ্ঞাসা করাতে অতুলকৃষ্ণ আগাগোড়া সব বললেন, 'যে মেয়ের পায়ের রঙয়ের থেকে হাত ও মুখের রঙ অনেক ফরসা, চোখে কাজল দিয়েছে'......কি করে বুঝব আসল মেয়েটি কেমন? তবে হ্যাঁ বলতে পারি মেয়েটির ঠোঁট দুটি লাল টুকটুকে।'

অচলা কিন্তু চিন্তান্বিত স্বরে বললেন 'তারই বা প্রমাণ কি? যে রকম তুমি ব'লছ তাতে মনে হচ্ছে ঠোঁটে হয়ত খুব 'লিপষ্টিক' দিয়েছে।'

'লিপষ্টিক? সে আবার কি?' অতুলকৃষ্ণ অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন।'

অচলা বললেন, 'সে আছে একরকম জিনিষ ঠোঁটে দিলে খুব লাল দেখায়, এই সব জিনিষ বেরিয়ে এক মুস্কিল হয়েছে বাপু, বোঝা দায় কি রকম দেখতে। ও মেয়ের আসল রঙ ঐ পায়েই প্রকাশ, তার ওপর আবার চোখ ঠোঁট ভাল করবার চেষ্টায় বোঝা যাচ্ছে যে প্রকৃত রঙ মেয়েটির ভাল মোটেই নয়। ও মেয়ে হবে না, তুমি অন্য মেয়ে দেখ।

অতুলকৃষ্ণ বললেন 'সে ত হবেই না। কিন্তু যে রকম সব দেখছি তাতে ত আসল সুন্দরী দেখতে পাওয়া ভয়ানক কঠিন।'

(আগামী বারে সমাপ্য)

কোথায় গেল ?

আমরা জানি সোনা অতি প্রাচীনকাল হইতে উত্তোলিত হইতেছে। খৃষ্টপূর্ব্ব ২৯০০ সালের মিশরীয় প্রতীক দৃষ্টে জানিতে পারা যায়, নিউবিয়ান ক্রীতদাসেরা ফেরাওয়ের জন্য খনিজ সোনা ধুইয়া পরিষ্কার করিত। খৃষ্টপূর্ব্ব ১২০০ সালে গ্রীকগণ আকৃষ্ট হয় আরমেনিয়ার সোনা-খনি দ্বারা। গ্রীকেরা তথায় যাইয়া দেখে, আরমেনিয়ানগণ ভেড়ার পশমসহ চামড়া দ্বারা সোনা ধুইয়া পরিষ্কার করে। খুব সম্ভবত এই প্রথা হইতেই সোনার পশম (Golden Fleece)-য়ের জনরব ছড়াইয়া যায় এবং উহার সংগ্রহের জন্য অভিযান সুরু হয়।

ক্রোইসাসের যে অপরিসীম ধনৈশ্বর্য্যের প্রবাদ—তাহার সোনাও সংগৃহীত হয় এশিয়া মাইনরের প্যাক্‌টোলাস নদী-গর্ভ হইতে।

ট্রান্‌স্‌সিল্‌ভানিয়া হইতে সোনা সংগ্রহ করে রোমানগণ। সেখানকার সোনা-খনি হইতে আজিও প্রচুর সোনা তোলা হইতেছে।

কাজেই খৃষ্টের জন্মের ৩০০০ হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত লক্ষ লক্ষ মণ সোনা খনি হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। কিন্তু উহার অর্দ্ধেরও অবস্থান আজ জানা যায় কিনা সন্দেহ। কোথায় গেল এত সোনা ?

সমগ্র বিশ্বের স্বর্ণ-সম্পদ একত্রিত করিলেও, খনি হইতে যে সোনা পাওয়া গিয়াছে বলিয়া অনুমান হয়, তাহার একার্দ্ধের হিসাবও মিল করা যায় কিনা সন্দেহের বিষয়।

তবে একটা কথা রহিয়াছে। অন্য সকল বাদ দিলেও খরচের একটা মোটা অঙ্ক পাওয়া যায়, যখন পেরু বিজয়ে পিজারো তাহার সেনাদের সোনা দিয়া পুরস্কৃত করিয়াছিল। শুধু পুরস্কার নয়—তাল তাল সোনা এবং রূপা তাহাদের দেওয়া হইয়াছিল। বেতন বা বৃত্তি হিসাবে আর কিছু দেওয়া হয় নাই। যে সোনা প্রথম সপ্তাহে ঐ স্থানে লুটিয়া পাওয়া গিয়াছিল তাহার মূল্য তখনকার দিনে ছিল প্রায় এক কোটি পাউন্ড।

প্রত্যেক অশ্বারোহী সৈনিককে দেওয়া হইয়াছিল ২৫০০০ পাউন্ড মূল্যের সোনা, আর প্রত্যেক পদাতিককে দেওয়া হইয়াছিল প্রায় ১০,০০০ পাউন্ড মূল্যের সোনা।

এই সোনা ছড়াইয়া পড়িবার মোটা একটা হিসাব পাওয়া যায়।

অনুরূপ সোনা বিতরণ ইতিহাসে তেমন প্রকটিত না হইলেও এশিয়ায় বিভিন্ন ধর্ম্ম-মন্দির-তীর্থাদিতে যে-প্রকার সোনার ছড়াছড়ি হইয়াছিল, (যাহার কিছু কিছু নিদর্শন আধুনিক কালেও পাওয়া যায়) তাহাতেও প্রচুর সোনা খরচের হিসাব মিলিবে। এ বিষয়ে চীন আর ভারত যে প্রসিদ্ধ, তাহাতে সন্দেহ নাই কিছুমাত্র।

দুই পা-ওয়ালা ঘোড়া

এই ঘোড়ার বাচ্চাটির জন্ম হইতেই মাত্র দুইখানি পা। সম্মুখের পা উহার ছিল না কোন দিনই। ইহার জন্ম হয় ওক্‌লা অঞ্চলের ব্রিণ্টাউ নামক স্থানের নিকটে। বাচ্চাটির পদ-সংখ্যায় কমতি থাকিলেও আহার-প্রবৃত্তি একেবারেই কম নহে। স্বাস্থ্যও তাহার কোন প্রকারে ক্ষীণ নহে। পশু-চিকিৎসকগণ বলিয়া থাকেন—এই বাচ্চাটি এইভাবেই দীর্ঘ-

জীবন লাভ করিলে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। দুই পদ বলিয়া সে যে একেবারেই চলিতে অক্ষম, এমনও নহে—সে বসিয়া বসিয়া অর্থাৎ যে অবস্থায় তাহাকে ছবিতে দেখা যাইতেছে, সেই অবস্থায় শুধু পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়া ব্যাঙের মত লাফাইয়া লাফাইয়া চলিতে পারে, কিন্তু সেই গতি অতিশয় ধীর। খাইবার সময়ও এই একই অবস্থায় খাইয়া থাকে। কিন্তু মাঠ হইতে দূর্ব্বা অথবা অন্য কোনও ঘাস-গাছের স্বাদ গ্রহণ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব।

খৃষ্টমাসে 'এয়ার-মেল' চিঠি

গ্রেটব্রিটেন হইতে এই বারের খৃষ্টমাস দিবসে শুধু 'এয়ার-মেল'-যে ৮০ টন অপেক্ষা বেশী চিঠি প্রেরণ করা হইয়াছে শুভেচ্ছা জ্ঞাপনে। "এয়ার-মেল খৃষ্টমাসে"য়ের জন্য বিশেষ অল্পমূল্যে টিকেট বিক্রয় করা হইয়াছিল। ৮০ টন চিঠি দ্বারা অবশ্য উহার সংখ্যার ধারণা করা যায় না। ঐ দিবস খৃষ্টমাস পর্ব্বের শুভেচ্ছাজ্ঞাপক 'এয়ার-মেল' চিঠির সংখ্যা ছিল ৪৩০০০০০ খানা।

মুসোলিনীর পাণ্ডুলিপির মূল্য ১০০ পাউণ্ড

মুসোলিনীর প্রসিদ্ধ "আরটিকল অন ফাসিজম"য়ের পাণ্ডুলিপি লণ্ডন শহরে ১০০ পাউণ্ড মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে। নেলসনের পত্রাবলীর সংগ্রহ বিক্রয় হইয়াছিল ১০৫ পাউণ্ডে।

প্রসিদ্ধ রোম-অভিযান, যাহার ফলে মুসোলিনী প্রতিষ্ঠিত হয় ইটালীয়ান গবর্ণমেণ্টের শীর্ষে, উহারই কয়েক মাস পূর্ব্বে এই পাণ্ডুলিপি লিখিত হয় মুসোলিনীর নিজ হস্তে।
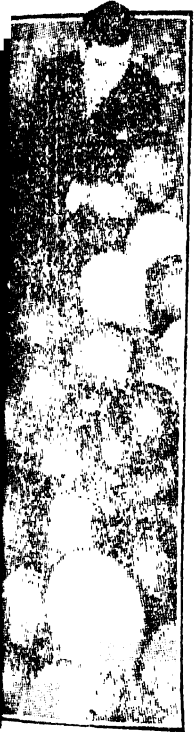
টোরিপার্টির বেলুন

টোরিপার্টির বার্ষিক "পার্টি"তে প্রতিবৎসর ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে খেলনা বেলুন উড়ান হয় মহাশূন্যে। একটি দুইটি নয়, শত শত। আর্লস কোর্ট হইতে এই অনুষ্ঠানটি সমাধা করা হয়। কিন্তু এত সংখ্যার বেলুন ফুলাইয়া বাঁধা এক কঠিন সমস্যা, তাই শুধু টোরিপার্টির সদস্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকা যায় না —টোরি ভিন্ন অন্যকেও আহ্বান করা হয় এ কাজে সাহায্য করিতে। বলা বাহুল্য বেলুনের রং থাকে টোরিপার্টির প্রতীক।

১৫০০০ বৎসরের জীবন্ত "ঠাকুরদাদা"

অদ্ভুত ঠাকুরদাদাটি জাতিতে উদ্ভিদ—মানব নয়। ইনি নাকি দুনিয়ার সর্ব্ব-জ্যেষ্ঠ জীবন্ত পদার্থ। অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যাণ্ড প্রদেশে ব্রিসবেন শহরের নিকট টুম্বোরিন্ পাহাড়ে ইহাকে নূতন করিয়া বসান হইয়াছে স্থানান্তরিত করিয়া। ১৯১২ সালে চিকাগোর প্রোফেসর চেম্বারলেইন্ অভিমত প্রদান করেন যে, এ উদ্ভিদ-ঠাকুরদাদাটির বয়স মাত্র ১৫০০০ বৎসর। ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা ইহার নামকরণ করিয়াছে ঠাকুরদাদা পিটার (Grandfather Peter)। ইহা পাম্ জাতীয় বৃক্ষ।

ইহার বৈজ্ঞানিক নাম ম্যাক্রোজেমিয়া এবং সাধারণতঃ ২৫ ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হয়। আবার বৈজ্ঞানিকগণ আরও বলেন, ইহা প্রকৃতপক্ষে বৃক্ষ নয়, ফার্ন এবং পামের সম্মেলনে উদ্ভূত বর্ণসঙ্কর মাত্র। ইহাদের বৃদ্ধি অতি ধীর। আনারসের মত পাতাগুলি ৬ হইতে ৭ ফুট লম্বা হয় আর চওড়া হয় ১৫ ইঞ্চি। ইহার যে ফল হয় তাহাও দেখিতে আনারসের মত—তবে আকার ও ওজনে অনেক বেশী বড়। একটি ফল ১ মণ পর্য্যন্ত হইয়াছে। এখন ঐ ফল সংগ্রহ করিয়া পোঁতা হয়, তাহা হইতেই ম্যাক্রোজেমিয়া-ঠাকুরদাদার বংশবৃদ্ধি হয়।

তরুণীর মৃত্যু-নর্ত্তন

নিউপোর্ট, মনমাউথের অষ্টাদশী তরুণী রেই প্যাটিমোর তাহার প্রণয়ীর সহিত দুই ঘণ্টা পরে সাক্ষাতের আনন্দে নাচিতে নাচিতে বৈকাল পরিচ্ছদ পরিধান করিতে থাকে দোতলায় আপন শয়ন-কক্ষে। সঙ্গে সঙ্গে গানের সুর ঝঙ্কার দিয়া উঠে তাহার কণ্ঠে। তরুণীর পিতা উহার নিম্ন কক্ষে একতলায় থাকিয়া কন্যার উল্লাসের সাড়া পায়। পিতা তখন কন্যাকে ডাকিয়া বলে, "আমার তরেও একটি গান গাও রেই।"

মেয়ে তখন আবার ভরপুর খুশীর আমেজে তান ধরে—

("আজ রাতে তার কথা নয়"......)

এই সুরটি তরুণীর বড়ই প্রিয়।

পিতা কন্যার পদক্ষেপ আর গানের সুর দুই-ই নিবিড়-ভাবে কান পাতিয়া শুনিতে থাকে। —দুপ্ দুপ্ দুপ্ দুপ্ —হঠাৎ পদক্ষেপ শব্দ নীরব হয়, সঙ্গে সঙ্গে একটা বিপুল নিনাদ—সংঘর্ষের, গুরুভার পদার্থ কিছু পতনের।

পিতা ব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া যায় দোতলায়। কন্যার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখে—সর্ব্বনাশ! কন্যা তাহার চির-দিনের জন্য নৃত্য-গান সমাপ্ত করিয়াছে।

যে নারীর চক্ষুশূল—আলো আর ফুল

মিস্ ডরোথি ফোবি সেয়ার, বয়স ষাট বৎসর, হোভ্ শহরে ব্রিটোন রোডে বাস করিত। সে কখনও নিজাবাসে আলো জ্বালিত না। সন্ধ্যার পর একবার মাত্র খাইবার জন্য হোটেলে যাইত। তাহার প্রতিবেশীরা তাহার চেহারা কখনও দেখে নাই

সে আলো আর ফুল দুই-ই বরদাস্ত করিতে পারিত না। নিজের গৃহে ত ফুল আনিতই না, এমন কি, পাশের বাড়ীর বাগানে, যদি এমন জায়গায় ফুল ফুটিত যে তাহার আঙিনা হইতে দেখা যায়, তবে সে সেই ফুলটি কাটিয়া ছুড়িয়া দিত দূরে বাগানের ভিতরে যেন আর তাহার চোখে না পড়ে।

নিজাবাসের প্রত্যেকটি জানালায় অতি মোটা কাপড়ের পর্দ্দা থাকিত, যেন বাহিরের আলো প্রবেশ করিতে না পারে। রাত্রিবেলা অন্ধকারে সে নিজ কক্ষে আনাগোনা করিত।

সম্প্রতি তাহার মৃত্যু হইয়াছে এক সন্ধ্যায়। আর পুলিশ তদন্তে আসিয়া সেই গৃহে আলো জ্বালাইয়া দিয়াছে। পূর্ণ সাত বৎসর পর এই গৃহে আলো জ্বলিল।

গন্ধ ও স্বাদের মূল্য ৪০০ পাউণ্ড

ম্যাঞ্চেষ্টার শহরে এক মোটর-সংঘর্ষের ফলে মিসিস প্লাট আহত হয়। তাহার বয়স পঞ্চাশ বৎসর। সে যে মোটরে ছিল, উহা তাহার জামাতা চালাইতেছিল। মোকদ্দমার সময় বলা হয়, মিসিস প্লাট যে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহার ফলে স্বাদগ্রহণ ও গন্ধ অনুভব তাহার পক্ষে আর বাকি জীবনে

সম্ভব হইবে না। তাহার নাসিকা এবং জিহবার ঐ দুই শক্তি চিরকালের জন্য বিনষ্ট হইয়াছে—উহার পুনরুদ্ভব আর হইবে না।

ম্যাজিস্ট্রেট মিসিস প্লাটকে ৪৩৬ পাউন্ড ক্ষতিপূরণ দানের আদেশ দেন আসামী ফ্রাঙ্ক ডাটনের উপর। ডাটনের পক্ষের আইনজ্ঞের কথার প্রতিবাদে ম্যাজিস্ট্রেট বলেন,—"আসামীর পক্ষীয় আইনজ্ঞের বাক্য অতিশয় অসঙ্গত। স্বাদ-গন্ধ শক্তিহীন ব্যক্তির এই ক্ষতিকে অকিঞ্চিৎকর প্রতিপন্ন করিবার জন্য 'স্বাদ-গন্ধ গ্রহণের শক্তি লোপে অনেক বিস্বাদ ও দুর্গন্ধ গ্রহণ হইতে রেহাই পাওয়া যায়'—এইরূপে বলা অতিশয় অন্যায়। একবার অনুমান করিতে চেষ্টা করুন, কি আপনার জীবন হইয়া পড়িবে, যদি আপনি মাটি আর মিষ্টান্ন খাওয়ার প্রভেদ না টের পান কিম্বা গন্ধক আর পাকা কলার গন্ধের বৈষম্য আপনি ধরিতে না পারেন!"

দীর্ঘতম নেত্রলোম

মিস্ পেগি গ্রান্ট কুড়ি বৎসর বয়সেই জীবনে বীতস্পৃহ হইয়া পড়িয়াছে, কারণ সে যখন যেখানে যায়, চারিপাশের ছোট বড় সকল মহিলাই ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিতে থাকে—ঐ দেখ নূতন ফ্যাশান, চোখের পিছি (রোম)ও আজকাল কৃত্রিম ব্যবহার করা বাহাদুরীতে দাঁড়াইয়াছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে লণ্ডনের কোনও হোটেলে যখন মিস্ গ্রান্ট প্রবেশ করে, তখন কোনও অভিজাত মহিলা মিস্ গ্রান্টের নেত্রলোম টানিয়া ধরিয়া প্রমাণিত করিতে চাহিয়াছিল যে, উহা কৃত্রিম। কিন্তু অভিজাত মহিলা তাহা ত পারেই নাই, বেশীর ভাগ ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইয়াছে তাহার মিস্ গ্রান্টের নিকট।

ব্যাপার এই যে, মিস্ গ্রান্টের নেত্রলোম প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা; কাজেই উহা যে স্বাভাবিক, ইহা সহজে কেহ বিশ্বাস করিতে চাহে না।

মিস্ গ্রান্ট একেবারে ক্ষুণ্ণ হইয়া বলে, সে এক প্রতিযোগিতা আহ্বান করিবে এবং তাহার অপেক্ষা লম্বা 'চোখের পিছি' যদি কাহারও থাকে তবে তাহাকে সে নিজ তহবিল হইতে পুরস্কার দান করিবে। মিস্ গ্রান্টের অক্ষি-পক্ষ্মের দৈর্ঘ্য ঠিক ঠিক এক ইঞ্চির আট ভাগের সাত ভাগ পরিমাণ।

মুষ্টিযুদ্ধে জয়ে তুক্‌তাক্

মুষ্টিযুদ্ধে লিপ্ত হইবার পূর্ব্বে পরিহিত জুতার ভিতর পারিবারিক সৌভাগ্য-প্রতীক লকেটটি থাকিলে আর পরাজয় কিছুতেই হইবে না—এই বিশ্বাস মুষ্টিযোদ্ধা জর্জ্জ হাওয়ার্ডের রহিয়াছে বদ্ধমূল। তাই সে মুষ্টিযুদ্ধ-প্রতিযোগিতায় ঐ সৌভাগ্য-প্রতীকটি না লইয়া কখনও যোগদান করে না। ফলে, এই পর্য্যন্ত সে যতগুলি প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইয়াছে, উহার একটিতেও পরাস্ত হয় নাই।

কিন্তু বিপদ হইয়াছে; তাহার ছোট ভাই প্যাটও মুষ্টিযোদ্ধা হইয়াছে, সেও লকেটটির আশিস্ পাইতে চায়। এক-দিনে দুইজনের [illegible] উহার সাহায্য [illegible] এইটি [illegible] পরিবারের সৌভাগ্য-লক্ষ্মী এবং বহুকাল হইতে আ[illegible] সৌভাগ্য বিধান করিতেছে। উহার মালিক অবশ্য [illegible] জর্জ্জকে ধার দিয়াছি। এখন প্যাটকেও দিব। কিন্তু [illegible] পরিধান সত্ত্বেও যে প্রথম হারিবে তাহাকে আর দেওয়া [illegible] না। কারণ, সে নিজেই অপয়া—লকেট তাহার সৌভাগ্য [illegible] করিবে না। অপয়ার সংস্পর্শে লকেটটি যাহাতে [illegible] বৈশিষ্ট্য না হারায়, সেজন্যই পরাজিতকে উহা স্পর্শ ক[illegible] দেওয়া হইবে না।

শব্দ-নিবারক সমিতি

চারি বৎসর পূর্ব্বে লণ্ডনে শব্দ-নিবারক সমিতি [illegible] হইয়াছে। উহাদের সুপারিশে সমগ্র মেট্রোপলিসে রা[illegible] মোটরের হর্ণ-শব্দ বন্ধ করা হইয়াছে। ইহাই হইল উ[illegible] সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। রাজপথ খনন করিবার কানফাটা [illegible] দিকে এখন এই সমিতি মনোযোগ দিয়াছে। ফলে, স[illegible] প্রেসিডেণ্ট রাজকীয় চিকিৎসক লর্ড হোর্ডার-এর নি[illegible] ক্রমে শব্দ-নিবারক সদস্য ওয়ালটার আর পেটিট একটি [illegible] যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহার দ্বারা রাস্তা খু[illegible] কাজটি নিতান্তই নগণ্য শব্দে সমাধা হইবে। তিনি [illegible] ড্রিলটিকে একটি মস্ত বড় চোঙের ভিতর স্থাপন করিয়[illegible] দেখিতে উহা ডাস্টবিনের মত—কিন্তু এই চোঙ (Sile[illegible] শব্দ-প্রতিরোধকের কার্য্য করিবে। এই চোঙের [illegible] অপেক্ষাকৃত বড় আর একটি চোঙ—এই দুয়ের আভ্য[illegible] শূন্য স্থান পূরণ করা হইয়াছে—কাঠের কুচি দ্বারা। যন্ত্রটি চালাইবার শ্রম লাঘব করিবার জন্য ক্যান্ট-[illegible] কৌশল জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, ব্যাক-বিল ও ষ্টীল সা[illegible] যন্ত্রটিকে একটি বালকও অনায়াসে চালাইতে পারিবে[illegible] রাস্তার বার ইঞ্চি পুরু কনক্রিট কাটিতেও শব্দ হইবে [illegible] সামান্য। এই মৃদু খট্‌খট্ আওয়াজ লণ্ডনের [illegible] সোরগোল ছাপাইয়া শ্রুত হইবে না একেবারেই।

বিশেষজ্ঞগণ হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন—প[illegible] ফ্যাশানের ড্রিল-যন্ত্রের শব্দের ছিল ৯০ ফোনস (P[illegible] শক্তি, কিন্তু লণ্ডনের সাধারণ শব্দের শক্তি ৬৮ [illegible] কোন কোন শক্তিশালী ড্রিল-যন্ত্র ১১৭ ফোনস শক্তি [illegible] শব্দ উত্থিত করিত। নূতন ড্রিল-যন্ত্রে ৪৫ ফোনস-এর শব্দ হইবে না, কোন কোন স্থলে হইবে মাত্র ৩০ ফোনস

১১০ বৎসরের বিবাহিত জীবন

তুরস্ক রাজ্যের পূর্ব্ব আনাটোলিয়া প্রদেশের [illegible] শহরে এক বৃদ্ধ দম্পতি বাস করে; স্বামীটির বয়স [illegible] বৎসর, স্ত্রীর বয়স ১৪০ বৎসর। চতুর্থ জর্জ্জ যখন ই[illegible] রাজা, তখন তাহাদের বিবাহ হয়। তাহারা ১১০ [illegible] ব্যাপিয়া বিবাহিত জীবন-যাপন করিতেছে। পৃথিব[illegible] চেয়ে বৃদ্ধ দম্পতি। তাহাদের বিবাহের ১১০ বার্ষিকী উপলক্ষে ১২০ টিরও বেশী পুত্র-কন্যা নাতি-নাতনী [illegible] করিয়াছিল। তাহাদের [illegible] ও সামান্য ফলমূল [illegible] আর তাহাদের উভয়েরই অতি প্রিয়।

সমাধান

(উপন্যাস—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন

(১৮)

"গুড্ মর্নিং সার্! একটু আসতে পারি কি?"

পূর্ব্বাহ্ণ আটটা সাড়ে আটটার সময় আশুবাবু তাঁহার অফিস-কক্ষে বসিয়া কাজ-কর্ম্ম করিতেছিলেন; মুখ তুলিয়া দ্বারদেশে একজন অপরিচিত প্রৌঢ় ভদ্রলোককে দেখিতে পাইলেন, এবং "গুড্ মর্নিং, আসুন" বলিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া একখানি চেয়ার টানিয়া বসিতে দিলেন।

"থ্যাঙ্কস্" বলিয়া আগন্তুক উপবেশন করিলেন, এবং সমুচিত সৌজন্য প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"আমি মহাশয়ের সম্পূর্ণ অপরিচিত। আশা করি, কাজের মধ্যে এসে আপনার কোন ক্ষতি করছি না।"

আশুবাবু হাসিমুখে বলিলেন,—"না না, কিছু না; বসুন। কোথেকে আসছেন?"

আগন্তুককে কিঞ্চিৎ বিব্রত দেখা গেল। ঈষৎ ইতস্তত করিয়া তিনি বলিলেন,—"আজ্ঞে হ্যাঁ, এসেছি যখন, সব বল্‌তে হবে বৈ কি।" এইটুকু বলিয়াই তিনি আবার যেন কেমন থতমত খাইয়া গেলেন। অবশেষে ধীরে ধীরে বলিলেন,—"দুলালী এখন আপনাদের এখানে আছে কি?"

বিস্ময়ভরে আশুবাবু তাঁহার মুখের উপর স্থির নিঃসন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন,—"কেন বলুন ত?"

আগন্তুক অত্যন্ত বিনীতভাবে বলিলেন,—"আমি বহু দূর থেকে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। সে যদি এখানে থাকে তবে দয়া করে তাকে একটু খবর দিন যে ওভারসিয়ার দেবেন ভট্‌চায এসেছে।"

আশুবাবু একটু চমকিয়া উঠিলেন। কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত্ত তিনি আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া মৃদুহাস্যের সহিত প্রশ্ন করিলেন,—"আপনার নাম কি বললেন, দেবেনবাবু? আপনি ওভারসিয়ার? 'সমুলগাছি' বাংলোয় আপনি কখন ছিলেন কি?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ, বছর পাঁচেক পূর্ব্বে আমি সেখানে ছিলাম।"

—"ও তবে আপনিই সেই দেবেনবাবু!" বলিতে বলিতে আশুবাবু উঠিয়া পড়িয়া আগন্তুক ভদ্রলোককে একেবারে আলিঙ্গনে জড়াইয়া ধরিলেন,—যেন কতকালের পুরাতন বন্ধুকে আলিঙ্গন করিতেছেন এবং পরম উৎসাহের সহিত বলিলেন,—"আরে মশাই, আপনার এবং আপনার পুণ্যবতী সহধর্ম্মিণীর কোন সংবাদ জান্‌তেই আমাদের বাকি নেই!" তারপর তিনি কনককে ডাকিলেন। কনক ছুটিয়া আসিল।

আশুবাবু তাহাকে বলিলেন,—"এঁকে প্রণাম কর;" এবং আগন্তুককে বলিলেন,—"আমার মেয়ে,—দুলালীর ছোট বোন।"

কনক প্রণাম করিল। আগন্তুক তাহার মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, কিন্তু আশুবাবুর অমায়িক ব্যবহারে তিনি এতদূর অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, কোনরূপ একটা আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিতে ভুলিয়া গেলেন।

আশুবাবু বলিলেন,—"তোমার দিদি কোথায় মা? তাকে একবার ডেকে দাও।"

—"দিদি স্নান করতে গেছেন; ডেকে দিচ্ছি।" বলিয়া কনক ভিতরের দিকে চলিয়া গেল।

আশুবাবু প্রশ্ন করিলেন,—"তা দেবেনবাবু! আপনি কবে এলেন? কোথায় উঠেছেন?"

দেবেনবাবু উত্তর দিলেন,—"আজ-ই ভোর চারটের সময় এসে পৌঁচেছি। এখানে আমার একজন আত্মীয় আছেন, তাঁর বাসায় উঠেছি।"

এমন সময় ভিতরের দিকের দ্বারদেশে সদ্যস্নাতা ভদ্র-কন্যাবেশিনী দুলালী আসিয়া উপস্থিত হইল। দেবেন্দ্রবাবু তাহার দিকে চাহিলেন এবং সেও দেবেন্দ্রবাবুর দিকে চাহিল। মুহূর্ত্তের জন্য কেমন যেন বিস্ময়পূর্ণ চমকপ্রবাহ উভয়কে বিহ্বল করিয়া ফেলিল। পরক্ষণেই দুলালী "বাবা" বলিয়া ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে পড়িল। দেবেনবাবু পিতার আদরে তাহাকে কোলের পার্শ্বে টানিয়া লইলেন। কনক পিছনে আসিয়াছিল। দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া সে একবার তাঁহাদের উভয়ের দিকে এবং একবার আশুবাবুর দিকে চাহিয়া, ব্যাপারটা যে কি, তাহা বুঝিবার নিষ্ফল চেষ্টা করিতে লাগিল।

দুলালী কহিল,—"আপনি কোত্থেকে এলেন বাবা? আপনাকে খুব রোগা দেখাচ্ছে। মা কোথায়, কেমন আছেন, পাঁচুদাদা আর ছোট খোকা ভাল আছে?" দুলালীর মুখ আর থামে না;—সে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া যাইতে লাগিল।

আশুবাবু হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না। দেবেন-বাবুর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া তিনি হো হো করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। সুতরাং প্রশ্ন বন্ধ করিয়া দুলালীকে আশুবাবুর দিকে চাহিতে হইল। আশুবাবু কহিলেন,—"তুমি ত প্রশ্নই করে যাচ্ছ মা;—উত্তর দেবার ফুরসুৎ দিচ্ছ কই?"

দুলালী লজ্জা পাইয়া মুখ টিপিয়া হাসিল।

দেবেন্দ্রবাবু বলিলেন,—"তোমার সব ক'টি প্রশ্নেরই উত্তর দিচ্ছি মা! আমি অনেক দূরে থেকে আস্‌ছি। রেল-স্টীমার গরুর গাড়ীর অত্যাচারে, স্নানাহারের অনিয়মে এবং কোন একটা বিষয় নিয়ে অতিশয় দুশ্চিন্তায় পড়ে, শরীরটা একটু অসুস্থ হয়েছে ঠিকই, তবে তেমন কিছু হয় নি। তোমার মা, পাঁচু, খোকা,—সকলে ভাল আছেন। গেল বছর বৈশাখ মাসে তোমার একটি বোন জন্মেছে এবং সেও বেশ ভাল আছে।"

আশুবাবু বলিলেন,—"কনক! যাও ত মা, তোমার এই কাকাবাবুর জন্য একটু চা নিয়ে এস।" তারপর দেবেনবাবুকে বলিলেন,—"তামাক খেয়ে থাকেন বোধ হয়?"

দেবেনবাবু বলিলেন,—"আজ্ঞে না। অভ্যেসটা পূর্ব্বে ছিল;—ছেড়ে দিয়েছি।"

আশুবাবু বলিলেন,—"বেশ করেছেন। আমি খাই বটে, কিন্তু দিন রাত্রে মাত্র চার পাঁচবার।"

ইতিমধ্যে কনক আশুবাবুর কানের কাছে মুখ লইয়া চুপি চুপি কহিল,—"কাকাবাবু?"

আশুবাবু হাসিয়া ফেলিলেন; বলিলেন,—"হ্যাঁ, কাকা-বাবু।"

কনকের অন্তর আনন্দে নাচিয়া উঠিল। ঐ ত ওবাড়ীর গিরিবালার কেমন একজন কাকাবাবু আছেন; গিরিবালাকে তিনি কত আদর করেন, স্নেহ করেন! কনক ছুটিয়া ভিতরে গেল।

দেবেন্দ্রবাবু দুলালীকে কহিলেন,—"শিবু কোথায় মা? সুখন? তারা দু'জনে বেশ ভাল আছে ত?"

—"হ্যাঁ বাবা! ভালই আছে। আমরা এখান থেকে সাত আট মাইল দূরে রামপুর গ্রামে থাকি। সেখানে আমাদের খামার আর বাড়ী আছে। বাবুয়া আর দাদা সেখানে আছে; আমি একটা কাজের ঠেকায় আজ এগার দিন হ'ল এখানে আছি।"

—"শিবু, সুখন কি এখন চাষ-বাসই করে না কি?"

—"হ্যাঁ বাবা! আপনার ওখান থেকে আসা অবধি আমরা চাষ-বাস নিয়েই আছি।"

এইরূপে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। কনক এক গ্লাস জল, কিছু খাবার এবং এক পেয়ালা চা আনিয়া দিল।

চা এবং জলযোগ শেষ হইলে দেবেন্দ্রবাবু আশুবাবুকে বলিলেন,—"আপনার সঙ্গে আমার একটি বিশেষ আবশ্যকীয় কথা আছে। আপনার এখন একটু অবসর হবে কি?"

—"অবসর? হ্যাঁ, হবে বৈ কি, খুব হবে। কি কথা আছে বলুন।" বলিয়া আশুবাবু সম্মুখের কাগজ-পত্রগুলি তুলিয়া রাখিলেন।

দেবেন্দ্রবাবু দুলালীকে বলিলেন,—"তবে তুমি এখন এস মা, এখন আমরা একটু কাজ করি; পরে তোমার সঙ্গে আবার কথাবার্ত্তা হবে।" দুলালী হাসিমুখে অন্দরের দিকে চলিয়া গেল। কনকও তাহার অনুসরণ করিল।

মেয়েরা চলিয়া যাইতেই দেবেনবাবু উঠিয়া আসিয়া খপ্ করিয়া উভয় হস্তে আশুবাবুর দক্ষিণ হাতখানি চাপিয়া ধরিলেন এবং চোখে মুখে ও কণ্ঠস্বরে অব্যক্ত কাতরতা আনিয়া বিষাদ-ক্ষীণ কণ্ঠে কহিলেন,—"আপনাকে আমি কি বলে সম্বোধন করব ঠিক পাচ্ছি না; তবে দুলালীর সম্পর্ক নিয়ে এবং আপনার মেয়ের কানে আপনি যে সম্পর্ক প্রকাশ করেছেন তাই নিয়ে আমি আপনাকে দাদা বলেই সম্বোধন করছি। আজ আমি আপনার কাছে নিতান্ত কৃপাপ্রার্থী!"

তাঁহার কথায় বাধা দিয়া আশুবাবু হাত ছাড়াইয়া লইলেন এবং তাঁহাকে পুনরায় চেয়ারে বসাইয়া বলিলেন,—"আপনার কি হয়েছে দেবেনবাবু? আপনি এমন ব্যাকুল হচ্ছেন কেন?"

—"আমি যার পর নাই বিপন্ন হয়েই আপনার শরণাগত হয়েছি এবং আপনি দয়া করলেই আমি নিস্তার পেতে পারি।"

—"আমি? আমি ইচ্ছা করলে আপনাকে বিপদ থেকে নিস্তার করতে পারি? তবে আর কি,—বিপদ ত আপনার তা হলে কেটেই গেছে। কিন্তু কি,—ব্যাপারটা কি বলুন ত।"

—"বলতেও মাথা কাটা যাচ্ছে মশাই! কিন্তু না বলেও উপায় নেই। একটি নিরপরাধ ব্রাহ্মণ যুবতীর এবং একটি ব্রাহ্মণ শিশুর জীবন মরণ আজ আপনার হাতে নির্ভর করছে।"

আশুবাবুর চক্ষু কপালে উঠিল। তিনি বলিলেন,—"আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না দেবেনবাবু! তা' আপনি অত ইতস্তত না করে কথাটা খোলসা করেই বলে ফেলুন না। আমার দ্বারা যদি আপনার কোন উ[illegible] হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনি বঞ্চিত [illegible] না।"

—"সেই ভরসা নিয়েই ত আপনার কাছে এ[illegible] আপনার মহানুভব চরিত্রের"—

—"এ হে, আপনিও যে দেখছি,—আরে মশাই, বাজে কথা ছেড়ে সোজা কাজের কথায় এসে পড়ুন। ব্যাপারটি জানবার জন্য আমি বড় উৎকণ্ঠিত হয়ে প[illegible] কোথায় কোন্ ব্রাহ্মণ কন্যার এবং কোন ব্রাহ্মণ শিশুর মরণ আমার হাতে নির্ভর করছে,—কি ব্যাপার, বলে ফে[illegible]

—"তবে সোজা কথাই বলি", বলিয়া দেবেনবাবু [illegible] থামিয়া গেলেন;—বলি বলি করিয়াও যেন বলিতে পারি[illegible] না। অবশেষে কোন প্রকারে বলিলেন,—"ভূপতি চ[illegible] আমার ভগ্নীপতি। আমার একমাত্র স্নেহের কনিষ্ঠা [illegible] এবং তার শিশু পুত্রকে আপনি রক্ষা"—আর বলিতে পা[illegible] না; ঠোঁট দু'খানি অবাধ্যভাবে কাঁপিতে কাঁপিতে থামি[illegible] এবং অপমান ও লজ্জা তাঁহার দুই চক্ষু হইতে দুই বি[illegible] বড় তপ্ত অশ্রু রূপে গলিয়া পড়িল।

আশুবাবু স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

একটু পরে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া, দেবে[illegible] পুনরায় কহিলেন,—"দুলালীর নিকট আমার কোন [illegible] নিষ্ফল হবে না, তা আমি জানি। শিবুও আমার [illegible] অনুরোধ ঠেলতে পারবে না বলেই আমার বিশ্বাস। মনে করেছি, আহারান্তে দুপুরবেলা একটা সাইকেল একবার রামপুর থেকে ঘুরে আসব। তারপর বিকেলে[illegible] দুলালীকে বলব। কিন্তু সবই আপনার দয়ার উপর [illegible] করছে। আমার মাত্র দশ দিনের ছুটি;—তারও ত[illegible] গেল।

আশুবাবু গম্ভীরমুখে শিষ্টতার হাসি টানিয়া [illegible] বলিলেন,—"এ যে বড় জটিল ব্যাপার নিয়েই আপনি পড়েছেন দেখছি! ভূপতি আপনার ভগ্নীপতি? [illegible] পশুর হাতে আপনার ভগ্নীটিকে সমর্পণ [illegible]রেছিলেন?

দেবেন্দ্রবাবু মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন।

আশুবাবু বলিলেন,—"যাক, যা হবার হয়ে[illegible] দুলালীর মান-অপমানের,—দুলালীর ভবিষ্যতের আপনার দৃষ্টিও কম থাকার কোন কারণ আছে ব[illegible] আমার মনে হয় না। আপনাকেও সে পিতৃ সম্বোধন[illegible] এবং আপনি তাকে কন্যার ন্যায় স্নেহ করেন, তা ত দে[illegible] পেলাম। ওর বাবা কি বলে, তাই আগে দেখুন।"

দেবেনবাবু পুনর্ব্বার যেন একটা বিষম ইতস্ততে পড়িলেন। বলি কি বলি না, এইরূপ একটা দ্বন্দ্ব মনের মধ্যে তাল পাকাইয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে মন স্থির করিয়া চাপা স্বরে কহিলেন,—"দেখুন, এক[illegible] উত্তম ও সুখের সংবাদও আমি এনেছি; কিন্তু [illegible] ব্যাপারটা এতই কুৎসিত ও মর্ম্মভেদী, এবং তা নিয়ে এতই যন্ত্রণা ভোগ করছি যে, অন্য সময়ে যে শুভ স[illegible] প্রকাশ করবার জন্য আমি এক মুখের স্থানে শত

কামনা করতাম, তেমন একটা সুসংবাদ প্রকাশ করতেও আজ আমাকে নানারূপ সতর্কতা অবলম্বন করতে হচ্ছে।"

—"কি মশাই, ব্যাপার কি? এবার আর দেরী করবেন না, চট্ করে আপনার সুসংবাদটি বলে ফেলুন।"

দেবেন্দ্রবাবু চতুর্দ্দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া আশুবাবুর মুখের নিকট মুখ লইয়া অতি মৃদুস্বরে বলিলেন,—"শিবু দুলালীর পিতা নয়। দুলালী সম্ভ্রান্ত বাঙালী ঘরের মেয়ে।"

আশুবাবু অত্যন্ত চমকাইয়া উঠিলেন; কহিলেন,—বলেন কি? সত্যি?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি এই সাড়ে তিন বৎসর যাবৎ যে স্থানে আছি তার অত্যন্ত নিকটেই 'সোনাপেটিয়া বাগিচা' নামে একটা খুব বড় চা-বাগান আছে। শিবু সেই বাগানের সর্দ্দার ছিল।" তারপর দেবেনবাবু শিবপ্রসাদ ও দুলালী সংক্রান্ত সকল ব্যাপার খুলিয়া বলিলেন।

"অনেক অনুসন্ধানে জানতে পেরেছি—শিবপ্রসাদ রায়ের মেয়েই আমাদের ঐ দুলালী। শিবুর নিজের ছেলে হচ্ছে ঐ সুখন।"

অপরিসীম আনন্দে ও বিস্ময়ে আশুবাবু একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। চেয়ার ছাড়িয়া নিঃশব্দে দুই তিন মিনিট পায়চারি করিতে করিতে অনেক কিছু ভাবিয়া লইলেন। তারপর দেবেন্দ্রবাবুকে বলিলেন,—"আপনি যে মূল্যবান সংবাদটি বহন করে এনেছেন, তার বিনিময়ে দুলালী আপনার আদেশ নিশ্চয়ই মাথা পেতে নেবে। কিন্তু এত বড় একটা সংবাদ একেবারে হঠাৎ জানান সঙ্গত হবে কি? সন্ধ্যার পর ধীরে সুস্থে প্রকাশ করাই বোধ হয় ভাল হবে। আপনি দয়া করে তখন উপস্থিত থাকবেন, এবং আপনার মুখেই সে তার জীবন বৃত্তান্ত অবগত হবে। আজ রাত্রে আপনি আমাদের এখানেই চারটি যা হয় খাবেন।"

"যে আজ্ঞে" বলিয়া দেবেন্দ্রবাবু তখনকার মতন বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন।

আশুবাবুর মনে সহসা সন্দেহের উদয় হইল যে দুলালীকে মুগ্ধ ও বশীভূত করিয়া তাহার দ্বারা স্বীয় কার্য্যোদ্ধার করার জন্য দেবেন্দ্রবাবু এই একটি কৌশলের সৃষ্টি করেন নাই ত? তিনি গ্যারেজ হইতে গাড়ী লইয়া দ্রুত বাহির হইয়া গেলেন।

কনক ছুটিয়া আসিয়া কহিল,—"এই অবেলায় কোথায় যাচ্ছ বাবা?"

আশুবাবু বড় তৃপ্তিলাভ করিলেন। এইখানেই ত সংসারের শান্তি! তিনি হাসিয়া বলিলেন,—"একটু বিশেষ কাজে যাচ্ছি মা! ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ফিরব।"

রামপুরের সম্মুখে গাড়ী থামাইয়া আশুবাবু উপর্য্যুপরি কয়েকবার হর্ন বাজাইয়া দিলেন। শিবু ও সুখন তাঁহার গাড়ীর হর্নের শব্দ চিনিত। তাহারা দৌড়াইয়া আসিল। তারপর কোনরকম ভূমিকা না করিয়াই তিনি শিবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দেখ শিবনাথ তোমার কাছে একটি সত্যকথা শুনবার জন্য আমি এইমাত্র বাড়ী থেকে ছুটে আসছি।"

কিছু বুঝিতে না পারিয়া শিবু একটু ঘাবড়াইয়া গেল; ভয়-চকিত-কণ্ঠে কহিল,—"কি কথা বাবু?"

—"না, কোন ভয়ের কথা নয়, কিম্বা কোন মন্দ কথা নয়। দুলালীর জন্ম সম্বন্ধে আমি আজ হঠাৎ একটা সংবাদ পেয়েছি। সেই সংবাদ সত্য, কি মিথ্যা, তোমার কাছে আমি তা জানতে এসেছি।"

শিবুর মুখমণ্ডলের রক্তপ্রবাহ হঠাৎ যেন শুকাইয়া গেল এবং সমস্ত মুখখানা মুহূর্ত্তে শাদা ফ্যাকাসে হইয়া পড়িল। কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বরে কোনরূপ বিকৃতি স্পর্শ করিল না। আশুবাবুর মুখের প্রতি নিষ্পলক নেত্রে চাহিয়া ধীর অবিকৃত-কণ্ঠে সে কহিল,—"কি সংবাদ শুনেছেন জানি না বাবু, কিন্তু যা শুনেছেন তা সত্য। আমি দুলালীর বাপ নই; কিন্তু ভগবান জানেন, দুলালী আমার মেয়ে। আমি অনেকদিন আপনাকে বল্‌তে চেয়েছি,—আপনাকে বলবার জন্য কয়েকদিন আপনার সম্মুখেও গিয়েছি, কিন্তু বলি বলি করেও বল্‌তে পারি নি।.....সেই রাত্রে, দুলালীকে আমার হাতে সমর্পণ করে দিয়ে দুর্গাদিদি যখন পরলোকে চলে যান, তার অল্পক্ষণ পরেই শিবপ্রসাদবাবুও যখন দুলালীর মায়া কাটিয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন, তখন বুঝলাম ভগবান আপন হাতে আমার বুকের মধ্যে দুলালীর জন্য বাসা বেঁধে দিলেন। দুলালীও কিছু কম করে নি বাবু! আমার মা-হারা ছেলে সুখনকেও সে সরিয়ে দিয়ে আমার বুকের অধিকাংশ স্থান অধিকার করে বসল্।"

তারপর একটু থামিয়া পুনরায় কহিল,—"আপনি জেনেছেন ভালই হয়েছে।' দুলালীর জন্ম-বৃত্তান্তও তার নিজের কাছে প্রকাশ করার জন্যও কিছুকাল যাবৎ আমি ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলাম; কিন্তু সাহস পাই নি। কি জানেন বাবু?—মা সন্তানকে বাঁচায় বুকের দুধ দিয়ে; কিন্তু আমি দুলালীকে বাঁচিয়েছি আমার বুকের রক্ত দিয়ে। আপন জন্ম-কাহিনী ও বংশ-পরিচয় জানতে পেরে সেই দুলালীই পাছে আমাকে ঘৃণা করে, অবহেলা করে, দয়ার চক্ষে দেখে, এই ভয়েই আমি এতদিন কথাটা প্রকাশ করতে পারি নি। সে ত আর বুঝবে না বাবু, যে এই চা-বাগানের সামান্য কুলী শিবু সর্দ্দার না হলে ঐখানেই তার এমন সুন্দর জীবন-টুকু খতম হয়ে যেত!"

আবার শিবুর কণ্ঠে উচ্ছ্বাস জাগিল—"তিন মাস রাস্তায় রাস্তায় ঐ অতটুকু মেয়েটাকে বুকে করে, আর ঐ অতটুকু ছেলের হাত ধরে, এবং কাপড় চোপড় লোটা কম্বলের একটা বোঝা পিঠে বেঁধে, শেয়াল-কুকুরের মত ঘুরে ঘুরে, শেষটায় এক দেবতার বাড়ীতে আশ্রয় পেলাম। বেশ সুখে ছিলাম কয়েকটা বৎসর। ছেলে মেয়ে দুটোও সেইখানেই বড় হ'ল। তারপর হঠাৎ আমাদের সেই আশ্রয়দাতা দেবেনবাবু বদলি হলেন একেবারে সেই চা-বাগানের কাছাকাছি জায়গায়। আমার আর সেখানে যেতে সাহস হল না, পাছে কেউ দুলালীকে কেড়ে নেয় আমার বুক থেকে—ছিনিয়ে নেয় দাবী করে। দেবতার আশ্রয় ছেড়ে দিলাম, এবং রামপুরে এসে ডেরা বাঁধলাম। বেশ সুখে ছিলাম বাবু এখানেও; ভগবানের

দয়ায় এখানেও আবার আপনাদের পেলাম। আর কি বাবু? দুলালীর জন্য আমার আর কোন চিন্তা নাই। ভগবান জানেন, আমি আমার কর্ত্তব্য পালনে এতটুকুও ত্রুটি করি নি।"

একটু থামিয়া, কিন্তু আশুবাবুকে কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়া, শিবু পুনরায় কহিল, "তবে এই মোকদ্দমাটা আমার অন্তরে বড় গুরুতর আঘাত দিয়েছে বাবু! ভগবান জানেন, দুলালী আমার নির্দ্দোষ; শ্মশানে দাঁড়িয়ে শব স্পর্শ করেও আমি শপথ করে বলতে পারি দুলালীর কোন পাপ নাই। শুধু আমার বোকামিতেই এমন একটা কুকান্ড হয়ে গেল। আমি যদি সন্ধ্যার সময় গ্রাম ছেড়ে না যেতাম, কিম্বা সুখনাকেও যদি যেতে না দিতাম, তা হলেই আর কিছু হতে পারত না।"

আশুবাবু বলিলেন,—"দেখ শিবনাথ! ব্যাকুল হচ্ছ কেন—এই ঘটনা উপলক্ষ করেই আজ দুলালীর জন্ম-বৃত্তান্ত প্রকাশ হয়ে পড়ল, নইলে এত সহজে জানা যেত না। তুমি যদি একথা বলতে কেউ বিশ্বাস করত, কেউ করত না; এবং যে করত তার মনে একটু-না-একটু খট্‌কা নিশ্চয়ই থেকে যেত। কিন্তু আজ তার জন্ম-কাহিনীর সমস্ত প্রমাণ আপনা থেকে উপস্থিত হয়েছে। এর পরিণাম ফল ভালই হবে।"

শিবু আশুবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

আশু বাবু বলিতে লাগিলেন,—"তোমাদের সেই ওভারসিয়ার দেবেনবাবু,—যাঁকে তোমরা দেবতার মতন ভক্তি কর,—ভূপতি দারোগা তাঁরই ভগ্নীপতি। ভূপতিকে বাঁচাবার জন্য তিনি স্বয়ং এসে পড়েছেন। এই খানিকক্ষণ পূর্ব্বে তিনি আমার বাসায় এসেছিলেন। দুলালীর সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে। তাঁর কাছে দুলালীর জন্ম-বৃত্তান্ত শুনতে পেয়েই, তোমার মুখে খাঁটি সংবাদ শুনবার জন্য আমি ছুটে আস্‌ছি।"

শিবু জিজ্ঞাসা করিল,—"দুলালীও শুনেছে বাবু?"

—"না, সে এখনও শোনেনি। আজ সন্ধ্যার পর তাকে জানাব ভাবছি। তুমি কি বল?"

—"তবে আমাকে নিয়ে চলুন; সর্ব্বাগ্রে সে আমার মুখ থেকেই তার প্রকৃত পিতামাতার পরিচয় এবং জন্ম-বৃত্তান্ত শুনুক।"

—"আচ্ছা চল।"

(ক্রমশ)

অবিশ্বাসী

(১০ পৃষ্ঠার পর)

আলোকনাথ পাংশুমুখে বলিল, "একথা আগে বলনি কেন, অনীতা?"

অনীতা ধীরে ধীরে বলিল, "আমি বুঝতে পারিনি। তোমাকে একথা ব'লতে সাহস হয়নি।"

আলোকনাথ অস্থিরভাবে বালু প্রান্তরের উপর পদচারণা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে অনীতার সম্মুখে আসিয়া কহিল, "ভুল—ভুল, অনীতা। মানুষের নিজের সমস্ত ইচ্ছাই ভুল। যখনই কর্ত্তব্য করছি ভেবে আনন্দ হয়, তখনই তার পিছনে দেখি মস্ত ভুল বিদ্রূপ ক'রছে।"

পরে উত্তেজিতভাবে মুষ্টিবদ্ধ হাত দুখানি আন্দোলিত করিতে করিতে বলিল, "পরাধীন পশু, তাকে আঘাত ক'রতে গেলেই সে আঘাত গিয়ে পড়ে সংসারের উপর। সেখানে কোমল স্নেহ মমতার বৃন্তগুলি বুক দিয়ে ঘিরে রেখেছে, ওই পশুকে! কেন অনীতা, ঘরে এমন সোনার স্বর্গ থাকতে বাইরে তা'রা নরকের প্রলোভনে ছোটে? আমার ইচ্ছা হয়, এই সব হতভাগাকে টেনে এনে নির্ম্মমভাবে প্রহার ক'রে বলি, 'ওরে পশু, যদিই তোর প্রবৃত্তির বল্গা তোর হাতে রাখতে না পারিস ত, এই সংসারের বিড়ম্বনা কেন?"

অনীতা কোন কথা বলিল না।

আলোকনাথ [illegible] লাগিল, "এখন কি করি অনীতা, আর ত কোন উপায় নেই। আমার জন্যই আজ একটি নারীকে আজীবন জ্বলতে হবে। উঃ, এমন নিষ্ঠুর আমি?"

অনীতা বলিল, "সে দোষ তোমার নয় দাদা, তুমি কেন মিছে কষ্ট পাচ্ছ? যাও, কোর্টে যাও।"

আলোকনাথ নৌকায় উঠিয়া বলিল, "না। যতক্ষণ সে পশুকে শাস্তি দেবার আনন্দ আমার ছিল, ততক্ষণ ছিল সান্ত্বনা। এখন মনে হচ্ছে, শাস্তি তাকে দিচ্ছি না, দিচ্ছি এক নিরীহ প্রাণীকে। যাঁকে জানি না, কোন দিন যাঁর কথা শুনি নি, যাঁর জীবনের সংস্পর্শে কখনও আসি নি—সেই নিষ্পাপ সরলার সর্ব্বনাশের হুকুম আমি শুনতে পারব না।"

অপরাহ্ণে সংবাদ আসিল, মদনের দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। সংবাদ শুনিয়া আলোকনাথ মাঝিদে হুকুম দিল, এই মুহূর্ত্তে নৌকা খুলিয়া দাও।

আর মুহূর্ত্তমাত্র সে এখানে তিষ্ঠিতে পারিতেছিল না।

কল্পনায় আর একখানি ছল ছল সুকোমল মুখ দেখিয়া আলোকনাথের সারা অন্তর তীব্র অনুশোচনায় ভরিয়া উঠিতেছিল।

রাত্রির গভীর অন্ধকারে নিঃশব্দ নিস্তরঙ্গ নদীর বুকে নৌকাখানি ধীরে ধীরে ভাসিয়া চলিল।

(ক্রমশ)

মৃত্যুর ইতিহাস

(গল্প)

কুমারী আয়েসা বেগম

ছোট একখানি বাড়ী, চারখানি ছোট ঘর। সব চেয়ে ছোট একখানিতে থাকেন কছিরন: এ বাড়ীর বৃদ্ধা—শুধু এ বাড়ীর বলি কেন এ পাড়ার—ঘরের এক পাশে ছোট একখানি তক্তাপোষে শুয়ে থাকেন, শুয়ে থাকেন মানে উঠ্‌বার, দাঁড়াবার শক্তি তাঁর নেই। বিশাল জগৎ আজকাল তাঁর ওই ছোট ঘরখানির মাঝেই বন্ধ হ'য়েছে! তক্তাপোষের এক পাশে কলসে তাঁর খাবার জল, জল খেতে হ'লে নিজেকেই হাত বাড়িয়ে খেতে হয়, দেখার কেউ নেই! তাঁর বয়স বোধ হয় নব্বয়ের কোঠায়; সবাই তাই আন্দাজ করে, কেউ বা তারও বেশী বলে, কেউ বা কম বলে। তাঁর বয়স সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে কেউই নেই শুধু তাঁর লোলচর্ম্ম দেহ ছাড়া। যারা তাঁর প্রথম জীবনের সাথী ছিল, তাদের স্মৃতি পর্য্যন্ত মানুষের মনে অস্পষ্ট হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, কছিরন আজ তাঁর নিজের শৈশব বা যৌবনের স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছেন অতীত বা বর্ত্তমানের কিছুই তাঁর মনে নাই, মনে থাকে না।

ঘরভরা তাঁরই স্নেহের পৌত্র-পৌত্রীরা। কছিরন পাঁচ বছর পূর্ব্বেও তাদের চিনতেন, এখন কর্ত্তাকেই চেনেন না।

ঘরখানায় ফিনাইল ও ব্লিচিং পাউডারের গন্ধে ভরা, কারণ বৃদ্ধার যত সব ক্লেদ ঘরেই জমা থাকে! ঘৃণায় কেউ তাঁকে স্পর্শ করে না, তার নিজের ছেলে পর্য্যন্ত কাছে আসে সসঙ্কোচে! শহর বলেই তাঁর ঘরে তবু ফিনাইলের ব্যবস্থা, গ্রাম হ'লে কি হ'ত বোঝা যায় না! একটা মেথর রেখেছে তাঁর ছেলে, সেই বৃদ্ধাকে পরিষ্কার করে। কছিরনের সমস্ত শরীরে পোকা পড়েছে, রোজই মেথর ফিনাইল দিয়ে তাঁকে ধুইয়ে দেয়।

সবই তাঁর অদৃষ্ট, নতুবা আজ তাঁকে মেথরের হাতে পড়তে হয়! দয়া করে বৌ তাঁকে খাবার দিয়ে যান, কিন্তু তিনি তা ধরতেও পারেন না। কোনদিন বা খান, কখন বা খান না! তাঁর বৌও আজ প্রৌঢ়ত্ব পার হ'য়ে বৃদ্ধার দলে পড়েছেন, শক্তি তাঁর কমে আসছে! তবু বৃহৎ সংসারের কাজের ফাঁকে ছুটে ছুটে এসে শাশুড়ীকে দেখে যান। যন্ত্রণা ব্যথার কথা শুনে যান।

সেই কোঠা বাদ দিয়ে, তার পরের কোঠাও বাদ দিয়ে শেষের দিকে এক কোঠায় থাকে কছিরনের বড় পৌত্র! ঘরখানি নাঝারি, অল্প জিনিষে সাজান: শাহরিয়ার অসুস্থ, আজ ক'দিন হ'ল তার মেলিনা হয়েছে! বাড়ীতে একটা স্তব্ধ গুমোট ভাব, কা'রও মুখে উচ্ছ্বসিত হাসি নেই! মায়ের মুখ চিন্তাপূর্ণ, পিতাও তাই। বধূ করছে স্বামীকে প্রাণ দিয়ে সেবা, আর ডাকছে খোদাকে। ভাই-বোনেরা সবাই ব্যস্ত হ'য়ে করছে সব কাজ। শহরের বড় বড় ডাক্তার কেউ আর বাদ নেই, সবাই এসে দেখে যাচ্ছে।

মিনিট গুনে গুনে ঔষধ খাওয়ান, জ্বর দেখা সব সারছে বধূ, শাশুড়ী ও শ্বশুর করছেন খবরদারি।

পথ্য যা বলছে ডাক্তার, যতই মূল্য হোক না কেন, আসছে সব।

তবু মায়ের মন! এর মাঝেই মানত হয়েছে একটা গরু, একটা খাসী; ছেলেকে তার ভাল করাই চাই! আর ওই প্রান্তের ঘরখানায়, কছিরন পড়ে আছে, আজ তার কেমন একটু যন্ত্রণার মত মনে হচ্ছে; যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠছে, স্বর ফুটছে না।

ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁর বৌ, শাশুড়ীর গোঙানি শুনে এসে বললেন, আম্মা, কষ্ট হচ্ছে?

শাশুড়ী বললেন, হাঁ মা।

বৌ আশ্চর্য্য হ'য়ে ভাবলেন, আজ কছিরন তাঁ[illegible] চিনতে পারলেন! তিনি ঝুঁকে পড়ে বললেন, কোথায় যন্ত্র[ণা] হচ্ছে মা?

কোথায় বুঝতে পারছি না ত। ও ঘরে তোমরা সব করছ?

শাহরিয়ারের যে বড্ড অসুখ আম্মা।

শাহরিয়ারের? আমার শাহরিয়ারের? সে ভাল যাবে বৌ।

আপনি দোয়া করুন আম্মা।

বড় মেয়ে সেখান দিয়ে যাচ্ছিল, মাকে সেখানে দেখে বললে, কি হয়েছে মা?

তোর দাদির শরীর ভাল নয়।

শরীর কোন্ কালেই ভাল?। মরণ হ'লেই বাঁচা যায় দাদিও বাঁচে আমরাও বাঁচি।

ওরে দাদিও একদিন ভাল ছিলেন, তোদের মত আর কি! তোদের বয়সে দাদি সমস্ত গ্রামের সেরা সুন্দরী ছিলেন। আজ ওই কুঞ্চিত ভাঙ্গা মুখখানা তখন তোদের মতই নিটোল ভরপুর ছিল। আশে-পাশের সবাই সুন্দরী বৌ বলতে— এঁকেই বুঝত! আজ অশক্ত বলে, পৃথিবীতে কেউ চায় না। আজ [illegible] তাঁকে সরে যেতে বলে, তিনি নিজেও সরে যেতে [illegible] কারণ যে পৃথিবীর বালুকণা একদিন তাঁর কাছে সুন্দর মনে হ'ত আজ মণিহর্ম্ম্যও তাঁর কাছে তুচ্ছ তোমরা আজ যাঁকে দূর দূর করছ, তিনিত ঠিক এমনি দু'পায়ে তোমাদের ঠেলে ফেলে চলে যেতে চান, কিন্তু ওপারের রথ এখনও সে পৌঁচাচ্ছে না।

মা ও মেয়ে বাইরে এসে সবাইকে কথা জানালেন, বৃদ্ধা বুঝি আর বাঁচে না। সে কথা শুনে সবাই স্বস্তির নিশ্বা[স] ফেললে, তারা বৃদ্ধার মৃত্যুর অপেক্ষা করতে লাগল। উ[নি] মরলেই যেন সকলের ঘাড়ের একটা বোঝা নেমে যায়।

ছোট পৌত্র বললে, দাদি মরে কোথায় যাবে?

তারই বড় বোনটি—বয়স বার-তের বৎসর, বললে বেহেস্ত হ'তে এরোপ্লেন করে ফেরেস্তারা এসে দাদিকে নিয়ে যাবে।

আর আসবে না?

না।

মেজ পৌত্র বল্‌লে, দাদি মারা যাওয়ার পর আমি কিন্তু নেব ওই ঘরটা।

উঃ, ওই গন্ধ ভরা ঘরটা!

গন্ধ! ও থাকবে নাকি? চূণকাম করিয়ে নেব।

বোন বললে, হোয়াইট-ওয়াস করালেই কি যাবে, ভয় করবে না!

ভয় কিসের, ভূতের!—ব'লে সবাই হেসে উঠল! মাঝে মাঝে সবাই এক একবার উঁকি মেরে দাদিকে দেখে আসছিল! মরেছে না বেঁচে আছে? এ মৃত্যু, এযে আসবেই, এতে কারও কোন দুঃখ ছিল না, তাই এতে আনন্দিত না হ'লেও কেউ দুঃখিত হয় নি। বরং ওরা বলছে, এই মৃত্যু আরও পূর্ব্বেই আসা উচিত ছিল। তাহলে এরাও ভুগ্‌তে না, দাদিও এত কষ্ট পেতেন না।

বৌ একবার এসে বললেন, আম্মা কিছু চান?

হাঁ চাই, আমি কি আর বাঁচব না? আমি বাঁচতে চাই! বৌ আমি বাঁচতে চাই!

হায়রে মানুষের আশা! এখনও বাঁচতে চায়? কি সুখে বাঁচতে চায়? কোন সুখই ত নাই, তবু কেন বাঁচতে চায়?

মৌলবী এসে বৃদ্ধাকে তওবা করিয়ে গেলেন।

মৃত্যুর যন্ত্রণায় বৃদ্ধা কাতর চীৎকার করছে, কেউ নাই তাকে একটু শান্তি দেয়, কেউ ঘরে নাই তাঁর মুখে শেষ পানিটুকু দেয়। হাত আজ একেবারেই অবশ হ'য়ে গিয়েছে, বুকের কাছে শুধু ধুক্‌ধুক্ করছে, দৃষ্টি স্থির হ'য়ে গিয়েছে।

বাড়ীর গিন্নী ছেলেমেয়েদের সবাইকে খাইয়ে দিলেন তাড়াতাড়ি করে। কর্ত্তা তিনি ও বধূ সবাই আজ শাহরিয়ারের ঘরে। আজ এ ঘরে চলছে যমে-মানুষে টানা-টানি! শাহরিয়ার উঃ করবার আগেই সবাই ব্যস্ত হ'য়ে তার যন্ত্রণার উপশমের চেষ্টা করছে।

এই ত পৃথিবীর নিয়ম! একজনকে সরাবার বিপুল চেষ্টা, আর একজনকে ধরে রাখবার আকুল আগ্রহ!

শাহরিয়ার শুধু রক্তবমি করছে! ডাক্তাররা সব ছুটে এল, নানারকম চিকিৎসা চলতে লাগল। আর ও ঘরে দাদি প্রায় শেষ হ'য়ে আসছিলেন, তাঁর কাছে কেউ-ই ছিল না।

ডাক্তার বললেন, ছেলে যেমন দুর্ব্বল, তাতে হয়ত কারও গায়ের রক্ত লাগতে পারে ওর গায়ে দিতে। আপনারা কে দিতে পারবেন?

পিতা বললেন, আমি; মা বললেন, আমি; মেজ ভাই বললে, আমি দেব;

কিন্তু লাগল না রক্ত, শাহরিয়া ক্রমে ভালর দিকে যেতে লাগল!

এদিকে সবাই গায়ের রক্ত দিতে প্রস্তুত আর ওই প্রান্তের ছোট কোঠাখানিতে একটু পানি শেষ সময়ে না পেয়ে বৃদ্ধা মারা গেলেন। পৃথিবী মুক্তি পেল।

ইংলণ্ডে রক্ষাকবচের তুকতাক

(১০২ পৃষ্ঠার পর)

তাহার যে সদাহাসিপূর্ণ মুখভাব, তাহার যে উদারতা, তাহার যে প্রেমত-সহিষ্ণুতা তাহাতে তাহাকে 'হ্যাণ্ডসাম প্রিন্স' Handsome Prince) বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না।

তাই এই প্রকারে পরীক্ষিত যাদুমন্ত্রের অধিকারী এই মাংটিটিকে আমি প্রাণের চেয়ে ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি। সারা দুনিয়ার সমগ্র বিত্ত-বিভবের বিনিময়েও এই আংটি আর আমি হস্তান্তরিত করিব না জীবনে।

* * * * * * *

প্রিন্সেস লুই কেনসিংটন হসপিটাল ফর চিলড্রেন-য়ের সাহায্যে এক মেলার উদ্বোধনকালে মিসিস নেভিল চেম্বারলেন বলিয়াছেন (৩রা নবেম্বর, ১৯৩৮)—আমার বহু বন্ধু-বান্ধবী বিশ্বাস করেন যে, পকেটে একটি আলু সর্ব্বদা বহন করিলে বাতের আক্রমণ এড়ান যায়। আজকাল দেখিতে পাওয়া যায় যে, চিকিৎসকগণও রোগ আরোগ্য করা অপেক্ষা উহার সম্ভাবনাকে বিলুপ্ত করা ও পূর্ব্ব হইতে প্রতিরোধক-উপায় অবলম্বন করারই পক্ষপাতী অধিক।

তিনি আরও বলেন—সেকালে ছিল রোগ আরোগ্য করাই বড় কথা এবং সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অন্ধ সংস্কারও আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকা হইত আশ্চর্য্য দৃঢ়তার সহিত। উদাহরণ স্বরূপ আমি বলিতে পারি, আপনারা যদি নীল বিড্ (bead) পরিধান করেন, তবে কখনই আপনারা হূপিং কাশিতে আক্রান্ত হইবেন না, এ বিশ্বাস বংশানুক্রমে আমরা পাইয়াছি এবং অনেক স্থলে ঠেকিয়াই ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছি।

এদেরও প্রাণ আছে

(গল্প)

—সুধীরকুমার রায় চৌধুরী

বাঙালীদেরকেই যা হয়, আমিও তাই। ভগ্নস্বাস্থ্য। এই ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়েই রাত জেগে বি-এ পরীক্ষা দিলাম। এখন আমার পক্ষে কিছুদিন বিশ্রাম দরকার। মা আমায় সেদিন বললেন,—'খোকা, ইনি বলছিলেন তুই কিছুদিন পাহাড়ে-জঙ্গলে ঘুরে আয়।"

আমি হেসে বললাম—"এ বাঙলা ছেড়ে কোথায় মরতে যাব?"

মা বললেন—তাঁর এক বন্ধুর বিহারের কোন গ্রামে বাড়ী আছে। তার বাড়ীতে তোর থাকার জন্য তাঁকে বলবেন।

যাওয়া ঠিক হয়ে গেল। মার্কেটে গেলাম—সঙ্গে নেওয়ার মত কিছু জিনিস কিনতে। বিশুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। আমরা একসঙ্গে ম্যাট্রিক পাশ করেছিলাম। তারপরে আর্ট স্কুলে ভর্ত্তি হয়েছিল। আজ চার বছর পর ওকে দেখে আমার বেশ আনন্দ হল। বললাম কি খবর?

বিশু আমায় দেখে বললে আরে তুই? অনেকদিন পর। আর বলিস! এই দেহটা নিয়ে পড়েছি মুস্কিলে। অসুখ লেগেই আছে।

আমি বললাম—'আমি যাচ্ছি পাহাড়ে বেড়াতে। তুইও চ, দুজনে দুরে আসা যাবে।

শেষ পর্য্যন্ত দুজনে একদিন হাওড়া থেকে রওনা দিলাম—মায়ের বন্ধুর বাড়ীর উদ্দেশে। সন্ধ্যা ৭টায় সময় ছোট্ট স্টেশনে এসে নামলাম। একটা কুলিকে ডেকে বললাম—হ্যাঁরে! এখান থেকে হিল্‌ভিউ কতদূরে?

সে মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—"হালভি কাঁহা আছে হাম না জানে।"

এমন সময় ষ্টেশনমাষ্টার এসে বললেন—'আপনারা কোথায় যাবেন?'

আমি বললাম—'আমার হিল্‌ভিউ যাব।

তিনি কুলিকে বললেন—'ওহি টিলাপার যো দোমহলা কুঠি হ্যায় উঁহাপর বাবুলোককো লে যাও।'

আমরা তাকিয়ে দেখলাম ষ্টেশন থেকে কিছুদূরে একটা টিলার উপর শাদা দোতলা বাড়ী।

আমরা বাড়ীর কাছে এসে দেখি মালী বাতি নিয়ে বাড়ী থেকে বেরোচ্ছে। আমি বললাম—এই! এটা হিল্‌ভিউ!

মালী বললে—হ্যাঁ বাবু! এইটা আছে। আপনারা কি কলকাতা থেকে আসছেন!

আমি বললাম— হ্যাঁ।

মালী তখন ভেতরে নিয়ে আমাদের ঘর দেখিয়ে দিল।

বিশু কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বললে—চায়ের জোগাড় কর।

আমি বললাম—ভাল একটা রান্নার লোক দেখতে হবে। সাধারণ রান্না করা আমাদের চলবে না। শেষে স্বাস্থ্যের জন্যে এসে হাত-পা পুড়িয়ে ফিরে যাই আর কি! মালীকে ডেকে বললাম—'কাল একটা রান্নার লোক জোগাড় করে দিতে পারবি?'

মালী বললে—'কাল সোকালে দেখবো। এখানে ত বাঙালী রান্না কোরতে পারে এমন লোক পাওয়া মুস্কিল আছে।'

সেদিন চা করে আর সঙ্গে যা খাবার ছিল খেয়ে দুজনে শুয়ে পড়লাম। কলকাতার চেয়ে এখানে রাতে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে। রাতে বেশ সুনিদ্রা হয়েছিল। ভোর বেলা মালীর ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে এসে দেখি মালীর সঙ্গে একটি মেয়েমানুষ, বয়স তেমন বেশী হবে না। কালো হলেও চেহারা বেশ সুন্দর এবং স্বাস্থ্য বেশ ভাল।

আমি বললাম—'এ কে রে?'

মালী বললে—'আপনাদের রান্নার ওয়াস্তে ঠিক করেছি।'

আমি বললাম—'কেন পুরুষলোক রান্না করতে জানে না?'

মালী বললে—'এখানে চাকর, রান্নার কাজ সব জেনানা আদমি করে।'

নাম জিজ্ঞাসা করে জানলাম—'মনুয়া'।

আমি মনুয়াকে বললাম—'আমাদের রান্না তুমি করতে পারবে?'

মনুয়া বললে—"কাহে নেহি সেকেগা! একরোজ দেখার দেবে।'

বিশু এমন সময় বাইরে এসে বললে—'ইনিই আমাদের পাচিকা?'

আমি হেসে বললাম—হ্যাঁ, ইনিই আমাদের সৈরিন্ধ্রী।

এরপর থেকে আমরা সৈরিন্ধ্রী ওরফে মনুয়ার হাতে খেয়ে আর এদেশের জলহাওয়া খেয়ে স্বাস্থ্য উদ্ধার করছিলাম।

সেদিন সকালে বিশু চা খেতে খেতে হেসে বললে—'তোমার সৈরিন্ধ্রী দেখছি তোমায় খুব পছন্দ করেছে।'

আমি বললাম—'কি রকম?'

বিশু বললে—'আমরা আর্টিষ্ট মানুষ। মানুষের হাবভাব দেখে আমরা এসব ধরতে পারি।'

আমি বললাম—'ননসেন্স! ও বিবাহিতা, তা ছাড়া আমরা বিদেশী।'

মনুয়া দুহাতে দুটো প্লেটে ডিমসিদ্ধ নিয়ে ঢুকল।

বিশু বললে—'মনুয়া! তুমি ত হিন্দু: তুমি ডিম ছোঁও, তোমার ধর্ম্ম নষ্ট হবে না?'

মনুয়া মিষ্টি হেসে বললে—'বাবু! তু লোককা ডিম খানেসে ধরম্ নাশ নেহি হোতা; আউর হাম্ ছোঁনেসে হামারা ধরম চলা যায়েগা?' আমার দিকে তাকিয়ে বললে—'আউর চা আনে গা?'

আমি বললাম—'না, আর লাগবে না।'

আমাদের দিনগুলো বেশ আনন্দেই কাটছিল। বিশুর কথা যেন সত্যি মনে হচ্ছে। মনুয়া কারণে-অকারণে আমার কাছে আসে। ও যেন আমার মধ্যে কি খোঁজে। আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। জিজ্ঞাসা করলে 'কুছ নেহি' বলে ছুটে পালিয়ে যায়। সত্যিই কি মনুয়া আমায় ভালবাসে? কিন্তু কেন? ওর ত কিছুরই অভাব নেই। মনুয়ার স্বামী কি মনুয়াকে ভালবাসে না? শুনেছি মনুয়ার স্বামী খুব মদ খায়। তবে কি মদখেয়ে ওকে মারধর করে? আমি মনুয়ার এ রহস্য বুঝতে পারলাম না।

আমাদের এখানে আসার মাসখানেক পর আমি আর বিশু গেছলাম দূরে পাহাড়ে বেড়াতে। সেদিন ছিল চাঁদনী রাত। বিশু পাহাড়ে উঠে চারদিকে তাকিয়ে বললে—'আহা বড্ড ভুল করেছি; খাতাখানা আনলে কয়েকটা ছবি আঁকতাম।'

কিছুক্ষণ দুজনে চুপচাপ এই দৃশ্য উপভোগ করবার পর আমি বললাম—'চ, সন্ধ্যে হয়ে গেছে। এবার বাড়ী ফেরা যাক্।'

বিশু বললে—'আর একটু বোস্। হয়ত জীবনে এ রকম দৃশ্য দেখবার সুযোগ আর আসবে না।'

অগত্যা বসতে হল।

আমরা যখন পাহাড় থেকে নামতে আরম্ভ করলাম, তখন বেশ রাত হয়েছে। কিছুদূর নেমে এসেছি এমন সময় একটা আলগা পাথরে পা লেগে হড়্‌কে প'ড়ে হাঁটুর বেশ খানিকটা মাংস উঠে গেল। বিশুর কাঁধে কোন রকমে ভর দিয়ে বাড়ীতে এলাম।

সেদিন কিছুই বুঝতে পারলাম না। কিন্তু তারপর দিন হাঁটুতে বেদনা, সংগে সংগে জ্বর। বিশু আমার অবস্থা দেখে বললে—'মেসোমশাইকে একটা টেলিগ্রাম করব?'

আমি যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে বললাম—'না, তাদের ব্যস্ত করে দরকার নেই। তার চেয়ে দেখ একটা ডাক্তার পাস্ কি না।'

বিশু ডাক্তার ডাক্‌তে চলে গেলে পর মনুয়া এসে দরজার কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি বললাম—'কিছু দরকার আছে?'

মনুয়া করুণভাবে মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—'বাবু! তুকো বহুত দরদ হুয়া হ্যায়?'

আমি বললাম—'হ্যাঁ, তা একটু হয়েছে। ভেতরে এস না।'

মনুয়া ভেতরে এসে বললে—"গোর দাব দেগা?"

আমি বললাম—'না। আচ্ছা মনুয়া, আমার দরদ দেখে তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে?'

মনুয়া—হবে না?' বলে উঠে চলে গেল। দেখি বিশু ডাক্তার নিয়ে ঢুকছে।

ডাক্তার ঘা দেখে বললেন—'ভয়ের কিছু নেই। খুব কম্প্রেস লাগান।'

ডাক্তার চলে যাওয়ার পর বিশু বললে—'আচ্ছা ফ্যাসাদে ফেললে তুমি। তোমার পা ভাল হলেই আমরা এখান থেকে পাততাড়ি গোটাব। বিদেশে আত্মীয়স্বজন ছাড়া কেউ কখনও আসে?'

আমি বললাম—'তুই থাম। তোর আর উপদেশ দিতে হবে না। এখন কম্প্রেসের ব্যবস্থা করগে।

ক'দিন যে কি রকমভাবে কেটেছে তা জানি না। আমি যন্ত্রণায় শুধু চীৎকার করেছি। আজ অনেকটা ভাল। জ্বর নেই। যন্ত্রণা অনেক কমে গেছে। এ কয়দিন মনুয়া আমার কাছে সব সময় থাক্‌ত। কখন যে রান্না কর্‌ত, জানি না। যখনি চোখ খুলি দেখি মনুয়া আমার ঘরে। বলতে গেলে মনুয়ার শুশ্রূষাতে আমি ভাল হয়ে উঠেছি। আমি মনুয়াকে বললাম—'তুমি যে এখানে রাতে রয়েছ, তাতে তোমার আদ্‌মি কিছু বলবে না?'

মনুয়া হেসে বললে—'ও হামকো কেয়া বলে গা? ... বুখার হুয়া, তুকো রাখকর হাম ঘরমে ক্যাইসে যা সেক... তু আচ্ছা হো যা, হাম ঘর চলা যায় গা।'

আমি বললাম—'তুমি আমার জন্যে কেন এত কষ্ট ক...

সে 'হামারা খুশী' বলে ছুটে চলে গেল।

দুমাস পর আজ আমরা কলকাতায় যাব। সকাল ... সব বাঁধা-ছাঁদা করতে ট্রেনের সময় হয়ে গেল। মা... বললাম—'মনুয়া কোথায় রে?'

মালী বললে—'কাল মাহিনা লিয়ে চলে গেছে। ... আসেনি।'

যাবার সময় মনুয়ার সংগে দেখা না হওয়ায় দুঃখ... মালীর হাতে দশটা টাকা দিয়ে বললাম—'তোরা দুজনে... করে নিস্।'

ষ্টেশনে এসে টিকিট কেটে দুজনে প্লাটফর্ম্মে পা... করতে লাগলাম। এমন সময় বিশু বললে—'এই দেখ, ... পিছনে পিছনে সৈরিন্ধ্রী ধাওয়া করেছে। তাকিয়ে... মনুয়া প্লাটফর্ম্মের দিকে আসছে। আমি এগিয়ে... বললাম—'কাল রাত থেকে তোমার দেখা নেই কেন? ম... কাছে টাকা দিয়েছি, পাঁচ টাকা নিয়ে নিও।' মনুয়ার... তাকিয়ে দেখি ও কাঁদছে।

আমি বললাম—'কাঁদছ কেন মনুয়া?'

মনুয়া কাঁদতে কাঁদতে বললে—'হামার রুপিয়া ... না।' কিছুক্ষণ পর বললে—'হামার একটা বাত্ রাখ্‌বি...

আমি বললাম—'কি?'

মনুয়া আস্তে আস্তে ওর গলার রুপোর হারটা ... বললে—'এইঠো লেনে হোগা।'

আমি বললাম—'আমি বেটাছেলে; ও হার নিয়ে ... কি করব?'

মনুয়া বললে—'হামার মুলুকে ভাইকো সাদিমে ... কো কুছ না কুছ দেনে হোতা। তোরা সাদি হোনেসে, ... জরু পিন্‌গা।'

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললাম—'মনুয়া, আমার ... এইটেই হবে শ্রেষ্ঠ উপহার।'

আমিও কেঁদে ফেলেছিলাম। বিশুর ডাকে তাড়া... রুমাল দিয়ে চোখমুছে মনুয়াকে বললাম—'বিয়ের পর এ... আস্‌ব বউকে নিয়ে বহিনের দেশে। চলি তাহলে।'

মনুয়া হঠাৎ ঢিপ্ ক'রে আমার পায়ের উপর প্রণাম ক... উদ্যত হলে তার হাত ধরে ফেললাম। সে হাত ছাড়িয়ে ... বললে—'বড়া ভাই তু, হামি ছোটা বহিন্' সংগে সংগে ... করে চলে গেল।

আমি ট্রেনে উঠ্‌তেই ট্রেন ছেড়ে দিল। প্লাটফর্ম্ম ছা... যেতে দেখি, প্লাটফর্ম্ম থেকে হিলভিউ পর্য্যন্ত যে আঁকা... লাল রাস্তাটা গেছে, তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে মনুয়া সজলচো... ট্রেনের দিকে তাকিয়ে আছে।

বিশু বললে—'তুই কাঁদছিস্ না কি?'

আমি তাড়াতাড়ি চোখ মুছে শুধু বললাম—"এদে... প্রাণ আছে।'

বিদ্যালয়ের পরীক্ষা সংস্কার

অধ্যাপক শ্রীকমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়

আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলি প্রথমে পাশ্চাত্য অনুকরণে গঠিত হইয়াছিল। এখানকার পরীক্ষা ব্যবস্থাগুলিও তদ্রূপ চিন্তা ধারার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়। কিন্তু আমাদের নিকট সব চেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, ইদানীং ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশে পরীক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট সংস্কার সাধিত হইলেও আমাদের দেশের স্কুলগুলিতে এখনও গতানুগতিক ভাবেই সেই পরীক্ষার ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। মাঝে মাঝে এখানকার তথাকথিত মনস্তত্ত্বিদগণ এবং টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপক পরীক্ষা সংস্কার ব্যাপার লইয়া ক্ষণিকের জন্য হৈ চৈ করিলেও বাস্তবক্ষেত্রে কাজে কিছুই ফল হয় না। দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের গভর্ণমেণ্ট স্কুলগুলিতে শতকরা ৯০-৯৫ জন ট্রেনিং প্রাপ্ত শিক্ষক থাকিতেও এবং গভর্ণমেণ্টের পরিদর্শন (Inspection) বিভাগ সুদক্ষ মনোবিদ্ অফিসারগণ দ্বারা পূর্ণ থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলিতে ছেলে-মেয়েদের পরীক্ষা লওয়ার ধারা তিলার্ধও বদলায় নি। বরং অন্যান্য দেশে যখন পরীক্ষা প্রথা যতদূর সম্ভব কমাইবার চেষ্টা চলিতেছে তখন আমাদের স্কুলগুলিতে বৎসরে দুইটির জায়গায় তিনটি করিয়া পরীক্ষা লওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। একটি হইল 'ফার্ষ্ট টার্মিন্যাল,' একটি 'সেকেণ্ড টার্মিন্যাল,' এবং আর একটি 'ইয়ার্লি' বা বার্ষিক। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা পরীক্ষাব্যাধিগ্রস্ত! ফলে এই দেখা যায় যে, ছেলেমেয়েরা এই সব পরীক্ষাগুলিতেই সমানভাবে ভাল ফল করিবার অভিপ্রায়ে অযথা পরিশ্রম করে এবং এই পরীক্ষার চাপে পিষ্ট হইয়া মূল্যবান স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া বসে। আবার কোন কোন স্কুলে দেখা যায় যে এই তিনটি পরীক্ষা ছাড়াও হয় সাপ্তাহিক না হয় ত্রৈমাসিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে! কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা এই সকল ছোটখাটো পরীক্ষায় ভাল ফল করিল, তাহারাই সাধারণত বড় বড় পরীক্ষায় সিলেবাস একসঙ্গে বেশী থাকার দরুন কম নম্বর পাইয়া থাকে। কেহ কেহ হয়ত, সব পরীক্ষাগুলিতেই ভালভাবে উত্তীর্ণ হয়; কিন্তু পরিণামে ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া ব্যবহারিক জীবনের পক্ষে একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।

আমার মনে হয়, স্কুলে সারা বছরে মাত্র একটি করিয়া পরীক্ষা থাকা দরকার—সেটি হইবে বার্ষিক পরীক্ষা। ছাত্রছাত্রীদের "ক্লাশ-প্রমোশন" নির্ভর করিবে কতকটা ইহার ফলের উপর এবং অধিকাংশই নির্ভর করা উচিত—তাহাদের দৈনন্দিন কাজ সম্বন্ধে শিক্ষকবর্গের রেকর্ড এবং তাঁহাদের ব্যক্তিগত অভিমতের উপর। ইহাতে ছাত্রছাত্রীগণের পড়াশুনার কাজ বেশ ভালভাবেই চলিবে এবং তাহাদের সমগ্র সিলেবাসটি সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন হইবে আশা করা যায়। তা ছাড়া, আজকাল কলিকাতার মত অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্কুলগুলিতে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ও অবশ্য শিক্ষণীয় (compulsory) হওয়াতে সিলেবাস অত্যন্ত বেশী হইয়া গিয়াছে; সুতরাং তিন চারিটি করিয়া পরীক্ষা লইতে গিয়া বেশী সময় নষ্ট করিলে সিলেবাস্ শেষ হওয়া এক প্রকার অসম্ভব হইবে।

পরীক্ষাবাতিকের পীড়নে প্রকৃত শিক্ষাদান ব্যাহত হয় অতিরিক্ত রকমে। আমরা সাধারণত দেখিতে পাই যে, বৎসরের মধ্যে বিদ্যালয়ের ছুটী থাকে প্রায় পাঁচ মাস। তিনটি পরীক্ষা লইতে অতিবাহিত হয় তিনমাস কিম্বা তাহারও কিছু বেশী। কেননা, প্রত্যেক পরীক্ষার পূর্ব্বে পুরাতন পড়ার "রিভিসন্" —— নামীয় জিনিষ আছে। সুতরাং অবশিষ্ট থাকে মাত্র চারিমাস। এই চারিটি মাস হইল প্রকৃত শিক্ষাদানের কাল; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এই অল্পকালব্যাপী শিক্ষাদানও অধ্যাপনামূলক নয়—পরীক্ষামূলক। ছাত্রছাত্রী গৃহ হইতে পাঠ প্রস্তুত করিয়া আসে এবং বিদ্যালয়ে প্রত্যহ "পাঠ-ধরা" হয়; অর্থাৎ বাড়ীতে অধীত সেই বিদ্যার পরীক্ষা লওয়া হয় মাত্র। কিন্তু তাহা হইলেও ইহা এক প্রকারের পরীক্ষা—অবশ্য অন্য-ধরণের পরীক্ষা—যাহা মৌখিক পরীক্ষা। ছেলেদের নূতন পড়াগুলি ঠিক এমনিভাবেই দ্রুতগতিতে শেষ করিয়া দেওয়া হয়। অবশ্য, শিক্ষক মহাশয়রাই শেষ করেন, তাহাতে ছাত্র-ছাত্রীরা সকলে সমানভাবে বুঝিতে পারুক আর নাই পারুক! শিক্ষার্থীরা অধ্যয়ন করে না, করে গলাধঃকরণ। শিক্ষকগণ অধ্যাপনা করেন না, করেন পরীক্ষা। কাজে কাজেই আমাদের ছেলেমেয়েদিগকে অগত্যা গৃহ-শিক্ষক এবং বাজারের মানে-বই এর শরণ লইতে হয়।

আমাদের দেশের পরীক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আর একটি প্রধান ত্রুটী হইতেছে প্রশ্ন পত্রের। সাধারণত আমাদের "পেপার-সেটারগণ" যে সমস্ত প্রশ্ন 'সেট্' করেন এবং সেগুলির জন্য যে প্রকৃতির উত্তর চাওয়া হয় তাহা প্রায়ই প্রবন্ধমূলক এবং অত্যন্ত সাধারণ ধরণের; অর্থাৎ যাহাতে ছেলেমেয়েদের মুখস্থ বিদ্যায় বেশ কাজ চলিয়া যায়। সুতরাং এই সুযোগ লইয়া ছাত্রেরাও টেক্সট্ বইগুলি ভাল করিয়া না পড়িয়া কোন পণ্ডিতকে নোট্-বুক্, মানে বই, মেড্ ইজি, সংক্ষিপ্তসার ইত্যাদি ধরণের বই গলাধঃকরণ করিয়া ফাঁকি দিয়া পাশ করিবার চেষ্টা করে। শুধু যে কেবল ইতিহাস ভূগোলেই এই অবস্থা তাহা নহে। সংস্কৃত, ইংরেজী-সাহিত্য এমন কি অঙ্ক এবং বিজ্ঞান বিষয়েও এই পন্থা অবলম্বন করিতে দেখা যায়। "Matric Geography in three Hours," "Half an hour with Indian History," বীজ-গণিত এবং জ্যামিতির "Solution" ইত্যাদি ধরণের বইয়ে বাজার ছাইয়া গিয়াছে একথা কেহই অস্বীকার করিবেন না।

সুতরাং পরীক্ষায় এখন আমাদের এমনভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা উচিত যাহাতে পরীক্ষার্থীরা মূল বইগুলিকে ভালভাবে পড়ে এবং তাহাদের মৌলিক চিন্তা-শক্তিকে বৃদ্ধি করিবার প্রয়াস পায়। তুলনামূলক এবং ঘটনা-বিষয়ক প্রশ্নের দাম এই ক্ষেত্রে বেশী।

তারপর, খাতা পরীক্ষা সম্বন্ধেও কিছু কিছু ত্রুটী দেখা যায়। ম্যাট্রিকুলেশনের মত বাহিরের (external) পরীক্ষায় যাঁহারা খাতা পরীক্ষা করেন, সেই সকল পরীক্ষকগণের ভিতর অনেকেরই যোগ্যতা সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। স্কুলের ভিতরকার (internal) পরীক্ষাগুলিতে অবশ্য বিশেষ কোন অসুবিধা নাই; কেন না, যে সকল শিক্ষক যে যে বিষয় পড়ান তাঁহারা হেড্-মাষ্টার মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া সেই সেই বিষয়ে প্রশ্নপত্র তৈয়ারী করেন এবং খাতা পরীক্ষা করেন। কিন্তু ম্যাট্রিকুলেশন্ কিম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরের দিকের পরীক্ষাগুলির প্রশ্নপত্র যাঁহারা 'সেট্' করেন, তাঁহারা সেই সকল বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং পারদর্শী হইলেও হয়ত কোন দিন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণকে তাহা পড়ান নাই; কাজেই তাহা-দের প্রকৃত যোগ্যতা সম্পর্কে ইঁহারা এক প্রকার অনভিজ্ঞ আবার যাঁহারা খাতা দেখেন তাঁহাদের ভিতরও হয়ত এমন লোক থাকিতে পারেন যাঁহারা ছেলেদের স্কুলের পাঠ্য-পুস্তকের খুঁটিনাটির সহিত বিশেষভাবে পরিচিত নহেন। কাজেই এই সমস্ত পরীক্ষায় পরীক্ষকগণের ভিতর বেশীর ভাগ স্কুলের শিক্ষক থাকা বাঞ্ছনীয়। কেননা,

স্কুলের ঠিক প্রয়োজনীয়তা এবং ছেলেমেয়েদের যোগ্যতা সম্পর্কে তাঁহাদের সম্পূর্ণ জ্ঞান বা ধারণা আছে। এই উপায় অবলম্বনে অপেক্ষাকৃত ভাল ফল হইবে আশা করা যায়।

পরীক্ষা সম্বন্ধে আর একটি লক্ষণীয় দোষ এই যে—নিম্নশ্রেণীর পরীক্ষা সম্পূর্ণ মৌখিকভাবে এবং উপরের শ্রেণীগুলির পরীক্ষা লওয়া হয় সব লিখিয়া কিন্তু দুইই হইল অসুবিধাজনক। নীচের ক্লাশের ছেলেমেয়েদিগকে কিছু কিছু লিখিয়া পরীক্ষা দেওয়াইতে অভ্যাস করান ভাল। কিন্তু ইহার চেয়েও বেশী প্রয়োজনীয়তা হইতেছে উপরের ক্লাশে সামান্য সামান্য মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখা। ইংরেজী, বাঙলা, প্রভৃতি সাহিত্য বিষয়ক পরীক্ষায় মৌখিক পরীক্ষা এক প্রকার অপরিহার্য্য। কেননা, বাস্তব জীবনে, দৈনন্দিন কর্ম্মক্ষেত্রে যে জিনিষটার সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন তাহা হইল 'বলিতে কহিতে পারার ক্ষমতা'। স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালতে কথ্য ইংরেজীর (Spoken English) মূল্য ঢের বেশী। কিন্তু এই জায়গাতেই আমাদের ছেলেমেয়েরা শতকরা ৯০ জনেরও বেশী অপারগ। কতকটা এই কারণেই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক কৃতী ছাত্র আই-সি-এস, বি-সি-এস ইত্যাদি পরীক্ষায় কিংবা আরও অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মৌখিক (viva-voce) পরীক্ষায় অত্যন্ত খারাপ করিয়া বসেন।

আমি অবশ্য স্কুলের ভিতরকার পরীক্ষাগুলিতেই শ্রেণীতে মৌখিক পরীক্ষা প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী; কেননা খুব সহজসাধ্য। তবে ফাইন্যাল ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা ব্যাপারে কতদূর কৃতকার্য্য হওয়া যাইতে পারে তাহ কঠিন। এখানে বর্ত্তমান অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রবেশিকা পরীক্ষায় এই প্রকার মৌখিক পরীক্ষা প্রবর্ত্ত হয়ত এক প্রকার অসম্ভব হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে ক্ষতি নাই। কেননা, স্কুলগুলিতে ছেলেমেয়েরা এই গোড়া হইতে অভ্যস্ত হইয়া যাইবে।

উপসংহারে আমি এই মাত্র বলিতে পারি যে, প প্রথা একদম তুলিয়া দেওয়ার পক্ষপাতী আমি নই। কিছু পরীক্ষা আছে বলিয়াই ছেলেরা কাজকর্ম্ম করে। যে কোন আকারেই হউক থাকিতেই হইবে; তবে ইহার সংস্কার ও পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

আর এই মূল্যবান কথাটি ছেলেমেয়েদের এবং ঐ তাহাদের অভিভাবকগণের মনে রাখা উচিত যে, স্কুল জীবনের চরম উদ্দেশ্য শুধু পরীক্ষা পাশ করাই নয়। ছাত্রীগণের কিরূপ পড়াশুনা মোটামুটি হইতেছে না হই তাহা শুধু দেখিবার জন্যই পরীক্ষা। সেই জন্যই বলা হই "Examination is a bad master, but a servant."

কৃষাণের কথা

শ্রীগোপেশ্বর সাহা

গাঁয়ের ভিটায় মানুষ আমরা সাত পুরুষের বাস,
তোমরা গিয়াছ ইহারে ছাড়িয়া, আমরা ছাড়িনি আশ।
রোদ ও-বাদলে সমান ভুগিয়া রোগে ও দেনার দায়ে,
আজো বেঁচে আছি অভাগা আমরা চাহিনি ডাইনে বাঁয়ে।

চালে নাই খড় ঘরে নাই চা'ল বৌএর কাপড় নাই,
তবুও আমরা ইহারে ছাড়িনি, ছাড়িবারে নাহি চাই।
নুন ভাত সাথে পাটপাতা ভাজা হাসিমুখে মোরা খাই,
'কট্‌কী' ধুতি আর 'পানি গামছায়' দুনিয়া ঘুরিয়া যাই।

অভাব মোদের কতটুকু বল—তবুও মোদের হায়,
আধপেটা খেয়ে কত দিন যে গো উপবাসে কেটে যায়
তোমরা বন্ধু কবিতা লিখেছ লিখো কৃষাণের ব্যথা,
হায় কি কখনো ধরিতে পেরেছ মোদের প্রাণের কথা?

বড় সুখে মোরা ছিলাম বন্ধু বড় সে সুখের দিন,
তোমাদের পিতা-পিতামহ তাঁরা চিনিত পরাণ-বীণ।
আমাদের প্রাণ জয় করে তাঁরা ছিলেন গাঁয়ের রাজা,
তাঁদের পরাণে পরাণ মিশায়ে মোরাও ছিলাম তাজা।

শ্যাম সায়রের অপরূপ ঘাট দুধ সাগরের জল,—
তাঁদেরই কীর্ত্তি সেদিনো বন্ধু করিয়াছে ঝলমল।
মঠে মস্‌জিদে আজানে বাজনে সে দিন বাধেনি গোল,
এক-সাথে মোরা হেসেছি কেঁদেছি কহিয়াছি এক বোল

তোমরা এনেছ সাম্যের জয় হরিতে মোদের ব্যথা,
ব্যথা ত' বন্ধু কমাতে পারনি বড় দুঃখের কথা।
চেয়ে দেখ ওগো দিকে দিকে ওই পড়ো ভিটার পানে,
শেয়াল শুয়োরে আড্ডা গেড়েছে মুখর ঝিঁঝিঁর গানে।

বাবুদের ওই দোতলা ঘরটা যেথায় জাজিম পাতি,
গল্পগুজবে হাসি ও আমোদে কেটেছে দিবস রাতি
সেথায় আজিকে দিবসে দুপুরে বাঘেরা দিয়েছে হানা,
ও-পথে আজিকে বালক-বৃদ্ধ সবারি যাইতে মানা'

কি আর বলিব দুখের কাহিনী কি আর শুনিতে চাও?
পূজার পরবে মেয়ের কাপড় জুটাতে পারিনি তাও!
মোদের একুক ভাঙিয়া গিয়াছে—দলাদলি রেষারেষি
মাথার উপরে ভগবান্ তাই বেদনা দিতেছে বেশী!

চারিদিকে দেখ, হানাহানি শুধু কেহ নাহি মানে কারে,
তোমরা এনেছ সাম্যের জয় আজি আমাদের দ্বারে।

নারী প্রগতির নব অধ্যায়

শ্রীমতী জ্ঞানপ্রিয়া দেবী

ঊনবিংশ শতকের শেষ ভাগ হইতেই নরওয়ে দেশে নারী-প্রগতি বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করে। মনস্বিনী লেখিকা এলেন কাই-এর নেতৃত্বে নারীর মুক্তি আন্দোলন এই দেশে খুব শক্তিশালী হইয়া উঠে। নারীর দাবী-দাওয়া ষোল আনার আদায় করিয়া লইতে বদ্ধপরিকর হইয়া আন্দোলনকারী মহিলা-দল তীব্রভাবে ব্যাপক আন্দোলন চালাইয়া অধিকার আদায় করিয়া লইতে অনেক পরিমাণে সফল হন। এই সফলতার পরে নরওয়ে দেশে এক নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। দেখা যাইতেছে, অধিকার আদায় করিয়া লইয়া সেই দাবী বজায় রাখিবার মত কার্য্যপটু মহিলাদের কর্ম্মক্ষেত্রে তেমন প্রচুর সংখ্যায় পাওয়া যাইতেছে না। ইহার জন্য কতক পরিমাণে দাবী অভ্যাসের অভাব ও কতক পরিমাণে দাবী নারীর সংসারের খুঁটিনাটি লইয়াই তাহার সকল কর্ম্মশক্তিকে নিয়োজিত রাখিবার প্রবৃত্তি। কিন্তু এই দুইটি কারণ স্বীকার করিয়া লইলেও এই দুইটির জন্য বাহিরের কাজে নারী-কর্ম্মীর এত অভাব ঘটিবার কথা নয়। সেজন্য ইহার কারণ নির্ণয় করিবার জন্য নরওয়ের চিন্তাশীলা নারীগণ বিশেষভাবে চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছেন। সম্প্রতি নারী আন্দোলনের নায়িকাগণ এক আলোচনা-সভায় স্থির করিয়াছেন যে, নারী-প্রগতি আন্দোলন দ্বারা যদি সার্থকতা লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে ইহার আদর্শের আমূল সংস্কার করিতে হইবে এবং ইহার লক্ষ্যেরও পরিবর্ত্তন একান্ত বাঞ্ছনীয় হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া ইঁহাদের ধারণা। নরওয়ের ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অফ্ উইমেন অর্থাৎ নারী মঙ্গলের জন্য জাতীয় সভার (ইহা আন্তর্জ্জাতিক নারী মঙ্গল সমিতির অন্তর্ভুক্ত) অন্যতম নেতা মিসেস বেট্সি কিয়েলস্‌বার্গ অস্‌লো নগরীতে অনুষ্ঠিত এক নারী সভায় উপরোক্ত মত স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়া এক বক্তৃতা দিয়াছেন। তিনি স্পষ্টই ঘোষণা করিয়াছেন—

"If Women's movement is to go forward, it must be prepared to change its front."

তিনি নারী মঙ্গল সভার সভাপতিত্বও এই সভার মিসেস সিগ্রিড ষ্ট্রে নাম্নী আর একজন নবীন কর্ম্মীর স্কন্ধে অর্পণ করিয়া অবসর গ্রহণ করেন এবং অবসর গ্রহণের সময় এই বলিয়া বিদায় চাহেন যে, প্রথম পথ-প্রদর্শিকাগণ দাবী আদায় করিবার জন্য আন্দোলন করিয়াই তাঁহাদের সমস্ত শক্তি ক্ষয় করিয়া ফেলিয়াছেন, এখন বৃদ্ধাবস্থায় নূতন কর্ম্মপদ্ধতি স্থির করিয়া সেই পদ্ধতি অনুসারে কাজ করিবার ক্ষমতা আর তাঁহাদের নাই, সেজন্য তাঁহারা নূতন উদ্যমশীল কর্ম্মীদের হস্তে কার্য্যভার অর্পণ করাই শ্রেয় মনে করেন। মিসেস কিয়েলস্‌বার্গ আরও বলেন যে, তিনি আশা রাখেন যে তরুণী দল তাঁহাদের উপর ন্যস্ত কর্ম্ম গ্রহণে পশ্চাৎপদ হইবেন না, বরং নব নব কর্ম্মপদ্ধতি সৃষ্টি করিয়া দেশকে নব উন্নতির পথে লইয়া যাইবেন। এই নূতন দলের প্রধান কাজ হইবে কর্ত্তব্যসাধন, দাবী করা নহে। এতদিন যে সমস্ত দাবী করা হইয়াছে, সেই সমস্ত দাবীর সহিত যে সমস্ত অবশ্য প্রতিপাল্য কর্ত্তব্য রহিয়া গিয়াছে সেই সমস্ত কর্ত্তব্য সুষ্ঠুরূপে পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করাই নূতন যুগের নারীর প্রধানতম কাজ।

মিসেস ষ্ট্রেও কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া বলেন যে,—

"The days of asking for rights are over, and that women must now be prepared to give. Enormous energy had been expended in the past in demanding the right to serve. Now-a-days there is danger lest women should, by sheer force of habit, continue to "demand" instead of seeing that rights have, for the most part, been won, and now need only to be put into action."

অর্থাৎ কেবলমাত্র দাবী আদায় করিবার দিন শেষ হইয়াছে, বর্ত্তমান যুগে নারী জাতিকে দান করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। অতীতে আমরা সেবা করিবার অধিকার দাবী করিতেই আমাদের বহু শক্তি নিঃশেষ করিয়াছি। এতদিন ক্রমাগত চাহিয়া আসাতে বর্ত্তমানে এই বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে যে, 'চাওয়া'টা একটা অভ্যাসমাত্র হইয়া উঠিতে পারে। কোনও দাবীবিশেষ কোনও কাজ করিবার জন্য না হইয়া কেবলমাত্র চাহিবার অভ্যাসবশে 'চাওয়া'র কোনই অর্থ হয় না। যখন আমাদের 'দাবী'গুলি প্রায় সমস্তই আদায় করিয়া লওয়া গিয়াছে, তখন সময় আসিয়াছে ওই 'দাবী'র মূলে যে কাজ করিবার অধিকারগুলি রহিয়াছে সেই কাজ সুন্দরভাবে করিবার জন্য প্রস্তুত হইবার।

মিসেস ষ্ট্রে আরও বলেন যে, পৌরকল্যাণ ও রাষ্ট্রকল্যাণ যজ্ঞে যে যে অনুষ্ঠানের জন্য নারীই বিশেষভাবে উপযোগী—যেমন শিশু-শিক্ষা, প্রসূতি-কল্যাণ, শিশু-কল্যাণ প্রভৃতি কাজ—সেই সমস্ত কাজ করিবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নারীদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। পৌর-সেবা দ্বারাই নারী আপন অধিকার প্রতিপন্ন করিবে এবং যে সমস্ত দাবী তাঁহারা আদায় করিয়া লইয়াছেন, তাহার সার্থক রূপ দিবেন। কুমারী মিসিস বকম্যান বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে—"নারী আন্দোলনের মূলে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা একটি ভুল করিয়া আসাতেই নারী আন্দোলন তাহার সার্থক রূপে আজও প্রতিভাত হয় নাই। সেই ভুলটি এই যে, তাঁহারা দাবী জানাইয়াই আসিয়াছিলেন, কিন্তু দাবী মিলিবার সঙ্গে সঙ্গে নারী-প্রতিষ্ঠানগুলির সভ্যবৃন্দ ব্যষ্টিগতভাবে কর্ম্মভার গ্রহণে সম্মত আছেন কি না সেদিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। এই সমস্ত কারণেই নরওয়ের নারীগণ কর্ম্মক্ষমতায় অন্য দেশের নারী অপেক্ষা হীন না হইয়াও আপনাদের প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। সেজন্য নরওয়ের রাষ্ট্রসভায় মাত্র তিনজন মহিলা সভ্য হইতে পারিয়াছেন। কিন্তু আপনার সেবা দ্বারা আপনাদের প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে বহু নারীই নির্ব্বাচনে জয়ী হইয়া রাষ্ট্রসভার সভ্য হইতে পারেন"।

যাহা হউক, এই নারী সম্মেলনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইয়াছে যে, এখন হইতে এই নারী মঙ্গল প্রতিষ্ঠানের আদর্শ হইবে "সেবা—দাবী নহে।"

চীনের মহিলা পেপিস

শ্রীবামন দেব

সপ্তদশ শতকে স্যামুয়েল পেপিস্ সারা মুলুকের পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া ছবি, পুস্তক, পল্লীগাথা সংগ্রহ করেন। এই সংগ্রহের কার্য্যে তিনি সমগ্র জীবন যাপন করেন। তাঁহার এই সংগ্রহ মৃত্যুকালে লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রদান করেন কেম্ব্রিজের ম্যাগডেলেন কলেজের কর্তৃপক্ষের হস্তে।

আমেরিকার এক মহিলা সাংবাদিক তেমনই ভ্রাম্যমানের জীবন বরণ করেন চীনযুদ্ধে অষ্টম রুট আর্ম্মির সঙ্গিনী হইয়া। অবশ্য মহিলার পরিচ্ছদে তিনি এই অসমসাহসিক অভিযানে যোগদান করেন নাই।

চীনা কমিউনিষ্ট সেনার নীল উর্দ্দি ধারণ করিয়া, মাথার টুপীতে লাল তারকা প্রতীক জুড়িয়া লইয়া মধ্যবয়সী সাংবাদিক মিস্ য়্যাগনেস্ স্মেড্‌লি অষ্টম রুট আর্ম্মির সঙ্গে সঙ্গে গমন করেন। ১৯৩৭ সালের আগষ্ট মাস হইতে ১৯৩৮ সালের জানুয়ারী পর্য্যন্ত তিনি শান্সি প্রদেশে ঐ সেনাদলের সহিত ভ্রমণ করেন।

তাঁহাকে পুরুষ বলিয়া ধরিয়া লইয়া এবং আমেরিকা-বাসী বলিয়া চিনিতে না পারিয়া চীনা সৈনিকেরা ঠাওরাইয়া লইয়াছিল যে, এইটি রুশীয় প্রধান সেনানায়ক (This is the Russian Chief of Staff)। যখন তাহারা প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারিল, তখন তাহারা মিস স্মেড্‌লিকে চীনের "জোয়ান অফ্ আর্ক" আখ্যা দিল. অবশ্য যোগ্যতর নাম হইত যদি তাঁহাকে "চীনের মহিলা পেপিস" নামকরণে ভূষিত করা হইত। কারণ, তিনি যতদিন ঐ সেনাদলের সঙ্গে ছিলেন, প্রতিনিয়ত তাঁহার একমাত্র লাটবহর টাইপরাইটার যন্ত্রটিতে সংবাদ টাইপ করিয়া যাইতেন।

কি প্রকারে চীনের রেড্ আর্ম্মির যোদ্ধাগণ গরিলা-যুদ্ধকে একেবারে নিখুঁত রণকৌশলে উন্নীত করিয়াছে এবং সূর্য্য-মামার দেশের সেনাদলের (জাপানী) অভিযানের পথে কতদূর অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে ও তাহাদিগকে অবিরাম লাঞ্ছিত করিয়াছে, তাহার গোপন-কথা তিনি পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। China fights Back নামে উক্ত পুস্তক সম্প্রতি ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে।

ঘোর রঙের কেশপাশ শোভিত য়্যাগনেস্ স্মেড্‌লি আজীবন সংগ্রাম করিয়াছেন বিপদের সঙ্গে এবং শিশুকাল হইতেই তাঁহাকে লিপ্ত হইতে হয় বাস্তব জীবন-সমরে। পিতা ছিল তাঁহার নিঃস্ব কৃষক। দারিদ্র্যের তাড়নায় যখন এই কৃষক আইওয়া ত্যাগ করিয়া কলোরেডোর ট্রিনিডাড নামক জলপ্লাবিত খনিপূর্ণ শহরে চলিয়া যান, তখন য়্যাগনেস্ শিশুমাত্র। এই সময়ে খনিসমূহের শ্রমিক-মহলে ধর্ম্মঘট উপস্থিত হয়। ফলে ফৌজের আমদানী হয় আর অবাধে আরম্ভ হয় লাঠীবাজি ও গুলীবর্ষণ। সৈনিকেরা নারীদের উপরও অকথ্য অত্যাচার করে। জীবনপ্রভাতের এই কঠোর অভিজ্ঞতাই য়্যাগনেসকে চিরজীবনের জন্য নির্য্যাতিতের প্রতি পক্ষপাতিনী করিয়া ফেলে। এবং অভিজ্ঞতা হইতেই নানা প্রকার চতুর কৌশল আয়ত্ত করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয়।

নিজের চেষ্টায়ই তিনি আইওয়ার কোন স্কু শিক্ষয়িত্রী হন এবং কার্য্য-কুশলতা ও কঠোর শ্রমের ফ কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশলাভ করেন। এই স তিনি এক সহপাঠীকে বিবাহ করেন। কিন্তু তাঁহার বি সাফল্যমণ্ডিত হইল না, বিবাহ-বন্ধন বরদাস্ত করা তাঁহার স রহিল না। তখন তিনি সাময়িক পত্রের লেখিকা হই এবং সোসিয়ালিষ্ট সংবাদপত্রসমূহের সংবাদদাতার ক নিরত হইলেন। পরে অবশ্য তিনি বামপন্থীদের দলভুক্ত হন।

একদিন এক হিন্দু-বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া, তিনি ভার স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। আমেরিকা বিগত মহাযুদ্ধে যোগদান করিল, মিস্ স্মেড কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন; তাঁহাকে তৃতীয় ডিগ্রীর অপ বলিয়া সাব্যস্ত করা হইল। বন্দী জীবন হইতে মুক্তি পা যখন তিনি বাহিরে আসিলেন, তখন তাঁহাকে পুরোদ বিপ্লবী বলিয়া গণ্য করা হইল। তিনি গোপনে এক জাহ পরিচারিকার পদ গ্রহণ করিয়া ইউরোপ যাত্রা করিলে প্রথমতঃ তিনি গেলেন সোভিয়েট রুশিয়াতে। তথা হই জার্ম্মানীতে চলিয়া যান ভারতীয় বিপ্লবপন্থীদের প্র কার্য্য চালাইবার জন্য।

১৯২৮ সালে "ফ্রাংকফার্টার জিটুং" (সে সময়ে জার্ম্মা উদারনৈতিক দলের মুখপত্র) মিস্ স্মেডলিকে পাঠায় চ দেশে উক্ত পত্রের সংবাদদাতা হিসাবে। চীনদেশে পৌঁ তিনি চৈনিক কমিউনিষ্ট দলের মতবাদে আকণ্ঠ নিমজ্জি হইয়া পড়েন। দিনের পর দিন ডিক্‌টেটর চিয়াং কাই চীনা কমিউনিষ্টদিগের উপর রুদ্রনীতি পরিচালন ক থাকেন। মিস্ স্মেড্‌লির বহু কমিউনিষ্ট বন্ধু-বান্ধব হত্যা করা হয়; অনেককে আবার অমানুষিক নির্য্যা জর্জ্জরিত করা হয়।

দুই-তিন বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহাকে নিতান্তই অ বর্ব্বরোচিত জীবন যাপন করিতে হয়, কারণ ইউরোপী ও আমেরিকানগণ তাঁহার সান্নিধ্য বিষবৎ পরিবর্জ্জন করি তাঁহার চিঠিপত্র পুলিশের লোক খুলিয়া পরীক্ষা করি তাঁহার আবাসের ঠিক বিপরীত দিকে পুলিশের গুপ্তচর প্রধান আড্ডা বসান হইল। সপ্তাহের পর সপ্তাহ তাঁহ আবাসে বন্দী থাকিতে হইত, কারণ তিনি একক বা বাহির হইতে ভরসা পাইতেন না। পরিশেষে তাঁহার স্বাস্ ভঙ্গ হইল; তিনি রুশিয়ার এক স্বাস্থ্য-নিবাসে গ করিলেন ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে। এইস্থানে থাকাকাল তিনি দুইখানি পুস্তক লিখেন—Chinese Destinies এ China's Red Army Marches নামক।

উত্তর-পশ্চিম চীনের কমিউনিষ্ট প্রাধান্যের অঞ্চলে ফি আসিয়া গত বৎসর তিনি বিপুল যশ অর্জ্জন করেন। য সেনাপতি চিয়াং কাই শেক বন্দী হন মার্শাল চাং হুয়েলিং- হস্তে। সিয়ানফু হইতে কমিউনিষ্টদিগের তরফে রে সংবাদ প্রচারকার্য্য চালাইবার জন্য একটি [illegible]

হয়—বিশেষ বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে ভিন্ন এই প্রকার গুরুতর ব্যাপারের ভার দেওয়া যায় না। তখন মিস স্মেডলিকে নিয়োগ করা হয় এই কার্য্যের দায়িত্বে।

অষ্টম রুট আর্ম্মিতে যোগদান করিয়া তিনি দেখিলেন—এই সেনাদল সমগ্র বিশ্বের নিপুণতম গরিলা-যোদ্ধায় পরিণত হইয়াছে। চিয়াং কাই শেকের গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে দশ বৎসর অন্তর্বিপ্লব পরিচালন করিয়া এই দল অনেক কিছুই আয়ত্ত করিয়াছে; কি করিয়া উৎকৃষ্টতর অস্ত্রশস্ত্রধারী সংখ্যা-গুরু দলকে কাবু করা যায় অকস্মাৎ অতর্কিত আক্রমণ দ্বারা, কি প্রকারে স্থানীয় অধিবাসী কৃষকদের সহিত সহযোগিতায় বিপক্ষ-সৈন্যের গতিবিধির সংবাদ রাখা যায়, কি প্রকারে কৃষকের ছদ্মবেশে বিপক্ষের চোখে ধূলি দিয়া বেমালুম সরিয়া পড়া যায়, কিম্বা আক্রমণের পূর্ব্বে একত্র জমায়েত হওয়া যায়—সকল কৌশলই অতি চতুরতার সহিত ইহারা বিস্তার করিতে সক্ষম। এই সকল ফন্দি-ফিকির জাপানীদিগের বিরুদ্ধেও কার্য্যকরী হইয়াছে সমানভাবেই।

আধুনিক সমরাস্ত্রসমূহে অতি মাত্রায় সুসজ্জিত কোনও সেনাদলের বিরুদ্ধেও চীনের এই গরিলা-যোদ্ধারা কৃতকার্য্য হইতে পারে; তাহার কারণ, প্রথমত—ইহারা সারা দুনিয়ার সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী ফৌজ, দৈনিক ৭০ মাইল পর্য্যন্ত মার্চ্চ করিবার শক্তি ইহাদের রহিয়াছে। দ্বিতীয়ত—গরিলা-যোদ্ধারা অসম্ভব রকম কষ্ট সহ্য করিতে অভ্যস্ত। তৃতীয়ত—ইহারা শুধুই সর্ব্বপ্রকারে শিক্ষিত ও অপূর্ব্ব নিয়মানুবর্ত্তী সেনা নয়, ইহাদের রাজনীতিক জ্ঞানও গভীর। চীনের জাতীয়তাবাদের মূলোভিত্তি বলিতে গেলে ইহারা—এই দলের প্রত্যেকটি লোক নিশ্চিতভাবেই জানে—কি উদ্দেশ্যে এবং কি ধাঁচের যুদ্ধে ইহারা লিপ্ত।

মিস স্মেডলি অষ্টম রুট আর্ম্মির এক অভিনব বিভাগের অদ্ভুত কর্ম্মপদ্ধতির বিবরণ দিয়াছেন। এই বিভাগটি গরিলা-প্রণালীর যুদ্ধের পক্ষে কতটা প্রয়োজনীয়, তাহা সমর সম্বন্ধে যাহার সামান্য ধারণা আছে সে-ও বুঝিতে পারিবে। এই বিভাগটির নাম—ফ্রণ্ট সার্ভিস গ্রুপ; ইহাতে ২৬ জন পুরুষ এবং ৪ জন নারী নিযুক্ত রহিয়াছে। এই বিভাগের পরিচালিকা হইলেন বিখ্যাত চীনা লেখিকা টিংলিং। এই দলে অভিনেত্রী উও কাং-ওয়েই, কয়েকজন রিপোর্টার, কয়েকজন বক্তা, কয়েকজন প্রসিদ্ধ গায়ক-গায়িকা এবং একজন ছোট গল্প রচয়িতা রহিয়াছেন। এই প্রচারকারী দল উড়ো জাহাজ-যোগে যখন যেখানে প্রয়োজন অভিযান করে এবং বিপ্লবমূলক নাটক-নাটিকার অভিনয় করিয়া থাকে। শহরে, পল্লীতে এবং সেনাশিবিরে উক্ত প্রকার অভিনয়-সঙ্গীতাদির দ্বারা যোদ্ধাদিগকে উৎসাহিত করে; যে সকল সেনাদল অষ্টম রুট আর্ম্মির মত নিপুণতা লাভ করিতে পারে নাই, তাহাদিগকে শিক্ষাদান করে; চীনের কৃষক-মজুর প্রভৃতিকে দেশাত্মবোধে জাগ্রত করিয়া বিপক্ষের প্রতিরোধে উত্তেজিত করে। চীনের জনগণের অন্তরে জাতীয়তার প্রতি আকর্ষণ যে জন্মলাভ করিয়াছে, উহার মূলে রহিয়াছে এই ফ্রণ্ট সার্ভিস গ্রুপের কঠোর শ্রম। ক্লান্ত, অবসন্ন ও নিরুৎসাহ সৈন্যদল উহাদের চরম অবসাদের সময় এই গ্রুপের নিকট কতভাবে যে উৎসাহ ও প্রেরণা লাভ করিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। মোট কথা এই ফ্রণ্ট সার্ভিস প্রচার বিভাগ যে কার্য্য এই সমরোপলক্ষে সম্পন্ন করিয়াছে, তাহাকে অসাধ্যসাধনই বলা যাইতে পারে নিঃসন্দেহে।

কখনও এই সেনাদলের অভিযানসময়ে এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, আগুন জ্বালিবার কোন কিছু নাই—না আছে তেল, চর্ব্বি বা কাঠ, আবার খাদ্যের অতি সাধারণ উপাদানেরও হয়ত অভাব, যেমন লবণ প্রভৃতি। তাহাদের খাদ্য অধিকাংশ সময়েই হইয়াছে ভাত বা রুটি আর গাজর বা চীনা মূলা। এই সামান্য আহারেই তাহাদিগকে তৃপ্ত থাকিতে হইয়াছে রাতদিনের অমানুষিক পরিশ্রমের পর।

এই রেড আর্ম্মির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চীনের অন্যান্য ফৌজ অতি ধীরেই গরিলা-যুদ্ধের সকল কৌশল শিক্ষা করিয়াছে। শানসী অঞ্চলের গরিলা-যুদ্ধ পরিচালনার সময় এমন ঘটনা বহুবার দেখা গিয়াছে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের সেনাদল কিম্বা প্রাদেশিক শাসনতন্ত্রের সৈনিকেরা অতি দুঃসাহসের সহিত লড়াই চালাইলেও প্রায়ই অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছে বিপক্ষের হাতে বন্দী হইবার অতিরিক্ত আতঙ্কে; অপরপক্ষে অষ্টম রুট আর্ম্মির যোদ্ধাগণ উপযুক্ত সময়ের এক নিমেষ আগেও সমরক্ষেত্র ত্যাগ করে নাই, বরং তাহারাই সহ-যোদ্ধাদের পরিত্যক্ত অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া তবে আশ্রয়ের সন্ধানে অগ্রসর হইয়াছে। এই প্রকার উত্তেজনার সময়েও কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া প্রাণ তুচ্ছ করিয়া এই যে অস্ত্রশস্ত্র বিপক্ষের করায়ত্ত হইবার সম্ভাবনা হইতে বাঁচান, ইহা শুধু অষ্টম রুট আর্ম্মির যোদ্ধাগণের পক্ষেই সম্ভব।

চীনা রেড্ আর্ম্মির যোদ্ধাগণ শুধু যে সমরে সর্ব্বাপেক্ষা বিপদসঙ্কুল স্থান গ্রহণ করিয়াছে এমন নয়, অবকাশ সময়ে নূতন যোগদানকারী দলের শিক্ষাদান কার্য্যও পরিচালনা করিয়াছে বিচক্ষণতার সহিত। আবার যখন যে অঞ্চলে পদার্পণ করিয়াছে সেখানকার কৃষক ও শ্রমিকদেরও শিক্ষিত করিয়াছে প্রত্যক্ষ সমরক্ষেত্রের বাহিরে শত্রু-সেনাকে নানা-প্রকার লাঞ্ছনায় অস্থির করিতে। এমন কি ঐ সকল কৃষক-চাষীদের লইয়াও তাহারা স্বেচ্ছাসেবক বা সাময়িক বাহিনী প্রস্তুত করিয়াছে। উয়াতাই শান্ পার্ব্বত্য অঞ্চলে জাপানী সেনা-শিবিরের পশ্চাতে লাগিয়া থাকিবার জন্য একমাস মধ্যে রেড-দল ১০,০০০ শ্রমিকের বাহিনী গঠিত করিয়াছিল, যেখানে মাত্র পূর্ব্বে ১২০০ শতের বেশী স্বেচ্ছাসেবক যোগদান করে নাই।

মিস্ স্মেড্‌লির দিনপঞ্জী যখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ইংলণ্ডে, তখন তিনি হুনান প্রদেশের কোনও স্থলে চীনা সেনার সঙ্গে ছিলেন এবং রীতিমত বিবরণ প্রেরণ করিতে-ছিলেন কলিকাতার "হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড" দৈনিক পত্র এবং ইংলণ্ড ও আমেরিকার বহু সংবাদপত্রের নিকট। বস্তুত যে পুস্তকখানি ইংলণ্ড হইতে সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার প্রায় সমুদয় বিবরণই 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডে' পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে।

কৃষ্ণভাবিনী নারী-শিক্ষা মন্দিরে বার্ষিক উৎসব

৫ই ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ণে চন্দননগরের কৃষ্ণভাবিনী নারী শিক্ষা-মন্দিরের বাৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্তা সরলা দেবী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ

সিদ্ধার্থের জরাদর্শন   রাহুলের পিতৃধন-প্রাপ্তি

করিয়াছিলেন। পরিচালক সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠের প্রস্তাবে সভানেত্রী বরণের পর অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র দে মহাশয় ১৯৩৮ সালের কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। অতঃপর সভানেত্রী একটি নাতিদীর্ঘ সারগর্ভ অভিভাষণ পাঠ করেন।

অনন্তর শিক্ষা-মন্দিরের বৃত্তিপ্রাপ্তা ছাত্রীদিগকে ও নিম্নশ্রেণীর সমস্ত ছাত্রীদিগকে পারিতোষিক ও পদকাদি প্রদত্ত হয়। এই উপলক্ষে দুইটি সুবর্ণ পদক ও দশটি রৌপ্য পদক দেওয়া হয়। কার্য্যবিবরণী হইতে জানা যায়, গত তিন বৎসর ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল খুব সন্তোষজনক হইয়াছে এবং শিক্ষা-মন্দিরেরও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইয়াছে। ছাত্রীদের আবৃত্তি এবং অভিনয়—"রাবণ ও চিত্রাঙ্গদা", ড্রিল—"সন্ধ্যা প্রদীপ", সঙ্গীত—"বন্দে মাতরম্", কৌতুকাভিনয়—"ছাত্রের পরীক্ষা" ও মূকাভিনয়—"হিংসা উন্মত্ত পৃথিবী" অতি সুন্দর হইয়াছিল।

চন্দননগরের এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর মঁসিয়ে মেনার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, চন্দননগরের মিঃ বাপ্পানারা, ডাঃ প্রভাবতী দাশগুপ্তা, ডাঃ বৃন্দাবন মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক গুরুদাস ভড়, রায় বাহাদুর ভগবতীচরণ কুণ্ডু, রায় বাহাদুর ডাঃ যজ্ঞেশ্বর ঘোষ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ দত্ত, শেওড়াফুলির সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত ভূতেশ্বর শ্রীমানী, শ্রীযুক্ত গুরুদাস রায়, কুমার মণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, কবিরাজ ব্রজবল্লভ রায়, হুগলীর পোষ্টাল সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মিঃ এস এস ঘোষ, সরকারী ডাক্তার আঁদ্রে, শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস মল্লিক, রায় সাহেব মণীন্দ্রনাথ সাধু প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সভানেত্রীর অভিভাষণ

সভানেত্রী ছাত্রীদিগকে সম্বোধন করিয়া সাধনা সম্পর্কে বলেন, সাধনা শব্দটির মর্ম্ম কি বোঝ তোমরা, আজকালকার মেয়েরা? সাধনা ব'ল্লেই মুনিঋষিদের যোগসাধনার কথা বোধ হয় তোমাদের মনে আসে, অতি কঠিন তপঃসাধ্য সুদূরপরাহত কোটি কোটি জন্মলব্ধ ফল যার, প্রাচীন দিনের ইতিহাসের একটি পৃষ্ঠায় লিখিত, শুধু তাই
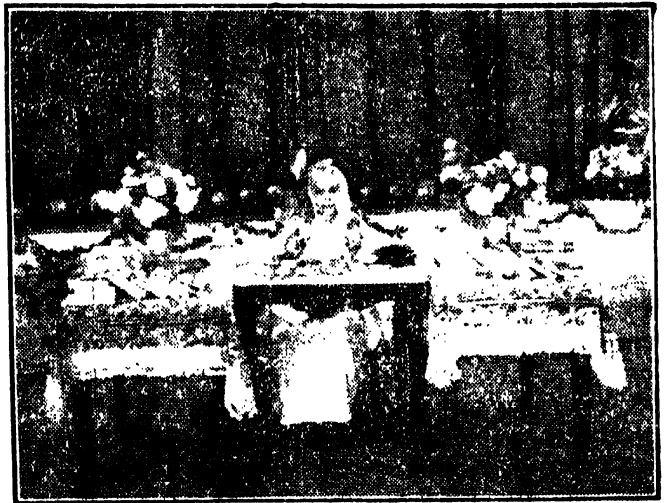
কৃষ্ণভাবিনী নারী শিক্ষা মন্দিরে শ্রীযুক্তা সরলা দেবী

কি? কিন্তু তার পরের পাতা উল্টালেও কি সাধনার সঙ্গে চোখাচোখি হয় না আমাদের?

নানা মার্গ দিয়ে ভগবানের সঙ্গে মানবাত্মার যোগসাধনা ছাড়াও মানব জীবনে সাধনার আরও নানা বিষয় প্রত্যক্ষীভূত হয় না কি? জ্ঞান-সাধনা, বিদ্যা-সাধনা প্রভৃতি কথাগুলি তো প্রতিদিনই আমরা ব্যবহারে আনছি। তাই অনেকক্ষেত্রে ওই শব্দটির প্রয়োগ ক'রে আমরা তার একটি সার অর্থ উদ্ধার ক'রেছি—কোনও আদর্শ, কোনও লক্ষ্য

করেছিলাম। এই এক যুগের সাধনার শেষধাপে পৌঁছান গেছে কি?

মন্দিরের এক একখানি বহিরিষ্টক গেঁথে গেঁথে এ বাড়ীখানি তৈরী হ'য়েছে বটে, এর অন্তর গাঁথুনিও সঙ্গে সঙ্গে শেষ হ'য়েছে কি? জেনো মেয়েরা, ছাত্রীরা, তোমাদের চিরসুহৃদ তোমাদের সম্মুখে সমাসীন এই মহাসাধক হরিহর শেঠের সাধনা ততদিন সম্পূর্ণ হবে না, যতদিন না তোমরা গড়ে উঠবে। এ সাধনা একজনের তপঃসাপেক্ষ নয়, যাদের জন্য সাধনা তাদের সহযোগিতা সাপেক্ষ।

জন নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আত্মার পরমানন্দ চাই। তবেই চাকুরিতেও তাঁরা অমৃতের আস্বাদ পাবেন, শুধু দাসত্বের কটুতা বা শুধু শ্রমের তিক্ততা নয়। আজকাল মেয়েদের বিদ্যা-শিক্ষাও অর্থাগমের উপায়স্বরূপ বলে গৃহীত হ'চ্ছে। কিন্তু অর্থোপার্জ্জনকেই যাঁরা পরমার্থ জ্ঞান ক'রে এই দিকে ধাবমানা হ'চ্ছেন, তাঁরা জাতীয় বা মানবীয় আদর্শকে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ করেছেন এটা যেন থেকে থেকে মনে এনে মনের বাঁক ফিরিয়ে দেন—নতুবা জীবনটা অত্যুগ্র

বুদ্ধদেব ও সুজাতা

বা কোন কিছু প্রাপ্তির জন্য আপ্রাণ চেষ্টার নামই সাধনা।

জীবনেতে যাই করি আমরা, যা কিছুই চাই সেটিতে কৃতকার্য্যতার জন্যে চাই সাধনা। এই যে তোমাদের বিদ্যা-মন্দিরখানি, এটি একটি মানুষের কত সাধনার ফলে আজ এই উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হ'য়েছে, তা মাঝে মাঝে কল্পনায় আনতে পেরেছ কি?

বার বৎসর অতীত হয়ে গেছে, একটি যুগ উত্তীর্ণ করেছে কালপ্রবাহ সেদিন থেকে, যেদিন আমি এই চন্দননগরবাসীদের মধ্যে এসে এই মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন

আর সহযোগিতা চাই এই তপোভূমিতে শিক্ষয়িত্রীদের। সুকুমারমতি বালিকাদের মানুষ করিবার সমস্ত উপকরণ এখানে মজুত—যদি সে উপকরণের সুযোগ গ্রহণ না করেন, যদি ভগবচ্চরিত উপাদানে ব্রহ্মার সৃষ্টির আনন্দের মত আনন্দে নিজেদের দিনের পর দিন তাঁরা ডুবিয়ে রাখতে না পারেন, যদি মাসান্তে শুধু মাহিনার টাকা কটি গুণে নেবার পথ চেয়ে থাকেন, তবে তাঁরা নিজেরাও মহাভাগ্যে বঞ্চিত হবেন এবং যাদের জন্য এ যজ্ঞ তাদেরও বঞ্চিত ক'রবেন। শিক্ষয়িত্রীদের অর্থের প্রয়ো-

লালসার একটা ভয়ানক ঘূর্ণিপাকের ভিতর দিয়ে পড়ে বানচাল হ'য়ে যাবে। কাণ্ডারীর সঙ্গে সঙ্গে ভরা নায়ের শিশুযাত্রীরাও তাতে ডুববে।

ভোগের সঙ্গে ত্যাগের মিশ্রণ ছাড়া সে পরম আনন্দের জন্ম হবে না। যদি সে রকম আনন্দমন্ত্রে উজ্জীবিত অনুপ্রাণিত, উৎসর্গীকৃত, নিবেদিত শিক্ষয়িত্রীরা এই বিদ্যা-মন্দিরে পা বাড়িয়ে থাকেন, তবে তাঁদের পদধূলি নিয়ে ছাত্রীরা ধন্য হোক এবং হরিহরবাবু সার্থকমনোরথ হউন—এই আমার প্রার্থনা।

পুস্তক পরিচয়

ক্যালকাটা জিওগ্রাফিক্যাল রিভিউ (Calcutta Geographical Review)—ক্যালকাটা জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি কর্ত্তৃক দারভাঙ্গা বিল্ডিং, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

বিভিন্ন দেশে ভূগোল একটি বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয়। আমাদের দেশে এতকাল এই বিষয়টির ততটা সমাদর হয় হয় নাই। তথাপি, ইদানীং যে সুষ্ঠুভাবে ইহার চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে, তাহা বড়ই আশা ও আনন্দের কথা। ভূগোল এখন আর পাঠ্য-হিসাবে স্কুল ও কলেজের গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ নহে, ভারতবর্ষস্থিত দেশী-বিদেশী ভূতাত্ত্বিক গবেষকগণ নিয়মিতরূপে ইহার চর্চ্চায় লিপ্ত হইয়াছেন। কলিকাতা, মাদ্রাজ, এলাহাবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন কেন্দ্রে ইহার আলোচনা হইতেছে এবং ইংরেজী ও দেশী ভাষায় সাময়িক পত্রিকাদিও প্রকাশিত হইতেছে। আলোচ্য পত্রিকাখানি বৎসরে দুইবার বাহির হয়। বর্ত্তমান সংখ্যায় কয়েকটি সুচিন্তিত গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। রাজপুতানা, হিমালয় প্রভৃতির ভূতত্ত্বের দিক হইতে আলোচনা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বিজ্ঞান শাখার ভূগোল বিভাগের বিবরণী ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহা পাঠে জানা যায়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ভারতবাসীরা ভূতত্ত্বের চর্চ্চায় কিরূপে অগ্রসর হইয়াছেন। শিক্ষিত জনের সহানুভূতি পাইলে পত্রিকাখানি আরও উন্নতি লাভ করিবে নিশ্চয়।

এক পেয়ালা চা—শ্রীবুদ্ধদেব বসু। দাম ছয় আনা।

গুজবের জন্ম—শ্রীসুনির্ম্মল বসু। দাম ছয় আনা।

খাদে ডাকাতি—শ্রীধর্ম্মদাস মিত্র। দাম ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—ইষ্টার্ণ ল-হাউস, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

গল্প, উপন্যাস, অ্যাডভেঞ্চারে শিশু-সাহিত্য ছাইয়া গিয়াছে—এই কথা বলিয়া কেহ কেহ একটা নৈরাশ্য ও আতঙ্কের ভাব প্রকাশ করেন। আমরা সে শ্রেণীভুক্ত নহি। যত বেশী বই এই সব বিষয়ে প্রকাশিত হইবে, ততই ছেলেদের ও অভিভাবকদের যাচাই করিয়া লইবার সুবিধা হইবে। আমরা এই তিনখানা বই পড়িয়াছি। প্রথম দুইখানির লেখক সাহিত্যিক হিসাবে বাঙলা দেশে সুপরিচিত; তাজেই স্বতঃই আশা হয়, ভাল গল্প তাঁহাদের মুখে হইতে আমরা শুনিব। কিন্তু আলোচ্য প্রথম পুস্তকখানি 'এক পেয়ালা চা' আমাদিগকে কতকটা নিরাশ করিয়াছে। এক পেয়ালা চা, বক্তুর বই লেখা, খুকীর নাম, টামীর ভাবনা, দিনে-দুপুরে এই পাঁচটি গল্প বইখানিতে আছে। গল্পের বিষয় বস্তু ও প্লট এমন যে, শিশু-চিত্ত তাহাতে আদৌ আকৃষ্ট হইবে কি-না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। দ্বিতীয় পুস্তক 'গুজবের জন্ম'। ইহাতে [illegible]টি গল্প আছে। ইহাদের অধিকাংশের মধ্যেই এমন কিছু জিনিস আছে, যাহা শিশু-চিত্তকে সত্যই আকর্ষণ করিতে পারিবে। কীর্ত্তিপদর কীর্ত্তি, গ্রহের ফের, মিল আর গরমিল, হজমি-গুলি এই কয়টি এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'খাদে ডাকাতি'র লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে তেমন পরিচিত নহেন। তথাপি তাঁহার লেখা পড়িয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি। এখানিতে গল্প আছে সাতটি। প্রথম গল্প 'খাদে ডাকাতি'র নাম অনুসারে পুস্তকখানির নামকরণ হইয়াছে। লেখকের কয়েকটি গল্প বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক। এরূপ না হইলে যেন উহা আরও সুখপাঠ্য হইত। ছেলেরা এই পুস্তকখানি পড়িয়া আনন্দ পাইবে।

আজব-দেশে অমলা—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—ইষ্টার্ণ ল-হাউস, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

এই বইখানি বিখ্যাত ইংরেজী "Alice in Wonderland" পুস্তকের অনুবাদ। লেখক এদেশের ছেলেমেয়েদের উপযোগী করিয়া এখানি অনুবাদ করিয়াছেন। বাঙলার ছেলেমেয়েরা যে এখানি আদরে গ্রহণ করিয়াছে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ তাহাই সূচিত করে। হেমেন্দ্রবাবু শিশু-সাহিত্যে একজন দিক্‌পাল। তাঁহার অনুবাদ যে সরল ও সুবোধ্য হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। বহু একবর্ণ চিত্র আছে। ছাপা বাঁধাই উত্তম।

শ্রীশ্রীমায়ের মাহাত্ম্য—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল বিশ্বাস প্রণীত ১নং কাঁকুড়গাছি ফার্ষ্ট লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত পৃষ্ঠা ৪৪। মূল্য চারি আনা।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহধর্ম্মিণী সারদেশ্বরী দেবী ভক্তজনের নিকট 'শ্রীশ্রীমা' নামে পরিচিত। আলোচ্য পুস্তকখানিতে সারদেশ্বরীর জীবনের বিশেষ বিশেষ কাহিনী শ্রদ্ধা সঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে। বাঙালী-জীবনে শ্রীশ্রীমা'র প্রভাব কতখানি ইহার অধ্যায়গুলি পাঠ করিলে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। লেখক কয়েকটি অধ্যায়ে তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতা ও ধর্ম্মচর্চ্চার কথাও বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া মা'র ভক্তগণ মুগ্ধ হইবেন, সাধারণ পাঠক অনেক নূতন কথা জানিতে পারিবেন। বাঙলা দেশের এ মহীয়সী মহিলার কথা যতই প্রচারিত হয় ততই দেশের জাতির পক্ষে মঙ্গল। আমরা পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা—৪৫শ ভাগ তৃতীয় সংখ্যা পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির, ২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। "বাঙলা ভাষা পরিষদে"র ভূমিকা, বৈদিক কৃষ্টির কালনির্ণয়, বঙ্কিমচন্দ্রের অবতারতত্ত্ব, ভারতচন্দ্রের এক খানি পুঁথি; রামনারায়ণ তর্করত্ন, সড়াইকলা রাজ্যে তৈল-নিষ্কাশন যন্ত্র, বগুড়ার কবি গোবিন্দচন্দ্র, বাঙলা গদ্যের প্রথম যুগ প্রবন্ধগুলি সবই সারগর্ভ, বহু তথ্যপূর্ণ এবং সুচিন্তিত প্রবন্ধ গৌরবই সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার বৈশিষ্ট্য।

অতি আধুনিক—সচিত্র মাসিক পত্রিকা। ৩৪বি, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অতি আধুনিকের পৌষ সংখ্যা অনেক সুচিন্তিত এবং সারগর্ভ প্রবন্ধে পূর্ণ। কবিতা কয়েকটিও বেশ ভাল। ছোট গল্প ও উপন্যাসেও সম্পাদকীয় নির্ব্বাচনের যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। ছাপা, কাগজ সর্ব্বাংশে প্রথম শ্রেণীর মাসিকের যোগ্য।

অগ্রণী—সম্পাদক প্রফুল্ল রায়। বামপন্থী মাসিক পত্রিকা। ঠিকানা—২৩।১ গিরিশ বিদ্যারত্ন লেন। তরুণ সহযোগী তাঁহাদের মত ও লক্ষ্যের সম্বন্ধে বলিতেছেন—'ফ্যাসিস্ট সাম্রাজ্যতন্ত্রী সম্মেলনের বিপক্ষে সব দেশের যথার্থ গণতান্ত্রিক জনগণের ভিত্তিতে এক বিরাট শান্তিকামী শক্তির প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে আজ সংস্কৃতিশীল মাত্রেরই প্রথম ও অবশ্য কর্ত্তব্য।' 'অগ্রণী'র প্রবন্ধগুলি বেশ সুচিন্তিত এবং সুলিখিত। ছাপা, কাগজ বেশ সুন্দর। আমরা নবীন সহযোগীর সাফল্য কামনা করিতেছি।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—আদিলীলা, শ্রীরাধানাথ কাবাসী কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ধান্যকুড়িয়া মদনমোহন মন্দির হইতে প্রকাশিত। এই খণ্ডের মূল্য ভাল বাঁধাই—১৷০, কাগজে বাঁধাই—১৷৹ আনা। শ্রীযুক্ত কাবাসী মহাশয় কেবল বৈষ্ণব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ভক্ত নহেন, অক্লান্ত কর্ম্মীও বটেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি শ্রীশ্রীবৃহৎ-ভক্তিতত্ত্বসার, শ্রীচৈতন্য ভাগবত, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব গ্রন্থের উত্তম সংস্করণ প্রকাশ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। বর্ত্তমানে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত অমর গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সংস্করণ প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা প্রথমতঃ আদিলীলা পাইয়াছি, মধ্যলীলা ও অন্ত্যলীলা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। কাবাসী মহাশয়ের অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় এই গ্রন্থেরও বৈশিষ্ট্য আছে। ইহাতে মূলের বিস্তৃত ব্যাখ্যা, শব্দার্থ, ভাবার্থ, অনুবাদ, সিদ্ধান্ত ও যথাসম্ভব গ্রন্থোক্ত স্থানের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। যে সব স্থলে দুরূহ দার্শনিক তত্ত্ব আছে, সরল ভাষায় তাহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। মোট কথা সব দিক দিয়াই বইখানি সাধারণ পাঠকের উপযোগী হইয়াছে। ছাপা কাগজ ভাল, মূল্যও সুলভ। এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

তাসের দেশ—লেখক শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রকাশক—বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ২১০নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য এক টাকা।

জীর্ণ পুরাতন আদর্শকে ভেঙে নূতন আদর্শ সৃষ্টির যে প্রেরণা পাই রক্তকরবীতে, মুক্ত ধারায়, ফাল্গুনীতে অচলায়তনে —'তাসের দেশ' সেই প্রেরণাই দেবে পাঠক-পাঠিকার মনের মধ্যে। এই নাটকখানির মধ্যে যে সুরের সন্ধান পেলাম আমরা সে সুর হচ্ছে সমস্ত বন্ধনকে ভেঙে ফেলে নিজেকে জীবনের প্রাচুর্য্যের মধ্যে প্রকাশ করবার সুর। পরানুকরণপ্রিয় এবং অতীতের ক্রীতদাস যারা তাদের দেশে কবি দুরন্ত যৌবনের উন্মত্ত হাওয়া এনেছে এই নাটকখানিকে আশ্রয় করে। মানব সভ্যতাকে পুরাতনের শাসন থেকে মুক্ত ক'রে যারা রূপান্তরিত করতে চায়—সেই নবযৌবনের দল 'তাসের দেশ' প'ড়ে যে প্রচুর প্রেরণা অনুভব করবেন—এতে কোনই সন্দেহ নেই।

বিশ্ব-পরিচয়—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক লিখিত এবং বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ২১০নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

ইহা একখানি বিজ্ঞানের পুস্তক। এমন সরল এবং সরস ভাষায় এই পুস্তকখানি লিখিত যে, বিজ্ঞানের অত্যন্ত জটিল তত্ত্বগুলিও সহজবোধ্য হইয়াছে। সাধারণ পাঠক-পাঠিকা ইহা পাঠ করিয়া বিজ্ঞানরাজ্যের বহু সত্যের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ পাইবেন। আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েরা সাধারণত বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ পড়িতে চাহে না। নীরস বলিয়াই পড়িতে চাহে না। এই কারণে আমাদের দেশের শিক্ষিত নরনারীর জ্ঞান অত্যন্ত একপেশে। কবির এই গ্রন্থখানি মানুষের মনের দিগন্তকে যে প্রসারিত করিবে—ইহাতে সন্দেহ নাই। 'বিশ্ব-পরিচয়' আপনার গুণের দ্বারা ইতিমধ্যেই যে বাঙালীর হৃদয়কে আকর্ষণ করিয়াছে—তাহার প্রমাণ দেড় বৎসরের মধ্যেই ইহার তিনটি সংস্করণ হইয়া গিয়াছে।

কস্তুরীবাই

(৭৮ পৃষ্ঠার পর)

সঙ্গে সর্ব্বদা একমত হ'তে পারেননি সত্য কিন্তু তাঁর জীবনকে কোনোও তিনি ভারাক্রান্ত করেন নি আপনার দুর্ব্বিনীত ব্যবহারের দ্বারা। যেমন ক'রে সীতা চলেছিলেন রামচন্দ্রের পিছনে পিছনে বনবাসে—কস্তুরীবাইও তেমনি আজীবন স্বামীর পিছনে পিছনে চলেছেন দুঃখের দুর্গম পথে। আজ যখন এই মহীয়সী মহিলা ৬২ বৎসর বয়সে মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপ দিয়ে দুঃখের পথকে বরণ ক'রে নিলেন—তখন হৃদয় বারম্বার শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছে তাঁর জীবনব্যাপী ত্যাগের ও শৌর্য্যের কথা। রাজকোটে কারাবরণ করতে যাবার সময় কস্তুরীবাইয়ের স্বাস্থ্যের অবস্থা কি রকম শোচনীয় ছিল তার বর্ণনা গান্ধীজী দিয়েছেন গত ১১ই ফেব্রুয়ারীর হরিজনে। গান্ধীজী লিখেছেন—

"মণিবেনের গ্রেপ্তারের সংবাদ পেয়ে তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। আমার কাছে অনুমতি চাইলেন রাজকোট যাবার জন্য। আমি বললাম—এত দুর্ব্বল শরীর নিয়ে যাওয়া ঠিক হবেনা। দিল্লিতে এর একটু আগেই তিনি স্নানাগারে মূর্চ্ছা গিয়েছিলেন। দেবীদাসের উপস্থিত বুদ্ধিই তাঁকে বাঁচিয়েছিলো, নইলে স্নানাগারেই তিনি মারা যেতেন।"

এইরকম দুর্ব্বল দেহ নিয়ে এই বৃদ্ধ বয়সে স্বাধীনতার সংগ্রামে যিনি যোগ দিতে পারেন—সে নারীর হৃদয় যে কত বড় নির্ভীক—তা অনুমেয়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জ্যোতিস্ময় ইতিহাস যেদিন লেখা হবে সে দিন গান্ধীজীর নামের পাশে কস্তুরীবাইয়ের নামও দীপ্তি পাবে।

সাহিত্য-সংবাদ

নিখিল ভারত বাঙলা রচনা প্রতিযোগিতা
(শিবপুর ভ্রাতৃ-সংঘ)

বিষয়ঃ—শরৎ সাহিত্যে শিশু, ১ম পুরস্কার ১টি রৌপ্য-কাপ, ২য় পুরস্কার ১টি রৌপ্য পদক।

যে কেহ এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারিবেন। বাংগলা ভাষায়, কালীতে স্পষ্টাক্ষরে ও কাগজের এক পৃষ্ঠায় রচনা পাঠাইতে হইবে। রচনা পাঠাইবার শেষ তারিখ ১লা চৈত্র, ১৩৪৫।

রচনা পাঠাইবার ঠিকানা—সম্পাদক, শিবপুর ভ্রাতৃ-সংঘ, ২০৪, শিবপুর রোড, শিবপুর, হাওড়া।

রচনা প্রতিযোগিতা
নদীয়া মুসলিম এসোসিয়েশন

সমিতির শিক্ষা সম্পর্কীয় কার্য্যসূচী অনুযায়ী নদীয়া-বাসী মুসলমান ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি রচনা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। রচনায় বিষয়—"নদীয়া জেলার নদনদী ও তাহার উপকারিতা"—রচনা লিখিতে নিম্নলিখিত বিষয়-সমূহের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। (১) ভৌগোলিক বিবরণ, (ক) নাম, (খ) অবস্থিতি, (গ) উৎপত্তি (ঘ) মোহনা, (ঙ) শাখা নদী, (চ) উপনদী, (২) অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থা, (৩) স্বাস্থ্য, কৃষি ও বাণিজ্যের সহিত সম্বন্ধ, (৪) সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ও উপায়। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রতিযোগীকে রৌপ্য পদক পুরস্কার দেওয়া হইবে।

রচনা নিজ নিজ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের মারফৎ আগামী ৩১শে মার্চ্চের মধ্যে ১১বি তাঁতিবাগান রোডে সমিতির সম্পাদক মৌলবী ওয়াহেদ হোসেন সাহেবের নিকট পাঠাইতে হইবে।

নদীয়া জেলার মুসলমান অধিবাসীদের মধ্যেও একটি রচনা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ও তজ্জন্য একটি রৌপ্য পদক ঘোষণা করা হইয়াছে। রচনার বিষয়ঃ—"বাঙলার ব্যবসায়ে বাঙালী মুসলমানের স্থান"। রচনা আগামী ৩১শে মার্চ্চের মধ্যে সম্পাদক সাহেবের নিকট উপরের ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

আবৃত্তি, রচনা ও সংগীত প্রতিযোগিতা
(সাহিত্য মন্দির, চুঁচুড়া)

আগামী ৯ই এপ্রিল, ১৯৩৯, রবিবার, চুঁচুড়া দত্তগলিস্থ "বড়াল ভবনে" সাহিত্য মন্দিরের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে রচনা, আবৃত্তি এবং বাঙলা আধুনিক সংগীত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হইয়াছে। ইহাতে প্রতি-যোগিগণ যোগদান করিতে পারিবেন। নিখিল বংগীয় মহিলা, পুরুষ এবং হুগলী জেলার স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রতিযোগিতার বিষয় পৃথক পৃথক ভাবে করা হইয়াছে। অন্যান্য বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় এক আনার ডাক টিকিট সহ আবেদন করুন।

শ্রীবিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, যুগ্ম-সম্পাদক, মাধবীতলা, চুঁচুড়া অথবা শ্রীনিরাপদ চক্রবর্ত্তী, যুগ্ম-সম্পাদক, দত্তগলি, চুঁচুড়া।

"শরৎ-স্মৃতি প্রতিযোগিতার ফলাফল"

গত ১৭ই ডিসেম্বর যে গল্প প্রতিযোগিতায় ছাত্র-ছাত্রীদিগকে আহ্বান করা হইয়াছিল, তাহাতে (১) শ্রীমণীন্দ্রনাথ সিংহ, C/o বি এন সিংহ, ৪৭।১ বসুপাড়া লেন, বাগবাজার, কলিকাতা এবং (২) শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দত্ত মৌলিক, C/o এন জি দত্ত, মাণিকদহ, ফরিদপুর, যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। – শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার ঘোষ, শ্রীসুশীলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

"জয়যাত্রা" পত্রিকার প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ফলাফল

হাওড়া সংঘ পাঠাগার, ছাত্রবিভাগ পরিচালিত "জয়যাত্রা" পত্রিকার উদ্যোগে "জাতীয় জীবনে সাহিত্যের প্রভাব" সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হইয়াছিল তাহাতে ময়মনসিংহ উচ্চ ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী শ্রীমতী অরুণা মহলানবীশ প্রথম ও হাওড়া আই আর বেলিলিয়স ইন্‌ষ্টিটিউশনের ছাত্র শ্রীমান পঞ্চানন দে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন

শ্রীপরিতোষ বসু, সম্পাদক, "জয়যাত্রা"।

সম্মিলিত ব্যায়াম উৎসাহদানকারী প্রতিষ্ঠান

বাঙলার বালক-বালিকা, যুবক-যুবতীগণ সম্মিলিত ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শন করিবার উৎসাহ যাহাতে লাভ করেন তাহার জন্য হাওড়া ও কলিকাতায় দুইটি প্রতিষ্ঠান প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রতিযোগিতার কথা প্রকাশিত হইলে তাঁহারা কয়েকটি বালিকা প্রতিষ্ঠান হইতেও আবেদন-পত্র পান। উৎসাহ দান করিবার জন্য এই প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী প্রত্যেক দলকে তাঁহারা পুরস্কৃত করেন। এই বৎসর সেইজন্যই তাঁহাদিগকে বালিকাদের জন্য ভিন্ন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। গত বৎসরের বালক ও যুবকদের প্রতিযোগিতায় বহুসংখ্যক দল যোগদান না করিলেও উৎসাহ ও উদ্দীপনার কোনরূপ অভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। এই বৎসর এই প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী দলের সংখ্যা যে বৃদ্ধি পাইবে, ইহা গত বৎসরের অনুষ্ঠান হইতেই বুঝিতে পারা গিয়াছে।

এই বৎসর জানুয়ারী মাসে কলিকাতায় গণপতি মেমোরিয়াল এসোসিয়েশন নামক একটি প্রতিষ্ঠান সম্মিলিত খালিহাতে ব্যায়াম প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সিনিয়ার ও জুনিয়ার দুই বিভাগের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ছিল। ১৫ বৎসরের নিম্নবয়স্কদের জুনিয়ার বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে দেওয়া হয়। প্রতি দলে ২০ জনের অধিক সভ্য যোগদান করিবার নির্দেশ ছিল। প্রতি দলকে ২০ মিনিট সময়ের মধ্যে নিজ ব্যায়াম শিক্ষকের পরিচালনায় খালিহাতে ব্যায়ামের বিভিন্ন কৌশল প্রদর্শন করিতে হয়। আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শনের মাপকাঠিতে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের ব্যায়াম কৌশল বিচার করিয়া প্রতিযোগিতার ফলাফল নির্ণয় করা হয়। সরস্বতী পূজার দিন এই প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হওয়ায় বহুসংখ্যক ক্লাব, স্কুল ও কলেজ দল যোগদানের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যোগদান করিতে পারে না। যে কয়েকটি ক্লাব ও স্কুল যোগদান করিয়াছিল তাহা হইতেই সম্মিলিতভাবে ব্যায়াম শিক্ষার ব্যবস্থা যে হইতেছে তাহার প্রমাণ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। সিটি কলেজ স্কুল জুনিয়ার বিভাগে ও হাওড়ার সাধনা সমিতি সিনিয়ার বিভাগে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক পয়েন্ট লাভ করায় গণপতি মেমোরিয়াল শীল্ড লাভ করিয়াছে। আগামী বৎসরে এই প্রতিষ্ঠান বালিকা ও যুবতীগণের জন্য প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। সম্মিলিত ব্যায়ামে উৎসাহদানকারী এইরূপ প্রতিষ্ঠান আরও যে গঠিত হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে?

গণপতি মেমোরিয়াল এসোসিয়েশন পরিচালিত সম্মিলিত খালিহাতে ব্যায়াম প্রতিযোগিতায় শীল্ড প্রাপ্ত সিটি কলেজ স্কুল ও হাওড়া সাধনা সমিতির ভাগণ। মধ্যস্থলে উপবিষ্ট অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

সম্মিলিত ব্যায়াম ব্যবস্থা

সম্মিলিতভাবে ব্যায়াম-কৌশল প্রদর্শনের উৎসাহ বাঙলা দেশে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। গত কয়েক বৎসর হইতে হাওড়া ফেডারেশন অব এসোসিয়েশন পহেলা বৈশাখে যে বিরাট সম্মিলিত ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছে ইহা যে তাহারই ফলস্বরূপ, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। গত দুই বৎসর হইতে হাওড়ার এই ব্যবস্থায় যোগদানকারী বালক ও যুবকগণের সংখ্যা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত বৎসর প্রায় তিন সহস্র বালক ও যুবক এই প্রদর্শনীতে যোগদান করিয়াছিল। পরিচালকবর্গের অক্লান্ত পরিশ্রম ও শিক্ষার সুব্যবস্থার জন্য গত বৎসরের অনুষ্ঠানে ব্যায়ামকারিগণ নিখুঁতভাবে খালিহাতে ব্যায়ামের কৌশলাদি প্রদর্শন করেন। এই বৎসরে এই অনুষ্ঠানে আরও অধিকসংখ্যক ব্যায়ামকারী যাহাতে যোগদান করেন ও বিজ্ঞানসম্মত খালিহাতে ব্যায়ামের নব নব আবিষ্কৃত কৌশলাদি প্রদর্শিত হয়, তাহার জন্য পরিচালকগণ এখন হইতেই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছেন।

গত দুই বৎসর হইতে মধ্য কলিকাতা ও উত্তর কলিকাতার কয়েকটি প্রতিষ্ঠান এই দিকে মনোনিবেশ করিয়াছেন। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানও হাওড়ার ন্যায় পহেলা বৈশাখে সম্মিলিতভাবে ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিতেছেন। এই সমস্ত অনুষ্ঠানে হাওড়ার ন্যায় সহস্র সহস্র বালক ও যুবকগণকে যোগদান করিতে না দেখা গেলেও অদূরভবিষ্যতে যে দেখে যাইবে তাহার আভাষ এই সমস্ত অনুষ্ঠানের পরিচালকগণের কার্যকলাপ হইতেই পাওয়া যাইতেছে। দক্ষিণ কলিকাতার কতিপয় প্রতিষ্ঠানের উৎসাহী কর্ম্মীর প্রচেষ্টায় গত বৎসর দেশপ্রিয় পার্কে পহেলা বৈশাখ কয়েক শত বালক, যুবক ও বালিকাকে সম্মিলিতভাবে ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শন করিতে দেখা গিয়াছে। এই অনুষ্ঠানের পরিচালকগণ হাওড়ার ন্যায় ফেডারেশন বা সঙ্ঘ গঠন করিয়া কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন। ইঁহাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখিয়া অনুমান হয় যে, দুই এক বৎসরের মধ্যে ইঁহারা হাওড়ার ন্যায় অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

কলিকাতা কর্পোরেশনের ব্যবস্থা

কলিকাতা কর্পোরেশনের শিক্ষা বিভাগের ব্যায়ামশিক্ষক শ্রীযুত বলাইদাস চট্টোপাধ্যায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণকে লইয়া এইরূপ সম্মিলিত ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শনীর ব্যবস্থা দুই তিন বৎসর করিয়াছিলেন। শিক্ষা বিভাগের কর্ম্মকর্তাদের উৎসাহের অভাবে এই অনুষ্ঠান গত দুই বৎসর বন্ধ ছিল। এই বৎসর উক্ত শিক্ষা বিভাগের সুযোগ্য সচিব ডাঃ এস রায়ের উৎসাহে শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায় পুনরায় বিপুল উৎসাহে বিরাট সম্মিলিত ব্যায়াম-কৌশল প্রদর্শনীর ব্যবস্থায় লাগিয়া গিয়াছেন। গত দুই মাস যাবৎ তিনি বিভিন্ন বালকদের স্কুলে প্রদর্শনীর জন্য কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ব্যায়াম কৌশল শিক্ষা দিতেছেন। দুই সহস্রের অধিক বালকগণকে লইয়া শ্রীযুত বলাইদাস চট্টোপাধ্যায় ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শন করিবেন। কলিকাতা ময়দানে [illegible] হইতে কয়েক শত ছাত্রীকে লইয়া সম্মিলিত ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শন করিবার ভার উক্ত শিক্ষা বিভাগের ব্যায়াম বিষয়ে অভিজ্ঞা শি[illegible] শ্রীযুক্তা সরলা চক্রবর্ত্তীর উপর দেওয়া হইয়াছে। বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রীগণকে নির্দ্দিষ্ট ব্যায়াম-কৌশলাদি দিতেছেন। এই অনুষ্ঠান মার্চ্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে বলিয়া শোনা যাইতেছে। কর্পোরেশেন প্রাথমিক বিভাগের এই অনুষ্ঠানের ফলস্বরূপ কলিকাতার বিভিন্ন ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীগণের মধ্যেও এইরূপ সম্মি[illegible] ব্যায়ামের সাড়া যে দেখা দিবে, ইহা আমরা নিঃসন্দেহে ব[illegible] পারি।

হুজুগ অথবা আতঙ্ক

ডাঃ ডি এন মুখার্জ্জী

হুজুগ অথবা আতঙ্ক—কোনটাই সমর্থনযোগ্য ব্যায়াম-চর্চ্চার বেলা, কারণ উভয় ক্ষেত্রেই পরিণাম বিষ[illegible] ব্যায়াম-চর্চ্চার প্রতি অত্যধিক প্রলোভন, অনেক নরনা[illegible] স্বাস্থ্যকে প্রবল দোলা দিয়াছে অসংগত ক্লান্তি আনয়ন করি[illegible] কোনও ব্যায়ামিকের স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্য দেখিয়া ত[illegible] আচরণের অনুকরণ শুধু নিরর্থক নয় হানিকরও। আ[illegible] ব্যায়ামের প্রতি অশ্রদ্ধা, যেটুকু শরীর চালনা দ্বারা দেহ পটু রাখা যায়, তাহার প্রতি উদাসীনতা অহেতুক আতঙ্কে দরুন—এমন দৃষ্টান্তও এদেশে বিরল নয়। উভয় মনো[illegible] বৃত্তিই দোষাবহ, কারণ ব্যায়ামের ব্যাপারে সকল প্রকার দে[illegible] গঠনের উপযোগী একই সাধারণ পদ্ধতি কোন দিন নির্দ্ধার[illegible] যোগ্য হইতে পারে না। প্রত্যেক নরনারীর বিশেষত্ব, তাহ[illegible] জীবনধারা—সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া তবে ব্যায়ামে[illegible] প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিৎ। আবার শরীরের সকল যন্ত্রকে যথাবিহিত কার্য্য করিতে না দেওয়া—কতকগুলি যন্ত্রকে ক্রমাগত ক্রিয়ারত রাখিয়া বাকি যন্ত্রগুলিকে নিষ্ক্রি[illegible] রাখা স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর নয়—গঠনের উদ্দেশ্যও তাহ[illegible] নয়।

পঞ্চান্ন বৎসর বয়সের একটি কেরাণী একদিন উপস্থিত হইল—উপসর্গ তাহার ক্ষিপ্রকারিতা কমিয়া যাইতেছে ক্রমশ। তাহার মনের কোণে প্রবল প্রলোভন—কোন প্রকার ব্যায়াম, বারবেল, ডন, বৈঠকী, অন্ততঃ আর কিছু না হউক মাঠে ছুটোছুটি তাহাকে নিতান্তই তরুণে পরিণত করিবে। তাহার 'হার্ট' পরীক্ষা করার কথা হইল। কারণ এই সকল ক্ষেত্রে হার্ট এবং শারীর গঠন-গত পরীক্ষা যেমন প্রয়োজন, তাহার অন্যান্য উপসর্গের প্রতিও তেমনই মনোযোগ দেওয়া দরকার, তাহার পূর্ব্বে ব্যায়ামের সিদ্ধান্ত কিছুতেই অনুমোদন করা যায় না। কিন্তু সে ব্যক্তি পরীক্ষায় একেবারে নারাজ। বলে—আমার কোন রোগ নাই, বেশ আছি, কেবল দরকার একটু শ্রম।

যাহা হউক হার্ট পরীক্ষা করা হইল। প্রশ্নে জানা গেল, জীবনে কোনদিন কোন প্রকার ব্যায়াম করে নাই, সেই নেহাৎ ছেলেবেলার খেলা ছাড়া। তাহার উপর রাত্রিতে ঘুম হয় অতি কম। শুইবার পর হৃৎপিণ্ড এমন ঢিব ঢিব করিতে থাকে যে, তাহার ভয় হয় পাছে শরীর [illegible] জাগিয়া উঠিবে ঐ শব্দে। আরও কতক্ষণ পরীক্ষা ও প্রশ্নের পর নিশ্চিত হওয়া গেল—

ব্যক্তির গ্লানি স্নায়ুতে (nerves)। প্রত্যহ স্নান এবং ... ও সন্ধ্যায় মাথা ধোয়ান—সর্ব্বশরীরে মার্জ্জনা (massage) এবং ব্যায়ামের ভিতর প্রত্যহ দুই তিন মাইল ... বা পনর কুড়ি মিনিট সাঁতার কাটা ব্যবস্থা দেওয়া হইল। ... সপ্তাহে ঐ ব্যক্তি অনেকটা সারিয়া উঠিল। সাঁতার ... না—তাই এখনও প্রাতে ২ মাইল ও সন্ধ্যায় ২ মাইল হাঁটিবার সে অভ্যাস করিয়া লইয়াছে। ইহা অপেক্ষা ...দের ব্যায়ামে তাহার উপকার হইত না—ক্রমে ক্রমে 'হার্ট' ...ল হইয়া অপটু হইয়া পড়িত।

আর একদিন ৩৬ বৎসর বয়সের এক ব্যক্তি উপস্থিত হইল। ...-জীবনে রীতিমত ব্যায়াম করিয়াছে। ব্যায়ামবীরের ...তিগত যে হৃদযন্ত্রের বিশিষ্ট শব্দ—তাহা বেশ সুস্পষ্ট। ...চায় পুনরায় ফুটবল খেলিয়া, মুগুর ভাঁজিয়া স্বাস্থ্যের ...দূর করিতে। কিন্তু হার্ট পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল, ...ধিক ব্যায়াম-চর্চ্চার ফলে এখনই তাহার হৃদযন্ত্র কর্ম্ম-...; বৈজ্ঞানিক ভাষায় heart lesion বা অতিরিক্ত ...য়ায় আহত হৃদযন্ত্র। কাজেই ব্যবস্থা হইল—ব্যায়াম বন্ধ থাকিবে; জীবনে আর কখনও কঠোর শ্রমের কাজও করিতে পারিবে না। আপাতত কিছুদিন চাই বিশ্রাম। সে ব্যবস্থায়ই তাহার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতেছে।

যুবকদিগের ভিতর অতি শীঘ্র হাত, পা, বক্ষ প্রভৃতির মাংসপেশী বিপুল আকার করিয়া সকলকে স্তম্ভিত করিবার একটা প্রয়াস মাঝে মাঝে দেখা যায়। চারিদিকে ব্যায়ামবীরগণের ছবির ছড়াছড়ি দেখিয়া কোথাও কোথাও বাইসেপস্' মাংসপেশীর পরিমাপ মুদ্রিত দেখিয়া আপন দেহের সহিত তুলনার প্রবৃত্তি যুবকদের হওয়া স্বাভাবিক। এবং পার্থক্য বিপুল দেখিয়া যাহাতে অতি শীঘ্র কাছাকাছি পৌঁছান যায়, তাহার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগা কিছুতেই অস্বাভাবিক নয়। সেই বয়সে অতিরিক্ত energy খেলা-ধুলা, ছুটোপাটিতে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া যায়; কিন্তু মাংসপেশী ...জোর মোহ অধিক বয়সেও দূর হয় না, বরং অটুট রাখিবার ঝোঁক একেবারে ব্যক্তিকে পাইয়া বসে; কিন্তু তখন আর খেলা-ধুলা ছুটোপাটির সুযোগ থাকে না। সুযোগ থাকিলেও তাহাতে ক্ষিপ্রকারিতার অভাব বলিয়া নিজেরই উৎসাহ থাকে না। এই সময়ে শরীরের যে অনিষ্ট হয়, তাহা আর বাকি জীবনে শুধরাইবার উপায় থকে না। মাংসপেশী স্থূল ও দৃঢ় করিবার বাড়াবাড়িতে যুবকবয়সে হার্টে যে সামান্য গ্লানি আসিয়াছিল, তাহা হয়ত পরিণত বয়সের বিরামে আরোগ্য হইত; কিন্তু পরিণত বয়সের ব্যায়ামে সে গ্লানি বাড়াইয়া দিল। অতিরিক্ত ব্যায়াম চর্চ্চা তাই পূর্ব্বোক্ত ৩৬ বৎসর বয়সী লোকটিকে যে গ্লানিযুক্ত করিয়াছে, তাহার কবল হইতে তাহার ... মুক্তি নাই।

শুধু মাংসপেশী স্থূল করিতে অভিলাষী যুবকদের ...কেই দায়ী করিলে চলিবে না। ব্যায়াম ... নির্ম্মাতা ...বং ব্যায়াম চর্চ্চার প্রণালী উদ্ভাবকগণও এই অবস্থার জন্য ...ম দায়ী নহেন। দেশবিখ্যাত কুস্তিগীর, কি ব্যায়াম-বিশারদ ...তির সাফল্যের অতিরঞ্জিত ও চোখ ... প্রচারকার্য্য দ্বারা যুবকদের মোহগ্রস্ত ও আকৃষ্ট করা ব্যায়াম ... বিক্রেতাদের

এক প্রশস্ত পন্থা। আগেই বলিয়াছি সাধারণ একটা পদ্ধতি সকলের জন্য কার্য্যকরী করা সম্ভব নয়—কার্য্যকরী করিতে হইলেও উহার মাত্রার নিয়ন্ত্রণ আর এক অসম্ভব ব্যাপার প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে। সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ শক্তিসম্পন্ন অভিজ্ঞ ব্যায়ামবিদ ভিন্ন এই নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়—সংগত নয়—সুপ্রযোজ্যও নয়। এমন অবস্থায় প্রলোভনে পড়িয়া নবীন শিক্ষার্থী অতি অল্প সময়ে বিশিষ্টতা অর্জ্জন করিতে বিজ্ঞাপনের চাটুকারিতায় হাতে স্বর্গ পায়। আর একবার সূত্রপাত করিয়া অভীষ্ট লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত সুস্থ শরীরকে এমনই কঠোর মাত্রাতীত, সীমাতীত ব্যায়ামে নিয়োগ করে যে, আভ্যন্তরিক যন্ত্রগুলির অতিরিক্ত ক্রিয়ায় একটা অস্বাভাবিক পরিণতি লাভ হয়। ফলে বহুপ্রকার গ্লানি উপস্থিত হয়। উহার প্রতিকারের জন্য ব্যায়ামবিদ বা সরঞ্জাম বিক্রেতাদের স্বারস্থ হইলে আবার 'মাসেজ পুঁথি' একখানি কিনিয়া ক্রয় করিতে হয়। সেই ব্যবস্থা মত গরম জলে স্নান, বাষ্প সহায়ে স্নান, সুরাসার মর্দ্দন, মাংসপেশী মর্দ্দন প্রভৃতি ব্যবস্থা—সাময়িক আরাম প্রদান করিলেও মূল গ্লানির দূরী-করণে সাহায্য করে না কিছুমাত্র।

ভারত হঠযোগের দেশ। হঠযোগের দ্বারা অমানুষিক শক্তি লাভ এই দেশে একদিন রেওয়াজ ছিল। আজও অনেকে হঠযোগের পক্ষপাতী, কিন্তু প্রতিবন্ধক এই যে, বিভিন্ন দেহ গঠনের উপযোগী বিভিন্ন ক্রিয়ার নির্দ্দেশ দিবার উপযুক্ত উপদেষ্টার অভাব পদে পদে। এইজন্য হঠযোগ আতঙ্কের সহিত উপেক্ষিত। ব্যায়াম চর্চ্চার বেলাও সেই কথা বলা চলে অনেকটা। কারণ ব্যায়ামের উন্নতি নির্ভর করে শ্বাসের সঙ্গে ব্যায়াম-ক্রিয়ার যোগ নিয়ন্ত্রণে, ইহাতে ত্রুটি-বিচ্যুতি হইলে হঠযোগেরই ন্যায় বিষময় ফল উৎপন্ন করিবে।

সুতরাং ভারতের শাশ্বত প্রথানুযায়ী সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন গুরু—অর্থাৎ অভিজ্ঞ সতর্ক উপদেষ্টা, যে নির্ব্বাচন করিয়া দিতে পারিবে—কোন ব্যায়াম কাহার (যুবক) উপযোগী। ব্যায়ামের মাত্রা—শ্বাস-নিয়ন্ত্রণ—তাহার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া দিনের পর দিন ত্রুটি-বিচ্যুতি হইতে ব্যায়াম শিক্ষার্থীকে উপযুক্ত পথে চালিত করিবার অধিকারী একমাত্র সহানুভূতি-প্রবণ উপদেষ্টা।

ইহার পর খাদ্য। যেহেতু ব্যায়াম করিতেছি, সুতরাং সে রাক্ষসের মত খাইবে—এ নিয়ম আত্মঘাতী। এ বিষয়ে আমাদের দেশীয় কিম্বদন্তী গুরুত্বপূর্ণ—"আহার-নিদ্রা-ভয় বাড়ালেই হয়।" মুস্কিল হইতেছে এই যে, অধিকাংশ লোকেরই যথেষ্ট দৃঢ়তা বা ইচ্ছাশক্তি নাই আতিশয্য বর্জ্জন করিবার। এই যে সংযম—সর্ব্ব ব্যাপারেই ইহা প্রযোজ্য। ব্যায়ামে, আহারে এবং দৈনন্দিন সর্ব্বকার্য্যে সংযমের মত উৎকৃষ্ট চিকিৎসক আমাদের আর নাই। মধ্যপন্থা সকল বিষয়েই ...—এই লক্ষ্য রাখাই প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে যে নিপুণ লোক, তাহার এই সৎসাহস থাকা প্রয়োজন, এই দৃঢ়তা থাকা দরকার যে, সে বুদ্ধিমানের জীবন যাপন করিবে—প্রলোভনকে ... দাস হইবে না—... সৃষ্টি আমন্ত্রণ করিতে না দেবে।

নিউ থিয়েটার্সের হিন্দী ছবি 'দুষমন' তোলা শেষ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নীতীন বসু এই ছবিখানি তোলা শেষ করিয়াই—গত সপ্তাহে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার পরের ছবি যে কবে আরম্ভ হইবে তাহা এখনও স্থির হয় নাই।

২১শে তারিখে 'দুষমন' ছবিখানি দিল্লীর রিগ্যাল থিয়েটারে আরম্ভ হইবে।

অপরাজেয় কথাশিল্পী স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বিখ্যাত উপন্যাস 'বড়দিদি' অবলম্বনে শ্রীযুত অমর মল্লিক মহাশয় যে ছবি তুলিতেছেন তাহা শেষ হইয়াছে। বাঙলা ও হিন্দী উভয় সংস্করণেই ছবি তোলা হইয়াছে।

শ্রীযুত ফণী মজুমদারের হিন্দী ছবি 'কপালকুণ্ডলা'র কাজ বেশ ভালই চলিতেছে। নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় নাজাম, লীলা দেশাই অভিনয় করিতেছেন। সংগীত পরিচালনা করিতেছেন পঙ্কজ মল্লিক।

শ্রীযুত দেবকীকুমার বসুর পরিচালনায় 'সাপুড়ে' ছবির কাজ বেশ দ্রুতগতিতে চলিতেছে।

* * *

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীঃ—রায় বাহাদুর মতিলাল চামারিয়া পাঞ্জাবী ভাষায় কয়েকখানি ছবি তোলার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রথম ছবিখানি পরিচালনার ভার দেওয়া হইয়াছে মিঃ রাজহংসের উপর। শ্রীযুত প্রবোধ দাস এই ছবির চিত্র গ্রহণ করিবেন।

শ্রীযুত হরি ভঞ্জের 'যখের ধন' ছবির কাজ বেশ ভালভাবেই চলিতেছে। এই মাসের শেষে ছবিখানি তোলা শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই ছবিখানি শেষ হইলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানী অন্যান্য বাঙলা ছবি তোলার কাজে হাত দিবেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ার সেটে সম্প্রতি একখানি তেলেগু ছবির কাজ চলিতেছে।

* * * * *

শ্রীযুত প্রফুল্ল রায়ের পরিচালনায় শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের "পরশমণি" ছবির কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। শ্রীযুত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাণীবালা, জ্যোৎস্না, বীণা বাগচী, দেববালা, রাজলক্ষ্মী, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, সত্য মুখার্জ্জি, তুলসী লাহিড়ী, সন্তোষ সিংহ, রবি রায়, কৃষ্ণধন বিশ্বনাথ মিত্র প্রভৃতি এই ছবিতে অভিনয় করিয়াে

'পরশমণি' ছবি তোলা শেষ হইলেই শ্রীভা পিকচার্স আর একখানি বাংগলা ছবির কাজে হাত

নিউথিয়েটার্সের সাপুড়ে চিত্রে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য ও কাননবালা। শ্রীযুত দেবকীকুমা বসু পরিচালনা করিতেছেন

শ্রীযুত কালীপ্রসাদ ঘোষ এই ছবিখানি পরিচালনা করি

* * * * *

শ্রীযুত সুশীল মজুমদারের পরিচালনায় ফিল্ম ক রেশন অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড "রিক্তা" নামে একখানি ব ছবি তুলিতেছেন। ছায়া, তুলসী লাহিড়ী, রতীন ব পাধ্যায়, মোহন ঘোষাল, দেববালা, রাজলক্ষ্মী, রমলা, স মজুমদার, অহীন্দ্র চৌধুরী, সন্তোষ সিংহ, কানু ব পাধ্যায়, যমুনা, পারুল, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, শৈলবালা, মুখার্জ্জি, কার্ত্তিক রায় প্রভৃতি এই ছবিতে অ করিতেছেন।

বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সম্মেলনের ফরিদপুর অধিবেশনে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তৎপ্রতি আমরা বাঙলা দেশের চলচ্চিত্র শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট সকলের এবং জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। কারণ আমরা মনে করি, গৃহীত প্রস্তাবগুলিকে কার্যে পরিণত করিতে হইলে জনসাধারণের সহানুভূতি ও সমর্থন সর্বপ্রথম আবশ্যক।

বাঙলা সরকার এবং ভারত সরকার আজও পর্যন্ত আমাদের দেশের চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নতির জন্য বিশেষ কিছু করেন নাই। অথচ এই শিল্প মোট ১৪ কোটি টাকার উপর মূলধন নিয়োজিত আছে এবং ৩০ হাজারের উপর লোকের অন্নসংস্থান এই শিল্প-ব্যবসা হইতে হইতেছে। চলতি পড়ি ভারত গবর্ণমেণ্ট শুল্কের হার যেটুকু কমাইয়াছেন তাহা এত বড় একটি শিল্পের পক্ষে নিতান্তই তুচ্ছ। আরও একটি বড় কথা এই যে, চাপে না পড়িলে আমাদের দেশের যাহা কিছু তাহার উপরেই সরকার চিরকাল একটা উদাসীনতার ভাব ও উপেক্ষার ভাব পোষণ করিবেন। এ সম্বন্ধে যদি জনমত জাগ্রত হয় এবং দাবী করে, তাহা হইলে কিছু হইবার আশা আছে।

যে সমস্ত বিদেশী কোম্পানী ভারতের অবমাননাকর ছবি তোলে সেগুলির ভারতে প্রদর্শনী বন্ধ করার জন্য সরকারের দিক হইতে কোন আগ্রহ সচরাচর দেখা যায় না। ইহার কারণ যে কি তাহা সকলেই জানেন। যেখানে জনমত তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছে সেখানে কয়েক ক্ষেত্রে সরকার চাপে পড়িয়া ছবি প্রদর্শনের অনুমতি দেওয়ার পরে তাহা বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। যদি সরকার এই ধরণের ছবি এখানে প্রদর্শনের অনুমতি দেন তবে দেশবাসীর, চিত্র-প্রদর্শক এবং চিত্র-পরিবেষকগণের কর্তব্য হইবে সেই সমস্ত ছবি বয়কট করা।

নিউথিয়েটার্সের 'বড়দিদি' চিত্রে শ্রীমতী চন্দ্রা। শ্রীযুত অমর মল্লিক পরিচালনা করিতেছেন

সাপ্তাহিক সংবাদ

৭ই ফেব্রুয়ারী—

কংগ্রেস সভাপতি নির্ব্বাচন লইয়া যে, পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তৎসম্পর্কে কলিকাতায় ১নং উডবার্ণ পার্কে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ও তাঁহার সমর্থকদের মধ্যে ঘরোয়া আলোচনা হয়। সভাপতি নির্ব্বাচনে শ্রীযুক্ত বসুর পক্ষে যাঁহারা ভোট দিয়াছিলেন, বিভিন্ন প্রদেশের সেই সকল প্রতিনিধি এবং স্থানীয় কংগ্রেস কর্ম্মীরা এই ঘরোয়া আলোচনায় সমবেত হইয়া ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা সম্পর্কে পরস্পর মত বিনিময় করেন।

কেন্দ্রীয় পরিষদে তিনটি মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল। বড়লাট তিনটি প্রস্তাবই না-মঞ্জুর করিয়াছেন। একটি প্রস্তাবে বিদেশীদের সামরিক শিক্ষার বাবত যে ব্যয় হয়, তাহার প্রতিবাদ করা হয়। দ্বিতীয় প্রস্তাবে চ্যাটফিল্ড কমিটির সুপারিশ পরিষদে আলোচনা করিতে দেওয়া হইবে না, গবর্ণমেন্টের এই সিদ্ধান্তের নিন্দা করা হয়। তৃতীয় প্রস্তাবে প্যালেষ্টাইন বৈঠকে ভারতীয় প্রতিনিধি গ্রহণ না করার প্রতিবাদ করা হয়।

নৌ-বাহিনী সম্পর্কিত বিলটি কেন্দ্রীয় পরিষদে ৫৬-৩৬ ভোটে অগ্রাহ্য হইয়াছে। এক শ্বেতাঙ্গ দলের সদস্যগণ ব্যতীত পরিষদের সমুদয় নির্ব্বাচিত সদস্যই একবাক্যে এই বিলের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছেন।

টিটাগড়ের চটকলের শ্রমিকদিগকে দাঙ্গায় প্ররোচিত করিবার অভিযোগে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট ডাঃ প্রভাবতী দাশগুপ্তার বিরুদ্ধে চার্জ্জ গঠন করিয়াছেন।

রাইপুর কৃষক প্রজা সমিতির দণ্ডিত সদস্য লালমোহন মণ্ডল প্রভৃতি ২০ জন আসামী তাহাদের দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করিয়াছিল। বিচারপতি মিঃ রাও মামলার পুনর্ব্বিচারের আদেশ দিয়াছেন।

দেশীয় রাজ্যের সমস্যা দ্রুতগতিতে নিখিল ভারতীয় সমস্যায় পরিণত হইতে চলিয়াছে। গান্ধীজীর নিকট এখন রাজকোট এবং জয়পুর এই দুইটি সমস্যাই সমান গুরুত্ব পাইয়াছে। গত শনিবার তিনি বড়লাটের নিকট যে আবেদন জানাইয়াছেন, দিল্লীতে তাহার কি প্রতিক্রিয়া হয়, গান্ধীজী আগ্রহ সহকারে তাহা লক্ষ্য করিতেছেন। যদি দিল্লী হইতে সহানুভূতিসূচক কোন ইঙ্গিত না আসে, তবে তিনি ভারত গবর্ণমেন্টের নিকট চরমপত্র পাঠাইয়া জানাইয়া দিবেন যে, তিনি সত্যাগ্রহ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবেন। গান্ধীজী এখনও তাঁহার কর্ম্মসূচী প্রস্তুত করেন নাই; কেননা তিনি আশা করিতেছেন যে, শেষ পর্য্যন্ত গবর্ণমেন্টের চৈতন্য হইবে এবং তাঁহারা বিরোধের পথে চলিবেন না।

৮ই ফেব্রুয়ারী—

বাঙলা গবর্ণমেন্ট আরও ৮ জন রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দিয়াছেন। ইহাদের নাম—(১) শ্রীউমাশঙ্কর কোঙার, (২) শ্রীনারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস, (৩) শ্রীপ্রভাতকুসুম ঘোষ, (৪) শ্রীউষারঞ্জন দে, (৫) শ্রীচিন্তাহরণ দাস, (৬) শ্রীসুধীররঞ্জন রায়, (৭) শ্রীদেবপ্রসাদ ব্যানার্জ্জি, (৮) শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দেব-বর্ম্মন।

[illegible] মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধন

বিলের তীব্র নিন্দা করিয়া কলিকাতা কর্পোরেশনের [illegible] মিঃ এ কে এম জ্যাকেরিয়া বিবৃতি দিয়াছেন।

গত ১২ই নভেম্বর তারিখে দৈনিক "বসুমতী"তে [illegible] ও [illegible] শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসম্পর্কে বসুমতীর সম্পাদক [illegible] হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীযুত [illegible]ভূষণ দত্তের বিরুদ্ধে চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ অ[illegible] চার্জ্জ গঠন করিয়াছেন।

দৈনিক বসুমতীর সম্পাদক ও মুদ্রাকরের বিরুদ্ধে আর একটি মামলা আছে। ১৮ই [illegible] তারিখের 'নান্যপন্থা' শীর্ষক প্রবন্ধ সম্পর্কে এই মামলা রুজু করা হইয়াছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে।

মাদ্রাজে ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া ম্যাচ ফ্যাক্টরীতে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। উহার ফলে ১০ জন গুরুতর আহত হইয়াছে এবং কারখানার ভিতর [illegible] হইয়াছে। অগ্নিকাণ্ডের কারণ জানা যায় নাই। [illegible] সম্পর্কে ১১ জনকে [illegible] করা হইয়াছে।

লণ্ডনে সেণ্ট জেমস প্রাসাদে বৃটিশ এবং ইহুদী [illegible] নিধিদের মধ্যে প্রথম প্যালেষ্টাইন বৈঠক আরম্ভ হয়। ইহুদীদের পক্ষ হইতে ডাঃ ওয়াইজম্যান প্রায় দুই ঘণ্টা বক্তৃতা করেন।

৯ই ফেব্রুয়ারী—

[illegible] আর এক দফায় ৮ জন রাজনৈতিক বন্দীকে [illegible] পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। বন্দীদের নাম শ্রী[illegible] রায়, শ্রীহরিদাস সরকার, শ্রীবীরভূষণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীকালাচাঁদ চক্রবর্ত্তী (মাখন), শ্রীজীবনময়[illegible], শ্রীশশিভূষণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীজগদীশ ঘটক এবং শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য।

জাপানীরা ক্যাণ্টন প্রদেশের আনকুও ও হোচিয়েন শহর দখল করিয়াছে বলিয়া দাবী করিতেছে। চীন যুদ্ধের আরম্ভ হইতে এ পর্যন্ত ঐ দুইটি শহর চীনাদের হাতে ছিল এবং জাপানীরা ঐ দুইটি দখলের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিল। জেনারেল [illegible] যুদ্ধ পরিচালনা করিতেছেন এবং তিয়েন-সিন-পুক রেলওয়ে ধরিয়া জাপানীরা অগ্রসর হইতেছে।

শ্রীযুক্তা বিমলপ্রতিভা দেবীর 'নূতন দিনের আলো' নামে একখানি পুস্তক বাঙলা সরকার সম্প্রতি বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। এই সম্পর্কে কলিকাতা পুলিশ শ্রীমতী বিমল-প্রতিভা দেবী ও উক্ত পুস্তকের প্রকাশক শ্রীযুক্তা কল্যাণী ভট্টাচার্য্যের বাড়ী ও অন্যান্য বহু স্থানে খানাতল্লাসী করিয়াছে।

ভূতপূর্ব্ব রাজবন্দী শ্রীযুত রেবতী বর্ম্মন মহাশয়ের ২নং ডাক্তার জগদ্বন্ধু লেনস্থিত বাসায় খানাতল্লাসী হয়। পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করে। তল্লাসীর কারণ অজ্ঞাত।

প্যালেষ্টাইন বৈঠকে আরব প্রতিনিধিদের যে দুইটি দলের মধ্যে মতানৈক্য হইয়াছিল, তাহার একটা আপোষ-রফা হইয়াছে। এই দুইটি প্রতিনিধি দল একটি প্রতিনিধি-দল হিসাবে বৈঠকের আলোচনায় যোগ দিবেন। [illegible] নাশাশিবি নাশাশিবি দলের এবং ইয়াকুব ফররাজ আরব

। পার্টির পক্ষ হইতে প্রতিনিধিস্বরূপ উপস্থিত ন।

ন্ধুর আল্লাবক্স মন্ত্রিসভায় আরও দুইজন মন্ত্রী করা হইয়াছে। ইহাদের নাম—মীর বন্দে আলি খাঁ র ও দেওয়ান দয়ালরাম দৌলতরাম। উক্ত মন্ত্রিদ্বয় ানুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন।

ন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে স্বরাষ্ট্র সচিব বলেন যে, শিবমন্দির সত্যাগ্রহ সম্পর্কে ২৪শে জানুয়ারী ১৩০ জন ধৃত হইয়াছে।

নারেল ফ্রাঙ্কোর সৈন্যদল ফরাসী সীমান্তের লেপার- পৌঁছিয়াছে এবং সেখানে বিদ্রোহীদের পতাকা উত্তোলন ছ।

 গবর্ণমেণ্ট ছাত্রদের দাবী স্বীকার করিয়া না লওয়ায় ন এক হাজার ছাত্র-ছাত্রী অনশন অবলম্বন করিয়াছে। দাবী চারিটি:—(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার পিছাইয়া দিতে হইবে, (২) দমনমূলক ব্যবস্থা র করিতে হইবে, (৩) মন্ত্রিমণ্ডলকে পদত্যাগ করিতে (৪) ছাত্রদের উপর যে লাঠিচালনা হইয়াছিল, র্কে তদন্ত করিতে হইবে এবং যে সমস্ত ছাত্র-নেতাকে করা হইয়াছে, তাহাদিগকে মুক্তি দিতে হইবে।

পনের গণতন্ত্রী গবর্ণমেণ্টের প্রেসিডেণ্ট জেনেভা প্যারিসে গমন করেন। আর যুদ্ধ চালান হইবে কি না, ন লইয়া প্রেসিডেণ্ট আজেনার সহিত মতভেদ হওয়ার গ্রিন পদত্যাগ করিবেন বলিয়া শোনা যাইতেছে।

পনের বিদ্রোহীবাহিনী ভূমধ্যসাগরস্থিত মিনর্কা অধিকার করিয়াছে বলিয়া দাবী করিতেছে।

রত সরকারের এক ইস্তাহারে প্রকাশ যে, গত কয়েক- বং সীমান্তের ওয়াজিরিস্থানে উপজাতিদের উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে। একদল মদ্দাখেল লস্কর দত্ত- নিকট কামান দাগিয়া কেল্লার উপর ১৫টি গোলাবর্ষণ দুইটি গোলা কেল্লা-প্রাচীর ভেদ করিয়া যায়। হইতে একখানি বিমান গিয়া উপজাতীয় লস্কর- াক্রমণ করে। তাহার পর হইতে লস্করদল নীরব উপজাতিরা ইতিমধ্যে কয়েকবার সৈন্যদল ও সৈন্য- । উপর চোরা গুলীবর্ষণ করিয়াছে এবং টেলিফোন াটিয়া দিয়াছে।

ন্স সভায় প্রশ্নোত্তরকালে সহকারী ভারত সচিব মুরহেড বলেন যে, হের হিটলারের আত্মজীবনী ভারতে নিষিদ্ধ হয় নাই এবং ভারত সচিব এই কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন হইবে বলিয়া ন না।

ষ্টপতি সুভাষচন্দ্র বসু চোরামে গয়া জেলা সম্মেলনের করেন।

ব্রুয়ারী—

তী মণিবেন প্যাটেলকে রাজকোট জেলে রাখা হই- শ্রীযুক্তা কস্তুরবাঈয়ের নিকট হইতে তাঁহাকে সরাইয়া াতিবাদে তিনি অনশন অবলম্বন করিয়াছেন। রাজকোটে সত্যাগ্রহ করিতে গিয়া শ্রীযুক্তা মৃদুলাবেন ও অপর তিনজন ধৃত হইয়াছেন।

কেন্দ্রীয় পরিষদে তিনটি বিতর্কমূলক বে-সরকারী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। প্রথম প্রস্তাবে, ভারতবর্ষ রাষ্ট্র- সঙ্ঘ ত্যাগ করিবে, এই মর্ম্মে নোটিশ দিতে বলা হয়। দ্বিতীয় প্রস্তাবে ব্রহ্ম-ভারত বাণিজ্য-চুক্তি সম্পর্কিত আদেশ বাতিল করিতে সুপারিশ করা হয় এবং তৃতীয় প্রস্তাবে ভারত গবর্ণমেণ্টের যে সকল কর্ম্মচারী মাসিক ২০০৲ টাকা বা তদূর্দ্ধ বেতন পান, তাঁহাদের বেতন হ্রাস করিতে বলা হয়। প্রথমটি ৫৫-৪৫ ভোটে, এবং শেষোক্ত দুইটি বিনা- ডিভিসনে গৃহীত হয়।

জাপানী সৈন্যেরা হাইনান দ্বীপে অবতরণ করিয়াছে। হাইনান চীনের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ দ্বীপ এবং এই দ্বীপ ফরাসী ইন্দোচীনের খুব নিকটে।

জাপ সমর অফিসের এক ইস্তাহারে প্রকাশ, জাপানীরা জানুয়ারী মাসে উত্তর চীনে চীনা গরিলা বাহিনীর বিরুদ্ধে যে অভিযান চালায়, তাহাতে ১৭ হাজার চীনা নিহত হইয়াছে এবং ৫ শত ৫০জন চীনা বন্দী হইয়াছে।

মাদ্রাজে একটি জার্ম্মান বিমান ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। ফলে একজন বিমানচালক ও একজন আরোহীর শোচনীয় মৃত্যু হইয়াছে। আরোহীটির নাম মিঃ শ্রীনিবাস রঙ্গম্; ইনি যুক্তরাষ্ট্র আদালতের ভাবী বিচারপতি মিঃ বরদাচোরিয়ার জামাতা।

প্রকাশ যে, বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী বাজেট অধিবেশনে বাঙ্গলার মন্ত্রিমণ্ডলী তাঁহাদের বেতন সম্পর্কে একটি নূতন বিল উত্থাপন করিবেন। ঐ বিলে মন্ত্রীদের প্রত্যেকের বেতন মাসিক এক হাজার ও ভাতা এক হাজার টাকা নির্দ্দিষ্ট হইবে অর্থাৎ প্রত্যেক মন্ত্রী বেতন ও ভাতায় দুই হাজার টাকা করিয়া পাইবেন। প্রধান মন্ত্রী ইহার অতিরিক্ত আরও পাঁচশত টাকা করিয়া বিশেষ ভাতা পাইবেন, সুতরাং তিনি বেতন ও ভাতায় আড়াই হাজার টাকা পাইবেন। বর্ত্তমানে প্রধান মন্ত্রী মাসিক তিন হাজার টাকা এবং অপরাপর মন্ত্রীরা আড়াই হাজার টাকা করিয়া বেতন পাইয়া থাকেন, কিন্তু কোন নির্দ্দিষ্ট ভাতা পান না।

ক্যাথলিক জগতের ধর্ম্মগুরু পোপ একাদশ পায়াস পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় ৮২ বৎসর হইয়াছিল।

১১ই ফেব্রুয়ারী—

জাপ সমর বিভাগের এক ইস্তাহারে প্রকাশ, জাপানীরা হাইনান এবং হইচাওর রাজধানী কিউয়াংসান অধিকার করিয়াছে। এই দ্বীপে কিউয়াংসানই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ শহর। বহু লোক হতাহত হইয়াছে।

ফরাসী গবর্ণমেণ্ট জাপ-সরকারের নিকট হাইনান দ্বীপ অধিকার করার কারণ সম্পর্কে কৈফিয়ৎ তলব করিয়াছেন।

বৃটেন হাইনান দ্বীপকে "সুদূর প্রাচ্যের মিনর্কা" আখ্যা দিয়াছে। কারণ একই সময়ে ফ্রাঙ্কোর বাহিনী কর্ত্তৃক ভূমধ্যসাগরের মিনর্কা এবং জাপান কর্ত্তৃক প্রশান্ত মহা-

সাগরের হাইনান দ্বীপ অধিকারের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ রহিয়াছে।

জাপ প্রতিনিধি দল বার্লিন যাত্রা করিতেছেন। বৃটেন ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা করিবার উদ্দেশ্যে জার্ম্মানী, ইতালী ও জাপানের মধ্যে এই মাসে শেষে বার্লিনে একটি সামরিক চুক্তি হইবে।

শ্রীযুক্তা মণিবেন প্যাটেলের দাবী অনুযায়ী তাঁহাকে শ্রীযুক্তা কস্তুর বাঈ গান্ধীর নিকট রাখা হইবে,—এই ব্যবস্থা হওয়ায় শ্রীযুক্তা মণিবেন প্যাটেল অনশন ত্যাগ করিয়াছেন। শ্রীযুক্তা গান্ধী, শ্রীযুক্তা মণিবেন প্যাটেল ও শ্রীযুক্তা মৃদুলাবেনকে রাজকোট হইতে তিন মাইল দূরবর্ত্তী ত্রাগিয়াদা প্রাসাদে রাখা হইয়াছে।

রাজকোটের ৩৩তম ডিক্টেটর শ্রীযুক্তা ঠারো ভাই গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। রাজকোট দরবার বহু সংখ্যক নূতন পুলিশ সংগ্রহ করিয়াছেন।

শেঠ যমুনালাল বাজাজকে প্রথমে জয়পুরে গ্রেপ্তার করিয়া পরে বৃটিশ এলাকায় মথুরায় আনিয়া মুক্তি দেওয়ায় এক জটিল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে।

মিশরের ওয়াফদ দলের সভাপতি মুস্তাফা নাহাস পাশা আগামী ত্রিপুরী কংগ্রেসে যোগদানের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন।

লণ্ডনের ভূতপূর্ব্ব চেকোশ্লোভাক রাষ্ট্রদূত মঃ জান মাসারিক পদত্যাগ করিয়া আমেরিকায় গিয়াছেন তিনি "নিউ ইয়র্ক" টাইমস"এর নিকট এক বিবৃতিতে বলেন, "চেকোশ্লোভাকিয়াকে জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং উচ্ছৃংখল গবর্ণমেণ্ট এখন চেকোশ্লোভাকিয়া শাসন করিতেছে।"—এই বিবৃতির জন্য মঃ জান মাসারিকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে বলিয়া চেক গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন।

১২ই ফেব্রুয়ারী—

জয়পুর দরবারের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করায় শেঠ যমুনালাল বাজাজকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁহাকে মাউসার ডাক বাংলোয় রাখা হইয়াছে। শেঠজীর ভগ্নী শ্রীমতী গোলাপ বাঈ জয়পুর রাজ্যের মধ্য দিয়া শিকারে গিয়াছেন। শ্রীমতী গোলাপ বাঈ সম্ভবতঃ সেখানে প্রজামণ্ডল আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবেন।

আসামের অবশিষ্ট কমিশনারের পদ তুলিয়া দিবার জন্য আসামের বড়দলুই মন্ত্রিসভা যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, গবর্ণর স্যার রবার্ট রীড পরীক্ষামূলক হিসাবে তাহাতে সম্মত হইয়াছেন।

কাণপুর দাঙ্গা সম্পর্কে সংবাদে প্রকাশ, মোট ২৪ জন নিহত হইয়াছে এবং দুই শত লোক আহত হইয়াছে। নিহতদের মধ্যে ১৫ জন হিন্দু এবং ৫ জন মুসলমান। একজন মুসলমান স্ত্রীলোক ছোরার আঘাতে নিহত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত মোট পাঁচ শত লোক গ্রেপ্তার হইয়াছে। হাসপাতালে ১৯ জনের মৃত্যু হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ১৫ জন হিন্দু এবং ৪ জন মুসলমান। দাঙ্গার অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। পুলিশ এবং সৈন্যদল দাঙ্গার এলাকায় টহল দিতেছে। চমনগঞ্জ, মুলগঞ্জ এবং আনোয়ার প্রভৃতি মুসলমানপ্রধান স্থান এবং নয়াগঞ্জ, গোয়ালটুলি জেনারেলগঞ্জ প্রভৃতি হিন্দুপ্রধান স্থানে বিশেষ হাঙ্গামা দেখা যাইতেছে।

১৩ই ফেব্রুয়ারী—

বর্দ্ধমান দামোদর ক্যানেলকর অতিরিক্ত বর্দ্ধিত হওয়ায় ক্যানেল অঞ্চলের কৃষকগণ তাহার প্রতিবাদে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছে। স্বেচ্ছাসেবক দল গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া যাহাতে ক্যানেল কর না দেওয়া হয়, তজ্জন্য প্রচারকার্য্য চালাইতেছে। বাঙলা সরকার কর্ত্তৃক এই আন্দোলন দমন করিবার উদ্দেশ্যে আসানসোল মহকুমা ব্যতীত সমগ্র বর্দ্ধমানে সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ৭ম ধারা জারি করা হইয়াছে। দামোদর ক্যানেল ডিপার্টমেণ্ট হইতে হাজার সার্টিফিকেট জারী করা হইয়াছে। কর্ম্মচারীরা সকল সার্টিফিকেট লইয়া পুলিশ বাহিনীসহ গ্রামে গ্রামে যাইতেছে। যাহারা কর না দিবে তাহাদের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। জরুরী প্রয়োজনের জন্য দুইশত গুর্খা সৈন্যও প্রেরিত হইয়াছে।

কাণপুরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। এ পর্য্যন্ত ৩০ জনের অধিক নিহত, তিনশত জন আহত এবং মোট পাঁচ শত লোক গ্রেপ্তার হইয়াছে। উন্মত্ত জনতার উপর পুলিশ আটবার গুলী চালনা করে। শহরের দোকান-পাট বন্ধ আছে এবং সর্ব্বত্র আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। পুলিশ এবং সৈন্যদল দাঙ্গার এলাকায় টহল দিতেছে। দুইজন কনেষ্টবল এবং কোতোয়ালীর স্টেশন অফিসার আহত হইয়াছেন।

কেন্দ্রীয় পরিষদের স্যার টমাস ষ্টুয়ার্ট ১৯৩৯-৪০ সালের রেলওয়ে বাজেট পেশ করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় যে ১৯৩৮-৩৯ সালে মোট উদ্বৃত্ত হইয়াছে দুই কোটি পাঁচ লক্ষ টাকা। প্রথম বাজেট বরাদ্দ অনুসারে আড়াই কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ সালের বাজেট বরাদ্দে ২ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত দেখান হইয়াছে।

অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে সি [illegible] এজলাসে দৈনিক বসুমতীর সম্পাদক শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এবং মুদ্রাকর শ্রীযুত শশিভূষণ দত্তের বিরুদ্ধে উক্ত পত্রিকার ১৯৩৮ সালের ১৮ই ডিসেম্বর সংখ্যায় "নানা কথা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করার অভিযোগে দণ্ডবিধির ১২৪ক (রাজদ্রোহ) ধারানুযায়ী এক মামলা দায়ের করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করিয়াছেন।

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু বিমানযোগে কলিকাতা হইতে এলাহাবাদে গমন করেন। সেখানে আনন্দ ভবনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সহিত গোপন আলোচনার পর তিনি গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ওয়ার্দ্ধা রওনা হইয়া গিয়াছেন।

আয়ার গবর্ণমেণ্ট জেনারেল ফ্রাঙ্কোর গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।